[২৭শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড]

সম্পাদক—শ্রীযামিনীমোহন কর

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৭শ বর্ষ] ১৩৫৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

সূচিপত্র

সূচিপত্র

—ভলো ঠাকুর

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—কার্ত্তিক ঃ ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড ঃ ১ম সংখ্যা

কলিকালের কোন্ ভক্তি ?

'ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

সে দিন তোমায় যা বল্লুম—ভক্তির মানে কি—না কায়মনবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় ;—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা ; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা।

কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। এ আমিতে অজ্ঞান করে না ; বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ আমি আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয় ; অন্য শাকে অসুখ হয় ; কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয় ; উল্টে উপকার হয় ; মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয় ; অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম।

প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হলে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম

(সৌন্দর্য্য ও প্রেম-রচনার কয়েকটি ছিন্ন অংশ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিঁকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ের জোর; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

* * *

মনের মিল

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ-বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার "মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলেই তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভালবাসিতাম না।

* * *

আমরা সুন্দর

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর, সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি; কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

* * * *

সুন্দর সুন্দর করে

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমেই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় ঘৃণায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চুণকালী মাখাইয়া তাহার রাজপথে

ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

* * * *

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্য কেবল মাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভাল করিয়া থাকা। সত্য শিব না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্য-জীবনে সত্য, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

* * * *

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য-ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষ্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব-চরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহ-হস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর। তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক।"

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্-গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারি দিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে।

—ভারতী, আষাঢ়, ১২৯১

সার এলিজা ইম্পে

[ইনি সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, হেষ্টিংসএর বন্ধু, অপবিচারে ইনিই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দেন]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নাইট তুমি?
বলতে ঘৃণায় জিহ্বা নাহি সরে,
এমন নিঠুর ব্যঙ্গ কি কেউ করে?
বিচারপতি? একেবারে বিচার-বুদ্ধি-হীন
মন ও মনোবৃত্তি কি মলিন!
'জেফ্রি' তোমার স্বগোত্রীয়, নরপশুর দল—
কলঙ্কিত করলে ভূমণ্ডল।
লিখ্‌লে অতি-পক্ষপাতে দুষ্ট তোমার মন
'রাব' না বিয়োগান্ত প্রহসন?

সুপ্রিম আদালতের তুমি সুপ্রিম কলঙ্ক
মূর্ত্ত পাপ ও নির্লজ্জ দম্ভ!
(মূর্ত্ত পাপ ও নির্লজ্জ দম্ভ)
নাই মহারাজ নন্দকুমার, তুমিও আজ নাই
তোমার পচা গন্ধ শুধু পাই।
দুই জনাতে কতই প্রভেদ—বুঝবে যে হোক কেহ
কতই খাটো! কতই তুমি হেয়!
ইতিহাসের পাতায় তোমার নামের অপচার
জগৎবাসীর নামায় যে থুৎকার।

হয়েছে যে চৌষট্ট কলার মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম এবং এই চিত্রকলার চর্চা প্রাচীন ভারতে নারীদের রীতিমত করতে হত। এছাড়া প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থ "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণে" প্রায় আটটি অধ্যায় জুড়ে কেবল চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য্যের আলোচনা করা হয়েছে। এই "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণ" ডাঃ ব্যুলরের মতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রচিত। এর মধ্যে "রঙ" (Colours) সম্বন্ধে অধ্যায়টি ভরতের "নাট্যশাস্ত্র" থেকে একেবারে হুবহু নকল করা হয়েছে দেখা যায়। তা ছাড়া "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থের অনেক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে চিত্রকলার এই সব সূত্রগুলি প্রাচীন কলা-শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, "বিষ্ণুধর্ম্ম-মহাপুরাণ" বা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" রচনার পূর্ব্বেও কয়েক জন কলাশাস্ত্রবিদ্ চিত্রকলা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অবশ্য এই সব প্রাচীনতম চিত্রকলা-শাস্ত্রের কোন চিহ্ন আজও পাওয়া যায়নি, যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" উল্লেখযোগ্য। এই "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় হল "চিত্রকলা", এবং রচনা-কাল সপ্তম খৃষ্টাব্দ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও চিত্রকলা

পুরাণবিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন, "বিষ্ণুধর্ম্ম-পুরাণ" চতুর্থ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত। এ কথা আগেই বলেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে" যে ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে তা থেকে এইটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতীয় চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ না হলে এত উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকলা-শাস্ত্র কলাবিদ্‌দের দ্বারা রচনা করা সম্ভব হ'ত না। চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য এখানে আমরা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" থেকে উদ্ধৃত করে দেব। পুরাণকার বলছেন :

"সকল কলার শ্রেষ্ঠ হল চিত্রকলা। ধর্ম্ম, আনন্দ, ঐশ্বর্য এবং মুক্তির প্রতীক চিত্রকলা।"

"বাতাসের গতির তালে তালে পরিবর্তনশীল তরঙ্গ, অগ্নিশিখা ধোঁয়া ও উড়ন্ত মেঘের রূপ যিনি চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।"

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (৪৩) ২৮ ও ৩৮

হাজার হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই যে ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ শুরু হয়েছে তার প্রমাণ আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে যথেষ্ট পাওয়া গেছে। মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পার চিত্রমূর্ত্তি থেকে ভারতীয় চিত্রকলার বয়স খৃষ্ট-পূর্ব্ব তিন হাজার বছর পর্য্যন্ত টানতেও কোন বাধা নেই। মাটির নানা রকম ভাণ্ড পাত্র থেকে শুরু করে পাথরের ফলকে খোদাই করা লতাপাতা জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখলেই বোঝা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমাদের এই ভারতবর্ষেও মানুষ আদিম কাল থেকেই প্রত্যক্ষ বাহ্য প্রকৃতিকে রঙে রূপায়িত করতে চেয়েছে। আদিকালের এই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ পরে "চিত্রকলায়" (Art of Painting) পরিণতি লাভ করেছে।

চিত্রকলা-শাস্ত্রের প্রমাণ

ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীনত্ব অনেকটা প্রাচীন চিত্রকলা-শাস্ত্র থেকেও অনুমান করা সহজ হয়। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রের" মধ্যে বলা
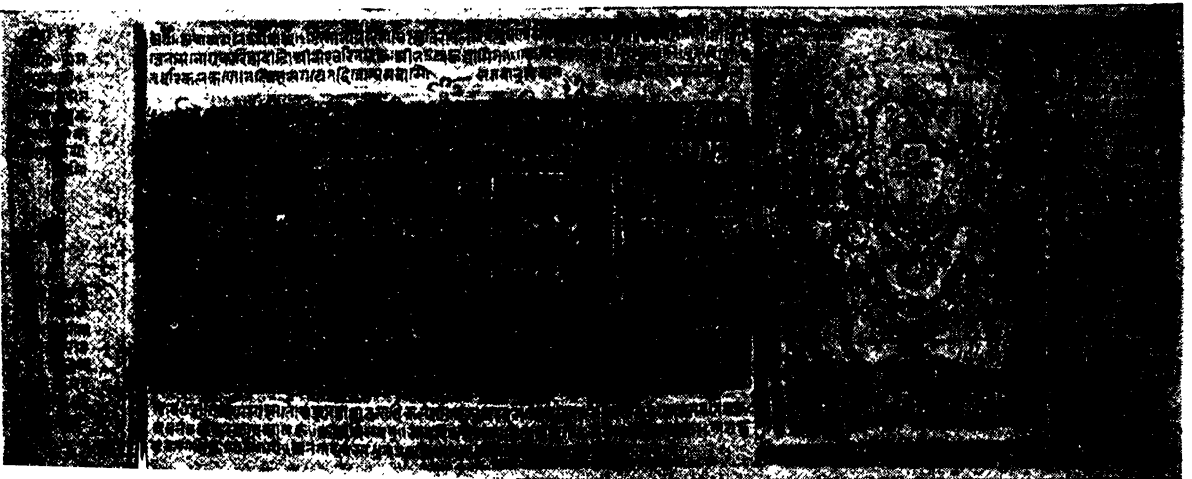
ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশ

রূপানন্দ গুপ্ত

"শিল্পী যাঁরা তাঁরা চিত্রের রেখার বিচার করেন, কলা-রসিক যাঁরা তাঁরা বর্তনার (display of light and shade) নারীরা অলঙ্কার পারিপাট্যের এবং লোকসাধারণ বর্ণাঢ্যতার বিচার করেন।"

এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে শক্তিশালী প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী যিনি, তিনি প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ও জীবনকেই যে চিত্ররূপ দিতে সক্ষম হবেন তা নয়, তাঁর তুলির আগায় বাত্যাহত তরঙ্গের নৃত্য, অগ্নি-শিখার কম্পন, ধোঁয়ার অস্পষ্টতা এবং উড়ন্ত মেঘের গতি পর্য্যন্ত ধরা পড়বে। চিত্রকলার বিচার ও রসাস্বাদন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে শিল্পী যাঁরা তাঁরা যে-কোন চিত্রের রেখার গতি বিচার করবেন এবং তাই দিয়ে সেই চিত্রের উৎকৃষ্টতা যাচাই করবে। যাঁরা কলা-রসিক তাঁরা উপভোগ করবেন চিত্রের বর্তনা অথবা আলো-ছায়ার খেলা। নারীরা মোহিত হবেন চিত্রের অলঙ্করণে (Ornamentation) এবং প্রাকৃত জনের কাছে বর্ণাঢ্যতারই (Richness of colours) আবেদন হবে সব চেয়ে বেশী।

এছাড়া "বিষ্ণুধর্মোত্তরে" চিত্রকে সাধারণ ভাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে:

সত্য (true to life)
বৈণিক (lyrical)
নাগর (common)
মিশ্র (mixed)
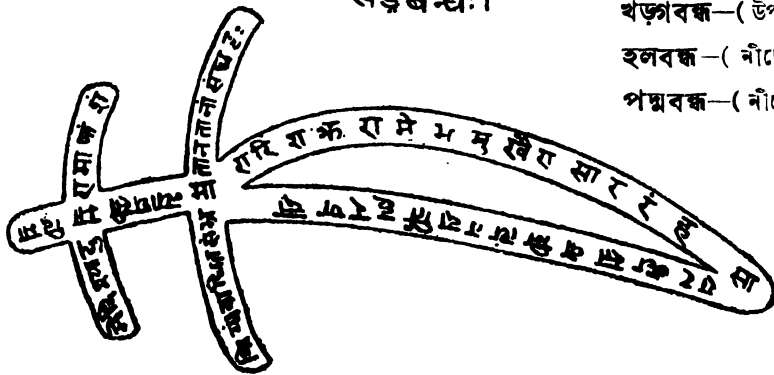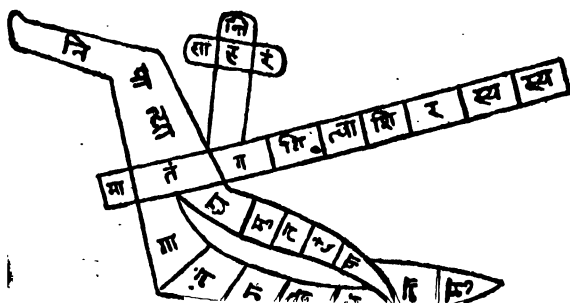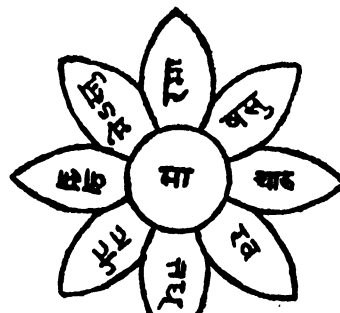
প্রত্যক্ষ জীবনের সুসমঞ্জস চিত্রায়ণকে "সত্য চিত্র" বলে। "বৈণিক চিত্রের" বিশেষত্ব হল গীতিধর্ম্মিতা, অর্থাৎ কল্পনা-ঐশ্বর্যাই তার অন্যতম গুণ। "নাগর চিত্র" সাধারণ নাগরিকের উপভোগ্য, সুতরাং সূক্ষ্মতার চেয়ে স্থূলতাই কতকটা তার বৈশিষ্ট্য। "মিশ্র চিত্র" হল এই তিনের গুণসমন্বয় (৪১ অধ্যায়, ১—১৫)। মূর্ত্তিচিত্রের (figures) বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে (Positions) নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ঋজ্বাগত (Front view)
অনৃজু (Back view)
সাচীকৃতশরীর (Bent, profile view)
অর্দ্ধবিলোচন (Face in profile, body in three quarter profile)
পার্শ্বাগত (Side view)
পরাবৃত্ত (Head and shoulder belt turned backwards)
পৃষ্ঠাগত (Back view, upper body partly visible in profile)
পরিবৃত্ত (Body sharply turned back from waist upwards)
সমানত (Back view, squatting position, body bent) (৩৯ অধ্যায়, ১—২২)

খড়্গবন্ধ—(উপরে)
হলবন্ধ—(নীচে—বামে)
পদ্মবন্ধ—(নীচে—ডাইনে)

"শালিভদ্রমহামুনিচরিত" গ্রন্থের চিত্র

এর পর আরও তের রকমের মূর্ত্তি-ভঙ্গিমার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি যে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। মূর্ত্তির এই বিভিন্ন ভঙ্গিমার রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, চিত্রশিল্পী "ক্ষয়" "বৃদ্ধি" (Fore-shortening) ও "প্রমাণ" (Proportion)—এই তিন কৌশলের সাহায্যে বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মূর্ত্তির এই ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্যকে চিত্ররূপ দিতে পারেন। বিশেষ করে, চিত্রের বর্তনা (Shading) সম্বন্ধে যে নির্দেশ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তা পড়লে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হতে হয়। বর্তনা সম্বন্ধে, অর্থাৎ চিত্রে আলো-ছায়ার রূপভেদ ফুটিয়ে তোলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শিল্পীরা প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে এই কাজ করতে স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন:

পত্রজ (Cross line)
ঐরিক (Stumping)
বিন্দুজ (Dotting)

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও বর্ণসংযোজনা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। যাই হোক্, মোটামুটি আলোচনার এই ধারা থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে চিত্রকলার চর্চ্চার রীতিমত উন্নতি হয়েছিল। তা যদি না হত তাহ'লে চিত্রকলা সম্বন্ধে এই শ্রেণীর তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হত না। "বিষ্ণুপুরাণের" রচনা-কাল চতুর্থ খৃষ্টাব্দ বলেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কিন্তু এই পুরাণের চিত্রকলা বিষয়ক অংশের রচনা-কাল তাঁরা সপ্তম খৃষ্টাব্দ বলে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ অজন্তার শেষ যুগের সমসাময়িক রচনা হল এই চিত্রকলাশাস্ত্র।

গ্রন্থচিত্রণ (Book-illustrations)

ভারতীয় চিত্রকলার মতনই ভারতীয় গ্রন্থচিত্রণ (Book-illustrations) প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। চিত্রকলার সমবয়স্ক যে গ্রন্থচিত্রণ তাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ কথা ভাবাই যায় না যে, চিত্রকলার যখন এ রকম আশ্চর্য্য চর্চ্চা ও বিকাশ হয়েছে এ দেশে তখন গ্রন্থচিত্রণ একেবারেই প্রচলিত হয়নি। ইতিহাস, পুরাণ, শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি চিত্রিত করার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই রচয়িতা-শিল্পীরা অনুভব করেছিলেন। ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র অথবা কাগজ, যাতেই পুরাণ, শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি রচিত হ'ক না কেন, প্রত্যেকটাতেই চিত্র-শিল্পীদের পক্ষে চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভবপর। বিশেষ করে, কাগজের প্রচলনের পর থেকে গ্রন্থচিত্রণের প্রচলনও যে রীতিমত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই যে এই ভারতবর্ষে গ্রন্থচিত্রণ প্রচলিত ছিল তা আজও এ দেশের জ্যোতিষীদের (Astrologers) কোষ্ঠীরচনা (Horoscope) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কাশ্মীরের জ্যোতিষীরা, এমন কি অন্যান্য প্রদেশের জ্যোতিষীরাও কোষ্ঠীরচনার সময় গ্রহ-উপগ্রহের রঙিন চিত্র নিজেরাই আঁকেন। তাই যদি হয় তাহ'লে আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন যুগে রচিত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষায় চিত্রিত পাণ্ডুলিপি (Illustrated Manuscripts) খুঁজে পাওয়াও বিচিত্র নয়।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর মতন কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "Indian art has never developed book-illustrations as such" এবং যদিও বা এক-আধটা গ্রন্থচিত্রণের নমুনা এখানে-সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়, "the illustrations take the form of square panels applied to the page with-out organic relation to the text."—(Dr Coomer-swamy: Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Art, Boston)। অর্থাৎ ডাঃ কুমারস্বামী বলেন, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় গ্রন্থ-চিত্রণের বিশেষ কোন দান নেই। চিত্রিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। যা-ও বা পাওয়া যায় তার মধ্যে চিত্রের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিশেষ দেখা যায় না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তার চিত্ররূপ পরস্পর-

[illegible] ... এই অভিমত ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী

প্রমুখ পণ্ডিতেরা যথার্থ ও সঙ্গত বলে বিবেচনা করেন না (ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রীর "Indian Pictorial Art as developed in Book-illustration" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এ কথা ঠিক অবশ্য যে "কল্পসূত্রের" মতন গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও নৃত্যের যে চিত্ররূপ দেখা যায় তা ভরতের "নাট্যশাস্ত্রেরই" উপযোগী, "কল্পসূত্রের" বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের চিত্রের ক্ষেত্রে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ভাষায় রচিত চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের অভাব ভারতবর্ষে নেই এবং এই সব পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের চিত্রগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করেই অঙ্কিত। এক কথায় বলা যায়, চিত্রগুলি বিষয়বস্তুরই চিত্ররূপ। "শ্রৌত শাস্ত্রের" যজ্ঞের বেদী ও উৎসর্গের দ্রব্যাদির যে চিত্র, "চরকসংহিতার" অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের যে চিত্র, বিভিন্ন "শিল্পশাস্ত্রের" মধ্যে মারণাস্ত্রাদির যে চিত্র, চক্রব্যূহ দুর্গ-প্রাকার প্রাসাদ ইত্যাদির যে চিত্র, তা নিশ্চয়ই গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এছাড়া প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য-নাটক, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতগীতা, গীত-গোবিন্দ, কামশাস্ত্র অনঙ্গরঙ্গ, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদিতে যে প্রচুর চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় তা বিচ্ছিন্ন বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার কোন কারণ নেই।

প্রাচীন ভারতের চিত্রকাব্য

প্রাচীন ভারতের চিত্রকাব্যগুলিই গ্রন্থচিত্রণের সব চেয়ে বড় নিদর্শন। "পদ্ম" "খড়্গ" ইত্যাদি বিভিন্ন "বন্ধে" কি ভাবে কাব্য রচনা হবে এবং আবৃত্তি করা হবে তা চিত্রিত করে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বুঝিয়ে দিতেন। এই ভাবে চিত্রের দ্বারা পাঠকদের কাব্যপাঠের নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতেন। বিশ্বনাথ-রচিত "সাহিত্যদর্পণ" তার একটা অন্যতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

রামায়ণ, মহাভারতের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারে রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের এই চিত্রগুলি আদৌ বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত চিত্র নয়, মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বরোদার "ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে" ভাগবতগীতার দশম অধ্যায়ের একটি অতি সুন্দর চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। ভাগবতগীতার এই চিত্রগুলি মুঘল-রীতিতে আঁকা এবং কলা-কুশলতাও তার মধ্যে যথেষ্ট আছে। "গীতগোবিন্দের" চিত্রিত পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে, তার মধ্যে দু'টি পাণ্ডুলিপিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি উড়িষ্যা থেকে পাওয়া গেছে, তালপত্রে লেখা ও আঁকা, আর একটি কাশ্মীর থেকে পাওয়া গেছে, কাগজে লেখা ও আঁকা। কামশাস্ত্রের কয়েকটি পাণ্ডুলিপিও চিত্রিত আকারে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে "অনঙ্গরঙ্গ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক শাস্ত্রের চিত্রিত পাণ্ডুলিপিও অনেক পাওয়া গেছে, যার মধ্যে দেবদেবীর ধ্যানমূর্ত্তি, কুণ্ডলিনী পদ্ধতি ও বিভিন্ন "মুদ্রার" চিত্ররূপগুলির উল্লেখ না করে উপায় নেই। চিত্রিত জৈন
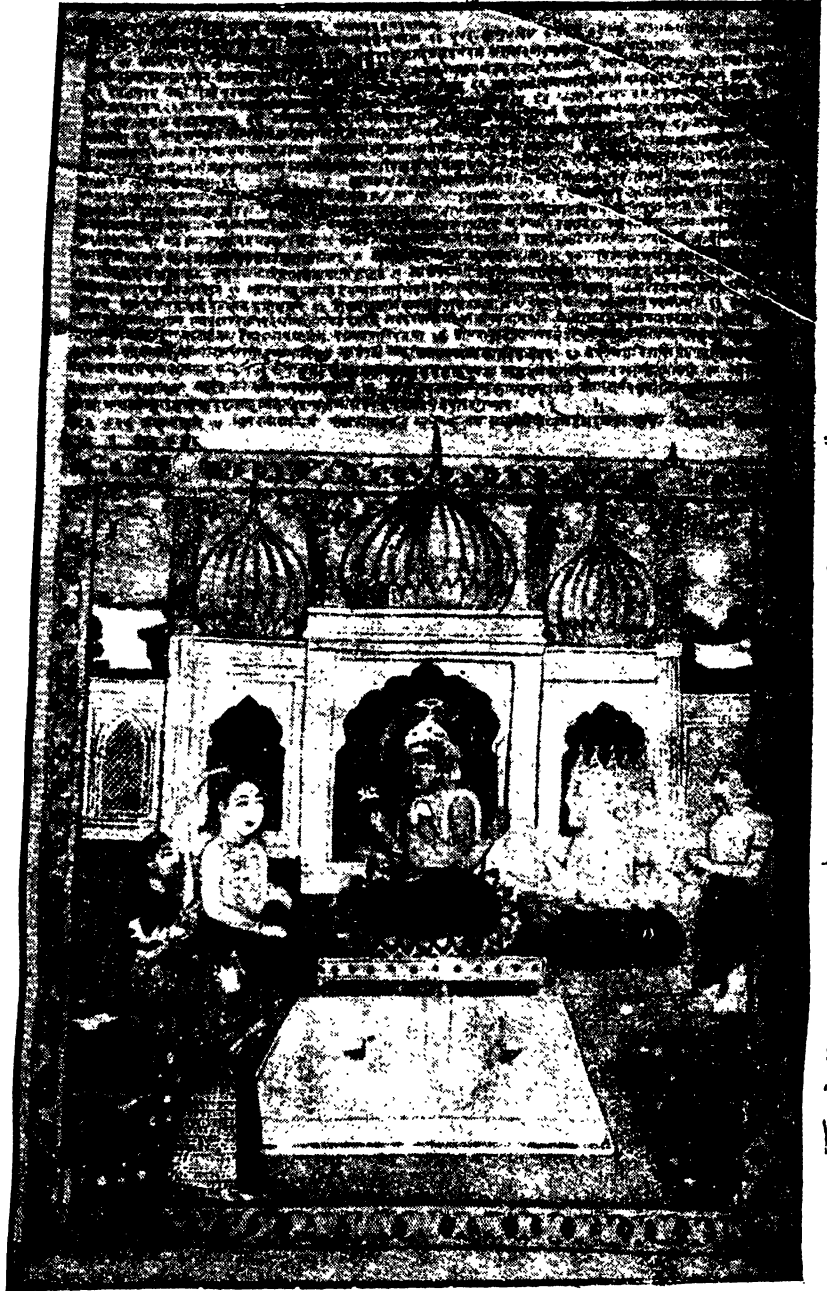
"ভাগবতপুরাণের" চিত্রিত পৃষ্ঠা

ভাগবতগীতার একটি চিত্রিত পৃষ্ঠা

পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভদ্রবাহুর "কল্পসূত্র" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভদ্রবাহু মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই "কল্পসূত্র" গ্রন্থের কয়েকটি চিত্রিত সংস্করণ আজ খুঁজে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন যেটি তার রচনা-কাল সংবৎ ১১২৫ বলে অনুমান করা হয়। এর মধ্যে মহাবীর ও অন্যান্য তীর্থঙ্করদের জীবন-বৃত্তান্ত কাব্যে ও চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। শোনা যায়, বিখ্যাত জৈন-সম্রাট কুমারপাল তাঁর গুরু হেমচন্দ্র সূরির আদেশে এই পাণ্ডুলিপির কয়েকটি কপি স্বর্ণাক্ষরে লিখে বিলি করেছিলেন।

প্রাচীন চিত্রিত হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রন্থ

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত প্রাচীন চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আমাদের দেশে আজ অনেক খুঁজে পাওয়া গেছে। তা'ছাড়াও চিত্রিত হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে তা থেকে গ্রন্থচিত্রণের ঐতিহাসিক ধারার একটা সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। তুলসীদাসের 'রামায়ণের' চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আজও বারাণসীর রাজার কাছে রয়েছে। এই চিত্রিত পাণ্ডুলিপি থেকেই নাগরী-প্রচারণী সভা তুলসীদাসের রামায়ণের চিত্রিত সংস্করণ ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। এই
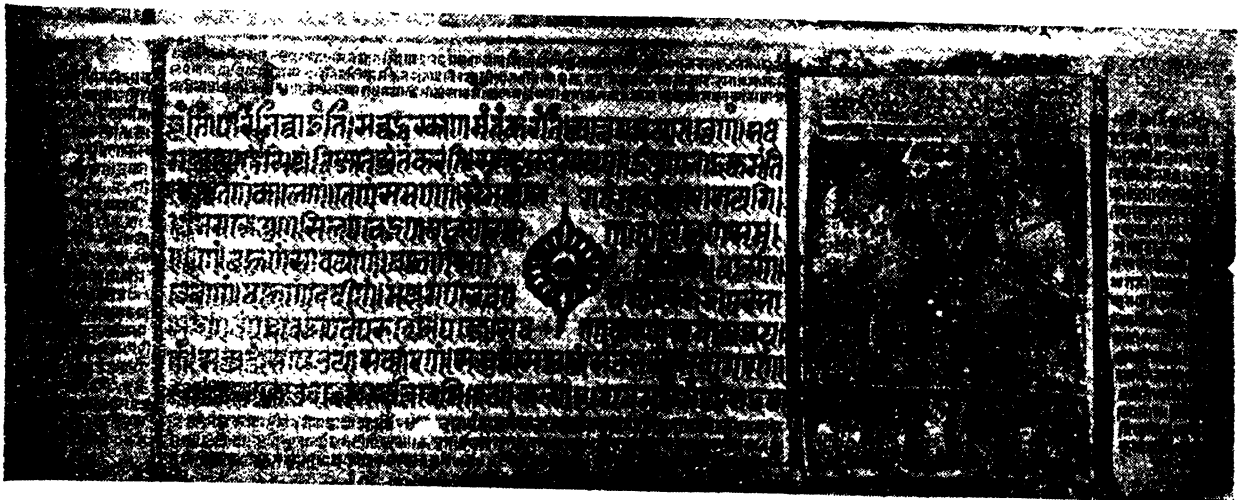
"কল্পসূত্রের" একটি চিত্রিত পৃষ্ঠা

অনুসরণ

সমর ঘোষ

জীবনে জীবনে তোমার আমন্ত্রণ,
শত শতাব্দী লাখো ঠিকানায়
তোমার অন্বেষণ !
কত বালুচরে পাশাপাশি বসে
গড়ে গেছি খেলা-ঘর,
কত ময়ূরের কেকা রব শুনে
কাটানো দ্বিপ্রহর,
ধান্যশীর্ষে সোনালী আলোকে পরস্পরের হাসি
দেখেছি আমরা,—
বলে গেছি ওগো তোমাকেই ভালবাসি !
তাই তো এবার পাঠাই তোমায়
সারা জীবনের ডাক,
তোমার-আমার গানেতে বন্ধু
পৃথিবী সুর মিলাক।
মনে পড়ে প্রিয়া—
সেদিনের সেই রক্ত-পিপাসু দিন—
অসি-ঝঙ্কার : পৃথিবী অর্ব্বাচীন,
ঝড়ের রাত্রি : গর্জ্জমান সিন্ধু : ছিন্ন পাল,
মাঝি দিশাহারা : ঘূর্ণি : ভগ্ন হাল ;
ভীত-কম্পিত যাত্রীর মাঝে
আমরা দু'জনে প্রিয়া—
স্বপ্ন দেখেছি—এলো ঘুম-ভাঙানিয়া,
কত রোমাঞ্চ : চকিত চাহনি : কত না গুঞ্জরণ
উগ্র-মধুর-অলস আলিঙ্গন ?—
মনে পড়ে না কি—
আমি তো ভুলিনি সজীব স্বপ্নজাল !
প্রতিদ্বন্দ্বী ?—
কেউ নেই প্রিয়া তোমাকে করে আড়াল !!
অনন্ত কাল তোমার প্রেমেতে আমি যে জাতিস্মর,—
ঠিকানা চাও তো দিতে পারি—
কবে কোথায়
বেঁধেছি ঘর,
কোন উপবনে
অভিসারিকার হয়েছে পদার্পণ,
কোন সে করবী চম্পক যূথী মাল্য সমর্পণ,—
সব মনে আছে (!)—
যদিও এবার উপবনে খরতাপ,
বন্ধ্যা বসুন্ধরার বুকেতে শোনায় সব—
প্রলাপ ;
জানি এ কথাটি
পরম সত্য : আজিও সন্ধ্যা বেলা :—
মনে হয় যেন তোমার দু'চোখে
মৃদু জ্যোৎস্নার খেলা
তেমনি চলেছে,—
তুমি বসে বাতায়নে
খুঁজিছ-আমায়-নীরবে সঙ্গোপনে।

মহা কাব্যের চিত্রগুলির সঙ্গে কাব্যবস্তুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মোগল যুগের "আকবরনামা" "শাহনামা" ইত্যাদি চিত্রিত রচনার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আর একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সম্প্রতি, যার নাম হল "শালিভদ্রমহামুনিচরিত"। এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিখানি কলিকাতার শেঠ বাহাদুর সিংজীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলিপি রচিত। রচয়িতার নাম পণ্ডিত লাবণ্যকীর্ত্তি. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। পাণ্ডুলিপির চিত্রশিল্পী হলেন আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারের বিখ্যাত শিল্পী শালিবাহন। সমস্ত কাহিনীটি এই পাণ্ডুলিপিতে কাব্যে ও চিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী তাই বলেছেন : "What other proof is needed to show that the pictorial art in India developed in book-illustration as well. ?" (পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ)।

বাস্তবিকই তাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থচিত্রণের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সত্য ব'লে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। গ্রন্থচিত্রণের মধ্যে দিয়েও যে প্রাচীন ভারতে চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে। সুতরাং গ্রন্থচিত্রণ আধুনিক নয়, রীতিমত প্রাচীন। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে এই গ্রন্থচিত্রণের একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য আছে, ধারা আছে। ভারতীয় চিত্রকলার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে তার একটা বিশেষ অবদানও আছে। চিত্রকলার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আজ এ দেশে গ্রন্থচিত্রণের যথেষ্ট উন্নতি হলেও, এই প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত তো নয়ই, বরং তার জন্য গর্ব্ববোধ করা উচিত।

নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের এক শাখায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিচরণ করিবার স্থান পাইয়াছে, ইহাতে আমার আন্তরিক সন্তোষ জানাই। আধুনিক ভারত-ভাষা ও ভারত-সাহিত্যের মধ্যে বাংলার যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, এইরূপ গ্রহণের দ্বারা হয়তো তাহা স্বীকারের প্রয়োজন ছিল। 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'—পুরাতন হইলেই কাব্য শ্রদ্ধার বস্তু হয় না, নূতনের মধ্যেও এমন কিছু থাকিতে পারে যাহা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন ইহা কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্যত স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, আধুনিক ভারত-ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের বিষয়রূপেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাছাড়া যেখানে যেখানে অধিবেশন হইয়াছে সেখানে সেখানে প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগের ও সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়াছেন, অথচ পাটনার অধিবেশন ভিন্ন এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এত দিন দৃষ্টি পড়ে নাই, দৃষ্টি পড়িবার উপলক্ষই হয় নাই। আমি জানি, পণ্ডিত-সমাজে সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতিমান, অদ্য প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, বাংলা-সাহিত্যের এক জন সামান্য সেবক হিসাবে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার এই সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

মিথিলার এই জ্ঞানযজ্ঞে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আমন্ত্রণ তো হইবেই। শুধু ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য, পঞ্চ গৌড়ের অন্যতম বলিয়া, সেন বংশের রাজাদের অধিকার-ভুক্তিতে সমবস্থ বলিয়া, অথবা প্রতিবেশী সূত্রে আবদ্ধ থাকার কথা বলিতেছি না। শুধু "দ্বারবঙ্গের" কথাও নহে—আত্মায় আত্মায় যোগও যে আছে, বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষায়, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে, গোবিন্দদাস ওঝার পদ-সংগ্রহে, বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষায় বাঙ্গালী ও মৈথিলী একই রস-গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী আজ আর মিথিলার হৃদয়ের বস্তু নহে, তাঁহার শৈব পদাবলী, সমাজের অন্তঃপুরিকাদের কণ্ঠে নানা পার্বণে গীত নানাবিধ গান শুনিতে পাই ইহাই না কি মিথিলার আদরের বস্তু, মিথিলা ইহারই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় অধীশ্বর মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর তদানীন্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রকে একখানি মৈথিল পুঁথি উপহার দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিদ্যাপতির সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হন। এদিকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ভাগলপুর অঞ্চলে কৈশোর কাল কাটাইয়া মিথিলার প্রাদেশিক ভাষায় পটুতা লাভ করেন, এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণে হাত দেন। নগেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং দ্বারভাঙ্গা নরেশের ব্যয়ে মুদ্রিত 'বিদ্যাপতি ঠাকুরকি পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খৃঃ অব্দে এবং ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, বাঙ্গালীর ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে উহা প্রকাশিত হয়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নামও এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক বলিয়া স্মরণীয়। কল্পনা-চক্ষে ইহাও দেখা সম্ভব যে, বাংলার রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কৈশোরে কি ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন—বাংলায় ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী অনুকরণ বটে, কিন্তু অনুকরণ তো অনুপ্রাণনেরই একটি রূপ মাত্র। কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া বাংলা ভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টার ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। মৈথিলী সাহিত্যে রত্নোদ্ধারের চেষ্টার ইতিহাসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নেপালে তিনি যখন সংস্কৃত পুঁথি খুঁজিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় কতকগুলি মৈথিলী ভাষায় লিখিত পুঁথিও উদ্ধার করেন; তাহার সহযোগীর চেষ্টায় পরে তাহার মধ্য হইতে একটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত বাবুয়া মিশ্রের সহযোগিতায় ইহার সম্পাদন করেন, এই পুস্তকের নামই 'বর্ণ-রত্নাকর'!

আরও ব্যাপক ভাবে বাঙ্গালীর মৈথিলী চর্চার কথা বলি, ২৮ বৎসর পূর্বে স্যর আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারত-ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন, তখন অন্যান্য ভাষার মত মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যও পড়াইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বহু বাঙ্গালী ছাত্র এই আটাইশ বৎসর ধরিয়া মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্য শিখিয়াছে, কারণ মৈথিলী তাহারা সহজে শিখিতে পারে। ডক্টর সুকুমার সেন বিরচিত 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী'-কথা মৈথিলী কাব্য-সাহিত্যের পরিচয় দানে বঙ্গের সহিত মিথিলার শুভ মিলনের যুগকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছে। লিপি হিসাবেও বঙ্গের ও মিথিলার এক কালে আদান-প্রদান চলিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে এখনও তাহার পরিচয় আছে। মজঃফরপুরের নন্দকিশোর দাস মিথিলায় মৈথিলদের চেয়ে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা কয়েক জন বেশি, এ কথা বলিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে মিথিলার লিপির সহিত বাংলা লিপির মিল ছিল বেশী, এমন কি মিথিলা লিপি হইতে বাংলা লিপি হইয়াছে না বাংলা লিপি হইতে মিথিলা তাহার লিপি পাইয়াছে ইহা লইয়া গবেষণা চলিতে পারে, স্থির করিয়া বলা কঠিন। নবদ্বীপের বিদ্যার্থীরা ন্যায় পড়িতে আসিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে লিপি আমদানি করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন। যাহা হউক, বাংলা দেশে মৈথিলীর চর্চা কি ভাবে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটা সামান্য আভাষ উপরে দিলাম, মৈথিলী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরূপ চর্চা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না, আশা করি, মিথিলার কোনও বিদ্বান লেখক এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত করাইবেন।

আমাদের পরস্পর সম্ভাষণের মধ্যে আজ এই কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,

সুখ্যাত না হইলেও অনেক পরিমাণে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবেরই কথা। রামমোহন রায় হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে ভাবধারা এবং যে রসোত্তীর্ণ রূপ বাংলা সাহিত্যকে এক অভিনব কান্তি প্রদান করিয়াছে, সাধারণ দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যে তাহার ছায়া পড়িলেও, বাংলা-সাহিত্যে তাহার মাধ্যমে বিশেষ করিয়া যে বৈচিত্র্য আসিয়াছিল, অন্য কোন সাহিত্যে সেরূপ কিছু সম্ভব হয় নাই, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল বর্ণ কি শুধু ইংরাজী সাহিত্যে সংস্পর্শজনিত, না স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অর্জিত? যদি ইংরাজী-সাহিত্যের সংস্পর্শ জনিতই হয়, তবে ইংরাজ চলিয়া যাইতেই কি সে মহিমার মুকুট খসিয়া পড়িবে? আর যদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অর্জিত হয়, তবে ত আমাদের ভাবনার কিছুই নাই। যে শক্তি বা উপাদান এত দিন আমাদের সাহিত্যকে বিকশিত করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে, তাহা এখনও করিবে, তাহার ক্রিয়া ত শেষ হয় নাই। বাহিরের প্রভাব কিছু আর চির দিন থাকে না, কিন্তু অন্তরের আলো ত অনির্বাণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কাব্যে, বৈষ্ণব কান্ত পদাবলীর মধুস্যন্দী ভাষায়, ভারতচন্দ্রের চাঁচাছোলা পরিপাটী পদবন্ধে যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যই কি রূপায়িত হইয়াছে মধুসূদনের ওজস্বিনী ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু শতাব্দীর যবনিকা অপসারিত করিয়া ঐতিহাসিক জীবনের পুনর্গঠনে, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য উন্মেষণে ও অভিনব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে? পাশ্চাত্য দৃষ্টি ও পাশ্চাত্য প্রকাশভঙ্গি যতটুকু আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে মিশিয়াছে ততটুকু তো আমরা আয়ত্ত করিয়াই লইয়াছি, তাহা তো আমাদের চিন্তাধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই এখন আর তাহা বর্জন করিতে পারি না। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে ইংরাজ বিদায় লইয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে ভাব-জগতে তাহার চিহ্ন, তাই এই যুগসন্ধটে, এই অব-সম্মেলনের দিনে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি, সনেট, আধুনিক নাট্যরূপ—এ সব কি দু'দিন বাদে ইংরাজী ভাষার মতই আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে, এবং তাহার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন—তখন বাংলা সাহিত্যের এখন যে গৌরব করি তাহা কি আর থাকিবে না? তাহা কি নিতান্তই ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইবে? বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর প্রশ্ন করিবার সময়.আসিয়াছে, এ সব প্রশ্নে জল্পনার ভাব খানিকটা থাকিলেও ইহারা আর নিতান্ত অলীক নহে—পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের গুণাগুণ যে বিশেষ ভাবে জড়িত। এখনই ত এরূপ প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমরা যাহারা বাংলা সম্বন্ধে শ্লাঘা করি, তাহাদের পক্ষে। তাই এখন আমাদের বর্তমানের কৃতিত্ব ও ভবিষ্যতের আয়োজন, দুই-ই বিশেষ করিয়া হিসাব করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন; রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে যাহাই হউক—হিন্দীই হউক অথবা হিন্দী-হিন্দুস্থানীই হউক, বিধান-পরিষদের সদস্যগণ তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন, প্রাদেশিক ভাষার গৌরব খর্ব করার কথা ইহাতে আসে না। প্রত্যেক প্রদেশে তাহার নিজস্ব ভাষাই প্রধান, বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের স্থান বাংলা দেশে নির্ণীত হইবে মাতৃভাষা বলিয়া। বাংলার বাহিরে, ভারতবর্ষের মধ্যে, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় তাহার স্থান নিরূপিত হইবে ভোটের আধিক্যে নয়, তাহার গুণগত উৎকর্ষের ও সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা বিচার করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হিন্দী কথা-সাহিত্যের যশস্বী লেখক প্রেমচন্দ লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে শুধু বাঙ্গালী বলিয়া ধরিলে ঠিক হইবে না, তাঁহারা কোনও এক প্রদেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, তাঁহারা যে সমগ্র ভারতের সম্পত্তি। এই গুণগত উৎকর্ষ কি কখনও সাধনা করিয়া সৃষ্টি করিতে পারা যায়? The wind blowith where it listeth. প্রতিভার আগুন কোথায় জ্বলিয়া ওঠে, তাহার হিসাব তো শেষ পর্য্যন্ত আমরা খতাইয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের হাতে ভুবন পরিচালনের ভার না থাকিলেও আমাদের পরিবেশ তো আমরা সাধ্যমত সৃষ্টি করিতে পারি—আর যদি নিজের নিজের পরিবেশ সক্রিয় ভাবে যথাসম্ভব সৃষ্টি করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সাধ্যমত অগ্রসর হইতেও পারি। একটা মাপকাঠি ধরা যাক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল ১৯৪১ সালে। সেই অনবদ্য সৃষ্টির রক্তিম রাগে আমাদের সাহিত্য-জগৎ এখনও দীপ্তিমান, তথাপি এখন এই কয় বৎসরের মধ্যে দেশে কি বিপুল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে—আর্থিক অস্বস্তির দিক দিয়া, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিক দিয়া জোড়া বাংলা ভাঙ্গার দিক দিয়া ইংরাজ চলিয়া গিয়া দেশের আকার অমনি বদলাইয়া গিয়াছে, আমরা এখনও অনুভব করিতে পরিতেছি না। একটা যুগই শেষ হইয়া গিয়াছে, নূতন যুগ যেন আবির্ভূত হইয়াছে, আমাদের কাছে ইহাদের পটভূমিকা বিস্তৃত হইয়া নাই, গুটাইয়া আছে, পরিপ্রেক্ষিত আমাদের সংকীর্ণ, সেই কারণে পুরাতনের অবসান ও নূতনের আবির্ভাব আমরা যেন এখনও ভাল করিয়া অনুধাবন করিতেই পারি না। তথাপি গুরুতর পরিবর্তনের পথ যেন আপনা-আপনি প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনীশক্তি নিহিত আছে এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহার পরিচয়ও তো আমরা পাইয়াছি—জাগরী উপন্যাসের বিষয় উপস্থাপনের অভিনব আঙ্গিকের মধ্যে যাযাবরের দৃষ্টিপাতের ভঙ্গীতে, অভ্যুদয়ের গীতিকথকতার নৃত্য মাধ্যমে বাঙ্গালী বুঝিয়াছে ও বুঝাইয়াছে যে, এ সাহিত্যে চর্বিত চর্বণের যুগ এখনও আসে নাই, এখনও নূতন বিষয়-বস্তু চিন্তা করিবার, দেখিবার ও ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আছে। অতীতের ধারা তো আমাদের বর্তমানে আছেই, তাহার সন্ততি তো চলিয়াছেই—সঙ্গে সঙ্গে নব নব সুরে নব রাগিণী গাহিবার ক্ষমতাও সে হারায় নাই। তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, বিভূতিভূষণ, মাণিক বাঁড়ুজ্যে ও বনফুল, ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে নূতন লেখকের দল, যাঁহারা অল্প পরিচিত ছিলেন তাঁহারা হইলেন সুপরিচিত, যাঁহারা ছিলেন অপরিচিত তাঁহারা হইয়া উঠিলেন জনপ্রিয়। এরূপ পরিবর্তন ত অবশ্যম্ভাবী—জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তবে না জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। বাংলা দেশে নাটক কেন অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করে না অনেক সমালোচককে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি, এবং উত্তরও আসিয়াছে পরাধীন দেশের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই ইহার কারণ—শুধু নাটকে নয়, সাহিত্যের অন্য বিভাগেও

এই সব বাধা এত দিন ছিল, তবে নাটকের সম্বন্ধেই এই বাধা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বাঙ্গালী এখন নূতন পথ খুঁজিয়া পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যরূপও নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই হইবে স্বাভাবিক। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ইহা ছাড়াইয়া নয়। তবে এই কথাই বলিতে চাই যে, এরূপ আশা পোষণ করার পক্ষে কারণও আছে যথেষ্ট।

প্রাদেশিক ভাষায় গৌরব যে বাড়িবে স্যর আশুতোষ যেন তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনার আর একবার পুনরাবৃত্তি করি। এম-এ, পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইলে একটি প্রধান বা মুখ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রাদেশিক ভাষাও শিখিতে হইবে: বাঙ্গালীকে শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত খুঁটি-নাটি শিখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ভাষাও—হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, যাহাই হউক না কেন—শিখিতে হইবে। তেমনি যাহারা মৈথিল ভাষা মুখ্যত অধ্যয়ন করিবে তাহাদিগকে বাংলা হিন্দী গুজরাতী মারাঠী উর্দ্দ যাহা হউক একটা শিখিতে হইবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা এমন এক দল কর্ম্মী পাইব যাহারা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান তো লাভ করিবেই—সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ভাষার সম্বন্ধেও যাহা কিছু জানিবার তাহা জানিবে। তাহারা অন্য প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিয়া নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিবে এবং নিজেদের ভাষায় যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা অন্য ভাষাভাষীদের নিকট পরিবেশন করিতেও পারিবে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালী, আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া এক বিরাট সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি-আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি—অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের নর-জীবন সার্থক হইবে।" এই ভাবে তিনি যে বাঙ্গালীকে দিয়া নূতন ভারতীয় সাহিত্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আমরা আজ তাহার কিছু করিতে না পারিলেও ভাবিয়া দেখিতে পারি যে, আজ ২৮ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী গুজরাতী মারাঠী তামিল তেলেগু কানাড়ী মলয়ালী সিংহলী আরও কত কি পড়িয়াছে, পরীক্ষাও পাশ করিয়াছে—কোথায় তাহাদের কৃতিত্ব! আজ তো তাহাদেরই অগ্রণী হইবার কথা। আমাদের এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অংশে যে সাহিত্য আছে, আমরা এখনও তাহার পরিমাণ তো দূরের কথা, অস্তিত্বও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। যদি কোন প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু না-ই থাকে, তাহা হইলেও সেই প্রদেশের বা সেই অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য, তাহাদের রুচি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ও বিভিন্ন সাহিত্যের সন্ধান রাখা আজ চারি দিক হইতে আহত জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার মাধ্যমে কি আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি না? বাংলার পক্ষে এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। কথাও নূতন নহে; নববিধানে কেশবচন্দ্র যখন ভক্তদের এক-একটি ভাষা শিখিয়া সে ভাষায় রচিত ধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে বলেন, ও বাংলায় তাহার অনুবাদ করিতে বলেন, তখন তো এই কাজেরই গোড়া পত্তন হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকার ২য় বর্ষের সংখ্যায় এই সাধনারই সূত্রপাত হইয়াছিল। হংস পত্রিকা প্রকাশ, আন্তর্জাতিক পি, ই, এন্ এর ভারতীয় শাখা ও তাহার বঙ্গীয় প্রশাখার দীর্ঘচ্ছন্দে প্রগতি, ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের গঠন সমস্তই ইহার ভিত্তি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আমাদের একমাত্র বলিবার আছে যে, 'ভিৎ তো কাটা হইয়াছে, ইমারত কই?' বাঙ্গালীর পক্ষে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা, ইহাকে প্রাণবন্ত করা, এমন কিছু অসম্ভব বা কঠিন কথা নহে। প্রয়োজন হইল, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মকে সংহত করিয়া তাহাকে রূপ দেওয়ার। ইংরাজী India Pen এর দ্বারা যে কাজ ইংরাজীর মাধ্যমে করা সুকঠিন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাহা সুষ্ঠু ভাবে করিতে পারা কত সহজ! ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বাংলায় একত্র করানো এবং তাঁহাদের দিয়া ভারত-সাহিত্যের পরিচয় দেওয়ানো বিশ্ববিদ্যালয় তো সহজেই করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সামান্য কয়েক জন লেখকের সমবায়েও তাহা সম্ভব। ত্রৈমাসিকী পত্রিকার দ্বারা বাংলা ভাষায় তাহার প্রচার এবং বিভিন্ন ভাষার প্রবেশক, পাঠমালা ও ইতিকথা রচনা ব্যয়বহুল হইবারও কথা নয়।

এই সম্পর্কে আমাদের দেশে প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলি। বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়ার রীতি বহু কাল পূর্বে, ইংরাজী আমলেই, প্রায় এক শত বৎসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। পূর্বে সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনপতি, রাজা-মহারাজের দল, মুসলমানী আমলে উদার চরিত নবাব-বাদশাহেরাও সাহিত্যিকদের কবিদের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজকাল রসজ্ঞ গণপতির উপর সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়ার ভার পড়িয়াছে। সরকারী খেতাব ও মাসিক বৃত্তি ইংরেজ সরকারও দিয়াছেন, তাহা গণনার মধ্যে মানিলাম না। সাধারণের পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-স্মৃতি, শরৎ-স্মৃতি, গিরীশ-স্মৃতি রক্ষার আয়োজন হইতেছে। সরস অর্থনৈতিক রচনার কৃতী অধ্যাপক অনাথগোপাল সেনের স্মৃতিরক্ষার জন্য কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ যে সামান্য আয়োজন করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য—তাঁহারা অনাথ বাবুর লেখার বিষয় ও সরসতার অনুরূপ লেখা বৎসর বৎসর পুরস্কার দ্বারা গ্রহণ করিবেন, পূর্ব হইতেই বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এই কাজ দশ বৎসর চলিবে। ইহাতে দেশের চিন্তাশক্তি বাড়িবে, ও নূতন লেখক উপযোগিতা অর্জ্জন করিবেন, এই হইল তাঁহাদের বিশ্বাস। গিরীশ স্মৃতি দ্বারা নাট্য-সাহিত্যে সমালোচনার ভাণ্ডার কতখানি পুষ্ট হইতেছে, তাহা এ পর্যন্ত গিরীশ-স্মৃতির আয়োজনে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শরৎ-স্মৃতি ও রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্পর্কে শুধু বাংলা ভাষা নয়, ভারতবর্ষের আধুনিক সকল ভাষার মধ্যে প্রতিযোগিতার যে কথা হইতেছে, তাহাতে আমাদের সর্বভারতীয় দৃষ্টি যে ফুটিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ ও সমালোচনা প্রকাশ হইতে থাকিবে, আশা করিতে

পারি। মনন-সাহিত্যের এরূপ পুরস্কার এত দিন আমাদের দেশে ভাবনার অতীত ছিল। এখন দেশের কর্মীদের ও চিন্তানায়কদের এদিকে দৃষ্টি দিতে দেখিয়া মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার এই প্রয়াস সার্থক হইবে, এবং বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর নব নব জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুরূপ পারিতোষিকের আয়োজন কোথায় কোথায় হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া, পুরস্কৃত উপযুক্ত সন্দর্ভের বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়, ইহাও জোর করিয়া বলিতে পারি। কে জানে, নব যুগের সাহিত্যে অগ্রসর হইবার পথে ইহাই হইতে পারে প্রথম সোপান।

বাংলা ভাষার উপযোগিতা বাড়াইবার আর একটা দিক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে তাহার বাংলা "বাঙ্গলা নবলিপি" প্রবন্ধে। যাঁহারা বলেন সব লালে লাল হো যায়গা—সর্বত্র রোমক লিপি প্রচলিত হউক—তাঁহারা অবশ্য প্রাচীন লিপি সমূলে নাশ করিতে চাহিবেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গলিপির সংরক্ষণে যত্নবান তাঁহাদের মধ্যে সংস্কারের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সংস্কার অর্থে বুঝিতে হইবে, পুরাতনের কাঠামো একেবারে বর্জন না করিয়া তাহাকে আবশ্যক মত পরিবর্তিত করিয়া রক্ষা করার কথা। পুরাতনের সংরক্ষণ অথচ নবীনের প্রতিষ্ঠা, প্রাচীন ও নবীনের এই সামঞ্জস্য কি করিয়া হয়? সকল লিপি সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন। অথচ নিত্য প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইতে নিত্য নূতন কিছু উদ্ভাবনের কথা ওঠে। প্রথম বাংলা বই বাংলা দেশে ছাপা হইবার পর, শ্রীরামপুরের মিশনরিরা, বটতলার ছাপাখানার কর্তারা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকলেই প্রয়োজন মত ছাপাখানার টাইপ বদলাইয়াছেন ও বাড়াইয়াছেন। ১৬ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার দেখাইয়াছিলেন (প্রবাসী, ১৩৩১, পৌষ)। বাঙ্গালা কেসে বিভিন্ন প্রকারের টাইপের সংখ্যা ৫৬৩, আর ইংরাজী কেসে ১৬০, অর্থাৎ ইংরাজী কেস অপেক্ষা বাঙ্গালা কেসের টাইপ-সংখ্যা সাড়ে তিন গুণ বেশী। এ বিষয়ের চর্চা যে সাহিত্যের তথা মুদ্রণকার্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, তাহা সাহিত্য-সমাজের মহারথ ও মহামহোপাধ্যায়গণ ভুলিয়াও ভাবেন না—এই বলিয়া অজয় বাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এত দিনের মধ্যে বানানের সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সে নিয়ম কেহ কেহ মানিয়া চলেন, সকলে চলেন না, কারণ আমাদের এখনও ফরাসী একাডেমির মত ভাষার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নাই, থাকা যে সর্বথা বাঞ্ছনীয় এ কথাও অবশ্য স্বীকার করি না। 'আনন্দবাজারে'র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লিনোটাইপের পথ প্রস্তুত করিয়া বর্ণ ও লিপির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কার্যত দেখাইয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় চল্লিশ বৎসর পরে আজ নব্বই বৎসরের উপকণ্ঠে আসিয়া নূতন করিয়া বাংলা বর্ণলিপি সংস্কারের আলোচনা করিয়াছেন—অক্ষরযোজনার দোষ, যুক্তাক্ষরের অস্পষ্টতা, সংযুক্তাক্ষরের সম্পূর্ণ নূতন কলেবর, বাংলা লিপিকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিয়া যে সমাধানে আসিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই চিন্তনীয়। নবলিপির সম্বন্ধে তিনি দাবী করিয়াছেন, যে শিশু দুই বৎসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে পারিবে, এবং ছাপাখানায় বর্তমানে ব্যবহৃত অন্তত ১৬৮ অক্ষরের টাইপের পরিবর্তে ৬৮টি টাইপ রাখিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। এছাড়া তিনি যে সব চিহ্নের তালিকা দিয়াছেন (কমা, সেমিকোলন, প্রভৃতির নাম তিনি দিয়াছেন কলা, কলাবিন্দু) তাহাদের সংখ্যাও ৩৪, এই সকল সুবিধার মূল্য কম নহে। শিক্ষা, সাহিত্য, মুদ্রণকার্য—পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। যদি ভাষার বাধা দূর করা যায়, সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার শক্তি সহজে কাজ করিতে পারিবে, চিন্তাও স্পষ্ট হইবে, প্রকাশভঙ্গীও হইবে জোরালো। এই তো হইল আমাদের বাঙ্গালীদের দিক হইতে বিবেচনা করার ব্যাপার। অন্য দিক দিয়াও দেখিবার আছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশবাসী অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলা-ভাষার আদর নূতন করিয়া দেখা দিতেছে—প্রাদেশিকতার দোষ বর্জন করিবার জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, বাংলা প্রবাসীরা বাংলা দেশকে স্বদেশ ও বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, ঠিক এ সময়ে সাহিত্যিকেরা ও ভাষাবিদেরা প্রয়োজন মত লিপি-সংস্কারে সম্মত হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রভাষার গৌরবময় আসন না পাইয়াও অম্লান গৌরবে বিরাজ করিবে; তাহার মহিমা ম্লান হইবার কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। অক্ষর-সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগে নামাইলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বাংলা আর মোটেই কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। দেশে বিদ্যার বিস্তার সহজসাধ্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গৌরব নিশ্চয়ই বর্ধিত হইবে, প্রসারও হইবে। হয়তো আমাদের রক্ষণশীল মন প্রথমটায় এই ধরণের প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবে, কিছুতেই অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া অন্য ধারা বাহিয়া চলিতে চাহিবে না, কিন্তু বাংলা বানানের নিয়মে অশেষ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও যেমন পরিবর্তন আসিয়াছে, অন্তত এক শ্রেণীর লেখকের অভ্যাসে, তেমনি লিপি-সংস্কারের চেষ্টাও নিকট ভবিষ্যতে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে—কে জানে, আমাদের অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতার। পরিবেশে এরূপ সংস্কার সহজ হইয়াও উঠিতে পারে। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই সংস্কারের প্রস্তাব মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও অনুরূপ চেষ্টা চলিতেছে। রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কয়েক বৎসর হইল নানা প্রকার পরিবর্তন করিয়া দেখিতেছেন, প্রথম শিক্ষার্থীর ভার কতটা লঘু করিতে পারা যায়। গান্ধীজীর প্রভাবে গুজরাতী সাহিত্যিকরাও লিপি-সংস্কার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। দক্ষিণে তামিল ভাষাতেও কালোপযোগী লিপি পরিবর্তনের কথা লেখকেরা ভাবিতেছেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল কাল বলিয়াছেন—No nation's problems can be isolated—কোন জাতির সমস্যাই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। নানা বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সমস্যা সাধারণ, সমাধানও একই ধারা অনুসরণ করিবার কথা। ভারতবাসীর একজাতীয়ত্ব এই দিক দিয়া সন্তোষজনক ভাবেই প্রমাণ করা যায়।

ভবিষ্যতের সাহিত্য যে কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল অনেক মনীষীই কল্পনার ছবি আঁকিয়াছেন। প্রায় আশী বৎসর পূর্বে এমিয়েলও আঁকিয়াছিলেন ভবিষ্যতের ছবি;—" ফরাসী সমালোচক

টেইন (Taine) লিখিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ভবিষ্যতের সাহিত্যের রং হয়তো আমেরিকান ঢং-এরই হইবে—গ্রীক আর্ট হইতে যত দূর সম্ভব অন্য রকমের ; তাহা আমাদের জীবনের অনুভূতি না দিয়া শিখাইবে বীজগণিত, চিত্র বা মূর্ত্তি না দিয়া দিবে ফরমূলা বা মন্ত্র, অ্যাপোলোর দিব্য উন্মাদনার পরিবর্ত্তে বীক্ষণাগারের চুল্লীর বাষ্প। চিন্তার আনন্দের স্থান গ্রহণ করিবে প্রাণহীন দৃষ্টি, আর আমরা দেখিতে পাইব কেমন করিয়া বিজ্ঞান কবিতার গায়ের চামড়া উঠাইয়া কবিতার মৃত্যু ঘটায়, তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে।"

কিন্তু বিজ্ঞান যে সাহিত্যের পরিপন্থী নয়, আমাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় তাহা বহু বার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের সার্থক সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে নিত্যই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" পাতায় পাতায় নূতন লেখকদের কথা বলিবার সহজ সরল ভঙ্গী তাহার প্রমাণ দেয়। এ কথা অবশ্য দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করিব যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিবেশন করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, আজও তাহা কথামাত্রই রহিয়া গিয়াছে, সে কথা অনুযায়ী কাজ তো হয় নাই। যেদিন বাঙ্গালীর শিক্ষায় সত্যকার বিজ্ঞানের স্থান থাকিবে সেদিন সমন্বয়ী ও সহজ চিত্ত-সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালীর মন কখনই বিজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকিবে না, বিজ্ঞানের শিক্ষা তাহাকে বাস্তব ও অতীন্দ্রিয় উভয় জগতেই অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে শিখাইবে, তাহার ভিত্তি থাকিবে স্থূল মাটির উপরে, কিন্তু মন থাকিবে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, তাহার মাথা ভেদ করিয়া উঠিবে দূরপ্রসারী নীল আকাশের চন্দ্রাতপকে বিদেশী ভাষার চাপ যে আমাদের হৃদয়ের উৎসকে কতখানি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এই অল্পকালের মধ্যে তাহার আভাস পাইয়াছি ; মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও স্পষ্ট হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করুক, ইহা প্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

সন্ধ্যাভৈরবী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জীবনের পথে খালি কুড়িয়েছি ধূলো ও কাঁকর,
নিজের হুকুমে আমি সব ক'রে নিজের চাকর!
পথ-শেষে এসে যবে ছাড়িয়াছি যত-কিছু আশা—
ধূলপটে এ কি বাণী—লেখা কার সোনার আখর!

* * *

সোনার অক্ষরে আঁকা বাণী ক্রমে হ'ল মূর্ত্তিমান,
দাঁড়াল সম্মুখে মোর আজন্মের কলস্বপ্নগান।
কণ্ঠে বাজাইয়া বেণু বলিল সে, "হতাশ পথিক!
এসেছ যেদিক থেকে, সেই দিকে কর গো প্রস্থান!"

* * *

"কি আছে সেখানে দেবি? নাই কোন নূতন বিস্ময়।
পরিচিত, পুরাতন—রূপ, রস, গন্ধ সমুদয়।"
হাত দু'টি ধ'রে মোর ছন্দে বলে স্বপনপ্রতিমা—
"ফিরে চল ওগো বন্ধু! সেথা নিত্য নব সূর্য্যোদয়!"

* * *

সূর্য্যাস্ত-প্রদেশ ছাড়ি ফিরি ফের পূর্ব্বাচল পানে।
মানসী বান্ধবী এসে কাছে মোর কহে কাণে কাণে :
"তোমার অন্তরে বন্ধু, থাক্ চিরজীবন্ত প্রভাত,
বন্ধ কভু হোয়ো নাকো অন্ধকার সন্ধ্যার মশানে।"

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

সাত

সমগ্র বিশ্বই পান্থশালা কি না জানিনে—ধর্মশালা যে নয় তা জানি—কিন্তু দার্জিলিংকে মুসাফিরখানা বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এত হোটেল বোধ হয় এদেশে আর কোথাও নেই। কলকাতায় প্রায় প্রত্যেক পঞ্চম দোকানই যেমন ভাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকান এবং প্রত্যেক দশম আপিসই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, দার্জিলিঙেও তেমনি হোটেল আ কয়েক বাড়ী পরে পরেই। সেগুলির বেশীর ভাগেরই অবস্থিতি মনোরম ও ব্যবস্থা সুষ্ঠু। সেগুলিতে বাস করা শাস্তি নয়, স্বস্তি। সেখানে অবস্থান গৃহ থেকে নির্বাসন নয়, আকাঙ্খিত পলায়ন। অতিথি এখানে অবাঞ্ছিত, অনাহুত নয়; আমন্ত্রিত।

সদ্য স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন সাধনের জন্যে চাই প্রচুর বিদেশী মুদ্রা। আমাদের হাতে তার পরিমাণ পরিমিত, আয়ের পন্থাও অগণিত নয়। ষ্টার্লিং এলাকায় আমরা বন্দী। তার বাইরে আমাদের কিনতে হয় আজকের জন্ত খানা, কালকের জন্য কল-কারখানা। কিন্তু কিনব কী দিয়ে? হাতে পয়সা নেই বললে ঠিক হবে না। পয়সা আছে। এমন কি পাউণ্ডও আছে—রিজার্ভ ব্যাংকে না হলেও ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু চাই যে ডলার। ডলারের দেশে পাঠাবার মতো পসরা আমাদের বেশী নেই।

বিদেশী মুদ্রা অর্জন করবার একটা উপায় হচ্ছে পরদেশীকে আমাদের ঘাটে ডিঙা লাগিয়ে পান খেয়ে যেতে প্রলুব্ধ করা। এই টুরিষ্ট ট্রেড এখন বৃটেন সুরু করেছে পরম উৎসাহে। তারও আমাদেরই অবস্থা—ডলার নেই। আমাদের সরকারও টুরিষ্ট ট্রেড সম্বন্ধে সমান উৎসাহী। ভারতের ইতিহাস এদিক থেকে আমাদের পরম সম্পদ। কিন্তু তবু পরদেশীর মন ভোলাতে পারছি কই আমরা? রেলে-ষ্টীমারে যাতায়াতের অসহ্য অসুবিধা যে হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা থেকে ভ্রমণবিলাসীর পক্ষে উৎসাহ সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। রেলওয়ে রিফ্রেস্‌মেণ্ট, রুম এবং ডাইনিং কার থেকে পানীয় নির্বাসন করে নৈতিক সংস্কার সাধনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা থেকেও বিদেশীর ভ্রমণপিপাসা দুর্দমনীয় হয়ে উঠবার কথা নয়। এ সমস্ত আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা উপেক্ষা করলেও ভারতের ভ্রমণ উদ্যোগের প্রধানতম অন্তরায় আমাদের হোটেল-ব্যবস্থা, অর্থাৎ অব্যবস্থা। কয়েকটা প্রাদেশিক রাজধানীর গুটিকয় হোটেলের কথা বাদ দিলে তার বাইরে আবাসযোগ্য একটা হোটেল মেলা ভার। হোটেল নাম ধরে যেগুলি আছে সেগুলি হয় জেল নয় হাজত। কোনো কোনোটা বা দান্তের মহাকাব্যের প্রথমাংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অবস্থার জন্ত দায়ী আমাদের চরিত্রগত স্থাণুতা: এই স্থাণুতার ফল আমাদের দেশব্যাপী হোটেলহীনতা।

দার্জিলিঙের অন্যান্য অনেক কিছুর মতো তার হোটেল-ব্যবস্থাও এই সাধারণ ভারতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম। মরশুমী অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্ত ছোটো বড়ো মাঝারি যত হোটেল আছে তার অধিকাংশই ব্যবস্থাপন্ন। অবস্থাপন্নদের জন্ত আছে মাউণ্ট এভারেষ্ট, উইণ্ডামিয়ার ইত্যাদি। মাথা-পিছু সেখানে দৈনিক দক্ষিণা পঁচিশের

কাছাকাছি। তার নীচের স্তরের জন্য আছে বেলভিউ, সেণ্ট্রাল, সুইস্, ইত্যাদি।

হোটেলগুলির দক্ষিণাও কিন্তু দার্জিলিঙের আবহাওয়ারই মতো পরিবর্তনশীল। শরতে আর বসন্তে যখন জনসমাগম হয় সর্বাধিক তখন মূল্য থাকে শীর্ষে। শীতে আর বর্ষায় বিমুখ অতিথির পকেটের তুষ্টিবিধানের জন্য দক্ষিণার হ্রাস হয়—কলকাতায় যেমন ছিল ট্রামের চাপ, মিডল্ ফেয়ার। কিন্তু সব হোটেল আবার সারা বছর খোলা থাকে না। বেশীর ভাগই মরশুমী ফুলের মতো নির্দিষ্ট ঋতুতে দ্বার খোলে, চোখ মেলে। কুসুমের মাস শেষ হলে নীরবে বিদায় নেয়।

শরতে আর বসন্তে কিন্তু এই হোটেলগুলিতে প্রতিযোগিতার অন্ত থাকে না। প্রতিযোগিতা শুধু হোটেলের মালিকদের মধ্যে নয়, সেগুলির অতিথিদের মধ্যেও। সে প্রতিযোগিতা ব্যবসাগত নয়, শ্রেণীগত। মাউণ্ট এভারেষ্টের কৌলীন্য নেই স্নো-ভিউ বা হিল-ভিউ হোটেলে। অক্টোবরে বা এপ্রিলে তাই ম্যালে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মাউণ্ট এভারেষ্টবাসিনী মিত্রজায়া বসুজায়াকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে বসুজায়া উত্তর দেন, "আর বোলো না ভাই, আমি সেই জুলাই মাস থেকে বলছি যে আগে থেকে লিখে জায়গা রিজার্ভ করো। কিছু না হোক হাজার বার বলেছি। ওর না কি সময়ই হয় না। শেষ মুহূর্তে এসে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে উঠতে হয়েছে—এ!" সম্ভাব্যতার দিক থেকে বসুজায়ার উক্তি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ এমন কথা। একথা বসুজায়ারও অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তবু বলতে হয়। মিত্রজায়াকেও তাঁর অবিশ্বাস গোপন করতে হয় স্মিতহাস্যের অন্তরালে।

এমন অজস্র হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় মরশুমী দার্জিলিঙে, কেন না সেখানে ভ্রমণের জন্যেই তো শুধু যাওয়া হয় না, যাওয়া হয় সামাজিক রীতির অলংঘ্য আইনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে। ইংরেজিতে ওরা যাকে বলে জোন্সদের সঙ্গে সমান তালে চলা, এ বুঝি তারই স্বদেশী সংস্করণ। মিষ্টার মিত্র গেলে মিষ্টার বসুকে যেতেই হবে এমন ধ্রুব নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মিসেস্ বসু এমন একটা গুরুতর বিষয়ে মিসেস্ মিত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন একথা উচ্চারণ করবার মতো হঠকারিতা যার আছে ঈশ্বর তার সহায় হোন!

পুরুষে পুরুষে বৈষম্যের বিভিন্ন মান আছে। পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রসঙ্গও সেখানে অবান্তর নয়। মিষ্টার দত্তর সঙ্গে মিষ্টার সেনের যে প্রভেদ তা প্রধানত এই যে প্রথম জন ক্লাস ওয়ান অফিসার আর দ্বিতীয় জন ক্লাস টু। মিসেস্ দত্তর সঙ্গে কিন্তু মিসেস্ সেনের এমন সুস্পষ্ট প্রভেদ নেই। এ দু'য়ের প্রতিযোগিতায় তাই অন্যান্য প্রসঙ্গের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

তাই হয়তো দত্ত এবং সেনকে ম্যালে দিনের পর দিন দেখা যাবে একই পুরানো বিপুকরা ফ্লানেল আর টুইডে যদিও দত্তজায়ার বেলায় একই শাড়ীতে একাধিক আবির্ভাব একেবারেই অভাবনীয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সাম্য নেই, কিন্তু তাঁদের বিরোধে বেশভূষার মূল্যটা চরম বিচার নয়। দত্ত সেনকে পরাস্ত করতে পারেন চাকরিতে, খেলায়, খ্যাতিতে। সেনের উপর দত্তর যে শ্রেষ্ঠত্ব তা আপন ক্ষমতার দ্বারা অর্জনসাধ্য। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের ফলাফল নির্ধারিত হয় পরস্পরের কর্মক্ষমতার দ্বারা। সাধারণ্যে পুরুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয় তার শৌর্য্য দিয়ে কিম্বা তার মেধা দিয়ে। এ-সংগ্রামে কোনো না কোনো একটা রকমের শক্তি চাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে শক্তি নিজের হতে হয়—ঋণ করা চলে না।

বৈচিত্র-প্রীতির জন্যেই হোক বা অন্যতর কোনো উদ্দেশ্যসাধন মানসেই হোক, প্রকৃতি অবলাকে বঞ্চিত করেছে এই শক্তি থেকে। তার শক্তি মোহিনী শক্তি; বিশেষ বয়সে, সুনির্ধারিত প্রয়োজনে তার সার্থকতা এবং তার সবটুকুই কেবলমাত্র পুরুষের পরে প্রযোজ্য। কোনো মেয়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে না তার কোনো স্বজাতীয়ার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। বরং ঈর্ষাবিষাক্ত কটাক্ষপাতে রূপশালিনীকে ভস্মীভূত করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না তাঁর বান্ধবীবাহিনী।

একমাত্র দেহসৌন্দর্য ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্যের পরিসর নিতান্তই সংকীর্ণ। তাই তাদের মধ্যে দৈনন্দিন সামান্যতার ঊর্ধ্বে প্রতিযোগিতার অবকাশ এত অল্প। সরোজিনী-বিজয়লক্ষ্মীদের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ নারীরই সামাজিক জীবনে স্থান নির্ধারিত হয় প্রথমে পিতৃকুলের কল্যাণে এবং পরে পতিদেবতার সাফল্যে বা অসাফল্যে। তাই তাদের মান আগলে রাখতে হয় অনুক্ষণ অন্তহীন যত্নভরে। ময়ূর পারে তার পুচ্ছকে তুচ্ছজ্ঞান করতে। আত্মবিশ্বাসহীন বায়সের সে সাহস আসবে কোত্থেকে?

চামড়ার তলায় কর্ণেল-পত্নী ও জুডি ও' গ্রেডি যে অভিন্না ভগিনী, এই আত্মীয়তা অস্বীকার করতে কর্ণেলপত্নীর তাই প্রতি পদক্ষেপে জুডিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তিনি যাঁর স্কন্ধলগ্না তাঁর স্কন্ধে একটি ক্রাউন ও দু'টি তারা শোভা পায়। স্বামীর য়ুনিফর্ম পরিধান করে বাইরে বেরুবার উপায় নেই, সব সফল স্বামীর আবার য়ুনিফর্মও নেই। কর্ণেল-পত্নীর মহিমার প্রত্যক্ষ উদ্ভাসনের জন্যে তাই উদ্ভাবন করতে হয়েছে অন্যান্য পন্থা যাতে কখনোই তাঁকে জুডির জুড়ি বলে ভুল না হয়। যে-প্রভেদের অস্তিত্বই নেই তাকে প্রত্যক্ষ করা প্রতিভাসাপেক্ষ।

এই দুর্লভ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয় মিত্র-জায়ার। তাই তন্দ্রা নাহি আর চক্ষে তাঁর—তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, সদা আন্দোলন। মিসেস্ সেন বুঝি মাদুরা থেকে নতুন রকমের একটা শাড়ী আনিয়েছে? তারও দূরে কোথাও থেকে আরো নতুন একটা কিছু না আনা পর্যন্ত মিত্রজায়ার নিদ্রার ঘটল নির্বাসন। মিসেস্ ঘোষ বুঝি প্রাচীন উৎকল থেকে উদ্ধার করেছে আধুনিক গৃহসজ্জার নবীন কি উপকরণ। মিত্রজায়াকে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করতে হয় মোহন-জোদারোয়, আরো প্রাচীন কিছুর সন্ধানে। তাঁর উদ্দেশ্যটা যে একেবারেই অবিমিশ্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এমন বললে পুরো সত্য বলা হবে না।

নিয়ত পরিবর্তনশীল এই ফ্যাশানের অবিরাম প্রতিযোগিতায় অগ্রভাগে থাকতে হলে প্রখরতম দৃষ্টি রাখতে হয় পরিচ্ছদের উপর। সেদিক থেকে দার্জিলিঙের মতো প্রদর্শনীক্ষেত্র ভাবতে দুর্লভ। হেমন্তের শেষে সন্ন্যাসী শীত হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এসে হয়তো বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে বিষণ্ণ করে এবং ঝরা-পাতার ঝড় উড়িয়ে যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ, দিকে দিকে দেয় করি বিকীর্ণ। কিন্তু প্রকৃতির যেখানে শেষ, সেইখানেই তো আর্টের সুরু। প্রকৃতির

যখন নিরাভরণ বৈধব্যের শুভ্রতায় সাজ খসাবার পালা, মানবীর সাজ পরবার সেইটেই প্রশস্ততম ক্ষণ।

পরিচ্ছদ-রচনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাইতে প্রতিকূল ঋতু আর নেই। প্রখর তপন-তাপে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো মানে পা পোড়ানো। তখন কে যাবে বেরুতে বেড়াবার জন্যে? আর বাইরেই যদি না যাওয়া গেল, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা? নির্বাক বহ্নি যখন শুধু মাত্র অন্তরে দহে না, দেহেও, তখন অঙ্গে সামান্যতম আবরণ ধারণ করাই প্রাণান্তকর ক্লান্তি। তার উপর আবার বিলাসের বাহুল্য বোঝাই করবার উৎসাহ থাকে না কারো। গরমের পরে আবার যদি থাকে কলকাতার হিউমিডিটি, তাহোলে পোষাক করতে গায়ে ঝরে ঘাম, আর চোখে জল।

সমতলবাসিনী তাই সারা বছর ধরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন দার্জিলিং আরোহণের প্রতীক্ষিত বাসরের পানে। তখন ডাক পড়ে দর্জির, দোর খোলে ওয়ার্ডরোবের। বেরিয়ে আসে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্রতর বস্ত্রের ভাণ্ডার—ম্যালের বেঞ্চিতে বসে বিস্ফারিত নেত্রে গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ইংরেজিতে যাকে 'ফিগার' বলে, ভারতীয়দের সৌন্দর্যের সেটাই ঠিক forte নয়। ব্যায়ামের স্বল্পতা এবং নিদ্রা ও আহারের অরূপণতার কল্যাণে বেশীর ভাগ ভারতীয়ই মেদ-বাহুল্যে বিব্রত হয় জীবন-মধ্যাহ্নের অনেকগুলি প্রহর আগে। তাই প্রসাধনকারিণীর প্রধান সমস্যা প্রকাশন নয়, লুক্কায়ন; উদ্ঘাটন নয়, আচ্ছাদন।

দার্জিলিঙের শীত এদিক থেকে কুশল রূপায়ণের পরম সহায়। তবু এমন কথা বলা চলবে না যে শৈলবিহারিণীগণ প্রত্যেকেই এই সহজ সত্যটা স্বীকার করেন। প্রকৃতিদত্ত সুযোগ হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে বিদেশিনীদের অনুকরণে তাঁরা যে পরিধেয় নির্বাচন করেন তাতে না থাকে ভূগোলের মান, না রুচির। অধুনা যেটার প্রচলন ভয়াবহ বেগে প্রসার লাভ করছে তার নাম 'শ্যাক্স্'—ট্রাউজারসের স্ত্রী-সংস্করণ। লালিত্য-বিরহিত এই পোষাকটায় সুন্দরীর রূপ বৃদ্ধি পায় না, অসুন্দরীর অকিঞ্চিৎকরতা মুখরা হয়ে লজ্জা বাড়ায় মাত্র।

রূপগ্রহণে আমি আপোষবিহীন অদ্বৈতবাদী নই। কবির মতো সর্বশেষের গানটি আমার কেবল মাত্র কল্যাণী গ্রামবধূর জন্যই রিজার্ভড্, নেই: হলিউডের গড়া ডিভান শায়িতা রূপসীরাও আমার মুগ্ধদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত নয়। মেঘলা দিনে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে আমার হৃদয় যেমন ময়ূরের মতো নাচে, তেমনি আলোকোদ্ভাসিত ব্রডওয়ের প্রশস্ত পথেও সৌন্দর্যের সন্ধান পেলে আমার হৃদয়ে পুলকের অকুলান ঘটবে এমন আশংকা করিনে। কিন্তু অর্থনীতির মতো রূপায়ণেও আমি টেরিটোরিয়্যাল ডিভিশনে বিশ্বাসী। মাদাম্ চিয়াং কাইশেককে শাড়ি-পরিহিতা দেখে মুগ্ধ না হলেও ক্ষুব্ধ হইনে; কিন্তু ক্লদেৎ কোলবেয়ারকে বেনারসী-বিভূষিতা দেখলে নিতান্তই লাঞ্ছিত বোধ করি, যেমন লাঞ্ছিত বোধ করি শ্ল্যাক্সমণ্ডিতা মিত্রজায়ার আবির্ভাবে।

সাধারণ ভাবে এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না পাশ্চাত্য সৌন্দর্যের প্রধানতম সম্পদ হচ্ছে তার Glamour আর আমাদের মেয়েদের গৌরব হচ্ছে তাদের Grace। ওরা ওদের উগ্র ঔজ্জ্বল্য দিয়ে চোখকে ধাঁধায়, এরা এদের স্নিগ্ধ লাবণ্য দিয়ে নয়নকে তৃপ্ত করে। সৌন্দর্যসৌধে অনেক ম্যান্‌সন্ আছে। তাই বুঝতে পারিনে লালিত্যের রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মিত্রজায়া কেন ঔজ্জ্বল্যের কক্ষে ভিখারিণী হতে যান।

কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর পক্ষে রূপচর্চাটা শুধু মাত্র কলাবিচারসাপেক্ষ নয়। শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্নটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছদের দুর্মূল্যতায় আর ঔজ্জ্বল্যে সারা বিশ্বকে এ-কথাটা উচ্চৈঃস্বরেই জানাতে হবে যে ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্বে মিত্রজায়া কারো দস্তানাই কুড়িয়ে নিতে দ্বিধা করবেন না।

কিন্তু মিত্রজায়া তাঁর প্রথম উদ্দীপনাকে দ্বিতীয় চিন্তার পরিণতি থেকে সজোরে রোধ না করলে বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারতেন যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাই সমীচীন হোতো। মিষ্টার মিত্রের সমৃদ্ধির বৃদ্ধির জন্যে নয়, মিত্রজায়ার নিজেরই সম্মান রক্ষার জন্য।

প্রাচীন সমাজে গৃহকর্ত্রীর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গৃহমঞ্চে তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা কেবল মাত্র শোভাবর্ধনেই নিবদ্ধ ছিল না। সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করে অসংখ্য পারিবারিক কর্তব্য সাধন করে তিনি পুনরায় যখন শয্যাগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন রাত্রি আর কিশোরী থাকত না। পরিবার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অংশ ছিল সর্বতোভাবে সক্রিয়—কেবল মাত্র দীন জনের কুটীরে নয়, ধনিজনের ভৃত্যসংকুল প্রাসাদেও। গৃহকর্ত্রীর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতো প্রতি গৃহের নিপুণ পরিচ্ছন্নতায় আর সুস্পষ্ট শুচিতায়। তাঁর কাজ শুধু প্রদর্শন ছিল না। এমন কি শুধু মাত্র পরিদর্শনও নয়। তিনি প্রতিটি কাজে নিয়োজিত করতেন নিজের হাত। আমাদের সকলের মনে মা-ঠাকুমার যে ছবি আছে তা এই ছবি। গৃহকর্ত্রী তখন বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন না কিন্তু সংসার-পরিচালনায় তাঁর কাজ ছিল ফুল-টাইম্ জব।

এদেশের আধুনিকাদের কিন্তু এমন দাবী করবার অধিকার নেই একেবারেই। তাঁদের গৃহকর্মের জন্যে আছে দাসদাসী, শিশু-পরিচর্যার জন্যে আয়া, অন্যান্য কাজের জন্যে অন্যান্য লোক। পরিবার-পরিচালনের কাজে আজকের গৃহকর্ত্রী ঠিক কতটা কাজ করেন তার পরিমাপ করলে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে তার যা মজুরি নির্ধারিত হবে তা দিয়ে গৃহকর্ত্রীর একটি বেলার প্রসাধনেরও খরচ উঠবে না।

কিন্তু আজ যদি মিত্রজায়াকে বলি, ঠিক কিসের বিনিময়ে তিনি মিত্রার্জিত অর্থের অপব্যয়ের অধিকার লাভ করেছেন তাহ'লে মিত্রজায়া শিউরে উঠবেন।

নেপালী মেয়েরা কিন্তু এ-অপবাদ সহ্য করবে না কোন মতেই। কর্মিষ্ঠতায় ও কর্মক্ষমতায় ওরা নেপালী পুরুষদের সমকক্ষ নয়, অগ্রণী। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই দেখা যায় নেপালী মেয়েদের অসাধারণ কর্তৃত্ব এবং অসাধারণ আত্মনির্ভরতা। শুনেছি, এমন পরিবারও বিরল নয় যেখানে স্ত্রীর উপার্জনেই পরিবারের অন্নসংস্থান হয় এবং স্বামীই অলংকাররূপে শোভা পান। নেপালীদের মধ্যে তাই সিভ্যালরাস্ পৌরুষবোধটা ঠিক সার্বজনীন নয়। 'তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল'—এটা স্ত্রীর প্রতি নেপালী পুরুষের উক্তি নয়। তিনি বরং প্রায়শই তুষ্মামত্ত হয়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বলেন, "কেই ফিকর গরম্ম্ পড়দেই না—যো হুনছা দেখা জালা!"

মূল নেপালী উক্তি সমেত স্থানীয় আচারের পরিচয় দান

করছিলেন মিসেস্ রায়, আমার বাসস্থান 'কাঞ্চনজঙ্ঘা কর্ণারের' একচ্ছত্র পরিচালিকা। এটা ঠিক হোটেলও নয়, বাড়ীও নয়। অতিথি এখানে উভয়েরই সুবিধা ভোগ করতে পারেন। একা থাকতে চাইলে নিঃসংগতায় বাধা দেবে না কেউ। নিঃসংগ বোধ করলে মিসেস্ রায়ের হাস্যময়ী উপস্থিতিতে শূন্যতা বোধের নিরসন হয়।

রায় মশাই বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে থাকেন। অতিথির অভাব-অভিযোগ শোনা এবং তার প্রতিকারের ভার তাই মিসেস্ রায়েরই। তাছাড়া ভাষাগত অসুবিধার জন্যও তাঁকেই অতিথি এবং ভৃত্যদের মধ্যে Liaison-য় কাজ করতে হয়। কেউ গরম জল চাইলে মিসেস্ রায় তৎক্ষণাৎ মৃদু কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে "কাঞ্চা" বলে সম্বোধন করে নেপালী ভাষায় আদেশ করেন।

নেপালী ভাষায় অনর্গল কথোপকথনে মিসেস্ রায়ের অদ্ভুত দক্ষতা দেখে প্রথম দিনই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেম, "আপনি এত চমৎকার নেপালী শিখলেন কি করে?"

মিসেস্ রায় উত্তর দেবার আগেই মিষ্টার রায় বললেন, "কিছু নয়। খুবই সোজা ভাষা। বাঙলার সঙ্গে অনেক মিল আছে। আপনি যদি মাস তিনেক থাকেন তো আপনিও অনায়াসে শিখে ফেলবেন।" ইত্যাদি।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' বাংলোটা বৃহৎ নয়। নিজেদের জন্যে একটি মাত্র ঘর রেখে বাকী চারটে তৈরী করেছেন দক্ষিণাদাতা অতিথিদের জন্য। সীজনে ঘরগুলো বড়ো একটা খালি থাকে না, কখনো-কখনো বা উপচে পড়ে। কিন্তু এখন আমি ছাড়া অন্য অতিথি আর নেই। তাই পৌঁছোবার কিছুক্ষণ পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আমার বাক্স-বিছানা সব কিছু খুলে জিনিস-পত্তর বের করে দু'টো পাশাপাশি ঘরে সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো রয়েছে। বিদেশে এমন পরিপাটী ব্যবস্থা আমি নিজে কখনোই করে নিতে পারতেম না। এই সব ব্যবস্থায় যে নিঃসন্দেহে 'ফেমিনিন্ টাচ' ছিল তা অন্ধেরও বুঝতে বাকী থাকে না।

মিসেস রায় একটু পরেই এসে বললেন, "কি? ঘর দু'টো পছন্দ হয়েছে তো?"

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে বললেন, "চলুন, খাবার দেয়া হয়েছে।"

আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে আয়নার সামনে হাত দিয়ে অবাধ্য কেশরাশি নিয়ে উদ্ব্যস্ত আছি দেখে মিসেস রায় হাসছিলেন। চিরুণী আনতে যে ভুল হয়ে গেছে এই কথাটা স্বীকার করতে সংকোচের সীমা ছিল না।

মিসেস্ রায় তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "দাঁড়ান, এখনি একটা কাংগো এনে দিচ্ছি আপনাকে।"

কাংগো? সে কী জিনিস? অন্তর্হিতা মিসেস রায়ের পুনরাবির্ভাবে বোঝা গেল যে তা চিরুণীর চাইতে ভয়াবহ কিছু নয়। কিন্তু কাংগো কেন? চিরুণী নয় কেন? কে জানে!

খাবার-ঘরে গিয়ে দেখা গেল রায় নেই সেখানে। জিজ্ঞাসায় জানলেম যে রায় কাজে গেছেন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। এই অনুপস্থিতি যে রীতিই, ব্যতিক্রম নয়, তা দিন কয়েকের অবস্থিতিতে স্পষ্ট হোলো।

আমার জীবনটা ঠিক শিশুদের অভিনয়োপযোগী একেবারে স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত নাটক নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের প্রিসিডেন্ট নেই আমার অভিজ্ঞতায়। মহিলার আতিথেয়তায় যে নির্ভুল প্রতিভার পরিচয় আছে তা নিখুঁত ভাবে এফিসিয়েন্ট—সামান্যতম অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্যত তর্জনীকে ভৃত্যরা ভয় করে—কিন্তু এই দক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর সুমধুর ব্যবহার। তার মধ্যে স্নিগ্ধ আন্তরিকতার আভাস আছে কিন্তু অত্যধিক অন্তরঙ্গতা নেই। তা শুষ্ক ভদ্রতাই শুধু নয়, কিন্তু আর্দ্র আদর দ্বারাও সে আপ্যায়ন জর্জরিত হয়নি। মহিলার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে গ্রেস্ এবং ডিগনিটির। তাঁর গ্রেস্ অতিথিদের হৃদয় আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর ডিগনিটি রায়কে ক্লিষ্ট করে।

এই ক্লেশ গোপন করতে রায়ের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আগন্তুকের সম্মুখে ওদের দু'জনের ব্যবহারে সামান্যতম সন্দেহেরও কারণ হয় না যে ওরাই বিশ্বের আদর্শ-দম্পতি নয়। রায়কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর আসে, "তাই তো, তা আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মিসেসকে একবার জিগেস করা যাক, কি বলেন? হে হে, তাঁর মতটার খোঁজ নেয়া যাক, হে হে।" এটা যে রুটিন কনসাল্টেশন নয়—বরং ফর ফেভার অব অর্ডারস—তা বোঝা যায় এই থেকেই যে রায়-গৃহিণী কখনো অনুরূপ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁর ডিসীশন সর্বদা জিহ্বাগ্রে। এই দ্বিধাহীন আত্ম-প্রত্যয়ের উৎস যে কী সে তথ্য পরে একদিন প্রকাশিত হোলো।

সেদিন সকালে শীতের দার্জিলিঙে আলোর আভাসটুকুও ছিল না কোনো দিকে। সূর্য ছিল নিরুদ্দেশ। আকাশে কোথাও তার খোঁজ না পেয়েই বুঝি মেঘগুলি নেমে এসেছিল মাটির কাছাকাছি। সঙ্গে এনেছিল এক রাশি দুর্ভেদ্য কুয়াশা। আমি আমার শয্যা থেকে এক মুহূর্তের জন্য গলা বাড়িয়ে জানালার বাইরের রূপহীন, রসহীন, অন্তহীন নকল সন্ধ্যার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাৎ আবার লেপের তলায় অন্তর্হিত হয়েছিলেম। যে-দিনের দিন হয়ে দেখা দেবার সাহস নেই, কাজ নেই অমন দিনকে 'সুপ্রভাত' বলে লজ্জা দিয়ে।

দরজায় আঘাতের উত্তরে 'কাম ইন' বলার আহ্বানে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি রায়-গৃহিণী। এটা যে একেবারে অপ্রত্যাশিত তা নয়। কিন্তু আশাতীত ছিল তাঁর সেদিন সকালের রূপ।

মিসেস রায়কে অসামান্যা সুন্দরী বললে অতিরঞ্জন হবে, যদিও সৌন্দর্যের প্রথম পরীক্ষায়—গাত্রবর্ণে—তিনি অত্যন্ত সসম্মানেই উত্তীর্ণ হবেন। তাঁর বর্ণ শুধু সাদা অর্থে ফর্সা নয়, তার সঙ্গে মেশানো আছে রামধনুর আরো অনেকগুলি রঙ। একটু হাসলেই তারা খেলায় মাতে মিসেস রায়ের আনন ভরে।

সেদিন কিন্তু তাঁর মুখে হাসির আভাসটুকুও ছিল না কোনোখানে চুল ছিল এলোমেলো, স্ফীত চোখে ছাপ ছিল পূর্বরাত্রির নিদ্রা-হীনতার। গায়ের উপর হেলাভরে ফেলা ছিল ফারের ওভারকোট শূন্যগর্ভ হাতা দু'টো দু'দিকে দুলছিল অসহায়ভাবে। দুঃখ মানবের চরিত্রকে উন্নত করে কি না জানিনে, কিন্তু বেদনা যে অনেক সময় নারীর রূপকে গাম্ভীর্যমণ্ডিত করে ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করে তার প্রমাণ সে সকালের মিসেস রায়।

"আচ্ছা, রায় কি আপনাকে কিছু বলেছে? কাল বিকেলে?" নানা মামুলি আলাপের মধ্যে অকস্মাৎ মিসেস রায় প্রশ্ন করলেন।

রায় অত্যন্তই সাধারণ একটি নিরীহ ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় কোনো উক্তি তাঁর কাছে কখনোই শুনেছি বলে মনে করতে পারলেম না, পূর্বদিনের বিকালে তো নয়ই। রায় ভালো লোক, তার সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই। মিসেস রায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিমূঢ় ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "কি সম্বন্ধে বলুন তো ?"

মিসেস রায় চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ, কিন্তু শুধু দুশ্চিন্তার নয়। কেন বলতে পারব না, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে সন্দেহ রইল না যে বেশ গুরুতর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু জানতেম যে জিজ্ঞাসায় কৌতূহলের প্রশমন হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মিসেস রায় উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ছিল বাইরে। যেখানে দৃষ্টি নিষ্ফল। কাকে উদ্দেশ করে জানি না, বাইরের অন্ধ-বধির কুয়াশাকে না আমাকে, মিসেস রায় বললেন, "সেই কাল বিকেলে যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।"

বাক্যটির, এবং কার্যটির, কর্তা যে রায়ই তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কী করতে পারি ভেবে পেলেম না। সাধারণত তিনি কোথায় যান, এরকম বাইরে থাকা স্বাভাবিক কি না, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মিসেস রায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেম কিন্তু তাঁর চিন্তার লাঘব হোলো না একটুও।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "না, না, না। সে সব কিছু নয়। আমি জানি ও আর ফিরবে না।"

ফিরবে না ? কেন ? কিছুই বুঝতে পারলেম না। কোনো কিছু বলার না থাকলে কোন কিছু না বলাই যে সব চেয়ে ভালো তা আমিও জানি কিন্তু তখন মনে ছিল না। একান্ত নির্বোধের মতো বললেম, "তা—তা হোলে তো বড়োই মুস্কিলের কথা।"

"মুস্কিল ? কার ? আমার কথা ভাবছেন ? আমার একটুও মুস্কিল হবে না," মধুরা মিসেস রায়ের কণ্ঠে যে এমন হিংস্রতা নিহিত ছিল জানতেম না, "তবে, তবে ওর একটু মুস্কিল হবে হয় তো।" দাঁতে ঠোঁট কামড়ে যোগ করলেন, "এবং তাতে আমি খুশী বৈ দুঃখিত হবো না।" মিসেস রায় দ্রুতপদে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নির্বোধ-বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেম।

বিকালের দিকে আবার যখন মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা হোলো সকালের ক্রোধ তখন শান্ত হয়েছে। ধুলো উড়িয়ে ঝোড়ো হাওয়া স্তব্ধ হয়েছে, বর্ষণের পালা এবার ; অপমানাহত উষ্মা তখন অভিমানে পরিণত হয়েছে।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মিসেস রায় বললেন, "রায় যখন নেই, আপনি নিশ্চয়ই এখানে আর থাকবেন না ?"

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। নিজের দুঃখের অন্ত নেই, অপরের বেদনা দিয়ে বোঝা বাড়াবার আর ইচ্ছা ছিল না। সকাল থেকেই অজুহাত উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেম ; কিন্তু মিসেস রায় নিজেই যখন সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে নিষ্ক্রমণের পথ এত সহজ করে দিলেন তখন কিছুতেই পারলেম না সেই সুযোগ গ্রহণ করতে। একটু ইতস্তত করে বললেম, "না, না, এখনি যে যেতে হবে এমন কি কথা আছে ?"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালের সেই দৃপ্তা রমণী করুণ, অসহায় মিনতির সুরে বললেন, "সত্যি থাকবেন আপনি আমার এখানে ?"

আমি কী বলেছিলেম মনে নেই। ভয়ানক বীরত্বব্যঞ্জক কিছু নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের মনে তখন বোধ হয় ভাসমান খড়ের টুকরোও অপরিসীম ভরসার সঞ্চার করতো।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডুর হাসির স্নিগ্ধতায় বললেন, "কাল থেকে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে। একটু বেড়াতে বেরুবেন এখন ? আমার তৈরী হতে দু' মিনিটের বেশী লাগবে না।"

উপায় ছিল না এমন অনুরোধ উপেক্ষা করবার। ইচ্ছাও ছিল না। মনে একেবারেই ভয় ছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল মিসেস রায়ের কাছে এবং নিজের কাছে ভীরু বলে প্রতিপন্ন হবার। ইতিহাসের বহু দুঃসাহসিক কীর্তির উৎস অবিমিশ্র ভীরুতা।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত শীতল রাত্রির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অত্যন্ত অল্পপরিচিত দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেম দার্জিলিঙের জনহীন পথে।

কে জানে কি ছিল বিধাতার মনে ! [ক্রমশঃ

—গোপাল ঘোষ

ক্লোরোফরম

শ্রীনক্ষত্র গুপ্ত

ট্যাক্সি থেকে মুখ বের করে হাত নাড়ে। অভ্যাস—অথবা অমনি।

একসঙ্গেই পড়ত। দু'বছর……হতে পারে বছর তিনেক আগে। হয়েছিল জানা-শুনা, মেলা-মেশা—একটু বেন কেমন মাখা-মাখি। ওকে রাণী করে সাজিয়ে দেখবার সাধও যে মনে না উঠেছিল তা নয়। হেনা কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছিল। আবার কিন্তু এক দিন হেনাই আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, তার চাই পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট বাংলো, সে বাংলোয় ঘিরে এক-ফালি সবুজ লনের বেল্ট, আর সে সবুজ আস্তরণের প্রান্তে লাল-হলুদ মরশুমী ফুলের বেষ্টনী—কচি-কলাপাতা রংএর শাড়ীর রঙীন আঁচলের মত। ময়দানে খেলবে ফুটফুটে এক জোড়া খোকা…সে বলেছিল খোকা, অমল বলেছিল খুকু। এ-নিয়ে মিষ্টি একটু মনান্তরও হয়ে গেছিল।

হেনার না কি ফেটে-পড়া রূপ। ছেলেরা তাই বলত। অমলের রূপের বালাই নেই। বিদ্যের চকচকে চাপরাশ দেখে হেনার হয়ত আরদালীর প্রয়োজন হয়েছিল। কালো কষ্টি-পাথরের একটা বিরাট দৈত্য! দরাজ বুকের রোমারণ্য আর রোমশ বাহুর লৌহ-পেশীর আবেষ্টনের বুভুক্ষা হয়ত বা তার হয়েছিল। তাই নিমরাজী হচ্ছিল ক্রমে। আবার ক্রমেই হয়ে পড়েছিল গররাজী। যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—হুঁ, তাতে আনন্দ কি নিরানন্দ ও তা স্থিরই করে উঠতে পারছিল না। মন থেকে অমলের অহমিকা মাথা তুলে বলেছিল—হেনাকে বিয়ে? হতেই পারে না। মনের শাসন তাকে মানতে হয়েছিল।

এর পরও হেনা এসেছে গায়ে পড়ে পিরীতের খেলা করতে—তার কোলের পাপির সঙ্গে যেমন খেলে থাকে হয়ত তেমনি খেলা। অমলের মন তাতে বাধা দিতে হুকুম দিয়েছে—বলেছে—ঢংইলা স্ত্রীলোকটাকে ঘৃণা করতে।……

ট্যাক্সি থেকে চাঁদবদন বের করে হাত নাড়ে—আবার বদনখানিও সরিয়ে নেয়—হাড়মাসের হাতও।

……*প্রেম? ঘরকন্না? মানে দাসখত। ওর আরদালী* *হওয়া। দাও! আরও দাও।*

ট্যাক্সিতে বসে এক রকম চেঁচিয়েই বলে—'দেব না!' ড্রাইভার *মুখ ফিরিয়ে চেয়ে নেয়।*

……ভেতর থেকে কিন্তু কে যেন দিতে চায় সব। আবার কে যেন তার সারা অস্তিত্বটার উপর কর্ত্তৃত্ব করে হুকুম চালিয়ে বলে—'না-হতে পারে না।' সে হুকুমে দাতাটি মাথা লুকোয়। অন্তর হেসে ওঠে হা-হা করে, অদৃশ্য তর্জ্জনী হেলিয়ে বলে—দুর্ব্বলতা। ভুল!

তবু মন বুঝে না, দুর্ব্বলতাই বা কি ভুলই বা কোথায়। অমল বিচার করে সিদ্ধান্ত করে দুর্ব্বলতার হয় কোন মানেই নেই, না হয় অন্তরের এমন এক গভীর তলদেশে ওর ঠাঁই যে জোর করে বুক চেপে রাখলেও ফাঁক পেলেই উঁকি দেয়—আর সে অবগুণ্ঠনের ফাঁক হেনার মুখখানি দেখতে ইচ্ছে করে……

এলিয়ে পড়ে গাড়ীতে! মন এলিয়ে পড়ে হতাশ হয়ে। পাশব প্রবৃত্তিগুলোও নেতিয়ে পড়ে।

পৃথিবীও না কি এমনি নেতিয়ে পড়ছে ক্রমে। ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। অনন্তের দরিয়ার ক্ষুদে একরত্তি পৃথিবী ত একটা বিন্দুর বিন্দু। তারই মধ্যে আবার অমলের প্রাণ। দুনিয়াই যদি গেল ঠাণ্ডা মেরে, তার প্রাণটাও যে পড়বে নেতিয়ে আর ঝিমিয়ে তার আর আশ্চর্য্য কি! ক্ষুদে দুনিয়ার অদৃশ্য কেন্দ্র-কণা ঘিরে একটা ইলেকট্রন যেন অহরহ স্পন্দিত হয়ে ঘূরপাক খাচ্ছে—শূন্যে ছিটকে পড়তেই বা কতক্ষণ।

এই ত বলে তোমাদের কেমিষ্ট্রি আর ফিজিক্স, আর অ্যাষ্ট্রনমি।

তবু চেষ্টা কেন? তবু কেন বেঁচে থাকা?

না বেঁচে যে থাকা যায় না। বাঁচার সাথে না বাঁচার যে পাল্লা চলেছে অমলও যে তাতে যোগ দিয়েছে…

উঃ, কি ঠাণ্ডা। পৃথিবী জমতে বাধ্য। আলোয়ানটা অমল এক হাত দিয়ে জড়িয়ে নেয়।

তবু শীত! শীতের উলটো গ্রীষ্ম। ঠাণ্ডার উলটো গরম। তাপ প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। শীতে প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব। তাপেই আরাম!

একটা জঙ্গলে ছবি দেখতে গেছল অমল আর হেনা। বুনোদের নাচনার যাদু-সুরে প্রেক্ষা-কক্ষের উত্তাপ রীতিমত বেড়ে গেছল। হেনার সুরভি শাড়ীর আঁচল বার-বার অমলের স্কন্ধে স্পন্দিত হয়ে বার-বার জানিয়ে দিচ্ছিল, তার সম্মতি আছে। তার পর এক দিন লেকের সন্ধ্যায় গগনের হাজারো দীপের রোসনাইএ অমল দেখেছে তার মুখ—চেখেছে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি—হাসিতে আবেদন—আবেদনে মৃদু-মৃদু উল্লাস আর মৃদু দুঃখ। দেখেছে—লেকের প্রশান্ত জলরাশি সহসা সচল হয়ে ধীর-মন্থরে বয়ে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক এরও একটা ব্যাখ্যা হয়ত দেবে। তারা ব্যাখ্যা করে থাকে সব-কিছুরই। খেয়াল-খুশি সব-কিছুরই ব্যাখ্যা ওদের ঝুলি খুঁজলে মিলবে।

তবু অমলের সারা মন জুড়ে হেনা। ভাবনা-প্রবাহের সুরুতে হেনা। সে স্রোত এলোমেলো ভাবে শত স্রোতে ঘুরে-ফিরে আবার মিলে-মিশে ফিরে আসে হেনায়…

ট্যাক্সি থামে হাসপাতালের গেটে। অমল এক হাতে মনি-ব্যাগটা কোন মতে খুলে একটা কি দু'টো—কত টাকার কে জানে—নোট এগিয়ে দিয়ে নেমে পড়ে। ড্রাইভার সেলাম জানায়। অমল ফিরে চায়—"সেলাম কি হে! তুমি যা আমিও সেই। একই প্ল্যানে বাঁধা। তোমার ট্যাক্সির সঙ্গে আমার যন্ত্রের ফারাক এই যে, ওটা বিগড়োয় কম—আর"—হেসে ব্যাণ্ডেজ করা-হাত দেখিয়ে বলে—আমার হামেসাই। ডাক্তার বাবুরা ত ভাই-ই বলে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি নে। তুমি কর?

এক নার্স সামনে পড়ে। মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে চায়। জিজ্ঞেস করে—'কি নাম বলব?'

'নাম? হেনা।'

আপনার নাম?

ঠিকই ত, আমার নাম—বলুন সেন—অমল সেন।

ঘরে একখানা বড় আরসি। ডাক্তার দাঁড়িয়ে দেখছেন আপনাকেই! বিস্তীর্ণ বক্ষ। তাঁর ধারণা, তাঁর প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ বাহু ও বিস্তীর্ণ বক্ষ দেখে রোগীদের আস্থা হয়। ডাক্তার তাই মাঝে-মাঝে আপনাকে দেখে নিয়ে আপন কেরামতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনেন

ডাক্তার বললেন—'আপনার একস্‌রে প্লেট দেখেছি মিঃ সেন। চিন্তার কিছুই নেই। কনুয়ের জোড় একটু ঠিকঠাক করে দিতে হবে। একটু অজ্ঞান করতে হতে পারে। সে কিছু না। একটু ঘ্রাণ—তার পর নিদ্রা—তার পর বিস্মরণ।

এ লোকগুলোর মনে সংশয়-সন্দেহের বালাই নেই। মেহগনি টেবিলটার মত ওদের মন যেমন শক্ত, তেমনি নিস্পৃহ, নিশ্চিন্ত, নিঃসংশয়। ঘন নীল রংএর দেওয়ালের রেখাচিত্রের মতই এদের মর্য্যাদা। এদের চলন-চালন খেলোয়াড়দের মতই সহজ ও স্বচ্ছন্দ। ভগবানকে ভয় করে বোধ হয়। রাজভক্তও সম্ভবতঃ। ঘরে রূপসী স্ত্রী সম্ভবতঃ ওদের গরবে গরবিনী। সহকর্ম্মী ডাক্তাররাও বুঝি মনে করে বেশ লোক। দেখেই মনে হয়, নির্ভর করা চলে, —মনে হয়, ওর কাজ ও ভালই বুঝে।

অমল ভাবে—মানুষকে ওরা টেবিলে ফেলে অজ্ঞান করে তার হাড় টানাটানি—মাংস ছেঁড়া-ছেঁড়ি করে—ত্বক্ মাংস ভেদ করে রক্ত চুইয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তার পর শোণিতধারা বন্ধ করে দেয় চকিতে। ক্ষমতার তারিফ করতে হবে বৈ কি?

ডাক্তার চকচকে দাঁত দু'পাটি বিকশিত করে হেসে বলে—'ভয় কিছুই নেই।' একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—'দু'বছরে দু'হাজার সাত শত—একটা কেসের কোনটি ব্যর্থ হয়নি।'

অমল পকেট থেকে একটা দেশলাই-বাক্স বের করে, আবার তা পকেটে রেখে দেয়।

···অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! শত শত রোগী এসে ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যেন মরে পড়ে থাকে অপারেশন টেবিলে, তার পর ফিরে পায় প্রাণ—আবার বলে কথা—ফিরে যায় ঘরে—ভয়-সংশয়ে অপেক্ষমান তাদের স্ত্রীর চোখগুলো সজল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'এত কি ভাবছেন?'

অমল ভাবে—আলাপ বন্ধ করা চলবে না। ডাক্তার হাসে। 'কথা? মোটেই না—একটু ঘ্রাণ—তার পর নিদ্রা—তার পর বিস্মরণ।'

সত্যি ত লোকটাকে ঘৃণা করা চলে না। ঘৃণা হয় কখন? জীবন সম্বন্ধে যে সব বাতিল থিওরীর কথা কেতাবে পড়ে গেছে, সেগুলোর ব্যর্থতা দেখেই হয় ঘৃণা। উদ্দেশ্য, গতি, রূপ, আদর্শ—এ সবের নিশ্চয় মানে আছে···

অপারেশন টেবিলে উঠতে উঠতে ভাবে—জীবন জটিল যন্ত্র মাত্র নয়—আরও কিছু।

ওরা অমলের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোণে—হয়তো বা শোনে। হেসে ফেলে বলে—'কি বলে?'

ওরা তার নাকের উপর মুখোস পরিয়ে দিয়ে বলে—'লাগছে না ত?'

অমল মাথা নেড়ে জাগায়, না।

'বেশ! এইবার একটু নিশ্বেস টেনে নিয়ে ছেড়ে দিন। তার পর ঘুম!'

তার পর ঘুম! অমল ভাবে—তার পর আরাম, সব ভুলে যাওয়া! কিন্তু না ভুলে কি পারা যায় না?

নিশ্বাস টেনে নেয়।

কি মিষ্টি গন্ধ! রিমঝিম—রিমঝিম, তালে তালে নাচে হেনা বেগুনী আলোয় অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে।

ইচ্ছে হয় মুখোসটা খুলে নিক! একটু বাতাস! বিস্তীর্ণ জলরাশির ও-পার থেকে ভেসে আসে ঝিরঝিরে হাওয়া। ঝিরঝির করে ব্যজন করে যায়, বলে যায়, নাও! নাও! নাও! নাও! দেখতে দেখতে হেনা হাওয়া হয়ে বয়ে আসে, আর বয়ে যায় কুলু-কুলু প্রবাহিত বিস্তীর্ণ জলরাশির বুকের উপর দিয়ে। ইচ্ছে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকে। হাত ওঠে না। পা দু'টো ভারি, ছুটে যেতে চায়, পারে না। নিজেই কিন্তু ফিরে এসে সর্ব্বাঙ্গে চুমু খেয়ে যায়। সে চুম্বনের শিহরণে পেশীগুলো আরামে অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে। পায়ের তলা থেকে খুনসুরি দিতে দিতে ওর চাঁপাস্পর্শ ওঠে পা থেকে উপরে—আরও উপরে। মন নাচে পাগলা বাউলের ঘূর্ণী নাচ—পাকে-পাকে ঘুরে-ঘুরে। নাচে সে-ও চঞ্চল অঞ্চলের বেষ্টনী রচে। কি আনন্দ। এ কী আনন্দ!······

হঠাৎ তিনটে খুদে সাপ গালের উপর পাক ছড়াতে চায়। সাপ নয় মুখোসের রবারের ব্যাণ্ড। জ্ঞান ঠিকই আছে তা হলে!

কিন্তু, ও কি! তাকে যে উড়িয়ে নিয়ে গেল! চক্রাকারে ঘোরে শূন্য। সে অনন্ত ঘূর্ণায়মান শূন্যে অমল যেন ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলছে। তার সর্ব্বাঙ্গের সকল ছিদ্র দিয়ে প্রাণ চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসে'

তবে মৃত্যু?

অমল পুরানো কথা ফিরে ভাবতে চায়। কত সমস্যার সমাধান হয়নি—ব্রহ্মাণ্ডের হেঁয়ালী—জীবনের অর্থ—ভগবান দার্শনিক, না যাদুকর! হঠাৎ উত্তর মিলে যায়। সরল সোজা সমাধান—'হেসে নাও!' কি সুন্দর উত্তর—হাস!

যে শেকল অমলকে নিয়ে মহাশূন্যে ঝুলছিল তা ভয়ঙ্কর হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। এই ত ভগবানের বর! ওরা কাঁদে। বোকা! গোপন রহস্য ত কেউ জানে না—তাই কেঁদে মরে মূর্খরা। সে রহস্য কে-ই বা জানে? কি আশ্চর্য্য!

কিন্তু এ সত্য দুনিয়াতে বয়ে কে নিয়ে যাবে? অমল ত মরেছে। জীবনের এই গুপ্ত তথ্য আজ মাত্র অমলের কাছেই প্রকাশিত। এ সত্য সাথে নিয়েই সে চিতায় উঠবে। পৃথিবীর মুক্তির প্রাণ-ভোমরা আজ যে অমলের করায়ত্ত, সেই অমলকেই ওরা যে হত্যা করেছে! পরম তত্ত্বের ও-পার পর্য্যন্ত ওরা কারণকে তাড়া করে নিয়ে যেতে চায়—ওরা জড়কে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে উড়িয়ে খোঁজে কি-যেন-কি—ওরা টেষ্টটিউবে; প্রাণে সৃষ্টি করতে চায়। এমন দিন আসবে, যেদিন সূর্য্য ঠাণ্ডা হেরে গিয়ে ভ্রুকুটি-কুটিল শুকনো কটাক্ষ করবে, আর তুহিন-জমাট পৃথিবীর উপর মানুষগুলো নিষ্ফল গবেষণা প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হবে। কি ভয়ঙ্কর! কি বীভৎস! অমল ভাবে, সে একবার শেষ চেষ্টা করে পৃথিবীর এ সব নরনারীকে বুঝিয়ে দিবে—কে তাদের হত্যা করেছে—তাদের শেষ আশাও নির্ম্মূল করেছে।

কিন্তু অমল? সে ত মরেছে। বেঁচে থাকলে সে সবাইকে মৃত্যুর সত্য-কাহিনী যে কি তা বলতে পারত। বলতে পারত—মৃত্যু সব চাইতে প্রচণ্ড তামাসা—পরম উপহাস।

অমলের হাসি পায়। হাসি চেপে রাখা আর যায় না। হাসির তরঙ্গে তার উদরের পেশীগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। অদম্য উল্লাসে তার দুই পাশ কম্পিত হতে থাকে। কম্পন ও

আন্দোলনে যে শেকলে অমল ঝুলছিল তা যায় ছিঁড়ে। অমল মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ডাঃ বিভূতি বললেন—'শীগ্‌গির অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ওঁর এত হাসি কেন বুঝি না।'

সার্জেন রায় চৌধুরী বললেন—'জ্ঞান ফিরলে কিছু বলতে পারবে না। স্বপ্ন এরা মনে রাখতে পারে না। বড় আশ্চর্য্য!'

অমলের অট্টহাস্যের শেষ প্রতিধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সে দেখে, খাড়া এক পাহাড় বয়ে উঠছে। মৃত্যুর মানেই বা কি, মৃত্যুর কারণই বা কি তারই সন্ধানের অভিযান। অমল সন্ধান করে পায় তথ্য। মরণের প্রক্রিয়াটা মন্দ না, বেশ নাগরদোলার দোলন পুলক। কিন্তু মৃত্যু কি তা ত বুঝা যায় না, মাথা ঘুলিয়ে দেয়। বেঁচে থাকতেও সমস্যার পর সমস্যা—মৃত্যুর দক্ষিণ দ্বারেও সেই সমস্যার পর সমস্যা পেছু ছাড়েনি। মরণের অধিবাস প্রক্রিয়া চলতে চলতে ঝট্‌ করে যে অণু-মুহূর্ত্তে মৃত্যু-সংস্কার হয়ে গেল, আর তার ফ্লাশ লাইটে জীবনের গোপন রহস্যের হ'ল মুহূর্ত্ত-প্রকাশ—তা যদি মনে রাখতে পারত অমল! অমল খাড়া পাহাড় বয়ে ওঠে আর ভাবে—হতে পারে জীবন মানেই মরণ, সমস্যাও হয়ত এক, সমাধানও হয়ত একই···

অনেকে পাহাড়ে ওঠা-নামা করছে। প্রত্যেকের পরনে জটিল চিন্তার এক-একটা বোরখা। এক জন আর এক জনকে দেখতে পাচ্ছে না।

এক স্ত্রীলোক। চুলগুলো সব সাদা। একটা পাথরের উপর বসে কাঠি দিয়ে ভুঁইয়ের উপর তার খোকার ছবি আঁকছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে অমলের মনে হল, যেন তার মা। চোখাচোখি হল, চিনতে পারল না। মাথা তুলে অমল দেখল, পাহাড়ের উপরে বসে হেনা খেলনার ইট দিয়ে ইমারৎ রচনা করছে, আর খেলা-ঘর তৈরি হবা মাত্র একখানা হাত কোত্থেকে এসে সব ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে। উদাস শ্বাস ফেলে হেনা আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে চেষ্টা করে। অমল চেঁচিয়ে ডাকে—হেনা! ঠোঁট নড়ে, আওয়াজ বের হয় না। কইতে পারে, শোনে না কেউ! ভয় হয়! তাড়াতাড়ি পাহাড় বয়ে অমল উঠে যায়।

পাহাড়ের সোনালী চূড়া। ঐ কি জীবন? আর ঐ নীচে, যেখানে সে মৃত্যু-রহস্যের সন্ধান করে ঘোরাফেরা করছিল, ঐ কি মৃত্যু?

পাহাড়ের জঙ্ঘা ঘিরে এক বনানী। ছোট একটা নদী পার হলেই বন। অমল দেখলে, নদীতে জল থমকে আছে। বনের মাঝখানে একটা জায়গা পরিষ্কার—সেখানে এক মন্দির। মন্দিরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করে, তবু প্রবেশ করতেই কানে যায় কার যেন দীর্ঘশ্বাস! কে? চার দিকে চায়। কেউ না ত?

আরও চলে এগিয়ে। এক জায়গায় কতকগুলো লোক উত্তেজিত হয়ে কি সব আলোচনা করছে।

এক জন বললে—ও যদি পাহাড়ের উপরে যেয়ে থাকতেও না চায়, নীচে গিয়ে মরতেও না চায়, তাহলে ওকে শেষ করে ফেল!

লোকটা দেখতে যেন শুকনো কাঠ—তপস্বী-টপস্বী হবে!

এক জন বললে—সংশয় বরদাস্ত করবার মত ক্ষমতা ওর নেই।

সবাই বলে ওঠে—ও ত খালি একটা ছবির মুখাবিদা শুকনো বালির উপর।

মন্দিরের এক থাম থেকে আর এক থামে হতাশ করে বেড়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস—অশরীরী অথচ বাস্তব—মর্ম্ম-ছেঁড়া চাপা কান্না। কার শাসনে কে যেন মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কেঁপে-কেঁপে কেঁদে যায়।

লোকগুলোও শোনে। ওদেরও মায়া? বলে—'ও ফিরবে, ফিরে আর একবার দেখবে।'

অমল দেখে—সে কান্নাকে ওরা ধরে-বেঁধে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে যায়। ইচ্ছে হয় পেছু নেয়। নৌকায় দেহখানা রেখে ওরা নদী পেরোয়। অমল দেখে, নদীর অলসঘন থমকা জল নিতান্ত অনিচ্ছায় বিরক্ত হয়ে একটু যেন আড়মোড়া ভাঙ্গে। পেছন ফিরে দেখে হেনা। ঘর বানানো শেষ করেছে। অমল পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়। হেনা কি সুন্দর! কী সুন্দর হেনা!

ইচ্ছে হয় ফিরে যায় তার কাছে। কিন্তু মন্দিরের ঐ মুদ্দা-ফরাসগুলো তারও দেহখানি নিয়ে যে নীচে নেমে যায়! তার বড় আদরের দেহ—অনেক দিন ধরে তার পেশীর সযত্ন কলা-স্থাপনকেই বা কি করে ছাড়া চলে?

কেমন একটা অদ্ভুত হট্টগোল ওর কানে। মনে হয় কিছু দেখা যাচ্ছে না চোখে, আবার বেশ দেখাও যাচ্ছে। দেখে, তার দেহটা নিয়ে একটা বাড়ীর লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে সর্দ্দার-গোছের লোকটা একটা দ্বারে দেয় ঘা। দোর খোলে। ওরা দেহটাকে ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর রেখে তার উপর সাদা একখানা চাদর বিছিয়ে দেয়। দু'জন থাকে, আর সবাই চলে যায়। যে দু'জন রইল তাদের এক জন দেহখানার মুখের উপর থেকে কি যেন সরিয়ে দেয়। অমল চেয়ে দেখে, তার দেহ উঠে বসে চার দিকে চেয়ে কি যেন—কাকে যেন খোঁজে।

হাত দিয়ে চোখ দু'টো একবার ভাল করে রগড়ে নেয়। বেশ একটা জোর নিশ্বাসও টেনে নেয়। স্পষ্ট দেখে দেহটা অমলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়।

সার্জ্জন রায় চৌধুরীর হাতখানি চেপে ধরে অমল চেঁচিয়ে বলে—'কিন্তু হেনা! হেনা কোথায় বল—বলতে হবে।'

সার্জ্জন বললেন—'বেশ! সব ঠিক।'

লজ্জিত হয়ে বলে—'মাপ করবেন, কোথায় আছি ঠিক বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছিল আপনি···নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলাম! হাঁ, ঠিকই স্বপ্ন। আপনি ছিলেন একটা মন্দিরে আর···এক মিনিট··· একটু ভেবে নিই···সব মনে পড়বে।'

হো-হো করে হেসে উঠে রায়-চৌধুরী বললেন—স্বপন, স্বপন। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না···ভাবলেও মনে হবে না, কখনো কারু হয় না!—দেখি, নাড়ুন তো পা-খানা।

অমল নড়ায় তার পা।

"কিন্তু ডাক্তার! পাহাড়ে কেউ ছিল।···কোন হাঙ্গামা করিনি ত? মানে—"

'একটুও না। বেহুঁস হবার সময় হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন—কিন্তু অন্তরের সে অদ্ভুত আনন্দের কথা আর যে মনে হবে না এই ত দুঃখ। *

---

* অনেক দিন আগে লণ্ডনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা "লাইফ এণ্ড লেটার্স" প্রকাশিত হিউ এণ্টনীর "আণ্ডার এনেসথেটিক" গল্প থেকে।

স্বাধীনতার স্বরূপ

গণেশচন্দ্র ঘোষ

ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশে-বিদেশে অনবরত ঢাক পেটানো হচ্ছে ভারত স্বাধীন হয়েছে—ভারতবাসীরা এখন স্বাধীন, আর এমন ভাবে স্বাধীনতা এসেছে যেভাবে কোন কালে কোন দেশে আসে নাই—একেবারে সহজ সরল অহিংস ভাবে। কিন্তু তবু লোকে বুঝতে পারছে না কোথায় সেই স্বাধীনতা—কোথায় সেই স্বাধীনতার আনন্দ যা পাবার জন্য দেশবাসী আকুল আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস জোর করে বোঝাতে চেষ্টা করছে, তবু লোকে বুঝছে না। লোকগুলো কি বোকা! ডাক্তার এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বলছেন তার পেটে ব্যথা নাই; তবুও রোগী বলছে তার পেটে বড় ব্যথা; সে যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। রোগীর কি ধৃষ্টতা!

লোকের দুর্ভাগ্য, তারা বুঝে উঠতে পারছে না কংগ্রেসের এই বহু-বিঘোষিত স্বাধীনতার মধুর আস্বাদ; তারা কেবল তিক্ত স্বাদই পাচ্ছে। তারা দেখছে রোগ সেরে গেছে; কিন্তু রোগী আর বেঁচে নাই। ভারত স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু ভারত আর সে ভারত নাই—তার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে প্রাণ নাই; সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার বুকের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে—অহিংস উপায়ে। তারা শুনছে তারা স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু তাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, রোগে-শোকে জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, নানারূপে নিপীড়িত, নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—এমন ভাবে তাঁ'দিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে যে তারা যে ভারতবাসী তা বলবারও তাদের অধিকার নাই—তারা একেবারে ভিন্নদেশী হয়ে পড়েছে; তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে; কত লোক দেশহারা, বাস্তুহারা হয়ে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, মাথা গোঁজবার জায়গা পাচ্ছে না: অথচ তাদের কোন দোষ নাই। তাই দেশবাসীরা অবাক হয়ে গেছে—তারা বুঝতে পারছে না এই স্বাধীনতার মর্ম, এর আনন্দ। আর যাঁরা এই স্বাধীনতা এনেছেন তাঁরা আর এদিকে তাকাচ্ছেন না, তাঁরা নিজের নিজের ও দলের স্বার্থ নিয়ে নিজেরা নিজেরা রেষারেষি কামড়া-কামড়ি করছেন।

দেশের লোক বুঝে উঠতে পারছে না কি করে এই অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত অবস্থা সম্ভবপর হলো। কংগ্রেস জিন্না সাহেবের দোরে বার-বার ধন্না দিয়ে এবং ইংরেজের প্রীতি ও বন্ধুতায় মুগ্ধ হয়ে যে স্বাধীনতা এনেছে সেই বৃটেনের আঁচল-ঢাকা স্বাধীনতা অনেক পূর্বেই আসতে পারতো এবং তার জন্য এতো মূল্য দিতে হতো না, দেশকে এতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে হতো না। ইংরেজ নিজে যে কাজ করতে সাহস করে নাই, কংগ্রেসকে দিয়ে সে সেই কাজ করিয়েছে। তাই দেশের লোক আজ জানতে চায়, কি করে এই অবস্থা কংগ্রেস আনতে বাধ্য হলো। বরাবর কংগ্রেস দেশবাসীকে বলে এসেছে—আশ্বাস দিয়ে এসেছে সে অখণ্ড ভারত চায়—ভারত-খণ্ডন সে সমর্থন করবে না, দুই জাতিবাদ সে মানে না। তাই দেশবাসী কংগ্রেসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বড় আশায় উৎসুক হয়ে তার ওপরেই নির্ভর করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস তার কথা রাখে নাই; দেশবাসীর সেই বিশ্বাস সে ভঙ্গ করেছে। যদি ভারত-খণ্ডন সমর্থন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাহলেও দেশবাসীদের একবার জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের মত নেওয়া উচিত ছিল। তা' না করে, সব বিষয় ঠিক্‌ঠাক্ না করে ভারত-খণ্ডনে রাজী হওয়া কি কংগ্রেসের উচিত হয়েছে? আর যদি ভাগাভাগি করতেই হলো তখন এতো তাড়াতাড়ি না করে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারটা সব ভাল করে ঠিক করে নিয়ে, সমস্যা সব মিটিয়ে নিয়ে তার পর অহিংস ভাবে পৃথক্ হলেই তো হতো। তাহ'লে তো এতো অনর্থের সৃষ্টি হতো না; এতো হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হতো না; বোধ হয় মহাত্মা গান্ধীকেও এ ভাবে প্রাণ হারাতে হতো না; আর সীমা-নির্ধারণ সমস্যা, লোকাপসরণ সমস্যা, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি নানারূপ সমস্যা নিয়ে এতো বিব্রত হতে ও অশান্তি ভোগ করতেও হতো না। না হয় দু'-বৎসর পরেই স্বাধীনতা আসতো। দু'শো বৎসর যখন সইতে পারা গেল তখন আর দুই বৎসর কি সইতে পারা যেতো না! কিন্তু তা না করে দেশকে অন্ধকারে রেখে সাত তাড়াতাড়ি সবটাতে কংগ্রেস রাজী হয়ে গেল। যে স্বাধীনতা ১৯৪৮ সালে আসবার কথা ছিল সেটা এক বৎসর আগেই এসে উপস্থিত হলো! কংগ্রেস দুই জাতিবাদ মেনে নিলো। আজ যদি দেশের লোক বলে যে, কংগ্রেসের স্বার্থান্ধতা এবং ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার মোহ এতই প্রবল হয়েছিল যে সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, তা'হলে দেশের লোককে দোষ দেওয়া চলে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, সব প্রলোভন দমন করা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠার মোহ দমন করা বড়ই কঠিন। আর কংগ্রেস যখন দেখলো ক্ষমতাটা তার নিজের হাতেই আসছে। আজ আবার কংগ্রেস বলছে দুই জাতিবাদ সে মানে না। এ হেঁয়ালি বোঝা কঠিন।

ইংরেজ অভিজ্ঞ সুচতুর খেলোয়াড়। ছিপে মাছ শিকার করতে সে খুব ওস্তাদ। সে জানে কোথায় কি রকম চার ফেলতে হয়, কোন মাছকে কি রকম টোপ দিতে হয়। সেই ভাবেই সে বড় বড় রুই-কাতলাকে শিকার করবার ব্যবস্থা করেছিল। সে যখন দেখলো, বড় মাছ মুখের ভিতর টোপ নিয়েছে তখন আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ঠিক মতো টান মেরেছে—দেরি করলে হয়তো টোপ ছেড়ে দিতে পারে। কাজেই এক বৎসর আগেই সে তার যাওয়া ঠিক করলো। তার কাজ হাঁসিল হয়েছে, আর কি সে দেরী করতে পারে! কংগ্রেস টোপ মুখে নিয়ে আটকা পড়ে গেলো। এখন ইংরেজ তাকে নিয়ে বেশ খেলাচ্ছে। এই তো ইংরেজের কাজ। যেখানে সে গেছে সেখানেই সে এই ফন্দিই করেছে। যেখান থেকে তাকে চলে আসতে হয়েছে সেখানেই সে ভাল করে গোলযোগ বাধিয়ে রেখে এসেছে। কংগ্রেসের কর্ণধাররা এ সব নিশ্চয়ই জানতেন এবং ভুক্তভোগীরা তাঁ'দিকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রলোভন বড়ই কঠিন; তাঁরা সামলাতে পারলেন না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব তো বলেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠরা যদি একমত না হতে পারে তাহ'লে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতেই শাসন-ভার দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। অবশ্য এর ভিতরেও তাঁদের অনেক প্যাঁচ ছিল।

যা হোক, কংগ্রেসের নেতারা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা ইংরেজের প্ররোচনায় এবং মুসলিম লীগের direct actionএ ভীত হয়ে দেশের জন্য সব মুসলিম ও অমুসলিম

দলের আশ্বাস ও সাহায্য উপেক্ষা করে জিন্না সাহেবের কাছেই মাথা নত করলেন। যা হবার তা হলো—ভারত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলো। দেশে অশান্তি আরও বেড়ে চললো। কংগ্রেসের জয়, অহিংসার জয় দেশে-বিদেশে ঘোষিত হলো। ইংল্যাণ্ড কংগ্রেসকে বাহবা দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাসতুতো ভাই, তার মুরুব্বী, পৃথিবীর বড় সাম্রাজ্যবাদী, অমানুষিক নৃশংস ভাবে জাপান ধ্বংসকারী, অ্যাটম বোম ভীতিপ্রদর্শনকারী আমেরিকা ও তাদের তাঁবেদাররাও খুব বাহবা দিল। এরা সকলে তো বাহবা দিবেই, তাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে। তবু যেটুকু বাকী আছে সেটা করিয়ে নিতে হবে তো—কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ জুনাগড় ইত্যাদি সমস্যা জটিল করে তুলে তৃতীয় মহাসমরে তাদের সুবিধার জন্য? এদের বাহবায় স্ফীত হয়ে এদের উপদেশ মতো কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা প্রবল ভাবে দেশ শাসন করতে লেগে গেছেন। সরকারী কাজকর্ম যতো সব কংগ্রেসীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে ও হচ্ছে। কংগ্রেসীরা দেশসেবা ছেড়ে আত্মসেবায় মেতে গেছেন। স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, দুর্নীতি, অবিচার, অনাচার, উগ্র প্রাদেশিকতা কংগ্রেসের ভিতরে প্রবেশ করে দেশের শাসনযন্ত্রকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। শাসনযন্ত্রের কর্ণধাররাও যেন এ বিষ থেকে মুক্ত থাকতে পারছেন না। ক্রমশঃ সমস্ত দেশই এই বিষে জর্জরিত হয়ে উঠছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহ'লে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। দেশের এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসই দায়ী। তাই আজ দেশ কংগ্রেসের কাছেই জানতে চায়, কেন এই অবস্থা হলো? এখন এর প্রতিকার কি? কংগ্রেসের উচিত সব বিষয় দেশকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া।

কংগ্রেসের ভিতরে এই দুর্নীতি যদি চলতেই থাকে তাহ'লে তার ভবিষ্যৎও ভালো হতে পারে না। কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা বেড়ে গেলেই তার উন্নতি হবে না। কংগ্রেসের ভিতর প্রবেশ করলে স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হবে বলে অনেকে সভ্য হচ্ছেন। দু'দিন সখ ক'রে জেলে থেকে এসে অনেকে এখন দেশসেবার পুরস্কারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এতে দেশসেবা অপেক্ষা আত্মসেবাই বেশী হবে; দেশ ক্রমশঃ অবনতির দিকেই যাবে। নানা কারণে দেশের লোক কংগ্রেসের ওপর ক্রমশঃ তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাচ্ছে। কংগ্রেসের ওপর তারা যেন আর ভরসা করে থাকতে পারছে না।

আজ রাষ্ট্র-নায়করা, কংগ্রেস-নায়করা স্থিরচিত্তে বিবেকের দিকে তাকিয়ে ভাল করে ভেবে দেখুন তাঁরা কি করছেন—এবং এখন কি করা উচিত। এখন কংগ্রেস তার দুর্নীতি দূর করে আন্তরিক সেবা ও যত্ন দ্বারা দেশের অবস্থা ও রূপ উন্নত ও সুন্দর করতে চেষ্টা করুক। স্বাধীনতা এসেছে বলে শুধু চিৎকার করলে হবে না। জোর করে স্বাধীনতার আনন্দ লোকের মনে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করলে লোকের মন আরও তিক্ত হয়ে উঠবে। আন্তরিক দেশসেবা, সুনীতি, সুবিচার, সুশাসন দ্বারা দেশে স্বচ্ছলতা, সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা এনে লোকের মনের ক্ষত আরোগ্য করে তা'দিকে আনন্দ দিতে হবে। তখন তারা বুঝবে স্বাধীনতার স্বরূপ, সুখ ও আনন্দ কি।

রাস্তা

হরপ্রসাদ মিত্র

আকাশ হাজার মেঘের গুল্মে ঢাকা যেন দূর মাঠ
তারই মাঝে নীল একটি সরল রেখা।
—সে ইশারা চেনে গুপ্ত, সুপ্ত মন।
হে নীল রাস্তা! তোমার দু'ধারে উদাস মেঘের বন!

দূরে সুষুপ্ত তাল-তমালের চরে
কাঠ-ঠোকরার ঠোঁটের ঠোকরে মরা পাতা শুধু ঝরে
সেই প্রেরণায় আর এক শিল্পী রং দিয়ে পলে পলে
কতো পট এঁকে ছিঁড়ে ফেলে দেয় জলে।

কালো মাটি হাসে চিরায়ুষ্মতী, সুদতী, অপরাজিতা
কখনো ফোটায় মিলনের ফুল কখনো জ্বালায় চিতা।

রাস্তা তোমার বণিকভূতিক শহরে
দেহ-মন বাড়ে এখানে কেবল বহরে।
দৈর্ঘ্য অপরিচিত গভীরতা অযাচিত
শূন্যের ধ্যান সুদূরে নির্বাসিত।
ত্রিকালদর্শী ভুষণ্ডী বাঁধা পিঞ্জরে
সোনায়—কাদায় মিশিয়ে পঙ্কু—দিন ঝরে।

যুগে যুগে খোলো নতুন পান্থশালা,
নতুন বিছানা বিছিয়ে দোলাও নতুন ফুলের মালা
মনে মনে চলে নতুন চিত্রকলা
সনাতন কথা অচিন কণ্ঠে বলা।

সে নয় স্থবির ইটের আরামাবাস
রাস্তা, তোমার তর্জনী মোছে নিমেষে শাসন-পাশ।
জীবনে জীবনে নব জাতকের চলা লক্ষ পায়ের দোলা—
সেই গৈরিকে, সেই পদাঘাত মেখে
প্রশ্নের মতো তোমার চিকণ চিহ্ন গিয়েছে বেঁকে।

নীচে এই ছোটো আড়ালে, বেড়ায় ঢাকা
সোনায়—কাদায় মাখা
অতৃপ্ত দেশ সময়ের কোণঠাসা।
কবন্ধ শোক, কুবের দীপ্তি—আশা আর জিজ্ঞাসা!

হে নীল রাস্তা! এবার তোমার
যুগের ঢাকনি খোলো।
মেঘের পর্দা তোলো।
খুলে মেলে ধরো সৃষ্টির চির ক্রান্তিক্ষেত্র নীল,
হোক সে সরল, হোক্ সে বিসর্পিল!
ক্লীব অধিকার-বেষ্টনী নও,
কখনো তাসের সম্রাট নও তুমি
না হয় মেঘের গুল্মে খচিত হয়েছে শূন্য ভূমি!
হে নীল রাস্তা! শাশ্বত নির্দেশে
এ বিলম্বিত গ্লানির পর্দা তোলো
যুগের ঢাকনি খোলো।

—সুনীলকুমার গুপ্ত

ভাব এবং অভাব

— অহিভূষণ রুদ্র
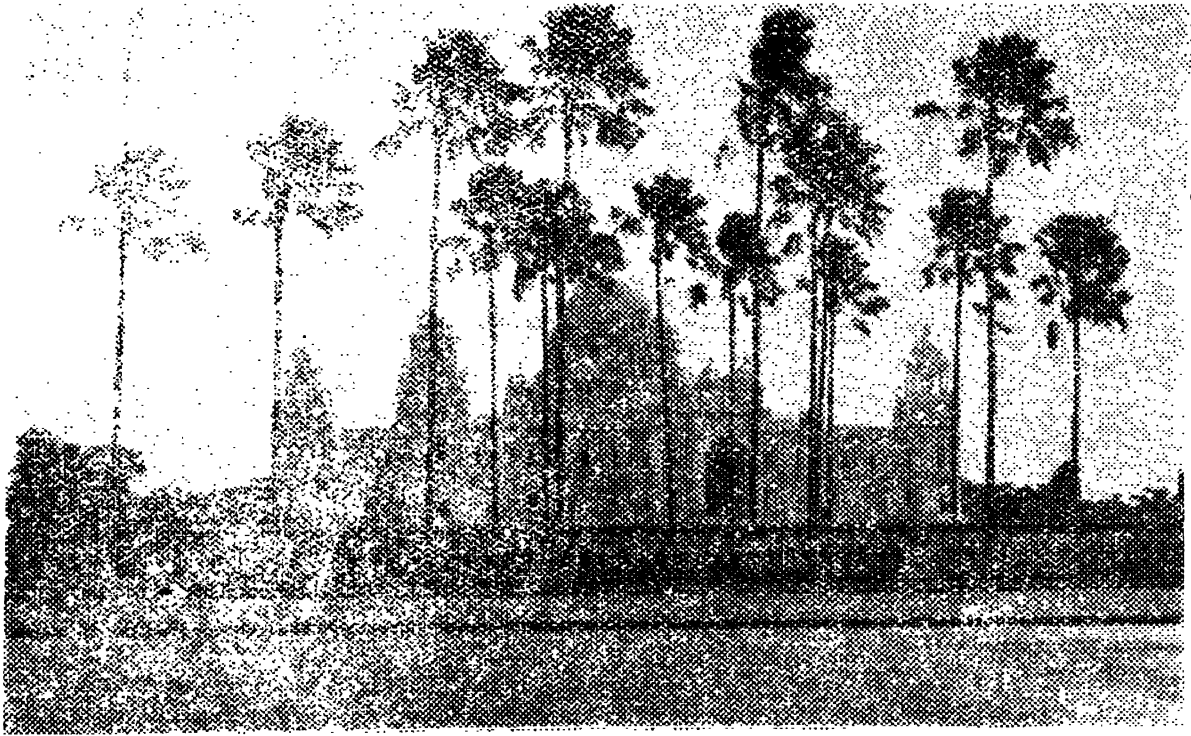
"মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে……"

—রবীন্দ্রনাথ

—গোপীনাথ সাহা

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

—গোবিন্দ মিশ্র

“বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয় ...

—রবীন্দ্র

—ব্রজগোপাল নায়ক

চিড়িয়াখানা

মৃগ-তৃষ্ণা —রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজহংস —রাধাকান্ত হালদার
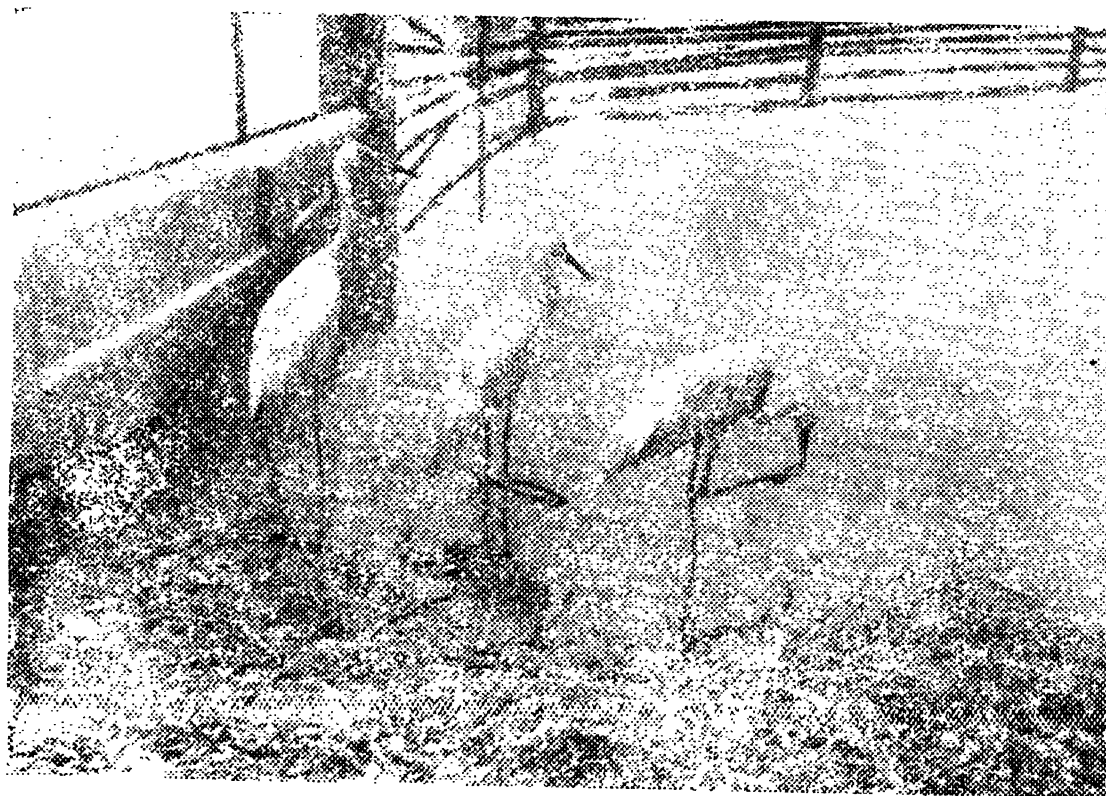
বক ধার্ম্মিক —পান্না সেন

ফুলওয়ালী —কেশবলাল দত্ত

—শ্রীসমর

জীবনের ডাক

জর্জ বার্ণাড শ'র চিঠি

[জীবনীকার ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসকে লেখা শ'র দু'টি চিঠি]

ম্যালভার্ণ

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় ফ্রাঙ্ক হ্যারিস,

তুমি জানতে চেয়েছ যে বিত্তশালী কেমন লাগে। সে ত তোমার নিজেরই জানা উচিত। কারণ এই মুহূর্ত্তে যদি কোটিপতি না হও, একটি বিকেল অথবা একটি পুরো সপ্তাহ অথবা জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, হয়ত একটি বৎসর তুমি তা ছিলে যে সময় পার্ক লেনের মহিলাকে বিবাহ করে তুমি স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি ব্যাণ্ডল্ফ চার্চিল ও এডোয়ার্ড সপ্টের সঙ্গে প্রণয়ে ব্যয় করেছিলে। আর সত্য কথা বলতে কি, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমি ধনবান লোক নই। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা উভয় দেশেই আমার উপার্জ্জন থেকে ট্যাক্স সার-ট্যাক্স আদায় করা হয়। মাঝে-মাঝে যখন আমার আয় দাঁড়ায় বিশ হাজার পাউণ্ড, তখনও মূলধন ও তার আয় দু'য়ের উপরই ট্যাক্স ও সার-ট্যাক্স আদায়ের পর কি অবস্থা দাঁড়ায়? আমার স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি এবং আমার নিজের আয় মিলিয়ে আমাদের বাৎসরিক আয় পাঁচ থেকে দশ হাজার পাউণ্ড। তাও সব খরচ হয় না। আসলে আমি এত ব্যস্ত মানুষ যে অর্থব্যয়ের বিলাসিতা করতে পারি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমার আছে এবং কিছুই আমার ছিল না এবং দু'য়ের পার্থক্য আমার কাছে তুচ্ছই। আমি সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের চোখে অর্থই হোল নিরাপত্তা এবং ছোট-ছোট অবিচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। সমাজ যদি আমাকে উভয়বিধ সুবিধে দিত আমি আমার সমস্ত অর্থ জানলার বাইরে নিক্ষেপ করতাম, কেন না ধন-সম্পত্তির তদারক করা এক ঝামেলা এবং ধন-সম্পত্তি পরগাছা ও ঈর্ষাকে প্রশ্রয় দেয়। করুণা, প্রাচুর্য ও পৃষ্ঠকতা এ-সব আমি ঘৃণা করি। কোন লোককে টাকা দিয়ে যখন আমি সাহায্য করি যেন সে-ও যত আন্তরিকতায় আমায় ঘৃণা করে আমিও তত ঘৃণা করি তাকে।

বিশ্বস্ত

জি, বি, এস।

২

ম্যালভার্ণ

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় ফ্রাঙ্ক হ্যারিস,

একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তোমার লেখা আমার জীবনী প্রামাণ্য এবং সেই গ্রন্থে আমার লেখা পনেরো হাজার শব্দ আছে। আমি তাদের লিখে দিয়েছি যে হেণ্ডারসন-কৃত জীবনী ভিন্ন আমার কোন জীবনী প্রামাণ্য নয় এবং তোমারটি বিশেষ-রূপেই নিন্দনীয়। তুমি যদি আমার লেখা একটি কথাও ব্যবহার করো আমি আইনের আশ্রয় নেব। তোমার লেখা বই আমি তোমার জন্য লিখে দেব না। গ্রন্থকার হিসেবে তুমি কেমন লেখ তার উপরই তোমার যশ নির্ভর করছে এবং আমার ঔৎসুক্যও সেইটুকুতে সীমাবদ্ধ। নিজের সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি এবং এক দিন যা প্রকাশ করার অভিপ্রায় আমার, তার কোন কোন অংশ তোমায় আমি দেখতে দিয়েছি। কারণ, আমার জীবনী লেখাই যদি তোমার জিদ হয়, সে ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তোমার ভাল ভাবে জানতে হতে পারে। তবু বক্তব্য বিষয়টি তোমার স্বভঙ্গীতেই প্রকাশ করা ভাল, আমার ভঙ্গীতে নয়। গ্রন্থকার আমিই একথা বোঝাতে পারলে যে কোন নির্বোধই সে বই প্রকাশে প্রকাশককে রাজী করাতে পারে এবং প্রকাশকও সেই ধারণায় তা বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যত সমালোচক সব ত আমাকে ঘিরেই কলরব করবে, আর নামে মাত্র জীবনীকারটি সেই দস্যুতার বখরা ভিন্ন আর কিছুই পাবে না। আমার লেখা পনের হাজার শব্দ এবং জীবনীর প্রামাণ্যতা এই উভয় বিজ্ঞপ্তিই প্রত্যাহার

করতে হবে তোমার প্রকাশককে। আমার আত্ম-পরিচয় থেকে একটি 'বাক্য ব্যবহার না করেও ওয়াইল্ডের জীবনীর সমতুল্য আর একখানি মূল্যবান জীবনী রচনা করার ক্ষমতা তোমার নিজেরই আছে এবং তোমায় সে কাজে ব্রতী করার জন্য আমি সাধ্যমত সব শক্তিই প্রয়োগ করব। তোমার লেখা ওয়াইল্ডের জীবনীতে একটিও প্রমাণ নেই যে তুমি তাঁর রচনার একটি কথাও কখনো পড়েছ এবং তুমি যখন আমার লেখার শতকরা তিন ভাগের বেশী নিশ্চয়ই পড়নি তখন সাহিত্যিককে নয় মানুষটিকে রূপায়িত করার জন্য তোমার আস্থা রাখতেই হবে নিজের ক্ষমতার উপর। শ' এবং হ্যারিস বীভৎসরূপে অঙ্গাঙ্গী হয়ে অবস্থান করছে এর চেয়ে দানবীয় কল্পনা করতে পারি না আমি। তা ভিন্ন তোমার গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের একটি প্রবন্ধ জাতীয় হওয়া সমীচীন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন মানুষের ভীড় থাকাই উচিত হবে। সেই ধরণের বস্তুই তুমি লিখতে পারবে আর যদি সত্যি কুশলতার সঙ্গে তা পার তবে তোমার লাইফ এ্যাণ্ড লাভস প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া চলবে। মৃত্যু পবিত্র পরিবেশেই বাঞ্ছনীয়, হয়ত সব মধ্যেও তুমি উন্নাসিকতার ছাপ দেখতে পাবে।

বিশ্বস্ত
জি, বি, এস।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিঠি

[মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবল বাংলার নয় সারা ভারতের পূজনীয়। লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে চিরকাল তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর মেঘদূত ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারত-মহিমা প্রভৃতি পুস্তক, বিভিন্ন অভিভাষণাদি ও নানা সম্পাদিত গ্রন্থ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁর আজীবন সম্পর্ক ছিল এবং পরিষদের উন্নতির জন্য বহু অমূল্য কাজ করে গেছেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্রী মহাশয় পরম রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রসিকতা ছিল অন্তঃসলিলা। গণপতি সরকার মহাশয় একদা তাঁকে এক জন পণ্ডিত দিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়কে এই পত্রখানি সমেত গণপতি বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।]

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় গণপতি বাবু,

তোমাকে যে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছি তাহাতেই তোমার প্রার্থিত সকল সংবাদ লিখিয়া দিয়াছি। উৎকল ভদ্রলোকটি শিলালিপির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু দুরূহ শব্দগুলির অর্থোদ্ধার করিতে কিছু সময় লাগিবে জানাইয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় তোমার নিকট যাইতেছেন। তুমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ বলিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার মতবাদ, অভিমত এবং হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অতি গভীর। ইঁহাকে পাইলে সকল দিক্ দিয়া উপকৃত হইবে। অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা—কাজেই তিনি তোমার নিকট যাইতেছেন।

শুভার্থী
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ৩১ এপ্রিল, ১৯৩১

কল্যাণবরেষু,

গণপতি বাবু, তোমার দাদার সইওয়ালা তোমার মেয়ের বিবাহের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। একে তোমার মেয়ে আবার ৺ক্ষুদিরাম বসুর ছেলে—দুই আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। দু'জনের মিলনে মণিকাঞ্চন যোগ হউক এই আমি ৺স্থানে নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। ১৮৭৪ সালে সুদূর রাঢ়ে এক দুর্গম জায়গায় ক্ষুদিরাম বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তাহার পর আমাদের এ পর্য্যন্ত বরাবর প্রীতি ছিল। প্রীতি খুব ঘন হউক আর না হউক, পরোক্ষে উভয়েই উভয়ের হিত আকাঙ্ক্ষা করিতাম। তাহার পুত্রটি দীর্ঘজীবী হউক আর তোমার মেয়েটির এয়োত, বাড়ুক ও হাতের নোয়া ক্ষয় হইয়া যাউক। আমি যাইতে পারিলাম না তাহাতে দুঃখ নাই, মনটা বিবাহের ক্ষেত্রেই ওদিন পড়িয়া থাকিবে।

শুভার্থী,
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

লর্ড কার্জনের চিঠি

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক ম্যাকডোনেল সাহেবের সহিত উত্তর-ভারত পরিভ্রমণের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। এই সময় পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় প্রাচীন দ্রব্য-সংগ্রহশালা, প্রত্নতত্ত্বের খনন-কার্য, মন্দির ও নানা পুঁথি প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময় তিনি ম্যাক্সমূলার-স্মৃতিভবনের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুঁথিও সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়া আরো প্রায় সাত হাজার পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। নেপালের মহারাজা এগুলি অক্সফোর্ডের বোর্ডলিয়ান পুস্তকাগারে দান করেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নীচের পত্রখানি লিখেছিলেন।]

১, কর্লটন হাউস
সাউথ ওয়েষ্ট টেরাস,
৫ই জানুয়ারী, ১৯১০

প্রিয় মহাশয়,

নেপালের মহারাজা তাঁর চন্দ্রসামসের জং কর্ত্তৃক বোডলিয়ান পুস্তকাগারে প্রদত্ত সংস্কৃত পুঁথির অপূর্ব সংগ্রহটি ক্রয়, তাহাদের তালিকা প্রণয়ন ও ইংলণ্ডে প্রেরণের সুচারু ব্যবস্থার দ্বারা আপনি

যে অমূল্য কাজ করিয়াছেন অক্সফোর্ডে থাকা-কালীন আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য, শুভেচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে আপনি যে মহৎ কাজ করিয়াছেন ভারতের প্রাক্তন বড়লাট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে আমি তাহার জন্য আপনাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি।

নব বৎসরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। ভারতে আপনাদের মত বিদ্বজ্জনের অভাব কখনো না যেন অনুভূত হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
কার্জন অফ কেডলষ্টন

বেথনের চিঠি

[বাল্যকাল হতে ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা মধুসূদন ইংরেজী সাহিত্যের এক জন গভীর মর্ম্মজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবেই মাতৃভাষাকে তিনি অবহেলা ও ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। জে, ই, ডি, বেথন তখন গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষা-সংসদের সভাপতি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর দরদ। তিনি এ দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের অকৃত্রিম চেষ্টা করেছিলেন। গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন তাঁকে এক কপি 'ক্যাপটিভ লেডি' উপহার পাঠালে তিনি প্রত্যুত্তরে গৌরদাস বসাককে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি বেথুনের অনুরাগের জীবন্ত স্বাক্ষর এটি।]

চৌরঙ্গী

ই, ১৮৪৯

মহাশয়,

আপনার বন্ধুর কাব্য-পুস্তক উপহারটির জন্য তাহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। সেই উপহারের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার স্বদেশবাসীর অনেককেই ইতিমধ্যে আমি যে উপদেশ দিয়াছি অর্থাৎ ইংরেজী কবিতা রচনার পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহাদের সময় আরো মূল্যবান কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন—সে-উপদেশ আপনার মারফৎ তাহার মনেও মুদ্রিত করিবার এই সুযোগ গ্রহণ অত্যন্ত অভব্য কাজ হইতেছে বোধ হয়। ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শিতার পরিচয় এবং সাময়িক অনুশীলন হিসেবে এই প্রকার রচনার অনুমোদন করা যাইতে পারে কিন্তু ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন দ্বারা তিনি যে মার্জ্জিত রুচি ও পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যদি নিজের মাতৃভাষায় শ্রী ও কবিতার সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত করেন—অবশ্য কবিতা রচনাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়—তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের মহত্তর উপকার সাধন করা হইবে এবং তিনি নিজেও অক্ষয় যশলাভের আরো উত্তম সুযোগ পাইবেন।

আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, আপনাদের বাংলা সাহিত্য অতি অমার্জ্জিত ও অশ্লীলতা-দুষ্ট। এক জন উচ্চাভিলাষী কবির পক্ষে তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে নিজ ভাষায় মহত্তর সৃষ্টি-কার্য্যে পথ প্রদর্শন অপেক্ষা আর চমৎকার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পারে না। এখানি অনুবাদের দ্বারাও তিনি উপকার করিতে পারেন। এই ভাবেই ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

আপনার অনুগত ভৃত্য
জে, ই, ডি, বেথুন

মাইকেলের বাংলা চিঠি

[মধুসূদনের পত্র-সংখ্যা অতি বিপুল এবং বেশীর ভাগ চিঠিই ইংরেজীতে লেখা। তাই মাতৃভাষায় লেখা মধুসূদনের চিঠির নিদর্শন হিসেবে নীচের এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করা হোল। মধুসূদন তখন য়ুরোপে। বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেছেন। মধুসূদন মনোমোহন বাবুর মাতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য য়ুরোপ থেকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

শ্রীচরণকমলেষু,

জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবা মাত্রেই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া, তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি। আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বন্ধন করে। পিতৃচরণ-

দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত মুহ্যমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব, এবং আমি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদ-সেবা করিয়া প্রজ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তার-পথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এ দেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যত দিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোন মতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
দাস মধুসূদন দত্তস্য

শিল্পদৃষ্টিতে স্থানমাহাত্ম্য

শুভেন্দু ঘোষ

জ্যাকব এপ্‌ষ্টাইন বিলাতের এক জন নামী ভাস্কর। তাঁর কাজের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণে তাঁর শিল্পের সমাদর করে, তবু তাঁর তৈরি মূর্ত্তি তিনি কোনো প্রদর্শনী-গৃহে পাঠাতে চান না। তাঁর ধারণা, ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় অস্বাভাবিক আলোতে ওগুলোর প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, ওগুলো নির্জীব হয়ে পড়ে। ওদের পরিচয় পেতে হলে ওদের দেখতে হবে খোলা হাওয়ায়, আকাশের নীচে। তাঁর কাজ যাতে সর্ব-সাধারণ দেখবার সুযোগ পায় তার জন্যে সেগুলো পৌরসভা ব্যাটার্সি পার্কে তাঁর এবং আরও কয়েক জন বড় ভাস্করের গড়া মূর্ত্তি সাজানোর ব্যবস্থা করেছেন।

সংবাদটা বেরিয়েছে 'শিল্পীর অদ্ভুত খেয়াল' এই শিরোনামায়। সত্যিই কি এটা শিল্পীর একটা খেয়াল মাত্র? তাঁর ধারণা কি সত্যিই অমূলক?

সাধারণ ভাবে এ-কথা আমরা সকলেই বোধ হয় বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে রাজি আছি যে, সব জিনিষ সব জায়গায় মানায় না। সব-কিছুরই একটা 'যথাস্থান' আছে—যেখানে তার পূর্ণ সার্থকতা।

'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' বনের বাইরেও বন্যের একটা সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, মায়ের কোল ছাড়াও শিশুর সৌন্দর্য্য আমাদের মনোহরণ করতে পারে, তবু সে সৌন্দর্য্যে কোথায় যেন খুঁৎ থেকে যায়, তার সার্থকতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর কারণ কি?

মায়ের কোলে শুয়ে শিশুর প্রকৃতি, শিশু কোলে নিয়ে মায়ের প্রকৃতি যেমনটা ছাড়া পায় অন্য যে-কোনো অবস্থায় তেমনটি হওয়া অসম্ভব। শিল্পের মধ্যেও যদি প্রকৃতির এই গূঢ় লীলার ছন্দ ধরা না পড়ে তবে সে শিল্প নিরর্থক। এপ্‌ষ্টাইন যদি বলেন, খোলা আকাশের নীচে, মুক্ত বায়ুতে আমার গড়া মূর্ত্তিগুলোর যথাস্থান, সেখানেই তাদের অর্থ ফুটে উঠতে পারে, তাহলে তাঁকে খেয়ালী বলা চলে কি?

বস্তুতঃ, কোনো ভাস্কর্য্যের কাজ ঘরে রাখা হবে কি মাঠে রাখা হবে, এ সমস্যা হচ্ছে একান্ত ভাবে এই ধনিক যুগের। শিল্পও এ-যুগে পণ্যমাত্রে পরিণত হয়েছে। ঘরে বসে ভাস্কর মূর্ত্তি গড়ছেন, সে মূর্ত্তি কে ব্যবহার করবে, কে কিনবে কিছুই জানা নাই, ধনিক যুগের আগে পর্য্যন্ত এ রকমটা কোনো দেশের শিল্পের ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। সেকালে শিল্পসৃষ্টি করা হত শিল্পসৃষ্টি করার জন্যেই নয়, একটা তাগিদে—একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে; অমুক রাজার জন্যে তৈরি হবে এই দেব-মূর্ত্তিটা, অমুক গ্রামের নদীর বাঁকে যে মন্দির আছে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে এই মূর্ত্তিটা—এ সমস্তই শিল্পীর কাজ সুরু করার আগে থেকেই জানা থাকত শিল্পীর। শিল্পরচনায় এই জানার মূল্য কম নয়। এ কথার মানে এ নয় যে, রাজার কাজটা করার সময় বেশী যত্ন নেওয়া হত আর গ্রাম্য মন্দিরের জন্যে মূর্ত্তি গড়তে গিয়ে শিল্পী কোনো রকম হেলা-ফেলা করত। তার মানে হচ্ছে :

"It is, in fact, well-known that the construction of the fire-altar is a veiled personal sacrifice. The sacrificer dies, and it is only upon this condition that he reaches heaven. At the same time, this is only a [illegible] altar, identified with the sacrificer, is his substitute. We freely recognise an analogous significance in the identification of the king with the Buddha, and in particular in the manufacture of statues in which the fusion of the personalities is materially effected.…The king gives himself to the Buddha, projects his personality into him, at the same time that his natural body becomes the earthly trace of its divine model."—(M. Mus.)

অর্থাৎ বৈদিক অগ্নিবেদী ছিল হোতার আত্মোৎসর্গের রূপক মাত্র। হোতা মৃত্যুবরণ করতেন, এই ভাবে স্বর্গে পৌছুতেন তিনি। মৃত্যুটা অবশ্য হত অস্থায়ী, হোতাস্বরূপ ঐ যজ্ঞবেদীটার যা হবার সব হত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরি করার সময় ঐ ভাবে রাজা আর বুদ্ধের একাত্মতা কল্পনা করে মূর্ত্তি গড়া হত। রাজা বুদ্ধের নিকট আত্মনিবেদন করতেন, রাজার ব্যক্তিত্ব লীন হত বুদ্ধে, রাজার দেহ দৈব আদর্শের পার্থিব চিহ্ন হিসাবে কল্পিত হত।

মোট কথা হচ্ছে, সে যুগে যার জন্যে মূর্ত্তি গড়া হচ্ছে আর যে শিল্পী গড়ছে—এই দুই জনকেই মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কাজে অবহিত হতে হত। গ্রাম্য মন্দিরের জন্যে মূর্ত্তি গড়ার সময় শুধু শিল্পী নয় গ্রামের লোকের শ্রদ্ধার আবহাওয়া অনুপ্রবিষ্ট হত ঐ মূর্ত্তির মধ্যে।

প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। আমরা বলছিলাম, শিল্প পণ্যে পরিণত হওয়ার আগে শিল্পীর সৃষ্টি কোথায় সার্থক হবে তা নির্দ্ধারিত থাকত। রবীন্দ্রনাথের গানের মত তাকে 'যথাস্থান' বাছতে হত না; 'কোন্‌খানে তোর স্থান' জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন হত না সেকালের শিল্পকাজকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খোলা হাওয়ায় মূর্ত্তি দেখানোটা এপ্‌ষ্টাইনের নিছক খেয়াল না হতেও পারে। উদার আকাশের নীচেই স্থান পাবার জন্যেই হয়তো সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর সৃষ্টিপ্রেরণার মধ্যে হয়তো খোলা হাওয়া আর উদার আকাশেরও ক্রিয়া ছিল।

যাক্, এপ্‌ষ্টাইনের হয়ে ওকালতি করার বা তাঁর খেয়ালী হওয়ার অপবাদ মোচনের জন্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। তাঁর—এ যুগের পক্ষে—অ-সাধারণ ধারণাটার প্রসঙ্গ তুলে শিল্পের—বিশেষ করে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের একটা উপেক্ষিত দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

আমরা ভারতীয়রা—স্থান-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি। প্রতি স্থানের যে একটা আত্মা আছে, যার জন্যে তার সঙ্গে আমরা একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ করি, এ কথা আমরা জানি! গ্রামদেবতা, গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করে আমরা গ্রামের আত্মাকেই একটা রূপ দিয়ে এসেছি। এই রূপ-কল্পনা মোটেই কারও খেয়াল-খুশি মত করা হয়নি। গ্রামদেবতার রূপ হচ্ছে শিল্পীর তথা গ্রামবাসীদের চিত্তে ধৃত গ্রাম-আত্মারই শিল্পরূপ—একক এবং অনিবার্য্য শিল্পরূপ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশেই, শিল্পের আদি পরিচয় হচ্ছে ধর্ম্মের অঙ্গহিসাবে। গান বলো, নাচ বলো, ছবি বা মূর্ত্তি বলো, গৃহ-নির্ম্মাণ বলো, সকলেরই সঙ্গে ছিল

পেয়েছে তখনই সেই পরিচয় রাখতে চেয়েছে শিল্পের মধ্যে ধরে—এ চাওয়াটা এবং এই সৃষ্টিটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মানুষকে যা বিশ্বের সব-কিছুর সঙ্গে ঐক্যবোধ দিতে পারে তাই হল তার আত্মা; এই আত্মার প্রকাশ হল শিল্পে। মানুষ হিমালয়ের তুষারশুভ্র রূপ দেখে তদ্‌গত হয়েছে, হিমালয়ের মধ্যে অনুভব করেছে নিজের বিরাট রূপকে, তাই হিমালয়কে মহাদেবের মূর্তিতে কল্পনা করে নিজের বিরাট রূপকেই হিমালয়-চূড়ায় মন্দির গড়ে স্থাপন করেছে। এই ভাবেই হয়েছে ভারতের তীর্থে তীর্থে মন্দিরের, দেবতার উদ্‌ভব। তীর্থে গিয়ে ঐ সব মন্দির আর দেবতা-মূর্তি দেখে যদি মানুষ ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বোধ না করতে পারে, ঐ স্থানের রূপে তদ্‌গত না হতে পারে তাহলে তার তীর্থে যাওয়া বৃথা। নিজের আত্মার বিরাটত্ব অনুভব করার জন্যই নিজেকে প্রাত্যহিক জীবনের উর্দ্ধে তোলার জন্যেই তো তীর্থযাত্রা, নইলে তার অর্থ কি?

বস্তুর বিশ্বরূপ দেখা মানুষের ভাগ্যে বড় ঘটে না। একটা বিশেষ স্থানে, একটা বিশেষ কালে, একটা বিশেষ 'আবহাওয়ার' মধ্যে বস্তুর বিশেষ একটা রূপই শিল্পীর চিত্তে ধরা পড়ে। সে রূপকে যথাযথ ভাবে শিল্পে ধরে দিতে হলে শিল্পীকে ঐ স্থান, কাল, ঐরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হয়। কাব্যে এ-সব করা যত সহজ, ভাস্কর্যে বা স্থাপত্যে তা নয়। ভাস্কর্যে বা স্থাপত্যে এই জন্যেই স্থানের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সূর্য্য-মন্দির কোনার্কেই সম্ভব ছিল—এমনটা আর বোধ হয় কোথাও নয়, সেখানকার সমুদ্রকূলে সূর্য্যের যে মাহাত্ম্য অনুভূত হয়, এমনটা আর কোথায়? শান্তিনিকেতনের লালচে কাঁকর-ভরা মাঠে শ্রীরামকিঙ্কর নিজের তৈরী একটা সাঁওতাল-মূর্তি আছে। বাঁ কাঁধে বিরাটকায় এক মূর্তি, তার পিছনে একটা কুকুর। ঐটাকে ঠিক ঐ স্থানেই তার পূর্ণ অর্থে, তার পূর্ণ গৌরবে দেখা যায়। কলকাতায়, এমন কি ঐ শান্তিনিকেতনেরই কোনো আর্ট-গ্যালারিতে ওকে গুঁজে দিলে ওর যে দম বন্ধ হয়ে যাবে, এটা যে কেউ বুঝতে পারে। দাক্ষিণাত্যে, এক পাহাড়ের উপর মন্দিরের পাশে গাছপালার নীচে রয়েছে একটা হনুমানের প্রস্তর-মূর্তি। ঐ পরিবেশ ছাড়া উক্ত জীবটার মহিমা পূর্ণ ভাবে যে ধরা পড়ত না, এটা যাঁদের কিছুমাত্র রসবোধ আছে তাঁরাই বুঝবেন। দক্ষিণ-ভারতেই একটা পাহাড়ের গায়ে বিরাট শিবমূর্তি খোদাই করা হয়েছে—ওটা পাহাড়ের দৈব রূপের প্রতীক হয়েছে। শুধু পাহাড়ের অঙ্গ বলে নয়, পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ মূর্তিটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, অন্য যে কোনো স্থানে ঐ শিবমূর্তির অর্থ ফুটতে পারত না। স্থাপত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে।

মানুষ বাড়ী-ঘর তৈরি করে, মন্দির তৈরি করে, সহর তৈরি করে থাকবার জন্য। তৈরি করার সময় সে শুধু থাকার সুবিধাই বিবেচনা করে না, তার বাড়ী-ঘর সহরকে সুন্দর করার কথাও ভাবে। জীবন ধারণের জন্যে একান্ত ভাবে যা প্রয়োজন তার বেশী চাওয়া হল মানবধর্ম, মানুষ সব ব্যাপারেই তার জীব-ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই জন্যে মানুষ বাড়ী তৈরি করে, সহর তৈরি করে নিছক প্রয়োজনে নয়, শুধু রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে নয়, নিজেকে গৃহ-নির্মাণের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্যেও বটে। সেকালে সমাজে ছিল unanimity—একপ্রাণতা, একটা নির্দিষ্ট 'ছক' মত বাড়ী তৈরি হত, সহর তৈরি হত। একালে বিশেষ করে সহরগুলোয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে বাড়ী তৈরি হয় মালিকের খুশি মত। একটা বাড়ীর সঙ্গে পাশের বাড়ীর সঙ্গতি রইল কি না, ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ীটা মানায় কি না, একথা বিচার করার কোনো প্রয়োজন মানুষ যেন বোধ করে না আর। প্রধানতঃ ধন-গত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ফুটে ওঠে আমাদের গৃহ-নির্মাণে। সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীগত বিভেদ আজ রূঢ় ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের গৃহ ও সহর-নির্মাণে তারই প্রতিফলন হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না, চাপা পড়ে যায়। আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, তার পরে আসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার কথা। তবু, মানুষ যেখানেই প্রকৃতিস্থ, সেখানেই গৃহ বা সহর-নির্মাণের সময় প্রকৃতির সহযোগিতা দেখা যাবেই। হিমালয়ের সানুদেশে তিব্বতী গ্রামের কথা পড়েছি কোন এক এভারেষ্ট অভিযাত্রীর বইয়ে—তার ছবিও দেখেছি। যে গ্রামের রূপের বৈশিষ্ট্য মুগ্ধ করেছে লেখককে, তিনি হিমালয় অঞ্চলের সাধারণ রূপের সঙ্গে গ্রামের এবং গ্রামের বাড়ীগুলোর পরিপূর্ণ সঙ্গতির কথা বলেছেন। অত দূর যাবার দরকার হত না, আমাদের বাংলা দেশের সাধারণ রূপের সঙ্গে আমাদের বহু গ্রামের রূপের এখনও একটা অদ্ভুত সঙ্গতি দেখা যায়, যার ফলে গ্রামগুলোর সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে বিদেশ থেকে আসার পর আমাদের চোখে; বিদেশীদের চোখে তো বটেই।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]
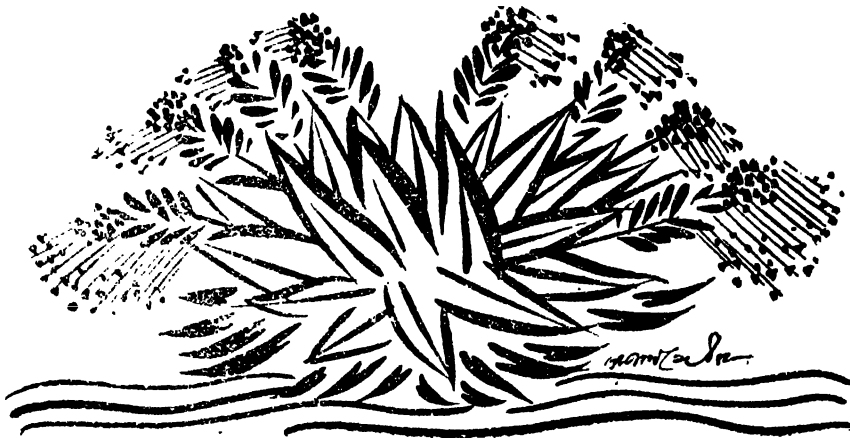
ভদ্রে, ভট্টতনয়ের প্রায় এইরূপ বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার, সুতরাং তাহাকে মদনের ফাঁদে ফেলিতে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি—

চতুরা, প্রগলভা, পরের মন বুঝিবার কৌশল জ্ঞানে ও বক্রোক্তিতে পটু এইরূপ একটি দূতী সযত্নে তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও। সুন্দরি, সে অবসর বুঝিয়া ভট্টপুত্রকে তাম্বুল ও পুষ্প দান করিয়া কামোদ্দীপক বাক্যে এইরূপ বলিবে—

"বাররমণীগণ শিক্ষা-কৌশলে নটীর ন্যায় চাটুবাক্য, অনুরাগ, প্রণয়, অভিমান, বিরহজনিত শোকার্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যোগিগণের ন্যায় গণিকাগণ বৃদ্ধ ও যুবা, হীনকুলজাত ও সংকুলজাত, রোগযুক্ত ও স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না। পণ্যবধূগণ পূর্বে যথেষ্ট শোষণ করা সত্ত্বেও, (পূর্ব-প্রণয়ী) অল্পবিত্তা-বশিষ্ট ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার একমাত্র সম্বল পরিধেয় বস্ত্রখানির প্রতিও লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সেই জন্য বেশ-বিলাসবতীগণ(১) দৃঢ়চিত্ত পুরুষের সম্মুখে 'আমার সহস্র জন্মের অর্জিত পুণ্যসমূহ আজ সুফল দান করিল, কারণ আপনার নয়নাভিরাম মূর্তি আমার লোচনপথবর্তী হইয়াছে, এইরূপ ভাবে কামব্যথা প্রকাশ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া থাকে।" [৮৮—৯৫]

"কেবল, ধৈর্যরূপ আভরণ-পরিত্যক্তা,(২) দুরাশার আগুনে দগ্ধা আমার সখী নিজের নগণ্যতার কথা বিচার না করিয়াই আমাকে প্রণোদিত করায় আমি আপনাকে বলিতেছি—

"হে রমণীবল্লভ, মালতী আপনাকে মনে মনে ভজনা করায় পূর্ব হইতেই আপনি তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে যখন তাহার লোচন-গোচর হইলেন তখন হইতে সে কুসুমধনুর শরের লক্ষ্যীভূতা হইয়া পড়িয়াছে।—কখন তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা কামাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার জন্য বেদনার অবস্থা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, কোন সময়ে তাহার দেহ কম্পিত হইতেছে, কখনও আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। কখন তাহার হাস্যলোপ হইতেছে,(৩) কখন সে ধীর ভাব ধারণ করিতেছে, কখনও বা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে, কখন গান গাহিতেছে, কখনও আবার মৌনাবলম্বন করিয়া আছে। কখন পালংকে, কখন পরিজনের অংকে, কখনও বা ভূতলে, কিংবা কখন অনঙ্গসন্তপ্ত হইয়া কিশলয়রচিত শয্যায় অথবা জলে গিয়া শুইয়া পড়িতেছে।"

"হে সুভগ, (কর্পূর-চন্দনাদিতে দেহ লিপ্ত করিয়া) কখনও সে কর্দমলিপ্তগাত্রা মহিষীর ন্যায় কখন বা মৃণাল-বলয় পরিধান করিয়া (মৃণাল সমূহ মধ্যে বিচরণশীলা) হংসীর ন্যায় কখনও বা ময়ূরীর ন্যায় (বিটরূপ) ভুজঙ্গের প্রতি সে বিদ্বিষ্টা হইয়া উঠিতেছে। কদলী, চম্পক, চন্দন,(৪) পংকজ, জল, হার, কর্পূর অথবা সুন্দর চন্দ্রকান্তমণি কিছুতেই তাহার মদনহুতাশন প্রশমিত হইতেছে না।

---

(১) বেশই যাহার বিলাস অর্থাৎ কলাকৌশলহীনা সাধারণ বেশ্যা। (২) ধৈর্যহীনা, অধৈর্য। (৩) রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণে পাঠ আছে "মুহুরবিভাবিত কার্শ্যা" এবং কাব্যমালার সংস্করণে পাঠ আছে "দূরবিভাবিত কার্শ্যা" আমরা তনুসুখরামের সংস্করণের পাঠ "মুহুরবিভাবিত হাস্যা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। (৪) তনুসুখরামের সংস্করণে 'চম্পক চন্দন'এর পরিবর্তে 'চন্দন পংক' আছে।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

'দূর কর সখি কর্পূর, দূর কর হার, কমলে কি প্রয়োজন, কাজ নাই সখি মৃণালে,' দিবানিশি সেই বালা এই রকম (প্রলাপ) বলিতেছে! কল্পনায় আপনার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া অন্তরে প্রফুল্ল হইয়া আপনাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিতে গিয়া যখন নিজ ভুজ-পীড়নে তাহার জ্ঞান হইতেছে তখন সে বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িতেছে। কুসুম-সুবাসিত পবন, পিকের কূজন, ভৃঙ্গশ্রেণীর গুঞ্জন এই সকল দ্রব্য বিধি যেন তাহার বিনাশের জন্যই একত্রিত করিয়াছেন। প্রবল মকরকেতু কর্তৃক সেই অবলা এক্ষণে এই দশায় আনীত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা করুন। শুভজন্মাগণ বিপদে পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন।" [৯৬-১০৬]

"প্রায়শ: প্রার্থিগণ যাহা বলে তাহা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয় না, তথাপি ধৃষ্টতা সহকারে আমি মালতীর গুণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি (দয়া করিয়া) শ্রবণ করুন—

"অতনু তাঁহার কুসুম-ধনু আস্ফালন করিলে যে কুসুম-রজ: পতিত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই বিধাতা তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই সুগাত্রীকে নির্মান করিয়াছেন। মালতীর দেহলাবণ্য ফণীন্দ্রভূষণ শিবের দেহার্ধের সহিত সতত-লগ্ন পার্বতীর দেহের লাবণ্যকে উপহাস করে, কারণ, তাহার লাবণ্যের কোন অংশই লুপ্ত হয় নাই (তাহা সম্পূর্ণ)। শশধরের বিম্বের অর্ধেক যেরূপ রাহুর বদনের ছায়ার দ্বারা আবৃত হয়, ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় নীল কুটিল অলকাবলী তাহার ললাট আবৃত করায় তাহার (বদন-চন্দ্রমার)ও সেইরূপ শোভা। হে হৃদয়প্রিয়, সরসিজের শোভা অস্থির (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী) এবং শশীর মণ্ডলে কোন বিভ্রম নাই সুতরাং মালতীর বদন (যাহার শোভা স্থির এবং বিভ্রম-বিভাসিত)এর সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের উপর অলি (কমল ভ্রমে কিছুক্ষণ) উড়িয়া সৌগন্ধে পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া কর্ণস্থিত কমলে গিয়া বসে—সময়-বিশেষে নির্গুণতা হিতকারী হইয়া থাকে। সহজাত অরুণিমাসম্পন্ন জিত-বন্ধুজীব-রুচি(৫) "তাহার অধরে যে অলক্তকবিন্যাস তাহা তাহার প্রসাধন-লীলা(৬)। বিচিত্র তাহার বলিসম্বলিত মধ্যদেশের কৃশতা! বিধাতার দ্বারা বিহিত এই তনুতাকে কোন মহতী শক্তিই অপনীত করিতে পারে না। আরও যে তাহার মদনের আবাসস্থলরূপ

---

(৫) বন্ধুজীব বা বাঁধুলি ফুলের রক্তবর্ণকে পরাজিত করিয়া যাহার শোভা। (৬) অর্থাৎ তাহার সহজাত রক্তিম অধরে আর অলক্তক-বিন্যাসের প্রয়োজন নাই, সে যে তাহা করে তাহা কেবল প্রসাধন-লীলা মাত্র।

অতিবিশাল নিতম্ব আছে তাহা কপিলমুনিরও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারে। সেই রম্ভাবপুর(৭) রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় উরুযুগল দেখিলে মকরধ্বজও সহসা নিজের কুসুমশরের লক্ষীভূত হইয়া পড়িবেন। সেই জঘনভারালসগমনা (মালতী) মনোহর শরজন্মা (কার্ত্তিকের)র লোচনপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পঞ্চবাণের সর্বস্ব-স্বরূপা তাহাকে যদি কোন মতে মধুসূদন দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহার বক্ষলগ্না লক্ষ্মীকে বৃথায় ভার বহন করিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। যদি সে কোন ক্রমে হরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাঁহার দেহের দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া ত্রিভুবনকে শিবরহিত করিয়া ফেলিবে(৮)। তাহার সেইরূপ অসামান্যরমণীসুলভ সৌন্দর্য সৃজন করিতে করিতে বিধাতা যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা কাকতালীয়ের ন্যায় (আকস্মিক ঘটনা) বলিয়া মনে করি। সহজাত বিলাসের নিকেতন তাহার দেহ স্বর্গরাজ (দেবেন্দ্র) যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাঁহার সহস্র চক্ষু থাকিলেও তাহা বিফল। সংসারের সারভূতা মালতী যতক্ষণ ধরায় বিচরণ করে ততক্ষণ হে মনসিজ, তোমার কুসুম-ধনুর জ্যা শিথিল করিয়া দাও, বাণসকল তূণীরে তুলিয়া রাখ(৯)। বাৎস্যায়ন, 'মদনোদয়' গ্রন্থের প্রণেতা, দত্তক, বিটপুত্র ও রাজপুত্র প্রভৃতি কামশাস্ত্রকারগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সমস্তই স্বভাবতঃই তাহার মানসগোচর হইয়া আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র, দন্তিলের সংগীতশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, চিত্রকলা, সূচীশিল্প, পত্রচ্ছেদ্যবিধান, ভ্রমকর্ম(১০), পুস্তকর্ম(১১), পাকশাস্ত্র প্রভৃতিতে এবং আতোদ্য বাদ্যাদিতে(১২), নৃত্যে ও গীতে তাহার যে কৌশল তাহা সর্পরাজ (শেষনাগ) তাঁহার সহস্র বদনেও বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। স্খলিতোত্তরীয় বিস্রস্তবসনা রতিলালসমানসা(১৩) মালতী সহসা নির্জনে যাহার বক্ষলগ্না হয় সে ব্যক্তি পুণ্যবান্। রতিরসরভসের আস্ফালনে চঞ্চল বলয়ধ্বনি মিশ্রিত তাহার তৎকালোচিত রতকূজিত যাহার শ্রুতিপথে পতিত হয় সে অল্প পুণ্যবান্ নহে। [১০৭—১২৭]

হে শুভমধ্যে,(১৪) এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে উদাসীন থাকে তাহা হইলে দূতী তাহাকে কোপপ্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিবে—

"কি এমন আপনার সৌভাগ্যের অহংকার, কি এমন রমণীয় যৌবন-লাবণ্যের দর্প যে, আপনা হইতেই প্রেম নিবেদন করিতেছে যে মালতী, তাহাকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না? ধনবান, সৎকুলজাত বা প্রশস্ত শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণকে যে নগণ্য বলিয়া মনে করে সে কি না আপনার জন্য ক্লেশ পাইতেছে, অপাত্রে নিবেশিত তাহার অনুরাগকে ধিক্। তীব্রকর সূর্যের প্রতি কমলিনীর ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত শম্ভুশিরের প্রতি শশিকলার ন্যায় পশুতুল্য আপনার প্রতি অনুরক্তা তাহার কথা ভাবিয়া (দুঃখে) আমি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছি। অসরল, নীরস, কঠিন, দুর্গ্রহ, কর্কশ খদির বৃক্ষকে মালতীলতা যখন আশ্রয় করে তখন অসরল-প্রকৃতি, প্রীতিবিবর্জিত, কঠোর-হৃদয়, যুক্তি দ্বারা অনুকূল করিতে দুঃসাধ্য, রুক্ষ-প্রকৃতি আপনাকে ভালবাসিয়া মালতী যে মালতীলতার নামোচিত আচরণ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাতে দোষই বা কি দিব। অসামঞ্জস্যের জন্যই এই বৈলক্ষ্যের কারণ হইয়াছে(১৫), স্বাধীনা(১৬) হওয়া সত্ত্বেও মৃণালিনীকে কাক পরিত্যাগ করে (ভক্ষণ করে না)। হে সুভগ, আমি আপনাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিলাম বলিয়া দুঃখ করিবেন না, অনুরক্তা তরুণীর সুহৃদ্ যদি পরুষবাক্য বলে যুবকদিগের তাহা আভরণ-স্বরূপ। সেই সুগাত্রী রমণীয়া হইলেও চন্দ্রসংযুক্তা জ্যোৎস্নার ন্যায়, কংসারির কণ্ঠস্থিত বনমালার(১৭) ন্যায়, বসন্তবল্লভ মদনের কুসুমশরাসন লতিকার ন্যায়, হলধরের মদলীলার ন্যায়, স্তনযুগলের মধ্যস্থ হারলতার ন্যায় আপনার সহিত সঙ্গতা হইয়া আরও রমণীয়া হউক। কি আর বেশী বলিব, যদি নিখিল তরুণকুলের শিরোদেশে চরণস্থাপন করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে এই প্রেমোজ্জ্বল স্ত্রীরত্নটিকে শীঘ্র অংকে ধারণ করুন। [১২৮—১৩৭]

অনন্তর তাহার (এই সকল) বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি ভট্টপুত্রের মদন উদ্দীপিত হয় তাহা হইলে সে যখন তোমার গৃহে উপস্থিত হইবে তখন তুমি এইরূপ করিবে—

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে ও প্রণাম করিয়া নিজের আসনটিতে তাহাকে বসিতে দিবে, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার পদদ্বয় পুঁছিয়া দিবে। অযত্নপ্রকাশিত কক্ষ, উদর, বাহুমূল ও কুচযুগল নায়ককে ঝটিতি ঈষৎ প্রদর্শন করিয়া ত্বরায় তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইবে। [১৩৮—১৪০]

অনন্তর, হে গুরুজঘনে, তাহাকে পর্যংকসজ্জিত, দীপোজ্জ্বল কুসুম ও ধূপবাসে সুবাসিত বাসকাগারে প্রবেশ করাইয়া তোমার মাতা (১৮) অবতারণাদিপূর্বক এই সকল বাক্যবিশেষে যত্নসহকারে অভিনন্দন করিবে—

"আজ আশীর্বাদ সফল হইল, ইষ্টদেবতাগণ পরিতুষ্ট হইয়া কল্যাণরূপ অলংকার দ্বারা এই গৃহ অলংকৃত করিয়াছেন। অনুরূপ পাত্র সংঘটন করিয়া আজ বহুকাল পরে কুসুমেষুর শরাসন আকর্ষণ সফল হইয়াছে। সকল গণিকাগণের শিরে চরণবিন্যাস করিয়া এক্ষণে আমার সুভগা বৎসা সৌভাগ্য-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিক। (কেবল মাত্র) পুত্রজন্মে যাহারা সন্তুষ্ট তাহাদিগকে ধিক্, দুহিতাগণই প্রশংসনীয়, কারণ, তাহাদেরই সম্বন্ধহেতু আপনার ন্যায় জামাতা

---

(৭) অপ্সরা রম্ভার সুগঠিত দেহের মত যাহার দেহ রম্ভাকাণ্ড—কদলীকাণ্ড। (৮) শিবের দেহের বামার্ধ পার্বতী অধিকার করিয়াছেন এখন দক্ষিণার্ধ মালতী অধিকার করিলে শিবের নিজস্ব দেহ বলিয়া কিছু থাকিবে না, সুতরাং ত্রিভুবন শিবরহিত হইবে। (৯) কারণ তাহার কোন আবশ্যক নাই, মালতীই ফুলশরের কার্য করিবে। (১০) ইন্দ্রজাল অথবা যানাদি চালন-বিধি। (১১) কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, চর্ম অথবা ধাতুনির্মিত পুত্তলিকা নির্মাণ-কৌশল। (১২) বীণা, মুরজ, বংশী ও কাংস্য এই চতুর্বিধ বাদ্য। (১৩) ইহাতে রতির আবেগে নায়িকার স্বয়ং অভিসার সূচনা করিতেছে, ইহা কামুকের প্রার্থনাতিরিক্ত সৌভাগ্য। (১৪) সুন্দর মধ্যদেশ যাহার।

(১৫) আমা হইতে অধিক গুণবতী এই মনে করিয়া গ্রহণ করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা হইতেছে। (১৬) মৃণালপক্ষে 'অরক্ষিত,' মালতী পক্ষে 'স্বেচ্ছাধীনা'। (১৭) "আপাদলম্বং যা মালা বনমালেতি সা মতা" অথবা "পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা প্রকীর্তিতা"। (১৮) জননী অথবা মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা [illegible]ার ন্যায় পালন করিয়াছে।

লাভ হয়। আপনার স্থায় ব্যক্তি যদিও দৃঢ়পরিচয়(১৯), ও গুণজ্ঞ হইয়া থাকেন এবং উচিত পাত্রকে সম্মান করিয়া থাকেন তথাপি সুহৃদ্স্নেহবশতঃ আমার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। নিজ হইতে আপনাতে অনুরক্তা মালতীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন বেচারী(২০) যাহাতে আপনার অপ্রিয় কার্য করিয়া দুঃখের কারণ না হয় সেইরূপ করিবেন।" [১৪১-১৪৮]

কোমল, ধৌত ও ধূপাদি দ্বারা সুরভিত বসন ও সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত মহার্ঘ্য(২১) ভূষণাদি পরিধান করিয়া যথেষ্ট ধূপবর্ত্তি(২২) পান করিয়া হে সুতনু, তুমি কান্তের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া সস্নেহে, সলজ্জে, সাধ্বস সহকারে(২৩), সস্পৃহ ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ঈষৎ দেহ-লাবণ্য দর্শন করাইয়া মধ্যে মধ্যে দু'-একটি পরিহাসসূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত নর্মালাপ করিবে। মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, পরিজনবর্গ বাসকস্থান পরিত্যাগ করিলে যখন কান্ত বিলাসের উপক্রম করিবে তখন কিছুক্ষণ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। রতিযুদ্ধের অভিলাষ করিয়া সে যখন তোমাকে আনন্দে তাহার নিকট আকর্ষণ করিবে তখন কুট্টমিত(২৪) আচরণ করিবে, কিঞ্চিৎ অঙ্গসংকোচ করিবে। বৎসে, সুরত-বিধির আরম্ভে ক্রমে মদনাবেগ প্রদর্শন করিয়া নিঃশংকে অকপটে অঙ্গাদি সমর্পণ করিবে। সে তোমার দেহের যে যে অংশে আঘাত করিতে(২৫), দেখিতে বা নখরেখাংকিত(২৬) করিতে ইচ্ছা করিবে তুমি আবেগ-সহকারে তাহা প্রকাশ করিবে ও আগাইয়া দিবে। দংশন(২৭) করিলে ব্যথাসূচক হুংকার করিবে, (স্তনাদি) মর্দন করিলে(২৮) বিবিধ কণ্ঠশব্দ করিবে, নখাঘাত করিলে সীৎকার করিবে, আঘাত করিলে সুস্পষ্ট নূপুরশিঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিবে(২৯)। পুরুষের রাগ বৃদ্ধির জন্য শ্রমজনিত ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুলক-রোমাঞ্চিত দেহে সকল অবয়ব শিথিল করিতে করিতে বিক্ষেপ করিবে(৩০)। হে কলকণ্ঠি, উপযুক্ত সময়ে(৩১) রসাবেগে তুমি কোকিল, লাবক(৩২), হংস, পারাবত ও অশ্বের(৩৩) ন্যায় বিরুত প্রকাশ করিবে।

'না—না, অত জোরে পীড়ন ক'রো না। নিষ্ঠুর, একটু ছেড়ে দাও। আমি আর পারছি না—' এইরূপ ভাবে অস্ফুটাক্ষরে গদ্‌গদ কণ্ঠে নায়ককে অনুরোধ করিবে। কামুকের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিয়া সুরতকালে অনুরাগ, আনুকূল্য, বামতা, প্রগল্‌ভতা এবং অসামর্থ্য প্রদর্শন করিবে। রতাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা) অসংগতি, অশ্লীলতা, অধৈর্য ও অবিনয়সূচক ব্যবহার আচরণ করিবে(৩৪)। নায়কের কার্য সমাপ্ত হইলে নখক্ষত সকল উপেক্ষা করতঃ নিমীলিত নেত্রে নিরুৎসাহ হইয়া শিথিলীকৃত অবয়বে পড়িয়া থাকিবে। মোহভাব অপনীত হইলে ত্বরায় নিতম্ব আবরণ করিবে খিন্নাঙ্গতা দেখাইয়া সলজ্জ মৃদুহাস্যে খেদালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। [১৪৯—১৬২]

রতাভিযোগ সমাপ্ত হইলে, নির্জন স্থানে গিয়া জলস্পর্শ করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ কিছুক্ষণ আসনে উপবেশন করিয়া কেশসংযমান্তে তাম্বূলাদি উপযুক্ত মুখবাস গ্রহণ করিয়া শয্যায় আরোহণ করিবে এবং রমণের কণ্ঠ রভসভরে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্বক প্রণয়-সহকারে এইরূপ বলিবে—

"ভট্টপুত্র, তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীকে খুব ভালবাস, সেই জন্য তাহার প্রতি অনুরক্ত-হৃদয়, তুমি অপর নারীর আলিঙ্গনে নির্মল পরিতুষ্টি লাভ করিতে পার না। সফল তাহার জন্ম, সে-ই সকল নারীগণ হইতে বাঞ্ছনীয়া, সার্থক তাহার গৌরী আরাধনা, সার্থক তাহার সৌভাগ্যজনক তপস্যা। নিশ্চয়ই সে বহুগুণবতী এবং যে বংশে তাহার জন্ম শ্লাঘনীয় সেই বংশ, বহু পুণ্যফলে সে তোমার বিবাহিতা পত্নী হইয়াছে। নরকাসুরবৈরী নারায়ণের বক্ষ হইতে যেমন লক্ষ্মী কখনও বিচ্যুতা হন না তেমনি (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় কুলের ভূষণস্বরূপা সেই বরারোহা পুণ্যবতী তোমার বক্ষলগ্না হইয়া থাকুক। তুমি কেবল মাত্র কৌতুকভরে যে সকল রমণীর প্রতি তোমার কুবলয়সন্নিভ লোচনের দৃষ্টিপাত করিয়া থাক তাহারাও আপনাদিগকে যথার্থ সুন্দরী মনে করিয়া এত হর্ষোৎফুল্ল হয় যে তাহাদিগের আনন্দ যেন তাহাদিগের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তরল-বুদ্ধিশালিনী রমণী প্রিয়ের প্রণয় অতি অল্প হইলেও প্রায়শঃ তাহা লইয়া বড়াই করে, তাই আমি নিজ মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি—[১৬৩—১৭০]

---

(১৯) চঞ্চল নহে অর্থাৎ এক জনকে ছাড়িয়া অপরে অনুরক্ত হয় না। (২০) মূলে 'বরাকী' শব্দ আছে। (২১) মূলে 'অগ্রাম্য' শব্দ আছে। (২২) মুখ সুবাসিত করিবার জন্য বর্তমান কালের 'বিড়ি' প্রভৃতির ন্যায় সুগন্ধি মশলায় প্রস্তুত ধূপবর্ত্তি বা ধূমবর্ত্তি। (২৩) সম্ভ্রমের সহিত। (২৪) কেশ স্তনাদি গ্রহণ করিলে সুখে অন্তরে হৃষ্ট হইয়া মুখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া মস্তক ও হস্ত বিধূনন করাকে বলে 'কুট্টমিত'। (২৫) স্কন্ধদ্বয়, শির, স্তনান্তর, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব আঘাত বা প্রহণনস্থান। (২৬) কক্ষদ্বয়, কণ্ঠ, কপোলদ্বয়, নাভি, শ্রোণি, কুচদ্বয়, ভগস্কন্ধ ও কর্ণমূল নখাঘাতের স্থান। (২৭) কক্ষ, উদর, স্তনযুগ, কপোল ও কণ্ঠ ইহাই দন্তপীড়ন স্থান। (২৮) দেহের মাংসল স্থান, যথা, বাহু, কুচ, উরু, নিতম্ব, পার্শ্ব, নিম্নোদর, জঘন প্রভৃতি মর্দন স্থান। (২৯) কামশাস্ত্রে হিংকৃত, স্তনিত, সূৎকৃত, দূৎকৃত, ফূৎকৃত কূজিত ও রুদিত প্রভৃতি সীৎকারের বর্ণনা আছে। (৩০) wriggling। (৩১) বাৎস্যায়ন কামসূত্রে কোন্ সময়ে কিরূপ বিরুত করিতে হয় তাহা বলিয়াছেন [কাঃ সূঃ ২।৭।১৩-২০]। (৩২) 'লাওকা'পক্ষী (Perdix chinesis)। (৩৩) অশ্বের ন্যায় বিরুত করার কথা অন্য কোন কামশাস্ত্রে পাই নাই। কবি এ ক্ষেত্রে চণ্ডবেগা নায়িকার রাগকালে চণ্ডনায়ক কর্তৃক দৃঢ় নিপীড়নে মুখ হইতে নির্গত 'হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ' এইরূপ শব্দকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

(৩৪) রতির আবেগে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা তরুণীগণ যে সকল অসঙ্গত বা অনুচিত আচরণ করে, অশ্লীল বাক্য বলে, অধৈর্য প্রকাশ করে বা অবিনীত বা অসভ্যতা আচরণ করে তাহা নিন্দনীয় নহে বরং সুখাবহ।

উলুখড়

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

বচন সিং ভাবতেই পারে না, কি করে সে ছ'শ মাইল পথ পার হয়ে দিবা-রাত্রি পায়ে হেঁটে দিল্লী এসে পৌছল! এগার দিন পথ চলার পর যেদিন অমৃতসহর পৌচেছিল, সেদিনকার কথা ভুলতে পারেনি। মৃত্যুর কালো ছায়া সারা দলটাকে ঘিরে রেখেছিল কোন প্রেতাত্মার মত। সেদিন দূর হতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের চূড়া আকাশের গায়ে রোদের আভায় ঝকঝক করতে দেখে দূর হয়ে গেল মন হতে মৃত্যুর স্তব্ধ নিশ্চল রূপ—সারা মনের হাহাকার, কত প্রিয়-জনকে হারাবার জমাট ব্যথা। নিজেকে বোধ হয় সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মানুষ। না হলে মা, ছোট ভাই গুরুদিৎ—কত পরিচিত কত সুখ-দুঃখময় দিনের সঙ্গী তার সাথী···চোখের সামনে ভেসে তাদের মৃত্যুকাতর মলিন চাহনি—তাদের অসহায় ভাষাহীন আর্তনাদ সব ভুলে গিয়ে বাঁচবার আনন্দে এগার দিনে পথশ্রমক্লান্ত যাযাবর বচন সিং ছেঁড়া কুর্তার ফাঁক হতে রক্তাক্ত হাতটা আকাশের দিকে তুলে আর সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আনন্দধ্বনি করেছিল—

—"ওয়া গুরুজি কি ফতে!"

দলে দলে আশ্রয়প্রার্থীরা আসছে দূর নৌসেরা—লালামুসা—গুরুদাসপুর—কসুর এমন কি ডেরাইসমাইল—ডেরাগাজি আরও কত দূর হতে, কেউ দশ দিন—বিশ দিন পায়দল আসছে। মাইলের পর মাইল লম্বা যাত্রিদল স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকলেই কোন রকমে জরাজীর্ণ পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে পালিয়ে আসছে। পিছনে পড়ে রইল কত জানে না—কত সঙ্গী নিঃশেষ হয়ে গেল মৃত্যুর বুকে তাদেরই সামনে। ভয়ে দু'হাতে চোখ বুজে সে দৃশ্য না দেখবারই চেষ্টা করছিল তারা। মনে মনে ব্যাকুল প্রার্থনা—এ দিন যেন তাদের জীবনে না আসে।

সেদিনগুলো কোন অতীতের দেখা দুঃস্বপ্নের মত গেঁথে আছে বচন সিংএর জীবনের সঙ্গে। সেগুলোকে ভুলতেই পারবে না সে, যা তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে তা'দিকে সে চিরদিনই মনে রাখবে।

দুপুরের অসহ্য রোদে দিল্লীর সারা আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে গরম বাতাসের হলকা সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে যায়, ইণ্ডিয়া গেটের নীচে বিশাল পাথরের তৈরী ফটকটার পাশেই নীল কেরাসিন কাঠের বাক্সে ছোট-ছোট খোপ তৈরি করে লেমনেড-সোডার বোতলগুলো বসিয়ে সরবতের দোকান সাজিয়েছে বচন সিং—জীবিকা এখন এই-ই।

রোজ বেলা দশটার সময় পাণ্ডবকেল্লা হতে ছোট্ট গাড়ীখানা ঠেলতে ঠেলতে আসে বচন সিং, শাহাজাহান রোড হয়ে ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে ইণ্ডিয়া গেটের দিকে, গাড়ীখানা গেটে উঠবার সিঁড়ির পাশে দাঁড় করিয়ে কাছেই ঝিল হতে কয়েক বালতি জল এনে চারি দিকে একটু পরিষ্কার করে দোকান সাজায়। নিজে এক গেলাস জলে দু'-এক টুকরো বরফ দিয়ে বেশ একটু খেয়ে আয়েস ক'রে বসল। আজ প্রায় মাসখানেক ধরে চলে আসছে—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ক্লান্ত দুপুর বেলা জনসমাগম কমে যায়। ট্যুরিষ্ট দলও এই খর 'লু'এর মধ্যে বার হয় না—দু'-এক জন বেয়ারা সাইকেল থামিয়ে চোখের গগলস খুলে দু'-এক গেলাস লেমনেডের, অর্ডার দেয়। নয়ত একখানা গাড়ী সশব্দে থেমে গিয়ে কিছু সওদা করে আবার বার হয়ে যায়।

নীরবে বসে থাকে বচন সিং, প্রশস্ত রাস্তাটা দু'পাশে ঘাসের বুক চিরে চলে গেছে, দূরে সোজা গিয়েই উঠে গেছে আরাবল্লীর রিজ, গভর্ণমেণ্ট হাউসের চূড়াটা বিশাল প্রাসাদের গাম্ভীর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দু'পাশে সেক্রেটারিয়েট—স্বাধীন ভারতের কর্ম-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রশালা। এ পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হস্তিনাপুরের কোন পৌরাণিক যুগের ধ্বংসাবশেষ। কালো-কালো বিশাল পাথরগুলো আজও আকাশচম্বী দুর্গ-প্রাকারের কল্পনা এনে দেয়। এক দিকে সুদূর অতীত, অন্য দিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। মাঝখানে নির্বাক্ বচন সিং,—যেন স্বপ্ন দেখে কোন অতীতের।

প্রথম যখন এল সে দিল্লীতে, ঠাঁই নাই তার কোথাও! দিল্লী মেন ইষ্টিশানের বাইরে টাঙ্গা-শেডের নীচে পড়ে থাকত। দিল্লীর মোহ তার কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা সর্বহারা মনের মাঝে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির প্রলেপ এনে দিল। অনুভব করল বচন তার নিজের অস্তিত্ব—তাকে বাঁচতে হবে! খাবার সংস্থান করতে হবে।···

দিন-রাত ঘুরে বেড়ায় সারা দিল্লীতে। নিরাশ্রয় সে···আপন বলতে যার সারা পৃথিবীতে কেউ নাই, টাঙ্গাওয়ালাই বোনে গেল, রাতে পড়ে থাকে টাঙ্গা-শেডের নীচে!···

মাঝে-মাঝে অতীতের কথা মনে আসে!···দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

···ঝিলামের ধারে মিরকি টিলার উপর গাঁও। গাঁয়ের চারি দিকে গোল পাঁচীরের বাইরে ঝিলামের ধারে ত্রিশ বিঘা ক্ষেতি—তিনটা ভইসা! কাজল-কালো জলরাশির পাশে সবুজ ক্ষেতি, নরম পলির উপর শীতের প্রারম্ভে লকলকে হয়ে ওঠে যব-গম-বাজরার চারা। চানার পুষ্টলো গাছগুলো বৈকালের হিমেল বাতাসে ঝিলমিল করে কোন্ অজানা দেশের স্বপ্ন দেখে।

—'ভেইয়া—ভেইয়া!'

ছোট ভাই গুরুদিতের ডাকে ফিরে চাইল বচন সিং। বেলা হয়ে গেছে অনেক, টিলার পাশ দিয়ে বর্তন হাতে নেমে আসছে বুড়ী মা রোটি নিয়ে। খাবার সময় হয়ে গেছে, বচন ভইসাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নদীর জলে স্নান করতে নামল। মোষগুলোও কর্দমাক্ত কলেবরে নদীর জল তোলপাড় করে তুলতে লাগল

স্নানের পরেই আহার, জমির আলের উপর দুই ভাইন বসে পড়ে, রোটি সবজি আর দহি—সারা দিন পরিশ্রমের পর তাই যেন অমৃত বোধ হয় বচনের।

খাওয়ার পর নিম গাছের নীচে পাগড়িটা বিছিয়ে একটু গা গড়িয়ে নিতে যাবে—পাশের ক্ষেত থেকে বেড়া ডিঙ্গিয়ে আসে মিঠু, বচনের ঘুমন্ত দেহটাকে ঠেলে উঠিয়ে দেয়—"এ্যাই! এ্যাই!"

ধড়মড় করে উঠে বসল বচন, মিঠুর হাতে কলকেটা···

"লেও, পি লেও!"

"নেহি" ঘাড় নাড়ে বচন! গুরু গোবিন্দ সিংএর শিষ্য তারা, তাম্বাক খাওয়া নিষেধ!

"ছোড় দে—হট্ তুসি!

মিঠু কিছুই মানে না, তার কথাবার্তাই এমনি, গম বেচতে গিয়ে সেবার গুজরানওয়ালায় গিয়ে মাথার চুল-দাড়ি সব কামিয়ে একেবারে

বাঙ্গালী বাবু বনে চলে এসেছিল,—কি মারটাই না মেরেছিল ওর বাবা। সারা গাঁয়ে ওর চুল-দাড়ি কামানর জন্ম কত গোলমাল—শেষ কালে ওর বাবা মোহন্তের অস্থলে বেশ কিছু দণ্ড দিয়ে চাপা দিয়েছিল ব্যাপারটা।

ও-সব দিকে মিঠ্‌ঠুর খেয়াল নাই। ইত্যবসরে আরও বেশ ক'টা টান দিয়ে কল্‌কেটা নিঃশেষ করে দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে বলে, "আরে—সাথী তুসে বোলায়া।"

"সাথী। কেঁউ?" নামটা শুনেই চমকে উঠে বসে বচন, পাশের ছুপড়ির গুরুদয়ালের মেয়ে। তাকে ঘিরে কোন অবচেতন মনে বচনের রচিত হয় কোন কল্প-জগৎ। তার কালো ডাগর চোখের মাঝে ঝিলামের মতই কোন সুদূর হিমালয়ের অজানা মায়া—দেহে ঝিলামের মতই কোন চঞ্চল যৌবন-স্রোত।

মিঠ্‌ঠুর ধাক্কাতে চমকে ওঠে বচন—"খামোস্ কিঁউ বে?"

সত্যিই তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে গেছে মিঠ্‌ঠুর কাছে। নইলে চুপ করে গেল কেন সে হঠাৎ। দূরে গাঁয়ের দিকে চেয়ে দেখে, সত্যিই সাথী ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সালোয়ার পাঞ্জাবীর উপর আধ-ময়লা জাফরাণী রং-এর ওড়নাটা বাতাসে দোল খায়।···

রাত্রি ঘনিয়ে আসে আকাশে-আকাশে। শীতের কনকনে হাওয়া হিমালয়ের জমাট তুষারকে ঘনতর করে তোলে। সারা পশ্চিম-পাঞ্জাবের সমভূমিতে ফসলের ইসারা; লকলকে গমের পুষ্ট শিষে সোনার মৃত্তিকার সফলতার সংবাদ, সোনালী শিষে ছেয়ে গেছে দিক্ হতে দিগন্ত। শীতের কুহেলি তখনও বিদায় নেয়নি। দূরে ক্যাম্বেলপুরের বাগিচায় পীচ গাছগুলোর ঝরা পাতায় শূন্যতার আভাষ, মকরোল লতার শিরে শিরে বসন্তের আগমনী।

রাতের বেলায় সব ঢেকে যায়, জেগে থাকে শুধু আকাশের তারা আর একফালি চাঁদ। মৃত্তিকার বুকে ছন্দ তুলে ঘুরে বেড়ায় ঝিলামের তীরে-তীরে ধনেশ পাখীর দল।

ঘুম আসে না বচনের। বাইরে পায়চারি করছিল, একটা পাথরের উপর বসে কি সব ভাবতে থাকে আকাশ-পাতাল। হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে যায়। সাথী পা টিপে-টিপে আসছে।

একটু বিস্মিতই হয়ে যায় বচন সিং। গুরুদয়াল মেয়ের সাদীর সব আয়োজনই করেছে। বচপণ হয়ে গেছে। ফসল উঠলেই বান্দাগড়ের জোতদার লগনের সঙ্গেই বিয়ে হবে। বর হিসেবে বেশ ভালই। আশা করেছিল বচন, হয়ত তাদের দু'জনেই একসঙ্গে থাকতে পাবে সারা জীবন। সে আর সাথী, কিন্তু বাদ সাধল গুরুদয়ালই, একটি মাত্র মেয়ে তার—এত টাকা দিয়ে তার খাঁই মিটোতে বচন পাবে কোথা।

জোতদার লগন সিং পয়সাওলা লোক। দু'-পাঁচশো টাকা তার কাছে কিছুই নয়। গুরুদয়ালের সমস্ত চাওয়াই সে মিটিয়েছে।

বচনের সম্বল কোথা? মা বলেছিল, জমি বিক্রী করেও বিয়ে দেবে বচনের ওই সাথীর সঙ্গে। কিন্তু আপত্তি করেছিল বচনই। জমি বিক্রী করে জরু কেনবার সামর্থ্য তার নাই. সারা পাঞ্জাবে ভাল মেয়ে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা. টাকা যাদের আছে তারাই ভাল মেয়ে কিনতে পাবে—যাদের নাই তাদের আশা দুরাশা।

···কথা কয় না বচন। মুখ ফিরিয়া বসে থাকে। সাথী জোর করে তার মুখে গুঁজে দেয় একটা পেস্তার লাড্ডু। তার হাতটা সরিয়ে দেয় বচন।

বেশ ভুরভুরে গন্ধ, গাজিয়াবাদী আতরের খোসবু! সাথীর কথাটা শুনেই চমকে ওঠে বচন।

—"ক্যা মালুম, বান্দাগড়কা কোন বান্দা নে ভেজা হ্যায়।" শ্বশুর-বাড়ী হতে 'দেয়াৎ' পাঠিয়েছে ঐ-লাড্ডু, আর তাই তাকে খাওয়াতে এসেছে সাথী নিজে। সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে বচনের—"ওহি লাড্ডু খিলানে আয়া হাম্‌কো, তেরি সরম নেহি আতি? হট্—"

জোর করে সাথীকে সরিয়ে দিল বচন। লজ্জা লাগে না—শোনান হচ্ছে হবু শ্বশুর-বাড়ী হতে ভেট্ পাঠিয়াছে আর সেই লাড্ডু খাওয়াতে এসেছে তাকে। মেয়েরা এত বেহায়াও হতে পারে।

এ কি! দূরে সাথীর দিকে চেয়েই অবাক্ হয়ে যায় বচন। কাঁদছে সে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার মুখটা তুলে ধরল। টানা-টানা ডাগর কালো চোখের কোলে টলটলে মুক্তার মত আঁখিতারা দু'টো চিকমিক করছে অস্পষ্ট তারার আলোয়। টিকলো নাকের মাঝে দীর্ঘ আয়ত চোখ-দু'টোয় কি যেন গভীর ব্যর্থতার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। আদর করে আরও কাছে টেনে নেয় তাকে বচন—"আরে রোতি কিঁউ?"

কথার জবাব দেয় না সাথী। নীরবে কাঁদতে থাকে. বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বচন! সারা শরীরে তার কি এক অজানা শিহরণ, এত কাছে এ ভাবে সাথীকে কোন দিনই পায়নি সে। রাতের নিবিড় মায়া যেন সব কিছু ভুলিয়ে দেয় তাকে। দু'টো ডাগর কালো চোখে কি যেন রং-এর নেশা—আরও কাছে টেনে নেয় বচন সাথীকে।

আবেশে সাথীর দু'চোখের পাতা ছেয়ে আসে। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বচন। রাতের আকাশ তারার রোশনীতে ওঠে শিউরে, পাঞ্জাবের কঠিন শিলালিপিতে এক নিশীথ রাত্রে কোন যুবক-যুবতীর ক্ষণিকের মিলন-কাব্য তার স্থায়িত্ব কি কালের বুকে বিন্দুমাত্র রইবে কোন দিন?···কে জানে?

ফসল উঠে গেছে। অঙ্গনে রাশি-রাশি গম-বাজরার স্তূপ। মাড়াই চলেছে। সোনালী দানা-দানা গমের আঁচলা—বুড়ী অনুভব করে এর প্রতিটি কণা তার ছেলে বচন আর গুরুদিত্তের জমাট রক্তকণিকা!

গুরুদয়াল পরম উৎসাহেই মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ করতে সুরু করেছে! মোহন্তের অস্থলে প্রায়ই পরামর্শের জন্য যায়,—পাগড়ীর ফাঁক হতে তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় সিদ্ধির পুটুলি।

এমনি এক নিস্তব্ধ দিনে বৈশাখীর ঝড় উঠল। আকাশে ঘনিয়ে এলো কালো পুঞ্জীভূত মেঘাড়ম্বর। পাঞ্জাবের কালো মৃত্তিকায়—ঝিলাম—শতদ্রু—বিপাশা—চন্দ্রভাগার তীরে তীরে উঠল হিংসার করাল ছায়া, রাঙ্গা হয়ে গেল মৃত্তিকার বুক। ওয়াজিরিবাদ—ডেরাগাজি—দোমেলের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহ্র হয়ে এল কোন তাইমুরের প্রেতাত্মা—পশ্চিম-পাঞ্জাবের নগরে-প্রান্তরে। প্রধূমিত বহ্নি সৃষ্টি করল মহা দাবানলের! গ্রাম-গ্রামান্তরে কত সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল! কত জনপদ পরিণত হল শ্মশানে! বান্দাগড়-মরফি টিলাও বাদ গেল না।

নিশীথ রাত্রে অশ্বারোহী দস্যুদলের অতর্কিত আক্রমণে জেগে উঠল গ্রামবাসীরা। টিলাটার চার পাশে কাদের অট্টহাসি! রাতের

আঁধার মশালের আলোয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। উঠল ঝিলামের কালো জল রাঙা হয়ে উঠল কাদের বক্ষরক্তে। আকাশের কোলে-কোলে আগুনের লেলিহান শিখা। দূর-দিগন্তে কাদের আর্ত কোলাহল-ছেয়ে ফেলল দূর ক্রন্দসী।

সকাল হয়ে এল। মরফি টিলার পূর্বপ্রান্তে নিম গাছটার ফাঁকে উঠল সকালের আলো-রেখা। পড়ে রয়েছে গ্রামখানার ধ্বংসাবশেষ। এখানে-ওখানে আগুনের ধূমায়িত চিহ্ন, গাঁয়ের পাঁচীর ভেঙে পড়েছে ঝুপড়ি আর দাঁড়িয়ে নাই। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, আহত মৃতের ভীড় গ্রামের পথে-পথে।

স্বপ্ন দেখছে না কি বচন।

সত্য এত নিষ্ঠুর কঠোর হতে পারে ভাবেনি। চোখের সামনে মাকে দেখে চিনতে পারে না। বুড়ীর মুখটা কালো হয়ে গেছে। সারা দেহে ঝলসান দাগ। শেষ হয়ে তার সব কিছু আস্ত নেই। গুরুদিতের মাথায় চোট লেগেছে। সারা গ্রামে হাহাকার—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। গুরুদয়াল সিংএর মৃতদেহটা চেনাই যায় না। আজ সাথী বাবাকে হারাল। কান্না যেন জমাট পাথর বনে গেছে।

বাকী যারা রইল—জীবনের কঠিনতর কোন বিপদের মুখোমুখী হবার জন্তই রয়ে গেল। কানে আসে দলবদ্ধ ভাবে নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। এক মুঠো দানা নেই—কতক লুঠ হয়ে গেছে। বাকী যা ছিল সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নির্বাক্ জনতা নীরবে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—কোন বজ্র নেমে আসে তারই প্রতীক্ষায়।

এক দিন—দু'দিন—তিন দিন। দীর্ঘ প্রান্তর রাত্রেই অতিক্রম করে তারা এসে পড়েছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে। বাড়ী ছেড়ে—গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। দূরে রাস্তার বাঁক হতে শেষ বারের মত চেয়ে দেখে তারা···তাদের জন্মভূমি—মা—মাটি সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে হল তাদের, আর হয়ত কোন দিনই পায়ের ছাপ পড়বে না ওখানে। দূর হতে প্রণাম জানায় তারা বিদেহী পূর্বপুরুষদের আত্মাকে।

দু চোখে নেমে আসে জলধারা।

"কিথে যাঁউ?"

সাথীর কথায় চমকে ওঠে বচন। তারা যাবে কোথায়—কোন্ দিকে? কেন? তা জানে না—বাঁচতে হলে চলে যেতে হবে এখান হতে তাই জানে।

"চলো তুসি!"

···কোথায় যেতে হবে জানে না, ছিন্ন-ভিন্ন জনতা চলেছে সামনের দিকে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে! দু'পাশে দেখা যায় আগুনের শিখা—কাদের আর্তনাদ—ভীত জনতার সারি, মোট-পুটুলি-তালাই বগলে করে চলে আসছে গ্রাম ছেড়ে।

দুপুরের কড়া রোদে পাঞ্জাবের রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে আসছে যাত্রিদল, ক্লান্ত—পাংশু—বিবর্ণ চেহারা। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। রাত্রি কাটে দীর্ঘ প্রান্তরের মাঝে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায়। শীতের বাতাস এরই মধ্যে বইতে সুরু করেছে—রাত্রি নিবিড়তর হয়ে আসে, চারি দিকে আগুন জেলে ক্লান্ত জনতা বসে থাকে—প্রহর গণনা করে—চোখে তাদের ঘুম নাই। ব্যাকুল হয়ে চেয়ে থাকে পূব আকাশের দিকে—কখন আসবে রাত্রির তোরণ-দ্বারে সূর্য্য-সারথির স্বর্ণরথ—তারি প্রতীক্ষায়।

আর্তনাদ করে গুরুদিৎ। মাথার ঘাটা ক'দিন বিনা চিকিৎসায় পরিশ্রমে বেশ বেড়ে গেছে ধূলো-বালি লেগে। ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে সারা মুখ-চোখ। ময়লা পাগড়ীর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে পুঁজ। হাঁটতে পারেনি, তাকে এক রকম কাঁধে করেই বয়ে এনেছে অনেকটা পথ। হাত-পা টন-টন করছে বচনের।

—"ভেইয়া!" অশ্রুসজল নয়নে চেয়ে থাকে বচন ভাইয়ের দিকে।

জীবনের চৌদ্দ বৎসর আগে হতে দেখে আসছে তাকে। একই রক্তকণিকা প্রবাহিত তার দেহে। একই মাতৃস্তন্য পুষ্ট করেছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর মুচড়ে ওঠে গুরুদিতের। চোখের ঘা-টায় বোধ হয় 'ম্যাসেট' হয়ে গেছে—পচে গন্ধ ছাড়ছে।

পাশে বসে সাথী। করবার কিছু নেই। তার চোখে জলধারা। চোখের সামনে ধীরে-ধীরে হিমশীতল মৃত্যুকে নেমে আসতে আগে সে কখনও দেখেনি। নিশ্চল হয়ে আসছে গুরুদিতের দেহ। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে রাত্রির জমাট অন্ধকার।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। শেষ হয়ে আসছে গুরুদিতের জীবন-প্রদীপ। চোখের সামনে বাবা-মা-ভাইকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিল বচন, নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল শুধু দর্শকের মত, করবার তার কিছুই নাই।

কাল সকালে যাত্রা করবে যাত্রিদল, রাতের আঁধারে কোন নাম-না-জানা এক পথের ধারে সব কিছু শেষ হয়ে গেল গুরুদিতের। কোথায় জন্মেছিল—ভিখারীর মত মরল কোথায়।

ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদে বচন, সাথীর দু'চোখে জলধারা। রাত্রি শেষ হয়ে এল, দুঃখের আঁধার রাত্রির পর প্রভাত-সূর্য্য দেখা দিল, কিন্তু গুরুদিৎ আর ফিরে আসবে না। সে আজ কোন্ অচেনা পথের যাত্রী—বাঁচবার জন্ম ভীত পলাতক যাত্রী সে নয়, নব জনমের আলোকতীর্থ-যাত্রী সে।

"পাঁইজী, একঠো লেমনেড, য্যাদা বরফ দেনা।"

কার ডাকে চিন্তাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, লোকটা একটু বিস্মিত হয়েই চেয়ে থাকে বচনের দিকে। ও জানে না, বচনের অন্তরের স্তরে স্তরে কত না বলা ব্যথা গুমরে ওঠে। ওরা জানে না সব হারিয়ে মা—মাটি হতে ভিখারীর মত বার হয়ে এসেছে, তাঁদের বেদনা কোনখানে।

"লিজিয়ে"—লেমনেড একটা খুলে বরফ দিয়ে তার হাতে দিল, লোকটাও তিন আনা পয়সা দিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে অদৃশ্য হল আকবর রোডের দিকে।

দুর্গম পথ।······সে রাত্রি পার হয়ে গেল। আরও দু'টো দিন। ···পথের বাঁকে নোতুন পথের রেখা, পায়ে চলা পথ চলে গেছে দিল্লীর দিকে। আর কত দূর? এ পথের শেষ হবে কবে?

দু'ধারে বীভৎস দৃশ্য। চোখ যেন আর দেখতে চায় না। ভিখিরীর মত বার হয়ে যেতে পারলে বাঁচবে তারা। আজ দুনিয়ায় তারা দু'টি প্রাণী—সাথী আর সে। দু'জনে ঘর বাঁধবে, নিঃস্ব হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া তাদের ক্ষুদ্র জগতে সান্ত্বনা আনবে।

যারা গেল তারা যাক। এ নিয়ে দুঃখ করে মনের বোঝা বাড়িয়ে লাভ নাই।

সোলাপুর পার হয়ে আসছে তারা, মাইলের পর মাইল লম্বা ভীড়—জনতার শোভা। রাত্রি নেমে এসেছে—আর এক দিনের পথ পার হতে পারলেই পূর্ব-পাঞ্জাব···দিল্লী অনেক কাছে।

আগত রাত্রির অন্ধকারে রাস্তার পাশে প্রান্তরের মাঝে জনতা 'সামান' খুলে সামান্য আটা, মকাই বার করে কোন রকমে খাবার যোগাড় করে।

আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে বচন। একা—একা সে বিশাল পৃথিবীতে। বাবা! বাবাকে মনে পড়ে না। মেসোপটেমিয়া—ইরাকের মরুভূমিতে কোথায় হারিয়ে গেছে গত মহাযুদ্ধে! বৃদ্ধা মা—গুরুদিং তার চোখের সামনে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী হতে কোন্ গহন তিমিরাচ্ছন্ন দেশে! একা পড়ে রইল সে। আকাশে ঝিকমিক করে তারার দল। অন্ধকারের মধ্যে কনকনে হাওয়ায় লালাভ আগুন রাতের আঁধার ঘনতর করে তোলে। দূরে—দিগন্তের বুকে আকাশজোড়া জমাট অন্ধকার! কে যেন গোঙাচ্ছে! কার হয়ত বা শেষ দিন ঘনিয়ে এল! একা ধীরে-ধীরে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে বন্ধুহীন···বন্ধুর এই যাত্রাপথে। আগেকার যাত্রিদল চলে যাবে তাকে ফেলে রেখে! একটা চাপা কান্নার স্বর নিস্তব্ধ রাতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

—"রোটি খান্দা—?"

পিছন ফিরে দেখল সাথী ডাকছে। সামান্য আটা ছিল তাই দিয়ে বানিয়েছে খান-দুয়েক পোড়া রুটি। সারা দিনের সেই খাবার, ভাগাভাগি করে কোন রকমে তাই খেয়ে থাকবে দু'জনে।

পাশের একটি মেয়ে ছোট দু'টো ছেলেকে উড়ানী পেতে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল, সাথীকে জিজ্ঞাসা করে বচনকে দেখিয়ে—"উয়ো কৌন হ্যায় তুমহারি?"

ডাগর কালো চোখে কি যেন না-বলা বাণী। মেয়েটি যেন কি বুঝে নেয়! মলিন হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে রহস্য-ভরা কণ্ঠে—"সরমাতি কি'উ?"

সাথী লজ্জায় মুখ নামায়। কথাটা বচনের কানেও গেছে। আজকের সাথীর দেওয়া পরিচয়ে সে একটু বিস্মিতও হয়। কোন সম্বন্ধই তাদের ছিল না—নেইও। আজ নিজে থেকে সাথীর এই আত্ম-নিবেদন তার মনকে নাড়া দেয়।

প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নাই বচনের। আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে। মাথায় কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ওঠে সাথী!

"নিদ্ আবেঁহে?

"নেহি"—ঘুম নাই তার চোখে।

বলে ওঠে বচন—"ঝুট কি'উ বোলা উস্‌কো?"

মিথ্যা—মিথ্যা নয়। সাথী আজ চায় এক জনকে, বচনেরও সব-হারানোর ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারে এমন এক জনকে চাই। তাই সাথী আজ হতেই পরিচয় দিয়েছে তারা স্বামি স্ত্রী।

এত দুঃখ-বিপদেও বচন যেন কোন নির্ভর খুঁজে পায়। তারা সব-হারানোর ব্যথা ভুলবে দু'জনে দু'জনকে পেয়ে। তারার রোশনী চিকমিক করে সাথীর ডাগর কালো চোখের কোলে-কোলে নেমে আসে শান্তির প্রলেপ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় কাদের কোলাহলে। আকাশ-বাতাস মথিত করে শোনা যায় চীৎকার!

—"ওয়া গুরুজি কি ফতে!" ও-পাশে দিগন্ত লাল হয়ে গেছে আগুনের আভায়। কারা যেন আসছে দল বেঁধে, সারা শরীরে বচনের এক অভূতপূর্ব শিহরণ সাথী ভয়ে মুখ লুকোয় তার বুকে।

বিগত এক রাত্রের সেই নিষ্ঠুরতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বচনের। সেই আর্তনাদ, সেই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা! ছেলেমেয়েদের আর্তনাদ! কাদের পৈশাচিক অট্টহাসি, চোখের সামনে দেখছে মানবতার নিষ্ঠুর লীলা! কোন বিজাতীয় আনন্দ সেই বর্বরদের চোখে! সাথী ভয়ে কাঁপছে বচনের বুকে মুখ লুকিয়ে। হঠাৎ পিছন হতে কে যেন সাথীকে ধরে টানছে। আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরে সাথী বচনকে।

সারা শরীরে সমস্ত রক্ত যেন শিহরণ জাগায় তন্ত্রী-তন্ত্রীতে! সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হাতের লাঠিটা দিয়ে আঘাত করে বচন, লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যায়। একটা উন্মত্ত কোলাহল, অতর্কিত আক্রমণে ভীত আশ্রয়প্রার্থী দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাতের আঁধারে। আকাশে-বাতাসে তাদের আর্তনাদ! বচনের চোখের সামনে জমাট অন্ধকার—মাথায় একটা আঘাত পেতেই ছিটকে পড়ে সে দূরে। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে কঠিন মৃত্তিকা। আর্তনাদ করে ওঠে সাথী। নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সে করতে পারে না।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আক্রমণকারীর দল। পড়ে রইল রাতের আঁধারে বিপর্য্যস্ত আশ্রয়প্রার্থীরা, রক্তাক্ত হয়ে গেছে কঠিন মৃত্তিকা। কাদের আর্তনাদ আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলেছে। লুণ্ঠনকারীর দল মহানন্দে চলেছে রাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, জ্ঞান ফিরে আসে সাথীর!···কারা যেন একটা গাড়ীতে ফেলে নিয়ে চলেছে তাকে! একা নয় সে—আরও অনেকেই আছে।

রাতের বাতাসে ক্রমশঃ জ্ঞান ফিরে আসে বচনের। মাটিতে পড়ে-পড়েই শুনতে পায় কাদের আর্তনাদ। রাস্তার উপর কতকগুলো জোরালো সার্চ-লাইটের আলো। কোন রকমে ডাক দেয় বচন—"সাথী—সাথী—"

কোন সাড়া-শব্দই নাই। তার পর! তার পর আর জানে না বচন!

জ্ঞান ফেরে? চারি দিক্ চেয়ে বুঝতে পারে না এ কোথায় সে এসেছে। খাট—পরিষ্কার বিছানা,—নীচে লাল কম্বলের উপর শুয়ে রয়েছে—মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ। শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিক কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

"সাথী—সাথী!" সামনে দিয়ে এক জন নার্স যাচ্ছিল, ফিরে চেয়েই আবার চলতে থাকে সে। হতাশ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল সে।

ক্রমশঃ স্মরণে আসে সেই রাত্রিতে আহত হবার পর মিলিটারী সাহায্যে তাঁদিকে আনা হয় অমৃতসর জেনারেল হস্পিটালে! সাথী কোথায় জানে না সে! কোন খোঁজই পায়নি তার। আজও ভুলতে পারে না বচন সেই রাত্রির আত্ম-নিবেদনের কথা,

কালো ডাগর চোখের আঁখি-তারায় সে দেখেছিল, কোন এক নিঃস্ব নারী-হৃদয়ের ভালবাসা—কার সব-হারানোর ব্যথা-বিধুর মনের প্রতিচ্ছবি। কে জানে সাথী কোথায়, জীবনে আর তাকে দেখতে পাবে কি না।

* * * *

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গে, এ কি! কখন বেলা পাঁচটা বেজেছে জানে না বচন! কি সব ভাবনায় সারাটা দিন কেটে গেল, দূরে আরাবল্লীর রিজে জমেছে গাড়ীর ভীড়। নয়াদিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় অফিস-ফেরতা বাবুদের সীমা-সংখ্যাহীন সাইকেলের সমারোহ। পথচারীর চেয়ে তারই সংখ্যা বেশী।

এমনি এক পড়ন্ত বেলায় দিল্লী মেন ইষ্টিশানে সাধারণ এক দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়ে মিশে নেমেছিল সে-ও! কোথায় ঠাঁই নাই—বাইরে টাঙ্গা-শেডের নীচেই ঘুমিয়েছিল! যমুনার ধারে ঘাস কেটে এনে বেচত। এক রাত্রিতে এক টাঙ্গার ঘোড়ার নীচে পড়তে পড়তেই বেঁচে গিয়েছিল! তার ঘুমন্ত দেহটাকে পা দিয়ে ঠেলে তুলে চীৎকার করে হিন্দীতে গালাগাল দেয় শেঠজী—"কৌন সে বুদ্ধু রে? হঠ যানা—নেহি ত মার পানা 'মু' লাল কর দেনা।"

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায় বচন, জবাব দেবে কি না ভাবছে, পরক্ষণেই অনুভব করে সে ত ভিখারীর সামিল! জুতো মেরে তার মুখ লাল করে দেবার অধিকার তাদের হয়ত আছে! পথে আসবার সময় ওরা মাথায় লাঠি মেরে সারা গা রাঙ্গা করে দিয়েছিল—এরা মুখে জুতো মেরে লাল করে দেবে! কে যে আপন—কে যে পর ভাবতেই পারে না বচন।

পাণ্ডব-কিল্লাতে যেদিন আশ্রয় পেল কি আনন্দ। মাথার উপর একটু ছেঁড়া তাঁবু—চারি পাশে ঘেরা, কি আরাম—সাথীর কথা মনে পড়ে—কত আনন্দই না তার হত আজ।

প্রথম সে দেখতে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া গেট, বিশাল তোরণ লাল-পাথরের তৈরি কোন সুনিপুণ শিল্পীর কত বৎসরের পরিশ্রম! বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাহাদেরই নাম খোদাই করা আছে এর সারা গায়ে। সন্ধানী চোখ মেলে খুঁজতে থাকে বচন!···তার বাবাও ত গিয়েছিল মেসোপোটেমিয়ার কোন মরুপ্রান্তরে—আর ফিরে আসেনি।

অসংখ্য নামের মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পায়···

'৩৪৭ ডোগরা রেজিমেণ্ট! কয়েকটা নামের নীচেই হঠাৎ তার চোখটা আটকে যায়। হ্যাঁ—ওই ত! চোখ দু'টো মুছে ভাল করে পড়তে থাকে! হ্যাঁ—

১২৪৭ হাবিলদার গুরুনাম সিং!

তার বাবা, অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবাকে। তার বাবা নিহত ঐ বীরদের অন্যতম। এই কীর্তি-স্তম্ভে তারও একটু অধিকার আছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে বচন।

সে আজ কয়েক মাস আগেকার কথা। তার পর হতেই সরবতের দোকান দিয়েছে ঠেলা গাড়ীতে এইখানে। তার বাবা কি জানতে পেরেছে তার মৃত্তিকায় তার সন্তানের কোন ঠাঁই-ই নাই! তার স্ত্রী-পুত্র-আজ মৃত! এক জন মাত্র রয়েছে তাদের স্মৃতির বোঝা বইতে!

মাসের পর মাস ধরে রোজই আসে বচন এইখানে। কি যে এক অপূর্ব সান্ত্বনা খুঁজে পায় সে!

সাথীর কথা ভুলতে পারেনি আজও। প্রায়ই মনে পড়ে তাকে, কে জানে কোথায় কি ভাবে আছে সে।

সেদিন কি একটা পর্ব-দিন। অনেক ভ্রমণকারীর ভীড় জমেছে ইণ্ডিয়া গেটের নীচে! কেউ কেউ উপরেও যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে বাবার নামটা দেখে নেয় বচন। শোনাবে কি—ওই তার বাবা—সে-ও এদের এক জন?

লজ্জা লাগে। আবার সরবৎ তৈরী করতে থাকে। হঠাৎ একখানা গাড়ী গেটের ওদিকে সশব্দে ব্রেক কষল। নেমে আসে একটি ছেলে ও মেয়ে। দামী সুট-ফেল্টহ্যাট, পিছনের মেয়েটিকে দেখেই চমকে ওঠে বচন।

—সাথি!

সামনে সাপ দেখলেও বোধ হয় এতখানি আশ্চর্য্য হত না সাথী। বচন! আজও বেঁচে আছে সে—সরবতের দোকান দিচ্ছে। বচন আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। সারা দেহে সাথীর যৌবনের উদ্দাম জলস্রোত। সিল্কের সালোয়ার পাঞ্জাবী ওড়না—চোখে আজও সেই গভীর মায়া।

থমকে দাঁড়িয়েছে সাথী, এগিয়ে আসছে বচন।

—"তু হিঁয়া ক্যায়সে আয়ি?"

সঙ্গের ছেলেটি সাথীকে দাঁড়িয়ে সরবৎওয়ালার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে তাগাদা দেয়—"দের কিঁউ।"

—"আয়ি হু"—চলে গেল সাথী, স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে বচন। পায়ের নীচে জমাট পাথর যেন সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কানে আসে ছেলেটির প্রশ্নে উত্তর দিচ্ছে সাথী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে—ওদের গাঁয়ের একটি ছেলে ওই সরবৎওয়ালা।

সে রাতের কথা ভোলেনি বচন। অন্ধকারে তারাকিনী রাত্রিতে প্রান্তরের মাঝে আশ্রয়প্রার্থী জনতার মাঝে সেদিন যে নারী স্বীকার করেছিল তাকে স্বামিরূপে, আজ বিলাস-বৈভবের বাহুল্যে সেই নারীই অস্বীকার করে গেল তাদের পরিচয়,—অস্বীকার করে গেল তাকে—যে প্রাণ দিয়েও ওর সম্মান রাখবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল।

ধীরে ধীরে আবার কাজে মন দেয় বচন: সারা মাথাটা ঘুরছে, এক গেলাস জল খেয়ে একটু সামলে নেয়।

জীবনে যে সবুজ জায়গাটুকু এত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল আজ তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সুখে থাক সাথী, কাউকে অভিশাপ দেবে না সে। ভাল-ঘরের ঘরণী হোক—তার হিংসা করবার কিছুই নাই।

এ ভুল ধারণা তার ভেঙ্গে যায়, কয়েক দিন পরেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুরোনো দিল্লী হতে নয়াদিল্লীর দিকে। হাউসকাজীর ঘন-ঘিঞ্জী বসতি—দু'পাশে রাস্তা অন্ধকার-করা বাড়ীগুলোতে কত কৌতূহলী মুখ। পাশের গলিটার মধ্যে হঠাৎ গ্যাসপোষ্টের নীচে একটা চেনা-মুখ দেখেই থমকে দাঁড়াল! হাঁ—সত্যিই ত সাথী।

মুখ-চোখে উচ্ছৃঙ্খলতার পাশব চিহ্ন। চোখের নীচে কালিমাকে পাউডার রুজ দিয়ে ঢেকে নেহাৎ সাধারণ আরও পাঁচ জন দেহ-পসারিণীর মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে সাথী। প্রয়োজনের তাগিদে তাকে

‘দৈনিক বসুমতী’

‘শনিবারের চিঠি’তে (চৈত্র, ১৩৫৪) সাপ্তাহিক ‘বসুমতী’র জন্ম-তারিখ লইয়া যখন আলোচনা করি, তখন ‘দৈনিক বসুমতী’ সম্বন্ধেও যে অনুরূপ গোল থাকিতে পারে, ইহা ভাবিয়া দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে দুই প্রতিষ্ঠাবান্ সাংবাদিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) শ্রীঅমল হোমের মতে :—1914 : Basumati, Bengali Daily, started with Hemendra Prasad Ghosh as Editer."

(২) শ্রীযুত হোমের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত ‘দৈনিক বসুমতী’তে (৫ চৈত্র, ১৩৫৪) এইরূপ লেখেন :—"সাপ্তাহিক বসুমতী পরে ১৩২০ সালে যখন ‘দৈনিকে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।" অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবুর মতে সাপ্তাহিক ‘বসুমতী’ দৈনিক বসুমতী’তে পরিণত হয়, এবং ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নহেন,—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

‘দৈনিক বসুমতী’র পুরাতন ফাইল বিদ্যমান থাকিলে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির নিষ্পত্তি সহজ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ইহার জন্মকাল নির্ণয় করা একেবারে দুঃসাধ্য নহে। ‘বসুমতী’র কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ‘দৈনিক বসুমতী’র জন্মকাল-নির্ণয়ের সূত্র মিলিতেছে। তিনি লেখেন :—

"প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এবং যত্নে ‘দৈনিক বসুমতী’ জন্মগ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা সতীশচন্দ্রের উৎসাহ অনেক অধিক ছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরদিনই উপেন্দ্রবাবু আমার নিকট ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র একখানা দৈনিক সংস্করণ বাহির করিবার প্রস্তাব করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণে আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু সতীশবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। শেষে যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই আমি এবং শ্রীযুত দুর্গানাথ ঘোষাল কাব্যতীর্থ উভয়ে বর্ত্তমান ‘দৈনিক বসুমতী’ প্রথম বাহির করি।" (‘মাসিক বসুমতী,’ বৈশাখ ১৩৫১, পৃ ৭)

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, "যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই" অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট ১৯১৪ (২১ শ্রাবণ, ১৩২১) ‘বসুমতী’র একটি দৈনিক সংস্করণ—সাপ্তাহিক সংস্করণ ছাড়া—প্রকাশিত হয়। ‘দৈনিক বসুমতী’র জন্মকাল সম্বন্ধে শশিভূষণের উক্তি একটি স্মরণীয় ঘটনার সহিত জড়িত, এই কারণে সাল-তারিখের ভুল না হইবারই কথা। প্রকৃতপক্ষে ‘দৈনিক বসুমতী’ ১৯১৪ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ, ১৩২১) মাসেই যে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি।

বঙ্গীয় রাজসরকার দেশীয় সংবাদপত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে জনমত কিরূপ প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকারী মহলে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত হইত। এই রিপোর্টে থাকিত সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় অংশের সঙ্কলন এবং বাংলা দেশের সমুদায় সংবাদপত্রের (মাসিক পত্রাদিও বাদ পড়িত না) নামধাম, সম্পাদকের নাম ও বয়স। ১৯১৪ সনের ১৫ই আগষ্টের রিপোর্টে ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র উল্লেখ আছে, ‘দৈনিক বসুমতী’র নামগন্ধ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ২২এ আগষ্টের রিপোর্টে সংবাদপত্রের নাম-তালিকায় পাইতেছি :—

Additions to, and alterations in, the list of Vernacular Newspapers as it stood on 1st March 1914 :

... ...

Basumati—Daily.

শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল, ১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে (১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে—১৩২০ সালে নহে) ‘দৈনিক বসুমতী’ জন্মলাভ করে, ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং ইহার সহিত সাপ্তাহিক বসুমতীর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[শনিবারের চিঠি হইতে]

শেষ পর্য্যন্ত এই জঘন্য ঘৃণ্য পথেই আসতে হয়েছে। তাই বোধ হয় সে দিন তাকে ঠিকানাও বলেনি নিজের।

ধীরে ধীরে সরে এল বচন। আজ রাগ-অভিমান নয়, সাথীর জন্য দুঃখ হয়। ঠাঁই পেলে এ পথে আসত না সে। আজ ফেরার পথ নাই।

রাত্রি নেমে এসেছে। একা পথটা দিয়ে আসছে বচন। দূরে ফিরোজ শাহ কোটলার কালো গম্বুজের গায়ে জমাট রাতের অন্ধকার, এ আঁধারে পথের দিশা নাই। সে মা-মাটি হতে বিতাড়িত। ভাই—মা—বন্ধু কেউই নাই। সাথী—সেও আজ সর্বহারা। ঝড় বয়ে গেল তাদের জীবনে, ঝড়ের বেগে ঝরা-পাতার মতই ছিটকে পড়ল তারা কে কোন দিকে।

• • • •

চারি দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মাঠটা জনশূন্য হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়া গেটের দ্বারোয়ান পাথরের জাফরি-দেওয়া কপাটটা তালাবদ্ধ করে কখন চলে গেছে। ধীরে ধীরে দোকান গুটোতে থাকে বচন। লেমনেডের বোতল-বালতি—সব পূরে গাড়ীখানা ঠেলতে ঠেলতে পাণ্ডব কিল্লার দিকে এগিয়ে চলে। সেদিনের মত কাজ শেষ।

দূরে আকাশের কোলে অস্পষ্ট অন্ধকারে বিশাল কালো-কালো পাথরগুলো আকাশের গায়ে কোন্ স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে। নির্জন রাস্তাটা দিয়ে চলেছে বচন। তার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল, স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে।

হাজার-হাজার—লাখ-লাখ আজকের রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়ে উলু-খড়ের মত যারা উড়ে গেল আকাশে-আকাশে—কোন স্মৃতিস্তম্ভ রচনা হবে না তাদের জন্য। কেউ স্মরণেও আনবে না তাদের। মহাকালের বুকে চিরদিন অজ্ঞাত—অখ্যাত রয়ে যাবে তারা।

গৃহহারা—সর্বহারা—একটি নয়—দু'টি নয়। লাখো-লাখো তারা কোন্ আশায় বেঁচে থাকবে জানে না। তবু তারা বাঁচতে চাইবে—অজ্ঞাত সহস্র সহস্র দর্শকের মাঝে তারাও দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকবে প্রভাতের নূতন সূর্য্যের আশায়, তিমির রাত্রির প্রহর গণনা করে ভারতের পার্বত্য-বন্ধুর প্রান্তরে-প্রান্তরে—কুরুক্ষেত্র—পাণিপথ—ভরতপুর—পাণ্ডব কেল্লায়···আরও কত নাম না-জানা হাজারো জায়গা হতে পূব-আকাশের পানে।

এগিয়ে চলে পরিশ্রান্ত বচন সিং। সন্ধ্যা নেমে আসছে···নয়া দিল্লীর প্রাসাদশীর্ষে···ইণ্ডিয়া গেটের স্তম্ভ-চূড়ায়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি
পুস্তক পাঠাইতে হয়

সাহিত্য পরিচয়

কবি টি, এস, এলিয়ট

এ-বছর সাহিত্যের "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন টি, এস্, এলিয়ট (T. S. Eliot)। বাংলা দেশের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের বাইরে এলিয়ট খুব বেশী পরিচিত বলে মনে হয় না। পরিচিত না হবারও কারণ আছে! প্রথম ও প্রধান কারণ হ'ল, এলিয়ট কবি। গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তা যতটা সুলভ ও সহজলভ্য, কবি ও সমালোচকের জনপ্রিয়তা আদৌ তা নয়। তাছাড়া টি, এস, এলিয়ট সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য কবিতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেখেননি। এলিয়টের কাব্য প্রধানতঃ মননধর্মী, আপাতপাঠে তা রীতিমত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এলিয়ট যদি কাব্যসাধনায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রে না থাকেন তাহলে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছুই নেই। ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট তাঁর নিজের দেশেই আজও তেমন সুপরিচিত নন। মিল্টন, ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীট্‌স, এমন কি কবি ইয়েটসের যে জনপ্রিয়তা ছিল এক সময় তা-ও এলিয়টের ভাগ্যে আজও জোটেনি। তাতে অবশ্য একথা সব সময় অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় না যে এলিয়ট শক্তিশালী কবি প্রতিভাবান নন। সাময়িক সস্তা "জনপ্রিয়তা", প্রতিভা যাচাই করার নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড যদি হয় তাহলে সব দেশের "তৃতীয় শ্রেণীর" লেখকদের(?), কেবল লেখার ওজনের দিক দিয়ে বিচার করে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে জাহির করতে হয়। কিন্তু কোন কালে হয়নি, আজও হয় না। সস্তা "যৌন-সাহিত্য" অথবা গাঁজাখুরি "রোমাঞ্চ সিরিজ" যাঁরা প্রচুর পরিমাণে লেখেন বা লিখেছেন "গাটার প্রেস" এবং "গাটার টেস্‌ট" পরিপূর্ণ করাই যাঁদের কাম্য, তাঁরাই তাহলে তাঁদের "জনপ্রিয়তার" জন্যে "শ্রেষ্ঠ প্রতিভা"রূপে প্রতিপন্ন হতেন। সুতরাং "জনপ্রিয়তা" কথাটা প্রয়োগ করা যত সহজ, ব্যাখ্যা করা তত সহজ নয়। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে "জনপ্রিয়তা" কথার অর্থ "স্থূলবুদ্ধি জনতার হাততালি' বা 'আহা মরি' ধ্বনি"। জনসাধারণ বাস্তবিকই কোন দিনই স্থূলবুদ্ধি নয়, তাদের সহজ প্রবৃত্তি যথেষ্ট সুস্থ এবং স্বাভাবিক বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু বিকৃতরুচি রঙ্গচিন্তারা যেমন জনসাধারণ নয়, তেমনি অনেক শ্রেণীর সাহিত্য "রঙ্গপ্রিয়" হলেও "জনপ্রিয়" নয়। যাই হোক্, এলিয়ট এই বিকৃত অর্থেই "জনপ্রিয়" নন। না হলেও তাঁর খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী এবং তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত।

এলিয়টের জীবনদর্শন, কাব্যবস্তু ও কাব্যভঙ্গী আধুনিক যুগোপযোগী বা যুগধর্ম্মী কি না তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এলিয়টের কাব্যের ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তা করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। এলিয়টের কাব্যের যে পরিণতি আজ আমরা দেখছি তা নিশ্চিত যুগধর্ম্মপরিপন্থী। কবি যদি মানুষের জীবনের অফুরন্ত প্রেরণার প্রতিমূর্ত্তি হন, কবির কাব্য যদি মানব জাতির ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন হয়, যদি সাময়িক দুর্ণাবর্ত্তের মধ্যে থেকেও কবির কাব্যতরী আত্মরতি, আত্মবিলাপ বা আত্মবিলোপের মহাসমুদ্রে ভরাডুবি না হয়, কবিই যদি মানুষের ও সমাজের জীবনবিধাতা হন, তাহলে নিঃসংশয়ে বলতে হয়, জীবনে বা কাব্যে কোথাও এলিয়ট সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এক মহাযুদ্ধ থেকে আর এক মহাযুদ্ধের মধ্যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে, এলিয়ট দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন হংসবলাকার মতো আত্মবিলাপের করুণ সুর আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত ক'রে, তাঁর মানস-দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন। তবু এলিয়ট আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, এ কথা কোন সাহিত্য-রসিকের অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের কবি এলিয়ট

১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের দাবানলে মানুষের অনেক পুরাতন জীর্ণ ধারণা, অনেক দীর্ঘকালের সস্নেহে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সব ভস্মীভূত হয়ে গেল। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসার বন্যপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী হানাহানিতে সভ্যতার সমস্ত কিছু অর্জ্জিত সম্পদ

টি, এস, এলিয়ট

উৎসর্গ করার জন্তে ব্যাকুল হতে পারে, প্রথম বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে তা প্রমাণ হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় লোভীর এই উদ্ধত স্পর্দ্ধা ও প্রচণ্ড অন্যায়ের যূপকাষ্ঠে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ শুধু যে আত্মবলি দিয়েই ক্ষান্ত রইল তা নয়, তারা বিদ্রোহ করল এই নরমেধ যজ্ঞের হোতাদের বিরুদ্ধে। বিপ্লব হ'ল রুশিয়ায়, বিপ্লব হ'ল ইয়োরোপের দেশে দেশে। রুশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্যে মানুষের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিপথে যেমন এক নতুন আদর্শের সূর্য্যোদয় হ'ল, ব্যর্থ ক্লিষ্ট পীড়িতের অন্তরে যেমন এক নতুন আশার বাণী অনুরণিত হয়ে উঠলো, ইয়োরোপে বা অন্য কোথাও তা হ'ল না। স্পর্দ্ধিত রাজশক্তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে বিপ্লব সেখানে ব্যর্থ হল। অবসাদ, ব্যর্থতা ও গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেল ইয়োরোপ। সত্য, ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদির যে রঙিন গোলাপী স্বপ্ন দীর্ঘ দিন ইয়োরোপের মানুষকে স্বপ্নচারীর মতো চালিত করেছে জীবনের পথে, তার স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়ল পথের ধূলোয় তাসের খেলাঘরের মতো। দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল, সামনে আর কিছুই রইল না। আশা-আকাঙ্ক্ষার শ্যামল ক্ষেত্র পড়ে রইল পরিত্যক্ত পোড়া মাঠের মতো। আশ-পাশে রইল কামনা-বাসনার পর্ব্বতপ্রমাণ ভগ্নস্তূপ, মোলায়েম মনভোলানো কথা আর আদর্শের চূর্ণ হাড়পাঁজর, জীর্ণ কঙ্কাল। সামনে রইল ইতিহাসের আঁকা-বাঁকা পথের প্রান্তে ব্যর্থতা নৈরাশ্য দীর্ঘশ্বাস আর নিরবচ্ছিন্ন অবসাদের দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি।

মরুভূমির এই অসীম শূন্যতা ও ভীষণ হাহাকারই সেদিন চরম সত্য হয়ে উঠলো ইয়োরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের কাছে। বলিষ্ঠ আশার বাণী শোনবার কোন প্রেরণা তাঁরা তখনকার পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অপূর্ব্ব কলতানে জীবনের জয়গান বা বন্দনা-গান গাইবার কোন অদম্য ইচ্ছা জাগল না তাঁদের মনে। এই সময় আবার বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন বার্গসন (Bergson) ও ফ্রয়েড (Freud)। অবচেতন মনের অতল গহ্বরে ডুব দিয়ে লুকানো মাণিকের সন্ধানে ইয়োরোপের চিন্তানায়কদের অভিযান শুরু হ'ল। বাইরের দৃশ্যমান জগৎ নয়, মনোজগৎ তার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশী স্থায়ী সত্যরূপে প্রতিভাত হ'ল। পরিত্রাণের (Escape) খিড়কি দরজা খুলে গেল। চারি দিকে যখন মানব-সভ্যতার কঙ্কালাকীর্ণ পোড়ো জমি পড়ে রইল, সোনার ফসল ফলার কোন আশাও আর রইল না, যখন মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা এক অপূর্ব্ব রহস্যাবৃত অন্তর্জগতের সন্ধান দিলেন এবং দিয়ে বললেন যে সেইটাই বৃহত্তর সত্য, তখন তো রঙ্গমঞ্চ পরিষ্কার। ইয়োরোপের শিল্পীরা যাঁরা এই সময় মঞ্চের উপর অবতীর্ণ হলেন তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট অন্যতম।

টি, এস, এলিয়টের বিশ্ববিখ্যাত কাব্য "The Waste Land" বা "পোড়ো জমি" এই সময় প্রকাশিত হল, ১৯২২ সালে। "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডকে" প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর কোন কবিতা যদি এলিয়ট না লিখতেন তাহলেও এই একটি মাত্র কবিতার জন্তেও তিনি এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হতেন। যে-সভ্যতা, যে-সমাজ চারি দিকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, যে শতভালি-দেওয়া ছিন্নভিন্ন জীবনের ভগ্নস্তূপের উপর বসে ইয়োরোপ তথা সারা পৃথিবীর মানুষ আজও সভ্যতার বড়াই করছে, যে-নীতি ও ন্যায়বিচারের ছদ্মনামে দুর্নীতি আর ব্যভিচারের বন্যা নেমে এসেছে সমাজে, ভণ্ডামি কপটতা শঠতা আর প্রতারণাই যে অন্তগামী যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এলিয়ট তাঁর কাব্যে সেই অন্তগামী যুগের সেই জীর্ণ সমাজ ও সভ্যতার, সেই ছদ্মবেশী নীতি রুচি ও সাধুতার, সেই ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার পোড়ো জমির গান গেয়েছেন। তার মধ্যে তিনি দেখেছেন, মানুষ তার দুর্ভেদ্য আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে জীবনের বলিষ্ঠ চলার ছন্দ, চলার মন্ত্র এবং চলার লক্ষ্য। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই বিশ্বাস, সেই ছন্দ, সেই মন্ত্র, সেই লক্ষ্য, তবেই আবার এই "পোড়ো জমি"তে সোনার ফসল ফলবে, সভ্যতার এই নিস্তব্ধ গোরস্থান আবার জীবনের কল-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে, পুনরভ্যুত্থান (Resurrection) হবে মানুষের। কবি এলিয়ট বলছেন:

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish ? Son of man,
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water……

(The Waste Land)

অর্থাৎ আশে-পাশের এই পাথুরে ভগ্নস্তূপে শিকড় গজিয়ে উঠবে কোথায় বলতে পারো, কোথা দিয়ে শাখা মেলবে নতুন জীবন? হায় অমৃতের পুত্র মানুষ! তোমরা তা জান না। তোমরা জান আর চেন কেবল ভাঙা-চোরা জীবনের কতকগুলো টুকরো ছবি, তারই ওপর সূর্য্যের আলো চিক্‌চিক্ করে। শুকিয়ে যাওয়া গাছের তলায় ছায়া কোথায়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে কোথায় শান্তি! শুকনো নীরেট পাথরের গায়ে কোথা থেকে শুনবে জলের কলকলানি!'

তার পরেই কবি বলছেন:

Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mud-cracked houses
If there were water.

(The Waste Land)

অর্থাৎ এই শুকনো পার্ব্বত্য অঞ্চলে বসা যায় না, দাঁড়ানো যায় না, শোয়া যায় না। এখানে এই পাহাড়েও শান্তি নেই, আছে শুধু বৃষ্টিহীন কঠিন মেঘগর্জ্জন। এখানে এই পাহাড়ে নির্জ্জনতাই বা কোথায়? আছে কেবল আরক্ত গম্ভীর মুখের বিক্ষোভ আর

চাপা গজরানি, ভেঙে-পড়া মাটির ঘরের দরজায় ফাঁকে ফাঁকে। একটু যদি জল থাকত কোথাও—

পাথর ও পাহাড় হ'ল এখানে নৈরাশ্যের প্রতীক, জল হ'ল আশার প্রতীক। পাহাড় হ'ল মৃত্যুর ও ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, জল হ'ল জীবন ও প্রাচুর্যের প্রতীক। তাই "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যে "Rock" "Mountain", "Stone" আর "Water" কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তা হ'ল কবির আশা-নিরাশার মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। এই দ্বন্দ্ব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর এই কাব্যের মধ্যে :

If there were rock
And also water
And water
A Spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only
... ...
Drip drop drop drip drop drop drop
But there is no water

(The Waste Land)

ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার জঘন্য পরিবেশের ভিতর দিয়ে, আশা-নিরাশা জীবন-মৃত্যু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্বের বাঁকাচোরা ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ছন্দে "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের পরিণতি হয়েছে ঔপনিষদিক সত্যের উপলব্ধির মধ্যে। কবি মানুষের জীবনে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে চান, আস্থা ও প্রাণৈশ্বর্যের পুনরাবির্ভাব চান। কিন্তু শান্তির মূলমন্ত্র কোথায়, কে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করবে মানুষকে, উর্বর করে তুলবে এই অনুর্বর "পোড়ো জমিকে"? কবি বলছেন :

These fragments I have shored against my ruins
Why then He fit you···
Datta. Dayadhvam. Damyata,
Shantih Shantih Shantih,

(The Waste Land)

"বৃহদারণ্যক উপনিষদে" দেখতে পাই, প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবতা, মানুষ ও অসুর। তাঁরা একে একে প্রজাপতির কাছে উপদেশ চাইলেন। দেবতাদের কাছে প্রজাপতি "দ" অক্ষর উচ্চারণ ক'রে বললেন, কি বুঝলে বল? দেবতারা বললেন, "দাম্যত—দান্ত হও"। প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। মানুষের প্রশ্নের উত্তরেও প্রজাপতি "দ" অক্ষর উচ্চারণ ক'রে বললেন, কি বুঝলে? মানুষ বলল, "দত্ত—দান কর।" প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। অসুরদের কাছেও "দ" উচ্চারণ করে প্রজাপতি বললেন, কি বুঝলে? অসুররা বললে, "দয়ধ্বম্—দয়া কর"। প্রজাপতি বললেন, ঠিক বুঝেছ। মেঘ-গর্জন সব সময় যেন এই দৈববাক্যই প্রতিধ্বনিত করছে "দ" "দ" "দ"—"দাম্যত. দত্ত, দয়ধ্বম্"—"দান্ত হয়, দান কর, দয়া কর।" দম, দান ও দয়া—এই তিনটিই হ'ল দেবতা, মানুষ ও অসুরের, সকলের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষাই ইংলণ্ডের কবি এলিয়ট ভারতের ঔপনিষদিক যুগ থেকে গ্রহণ করলেন—

দত্ত দয়ধ্বম্ দাম্যত
শান্তি শান্তি শান্তি

দান কর, দয়া কর, দান্ত হও,—তাহ'লেই শান্তি আসবে।

ভারতের এই প্রাচীন ঋষিবাণী এক দিন বাংলার রবীন্দ্রনাথ সংশয়াকুল পাশ্চাত্ত্য সমাজকে শুনিয়েছিলেন, আজ কবি এলিয়ট শোনাচ্ছেন। এ-বাণী নতুন নয়, ভারতবাসীর কাছে তো নয়ই। জীবনের সমস্ত সত্যের এই হ'ল সারমর্ম।

এলিয়টের কাব্যের পরিণতি

রবীন্দ্রনাথের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়া আর এলিয়টের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়ার কারণ হয়ত একই। কাব্য-প্রতিভার মধ্যে দু'জনের পার্থক্য থাকলেও, এলিয়টের কাব্যবাণী আজ রবীন্দ্রনাথেরই অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রচণ্ড গতিশীলতা তাঁকে জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ঔপনিষদিক আদর্শকে বাস্তবকে রূপায়িত করার দিকে টেনে আনছিল, "নবজাতক" আর "জন্মদিনে" বিশ্বকবি আবার নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতি ঘটছিল জীবনের বাস্তব উপলব্ধির মধ্যে। এলিয়টের কাব্য উপনিষদ থেকে পুরাতন ক্যাথলিক গির্জার গম্বুজ অতিক্রম ক'রে মহাশূন্যতার স্পষ্টতার ডানা বিস্তার করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে তাঁর যে "Four Quartets" প্রকাশিত হয়েছে (Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding), তার মধ্যেই তার কাব্যের এই পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট। আজ চরম আত্ম-সমাধির মধ্যে এলিয়টের কাব্যসমাধি ঘটেছে। যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা এক দিন তাঁর "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" কাব্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, আজ তা শান্ত সমাধিস্থ হয়ে গেছে। তাই মনে হয়, যদি "নোবেল প্রাইজই" তাঁকে দেওয়া হ'ল তাহলে এখন কেন এবং এত দেরীতে কেন?

এলিয়টের গ্রন্থাবলী

কাব্য ও নাটক :

Prufrock and other observations ;
The Waste Land, Sweeny Agonistes ;
Ariel Poems, The Rock, A pageant play ;
Old Possum's Book of Practical Cats ;
The Family Reunion, Burnt Norton ;
East Coker ; Dry Salvages, Little Gidding ;
Murder in the Cathedral.

প্রবন্ধ ও সমালোচনা :

Selected Essays ; Essays Ancient and Modern ; Elizabethan Essays ; The use of poetry and the use of criticism ; The Idea of a Chritian Society ; After Strange Gods ; Points of View ; Thoughts after Lambeth ; Homage to John Dryden.

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস

৪

সন্তোষ ঘোষ

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-৬)

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির অবদান অসামান্য। বাংলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় এবং বাংলার নেতৃবৃন্দই সমগ্র ভারতে জাতীয় ভাব প্রচারের কার্য্যে অগ্রণী হন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সাহিত্যিক চিন্তানায়ক ও নেতৃবৃন্দ দেশের গতানুগতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী বিপ্লব আনয়ন করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বাংলার জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও সমাজ-সংস্কারকগণ বাংলার সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী প্রভাবে বাংলার জনচিত্ত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। বাংলার নেতৃবৃন্দ নির্ভীক ভাবে বৃটিশ সরকারের ভারত শাসন-নীতির সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য্য। নবজাগ্রত ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রাণশক্তি দর্শনে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠেন। বাংলার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য এবং বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করিয়া দিবার জন্য বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার আয়োজন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার যুবক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতে থাকেন। সেই সময়ে লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের বড়লাট। বাংলার নেতৃবৃন্দ তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চরম পর্য্যায়ে উঠে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় কার্য্যকরী প্রতিবাদ করেন বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি লর্ড কার্জনের নির্দেশ মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীতই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইয়া যাইতে মনস্থ করেন। এই বিরোধ উপলক্ষে স্যার আশুতোষ যে অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন, তাহা পরাধীন জাতির চিত্তে নূতন ভাব ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। লর্ড কার্জন একটি সরকারী প্রস্তাবে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রসংগে তিনি ভারতীয়দের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ পূর্ণ করার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড কার্জনের এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন এশিয়াবাসীদের মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপট বলিয়া অভিহিত করেন। লর্ড কার্জনের এই উক্তিতে সমগ্র ভারতে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সিষ্টার নিবেদিতা সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লর্ড কার্জনের উক্তিতে বিশেষ ভাবে ব্যথিত হন। লর্ড কার্জন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেই যে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য তিনি কার্জন-রচিত 'Problems of the Far East' গ্রন্থের অংশ-বিশেষের প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোরিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের সভাপতির অনুগ্রহ-ভাজন হইবার জন্য লর্ড কার্জন কোরিয়াতে কিরূপ ভাবে অসত্য ও চাটুকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, "Problems of the Far East" গ্রন্থের উক্ত অংশে তিনি নিজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "Problems of the For East" গ্রন্থের উক্ত অংশ এবং কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতার আপত্তিকর অংশ পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখান হয়। লর্ড কার্জন নিজে কি চরিত্রের লোক তাহার পরিচয় পাইয়া জনসাধারণ কার্জনের দাম্ভিক ও নির্লজ্জ উক্তির মূল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। টাউন হলের সভায় সুরেন্দ্রনাথও লর্ড কার্জনের এই উক্তির সুতীব্র সমালোচনা করেন।

এই সকল নানা কারণে লর্ড কার্জন প্রগতিশীল, স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালীদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ঝনা সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন মনে করেন যে, বাঙ্গালীদের সংহত শক্তি ও ঐক্যবোধকে আঘাত করা প্রয়োজন। পদত্যাগ করিয়া ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যান। বহু দিন হইতেই গবর্ণমেণ্ট বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছিলেন। ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনর স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলা দুইটিকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী পেশ করেন, কিন্তু তখন কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রস্তাবিত ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে রিজলি সাহেবের পত্র প্রকাশিত হয়। সমগ্র দেশে এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ব-বাংলার জেলা সমূহে ভ্রমণ করেন এবং ঐ সকল জেলার প্রতিপত্তিশালী লোকদের নিকট বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সুফল বর্ণনা করেন। তিনি নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালের ১৯ই জুলাই তারিখে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। রাজসাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য আসামের চীফ কমিশনরের প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বাংলার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। লর্ড কার্জনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব নষ্ট করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব-বাংলায় সফর-কালে লর্ড কার্জন মুসলমানদের এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য হইবে। লর্ড

কার্জনের এই প্রচারকার্য্যে সাধারণ ভাবে পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই তারিখে বাংলার জনসাধারণ জানিতে পারিল যে ভারত-সচিব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে সম্মতিদান করিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গের সংবাদ শ্রবণে বাংলা দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মৃত্যুপণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বহু দিন হইতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে বাংলার নবজাগ্রত জনচিত্তে যে ক্ষোভ ও তিক্ততা জমা হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইল। বাংলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণ সহানুভূতি ও ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেস সরকারী ভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা না করিলেও বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গভঙ্গের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন, "বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

আন্দোলনকে কার্য্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি তাঁহার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশবাসীকে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলেন,—"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি-স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এইরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করাইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়াই ভারতে আবার নূতন করিয়া বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য দেশী শিল্প প্রসার লাভ করিল। কান্ত-কবি রজনীকান্ত দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিষ কিনবো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

বাংলার পথে-প্রান্তরে কবির এই গান ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাংলার সর্বত্র—ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, মৈমনসিংহে জনসভায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত অভিব্যক্ত হইল। বাংলার জনসাধারণ বৃটিশ-দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট জন-সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত জননায়ক নরেন্দ্রনাথ সেন। গবর্ণমেণ্ট মুসলমান সম্প্রদায়কে এই আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। মুসলমান জনসাধারণ দলে দলে সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। ঢাকার নবাবের ভ্রাতা আকাতুল্লা বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সমর্থন করিলেন। দেশীয় খৃষ্টান সমাজও আন্দোলনকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করিতে লাগিলেন। বাংলার যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি সক্রিয় ভাবে কোন দিন রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করেন নাই, তাঁহারাও এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, কাশিমবাজার ও ময়মনসিংহের মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে লিখিয়াছেন,—"যে সব ব্যক্তি সাধারণতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকেন এবং যাঁহারা কর্তৃপক্ষকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য কখনও কোন কথা বলেন না, তাঁহারও কর্তব্যের অনুরোধে এই বিপর্য্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যথাশক্তি সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। যদি এই সকল ব্যক্তির মতামত তাচ্ছিল্যের সহিত অগ্রাহ্য করা হয়, যদি সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত মূক বিতাড়িত পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, জগতে যে-কোন দেশে সম্মান পাইবার উপযুক্ত এই সকল ব্যক্তিকে নিজ দেশে তাহাদের অপমানজনক অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে জনস্বার্থের খাতিরে আমলাতন্ত্রের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।" লোকমান্য তিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নূতন ভাবধারাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন।

[ক্রমশঃ

সন্ধ্যাসূর্য

উইলিয়ম্ ফকনার

এখনকার জেফারসনের সোমবার সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ। ইট দিয়ে রাস্তা বাঁধানো হচ্ছে, টেলিফোন আর ইলেকট্রিক কোম্পানীরা রাস্তার দু'পাশের ছায়াচ্ছন্ন গাছগুলো কেটে পরিষ্কার করছে,—ওক, ম্যাপল, আর এলম্ গাছগুলো বিদায় নিচ্ছে লোহার থামগুলোকে জায়গা দেবার জন্যে, গাছের বদলে আজকাল থামগুলোর ওপরেই রক্তশূন্য আঙুর ঝোলে। আমাদের ধোপার দোকানের কাপড় নেবার দিন সোমবার। সকাল বেলা থেকেই কাপড়ের মোটগুলো মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সপ্তাহ [illegible] জমে-ওঠা কালো ময়লা কাপড়-ভর্তি মোটরগুলো রাস্তা দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে ছুটে চলে যায়, এমন কি নিগ্রো মেয়েরাও যারা পুরনো [illegible] অনুসারে সায়েবদের কাপড় কাচে, তারাও [illegible] মোটরে আবার দিয়ে যায়!

[illegible] বছর আগে যে কোন সোমবার সকালে শান্ত নির্জন ধুলি-ধূ[illegible] রাস্তা নিগ্রো মেয়েতে ভর্তি থাকতো, তাদের মাথায় থাকতো কাপড়ের বিরাট বোঝা—চাদরে কাপড়গুলো বেঁধে তুলোর বস্তার মতো মাথায় বসিয়ে, হাত দিয়ে না ধরেই সেগুলো সায়েবদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, আবার কালো কাপড়ের রাশ নিয়ে ফিরতো নিজেদের আস্তানায়।

ন্যান্সির মাথাতেও থাকতো এমনি একটা বিরাট মোট, মোটটার ওপরে চাপাতো কালো একটা টুপি, যা কেবল শীত আর গ্রীষ্মকালেই থাকতো তার মাথায়। লম্বাটে গাল-বসা করুণ মুখখানি, সামনের কতকগুলো দাঁত নেই। আমরা প্রায়ই তার পেছনে ধাওয়া করতাম তার মাথার অদ্ভুত কায়দা দেখবার জন্যে। চলবার সময় তার টুপিটা নড়তো না পর্যন্ত। খাল পেরিয়ে ঢালু পথে ওঠবার সময়ও তার মাথা [illegible] মাথার বোঝাটা থাকতো পাহাড়ের মতোই নিশ্চল। আর পরে এক-পা এক-পা করে সে সামনে এগিয়ে যেতো।

[illegible] মামারা কখনো কখনো স্ত্রীদের বদলে কাপড় দিতে [illegible] গেলেও ন্যান্সির হয়ে জেসাস্ কোন দিন কোথাও যায়নি, এমন কি বাবা বললেও, বা ডিল্‌সের অসুখ করলেও না। ন্যান্সিকেই ফিরে এসে আবার আমাদের জন্যে রাঁধা বাড়া করতে হতো। প্রায়ই আমরা তাকে সকালের খাবার রাঁধবার জন্যে তার বাড়ীতে বলতে যেতাম। খালের ধারে থাকতাম দাঁড়িয়ে, কেন না, বাবা জেসাসের সঙ্গে কোন রকম গণ্ডগোল করতে বারণ করতেন—ছোটখাট কালো মতো লোকটি, মুখে ক্ষুরে-কাটা ক্ষতচিহ্ন,—সেখান থেকেই আমরা ঢিল ছুঁড়তাম যতক্ষণ না সে বাইরে বেরিয়ে আসতো।

—"কী, মনে করেছো কি তোমরা—ঘরটা কি ভেঙে ফেলবে না কি?" ন্যান্সি বিরক্ত হয়ে চেঁচায়,—এই ক্ষুদে শয়তানের দল, তোমরা কি ভেবেছো শুনি?"

—"বাবা বলে দিয়েছেন তোমাকে আমাদের বাড়ীতে সকালের খাবার রাঁধতে", ক্যাডি বলে ওঠে,—"আধ ঘণ্টা আগে আমাদের বলেছেন সুতরাং আর এক মিনিটও দেরী কোরো না যেন।"

—"আমি রাঁধতে জানি না যাও," ন্যান্সি বলে ওঠে, "আমি এখন শুতে যাচ্ছি।"

—"বাজী ফেলে বলতে পারি তুমি মদ খেয়েছো", জেসন বলে, "বাবাও তো বলেন তুমি মদ খাও, খাও না ন্যান্সি?"

—"কে বললে যে আমি মদ খাই?" ন্যান্সি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "আমি এমনিই শুতে যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘর-বাড়ী তছনছ করে দিয়ে আমরা ফিরলাম। শেষ পর্যন্ত যখন সে আমাদের বাড়ী এলো তখন ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যেদিন তাকে ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার পাদ্রী মিষ্টার ষ্টোভালের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মদের নেশায় ন্যান্সি বলেছিল: "কখন আমার কাপড়-কাচার পয়সা দেবে সায়েব? কখন আমার কাপড়-কাচার পয়সা দেবে? এতো দিন ধরে তো মাত্র এক সেন্ট দিয়েছো—"

মিষ্টার ষ্টোভাল তাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখনো সে বিড়-বিড় করে বলছিল: "কখন আমার পয়সা দেবে সায়েব—কখন আমার পয়সা দেবে···"

মিষ্টার ষ্টোভাল তখন জুতোর গোড়ালী-শুদ্ধ এক লাথি তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ন্যান্সি লুটিয়ে পড়েছিলো রাস্তার ধুলোয়, কিন্তু তবুও তার মুখে হাসি। মুখ ফিরিয়ে খানিকটা রক্তমাখা থুথু ফেলবার সময় কয়েকটা ভাঙা দাঁতও বেরিয়ে এসেছিলো মুখ থেকে।—"এতো দিনে তো মাত্র এক সেন্ট দিলে···" অদ্ভুত কাটা-কাটা সুরে সে বলেছিলো কথা ক'টি।

এই হলো তার দাঁত হারাবার ইতিহাস। সেদিন সকলের মুখেই ছিলো এই ন্যান্সি আর ষ্টোভালের আলোচনা। সেদিন জেলের ধার দিয়ে রাত্রে যাবার সময় সবাই শুনেছিলো ন্যান্সির মনের খুশী-ভরা গান। সবাই দেখেছিল, ন্যান্সি গরাদে ধরে গান গাইছে আর জেলের কর্তা প্রাণপণে তাকে থামাবার চেষ্টা করছে—

সারা দিন কেউ তাকে থামাতে পারেনি। হঠাৎ ওপরতলা থেকে ভারী একটা শব্দ কানে যাওয়ায় জেল-কর্তা গিয়ে দেখে, স্ন্যান্সি জানলার গরাদে থেকে ঝুলছে। জেলার তখন বলেছিলো: 'এটা মাতাল নয়, কোকেনখোর।' কেন না মদ খেয়ে কোন নিগ্রোই আত্মহত্যা করে না, পূরো দমে কোকেন খেলে নিগ্রোরা তখন না কি আর নিগ্রোই থাকে না। জেলার দড়ি কেটে তাকে সুস্থ করে তোলার পর বেদম প্রহার দেয়। ন্যান্সি নিজের পোষাক দিয়েই উদ্বন্ধনে মরবার চেষ্টা করে, কেন না যখন তাকে ধরা হয়েছিল তখন নিজের গায়ের পোষাক ছাড়া তার কাছে আর কিছু ছিল না। শব্দ শুনে জেলার ছুটে এসে দেখেছিল, ন্যান্সি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে জানলার গরাদে থেকে ঝুলছে, তার পেটটা তখন বেলুনের মত ফুলে উঠেছে।

ডিলসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ন্যান্সিই আমাদের রান্না-বান্না করছিল। তখনই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, তার পোষাকের তলায় যেন ফোলা ফোলা কি। জেসাসও ছিলো রান্নাঘরে ষ্টোভের ধারে বসে, তার মুখের কাটা দাগটা যেন ময়লা দড়ির মতো দেখতে লাগছিলো, হঠাৎ বলে উঠলো, "ন্যান্সির কাপড়ের তলায় তরমুজের মতো কি যেন একটা রয়েছে?"

—"তোমার বাগান দিয়ে তো আসিনি"—ন্যান্সি ঝংকার দিলো।

—"কিসের বাগান?" ক্যাডি প্রশ্ন করে।

—"ওটা যদি একবার বার করো তো আমি দু'ফাঁক করে দিতে পারি—" জেসাস্ রসিকতা করে উঠলো।

—"আঃ, ছোট ছেলেপুলেদের সামনে কি যা তা বকছো?"—ন্যান্সি বললে, "তুমি কাজে যাওনি? তোমাকে কি মিষ্টার জেসন্ রান্নাঘরে বসে ছেলেদের সামনে ফষ্ট-নষ্ট করবার জন্যে বেতন দেন না কি, য়্যাঁ?"

—"তরমুজের কথা কি বললে?" ক্যাডি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

—"আমি সায়েবদের রান্নাঘরে আসতেও চাই না', জেসাস বলে, "তারাই তো আমাকে আসবার জন্য বলে। সায়েবরা ইচ্ছে করলেই আমাদের বাড়ী যেতে পারে, বারণ করবার বা বাধা দেবার আইন নেই, কিন্তু তারা আমাদের ইচ্ছেমত যে-কোন সময়ে লাথি মেরে তাদের বাড়ী থেকে ভাগিয়ে দিতে পারে।"

ডিলসে তখনো অসুস্থ, বাবা জেসাসকে আমাদের বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। এর অনেক দিন পরে এক দিন রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা লাইব্রেরী ঘরে এসে বসেছি, মা জিজ্ঞেস্ করলেন, "ন্যান্সির সব কাজ-কম সারা হলো? অনেকক্ষণ তো সময় পেলো, শেষ হয়েছে বলেই মনে হয়।"

উত্তরে বাবা বললেন, "কোয়েন্টিনকে পাঠাও না দেখতে। যাও তো, দেখে এসো ন্যান্সির কাজ শেষ হলো কি না, শেষ হলে তাকে বোলো, এখন সে বাড়ী যেতে পারে।"

আমি রান্নাঘরে গেলাম। ন্যান্সির বাসন-মাজা, আগুন নেভানো সব কাজ শেষ। একটা চেয়ারে সে তখন বসে। আমি যেতেই পরিপূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো।

—"মা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব কাজ কি শেষ হয়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ," ন্যান্সি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়। তখনও সে তাকিয়ে আমার দিকে।

—"কি হয়েছে তোমার?" আমি জিজ্ঞেস করি, "কি হলো কি?"

—"আমি যে নিগ্রো," ন্যান্সি কাতর কণ্ঠে বলে, "সেটা তো আমার দোষ নয়।" নেভানো উনুনের পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে সে তাকিয়েই থাকে। আমি আমার লাইব্রেরীতে ফিরে এলাম তার ভাবগতিক দেখে। রান্নাঘরের কাজ সব শেষ, খাবার আর কেউ বাকী নেই।

—"কি, হয়ে গেছে?" যাওয়া মাত্র মা জিজ্ঞেস করেন।

—"হ্যাঁ মা।"

—"কি করছে সে?"

—"কিছু না, বসে আছে শুধু।"

—"যাই, গিয়ে দেখে আসি," বাবা বললেন।

ক্যাডি বললো, "ন্যান্সি হয়তো জেসাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, তার সঙ্গেই ফিরবে বোধ হয়।"

—"জেসাস তো নেই," আমি বললাম, "ন্যান্সিই বলছিল, এক দিন সকালে উঠে সে যেন কোথায় পালিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। সে মেমফিস্-এ গেছে বলেই ন্যান্সির বিশ্বাস, হয়তো কিছু দিনের জন্যে শ্রীঘর থেকে ঘুরে আসতে গেছে।"

—"ন্যান্সির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বেচারা মুক্তিই পেয়েছে বলতে হবে। আমারও মনে হয়, লোকটা ওখানেই গেছে।" বাবা বললেন।

—"ন্যান্সি তাহ'লে বোধ হয় চোখে অন্ধকার দেখছে," জেসন বললো।

—"তুমিও বোধ হয় সেই সঙ্গে?" ক্যাডি টিপ্পনী কাটে।

—"না, আমি কেন?" জেসন উত্তর দেয় পিঠ-পিঠ।

—"উল্লুক কোথাকার!" ক্যাডি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

—"চুপ করো তো তোমরা," মা ধমকে ওঠেন। বাবা ফিরে এসে মাকে বললেন,—"আমি ন্যান্সির সঙ্গে একটু যাচ্ছি। ও বলছে, জেসাস না কি আবার ফিরে এসেছে।"

মা প্রশ্ন করলেন, "তাকে ফিরে আসতে দেখেছে নাকি ন্যান্সি?"

—"না, জন কয়েক নিগ্রো ওকে খবর দিয়েছে। আমার বেশী দেরী হবে না ফিরতে।"

—"ন্যান্সিকে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাবে আমাকে ফেলেই?" অনুযোগের সুরে মা বলেন, "আমার চেয়ে কি তার নিরাপত্তার বেশী দরকার?"

—"আমি যাবো আর আসবো," বাবা সান্ত্বনা দেন মাকে।

—"একটা নিগ্রোর জন্যে আমাদের সবাইকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে তুমি যাবে মনে করেছো?"

ক্যাডি বায়না ধরলো,—"আমিও তোমার সঙ্গে যাবো বাবা।"

—"তুমি শুধু শুধু গিয়ে কি করবে?"

—"আমিও যাবো বাবা," জেসন ধরে।

—"জেসন!" মা ধমকে ওঠেন। এর পর মায়ের সঙ্গে বাবার কথা-কাটাকাটি চলতে লাগলো। মা যা ভালোবাসেন না তাই বাবা করেন, তবে এটাও ঠিক যে শেষ পর্যন্ত এ-নিয়ে তাঁকে ভাবতে

হবে। আমি জানতাম মায়ের কাছে আমাকেই থাকতে হবে, কাজেই আমি চুপ করেছিলাম, বাবাও কিছু বলেননি আমাকে। আমিই বড়। আমার বয়স নয়, ক্যাডির সাত, আর জেসনের পাঁচ।

—"আঃ, বলছিই তো বেশী দেরী করবো না," বাবা বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবার।

ন্যান্সি তার টুপিটা মাথায় বসিয়ে নিলো, আমরা সবাই গলিতে এসে নামলাম।

—"জেসাস্ আমাকে খুব ভালবাসে," ন্যান্সি হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙে, "যদি সে দু'ডলার পায় তো আমাকে এক ডলার দেয়।"

গলি দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা।

—"এই ভাবে আমরা যদি ঠিক মতো চালিয়ে নিতে পারতাম তাহ'লে তো বেশ ভালই হোত," ন্যান্সি বলে চলে। গলির সবটাই ভীষণ অন্ধকার।

—"একলা এখানে এলে জেসন্ খুব ভয় পেয়ে যেতো", ক্যাডি বললো।

সঙ্গে সঙ্গে জেসন্ প্রতিবাদ করে উঠলো, "কক্ষনো না।"

—"র‍্যাশেল খুড়ি তার সঙ্গে কিছু করেনি তো?" বাবা বললেন আশঙ্কা ভরে। র‍্যাশেল খুড়ি বৃদ্ধা, মাথার সব ক'টা চুলই পেকে গেছে, ন্যান্সির বাড়ীর কাছেই একলা থাকে সে। দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন পাইপ ফোঁকে। লোকে তাকে বলে জুবার মা, কখনো সে তা স্বীকার করে, আবার কখনো অবজ্ঞায় উড়িয়ে দেয়।

—"নিশ্চয়ই তুমিই তাহ'লে কিছু করেছো," ক্যাডি জোর দিয়ে বললে, "তুমি ফ্রনির চেয়ে বদমায়েস, টিপির চেয়ে পাজী, এমন কি ঐ কালা নিগ্রোগুলোর চাইতেও বেশী শয়তান।"

—"তার সঙ্গে কারো কোন গণ্ডগোলই হয়নি", ন্যান্সি বলে আনমনে, "সে বলতো আমিই না কি তাকে উত্তেজিত করে শয়তান করে তুলতাম, আবার আমিই না কি শুধু তাকে পারতাম ঠাণ্ডা করতে।"

—"আচ্ছা, সে তো এখন চলেই গেছে", বাবা বললেন, "এখন আর তোমার তো ভয় পাবার কিছু নেই, শাদা মানুষগুলোকে এখন একটু একলা থাকতে দাও।"

—"শাদা মানুষগুলোকে একলা থাকতে দাও কি?" ক্যাডি প্রশ্ন তুললো, "একলা থাকতে দেবে কি করে?"

—"সে কোথাও যেতো না", ন্যান্সি আনমনা হয়ে পড়ে, "আমিই কেবল তাকে বুঝতাম, আর এই গলির ভেতর এখন যেন তাকে আরও বুঝতে পারছি কিছু [illegible] বলবার সময় সবটাই শেষ করতো না, প্রায়ই চুপ করে থাকতো। তাকে দেখছি না, হয়তো আর কখনোই তার কাটা দাগওয়ালা মুখ দেখতেও পাবো না। ক্ষত শুধু তার মুখেই নেই, জামার ভেতরও তার বহু ক্ষতচিহ্ন লুকোনো আছে।"

—"যদি অন্য ভাবে ব্যবহার করতে তো আজ আর এ সব কিছুই হোত না", বাবা ধীরে ধীরে ন্যান্সিকে বললেন। "সে এখন হয়তো সেন্টলুই-এ, হয়তো অন্য কাউকে এতো দিন বিয়ে করে তোমাকে ভুলেছে।"

—"তাই যদি করে থাকে তাহ'লে কিন্তু কম মোটেই ভালো হবে না," ন্যান্সি ভীষণ রেগে উঠলো, "সেখানে গিয়ে আমি তার জীবন দুর্বিসহ করে তুলবো, তার মাথা কেটে, তার হাত কেটে, পেটটা ফেড়ে ফেলে ধাক্কা মেরে—"

—"চুপ করো", বাবা তাকে থামিয়ে দেন।

—"কার পেট ছিঁড়ে দেবে ন্যান্সি?" ক্যাডি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—"আমি তো দুষ্টুমি করি না", জেসন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। "আমি তো আস্তে আস্তে ভালো ভাবেই চলছি।"

—"ওঃ", ক্যাডি টিপ্পনী কাটে সঙ্গে সঙ্গে, "আমরা না থাকলে তোমাকে আর যেতে হোত না।"

ডিলসে তখনো ভালো হয়ে ওঠেনি, তাই আমরা ন্যান্সিকে রাত্রে এগিয়ে দিতাম। আমাদের কাণ্ড দেখে এক দিন মা প্রশ্ন করলেন, "এমন করে আর কতো দিন চলবে বলো তো? একটা ভীতু নিগ্রোকে এগিয়ে দিতে গিয়ে যে আমাকেই এতো বড় বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে যাচ্ছো।"

তাই রান্নাঘরে ন্যান্সির শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা অদ্ভুত শব্দে হঠাৎ এক রাত্রে আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। কোন গান বা কান্নার শব্দ নয়, শব্দটা আসছে অন্ধকার সিঁড়ির দিক থেকে। মায়ের ঘরে আলো জ্বললো, বাবাকে নেমে যেতে শুনলাম হলের দিকে। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে আমি আর ক্যাডিও এসে হাজির হলাম হলে। মেঝে কনকন্ করছে ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডায় পায়ের আঙুলগুলো বেঁকে যাওয়া সত্তেও আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। গানের মতো শুনতে হলেও আওয়াজটা গানের নয়, এ রকম শব্দ শুধু নিগ্রোরাই করতে পারে জানি।

তার পর এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো শব্দটা, বাবা চলে গেলেন। আমরা উঠে গেলাম সিঁড়ির মাথায়। হঠাৎ আবার শব্দ আরম্ভ হলো সিঁড়িতে, তবে খুব জোরে নয়। দেখলাম, ন্যান্সি সিঁড়ি থেকে বিস্ফারিত চোখে বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নেমে আসতে আসতে শুনলাম আবার সে শব্দ আরম্ভ করেছে, রান্নাঘর থেকে বাবা পিস্তল নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ন্যান্সির বিছানা-পত্র নীচে নিয়ে আসা হোল।

এবার আমাদের ঘরে তার বিছানা পাতা হোল। মায়ের ঘরের বাতি নেবার পর আমরা আবার ন্যান্সির সেই রকম চোখ দেখলাম। "ন্যান্সি!" ক্যাডি চুপি-চুপি ডাকে, "ঘুমিয়ে পড়লে না কি ন্যান্সি?"

ন্যান্সিও আস্তে আস্তে কি যেন বললো, হ্যাঁ, কি না, ঠিক বোঝা গেল না। কিছুই যেন হয়নি, কেউ যেন নেই সেখানে, এমনি উদাস ভাবে লক্ষ্য করছে সিঁড়ির পথটা চিত্রার্পিতের মতো, যেন চোখ বুঁজে সূর্যকে অনুভব করছে। "জেসাস্," ন্যান্সি বিড়বিড় করে উঠলো। "কি বলছো?" ক্যাডি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করে, "সেই কি রান্নাঘরে আসবার চেষ্টা করেছিল?"

ন্যান্সি টেনে-টেনে দীর্ঘ করে ডাকলো আবার, "জে-সা-া-া-স্।" কথাটা মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো যেন দেশলাইয়ের বারুদ বা মোমবাতির শিখার মতো।

—"আমাদের দেখতে পাচ্ছো ন্যান্সি?" ক্যাডি আবার আস্তে আস্তে ডাকে, "আমাদের দেখতে পাচ্ছো?"

—"আমি যে নিগ্রো", ন্যান্সি কথা বলে এবার, "ভগবান, হা ভগবান !"

—"নিগ্রো কি ন্যান্সি ?"

—"আমি নরকের কীট", ন্যান্সি ক্লিষ্ট স্বরে বলে, "যেখান থেকে এসেছি সেইখানে যেতে আর আমার দেরী নেই।"

ন্যান্সি কফি খাচ্ছে চুমুকে চুমুকে। দু'হাতে কাপটা ধরে কফি খেতে খেতে আবার সেই রকম শব্দ করছে সে। শব্দ করছে, আর কাপ থেকে ছলকে ছলকে কফি ছিটকে পড়ছে হাতে, জামায়, পোশাকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাঁটুর ওপর দুই কনুই রেখে, হাত দু'টি দিয়ে কাপটি ধরে রয়েছে সে। ভিজে কাপটার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে আর চেঁচাচ্ছে।

—"ন্যান্সিকে দেখে", জেসন বললে, "ন্যান্সি, আর আমাদের রান্না করতে হবে না, ডিলসে তো সেরে উঠেছে এবার।"

—"তুমি থামো তো বাপু", ডিলসে কড়া সুরে ধমকে উঠলো।

আমাদের দিকে সেই রকম ভাবে তাকিয়ে কাপটা ধরে একটানা শব্দ করেই চলেছে ন্যান্সি। এ যেন এক জনে তাকিয়ে আছে, আর শব্দ করছে অন্যে, তার হাবভাবে এমনিই মনে হচ্ছিলো আমাদের।

—"তুমি মার্শালকে ফোন করবে নাকি ?" ডিলসে প্রশ্ন করলো। ন্যান্সি তখন একটু থেমেছে, লম্বা বাদামী হাতে তখনো কফির কাপ। চেষ্টা করলে খানিকটা গেলবার, কিন্তু কাপটা হঠাৎ উল্টে গিয়ে জামা-কাপড়ই নোঙরা করে দিলো কেবল, মেঝেতে নামিয়ে রাখলো পেয়ালাটাকে। এগিয়ে এলো জেসন ব্যাপার কি দেখতে।

—"এ আমি খেতে পারছি না," ন্যান্সি হতাশ কণ্ঠে অনুনয় জানায়, "আর খেলেও গলার নীচে নামছে না কিছুতেই।"

"এখন নীচের ঘরে যাও তুমি," ডিলসে বললো, "ফ্রনী বিছানা-পত্র ঠিকঠাক করে দেবে, আর আমিও এলাম বলে।"

"কোন নিগ্রোই তাকে থামাতে পারবে না।" ন্যান্সির কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়ে।

"আমি তো নিগ্রো নই," জেসন প্রতিবাদ জানায়, "আমি কি নিগ্রো, ডিলসে ?"

"জানি না, যাও।" ডিলসে বিরক্ত হয়ে ন্যান্সির দিকে মুখ ফেরায়। "আমি কিন্তু তা মনে করি না। তাহ'লে কি করতে চাও এখন ?"

ন্যান্সি তাকালো আমাদের দিকে, চোখ তার চঞ্চল, তাতে একটুও সময় নেই বলে যেন ভয়ও পেয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের তিন জনের দিকেই সে অদ্ভুত ভাবে তাকাতে লাগলো বার-বার !

—"তোমাদের ঘরে যেদিন ছিলাম আমি, তোমরা তো দেখেছো," ন্যান্সি বলতে লাগলো, "কতো সকালে উঠে আমরা সবাই কেমন খেলেছিলাম।" সেদিন তার বিছানায় আমরা খুব খেলা করেছিলাম বটে বাবা বিছানা থেকে না-ওঠা পর্যন্ত, এমন কি খাবার আগে পর্যন্ত চলেছিলো সে খেলা ! "মাকে বলে এসো, আজ রাত্রেও তোমরা এখানে শোবে। কোন বিছানা-পত্তরের দরকার নেই, আজও আবার বেশ মজা করে খেলা যাবে।" সে উচ্ছ্সিত হয়ে ওঠে। ক্যাডি চললো মায়ের কাছে, জেসনও।

মা ঝংকার দিয়ে বললেন, "না, বাড়ীটাকে আমি নিগ্রোর শয়ন-মন্দির করে তুলতে পারবো না।" জেসন কান্না জুড়ে দিলো, ধমক দিয়ে মা বললেন, "এমনি অসভ্যতা করলে তোমাকে তিন দিন একদম ফল খেতে দেওয়া হবে না।" জেসনও আবদার ধরলো, যদি ডিলসে তাকে 'চকোলেট-কেক' তৈরী করে দেয়, তবেই সে এখুনি থামবে। বাবাও ছিলেন সেখানে।

—"এ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত করছো না তুমিও ?" মা বললেন, "তাহ'লে অফিসারগুলোকেই বা রাখা হয়েছে কি জন্যে ?"

—"জুবাকে ন্যান্সি এতো ভয় করে কেন মা ?" ক্যাডি মাকে প্রশ্ন করলো,—"তুমিও কি বাবাকে ওমনি ভয় করো ?"

—"তারাই বা কি করবে বলো ?" বাবা বলতে লাগলেন, "ন্যান্সিই যদি তাকে দেখতে না পায় তাহ'লে অফিসাররা তাকে কোথায় খুঁজবে ?"

—"তাহ'লে ন্যান্সিই বা শুধু শুধু এতো ভয় পাচ্ছে কেন ?" মাও প্রশ্ন করেন সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা জানান, "ন্যান্সি বলছে, সে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে, আজ রাত্রে হয়তো সে আসতেও পারে।"

—"আমরাও তো খাজনা দিই।" মায়ের গলায় শ্লেষ, "আমি এই পেল্লায় বাড়ীতে একলা থাকবো, আর তুমি যাবে ঐ একটা নিগ্রো মেয়েকে পৌঁছে দিতে ?"

—"তুমি তো জানো, আমিও কম বিপদের মধ্যে নেই," বাবা জানান।

"ডিলসে চকোলেট-কেক তৈরী করে দিলে তো আমি থামবো বলেছি !" কাঁদতে কাঁদতেই জেসন আবার মনে করিয়ে দেয়। মা আমাদের সেখান থেকে যেতে বললেন। আর বাবা ভীষণ রেগে বলে উঠলেন, জেসন কেক পাবে কি না তা তিনি জানেন না, তবে তার কপালে যে সাংঘাতিক কিছু আছে এ ঠিক।

আমরা রান্নাঘরে ফিরে এসে ন্যান্সিকে সব কথা জানালাম। ক্যাডি বললো, "জানো, বাবা বলছিলো বাড়ীতে তালা বন্ধ করে থাকলে তোমার কিছু হবে না। কিসের কি হবে না ন্যান্সি ? জুবা কি তোমার ওপর ক্ষেপে গেছে না কি ?" ন্যান্সির হাতে কফির কাপ, হাঁটুর মাঝে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে সে, তাকিয়ে আছে কাপের মধ্যে। "কি এমন হয়েছিলো ন্যান্সি যে জুবা তোমার ওপর চটে গেলো ?" ক্যাডিটা এতো জ্বালাতন করে! ন্যান্সি কোন জবাব না দিয়ে কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলো, কাৎ হয়ে তার থেকে খানিকটা কফি গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। হঠাৎ আবার তার মুখ থেকে সেই অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরুতে লাগলো! আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে!

—"এখন," ডিলসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, "এ-সব বাজে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলো দেখি। নিজেকে একটু সামলাবার চেষ্টা করো। এখানে খানিকটা বিশ্রাম করে তোমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি চলো।" ডিলসে চলে গেলো বাইরে।

ন্যান্সির দিকে তাকালাম আমরা। তার ঘাড়টা মাঝে মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে, কিন্তু আর সেই শব্দটা কই আর বেরুচ্ছে না মুখ থেকে। আমরা সবাই মিলে আবার জিজ্ঞেসা করি: "জুবা তোমার কি [illegible] ন্যান্সি ? সে তো এখানে নেই, তবে তোমার কিসের [illegible]

স্যান্সি শুধু শান্ত দু'টি চোখ তুলে তাকায়। "সে-রাত্রে আমরা সবাই মিলে কেমন ফুর্ত্তি করেছিলাম, না?"

—"আমি করিনি," জেসন বললো হঠাৎ, "আমি তো সেদিন কোন ফুর্ত্তিই করিনি।"

—"তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে," ক্যাডি মনে করিয়ে দেয় তাকে, "তুমি তো ছিলেই না সেখানে।"

—"আজকে আমার বাড়ীতে চলো, সেদিনকার চেয়েও বেশী ফুর্তি হবে," স্যান্সি বললো।

—"মা যে আমাদের যেতে দেবেন না," আমি বললাম, "অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

—"তাঁকে আর বিরক্ত করতে হবে না," স্যান্সি বলে, "কাল সকালে বললেই চলবে। কিছুই বলবেন না আমার বাড়ী গেলে।"

—"আমাদের যেতেই দেবেন না," আবার বলি আমি।

—"তাহ'লে থাক," ভয়ে ভয়ে স্যান্সি বলে, "এখন আর জিজ্ঞেস করে কাজ নেই।"

—"তিনিও যেতে দেবেন না আর আমরাও বলতে পারবো না," ক্যাডি স্পষ্ট কথা জানিয়ে দেয়।

—"তোমরা সবাই মিলে গেলে আমি বরঞ্চ জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি," জেসন বললে।

—"ভারী ভালো হয় তাহ'লে, খুব মজা হবে দেখো," স্যান্সি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "একবার না হয় যাও তুমি। কোন ভয় নেই।"

—"না, ভয় আমি করি না। মাকে না বলেও যেতে পারি।" ক্যাডি বললো, "তবে ভয় শুধু জেসনকে, শেষ কালে যদি বলে দেয় মাকে?"

—"না, না, আমি কোন কথা বলবো না", জেসন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

—"হ্যাঁ গো মশাই, শেষ কালে তুমিই সব ভেস্তে দেবে!" ক্যাডি বক্রোক্তি করে তাহাকে।

—"কিছুতেই না", লাফিয়ে ওঠে জেসন উত্তেজনায়।

—"আমার সংগে যেতে ভয় করবে তোমার জেসন?" স্যান্সি জিজ্ঞেস করলো।

ক্যাডি বললো, "গলিটা ভারী অন্ধকার, আমরা মাঠের দিকের দরজা দিয়ে যাবো, স্যান্সি। তা না হলে কিছু একটা লাফিয়ে উঠলেই জেসন কাঠ হয়ে যাবে ভয়ে।"

—"আজ্ঞে না", জেসনও প্রতিবাদ করে সজোরে। আমরা গলি দিয়ে এগোচ্ছি, আর স্যান্সি জোরে জোরে গল্প করছে।

—"অতো জোরে জোরে কথা বলছো কেন স্যান্সি?" ক্যাডি প্রশ্ন করে তাকে।

—"কে, আমি?" স্যান্সি উত্তরে বলে, "শোন ছেলের কথা, আমি না কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছি!"

—"ঠিক বক্তৃতা দেওয়ার মতো কথা বলছো তুমি," ক্যাডি বললো। "তোমার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, বাবাও যেন এখানেই কোথাও আছেন।"

—"কে, আমি বুঝি বড্ড জোরে কথা বলছি মিষ্টার জেসন?" হেসে হেসে স্যান্সি বললো।

—"দেখ ভাই, স্যান্সি জেসনকে মিষ্টার বললো।" ক্যাডি আশ্চর্য হয়ে যায়।

—"বলো দেখি এবার, তোমরা কেমন করে কথা বলছো?" স্যান্সি উল্টে প্রশ্ন করে।

—"কৈ, আমরা তো জোরে জোরে কথা বলছি না", ক্যাডি উত্তর দেয়, "তুমিই বরঞ্চ বাবার মতো—"

—"চুপ", স্যান্সি হঠাৎ থামিয়ে দেয় তাদের। "একটু থামো তো মিষ্টার জেসন্।"

—"স্যান্সি, জেসন্‌কে বার-বার মিষ্টার বলছো কেন?"

—"চুপ।" স্যান্সি আবার থামিয়ে দেয় তাদের। খালের যেখানটায় সে তারের বেড়া পেরিয়ে হেঁটে পার হয়, সেইখানেই স্যান্সি জোরে জোরে কথা বলছিলো লক্ষ্য করলাম। তার পর আমরা স্যান্সির বাড়ী এসে পড়লাম। তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে ফেললো। বাড়ীর গন্ধটা ঠিক যেন প্রদীপের মতো, আর স্যান্সির গন্ধটা শলতের মতো, পরস্পরের গন্ধের জন্যেই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো আবহাওয়া। আলোটা জ্বালিয়ে সে হুড়কো দিয়ে দিলো দরজায়। তার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে গল্প ফেঁদে বসলো।

—"এখন আমরা করবো কি?" ক্যাডি প্রশ্ন করে।

—"কি করতে চাও শুনি?" স্যান্সি জানতে চায়।

—"মজা করবে বলে আমাদের তো ডেকে এনেছো তুমি?" ক্যাডি মনে করিয়ে দেয়।

—"স্যান্সির বাড়ীতে কিসের যেন একটা গন্ধ বেরুচ্ছে," জেসন বললো নাক সিঁটকে, "আমি এখানে থাকতে চাই না, আমি বাড়ী যাবো।"

—"যাও তাহ'লে," ক্যাডি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেয়।

—"একলা যাবো কি করে?"

—"এখুনি আমরা একটা মজা করবো জেসন," স্যান্সি স্তোক দেয়।

—"কেমন করে?" ক্যাডি কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

স্যান্সি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, সেখান থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো শূন্যদৃষ্টিতে, সে যেন কত দূরে চলে গেছে।

—"কি করতে চাও বলো তো?" কেটে কেটে বলে কথা ক'টি স্যান্সি।

—"আমাদের একটা গপ্পো বলো তুমি," ক্যাডি ধরে বসে, "গপ্পো বলবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে বলো।"

"—তুমি কোন গপ্পো জানো?" ক্যাডি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে।

—"হ্যাঁ," স্যান্সি জবাব দেয়, "নিশ্চয়ই জানি।"

উনুনটার সামনে একটা চেয়ার টেনে সে বসে পড়ে। আগুন জ্বলছে, ঘরটা গরম হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, অথচ এতো আগুনের কোন প্রয়োজনই নেই। স্যান্সি গল্প আরম্ভ করলো এবার। চোখের সঙ্গে সমতা রেখে এগিয়ে চললো গল্পের কাহিনী। তার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে অন্য কেউ। কোথায় নেমে গেছে তার কণ্ঠস্বর, অন্য কোথাও চলে গেছে স্যান্সির মন। মনে হচ্ছে, বাইরে

থেকে আসছে তার কথাগুলো ভেসে। কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়া পার হতে হতে যেন সে কথা বলছে—"খালের মধ্যে দিয়ে রাণী আসছে, আর একটা শয়তান যেন কোথায় লুকিয়ে আছে ধারে-পাশে। খালের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে রাণী বললো, "এই খালটা যদি কোন রকমে পার হয়ে যেতে পারি—"

"কোন্ খালটা ?" গল্পের মাঝখানেই ক্যাডি প্রশ্ন করে বসে, "সেই খালের মধ্যে রাণী গেলো কেন ?"

—বাড়ী যাবার জন্যে," ন্যান্সি তাদের বুঝিয়ে বলে, "সেই খালটা পেরিয়েই যে রাণীর বাড়ী।"

"রাণী বাড়ী যাচ্ছে কেন একলা ?" ক্যাডির মনে তবুও প্রশ্ন।

কথা বন্ধ করে ন্যান্সি আবার আমাদের দিকে তাকালো। জেসন ছোট বলে প্যান্টের বাইরে থেকে পা দু'টো ছড়িয়ে বসে আছে। "এটা আবার একটা গল্প হলো না কি ?" মুখ ভার করে সে বলে, "আমি বাড়ী ফিরে যাবো।"

—"আমারো মনে হয় সেই ভালো।" ক্যাডি উঠে পড়ে বললো, "বাজী রেখে বলতে পারি, বাবা-মা আমাদের জন্যে বসে আছেন।" কথাগুলো বলে সে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"না", তাড়াতাড়ি উঠে এসে ন্যান্সি বাধা দেয়, "দরজা খুলো না।" ক্যাডি পাশ কাটিয়ে সোঁ করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু খিলে হাত দিলো না।

—"কেন খুলবো না বলো তো ?" ক্যাডি বললো।

—"আলোর কাছে চলো বলছি", ন্যান্সি মিনতি করে, "এখুনি চলে যেও না তোমরা, লক্ষ্মীটি।"

—"আমি বাড়ী যাবো", জেসন জোর ধরে এবার। "আমি বলে দেবো সব।"

—"আর একটা গল্প বলবো তোমাকে", ন্যান্সি তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। বাতির কাছে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ক্যাডির দিকে তাকায়। দৃষ্টি তার স্থির শান্ত, যেন নাকের ওপর কাঠি রেখে তার দিকে নিশানা করে তাকিয়ে আছে লক্ষ্যভেদ করতে।

—"শুনতে চাই না তোমার বাজে গল্প" জেসন ছিটকে উঠে। "তোমার গল্পে লাথি মারি আমি।"

—"এটা খুব ভালো গল্প", ন্যান্সি প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করে। "আগেরটার চেয়ে অ-নে-ক ভালো।"

—"কিসের গল্প ?" ক্যাডি জিজ্ঞেস করে ঠাণ্ডা হয়ে। ন্যান্সি আলোর পাশে দাঁড়িয়ে তার লম্বা বাদামী হাত দিয়ে আলোটা নাড়া-চাড়া করে থামকা।

—"আলোতে হাত দিয়েছো", আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ক্যাডি, "গরম লাগছে না তোমার ?"

আলোর ওপর আর একবার হাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নেয়। হাত দু'টো যেন শিরা-উপশিরা দিয়ে কব্জির সঙ্গে বাঁধা।

—"তার চেয়ে অন্য কিছু করো একটা।" ক্যাডি পরামর্শ দেয়।

—"আমি বাড়ী যাবো", জেসনের সেই এক কথা।

—"খানিকটা কেক আছে ঘরে।" ন্যান্সি ক্যাডির দিকে তাকালো, তার পর জেসনের দিকে, তার পর আমার দিকে, সব শেষে আবার ক্যাডির দিকে।

—"কেক আমি খাই না", জেসন বললো, "আমি লজেন্স খাবো।"

ন্যান্সি তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললো, "তাহ'লে 'পপার'টা একটু ধরো।"

—"বেশ! 'পপার' ধরতে দিলে থাকতে পারি আমি।" জেসন বললো, "ক্যাডিটা ধরতে পারে না, ওকে ধরতে দিলে আমি থাকবো না।"

ন্যান্সি আগুন জ্বালাতে লাগলো। "দেখো, দেখো, ন্যান্সি আগুনে হাত দিচ্ছে", ক্যাডির গলায় বিস্ময়। "কি করছো তুমি ন্যান্সি ?"

—"কেক তৈরী করবো", ন্যান্সি উত্তর দেয়। "কিছু তৈরী করা যাক কি বল ?" তার পর খাটের তলা থেকে ভাঙা পপারটা টেনে বের করলো ধূলো ঝেড়ে। ভাঙা দেখেই জেসন কান্না জুড়ে দিলো জোরে। "চাই না আমি কেক খেতে"—

—"যেমন করেই হোক, আমরা বাড়ী চলে যাবো", ক্যাডিও বেঁকে বসে। "চলে এসো কোয়েন্টিন্।"

—"দাঁড়াও", ন্যান্সি বললে, "একটুখানি দাঁড়াও, সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমাকে তোমরা শুধু একটুখানি সাহায্য করো।"

—"আমরা পারবো না", ক্যাডি বললো, "অনেক দেরী হয়ে গেছে আজ।"

"তুমি একটু সাহায্য করো জেসন", ন্যান্সি অনুনয় করে জেসনকে, "তুমি একটু আমাকে সাহায্য করবে না ?"

—"না", জেসন স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দেয়। "আমি বাড়ী যাবো ওদের সংগে।"

—"চুপ", ন্যান্সি হঠাৎ ফিস-ফিস করে বলে, "চুপ, একটুখানি থেকে দেখো আমি কি করি। দেখবে এটাকে আবার নতুন করে দেবো, তখন তুমিও 'কেক' সেঁকতে পারবে।" কথা বলতে বলতে ন্যান্সি সেটাকে একটা 'তার' দিয়ে বাঁধতে থাকে।

—"বাজে হলো", ক্যাডি মন্তব্য করে।

—"এতেই হবে।" ধরা-গলায় ন্যান্সি জবাব দেয়। "এবার আমাকে একটু সাহায্য করো।" আমরা কেকগুলো তার হাতে দিতে লাগলাম আর সে আগুনে সেঁকতে লাগলো।

—"এ সব তো কেক হচ্ছে না", জেসন আবার বেঁকে বসলো। "আমি বাড়ী যাবো—"

—"একটু দাঁড়াও না", ন্যান্সি আবার তাকে থামাবার চেষ্টা করে। "দেখো না, টপ-টপ করে কেমন হচ্ছে, তোমার মজা লাগছে না ?" ন্যান্সি বসেছে বাতির কাছ ঘেঁসে। বাতিটা দপ-দপ করে জ্বলে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে শুধু।

—"আলোটা একটু কমিয়ে দাও না ?" আমি বলি।

—"ঠিক আছে", ন্যান্সি বললো, "কালি পরিষ্কার করে দিলেই চলবে। একটু সবুর করো, এক মিনিটের মধ্যেই কেক তৈরী হয়ে যাবে।"

—"বিশ্বাস হয় না যে এক মিনিটের মধ্যেই সব হয়ে যাবে" ক্যাডি অবিশ্বাস ভরে বললো, "এবার আমাদের বাড়ী ফিরতেই হবে। মা-বাবা এতক্ষণ খুব ভাবছেন হয়তো।"

—"না, না", স্যান্সি বলে উঠলো। "আর তৈরী হলো বলে। ডিলসে মাকে বলবে'খন যে তোমরা আমার সংগে এসেছো। তোমাদের বাড়ীতে তো বহু দিন থেকেই চাকরী করছি, আমার বাড়ীতে থাকলে তাঁরা ভাববেন না। একটু বসো, সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

এই সময় জেসনের চোখে ধোঁয়া লাগায় সে কেঁদে 'পপার'টা দিলো আগুনের মধ্যে ফেলে। ভিজে একটা কম্বল এনে স্যান্সি তাঁর মুখ মুছিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার কান্না থামলো না।

—"চুপ করো লক্ষ্মীটি", স্যান্সি তাকে থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চুপ করার নামও করে না সে। ক্যাডি আগুন থেকে পপারটা তুলে নেয় সন্তর্পণে। "এঃ, সব ক'টা কেকই পুড়ে গেছে দেখছি, ক্যাডির দুঃখ হয়, "আরো কিছু কেক করা দরকার দেখছি স্যান্সি।"

স্যান্সি অনেকক্ষণ ক্যাডির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় 'পপার'টা খুলে কালো কালো পোড়া কেকগুলোর ওপরের ছাই মুছতে থাকে লম্বা লম্বা বাদামী হাত দিয়ে।

—"আর কিছু আছে না কি ওতে?" ক্যাডি আবার প্রশ্ন করে।

—"এই দেখো না, এগুলো এখনো পোড়েনি, আমাদের খাওয়ার মতো—"

—"আমি বাড়ী যাবো স্যান্সি," জেসনের বায়না আরো জোর হয়ে ওঠে, "মাকে সব কথা বলে দেবো আমি।"

—"চুপ," ক্যাডি তাকে থামিয়ে দিলো। দেখলাম, ইতিমধ্যেই স্যান্সি দরজার দিকে তাকিয়েছে স্তব্ধ হয়ে। "কেউ যেন আসছে মনে হচ্ছে?" ক্যাডির মুখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা।

আবার স্যান্সির মুখ দিয়ে সেই শব্দ বেরিয়ে আসে। কোলের ওপর কনুই রেখে আস্তে আস্তে শব্দ করতে করতে এবার হঠাৎ তার মুখ বেয়ে বড়-বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ে। গাল বেয়ে মুক্তোর মতো চকচকে ঘামের ফোঁটা অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে পড়ছে।

—"স্যান্সি, তুমি কি কাঁদছো?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

—"না, না, কাঁদবো কেন?" স্যান্সি চোখ বুজে উত্তর দেয়। "আমি কাঁদিনি তো, কিন্তু কে আসছে বল তো! এত রাত্রে?"

—"কি করে জানবো," ক্যাডি উত্তর দেয়। তার পর দরজার কাছে গিয়ে দেখতে থাকে সুতীক্ষ্ণ ভাবে।

—"এবার আমরা বাড়ী চলে যাবো," হঠাৎ খুশী-ভরা গলায় চীৎকার করে ওঠে সে, "বাবা এসে গেছেন।"

—"আমি বাবাকে সব কথা বলে দেবো," জেসন নেচে ওঠে যেন, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে টেনে এনেছো এখানে।"

এখনো স্যান্সির মুখ বেয়ে তেমনি করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, এবার সে চেয়ারে গিয়ে বসলো আস্তে আস্তে। "শোন, তোমার বাবাকে বলবে যে আমরা একটু খেলা করতে এসেছিলাম এখানে। বলবে, কাল সকালে তোমরা বাড়ী যাবে। আমিও যাবো তোমাদের সংগেই, আমি মেঝেতে গিয়েই শোব, কোন বিছানা-পত্রের দরকার নেই। আমরা সবাই একসংগে মজা করে শোব, আচ্ছা?"

—"আমি সব কথা বলে দেবো," জেসন বলেই চলে, "তুমি আমাকে মেরেছো, আমার চোখে ধোঁয়া দিয়ে দিয়েছো।"

বাবা এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। স্যান্সি চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। "বলো ওঁকে," স্যান্সি সূত্র ধরিয়ে দিতে চায়।

—"ক্যাডি এখানে আমাদের টেনে এনেছে বাবা", জেসন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে, "আমি আসতে চাইনি মোটেই।"

বাবা আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্যান্সি তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে।

—"র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ী গিয়ে থাকতে পারোনি?" ধমকের সুরে বললেন বাবা। স্যান্সি তখনো হাঁ করে তাকিয়ে। হাত দু'টো কোলে গোঁজা। "সে তো এখানে নেই", বাবা বললেন, "তুমি বোধ হয় তার আত্মাকেই দেখে থাকবে।"

—"খালের মধ্যে আছে সে," স্যান্সি বললো। "এই কাছের খালটায় সে লুকিয়ে আছে।"

—"বোকা কোথাকার!" বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন এবার। স্যান্সির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, "তুমি ঠিক জানো?"

—"প্রমাণ পেয়েছি আমি," স্যান্সি বললো।

—"কি প্রমাণ?"

—"এইটে পেয়েছি। বাড়ীর ভেতর পড়েছিলো এটা। এটা শুয়োরের হাড়; আলোতে দেখুন এখনো রক্ত-মাংস লেগে আছে। সে বাইরে কোথাও আছে। আপনারা বেরিয়ে গেলেই আমি মারা পড়বো।"

—"কে মারা পড়বে?" ক্যাডি বললো।

—"আমি মিথ্যে কথা বলিনি।" জেসন নিজেকে সত্যবাদী বলে জাহির করতে ব্যস্ত হয়।

—"চুপ করো," বাবা আবার ধমকে ওঠেন।

—"সে এতক্ষণ বাইরেই ছিলো," স্যান্সি বলে, "এই খানিকক্ষণ আগেও জানলা দিয়ে উঁকি মারছিলো, আপনাদের চলে যাবার অপেক্ষা করছে শুধু। আপনারা না থাকলে আমি আর বাঁচবো না।"

—"আমি কি করবো তার?" বাবা বলে ওঠেন, "দরজায় তালা দাও, চলো তোমাকে র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ীতে রেখে আসি।"

—"তাতে কিছুই হবে না।"

—"তাহ'লে কি করতে চাও শুনি?"

—"আমি কি করে বলবো বলুন," স্যান্সি হতাশায় ভেঙে পড়ে, "আমি কিছু ভাবতে পারছি না।"

—"কি বলছো তুমি স্যান্সি?" ক্যাডি মাঝখানেই প্রশ্ন করে।

—"কিছু না," বাবা বললেন।

—"ক্যাডি আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।" জেসন পুনরুক্তি করে আগের কথা।

—"র‍্যাশেল খুড়ীর বাড়ীই চলো বরঞ্চ," বাবা উপদেশ দেন।

—"তাতে কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না," স্যান্সি বললো। আগুনের সামনে বসে মনের আবেগে হাঁটু দু'টো চেপে ধরে বসে থাকে সে।

—"আরে মলো যা", বাবা আরো রেগে যান ওর নির্লিপ্ততা দেখে, "চলো তোমাকে রেখে আসি, আমাদের যে শোবার সময় হয়ে গেলো।"

—"আপনাদের সংগে আমিও যাবো।" নান্সির গলায় অজস্র আকুতি। "না হলে আমি মারা পড়বো। লভলেডীর কাছে আমার কিছু টাকা জমা আছে—"

মিঃ লভলেডী হচ্ছে এক জন নোঙরা যাচ্ছেতাই লোক, নিগ্রোদের ইন্সিওরেন্সের দালাল। প্রতি শনিবার সকালে ১৫ সেণ্ট করে আদায় করার জন্যে তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। হোটেলে সে আর তার স্ত্রী থাকতো। এক দিন সকালে দেখা গেল, স্ত্রীটি আত্মহত্যা করেছে। স্ত্রী মরার পর লভলেডী তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। কিছু দিন থেকে সহরের রাস্তায় আবার তাকে দেখা যাচ্ছে, শনিবারে শনিবারে আবার সে টাকা আদায় করে বেড়াচ্ছে।

জেসনকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাবা আমাদের ডাকলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম দরজা দিয়ে। ন্যান্সি তখনও আগুনের কাছে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে

—"দরজার খিলটা লাগিয়ে দাও ন্যান্সি।" যাবার সময় বাবা বলে গেলেন। তবুও ন্যান্সি এতটুকু নড়লো না, আমাদের দিকে ফিরে তাকালোও না একবার। আমরা এগিয়ে চললাম, তখনও ন্যান্সি দরজাটা খোলা রেখেই বসে আছে।

"বাবা", ক্যাডি জিজ্ঞেস করলো উৎসুক হয়ে, "ন্যান্সি অন্ধকারকে অতো ভয় করে কেন? জুবা ওর কি করবে?"

—"জুবা তো নেই এখানে", জেসন মুরুব্বিয়ানা করে বলে।

—"না", বাবাও বললেন, "সে এখানে নেই, কোথাও চলে গেছে।"

—"তবে যে সে বলছিলো খালের মধ্যে জুবা লুকিয়ে বসে আছে?" ক্যাডি আবার ফ্যাঁকড়া তোলে। আমরা খালটা লক্ষ্য করতে-করতে চলেছি। যেখানটা ঢালু হয়ে আঙুর ক্ষেতের দিকে চলে গেছে, সেখানটা দিয়ে আমরা আবার উঠতে লাগলাম।

—"কে আবার বসে থাকবে খালের মধ্যে?" বাবা জোর দিয়ে বলেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। খালটা আধা অন্ধকার, থমথমে স্তব্ধতা সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। "যদি সে এখানে লুকিয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের দেখতে পাবে বাবা?" ক্যাডি জিজ্ঞেস করে ভয়ে ভয়ে।

—"তুমিই তো আমাকে জোর করে এখানে এনেছো," বাবার কাঁধ থেকে জেসন বলে ওঠে, "আমি তো আসতেই চাইনি।"

খালটা নির্জন, শূন্য। আমরা কোথাও জুবাকে দেখতে পেলাম না। খোলা দরজা দিয়ে ন্যান্সিকেও আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবুও খাল পার হতে হতে তার সেই অস্বাভাবিক শব্দটা কানে আসছে। জেসন বাবার মাথার কাছে চুপটি করে বসে।

খাল পেরিয়ে আমরা ন্যান্সির জীবনবৃত্ত থেকে দূরে সরে এসেছি। এখনো খোলা দরজায় বাতি জ্বেলে সে অপেক্ষা করছে কার। আমাদের মধ্যে ব্যবধান পড়েছে একটা খালের। সাদা মানুষ ক'টি চলেছে এগিয়ে, একটা ধাক্কা খেয়ে কালো মানুষদের সংগে তাদের জীবন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন।

—"কে এখন আমাদের কাপড় কাচবে বাবা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

জটায়ুর আত্মকথা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা জটায়ু পাখী
আমাদের ঝরে পড়া আশা
সীতা বলে মনে হয় তাকে।
অনার্য রাবণ
যাকে নিয়ে পাড়ি দেয় আকাশ-পথেতে
নিঃশব্দে পুষ্পক রথে মেঘের আড়ালে।
তাই যেই আশা ভাঙ্গে
আমরাও ঘুম থেকে উঠি
বিবশ পাখাটা নেড়ে সুরু করি রণ,
প্রবল আঘাত পেয়ে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে তো পালক।
টোপে-টোপে রক্ত পড়ে মাটি আর গাছের পাতা,
যেমন বিকেলে রোদ
নদীটার জল ছুঁয়ে যায়
আর যায় ছুঁয়ে
গাছের আওতা-পড়া স্যাঁতসেঁতে মাটি।
দুর্বল নিস্তেজ ঠোঁটে কামড়ের দাগ
এঁকে দিই ঘৃণিতের দেহে।
তারও শাণ দেওয়া ঝকঝকে উলংগ কৃপাণে
আমাদের দেহগুলো ক্ষতে ভরে ওঠে।
তার পর গতায়ু প্রাণেতে
নেমে এসে ঢলে পড়ি নিঝুম মাটিতে।
বন্দিনী সীতাকে
নিয়ে যায় চোখের আড়ালে
এখানেই শেষ নয়, এর পালা
হয়েছে আরেক [illegible]
আমাদের মৃত্যুর ইশারাতে
নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাবে লক্ষ্মণ-রাম
আমরা জটায়ু পাখী প্রাণ দিয়ে যাই
তোমাদের বুকে-বুকে বেঁচে রব বলে।

—"আমি তো নিগ্রো নই," কাঁধের ওপর থেকে জেসন বলে ওঠে।

—"তুমি নিগ্রোদের চেয়েও অদ্ভুত," ক্যাডি তাকে বলে, "তুমি একটা বাচাল। পাশ থেকে যদি একটা কিছু লাফিয়ে পড়ে তখন বোঝা যাবে তুমি নিগ্রোদের চেয়েও অপদার্থ।"

—"আজ্ঞে না," জেসন প্রতিবাদ তোলে।

—"তুমি খালি কাঁদতেই আছো," ক্যাডি শ্লেষের সংগে বললো।

—"ক্যাডি!" বাবা এবার ধমক দেন।

—"কখনো না," জেসন বকুনী খেয়েও থামে না।

—"ছিঁচকাঁদুনে উল্লুক কোথাকার," ক্যাডিও ঝলসে ওঠে।

—"আঃ!" বাবা আরো বিরক্ত হন।

অনুবাদ: মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

জন-জাগরণের অগ্রদূত বিবেকানন্দ

স্বামী পূর্ণানন্দ

মূর্ছিত ভারত

শত শত শতাব্দী ধরে পশ্চিম ও উত্তর থেকে ছুটে এসেছিল যত নব জাগ্রত, ভোগলুব্ধ, উন্মত্ত মানুষের প্লাবন এই ভারতের প্রশান্ত বুকে। ঐ সব পশুধর্ম্মী হিংস্র মানুষের সহস্র বৎসরব্যাপী অবিরাম আঘাতে ও সর্ব্ববিধ অত্যাচারে জর্জ্জরিত ভারতের [illegible] পড়েছিল সম্বিতহারা বিরাট কুম্ভকর্ণরূপে।

কিন্তু [illegible] মরেনি। পাশবিক অত্যাচারের বিষাক্ত [illegible] গ্রহণ করে ভারতের চিরসহিষ্ণু অন্তর-[illegible] মেঘের মতই কিছু কাল আচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। [illegible] এই ভারত চিরদিনই জগতের সকল জাতিকে [illegible] চরম [illegible] লাভের ইঙ্গিত দান করেছে, শ্রেষ্ঠ [illegible] দিয়েছে।

ভবিষ্যতে [illegible] ভারতকেই সমগ্র মানবের পথের সন্ধান দিতে হবে তারই প্রমাণস্বরূপে নিখিল বিশ্বের ভোগ-বাসনার ধূম্রজাল-কলঙ্কিত আবেষ্টনের মধ্যে এই ভারতে, বিশেষ করে এই বাংলার বুকে, সহসা জ্বলে উঠলো এক মহা শক্তিশালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক ও লাজপৎ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপে।

এই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের কেন্দ্রপতিরূপে ভবিষ্যতের পথে নব চেতনার অরুণরশ্মি বিকীর্ণ করতে প্রদীপ্ত প্রভাত-সূর্য্যের মতই দেখা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এবং বিশ্বমানবতার অভ্রান্ত অগ্রদূতরূপে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব-শিল্পীর [illegible] কোন অজানা কাল হতে অবিরাম চলেছে [illegible] ভাঙ্গাগড়ার খেলা। যে যন্ত্র দিয়ে তিনি জগৎ [illegible] তাঁকেও বিরাট শক্তি নিয়ে ঐ বিশ্ব শিল্পীই [illegible] পাঠিয়ে দেন এই জগতের মাঝে। এ যে [illegible] এরই, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ [illegible] অতীত ও ভবিষ্যতের আভাসপূর্ণ দৈব চিত্রদর্শনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে দিন দেখিয়েছিলেন, সৃষ্টি-রহস্যের শেষ স্তরে অখণ্ডের জ্যোতির্ম্ময় লোক ; সকল জ্ঞানের ও শক্তির আধার সাত জন জ্যোতিদেহধারী বিরাট ঋষিকে। আর দেখেছিলেন, ঐ জ্যোতি-সমুদ্রে জ্যোতির্ম্ময় শিশুর প্রেমমূর্ত্তি। যাঁর অপরূপ হাস্যমধুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানপ্রবুদ্ধ ঋষি—এই জগতে নেমে আসার সহাস মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেও শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হন। এবং ঐ সমাধি অবস্থাতেই চিনতে পারলেন, এই নরেন্দ্রনাথই সেই জ্ঞানপ্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় ঋষি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই সেই—অগ্রবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড রাজ্যের প্রেমময় শিশু।

মুসলমান গর্ব্ব খর্ব্ব করে ইংরেজ সেদিন ভারতের বুকে উড়িয়ে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নব জাগ্রত দুর্ব্বার শক্তির রক্ত পতাকা। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ভারতের নব রাজধানী কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন নাটকের অভিনব রঙ্গমঞ্চ। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সমাজ—ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার জোয়ার ভাটার খরপ্রবাহে সৃষ্ট হয়েছে ভয়াবহ ঘূর্ণি। চারিদিকে জেগে উঠেছে নূতন ও পুরাতনপন্থীর কণ্ঠে কণ্ঠে বর্ণবিদারি তর্ক ও তীব্র গর্জ্জন।

এমনি বিভ্রান্তকারী যবনিকার অন্তরালে, সবার অলক্ষ্যে নেমে এলেন সেই জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানী ঋষি—নরেন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দরূপে। কলিকাতার বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে দেবদুর্লভ শিশু নরেন্দ্রনাথ দেখা দিলেন ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারীর অখ্যাত অজ্ঞাত শুভ দিনে।

স্বপ্নভঙ্গ

বিরাট সম্ভাবনাময় জীবন-প্রবাহ মহৎ হতে মহত্তর পথেই চির প্রবাহিত। নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যের ধূলো খেলাও শেষ হলো অনন্যসাধারণ ভাবের মধ্য দিয়েই। পূজোর খেলায়,—সন্ন্যাসী সাজে—ধ্যান ও উপাসনার খেলায়,—অনন্তের গুণগানে,—মহানন্দময় পবিত্র ক্রীড়া-কোলাহলে,—আশৈশব সংগঠন ও নেতৃত্বের খেলায় ; এবং জ্ঞানার্জ্জনের অপরিসীম ধৈর্য্য ও উৎসাহেই ভেসে গেল তাঁর সেই কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলি। জগৎ-নিয়ামক রাজশক্তির বিজয়-তিলক যাঁর কপালে প্রজ্জ্বলন্ত, বসুন্ধরার সৌভাগ্য-শ্বেতহস্তী সোনার সিংহাসন পিঠে নিয়ে আপনি তাঁকে খুঁজে বেড়ায়!

বিদ্যালয়ে—জ্ঞানার্জ্জনে এত সফলতা, বন্ধু-পরিচিত সমাজে এত যে সমাদর—নেতৃত্ব, ধনী পিতা-মাতার ঘরে এত যে সুখ-সম্ভোগ,—সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্রাহ্ম-মন্দিরের এত যে উপাসনা—আদর্শবাদ, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত স্থায়ী সে আনন্দ কোথায়?—শান্তি কোথায়? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অভাবের জ্বালা যে অন্তরে বেড়েই চলেছে! নরেন্দ্রনাথ স্থির হতে পারেন না। অধীর নরেন্দ্রনাথের কানে যেন থেকে থেকেই ভেসে আসে কোন সুদূর বাঁশরীর এক বিশ্ব-প্লাবী সঙ্গীত,—"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বারি, ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।" কে যেন সদাই তাঁর কানে কানে বলে—"নরেন্দ্রনাথের জীবন সংসারের চলতি সাধারণ জীবন নয়। এ জগতে তাঁকে অনেক বিরাট কর্ম্ম করতে হবে। জগতে স্থায়ী মহা কল্যাণ করবার শক্তি দিয়েই তাঁকে পাঠিয়েছেন বিশ্বদেবতা।"

মহাসিন্ধু ও মহাকাশ

অবিরাম অন্তরের প্রেরণা এবং বাইরের নৈরাশ্য নরেন্দ্রনাথকে করে তুললো অধীর অশান্ত,—আপন গন্ধে অন্ধ কস্তুরী মৃগের মত। এই আবেগভরেই নরেন্দ্রনাথ ছুটে চলেছেন নিয়ত সম্ভব ও অসম্ভবের পানে। খ্যাত ও মহতের সন্ধান পেলেই ছুটে গিয়ে তাঁর ক্ষুধার্ত্ত অন্তর-আধারকে তুলে ধরছেন অমৃতে পূর্ণ করে নেবার আশায়। এমনি করেই সেদিনের বিখ্যাত সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে, ফিরে এলেন ব্যর্থতার আঘাত নিয়ে।

তবুও নিরাশ হলেন না। মধুলুব্ধ অস্থির পতঙ্গের মতই নরেন্দ্রনাথ সন্ধান করতে লাগলেন, কোথায় রয়েছে তাঁর সন্ত-ফোঁটা, বুক-ভরা মধু, সুধাগন্ধামোদি সহস্রদল সেই পদ্ম।

১৮৮১ সালের নভেম্বরের শুভ সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথের আশৈশব আকুল আগ্রহের প্রথম সফলতা লাভ হলো কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে, এক আনন্দ সম্মেলনের ভেতর দিয়ে। সেই দৈব সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবদুর্লভকান্তি নরেন্দ্রের অমর কণ্ঠে "মন চল নিজ নিকেতনে"র সুরে—ভাবে—ও রসের অপূর্ব্ব পরিবেশে, এক নিমেষেই চিনে নিলেন, তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের লীলা-সহচরকে, ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দকে। আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। মুছে গেল তাঁর অন্তর থেকে,—দু'চোখ থেকে, এই পার্থিব জন-সমাবেশের ছবি। দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে, আনন্দাশ্রুপূর্ণ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন, নরেন্দ্রনাথের সামনে এক অভাবনীয় স্তুতি-গাথা ;— "হে ঋষি, হে নররূপী নারায়ণ, আমি জানি, জগৎ-কল্যাণের জন্য তুমি আবার এসেছ এই ধরার ধূলায় !"

বিস্ময়ে সঙ্কোচে হতবাক্ নরেন্দ্র তবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবু যেন তাঁর মনে হোলো,—"পরাণ পুরে গেল, হরষে হোলো ভোর।...প্রভাত হোলো যেই, কী জানি হোলো এ কি। আকাশ পানে চাই, কি জানি কারে দেখি !..."

তবু এই স্তব-স্তুতিতেই সব তো শেষ হবার নয়। এ যে সূচনা মাত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর কথা নিয়ে গেলেন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে যেতেই হবে।

আপনভোলা নরেন্দ্রনাথ ভুলবার চেষ্টা করেও শ্রীরামকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারলেন না। যেতেই হোলো তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে। ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম গভীর হয়ে এলো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ মহাশক্তির স্পর্শে, মহান্ আধার নরেন্দ্রনাথের প্রচণ্ড শক্তিধর অন্তর-দেবতাও ধীরে ধীরে স্বরূপে জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণেশ্বরের এবং যদু মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ ভগবৎ-শক্তির অপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভূতি লাভ করে বিস্ময়ে আনন্দে বিভোর হলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গেই মেনে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর অদৃষ্ট-পরিচালক হৃদয়-দেবতা বলে। আর ঐ মন্দিরের মাকে জানলেন জগতের সর্ব্বশক্তির ও সকল ঘটনার মূল বলে।

কত কাল এই পীড়িত ভারতের তপস্যা-মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ধ্যানগম্ভীর মহাকাশরূপে, গ্রহ-নক্ষত্ররূপী সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর প্রিয়তম চির অশান্ত মহাসিন্ধুরূপী অন্তরঙ্গ নরেন্দ্রনাথের জন্য। প্রমত্ত সিন্ধু সে দৃষ্টি, সে আহ্বান দেখেও দেখেনি,—শুনেও শোনেনি এত দিন। কিন্তু লগ্ন যখন এলো, তখনি চির-দুরন্ত নীল সিন্ধুর আনন্দোদ্বেল বাহুতরঙ্গ প্রসারিত হোলো চির প্রশান্ত মেঘমালাশোভী নিঃসীম নীলিমার কোমল কণ্ঠালিঙ্গনের সপ্রেম আগ্রহে।

প্রদীপ হতে প্রদীপে

১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে এই দু'টি যুগ-প্রবর্ত্তক মহান্ আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হোলো জগতের নব তীর্থ ঐ দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে। দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত নিবাসে আপন সাধন-সঙ্গী করে পরম স্নেহভরে নরেন্দ্রনাথকে সকল সাধন-প্রণালী, এবং আত্মবিকাশের সকল শ্রেষ্ঠ পন্থাই শিখিয়ে দিলেন ; বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু, কোন শ্রেয়ঃলাভের চেষ্টাই কঠোর পরীক্ষা ভিন্ন পরিপূর্ণ সফলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না। নরেন্দ্রনাথের এই গুরু-লাভ ও অপূর্ব্ব সাধন-শিক্ষারও পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হোলো অতি নিষ্ঠুররূপেই।

তখন নরেন্দ্রনাথের বি-এ ডিগ্রি লাভের পাঠ শেষ হয়েছে মাত্র। আকস্মিক পিতৃবিয়োগে এবং দারুণ অর্থাভাবে পরিবারিক ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। কোমলপ্রাণ, আত্মীয়বৎসল, নরেন্দ্রনাথ পরিবার-পরিজনের রক্ষায় অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বার-বার আশাভঙ্গে, অর্থলাভের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ভগবানে বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিল হয়ে এলো। তখন উপায়ান্তর না দেখে পাগলের মতই তিনি ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে গুরুর চরণপ্রান্তে।

গুরুর রহস্যপূর্ণ হাসিমুখের নির্দেশ পেলেন। নরেন্দ্রনাথও মা ভবতারিণীর পায়ে প্রার্থনা করতে গেলেন ইহকালের সুখৈশ্বর্য্য, আকাঙ্ক্ষিত ধনসম্পদ। কিন্তু তিন বারের চেষ্টাতেও আত্মভোলা আজন্ম-বৈরাগী নরেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করে এলেন, "মা, আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও। নিয়ত যাতে তোমার দর্শন পাই, এমনি করে দাও মা।"

এমনি করেই ভোলানাথের ভুল ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝলেন, সংসার তাঁর নয়। সংসারীর পথও তাঁর পথ নয়। তাঁর মহান জীবন একমাত্র মায়ের পূজার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট।

দিন চলে যায়। কারু দিনই এক ভাবে থাকে না। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-লীলার গোণা দিনও ফুরিয়ে এলো। দেহান্তকারী কঠিন ব্যাধি তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তেরা শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে একত্রে প্রাণপণ সেবায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বিদায়ের দিন অতি দ্রুতই ঘনিয়ে এলো।

আর দেরী নেই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন প্রিয়তম নরেন্দ্রকে ডেকে সামনে বসালেন। অন্য সবাইকে সরিয়ে দিলেন ঘর থেকে। কিন্তু কোনো কথাই তোলে না। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, নির্ব্বাক্ শ্রীরামকৃষ্ণের দুই চোখে শুধু উষ্ণ অশ্রুই ঝরে পড়ছে। আর বিদ্যুৎ-শিখার মত এক তীব্র জ্যোতিরেখা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ থেকে নরেন্দ্রনাথের শরীরে প্রবেশ করছে।

নরেন্দ্রনাথও ভয়ে-বিস্ময়ে নিস্পন্দ নীরব। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে সাশ্রু-ভাষায় বলে উঠলেন, "নরেন, আজ তোকে আমার সাধন-সর্ব্বস্ব দান করে ফতুর হলাম। এই শক্তির বলেই জগতে তোকে বিরাট কল্যাণ সাধন ক'রে যেতে হবে। কাজ শেষ হলেই আবার তুই ফিরে যেতে পারবি।"

এমনি করেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-প্রদীপের আগুন দিয়ে নরেন্দ্র-নাথের জীবন-দীপকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ হোলো ১৮৮৬ সালের ১৭ই আগষ্ট।

অনন্তের আহ্বান

গুরুর দেহান্তে, গভীর বিচ্ছেদ-বেদনার আঘাতে ঘনীভূত হয়ে উঠলো বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদের প্রেমের আকর্ষণ। এবং প্রবল হয়ে উঠলো তাঁদের সাধন-প্রচেষ্টা বরাহনগরের অস্থায়ী মঠে। এই সাধনাই যে হবে নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তিভূমি, তা দূরদর্শী বিবেকানন্দ ভাল করেই বুঝে-ছিলেন।

কিন্তু, সমগ্র বিশ্বের দেবতা যাঁকে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন—জগতের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে, নিখিল নর-সমাজের দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিতে, সে কি আপন মুক্তিসাধনার নিভৃত গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারে? তাই ১৮৮৮ খৃঃ সহসা এক দিন এক কৌপিন, উত্তরীয়, দীর্ঘ দণ্ড, ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করে পথের ডাকে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়ালেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ!

সমগ্র উত্তর-ভারত, বোম্বাই প্রদেশ হয়ে কুমারিকা দর্শন করে ছদ্মনামধারী ভ্রাম্যমান বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ালেন মান্দ্রাজের যুব-সমাজের মাঝখানে। আলোয়ার ও ক্ষেত্রীর মহারাজা এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ দিশেহারা হয়ে পড়লো এক নূতন আশায় ও আনন্দে—বিবেকানন্দের দীপ্ত জীবনের সংস্পর্শে এসে। আর নিজের বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম দুঃখ ও দুর্দ্দশার মর্ম্মদাহী অগ্নি-জ্বালা।

সবার শেষে হায়দরাবাদে এসেই তাঁর কানে এলো আমেরিকার ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের কথা। মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ দরিদ্র ভারতের দুঃখে পাগল হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, "আমি যাব আমেরিকা ও য়ুরোপের শক্তিধরদের ঐ মহাসম্মেলনে। আমি তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো এই মহান্ ভারতের দুঃখী মানুষদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য।" বিঘ্ন-বিপদের সকল আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে দুর্দ্দমনীয় বিবেকানন্দ মান্দ্রাজের আলাসিঙ্গা ও ক্ষেত্রীর মহারাজের সহায়তায়, ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে, তাঁর জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলেন, কূলহারা মহাসিন্ধুর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বুকে!

বিশ্ব-বিজয়

সিংহল ছেড়ে, চীন ও জাপানের নবোদিত সৌভাগ্যের আলোয় নয়ন-মন ভরে নিয়ে, দীর্ঘ তিন মাস পরে রিক্তহস্তে চিকাগোর বুকে এসে দাঁড়ালেন অজ্ঞাত কুলশীল, অদ্ভুত বেশধারী 'কৃষ্ণকায়' বিবেকানন্দ!

যে জগন্মাতার স্নেহে সার্থক হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা, যে মায়ের পায়ে সঁপে দিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয়তম বিবেকানন্দকে, সেই মাতৃশক্তিই অলৌকিক রূপে প্রকাশিত হোলো আমেরিকার ও য়ুরোপের নারী-সমাজের ভেতর দিয়ে।

ঐ মাতৃজাতির প্রভাবেই বিবেকানন্দ পেলেন রাজসিক ভোজ্য, সুখের আশ্রয় ও দুর্লভ সৌভাগ্য। ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের দুর্লঙ্ঘ্য দ্বার আপনিই মুক্ত হোলো মহাসহিষ্ণু বীর বিবেকানন্দের সামনে। অবিলম্বে সমগ্র আমেরিকায় বিঘোষিত হোলো বিবেকানন্দের বিজয়বার্ত্তা। 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে' প্রচারিত হোলো—"নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বিবেকানন্দই মহাসম্মেলনের শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে, মহাজ্ঞানী ভারতীয়দের কাছে এ দেশ থেকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠানো কি মূর্খতা!" ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেই মহা বিজয়েরই প্রতিধ্বনি উঠলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমত্ত ইংরেজের রাজধানী ইংলণ্ডে।

জয়মাল্য

আমেরিকায় ও য়ুরোপে বেদান্তের উদার ও মহান ধর্ম্মমত প্রচার করে; সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ে এক বিরাট বিশ্ব-মানবতার সম্ভাবনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করে; ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে আমেরিকা ও য়ুরোপের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে; রাজযোগ—জ্ঞানযোগ—কর্ম্মযোগ ও দৈববাণীর প্রচারের ফলে অগণিত গুণগ্রাহী আমেরিকাবাসী ও ইংলণ্ডীয় বন্ধু, হিতৈষী ও ভক্তের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও শুভেচ্ছা নিয়ে; শ্রীমতী ক্রিশ্চিনা, সেভিয়ার দম্পতি, শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড, শ্রীযুক্ত গুড্উইন্ ও ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির মত এক দল দেবচরিত্র সাধক কর্ম্মযোগী সঙ্গে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন আবার এই ভারতের বুকে বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মতই, ১৮৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ঘরে ফেরার এই মহা আনন্দবার্ত্তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। সিংহল থেকে হিমাচল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো তাঁর জয়গানে। সমগ্র ভারতের নব আশা ও আনন্দ-চঞ্চল জাগ্রত জাতির অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি তাঁর কণ্ঠকে শোভিত, ভারাক্রান্ত করে তুললো। বৈদান্তিক-কেশরী বিবেকানন্দ অভিনব জাতীয় চেতনাময় অগ্নিমন্ত্রে উন্মত্ত করে তুললেন সমগ্র ভারতকে। "ভারতে বিবেকানন্দ" বা "Colombo to Almora" গ্রন্থ আজিও সেই অভূতপূর্ব্ব বিজয়োৎসবের উজ্জ্বল ইতিহাসকেই বহন করছে।

বিদায়ের অশ্রুলেখা

বিজয়োৎসব শেষ হতে-না-হতেই আবার বিবেকানন্দের অবিরাম কর্ম্ম-প্রবাহ ছুটে চললো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে ভারতকে নতুন করে গড়ে তোলার দুর্দ্দমনীয় আশায়। ১৮৯৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন, এবং ১৮৯৮ খৃঃ বর্ত্তমানের এই বিশাল বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হোলো। সঙ্গে সঙ্গে খোলা হোল নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হোলো উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত, ও বেদান্ত-কেশরী প্রভৃতি মাসিকপত্র।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের অবিরাম কর্ম্মক্লান্তি, উপযুক্ত আহার-নিদ্রার অভাব ও দারুণ মানসিক ক্লেশ, ঐ অত্যুজ্জ্বল বিরাট হৈমশৃঙ্গতুল্য জীবনকেও ঊনচল্লিশ বৎসরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। কোন চিকিৎসায় বা দেশভ্রমণেই ঐ নিঃশেষিত জীবন-প্রদীপ আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না। নির্ব্বাণের সকল চিহ্নই অতি দ্রুত দেখা দিল। বিবেকানন্দ স্পষ্টই বুঝলেন, পারে যাবার আর দেরী নেই।

তাঁর রুগ্ন কাতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো বিদায়-বেলার সেই অশ্রুমাখা বাণী,—"যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বুকে ক'রে যেখানে আমায় নিয়ে চলেছ, সেই শব্দহীন, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব রাজ্যে......আমি যাব...।"

আর ভারতের যুব-সমাজের হাতে দিয়ে গেলেন তাঁর বুকের অগ্নি-অক্ষরে লেখা দান-পত্র,—"হে তরুণগণ, তোমাদের কাছে আমি উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞ, অসহায়, নিপীড়িত ভারতের জন্য আমার প্রাণের জ্বালা।"

তার পর, ১৯০২ খৃঃ ৪ জুলাই, ভারতের নব জাগ্রত, আনন্দ-মুখর অঙ্গনে নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে নির্ব্বাপিত হোলো ঐ অতুলনীয় রত্নদীপ। সে অন্ধকারে শুধু জেগে রইল ধ্রুবতারার মত—এক—অভিনব বেদবাণী—

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা

জীবনানন্দ দাশ

খুব ভালোবেসে যে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলাম এক দিন তা বলতে পারব না, শিক্ষকতায় লিপ্ত হয়ে থাকতে যে খুব ভালো লেগেছিল তাও নয়। তবে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে কি করব কোন্ কাজ নেব স্থির করতে করতে অনুভব করেছিলাম শিক্ষকতার—কলেজের মাষ্টারীর দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। যেই সুযোগ এল—সুযোগ সেদিন বেশ খানিকটা তাড়াতাড়িই পাওয়া গিয়েছিল—কলকাতার একটি প্রাইভেট কলেজে খুব কম মাইনেতে—আজকাল পে-কমিশন নিয়ে সরকারী অফিসের দপ্তরীরা যা পায় তার চেয়ে কম পারিশ্রমিকে—চাকরী নিয়েছিলাম। তবে তখনকার দিনে টাকার কেনা-কাটার শক্তি আজকের চেয়ে বেশী ছিল। তার পর কয়েকটা প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছি। ইস্কুলের মাষ্টাররা তো নিশ্চয়ই—বাংলা দেশের অধিকাংশ বেসরকারী কলেজের বেশীর ভাগ অধ্যাপকেরাই যা মাইনে পায় তাতে মনে হয়, আমাদের দেশের পরিচালকদের কোনো আস্থা ও শ্রদ্ধা নেই শিক্ষার ও শিক্ষকদের ওপর। অনেক বেসরকারী কলেজের শিক্ষকেরা মোটামুটি গভর্ণমেণ্ট অফিসের লোয়ার ডিভিসনের কেরাণীদের মত মাইনে পায় কিংবা তার চেয়েও কম। তবে গভর্ণমেণ্টের কেরাণীদের মাইনের একটা গ্রেড বাঁধা হার ঠিক করা আছে, প্রোমোশনের পথ আছে, চাকরীর নিশ্চয়তা আছে, পেনসন আছে; প্রায় কোনো প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদেরই এ-সব কোনো সুবিধা নেই। গভর্ণমেণ্টের আপার ডিভিশনের কেরাণীদের অবস্থা প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের চেয়ে ঢের ভালো—অধিকাংশ কমার্শ্যাল ফার্মের কেরাণীদের একটা বিশেষ বড় সংখ্যার অবস্থা কলেজের প্রফেসরদের চেয়ে সচ্ছল, এবং ক্ষুদ্র অপর একটি শ্রেণীর সংস্থান প্রফেসরদের চেয়ে অনেক ভালো। প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের দশা প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ—উপরোক্ত কেরাণীদের চেয়ে বেশী খারাপ।

আমি কেরাণীদের সঙ্গে প্রফেসরদের তুলনা করলাম এই জন্যে যে, আমাদের দেশে অনেকেরই মনে একটা ধারণা আছে, তথাকথিত ভদ্রসাধারণদের ভেতর কেরাণীরাই সব চেয়ে বেশী আর্থিক অবিচার সহ্য করে আসছে—বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিক্ থেকে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। গভর্ণমেণ্টের ও ধনিক অফিসগুলোর ওপরের—এমন কি মাঝামাঝি দিকের কেরাণীরা যে ধরণের মাইনে, বোনাস ও অন্য দু'-চার রকম সুবিধে পায়, বাঁধা-ধরা পথে তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতির যত বেশী সহজ সুযোগ ও সুবিধে রয়ে গেছে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের তা নেই। গভর্ণমেণ্টের ও ভালো এমন কি, কোনো কোনো চলনসই কমার্শ্যাল অফিসগুলোতেও কেরাণীদের মাইনের একটা গ্রেড রয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্তও প্রায় কোনো প্রাইভেট কলেজেই প্রফেসরদের মাইনের বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া গ্রেড ছিল না; এক-এক জন প্রফেসর একই মাইনেতে পাঁচ-সাত-আট-দশ বছর—হয়তো আরো বেশী সময় কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একই কলেজের অন্য দু'-চার-পাঁচ জন প্রফেসরের মাইনে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো কিছু কিছু বেড়েছে। কাজেই গ্রেড বলে কোনো জিনিষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। কোনো প্রতিষ্ঠানের একই শ্রেণীর চাকুরেদের—ধরা যাক ফোরম্যানদের মাইনের যদি একটা গ্রেড ঠিক করা থাকে তাহ'লে কোনো কোনো ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে সে গ্রেড আট-দশ বছরেও কাজ করবে না, বাকী দু'-চার জনের বেলায় দু'-এক বছর অন্তর চালু হতে থাকবে—কোনো ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানে এ রকম নিয়ম আছে কি না জানি না। কোনো ফ্যাক্টরি কি মনে করে এই চারটে ফোরম্যান প্লাম্বারের মত, আর ঐ চারটে ফোরম্যানের মত, অতএব এদের মাইনের বেলা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাক,—কারু কারু জন্যে একটা আবছায়া গ্রেড থাকুক ফ্যাক্টরির কর্ত্তাদের খুশী মতো, আর অন্যদের জন্যে কোনো গ্রেডেরই দরকার নেই—একই বেতনে আট-দশ—বেশী বছর তাদের আটকে রাখা হোক? কোনো ফ্যাক্টরিতে কি এ রকম অব্যবস্থা চলে কিংবা সরকারী বা ভালো সদাগরী অফিসের কেরাণীদের ব্যাপারে? না, তা চলে না। কিন্তু প্রাইভেট কলেজে এ রকম অনিয়ম চলেছে। এর জন্যে কাকে দায়ী করা যাবে সেইটেই ভাববার কথা। ইংরেজদের নিজেদের দেশে ইস্কুল-কলেজের মাষ্টারদের বেলা এ রকম অনাচার ঘটে বলে মনে হয় না, আমাদের চেয়ে ওদের পরিচালনা সহানুভূতি, সুনিয়ন্ত্রণ ও শ্রদ্ধা—এমন কি ইস্কুল-কলেজের ব্যাপারেও ঢের বেশী সক্রিয়, সফল। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিক্ষকদের ব্যাপার নিয়ে বৃটিশরা মাথা ঘামায়নি, আমাদের দেশে নিজের লোকেরাই যা করবার নিজেদের রুচি ও শক্তি অনুসারে করেছে। আমাদের দেশের প্রাইভেট কলেজের শিক্ষকদের মাইনে, গ্রেডের অভাব, কিংবা যে যে কলেজে গ্রেড আছে সেখানে সেগুলোর অদ্ভুত প্রয়োগ—আমাদের নিজেদেরই দুর্ব্বলতার প্রমাণ, অধ্যাপকেরা চোখ বুজে শিক্ষা দেওয়া জিনিষটাকে টাকাকড়ির সঙ্গে জড়িত করতে না চেয়ে (এ অপলক অন্তঃপ্রেরণা শুকিয়ে এসেছে প্রায়) অধ্যাপনার ও অধ্যয়নের খানিকটা কম-বেশী স্বপ্নসরল আত্মরতির ভেতর নিমগ্ন থেকে দেশের কর্ত্তাদের এই বিমুখতা অনেক দিন থেকে ক্ষমা করে এসেছে। কিন্তু টাকার মূল্য এমন দুঃসহ ভাবে কমে গেছে যে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কলেজ-ইস্কুলের মাষ্টারও সজাগ না হয়ে পারছে না।

আজকের এ লেখায় আমি প্রাইভেট কলেজের মাষ্টারদের সম্বন্ধেই বলছি; বলা বাহুল্য, প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের অবস্থা এ সব প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ। দু'-একটি কলেজ ছাড়া খুব সম্ভব কোনো প্রাইভেট কলেজেই প্রফেসরদের মাইনের কোনো গ্রেড ছিল না। যেখানে ছিল সেখানেও সে জিনিষ কি রকম অশুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলেছি। আজকাল অবিশ্যি কোনো কোনো প্রাইভেট কলেজে প্রফেসরদের মাইনের একটা মাপ-জোঁক ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চালের মণ যখন চার পাঁচ টাকা ছিল, এক জোড়া জুতার দাম চার-পাঁচ টাকা, দু'-তিন টাকায় এক জোড়া ধুতি পাওয়া যেত—তখনই সত্তর-আশি টাকা থেকে সুরু করে প্রফেসরদের মাইনের উচ্চতম বৃদ্ধি—দেড়শো, একশো পঁচাত্তর টাকা অত্যন্ত নিদারুণ ভাবে আপত্তিজনক ছিল, কিন্তু আজকালকার ত্রিশ-চল্লিশ টাকার চালের বাজারেও দেখছি যাদের গ্রেডের ব্যবস্থা আছে সে সব অধিকাংশ প্রাইভেট কলেজেই সেই কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার মাইনের কোনো উনিশ-বিশ নেই।

প্রফেসররা কি খাচ্ছে তাহ'লে ? কি পরছে ? সবাই গ্রেডও পাচ্ছে না ; সব কলেজে গ্রেড নেই ; যারা গ্রেড পাচ্ছে তাদের অবস্থাও এ রকম। কলেজের গভর্ণিং বডিগুলোর উকীলরা হাজার-বারোশো টাকা (কেউ কেউ আরো বেশী, হাইকোর্টের উকিল, জজের বরাদ্দ) মাসে মাসে পেলেও কলেজের প্রফেসরকে যে গোড়াতে একশো টাকার বেশী বেতন দেওয়া যেতে পারে না এবং চুল সাদা হয়ে গেলে মরবার আগে একশো পঁচাত্তর বড় জোর দু'শো দেওয়া চলে—এ সম্বন্ধে তাঁদের বিবেক এত পরিচ্ছন্ন যে, সত্যিই তাঁদের কোন দোষ দেয়া যায় না। মনের অগোচরে কোনো পাপ নেই—তাদের মসৃণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে সম্বন্ধে ভুল বুঝবার কোনো সম্ভাবনা নেই। একশো টাকায় আকচার প্রফেসর নিযুক্ত হচ্ছে—এই উনিশশো আটচল্লিশেও কয়েক দিন আগে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম—ইকনমিক্স্ ইত্যাদির জন্যে ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ চাওয়া হচ্ছে, অধ্যাপক হিসেবে কিছু অভিজ্ঞতাও থাকা চাই, মাইনে—একশো টাকা, খুব সম্ভব বছরে কি দু'বছরে পাঁচ টাকা বাড়বে (পরিষ্কার নির্দ্ধারণ নেই) ;—দেড়শো টাকায় এফিশ্যেন্সি বার। কোনো বিশুদ্ধ শিক্ষক ছাড়া এরকম প্রলোভনে ইকনমিক্সের কোনো ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ ভুলবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তবুও না ভুললে প্রফেসর-মৃগয়ার এ রকম বা এর চেয়েও খারাপ বিজ্ঞাপন আজো চার দিক্ থেকে নিরবচ্ছিন্ন বর্ষিত হচ্ছে কেন ? সেদিন কলকাতার একটা বড় কলেজে কয়েক জন প্রফেসরের দরকার হয়ে পড়েছিল ; মাইনে কি রকম দেওয়া হবে বিজ্ঞাপনে সেটা জানানো হয়নি। প্রায়ই জানানো হয় না, কখনো কখনো আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হয় সে ন্যূনতম কত নিতে রাজী আছে (মাছের বাজারে অবিশ্যি চার টাকা সাড়ে চার টাকা সের বেঁধে দেওয়া আছে, কোনো উকীল বা জষ্টিসও সেটাকে ন্যূনতম করতে পারেনি), কিংবা বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রফেসরকে (নিযুক্ত করা হলে) গুণ অনুসারে মাইনে দেওয়া হবে (গুণ খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ক্লাস ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা, আরো কিছু আছে)। শুনেছি, কলকাতার সেই বড় কলেজে সম্প্রতি এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ, বয়স পঞ্চাশ আন্দাজ, ইতিপূর্ব্বে বাংলার বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছিলেন—মাইনে সাড়ে চারশো টাকা হয়েছিল, কিন্তু সে জায়গা পাকিস্থানের এলেকায় চলে যাওয়ায় তিনি কলকাতার কলেজে কাজ নিলেন। এই অধ্যাপককে ১৩৫৲ টাকা মাইনেতে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিযুক্ত করেছে অবিশ্যি গভর্ণিং বডি, নিযুক্ত হয়েছেন প্রফেসর নিজে। কেন নিযুক্ত হতে গেলেন ? অসহায় শিক্ষক, অন্য কোনো উপায় নেই বলে ?

কলেজের শিক্ষকরা কি করে এতদূর অসহায় হল ? তাদের নিজেদের দোষ কতখানি ? তাদের টিচার্স এসোসিয়েশন আছে, কিন্তু সেখানে কি হয় সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ পরিষ্কার ধারণা নেই, হয়তো অনেক ভালো কাজ হয়। আশা করি, শিক্ষকদের এদিককার ক্রমায়াত নিষ্ফলতা শেষ করে দেবার মত কোনো সৎ সফল উপায় স্থির করছেন তাঁরা। কলকতার বড় কলেজে ভদ্রলোকটি একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় প্রফেসরি পেলেন। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস—পঁচিশ ত্রিশ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। কলকাতার অন্য কোনো প্রাইভেট কলেজে একশো পঁয়ত্রিশের চেয়ে বেশী পেতে পারতেন হয়তো—অন্ততঃ দেড়শো পেতেন আশা করা যায়। কিন্তু দেড়শো-একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তো এক জন মুটেও পায় আজকাল। ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ, ফেল, হুঁশিয়ার ছেলেরা কলকাতায় দু'-চার বছর ঘুরে একটু জমিয়ে নিতে পারলে তিনশো-চারশো টাকার সংসার অবলীলায় চালিয়ে নেয়। কিন্তু ও-রকম সব আব-ছাওয়ার পথে প্রফেসর যাবেন না বলে তাঁকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে বুঝ দেবার রকমটা সমাজের কোনো শুভানুধ্যায়ীর কাছেই খুব straight বলে মনে হবে না।

ইউনিভার্সিটির থেকে বছর বছর যে সব আনকোরা ফার্ষ্ট ক্লাস বেরিয়ে আসে তারা অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞ হলে একশো-সোয়াশো টাকায় (কলেজে) নিযুক্ত হচ্ছে ; আরো বেশী অভিজ্ঞতা থাকলে আরো একটু বেশী মাইনেতে সুরু করতে দেওয়া হয়—মাইনে বাড়তে বাড়তে একশো পঁচাত্তর, দু'শো কি দু'শো পঁচিশ কিংবা কোনো লক্ষীমন্ত কলেজে আড়াইশো অবধি হতে পারে। কিন্তু মাইনে বাড়বে কি ধারায় ? হয়তো বছরে পাঁচ টাকা কিংবা দু'বছর অন্তর দশ টাকা হিসেবে। ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ না হলে আজকাল কলেজে মাষ্টারী পাওয়া কঠিন। ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ হলেও ওপরে যা বিবৃত করেছি, প্রাইভেট কলেজের সে সব বাঁধা-ধরা মাইনের চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ হলেই যে সেকেণ্ড ক্লাসের চেয়ে বেশী বিদ্বান বা কুশলী শিক্ষক হতে পারে আমি তা' বিশ্বাস করি না। আমি নিজে কয়েকটি কলেজে অনেক রকম অধ্যাপকের কাছে পড়েছি। সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রির ভালো শিক্ষকরা ফার্ষ্ট ক্লাস ডিগ্রিওলা ভালো শিক্ষকদের চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ নন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ তো অনেক ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়েই ভালো পড়াতেন, এবং এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অধ্যাপক ঘোষ একা ছিলেন না, অন্য কলেজেও এ জিনিষের রকম-ফের দেখেছি। ইউনিভার্সিটিতে যে রকম ধরণের পরীক্ষা প্রচলিত আছে এবং পরীক্ষকেরা যে নিয়মে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ধার্য্য করেন তাতে স্মৃতিশক্তি—ফলিত স্মৃতিশক্তির ওপরই জোর দেওয়া হয় বেশী—শুদ্ধ চেতনা ও সৃজনী শক্তিকে কোণঠাসা করে। প্রায়ই ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি সাহিত্যের ফার্ষ্ট ক্লাস এম-একে উত্তর-জীবনে সাহিত্যস্রষ্টা এমন কি সৎসাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও কোথাও দেখা যায় না ; দরকারী নোট দিয়ে ভালো প্রফেসর হিসাবে গণ্য হবার শক্তি বা ইচ্ছা ছাড়া রচনা বা আলোচনার দিক্ দিয়ে সাহিত্যে কোনো গভীরতর অন্তঃপ্রবেশের নিদর্শন পাওয়া যায় না তাঁদের জীবনে। সে যা হোক, তাঁরা সাহিত্যের অধ্যাপক (সাহিত্যিক নন), ধান ভানতে শিবের গান না গেয়ে তাঁরা মাষ্টারী করেন এবং আমাদের কলেজগুলোর রুচি ও চাহিদা অনুসারে খুব সম্ভব ভালো মাষ্টারীই করেন। ভালো মাষ্টারী করবার শক্তি থাকলেও সেকেণ্ড ক্লাস এম-এর পক্ষে আজকাল কলেজে কাজ পাওয়া শক্ত। নিতান্ত কপালের জোরে কলেজে প্রফেসরি পেলেও মাইনের দিক দিয়ে তার অবস্থা ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এর চেয়ে খারাপ। সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ সত্তর-আশি টাকা মাইনেতেও কলেজে ঢোকে—তার চেয়ে কমেও ; টাকা-কড়ি ও পদমর্য্যাদার দিক্ দিয়ে সে ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়ে বিপন্ন। ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়ে ভালো পড়াতে পারলেও

সেটা স্বীকৃত হতে চায় না, বেশী অভিজ্ঞতা থাকলেও তাকে ডিঙিয়ে নতুন ফার্ষ্ট ক্লাসকে উঁচু পদ ও বেশী মাইনে দেওয়া হয়; কলকাতার চেয়ে এ জিনিস মফঃস্বলেই হয়তো বেশী চলে। এ ছাড়া উপায়ও নেই হয়তো? ইউনিভার্সিটি নিজে ঠিক করে দিয়েছে কে কোন্ ক্লাস। সেটা তাদের কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে ঠিক হয়ে গেছে। এর পর সমস্ত জীবন ভরে আর কোনো ক্রমবিকাশ নেই? মানুষ আঠারো-কুড়ি বছর পর্য্যন্ত বাড়ে, তার পর আর কোনো বাড় নেই শরীরের, মনের বেলাও সেইটেই ঠিক? টাকা-কড়ি পদমর্যাদা ইত্যাদি সব কিছুর দিক দিয়ে কোনো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এরই আজকাল আর কলেজে কাজের চেষ্টা করা উচিত নয়। ক্বচিৎ সে কাজ সে পাবে। আত্মীয়তা বন্ধুতার সূত্রে কিংবা বিশেষ খোসামুদি করে পেতে হবে—পাওয়ার পর শেষ দিন পর্য্যন্ত খোসামুদি করতে হবে। এটা কোনো দিক্ দিয়েই ভালো নয়। কিন্তু খোসামুদি করেও সাংসারিক সুবিধা বড় একটা পাওয়া যাবে না, ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এদেরই অবস্থা খারাপ, সেকেণ্ড ক্লাস প্রফেসরের আরো খারাপ। পাকিস্থানের কোনো কলেজে কুড়ি-পঁচিশ বছর কাজ করলেও কলকাতার কলেজে কাজ খালি হলে অল্প-বেশী পুরোনো বা আনকোরা ফার্ষ্ট ক্লাস নেওয়া হয়—অভিজ্ঞ সেকেণ্ড ক্লাসকে না নিয়ে। খুব ভালো অভিজ্ঞ সেকেণ্ড ক্লাসও নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত—কলকাতার বা উপকণ্ঠের কলেজী চাকরীর বাজারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করতে ভালো না লাগলেও কোনো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এরই এখন আর কলেজে কাজ নেওয়া উচিত নয়। অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকলেও—গভর্ণমেণ্টের কলেজ বা প্রাইভেট কলেজগুলো সত্যিই তাকে চায় না—যদি না সে খিড়কী দিয়ে ঢুকতে পারে। সেটা খুব নিন্দিত পথ—যে মানুষ অধ্যাপক হতে যাচ্ছে তার পক্ষে। ও-সব পথ তার নয়। যে সব সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রিওলা প্রফেসর কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু এখন বাস্তভিটা থেকে ছিটকে পড়ে নিশ্চয়তা ও ছন্দ হারিয়ে পশ্চিম বাংলার পথে-ঘাটে ফিরছেন—কোনো কলেজে স্থান পাচ্ছেন না, তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত কি করবেন ভাবনার বিষয়।

পনেরো-কুড়ি বছর আগে আমরা মাইনের জন্যে গ্রাহ্য করতাম না বড় একটা, কলেজে কাজ পেলেই হত, মাইনে নিয়ে যে অবিচার হচ্ছে মাঝে মাঝে সেটা হৃদয়ঙ্গম হলেও সে সম্বন্ধে কোনো ভালো ব্যবস্থার আশা ও চেষ্টা করা ভারতকে স্বাধীন করার চেয়েও কঠিন মনে হত। কে মাইনে বাড়িয়ে দেবে? যতটা অন্ততঃ সুবিচার সম্ভব সেই অনুপাতে মাইনের হার কে ঠিক করে দেবে? কোনো এক জনের বা এক পক্ষের কাজে বিশেষ কিছু হত না—সকলের সম্মিলিত শুভার্থী চেষ্টায় সুফল পাওয়া যেত খুব সম্ভব। কিন্তু কোন দিক্ দিয়েই চেষ্টা হয়নি, বড় একটা চেষ্টা করবার যে ইচ্ছা আছে তাও এক-আধটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও যে দেখেছি বা অনুভব করেছি তা মনে পড়ছে না। আর্থিক দিক্ দিয়ে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরেরা কলেজগুলোর সেই সূত্রপাতের দিন থেকেই এ রকম অবহেলিত হয়ে আসছে। যে কারণেই হোক না কেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন দিনও প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের দিকে ফিরে তাকায়নি। ফিরে যে তাকায়নি—শিক্ষার সৎ সংগঠন ও বিস্তারের জন্যে এবং কলেজের প্রফেসরদেরও রাষ্ট্রের অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যে বৃটিশদের ভেতরে যে কঠিন বিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নেই, এ নিয়ে (যারা মাষ্টার নয়) দেশের সব শিক্ষিত ও স্বচ্ছল সাধারণ মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বলে জানা নেই। যত দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে রাজ্য সাম্রাজ্যের কাজ ক'রে গেছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ সব ছেড়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবার একমাত্র ব্রত নিয়ে যে ব্যাপৃত রয়েছিলেন এ কথা বলতে পারা যায় না। তাঁরা গভর্ণমেণ্টের সব রকম প্রতিষ্ঠানে বড় বড় কাজ করেছেন—ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করেছেন—আইন-সভায় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন, বেআইন বাতিলের চেষ্টা করেছেন, মন্ত্রিত্ব করেছেন, বৃটিশকে পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক কাজই করেছেন, সব কিছুতেই সফল হননি বটে, কিন্তু নানা রকম ব্যাপারে অল্প-বিস্তর সফলতা পেয়েছেন। কিন্তু ইস্কুলের মাষ্টারদের হয়ে তাঁরা কোনো দিন আপ্রাণ লড়েছেন বলে জানি না। প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের সাংসারিক অসচ্ছলতার নমুনা অহরহ চোখে পড়েছে তাঁদের, টাকা-কড়ির অভাবে কলেজের শিক্ষকদের সামাজিক মর্য্যাদাও যেখানে-সেখানে ক্ষয়িত খণ্ডিত হতে দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু দেশের প্রাইভেট কলেজগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সে সব কলেজের শিক্ষকদের বেতন একটা সুমাত্রায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার একান্ত চেষ্টা কোনো দিনই তাঁরা করেননি। করলেই যে তৎক্ষণাৎ অনেকখানি সফলতা পাওয়া যেত তা নয়, কিন্তু চেষ্টা করলেই আমাদের এ সব কল্যাণকৃৎ দেশবাসীরা স্বচ্ছ বিবেকে আমাদের বলতে পারতেন যে, তাঁদের নিজেদের কোনো ত্রুটি বা উদাসীনতা ছিল না—তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন খুব ব্যাপক ভাবে, অনেক দিন ধরে—কিন্তু ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না বলে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না তাঁরা। আমাদের সে সব কথিত কর্ম্মী শুভার্থী দেশবাসীরা অনেকেই আজ মৃত, কিন্তু তাঁদের উত্তরবর্ত্তীদের হাতে তাঁদের সেই ঐতিহ্য তো খাসা চলছে দেখছি। ইংরেজরা এদেশে থাকতে সত্তর-আশি টাকা থেকে সুরু করে উচ্চতম দেড়শো-দু'শোর ভেতরে প্রাইভেট কলেজের এক-এক জন প্রফেসরের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা গভর্ণমেণ্টের বা ভালো কমার্শ্যাল ফার্মের অফিসারদের সঙ্গে প্রফেসরের বেতনের কোনো তুলনা চলেনি, চলেছে কেরাণীদের সঙ্গে—লোয়ার ডিভিশনের কিংবা সাদাসিদে মার্কেনটাইল ফার্মের। তুলনায় সরকারী লোয়ার ডিভিশনের কেরাণীরা জিতেছে, তাদের পেনসন আছে, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, তারা আপার ডিভিশনে চলে যেতে পারে, কোনো ইচ্ছাময় ম্যানেজিং কমিটির রুচি-অরুচি সহ্য করতে হয় না তাদের, তাদের চাকরীর নিশ্চয়তা আছে, গুণ, অধ্যবসায় থাকলে গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম ডিপার্টমেণ্টে উঠে যেতে বাধা নেই তাদের, ত্রিশ টাকা বেতনে সুরু করে তিন হাজার টাকায় পৌঁছুনো অসম্ভব ছিল না সে সব জায়গায়, কিন্তু সাহিত্য ইকনমিকস্ বিজ্ঞান দর্শন পড়িয়ে চুল পেকে গেলেও প্রফেসরকে দেড়শো-দু'শো টাকার বেশী কিছু মঞ্জুর করবে বৃটিশ আমলে আমাদের দেশী উকীল ব্যারিষ্টার জজ অফিসার মন্ত্রী—কেউই এ রকম অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাববার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা কলেজের ম্যানেজিং কমিটি (গভর্ণিং বডি) চালিয়েছেন—আইন পরিষদ,

হাইকোর্ট, মন্ত্রিসভা, চেম্বার অব কমার্স'ও। আরো কত কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন, তদারক করেছেন, সুপারিশ করেছেন, প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদেরও মাঝে মাঝে বলেছেন: টাকা দিয়ে কি করবেন? আপনারা প্রফেসর—এই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের জিনিষ।

ফলে অধ্যাপকেরা টাকাও পাননি, সম্মানও পাননি। টাকা ছাড়া এদেশে সম্মান পাওয়া যায় না। বিদ্যার জন্যে যাদের কাছে অকৃত্রিম মর্য্যাদা পাওয়া যেত এক সময়, তারাও কৃত্রিম হয়ে উঠছে। টাকা-কড়ি বা বিদ্যা কোনো কিছুর জন্যেই কোনো রকম রবাহূত সম্মান প্রফেসরের কাম্যও নয়। সম্মান নয়—অধ্যাপনা বিশেষ করে অধ্যয়নের ভেতর আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে তার সচ্ছল বিলাসের কোণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশুদ্ধ ও তাৎপর্য্য-গভীর করবার যে পথ খুঁজে পাওয়া যায়—অধ্যাপক যতই তার নিজের পরিধির ভেতর সনির্ব্বন্ধ হতে থাকবে—এ পথ ততই তার কাছে সৎ মনে হবে—নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। আমি বলতে চাই না যে, শুধু বই পড়ে মানুষের সব রকম বিকাশ বা কোনো রকম মহৎ বিকাশই পুরোপুরি সম্ভব হয়, কিন্তু আমাদের রুচি অনুভূতির সুপরিণতির পথে বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করার একটা বিশেষ মূল্য আছে—সচেতন মন নিয়ে মানুষের সমাজে অনেকখানি মেলামেশার যেমন একটা বিশ্রুত মূল্য আছে। অধ্যাপকের জীবনে বেছে বই পড়বার এবং হয়তো কিছু লিখবার এই যে প্রেরণা ও পদ্ধতি তৈরি হতে থাকে—যা ক্রমে অধ্যাপকীয় স্বভাবে পরিণত হয় তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে—সম্মান নয়—এই জিনিসটাই তার অল্প বেতনের বিসদৃশ সংসারে তার নিজের সুশৃঙ্খল পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমি জানি, আমাদের বাংলা দেশে অন্ততঃ অনেক কলেজের অনেক অধ্যাপকই পড়াশুনো করতে চান না—বাকী অনেকে পড়তে ইচ্ছুক, কিন্তু সুযোগ পান না। মফঃস্বলে ভালো লাইব্রেরী নেই—সুযোগ সুবিধা কম; কিন্তু যেটুকু আছে তাও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয় না। কলকাতায় সুযোগ আছে, খুব বেশী যে কাজে লাগানো হয় মনে হয় না। সে যা হোক, যে কোনো নিজের কাজে তৃপ্ত অধ্যাপককে বই, পত্র, পত্রিকা, জর্ণাল ইত্যাদির জন্যে কৌতূহলী হয়ে থাকতে হয়, পৃথিবীর পুরোনো বইগুলোর মর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়, নতুন বইয়ের খোঁজ রাখতে হয়—যত দূর সম্ভব শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ে দেখতে হয়—কেউ তাকে কাণে টানছে বলে নয়—ভালোবাসার তাগিদে। সত্যিই জ্ঞানকে সে ভালোবাসে, কিন্তু অনেক তথাকথিত অধ্যাপকই নিজের কাজে তৃপ্ত নয় আজকাল আর, সুযোগ পেলেই অন্য পথে চলে যাচ্ছে—বেশী টাকার কাজে; যাদের শক্তি সুযোগে কুলিয়ে উঠছে না তারা মুষড়ে পড়ছে যেন, প্রাইভেট কলেজে দিনগত পাপক্ষয় করছে এই রকম তাদের ভাব। কিন্তু যে কোনো নিজের কাজে সমাহিত অধ্যাপককে ভাঙিয়ে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া কঠিন—টাকার প্রলোভনেও তিনি অধ্যাপনা অধ্যয়ন ছেড়ে অন্য কোনো 'বড়' চাকরীতে যাবেন না। এঁদেরই নাম শিক্ষক। বাংলা দেশে এক সময় এ রকম সুধী আত্মস্থ শিক্ষকের বেশ সুসমাবেশ ছিল, দিনের পর দিন তা কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক হিসেবে সমাজের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য সম্মান আমাদের দেশের প্রাইভেট কলেজের বেশির ভাগ প্রফেসরই কোনো দিন পাননি। এ সমাজে টাকার গৌরবের কাছে অন্য কোনো কিছুর উজ্জ্বলতা দাঁড়াতে পারে না। প্রফেসর তাঁর শূন্য পকেট নিয়ে কি জ্ঞানের প্রমাণ দিতে পারবেন? সে শূন্য কুম্ভের ঠনঠনানি দেশ শুনতে যাবে কেন? প্রফেসরের হাতে টাকা আসতে থাকলে তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়ে চেম্বার অব কমার্সের চাঁই হয়ে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কথাবার্ত্তার জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের মূল্য বেড়ে যাবে ঢের—তাঁর আগেকার দিনের নিরাসক্ত মূল্যজ্ঞান ও জ্ঞানের স্পৃহা হৃদয়হীন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে থাকলেও। আমাদের সমাজে শতাব্দীতে টাকার এই মানে, জ্ঞানের এই মানে। সম্মান নয়—টাকাও নয়—একটা জিনিষ ছিল শুধু এত দিন পর্য্যন্ত প্রাইভেট কলেজের খাঁটি প্রফেসরদের নিজেদের কাজকর্ম আবহ নিয়ে একটা চরিতার্থতার চেতনা। কিন্তু সে জিনিষ গত কয়েক বছরের বিশৃঙ্খলা অনটন অন্ধকারের মধ্যে একেবারে উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে—অন্তিম অবলম্বনের মত প্রফেসরদের হাতে কিছুই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

নিজের কাজে তৃপ্ত প্রাইভেট কলেজের প্রফেসররা আজকাল ডোডোর মতন দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালের মণ যখন চার টাকা পাঁচ টাকা ছিল এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষের দাম ঐ রকমই আয়ত্তের ভেতরে, তখন কলেজ ও দেশের মালিকেরা পরিচালকেরা প্রফেসরকে নিজের রুচি ও বিবেকসম্মত কাজের ভেতর নিবিষ্ট রেখে তার পাওনার ব্যাপারে তার সঙ্গে যে পরিহাস করছে সে সম্বন্ধে প্রফেসরের চেতনা সজাগ থাকলেও সে চেতনাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। খাওয়া-পরার জিনিষের দাম বেশী ছিল না, সংসারে আর্থিক (সাচ্ছল্য না হোক) স্বাধীনতা এবং যেটুকু না হলে নয় সে পরিচ্ছন্নতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা মোটামুটি সম্ভব ছিল। কিন্তু জিনিষ-পত্রের দাম চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে এখন। এ রকম খারাপ দিনকালে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের বেতন সম্পর্কে দেশের পরিচালকদের চেতনা যে নেই তা নয়; আছে। সদিচ্ছা আছে, কিন্তু ফণ্ড নেই; কোটি কোটি টাকার নোট বাজারে ছেড়ে কাগজও থাকছে না আর, কোটি কোটি টাকার কাগজের নোট বানাতে হচ্ছে আবার তাই; এই সব সদিচ্ছা আছে, কিন্তু এ পথে চলে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের জন্যে কোনো ফণ্ড থাকছে না গভর্ণমেন্টের হাতে। ব্যাপারটা এই রকম।

পৃথিবীর টাকা-কড়ি কাড়াকাড়ির ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া যাদের স্বভাব, তাদের পক্ষে আত্মদান করে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। যে কোনো নিজের কাজে নিবিষ্ট অধ্যাপকই ও-রকম উত্তেজনার উত্তাপের পৃথিবীর থেকে স্বভাবতই এত দূরে স'রে থাকে যে, ঠিক তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সত্য সার্থক শিক্ষকতার কাজ চলে না। কারণ শিক্ষকতাই একমাত্র কাজ—আমার মনে হয়, আজকের পৃথিবীর সব রকম কাজের ভেতরে যা সব চেয়ে অগম্ভ ও স্থির ধীর মনের অভিনিবেশ দাবী করে। জোর করে নয়, নিজেদের রুচি ও স্বভাবের মর্য্যাদায় এ দাবী সংশিক্ষকেরা মিটিয়ে আসছিলেন অনেক দিন। কলকাতার মত বড় শহরের অনুপাতে এখানে এ সব মাষ্টার-প্রফেসরদের

সংখ্যা কম ছিল বটে, মফঃস্বলের ছোট ছোটে জায়গায় বেশী ছিল। এই সব শিক্ষকদের আশ্চর্য্য আত্ম-সমাহিতির বলয়ের ভেতরে এসে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকদের প্রায় সকলেই খুব বেশী বেগ না পেয়ে স্থির করে ফেলতে পারত : ভেসে বেড়াব না, ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজ নিয়ে থাকব, এতে মাইনে কম বটে, মাইনে কম বলেই লোক-সমাজে সম্মানও কম—কিন্তু টাকা ও টাকার সম্মানের শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের নিজেদের অন্ততঃ সমর্থন নেই। অধ্যাপনায় অবকাশ আছে, ছেলেদের শেখাবার পথ কেটে দেবার পরে নিজেদেরও পড়বার লিখবার চিন্তা করবার সুযোগ আছে, সে সুযোগকে গ্রহণ করা চলে।

আজকাল যখন টাকা ও রিরংসার পথে ক্রমেই বেশী করে অগ্রসর হতে না পারলে কেউ কাউকে সভ্য ও সুখী মনে করতে সত্যিই দ্বিধা বোধ করে, তখন পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ঐ সব অবলুপ্তপ্রায় অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মত যদি কয়েক জন মানুষ টাকা ও লালসার কান ঘেঁষে না চ'লে সুস্থিরতা আবিষ্কার করতে পারে কিছু পরিমাণে এবং সভ্যতাও, তাহ'লে তাদের কি আমরা সংরাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে গণ্য করব, না বন্ধু হিসেবে? কিন্তু যে রকম ভাবে বড় ব্যবসাকে আরো স্ফীত হতে দেওয়া হচ্ছে, সদাগর ও সরকারের সুখী অফিসারেরা নাম-ডাকে মৃগয়ায় আরো দোর্দ্দণ্ড সুখী হয়ে উঠছে, যে রকম ভাবে প্রাইভেট ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ভাতে-কাপড়ে নিকেশ হতে চলেছে, তাতে মনে হয়, এই সব শিক্ষকদের দিয়ে রাষ্ট্রের সত্যিই কোনো হিত হয় বিবেচিত হ'লে খুব সম্ভব এ রকম গ্লানি সম্ভব হত না।

পাশের পড়া

নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

দু'টি বছর পড়ার পরে সেদিন চৈত্র মাস,
দাদার মনে জাগ্‌ল আশা করবে বি-এ পাশ।
আমায় ডেকে বলে দিলেন, শোন নিমু শোন,
দেখো যেন আজ থেকে আর গোল হয় না কোন।
পাশের ঘরে পড়ব আমি ডিস্টার্ব না হয়।
পাশের-পড়া মনে রেখো ছেলে-খেলা নয়।

দিন-রাত্তির চল্‌ল পড়া এক-শো মাইল গতি।
বই ছাড়া আর নাইকো দাদার লক্ষ্য কারো প্রতি।
মুখ শুকোলো দাঁত বেরোলো রুক্ষ হল কেশ।
ছিঁড়ল জামা হারায় চটি মলিন হল বেশ।
চশমা গেল অসাবধানে নিব ভাঙ্গলো পেনে,
ঘড়ির কাচ আর আস্ত না রয় জং ধরল চেনে।
তবু পড়ার ত্রুটি কিছু একটুও না ঘটে,
লোকে দেখে বলে ছেলের পাশের-পড়া বটে।

রান্না-ঘরে মহা ফ্যাসাদ,—ডিম খাবে না দাদা।
ইলিশ মাছে কাঁচকলা আর কলাই ডালে আদা।
কালীঘাটে মানোত মানা গঙ্গাজলে স্নান।
গণৎকারকে হাত-দেখানো দীন-গরীবে দান।
সবই চলে পুরো দমে কোথাও না রয় ফাঁকি
যোগ-যাগ-হোম-জপ-তপ আর কিছু না রয় বাকী।

ঠাকুর দিল রান্না ছেড়ে স্বস্ত্যয়নে মন।
চাকররা সব বাবুর লাগি প্রার্থনা-মগন।
নাপিত-ধোপার মুখ দেখে না কভু মনের ভুলে।
দাড়ী-গোঁফে ঢাক্‌ল বদন জট পাকালো চুলে।
শিতলার পায় মাথা নোয়ায় কালীরে দেয় ডাক।
ত্রিশ কোটি দেব-দেবতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

অবশেষে পরীক্ষার আর দু'দিন যখন বাকী।
তখন দাদা পড়ল জ্বরে চল্‌ল না আর ফাঁকি।
মাথা-ধরা অতি প্রবল জ্বরের বেগও বেশী।
সকল বাধা কাটিয়ে এসে ঠেকল শেষাশেষি।
কভু দেখে হল্‌, কোশ্চেন, কাগজ, কলম, কালী,
কভু পেপার-সেটারকে দেয় বেদম গালাগালি।
বরফ-জল আর পাখা নিয়ে বোনটি বসে পাশে
দুর্ভাবনায় চিন্তায় তার পরাণ কাঁপে ত্রাসে।
ডাক্তার এলো বদ্যি এলো ওষুধ শিশি শিশি।
কিছুতে আর কিছু না হয় এ-রোগী কোন দেশী।

পরীক্ষার দিন সকাল বেলা বিষম হুলুস্থুল!
দেখছে দাদা হলঘর আর বলছে কেবল ভুল।
জ্ঞান হারাল জ্বরের বেগে আত্মজনের ত্রাস,—
হায় রে দাদার পড়া-শুনা হায় রে বি-এ পাশ।

১৮

কাছারীর পূর্ব দিকে একটা পুকুর কাটা হচ্ছে। নোয়াগালী থেকে এসেছে দু'দল কৃষাণ। তাদের ঠিকা দেওয়া হয়েছে। তারা উভয় পক্ষ ভীষণ উত্তেজিত—গাল-মন্দ-বচসা চলছে। একটা মেয়েমানুষ হয়েছে তাদের তর্কের বিষয়। বিষয়টি সজীব, কিন্তু তাকে টানতে টানতে একেবারে নির্জীব করে ফেলা হয়েছে। দু'খানা হাত ধরে দু'দিক থেকে সে কি টান! হাত দু'খানা এখন তার ছিঁড়ে যাবে বুঝি! উচিত তাকে কারুর এখন রক্ষা করা। মেয়ে-লোকটি মধ্যবয়সী! রোগা হাত, রোগা দেহ, মুখে শুধু একটুখানি মিষ্টি আভা। দু'টো তাজা যোয়ানের সবল আকর্ষণে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। উভয় পক্ষের ভাষা এমনিতেই বোঝা দায়, এখন দোভাষীতেও অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। বিশেষ করে অশ্লীল বাক্যগুলোর। ঘটনাটা পরে শোনা যাবে, এখন দরকার মেয়েটাকে উদ্ধার করা। এখনও ওকে ছাড়িয়ে না দিলে ওর অবস্থা আরও শোচনীয় হবে—প্রায় বিবস্ত্র হওয়ার জোগাড়।

বিপ্রপদ সহজেই সব বোঝেন। মেয়েটার জন্যই কাজ-কর্ম্ম বন্ধ, কোদাল নিয়ে আস্ফালন—একবার রুখে রুখে এগোন, আবার কি বুঝে যেন কয়েক কদম পিছোন। দু'দলই সমান তালে ঝগড়া করে যাচ্ছে। একটি কৃষাণও নিরপেক্ষ নেই।

তিনি থামতে বলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্রমশঃ অবস্থা সংগীন হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকটি এক পক্ষের টানে পড়ে গেল মস্ত বড় একটা শুকনা মাটির ঢেলার ওপর। তৎক্ষণাৎ আর এক পক্ষ টেনে তুলল তাকে। তার কপালটা কেটে রক্ত ঝরছে। পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। পেয়াদা পাইক বা অন্য কেউ কিছু বলছে না। মানুষ যে কুকুরের মত কলহ করতে পারে তা বিপ্রপদর জানা ছিল না। ঘটনাটা আর একটু ঘোরাল হতেই তিনি বিদ্যুতের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু এতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে আর একটু খারাপের দিকেই গেল। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—ফিরে দাঁড়ায় বিপ্রপদর বিরুদ্ধে।

কে যেন পিছন থেকে বলে, 'ওরা ছোটলোক, ভীষণ দুর্দান্ত—ফিরে আসুন বাবু।'

বিপ্রপদ ভীরু লোক নন। তিনি কেন ফিরবেন ন্যায্য কাজে? কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে হঠাৎ লাফিয়ে পড়েন এক জনের হাত থেকে একটা লাঠি টেনে নিয়ে। চরকীর মত লাঠি ঘুরছে, ওরা পালাচ্ছে কুকুরের মত। বাজের মত ছোঁ মেরে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে তিনি ঘুরে আসেন পুকুর-পাড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। দৈহিক শক্তির কাছে ষাঁড়ের গোঁ লুটিয়ে পড়ে। মজুরগুলো এখন হাতজোড় করে এসে দাঁড়ায়—বিচার চাই। একটা পেয়াদার জিম্মায় ঐ মেয়েটাকে দিয়ে, তিনি কাছারী-বাড়ীর দিকে নিজের জামা-কাপড় বদলাতে যান—এ-ও বলে যান, বিকালে বিচার হবে।

কাছারী-বাড়ীর খোলা স্থানটায় বিচার-সভা বসেছে। প্রায় দু'-তিন শো লোক জমা হয়েছে। বিচারক বিপ্রপদই স্বয়ং। এখানে তাঁর সম্মান এক জন জেলার জজের চেয়েও বেশী।

এক জন দোভাষী উভয় পক্ষের কথা বুঝিয়ে দেবে বলে খাড়া হয়েছে। মানুষটা বুড়ো কিন্তু দেখতে অনেকটা ছুঁচোর মত। দাড়ি-গোঁপের বেশী বালাই নেই।

মেয়েলোকটি বিপ্রপদর নিকটে এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আশ-পাশ থেকে বার বার ভীড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন এতগুলো লোকের সুমুখেই তাকে অস্ত্রোপচার করা হবে।

বাদী-বিবাদী দু'দল দাঁড়িয়েছে দু'ভাগে ভাগ হয়ে। সকলেরই জোড় হাত—কাঁচু-মাঁচু চেহারা! ওরা টাকু-খাওয়া ঘুঘু। সময় বুঝে চলতে ওস্তাদ।

বিপ্রপদ ভাবেন: চাকরী করে মানুষ শুধু পয়সার জন্য, গৌরবের জন্যও বটে। এতে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, পংগু করে রাখে তার নিজস্ব সত্তা। তাঁর মোহ কাটাতে হবে। সোজা কথায় গোলামীর জাঁকজমকে তাঁকে আর ভুলিয়ে রাখতে পারবে না কিছুতেই। তিনি বাঁধন কাটবেন। এই যে পেয়াদা পাইক কর্ম্মচারী, নায়েব গোমস্তা মুহুরী, পাল্কী ঘোড়া কোষ নৌকা—এ সকলই মাকাল ফলের রঙিন প্রলেপ। রঙের আভায় তিনি আর ভুলবেন না।

কৌতূহলী জনতা নিয়ে মুস্কিল হয়েছে। তাই বার বার কটু ও উষ্ণ কথায় ভীড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'এখন বলো ঘটনাটা, সকলে শুনুক।'

দোভাষী বলে, 'হুজুর, প্রথম পক্ষ বলছে, ঐ মেয়েটা গত বছর ওদের ছাউনীতে ছিল—তখন ওরা কাজ করত পশ্চিমে কোন এক সহরে, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে।'

'সহরটার নাম কি?'

'বলছে ওদের মনে নেই—ওরা মুখ্যু লোক!'

'এ তো বড় আশ্চর্য! এতগুলো লোকের ভিতর এক জনও নাম জানে না?'

'না।'

এ-দল ও-দলের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করে।

'আচ্ছা বেশ!' বিপ্রপদর সন্দেহ হয় যে এর ভিতর একটা রহস্য আছে। 'তার পর বলে যাও।'

'প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ ওকে না কি নিকে করে এনেছে একটা ছোট ছেলে সমেত। তার আগেও না কি ওর কতগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে—সেগুলো যাদের ঘর করেছে, তাদের ঘরেই রয়ে গেছে।'

জনতার ভিতর একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি শোনা যায়।

'এর আগে ক'বার ঘর ভেঙেছে ?'

দোভাষী জিজ্ঞাসা করে মেয়েটাকে, 'ক'বার ? বল্ না ক' ফির ?'

মেয়েটা ধীরে ধীরে ওর কানে কি যেন জবাব দেয়। 'হুজুর ছ-সাত ফির—বেশীও হতে পারে।'

'বলো কি !'

দোভাষী সকলকে তাক্ লাগাবার জন্য একটু মুন্সীয়ানা করে বলে, 'ঘর ভেঙেছে, আর বাচ্চা ফেলে এসেছে !'

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'হুঁ। তার পর ?'

'কি করবে হুজুর, পেটের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা। সে জ্বালার কাছে ছেলেমেয়ের বালাই নেই। ওর মা ওকে বার না তের বছর যেন প্রথম বিক্রি করে কোন এক কসাইর কাছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে সে ওকে মেহেরবাণী করে জবাই না করে বেচে যেন কোন কুলীদের কাছে। তার পর কেবল হাত ঘুরেছে। কাজ ফুরিয়েছে, আর হাত ঘুরেছে। নেমন্তন্ন-বাড়ীর এঁটো পাতার মত কত কুকুরে যে চেটেছে তার কোনও ঠিক-ঠাক নেই। ছানাগুলোরও কি বাপের ঠিক আছে হুজুর—ও নিজেই কি ঠিক রাখতে পেরেছে কিছু ! তাই যখন যার ঘাড়ে যেমন সুবিধা ফেলে পালিয়েছে। এ সব আমি ওর কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বলছি। একটি কথাও মিথ্যা বা বানাই নয়।'

এতক্ষণ মেয়েটাও হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল—সে কাঁপতে থাকে।

বিপ্রপদ তাকে ইসারায় বসতে বলেন। সে মাটিতেই বসে পড়ে।

একটু আগের বিদ্রূপমুখর জনতা কেন যেন চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। সমাজে অধঃপতিতা এই নারী, নিদারুণ ব্যভিচারে এর যৌবন গতপ্রায়, লক্ষ গ্লানির চিহ্ন এর প্রতি অংশে—তবু আর যেন কেউ একে কোনও ইংগিত করতে সাহস পায় না। সকলেই কেমন যেন একটা সংকোচে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

স্তব্ধতা ভাঙেন বিপ্রপদ। 'তার পর দ্বিতীয় পক্ষ কি বলছে ?'

'হুজুর, দ্বিতীয় পক্ষ বলেছে : প্রথম পক্ষের জবানবন্দী শেষ হলে ওরা ওদের কথা বলবে।'

'তা ঠিক, তাই ভাল।' বিপ্রপদ একটু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রথম পক্ষের আর বলার কি আছে ?'

'দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমু সেখ না কি চুরি করে এনেছে প্রথম পক্ষের ছাউনী থেকে। সেই নিয়েই ঝগড়া ! খুঁদির নিকার স্ত্রীকে কোন্ আইনের বলে ঝুমু জোর করে রাখবে ?'

দ্বিতীয় পক্ষ তখনি জবাব দেয়, অবশ্য দোভাষীর মারফতে। 'কে বললে চুরি করে এনেছে ঝুমু ? সে-ই ঠিক ওকে নিকে করে এনেছে এক খান্‌কির কাছ থেকে—অর্থাৎ এক বেশ্যার কাছ থেকে। খুঁদির কথা মিথ্যা।'

'না হুজুর, ঝমুই না কি মিথ্যা বলছে, খুঁদির কথা একেবারে সত্যি।'

ব্যাপারটা সকলের কাছে বড়ই ঘোরাল হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রথম পক্ষ কেন ওকে দাবী করছে তার কি কোনও কারণ দেখাতে পারে ঝুমু—ঐ দ্বিতীয় পক্ষের লোকটা ?'

দোভাষী বলে,' পারে।'

'কি কারণ ?'

'প্রথম পক্ষের ওই খুঁদি সেখের বৌটা আর এই মেয়েলোকটা না কি দেখতে অনেকটা এক রকম। সেই বৌটাতে না কি ওর অরুচি ধরেছে—এখন ফাঁকে-চক্কোরে নতুন একটা চেখে দেখতে চায়। ও কি কম হারামী ! বেশ একটা জটিল মামলা দাঁড়াল হুজুর। এরা কেউ সহজ লোক নয়। হাইকোর্টের উকিলের মাথা খায়।'

'সেই বৌটা আর এই মেয়েলোকটা সত্যিই কি দেখতে এক রকম ? এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

'একটা আছে, আর একটা এখানে নেই—আছে না কি দেশে, দু'টোকে তো একত্র করা যাবে না, তখন আর যাচাই হবে কি করে ? এ প্রমাণ অগ্রাহ্য। হুজুরের কি মত ?'

অগ্রাহ্য তো বটেই। ঝুমু সেখ ওকে না কি নিকে করে এনেছে এক বেশ্যার কাছ থেকে ? তার ঠিকানা কি ? নামই বা কি ?'

'নাম রামতারা—থাকে রতনপুর বন্দরে।'

'বেশ্যাটা হিন্দু আর এরা মুসলমান ! ভাল মজা !'

'মজা নয় হুজুর—এমন নতুন কিছুও না। আসলে এ-লোকগুলো হিন্দুও না, মুসলমানও না। যখন যেমন তখন তেমন করে জীবন কাটায়। এরা নামাজ-রোজাও করে না, সন্ধ্যাহ্নিকেরও ধার ধারে না। নামের শেষে একটা সেখ কি তারা দিয়েই কিছুই ধরে নেওয়া চলে না। এরা এটাও মানে না, ওটাও করে না। এমন লোক যে কত আছে সংসারে।'

রতনপুর থেকে যে বিয়ে করে এনেছে, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে ঝুমু ? কোনও সাক্ষী-সাবুদ আছে ?'

দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমু সেখ বলে, 'আলবৎ আছে, এই যে চোথা।'

'গরু-বাছুর না কি যে চোথা দেখাচ্ছ ?'

'গরু আর জরু সমান হুজুর—চোথা তো লাগবেই, নইলে হারিয়ে গেলে, পালিয়ে এলে ধরবে কিসের জোরে ?'

প্রথম পক্ষের খুঁদি সেখ প্রতিবাদ করে, 'ও মিথ্যা চোথা !'

দোভাষী ওদের মত ক'রে পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো তর্জমা করে দেয়। কখন বলে জোরে, কখন ধীরে—যেমন যেখানে প্রয়োজন। কিন্তু তাতে যেন বিষয়টা জড়িয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার হচ্ছে না।

বিপ্রপদ বিব্রত হয়ে পড়েন। এতগুলো লোকের সামনে একটা সুবিচার করে রায় না দিতে পারলে বড়ই লজ্জাজনক। চাকরির জীবনে তিনি এমন কঠিন পরীক্ষায় কখনও পড়েননি। তিনি চোথাখানা হাতে নেড়ে-চেড়ে চিন্তা করতে থাকেন। কাগজটাও অযত্নে রক্ষিত—পেন্সিলের লেখা, একটা অক্ষরও বোঝা যায় না। হয়ত সাদা একটা পুরোন কাগজ না কি তাই বা কে জানে ! এ-সব লোকের পক্ষে কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব নয়। এবার একবার মেয়েটাকে জেরা করে দেখা যাক। ও আবার কোন্ রহস্যের অবতারণা করে কে জানে !

'এখন মেয়েলোকটা কি বলে, ওর নাম কি ?'

সকলকে যেন একটু আশ্চর্য্য করে দিয়ে সহজ বাংলায় মেয়েটি জবাব দেয়, 'হুজুর, আমার নাম আসমানতারা?'

'তুমি এমন বাংলা শিখলে কোথায়।'

'ছোটবেলায় আমার মা আমাকে নিয়ে ক'লকাতায় আসে—আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম।'

'আসমানতারা, আশা করি, তুমি আমার কাছে সত্য ছাড়া মিথ্যা কিছু বলবে না—যদি মিথ্যা বলো তবে তোমারই ক্ষতি হবে। ঠিক দোষীকে যদি না ধরতে পারি তবে সাজা দেব কাকে?'

'হুজুর, আমি আপনার কাছে জেনে-শুনে মিথ্যে বলব না।'

'এদের দু'জনের মধ্যে কার কথা সত্য? প্রথম পক্ষের খুঁদির না দ্বিতীয় পক্ষের ঝুমুর? কে তোমাকে বাস্তবিক নিকা করে এনেছে?'

আবার সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে আসমানতারা জবাব দেয়, 'এদের দু'জনের এক জনকেও আমি চিনি নে হুজুর। আমাকে—'

'চুপ করো।' বিপ্রপদ ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'সবগুলোই মিথ্যাবাদী—এদের দলসমেত চালান দিয়ে দেবো থানায়।'

জনতাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'তাই করুন হুজুর, তাই করুন। দেখবেন, থানায় গেলে মারের চোটে কথা আদায় হয়ে যাবে।' কেউ কেউ বলে, 'ও মাগীও কি কম! সাত-ভাতারে খানকি বলবে আবার সত্যি কথা? ওকেই আগে চাবকান দরকার।'

'এই, তোমরা চুপ করো। তোমরাই যদি বিচার করো তবে আমি এখানে বসেছি কেন? যা-তা কেউ বললে তাকে এক্ষুণি শিক্ষা দিয়ে দেবো। চুপ সব।'

আবার ভীড়টা ঠাণ্ডা হয়। বিপ্রপদ চেয়ে দেখেন, আসমানতারার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ওর মুখের ব্যঞ্জনার মধ্যে তিনি যেন কোন ছল-চাতুরী খুঁজে পান না। খুঁদি এবং ঝুমু সেখের দলকে একটু প্রফুল্ল বলেই মনে হয়। এত সময় জেরার পরও রহস্য শিথিল হাওয়া তো দূরের কথা, আরও জটিল হয়ে উঠল! এখন কি প্রশ্ন করবেন?

আসমানতারা বলে, 'হুজুর মা-বাপ—আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলছি নে।'

'ওদের কেউকে চেন না তবে তুমি এখানে এলে কি করে—এমন ঠার-ঠিকানায় ওরা তোমাকে দাবীই বা করছে কি করে?'

অবশেষে রহস্য ভেদ করে দেয় আসমানতারা। ও এইমাত্র জানে, ওকে আমতলার ছাউনী থেকে রাত্রে এরা চুরি করে এনেছে দু'দলে মিলে। ওর এখন যে বাস্তবিক স্বামী—ওকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে কোথায় তাড়ি না ধেনো-মদ খেতে গিয়েছিল। ওর জ্ঞান হলে দেখে যে, ও এদের ছাউনীতে শোয়া। দু'-পক্ষের লোকই গিয়েছিল—কিন্তু ওকে কে আগে প্রথম ব্যবহার করবে তাই নিয়েই বচসা। রাত্রের বচসা দিনে ঝগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। আসমানতারা ধীরে ধীরে থেমে থেমে কখন মাটির দিকে চেয়ে কখনও বা আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে সব কথা বলে যায়।

ক্ষণিকের জন্য বিপ্রপদ নীরব হয়ে থাকেন।

সভাটাও স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেউ খুন-জখম হয়নি, বিচারে কারুর ফাঁসীর হুকুমও কেউ দেয়নি—তবু সকলে যেন স্তম্ভিত হয়ে কাল্হরণ করে।

বিপ্রপদ ভাবেন: মানুষের একটা ক্লান্ত দেহ নিয়ে মানুষে মানুষে কুকুরের মত ধ্বস্তাধস্তি! 'আসমানতারা, তুমি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারো?' এ কথাটা তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায়ই আইনের খাতিরে জিজ্ঞাসা করেন।

'কিসের প্রমাণ হুজুর?'

'তোমাকে যে আমতলার ছাউনী থেকে আনা হয়েছে।'

'সেখানে আমার একটা দুধের ছেলে আছে।'

বিপ্রপদ পেয়াদাদের ঝুমু ও খুঁদিকে এবং বেছে-বেছে ওদের মধ্যের মোড়লদের আটক করে রাখতে বলেন। এখন মিথ্যা মামলাও ওরা সাজাতে পারে! আসমানতারার কথা সত্য বলে প্রমাণ হলে ওদের থানায় চালান দেওয়া হবে।

ঘোড়ার পিঠে তখনই আমতলা লোক যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে—সংবাদ সত্য। প্রমাণস্বরূপ ছেলেটাকে নিয়ে তার বাপ আসছে হেঁটে।

কিছু সময় পরেই সে এসে উপস্থিত হয়। ছোট ছেলেটা অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে মার কোলে। মার বুক ঠাণ্ডা হয়।

বিপ্রপদ যেন একটা মহা দায় থেকে উদ্ধার পেলেন—তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলেন, 'এখন তুমি তোমার স্বামীর সাথে যাও।'

'না, আমি তা যাব না হুজুর।'

'কেন?'

সভার মধ্যেই মেয়েলোকটা বিপ্রপদর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকে। সে কিছুতেই যাবে না তার সাথে। সে এখানেই থাকবে হুজুরের কাছে। দু'টো ভাত-পাত কুড়িয়ে খাবে। ওর গতরে আর সয় না। ওর গতর ক্ষ'য়ে গেছে অসৎ ব্যবহারে। সাত-আটটা স্বামী ওকে চেখেছে, ওর আর স্বামীর সখ নেই! ও আর যাবে না, কিছুতেই যাবে না। ও হুজুরের পায়ের তলায়ই পড়ে থাকবে।

বিপ্রপদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকাতে থাকেন চারি দিকে।

একটা স্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়, 'হুজুরেরই বিহিত করা উচিত।'

অগত্যা বিপ্রপদ আসমানতারাকে স্থান দেন। স্বামীটা বোকার মত ফিরে যায়—কিছু বলতেও সাহস পায় না।

আসমানতারাকে একটা ঘর ঠিক করে তাকে সাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পরে যা হোক চিন্তা করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সেদিনের সভা এখানেই শেষ হয়।

ভালই হলো বিপ্রপদর। কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর-বিনোদনের একটা সুযোগ জুটল। আসমানতারাকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানায় বেশী দিন তার পক্ষে থাকা অসম্ভব। তার আব্রু রক্ষা হয় না। তার জন্য একখানা পৃথক্ ঘর চাই। রান্না-ঘরেরও একটা ভাল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাকে একটা কাজও দিতে হবে। বিপ্রপদর হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে আসমান-তারার জন্য। কিশোর বয়স থেকে অত্যাচার ও ব্যভিচারে ওর হৃদয়-মন জর্জ্জরিত। ওর নারী-জীবনের কোনও কামনাই সার্থক

হয়নি। তাই অতি সহজেই স্বামীর সংগ ত্যাগ করতে পারল। বছরের পর বছর ও যাদের সন্তান ধারণ করেছে, তারা ওকে শুধু কামনার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে। তাই ওর এত ঘৃণা দাম্পত্য জীবনে। ওর অংগে-অংগে দাগ রয়ে গেছে লাঞ্ছনার। বিপ্রপদ দেখবে, ওর জন্য কিছু করা যায় কি না! যারা এমনি দুর্বিসহ জীবন ধারণ করে দিন কাটাচ্ছে—তাদের প্রতিচ্ছবি যেন ঐ আসমানতারা।

বিপ্রপদ ওর জন্য যে ঘরের ব্যবস্থা করলেন—তার পাশ দিয়েই নিত্য দু'বেলা তাঁর যাতায়াত। আসমানতারা ওঁকে দেখলেই জড়োসড়ো হয়ে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ কখনও হাত তুলে কখনও বা শুধু একটা আঙুল তুলে প্রত্যভিবাদন করে চলে যান।

কোলের ছেলেটা বিপ্রপদকে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি গিয়ে মা'র কোলে লুকায়। তার পর সেখান থেকে একটা ভীরু বানর-শিশুর মত চেয়ে থাকে। কি যেন বলে ওর মা'র কাছে। আসমান-তারাও গায় হাত বুলিয়ে কি যেন বুঝিয়ে দিতে থাকে—ও চুপ করে শোনে।

ধীরে ধীরে নিত্য দু'বেলা ওঁকে দেখে ছেলেটার ভয় ভাঙে। ও ওর মার সাথে সাথে বলে, 'সেলাম হুজুর।'

বিপ্রপদ এবার না হেসে থাকতে পারেন না। তিনিও প্রতি উত্তরে বলেন, 'সেলাম হুজুর।'

ছেলেটা খিল-খিল করে হাসে। দেখতে বেশ দেখায়। ওর মায়ের মুখের ছাপ ওর মুখে।

বিপ্রপদর দু'-এক দিন ইচ্ছা হয়, ওর অভাব-অভিযোগের কথা জানতে—ওর আসবাব-বিছানা মাদুর ঠিক মত কিনে দেওয়া হয়েছে কি না! কিন্তু লজ্জা হয় এই তুচ্ছ মেয়েলোকটার সাথে আলাপ করতে। ওর জামা-কাপড় আছে কি না তাও ঐ এক কারণেই জানা হয় না। ওর জন্য বেশী দরদ দেখানই মানে তাঁর সম্মানের বিশেষ ক্ষতি।

কিন্তু ছেলেটা ধীরে ধীরে আলাপ জমায়, 'সেলাম দাদু।'

ওর সাহস দেখে বিপ্রপদ অবাক্ হন—আবার মনে-মনে সন্তুষ্টও হন। কিন্তু একটু পরেই আবার ঘৃণায় তাঁর মন তিক্ত হয়ে ওঠে। নাম-গোত্রহীন ওটা কার ছেলে! ওর মা একটা বেশ্যারও অধম। তারই পেটের ছেলে ওঁকে কি সাহসে দাদু বলে ডাকছে? আবার ভাবেন: ছেলেটা তো তার জন্মের জন্য দায়ী না। তবে তাকে ঘৃণা করার কোনই তো হেতু নেই। ওর মাকেই বা তুচ্ছ করে লাভ কি? যে নিজের বিগত জীবনের জন্য দায়ী নয়, তাকে অবহেলা করা বিবেক ও বিচারবিরুদ্ধ। ও সমাজে অচল, কিন্তু বাস্তবিক ভাবতে গেলে ওকে তো অচলও বলা চলে না। ও হিন্দু কি মুসলমান তাতে কিছু এসে যায় না—ও বিরাট মনুষ্য সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ। রুগ্ন হলেও ওকে নিরাময় করে নেওয়া ন্যায়সংগত।

'আসমানতারা, তুমি বসে না থেকে কাছারী-বাড়ীটা ধোয়া-মোছা করলেও তো পারো। একেবারে বসে-বসে দিন কি কাটে?'

'হুজুর, আমাকে দেখিয়ে দিলেই তো পারি।'

পরের দিন কাছারী-বাড়ীটা অনেক পরিষ্কার দেখায়। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নিয়েই ও কাজ করে যায়। এ সব কাজ ওর গায়েই লাগে না। পুকুর কাটতে, মাটি-বোঝাই ঝুড়ি টানতে যে পরিশ্রম তার তুলনায় এ আর কি খাটুনী! সে উঠানটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। ঝুড়ি-ঝুড়ি গাছের পাতা কুড়িয়ে এক স্থানে জমা করে রাখে। কাঠের বদলে পাতা দিয়ে রান্না করা যাবে। ছোট ছেলেটা কচি আমগুলো কুড়িয়ে খায়। বিপ্রপদর আশংকা হয় ছেলেটার অসুখ হবে। ও যে একটা সাধারণ কৃষাণের ছেলে সে কথা তিনি ভুলেই যান। ওর মা দেখে কিছু গ্রাহ্যই করে না। সে বরঞ্চ কোল থেকে নামিয়ে একটু রেহাই পায়। কত আর কোলে কোলে রাখতে ইচ্ছা করে!

ক'দিনের মধ্যেই কাছারী-বাড়ীর শ্রী ফিরে যায়—দেখতে দেখতে উঠানটারও শ্রী ফেরে। আসমানতারা ঐ সংগে বিপ্রপদর ঘর দু'খানাও বেশ করে পরিষ্কার করে আসে। আল্না টেবিলের নীচের ময়লাগুলোও দূর হয়। প্রথম প্রথম আসমানতারার ভয়-ভয় করে বিপ্রপদর ঘরের কাজ করতে—শেষে ভয় কমে—সহজ হয় সকল কাজ। কাপড় গুছায়, জুতো সাফ করে, বিছানা ঝাড়ে, এটা ওটা ঠিক করে রাখে।

বিপ্রপদ সকলই লক্ষ্য করেন। সময় সময় দু'-একটা প্রশ্নও করেন। আসমানতারাও উত্তর দেয়। তিনি বুঝতে পারেন মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। কাজ-কর্ম্মও নোংরা নয়। ও যে অজ্ঞাতকুলশীলা তা ক্রমশঃ সকলেই ভুলে যায়—এমন কি বিপ্রপদও।

এখন সময় সময় দু'-একটা ফাই-ফরমাসও করা হয় আসমান-তারাকে। সে অতি সযত্নে তা করে যায়। এমনি ক'রে সে অল্প দিনের মধ্যেই কাছারী-বাড়ীর এক জন হয়ে ওঠে। ওকে না পেলে অনেকেরই অসুবিধা হয় এখন। দোষ-ত্রুটি হলে এখন ওকে মাঝে-মাঝে কৈফিয়ৎও দিতে হয়। লোমশ নায়েব মশাই ওকে খুবই পছন্দ করে। তামাক সেজে দিতে ওর জুড়ি না কি আর কেউ নেই ভূভারতে। ঘন-ঘন তামাক চাইলেও ও কক্ষনো কল্কীতে এমন করে তামাক ঠেসে ভরে না যাতে লোমশের টানতে অসুবিধা হয়। আজকাল ও যেন একটু খুশী মনেই চলে-ফেরে। দেখলে মনে হয়, ও যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। ওর স্বাস্থ্যও ফিরছে দিন-দিন। কঠোর শীতের পর যেমন বসন্ত আসে, তেমনি একটু-একটু করে ওর দেহে ফাগুনের প্রলেপ লাগছে। এ সব দেখে বিপ্রপদর খুবই আনন্দ হয়। এর ভিতর তাঁর দান রয়েছে। ওই যে একটু পাতলা রক্ত জমেছে ওর ঠোঁটে, হাড়ে লেগেছে মাংস—নির্ভয়ে বিচরণ করছে ওর ছেলেকে নিয়ে এই কাছারী-বাড়ীটায়—এর অন্তরালে রয়েছে কার কৃতিত্ব? তিনি চেয়ে-চেয়ে দেখেন এবং মনে-মনে স্ফীত হন। প্রথম দিনের সে ভীতিবিহ্বল চাহনি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। কত স্বাধীনতা যেন এসেছে ওর প্রাণে।

এক-এক দিন ওর বিগত জীবনের কাহিনী জানতে ইচ্ছা করে বিপ্রপদর। কিন্তু কতখনি মর্ম্মস্পর্শী না জানি হবে তাই তাঁর জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়। পাছে তার এ জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে তাই তিনি কৌতূহল দমন করেন।

কেন জানি ক'দিন আসমানতারাকে দেখা যায় না।

ঘরগুলো আবর্জনা জমে নোংরা হয়ে ওঠে। আম-পাতায় কাছারী-বাড়ীর উঠানটা ভরে যায়। লোমশ নায়েব ডাকাডাকি করেও তামাক পায় না সময় মত।

কিন্তু বিপ্রপদর ঘর দু'খানা প্রথম দু'-তিন দিন আসমানতারা কোনও রকমে এসে পরিষ্কার করে গেছে। পরে তাও বন্ধ করতে হয়। ওর ছেলেকে ছেড়ে বের হওয়াই অসম্ভব।

বিপ্রপদ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে আসমানতারার ছেলেটার অসুখ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে যান। এ আবার কি বিপদ! ছেলেটার ভীষণ জ্বর। ঋতু-পরিবর্তনের সময় কেমন করে যেন ঠাণ্ডা লেগেছে। বিছানায় প'ড়ে ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। অসুখ এর মধ্যেই যে আকার ধারণ করেছে তা গুরুতর। ওঁকে খবর না দেওয়ার জন্য আসমানতারাকে মন্দ বলেন। তখনই ডাক্তার কি কবিরাজ যা পাওয়া যায় তাই আনতে লোক পাঠান হয়। কিছুক্ষণ পরেই লোক ফিরে আসে। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে এক জন কবিরাজ আছে, সেও বাড়ী নেই। তখনই পাঁচ সাত মাইল দূরে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

ক'ঘণ্টা পরেই ডাক্তার আসে—পাশ-করা ডাক্তার। ঔষধপত্র নিয়ম মত দেওয়া হয়। বিপ্রপদও নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় অসুখ ক্রমে বেশীর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

সেই রাত্রেই আবার ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠান হয়।

বিপ্রপদ ভেবেছিলেন: এই ছেলেটা একটু বড় হলে লেখা-পড়া শিখিয়ে একটু মানুষ করবেন। ও আসমানতারার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেবে মা'র বুকে। ওর দিকে চেয়ে আসমানতারা সব ভুলে যাবে। কিন্তু বিধাতা বুঝি বিবাদী। কি আর করবেন বিপ্রপদ! তবু চেষ্টা-যত্ন করে দেখবেন।

সময় মত ডাক্তার আসে আবার। ঔষধপত্র অদল-বদল হয়। রাত্রে আর ডাক্তারকে যেতে দেওয়া হয় না। ভোরের দিকে রোগী একটু ভাল বোধ করে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই—নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত। ছেলেটা মারা যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বিপ্রপদ উঠে পড়েন। আশা চোরাবালি! কখন যে কে তার কবলে পড়বে বলা যায় না। আসমান-তারার ভবিষ্যৎ ভেবে বিপ্রপদ যথেষ্ট দমে যান। এ বন্ধনহীনা রমণীর উপায় হবে কি?

ছেলেটার জন্য কফিন এলো—একটু দামী কফিনই এলো বিপ্রপদর চেষ্টায়। সুগন্ধি আতর নতুন কাপড় যা-যা প্রয়োজন কিছুই বাদ গেল না। ওকে কবর দেওয়া হলো কাছারী-বাড়ীর পশ্চিম সীমানায়—ডালিম-বাগে।

যে সব চেয়ে বেশী খাটল, সব চেয়ে বেশী প্রবোধ দিল আসমান-তারাকে সে হচ্ছে কনিষ্ঠ পেয়াদা মোবারক। বয়স তার ওর প্রায় সমান সমান, দেখতে-শুনতে মন্দ না—একটু লেখা-পড়াও শিখেছে। লোকে বলে ওর অবস্থাও ভাল—ও গৃহস্থও ভাল। সংসারে ওর মা ছাড়া কেউ নেই—কিন্তু হাল লাঙ্গল গরু বাছুর সবই আছে।

আসমানতারা ধীরে ধীরে কাজে মন দেয়। ক্রমে ওর শোক পাতলা হয়। এক কাজ বারবার ক'রে করে। কোনও দোষ-ত্রুটি রাখে না। ওর সময় এতটুকুও নষ্ট হ'তে পারে না। ওর এ খাটুনী অনেকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। বিপ্রপদ স্বস্তি বোধ করেন। যাক, এক ভাবে তো দিন ওর কাটছে। এ ভাবেই কাটুক যে ক'দিন কাটে। কিন্তু তার পর কি হবে তা তিনি ভেবেই পান না। যদি তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে যান তখন ঐ নিরাশ্রয়া মেয়েটা কার আশ্রয়ে থাকবে? কে নেবে ওর শ্লীলতা রক্ষার ভার? এ একটা গুরুতর সমস্যা। ছেলেটা বেঁচে থাকলে ওটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি রেহাই পেতেন—এখন আজীবন ওকে টানতে হবে, তার চেয়েও অসুবিধা—আগলাতে হবে। হীনতা এবং দীনতাই ওর সব চেয়ে বড় শত্রু। ও দু'টোর সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করতে চাইবে। ওর কাছে আর বিয়ের কথাও বলা যাবে না। দাম্পত্য জীবনে ওর আর কোনও বিশ্বাস নেই। কখনও যে ফিরবে সে আশাও সুদূর-পরাহত। তখন বিপ্রপদ মানুষের কথায় মাথা পেতে এখন এমন দায়ে ঠেকলেন!

আসমানতারার রূপ আছে, বয়সও আছে—যদি ওর ইচ্ছা থাকে তবে বিপ্রপদ ওর একটা ভাল বিয়েও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে প্রস্তাব ওর কাছে কে করবে? এমন দুঃসাহস কার আছে?

তার চেয়ে এক কাজ করলে মন্দ হয় না। ওকে এক জন বুড়ো-গোছের মৌলভী রেখে লেখাপড়া শেখালে মন্দ হয় না। ওরও সময় কাটবে মনটাও সুস্থ হবে।

বিপ্রপদ এক দিন এক জন মৌলভী জোগাড় করে বলেন, 'আশমান, তুমি লেখা-পড়া শেখো। মুসলমানের মেয়ে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ো, দিল ঠাণ্ডা হবে।'

আসমান সম্মতি জানায়।

সেই থেকে বিপ্রপদ আসমানতারার ঝাড়'-পোঁছার কাজ বন্ধ করে দেন। ওকে চলতে বলেন আব্রু মত। ও একাগ্র মনে মেধাবী ছাত্রীর মত লেখা-পড়া করে যায়। এতটুকুও সময় নষ্ট করে না। কিন্তু একটা কাজ সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কখনও কোন সময় গিয়ে যেন বিপ্রপদর ঘর জামা জুতো সব কিছু পরিষ্কার করে আসে। বিপ্রপদ সস্নেহে তিরস্কার করেন। কিন্তু সে তিরস্কার আসমান শোনে না। সে সব প্রলোভন ত্যাগ করেছে, কিন্তু এটুকু সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। বিপ্রপদ খুশী হন—খুশী হন এই ভেবে, মেয়ে যদি পিতার পরিচর্যা করে, করুক না—তাতে দোষের কি-ই বা আছে!

মৌলভীটি স্বল্পভাষী ধর্ম্মভীরু। সে সুললিত কণ্ঠে কোরাণের ব্যাখ্যা করে, আসমান কান পেতে শোনে। দু'-এক সপ্তাহ সে হাঁ করে শোনে, কিছুই বুঝতে পারে না। তার পর একটু একটু করে আস্বাদ পায় বুঝতেও পারে বেশ। ও যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। সেখানে সকলে শান্ত নিরীহ খোদার দিকে চেয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে-চেয়েই তাদের দিন কাটে। ও যত শোনে তত ওর মন ভরে যায়। বিপ্রপদ দিন-দিন লক্ষ্য করেন, আস-মানের মুখে-চোখে প্রগাঢ় শান্তির ছায়া পড়ছে, ওর জীবনে আসছে নব চেতনা। ও কোন ঘৃণ্য সমাজ থেকে ক্লেদ-পংক ঠেলে যে এখানে এসেছে তা এখন ওকে দেখলে কে বলতে পারে? ওর

শিক্ষা সার্থক হচ্ছে, ওর অজু করার ভংগি, ওর নুয়ে-নুয়ে নামাজ পড়ার প্রণালী বিপ্রপদর কাছে অপূর্ব বলে মনে হয়। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটল এই মেয়েটার একটা জীবনে!

এক দিন আসমান অভিযোগ করে। অভিযোগটা গুরুতরই বটে। শুনে বিপ্রপদ রেগে আগুন। কি এত বড় দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে? বর্দ্ধিত হবে তাঁর আমলে এই কাছারীতে? সামান্ত একটা পেয়াদার এই সাহস! সে না কি যখন-তখন চেয়ে থাকে আসমানের দিকে কুকুরের মত? তবে আর পৃথক্ বন্দোবস্তে লাভ হল কি? ওঁর মেয়ের তুল্য আসমানতারা—তাকে অপমান! পর্দ্দা আব্রু সকলি গেল বিফলে! আচ্ছা, আসুক গাঁয়ের তাগাদা থেকে ফিরে। জুতিয়ে লম্বা করে দেবেন বিপ্রপদ!

আসমান খুশী হয় সব শুনে।

নালিশটা মোবারকের বিরুদ্ধে!······

একটু বেশী রাত্রেই মোবারক কাছারীতে ফেরে।

'হুজুর ডেকেছেন তোমাকে।' সংবাদটা জানায় বংশী দারওয়ান।

মোবারক ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। এ রকম ডাক তো কত দিন পড়ে, কিন্তু আজকের ডাক যেন স্বতন্ত্র মনে হয়। তবু না গিয়ে উপায় নেই।

মোবারক সেলাম দিয়ে দাঁড়াইতেই বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'তোমার সাথে কথা আছে, দাঁড়াও—হাতের কাজ শেষ করে নি।'

এর পর ওর গলাটাই বোধ হয় কাটা যাবে এমনি ভাবে ও তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিপ্রপদর হাতের কাজ সারা হতে বেশীক্ষণ লাগে না। তিনি ভেবে দেখেছেন, রাগের মাথায় বেশী চেঁচামেচি করে লাভ নেই, তাতে আসমানতারারই দুর্ণাম হবে। মোবারককে কেউ দোষ বলবে না। স্ত্রীলোকটাই নষ্ট, এই কথাই সকলে বিশ্বাস করবে—এত দিনের চেষ্টা-যত্ন সব হবে বৃথা।

মোবারক মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! বিপ্রপদ ওকে ধীরে ধীরে উপদেশের ছলে তিরস্কার করে যান। বুঝিয়ে দেন যে এ সব অত্যন্ত গর্হিত। তার পর মোলায়েম করে [illegible] একটা পেয়াদার কাছে বলেন, 'তোমারও তো মা-বোন আছে মোবারক, তাদের সাথে যেমন করে বাস করো, তেমনি [illegible] তোমার চলা উচিত। তুমি যদি নিজে না বোঝ [illegible] কি পারবে তোমাকে বোঝাতে! এই যে মেয়েটা এখানে রয়েছে, এর ভাল-মন্দের জন্ম তোমরা কেউ এতটুকুও দায়ী নও, শুধু আমারই দায়িত্ব—যদি এই কথাই মনে-মনে ভেবে থাকো তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই। তোমার উঠতি বয়স, একটু লেখা-পড়া জানো, বেশ চালাক-চতুরও আছ—চাকরীতে উন্নতির খুবই আশা তোমার রয়েছে, একটা বদ্-খেয়ালে তা' কি তোমার নষ্ট করা ভাল? লোকে বলবে কি?'

'হুজুর, আমাকে আর বলবেন না—এ-যাত্রা মাপ করুন, আপনি বাপ সমতুল।' মোবারকের কণ্ঠ অনুশোচনায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

বিপ্রপদ আর কিছু বলেন না। [illegible] ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তিনি যেন নিষ্কৃতি পান।

এর পর রীতিমত কাছারীর [illegible] আসমানতারারও পড়া-শুনা চলে [illegible] সদরের হুকুম আসে, বিপ্রপদ তা তামিল করেন। [illegible] কাছারীর কাগজ-পত্র দেখেন—গতানুগতিক ভাবে সব চলতে থাকে। তবে সময় সময় আসমানের ছেলেটার কথা মনে পড়ে, বেশী করে মনে আলোড়ন আনে যখন ডালিম-বাগানের পথ দিয়ে যাতায়াত করেন।

হঠাৎ এক দিন মফঃস্বল থেকে ঘুরে এসে সংবাদ পান: আসমানতারা নেই, সে মোবারকের সাথে পালিয়েছে।

'কি, পালিয়েছে!' বিপ্রপদ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে ভাবেন, ভালই হয়েছে। তিনি আজ সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি আজ বাস্তবিকই নিশ্চিন্ত। তাই প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন।

[ক্রমশঃ

চাওয়া ও পাওয়া

দিলীপ দে-চৌধুরী

প্রথম কথাই তার—'কই,

খুব তো দিলেন প'ড়তে আমাকে বই!'

—'ওই যাঃ! ভুলে গেছি একেবারে—

নানান্ কাজেতে এ-ধারে ও-ধারে

প'ড়েছি জানেন এমনি এ ঝালাতনে

কিছুই থাকে না মনে:

লজ্জিত আমি, ছিঃ ছিঃ!'

—'কেন আর মিছিমিছি—

লজ্জার কথা তোলা

স্বভাবই যাদের ভোলা

লজ্জা কী আছে বলুন তাদের এটাতে?'

সত্যিই তাই—লজ্জা কী আছে এটাতে—

ক'টা চাওয়া কার

নিঃশেষে আর

পেরেছি জীবনে মেটাতে!

যুগাবতারগণ ও গান্ধীজী

শ্রীশতদল বিশ্বাস

১

যুগে যুগে হয়েছে জগতে অবতারগণের আবির্ভাব। তাঁরা এসেছেন মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে।

জগৎবাসী যখনই ভুলে যায় তার সৃষ্টিকর্তাকে, যখনই মন্দের হয় জয়, মানব যখন পাপ-পঙ্কে ডুবতে থাকে, তখনই ভগবান পাঠান এই যুগাবতার মহামানবগণকে। তাঁরা বিপথগামী নিমজ্জমান্ মানব-জাতিকে আবার টেনে তোলেন উপরে তাই এঁরা মানব জাতির প্রতি ভগবানের প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান।—এঁরা দেখিয়ে দেন মানব-জাতিকে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কি।—এঁরা দেখিয়ে দেন যে পথ—সে পথ সত্যের, জ্যোতির ও মঙ্গলের সন্ধান জানিয়ে দেয় তাই মানুষ আবার ফিরে পায় তার লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব তার পশুত্বের উপর জয় লাভ ক'রে; মানুষ অনুপ্রেরণা পায় তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করতে। জগদ্বিখ্যাত [illegible] সক্রেটিস্ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে নিজের প্রাণ অম্লান [illegible] বলি দিয়েছিলেন।

[illegible]—এই সব মহাপুরুষদের মধ্যে কয়েক জন। [illegible] মনে মনে ওল্‌টালে কার না স্মরণ হয় [illegible] সেই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক আর এক [illegible] জৈনধর্ম-প্রবর্ত্তক 'জীন্' মহাবীরের কথা?

মহা[illegible] আবির্ভাব হয়, বৈদিক যুগের শেষ ভাগে; এই সময় [illegible] অথবা ঐতিহাসিক ভাষায় আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা অতি [illegible] হয়ে উঠেছিল।

এই যে ঘোর অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণগণ যখন ধর্মের নামে নানারূপ অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত [illegible] ও নিম্নবর্ণগণ যখন তাঁদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন [illegible] ধর্মের উপর বীতরাগ হয়ে, যখন তাঁরা প্রকৃত ধর্মের জন্য [illegible] হয়ে উঠলেন—যে ধর্ম শিক্ষা দেবে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের [illegible] রক্ষা করতে, সেই সময় হল এক যুগাবতারের আবির্ভাব—[illegible] 'জিন' মহাবীর, 'জয়ী' মহাবীর, 'আত্মজয়ী' মহাবীর। জৈনধর্ম [illegible] পার্শ্বনাথের ন্যায় ঐতিহাসিক [illegible]।

[illegible] ধর্মের মূলমন্ত্র "চতুর্যাম" নামে বিখ্যাত। [illegible] অপরিগ্রহ এই চারিটির সাধন চতুর্যাম" [illegible] পর মহাবীর "জিতেন্দ্রিয়তা" এই চারিটি [illegible]।

[illegible] সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার নাই, জাতিভেদও তাঁরা মানতেন না। 'আত্মজয়ী' পুরুষই 'নির্বাণ' বা মোক্ষ লাভ [illegible] এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অহিংসা ও ইন্দ্রিয় জয়ই ধর্মাচরণের একমাত্র পথ এই ছিল তাঁদের ধারণা।

মহাবীরের সমসাময়িক বুদ্ধদেব তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-বিভোর জগতে এলেন ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে।

পরবর্তী কালে তাঁর প্রচারিত ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লেও গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ছিল খুবই সহজ ও সরল। জৈনদের মত তিনিও বেদের অপৌরুষেয়তা, জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে কামনা-বাসনাই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষ এক জন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী পরজন্মে নানারূপ দুঃখ ভোগ করে,—সুতরাং কামনা-বাসনা বিনাশ করে চিত্তশুদ্ধিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। এই মোক্ষই 'নির্বাণ' অর্থাৎ বাসনা হতে মুক্তি।

শুদ্ধচিত্ত যিনি তিনি কখনও কোনরূপ অধর্মাচরণ করতে পারেন না এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। ধর্মের নামে অনাচার, জীবহত্যা, ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার—এই সব অমানুষিক নৃশংসতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন অহিংসার মন্ত্র। যেখানে হিংসা নাই সেখানে পীড়ন নাই, অত্যাচার নাই, অধর্মাচরণ নাই, হত্যাও নাই। হিংসাই সকল অনর্থের মূল, সুতরাং অহিংসার ব্রত না নিলে মানুষের মুক্তি নাই, জগতেও শান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ও ধর্মের অবনতির প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ, জনসাধারণের কল্যাণার্থে এই দুই মহান্ ধর্মমতের প্রবর্তন হয়।

বৈদিক যুগের শেষভাগে হিন্দুধর্মের যেরূপ অবনতি হয়েছিল, দু' হাজার বছর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে য়ীহুদিগণ সেইরূপ ধর্মের প্রকৃত নির্দেশ ত্যাগ করে বাহ্যিক আড়ম্বর, যাগযজ্ঞ লোক-দেখান দীর্ঘ প্রার্থনা, আচার-বিচার প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ন্যায় ফরিশী ও ধর্মযাজকেরা করগ্রাহী ও পরজাতিদের অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখত, তাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করত, আর ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা অধর্মাচরণ করত। য়ীহুদি জাতির এই ঘোরতর অবনতি সত্ত্বেও তাদের প্রতি তাঁর অসীম প্রেমের নিদর্শন দেখালেন তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখৃষ্টকে জগতে পাঠিয়ে। খৃষ্ট এলেন স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে—জন্মগ্রহণ করলেন দরিদ্র সূত্রধরের ঘরে। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনিও ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। সে এক অপূর্ব ধর্ম—প্রেমের, ক্ষমার ধর্ম। তিনি মিশলেন একেবারে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে। যাদের করত সকলে ঘৃণা তাদের তিনি ভালবাসলেন নিজের ভাই-এর মত। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হলেন তিনি। রোগীকে দিলেন আরোগ্যদান—দুঃখীর নয়ন-জল দিলেন মুছিয়ে—বুভুক্ষুর মুখে দিলেন অন্ন তুলে—করুণায় গলে গিয়ে মৃতকেও করলেন জীবন দান।

যীশুখৃষ্ট তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ভণ্ডামি না করতে—অকপট হতে। তাদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে বিশ্রাম করে কোন কাজ করতে। যীশুখৃষ্ট তাদের শিক্ষা দিলেন শাস্ত্রবিধি আক্ষরিক ভাবে পালন না করে তার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে। বার বার বলেছেন তিনি—বাহ্যতঃ শাস্ত্রবিধি আক্ষরিক ভাবে পালন করে মনের ভিতর কুচিন্তা পোষণ করা অপেক্ষা বরং শুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধ বিবেকে অপরের কল্যাণার্থে শাস্ত্রনির্দেশ অমান্য করাও বাঞ্ছনীয়। জোর গলায় বলেছেন তিনি—"মানুষ শাস্ত্রের জন্য সৃষ্ট হয়নি শাস্ত্রই হয়েছে মানুষের জন্য।" শুধু নিম্নজাতি নিম্ন বর্ণের লোকেদেরই তিনি নেননি কাছে টেনে—পাপী-তাপীও যখন পরিতাপানলে চিত্তশুদ্ধি করে এসেছে ছুটে তাঁর কাছে, তিনি তাকেও টেনে নিয়েছেন কাছে। যীশুখৃষ্ট বার বার জনসাধারণকে বলেছেন—ভগবান তোমার টাকাকড়ি ধনরত্ন কিছুই চান না, চান শুধু তোমার হৃদয়খানি···তাঁকে ভালবাস। কিন্তু তাঁকে ভালবাসতে হলে আগে তোমায় ভালবাসতে হবে মনুষ্য মাত্রকে। তোমার মতই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ—যে তোমারই মত সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তার দুঃখ-ব্যথা যদি বুঝতে

না পার, তাকে যদি ভালবাসতে না পার, তা'হলে কেমন করে পারবে সেই অদৃশ্য ভগবানকে ভালবাসতে? নারায়ণকে ভালবাস যদি তবে আগে ভালবাসবে নর-নারায়ণকে।

বড় কঠোর আদেশ! ভগবানকে ভালবাসা তো সহজ নয়। আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ মনোমালিন্য হলে সহজে পারা যায় না তাকে ক্ষমা করতে মন খুলে—তা শত্রুকে! কিন্তু কঠোর হলেও যে এ আদেশ পালন করা একেবারে অসম্ভব নয় তা দেখিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর নিজের জীবনে।

মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, শত্রুকে ক্ষমা করা, তাকে ভালবাসা ব্যতীত জগতে শান্তির—মানব জাতির কল্যাণের আর কোন পন্থা নেই। তাই তাঁর এই ধ্রুব বিশ্বাসের নির্দেশ মত চলেছিলেন তিনি, প্রচার করেছিলেন তার মত জনগণ সম্মুখে। পরকে ভালবাসা ও শত্রুকে ক্ষমা করা মানে নিজের 'আমিত্ব'কে বলি দেওয়া। 'অহম্'এর আস্থা আর থাকবে না মনের কোণেও—'আমিত্ব' ও 'স্বামিত্ব' করতে হবে ত্যাগ নিজেকে নিঃস্ব—শূন্য করে দিতে হবে বিলিয়ে পরের কল্যাণার্থে। এ যে বড় কঠোর নির্দেশ—দু'হাজার বছর পূর্বে তাই যেমন য়ীহুদিগণ হত্যা করেছিল প্রেমের অবতার যীশু খৃষ্টকে আজ তেমনই হত্যা করলুম আমরা মহাত্মাজীকে। হায় রে আত্ম-সর্বস্ব মানুষ, বুঝলে না তুমি প্রেমের মহিমা—ক্ষমার মহত্ব! বধ করলে তাই তুমি সেই প্রেমের অবতারকে।

মহাত্মা গান্ধীর ভারতবাসীর মুক্তির জন্য আবির্ভাব হল—যখন ভারতবাসী প্রায় দেড় শত বছর ধরে বিদেশীর দাসত্ব করে করে হারিয়ে ফেলেছিল তার আত্মমর্যাদা জ্ঞান—হারিয়ে ফেলেছিল তার মনুষ্যত্ব।

২

ভারতের ভাগ্যাকাশের মহা সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হল মহাত্মা গান্ধীর। পুণ্যবতী জননীর নিকট তিনি লাভ করেছিলেন প্রবল ধর্মানুরাগ, অবিচলিত সত্যানুরাগ ছিল তাঁর ভগবানদত্ত নিজস্ব মহা গুণ।

যে জননীর মুখখানির স্মৃতি সম্বল করে বিদেশে কাটিয়েছেন তিনি দীর্ঘ প্রবাসকাল; স্বদেশে ফিরে সেই অতি প্রিয় মুখখানি দেখবার আর অবকাশ পেলেন না তিনি। গভীর শোকে তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না মানসিক স্থৈর্য ও শক্তির প্রভাবে। তাঁর জননীর স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করল তাঁর দেশ-মাতৃকা।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কার্যানুরোধে গিয়ে নিজ দেশবাসী এবং কৃষ্ণকায় জাতি মাত্রেরই শ্বেতকায় প্রভুদের নিকট অকথ্য নির্যাতন ভোগ দেখে জেগে উঠেছিল তাঁর প্রাণে দেশাত্মবোধ। কৃষ্ণকায়দের আত্মসম্মান-বোধ ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান জাগিয়ে তুললেন তিনি। নিরস্ত্র একাকী তিনি সশস্ত্র বিদেশীর সম্মুখীন হয়েছিলেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে-ছিলেন—"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" তাই তিনি অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের জঘন্যতম কলঙ্ক বলে মনে করতেন। শৈশব কাল হতে তিনি অস্পৃশ্যতার সমর্থন করতে চাইতেন না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপর উচ্চবর্ণের সামাজিক অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেছেন—"বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলি তাহারা অত্যাচারী, কিন্তু এমন কোন্ অত্যাচার, এমন কোন্ অনাচার বিদেশী গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর করিয়াছেন, যাহা আমরা আমাদের স্বদেশবাসী—আমাদের স্বজাতির উপরেই প্রয়োগ করি নাই?"···অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি অনুকম্পায় তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসীকে যেমন তিনি চেয়েছিলেন বিদেশীর পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে তেমনিই তিনি চেয়েছিলেন অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বদেশবাসী উচ্চবর্ণের অত্যাচারের হাত হতে মুক্ত করতে। একাধারে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—বিদেশীর উৎপীড়নের ও সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দেশ-প্রেমিক হলেও তিনি দেশবাসীর ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। গোড়ায় গলদ মুক্ত করতে তিনি সম্মার্জনী ধরেছিলেন, কিন্তু শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লাঠিগাছিও উত্তোলিত করেননি।—সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর স্থির বিশ্বাস ছিল সত্যের আশ্রয় নিলে, সত্যের পথ ধরলে জয় অবশ্যম্ভাবী তাই বিদেশীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান তিনি "সত্যাগ্রহ" নামে অভিহিত করলেন। এত বড় অস্ত্র ধরলেন তিনি বিদেশীর বিরুদ্ধে যে তাকে হার মানতেই হল। 'এ্যাটম বম্বে'র শক্তিও আজ এর কাছে পরাজিত। তাই ভাবি, আজ মহাত্মা মানব-জাতির চক্ষে তাঁর কোন্ কীর্ত্তির জন্য অমর হবেন? রাষ্ট্রীয় জগতে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাশ হতে মুক্ত করবার জন্য? না—ধর্ম-জগতে ভারত-বাসীকে তার আভ্যন্তরিক দুর্নীতির পাপ-পাশ হতে মুক্ত করবার প্রচেষ্টার জন্য?···

যুগে যুগে যে মহাপুরুষ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে—সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের অমরকীর্তি সমগ্র মানব-জাতির মর্মে মর্মাক্ষরে রয়েছে গাঁথা। মহাত্মা গান্ধী তাঁদের সকলের প্রচেষ্টার অনুধাবন করেছেন নিজের জীবনে। সক্রেটীসের মতই তিনি সত্যাশ্রয়ী—জৈনদের মতই 'অহিংসার' ব্রত তিনি করেছিলেন বরণ—বৌদ্ধদের কাম্য 'নির্বাণ' তিনি লাভ করে-ছিলেন কামনা-বাসনা ত্যাগ করে চিত্ত শুদ্ধি করে।' তবু সংসার-ধর্ম তিনি পালন করেছিলেন। সংসার-ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে-ছিলেন—জগৎকে দেখিয়েছিলেন সংসারী মানবও কেমন করে পারে সংসারের মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে। গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত এই মহাধর্ম সাধারণের কল্যাণার্থে, তাদের প্রতি তাঁর অসীম প্রেম, করুণা ও সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তাই তাঁর প্রচারিত অপূর্ব ধর্মে,—প্রেমের ধর্মে, ত্যাগের ধর্মে, ক্ষমার ধর্মে, যার তুলনা হয় শুধুই খৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত মহান্ প্রেমের ধর্মের সঙ্গে—যে ধর্মের অনুধাবনে মানব পায় অমৃতের সন্ধান, চির-জ্যোতির সন্ধান, অসীম আনন্দের সন্ধান, অনন্ত জীবনের সন্ধান।

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় হেড-মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া গাঙ্গুলী মশায় বিনয় মাষ্টারের বাড়ী গেলেন। বিনয় আপ্যায়ন সহকারে তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসাইয়া কহিল—"সব ঠিক আছে। একটু গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিচ্ছে। আপনাদের সামনে বেরোতে হবে কি না—" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। মাষ্টার মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"হাসছ যে?"

মাষ্টার কহিলেন—"না, না, হাসিনি তো। হাসব কেন? হাসবার কি আছে এতে—" বলিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-বেলায় বিনয় বললে অনেক করে একবার শুনে যেতে। হাকিম-টাকিমদের সামনে যা'-তা' পড়লে তো চলবে না! তা'ছাড়া মেয়েমানুষ। একবার দেখে দেওয়া দরকার। আমি বললাম, আমি কিছু তো বুঝি না। মাষ্টারকেও সঙ্গে নাও। ও যদি পছন্দ করে তো কোন ভয় নাই।"

কিছুক্ষণ পরে বিনয় আসিয়া দুই জনকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ীটি ছোট, মাটীর—খড়ে ছাওয়া, সামনে অপ্রশস্ত বারান্দা, তার পরেই পাশাপাশি দুইটি কুঠুরী। ডান পাশের কুঠুরীতে তাহাদের বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘরে ঢুকিতেই ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া পাশাপাশি দুইটি আসন পাতা, প্রত্যেকটি আসনের সামনে রেকাবীতে খান-চার লুচি, আলু-ভাজা, দু'টি রসগোল্লা, এক পাশে এক গ্লাস জল, আর এক পাশে এক কাপ চা।

দুই জনেই বলিয়া উঠিলেন—"ও-সব আবার কি?"

বিনয় সবিনয়ে কহিল—"কত ভাগ্যে আমার মত অভাজনের বাড়ীতে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে। একটু মিষ্টি-মুখ করাব না?"

মাষ্টার কহিলেন—"তা' বেশ করেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা—"

বিনয় কহিল—"খেয়ে নিন। তার পর চা খেতে-খেতে শুনবেন।"

বাড়ীর উঠানের দিক্ হইতে অনেকগুলি মেয়ের চাপা কথা-বার্তা ও হাসির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে-মাঝে একটি কোমল কণ্ঠের তর্জ্জন। তার পরেই মিলিত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাসকে সবলে দমন। বাড়ীর ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সাজিয়া-গুজিয়া ঘরটার ও-পাশটায় সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-ভরা চোখে ইঁহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বহু দিনের কথা মনে পড়িল গাঙ্গুলী মশায়ের। উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। কুলীন বামুনের ছেলে। অনেক যায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। কোনটি বাবার পছন্দ হইতেছে তো ঠাকুরদাদার হইতেছে না; আর যদি দু'জনেরই পছন্দ হইতেছে তো মায়ের পাঁচশ' রকমের বায়নাক্কার দাপটে তলাইয়া যাইতেছে। এদিকে একটি নোলক-পরা কিশোরীকে বাহুপাশে বাঁধিবার জন্ত তাঁহার প্রাণ হাহাকার সুরু করিয়াছে। পূজার পরেই মামার বাড়ী গিয়াছিলেন গাঙ্গুলী মশায়। এক দিন বড় মামী বলিলেন, আমার ছোট ভাইঝিটি দেখতে-শুনতে খাসা, বাছা! বৌ করবার মত মেয়ে; বিয়ে করবি তো বল্, তোর মামাকে দিয়ে তোর ঠাকুরদাকে চিঠি লেখাই। তাঁহার বুকটা ময়ূরের মত পেখম ধরিয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরম ঔদাস্তের সহিত বলিয়াছিলেন, আমাকে বলে কি হবে মামী? ওদের চিঠি লেখাও। মামী বলিলেন, তা তো লেখাবই, বাছা! তবে তুই আগে একবারটি দেখ, তোর যদি পছন্দ হয়তো চিঠি লেখানোর ব্যবস্থা করব। মেয়েটিকে দেখানো হইয়াছিল তাঁহাকে। বারো বৎসরের কিশোরী মেয়ে, চাঁপা ফুলের মত রং, পরনে নীলাম্বরী শাড়ী; নতমুখে আসিয়া তাঁহার হাতে দুইটি পান দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মেয়েটিকে ভারী পছন্দ হইয়াছিল তাঁহার, কিন্তু মেয়ের বাপ ভঙ্গ-কুলীন বলিয়া বিবাহ হয় নাই। ওদিকে মা, বাবা ও ঠাকুরদাদার ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়া গেল; ফলে গৃহিণী তাঁহার ঘাড়ে চাপিলেন।

সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন গাঙ্গুলী মশায়। মনে হইল, বয়স অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। সে-দিনের যে আবেগের চাপ অবলীলাক্রমে হৃদয় বহন করিয়াছিল, পুরাতন বয়লারের মত এখন সে চাপ সহ্য করিতে পারিবে না। রসগোল্লা দুইটি শেষ

করিয়া গেলাস হইতে আলগোছে কতকটা জল গিলিয়া বাকী জলটাতে মাথার সামনেটা ও রগ দুইটা ভিজাইয়া লইলেন।

বিনয় কহিল—"চা খাবেন না?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"না, ভায়া! ভারী গরম!"

বিনয়ের শ্যালিকা অবিলম্বে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইল। বয়স বিনয় বাড়াইয়া বলে নাই। ত্রিশ তো বটেই—দু'-এক বৎসর বেশীও হইতে পারে। লম্বা, দোহারা চেহারা; কালো রং; পরনে ছাই-রংএর বুটিদার ঢাকাই শাড়ী; ফিকে সবুজ রংএর ব্লাউস। শাড়ীর আঁচলটি গলায় বেড়ানো। মাথায় এলো খোঁপা। মুখখানি শান্ত, গম্ভীর। ধীর-পদে আসিয়া যুক্তহস্তে নমস্কার করিয়া আনত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় সাহস দিয়া কহিল—"লজ্জা কি, পড়।"

মেয়েটি এক খণ্ড কাগজে-লেখা গাঙ্গুলী-প্রশস্তি ধীর ভাবে, সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়িয়া গেল এবং শেষ হইবা মাত্র আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটি বাহিরে যাইবা মাত্র সমবেত নারীকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইল।

গাঙ্গুলী মশায় সশঙ্কে কহিলেন—"ও আবার কি?"

বিনয় কহিল—"মেয়েরা কেমন করে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে আপনাকে আবাহন করবে, তাই শুনিয়ে দিল আর কি।"

মাষ্টার মশায় গম্ভীর মুখে কহিলেন—"মাল্য-চন্দন দিয়ে বরণটারও রিহার্শেল হবে না কি?"

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"না, না, ভায়া, ও সব থাক।"

গাঙ্গুলী মশায় তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে, বলে দিও মেয়েটিকে; কি হে মাষ্টার, ভাল হয়নি?"

মাষ্টার মশায় কহিলেন—"খুব ভাল হয়েছে। যেমন মিষ্টি গলার স্বর, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ। পাঠটিও বেশ ধীর ভাবে করেছেন। বেশ ভাল হয়েছে, বলে দেবেন ওঁকে। খুব ভাল লেগেছে আমার, গাঙ্গুলী মশায়েরও—"

তিন জনে বাহিরে আসিলেন। রাস্তায় নামিয়া গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীটার চালের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"ঘরের চালটা গেছে যে হে! এ বছর না ছাওয়ালেই নয়।"

বিনয় কহিল—"সেদিনের ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে; আর দেরী করলে চলবে না; বৃষ্টি হলেই ভিজতে হবে বাড়ীর সবাইকে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"না না, দেরী কিসের? ব্যবস্থা করে দেব। প্রফুল্লর বাড়ীর অবস্থা কি?" বিনয়, ওর এ বছরটা চলে যাবে—"

এই বাড়ী দুইটি গাঙ্গুলী মশায়েরই সম্পত্তি। এ-পাড়ায় আগে ঘর-কয়েক রাজপুত বাস করিত। তাদের অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু রাজপুতদের স্বাভাবিক অমিতব্যয়িতার জন্য অবস্থা তাহাদের খারাপ হইয়া আসে। গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে অনেক টাকা দেনা করে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে জমি-জমা, ঘর-বাড়ী গাঙ্গুলীর মশায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যে বাড়ীগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল—বর্ষায়, বাদলে পড়িয়া গিয়াছে। কেবল দুইটি বাড়ী বাসযোগ্য ছিল বলিয়া গাঙ্গুলী মশায় মেরামত করিয়া লইয়াছেন। এবং গ্রাম হইতে একটু দূরে হইলেও স্কুলের খুব কাছে বলিয়া, স্কুলের দুই জন শিক্ষককে নাম-মাত্র ভাড়ায় বাস করিতে দিয়াছেন।

বিনয়ের কাছে বিদায় লইয়া গাঙ্গুলী মশায় দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। মুখে কোন কথা নাই। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব। মাষ্টার মশায়ও নীরবে পাশে-পাশে চলিতে লাগিলেন। মাঝে-মাঝে গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া তাঁহার মানসিক অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় লোক-জন নাই। সারা গ্রামটি সারা দিনের কর্ম্মব্যস্ততার পর বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে যেন। দূরে বাউরীপাড়া হইতে সমবেত কণ্ঠে গান ও খোলের শব্দ কানে আসিতেছে। গাঙ্গুলী মশায়ের প্রশস্তি গানটি রপ্ত করিতেছে সম্ভবতঃ।

অনেকক্ষণ পরে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মেয়েটিকে বড় দুঃখী বলে মনে হল, না?"

মাষ্টার কহিলেন—"হুঁ—"

—"হবেই তো! এত বয়স হ'ল বিয়ে হয়নি। পরের দয়ায় বেঁচে থাকা তো?"

—"সত্যি!"

—"তা' বয়স কত হবে বলে মনে হল?—"

—"ত্রিশ তো বটেই—"

—"আমারও তাই মনে হয়। বিনয় মিথ্যে বলেনি—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্বাস্থ্যটিও ভাল। ডাক্তার-বদ্যির জন্যে পয়সা খরচ করতে হবে না ওর স্বামীকে।"

মাষ্টার কহিলেন—"তা' বটে! অবশ্য যদি বিয়ে হয়—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বিয়ে হবে না কেন? একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।"

মাষ্টার মনে-মনে হাসিয়া কহিলেন—"ওর উপযুক্ত পাত্র কই এ গ্রামে? কোন ছোকরার ঘাড়ে তো চাপানো চলবে না। বেশ একটু ভারী বয়সের বর না হলে মানাবে না ওকে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা তো বটেই! ত্রিশ-বত্রিশ যদি বয়স হয় তো আরও দশ বছর যোগ কর; চল্লিশ-বিয়াল্লিশের পাত্র চাই, নিদেন পঞ্চাশ পর্য্যন্ত—"

—"অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ হওয়া চাই। তা' সে-রকমও তো গাঁয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! প্রথম পক্ষগুলি তো সবারই জল-জ্যান্ত বেঁচে!"

নাভি-শ্বাস ফেলিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা' সত্যি!"

মাষ্টার কহিলেন—"আপনার মামাতো-ভাইয়ের ছেলেকে আসতে চিঠি লিখেছেন?"

—"লিখেছি তো।"

—"তিনি তো বিয়ে করেননি এখন পর্য্যন্ত।"

—"না।"

—"তাঁর বয়স কত হবে?"

—"তা' চল্লিশের কাছাকাছি হবে বৈ কি!"

—"তাঁকে একবার বিয়ের জন্যে ধরলে হয় না? আর তো জেলে যেতে হবে না ওঁদের। এবার একটা ভাল কাজ-টাজ বাগিয়ে বে'-থা করে সংসার করলেই পারেন।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও কেন ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে? কলকাতায় থাকে। কংগ্রেসের নাম-করা লোক। কত বড় কাজ পাবে। সাহেব বলছিলেন, মন্ত্রীই হয়ে যেতে পারে হয়তো। কলকাতার কত বড়-ঘরের ভাল-ভাল মেয়ে ওকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুলোঝুলি সুরু করে দিয়েছে দেখ গে!"

—"তা' হ'লেও একটা গরীব অসহায় মেয়ের সদ্গতি ওঁরা ছাড়া কে করবে? আমার মনে হয়—"

গাঙ্গুলী মশায় বাধা দিয়া কহিলেন—"ও-সব আশা ছাড়, ভায়া! দেশোদ্ধার করেছে বলে যে সে একটা মেয়েকে সারা জীবন ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবে, সে লোক ওরা নয়।"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

বাড়ীর কাছে আসিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"আজকার ব্যাপারটা আর কাউকে বলে কাজ নাই। কি বল? কে কি ভাববে। দরকার কি!"

মাষ্টার কহিলেন—"কি দরকার! বলব না কাউকে।"

৪

দিন-দুই পরে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী হেড-মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। হেড-মাষ্টার-গৃহিণী আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে বসাইলেন। দু'-চার কথার পরে প্রফুল্লর স্ত্রী কথাটা পাড়িল—"আপনার কর্ত্তাটি যে সেদিন আমাদের পাড়াতে গিয়েছিলেন—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী কহিলেন—"কেন?"

—"আমাদের বিনয় বাবুর এক-পাল শালী এসেছে কি না! বেশ ডাগর-ডোগর সবগুলিই—বড়টি তো আমাদের বয়সী—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"বিনয় বাবুর শালীরা এসেছে তো উনি ছুটবেন কেন?"

প্রফুল্লর স্ত্রী কহিল—"না, না—উনি একা যাননি। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী নীরস কণ্ঠে কহিলেন—"গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গেই বা যাবেন কেন?"

প্রফুল্লর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"ও মা! আপনি তা' হলে কিছু জানেন না?"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—"না তো! আমাকে কিছু বলেননি—"

প্রফুল্লর স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"গাঙ্গুলী বুড়োর যে জন্মদিন!"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"সে আবার কি! বাহাত্তুরে বুড়ো! মরবার দিন ঘনিয়ে আসছে—ওর আবার জন্মদিন! ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদেরই তো জন্মদিন হয়। দিন, তিথি দেখে, নতুন কাপড় পরিয়ে পরমান্ন খাওয়ানো হয়—"

প্রফুল্লর স্ত্রী লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, সহরের অনেক খবর রাখে। কহিল—"আজকালকার রেওয়াজ, দিদি! বড় বড় লোকদের—জোয়ানই হোক, বুড়োই হোক, সবাই মিলে 'জন্মদিন' করে। সভা-সমিতি হয়, গান-বাজনা হয়, বক্তৃতা হয়, যুবতী মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, চন্দনের ফোঁটা পরায়, গলায় মালা দেয়—"

—"তাই না কি? কি জানি, ভাই! পাড়াগেঁয়ে মানুষ! গাঙ্গুলী বুড়োর জন্যেও ঐ সব ব্যবস্থা হচ্ছে না কি? তা' হলে মালা-চন্দন দিচ্ছে কে?"

প্রফুল্লর স্ত্রী মুচকি হাসিয়া কহিল—"বিনয় বাবুর বড় শালী দেবে।"

—"বল কি! ঐ ধাড়ী মেয়েটা সভায় দাঁড়িয়ে বুড়োকে মালা পরাবে?"

—"তাতে আর লজ্জা কি, দিদি! গাঁ-শুদ্ধ লোকের সামনে এক দিন মালা পরাতে হবে যখন—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সোৎসুক কণ্ঠে কহিলেন—"তার মানে?"

প্রফুল্লর স্ত্রী চোখ মটকাইয়া কহিল—"মেয়েটাকে যে বুড়ো বিয়ে করবে। দিন মাছ-তরকারী যাচ্ছে—নূতন করে ঘর-ছাওয়া হচ্ছে—"

হেড-মাষ্টারের স্ত্রী গভীর বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"বল কি! সত্যি?"

—"হ্যাঁ। উনি বলছিলেন 'জন্মদিন' চুকে যাবার পর বুড়ীকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে বুড়ো বিয়ে করবে।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"বুড়ী যদি না যেতে চায়?"

—"না যায় তো মার খেয়ে মরবে! যা' দশা-সই মেয়ে, ওর হাতের গোটা কয়েক কিল খেলে বুড়ীকে উঠে দাঁড়াতে হবে না।"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"ছিঃ ছিঃ, এই কাণ্ড! আর উনি এর মধ্যে আছেন? আসুন আজ একবার বাড়ীতে, মজাটা দেখাচ্ছি। আর বুড়ীর কাছেও যাব আজ। বলে দিয়ে আসব সব। আর বলে দেব পই-পই করে—বাড়ী থেকে এক-পা নড়বেন না। আচ্ছা, গাঁয়ের ছোকরারা এ কথা শুনেছে?"

—"ওদের যে টাকা দিয়ে বশ করেছে। তা' ছাড়া ভিতরের কথা আর কেউ জানে না—এক আপনার কর্ত্তা আর বিনয় বাবু ছাড়া—"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী রাগত কণ্ঠে কহিলেন—"আসুন একবার তিনি—এ-সবের মধ্যে থাকা আমি বার করব। আর গাঙ্গুলী-দিদিমাকে বলে বুড়োকেও টিট্ করবার ব্যবস্থা করব—"

সেই দিন রাত্রে হেড-মাষ্টার বাড়ী ফিরিবা মাত্র তাঁহার গৃহিণী কহিলেন—"হ্যাঁ গা, তোমার বয়স কত হল?"

হেড-মাষ্টার সবিস্ময়ে কহিলেন—"কেন বল দেখি? বয়স নিয়ে কি হবে?"

গৃহিণী একদৃষ্টে তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হেড-মাষ্টার অস্বস্তির সহিত কহিলেন—"ও কি হচ্ছে! এমন প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে দেখছ কি? কখনও দেখনি না কি আমাকে?"

হেড-মাষ্টার-গৃহিণী শ্লেষের স্বরে কহিলেন—"ভাল করে দেখছি গো! বয়স তোমার বাড়ছে, না, কমছে—"

মাষ্টার কহিলেন—"বয়স বাড়বে না তো কি কমবে? আমারও বাড়ছে, তোমারও—"

—"আমার তো বাড়ছেই। কিন্তু তোমার শুনছি কমছে। ছুকরী মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি সুরু করেছ।"

হেড-মাষ্টার সভয়ে কহিলেন—"ও-সব আবার কি কথা ?"

—"হ্যা গো। শুনলাম্ যে। যে নিজের চোখে দেখেছে, সে বলে গেল যে। গাঁয়ে এতক্ষণ ঢি-ঢি পড়ে গেছে দেখ গে। যে আমাকে বলে গেল, সে কি এতক্ষণ গাঁয়ের সবাইকে বলতে বাকী রেখেছে ?"

—"কার কাছে যা'-তা' শুনেছ। ও সব বাজে কথা—"

এবার গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন—"বাজে কথা নয়। স্বচক্ষে দেখেছে—"

হেড-মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, "কথা বল না যে ? ব্যাপার কি বল দেখি ? বিনয় মাষ্টারের বাড়ীতে এত আনাগোনা করছ কেন ? কোন একটি শালীকে ঘরে আনবার মতলব আছে না কি ?"

হেড-মাষ্টার কহিলেন—"ছিঃ ছিঃ, ও-সব কি কথা ? ছোট বোনের মত সব—"

—"আনাগোনাটা সত্যি তা' হলে ?"

—"আনাগোনা নয়, এক দিন গিয়েছিলাম গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে। মেয়েটির একটি কবিতা পাঠ শুনবার জন্যে—"

—"হঠাৎ মেয়েটির কবিতা পাঠ করবার সখ হ'ল কেন ? আর তা' শুনবার জন্যে তোমাদের ডাক পড়ল কেন ?"

গৃহিণীর সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে মাষ্টারকে 'জন্মদিন' উৎসবের কথাটা বলিতে হইল। শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন—"বুড়োর আবার 'জন্মদিন' করা কি জন্যে ?"

—"ভাল ভাল লোকেদের 'জন্মদিন' করার রেওয়াজ হয়েছে আজ-কাল।"

—"রেওয়াজ তো অনেক দিন থেকেই হয়েছে। হঠাৎ এখনই তোমাদের খেয়াল হ'ল কেন ?"

—"গাঙ্গুলী মশায়ের বয়স হয়েছে। কবে মারা যাবেন। আমাদের কর্ত্তব্য তো করে ফেলাই ভাল।"

—"বেশ, কর্ত্তব্য যদি হয় তো কর গে। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে ওর মধ্যে টানছ কেন ?"

—"টানা আবার কি! বিনয় বাবু বললেন, ওঁর শালী লেখাপড়া-জানা মেয়ে—সভা-সমিতিতে অনেক বার কবিতা পড়েছে—"

—"কবিতা-টবিতা পড়বার দরকার কি ? জন্মদিনে তো শুনি লোকে ভাল পরে, ভাল খায়-দায়—"

মাষ্টার মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিলেন—"আরে, এ সব নিয়ম! এটা তো আর ঘরোয়া ব্যাপার নয়। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে এক জন শ্রদ্ধেয় লোককে শ্রদ্ধা জানানো। তিনি যা' করেছেন তা' স্মরণ করা, বর্ণনা করা, তিনি যেন আরও অনেক দিন বেঁচে থেকে আরও ভাল কাজ করতে পারেন, তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা।"

গৃহিণী কহিলেন—"সভার মধ্যে মেয়েটা না কি বুড়োর গলায় মালা পরাবে ?"

—"হ্যা, পরাবেই তো। ওটাও নিয়ম। সভার মধ্যে তাঁকে সাদরে আবাহন করে নিয়ে গিয়ে মাল্য-চন্দন দিয়ে তাঁকে বরণ করতে হবে। তা' ও-কাজ তো মেয়েমানুষ ছাড়া হয় না।"

—"যুবতী মেয়েমানুষ ছাড়া বল।"

—"তা' আবার কি ? তুমি রাজী হও তো তোমাকে দিয়েই মালা দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—"মরণ আমার! আমার কি দায় পড়েছে ?"

—"তবে ও-সব কথা বলছ কেন ?"

গৃহিণী গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"আমি যা'-যা' শুনেছি—সব মিলে গেল। তা'হলে বাকী খবরটাও নিশ্চয় সত্যি।"

মাষ্টার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"কি খবর ?"

গৃহিণী কহিলেন—"গাঙ্গুলী বুড়ো না কি মেয়েটাকে বিয়ে করবে ?"

মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—"পাগল! কে তোমাকে ও-সব কথা বলে গেছে বল দেখি ? প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী বুঝি ?"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

মাষ্টার সক্ষোভে কহিলেন—"প্রফুল্লরা এই সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে ? ওদের ভাল লোক বলে জানতাম—"

গৃহিণী ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"তোমাদের দলের লোক বলে জানতে বুঝি ? কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে বলে রাগ হচ্ছে ?"

—"দলাদলি আবার কি, গাঙ্গুলী মশায়ের জন্মদিন উৎসব করবার সঙ্কল্প করেছি আমরা। পাছে রাধানাথ আগে থাকতে খবর পেয়ে কাজটা পণ্ড করে দেয়, এই ভয়ে খবরটা গোপন রাখতে বলে দিয়েছিলাম সবাইকে। প্রফুল্ল বিনয়ের কাছ থেকে খবরটা জানতে পেয়ে ঢাক পিটতে সুরু করে দিয়েছে।"

গৃহিণী কহিলেন—"ভালই তো করেছে। ঐ জন্মদিনের ছুতো করে গাঙ্গুলী বুড়োর যে ঐ মেয়েটার সঙ্গে বে দেবে আর বুড়ীকে পথে বসাবে তা' হবে না।" ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন—"বুড়ী তোমাকে এত স্নেহ করেন, এত বিশ্বাস করেন, তার জন্যে কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই তোমার ? গাঙ্গুলী-দিদিমাকে সব বলে দেব কাল।"

মাষ্টার সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"বলছি যে ও-সব মিথ্যে কথা! এ নিয়ে হৈ-চৈ কোরো না। গাঙ্গুলী-দিদিমাকে কিছু বলতে যেও না। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি থাকতে ও-সব কিছু হবে না।"

—"তোমাকে বিশ্বাস কি ? তুমিই তো বুড়োটাকে সঙ্গে করে মেয়েটার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে।"

—"তাতে কি হয়েছে! কবিতাটি কেমন পড়ে—শুনতে গিয়েছিলাম দু'জনে। মেয়ে দেখতে তো যাইনি।"

—"সেইটাই ভিতরে ভিতরে উদ্দেশ্য ছিল।"

মাষ্টার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আসল কথা কি জান, ওখানে যাবার আগে গাঙ্গুলী মশায়ের মনের ভাব কি ছিল জানি না, তবে মেয়েটাকে দেখার পরে একটু ইচ্ছে হয়েছে। তা' দোষ তো নাই, এত বড় সম্পত্তি, ছেলে নাই। তার উপরে গাঙ্গুলী দিদিমার ঐ মেজাজ।"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—"দোষ নাই ? এতগুলো মেয়ে-জামাই

এক পাল নাতি-নাতনী রয়েছে, তাতেও সম্পত্তির জন্তে বুড়োর ভাবনা ? আর ঝগড়া ! কোন্ সংসারে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া না হয় ? তা' বলে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিয়ে করতে ছুটবে ? আমাকেও দেখছি মুখে গুলোপ দিয়ে থাকতে হবে। না হ'লে তুমিও হয়তো কোন দিন—"

মাষ্টার বাধা দিয়া কহিলেন—"কি যে সব বাজে কথা বল !"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন—"বাজে কথা আবার কি ? তোমারও তো ঐ রকম মতি গতি দেখ্‌তে পাচ্ছি। দেখ, ও-সব জন্মদিন-টিন বন্ধ কর। না হলে গাঙ্গুলী-দিদিমাকে বলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব।"

মাষ্টার সশঙ্কে কহিলেন—"না না, ও-সব করতে যেও না। সব পণ্ড হয়ে যাবে তা'হলে। আসছে ইলেক্‌শানে তা'হলে পাত্তা পাওয়া যাবে না। রাধানাথই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়ে যাবে।"

আসল ব্যাপারটা গৃহিণীর কাছে খুলিয়া বলিতে হইল মাষ্টার মশায়কে—"আসছে ইলেক্‌শানে ইউনিয়ন বোর্ডটা আবার হাতে পেতে আগে থাকতে হাকিমদের তোয়াজ করার দরকার। গাঙ্গুলী মশায়ের গুণগ্রাম, কার্য্যকলাপ তাদের কাছে প্রচার করার দরকার। জন্মদিনটা উপলক্ষ করে তাই করা হবে। গাঙ্গুলী মশায়ের মনে মনে যা'-ই ইচ্ছা হয়ে থাক্, আমি থাকতে কিছু হতে দেব না। তুমি হৈ-চৈ কোরো না। চুপ করে থেকে সব দেখ। যদি কিছু ফ্যাসাদ হয় তো তখন বোলো।"

গৃহিণী কহিলেন—"ফ্যাসাদ হয়ে গেলে আর বলে লাভ কি ?"

মাষ্টার দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"কিছু হবে না। যদি দেখি তেমন কিছু হবার উপক্রম হয়েছে তখন তোমাকে বলে দেব। তুমি গাঙ্গুলী-দিদিমাকে সাবধান করে দেবে। কিন্তু এখন কিছু বলতে যেও না।"

৫

দিন-দুই পরে। গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীতে ছিলেন। পিয়ন আসিয়া খান-দুই চিঠি দিয়া গেল। গৃহিণী কহিলেন—"কার চিঠি এল গা ?"

একে একে চিঠিগুলা দেখিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"একটি আমাদের শ্যামলালের।"

গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন—"শ্যামলাল আবার কে ?"

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়-প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আমাদের শ্যামকে চেনো না ? আমার বড় মামার ছেলে—পটলা !"

গৃহিণী এতক্ষণে চিনিতে পারিলেন। কহিলেন—"সেই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা ? লেখা-পড়া শিখে, চাকরী-বাকরী, বে-থা না করে সারা জীবনটা হৈ-হৈ করে কাটালে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-সব কথা বোলো না, গিন্নি! আজকাল সে মস্ত লোক—দু'দিন পরে মন্ত্রী হবে।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন—"তাই না কি ?"

—"হ্যাঁ গো! সত্যি! ইংরেজ তো আর নাই। ওরাই এখন দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। এখানে আসবে লিখেছে—"

—"হঠাৎ এখানে আসছে কেন ?"

—"আপনার লোক, আসবে না ?"

গৃহিণী ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"আপনার লোক তো বরাবরই ছিল গো! সে-বছর যখন আসতে চেয়েছিল, তুমি বারণ করে দিলে। মিথ্যে করে লিখলে—এখানে ভয়ঙ্কর কলেরা হচ্ছে, এসো না।"

—"তখন এক রকম দিন ছিল। ওরা ছিল ইংরেজের শত্রু। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে জানলে সাহেবরা—তাদের দেখাদেখি দেশী হাকিমরাও মারমুখী হয়ে উঠত। ওরা কোথাও গেলে পুলিশ পিছনে লাগত, যার বাড়ী যেত তাকে পর্য্যন্ত নাস্তানাবুদ করত। সে সব দিন বদলে গেছে, গিন্নি ! ও যদি এখন আমার বাড়ীতে আসে, দারোগা বাবু দিন দশ বার আমার বাড়ী আনাগোনা করবে। এমন একটা লোকের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে জানলে হাকিমরা পর্য্যন্ত আমাকে খাতির করতে সুরু করবে।"

হঠাৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"ও কি নিজে হতে আসছে ?"

গাঙ্গুলী মশায় ঢোক গিলিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, এক রকম নিজে থেকে বৈ কি ! মানে, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। রেখোটা ওর সেই কংগ্রেসী মামাতো ভাইটাকে মুরুব্বি ধরে বড় বাড়াবাড়ি করছে কি না ! ইউনিয়ন বোর্ডটা হাতে করে গাঁয়ের সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করছে। তাই সবাই বললে—আপনার যখন এমন এক জন নিজের লোক রয়েছে, তখন একবার এখানে আসতে লিখুন। উনি একবার এলেও অনেক কাজ হবে। কিন্তু কি চমৎকার ছেলে দেখেছ শ্যামলাল, চিঠি পাবা মাত্র লিখছে—যাব।"

হঠাৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁ গা ! সবাই বলছে, তুমি না কি দানছত্র খুলেছ ?"

—"মানে ? সে আবার কি ?"

—মুঠো-মুঠো টাকা খরচ করে বাগ্‌দীদের মনসামেলা সারিয়ে দিয়েছ—ছোকরাদের লাইব্রেরীর বই কিনে দিয়েছ ?"

—"কে বললে তোমায় ও-সব কথা ?"

গৃহিণী অনুযোগের স্বরে কহিলেন—"গাঁয়ের সবাই তো জানে, আমি ছাড়া। আমার কথা অবশ্যি আলাদা। দু'টি ভাত—দু'খানা কাপড় পাচ্ছি, এই ঢের। স্বামী যে কোথায় কি করে তা' জানবার আমার কি অধিকার ? সারা জীবন কুকুর-বেড়ালের মতই কাটল !"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ও-সব আমার টাকা নয়। লোকে বললে কি হবে। ও বোর্ডের টাকা।"

—"তবে লোকে বলে কেন ?"

—"বললে কার মুখে হাত চাপা দেব ?"

গৃহিণী দুই ঠোঁট চাপিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—"তোমার টাকা নয় তো ? বেশ, বলে দিই লোককে ঐ কথা ?"

—"পাগল না কি ! লোকে যদি একটু প্রশংসা করে তো তাতে তোমার কি ? স্বামীর একটু প্রশংসা সহ্যই কর না কষ্ট করে—" বলিয়া আর একটি চিঠিতে দৃষ্টি সংযোগ করিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা আবার কার চিঠি ?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বেয়াই লিখেছেন, কাশী থেকে।"

গৃহিণী সাগ্রহে কহিলেন—"বেয়াই লিখেছেন ? কি লিখেছেন ?"

গাঙ্গুলী মশায় চিঠিটা পড়িতে লাগিলেন। কথার জবাব দিলেন না। গৃহিণী আগ্রহাকুল চক্ষে তাকাইয়া রহিলেন।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া গাঙ্গুলী মশায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আমাদের কি আর সে অদৃষ্ট হবে ?"

গৃহিণী কহিলেন—"কি লিখেছেন ?"

—"বেয়াই লিখছেন, আমাদের দু'জনকে সেখানে যেতে। বেশ বড় একটি বাড়ী পেয়েছেন। কাছেই গুরুদেবের আশ্রম। দু'পা দূরে মা-গঙ্গা। নিত্যি গঙ্গাস্নান করছেন, আর গুরুদেবের উপদেশামৃত পান করছেন। গ্রামে আর ফিরতে ইচ্ছে নাই। যত দিন বাঁচবেন ঐখানেই থেকে যাবেন দু'জনে।"

গৃহিণী কহিলেন—"বেশ করছেন। কি আর হবে সংসারের ঝামেলা সহ্য করে। ছেলে-বৌ যখন উপযুক্ত হয়েছে।"

বেয়াই লোক ভাল, বেয়ান কিন্তু ভারী দজ্জাল। মেয়েকে তাঁহার অনেক হেনস্তা সহ্য করতে হয়। ভগবান সুমতি দিয়াছেন উহাদের। সুমতি বজায় থাকিলে মেয়ে তাঁহার সংসারের কর্ত্রী হইবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী কহিলেন—"বেশ কপাল করে এসেছে দু'জনে। বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে থাকবে, দিন দু'বেলা তাঁর দর্শন পাবে, চন্নামেত্ত খেতে পাবে, আর মরে গেলে শিবলোকে ঠাঁই পাবে!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কাশীবাস করতে চাও তো ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি; বেয়াই-বেয়ান যখন রয়েছেন ওখানে।"

—"কুটুমের বাড়ীতে গিয়ে থাকব না কি? অভাগ্যি!"

—"না না, কুটুমের বাড়ীতে কেন? একটা বাড়ী ভাড়া করব—সেখানে থাকবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"আর তুমি?"

—"আমিও থাকব। তবে আমার তো একটানা থাকা চলবে না। মাঝে-মাঝে গাঁয়ে এসে সব দেখে-শুনে যেতে হবে।"

—"তখন আমি একা থাকব বুঝি?"

—"একা থাকবে কেন গো! যে-কোন একটা মেয়ে গিয়ে কাছে থাকবে।"

গৃহিণী চিন্তিত মুখে কহিলেন—"তা' হলে মন্দ হয় না। আমিও ইচ্ছা হয় তো দু'-এক বার তোমার সঙ্গে আসতে পারি।" একটু ভাবিয়া কহিলেন—"বেয়াই যখন বলেছেন, তখন চল তো একবার। যদি ভাল লাগে, তখন ও-সব ব্যবস্থা হবে।"

গাঙ্গুলী মশায়ের মাথার মধ্যে একটি মতলব ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে লাগিল। কাশী গিয়া, খুঁজিয়া-পাতিয়া একটি পছন্দসই গুরুদেব বাহির করিয়া, যদি সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যায়, এবং গুরুদেব যদি—সংসার বিষ-ভাণ্ড স্বরূপ, স্বামী, পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন কেউ আপনার নয়, ভগবচ্চরণই চরম ও পরম আশ্রয়, দিবারাত্র গুরুসেবা ও গুরু-উপদেশ শ্রবণ জীব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের এক মাত্র উপায়—ইত্যাদি সারগর্ভ উপদেশ বর্ষণ করিয়া শিষ্যাটির মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা হইলে গুরুদেবের হেপাজতে গৃহিণীকে রাখিয়া, মাসে মোটা প্রণামীর প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিতে ও নূতন করিয়া সংসারযাত্রা শুরু করিতে পারিবেন।

গৃহিণী কহিলেন—"কি অত ভাবছ গো?"

গাঙ্গুলী মশায় এক মুহূর্ত্তে চিন্তার জাল গুটাইয়া ফেলিলেন; কহিলেন—"ভাবছি—সেই ভাল। কি হবে আর এই সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থেকে? অনেক দিন তো হ'ল। এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তীর্থে গিয়ে দিবারাত্র ভগবানের নাম করাই ভাল। পৃথিবীতে কেউ কারও আপনার নয়, গিন্নি! সব দু'দিনের পথ-চলার সঙ্গী; এক মাত্র আপনার তিনিই"—বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন।

গৃহিণীর হঠাৎ মনে হইল—সত্যিই তো! দু'দিনের পরিচয়, চোখ বুজিলে কেউ কারও নয়। হঠাৎ মন খারাপ হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সত্যি!"

সেদিন রাত্রে বিনয়কে একা পাইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মেয়েটিকে ভারী শান্ত মনে হল।"

বিনয় কহিল—"একেবারে নিরীহ, গোবেচারী। সাত চড়ে রা নাই। তা' ছাড়া ভারী কাজের। ও এখানে আসা অবধি গিন্নীকে নড়ে বসতে হয় না।"

—"দেখে মনে হল তাই। যাক গে ও-কথা। কবিতাটা রোজ অভ্যেস করছে তো?"

—"নিশ্চয়! ওর জন্যে আপনার চিন্তা নাই। ঠিক পারবে। বলছিল, সে দিন বেশ ভাল হয়নি। আর এক দিন শোনাবে আপনাকে—" একটু হাসিয়া কহিল—"মানে কি জানেন, মাষ্টার মশায়ের কাছে একটু লজ্জা করছিল, আপনি বলবেন, তা'হলে সভায় পড়বে কি করে? সভায় অনেক লোক হলেও অনেকখানি যায়গা, কাজেই সেখানে এক রকম। আর, ঘরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে, কম লোকের সামনেও, অন্য রকম। বলছিল, আপনার কাছে যেমন লজ্জা করে না, ওঁর কাছেও তেমনই। সভাতেও তো আপনারা কাছে থাকবেন—"

বিনয়ের কথাগুলি গাঙ্গুলী মশায়ের ভারী মিষ্ট লাগিতেছিল—তথাপি কথার স্রোতকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য কহিলেন—"আর তো বেশী দিন নাই। মাষ্টার সহরে গেছে সব ব্যবস্থা করতে। আমাদের শ্যামলালেরও চিঠি পেয়েছি—আগে আসতে পারবে না, ঠিক দিনটিতে আসবে! এই ক'টা দিন ভালয়-ভালয় কাটলে হয়। ওরা বোধ হয় আসল খবরটা জানতে পারেনি—নয়?"

বিনয় কহিল—"তা' ঠিক বলা যায় না।"

—গাঙ্গুলী মশায় সচকিত ভাবে কহিলেন—"মানে?"

—"মানে, আমাদের দলের মধ্যে একটি বিভীষণ আছেন কি না—"

সাগ্রহে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কে?"

—"আমাদের প্রফুল্ল বাবু। আপনি যে দয়া করে আমার বাড়ী এক দিন পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আমার শালী কবিতা পড়বে, আমার বাড়ীর মেয়েরা আপনার কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, এতে ওরা স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই সুখী হতে পারছে না। এমন কি, আমাদের পণ্ডিত মশায় পর্য্যন্ত—"

গাঙ্গুলী মশায় সবিস্ময়ে কহিলেন—"বল কি? ভটচাযও ঐ দলে না কি?"

—"আমার তো তাই মনে হল। আজ সকালে জিজ্ঞেসা করলাম, 'কি পণ্ডিত মশায়, কবিতা পড়বেন তো?' বললে—'না। সংস্কৃত কেউ বুঝবে-টুঝবে না। তা ছাড়া ছেলেটাও পড়তে পারবে না বলে মনে হচ্ছে'।"

গাঙ্গুলী কহিলেন—"ছেলে মানুষ আবার ঐ কটমটে ভাষা পড়তে পারে না কি? নিজেই পড়লে পারে—"

অনার্য সংস্কৃত সাহিত্য

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী

মানব-সভ্যতার উষায় ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভার অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে গীতিস্রোত বিশ্বভুবন প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা এখনও আমাদের চরম ও পরম সম্পদরূপে বিরাজিত আছে। তখন উষার আলোক উদ্ভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নান-শুচি দম্পতি অগ্নিগৃহে অগ্নিদেবকে উদ্‌বোধিত করিয়া 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। সে যুগের উপদেষ্টা সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, 'অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা উঠ, জাগরিত হও, সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ কর'। সে যুগের জ্ঞানার্থী বলিত, 'যে জ্ঞানে অমৃতের সন্ধান পাইয়া মানুষ অমরত্ব লাভ না করিতে পারে তাহাতে প্রয়োজন কি?' সে যুগের সত্যদ্রষ্টা বলিতেন, 'নিবিড় অন্ধকারের পর-পারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আমি সন্ধান পাইয়াছি, তিনি এক, অদ্বিতীয়—বিদ্বান্‌গণ বিভিন্ন নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়া থাকেন, সেই অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ জলে, স্থলে, আকাশে, ওষধি-সমূহে, বিশ্বভুবনের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত'। অন্তরের কোন্ প্রেরণা তাঁহাদের সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দিকে চালিত করিত, কোন্ সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন তাহা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু সৌর-কিরণের ন্যায় তাঁহাদের যে সঙ্গীত দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছে, নিরানন্দ অপসারণ করিয়া আনন্দের নির্ঝর খুলিয়া দিয়াছে তাহা আমরা ভুলি নাই; যাঁহারা সেই গান করিতেন, দূরতম অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়াও তাঁহাদের তেজোদীপ্ত, আনন্দপ্লাবিত, জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী এখনও আমাদের কল্পনা-নয়নের সমক্ষে দিব্য জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে।

বৈদিক ঋষিগণের প্রতিভা সূর্য্যের ন্যায়, তাহা উদিত হইয়া যুগপৎ জল স্থল আকাশ সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্যানী প্রকাশিত করিয়াছে, সে প্রতিভার নাম বিশ্বতশ্চক্ষু—যাহা কিছু মহৎ সকলই তাহা প্রকাশিত করিয়াছে—কেবল অন্ধকারের গর্ভ হইতে তাহা জগৎকে আলোকের রাজ্যে টানিয়া বাহির করে নাই, যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন তাহাকে এক করিয়া মহত্ত্ব অর্পণ করিয়াছে—অল্পকে ভূমার মহিমা দান করিয়া সকল সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটাইয়াছে। এই সূর্য্য যখন মধ্যাকাশে, তখন আমাদের দেশে নানাবিধ দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। সূর্য্য কাহারও উৎসাহে, কাহারও প্ররোচনায় বা কাহারও সাহায্যে উদিত হয় না—বিশ্ব-প্রকৃতির আন্তরিক প্রেরণা হইতেই তাহার উদ্ভব, আর্ষ বিজ্ঞানমাত্রের সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ অন্তরের প্রবল প্রেরণা হইতেই এই সকলের উদ্ভব। আমাদের গৌরবের যাহা কিছু মুখ্য অবলম্বন তাহা এই আর্ষপ্রতিভা। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন, ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, চিকিৎসা-শাস্ত্রকার চরক ও সুশ্রুত আর্ষপ্রতিভা সূর্য্যের অস্তগমনের সময়ের ঋষি, ইঁহারা প্রদোষ সময় অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের পরেই আর্ষসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময়ে অগ্নিতে তাহার তেজ সংক্রমিত করিয়া যান, এই অগ্নিকে ইন্ধনদানে ও নানা প্রচেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আর্ষপ্রতিভা-রবির অস্তগমনের পর যাঁহারা আমাদের গৌরবের বাহক ও ধারক তাঁহারা সযত্নে এই অগ্নি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তপোবনের সভ্যতা নহে, নাগরিক সভ্যতা। প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রকাশে যে বিশাল জগৎ এক হইয়া উদ্‌ভাসিত ছিল তাহা তখন অন্ধকারের আক্রমণে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাগর, পর্ব্বত ও অরণ্যানীময় বিশাল দৃশ্যপটের স্থান ছোট ও বড় নানা মার্গসঙ্কুল নানা প্রকার অট্টালিকা ও প্রাসাদে সুশোভিত বিশাল নগরী গ্রহণ করিয়াছে, এ যুগের প্রতিভা সেই সকল পথের প্রান্তে, মধ্যে ও নানা স্থানে বিশাল আলোক-স্তম্ভের ন্যায় শোভমান—ইহার দীপ্তি আছে, বৈচিত্র্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে—কিন্তু সে মহত্ত্ব নাই।

অনার্য যুগে ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি ও বাণভট্ট সাহিত্যে; শবর, কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, গঙ্গেশ ও রঘুনাথ দর্শনে; বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে; এবং ইঁহাদেরই সমধর্ম্মা আরও শত শত মনীষী আপনাদের প্রতিভা-রশ্মি বিকিরণ করিয়া ভারতভূমি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই নমস্য, কিন্তু আর্ষপ্রতিভার সহিত ইঁহাদের তুলনা চলে না। সত্য বটে, বাল্মীকি ও ব্যাস আপনাদের কবি এবং রামায়ণ মহাভারতকে কাব্য নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ-কথা খুবই সত্য যে, মহাভারত মহাকাব্য হইলে রঘুবংশ মহাকাব্য নহে, এবং রঘুবংশ যদি মহাকাব্য হয় তবে মহাভারত মহাকাব্য নহে। শ্রুতির যুগের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়াই

জন্মদিন

—"আমিও তো তাই বললাম। তো বললে—'সে কি কারও ভাল লাগবে? বুড়ো মদ্দর পড়া আর যুবতী মেয়েমানুষের পড়া আকাশ-পাতাল ফারাক্! আসল কথা কি জানেন—হিংসে হয়েছে। ওর মতলব তো জানেন—সেই বিচ্ছ শয়তান ছেলেটাকে আপনার ঘাড়ে চাপানো!"

"পাগল না কি! ঐ ডাংপিটে ছেলেকে কেউ পুষ্যিপুত্তুর নেয়? ওর জ্বালায় বাগানের একটা ফল সোয়াস্তিতে খাবার জো নাই। তা' ছাড়া পুষ্যিপুত্তুর নিতে যাব কেন?"

বিনয় সোৎসাহে সায় দিল—"নিশ্চয়! কি দরকার!"

গাঙ্গুলী কহিলেন—"দেখ হে, তোমার তো পুষ্যি অনেকগুলি বেড়েছে দেখছি! মাইনেতে কুলোচ্ছে না নিশ্চয়?"

বিনয় কহিল—"মাইনেতে তো কখনই কুলোয় না। আপনাদের দয়ায় কোন রকমে—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা' এক কাজ কর। স্কুল কমিটির কাছে একটা দরখাস্ত কর। কয়েকটি 'রিফিউজি' তো ঘাড়ে চেপেছে—সে কথাটাও উল্লেখ করবে। মাষ্টারকেও একবার বলে রাখবে। দেখি, যদি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

[ক্রমশঃ

সবিনয়ে ব্যাসদেব মহাভারতকে কাব্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন, রঘুবংশের ন্যায় গ্রন্থও যে পরবর্ত্তী কালে এই নামেই আত্মপরিচয় দিবে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য হইলেও উহা আমাদের নিকট কাব্য নহে, সমুদ্র জলাশয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু জলাশয় বলিলে বাপী, কূপ, তড়াগই আমাদের মনে পড়ে—সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের কথা আমরা ভাবিতেই পারি না। আমাদের নিকট রঘুবংশই কাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত নহে। কালিদাস ইহা জানিতেন, কাজেই রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি যে বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেবল শিষ্টাচারের জন্যই নহে। হলায়ুধ ভট্ট ভারবির প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"দিবা দীপা ইব ভান্তি যস্যাগ্রে কবয়োঽপরে" যাহার সম্মুখে অন্যান্য কবিরা দিবা-দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ—আর্য ও অনার্য কাব্য সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে এই কথা আরও জোরের সহিত বলা চলে। শব্দচয়নে, সঙ্গীতের ঝঙ্কারে, রসমাধুর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে এবং সকল বিষয়ে নিপুণ পরিমার্জ্জনার সৌষ্ঠবে কালিদাস প্রভৃতির রচনা অনুপম—সকল বিষয়ে উক্ত নিপুণ পরিমার্জ্জনা রামায়ণ ও মহাভারতে নাই। চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর শিলা-সোপানে আবদ্ধ, তীরে নানাবিধ কুসুমপাদপে শোভিত স্বচ্ছ সুপেয় জলে পরিপূর্ণ রাজসরোবর অথবা আলোকস্তম্ভমণ্ডিত নানা পথে বিভক্ত, আয়তন ও উচ্চতার সাম্যে সমৃদ্ধ, নানাবিধ ফল ও পুষ্পের পাদপে শোভিত, বাপী ও তড়াগে রমণীয় রাজোদ্যানের শোভা যে অতুলনীয় ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কোনও বাতুলও তাহাদের সমুদ্র বা হিমালয়-প্রস্থের সহিত তুলনা করিবে না। রুক্ষতায়, ঔদ্ধত্যে, সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, সরসতায়, নীরসতায়, ভীষণতায় ও কমনীয়তায়—এক কথায় আপনার অতুলনীয় মহত্ত্বে তাহারা পরিপূর্ণ,—সংসারে তাহাদের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কালিদাস প্রভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ এই সকল কথা বলিতেছি না—মার্জ্জিত ও সুনিপুণ রচনায় তাঁহারা অসাধারণ; বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সংস্কৃত-সাহিত্যে অনুরাগী অনেক পাঠকই কালিদাস প্রভৃতির রচনায় এত মুগ্ধ যে আর্য সাহিত্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিই পড়ে না—অথচ ভারতীয় আর্য্যদের সাহিত্য-প্রতিভা বুঝিতে গেলে আর্য সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য। কালিদাস প্রভৃতির সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তাহার জন্য একটা প্রস্তুতি চাই—সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও সূক্ষ্ম মননশক্তি সেই প্রস্তুতি। আর সাহিত্য আলোচনার জন্যও একটা প্রস্তুতি চাই—মহৎ—বিশাল—উদার ও গম্ভীরকে ধারণা করিবার শিক্ষাই সেই প্রস্তুতি। যাঁহারা বীণার সূক্ষ্ম নিক্কণ ও কলধ্বনি ব্যতীত অন্য ধ্বনির মূল্য স্বীকার করেন না, সমুদ্রের কলরোলে ও উন্মত্ত গর্জ্জনে যাঁহারা সঙ্গীতের মাধুর্য্য খুঁজিয়া পান না, আর্য সাহিত্য আলোচনা করিলে তাঁহাদের নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

ব্যাকরণ সাহিত্য নহে, তথাপি অনার্য যুগের সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে আগেই ব্যাকরণের কথা বলিতে হয়। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ, বেদ-পুরুষের 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্', সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায়ও যে ব্যাকরণকে একটা উচ্চাসন দেওয়া হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এত সমাদর থাকা সত্ত্বেও বৈদিক যুগে ব্যাকরণের যে স্বরূপ কি ছিল তাহা বলা কঠিন। বৈদিক সাহিত্য ব্যাকরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, বরং বৈদিক সাহিত্য দ্বারাই ব্যাকরণ নিয়মিত। পরবর্ত্তী কালে পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার একটা উদ্দেশ্য বেদকে রক্ষা করা। বেদে যে কথাটি যেমন আছে শত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই, যেমন তেমনই রাখিতে হইবে। বৈদিক প্রয়োগ দেখিয়া বৈদিক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে—ব্যাকরণের নিয়ম স্মরণ করিয়া বেদ রচনা করা হয় নাই। সেকালে ব্যাকরণ বলিতে পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় কোন গ্রন্থকে বুঝাইত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ, ব্যাকরণ শব্দের অর্থই পৃথক্‌করণ বা বিশ্লেষণ, শব্দ ও ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগে পদনির্ম্মাণ, অথবা আরও বিশদ করিয়া বলিতে হইলে পদ-সমূহকে শব্দ ও বিভক্তি এবং ধাতু ও বিভক্তি অনুসারে বিশ্লেষণ, শব্দ-প্রকৃতি ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং ধাতু-প্রকৃতি ও কৃৎপ্রত্যয় ভেদে শব্দের বিশ্লেষণ—ইহাই ব্যাকরণের মুখ্য কার্য্য। ধাতু, শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত হিসাবে উচ্চারণ নির্ণয়ও ব্যাকরণের কাজ, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহা ব্যাকরণের বিষয় নহে। পাণিনি আর্ষ ব্যাকরণ হইলেও ইহাতে কিন্তু উক্ত বিষয় সকল ব্যতীত আরও অনেক কিছু আছে। কুমারিল ভট্ট কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণকেও বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কথা—"পাণিনীয়াদিষু হি বেদস্বরূপবর্জ্জিতানি পদান্যেব সংস্কৃত্য সংস্ক্রিয়োৎসৃজ্যন্তে। প্রাতিশাখ্যৈঃ পুনঃ বেদসংহিতাধ্যয়নানুগত স্বরসন্ধিপ্রযতিবিবৃত্তি পূর্ব্বাঙ্গপরাঙ্গাত্মনুসরণাদ্ বেদাঙ্গত্বমাবিষ্কৃতম্।" (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।২১)। অর্থাৎ বেদে অব্যবহৃত কথার সংস্কার করিয়াই পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণের বহুলাংশ রচিত। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে স্বরপ্রক্রিয়া, যতিনির্ণয়, যতিবিচ্ছেদ, প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল জ্ঞান প্রয়োজন প্রাতিশাখ্য সমূহেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বেদাঙ্গ ব্যাকরণ বলিতে প্রাতিশাখ্য সমূহকেই বুঝায়। পাণিনির ব্যাকরণে জ্ঞাপক বিধি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে অনেক স্থলে পাণিনির বহু স্ববিরোধী কথার সন্ধান পাওয়া যায়—অনেক স্থলেই পূর্ব্বে এক বিধান করিয়া পরে স্বয়ং তিনিই তাহার লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই জন্য কুমারিল এক স্থানে পাণিনিকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, "অশ্বারূঢ়াঃ স্বয়মশ্বান্ বিস্মরন্তি হৃতচেতসঃ" ঘোড়ায় চড়িয়া পাগলেই ঘোড়ার কথা ভুলিয়া যায়। বৈদিক সমাজে পাণিনির এই তো প্রতিষ্ঠা, আর্ষ সাহিত্যেও তাহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় নহে। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে বোধ হয় পাণিনির ন্যায় সুসংবদ্ধ ব্যাকরণের অভাব ছিল, তখন কথ্য ভাষাও সংস্কৃত ছিল। একে ত সুসংবদ্ধ ব্যাকরণের অভাব, তাহার উপর বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় কবি—যাঁহাদের উক্তিই ব্যাকরণের নিয়ামক, কাজেই রামায়ণ প্রভৃতিতে এমন অনেক প্রয়োগই পাওয়া যায় প্রচলিত ব্যাকরণের মতে যাহাদের সমর্থন চলে না, প্রায়ই আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া ইহাদের সম্মান রক্ষা করিতে হয়। অনার্য যুগের কথ্য ভাষা সংস্কৃত নহে—কাজেই সে যুগের লোকদের ব্যাকরণের প্রতি ভক্তি অসীম। যাঁহারা স্থানে স্থানে প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন তাঁহাদের পণ্ডিত-সমাজের ভ্রূকুটি সহ্য করিতে হইয়াছে। এ যুগের 'বাণী ব্যাকরণের' শোভা পাইয়া থাকেন, ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন চ্যুত সংস্কৃতি—ইহা এক প্রকার অশিষ্টতা। সত্য বটে, "যুগে যুগে ব্যাকরণান্তরং"

বলিয়া পণ্ডিত সমাজে একটা কথা আছে, কিটসূত্রের সঞ্জীবনী টীকায় টীকাকার জয়কৃষ্ণও "নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতবঃ" ব্যাকরণ প্রভৃতি স্মৃতিও কালানুসারে ব্যবস্থাপিত—কৈয়টের এই মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিও তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যাহা প্রচলিত দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, এবং পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ আলোচনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়, —তথাপি পতঞ্জলি শেষ পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরবর্ত্তী কালে তাহা লঙ্ঘন করিয়া কেহই নূতন পথে চলিবার সাহস করেন নাই। প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ লক্ষ্য করিয়া যদি যুগে যুগে ব্যাকরণান্তরের কথা বলা হইয়া থাকে তবে অবশ্য পৃথক্ কথা, কিন্তু তাহা ব্যতীত যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যাকরণের দ্বারা সংস্কৃত-সাহিত্য শাসিত হইয়াছে ইহার কোনও দৃঢ় প্রমাণ নাই। দুই-একটি বিষয়ে অনার্য যুগের সাহিত্যিক পাণিনির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, পাণিনিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ সংজ্ঞা যেটি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অথবা লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ বিভক্তির ব্যবহারের জন্য যে নিয়ম করা হইয়াছে সাহিত্যিকেরা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, বহু পণ্ডিতের মতেই পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় ব্যাকরণ ছিল বলিয়াই সংস্কৃত ভাষার কেবল উন্নতিই হয় নাই—উহা রক্ষা পাইয়াছে। কেহ কেহ আবার ইহার বিরোধী মতও পোষণ করেন; তাঁহাদের মতে পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় কঠিন শৃঙ্খলের বন্ধন না থাকিলে স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত-সাহিত্য আরও উন্নতি করিতে পারিত। এ-সম্বন্ধে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যিকেরা পাণিনিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গাথা ভাষা বলিয়া একটা ভাষা বা অপভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ললিতবিস্তর প্রভৃতি সে ভাষার দুই-একখানা বইও আছে। বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবন-কাহিনী না হইলে মাত্র ভাষা বা কাব্য-সৌন্দর্য্যের জন্য কত লোকে ললিতবিস্তর পড়িত জানি না, কিন্তু যে কারণেই হউক, এই স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল ভাষা চলে নাই। পক্ষান্তরে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যামূলক বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া পাণিনিকেই সমর্থন করিয়াছেন। বৈদিক সমাজের পণ্ডিতেরা কিন্তু এই কঠিন শৃঙ্খলকে মালতীমালায় পরিণত করিয়া লইয়াছেন। শৃঙ্খলকে পুষ্পদামে পরিবর্ত্তিত করিতে তাঁহাদের যে উৎকট সাধনা করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণ বিস্ময়কর প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে সেই উৎকট সাধনার একটু পরিচয় দিব।

ভট্টিকাব্য রচনা সম্বন্ধে প্রবাদ সুবিখ্যাত। প্রবাদটি সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, কবি কাব্যের মধ্যে যে ব্যাকরণকে অতি-মাত্রায় স্থান দিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ব্যাকরণের আতিশয্য থাকিলেও ভট্টিকাব্য কাব্য। বহু ছন্দঃ ও পূর্ব্বে অপ্রচলিত অলঙ্কারের ব্যবহারে তাহা সমুজ্জ্বল, কোথাও প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনে কবিত্ব, কোথাও রাজনীতির সূক্ষ্ম আলোচনায় গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এমন কাব্যও আছে যাহার নিকট ভট্টিকেও হার মানিতে হয়। আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কবি ভট্টভীমের 'রাবণার্জ্জুনীয়' কাব্য ইহার উদাহরণ-স্থল। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সংঘর্ষ ও তাহাতে রাবণের লাঞ্ছনাজনক পরাজয়, কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যাকরণের সূত্রসমূহের উদাহরণ প্রদর্শন। কবি পাণিনির ব্যাকরণের প্রথম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার পোষণকল্পে উদাহরণ-সম্বলিত শ্লোকের পর শ্লোকে কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এ ক্ষেত্রে কাব্য যেরূপ হইবার কথা তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টই হইয়াছে। এ-হেন কাব্যেও কবি রসিকতার পরিবেশনে কার্পণ্য করেন নাই। ক্রিয়ার আতিশয্যমূলক বা পৌনঃপুন্যমূলক যঙন্ত পদের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন—যেন উক্ত বিষয় বর্ণনার জন্যই যঙন্ত ক্রিয়াগুলি পৃথক্ করিয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন। বাসুদেব কবি-বিরচিত 'বাসুদেব-বিজয়' কাব্য ইহার আর একটি উদাহরণ, এই কাব্যেও কবি ভট্টভীমের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। কবি কাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, ধাতুরূপগুলির উদাহরণ বাকী ছিল। কবির সতীর্থগণ 'ধাতুকাব্য' নামে পৃথক্ কাব্য রচনা করিয়া তাহাও পূরণ করিয়াছেন। ভট্টভীম ও বাসুদেবের সগোত্র বহু কবি আছেন, পাণিনির ন্যায় বিশাল ব্যাকরণের উপর এইরূপ কাব্যরচনা উৎকট সাধনা নহে কি? লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই উৎকট সাধনার মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণের বৈদিক অংশ অবহেলিত হইয়াছে—অবশ্য লৌকিক ভাষায় নরাঃ দেবাঃ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নরাসঃ দেবাসঃ ইত্যাদি উদাহরণ দেওয়াও চলিত না। যে কারণেই হউক, পাণিনির পরে বৈদিক ভাষার চর্চ্চা ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। পাণিনি বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ যেটুকু রাখিয়া গিয়াছেন উব্বট সায়ণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বেদব্যাখ্যাতাদের তাহাই প্রধান অবলম্বন হইলেও কুমারিল প্রভৃতির ন্যায় বৈদিকনিষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা পান নাই। উত্তরকালের বৈয়াকরণগণ পাণিনির এই অমর্য্যাদার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন বৈদিক ব্যাকরণের মোটে আলোচনা না করিয়া। কুমারিল পাণিনি ব্যাকরণে লৌকিক ভাষার শব্দবাহুল্য দেখিয়া তাহার বেদাঙ্গত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহার ছয়-সাত শত বৎসর পূর্ব্বে কাতন্ত্র ব্যাকরণকার আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা বৈদিক শব্দ সাধনের জন্য কোন সূত্র প্রণয়ন না করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে এক কথায় বলিয়াছেন, 'লোকোপচারাদ্গ্রহণসিদ্ধিঃ'—বেদের অধিকাংশ শব্দই তো লৌকিক ভাষায় প্রচলিত, যদি তাহাদের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি জানা যায় তবে অবশিষ্ট অল্প কয়েকটা শব্দ লইয়া বিশেষ কোন বাধা হইবে না—বেদের অধিকাংশ শব্দই যখন লৌকিক ভাষায় ব্যবহৃত, তখন লৌকিক ভাষার ব্যাকরণই বা বেদাঙ্গ হইবে না কেন? বৈদিক শব্দ কয়েকটা লোকোপচার বশতঃই সিদ্ধ হইবে—নরাঃ স্থানে নরাসঃ হয় ইহা জানিয়া লইতে কত আর পরিশ্রম হইবে? পাণিনি আর্ষ ব্যাকরণ—ইহা ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, অনার্য যুগে বহু ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের আদর্শ পাণিনি; নূতন মত বা নূতন পথ কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

আর্যযুগের পর কথ্য ভাষা সংস্কৃত ছিল না, অথচ সাহিত্যের ভাষা প্রধানতঃ ছিল সংস্কৃত। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এই ভাষাটি আয়ত্ত করিবার ও প্রায় মাতৃভাষার ন্যায় সহজসাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইত। এই কার্য্যে সে সময়ের পণ্ডিতরা যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ আছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় তাহাদের যে পরিশ্রম

করিতে হইত তাহার ফলে মৌলিক কোনও চিন্তা করিবার শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইত। সংস্কৃত এ-যুগে কাহারও পক্ষে সহজ ছিল না; বহু আয়াসের ফলে তাহা অর্জন করিতে হইত, সুতরাং তাহা ছিল কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতার ফল সুদূরপ্রসারী, ইহার ফলে এই যুগের অধিকাংশ সৃষ্টিই কৃত্রিম। পণ্ডিতদের ভাষায় কৃত্রিম শব্দটায় গ্লানি অপেক্ষা গৌরব অনেক বেশী—যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত তাহাই কৃত্রিম। পাখী আকাশে উড়িতে পারে ইহাতে তাহার গৌরবের কিছুই নাই, কিন্তু কল-কৌশলে মানুষ যে আকাশে উড়িতে পারে ইহাই তাহার গৌরবের। কৃত্রিমতায় যথেষ্ট কলা-কৌশলের প্রয়োজন। এই জন্যই দেখিতে পাই, রামায়ণ ও মহাভারতের সহজ সংস্কৃতে কলা-কৌশল ও বুদ্ধির কসরৎ খুবই কম, কিন্তু তাহা জীবনী-শক্তিতে ভরপুর; পড়িলেই মনে হয়, একটা জীবন্ত জাতির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পক্ষান্তরে আর্য যুগের পরের কৃত্রিম সংস্কৃতে এই কলা-কৌশলটাই চক্ষে বেশী পড়ে—তাহার জীবনী-শক্তি স্তরে স্তরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। এ যুগটা প্রধানত: টীকা-ভাষ্যের যুগ—কবির মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি ও শূদ্রক প্রভৃতি দুই-চারি জন, দার্শনিকের মধ্যে শঙ্কর, উদয়ন, গঙ্গেশ, রঘুনাথ প্রভৃতি কয়েক জন ও এই যুগের প্রধান জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতদের বাদ দিলে অবশিষ্টের অনেকেই মৌলিকতার কোন দাবী করিতে পারেন না। অবশ্য টীকা-ভাষ্যে পাণ্ডিত্যের অবধি নাই, স্থানে স্থানে নূতন কথাও আছে, কিন্তু তথাপি তাহা মূল নহে। এক বৈশেষিক দর্শনের বহু ভাষ্য থাকিতে পারে—কিন্তু কণাদ যেমন একটা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে একটা নূতন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা পারেন নাই। বিশেষ পদার্থটিকেই তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই যুগের পণ্ডিতেরা অগ্নিহোত্রী—আর্য যুগের আগুন তাহারা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টায় মূল শাখা পল্লব পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা না থাকিলে আমরা হয়তো মূলেরও সন্ধান পাইতাম না; কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে আর্য যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা স্বর্গীয় অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুতের উপাসনা করিতেন ও অনার্য যুগের মনীষীরা সেই অগ্নির তেজে দীপ্ত ভৌম অগ্নিরই উপাসনা করিতেন—তথাপি তাঁহারাও যে অগ্নিহোত্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃত্রিমতার কথা কিছু বলিতেছি। অগ্নিপুরাণের অন্তর্গত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাচীনতা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে আর্য যুগে সাহিত্য ছিল, সাহিত্যশাস্ত্র ছিল না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র আর্য যুগের সন্ধ্যায় রচিত। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য ছন্দ: অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা আছে, তথাপি রূপক ব্যতীত সাহিত্যের অন্য বিভাগ সম্বন্ধে ভরত এক প্রকার নীরব। কবি কালিদাসের পরবর্তী দণ্ডী দশকুমারচরিতের লেখক হইলেও প্রধানত: তিনি আলঙ্কারিক, ভামহও বোধ হয় তাঁহার সমসাময়িক। দণ্ডী কাব্য, মহাকাব্য, কথা, আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যের নানাবিধ ভাগ করিলেন। দণ্ডীর পূর্ব্বে কথা আখ্যান প্রভৃতি শব্দগুলির সাহিত্যে যথেষ্ট প্রয়োগ ছিল, কিন্তু সংজ্ঞা শব্দ হিসাবে তাহাদের ব্যবহার ছিল না। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ আর্য যুগে সাহিত্যের এইরূপ ভেদ বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাই যে, তখন রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়া রচনা দেবতা, যক্ষ, রক্ষ:, গন্ধর্ব্ব, সর্প, ঋষি, মহর্ষি বা ঋষিপুত্র ইঁহাদের কাহার হওয়া সম্ভব তাহা নির্ণয় করা হইত; বিষয়বস্তু, ভাষা ও ভাব দেখিয়াই রচনার এইরূপ ভেদ করা হইত। দণ্ডী কাব্য প্রভৃতির যে সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, মনে হয় কালিদাসাদির গ্রন্থ দেখিয়াই তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তখন সাহিত্যক্ষেত্রে কলা-কৌশলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে, নিত্য-নূতন সাহিত্য দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহাদের নাম নাই। দণ্ডী এই সকল নবজাত শিশুদের নামকরণ করিয়া সকলের নিকট তাহাদের পরিচয় দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার বিবরণ দিয়া তিনি মহাকাব্যের সংজ্ঞা করিলেন, এইরূপ বৃহৎকথা প্রভৃতি দেখিয়া কোনও কোনও বিভাগের নাম হইল। ভামহ ছিলেন দণ্ডীর প্রতিদ্বন্দী, দণ্ডী স্বভাবোক্তির ভক্ত, ভামহ স্বভাবোক্তিকে গ্রাহ্যই করেন না এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে। দণ্ডী মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিতে যাইয়া কি থাকা উচিত তাহার এক বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, ভামহের তালিকা অত বিস্তৃত নহে। মহাকাব্য সম্বন্ধে তিনি প্রথম যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট—

সর্গবন্ধো মহাকাব্য: মহতাং চ মহচ্চ যৎ।
অগ্রাম্যশব্দমর্থ্যং চ সালঙ্কারং সদাশ্রয়ম্।

(কাব্যালঙ্কার (১।২০)

মহাকাব্য সর্গবন্ধ, ইহা আকারে বিশাল ও ইহার বিষয়বস্তু মহৎ। ইহাতে অর্থবান্ অগ্রাম্য শব্দ থাকিবে এবং ইহা অলঙ্কার-ভূষিত ও উত্তম বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে। মাত্র এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহাকাব্য রচিত হইলে কবির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিত, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিগণ ইহার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া দণ্ডীকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই অনুসরণের ফল অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত হইয়াছে। ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের নায়ক—তপস্বী ও ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন; বিষয়বস্তু—বিরোধ ও যুদ্ধ। এই কাব্যে পান গোষ্ঠী প্রভৃতির বর্ণনা অবান্তর, কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে যাইয়া কবিকে তাহাও করিতে হইয়াছে। দণ্ডী অলঙ্কারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে এই আলোচনা আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। শব্দালঙ্কারের মধ্যে নানা প্রকার যমক ও অনুপ্রাসের ব্যবহারেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিগণ এই সকল অলঙ্কার লইয়া খুব বেশী মত্ত হইয়াছেন, কাব্য সালঙ্কার হওয়া চাই, সুতরাং শ্লোকে শ্লোকে অলঙ্কার, এক-একটি শ্লোকে দু'-তিন প্রকারের অলঙ্কার। এই চেষ্টার ফলে সন্দেশে ক্রমেই যে ছানা অপেক্ষা চিনির ভাগ বেশী হইয়া ক্রমে কাব্য বাবা তারকেশ্বরের ওলায় পরিণত হইতেছে, কবিগণ মত্ততা বশতই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ছিল ব্যাকরণ, আসিল অলঙ্কার, শব্দালঙ্কার যমক ও অনুপ্রাসে একটু ইন্দ্রজালও আছে, ইহার উপর আছে সংস্কৃত ভাষায় প্রতি বর্ণের পৃথক্ অর্থ ও এক শব্দের বিবিধ অর্থ। কলা-কৌশলই যাঁহাদের প্রধান অবলম্বন তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? ভারবির ন্যায় কবিও শ্লোক রচনা করিলেন—

"দেবা কানি নিকাবাদে বাহিকাস্ব স্ব কাহিতা।
কাকারে ভভরে কাকা নিস্বভব্যব্যভস্বনি।"

প্রত্যেক চরণ অনুলোম ও প্রতিলোম যে ভাবে ইচ্ছা পড়িলে একই হইবে। রসিকেরা ভাবিলেন, ইহা কি কাব্য না হেঁয়ালি,

পণ্ডিতেরা কিন্তু খুসীই হইলেন। কাব্যে এই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—এ কালের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পর্য্যন্ত এই পাণ্ডিত্যের তরঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুবন্ধু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এমন কাব্য রচনা করিব যাহার প্রত্যেকটি পদের দুইটি করিয়া অর্থ হয়। তাহার দেখাদেখি এ রোগও সংক্রামক হইয়া পড়িল, কবিরাজ কবি এমন কাব্য রচনা করিলেন যাহার প্রতি শ্লোকের পাণ্ডবদের ও রাঘবদের সম্বন্ধে পৃথক্ অর্থ হয়—একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত। হরদত্ত রাঘব নৈষধীয় রচনা করিয়াও অনুরূপ কৌশল দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁহার রামচরিতে যদি এইরূপ কৌশল দেখাইতে না যাইতেন তাহা হইলে হয়ত পালবংশের রাজত্বের শেষের দিকের ইতিহাসটা আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হইত। কোনও কোনও কবি আবার বিলোম কাব্য রচনা করিয়া এই শ্রেণীর কৌশলের আরও নিপুণ পরিচয় দিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপ সূর্য্যক কবির রামকৃষ্ণ-বিলোম কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি প্রথম পংক্তির বিলোম অর্থাৎ ডান দিক্ হইতে বাম দিকে পাঠ। কাব্যের প্রথম শ্লোকটি এই—

তং ভূসুতামুক্তিমুদারহাসং বন্দে যতো ভব্যভবং দয়াশ্রীঃ।
শ্রীযাদবং ভব্যভ-তোয়দেবং সংহারদামুক্তিমুতাসুভূতং।

প্রথম পংক্তির অর্থ—যিনি ভূমিজা সীতাকে (রাবণের হস্ত হইতে) মুক্তিদান করিয়াছিলেন, (নিতান্ত বিপদে পড়িয়াও) যাঁহার হাস্য সকল সময়েই অতি উদার, যাঁহার জন্ম অতি পবিত্র এবং দয়া ও শ্রী যাহা হইতে উদ্ভূত সেই রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—যিনি মঙ্গলময় রশ্মিযুক্ত (ভব্যভ) সূর্য্য এবং চন্দ্রকে (তোয়) প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি সংহারদাত্রী পূতনারও মোক্ষ বিধান করিয়াছিলেন, এমন কি যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ সেই শ্রীযদুনন্দনকে বন্দনা করি। কোনও কবি এরূপ দুরূহ পথে প্রয়াণ না করিয়া অপেক্ষাকৃত সুগম পথে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জৈন কবি শ্রীবিক্রম নেমিদূত কাব্যের প্রতি শ্লোকের চতুর্থ চরণ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের এক একটি শ্লোকের চতুর্থ চরণ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। একটি শ্লোক হইতেই তাহার কৌশল প্রতীয়মান হইবে। নেমিদূতের প্রথম শ্লোক এই—

প্রাণিত্রাণপ্রবণহৃদয়ো বন্ধুবর্গং সমগ্রং
হিত্বা ভোগান্ সহ পরিজনৈরুগ্রসেনাত্মজাং চ।
শ্রীমান্ নেমির্বিষয়বিমুখো মোক্ষকামশ্চকার
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। বিহ্লন কবি ও চোর কবির কাব্য সুবিখ্যাত, একই শ্লোকের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা—প্রিয়া-সঙ্গমের স্মৃতি ও ইষ্টদেবতার স্তব। ভক্তিরসাত্মক স্তোত্রগুলি পর্য্যন্ত এই জাতীয় কলা-কৌশল ও পাণ্ডিত্যের আস্ফালন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মহিম্নস্তবটি সাহিত্যের আকারে একটি রত্নবিশেষ, পণ্ডিতেরা তাহারও শিব ও বিষ্ণুপক্ষে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের আশ্রয়ে এই শ্লোকে স্তুতি ও নিন্দা অনেকে করিয়াছেন। কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের আনন্দসাগর স্তবটি একটি উৎকৃষ্ট স্তব। স্তুতি করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—

ভক্তিস্তু কা যদি ভবেদ্ রতিভাবভেদ-
স্তৎকেবলাম্বয়িতয়া বিফলৈব ভক্তিঃ।

অর্থাৎ—ভক্তি কি? ভক্তি যদি অনুরাগ-বিশেষই হয় তাহা হইলে তোমার কেবলাম্বয়িত্ব (সর্ব্বব্যাপিত্ব) প্রযুক্ত তাহাও বৃথা, কেন না, যে কোনও ব্যক্তিকে ভালবাসিলে ত তোমাকেই ভালবাসা হয়। কবি স্তবের মধ্যেও ন্যায়শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কেবলাম্বয়ী কথাটি ব্যবহার করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই, এইরূপ এই স্তবটির মধ্যে কোথাও বেদান্ত, কোথাও সাংখ্য, কোথাও বা শব্দবিদ্যার পাণ্ডিত্যের উৎকট উদাহরণ রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, কেবল অনুকরণপ্রিয়তা, কলা-কৌশলে নৈপুণ্য বা উৎকট পাণ্ডিত্য হইতে কোনও মহৎ বস্তুর সৃষ্টি হইতে পারে না। তারের উপর নৃত্য চলিতে পারে কিন্তু বসবাসের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণ করা চলে না। আর্য-প্রতিভার সূর্য্য অস্তমিত হইলে বহু খদ্যোতই নভোমণ্ডল আলোকিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কেহ করিয়াছেন কেবল অনুকরণ, ভাস বাসবদত্তা ও উদয়ন-চরিত্র অবলম্বনে মনোরম রূপক রচনা করিয়াছেন, তাহার পর সালঙ্কার সুললিত বাণীতে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নাট্যকারেরা সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কেবল তাহার ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন। স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন কিন্তু সেই উদয়ন, সেই অগ্নিমিত্র—তাহাদের লালসা ও সেই লালসা নির্বাপণের জন্য যৌবনভারখিন্না, মৃদুচিত্তা, মৃদুগামী, নিরাশ্রয়া কতগুলি সুন্দরী। এই অনুকরণ সহজ, কিন্তু শকুন্তলার অনুকরণ অত সহজ নহে। সংস্কৃত ভাষার অতুলনীয় নাটক মৃচ্ছকটিক বা মুদ্রারাক্ষসের অনুকরণও সহজ নহে। কেবল পাণ্ডিত্য সম্বল লইয়া মুরারি মিশ্র ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ের বিভূতি না থাকিলে কেবল শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দ্বারা উত্তররামচরিতের কবিকে পরাজয় করা যায় না, ইহা তিনি জানিতেন না। অন্তঃকরণ বিশেষ মার্জ্জিত ও রসসিক্ত না হইলে কালিদাসকে ও সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম অনুভূতি না থাকিলে বাণভট্টকে পরাজয় করা সহজ নহে। কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক ও বাণভট্ট প্রভৃতি অনার্য ভারতের উজ্জ্বল বৈদ্যুত আলোক—ইঁহারা এই যুগের শ্রেষ্ঠ অগ্নিহোত্রী।

অনার্য যুগের একটা গৌরব এই যে, ইহা বৈচিত্র্যের যুগ। গদ্য ও পদ্য-সাহিত্য এই যুগে নানা ভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। উদয়ন প্রভৃতি দার্শনিক হইলেও তাঁহাদের রচনা সাহিত্যক্ষেত্রেও উৎকৃষ্ট নিবন্ধের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, পূর্ব্বে এ-শ্রেণীর রচনা ছিল না। খণ্ডকাব্যের মধ্যেও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বিচিত্র উপাদানে অল্প আয়তনের মধ্যে নারায়ণ ভট্টের স্বাহাসুধাকরম্ ও শ্রীকৃষ্ণ কবির তারাশশাঙ্কম্‌এর মত আখ্যান কবিতা এই যুগেই রচিত হইয়াছে। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় কবিতা একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। মৃচ্ছকটিকের ন্যায় নাটকের অনুকরণ সম্ভব না হইলেও বহু কবি ভাণজাতীয় রূপকের মধ্যে সমাজের এক এক দিকের নিখুঁত ও সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য জানিতে হইলে আর্য-প্রতিভা যেমনই শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করা প্রয়োজন এই সকল কবিতা, কাব্য ও তাহাদের কবিদের সহিতও তেমনই প্রীতির সম্বন্ধ রক্ষা করা উচিত।

বাতায়নে

২

রাস্তা-ধারের জানলায় বসে আছি—পথ ক্রমেই জনবিরল হ'য়ে উঠছে, বেরিয়েছে দুপুর বেলাবার যত ফেরিওয়ালার দল। সে সময় অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুদের দল বাড়ীতে থাকে না—মেয়েদের কাছে জিনিষ বিক্রি করা সহজ।

ঐ যায় চুড়িওয়ালা—বেলোয়ারি চুড়ি চাইয়া—বালা চাইয়া—খেলনা চাইয়া—

তখনকার দিনে সব বাড়ীরই রাস্তার দিকের বারান্দায় নীল কাপড়ে মোড়া চিক্ ঝুলত। রাস্তায় চলা, ট্রামে-বাসে চড়া, কিংবা বাজার করবার ছলে সকাল থেকে দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে সঙ্গের পুরুষ জীবগুলিকে নিমখুন ক'রে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে ঘণ্টা দু'য়েক হুল্লোড় ক'রে কল-ঘরে ঢোকবার রীতি বা সাহস তখনকার মেয়েদের ছিল না।

চুড়িওয়ালা হেঁকে চলেছে সুর করে—এক বাড়ীর ওপরকার বারান্দার চিক্ ফাঁক ক'রে সরু-গলায় কে যেন ডাকলে—চুড়িয়ালা!

চুড়িওয়ালার সজাগ কান নারীকণ্ঠের এই ক্ষীণ আহ্বানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ বাড়ী গো?

—এই যে, এই বাড়ী।

সদর দরজা খুলে গেল। চুড়িওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল—তার পেছন পেছন পাড়ার একপাল ছোট ছেলেও ঢুকে পড়ল।

চুড়িওয়ালা উঠোনে তার সেই বিরাট ঝোড়া নামিয়ে একখানা চারচৌকো পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল আর ইতিমধ্যে বাড়ীতে যত মেয়ে আছে তারা একে একে চুড়িওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, শিশু—গৃহিণী, দাসী, কন্যা, বৌ—সধবা, বিধবা, পতি-সোহাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা কেউ বাদ গেলেন না।

চুড়িওয়ালা তার বোচকার বাঁধন খুলে ফেললে। ওপরেই নানা রকমের খেলনা, বাঁশী, চকচকে ফুলদানী ইত্যাদি মনোহারী জিনিষ। দেখামাত্র ছেলেদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হোলো—তারা সবাই মিলে সশব্দে এই জিনিষগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগল। এরই মধ্যে মেয়েদের চুড়ি দেখানো আরম্ভ হোলো।

এই চুড়িওয়ালারা প্রায়ই ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান। কথা-বার্ত্তা ছিল মিষ্ট, মুখে একেবারে মধু মাখানো যাকে বলে। তাদের অমানুষিক তিতিক্ষা আজকের দিনে যে কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্ল্লভ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা সংসারে কোন্ মহিলার স্থান কোথায় তা বুঝে নিয়ে বড়মা, ছোটমা, বৌমা, দিদিমণি, খুকুমণি প্রভৃতি ডাক শুরু করে দিত। তার পরে সেই মেয়ে-সভায় চুড়ি পছন্দ করানো—ঝাঁকা-মুটের পক্ষে অতি জটিল রকমের অপারেশন করাও বোধ হয় তার চাইতে সোজা। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

পাঁচ জন মহিলা ও একটি ছোট মেয়ে হয়ত চুড়ি পরবে। প্রথমে ছোট মেয়েটির চুড়ি পছন্দের পালা। পঁচিশ রকমের চুড়ি দেখাবার পর এক রকম চুড়ি পছন্দ হোলো। দরে আর কিছুতেই বনে না। চুড়িওয়ালা বার-দু'য়েক তার বোচকা বেঁধে ফেল্লে। শেষ কালে সব ঠিক হয়ে যাবার পর চুড়ি পরাতে যাচ্ছে, এমন সময় এক জন বলে উঠলেন যে, তাঁর মামার বাড়ীর পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে সে বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের হাতে দু'গাছি চুড়ি দেখেছিলেন—আহা, সে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়।

চুড়িওয়ালাকে সেই চুড়ির বিবরণ শুনিয়ে বলা হল—সেই রকম চুড়ি দেখাও।

চুড়িওয়ালা অতি বিনীত ভাবে বললে—না মা, সে রকম চুড়ি আমার কাছে আজ নেই, বলেন তো এনে দিতে পারি।

খুকুর মা এই সুযোগে খুকুকে ফাঁকি দেবার তালে তাকে বললেন—তোকে ভাল চুড়ি পরে এনে দেবে, আজ আর চুড়ি পরিস্‌নি।

খুকু অমনি পোঁ ধরলে। সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগলেন যে অচিরেই তার জন্য এমন ভাল চুড়ি আসবে যে সে রকমটি আর কারুর হাতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

বাক্যটির ব্যঙ্গার্থ ধরে ফেলে খুকুমণি তার সুর আর এক গ্রাম উচ্চে তুলে দিলে। খুকীর মা আর সহ্য করতে না পেরে রেগে তাকে দিলেন ঘা দু'-তিন। কিন্তু খুকু তো আর খোকা নয়! যে-পাপ থেকে তাকে নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সে-পাপে সহজাত অধিকার নিয়েই যে সে জন্মেছে—সে থামবে কেন! একটা মহা হট্টগোলের পর সাব্যস্ত হোলো, আচ্ছা তা হোলে ঐ চুড়িই খুকীকে পরিয়ে দেওয়া হোক।

খুকীর বেলাতেই যদি এই হয় তা হোলে খুকীর মা, খুড়ী, জেঠিদের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়।

এর পরে চুড়ি পরবার পালা। সে এক লাঠালাঠি কাটাকাটি ব্যাপার! কারণ, সকলেই চান যে চুড়ি হাতের কব্‌জিতে একেবারে সেঁটে বসে যাবে। তাঁদের অধিকাংশের কব্‌জিতেই যে ছোট মেয়েদের মল সেঁটে বসে যাবার অধিকার রাখে, এক সোনার চুড়ি গড়াবার সময় ছাড়া সে খবরটা তাঁরা প্রায় একেবারে ভুলেই যেতেন। সেই গুণ-ছুঁচের ছ্যাঁদায় জাহাজের কাছি ভরার কসরৎ বালক-মহলে খুবই উপভোগ্য ছিল।

এত কাণ্ডের পর, বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক বাদে চুড়িওয়ালা এক বাড়ী থেকে মুক্তি পেল। এত ক'রে তারা লাভ করত কি ক'রে তাই ভাবি—কারণ পরাতে পরাতে চুড়ি ভেঙে গেলে তা চুড়িওয়ালার যেত—বোধ হয় চুড়ি পরানোটুকুই ছিল তাদের লাভ।

চলেছে ফেরিওয়ালা এক-এক জন এক এক সুরে হেঁকে—

মহাস্থবির

আমাদের মগজে চিত্রবাহার তরঙ্গ তুলে। বাসনওয়ালা চলেছে, তারা হাঁকে না—বাজায়। রকমারী বাজনা সে—গিন্নিরা শুনেই বলে দিতে পারতেন, কার কাছে কি ধরণের বাসন পাওয়া যায়। ঐ যায় বেদের মেয়ে, পিঠে পোঁটলা বাঁধা। ক্ষীণ দেহযষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে ভারতের রাজধানীর বুকের ওপর দিয়ে ঘোষণা করতে করতে চলেছে—ব্যাত ভালে কবি—দাঁতের পোকা বের করি—এমন মন্ত্র ঝাড়বে যে দাঁতের পোকার বাবা তো দূরের কথা তাদের তিন কুলে যে যেখানে আছে পিল্-পিল্ করে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না। শুনতুম, ওরা না কি আরও অনেক সাংঘাতিক রকমের তুক-তাক্ ঝাড়-ফুক মন্ত্র-তন্ত্র জানে, কিন্তু ছাড়ে না।

ঐ আসে মাড়োয়ারী কাপড়ওয়ালা—রামশিঙের মতন আওয়াজে পাড়া কাঁপিয়ে—একটি—য়াকায়—তিন খা—না কাপড় —এক্‌খি—য়ানা ফাউ !!!

টাকায় চার খানা ধুতি! হোক না কেন সে পাঁচ-হাতি। আজ যে একখানা রুমালের দাম পাঁচ সিকে। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেদিনও মাতব্বরদের মুখে শুনেছিলুম—কি দুর্দিনই না পড়েছে। দুর্দিনের জয়ডঙ্কা কালের বুকে চিরদিনই বেজে চলেছে। মানুষ রাজ্য জয় করবার কৌশল শিখেছে বটে, কিন্তু দুর্দিনের কাছে তাকে চিরকাল হার মানতে হয়েছে।

এই দুপুরের যাত্রীদের মধ্যে আর এক জনের কথা মনে পড়েছে—সে ছিল ভিখারী, অন্ধ ভিখারী। খুব লম্বা-চওড়া ও হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল তার—বিশেষ কোরে পা দু'খানা ছিল তার অদ্ভুত। অত বড় লম্বা-চওড়া ও শক্তিব্যঞ্জক পা পালোয়ানদের মধ্যেও দুর্লভ। ডান হাতে তার মাথা সমান উঁচু একটা মোটা বাঁশের লাঠি ঝুলত আর বাঁ হাতে ঝুলত একটা রোগা কালো মতন প্যাংলা মেয়ে।

অন্ধ আবার গান গাইত। যেমন ছিল তার বিরাট দেহ, তেমনি ছিল তার কণ্ঠস্বর। উঃ, সে যেমন গম্ভীর, তেমনি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু গাইয়ে হওয়ার পক্ষে এতগুলি প্রতিকূল গুণাবলীর সমাবেশ সত্ত্বেও তার গান পড়শীদের বুকে করুণার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিত, এমনি দরদ ছিল তাতে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু তার সমস্ত অক্ষমতা ভেদ ক'রে হৃদয়-বেদনা শতধা উৎসারিত হচ্ছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে, সে গান নিশ্চয় তার নিজের রচনা নয়। চমৎকার গান—অন্ততঃ সে সময় খুবই ভাল লাগত। আজ সে গানের কথা ও সুর স্মৃতি থেকে মুছে গেলেও ভাবটা মনে আছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—অন্ধের যা কষ্ট তা ধৃতরাষ্ট্রই জানেন আর জানেন সেই অন্ধ মুনি—তিন যুগের ব্যথার ঢল নামল স্তব্ধ দুপুরের বুকে। গান গেয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে অন্ধ দাঁড়িয়ে বললে—মা জননী, অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটা পিঁ-পিঁ শব্দে টেনে টেনে সুর ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে—মা গো, দয়া ক'রে অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

হয়ত কোনো গৃহস্থবধূ তাকে একটা পয়সা কিংবা কেউ-ই কিছু দিলে না। অল্প কিছুক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে আবার ফিরলে সামনের দিকে, আবার সুরু হোলো সেই গান আবার সুরু হোলো তার যাত্রা।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—আমি শুনেছি মাথার ওপরে না কি আকাশ আছে, তার রং না কি নীল। রাত্রিবেলা না কি আকাশে ঝকঝকে সব তারা ফোটে, সে দৃশ্য না কি খুব সুন্দর। কিন্তু নীল বা ঝকঝকে কাকে বলে তা আমি জানি না—আমি যে অন্ধ!

তার সেই নিদারুণ অভিযোগ আমাদের অন্তরে যে তরঙ্গ তুলত তা একমাত্র বালক-মনেই সম্ভব।

অন্ধ গেয়ে চলল—শুনেছি না কি গাছে নানারকম ফুল হয়, বিচিত্র তাদের রং ও রূপ। সেখানে না কি প্রজাপতি ওড়ে, তাদের রং ও রূপ বিচিত্রতর। হায়! আমি যে অন্ধ, আমার কিছুই দেখা হোলো না।

তার গানের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে, সেটা শাশ্বত সত্য। প্রত্যেক লোকই জীবনে তা হয়ত বহু বার উপলব্ধি করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে—আঁখি নেই বিধি দিলি আখিঞ্জল—

এই অন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর প্রায় সামনেই একজনেরা থাকত। ভাড়াটে বাড়ী হলেও বেশ বড় বাড়ী, অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁদের। ছেলেরা দু'জন কলেজে পড়ত আর দু'জন চাকরী করত। বাড়ীর কর্ত্তা ভাল চাকরী করতেন—চোগা-চাপকান পরে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে গাড়ী চড়ে রোজ আপিসে যাওয়া-আসা করতেন। এ ছাড়া দেশে জমি-জমা ছিল এবং সেখান থেকে আমদানীও মন্দ ছিল না। সেখান থেকে প্রায় তরি-তরকারী ও ফল-মূল আসত এবং বাড়ীর গিন্নি পাড়ার প্রায় সব বাড়ীতেই সে সব জিনিষ বিতরণ করতেন। তাঁদের বাড়ীতে ছোট ছেলেপিলে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ও ব্যবহারটি এমন মধুর ছিল যে পাড়ার অধিকাংশ ছোট ছেলে ও মেয়েদের আড্ডা ছিল সেখানে। বাড়ীর কর্ত্তা ও ছেলেরা সকলেই ছোটদের ওপরে খুবই সদয় ছিলেন। কর্ত্তা মাঝে-মাঝে ছেলেদের চার নম্বরের ফুটবল কিনে দিতেন—বিকেলে তাঁদের বড় উঠোনে আমরা খেলতুম। পাড়ার প্রায় সব ছেলেই এখানে যাতায়াত করলেও আমরা দু'-ভাই এদের ভারি প্রিয়পাত্র ছিলুম, বোধ হয় সামনা-সামনি বাড়ী থাকায়।

কিছু দিন পরে বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ে হোলো। বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি সেরে তাঁরা দেশ থেকে ফিরে এলেন। আমরা বৌ দেখলুম, জমিদারের মেয়ে, রং খুব ফর্শা না হোলেও বেশ দেখতে—বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। চমৎকার হাসি-হাসি মুখ, টানা-টানা চোখ। বিদেশে শ্বশুরবাড়ীতে এসে তখনকার দিনে মেয়েরা যে-রকম কান্নাকাটি করত তার সে-রকম কোন বালাই ছিলই না, বরং আমাদের মতন এতগুলি বাচ্চা দেওর পেয়ে সে বেশ খুশীই হোয়ে উঠল। কনে-বৌ অবস্থাতেই সে এক দিন গাছ-কোমর বেঁধে আমাদের সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল ফুটবল খেলতে। কিন্তু সে ঐ এক দিনই, খুব সম্ভব তার শাশুড়ী বারণ করে দিয়েছিলেন। তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া করে ড্যাংগুলি খেলেছে।

যা হোক, ঐটুকু মেয়ে—আমাদের চাইতে আর কতই বা বড় ছিল সে, সেই এক পাল ছেলেকে সে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। এমনি ছিল তার আকর্ষণী শক্তি। মুখের কথা খসবার আগেই আমরা তার কাজ ক'রে

দিতুম। বৌদির কোনো দুঃখই ছিল না, অন্তত আমরা বুঝতে পারতুম না—তবে বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামত এর-তার বাড়ীতে ঘুরে-ঘুরে গল্প করা অর্থাৎ মনের সুখে পাড়া বেড়াতে পারে না বলে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে চাপা দুঃখ প্রকাশ করত।

এক দিন দুপুর বেলা আমরা দু'-ভাই এই রকম জানলায় বসে আছি, দূরে অন্ধ ভিখারীর গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মুখ তুলতেই চোখ পড়ল, বৌদি বারান্দায় চিক্ ফাঁক করে দূরে অন্ধকে দেখবার চেষ্টা করছে। অন্ধ তাদের বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই সে বারান্দা থেকে সরে গেল।

একটু বাদেই দেখলুম, বৌদি তাদের সদর দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দু'-দিকে দেখতে লাগল—লোক-জন কেউ কোথাও আছে কি না! গ্রীষ্মের দুপুর, রাস্তায় লোক-জন নেই, খাঁ-খাঁ করছে—একমাত্র সেই ভিখারী ও তার হস্তলগ্ন সঙ্গী ছাড়া।

ভিখারী বাড়ীর সামনে বরাবর আসতেই বৌদি দরজা খুলে বেরিয়ে টপ্ ক'রে তাদের বাড়ীর রকে উঠে পড়ল। রকের ঠিক নীচেই একবারে ভিতের গা-ঘেঁষে হাত-দুই চওড়া একটা নর্দ্দমা ছিল—সে সময়ে শহরে অনেক রাস্তাতেই দু'পাশের বাড়ীর গা দিয়ে এই রকম খোলা নর্দ্দমা থাক্‌ত।

দেখলুম, বৌদি বিনা আয়াসে একটি লম্ফে একেবারে নর্দ্দমা টপ্‌কে রাস্তায় পড়ল। তার পরে ভিখারীর হাতে পয়সা দিয়েই মারলে দৌড় বাড়ীর দিকে।

ভিখারীর আশীর্ব্বাণী তখনো শেষ হয়নি—দরজার সামনেই আমের খোশায় পা পড়ে বৌদি সশব্দে আছাড় খেল, সেই নর্দ্দমা-ঢাকা পাথরের ওপরে।

ভিখারী গান গাইতে গাইতে চলে গেল। আমরা দেখ্‌ছি, বৌদি আর ওঠে না। দু'-একবার ঘেঁষ্‌ড়ে ঘেঁষ্‌ড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে এলিয়ে পড়ল।

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে তাকে তুলি! শেষকালে কোনো রকমে হেঁচ্‌ড়ে—টেনে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলুম।

বৌদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারলে না—কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বল্‌লে—কোনো রকমে আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

দুই ভাই তার দুই হাত ধরে ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে ওপরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। যন্ত্রণার চোটে দেখতে দেখতে তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। আমরা তার কষ্ট দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার শাশুড়ীকে ডাবকার উপক্রম করছি দেখে সে বললে—এখন যা, বিকেলে আসিস্—কারুকে কিছু বলিস্‌নি যেন!

বিকেলে সেখানে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যা বেলা মা বল্লেন—ও-বাড়ীর বৌমার কি হয়েছে, দু'দু'জন ডাক্তার এল।

পরের দিন বিকেলে বৌদিকে দেখতে গেলুম। এক দিনেই তার চেহারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। শুনলুম, কল-ঘরে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, কাল সকালে অজ্ঞান ক'রে হাড় জোড়া লাগানো হবে।

একটু নিরালা হতেই বৌদি আমাদের বললে—একটা কথা বলব, রাখবি ভাই?

—নিশ্চয় রাখব।

—আমি এদের বলেছি যে কল-ঘরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে। ভিকিরিকে পয়সা দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলুম জানতে পারলে এরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। লক্ষ্মী ভাই, তোরা কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

পরদুঃখকাতরতা তখনকার দিনেও গুণ বলেই বিবেচিত হোতো, কিন্তু পরদুঃখে কাতর হয়ে বৌ-মানুষের রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া অমার্জ্জনীয় ছিল।

বৌদির পায়ে কাঠ বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলো বটে, কিন্তু অসুখ তার আর সারল না। দিনে দিনে নানা উপসর্গ জুটে অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। দেশ থেকে তার বাপ-মা এলেন, সায়েব ডাক্তারও এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দু'দিনের জন্য এসে সবাইকে আপন ক'রে, পাড়াশুদ্ধ ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে এক দিন সে চলে গেল।

বিশ্বাস ক'রে এক দিন সে আমাকে যে-ঋণে আবদ্ধ করেছিল আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সেই ঋণ শোধ করলুম।

[ক্রমশঃ

প্রতিসরণ

অরুণ বাগচী

পৃথিবীকে আকাশ দাও—নীলাকাশ, অতৃপ্তির নীল সমুদ্রে
অবগাহনের সুখ;
আকাশকে বিত্তবান্ কর রক্তসূর্যে, কালো মেঘে আলোর
চমক লাগুক্;
জোয়ার আনো মহাশূন্যের মরা গাঙে, শুকনো গাছে ফুল ফুটুক্।

তুমি-আমি নইলে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন, সৃষ্টি সৃষ্টির ভ্রম:
প্রাণের পর্দায় পর্দায় বেঁচে থাকা মৃত্যুর ব্যতিক্রম।
মননের অনুপস্থিতিতে সেই তুমি-আমি-সূর্য-স্বপ্নও বিধাতার পণ্ডশ্রম।

মনন চাই, উদ্ধত তরবারির দীপ্তিলিপ্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফসল—
সমুদ্র স্বননে যার উদ্ভাসিত নগ্নরূপ উচ্ছল,
নইলে প্রাণের অংকুর শুধুই সম্ভাবনার ছল।

প্রতিভার চাষ কর, ক্ষুরধার প্রতিভার চাষ:
ভালো লাগা, ভালোবাসা অনেকই তো চেখে চেখে
কেটেছে মাস;
দয়া করে আজ তুমি আশ্বাস আনো, আনো বোঝা-বোঝানোর
সুতীব্র বাতাস।

ঝরা পালখ

কানাই সামন্ত

এক

স্রষ্টা যিনি, সার্থক যাঁর নাম, সেই কবি লোক-লোকান্তরের অধিপতি। প্রথম ও পরম স্বর্গ অন্তরে, যেখানে কবি ও কবির অন্তর্যামী একত্র বিরাজ করছেন। সেই গূঢ়তম লোকে অপরিসীম আনন্দ, অলৌকিক চেতনা, সমাহিত শক্তি। আমি ও তুমির প্রেমে শান্ত সমুদ্রে সহসা অমিত আনন্দ উন্মথিত হয়ে ওঠে, আর তারই নিরন্তর বীচি-বিক্ষোভ মণ্ডলাকারে লোক হতে লোকান্তরে বিসর্পিত হয়ে অবশেষে অসীমে হারিয়ে যায়।

কাব্যসৃষ্টির নিমিত্ত উপাদান

কাব্যসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান

একান্ত ধ্যানে কবির যে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত ছিল তা বাইরের জগতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতেই, আনন্দময়ী কোন্ নারীমূর্তির প্রথম দর্শনেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আর বিস্ময়ে বলে: তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির!—কথা বলে না, দুটি সলজ্জ অর্ধনিমীলিত চক্ষুতে অপরূপ হাসি হাসে; সত্য বটে এই রমণী অন্তর থেকেই বাইরে এসেছে, আর তন্ময় ভাবুককেও অন্তর থেকে বাইরে টেনে এনেছে; অন্তরে যা অসীম আনন্দ আর বিশ্বভুবনে যা অনির্বচনীয়া মায়া, সেই উভয়েরই সম্পূর্ণ প্রতিমা এই। চোখ মেলে একে যদি খুঁজে না পায় তবে কবি কবিই হতে পারে না; এ জীবনে পথের ধুলায় খ্যাপা-পাগল সেজে বসে থাকা ভিন্ন তার আর উপায় নেই। কিন্তু একে যদি পায়, কাছের পাওয়াই নয়, নাই বা সে রাতে রাতে নিভৃত গৃহকোণের দীপটি জ্বেলে দিল, নাই বা তার হাসিতে প্রতি প্রভাতে নির্ধনের স্পৃহনীয় দৈন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দূরের চোখের দেখাতেও যদি পায়, অম্লান স্মরণের ভাস্বর পটে যদি আঁকা থাকে, তবে তাইতেই নব জীবনের সূত্রপাত।

অন্তরে যে প্রেমলীলা অন্তর্যামীর সঙ্গে বাইরেও তাই; একটি অপরটির প্রতিভা। আর, এই প্রেমেই সমস্ত সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে, নিত্য নবীন হয়ে ওঠে। সমস্ত সংসারকে, সংসারের সকল জীবন আর জীবনের সমুদয় ঘটনাকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করা যায়—যেন সে জগৎ নয়, নূতন জগতে নূতন ক'রে জন্মলাভ হয়। দশ দিকে অরণ্য-পর্বত, নদ-নদী-তড়াগ, অকূল সিন্ধু, অনন্ত তুষার, আকাশের বিপুল প্রসারে ষড়্ঋতুর পরিক্রমণ, আলো-অন্ধকার, সূর্য-চন্দ্র-তারা—যারা চিরদিন জড় মৃত বাণীহীন হয়েছিল, সে সবই সহসা প্রাণ পেয়ে নড়ে ওঠে। দেখা যায়, একই সত্তায় নিখিলের সকল সত্তার অনুপম রহস্য নিহিত; অন্তরের তারে যে সঙ্গীত বাজছে বিশ্বময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই রেশ জাগছে। অন্তরে অসীম জীবনের একটি পরিপূর্ণ বাণী জাগছে—ওঁ; সর্বভূত তাতেই সায় দিয়ে জপছে—ওঁ ওঁ। (১) অন্তরেও তল নেই, বাইরেও সীমা নেই।
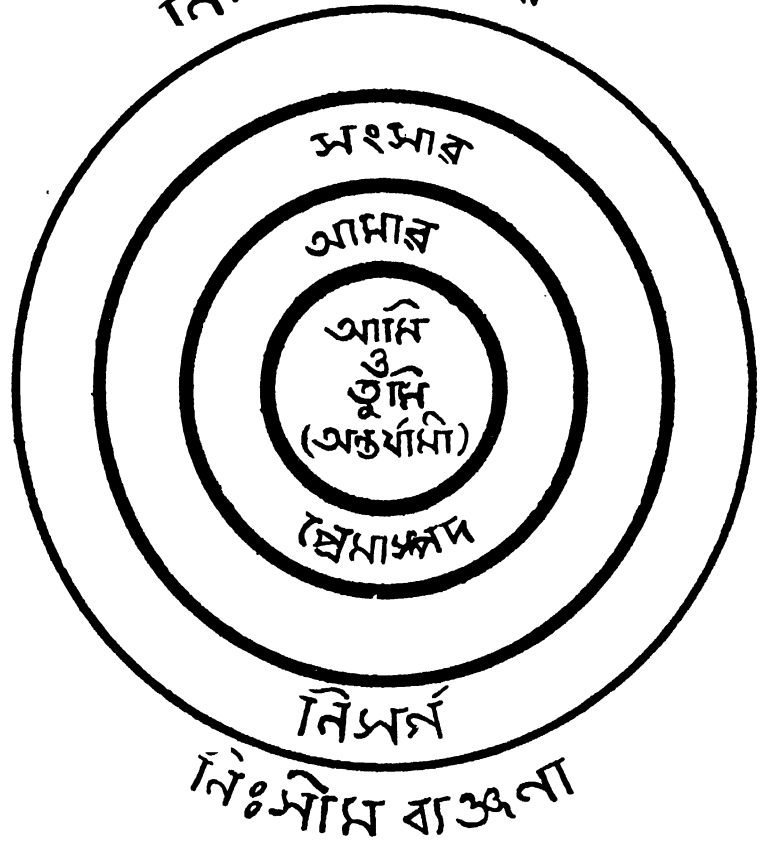
আপনার সৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কবি মানুষ-সাধারণের সুগোচর করে। মানুষ বললে: এই যে জগৎ, এই জীবন, আমায় বুঝিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা তাই নানা দিকে নানা ভাবে সচেষ্ট হল। অনেক প্রশ্ন; অনেক সংশয়; অনেক সমস্যা; অনেক তর্ক-বিতর্ক; অনেক সিদ্ধান্ত-শিখরে পৌঁছুবার দুরূহ প্রয়াস যা এক জন যদিও বলে অটল, স্থির, আর এক জনের যুক্তিঘাতে টলে উঠতে দেরী হয় না। কবি বলে: রোসো! আমি তো জানি আনন্দকে আনন্দ দিয়েই বুঝতে হয়, ভবকে বুঝতে হয় অনুভব দিয়ে, নিখিলজীবনকে পাই আমি নিজের এই সীমাবদ্ধ জীবনেই। অতএব সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি দিয়ে বোঝাব। আমি রূপরচনা করি, তুমি দেখো; আমি গান গাই, তুমি তোমার প্রাণের বীণা-যন্ত্রে তারগুলো সযত্নে বেঁধে নিয়ো। আনন্দে ও সুরে সকল রহস্যই নিঃশেষে ধরা দেবে, ফুলের গোপনে মধু যেমন ভরে ওঠে চুপি-চুপি।

কবির বাণীতে অন্তরের চিররুদ্ধ দেউল-দ্বার খুলে গেল; মাটির ঘরে দু'টি মানব-মানবীতে মিলে প্রতিদিনের ঘরকন্নার কাজ যা কিছু,

---

(১) রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, ওঁ এই প্রণব হচ্ছে নিখিল-সৃষ্টির মূলীভূত পরমা স্বীকৃতির অনাহত ধ্বনি ও মন্ত্রবীজ।

তাই চিরদিনের স্বর্গের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সংসারে যে অসংখ্য নর-নারীর মুখ চিনি, মর্ম জানি নে—যাদের সঙ্গে প্রয়োজনের বাঁধনে মিলি, ঐক্যের উপলব্ধিতে বা আনন্দের বেদনায় নয়—তাদেরও জানলেম, তাদেরও চিনলেম, ভালোবাসলেম, এ জীবনে তাদের আবির্ভাব সত্য হল; নিখিল ভুবন কথা কয়ে উঠল, নেচে উঠল, গেয়ে উঠল, নিখিল নিসর্গের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভোলা মনকে ভুলিয়ে কোথা যে নিয়ে গেল কিছুতে তার ঠিকানা পাই নে, যতক্ষণ না আবার চোখ বুজে ডুব দিই আপন অন্তরে, রসের রসাতলে, আর কী অরূপরতনের অঙ্গস্পর্শ ক'রে বলি: এই গো এই!

দুই

সময়ে সময়ে মনকে জিজ্ঞাসা করি, রূপরচনা করে কী ফল? সূচনাতেই বলে রাখি, যে মন এই প্রশ্ন করে আর যে মন এর সদুত্তর খোঁজে, উভয়ের কোনোটিই কবি-মন নয়। দিনে দিনে ফুল ফোটানো যেমন ফুলগাছের স্বভাব, বেশভূষণের কথা ভুলে গিয়ে ধূলিধূসর দিগম্বর সেজে খেলা করা যেমন শিশুর সহজ প্রবৃত্তি, অন্ধকার দূর করা যেমন আলোর কাজ, তেমনি রূপরচনা করাই রূপকার বা কবির ধর্ম। কেন, কী হবে, এ-সব কথায় তার প্রয়োজন কৈ? রূপরচনার দ্বারাই সে নিজেকে বিকাশিত করে—প্রকাশিত করে, রূপরচনাতেই তার সব হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আহ্লাদ। কবির নিজের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট, অর্থাৎ ষোলো আনার উপরে সতেরো আনা লাভ। আর, কবির রচনা যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের পক্ষেও যে নয় তা বলতে পারি নে। কারণ কবির সঙ্গদোষে তাঁরাও কবিরই সাধর্ম্য লাভ করেন, কিন্তু তাঁদের দার্শনিক মন জিজ্ঞাসু মন, কিছু কালের জন্য মুখ বুজে অন্তরালে সরে বসলেও চিরকাল হয়তো মূক থাকে না, কিম্বা নেপথ্যেও থাকতে রাজী হয় না, তখনই এই সমস্ত প্রশ্ন ওঠে: রূপরচনা ক'রে কী ফল? তাতে কার কী হিত হয়?

যদি বলি, হিত কারো কিছুই হয় না কিছুই হয় না, কখনোই হবার নয়, কিন্তু কবির কাব্য-সৃষ্টিতে কবির নিজেরও মুক্তি আর রসিকেরও মুক্তি(২)—কথা শুনে কেউ চমকে উঠবেন না। মুক্তিসাধনা সন্ন্যাসী-বৈরাগীরই একচেটে নয়। মুক্তিতে প্রয়োজন সকলেরই, অতএব সকলেই মুক্তি সাধে আপন প্রকৃতি অনুসারে আপনার প্রণালীতে। বৈরাগ্যের হয়তো একটা মুক্তি আছে, কিন্তু অনুরাগের ও কল্পনার তা থেকেও বহু গুণে মহীয়সী মুক্তি আছে জেনো। তা যার-পর-নেই শ্রেয়ঃ বলেই যার-পর-নেই সহজ, আর যার-পর-নেই দুরূহ তার সাধনা।

নিজের ক্ষুদ্র জীবনে, সীমাবদ্ধ দেহে-মনে, সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ থাকি বলেই তো যত দুঃখ আমাদের, যত হীনতা। বুদ্ধদেব না কি উপলব্ধি করেছিলেন, বাসনাই জীবের মোহবন্ধ অর্থাৎ তার দুঃখের হেতু, তার মুক্তির প্রতিবন্ধক। বাসনা তখনই সম্ভব হয় যখন নিজের বা নিজের জীবনের পরিধি, সাধনা ভাবনা বেদনার ক্ষেত্রে, যথেষ্ট ছোটো ক'রে রাখি। নইলে যতই নিজেকে অন্য অনেকের জীবনে বা অসীম জীবনে প্রসারিত করে দিই, নিজের সীমানা মুছে মুছে দিই, অথবা নিজেকে ভুলতে থাকি, বাসনার বশে বা লোভীর মতো ক'রে চাওয়া-পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মনে হতে পারে, অনুরাগের ও বাসনার আকর্ষণ এক দিকে, উভয়ে মানুষকে একই ভাবে গড়ে তোলে। বস্তুতঃ তা নয়। অনুরাগে যে বাসনার মিশ্রণ থাকতে পারে না, আবার ভাগ্যক্রমে বা অজানা স্বর্গের অচেনা দেবতার প্রসাদে বাসনাও যে অনুরাগ হয়ে ওঠে না, এমন বলি না—না হলে বিল্বমঙ্গলের কাহিনী তো মিথ্যা বলতে হয়—তবুও মানুষের জীবনে অনুরাগ এক, বাসনা ভিন্ন। বাসনা টানতে চায় সবকে নিজের পানে, সবই করতে চায় নিজে আত্মসাৎ। প্রেম সর্বত্রই নিজেকে বিলোতে চায়, হয়ে উঠতে চায় সর্বময়। বাসনা যা কিছু চায়, যা কিছু পায়, তাতে তার ক্ষুদ্রতা কখনো ঘোচে না; এবং জড়-চেতন নির্বিশেষে তার সমুদয় কেড়ে-নেওয়া জিনিষ, আগলে-রাখা জিনিষ, শেষ পর্যন্ত বিষম বোঝা হয়েই তাকে পীড়িত করতে থাকে। জড় তো জড়ই বটে, চেতনার জিনিষও তার কাছে অচেতন, যে জন্যে মানুষকে আক্ষেপ করতে হয়েছে—

> 'নিরখি কোলের কাছে
> মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
> দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।'

প্রেম চোখ মেলে যা-কিছু দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়, সেখানেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজে তাই হয়ে যায় বা তাই হয়ে যেতে চায়। আপনার চৈতন্য দিয়ে সে জড়কেও উদ্ভাসিত ক'রে তোলে, তাকেও চৈতন্যময় বলেই উপলব্ধি করে! অবশেষে আনন্দের ও চেতনার লোকে সকল সীমা হারিয়ে যায়।

সুতরাং প্রেমের ও বাসনার বিভিন্ন প্রকৃতি, বিপরীত মুখেই গতি।

কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বিশুদ্ধ প্রেম বা অবিমিশ্র বাসনা সংসারে দেখা যায় না। অন্য কথায়, এ সংসারে প্রেমের ও বাসনার বিভিন্ন প্রবৃত্তি (tendency) যেমন চোখে পড়ে, তেমন চোখে পড়ে না কখনোই প্রেমের বা বাসনার একান্ত পরিপূর্ণতা বা শেষ পরিণাম। কাজেই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা দিয়েই বিচার করতে হয়।

ভাবুক, কবি, প্রেমিক যেমন পরস্পরের নিকট-আত্মীয়—কল্পনা, অনুভূতি, অনুরাগ, দৃষ্টি তেমনি এক গোত্রের জিনিষ। একই মানুষ যেমন জীবন-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আর বিভিন্ন ছন্দে ভাবুক, কবি বা প্রেমিক নামে পরিচিত; চেতনার একই ক্রিয়া বা ক্রীড়া তেমনি বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন অবস্থায় কল্পনা, অনুভূতি, অনুরাগ দৃষ্টি, আরো কত কী নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে অনুরাগের কথাই এতক্ষণ বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং অনুরাগীর স্বধর্ম যে কী তাই হয়তো কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে। কবির স্বধর্মও প্রায় ঐ। প্রেমিক যেমন ভালোবাসে আপন প্রেয়সী নারীকে, বন্ধুকে বা পথের পথিককেও—যেমন ক'রে অনুভব করে আর সত্তায় প্রবেশ করে তাদের—কবি তেমনি কল্পনার যোগে সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি। চরমে প্রেমিকের প্রেমও হয়ে ওঠে দৃষ্টি, কবির কল্পনাও তাই। প্রেম বা কল্পনার বিষয় সেই অলৌকিক আদিম দৃষ্টিতে অন্তরে-বাহিরে উদ্ভাসিত হয়ে

---

(২) সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলছি না, তা হলে তো বিশেষ লোকহিত হত।

উঠে, অন্তর-বাহিরের কোনো রহস্যই অগোচর থাকে না তার, কারণ এই দৃষ্টিতেই যে আলো, এই দৃষ্টিতেই আনন্দ, এই দৃষ্টিতেই হওয়া। কবি বা প্রেমিক যা দেখে তাই হয়ে যায়।

বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনভঙ্গী অন্য রূপ। তাঁদের মুক্তিও তাই ভিন্ন। কবি বা প্রেমীর মুক্তি সবকে আলিঙ্গন ক'রে; আর সন্ন্যাসীর মুক্তি সবকে ত্যাগ ক'রে—বর্জন ক'রে। সন্ন্যাসী যখন তাঁর ঈপ্সিত মোক্ষ-কামনায় বলছেন নেতি-নেতি, কবিপ্রেমিক তখন আহ্লাদে গেয়ে উঠেছেন ইতি-ইতি। কোন্ কথা, কোন্ মুক্তি বড়ো তা-ও কি বলে দিতে হবে? এই মাত্র বলতে পারি যে, যে বলে এই, যে বলে ইতি, নিখিলের সর্বত্র যে প্রেম দেয়—পূজা দেয়—ও, তার মুক্তিই তো ভাগবত মুক্তি। কারণ, ভগবানও তো ঠিক এমনি ভাবে তাঁর অনাদি অনন্ত সৃজনলীলায় খুশী হয়ে মুক্ত হয়ে রয়েছেন; তাঁর মুক্তি লোকে লোকে, তাঁর মুক্তি রূপে রূপে, তাঁর মুক্তি অদৃশ্য প্রাণ-জাহ্নবীর সহস্র ধারায় জীবনের সুদৃশ্য কুমুদ-কহ্লার শতদল সহস্রদল হয়ে তরঙ্গে-তরঙ্গে দিবানিশি নাচে। সেই যে লীলাময় ভগবান, কবি ও প্রেমিক তাঁরই ভক্ত, তাঁরই সখা, তাঁরই সঙ্গী, শিশুসম তাঁরই অনুকারী।

বিষয়ী বা কামুক আমাদের থেকে যত দূরে, বৈরাগী সন্ন্যাসী তার চেয়ে অধিক দূরে। ওরা নিজেদের অপরিসীম তামসিক মোহে চেতনাকেও সর্বত্র সর্বপ্রকারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে শেষ পর্য্যন্ত নিছক জড়ের উপাসনায় জড় হবার পথেই চলে। এরা সৃষ্টিকে স্বীকার করে না, রূপকে স্বীকার করে না, বিশ্বসংসার বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ চেতনায় লীন হতে চায়। আমরা কিন্তু অমৃতের মূর্তি চাই, চেতনার লীলা ভালোবাসি। আমরা তনুকে বাদ দিয়ে প্রাণকে দেখি নে। প্রাণকে বাদ দিয়ে তনুও কি দেখা যায়? তাই তো আমাদের জীবনে আর আমাদের উপলব্ধিতে, লক্ষ ও অলক্ষ, মর্ত ও স্বর্গ, মানব ও দেবতা মিলে মিশে এক ও অভিন্ন। আর সকলের আকাঙ্ক্ষা অভেদে ভেদ কল্পনা ক'রে ধাবিত হয় নানা বিরুদ্ধ ও বিপরীত মুখে। আমরা চাই প্রতি পদে নিখিলের সমগ্রতাকে মিলিয়ে মিলিয়ে, কবি-ভাবুক প্রেমিক-শিল্পী সখা ও সুহৃৎ সকলে মিলে নিত্যের পরিক্রমা দিই নৃত্যচ্ছন্দে। আমরা সতক্রিয়া; আমাদের সাধনা সকলের চেয়ে কঠিন, ব্যর্থতাও স্পৃহনীয়।

এসো কবি, এসো রূপকার, রূপের ভুবন দেখিয়ে দাও; যুগ-যুগান্তরের যাত্রীদের জন্যে নিখিলের সকল দ্বার-বাতায়ন উন্মুক্ত ক'রে দাও। আমরা ত্রিভুবনের সর্বত্র প্রবেশ করব। আমাদের কল্পনা মুক্ত, আমাদের অনুরাগ মুক্ত; আমরা তোমার প্রসাদে নিখিল জগতের নিখিল জীবনেই স্বয়ং হারিয়ে গিয়ে স্বকে পেলাম।

শীতে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

নিস্তেজ শীতের রোদ, নিরুত্তাপ বসে আছি ঘরে।
হিমসিক্ত হ্রস্ব দিন, ভিতরে তুষার-গলা শীত,
অরণ্য-নিবিড় নীড়ে সঙ্কুচিত পাখীরা স্তম্ভিত,
শিশির-নিষিক্ত মাটি,—হৃদয় উত্তাপ খুঁজে মরে।
বিচ্যুত দমকা হাওয়া উদ্দামতা আনে অভ্যন্তরে।
কুয়াশা-ধূসর সূর্য মুহ্যমান, স্তিমিত অতীত,
উত্তপ্ত হৃদয় কোনো মনে পড়ে, গ্রীষ্মের সঙ্গীত,
আজ এ মধ্যাহ্ন-বেলা নিরুত্তেজ, মন উষ্ণ করে।

কোথায় হিমানী নদী, উত্তাল পাহাড়ী-ঝর্ণা কাঁপে?
জানালায়, বাতায়নে প্রকম্পিত লক্ষ হিম-কণা,
কাঁপিছে পীতাভ রৌদ্র অনভ্যস্ত শীতের প্রতাপে,
আমারো হৃদয়ে কাঁপে দুর্নিবার বৈশাখী কামনা।

নিরুত্তেজ বসে আছি, মধ্যাহ্ন শীতের বেলা কাটে।
একটুকু অগ্ন্যুত্তাপ নেই তৃপ্তি ভিতরে ও মাঠে।

কবি-গানের কবি ও গান

মুস্তাফা নূর-উল্ ইসলাম

কবি-গানের ইতিকথার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্র টানতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। যখন ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে, স্বাধীন বাংলার মসনদের উপরে আসীন হয়েছে বণিকের মানদণ্ড শাসনের রাজদণ্ডরূপে, বৈদেশিক শাসন ও শোষণের পেষণে দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে গিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে—এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণের পরিবেশে নাগরিক সভ্যতা থেকে বহু দূরে গ্রামাঞ্চলের চণ্ডীমণ্ডপে, যাত্রার আসরে কিষাণদের অবসর-বিনোদনের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-ব্যসনের অন্যতম অপরিহার্য অংগ হিসেবে কবি-গানের গোড়াপত্তন হয়। মোটামুটি ভাবে ১৭৬০ খৃঃ অঃ থেকে ১৮৩০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত এই সত্তর বৎসর কাল কবিওয়ালাদের মাতামাতি গোটা বাংগালী জাতটাকে মাতিয়ে এবং তাতিয়ে রেখেছিল। স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং খাঁটী স্বাদেশিকতার ছাপ থাকায় কবি-গানের ইতিহাস আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার দরুণ, নতুন করে গজিয়ে-ওঠা 'ইয়ং-বেংগলের' অত্যাচারের দরুণ এবং বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবের চাপে এ দীর্ঘতা সম্ভাবনার আকার না পেয়ে হ্রস্বতেই কুঁকড়ে মরে যায়।

বাংগালী জাতের একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে 'আবেগ-প্রবণতা'। 'বোধ' আর 'মুক্তিজ্ঞান' থেকে বহু দূরে অনুভূতির, 'আবেগের' বিস্তিখেলাতেই এ জাত রস পায়। তাই এ দেশের জাতীয় সাহিত্যও হয়ে পড়েছে প্রধানতঃ গীতিধর্মী। গানের ভেতর দিয়েই বাংলা সাহিত্য-ভারতী ভূমিষ্ঠা হয়েছেন। চর্য্যাগান, পদাবলীর গান, পুরাণ ও মংগলকাব্যের পালা গান ইত্যাদি চলে এসেছে সেই দশম শতাব্দী থেকে ভারতচন্দ্রের যুগ অবধি নাচ, গান আর ছড়ার ভেতর দিয়ে। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে দেশ জুড়ে একটা ওলট-পালট সংঘটিত হলেও তা হয়েছিল ওপরতলায় নবাব, উজীর, সেনাপতি, জমিদার, বণিক এদের চত্বরে—সমাজের নীচুতলায় সে আলোড়নের ঢেউ পৌছায়নি। তাই দেখা যায়, দেশের এমন যুগ-সন্ধিক্ষণেও মুর্শিদাবাদ বা কোলকাতা বা কাটোয়া থেকে সুদূর পাড়াগাঁয়ে দিনান্তের কঠোর পরিশ্রমের পর সমানে চলত যাত্রা, পাঁচালী, ছড়া গানের চর্চা। এবং এই ভাবেই বাংগালী জাতের গীতিস্পৃহা, রস-আস্বাদন আকাংখা তুষ্ট হত। কবিওয়ালাদের উদ্ভব হল উক্ত স্পৃহার তাগিদেই এমনি ধরণের যুগে। ঝঞ্ঝা এবং বাত্যাবিক্ষুব্ধ সে যুগ চিন্তাশীলতার বিকাশের অনুকূল ছিল না, প্রতিভা চর্চার আবহাওয়াও ছিল না তখন। তখন জন-সমাজের চাহিদা ছিল কেবল সংগীতের জন্য। এ চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন কবিওয়ালার দল। তাই এ-যুগের ইতিহাস কবি-গানের ইতিকথায় পূর্ণ।

কোন রকম সংগা নির্ধারণ করে কবি-গানকে সে সংগার ছকে ফেলা মুস্কিল। সঠিক ভাবে বলাও যায় না কবি-গান কাকে বলে। সাধারণতঃ বিভিন্ন সময়ে চলিত খেউড়, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, চপ, কীর্ত্তন, টপ্পা, দাঁড়া-কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি কবি-গান নামে খ্যাত। আর দু'টিয়ের জনাকয়েক ছাড়া কবিওয়ালারা প্রায়ই হচ্ছেন অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত গেঁয়ো স্বভাবকবি। 'কবি ও কবি-গান' সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে দেয়া হল: "ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে (কলিকাতা) পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয় জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্য-রস চাহিত না।

"কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ব্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমানে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু স্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন-ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্-ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"

মোটামুটি ভাবে কবি-গান রচিত হত সাধারণ (লোক-সাহিত্য) লোকদের জন্যে, যাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সর্বসাধারণ' নামক 'হঠাৎ-রাজা'। কোম্পানীর রাজ-দরবার দেশ-শোষণের একটা কারখানাবিশেষ ছিল। আবার এ-দেশীয় যাঁদেরকে আশা করা যেত দেশের সংস্কৃতি-চর্চ্চার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে, সেই সব নব গঠিত ঔপনিবেশিক সমাজের মুকুটমণিরাও দিনে দিনে হয়ে পড়তে লাগলেন রাজশক্তির পদলেহকের পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তি ও পরিবার গত স্বার্থের নেশায়। তাই অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকের অভাবে জাতীয় সংস্কৃতি ক্রমেই আশ্রয় খুঁজতে শুরু করল সমাজের নীচুতলার দিকে। এবং শেষ অবধি দেখা গেল, জনসাধারণ ছাড়া কবি-গানের শ্রোতা এবং সমঝদার অভিজাত শ্রেণীর কাউকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, এই সব অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত শ্রোতার আসরে উপযুক্ত সমালোচক বা উপযুক্ত সমঝদারের অভাব ঘটল। ফলে কবি-গানের চর্চ্চা হয়ে দাঁড়াল গতানুগতিক; বিষয়-বস্তুর উৎকর্ষতায় শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হত না বলে বিষয়-বস্তুও নামতে লাগল অপকর্ষতার দিকে। এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যেমন শ্রোতা তেমনি কবিওয়ালা এসে জুটে গেছেন। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, খুব কম কবিই ছিলেন যথার্থ শিক্ষিত, মনীষাসম্পন্ন এবং চমকপ্রদ প্রতিভার অধিকারী। নতুন কিছু উদ্ভাবন করবার মত মগজ আর প্রচেষ্টা প্রায় কারুরই ছিল না বলা যেতে পারে। কারণ, উপযুক্ত সমালোচনা, উৎসাহ এবং সমর্থন ছিল না মোটেই। আসরে দেখা যেত একটা মূক জনতা সাময়িক চিত্তবিনোদনের জন্যে কবিওয়ালা সম্বন্ধে পূর্বকৃত একটা অন্ধ ধারণার মূঢ়তায় 'থির' হয়ে বসে আছে। তারা 'সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত,...সাহিত্য-রস চাহিত না।' এ

উত্তেজনার ফেনা কেটে গেলেই 'যথা পূর্বম্ তথা পরম্' অবস্থা। তাই বলছিলাম, তীক্ষ্ন সমালোচক, সমঝদার এবং উৎসাহদাতার অভাবে হরু ঠাকুর, রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ প্রমুখ ছাড়া আর কেউই 'মান' (standard) পর্য্যন্ত উঠতে পারেননি। সুতরাং দেখা যায়, সমষ্টিগত ভাবে কবি-গানের চর্চা ও সাধনায় কবিওয়ালারা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে এগিয়ে যেতে পারেননি। পরন্তু দেখা যায়, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজী কালচারের জোয়ারে তাঁরা তলিয়ে যান বিস্মৃতির অতলতায়।

কবি-গান বলতে সাধারণ ভাবে আমাদের মনে এর বিষয়-বস্তুর অপকর্ষতা এবং কবিওয়ালা ও শ্রোতা-সাধারণের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে হীন ধারণার উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু এমনও দিন ছিল যখন কবি-গানের বিষয়-বস্তু ছিল উচ্চাংগের এবং তার ভেতরে ধর্মীয় দর্শনের বেশ একটা ঠাঁই ছিল। সেটা হচ্ছে কবি-গানের গোড়ার যুগ। অপসৃয়মান বৈষ্ণব-যুগে যখন শাক্ত-সাহিত্য ক্লাসিক পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তখন কবিওয়ালারা তাঁদের রচনায় রাধাকৃষ্ণের 'বিরহ' কিংবা 'সখীসংবাদ' তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির এই সব পুরানো ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরেন। অবিশ্যি এটা ঠিক যে কবিওয়ালারা বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তবু তাঁদের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার মূল ভাবের (মান, মাথুর, গোষ্ঠ ইত্যাদি) অনুকরণ এবং বৈষ্ণব কবিতার রচনাশৈলীর একটা ছাপ ধরা পড়ে। যেমন নিতাই বৈরাগীর একটা পদ :

শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশো হইলো,
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। খুব কম কবিওয়ালাই ছিলেন সংগীত-রচনার কলায় (art) বিশেষজ্ঞ। অথচ গেঁয়ো অশিক্ষিত বড় জোর অর্ধশিক্ষিত সাধারণ কবিওয়ালাদের রচনায় বৈষ্ণব পদসমূহের মূল ভাব এবং রচনাশৈলী কেমন করে অবিকৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর জবাবে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এই সব কবিদের ছন্দোবদ্ধ আকারে ছড়া এবং গান-রচনার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। আর তার সংগে মিশেছিল সাহিত্যিক যুগ-প্রভাব। কারণ তত দিনে 'Baisnab poetry had been reduced almost to a mechanic art ; its conceptions had become stereotyped and its language conventional.—(ডাঃ সুশীলকুমার দে)

কিন্তু সাধারণ ভাবে এ-কথা বললেও বৈষ্ণব কবিতার সংগে সম্পর্কিত হিসাবে বিচার করতে গেলে রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রমুখের মৌলিকত্ব, প্রতিভার উৎকর্ষতা উপেক্ষা করা যায় না। এঁদের রচনায় বৈষ্ণব কবিতার মাল-মশলার সন্ধান পাওয়া গেলেও এঁরা স্বকীয়তা এবং প্রতিভার মৌলিকত্বের বলে রচনার স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততার দিক্ থেকে বৈষ্ণব-প্রভাবের বাইরে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। দু'-একটা নমুনা এ সম্পর্কে দেওয়া গেল :

মান করে মান রাখতে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালরূপ সদা।
হৃদয়-মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা দু'নয়নে।—(রাম বসু)

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে।
শুনেছ কখন জ্বলন্ত আগুন
বসনে বন্ধন রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে।
—('বিরহ' হইতে উদ্ধৃত—হরু ঠাকুর)

মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে কবি-গান সাহিত্য হিসেবে কতটা উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে গিয়েছে, আবার কতটা নেমে গিয়েছে অপকর্ষতার পথে তার বিচার-বিশ্লেষণ হল। এবার দেখতে চাই, এই সত্তর বছরের মধ্যে কবি-গান এমন কি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটা স্থান নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কবি-গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলা দেশ আর বাংগালীর সমাজের নাড়ীর সংগে কবি-গান একেবারে মিশ খেয়ে গেছে। তৎকালীন বাংগালী সমাজের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার ইতিহাস—সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-আনন্দের ছবি কবি-গানের ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। 'বিরহ' এবং 'আগমনী' সংগীতগুলি—বিশেষ করে রাম বসু—এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রবণ বাংগালীর সামাজিক জীবনের প্রতিটি অনুভূতির সংগে সূক্ষ্ম কারু-কৌশলতার মারফৎ তার ধর্মীয় অনুষ্ঠান একাংগীভূত হয়ে রেখায়িত হয়েছে কবি-গানের ছন্দ-ঝংকারে। যেমন বলা যেতে পারে, 'মেনকা' এবং 'উমাকে' নিয়ে রচিত 'আগমনী' গীত। বাংগালী-ঘরের প্রতিটি মাতা আর কন্যার মধ্যকার স্নেহ-বাৎসল্যরসাশ্রিত অনুভূতিটি 'মেনকা-উমা' কাহিনীর সমগোত্রীয়। বিস্তৃততর ভাবেও গণ-মানসের সংগে কবি-গানের অদ্ভুত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। তৎকালীন বাংলা দেশের গণ-সংস্কৃতি আশ্চর্য্য ভাবে রূপ নিয়েছে কবিওয়ালাদের রচনায়। নওয়াব, বাদশা, রাজা, জমিদার এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীর আওতা থেকে সরে আসাতে উৎসাহ, সমর্থন, সমালোচনা এবং সাহায্যের অভাবে কবিওয়ালাদের রচনার, বিষয়বস্তুর, রচনা-শৈলীর উৎকর্ষতার পারদমান নেমে গেছে এটা ঠিক, কিন্তু তার ফলে পরোক্ষ ভাবে এঁদের সৃষ্ট গানে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অঙ্কিত হয়েছে বাংলার অগণিত কিষাণ সাধারণের অন্তরের আকুতি, ব্যথা, বেদনা, আনন্দের ইতিহাস।

মানুষ ও জান্তব প্রবৃত্তি

অভীশ্বর সেন

ক্রমবিবর্ত্তনের পথে মানুষ আজ বহুল অগ্রসর। নতুন কোন শরীরাংশ উদ্ভবের তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সাধারণ স্বাস্থ্য কিন্তু হইবে আরও উন্নত; কারণ সে আজ পাইয়াছে পুষ্টিকর খাদ্য ও দুরারোগ্য রোগের ঔষধ। অস্ত্র-চিকিৎসার নানা কৌশল সে আয়ত্তে আনিয়াছে। অন্ততঃ তাহার মানসিক শক্তিগুলি প্রকাশ করিবার আরও সুযোগ সে পাইবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে উন্নতি হইবে মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অবস্থার। ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের সভ্যতা ও তাহার দর্শনযোগ্য ব্যবস্থা এবং রীতি-নীতি কখনও বা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কখনও বা পিছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই থাকিয়া গিয়াছে লাভ। তাহার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে অসম্ভব, কিন্তু মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে বহু দূর। সৌভাগ্য বশতঃ মানব-মস্তিষ্কের নূতন নূতন উন্নতি সময় কখনও রোধ করিতে পারিবে না। তাহা চিরকাল সম্ভব।

পাখীরা দিনের শেষে নিজেদের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ক্ষুদ্র গায়ক পাখী গৃহস্থের দুয়ারে বাসা বাঁধে, শীতে তাহারা কোথায় যেন চলিয়া যায় কিন্তু পরের বসন্তে আবার তাহারা সেখানে ফিরিয়া আসে। সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার পাখীরা দক্ষিণের দিকে সমুদ্রের উপর দিয়া হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, কিন্তু তাহারা তাহাদের পথ হারায় না। বার্ত্তাবাহী কপোত বাক্সের ভিতর বন্দী হইয়া, দুরন্ত যাত্রায় প্রথমটা ঠিক পায় না, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য সে ঘুরিয়া নিভুল ভাবে স্বস্থানে ফিরিতে থাকে। বাতাসে যখন তৃণদল আন্দোলিত হয়, যাহা কিছু দর্শনীয় পথের সন্ধান কোথায় মিলাইয়া যায়, তবু মৌমাছি তাহার পথের সন্ধান পায়—মৌচাকে ফিরিয়া আসে। গৃহের এই আকর্ষণ মানুষের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহার শক্তি নানা জীবের তুলনায় ক্ষীণ—নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে তাহার এই শক্তি সে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের চক্ষু কতটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি, ঈগল ও শকুনির চক্ষু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত। এখানেও মানুষ তাহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে প্রকৃতি নয়, জান্তব শক্তিকে পরাজিত করিয়াছে। তাহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আকাশের ক্ষীণ নীহারিকাপুঞ্জকে সে দেখিতে পায়, তাহার যন্ত্রশক্তি তাহার স্বভাবলব্ধ দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা কুড়ি লক্ষগুণ বেশী। মানুষ আজ আনবিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অদৃশ্য জীবাণুদের দেখিতেছে, এমন কি যে সকল জীবাণু সাধারণ জীবাণুদের খাইয়া ফেলে, তাহারাও বাদ যায় নাই।

অন্ধকার রাত্রে বৃদ্ধ ভারবাহী অশ্বকে একাকী ছাড়িয়া দিলেও সে পথ চিনিয়া লইতে ভুল করে না। তাহার দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় বিশেষ উজ্জ্বল নহে, তবু সে চক্ষু দিয়া পথের ও চতুষ্পার্শের তাপের তারতম্য অনুভব করে। তাহার চক্ষু তাপবাহী আলোকরশ্মি দ্বারা সামান্য পীড়িত হয়। অন্ধকার রাত্রে অপেক্ষাকৃত শীতল প্রান্তরের উপর দিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মূষিকদের পেচক দেখিতে পায়। আলোক দিয়া আমরা রাত্রিকে দিবালোকে পরিণত করিতে পারি।

চক্ষুর অক্ষিগোলক পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লীর উপর চিত্র প্রক্ষেপন করে, চক্ষুর মাংসপেশী ঐ গোলকটিকে ঠিক দর্শন-কেন্দ্রে আনিতে পারে। এই ছায়াপট নয়টি স্তর দিয়া তৈরী। পাতলা কাগজ অপেক্ষা এক-একটি স্তর বেশী ঘন নয়। সকলকার ভিতরের স্তরটি হইতেছে সরল ও বক্রকোণ মাংসসূত্র দিয়া নির্ম্মিত, ইহার ভিতরে তিন কোটি সরল সূত্র ও ত্রিশ লক্ষ কোণ আছে। তাহারা পরস্পর এবং অক্ষি-গোলকের সহিত সংযুক্ত কিন্তু অদ্ভুত ভাবে তাহারা বাহিরের দিকে থাকে না, ভিতরের দিকে থাকে। কাচ-গোলকের মধ্য দিয়া কোন মানুষকে দেখিলে দেখা যাইবে তাহার পদদ্বয় উপরে ও মস্তক নীচে রহিয়াছে, বামের শরীরাংশগুলি ডাইনে দেখা যাইবে! এই বিকৃত দর্শন চিত্রের শোধন করিয়াছে প্রকৃতি, কোন্ উপায়ে তাহা আগেই জানিতে পারিয়া। এই শোধন ঘটিয়াছে, লক্ষ লক্ষ স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া। এই সকল স্নায়ুসূত্র মস্তিষ্কের সহিত সুসংবদ্ধ ভাবে জড়িত। তাই আমরা চক্ষু দিয়া কোন চিত্রের প্রকৃত রূপই দেখি। আমাদের দর্শন-ক্ষমতা প্রকৃতি তাপরশ্মি হইতে আলোকরশ্মিতে আনিয়া দিয়াছে—তাই চক্ষু নানা বর্ণের আলোতে চঞ্চল। সেই জন্যই আমরা পৃথিবীর রঙীন ছবি দেখিতে পাই। চক্ষু-গোলকের নানা অংশ ঘনত্বে বিভিন্ন, তাই সকল আলোকরশ্মিই সঠিক দর্শন-কেন্দ্রে আসে। কাচের মত সমঘনত্ব পূর্ণ পদার্থে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অক্ষিগোলক, সরল ও বক্র মাংসসূত্র, স্নায়ু,—সকলের মধ্যেই আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। তাহা না হইলে, প্রকৃতির রূপ এত সুন্দর ভাবে আমাদের চক্ষুতে পড়িত না। ইহা কি আশ্চর্য্য নয়, শরীরের কোন একটি যন্ত্রের বিশেষ অংশ অপরাপর অংশের প্রয়োজন জানিতে পারে?

যে শামুক আমরা খাই তাহাদের ঠিক আমাদের মত সুন্দর অনেকগুলি চক্ষু আছে—তাহার প্রত্যেক উজ্জ্বল চক্ষুটিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছুরক দর্পণের সাহায্যে দৃশ্যমান প্রত্যেক পদার্থই সঠিক ভাবে দেখিতে সাহায্য করে। এই সকল আলোক-বিচ্ছুরক দর্পণ মানুষের চক্ষুতে নাই। ইহারা শামুকের ভিতর, মানুষের ন্যায় উন্নত মস্তিষ্কের অভাব সত্ত্বেও গঠিত হইয়াছিল। জীবজন্তুর চক্ষু, দুই হইতে কয়েক সহস্র এবং প্রত্যেকটিই বিভিন্ন। এই অসংখ্য চক্ষু নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রকৃতি কোন্ দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াছিল—কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্য কোথাও না কোথাও সে পাইয়াছিল নির্ভুল ভাবে।

ফুলের রঙ আছে, তাহা দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই। মৌমাছিরা তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। তাহারা আকৃষ্ট হয় আলট্রাভায়োলেট আলোকরশ্মিতে, তাহার আরও সুন্দর রঙে। যে রশ্মি আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে, সে আলোকের মধ্যে যে আনন্দ ও উৎসাহ নিহিত আছে, তাহা মানুষ সবে মাত্র অনুভব করিতে শিখিয়াছে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উদ্ভাবনা কৌশল অদৃশ্য আলোকরশ্মির এই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সাহায্য করিবে। সুদূরবর্ত্তী তারকার তাপরশ্মি ও তাহার শক্তির পরিমাণ করিতে মানুষ আজ সমর্থ।

কর্ম্মী মৌমাছি, শিশু মৌমাছিদের জন্মগ্রহণ সময়ে মৌচাকের মধ্যে বিভিন্ন আকারে কক্ষ নির্ম্মাণ করে। কর্ম্মীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, অলস পুরুষ মৌমাছির জন্য বৃহৎ কক্ষ ও রাণী মৌমাছির জন্য বিশেষ আকারের কক্ষ নির্ম্মিত হয়। রাণী মৌমাছি অসম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করে পুরুষদের ঘরে ভবিষ্যৎ রাণী মৌমাছিদের ঘরে তাহারা সম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করে। স্ত্রী মৌমাছি হইতে কর্ম্মীদের উদ্ভব। সে নূতন বংশধরদের আগমন পূর্ব্ব হইতেই আশা করিয়া মধু এবং পুষ্পরেণু চর্ব্বণ করিয়া, খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য তৈরী হয়। পুরুষ

এবং স্ত্রী মৌমাছির গঠন সময়ের একটি বিশেষ পর্য্যায়ে তাহারা খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করা বন্ধ রাখে—কেবল মাত্র মধু ও পুষ্পরেণু শিশু মৌমাছিদের খাওয়াইতে থাকে। যে সকল স্ত্রী মৌমাছি এই সকল খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহারা কর্ম্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়।

রাণীদের ঘরে, স্ত্রী মৌমাছিদের চর্ব্বিত ও পরিপাক করা খাদ্য খাওয়ানো চলিতে থাকে। এইরূপে বিশেষ ভাবে আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত স্ত্রী মৌমাছিরা শেষে রাণী মৌমাছি হইয়া দাঁড়ায়। তাহারাই কেবল সম্পূর্ণ ডিম্ব প্রসব করিতে পারে। এইরূপ ভাবে মৌমাছিদের জন্ম রচনার মধ্যে বিশেষ কক্ষ, বিশেষ ডিম্ব প্রসবের প্রবর্ত্তন আছে এবং খাদ্যের সহিত অবয়ব পরিবর্ত্তনের অদ্ভুত সম্পর্ক সকলের চক্ষেই প্রতীয়মান হইবে। শরীরের সহিত খাদ্য সম্পর্কের আবিষ্কার, সম্ভাবনা এবং কার্য্যে নিয়োগের সহিত মৌমাছিরা পরিচিত। মৌমাছিদের সামাজিক জীবনের জন্য এই পরিবর্ত্তনগুলির প্রয়োজন আছে। এই দক্ষতা ও জ্ঞান মৌমাছিদের সামাজিক জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে নিশ্চয় আসিয়াছে—তাহা নিশ্চয় মৌমাছিদের শরীরের গঠন-কৌশল অথবা বাঁচিয়া থাকার সহিত সংযুক্ত নয়। খাদ্যের সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন লইয়া মৌমাছিদের এই জ্ঞান, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের বহু আয়াসলব্ধ খাদ্যবিজ্ঞানকে পরাজিত করিয়াছে।

কোন জন্তু চলিয়া গেলে কুকুর তাহার অনুসন্ধানকারী নাসিকার সাহায্যে তাহা অনুভব করে। স্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা উচ্চ কোন শক্তি বা যন্ত্র মানুষ আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইহাকে সাহায্য করিবার কোন শক্তি আজও মানুষের নাই। অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও আমাদের ঘ্রাণশক্তি আবিষ্কার করিতে পারে। কেমন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে এক গন্ধ হইতে আমরা সকলে একই রকম অনুভব করি? প্রকৃত পক্ষে আমরা তাহা কখনও পারি না। স্বাদও আমাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন। দর্শন, ঘ্রাণ ও স্বাদের এই বিভিন্নতা বংশগত; ইহা কি আশ্চর্য্য নয়?

যে সকল শব্দ আমরা শুনিতে পাই না, সকল জন্তুতেই তাহা শুনিতে পায়। আমাদের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা তাহাদের তুলনায় কত তুচ্ছ। মানুষ আজ যন্ত্রপাতির দ্বারা তাহার শ্রবণশক্তির উন্নতি করিয়াছে। কয়েক মাইল দূরে মাছি উড়িবার শব্দ সে আজ যন্ত্রপাতির দ্বারা শুনিতে পায়;—যন্ত্রপাতির দ্বারা শূন্যাগত আলোকরশ্মির আঘাতও লিপিবদ্ধ করে।

জলের মধ্যে এক রকম মাকড়শা আছে, তাহারা বেলুনের মত জাল তৈরী করে এবং জলের নীচে কোন প্রস্তরখণ্ড অথবা মৃত উদ্ভিদ-কাণ্ডের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। তাহার পর অদ্ভুত ভাবে সে একটি জলবুদ্বুদ তাহার শরীরের লোমের ভিতর বন্দী করিয়া জলের নীচ দিয়া বেলুনের ভিতর ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে বেলুনটি স্ফীত হইয়া উঠে। সে তখন তাহার ভিতর ডিম্ব প্রসব করে। তাহার সন্তানেরা বহিরাক্রমণ হইতে এইরূপে মুক্ত থাকে। এই মাকড়শার জালের মধ্যে অসামান্য পূর্ত্তবিদ্যা, অপরিসীম বুদ্ধি ও বায়ুবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? হয়ত ঘটনাক্রমেই মাকড়শা সন্তানদের রক্ষা করিবার জন্য এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাই কি এই মাকড়শার কার্য্যপ্রণালীর সত্য পরিচয়?

শিশু সালমন মৎস্য কয়েক বৎসর সমুদ্রে কাটায়, তাহার পর সে তাহার পরিচিত নদীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এমন কি, নদীর যে শাখায় বা প্রশাখায় তাহার জন্ম হইয়াছিল, নদীর তীর ধরিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিতে তাহার একটুও ভুল হয় না। কি করিয়া সে নির্ভুল দিক্‌নির্ণয় করে? নদীর যে শাখার যে অংশে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার ব্যাকুল আগ্রহ তাহাকে সেখানে পৌঁছিতে সাহায্য করে; পলাতক সালমন শেষে নিজের নদী অংশে গিয়া শান্ত হয়। ইল মৎস্যের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন সমস্যা আরও দুরূহ। এই দুরন্ত জীবেরা বড় হইয়া পুষ্করিণী হ্রদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, নদী সকল স্থান হইতেই—যাহারা ইয়োরোপের, তাহারা হাজার হাজার মাইল সমুদ্র-তলদেশ অতিক্রম করিয়া—দক্ষিণে বারমুদার গভীর জলের নীচে পলায়ন করে। সেখানে তাহারা অণ্ড প্রসব করে—শেষে সকলেরই মৃত্যু হয়। শিশু ইলের দল সমুদ্রের গভীর জলের নীচে খেলিয়া বেড়ায়। কোথায় তাহারা তাহাদের বলিয়া দিবার কেহ নাই। কি করিয়া তাহারা যেন টের পায়, কোন অজ্ঞাত তীরভূমি হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেখানে আসিয়াছিল। ক্রমে সেই অজ্ঞাত লক্ষ্য অভিমুখে তাহারা চলিতে আরম্ভ করে। কি অজ্ঞাত প্রবৃত্তিতে উদ্বোজিত হইয়া তাহারা নদ, নদী, হ্রদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়, শেষে প্রতি জলাশয়ই ইল মৎস্যে ভরিয়া যায়। তাহারা আসে মহাসমুদ্রের পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গরাশি উত্তীর্ণ হইয়া, তাহারা ঝড়, জোয়ার-ভাটা, প্রতি তীরভূমির তরঙ্গাভিঘাত অতিক্রম করিয়া শেষে জয়ী হয়। তাহার পর তাহারা বাড়িতে থাকে। যখন ইলেরা পূর্ণ যৌবন লাভ করে, প্রকৃতির এক অজ্ঞাত রহস্যাবৃত নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহারা পুনরায় সমুদ্রাভিমুখে দলে দলে ধাবিত হয়—ইল-জীবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কোথা হইতে আসে এই নির্দ্দেশ? আমেরিকার কোন ইলকে ইয়োরোপের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অথবা ইয়োরোপের কোন ইলকে আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইয়োরোপে ইলদের শুধু বড় হইতে এক বৎসর বেশী সময় লাগে বোধ হয় ইহাদের যাত্রাপথ দীর্ঘতর বলিয়া। যে অণু-পরমাণু লইয়া ইল-এর শরীর গঠিত তাহাদের কি কোন দিক্‌জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি আছে?

জন্তুদের মধ্যে বেতার-বার্ত্তার প্রচলন আছে। কাদাখোঁচা পাখীকে উড়িতে কে না প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়াছে? তাহার উড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কত পাখীই না সূর্য্যালোকে উড়িতে আরম্ভ করে।

উন্মুক্ত বাতায়নের প্রবেশ-পথে স্ত্রী-পতঙ্গকে রাখিয়া দিলে সে কোন উদ্দেশ্যশীল বার্ত্তা বাহিরে প্রেরণ করে। চারি দিক্ হইতে পুরুষ-পতঙ্গেরা সে আহ্বান শুনিতে পায়। নানা দুর্গন্ধ রাসায়নিক দ্রব্য রাখিয়া দিলেও তাহারা সেখানে আসিয়া জোটে। এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদের দেহে কোথাও কি বেতারকেন্দ্র আছে? পুরুষ পতঙ্গদের শুণ্ডের মধ্যে কি বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ করিবার কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র থাকে? স্ত্রী-পতঙ্গ কি ইথরে তরঙ্গ তোলে, আর পুরুষ পতঙ্গ সেই তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণ করিয়া চঞ্চল হয়? গঙ্গা-ফড়িং তাহার পায়ে পায়ে অথবা পাখায় পাখায় ঘর্ষণ করে, নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে তাহার শব্দ আধ মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। ষোল হাজার মণ বাতাসকে আন্দোলিত করিয়া সে তাহার সঙ্গীকে আহ্বান করে। পতঙ্গ-কুমারী বাহ্যতঃ নিঃশব্দে আপনার কার্য্য করে কিন্তু তাহার কার্য্য সুসম্পন্নই হয়। বেতার-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে

বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিতেন যে কুমারী-পতঙ্গের দেহের গন্ধেই পুরুষ-পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়। দেহের গন্ধ পুরুষ-পতঙ্গকে আকর্ষণ করিবার জন্য বহু দূর পর্য্যটন করে। পুরুষ পতঙ্গকে এই গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া, তাহা কোন দিক হইতে আসিতেছে, জানিতে হয়। বহু যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ এইরূপ বার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক দিন হয়ত আসিবে, মানুষ নিকটে উপস্থিত না থাকিয়াও তাহাদের প্রিয়তমাদের দূর হইতে ডাকিবে, প্রেয়সীরাও তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কোন বাধা, কোন প্রাচীর তাহাদের প্রেমবার্ত্তার আদান-প্রদানকে বাধা দিতে পারিবে না। বর্ত্তমান টেলিফোন ও বেতার-যন্ত্র মানুষের যন্ত্র-বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার, তাহাদের সাহায্যে মানুষ সত্ত সত্ত সংবাদের আদান-প্রদান করে, কিন্তু মানুষকে কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। যত দিন না মানুষ প্রত্যেকে এক একটি বেতার-কেন্দ্রের উদ্ভব মস্তিষ্ক সাহায্যে করিতে পারিবে, তত দিন ক্ষুদ্র পতঙ্গের এই স্বাভাবিক শক্তি তাহার হিংসার বিষয় হইয়া থাকিবে।

উদ্ভিদেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপনাদের অজ্ঞাতে কত সাহায্যই না প্রকৃতি হইতে লয়। কীট-পতঙ্গ পুষ্পরেণু ফুলে ফুলে ছড়াইয়া দেয়, বাতাস ও সঞ্চরণশীল প্রতি প্রাণীই তাহাদের বীজ জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে। এই প্রাণীদের তালিকা হইতে শক্তিশালী মানুষও বাদ পড়ে না। মানুষের বুদ্ধি প্রকৃতির উন্নতি বিধান করিয়াছে, প্রকৃতিও তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে ছাড়ে নাই। সংখ্যায় সে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সে চাষবাস করিতে বাধ্য, তাহাকে ভূমিকর্ষণ, বপন, শস্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। নানা বীজ দ্বারা নূতন নূতন উদ্ভিদের উৎপাদন, বিনাশ ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি সকল কাজই তাহাকে করিতে হয়। এই কাজগুলি বন্ধ করিলে সে অনাহারে মরিবে—সভ্যতার মৃত্যু হইবে—পৃথিবী জনমানবশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত হইবে।

পক্ষী-শাবকদের তাহাদের বাসা হইতে লইয়া আসিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেও, কালে তাহারা নিজ জাতি অনুযায়ী বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিবে। বংশগত অভ্যাস ও প্রবৃত্তির জন্ম অতীতের রহস্যে আবৃত। এই সকল কার্য্যধারা কি একটি ঘটনার ফল? বা কেহ তাহাদের কোন বুদ্ধিশালী শক্তির দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছে? এই বংশগত অভ্যাস হইতেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির শক্তি ও উত্তেজনা উপলব্ধি হইবে। পৃথিবীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যত জীবন্ত প্রাণী বিচরণ করিয়াছে, তাহাদের বিবেচনা-শক্তি মানুষের এই শক্তির নিকট পরাজয় মানিয়াছে। প্রয়োজন অনুযায়ী গঠন ও ধ্বংস—তাহার ফলেই মানুষ আজ জয়ী হইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহার এই পরিবর্ত্তন-সামঞ্জস্য বহুদূর অগ্রসর। কেবল মাত্র মানুষই সংখ্যার ব্যবহার করিতে সমর্থ। যদি কোন কীট বা পতঙ্গ কোন দিন মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারে এবং যদি বা সে জানিতে পারে, তাহার কতগুলি পা আছে, কোন দিন সে বলিতে পারিবে না, তাহার এবং সঙ্গীদের সকলের মিলিয়া কতগুলি মোট পা আছে। তাহা বলিতে বিবেচনা-শক্তির প্রয়োজন। মানুষ ব্যতীত তাহা কাহারও নাই।

অনেক জীবই চিংড়ি মাছের মত; তাহাদের একটি দাঁড়া ভাঙ্গিয়া গেলে, জীবকোষ উত্তেজিত করিয়া ও শরীরের কতকগুলি কার্য্যপ্রণালীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আবিষ্কার করে, তাহাদের দেহের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তদনুযায়ী তাহারা তাহাদের পুনর্গঠন করে। গঠন শেষ হইয়া গেলে জীবকোষেরা তাহাদের কার্য্য বন্ধ করে। তাহারা কেমন করিয়া বুঝিতে পারে তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে? পরিষ্কার জলের বহুপদ কীট নিজেদের দুই অংশে ভাগ করিয়া যে কোন একটি হইতে নিজেদের পুনরায় গঠন করিতে পারে। কেঁচোর মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলে নূতন একটি মস্তকের উদ্ভব হয়। ক্ষত আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি, কিন্তু কোন দিন কি আমাদের চিকিৎসকেরা জীবকোষদের উত্তেজিত করিয়া নূতন হস্ত, নূতন মাংস, নূতন অস্থি, নূতন নখ ও উত্তেজক স্নায়ু নির্ম্মাণ করিতে পারিবে? একটি অদ্ভুত বিষয় পুনর্গঠন-রহস্যের উপর আলোকপাত করিবে। জীব-কোষদের গঠনকালে যদি তাহাদের বিভক্ত করিয়া দেওয়া যায়, প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া নূতন জীবকোষ গঠন করিতে পারে। এই প্রকারের যমজ প্রাণীর সৃষ্টি ইহাদেরই কার্য্য। প্রতি জীবকোষই অল্প বয়সে এক একটি সম্পূর্ণ প্রাণী। আমরা প্রতি জীবকোষে আমাদেরই প্রকৃতি।

আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের বাহিরে প্রকৃতির দর্শন ও স্পর্শন শক্তির বহু অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহাতে বোঝা যায় মানুষের শিক্ষা করিবার বিষয় কত বেশী। যত দিন না মানুষ নূতন নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিবে অথবা যন্ত্র সাহায্যে প্রাণীদের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী হইবে, তত দিন তাহার সম্মুখে বহু দূর বিস্তৃত পথ পড়িয়া আছে। তাহাকে এক দিন এই দুর্গম বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। প্রতি জান্তব-শক্তি যাহা আমাদের নাই, তাহা যেন আমাদের বুদ্ধি, শক্তি ও অহঙ্কারকে উপহাস করিতেছে। যত দিন না আমরা তাহার উত্তর দিতে পারিব তত দিন আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। আমাদের অসম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জ্ঞান দিয়া আমরা কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য কোন দিন জানিতে পারিব না। যত দিন না মানুষ প্রতি জান্তব-শক্তির অধিকারী হইবে, তত দিন সে উপলব্ধি করিতে পারিবে না প্রকৃতির বিধানের সঙ্গে জান্তব-জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক। অনন্তের—অসম্পূর্ণ ব্যতীত সম্পূর্ণ কল্পনা বা আলোচনা করিতে সে কোন দিন সমর্থ হইবে না। আমাদের নবায়ত্ত শক্তিগুলির অপব্যবহার আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয়। যে অমূল্য আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের মুষ্টিমেয় মহাঋষি অতীতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বর্ত্তমানের ভোগলালসা-লুব্ধ মানুষের মধ্যে সবে মাত্র তাহার বিকাশ হইতেছে। পার্থিব মস্তিষ্কে অনন্তের আলোকপাত সবে মাত্র সুরু হইয়াছে। মানুষের আত্মঘাতী ভুলগুলি কেবল মাত্র শিশুকালের দুর্ঘটনা। অতীত অনন্ত দিয়া মানুষের সময়ের পরিমাপ করা যায়, সুদূর ভবিষ্যৎ একটি ঘড়ির কাঁটার একটি শব্দ মাত্র! আমাদের আত্মা অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট।

বার্লিন সহরে

শ্রীমতিলাল দাশ

সুইডেন হইতে রাত সাড়ে চারিটার সময় জার্মাণীর উপকূলে পৌঁছিলাম। জার্মাণীর তৃতীয় শ্রেণীতে কাঠের বেঞ্চ, গদি-দেওয়া গাড়ী চড়িবার পর ইহাতে চলিতে কষ্ট লাগে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, তাই কাঠের বেঞ্চের উপরই খানিক ঘুমাইয়া লইলাম।

বিদেশ বিভুঁই, টাকা-পয়সা জিনিষ-পত্র নিয়া চলিতেছি। তাই শঙ্কাশীল চিত্ত, ঘুম সহজে আসিতে চায় না।

ভোরের আলো ফুটিতে ঘুম ভাঙিল। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বার্লিনে আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব রহিলাম। বেলা আটটায় বার্লিনে পৌঁছিলাম। অচেনা সহর, বন্ধুও কেহ আসে নাই। তাই অশরণের শরণ 'ক্লোকরুমে' স্যুটকেশ রাখিয়া বাসে করিয়া কুকের আফিসে চলিলাম। কুকের অফিস হইতে হিন্দুস্থান হাউসের সন্ধান লইলাম। গুপ্ত নামক এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক জন য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়া জার্ম্মাণীতে আছেন—তাহারই স্থাপিত প্রতিষ্ঠান।

এখানে শুনিলাম, ডাঃ ভাগনার আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, টেলিফোনে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। ফোনে কথাবার্ত্তা বলিতে আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি না—বোধ হয় অনভ্যাস।

গুপ্তর ওখানে স্থান না থাকায় গুপ্ত নিকটবর্ত্তী পাঁসিও ওতয়বায় নামক স্থানে স্থান করিয়া দিলেন। বুড়ী গৃহকর্ত্রী—স্থান নির্ব্বাচন করিয়া জিনিষ আনিতে চলিলাম। জিনিষ আনিয়া পাঁসিওতে বসিয়া কয়েকখানি চিঠি লিখিলাম। তার পর বিকালের চা-পানের জন্ম হিন্দুস্থান হাউসে গেলাম। কয়েক জন বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হইল।

তার পর এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সংঘে গেলাম। কর্ম্মকর্ত্তা মুখার্জ্জি বলিলেন—যে আমার পোষাক কেতাদুরস্ত নয়। বিদ্রূপ নয়, বন্ধুর সদুপদেশ। সদুপদেশ মানিয়া চলিব না এমন ধৃষ্টতা নাই, তবে 'স্মার্ট' সাজিতে মানুষ যে দুশ্চিন্তা সময় ও অর্থব্যয় করে তাহা কখনই আমার ধাতুসহ নহে। ফিটফাট সাজিতে অভ্যাস প্রয়োজন—সে সতর্ক অভ্যাস যাহাদের তাহাদের নমস্কার করি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার একান্ত ঢিলেঢালা বাঙালী-স্বভাব। বন্ধুদের অনুরোধে স্থির হইল যে, আগামী বুধবারে এই ছাত্র-সংঘে 'গীতার বাণী' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিব। হিন্দুস্থান হাউসে ফিরিয়া মাছ, ডাল, দই ও ভাত দিয়া নৈশভোজন সমাপ্ত করিলাম, রান্না ভাল নয়। বিদেশের বড় বড় সহরে ভারতীয় খাদ্যের আয়োজন করিয়া হোটেল চালাইলে বোধ হয় বিশেষ অর্থাগমের সম্ভাবনা। এ বিষয়ে দেশের দুঃসাহসীদের লক্ষ্য করা উচিত।

২৯শে নবেম্বর রবিবার। জার্ম্মাণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বজনবিদিত—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মাত্র বার্লিনে একটি কলা-ভবন ছিল, বর্ত্তমানে ১৮টি আছে। আমি প্রথমে বার্লিনের ন্যাশানাল গ্যালারিতে। উন্টার ডেন লিণ্ডেন বার্লিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথ্যা—এই রাজপথ ১৯৭ ফুট বিস্তৃত—ইহার এক দিকে টিয়ারগার্টেন। লণ্ডনের যেমন হাইড পার্ক, প্যারিসের যেমন বয় ডি বুলোঁ—বার্লিনের তেমনই এই শোভন পুরোদ্যান। অন্ত দিকে শ্লোষ। ন্যাশানাল গ্যালারির দু'টি অংশ। যে দ্বীপে বার্লিনের অধিকাংশ যাদুঘরগুলি অবস্থিত তাহাকে মিউজিয়াম আইল্যাণ্ড বলে—প্রাচীনটি সেখানে অবস্থিত—নূতন চিত্রশিল্প সংগ্রহ উন্টার ডেন লিণ্ডেনে অবস্থিত—এটা পূর্ব্বে জার্ম্মাণ যুবরাজের প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের অপর পারে জার্ম্মাণ যুদ্ধোপকরণ-ভবন। চিত্রশালায় উনবিংশ শতকের শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রাবলীর সংগ্রহ বর্ত্তমান।

চিত্রশালা দেখিয়া যুদ্ধোপকরণ-ভবনে গেলাম—ইহার জার্ম্মাণ নাম জিউগহাস্—এখানে মানুষকে মারিবার জন্ম মানুষের যে উত্তম ও উদ্ভাবন তাহার বিরাট পরিচয় মেলে।

তার পর শ্লোষ মিউজিয়াম ও 'ডোম' দেখিলাম। এই দুইটি বাড়ী জার্ম্মাণ স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব উদাহরণ। ডোমের সম্মুখে মনুমেণ্টের পাশে দাঁড়াইয়া দেড় মার্ক দিয়া চারখানি ছবি তুলিলাম। তার পর একটি রেস্তরায় আহার করিলাম। এক জন অপরিচিত জার্ম্মাণ কেরাণী এক টেবিলে বসিলেন। তিনি পরিচারককে আমার বাঞ্ছিত দ্রব্যের কথা বুঝাইয়া দিলেন।

আহারের পরে ইহার পরিচয় মত টেম্পলহফে ডাঃ ভাগনারের সন্ধানে চলিলাম। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক। তিনি বাংলা সম্বন্ধে যে-সব বই লিখিয়াছেন তাহা আমাকে দেখাইলেন। অধ্যাপক ভাগনার কতকগুলি বাংলা গল্প জার্ম্মাণীতে অনুবাদ করিতেছিলেন। আমাকে কয়েকটি স্থানের ইংরেজী অনুবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সন্ধ্যায় তিনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক জন বিদেশীর অভিজ্ঞতালব্ধ এই সব মতামত চিত্তাকর্ষক হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডায়েরীতে তাহার কোনই সারাংশ লিখিত নাই।

৩০শে নবেম্বর, সোমবার। সকালে উঠিয়া প্রথমে কুকের আফিসে গেলাম। তার পর প্রাসিয়ান লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের তুলনায় ইহা কিছু নয়। তার পর ইহাদের পার্লামেণ্ট রাইখষ্ট্যাগ দেখিতে চলিলাম। বাড়ীটির একাংশ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল—সেটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ইহার নিকটেই বিসমার্কের স্মৃতিস্তম্ভ। বিসমার্ক নব্য জার্ম্মাণীর স্রষ্টা—জার্ম্মাণ জাতি তাহার ঋণ ভুলিতে পারে না। সেখান হইতে টিয়ারগার্টেনের ভিতর Column of victory দেখিলাম—বিজয়-তোরণ দেখিয়া পুলিস-ফোর্টের সন্ধানে চলিলাম। বৃষ্টি পড়িতেছিল, ভিজিতে ভিজিতে পুলিস-ফোর্টে চলিলাম। সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়

গুপ্তের ওখানে আহার করিয়া বাসায় আসিয়া পোষাক বদলাইয়া প্লানেটেরিয়াম দেখিতে গেলাম। এটি চমৎকার জিনিষ—সমস্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সত্যকার রূপ দেখায়, তাহাতে জ্যোতিষের জ্ঞান বেশ পরিস্ফুট ও বোধগম্য হয়। কেবল বিজ্ঞানের আবেদন লোকপ্রিয় হইবে না ভাবিয়া ইহার সঙ্গে ছায়াচিত্রে অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে। বাঘে ও মানুষে মিতালির একটি ছবি দেখাইল—প্রেমের দ্বন্দ্বের পাশে বেশ লাগিল।

সেখান হইতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিলাম। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় জাতি-গঠনের মন্দির। ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ গড়ে, তাই সত্যের উপাসনায় মিলিত সাধকদিগের মিলন-ক্ষেত্র সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেয়। শিক্ষা এখানে মুখস্থ-বিদ্যা নয়। জাতির চেতনার সহিত তাহার সকল রকমে নিবিড় সংযোগ থাকে। শিক্ষার পূর্ব্বে গবেষণার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

আমি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। খুব অধিক লোক-সমাগম হয় নাই। জন পঞ্চাশ লোক—অধ্যাপক ভাগনার পরিচয় করিয়া দিলে আমি প্রবন্ধটি পড়িলাম। প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েক জন কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তার পর ডাঃ ভাগনার ও শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বক্তৃতা করিলেন। পরকীয়া তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থিত জার্ম্মাণ শ্রোতাদের বোধগম্য হইতেছিল না। ফিরিবার পথে Haus vater land নামক প্রতিষ্ঠানে ইহাদের নৈশ জীবনের আনন্দ-ভাস্বর ছবি দেখিলাম। ভোগের আয়োজন, কিন্তু ইহাকে নিন্দা করিব সে দুঃসাহস নাই।

১লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। সকালে উঠিয়া আমার বাসার নিকটবর্ত্তী Bahuhof ২০ হইতে পটসডাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বার্লিন সহরে রেলওয়ে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে—সহরের সীমানার মধ্যেই ১৪৮টি ষ্টেশন আছে। বৈদ্যুতিক গাড়ী সহর ও সহরতলীকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহা ছাড়া অন্তর্ভৌম গাড়ী আছে। মেট্রোপলিটান ও সুবারবন রেলপথের গাড়ীতে চড়িলাম। খানিক দূর আসিয়া Charlottenburg ষ্টেশন পড়িল। পথে গুরুনেওয়াল্ডের বনভূমি পড়িল।

পটসডাম ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নির্ম্মিত সহর। এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছিলাম। পটসডাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাস ও শিল্পকলা ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য নগরটির একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে। পটসডাম রেল-ষ্টেশন হইতে নামিয়া ট্রামে চড়িয়া সাঁসুচি প্রাসাদে। সাঁসুচি উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদটিকে খুব সুন্দর দেখায়। ১৭৪৫ হইতে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রেডারিক এই প্রাসাদ Rococo রীতিতে নির্ম্মাণ করেন। সাঁসুচি পার্ক বিস্তৃত পরিসর, তাহার মধ্যে একটি ফোয়ারা আছে—ফোয়ারার জল খুব উঁচুতে ওঠে। সাঁসুচি প্রাসাদে চমৎকার চিত্রশালা আছে। টিকিট কাটিয়া অল্প কয়েক জনের সঙ্গে মর্ম্মর প্রস্তরের দালান, সঙ্গীতশালা, পাঠাগার, ফ্রেডারিকের মৃত্যু-কক্ষ দেখিলাম। বাহির হইয়া ভগ্ন উইণ্ড-মিলের পাশ দিয়া Orangerieschloss দেখিতে চলিলাম। একটি জার্ম্মাণ তরুণী ও তাহার মা চলিতেছিল। মেয়েটি অল্প ইংরাজি জানে, তাহার সাহায্যে অপরিচিত পথে চলা অনেকটা সুবিধা হইল। ইহার মধ্যে র‍্যাফেল-কক্ষ আছে। কিন্তু এই চিত্রভবন দেখিবার সুবিধা হইল না—কারণ বনভূমির মধ্য দিয়া একা যাত্রা করার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তরুণী ও তাহার মাতার সহযাত্রী হইলাম। দ্বিতীয় উইলিয়াম এই প্রাসাদ স্থাপন করেন। ইহাতে নানা বিদেশীয় তরুলতার সংগ্রহ আছে। বাহির হইতে তাহার উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম। খানিক দূর চলিবার পর বুড়ী অন্য পথ ধরিল। বোধ হইল সে তাহার তরুণী কন্যাকে এক জন কালো লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে দিতে চায় না—তখন একাকীই নূতন প্রাসাদের চূড়া দেখিয়া চলিলাম। নূতন প্রাসাদ ১৭৬৮ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়—ইহাতে ২০০ কক্ষ আছে। মর্ম্মর কক্ষ এবং Grotto Hall ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। সেখান হইতে রাজার নগর-ভবন Stadschloss দেখিলাম। ফ্রেডারিক এখানে বাস করিতেন।
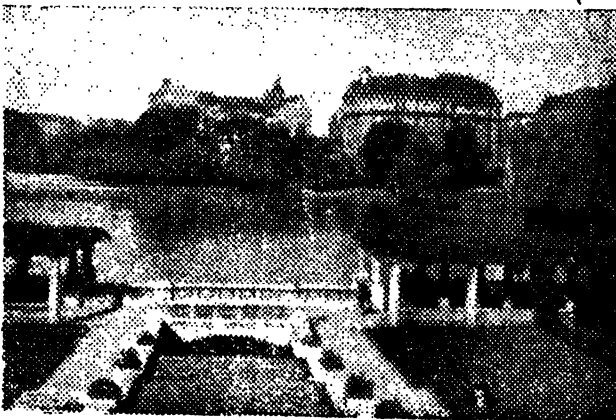
চতুর্থ উইলিয়ামের বাস-ভবন Charlottenhof দেখিয়া গেলাম। ফিরিবার পথে সেন্ট নিকোলাসের গির্জ্জা দেখিতে নামিলাম। বিখ্যাত স্থপতি সিঙ্কেলের নির্ম্মিত প্রাচীন রীতিতে গঠিত এই গির্জ্জার দরজা বন্ধ থাকায় দেখা গেল না। তার পর ফিরিবার পথে একটি দোকান হইতে কিছু ফল কিনিয়া লইলাম। রাস্তার পাশে ভূগর্ভে দোকান—তার পর কাজিয়া উইলহেলম সেতু পার হইয়া ষ্টেসনে আসিলাম। বিকালেই বাসায় ফিরিলাম।

সন্ধ্যায় খানিক রাজকীয় নাট্যমন্দিরে অপেরা দেখিতে চলিলাম। সাড়ে ৬টায় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু টিকিট করিবার সময় বুঝিতে না পারিয়া এক ঘণ্টা পরে গেলাম। রাত বারটা পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিলাম। ভাষা না জানায় গল্প-ভাগ কিছুই বুঝিলাম না, তবে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা খুব চমৎকার লাগিল। রাত্রে বাসে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

২রা ডিসেম্বর, বুধবার। বার্লিনের কলাভবনগুলি লোক-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আজ সেগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। প্রথমে পারগেমাস মিউজিয়াম দেখিলাম। এই কলাভবনে জার্ম্মাণ অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কার্ল হিউম্যান নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এশিয়া-মাইনরে কাজ করিবার সময় এই সমস্ত মর্ম্মর-খচিত মূর্ত্তি নষ্ট হইতে দেখিয়া কিনিয়া দেশে পাঠান। তাহার পর খনন করিয়া গ্রীক স্থাপত্যের এই সমস্ত

উদ্যান

অপূর্ব্ব নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক ভাস্করের সৌন্দর্য্য বোধ ছিল অপরিসীম, মৃত প্রস্তরে প্রাণ সঞ্চার করিবার গোপন বিদ্যা তাহাদের ছিল। Altar-Hall নামক কক্ষে এই সব সমতল পাথরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির মাধুর্য্য সত্যই দর্শক চিত্তকে মোহিত করে। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মুখর ছন্দে যে সব শিল্পীরা আঁকিয়াছিল তাহারা আমাদের নমস্য। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত মনে হয়। জার্ম্মাণ-পণ্ডিতেরা গ্রীক উপাসনায় প্রাচীন রীতি-নীতি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া এগুলি সুক্ষ্ম ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। গ্রীক সভ্যতা য়ুরোপকে সুন্দরের মন্ত্র পড়ায়, এই কলাভবন দেখিলে সেই মন্ত্রের অপূর্ব্ব প্রভাব ক্ষণিকের জন্য দর্শকের চিত্তেও সঞ্চারিত হয়।

এখান হইতে Kaiser Friedrich Museum দেখিতে চলিলাম। ইহার চিত্র-সংগ্রহ খুব বিরাট, তাহাতে সর্ব্ব-যুগের ইতালীয় ও ডাচ শিল্পীদের জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলি আছে। তাহা ছাড়া খৃষ্টান সভ্যতার প্রথম যুগের, ইসলামিক ও বাইজানটানি চিত্রের সমাবেশ আছে।

এখান হইতে সেতুর উপর দিয়া জার্ম্মাণ মিউজিয়ামে গেলাম। কলাভবনগুলি দেখিয়া একটি নিরামিষ ভোজনালয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। খাওয়াটি চমৎকার লাগিল। আলু ও কপি সিদ্ধ, ঘি মাখিয়া রুটির সঙ্গে চর্ব্বণ করা গেল। নিরামিষ তরকারির সুপ এবং চিঁড়ে-দই খাওয়া গেল। এখান হইতে একটি ছায়া-ছবি দেখিতে গেলাম। নূতনত্ব কিছুই নাই।

সন্ধ্যার সময় গাঙ্গুলি-পরিবারে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। গাঙ্গুলি-গৃহিণী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের আওতা কাটাইয়া এখানে বেশ দৃপ্ত ভাবে চলিতে শিখিয়াছেন। গাঙ্গুলি-গৃহিণী তাঁহার সাত-আট বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে বিলাতী কায়দায় ভিন্ন ঘরে শোয়াইতে অভ্যস্ত করাইয়াছেন। এ জিনিষটি আমার ভালই লাগিল। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা মায়ের আঁচল ধরিয়া মানুষ হয় বলিয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরনির্ভরতা কখনও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে নবাগত শিশু প্রথম দিন হইতেই স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তার অনুভূতি পাইতে শেখে, তাই ব্যক্তিমানব হইয়া দাঁড়াইতে বাধে না—সে সর্ব্বদা আত্ম-নির্ভর—কিন্তু আমাদের নিরালম্ব নিরাশ্রয় হইয়া এক পা চলাও সহজ নহে।

পর্য্যাপ্ত ও পরিতৃপ্ত ভোজন-শেষে এখানকার ছাত্রদের মিলন-সংঘে প্রবন্ধ পড়িতে চলিলাম। গাঙ্গুলি-দম্পতী সঙ্গে চলিলেন। বড় রাস্তার উপর হিন্দুস্থান ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন—ভারতের নানা দেশের ছাত্রেরা এখানে জটলা করে। ছাত্রী নাই বলিলেই হয়। অল্প কয়েক জন জার্ম্মাণ দর্শক ছিল। The Message of the Gita নামক একটি প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় পড়িলাম—শ্রোতারা নীরবে শুনিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে প্রশ্নবাণের বর্ষণে জর্জ্জরিত হইলাম। এক জন প্রশ্ন করিলেন—গীতার ধর্ম্ম ও চৈতন্যের ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কোথায়? বলিলাম—গীতায় যে ভক্তি-ধর্ম্ম ছিল পুষ্পিত,

পথ

চৈতন্যে প্রেমগন্ধের বন্যায় তাহা ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যের অশ্রু-সজল আর্তি য়ুরোপীয় শ্রোতারা বোধগম্য করিতে পারে না। গীতায় কর্ম্মের আহ্বানকে তাহারা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। অপরে প্রশ্ন করিলেন—গীতার প্রভাব ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় বর্ত্তমানে কি কাজ করিবে? বলিলাম—এ প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যাপক—ভারতবর্ষের যে নব জাগরণের উদ্দীপনা, গীতা হইতে তাহা শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিবে। অপরে প্রশ্ন করিলেন—গীতায় সত্য আদর্শ কি? বলিলাম—গীতা যুদ্ধের আহ্বান করে না—নিষ্কাম ভাবে নিস্পৃহ চিত্তে কর্ম্ম করিবার বাণী গীতার অন্তরতম কথা।

রাত্রি এগারটায় বাসায় ফিরিলাম। কয়েক জন সদ্য-পরিচিত বন্ধু বাসার পথ দেখাইয়া দিয়া চলিলেন। পরদিন প্রাগায় যাইতে হইবে তাই তাহাদের সহিত বহুক্ষণ গল্প-গুজব করা সম্ভব হইল না।

বার্লিন আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। জার্ম্মাণ-চরিত্রে একটি দৃঢ়তা আছে—যে দৃঢ়তার পরিচয় পাই তাহা অধ্যাপকমণ্ডলীর অমানুষ অধ্যবসায়ের মাঝে—তাহার সৈন্যদের অবিচল নিষ্ঠায়। কিন্তু দার্ঢ্যই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তাহাদের অন্তরের সহজ কমনীয়তা মুগ্ধ করে। যত্র-তত্র এই সুমধুর শালীনতার পরিচয় পাইয়াছি।

"মনোবৃত্তি সকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম, তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম এবং যেমন সে-সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির সেইরূপ অনুশীলন জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বিপজ্জনক এ্যাডভেঞ্চার

বীরেন দাশ

জুহু সমুদ্রসৈকতে নির্জন বাংলোর দোতলার একটা ঘরে মিটমিট করে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, মোমবাতিটি একটি সদ্যমৃত লাশের শিয়রের কাছে একখানি বুক-সেলফে রাখা হয়েছে। লাশটির গলা অবধি সাদা থান কাপড়ে ঢাকা। অনাবৃত মুখখানি দেখে মনে হয়, লোকটি বহু দিন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল। লাশের পায়ের দিকে একখানি শূন্য আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরটিতে আর কোন আসবাব-পত্র নেই। সমুদ্রের দিকের জানালা দু'টি আধ-ভেজানো।

দূরে জুহু চার্চের ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খট করে ঘরের সমুখের দুয়ার খুলে গেল। আবছায়া অন্ধকারে জনৈক যুবক ঘরে প্রবেশ করতেই পেছন থেকে খটাং করে দরজা বন্ধ হল। ধীর, শান্ত পদক্ষেপে যুবক লাশের সামনে এসে দাঁড়াল। সদ্যমড়ার গায়ের দুর্গন্ধ লাগল ওর নাকে। যুবক একটুখানি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে জানালায় সরে এল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে ঢেউগুলো থেকে থেকে বেলাভূমিতে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল। রাত্রির সমুদ্রের অপরূপ বেশ। এ রূপ মনের গহন দেশ নাড়া দেয়।

অচিন্ত্য অবশ্য কবি নয়। কবিতা সে কোন কালেই লেখেনি। ঘরের চার পাশে একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল। আজকার রাত তাকে মড়ার সাথে কাটাতে হবে। চেষ্টা করলেও এ-ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই অচিন্ত্যের। কারণ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

জীবনে অচিন্ত্য অনেক মড়া পুড়িয়েছে। সাহসী বলে চিরকালই সে বন্ধু-বান্ধবের বাহবা পেয়ে এসেছে।

আস্তে আস্তে সে আরাম-কেদারায় এসে বসল। আড়চোখে সে লাশটির দিকে তাকাল বারেক। লাশটি সদ্যমৃত সন্দেহ নাই। সমুখে সেলফের উপর মোমবাতির পরমায়ু দ্রুত ক্ষয়ে আসছে। অচিন্ত্য কি ভেবে মোমবাতিটি নিবিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে রাখলে। কি জানি হয়ত পরে দরকার হতে পারে। অন্ধকারে আরাম-কেদারায় চুপ-চাপ বসে রইল অচিন্ত্য।

বাজী ধরে কত বার সে সদ্যমড়া পোড়ানো শ্মশানে বসে অমাবস্যার রাত কাটিয়েছে। আর এ ত ঘরের ভেতর। না, অচিন্ত্য ভয় পাবার ছেলে নয়। যারা অচিন্ত্যকে জানে তারাই স্বীকার করে। ভয় কাকে বলে অচিন্ত্য জানে না। সবল, সুস্থ, সংস্কার-মুক্ত মন কিসের ভয় করবে—কেন ভয় করবে? অন্ধকারে বসে বসে অনেক কথাই ভাবছিল অচিন্ত্য। বোম্বেতে সে নতুন এসেছে। এসে উঠেছে এক অপরিচিত হোটেলে। সেখান থেকে সময় তাকে টেনে বার করলে। কথায় বলে, ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও সুখ নেই। বোম্বে এসেও অচিন্ত্য বাজী রাখতে বাধ্য হল!

আধ-খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া ঘরের ভেতর আসছে। অচিন্ত্য হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত। সহসা মড়ার খাটের নীচ থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসতেই অচিন্ত্য মাথা তুলে উঠে বসল। এ-ও কি সম্ভব? কিন্তু ঘরের কোণে পায়ের শব্দ যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য্য! শেষকালে কি অচিন্ত্যও ভয় পেয়ে কল্পনা করতে সুরু করল! অথচ সজ্ঞানে যা সে শুনতে পাচ্ছে, কল্পনা বলে তা কেমন করেই বা উড়িয়ে দেয়া যায়। অচিন্ত্যর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হচ্ছে, বুকে কে যেন পাথর চাপা দিয়েছে। নিশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে তার।

আসলে অচিন্ত্য নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দটা শুনছিল। বারেক জোরে নিশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। এ রকম দুর্বলতা, তার জীবনে এই প্রথম। নিজের উপর বিরক্তিতে মন ভরে গেল। অন্ধকার ঘরে অচিন্ত্য পায়চারি করতে লাগল। হয়ত ইঁদুরই এতক্ষণ শব্দ তুলছিল। অচিন্ত্য মনে মনে স্থির করল, পায়চারি করেই রাত কাটিয়ে দেবে।

সহসা বুক-সেলফে ধাক্কা লাগতেই অচিন্ত্য থমকে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বালিয়ে সে মড়ার দিকে তাকাল। যত দূর মনে পড়ে, সেলফটা মড়ার মাথার দিকে ছিল। কি ভোলা মন! অচিন্ত্য বিড়-বিড় করে বলল, নিজেই কখন সেলফটা এ-পাশে সরিয়ে রেখেছে, খেয়াল নেই।

আসবাব-পত্রহীন ঘরখানির চার দিকে একবার তাকিয়ে অচিন্ত্য দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজাটা ঠিক তেমনি বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও সে বন্ধ-দুয়ার খুলতে পারলে না। কি ভেবে অচিন্ত্য ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দিল।

আরাম-কেদারায় ফিরে এসে সে মোমবাতি নিবিয়ে দিল। যে মরে গেছে তাকে কিসের ভয়! অচিন্ত্য হাই তুলতে তুলতে ভাবলে। মস্তিষ্কহীন নির্ব্বোধরাই মড়ার ভয়ে মরে। মড়াকে ভয় করবার মূঢ়তা অচিন্ত্যর কখনো ছিল না, আজো নেই।

—হুম্-হুম্! শব্দটা বোধ করি ঘরের ছাদ থেকে আসছে। অচিন্ত্য কান সজাগ করে শুনলে। শব্দটা কিসের? না, ও কিছু না। মড়াকে ভয়! বাজী রেখে আজ সে মড়ার সাথে রাত কাটাচ্ছে। ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে, অচিন্ত্য কখনো স্বীকার করেনি! মানুষ মরে গেলেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এ ত জানা কথাই।

নিজেকে সে নানা সময় নানা ভাবে যাচাই করে দেখেছে। মনের ভেতর কোন খাদ, কোন কুসংস্কার তার নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য! যতই সে ভাবছে, একটা অজ্ঞাত ভয়ে ততই সে মুষড়ে পড়ছে। কিসের ভয়? কাকে ভয়। বিশেষ আজকের বাজীর উপর যখন তার মান-সম্ভ্রম নির্ভর করছে। সহসা মৃদু অথচ স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনে অচিন্ত্যর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। নিশ্বাস বন্ধ করে সে

শুনতে লাগল। অদ্ভুত! অনেক দূর থেকে পায়ের শব্দ ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মনের ভুল? স্বপ্ন? ভয়? না—এ সত্যিকার পায়ের শব্দ।

* * *

সান্তাক্রুজের একটা ছোট মেসে প্রাত্যহিক সান্ধ্য-বৈঠক বসেছে। ঘরটিতে তিন জন যুবক বসে তাস খেলছিল। সমর, অমর ও দেশপাণ্ডে—তিন জনই ডাক্তারী পড়ে। তাস আজ তেমন জমছে না।

ওদের পাশের ফ্ল্যাটে আজ একটা লোক আত্মহত্যা করেছে। ঐ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল।

দেশপাণ্ডে বললে: তাহ'লে অমর, লোকটার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই পাশের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াবে, কি বল?

অমর বললে: ভূত-প্রেত সত্যি সত্যিই আছে কি না জানি নে, কিন্তু ভূতের চেয়েও অদ্ভুত, সংস্কার চিরকালই মানুষের মনে আছে, ও থাকবে।

সমর বললে: কিন্তু এমন লোক আমি দেখেছি, সত্যিই যার ভৌতিক সংস্কার নেই।

দেশপাণ্ডে বললে: অসম্ভব। আমি কত কত সাহসী লোক দেখেছি, শবের কাছে রাত্রে একা থাকতে সাহস পায় না।

সমর হেসে বললে: কিন্তু আগে যার কথা বলেছি, সে পারে। বাজী রেখে সে অমাবস্যার রাত শ্মশানে বসে কাটিয়ে দিয়েছে।

দেশপাণ্ডে তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করে বললে; এ নিয়ে আমি তোমার সাথে এক হাজার টাকা বাজী রাখতে প্রস্তুত। সর্ত্ত এই যে, ওকে মড়ার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হবে সারা রাত। ঘরটিতে আলো জ্বালাবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। আর,—তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে পারবেন না।

সমর বললে: এক হাজার টাকা! কিন্তু আমি আগেই বলে দিচ্ছি, বাজী তুমি হারবে।

দেশপাণ্ডে বললে: হাজার টাকা দেশপাণ্ডের কাছে কিছু না, আশা করি, সে-কথা তুমি ভোলনি। কিন্তু তোমার বন্ধুর শারীরিক ও মানসিক কোন বিকার ঘটলে আমি দায়ী হব না, মনে থাকে যেন।

সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। সমর বললে; কিন্তু মড়া পাবে কোথায়?

অমর চুপ করে এতক্ষণ শুনছিল। বললে: মড়ার ভাবনা কি? আমিই মড়া সাজব'খন। তোমার বন্ধুটা দেখতে কেমন হে?

সমর বললে: বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। যেন এখানকার লোক না, ক'দিনের জন্য বোম্বে বেড়াতে—

অমরের মুখের দিকে তাকিয়ে সমর সহসা থেমে গেল। বললে: তোমার চেহারার সাথে অচিন্ত্যর চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখছি।

এর পরের দৃশ্য আমরা দেখেছি।

* * * *

শেষ রাত্তে দেশপাণ্ডে বেড-সুইচ টিপতেই সমর বিছানায় উঠে বসে বললে: তুমিও জেগে আছ।

দেশপাণ্ডে বললে: বাজীর কথা ভেবে ঘুম পাচ্ছে না বুঝি?

সমর হেসে বললে: ভয় নেই তোমার। বাজী জিতলেও অচিন্ত্য টাকা নেবে না।

দেশপাণ্ডে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে: তুমি জান, টাকাই বড় কথা নয়। একটা কথা ভেবে আমি অশান্তি বোধ করছি সমর। তোমার বন্ধু যদি এমন তাচ্ছিল্য ভরে আমার সাথে কথা না কইত, এ-বাজী আমি রাখতাম না। এখন আমার মনে হচ্ছে, জীবন-মরণ সমস্যায় এমন একটা বাজী রাখা আমাদের অন্যায় হয়েছে।

সমর বললে: হ্যাঁ তা-ও ঠিক। কিন্তু কি আর হতে পারে? অচিন্ত্য যদি সত্যিই ঘাবড়ে যায়, অমর সোজা শয্যা থেকে উঠে এসে ওকে সব বুঝিয়ে বললেই—

বাধা দিয়ে দেশপাণ্ডে বললে: অমর শয্যা থেকে উঠে এলে স্বভাবতই অচিন্ত্য তাকে প্রেতাত্মা মনে করবে। তখন,—

সহসা টেবিলে টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে দেশপাণ্ডে এক লাফে বিছানা ছেড়ে নীচে নামল। বললে: চারটে বাজল। আর দেরী করা যায় না। এস, বেরিয়ে এস।

পরক্ষণেই কার নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল জুহুর দিকে। খানিক দূরে গাড়ী রেখে তারা বাংলোটার দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে দেশপাণ্ডে বললে, মড়াকে জীবিত দেখে অচিন্ত্য যদি হার্টফেল করেই মারা যায়। কে জানে কি অনর্থই না ঘটল।

সমর বললে: আমি ঠিক উল্টোটাই ভাবছি। অমরকে সত্যি সত্যিই না সে মেরে ফেলে!

বাংলোটার সামনে আসতেই তারা দেখলে, আশে-পাশের সব ক'টি বাংলোয় আলো জ্বলছে। গেটের ভেতর জনতার ভয়ার্ত্ত কোলাহল শোনা গেল।

একজন ভদ্রলোক বাইরের দিকে ছুটছিল। তাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। বললে: হ্যাঁ মশাই, এখানে ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায়, জানেন?

ব্যাপার কি? দেশপাণ্ডে শুধাল।

ভেতরে যেয়েই দেখুন না। বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

দেশপাণ্ডে সমরকে চুপি-চুপি বললে:, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!

সমর উত্তর দিল না। দু'জনে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। উপরে উঠে দেখলে, দরজা খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক দল লোক কোলাহল করছে। বারান্দার মতই ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ভেতর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। কে যেন পাগলের মত ঘরের ভেতর দাপাদাপি করছে।

দেশপাণ্ডে সমরকে বললে: এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ না। চল, পালাই।

সমর বললে: আমরা ডাক্তার। এখনো হয়ত কিছু করা যায়।

কিন্তু,—দেশপাণ্ডে বললে।

বাংলোর মেন-সুইচটা কোথায় সমর জানত। বাঁ-দিকে বারান্দায় একটুখানি যেয়ে সে সুইচ খুলে দিল। বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু ঘরের ভেতরকার আলো জ্বলল না। সমরের মনে পড়ল, বিকালবেলা বালব খুলে নেওয়া হয়েছিল।

পরক্ষণেই দরজার জনতা আর্ত্ত চীৎকার করে যে যেদিকে পারে ছুটল। আলোর অচিন্ত্য পালাবার পথ খোঁজে পেয়েছে। দরজার সামনে মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ সে থমকে দাঁড়াল। সমর ও দেশপাণ্ডে

দেখতে পেল, তার চুলের রং শণের মত সাদা, গায়ের সার্ট ছেঁড়া। কপাল ঘর্মাক্ত। সমর কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বললে : এ কি করলে অচিন্ত্য !

দেশপাণ্ডে সমরের হাতে চাপ দিয়ে বললে : চুপ কর সমর !

অচিন্ত্য বোধ হয় শুনতে পেলে না। তিন-চার জন লোক খুব সম্ভব বাধা দেবার জন্য সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। শিকারী বাঘের মত অচিন্ত্য তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, নিজের পথ করে নিয়ে সিঁড়ির নীচে অদৃশ্য হল।

একটু বাদে পুলিস-অফিসার ও ডাক্তার টর্চের তীব্র আলো ফেলে উপরে উঠে এলেন। ঘরের ভেতর শয্যায় শায়িত অমরের লাশটি পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন : ঘণ্টা দুই আগে এর অপমৃত্যু হয়েছে। শব মর্গে পাঠানো হোক।

পুলিশ-অফিসারের টর্চের আলো জনতার উপর পড়তেই তারা ছুটে পালাল। টর্চের আলোয় দেখা গেল, দেশপাণ্ডে ও সমর জনতার আগে আগে ছুটে পালাচ্ছে।

মোটরে সেলফ ষ্টার্ট দিয়ে দেশপাণ্ডে বললে : যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটল।

সমর বললে : শেষ পর্য্যন্ত অচিন্ত্য অমরকে হত্যা করল।

বাড়ী এসে দেশপাণ্ডে বললে : সমর, আমাদের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। দিন কতক বায়ু-পরিবর্ত্তনে গেলে কেমন হয়।

সমর বললে : আমিও সে কথা ভাবছিলাম।

দেশপাণ্ডে বললে : ভাবাভাবির সময় নেই সমর। আজই,—সন্ধ্যায়, ফ্রণ্টিয়ার মেইলে আমরা শ্রীনগর যাচ্ছি।

সমর মাথা নেড়ে সায় দিল।

* * * *

দু'বছর বাদে রাঁচির এক পার্কে দুই বন্ধু একখানি বেঞ্চিতে বসে গল্প করছিল। ওপাশ থেকে জনৈক ভদ্রলোক আড়চোখে এদের দেখছিল।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

পরের দিন খেতে বসে গোকুল বাবু গল্প করলেন যে, তাঁদের আপিসের বড় সাহেবের বাংলো থেকে অনেক জিনিষ-পত্র চুরি হয়ে গেছে। এই সাহেব বদলী হয়ে সম্প্রতি এসেছেন, এঁর নাম টমসন। জিনিষ-পত্র চুরি যাওয়াতে সাহেব ভীষণ ক্ষেপে আছেন, এবং ভবিষ্যতে যাতে শীঘ্রই এখানে থানা ও আদালতের সৃষ্টি হয় তার চেষ্টা করছেন।

গোলু এই সময় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, পোড়ো বাড়ী সম্বন্ধে আর কিছু শুনলে ?"

গোকুল বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আপিসে এই নিয়ে এর মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেছে, তবে সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কয়লা-খাদের নীচে এর মধ্যে পর-পর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এবং ঘটেছে সম্পূর্ণ কুলীদের নিজেদের দোষে। তারা নেশা করে সেখানে নেমে মারা পড়েছে।"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "তারা নেশা করবার জিনিষ পায় কোথায় ?"

গোকুল বাবু বললেন, "লুকিয়ে একটু-আধটু মদ চোলাই চলে এবং সেটা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "নতুন সাহেবের দরকারী জিনিষপত্র কে সাপ্লাই করে ?"

গোকুল বাবু বললেন "তা ত জানি না, তবে আমার মনে হয়, হরদেও অনেক জিনিষ সাপ্লাই করে, কারণ, সাহেবের খানসামাটা প্রায়ই হরদেওর সঙ্গে ঘোরে এবং হরদেও মাঝে-মাঝে সাহেবের বাংলোতে যায়।"

গোলুর মুখের ভাব দেখে মনে হোল, সে যেন একটা প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছে। সে বলল, "সাহেবের বাংলোতে অত চুরি হয়ে গেল তার জন্য সাহেব সাবধান হয়নি ?"

গোকুল বাবু বললেন, সাবধানের মধ্যে এক ষণ্ডামার্কা দরোয়ান রেখেছে এবং শুনলাম সে না কি যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক, খুব সাহসী ও বলবান।"

গোলু শুনে বলল, "তাহলে ওই লোকটাকেই আমি দেখেছি, —বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, আর সাহেবের খানসামার সঙ্গে গল্প করছিল।"

গোকুল বাবু আহার সেরে বেরিয়ে গেলেন আর গোলুও স্কুলের পথ ধরল। স্কুল থেকে ফিরে, জলখাবার খেয়ে গোলু নিজের ঘরে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরেন আর কানাই উপস্থিত হোল। বরেন এসেই গোলুর খাটে শুয়ে পড়ে বলল, "শীগ্‌গির এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দে, গরমে আর তেষ্টায় প্রাণ গেল।"

কানাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "দু'গেলাস।"

গোলু জল আনতে নীচে গেল ও ফিরে এসে দেখে, বরেন পাঞ্জাবী খুলে খালি-গায়ে শুয়ে আছে। বরেনের পেশীবহুল নিটোল দেহ দেখে গোলু তারিফ না করে পারল না। বরেনের ঘাড়ে হাত রেখে গোলু বলল, "ষাঁড়ের মত ঘাড়খানা করেছিস, বলি কুস্তি লড়া ছেড়ে দিয়েছিস্ না কি ?"

বরেন উঠে বসে বলে, "দূর হোগ্‌গে, কুস্তি-টুস্তি আর পোষায় না। যাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরব সে কুস্তি জানুক আর না জানুক তার নিস্তার নেই।"

কানাই হেসে বলল, "তাই ত আমার সঙ্গে হেঁটে পারলি না।"

বরেন রেগে বলে "তোর ফড়িংয়ের মত হাল্কা শরীর, তাই লাফিয়ে চলিস, আমার এই ভারী শরীর নিয়ে তোর সঙ্গে পারব কেন ?"

গোলু কানাই আর বরেনকে তাড়া দিয়ে বলল, "চল চল, আর দেরী করিস্ না, একবার ডিসপেন্সারীতে যেতে হবে।"

বরেনকে শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে উঠতে হোল।

তিন বন্ধুতে যখন হরদেওর দোকানের সামনে এসেছে, তখন গোলু হঠাৎ দাঁড়িয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে সুরু করল। তার দেখাদেখি বরেন এবং কানাইকেও দাঁড়াতে হোল। হরদেওর এইটাই ছিল দোকান ও থাকার বাড়ী। একতলায় পাশাপাশি দু'টি পাকা ঘর ও পাকা ঘরের দু'পাশে দু'খানি লম্বা খোলার ঘর। ভিতর দিকে উঁচ পাঁচিল-তোলা উঠান এবং দু'তলায় একখানি ঘর। খোলার ঘরটাতে সে কয়লা বিক্রী করত এবং

বস্তীটিতে মুদীর দোকান ছিল। হরদেও বোধ হয় বাড়ী ছিল না, কারণ তার দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। গোলু কিন্তু এক দৃষ্টিতে উপরের ঘরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। উপরের ঘরটির জানলা-দরজা সব বন্ধ। গোলু কানাইকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয় যে, এই ঘরটা থেকে আমার ঘরটা দেখা যায়, অথবা আমার ঘর থেকে এই ঘরটা দেখা যায়?"

কানাই বলল, "নীচে থেকে বলা শক্ত, কারণ সামনে গাছের আড়াল পড়ছে, তবে উপরের ঘর থেকে হয়ত দেখা যায়।"

গোলু খানিকক্ষণ মনে মনে দিক্ নির্ণয় করে নিলে, তার পর বলল, "চল এবার।" পথে যেতে-যেতে গোলু বলল, "দেখ বরেন, এক দিন এই হরদেওর বাড়ী আর দোকান সব খুঁজে দেখতে হবে,—পারবি?"

বরেন বলল, "পারব না কেন?"

ডিস্পেনসারীতে পৌঁছে গোলু খানিকটা পারম্যাঙ্গানেট কিনল। বরেন জিজ্ঞেস করল, "এ কি আমাদের সর্ব্বদা সঙ্গে রাখতে হবে?"

গোলু বলল, "রাখতে পারলে ভাল হয়। ডিস্পেনসারী থেকে বেরিয়ে তারা কানাইয়ের ইচ্ছামত গয়ারামের আড্ডার দিকে চলল। গয়ারাম আড্ডায় ছিল। সে কানাই ও গোলুকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু বরেনকে বিশেষ কিছু বলল না। ইদানিং বরেনের সঙ্গে কুস্তিতে হেরে যাওয়াটাই বোধ হয় তার এই উদাসীনতার কারণ। সে ঘরের কোণ থেকে তিনটে পাকা বাঁশের লাঠি এনে গোলুর হাতে দিল এবং কি ভাবে সেগুলোতে তেল লাগিয়ে রোদে রাখতে হবে, সে বিষয়ও হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিল। যাই হোক, গয়ারামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্রমে টমসন সাহেবের কথা উঠল। গয়ারাম বলল, "সাহেব বহুৎ জবরদস্ত, আউর উনকা নয়া দারোয়ান ভি বহুৎ হুঁসিয়ার আদমী।"

গোলু প্রশ্নে প্রশ্নে জানতে পারল যে, সেই দরোয়ানের নাম বিষণলাল। দেশ কোথায় কেউ জানে না। সে হিন্দী, উর্দ্দূ এবং দেহাতি—তিনটে ভাষাতেই কথা বলতে পারে এবং আগে পল্টনে সিপাহী ছিল। সব শুনে গোলুর মনে হোল যে, সাহেবের দরোয়ান বেশ মিশুক লোক। যাই হোক, গয়ারামের আড্ডা থেকে তিন বন্ধু বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পোড়ো-বাড়ীর সামনে উপস্থিত হোল। গোলু অভ্যাস মত একবার দাঁড়িয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে সুরু করল।

বরেন বলল, "ভিতরে যাবি ত চল, রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে কি দেখিস্?"

গোলু কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখে যে, একটা লোক আড়াল থেকে হঠাৎ তাদের সামনে চলে এসেছে। লোকটা বোধ হয় বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করছিল। যাই হোক, গোলুদের দেখে সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, কাছে এসে সেলাম করল। গোলু হিন্দীতে বলল, তাকে এ অঞ্চলে সে নতুন দেখছে এবং জিজ্ঞেস করল যে, কোথায় থাকে। সে হিন্দীতে জবাব দিল, যে তার নাম বিষণলাল এবং সে টমসন সাহেবের দরোয়ান। এই দিক দিয়ে সে যাচ্ছিল, আম গাছে প্রচুর আম দেখে কয়েকটা আম নিতে এসেছিল। গোলুও হেসে তাকে বলল যে সে বেশ করেছে, কারণ এই গাছের আম সচরাচর কেউ নেয় না, কেবল বাদুড় ও কাঠবেড়ালীতে খায় অথবা পড়ে নষ্ট হয়।

বিষণলাল গোলুকে বলল, "আপ লোক বাংলামে বাতচিত্ করিয়ে, হামভি বাংলা বোল শেখতে। হাম পঁচিশ বরষ বাংলা মুলুকমে কাম কিয়া।"

গোলু তখন হেসে তাকে বলল যে তাই হবে। তারা সেখানে আর সময় নষ্ট না করে আবার চলতে শুরু করল এবং বিষণলালও তাদের সঙ্গে চলল। কিছু দূর যাবার পরই তারা দেখল যে, টমসন সাহেবের খানসামা তাদের দিকে আসছে। বিষণলালকে দেখেই খানসামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল এবং তাকে সকলে খুঁজছে। যাই হোক, খানসামা ও বিষণলাল দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেলে, গোলু কানাইকে বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় না যে, সাহেব সত্যই বিষণকে ডাকছে, এ খানসামাটার চালাকী। ও নিজে বোধ হয় বেরোতে চায়।"

কানাই বলল, "এমন ত হতে পারে যে, বিষণলাল যেখানে ঘোরাঘুরি করছিল, সেখানে ঘোরাঘুরি করাটা কোন লোক অপছন্দ করছে।"

গোলু বলল, "সাবাস, তাও হতে পারে।"

তিন জনে বেড়াতে বেড়াতে গোলুর বাড়ীতে ফিরে এল। কানাই বলল, "স্কুল ছুটি না হলে কোন দিকেই মন দেওয়া যাবে না।"

বরেন বলল, "আর ত একটি দিনের মামলা।"

গোলু বলল, "আপাতত চল আমার ঘরে একটু বসা যাক্।" দুই বন্ধুকে ঘরে বসিয়ে গোলু একটা থালায় প্রচুর মুড়ি তেল-নুণ দিয়ে মেখে, তিনটে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে উপরে এল। মুড়ি দেখে বরেনের আগেই জিভে জল এসে গেছে। সে শুয়েছিল, গোলু ঘরে ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। কানাই বলল, "বরেনটার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, একাই সবটা শেষ করবে।"

গোলু থালাটা তক্তাপোষের উপর রাখতেই বরেন বিরাট এক হাত বাড়িয়ে এক-মুঠ মুড়ি মুখে পুরল। গোলুও তক্তাপোষে বসে মুড়ি খেতে সুরু করল। বরেন বলল, "নানা গণ্ডগোলে পড়ে আমার এক্সারসাইজ হচ্ছে না, এবার ছুটিতে ভাল করে করতে হবে।"

কানাই বলল "হ্যাঁ, এই গরমে আর বেশী এক্সারসাইজ করলে তোর মাথায় মগজের বদলে মাসেল গজাবে।"

বরেন চটে বলল, "থাক্ থাক্, তোকে আর বেশী কথা বলতে হবে না, তোর মগজ দিয়ে ত ঘুঁটে দেওয়া ছাড়া আর কিছু কাজ হবে না?"

গোলু এবার হেসে ফেলল। সে বলল "এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন, নয়ত বুঝতে পারবি না।"

কানাই খেতে খেতে বলল, "তুই বলে যা না, আমরা শুনছি।"

গোলু বলল, "গোড়া থেকে ঘটনাগুলি পর পর ভেবে দেখলে, দেখা যায় যে, এতগুলি লোক এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে, কে কোন কাজের জন্য দায়ী বোঝা শক্ত। প্রথমেই ধর, হরদেওর কার্য্যকলাপ, সে গোড়াতেই পোড়ো বাড়ী সম্বন্ধে আমায় ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল। তার পর ধর, এক জন অচেনা লোকের ভূধর বাবুর কাছে পোড়ো-বাড়ীর খোঁজ নেওয়াটাও আশ্চর্য্য। এর পরে হরদেওর বোতল নিয়ে সন্দেহজনক আচরণ ও সেই সঙ্গে তার সঙ্গীটির অদ্ভুত ধরণ-ধারণ। তার পর সাহেবের খানসামা ও
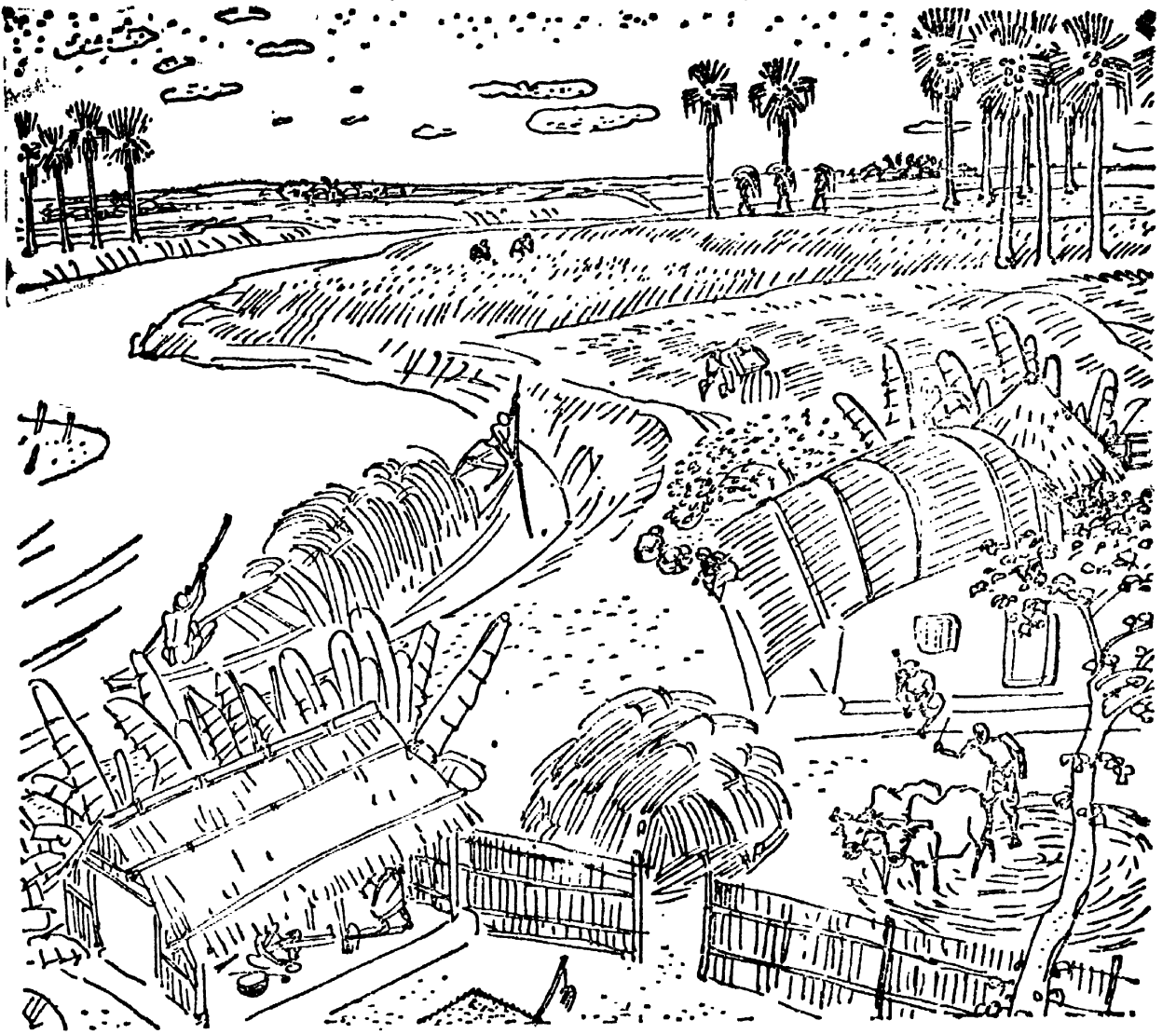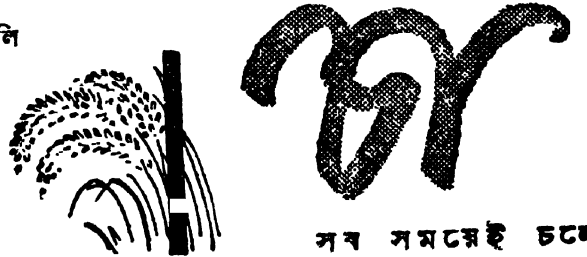
বিষণলালের সন্দেহ জনক গতিবিধি।"

গোলু চুপ করতেই কানাই জিজ্ঞেস করল, "এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত?"

গোলু বলল, "এত শীগ্‌গির কিছু বলা শক্ত, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করলে হয়ত ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হবে। তাছাড়া আমি আরও দু'-একটা খবর জানতে চাই, যেমন টমসন সাহেবের বাড়ী সেদিন কি জিনিষ চুরি গেছে এবং চোর কোন্ ঘরে ঢুকেছিল।"

কানাই বলল, "এ খবর তুই গয়ারামের কাছে পাবি, কারণ তার সঙ্গে খানসামাটার বেশ জানা-শোনা আছে।"

গোলু বলল, "ঠিক বলেছিস, কালই গয়ারামটাকে ধরতে হবে।"

এই ভাবে নানা কথাবার্ত্তার পর সভা ভঙ্গ হোল।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে গোকুল বাবু একটা অদ্ভুত খবর শোনালেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের আপিসে বিহারী বলে একটা লোক আছে। সেই লোকটা কুলীদের হিসেব রাখে, অর্থাৎ কত জন কুলী আছে, কার কত মাইনা, কত জন কাজে আসে, কোথায় থাকে, কি চায় ইত্যাদি। এ ছাড়া মঙ্গলু ব'লে এক জন কুলীর সর্দার আছে। এই মঙ্গলুর কথা সব কুলীই মানত এবং তার মেজাজ ও শক্তির জন্য সব কুলীই তাকে ভয় করে চলত। ইদানিং কয়েক দিন ধরে মঙ্গলুর মেজাজ যেন একটু বেশী খারাপ হয়েছিল। কুলীদের গালাগাল দেওয়া, এমন কি মার-ধর করার কথাও কানে এসেছে। গত কাল হরদেও কি কাজে আপিসে এসেছিল এবং বিহারীর সঙ্গে তার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। পরে বিহারী মঙ্গলুকে ডেকে আনে ও মঙ্গলুর সঙ্গে হরদেও দু'-একটা কথা বলবার পরই মঙ্গলু হরদেওর গলা ধরে মাটিতে ফেলে দেয় ও গালাগাল দেয়। এই ব্যাপারে খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়, এবং মঙ্গলুও সেখান থেকে সরে পড়ে। গোকুল বাবুর কাছে এই সকল খবর শুনে গোলুর মনে হোল যে, সমস্ত ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে গেল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গোলু অনেকক্ষণ এই সব কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ একটা নাম মনে পড়ে যাওয়াতে সে অস্ফুট স্বরে "ডিহিরি" বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। টিলাডি থেকে ২১ মাইল দূরের ষ্টেশনের নাম ডিহিরি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গেই গোলুর মনে পড়ল যে, স্কুলে ছুটি হয়ে গেছে। আনন্দে একটা চীৎকার করতেই খাটের নীচে থেকে কালু বেরিয়ে এল এবং দু'পায়ে ভর রেখে খাটের উপর উঠে গোলুর নাকটা চেটে দিল। গোলু হো-হো করে হেসে, কালুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই ছাড়া আমার মনের কথা কেউ টের পায় না।"

কালু এ কথায় ল্যাজ নেড়ে সায় দিল।

সকাল বেলা চা-পান করতে করতে গোকুল বাবু গোলুকে বললেন, "কি রে, তোর ত ছুটি হয়ে গেছে।"

গোলু বলল, "হাঁ, ছুটিও হয়েছে এবং ছুটির কার্য্য-তালিকাও ঠিক হয়ে গেছে।"

গোকুল বাবু হেসে বললেন, "কি রকম?"

গোকুল বাবু তাঁর এই মাতৃহীন ছেলেটিকে যে শুধু অত্যন্ত ভালবাসতেন তা নয়, তিনি কখনও তাকে অকারণ তিরস্কার অথবা অতিরিক্ত শাসন করেননি।

গোলু সংক্ষেপে গোকুল বাবুকে বুঝিয়ে দিল, সে এবং তার দুই বন্ধু মিলে পোড়ো-বাড়ীর রহস্যের কিনারা করতে চায়।

গোকুল বাবু হেসে বললেন, "যা খুসী করো তবে সাবধানে থেকো আর কোন গণ্ডগোলের মধ্যে যেও না।"—তিনি গোলুর নির্ম্মল ও নির্ভীক মনের পরিচয় জানতেন, কাজেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

[ক্রমশঃ

চিঁড়ের নওলা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

শনিবারের হাফ ছুটি। বাড়ী ফেরার পথে ইস্কুলের ছেলেরা আবিষ্কার করলে গোবিন্দকে। দিব্বি মজাদারী গল্পবাজ লোক! তারা তো এই চায়! অতএব গোবিন্দ গল্প শুরু করলে:

অনেক দিনের কথা। বয়স তখন অল্প! পাড়ায় থাকতেন যদু বাবু। বুড়ো থুথ্‌থুড়ো। পাঁকাটির মত চেহারা। শণের নুড়ো তাঁর চুল,—দাড়ি ছিল এক-মুখ, হাত-খানিক লম্বা—সাদা, ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়া কোঁকড়া। চোখে সব সময় একটা নীল চশমা—চার কোণা তার কাঁচ। মুখের ভিতর দু'পাটি দাঁতের অল্পই ছিল অবশিষ্ট। পাশের কষে মাত্র পাঁচটি, সামে ওপরে দু'টি, নীচে দু'টি—নড়বড়ে সব শুদ্ধ ন'টি। রেগে-মেগে কথা কইতে গেলে দাঁতে দাঁত আটকে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! আজব রকমের স্বভাব সে বুড়োর। কৃপণের হদ্দ। সকাল-বিকাল—দু'বেলা দু'পয়সার মাত্র চিঁড়ে এনে ভিজিয়ে রেখে তাই খান। ন'টি দাঁতে চিঁড়ে চিবানোর কাহিনীটি লোক-মুখে সবিস্তারে প্রচার হয়ে পড়ে, সকলে তাঁর নাম রাখলে—চিঁড়ের নওলা।

সকালে চিঁড়ের নওলার নাম কেউ নিত না। তাস খেলতে খেলতেও ভুল করে কেউ নিয়ে ফেললে সেদিন যে কপালে তার ভাত জুটবে না, হাঁড়ি যে ফাটবেই—তখনই তা নিশ্চিত জেনে নিত। ঐ কৃপণের নাম নিলে কখনও ভাত জোটে!

পাড়ায় সবাই গুলি খেলতাম। সেখানে কেবল যদু বুড়োর নামটি ছড়ায় গেঁথে পড়া চলতো। গাব্‌বুতে গুলি পিলোতে হবে, সেই সময়ে তার চেষ্টা আমরা এক নিমিষে ব্যর্থ করে দিতাম—মাথার ওপর ডান হাতখানি রেখে আঙুলগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে স্বর করে বলতাম:

যদু বুড়ো, যদু বুড়ো—যক্ষি
এই দানটি হয় যেন গো ফক্কি!

বার বার তাড়াতাড়ি এই মন্ত্রটি পড়া চলতো অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে। আর যায় কোথায়! সাক্ষাৎ ফল! যদু বুড়োর কৃপায় সে দানটি ফক্কি তো হতই, সময় সময় গুলিটা যে কোথায় কাঁটা-ঝোপে বা জঙ্গলে গিয়ে পড়তো খুঁজতে খুঁজতে গলদঘর্ম। আর আমাদের সে কি হৈ-চৈ! যদু বুড়ো থাকতে ভাবনা! যার গুলি হারাতো সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতো না। রেগে-মেগে আগুন হয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতো।—ও নাম নিলে খেলবো না বলে দিলাম,—কিছুতেই খেলবো না!

কে শোনে তার শাসানী। আমরা আরো মজা পেতাম। খুব করে চেঁচাতাম :

গুলি কোথায় গুলি কোথায়, চিঁড়ের নওলা।
গোবর্ধন দেবে খেতে গুড় ও কলা।

চিঁড়ের সঙ্গে গুড় কলা হলে চিঁড়ের নওলার সে এক মস্ত ভোজ।

ছেলেটির নাম গোবর্ধন; সে মারমুখী হয়ে দৌড়তো, কিন্তু আমরা দলে ভারী—পারবে কেন!

চিঁড়ের নওলা যদু বুড়োর অনেক কাণ্ড-কারখানাই লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

বলে উক্তি মূল পত্তনে চেনা যায়। যদু যে ভবিষ্যতে একটা কেউ-কেটা হবে, সকলের মুখে মুখে কীর্তি-কলাপ এই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তা ছোট বেলাতেই না কি ধরা পড়েছিল দু'-একটি ঘটনায়।

এক দিন দুপুর বেলা যদু বাইরের দালানে বসে আছে। একটি লোক কলা বেচতে যাচ্ছিল। কলা চাই—কলা—গম্ভীর ভাবে যদু ডাক দিলে, এই—শোন্ এদিকে—

কলাওলা এলো।

বেশ ভারিক্কি চালে যদু জিজ্ঞেস করলে, দর কি?

বাবু, পৌনে পাঁচ আনায় বাবো।

ধ্যাৎ—পৌনে পাঁচ আনা—পৌনে পাঁচ আনা আবার কি?

তবে কত দেবেন, আপনিই বলুন।

বলে দিচ্ছি বাবা, ভদ্রলোকের এক কথা—ও পৌনে পাঁচ আনা-টাচ আনা দিতে পারবো না। পুরো পাঁচ আনায় দিবি তো দে!

কলাওলা তো অবাক। তাকে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যদুর হয়তো বা কিছু সন্দেহ হয়—আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় আর দু'টো পয়সাই বেশী পাবি।

কলাওলা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে প-এ-আকার।

এই ব্যাপারটাই পরে হয়তো যদু বাবুকে হিসেবী—ক্রমশঃ কৃপণ হতে শিখিয়েছে।

ইস্কুলেও যদুর নাম ছিল বেশ। তার বুদ্ধি দেখে মাষ্টার মশাইদেরও সময় সময় তাক লেগে যেত।

তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র যদু। বাংলার শিক্ষক হরিসাধন বাবু ছেলেদের খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন: তাঁর মত যত্ন সচরাচর বোধ করি কোন শিক্ষকই নেন না। তিনি একবার ঠিক করলেন, ক্লাসে সপ্তাহে সপ্তাহে রচনা লেখার পরীক্ষা হবে কি শনিবার দিন, কেন না, রচনা ভাল না লিখতে পারলে কিছুতেই না কি বড় হওয়া যায় না। যদুর প্রতি সব শিক্ষকেরই দৃষ্টি ছিল একটু বেশী। হরিসাধন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম যদু, তোমার মত কি?

যদু আস্তে আস্তে উঠে বললে, মত তো তাই, কিন্তু না পারলে—

না—না, চেষ্টা করবে—ক্রমেই ভাল হবে। চেষ্টায় কি না হয়।

তা হলে হবে, বলে যদু ভাল ছেলেটির মত বসে পড়ে।

প্রথম সপ্তাহের প্রশ্ন ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিলেন হরিসাধন বাবু—ঘোটকের রচনা লেখ।

যদু তাড়াতাড়ি খাতা তুলে নিল লেখবার জন্য। কিন্তু, ঘাটক—ঘোটক মানে কি? যদু পেন্সিল ঠোঁটে রেখে ভাবতে বসে ঘোটক মানে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। হরিসাধন বাবু বললেন, কি ভাবছ, যদু?

যদু সসম্ভ্রমে উঠে জানালে, লিখছি স্যার—ভেবে ভেবে।

ভাল—ভাল। বলে হরিসাধন বাবু চলে গেলেন।

ভেবে ভেবে যদু যা লিখেছিল, সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না! তার কিছুটা প্রবাদের মত প্রচার হয়ে পড়েছে। শোন।

বিয়ের সময় বাড়ীতে ঘোটক আসে। দিদির বিয়ের সময় এক জন এসেছিল। সে নিজে যেমন ভূতের মত কালো, তেমনি দুর্গন্ধ আর ময়লা তার জামা-কাপড়। গলায় একটা চাদর ছিল। মুখে খোঁচা-খোঁচাদাড়ি। ঘোটক দেখতে মোটেই সুশ্রী নয়। ঘোটক আমাদেরই মত মানুষ হলেও বড় নোংরা।

তবে ঘোটক মানুষের খুব উপকারী। যে মেয়ের বিয়ে সহজে হয় না, ঘোটক তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করে দেয়।

হরিসাধন বাবু ক্লাশে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন যদুর রচনাটি। শেষ হলে যদুকে ডেকে বললেন, ঘোটক মানে কি?

ঘোটক মানে—মানে স্যার,—দিদির বিয়ের সময়—

থাম।

ধমকানিতে সে আরো ঘাবড়ে যায়।

আমি তো লোকটাকে তখন জিজ্ঞেস করেছিলেম। সেই তো বললে, সে ঘোটক—

হরিসাধন বাবু বুঝিয়ে বলেন, ঘোটক নয় সে—ঘটক—ঘটক বুঝলি! ঘ—ট—আর 'ক'।

আচ্ছা। বলেই ভ্যাঁ—।

হরিসাধন বাবু তাকে বাইরে এনে একটি ঘোড়া দেখিয়ে বলেন, ঐ—ঐ ঘোটক!

ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে ঠোঁট বেঁকিয়ে যদু বলে, ও—ওটা তো ঘোড়া?

ক্লাসের সব ছেলে হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলো।

বলা বাহুল্য, এর পর যদুর বেশী দূর আর পড়া-শুনো এগোয়নি।

বহু পরের কথা। তখন যদু আর যদু নয়—যদু বাবু।

দেখা গেল, হঠাৎ এক দিন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাড়ায়-পাড়ায়—বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কি—কি?—কয়েকটি ছেলে-মেয়ে তাঁকে ছেঁকে ধরলো।—বলতেই হবে ব্যাপারখানা।

যদু বাবু হেসে হেসে বললেন, কাল ছেলের বিয়ে, বৌভাত, বুঝলি? তোদেরও নেমন্তন্ন রইলো।

নেমন্তন্ন!—কানে কানে সবাই বলাবলি করতে লাগলো।—খাওয়াবে—ঐ চিঁড়ের নওলা।

হাসছিস যে বড়!—যদু বুড়ো ধমক দেন।

হাসবো না! বা-রে—খাবার কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়। কি কি খাওয়াবেন?

দই, সন্দেশ, লুচি, রাবড়ি—আলুর দম—যা চাইবি। আসবি—কেমন?

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

হন্‌-হন্‌ করে আর এক জনের বাড়ী গেলেন যদু বাবু—তার পর আর এক জনের—

যদু বুড়োর মুখের পানে না তাকিয়ে সবাই শুনে গেল। নাম করলেই অনর্থ, মুখ দেখলে কত কি না!

বিয়ে-বাড়ী। হৈ-চৈ—গোলমাল। তুমুল ব্যাপার। লোক গিস-গিস করছে। ছেলে-মেয়ে নাচছে—গাইছে—লাফাচ্ছে। সে এক মহোৎসব!

খাওয়ার সময়। যদু বাবুর খোঁজ পড়লো। যদু বাবু কৈ?

আর যদু বাবু!

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ। বাড়ী-ঘর, আনাচে-কানাচে সমস্ত তল্লাট খোঁজা হোল, যদু বাবু কৈ! আর খাওয়াবার বন্দোবস্ত কোথায়—কোথায় বা ভিয়েন, কোথায় বা কি!

দলে দলে লোক উন্মত্তের মত ছুটলো এদিক-ওদিক-সেদিক। রেগে সবাই আগুন। চিঁড়ের নওলাকে একবার পেলে হয়!

একটি ছেলে ছোট্ট একটি হাঁড়ি নিয়ে আসছিল। পথে ভীড় দেখে বললে, ব্যাপার কি?

যদু বুড়োর খবর কিছু জানা? চিঁড়ের নওলা।

ছেলেটি বললে, হাঁ—হাঁ, তিনিই তো পাঠালেন এক সের রসগোল্লা দিয়ে। বলে দিয়েছেন, ততক্ষণে পরিবেশন হতে থাক।

সকলে এবার ক্ষেপে উঠলো। এক সের রসগোল্লা তিনশো লোকের মধ্যে পরিবেশন। কোথায় সে চিঁড়ের নওলা! পাজি—ছুঁচো কোথাকার, নেমন্তন্ন করে ন্যাকামো!

ছেলেটি বুঝলে অবস্থা সুবিধের নয়। বললে, ঐ দিকে তো কোথায় গেলেন।

সবাই ছুটলো। যেমন করে হোক খুঁজে বার করতেই হবে—চিঁড়ের নওলাকে আজ চিঁড়ে-চেপ্টা করে তবে ছাড়া!

খোঁজ চলেছে। হঠাৎ হারু দৌড়তে দৌড়তে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, পেয়েছি—পেয়েছি—

কোথায়?

আস্তে আস্তে চলে এসো—এদিকে—

হারুর পিছনে চললো বিরাট দল।

বক্সীদের পচা পুকুর। তার মধ্যে গলা ডুবিয়ে যদু কৃপণ দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে!

হারু উত্তেজিত হয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যদু বুড়ো প্রমাদ গণলেন। হাত জোড় করে মিনতি জানান, পায়ে পড়ি তোমাদের। আর এমনটি হবে না—

কে শোনে!

হারু তাঁর হাতের গামছাটা ছিনিয়ে নিয়ে গলার বেশ করে না জড়িয়ে দু'হাতে হিড়-হিড় করে যদু বুড়োকে টেনে আনলে ওপরে।

তার পরের ব্যাপার অতীব ভয়ঙ্কর। প্রহারের পর প্রহার—যাকে বলে ভুলো-ধোনা। দাঁত খিঁচিয়ে হারু বলে, বড্ড খরচ হয়ে গেছে এক সের রসগোল্লায়—না, তাই গায়ের জ্বালা, সেই জ্বালা জুড়োতে পুকুর-জল—হুঃ!—বলে শক্ত করে গামছাটায় এক টান মারলে।—

এরও অনেক পরের কথা।

পূজোর সময়। কার্পণ্যের চরম করে ছাড়লেন যদু বাবু। বিজয়ার দিনটি ছেলেদের কাছে পরম শুভ—স্মরণীয়। প্রতিমা ভাসানের পর শান্তিজল নেওয়া হলে তারা দল বেঁধে প্রত্যেকের বাড়ী যায় যথাযোগ্য নমস্কার কোলাকুলির পর মিষ্টিমুখ করতে।

যদু বাবু আগের দিন ছেলেদের ডেকে বললেন, আমাকে ভুলিসনি, বাছারা। আমার ওখানেও আসবি।

বটেই তো—বটেই তো! সমস্বরে সকলে সম্মতি জানায়।—সেদিন সকলের সঙ্গেই যে দেখা করতে হয়!

খুশী-মনে যদু বাবু বাড়ী ফিরলেন।

বিজয়ার রাত। দল বেঁধে ছেলেরা এ-বাড়ী সে-বাড়ী—সব বাড়ী ঘুরলো একে একে। পেটে তাদের আর ধরে না। খুব খেয়েছে সবাই এবার কলরব করতে করতে চললো চিঁড়ের নওলা যদু বাবুর বাড়ী

পথে যেতে যেতে এক জন বললে, কি আর দেবে কেপ্পন।

আর এক জন প্রতিবাদ করে বলে, জানিস, নেমন্তন্ন করেছে বিশেষ করে।

কে এক জন বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বললে, ঘোড়ার ডিম! স জানা আছে। নেমন্তন্ন করে তো এক-গলা জলে ডুব মারে!

হৈ-হৈ করে যদু বাবুর বাড়ীর সামনে [illegible] ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন যদু বাবু।—এসো—এসো [illegible] তোমাদের জন্যে তো এই আলো জ্বালিয়ে বসে আছি। এসো।

উৎসাহ-ভরে সবাই ঢুকে পড়লো। যদু বাবু যখন এমন আদর করে ডেকে নিলেন ভেতরে, এবার সরেশ ব্যবস্থা হয়েছে। উল্লসিত হয়ে বড় চৌকিটার উপর বসে পড়লো সবাই।

যদু বাবু হাসিমুখে বলেন, বস বাবা, বস। আজ মিষ্টিমুখ একটু করতে হয়।

কয়েক জন বলে উঠলো, পেটে আর জায়গা নাই, যদু বাবু।

কেউ কেউ ঢেকুর তুলে জানিয়ে দিল।

যদু বাবু বললেন, তাই কি হয়! শাস্ত্রের নিয়ম। বস।—তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

তাহ'লে ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। চিঁড়ের নওলা তবে এক-হাত দেখিয়ে দেবেন! তাদের মধ্যে জোর আলোচনা চলতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যদু বুড়ো ফিরে এলেন। [illegible] কোথায় কি! এক বালতি জল ও কয়েকটি গেলাস [illegible]!

ঘাবড়ে গেল ওরা। শুধু জল খাওয়াবে না কি!

নাও বাবা, নাও—শুরু করে দাও—বলে যদু বাবু এক জনের হাতে এক গেলাস জল তুলে দিলেন।—মিষ্টিমুখের জন্যে, গরীব মানুষ জানোই তো—এই সামান্য ব্যবস্থা, বলে তিনি উপরের দিকে তর্জনী তুলে দেখান।

আঙুল অনুসরণ করে সবিস্ময়ে সবাই দেখলে, সরু একগাছা সুতো দিয়ে কড়িকাঠের কাছ বরাবর নাগালের বাইরে ঝুলছে একখানি জিলাপি!

—ঐটা দেখে-দেখে এক-এক গেলাস জল খাও। অর্দ্ধেক তো খেয়ে এসেছ—তাই ভাবলাম, আণেন আর অর্দ্ধেক—নাও। জলটা ইঁদারার, খুব ঠাণ্ডা! বলতে বলতে আর এক গেলাস জল তুলে ধরলেন যদু বাবু।

আর দাঁড়ালো না কেউ। সকলে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল। এক জন বললে, গ্লাস ছুঁড়ে মাথাটা ফাটাতে পারলে

কাজের কাজ হত। হাসতে হাসতে আর এক জন বললে, ও গ্লাসও তেমনি ; টিনের—পটপটে, মারলে মাথা ফাটে না।

তারা ক্ষেপে উঠলো। এর প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। এত বড় অপমান—অমন বছরকার দিনে।

একটা উপায় স্থির হতেও দেরী হল না।

কালী পূজার দিন। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। দু'টি ছেলে—চারু আর বেণী পরামর্শ করে বসে রইলো একটি গাছের মাথায় ; গাছটি যদু বুড়োর বাড়ীর ঠিক সামনেই।

অনেক রাত। পূজো-বাড়ী থেকে প্রসাদ পেয়ে যদু বুড়ো ঠুক-ঠুক বাড়ী ফিরছে কালী—কালী—কালী—ভক্তি-গদগদ স্বরে উচ্চারণ করতে করতে।

ঝপাস—

ঠিক যদু বাবুর কাঁধের উপর লাফিয়ে পড়লো চারু।

ভয়ে যদু বাবু গোঁ-গোঁ করে পড়ে গেলেন। বেণীও ইত্যবসরে গাছ থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে—মুখোস-পরা বিকট মূর্তি। যদু বুড়োর লম্বা দাড়িটি [illegible] ক হাতে ধরে, আর এক হাত বাড়িয়ে নাকি-সুরে বলে, [illegible] এক্ষোটা টাকা দে—

[illegible]টি। কিন্তু টাকার মায়া যে প্রাণের চেয়েও বেশী!

চারু তাঁর পিঠে চেপেই আছে, সমানে আঁচড়াচ্ছে—কামড়াচ্ছে।

শেষে যদু বাবু অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়েন। দোষ যে দোষ—সব দোষ।

আগে দে—

কৃপণের থলি সব সময় সঙ্গেই থাকে। একশোটা টাকা বার করে দিয়ে তবে রেহাই।

যদু বাবুর ছেলে গোলমাল শুনে তৎক্ষণে আলো হাতে হাজির হয়েছে। চারু, বেণী মুখোস খুলে ফেলেছে। তাদের চিনতে পেরেই যদু বাবু টাকার শোকে চেঁচিয়ে ওঠেন, দে—দে শয়তানেরা—আমার টাকা—

খটাস—দাঁতে দাঁতে আটকে গিয়ে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার!

[illegible], এক গ্লাস জল এনে দে চট করে—নয় তো মরবে নাকি

বেণী ছুটে গিয়ে ইঁদারার জল এক গ্লাস নিয়ে আসে।—এটুকু খেয়ে নিন! ইঁদারার জল—খুব ঠাণ্ডা!

তাঁর সঙ্গে চালাকি! যদু বাবু কট-মট করে তাকান, কিন্তু অনুপায়! হাঁপাতে হাঁপাতে জল গিলতে লাগলেন।

জল খাওয়া হল, কিন্তু যদু বাবু হাঁ করেই রইলেন। বেণী হাওয়া নেবার জন্য বুঝি!

বেণী ও চারু দেখে, না, তা নয়। সর্বনাশ হয়েছে। চিঁড়ের নওলার মাত্র আটটি দাঁত যে! আর একটি গেল কোথায়!

যদু বাবু উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। হাত বুলিয়ে কেবল দেখিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ, দাঁতটা ভেঙে জলের সঙ্গে বেমালুম পেটের মধ্যে চলে গেছে!

• • • •

ইতি। যদু বাবুর প্রথম দাঁত-হারানোর কথা।—বলে গোবিন্দ বিদায় নিল।

সমুদ্র-স্রোত

শ্রীহৃষিকেশ রায়
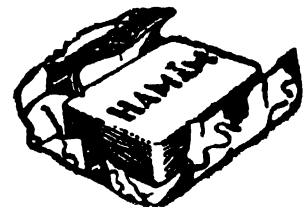
ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ এক বিশাল অবিচ্ছিন্ন জলরাশির দ্বারা আবৃত। এই জলভাগ সমগ্র ভূ-গোলকের শতকরা ৭১ ভাগ এবং অবশিষ্ট ২৯ ভাগ মাত্র স্থল। স্থলভাগ যেমন সর্বত্র সমতল নয়,—পর্বতাদি বিরাজিত, সেইরূপ সমুদ্রের তলদেশের গভীরতারও তারতম্য আছে। এমন কি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের উচ্চতম অপেক্ষা ইহা অধিক। অবিচ্ছিন্ন হইলেও, বিভিন্ন স্থানে এই জলরাশির বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে এবং তাহাদিগকে মহাসাগর বলে।

আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে এশিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ১০ হাজার মাইল বিস্তৃত বিশাল জলভাগে (পৃথিবীর সমগ্র জলভাগের অর্ধাংশ) কোনরূপ ঝড়-তুফান না দেখিয়া বিখ্যাত নাবিক ম্যাজিলান ইহার নাম দেন প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বড়ই অশান্ত। উত্তরে এশিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, দক্ষিণে কুমেরু বৃত্ত, পূর্বে পলিনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভারত মহাসাগর। আমেরিকার পূর্বে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমে ৩০০০ মাইল বিস্তৃত শ্রেষ্ঠ মহাসাগর আটলান্টিক। আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক হইলেও, ইহার উভয় তীরবর্তী আধুনিক সভ্যতাদীপ্ত সমৃদ্ধ দেশ ও বিখ্যাত বন্দর সমূহ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শেষোক্ত মহাসাগর দুইটি বরফে আবৃত থাকে।

পঞ্চ মহাসমুদ্রের এই যে ১৪ কোটি বর্গমাইল বিস্তৃত অসীম জলরাশি, মুহূর্তের জন্যও ইহা স্থির নয়। অবিরত প্রবল বায়ুপ্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া এই জলরাশিকে আলোড়িত করে। তরঙ্গে অবশ্য জলরাশি স্থানান্তরিত হয় না, এক স্থানে থাকিয়াই উঠা-নামা করে। জোয়ার-ভাটার জন্য সমুদ্রের জল এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। এই দুই প্রকার আলোড়ন ব্যতীত বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন গতি, লবণতার অনুপাতে সমুদ্রজলের ঘনত্বের তারতম্য, সমুদ্রজলের বাষ্পীভবন প্রভৃতি নানা কারণে সমুদ্রজলে আর এক প্রকার গতি আছে। ইহাই সমুদ্র-স্রোত। বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সমুদ্র-স্রোতও ফেরেল সূত্রের* অনুগামী। কিন্তু স্থলভাগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, ইহার গতিপথের পরিবর্তন হয়।

প্রধান প্রধান সমুদ্রস্রোত এবং নিয়ত বায়ু† প্রবাহ, উভয়ের গতিপথের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, প্রবাহ প্রধানতঃ সমুদ্রস্রোতের নিয়ামক।

বিষুবরেখার উত্তরে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু সমুদ্রের যে অংশ দিয়া প্রবাহিত হয়, দেখা যায় যে, সে অংশে সমুদ্র-স্রোতও উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে এবং বিষুবরেখা অতিক্রম না করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হয়। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এই স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে যায় ও কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করিয়া প্রত্যায়ন বায়ুপ্রভাবে সেই দিকেই প্রবাহিত হয়। মেরুদেশীয় বায়ু যেমন উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়, সমুদ্রস্রোতও ঐ অঞ্চলে প্রায় সেই পথেই চলে। আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুদেশীয় বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বিষুবরেখার দক্ষিণে সমুদ্রস্রোতের উপরেও সমভাবেই বর্তমান। বায়ুপ্রবাহের
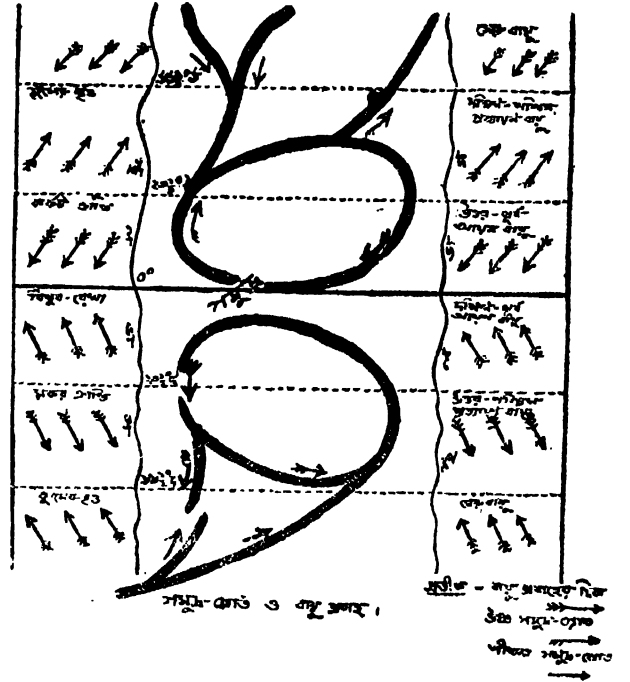
ন্যায় সমুদ্রস্রোতের এই যে উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম ও অন্যান্য বক্রগতি, ইহা পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তন গতির ফল। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের গতির যে পরিবর্তন, সমুদ্রস্রোতও সে প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সমুদ্র-জল স্বভাবতই লবণাক্ত। এই জলে শতকরা সাড়ে ৩ ভাগ লবণজাতীয় বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান। কিন্তু বাষ্পীভবন, নদ-নদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির তারতম্যের উপর সমুদ্র-জলের লাবণতার হার নির্ভর করে। ভূমধ্যসাগরে দ্রুত বাষ্পীভবন হয় এবং নদনদী ইহাতে বেশী আসিয়া পতিত না হওয়ায় জিব্রাল্টার প্রণালীর নিকট ইহার লাবণতার হার শতকরা ৩৭০ অপেক্ষা বেশী (শতকরা ৩৭৭৫) এবং পূর্ব দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, এই হার ততই বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৩৯১ হয়। লাবণতার এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে জলের আপেক্ষিক গুরুত্বেরও তারতম্য হয়। সেই জন্য দেখা যায় যে, জিব্রাল্টার প্রণালীতে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্য সাগরের উপরিভাগে একটি এবং নিম্নে বিপরীতমুখী অপর একটি স্রোত আটলান্টিকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। শেষোক্ত নিম্নগামী স্রোতের লাবণতা উপরিভাগের স্রোত অপেক্ষা বেশী। আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এই উভয় প্রকার স্রোতপ্রবাহ ন

---

* ফেরেল সূত্র (Ferrel's law)—পৃথিবীর আবর্তনের গতি নিরক্ষ রেখায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল। যত উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, এই গতি ততই কম। পৃথিবী স্বীয় মেরুরেখার উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। এই দুই কারণে পৃথিবীর উপর গতিশীল পদার্থের গতি বিক্ষেপ হয়। ফলে মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখার দিকে বা বিষুবরেখা হইতে মেরুপ্রদেশের দিকে বায়ুপ্রবাহ বা জলপ্রবাহের গতির দিক উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যায়।

† নিয়ত বায়ু (Constant wind)—আয়ন বায়ু (Trade winds), প্রত্যায়ন বায়ু (Anti-trade winds) এবং মেরুদেশীয় বায়ু (Polar winds) ইহাদের অন্তর্গত।

তাহাদের জলের লাবণতার তারতম্য। অপর পক্ষে কৃষ্ণসাগরে বাষ্পীভবন কম এবং দানিয়ুব, নিষ্টার, নিপার, ডন প্রভৃতি নদী ইহাতে পতিত হওয়ায় ইহার লাবণতার হ্রাস, তথা জলের ঘনত্ব কম। ফলে কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের দিকে উপরিভাগে এবং নিম্ন-প্রবাহী স্রোত ভূমধ্যসাগর হইতে কৃষ্ণসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। বাল্টিক সাগর-স্রোতের কারণও ঠিক কৃষ্ণসাগরের অনুরূপ। লাবণতার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রে যে স্রোত সৃষ্টি, বদ্ধ-সমুদ্রেই ইহা কার্যকরী, মুক্ত-সমুদ্রে ইহার প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না।

সূর্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ সমস্ত তাপের আধার। সূর্যতাপে যেমন বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি, সমুদ্রস্রোতও সেইরূপ তাপের তারতম্যের উপর আংশিক নির্ভর করে। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়, কিন্তু যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই তির্যকভাবে সূর্যকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। সে জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে সমুদ্রের জল যেরূপ উত্তাপ পায় (গড় উষ্ণতা ৮০° ফা), তাহার উত্তর বা দক্ষিণের সমুদ্র জল সে পরিমাণ উত্তাপ পায় না (মেরুপ্রদেশের গড় উষ্ণতা ২৮° ফা)। তাপে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। এই কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্র-জল সূর্যকিরণে উত্তপ্ত ও আয়তনে বর্ধিত হইয়া লঘুতর হয় এবং মেরুপ্রদেশের দিকে বহিয়া যায়। আবার মেরুপ্রদেশের শীতল ও ঘন জলরাশি সেই স্থান পূরণের জন্য সমুদ্রের গভীর অংশ দিয়া উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। জল তাপের ভাল পরিবাহক নয়; সে জন্য উপরের জলরাশি উত্তপ্ত হইলেও নিম্নের জলরাশিতে তাপের কোন পার্থক্য হয় না। গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরুপ্রদেশের দিকে প্রবাহিত স্রোতের জল উষ্ণ বলিয়া ইহাকে উষ্ণ স্রোত এবং মেরুপ্রদেশ হইতে প্রবাহিত স্রোতকে শীতল স্রোত বলে। উষ্ণ ও শীতল স্রোত-প্রবাহ পরীক্ষাগারে নিম্নবর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

একটি পাত্রে জল লইলাম। পাত্রের এক পার্শ্বে জলের উপর এক খণ্ড বরফ ঝুলাইয়া দিলাম। অপর পার্শ্বে একটি লৌহদণ্ডকে এরূপ ভাবে রাখিলাম যে, ইহার কিয়দংশ জলে এবং অবশিষ্টাংশ পাত্রের বাহিরে থাকে। লৌহদণ্ডকে উত্তপ্ত করায় ইহার নিকটস্থ জলের আয়তন বর্ধিত হইবে এবং উচ্চতাও অধিক হইবে, কিন্তু যে পার্শ্বে বরফ আছে সে পার্শ্বে জলের উচ্চতা কম হওয়ায় উষ্ণ জল বরফের দিকে যাইবে এবং স্রোতের সৃষ্টি হইবে। উত্তপ্ত জলে যদি কিছু রং ঢালিয়া দেওয়া যায়, স্রোতের গতি স্পষ্ট দেখা যাইবে। শীতল জলের উপর উষ্ণ জল আসায় শীতল জল নিম্নপ্রবাহী হইয়া উষ্ণতর স্থানের দিকে প্রবাহিত হইবে। পাত্রের উভয় পার্শ্বে যতক্ষণ এইরূপ উষ্ণতার তারতম্য থাকিবে, স্রোতও ততক্ষণ বহিবে। এক্ষণে উত্তপ্ত অংশকে বিষুবরেখা ও শীতল অংশকে মেরুপ্রদেশ কল্পনা করা যাইতে পারে।

সমুদ্রের কোন কোন অংশে উষ্ণতার আধিক্যে বাষ্পীভবন ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায়, সে স্থানে জলের অভাব পূরণের জন্য উহার পার্শ্ববর্তী স্থানের শীতল জলরাশি প্রবাহিত হইয়া আসে। ইহাতেও সমুদ্রে স্রোত উৎপন্ন হয়। আবার গভীরতার তারতম্যেও জলের উষ্ণতার বৈষম্য হয় এবং বায়ুপ্রবাহ ইহার সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। সে জন্য দেখা যায় যে, একই অক্ষাংশে যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে সেখানকার জলের উষ্ণতা অপেক্ষা ইহার বিপরীত দিকের জলের উষ্ণতা অধিক।

এই সমস্ত সাধারণ নিয়মের অনুগামী হইয়া প্রধান প্রধান সমুদ্র স্রোতগুলি প্রায় একই গতিপথে প্রবাহিত হইতেছে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোতে গতির কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্রোতের গতিপথ নির্ণয় করিবার জন্য উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থান হইতে শূন্য বোতল বা কাষ্ঠখণ্ড ভাসান হয় এবং তাহারা যে পথে অগ্রসর হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া মানচিত্রে রেখাঙ্কন দ্বারা স্রোতের গতিপথ দেখান হয়।
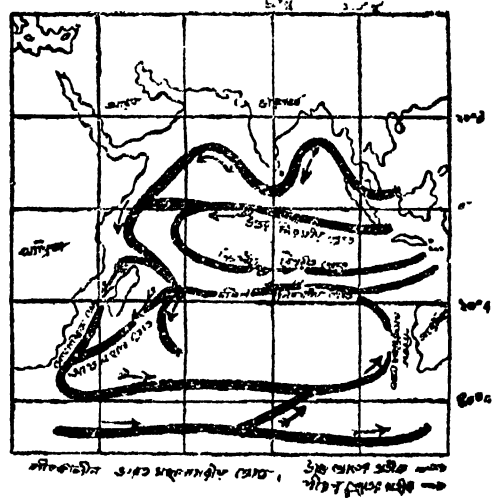
আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগ—বিষুবরেখার উত্তরে—উত্তর নিরক্ষীয় এবং দক্ষিণে—দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। আয়ন বায়ুতাড়িত এই দুই স্রোত পশ্চিমাভিমুখে আমেরিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যায়; দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি সেন্ট রক অন্তরীপে বাধা পাইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়; একটি শাখা ব্রেজিল-স্রোত নামে ব্রেজিলের উপকূল দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বাভিমুখী হয় ও পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশে। এই মিলিত স্রোত বেঙ্গুয়েলা-স্রোত নামে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। অপর শাখাটি ক্যারিব সাগর অতিক্রম করিয়া মেক্সিকো উপসাগরে ও ফ্লোরিডা প্রণালী পার হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। এই মিলিত স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে উপসাগরীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার প্রায় ৪০ মাইল, গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল এবং জলের উষ্ণতা ৮৫° ফারেনহাইট। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যায়ন বায়ুর তাড়নে এই স্রোত তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তরে গিয়াছে, মধ্যেরটি উত্তর আটলান্টিক স্রোত (উপসাগরীয় স্রোত নামে অধিক পরিচিত) নামে বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তর সাগরে মিশিয়াছে। অপর শাখাটি ক্যানারী-স্রোত নামে পর্তুগাল ও আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। উত্তর-আটলান্টিক স্রোতটি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন করে ও পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি দান করে এবং এই স্রোতের উষ্ণতার প্রভাবে বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের বন্দর-

গুলি বরফমুক্ত থাকিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করে। শেষোক্ত স্রোতটি (পরে যাহা ক্যানারি-স্রোত নামে পরিচিত) একটি প্রকাণ্ড জলাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরস্থ জলরাশিতে কোন স্রোত না থাকায় এখানে শৈবাল, কাষ্ঠ, জঞ্জালাদি জমিয়া থাকে। ইহাকে শৈবাল-সাগর (Sargasso Sea) বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই স্রোতগুলি উষ্ণ স্রোত। আয়ন বায়ু-তাড়িত উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের জন্য আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকূলে জলের উচ্চতা একই সমতলে নয়—আমেরিকার উপকূলে জলের উচ্চতা আফ্রিকার উপকূল অপেক্ষা অধিক। বায়ুমণ্ডলস্থ নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ে কোন বায়ুপ্রবাহ না থাকায় দুই স্রোতের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী স্রোতের (Counter Equatorial Current) সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সুমেরু মহাসাগর হইতে দুইটি দক্ষিণবাহী শীতল স্রোত —একটি গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া, অপরটি বেফিন-বে দিয়া, প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারা ল্যাব্রাডর উপকূলে মিলিত হইয়া শীতল ল্যাব্রাডর-স্রোত নামে আমেরিকার পূর্ব উপকূল বাহিয়া নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিয়াছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় এই উভয় স্রোতের মিলন-ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা দেখা যায়। ল্যাব্রাডর-স্রোতের জল শীতল ও সবুজ এবং উপসাগরীয় স্রোতের জল উষ্ণ ও নীল। ল্যাব্রাডর-স্রোত এই মিলনক্ষেত্রে হিমপ্রাচীর (cold wall)রূপে বহিয়া যায়। সুমেরু মহাসাগর হইতে যে সকল হিমশৈল (Iceberg) শীতল স্রোতের সহিত ভাসিয়া আসে, তাহারা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে আসিয়া গলিয়া যায় ও গ্রাবরেখার (Moraine) বালি সঞ্চিত হইয়া মগ্ন চড়ার (Sand bank) সৃষ্টি করে। এইরূপে ৩১,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত Grand bank নামক বিশাল মৎস্য-শিকারক্ষেত্রের সৃষ্টি। উভয় স্রোতের মিলনে তাপের পার্থক্যহেতু নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট প্রায়ই কুয়াসা ও ঝড় হয়। এইরূপ কুয়াসাচ্ছন্ন এক রাত্রিতে শীতল স্রোত বাহিত হিমশৈলের সংঘাতে বিখ্যাত টাইটানিক নামক জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছিল। কুমেরু মহাসাগর হইতেও ঐরূপ শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণাংশে আসিয়া ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা উত্তরাভিমুখী হইয়া ফকল্যাণ্ড-স্রোত নামে ব্রেজিল-স্রোতের সহিত মিশিয়াছে; অপরটি আফ্রিকার উপকূলে বেঙ্গুয়েলা-স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর হইতে প্রবাহিত শীতল স্রোতের জলে লবণতা কম, সে জন্য প্রথমে ইহারা সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া প্রবাহিত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যখন উষ্ণ স্রোতের সহিত মিশে, তখন উষ্ণ জলের ঘনত্ব অপেক্ষা শীতলতার জন্য ইহাদের জলের ঘনত্ব বেশী হয়। এই কারণে ইহারা নিম্নাভিমুখী হইয়া নিম্নপ্রবাহী হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের প্রায় অনুরূপ। তটভূমির ভগ্নতার জন্য স্রোতের গতিপথ কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে গিয়া উত্তর দিকে জাপানের পার্শ্ব দিয়া কুরোসিও বা জাপান-স্রোত নামে প্রবাহিত হইয়াছে। ফলে উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও জাপানের জলবায়ু উষ্ণতর কুরোসিও-স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা জাপানের পশ্চিম দিয়া জাপান সাগরে গিয়াছে। সে জন্য জাপানের পশ্চিম পার্শ্বও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। পশ্চিম বায়ু-তাড়িত এই স্রোত প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, এক অংশ বৃটিশ-কলম্বিয়ার পার্শ্ব দিয়া উত্তরে প্রবাহিত হয়, এবং অপর অংশ দক্ষিণে আসিয়া পুনরায় দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে। এইরূপে উত্তর-প্রশান্তমহাসাগরেও একটি শৈবাল-সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সুমেরু মহাসাগর হইতে আগত শীতল স্রোত বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া কামচাটকা উপদ্বীপের দক্ষিণে কুরোসিও-স্রোতের সহিত মিশিয়া ল্যাব্রাডর-স্রোতের ন্যায় কুয়াসা এবং টাইফুনের সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া অতি শীতল বেরিং-স্রোতের জন্য কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, সাখালিন ও হোক্কাইদো দ্বীপে প্রবল শৈত্য অনুভূত হয় ও বৎসরে কয়েক মাস এ সকল অঞ্চল বরফাবৃত থাকে। পশ্চিমা বায়ু তাড়িত শীতল কুমেরু স্রোত দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া পেরু বা হামবোল্ট-স্রোত নামে প্রবাহিত হয় ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়া পশ্চিমাভিমুখে ৮০০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং তিনটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা নিউ সাউথ ওয়েলস-স্রোত নামে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল অতিক্রম করিয়া পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হয়; এক শাখা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগ দিয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট শাখা উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরে বহু দ্বীপের অবস্থান হেতু দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিবার পূর্বে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশিয়া পেরু-স্রোতের সৃষ্টি করে।
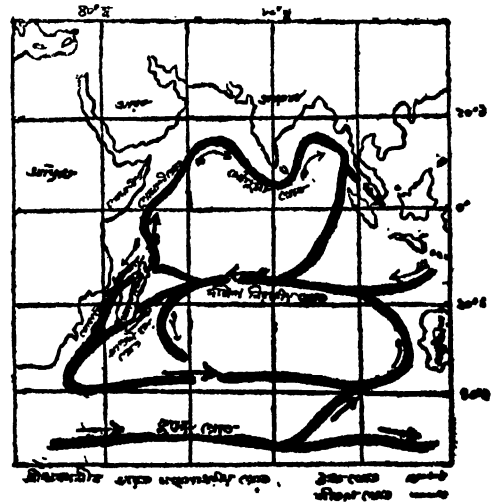
বায়ুপ্রবাহের সহিত সমুদ্রস্রোতের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা ভারতমহাসাগরীয় স্রোতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মৌসুমী বায়ু-প্রভাবে উত্তর-ভারতমহাসাগরীয় স্রোত মৌসুমী বায়ুর গতির সহিত নিজ গতিপথেরও পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতমহাসাগরীয় স্রোত অন্য দুই মহাসাগরীয় স্রোতের দক্ষিণাংশের অনুরূপ। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত শীতল কুমেরু স্রোতের অন্যতম শাখা পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া স্রোত নামে অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া উত্তরে অগ্রসর হয় এবং উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া দিয়া প্রবাহিত
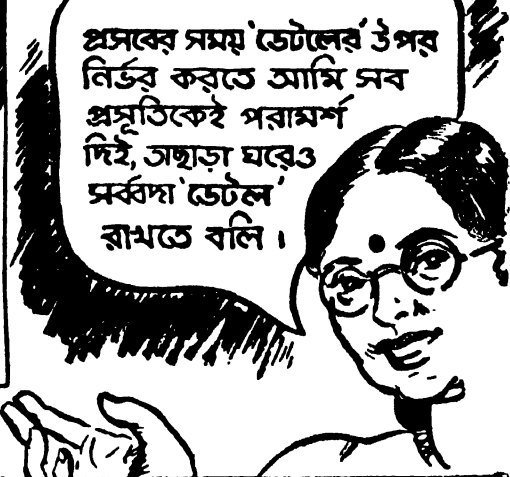
প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু-প্রভাবে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। এই মিলিত স্রোত ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের উত্তরাংশে প্রতিহত হইয়া দুই বিভিন্ন শাখায় দ্বীপটিকে বেষ্টন করিয়া পুনরায় কুমের স্রোতে মিলিত হইয়াছে। ম্যাডাগাস্কারের পশ্চিমে মোজাম্বিক প্রণালী দিয়া প্রবাহিত স্রোতটি মোজাম্বিক স্রোত নামে এবং অন্যটি আগুলহাস স্রোত নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্দ্ধের গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, সোমালী স্রোত নামে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বাহিয়া প্রথমে আরব সাগর ও পরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে, এবং মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম পার্শ্ব বাহিয়া পুনরায় দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এ সময় আয়ন বায়ুর প্রভাব না থাকায় ভারত মহাসাগরে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত দেখা যায় না। নিরক্ষ রেখার উত্তরাংশের জলরাশি মৌসুমী বায়ু-প্রভাবে পশ্চিম দিকে চালিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য নিরক্ষীয় শান্ত-বলয়ের প্রভাব না থাকায় বিপরীত স্রোতেরও উৎপত্তি হয় না। শীতকালে যখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, সে সময় আটলাণ্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের অনুরূপ একটি স্রোত প্রথমে বঙ্গোপসাগর ও পরে আরব সাগর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বাধা পাইয়া দক্ষিণমুখী হয় এবং দক্ষিণ-ভারতমহাসাগরীয় স্রোতে মিশিয়া যায়। এ সময় কিন্তু নিরক্ষীয় শান্ত-বলয় নিরক্ষরেখার কিছু দক্ষিণে সরিয়া থাকে ও নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতের উৎপত্তি হয়।

এক

নীচের গোলমাল ক্রমশঃ নেমে আসছিল। এতক্ষণ ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার গোলমাল, আরো ছোটদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে নানা রকমের বায়না, ঝি, চাকর, ঠাকুরের মধ্যে মন-কষাকষির সুস্পষ্ট কোলাহল এবং বাবুদের সান্ধ্য মজলিসে নানা বিষয়ের মতামত প্রকাশ বাড়ীটিকে সরগরম করে রেখেছিল।

সুরুচি এ বাড়ীর মেয়ে—বৌ নয়। এতক্ষণ নিজেকে বাড়ীর এই নানা বিষয়ের গোলমালের মধ্যে ছড়িয়ে রাখলেও এখন তার মনের মধ্যে কিছু আগের কোনো ছায়াপাত করছিল না—সে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের মনের একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। দিনের উজ্জ্বল আলোর মধ্যেকার কর্ম্মব্যাপৃতা, হাস্য-পরিহাস-ময়ী সুরুচির সঙ্গে রাতের আঁধারের মৌন, অলস সুরুচির মোটেই মিল হয় না। অন্ধকার তার খুব ভাল লাগে, অন্ধকারের মধ্যে সে নিজের জীবনের প্রতিরূপটি ঠিক দেখতে পায়—অন্ধকারেরও ভাষা আছে, ধ্বনি আছে; সে একলা হলেই কান পেতে সেই ধ্বনি শোনে, ভাষার সাথে নিজের ভাষা-বিনিময় করে।

যে গোলমালের রেশটুকু এতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছিল, তাও থেমে গেল। আলোগুলি সব গেল নিবে—এইবার অন্ধকার আরো প্রকট হয়ে উঠলো।

সুরুচি বসে আছে একই ভাবে। ভাদ্রের শেষ, গরম আছে বেশ, তাই জানালা-দরজা সবই খোলা আছে; একটু পরেই সে উঠে দরজাটি বন্ধ করবে। গরমের জন্য বিকেলে স্নান করায় রাশীকৃত চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। পরনে মোটা লাল-পাড় শাড়ী, হাতে সধবার লক্ষণ একগাছি করে শাখা—সধবার আর কোন চিহ্নই সে ধারণ করে না, কিন্তু এইতেই যেন সে দীপ্ত অগ্নিশিখা। যেখান দিয়ে সে চলে যায়, চেয়ে না দেখে কেউ পারে না। বাড়ীর সকলেই তাকে যথেষ্ট সমীহ করে বোঝা যায়, কিন্তু তার উপরেও আরো একটু কিছু করে মনে মনে—সেটা সোজা ভাষায় অনুকম্পা বলা যায়। সুরুচি যেমন বুদ্ধিমতী—সে-ও এটা বোঝে; কিন্তু তার প্রকাশ নাই—সে নির্ব্বিকার।

ঘরের আলোটা একবার জ্বলে উঠেই নিবে গেল। সুরুচিও একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে আবার জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রইলো।

ঘরে যে ঢুকেছিল সে তারই একমাত্র ছেলে দীপক। ছেলেরও মায়ের মত স্বভাব। যত কথা তার, সবই তার এই মা'টির সঙ্গে। মায়ের মনের সঙ্গে ছেলের মনের এত মিল ছিল যে একের মনের আলো-ছায়া অন্যের মনেও দর্পণের মত ফুটে উঠতো।

দীপক বিছানায় শুয়ে পড়লো। সুরুচি তার সুগঠিত আঙুলগুলি দিয়ে তার মাথার চুলগুলি চিরে দিচ্ছিল। সারা দিনের পরে এইটুকু পাওয়া এবং দেওয়া তাদের মা-ছেলের নিত্যকারের অভ্যাস। কথা দু'জনেরই মুখে ছিল না—সুরুচি তার আঙুলগুলির ভিতর দিয়ে মাতৃস্নেহের বিমল ধারা ছেলের মাথায় ঢেলে দিচ্ছিল আর দীপক সেই স্নেহধারা মনে-প্রাণে অনুভব করে শক্তিসঞ্চার করে নিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরুচি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আজও কি ভোর বেলা তোকে এগিয়ে দিতে হবে?"

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
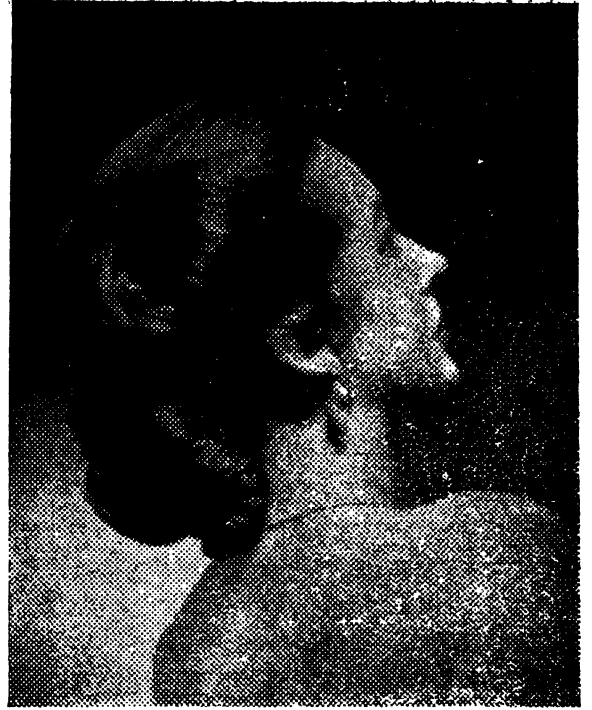
মায়ের আর একখানা হাত টেনে নিয়ে তার উপর মুখ রেখে দীপক বললে, "হ্যাঁ মা। তোমার ভোরের ঘুমটুকু আমার জন্য এ ক'দিন নষ্ট হবেই, আমি আবার যা ঘুমকাতুরে ডেকে না দিলে হয়তো সময় মত উঠতেই পারবো না।"

সুরুচি হাসলো নীরবে—ভাবলে, তার কত রাত্রি যে একেবারে বিনিদ্র কেটে যায় তার খবর পাশে থেকেও দীপক জানতে পারে না, তাই আসন্ন পরীক্ষার পড়ার জন্য তাকে ভোরে ডেকে দিতে হবে—মায়ের কর্ম্মক্লান্ত বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। সন্তানেরা কি বোঝে মায়েরা অতন্দ্র মন নিয়ে তাদের কল্যাণ চিন্তা করেই যায়।

মা ও ছেলে, দু'জনেই দু'জনের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। ছেলের আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা—কারণ তার ভবিষ্যৎ এর ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আর মায়ের? সুরুচি ভাবছিল, দীপক যদি ভাল ভাবে পাশ করে যায় তাহ'লে তার মনের এত দিনের যে একটি আশা গোপনে অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে সেটিকে প্রকাশ করে ফেলবে।

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে সুরুচি বললে, "তুই ঘুমিয়ে পড় দীপু, আমি ঠিক সময়ে তোকে ডেকে তুলব।—" বলে সে-ও শুয়ে পড়লো, ঘুম তার তখুনি এলো না—এলো-মেলো কত কি চিন্তার জালে জট পড়ে পড়ে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সব চাওয়া মোর যদি হলো ভুল

প্রমীলা রায়চৌধুরী

দুই

যে বিষাদ-ছায়ায় এই ঘটনার জন্ম—তার পূর্ব্ব-কথা কিন্তু এমন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল না।

জীবন চৌধুরী হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি থেকে সবে মাত্র ফিরেছেন কলকাতায়—কলকাতার সমাজে তাঁকে নিয়ে রীতিমত একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়ে গিয়েছে। অবিবাহিতা মেয়েদের চেয়ে তাদের মায়েদের মধ্যেই যেন তাঁকে নিয়ে রেষারেষির ভাবটা বেশী চলছিল। কার বাড়ীর পার্টিতে তিনি কতক্ষণ সময় কাটান, এটা যেন মুখরক্ষার ব্যাপার হয়ে পড়ছিল তাঁদের কাছে। চৌধুরীর কিন্তু এ-সব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না—বহু দিন পরে দেশে ফিরে একটা হালকা আনন্দে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে সুরুচির সতেজ মনটি ধাক্কা দিয়ে গেল।

সুরুচির বাবা কমলকৃষ্ণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রীর প্ররোচনায় সামাজিক দু'-একটা ব্যাপারে জীবনের সাথে সামান্য পরিচিত হলেও তাকে যে কোনও প্রকারে জামাতা করে ফেলার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী অসীমা এই নিয়ে অনুযোগ তুললেই তিনি তাঁকে একটি কথায় থামিয়ে দিতেন, বলতেন—"যোগাযোগ হলে আপনিই হবে। এই নিয়ে আমি একটা 'মণ্ডলী' তৈরী করতে পারব না।"

সুরুচি বাপ-মায়ের একটি মাত্র মেয়ে আর তাঁদের সবগুলি সন্তান ছেলে। এ ক্ষেত্রে দাদাদের চেয়ে আদর-আবদার তার বাড়ীতে বেশীই ছিল। ছোট বেলায় দাদাদের সঙ্গে 'মানুষ' হয়ে তার মধ্যে মেয়েলীপনার চেয়ে পুরুষ-ভাব বেশী ফুটে উঠেছিল, ফলে স্বাধীন মতামত প্রকাশ তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সাঁতার থেকে আরম্ভ করে ঘোড়ায় চড়া পর্য্যন্ত সব বিষয়েই সে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিত।

ভগবানের ইচ্ছায়ই হোক বা সুরুচির মায়ের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হোক্, জীবন চৌধুরী এই তেজস্বিনী মেয়েটিকে কমলকৃষ্ণের কাছে চেয়ে বসলেন। সুরুচিকে যতই দেখছিলেন ততই তিনি স্থির করে ফেলছিলেন যে তাঁর এই বেপরোয়া জীবনের লাগামটি যদি কড়া-হাতে কেউ ধরতে পারে তো সে এই মেয়েটিই পারবে।

বলা বাহুল্য যে, সুরুচি সম্বন্ধে মনস্থির করতে কমলকৃষ্ণের কিছু মাত্র দেরী হলো না—যেন সব ঠিক করাই ছিল, শুধু একটা কথার অপেক্ষা—শুভ লগ্নে বিবাহিতা হয়ে সুরুচি স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থল সুদূর দাক্ষিণাত্যে চলে গেল।

জীবনের পূর্ণতায় যেটুকু বাকী ছিল স্বামী তা এনে দিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন জীবনযাত্রা, চলা-ফেরার সহজ সরল দৃঢ়তা সুরুচির মনকে আরো সতেজ করে তুললো—এর ওপর স্বামীর স্নেহ মিশে একটি মধুর লালিত্য তাকে ঘিরে রইলো।

মাসের প্রথমে জীবন তাকে তার অধ্যাপনার মূল্য এনে দিয়ে বললে, "এই আমার যথা এবং সর্ব্বস্ব।"

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সুরুচি সেই টাকাগুলি একটি একটি করে গুণে বললে, "এ তো অনেক টাকা—এত কি হবে ?"

হাসতে হাসতে জীবন বললে, "তোমার, খাওয়া-পরা এবং খেয়াল-খুশীর খরচের মূল্য—"

ভ্রূকুটি করে সুরুচি বললে, "আমার খেতে এত টাকা লাগবে না আর তোমার টাকায় আমার খেয়াল মিটবে কেন ? আমি নিজে রোজগার করতে পারি। দক্ষিণী মেয়েরা—"

বাধা দিয়ে জীবন বললে, "থাক্—আমি স্বীকার করছি যে তোমার দক্ষিণী মেয়েরা ও তুমি সবই পারো।"

দিন এমনি হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়—একটানা দু'বৎসর দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে সুরুচি আবার কিছু দিনের জন্য তার পুরানো আবেষ্টনীতে ফিরে এলো সন্তান-জন্ম-সম্ভাবনা নিয়ে।

যথাসময়ে এলো সন্তান,—পুত্র। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে জীবন চলে এলো কলকাতায় সুরুচির কাছে। কয়েক দিন কাটিয়ে তার ফিরে যাওয়ার সময় হলো। যাওয়ার আগে সে সুরুচিকে বললে, "এবার আমি একা যাচ্ছি, মাস দুই পরে আবার আসবো তখন আর একা ফিরব না—ভাল করে সেরে উঠো। আর হ্যাঁ—এইটার জন্য কি-সব দরকার হতে পারে—আমি জানি না ঠিক—তার জন্যে এটা রেখে দেও। বলে একটা নোটের বাণ্ডিল সুরুচির বিছানার ওপর ফেলে দিলে। যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে সে বললে, "হ্যাঁ, ওর নামও একটা আমি ঠিক করেছি—'দীপক নারায়ণ' বা 'প্রদীপ'—যেটা তোমার পছন্দ হয়।"

মৃদু হেসে সুরুচি বললে, "প্রদীপও নয়—নারায়ণও নয়—শুধু 'দীপক' ওর নাম থাক্।

"মেয়ে হলে কিন্তু "রাগিণী" নাম রাখতাম বলে জীবন আর একবার সুরুচিকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার তাগিদ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তিন

দীপককে নিয়ে যথাসময়ে সুরুচি ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখলো, প্রফেসর জীবন চৌধুরীর পারিবারিক মোহ ও মাধুর্য্য অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। আর এই দু'টির জায়গায় 'নামের মোহ' ও ধনী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান নিয়েছে। দিন-রাত জ্ঞান নাই, আহার-নিদ্রার স্থিরতা নাই, স্ত্রী-পুত্র মনে স্থান পায় না—প্রফেসর তার 'ফরমূলা' আবিষ্কারেই মত্ত।

চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানলো যে ল্যাবোরেটরী ঘর থেকে সাহেব দু'-এক বার দু'-তিন দিন পরেও বেরিয়েছেন—তাদের ওপর হুকুম দেওয়া আছে যে তাঁর খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ওরা যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। একটার পর একটা খাবার ওরা দিয়ে আসে—পরের খাবারটা দেওয়ার সময় প্রায়ই দেখে আগেরটা খাওয়া হয়নি। দু'-এক বার বলেও কোন ফল হয়নি—সাহেব এমন রাগ করেন। এইবার তো 'মায়িজী' এসেছেন—যদি বলে বলে সাহেবকে খাওয়াতে পারেন। মনিব 'উপবাসী' থাকলে খাওয়ায় কারই বা সুখ লাগে ?

অনেক দিনের পুরানো চাকর—তার কাছে সুরুচি বসে বসে জিজ্ঞাসা করে অনেক কথা শুনলো। ইতিমধ্যেই সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে পড়লো।

ঘরে ঢুকে সুরুচিও বাক্যহারা ও নিমেষহারা হয়ে চেয়ে রইলো। বৈজ্ঞানিকের সাধনা-ক্ষেত্রে এর আগে এমন করে ঢুকবার সুবিধা তার হয়নি। কত রকমের, কত আকারের কত রংয়ের জিনিস-পত্র যে প্রকাণ্ড লম্বা টেবিলটিতে জায়গা নিয়েছে তার সংখ্যা নাই। টেবিলটির ওপরে হাতে মাথা রেখে চৌধুরী চোখে-মুখে চিন্তার একটা অত্যুগ্র আলো জ্বালিয়ে বসেছিল।
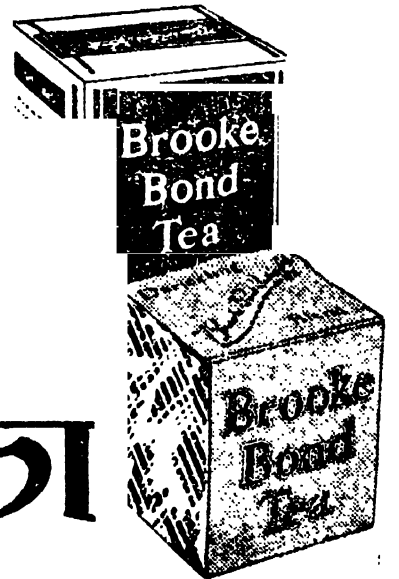
ধীর-পায়ে কাছে গিয়ে সুরুচি বল্‌লে, "আমি এসেছি।" তার মৃদুস্বর চৌধুরীর কানে গেল না। সুরুচি এবারে তার রুক্ষ অগোছালো চুলগুলি গুছিয়ে দিতে দিতে আবার বললে, "আমি এসেছি।"

সুরুচির আঙুলের ছোঁওয়ায় প্রফেসার যেন চেতনা পেয়ে জেগে উঠলো ; বললে, "এসো এসো রুচি—আমি হয়তো ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম—কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না।"

চার দিকে ছড়ানো টেষ্ট-টিউব, যন্ত্রপাতি, তারই এক ধারে সকালের খাবার অভুক্ত পড়ে রয়েছে—ঘরের এক দিকে পুরোনো এক-খানা কৌচের ওপর একটা ময়লা ওয়াড় দেওয়া বালিশ ও ততোধিক ময়লা বেড-কভার পড়ে আছে। উপরের শোওয়ার ঘরে চমৎকার পুরু গদীর ওপর নরম বিছানা পাতা পড়েই থাকে—সে ঘরে যাওয়ার বা শোওয়ার সময় সব দিন হয় না। সুরুচির হাত চৌধুরীর মাথায় সমভাবেই চললেও মন তার অনেক কিছু দেখছিল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে জীবেন বললে—"এইবার থামো রুচি, আর বেশীক্ষণ হলেই আমি আরামে ডুবে যাব—আমার সাধনা, আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যাও—আমাকে আমার কাজে ডুবে যেতে দেও।"

সুরুচি বললে, "কিন্তু এমন করে সাধনা করলে যে শরীর নষ্ট হবে, তখন তো আর কোন কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার চোখের সামনে এমন করে নষ্ট হতে দেব না। চলো, এখন একটু বিশ্রাম করে নেবে। আমি শুনলাম যে তোমার খাওয়া-শোওয়া কোন কিছুরই স্থিরতা নেই। আমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু দীপুর ভবিষ্যৎ কি তুমি এমনি করে নষ্ট করে দিতে চাও ?"

অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে প্রফেসর কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, পরে বললে, "না, তা চাই না—দেখো ওকে আমি কত বড় বৈজ্ঞানিক করে আনব, কত কি যে অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে তার কতটুকুই বা আমি জানি! এক জীবনে এই সাধনা শেষ হবে না—জন্ম-জন্ম ধরে সাধনা করলে যদি কিছু হয়। মহাসাগরের তীরে বসে শুধু পাথর কুড়িয়ে যাচ্ছি, সাগরের ভিতরে যে কি আছে জানি না।"

দরজার কাছে শিশু-কণ্ঠের কলধ্বনি শোনা গেল, সুরুচি দীপককে নিয়ে ফিরে এলো—জীবেন তার দিকে চেয়ে বললে, "আমার বড় ইচ্ছা, আমি যদি না পারি, তুমি একে বৈজ্ঞানিক করে তুলো।"

মাস-দুই পরে রাত্রে ঘুম ভেঙে সুরুচি দেখলে বিছানায় স্বামী নাই—মাথার মধ্যে তার দ্রুত একটা প্রবাহের সঞ্চার হলো। চৌধুরী এসে নিজের খাটে শুয়ে পড়লে সে তো নিজেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—তবে!

দ্রুত-পায়ে সে নীচে নেমে গেল—ল্যাবোরেটারী থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—অতি উজ্জ্বল আলো। ঘরের দরজা ঠেলে দেখলে ভিতর থেকে বন্ধ। কি করবে ঠিক করতে না পেরে চাকরকে ডেকে ঘরে ঢুকবার অন্য দরজা যেটি শুধু বাহিরে থেকেই বন্ধ করা যায়—সেইটি খুলে দিতে বললে।

ঘরে ঢুকে সুরুচি দেখলে, সামনের টেবিলে দু'টি হাত ছড়িয়ে দিয়ে চৌধুরী কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুমিয়ে আছে। বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মনে পড়লো—কি ঘুম এ! 'মহা-ঘুম' নয় তো!

দ্রুত-পদে এগিয়ে এসে সে বুকে হাত দিয়ে দেখে স্বস্তির একটি নিশ্বাস ফেলে চাকরকে বললে—"সাহেবকে এই কৌচে শুইয়ে দিয়ে তুমি ডাক্তারকে খবর দাও।" তার মনে তখন কি যে হচ্ছিল তা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না।

চাকর বাহিরে চলে যাওয়ার পরে ঘরে একা অসুস্থ স্বামী নিয়ে বসে থাকতে থাকতে টেবিল-ভরা শিশি, ঔষধ, আরক ও টিউব এবং নানা রকমের যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে তার চোখের কোণে জল জমলো।

ডাক্তার এলেন এবং যথারীতি পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিলেন তা শুনে সুরুচির পাথরের মত শক্ত মনখানাও নিমেষে ভেঙে পড়বার মত হলো।—সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত—ভাল তো হয়ই না।—শুশ্রূষা এবং ভাল খাওয়া-দাওয়ার গুণে যে ক'দিন বেঁচে থাকে, জড়ের মতোই হয়ে থাকে। সুরুচির চোখের জলের বিরাম থাকলো না।

চার

আর একটি বার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে সুরু হলো। সুখের নীড়টি ভেঙে দিয়ে, তার সকল চিহ্ন লুপ্ত করে দিয়ে সুরুচি ছোট্ট দীপক এবং অসুস্থ, অর্দ্ধ-চেতন স্বামী নিয়ে একাই ফিরে চললো কলকাতায়। এ পর্য্যন্ত নিজের এত বড় বিপদের কথা সে আপনার জন কা'কেও জানায়নি—হয়তো তাদের কাছে পেলে তার অনেক দিকে সুবিধা হতো, কিন্তু তাদের সহানুভূতির ছোঁওয়া পেয়ে সে নিজে হয়তো ভেঙে পড়তো। সঙ্গে একটি মাত্র ডাক্তার আর সঙ্গে সে একাই—

কলকাতায় পৌঁছে তার প্রথম কাজ হলো হাসপাতাল খুঁজে সেখানে চৌধুরীকে আজীবন রাখবার ব্যবস্থা করা। ডাক্তারের সহায়তায় সে-কাজ সহজেই হয়ে গেল। এতক্ষণ সুরুচি বেশ শক্তই ছিল, কিন্তু সারা জীবনের মত স্বামীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে ফিরে আসা তার পক্ষে সহজ হলো না। বিছানার উপরে পড়ে আছে চৌধুরী, জীবিত কি মৃত বুঝবার যো নাই—চলে আসার সময় কোন কথাও তাকে বলা যাবে না—প্রাণ আছে, অথচ প্রাণবানের মত কিছুই নয়—এ কি দুর্দ্দৈব! সুরুচির চোখে আবার জল এসে পড়লো। মনে এলো—বিজ্ঞানের কি একাগ্র সাধনাই যে এই লোকটির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো!

সুরুচির সঙ্গের ডাক্তারটি মাদ্রাজী—অতি ভদ্র এবং সজ্জন বললেন, "চলুন মিসেস্ চৌধুরী, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি" শূন্যতায় ভরা চোখ দু'টি তুলে সুরুচি বললে, "আপনি আমার জন্য অনেক করলেন আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না—এ পথটুকু আমি একাই যেতে পারব।"

বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন, "তা হয় না মিসেস চৌধুরী, আমি ডাক্তার হলেও মানুষ—এ পর্য্যন্ত আপনার মনের যা পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি—কেবলই ভাবছি যে নিজের এই বিপদে আপনি একা—কি করে এমন অটল হয়ে রয়েছেন!"

সুরুচির মন আর পারছিল না—সে যেন মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়ছিল। আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ীর ঠিকানাটি বলে দিয়ে সে আগেই গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। ছোট্ট দীপক তার আধো আধো বুলিতে কত অনর্গল কথাই যে বলে গেল সে-সব কিছুই তার কানে পৌঁছালো না।

অসময়ে বাড়ীর মধ্যে গাড়ী ঢুকতে দেখে কমলকৃষ্ণ নিজেই এগিয়ে এলেন। তিনি তখন সামনের ঘাসে-ছাওয়া জমিটুকুতে পায়চারি

করছিলেম। দরজা খুলে ডাক্তার আগেই নামলেন—পিছনে সুরুচি নেমে এলো।

হঠাৎ সুরুচিকে দেখে কমলকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে গেলেন—স্তম্ভিত হলেন তার রুক্ষ বেশ-বাস দেখে। চশমার মধ্যে দিয়ে স্তিমিত চোখ দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে দেখলেন, নাঃ, সাঁথির আগায় সিঁদুরের লালিমা তো দেখা যায়। তবে?

সুরুচি ততক্ষণে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে—তার কেবলই ভয় হচ্ছিল যে স্নেহময় পিতার সম্ভাষণে সে বুঝি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

ভিতর-বাড়ীতে তখন সন্ধ্যার সমাগমে কাজ-কর্ম্মের সমারোহ পড়ে গিয়েছে। বৌএরা এবং মা অসীমা রান্না, ভাঁড়ার ও খাবার-ঘরের তদারকে ব্যস্ত—ছেলেমেয়েদের কোলাহল মাঝে-মাঝে সব ছাপিয়ে উঠছে, এর মধ্যে সুরুচি গিয়ে দাঁড়াতেই অসীমা নিজের চোখকে হঠাৎ বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না।

"এ কি খুকী?—খবর-বাদ কিছু নেই—হঠাৎ অসময়ে কি করে এলি? দীপু কই?"

সুরুচির এতক্ষণের যত্নের বাঁধ আর বাধা মান্‌লো না। মায়ের গলা জড়িয়ে ছোট মেয়ের মত কাঁধে মাথা রেখে বললে, "মা, ওর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত হয়েছিল—হাসপাতালে এইমাত্র রেখে তোমার কাছেই ফিরে এলাম।" "চোখ দিয়ে তার এইবার টপ-টপ করে জল পড়ছিল।

চারি দিকে সকলে ভীড় করে দাঁড়িয়ে—অসীমা মেয়ের কথায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন—অবুঝ শিশুর দলও কি একটা বিপদপাতের আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ছোট্ট দীপককে কোলে নিয়ে কমলকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন—স্ত্রীর কোলে তাকে দিয়ে সুরুচিকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি শুধু বলে যেতে লাগলেন, "মা খুকি, তুই এত শক্ত হলি কি করে? আমাকে তো তুই কিছু জানালি না!"

একে, দুয়ে সকলেই জানলো এবং বুঝলো যে, সুরুচির সুখের দিন চিরদিনের মতই অস্ত গিয়েছে—এখন শুধু ক্ষীণ অস্তলেখার মত ম্লান আলোটুকু মাত্র ভরসা।

কমলকৃষ্ণ এই দুর্ঘটনাকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি—ঈশ্বরে বিশ্বাসী মন তাঁর বিদ্রোহ না করে একেবারে ভেঙে পড়্‌লো আর অসীমা একটি দিন জামাইকে দেখে এসে সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। স্বামি-স্ত্রী তাঁরা অল্পদিনের ব্যবধানে লোকান্তরিত হলেন।

ধীরে কালস্রোত গড়িয়ে চললো। সুরুচি অসীম ধৈর্য্য নিয়ে দীপককে মানুষ করার আশায় ভায়েদের কাছে রয়ে গেল আর বৈজ্ঞানিক জীবেন চৌধুরী, অতি সাধারণ মানুষের চেয়েও জড়তা-ভরা মন ও দেহ নিয়ে হাসপাতালে রইলেন।

পাঁচ

সকালের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে—দীপককে ভোরের সুখ-নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে সুরুচি নিত্যকার মতো গৃহকর্ম্মে নেমে গিয়েছে। নীচে থেকে সজীব গৃহস্থালীর অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছিল—তিন-তলায় একটি ছোট ঘরে দীপক তার শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

সব দিন ক'টি ভাল ভাবে কেটে গিয়েছে, আজকের দিনটি পরীক্ষা দিয়ে এলে তবে ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবে দীপক; সামনে বই রেখে এই সবই ভাবছিল—এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরেই তার ভবিষ্যৎ জীবন অনেকটা নির্ভর করছে। বাবাকে মনে পড়ে না—মাকে দেখে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের মূর্ত্তি—মুখে মৃদু হাসিটি লেগেই আছে, এই তো গেল দিবসের পরিচিতা মা—রাত্রে এই মাকেই সে দেখে অন্য মূর্ত্তিতে। সে জানে যে সেই রূপই তার মায়ের আসল রূপ। কত আশায় বুক বেঁধে মা যে তার পরীক্ষার ফলটির জন্য চেয়ে আছেন তা সে জানে। মায়ের এই ইচ্ছা সে অপূর্ণ রাখবে না। দীপক বই টেনে নিয়ে বস্‌লো—দেখলো কিছুই পড়া হয়নি—বেশীর ভাগ যা পড়েছিল তা যেন সবই ভুলে যাচ্ছে মনে হলো। পর-পর মাস দুইএর অনিয়ম ও অনিদ্রায় মাথা যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। বই রেখে দিয়ে দীপক ঘরময় পায়চারী করতে লাগ্‌লো।

বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ছেলের কোন খবর না পেয়ে সুরুচি উপরে উঠে এলো; দেখলো বই খোলা পড়ে—খোলা ছাদে দীপক ঘুরে বেড়াচ্ছে—উন্মনা হয়ে। দৃষ্টি বিভ্রান্ত, পদক্ষেপ অসম। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে সে ডাক্‌লো, "খোকা!"

দীপকের কাছ থেকে কোনো সাড়া এলো না। রৌদ্রভরা ছাদে অসম পদক্ষেপে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই। সুরুচি এবার যেন ভয়ে ভয়ে, অন্যে না শোনে, এমন স্বরে ডাক্‌লো, "খোকা—দীপু!"

দীপক দ্রুত-পায়ে মায়ের কাছ পর্য্যন্ত এলো—আরক্ত চোখ দু'টি তুলে জিজ্ঞাসা করলো, "টেলিমেকাস্ কে? পিনোলোপী কে?"

ছেলের মুখের এই দু'টি কথাতেই সুরুচি চম্‌কে উঠলো—এ কি?—বিজ্ঞানের ছাত্র—টেলিমেকাস বা পিনোলোপীর আখ্যান নিয়ে কি করবে? তবে কি এ-সব জ্ঞানলোপ হওয়ার লক্ষণ? উচ্চ আশা মনে নিয়ে বেশী পড়ে শেষে এই কি তার পরিণতি? সুরুচির নিজের মাথাও যেন শূন্য মনে হতে লাগ্‌লো।

বেলা বেড়ে চললো, কিন্তু অন্য দিনের মত দীপক আজ এখনো প্রণাম করতে এলো না দেখে সুরুচির বড় দাদা ধীরে ধীরে তার সন্ধানে পড়ার ঘরে এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর বাক্য-লোপ হয়ে গেল। দেখলেন যে ছাদভরা রৌদ্রের মাঝে দীপক অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার দিকে অপলক চোখে সুরুচি চেয়ে আছে। শিষ্ট, শান্ত, সুবোধ ছেলের একটি রাত্রের মধ্যে কি হলো, তা তিনি বুঝতে পারলেন না—শুধু বুঝলেন, ধীরে ধীরে উন্মাদের সকল লক্ষণই ফুটে উঠছে। আদরিণী বোনটির কথা ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ দীপক সকলকে চমকিত করে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠলো "—আমি ঢের সয়েছি, আর তো সবো না।" এর আগে বাড়ীতে কেউ তার উঁচু স্বরই শোনেনি।

সজনী বাবু—সুরুচির দাদার কেবলই মনে হতে লাগলো, ভগবানের এ কি বিচার? যার জীবনের মুকুল প্রস্ফুটিত হতে না হতে শুকিয়ে এসেছিল, ফুলের মেলা যার জীবনে হলো না, তার জীবন নিয়ে এ কি নিষ্ঠুর প্রহসন? কাছে এসে বোনের হাতটি ধরে তিনি ঘরে নিয়ে যেতে সুরুচি বাঁধ-ভাঙা নদীর মতো আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে

বললে, "দাদা, দীপু কি আমার পাগল হয়ে গেল ? আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না দাদা ! ওঃ ভগবান ! শেষ আশার রশ্মিটুকুও এমনি করে নিবিয়ে দিলে ?"

নীচে অবিরত টেলিফোন বেজে চলছিল—খবর শোনা গেল, "হাসপাতালে এইমাত্র জীবনে চৌধুরী মারা গেলেন—তাঁর দেহের সৎকার সম্বন্ধে তাঁরা উপদেশ চান।"

সজনী বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—সুরুচির ভাগ্য দেখে। উপরের ঘরে দীপকের মুখে তখন অনর্গল যে গান এবং বক্তৃতা চলেছে সে-সব কথার কোন যুক্তি বা অর্থ হয় না।

সুরুচিকে কিছু না বলেই তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন। দিনের প্রখর আলোর মধ্যে সুরুচির চোখে বিশ্বের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

চিন্তা

প্রীতি নস্কর

পিছনের দিনগুলি অন্ধকারে কুয়াসার মতো
মনের গভীরে ফেরে নিরুদ্বেগে দৃষ্টি অগোচরে,
ধীরে ধীরে মুছে যায় বাসনার কালো কালি যতো,
পুঞ্জ পুঞ্জ ক্লান্তি জমে রজনীর দুষ্ট স্বপ্ন ভ'রে।

জীবনের যতো চাওয়া কি জানি কি অর্থ ছিল তার,
কি এসেছে কি আসেনি সে হিসাব হয়নি তো ঠিক,
আজিও সে রচিতেছে নিজ হাতে নিজ কারাগার
পথে পথে জমে রাত্রি, উর্দ্ধশ্বাসে ফেরে দিগ্বিদিক্।

চপল চোখের দিঠি যৌবনের উচ্ছসিত হিয়া
অ-ধরার যাদুমন্ত্রে অকারণে জাগে ও ঘুমায়,
নিভৃতের পুষ্পগুলি ঘ্রাণ-বাষ্পে পড়ে মুরছিয়া
দিগন্তের নীল প্রান্তে অতন্দ্রিত পলক হারায়।

চাহিতেছে অর্থশূন্য বিড়ম্বিত ক্ষুব্ধ ক্ষণগুলি
রেখাপাত করিবারে অসীমের পটভূমিকায়।
বিফল সঞ্চয় যত স্মৃতির পসরা পরে তুলি,
স্তূপ বাঁধে মন্থরতা সায়াহ্নের অস্পষ্ট ছায়ায়।

অন্দরে বাঁধি বন্দনা তিন লোকে

বাণী মজুমদার

হিন্দু সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থান সমপর্য্যায়ী। যতই ওরা চেঁচাক না কেন যে, নারী শক্তির অবতার, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝখানে তারা অস্থিপঞ্জরসর্বস্ব হয়েই থাকে,—দশপ্রহরণ-ধারিণীদের হাতে মাত্র সমার্জনী ও বেড়ী-খুন্তীই থেকে যায়। যতই ওরা জোর-গলায় হেঁকে বেড়ায় নারী সহধর্মিণী—পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও তারা স্ত্রীকে চায় গঙ্গাজলে ধোওয়া নির্মল চরিত্রবতী হতে।

৺অজয় ভট্টাচার্য্যের 'তুমি' কবিতায় এ দু'টি লাইন তখন মনে পড়ে :—"দেবীর ভক্তি কাঁদে মানবীর অর্জ্জব অপমানে,
অন্দরে বাঁধি বন্দনা তিন লোকে!"

তাই আজ নারী বাস্তব জীবনে অপদস্থ থেকে পুরুষের মুখে দেবীত্বের আখ্যা পেতে চায় না।

সমাজবাদ ভারতীয় হিন্দু সমাজে অচল তার হিন্দু-সংস্কৃতির সনাতনত্ব ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। এ নৈতিকতা আধুনিক পরিস্থিতির মাঝখানে হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে কত দূর প্রযোজ্য তাই আলোচনা করতে চাই।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের মাতৃসত্তা যুগ হয়তো এখনকার নারীর মনে বিস্ময়কর অবিশ্বাসই জোগায়, কিন্তু এক দিন ছিল যে-দিন নারী বেতস লতার মত পেলবদেহী ছিল না—পাথুরে প্রহরণে তার পেশীবহুল হাত মেরেছে বহু বন্য পশু—তার আশ্রিত পরিবারকে পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই সবাইকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আজও—যুগ-যুগ ধরে যে পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে নারী-জাতি ক্রমে অবনতির সোপান বেয়ে নেমে এসেছে—আধুনিক সভ্যতার কীট তারই শক্তিতে—ভিতে ঘুণ ধরিয়েছে সব চেয়ে বেশী : আজও এই ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতির স্থান বেশ উঁচুতে পাই। দাক্ষিণাত্যে মাতৃপ্রধান সমাজ আজও জীবিত—আর্থিক ও সামাজিক স্থান পুরুষ থেকে নারীর অনেক উঁচুতে। সম্পত্তির উপর মেয়েদেরই বেশী অধিকার। পৈত্রিক সম্পত্তি মেয়েরা পায়। তিব্বতেও এই মাতৃপ্রধান সমাজ হওয়ার দরুণ সেখানকার স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস থেকে অনেক প্রকারে বেঁচে যায়। এই সব সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। প্রাচীন স্মৃতি ও বাৎসায়নের সূত্রে দাক্ষিণাত্যের এই মাতৃপ্রধান সমাজের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোথায়ও এর উল্লেখ নাই যে, মাতৃপ্রধান সমাজের দরুণ সেখানে কামপ্রধান বিশৃঙ্খলতা বেশী। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, স্ত্রীর আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতার দরুণ ভারতীয় সমাজে কোথায়ও নৈতিক বিশৃঙ্খলতা ও অবনতি আসেনি।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্ত্রীজাতির বিষয় যা-কিছু বর্ণিত আছে তাতেও প্রমাণিত হয় না যে তারা সমাজিক স্বাধীনতা পেয়ে উৎসন্ন গিয়েছে। জাতকে ভিক্ষুণীদের বিষয়ে যা-কিছু আলোচনা হয়েছে, তা তখনকার পরাধীনতা ও অনুন্নত অবস্থার জন্যই নারীর সেই অধঃপতন ঘটেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত আর্থিক পরাধীনতা ও সামাজিক হতে বাঁচবার জন্যই অনেক নারী ভিক্ষুণী হয়ে যেত। তার থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, নারীর নৈতিক অবনতির কারণ তার আর্থিক ও সামাজিক পরাধীনতাই।

এর পরেই এলো ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি আর হিন্দু স্ত্রীজাতির উপর চরম কুঠারাঘাতের যুগ। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির আচার-বিচার সম্বন্ধীয় প্রধান বই 'মনুস্মৃতি'—যার শতকরা পনেরোটি শ্লোকই স্ত্রীজাতির বিষয়ে। পুষ্যমিত্রের সময়কেই ব্রাহ্মণবাদের পুনরুত্থান যুগ বলে ধরা হয় এবং এই সময়েই মনু-স্মৃতি শেষ বার সঙ্কলন করা হয়। এ হলো ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রান্তির যুগ। ডাঃ জায়সোয়াল তাঁর 'মনু এণ্ড যাজ্ঞবল্ক্যে' লিখেছেন যে, বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত সমাজ উন্নয়নের প্রত্যেক নিয়মই কঠোর ভাবে পালটে দেওয়া হয় এই সময়ে। এঁদেরই আগ্রহে স্ত্রী ও শূদ্র সমপর্য্যায়ী হয়ে সমাজের সব চেয়ে নিপীড়িত ও দলিত সম্প্রদায় হয়ে রইলো।

বুদ্ধের দশশীল ও মনু-নির্দ্ধারিত ধর্মের দশবিধ লক্ষণে বিশেষ

EVEREADY
TRADE-MARK
Fresh Power
BRIGHTER LIGHT
LONGER LIFE

নতুন EVEREADY ব্যাটারী

TRADE-MARK

কোনো পার্থক্য না থাকলেও মৌলিক পার্থক্য তার মধ্যে বিদ্যমান। এ মৌলিক পার্থক্য হল যেখানে বুদ্ধের দশশীলে জাতি বা বর্গের কোনো উল্লেখ নাই, মনুতে তার প্রাধান্য আছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে নৈতিকতার বুনিয়াদ অখিল মানবীয় নৈতিকতার উপর স্থিত আর মনুতে জাতি-বিভাজনে সীমিত ও সঙ্কুচিত এই জন্যই ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রে পুরুষ দশ জন স্ত্রীকে পরিগ্রহ করতে পারে লেখা হয়েছে দেখে মোটেই আশ্চর্য্য হই না। স্ত্রীজাতিকে কতখানি সহায়হীন করে তোলা হয়েছে সে সময় থেকে।

বিষ্ণু-পুরাণ ও বিষ্ণু-ভাগবতে বর্ণিত স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এইরূপ: "সে পুরুষ হলেন বিষ্ণু ও সে স্ত্রী হলেন লক্ষ্মী। নারী ভাষা, পুরুষ ভাব। পুরুষ নিয়ম, স্ত্রী তাহার পরিবেদনা। পুরুষ যুক্তি, নারী বুদ্ধি। পুরুষ অধিকার ও নারী কর্ত্তব্য। পুরুষ ধৈর্য্য ও নারী শান্তি। পুরুষ রচয়িতা ও নারী তার রচনা। পুরুষ দৃঢ়সঙ্কল্প, নারী মাত্র অভিলাষা। পুরুষ করুণা ও নারী পুরস্কার, পুরুষ স্তোত্র ও নারী তাহার স্বর। নারী ইন্ধন, পুরুষ তাহার অগ্নি। পুরুষ সূর্য্য, নারী তাহার আলো। পুরুষ প্রসার ও নারী তাহার মণ্ডল। পুরুষ বায়ু, নারী গতি। পুরুষ সমুদ্র, নারী উপকূল। পুরুষ মালিক, নারী সম্পত্তি। পুরুষ যুদ্ধ, নারী তাহার শক্তি। পুরুষ বৃক্ষ ও নারী দ্রাক্ষ-লতিকা। পুরুষ প্রদীপ, নারী জ্যোতি। পুরুষ দিন, নারী রাত্রি। পুরুষ সঙ্গীত, নারী কথা। পুরুষ বিচার, নারী সত্য। পুরুষ প্রণালী, নারী তাহাতে স্রোতস্বিনী। পুরুষ পতাকা-দণ্ড, নারী পতাকা। পুরুষ বল, নারী সৌন্দর্য্য। পুরুষ দেহ ও নারী আত্মা।"

পুরুষ না হলে এতে নারীর কোন অস্তিত্বই নাই, অথচ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষের সার্থকতার পথও শূন্য। নিম্নাঙ্কিত উক্তিগুলি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারী পুরুষের সম্পত্তি, তাহার অগ্নিতে সে ইন্ধনের কাজ করে—নারীর কোনো অধিকার নাই আছে মাত্র কর্ত্তব্য, পুরুষের কাঁধে ভর দিয়েই সে একমাত্র দ্রাক্ষা-লতিকার মত উঠতে পারে, তার স্বতন্ত্র শক্তি কিছু মাত্র নাই। এ রকম করে নারীর হাত থেকে সমস্ত শক্তি, সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের দিয়ে ষোলো আনা কাজ বাগাবার কৌশলটি আয়ত্ত ছিল নীতিকারদের, তা বোঝা যায় মনুর বহু উক্তিতে। সেখানে নারী ও মাতৃজাতিকে গৌরবের পদে উন্নীতা করে তাকে দিয়ে ঈপ্সিত কাজ আদায় করে নিচ্ছে:

"উপাধ্যায়ানদশাচার্য্যঃ শতাচার্য্যাংস্তথা পিতা।
সহস্রং তু পিতৃর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥"

অর্থাৎ "দশ জন উপাধ্যায়ের সমান হল এক জন আচার্য্য, শত আচার্য্যের সমান পিতা; কিন্তু মাতা সহস্র পিতা হতেও অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী ও শিক্ষাদানের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য।" শিশু-পালনের কষ্টকর কাজ থেকে পিতাকে অব্যাহতি দিয়ে মা'র উপর এই গুরু ভার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। এই সব স্তোক বাক্যে ভুলে নারী যুগ হতে যুগে নিজের অধিকার হারিয়ে এসেছে ও কাজের ঘানিতে নিজেকে বেঁধে চোখ-বাঁধা বলদের মত কাজ করে চলেছে।

আজ ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে শিক্ষিতা নারীর অনুপাত মন্দ নয়, তবে ভারতের ক'জনই বা শিক্ষার আলোক দেখতে পেয়েছে? শিক্ষা তাদের এত দূর বলশালিনী করে তুলতে পারেনি, যাতে তারা মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে পারে। পদে পদে তারা অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মের গোঁড়ামীর সামনে মাথা নত করে দেয়। আজ সমাজবাদ যদি স্ত্রীকে তার যোগ্য আসনে পুরুষের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে পারে তাহলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নারী নিজের পরাধীনতা, সহায়হীন অবস্থা ও সামাজিক কুব্যবস্থার জন্য নৈতিকতার মাপকাঠিতে যতখানি নীচে নেমে গেছে তার একমাত্র উন্নয়নের পথ স্বাধীনতার খোলা আবহাওয়া এবং আর্থিক ও সামাজিক সাম্যের বিশালতায়।

আমার কবিতা

রেবারাণী ঘোষ

লিখিতে বসেছি কবিতা আমার
শেষ হবে কি তা জানি না।
লেখার ভিতরে যে প্রতিভা থাকে,
মোর লেখাতে তা থাকে না।

কতই না জানি ভাবিব বসিয়া
কবিরে স্মরণ করি।
বিশ্বাস-ভরে নিশ্বাস বহি
তাঁরই চরণ স্মরি।

কবির দেখিয়া, কবিতা লিখিতে
সাধ জেগে ওঠে মনে।
বিরাটের সনে ক্ষুদ্র মিলনে
গর্ব্ব জাগিছে প্রাণে।

ঠাকুর অমর, রবির মুকুটে
কবি-কোহিনুর জ্বলে।
তারি জ্যোতি আজও
ছড়ায়েছে আলো
দীপ্ত ভূমণ্ডলে।

বরিশালের 'নকীব' বলিতেছেন: "পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের সম্মুখে আজ প্রধানতম সমস্যা হইতেছে খাদ্য-সমস্যা। গত কয়েক সপ্তাহ হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে চালের অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির ও তজ্জন্য অনাহার উপবাসের সংবাদ আমরা পাইতেছিলাম। বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশালেও চালের দর পঞ্চাশে চড়িয়াছিল। আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে সন্ত্রস্ত জনসাধারণ ও রাজপথে দুই-একটি করিয়া অনাহারী দুর্গতদের দেখা পাইয়া আমরা পঞ্চাশ সনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবে আশার কথা, চালের দর ক্রমেই নামিতেছে। খোদার মর্জ্জি বর্ত্তমানে বাজারে ৪৫৲।৪৬৲ টাকায় সুপার-ফাইন চালই পাওয়া যাইতেছে।" ফাইন! ৪৫৲।৪৬৲ টাকা মণ-দরে চাউল ক্রয় করা তাহা হইলে পাকিস্তানীদের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার! আমরাই কেবল গরীব।

* * *

তাহার পর নকীবের মন্তব্য: খাদ্য-সংগ্রহ ব্যাপারে শুধু সরকার নন, আমরা বে-সরকারী জনসাধারণের সদিচ্ছা ও পাকিস্তান-প্রীতির কাছে ও আল্লার ওয়াস্তে আবেদন জানাইতেছি—আপনারা যদি পাকিস্তানকে এক বিন্দু মহাব্বত করেন, সত্যি সত্যি পাকিস্তানের কামিয়ার লাভে আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে—তবে আশু খাদ্য-সংকটে পাকিস্তানের ইজ্জত রক্ষার্থে আপনারা সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ বরণে প্রস্তুত হোন। সমস্ত প্রকার লোভ, মোহ, দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিয়া কায়েদে আজমের স্মৃতি ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎকে স্মরণ করিয়া আপনাদের বাড়তি শস্য সরকারের হাতে অর্পণ করুন। এই ব্যাপারে ভয়ের কিছু নাই, আপনার বৎসরের খোরাকী শেষে যে শস্য বাড়তি থাকিবে আপনাদের দুর্গত মা, বোন, ভাইদের মুখে অন্ন যোগাইতেই উহা ব্যবহৃত হইবে। কোন প্রকার অসাধু উদ্দেশ্যে এক কণা চালও যদি আপনারা ষ্টক করিয়া রাখেন উহাই হইবে পাকিস্তানের প্রতি আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা চরম বিশ্বাসঘাতকতা।" এ বিষয়ে আমরাও একমত। তবে কাজে কিছু হইবে কি?

* * *

'আমার দেশ' বলিতেছেন: দিনের পর দিন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠছে। বাজারে যাও মাছ প্রতি—সের ৩৲, আলু প্রতি সের ৵৵০, বেগুন প্রতি সের ।০, গাওয়া ঘৃত প্রতি সের ১১৲, মাখন প্রতি সের ৫।০, দুগ্ধ প্রতি সের ১৲, সরিষা তৈল প্রতি সের ২৵০, দ্রব্যমূল্য অগ্নিবৎ হওয়ার ফলে এক শ্রেণীর লোক ভিন্ন অন্যান্যদের ক্রয়-ক্ষমতা কমে গেছে। খাঁটি জিনিষের ক্রেতা খুবই কম। বাজারে দিনের পর দিন মেকীর কদর বেড়ে গেছে। হোয়াইট অয়েল, বাদাম তৈল, উদ্ভিজ্জ তৈলে বাজার ছেয়ে গেছে। বাজারে এক প্রকার ঘি পাওয়া যায়, যার প্রতি সের ২৸০, ৩৲। খাবারের দোকানে যে সব লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী, পানতোয়া সাজান থাকে ঐগুলি এই ঘি থেকে তৈরী। এই সব খাদ্য-অখাদ্য ভক্ষণের ফলে জাতির জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে। জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড আছে। মিউনিসিপ্যালিটি আছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরাও রয়েছে কিন্তু ভেজাল তাড়ানর জন্য কখনও হাত উঠছে না। সব যেন উদাসীন ভাব! স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কথাই ধরা যাক, তারা এই সহরের করদাতাদের জন্য কতটুকু কি ব্যবস্থা করেছেন? শীত এসেছে, মানুষের জামা কাপড়ের অভাব। চাষী-বাসী এক রকম নগ্নগাত্রেই পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বস্ত্রের বাজার আজও অস্বাভাবিক, একখানি ধুতি চাদরের দাম ৮৲, ঔষধ-পত্রও দুর্মূল্য, এই অবস্থায় মানুষের জীবন তিক্ত হয়ে উঠেছে। এর উপর কালোবাজারের চোরাকারবারীর লোভ আজও প্রশমিত হয় নাই। এ রোগের প্রতিকার কত দিনে হবে কে জানে? অন্নবস্ত্র-স্বাস্থ্যহীন জাতির অসহায় অবস্থার কথা ভাবলে শ্মশান-বৈরাগ্য আসে। এ সব কথা বহু লিখেছি, বহু জানিয়েছি, কিন্তু কর্তাদের কর্ণ-রন্ধ্রের ফুটো কি আছে, যে শুনতে পাবেন? চক্ষু আজ অন্ধ। যে-দিকেই চাও স্বার্থপরতার যেন এক প্রতিযোগিতা চলেছে, পরস্পরকে ঠকিয়ে কে কত টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলতে পারে। হতভাগ্যেরা বুঝছে না যে, তারা এমনি করে সারা দেশটাকে শ্মশানের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। হায়! মূর্খের দল বুঝে না জাতিকে ধ্বংসের পথে পাঠিয়ে সঞ্চিত অর্থ আগলে যখের অভিনয় করে লাভ কি!" সবই বুঝিলাম, কিন্তু এতো লিখিয়াই বা লাভ কি হইবে? বহু বার একই কথা আমরাও বলিয়াছি, কিন্তু কোনো ফল দর্শন এখনো হয় নাই।

* * * *

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত 'মুক্তি' লিখিতেছেন: "ভোটার তালিকা প্রণয়ন ব্যাপারে বহু গ্রাম হইতে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট আসিতেছে, তাহার দু'-একটি আমরা 'মুক্তি'তেও প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি হুড়া থানার চাকলতা গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উক্ত গ্রামের শ্রীনন্দলাল পৈতুণ্ডি ও শ্রীকালোবরণ চক্রবর্ত্তীকে ভোটার তালিকা প্রণয়নে নিযুক্ত করা হয় ও তাহাদের হিন্দী ফরম দেওরা হয়। তাহারা হিন্দী না জানার দরুণ ফরম পূরণ করিয়া কাজ করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেন ফৌজদারী আইনে মামলা করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য যথাক্রমে উভয়ের উপর নোটিশ জারি করেন। তাঁহারা স্থানীয়

এস, ডি, ওর আদালতে উক্ত নোটাশের উত্তর দান প্রসঙ্গে জানান যে তাহারা হিন্দী ভাষায় ফরম পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। বাংলা ভাষায় ফরম দিলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। এস, ডি, ও, সেই ব্যবস্থা করেন এবং মামলা আর আনা হয় না। বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইলেও উপেক্ষণীয় নয়। ভাষা বিষয়ে যে সব অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার বিরোধিতা যাহারা করিতেছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা অজুহাতে তাহাদের উপর মামলা দায়ের করিবার ব্যবস্থা করা এই জিলায় একটা সাধারণ রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীনন্দলাল পৈতুণ্ডী ও শ্রীকালোবরণ চক্রবর্ত্তীর উপর নোটাশ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। তবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া ভুল করিতেছেন। প্রলোভনের দ্বারা কিছু সুবিধাবাদীদের কাজে লাগাইলেও পীড়নের চেষ্টা দ্বারা এই জিলার কর্ম্মীদের দাবাইবার চেষ্টায় কোন দিনই সাফল্য আসিবে না।" বিহার হইলে বাঙ্গালী বিতাড়নের অন্যতম পন্থা ভালই করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, বহু 'সাবালক' বাঙ্গালী ভোটার তালিকা হইতে বিচিত্র কায়দায় ছাঁটাই হইয়া গিয়াছে—ক্রমে আরো হইবে। মন্তব্য করিবার আর কিছুই নাই।

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথায়' প্রকাশ: "আমরা সংবাদ পাইলাম, কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে কমিউনিষ্ট পার্টিভুক্ত বা ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি শিবিরগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যাওয়া-আসা আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কি করিয়া সাময়িক সহানুভূতি অর্জন করা যায় তাহা ইহাদের জানা আছে। দাবী যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক দাবী যাহারা করে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিলেই তাহাদের প্রিয় হওয়া যায়; এমন কি নেতা হওয়াও যায়। ইহারা এই পথ ধরিয়াই চলিতেছে—কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে পড়িবে কি?" সত্যি? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দুর্গত-শিবিরে কোন প্রকার অভিযোগ করিবার প্রকৃত কোন কারণ নাই। যত দোষ এই সকল কমিউনিষ্টদেরই! ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, আগামী বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া যদি অজন্মা হয়, তাহা হইলে তাহাও এই কমিউনিষ্টদের দোষেই হইবে! কমিউনিষ্ট ঠাণ্ডা করিবার জন্য যে-কোনো ডাণ্ডাই হ্যাণ্ডি বলিয়া মনে হয়!

* * * *

এ-দিকে 'গণবার্ত্তা' বলেন: "বহরমপুর সহরের নিকটবর্ত্তী বলরামপুর গ্রামে একটি আশ্রয়প্রার্থী শিবির খোলা হইয়াছে। উক্ত শিবিরে প্রায় দশ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইখানে শিবির অর্থে কয়েকটি তাঁবু মাত্র। ঘরের উপর কোন আচ্ছাদন নাই। বৃষ্টির সময় জল আর কাদায় আশ্রয়প্রার্থীদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। পানীয় জল ও পায়খানার দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গবর্ণমেন্ট মাথা-পিছু যৎসামান্য বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহাও আবার না কি শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। রেড-ক্রশ সোসাইটি হইতে শিশুদের জন্য দুধ বিলি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও নাম মাত্র। উপযুক্ত আহার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাবে এই বিরাট জনসমষ্টি দিন দিন সর্বনাশের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।" এ-বিষয় যখন কোনো সরকারী প্রতিবাদে দেখি নাই তখন অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করিব কি? কতকগুলি দুর্গত ক্যাম্প আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। দুর্গতাবাসগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, গরু-মহিষও এমন স্থানে কিছু দিন বাস করিলে হয় মরিয়া যাইবে, আর না হয় ক্ষেপিয়া গিয়া গুঁতাগুঁতি করিয়া শিবির তছনছ করিয়া দিবে। ইহার বেশী আর কিছু বলিবার নাই।

* * * *

তাহার পর বর্দ্ধমানের 'দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে কি পড়িয়াছে দেখুন: "আসানসোল মহকুমায় বিভিন্ন আশ্রয়-শিবিরে ১৬।১৭ হাজার আশ্রয়প্রার্থী সরকারী তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কয়েকটি শিবিরে ভীষণ ভাবে নানা জাতীয় রোগ দেখা দিয়াছে। চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা অতীব শোচনীয়। পরিধেয় বস্ত্রের বিশেষ অভাব। বস্ত্রাভাবে মা-বোনেদের বাহির হওয়া সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বণ্টন ব্যবস্থাও অসন্তোষজনক। অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বসতি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।" 'দৃষ্টি'র দৃষ্টি আকর্ষণ চেষ্টার সমর্থন করি। কিন্তু এত দূরে কর্ত্তাদের দৃষ্টি সহজে পড়িবে না। ঘরের কাছের ক্যাম্পগুলির প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি তাহাদের পড়ে নাই।

* * * *

চুঁচুড়ার 'সমাধান' খাদ্যশস্য সমাধান প্রবন্ধে বলিতেছেন: "বৃষ্টি কাহারও সুবিধা বোঝে না বা মানুষ অনাহারে মরিয়া গেলেও কিছু যায়-আসে না বৃষ্টির—কিন্তু মানুষ অনাহারে মরিতে চাহে না এবং সেই জন্যই নানারূপ চেষ্টা করিয়া খাদ্য ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করে। এই জেলার খন্যান গ্রামের নিকট কয়েকটি বড় বালির খাদ হইতে বালি উঠাইয়া চালান হইতেছে। বালি উঠাইবার জন্য খাদগুলি জলশূন্য করিবার জন্য কলের দ্বারা জল উঠাইয়া মাঠে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সেই জলের সাহায্যে চাষীগণ যথাসময়ে ধানের চাষ করিয়া ভাল ফসল পায় এবং তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন হয় না। এই জেলার সর্ব্বত্রই জমির অল্প নীচেই ১০।১২ ফুট হইতে ২০।২৫ ফুটের মধ্যে বালির স্তর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং সে স্তরে জলও প্রচুর পাওয়া যায়। যে সমস্ত মাঠে ছেঁচের পুষ্করিণী আছে তাহা মজিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে জল লইয়া ২।৪ বিঘা আবাদ করিতে জল ফুরাইয়া যায় তাহা ছাড়া সাধারণ ডোঙ্গার খরচ অত্যন্ত বেশী হয়। একমাত্র উপায় কলের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা করা। এক একটি মাঠে সর্ব্বোচ্চ স্থানে মোটা নলের কূপ তৈয়ারী করিয়া পাম্প দ্বারা জল উত্তোলনের ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন হয়। যদি বৈশাখ মাসে আবাদের জল পাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক জমিতে আউস এবং আমন ২ বার ধান উৎপন্ন হইতে পারে এবং কার্য্যতঃ খাদ্যশস্য যোগানের প্রভূত উন্নতি হইবে। ঐ সকল নলকূপগুলি বেশী গভীর হওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং তৈয়ারী করিতে অসম্ভব বেশী খরচ হইবে না। কলের পাম্পের দামও অত্যধিক নহে। প্রতি বিঘা জমিতে যে পরিমাণ বেশী ফসল নিশ্চিত উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্যে একটি মাঠের উপযোগী নলকূপ ইত্যাদির খরচ এক বৎসরের মধ্যেই পরিশোধিত হইয়া লাভ হইবে।" সরকারী কৃষি বিভাগের এক

বেসরকারী দেশকর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। সংগঠনমূলক পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় বোধ হয় সরকারের এখন হইতে পারে।

* * * *

'বীরভূম বাণী' বলিতেছেন : "বীরভূম জিলার এগার লক্ষ লোকের বাস। এখানে আছে একটি প্রধান পোষ্ট অফিস সিউড়ীতে। তার অধীনে সাব অফিস মাত্র ১২টি, শাখা পোষ্ট অফিস সমগ্র জেলায় মাত্র ৭১টি, নূতন অস্থায়ী অফিস খোলা হয়েছে মাত্র ৩টি; তার দুইটি বোধ হয় সিউড়ীতে। সব শুদ্ধ একটা জেলায় মাত্র ৮৫টি পোষ্ট অফিস। এক একটা থানায় গড়ে ৬টি পোষ্ট অফিস। এর মধ্যে পশ্চাৎবর্ত্তী থানাও আছে, যথা, ইলামবাজার মহম্মদবাজারের মত থানা। এ সব থানায় একটি পোষ্ট অফিসের অধীনে প্রায় শত খানেক গ্রাম আছে। অধিকাংশ গ্রামে ডাক-পিওন যাওয়ার বিট সপ্তাহে এক দিন, তাও পিওন সব সপ্তাহে যায় না। সহরের বাবুদের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা বহু হচ্ছে, পল্লীর জন্য কতটা প্রাণ সত্যি কাঁদচে তা এই থেকে বোঝা যায়। পল্লীবাসীর দৈনিক সংবাদপত্র নেবার উপায় নাই—সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন বিট। বহির্জগতের সঙ্গে পল্লীর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা আদৌ নাই।" এ-অভিযোগ কেবল বীরভূমের নহে। কতকাংশে বাঁকুড়া জেলারও। কর্ত্তৃপক্ষ দয়া করিয়া চেষ্টা করিবেন—যাহাতে গ্রামবাসী সপ্তাহে অন্তত দেড় বার ডাক-হরকরার মুখ দেখিতে পায়।

* * * *

'দৃষ্টি' সাপ্তাহিক মন্তব্য করিতেছেন : "বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতাল সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। রোগী হাসপাতালে গৃহীত না হইলে অথবা গৃহীত হওয়ার পর উপযুক্ত চিকিৎসা শুশ্রূষা ও পথ্যের সুযোগ না পাইলে হাসপাতালের মর্য্যাদা আদৌ রক্ষিত হয় না। হাসপাতালের দৈনন্দিন পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহাদের আচরণ সময় সময় কত দূর অবিবেচনা-প্রসূত ও নির্ম্মম হয়, জামালপুরের যে রোগিণী হাসপাতাল হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তাঁহার কথা ভাবিলে তাহা বুঝা যায়। শুনিতে পাইলাম যে রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগিণী হাসপাতালের শরণার্থী হইয়াছিলেন সে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হাসপাতালে নাই। কিন্তু আর্ত্ত হিসাবে হাসপাতালের ন্যায্য সাময়িক সাহায্য পাইবার যে দাবী ছিল কোন্ অধিকারবলে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন তাহা তিনি সাধারণকে জানাইবেন কি?" তাহা হইলে দোষী কেবল মাত্র কলিকাতার হাসপাতালগুলিই নয়? একবার তদন্ত করিয়া দেখা দরকার, হাসপাতালগুলিতেও বর্ণচোরা সাম্যবাদীরা প্রবেশ করিয়াছে কি না। তাহা না হইলে সামান্য ব্যাপার লইয়া এত সোরগোল কেন?

* * * *

'সাধারণতন্ত্রী'র বক্তব্য : "বাস্তত্যাগী আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা আমরা যথেষ্টই শুনেছি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছেন, এক মাসের বেশী আর তাঁরা খাবার যোগান দিতে পারবেন না। ভারত খণ্ডিত হওয়ার ফলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যারা ভারত ডোমিনিয়নে আসতে বাধ্য হচ্ছে তাদের প্রতি সরকারের এরূপ আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। কারণ নেতাদের জন্যই আজ তাদের এই দুর্দশা। যারা চোদ্দ-পুরুষের ভিটেমাটী ত্যাগ কোরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আসছে তারা এই আশায় আসছে যে জাতীয় সরকারের আমলে ভারত ডোমিনিয়নে তারা অন্তত পেটের ভাত পাবে এবং সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে। এদের আশ্রয় দেবার, অর্থ সাহায্য করবার এবং জীবিকার ব্যবস্থা কোরে দেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারেরই। কিন্তু সরকার মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা জল সিঞ্চন ছাড়া আর কিছুই করছেন না। বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা আজও পর্য্যন্ত গৃহীত হোল না। সরকারের এই উদাসীনতার ফলে হাজার হাজার মানুষ কুকুর-বেড়ালের মত পথে-মাঠে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এক দিকে আশ্রয়প্রার্থীদের যখন এই অবস্থা অন্য দিকে তখন কেন্দ্রীয় সরকার নূতন দিল্লীতে গণপরিষদের সদস্যদের থাকবার জন্য ১০ লক্ষ টাকা খরচ কোরে প্রাসাদ তৈরী করছেন। জনস্বার্থে পরিচালিত যে কোন সরকারের পক্ষে এরূপ কাজ অপরাধতুল্য। অথচ বাস্তত্যাগী সমস্যা যে সমাধানের অতীত তা নয়। শহরে এবং শহরের আশে-পাশে এখনও বহু খালি বাড়ী পড়ে আছে। এমন অনেক বাড়ীও আছে যেগুলির সমস্তটা ব্যবহার হয় না। বড়লোকদের বাগানবাড়ীগুলি তো ঠায় দাঁড়িয়েই আছে। এগুলি সরকার বাস্তহারাদের জন্য দখল করছেন না কেন? তাছাড়া শহর থেকে দূরে যে সমস্ত বিস্তীর্ণ মাঠ ও প্রান্তর পড়ে আছে, সেখানে অল্প খরচে গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। তাই বা হয় না কেন? এই ভাবে তো আশ্রয়ের প্রশ্নের মীমাংসা হোতে পারে। এইবার জীবিকার প্রশ্ন। প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও নারীকে শিল্পক্ষেত্রে অথবা কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অর্থসাহায্য বা ঋণদান করা যেতে পারে। এখনও পল্লী অঞ্চলে বহু জনশূন্য গ্রাম ও অনাবাদী জমি পড়ে আছে। সে জায়গাগুলি জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। ম্যালেরিয়াপীড়িত জঙ্গলাকীর্ণ সেই সব স্থানগুলি সংস্কার কোরে হাজার হাজার বাস্তহারাকে ঘর-সংসার পেতে বসিয়ে দেওয়া যেতে পাবে। তাতে পল্লীগুলিও মানুষে ভরে ওঠে এবং নবাগতদের চেষ্টায় গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার ও উন্নতিও হয়।" আমাদেরই কথা। বহু বার এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ফললাভও হয় নাই। তবুও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

★
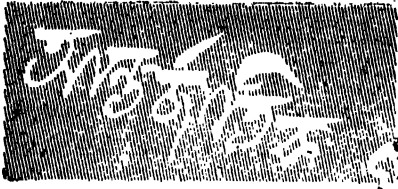
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিঃ ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত--

গত ২রা নবেম্বর (১৯৪৮) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন-পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ডেমোক্রাটিক প্রার্থী মিঃ হ্যারি এস ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী মিঃ টমাস ই ডিউই-র সহিতই তাঁহার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। মিঃ ট্রুম্যান ২,২২,৮৮,৫১১ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং মিঃ ডিউই পাইয়াছেন ২,০৪,২০,০৬৫ ভোট। এই দুই জন ব্যতীত বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক আরও ৯ জন প্রার্থী প্রেসিডেণ্ট-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রোগ্রেসিভ দলের প্রার্থী মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস এবং ষ্টেটস্-রাইটস্ দলের (States-Rights) মিঃ ষ্ট্রম থারমণ্ডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ওয়ালেস অন্ততঃ এক কোটি ভোট পাইবেন বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাইয়াছেন মাত্র ১০,৩০,৭৮১ ভোট। মিঃ ওয়ালেস পূর্ব্বে রিপাবলিকান দলভুক্ত ছিলেন এবং পরে হইয়াছিলেন নিউ ডিল ডেমোক্রাট (New Deal Democrat)। মার্কিণ গৃহযুদ্ধের পর এই সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণীরা (Southerners) প্রেসিডেণ্ট-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পৃথক্ প্রার্থিরূপে মিঃ থারমণ্ডকে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি ৮,৬৪,৩০৩ ভোটের বেশী পান নাই। উল্লিখিত চার জন ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট-পদের জন্য নিম্নলিখিত আরও সাত জন প্রার্থী ছিলেন: (১) সোস্যালিষ্ট দলের মিঃ নরম্যান টমাস, (২) প্রোহিবিশন বা মদ্যপান নিবারণী দলের ডাঃ ক্লড এ ওয়াটসন, (৩) সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলের মিঃ এডওয়ার্ড এ থেইচার্ট, (৪) সোস্যালিষ্ট ওয়ার্কার্স দলের মিঃ ফারেল ডবস্, (৫) নিরামিষভোজী (Vegetarian) দলের মিঃ জন ম্যাক্সেল, (৬) গ্রীন ব্যাক দলের (Greenback) দলের মিঃ জন জী স্কট এবং (৭) ক্রিশ্চিয়ান নেশনাল দলের মিঃ জেরাল্ড এল কে স্মিথ।

শুধু ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থীই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন নাই, মার্কিণ সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদেও ডেমোক্রাটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর হইতে উভয় পরিষদেই রিপাবলিকান দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বস্তুতঃ, ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদ উভয় পরিষদেই রিপাবলিকান দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় অনেকের মনেই এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ১৯৪৮ সালের নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দলই ক্ষমতা লাভ করিবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। সিনেটে ডেমোক্রাটিক দল ৫২টি আসন এবং রিপাবলিকান দল ৪১টি আসন দখল করিতে পারিয়াছেন। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটিক দল দখল করিয়াছেন ২৪০টি আসন এবং রিপাবলিকান দল ১৯৪টি আসন দখল করিয়াছেন এবং শ্রমিক দল ১টি আসন পাইয়াছেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিনেটের ৩৩টি আসনের জন্য অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ আসনের জন্য এবং প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের প্রায় সবগুলির জন্যই নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

ডেমোক্রাটিক দলের বিশেষ করিয়া মিঃ ট্রুম্যানের এই জয়লাভ প্রায় সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিতই ছিল। রিপাবলিকান দলের বিশেষ করিয়া মিঃ ডিউইর জয়লাভ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহই ছিল না। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা সকলেই মিঃ ট্রুম্যানের হারিয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন। মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্রাটিক দলের জয়লাভ সকল রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগকে বোকা বানাইয়া ছাড়িয়াছে, অথবা এ-কথাও বলিতে পারা যায় যে, রাজনৈতিক পণ্ডিতরা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া নিজেরাই বোকা বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যাহা কেহই অনুমান করে নাই তাহা সম্ভব হইল কিরূপে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত জনমত কি, সে সম্বন্ধে কেহই অনুমান করিতে পারে নাই কেন? মিঃ ডিউই এবং রিপাবলিকান দলের জয় সম্পর্কে কোন সন্দেহই রিপাবলিকান দল করে নাই। জয় সম্বন্ধে রিপাবলিকান দলের অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ততাই মিঃ ট্রুম্যানের জয়লাভ করিবার কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল অপ্রত্যাশিত ভাবে মিঃ রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুতে মিঃ ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার প্রেসিডেণ্ট হওয়াটা দৈবাৎ ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ প্রেসিডেণ্টের পদ পাওয়ার পর মিঃ ট্রুম্যানের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ডেমোক্রাটিক দল ষোল বৎসর ধরিয়া ক্ষমতা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন; কাজেই নির্ব্বাচক-মণ্ডলী এবার শাসকের পরিবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ একটা দৃঢ় ধারণাও জন্মিয়াছিল। এই অবস্থায় রিপাবলিকান দল তাঁহাদের জয় অবধারিত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই রিপাবলিকান দলের পরাজয়ের কারণ, এ-কথা স্বীকার করা খুব কঠিন। এই নির্ব্বাচনে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ভোটদাতা ভোট দিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, যত সংখ্যক ভোটদাতা ভোট দিবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভোটদাতা ভোট দিয়াছিলেন। এই সকল অতিরিক্ত ভোটদাতাদের কোন দলবিশেষের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ভোটদাতাই মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়াছেন। এই ফ্লোটিং ভোটই মিঃ ট্রুম্যানের জয়লাভের কারণ বলিয়া কেহ কেহ যে মনে করেন না তাহাও নয়। ইহা আংশিক কারণ হইলে হইতেও পারে। কিন্তু মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্রাটিক দলের জয়লাভ করিবার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের পররাষ্ট্র-নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যেই সন্ধান করা আবশ্যক।

মিঃ ডিউই মিঃ ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে রুশ তোষণ-নীতির অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালেও মিঃ ট্রুম্যান

রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য প্রধান বিচারপতি ভিনশনকে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। মিঃ মার্শাল বাধা দেওয়াতেই তাহা সম্ভব হয় নাই। মার্কিণ ভোটদাতারা রুশ তোষণ-নীতি সমর্থন করিলে মিঃ ওয়ালেসকেই তাঁহারা ভোট দিতেন, মিঃ ট্রুম্যানকে নয়। মিঃ ট্রুম্যানের রাশিয়ার সম্প্রসারণ নিরোধের নীতি মার্কিণ ভোটদাতারা ভালরূপে অবগত আছেন। হয়ত রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিবার মুহূর্ত্ত দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসুক, ইহাও তাঁহারা চান না। কম্যুনিজম নিরোধে মিঃ ডিউইর যোগ্যতা মিঃ ট্রুম্যান অপেক্ষা বেশী, এ কথা প্রচার করা হইলেও কম্যুনিজম নিরোধ করা সম্বন্ধে ডেমোক্রাটিক দল ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে আসলে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই। আভ্যন্তরীণ নীতির দিক দিয়া শ্রমিক নীতির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বড় বড় শ্রমিক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য মিঃ ট্রুম্যান আদালতের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিতে উদ্যত হইলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকীও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ত্তৃক ট্যাফ্ট-হার্টলি বিল পাশ হওয়ার কথা শ্রমিকরা বিস্মৃত হইতে পারে না। শ্রমিক-নেতারা এই বিলকে 'ক্রীতদাস আইন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উক্ত শ্রমিক বিলে ভেটো প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভেটো নাকচ করিয়া মার্কিণ কংগ্রেস উক্ত বিল পাশ করেন। সুতরাং রিপাবলিকানদের হাতে ক্ষমতা গেলে শ্রমিকদের অবস্থা কি হইবে, তাহা শ্রমিকরা বিবেচনা না করিয়া পারে নাই। সুতরাং এ-এফ-এল এবং সি-আই-ও এই দুইটি শ্রমিক দলই মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়াছিল। মার্কিণ কৃষকরা সাধারণতঃ রিপাবলিকান দলেরই সমর্থক। কিন্তু কিছু দিন হইল, শস্যের দর নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যেরও কম হইয়া যায় এবং মিঃ ট্রুম্যান স্পষ্ট ভাবেই জানান যে, কংগ্রেস শস্যসঞ্চয় পরিকল্পনার ব্যয় নাকচ করাতেই নিম্নতম মূল্য কার্য্যকরী হয় নাই। এই অবস্থায় মার্কিণ কৃষকরাও মিঃ ট্রুম্যানকে সমর্থন করিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ সমস্যা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ১৯৪৬ সনের শেষ ভাগে মিঃ ট্রুম্যানই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি ইহাও সত্য যে, মূল্য-বৃদ্ধি, মজুরি-বৃদ্ধি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য কোন না কোন রকম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, মিঃ ট্রুম্যান ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়া আসিতেছেন। এই সকল কারণ মিলিত হইয়াই যে মিঃ ট্রুম্যান এবং ডেমোক্রাটিক দলকে জয়ী করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ ট্রুম্যান মিঃ ডিউই অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ১৮ লক্ষ ভোট বেশী পাইয়াছেন। অর্থাৎ ভোটদাতারা প্রায় সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন বলিলে খুব বেশী ভুল বলা হয় না।

মিঃ ট্রুম্যানের এই জয়কে কেহ কেহ তাঁহার ব্যক্তিগত জয়, এবং কেহ কেহ ডেমোক্রাটিক পার্টির জয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, এখন আর তিনি দৈবাৎ প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন এ কথা বলা চলিবে না। কংগ্রেসে তাঁহারই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কাজেই দৃঢ়তার সহিতই তিনি তাঁহার নীতি কার্য্যকরী করিবার সুযোগ পাইবেন। মিঃ থারমণ্ডের পরাজয় হওয়ায় নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ডেক্সিক্রাটদের (Dixiecrat) মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। সব দিক দিয়াই অনুকূল অবস্থার মধ্যে মার্কিণ প্রেসিডেন্টরূপে তাঁহার নূতন কার্য্যকাল আরম্ভ হইবে। রাশিয়ার সহিত নূতন করিয়া আলোচনা চালাইবার চেষ্টা তিনি করিবেন কি? মস্কো হইতে এইরূপ প্রচার করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ ষ্টালিনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বিশেষ ভাবেই কাম্য। মিঃ মার্শাল উহাকে প্রচারকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মিঃ ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে রুশ তোষণ-নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও রাশিয়ার সহিত কোন মীমাংসায় তিনি আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হইবেন, ইহা আশা করা কঠিন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতি যেমন চলিতেছিল, মিঃ ট্রুম্যানের নির্ব্বাচনের পরেও ঠিক তেমনিই চলিতে থাকিবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী মিঃ মার্শাল পদত্যাগ করিবেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। মিঃ ট্রুম্যানের নির্ব্বাচিত হওয়ার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতিতে যে পরিবর্ত্তনই হউক, পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার—

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনেলে জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় গত ১০ই নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। এগার জন বিচারপতি লইয়া এই ট্রাইবুনেল গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন জন বিচারপতি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ বিচারপতিদের রায়ে জেনারেল হিদেকি তোজো-প্রমুখ সাত জন জাপ যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ফাঁসীর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ১৬ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এক জন ২০ বৎসর এবং অপর এক জনের প্রতি সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল অধিকাংশের রায়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে তিনি দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অভিযোগের প্রত্যেকটি দফায় প্রত্যেক আসামীকে নির্দ্দোষ ঘোষণা করা উচিত এবং তাঁহাদিগকে সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত। ট্রাইবুনেলের ফরাসী বিচারপতি মঃ বেরনার তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে বলিয়াছেন যে, দণ্ডিত জেনারেল হিদেকি তোজো এবং অপর ২৪ জন অভিযুক্ত নেতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্র। তিনি সকলকে বে-কসুর খালাস প্রদানের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার প্রধান নায়ককেই অভিযুক্ত করা হয় নাই। জাপ-সম্রাট হিরোহিতোর বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হল্যাণ্ডের বিচারপতি ডাঃ বি, ভি, রোলিং তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে ৬ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে তাকাজুমি ওকা, কেনরো সাতো এবং হিরোশি ওশিমা এই কয়েক জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোকি হিরোতা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত শুনরোকো হাতা, কোইচি কিদো, ২০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শিগেনরি

াগো এবং ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত মমুরো শিগেমিৎসুকে ক্তি দেওয়া উচিত। ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট অষ্ট্রেলিয়াবাসী চারপতি স্যার উইলিয়ম ওয়েব স্বতন্ত্র মতপ্রকাশী রায়গুলি দালতে পঠিত হইতে দেন নাই। অধিকাংশের রায়ে বলা য়াছে যে, যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধারম্ভের জন্য জেনারল জোই প্রধানতঃ দায়ী। ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়ম বের জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতোকে 'যুদ্ধাপরাধের নেতা' (Leader crime) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুলাই তারিখের পটসডাম ঘোষণা ও ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের আত্মসমর্পণ পত্র (Instrument of Surrender) অনুযায়ী সুদূর প্রাচ্যে প্রধান পরাধীদের ন্যায় ও দ্রুত বিচার এবং শাস্তি প্রদানের জন্য লিখিত আন্তর্জ্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনেল গঠিত হয়। জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে ১৯৪৬ সালের ২৯শে এপ্রিল জাপ পরাধীদের বিচার আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য বিচারকার্য্য শেষ হয় ১৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল। অতঃপর অধিকাংশের রায় তৈয়ারী হইতে য় সাত মাস লাগিয়াছে। বিচার শেষ হইতে আড়াই বৎসরের ধিক সময় ব্যয়িত হওয়াকে দ্রুত বিচার বলা যায় না, সে কথা াইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। নুরেমবুর্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধাপরাধীদের চারকার্য্য শেষ হইতেও ১১ মাসের বেশী সময় লাগে নাই। চারকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু ন্যায়বিচার হইয়াছে কি? য়বিচার হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ত ইতিহাসই দান করিবে, তাই বলিয়া এই প্রশ্নকে এখনও আমরা উপেক্ষা রিতে পারি না। এই বিচার-প্রহসনের মধ্যে ন্যায়বিচার করিবার গ্রহ অপেক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণের আগ্রহই যে অধিকতর পরিস্ফুট য়াছে, তাহা স্বতন্ত্র মতপ্রকাশী রায় আদালতে পঠিত হইতে না ওয়ার মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়। এই পৃথক্ রায় তিনটি বিশ্বসীর নিকট প্রকাশিত হইতে বাধা নাই, কিন্তু ট্রাইবুনেলের প্রকাশ্য লাসে তাহা পঠিত হইতে দেওয়া হইল না। অভিযুক্ত ও দণ্ডিত পনেতাদের পক্ষ হইতে ঐ তিনটি রায় আদালতে পঠিত হইবার দরখাস্ত করা হইলে ট্রাইবুনেল প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনিতে স্বীকৃত হন। বৃটিশ ও মার্কিণ আদালতে প্রতিকূল এবং কূল উভয়বিধ রায়ই পঠিত হইবার বিধান আছে। বিজেতা তিবর্গ পরাজিত জাতির নেতাদের বিচার করিতে বসিয়াছেন বলিয়াই ন্যায়বিচারের অন্যতম মৌলিক বিধান এই ভাবে ঘন করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য এই দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ দ্ধান্ত করিবেন জেনারেল ম্যাক আর্থার—মিত্রপক্ষীয় মিশনের ধানদের সহিত পরামর্শ করিয়া। রয়টারের সংবাদে আরও প্রকাশ, এই আলোচনার ফলে গুরুদণ্ডাদেশগুলির অন্ততঃ কয়েকটি ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। স্যার উইলিয়ম ওয়েব না কি রূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন অপরাধীরই প্রাণদণ্ড ওয়া উচিত নহে। কিন্তু এইরূপ বিচারের এবং দণ্ডপ্রদানের যায্যতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।

মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষীয় কৌঁসুলী এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, দ্ধের জন্য জাপান যে চক্রান্ত বা পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহার দেশ্য ছিল প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহা একটি অপরাধ। তাই যদি হয়, তবে বৃটেন, আমেরিকা, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স সকলেই এই অপরাধে জাপান অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহা সত্যই অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কি? পরাজিত জাতির নেতাদের বিচারে ন্যায়বিচারের স্থান সত্যই কি আছে? ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে এই প্রশ্ন দুইটি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ পাল তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, "The name of Justice should not be allowed to be invoked only for the prolongation of pursuit of vindictive retaliation." অর্থাৎ 'প্রতিশোধমূলক প্রতিহিংসার কার্য্যকলাপকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য ন্যায়বিচারের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত নহে।' বস্তুতঃ, জাপ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায়বিচারের কোন স্থান নাই। কিন্তু জাপান প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে তাহার অধীনে আনিতে চাহিয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহা সত্য হইলেও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় কি? ডাঃ পাল তাঁহার মন্তব্য করিয়াছেন, "এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গৃহীত পন্থা আইনসঙ্গত কি না সেই প্রশ্ন বাদ দিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উদ্দেশ্যটি এখনও পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বে-আইনী বা অপরাধজনক বলিয়া গণ্য হয় নাই।" যুদ্ধাপরাধের বিচারে প্রধান প্রশ্ন জাপ নেতারাই যুদ্ধাপরাধে মুখ্য অপরাধী কি না? ডাঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন, "We may not altogether ignore the possibility that perhaps responsibility did not lie only with defeated leaders." অর্থাৎ 'শুধু পরাজিত নেতারাই দায়ী নহেন, এই সম্ভাবনা আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না।' তাঁহার এই মন্তব্যের মধ্যে যে তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাই প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জাপানের মানসিক প্রস্তুতির জন্য যে প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া এবং বিশেষ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম মরিস হিউজেস দায়ী, সে কথাও ডাঃ পাল উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যেরূপ মোকর্দ্দমা হয়, যুদ্ধপরাধের বিচার সেরূপ নহে। যে পক্ষে ন্যায় এবং ধর্ম্ম সেই পক্ষই যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহাও নয়। শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি, দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি যুদ্ধ জয়ের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক বিজেতাই দাবী করিয়া থাকেন ন্যায় তাহারই পক্ষে। হিটলারের জার্ম্মাণী এবং জাপান জয়লাভ করিলে তাহারাও এই কথাই বলিত এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারে পক্ষের উলট-পালট হইয়া যাইত মাত্র।

মুকডেনের পতন—

গত ২রা নবেম্বর (১৯৪৮) চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী কর্ত্তৃক মুকডেন অধিকৃত হওয়ায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া তো কম্যুনিষ্টদের অধিকারে আসিলই, চীনের গৃহযুদ্ধেরও আরম্ভ হইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নূতন পর্য্যায়ে। মুকডেন পতনের পরেই ৩রা নবেম্বর ওংওয়েন হাসের প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত চীনের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য অর্থসচিব ব্যতীত অন্যান্য সকল মন্ত্রীকে পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু

মার্শাল চিয়াং কাইশেক যে কিরূপ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাংহাই হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, কম্যুনিষ্ট ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে আট দফা শান্তি-চুক্তি লইয়া এক আলোচনা চলিতেছে। চিয়াং কাইশেককে চীন ত্যাগ করিয়া খুব সম্ভবতঃ আমেরিকায় চলিয়া যাইতে হইবে এবং চীনে উভয় পক্ষের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, ইহাই না কি ছিল এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ৮ই নবেম্বর জেনারেল চিয়াং কাইশেক এক ঘোষণায় শান্তি-প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, চীন হইতে কম্যুনিষ্টদের সম্পূর্ণরূপে বিলোপের জন্য তাঁহার গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি মনে করেন যে, কম্যুনিষ্টদের বিলোপ সাধন করিতে আট বৎসর লাগিবে। মাঞ্চুরিয়া কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মাঞ্চুরিয়া হস্তচ্যুত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক বিপুল সামরিক ব্যয়ভার হইতে মুক্তি পাইল।

জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদ পোষণ করিলেও সামরিক দিক হইতে কুয়োমিণ্টাং-এর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। নানকিং এবং সাংহাই পর্য্যন্ত আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাশিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিতেছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আমেরিকা প্রকাশ্য ভাবেই চীনের জাতীয় সরকারকে সাহায্য করিতেছে। আমেরিকার সাহায্য সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের নিকট চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ক্রমাগত পরাজয় কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে? ১৯৪৬ সালে মিঃ মার্শাল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চিয়াং কাইশেক এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করিবার জন্যই তিনি চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি দেশে ফিরিয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে শুধু কম্যুনিষ্টদেরই নয় কুয়োমিণ্টাং দলেরও কঠোর নিন্দা করা হইয়াছে। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের খাস-প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল ওয়েডমেয়ার চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত সাহায্য কি ভাবে ব্যয়িত হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে-সকল বিশেষজ্ঞ চীনে গিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সাহায্যের বহুলাংশ অপব্যয়িত হইয়াছে। অর্থ-সাহায্য যদি শুধু চোরা-কারবারীদিগকেই পরিপুষ্ট করে, তাহা হইলে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট জনগণের সমর্থন পাইবে কিরূপে? চীনের জনসাধারণের সহিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্পর্শ মাত্র নাই। সমর উপকরণ দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য করে, সৈন্যরা কম্যুনিষ্টদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে উহা কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হয়। গবর্ণমেণ্ট দুর্নীতিপরায়ণ। কৃষক শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট। সৈন্যবাহিনীও সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নহে। এই অবস্থায় মার্কিণ সাহায্য যত বেশীই হউক, কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আমেরিকা যদি মার্কিণ সৈন্য কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠায় এবং সাহায্যকৃত অর্থ নিজের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করে, তাহা হইলে হয়ত কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু মার্কিণ সৈন্য চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতে আসিলেই যে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইভাট-লাই যুক্ত আবেদন—

বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের জন্য তথাকথিত ছয়টি নিরপেক্ষ শক্তি (আর্জেনটিনা, বেলজিয়াম, কানাডা, চীনা, কলোম্বিয়া ও সিরিয়া) কর্ত্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে উপাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে রাশিয়া ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন-সমস্যার গতি কি হইবে তাহা কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ এইচ, ভি, ইভাট এবং সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ টাইগ্রিভ লাই মিঃ এটলী, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, মঃ কুইলি এবং মঃ ষ্টালিনের নিকট এক যুক্ত আবেদন প্রেরণ করিয়া বার্লিন-সমস্যা সমাধানের জন্য ডাঃ ব্রামুগলিয়ার প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদনে গত ২২শে অক্টোবর (১৯৪৮) তারিখে জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত মেক্সিকোর প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করা হয়। এই প্রস্তাবে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গকে তাঁহাদের সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় ইভাট-লাই যুক্ত আবেদনের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কোন নূতনত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথক্ পৃথক্ উত্তর দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের মূল বক্তব্য এই যে, রাশিয়ার ভেটোই জার্ম্মাণ-সমস্যা সম্পর্কে আরও আলোচনা চালাইবার পক্ষে প্রধান বাধা। দ্বিতীয়তঃ, বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহৃত হইলেই বার্লিন ও জার্ম্মাণী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন, বার্লিন-সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। রাশিয়ার উত্তরে বার্লিনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং সমগ্র জার্ম্মাণ-সমস্যা বিবেচনার জন্য পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বানের এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের উন্নতিবিধানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে। রাশিয়ার উত্তরে আরও বলা হইয়াছে যে, বার্লিন-সমস্যা সমাধানের জন্য গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৪৮) বার্লিনের সর্ব্বাধিনায়কদের সভায় মীমাংসার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ৩রা অক্টোবর তারিখে এক পত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সকে জানাইয়াছেন।

ডাঃ ইভাট এবং মঃ লাই চতুঃশক্তির জবাবের উত্তরে একটি নূতন আবেদন জানাইয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমত হওয়ার জন্য তাঁহারা আরও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই আবেদনের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে, বার্লিন-সমস্যা সমগ্র জার্ম্মাণ-সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, বার্লিন-সমস্যা

সৃষ্ট হইল কেন? পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম-বার্লিনে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাতেই যে বার্লিন-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাশিয়া চায় যে, বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহার এবং সমগ্র বার্লিনে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন একই সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিত্রয় দাবী করেন যে, প্রথমে বার্লিন অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হইবে, তার পর সমগ্র বার্লিন রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের মুদ্রা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা হইবে। তথাকথিত নিরপেক্ষ ষড়-শক্তির প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দাবী অনুযায়ীই রচিত হয়। কাজেই এই ষড়-শক্তিকে নিরপেক্ষ বলা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে! অতীতে রাশিয়ার সংবাদপত্র সমূহ ডাঃ ইভাটকে যুদ্ধের প্ররোচনা-দাতা (Warmonger) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং মঃ লাইয়ের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগও করা হইয়াছিল। তথাপি রাশিয়া তাঁহাদের মীমাংসার চেষ্টার প্রশংসাই করিয়াছে।

মীমাংসা সম্বন্ধে ডাঃ ইভাট এবং মঃ লাই যে কি জন্য আশাবাদ পোষণ করেন তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু কম্যাণ্ডার কিং-হল (King-Hall) তাঁহার সাম্প্রতিক পত্রে (News letter) পুনশ্চ দিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ আগামী বসন্ত কালে রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষ বাধিবে বলিয়া আশা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এই সময়ের মধ্যে আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা ৫০ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আগামী বসন্ত কালের মধ্যে অভিযান চালাইবার উপযোগী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠিবে বলিয়াও আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও অতি দ্রুত টেরিটোরিয়েল বাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। চীনে, কাশ্মীরে, প্যালেষ্টাইনে এবং গ্রীসে তো যুদ্ধ চলিতেছেই। ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়ার অবস্থা বাহ্যতঃ শান্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে অশান্তি ধূমায়িত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ ও মালয়েও গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলিতেছে তাহা সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। রাশিয়ার আশঙ্কা, তাহার উপর পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত হইতেছে, এবং ক্রমশঃ রাশিয়ার অধিকতর নিকটে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে। আর আমেরিকা মনে করিতেছে, কম্যুনিজম মতবাদ দিয়া রাশিয়া সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া তাহাদের তাঁবে আনিতে চায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই মুখে সকলেই শান্তির কথা বলিলেও, সাধারণ মানুষ কোন ভরসা করিতে পারিতেছে না।

রূঢ় অঞ্চলের সমস্যা—

রূঢ় অঞ্চলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা গঠনের জন্য গত ১১ই নবেম্বর (১৯৪৮) লণ্ডনে ষড়শক্তির সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত জুন মাসে ষড়শক্তির লণ্ডন-সম্মেলনে উৎপাদিত কয়লা, কোক এবং ইস্পাতের জার্ম্মাণীতে ব্যবহার এবং রপ্তানির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব-শক্তি গঠিত হয়। কিন্তু আলোচ্য সম্মেলনে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে পশ্চিম জার্ম্মাণীর কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলি জার্ম্মাণদের হাতে সমর্পণ করিতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করা যায়। গত ১০ই নবেম্বর বৃটিশ ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম জার্ম্মাণীর কয়লা, ইস্পাত ও লৌহশিল্পগুলি জার্ম্মাণদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল শিল্প ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার জনসাধারণের হাতে দেওয়া হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে অধিক সংখ্যক শিল্পের মালিক না হয় এবং নাৎসীদের সহিত সংশ্লিষ্ট পূর্ব্ব-মালিকরা যাহাতে কোন কারখানা ফিরিয়া না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ঘোষণায় ফ্রান্স খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আশা ছিল, রূঢ়ের খনি ও শিল্পগুলির স্বত্ব কোন না কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পিত হইবে অথবা সন্ধিসর্ত্তে এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে ঐগুলির মালিকানা স্বত্ব অনভিপ্রেত লোকের হাতে যাইবে না।

রূঢ় অঞ্চল জার্ম্মাণীর অস্ত্রাগার বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের খনি ও শিল্পগুলির মালিকানা-স্বত্ব জার্ম্মাণদের হাতে গেলে জার্ম্মাণী আবার সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, ফ্রান্স এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে নিষ্ফল প্রতিবাদ ছাড়া ফ্রান্স আর কিছু করিতে পারিবে না, এ সম্পর্কে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই অবহিত আছে। রূঢ় অঞ্চলের খনি ও শিল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ফ্রান্সের অভিমত জানিতে চাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হয় না। বস্তুতঃ, ১৯৩৫ সালে যে ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি হইয়াছিল ফ্রান্স তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারে নাই। ফ্রান্স রূঢ় অঞ্চলকে জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার দাবীই প্রথমে করিয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের সহিত মতৈক্য রক্ষা করিবার জন্য এই দাবী সে পরিত্যাগ করে। জুন মাসে লণ্ডনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার পক্ষে ২৯৭ ভোট এবং বিপক্ষে ২৮৯ ভোট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, রূঢ় অঞ্চল সম্বন্ধে ফ্রান্সের সকল দলই একমত। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন মনে করে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে বাদ দিয়া মার্শাল-পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর হইতে পশ্চিম জার্ম্মাণী অতি দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রূঢ় অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহাও অপ্রকাশ নাই। কি উদ্দেশ্যে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার পরিণাম কি হইতে পারে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১৮৭০ সাল হইতে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম পর্য্যন্ত ফ্রান্সে তিন বার জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণীকে যত দূর সম্ভব দুর্ব্বল করিয়া রাখাই যে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিকেন্দ্র বুঝিতে হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের যে দাবী উঠিয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর দাবী এই যে, মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী যদি জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সমগ্র জার্ম্মাণী যাহাতে কম্যুনিষ্টদের নিয়ন্ত্রণাধীনে না যায় তাহার জন্য পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী দখল করিবার মত শক্তিশালী জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করিলেই এই সৈন্যবাহিনী জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চল দখল করিয়া বসিবে। রাশিয়া বিনা যুদ্ধে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী হাত ছাড়া হইতে দিবে, মিত্রশক্তি তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। এই নবগঠিত জার্ম্মাণ বাহিনীর কাছে রাশিয়া অবলীলাক্রমে হারিয়া যাইবে, তাহাও মনে করা কঠিন। তবে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'বাকারষ্টেট' হিসাবে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় যে বৃটেন এবং আমেরিকার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রূঢ় অঞ্চলের খনি ও শিল্পগুলির মালিকানা-স্বত্ব এবং পরিচালন-ক্ষমতা জার্ম্মাণদের হাতে আসিলে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন-ব্যবস্থার উপর আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী রাখা খুব কঠিন হইয়া পড়িবে। তাছাড়া পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ যে পশ্চিমমুখী হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? বস্তুতঃ জার্ম্মাণী সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি আন্তর্জ্জাতিক শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিলে, উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা—

১১শে নবেম্বর তারিখের (১৯৪৮) রয়টার সংবাদে প্রকাশ, ইহুদীরা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহাদের উত্তরে যুদ্ধ বন্ধ করিতে এবং অবিলম্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে রাজী হইয়াছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, নেগেভ অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতেও তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের অস্থায়ী সালীশ ডাঃ বাঞ্চে ইহাতে ভারী খুশী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু গত ১৮ই নবেম্বর ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন ষ্টেট কাউন্সিলে বলিয়াছেন যে, ইহুদী সৈন্যবাহিনী কিছুতেই দক্ষিণ-প্যালেষ্টাইনের নেগেভে নূতন ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইহুদী সৈন্য মিশরের আক্রমণ হইতে নেগেভ রক্ষা করিবার জন্য ১৪ই অক্টোবরের পূর্ব্বে যেখানে ছিল তাহারা সেইখানেই আসিবে। তাছাড়া মিশরের আক্রমণ হইতে তাহারা জেরুজালেম রক্ষা করিবে। হাইফা হইতে ১১শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ইজরাইল গবর্ণমেন্ট নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এক টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন যে, যে-সকল সৈন্য ১৪ই অক্টোবরের পর নেগেভে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগকে সরাইয়া আনিতে তাঁহারা রাজী আছেন। কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে ইহুদী পল্লী রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে ঐ স্থানে রাখার অধিকার পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা রাজী নহেন। এই সকল সংবাদ হইতে ইজরাইল গবর্ণমেন্ট কতটুকু কি রাজী হইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তেমনি সিরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ মোসেম রাবাজী দামাস্কাসে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরাসরি ভাবে অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সিরিয়া এবং অন্যান্য আরব-রাষ্ট্র ইহুদীদের সহিত আলোচনা চালাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। আরব লীগ সন্ধিস্থাপনের জন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলোচনা চালাইতে সম্মত আছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহাও অস্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অস্থায়ী সালীশ ডাঃ বাঞ্চে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডাঃ বাঞ্চের পরিকল্পনায় নেগেভ হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে ইহুদী সৈন্য সরাইয়া আনিবার নির্দেশ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু আরবদিগকে সৈন্য অপসারণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিবার কোন কথা নাই। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত অঞ্চল জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে, কিন্তু বীরসেবা সহরটি আরবদিগকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব আছে। নিরাপত্তা পরিষদের সাত জনের বিশেষ কমিটি গত ১৩ই নবেম্বর এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। জাতিপুঞ্জের ১৯৪৭ সালের ২৯শে নবেম্বর তারিখের প্রস্তাবে নেগেভ ইহুদীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই মে'র (১৯৪৮) পর মিশর জোর করিয়া এই অঞ্চল দখল করে এবং ইহুদীরা অক্টোবর মাসে সাত দিনব্যাপী যুদ্ধে এই অঞ্চল তাহাদের দখলে আনিয়াছে। ডাঃ বাঞ্চের পরিকল্পনার মধ্যে সামরিক দিক হইতে বাস্তব অবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। ডাঃ বাঞ্চের সহিত প্যালেষ্টাইনে জাতিপুঞ্জের প্রধান পর্য্যবেক্ষক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল রিলের (Gen. Riley) যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। জেনারেল রিলে অস্থায়ী সালীশকে জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির কোন সার্থকতাই আর নাই এবং নেগেভে ১৪ই অক্টোবর তারিখের অবস্থার ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের শাস্তিমূলক প্রস্তাব (Sanctions resolution) কার্য্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের সামরিক পরিস্থিতির উপর এখন ইহুদীদের একাধিপত্য বর্ত্তমান। ইহুদীরা ইচ্ছা করিলে এখন সমগ্র প্যালেষ্টাইনই দখল করিতে পারে। জেনারেল রিলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৪ই অক্টোবর তারিখের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টার ফল নৈরাশ্যজনক হইবে। জেনারেল রিলের এই অভিমতের পর ডাঃ ব্যাঞ্চের পরিকল্পনাকে ইহুদীদের প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবের ফল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কাউন্ট বার্ণাডোট ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। সেই কাউন্ট বার্ণাডোটের আসনে তিনি বসিয়াছেন। এই অবস্থায় সালিশের নিরপেক্ষ মনোভাব তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা কঠিন।

বার্ণাডোট-পরিকল্পনা সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এখন পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ মার্শাল উহা একরূপ অনুমোদনই করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার প্রাক্‌নির্ব্বাচন বক্তৃতায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভাগ পরিকল্পনাই সমর্থন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নেগেভ ইহুদীদের প্রাপ্য। যে সময় মিঃ মার্শাল বার্ণাডোট-পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া ছিলেন সেই সময় কেহই আশা করে নাই যে, মিঃ ট্রুম্যান পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ডেমোক্রেটিক দল ক্ষমতা লাভ করিবে। গত ১৮ই নবেম্বর প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটেন এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। এই প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইনের আরব-অধিকৃত অঞ্চল ট্রান্সজর্ডানের হাতে দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কাউন্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনা অনুযায়ী আরবদিগকে নেগেভ

এবং দক্ষিণ-পশ্চিম গ্যালিলী ইহুদীদিগকে দেওয়ার এবং জেরুজালেমকে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার কথা আছে। প্যালেষ্টাইনের মোট আয়তন ১০০০ বর্গ-মাইল। বার্ণাডোটের পরিকল্পনায় মাত্র ২০০০ বর্গ মাইল ইহুদীদিগকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহুদীরা যে তাহাদের কষ্টার্জ্জিত স্থান ছাড়িয়া দিবে ইহা আশা করা কঠিন।

পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ—

গত ৪ঠা নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পরমাণু-শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ৪০টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে এবং চারিটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। এই প্রস্তাবটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ, পরমাণু-শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 'বারুচ' পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। গত ৩০ মাস ধরিয়া সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হইলেও পরমাণু-শক্তি কমিশনকে কাজ চালাইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ। প্রস্তাবের তৃতীয় অংশে ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া একটি কমিটি গঠনের কথা আছে। বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চক এবং কানাডা এই ছয়টি রাষ্ট্র লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে এবং রাশিয়া তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য আগামী বৎসরে এই কমিটির অধিবেশন হইবে এবং সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই কমিটিকে রাশিয়ার মনোভাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। রাশিয়া এই প্রস্তাবকে আমেরিকার পরমাণু-শক্তির একচেটিয়া অধিকার অর্জ্জনের প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন—

দুই মাস হইল প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন চলিতেছে। কিন্তু কোন বিষয়ে কোন সমাধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্মুখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রথম দিকে কাজ তেমন অগ্রসর হয় নাই। ইহার কারণ নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট টুম্যান নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, রিপাবলিকান দল ক্ষমতা লাভ করিবে এবং তাহার ফলে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির এমন পরিবর্ত্তন হইবে যাহাতে রাশিয়ার সহিত মীমাংসার চেষ্টা বাদ দিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে, এই সকল ধারণাই হয়ত প্রথম দিকের শিথিলতার কারণ। এই সকল ধারণার একটিও সত্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর যদি অধিবেশন শেষ করিতে হয়, তাহা হইলে অতঃপর দ্রুত কাজ শেষ করা প্রয়োজন। সেই জন্যই গত ১৫ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে দ্বিতীয় আর একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়। রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ এগারটি সমস্যা সমাধানের জন্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি আচরণ, কোরিয়ার ভবিষ্যৎ, ফ্রাঙ্গ, স্পেন এবং ইটালীর প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের ভবিষ্যৎ এই পাঁচটি বিষয় মূল রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচনা করা হইবে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বিষয় বিশেষ এডহক্ রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচিত হইবে। ইহাতেও ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হইবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন।

উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় ব্যতীত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সমস্যাও বড় কম কঠিন নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অঙ্গীভূত করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে ট্রাষ্টিশিপের খসড়া দাখিল করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ-আফ্রিকাকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই নির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন পরিচালন সম্পর্কে দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্ব্বশেষ রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিয়া ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল ট্রাষ্টিশিপ কমিটির নিকট রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারী চাকুরী পাইতে অধিকারী নহে, শাসন পরিষদগুলিতে এবং শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, যদিও দক্ষিণ-আফ্রিকা দাবী করিয়াছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্দ্ধিত সমৃদ্ধির অংশ আফ্রিকানরাও পাইয়াছে, তথাপি এই বর্দ্ধিত সমৃদ্ধির কি পরিমাণ অংশ আফ্রিকানরা পাইয়াছে প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাউন্সিল তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, নীতির দিক হইতে কোনও জাতিকে একঘরে করিয়া রাখিবার (social segregation) তাঁহারা বিরোধী এবং এইরূপ একঘরে করিয়া রাখিবার যে কারণই প্রদর্শন করা হউক না কেন, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৮ই নবেম্বর তারিখে ট্রাষ্টিশিপ কমিটির অধিবেশনে ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ১০ই নবেম্বর ট্রাষ্টিশিপ কমিটিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসীরা ট্রাষ্টিশিপের বিরোধী কি না এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে চায় কি না সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ কমিশন প্রেরণ করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে দাবী উত্থাপন করা হয়। বৃটেনের পক্ষ হইতে কমনওয়েলথ রিলেশনের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ গর্ডন ওয়াকার বলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিল করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকা বাধ্য নয়। তিনি আরও বলেন যে, বৃটেন কয়েকটি ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিল করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটেন উহা দাখিল করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল না এবং ঐগুলি দাখিল করিতে বৃটেনকে কখনও আইনতঃ বাধ্য করাও হয় নাই। আমেরিকার অভিমত এই যে, ভারতের প্রস্তাবিত মত কোন কমিশন প্রেরণ করিবার অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাই। সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ভাগ্যে কি লিখিত আছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ লাউ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত করিতে চান না, তাঁহারা চান উভয়ের সম্পর্ককে নিবিড়তর করিতে। এই নিবিড়তর সম্পর্ক যে কিরূপ মধুর তাহা প্রত্যেক পরাধীন দেশের অধিবাসীই জানে। মিঃ লাউ ভারতের যুক্তির কোন উত্তর দিতে পারেন নাই, কিন্তু ভারতকে গালাগালি করিতে তিনি কসুর করেন নাই। ভারতে যে বিপুল সামাজিক বৈষম্য আছে তিনি তাহারই উল্লেখ করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মলান গত ১৬ই নবেম্বর প্রিটোরিয়ায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা অঙ্গীভূত

করিতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং কিছুতেই অছিগিরির চুক্তি তাঁহারা দাখিল করিবেন না। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিত্যাগ করিবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন যাহা করিতে বলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাই করিয়া থাকে। কখনও বৃটেন ও আমেরিকার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। এই দুইটি বৃহৎ শক্তির একমাত্র অসুবিধার স্থল হইয়াছে নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। গত ১৭ই নবেম্বর ক্ষুদ্র (minor) রাজনৈতিক কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রতিনিধি মঃ মালিক 'ক্ষুদ্র পরিষদ' সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কাজ চালাইবার জন্য স্থায়ী অন্তর্ব্বর্ত্তী কমিটি বা ক্ষুদ্র পরিষদ গঠনের দায়িত্ব উক্ত 'ক্ষুদ্র' রাজনৈতিক কমিটির হাতে অর্পিত হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিনিধি এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন, গ্রীস, ইটালীর উপনিবেশ এবং কোরিয়ার সমস্যা 'ক্ষুদ্র পরিষদে' উত্থাপন করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো এড়াইয়া চলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ যে-সকল বিষয় সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবেন সেগুলিও আলোচনা করিবার অধিকার ক্ষুদ্র পরিষদকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যতঃ ক্ষুদ্র পরিষদকে নিরাপত্তা পরিষদের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিবাদে যে কোন ফল হইবে সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই।

গ্রীসের সমস্যা—

সুদীর্ঘ আলোচনার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি গত ১০ই নবেম্বর গ্রীসের সমস্যা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রীসের গরিলা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার তীব্র নিন্দা করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও চীন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা ৪৬—৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে রুশ প্রতিনিধিদের নিকট গ্রীস সংক্রান্ত অচল অবস্থার সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সহিত বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের এক গোপন আলোচনার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ বেব্‌লার বলেন যে, পরে তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, রাজনৈতিক কমিটিতে গ্রীস সংক্রান্ত চতুঃশক্তির প্রস্তাবের ভোট গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি ঐরূপ আলোচনায় যোগদান করিবেন না। রাজনৈতিক কমিটিতে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ঐরূপ গোপন আলোচনার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। উক্ত প্রস্তাবে যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়াকে মারকোসের সৈন্যবাহিনীকে সাহায্যদান বন্ধ করিতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রীসের সহিত সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবে বিশেষ কমিটিকে পর্য্যবেক্ষণ চালাইয়া যাইতে এবং রিপোর্ট প্রদান করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে; এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ গ্রীসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ঘটনা-স্থল পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং যে মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। এগার জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য গ্রীসের উত্তর দিকস্থ তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে গ্রীসের গরিলা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও কলম্বিয়া উক্ত ছয় জন সদস্যের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারে নাই। রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড উক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদে আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়াকে গ্রীসের গরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করিলে উহা সাধারণ পরিষদে প্রেরিত হয় এবং সাধারণ পরিষদ ১৯৪৭ সালের ১৩ই অক্টোবর এই বিশেষ কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিশেষ কমিটি তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং গত মে মাসে (১৯৪৮) তাঁহাদের রিপোর্ট লেখার কাজ আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, পাকিস্তান, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিশেষ কমিটির সদস্য।

গ্রীসের সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ারও একটি প্রস্তাব ছিল। উক্ত প্রস্তাবের এক অংশে গ্রীস হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য এবং বিদেশী সামরিক ব্যক্তিবর্গকে অপসারিত করিবার এবং বিশেষ কমিটি বাতিল করিয়া দিবার দাবী করা হয়। প্রস্তাবের এই অংশ ৩৮—৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এগার জন সদস্য ভোট দেন নাই। প্রস্তাবের আর এক অংশে গ্রীসকে বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই অংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের অপর এক অংশে সীমান্ত সংক্রান্ত মীমাংসার জন্য এক দিকে গ্রীস এবং অপর দিকে যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়াকে আলোচনা বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবের এই অংশও ভোটে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবের যে অংশে বলা হইয়াছে যে, গ্রীসের অবস্থা গত বৎসর অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপেই ইহার জন্য দায়ী, ঐ অংশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক ও আর্থিক সাহায্যই বর্ত্তমান গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে গ্রীসের জনসাধারণের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, আমেরিকার সামরিক, শাসন পরিচালন সংক্রান্ত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মিশনই বর্ত্তমানে গ্রীসের গবর্ণমেণ্ট পরিচালন করিতেছে বলিয়া ভিশিনস্কী যে অভিযোগ করিয়াছেন, কি আমেরিকা, কি বৃটেন কেহই তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। খণ্ডন করিবার উপায় তাহাদের ছিল না। কাজেই শুধু যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়াকে দোষ দিয়া লাভ কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃটেন ও আমেরিকা গ্রীসের সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করিতে একটুকুও লজ্জা বোধ করে নাই।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের বয়স বড় কম হ'ল না। এখন আর তাকে শিশু ব'লে অগ্রাহ্য বা তার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মার্জ্জনা করা চলে না। অন্যান্য দেশের মত এ দেশেও জাতীয় জীবনের মধ্যে দিন-কে-দিন বেড়ে উঠছে তার প্রভাব।

কিছু কাল আগেও আর্টের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের আভিজাত্য বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করতে চাইত না। কিন্তু প্রতীচ্যের কয়েকটি দেশে চলচ্চিত্রের অভাবিত অভিব্যক্তি দেখে আজ বিরুদ্ধ-বাদীদেরও মুখ বন্ধ হয়েছে। খুব উচ্চশ্রেণীর মনেরও খোরাক সে আজ জোগাতে পারে। চলচ্চিত্রের নট-নটীরা কোন্ দরের শিল্পী তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন বা তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন দিক্ দিয়ে সমগ্র ভাবে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, অর্দ্ধ শতাব্দী আগে যা ছিল একটা বিস্ময়কর খেলনা মাত্র, আর্টের জগতে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র আসন দাবি করবার অধিকার আজ তার হয়েছে।

কিন্তু বাংলা দেশের বালক-বালিকাদের এবং বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের খেলা-ঘরে যে চলচ্চিত্রের পরম আদর, তার মধ্যে যথার্থ আর্টের প্রকাশ আছে কতটুকু? এখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ভালো ছবির সঙ্গে পরিচয় যে হয় না এমন কথা বলছি না। কিন্তু তেমন সব ছবির সংখ্যা গোণা যায় আঙুলের ডগায়। একটি মাত্র কোকিল প্রকাশ করতে পারে না বসন্তের সৌন্দর্য্যোৎসব।

প্রতীচ্য থেকে ছবির-পর ছবি এ দেশে আসছে, ভারতের দর্শকরা দলে দলে তাদের দেখতে যাচ্ছে এবং দেখে অভিভূত হচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু সাগরের ওপারে যাত্রা করবার শক্তি ও সাহস আছে ক'খানি দেশী ছবির?

তার্কিক হালে পানি না পেয়ে মাথা নেড়ে বলবেন, "দেশী ছবি ওরা বুঝবে কেমন ক'রে? ওরা কি এ দেশের ভাষা জানে?"

কিন্তু ভাষা জানা আর না-জানাটাই বড় কথা নয়। কথা কইতে শেখবার পর থেকে ছবির সর্ব্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে আংশিক ভাবেই—সমগ্র ভাবে নয়। কলকাতার সব ছবিঘরে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, বিলাতী সবাক চিত্র দেখে যারা মুগ্ধ ভাবে উপভোগ করছে, তাদের মধ্যে আছে ইংরেজী ভাষায় অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বহু ব্যক্তি—এমন কি একেবারে নিরক্ষর লোকও।

ভাষার কথা ছেড়ে দিন। সাগরপারে গেলে দেশী ছবির দারিদ্র্য প্রকাশ পাবে নানান্ দিক দিয়ে। গল্পের দারিদ্র্য, চিত্র-নাট্যের দারিদ্র্য, আলোকচিত্রের দারিদ্র্য, শব্দগ্রহণের দারিদ্র্য, অভিনয়ের দারিদ্র্য, সঙ্গীত-চালনার দারিদ্র্য, পরিচালনার দারিদ্র্য। অথচ দেশী ছবি আজ শিশু নয়, সে এসে দাঁড়িয়েছে যৌবন-সীমানার মধ্যে।

এই অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণ কি?

একটা বড় কারণ তো দেখতে পাচ্ছি, অনুকরণপ্রিয়তা।

আর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টি। যে নব নব উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতে পারে না, যে সৃজনক্ষম নয়, আর্ট হিসাবে সে ব্যর্থ, একেবারেই ব্যর্থ।

বাংলা তথা ভারতের চিত্রকলার প্রথম যুগে এ দেশের চিত্রকররা ছবি আঁকা শিখতেন বিলাতের দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আবার শেখবার জন্যে বিলাতেও ছুটতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক জন অবনীন্দ্রনাথ বা এক জন নন্দলালও আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বড় জোর রাজা রবিবর্ম্মার শক্তি—ভারতকে দেখাতে গিয়েও যা দেখাতে পারেনি ভারতের আত্মা।

এক সময়ে এদেশে রবিবর্ম্মার কি জনপ্রিয়তাই ছিল! বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরাও (যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে হঠাৎ প্রাচ্য চিত্রকলার গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন) রবিবর্ম্মার ছবি প্রকাশ করবার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। একখানি ছবি দেখেছিলুম, "গঙ্গাবতরণ"। বিলাতী রঙে-রেখায় আঁকা নিসর্গ-দৃশ্যের মাঝখানে কোমরে দুই হাত দিয়ে মেলো-ড্রামাটিক এবং ফিরিঙ্গি ভঙ্গিতে দুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র-শঙ্কর ঊর্দ্ধমুখে মস্তকের উপরে ধারণ করছেন গঙ্গার ধারা। ছবি দেখে চারি দিকে উঠল প্রশংসার হৈ-চৈ, কিন্তু কেউ তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে না যে, এখানে হিন্দু দেবতাটির পরিকল্পনা আমদানি করা হয়েছে অহিন্দু শ্বেতদ্বীপেরই শিল্পশালা থেকে।

সেই রবিবর্ম্মা এবং তাঁর আর্টের সঙ্গে যথার্থ ললিতকলার কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাই শিল্পসমাজে তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। ভারতে স্বাধীন ও নিজস্ব চিত্রকলার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভূমিকা সঙ্গে করে রবিবর্ম্মাকে প্রস্থান করতে হয়েছে নাট্যমঞ্চের বাইরে। কারণ তিনি সৃষ্টি করেননি, করেছিলেন অনুকরণ।

আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পেরও অবস্থা হয়েছে ঐ রকম। সে পদে-পদে তালে-বেতালে করতে চাইছে সাধারণত ইয়াঙ্কি ছবির অনুসরণ—অথচ ললিতকলার ক্ষেত্রে আজ ও-সব ছবির বাজার-দর খুব চড়া নয়। কিন্তু ভারতের মাটিতে ইয়াঙ্কি প্যাঁচ কষলে বড় জোর লোককে চমকে দেওয়া চলে, কলালক্ষ্মীর প্রসাদ পাওয়া যায় না কিছুতেই। লাগসৈ হোক্ আর নাই-ই হোক্, হলিউড থেকে নতুন নতুন

প্যাচ এনে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে যন্ত্র-তন্ত্র! খালি কি প্যাঁচ? হলিউডের প্রায় সব রকম 'টেকনিক'ই আমাদের দেশী ছবির ভিতরে আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। ওখানকার চিত্রকাহিনীও আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বেমালুম চুরি করবার চেষ্টা হয়। এই সেদিন দেখলুম, বাংলা দেশের এক জন নামজাদা ঔপন্যাসিকও বিলাতী চিত্রকাহিনীকে নিজের ব'লে পরিচিত করতে লজ্জিত হননি!

কোন কোন বাংলা ছবিতে অতি-আধুনিক গৃহসজ্জা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সে সব ঘরের ভিতরে গেলে কিছুতেই মনে হবে না যে, আমরা স্বদেশে বাস করছি। বহু অতি-আধুনিক সম্রান্ত বাঙালীর বাড়ীর ভিতরে যাবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু কোথাও অমন সব গৃহসজ্জা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি! বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঐ সব ঘরের এবং সাজসজ্জারও পরিকল্পনা এসেছে বিলাতী চিত্র-ভাণ্ডার থেকে।

গল্প আছে, এক হঠাৎ-ধনী মাড়োয়ারি আধুনিক আদর্শে নিজের বৈঠকখানার দেওয়াল চিত্রবিচিত্র করবার জন্যে জনৈক শিল্পীকে নিযুক্ত করলে। কয়েক দিন পরে নিজের কাজ শেষ করে শিল্পী মাড়োয়ারিকে এনে দেখালে। মাড়োয়ারি দেখে-শুনে বললে, "সব তো ভালো হয়েছে বাবু, কিন্তু হনুমানজী কৈ?" শিল্পী বিস্মিত হয়ে শুধোলে, "হনুমানজীর ঠাঁই এখানে কোথায়?" মাড়োয়ারি বললে, "হনুমানজীকে ঠাঁই দিতে হবেই বাবু। তিনি না থাকলে এ ঘর মানাবে না।" তাই হ'ল। ঘরের এক দেওয়ালের মাঝখানে বিরাজ করতে লাগল হনুমানজীর মূর্ত্তি।

আমাদের কোন কোন চিত্রনির্ম্মাতারও মন হয়েছে ঐ মাড়োয়ারির মত। বিলাতী ছবিতে যা তাঁদের চোখে লাগবে, উদ্ভট হ'লেও এবং খাপ না খেলেও বাংলার ঘরোয়া ছবির যেখানে-সেখানে তাকে এনে বসিয়ে না দিয়ে তাঁরা ছাড়বেন না।

বহু দিন পরে একখানি ছবি দেখে আনন্দ উপভোগ করেছিলুম এবং তা হচ্ছে উদয়শঙ্করের "কল্পনা" বা "Fantasy"। ছবিখানির মধ্যে যে উদ্ভটতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা চিত্রকরের স্বেচ্ছাকৃত। ছবিটি একেবারে নিখুঁৎ বলতে চাই না। কিন্তু ওর প্রধান গৌরব হচ্ছে উদয়শঙ্করের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তির পরিচয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে গেলেও ঐ ছবিখানি প্রচুর প্রশস্তি অর্জ্জন করবে, কারণ ওর মধ্যে নেই বিলাতী ছবির অক্ষম অনুকরণ।

হ্যাঁ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তি। আর্টকে সৃজনক্ষম ও শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলতে পারে কেবল ঐ দু'টি দুর্লভ গুণই।

দেশী ছবি আর শিশু নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, আমাদের চলচ্চিত্রকেও তাই করতে হবে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় বাঙালীর গৃহমুখী মন করছে নব নব সৃষ্টি, আমাদের চলচ্চিত্রেও তা সম্ভবপর হবে না কেন?

পেশাদার অভিনয়

[পূর্বানুবৃত্তির পর]

জনৈক পেশাদার

চরিত্র-চিত্রণের সময় যে কৃত্রিমতা অভিনয়কে স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল ও প্রাণবন্ত করে সে সম্বন্ধে আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা শেষ করেছি।

এর পর আমরা বাচনের রীতিকে নিয়ে আলোচনা সুরু করব। কেন না, বাচন-ভঙ্গীই হোল চরিত্র পরিস্ফুটনের সর্বোত্তম হাতিয়ার এবং যে অভিনেতার এই হাতিয়ার নিপুণ নয় তার পক্ষে অভিনেতার জীবনের সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

সুষ্ঠু বাচনের জন্য অভিনেতার থাকা প্রয়োজন সংযত কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠের মধুর ধ্বনন। লোকে কথায় বলে, অমুক লোকের থিয়েটারী ঢঙ বেশ আছে, কিন্তু থিয়েটারী গলা নেই। সত্যিই, থিয়েটারী গলা নেই' বলে যে কতো প্রতিভাবান্ শিল্পীকে অকালে অভিনয়-গগন থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, সত্যিকার থিয়েটারী গলা ক্বচিৎ দু'-এক জনের কণ্ঠেই শোনা যায়। আর দুর্লভ বলেই লোকে বলে—ও ঈশ্বরের দান। বেগবান, গম্ভীর অথচ সংযত, ধ্বনিপ্রধান কণ্ঠের আবৃত্তি যখন কড়ি-কোমলের পর্দায় ঘা দিয়ে আমাদের দুটি কর্ণে মধুবর্ষণ করতে থাকে তখন স্বভাবতঃই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে এবং আমরা সেই মধুবর্ষণ শোনার জন্য এমন ব্যগ্র আগ্রহে কান পাতি যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই অভিনেতার চরিত্র-চিত্রণ আমাদের হৃদয় হরণ করে। এর চেয়ে বড়ো জিত আর অভিনেতার পক্ষে কিছু নেই। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই এই দুর্লভ কণ্ঠ-মাধুর্যের অধিকারী।

কিন্তু ঈশ্বরের দান যখন সকল মানুষের মধ্যে বণ্টিত নয় তখন তা নিয়ে আফশোষ করে কোন লাভ নেই। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালকবর্গ এই কথা বলে তরুণ অভিনেতাদের উৎসাহিত করেন যে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অনুশীলনের দ্বারা তারাও সেই কণ্ঠৈশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে। অবশ্য এর জন্য রীতিমত শিক্ষাই হোল প্রথম এবং প্রধান কথা।

মানুষের কণ্ঠদেশ এবং স্বরোৎপাদন কৌশল সম্বন্ধে এখানে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণা করলে হয়ত অনেকেই তা খুসী মনে গ্রহণ করতে পারবেন না, সেই কারণে আমরা তা থেকে নিরস্ত

বাঁকা লেখা চিত্রে কানন দেবী

হলাম। কেবল এইটুকু উল্লেখ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি যে, চেষ্টাকৃত পেশী-সঙ্কালনের দ্বারা আমরা যখন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে চীৎকারে রূপান্তরিত করি তখন যে কেবল কণ্ঠের মাধুর্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করি তা নয়, নানা জটিল রোগের জটিলতাও সৃষ্টি করি তার দ্বারা। অনেক লোকের ধারণা থাকে যে, চেষ্টার দ্বারা কণ্ঠের পেশীগুলিকে অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল করতে পারলেই উচ্চ স্বর নির্গত হতে পারবে। কিন্তু সে ধারণা একান্ত ভ্রান্ত। অভিনেতা যদি মনে রাখেন যে কণ্ঠ-মাধুর্য এবং স্বরের ধ্বননই তার অভিনয়-জীবনের সর্বোত্তম ক্যাপিটাল এবং একবার তা হারালে তিনি সম্পূর্ণরূপেই দেউলে হয়ে পড়বেন তা হলে এই ভাবে তিনি কণ্ঠকে পরিশ্রান্ত না করে বরং বিপরীত ভাবে তাকে যথাসম্ভব আরাম দেবারই চেষ্টা করবেন। মূলতঃ, কণ্ঠকে আরাম দেওয়াই অভিনেতার প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হওয়া উচিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই আরামই সু-অভিনয়ের ভিত্তি।

কণ্ঠ হোল কাণের জানালা, যার সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে ধ্বনি নির্গত হয়। অথবা পেশী-সঙ্কালনের ফলে সেই কণ্ঠ-সুড়ঙ্গ সঙ্কুচিত হয় এবং নিশ্বাসের সহজ সখ্যতায় যে শব্দোচ্চারণ স্বাভাবিক তা বিকৃত হয়ে পড়ে। অনভ্যস্ত কণ্ঠের চীৎকারে এই স্বরবিকৃতি হামেশাই আমাদের কর্ণপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে আমাদের নাট্যরস-পিপাসু মনকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়।

কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তোলার জন্য এক অভিনব উপায়ের কথা আবিষ্কার করেছেন গুণীরা। চীৎকার করে প্রেক্ষাগৃহের প্রান্ত থেকে প্রান্ত ধ্বনিত করে তোলার অপচেষ্টার কথা বিস্মৃত হয়ে অভিনেতাকে এই ছোট উপদেশটুকু মনে রাখতে হবে সব সময়। তিনি যখন পার্শ্ববর্তী চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করবেন তিনি এমন ভাবে কথা বলবেন যেন নিকটবর্তী মানুষটির কান আছে হলের শেষ প্রান্তে। উদাহরণটি আরো বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করলে এই রকম দাঁড়াবে। মনে করা যাক্, দুই বন্ধু হলের এক কোণে বসে নিম্নকণ্ঠে কথা কইছিলেন, এমন সময় উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছেন হলের দূরতম প্রান্তে। তখন এক জন সোৎসাহে অতিথিকে আহ্বান করলেন—এসো, এসো। অতি নিম্নকণ্ঠের আলাপের মধ্যে বন্ধুটিকে আহ্বান করে স্বর-নিক্ষেপ করা হোল। বন্ধুটি সে কথা শুনে আনন্দিত মুখে এগিয়ে আসতে লাগলেন। অথচ এই উচ্চকণ্ঠের স্বরনিক্ষেপের জন্য কোন অস্বস্তিকর চেষ্টাও করতে হোল না এবং তা করার জন্য কোন পীড়াদায়ক চিন্তাও এলো না মনে।

[ক্রমশঃ

● প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত বসুমিত্রের রহস্যবন ছবির কয়েকটি দৃশ্যে ধীরাজ, সিপ্রা ও শিশির মিত্র। ছবিটি কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে।

হলিউড তারকা—না—চীনামাটীর বাসন?

সম্প্রতি বৃটিশ মন্ত্রী হার্বার্ট মরিসনের সঙ্গে হলিউডের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ইনগ্রিড বার্গম্যানের এক চিত্তাকর্ষক আলাপ-আলোচনা হয়। "আণ্ডার ক্যাপ্রিকর্ণ" ছবির স্যুটিংএর সময় সম্প্রতি হার্বার্ট মরিসন মেট্রো গোল্ডউইনের ষ্টুডিওতে আমন্ত্রিত হন। ষ্টুডিওর সেটিংএ গিয়ে তিনি বার্গম্যানকে অপরূপ সাজে দেখতে পান। সান্ধ্য পোষাক পরা, চুলে গোলাপ গোঁজা বার্গম্যান তখন খালি পায়ে সবে মাত্র একটা দৃশ্য শেষ করছেন। দেখে মরিসনের অদ্ভুত লাগে। পরে চায়ের আসরে বার্গম্যানের সঙ্গে তাঁর অনেকক্ষণ আলাপ হয়। মরিসন ১৯৩৬ সালে একবার হলিউডে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, হলিউডের তারকাদের পোর্সিলেনের আসবাবের মত অত্যন্ত সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বার্গম্যান তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'আপনি ভুল করছেন মিঃ মরিসন, হলিউড তারকাদের চীনামাটীর বাসনের মত ব্যবহার করা হয়।" এ নিয়ে চায়ের আসরে হাসির ধুম পড়ে যায়।

সিনেমা-জগতের মানুষেরা যে আদর্শ জীবন যাপন করেন তার সম্বন্ধে লোকের ধারণা অস্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে অতিরঞ্জন প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অনভিজ্ঞ লোকেরা আসর জমিয়ে তোলার জন্য নানা গল্প আবিষ্কার করে এবং সেগুলি কৌশলে পরিবেশন করে আসর জমিয়ে তোলে। সম্ভবতঃ সিনেমা-জগতের মধ্যে হলিউড সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় প্রবল। হলিউড নাম শুনলেই সিনেমা-জগতের নরনারী উন্নাসিক হয়ে ওঠেন। অবশ্য তার অনেক কারণ।

একথা খুবই সত্য, যেখানে অর্থ, বিলাস ও বাহ্যাড়ম্বরই বাঁচার একমাত্র মাপকাঠি সেখানে নানা ব্যতিক্রম গড়ে ওঠেই। সুস্থ সমাজ-নীতি পদে পদে ব্যাহত হবার সংশয় ঘটে। সামাজিক বাধা-নিষেধের শাসন যেখানে প্রবল নয় সেখানে অসংযম স্বতঃস্ফূর্ত হবার সুযোগ নেয়। কিন্তু তথাপি এ কথা হয়ত জোরের সঙ্গেই বলা চলে যে, হলিউডের সমাজে যে জীবন-নীতি চালু তা পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে কোনো সমাজে পূর্বে ঘটেনি এ কথা সত্য নয়।

হলিউডে বাস করে নানা শ্রেণীর নরনারীরা। তার মধ্যে শ্রমিক, লেখক, প্রযোজক, শিল্পী এবং বিজ্ঞানকর্মীরা প্রধান। তা ভিন্ন যারা আছে তারা কোন না কোন কারণে এদের সঙ্গেই ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ এ কলোনীতে কোন ফালতু লোক নেই, কেবল মাত্র চাকুরীপ্রার্থী বেকাররা ছাড়া। অবশ্য তারাও সংখ্যায় কম নয়।

একই পরিবেশের মধ্যে যারা বৎসরের পর বৎসর এক কৃত্রিম জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যে হাঁফ ছাড়ার সুযোগ আসে না। সর্বদা এক চিন্তায় যাদের মন পঙ্কমগ্ন তারা স্বভাবতঃই হাল্কা ভাবে অবসর যাপন করার চেষ্টা করে। হলিউডের সমাজ সেই অবসর-বিনোদনের এক কৌতুকবহ পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে।

কনষ্টানস বেনেট একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, হলিউডে তারাই কল্কে পায় যারা চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে পারদর্শিতা প্রমাণ করতে পারে। এ কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ হোল, হলিউডের পার্টিতেই সিনেমার কাহিনী নিয়ে দরাদরি হয়, রেস্তোরাতে তপ্ত মস্তিষ্কে দলিল-দস্তাবেজ সই হয়ে নতুন কনট্রাক্ট নেওয়া হয়, বড়ো বড়ো নাচঘরে কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতায় কারেন্সী নোট ওড়ে বুদবুদ সম।

হলিউডে নামল রাত্রি। ভগবান তোমার পৃথিবীকে রক্ষা করো।

এ ধারণা কিন্তু যথার্থ নয়। যদিও হলিউডের নীতিকে বাঁচাবার পক্ষে এ যুক্তিও অচল। একদা যে অসংযত স্রোত হলিউডের আব-হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল আজ তার গল্পটুকুই বেঁচে আছে মাত্র। আজকের দিনে অনেক ক্লেদ ধুয়ে গেছে। যেটুকু পড়ে আছে তার মধ্যে রোমান্সের চেয়ে ট্রাজেডীর চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাইরের দর্শক তাই হতাশ হয়ে যান।

হলিউডের সমাজে ছোট ছোট কেন্দ্রই হোল প্রাণবিন্দু। আতিথেয়তা সেই প্রাণকে রস-সঞ্জীবিত করে। ভালো আহার্য, ছোট ছোট জলসা, মদ আর সিনেমারই গল্প সেই সব ছোট ছোট পার্টির একমাত্র প্রয়োজনীয়। যাঁরা কোন রেলওয়ে কলোনীতে বাস করেছেন তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কাজের পর যখন ছোট ছোট দল অবসর যাপন করতে বসে, অর্থাৎ গানের আড্ডা জমায়, তাসের আড্ডা জমায়, গাল-গল্পের আড্ডা জমায়, তখন গানের চেয়ে, তাসের চেয়ে, অন্য ধরণের গল্পের চেয়ে অফিসের গল্পই হয়ে ওঠে প্রধান। দলাদলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কিছুটা অস্বাভাবিকতা প্রবেশ করে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। হলিউড এই রকমেরই এক কলোনী এবং কলোনী-জীবনের দোষ-গুণ তার মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হয়ে গেছে।

সময় যাদের ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে প্রতিদিন সেই সময়টুকুর মত আতঙ্কজনক কিছু নেই। বাধ্য হয়ে তারা উদ্ভাবন করে নূতন নূতন কৌশল সেই দুর্বিষহ বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য।

যেমন আছো তেমনি এসো। সুন্দর একটি খেয়াল ও খেলা। যে কোন সময়ে নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়ে পৌছোল ঘরে ঘরে। এখনি উপস্থিত হোন অমুকের বাড়ীতে। সাজ বদলের সময় নেই। শরীর মার্জনার সময় নেই, সময় আছে শুধু হেঁটে যাবার অথবা গাড়ী করে সময় মত উপস্থিত হবার। পর্দায় যে মেয়ে পুরুষের চোখে মোহিনী, সে হয়ত সদ্য ঘুম-ভাঙা অবিন্যস্ত চেহারায় রাত্রির সাজেই এসে উপস্থিত। কোন পুরুষ দাড়ী কামাচ্ছিল, অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই সে এসে পড়ল। অন্যান্য শিল্পী ও পরিচালকবর্গও বিচিত্র সব অবস্থায় ও সাজে হাজির। তার পর হৈ-হুল্লোড়। বিচিত্র দেশের আজব কাণ্ড!

রবার্ট ইয়ং একবার একটি অভিনয়-প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছিলেন। শিল্পীরা তাদের শিশু বয়সের ছবি এনে জমা দিয়েছিল। তার পর চিনে নেওয়ার প্রতিযোগিতা। এতে কিছু সময় কাটে বটে—কিন্তু এরও শেষ আছে।

অনেকেই শিল্পি জীবনের অতিরিক্ত আরো কিছু শেখেন। তার দ্বারা পার্টিতে তাদের দাম বাড়ে।

হারল্ড লয়েড, ফ্রাঙ্ক মর্গান এঁরা হোলেন যাদুকর। তাসের খেলা দেখিয়ে যে কোন আসরে এঁরা নাম কেনেন। নর্মা শিয়ারার ভারসাম্যের খেলায় নিপুণা। মাথায় এক গ্লাস জল রেখে তিনি মাটিতে ওঠা-বসা করেন। এক ফোঁটা জলও ভেজাতে পারে না তার দামী দেহাবরণ।

এ ছাড়া আছে পার্টি দেওয়ার নূতন নূতন ঢঙ। পয়সা খরচের নিত্য-নূতন সুযোগ। বড় হোটেল ভাড়া নিয়ে তাকে সবশুদ্ধ আলিবাবার গুহায় রূপান্তরিত করে তার মধ্যে হৈ-চৈ করা। বড়ো বড়ো নৌকা ভাড়া করে প্রমোদ-বিলাস করা। এতে যে পরিমাণ খরচ হয় এক এক বারে তাতে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। ব্যাসিল র‍্যাথবোন ও তার স্ত্রী এ বিষয়ে খুবই অগ্রণী ও সাহসী।

এই সব পার্টিতে গৃহস্বামী যত খরচ করেন, তার চেয়ে খুব কম করেন না নিমন্ত্রিতেরা। এক এক পার্টিতে উপস্থিত হবার জন্য শিল্পীরা নতুন নতুন ফ্যাসানের পোষাক তৈরী করান। আর সাজ ও ফ্যাসানই হোল হলিউডের প্রেরণা। কোন কোন পার্টিতে ইতিহাসের সম্রাটদের সাজে উপস্থিত হবার নির্দেশ থাকে। সেই সব পার্টিতে চটকদার নিমন্ত্রিতদের দেখে দর্শকের মনে হাস্যরসের যোগান হয়। এক জন রিপোর্টার একবার বলেছিলেন যে, হলিউডের রীতি-নীতি ও খেয়াল দেখলে শিশু-জগতের কথা মনে হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা যেন মজার খেলা খেলছে রাজা-রাণী সেজে। অথচ এই সব জাঁকজমক ও চটকদার প্রমোদ প্রোগাম কোনটিই নূতন নয়। সবই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই রাজাকে কেন্দ্র করে অভিজাত শ্রেণীর এই ধরণের বিলাস ও খেয়ালীপণার ঐতিহাসিক বিবরণী আছে। এক দিন রাজরক্তে ও নীলরক্তে যা মানাত আজ তার চিন্তাও মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এই আজব কলোনীতে সেই অতীত দিনের দুঃস্বপ্নকে বাস্তব করবার এক সাধনা চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। আর সেই জন্যেই হলিউডের বিলাস ও আড়ম্বর এক চরম ট্রাজেডী মাত্র।

মদ হোল এই সব অবসর যাপনের প্রধান হাতিয়ার। বেটি ডেভিস একবার বলেছিলেন যে, হলিউডে আসার আগে তিনি কখনো মদ খাননি। কিন্তু হলিউডে বাস করতে গেলে মদ না খেলে অসামাজিকতার দুর্নাম রটে।

হলিউডেও শ্রেণিবৈষম্য প্রবল। এখানকার রাত্রি সেই শ্রেণিগত সমাজকে ঘিরে আবর্তিত হয়। অর্থই হোল কৌলিন্যের পরিচয় ও মাপকাঠি। এক-এক জন কর্তৃত্বশালী ধনীকে ঘিরে এক-একটি নড়ে চড়ে। পার্টিতেও সেই কৌলীন্য বজায় রেখে নিমন্ত্রণ-লিপি বিতরিত হয়। নীচুতলার লোক উঁচুতলায় পাত্তা পায় না। মধ্যবিত্তরা উচ্চ স্তরের দিকে উন্মুখ কিন্তু তাদের পা ধরে টানে নিম্নমধ্যবিত্তরা।

শিল্পীদেরও নিজস্ব ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশভেদে এই সম্প্রদায়ভেদ। ব্রিটিশ কলোনীর নেতৃত্ব করেন রোনাল্ড কোলম্যান, সি, অব্রে স্মিথ প্রভৃতিরা। কেলটিকদের প্রধান হলেন জেমস ক্যাগনি, স্পেন্সার ট্রেসি। অর্কেস্ট্রার দল পরিচালনা করেন জেনেট ম্যাকডোনাল্ড। তা ছাড়াও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তাদের শিবিরে আছেন মার্লিন ডিট্রিচ, কনস্টান্স বেনেট প্রভৃতিরা। রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সর্দার মেলভিন ডগলাস। তা ভিন্ন অর্থের আভিজাত্যে প্রযোজক ও পরিচালকদের মধ্যে স্পষ্ট শ্রেণিবিদ্বেষ।

হোটেল, রেস্তোঁরা ও নাচঘরেও এই কৌলীন্য ও ছুৎ প্রবল। এই সব আস্তানায় নানা প্রকারের জুয়ার চলন। বহু লক্ষ

ডলার যার মাসিক আয় সেও জুয়ায় পাঁচ ডলারের পুরস্কার পেয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে যেন সে চাঁদ হাতে পেয়েছে। তা ছাড়া অন্য ধরণের জুয়া তো আছেই।

আর এই সব হোটেল, পার্টি ও নাচঘর হোল হলিউড রমণীদের নিশ্বাসের বায়ু। সারা দিন মুখ বুজে থাকতে হয় তাদের, সাজ পোষাক আর বাজার তাদের কোন প্রাধান্য দিতে পারে না। এই সব পার্টিতে তারা হাঁফ ছাড়ে, তাদের দায়িত্বহীন কর্মহীন দিন-রাত্রির একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পায়। নিজেদের ফ্যাসানের নিপুণতা দেখাবার প্রতিযোগিতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। যারা চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করে তাদের প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে রূপালী পর্দা, পত্রিকা, ফটোগ্রাফার। কিন্তু এই সব শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজকদের বনিতাদের কে প্রচার করে? সুতরাং তারা নিজেরাই সে দায়িত্ব নেয়। ফটোগ্রাফারদের খুশী করে তারা সর্বোত্তম সাজে ফটো তুলিয়ে পত্রিকা অফিসে হানা দেয়। নানা ভাবে আত্মপ্রচারের সুযোগ নেয়। তা নইলে তারা বাঁচে কি করে। জুয়ার আড্ডায় এদের নিত্য যাওয়া-আসা। ছোট ছোট পার্টিতে এদের বিশেষ আমোদের ব্যবস্থা।

তা ভিন্ন এদের সব থেকে বড়ো দায়িত্ব হোল নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য পার্টি দেওয়া। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন লেখকরা, আসেন মাতব্বর প্রযোজক ও পরিচালকরা, আসেন যোগাযোগের দালালরা। সেইখানে তাদের খুশী করতে পারলে স্বামীর আয় ও যশের জন্য আর ভাবনা থাকে না।

স্বামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা ষ্টুডিয়োতে রক্ত জল করে যে অর্থ পান, তার শুভন দেখাবার দায়িত্ব থাকে স্ত্রীর কাঁধে। আর হলিউডের সহধর্ম্মিণীরা সে দায়িত্ব সানন্দে পালন করেন। দোকানে, রেসে, নাচঘরে সাজে-পোষাকে এবং বিলাসিতায় তারা যে কোন রাণীকেই হার মানাতে পারেন।

আর সবার উপরে সাজের বিলাসিতা ও নুতনত্ব। মানুষের আদিম বৃত্তি এখানে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছে। হলিউডের ধারণা, মেয়ে এমনি মেয়ে, পুরুষকে ভগবান পুরুষই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মেয়ে মানুষ মহিলা হয় দেহাবরণে, পুরুষ ভদ্রলোক হয় ফ্যাসানে। এর জন্য নীতি ও রুচিকে বারে বারে বদলে নিতে হয়, মেনেও নিতে হয়।

বিরাট কিছু করব, তাজ্জব কিছু দেখাব, অভূতপূর্ব আড়ম্বরে চমকে দেব, এ সব ধারণা ধীরে ধীরে হলিউড থেকে সরে যাচ্ছে। অসংযত জীবনের ঘূর্ণি শান্ত হচ্ছে আইনের শৃঙ্খলে, রুচির প্রভাবে। মুভি কলোনী সুস্থ সামাজিকতায় থিতিয়ে বসবার কঠিন প্রয়াস করছে। কিন্তু সে কি সহজ কথা! হলিউডের কাঁধের উপর শূন্যতা সিন্ধবাদের বৃদ্ধের মত চেপে বসে আছে। তা থেকে নিষ্কৃতি না পেলে সে সহজ জীবন পাবে না। আর যত দিন তা না পাচ্ছে তত দিন, পৃথিবীর লোকের উন্নাসিকত যাবে না হলিউডের কথায়। তত দিন হলিউড আত্মসম্মান-শীল সম্ভ্রান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কলোনী বলে পরিচিত হতে পারবে না।

ভারত-সরকারের লৌহ ও ইস্পাত বণ্টন-বিভাগের সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে যে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়, তাহাতে তিনি লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ছবিতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীভবতোষ ঘটক (সভাপতি), মিঃ স্পুনার, মিঃ সেট্না, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ (সহ সভাপতি), পুলিশ কমিশনার এস, এন [illegible] পাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র

১৮ই কার্তিক ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্র উত্থাপিত করিয়া শাসনতন্ত্র প্রয়োগকারী কমিটির সভাপতি ডাঃ আম্বেদকর খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করেন। গণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষা কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া এই খসড়া শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ীই করা হইয়াছে। কাজেই ডাঃ আম্বেদকরের নিজের রচিত এবং কংগ্রেস-অনুমোদিত খসড়া শাসনতন্ত্রকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার মতে ইহা কি যুদ্ধের, কি শান্তির সময়, সর্ব্বাবস্থাতেই প্রযোজ্য এবং দেশকে সংহত রাখিবার উপযোগী। তিনি বলিয়াছেন,—"নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে যদি কখনও দেশের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, শাসনতন্ত্র খারাপ বলিয়া ঐরূপ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে না, মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়াই উহা ঘটিবে।" এই কথার প্যাঁচে শাসনতন্ত্রকে খারাপ বলিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে গণ-পরিষদের সদস্যগণ বাদে আর সমস্ত দেশবাসীর উপরেই কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। "মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ" এই দোহাই দিয়া দলবিশেষের ডিক্টেটরশিপ চিরস্থায়ী করিবার জন্য দেশের উপর এইরূপ শাসনতন্ত্র চাপাইবার চেষ্টা কেবল অশান্তির বীজই বপন করিবে।

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে এই গণ-পরিষদ গঠিত হয় নাই। ইহা ভারতের শতকরা ১৩ জনের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং এই গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র ভারতের নির্ব্বাচকমণ্ডলী গ্রহণ করেন কি না, তাহা নির্দ্ধারণের বিধান থাকা উচিত। প্রতিনিধিমূলক দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্যই বোধ হয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভোটদাতার মধ্যে পার্থক্যের কথা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই শুধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইবেন, এইরূপ অব্যর্থ ব্যবস্থা করা কিরূপে সম্ভব, তাহা লইয়াও তিনি মাথা ঘামাইতেছেন। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মূল নীতিকেই কি কৌশলে এড়াইয়া শুধু কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের মনোমত লোককে নির্ব্বাচনে জয়ী করিবার উপযোগী ব্যবস্থা করা? জনগণের প্রতি যাঁহাদের এত অবিশ্বাস, তাঁহাদের দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করা যে সম্ভবপর নয়, খসড়া শাসনতন্ত্রে তাহা সুস্পষ্ট। এমন কি, গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তও গণতন্ত্রসম্মত নহে। মহীশূর, বরোদা, যোধপুর, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যের নৃপতিদিগকে ৪১ জন প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার দেওয়া সম্পর্কে না কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ছয়টি দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের রাজপ্রমুখকে ২৪ জন সদস্য মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যে সকল দেশীয় রাজ্য প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ঐ ঐ প্রদেশের গবর্ণর সদস্য মনোনয়ন করিবেন। সোজা কথায়, বৃহৎ নেতৃত্বের অভিপ্রায়ে চলিবেন, দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সেইরূপ প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের জনগণের কথা বিবেচনা করা হয় নাই।

যদিও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতেই এই শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে, যাহার ফলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কার্য্যতঃ ব্যর্থই হইবে। কেন্দ্রে উচ্চতন এবং নিম্নতন দুই পরিষদের প্রস্তাব এই সকল ত্রুটির অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে জরুরী ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবও অন্যতম গুরুতর ত্রুটি। প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। তার পর আছে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন। কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে আদালতে গ্রহণযোগ্য না করায় জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ইউনিটারী শাসনতন্ত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব, ডাঃ আম্বেদকর তাহারই দৃষ্টান্তরূপে ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রকে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিচার-ব্যবস্থা, মৌলিক বিধানগুলির ঐক্য এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই সিভিল সার্ভিস—এই তিনটি উপায় গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রদেশগুলির হাতে যে কোন ক্ষমতা কার্য্যত রাখা হয় নাই, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহা উল্লেখ করেন নাই। খসড়া শাসনতন্ত্রটি বৃটিশ আমলের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অতি নিকৃষ্ট নকল ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, যে সকল ধারা ভারত শাসন আইন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলি শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন সংক্রান্ত এবং যদিও ঐগুলি শাসনতন্ত্রে স্থান না পাওয়াই উচিত ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন, তথাপি শাসনতন্ত্র বিকৃত হওয়ার আশঙ্কার জন্য তিনি উহা সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"জনসাধারণকে যদি মনে-প্রাণে শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে দেখা যায়, তাহা হইলেই শুধু শাসনতন্ত্র হইতে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনবিধি বাদ দেওয়ার ঝুঁকি লইয়া উহা আইন-সভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" এই উক্তির মধ্যে তাঁহার সুদৃঢ় ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, শাসনতন্ত্রের জন্য জনসাধারণ নয়, জনসাধারণের জন্যই শাসনতন্ত্র।

সমগ্র শাসনতন্ত্রের মধ্যে ডাঃ আম্বেদকর মাত্র একটি ত্রুটি লক্ষ্য

করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কেন্দ্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রের সহিত প্রদেশ-সমূহের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে, তাহা সুখকর নহে। সুখকর না হইলেও তিনি আশা করিতেছেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই পার্থক্য বিলোপ হইবে। অবশ্য আশা না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের পক্ষপুটে দেশীয় নৃপতিগণ আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষক, এখন কংগ্রেসকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রধান স্তম্ভ।

আলোচনার সূত্রপাতে সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য শেঠ দামোদর-স্বরূপ একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন,—"স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ভারতীয় নরনারীর ইচ্ছার ভিত্তিতে রচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান গণ-পরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই। এই অবস্থায় গণ-পরিষদ মনে করেন যে, ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের পার্লামেণ্টরূপে কার্য্য চালাইয়া যাইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে একটি নূতন গণ-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।" ইহা দেশবাসীর মতেরই প্রতিধ্বনি। বলা বাহুল্য যে, এই প্রস্তাব বাতিল হইয়াছে, কারণ এই গণ-পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাই প্রবল, এবং কংগ্রেস জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়াই কার্য্য চালাইতে বদ্ধপরিকর। ইহাই কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি। গণতন্ত্র ও প্রগতিবিরোধী অসংখ্য ব্যবস্থাকে আজ জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়া বলা হইতেছে,—"গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিও না, দেশনেতাদের কথা মানিয়া লও।" আর এই ব্যবস্থা মানিতে না চাহিলে জনসাধারণকে দমন করিবার সমস্ত আয়োজনই তথাকথিত গণ-পরিষদ করিয়াছেন।

সংশোধিত তৃতীয় ধারা

ভাষার ভিত্তিতে বৃটিশ আমলের প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গালা ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের দাবী বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নেতারা যে কিরূপ জঘন্য ষড়যন্ত্র সুরু করিয়াছেন গণ-পরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর ডাঃ আম্বেদকরের তৃতীয় নম্বর ধারাটির সংশোধন প্রস্তাবই তাহার নিদর্শন। মূল খসড়ায় ছিল যে, ভারত পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা কোন ষ্টেটের অংশবিশেষ পৃথক্ করিয়া অথবা দুই বা অধিক ষ্টেট একত্র করিয়া কিংবা কয়েকটি ষ্টেটের অংশ লইয়া একটি নূতন ষ্টেট গঠন করিতে পারিবেন; কোন ষ্টেটের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন এবং নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম দিতে পারিবেন। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ পার্লামেণ্টে এরূপ আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু, ভারত সরকারও ইচ্ছামত যখন-তখন কিছু করিতে পারিবেন না। কোন ষ্টেটের যে এলাকা পৃথক্ হইতে বা উহার বাহিরে যাইতে চাইবে, সেই এলাকায় স্থানীয় আইন সভার যে সকল প্রতিনিধি থাকিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশ একমত হইয়া যদি ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করেন কিম্বা যে ষ্টেটের সীমানা অথবা নাম প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি দ্বারা প্রভাবিত হইবে, সেই ষ্টেটের আইন-সভা যদি সমর্থনসূচক প্রস্তাব পেশ করেন, তবেই ভারত সরকার পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিষদ যথেষ্ট আগ্রহের সহিত তিন নম্বর ধারার আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নূতন প্রদেশ গঠন, বর্ত্তমান প্রদেশগুলির সীমানা পরিবর্ত্তন, নাম পরিবর্ত্তন ও নূতন নামকরণ এবং আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির অবাধ অধিকার একমাত্র ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উপরই ন্যস্ত করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত ধারাতে ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সম্ভাবনা অনেকখানি খর্ব্ব করা হইয়াছিল। কারণ এই ধারা অনুসারে আপনা হইতেই বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার কোন কথাই ছিল না। বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছা থাকিলেও রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অনিচ্ছাতে বাঙ্গালার দাবী ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু তবু সামান্য ক্ষীণ আশা ছিল, যদি রাষ্ট্রপতি মহাশয় সুবিবেচক হন। সেই আশার রেখাটিকেও মুছিয়া দিবার জন্য ডাঃ আম্বেদকরের সংশোধন প্রস্তাব। তাহাতে বলা হইয়াছে,—"ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চলের সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভারতীয় পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টকে (রাষ্ট্রপতিকে) এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রেসিডেণ্টকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভিমত গ্রহণ করিতে হইবে।" গণ-পরিষদে শতকরা ১৩ জন দেশবাসীর প্রতিনিধিদের ভোটে এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের ফল যে কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং তাঁহারা হইবেন শক্তিহীন। 'গণতন্ত্রের অর্থই সংখ্যাগুরুদের শাসন' এই শ্লোগানের আড়ালে বিরাজ করিতেছে স্বৈরাচার। যে সকল প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়া কংগ্রেস আজিকার শক্তি ও পোজিশন অর্জ্জন করিয়াছেন এখন ক্ষমতা হাতে পাইয়া সেগুলি বিসর্জ্জন দিতেছেন। আসল কথা, বৃটিশ আমলের শাসন শোষণ, সব-কিছুরই ঠাঁট কংগ্রেস সরকার আজ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। তাই ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবীকে অন্যান্য অনেক প্রতিশ্রুতির মত দাবাইয়া রাখিতে চান। স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিয়া জনসাধারণের ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পূর্ব্বাচল প্রদেশ

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস এত দিন স্বীকার করিয়া আসিলেও আজ সেই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে না চাওয়ার ফলে ভারতের বহু প্রদেশেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ফলে ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অভাগা বাঙ্গালীরাই যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিহারের বাঙ্গালীদের দুরবস্থা যে আজ কতখানি তাহা সকলেরই ভাল করিয়া জানা আছে। কিন্তু এই দুরবস্থা কেবল বিহারেই সীমাবদ্ধ নহে। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী আসামেও বাঙ্গালী-দের একঘরে করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে প্রবল চেষ্টা শুরু হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল বাঙ্গালী আসামে বসবাস করিতেছেন, আসামের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের আসামের লোক বলিয়া আসাম সরকার স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ছাত্রবৃত্তি ও সরকারী চাকুরীতে অসমীয়া

ভাষা না জানিলে বাঙ্গালীদের বিতাড়ন করিবার গোপন ও প্রকাশ্য চেষ্টার নিদর্শন প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এই অবস্থায় আসামের বাঙ্গালা-ভাষাভাষী জনসাধারণ যে বাঙ্গালীদের লইয়া স্বতন্ত্র একটি সীমান্ত প্রদেশ গঠনের দাবী তুলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা, লুসাই ও গারো পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া একটি পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠন করিবার জন্য গণ-পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী যে সকল অঞ্চল আজ আসামের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে—ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের কোন দিক্ দিয়াই সেগুলিকে আসামের মধ্যে পুরিয়া দিবার বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নাই। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালীকে ভয় করিতেন এবং সর্ব্ব রকমে পঙ্গু করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চাল চালিবার জন্য তাঁহারা যে অপকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দ যদি তাহাই আঁকড়াইয়া থাকেন, তবে পুরাতন আমলের সহিত নূতন আমলের পার্থক্য কোথায়? গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলে পাহাড়ীরাই প্রধান অধিবাসী হইলেও ঐ অঞ্চলগুলিকে আসামের সহিত যুক্ত রাখিবার কোন হেতুই নাই, কারণ ঐ স্থানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বারো হাজারের কাছাকাছি হইলেও অসমীয়াদের সংখ্যা ছয় হাজারেরও কম। লুসাই পাহাড়ের অবস্থাও অনুরূপ। এই অবস্থায় কংগ্রেসের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড়কে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়া খাসিয়া, জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চল, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, লুসাই পাহাড় ও মণিপুর লইয়া একটা পৃথক্ সীমান্ত প্রদেশ গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সীমান্ত অঞ্চল সুদৃঢ় করার কাজে এই নূতন প্রদেশ অনেকখানি সাহায্য করিবে। সর্দ্দার প্যাটেল এই পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চল সমূহ আসামের সহিতই সংযুক্ত থাকিবে। আত্মরক্ষার তাগিদেই আসামের বাঙ্গালীদের এই দাবী লইয়া প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ না করিলে দাবী পূরণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

ভারত কি কমনওয়েলথে থাকিবে?

আমাদের নেতৃবর্গ এত দিন বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভারত বৃটিশের সহিত সম্পর্কশূন্য স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইবে। কংগ্রেসের প্রস্তাবেও তাহাই আছে। জনগণও তাহাই চায়। বৃহৎ নেতৃত্ব কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। জনমতকেও শান্ত রাখা প্রয়োজন। তাই আয়ার যখন বৃটেন তথা বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত তাহার শেষ ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করিল, তখন বৃহৎ নেতৃত্ব ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার জন্য পথ সন্ধানে ব্যস্ত। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি ডোমিনিয়ন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতকে কমনওয়েলথে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা হইবে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত নেহরু দেশবাসীর কাছে বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন নাই। অথচ আজ ভারত-কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ে একটি খসড়া ফরমুলার অস্তিত্বের কথা শোনা যাইতেছে। লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলী, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং কোন কোন ডোমিনিয়ন রাজনীতিকদের সহিত পণ্ডিত নেহরুর আলোচনার ফলেই না কি এই খসড়া ফরমুলা রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার অন্যান্য সহযোগীদের ইহা গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আলাপ-আলোচনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে না-কি বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলীকে রীতিমত ওয়াকিবহাল রাখা হইতেছে।

এই খসড়া ফরমুলা সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, দুইটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। প্রথম, পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া বৃটেনের সহিত একটি সন্ধি করা। দ্বিতীয়, কমনওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য দ্বৈত নাগরিক অধিকার প্রবর্ত্তন করা। দ্বৈত নাগরিক অধিকার বলিতে বুঝায় যে, কমনওয়েলথের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা নিজ নিজ নাগরিক হিসাবে যেমন প্রাথমিক মর্য্যাদা লাভ করিবেন, তেমনি বৃহত্তর রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমনওয়েলথের এক জন হিসাবে সাধারণ মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন। ইউ-এন-ওতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে ভারতের মর্য্যাদা যে ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, তাহার পর আর মর্য্যাদার কথা না বলাই ভাল।

বিলাতে যাইয়া পণ্ডিত নেহরু বহু স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে গলিয়া গিয়া তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা চিন্তা করা বোধ হয় ঠিক হইবে না। তবে কি কমনওয়েলথে থাকিবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ আবার ভারত জয়ের চেষ্টা করিবে এ-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার হুমকীর দ্বারা চাপ দেওয়া যাইতে পারে। বৃটিশের প্রিয়পাত্র পাকিস্তান যে বৃটিশের কথামত চলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তাছাড়া কম্যুনিজম ভীতির চাপ দেওয়াও অসম্ভব নয়। চীনে কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার জোগাড় চলিতেছে। মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া সর্ব্বত্রই কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারত যে শীঘ্রই কম্যুনিষ্ট-বেষ্টিত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কা রহিয়াছে। রাষ্ট্রনায়করা বিলক্ষণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন ভারতও শেষে কম্যুনিষ্ট না হইয়া যায়! এই অবস্থায় ভারত একমাত্র বৃটেনের দিকেই সাহায্যের জন্য তাকাইতে পারে। ইহার অর্থ, উক্ত সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন। ভারতের সম্মুখে আজ উভয় সঙ্কট। এক দিকে কম্যুনিজম, অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ। নেতাদের ইচ্ছা কম্যুনিজমের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় লওয়া। একমাত্র বৃটিশ-সম্পর্কশূন্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই ভারত এই উভয় সঙ্কট এড়াইতে পারে, ইহাই জনগণের ধারণা ও বিশ্বাস।

সর্দ্দারজীর সত্যভাষণ

জন্মদিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন,—"পুঁজিবাদ ধ্বংস করার যে সব কথা উঠিয়াছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। গভর্ণমেণ্ট পুঁজিপতিদের শত্রু নহেন। পুঁজিবাদ লোপ করিলে যদি দেশের মঙ্গল হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিত, তবে আমিই সর্ব্বপ্রথম পুঁজিবাদ লোপ

করিতে বলিতাম। কিন্তু পুঁজিবাদ বিলোপে দেশের কল্যাণ হইবে না।" এমন স্পষ্ট ভাবে কংগ্রেসের ধনিক তোষণ-নীতির কথা সর্দ্দারজী ছাড়া আর কে ঘোষণা করিতে পারিতেন ?

সর্দ্দার প্যাটেল আরও বলিয়াছেন,—"শ্রমিক, মালিক, কর্ম্মচারী, ধনি-দরিদ্র সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমরা যে পথে চলিয়াছি, সেই পথেই যদি চলিতে থাকি, তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য্য।" সর্দ্দারজী যে একটি সত্য কথা স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার প্রভৃতিই যে দেশের দুরবস্থার হেতু, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মিল-মালিকদের উদ্দেশ্যে এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন,—"অতিলাভের জন্য আপনাদের উপর যে দোষারোপ করা হয়, আপনারা তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।" শুধু এখনই নহে, ইতিপূর্ব্বেও ভারত সরকারের নেতারা কাপড়ের চোরাবাজার করিয়া দেশের লোকের রক্ত নিঙড়াইয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিবার জন্য শিল্প-মালিকদের অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত করিবার জন্য কল-কারখানার অধিপতিরা যে চেষ্টা করিতেছেন, সরকারের রেল বিভাগের বিবৃতিতে সে কথা গোপন করা হয় নাই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার জন্য তাঁহাদের সায়েস্তা করিবার জন্য সর্দ্দারজী ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? তাঁহার বক্তৃতায় তো তোষণ ও সহানুভূতিই প্রকাশ পায়।

বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যা

৬ই অগ্রহায়ণ ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুদের প্রাণ ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে এক চুক্তি হইয়াছিল। পাকিস্তান ঐ চুক্তির একটি সর্ত্তও পালন করে নাই। যদি পালন করিত তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা ভিটামাটি ছাড়িয়া এই ভাবে চলিয়া আসিত না। কাজেই কলিকাতা চুক্তি কত দূর কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য সম্মেলনের নূতন করিয়া কার্য্যতঃ কোন সার্থকতা নাই। পাকিস্তানী নেতাদের কার্য্যকলাপ ও ভারতের বিরুদ্ধে নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার দেখিয়া তাঁহাদের কোন প্রতিশ্রুতির উপরই নির্ভর করা চলে না। ২৫ লক্ষের অধিক হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসা সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গের এক জন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যেখানে বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের একটি হিন্দুও বাস্তুত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই, সেখানে আলোচনা বৃথা।

অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শুধু পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ আর কত দিন চলিতে পারে, ইহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী গবর্ণমেণ্ট সমূহের মনোভাবও বাঙ্গালী-বিমুখ। সেদিক্ দিয়া কোন সাহায্যের ভরসা নাই। নয়া দিল্লীর রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, হয়ত শীঘ্রই এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইবে, যখন পাকিস্তানকে ভারতবাসী মুসলমানকে গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় তো বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের বসবাসের জন্য পাকিস্তানের কতকগুলি অঞ্চল ভারতকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কতক অঞ্চল, বিশেষ করিয়া সমগ্র নদীয়া, খুলনা ও যশোহর জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি বিশেষ বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাকিস্তানী হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিবরণের কোন অংশ যে অসত্য বা অতিরঞ্জিত, তাহা বলিবার সাহস পাকিস্তানী গবর্ণমেণ্টের হয় নাই। পাকিস্তান গণ-সমিতির নেতারাও বাস্তুত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, একে তো শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি নাই; তাহার উপর ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। অকারণে বিশিষ্ট হিন্দুদের ঘর-বাড়ী রেকুইজিশন করা হইতেছে এবং উদ্বাস্তু বসবাসের কোনরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে না। বিহার হইতে আগত মুসলমানরা জোর করিয়া হিন্দুদের ঘর-বাড়ী দখল করিতেছে, অথচ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে পক্ষপাতিত্ব করা হইতেছে। সরকারী শিক্ষানীতি অমুসলমানের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিরোধী। কয়েকটি এলাকায় সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ চলিতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ তাহা আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না। এই সমাজ-বিরোধী কার্য্য-কলাপগুলির স্বরূপ যে কি, তাহা পাকিস্তান গণ-সমিতির নেতারা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন হিন্দুই বয়স্থা কন্যা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বাস করা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা মুসলমান যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইহার পর হিন্দুরা যে পাকিস্তান ত্যাগ করিতে চাহিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

অথচ পাকিস্তানী কর্ত্তারা বলিতেছেন যে, হয়তো কয়েক জন হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে জন্য পাকিস্তানী কর্ত্তৃপক্ষের অথবা কর্ম্মচারীদের কোনরূপ দায়িত্ব নাই। দোষ হিন্দুদের নিজেদেরই। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন, ভারতীয় নেতারা পাকিস্তানের হিন্দুদের দুর্গতি সম্বন্ধে কাল্পনিক চিত্র-সম্বলিত বিবৃতি প্রচার করিতে লাগিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও না কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলমানদের উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তু ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। চমৎকার যুক্তি! ইহার পর আর বলিবার কিছুই নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে যে প্রেস-নোট প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপসংহারে বলা হইয়াছে,—"পরস্পরের প্রতি দোষারোপের সময় ইহা নহে। চিন্তানুসন্ধান এবং আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য যুক্ত-কর্ম্মপন্থা গ্রহণই বর্ত্তমান সময়ের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার।" ইহার একমাত্র সহজ ও সরল অর্থ এই যে, উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবের জন্যই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুরা নিরাপদে, নির্ভীক ভাবে এবং সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছেন। কেহই ভারতীয় ডোমিনিয়ন ছাড়িয়া পাকিস্তানে যাওয়ার কল্পনাও করিতেছেন না। বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিতেছে শুধু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা। ইহার অর্থ কি অত্যন্ত স্পষ্ট নহে ? সহযোগী ইত্তেহাদ

লিখিয়াছেন,—"কিন্তু পূর্ব্ব-বাংলা সরকারের আলোচ্য প্রেস-নোটে প্রদর্শিত দুইটি কারণের দিকে আমরা উভয় সরকারের এবং উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না।" এই দুইটি কারণের একটি পূর্ববঙ্গের নেতাদের পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসা এবং অপরটি উভয় বাঙ্গালার মধ্যে যাত্রী ও মাল-চলাচলের বাধা-নিষেধ আরোপ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিপীড়িত হইয়া বাস্তত্যাগ করিতেছে, এই আসল কারণটি বাদে আর যত কিছু অসম্ভব বা অসংলগ্ন ঘটনা বা ব্যাপারকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তত্যাগের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পূর্ববঙ্গ সরকার ও 'ইত্তেহাদে'র আপত্তি নাই।

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের সম্পর্কে ভারত সরকার কিছুটা মাথা ঘামাইতেছেন। কিন্তু এখনও কোন সমাধান ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত ছিল, কারণ এই অবস্থার জন্য প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বই দায়ী। এই সম্পর্কে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, —"পাকিস্তানের কর্তারা যদি পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে তাড়াইয়া দিতে চান, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালার মুসলমানেরা যতটুকু অংশ দাবী করিতে পারিতেন, র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কৃপায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জমি পাইয়াছেন। এখন যদি আবার পূর্ববঙ্গ হইতে সমস্ত হিন্দুকে তাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত হিন্দুদের বাসোপযোগী জমিও তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বসতি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের দুই-এক জন কংগ্রেসী নেতা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট হইতেও এইরূপ উপদেশ মিলিয়াছে। কিন্তু সে উপদেশ অনুসারে কাজ করিবার বেশী লোক পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এখন সকলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন যে, বাস্তহারাদের পাকিস্তানের কিয়দংশ দাবী করা উচিত এবং ইহার জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

পাঞ্জাবে অধিবাসী-বিনিময় কংগ্রেসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ইহা বেশ বুঝিয়াছেন যে, কংগ্রেসী নেতারা অধিবাসী-বিনিময়ের প্রস্তাব কিছুতেই করিবেন না। ভারতে মুসলমানরা সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া বিচরণ করিতেছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্ট চাপে পড়িয়া অধিবাসী বিনিময়ের প্রস্তাব করিলেও পাকিস্তান তাহাতে রাজী হইবে না, কারণ ভারতে মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিরাপদে বাস করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আঘাত লাগিবে। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট তথা কংগ্রেসী নেতারা ইহা পছন্দ করিবেন না। পাকিস্তানী নেতারা ইহাও বুঝেন যে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি পূর্ববঙ্গে ঘটিলে ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের মত হওয়া উপেক্ষার বিষয় নয়। এই সকল কারণেই পূর্ববঙ্গে পশ্চিম-পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম এবং কৌশলপূর্ণ উপায়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, এই ভাবে চাপ দিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা। এই জন্য হিন্দু মেয়েদের বিবাহ করিবার জন্য মুসলমান যুবকদের এত উৎসাহ। সমস্তই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফল।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তত্যাগ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেব যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই—"হিন্দুরা যে দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ দায়িত্বই নাই; এবং বাস্তত্যাগ বন্ধ করাও পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত হিন্দু-নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মিছামিছি চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, পূর্ববঙ্গে বাস করা হিন্দুদের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে। তাঁহাদের চীৎকার শুনিয়া পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের মনে অযথা আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে এবং তাঁহারা তাড়াতাড়ি সব ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটিতেছেন। এইরূপ করিবার কারণ আসন্ন নির্ব্বাচনে জয়লাভ করাই এই সকল নেতার লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের নেতাদের ভোট দিবেন; এই ভোটের সাহায্যে তাঁহারা দলবলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া ফেলিবেন।" পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সহিত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিরোধ বাধাইবার কৌশল হিসাবে এই যুক্তির যে মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেব সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের এখনও বিলম্ব আছে এবং পূর্ববঙ্গের সব হিন্দুও যদি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য লাভ করার কোন সম্ভাবনাই তাঁহাদের নাই।

নুরুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববঙ্গে একটিও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। কথাটি সত্য, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া হিন্দুদের নিপীড়িত করিবার আরও যে সহস্র উপায় আছে, তাহাও তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষ সরকারী প্রয়োজনের অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট যদি বিশিষ্ট হিন্দুদিগকে দুই দিনের নোটাশে তাঁহাদের পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করেন, নিরাপত্তার দোহাই দিয়া কেবল হিন্দুদেরই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন, পূর্ব্বে যে সকল স্থানে কস্মিন্ কালেও গো-হত্যা করা হইত না, সেই সকল স্থানে যদি গো-হত্যার ধুম পড়িয়া যায়, মুসলমানেরা যদি বিনা বাধায় হিন্দুদের জমি হইতে ধান কাটিয়া লইয়া যায়, তাহাদের গরু-বাছুর চুরি করিয়া খাইয়া ফেলে, গাছ হইতে ফল পাড়িয়া আত্মসাৎ করে, মুসলমান যুবকেরা যদি হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং পুলিসে সংবাদ দিয়াও যদি এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে হিন্দুর যে সসম্মানে পাকিস্তানে বাস করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের আছে।

বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চল ভারত গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতে পারেন, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের

মুখে এই কথা শুনিয়া নুরুল আমিন সাহেব ক্রোধে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। তিনি বীরদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন,—"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র সহস্র মুসলমান সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা মুসলমানদের এই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" তাঁহার মতে পাকিস্তান যদি মুসলমানদের স্বদেশ হয়, এবং হিন্দু ও মুসলমান যদি পৃথক্ নেশন হয় তাহা হইলে পাকিস্তান হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দেশ, নুরুল আমিন সাহেবের এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য মুসলমানদের ত্যাগ স্বীকারের কথা না তোলাই ভাল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপা হইতে ইহার উৎপত্তি; এবং ইহা অর্জ্জনের জন্য দুই-এক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া হিন্দুহত্যা করা ভিন্ন মুসলমান নেতারা আর যে কি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন করিতে তাঁহারা যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা আমরা স্বীকার করি।

যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা বহু দিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক্ নেশন এবং সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়াও উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এক রাষ্ট্রের ভিতর বাস করা সম্ভবপর নয়। জনাব সহীদ সোরাউর্দ্দী তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে কলিকাতার কুখ্যাত ১৬ই আগষ্ট আজও নাগরিকদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এত করিয়াও তিনি পাকিস্তানে কলিকা পান নাই, আজ তাঁহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াই বাস করিতে হইতেছে। হঠাৎ তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আবার একটি বৈঠক বসাইবেন শুনিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া বলিয়াছেন,—"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যত্র যাহাই ঘটুক না কেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গায়ে আমরা আঁচড় লাগিতে দিব না। বাঙ্গালার উভয় অংশকেই আমাদের নিরাপদ রাখিতে হইবে।" পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ মাত্র এবং পাকিস্তানের কর্তারা যে নীতি অনুসরণ করিবেন পূর্ব্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষকেও সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে। কাজেই পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দুইটির মধ্যে যতক্ষণ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার স্বতন্ত্র মীমাংসা অসম্ভব। সোরাউর্দ্দী সাহেব বলিয়াছেন,—"উভয় ডোমিনিয়নে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক, ইহাই আমাদের কাম্য। আমরা যেন লোক-বিনিময় বা নূতন করিয়া সীমা নির্দ্ধারণের কথা তুলিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি না করি।" পশ্চিম-পাকিস্তানে লোক-বিনিময়ের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে উহা এখন প্রবল বেগে চলিতেছে। আমরা সোরাউর্দ্দী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, উভয় ডোমিনিয়নে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে পাশাপাশি প্রীতিপূর্ণ ভাবে বাস করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পাকিস্তান সৃষ্টি করিবার অথবা বজায় রাখিবার সার্থকতা কি? পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। হিন্দুরা যাহাতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নিরাপদে ও সসম্মানে বাস করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতেছেন না। তাই বাধ্য হইয়াই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে হইতেছে।

বাস্তুহারাদের সমস্যার কোন সমাধানই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই। তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? স্থান কোথায়? এই জন্যই মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া ইত্যাদি জেলা পশ্চিমবঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি অনুসারে ভাষামূলক প্রদেশ গঠন করিলে এইগুলি পাওয়া যাইত এবং বাস্তুহারাদের বসতি-সমস্যা কিছুটা সমাধান হইত। কিন্তু সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মনে করেন যে, বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভাষামূলক প্রদেশ গঠনের কথা স্থগিত রাখা উচিত। কেন—তাহা তিনি বলেন নাই। কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বেরও এই মত। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে কোন

বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও পশ্চিম-বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এখন অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার আবাসগৃহে এক ঘরোয়া-বৈঠকে এই ছবিটি তোলা হয়। স্যর ব্রজেন্দ্রলাল (মধ্যে) লেডী প্রতিমা মিত্র (বামে) ও শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক মহাশয়কে (ডাইনে) দেখা যাইতেছে।

জমি দেওয়া হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টই যখন জমি দিতে অস্বীকৃত, তখন পূর্ব্ব-পাকিস্তান জমি দিতে যে রাজী হইবে তাহা আশা করা যায় না। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের মাত্র একটি পথই খোলা আছে। পাকিস্তানের বিলুপ্তিই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কি পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটাইতে পারেন ?

সুখের বিষয়, নব-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীকে স্বীকার করিয়াছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মত এই সমস্যাটিকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। ১৬ই নবেম্বর দিল্লীর এক সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি বলিয়াছেন,—"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত। এই দাবী অবশ্যই মানিয়া লওয়া উচিত। বৃটিশ সরকার তাঁহাদের সুবিধার জন্য অন্যায় ভাবে যে সকল কৃত্রিম সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদেরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" কিন্তু খসড়া শাসনতন্ত্রে সীমানা রদ-বদলের জন্য যে রকম ধারা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্যই এত তোড়-জোড়। সুতরাং শেষ অবধি বাঙ্গালার ভাগ্যে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া ইত্যাদি লাভ হইবে বলিয়া আশা হয় না।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য স্বয়ং লিয়াকৎ আলি খাঁ সেখানে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সংখ্যালঘুদের কিছু সুবিধা অথবা সমস্যার আংশিক সমাধানও হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বক্তৃতায়, পাকিস্তান যে ইসলামী রাজ্য তাহা বেশ জোরের সহিতই বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, বহিরাক্রমণ হইতে পাকিস্তান রক্ষা করাই এখন আমাদের উদ্দেশ্য। অন্ন বস্ত্রের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনই অধিক। উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কলিকাতায় মহরম

২৭শে কার্ত্তিক শনিবার, মহরমের শোভাযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতায় যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর তেমনই শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘুদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান। পুলিশের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা অবগত আছি যে মহরমপর্ব্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহার সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই অবস্থায় মহরমের মিছিল উপলক্ষে যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল, তাহাকে শুধু অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয় বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পুলিশ অবশ্য অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পায় নাই।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই গোলমাল তাহারা আরম্ভ করে তাহা সঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। তবে উচ্ছৃঙ্খল লোকেরাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট গোলযোগকারীদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না। বিপুল জনতার মধ্যে গুণ্ডার দল সাধারণতই হাঙ্গামা করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনরূপ হাঙ্গামা না হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায়ী, তাহারা যে গণতান্ত্রিক লৌকিক রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্যই ইহা করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কাহারা? এই সেদিনের কথা, পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে এক অলীক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। ঠিক তাহার পরেই মহরম উপলক্ষে এই গোলযোগ কি তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় না? এই গোলযোগ পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ভুয়া অভিযোগের একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রয়াস কি না, তৎসম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিবকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ জ[illegible]তেছি।

ষ্টীমার দুর্ঘটনা

২রা অগ্রহায়ণ প্রাতে পাটনা [illegible] কলেজ ঘাটের নিকট গঙ্গা নদীতে "নারায়ণী" ষ্টীমার [illegible] শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ষ্টীমারখানি শোনপুর মেলা হইতে যাত্রী ও গবাদি পশু [illegible] সময় উল্টাইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ ষ্টীমার [illegible] মৃতদেহ [illegible] করিবার আদেশ দিয়াছেন।

পরলোকে নরেন্দ্রনাথ শেঠ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ১৮৭৮ সালে কলিকাতার খাণ্ডলায় শেঠ-বসাক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। নগরীতে সর্ব্বপ্রথম যে সকল সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেন, এই সম্প্রদায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। নরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে আইন পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের নীতি প্রচার করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্ব জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" প্রচার করার জন্য তৎকালে যে বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় গঠিত হয় তিনি তাহার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় রাজনৈতিক এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে নরেন্দ্রনাথকে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপের এক সর্পসঙ্কুল স্থানে অন্তরীণ রাখা হয় এবং এই স্থানে আটক থাকার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহাকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে আটক রাখা হয়। সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত রেগুলেশন অনুসারে ধৃত তৃতীয় রাজবন্দী ছিলেন। ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করিয়া মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসেবার কার্য্যে ব্রতী হন। কিছু কাল হইতে তিনি বাতব্যাধি ও রক্তের চাপবৃদ্ধির জন্য কষ্ট পাইতেছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর সহসা তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় পক্ষকাল পরে ২১শে আশ্বিন রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড ঃ ২য় সংখ্যা

"রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বই আর কিছু নাই। সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় তা হলে রাধিকার কাছে শিখা যায়। সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করবার জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 'আধার' আর তিনি নিজেই শ্রীরাধারূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন কর্ত্তে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ কর্ত্তে।"

"শ্রীমতীর মহাভাব হতো। সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত—কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁসনি, ওঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস কচ্চেন। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, যেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। আহা! গোপীদের কি অনুরাগ। তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁজে শুকিয়ে যেত—জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত! কখন কখন তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কেউ টের পায় না। আহা! সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি কারু হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়—পাঁচ সিকে পাঁচ আনা! এর নাম প্রেমোন্মাদ! ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল,—কৃষ্ণে অনুরাগ! শ্রীমতী যখন বললেন,—আমি কৃষ্ণময় দেখ্‌ছি; সখীরা বল্‌লে,—কৈ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি প্রলাপ বক্‌চো? শ্রীমতী বল্‌লেন,—সখী! অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মাখো তা হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। শ্রীমতীর মহাভাব! গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না—কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় না।"

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্য অত হয় না। যদি থোচ্‌ ধর যে তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের অত টান হবে? তা শুন্‌লেও সে টান হয়—'না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো'।"

"প্রেমোন্মাদ হলে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল,—আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে! তৃণ দেখে বলে,—শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে! মেঘ দেখে,—নীলবসন দেখে,—চিত্রপট দেখে শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো! তিনি এ-সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় কোথায় কৃষ্ণ! বলে ব্যাকুল হতেন। শ্রীমতীর প্রেম—কৃষ্ণ সুখে সুখী,—তুমি সুখে থাক আমার যাই হোক্‌! গোপীদের এই বড় উচ্চ ভাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মধুর ভাব সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"কি অবস্থা গেছে! হরগৌরী ভাবে কত দিন ছিলাম। আবার কত দিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে থাক্‌তাম—ঐরূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো। কখন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত্তাম; সীতার ভাবে রাম রাম কর্ত্তাম। সীতারামকে রাত-দিন চিন্তা কর্ত্তাম, আর সীতারাম রূপ দর্শন হতো।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
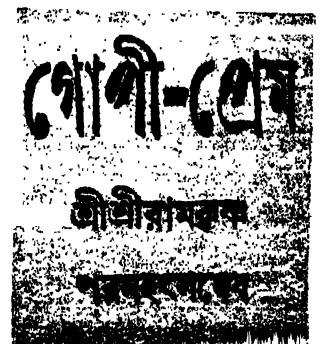
পাঞ্জাব-অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্বে এক দিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ-জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয়-জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্‌দিকে প্রচার করে বলেছিলাম স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন প্রতিবিধান করতে পারব না। কথাটা যে মূলত সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসন-ভার ভারতবর্ষীয়দের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে-কেউ তাদের বঞ্চিত রাখে, সে-ই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও তো একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না করে পথ নেই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। Right এবং duty এই দু'টো অনুপূরক শব্দ তো সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে না, এ তো অবিসংবাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্ব-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্তব্যের দায়ী হয়েও তো আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাবার এত বড় অন্যায়—অসংগত দাবী, এত বড় পাগলামী আর তো কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবল মাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতা আমাদের চাই, এ কথাও কোন মতেই সত্য হতে পারে না। এবং এ প্রার্থনা ইংরেজ কেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চির-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখনো পায়নি, পায় না এবং আমার বিশ্বাস, কোন দিন কখনো কেউ পেতে পারে না। কর্তব্যহীন অধিকার অনধিকারের সমান। অথচ, এই যদি আমাদের ঈপ্সিত বস্তু হয়, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারা যদি আমরা সত্যই গ্রহণ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবল মাত্র সমস্বরে বন্দে মাতরম্‌ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না। কাজ করব না, মূল্য দেব না, অথচ জিনিস পাওয়া চাই—এ হলে হয়তো সুবিধে হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না এবং আমার বিশ্বাস, হলে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বাড়ে। অথচ মূল্যহীন এ ভিক্ষার চাওয়াকেই আমরা সার করেছি।

বছর দেড়েক ঘুরে-ঘুরে নিজের চোখেই আমাকে অনেক দেখতে হয়েছে এবং একটুখানি অবিনয়ে অপবাদ নিয়েও বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা'-যা' দেখেছি (অন্তত এই হাবড়া জেলায় যা' দেখেছি) তা' নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না-দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয় চাওয়া। মানুষের কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্বপ্রকারের সুখ-সুবিধের কোথাও যেন ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে এক বিন্দু চূণ পর্যন্ত না খসতে পায়—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরেজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্যন্ত বল, যা-হয় তা হোক্‌, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরেজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার শিকল মজবুত করে তৈরি করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, গলায় এবং কলমে গালি গালাজ করে, তার ত্রুটি ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু পাওয়া যাবে? এ প্রশ্ন তো সকল দ্বন্দ্বের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই লজ্জাস্কর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘটবে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন স্বর ফোটে না, পরের মুখে তত্ত্ব-কথা শোনবার ধৈর্যও আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ্তিশিখার, দীপের নয়। নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপনের আগে এ-কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরেজ নয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথম দিকে মাতামাতি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্বে বললে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল; Anglo Indian কাগজওয়ালারা হেসে জবাব দিলে এ শুধু নিছক indifference! আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হয়েও থাকে তো দেশের লোকের এতে গর্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence? সে তো কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্র ব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও তো কেউ জোর করে বলতে পারি নে, আমাদের বাড়ী ফেরবার পথটুকুর মাঝেই হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে দিতে না পারি। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই এবং আমিও একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে চাই নে; কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নেই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা করতে যাওয়া আত্ম-বঞ্চনা; আর indifference? এ কথায় যদি তারা ইঙ্গিত করে থাকে যে, দেশের লোকের বুকে গভীর ব্যথা বাজেনি, তো তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত মন যেমন

শরৎচন্দ্রের এই মূর্তিটি সহসা দেখলে যে কোন ব্যক্তি সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। আশা করেন, হয়তো বা কথাশিল্পীর মুখে কথা ফুটে উঠবে, শুনতে পাওয়া যাবে তাঁরই প্রাণের কোন সর্ব্বজনীন অনুভূতির কথা। কিন্তু শিল্পী বা ভাস্করের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কোন শক্তি নেই, তাঁরা শুধু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেই খালাস। ভাস্কর মণি পাল এই মৃন্ময় মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ ক'রেছেন এবং তাঁরই ষ্টুডিওতে এখনও রক্ষিত আছে।

উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে অথচ যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাসা, কাজ-কর্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের ওপর; কেউ বললে, তার প্রশংসা-বাক্য শুধু ভণ্ডামি, কেউ বললে, তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বললে, বড় জোর তিন বছর, কেউ বললে, না, চার বছর। কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হল তখন আর উপায় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়! কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল, হোক না জেল ছ'বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা তো তাঁর দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশি কেউ তাঁকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হন। কিন্তু যে আশা তাঁর একার ছিল, সমস্ত দেশের লোকের সে ভরসা করতে সাহস হ'ল না। তাদের অর্থোপার্জন থেকে শুরু করে আহার-নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হল না। শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এত-বড় হীনতায় লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধিজীর movement কি practical? তাই তো আমরা—কিন্তু কে

এদের বুঝিয়ে দেবে, কোন movement কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে co-operation, non-co-operation, violence, non-violence—এর যে কোন একটাই স্বাধীনতা দিতে পারে; শুধু যে ভীরু, যে দুর্বল, যে মৃত, তার কাছে ভিক্ষে ছাড়া আর কোন পথই উন্মুক্ত নেই। সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয়, non-co-operation পন্থা দেশে অচল, মুক্তির পথ সেদিকে যায়নি। অন্তত, এখনো এক দল লোক আছে—তা সংখ্যায় যতই অল্প হোক্—যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? এক দিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল—উকিল তার ওকালতি ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে চারি দিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে—এঁরা তাদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত ভিক্ষুকের দল। তাদের মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবন-যাপন করে, যৎসামান্য তেল-নুণের পয়সার জন্যে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয়। অথচ স্বেচ্ছায় যে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে, কতটুকুতে তার প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎকর। এইটুকু সে সম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না, মাত্র এইটুকুর জন্যে তার অসুবিধের অন্ত নেই। অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক্, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্যাতনের কাহিনী সংবাদপত্রে পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা এদের লোকের কাছেই সহ্য করতে হয়? মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক্, এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীনহীন ব্যর্থ করে তোলবার, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে এক দিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও সত্যকার বিধি-বিধান কোথাও কোনখানে থাকে।

হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, অন্তত এ জেলার লোকে স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটুক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও এ-কথা সত্য—কেউ কিছু করব না, কোন সুবিধে, কোন সাহায্য কিছুই দেব না,—আমার বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার এক তিল বাইরে যেতে পারব না,—আমার টাকার ওপর টাকা, গাড়ির ওপর গাড়ি, আমার দোতলার ওপর তেতলা এবং তার ওপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত ভাবে উঠতে থাক—কেবল এই গোটা-কতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না-খেয়ে না-দেয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে তো দিক—তখন না হয় তাকে ধীরে-সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবোনো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও হয় না। আসল কথা, এরা বিশ্বাস করতেই পারে না, স্বরাজ না কি আবার কখনও হতে পারে, তার জন্যে না কি আবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাঁতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চ্চায়? নিবোনো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে-মুছে গেছে। একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে অপর কিছুতে? একটা নমুনা দিই—

সেদিন নারী কর্ম্মমন্দির থেকে জন-দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে নিয়ে দুর্যোগের মধ্যেই আমরা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম, ঋষিতুল্য সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটিকে সঙ্গে নেওয়ায় এ-যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল। বন্দে মাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মনুষ্যটিকে স্থানীয় রায়-বাহাদুরের ভাঙা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হল টাকা পঞ্চাশ, ঝড়ে-জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এমনি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকিল, মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস—অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হ'ল তিন টাকা পাঁচ আনা। আর রায় মহাশয় বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলেন, জন-দুই উকিল বিলিতি কাপড় কেনেন না, এবং এক জন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন ভবিষ্যতে তিনি আর কিনবেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কানে-কানে বললেন, "হ্যাঁ, জেলাটা উন্নতিশীল বটে। আর একটু লেগে থাকুন, Civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare করতে পারবেন।"

আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বথা ভদ্রলোকেরই অনুসন্ধান করে।

এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি। কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ-জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন প্রতিষ্ঠা, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Government-এর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

আমার এক আশা—সংসারে সমস্ত শক্তিই তরঙ্গগতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান-পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নিচে পড়েছে, কাল সেই আবার ওপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল—তাই তার শিখরদেশ এক স্থানে উঁচু হয়েই থাকে, নামতে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গের সে ব্যবস্থা নয়—তার ওঠা-পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। সে কেবল উঁচু হয়েই থাকতে চায়; যখন জমে, বরফ হয়ে ওঠে। তেমনি আমাদের এ-ও যদি একটা movement হয়, পরাধীন দেশে একটা অভিনব গতিবেগ হয়, তা হলে ওঠা-নামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চলতেই পারবে না।

নারায়ণ, শ্রাবণ, ১৩২৯

সৈয়দ মুজতবা আলি

বাস্তুবাড়ী আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কত দূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক্ দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশী কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেন্টটদের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোনো প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও এক দিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, একের অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়তে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করেনি, আমরা যে তার কাছে কত দিক্ দিয়ে ঋণী সে কথাটাই সে আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে বলেছে। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ ছাড়া আরো দু'-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে এক দিন বহু দিক্ দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মাননি এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহু লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক্ দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু, সেই জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এখন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে এসেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।
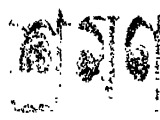
এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন, ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক্ থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিক্ যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান-প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছু দিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে)। ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পাননি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরাণি-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণও লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনের' দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীনা সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিচরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে অতি উত্তম জাপানী ভাষা শিখে এসেছেন। সে-ভাষা শেখাবার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃতি চীন এবং জাপানে প্রসার লাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভেতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খৃষ্টধর্ম ও প্যারিসের খৃষ্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিম ও বাঙালী মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক্ থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমতঃ, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধানতঃ গবেষণামূলক হবে বলে এর ভেতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রায়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রায়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারেনি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew-drops on a Lotus Leaf. আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারিনি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়ত জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, খেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন।

শ্রমণ রায়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রায়োকোয়ান-চরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন: রায়োকোয়ানের আমলের বড় জাগিরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রায়োকোয়ানের কুঁড়ে-ঘরে পৌঁছবার পূর্বে গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রায়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চার দিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রায়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ! মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয়নি। রায়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায়, হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় ছিল ঝিঁঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?"

রায়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল।

শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটিরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদ-কাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:

'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।' *

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশ-খৎকে † তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রায়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর ভেতর দিয়ে এখনো জীবিত আছেন। ফিশারের গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহ মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রায়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।"

* শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিজাত, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।

† Calligrapher ইকোয়াল সুদর্শন লিপিকর।

রায়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকেছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রায়োকোয়ানের প্রিয়শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রায়োকোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রায়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেননি। তিনিই রায়োকোয়ানকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী—আর যে পাঁচ জন রায়োকোয়ানকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালি ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমন কি রায়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। তাঁদের কাছেও তিনি অজ্ঞেয়, কবি ও সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রায়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন; চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন রায়োকোয়ানের কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়াছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধূলো করে। তাতেই না কি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশী আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, ক্ষেতে ক্ষেতে আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট-ছোট পাখী তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশী হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল সন্ধ্যা তাদেরি সঙ্গে ফূর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজনসুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকম্' জগতের প্রবাহমান ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে গিয়ে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রায়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেননি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুত সোমা গায়োফু কর্তৃক 'তাইগু রায়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপনি প্রব্রজ্যা-ভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক যাকব ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রায়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রায়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়োফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইয়োরোপীয় যিনি শ্রমণ রায়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন।

[ক্রমশঃ

স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস

"You young men of Bengal! Do not look up to the rich and great man who have money. The poor did all the great and gigantic works of the world."

—*Swami Vivekananda.*

"Bengal has come forward as Saviour of India."

—*Aurobindo Ghose.*

যুগ-যাত্রী

কংগ্রেস যা চেয়েছিল ৬'এ, তা পেয়েছে ৪৬-এ। ৬-এ কংগ্রেসের সজ্জ স্থবিরদের মুখে অবশ্য যে স্বরাজের দাবী করতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা ছিল "Self Government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies" বৃটেন ও তার উপনিবেশ রাজ্যগুলো যেমন স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করে তেমনি স্বরাজ।

এ দাবীর মন্ত্রদাতা মার্কুইস অব ডাফরিণ এণ্ড আলভা। তার প্রেরণায় সেকালের ইংরেজ-ভক্ত, ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজ-গতপ্রাণ গুটিকয়েক বরেণ্য ভারতবাসী, এক দল ইংরেজ আর এংলো ইণ্ডিয়ানের নেতৃত্বে ইংরেজের দরবারে ইংরেজী শিক্ষিতদের অর্থ ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্ম বচন, আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল।

ইংরেজের এ প্রেরণা যেমন ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত করেনি, মুষ্টিমেয় ইংরেজ-প্রত্যাদৃষ্ট, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ও স্বপদকামী ভারতবাসীকেও এ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুস্পর্দ্ধী সৈনিক আহরণ করতে হয়নি।

কিন্তু ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের উপর সহসা ইংরেজদের এই প্রেম উথলে উঠেছিল কেন? কেন উঠেছিল জানতে গিয়ে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের আভাষ আমরা পাই।

ইংরেজ আমাদের জাতীয় কৃষ্টি নষ্ট করছিল, ধর্ম্মপ্রচারের নামে নারী-নির্য্যাতন করছিল, ঘর ভাঙ্গছিল, শিল্পজাত পণ্য চালু করে আমাদের উটজ শিল্পীদের বৃত্তিহীন করছিল, কৃষকদের উপর নির্ম্মম পীড়ন করছিল, ভারতবাসীকে কুকুর-বিড়ালের চাইতেও ঘৃণা করছিল, ঘর ভেঙ্গে মানুষ চুরি করে কুলি বানাচ্ছিল, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছিল। ওরা দুর্ভিক্ষের সুযোগে ভারতবাসীকে ধর্ম্মচ্যুত করেছে, মন্বন্তর আর মহামারীর সুযোগে দৈন্যকে অসহ্য করে তুলেছে। ওদের শাসনে সাধারণ মানুষগুলো বিদ্যা পায়নি, অর্থ পায়নি, কাম্যও লাভ করেনি, লাভ করেছে কালে ও অকালে মোক্ষ।

ভারতে ইউরোপের অধীনতা আরম্ভ ১৪৯৮, ১৭ই মে—সেই দিন থেকে "Indian goods and curios began to enter Europe through the agency of the Portuguese and the Venetians." ভারত-হরণ ষড়যন্ত্র হল এর প্রায় একশ' বছর পর যখন লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা ভারতের ধন লুণ্ঠনের জন্য এক সওদাগরী সঙ্ঘ গড়ে রাজার সনদ পেল—আর তার কয় বছর পরে বেওয়ারিশ বাংলার জনসাধারণের শোণিত শোষণের জন্যে আর একটা বিদেশী বাদশা ইংরেজকে বেপরোয়া লুঠের ছাড়পত্র দিল।

তার পর কত কাণ্ড হয়েছে। বাংলায় ওরা এ-সময়ে যে মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব করেছিল আর শোষিত-শোণিত মানুষগুলোর উপর কৃত্রিম মন্বন্তর স্থাপিত করে অর্থনীতি ষড়যন্ত্রের যে অদ্ভুত ওস্তাদি দেখিয়েছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ সেই দিন উপ্ত হয়েছিল। জালিয়াৎ ক্লাইভের পর বাংলার জনসাধারণের ধন-প্রাণ অবিরাম ৩০ বছর ধরে হরণ করে ইউরোপের শিল্প মহাবিপ্লবে ইংরেজ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আর বিনিময়ে ভারতকে দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০-এর এই গণহত্যায় তিন ভাগের এক ভাগ বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল বলেই এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে উত্থানের প্রথম আয়োজনের ভার বাংলাকেই নিতে হয়েছিল। উত্থানের এই আয়োজনের আভাষ মাত্র পেয়েই কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "ইংরেজের বাংলা অধিকারের কালে যে গণ-উত্থানের আভাষ পাওয়া গেছল এশিয়া-খণ্ডে তা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ("The greatest and to speak the truth the only social revolution ever heard of in Asia") বর্ত্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল হয়তো বা একটু ঠাট্টা করেই বলেছেন—"Bengal can take pride in the fact that she helped greatly in giving birth to the industrial revolution in England" ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প বিপ্লবের জন্মদানে বাংলা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল বলে গর্ব্ব করতে পারে। ইঙ্গিত বেদনাদায়ক হলেও সত্য।

গণ-দুঃখ মোচনের জন্য কেউ তখন আঙ্গুল ওঠায়নি। মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায় তখন প্রভু-বদলের সুযোগ নিচ্ছিল। অপহৃত-প্রভুত্ব রাজন্যরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তেমনি ক্ষুব্ধ হয়েছিল হডসনের গুলীতে দিল্লীতে শেষ বাদশাহ-পরিবারকে কুকুর-বিড়ালের মত হত্যা করতে দেখে মুসলমান সৈনিকরা, পেশোয়াদের চিৎপাবন মন্ত্রিত্ববিলোপ হবার ফলে তেমনি বিদ্রোহও হয়েছিল উমাজী নায়কের নেতৃত্বে। বিপন্ন ও মরিয়া জনসাধারণের উত্থান-ধ্বনি তখন সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তারা প্রচার করতে লেগেছিল ইংরেজ রাজত্বের খতম হয়েছে, ওদের সাবাড় কর। উত্তর-বাংলায় কৃষাণ বিদ্রোহ আর বাংলার ঘাটবাল অঞ্চলগুলোয় চুয়াড় বিদ্রোহ এইখানে প্রথমে করে আত্মপ্রকাশ, দক্ষিণ-বাংলার এ উত্থানে জনসাধারণকে সাহায্য করে বাংলার রবিনহুড, বিশ্বনাথ বাবু, মনোহর প্রভৃতির ন্যায় মৃত্যু-স্পর্দ্ধী দল। কুবের নদীর উভয় তটে দাঁড়িয়ে লেফটন্যাণ্ট গবর্ণর গ্র্যাণ্টের প্রতি ৭০ হাজার নরনারী যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল, তাতে ইংরেজের বুকে বেশ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। তার পর, যাকে

বলা হয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম—সেপাই বিদ্রোহ। তারও উদ্ভব বাংলা দেশে। ঐতিহাসিক কার্ত্তুজের হেতু-নির্দ্দেশ করেছিল মাত্র, বাস্তব কারণ নির্দ্দেশ করেনি। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যে তার রাইফেল উত্থিত করে চীৎকার করে বলেছিল—"ওঠ। ওঠ। তোরা, সাদা আদমিগুলোকে গুলী করে মার", সে আহ্বান যে মাত্র সেপাইদের জন্য না, তা সে যুগের নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস যে ভাল করে আলোচনা করেছে সে-ই বুঝবে।

কংগ্রেসের জন্মদাতা এলান অক্টেভিয়াস হিউম এমন প্রমাণ পেয়েছিলেন যে ধর্ম্মগুরুরা গণবিপ্লবের আয়োজন করছেন। হিউম জানতেন,"The hatred was already there and required to be assuaged"—স্যর ওয়েডার বার্ণ কিন্তু জানিয়েছিলেন "শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করো না। চাষী জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চাষীদের শক্তিস্বীকার করে সংগঠিত করে ফেলতে পারে।"

রাজা রামমোহন ইংরেজের অত্যাচারী শাসন আর জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ অবস্থার কথা জানতেন, তাই তিনি আশা করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে জনসাধারণের সাধারণ ও রাজনৈতিক জ্ঞান তথা কলা-বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ হলে তারা তাদের অবস্থার অপকর্ষ-কারী অন্যায় ও অত্যাচারী ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবে। হয়ত এতে একশ' বছর লাগবে। লেগেছিলও তাই।

উইলিয়ম য়্যাডামের রিপোর্টে জনসাধারণের অবস্থার কথা জানা গেছল। তিনি লর্ড বেণ্টিঙ্ককে জানিয়েছিলেন, জনসাধারণের যেমন মনোভাব, তাতে মনে হচ্ছে বিনা সংগ্রামে ও নির্ব্বিকারে কালই হয়ত মুনিব বদল করে ফেলবে।

এই বিক্ষুব্ধ ও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত জনসাধারণকে ঠাঁবে রাখবার জন্য ইংরেজ সেকালের শিক্ষিত বরেণ্য পুরুষদের সাহায্য নিয়েছিল আর কালা-ইংরেজ সৃষ্টি করবার জন্য শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করেছিল।

এই শিক্ষানীতির প্রভাব প্রাথমিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ যেমন রোধ করতে পারেনি তেমনই তারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংরেজের সব আচরণের সমর্থনও করতে পারেনি। কেশবচন্দ্র অবশ্য মনে করতেন যে, ইংরেজ ভারতের অছি এ-কথা তাঁকে জানাতে হয়েছে—

"Those days are gone by never to return when men thought of holding India at the point of the bayonet."

১৮৮৫ থেকে ইংরেজ যেমন এক দিকে কংগ্রেসের নেতাদের মারফৎ বৃটিশ সরকারের কৃপা-বলিষ্ঠ এক দল নেতার সৃষ্টি করে মুমুক্ষু জাতির মুক্তির প্রচেষ্টা দমন করতে চেষ্টা করেছিল, অন্য দিকে তেমনি ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিণ স্বাধীনতা সংগ্রাম, বুয়ার যুদ্ধ তথা রুশ-জাপ যুদ্ধের প্রেরণায় জনসাধারণের মুক্তির দায়িত্ব নিয়ে ভারতের নওজোয়ানরা কংগ্রেসের আস্ফালন তুচ্ছ করে প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হতে লেগেছিল।

ইংরেজ এই বিপ্লবী যুব-আন্দোলন এড়াবার চেষ্টা করেও পারেনি। এ আন্দোলনের নেতা ইংরেজের মোহমুক্ত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। উচ্চবর্ণ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর নেতৃত্বকে তুচ্ছ করে এমন নূতন ভারতের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন যে ভারত বেরুবে লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে—মালো, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, ঝোড়-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত থেকে নূতন ভারতের সন্ধান করবার জন্য কর্ম্মীদের প্রতি তাঁর নির্দ্দেশ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ ভাবে বাংলার জোয়ানদের আহ্বান করে বলেছিলেন—"We know to our shame that most of the real evils for which the foreign races abuse the Hindu nation, are only owing to us. But glory unto God, we have been fully awakened to it, and with his blessings, we will not only cleanse ourselves, but help the whole of India to attain the ideals"...বাংলার দরিদ্র যুব-সাধারণকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন—"You young men of Bengal! do not look up to the rich and greatmen who have money. The poor did all the great and gigantic work of the world."

বাংলার জোয়ান যে সেদিন গোটা বাংলাকে, বাংলার প্রতি গ্রাম, প্রতি নগর, প্রতি গৃহ, প্রতি পথ, নদী, গিরি-বনানীকে স্বাধীনতার যজ্ঞশালায় পরিণত করেছিল, তার প্রেরণা নিশ্চয় সেকালের কংগ্রেস দেয়নি, দিয়েছিল এই Cyclonic Hindu. ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই বাল-কিশোর নব যুবদলের প্রতি উপদেশ ছিল—"Be and make—let this be our motto. Say not, man is a sinner. Tell him he is God."

প্রথমে তারা নিজে যে ভাবে তৈরী হয়েছিল আর দেশকে যে ভাবে তৈরী করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর কোন মহাজাতির জাগরণের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত জওহরলালও স্বীকার করেছেন, এরা more aggressive and defiant ছিল, কংগ্রেসের নেতা ও প্রতিনিধিদের চাইতে আন্তরিকতা, শক্তি, সংখ্যায় এরা অনেক বেশী ছিল। কংগ্রেসের পদমর্য্যাদাকামী ইংরেজ-স্তাবকস্থবিরদের কাছেও এরা যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, স্বয়ং ইংরেজ সরকারের কাছেও তেমনি ছিল ত্রাসস্বরূপ। এদের যেমন দেহ ও মনে সর্ব্বতোভাবে মহৎ ভয়স্বরূপ ও প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, অমনি ভারতে ও ভারতের বাইরে পরাধীনতার কু-ফল সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালান হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে। কংগ্রেসের মহানায়ক সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের দুর্দ্দশার কথা জানতেন, কিন্তু এ-ও জানতেন যে তাঁর কংগ্রেসের মারফতে গণ-জাগরণ হবার নয়। তাই তিনি নব-জাতির কাছে আবেদনে জানিয়েছিলেন—"It is for you to give voice to the voiceless, strength to the weak and the suffering. How many of you are prepared to go from village to village and to communicate to the ryots the glad tidings of their political redemption? I call upon you to take up this work." (১৮৮৩ খৃ:) সুরেন্দ্র-নাথ যে নেতৃ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, কংগ্রেস সৃষ্টির পর সে সম্প্রদায় অন্তত: গণ-সংগঠনের বাস্তব কার্য্য আরম্ভ করবেন এ আশা দেশ করেছিল। করে হতাশও হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নবীন ভারতকে ঘোষণা করতে হয়েছিল—এখানে কংগ্রেস ও লণ্ডনে সেই কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি দুই-ই ভিখারী প্রতিষ্ঠান। ভিক্ষায়

নতুন নাম আমরা দিয়েছি: নাম দিয়েছি 'এজিটেশন'। কিন্তু এজিটেশন সত্যিকার দেশপ্রেমের পরীক্ষা নয়। (বিপিন পাল)।

সুরেন্দ্রনাথ আপনাদের নির্ব্বীর্য্যতা অনুভব করে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্ত যাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ যাদের প্রাথমিক নেতৃত্ব করেছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তারাই মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়েছে, আর সমস্ত সংগ্রামেরও নেতৃত্ব করেছে বাংলা। বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি প্রতি প্রদেশে গিয়ে তরুণ সম্প্রদায়কে সেদিন আহ্বান করে বলেছিল—"There is a creed in India to day which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal···Bengal has come forward as a saviour of India."

এর পর স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের আর কোন স্থান নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত যুব-বিপ্লবীদের সংগঠন ও সন্ত্রাস প্রচেষ্টায় ইংরেজকে তখন আত্মরক্ষা করে চলতে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুমাত্র সুযোগ নেয়নি, কিন্তু এরা নিয়েছিল এদেশে ও বিদেশে। কংগ্রেসের নেতারা তখনও রেজোলিউসনের খেলাতেই মত্ত। আর এরা মত্ত পেশোয়ার থেকে গোয়ালপাড়া আর হিমাচল থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত মহা উত্থানের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করতে। ইংরেজ তাদের সঙ্গে লড়েছে ও মরেছে। জনসাধারণ তাদের সমর্থন করেছে ও তাদেরই জন্ত জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ড। তাদেরই জন্ত জনসাধারণের চাপে পড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্ম্মনীতি বদলে ফেলতে হয়েছে গান্ধীজীর পরিচালনে।

গান্ধীজীর দেবশক্তি অসুরশক্তিকে পরাজিত করতে পারেনি। কারণ প্রহারক্লিষ্ট জনসাধারণ দেহের বেদনাও যেমন ভুলতে পারেনি, তেমনি যারা প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের নেতৃত্ব করছিল গত ২০ বছরের যুব-সংগঠক ও বিপ্লবীরা, তারাও তেমনি আপনার প্রতিহিংসা নেবার পথ পরিহার করতে বিন্দুমাত্র সম্মতি হয়নি। গণশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তারা নব সংগঠিত কংগ্রেসে যোগ দিয়ে শিক্ষিত ও সুবিধা-বাদীদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

১৯২১-২২-এর পড়ে মার খাবার উদার আন্দোলন যখন ব্যর্থ হল তখন কংগ্রেসের নেতাদের কেউ বললেন, ইংরেজকে তা'র আইন সভায় ঢুকে জব্দ কর কেউ বললেন, সুতো কেটে সেই সুতোর অর্থনৈতিক ফাঁসে কণ্ঠরোধ করে ওকে বাগ মানাও। ২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরে স্বরাজ না পেয়ে বিপ্লবী যুবশক্তি কংগ্রেস গণ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অপর অপর পন্থা অনুবর্ত্তন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অধিকার করবার আয়োজনে মন দিয়েছিল। গণ-সমর্থনে নব নব বিপ্লবী দল কংগ্রেসেও যেমন প্রভাব বিস্তার করছিল, কংগ্রেসের বাইরেও তেমনি নিজস্ব কর্ম্মগণ্ডী প্রসারিত করছিল। ১৯২৮-এও গান্ধীজী "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" প্রার্থনা করলেন। লর্ড আরউইনও বললেন তাই-ই পাবে, আজ না হয় কাল। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গান্ধীজী তখনও মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু গণ ও যুবশক্তির প্রভাব সেদিন যে অদ্ভুত গণ-অভিযান হয়েছিল, আর তার পাশে যে বিপ্লবী রুদ্র প্রচেষ্টা চলেছিল, বাংলার দান ছিল তাতে সব চাইতে বেশী। গণ-শক্তির সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন তখন আগামী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্ত বিপুল আয়োজন করছে। "বিজয় নয় মৃত্যু" ধ্বনি তুলে যেমন গান্ধীজীর শান্ত ডাণ্ডী অভিযান সুরু হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিপ্লবীদের অশান্ত নালিক গর্জ্জে উঠেছিল চট্টলে। বিপ্লবী ও অধৈর্য্য জনসাধারণের এ প্রভাবের কাছে কংগ্রেসের প্রাথমিক যুগের গুরুবাদী ধনিক-প্রভাবান্বিত নেতৃবৃন্দের হার মানতে হয়েছিল। তারা কূট-কৌশলে বিপ্লবী দলে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করেছিল। জনসাধারণ এ কৌশল ধরে ফেলেছিল। তারা বুঝেছিল যে কংগ্রেসের কর্ম্মকাণ্ডহীন বচন-সর্ব্বস্ব হুমকীতে ভড়কে যাবে না ইংরেজ। তাই তারা নিজস্ব পথ নিয়েছিল। লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল বিপ্লবীরা লাহোরে পুলিশ ইনস্পেক্টর সণ্ডার্সকে হত্যা করে। দিল্লীর পরিষদ-কক্ষে সেদিন বোমা গর্জ্জনের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য মহাবিপ্লবের জয়ধ্বনি উঠেছিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। যতীন দাস অনশনে মৃত্যু বরণ করে সেদিন প্রত্যেক ভারতবাসী যুবকের বুকে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, সে উদ্দীপনার কাছে কংগ্রেসের আস্ফালন স্তিমিত হয়েছিল। টেরেন্স ম্যাকসুইনীর পরিবার এ মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভারতের নতুন জাতকে জানিয়েছিল—"Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come." গান্ধীজীকে এই যুববীরের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে মৌনী হয়ে থাকতে দেখে দেশ সেদিন অবাক্ হয়ে গেছল।

কিন্তু যুব-জগন্নাথের হয়েছিল নিদ্রাভঙ্গ। ভারতময় তখন শ্রমিক সংগঠন—ছাত্র আন্দোলন সর্ব্বত্র। নেতা জহরলাল, নেতা সুভাষচন্দ্র, নেতা পণ্ডিত মালবীয়।

কাজেই গণবিক্ষোভ হয়েছিল আসন্ন। গান্ধীজী তা বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই ৩০-এর বিপ্লব সুরু করতে হয়েছিল। ইংরেজ এ বিপ্লব দমন করতে চেয়েছিল বলপ্রয়োগে। ইংরেজ ভেঙেছিল সহস্র গণশির—বিপ্লবীরা তার প্রতিশোধও নিয়েছিল। শোলাপুরের জনসাধারণ ইংরেজের হাত থেকে সহর কেড়ে নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। মহাবিপ্লবে—আর বিপ্লবের ধূম ক্রমে দাবাগ্নিতে পরিণত হচ্ছে দেখে ইংরেজও সেদিন আপোষ করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের সজ্জ-স্থবিররাও ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব-ভারতের সঙ্গে নয়।

চলছে আরউইন-গান্ধী চুক্তি সর্ত্তের আলোচনা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীনতা—অন্ততঃ পক্ষে গান্ধীজীর ভাষায়—"Substance of Independence" বুঝি অধিগত হয়। অবিপ্লবী সাধারণ সেনাপতি ও নেতা গান্ধীজীকে দেবতার অধিক দিল সম্মান। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, যুদ্ধ-বিরতির চুক্তির সর্ত্ত ভেঙ্গে ২৩শে মার্চ রাত্রে যুব-মহানেতা সর্দ্দার ভগৎ সিং ও তার কমরেডদের গোপনে হত্যা করা হয়েছে ফাঁসীর মঞ্চে। গান্ধীজীকে বিক্ষুব্ধ জোয়ানরা অভিমান করে সেদিন কাল ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। এর আট বছর আগে সহীদ গোপীনাথের যে প্রস্তাবে গান্ধীজী দেশবন্ধুকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদান করতে পারেননি, সেই প্রস্তাবের ভাষাতেই ভগৎ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়েছিল স্বয়ং গান্ধীকে। বিপ্লবীর যুবশক্তিকে শান্ত করবার জন্ত মূলগত দাবীর প্রস্তাব ওঠান হয়েছিল। কিন্তু নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভা ওতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রায় কংগ্রেস ত্যাগেরই সঙ্কল্প করেছিল।

তবু এদের এড়িয়েই ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের হয়েছিল আপোষ। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের মুক্তির আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু বিপ্লবীদের

নয়। তাই বিপ্লবীদের জানাতে হয়েছিল ইংরেজকে যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপোষ-সর্ত তারা মানতে প্রস্তুত নয়, ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সত্যিকার যদি আপোষ করতে চাও তাহ'লে বিপ্লবী দলের সঙ্গে পৃথক্ কথাবার্ত্তা বলতে হবে। দেশবন্ধুর শেষ দিনের আশার অনুবর্ত্তন করে সে দিন মডারেট নেতাদের সাথে কংগ্রেসের নেতারাও, এমন কি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণাকারী লাহোর কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল পর্য্যন্ত (নিতান্ত অনিচ্ছা থাকলেও) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে সম্মত হয়ে বিবৃতি সই করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র, ডাঃ কিচলু, বিহারের আবদুল বারি—আয়র্ল্যাণ্ডের সিন-ফিন পার্টির নীতির অনুবর্ত্তন করে এর বিরোধিতা করেছিলেন। সার করে নেতারা লর্ড আরউইনের দরবারে দৌড়েছিলেন, বামপন্থীরা বোমা মেরে আরউইনের ট্রেণ ধ্বংস করতেও চেষ্টা করেছিল। ট্রেণ অবশ্য ভাঙেনি, নেতাদেরও মন ভেঙে গেছল হতাশ হয়ে ফিরে। কাজেই লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও যেমন উঠেছিল, তার সঙ্গে আরউইনের বরাতজোরের জন্ত ভগবানকে ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছিল।

বৃটেনের বড় উক্তির চার্চ্চিল ত সাফ বলেই দিয়েছিল—আজ হোক, কাল হোক, গান্ধী আর কংগ্রেসের দাবীকে চূর্ণ করে দিতে হবেই। পরিষ্কার বলে দিয়েছিল—"I did not contemplate India having the same constitutional rights and system as Canada in any period which we can foresee…

তবু ওঁরা গেছলেন গোল টেবিলে, বিপ্লবী ভারত সংগ্রাম বাচ্ছিল চালিয়ে। সীমান্তে লাল কোর্ত্তা দল, যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ দল, বাংলায় সন্ত্রসবাদীরা তাদের কর্ত্তব্য করছিল। ইংরেজও ছেড়ে কথা কয়নি, গুলী করেছে, অর্ডিন্যান্স করেছে। দিল্লী-চুক্তি খেলাপ করেছে। '৩২ সাল সুরু হতে না হতেই চার্চ্চিলের সাক্ষাৎ উইলিংডন যেমন প্রয়োগ করেছে চণ্ডনীতি—কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণও করেছে—চণ্ড সংগ্রাম। প্রথম চার মাসে ওরা বন্দী করেছিল প্রায় ৮০ হাজার ওরা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রী করেছিল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল। যেমন অত্যাচার, জবাবও তেমনি কড়া। বোনদেরও লড়াইএ নামতে হয়েছিল। প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা পাহাড়তলি ইনষ্টিটুটে ইংরেজদের উপর গুলী চালিয়েছিল, বাংলার গবর্ণরের উপর গুলী চালিয়ে বীণা দাস ঘোষণা করেছিলেন—সরকার যে সব অত্যাচার করছে তাতে আমার মত অবলাও বল পেয়েছে।

কিন্তু গান্ধীজী সেদিন পুণা-চুক্তি উপলক্ষ করে যে উপোষ আরম্ভ করেছিলেন, তার প্রভাবে বামপন্থীদের সব আন্দোলন ও সংগ্রাম বন্ধ করতে তিনি বাধ্য করেছিলেন। এই সুযোগে ইংরেজরা কৌশলে গণ-জাগরণকে ভেদমন্ত্র বলে ক্ষুণ্ণ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এক অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ রাজপুরুষের প্রভাবে মুসলমান ছাত্ররা Seperate Nation নীতি কার্য্যকরী করবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে গুপ্তদল তৈরী করছিল। (জিন্না কিন্তু তখন বলেছিলেন, এদের পাকিস্তান পরিকল্পনা "only a students' scheme") মিলন-বৈঠক—২ নং গোল-টেবিল ৩ নং গোলটেবিলে আপোষের আয়োজন চলছিল। ডাঃ আনসারী-প্রমুখ নেতারা নতুন স্বরাজ্য দল জিইয়ে তুলে ইংরেজের দান কাজে লাগাবার অজুহাতের সৃষ্টি করে গান্ধীজীর ও বিপ্লবীর প্রভাব পণ্ড করবার আয়োজনে মন দিয়েছিলেন। ওর 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' সম্বন্ধে কংগ্রেসকে নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য করেছিল এর পর যখন নয়া শাসন-বিধান এল তখন ফিরে গেল ১৯০৬-এর মডারেট আদর্শে অথবা ১৯২৪এর স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপদ্ধতিতে। দূরদর্শী গান্ধীজী বামপন্থীদের কর্ম্মনীতি যেমন ব্যর্থ হবে মনে করেছিলেন, নিয়মতন্ত্রপন্থী কংগ্রেস নেতাদেরও কর্ম্মনীতি তেমনি ব্যর্থ হবে মনে করেছিলেন। তাই হিন্দু গণশক্তি উদ্বৃদ্ধি করবার জন্ত অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলনে জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজ এ সময় কংগ্রেস থেকে মুসলমান দলকে যেমন বিচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি স্বাশালিষ্ট পার্টি গড়ে কংগ্রেসকে শক্তিহীন করতেও সমর্থ হয়েছিল। তার পর এল মহাযুদ্ধ। ইংরেজ চাইল কংগ্রেসের সাহায্য। কংগ্রেস দাবী করল—"Immediate declaration of the full independence of India"। বড়লাট লিনলিথগো বললে—নামঞ্জুর। সে মুসলমানদের উস্কে দিতে লাগল। অবস্থা দেখে বিপ্লবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হল। তাদের এ লড়াইএরও সুযোগ নিতেই হবে। তারা ত্রিপুরী কংগ্রেসের জাতের দাবী ঘোষণা করল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় কংগ্রেসের 'Old guard'রা নিয়মতন্ত্রের পথে এগুতে লাগলেন। সংগ্রামের—মহাসংগ্রামের সুযোগ এসেছিল ৪২-এ। ইংরেজ সেদিন বিপন্ন। চার্চ্চিল কেঁদে ফেলেছে। বঙ্গোপসাগর প্রায় জাপদের দখলে। ভারত আক্রমণ আসন্ন। "At this juncture Mr. Churchill stressed the ability of the Japanese to overrun a large part of India and to conduct air raids on defenceless Indian cities." বিপ্লবীরা এ-খবর রাখত। বিপ্লবীরা বললে—এইবার আঘাত কর। Old Guardরা তখনও বললে, দেশের সব দল অহিংস নয়—মনে ও কাজে। বিপ্লবীরা গান্ধীজীকে বলল—"We peldge our unconditional support in the event of the fight being resumed" ওরা কথা কইল না। কিন্তু যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হতাশ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে পালিয়ে গিয়ে ভারতের বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল। হতাশ হয়ে কংগ্রেসকেও হাঁকতে হয়েছিল—ইংরেজ হটু যাও। অহিংস নেতাদের পিঁজরায় পুরে ইংরেজ সেদিন ভেবেছিল প্রাণ-বন্যায় বাঁধ দিবে। পারেনি। '৪২-এর মহা বিপ্লব এসেছিল ভারতের ভিতরে আর ভারতের বাইরে। ভার নিয়েছিল ভারতের জনসাধারণ আর যুবশক্তি—ভার নিয়েছিল আজাদ হিন্দ দল।

তারা হুঙ্কার করেছে—লড়ব না হয় মরব। তারা হুঙ্কার করেছে "চলো দিল্লী।" ওরা মরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাণ। ভারতের প্রাণ-পুরুষ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহামন্ত্রে যুবভারতকে সঞ্জীবিত করেছিল, সে মন্ত্রসাধন ফলপ্রসূ হয়েছে। অধিবাস মন্ত্র-নিনাদ "বন্দে মাতরম্"—তার সাধন চলেছিল ২৫ বছর—সাধনমন্ত্র ধ্বনি "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", এর সাধন কাল দ্বাদশ বৎসর, এ ধ্বনি ফিরে জেগে উঠেছে নওজোয়ান গণশক্তি—আর উদ্‌যাপন মন্ত্র "জয় হিন্দ।" এ মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে লাল কেল্লায়—এ মন্ত্র প্রয়োগ করেই কংগ্রেসের সজ্ঞ-স্থবিররা আপনাদের আয়ত্ত ঔপনিবেশিক অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু এ মন্ত্রসাধন আজও সমাপ্ত হয়নি—হবে না ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত।

জয় হিন্দ।

শেলীর চিঠি

মিলান, ১০ই এপ্রিল, ১৮১৮

প্রিয় পিকক,

তোমার আমার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও যে এত তা আমার ধারণার অতীত ছিল। তোমার দু' তারিখের লেখা চিঠি এইমাত্র পেলাম আর ঐ একই দিনের লেখা আমার চিঠি তুমি কবে যে পাবে জানি না। তুমি এখনো মারলোতে থাকতে বাধ্য হয়েছ শুনে ভারী দুঃখিত হলাম। কিছুটা সামাজিকতা করতেই হয় সংসারে, বিশেষ করে এবার গ্রীষ্মে যখন তোমার সঙ্গে ইতালীতে দেখাই হচ্ছে না। মনে মনে কত বার মারলো ঘুরে আসি। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ হোল, একবার যা জানা হয়ে যায় আর তার কথা ভুলতে পারি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বেড়াতে গিয়েছ, হঠাৎ প্রয়োজনের তাগিদে জায়গাটি ছাড়ার কথা ভাব—দেখবে ছাড়তে পারবে না। সে লেগে থাকবে তোমার সঙ্গে। নানা স্মৃতি যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তেমন সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয়নি কোন দিন, যেন তোমার পলায়নের প্রতিশোধ নেয় এই ভাবে। সময় পালটায়, জায়গারও বদল হয়, অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও এক দিন খসে যায়। কিন্তু তবু যা ছিল তা একেবারে বন্ধ্যা, প্রাণহীন বলে বোধ হয় না। এই সঙ্গে 'নাইটমেয়ার অ্যাবির' উপর একটি আলোচনা পাঠালাম।

শেষ তোমায় যে চিঠি লিখেছি তার পর এক দিন বাড়ীর সন্ধানে কোমোতে গিয়েছিলাম। কীলার্নের আরবাটাস দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া এই হ্রদটির মত এমন অপূর্ব সৌন্দর্যময় আর কিছুই চোখে পড়েনি এ পর্যন্ত। দীর্ঘ অপ্রশস্ত হ্রদটি পাহাড়-অরণ্য ডিঙ্গিয়ে আসা বিরাট স্রোতস্বতীর মত দেখতে অনেকটা। আমরা নৌকা করে কোমো সহর থেকে ট্রেমেজিনা নামক একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। এবং সেখান থেকে হ্রদের বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছি। কোমো আর এই গ্রামটি, বরং বলা চলে গ্রামপুঞ্জের মাঝে চেষ্টনাটের বনানী-সমাকীর্ণ দীর্ঘ শৈলশ্রেণী প্রসারিত। এ চেষ্টনাট খাওয়া চলে এবং খাদ্যাভাবের সময় এখানকার লোকেরা সত্যিই এ চেষ্টনাট খায়। কোথাও কোথাও চেষ্টনাট গাছগুলি ধূসর ডালপালা নিয়ে হ্রদের বুকে ছায়া ফেলেছে। তবে সাধারণতঃ হ্রদের তীর পাহারা দেয় লরেল, বে, মার্টল, বুনো ডুমুর আর অলিভ। অলিভ গাছগুলি পাহাড়ের ফাটলে জন্মায়, গুহামুখে ঝুঁকে থাকে আর জলপ্রপাতের ঝলমলানিতে উজ্বল

[illegible]

আরো অনেক কুসুমিত লতাগুল্ম ছড়ায় পাহাড়ে যাদের নাম আমি জানি না। আরো উঁচুতে গাঢ় বনের পটভূমিকায় গ্রামের গীর্জার গম্বুজগুলি শ্বেত দেখায়। আরো দূরে দক্ষিণে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে হ্রদের জলে। অবশ্য ওদিককার পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচুও এবং কতকগুলির চূড়া সব সময় তুষারমণ্ডিত থাকে। কিন্তু এই উঁচু পাহাড় আর হ্রদের মাঝে আছে আর এক দল নীচু পাহাড়ের শ্রেণী—সেখানেও উপত্যকা, গুহা বা ফাটলের অভাব নেই। যেখানে একটি গুহার ভিতর দিয়ে আর একটি গুহায় যাওয়া যায় ঠিক ইড্ডা আর পারনাসাসের গীর্জার মত। এখানে দ্রাক্ষা-ক্ষেত, অলিভ, কমলালেবু আর ডুমুর গাছের আবাদী জমি আছে। গাছগুলি ফলভারে এমন নত হয়ে পড়েছে যে গাছে পাতার চেয়ে ফলের সংখ্যাই বেশী মনে হবে। হ্রদের এই তীরভাগ জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন একটি গ্রাম। মিলানের ধনী ব্যক্তিদের অনেকেরই এখানে বাংলো আছে। এখানে সংস্কৃতি আর প্রাকৃতিক মাধুর্যের এমন নিবিড় সংযোগ ঘটেছে যে ঠিক কোথায় তাদের সীমারেখা বোঝাই যায় না। কিন্তু এদের মধ্যে সুন্দরতম হোল ভিলা প্লিনিয়ানা। নামটি এসেছে ভিলাটির প্রাঙ্গণের একটি প্রস্রবণের নাম থেকে। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর এর উৎস-মুখ দিয়ে জল উৎসারিত হয়। প্লিনিই প্রথম প্রস্রবণটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একদা এই ভিলাটি একটি চমৎকার প্রাসাদ ছিল কিন্তু আজ অর্ধেকেরও বেশী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এটিকেই আমরা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাড়াইয়ের পাদদেশে হ্রদের তলা থেকে ওঠা টেরাসের উপর বাড়ীটি নির্মিত। সামনে বাগান। সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণী থেকেই দৃশ্যপট সব চেয়ে অপূর্ব আর তেমনি নয়নমুগ্ধকর। এক পাশে তরঙ্গায়িত শৈলমালা এবং ঠিক মাথার উপর সাইপ্রাস গাছের বিস্ময়কর উচ্চতা নিয়ে আকাশের বুক যেন বিদীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মনে হবে যেন মাথার উপরের মেঘপুঞ্জ থেকে উত্থিত এক বিপুলায়তন জলপ্রপাত বনভূমির দ্বারা খণ্ডিত হয়ে শত-সহস্র ধারায় এসে হ্রদে পতিত হচ্ছে। বিপরীত পার্শ্বেও পর্বতশ্রেণী আর শ্বেত পালখচিত নীল হ্রদের পরিসরতা। প্লিনিয়ানার প্রকোষ্ঠগুলি বিশাল বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন ধরণের আর বিশ্রী ভাবে সাজান গুছান। হ্রদের বুকে ঝুঁকে পড়া আর লরেলের ছায়াচ্ছন্ন টেরাসগুলিও সুন্দর। কোন মতে আমরা দু'দিন ছিলাম। এখন

[illegible] কথাবার্তা চলছে।

কোমো আর মিলানের দূরত্ব আঠার মাইল। ক্যাথিড্রাল থেকেও কোমোর পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়।

ক্যাথিড্রালটি শিল্পকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। শ্বেত মর্মর-প্রস্তরে আগাগোড়া নির্মিত—ছুঁচোল গম্বুজগুলি খুব উঁচু উঁচু আর সূক্ষ্ম কারুশিল্প ও ভাস্কর্যের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় তাতে। এই উত্তুঙ্গ চূড়া-খচিত নীরেট নীল, ইতালীর আকাশের নিঃসীম উদারতা, রাতে চাঁদের আলোয় তারার ঝলমলানি এমন এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে যে কোন স্থাপত্য-শিল্প তেমন করতে পারে বলে আমি কল্পনাও করতে পারি না। গীর্জার ভেতরটাও তেমনি মহিমান্বিত এবং এখানেই যা কিছু পার্থিব তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। চিত্রিত বড় বড় কাচাভরণ, বিরাট বিরাট স্তম্ভশ্রেণী, স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা সুপ্রাচীন মূর্তি, পেতলের বেদীর পাশে কালো চন্দ্রাতপের নীচে রৌপ্য-প্রদীপগুলি সারা ক্ষণ অনির্বাণ জ্বলতে থাকে, গম্বুজের গায়ে মারবেলের কারুকার্য—সব মিলে এক মহিমাময় সমাধিস্তম্ভের ভাব জাগায়। বেদীর পিছন দিকে একটি মাত্র স্থান আছে যেখানে দিনের আলো নিষ্প্রভ আর হলদে দেখায়। এইখানে এই নিরালাতে বসে আমি দান্তের কাব্য পড়ি!

এবারকার গ্রীষ্ম এবং আগামী বছর আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি টাসোর পাগলামি নিয়ে একটি ট্রাজেডি লিখব বলে। আমার ধারণা, ঠিকমত লিখতে পারলে বেশ কবিত্বময় আর নাটকীয় করে তোলা যাবে। কিন্তু তুমি হয়ত বলবে যে আমার নাটকীয় প্রতিভা নেই। এক হিসেবে তা খুবই সত্যি কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা ছাড়াই যে এক জন কত ভাল নাটক লিখতে পারে সেইটে দেখাব আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। অন্তত: বারট্রামের চেয়ে ভাল কবিতা হবে—ফেজিয়োর চেয়ে সুরুচিপূর্ণ। তুমি ত রোডোডাফন সম্বন্ধে আমায় কিছু লেখনি। এটি অপূর্ব সাফল্য আনবে আমার বিশ্বাস। পি, বি, এস

বিদ্যাসাগরের চিঠি

[শিক্ষা-বিভাগের তরুণ সিভিলিয়ান ডাইরেকটার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত মতভেদ হেতু পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর এই চিঠিখানি লিখে চাকরীতে ইস্তাফা দেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু তৎকালীন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেননি।]

মাননীয় ডাব্লিউ গর্ডন ইয়ং

শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেকটার মহাশয়ের সমীপেষু

মহাশয়,

যে গুরু কর্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত আছে তাহা সম্পাদনের জন্য যে অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে তাহাতে এক্ষণে আমার সাধারণ স্বাস্থ্য এত গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে যে আমি বঙ্গের মাননীয় লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সমীপে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইয়াছি।

২। আমি অনুভব করিতেছি যে যথাযথ ভাবে কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত যে গভীর মনোযোগের একান্ত প্রয়োজন তাহা আমি আর বিনিয়োগ করিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্য এবং সাধারণের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অবসর গ্রহণের দ্বারাই একমাত্র সে-বিশ্রাম আমি লাভ করিতে পারিব।

৩। যে মুহূর্তে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব সেই মুহূর্ত হইতে আমার সমস্ত সময় ও মনোযোগ আমি বঙ্গভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনায় ও সংকলন প্রকাশে নিযুক্ত করিব, ইহাই মনস্থ করিয়াছি। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রসারের সহিত আমার প্রত্যক্ষ সরকারী সম্পর্ক যদিও থাকিতেছে না তথাপি আমি আশা করি যে আমার জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি সেই মহান্ ও পবিত্র ব্রত সম্পাদনে নিয়োজিত থাকিবে এবং কেবল মাত্র মৃত্যুর দ্বারাই যেন আমার গভীর ও একান্ত আগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪। এই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণও বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা

লোপ এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সহিত আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাবই প্রধান। অথচ বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর পক্ষে এই দুইটিই অপরিহার্য।

৫। প্রথমোক্ত কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অবসর সময়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া আমি পূর্বের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারিব। এ কথা স্বীকার করিয়া লাভ নাই যে এবংবিধ কার্য আমার পক্ষে অতি গুরুতর, বিশেষ করিয়া এখনও যে নিজের পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। দপ্তরের দুর্বহ ও সুকঠিন কর্তব্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদনে আর বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্য ইহার অন্তরায় হইয়া উঠিবে বলিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।

৬। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সরকারের উপর আমার মতবাদ জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু যাঁহাদের অধীনে আমরা কাজ করি তাঁহাদের নিকট হইতে কাজে যে আমার আর মন নাই এ কথা গোপন করিতে আমি অক্ষম। ইহাতে আমার কর্মকুশলতা নষ্ট হইয়াছে এবং হইতে বাধ্য। আর অধিক আমি বলিতে চাহি না। কারণ আমার মতে বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর পক্ষে নিয়োজিত কর্মে হৃদয়ানুরাগ অপরিহার্য।

৭। এই পূর্ণ তৃপ্তি লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত আমি যথা-কর্তব্য সম্পাদনে সতত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিয়াছি। এবং আমি বিশ্বাস করি, সরকারের নিকট হইতে সর্বদা আমি যে অবিচলিত দয়া, প্রশ্রয় এবং প্রস্তাবিত সর্ব বিষয়ে সমর্থন লাভ করিয়াছি তাহার জন্য সরকারকে অকৃত্রিম

ও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে না। সসম্মানে নিবেদন ইতি—

সংস্কৃত কলেজ আপনার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য

৫ই আগষ্ট, ১৮৫৮ ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

[ঈশ্বরচন্দ্রের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সরকারের ছোট কর্ম্মসচিব কর্তৃক শিক্ষা-অধিকর্তাকে লিখিত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৫৬৬ নং পত্রের সারমর্ম।]

ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার বিগত ১৮ই অগষ্ট তারিখের (অন্যান্য নথিপত্র সহ) ২০১৭ নং পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে জানাইতেছি যে লেফটেনাণ্ট বাহাদুর আপনার সুপারিশ মত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অতিরিক্ত স্কুল-পরিদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতেছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ রূঢ়চিত্ততার সহিত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উচিত বোধ করিতেছেন, বিশেষতঃ যখন তিনি তাঁহার অসন্তোষের সঙ্গত কারণ দর্শাইতে সক্ষম হন নাই। তথাপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে জানাইবেন যে দেশীয় লোকদের শিক্ষা-ব্যাপারে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক কার্যের জন্য তিনি সরকারের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(অবিকল প্রতিলিপি)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত : ডব্লু উ, গর্ডন, ইয়ং

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সমীপেষু— শিক্ষা-অধিকর্তা

সারা বার্ণাডের চিঠি

[সারা বার্ণাডের নাম আজ ভুলে গেছে পৃথিবীর রসিক-সমাজ। অথচ এক দিন ছিল যখন সেই মেয়েটির নামোচ্চারণে তিনটি মহাদেশের লোক উন্মত্ত হয়ে উঠত। নৃত্যগীত-টীয়সী সারা ছিলেন সমসাময়িক রঙ্গ-জগতের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্ঞী।

১৮৪৪ সালে প্যারিসে সারার জন্ম, লালিত হয়েছিলেন কনভেণ্টে। যৌবনে রঙ্গালয়ের ভীতিকে সারা জয় করেছিলেন তার অনুকরণীয় স্মৃতিশক্তি আর সুধাময় কণ্ঠের দ্বারা। কবি, নাট্যকার, 'ফেডোরা'র লেখক সারডাউয়ের প্রতি সারা গভীর ভাবে আসক্ত ছিলেন। আর ফেডোরা ত সারাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। প্যারিসের একটি কাফেতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল দু'জনের এবং প্রথম দর্শনেই সারা সারডাউয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এর পর সারার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠল সারডাউকে জয় করা এবং তিনি তা করেছিলেন। সারডাউকে সারা বহু উচ্ছ্বাসময় প্রেমপত্র লিখেছেন। সেই মধুর পত্রগুলি তাদের মৃত্যুর পর সংগ্রহ করে প্রকাশিত করা হয়েছে।

সোত্তর বছর বয়সে সারার একটি পা বিকল হয়ে যায় এবং সেই খোঁড়া পা নিয়েই তিনি ইউরোপ আমেরিকা তোলপাড় করে বেড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছু কাল আগে সারা পর্দার জন্যও অভিনয় করেছিলেন। মৃত্যুর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে সারার উত্তেজনামুখর গৌরবময় জীবনের চির অবসান ঘটে। সারা—রঙ্গ-জগতে সারা অনন্তযৌবনা উর্বশী।]

আজ রাতে তুমি কোথায়! মাত্র এক ঘণ্টা আগে তোমার চিঠি এসেছে—নিষ্ঠুর মুহূর্ত—আশা করেছিলাম আজ তুমি আমার সাথে কাটাবে

তোমার বিহনে প্যারিস তো মৃতপুরী। তোমায় যখন জানতাম না তখন প্যারিস ছিল প্যারিস—মর্ত্যের অলকা। কিন্তু এখন প্যারিস ত পরিত্যক্ত জনহীন বিরাট মরুভূমি। বাহুহীন দেয়াল-ঘড়ির মুখের মত নিষ্প্রাণ।

তোমায় জানার আগে আমার স্মৃতির মণিকোঠায় যত ছবি জমা ছিল আজ তারা সব কোথায় ধুয়ে মুছে গেছে। আজ আছে শুধু আমাদের দু'জনের মিলনের ভাস্বর মুহূর্তগুলি।

এখন তোমায় ছেড়ে থাকা কঠিন আমার পক্ষে। তোমার মুখের কথা অতি কটু হলেও জগতের সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে নিবিড় সুখে ভরিয়ে তুলবে আমার জীবন। আমার শিল্প সে তোমার মুগ্ধ ভালবাসার রসে সঞ্জীবিত, তোমার মধুবাণীর দোলনায় তারা নিয়ত ধীর কম্পিত। আলো-হাওয়ার মত আজ তারা একান্ত আমার পক্ষে।

খাদ্যের মত তাদের জন্যও বুভুক্ষিত আমি—তৃষ্ণার্ত আমি। দুর্দম সে তৃষ্ণা। তোমার মুখের কথাই আমার প্রাণবন্ত। তোমার নিশ্বাস আমার জীবন-সুরা। তুমি আমার জীবনের সব। ইতি—

তোমার সারা

পুপুদিদিকে লেখা দাদামশায়ের চিঠি

বিশ্বভারতী কর্তৃক সংকলিত চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড) থেকে সংগৃহীত।

পুপুদিদি ওঁ শান্তিনিকেতন

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি ক'রে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙ্গুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসদের মতই ভদ্র,—মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসেদের চেয়ে এক হিসেবে ভালো—প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরী করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরী করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্ছে—তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয়নি। তোমার বাবা ব্যস্ত আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে—আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২২।১০।৩৫ দাদা মশায়

সন্তোষকুমার ঘোষ

এক

জিওগ্রাফির বইয়ের পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল ভাঁজ-করা এক টুকরো নীল কাগজ, যার শিরোনামায় লীলার নাম। সারা শরীর জ্বলে গেল, কান দু'টো গরম হয়ে উঠল লীলার। অনুপমের চিঠি, সন্দেহ নেই। এই নিয়ে বুঝি তিনবার হল। লোকটার স্পর্ধাও তো কম নয়!

আড়-চোখে লীলা একবার তাকিয়ে দেখল, রুবি দেখেছে কি না। রুবি তখন ভূগোলের অঙ্কের জটিলতায় নিমগ্ন। গ্রীণউইচ শূন্য আর কলকাতা প্রায় নব্বই। গ্রীণউইচে যখন সকাল সাতটা, কলকাতায় তখন ক'টা লীলাদি?

কেন, তুমি বার করতে পারছ না। লীলা অঙ্কটা ছাত্রীকে আরেক বার বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু বোঝাতে গিয়েও ভুল হয়ে যায়, একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনে বিঁধে আছে। চিঠিটা বাঁ হাতের মুঠোতেই রইলো। ব্যাগ খুলে যে রাখবে সে উপায় নেই। রুবি ড্যাবডেবে বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। চিঠিটা অবশ্য না পড়েও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। লীলা জানে ওতে কি লেখা আছে। দু'-চার ছত্র কবিতা, তাও আবার ভুল কোটেশন। একটা-দু'টো বানান ভুল। আর, "তুমি-আমার-ঘুম-কেড়ে-নিয়েছ" জাতীয় খানিকটা অজ্ঞ-বিলাপ। অবশ্য অজ্ঞ শব্দটার অভিধানগত অর্থে। এ সব ন্যাকামি তো লীলা কম দেখল না—প্রথম প্রথম মজা পেতো, এখন শুধু গা জ্বলে।

দরজার বাইরে পর্দার নিচে দিয়ে দু'খানি পা তখন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। খুক-খুক কাশি—ঠিক শ্লেষ্মাজনিত নয়—শোনা যাচ্ছে। লোকটা কি ভীরু। মেরুদণ্ড বলে কিছু ওর নেই না কি! সাহস থাকে তো আসুক না। এসে বসুক। এটা তো ওর দিদির বাড়ী। ভাগ্নীকে পড়ানোয় লীলা ফাঁকি দিচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করবার অধিকার তো ওর আছেই।

আর যেমন চরিত্র তেমনি চেহারা। রোগা টিঙ্‌টিঙ্‌ করছে, ঠেলা দিলে বুঝি পড়ে যাবে। নির্ঘাৎ ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে। নিষ্প্রভ চোখ দু'টির নির্বুদ্ধিতা উঁচু পাওআরের লেনস্‌ দিয়েও ঢাকতে পারেনি। কথা বলতে গেলেই কুঁজো হয়ে যায়, যেন কুর্ণিশ করছে; কপালের রগটা মাঝে-মাঝে চেপে ধরে, যেন স্বাস্থ্যহীনতাই বাহাদুরি। এই মূঢ়কে কে বোঝাবে দুর্বলতার অভিনয় করে বড়ো জোর অনুকম্পার উদ্রেক করা চলে, কিন্তু ভালোবাসা কেড়ে নিতে হলে চাই সাহস আর বলিষ্ঠতা,—শরীরের এবং চরিত্রের। আধো-আধো বুলি শুনলে মনে একমাত্র মাতৃভাব আসে, তার বেশী কিছু না।

পড়ানো শেষ হল। ব্যাগটা গুছিয়ে লীলা উঠে দাঁড়ালো। নীচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে শাড়ীর প্লেসটা ঠিক আছে কি না। তার পর বারান্দায় বেরিয়ে এলো। এদিক্‌-ওদিক্‌ একবার তাকালো কৌতূহল বশেই; তার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। শেষ ধাপ অবধি পৌঁছেছে, এমন সময় পেছনে খুক-খুক কাশির শব্দ শোনা গেল।
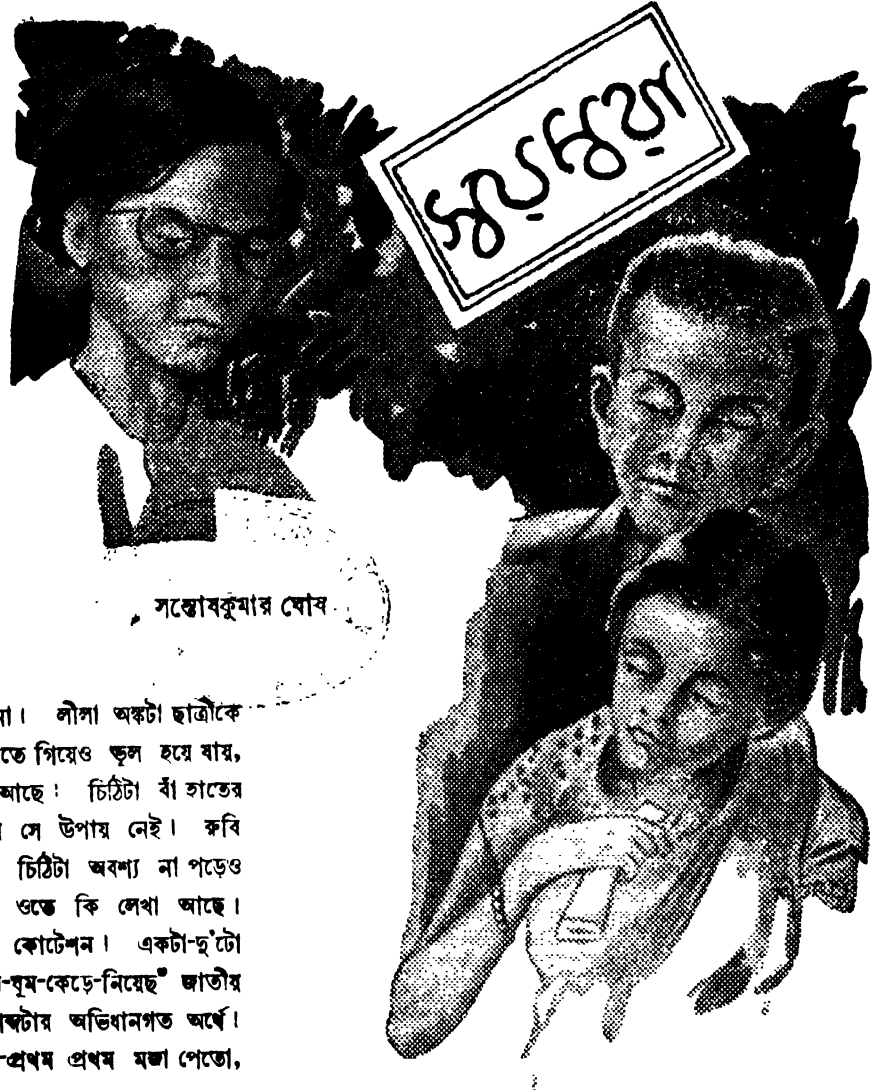
ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল, এবার মিহি—মার্জিত গলা কাণে এলো, 'শুনছেন।'

ঘুরে দাঁড়ালো লীলা।—'কি বলুন।'

বেশী দূর নামতে সাহস করেনি অনুপম, গোটা-পাঁচেক ধাপ ওপরে, সিঁড়িটা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী রোগা আর হ'লদে! এক ফোঁটা মাংস নেই, এক ফোঁটা নেই রক্ত। একটু কাঁপছেও বুঝি নার্ভাস হয়ে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—'আমার ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছেন?'

—'পেয়েছি।' লীলা হেসে ফেলল রকম-সকম দেখে, মাষ্টারণী মুখোসটা আর বজায় রাখা সম্ভব হল না।—'কিন্তু জিওগ্রাফির বই তো ডাকবাক্স নয়।'

প্রশ্রয় পাওয়া জীব-বিশেষের মতো অনুপম কোঁচা দোলাতে দোলাতে নেমে এলো আরো তিন-চার ধাপ। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মিঠি-মিঠি হেসে বললে, 'সব ডাকই কি ডাকবাক্সের মারফৎ পৌঁছয়, না পাঠানো চলে?'

লীলার মুখে একটা কঠিন কথা এসেছিল:—'প্রেম

সখ আছে অথচ হাতে চিঠি দেবার সাহস নেই ?'—বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কথাটাকে একটু কোমল করে বললে, 'হাতে দিতে পারেন না ?'

অনুপম হয়ত ভাবলে, এ-ও প্রশ্রয়। লীলা ওকে তবে উৎসাহ দিচ্ছে। যে দু'ধাপ বাকী ছিল, সে দু'ধাপও নেমে এলো। চকচকে গাল দু'টো। একটু আগেই কামিয়েছে বুঝি। বেহিসেবি স্নো মেখেছে। নির্মল-শ্মশ্রু চোয়াল আরো তোবড়ানো মনে হচ্ছে। লীলাকে ছুঁতে সাহস করলে না অনুপম, ধরা-ধরা গলায় শুধু বললে, 'অভয় দিচ্ছেন ?'

লীলা ধমক দিলে, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান অনুপম বাবু। আপনার আগের চিঠি দু'টোও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ করিনি এই জন্য যে তা হলে এই ট্যুইশনিটা ছাড়তে হত। আজো করতাম না। কিন্তু আপনি ডাকাডাকি করেই সমস্ত অনর্থ ঘটালেন। গোটা কতক শক্ত কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না। আপনার গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে অনুপম বাবু!'—একটু থেমে, শান্ত, ঠাণ্ডা-গলায় লীলা ফের বলতে শুরু করল, 'আপনি দিদির বাসায় পরম সুখে আছেন, খেয়ে, গড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাঁশী বাজিয়েও হাতে বাড়তি যে সময়টুকু থাকে সেটুকু প্রেম করে কাটাতে চান। ভুলে যান যে আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গরীবের মেয়ে, কোন রকমে পাশ করেছি, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপরেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ী-বাড়ী পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়। সংসারে উপরি ক'টা টাকা আনবার জন্যে। আমার ওপর কত জনের ভার আছে জানেন ? মা, বাবা, ছোট তিন বোন,—নাবালক দু' ভাই। আমাকে ভালবাসেন বলছেন। পারবেন এদের ভার নিতে ?'

অনুপমের গলা ক্ষীণতর হয়ে এলো, 'একটা চাকরির কথা চলেছে, সেটা ঠিক হলেই—'

চিঠিখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লীলা বললে, 'আগে ঠিক হোক, তার পর এ-সব দেবেন। আরো একটা কথা আপনাকে বলি। এ-সব চিঠি-ফিটি দেবেন না। কিছু বলার থাকে সোজাসুজি এসে বলবার সাহস অর্জন করুন। এই সব আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করা, শুনিয়ে-শুনিয়ে গুন্-গুন্ করে গান গাওয়া, ন্যাকামি-ভর্তি কবিতা কোট্ করে চিঠি পাঠানো, এ-সব ছাড়ুন। এতে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। পড়েননি, বলহীনের পক্ষে কিছুই লভ্য নয় ?'

অনুপমের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লীলা বুঝি ঈষৎ করুণা বোধ করল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল এই অপ্রিয় সত্য-ভাষণের। দুঃখ যদি পায় পা'ক্। একটা দুঃখের ভেতর দিয়েও শিক্ষা হোক। এমন ভুল যেন আর না করে, পুরুষ না হয়েও স্ত্রীলোকের প্রণয়-প্রার্থনার মতো ভুল।

রাস্তায় এসে লীলা দেখল এরি মধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। যখন পড়াতে এসেছিল তখন সকালের চোর-রোদ পা টিপে-টিপে পাশের উঁচু বাড়ীটার ছাদ থেকে এ বাড়ীর ছাদে সবে লাফিয়ে পড়েছে! তার পর এতক্ষণ ধরে কেবল গড়িয়ে নেমেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার পর্দায়, কম্পাউণ্ডের করবী আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের শীষে-শীষে। কব্জির ক্ষুদ্রাকৃতি ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে আটটা। ইস্কুলের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

বাসায় ফিরে সবে পোষাকি জামা-কাপড় বদলাবার উপক্রম করছিল, মা বললেন, 'বাইরের ঘরে তোর জন্যে কে বসে আছে।'

আমার জন্যে ? লীলা বিস্মিত হল। কে আবার এসেছে এত সকালে! অনুতপ্ত অনুপমই আবার আসেনি তো! কিন্তু এত শীগ্‌গির পৌঁছবেই বা কি করে ? তেল মাখবে বলে খোঁপাটা খুলে ফেলেছিল, আবার আলগা করে চুলগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে হল। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই চিরুণী বুলিয়ে নিলে কপাল আর কানের কাছে।

বাইরের ঘরে এসে যাকে দেখল, তাতে মনে হ'ল এত সবের প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই এক জন ক্যানভাসার। এর আগেও দু'-এক বার এসেছে লীলার কাছে। নিব্, কলম, পেন্সিল, চক্, ব্লটিং আর কাগজের ব্যবসা করে লোকটা। তা ছাড়া ওর বুঝি নিজেরি কি একটা কালি আছে। লীলাদের ইস্কুলের কনট্রাক্টটা নেবে বলে ওকে এসে ধরছে। লীলারই এক সহপাঠিনীর কি রকম আত্মীয় হয় বুঝি। প্রথম দিন তার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিল।

ডান হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর, বাঁ হাতটা নীচে ঝুলানো, লোকটাকে কুণ্ঠিত, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে লীলার মায়া হল।

'নমস্কার।' লীলাকে ঢুকতে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

'নমস্কার।' গম্ভীর কণ্ঠে বললে মাষ্টারণী-মানান গলায়, যেন চিনতে পারেনি এমন ভাব করলে।

'আমি মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেণ্ট করছি। স্মরজিৎ মিত্র।' ব্যাগ খুলে কার্ড বার করে দিলে লীলাকে। 'এর আগেও তো আমি এসেছি!'

কথা বলছে না তো খই ভাজছে, এই ক্যানভাসার জাতীয় লোকগুলো এমন চালিয়াৎ হয়! করিস তো বাবা পেনসিল-কাঁচি-ছুরি ফিরি, অথচ পোষাকের পারিপাট্য দেখলে মনে হবে একটা প্রিন্স কিম্বা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ম্যাগ্‌নেট হবে বুঝি। টুপি-ট্রাউজার-সার্ট-কোট-কলারের ষোড়শোপচার আয়োজন আছে ঠিক।

লীলার অনুমতি নিয়ে লোকটা সিগারেট ধরালে একটা; আগুনটা ধরালে এক আশ্চর্য কৌশলে, শুধু মাত্র ডান হাতে। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'নাউ টু বিজনেস। আমি ফেয়ার ফিল্ড চাই, ফেভার নয়। আমাদের ষ্টেশনারিজগুলোর স্যাম্পল আপনার কাছে দিয়ে যাই, বাজারের আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জানেন মিস্ সোম, আমি ভিক্ষঅনেষ্টি বিশ্বাস করি না। এই যে ফার্মটা গড়ে তুলেছি,—মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স—এটা আমারি এণ্টারপ্রাইজে তৈরী। ক্যাপিটাল সামান্য যা-কিছু তাও আমার।'

একবার কইতে শুরু করলে থামতে চায় না। গলার স্বরও কি আশ্চর্য ভারি লোকটার, অল্প-অল্প ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। কথা বলতে বলতে টেবিলে একটা চাপড় মেরেছিল, আস্তেই অবশ্য, তবু টেবিলটা যেন এখনো থর-থর করে কাঁপছে। কি মোটা-মোটা আঙুল, বাহুমূল, কব্জি আর কনুইয়ের বেড়-এ বোধ হয় কোন তফাৎ নেই।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। লীলা বললে, 'আমার বাসায় এসে তো

সুবিধে হবে না, এসব ব্যাপার হেড্ মিস্ট্রেসের হাতে। ইস্কুলে আসবেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।'

—'আশা দিচ্ছেন ?'

—'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' লীলা সংক্ষেপে বললে।

স্মরজিৎ মিত্র উঠে দাঁড়ালো। কড়কড়ে ইস্ত্রি, পুরো হাতা সার্ট ; বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। চকচকে নতুন পয়সার মতো তামাটে মুখ। স্বাস্থ্যের এতটা উজ্জ্বলতা না থাকলে কালোই বলা যেতো।

—'এক দিন তবে আপনার স্কুলে যাচ্ছি।' শেষ বারের মতো মাথাটা ঝুঁকিয়ে স্মরজিৎ চলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামলো। তার পর ফিরে একবার বাড়ীটাকে দেখে নিয়ে আবার সোজা এগিয়ে গেল। লোকটা পা ফেলছে জোরে জোরে, দূরে দূরে। ওর চলায়-ফেরায়-কথায়, এমন কি উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, সিগারেট ধরানোয়, কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা আছে, চোখে সেটা বেঁধে, কিন্তু বোঝা যায় না, কেন ?

পরদিন সকালে যখন ছাত্রী পড়াতে গেল, তখন লীলা ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। কালকের সকালের বিশ্রী ঘটনাটা ভুলতে পারেনি। অনুপম আজ আর চিঠি দিতে সাহস করবে না ঠিক, কিন্তু কে জানে হয়ত ওর দিদিকে কিছু বলে থাকবে। ও-সব প্যানপেনে ছেলেদের অসাধ্য কিছু নেই। নিজের কীর্তি-কাহিনী চেপে গিয়ে হয়ত দিদিকে বলেছে, মাষ্টারণীটা ওকে অবোধ মেষশিশু পেয়ে মাথা মটকানোর মতলবে ছিল ইত্যাদি। ছাত্রীর মাও কি ভাইয়ের কথা অবিশ্বাস করতে পারবেন, লীলাকে ছাড়িয়ে দেবেন। নতুন টীচার আসবে রুবির জন্যে। আবার দিন কতক তাকেও চিঠি লেখালিখি করবে অনুপম (পুরনো চিঠিগুলোর নকল রেখে দিয়ে থাকে যদি, তা হলে তো কোন মেহনতই নেই), তার পর ? হয়তো বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিম্বা নতুন টীচারটা পটেও যেতে পারে বা। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বুকটা একবার কেঁপে গেল লীলার, আজ আবার কি হয়, কে জানে। কিন্তু অনুপম ওকে দেখে গম্ভীর মুখে এক পাশে সরে দাঁড়ালো, কোন কথা বললে না। লীলা খানিকটা স্বস্তি পেল।

এর পরে রুবিও যখন রোজকার মতো খাতা-পেনসিল নিয়ে ঘরে ঢুকলো, এমন কি রুবির মাও একবার ঘরে এসে স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করে গেলেন, তখন আর সংশয়মাত্র রইলো না যে অনুপম কিছু বলেনি।

এর পরে আরো দু'-তিন দিন অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আরো যেন হ'লদে হয়ে গেছে অনুপম, এ ক'দিনে চোয়াল যেন আরো ঢুকে গেছে। ভেবেছিল, অনুপম ওকে কিছু বলবে ; কিন্তু লক্ষ্য করল, ওকে দেখলেই অনুপম গম্ভীর মুখে সরে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায়, এড়াতে চায়।

ক'দিন পরে অনুপমকে আর দেখতেই পেল না। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন কেটে গেল। শেষে লীলাই এক দিন কৌতূহলী হয়ে ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মামাকে যে দেখছি নে ?'

রুবি বললে, 'ও মা, জানেন না বুঝি। মামা এখান থেকে চলে গেছে।'

—'চলে গেছে ? কোথায় ?'

—'কানপুরে। আমার এক মাসিমার কাছে। সেখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, শুনেছি।'

লীলা বললে, 'ও।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কও হয়ে গেল। নিছক চাকরির জন্যেই লোকটা কানপুর গেছে এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আঘাতটা ভুলতেই গেছে। কেবল মাত্র তার জন্যেই একটা লোক দেশান্তরী হয়েছে, এ কথা ভেবে লীলার মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

দুই

বিজনেস করছে অথচ লোকটার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই। এসেছে যখন শেষ ঘণ্টাটিও বেজে গেছে। চক-মাখা হাত ধুয়ে লীলা ছাতা আর বই হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ী যাবে বলে, এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এলো ভিজিটিং কার্ড। এ কার্ড লীলার ব্যাগের মধ্যে আরো খান-দুই আছে। 'মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স, রিপ্রেজেন্টেড বাই এস, মিত্র।' পরিষ্কার স্বাক্ষর করেছে : এম-আই-টি-আর-এ। ইঙ্গবঙ্গীয় মিটার হয়নি, এই ঢের।

নীচে নেমে এসে লীলা ধমকের সুরে বললে, 'আচ্ছা, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন ? আপনাকে কি এখন আসতে বলেছি ? চারটে বেজে গেছে, হেড মিস্ট্রেস চলে গেছেন কখন—'

'তাতে কি হয়েছে ?' ঈষৎ স্মিত, কতকটা অপ্রতিভ মুখে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো। 'আরেক দিন না হয় আসবো।'

পাশাপাশি গেট অবধি এলো ওরা। লীলা বললে, 'বিবেচনার অভাবে আজ আপনার শুধু পরিশ্রমই সার হল।'

'শুধু পরিশ্রমই নয়।' স্মরজিৎ একটু হেসে বললে, 'পারিশ্রমিকও তো কিছু পেলাম মনে হচ্ছে।'

লীলা সামান্য চমকে উঠলো। সহজ, স্বাভাবিক গলায় একেবারে সোজাসুজি কথা বলছে লোকটা। বাঁকা গলি-ঘুঁজি চেনে না। ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাত রেখে পাশাপাশি একেবারে সটান হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও কুণ্ঠা নেই। সেদিনও মনে হয়েছিল, আজো মনে হল, লোকটার সপ্রতিভতা আছে, কিন্তু সেটা যেন অতিপ্রকট।

'আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?' জিজ্ঞাসা করলে স্মরজিৎ।

—'বাসায়। আপনি ?'

—'ঠিক নেই।'

লীলা বললে, 'আচ্ছা, তা হলে চলি।'

—'চললেন ?' লোকটা এক মুহূর্ত যেন একটু ইতস্তত করল, তার পর বললে, 'চলুন তবে। আমিও এদিকেই যাবো।'

কিছু বলাও যায় না। রাস্তা তার একার নয়। তবু পাশাপাশি হেঁটে যেতে লীলা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। ট্রামে-বাসেও এ সময় বড়ো ভীড়। একটা রিক্‌সা দেখে লীলা এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। কিন্তু স্মরজিৎও দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—'রিক্‌সা করবেন ? উঠুন না। অনেকখানি তো পথ।'

—'না, না।' কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো লীলা, প্রায় চীৎকারের মতো শোনালো, এক রিক্‌সায় ওঠার চেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া ভালো।

খানিকটা গিয়ে স্মরজিৎ প্রস্তাব করল, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন? সেই কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন।'

একবার রিক্‌সায় ওঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, চা খেতে অস্বীকার করবার শক্তি লীলার ছিল না। এই লোকটার না-বুঝ আবদারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা দুর্নিবার দাবী আছে, প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় নেই। নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, পাশা-পাশি চলেছে, একে ফেরাতে হলেও কিছু দিয়ে তবে ফেরাতে হয়।

চা খেতে-খেতে স্মরজিৎ ওর জীবনের কাহিনী শোনালে। চমকপ্রদ কিছু নয়। প্রায় সবটাই মামুলি। লেখা-পড়া বেশী দূর হয়নি। মা-বাবাকে ছোট বেলাই হারিয়েছে। মামা-বাড়ী থেকে কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। আর বেশি দূর পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু কলকাতা পালিয়ে এসেছিল, এক বস্ত্রে, ছ'আনা সম্বল করে। পড়া-শুনার সুবিধে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়েছিল। আর সে কত রকমের চাকরি। মুদি-দোকানে,—শুধু খোরাকি আর দু'টাকা পেতো। সেই থেকে এক দপ্তরীখানায়, দপ্তরীখানা থেকে বইয়ের দোকানে। বইয়ের দোকান থেকে—'

লীলার মুখের দিকে চেয়ে স্মরজিৎ বললে, 'থাক, এত কথা শোনবার আপনার ধৈর্য থাকবে না।' পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে ধরালো, এবং লীলা লক্ষ্য করল, সেই আশ্চর্য উপায়ে, ডান হাতে।

স্মরজিৎ ফের বলতে শুরু করলে, 'এটুকু শুধু জেনে রাখুন, দিন কতক এক রেলওয়ে লেভেল ক্রশিংয়ের গুমটি-ঘরেও কাজ করেছি—সেখানেই বাঁ হাতটা কাটা যায়।'

—'কাটা যায়?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল লীলা।

—'কাটা যায়।' কথাটার পুনরুক্তি করল স্মরজিৎ। 'দেখছেন না, আমার বাঁ হাত নেই।' প্যান্টের পকেট থেকে হাতটা বার করে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে টেবিলের ওপর রাখল স্মরজিৎ। কনুই থেকে কব্জি অবধি একখানা কাঠ শুধু, তার পর ইস্পাতের পাঁচটা আঙুল তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে এসে দৃষ্টি বিদ্ধ করছে।

লীলা শিউরে উঠল একবার, এবং সেটা স্মরজিতের কাছে গোপন রইলো না।

—'ভয় পেলেন?' আস্তিনটা আবার টেনে দিয়ে হাতটা পকেটে পুরে দিয়ে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করলে।

লীলা অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'না। তার পরে বলুন।'

এতক্ষণে বুঝি বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। ওর একটা অঙ্গ নেই, সেইটে ঢাকতেই এতটা স্মার্টনেসের অভিনয় করতে হয়, চটপটে ভাব দেখাতে হয়। এমন যে স্বাস্থ্য, সার্টের নিচে স্ফুরিত পেশীর ইঙ্গিত, সব কেমন মেকি মনে হল লীলার। ওর চোখ দু'টির তীব্র ঔজ্জ্বল্যের নিচেও একটা দৈন্য লুকানো আছে, যা মুগ্ধও করে, করুণাও আনে।

রাস্তায় নেমে স্মরজিৎ বললে, 'এখনো আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি। এখনো ভালো করে দাঁড়াতেই পারছি না। বাজার খারাপ। আমার টুক কম, খুচ্‌রো কারবার, আমার কোটেশনও একটু চড়াই হয়, বড়ো-বড়ো ব্যবসাদারদের মতো কম মার্জিনে তো ছাড়তে পারি না। আর আমাদের দেশে দেশপ্রীতি সব মুখে-মুখে, বিলিতি জিনিষ পেলে কেউ দিশী জিনিষ ছোঁয় না। তবে হাল ছাড়িনি। দমদমের ওদিকে ছোট একটা বাসা নিয়ে আছি। কালিটা আমার নিজের। তা ছাড়া ছোট-খাটো দু'-একটা টয়লেটের উপচারের ফরমূলা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছি। এ থেকে বড়ো একটা পারফিউমারি আমি গড়ে তুলবোই। আপনারাও রইলেন, দেখবেন একটু-আধটু।'

লীলা প্রতিশ্রুতি দিলে দেখবে।

বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। স্মরজিৎ বললে, 'চলি তাহ'লে, নমস্কার। শীগ্‌গিরি এক দিন আপনার ইস্কুলে যাবো।'

—'নমস্কার,' বললে লীলা। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো পেছন ফিরে। সেই উদ্ধত চলবার ভঙ্গি। পকেটে একটা হাত ঢোকানো। কিন্তু সে রকম বিসদৃশ বোধ হল না। একটা হাত নিয়েই অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝছে লোকটা, ভাবতেও ভালো লাগলো। আঘাত আছে, কিন্তু পরাজয় নেই। ভিক্ষা নেই, তবু প্রাপ্য আদায়ের প্রতিশ্রুতি আছে। আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে শুধু দৃঢ়তাই নেই, একটু কাঁপা-কাঁপা অসহায়তাও আছে যেন। হয় লোকটাকে ভালো লাগবে না, ওর আলাপচারিতাকে যেচে এসে ভাব করার মতো মনে হবে, নয় ত ওর সবটুকু ভালো লাগবে,—চলা-ফেরা-আলাপ, এমন কি প্যান্টের পকেটে লুকানো হাত নিয়ে অখণ্ড যে মানুষ, তাকে।

হেড মিস্‌ট্রেসকে আগেই বলে রেখেছিল, স্মরজিৎ নিজেও এর পর এক দিন এসে আলাপ করে গেল। কিছু-কিছু জিনিষ হেড মিস্‌ট্রেস সেদিনই নিলেন, প্রায় কুড়ি টাকার মতো। এ পাড়া মাসে প্রায় টাকা পঞ্চাশের মতো জিনিষ নিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনেই টার্মিন্যাল পরীক্ষা। সে জন্যে খাতার কাগজও চাই।

সেদিন খুব খুশি-খুশি দেখালো স্মরজিতকে। রাস্তায় এসে লীলাকে বললে, 'আমার সত্যি খুব উপকার করেছেন!'

কুণ্ঠিত হয়ে লীলা বললে, 'এ আর কি। এতে আপনার এমন কতোই বা থাকবে।'

স্মরজিৎ বললে, 'দশ পার্সেন্টের ওপর; তা ছাড়া কালিটা আমার, ওটাতে তো ফিফ্‌টি পারসেন্ট। অবশ্য টাকার অঙ্কই শুধু নয়—'

আবার উচ্ছ্বাসের মুখে কি বলে বসে ঠিক নেই, লীলা তাড়াতাড়ি বললে, 'আর বেশী দূর যাবো না, টিফিনের পর আমার আবার ক্লাশ আছে।'

—'এই পার্কটায় তবে একটু বসি চলুন।'

দুপুরের দিকে পার্কটা এমনিই নির্জন। এক কোণে কয়েকজন লোক তাস খেলছে। চিনেবাদামওয়ালা ঝিমুচ্ছে এক কোণে। চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান দু'-চার জন ছায়ার নিচে বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে। যত্ন করে লাগানো সীজন ফ্লাওয়ারগুলোও কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে, যে রোদ সকালে ওদের ফুটিয়েছিল, সেই এখন সব রস টেনে শুকিয়ে দিতে চাইছে।

ঘাসের ওপর বসল দু'জনে। খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। স্মরজিৎ একটু পরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বাক্স বার করে বললে, 'হাত পাতুন।'

কঠিন হয়ে উঠছিল লীলার মুখ। বললে, 'এ আবার কি?'

—'খুলেই দেখুন না।'

স্পর্ধার সীমা নেই। কী উপহার এনেছে দেখ। ছোট শিশিতে এসেন্স, একটা কৌটোয় স্নো কিম্বা ক্রীম হবে বুঝি। যেমন রুচি, তেমনি সাহস।

—'কিনে এনেছেন তো?'

স্মরজিৎ বললে, 'কিনে আনিনি। আমার নিজের হাতে তৈরি; সে দিন আপনাকে বলেছিলুম না ফরমূলার কথা? তাই থেকে এই হয়েছে। প্রথম তৈরি জিনিষ আপনাকেই দিলাম দুটো। কিছু অন্যায় হয়েছে?'

'অন্যায়?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে লীলার মুখ।—'আপনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন, সত্যি?' কৌটো খুলে নাকের কাছে ধরে প্রাণ ভরে টেনে নিলে গন্ধ।—'তবে এবার আপনার ফার্ম পুরোদস্তুর পারফিউমারি হয়ে গেল।'

—'হলই তো।' উৎসাহ পেয়ে স্মরজিতেরও মুখ খুলে গেল, 'অবিশ্যি বাজারে চালাতে এখনো কিছু বেগ পেতে হবে, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি খরচাও কম নয়। আপনি অবিশ্যি আপনার চেনা-শোনা, মেয়ে-মহলে বলে দিতে পারবেন—'

—'পারবোই তো।' বললে লীলা।

—'আমার আরো ইচ্ছে আছে', স্মরজিৎ বলে গেল, 'একটা সুগন্ধি তেলের ফরমূলাও পেয়েছি। এ ছাড়া পাউডার, আলতা, এমন কি সাবান পর্যন্ত···আমার স্বপ্নের কূল-কিনারা নেই, লীলা দেবি।'

তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'যাবেন এক দিন আমার বাসায়, নিজে চোখে দেখে আসতে পারতেন সব; আমার ল্যাবরেটরি। সামান্যই আয়োজন, কিন্তু একটা বৃহৎ পরিণতির সূচনা দেখতে পেতেন।'

—'আপনার বাসায়?' বিস্মিত, ভীরু-ভীরু গলায় লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আর কে আছেন?'—প্রশ্নটা নিজের কানেই অর্থহীন, অতি-সাবধানী, বোকা-বোকা শোনালো।

—'আমার এক পিসীমা আছেন।' বললে স্মরজিৎ। তার পর লীলার মুখের দিকে চেয়ে ওর প্রশ্নটার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললে,—'ভয় নেই, স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করব, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন এখনও হইনি।'

লজ্জিত মুখে লীলা বললে, 'সে জন্যে নয়, সে কথা ভেবে বলিনি। আমার আবার রবিবার ছাড়া ছুটি নেই কি না, অন্য দিন সকালে টিউশানি, দুপুরে স্কুল—'

—'বেশ, তবে রবিবারেই যাবেন।' বললে স্মরজিৎ।

লীলা সম্মতি দিল, কিন্তু রবিবার মানে যে একেবারে পরের রবিবার, তখন বুঝতে পারেনি।

খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল, ঠিক এমন সময় স্মরজিৎ এসে হাজির।

—'চলুন।'

—'বাঃ রে, কোথায়?'

—'মনে নেই? আজ আমার ওখানে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।'

—'দিয়েছিলাম বুঝি? কি আশ্চর্য দেখুন', লীলা বললে 'একেবারে মনে নেই। যেতেই হবে?'

জিজ্ঞাসা করে স্মরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল এ প্রশ্ন একেবারে নিরর্থক, যেতে হবেই, এসেছে যখন।

—'একটু বসুন, তৈরী হয়ে নিই।'

তৈরী হতে সেদিন সময় লীলার কিছু বেশীই লাগল। ঘণ্টাখানেক আগেই স্নান করেছে তবু আরেক বার সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হ'ল। পোষাকের বাহুল্য কোন দিনই ছিল না, না ছিল সখ, না সামর্থ্য। আজ মনে হ'ল, বাইরের বেরুবার উপযোগী জামা-কাপড় আর দু'-একটা বেশী থাকলে কিছু ক্ষতি হত না।

শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হ'ল। পেরিয়ে গেল বেলগাছিয়ার পুল, তার পর যশোর রোড্। কী মসৃণ পথ! শহরতলীর এদিকটাতে লীলা কখনো আসেনি। কয়েকটা বড়-বড় কারখানা পেরিয়ে এরোড্রাম, তার পর থেকেই গ্রামের ছোপ লাগল। রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু, শিরীষ, বট, অশথ। ক্বচিৎ কৃষ্ণচূড়া। ঝাউ আর দেবদারু। অসংস্কৃত মাথা গ্রামীণের মতো পলাশ। লাল আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে পথ, গির্জার খিলানের মতো। দু'ধারের মাঠের মাঝে-মাঝে অসম্পূর্ণ ইটের পাঁজা।

—'এসে গেছি। আসুন নামি।'

স্মরজিতের কথায় চমক ভাঙলো।

—'এখানেই?'

—'আবার কতো দূরে। বারাসত যেতে চান না কি?'

যশোর রোড থেকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে মাঠের রাস্তা। 'আপনার হয়ত চলতে অসুবিধে হবে', স্মরজিৎ বলল।

—'কিছু মাত্র না। আমার বেশ ভালোই লাগছে।'

কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ হাওয়া। প্রান্তরের একটা নিজস্ব সুর আছে, লীলা ভাবলে। এটা বুঝি নিয়ত প্রবহমান হাওয়ার শব্দ, যা কখনো ফুরোয় না। দূরের গাছগুলোর একটি পাতাও নড়ছে না, তবু কানের কাছে এই গুন্-গুন্ এলো কোথা থেকে।

খানিকটা এগোতেই আবার লোকালয় পড়ল। শহরের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। শহরের বাড়ীগুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠেছে, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর এখানে এক-একটি জায়গায় কতগুলো কুঁড়ে ঘর একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে আছে, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার। নিজের পায়ের শব্দে নিজেরি চমক লাগে। আম, জাম, আমলকী, কমরাঙ্গা আর জামরুল। পাতায় পাতায় পাখীর কলস্বর।

—'আমার বাসা। একটু দেখে আসবেন, বাঁশের মাচাটা বড্ডো দোলে।'

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল, এবার লীলা ফিরে এলো বাস্তবে। খান-তিনেক ছোট-বড়ো ঘর, একটার দাওয়া পাকা, বাকি দু'টোই কাঁচা। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা যেন স্যাঁতসেঁতে লাগছিল, স্মরজিৎ খুলে দিল। তার পর ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা!'

পিসীমা আসতেই লীলা খানিকটা ইতস্তত করে প্রণামই করল। স্মরজিৎ বললে, 'আপনারা গল্প করুন বসে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

পিসীমা বললেন, 'তোমার কথা আমি ওর কাছে অনেক বার শুনেছি। তুমি ওর জন্য অনেক করেছ।'

লীলা কুণ্ঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানালে। স্মরজিৎ ফিরে এসে বললে 'আসুন, আমার ল্যাবরেটারি দেখবেন।'

গোটা-কতক কাচের নল, খালি শিশি আর বড়ো বোতলে মিলিয়ে ডজন কয়েক, এরই নাম স্মরজিৎ দিয়েছে ল্যাবরেটরি? মুহূর্তে লীলার সব উৎসাহ যেন নিবে এলো। একে ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দুরাশা ছাড়া আর কি! চেয়ে দেখল, আশা-দীপ্ত চোখে স্মরজিৎ তার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জিত হয়ে পড়ল লীলা। বললে, 'বাঃ, বেশ তো!'

আর অমনি খুশি হয়ে উঠলো স্মরজিৎ। 'আপনি এনকারেজ করছেন?' অনর্গল কথা বলে গেল। দু'-একটা প্রিপেয়ারেশনের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলে সংক্ষেপে। 'আপনার মনে হয় না এর পসিবলিটি প্রচুর। আরো যখন বড়ো হবে, তখন একটা কারখানা করব। সামনের এই জমি আর জলাটা কিনে নেবো।'

ভিজে মাটির গন্ধ আসছে নাকে। শীতের বেলা গড়িয়ে এলো। ঘরখানা অন্ধকার-প্রায়। একটা হাত ঘুরিয়ে স্মরজিৎ বিশদ ব্যাখ্যা করছে, কাটা হাতটা অসতর্ক ভাবে ঝুলছে এখন। আর স্মরজিতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা চোখ দু'টো চুরুটের আগুনের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ কেমন শিউরে উঠলো লীলা। শরীরটা ছম-ছম করে উঠলো। বললে, 'চলুন যাই।'

—'এখুনি যাবেন?' স্মরজিৎ একটু যেন দমে গেল।

—'চলুন তবে।'

পিসীমা ইতিমধ্যে চা তৈরি করেছিল। খেয়ে আর লীলা বসল না।

—'এসো মাঝে-মাঝে।' পিসীমা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে অনুনয়ের সঙ্গে কাতরতাও ধ্বনিত হ'ল, মনে হ'ল লীলার।

—'আসব,' লীলা বললে। যদিও সে ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল, আর কোন দিন আসবে না। পিসীমার কণ্ঠের সঙ্গ-ব্যাকুল কাতরতা থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় স্মরজিৎদের আত্মীয়-বন্ধু বেশি নেই। নির্বান্ধব পুরীতে পিসীমা আছেন একলাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। লীলাই হয়ত এ বাড়ীতে প্রথম অতিথি।

তিন

সেদিন বাড়ী ফিরে পোষাক বদলাতে বদলাতে লীলা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, তার এই আকস্মিক আশাভঙ্গের হেতুটা কি। কি দেখবে বলে আশা করে গিয়েছিল, কি দেখতে পায়নি। সন্দেহ নেই, দূর থেকে স্মরজিতের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ওর মনে সামান্য একটু রঙীন অনুভূতি এনে দিয়েছিল, এই লোকটি অদৃষ্টের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কষছে,—চিত্রটি সম্ভ্রম এনেছিল মনে, সেই সম্ভ্রম থেকে এসেছে কৌতূহল, যাকে খেয়ালও বলা যায়। কিন্তু কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, ফিকে রঙীন, কাছে গিয়ে দেখল রক্তের মতো গাঢ় লাল। সভয়ে পিছিয়ে এসেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। খসে-খসে পড়া মাটির দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস-মুর্গী-পায়রার সদৃচ্ছ বিচরণ। দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার হওয়া চলে না।

চা ঢালতে ঢালতে পিসীমা গল্প করছিলেন, ওঁকেও বেরুতে হয়, স্মরজিতের তৈরি জিনিষ নিয়ে। 'বুড়ো মানুষ, পেরে উঠি নে। একটুতে হাঁপিয়ে পড়ি। আমার কাছ থেকে কেউ জিনিষ কিনতেও চায় না—' আক্ষেপ করে বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে ঠোঁটের কাছে চায়ের বাটি বিষিয়ে উঠেছিল। পিসীমা বুড়ো মানুষ, ক্যানভাসার হিসেবে অযোগ্য, তাই কি স্মরজিৎ তাকে এখানে এনেছে? ওকেও তার বণিক্-বৃত্তির জোয়ালে জুড়ে দিতে চায় না কি এই রকম একটা সন্দেহ এসেছিল মনে।

চলে আসবার আগেও স্মরজিৎ বলেছে, 'এখুনি যাবেন? বাড়ীর পেছনে একটা পোলট্রি করেছি, দেখে যাবেন না?'

—'না।'

—'আর ছোট একটা বাগানও করেছি, এ থেকে পরে হয়ত নার্সারি চলতে পারে একটা। তবে একলা মানুষ', স্মরজিৎ হেসে বলেছিল, 'তাতে আবার একটা মোটে হাত, সব পেরে উঠি নে।'

'তাই বুঝি আমাকে এনেছেন', রূঢ় এই প্রশ্নটা এসেছিল জিহ্বাগ্রে, কিন্তু লীলা নিজেকে সংবরণ করেছে।

মনে-মনে স্থির করলে লীলা, আর কখনো দমদমে যাবে না। কি কাজ স্মরজিতের সঙ্গে এত মাখামাখিতে, ক'দিনেরই বা চেনা! কালি, নিব, পেনসিল বিক্রি করতে এসেছিল, লীলার সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য তো লীলা যথাসাধ্য করেছে। এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মারাত্মক হবে। প্রথমত লীলা কাউকে বিয়েই করবে না,—মা-বাবা-ভাই-বোনের এই গোটা সংসারটার বোঝা তার ঘাড়ে। বিয়ে যদি কখনো করতেই হয়, তবে এমন কাউকে করবে, যে সঙ্গতিপন্ন, অন্ততঃ এই সংসারটার দায়িত্ব নিতে পারবে। স্মরজিৎ নিজেই টলমল করছে—

চিন্তার রাশ টেনে দিলে লীলা। এ সব কথা উঠছে কেন? স্মরজিৎ তো কখনো আভাসও দেয়নি। লীলার কাছে সহানুভূতি পেয়েছিল, হয়ত জীবনের প্রথম সহানুভূতি, তাই উৎসাহ নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় গিয়েছিল, হয়ত আর কোন কথা স্মরজিৎ নিজেই ভাবেনি। আর এমন পাগলের দুরাশা কি স্মরজিতের হবে?

ঠিক দু'দিন পরে স্কুলে ঢোকবার সময় গেটের সম্মুখে স্মরজিৎকে পায়চারি করতে দেখে লীলা জ্বলে উঠলো। বাঁ হাতটা পকেটে, ডান হাতে ব্যাগ, ঠোঁটে সিগারেট, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরছে দেখ। মেয়ে-স্কুলের সামনে, কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে।

—'আজ আবার এসেছেন কেন?' সামনে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠেই লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাকে তো হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, জিনিষ কিনিয়েও দিয়েছি, আর কী চাই?'

বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে শাদা দেখাল স্মরজিতের মুখ। 'আর?' অস্ফুট, নীরস কণ্ঠে বলল, 'আর কিছু চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিনকার পেমেন্টটা এখনো কিছু বাকি আছে—'

আরো কি কি কঠিন কথা বলবে বলে লীলা স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু পেমেন্টের কথা শুনে যেন একটু চমকে গেল। পেমেন্ট? শুধু টাকা চাইতেই লোকটা এসেছে না কি। 'আসুন' বলে স্মরজিৎকে নিয়ে গেল একাউন্টেন্টের কাছে। লিখিয়ে দিল চেক।

চেকটা নিয়ে স্মরজিৎ আর দাঁড়ালো না। শুধু একটা নমস্কার মাত্র করে রাস্তায় গিয়ে নামলো। একটু এগিয়ে ষ্টপেজের ধারে ট্রামের অপেক্ষা করতে লাগল। ট্রাম এলো প্রায় বোঝাই হয়ে। ষ্টপেজে দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো না ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল স্মরজিৎ, লীলার মনে হল, পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে কোন রকমে সামলে নিলো। আহা, একখানা মোটে হাত!

একটু আগেই অভদ্র ব্যবহার করেছে সে জন্যে মনে-মনে অনুতপ্ত হল লীলা। হয়ত সত্যিই ওর টাকার দরকার, পেমেণ্টের জন্যেই এসেছিল, শুধু পেমেণ্টের জন্যেই!

পরের রবিবারে যখন দমদমের বাসে নিজে থেকেই চড়ে বসল, তখন লীলার কম বিস্মিত হয়নি। নিজেকে বোঝালে, গত সপ্তাহে যে অপমান করেছি তার জন্যে মার্জনা চাইতে যাচ্ছি। এ শুধু 'ভদ্রলোকেদের' তাগিদ। কর্তব্য।

দু-এক বার ভুল করে রাস্তা সে চিনে বার করলও ঠিক। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে স্মরজিৎ একটা বই পড়ছিল, লীলাকে দেখে ওর মুখে যে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো সেটুকু গোপন করতে চেষ্টাও করল না। বইখানা মুড়ে রাখল চেয়ারের হাতলে। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'পিসীমা, ও পিসীমা, দেখে যাও কে এসেছে।'

স্মিত মুখে পিসীমাও এসে দাঁড়ালেন দরজায়। 'এসো, মা, এসো।'

লীলা লক্ষ্য করল, সে এলেই এরা দু'জনেই কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মৃতকল্প আবহাওয়ায় যেন স্পন্দন লাগে। বাইরের থেকে কেউ যে এত দূরে কষ্ট করে এসেছে, ওদের পাশে পাশে দাঁড়িয়েছে এই জন্যেই বুঝি পিসীমা কৃতজ্ঞ বোধ করেন। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত লোকের চিত্ত যেমন দিগন্তে শাদা পালের চিহ্নটুকু দেখা গেলেও উদ্বেগ হয়ে ওঠে।

নিজের কাছে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল লীলার। এরা তো কই জিজ্ঞাসা করল না, কেন এসেছ। কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া নেই, অভিযোগ নেই, এসেছে যে এতেই খুশি।

পিসীমা বুঝি কালির বড়িতে ষ্ট্যাম্প দিচ্ছিলেন, অল্প অল্প কালি লেগেছে তাঁর কাপড়ে, ঘাম মুছতে গিয়ে কাপালেও। সেখানে গিয়ে লীলা বসে পড়ল।—'আমিও ষ্ট্যাম্প লাগাবো, পিসীমা।'

'পিসীমা' সম্বোধনে নতুন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটা লীলার কানেও ধরা পড়ল। চোখে-মুখে অকারণেই রক্ত ছড়িয়ে গেল।—'এ তো সহজ কাজ।'

—'তোমাদের কাছে সহজ বাছা, কিন্তু আমরা এই পেরে উঠি নে।'

ঘুরে-ঘুরে সেদিন স্মরজিতের বাগান দেখলে লীলা। পোলট্রিও। আপাততঃ হাঁস-মুর্গী সব ডজন খানেক করে আছে, স্মরজিৎ বললে। শেয়ালে নিয়ে যায়, ঠিক মত দেখা-শুনা হয় না তো। তবু যখন ডিম দেবে—রোজ যদি ছ'ডজন করে পাওয়া যায়, তবে বাজারে ডিম এখন দু'-আনা করে—

—'থাক, অতো হিসেব করতে হবে না।' লীলা হেসে বললে। 'কেবল লাভের কথা ভাবলে চলে না, লোকসানের জন্যেও তৈরী থাকতে হয়।'

—'সে তো আছিই।' অন্য দিকে চেয়ে স্মরজিৎ আস্তে আস্তে বললে।

কিছুক্ষণ থেকে মৃদু ও মধুর একটা সৌরভ পাচ্ছিলো।—'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

পেছন দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'নেবু-ফুলের।'

—'এমন চমৎকার?'

স্মরজিৎ একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুলে অল্প একটু চটকে লীলার নাকের সম্মুখে ধরলো: 'দেখুন দিকি। এত দিন নেবু খেয়েছেন, নেবু গাছ চেনেন না বুঝি?'

ঘুরে ঘুরে স্মরজিৎ ওর বাগান দেখালে। গোটা-কতক ফুল তুলে বেঁধে দিলে তোড়া করে। রোদ এরি মধ্যে কখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সীমানার বাইরের ক্ষেত থেকে অর্ধপক্ক রবিশস্যের ঘ্রাণ আসছে হাওয়ায়। সে হাওয়ায় ঠাণ্ডার অবসাদময় আমেজ। পায়ের নীচে নরম মখমলের মতো ঘাসের ওপর গহনার মতো ফুল ছড়ানো। মাথার ওপর কখন থেকে একঘেয়ে গুন্‌গুন্ শোনা যাচ্ছে। কী? না মৌমাছি চাক বাঁধছে।

বাসে তেমন ভীড় নেই, তবু স্মরজিৎ যখন প্রথম দু'টো বাস ছেড়ে দিতে বললে, লীলা আপত্তি করলে না। শীতের পড়ন্ত বেলায় আলস্যটুকুর ছোঁওয়া লেগেছে মনেও।

দমদমে গেল পরের রবিবারেও। তার পরের রবিবারও বাদ গেল না। ক্রমশঃ ফি রবিবারেই। ছুটির দিন এলেই কি একটা দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। প্রথমটা অস্বস্তি, ক্রমশঃ অস্থিরতা অথচ কারণ বোঝা যায় না। অথচ শেষ পর্যন্ত প্রতিবারেই দেখা যায় দমদমের বাসে উঠে বসেছে।

গিয়ে যে খুব ভালো লাগে তা-ও নয়। কিন্তু খারাপও তো লাগে না। কী যেন একটা যাদু আছে বন্ধুর অসমতল মাঠের, রবিশস্যের আঘ্রাণের, নিঃসঙ্গ ঘুঘু-কণ্ঠের, নেবুপাতার মিষ্টি-মধুর সৌরভের। একখানা হাত শুধু দূরেই ঠেলে দেয় না, একটা রহস্যময় পশ্চাতেও কাছেও টানে। সেই ছমছমে ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ঢুকলে শরীরটা শিউরে ওঠে সত্যি, রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু রোমাঞ্চ তো শুধু ভয়েই হয় না।

নিজেকে ক্রমশঃ একটা জালে জড়িয়ে ফেলছে লীলা, স্পষ্ট বুঝতে পারে। এদের দ্বৈত সংগ্রামের সঙ্গে অলক্ষ্যে কবে নিজেও যুক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সে বুঝি এটা চায়নি স্মরজিতের তৈরি প্রসাধন-উপচার নিয়ে নিজের পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই দু-চার বার গেছে; সাফল্যও, আশানুরূপ না হোক, পেয়েছে। পাঁচ টাকার জিনিষও যেদিন চালাতে পেরেছে সেদিন আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে পড়েছে। আবার কখনো কখনো স্মরজিতের প্রতি অকারণেই সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে। কঠিন আঘাত করতে চেয়েছে এই মানুষটিকে। আবার পরক্ষণেই হয়ত নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে। দোষ তো স্মরজিতের নয়। এ দ্বন্দ্ব লীলার মনের। নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।

আবার নেশাও। জানে না ভবিষ্যৎ কী, জানে পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু তবু রাশ টানতে পারে না। এই সব অস্বাস্তিকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি লীলা সে সপ্তাহে খুব প্রাণপণ

খাটলে। যখনই অর্ডার পেয়েছে, মিত্র কোম্পানীর মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত। পিসীমা যা পারেন না, এমন কি স্মরজিৎও নয়, তা লীলাকে দিয়ে যেন অনায়াসেই হয়। তার কাছ থেকে জিনিষ রাখতে দোকানদারদের বিশেষ আপত্তি হয় না। কথা-বার্তায় লীলা স্মার্ট, আর লোকে তো বলে চেহারাটা এখন পর্যন্ত ভালোই। রবিবার গিয়ে স্মরজিৎকে হিসাব দিতেই স্মরজিৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—'বলেন কি? হাজার টাকা? হাজার টাকার অর্ডার এক হপ্তায়? বুঝেছি, আর বেশি বাকি নেই, আমার সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

—'আমি জানি মা যখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আর কোন ভাবনা নেই। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' পিসীমা পাশের ঘরে চা করতে চলে গেলেন।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ওরা কারবারের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ-পরিকল্পনা করলে। ল্যাবরেটরি ঘরটাকে আর একটু সম্প্রসারিত করতে হবে। খবরের কাগজের মারফৎ প্রচার-ব্যবস্থারও সময় এসেছে। দু'জনে মিলে ওরা বিজ্ঞাপনের কপিও মুসাবিদা করলে একটা। আর,—আর দরকার হয় তো লোক রাখতে হবে আরো দু'-একটা।

—'এক জন লোক তো রেখেইছি,' স্মরজিৎ ঈষৎ হেসে বললে, 'তবে পার্ট টাইম, এই যা। আসে আর চলে যায়। তাকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি যেতো। কি বলেন মিস্ সোম?'

লীলার মুখের সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন স্তব্ধ। কিছু দিন থেকেই এই কঠিন মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে, ভয় করেছে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেই মুহূর্ত এলো আজ, শীতের এই দ্রুত ক্ষীয়মাণ দিনান্তে। কি উত্তর দেবে। ওর নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়াই যে এখনো শেষ হয়নি।

এগিয়ে এসে স্মরজিৎ ওর কাঁধে ওর শক্ত ডান হাতখানা রাখলে। —'আমি জানি লীলা, এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সময় দিলাম। সব দিক্ ভেবে তুমি এক দিন, দু'দিন,—সাত দিন পরেই না হয় জবাব দিয়ো। আমার সবই তো তুমি জানো। আমার দিক্ থেকে তো জানাবার কিছু নেই—'

শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। কঠিন একটা প্রয়াসে নিজের সমস্ত সত্তাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লীলা। 'আমি পরে আবার আসব' ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারলো শুধু।

পরে? কিন্তু কত পরে লীলা? সাগ্রহে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু জবাব পায়নি। লীলা দ্রুত পায়ে চলে এসেছে গেট খুলে সদর রাস্তায়, তার পর মুশুরি কলাইয়ের ক্ষেত আর পাখীর কাকলি পেছনে ফেলে শ্যামবাজারের বাসে!

চার

দিন দুই বাদে এক দিন সকালে পড়াতে গিয়ে দেখল, বাইরের ঘরের সোফায় বসে কে খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা মনে হল চেনে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলো না। পড়াতে পড়াতে এক সময় রুবিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাইরের ঘরে নতুন এক জন লোক দেখলাম রুবি, কে বলো তো।'

—'নতুন লোক?' ভ্রূ কুঁচকে বললে রুবি, 'নতুন আবার কোথায়! ওঃ, আপনি মামা বাবুর কথা বলছেন? জানেন লীলাদি, মামা বাবু আবার এসেছে।'

মামা বাবু? এক মুহূর্ত ভাবল লীলা। অনুপম এসেছে তা হলে। চিনতে তবে পেরেছিল ঠিক। কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য এত ভালো হল কবে থেকে। ওর পায়ের শব্দে কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। টকটকে ফর্সা মুখ, গাল দু'টি বেশ ভরা-ভরা। গেঞ্জিতে ঢাকা চওড়া বুক। এই যদি অনুপম হয় তবে আশ্চর্য রূপান্তর তো!

লীলার একবার জানতে সাধ হল, অনুপমের সে সব পাগলামি এখনো আছে কি না। কিন্তু রুবিকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। ভুল বানান আর কোটেশনে ভর্তি চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেলো।

রুবি বললে, 'জানেন লীলাদি, মামা অনেক টাকা করেছে। এখান থেকে কানপুর গিয়েছিল, সেখান থেকে পালামৌ। সেখানে কনট্রাক্টারি করে না-কি বড়োলোক হয়েছে।'

পড়াতে পড়াতে লীলা দু'-চার বার দরজার দিকে তাকিয়েছিল। চটি-পরা দু'টি পা পর্দার নিচে ঘুর-ঘুর করছে দেখতে পাবে আশা করেছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু অনুপমের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়ত এখনো ওর মনে লজ্জা আছে। হয়তো, হয়তো, ভুলেই গেছে। লীলা আবার পড়ানোয় মনোনিবেশ করল।

লন পেরিয়ে গেট খুলেছে, ছাতাটাও খুলতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কানে এলো, 'শুনুন।'

লীলা ফিরে তাকালো। অনুপম।

হাফ-সার্ট আর ট্রাউজার। মুখে ফাল্গুনের সকালের নাতি-উষ্ণ রোদ। অনুপম নমস্কার করলে, 'চিনতে পারছেন?'

লীলা যন্ত্রচালিতের মত প্রতি-নমস্কার করল, কিন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। যাকে মাস কয়েক আগে ধমকে দিয়েছিল, বেত্রাহত কুকুরের মতো যে সমুখ থেকে চলে গিয়েছিল মাথা নীচু করে, এ যেন সে নয়।

অনুপম দু'পা এগিয়ে এলো। 'আপনি সে সব কথা ভুলতে পারেননি দেখছি। এক সময় যে সব ছেলেমানুষি করেছি, তার জন্যে আন্তরিক মার্জনা চাইছি লীলা দেবি!' একটু হেসে অনুপম আবার বলল, 'তা ছাড়া সে সময় আপনি আমাকে শাসন করে ভালোই করেছিলেন। নইলে হয়তো আমার চৈতন্য হ'ত না। জীবনে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগই পেতাম না।'

লীলা তাকিয়ে দেখল, অনুপম মানুষ হয়েছে সত্যি। স্বাস্থ্য তো আশ্চর্য রকম ফিরিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও একটা আত্মপ্রত্যয়ের ঋজুতা। কণ্ঠস্বরেও সেদিনকার সেই ভিখারি আকুতির স্পর্শ মাত্র নেই। পরিচ্ছদেও বেশ রুচির পরিচয় আছে অনুপমের। সার্টের হাতা থেমেছে কনুই অবধি, তার নিচে—বাঁ হাতটার সুপুষ্ট মণিবন্ধে সুদৃশ্য হাত-ঘড়িটির ব্যাণ্ড ভারি সুন্দর মানিয়েছে। সেদিকে চেয়ে লীলার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপম একবার নিজের বাঁ হাতটার দিকে তাকালো, তার পর হাত-ঘড়িটার দিকে। কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছেন বলুন তো ঘড়িটায়? সময় ভুল আছে?

লীলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না।' দৃষ্টি সরিয়ে নিলে। সে তো হাত-ঘড়িটা দেখছিল না, ওর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অনুপমের বাঁ হাতটার দিকে, যার ফর্সা দীর্ঘ আঙুলগুলো এখন ক্লান্ত ভাবে কপালের ওপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলির মধ্যে বিচরণ করছে।

অনুপম বললে, 'আপনাকে আমার আর মোটে একটি অনুরোধ করতেই বাকী আছে লীলা দেবি! সেদিনকার সব দোষ-ত্রুটি ভুলে যান। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি?'

লীলা এবারেও কোন জবাব দিতে পারলো না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে কিছু দেরি হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে, দমদম বুঝি?' লীলা কোন জবাব দিলে না, মা আপন-মনেই বলে চললেন, 'কি-যে শুরু করেছিস, তুইই জানিস। ওই হাত-কাটা স্মরজিতের সঙ্গে কিসের এত মেলা-মেশা। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। ও ছোঁড়ার নিজেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। ওকে ব্যবসায়ে সাহায্য করেছিস, ইস্কুলে ওর জিনিষ নিচ্ছিস, ভালো কথা। ওখানেই তো ফুরিয়ে গেল। এর পরও আসে কেন? ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালে তুই তো সুখী হবিই না, এ দারিদ্র্যও ঘুচবে না, মাঝখান থেকে আমরাও না খেয়ে মরব। তোর ওপরই তো সব নির্ভর করেছে মা!'

মা আরো সন্নিহিত হয়ে এলেন। নীচু-গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব লিলি, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি। তুই যে বাড়ী পড়াস না, সে বাড়ীর গিন্নী আজ দুপুরে এসেছিলেন। ভারি আলাপী মানুষ। এত বড়োলোক অথচ অহংকার নেই। কথায় কথায় বললেন, ওর এক ভাই আছে। দেখতে-শুনতে ভালো, ভালো পয়সাও আছে। কথার ভাবে বুঝলাম,-তোকে ওঁদের খুব পছন্দ। এখন তুই যদি মত করিস—'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মা বললেন, 'কি, জবাব দিচ্ছিস না যে?'

ক্লান্ত-গলায় লীলা বললে, 'আমি আবার কি দেখবো মা? তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।'

মা কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মি! তোর ভালোর জন্যই বলা। বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে, তোকে দেখলে আমার দুঃখু হয় না ভাবছিস্? এ বিয়ে হলে দেখবি কত সুখী হবি। আমাদের সংসারটাও একটা আশ্রয় পেয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর যদি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর জীবন জড়াস্—'

কিন্তু মা'র কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন ছিল না। লীলা স্থির করে ফেলেছে। স্মরজিতের সঙ্গে ওর জীবন আর জড়াবে না। স্মরজিতের প্রশ্নের জবাব স্থির হয়ে গেছে। সংসারের কথা ভেবেছে লীলা, নিজের কথাও ভেবেছে, আর সংশয় নেই।

তবু যখন পরদিন স্মরজিৎকে শেষ জবাব দিতে গেল, পা দু'টো বার বার কাঁপল লীলার। বেলা শেষের ম্রিয়মাণ রোদে রবিশস্যের ক্ষেতের সবুজও আজ কেমন স্তিমিত। ওর পায়ের শব্দে একটা কাঠবিড়ালি পালিয়ে গেল আমলকি গাছের ডালে। হেলে-পড়া খেজুর গাছের সূক্ষ্মশীর্ষ পাতাগুলো বিঁধছে পদ্মপাতায়। বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্য, একক ঘুঘুর একঘেয়ে কণ্ঠ।

স্মরজিৎ বাইরে বসে নেই। শোবার ঘরেও তাকে দেখা গেল না। কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে লীলা একটু বসল। অন্য-মনস্ক ভাবে টুল থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিতেই মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। ত্রস্ত হয়ে নিচের দিকে তাকাতেই লীলার দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল! নুয়ে পড়ে সেটাকে তুলে যথাস্থানে রাখবে এমন শক্তিও নেই।

স্মরজিতের কাঠের বাঁ হাতটা! স্যাঁতসেঁতে, স্বল্পালোক ঘরের ভিজে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েছে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সে আর নিঃস্পন্দ একখানি কাঠের হাত, ভাবতেই আরেক বার কেঁপে উঠলো লীলা। হৃৎপিণ্ড দুক্দুক্ করতে লাগল, অথচ উঠবে যে, ছুটে যে পালাবে, সে সামর্থ্যও নেই, পক্ষাহত প্রত্যঙ্গ-গুলোকে এই ঘরের মৃত আবেষ্টনীর সঙ্গে কে যেন কঠিন, নির্মম হাতে বেঁধে রেখেছে।

স্মরজিৎ ঘরে ঢুকলো একটু পরেই। খালি গা, চুলগুলো ভিজে, কাঁধে গামছা। স্নান করে এলো বোঝা যায়।

ওকে দেখে স্মরজিৎ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। 'কতোক্ষণ থেকে বসে আছো…আছেন। আজ ফিরতে দেরি হয়েছিল তাই অবেলায়—। পিসীমা আবার গেছেন দক্ষিণেশ্বরে।'

ঝুঁকে পড়ে টুলের ওপর কি যেন খুঁজলো স্মরজিৎ, তার পর এদিক্-ওদিক্ তাকাতেই মেজেয় চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিলো কাঠের হাতখানা। গামছা দিয়ে যেন কতকটা স্নেহে মুছে ফেললে মাটি।

লীলা কাঠ হয়ে বসে বসে দেখল সব।

—'একটু বসুন, এখুনি আসছি' বলে, স্মরজিৎ আড়ালে চলে গেল। ফিরে যখন এলো, তখন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, বাঁ হাতটা অভ্যস্ত রীতিতে পকেটে।

তক্তপোষের ওপর লীলার কাছ ঘেঁষেই বসল স্মরজিৎ। —'তার পর লীলা, আমার সেদিনকার প্রশ্নের জবাব ঠিক করে এসেছ?'

লীলার ঠোঁট দু'টো একবার কেঁপে উঠলো, কোন কথা ফুটলো না। আরো কাছে এসে ওর কাঁধের ওপর ডান হাতটা রাখল স্মরজিৎ।—'জানি তোমার লজ্জা করছে। থাক, তোমাকে মুখ ফুটে আর বলতে হবে না। ফিরে যখন এসেছ, তখনই তোমার উত্তর আমি অনুমান করে নিয়েছি।'

লীলার একখানা হিম হাত স্মরজিৎ ওর হাতের মধ্যে টেনে নিলে। লীলার সারা শরীর আরেক বার কেঁপে উঠলো। আর অপেক্ষা করা চলে না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমস্ত শক্তিকে অধরোষ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে লীলা ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলে, 'ফিরে আসিনি ফিরে যেতে এসেছি।'

নির্বোধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত লীলার দিকে চেয়ে রইলো স্মরজিৎ। ওর হাত থেকে লীলার হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। লীলার কথার যেন মানে বুঝতে পারেনি, এমন ভাবে রক্তহীন মুখে শুধু বললে, 'ফিরে যেতে এসেছ!'

উঠে দাঁড়ালো লীলা। 'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, হয় না। পারবো না, আমি পারবো না।'

অস্ফুট গলায় স্বরজিৎ বললে, 'পারবে না ?'

—'না'। লীলা চৌকাঠ পর্য্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণ স্বরজিৎও উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে দরজা অবধি। 'পারবে না ? কিন্তু কেন। কেন। কেন।'

যে হাতটা ক্ষণকাল আগে কোমল হয়ে লীলার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, সেই হাতটাই অকস্মাৎ কঠিন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ; প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লীলাকে, আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে, 'কেন, কেন, কেন। কেন তবে এসেছিলেন ? এক দিন নয়, দু'দিন নয়, এক বার নয়, দু'বার নয়, বার বার ? কেন। কেন দিনের পর দিন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কাজের সহায়তা করেছেন। কোন মমতা যদি ছিল না, তবে কেন আমাকে ভুল বোঝবার সুযোগ দিলেন ? এ কি শুধু কৌতূহল ? শুধু দয়া ?'

মাথা নীচু করে লীলা দাঁতে ঠোঁট চেপে আত্মসংবরণ করলে। বললে, 'হ্যাঁ। শুধু কৌতূহল। শুধুই দয়া।'

ধীরে ধীরে লীলা এগিয়ে গেল। চাক থেকে উড়ে আসা দু'-একটা মৌমাছি উড়ছে ইতস্তত। বাতাসে মৃদু গন্ধ, কে জানে হয়ত নেবুফুলের। আকাশে সূর্য্যের শেষ আলোয় দু'-একটি চিল এখনো ডানা-না-কাঁপানো সাঁতার দিচ্ছে। পথের ধারের পুকুরের পানায় চুপ করে বসে আছে দু'-একটি বক। আর সরু শাদা সিঁথির মতো পথ ফসল-ধোঁয়া মাঠ পাড়ি দিয়ে দূরের অশথ-বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার পরেই ঝাপসা, তার পরেই অন্ধকার।

এই দীর্ঘ পথ ওকে একলা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই লীলার পা দু'টো অবশ হয়ে এলো। হাঁটুতে যেন জোর নেই। চলতে গেলে লাউয়ের লতায় পা জড়িয়ে যায়, ফণি-মনসার কাঁটা আঁচল আঁকড়ে ধরে। এই নিরালোক, নিরানন্দ পরিবেশ তাকে কঠিন মায়ায় ঘিরেছে, বেঁধেছে দুশ্ছেদ্য মোহে। এই তমসা থেকে কেউ যদি তাকে হাত ধরে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, দিক। কিন্তু একা এই ক্লান্ত পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই লীলা ভয় পেল। অন্য দিন ওর সঙ্গে থাকতো স্বরজিৎ। আর আজ—লীলা পেছনে ফিরে তাকালো।

চৌকাঠে হাত রেখে স্বরজিৎ কাঠের পুতুলের মতো তখনো দাঁড়িয়ে। অবসন্ন ভঙ্গিতে চৌকাঠটা ধরে আছে, পাংশু মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর।

হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিত হয়ে তাকালো স্বরজিৎ।

লীলা ফিরে আসছে।

প্রায় ছুটে এসে লীলা ওর পায়ের কাছে, মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল। শিথিল আঁচল পড়ল লুটিয়ে। ওকে আস্তে আস্তে তুলল স্বরজিৎ, গভীর মমতায় কাছে টেনে নিলে। মোমের মতো শাদা দু'খানি আকুল হাত কখন জড়িয়ে গেছে গলায়। বুকের ওপর সিক্ত পক্ষ্ম দুটি চোখের স্পর্শ। কান পাতলে শোনা যায় একটি দ্রুতশ্বাস, স্পন্দিত হৃদয়ের ওঠা-পড়া। আর পরম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে খোঁপা-খোলা শ্রান্ত একটি মাথা এলানো। ধীরে ধীরে সেই মুখখানি স্বরজিৎ তুলে ধরল। ফিরে যেতে পারেনি ! ফিরে এসেছে।

স্বপ্ন-প্রাসাদ

সমর সোম

কৃপণ পৃথিবী তোমায় আমি তো জানি,
তবুও আজিকে বাড়াই দু'-হাতখানি।
দেখেছি রয়েছে—
মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
ক্ষয়-ক্ষতি আর ভাবনার জাল বোনা,
এরই মাঝে কিছু চাই !
বল না পৃথিবী—
রিক্ত রাত্রি কেমনে একা কাটাই !
শূন্যতা মাঝে বাঁচার মন্ত্র কিছু-না কিছুই আছে,
তাই হাত পেতে—দাঁড়াই তোমার কাছে।

স্বপ্ন-প্রাসাদ সংকেত করে
অবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্না-জাল,—
শূন্যতা আর ব্যর্থতা সব করে আড়াল ;
স্বপ্ন-প্রাসাদে পরিত্রাণ
মিলবে পৃথিবী—জানি যে মিলবে
সুরহারা প্রাণ গাইবে গান।
এখানে বন্ধ্যা মাটির বেদনা
ফসল ওখানে ঢেকেছে ঠিক,
এখানের শত চড়াই ওখানে নেমে গেছে
জানি হাসে পথিক,
মরা গাছ ঝরা পাতার কামনা
পূর্ণ হয়েছে—
জেগেছে দোল,
দখিনা বাতাস দিয়েছে কোল।

যে ফুল এখানে পারেনি ফুটিতে :
যে পাখী হয়েছে নিরুদ্দেশ,—
সে পাখী ফিরেছে সে ফুল ফুটেছে
বর্ণ-গন্ধে রূপ অশেষ ;
আমায় কোর না অস্বীকার,
একবার শুধু দাতা হও তুমি
দাও চাবী আমি খুলব দ্বার !

তোমার শাসনে যে প্রিয়া ফেলছে
নিশিদিন শুধু দীর্ঘশ্বাস,
মিলতে পারেনি : ঘটেছে চরম সর্ব্বনাশ,
স্বপ্ন-প্রাসাদ—
সে অভিসারিকা
একা চলে আসে হাতে দীপশিখা,
মিলন-কুঞ্জ আয়োজন শেষে
আমারে চায় !
বল না পৃথিবী
কেউ কি এখানে তব কাছ থেকে কিছু না পায় ?—
জল-ভরা চোখে শুধু তাকায় ?

বাজার (আমিষ) —ননী পাত্র

বাজার (নিরামিষ) —মণিকান্ত গুহ

নেশা
(নারী)

—ক, খ, গ
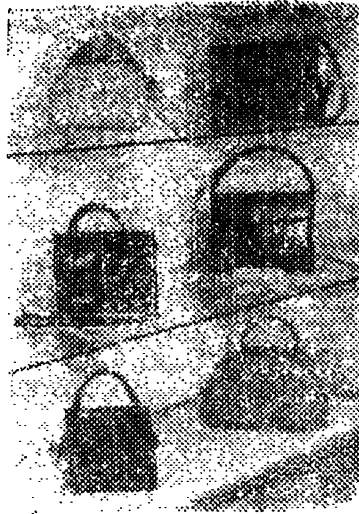
যাত্রা
(পর্ব্বতদেশ)

—সুদেব হরলালকা

যাত্রা (নিরুদ্দেশ)

—রামকিঙ্কর সিংহ

নেশা
(পুরুষ)

, শ, গ

নেতাজী আসছেন —বসুমতী

কর্ণধার

—প্রকাশচন্দ্র দাস

শক্তি সিন্ধু রসায়ন
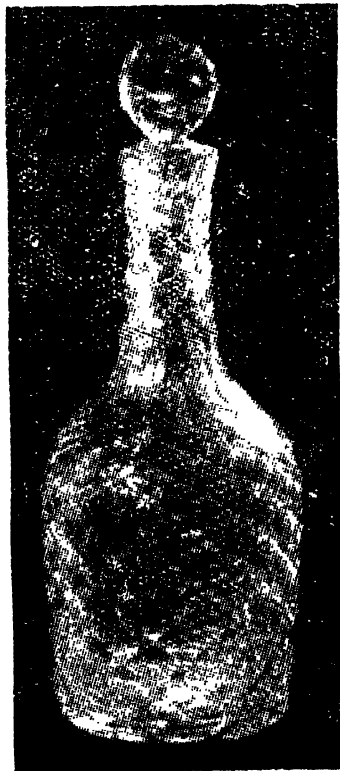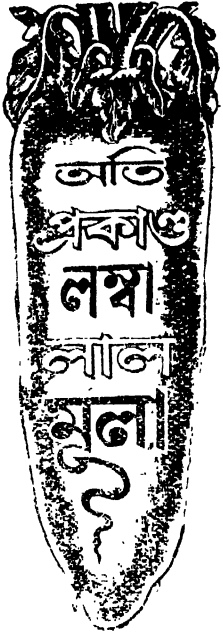
পাঁজির বিজ্ঞাপন ও বাঙালী সমাজ

শিল্পপ্রচারণী

পাঁজিতে যে কী জঘন্য আর কুৎসিত বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় তারই নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি চিত্র ও অক্ষর-কলা এখানে মুদ্রিত হল। পঞ্জিকা ব্যবসায়ীরা কোথা থেকে এ সকল বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন আমাদের জানা নেই, নতুবা উক্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আমরা সৌজন্য স্বীকার করিতাম।

পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনদাতাদের জানা উচিত, বিজ্ঞাপনের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং সেটা অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব। অনেক সময় তাঁরা এটা ভুলে যান এবং মনে করেন, ব্যবসাদার হিসাবে তাঁদের যে-কোন পণ্য যেমন ভাবে খুশী বিজ্ঞাপিত করার ব্যক্তিগত অধিকার আছে। তা অবশ্য আছে। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই উঠত না, যদি তাঁদের বিজ্ঞাপনটা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকেই কেন্দ্র করে থাকত। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তা নয়। "বিজ্ঞাপন" কথাটাই "জ্ঞাপন" কথা থেকে এসেছে এবং জ্ঞাপনের অর্থই হল অন্যদের জানানো। সুতরাং "বিজ্ঞাপনটা" কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপারও। সামাজিক ব্যাপার বলেই প্রত্যেক সামাজিক জীবের অধিকার আছে "বিজ্ঞাপন" সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা করার। সমাজের কল্যাণ, সমাজের সুনীতি ও রুচিবোধ "বিজ্ঞাপনের" সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত যে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবেও "বিজ্ঞাপনের" সমালোচনা করা প্রয়োজন। কলারসিক হিসাবেও "বিজ্ঞাপনের" আঙ্গিক ও মাধ্যম নিয়ে আলোচনা রীতিমত হওয়া উচিত, তা না হলে শিল্পকলার স্তরে বিজ্ঞাপনের ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু (Content) এবং বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক ('Technique)—দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী ও শিল্প-সমালোচকের চিন্তা করা উচিত, আলোচনা করা উচিত।

বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক নিয়ে নানা ভাবে নানা স্তরের আলোচনা চলতে পারে। মিশ্রকলা (Mixed Art) হিসাবে বিজ্ঞাপনের স্থান বর্ত্তমান সমাজে নিঃসন্দেহে অনেক উঁচুতে। ভবিষ্যৎ সমাজে পণ্য ও মুনাফার প্রতিযোগিতা যখন থাকবে না, তখন হয়ত এই "বিজ্ঞাপনের" অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনও থাকবে না। কিন্তু সেই "ভবিষ্যৎ" যত দিন না ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তত দিন "বিজ্ঞাপনের" মাহাত্ম্য অস্বীকার করা অর্থহীন। তত দিন অন্তত এই লক্ষ্যটা থাকা **দরকার যে "বিজ্ঞাপন" যেন বাস্তবিকই মিশ্রকলার স্তরে ওঠে,** মানুষের শিল্পকলাবোধ ও রুচিবোধ যেন বিজ্ঞাপনের দ্বারা গড়ে ওঠে, এবং বিজ্ঞাপনের ফলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অকল্যাণ যেন না হয়। বিজ্ঞাপনদাতারা যদি আজ এই লক্ষ্যটুকুর প্রতি নিষ্ঠা রাখেন তাহলে অনেক দুর্নীতি, অনেক কুশিক্ষা ও কুরুচির কবল থেকে আমাদের এই সমাজ অন্তত আংশিক ভাবেও মুক্ত হতে পারে।

পাঁজির প্রতিপত্তি

এ-কথাটার গূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকেই সকলেই বুঝতে পারবেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই যে বাংলার পাঁজি বাংলার প্রত্যেক পরিবারের অপরিহার্য্য সঙ্গী। বাংলা দেশে লিখতে-পড়তে জানা এমন কোন হিন্দু-পরিবার নেই যাঁর ঘরে বাংলার পাঁজি নেই। শহর নগর থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত পাঁজির একচ্ছত্র প্রতিপত্তি শতাব্দীব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত। পাঁজি ছাড়া বাংলার হিন্দুরা একটুও নড়া-চড়া করেন না, এক পা-ও এগোন না পিছোন না! হাঁচি কাশি জন্ম প্রেম বিবাহ অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য—সবই পাঁজির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়! বাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবনের একমাত্র পরিচালক পাঁজিকেই বলা চলে। অনেক পরিবারে রামায়ণ, মহাভারত নেই, গীতা, ভাগবত, চণ্ডীও নেই, কিন্তু পাঁজি নিশ্চয়ই আছে। পাঁজি হাতে করে মাতৃগর্ভ থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করি, পাঁজি বুকে করে জীবনের পথে হামাগুড়ি দেওয়া থেকে সোজা হয়ে চলতে শিখি,—পাঁজি বগলে করে প্রেমে পড়ি,—বিয়ে করি,—ছেলেমেয়ের বাপ-মা হই,—বাঁচি মরি,—পাঁজি মাথায় করে হোঁচট্ খাই—দৌড়ে চলি,—বাদশা বনি,—ফকির হই,

—মাম্‌লা করি আর মিতে পাতাই। আমাদের জীবনের এ-হেন সর্ব্বশক্তিমান "ভগবান" যে পাঁজি তাকে স্বচক্ষে সকলেই প্রায় দেখেছেন। পাঁজির মতন এমন কুৎসিত "ভগবান" বোধ হয় ২০০ বছরের ছাপাখানার ইতিহাসে কোন দিন চর্ম্মচক্ষে উদিত হয়নি। "গলিত ধবল কুষ্ঠ রোগীকেও" মেশিনে-ছাপা পাঁজির সঙ্গে তুলনা করলে "নবকুমার" বলা চলে। পাঁজির আকৃতির বিকৃতি বাংলা ভাষায় কেন, বোধ হয় আন্তর্জ্জাতিক ভাষা "এস্পারান্টোতেও" বর্ণনা করা যায় না, পৃথিবীর কোন ভাষারই সাধ্য নেই তা প্রকাশ করার। সে-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। পাঁজির আর একটা বীভৎসতম দিক লক্ষ্য করেছেন কি ?

পাঁজির বিজ্ঞাপনের প্রধান বিষয়বস্তু

পাঁজির "বিজ্ঞাপনের" দিকের কথা বলছি। পাঁজির পণ্ডিত মণ্ডলী, শুভদিনের নির্ঘণ্ট, 'হরপার্ব্বতী সংবাদ:' ও 'রবি রাজা বুধো মন্ত্রী'র কদর্য্য ছবি পর্য্যন্ত পৌঁছানোর আগে যে বীভৎস বিজ্ঞাপনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ঠেলে ভেতরের ও বাইরের চেহারা কেউ ভাল করে দেখেছেন কি ? দেখেছেন সকলেই, চিন্তাও করেছেন অনেকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোবা হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছেন। ভেবেছেন, পাঁজির ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি ? কিন্তু বোবা হয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেন, তাই বলছি।

পাঁজির বিজ্ঞাপনের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়, মোটামুটি তিন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনই তার মধ্যে প্রধান। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, ফলফুল, লতাপাতা, শাক-সবজী ও গাছ-গাছড়ার বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ নার্সারীর বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, ওষুধ-পত্তর, সালসা, রসায়ন, তেল-মালিশ ইত্যাদি যাবতীয় মধ্যযুগের কবিরাজী হাকিমী য়ুনানী দাওয়াইয়ের বিজ্ঞাপন এবং তার সঙ্গে জাদুকরী সব বিধান-ব্যবস্থার ফিরিস্তি। তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন হল, বিকৃত যৌন সম্পর্কিত নানা বিষয়ের, প্রেমে পড়া, বশীভূত করা থেকে শুরু করে পৌরুষ ও নারীত্বের পুনর্বিকাশ পর্য্যন্ত সব। এর সঙ্গে যৌন-সাহিত্যও আছে। এই বিকৃত যৌন-সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আছে জাদুমন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তাবিচ-মাদুলি-কবচ, সম্মোহন-বিদ্যা ইত্যাদি নানা রকমের বর্ব্বর যুগের ভুতুড়ে ব্যাপারের বিজ্ঞাপন। জাদুকরী উপায়ে হঠাৎ ধনী হওয়া এবং বিত্তলাভ করার ব্যাপারও তার মধ্যে অন্যতম।

প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ নার্সারীর বিজ্ঞাপনগুলি ভালই, পাঁজিতে প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজনও আছে তার। কারণ, শহরের লোকের কাছে যতটা না হোক, গ্রামের লোকের কাছে পাঁজি হল নিত্যসঙ্গী। চাষবাসের গুরুত্ব গ্রামের লোকের কাছে খুব বেশী। সুতরাং ভাল বীজের, ভাল গাছের সন্ধান পাওয়া তাদের সত্যিই দরকার। এদিক দিয়ে পাঁজির মারফৎ তারা যে উপকৃত হয় তাতে কোন সন্দেহই নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপনেও বিশেষ আপত্তি থাকার কোন

কারণ থাকত না, যদি বিজ্ঞাপনদাতারা আয়ুর্ব্বেদ বা হাকিমী শাস্ত্রের পণ্ডিত হতেন এবং ভেষজবিদ্যার অনুশীলন করে ওষুধ-পত্তর, সালসা ও রসায়নাদি তৈরী করতেন। দুঃখের বিষয়, পাঁজির কবিরাজ ও হাকিম বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে তাঁরা যে অধিকাংশই কবিরাজ বা হাকিম তা নন, আয়ুর্ব্বেদ বা হাকিমী বিদ্যার সঙ্গে অনেকের বর্ণপরিচয়ও হয়নি। তাঁরা সব হাতুড়ে পাষণ্ড, বনের গাছ-গাছড়া শিকড় নিঙড়ে ব্যবসা করাই তাঁদের লক্ষ্য। ব্যবসার সুযোগ সব চেয়ে বেশী তাঁদের পাঁজির ভিতর দিয়ে, কারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের কাছে তাঁদের এই হাতুড়ে-বিদ্যার ভৌতিক শক্তির খেলা দেখানো যত সহজ, অন্যত্র ততটা সহজ নয়। তাই তাঁরা পাঁজির পৃষ্ঠায় ভীড় করে থাকেন। অজ্ঞ মানুষের সস্তা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ আর কোথায় বা পাবেন তাঁরা ? এমন কোন দৈনিক সংবাদপত্র নেই, পাঁজির জনপ্রিয়তাকে যে হার মানাতে পারে। পাঁজির মতন মাধ্যম বাংলা দেশে দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং দেশের যত নরহত্যাকারী হাতুড়েদের বিজ্ঞাপনের ভীড় হয় পাঁজির পৃষ্ঠায়, এবং এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিও দেখা যায় না যা এঁদের পাচন-পিল-রসায়নে না সেরে যায়। পাঁজির দাওয়াই সবই প্রায় ভৌতিক ব্যাপার। ভেষজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার অহি-নকুল সম্বন্ধ। এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপন। তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপনগুলিই সব চেয়ে বেশী মারাত্মক।

বাংলার বাইরে থেকেই বাংলার ঘর ভাঙছে

তৃতীয় শ্রেণী: যৌন, জাদু ও সম্মোহন-বিদ্যা সম্পর্কিত কুৎসিত বিজ্ঞাপনগুলির সংখ্যাই পাঁজির মধ্যে সব চেয়ে বেশী। আর একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে বিজ্ঞাপন-দাতারা অধিকাংশই বাংলার বাইরের ব্যবসায়ী। বাংলার বাইরেই এই সব সমাজবিরোধী পিশাচ ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র। যদিও এই শ্রেণীর বাঙালী ব্যবসায়ী যে নেই তা নয়। কলকাতার

মতন আধুনিক মহানগরীর মধ্যেই তাঁরা দিব্যি ব্যবসা জমিয়ে বসে আছেন। অনেকে আবার নবদ্বীপ অঞ্চলেও বসবাস করছেন। পাঁজির পৃষ্ঠা থেকেই তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিকানা পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতাতেও এই শ্রেণীর ব্যবসাদারদের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশই অবাঙালী। অনেকে হয় ত বলবেন, লেখক এই কথা বলে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াতে চাইছেন। কিন্তু লেখক প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার ধারও ধারেন না এবং অনেক মহাপ্রাণ মহানুভব ব্যক্তির মতন তিনিও সামাজিক উদারতার বড়াই করতে পারেন। এখানে শুধু বাস্তব তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে মাত্র এবং সেই তথ্যোদ্‌ঘাটনের ফলে যদি কোন তত্ত্ব (Theory) তৈরী হয় তাহলে লেখক নিরুপায়।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসাদারদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: লাহোর, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, হোসিয়ারপুর, দিল্লী, জলন্ধর সিটি ইত্যাদি।

যে সব আজব আয়না, আঙটি, বশীকরণ-মন্ত্র-মাদুলি, কবচ, মুহব্বত কি ডোরি (প্রেমের দড়ি), ফুলাদি বটিকা, হবুবে মোমসেক (নারী-মোহন বটিকা), তেলায়ে দারাজী, লক্ষ্মী যন্ত্র, শাহনশাহী ক্রীম, কোকশাস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যের বিজ্ঞাপন এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতারা দেন, ঐন্দ্রজালিক তার দ্রব্যগুণ বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়?

১। গুপ্ত অঙ্গে লাগালে পুরুষের শক্তি বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হয়।

২। ব্যবসা, চাকুরী, মামলা মোকর্দ্দমা, লটারী, পরীক্ষা, মারামারি ইত্যাদিতে জয়লাভ হয়।

৩। মরা মানুষ বাঁচানো যায়।

৪। রাণী থেকে বৌরাণী, মেথরাণী পর্য্যন্ত যে কোন নারীর প্রেমে পড়া যায়,—তাদের পাষাণ হৃদয়কে মোমবাতির মতো জ্বালিয়ে গলিয়ে ফেলা যায়।

৫। বুড়ীকে তরুণী আর পাকা বুড়োকে কাঁচা তরুণ করা যায়।

৬। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, পাহাড়-পর্ব্বত সাগর-নদী হেঁটে পার হওয়া থেকে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ পর্য্যন্ত সবই অতি সহজে করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞাপিত দ্রব্যগুলির এই হল দ্রব্যগুণ। কেবল যে মলম মাদুলি আয়না আঙটি দড়ি ঘড়ি প্রভৃতি দ্রব্যই বিজ্ঞাপিত হয় তাই নয়, এই সব দ্রব্যের গুণমহিমা কীর্ত্তন করে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে তারও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এ-সাহিত্য সোজা সুলভ সাহিত্য নয়, কেউ সখ করে এর নামকরণ করেছেন "Pick-me-up" পুস্তকালী এবং বলেছেন এগুলি না কি "পাঠক জগতে অভিনব বিক্রয়মান সৃষ্টি করিয়াছে। পুস্তকগুলি হু-হু করিয়া বিক্রয় হইতেছে"। এ-হেন পুস্তকের বিষয়-বস্তু কি? নাম দেখলেই মালুম হবে—

১। ভারতীয় কুমারীদের স্বীকারোক্তি; ২। ভারতীয় কুমারীদের সত্য ঘটনামূলক প্রেমকাহিনী; ৩। শিক্ষয়িত্রীর ব্যক্তিগত জীবন; ৪। হরিজন কুমারীদের স্বীকারোক্তি; ৫। লজ্জাহীনা; ৬। কলেজে শিক্ষিতা কুমারীর আত্মকাহিনী; ৭। প্রেমের দস্যু; ৮। নারী-জীবনের রহস্য; ৯। পাপীর কাহিনী—ইত্যাদি।

আমেরিকা আজ এই ব্যবসায়ের গুরু

এই সব দ্রব্য এবং তার দ্রব্যগুণ, এই সব ব্যবসাদার আজও সভ্য সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এর চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার আর কিছুই নেই। কিন্তু সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল, বিজ্ঞান টেক্‌নোলজি ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আশ্চর্য্য দেশ আমেরিকা আজ এই বর্ব্বর যুগের ভুতুড়েবিদ্যা হাতুড়ে-বিদ্যা জাদুবিদ্যা ও সম্মোহন চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আমাদের দেশের এই সব ভুতুড়ে হাতুড়েদের, এই সব বর্ব্বর জাদুকরদের ব্যবসায়ের দীক্ষাগুরু আজ আমেরিকা। পাঁজির বিজ্ঞাপনের মধ্যে এটা সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। তার কয়েকটা মাত্র নমুনা দিচ্ছি ১৩৫৪ সালের "গুপ্তপ্রেশ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা" থেকে:

১। "আমেরিকায় আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন দ্বারা মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়।"

২। আজব আয়না—"এই আয়না বিখ্যাত আমেরিকান সমিতির (American Hypnotic Association)এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য সৃষ্টি এবং সম্মোহন বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে।"

৩। "আমেরিকান অটোম্যাটিক।"

৪। "আমেরিকার আধুনিক আবিষ্কার—পুরুষত্বহানি ও স্বাস্থ্যহীনতায় 'মেল ডেভেলপারই' বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আবিষ্কৃত নিশ্চিত ফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।"

এই হল "এটম বোমার" বাক্য-নবাব আমেরিকানদের "আধুনিক আবিষ্কারের" কয়েকটি মাত্র নমুনা।

"ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্স"—সামাজিক দিবাস্বপ্নব্যাধি

সকলের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—সুসভ্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ আমেরিকায় এই জাতীয় ভুতুড়ে-বিদ্যার প্রাধান্য কেন? এর উত্তর হল, সভ্য দেশ আমেরিকা যে সমাজ গড়ে তুলেছে সেই সমাজে টেক্‌নোলজির পাশাপাশি হিপ্‌নোটিজম, ম্যাজিক ইত্যাদির

প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক। যে বিকটাকার ধনতান্ত্রিক স্কাইস্ক্রেপার গড়ে তুলেছে আজ আমেরিকা, আমরা শুধু তার দিকেই ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকি। আমেরিকার ডলারের বন্যায় ভেসে গিয়ে আমরা ভাবি আমেরিকার কি ঐশ্বর্য্য, কি দৌলত? কিন্তু আমেরিকার স্কাইস্ক্রেপার, আমেরিকার ধনদৌলত, আমেরিকার কল-কারখানা যন্ত্রপাতি, এ-সব হল আমেরিকার অতি নগণ্য মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর, কয়েক জন মাত্র ডলার-দানবের কুক্ষিগত। তার জন্যেই আমেরিকার বিজ্ঞান, আমেরিকার টেক্‌নিক। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সেখানে মারণাস্ত্রের উন্নতি, ব্যাপক ধ্বংসলীলার কৌশল আয়ত্ত করা। এই মুষ্টিমেয় ডলার-সম্রাটদের বাইরের যে আমেরিকান সমাজ তার চেহারা আমাদের এদেশের সমাজের চেয়ে খুব বেশী উন্নত নয়। একমাত্র গায়ের রঙের তফাৎ ছাড়া তাদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা মনোবৃত্তি ইত্যাদির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। সাধারণ মানুষের বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই আমেরিকায়। জীবনের প্রত্যেক পদে পদে তাদের ব্যর্থতা। তাদের জন্ম ব্যর্থ, প্রেম ব্যর্থ, অর্থের অভাব, চাকুরী নেই, বেকার। সুতরাং ধর্ম্ম আর কুসংস্কার আজও আমেরিকায় জাঁকিয়ে বসে আছে। আর আমেরিকার সাধারণ ব্যর্থ মানুষ, পীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার একমাত্র উপায়স্বরূপ সেখানে রয়েছে দিবাস্বপ্ন

(Delusious)। আমেরিকার সাধারণ মানুষ এই ভয়াবহ দিবাস্বপ্ন-ব্যাধিগ্রস্ত। শুধু আমেরিকার নয়, ভেদ-বৈষম্য যে-সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বনিয়াদ, সেই সমাজের সাধারণ মানুষের এই অবস্থা। আমাদের ভারতবর্ষেরও তাই। ভারতবর্ষে যেমন তাই জাদুমন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা, তাকতুক, ঝাড়ফুঁক, সম্মোহনবিদ্যা ইত্যাদির প্রাধান্য আজও আছে, আমেরিকাতেও তার সাধনা কম হয় না। এটমিক গবেষণার পাশেই "আজব আয়নার" বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমেরিকাতে আজও হয়। বর্বর যুগের এই সব গুপ্তবিদ্যা ও জাদুমন্ত্রের প্রশ্রয় দেন আমেরিকার শাসকশ্রেণী তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। দেশের জনসাধারণকে সুশিক্ষা দেওয়ার যাঁদের ক্ষমতা নেই, তাদের অন্নবস্ত্র যুগিয়ে নানা বাসনা-কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেবার যাঁদের শক্তি নেই, তাঁদের সম্মোহনবিদ্যার প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া উপায় কি? আফিম খেয়েও তো লোক সব ভুলে থাকে। সেই রকম যদি "আজব আয়নার" দৌলতে লোকে তাদের জীবনের সব কামনা চরিতার্থ করতে পারে, যদি উচ্ছৃঙ্খল সমাজের কঙ্কালসার মানুষ "ইলেক্‌ট্রিক সলিউশনের" সাহায্যে তাদের লুপ্ত পৌরুষ উদ্ধার করতে পারে তাহলে তো আমেরিকার শোষকশ্রেণী নিশ্চিন্তে আরও কিছু দিন তাদের হাড়মজ্জা শুষতে পারে।

এক কথায় বলা চলে, এই শ্রেণীর জাদু ও সম্মোহনবিদ্যা সেই সব সমাজেই জাঁকিয়ে বসে থাকে, যে-সমাজের সাধারণ মানুষ ব্যর্থ ও পীড়িত, যাদের কবচ মাদুলি দড়ি ঘড়ি ও লক্ষ্মীযন্ত্র ছাড়া জীবনের কামনা চরিতার্থ করার আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই বর্তমান সমাজে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এদের বলা হয় "Dementia Preacx" রুগী। "ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্স" কি?

"Dementia Preacox comes on very frequently in consequence of some defeat in meeting the world of reality, a business catastrophe, a frustrated love affair, or some other cataclysm in patient's life. Unable to face reality, he withdraws into an imaginary world in which his wishes may be fulfilled."
(Abnormal Psychology: Edited by G. Murphy. see Intro. XXIX.)

আমেরিকায় আজ এই দিবাস্বপ্নরুগীর অন্ত নেই, আমাদের দেশে তো কথাই নেই। সুতরাং আমেরিকার হিপ্‌নোটিক এসোসিয়েশনের মতন আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, যাদুকর এবং ক্রিমিনাল ব্যবসাদাররাও বেঁচে আছে, ব্যবসাও তাদের ভালই চলছে। দেশের সাধারণ অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই সব ব্যবসাদারদের খপ্পরে পড়ে প্রতিদিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, হতাশা জড়তা ও অবসাদের ঘোর অন্ধকারে আত্মহত্যা করছে।

পাঁজির বিজ্ঞাপনের শ্রী

যেমন পাঁজির বিজ্ঞাপনের বিষয়-বস্তু, তেমনি তার শ্রী। ভাল বিজ্ঞাপন যা-ও বা কিছু থাকে তার কদাকার চেহারা দেখলেই আঁৎকে উঠতে হয়। নার্সারীর বিজ্ঞাপনে বড় বড় মূলোর চেহারা না দিলেই কি চলে না? আর সালসা রসায়নাদি বিজ্ঞাপনের পালোয়ানদের চেহারা দেখলে কারও ঐ অমৃতসুধা পান করে পালোয়ান হবার ইচ্ছে হবে না। স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত আরও সুস্থভাবে দেওয়া চলে। আর "Female Beauty Round the World", "নারীর নগ্ন ছবি", "প্রেমে পড়া ও বশ করার বিজ্ঞাপন-চিত্র" যা পাঁজির পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়, তার ফলাফল কি? প্রত্যেক পরিবারেই ছোট ছেলেমেয়েরা আছে, বয়স্কা অবিবাহিতা ও সদ্য বিবাহিতরা আছে, বাপ মা ভাই বোন আছে। পাঁজির এই বিজ্ঞাপনের শ্রী এবং বিষয়-বস্তুর কথা স্মরণ রেখে ভেবে দেখুন, পাঁজি সকলের হাতে দেওয়া যায় কি? না দিলেও দেখা যায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, দিনের বেলা শুয়ে-শুয়ে একমনে পাঁজি পড়ে। কি পড়ে তারা? পণ্ডিতদের জ্যোতিষ গণনার কথা নয়, বিজ্ঞাপন। নার্সারীর বিজ্ঞাপন নয়, এই সব আজব আয়না, কোকশাস্ত্র, প্রেমের দড়ির বিজ্ঞাপন। তার সামাজিক ও পারিবারিক ফলাফলের কথা যে কেউ সহজেই কল্পনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতাদের দায়িত্ব

আজ আমাদের "স্বাধীন জাতীয় সরকার" সমাজের সুশিক্ষা ও সুনীতির জন্য অনেক পরিকল্পনা করছেন শুনতে পাই। চলচ্চিত্রে তাঁরা চুম্বন নিষিদ্ধ করেছেন, কোন রকম অশোভন ছবি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না বলেছেন। ভাল কথা। কিন্তু সিনেমা যারা জীবনেও দেখেনি, এ-রকম লক্ষ লক্ষ দেশের লোক পাঁজি নিয়মিত দেখে ও পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎ কি? জাতীয় নেতারা, সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা উত্তর দেবেন কি?

মন্ত্রশক্তিকবচ

বুনিয়াদী শিক্ষার (Basic Education) বড়-বড় বুলি আমরা রোজই শুনছি। কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েদের বুনিয়াদী শিক্ষা রাস্তা-ঘাটের কুৎসিত সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন থেকে শুরু হয়, আর ঘরে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষার পত্তন হয় পাঁজি থেকে। ঘরের পাঁজি থেকে বাইরের রাস্তার কুৎসিত অশ্লীল বিজ্ঞাপনের মারফৎ যে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের সমাজে চালু রয়েছে তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার, কোন আইন জারী করার এবং তাকে সমাজবিরোধী দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রাষ্ট্রিক ঘোষণা করার সময় হয়নি কি আজও? শিশুরাষ্ট্রের বুনিয়াদী শিক্ষা যদি পাঁজির পাতায় হয় তাহলে সে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতেও যে ভয় হয়!
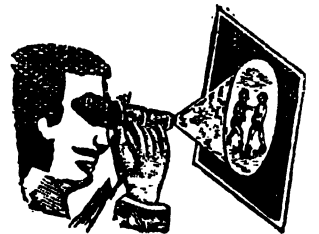
বাংলা দেশের প্রচার-পদ্ধতি

দীনেশ দত্ত (বার্মা শেল)

বাংলা দেশে পুকুরঘাটে বা 'বাবুদের' বৈঠকখানায় প্রচারের কোনও অভাব কোনও দিন ছিল না, আজও নেই। অবশ্য তার পদ্ধতির বিশ্লেষণ করতে যাওয়া সমীচীন হবে না। 'ওলো শুনেছিস্ সই, আমাদের বাড়ীর বড়বাবু বলছিলেন যে এ গাঁয়ের কাছাকাছি কোথায় না কি একটা চিনির কল খোলা হবে।' 'ধ্যাঃ, তা আর জানি নে! আমাদের বাড়ীর বাবুরা বলাবলি করছিলেন যে যত বদমায়েসীর এবার ষোলকলা পূর্ণ হবে।' এ ভাবে সংবাদ প্রচার আবহমান কাল থেকে নিয়মিত ভাবে চলে আসছে। সহরে অবশ্য আবহাওয়ার ও সাধারণ জ্ঞানের কিছু পার্থক্য থাকায় ভাবধারাও স্বতন্ত্র। এখানে, মোড়ের চায়ের দোকানে বা রোয়াকে যে সব সান্ধ্য-বৈঠক বসে তাতে কথাবার্তার গণ্ডী আরও একটু পরিসর হয়। সেখানে রাজনীতি, ব্ল্যাক মার্কেট, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে নারীহরণ অবধি সব আলোচনাই করা হয়। হয়ত এ-হেন একটি বৈঠকের সব-কিছু লিপিবদ্ধ করা গেলে দেখা যাবে, একটি ছোটখাট সংবাদ-পত্রের সব খবরই তার মধ্যে আছে। সিনেমা, থিয়েটার, গান-বাজনার কথা ত এ ধরণের বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ প্রথা যে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ তা নয়, ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই এবং প্রায় সব সমাজেই অল্প-বিস্তর এ-ধরণের বৈঠকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

পুরানো আমলে পাশ্চাত্য দেশেও এক রকম প্রথায় গ্রামের বা সহরের সংবাদ সংগ্রহ করা হত—ধনীরা একটি বলিয়ে-কইয়ে লোক নিযুক্ত করতেন যিনি তাঁদের প্রতিদিন সব খবর দিয়ে যেতেন; তা সে 'সু'ই হক বা 'কু'ই হক। যাত্রা, বাইনাচ, পুতুলনাচ, কুস্তি ইত্যাদি ত তার মধ্যে থাকতই। এই ব্যক্তিদের বলা হত 'গেজেটিয়ার'। সম্ভবতঃ এখনকার 'গেজেট' কথার জন্ম এর থেকেই হয়েছে। প্রাচ্য দেশেও এই প্রথায় সংবাদ সংগ্রহের কথা জানা যায়। ভারতবর্ষের পুরাণে দেখা যায়, ত্রেতা যুগেও না কি এই রকম এক চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছিল। খবর সকলেই চায়, দেবতাদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। নারদ মুনি না কি তেত্রিশ কোটি দেবতাদের খবর সরবরাহ করতেন। যে কোনও স্থূলশরীরবিশিষ্টের পক্ষে একা এ কাজ সম্ভব নয়, সেই জন্য তাঁকেও দেবতা হতে হয়েছিল। তিনি উত্তেজক খবর দেওয়ার ফলে, বর্ত্তমান যুগের Herr Hessএর মত দেবাদিদেব মহাদেবকে দিয়ে প্রলয় এনে ফেলেছিলেন।

ঢ্যাট্‌রা পিটে জনসাধারণকে ঘোষণা জানাবার রীতিও বহু পুরাতন। এখনও এই প্রথায় পল্লীগ্রামে বা সহরে সরকারী নির্দ্দেশ জানান হয়। বর্ত্তমান যুগে এরই একটা আধুনিক সংস্করণ দেখা যাচ্ছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে মোটর লরীতে রেডিও এমপ্লিফায়ার লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সরকারী ঘোষণা জানিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এ ভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার রীতি অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়েছে।

সম্রাট্ অশোকের সময় শিলালিপির দ্বারা জনসাধারণকে সরকারী ঘোষণা জানান হত। সম্রাট্ যখন কালাপাহাড় অবস্থা থেকে বৌদ্ধ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী হলেন, তখন সারা দেশে তিনি এই মাধ্যমের (Media) দ্বারাই জনসাধারণের নিকট তাঁর অহিংসা নীতি প্রচার

(কালো-বাজার বন্ধ কর)

করেছিলেন। এ প্রথায় প্রচার-কার্য্য যদিও সুরুচির পরিচয় দেয় কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। স্থায়িত্বের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য এর সঙ্গে কোনও প্রচার মাধ্যমই দাঁড়াতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অচল অটল অবস্থায় শিলালিপি তার বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণকে জানিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পাঠকের মতো তুমি ব'সে আছো অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছো অঙ্ক-পরে।
পাষাণের-পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ
গেল এলো কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।"

পাণ্ডুলিপির দ্বারা প্রচার-কার্য্যের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যম হিসাবে পাণ্ডুলিপির ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান

(কালো-বাজার নয়—নিয়ন্ত্রিত মূল্য)

(গ্লিসারিন সাবান—বেঙ্গল কেমিক্যাল)

যুগে পাণ্ডুলিপি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে দেখা যায়; কিন্তু দশ হাত ঘোরার পর এ ধরণের পত্রিকার আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তার পর এল মুদ্রণের যুগ। সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হল। সংবাদ-পত্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপনের প্রচলন দেখা গেল। শিল্পপতিরা শিল্পের প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপনরূপী প্রচার মাধ্যমের শরণাপন্ন হলেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ধীরে ধীরে কার্য্যকরী হয়ে উঠল। শিল্পপতিরা দেখলেন, এই মাধ্যমের দ্বারা অল্প খরচে বহু পাঠকের কাছে তাঁদের প্রচার-বার্ত্তা পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলা সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি ও বাংলা বিজ্ঞাপনের প্রসারও ক্রমশঃ দেখা গেল। সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে 'বসুমতী' অন্যতম। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'যুগান্তর' ইত্যাদির জন্ম হয়েছে পরবর্ত্তী কালে। সংবাদপত্র এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য্য বস্তু হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্য সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনকে প্রচার-কার্য্যের একটি বিশেষ মাধ্যম বলে গণ্য করা যায়। চারুশিল্পীরাও কালের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা বা নক্সা (Advertisement lay out) পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় বিশেষ পিছিয়ে নেই।

প্রচার-কার্য্যে নানারূপ মাধ্যমের (Media) ব্যবহার দেখা যায়। পাশ্চাত্যে বা মার্কিণ দেশে প্রচার-কার্য্য খুবই প্রসার লাভ করেছে, কারণ, সে দেশে প্রচারতত্ত্বকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে কোনও ব্যবসায়ে প্রচার-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে মনস্তত্ত্বের উপর কিছু জ্ঞান থাকা উচিত। জনসাধারণকে কখন কি ভাবে আকর্ষণ বা আক্রমণ করতে হবে তা জানতে হলে জনসাধারণের মনের খবর কিছুটা রাখতেই হবে। কৃতকার্য্য হওয়ার মূল ভিত্তিই হল এইখানে। এই ধরণের প্রচার-কার্য্যকেই বৈজ্ঞানিক প্রচার (Scientific advertising) বলা হয়।

প্রাচীর-পত্র (poster) এবং প্রাচীর-চিত্র (hoarding) এই দুইটি প্রচার মাধ্যমের বর্ত্তমান যুগে এদেশে খুবই প্রচলন হয়েছে। প্রাচীর ও প্রাকারের যুগ যখন ছিল তখনই প্রাচীর-পত্র ও প্রাচীর-চিত্রের সৃষ্টি হয়। মিশর দেশে এই দুই প্রথায় বিজ্ঞপ্তি জানানর রীতি ছিল। পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্যে এই দুইটি মাধ্যমের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়। আধুনিক প্রাচীর-পত্র এক রকম পাতলা কাগজে ছাপা হয়। সংখ্যায় সাধারণতঃ এগুলি হাজার হাজার এবং মুদ্রণের সুবিধার জন্য Offset মুদ্রণ-কৌশলে ছাপা হয়। রং এবং ভাষার পারিপাট্য এই মাধ্যমের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীর-পত্র চিত্রে এবং ভাষার চটকে এক লহমায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেশী এবং বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এই মাধ্যমের নিয়মিত ব্যবহার করেন। ইদানীং সরকারী প্রচার-কার্য্যেও ইহার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধের সঙ্গে কয়েকটি সাময়িক সমস্যা সংক্রান্ত প্রাচীর-পত্রের ছবি দেওয়া হ'ল। যদিও এগুলি ইংরাজীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রায় সবগুলিই বাংলায় অনায়াসে অনূদিত হতে পারে। প্রাচীর-চিত্রেরও আধুনিক ব্যবহার কলিকাতায় প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মধ্যযুগে বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেশ থেকে তাঁদেরই চারুশিল্পীদের দিয়ে চিত্রাঙ্কণ করিয়ে এদেশে প্রচার করবার জন্য আনতেন; কিন্তু দেখা গিয়েছিল, তার ফল বিশেষ সুবিধাজনক হয়নি। পরে তাঁরা দেশীয় শিল্পীদের শরণাপন্ন হলেন এবং এই পরিবর্ত্তনে দেখা গেল, তাঁদের প্রচার অনেক বেশী কার্য্যকরী হয়েছে। প্রাচীর-চিত্রকে একটি বড় মিউর্যাল চিত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এগুলি খুব বড় বড় হয়; সাধারণতঃ ১২×৮ ফিট এবং কখনও কখনও ১২×২০ ফিট হয়। উদ্দেশ্য হল, বহু দূর থেকে যাতে পথচারী এগুলি দেখতে পান। ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড দেশ। এখানে এখনও বিশেষ ভাবে দেশব্যাপী রাস্তার সৃষ্টি হয়নি। শের শার আমলের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডই এখনও আমাদের একমাত্র প্রশস্ত দেশব্যাপী রাজপথ। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই National High-way Scheme-এ বড় বড় রাজপথ তৈরী হবে। প্রাচীর-চিত্রে আশা করি তখন সারা দেশ ছেয়ে যাবে। কয়েকটি বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখনই প্রচারের এই মাধ্যমটির বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।
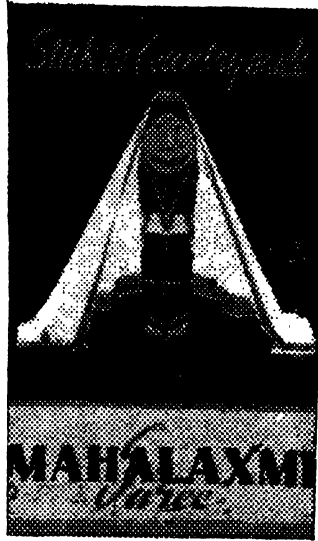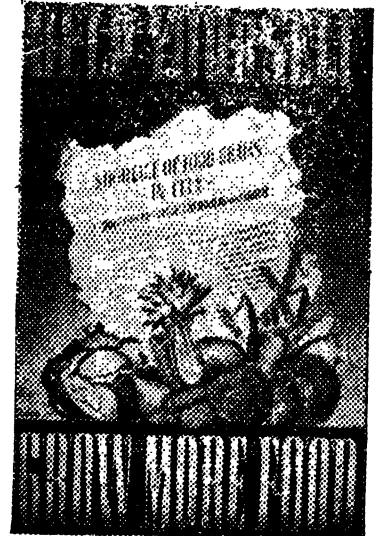
(মহালক্ষ্মীর শাড়ী)

(আরও ফসল বাড়াও)

(ভারতীয় চা)

(সৈন্য বিভাগে যোগ দিন)

...বিজ্ঞাপন যে শুধু চিত্রাঙ্কণেই দেখান যায় তা নয়। একটি ...তামাক-ব্যবসায়ী সম্প্রতি কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রাচীর-গাত্রে বাঁটি সিগারেটের একটি চালু বিজ্ঞাপন (Neon sign) দেখাচ্ছেন। দেখা যায়, বাঁটিটি সব সময় কেটেই চলেছে। এই বিজ্ঞাপনটি একটি বড় বাড়ীর চারতলার গায়ে দেওয়া ...প্রায় ৩ মাইল দূর থেকে দেখা যায় এবং রাত্রের অন্ধকারে মনে হয়, আকাশের গায়ে কোন বাজিকর তার ভেল্কী দেখিয়ে চলেছে। এ এক আজব ব্যাপার। কলিকাতায় চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়ালে বর্তমান যুগের বৈদ্যুতিক প্রচার-কার্য্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডার (Calendar) প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। এই মাধ্যমটি সারা বছর ৩৬৫ দিন ধরে নিজেকে প্রচার ক'রে চলে। অবশ্য ইহাতে এমন একটি ছবি দেওয়া উচিত যে, মানুষ তার দিকে দিনের পর দিন ... থেকে যেন শ্রান্ত না ... পড়ে। বর্তমান যুগে শিল্পপতিদের মধ্যে প্রচারের এই মাধ্যমটির ব্যবহারও খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। প্রচার-সাহিত্যের (Publicity literature) অর্থাৎ পুস্তিকা (booklet), হ্যাণ্ডবিল, ব্লটিং-পেপার ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। তথ্যমূলক চলচ্চিত্র (Documentary films) এবং বেতারের মধ্য দিয়ে প্রচারের রীতিও এদেশে ধীরে ধীরে স্থান পাচ্ছে। মনে হয়, ৫।১০ বছরের মধ্যেই এই দুইটি মাধ্যমের আরও অনেক উন্নতি হবে। বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়েছে। সম্ভবতঃ আমরা, বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ জাতি বলিয়া, সামান্য প্রচারেই এখানে কার্য্যোদ্ধার হয়। অবশ্য শিল্পপতিদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ভিত্তিহীন প্রচারের কোনও দাম নেই অর্থাৎ প্রচারের মূলে কিছু সত্যের বিকাশ থাকা চাই। মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, উন্নতি হয় না। জনসাধারণ মিথ্যা প্রচারে ভুলে একবারই ঠকে, বারে বারে ঠকে না।

...মানুষের কথায় কারও ...দেশ কিংবা নিষেধ যাই বলুন না ...ন, সাধারণতঃ কেউ কানেই শুনতে ...য় না। ঠাকুর তাই অনেক দুঃখে ...লেছিলেন,—'কারেই বা বলবো, ...ই বা বুঝবে।'

সাধারণ মানুষের মুখের কথা তো ...উ শুনতেই চায় না, আর তার ...ভাব অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতির ...ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

...র জন্য এই প্রচার-কলার ...কাশ। শিল্প আর সাহিত্যের ...ন অপূর্ব যোগাযোগের আর অন্য ...ন মাধ্যম নেই—যা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের চোখে ও মনে সমানে আলোকপাত করতে পারে। তাই ছবি এঁকে আর কাব্য ক'রে মানুষকে জানিয়ে দিতে হয়, কালো-বাজার সমর্থন করবেন না; শীতকালে গ্লিসারিন মাখতে পারেন; মহালক্ষ্মীর কাপড় পরলে বেশ মানাবে; ভারতীয় চায়ের তুলনা হয় না; খাদ্যাভাবের দিনে আরও ফসল চাই; কাগজ না থাকলে যতটা পারেন কম কাগজ ব্যবহার করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই প্রচার-কলার কী অদ্ভুত ক্ষমতা।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

শ্রীধর কথক

[শ্রীধর কথক প্রতি মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় আমাদের উপহার দেবেন। এই সংখ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপাল রাজাজীর জীবন-কাহিনী পাঠ করুন]

ভারতের জননায়ক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি বরাবর যে দূরদৃষ্টি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছে। রাজাজীর সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার বাস্তব বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কথায়-বার্তায় ও আচরণে রাজাজীর মার্জিত ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। রাজাজীর ঘটনাবহুল জীবন নানা দিক্ দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ-ভারতের সালেম জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চক্রবর্তী আয়েঙ্গার গ্রাম্য মুনসেফ ছিলেন। রাজাজীর শিক্ষা আরম্ভ হয় বাঙ্গালোরে এবং তাহা সমাপ্ত হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে। ছাত্রাবস্থায় তিনি তীক্ষ্ণধী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মাদ্রাজে আইন অধ্যয়নের সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে রাজাজী দেশসেবার নব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। অধঃপতিত দেশবাসীর কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণ সাধন নিজ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে রাজাজী সালেমে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কাজ। রাজাজী খুব শীঘ্র উকিল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মদ্যপান নিবারণের জন্য রাজাজী সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এ জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ও করেন। অস্পৃশ্যতার পীঠস্থান দক্ষিণ-ভারতে তাঁহার সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া যে কিরূপ আকারে দেখা দিবে, রাজাজী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সমাজের রক্ষণশীল দল তীব্র বিরোধিতা করিয়া তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। সমাজ-সংস্কার চেষ্টার ফলে তাঁহাকে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এ সব জানিয়া-শুনিয়াও রাজাজী এক মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। রাজাজী যাহা বিশ্বাস করেন, তদনুযায়ী কাজ করিবার মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনের বহু সংকটময় মুহূর্তে রাজাজীকে নিজ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চরম বিপদের ঝুঁকি লইতে হইয়াছে। লোকনিন্দা, অখ্যাতি ও ব্যক্তিগত বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বরাবর নিজ বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সালেমে রাজাজী তাঁহার নিজ গৃহে বিভিন্ন জাতির একত্র পান-ভোজনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। সালেম মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি সহরের ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে হরিজনদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের হোষ্টেলে হরিজন বালক কর্মে নিযুক্ত হয়। রাজাজীর এই সমস্ত কার্য্যকলাপের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার পিতা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তিনি রাজাজীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজাজী তাঁহার সংকল্পে অবিচলিত থাকেন। গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ রাজাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে। সমাজে রাজাজীকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হয়। কিন্তু রাজাজী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা সম্পর্কে রাজাজীকে বিপদে পড়িতে হয়। সমাজের কেহই তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে রাজী হন না। রাজাজী বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে বৈদিক রীতি অনুযায়ী পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অস্পৃশ্যতা তাঁহার নিকট ঘৃণ্য পাপ বলিয়া মনে হয় এবং দক্ষিণ-ভারতে এই পাপ দূরীকরণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। সমাজের ভ্রূকুটি, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি, কোন কিছুই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। অস্পৃশ্যতা দূর করিতে গিয়া রাজাজীকে যে কত প্রকার বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণ-ভারতের তিরুচেনগোদে নামক স্থানে রাজাজী যখন গান্ধী-আশ্রমের পরিচালক, তখন একবার তাঁহাকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়। রাজাজীর আশ্রমে হরিজন ও ব্রাহ্মণ একসাথে বাস করিতেন। এক দিন দুই জন স্থানীয় স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল যে আশ্রমের প্রাঙ্গণে দুই জন আশ্রমবাসী নীচে মাথা রাখিয়া ও উপরে পা তুলিয়া যৌগিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করিতেছে। তাহারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিল যে, রাজাজীর আশ্রমে ঘোরতর অনাচার চলিতেছে। আশ্রমবাসীরা আকাশের দিকে পা করিয়া আকাশকে ব্যঙ্গ করিতেছে এবং ইহার ফলে আকাশ ক্রুদ্ধ হওয়ায় ঐ স্থানে বৃষ্টি হইতেছে না। এইরূপ প্রচার-কার্য্য হাস্যকর মনে হইলেও অশিক্ষিত গোঁড়া জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ প্রচার-কার্য্যের

ফল যে কিরূপ মারাত্মক হইতে পারে, তাহা অনেকেই জানেন। রাজাজী অবিচলিত ভাবে সমাজের এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে থাকেন।

রাজাজীর সহিত গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। রাওলেট আইন সম্পর্কিত আন্দোলনের সময় গান্ধীজী মাদ্রাজ সফর করেন। তিনি মাদ্রাজে রাজাজীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজাজীর গৃহে অবস্থান কালে গান্ধীজী বিশেষ ভাবে কর্মব্যস্ত থাকেন—দিবা-রাত্র লোক-জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে থাকে। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে গৃহস্বামীর খোঁজ লইবার কথা গান্ধীজীর মনে হয় নাই। গৃহস্বামী রাজাজীও অতি সন্তর্পণে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখেন। মহাদেব দেশাই রাজাজীর অসাধারণত্বের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তখন গান্ধীজীর সহিত রাজাজীর আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয় এবং গান্ধীজী তাঁহার চিন্তাশক্তি ও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। রাজাজী গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে দেশের স্বাধীনতার জন্য অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন। গান্ধীজীর প্রিয় পার্শ্বচরদের মধ্যে রাজাজী অন্যতম। গান্ধীজী রাজাজীকে সত্যাগ্রহ নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মনে করিতেন। গান্ধীজী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের রীতিনীতি সম্পর্কে রাজাজীর ধারণা এত স্পষ্ট ছিল যে, অনেকেই মনে করিত যে, গান্ধীজী রাজাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া সত্যাগ্রহের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। রাজাজীর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতি গান্ধীজীর চিরদিন বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে রাজাজী অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দেন। আবার দেশ-শাসক হিসাবেও তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁহার পরিচয় দেন। মাদ্রাজে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বৃটিশ শাসকদেরও প্রশংসা অর্জন করে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অন্যতম নায়ক হিসাবে রাজাজী বহু বৎসর কংগ্রেস পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। রাজাজী কোন দিন অন্ধ ভাবে কোন কিছু সমর্থন করেন নাই। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি প্রত্যেক জিনিষ বিচার করিয়া দেখেন। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি গম্ভীর ভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা চিন্তা করেন। এই সব কারণে তিনি যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেন, প্রায়ই তাহা সত্যে পরিণত হয়। রাজাজীর সহিত তাঁহার সহকর্মীদের যে কখনও মতানৈক্য ঘটে নাই, তাহা নহে। কিন্তু মত-বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও রাজাজী কোন দিন তাঁহার সহকর্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হন নাই। রাজাজীর প্রতিভা কেবল মাত্র রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, তিনি জীবন-শিল্পী। তিনি জীবনকে নানা দিক্ হইতে উপভোগ করিয়াছেন। রাজাজী এক জন সুলেখক। তাঁহার ছোট গল্পগুলি গভীর রসবোধের পরিচায়ক। রাজাজীর বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা হইতে তাঁহার রসজ্ঞান ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাজীর ধৈর্য্য অনন্যসাধারণ। অত্যন্ত উত্তেজনার মুহূর্তেও তিনি ধীর-স্থির ভাবে কাজ করিতে পারেন। রাজাজীর অসাধারণ ধৈর্য্য সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে একবার তিনি বোম্বাইএ বক্তৃতা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এক দল তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আলকাতরা নিক্ষেপ করিতে থাকে। কিন্তু ইহাতেও রাজাজীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি বিক্ষুব্ধ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, You can force me to change my clothes but not my opinion অর্থাৎ আপনারা আমাকে আমার পোষাক পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিতে পারেন কিন্তু আপনারা আমার মত পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণই রাজাজীর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাজাজীর কর্মপ্রচেষ্টা সুবিদিত। ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারিখে রাজাজী ভারতে প্রথম ভারতীয় গবর্ণর জেনারেল হিসাবে দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত শক্তি তাঁহার আছে। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ভারত অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, আমরা ইহাই বিশ্বাস করি।

—গোপাল ঘোষ

আমেরিকার কথাসাহিত্যিক

এডগার এ্যালেন পো

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
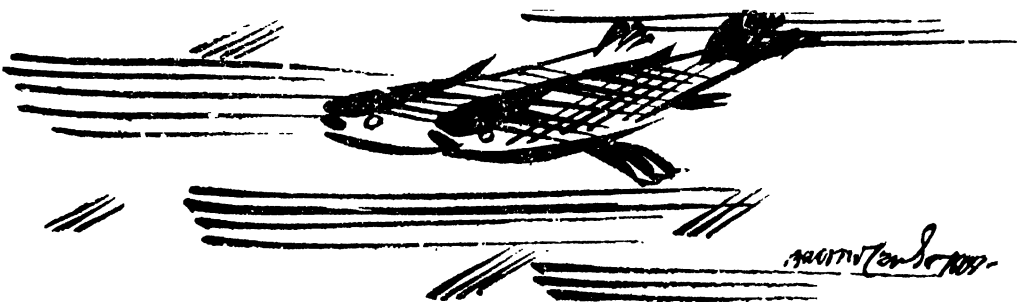
আমেরিকার সাহিত্য-জগতে যাঁরা দিক্‌পাল, এডগার এ্যালেন পো তাঁদের এক জন। যে স্বল্প কাল বেঁচে ছিলেন তিনি পৃথিবীতে তার মধ্যেই তাঁর ছোট গল্প, কবিতা বিদ্বৎ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় দুই মহাদেশেই তাঁর লেখার সমাদর হয়েছে এবং জীবিত কালেই সাহিত্য-জগতে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পেরেছেন তিনি। আমেরিকার তিনি এক জন বাস্তব কবি, বিশ্লেষক, গোয়েন্দা গল্পের প্রথম পথপ্রদর্শক।

পো'র সমসাময়িক ফরাসী কবি গুটিয়ার ও বোঁদেলেয়ার—এঁদের এক জন আবার প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকও বটে—পো'কে বলতেন আমেরিকার উদীয়মান প্রতিভা। তাঁরাই পো'র লেখা ফরাসী সমাজে পরিচিত করিয়েছেন। এই সুযোগে পো'র যশঃসৌরভ স্বল্পকালের মধ্যেই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। পো'র মৃত্যুর চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই সুইডিশ, ইতালীয়, ড্যানিশ ও স্প্যানিশ প্রভৃতি দশটি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সমস্ত লেখার অনুবাদ নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকায় পো ছোট গল্পের এমন একটি দিক্‌ প্রবর্তন করে গেছেন যা আজও একটুও পুরোনো হয়নি। "দি ব্ল্যাক ক্যাট", "দি ফল অফ দি হাউস অফ উসার", "দি পিট অ্যাণ্ড দি পেণ্ডুলাম", "দি মাস্ক অফ দি রেড ডেথ", "দি কাস্ক অফ এ্যামনটিলাডো" ও "দি টেল-টেল হার্ট" প্রভৃতি লোমহর্ষক গল্পগুলি আতংক ও ভীতি উৎপাদক রচনা হিসেবে অতি সার্থক ও অনবদ্য সৃষ্টি। এই অসম্ভব, অস্বাভাবিক গল্পগুলি পড়তে পড়তে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, আবার কিছুটা যুক্তিবন্ধনের বেঁধে চলায় মুহূর্তে মনকে এমন এক রহস্যময় রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসে যার সঙ্গে বাস্তবতার লেশমাত্র সংস্পর্শ নেই—কিন্তু যা সহজে মন থেকে মুছেও ফেলা যায় না। অর্থাৎ অবিশ্বাস্য হলেও গল্পগুলিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

কিন্তু পো'র এই উদ্দাম কল্পনার সঙ্গে সমান তালেই তাল রেখে গেছে পো'র ক্ষুরধার বিশ্লেষণ-শক্তি। তিনি এমন কতকগুলি রহস্য-নিগূঢ় গোয়েন্দা গল্প রচনা করে গেছেন যেখানে কূট বিচার-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রতিভা অফুরন্ত রহস্যকেও ছাপিয়ে গেছে। তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলির কাঠামো এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন-প্রণালী এমনিই অননুকরণীয় যে "দি গোল্ড বাগ", "দি মার্ডারস ইন দি রিউ মর্গ", "দি মিষ্ট্রী অফ ম্যারী রজেট" ও "দি পারলয়েণ্ড লেটার" প্রভৃতি গল্পগুলির সমকক্ষ লেখা আজো দৃষ্টিগোচর হোল না।

কবি পো'র 'র‍্যাভন'ই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বলে "দি বেলস," লেনোরও কম অনবদ্য নয়। সর্বশেষ রচনা "এ্যানাবেল লী"ও একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও পো শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন। মিডিয়োকার রচনার নীরসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী চিরদিনই অতি নির্মম ভাবে অক্লান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন। একটি মাত্র সমালোচনার দ্বারা তিনি ন্যাথানিয়েল হথর্ণকে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

'This finest of finest of artists'—পো সম্বন্ধে এই হোল বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণাড শ'র সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি এবং হাল্কা ভাবে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা শ'র রীতি নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্য-জগতে পো'র প্রভাব চিরকাল দুরতিক্রমণীয় হয়ে থাকবে।

১৮০৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে পো বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌সে প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখেছেন চোখ মেলে। তাঁর বাবা জাতিতে আইরিশ। বাবা-মা দু'জনেই অভিনেতা ছিলেন—সহরে সহরে অভিনয় করে বেড়াতেন তাঁরা। পো'র বয়স যখন প্রায় তিন, তার মধ্যেই তিনি বাপ-মা দু'-জনকেই হারান। তখন ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড সহরের জন এ্যালান নামক এক জন সদাশয় স্কচম্যান তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ীতে। তাঁরই দয়ায় পো'র যা-কিছু লেখাপড়া শেখা। ১৮২৬ সালে সতের বছর বয়সে পো ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু এই সময় তিনি উচ্ছৃংখল জীবনের ফাঁদে পা বাড়িয়ে দেন—জুয়ো খেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল পঁচিশ শ' ডলার। কিন্তু জন এ্যালান এই ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে নিশ্চিত জেলের হাত থেকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে আসেন। তবে তিনি পো'র কলেজীয় জীবনের এইখানেই খতম করে তাঁকে নিজের অফিসে একটি কাজে বহাল করে দেন।

পনের বছর বয়স থেকে পো কবিতা লেখা সুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই "ট্যামারলেন" যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার। কিন্তু অপরিণত রচনা বলে অভীষ্ট ফল লাভ হোল না।

এদিকে অফিসের শ্রীহীন নীরস কাজ-কর্মে একটুও আকর্ষণ ছিল না পো'র। মনের সুখ-শান্তিও পলায়িত। শুধু গভীর হতাশার মর্মবেদনায় নিপীড়িত হতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রিয়াও সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন তাঁর সঙ্গে। এক দিন তাই মরীয়া হয়ে তিনি কুশ্রী জীবনের নাগপাশ ছিন্ন করে পালিয়ে এলেন বোষ্টনে। জন এ্যালান যখন তাঁর সংবাদ পেলেন তখন পো সৈন্যবিভাগে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। সৈন্যবিভাগে তিনি সার্জেন্ট মেজরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হবে কুড়ি। এর পর পালক পিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়ায় এ্যালেন শেষ বারের মত তাঁকে ওয়েষ্ট পয়েণ্টের সামরিক কলেজে ভর্তি করে দেন। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই অনিয়মানুবর্তিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন পো।

ইতিমধ্যে পো'র স্বভাব ও চরিত্র এমন একটা বিশিষ্ট দিকে মোড় নিয়েছে যার আর পরিবর্তন হয়নি সারা জীবনের। পো মদ্যপায়ী হয়ে উঠেছেন; পো পাকা জুয়াড়ী; আর ধার করা যেন একটা দুরতিক্রমণীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে পো'র। কিন্তু সৈন্যদলে দু'বছর তাঁকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। এই নিয়মানুবর্তিতা আর সংযমকেই তিনি আজীবন কামনা করে গেছেন। সংযত জীবনই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। হয়ত পালক পিতার ব্যয়কুণ্ঠতাই তাঁকে জুয়াড়ীর জীবনে প্রলুব্ধ করেছিল। পো'র কামনা-কল্পনা ছিল অপরিসীম, আশা-আকাংখা গগনচুম্বী, যার সঙ্গে এই ব্যয়কুণ্ঠতা কিছুতেই খাপ খেতে পারে না। সৈনিকের জীবন হয়ত তাঁকে শাসন-শৃংখলার পথে চালিত করতে পারত

[illegible]

যেখানে দারিদ্র্য ও মিতাচারের কড়া শাসন অসহ্য। পো দেখতে ছিলেন অপরূপ সুন্দর, তেমনি সাজতে-গুজতেও তারী ভালবাসতেন তিনি। এমন কি দুঃখ-দৈন্যের কঠোর দিনগুলিতেও সুবেশ পরিধান করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পোর হাত-পার আঙুলগুলি ছিল মেয়েদের মত অতি পেলব, কিন্তু শরীরে শক্তি ছিল জোয়ান মরদের। পো এক জন ভাল কুস্তিগীরও বটে। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি লাটিন আর ফ্রেঞ্চে খুব সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর, কিন্তু অর্থের দিক্ থেকে কোনই সুরাহা হোল না। এই সময় দুই পরস্পর-বিরোধী দুর্দম জীবনানুভূতির সংঘর্ষ দেখা দিল তাঁর জীবনে। নিয়মনিষ্ঠ, মিতাচারী, সাহিত্যসাধনায় পূত শুদ্ধ জীবন গ্রহণ অথবা উচ্ছৃংখল কল্পনাবিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু ইতিমধ্যেই পো প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন—পকেট শূন্য। সেদিন আমেরিকায় গিয়ে জীবিকা অর্জন করা অতি কঠিন ব্যবসা ছিল। পো'ও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্নিবার কল্পনা আর অধৈর্য বার বার তাঁকে পর্যুদস্ত করেছে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন সেখানেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। উদ্ধতগর্ব, দাম্পট্য আর অপরিমিত মদ্যপান কোন সংবাদপত্র অফিসই বরদাস্ত করতে পারত না। সুরাপানাসক্তির জন্য পো নিজেও লজ্জিত। তিনি সামাজিক মানুষ হবার সুস্থ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। বিশেষ করে তখন থেকেই যখন তিনি নতুন প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। বাইশ বছর বয়সে মার্চ মাসে পো এলেন বালটিমোরে। আশ্রয় নিলেন আণ্ট মিসেস্ ক্লেমের গৃহে। মিসেস্ ক্লেম তখন থেকে পো'র খবরদারি নিজের হাতে তুলে নিলেন। মিসেস্ ক্লেম ভার্জিনিয়ারও মা। একেই পো পরে বিয়ে করেছিলেন। এই পরিবারের প্রতি ক্রমশঃ একটা দায়িত্ববোধও আসতে লাগল তাঁর। মাঝে-মাঝে অতি সুচারু ভাবে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন, তার পরই আবার সব ভণ্ডুল হয়ে যেত অতি দুঃখজনক পরিণতিতে। তার কেটে দেত বাঁধার।

এখন থেকে পো ছোট গল্প লিখতে সুরু করেন এবং পরবর্তী বছরে (১৮৩২) কয়েকটি ছোট গল্প ছাপাও হয়েছে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়। এর পর "আরমস ফাউণ্ড ইন বট্‌ল" নামক গল্পটি লিখে 'বালটিমোর স্যাটারডে ভিজিটার' কর্তৃক প্রদত্ত পঞ্চাশ ডলারের পুরস্কার পান। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সাহিত্যকেই জীবনের পেশা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্য ভাবিয়ে তুলল পো'কে। এটি তাঁর প্রতিভা-স্বীকৃতির শুভ সূচনা। 'সাউদারেন লিটারেরী মেসেঞ্জারে' তিনি গল্প লিখতে সুরু করলেন। "বেরেন্স" নামক গল্পটি এখানেই ছাপা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে পো রিচমণ্ডে ফিরে এলেন—সঙ্গে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আর মনে সাফল্যের দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি 'সাউদারেন লিটারেরী মেসেঞ্জারের' সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সপ্তাহে পারিশ্রমিক দশ ডলার। যাই হোক, টাকাটা নিয়মিত হাতে পাওয়া যাবে ত। পো'র সম্পাদনা কালে কাগজের প্রচার বেড়ে গিয়েছিল পাঁচ গুণ। পরে অন্য যে সব কাগজে তিনি যোগ দিয়েছেন তাদেরও প্রচার ঐ ভাবে বেড়ে গিয়েছে বহু গুণ। প্রতিভাশালী সম্পাদক ছিলেন পো। নিজের কাগজ নিজে সম্পাদনা করবেন এই ছিল পো'র জীবনের চরম আদর্শ। কিন্তু কাগজ চালানোর মত পর্য্যাপ্ত অর্থ কোথায়? আবার পত্রিকা প্রকাশ নিয়েই সুরু হোল নতুন বিপদ। পো প্রায়ই মদে চুর হয়ে থাকতেন। অবশেষে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। দু'বছর পরে আবার তিনি বালটিমোরে ফিরে এলেন ক্লেমের কাছে। এইবার এক দিন তিনি ত্রয়োদশবর্ষীয়া ভার্জিনিয়াকে গোপনে বিয়ে করে বসলেন। এর পর পো'র জীবন একেবারে ঝড়ের বেগে চলতে লাগল। নানা প্রচেষ্টা, সাময়িক সাফল্য, পরাভব, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডালফিয়া—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চরকিবাজীর মত ঘুরে বেড়িয়েছেন পো। "লেজিয়া", "দি ফল অফ দি হাউস অফ ইউসার" ও ছোট গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে নামও হয়েছে কিছুটা। পো সুরু করলেন 'গ্রাহাম ম্যাগাজিন' সম্পাদনা। এ কাজ চলল তেত্রিশ বছর বয়স অবধি। এই সময় তিনি সাহিত্য সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছেন এবং এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনী—"দি মার্ডারস ইন দি রিউ মর্গ।"

১৮৪২ সালে একটি দুঃখজনক ঘটনায় পো'র জীবন সম্পূর্ণ ওলোট-পালট হয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে এক দিন পত্নী ভার্জিনিয়ার শির ছিঁড়ে গেল। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে পো একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। ভার্জিনিয়ার বার-বার রক্ত মোক্ষণ হচ্ছে—ভার্জিনিয়ায় যক্ষার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কখন কি হয় এই দুশ্চিন্তা—দুঃস্বপ্নে দুর্বিষহ হয়ে উঠল পো'র জীবন। অবিরত মদ খেতে লাগলেন তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য। সম্পাদকের কাজটিও গেল। আবার সুরু হোল যাযাবর জীবনের দুঃসহ দুঃখ। পো'র উচ্ছৃংখল কল্পনা আর স্ত্রীর রুগ্ন অবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও ভার্জিনিয়ার প্রথম রক্ত-মোক্ষণের সঙ্গে হপম্যানের "দি ক্রিমজন ভায়োলিন" নামক গল্পটির অদ্ভুত মিল দেখা যায়। গল্পের নায়িকাও অদ্ভুত সুন্দরী আর সুগায়িকা। তারও বুকের দোষ ছিল। মেয়েটি যখন গান গাইত দেহের সমস্ত রক্ত যেন দু'টি রক্ত-গোলাপের মত গালে এসে জমা হোত। গান গাইতে গাইতেই এক দিন মারা যায় মেয়েটি। কিন্তু এই গল্প ভার্জিনিয়াকে দেখার বহু আগেই লেখা।

সাহিত্য-জগতে কিছু প্রতিষ্ঠা নিয়েই পো এলেন নিউইয়র্কে। তাঁর "র‍্যাভেন" প্রকাশিত হয়েছে। "র‍্যাভেন" তাঁকে এনে দিল প্রভূত নাম। পো তাঁর গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করলেন। অবশেষে একটি পত্রিকাও পেলেন সম্পূর্ণ নিজের এক্তিয়ারে—'দি ব্রডওয়ে জার্নেল।' কিন্তু বেপরোয়া জীবন আরো বেপরোয়া, আরো দুর্বার হয়ে উঠতে লাগল। কোন নিয়মানুবর্তিতার আর বালাই রইল না। সাংসারিক দুঃখ-অনটন যত বাড়তে লাগল জীবনের শ্রীও ততই নষ্ট হতে লাগল। তিনি আরও বেশী পানাশ্রয়ী হয়ে উঠতে লাগলেন। পত্রিকা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হোল। সমগ্র পরিবার নিয়ে পো নিউ ইয়র্কের উপান্তে একটি কুঁড়েতে উঠে এলেন।

ভার্জিনিয়া দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। চিকিৎসার টাকা নেই—ঘরে খাবার নেই—জ্বালানীর অভাব—অভাব ভদ্র পোষাক-পরিচ্ছদের। এই সময়কার একটি ঘটনায় কল্পনাবিলাসী কবির শেষ জীবনের একটি অতি করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় গৃহস্থালীর স্নিগ্ধ পরিবেশের আভাস যার পটভূমিকায় কবির

চরম অবনতি ও চমৎকারিত্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে পো এক দিন বনেতে বেড়াচ্ছিলেন। লাফান'র একটা বাজী ধরা হোল। পো'ই জিতলেন, কিন্তু লাফাতে গিয়ে তাঁর জুতো গেল কেটে। হতবুদ্ধি বাক্রুদ্ধ পো লাফান বন্ধ করলেন। বন্ধুরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একে একে সরে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে এক জন বন্ধু কুঁড়েতে ফিরে এসে দেখলেন—পো নিঃশব্দে কুঁকড়ে বসে আছে। আর মিসেস্ ক্লেম মাতৃসুলভ সমবেদনার সঙ্গে তাঁকে বলছেন—'এড্ডি! জুতোটা ফাটালে কেমন করে? উত্তর দাও।'

১৮৪৭ সালে প্রিয়তমা ভর্জিনিয়ার রোগক্লিষ্ট জীবনের অবসান হোল। পো'র তখন বয়স আটত্রিশ। এর পর পো তাঁর দীর্ঘ "লেসমগারী ইউরেকা" নিয়ে পড়লেন। প্রকাশকের হাতে বই দেওয়ার সময় তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ১৮৪৮এর গোড়ার দিকে "এ্যানাবেল লী" প্রকাশিত হোল এবং বেশ নামও হোল। গ্রীষ্মের দিকে পো রিচমণ্ডে ফিরে এলেন—প্রতিজ্ঞা করলেন মিতাচার জীবনের। নতুন করে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিকঠাক। একটি শান্তিময় নীড়—নিরবচ্ছিন্ন আরাম আর সুখের প্রতিশ্রুতি। এই আসন্ন প্রত্যাশার আনন্দে মত্ত পো আবার মদে ডুবে গেলেন। ১৮৪৯ সালের অক্টোবরে পো'কে মত্ত অবস্থায় পাওয়া গেল বালটিমোর নগরীতে। এক দল ভোট সংগ্রাহক তাঁকে দেখতে পেয়ে আরো মদ খাইয়ে ভোটের কাগজ হাতে দিয়ে বিভিন্ন পোলিং বুথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল তাঁকে। পরে বন্ধুরা দেখতে পেয়ে পোকে উদ্ধার করলেন এদের কবল থেকে। এই ঘটনার চার দিন বাদে ৮ই অক্টোবর চল্লিশ বছর বয়সে ব্যর্থ আশা, বিফল মনোরথ নিয়ে বিদায় নিলেন মরমী কবি পৃথিবী থেকে।

বিপজ্জনক ও বিপন্ন লোকটি চলে গেল। কিন্তু তাঁর লেখা রইল পড়ে পিছনে, দিন-দিন তাঁর সম্মান ও জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে তুলতে। কিন্তু মানুষটি কি ভাবেই না হারিয়ে গেলেন!

সন্তোষ ভট্টাচার্য

ভূস্বর্গ আজ চঞ্চল হ'ল
চঞ্চল হ'ল অমৃতের সন্তান।
নব-দেবতার স্বর্গের পথে পথে
ঐ কা'রা এলো কালো কালনেমি দল?

অন্যায় আর লালসার লিপ্সায়
বাংলা এবং পঞ্চনদের রক্তমাখানো ছুরি
স্বর্গের দ্বারে ঝলসে উঠলো
'যুদ্ধং দেহি' রবে।

বুনো শ্বাপদের অগ্নিদৃষ্টি
জ্বল্ জ্বল্ করে লোণা শোণিতের লোভে।
ভূস্বর্গবাসী জাগো—
পদ্ম-ছড়ানো ডাল্ লেক গেল নর-রক্তেতে ভরে।
শ্রীনগর আর জম্মুর পথে পথে
অস্ত্র শাণায় বুনো জানোয়ার দল।
দেরী নয়, ওগো কাশ্মীর-সুন্দরি—
বিলাসিতা আর তনু-প্রসাধনী ছেড়ে
জাগো—জেগে ওঠো দানবদলনীরূপে
ন্যায়ের কৃপাণে ঝলুক্ শাণিত রোদ।

কালো-কিম্ভূত চোয়াড়ে দস্যুদল
হে স্বর্গবাসী, তোমাদের ঘরে ঘরে
হৈ-হৈ করে ছড়ায় বারুদ-বিষ
তোমাদের ঐ পর্বত-সানুদেশে
দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সবুজের সংকেত,
রৌদ্র-রাঙানো চাষ-ফসলের গান
শেষ হতে কভু দিও নাকো,
হানো মসৃণ তলোয়ার।
হাত-পেতে-চাওয়া স্বাধীনতা
আর, ভিখিরীর মত প্রাণ-ধারণের কথা
মেকী হয়ে গেছে সীসের টাকার মত।

নরসিংহের দল—
ঘুম ছেড়ে ওঠো অরণ্য-গুহা ভেদি';
নেমে এসো সবে
উরী-বরমুলা-ঝানগড় সীমানায়
বুক-ভরা তেজে—মুক্তি-মশাল হাতে।
বর্বরতাকে কবর দেওয়ার
আদেশ এসেছে আজ।
এ আদেশ সেই অত্যাচারিত
গণদেবতার সকরুণ চীৎকার।
তাই—
তোমাদের দিকে চেয়ে আছে দেশ
চেয়ে আছে আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীর।

এক

গল্পকে আমরা গল্প ব'লেই গ্রহণ করি এবং সত্যিকার মানুষের জীবনের সঙ্গে তা'র যে কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে, প্রায়ই এমন কথা মনে করি না। কিন্তু অনেক সময়ে সত্যিকার মানুষের জীবনও যে এমন কত বিচিত্র ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে, যে-সব হয়ে দাঁড়ায় গল্পের চেয়েও অদ্ভুত, এটা বোধ হয় সকলে সহজে ধারণা করতে পারবেন না।

ঠিক তারিখ মনে নেই, তবে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর কিংবা তারও আগেকার কথা।

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' অথবা 'ষ্টেট্‌সম্যানে'র একটি খবরে জানা গেল যে, নিমতলার শ্মশানে এক অলৌকিক শক্তিশালিনী নবীন সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁকে দর্শন করবার জন্যে চারি দিক্‌ থেকে আসছে দলে দলে লোক। খবরের কাগজে সন্ন্যাসিনীর বা ভৈরবীর একখানি ছবিও যেন দেখেছিলুম ব'লে মনে হচ্ছে।

কলকাতার শ্মশানগুলি হচ্ছে চিত্তাকর্ষক জায়গা। সেখানে কেবল অসাড় মৃতদের ঘিরে মুখের জীবন্তরা অশ্রু-করুণ নাটকীয় দৃশ্যেরই অবতারণা করে না, সেই সঙ্গে তাদের আশ-পাশ দিয়ে আনাগোনা করে এমন সব অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, বড় বড় নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপেও অনায়াসে যারা আত্মপরিচয় দিতে পারে। মৃত্যুর সামনে ব'সেও তারা থাকে মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বিশেষ ক'রে ওদের দেখবার জন্যেই আমি এ-শ্মশানে ও-শ্মশানে কত বার যে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার আর সংখ্যা নেই। সাধারণতঃ শ্মশানে যাই আমি রাত্রিকালেই। কারণ, ও-সব জায়গায় ভালো ক'রে জ'মে ওঠে রাত্রির দৃশ্যই।

একে সন্ন্যাসিনী অলৌকিক শক্তিশালিনী, তার উপর আবার নবীন বয়সেই হয়েছেন শ্মশানবাসিনী। সংবরণ করতে পারলুম না তাঁকে দেখবার প্রলোভন। দর্শনার্থীর জনতা হালকা হবে এই আশায় একটু বেশী রাতেই শ্মশানের দিকে যাত্রা করলুম।

দুই

আয়োজনের কোন ত্রুটিই ছিল না।

সন্ন্যাসিনী আস্তানা গেড়েছেন শ্মশানের বাইরে, গঙ্গার ঢালু পাড়ের উপরে। সামনে জ্বলছে ধুনী। পাশেই মাটির ভিতরে পোঁতা সিন্দুরাবক্ত ত্রিশূল। নবীন সন্ন্যাসিনী নিমীলিত নেত্রে একটা হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে একখানা ছোট বইয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়-বিড় ক'রে যেন কি মন্ত্রপাঠ করছেন। পরনে তাঁর রক্তবসন। গায়ে জামা নেই, কাপড়ের ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে পীবর বক্ষের সুডৌল গঠন। রং কালো হ'লেও দেহে আছে যৌবনের লালিত্য। টানা ভুরু, টানা চোখ, এলানো চুল। বয়স হবে চব্বিশ কি পঁচিশ। ভাবছিলুম, এই কাঁচা বয়সে ইনি তপস্যার দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করলেন কেমন ক'রে?

সন্ন্যাসিনী হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন—ক্ষণিকের জন্যে। দৃষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক উচ্চ ভাব নেই, আছে লৌকিক বিলাসের বিদ্যুৎলীলা। এতটা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। মনে লাগল চমক।

রাত এগারোটা হবে। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে কয়েক জন লোক তীর্থের কাকের মত। লোকগুলির শ্রদ্ধা-ভক্তি যে মূল্যবান, ধুনীর পাশে সাজানো তাম্রপাত্রের দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তার উপরে জমে আছে পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা। অনেকে ফলমূলও উপহার দিয়েছে দেখলুম।

সন্ন্যাসিনীর দুই পাশে বসে আছে দুই জন পুরুষ। বোধ হয় চ্যালা। এক জন হেঁট হয়ে সন্ন্যাসিনীর কাণে-কাণে কি বললে। বেশ শুনলুম, সন্ন্যাসিনী একটু হেসে মৃদু স্বরে বললে, "মাইরি?"

আর কিছু দেখবার বা শোনবার প্রবৃত্তি হল না। ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে চললুম শ্মশান-ঘাটের সিঁড়ির দিকে। সেখানেও আবার আর এক দৃশ্য।

তিন

ঘাটের রাণার উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে এক দীর্ঘবপু হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। তার কালো রং, লম্বা লম্বা চুল উস্কো-খুস্ক, জোড়া ভুরুর তলায় ছোট ছোট কিন্তু ধারালো চক্ষু, খোঁচা-খোঁচা দাড়ী-গোঁফ, গায়ে একটা আধময়লা গেঞ্জী, কাপড় কোমর বেঁধে পরা। তার বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না। সামনে রয়েছে একটা দেশী মদের বোতল, তিন-চারটে মাটির ভাঁড়, আর একটা শালপাতার ঠোঙায় বোধ হয় কিছু খাবার-দাবার। তার এ-পাশে ও-পাশে বসে আছে আরো তিন জন লোক।

দীর্ঘবপু একটা মদ-ভরা ভাঁড় এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে বাঁ হাতের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চেটো দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "কেন রে তিনু, মদ খাবি নে কেন?"

তিনু নামধারী লোকটি বললে, "তোমার এখানে বসে মড়া দেখতে দেখতে আমার মদ খেতে ইচ্ছে হয় না।"

—"ওরে মুখ্যু, মড়াদের সঙ্গে আমাদের কতটুকু তফাৎ রে? গেল কাল ওরা ছিল আমাদেরই মত জ্যান্তো। আবার আসছে কাল আমরা হতে পারি ওদেরই মতন মড়া। আমরা নিশ্বাস ফেলতে পারি, আর ওরা নিশ্বাস ফেলতে পারে না, তফাৎ তো খালি এইটুকু। তবে তুই মদ খাবি নে কেন?"

দার্শনিক মাতাল, মন্দ নয়। আরো দুই পা এগিয়ে দাঁড়ালুম।

দীর্ঘবপুর দৃষ্টি হঠাৎ আমার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "তুমি আবার কে বাবা?"

বললুম, "তোমার মতই মানুষ।"

—"তা তো দেখছি। এই বয়সে এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

—"তোমার কথা শুনছি।"

লোকটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "আমার কথা? আমি একটা ডাকসাইটে মাতাল, আমার কথার না আছে মুণ্ডু, না আছে মাথা। তা আবার শুনবে কি?"

—"তোমার নাম কি?"

—"মাতাল।"

—"ওটা নাম নয়। অন্য নাম বল।"

—"আমার পরিচয় জেনে লাভ নেই। সবাই আমাকে রাজা বলে ডাকে, তুমিও ডাকতে পারো। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছ, তুমি কে বল তো? পুলিশের লোক না কি?"

"—না।"

—"তোমার নাম?"

—"তুমি নিজের নাম বললে না, আমিও বলব না।"

—"নিধু বাবুর টপ্পায় আছে—'শুধু নামে কি করে'। তোমার নাম আমি জানতে চাই না। আমি তোমাকে বাবু ব'লে ডাকি, কেমন?"

—"বেশ।"

—"আচ্ছা বাবু, সত্যি করে বল দেখি, এখানে তুমি কি করতে এসেছ?"

—"ঐ সন্ন্যাসিনীকে দেখতে।"

—"দেখা হয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"দেখে কি বুঝলে বাবু?"

—"কিছু বুঝিনি রাজা, কিছু বুঝিনি।"

রাজা মুখ ফিরিয়ে একবার সন্ন্যাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার চোখ দু'টো একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পর ধীরে ধীরে বললে, "সাধু-সন্ন্যাসীদের বাইরে থেকে দেখে ভেতরের কথা ক'জন লোক ধরতে পারে?"

—"তুমি ওকে ক'দিন দেখছ?"

—"হপ্তাখানেক।"

—"কিছু বুঝেছ কি?"

—"বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি।"

—"কি বুঝেছ বল।"

—"আজ নয়, কাল এস, বলব।"

—"এইখানেই দেখা হবে তো?"

—"হ্যাঁ, এই তো আমাদের রাতের বৈঠক। তবে রাত বারোটার আগে এস না।"

—"বেশ, তাই আসব।"

চ'লে যাবার উপক্রম করছি, রাজা আবার পিছু ডাকলে, "বাবু, শুনছ?"

—"আবার কি শুনব?"

—"চকোরের জ্যোৎস্না ফুরোয়, মাতালের মদ ফুরোয়। তখন চকোর আর মাতালের দুঃখের অবধি থাকে না গো! এই দেখ, আমার বোতল ঢুঁ-ঢুঁ!" রাজা বোতলটা তুলে দেখালে।

—"তোমার মনের কথা কি?"

—"খুব স্পষ্ট। সঙ্গে যা আছে, পুরো এক বোতলের দাম হবে না। একটা টাকা ছাড়তে পারো বাবু?"

তার অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না।

চার

পরদিন। রাত বারোটা।

নিমতলার শ্মশানের ভিতরে পা দিয়েই শুনলুম, গঙ্গার ও-দিকে বসে কে গাইছে—

"সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই মা তারা বলে।

মন-মাতালে মেতেছে আজ, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

ঘাটে গিয়ে রাজা বা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখা পেলুম না। কিন্তু ডান দিকে ফিরেই সচমকে দেখি, ভৈরবীর আসরে রাজা বিরাজমান সদলবলে! ধুনীর আলো আজ আরো জোরালো, হ্যারিকেন লণ্ঠনও একটার বদলে দুটো।

গান ধরেছিল রাজাই, চোখ তার ঢুলু-ঢুলু, হাতে তার মদের ভাঁড়!

এগুবো না পালাব ভাবছি, হঠাৎ রাজা আমাকে দেখতে পেলে। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই যে, বাবু যে! আরে, পরের মত ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, কাছে এস বাবু, কাছে এস!"

কাছে গিয়ে দেখলুম, প্রত্যেকেরই হাতে মদের ভাঁড়—এমন কি ভৈরবীরও! শুধালুম, "আজ বাইরের ভক্তরা গেল কোথায়?"

রাজা বললে, "সব শালা বাড়ী গিয়েছে।"

ভৈরবী এড়িয়ে এড়িয়ে বললে, "যাবে না তো এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর গালাগাল শুনবে না কি?"

রাজা সে কথায় কাণ না পেতে বললে, "ভৈরবীর দয়ায় আমরাও সবাই আজ ভৈরব হয়েছি। তুমিও দলে ভিড়ে যাও বাবু!"

ভৈরবী ঢুলতে ঢুলতে বা টলতে টলতে বললে, "তুমিও একটু কারণ-বারি নাও বঙ্কু! এ যে-সে কারণ নয়, আমি নিজে মন্ত্র প'ড়ে দিয়েছি, এ খেলে নেশা হয় না।"

নেশাই হয় না বটে। ভৈরবী নিজেই নেশায় এমন বুঁদ হয়ে আছে যে, সোজা হয়ে বসতে বা ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকাতেও পারছিল না।

রাজা বললে, "বেশ বাবু, মদ না খাও, খানিকটা মহাপ্রসাদ তো নিতে পারো?"

—"মহাপ্রসাদ ?"

—"হ্যাঁ। অর্থাৎ সাক্ষাৎ মা-কালীর সামনে বলি দেওয়া কচি পাঁটা-ভোগ। আজ ষোড়শোপচারে মায়ের সাধনা হবে।"

আমি বললুম, "না রাজা, এইমাত্র খেয়ে-দেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।"

ভৈরবী ঠোঁট ফুলোবার চেষ্টা করে বললে, "বন্ধু, তুমি বদরসিক।" তার পরেই গুন্-গুন্ ক'রে গান ধরলে—

"আমার এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে
তারা ব'য়ে পড়বে ধারা।"

রাজা উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দেখ বাবু, দেখ। ভৈরবীদের বাইরে থেকে দেখে সব সময়ে চেনা যায় না। চেয়ে দেখ, সত্যি সত্যিই ভক্তিভরে ভৈরবীর চোখ দিয়ে আজ ধারা ঝরছে।"

হ্যাঁ, কাঁদছে বটে ভৈরবী—কিন্তু ভক্তির আতিশয্যে না নেশার মহিমায়, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।

রাজা আবার বললে, "কেঁদ না ভৈরবী, কেঁদ না! এই নাও, আর একটু কারণ-বারি খাও, প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে।" সে নিজের ভাঁড়টা ভৈরবীর মুখের কাছে এগিয়ে দিলে।

ভৈরবী আর এক চুমুক মদ্য পান করতে গিয়েও পারলে না, হঠাৎ টলে পড়ে মাটির উপরে হল লম্বমান।

রাজা চীৎকার ক'রে বললে, "ওরে তিনু, ওরে মোনা! ভৈরবীর ভাব হয়েছে রে, ভাব হয়েছে! ওকে হাওয়া কর, ওর মুখে জল দে!" (তার পর আমার দিকে ফিরে) "দেখছ বাবু, ভক্তির জোর? এই বারে ভৈরবীকে চিনেছ তো?" তার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল না, সে ব্যঙ্গ করছে কি না।

তার পর ভৈরবীর অচেতন দেহ নিয়ে সবাই যখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, সেই ফাঁকে আমি চটপট্ সরে পড়লুম বুদ্ধিমানের মত।

শ্মশানের বাইরে এসে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, যাক্, ভৈরবী-রহস্যটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু যে খবরের কাগজওয়ালারা ফোটো তুলে এদের নাম জ্ঞাপিত করে, তাদের হাঁড়ি হাটের মাঝে ভেঙে না দিয়ে ছাড়ব না।

তবু শেষ পর্য্যন্ত সেটা আর করা হয়নি। আমার দুর্ব্বলতাই এখানে। রাগের মাথায় যা নিশ্চয়ই করব বলে মনে করি, রাগ জল হয়ে গেলে পর ইচ্ছা করলেও আর তা করতে পারি না।

কিন্তু ভৈরবী এবং রাজার বিচিত্র ইতিহাস এখনো শেষ হয়নি, অবশিষ্ট আছে আরো কিছু। এবং এই যৎকিঞ্চিৎ-এর মধ্যেই পাওয়া যাবে সত্যিকার মানুষের জীবন-নাট্য। যা বলব তা গল্পলেখকের কল্পনা নয়, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

পাঁচ

কেটে গেল মাস দেড়েক।

মনে এক দিন প্রশ্ন জাগল, ভৈরবী আর রাজার খবর কি?

পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললুম নিমতলার শ্মশানের দিকে। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

কিন্তু শ্মশানে প্রবেশ করবার আগেই দেখি, ভিতর থেকে প্রায় টলো-টলো অবস্থায় বেরিয়ে আসছে স্বয়ং রাজা।

শুধালুম, "কি হে রাজা, চিনতে পারো?"

রাজা একগাল হেসে বললে, "এক কথায় এক টাকার মদ খাইয়েছিলে, চিনতে আবার পারব না?"

—"আজ যে তুমি বড় একলা। তোমার স্যাঙাতরা কোথায়?"

—"বাসায়। আজ-কাল বাসাতেই বৈঠক বসে কি না? আমার বাসা দেখবে তো চল আমার সঙ্গে। ময়নাও সেখানে আছে।"

—"ময়না? ময়না কে আবার?"

—"তোমাদের সেই সখের ভৈরবী গো! তার নাম যে ময়না।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "সে তোমার বাসায় কেন

—"গঙ্গার ধারে আর তার থাকবার উপায় নেই। ময়না ভৈরবী সেজে যেখানে আস্তানা গেড়েছিল, সে জায়গাটা আগে ছিল আর এক বুড়ী ভৈরবীর দখলে। হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় বুড়ী বুঝি দিন কয়েকের জন্যে কোথায় হাওয়া খেতে গিয়েছিল; তার পর ফিরে এসে দেখে তার আস্তানা বেদখল হয়ে গিয়েছে। তখন বুড়ী আর ছুঁড়ী দুই ভৈরবীতে লেগে গেল দস্তুরমত চুলোচুলি কাণ্ড। আর সে কি কাঁচা খিস্তি রে বাবা, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু কাঁচা খিস্তিতে বুড়ী ছিল পাকা, ময়না তার সঙ্গে পারবে কেন? কাজেই শেষটা তাকেই চম্পট দিতে হল তল্পিতল্পা গুটিয়ে। আমি তখন তাকে বললুম, "ময়না, এই সোমত্ত বয়সে পথে-বিপথে টো-টো করে ঘুরে মরবি কেন, তার চেয়ে আমার বাসায় চল, দু'জনে মিলে মনের সুখে ঘর-সংসার পাতব। ময়না বড় সেয়ানা মেয়ে, আমার কথায় রাজি হয়ে গেল তখনি। সেই দিন থেকে আমরা আছি মাণিকজোড়ের মত। ময়নাকে দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে চল।"

যাকে দেখেছিলুম ভৈরবীরূপে, এখন নূতন রূপে তাকে দেখতে কেমন হয়েছে, জানবার আগ্রহ হল। রাজার সঙ্গে চললুম গুটি-গুটি।

জোড়াবাগান অঞ্চলের এক বস্তী। একখানা দোতলা মাঠ-কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা বললে, "এই আমার বাসা, বাবু।"

রাস্তার ধারে একখানা চাটের দোকানে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে গলদা চিংড়ী, কাঁকড়া, ডিম, চপ ও কাটলেট প্রভৃতি। দোকানী বসে বসে সশব্দে ভাজছে বড় বড় পরোটা।

দোকানের পাশেই প্রবেশপথ এবং পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণপণে সেজে-গুজে কয়েকটা নারীমূর্ত্তি, চক্ষু তাদের বুভুক্ষু।

রাজা কর্কশ কণ্ঠে বললে, "সরে দাঁড়া! বাবুর দিকে অমন করে তাকাচ্ছিস্ কেন? বাবু তোদের খোরাক হতে আসেনি?"

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে মাঠকোঠার ভিতরে ঢুকলুম। সামনেই একখানা কাঠের সিঁড়ি। উপরে উঠতে উঠতে শুনলুম হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে কে গান ধরেছে—

'কেটে দিয়ে প্রেমের ঘুড়ি আবার কেন লটকে ধর?
এক টানেতে বোঝা গেছে তোমার সুতোর মাঞ্জা খর!'

রাজা বললে, "ময়না গাইছে। আড্ডা খুব জ'মে উঠেছে দেখছি। এস বাবু, এই ঘরে।"

ঘরের এক পাশে ধবধবে বিছানা-পাতা খাট। তার উপরে তাকিয়া ও বালিসের ভিড়। এক পাশে একটা আয়না-বসানো আলমারি। দেওয়ালের গায়ে নানা আকারের কতকগুলো ছবি—বিলাতী ছবি, ঠাকুর-দেবতার ছবি, কালিঘাটের পট। দেওয়াল-আলনায় থান-কয় কোঁচানো সাড়ী।

ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপরে বসে আছে রাজার স্যাঙাত্তরা। সকলেই মদ্যপান করছে—কেউ কলাই-করা গেলাসে, কেউ হাতল-ভাঙা চায়ের পেয়ালায়। মাঝখানে বিরাজমান হার্মোনিয়াম এবং ময়না—খোঁপায় তার বেলফুলের মালা ; মুখে তার রং-পাউডার ও কাচপোকার টিপ ; পরনে তার রামধনু-রঙের সাড়ী ; নাক, কাণে, গলায় ও হাতে নাকছাবি, এয়ারিং, চেন-হার, তাগা আর চুড়ী-বালা এবং তার কোলের উপরে আরাম করে বসে আছে একটা ল্যাজ-মোটা বিড়াল। শ্মশানবাসিনী, নিরাভরণা, রক্তাম্বরা ভৈরবীর অপূর্ব্ব রূপান্তর।

আমি ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল গান ও বাজনা।

রাজা বললে, "কি রে ময়না, বাবুকে চিনতে পারিস্?"

ময়না খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠে ভুরু নাচিয়ে বললে, "একবার যাকে দেখি তাকে কি আর ভুলি ইয়ার ? তুমি তো আমার সেই গঙ্গাতীরের বন্ধু।" বলেই সে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললে।

আমার গা ঘিন-ঘিন করতে লাগল। তার পর আরো মিনিট-পাঁচেক কোন রকমে কাটিয়ে কেমন করে ওজর দেখিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম, সে-সব কথা আর না বললেও চলবে।

ছয়

মাস আষ্টেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে রাজার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা করবার ইচ্ছাও ছিল না।

এক দিন সকালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে উপরে এসে উঠেছি, হঠাৎ দেখি রাজা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপরে।

তার চেহারা বদলে গেছে। কি শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চোখের তলায় কালি, উদাস দৃষ্টি, বিশীর্ণ দেহ, আদুড় গা, খালি পা।

সবিস্ময়ে বললুম, "রাজা?"

ঠোঁটে একটু ম্লান হাসি মাখিয়ে রাজা বললে, "হ্যাঁ বাবু।"

—"এখানে কি করছ?"

—"খুঁজছি।"

—"কাকে?"

—"ময়নাকে।"

—"সে কোথায়?"

—"সেইটেই তো জানি না।"

—"এ আবার কি কথা?"

রাজা করুণ স্বরে বললে, "বাবু, ময়না আমার পালিয়ে গিয়েছে।"

—"পালিয়ে গিয়েছে। কেন?"

—"তা আমি জানি না। তাকে বড় আদরে রেখেছিলুম। জামা, কাপড়, গা-মোড়া গয়না কিছুই দিতে বাকি রাখিনি! তবু সে পালিয়ে গিয়েছে আর যাবার সময় আমার বাক্স থেকে নিয়ে গিয়েছে একশো পনেরো টাকা।"

—"সেই টাকার জন্যেই কি তুমি ময়নাকে খুঁজছ?"

দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে ভৎ‌র্সনার স্বরে রাজা বললে, "টাকা? না বাবু, না। আমি টাকা চাই না, আমি ময়নাকে চাই।"

—"এমন একটা দুষ্ট স্ত্রীলোকের জন্যে তোমার এত খোঁজাখুঁজি কেন রাজা?"

হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে রাজা বলে উঠল, "খুঁজব, খুঁজব! যত দিন তাকে ফিরে না পাই, তত দিন ধরে খুঁজে বেড়াব! ময়না দুষ্ট তো আমার কি? আমি তাকে ভালোবাসি বাবু, ময়নাকে আমি ভালোবাসি—হ্যাঁ, বড় ভালোবাসি!" বলতে বলতে সে হন্‌ হন্‌ ক'রে চলে গেল।

রাজা ময়নাকে খুঁজে পেয়েছিল কি না জানি না। কারণ তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

শ্রীঅমলা দেবী

৬

আসল খবরটি কিন্তু রাধানাথের কানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পৌঁছাইয়াছে—প্রফুল্ল ও মহেশ ভট্টাচার্য্য। রাধানাথের মনেও এমনই একটা কিছু ঘটিতেছে, সন্দেহ হইয়াছিল। গাঁয়ের ছোকরাদের দু'-এক জনকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। তাহারা কিছুই বলে নাই। কিন্তু সেদিন পাশের একটা গ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে একটা বাগদী-ছেলের মুখে একটা গান শুনিয়া তাহার সন্দেহ দৃঢ় হইল।

গ্রামের বাহিরে গোচর-মাঠ। এক পাল গরু এখানে-সেখানে চরিতেছিল। বাগাল ছোঁড়াটা একটা গাছের ডালে বসিয়া গান হাঁকিতেছিল—

'গাঙ্গুলী মশয়, মোদের অতি মহাশয়,
গরীবের মা-বাপ—অতি সদাশয়—'

ছোঁড়াটাকে গাছ হইতে নামাইয়া রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "গান কোথায় শিখেছিস রে?"

—"আমাদের মনসা-মেলায় দিন গাওনা হচ্ছে যে! শুনে শুনে শিখেছি—"

—"তোদের কীর্ত্তনের দলে আজকাল এই সব গান হচ্ছে না কি?"

—"এজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুরা বেঁধে দিয়েছেন—"

—"কোন বাবু?"

—"তা' কি করে জানব এজ্ঞে! মুরুব্বিরা জানে। ওনারাই তো গাইছে—"

—"কি জন্যে গাইছে জানিস? বল্ না—পয়সা দেব দু'টো, বিড়ি খেতে।"

—"এজ্ঞে না, আমি ছেলেমানুষ, জানি না কিছুই।"

সেই দিনই রাধানাথ সান্ধ্য-বৈঠকে সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে কথাটা পাড়িল। গানটি শুনিয়া সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। অতি সদাশয়, গরীবের মা-বাপ। এক-এক জন এক-এক বার করিয়া বলে, আর হা-হা করিয়া হাসে। এক জন কহিল—"যাচ্ছি আমি বাগদী-পাড়ায়—গানটা একটু বদলে দিয়ে আসি। বলব, ভুল করে গাইছিস কেন, শুদ্ধ করে গা—

গাঙ্গুলী মশায় মোদের অতি দুরাশয়,
খাতকের যম তিনি—প্রজাদের ভয়—"

বলিয়া লোকটি আবার হাসিয়া গড়াইয়া গেল। রাধানাথও হাসিতেছিল। হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—"হাসি থাক। আসল ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা কর দেখি। মাষ্টার ঘন-ঘন সহরে যাচ্ছে; বাগদীরা গাঙ্গুলী বুড়োর নামে বাঁধা গান গাচ্ছে; লাইব্রেরী-ঘরটা মেরামত হয়েছে; ছোকরাগুলো উঠে-পড়ে কিসের জন্যে আয়োজন করতে লেগে গেছে। কি এমন ব্যাপার যে, ছোটলোক, ভদ্রলোক এক-জোট হয়ে করবার চেষ্টা হচ্ছে? ওদের দলের কা'কে ধরলে একটা হদিশ পাওয়া যাবে বলতে পার?"

এক জন কহিল—"মহেশ পণ্ডিতটাকে ধরলে বোধ হয় সুবিধে হবে।"

আর এক জন কহিল—"প্রফুল্ল মাষ্টারও ওদের উপর সন্তুষ্ট নয়। ওদের নিন্দে করে খুব।"

আর একজন কহিল—"এক দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হোক। আমরা জন দশ তো আছিই। প্রফুল্ল মাষ্টার ও মহেশ পণ্ডিত এই দু'জনকেও নেমন্তন্ন করা হোক। সেই দিনেই ওদের তেলিয়ে-খেলিয়ে কথাটা বার করে নিলেই হবে।"

রাধানাথ কহিল—"তার জন্যে আর ভাবনা কি! কালই ব্যবস্থা কর।"

সেই দিনই কথাটা বাহির হইয়া পড়িল। গাঙ্গুলী মশায়ের 'জন্মদিন' উৎসব হইবে, সহর হইতে বড় বড় হাকিমরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, গাঙ্গুলী মশায়ের এক আত্মীয়, কংগ্রেসের এক জন বড় পাণ্ডা, কলিকাতা হইতে আসিবেন, বাগদীরা গাঙ্গুলী মশায়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে, ছোকরারা গাঙ্গুলী মশায়ের জয়ধ্বনি করিবে ও কেহ বাধা দিতে আসিলে মার-ধর করিবে, বিনয় মাষ্টারের স্ত্রী আর শালীরা শাঁখ বাজাইয়া ও উলুধ্বনি দিয়া গাঙ্গুলী মশায়কে সভার মাঝে বরণ করিবে।

সমস্ত খবর শুনিয়া রাধানাথ গুম হইয়া রহিল। পাড়াগাঁয়ে এ-রকম একটা ব্যাপার হইতে পারে, সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, খদ্দর পরিয়া, জেলা কংগ্রেসে আনা-গানা করিয়া সে বাজিমাৎ করিবে। কিন্তু গাঙ্গুলী বুড়ো যে এমন একটা চাল দিবে তাহা কে কোন দিন ভাবিয়াছিল! একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাধানাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—হুম্!

পাত্র-মিত্রেরা সকলেই স্তম্ভিত। এ রকম একটা চাল! ইহাকে কাটানো যায় কি করিয়া!

গালে হাত দিয়া সকলে চিন্তাবিষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে রাধানাথ কহিল—"বুদ্ধিটা দিলে কে?"

পণ্ডিত কহিল—"হেড-মাষ্টার, তা' ছাড়া ও-সব বুদ্ধি আর কার হবে?"

রাধানাথ কহিল—"গাঙ্গুলী-গিন্নী সব জানে?"

পণ্ডিত কহিল—"কি করে জানব?"

এক জন কহিল—"গাঙ্গুলী-গিন্নীকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, 'জন্মদিন'টা ভাল নয়, ওটা হ'লে গাঙ্গুলী বুড়ো মরে যাবে পট্ করে, তা'হলে বুড়ী হয়তো সব বন্ধ করে দেবে।"

রাধানাথ কহিল—"বোঝাবে কে? ও তো পুরুষদের কর্ম্ম নয়—মেয়েরা ছাড়া পারবে না।"

এক জন কহিল—"মুখী দিদির দলটাকে লাগালে হয় না?"

রাধানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তাই ভাবছি। দেখি একবার মুখী দিদিকে বলে।"

প্রফুল্ল মাষ্টার এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এতক্ষণে মুখ খুলিল। কহিল—"আর একটা খবর আছে। যা শুনলে গাঙ্গুলী-গিন্নী একেবারে ক্ষেপে উঠবে, গাঙ্গুলী মশায়ের ঠাং ভেঙ্গে ওঁকে বিছানায় ফেলে রাখবে।"

সকলে সমস্বরে কহিল—"কি খবর?"

প্রফুল্ল কহিল—"বিনয় মাষ্টারের যে ধুমড়ী শালীটা সভায় গাঙ্গুলী মশায়কে মালা-চন্দন পরাবে, সেইটাকে গাঙ্গুলী মশায়ের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে বিনয়—"

সকলে কহিল—"মানে?"

পণ্ডিত মশায় কহিল—"মানে খুব সোজা। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে—"

রাধানাথ কহিল—"মেয়েটার বয়স কত?"

—"ত্রিশ অনেক দিন পার হয়ে গেছে। নেহাৎ বেমানান হবে না।"

—"কে কে জানে এ খবর?"

—"মাষ্টার, বিনয় আর গাঙ্গুলী মশায় ছাড়া কেউ জানে না। আমার স্ত্রী কলে-কৌশলে কথাটা বিনয়ের স্ত্রীর কাছ থেকে বার করেছে।"

রাধানাথ কহিল—"বুড়ীকে জানিয়ে দিতে হবে তো! কথাটাও বলে দেব না কি মুখী দিদিদের?"

প্রফুল্ল কহিল—"ও-কথাটা আর ওঁদের বলে কাজ নাই। আমার স্ত্রী গিয়ে এক দিন বলে আসবে। তাতে বেশী কাজ হবে। চাক্ষুষ সাক্ষী কি না—"

রাধানাথ কহিল—"তাই কোরো ভাই। সবাই মিলে চেষ্টা করে গাঙ্গুলী বুড়োর এই চালটা কাটিয়ে দাও দেখি, তার পর আমি দেখে নেব।"

৭

সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলী-গিন্নী বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। রাত্রির রান্না শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঝি পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। এমন সময়ে সৌদামিনী বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—"কি করছ গো খুড়ি!" সৌদামিনী পাড়ার মেয়ে। বিধবা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সম্পর্কে গাঙ্গুলী মশায়ের ভাইঝি।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আয় মা, আয়, বস।"

সৌদামিনী আসিয়া পাশে বসিল, কহিল—"কাকাকে দেখছি নে?"

—"এ সময়ে কি করে দেখতে পাবি তোর কাকাকে? খামার-বাড়ীর বৈঠকখানায় এখন জমজমাট আড্ডা। রাত দশটার আগে বাড়ী ফেরে না।"

—"এত বড় বাড়ীতে একা-একা থাকা তো ভারী কষ্ট! নাতি-নাতনীরা কেউ কেউ কাছে এসে থাকলে পারে—"

—"তারা তো এসে থাকতে চায়। আমার সাহস হয় না। পাড়াগাঁয়ে আজকাল যা অসুখ-বিসুখ! তা মা, হঠাৎ আজ এলি যে? এমনই তো খুড়ী বেঁচে আছে কি মরেছে, খবর নিস্ না—"

—"খবর নেওয়া তো উচিত খুড়িমা, কি করব বল! এত বড় সংসারটি সব আমার ঘাড়ে। বৌগুলি তো ছেলে-মেয়ে নিয়েই অস্থির। তা আজ এলাম একবার সময় করে। নানা রকম কথা শুনছি গাঁয়ে। ভাবলাম, খুড়ীকে জিজ্ঞেস করে আসি। খুড়ী তো সবই জানে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন—"কি কথা বল্ দেখি?"

—"কাকার না কি 'জন্মদিন' পরব করছে গাঁয়ের লোক?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"সে আবার কি কথা? আমি তো কিছুই জানি না।"

সৌদামিনী আকাশ হইতে পড়িল। দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—"সত্যি, জান না? গাঁয়ের সবাই জানে। যার কাছে যাবে, তার মুখেই ঐ কথা।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন—"মিছে কথা বলে লাভ কি, মা! আমি কিছুই জানি না। যার দিব্যি করতে বল, তারই দিব্যি করে বলছি—" সখেদে কহিলেন—"আমাকে তো কিছুই বলে না। মানুষ হতাম তো বলত, জন্তু-জানোয়ারের অধম যে!"

সৌদামিনী কহিল—"সে কি কথা খুড়ি?" গাঁয়ের মধ্যে যদি কেউ মানুষ থাকে তো তুমি, আমরা সবাই এ কথা বলাবলি করি। কাকাটি তো আমার ভোলা মহেশ্বর! ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতগুলো ওঁকে নাচিয়ে নানা কাজ করায়—তা'তে লোকে নিন্দেই করুক, আর ঠাট্টাই করুক। নিজের নিজের কাজ সবার হাসিল হলেই হল।" মুচকি হাসিয়া কহিল—"কাকার জন্মদিন হচ্ছে শুনে ছেলেমেয়ে-গুলো হেসে কুটি-কুটি; বলছে—ঠাকুরদাদার আবার দাঁত বেরিয়েছে, তাই জন্মদিন হবে। বৌরা তো বাইরে হাসতে পারছে না—যতই হোক শ্বশুর তো? তবে আড়ালে হাসি-ঠাট্টা করছে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"রাধানাথ কাকা বলছিল কি জানেন?—জন্ম-দিন তো হবেই ওঁর দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছেন তো! কাজ-কর্ম্ম মতিগতি দেখলেই বুঝা যায়! এখন গাঙ্গুলী-বৌঠানকে পছন্দ

হলে হয়।" আর একটু থামিয়া কহিল—"আরও কত লোক কত কি বলছে—সব কথা শুনে তোমার কাজ নাই।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আমি কি বলব বল। আমার কথা কি কানে নেয়! আমি বাড়ীর রাঁধুনী—পেটের ভাতে চাকরাণী—আমাকে এ সব শুনিয়ে কি হবে বল?"

সেদিন রাত্রি দশটার পর গাঙ্গুলী মশায় বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী মাদুরে শুইয়াছিলেন। গাঙ্গুলী মশায় ডাক দিয়া কহিলেন—"খেতে দাও।" কোন জবাব নাই।—আবার ডাক দিলেন গাঙ্গুলী মশায়।

এবার গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"আমি কি মাইনে-করা রাঁধুনী না কি? পারব না উঠতে। পার তো বেড়ে খাও গে—"

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত! কি ব্যাপার! কোন কথা কানে গিয়াছে না কি! কহিলেন—"শরীর খারাপ তো উঠে কাজ নাই। আমি নিজেই বেড়ে নিচ্ছি—"

রান্না-ঘরে গিয়া গাঙ্গুলী মশায় সশব্দে ঘটি-বাটি নাড়িতে লাগিলেন। হঠাৎ দুম্-দুম্ পায়ের শব্দে মুখ না ফিরাইয়াই বুঝিলেন, গৃহিণী আসিতেছেন। কিন্তু কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই, এই ভাবে থালা লইয়া ভাত বাড়িবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী পাশে আসিয়া হাতের থালা কাড়িয়া লইয়া সরোষে কহিলেন—"রাঁধা ভাত সবাই বেড়ে খেতে পারে—ওতে বাহাদুরী কিছু নাই। যাও, খেতে বস গে—" গাঙ্গুলী মশায় আসিয়া খাইতে বসিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী ঠিক সামনে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঙ্গীনের মত উচাইয়া বসিয়া আছেন বুঝিতে পারিয়াও নির্ব্বিকার রহিলেন। শেষে গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"তোমার না কি জন্মদিন হচ্ছে?"

গাঙ্গুলী মশায় চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন—"কে বললে তোমাকে?"

—"যেই বলুক, কথাটা সত্যি কি না বল।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা সত্যি—"

—"আমাকে বলনি কেন?"

—তোমাকে পরে বলতাম। মেয়েমানুষ তো! মুখ আলগা। পাঁচ কান হয়ে গেলে—"

—পাঁচ কান হ'তে বাকী আছে না কি? গাঁ-শুদ্ধ সবাই জানে যে—"

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিত মুখে কহিলেন—"তাই তো দেখছি।"

—"কিন্তু গাঁয়ের সব কি বলছে জান? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে তোমার—"

—"ভীমরতি কিসের?"

—"ভীমরতি নয়? জ্ঞান-গম্যি থাকলে কি পরের কথায় বাঁদর-নাচ নাচতে! বুড়ো বয়সে জন্মদিন! বাপের জন্মে কখনও শুনিনি—"

—"তুমি আর শুনবে কি করে? লেখাপড়া জানতে, খবরের কাগজ পড়তে তো দেখতে—নিত্যি ঐ খবর। আজ এর জন্মদিন, কাল ওর জন্মদিন। যোয়ান-বুড়ো বাছ-বিচার নাই। অবশ্যি, যাঁরা দেশের গণ্য-মান্য লোক, তাঁদেরই হয়। রেধোর মত হারামজাদাদের হয় না—"

ব্যঙ্গের স্বরে গৃহিণী কহিলেন—"কি গণ্যি-মান্যি লোকটা! গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তুমি বললে কি হবে। লোকে মান্যি-গণ্যি না ভাবলে করছে কেন?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"তোমাকে কে বললে, বল দেখি?"

—"সদি বলে গেল। পাড়ার বৌরা, ছেলেমেয়েরা না কি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে তোমার জন্মদিন হওয়ার কথা শুনে। রাধানাথ না কি বলেছে—তুমি দিন-দিন খোকা হয়ে যাচ্ছ—লোক আর মানবে না তোমায়—হাকিমরাও পাত্তা দেবে না—"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"রেধো হারামজাদা, আর তার ঐ চর মাগীগুলো কি বলছে, তাতে কান দিও না। গাঁয়ের যারা শিক্ষিত লোক, ভাল লোক, তারা আমায় সম্মান করছে, হাকিমরা যখন দেখবে—"

গৃহিণী কহিলেন—"হাকিমরা আসবেন না কি?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"নিশ্চয়! তাঁরা আসবেন বৈ কি! তাঁরা যখন এই সব দেখবেন, আমার কত খাতির বাড়বে বল দেখি? রেধো ভাবছিল, খদ্দর চড়িয়ে আমার উপর টেক্কা দেবে! এবার আর ট্যাঁ-ফোঁ করতে হবে না। তাই রেধো ঐ মাগীটাকে চর পাঠিয়ে তোমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে কাজটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা করছে। আমরা এই ভয় করেই কথাটা চাউর করিনি—তোমাকে পর্য্যন্ত বলিনি। কিন্তু আমাদেরই কেউ কথাটা চাউর করে দিয়েছে বুঝতে পারছি।"

গৃহিণী অনেকটা শান্ত হইয়া কহিলেন—"আমাকে যদি কোনও কথা ব'লে কাউকে বলতে মানা কর, আমি কি কখনও তা কাউকে বলি?"

—"বল না বটে। বলতামও তোমাকে। তবে মাষ্টার নিষেধ করলে। বললে, দিদিমাকে এখন বলবেন না। পাড়াগাঁয়ে এ সব তো সচরাচর হয় না। উনি হয়তো মত দেবেন না—"

গৃহিণী কহিলেন—"যদি এতে তোমার মান বাড়ে, ভাল হয়, তো মত দেব না কেন? আমি কি এত অবুঝ।"

৮

পরের দিন। গাঙ্গুলী-গিন্নী পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছেন। একটু বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘাটে অন্য মেয়েরা কেউ নাই। শুধু এক জন প্রৌঢ়া স্নান করিতেছিলেন। প্রৌঢ়ার নাম মোক্ষদা। সম্পর্কে গাঙ্গুলী-গিন্নীর ননদ। গাঙ্গুলী-গিন্নীকে দেখিয়া মোক্ষদা কহিলেন—"এত দেরী হল যে, বৌ?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"ঘর-দোরগুলো পরিষ্কার করছিলাম। একলা মানুষ, সব দিন পেরে উঠি না।"

—"কেন, তোর তো লোকের অভাব নাই! মুনিষ, মান্দের, কামিন—কত লোক রয়েছে। তারা করে না?"

—"দিন-কাল কেমন পড়েছে জান তো, ঠাকুরঝি! পাওনা-থোওনার বেলায় সব আঠারো আনা, কাজের বেলায় গাফিলতি! ওদের কথা বোলো না, ঠাকুরঝি।"

মোক্ষদা বলিলেন—"একটু কড়া হয়ে করিয়ে নিবি। না হলে দাদাকে বলবি। এই বয়সে এত খাটবার দরকার কি? তা ঘর-দোর এত পরিষ্কার করছিস যে? কেউ আসছে না কি?"

—"হ্যাঁ—ওঁর এক মামাতো ভাই-এর ছেলে আসবে লিখেছে। কলকাতায় থাকে। আজকাল না কি খুব গণ্যি-মান্যি হয়েছে।"

—"কি নাম ?"

"নাম বললে কি তুমি চিনতে পারবে ঠাকুরঝি ?"

—"বলই না। না চিনতে পারি না চিনব। নামটা তো শুনে রাখি।"

হঠাৎ গাঙ্গুলী-গিন্নীর সন্দেহ হইল—অত নাম শুনিবার আগ্রহ কেন? সতর্ক হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"ভাল নামটা তো জানি না ঠাকুরঝি, ডাক-নামটি জানি—"

—"তাই-ই বল।"

—"ডাক-নাম—পটলা।"

মোক্ষদা চিনিতে পারিলেন না। হঠাৎ কি-যেন একটা কথা মনে পড়িল, এমনই ভাবে ভ্রূ নাচাইয়া মোক্ষদা কহিলেন—"এ্যাই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বয়স হ'লে মনে-টনে থাকে না কিছুই। ক'দিনই ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে দেখা হ'লে কথাটা জিজ্ঞেসা করব।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন—"কি বল দেখি ?"

—"হ্যা লা! দাদার না কি সবাই জন্মদিন করছে ?"

গাঙ্গুলী-গৃহিণী কহিলেন—"হ্যাঁ, করছেই তো! আজকাল মান্যি-গণ্যি লোকদের জন্মদিন করা রেওয়াজ। গাঁয়ের মধ্যে তো উনিই মানুষের মত লোক—কত লোকের কত উপকার করেন। তাই সবাই মিলে ওকে মান্যি করছে।"

মোক্ষদা কহিলেন—"কিন্তু এটা কি ভাল ? শুনে থেকে মনটা আমার খচ্-খচ্ করছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের মা-বাপরা সখ করে জন্মদিন করে; তা'ও আমাদের গরীব-গেরস্থদের ঘরে ও-সব হয় না; সহরের বড়লোকদের ঘরেই হয়, শুনেছি। কিন্তু এত বয়সে 'জন্মদিন' হওয়া তো কখনও শুনিনি। তা'ও ঘরের লোকে করে—সে এক কথা। কিন্তু গাঁ-শুদ্ধ সবাই মিলে 'জন্মদিন' করা—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"সবাই মিলে না করলে মান্যি হবে কি করে, ঠাকুরঝি ?"

—"দেখ, বৌ! দাদার মান্যি হ'লে শুধু তোরই গৌরব নয়, গৌরব আমাদেরও। যেখানেই যাই, দাদার নাম করে বলি—দাদা আমার এমন! দাদা আমার তেমন! এর মানটা দেখছিস, কিন্তু এর মানেটাও বুঝে দেখ। সবাই মিলে একটা বুড়োর 'জন্মদিন' করা মানে তাকে বলে দেওয়া—তোমার এত বয়স হয়েছে, অনেক দিন বেঁচে আছ তুমি। এমনই করে বয়স নিয়ে টোকা কি ভাল! তুই বুঝে দেখ—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

মোক্ষদা বলিতে লাগিলেন—"ছোট ছেলেরা একটু চাঁদ-পানা হলে, নাদুস-নুদুস হলে আমরা মাদুলী পরাই, টিপ পরাই, পাছে ডান-এ খুঁড়ে দেয়; কিন্তু এই যে গাঁ-শুদ্ধ লোক বয়স নিয়ে খুঁড়তে থাকবে, তা'তে কি ফল ভাল হবে ?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"দাদার মত একটা লোক গাঁয়ে আছেন, কত সাহস, কত ভরসা! বুড়ো বয়সে কেউ যদি কিছু না করে তো ভাবি, দাদা তো আছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, উনি নদীর বালির মত পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকুন, কিন্তু গাঁয়ের হিংসুটে হাড়-বজ্জাত লোকগুলো খুঁড়ে-খুঁড়ে দাদার যদি একটা কিছু ঘটিয়ে দেয় তো—" মোক্ষদার গলার স্বর কান্নায় ভাজিয়া পড়িল। কথা শেষ না করিয়া তিনি গামছায় চোখ চাপিলেন।

সেই দিন দুপুর বেলায় আহারের সময়ে গৃহিণী কহিলেন—"দেখ, ও জন্মদিন-টন্মদিন বন্ধ করে দাও—"

"গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"আরে! সে কি! সব তৈরী হয়ে গেছে, মাঝে একটা দিন মাত্র বাকী। হাকিমদের নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে। এখন ও-কথা বললে কি চলে ?"

—"বেশ তো, নেমন্তন্ন হয়ে গেছে, তাঁরা আসুন, খাওয়া-দাওয়া করে চলে যা'ন। জন্মদিন তোমার হবে না।"

সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"কি হয়েছে বল দেখি ? আবার কোন চর এসেছিল বুঝি ?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—"চর আবার কে ? চর-টর কেউ আসেনি"—একটু থামিয়া কহিলেন—"যারা তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তারা সবাই মানা করেছে—"

—"মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীটির নাম বল না ?"

—"মোক্ষদা ঠাকুরঝি। তোমাকে তো খুবই স্নেহ-ছেদ্দা করে।"

গাঙ্গুলী মশায়ের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। কহিলেন—"কি বলছিল ?"

—"বলছিল—ও-সব করলে ভাল হবে না—ওতে অমঙ্গল হবে।"

—"কি অমঙ্গল হবে ?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন—কি অমঙ্গল হবে—বলতে পারব না। সে কথা মুখে বলা যায় না!"

গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া কহিলেন—"মৃত্যু হবে—এই কথা বলেছে তো ? মুখ্যু মেয়েমানুষের কথা শুনছ কেন! দেশের অত লোকের 'জন্মদিন' হচ্ছে, কা'র মৃত্যু হয়েছে শুনি ? ওতে মৃত্যু হয় না, বরং পরমায়ু বাড়ে। সবাই মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে—যেন অনেক দিন বেঁচে থাকি, অনেক দিন শক্ত-সমর্থ থেকে যেন দেশের উপকার করি—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"দল বেঁধে কিছু চাইলে ভগবান দেন না। 'জন্মদিন' করলে যদি পরমায়ু বাড়ে তো আমি বাড়ীতে 'জন্মদিন' করব। ও-রকম বারোয়ারী 'জন্মদিন' চলবে না!"

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া খাইতে লাগিলেন! জানেন—প্রতিবাদ নিরর্থক। একবার যখন গোঁ ধরিয়াছে, কিছুতেই বুঝিবে না। কাজেই চুপ করিয়া থাকাই উচিত। যা হইবার তা হইবেই। এখন 'স্তোক-বাক্য' বলিয়া কোন রকমে থামাইয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ!

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"কথাটা কানে ঢুকল না না কি ?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ঢুকেছে বৈ কি! মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করব। যদি বন্ধ করলে অসুবিধে না হয়, বন্ধই করে দেব।"

গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"অসুবিধে হলেও বন্ধ করে দিতে হবে—বোলো নাতিকে আমার নাম ক'রে—"

সেদিন সন্ধ্যার পরে—'দিদিমা, মা বাড়ীতে আছেন?'—বলিয়া একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া শোবার ঘরের

দরজার সামনে দাঁড়াইল। গাঙ্গুলী-গিন্নী ঘরে বসিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের একটা পুরাতন চশমা চোখে দিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিলেন। আপ্যায়ন সহকারে কহিলেন—"এস, ভাই! এস, বস।"

ঘরটী মাঝারি আয়তনের। এক পাশে একটি পালঙ্কে ধবধবে ফর্সা চাদর দিয়া ঢাকা বিছানা-পাতা, দেওয়ালে নানা দেব-দেবীর পট, ও দেশের বড়লোকদের—যথা, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদির ছবি টাঙ্গানো। আর এক পাশে দেওয়াল ঘেঁসিয়া কাপড়ের আলনা। সামনের দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটা বেঞ্চির উপর ছোট-বড় নানা আকারের ট্রাঙ্ক উপরি-উপরি সাজানো। ঘরটি ঝকঝকে, তকতকে; অন্যান্য জিনিসগুলিও বেশ গোছানো; সর্বত্র গৃহিণীর কর্মকুশল হাতের পরিচয় পরিস্ফুট।

যুবকটি ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপরে বসিল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"হঠাৎ এলে যে?"

যুবকটি কহিল—"কাল রবিবার যে!"

—"ওঃ! তাই। তা বৌ, খোকা বেশ ভাল আছে?"

যুবকটি কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

যুবকটির নাম অপরেশ। বি,-এ পাশ। সহরে কালেক্টরীতে কেরাণীর কাজ করে। সহরেই সপরিবারে থাকে। ছুটি-ছাটাতে মাঝে-মাঝে বাড়ী আসে।

যুবকটি কহিল—"দাদামশায়ের না কি জন্মদিন হচ্ছে দিদিমা?"

গৃহিণী কহিলেন—"হচ্ছিল—বন্ধ করতে বলে দিয়েছি। ওতে আমার মত নাই।"

অপরেশ কহিল—"বেশ করেছেন! আমিও তাই বলতে এসেছিলাম—"

—"উনি বলছিলেন—সহরে বড়-বড় লোকদের জন্মদিন হয়।"

—"হয় তো। কিন্তু ফল কি হয়! ক'জন জন্মদিন-এর ধাক্কা সামলাতে পারে? এই যে দেশের বড় বড় লোকগুলো পটপট্ করে মরে গেল, এর কারণ জানেন? ঐ জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী বাধা দিয়া কহিলেন—"মহাত্মা গান্ধীকে তো খুন করে দিয়েছিল?

"সে তো দেখিতে খুন; আসল খুন করেছিল দেশের লোক—জন্মদিন ক'রে ক'রে। না হলে একশ পঁচিশ বৎসর বাঁচব বলেছিলেন, বাঁচতেনও।"

হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া কহিল—"যতগুলি লোকের ছবি দেখছেন, সব জন্মদিন-এর ধাক্কায় গেছে—"

পালঙ্ক হইতে নামিয়া, দেওয়ালের কাছে গিয়া সুভাষচন্দ্রের বাঁধানো ছবিটি লইয়া আসিয়া দিদিমার হাতে দিয়া কহিল—"দেখুন দেখি চেহারা!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আহা! চমৎকার চেহারা! কে ভাই?—"

—"সুভাষচন্দ্র। কেমন ডাকাবুকো চেহারা দেখছেন! কিন্তু ভক্তের দল বার কয়েক 'জন্মদিন' করতেই দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন্ বিদেশে বেঘোরে মারা গেলেন।"

—"আহা! বিয়ে হয়েছিল?"

—"বিয়ে করেননি! সন্ন্যাসী মানুষ, দেশের জন্যেই প্রাণ-মন সঁপে দিয়েছিলেন। ও-সব দিকে মন ছিল না। এত বড় একটা লোক এ দেশে কম ছিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"আমি তো মানা করে দিয়েছি—তাঁতেও যদি না শোনে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব।"

রাত্রে গাঙ্গুলী মশায় বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন—"মাষ্টার নাতিকে বলেছ?"

গাঙ্গুলী মশায় বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছি—"

—"কি বললে?"

—"কি আর বলবে? হাসছিল। পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়েমানুষের কথা শুনে ওদের মত শিক্ষিত লোক হাসবে না তো কি করবে?"

—"আমি না হয় মুখ্যু মানুষ, অপরেশ তো মুখ্যু নয়। ও তো ঐ কথা বলে গেল—"

গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন—"অপরা হারামজাদা এসেছিল বুঝি! কি বললে?"

ছবিগুলার দিকে হাত বাড়াইয়া গৃহিণী কহিলেন—"বললে—ঐ যতগুলো লোকের ছবি রয়েছে—সব জন্মদিনের জন্যে মারা গেছে।"

—"মুখ্যু মেয়েমানুষ পেয়ে বোকা বানিয়েছে আর কি! ওঁরা কত বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন জান? কেউ ষাট, কেউ সত্তর, কেউ আশী পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা দেশে ক'জন বাঁচে এত দিন? ওঁরা বেঁচেছিলেন—লোকে ওঁদের 'জন্মদিন' করেছিল বলে।"

গৃহিণী লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া সুভাষচন্দ্রের ছবিটি লইয়া আসিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের চোখের সামনে ধরিয়া কহিলেন—"এরও বয়স সত্তর-আশী! এ গেল কি করে?"

—"আরে এ তো সুভাষচন্দ্র! যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজের সঙ্গে। সেখানেই মারা গেছেন। যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোকে মারা গেছে, সব কি জন্মদিন-এর জন্যে? মুখ্যু মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! আসল কথা কি জান—আমার জন্মদিন হবে, গাঁয়ের লোক আমাকে সম্মান দেখাবে, হাকিমদের কাছে আমার মান বাড়বে, রাধানাথের সহ্য হচ্ছে না। তাই নানা লোক পাঠিয়ে তোমাকে নাচাচ্ছে! জানে তো—তোমাকে নাচানো কত সোজা, আর নাচতে সুরু করলে মা-কালীকেও হার মানিয়ে দাও—"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন, মনে সন্দেহের দোলা লাগিল।

গাঙ্গুলী মশায় তাহা বুঝিলেন, সোৎসাহে বলিলেন—"রাধানাথ এত কথা বলে পাঠাচ্ছে, কিন্তু নিজে মাষ্টারকে ডেকে কি বলেছে জান? বলেছে, যা' খরচ হয়েছে সব দেবে, তাছাড়া স্কুলে একশ' টাকা চাঁদা দেবে, ওর জন্মদিন হোক—"

গৃহিণী কহিলেন—"মিথ্যে কথা! রাধানাথ তোমার মত বোকা নয়, নিজের ভাল-মন্দ খুব বোঝে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"মিথ্যে কথা! বেশ তাই! তবে একটা কথা জেনে রেখো, রাধানাথ যদি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয় তো গাঁয়ে বাস করব না।"

গৃহিণী কহিলেন—"সে আর নতুন কথা কি শোনাচ্ছ? সে কথা তো সেদিন হয়ে গেছে। কাশীবাস করব দু'জনে—"

কাশীবাসের কথাটা গাঙ্গুলী মশায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গৃহিণীর কথায় মনে পড়িল। কহিলেন—"তা তো করব। কিন্তু তা বলে রেধোর হাতে বোর্ড তুলে দিয়ে গাঁয়ের সর্ব্বনাশ করতে পারব না! তাছাড়া, ঘর-বাড়ী, সম্পত্তি তো কাশী নিয়ে যেতে পারব না। সে সব এখানেই থাকবে। রেধো যদি গাঁয়ের কর্ত্তা হয় তো ফন্দি-ফান্দা করে সব তছনছ করে দেবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"তা কেন করবে? রাধানাথকে যত খারাপ লোক বল, তত নয়—"

গাঙ্গুলী মশায় বিকৃত স্বরে কহিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব ভাল লোক! —তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও—"

—"খুব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী!"

—"তোমার দুর্ম্মতি হয়েছে কি না, নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের তুমি চিনবে কি করে? তাঁদের কথা তো তোমার কানে ঢুকবে না। আমার কথাই যখন ঢুকছে না! তবে একটা কথা মনে কোরো—মন্দোদরীর কথা না শুনে রাবণের ঘোর অমঙ্গল হয়েছিল। আমার কথা না শুনলে তোমারও তাই হবে—" কণ্ঠস্বর ধারালো করিয়া কহিলেন—"আর একটা কথা, মন্দোদরীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখবার মেয়ে আমি নয়। যদি দেখি 'ভন্মদিন' হচ্ছে, তাহলে যেদিনে হবে, সেদিন ভোরে তুমি উঠবার আগে শোবার ঘরে ভারী তালাটা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা পুকুরের জলে ফেলে দেব। কেমন করে 'জন্মদিন' হয় দেখব আমি—"

[ক্রমশঃ।

দু'টি বিলাতী কবিতা

অমিয় ভট্টাচার্য্য

নৈশ প্রস্তাব

(মাইকেল ফীল্ড)

এসো নিদ্রা ধ্বান্ত-ক্রতু, সাহসিকা রাত্রির দুহিতা,
আমাকে তোমার স্বপ্ন ভিক্ষা দাও। দাও মিথ্যাগুলি।
দিবা-অস্বীকৃত সুখ নিয়ে এসো আমার শিয়রে,
কণ্টকিত, শৃঙ্গান্বিত শুভ্র তোরণের দ্বার খুলি'।

নিষ্ঠুর অধর হ'তে যে চুম্বন পারিনি কাড়িতে,
সে চুম্বন ওষ্ঠে আনো; আনো শিলীভূত সে হৃদয়,
প্রেম-বজ্রে যে হৃদয় পারিনি ভাঙিতে; শান্তি আনো,
যার আশে এ জীবন ভেঙ্গে ভেঙ্গে আজো বেঁচে রয়।

ঢের ভালো,—যদি স্বপ্ন-মায়া-মাখা নৈশ মিথ্যাগুলি
সুমধুর কল্পনার মন্ত্রোচ্চারে করে অভ্যর্থনা।
নিশিগন্ধ ওষ্ঠাধর হোক্ মোর নৈশ উপাধান,
শান্তি হোক্ নির্দ্দয় দিনের:—তার চরম লাঞ্ছনা।

মেঘ

(রুপার্ট ব্রুক্)

সুনীল-নিশীথ-গর্ভে অন্তহীন মেঘস্তম্ভগুলি
নৈঃশব্দের আলোড়নে ভাঙ্গে, বয়, আনে তরঙ্গিমা।
সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত তাদের করাঙ্গুলি
তুষার-প্রলেপে ঢাকে গুপ্ত শ্বেত শশি-মাধুরিমা।

সাথিহীন সংক্রমণে কেহ থেমে যায় অগোচরে।
অস্পষ্ট-মন্থর-ভঙ্গী,—ফিরে চায়;—দৃষ্টি মসীলীন।
যেন কোন যোগ-পান্থী পৃথিবীর হিত ভিক্ষা ক'রে,
অকস্মাৎ গোঝে সত্য: আশীর্ব্বাদ শূন্য, অর্থহীন।

লোকে বলে: মৃত্যু নেই। মৃতেরা তাদেরই পার্শ্ব-জন,
ফেলে-আসা সুখ-দুঃখ বেঁটে নিয়ে যারা বিত্তশালী।
আমি ভাবি: তারা শান্ত-নভোচারী (মেঘেরই মতন)!
প্রভুত্ব-গরিমা-দৃপ্ত-ভঙ্গিমায় উদ্ধৃত কপালী।

: সেথা হ'তে দেখে চাঁদ, দেখে, সিন্ধু আজো গর্জ্জমান,
দেখে, পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রবেশ-প্রস্থান।

"উদ্দীপ্ত-কাম-তারুণ্য বশতঃ বা চাপল্য হেতু বা কৌতূহল-বশে কিংবা অনুকম্পাবশে, অথবা আমার ভাগ্যগুণে বা দূতীর কৌশলে অথবা স্বভাববশে তুমি আমার প্রতি আমার জীবনধারণের উপায়স্বরূপ যে প্রেমকণাংশ প্রদর্শন করিয়াছ প্রেম সম্বন্ধে গণিকাদিগের অন্তরূপ ভাব (১) বিবেচনা করিয়া সেই প্রেম হইতে যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না। স্নেহ, ক্রোধ, শাঠ্য, দাক্ষিণ্য, সরলতা, ব্রীড়া এই সমস্ত ধর্ম সাধারণ নারীর ন্যায় জীবধর্ম অনুসারে তাহাদেরও (অর্থাৎ গণিকাদিগেরও) আছে। অকপট ও আন্তরিক প্রবল প্রেমে অভিভূত-হৃদয়া, দয়িতের বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে অক্ষমা গণিকাগণ নিজ প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। সত্যই যাহা ঘটিয়াছিল সেই উপাখ্যান আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। আজিও সেই ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ বটবৃক্ষ "বেশ্যাবট" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। [১৭১—১৭৫]

হারলতা উপাখ্যান

পাটলীপুত্র নামে এক মহানগর আছে; ইহা পৃথিবীর তিলকস্বরূপ, সরস্বতীর নিত্য নিবাসস্থল এবং (ঐশ্বর্যে) ইহা ইন্দ্রপুরীকেও পরাজিত করিয়াছে। ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রিভুবনের পুর-রচনা-কৌশল (২) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বকর্মা যেন চিত্র দ্বারা আপন শিল্পচাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (তথায়) কোন অমঙ্গল নাই, (যুদ্ধে) পরাভূত হইয়া শত্রু কর্তৃক তাহা নির্জিত হয় নাই (৩), (নৈসর্গিক) উৎপাত-সমূহ দ্বারা উপদ্রুত নহে (৪) এবং কলিকালোচিত দোষ সমূহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই (৫)। ভোগিগণের (৬) নিবাস হেতু ইহা পাতালতল তুল্য, বিবিধ রত্নসমুচ্চয়ে (ঐশ্বর্যশালী হইয়া রত্নাকর) সমুদ্রতুল্য, বিবুধগণের (৭) বাস হেতু স্বর্গতুল্য; অর্থসমৃদ্ধি হেতু ইহা কুবের-ভবনতুল্য, মহিলাগণের বাস হেতু ইহা অসুর-বিবর (৮) তুল্য, গন্ধর্বগণের (৯) বাস হেতু ইহা হিমালয়ের সানুদেশ তুল্য, যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের প্রাচুর্য হেতু ইহা হরিনগরের (১০)

(১) অর্থাৎ কেবল নিজলাভের চেষ্টা বা স্বার্থপরতাই গণিকা-দিগের অন্তরে থাকে, সেখানে প্রেম নাই এরূপ মনে করিও না। (২) নগরস্থাপনের কৌশল ব্রহ্মা জানিতে চাহিলে যেন বিশ্বকর্মা তুলির সাহায্যে তাহা অংকিত করিয়া ব্রহ্মাকে নিজ শিল্পচাতুর্য দেখাইয়াছেন এমনি সুন্দর অর্থাৎ পটে আঁকা যেন ছবিখানি! (৩) শত্রু কর্তৃক যাহা পরাভূত হয় নাই ইহা দ্বারা তাহার বীর্যবত্তা অক্ষুণ্ণ, গৌরব অম্লান, এবং শোভা অবিনষ্ট ইহা সূচিত করিতেছে। (৪) নৈসর্গিক উৎপাত যথা—ভূকম্পন, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। (৫) কলিকালোচিত দোষ অর্থাৎ চৌর্য, লাম্পট্য, অনাচার, অধর্ম ইত্যাদি। (৬) ভোগী—ঐশ্বর্য-ভোগী (luxurious) এবং পক্ষে সর্প; পাতাল সর্পদিগের বাসস্থান। (৭) বিবুধ—পণ্ডিত, পক্ষে দেবতা (৮) অসুরদিগের বিবর অর্থাৎ সুরক্ষিত গোপন নগরে মহিলাদিগের প্রাচুর্যের কথা প্রাচীন কাব্য সমূহে প্রসিদ্ধ; বাণভট্টের হর্ষচরিতে চক্রবর্তী সম্রাটকে দেখিবার জন্য সামন্তরাজগণের অন্তঃপুরচারিণী-গণের আগমনের বর্ণনায় "অসুরবিবরাণীব অপাবৃতানি" এই উৎ-প্রেক্ষা দৃষ্ট হয়; দশকুমারচরিতে—"দেব, অয়ি ত্বাবতীর্ণে বিজোপ-কারায়াসুরবিবরং" (দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস)। (৯) গন্ধর্ব—দেবযোনি বিশেষ পক্ষে গীতবাদ্যকলাবিৎ। (১০) হরিনগর—হরিদ্বার অথবা পূর্ব-বংশের রাজধানী অযোধ্যা যেখানে বহু যজ্ঞশালা বিদ্যমান।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

ন্যায় এবং শমবিভবের (১১) হেতু ইহা মুনিজনস্থান (অর্থাৎ বদরিকাশ্রম) তুল্য। [১৭৬—১৮০]

এই নগরীতে সকল শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা মার্জিত-বুদ্ধি বিপ্রগণ বাস করেন এবং নিকষ প্রস্তরে যেরূপ সুবর্ণের গুণ নির্ণীত হয় সেইরূপ এইখানে ললনাগণের সদসদ্‌ গুণ নির্ণীত হইয়া থাকে (১২)। কলি-কালের আবির্ভাবে (শীতার্ত) কম্বলাচ্ছাদিত বৃষের ন্যায় ধর্ম যজ্ঞীয় ধূমরূপ কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া নিভৃতে এই স্থানে বাস করেন (১৩)। শশধর নিজ কলংক আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত কররাশি প্রসারণ করিয়া নিশীথে এই স্থানের নারীগণের বদনপংকজকোষ হইতে লাবণ্য অপহরণ করিয়া থাকেন। এই নগরীতে অভিসারিকা তরুণী বল্লভের সহিত মিলনাভিসারকালে নিজ তনুকান্তি বিস্তার পূর্বক পথ হইতে ঘনান্ধকাররূপ কৃষ্ণ যবনিকা অপহরণ করিয়া থাকে (১৪)। হেথায় পথিক সমূহ নিতম্বিনীগণের চঞ্চল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের নিজ বনিতাগণের সহিত সমাগমের উৎকণ্ঠা শিথিল হইয়া যায়। [১৮১—১৮৫]

এই নগরীর কুলমহিলাগণ যেরূপ স্বল্পভাষিণী তাহাদের কর-পদপল্লবও সেইরূপ নাতি পবিসর, তাহাদের মন যেরূপ স্বচ্ছ চঞ্চল বিশাল নয়নযুগলও সেইরূপ। তাহাদের স্তন, জঘন ও কেশভারের ন্যায় তাহাদের প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগও নিবিড়, কুলদেবতাদিগের অর্চনায় তাহাদের বলিশোভা (১৫) যেরূপ তাহাদের দেহমধ্যভাগের বলিসকলের শোভাও সেইরূপ। মনোভবের বাণের তূণতুল্য তাহাদের নাভিকুহর তাহাদের স্বভাবের ন্যায় গম্ভীর, বিশাল নিতম্বের ন্যায় তাহাদের গুরুজন-পূজায়ুক্ত চিত্ত বিশাল। [১৮৬—১৮৮]

সেথায় বিচ্ছিত্তি (১৬) কেবল হরিণায়তনয়নাগণের বেশে, কোষ

(১১) শান্তভাব (sereneness); 'মুনিজনস্থান' অর্থে তপোবনও হইতে পারে। (১২) অর্থাৎ সেই স্থানে এমন সকল রসিক ব্যক্তির বাস যাহারা নিকষ প্রস্তরে স্বর্ণ পরীক্ষা করার ন্যায় ললনাগণের গুণাগুণ সহজেই বুঝিতে পারে। (১৩) বৃষ শব্দের এক অর্থ ধর্ম। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে কলির প্রভাবে অধর্মের প্রাচুর্য হইয়াছে, কেবল এই স্থানের জনসাধারণ অবিরত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া বৈদিক ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। (১৪) তরুণীদিগের অসামান্য দেহ-লাবণ্যের প্রভায় অন্ধকার পথ আলোকিত হয়। (১৫) উপহারের দ্রব্যের সমারোহ, নৈবেদ্যাদি, পক্ষে ত্রিবলি। (১৬) বিচ্ছিত্তি—বিচ্ছেদ, অমিল (discord); পক্ষে স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারচেষ্টা বিশেষ, যথা—"স্তোকা মাল্যাদি রচনা বিচ্ছিত্তিঃ

কান্তিহরণ (১৭) কেবল অস্ত্রে, কুটিলত্ব কেবল অলকরাশিতে এবং কামচেষ্টিত (১৮) কেবল শিশুগণের ক্রীড়ায় দৃষ্ট হয়। সেখানে সংযম (১৯) কেবল ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষে, ইনের(২০) উপঘাতরূপ(২১) গ্রহ(২২) কেবল রাহুর পক্ষে, স্তব্ধত্ব(২৩) কেবল তালতরুর পক্ষে এবং তরল-সংগত্য(২৪) কেবল হারলতার পক্ষেই প্রযোজ্য।

সেখানে পররন্ধ্রান্বেষণ(২৫) কেবল সর্পেরাই করিয়া থাকে, লোকে সেখানে কেবল প্রিয়তমার অধরই খণ্ডন করে (অন্যথা অপরকে খণ্ডন(২৬) করে না। সূচী ব্যথার(২৭) অনুভূতি কেবল নৃত্যাভ্যাস প্রবৃত্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। অতি সরলা যুবতীগণ সেখানে নতদেহা(২৮), নর্মদা সেখানে মন্থর-গমনা(২৯)। সেই স্থানের মুগ্ধ-স্বভাবা রমণীগণ গুরুজনের শাস্ত্রে(৩০) অনুরক্তা। [১৮৯-১৯২]

সেইখানে ইন্দ্রের ন্যায় শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান পুরন্দর নামে এক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাস করেন। তিনি সত্যনিষ্ঠায় যুধিষ্ঠিরকে, কামদমনে শংকরকে এবং জিতেন্দ্রিয়তায় ব্রহ্মাকে সতত উপহাস করিয়া থাকেন। শিব বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার পীড়ার কারণ হইয়াছেন, কৌস্তুভাভরণ নারায়ণ (বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া) যাচক হইয়া নিন্দনীয় হইয়াছেন, কপিলমুনি (সগরসন্ততিগণ কর্তৃক) পৃথিবীর খননের কারণ হইয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের ন্যায় গুণশালী অথচ তাঁহার মানের কোন ন্যূনতা হয় নাই। প্রাণিদেহের প্রতি হিংসায় বিমুখ হইয়াও তিনি মার্গানুসরণ (৩১) হেতু ব্যাধবৎ, পরদার বিমুখ হইয়াও গুরুজন-

পোষকৃৎ" অর্থাৎ কান্তিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে অল্প পরিমাণ মাল্যাদি রচনা দ্বারা প্রসাধন তাহাকে বলে বিচ্ছিত্তি। (১৭) কোষহরণ=কোষ হইতে হরণ (misappropriation); পক্ষে কোষ হইতে নিষ্কাশন (unsheathing)। (১৮) কামচেষ্টিত=যথেচ্ছাচার বা লাম্পট্য ; পক্ষে ইচ্ছামত ক্রীড়া।

(১৯) সংযম—দমন (control), পক্ষে বন্ধন (arrest of guilty persons)। (২০) ইন—সূর্য, পক্ষে প্রভু। (২১) উপঘাত—আচ্ছাদন, পক্ষে প্রাতিকূল্য (disaffection)। (২২) গ্রহ—গ্রহণ (eclipse), পক্ষে চরণ ধারণ। (২৩) সরল-প্রাংশুত্ব, পক্ষে প্রতিকূল বৃত্তি। (২৪) মধ্যমণির সহিত সংযোগ, পক্ষে তরল প্রকৃতি নায়কের সহিত মিলন (association with ficklelover)। (২৫) অপর জীবের বিবরের অন্বেষণ, পক্ষে পরের ছিদ্র বা দৌর্বল্যের অন্বেষণ। (২৬) অপরের ক্ষতি করা। (২৭) ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য নৃত্যের আংগিকাভিনয়ে, ভাবি বাক্যকে উপজীব্য করিয়া যে কর চালনা তাহাকে বলে সূচী—"বর্ত্তনা সা ভবেৎ সূচী ভাবিবাক্যোপজীবনাৎ" [সংগীতরত্নাকর]; পক্ষে শূল বেদনা। (২৮) স্তন-ভারে অবনতদেহা। (২৯) নর্মদা সাধারণতঃ খরস্রোতা নদী এই ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে নর্মপ্রিয়া পরিহাস-রসিকা রমণীগণ স্তনজঘনভারালসা। (৩০) গুরুজনদিগের শাসন বা উপদেশ, পক্ষে যে শাস্ত্র সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ চর্চা করিয়া থাকেন।

১৮৮ হইতে ১৯১ শ্লোক পর্যন্ত শ্লেষাত্মক পরিসংখ্যালংকার।

(৩১) মার্গ—মৃগযূথ, পক্ষে সদাচারের আচরণ।

দিগের প্রমদাকাংক্ষা (৩২) করেন। তিনি যে দুইটি মহৎ কুল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশাল সরসীর ন্যায় সমস্ত সত্ত্বের (৩৩) আধারস্বরূপ, সদাচারের জন্মভূমি এবং তাহা কলিকালোচিত দোষ সমূহ হইতে মুক্ত। তথায় পিতৃতর্পণের জন্য খড়্গ (৩৪) গ্রহণ করা হয় অন্যথা শৌর্যদর্পে কেহ খড়্গ গ্রহণ করে না। (এই উভয় বংশের) বালকগণ ব্রহ্মচর্য অবস্থায় যে মেখলা বা মৌঞ্জীবন্ধন করে তাহা (জীর্ণতাবশতঃ) ছিন্ন বা স্খলিত হইয়া যায় অন্যথা সুরতসংমর্দপ্রসঙ্গে কেহ মেখলা শিথিল করে না। বেদের পাঠভেদ হেতু (এই বংশীয়গণ) বিতর্ক করে নচেৎ অর্থ বিভাগ হেতু রোষবশে কেহ বিবাদ করে না। (এই দুই পরিবারে) যজ্ঞীয় অগ্নিতেই তেজের প্রকাশ দেখা যায়, জিতেন্দ্রিয় ভূদেবগণ তেজ বা ক্রোধ প্রকাশ করেন না। বার্ধক্যহেতু (এই বংশীয়গণের) পাদাদির স্খলন হয় অন্যথা শাস্ত্রাদিতে স্খলন হয় না। জপ হেতু (তাঁহাদের) অধর স্ফুরিত হয় অন্যথা রোষাবেশে হয় না। যজ্ঞার্থিগণই যজ্ঞার্থ সমিধ ইচ্ছা করেন অন্যথা কেহ সমিৎ (বা যুদ্ধ) ইচ্ছা করেন না। কৃষ্ণসারের চর্মনির্মিত আসনে উপবেশন হেতু যেটুকু কৃষ্ণতার সহিত তাঁহাদের সংপর্ক অন্যথা কোনরূপ কৃষ্ণতার (বা অপবিত্রতার) সহিত কোন সংপর্ক নাই। [১৯৩—২০০]

সেই বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিতের কচের ন্যায় গুণশালী সুন্দরসেন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি সকল কলায় শিক্ষিত হইয়া পূর্ণকল শশধরের ন্যায় (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় পক্ষকে (বা কুলকে) উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিধাতা যেন পুষ্পধনুকে পশুপতির নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া রতির তৃপ্তি হেতু তাঁহারই ন্যায় রূপশালী ইঁহাকে দেহধারী দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর কুলললনাদিগের কথা কি বলিব, মহর্ষিপত্নীও (৩৫) তাঁহার রূপ দেখিয়া অতি কষ্টের সহিত চরিত্র রক্ষা করেন। তাঁহার সুবর্ণফলকের ন্যায় বিশাল বক্ষ দেখিয়া নারায়ণের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মী আপন আসন যেন কষ্টকর বলিয়া মনে করেন। কামিনী সকল তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ ঠিক করিতে পারে না (তাহারা মনে করে)—যদি তিনি সূর্যের কিরণ হইতে সৃজিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন স্নিগ্ধ হয় কেন? আর যদি চন্দ্রের কিরণ হইতে তাঁহাকে নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে তাঁহার রূপ (মদনোদ্দীপন) হেতু পীড়াই বা দেয় কেন?* তিনি চন্দ্রের প্রসন্নতা, পর্বতের ধৈর্য জলধরের উন্নতত্ব এবং সমুদ্রের গাম্ভীর্য হরণ করিয়াছেন। তিনি বিনয়ের নিবাস, বৈদগ্ধের আশ্রয়, মর্যাদার স্থান, প্রিয় বাক্যের

(৩২) প্রমদ আকাংক্ষা অর্থাৎ হর্ষের আকাংক্ষা। প্রমদা-আকাংক্ষা রমণীতে অভিলাষ। (৩৩) সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ, পক্ষে প্রাণী অর্থাৎ জলচর। (৩৪) খড়্গ—গণ্ডার। বার্ধীনস বা গণ্ডারের মাংসে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কার্য। খড়্গ-গ্রহণ—গণ্ডার শিকার। (৩৫) বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অথবা অত্রিপত্নী অনসূয়া। * তন্সুখরামের সংস্করণে যে পাঠ আছে তাহাতে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ হয়—"কামিনীগণ মনে করে সে নিশ্চয়ই চন্দ্রের খণ্ড সকল দিয়া সৃজিত নতুবা চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে দেখিতে এত আনন্দই বা হয় কেন, আবার মনে (কামোদ্দীপন হেতু) পীড়াই বা হয় কেন?"

আয়তন এবং সাধু চরিতের নিকেতন। তিনি প্রমদাদিগের মদনস্বরূপ, সজ্জনরূপ কুমুদকুসুমের চন্দ্রতুল্য, গুণের নিকষ-প্রস্তর ও পথিকজনের ছায়াতরু। সজ্জনের সভায় তাঁহার বাস, স্বর্ণমূল্য নির্ধারক নিকষ প্রস্তরের ন্যায় কাব্য-কথার তিনি যথার্থ সমালোচক, প্রণয়িগণের (৩৬) কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং লক্ষ্মীর লীলাবিহার স্বরূপ। [২০১-২০৯]

সমুদ্র যেরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ তাঁহার সুখ-দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন (শীলাদি) সকল বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ গুণপালিত নামে তাঁহার এক সুহৃৎ ছিলেন। [২১০]

একদা তাঁহার সহিত নির্জনে অবস্থান কালে তিনি (অর্থাৎ সুন্দর সেন) সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহারই চিন্তানুরূপ এই আর্যাটি গান করিতেছে—

> "গুরুজনের [illegible] মন যার
> দেশান্তরের [illegible] ভাষা, আচার, ব্যবহার
> না [illegible] জানবে তারে সেই সে অভাজন
> শৃঙ্গবিহীন ষণ্ড যথা নিষ্ফল তেমন।"

ইহা শুনিয়া সুন্দর তাঁহার প্রিয় মিত্রকে বলিলেন—'গুণপালিত, ঐ সাধু লোকটি গীতচ্ছলে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। লোকে দেশ ভ্রমণ করিয়া সাধুব্যক্তিদিগের আচরণ, খলদিগের চাতুরী, বিভিন্ন লোকের মনোভাব, রসিকজনোক্ত নর্মপরিহাস, কুলটাগণের বক্রোক্তি, গুরু-নিগূঢ় (৩৭) শাস্ত্রতত্ত্ব, বিটদিগের চরিত্র, ধূর্তদিগের বঞ্চনাকৌশল এবং সসাগরা ধরিত্রীর স্বরূপ জানিতে পারে। অতএব গৃহে বাস করার সুখের কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত দেশভ্রমণে উদ্যত হইতে মনঃস্থির কর, ইহাতে পরিণামে বিবিধ লাভ হইবে। [২১১-২১৬]

সুন্দর সেন এইরূপ বলিয়া সুহৃদের উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইলে লজ্জিত হইয়া তাঁহার [illegible] তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—তোমার মত সুহৃৎ কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে লজ্জাজনক, তথাপি পথিকদিগকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ [illegible] পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া [illegible] পথ ভ্রমণ [illegible] ধূলিরাশি-ধূসরিত দেহে দিনাবসানে [illegible]) [illegible] এই বলিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে—'মা, [illegible], দয়া কর, আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, তোমাদেরও [illegible] ভ্রাতাপুত্র কার্য্যবশে গৃহ হইতে বিদেশে গিয়া থাকে। আমরা কি সকালে উঠিয়া যাইবার সময় বাড়ীখানি উঠাইয়া লইয়া যাইব? ইহা কি সাধু ব্যক্তির কার্য! পথিকগণ যেখানে বিশ্রাম করিতে পায় তাহারা তাহা আপন গৃহসম মনে করিয়া থাকে। মা, আজিকার রাত্রিটা কোন রকমে তোমার আশ্রয়ে কাটাইতে দাও, সূর্য অস্ত গিয়াছে, বল এখন কোথায় যাই'?"

"দীন অবস্থায় পতিত হইয়া বেচারী এইরূপ বহু প্রকার মিনতি-বাক্য দ্বারে দ্বারে বলে ও গৃহিণীগণ কর্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হয়—'কর্তা বাড়ী নাই, কেন মিছে চেঁচামেচি করছ! যাও, দেবমন্দিরে যাও—ব'লছি তবু যাচ্ছে না! দেখ দেখি লোকটার কি জেদ'।"

"সেইস্থান হইতে (বিতাড়িত হইয়া) অপর কোথাও হয়ত বহু কষ্টে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার পর গৃহস্বামী অবজ্ঞাভরে কোন জীর্ণ গৃহকোণ দেখাইয়া বলে—'ঐখানে নিদ্রা যাও'।"

"সেই স্থানে হয়ত সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 'অচেনা লোককে কেন থাকতে দিয়েছ' এই বলিয়া গৃহিণী স্বামীর সহিত কলহ করে; (নতুবা) নিকটবর্তী গৃহ হইতে প্রতিবেশিনীগণ তৈজসপত্র চাহিবার অছিলায় আসিয়া তাহাকে (অর্থাৎ ঐ গৃহিণীকে) আপ্তবাক্যে বলে—'কি ক'রবে বল বোন, তোমার স্বামী নেহাৎই সরল লোক! তবে, রাতটা একটু সজাগ থেকো, এই রকম অনেক জোচ্চোর ঘুরে বেড়ায়'।"

"শতাধিক গৃহ এইরূপে ঘুরিয়া (ভিক্ষা-লব্ধ) শালিধান্যের চাউল, কুলথের ক্ষুদ, ছোলা ও মসুর প্রভৃতি একত্র পাক করিয়া ক্ষুৎপীড়িত পথিক আহার করে। আহার পরাধীন, শয্যা ভূমিতল, আশ্রয় দেবালয়, উপাধান ইষ্টকখণ্ড—পথিকদিগের জন্য ইহাই বিধির বিধান।" [২১৭—২৩০]

তিনি এই কথা বলার পর সুন্দর সেন উত্তর দিতে যাইবেন এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে কোন লোক এই গানটি গাহিল—

> "আপন সাধন সাধিতে যেজন
> দৃঢ় করিয়াছে পণ
> দেবালয় তার সুখের আধার
> নিজ বাসনিকেতন,
> অতি মনোহর মনে হয় তার
> ভূমিতল হেন শয্যা,
> কদশন তার অমৃত সুতার
> ইথে তার কিবা লজ্জা?"

ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃৎকে বলিলেন—"এই গানে আমার মনের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব চল আমরা একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়ি।" [২৩১—২৩৩]

অনন্তর সহচরমাত্র সহায় হইয়া ক্লেশ-সমুদ্রে অবতরণ করিতে স্থিরসংকল্প সুন্দর সেন পিতার অজ্ঞাতে কুসুমপুর হইতে যাত্রা করিলেন। সুন্দরসেন সুহৃদের সহিত সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু রসিকজনের সঙ্গলাভ হইল, নানাবিধ অস্ত্রে শিক্ষালাভ হইল, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, অনেক কৌতুক দর্শন করিলেন, পত্রচ্ছেদ্য, আলেখ্য, মোম ও কাষ্ঠের পুত্তলিকা নির্মাণ কৌশল, নৃত্য, গীতাদি, বীণা-মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য ইত্যাদি কলায় জ্ঞানলাভ করিলেন, বঞ্চকদিগের চাতুরী এবং বিট ও কুলটাগণের সরস ও বক্রোক্তির অর্থ বুঝিতে শিখিলেন। [২৩৪—২৩৭]

তাহার পর সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া নানাবিধ লোকের সমাচার জানিয়া তিনি নিজগৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্বুদাচলের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুন্দরকে এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশ দেখিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—"চল আমরা এই বিশাল পর্বতটিতে আরোহণ করি—ইহা হিমালয়ের একটি পুত্র, ইহা হইতে শীতল স্বচ্ছসলিলনিঃস্রাবী প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হইয়াছে। হিমালয় যেন লোকের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ মেরুপ্রদেশে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন। (ইহার শিখরে চন্দ্রকান্ত মণি সকল বিদ্যমান

---

(৩৬) সুহৃদ্বর্গ, যাহারা তাহাকে স্নেহ করে।

(৩৭) গুরুমুখী বিদ্যা অর্থাৎ যাহা গুরুর সাহায্য ব্যতীত শিখিতে পারা যায় না।

থাকায়) ইহা চন্দ্রচূড়, (সানুদেশে বায়ুভুক্ তপস্বিগণ বাস করায়) কটিস্থিত-পবনভোজন, (৩৮) (ইহাতে গুহা সকল বিদ্যমান থাকায়) সগুহ, (৩৯) এবং (বিদ্যাধরগণ দ্বারা শোভিত হইয়া) ইহা বিদ্যাধরোপসেবিত শম্ভুর শোভা ধারণ করিয়াছে। নিশীথে মুগ্ধা কামিনীগণ তারা সকলকে তরুশিখরস্থিত পুষ্পসমূহ মনে করিয়া বিস্মিত চিত্তে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। (বহু ঊর্ধ্বে স্থিত) সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও ইহার নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়। না হইবেই বা কেন ? মহদ্ব্যক্তিগণ নিজ মহত্বের বলে কাহাকে না নিকটে আকর্ষণ করেন ? সূর্যের রথাশ্বসমূহ গগনমার্গে নিরবলম্বন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া বিধাতা এই ভূধরকে তাহাদের বিশ্রামের জন্য নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ওষধিগণ (ওষধীশ) চন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করে—প্রায়ই দেখা যায় (কৃপাপ্রার্থিগণ) মধ্যস্থ অনুগ্রাহকের সাহায্যে প্রভুদিগের নিকট উপস্থিত হয় (৪০)। [২৩৮—২৪৫]

"দিগ্গজগণ পৃথিবীধারণ হেতু পরিশ্রান্ত হইলে এই ভূধর নির্ঝর সলিল-কণা সেকে তাহাদের শ্রম বিনোদন করে। একই রূপ কার্য করিলে নিশ্চয়ই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ হইয়া থাকে (৪১)। হারীত পক্ষিগণ (৪২) শোভিত, শুক পক্ষিগণের বিহারস্থান, ব্যাস হেতু, (৪৩) রমণীয়, ভরদ্বাজ পক্ষিগণের বিশ্রামস্থল (৪৪) এই পর্বত শুক-হারীত-ব্যাস-ভরদ্বাজ মুনিগণ অধ্যুষিত তপোবন তুল্য। এই স্থানে নিঃসঙ্গ হইয়াও পরলোক (৪৫) প্রাপ্তির উপায়ে কৃতযত্ন, বায়ুভুক্ (৪৬) হইয়াও অহিংসক, বামন না হইয়াও ফলভুক্, একমাত্র শুভকর্মে নিরত হইয়াও ষট্কর্মনিরত, (৪৭) যত (৪৮) হইয়াও স্বাধীন, রৌদ্রচরিত (৪৯) অনভিমত হইয়াও শিবপ্রিয়, শান্তস্বভাব তপস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন। মৃগের বাস হেতু মৃগাংকের মূর্তির ন্যায়, সপ্তপত্র বৃক্ষ (৫০) শোভিত হইয়া সপ্তপত্র (৫১) যুক্ত সূর্যের রথের ন্যায়, (পলাশ বৃক্ষে শোভিত হইয়া) পলাশনী রাক্ষসীর ন্যায় (৫২), মদন বৃক্ষের (৫৩) অবস্থিতি হেতু) সমদনা উৎকণ্ঠিতা (৫৪) নায়িকার ন্যায়, (তিলকবৃক্ষে শোভিত হইয়া) তিলকশোভিতা বাসকসজ্জিতার ন্যায় (৫৫), বহু (হরিচন্দন ও পীলু বৃক্ষ সমাযুক্ত হওয়ায়) হরি(৫৬)-পীলু (৫৭)-সমাকুল রাজপ্রাসাদের দ্বারভূমির ন্যায়, (বহু অর্জুন ও বাণ (৫৮) বৃক্ষ সমাযুক্ত হওয়ায়) অর্জুন-বাণজাল-ভিন্ন কুরুরাজের বাহিনীর ন্যায়, (সহস্র সহস্র ঋক্ষ দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়) সহস্র ঋক্ষ-(৫৯) শোভিত গগন শোভার ন্যায়, (মিষ্টক অর্থাৎ আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ায়) মিষ্টক দৈত্য পরিচালিত দানব সেনার ন্যায়, (রোহিণী (৬০) বৃক্ষের উদ্গম হেতু) রোহিণী উদয়ে রাত্রির ন্যায় এই উপত্যকা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।" [২৪৬—২৫৩]

[ক্রমশঃ।

---

(৩৮) যাঁহার কটিদেশে বায়ুভুক্ সর্প ভূষণস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। (৩৯) গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সহিত বিদ্যমান।

(৪০) এই পর্বতে বহু ওষধি (medicinal herbs) আছে এবং ইহা এত উচ্চ যে ওষধিসমূহ চন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। চন্দ্রের একটি নাম ওষধীশ, কবি তাই বলিতেছেন, ওষধিগণ যেন চন্দ্রকিরণরূপ কৃপার প্রার্থী, তাই অর্বুদপর্বত যেন মধ্যস্থ হইয়া অনুগ্রাহকের ন্যায় ওষধিগণকে প্রভু চন্দ্রের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে। (৪১) পর্বতও ভূধর এবং দিগ্গজগণও ভূমি বা পৃথিবীকে ধারণ করে, সেই হেতু উভয়ের একই কর্ম। (৪২) হারীত = হরিয়াল পক্ষী (green dove)। (৪৩) = ব্যাস বিস্তার (expansion), (৪৪) ভরদ্বাজ। ভরতপক্ষী বা চাতকপক্ষী ; ইহারা অতি ঊর্ধ্বে উড়িয়া বেড়ায় এবং বহুক্ষণ অবিশ্রান্ত ভাবে উড়িতে পারে ও পর্বত-শিখরে বিবর মধ্যে বাসা করে। (৪৫) পরলোক—, অন্য লোক বা মনুষ্য, পক্ষে মৃত্যুর পর যে লোক প্রাপ্তি হয়। (৪৬) বায়ুভুক সর্প হিংসক জীব। (৪৭) অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণের ষট্কর্ম। (৪৮) যত—বদ্ধ, পক্ষে জিতেন্দ্রিয়। (৪৯) রৌদ্রচরিত—রুদ্রের চরিত বা জীবনী, পক্ষে ভয়ংকর আচরণ। (৫০) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম (Al-tonia scholaris)। (৫১) পত্র = অশ্ব।

(৫২)—পলাশিনী অর্থাৎ পল (মাংস) যে ভক্ষণ করে। (৫৩) ময়না গাছ (Randia Dumetorum)। (৫৪) অষ্ট নায়িকার মধ্যে একটি ; ইহার লক্ষণ, যথা "দুর্বার দারুণ মনোভব বাণ পাত পর্যাকুলাং তরলমানসমুত্তরন্তীম্। প্রস্বেদবেপথুযুতাং পুলকাঞ্চিতাঙ্গীমুৎকণ্ঠিতাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ।" (৫৫) ইহা অষ্ট নায়িকার মধ্যে অপর ; একটি ইহার লক্ষণ যথা—"যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিত তল্পমধ্যে তাম্বুলপুষ্পবসনৈশ্চ সমং সসজ্জ। কান্তস্য সংগমরসং সমবেক্ষমানা সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা।" (৫৬) হরি—অশ্ব, পক্ষে হরিচন্দন বৃক্ষ। (৫৭) পীলু—বৃক্ষবিশেষ (Salvadora Indica), পক্ষে হস্তী। (৫৮) বাণবৃক্ষ—নীলঝিন্টী। (৫৯) ঋক্ষ—নক্ষত্র। (৬০) রোহিণী—হরীতকী (Terminalia Chebula), পক্ষে চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্থ নক্ষত্র।
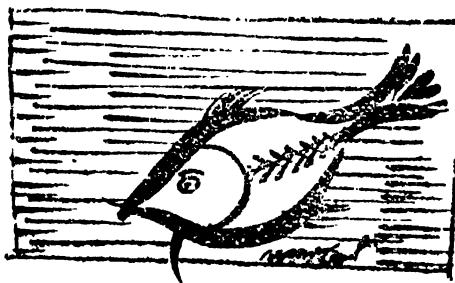
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উপমায় অতিরঞ্জন

শ্রীকামিনীকুমার রায়

উপমা প্রয়োগ করিয়া বিষয় বর্ণনার রীতি সকল দেশের মৌখিক কথায় এবং সাহিত্যে সুপ্রচলিত। উপমার ইঙ্গিতে রূপের চিত্রখানি সুন্দরতর হইয়া উঠে, মানসিক অবস্থাটি অতি সহজেই প্রকাশ পায়, যাহা থাকে অস্পষ্ট এবং অপরিজ্ঞাত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব ঘটে না। অতি অল্প কথায় বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর, মনোজ্ঞ ও রসাল করিয়া তুলিবার শক্তি উপমার অসাধারণ। যে বিষয়টি বুঝাইতে দুই-এক পরিচ্ছেদ চলিয়া যায়, উপমার সাহায্যে অনেক সময় তাহা মাত্র একটি-দুইটি কথায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য উপমাবহুল। এত উপমার প্রয়োগ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষা-সাহিত্যে আছে কি না আমাদের জানা নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা 'অনুবাদ-শাখা।' এই অনুবাদ-সূত্রে শিক্ষিত বাঙ্গালী সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও শব্দৈশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করে এবং যদৃচ্ছাক্রমে সেই সকল সম্পদ বাংলা সাহিত্যে আমদানী করিতে থাকে। কোনও নূতন ভাষা-সাহিত্যের গঠন-যুগে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন ও মূল্য কম নহে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী এবং অন্য অসংখ্য কাব্যকথার অনুবাদ বাংলা ভাষার পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট রসসিঞ্চন করিয়াছিল। আবার এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সংস্কৃত যুগের উপমা উৎপ্রেক্ষাগুলি অনেক স্থলে বাংলা সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধাও দিয়াছে। সংস্কৃত-গ্রন্থের 'আজানুলম্বিত', 'আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু', 'সিংহগ্রীব', 'খগরাজনাসা' নায়কেরা এবং 'গজেন্দ্রগামিনী', 'কুরঙ্গ-নয়না', খঞ্জনচপলা', 'কটিক্ষীণা' নায়িকারা আমাদের কবি ও সাহিত্যামোদীদের মন-বুদ্ধি হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের সেই মধ্যযুগে প্রকৃতির সহজ-দৃষ্ট দৃশ্য হইতে ফিরিয়া পুঁথির দিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল। পরের বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং নিজেদের প্রয়োজন ও আত্মস্থ করিবার ক্ষমতার দিকে না চাহিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাই আহরণ করিয়াছেন, ফলে অনেক পরিশ্রম হইয়াছে এবং সময় গিয়াছে, কিন্তু মুখ্য বস্তু ঘরে আসিয়াছে কম।

প্রাচীন যুগে প্রকৃতির লীলা নিকেতন তপোবন ছিল সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ঝরণার বুকে আকাশ যেমন তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া প্রতিফলিত হয়, সেই যুগের কবিদের অনাবিল চিত্তেও তেমনি চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক-চরিত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যুগপৎ প্রতিফলিত হইত। প্রকৃতি-জগৎ ও প্রাণি জগতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, সেই পরিচয় তাঁহারা নিজেদের কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকার রূপ ও মানসিক অবস্থার বর্ণনায় সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে উপমানের সাহায্যে রূপের চিত্রটি সুন্দরতর হইয়া ফুটিবে, বক্তব্যটি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে, তাঁহারা তাহাই প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রযুক্ত উপমার অনেকগুলিই যে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান হেতু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে একরূপ অচল ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বদা-দৃষ্ট এবং অধিকতর পরিচিত মনোজ্ঞ দৃশ্য বা বস্তুর ইঙ্গিতে কোনও অদৃশ্য বা নূতন বিষয়ের ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া উপমার কাজ। গজেন্দ্র-গমনের সঙ্গে নারীর গমনের তুলনা, মৃগ-নয়নের সহিত তাহার চক্ষুর উপমা, চামরীর পুচ্ছের সঙ্গে তাহার কেশের সাদৃশ্য-কল্পনা সেই যুগেই মানুষকে মুগ্ধ করিত, যে যুগে ঐ সকল উপমান বস্তুর সহিত মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। বন্য হরিণীরা যখন মানুষের প্রতিবেশী, তাহার অঙ্গনে, এদিকে-ওদিকে স্নিগ্ধ চপল নয়নে দলে দলে চরিয়া বেড়াইত, তখন কাহাকেও 'মৃগনয়না' বলিলে তাহার চক্ষু যে অতীব সুন্দর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু দলে দলে হরিণ দেখা তো দূরের কথা, যখন একটিকেও দেখিতে হইলে চিড়িয়াখানার দিকে যাত্রা করিতে হয়, তখন বাংলা সাহিত্যের মৃগ-নয়না নায়িকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব ঘটে। স্বচ্ছন্দ-বিহারী গজ-যূথের গতি-ভঙ্গিমা দর্শন যে যুগে দুর্লভ ছিল না এবং উহা মানুষকে অহরহ আকৃষ্ট করিত, আনন্দ দিত, তখন কোনও রমণীকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বা 'গজেন্দ্রমে হাটে' বলিলে তাহার অটুট যৌবনশ্রী এবং সুন্দর চলনভঙ্গিটিই মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠিত। কিন্তু করি-যূথের দর্শন যেখানে দুর্লভ, রাজা-জমিদারের বহিরঙ্গনে শৃঙ্খলিত শ্লথপদ হস্তীই যেখানে সাধারণত দৃষ্ট হয়, সেখানে কোন নায়িকাকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বলিয়া বিশেষিত করিলে সুরূপের চেয়ে তাহার কুলক্ষণ কুরূপই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িবে। যে সমাজ, যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে আসর গাড়িয়া প্রাচীন কবিগণ আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ও সিংহগ্রীব, খগরাজনাসা নায়কের এবং খঞ্জন-চপলা, কটিক্ষীণা নায়িকার চিত্র আঁকিতেন, সেকালে সে সমাজে ঐরূপ ধরণের নর-নারীর অভাব ছিল না। কিন্তু বাংলার মাটিতে, বাঙ্গালীর সমাজে সেইরূপ নর-নারী কয়টি দেখা যায়? উপমান বস্তুগুলি যেখানে প্রায়ই দৃষ্টি-বহির্ভূত এবং অপরিচিত এবং যে সমাজে অধিকাংশ নরনারী নাতিদীর্ঘ, বিশীর্ণদেহ, সেখানে সুদূর সংস্কৃত যুগের আবরণে নায়ক-নায়িকাকে সাজাইলে তাহারা সৌন্দর্য্যের চিত্র না হইয়া কিম্ভূত-কিমাকারই ঠেকিবে। বাঙ্গালী নর-নারীরও যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা ঐ প্রাচীন অবাঙ্গালী মানুষগুলির দৌরাত্ম্যে প্রায়ই ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, উপমা উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে একটা ঘোরতর অতিরঞ্জন ও বিকৃতি দেখা দিয়াছিল। বাংলা-রচয়িতারা সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতাদির উপমা উৎপ্রেক্ষা যথাযথ অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই;—একে তো সেইগুলি তখন অচল এবং দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার উপরও তাঁহারা আবার নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ফলাইয়াছেন। উপমা প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বা উপেক্ষা করিয়া, উপমার দ্বারা বক্তব্য বিষয় সহজ, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টতর করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা উহাকে বিশদ বিকৃত ও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। শুধু সংস্কৃতজ্ঞ কবি এবং সাহিত্যামোদিগণই নহেন, অনেক পল্লীগীতিরচকও এই বিকৃতি, বৈসাদৃশ্য ও আতিশয্য হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। ইঁহাদের অনেকেরই এক চক্ষু ছিল সহজদৃষ্ট প্রকৃতির রাজ্যে, অপর চক্ষু ছিল সংস্কৃত গ্রন্থের অতিক্রান্ত উপমান বস্তুর দিকে।

মুকুন্দরাম কালকেতুর রূপ-বর্ণনায় এক দিকে যেমন লিখিলেন, "নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ ; দুই বাহু লোহার সাবল। গুণশীল রূপ বাড়া যেন সে শালের কোঁড়া", অন্য দিকে তেমনি লিখিলেন, "গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, মোতি পাঁতি জিনিয়া দশন।" নায়িকার রূপ-বর্ণনায় এক জন পল্লীকবি লিখিয়াছেন, "আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল (অঙ্কুর) মাটি ফাট্যা উঠে। সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে (গজগমনে হাঁটে।" এইরূপ একই কবির রচনার মধ্যে দ্বিবিধ উপমার অবধি নাই।

আমরা এখানে উপমার রাজ্যে বিকৃতি এবং অতিশয়োক্তিগুলি লইয়াই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'নৈষধ-চরিত'এ দময়ন্তীর রূপ-বর্ণনায় আছে, "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে খুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে;" আর ভারতচন্দ্র বিদ্যার চক্ষু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কেড়ে নিল মৃগ-মদ নয়ন হিল্লোলে, কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।" দময়ন্তীর মুখের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে,—"বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটি গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।" বিদ্যার মুখের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

এক জন পল্লীকবি লিখিয়াছেন—

"পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলিতে যায়।
মৈলান (মলিন) হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়।
চান্দমুখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে
পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে।"

বেচারী চাঁদের কি দুরবস্থা! কোন রমণীর মুখের জ্যোতিতে সে কলঙ্কিত, কোন রমণীর বা পদনখের উপর পড়িয়া সে গড়াগড়ি দিতেছে, আবার কাহাকেও দেখিয়া সে কাছে আসিতেও সাহস পাইতেছে না, আপনাকে একেবারে অযোগ্য, অপাংক্তেয় মনে করিয়া লজ্জায় অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। চাঁদের যেখানে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি, সেখানে 'তারা'র কি যোগ্যতা! সে তো নায়িকার শাড়ীর 'বুঁচি' দেখিয়াই লজ্জায় অধোমুখ! তাই পল্লীকবি লিখিয়াছেন—

"অগ্নিপাটের শাড়ী কন্যা যখন না কি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে।"

এই সকল অতিশয়োক্তিতে চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু কোনও রূপের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই; অন্ততঃ তাহা পাঠককে আকৃষ্ট করে না।

নায়িকার নিতম্বের বর্ণনায় এক জন লিখিয়াছেন,—"তাহার নিতম্ব আল্পা পাহাড়ের ন্যায়।" পল্লীকবি বলিয়াছেন—

"নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে।"

ভারতচন্দ্র আরও একটু উপরে গিয়াছেন :—

"মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।"

এরূপ পর্ব্বত-প্রমাণ, মেদিনীত্রাস, চন্দ্রগর্ব্বনাশী নিতম্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার রূপ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা চলে কি? আপাততঃ আমরা বিরত রহিলাম।

স্তনের বর্ণনায় এক জন পল্লীকবি শুধু ইঙ্গিত করিয়াই নীরব রহিয়াছেন, কিন্তু সে-ইঙ্গিতের পরিমাণও সামান্য নহে—"যৌবনের ভারে কন্যা সামনে পড়ে এলি।" আর এক জন বলিয়াছেন,—"হৃদয় উপরত শোভা করে গুয়া নারিকল।" কিন্তু রায়গুণাকর সকলের উপর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—

"কুচ হতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

এখানেও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যে কটিক্ষীণা নারীর সৌন্দর্য্যের অনেক বর্ণনা আছে। তাহার অনুকরণে এক জন বলিলেন, "মুষ্টিতে আঁটয়ে লীলার চিকণ কাঁকালী।" আর এক জন লিখিলেন, "দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু। মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানি সরু।" স্বনামধন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আছে,—"মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালী।" এই ক্ষীণত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত,—"কাকুনি (খুব লম্বা) সুপারি গাছ বায়ে (বাতাসে) যেন হেলে।" এই সকল উক্তি হইতে কোনও স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি আমাদের মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠে না,—যাহা উঠে, তাহা অস্থিচর্ম্মসার রোগিণীর। অনুবাদ-যুগের আর এক জন লেখক উপরোক্ত কোন উক্তিতেই সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে লিখিয়া বসিলেন,—"তাহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক।" কটিক্ষীণা নারীর যতই সৌন্দর্য্য থাকুক না কেন, তাহাকে চুলেরও অর্দ্ধেক দেখিবার দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়। উপমার অতিরঞ্জন ও বিকৃতি কত দূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, দেখুন।

'পদ্মাবৎ' কাব্যে পদ্মিনীর 'বেণীর' বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

"যেন গিরিবর হস্তে (হইতে) অজগর
লটকি রহিল সুখে
জীবন-পতঙ্গ ভঙ্গিতে ভুজঙ্গ
বিষফুল করি মুখে।"

ভারতচন্দ্রের উক্তি আর উদ্ধৃত করিলাম না, সেখানে বিদ্যার 'বেণী' দেখিয়া ভুজঙ্গ আর কাছে নাই, একেবারে বিবরে পলায়ন করিয়াছে। যে নায়িকার এমন ভীষণ বেণী-বন্ধন, তাহাকে দেখিয়া নায়ক পুলকিত হইবেন কি ভীত হইবেন, গবেষণার বিষয় বটে! 'পদ্মাবৎ' কাব্যেই রাজকুমারীর বিরহ-ব্যথার এক বর্ণনা আছে। শুক পক্ষী রত্নসেনকে কন্যার বিরহ-ব্যথা জানাইবার জন্য দূতরূপে যাত্রা করিয়াছে—

"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল।
সেই দুঃখে জলদ শ্যামবর্ণ হৈল।
স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর।
অন্তরে শ্যামল তাই ভেল শশধর।
* * *
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন
জলনিধি হৈল তাই পূর্ণিত লবণ।"

যে দুঃখের স্পর্শে জলধর ও শশধর শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইল এবং রত্নাকর লবণে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহা যে কত বড় দুঃখ, সেই দুঃখভোগী ছাড়া অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে উপমা-বাহুল্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। দেবী অন্নদার শুধু চলন-বলন-ই সুন্দর নয়, তাঁহার কঙ্কনের ধ্বনিটিও অনবদ্য। তাহারই বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

"কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কন ঝঙ্কার হইতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥"

এখানে আমরা অন্নদার কণ্ঠস্বরের, তাঁহার কঙ্কন-ধ্বনির বা চক্ষুর চলনির কোন ধারণা করিতে পারি কি? কিন্তু কবির বাক্‌চাতুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকি। নারীর কত মিহি সুর, কঙ্কনের না হউক,—চুড়ির তো বটে,—কত রুণুঝুনুই না আমাদের কাণে আসে, কিন্তু ঝাঁকে-ঝাঁকে কোকিল-কোকিলা বা ভ্রমর ভ্রমরী তো দূরের কথা—তাহাদের একটিকেও তো কোন যুবতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিলাম না। তবে ভারতচন্দ্রের অন্নদার কথা স্বতন্ত্র, তাঁহার প্রভাব অসাধারণ।

পল্লীকবিদের রচনা হইতে উপমার বিকৃতি ও অতিশয়োক্তির আর দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এক জন নায়িকার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

"বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উড়িয়া আসে পদ্মফুল ছাইড়ে॥
নাকের নিশ্বাস তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ॥"

আমরা অনেক সুন্দরী যুবতী দেখি এবং তাহাদের এলো-মেলো অবস্থাও অনেক সময় হয়, কিন্তু ভৃঙ্গের বাসনা পদ্মফুল ছাড়িয়া তাহাদের চারি পাশে ভিড় করিতে দেখি না, এই যা দুঃখ। কবির দৃষ্টি হয়তো এখানে সম্পূর্ণ প্রভূত দিব্যই ছিল। যেহেতু নায়িকা সুন্দরী, অতএব তাহার নাকের নিশ্বাসও সুবাসযুক্ত এবং সে সুবাসেতে বাতাস ভরপুর। আহা! কবির এই উক্তি যদি সত্য হইত, আমাদের দরিদ্র সংসারের প্রসাধন-সামগ্রীর কত অর্থই না বাঁচিয়া যাইত। আর এক জন কবি তাঁহার নায়িকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কাজল মেখে সাজল হাসিরে বিজুলীর ঝলা।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাই গো আন্ধাইর ঘর উজালা।"

চাঁদের কিরণ মনোহারী বটে, কিন্তু তাহাতে গৃহের কাজকর্ম্ম চলে না, দীপের আলোর প্রয়োজন হয়। 'সোনাই'র মতো দরিদ্র-সংসারের মেয়েদের রূপে যদি অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইত, তাহা হইলে আর কেরোসিনের এই দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্যতার দিনে পল্লীবাসীর ভাবনা থাকিত না।

আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিক্রমণ করিলে যে কেহ উপমা উৎপ্রেক্ষার এই বিকৃতি ও অতিরঞ্জন লক্ষ্য করিবেন।

আপনি কি জানেন ?

১। আঠার-শ' সাতান্ন সালের আটই এপ্রিল তারিখে ব্যারাকপুরে সামরিক বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ-বংশীয় সৈনিক ফাঁসীর দড়িকে পবিত্র করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সেই প্রথম শহীদের নাম জানেন কি?

২। সতেরে-শ' আশী সালের উনত্রিশে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। যে বিদেশী মানুষটি নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে সেটিকে পরিচালনা করেন, তাঁর নাম বলুন ত?

৩। ভারতবর্ষের গড়-প্রতি তেতাল্লিশ হাজার লোকের জন্য ক'জন নার্স আছে জানেন?

৪। ভারতবর্ষের এক জন লোকের গড়-প্রতি বাৎসরিক আয় কত জানেন?

৫। উনিশ-শ' সাত সালে কলিকাতায় প্রথম ছবি-ঘর স্থাপনা করেন কে?

৬। উনিশ-শ' সতেরো সালে প্রথম বাংলা বই তোলেন ম্যাডান থিয়েটার। কি বই বলুন ত?

৭। গাছেরা অনেকেই দীর্ঘায়ু। চার হাজার বছরের সাক্ষী হয়ে আছে আমেরিকার কি গাছ জানেন?

৮। ভাষা-তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, এক প্রাচীন বর্ণমালা থেকে ভারতবর্ষের বর্তমান বিবিধ বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। সে বর্ণমালা কি?

৯। ব্রিটিশ-শাসনে এক জন ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের জন্য সরকার বৎসরে কত খরচ করতেন জানেন?

[উত্তর ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

আট

অন্ধকার শুধু আলোর অনুপস্থিতি, এই নঞর্থক ভ্রান্ত ধারণাটা বিজলী আলোর বিজ্ঞাপনের কল্যাণে আজ অত্যন্ত ব্যাপক। দিনের আলোর চাইতেও উজ্জ্বলতর রাত্রি সৃষ্টি করবার জন্যে প্রত্যহ উদ্ভাবিত হচ্ছে নব নব কৃত্রিম ব্যবস্থা। নগরবাসী গ্রাম পরিভ্রমণে গিয়ে সব চাইতে সরবে যে অভিযোগ করে থাকেন তা অন্ধকার নিয়ে। বর্তমানে পল্লী-উন্নয়নের জন্য যে যে পরিকল্পনা ভোট-চুম্বকের সম্মান লাভ করেছে তার সবগুলিই মূলত পল্লী-উচ্ছেদ পরিকল্পনা। কেন না আদর্শ পল্লী বলে তাকেই বরণ করা হচ্ছে যার নগরের অনুকরণ সব চেয়ে বেশী, পল্লীর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটুকু যেখান থেকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই নয়া গ্রামগুলি ম্যালেরিয়াশূন্য হয়ে স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা গ্রাম থাকেনি। এরা যেন রাশিয়ার "নয়া ডিমক্রাসি," এমন নয়া যে গণতন্ত্রের বাষ্পমাত্র নেই সেখানে।

অন্ধকার আর আলোর মধ্যে এমন একটা অবাস্তব বিরোধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে আজ 'সভ্যতার আলো' এবং 'কু-সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন' ইত্যাদি কথাগুলির প্রচলন একান্তই স্বাভাবিক বলে পরিগণিত। আলো যেন সভ্যতারই প্রতীক, অন্ধকার যেন বর্বরতার নামান্তর।

পৃথিবীর প্রারম্ভের সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই, কিন্তু সৌরমণ্ডলের সামগ্রিকতায় অন্ধকার যে একেবারে অস্বাভাবিক নয় এ তথ্য আলোর উপাসকরাও অস্বীকার করবেন না। মানুষ একদিন মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে অনায়াসে যাতায়াত করবে এমন সম্ভাবনাকে স্বপ্ন বলে অবজ্ঞা করি নে; কিন্তু সেখানে মানুষকে এই ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে আলো বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে আলো মিলবে না কোথাও।

এই আলো পৃথিবীকে হয়তো শত-সহস্র গ্রহ-তারার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, হয়তো করেনি। ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্য চরম প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে প্রমিথিয়ুসকে পরম ব্রহ্ম বলে জ্ঞান করলে বাড়াবাড়ি হবে।

আলো যদি সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী বাহন হয়ে থাকে তাহ'লে সে সভ্যতা একান্তই নাগরিক সভ্যতা, কেন না, ভারতীয় সভ্যতার জন্মস্থান যে-অরণ্য এবং পল্লী এবং পর্বত তার কোথাওই আলোর আধিক্য ছিল না এবং নেই।

দিনের আলোয় মানুষ কাজ করে, রাতের আঁধারে সে একা বসে ভাবে। পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের অধ্যবসায়ের বলে, আমাদের ধ্যানসর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চিন্তাশীলতার ফলে। ওদের সভ্যতাকে তাই বলা যায় দিনের সভ্যতা, আলোর সভ্যতা! আমাদের সভ্যতা রাত্রির অন্ধকারের।

দিনের বেলায় মানুষ কর্মস্থলে একত্রিত হয়। একসঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হয় অনেকের সঙ্গে। কিন্তু সেটা সাক্ষাৎই, মিলন নয়।

দিনে তাই আমরা একত্রিত হলেও পরস্পরের কাছে বিচ্ছিন্ন। মিলনের ক্ষণ রাত্রি। দিনের বেলায় ট্রামে আপিস যাওয়ার সময় পুরো আধ ঘণ্টা যার পাশে বসে থাকি তার সঙ্গে সামান্যতম পরিচয়ও ঘটে না, পরিচয়ের ইচ্ছাও হয় না, কিন্তু অন্ধকারে পার্কের কোনো বেঞ্চিতে একান্ত আগন্তুকের সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয়, আত্মীয়তা না থাকলেও তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত থাকে না। দিনে তাই আমরা সকলের, অর্থাৎ কারোই নই। সন্ধ্যার পরে আমরা আমাদের, কিম্বা বিশেষ কারো।

মিসেস্ রায়কে নিয়ে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে যেখানে গিয়ে বসলেম, সেটা জলাপাহাড়ে উঠবার পথে ক্লান্ত জনের বিশ্রামের জন্য সরকারী একটা ঘর। তার মাথার উপর একটা ছাদ আছে, ভিতরে আছে গোটা দুই বেঞ্চি, কিন্তু দেয়াল বলতে কিছু নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ার পথ একেবারেই অবারিত।

নগ্নদেহে শীতের সম্মুখীন হওয়া শাস্তি, কিন্তু পর্যাপ্ত আচ্ছাদন থাকলে শীতের মতো উপভোগ্য ঋতু আর নেই। তখন শুধু শীত বোধ না করারই আনন্দ নয়, এমন কি, শুধু শীত বোধ করার আনন্দও নয়। শীতকে জয় করার আনন্দ। সে আনন্দের আলাদা উত্তাপ আছে যা শীতকে শুধু সহনীয় করে না, রমণীয় করে।

একা পথ চলতে চলতে যদি কেউ নিজের মনে কথা কয় তবে তার দ্বারা কথকের মানসিক অবস্থার অস্বাভাবিকতাই সূচিত হয়। কিন্তু জাগ্রত দু'জন ব্যক্তি যদি অনেকক্ষণ একটি মাত্র কথাও না বলে কেবলমাত্র চুপ করে স্থির হয়ে বসে থাকে, তাহ'লে সেটাও স্বাভাবিক নয়। আমি এবং মিসেস্ রায় যে সেই ছোটো ঘরটায় এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসেছিলেম সেটা এমনিতেই স্বাভাবিক নয়; আমাদের পরিচয়ের দৈর্ঘ্যে বা গভীরতায় তার সমর্থন ছিল না। তার উপর কোনো কিছু বলতে বা শুনতে না পেরে আমার অস্বস্তির অবধি ছিল না।

বাক্য-বিনিময় হয়নি, কিন্তু তাই বলে আমরা দু'জন যে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং যোগাযোগের সকল সূত্রবিহীন বিভিন্ন দু'টি য়ুনিটরূপে বসেছিলেম তা নয়। ভাবের বিনিময় কি হয় শুধু মাত্র বাক্যের মাধ্যমে? এমন কি, কবি-কথিত আঙুলের স্পর্শ দিয়েও সেতু-নির্মাণের প্রয়োজন হয় না সব সময়। দার্জিলিঙের অন্ধকারের অসাধারণ ক্ষমতা আছে কাছের প্রকৃতিকে দূরের মতো অদৃশ্য করবার এবং দূরের মানুষকে অনুভূতির অতি-কাছে এনে দেবার।

সেই সন্ধ্যায় মিসেস্ রায়ের সঙ্গে অজানা অন্ধকারে বেড়াতে বেরিয়ে এবং পরে বিশ্রাম করতে বসে তাঁর সঙ্গে যে নিহিত ঐক্য অনুভব করেছিলেম তার সর্বাঙ্গীণ সন্তোষজনক কোনো সংজ্ঞা দিতে পারব না, কিন্তু কোনো প্রকার অন্তরঙ্গতা ব্যতিরেকেও আমাদের অপরিচয়ের সকল বাধা অতিক্রম করে সেদিন যে নিবিড় আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার উপায় নেই। তা নইলে মিসেস্ রায় পারতেন না আমার মতো দক্ষিণাদাতা অতিথির কাছে তাঁর জীবনের এত না-বলা কথা এমন নিঃসংকোচে প্রথম বারের জন্যে ব্যক্ত করতে, আমিও পারতেম না এমন সানুকম্প শ্রবণের মধ্য দিয়ে মিসেস্ রায়ের বিলাপ আর অভিযোগের পরোক্ষ সমর্থন জানাতে।

অনেকক্ষণ পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অতিবাহিত হলে মিসেস্ রায় প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বললেন, "কী, একেবারে চুপ করে আছেন যে? কী ভাবছেন?"

অনেক কিছু ভাবছিলেম অস্পষ্ট ভাবে, তার একটারও প্রকাশযোগ্য নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। রায় বা মিসেস্ রায় কারো সম্বন্ধেই কিছু জানি নে। দাম্পত্য-পরিস্থিতি এমনিতেই বাইরের লোকের কাছে দুর্বোধ। বন্ধু হিসাবে যাকে বহু দিন থেকে জানি, স্বামী হিসাবে তার স্বরূপের কিছুই না জানতে পারি। সবাই রক্ষয়িত্রীরূপে যে মহিলার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, মিসেস্ রায় হিসাবে তার পরিচয় একেবারেই বিভিন্ন হতে পারে। স্ত্রীসম্মুখীন রায়ের ভীরুতা দেখে যাকে নিরীহ বেচারী বলে মনে করেছি, তার কতটুকু পরিচয়ই বা পেয়েছি অতটুকু দেখার মধ্যে? রায় কেন ছিল তা-ও জানি নে, কেন চলে গেছে তা-ও জানি নে। এমন বৃহৎ অজ্ঞতা নিয়ে বিমূঢ় বোধ করতে পারি, কিন্তু বলব কী? তাই মিসেস্ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেম, "তেমন কিছু ভাবছি নে।" অন্য কথা তুলতে চেষ্টা করে যোগ করলেম, "ভীষণ শীত, না?"

"না তো। আমার তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না তো।"

"বলেন কি!"

"সত্যি, আমার আর দার্জিলিঙের শীতকে শীত বলেই মনে হয় না।"

অবিশ্বাস গোপন না করে বললেম, "শীতে লোকে দার্জিলিং থেকে নীচে নামে, আপনার ইচ্ছে বুঝি ফালুং ওঠবার?"

পরিহাস উপেক্ষা করে মিসেস্ রায় কঠোর ভাবে বললেন, "হয়তো কালই সেখানে যেতে হবে। আরেকটু পরেই জানতে পারব।"

আমি কিছুই বুঝলেম না। আবার চুপ করে রইলেম। ঘোর অন্ধকারকে এমনিতেই বোঝার মতো মনে হয়। তার উপর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে থাকলে তা বহন করা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ আগে মিসেস্ রায় যখন কি ভাবছি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন জানতেম যে আমরা দু'জনেই একটি কথা ভাবছিলেম, রায়ের কথা। কিন্তু আমার সে কথা উল্লেখ করবার উপায় ছিল না। অপেক্ষা করছিলেম মিসেস্ রায়ের নিজে থেকে কিছু বলার জন্য। তিনিও বোধ হয় আমার স্বল্পভাবিতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ মিলল ফালুঙের উল্লেখে। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, রায়কে আপনি কত দিন থেকে জানেন?"

"আপনাকে যত দিন থেকে জানি ঠিক তত দিন থেকে, সাত দিন আগে দার্জিলিঙে আসার পূর্বে তাঁকে কখনো দেখিনি।"

"বা রে, তাহ'লে আমাদের ওখানে উঠলেন কি করে? আমাদের ওই জায়গাটার নাম তো বিশেষ কেউ জানে না।"

"আমিও জানতেম না। আমার এক বন্ধু এসে গত অক্টোবরে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিই কাঞ্চনজংঘার ঠিকানা দিয়েছিলেন।"

"তাই না কি! আমার সম্বন্ধে কিছু বলেননি আপনার বন্ধু?"

"প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন।"

"আর?"

"তা ছাড়া কিছু বলেননি তো।"

মিসেস্ রায়ের সন্দিগ্ধতায় সন্দেহ হল আপন স্মৃতিশক্তির উপর। যা মনে পড়ল তা উল্লেখযোগ্য নয়। জিজ্ঞাসা করলেম, "কেন, আর কি বলার আছে?"

"অনেক, অনেক আছে! সত্যি, মিথ্যে…"

"আমার বন্ধুর ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে আপনার খুব শ্রদ্ধা নেই দেখছি!"

"কারো ভদ্রতা সম্বন্ধেই আর শ্রদ্ধা নেই, শুধু আপনার বন্ধুর নয়।"

মিসেস্ রায়ের উক্তিতে প্রেজেন্ট কম্প্যানি বাদ দেয়া ছিল কি না জানি নে। কিন্তু কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। বিরক্তি গোপন করে বললেম, "তার চেয়ে বলুন ফালুং যাচ্ছেন কেন?"

"আমার বাড়ী, লোকজন সবাই যে সেখানে।" হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন মিসেস্ রায়। কাউকে না দেখতে পেয়ে অধৈর্যসূচক স্বরে বললেন, "এত দেরী হওয়ার তো কথা নয়!"

আমি ভাবলেম বুঝি রায়ের কথা বলছেন। আশ্বস্তর সুরে জিজ্ঞাসা করলেম, "মিষ্টার রায়ের এখানে আসবার কথা আছে বুঝি?"

"না-না-না—, রায় নয়", মিসেস রায় অন্ধকারের বুক চিরে প্রায় কেঁদে উঠলেন, "রায়ের কথা বলছিনে। ফালুতে যাকে খবর আনতে পাঠিয়েছি তার আসবার কথা। রায়কে আর আসতে হবে না।"

আমি আবার চুপ। অন্ধকারে মিসেস্ রায়কে ভালো করে দেখবার উপায় ছিল না কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। প্রভাতের বিস্ফোরণের পরে অপরাহ্ণে যে করুণ শান্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেম তা যে একেবারেই অস্থায়ী তাতে আর সন্দেহ ছিল না। মিসেস্ রায়ের সশব্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শান্তির আশ্বাস ছিল না এতটুকুও, বরং অদৃশ্য সর্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা। আমার দুশ্চিন্তা যে স্বার্থলেশশূন্য ভাবে কেবল মাত্র রায়ের নিরাপত্তার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা নয়। গভীর উদ্বেগ গোপন করে বললেম, "এবারে বাড়ী ফেরা যাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।"—যদিও ওভার-কোটের তলায় ঘামাচ্ছিলেম।

আমি উঠবার নাম করতেই মিসেস্ রায়ের প্রজ্বলিত রোষ কেন জানি না নিমেষে নির্বাপিত হয়ে গেল। আবার সেই বিকালের অসহায় সুরে বললেন, "আমাকে সেই লোকটার জন্যে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি আর একটু বসবেন না—আমার জন্যে?"

বৈশাখের ঝড়, জ্যৈষ্ঠের বিদ্যুৎ এবং আষাঢ়ের বর্ষণ—এই তিনের এমন ত্বরিত পরিবর্তন—যা প্রায় যুগপৎ ঘটছিল বলে মনে হচ্ছিল, একই নারীর মধ্যে, মাত্র একটি দিনের পরিসরে এমন স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কোনটি আসল মিসেস্ রায়? যিনি রায়ের নামের সামান্যতম উল্লেখে অবর্ণনীয় উত্তেজনা গোপন করতে পারছেন না, না যিনি রায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানে অবিন্যস্ত কেশরাশি পিঠের পরে ছড়িয়ে আজ সকালে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, না যিনি এক মুহূর্ত পূর্বে অসহায় শিশুর মতো আমাকে থাকতে মিনতি করছিলেন?

আমি মিসেস্ রায়ের অনুরোধ অনুযায়ী অপেক্ষা করতে থাকলেম। হিমশীতল দেহ এবং উত্তপ্ত অতৃপ্ত কৌতূহল আর বাধা মানল না। বললেম, "বলছিলেন যে আমার বন্ধুর অনেক কিছু বলবার ছিল। কী বলুন তো?"

"এতক্ষণ আপনার এই প্রশ্নেরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেম, গভীর দুঃখের সময় কোনো কাউকে বিশ্বাস করে দুঃখের কাহিনী না বলতে পারায় দুঃখ যে কত বেশী গভীর হয়ে যাচ্ছে জানেন না আপনি। আপনার সঙ্গে আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলেম এই ভেবে যে যে কথা কাউকে বলিনি আজ তাই বলব আপনাকে। ভেবেছিলেম বাক্যের অপব্যয়ে হয়তো লাঘব হবে হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনার।"

মিসেস্ রায়ের দীর্ঘশ্বাসের জন্যে বিরতির সুযোগে বললেম, "যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনার বাক্য অপব্যয়িত নয়, অপরূপ ভাষা-মাধুর্যে তা সমৃদ্ধতর হয় মাত্র।" মিসেস্ রায় বোধ হয় আমার কথা শুনতেও পেলেন না।

"সেই এখানে এসে বসা থেকেই বলবার চেষ্টা করছি। এক দিকে আপন সংকোচ, অপর দিকে আপনার অকৌতূহল, তাই বলা আর হয়নি।"

"আপনার রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে বলতেন, 'শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা?"

মৃদু, প্রায় অদৃশ্য-অশ্রুত হাস্যে মিসেস্ রায় বললেন, হ্যাঁ, রবীন্দ্র-নাথ পুরোপুরি ভুলিনি এখনো।" একটু পরে বললেন, "আচ্ছা, আমার বাঙলার প্রশংসা করেছিলেন না আপনি একটু আগে?"

"হ্যাঁ এবং আবার করতে যাচ্ছিলেম।"

"কখনো আর কিছু মনে হয়নি আপনার? একটু অদ্ভুত, একটু অসমঞ্জস?"

বন্ধুর দু'-একটা হাস্যকর ইঙ্গিতের কথা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল, মনে এলো চিরুণী-কাংগোর কথা, কিন্তু বললেম, "আর মনে হয়েছে আপনার নেপালী ভাষায় সমান দক্ষতার কথা।"

"এই দেখুন, না জেনে একটা রায় দিয়ে বসলেন। আপনি তো নেপালী ভাষার কিছুই জানেন না। কি করে বুঝলেন ও-ভাষা আমি ভালো বলি?"

নিন্দা করলে জেরা হয় জানি, প্রশংসা তো লোকে অসত্য হলেও নির্বিবাদে মেনে নেয়! মিসেস্ রায় প্রশংসার কথা ভাব-ছিলেনই না।

আমি ইতস্তত করে বললেম, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, কিন্তু তাই বলে আপনার বাঙলার আন্তরিক প্রশংসাকে কপট স্তুতি বলে মনে করবেন না যেন।"

"অথচ বাঙালীই নই।" মিসেস্ রায় সশব্দে হেসে উঠলেন।

"বাঙালী ন'ন!" মিসেস্ রায় যদি বলতেন সামনে হিমালয় নেই, যদি বলতেন আমি দার্জিলিঙে নেই, যদি তিনি বলতেন তিনি আমার সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসে নেই, তাহ'লেও এমন অবাক হতেম না।

"না, জন্ম দ্বারাও নয়, বিবাহসূত্রেও নয়, হা—হা।" মিসেস্ রায়ের উচ্চহাস্যে শুধু উপহাস বা পরিহাস ছিল না। অনির্দেশ্য আরো কিছু।

আমি হতবুদ্ধিতা সম্বরণ করে বললেম, "তাহ'লে রায়ও বাঙালী নয়?"

"রায় বাঙালী, অতএব…?"

"অতএব?" আমার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না।

"নাঃ, আপনার কলেজে-পড়া লজিক দেখি একেবারেই ভুলেছেন। প্রোসেস্ অব্ এলিমিনেশন করলে কি থাকে?"

এবারে বুঝতে দেরী হোলো না। কিন্তু কিছু বলতে পারলেম না। আবার অস্বস্থ নৈঃশব্দ্য এলো। চুপ করে থাকা সোনার মতো দামী হতে পারে কিন্তু সে যে কখনো-কখনো লোহার চেয়েও ভারী হতে পারে প্রবাদে তার উল্লেখ নেই।

"কিছু বললেন না যে?" মিসেস্ রায়ের কম্পিত কণ্ঠে অশ্রুর আভাস ছিল নির্ভুল, "ঘৃণা বুঝি নির্বাক্ করেছে?"

"না, মিসেস্ রায়, আমার সকল ঘৃণা নিজেরই পরে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আর কারো জন্যে অবশিষ্ট নেই এক কণাও।"

"কিন্তু সবটা না জেনে ফাঁসির হুকুম দেবেন না।"

"আমি ফাঁসির হুকুম দিলেও তা তলব করার মতো কেউ নেই, অতএব সে ভয় করবেন না।"

"না, ভয় কাউকেই করি নে। ও-বস্তুটি, আপনারই ভাষায়, বিধাতা বাঙালীদের এমন নিঃশেষে দান করেছেন যে অ-বাঙালীদের জন্যে কিছুই বাকী থাকেনি। তবে কি না…"

মিসেস্ রায় আরেক বার কি একটা শব্দ শুনে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ আসছে কি না। কাউকে না দেখতেও পেয়ে আবার শুরু করলেন।

"তবে কি না, যে যাই বলুক, কেউ—সে যেই হোক না কেন, অপরিচিত, অক্ষম, অধম বা নগণ্য—কেউ আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবছে এটা কারোই ভালো লাগে না।"

নানা দার্শনিকতায় ভূমিকা কেবলি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছিল। প্রশ্নটার অশোভনতা সত্ত্বেও বললেম, "তার চেয়ে ভালো লাগার কথা বলুন। রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হোলো কবে বা কি করে?"

মিসেস্ রায় দোষ নিলেন না, বললেন, "তার আগে আমার কথা বলি। জন্ম হয়েছিল সভ্য লোকালয়ের বাইরে ফালুতের ডাক-বাংলোর কাছে। মা-বাবা কেউ কখনো ফালুৎ থেকে নীচে নামেননি, তাই তাঁদের নীচের সমতল দেশের সভ্যতর সমাজ সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম ভীতি এবং তার চেয়েও বেশী অজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা। আমার বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন কি একটা লটারীতে যেন বাবা অনেকগুলি টাকা পেয়ে গেলেন। অত টাকার সঞ্চয় বা ব্যয়ের পরিকল্পনা তো দূরের কথা, তার পরিমাণ কল্পনা করাও ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। গ্যাংটকের মিশনারী সায়েব—আসলে যাঁর নামে টিকিটটা কেনা হয়েছিল—তিনি যখন বাবাকে পুরস্কারের প্রাপ্য টাকার অংকটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন তখনই বাবা আনন্দাতিশয্যে হার্ট ফেল করে মারা যান।"

আমি দুঃখ জ্ঞাপন করে বললেম, "আপনার মা?"

"তিনি আমার জন্মের পরেই মারা যান। বাবার মৃত্যুর পরে সেই মিশনারী সায়েব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কার্শিয়ঙে মিশনারী ইস্কুলে, অভিভাবক আর একসিকিউটর করে দিলেন একটা ব্যাংককে। সেখান থেকে সীনিয়র কেমব্রিজ পাশ করবার আগেই চলে যাই শান্তিনিকেতনে। সেখানে ছিলেম তিন বছর, বাবার টাকার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ না করা পর্যন্ত।"

"তাই বলুন। এবারে বুঝতে পারছি আপনি কোথায় এমন সুন্দর বাঙলা বলতে শিখেছেন।"

"কিন্তু আমার ভাষা-পারদর্শিতার কারণ বলতে এত কথা বলছি নে আপনাকে। শান্তিনিকেতনে শুধু বাঙলাই শিখিনি, গানও শিখেছিলেম। তার চেয়েও বেশী শিখেছিলেম গানকে ভালোবাসতে।"

"অস্কার ওয়াইল্ডের কিন্তু একটা এপিগ্রাম আছে যে মেয়েরা গানকে কখনোই ভালোবাসে না, ভালোবাসে গায়ককে।" গুরু আলোচনায় লঘু তরলতার সুর আনতে চেষ্টা করলেম। চেষ্টাটা ভয়ানক রকম সফল হল না।

"মিথ্যে কথা। শান্তিনিকেতনে যতগুলি পুরুষ দেখেছি তার একটাকেও এতটুকুও ভালো লাগেনি। তখন গানকেই ভালোবেসে ছিলেম। কিন্তু যাক সে কথা। চেক সই করবার ক্ষমতা পাওয়ার পরেই মনে পড়ল দেশের কথা। ভাবলেম, যাই একবার দেখে আসি গাঁয়ের আপনার লোকজনদের—সফল পুরুষ যেমন বিজয়-গৌরবে বার্মা বা বিলেত থেকে ফেরে। সে নৈরাশ্যের কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বাঙলা দেশে এসে পরকে আপন করতে পারিনি, দেশে এসে আপনাকে মনে হল নিতান্ত পর বলে। ফিরে এলেম মাঝামাঝি জায়গা—দার্জিলিঙে, যা কিছু বাঙলা, কিছু নেপাল, কিছু ভুটান।"

একটু হেসে মিসেস্ রায় স্থির, অকম্পিত কণ্ঠে বলে চললেন, "এমনি মিশ্রত একটা জায়গাতে এক রকম কেটে যাচ্ছিল কিন্তু বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেম।"

"কম্পোজিট জায়গা যদি বা মেলে, কম্পোজিট মানুষ পাওয়া শক্ত।" আমি মিসেস্ রায়ের কাহিনী সংক্ষেপ করবার সুযোগ দিলেম।

"যে-হোটেলে ছিলেম তার ম্যানেজার ছিল রায়। একা একটা ঘর নিয়ে একটি মহিলা মাসের পর মাস কোনো সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ কারণ বাদেই থেকে যাচ্ছে এতে আর সবলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তা উপেক্ষা করেছিলেম অনায়াসেই। রায়ের সঙ্গেও দু'-চার বার যা কথা হয়েছিল তা ম্যানেজার হিসাবেই। হঠাৎ একদিন…"

আমি বাধা দিয়ে বললেম, "মাপ করবেন, কিন্তু রায়কে তো কখনোই একটা কম্পোজিট চরিত্রের লোক বলে মনে হয়নি আমার।"

"আজ আর তা কারোই মনে হবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু সেদিন রাত্রে রায় যখন আপন মনে নিজের ঘরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর গুন্-গুন্ করছিলেম না, বৈষ্ণব পদাবলীই সেদিন আমার কথা বলছিল। পাঁচ বছর আগের কথা এটা। তখনকার রায়ের সঙ্গে আজকের রায়ের এতটুকু সাদৃশ্য নেই। পুরুষ এতও বদলাতে পারে।"

শুধু পুরুষ বদলায় না, সবাই। যত বিরোধ, যত বিচ্ছেদ, যত বেদনা, সে তো পরিবর্তন নিয়ে নয়, পরিবর্তনের গতি এবং বেগ নিয়ে। রায়ের মতো মিসেস্ রায়ও নিশ্চয়ই পাঁচ বছর আগেকার মিসেস্ রায় নেই। তাঁরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ট্র্যাজেডি এটা নয় যে দু'জনেই বদলেছে, ট্র্যাজেডি এই যে উভয়ের পরিবর্তন সমান্তরাল গতিতে হয়নি, সমান তালে চলেনি। এক জনের আকর্ষণ যখন বেড়েছে, অপরের কমেছে। একের কমলে অপর পক্ষের বেড়েছে। ঘনিষ্ঠতার প্রথম কয়েকটা মুখর সন্ধ্যার কথা বাদ দিলে, নরনারীর প্রেমের নক্ষত্রলোকে নিয়তই

এই পরিবর্তন চলেছে—একের মিলন-পিপাসা যখন শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরের তখন কৃষ্ণপক্ষ, সেখানে গতি হ্রাসের দিকে, হ্রাস থেকে গ্রাসের দিকে।

কিন্তু এ সব কথা তখন মিসেস্ রায়কে বলতে যাওয়া বৃথা। দর্শকের পক্ষেই দার্শনিক নির্লিপ্ততা সম্ভব। অনাহত বিচারকের পক্ষেই সম্ভব সাক্ষ্য আর প্রমাণের নির্ভুল, নিরপেক্ষ নিক্তির ওজন করা। যে আঘাত পেয়েছে, যার উপর অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিচারের মান আলাদা হবেই। অন্যরূপ আশা করাই অন্যায়।

মিসেস্ রায় একটু থেমে নীরবে অশ্রুমোচন করে পুনরায় কাহিনীর বিবৃতি সুরু করলেন। পাঁচ বছর আগেকার প্রাণবন্ত আনন্দমুখর মুহূর্তগুলি মরে গেছে বহু দিন আগে। আজ তাদের ময়না-তদন্তে আনন্দের লেশ মাত্র নেই; আছে শুধু তিক্ততা, বিদ্বেষ আর আপন নির্বুদ্ধিতায় অপরিসীম অনুতাপ।

"রায় তখন সত্যি ভালো বাঁশী বাজাতে পারতো। আমার যেটা সব চাইতে লেগেছিল সেদিন তা হচ্ছে এই যে ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজাতো। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখনো পংকজ মল্লিকের কল্যাণে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি—তাঁর গান তখনো নিবদ্ধ ছিল বোলপুরের আশ্রমে আর বালিগঞ্জের দু'-একটা বসবার ঘরে। রায় দূরে বাঁশীতে সুরটা বাজাতো, আমি মনে-মনে গুন্-গুন্ করতেম কথাগুলো নিয়ে। সঙ্গীত যেমন করে ব্যবধানের অবসান ঘটাতে পারে এমন আর কিছু পারে না। গায়ক আর শ্রোতা তাদের পৃথক্ সত্তা হারিয়ে ফেলে এক হয়ে যায় সঙ্গীতের মূর্ছনায়। তাই রায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনে দু'জনকে জানলেম অসীম ঘনিষ্ঠতায়। অসীম গভীরতায় যে নয় সে কথা আজ জানি।"

"জানার কি শেষ আছে মিসেস্ রায়? মরবার পূর্ব মুহূর্তেও বলবার উপায় নেই যে একটি লোকের সম্বন্ধেও চরম জানা জেনেছি।"

"কিন্তু না-জানা নিয়ে রসায়নাগারে গবেষণা চলে, বাঁচা চলে না। বাঁচবার জন্যে কোন একটা মুহূর্তের জানাকে চরম বলে মানতেই হয়। এবং সেই জানা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি। এখন বলছি বিয়াল্লিশের ডিসেম্বরের কথা। এমনি শীত ছিল সেদিন, কিন্তু এমন অন্ধকার ছিল না। আমি আর রায় বসেছিলেম অবজার্ভেটরির কাছে আমাদের একটা প্রিয় জায়গায়। আজো কানে বাজছে, রায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সেই পূরবী সুরে আমার জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—'তুমি জান নাই তুমি জান নাই তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ' এই গানটার সুর বাজিয়েছিল। বুঝতে বাকী ছিল না যে এ ওরই মনের কথা। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার পরে যা হয়েছিল তা বলতে গেলে আমার কাছে মনে হবে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে, আপনার কাছে মনে হবে সাধারণ প্রেমের গল্প বলে। যদিও আমার কাছে তা আদৌ সাধারণ ছিল না। যাক সে কথা।

"ডিসেম্বরের দার্জিলিঙে সেবার অনেক লোক, সবই প্রায় খাকি। রায়ের হোটেলে অত খাকির ভীড় আমার ভালো লাগত না। তাই তখন এই 'কাঞ্চনজংঘা' বাড়লোটা কিনে সেখানে চলে এলেম। রায়ের হোটেলে কাজ ছিল ভয়ানক, কিন্তু কাজে মন ছিল না তেমন। বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো আমার বাড়ীতে। হোটেলের মাড়োয়ারি মালিক এক দিন রায়কে একটু জোরেই বোধ হয় ধমকেছিল এই নিয়ে। রায় সন্ধ্যা বেলা মুখ ভার করে আমা[র] কাছে এসে বলল, 'এই যুদ্ধের সময় এত লোক ব্যবসা করে এত টা[কা] করছে, আর আমি মরছি সামান্য মাইনের চাকরি করে ধমক খেয়ে। সামান্য মূলধন নেই বলে'।"

"সামান্য মূলধন কেন, আমার সমস্ত টাকা, সমস্ত গয়না সেদিন হাসিমুখে রায়ের হাতে তুলে দিতে পারতেম। কিন্তু যুদ্ধের ব্যবসায় আমার মত ছিল না। তাছাড়া রায় যে ব্যবসায় কিছু করতে পারবে তা বিশ্বাস করিনি। যার অন্তর থেকে উচ্ছৃত হাওয়ায় অমন স্বর্গীয় বাঁশী বাজে, সে-মনে ব্যবসায়িক কূটবুদ্ধির বা নীচতার স্থান কোথায়? আমি তাই রাজী হইনি, বলেছিলেম, "ব্যবসা তোমার জন্যে নয়। তুমি শিল্পী। ব্যবসার কথা ভেবো না।'

"ব্যবসার কথা ভাবেনি আর, কিন্তু চাকরিতেও মন ছিল না। চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি, জুন মাসেই, একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা ও এসে বলল, 'আজ আবার মাড়োয়ারীটা এসেছিল ধমকাতে—কাল সেই পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার হোটেল ছেড়ে তোমার কাছে এসেছিলেম না?—সেই জন্যে। আজ আর ভাল লাগল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

"চাকরিটা এমন কিছু একটা বিরাট চাকরি ছিল না, কিন্তু ওর আর কেউ নেই, হাতেও এক পয়সা নেই, তাই জন্যেই চাকরি ছাড়াতে আমি খুশী হইনি। কিন্তু কিছু বলিনি আমি। কাজ ছেড়ে দিয়ে ও কোথায় ছিল, কি করতো আমি জানতেম না। সন্ধ্যা বেলা আসতো প্রায়ই বাঁশী শোনাতে, কিন্তু ঠিকানা বা কাজের কথা জিগেস্ করলে অসন্তুষ্ট হতো। বুঝতে পারতেম যে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন চলছে ওর, কিন্তু আমাকে বলতো না কিছু। বুঝি পৌরুষে বাধতো। আমারও মন চাইতো না এমন প্রিয়জনকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে অপমান করতে।

"একদিন বাঁশী বাজাতে বাজাতে হঠাৎ ভয়ানক রকম কেসে উঠল। সে কাসির আওয়াজে যেন শ্মশানের কান্না ছিল। আমি বাঁশী সরিয়ে রেখে শুইয়ে দিলেম আমার বিছানার উপর। কপালে হাত দিয়ে দেখি ভীষণ গরম। ডাক্তার ডাকলেম, সেবা করলেম। সেরে উঠে সুস্থ হতে, কর্মক্ষম হতে প্রায় তিন মাস লাগল। তার পর বাড়ী ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কেন না, বাড়ী বলতে কিছু ছিল না রায়ের। শরীর তখনো একটু দুর্বল ছিল। একদিন বলল, 'এবার আমি যাবো।' আমি জিগেস করলেম, 'কোথায়?' আমার থাকতে বলার উপায় ছিল না। এরই মধ্যে কালুতের মোড়লদের মধ্যে আমার বাড়ীতে রায়ের থাকা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল বলে শুনেছিলেম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে রায় যখন করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল তখন কিছুতেই পারলেম না ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। ও থেকে গেল। কেন না, যাওয়ার জায়গা ছিল না।

"কেবল মাত্র বাঁশী বাজিয়ে আমার ঋণ শুধবে, সেইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু পুরুষের স্থূল মন বুঝবে কোথেকে অমন সূক্ষ্ম দেনা-পাওনা? রায় চাইল ঐশ্বর্য দিয়ে সমৃদ্ধি দিয়ে আমার দ্বিধা ভাঙতে, সংকোচ জয় করতে। একদিন বলল, 'কাকি, যদি কিছু টাকা ধার দাও তাহ'লে ক্যান্টিনে একটা সাপ্লাইয়ের কনট্রাক্ট পেতে পারি। খুব লাভ। অবিশ্যি এখনি একসঙ্গে সব

টাকাটা দিতে হবে না। আপাতত হাজার পাঁচেক হলেই সুরু করতে পারি।'

"কোন প্রশ্ন করিনি। পরের দিন সকালে ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার তুলে দিয়েছি। পরে আরো। কিন্তু যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। সরকারের বহু চর তখন চুরি ধরবার কাজে নিযুক্ত। যুদ্ধের কনট্রাক্ট তখন আর দু'টাকার জিনিষ দিয়ে (বা না দিয়ে) দু'শো টাকার বিল পাস করানো নয়। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা এখন লাভ নিয়ে সরে গেছে, লোভী মূর্খরা শেষে এসেছে ক্ষতি পুরোতে। রায় হল তাদেরই এক জন। যুদ্ধ যেদিন থামল সেদিন রায়ের কনট্রাক্টও শেষ হল—কিন্তু আমাকে শেষ করার আগে নয়। আমার সঞ্চিত অর্থের আর হাজার তিনেকের বেশী অবশিষ্ট ছিল না।

"আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর রায়ের বাঁশী, দুই-ই তখন চুলোয় গেছে। আমাদের আলোচনার বিষয় তখন কালের যাত্রার ধ্বনি নয়, কালকের বাজার। গুরুদেবের ভাষায় জীবন নয় জীবিকা। টাকার যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়ে আমিই তখন এই কাঞ্চনজংঘায় ছোটো-খাটো একটা বোর্ডিং-হাউস সুরু করলেম। দেখা-শোনা সব আমিই করি, কিন্তু রায়কে সামনে রেখে, নইলে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আসতে ভয় পায়।"

"আপনি এত করলেন ওর জন্যে আর রায় তার পরে আপনাকেই এমন ভাবে ফেলে চলে গেল?" আমি সমবেদনা না জানিয়ে পারলেম না।

"এই প্রথম নয়। কালুঙের কাছাকাছি একটা জায়গায় জ্ঞানরূপ বলে একটা জংলী ভুটিয়া মেয়ে আছে। আমি মাস ছয়েক আগে প্রথম জানতে পারি যে রায়ের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ। সেই থেকেই রায় কি একটা ব্যবসার কাজে কলকাতা যাওয়ার কথা প্রায়ই আমায় বলে। আমি জানতেম সবই, কিন্তু কিছু বলিওনি, যেতেও দিইনি।"

"আপনার এখনো এই অকৃতজ্ঞ লোকটার জন্য মমত্ববোধ আছে দেখছি!" আমি রায়ের সম্বন্ধে অযাচিত মন্তব্য না করে পারলেম না।

"না, মমতাই নয় শুধু, প্রয়োজনও ছিল। রায় চলে গেলে আমার বাঁচবারই উপায় থাকতো না। 'কাঞ্চনজংঘা' বন্ধ করে দিতে হত তখনি। তা'ছাড়া, কাউকে মুখ দেখাতে পারতেম না। স্বামি-পরিত্যক্তার জন্যে লোকের করুণা হয়। কিন্তু রায় তো আমার স্বামী নয়, প্রণয়ী। সে ছেড়ে গেলে ধিক্কার, উপহাস ছাড়া আর কিছু জোটে না কোন মেয়ের। সে উপহাস আমি সইব না কোন মতেই। আমার সব গেছে, কিন্তু এই শেষ গর্বটুকু খোয়াতে পারব না। তাই শেষ পর্যন্ত…"

মিসেস্ রায় হঠাৎ আবার একটা শব্দ শুনে কথা থামিয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। অন্ধকারে আমি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেম না। অন্ধকারের মধ্য থেকে, প্রায় শূন্য থেকে, একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো। মিসেস্ রায় তৎক্ষণাৎ উঠে একটু দূরে গিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। লোকটা আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল, মিসেস্ রায় ফিরে এসে বসলেন না আর। বললেন, "আপনাকে অনেকক্ষণ রেখেছি, অনেক বাজে কথা বলে বিরক্ত করেছি। এবারে বাড়ী চলুন, আর কিছু বলে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আর কিছু বলবার নেইও অবিশ্যি।" স্বরে নিশ্চিত আশ্বাসের সুর।

অন্ধকার থেকে আবির্ভূত লোকটার সঙ্গে শ্রীমতী কাঞ্চির কি কথা হয়েছে শুনিনি, যা শুনেছি তার এক বর্ণও বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কণ্ঠে আশ্বাসের সুরের কি কারণ হতে পারে, তাও ভেবে পেলেম না। আমার মনে শুধু ধ্বনিত হতে থাকল কৃতঘ্ন রায়ের জন্য অন্তহীন ঘৃণা আর মিসেস্ রায়ের জন্য অপরিসীম শ্রদ্ধা-মিশ্রিত করুণা।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ মিসেস্ রায় রীতিমত জোরে হেসে উঠলেন। আমি চমকে উঠলেম ভয়ে আর বিস্ময়ে। সে-হাসি চার দিকের অসংখ্য তরুরাজির মধ্যে তার অজেয়তা ছড়িয়ে দিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কি, হঠাৎ এমন জোরে হেসে উঠলেন যে?"

"খুব জোরে হয়ে গেছে, না? বড়ো অভদ্র, না?" হাসি কিন্তু থামল না, বা কমল না। হিস্টারিক হাসির মধ্যে আবার বললেন, "আপনার ভদ্র বাঙালী মেয়েরা এমন হাসতো না, না? কিন্তু ভুলবেন না, আমি বাঙালী নই। রায় এই সহজ কথাটা ভুলেছে বলেই না ওর আজ এই বিপদ।"

"কি বিপদ আবার?" স্বতই এই সভয় প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"বিশেষ কিছু হয়নি এখনো, তবে…"

"তবে কি?" আমি অপেক্ষা করতে পারছিলেম না।

"ভয় পাবেন না। ওই লোকটি এসেছিল দেখলেন না? ও সব ঠিক করে দিয়েছে। আমারও, আপনারও।"

"আমার কি করেছে আবার?" আমার ভয়ের শেষ ছিল না।

"আপনার জিনিষ-পত্তর সরিয়ে দিয়েছে অন্য একটা হোটেলে। সেখানে আপনি নিরাপদ থাকবেন।"

বিপদ কেটে গেলে বীরত্ব দেখাতে বাধা নেই। বললেম, "আমার নিরাপত্তার জন্য ওর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনার কি করেছে?"

"আমার যা করবার আমিই করব। ওকে শুধু ব্যবস্থা করতে বলেছিলেম। তা ও করেছে। বাকীটা নিজের হাতে করতে হবে। অন্যের কানে গান শোনা কি গান শোনা? তেমনি আরো কতগুলি কাজ আছে যা নিজে হাতে না করলে করাই নয়।" আবার সেই হাসি, কণ্ঠে সকালের সেই অস্বাভাবিক দৃঢ়তার স্বর।

"রায়কে একদিন সত্যি ভালবাসতেম। রায়ও আমাকে সত্যি ভালবাসত। রায় যখন আমার টাকায় ব্যবসা করে লোকসান করতে থাকল, তখন থেকেই সব কিছুর পরিবর্তন হতে থাকল। ক্রমে জানলেম যে আমার সব টাকা ব্যবসায়ও যায়নি, অনেকটা গেছে জ্ঞানরূপের ভরণ-পোষণে। উঃ, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা, আপনি জানেন না। একমাত্র পুরুষরাই পারে এমন হৃদয়হীন ভাবে অকৃতজ্ঞ হতে। আমাকে কোন দিন বলেনি জ্ঞানরূপের কথা। আমিও ভেবেছিলেম অমন নীচতার কথা তুলে নিজেকে নীচ করব না। কিন্তু পরশু যখন কালুং থেকে এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসী এসে হাসতে হাসতে অনেক কথা শুনিয়ে গেল তখন আর পারলেম না চুপ করে থাকতে। ও আমাকে আর ভালবাসে না, আমিও

যাসি নে। আমার মনে ওর জন্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাই বলে এই অপমান সহ্য করব কেমন করে? জিগেস্ করলেম ছ্যানত্রুপের কথা। সোজা অস্বীকার করল। হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কথাটা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলেম, এবারে আরো কড়া ভাবে। অনেক অপমান করাতে তখন রেগে গিয়ে বলল, হাঁ, ও ছ্যানত্রুপকে ভালবাসে। দু'বছর থেকেই বাসছে। মুখের উপর স্পষ্ট আমায় বলল যে আমাকে আর ওর ভাল লাগে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, কাছে আসতে বিরক্ত লাগে। তার পর আমি কিছু বলতে বা করতে পারার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

আমরা তখন ক্যানকাটা রোডের মোড়ের প্রায় কাছে এসে গেছি। মিসেস্ রায় আমাকে দূরে ডান দিকে একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন, "আপনার জন্যে ওখানে জায়গা ঠিক করে দিয়েছি। আপনি সোজা ওখানে চলে যান। ওরা জানে যে আপনি যা[…] কোন অসুবিধা হবে না।"

আমি মোড় ফেরবার আগে মিসেস্ রায় হঠাৎ ওভার-কো[…] ভিতর থেকে একটা কি বের করে বললেন, "এটা কি জান[…] থাক, জেনে কাজ নেই। কিছুক্ষণ আগে জিগেস্ করছিলেন যে ওই লোকটা আমার জন্যে কি করেছে? এইটে ওই [..] গেছে। ছ্যানত্রুপ শেষ হয়েছে এবার রায়ের পালা। সেটা [..] আর অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারি! এখন সেখানে যা[…] যেখানে রায় তাতে পায়ে বাঁধা আছে। এর মতো সমাধান [..] নেই! রায় নিরুদ্দেশ হলে অনেক বাজে কথা শুনতে হ[…] এর পরে আর কেউ বলতে পাবে না যে রায় আমাকে ফেলে চ[…] গেছে।"

মিসেস্ রায় বাঁ দিকে গেলেন। আমি ডান দিকে।

[ক্রমশঃ

সুরের মূল্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

একদা—রাজ-দরবারেতে নৃত্য-গীতের আসর চলে,
পড়ছে না কো মোটেই 'পেলি' কৃপণ রাজার রঙমহলে।
ভাবতো নটী মিলবে মোহর মিলবে ময়ূর কণ্ঠী চেলী,
দেখাবে তায় মুণ্ডমালা যে সুধাবে "বল কি পেলি?"

প্রহর পরে কাট্‌ছে প্রহর রাকা রাতি যায় যে ফাঁকা।
দেয় না কেহ ওড়না রুমাল এমন কি কেউ রূপার টাকা।
ভগ্নহৃদয় ক্ষুণ্ণ নটী গীতের সুরে বলছে ডেকে—
রঙ্গ করে রঙ্গিণী তার দিল-দরদী সারেঙ্গীকে—

'হে নটরাজ পোহায় যে রাত দণ্ড কয়েক কেবল বাকি
বেশ তুমি ত তাল দিয়ে যাও মোর যে ঘুমে ঢুল্‌ছে আঁখি।'
বুঝি গোপন মরম ব্যথা ছড় বুলায়ে তাহার তারে—
সংযত সুরের গিটকারিতে প্রবোধ সে দেয় বারে বারে।

'এমন মোহন নৃত্য সখি প্রায় ত্রিযামা কাটিয়ে দিয়ে
শেষে যেন তাল কাটে না হয় না রসভঙ্গ প্রিয়ে।'
সে আওয়াজে বেদন বাজে দেন যুবরাজ রত্নমালা,
সোনার কাঁকন রাজকুমারী চাকরাণী তার রূপার বালা।

মিতব্যয়ী মন্ত্রীও দেন তাঁহার হীরক অঙ্গুরীয়,
কম্বল এবং দেয় লোটা তার মুগ্ধ গীতে সন্ন্যাসীও।
সবিস্ময়ে শুধান রাজা কারণ কি হে? কারণ কি হে?
সহসা বৈরাগ্য কেন? যার যা আছে দেয় বিলিয়ে!

সন্ন্যাসী ক'ন, 'রাজৈশ্বর্য্য ভোগ-বাসনা জাগিয়েছিল।
পদস্খলন হয় না যেন সারঙ্গ আমায় জানিয়ে দিল।'
কুমার বলেন, 'বিদ্রোহী ভাব করছে ক'দিন তোলাপাড়া
'দেখো যেন তাল কাটে না' ফিরিয়ে দিলে জীবন-ধারা।

দুর্ব্বল 'ব' অসংযমী যে আছে, সুর করছে মানা
হয় না রসভঙ্গ যেন শেষে যেন তাল কাটে না।
অর্দ্ধোদয়ে স্নান করিয়া সুরের মণি-কর্ণিকাতে
হৃদয় হল স্নিগ্ধ শুচি মালিন্য আর নাই কো তাতে।'

তন্ময়তায় আবেগ ভরে যে যেথা গায় বাজায় নাচে,
তাদের সকল ছন্দে সুরে শিব-শিবানীর পরশ আছে।

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—

আউস ধান রোয়ার সময় বয়ে যায়—এখন জমি দখল না করলে এ বছর আর কোনও কাজ হবে না, জমি পতিত থাকবে। ঘন বৃষ্টি নামলে আর সেখানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক অসুবিধা হবে। জমি কিনে দখল করতে না পারলে টাকা যা যাওয়ার তা তো গেলই—মান-সম্মানও দেশে আর থাকবে না। সব চেয়ে অসুবিধা আইনের বিচারেও অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে।

বিপ্রপদ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি ছুটির জন্য অনেক মিনতি করে দরখাস্ত করেন। সপ্তাহ-খানেক চলে যায় কিন্তু উত্তর আসে না কিছুই। রোজ পোষ্ট আফিসে লোক পাঠান হয়—সব সংবাদ আসে, আদেশ-নির্দ্দেশ আসে, কিন্তু ছুটির কোনও সংবাদ আসে না।

বিপ্রপদ মহা ফাঁপরে পড়েন। তিনি নিজেই সদরে ছুটে যান। বাবুরা কোথায় যেন গেছেন, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আসবেন না। অতএব বিপ্রপদকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বাবুদের মধ্যে বড়বাবুই কর্ত্তা। একে একে সব বাবু আসেন কিন্তু তাঁরা বিপ্রপদর সাথে কথাই বলেন না, যেন চেনেন না। সর্বশেষে আসেন বড়বাবু। বিপ্রপদকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি বিপ্রপদ বাবু, কি মনে করে?'

'আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিতে হবে।''

'কত দিনের জন্য?'

'এই পাঁচ মাসের।'

'এই তো আপনি কত দিন কাটিয়ে সবে ক'মাস এসেছেন! এ ভাবে ছুটি নিলে আমাদের কাজ চলবে কি করে?'

'আমার তো তেমন কোনও মারাত্মক কাজ বাকী নেই, আদায়-উসুলও খারাপ হয়নি, কোনও কিস্তিও খেলাপ যায়নি। আমি আবার সময়মত হাজির হবো। আমি—'

'তাতে কি মহাল থাকে? নায়েব-গোমস্তার ওপর ভরসা করে বসে থাকা যায় না।'

'কিন্তু কি করব? আমি যে কতটুকু জমি কিনেছি। তা যদি দখল করতে না পারি, সব টাকাই মাটি। মরসুম যায়-যায়। আমি ফিরে এসে কাছারীর সব ঠিক করে নেবো।'

'মুখে যা-ই বলুন, ক্ষতি কিছু-না-কিছু আমাদের হয়ই, তা কিন্তু আপনারা স্বীকার করতে চান না।'

'কেন, এ কথা বলছেন কেন?'

'এই দেখুন না, ঐ মৌজাটার নাম, কি নাম হে উমেশ?'

'মহারাজ চৌদ্দরসির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চৌদ্দরসির কথাই বলছি—সেখানের অবস্থা কেমন সঙ্গীন হলো ম্যানেজারকে ছুটি দিয়ে। বুঝলেন, তাঁরও আপনার মত অবস্থা। ছুটি না দিয়ে আর পারা গেল না। কিন্তু শেষে ক্ষতি হলো আমাদেরই। কিছু বলার জো নেই, আপনারা পুরোন কর্ম্মচারী।'

'তাহ'লে এখন ছুটি পাওয়া যাবে না?'

'এর চেয়ে কি না বলা ভাল?'

বিপ্রপদর মনে-মনে ধিক্কার জন্মে। ইচ্ছা হয় চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে দিতে। কিন্তু কতকটা নিজের প্রয়োজনে কতকটা বাবুদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী বলে তা পারেন না। তিনি ক্ষুন্ন মনে উঠে যান।

একটা বছরের জন্য জমি পতিত পড়ে থাকবে, এত সাধের জমিতে দেওয়া হবে না চাষ—বিপ্রপদর যেন প্রাণ ফেটে যেতে চায়। তিনি কাছারীতে ফিরে যান। নিজের ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিজেকেই ধীরে ধীরে হজম করতে হয়।

কিছু-দিন বাদে বাবুরা ভেবে-চিন্তে যা লিখে পাঠান তা কতকটা কশাঘাত তুল্য।

এ কশাঘাতে যে মানুষ সে ক্ষেপে দাঁড়ায়, কিন্তু বিষয়লোভী বিপ্রপদ তা পারেন না। বাবুরা ছুটি মঞ্জুর করেছেন—চিঠিও এসেছে তাঁর বাড়ী থেকে যে, এক্ষুণি বাড়ী আসা চাই, নইলে তালুকটা হাতছাড়া হবে।

মেজ ঘোষাল রমণী বড়বাবুর বাল্যবন্ধু। বিপ্রপদর ছুটি নিয়ে যেটুকু টালবাহানা হলো তার মধ্যে যে সে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তা কেউ টের পেল না। জানল শুধু রমণী আর বড়বাবু।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা-পুটুলী বেঁধে রওনা দিলেন।···

পথে কোনও স্থানে একটুও অপেক্ষা করলেন না। শুধু সময় সময় আসমানের শূন্য ঘরটার কথা মনে পড়ল—আর মনে পড়ে ডালিমবাগের কবর-স্থানের কথা। আসমান চলে গেছে, শিশুটাও তার চলে গেছে, তখন এ দাগ কেন রেখে গেল বিপ্রপদর বুকে? কত দূরে তিনি কাছারী-বাড়ীটা ফেলে এসেছেন কিন্তু স্মৃতিটা কেন চলছে তাঁর সাথে-সাথে?

ভাদ্রের ভরা গাঙ।···

ঘোলা জল ও কালো আকাশ ঐ বাঁকের আবডালে ঘন সবুজ বন্-ফনে গাছ-গাছালি ও লতা বেতসের বুকের তলায় গিয়ে মিশেছে। নাম-না-জানা কত যে ফুল লতিয়ে লতিয়ে গাছের বুকে ও মাথায়

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

ফুটেছে তা দেখলে চোখ জুড়োয়। এ-পার থেকে ও-পারে একবার আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে বড় বড় হরিয়াল ও টিয়ার ঝাঁক। তাদের রংও সবুজ। সবুজ ঢেউয়ে দোলন্ত কচুরীপানাগুলো। বর্ষার শেষ সমারোহে আজ যেন সবুজ মেয়েটা অবুঝ হয়ে উলংগ করে দিয়েছে তার পূর্ণ যৌবনটা শক্তিগড়ের নায়ে চলা পথের দু'ধারে।

পথে দেশী লোকের সাথে দেখা হয়। তারা ডোঙা-নায়ে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে থাকতে বিপ্রপদর ভালই লাগে কিন্তু তার চেয়েও ভাল লাগে দেশী লোকের সাথে আলাপ করতে—জিজ্ঞাসা করতে তাদের দৈহিক ও আর্থিক কুশল। কে কেমন আছে? এবার দেশে ধানের অবস্থা কি? কার কার হালের বলদ আছে, কারটা মরেছে? দেশে অসুখ-বিসুখ মামলা-মকর্দমা আছে কি না এবং থাকলে তা গুরুতর না সামান্য?

'বাবু, আপনি না কি দক্ষিণের বিলে কতক সম্পত্তি কিনেছেন?'

'তোমাকে তো চিনি নে, তোমার নাম?'

'আমার নাম ফটিক। বাড়ী, ঐ যে একটা ঝাঁকড়া জিলগাছ দেখছেন, যার ডালে অনেকগুলো বাবুইর বাসা দুলছে, নদীর দক্ষিণ পাড়ে, ঐখানে। গাঁয়ের নাম গোপালপুর, আমি নিতাইর দূর-সম্পর্কের শালা।' কথাগুলো বলে একটু লজ্জা বোধ করে লোকটা।

'তার কাছেই জমির কথা শুনেছি। অনেক দিন নিতাইর সাথে দেখা নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনি—জমিগুলো কি করেছেন?'

বিপ্রপদ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করতে থাকেন, 'জমিগুলো··· নিতাই···'

'ও বুঝেছি, বড়লোক মানুষ, হাল-হালুটির খবর রাখেন না—ও-সব নিতাই জানে—বাড়ী যারা থাকে তারাই দেখা-শুনো করে। আপনার কি সে খোঁজ রাখার সময় আছে!' শ্রদ্ধায় ফটিকের মন ভরে ওঠে।

বিপ্রপদও যেন একটা উদ্যত অপমানের হাত থেকে রেহাই পান।

'আচ্ছা বাবু পেন্নাম হই, আমি যাবো ঐ খাল দিয়ে।'

'সুখে থাকো। নিতাইর বাড়ী বেড়াতে গেলে একবার আমাদের বাড়ীও যেও।'

'যাবো বাবু, নিশ্চয় যাবো।'

'মাঝি, নৌকা ভিড়িয়ে কতক মাছ নেওয়া যায় কি না?'

'ঐ তো জালিয়ার নাও, বাদাজাল পাড়ছে, মাছ কিছু-না-কিছু পাওয়া যাইবেই।'

বিপ্রপদর নৌকা সুমুখের দিকে তর-তর করে এগিয়ে আসছে—দূর থেকে শংকিত জেলে বলে ওঠে, 'এই মাঝি, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার—জালের ওপর এসে পড়ো না—নায়ের পাশে নাও ভিড়াও।'

দেখতে দেখতে বিপ্রপদর নৌকাখানা জেলের ডিঙির পাশে এসে ভেড়ে। জেলের নৌকাখানা মাঝ-নদীতে নোঙর করে ভাসান রয়েছে। তিন-চার হাত জলের নীচে একটা ত্রিকোণ কালো জাল রাক্ষসের মত হাঁ করে রয়েছে। স্রোতের জলে যা ভেসে আসছে, তার আর রেহাই নেই—একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। চিংড়ি বেলে শিলন—কেউ বাদ যায় না।

'কি কি ভাল মাছ আছে?'

'শিলন মাছ আছে বাবু, দাম কিছু বেশী হবে। একেবারে তাজা টাট্‌কা।'

বিপ্রপদর ডিঙির কাছেই এসে একখানা ডোঙা থামল—এক গৃহস্থের নাও। 'বাবু কিনবা না কি এই অকালের ফল কয়ডা?'

'কি ফল? আনারস?'

ভাদ্র মাস—এখন পাকবো পাকবো করছে এমন আনারস পাওয়া দুর্লভ। আবার একটা-দু'টো নয়—দশটা! বিপ্রপদ নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখেন। বাস্তবিক চমৎকার মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে, রসে টপ্‌-টপ্ করছে ফলগুলোর বুক। ছেলেমেয়েদের জন্য এগুলো তিনি কিনেই নেবেন। কিন্তু গরজ বেশী দেখালে কত না কত দাম চেয়ে বসে তাই তিনি একটু টিপ কাটেন। 'গাছ-পাকা আনারস খেতে জলসা লাগে—আবো অকালের জিনিষ কেমন না কেমন হয়, ও-নিয়ে পয়সা দণ্ড হয় না কি কে জানে—না আমি কিনব না, কিন্তু কত চাও তুমি?'

'বাবু, আমার এটা সংগীন মামলার তারিখ, এহনই যাইতে হইবে সদরে—যা তুমি দেও তা নিমু হাত পাইত্যা—কত দেবা তুমি কও?'

এবার বিপ্রপদ আর ঠকাতে পারেন না। মাঝি ও জেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, ন্যায্য কত দাম হয়? তারা দেখে-শুনে সাব্যস্ত করে দেয় দশ আনা। তাই তিনি দিয়ে দেন লোকটাকে। সে খুশী-মনে চলে যায়। ফল কয়টা বড়ই পছন্দমত হয়েছে। বাড়ী গেলে এ নিয়ে একটা হুড়োহুড়ি অনিবার্য্য। বিপ্রপদর চোখের সুমুখে কোলাহলরত ছেলেমেয়েগুলোর রূপ ফুটে ওঠে।

'এখন মাছটা তোল ওপরে, দামের জন্য ঠেকবে না।'

জেলেটা একটা শিলন মাছ নৌকার পাটাতনের ওপর তুলে রাখে। মাছটার ঠোঁটের কাছে একেবারে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে যেন।

'কত দাম?'

'আট আনা।'

মাঝিটা অবাক্ হয় দাম শুনে। 'আট আনা! কও কি জালিয়ার পো?'

বিপ্রপদ দাম-দস্তুর না করে জেলের হাতে সাত আনা পয়সা গুঁজে দেন। তিনি বোঝেন যে মাছটা নিতান্ত ছোট না! এর চেয়ে কম এ মাছের দাম কিছুতেই হতে পারে না।

'আপনার হাতে সাইত করলাম—আশীর্বাদ করবেন বাবু।'

বিপ্রপদ হেসে সম্মতি জানায়। মাঝি নৌকা ছেড়ে জোরে জোরে বইঠা বাইতে থাকে, আর চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে পাটাতনের তলা। এ সব জিনিষ ওকে কতখানি কেউ দেবে না, তবু ওর মনে আনন্দ হয় খুবই।

খালের পাড়ে বাড়ীর ঘাটে যখন এসে নৌকা ভেড়ে তখন খালের বুকে জোয়ার এসেছে। দেখতে দেখতে খাল ভরে গেল। কতগুলো লম্বা-লম্বা হেউলী ঘাস চিরে নৌকা এসে ঠেকল একেবারে পাড়ে। সংবাদ পেয়ে ছেলেমেয়ের দল এলো কলরব করে ছুটে।

সেবা এলো কোলে চড়ে হাসতে হাসতে। 'কই, বাবু কই?··· ওই!' সে কচি একটা আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে।

বিপ্রপদ একটু হাসেন।

অমরেশ দৌড়ে এসে মাছটা নিয়ে পালাতে চায়।

বিপ্রপদ বাধা দেয়, 'আরে থাম্ থাম্, তুই পারবি কেন?'

'না না, আমি পারব, খুব পারব—ইঃ, বড় তো একটা মাছ!'

'তাহ'লে নিয়ে যা, দেখব কত শক্তি তোর!'

খালিবটা নিয়ে গিয়েই অমরেশ হাঁপিয়ে পড়ে।

'কি রে, তখন বলেছিলাম না!' অমরেশকে সাহায্য করেন বিপ্রপদ। এখন সে অবলীলাক্রমে মাছটাকে নিয়ে যেতে পারে।

বিমলা বিদ্রূপের হাসি হাসে—অমরেশ দাঁতে জিভ কেটে উত্তর দেয়।

বিপ্রপদ দু'জনকেই চোখ রাঙান।

বাড়ী এসে বিপ্রপদ একটুও বিশ্রাম না করেই হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে যান। তাঁর প্রিয় গাছগুলো কেমন আছে—কত বড় হয়েছে—নিজের চোখে একবার না দেখে সুস্থ থাকতে পারেন না। ওরা যেন কোন মায়ায় বিপ্রপদকে আকর্ষণ করে নেয়। এই ওই সুগন্ধি নেবুর চারাটি। কেমন অজস্র ফল হয়েছে। কিন্তু কি যেন একটা বুনো লতায় জড়িয়ে ধরেছে ওকে শক্ত করে। গাছটা একে ছোট এখন, তাতে ফলন্ত—যেন শ্বাসরোধ হয়েছে। বিপ্রপদ লতাকে ছিঁড়ে গাছটা মুক্ত করে দেন। তিনি বাড়ী নেই, ওদের কেই বা দেখে কে-ই বা যত্ন করে! ঐ তো আমের কলম দু'টি। আঃ কি সুন্দর দু'টি দু'টি আমও হয়েছে! ওরা ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। যেন লাজ্জতা দু'টি যুবতী বান্ধবী গাছপালার আবডালে এসে থমকে রয়েছে। ওরা বিদেশী। বিদেশ থেকে এসে এখনও যেন সম্পূর্ণ পরিচিত হতে পারেনি এদেশী বন্ধু-বান্ধবীর সাথে। তবু মানিয়েছে বড় সুন্দর। বিপ্রপদ ঘুরে ঘুরে সব গাছগুলো দেখেন। পাতা ধরে একটু নাড়া-চাড়া করেন। কত দিন তিনি এ গাছগুলো না দেখেছেন, তবু আজ তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়—বিস্ময়ের সৃষ্টি করে পদে-পদে। মমতার কাজল পরিয়ে দেয় চোখে। একখানা পাতলা মেঘ নিচু দিয়ে ভেসে যায়, আসে একটা ছোট্ট পূবালী দমকা হাওয়া, বর্ষা নামে—ভিজিয়ে দিয়ে যায় মুগ্ধ বিপ্রপদকে। দূর থেকে একটা অজানা ফুলের মৃদু সৌরভ ভিজা বাতাসে জড়িয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্রপদ আঘ্রাণ করেন বুক ভরে।···

অমরেশ পা টিপে-টিপে পিছন থেকে এসে বিপ্রপদর হাত ধরে সরল এক টান। 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?'

'দেখছি বাগানের গাছগুলো কেমন হলো।'

'তোমার যে গা-হাত-পায় কাদা লেগেছে। চলো, ধোবে চলো। বোশেখ-জৈষ্ঠি মাসে আমরা এবার কি কষ্টই না করেছি! কত জল ঢেলেছি ঐ গাছগুলোর গোড়ায়। জল টেনে আনতে আনতে দিদিরা এক একবার নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি হাঁপাইনি একটুও। এক-এক দিন আমি একাই—'

'জল টেনেছ, আর কেউ আসেনি, না?'

হ্যাঁ বাবা, আমি একাই টেনেছি, আবার একাই সব গাছে জল ঢেলেছি।'

'দূর! অসম্ভব কথা বলতে নেই বাবা। ওকে মিথ্যা কথা বলা বলে। কখনও মিথ্যা বলা কি ভাল?'

ঘাটে এসে বিপ্রপদ পায়ের কাদা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেন। অমরেশও পা ধুয়ে ওঠে। পুকুরটার বুক-বোঝাই কালো জল টলমল করছে। তার ভিতর চার দিকে অগুণ্তি রাঙা ও শাদা শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। তারই মধ্যে জোড়ায়-জোড়ায় বাড়ীর হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে একটা ডাহুক লুকাল গিয়ে ঢেঁকিতলার বনে।

নিতাই মেঠো-পথে জল কাদা ভাঙতে ভাঙতে ধানের রোয়ার মাঝ দিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে-ও ঘাটে এসে পা ধুয়ে বিপ্রপদর পিছু নেয়।

'কেমন আছো নিতাই? ইমামই বা আছে কেমন?'

'আমাদের থাকা-না-থাকা দুই সমান বাবু!'

'সে কেমন?'

'সেই বাড়ী থেকে গেলেন, বলে গেলেন—এই তো এলাম বলে, আর আমাদের কথা ভুলেই গেলেন। বোশেখ গেল,—জৈষ্টি গেল—বর্ষা নামল—আমি ভাবি এই তো বাবু আসেন, কিন্তু বাবুর দেখা নেই। মাঠাকুরুণ বলেন তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন, তুমি ভেবো না—ঠিক সময় মত এসে হাজির হবেন। আউসের মরসুম গেল, আমনের জো এলো, পথের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেস করে বসে থাকি, কিন্তু কোথায় আপনি! লোকের টিটকারীতে আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না, ইমাম তো বড় একটা এদিকে আসেই না। আমরা বিদায় নিতে এসেছি—ইমাম আর আসবে না।'

'বসো নিতাই, তামাক-টামাক খাও। যখন ইচ্ছা তখনই তো যেতে পারবে, কিন্তু অনেক দিন বাদে দেখা হলো একটু কথাবার্তা বলি। তোমরা তো আর আমার মাইনের চাকর না, তোমাদের আটকায় কে? ছুটির জন্য যে আমি কত চেষ্টা করেছি তা বললে তো বিশ্বাস করবে না।' বিপ্রপদ জামা-কাপড় বদল'তে বদলাতে বলেন, 'সে কম চেষ্টা; কিন্তু কিছুতেই কিছু সময় মত হলো না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ নিতাই—অদৃষ্ট মন্দ!'

'তা না হলে একটা বছর জমিগুলো খিল যায়, চুনো পুঁটিতেও করে অপমান! দেখেনি নিতাই-ইমামের থাবা, কত শক্তি এই বুনো থাবায়।' বলেই নিতাই সশব্দে একটা থাবড়া মারে মাটির ওপর।

ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে যায়।

'দুঃখ করো না নিতাই, সবুরে মেওয়া ফলে—সবুর করে দেখো।'

'কি ভুল যে হলো বাবু, ঘোষালেরা আস্কারা পেল, একটা খন্দ মাটি হলো।'

'বিগত বিষয় নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? যা হওয়ার না তা হয়নি, সে কথা আর ভেবে কাজ নেই। আসছে বছর দেখা যাবে। এ দিকের সংবাদ কি?'

'তালুকের?'

'হ্যাঁ।'

'মেহেরপুরের বাঁকে নৌকা লাগিয়ে সেন মশাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখানে তাঁদের একটা কাছারী আছে!'

'বেশ, তা হলে আজই বিকালে চলো।'

'তাই চলুন, দেরী করা ভাল না। আমি সময় মত আসবো। এখন তা হলে উঠি।'

'ইমাম কেমন আছে? ওর সেই ছেলেটা?'

'সব ভাল আছে। এখনও সংবাদ পায়নি, তাই আসেনি। আপনার ওপর কি আমাদের রাগ সাজে! ওরা সেন মশাইর সাথে কথা চালাচ্ছে।'

'বুড়ো বলেন কি?'

'সে নিজের কানেই শুনতে পাবেন। সে কি যে-সে বুড়ো!'

কিন্তু আমরা যখন যাবো তখন যদি ঘোষালেরা টের পায়? চুপে-চাপে কি কাজ করা ভাল নয়?'

'এ সব গোপনে হলেই ভাল হয়—শত্রুর তো অভাব নেই—কিন্তু ধড়িবাজ বুড়ো নিজেই ঢাক বাজাচ্ছেন, আপনি আর চুপ করে করবেন কি?'

'তবে চলো বিকাল বেলা, ইমামদের সংবাদ দিও।'

'আচ্ছা বাবু।'

২০

আহার করতে বসে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'দীনুদা'র খবর কি? তিনি তো এদিকে এলেন না। আর আমিও তো তাঁকে সংবাদ দিতে সময় পাইনি।'

কমলকামিনী বলেন, 'সংবাদ দেবে কি, তিনি এদিকে আজকাল বড় একটা আসেন না। বাড়ীতে না কি একখানা দোকান দিয়েছেন—হরদম গাহেক-পত্তর—কোথাও বেড়াবার তাঁর সময় নেই।'

ভালই তো—নিজের কাজ নিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকেন। দোকানদারীর সুবুদ্ধি তাঁকে কে দিল? টাকা-পয়সাই বা পেলেন কোথায়? এখন বোধ হয় সংসারে অভাব-অভিযোগটাও কম। বেশ, বেশ।'

উত্তরে কমলকামিনী হাসেন। একটা সন্দেহ হয় বিপ্রপদর, তাই খেয়ে উঠে তিনি একখানা লাঠি-হাতে দীনুর বাড়ীর দিকে রওনা দেন।

বারান্দায় তিন-চার জন গ্রাহক বসে। দীনু তামাক টানছে—গ্রাহক ক'টি প্রসাদের আশায় অধীর হয়ে আছে। ঝুরঝুরিয়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। উঠানটায় কাদা হয়েছে খুবই। দীনু সুপারি গাছ অর্দ্ধেক করে চিরে পাশাপাশি রেল লাইনের মত পেতে দিয়েছে। বাড়ীর প্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে যেতে আর কাদা মাড়াতে হয় না। পুকুরঘাট থেকে পা ধুয়ে সরাসরি বিপ্রপদ বারান্দায় গিয়ে ওঠেন। 'দীনুদা, প্রণাম। আজ এসেছি। আপনি না কি দোকান নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তাই নিজেই এলাম দেখা করতে। দোকান কোথায়?'

'ভাল, ভাল। সুখে থাকো। দোকান করি আর যা-ই করি তুমি এসেছ শুনলে আমি একবার অবশ্য যেতাম, তোমার কি এত দূর আসতে হতো। পথ-ঘাট এঁটেল মাটি গলে যে পিছল হয়েছে।'

'দোকান কোথায় দীনুদা?'

'বাইরে কি সাজিয়ে রাখার জো আছে? সব শালা চোর, ছেলে-বুড়ো সব শালা। তাই তো দোকান তুলে মাচায় রেখেছি। দেখবে তুমি আমার দোকান? সব আছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব—তেল, নুণ, চাল, ডাল, বেনেতি, মনোহারী সব আছে। দেখবে, দাঁড়াও, সব নিয়ে আসছি।'

বিপ্রপদ বুঝতেই পারেন না যে এত বড় একখানা দোকান যদিও মাচায় তোলা থাকে তবুও এত সহজে কি করে নামিয়ে আনা যায়!

'ধরো, ধরো—এই ধরো' বলে দীনু অতি কষ্টে মাচার দুয়ার থেকে একখানা ডালা নামিয়ে এনে বিপ্রপদর সুমুখে রাখে। 'এই দেখ।'

দেখার সামগ্রীই বটে। হরেক রকম চিজ—না আছে এমন বস্তু নেই! এমন নির্বাচন, এমন সংরক্ষণ শুধু দীনুর মত ব্যবসায়ীর পক্ষেই সম্ভব!

গাব ও কুঁড়ো দিয়ে ডালাখানা বেশ পরিপাটি করে লেপা। পিঁপড়েটির পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। তামাক একপো, চিটাগুড় সেই পরিমাণ, ডাল আধ সের, তেল, নুণ, লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি এক সের—বাকীটা চাল; এই গেল মুদি মাল—এতেই যা ওজন। বেনেতি, পোঁটলায় পোঁটলায় কবিরাজী অষুধের মতো মোড়ক করা—খায় খাই সোডা পর্যন্ত। তার পর মনোহারী—দু'টি সূঁই, দু'টো 'আলোকজ্ঞান' সূতোর গুলি, দু'খানা ছোট্ট সাবান, মূল্য এক আনা। হোমিওপ্যাথিকের বড় একটা শিশিতে কি যেন লাল রং, তাই না কি তরল আলতা—আরো কত কি! মোট জমা পাঁচ টাকা কয়েক আনা! একটা হিসাবের খাতাও দেখায় দীনু। লেখা আছে অদ্য পর্যন্ত পঁচিশ টাকা বিক্রি হয়েছে, মূলধন ঠিকই আছে। তবু দীনুর সে কি চিন্তা! প্রায় সওয়া পাঁচ আনা বাকী পড়েছে। তবে চিটাগুড়টায় খুবই আয় দেখাচ্ছে, কারণ বলা উচিত না—বর্ষাকালে যথেষ্ট কাদা ভেজাল দেওয়া চলে। নুণ-সোডা তো জলো হাওয়ায় ওজনে বাড়ে, বেচে বেচে ফুরায় না। এ সব বিপ্রপদর কানে-কানে সগর্বে দীনু বলে যায়, কিন্তু প্রকাশ্যে গ্রাহক-সমাজে বলে যে বিলেত বাকীর জন্য তার দোকান আর কিছুতেই চলবে না। এ দুনিয়ার লোক বাকী খেয়ে কেবল দীনুকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে কি তাদের ভাল হবে?

'ঠাকুরদা, এক পয়সার লঙ্কা দেবেন? ভাল লঙ্কা আছে?'

'থাকবে না কেন—পয়সা?'

'দেখি কেমন লঙ্কা?'

'দেখি কেমন পয়সা?'

'ঠাকুরভাই একেবারে নগদ-ছগদ—ভাল জিনিষ চাই।'

'জিনিষ বাপু খুবই ভাল, কিন্তু পয়সাটা কোথায়?'

'ওজন করুন না, এই তো।'

'হাতে দাও, ঘষা না ভাল দেখে নি, তার পর তো জিনিষ?'

'সওদা আগে, না পয়সা আগে?'

'পয়সা আগে বাবা, পয়সা আগে। কথায় বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল। কড়ি আগে না তেল আগে? তুমি তো কচি খোকাটি নও যে কিছু বোঝ না।'

'পয়সাটা কাল সুপারী বেচে হাটের পর দিয়ে যাবো—এটুকু বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে?'

'তুমি কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির না কি হে? আমিও যে কাল তোমাকে লঙ্কা মেপে দেবো এটুকু কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'দিন দিন—এই যে পয়সাটা।' বলে লোকটি দীনুর হাতে পয়সাটি দিয়ে নিজের মনে-মনে বলতে থাকে, ভেবেছিলাম এই পয়সাটার পান নেবো, ধোপা-বৌ যে মুখরা—তা আর হলো না। ঠাকুরভাই একেবারে নাছোড়বন্দা! এত শক্ত হলে কি মুদী কারবার পাড়াগাঁয়ে চলে?'

এ সব কথা দীনু শুনেও শোনে না। সে পয়সাটা ভাল করে দেখে-শুনে একটা তৈলাক্ত থলিতে ভরে রেখে লঙ্কা মেপে দেয়। গোটা আষ্টেক লঙ্কা তাও গ্রাহকটি দু'-তিন বার অদল-বদল করে একটা-আধটা বেশী নিতে চায়। সামান্য বচসাও হয়, অবশেষে তা নিয়ে চলে যায়। বোঝা যায়, নগদ পয়সা দিয়ে এমন ছাতকুঁড়ো-পড়া মাল সে নিতান্ত ঠেকেই নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, 'ঠাকুরদা, আমি যে বসে রইলাম।'

'কেন বসে আছ বাছাধন?'

'ছেলের কাছে এক ছটাক ডাল মেপে দিয়েছেন, তা তো ওজনে কম!'

দীনু রেগে ওঠে। 'তবে কি আমি চোর? বামুনের ছেলেকে চোর বললে তোমার চোদ্দ পুরুষ নরকে যাবে। আমি ত্রিসন্ধ্যে যে হাত দিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করি সেই হাতে মেপে দেবো কম? বলুক দেখি এরা কে বলতে পারে আমায় চোর?'

দীনু গলার জোরে জিতে গেল, কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

'তবে ডাল হলো কি ঠাকুরদা? এ তো নুণ নয় যে জল হয়ে যাবে।' গ্রাহকটিও সহজে ছাড়বার লোক নয়। সে-ও ঘোঁট দিয়ে বসে থাকে।

'ভূতে খেয়েছে আর হবে কি? দেখি তোমার ডাল, দাও তো পাল্লার ওপর।'

লোকটি গামছার এক কোণা খুলে ডালগুলো ঢেলে দেয়।

দীনু সুকৌশলে পাল্লা ধরে। বাস্তবিক ডাল মাপে কম হলেও পাল্লা সরল রেখায় দুলতে দুলতে এমন স্থানে স্থির হয় যে মাপটা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

'দেখ, দেখ তোমরা—আমি না কি মাপে কম দিয়েছি? ব্যাটা বেয়াকেলে ছোটলোক কোথাকার।'

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তবু বলে, 'হাটের মাপে আর এ-মাপে যেন কেমন কম-বেশী আছে। আমরা সওদা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম।

'দেখছ, দেখছ—তবু ওর গড়গড়ানি দেখছ? শুধু সন্দেহ! তুই জাহান্নামে যাবি।'

লোকটা আর কিছু না বলে ডালগুলো গামছায় বেঁধে উঠে যায়।

যারা বোঝে তারা অন্তরে অন্তরে শিউরে ওঠে, আর যারা না বোঝে তারা দীনুর ন্যায্য মানদণ্ডের দিকে চেয়ে ভক্তিতে মাথা হেঁট করে।

বিপ্রপদ মনে মনে ধন্যবাদ দেয় দীনুকে, 'বাহাদুর বটে!'

যারা এসেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে চলে যায়। দীনু অতি-জীর্ণ বাটখারাগুলো দু'-এক বার নেড়ে চেড়ে উঠিয়ে রাখে। ডালাটা সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ করে বাঁধে। মাচার দুয়ারে তুলে রাখে। তার পর বিপ্রপদর কাছে এসে বসে। 'খবর কি ভায়া?'

'বৈকালে আপনাকে যেতে হবে আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'সেনেদের বোধ নৌকায়।'

'নিশ্চয় যাবো' তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ঘোষালেরা আমায় খবর দিয়েছিল কিন্তু আমি যাইনি ওদের সাথে।'

'কেন যেতে হবে বুঝেছেন বোধ হয়?'

'হুঁ, সে আর বুঝিনি! শত হলেও তুমি আমার প্রতিবেশী স্বজাতি। তোমার তুল্য আমার আর কে আছে বিপ্রপদ? আমার ভাই নেই, বন্ধু নেই, রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে, উত্থানে-পতনে তুমিই আমার ভাই—তুমিই আমার বন্ধু। দীনুর ভাষা গদগদ হয়ে আসে—চোখেও যেন জল দেখা যায়।

বিপ্রপদ মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'তবে চলুন দীনুদা—আজ আপনার অগ্নি-পরীক্ষা হবে সেনেদের বোধ নৌকায়।'

'আমি একনিষ্ঠ—নিশ্চয় উত্তীর্ণ হবো এ পরীক্ষায়।'

'তাই তো আমি চাই দীনুদা, তাই তো চাই।'

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

রিক্ত দিনেরা ভিড় ক'রে আসে শূন্যতায়,
কত ব্যথালতা হৃদয়ের তরু-শাখা জড়ায়—
দেহ মন জুড়ে আগুন জ্বলে।

মাঠের ফসল ঘরে নেওয়া হলে—

শূন্য শ্মশান পরে,
তৃষিত প্রাণের হাহাকার ক'রে পড়ে।
বন-মরুভূমি বর্ষণ-বেগ চায়—
হায় কোথায়?

স্তব্ধ প্রাণের গান
চেতনাশূন্য হ'বে কি আমার শস্যবিহীন প্রাণ?
ক্রন্দন শুধু আবেগের মেঘে ভাসে নীল অম্বরে;
শ্রাবণের ধারা শ্রান্তিবিহীন ঝরে।

ঋজু হয়ে ফোটে রজনীগন্ধা ফুল,
গন্ধ ছড়ায় ঝরা সে বকুল।
আমার এ প্রাণ অসহ শূন্যতায়,
দিকে-দিগন্তে শুধু যে ছড়ায়
ব্যথায় অনল তায়—
প্রাণ-অরণ্য পুড়ে হ'ল ছারখার।

ঝান্সী রাণীবাহিনী

রাণু ভট্টাচার্য্য
[আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ যোদ্ধা বিভাগ]

[গৌরচন্দ্রিকা

স্বস্তিবাচন একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বিশেষ স্থলে ইহার উপযোগিতা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপর আলোকসম্পাত করা প্রয়োজন তার গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটনের জন্য।

ঝান্সী রাণীবাহিনী কি? "A mere efflorescence of decay, a stage-dream, which the first break of day-light will dissipate into dust"—তা নয়। তবে কি? ঘন মেঘের সমাবেশ, বিপুল বজ্রনির্ঘোষ, প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত, প্রবল বারিবর্ষণ ও প্রচুর ফলের সম্ভাবনা! ইহা নেতাজীর নিজস্ব পরিকল্পনা। একটা psychological factor—স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয়!

বিপ্লবের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ভারতের অবিসম্বাদী নেতা আমাদের নেতাজী। হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন তিনিই। তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এবং তাহা বিশিষ্ট ভাবে রূপায়িত হয়েছিল ঝাঁসী রাণীবাহিনী মধ্যে দিয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার গণশক্তি ছিল সুপ্ত, তাকে জাগ্রত জাতীয়তায় উদ্‌বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। আর ছিল প্রয়োজন, দেশের যুব-শক্তির প্রেরণা দান। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল, আশাতীতরূপে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করা হয়েছিল পুরুষ-বাহিনী গঠনেই। নারী-বাহিনী গঠন করে নেতাজী sex disability তুলে দিলেন। চিরতরে উঠিয়ে দিলেন bar-sinister—যাকে complex বলা হয়। যা পৃথিবীতে কোথায়ও নাই নেতাজী তিন মাসের মধ্যেই তাই করলেন। জার্ম্মাণী ও জাপান—যে দুই দেশ সব চেয়ে জঙ্গী বলে বিখ্যাত সেই দেশেও মেয়েদের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সৈন্য-বাহিনী (fighting force) নেই, যাহা আছে তা Auxiliary Force—non-combatants—সেবা, শুশ্রূষা ও অন্যান্য সাহায্য করবার জন্য; ইহা সত্যই "whispering galleries" of the Westএ আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়েছিল। অতঃপর পুরুষ ও নারী সমপর্য্যায়ে সমাজ ও দেশ-সেবার অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হলো। আমরা "জগৎ-সভার শ্রেষ্ঠ আসন" পেলাম।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের জন-শক্তি বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে বলিতে পারি যে দঃ-পূঃ এশিয়াতে খুব কম বাঙ্গালী মহিলাই ছিলেন যাঁরা আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ অথবা ঝাঁসী রাণী বাহিনীতে যোগদান করেন নাই। নেতাজী সকল বয়সের মেয়েদেরই দেশসেবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। বালিকা হইতে প্রৌঢ়াদের পর্য্যন্ত সকলেরই যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োগ করেছিলেন। ঝাঁসী রাণী বাহিনীতে ১৪ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের পর্য্যন্ত "রংরুটদের" ভর্ত্তি করা হত।

ঝাঁসী রাণী-বাহিনীর সামরিক শিক্ষা কোন অংশেই শত্রুদের চেয়ে এমন কি জাপানী সৈন্যবাহিনী হতেও নিকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু যে ...র মধ্যে প্রথমোক্ত সৈন্যদের শিক্ষা হত তার এক-চতুর্থও ...ক সৈন্যের অর্দ্ধেক সময়ে ঐ শিক্ষা সমাপন করা হইত। তাহার কারণ, বাইরের চেষ্টা অন্তরের নিষ্ঠা; সর্ব্বোপরি নেতাজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ। এই বাহিনীতে দুইটি section ছিল—একটি Fighting (যোদ্ধা) আর একটি Nursing (শুশ্রূষাকারিণী), তবে শেষোক্তদেরও মোটামুটি সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। স্বাস্থ্য ও অভিরুচি হিসাবে বিভাগ করা হতো। এটা খুবই আনন্দের কথা ছিল যে, যোদ্ধা-বিভাগে ঢুকবার জন্য বেশীর ভাগ মেয়েরাই জিদ্‌ করত এবং বিশেষ কারণে না দিলে নেতাজীর নিকট গিয়ে আবদার করতে কসুর করত না। অনেক চেষ্টা করে বুঝোতে হত যে দুই-এরই সমান প্রয়োজন এবং দুই কাজের দ্বারাই তুল্য ভাবে সেবা করা যায়। আমি বলতে গর্ব্ব বোধ করছি যে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি রোগীর পার্শ্বে মেয়েরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল; অফিসারদের সৈন্য পরিচালনা ও আনুসঙ্গিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। মোট কথা, যাহাতে এই সৈন্য-বাহিনী স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে সেরূপ ভাবেই তৈরী করা হয়েছিল। সব চেয়ে নেতাজী এই বাহিনীর প্রতি বেশী মনোযোগ দিতেন। এটা একরূপ তাঁর দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছিল অপরিমেয়রূপে। এই প্রসঙ্গে কয়েক জন বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যদের (Officer and other ranks) নাম বোধ হয় আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা হবে—

(১) লেঃ গৌরী ভট্টাচার্য্য B.A. বার্ম্মা—যোদ্ধা বিভাগ
(২) লেঃ প্রতিমা সেন— বার্ম্মা— "
(৩) সেঃ লেঃ লাবণ্য চাটার্জ্জি—মালয়—শুশ্রূষা বিভাগ
(৪) সেঃ লেঃ প্রতিমা পাল— মালয়—যোদ্ধা বিভাগ
(৫) সেঃ লেঃ অরুণা গাঙ্গুলী— বার্ম্মা— "
(৬) সেঃ লেঃ করুণা গাঙ্গুলী— " "
(৭) সাব অফিসার মায়া গাঙ্গুলী— " "
(৮) সাব অফিসার রাণু ভট্টাচার্য্য— "—(প্রবন্ধের লেখিকা)
(৯) সাব অফিসার রেবা সেন— "—শুশ্রূষা বিভাগ
(১০) হাবিলদার শান্তি ভৌমিক—মালয়—যোদ্ধা বিভাগ
(১১) হাবিলদার বেলা দত্ত— "—শুশ্রূষা বিভাগ
(১২) নায়ক অঞ্জলি ভৌমিক— "—যোদ্ধা বিভাগ

ইঁহারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান; স্কুল বা কলেজে পড়া; শান্ত স্বভাবের। মোটেই দুর্দ্ধর্ষ নয়। বয়স ১৪ হইতে ২৫এর ভিতরে। ঠিক আমার এখানকার মেয়েদের মত। অভিভাবক উকিল, ডাক্তার, চাকুরিজীবী ইত্যাদি। বেশীর ভাগই এখন দেশে এসেছে কিন্তু একরূপ অপাংক্তেয় হয়ে আছে। "স্বাধীন ভারতে" (?) এরা স্থান পাচ্ছে না। অদৃষ্টের পরিহাস!

সমাজ-দেহের দুষ্ট ক্ষতের মত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী: সত্যই উহা জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); বোধ হয়, শান্তির মত এ-ও অবিভাজ্য (indivisible)। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ—সকলের উপর "মানব-বাদ"; এবং যত দিন মানুষ মানুষ থাকবে, তত দিন যুদ্ধ চলবেই। দেবতাদের ভিতরে কি সংগ্রাম ছিল না? Fallen angels কোথা থেকে এল? কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি না হয় নিলাম না, কিন্তু ইতিহাস ত আর ফেলে দেওয়া যায় না? সকলেই যে ভগবান, বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্ট হইবে তার লক্ষণ ত আপাতত দেখছি না; বরং কাঁটা অন্য দিকে ঘুরছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে যুদ্ধ কঠোর সত্য, স্বতঃসিদ্ধ, সমাজ-ক্ষতের নিদর্শন। এই ক্ষতের উপর প্রলেপ দেওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল ঝাঁসী রাণী-বাহিনী। কবিগুরুর ভাষায় তারা

"লেপে দিল দেহ আপনার করে
সিতচন্দন-পঙ্কে"

ঝাঁসী রাণীবাহিনী কি আজ মৃত ? না, তবে "ঘন মেঘে অবলুপ্ত।" ভারতের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আছে, নেতাজীর দ্যোতনা—প্রাণের ব্যঞ্জনা। বাহিরের প্রকাশ ? বোধ হয়, ভারতের সেই মহামানবের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করছে! জয়তু নেতাজী!

শ্রী এ, এন, সরকার

প্রাক্তন মন্ত্রী, আজাদ হিন্দ, সরকার, জনশক্তি ও রাজস্ব বিভাগ]

পটভূমিকা

১৯৪২ সাল; মে মাস। রেঙ্গুন জাপানীদের অধিকারে সবে মাত্র আসিয়াছে। চারি দিকে থমথমে আতঙ্কগ্রস্ত ভাব। অনাগত ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সবাই উদ্বেলিত হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে। সবাই যেন অসহায় ও আত্মবলে অবিশ্বাসী। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সকলেই বসিয়া আছে। প্রথমে পলায়মান ইংরেজদের পোড়া মাটি নীতির (Scorched earth policy) ফলে সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, তার পর তাহাদের অনুচর চীনা সৈন্যদের হিংসা-চরিতার্থের ফলে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে নৃশংস বর্মীদের লুণ্ঠন ও নরহত্যার লীলাতে রেঙ্গুন ও তাহার উপকণ্ঠ শ্মশানে পরিণত। এমন কি গৌড়ীয় মঠের কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত রেহাই পায় নাই। এই জন্য জাপানীদের আগমন যদিও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হইত, তবুও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল না। কেন না, অন্ততঃ তাহারা সভ্য ও শক্তিশালী জাতি হিসাবে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে এবং এশিয়ার জাতি হিসাবে সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিবে। জাপানের ঘোষিত নীতি "বৃহত্তর এশিয়া" গঠন (Greater Asia co-prosperity sphere) আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল ও সমবেদনার সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কয়েক দিন জাপানীদের সংস্পর্শে আসিয়া দেখা গেল যে, তাহারা সরল ও আড়ম্বরশূন্য ও মোটেই দাম্ভিক নয়। ব্যবহারিক জীবনে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনই পার্থক্য দেখা গেল না।

বাল্যজীবন, সংস্কার ও ঐতিহ্য

আমাদের পরিবারের বাসভূমি বাংলার নদীমাতৃক দেশে, যাহা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদের এবং পরে মুসলমান নবাবের অধীনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকায় যুদ্ধের বৃত্তান্ত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হইত এবং বীরত্বের কাহিনী শরীরে রোমাঞ্চের সঞ্চার করিত। অনেক সময় মনে হইত রামের কি অর্জ্জুনের মত যোদ্ধা কি একালে হওয়া সম্ভব ? তার পর একটু বড় হইলে ইতিহাসের ঘটনা শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতাম। বিশেষতঃ অহল্যাবাঈ, চাঁদবিবি ও ঝাঁসীর রাণীর বিবরণ শুনিয়া রক্তে উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইত ও বিপুল শিহরণ অনুভব করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে কবির রণভেরী কানে বাজিয়া উঠিত—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" তখন হইতেই মনে হইত যে আমি একটি সামান্য বালিকা হইলেও যদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচেষ্টা করি তবে কি আমি এক জন যোদ্ধা হইয়া ভারতমাতার নিগড় চূর্ণ করিতে পারিব না? তখন স্বাধীনতার কোনই ধারণা ছিল না, তবে ইংরাজদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ইহার একটা আবছায়া ধারণা ছিল।

অঙ্কুর উদ্গম

বাল্যকালে যে শিক্ষার বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহা এত দিনে গজাইয়া উঠিল। ইংরাজ-শাসনের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিদ্বেষ ছিল, ঘটনা-পরম্পরায় তাহা ঘনাইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের নগ্ন রূপ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বেতার-যোগে যে সমস্ত বার্ত্তা আসিতে লাগিল তাহাতে আমার মন বিষাইয়া গেল। ইংরাজ বণিকৃগণের মানদণ্ড ক্রমশঃ রাজদণ্ডে পরিণত হইয়া অবশেষে যে কদর্য্য বীভৎসতায় পরিণত হইয়াছিল তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত আমার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় ইংরাজদের পরাজয়ের ফলে আমাদের ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তবে কি ইংরাজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব? মনের ভিতরে যখন এইরূপ দোল দিতেছিল, তখনই এক দিন শুনিলাম, নেতাজী সোনানে (সিঙ্গাপুরে) পদার্পণ করিয়াছেন এবং আজাদ হিন্দ, ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের পদে বৃত হইয়াছেন। তথাকার ভারতবাসীরা নেতাজীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব (তন্ মন্ ধন্) নেতাজীর পায়ে সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা নেতাজীর রেঙ্গুন আসিবার সম্ভাবনায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। কিছু দিন পরেই আজাদ হিন্দ, সরকার সমারোহের সহিত গঠিত হইল এবং উহা ভারতবাসীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে আমাদের ভিতরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এইবারে বর্ম্মাতেও আজাদ হিন্দ, সরকারের কার্য্যকলাপ প্রসারিত হইবার সম্ভাবনায় আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এমন সময় আজাদ হিন্দ, ফৌজের কয়েক জন অফিসার রেঙ্গুনে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহরের বাহিরেই একটি নাতিবৃহৎ সভার আয়োজন করা হইল। আমরা সকলেই সেই সভায় যোগ দিলাম। স্বস্তিবাচনের পরই নেতাজীর মহান্ আদর্শ সম্বন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ, বাহিনী কিরূপে গঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিক্ষা ও দীক্ষার আয়োজন কি করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইল। এই বাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশ হিসাবে অভিনব একটি মহিলা সৈন্যবাহিনী অনতিপূর্ব্বে গঠিত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইল। ঝাঁসীর ঐতিহাসিক রাণী লক্ষ্মীবাঈর নাম অনুসারে ও তাঁহার মহান্ স্মৃতির রক্ষাকল্পে ঐ বাহিনীর নামকরণ "রাণী ঝাঁসী বাহিনী" হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ নেতাজীর মৌলিক ধারণা ও পরিকল্পনা। জাপানী মিলিটারীর অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এমন কি, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করিবার জন্য জাপানের তদানীং প্রধান মন্ত্রী হিদেকি তোজোর সহিত সাক্ষাৎ পত্রালাপ করিয়াছিলেন। আরও শুনিলাম যে অনেক পুরাতন-পন্থী এই বাহিনীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালিকা ও তরুণী ভর্ত্তি হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন নেতাজীর আহ্বান চারি দিকে তূর্য্য-নিনাদের মত পৌছিল তখন বালয়ের

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম হইতে দলে দলে মেয়েরা যোগদান করিতে লাগিল।

উদ্বেলিত হৃদয়; আশা ও আকাঙ্ক্ষার দোল

এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া গেলাম। এক এক বার মনে হইতে লাগিল যে ইহা যেন রূপকথা। আমরা যেন প্রত্যেকেই শত দেউড়ীর ভিতরে সুরক্ষিত দৈত্যের বিরুদ্ধে উদ্যত অসিহস্তে অগ্রসর হইতেছি, আমাদের মাতৃভূমিকে ঐ দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা করিতে। মনে হইল, নেতাজী যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ ভাস্কররূপে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। আমাদের শিরা-উপশিরায় রক্তের উদ্দাম স্রোত বহিতে লাগিল "জীবন-মরণ পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" হইল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে আমি ঝাঁপাইয়া পড়িলাম মুক্তি-সংগ্রামে, ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর আহ্বানে, অবলার মর্মান্তিক আর্তনাদে ও শিশুর করুণ ক্রন্দনে।

১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাস আমার জীবনের স্মরণীয় সময়। যাহা কিছু মহান্, পবিত্র ও সম্মানজনক, তাহার আস্বাদ পাইয়াছিলাম সেই দিনই। আত্মীয়স্বজন, পরিবার, সমাজ, সে তো আছেই, কিন্তু যা নাই, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম সেই দিনই।

১৯৪৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর আমি বিজানন্দন (রেঙ্গুনের উপকণ্ঠ) ক্যাম্পে গিয়া হাজির হইলাম। তখন মিসেস্ চন্দ্রন ক্যাম্প-কমাণ্ডার ছিলেন। সবে মাত্র ফৌজে ভর্তি আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫।৭ জন মেয়ে ক্যাম্পে দাখিল হইয়াছে। মিসেস্ চন্দ্রন আমাকে স্বাগত করিয়া ক্যাম্পে গ্রহণ করিলেন ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল সেই ঘরে আরও তিনটি মেয়ে ছিল—তাহাদের নাম অপর্ণা, মায়া ও নীরা, সবকেই বাঙ্গালী। আমরা সকলেই মেঝেতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিতাম ও শীঘ্রই ক্যাম্পের শিক্ষা আরম্ভ হইবে এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতাম। তবে আমরা স্থির সংকল্প করিয়াছিলাম যে, শিক্ষা যতই কঠিন হউক না কেন আমরা তাহা সমাপন করিব, কারণ আমরা বেশ জানিতাম যে নেতাজীর আহ্বানে দেশমাতৃকার সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে।

ঝান্সী রাণীবাহিনী গঠন

১৯৪৩ সালে জুন মাসের প্রথমে নেতাজী সাইগন হইতে এরোপ্লেনযোগে সিঙ্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সকাল ৯টার মধ্যে আসিবার কথা ছিল কিন্তু আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকায় ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুণ প্লেন আসিতে বিলম্ব হইল। এই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ক্রমশঃ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দিক্‌চক্রবালে একখানি প্লেন দৃষ্টিগোচর হইল। গেলাং এরোড্রোমে সমবেত জনতা আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রায় ১১টার সময় নেতাজী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাতং উপকণ্ঠের বাড়ীতে রওনা হইয়া গেলেন।

৩৩া জুলাই পূর্ব্ব-এসিয়া সম্মেলনে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের "বাগ-ডোর" হাতে লইয়াছেন ঘোষণা করিলেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই একটি মেয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করিবার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নেতাজীর আহ্বানে অভূতপূর্ব্ব সাড়া মিলিল এবং মেয়েরা দলে দলে আসিয়া যোগ দিল। কমাণ্ডার কে হইবে এই চিন্তা তাঁহাকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সংস্পর্শে আসিলেন এবং তাহারই মধ্যে ভবিষ্যৎ অধিনায়কের স্বরূপ দেখিয়া তাঁহাকেই এই কার্য্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই মহিলাটি অদ্ভুত খেয়ালী; ঝড়ের মত গতিবেগশীলা ও ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যসম্পন্না—একটু অনন্যসাধারণ প্রকৃতির। নেতাজীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া সে স্থির ও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল; তার পরই একেবারে নাচিয়া উঠিয়া বলিল যে, সে ঐ পদের দায়িত্ব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে এবং তাহার প্রতি যে সম্মান দেখান হইল তাহা জীবনে ভুলিবে না। এখন সমস্যা হইল, কোথায় ট্রেনিং-ক্যাম্প খোলা যায়। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের পুনর্গঠন বিভাগের জন্য তিন-চারিটি বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক লেঃ কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এ, সি, চাটার্জ্জি ও বিভাগীয় সম্পাদক এ, এন, সরকার (এঁরা পরে মন্ত্রী হইয়াছিলেন) ডাঃ লক্ষ্মীকে (পরে কর্ণেল) সঙ্গে করিয়া বাড়ী কয়েকটি দেখাইলেন এবং মেয়ে সৈন্যবাহিনীদের শিক্ষার জন্য যে কোন বাড়ী দিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে নানা কারণে ঐ সব বাড়ী লওয়া হইল না। সিঙ্গাপুর সহরের মধ্যস্থলে একটি নূতন ক্যাম্প তৈরী করা হইল। ২২শে অক্টোবর একটি রোমাঞ্চকারী বক্তৃতা দিয়া নেতাজী ঐ ক্যাম্পের উদ্বোধন করিলেন। বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি বলিলেন—"সত্য ঝান্সীর রাণীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু তাঁহার আত্মা অবিনশ্বর, অজেয়, অমর। আবার ভারতের বুকে ঝাঁসীর রাণীর একা নয়, হাজারে হাজারে আবির্ভাব হইবে। ভারতের বিজয়-কেতন প্রভাতের আলোতে উড়িতে থাকিবে।"

প্রথমে দুইটি Company গঠিত হয় কিন্তু ক্রমশঃ মেয়ে "রংরুট"এর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এই বাহিনীটির সম্প্রসারণ করা হয়। ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মোট ৬টা Companyতে উন্নীত করা হইয়াছিল ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল Front lineএর যোগ্য করিবার জন্য। তার পর রেঙ্গুনে ঝাঁসী বাহিনীর শাখা খোলা হইলে সেখানেও একটা Company গঠন করিয়া রেঙ্গুনের প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া একটি পলটনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাখিল হইবার জন্য মেমিওতে পাঠান হইয়াছিল। এই পলটনে আমিও অভিযানে গিয়াছিলাম ও সামান্য সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ফৌজি শিক্ষা

যেমন যোগীর মূলসূত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধ সেইরূপ ফৌজি শিক্ষার প্রাথমিক গুণ সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—উহাকে জঙ্গী ভাষায় ভিত্তি-প্রস্তর (bed-rock) বলা হয়। উহার ফলে অনেক লোক একসঙ্গে কাজ করিবার প্রেরণা পায় ও হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিতে পারে। কথায় আছে, সৈন্য মরে কিন্তু সৈন্যবাহিনী মরে না—ইহার গোড়ার কথা spirit de corps; সংযমই একের অন্যের সঙ্গে কাজ করিবার শক্তি দেয় এবং নিয়মানুবর্ত্তিতাই শৃঙ্খলার সহিত ক

করিবার স্পৃহা জন্মায়। এ সব ছিল মামুলি পদ্ধতি। এ ছাড়া নেতাজী জোর দিতেন নৈতিক শিক্ষার উপর। সাধারণতঃ ইহাকে নেপোলিয়ানের প্রবর্ত্তিত নীতি বলা হয়—যাহা জাপানীরাও অনুসরণ করিত: কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভারতেরই নীতি।

আমাদের ক্যাম্পের শিক্ষা খুব কঠিন ছিল। যাহা সাধারণ সিপাহীরা—অবশ্যই ইংরাজ সৈন্যবাহিনী এক বছরে শেখে তাহা আমাদের তিন মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইয়াছিল। সম্পূর্ণ শিক্ষা মায় জঙ্গলের যুদ্ধ ও পাহাড়ের যুদ্ধ এবং গেরিলা রণকৌশল ৬ মাসের মধ্যে আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। নিয়ে আমাদের শিক্ষার ও দৈনন্দিন কার্য্যের কিছুটা আভাস দেওয়া দেওয়া গেল: (১) ভোর পাঁচটায় উঠে নিজের নিজের জায়গা পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত হইতে হইত; (২) সাড়ে ৫টার সময় ঝাণ্ডা সেলামী হইত; (৩) তার পরই শরীরচর্চার জন্য প্রত্যহ বাহিরে দুই মাইল দৌড়াইবার পর P. T. হইত। (৪) বেলা ৭টার সময় চা-পানের জন্য অবসর মিলিত। অবশ্য এই চা বিলাসের সামগ্রী ছিল না, চায়ের পুরানো শুকনা পাতা গুড়মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার নির্যাস গলাধঃকরণ করিতাম। সাড়ে ৭টার সময় অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুচ-কাওয়াজের ময়দানে গিয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত অবিরাম নানারূপ শিক্ষা চলিত। তৎপরে আমরা ক্যাম্পে ফিরিতাম ও তিনটা পর্য্যন্ত ছুটি পাইতাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের আহারাদি বিশ্রাম চিঠিপত্র ইত্যাদি শেষ করিতে হইত। আহার্য্যস্বরূপ আমরা পাইতাম ভাতের সহিত সামান্য ডালসিদ্ধ (খোসাশুদ্ধ), কিছু শাকসব্জী ও কখনও কখনও একটু মাছ অথবা মাংস। প্রথম অবস্থায় কিছু দুধও পাওয়া যাইত ও কদাচিৎ ডিম্ব পাওয়া যাইত। ঠিক ৩টার সময় বাঁশী বাজিলে আমরা হিন্দী ক্লাসে যাইতাম। তৎপর বিকাল পর্য্যন্ত প্যারেড হইত। কোন কোন দিন অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে সেদিন প্যারেড বন্ধ থাকিত। পুনরায় বিকাল সাড়ে ৫টার সময় "কৌমী গানে" সমবেত হইতাম। ঐ অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র আমরা রাত্রের আহার সন্ধ্যার মধ্যেই গ্রহণ করিতাম। রাত্রে বাতি জ্বালানো নিষেধ ছিল। মিতব্যয়িতা বাদেও হাওয়া-জাহাজের আক্রমণ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। সপ্তাহে তিন দিন full kit লইয়া লম্বা রুট মার্চ করিতে হইত; সাধারণতঃ দৈনিক ১৫ মাইল রুট মার্চ হইত। এমন কি আমরা একবার সেমিও হইতে মাণ্ডালে পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ মাইল দুই দিনে অতিক্রম করিয়াছিলাম। যে সব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আমাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহার নাম: (১) রাইফেল, (২) বেয়নেট, (৩) হ্যাণ্ড গ্রেনেড, (৪) টমিগান, (৫) ব্রেণগান, (৬) স্টেন্‌গান, (৭) এণ্টি ট্যাঙ্ক রাইফেল, (৮) ২" মর্টার, (৯) পিস্তল।

আমাদের নিজের ক্যাম্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেন্ট্রি ডিউটি নিজেদেরই করিতে হইত। কখনও কখনও আমাদের নিশীথ আক্রমণের (night attack) মহড়া দেওয়া হইত। আমরা সঙ্গীন শিক্ষা সুচারুরূপে লাভ করিয়াছিলাম। জঙ্গলী ও পার্ব্বত্য যুদ্ধে খুব অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, কারণ, বার্ম্মা ফ্রন্টে ঐরূপ দেশই অবস্থিত। ইহা বলিতে গর্ব্ব বোধ হয় যে, জাপানীরা আমাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন।

আমাদের রেজিমেণ্ট দুইটি মোটা বিভাগ ছিল; যথা, ১। যোদ্ধার ইউনিট (Fighting force) ২। সেবিকা ইউনিট (Nursing unit)। শেষোক্ত বিভাগের সভ্যাদের হাসপাতালে প্রাথমিক ও আনুসঙ্গিক কতকগুলি চিকিৎসা-পদ্ধতি ও সেবা-শুশ্রূষা শেখান হইত। অবশ্য বৈকালিক অস্ত্রশিক্ষা আমাদের মতই তাহাদের লাভ করিতে হইত। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অফিসার ও অন্যান্য সিপাহী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য ছিল। অফিসারদের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার পদ্ধতি বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এই উদ্দেশ্যে কম্পাসের ব্যবহার, ম্যাপের জ্ঞান ও সঙ্কেত শিক্ষা দেওয়া হইত।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘে কৃষ্টি ও জ্ঞানবিকাশ বিভাগের মত আমাদের ভিতরেও অনুরূপ চেষ্টা করা হইত। ক্যাম্প-কমাণ্ডার স্বয়ং অবসর সময়ে আমাদিগকে সমবেত করাইয়া উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহ বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিশদ্ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিছু কিছু পুস্তক ও পত্রিকা আমাদের ভিতরে বিতরণ করা হইত এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইত। কখনও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার অথবা স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভ্যেরা আসিয়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সর্ব্বোপরি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নেতাজী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেন। আমরা অনেক বিষয়ে বালিকাসুলভ চপলতার সহিত তাঁহাকে কৌতূকপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম এবং তিনি সহাস্যে তাহার উত্তর দিতেন এবং সেই উত্তর হইতেই আমরা অতি দুরূহ বিষয়েও সহজে জ্ঞান অর্জ্জন করিতাম। যে শিক্ষা এখানে পাইয়াছিলাম তাহা দুর্ল্লভ এবং এই শিক্ষাই পরবর্ত্তী কালে আঁধারের ভিতরে আলোক-শিখারূপে পথ দেখাইয়াছিল। অবশ্য এই শিক্ষার সহিত কোন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, উহা ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অর্থ কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা যাহা ইংরাজীতে spiritual trainning বলা হইত। উহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোনই যোগ ছিল না। দেশই ছিল আমাদের ধর্ম্ম—জনগণই দেবতা।

ফৌজী তৈয়ারী (mobilization)

বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের রণাঙ্গনে যাইতে হইবে। কি আনন্দ! কি পুলক! ইহাই আমরা চাহিতেছিলাম। নেতাজীকে আমরা কত বার অনুযোগ করিয়াছিলাম যে, আমাদের কেন মুক্তিসংগ্রামে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পাঠান হইতেছে না? তিনি ইহা শুনিয়া কেবল হাসিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরই বিবরটি আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রি-সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং সব দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ অভিযানে একটি companyকে পরীক্ষামূলক ভাবে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। তদনুযায়ী অনতিবিলম্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। আমরা অবশ্য অসম সাহসিক কার্য্য বিশেষ কিছু করি নাই, কিন্তু যে গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় আমরা সম্পন্ন করিয়াছি। আমাদের আত্মপ্রসাদ এই যে নেতাজীর নিকট মাতৃভূমির সেবায় রক্তদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তাহা পূরণ করিয়াছি। যে stageএ আমাদের রণাঙ্গনে যাইবার সুযোগ মিলিয়াছিল তাহাতে দর্শনীয় কিছুই করিবার ছিল না; তবে আমরা যাহা করিয়াছিলাম

তাহা I. N. Aর despatchএ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে—উহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা

১৯৪৪ সাল। আমাদের মেমিও ক্যাম্পের স্থাপন সম্বন্ধে শত্রুরা গুপ্তচর হইতে সংবাদ পাইয়াছিল এবং যেহেতু নারীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করায় পুরুষদের ভিতরেও অভূতপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছিল, ইহার ফলে রংরুটের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছিল এবং যেহেতু নারী সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীদের উপরেও বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেই হেতু ঐ বাহিনীকে অঙ্কুরে বিনাশ করা শত্রুদের লক্ষ্যবস্তু হইয়াছিল।

আমরা আমাদের ক্যাম্পের নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যার কিছু পরেই শুইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত ক্যাম্প-প্রাঙ্গণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, নীরব, নিস্তব্ধ, কদাচিৎ ঈষৎ ঝিল্লীরব শ্রুত হইতেছে, আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ প্লেনের শব্দে পাহারা-রত সান্ত্রী বিপদের সঙ্কেত করিল। সকলেই ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী পরিখাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু আমি ও অরুণা বেপরোয়া হইয়া নিজ নিজ জায়গাতেই রহিলাম। তার পর কর্ণেল লক্ষ্মী আসিয়া আমাদের তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী আশ্রয়ে যাইতে বলিলেন। অরুণা প্রথমে এবং পরে আমি বাহির হইলাম। অরুণা একটি পরিখাতে আত্মগোপন করিল। আমি তখনও চলিতেছিলাম আর একটি পরিখার সন্ধানে। সহসা প্লেন হইতে flood light আমার উপর পড়িল এবং আমার রাত্রের পরিধান সাদা রঙের থাকায় আলো উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হইল। তৎক্ষণাৎই মারণাস্ত্র বোমাগুচ্ছ শ্রাবণের বারিধারার মত বর্ষিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে মেসিন গান চলিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঐরূপ ধ্বংসলীলা চলিতে লাগিল। যদিও ভীষণ ভাবে বোমাবর্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কোনও প্রাণহানি হয় নাই। আমি ও কয়েক জন সঙ্গী যে পরিখাতে ছিলাম তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল, আমরা সকলেই চাপা পড়িয়াছিলাম এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার স্বাদ পাইয়াছিলাম। শীঘ্রই রিলিফ দল আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিল। বলা বাহুল্য, আমাদের ক্যাম্পের জিনিষ-পত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বোমাবর্ষণের ভিতরেই সাঙ্ঘাতিক বিপদকে অগ্রাহ্য করি নাই। নেতাজী আমাদের ক্যাম্পে আসিয়া হাজির হইলেন এবং প্রত্যেকটি বালিকার খোঁজ নিলেন। ক্যাম্প-কমাণ্ডারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের তালিকা সংগ্রহ করিলেন। যদিও ক্যাম্পের কতকটা অংশ খাড়া ছিল তবুও কলের কামানের গুলীতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নেতাজী অবশ্য আমাদের অন্য স্থানে গিয়া আরামে রাত্রি যাপন করিতে বলিলেন, কিন্তু আমরা স্থান ত্যাগ করিব না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলাম। ক্যাম্প-কমাণ্ডার অবশ্য ইহাতে আনন্দিত হইলেন এবং নেতাজী আমাদের moralএর প্রশংসা করিলেন। তৎপর দিবস আমাদের ক্যাম্প পরিবর্ত্তন করার সময় আবার হাওয়া-জাহাজের আক্রমণ হইল ও মেসিন গান হইতে মাথার উপর দিয়া অবিরাম গুলী চলিতে লাগিল। আমরা মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, কিন্তু ইহা শেষ-শয্যা হইল না। এইরূপ অনেক বার হইয়াছিল; কারণ জাপানীদের প্লেনবিধ্বংসী কামান সামরিক কারণে কার্য্যে লাগান হইত না। কয়েক বার আমরা Time Bombএর হাত হইতে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়াছি। একটি বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ১৯৪৪ সালের শীতের প্রারম্ভে নেতাজী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মিঙ্গলাডনের (রেঙ্গুন) এক সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। সেখানে আমাদের সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল। অকস্মাৎ শত্রুপক্ষীয় একটি প্লেনের আবির্ভাব হইল ও সঙ্গে সঙ্গে সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। প্লেনটি সভাস্থলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কলের কামান দাগিতে লাগিল। তবুও সকলে স্থির ভাবে নিজ নিজ স্থানে রহিল। অতর্কিতে আর একটি bomber আসিয়া হাজির হইল ও সেই সময়েই anti air craft ব্যাটারী চলিতে লাগিল। উক্ত বম্বারটি গুলীবিদ্ধ হইয়া টাল খাইতে খাইতে নীচু হইয়া চলিতে লাগিল। সম্মুখ বিপদের সম্মুখে নেতাজীকে কিছুতেই মঞ্চ হইতে সরাইতে রাজী করান গেল না। অবশেষে তাঁহার বিশেষ অফিসারগণ এক প্রকার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। মেসিনগানের গুলীতে বিদ্ধ হইয়া একটি সিপাহী লাইন হইতে অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল নেতাজী তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে গেলেন, কিন্তু তখন সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় এই যে, যে গুলীতে শত্রুর Bomber বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা ঝান্সী রাণী বাহিনীরই একটি বালিকার কার্য্য।

আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান

সৈন্য-জীবনে ফৌজি শিক্ষার অবসরেও বিশেষ বিশেষ উৎসব আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান চিরাচরিত প্রথা। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মীতে Tattoo নামীয় অনুষ্ঠান ফৌজি আনন্দ-রসিকদের খুব পরিচিত, আমরা অবশ্য উহার পুনরাবৃত্তি করিতাম না, কেন না, উহা ইংরাজদের অনুষ্ঠানের নকল। আমাদের আমোদ-প্রমোদ ভারতের প্রথানুযায়ী হইত এবং তাহাতে মৌলিকতা ছিল। বিশেষ উৎসবে খেলাধুলা ও নাচ-গান হইত; বাংলার, দাক্ষিণাত্যের ও পাঞ্জাবের বৈশিষ্ট্য তাহাতে প্রকাশ পাইত। ইহা ছাড়া অনেক রকম অভিনয় হইত। নাটক, কবির গান—যাহা প্রাণে দেশপ্রেম জাগায় এইরূপ অনুষ্ঠান উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নেতাজী নিজে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেন ও সকলকে উৎসাহিত করিতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই স্বর যোজনা করিয়া দিতেন ও আর্টের দিক হইতে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিতেন। যখন ইম্ফলের পতন আসন্ন হইয়াছিল তখন অনুষ্ঠানগুলি একেবারে প্রাণবন্ত বলিয়া বোধ হইত। নেতাজীর অবস্থা একেবারে তুরীয়, ও অন্যান্য অফিসারেরা আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল। সকলেই আজাদ হিন্দের স্বপ্ন সফল হইতে চলিতেছে বলিয়া স্থির নিশ্চিত। আমরাও আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলাম।

এই সব উৎসবে full dress রুট মার্চ্চ হইত। আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া মার্চ্চ করিতাম। সকলেই মুগ্ধ হইয়া দেখিত—এমন কি জাপানীরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইত। সম্প্রতি, কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচায়ক ছিল এই সব রুট মার্চ্চ। ইহা ছাড়া বিশেষ কুচ-কাওয়াজ হইত, যাহাতে সকলেই

নিজ নিজ কৃতিত্বের নমুনা প্রদর্শন করিত এবং বিশেষ কৃতিমতি বালিকাদের পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করা হইত।

উৎসব উপলক্ষে প্রীতিভোজের আয়োজন সুচারুরূপে হইত। অবশ্য তখনকার আয়োজন অতি সামান্য; কিন্তু তাহাতে প্রাণ-ঢালা স্নেহের নিদর্শন পাইতাম। নেতাজী স্বয়ং এইরূপ প্রীতিভোজে অনেক বার যোগ দিয়াছিলেন এবং সামান্য সৈন্যের সাথে বসিয়া সুখ-দুঃখের গল্প করিতে করিতে একই আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। এইখানেই পাইতাম তাঁহার প্রাণের যোগাযোগ। প্রধান উৎসব হিসাবে তিনটী ঘটনার স্মৃতি উদ্‌যাপিত করা হইত; (১) নেতাজীর জন্মদিবস (২৩শে জানুয়ারী), (২) আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস (২১শে অক্টোবর), (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতবাসীদের সর্ব্বাধিনায়কত্ব (আগষ্টের প্রথম সপ্তাহ)।

নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক

নেতাজীর সংস্পর্শে আসা এক মহা ভাগ্যের কথা। আমাদের দেশাত্মবোধের যাহা কিছু ধারণা আমরা তাহার নিকট হইতেই সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের "অজ্ঞান-অন্ধকারে তিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার" দ্বারা আলোকিত করিয়াছিলেন। আমাদের অবচেতনা তাঁহার সান্নিধ্যে সচেতন হইয়া যাইত। তিনি লোহাকে সোনা করিয়া দিতে পারিতেন। বজ্রের মত কঠিন ও কুসুমের মত কোমল একসঙ্গে সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহার চরিত্রে; উহাতে ফুটিয়াছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী গুণের সামঞ্জস্য কোথায় তাহা প্রথমে আমরা বুঝিতে পাইতাম না, কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে যে তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা পরে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন দুর্জ্জেয়, দুর্ব্বার, মহাশক্তির উৎস। যাহা কিছু জাতীয়তার অপন্থব তাহা সত্বর অপসারিত হইত; কোন বাধাই তাঁহার পথরোধ করিতে পারিত না। সত্য ন্যায় ও নিষ্ঠা তাঁহার হৃদয়ে ত্রিধারার মত বহিতে থাকিত এবং আমরা তাঁহার প্রভাবে একেবারে অভিভূত হইতাম। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার চরিত্রের বিশ্লেষণ করা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। কে বলে তিনি হিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন? অন্যান্য মহাপুরুষদের মত তিনি প্রেমের দ্বারাই হৃদয় জয় করিতেন। অবশ্য এক গালে চড় দিলে তিনি অন্য গাল আগাইয়া দিতেন না; অন্য গালে চড়ান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন—সক্রিয় ভাবে, বাহুবলের দ্বারা। ইহা বীরের ধর্ম্ম—হিংসানীতি নয়। যদি ইহা হিংসা হয়, তবে অহিংসা কি জানি না। আমরা শুধু এই জানিতাম যে, নেতাজী ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর মুক্তি-সংগ্রামে উদাত্ত কণ্ঠে আমাদের অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আমরাও সর্ব্বাত্মক ভাবে সাড়া দিয়াছিলাম। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য এ সব আমাদের বিচারের বিষয়-বস্তু ছিল না। তিনি আমাদের নেতাজী আমরা তাঁহার সেবিকা—সকলেই মুক্তিপথের তীর্থযাত্রী। আমরা তাঁহার সুমহান্ নেতৃত্বে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তিনি জ্বালাইয়াছিলেন আমাদের প্রাণে আগুনের পরশমণি। আমরা পাইয়াছিলাম প্রেরণা; হইয়াছিল আত্মশুদ্ধি। তিনি আমাদের কাছে পাইয়াছিলেন কি? উল্লেখযোগ্য কিছুই নয় বোধ হয়, তবে হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি, পরম আনুগত্য তাঁহাকেই দিয়াছিলাম, সর্ব্বোপরি পণ করিয়াছিলাম আমাদের প্রাণ।

পশ্চাৎ অপসরণ

১৯৪৫ সাল, এপ্রিল মাস। আমাদের সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বর্ম্মা প্রান্তে এবং উত্তর বর্ম্মা হইতে দক্ষিণ-বর্ম্মায় আসিতে লাগিল। কোন যুদ্ধে পরাজিত না হইয়াও আমাদের হটিতে হইল, তাহার কারণ আমাদের যানবাহন ও সরবরাহ উপযুক্ত পরিমাণে ছিল না এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতে পাহাড়-পর্ব্বত দুর্গম হইয়াছিল। নেতাজীর ভাষায় আমরা শত্রুদের যুদ্ধে পরাভূত অথবা অগ্রগতি স্থগিত করিয়াছিলাম। আমাদের জন্য নেতাজী ঐ সময় বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, কারণ শত্রুসৈন্যের ভিতরে অনেকেই পশু-পর্য্যায়ের ছিল। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্প ভাঙ্গিয়া ঝাঁসী রাণী বাহিনী disband করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ এক দিন ক্যাম্পে আসিয়া আমাদিগকে দুই মাসের ছুটি ভোগ করতঃ নিজ নিজ গৃহে যাইতে বলিলেন। যাহারা মালয় অথবা শ্যাম প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল তাহাদের নিজ নিজ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই একটি দলকে রেলপথে ব্যাঙ্কক রওনা করা হইয়াছিল—আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা শ্রীদেবনাথ দাসের Chargeএ। পথিমধ্যে বর্ম্মার গেরিলা অতর্কিতে তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছিল এবং ফলে দুইটি তরুণী লান্স-নায়ক চেলা ও সিপাহী জোসেফাইন গুলীবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনায় সকলের উপর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, নেতাজী মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। নেতাজী আমাদের জন্য কত ব্যস্ত হইতেন তাহা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হইয়াছিল।

২৪শে এপ্রিল ১৯৪৫ সনে বর্ম্মা হইতে বিদায় হইবার প্রাক্কালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও কর্ম্মীদিগকে তাঁহার বাণী দিয়া তিনি এরোপ্লেনে রেঙ্গুন হইতে ব্যাঙ্কক যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি শুনিলেন যে, ঝাঁসী রাণী বাহিনীর শেষ দল যাহা ঐ দিন রওনা হইবার কথা ছিল তাহা যায় নাই। কারণস্বরূপ বলা হইল যে, জাপানীরা শেষ মুহূর্ত্তে লরী দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিল। ইহা শুনিয়া নেতাজী একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন এবং এরোপ্লেনে যাইবেন না দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্যাম্প-কমাণ্ডারকে তাঁহার বাহিনীকে লইয়া আসিতে বলিলেন এবং নিজে তাহাদের সঙ্গে পদব্রজে রওনা হইলেন। অনেক দূর পদব্রজে যাইবার পর জাপানীরা সৈন্যবাহিনীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক লরী ও তাঁহার জন্য একখানা গাড়ী আনিয়া দিলেন। মেয়েদের নিরাপদে রওনা করিয়া দিবার পর মাত্র তিনি গাড়ীতে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

সব শেষ

নেতাজী আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। প্রত্যেক মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিলেন। প্রাণের আকুতি প্রাণের দ্বারা জানাইলাম, শেষ ভক্তি-অর্ঘ্য নীরবে নিবেদন করিলাম। 'আবার কবে দেখা হইবে, প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন স্মিত হাস্যে। আমরা সমস্বরে "জয় হিন্দ্" ধ্বনি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

জয় হিন্দ্!

"তার পড়ল কনে দেখতে যাবার। প্রথমটা খুবই নার্ভাস হয়ে গেছলাম, কি জানি ওজন-দরে কথা বলা, আপ্যায়িতের হাসি হেসে অবাঞ্ছিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করা, ঘাড়টি ঈষৎ হেলিয়ে, দু'টি হাত জোড় করে, দন্তরাজি বিকশিত করে গদগদ ভাবে নমস্কার জানানো, এর কোনটাই আমার ধাতে কেমন সহ্য হয় না। তবুও যখন স্বামীর বন্ধু এবং স্বামী স্বয়ং আমাকে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, আমার certificateএর উপরেই নির্ভর করছে সেই বন্ধুটির বিবাহ, তখন আর অমত করতে পারলাম না। প্রথম জনের অনুরোধ যদি বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, শেষের জনের অনুরোধ রক্ষা না করার আর উপায় ছিল না, শেষে কি গৃহবিবাদের সৃষ্টি করব? অতএব পাত্রীপক্ষকে কথা দিলাম যে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে আমি নিশ্চয়ই যাব।

ঠিক সময়েই আমরা কনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। পুরুষরা পুরুষদের বৈঠকখানায় এবং আমি মহিলাদের অন্তঃপুরে আহূত হয়ে বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ করলাম। এ-সব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে কখন সেই মনোনীতা কুমারীকে পরীক্ষার্থে নিয়ে আসা হবে। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, আমিই সেখানের বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে পড়েছি, এ-জানলায় সে-জানলায় জোড়া জোড়া চোখ এক একবার দেখা যাচ্ছে, আবার অদৃশ্য হচ্ছে। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কনের মাসীর সাথে আজে-বাজে কথা বলার পর, কনের বাবা আমাকে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে জোড়হস্তে বললেন, "আপনি যদি দয়া করে একটু বাইরের ঘরে এসে বসেন তো ভাল হয়, এই ঘরটাতে বেশ আলো আছে, দেখার সুবিধা হবে।"

আমার পিতার বয়সী ভদ্রলোকের এইরূপ বিনয় প্রকাশে আমার সত্যিই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তাঁর পিছনে পিছনে বাইরের ঘরে গিয়ে কনের প্রতীক্ষায় বসে আছি, কনের মাসীমা হঠাৎ পিছন হতে পাখার বাতাস দিতে আরম্ভ করলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, "আরে করেন কি, পাখাটা আমার হাতে দিন।" এক রকম জোর করেই পাখাটা তাঁর হাত হতে কেড়ে নিলাম। তার পর আমাদের পরীক্ষার্থিনী শ্রীমতী মানসীর আবির্ভাব হল তার বউদিদির সাথে! অদূরে তার জন্য একটি চেয়ার নির্দিষ্ট ছিল। মানসী লজ্জা, ভয় ও গাম্ভীর্য্য-ভরা মুখে এসে আমাকে একটি ঢিপ করে প্রণাম করলে। আমি তো আবার ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। সে কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল। পুরুষেরা সকলেই ঘর হতে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, কারণ সেদিনের পরীক্ষক শুধু আমারই হবার কথা ছিল। সুতরাং তৎক্ষণেই নিজেকে সংযত করে মানসীকে বল্লাম, "ও কি ভাই, তুমি ঐ দূরে চেয়ারে বসে থাকলে তোমার সাথে আলাপ করব কি করে? তুমি এস, আমার কাছে বসবে এস, ভয় কি?" সে বেচারী একবার বউদি, ও একবার মাসীর দিকে তাকিয়ে আমার পাশে চৌকিতে বসে পড়ল। এখনও তার ভয় ও লজ্জা সম্পূর্ণরূপে কাটেনি। মেয়েটির বয়স বছর চব্বিশ হবে, বেশ সুশ্রী চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে টানা-টানা কালো ভাবালু চোখ দু'টি সত্যই অপূর্ব্ব।

দু'-চার কথার আলাপে বুঝলাম মানসী আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল। তার পর হঠাৎ জ্বরে মা মারা যাওয়ায় সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ায় আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এখন আর সংসার দেখবার
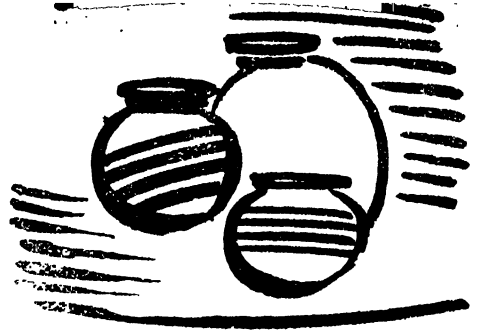
অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

প্রয়োজন নাই বলে বাবা উঠে-পড়ে লেগেছেন কন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্য, মানে বেশ Llrge acaleএ এই কনে দেখার ব্যাপার চলছে। এমন কি প্রয়োজন হলে সকালে এক পক্ষ বিকেলে আর এক পক্ষ এসেও তাকে যাচাই করে গেছে। আমি তাকে সস্নেহে বললাম, "আমি কিন্তু তোমাকে যাচাই করতে আসিনি ভাই, আমি তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি। আচ্ছা, এ বিবাহে তোমার মত আছে?"

সে উত্তর করলে, "মতামতের তো কোনও প্রশ্ন উঠছে না, বাবার বয়স হয়েছে, তিনি চান আমার বিয়ে দিতে। তাঁর যাঁকে পছন্দ হবে, আমার ভালো-মন্দ বুঝে যাঁর হাতে আমাকে তিনি দিতে চাইবেন, তাঁর সাথেই হবে আমার বিয়ে।"

তার কথার আভাসেই বুঝলাম, এখনও সে আমাকে তার প্রতি-পক্ষ মনে করছে। আরও সহজ করবার জন্য আবার প্রশ্ন করলাম, "এ রকম ভাবে কনে দেখার প্রথাটা খুব খারাপ লাগে, না? আমার তো ভারী বিশ্রী মনে হয়।"

এবারে সে আমাকে দরদী বন্ধু পেয়ে বললে, "হ্যাঁ সত্যিই বড় বিশ্রী লাগে। আমাদের সমাজের এই যে কি প্রথা—একটুও ভালো লাগে না।"

আমি হেসে বলি, "বেশ তো, যা ভালো লাগে তাই করলেই তো পারো—নিজের পছন্দ মত বিয়ে করলেই তো পারো?"

"তাতেও তো নিন্দে, লোকে যা-তা বলবে।"

"হ্যাঁ, প্রথমটা হয়তো নিন্দে করবেই। সবাই হাসবে আড়ালে, ঠাট্টা করবে। কিন্তু এ-সব নিন্দা ও আলোচনাটা ঈর্ষাপ্রসূত এবং সেটাকে fall করার মতন মনের জোর থাকলে দেখা যায়, পরে সবাই বোঝে যে তারা নিন্দনীয় কিছু করেনি। দেখ, আমি নিজে ভুক্ত-ভোগী। আমি নিজেই এক দিন আমাদের পরিচিত সমাজের মধ্যে একটা আলোচনার প্রসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম, এখন আবার তারাই আমার মতন মেয়েকে কনে দেখার মত সামাজিক কাজের ভার দেয়।"

মানসীর লজ্জা ও ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে, সে বেশ সহজ ভাবেই বলে, "শুধু যে নিন্দের ব্যাপার তা নয়, ঐ ভাবে তো সকলের বিয়ে হতে পারে না? আপনি না হয় নিজের পছন্দ মত স্বামী পেয়েছেন, এবং আপনাদের প্রেম হয়তো সার্থক হয়েছে। কিন্তু যারা পছন্দ মত স্বামী বেছে নিতে পারল না বা সে-রকম সুযোগ পেল না পুরুষের সাথে মিশবার মতন, তারা কি করবে? তারা যদি পনেরো-ষোল বছরের ছোট মেয়ে হয়, তাহ'লে তবু ঐ ভাবে

কনে দেখা

মৃণালিনী দাশগুপ্তা

বাচাই করে বিয়ে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের মতন তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়েকে নিয়ে পণ্য দ্রব্যের মতন যখন যাচাই করা হয়, তখন আর আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না।"

তাকে তখনকার মতন বললাম, "পড়েছ রবীন্দ্রনাথের সবলা?

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে অধিকার

কেন তুমি সংকোচের মোহজাল পাতো

হে বিধাতঃ চিত্ত ঘিরে।'

সত্যিই দেখ আমাদের সঙ্কোচ এসে আমাদের বিহ্বল করে দেয়। বিয়েটাকে আমরা জীবনের চরম পরিণতি মনে করেছি, সেখানেই আমাদের গলদ। বিয়েটা প্রয়োজনীয় ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের জীবনের। জীবনের চলার পথে সঙ্গী যদি জুটে যায় তো ভালই—পথ বেঁধে দেবে বন্ধনহীন গ্রন্থি। আর যদি নাই জুটে তো কেন আমরা এ ভাবে নিজেদের পণ্য দ্রব্যের সামিল করে তুলব দিন-দিন? এ-সব বুঝেও আমরা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারি কই?"

এই সব কথা-বার্তার মধ্যেই বাইরে থেকে আমার সঙ্গের ভদ্রলোকেরা ফিরবার জন্ত ব্যস্ত হওয়ায় আমাদের আলোচনা সেখানেই বন্ধ হল। মানসীকে জানিয়ে দিলাম, "তোমার সাথে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছি, এবং আমার স্বামীর বন্ধুর মানসী যাতে তুমি হতে পারো, সেই চেষ্টাই করব।"

সে একটু দুষ্টু হেসে গুরুজনদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমরাও জলযোগান্তে বাড়ী ফিরে এলাম।

বাড়ী এসেও কিন্তু মানসীর প্রশ্ন আমার চিন্তাকে অভিভূত করে রইল। তার প্রশ্নের সমাধান চাই। মনে হতে লাগল, শত শত মানসী আমাকে বলছে, "আমরা বয়স্থা শিক্ষিতা মেয়েরা, সবাই আমাদের অপবাদ দেয়, আমাদের নারীত্ব সতীত্ব সব না কি লোপ পেতে বসেছে, যেহেতু আমরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছি ও রাস্তায় একা বার হই। আমরা না কি উচ্ছৃঙ্খল, এক কথায় আমরা একেবারে যা-তা। অথচ আমাদের দিক্ হতে কেউ বিচার করে কেন দেখবে না? আমাদের যৌবন অস্তোন্মুখ, আমরা লেখাপড়া শিখেছি, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। যৌন উত্তেজনামূলক উপন্যাস পড়ছি, সিনেমা দেখছি, আমাদের যৌন আবেগ আছে, অথচ আমাদের যৌন পরিতৃপ্তি হয় নাই, আমাদের মনে বৈচিত্র্য আনবার জন্ত নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নাই, আমাদের জন্ত পাঠাগার নাই, আমাদের জন্ত ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ নাই, আমাদের জন্ত ক্লাব নাই, আমাদের জন্ত কিছুই ব্যবস্থা নাই। আমাদের পুরুষ-বন্ধু থাকলে সেই সমাজ চোখ রাঙায়—যে সমাজ পারে না উপযুক্ত বয়সে আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে। বিবাহের বাজারে আমরা পণ্য দ্রব্য, টাকা এবং কটা রং না হলে আমরা বাজারে অচল। প্রেম করে বিয়ে করার মতন সুযোগ আমাদের দেওয়া হয় না। যৌবনের শেষে বহু কষ্টে হয়তো এমন এক জনের সাথে আমাদের জুড়ে দেওয়া হয়, যাঁর অর্থ আছে হয়তো প্রচুর কিন্তু হৃদয় নাই। বংশে তিনি খুবই বড়, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান, কিন্তু স্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মান দিতে জানেন না। চোদ্দ বছরের বালিকার পক্ষে সম্ভব নিজেকে নূতন করে শ্বশুরবাড়ীর মতন করে গড়ে তুলতে, কিন্তু আমাদের আত্মসচেতন পরিণত মন কি করে তা পারবে?

এই সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজছিলাম। আসল গলদ আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমরা মেয়েরা ভুলে গেছি নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে, সমাজের উপর নির্ভর না করে কেন আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করব না? শুধু পুরুষের বেলা কেন, নারীর বেলাতেও কেন প্রযোজ্য হবে না—one should be the maker of one's own fortune!"

আমাদের ভালো-মন্দ পরিণত বয়সে আমরা নিজেরা বুঝে নেব; তার জন্ত যদি বিপদ আসে সে বিপদের ফল আমরাই ভোগ করব। বিবাহ আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং চরম পরিণতি হবে না। আমরা জোর করে আমাদের বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন করব। সমাজের শিক্ষায়, দীক্ষায় কৃষ্টিতে যদি প্রগতি আসে, পরিণয়ে প্রগতি কেন আসবে না? একটা অংশকে পিছনে ফেলে রেখে সমাজের বাকী অংশটা কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারবে না। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এক-সাথে বিপ্লব আনতে হবে। পরিণয়ে প্রগতি আসলে নারী-সমাজও এগিয়ে যাবে। সে-দিন আর কনে দেখার পালা থাকবে না, সে-দিনের মানসী এই কথাই বলবে,—

"যাব না বাসব-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী

আমারে প্রেমের বীর্য্যে কর অশঙ্কিনী

বীরহস্তে বরমাল্য লব এক দিন

সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন

ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে?

কভু তারে দিব না ভুলিতে

মোর দৃপ্ত কঠিনতা

বিনম্র-দীনতা সম্মানের যোগ্য নহে তার

ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

মাথার গুণ্ঠন খুলি ক'ব তারে মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে

একমাত্র তুমিই আমার।"

মনে হয় সেদিন সুদূর নয়।

অতীত দিনের কাহিনী

হাসিরাশি দেবী

ঘরের পেছনে কলাবাগান; ওরই পাতার ওপোর বৃষ্টিপাতের একটা একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে :···ঝর ঝর ঝর······

খড়ের ঘর। তারও চালা কয়খানা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ দিনের অ-মেরামতে। জল তো পড়েই, বিদ্যুতের চমকও দেখা যায় মাঝে-মাঝে। এমনি একটা দুর্য্যোগের রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপোর হঠাৎ উঠে বসলো খ্যাঁদা। তার পর শূন্য বিছানাটার আর এক প্রান্তে হাত বুলিয়ে ডাক দিলে: "ঝোড়ো, এই ঝোড়ো! জবাব দিচ্ছিস্ না যে বড়। গেলি কোতায়? এই—।" খ্যাঁদার কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ বর্ষা-রাত্রের বুকেই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো যেন, কেউ এ-ডাকের কোনও জবাব দিল না। অগত্যা, টিনের ল্যাম্পটা হাতড়ে হাতড়ে জেলে ফেললে খ্যাঁদা; তারই আলোয় দেখলে, বাঁশের দরোজাটা খোলা অবস্থায় বাদল হাওয়ার ঝাপটায় থেকে থেকে আছাড় খাচ্ছে কেবল।

ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে টেনে নিয়ে খ্যাদা নেমে এলো চৌকী থেকে। তার পর ঝাঁপের দরোজাটা টেনে খুঁটার সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে পলাতক পুত্র ঝোড়োর উদ্দেশ্যে যে মধুর বাক্যালাপ সুরু করলো: "শালাছেলে! র‍্যাতটুকুন মানে চোকে চোক্ নেগেচে কি না নেগেচে, ওম্‌নি ঘরে থেকে বেরিয়ে দে সট্‌কান্! সাধে বলি শালাছেলে! ঝড় নেই, জল নেই, আঁধার নেই, আলো নেই,··· এ র‍্যাকেবারে মানে যাকে বলে ইয়ে······! ঘর-সংসার কি বুক দিয়ে আগলে থাকবার কত্তা একলা আমারই? তোর—মানে কিছু নয়? সাধে মনে হয় এক একবার—সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাই! তকোন ও-শালা বুঝবে, নইলে, দুত্তোর মাইরি······এ র‍্যাকে-বারে···" বাকী কথাটা শেষ না করেই ফিরে এসে তামাক ধরায়, তার পর কলকেটাকে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে অশান্ত চিত্তে টানের-পর টান দিয়ে চলে অনবরত।

কাহিনীটার পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত একটুকু আছে বই কি এবং তাই বলছি। সাতবাঁকী গ্রামের ডোমপাড়ার ইতিহাসটা একটু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এই খ্যাদারই কোন এক পূর্ব্বপুরুষের সময়ে। সেই পূর্ব্বপুরুষটির নাম—ষষ্ঠীচরণ। ষষ্ঠীচরণের নামে আজ লোকে পথ চলে পৌছায়—সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিটি যে এক দিন এই খ্যাদারই বংশাবলীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, এ জন্য খ্যাদা আজও গৌরব অনুভব করে থাকে, কিন্তু এখনকার লোক তা মানে না। তবে, চলিত কাহিনী শুনতে বাধা নেই বলেই শুনে যায়; কাহিনীটা এই:—

সে-বার গ্রামে মড়ক দেখা দিয়েছিল বিদ্যুৎগতিতে। দিনের পর দিন ধরে যখন এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম আর ও-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে, তখন এক অমাবস্যার রাত্রে ষষ্ঠীচরণ স্বপ্নে দেখলে, মা কালী স্বয়ং তাকে ডেকে বলছেন: "ষষ্ঠী রে! আমারে পূজো দে,—তোর নিজের হাতের পূজো। না হলে কেবল সাতবাঁকী কেন, এদেশের মঙ্গল নেই,—কিছুতেই ভাল হবে না।"

স্বপ্নেই ষষ্ঠী শুধিয়েছিল: "কি পূজো দেব মা? আমি যে জাতে ডোম। আমার হাতের কেনে পূজো খেতে চাস্ তুই?"

উত্তর হয়েছিল: "রক্ত! রক্ত! একশো-একটা নরবলির রক্ত খাব আমি। দে, দে, তাই দে!"

কথাটা বহু দিনের।

ষষ্ঠীচরণ একশো-একটা নরবলি দিয়ে সেদিন ক্ষুধার্ত্তা গ্রামদেবীর ক্ষুধা কিছু নিবৃত্ত করতে পেরেছিল কি না, আজ তার প্রমাণ কিছু নেই, তবে একখানা খড়গ আজও গ্রামের কালীতলা, অর্থাৎ সাতবাঁকীর নদী কঙ্কনার তীরে যে ঝাঁপালো অশ্বত্থ গাছটা বছরের পর বছর ধরে নিজের বংশাবলী বিস্তার করে চলেছে, তারই তলায় কয়েক-খানা পাথরের ওপোর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। আর দেখা যায়, এত বছরের এত জল, রৌদ্র কি হিমেও সে খাঁড়া পুরু মরিচায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তবে চন্দন আর সিন্দুরের প্রলেপে ওর উজ্জ্বলতা কিছু কমে গেছে কেবল। সেদিনের সে-কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী আজ কেউ না থাকলেও পরবর্ত্তী কালের দুই-এক জন বলতে পারে, খ্যাদার বাপ পরাণহরির ওপোর মাঝে-মাঝে মায়ের ভর হতো, ফলে অনেকে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিরও ঔষধ পেয়েছে সেই অবকাশে।

কিন্তু, খ্যাদা সে সৌভাগ্য-বঞ্চিত। ভাগ্য-বিড়ম্বনাতেই হোক, আর যাতেই হোক, কু-লোকে তার নামে কু-ব্যাখ্যাই করে আস[illegible] এত কাল। তাই বংশ-গৌরবের নিদর্শন খ্যাদার বিড়ম্বিত ভা[illegible] এক কণাও জোটেনি এত দিন, জুটেছিল অপযশ। আর সে অপ[illegible] দিয়েছিল ঐ প্যানা চৌকীদার।

অন্ততঃ খ্যাদা তো তাই বলে। বলে: ওর ওপোর প্রাণ[illegible] অর্থাৎ প্যানার রাগ বহু কালের। তাই যে রাত্রে মনসা-ভাসা[illegible] গানে হাটতলা জনবহুল, সেই রাত্রে পুলিশ-পেয়াদা এনে খ্যা[illegible] হাতে দড়ী পরিয়েছিল চৌর্য্য অপরাধে।

সেদিনের স্মৃতিটা জ্বল্-জ্বল্ করে মনে পড়ে খ্যাদার। সে[illegible] শিশু ঝড়োকে কোলে নিয়ে তার মা আন্না গিয়েছিল গান শুনতে[illegible] আর সে? সে কোথায়, কি অবস্থায় ছিল, সে কথা আজ না তোল[illegible] ভালো। কেবল মনে আছে, জুড়ীর দল তখন সবে মাত্র গ[illegible] ধরেছে—

"ও হায় কান্দে রে!—

মায়ে কান্দে, বাপে কান্দে, কান্দে সতী না[illegible]
সাপে খাইল লখীন্দরে, বেউলো হইল রাঁড়ী—
সতী কান্দে রে!···"

সেদিন হুস্-হুস্ শব্দে হাতের বিড়িটা নিঃশেষ করে প্যানা চৌকীদার বাকীটুকু ছুঁড়ে ফেলে হেসেছিল,—তীক্ষ্ণ হাসি। সে হাসি, সেদিন খ্যাদার অন্তরের যেখানেই বিঁধুক, কালক্রমে তার আঘাতটা সহনীয় হয়ে এসেছিল, সইতও—অন্তত প্যানা যদি না আবার দীর্ঘ দিন পরে ওর মা-মরা ছেলে ঐ ঝোড়োর ওপর কটাক্ষপাত করতো।

সেই কথাগুলো আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রেও মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কানে এলো প্যানা চৌকীদারের কণ্ঠস্বর। এই ঝড়-জলের রাত্রেও চৌকী দিতে সে বার হয়েছে সাতবাঁকীর পথে।

খ্যাদার দরোজায় দাঁড়িয়ে প্যানা যথারীতি ওর কর্ত্তব্য শেষ করলে, বললে: "বলি খ্যাদা, ও-খ্যাদা, জেগে আছ?···"

গভীর বিরক্তিতে খ্যাদার মুখখানা বিকৃত হলেও কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে জবাব দিলে: "আছি গো!—"

প্যানা শুধোলে: "আর ঝোড়ো?—"

ঘরের মধ্যে থেকে খ্যাদার জবাব এলো: "ও! তার তো এ্যাকোন র‍্যাক্ পহর রাত। কানের কাছে বাগ ডাকলেও সাড়া মিলবে না। আর বলবোই বা কি খুড়ো, সারা দিন ঘুরা-ফেরায় ওর খাটা-খাটুনির শরীল, পড়েচে কি মরেচে!"

প্যানার জিহ্বা এবং কণ্ঠতালুও বোধ হয় এই সজল রাত্রে খ্যাদার ঘরের দরোজায় দাঁড়িয়ে এক ছিলিম তামাকের তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু খ্যাদা উঠলো না। বললে: "আর আমার কতা বলবে? তা আমার এমন জ্বর এয়েছে যে হাত-পা নাড়াবার পর্য্যন্ত ক্ষ্যামতা নেই।"

এর পর, বারান্দায় দণ্ডায়মান তামাক-প্রত্যাশী প্যানার কানে আসে একটা প্রবল কম্পনের ক্ষীণ শব্দ···!

খ্যাদা কাঁপছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে···"উঁ হুঃ হুঃ-হুঁ···" করে কাঁপতে কাঁপতেই খ্যাদা বলে: "কবে যে এ ভোগ থেকে মুক্তি পাব, তাই ভাবি খুড়ো! হি-হিঃ হিঃ!"

অগত্যা প্যানাকে বিদায় নিতে হয়। হাতের আলো ছাতার আড়ালে ঢেকে ও হাঁক দিতে দিতে চলে সখী বোষ্টমীর বাড়ীর দিকে। হাঁকের শব্দ ওর দূর থেকে দূরান্তরে চলে যায় ক্রমশঃ। হাতের আলোর রেখাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে ডুবে যায় অন্ধকারের অতলান্তিকে।

থ্যাঁদার দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেও পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় একটা ক্রুর—বৈর-নির্য্যাতনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সখী বোষ্টমী থ্যাঁদারই প্রতিবেশিনী। থ্যাঁদারই ঘর আর হাতনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটুকুন পার হয়ে গিয়ে সখীর বাড়ী পড়ে, সেইখানে সখীকে আজ প্রায় সুদীর্ঘ নয় বছর আগে নবদ্বীপ থেকে মালা-বদল করে এনেছিল মাখন বোষ্টম। কালে সেই মাখনের গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেও ওর যা-কিছু বিষয়-আশয়, সহায়-সম্পত্তি—সব সখীর নামে লেখাপড়া করে রাখায় সখীর বাস এই গ্রামেই চিরস্থায়ী হয়, তা ছাড়া বোষ্টমের জাত-ব্যবসা অর্থাৎ প্রত্যহ গ্রামের প্রতি গৃহস্থের দরোজায় ভিক্ষা গ্রহণেও তার বাধে না।

সেই সখীই সে-দিন ভিক্ষা সেরে গ্রাম থেকে ফিরছিল অবসন্ন পদক্ষেপে। নিটোল স্বাস্থের ওপোর থেকেও যেন ওর বিগত যৌবনের লাবণ্যটুকু ঝরে পড়তে চায়।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের মৃদু সুরটাকে ভাঁজতে ভাঁজতে সখী হঠাৎ থ্যাঁদার বাড়ীর কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়ালো। শুনলে, থ্যাঁদা আর ওর ছেলে ঝোড়োর মধ্যে মহা কলরবে লঙ্কাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। যা প্রায় হয়েই থাকে!···

থ্যাঁদা তাই বলে চলেছিল: "শালাচ্ছেলে! কেবল বসে বসে ভাতের কুণ্ডু গিলবে, আর পাথম্যালা খেলে বেড়াবে এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়ে? আর আমি মানে, শালার ধরা পড়েচি যত্ত-কিছুর চোরদায়ে,—নয়? য়্যাঃ, মাইরি আর কি!"

উত্তরে কানে এলো ঝোড়োর গর্জ্জন: "বাপ তুলো না বলছি, —শেষ পরে একটা যা-তা কাণ্ড হয়ে যাবে কিন্তুক!"

আর এক পর্দ্দা কণ্ঠস্বর চড়িয়ে থ্যাঁদা বললে: "বটে! একবার নয়, একশো বার, হাজার বার ব'লবো শালাচ্ছেলে! বলবো না? আলবৎ বলবো,···কি করতে পারিস্ তুই আমার, তাই যে!···"

প্রতিবাদের ইচ্ছাতেই বোধ হয় ঝোড়ো উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পারলে না। মাঝপথে সখীকে দেখেই উদ্যত হাতখানা নামিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে বাড়ীর বার হয়ে গেল!

থ্যাঁদাও হঠাৎ তাকে বাধা দিতে পারলে না; কেবল, সখীর দিকে সকাতর দৃষ্টিপাত করে বললে: "দেখলি সখি! নিজের চোখে দেখলি! হাজার হোক, আমি যকোন তোর বাপ—তকোন এম্নি ব্যাভার আমার ওপোর করাটা কি তোরই উচিত? এ-রম করলে কোন বাপের কোন ব্যাটার ওপোর ছেদ্দা-ভক্তি থাকে, তুই-ই বল?"

সখী হয়তো এ স্থলে কোনও জবাব দেওয়াটা সমীচীন বোধ করলে না, আর করলে না বলেই মুচকি হেসে ধীরে-ধীরে সামনের পথটুকু পার হয়ে গেল।

কালীতলায় যাত্রা বসেছে; যাত্রাটা জমেছে বেশ! দূর থেকে হ্যাচাকের আলো উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে, আর কানে আসে মানুষের কলগুঞ্জন।

বেসুরো হারমোনিয়ম আর ডুগি-তবলার শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গেও শোনা যায় যাত্রা-দলের গায়কদের গান। থ্যাঁদার ছেলে ঝোড়ো তখন রাজার পোষাক পরে সবে মাত্র গান ধরেছে:—

"শিকলি-কাটা ময়না পাখী
আয় না তোরে হিদে রাখি—"

আলো জ্বলছে! এদিকে ওদিকে জনসমুদ্র! এরই মধ্যে এক ধারে পুরুষ আর এক ধারে মেয়েরা রং-বেরংয়ের শাড়ীতে সমুজ্জ্বল! সখীও ওরই মধ্যে বসে মাথায় একটু কাপড় টেনে দিয়েছিল। ঝোড়ো ওর দিকেই লক্ষ্য করে গান ধরেছিল কি না, কে জানে, কিন্তু সখী মুচকী হেসে ওরই উদ্দেশ্যে মধুর সম্ভাষণ জানালে: "আ মুখপোড়া!"

সেই মুহূর্ত্তেই একটা বিভ্রাট ঘটে গেল অকস্মাৎ—বিভ্রাটটা আর কিছু নয়, প্যানা চৌকীদারের অকস্মাৎ বীরত্ব-প্রকাশ।

দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রাণকেষ্ট যেন ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝোড়োর ওপোর এবং তার পরেই যাত্রার আসরময় লাফিয়ে গড়িয়ে উভয়ের মধ্যে চললো গজ-কচ্ছপের মহাসমর।

ভয়ার্ত্ত দর্শকবৃন্দ রসভঙ্গ করে যে যেখানে পারলো অদৃশ্য হলো তখনি, একলা কেবল দাঁড়িয়ে রইল সখী।

নিমেষে যে এ কাণ্ড ঘটে যাবে, সে কথা সে-ও ভাবেনি বোধ হয়, তাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে থ্যাঁদাকে লাঠি হাতে নিয়ে রঙ্গভূমি মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই ও ডুকরে কেঁদে ওঠলো—"দোহাই তোমার! ব্যাগাত্তা করছি থ্যাঁদা, কাউরে যেন জখম করো না, তার চেয়ে ছাড়িয়ে দাও বরঞ্চ!···"

ওর অনুরোধের ফলে কি না ঠিক বোঝা গেল না, তবু থ্যাঁদা যখন দু'টো সবল হাতে দু'জনকে দু'দিক্ থেকে আটকে ফেললে, তখন কারোই ক্ষমতা রইলো না সে বজ্রমুষ্টি ছাড়িয়ে যাবার।

প্যানার গর্জ্জন-ধ্বনি তবু থামে না! কালীতলা আর কঙ্কনার কূলে কূলে যেন তার তীব্র চীৎকার-ধ্বনি ভেসে বেড়াতে লাগলো—"মেয়েছেলের অপমান! গোল্লায় গেছে, বনে গেছে, একেবারে গেছে! যাবে না! য্যামন বাপ তার তেমন ব্যাটা হবে তো?" বলতে বলতে আর একবার সে ঝোড়োকে মেয়েদের সম্মান-জ্ঞান সম্বন্ধে সমুচিত শিক্ষা দেবার চেষ্টায় থ্যাঁদার বজ্রমুষ্টি ছাড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

সুখে-দুঃখে কিম্বা ভাবনা আর নির্ভাবনাতেই হোক, এর পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল সখী বোষ্টমীর। সেদিনও সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে সে একলা বসেছিল দাওয়ার আঁচল পেতে। মনটা অকারণেই আজ যেন কেমন একটা উদাস্যে ভরে উঠেছিল, কিছু ভালো লাগছিল না। ঘরে অন্ধকার, এরই একটা পাশে আলোকিত করে যে প্রদীপ জ্বলছে সে প্রদীপের আলোয় দেখা যায়, নবদ্বীপ থেকে আনা মাখন বোষ্টমের রাধেকৃষ্ণ মূর্ত্তি, গোপাল মূর্ত্তি এবং আরো সব ধর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি-প্রতিমূর্ত্তি, আজও লাল শালুর আসন অধিকৃত করে সসম্মানে পূজা পেয়ে আসছেন সখীর হাতে
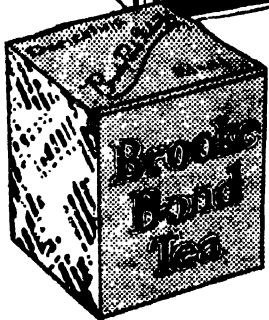
থেকেও, কিন্তু মাখনের মত পূজা সে করতে পারে না। কোথায় যেন নিষ্ঠার—একাগ্রতার ত্রুটি হয়।

সখী ভাবে। আজও তেমনি কোনও কিছুই ভাবছিল হয়তো। হঠাৎ বেড়ার ও-পাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে সচকিত হয়ে উঠলো। প্রশ্ন করলে,—"কে-ও, ওখানে দাঁড়িয়ে কে?"

যে দাঁড়িয়েছিল, সে মিহি সুরে জবাব দিল :—"আমি, আমি গো। আমি পাণকেষ্ট।" সখী ডাকলে—"তা ওখানে কেন, বাড়ীর ভেতরেই এসো না হয়, জাত তো আর যাবে না।"

"প্যানা হেসে উঠলো অকারণেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে সসঙ্কোচে জানালে—"কি যে বল বোষ্টমী—মানুষ থাকলেই মানুষের বাড়ী যাতায়াত করে থাকে, তার সঙ্গে জাত-বিজেতের সম্বন্ধ কি?"

সখী আসন পেতে দিয়েছিল. এইবার ঘরের কোণে রাখা প্রদীপটিকে এনে এমন জায়গায় রাখলো, যার আলোয় প্রায় প্যানার কদর্য্য মুখখানাও স্পষ্ট দেখা চলে।

প্যানা নিজেই আসনখানা টেনে নিয়ে বসলো। বললো—"বিনা কারণেই খ্যাঁদার ছেলেটা আমার ওপর যে রকম মার-মূর্ত্তি হয়ে এলো, তাতে অন্য কেউ হলে—হুঁ!"

সখী হঠাৎ কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলে—"চা খাবে একটুকুন চৌকীদার, চড়াব?"

প্যানা মধুর হাসি হাসলো। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালো দিয়াশলাই জেলে। তার পর সকৌতুকে বললে—"অমৃতয় অরুচি কার গা বোষ্টমী? তবে যদি না তোমার কষ্ট হয়, তবেই—"

বাকী কথাটা ওর মুখের মধ্যে থাকতেই সখী উঠে গেল এবং এক আঁটি খড়ের জাল দিয়ে পাথর-বাটিতে ঢেলে যে চা-টুকু তৈরী করে নিয়ে এলো, তার গন্ধ কি বর্ণ বিশেষ কিছু না থাকলেও মহা পরিতৃপ্তিতে সেটুকু উদরস্থ করতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলো না প্রাণকেষ্ট; এর পরের নানা গল্প-গুজবে সময় কাটিয়ে প্রাণকেষ্ট সেদিন যখন সখী বোষ্টমীর কাছ থেকে বিদায় নিলে, তখন রাত্রি গভীর।

চারি দিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা থম্-থম্ করছে।...এরই মধ্যে সখীর আলোয় সামনের খানিকটা জায়গা দেখে নিয়ে পথে নেমে পড়লো প্যানা; প্রদীপ নিয়ে সখীও ফিরে গেল। একা পথ চলতে চলতে প্যানার আজ এই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গা ছম্-ছম্ উঠলো একবার, তার পর অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলে—"রাম্, রাম, রাম্, রাম!......"

এর কয়েক মাস পরে।......

কালীতলায় বসে খ্যাঁদা তাকিয়েছিল কঙ্কনার দিকে।......

মঙ্গলবার।...পূজো আসবে অনেকের অনেক শুভাশুভের, মানত অমানতের। এরই অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল খ্যাঁদা।...দৃষ্টি তার বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত।

কঙ্কনার জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে; আর ওরই মধ্যে ডুব দিচ্ছে পানকোউড়ীর দল।...দুই-একটা জেলে-নৌকা চলে যাচ্ছে—দাঁড় টানবার ছপাছপ শব্দ করে; ওপারে কেউ গানও ধরেছে হয়তো! হঠাৎ কালীতলার অন্য প্রান্তে দেখা গেল দুই জন কনেষ্টবলকে। আগে আগে আসছে প্যানা! চৌকীদার।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালো প্রাণকেষ্ট। তার পর শুকনো শির-ওঠা হাতখানা নেড়ে জিজ্ঞেসা করলে—তোমার ছেলে কোথায় হে খ্যাঁদা—?"

খ্যাঁদা সচকিতে ফিরে তাকালো; দেখলে প্যানার শুকনো বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে আজ আবার সেই হাসি দেখা দিয়েছে—যে হাসি আর এক দিন তার হাতেও দড়ী পরাবার সময় দেখা দিয়েছিল। প্যানার কথার কোনও জবাব অত তাড়াতাড়ি দিল না খ্যাঁদা। একটু পরে আড়-চোখে একবার প্যানার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—"কোতায়, তার আমি কি জানি?...কেন, তার খোঁজ কিসের জন্যে?"

প্যানা মুখ ভেংচালো—"জানো না কিসের জন্যে? ন্যাকা না কি—?"

কনেষ্টবল দু'জন এগিয়ে এলো। ভেংচি কেটেই প্যানা বললে—"বলি, কাল রাতে সে কোতায় ছিল হে ধম্মপুত্তুর?...সত্যি কথা বলবে,—বিশেষ এই মায়ের থানে বসে।..."

খ্যাঁদা এবার চীৎকার করে উঠলো:—"মুক্ সামলে কতা বলবে বলচি,...নইলে..."

প্যানা এগিয়ে এলো, বললে:—"নইলে কি? কি করতে পারবে তুমি আমার, তাই শুনি?"

শোনার অবকাশ হলো না আর, এই সময়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঝোড়োকে প্রবেশ করতে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে, তার পেছনে সখী।

ঝোড়ো বললে,—"চৌকীদার ঠাকদ্দা, বাবাকে হায়রাণ করো না, তার চেয়ে যা জিজ্ঞেস করবার তা আমায় শুধোও,—আমিই জবাব দেব তার।"

প্যানা এবার আরো এগিয়ে এলো, ওর রহস্যজনক দৃষ্টিপাতের উত্তরে কনেষ্টবল দু'জন এসে ঝোড়োর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিতেই খ্যাঁদার কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর শোনা গেল—"ই কি? বলি, ই কি তাজ্জব ব্যাপার!...য়্যাঁ, ই কি?"...যেন অনেক দিনের অনেক বিশ্বাস, অনেক আশা—যা সে এত দিন ঝোড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই এক লহমায় সে আশা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল কোনও একটা আকস্মিক ঝঞ্ঝায়।

ওর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে প্যানা হেসে উঠলো; হাসলো সখীও, কিন্তু ঝোড়োর মুখে কোনও জবাব এলো না। যেন আজই প্রথম সে খ্যাঁদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলে—জেনে হোক, আর না জেনেই হোক, কত বড় অপরাধ সে করেছে!

খ্যাঁদার চোখের সম্মুখে দিনের আলো যেন নিবে এলো, সেই সঙ্গে কানে এলো—ঝোড়োর অপরাধের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বসম্মত প্রমাণ!

সে গত কাল রাত্রের কোনও ডাকাতি-কেসের আসামী, এবং সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ঐ মাথার ক্ষতস্থান। খ্যাঁদা শিউরে উঠে চোখ বোজে, তার পর তাকিয়ে দেখে, ঝোড়োকে ওরা নিয়ে চলেছে প্যানারই প্রদর্শিত পথে—ফাঁড়ির দিকে।

এর পরেও—দিন চলে যায়।...

খ্যাঁদার দিন কাটে সুস্থ-অসুস্থতার মধ্যে—ম্যালেরিয়া জ্বরে

নতুন
EVEREADY
Fresh Power
BRIGHTER LIGHT
LONGER LIFE
EVEREADY
TRADE MARK
BATTERY
ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত

ভুগে, আর অসুস্থ শরীরে প্রতিবাসীদের সাহায্য ভিক্ষা করে। খ্যাদার সেই সবল বাহু আজ শিরা-বহুল, দুর্বল; চোখের সম্মুখেও অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে অকারণে। খ্যাদা হাঁপায়।

বহু দিন হ'লো, বোড়ো শহরের জেলখানায় আবদ্ধ; কবে সে মুক্তি পাবে খ্যাদা তা জানে না,—জানবার উৎকণ্ঠাও যেন নেই ত'র। কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—প্রাণকেষ্টর অনুগ্রহে সখী বোষ্টমীর কাঁচা-ঘরের পরিবর্ত্তে তৈরী হচ্ছে পাকা ইমারত, আর তার গায়ে পড়ছে চুণ-বালির প্রলেপ। খ্যাদা তাকিয়ে থাকে।···তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁপে চোখের পাতা দু'টো, কাঁপে সমস্ত মনটাও বোধ হয়! তার পর বোধ হয় অজ্ঞাতেই হাতখানা এসে থামে মন্ত্রপূত সেই খাঁড়াখানার ওপোর—যেখানা আজও কালীতলায় কয়েকখানা পাথরের ওপোর প্রতিষ্ঠিত থেকে গ্রামবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রে চলেছে।···সেই খাঁড়াখানাই আবার যেন নতুন হয়ে খ্যাদার দৃষ্টির সম্মুখে ঝক্-ঝক্ করে।···কোন্ অলক্ষ্য পুরী থেকে কে তার কাছে প্রার্থনা জানায়:—"রক্ত দে রে, রক্ত দে! বড় খিদে—"

খ্যাদা শিউরে ওঠে···।

রাত্রি গভীর।···

আর এক দিনের মত অবিশ্রান্ত জল ঝ'রছে আকাশ থেকে, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎও দেখা যাচ্ছে আকাশের এক-এক দিকে।

—স্বন্-স্বন-স্বন্!

ঝড় হাওয়া।···গায়ের কাপড়খানা গায়ে টেনে সখী ঘুম-কাতর চোখে বিছানার ওপোর উঠে বসেই চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"কে, ও কে?···"

দরোজার পাশে যে মানুষটা এসে আলো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, সে অকুণ্ঠ পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে সামনে। সখী দেখলে ওর হাতে সেই খাঁড়া—যে খাঁড়া প্রতিদিন কঙ্কনার তীরে ফুল-চন্দনে আর সিন্দুরে ঢাকা থাকে। সখী বিদ্রূপের মত উচ্চারণ করলে—"তুমি, খ্যাদা তুমি?···"

কিন্তু এ যেন খ্যাদা নয়, খ্যাদার প্রেতাত্মা! তাই শুক্‌নো, ফাটা ঠোঁট দু'টোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে খ্যাদা জবাব দিলে—"হ্যাঁ, আমি খ্যাদা! আমিই এসেছি আজ প্যানা চৌকীদারের খোঁজ নিতে। বল—কোতায় সে?···সে কোতায়···লুকিয়েচিস্ তাকে?"

সখী এবার কেঁদে উঠলো ককিয়ে:—"মাইরি বলচি খ্যাদা, আমি জানি নে প্যানার কথা, মাইরি জানি নে!···"

সঙ্গে সঙ্গে খ্যাদার বজ্রমুষ্টি ওর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ করবার জন্যে এগিয়ে আসে,—অনলবর্ষী দৃষ্টিতে সে সখীর দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করে—"য়্যাকনও? য়্যাকনও মিচে কতা? আমার ছেলেটাকে যাবজ্জীবনের জন্যে জেলখানায় পাঠিয়েও?···য়্যাঁ।"

সখী আর কিছু শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না চোখে, কেবল মনে হয়, খ্যাদার হাতের খাঁড়াখানা সবেগে এগিয়ে আসছে তারই দিকে,—তাকেই লক্ষ্য করে!

সখী চীৎকার করতে যায় প্রাণপণে, কিন্তু পারে না; চারি দিকের অন্ধকারের মধ্যে ওর অসহায় হাত দু'খানা যেন কোন আশ্রয় অন্বেষণ করে আকুল চেষ্টায়—তার পর লুটিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছাতেই সাতবাঁকীর প্যানা চৌকীদার আর গ্রামবাসী সবিস্ময়ে আর সভয়ে দেখলে, সখী বোষ্টমীকে কে তার ঘরেই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা ক'রে গেছে; আর কঙ্কনার কালীতলায়, বেদী আঁকড়ে ধরে রক্তাক্ত দেহে উপুড় হয়ে পড়ে আছে খ্যাদা ডোম।

মুখে আজ তার পরম সান্ত্বনার আশ্বাস; এখনো হাতের মুষ্টিতে তখনও সেই সিন্দুর-মাখা খড়্‌গখানার একটা প্রান্ত ধরে থাকতে দেখা যায়! সে খড়্‌গের ওপোর থেকে সিন্দুরের আর চন্দনের দাগ তখনও সম্পূর্ণ মিলায়নি, কেবল তারই ওপোরে খ্যাদার বুকের রক্তের গাঢ় একটা ছাপ লেগেছে মাত্র।···

গ্রামবাসীর সঙ্গে প্যানা চৌকীদারও একবার সভয়ে চমকে ওঠে,—তার পর আকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করে "মা, মা গো, রক্ষে করো,—বাঁচাও আমাদের, আমরা কিছু জানি নে, কিছু বুঝি নে, নির্দ্দোষী আমরা, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

উৎসুক

রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমার কাছে শিখব প্রীতির রীতি,—
এই মিনতি রাখতে আমার হবে।
আকাশ-ভরা পূর্ণমাসীর তিথি,
তারার মেলা মিলন-মহোৎসবে।

তোমার কাছে শুন্‌ব, কেমন সুরে
দখিণ বাতাস কয় কুসুমের কানে,
জানব আমি, আকাশ-ভুবন জুড়ে
কোন কথাটি বাজছে গানে গানে।

নাই বলিলে, সরম যদি লাগে,
কোন্ কথাটি তোমার মনে আছে,
নিখিল ধরা ভরা যে-অনুরাগে,
তার কথা আজ বোলো আমার কাছে।

আমার ছেলে হওয়ার সময়
জীবাণু-সংক্রমণের
কথা ভেবে ভয় হয়েছিল
দাই বলল
একটুও ভেবোনা, আমি তখন 'ডেটল' ব্যবহার করব
প্রসবের সময়
চমৎকার—'ডেটল' যখন রয়েছে তখন আর সংক্রমণের ভয় নেই
একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে আপনার—আর 'ডেটল'-এর গুণে আপনার স্ত্রী এখন ভালই থাকবেন
দাই বলে
ডাক্তাররা সব প্রসূতিকেই প্রসবের সময় 'ডেটল' ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন এবং বাড়ীতেও সর্ব্বদা 'ডেটল' রাখতে বলেন।
DETTOL
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ. ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা
B3

যে ঘরে হোলো না খেলা

ইউ-অং-স্থ

সুপরক্ষিতা নারী !

এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমি একা বসে আছি। বাড়ীতে যারা ছিলো সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। চারি পাশের এই শব্দহীন শান্ত পরিবেশে আমার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ কোরে জেগে আছে—একাকীত্বের নিবিড় অনুভূতি—আমার সমস্ত ভাবনাগুলি যেন কোন অজানা ব্যথার সুরে গাঁথা।

এখন সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। বাইরে পথের উপর সূর্য্যকিরণ ঝলমল কোরছে; বাতাসে ভেসে আসছে বসন্তের সৌরভ। কিন্তু সেই বাতাস আমার ঘরে এমন বিষণ্ণ, এমন বদ্ধ হোয়ে উঠছে কেন? সবুজ মাঠের কোলে, পীচ-গাছের ছায়ায়, লাংহোয়ার শ্যামল বীথিতে কত তরুণ-তরুণীর সমাবেশ, কত রঙের খেলা, ঘন নীল আকাশের নীচে ভেসে যাচ্ছে তাদের হাসি-গানের সুর। কিন্তু আমার জানলার ধারে, আমার ব্যথিত আত্মার সম্মুখে সেই আকাশকেই এমন একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত মনে হয় কেন? কেন আমার দেহ, মন, প্রাণ নব জীবনের এই স্পন্দনে সাড়া দিচ্ছে না? বসন্তের এই উষ্ণ-মধুর সোহাগে, প্রকৃতির বুকের কচি কিশলয় আজ শ্যামল বীথিতে পরিণত, কিন্তু এই মধু ঋতুতে আমি কেন যোগ দিতে পাচ্ছি না? হায় রে নারী! যাকে ভালবাসলে ধন্য হোতো এ জীবন,—তবু যাকে ভালবাসতে পারি না! সমস্ত পৃথিবীর উপর আমার ঘৃণা, নিজেকেও ঘৃণা করি কেন জানো? তোমার উপর আমার পাশবিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য।

তুমি চলে যাচ্ছো, হয়ত এতক্ষণ তোমার ট্রেণ সান কিয়াংও ছাড়িয়ে গেছে। কল্পনায় তোমার ছবিখানি আমার চোখের সামনে মূর্ত্ত হোয়ে উঠছে। তুমি বসে আছো, তোমার কালো চোখের উদাস দৃষ্টিখানি পাঠিয়ে দিয়েছো সবুজ মাঠের বুকে রাঙা মাটির পথে পথিকদের উপর। কি ভাবছো তুমি? সে তো বলা কঠিন নয়—তোমার ঐ কালো চোখের কাণায় কাণায় যে জোয়ার এসেছে। তোমার মনে জেগে উঠছে একে একে—তোমার উপর আমার নিষ্ঠুর আচরণের সব স্মৃতি—যখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে ছিলাম। নারী! যাকে ভালোবাসা আমার আদর্শ, কিন্তু তবুও যাকে পারি না বাসতে, সেই তুমিই শোনো—অতীতের সব কিছুর পরিবর্ত্তে, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে ছিলো তোমার প্রতি নিবিড় সহানুভূতি—আমার সেই সব অপমান, অত্যাচার, গালি আসলে কি তা জানো? সে হোচ্ছে আমাদের সমাজ, যেখানে আমাদের মত লোকের সৃষ্টি হয় তার প্রতি চরমতম ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। সত্যি যদি তোমায় আমার মনের ভিতরটি উন্মুক্ত কোরে দেখাতে পারতাম, তবে হয়তো আমার সব অত্যাচারই তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব হোতো।

আমার মনে হয়—আজ চিং সিংএর উৎসব, প্রকৃতির বুকে তরুণ-তরুণীর আনন্দ সম্মিলন। হয়তো তুমি তোমার গাড়ীর জানলা থেকে অনেককেই দেখতে পাচ্ছো। আচ্ছা, এই দৃশ্য তোমার মনটিকে আমার উপর আরও বিরূপ কোরে তুলছে না? আমায় ঘৃণা কোরেই যেন তুমি সান্ত্বনা পাও—তোমার মনের অনুভূতিগুলি তার ভিতর নিবিড় কোরে ফুটে উঠুক। তুমি প্রার্থনা করো, যেন আমার এই জীবনের শীগ্‌গিরই অবসান ঘটে। কিন্তু হায় রে অভাগিনী, আমি জানি তুমি তা কোরতে পারো না—তুমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম, এমন কি যে মুহূর্ত্তে তুমি চেষ্টা কর, সেই মুহূর্ত্তে আবার আমাকে ক্ষমা করার জন্য কারণ খুঁজতে চাও। তোমার মনটি যে কি কোমলতায় ভরা—সে বিষয়ে কি কোনো প্রশ্নই জাগে?

জানি না কতগুলি (কিম্বা ক'টি মাত্র) দিন আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা—সে যেন ছিলো বিধির বিধান। তুমি জানো যখন আমি সাগর-পারে চলে যাই, তখন আমার বয়স সতেরো। তবু ঐ বয়সেও নিজের বাড়ীর চেয়ে যে কোনো অজানা-অচেনা, এমন কি কঠিন পরিবেশের মধ্যেও থাকতে ভালোবাসতাম। আমি আটটি বছর ঘর-ছাড়া হোয়েছিলাম, এই সুদীর্ঘ দিনগুলির মধ্যে এমন কি শীত-গ্রীষ্মের অবকাশের সময়ও একটি বারের জন্য বাড়ী ফিরিনি। কেন তা জানো? কারণ বিবাহের প্রতি আমার নিবিড় ঘৃণা ছিলো—না, না, তোমার উপর নয়—ছিলো শুধু ঐ আগে থেকে স্থির কোরে রাখা সেকালের বিবাহ-প্রথার উপর। আমি ঠিক কোরেছিলাম বিদ্রোহ করবো—তাই যত দিন জাপানে ছিলাম তত দিন বিবাহ কোরতে পারিনি।

অবশেষে চার বছর আগের এক গ্রীষ্মকালে আমি ফিরে এলাম। তার পরই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকের বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হোলো। আমাদের দেশের সেই চিরকালের কঠিন প্রথা বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙতে দিলে না। তোমার মা, বাবা, আর দেরী করা উচিত নয় বলে জোর কোরতে লাগলেন, আর আমার মা চোখের জল ফেলে 'অবাধ্য সন্তান' বলে আমাকে অভিযুক্ত কোরলেন। চার পাশের এই হৃদয়হীন লোকগুলি—এরা যেন জোর কোরে আমাদের এক অবাঞ্ছিত মিলনে বেঁধে দিলে। আমার সে বিদ্রোহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হোলো। তাই বলছি, আজকের এই ব্যর্থ পরিণামের জন্য আমরা তো দায়ী নই—আমাদের বাপ, মা এমন কি, সমগ্র চীন দেশ দায়ী। কিন্তু এত দিন ধরে এর কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করা আমার উচিত হয়নি।

উৎসবটা তোমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু আমি তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাইনি। আমি ভেবেছিলাম যখন সহ্য কোরতেই হবে, তখন এ নিয়ে আন্দোলন না করাই ভালো। অতিথি-সমাগম, আদর-অভ্যর্থনা—আইন অনুযায়ী কাজ—সে সব কিছুই হয়নি—এমন কি দু'টি দীপও জ্বলেনি। এখান থেকে ২২ লী দূরে তোমাদের বাড়ী; তুমি এলে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে। একটি ছোটো সিডান চেয়ারে তোমাকে আনা হোয়েছিলো। সে রাত্রে আমার মায়ের সঙ্গে একা-একাই তুমি খাওয়া শেষ কোরলে। তার পর নিজেই উপরে যাবার সিঁড়ি খুঁজে নিয়ে ছোটো বাঁধা পা দু'খানি ধীরে ধীরে ফেলে একা এসে ঢুকলে আমার ঘরে।

আমাকে বলা হোয়েছিলো, তুমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছো। গভীর রাত্রে আমি এসে তোমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম। তোমার পরনে ছিলো পাতলা পশমের একখানি রাত্রিবাস—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে তুমি ঘুমাচ্ছিলে। আজও মনে জাগে, সে রাত্রে তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষা-ভরা ব্যগ্র ভঙ্গীটি। আমি বিছানায় ঢোকবার সময় তুমি জেগে উঠলে, বাতির ম্লান আলোয় আমার দিকে স্তব্ধ হোয়ে চেয়ে রইলে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো, তোমার মুখখানি অশ্রুসিক্ত, ঠোঁট দু'খানি বেঁপে বেঁপে

উঠছিলো—আর কি করুণ ক্লান্তিতে তোমার কচি মুখখানি ম্লান হোয়ে উঠেছিলো। সে রাতের কথা ভেবে আজও চোখে জল ভরে আসে।

তুমি জীবনে সেই প্রথম সহরে এলে। তার আগের জীবন কেটেছে সেই ছোটো শান্ত পল্লীর বুকে। ছোটো থেকেই অন্তঃপুরে বন্ধ ছিলে, কখনও স্কুলে যাবার অনুমতিও পাওনি :—তাই বুঝি ছিলে অমন ভীরু, লাজুক মেয়েটি! কিন্তু চীন দেশে নারীর যে কর্ত্তব্য, সে শিক্ষায় তোমার এতটুকু ত্রুটি হয়নি। মনে আছে আমাদের বাড়ী আসার সময় তুমি একটি ছোটো-খাটো লাইব্রেরী সঙ্গে এনেছিলে,—তাতে ছিলো, বিখ্যাত মহিলাদের জীবনী, আর ঐ ধরণের কত বই যা তোমাদের পরিবারে তোমাকে পড়তে হোয়েছিলো—জীবন সম্বন্ধে সব ধারণা যা' থেকে পেয়েছিলে। এ কথা খুবই সত্যি, পুরুষের মন আকর্ষণ কোরতে তুমি শেখনি, আধুনিক ধরণে বেশবাসও তোমার জানা ছিল না। কিন্তু 'কনফুশিয়াং'এর 'নম্র ব্যবহার' সম্বন্ধে যে উপদেশ ছিলো তার একটি বাণীও তুমি শিখতে বাকী রাখনি।

বিবাহের উৎসব শেষ হোলে সহরের গণ্ডী থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্য আমরা তোমার মা-বাবার কাছে গিয়েছিলাম—সেখানে মিলেছিলো সত্যিকারের আনন্দের স্বাদ, তখন যদি থেকে যেতাম! ……কিন্তু তোমার সেই বদ্‌মাইশ ভাইপোটা? সে তোমাকে সব সময় জ্বালাতন কোরতো, তার অত্যাচারে আমি রাগে জ্ঞান হারাতাম আর তুমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে। ঐ নিয়ে ঝগড়া-ঝাটীর পরদিনই আমরা সহরে ফিরে এলাম। সেখানে দু'দিন থাকার পরই আমি অসুস্থ হোয়ে পড়লাম, তোমারও ম্যালেরিয়া সুরু হোলো। দু'জনেই তখন হতাশ, কিন্তু আমি অসুখটাকে তুচ্ছ করে এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য মরীয়া হোয়ে উঠলাম। তোমার মনে পড়ে, কতকগুলি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম, বাড়ী ফিরলাম সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায়, এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম—বলো তো ব্যাপারটা ভারী অসহ্য হোয়ে উঠেছিলো না? তোমার সম্বন্ধে একটা আবছা চেতনা ছিলো আমার—মনে হয়, ম্লান আলোয় রাত্রির মত নিস্তব্ধ হোয়ে বসেছিলে। পরদিন ভোরে জেগে দেখি সেই একই ভাবে বসে আছো, সমস্ত রাতের মধ্যে একবারটিও বিছানার ধারে আসতে সাহস করনি। তোমাকে বলবার মত একটি কথাও সেদিন খুঁজে পাইনি। তুমিও বলনি একটিও কথা—এমন কি যখন চোলে যাচ্ছি তখনও না। ভোরের কিছু পরেই মা এসে খবর দিলে 'ডিয়ার হিল'এর তলায় জাহাজ দেখা যাচ্ছে। সেদিনের বিদায়ের স্মৃতিটি তোমার মনে গেঁথে দু'বছরের জন্যে তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম। তোমার চিঠিতে খবর আসতো বুড়ী ঠাকুমা আমাকে দেখতে চায়, কবে ছুটীতে বাড়ী যাবো সেই আশায় দিন গোণে। তুমি জানাতে, মায়ের বয়স দিন দিন বাড়ছে ছাড়া কমছে না তো, মাকে একটু তৃপ্তি দেবার জন্যেও আমার আসা উচিত। কিন্তু তাদের মত তোমার কথাটি তো তুমি জানাতে না। আর আমি তখন রাজ্যের অকর্ম্মা বন্ধু জুটিয়ে জাপানী সুন্দরীদের মোহে মত্ত ছিলাম। চীনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও আমার ছিল না—সব দায়িত্ব ভার সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরছিলাম। স্বাধীন ভাবে বাঁচতে না পারলে জীবনে লাভ কি? অত্যধিক মদ ধরে দিনের মধ্যে সারাক্ষণই মাতাল হোয়ে পড়ে থাকতাম। কতগুলি বিদেশিনী রূপসী যে আমার কাছে এলো আর গেলো, তা' আমার মনেও নেই—তারা যেন প্রাণহীন জড়পিণ্ডের রাশি! যাই হোক, আমাকে আমোদ দিতে পারলেই হোলো, আর কিছুতেই আমার এসে-যেতো না। কিন্তু এমন কোরে মদে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তোমার কথা মনে পড়তো মাঝে মাঝে, আর তখনই যেন রাতের কালো অন্ধকারে স্নিগ্ধ হাওয়া বহে যেতো—আকাশে চাঁদ হোয়ে উঠতো আরও উজ্জ্বল। কখনও কখনও আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে ধিক্কার দিতাম আমার এই হতভাগ্য দশায় তোমাকে বেঁধেছি বলে।

গত বছরের আগের বছর যখন আমি চীনে ফিরে এলাম কিছু দিনের জন্য, সেবারের মত অত স্পষ্ট হোয়ে আমার ঘৃণা আর কখনও প্রকাশ পায়নি। তোমার কাছে না গিয়ে 'এ্যাময়'তে আমার এক বন্ধুর অতিথি হোয়ে সেখানেই তিন মাস কাটাই। তার পর 'সাংহাই'তে গিয়ে নববর্ষ উৎসব শেষ করে 'টোকিও'তে ফিরে আসি। শেষে গত বসন্ত কালে যখন আমার থিসীস লেখা শেষ হোলো তখন জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হলাম। রাশীকৃত বাজে বইয়ের বোঝা নিয়ে 'সাংহাই'তে ফিরে কাজের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু কি কাজ? কি-ই বা করবার ক্ষমতা ছিলো? তবে আমাদের গভর্ণমেণ্ট আর অশিক্ষিত দেশবাসীদের ধন্যবাদ—আমাকে অর্থাৎ একটি অকেজো, ভীরু লোককে—সমুদ্রপারে বৃত্তি দিয়ে শিক্ষার জন্য পাঠানো হোলো। গভর্ণমেণ্টের ঐ সাহায্যে আমার খাবার-খরচই চলতো না, তবে নিয়মিত ভাবে টাকাটা হাতে পেতাম। তাছাড়া নানা রকম ফন্দী করে আমি মা আর ভাইদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতাম। তাইতে ঐ নব ঐশ্বর্য্যসম্ভার, ভোগবিলাসে ভরা রাজধানীতে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবার খুবই সুবিধা হোতো। কিন্তু তার পর এলো সেই নির্দ্দিষ্ট দিন—আমাকে লাইব্রেরীর সাহায্য ত্যাগ করে সরে যেতে হোলো। কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ছাত্রদের বৃত্তি-ফাণ্ডটির ভার পেয়েছিলেন—গত জুনে আমার মাসিক বৃত্তিটা একেবারেই বন্ধ হোলো।

যাক্, সাহায্য তো বহু দিন ধরেই পেয়েছিলাম, বয়সও তখন ত্রিশের কাছাকাছি। সমাজের বাধা-বিঘ্ন সব-কিছুর ভিতর দিয়ে পথ করে নেবারই তো সময় তখন। তাছাড়া সে সময় আমি বিদেশের 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে'র গ্রাজুয়েট, তখন আর মা-ভাইয়ের কাছে সাহায্য নেবার মুখ ছিল না। তুমি কি জানো? কেন গত গ্রীষ্মকালে বাড়ী ফেরবার আগে মাসখানেকেরও বেশী আমি সাংহাইতে ছিলাম? আর গোপন করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, যত দিনের পথ-খরচ ছিলো তত দিন ধরেই গড়িমসি করার ইচ্ছাটাই ছিলো প্রবল, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিলো। আমি জানতে চেষ্টা করছিলাম যে আমার আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে কি না। আমার হৃদয়ের সব উৎস শুকিয়ে গিয়েছিলো, পার্থিব প্রয়োজনের মত কিছুই বাকী ছিল না। এক দিন রাত্রে 'হোয়াংপু' নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের বুকে ঢেউয়ের দোলা দেখছিলাম। তীব্র নিরাশায় আমার সমস্ত অন্তর ভরে গিয়েছিলো।

সমুদ্রপারের দিনগুলি কাটিয়েছি কি এক ভীরু বিশ্লেষণী মন নিয়ে। নিজের উন্নতির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না। একটাও প্রবন্ধ লিখিনি, একটি বারের জন্যও ছাত্রদের উত্তেজিত তর্ক-সভায়

যাইনি, কিম্বা আর সব আধুনিক তরুণদের মত আমাদের গণ-আন্দোলনেও যোগ দিইনি। সর্ব্বদাই কেমন যেন বিমর্ষ বোধ কোরতাম। কোনো কাজে নিজের কাছ থেকে একটু সাড়া পেতাম না। কি জানি কি হোয়েছিলো আমার। এই অবস্থায় জীবনের মূল্য কিছু ছিলো কি? কোথাও কোনো কাজ, কোনো চাকরী খুঁজে পেলাম না—তাই শেষে মুক্তির সব চেয়ে ভালো উপায় ঠিক কোরলাম—অর্থাৎ আত্মহত্যা।

এই নেশা আমাকে আচ্ছন্ন কোরে তুললো। প্রতি রাত্রেই উঠে ধীরে ধীরে এসে হোয়াংপু নদীর তীরে দাঁড়াতাম। কিন্তু একটা সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কিছু করবার জন্য মন অস্থির হোয়ে পড়েছিলো। প্রয়োজনীয় কাজ অর্থে আমার আদর্শ ছিলো প্রথমতঃ অনেক টাকা পাওয়া, তার পর মদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দু'-এক জনকে হত্যা কোরে জীবনের যবনিকা টেনে দেওয়া। যদি সে ধনী হোতো তবে তাকে হত্যা করলে সমাজের কল্যাণ হোতো, আর গরীব হোলে তাকে হত্যা কোরে তার ভারবাহী জীবন থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হোতো—তারও পরে? হোয়াংপুর জলে নিজেকে বিসর্জ্জন। তাছাড়া তুমি জান কি যে সারা ক্ষণ এই উন্মত্তের মত চিন্তা করার অবসরে একটি বারও একথা ভাবিনি যে আমার মৃত্যুর পর তোমার কি হবে? মা কি ঠাকুমার কথাও একবারও ভাবিনি। তুমি হয়তো বলবে আমার দায়িত্বজ্ঞান চিরদিনই নেই। সত্যিই তাই, আমি এতে কেমন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পেতাম। এর জন্য দোষী কে জানো? প্রথমতঃ, আমাদের এই বর্ব্বর সমাজ যাতে আমাদের বাধ্য হোয়ে থাকতে হয়, অথচ কোনো উপকারেই আসে না, দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা, বাবা যাঁরা তোমাকে এতটুকুও স্বাধীনতা আর আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেননি। সবার শেষে দায়ী আমার মা, আমাদের সমগ্র পরিবার আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা, মৃত্যুর পরেও যাঁদের প্রভাব এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার অক্ষমতার কথা জানা সত্ত্বেও জেদ কোরে আমাকে এই বিয়েতে বাধ্য করা হোয়েছিলো। কিন্তু তখন এ সব কারণ মাথায় আসেনি, ভাবিনি তোমার কথা।

যদি ট— সেদিন রাতে অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে 'এ্যাময়ে'র বন্ধুর কাছ থেকে ঐ চিঠিটা নিয়ে আমার বাসায় না আসতো তাহ'লে কি যে হোতো তা বোলতে পারি না। সাধারণতঃ ট—র সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎটা নেহাৎই একতরফা ছিলো, কারণ আমার নিমন্ত্রণের প্রতিদান ও কখনও দিত না। তাই জুনের সন্ধ্যায় তাকে হঠাৎ আসতে দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ খবর আছে। ঠিকই ভেবেছিলাম। আমার ভাঙা ডেস্কটার পাশে বসবার আগেই ও চিঠিটার কথা বোললে—"তুমি 'এ্যাময়'তে একটা শিক্ষকতার কাজ পেয়েছো—এখন কি বল?" তুমি তো জানো, এই শিক্ষকের কাজে আমার কি বিতৃষ্ণাই ছিলো, শিক্ষিতদের কাছে এটা যেন একটা বিশেষ শ্রেণীর নরক। প্রায় দু'মাস আমার কাছে থাকার পর তোমার এ সম্বন্ধে কোনো ভুলই থাকতে পারে না। সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার যে, এই কলেজটা নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ভরা ছিলো—সভাপতিত্ব পাবার আকাঙ্ক্ষায় কতকগুলি লোকের পরস্পর রেষারেষিই এর মূলে ছিলো; তাই যাঁরাই সেখানে শিক্ষকতা কোরতেন তাঁদেরই বাধ্য হোয়ে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হোতো। জানি না এখনও তুমি বুঝবে কি না যে অনাহারের মুখে দাঁড়ানো এই পারিপার্শ্বিকতায় কাজ নেওয়া আমার পক্ষে কতটা অসম্ভব ছিলো। হায় রে! মনে পড়ে সেই সব চিঠি—খুবই ব্যস্ত আছি জানিয়ে তখন যা' তোমাকে লিখতাম।

বাস্তবিক আমি যেন দিশাহারা হোয়ে পড়েছিলাম, তাই এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার সাহস কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। ট— যখন আমার হাতে চিঠিটা দিলে তখন আমি একেবারে নিঃস্ব, আমার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কাপড়-চোপড় অবধি বাঁধা পড়েছে। আমার অবস্থা ঠিক সেই জার্ম্মাণ কবি Grabbe-এর মত হোয়েছিলো—সে-ও খ্যাতির আশাতেই সহরে এসেছিলো। আসার আগে তার বৃদ্ধা মা তাকে একপ্রস্থ পৈতৃক আমলের রূপার বাসন দিয়েছিলেন। বহু দিন ধরে ঐগুলি রক্ষিত হোয়েছিলো। কিন্তু কবিকে সহরে এসে ঐ বাসন বাঁধা দিয়েই জীবিকা উপার্জ্জন সুরু কোরতে হোলো। প্রতিদিনই একটি চামচ কিম্বা অন্য কিছু বাঁধা দিয়ে চালাতেন। অল্প দিনেই সব বাসন শেষ হোয়ে যায়। কিন্তু আমার তো অমন দামী পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু ছিলো না, থাকার মধ্যে ছিলো একটি রূপার ছবি রাখা ফ্রেম। টোকিও থেকে তোমার জন্য কিনেছিলাম। কত বার লোভ হোয়েছিলো ঐটি বাঁধা দেবার, কিন্তু কোনো রকমে সব সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত কাটিয়ে উঠে ঠিক কোরেছিলাম, যদি সত্যিই সম্ভব হয় তবে এটিকে ছাড়বো না—কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তাই সে সত্ত্বেও চিঠিখানি পেয়ে এক মহাজনের কাছে ওটি বাঁধা দিয়ে নিয়ে এলাম তোমাদের কাছে যাবার পাথেয়—মাকে, ঠাকুমাকে আর আমার লাজুক ভীরু বধূটিকে দেখবার জন্য।

জুন মাসের সেই দ্বিপ্রহর—কি বুকভাঙা সৌন্দর্য্যে ভরা ছিলো! সেদিন হাংচাউ থেকে চৌয়েন টুং নদীর বুকের উপর দিয়ে, হোলিনেস আর সী পাহাড়ের গ্রাম্য সেতুটির নীচ দিয়ে শ্যামল উপত্যকার তলায় আমাদের জাহাজ ভেসে চোললো আমার জন্মভূমির দিকে। আমার আনন্দের ভিতরও কেমন যেন এক অজানা আশঙ্কা বার-বার কেঁপে উঠছিলো। সহরে ঢোকবার পর থেকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী দেখে আমার যেন মনে হোলো দম বন্ধ হোয়ে আসছে। আমি তবুও গুন-গুন কোরে গান গাইছিলাম, আর এমন পরস্পর-বিরোধী দু'টি অনুভূতি যদি একই সঙ্গে সম্ভব হয় তবে তখন আমার মনে এই প্রার্থনাই জেগেছিলো যে—"হে ঈশ্বর, যেন পরিচিত কেউ আমাকে জাহাজ থেকে নামতে না দেখে। এমন দীন-হীন অবস্থায় যে কেউ আমাকে ফিরতে দেখবে তা আমার সহ্য হবে না।"

জাহাজ নোঙর কোরতেই তীরে নেমে পড়লাম। দুই হাতে দু'টি বাক্স নিয়ে সেই প্রখর রোদের মধ্যেই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে এগোলাম। চারি দিকের জনতার মধ্যে আমি পলাতকের মত মাথা নীচু করে যাচ্ছিলাম। বাড়ী অবধি নিরাপদেই পৌঁছানো গেলো, সদর দরজায় ঢুকতেই চোখে পড়লো, মা একা-একা বসে চা খাচ্ছেন। আশ্চর্য্য! জানো, আমার বরাবর ইচ্ছে ছিলো প্রথম দেখার মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ডাকবো—"মা গো, মা আমার!" কিন্তু গিয়ে যখন মাকে দেখলাম আবার সেই ঘৃণার ভাবটা মনে জেগে উঠলো—কিছুতেই আর মায়ের কাছে যেতে পারলাম না। যে অবিচারের ফলে আমার এমন দশা, তাকে ধিক্কার না দিয়ে পারলাম না। কোনো কথাই না বলে বেঞ্চের উপর চাপড়ায় ব্যাগ দু'টি

ফেলে তাড়াতাড়ি উপরে চলে এলাম—পাছে হৃদয়াবেগের অবতারণা শুরু হয়।

উপরে এসে অবাক্ হোয়ে দেখি, তুমি বিছানার সামনে নতজানু হোয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছো, চোখের জলে তোমার মুখখানি ভেসে গেছে। আমি হতবুদ্ধি হোয়ে কিছুক্ষণ তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, অনুশোচনায় মন ভরে গেলো। কিন্তু শেষে নীরস গলায় জিজ্ঞাসা কোরলাম—"কি হোলে কি তোমার?"—তুমি আরও আকুল হোয়ে কাঁদতে লাগলে, আমার বার-বার প্রশ্নের কোনো উত্তরই না দিয়ে আরও উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলে। কিন্তু হায় ভগবান! কারো কান্না থামানো দূরে থাক, লোকের দুরবস্থা দেখলে আমি নিজের চোখের জল সামলাতে পারি না। পর-মুহূর্ত্তেই আমি তোমার মাথাটি বুকে চেপে ধরি, চোখের জলে নিজের ব্যথাও তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম। একটু পরেই মা উঠে এলেন সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে—"কি গো নবাব-নন্দিনী, দু'টো ভালো কথাই বলেছিলাম, কিন্তু খুব যে রাগ দেখিয়ে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে?—আর তুই ক্ষুদে শয়তান, সাংহাই থেকে বেড়িয়ে ফিরলি! একটি মাস সহরে বসে কুঁড়েমি কোরে কাটালি। তার পর এসে একটা কথা অবধি না বলে পায়ের কাছে যে ব্যাগ দু'টো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলি—এ কেমন ধারা শিক্ষা? নবাব-পুত্তুর হলেও এত অপমান সহ্য করা যায় না···আমি তখনই জানি, তোরা স্বামি-স্ত্রীতে লুকিয়ে চিঠিপত্র লিখছিস—এই আমাকেই মারবার মতলবে, উঁহু, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।"

আমার চোখের জল শুকিয়ে বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেলো। সেই দারুণ গরমেও আমার সমস্ত দেহ পাথরের মত শক্ত হোয়ে গেল, ঠিক ভরা শীতের রাতে দমকা হাওয়া লেগে যেমন ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। অত-বড় একটা ঘা খেয়ে প্রতিশোধের জন্য আমি চিৎকার কোরে উঠতে গেলাম, তুমি যদি না সেদিন পিছন থেকে আমায় ধরে রাখতে তাহ'লে একটা ভীষণ কিছু কোরে বোসতাম যার সমাপ্তি ঘটতো মায়ের কাছে চিরবিদায় নিয়ে। অন্ততঃ এই জন্যও, অবাধ্য সন্তানকে আরও একটা বড় অপরাধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তোমরা কেউই আশা করনি যে সেদিন আমি ফিরবো। পরে সমস্ত ব্যাপারটা একটু শান্ত হোলে জানলাম মা সারাক্ষণ কেমন কোরে তোমায় গালি দিতেন, আর সাংহাইতে আমার পড়ে থাকার জন্য তোমাকেই কোরতেন দোষী। যখন শুনলে যে আবার আমি তোমাকে ছেড়ে 'এ্যাময়'তে যাবে, তখন তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু ছিল না, কারণ এ ব্যাপার তোমার কাছে এই প্রথম নয়।

যেমন সব কিছুতেই আত্মসমর্পণ আর নম্র ভাব তোমার ঐ অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার মূলে ছিলো, তেমনি সব কিছুতেই অধৈর্য্য অথচ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাবার অক্ষমতা ছিলো আমার দুঃখের মূল। আর বিদ্রোহ? বিদ্রোহ কথাটাই শুধু জানি কিন্তু কোথায় কেমন ক'রে এ কথার ব্যবহার করবো? আমার মত দুর্ব্বল অস্থিরচিত্ত লোক কখনই তা' বোলতে পারে না।

ওই বিশ্রী ঘটনার পর থেকেই তোমার দিকে আমার লক্ষ্য হোলো। দেখলাম, যখন তুমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতে তখনকার চেয়ে তুমি অনেক রোগা, ফ্যাকাশে, রক্তহীন হোয়ে গেছো। তোমার রক্তমাংসহীন পা দু'খানি বাঁশপাতার মত সরু হোয়ে গেছে। আমি ঠিক কোরলাম 'এ্যাময়'তে তোমাকেও নিয়ে যাবো, পথ-খরচা পাবার জন্য কলেজে একটি চিঠিও দিলাম। যখন ঐ দু'শো ডলার পাবার জন্য আমাদের প্রতীক্ষা চোলছিলো, তখন অবধি মাকে এই গোপন পরামর্শের একটি কথাও জানাইনি। শেষ অবধি যখন টাকা এলো তখনও তোমার ইতস্ততঃ ভাব ঘোচেনি। তুমি বোললে, "যদি ওখানে তোমার চাকরী যায়? যদি আমরা নিঃসম্বল হোয়ে পড়ি তখন কি হবে? কোথায়ই বা যাবো?"—গ্রীসের গণৎকারদের মত তুমি ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের নির্দ্দেশ দিলে, কিন্তু তখন কি জানতাম আজকের এই মর্ম্মান্তিক সমাপ্তির কথা?

আমাদের ক'টি মাত্র মিলিত দিন, কি অবাঞ্ছিত ফলই এনে দিলে! তখন আমরা সবে মাত্র 'এ্যাময়'তে বসবাস স্বরু কোরেছি—এমন সময় তোমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গলো। তুমি কিছুই খেতে পারতে না, সর্ব্বদাই ক্লান্তিতে অবসন্ন হোয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে। আমি প্রথমে আসল ব্যাপারটা জানতাম না, তাই তোমাকে কত রূঢ় কথাই বলেছি। এমন কি তৃতীয়, চতুর্থ মাসেও যখন এর স্থিরতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জাগে না, তখনও কি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরতাম তোমার সঙ্গে। আমার মনের সমস্ত আক্রোশ, ক্ষোভ তোমার উপর দিয়েই মিটিয়ে নিতাম!

আমি এই ছেলে-পড়ানোর কাজকে সত্যিই ঘৃণা কোরতাম, আমার মনে হোতো এর চেয়ে নীরস, ক্লান্তিকর বুঝি আর কিছুই নেই। সমস্ত ক্ষণ এ যেন আমাকে কাঁটার মত বিঁধে থাকতো, আর যখন এ-ক্লাশ, ও-ক্লাশ যাওয়া-আসা কোরতাম তখন মনে হোতো যেন আমাকে বিনা অপরাধে বন্দী ক'রে অত্যাচার কোরছে। এই দুঃখটা সব সময় আমার মনে জাগতো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী করুণা আর দুর্ব্বলতা ছিলো তোমার উপর—যা আমি সর্ব্বদাই চাপা দেবার চেষ্টা কোরতাম।

ব্যাপারটা হোলো, আমার বহু দিন আগের একটি রচনা একটি পত্রিকায় আমার অজানাতেই প্রকাশিত হোয়েছিলো। এইটিতে আমার উপর চারি দিক্ থেকে আক্রমণ স্বরু হোলো, বিশেষ করে কয়েক জন হিংসুক সহকর্মীদের কাছ থেকে। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। রুদ্ধ আক্রোশে, নিষ্ফল ক্রোধে আমি আত্মহারা হোয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তবুও প্রফেসারিটা ছাড়তে পারিনি। আবার হোলো সেই গত জুনের আগেকার অবস্থার পুনরাবৃত্তি; তা-ও শুধু তোমাকে নিয়ে নয়, আরও একটি অনাগত শিশুকে নিয়ে—উঃ, এ আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি। কিন্তু এর জন্য তুমি কি দুঃখই না সয়েছিলে!

নিজেকে সমাজচ্যুত কল্পনা কোরে নিয়ে, সমাজের কোনো কাজেই না লাগার ভীরুতাটা তোমার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন কোরেই মিটিয়ে নিতাম। তুমিই, না,—আমি না নয়—তুমিই সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দিয়েছিলে, সমাজের কঠোর অত্যাচার নিরীহ পশুর মত তোমাকে জবাই কোরেছিলো—তবে, হ্যাঁ, সেটা ঘটেছিলো আমারি মধ্যস্থতায়। নিজের কাজের সমর্থনের জন্য কত বাজে ভিত্তিহীন ওজরই না দেখাতাম—কোথাও অপমানিত হোয়ে ফিরে এলে তোমার রান্নার খুঁত ধরে, গৃহস্থালীর নিন্দা কোরে তোমাকেই আমার সকল অশান্তির মূল সাব্যস্ত কোরতাম। যখন ঐ চাকরীটা

যাবার ভয়ে উত্তেজিত হোয়ে তোমাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত কোরতাম, তখনকার প্রতিটি কথা এখনও আমার মনে গাঁথা আছে।

আমি বলেছিলাম—"কেন? কেন তুমি মরছো না? শুধু তুমি গেলেই আমি আবার শান্তি পাবো। তুমি আমার কে? কেন তোমার জন্যে এই পশুর মত পরিশ্রম কোরবো—আমি কি তোমার কেনা চাকর? উঃ, মুক্তি—একটু শুধু মুক্তি—এই নরক-যন্ত্রণা থেকে তুমি আমায় মুক্তি দাও—আমাকে বাঁচতে দাও। তুমি তো মরবে বাছা, তবু—তবু কেন তুমি আজও বেঁচে আছো?"

তুমি নীরবে শুনতে সব; যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো, তখন চোখের জলের বাঁধও ভাঙ্গতো, কিন্তু তুমি কাঁদতে নিঃশব্দে, চাইতে না সে গোপন বেদনার আমি সাক্ষী থাকি। অনুশোচনায় মন ভরে যেতো, আবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম, আদর কোরে বোঝাবার চেষ্টা কোরতাম। তোমাকে এই কথাই তখন বোঝাতে চেয়েছি যে তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই, আমি ঘৃণা কোরতাম এই জগৎটাকে, এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমার সব দুঃখ, অভিযোগ, তোমার ভিতর দিয়েই মুক্তির পথ নিত। তাইতেই বোধ হয় তুমি আরও উচ্ছ্বসিত হোয়ে কাঁদতে, আর বেশী সময়েই পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হোয়ে এই কান্নার সমাপ্তি হোতো। প্রথম দিকে এ ব্যাপার প্রায়ই ঘটতো, কিন্তু বিশেষ কোরে নববর্ষের ছুটিতে প্রায় প্রতিদিনই ঘটতে লাগলো, এমন কি দিনে দু'বার কোরেও।

আমাদের দু'জনার মাঝে কি দুঃসহ ব্যথা-ভরা দিনগুলি এলো। আচ্ছা 'বিবাহটাই অপরাধ, না, যে সমাজ এই বিবাহে জোর করে অপরাধ তার? এ প্রশ্নটি যদি সত্য হয়, তবে তো জীবনটাই মিথ্যা, আর সমাজ দায়ী হোলে আমাদের উচিত এর প্রথাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত করা। আমাদের মত ক্রমাগতই বংশবৃদ্ধি কোরে দুঃখকে গভীর না কোরে এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ থাকা উচিত। মাসখানেক বয়স হবার আগেই আমাদের দু'জনার ব্যাধি দেখা দিলো আমাদের সন্তানের মধ্যে—এই অবাঞ্ছিত জীবনের ক্ষুদ্র বোঝাটির মধ্যে—আমাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের এই ভরা পাত্রটির মধ্যে……। কি অসম্ভব দুর্ব্বল, ভীরু-প্রকৃতি হোলো তার সেটা লক্ষ্য করবার বিষয় ছিলো, আর কত সামান্য কারণেই কেঁদে উঠতো। দুধ দিতে এক মুহূর্ত্ত দেরী হোলেই কপালের নীল নীল শিরাগুলি ফুলে উঠতো। হায় রে! আমি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে মৃত্যুকামনা কোরতে কোরতে কেমন কোরে আর একটি অবাঞ্ছিত জীবনের জন্ম দিলাম?

এ তো সত্যিই অপরাধ—না, না—একে আমি কিছুতেই সমর্থন কোরতে পারি না। যদি তোমাকে এ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করে তবে অনুগ্রহ কোরে আমার হোয়ে এর উত্তরটা দিও।

মাত্র এক মাস আগে আমাদের অবস্থা চরমে এলো। তোমার হয়ত আমার মত এত স্পষ্ট মনে নেই। হাঁ, তোমার পক্ষে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হোয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু প্রতিটি ঘটনা আমার মনে এত স্পষ্ট আঁকা আছে, যেন কেউ পাথরের উপর খোদাই করে দিয়েছে। সে ছিলো এক রাত্রি, চাঁদ তখন সবে পূর্ব-গগনে দেখা দিয়েছে। তখন আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে, ভাইয়ের সাহায্যে একটা নতুন ব্যাঙ্কে কাজ পেয়েছি, কিন্তু রাজনৈতিক গোলমালে ব্যাঙ্ক খুলতে দেরী ছিলো। ইতিমধ্যে আমার প্রকৃতি আরও অলস হোয়ে পড়েছিলো। সেদিন রাত্রে পূর্ণ মত্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরেছিলাম, অন্য দিনের চেয়ে আরও বেশী নিরাশ ভগ্নমন—বাড়ী ঢুকেই তোমাকে তার পর ছোট্টো খোকাকে দেখেই আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো। আজ মনে পড়ছে, যেন ডুবে মরবো বলে ভয়ও দেখিয়েছিলাম,—তোমাকে কত কঠিন অভিশাপ আর নিষ্ঠুর বিদ্রূপে জর্জ্জরিত কোরে বোলেছিলাম—তোমরা দু'জনে আমার পায়ের শৃঙ্খল। অত্যাচারের শেষে ক্লান্তি আর জ্বরে অর্দ্ধেক চেতনাহীন হোয়ে শুয়ে পড়লাম। তা সত্ত্বেও মনে পড়ে, নেটের মশারির ভিতর দিয়ে আবছা ভাবে তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি খোকাকে কোলে নিয়ে অনেকটা এই ভাবে কথা বলছিলে—"নাঃ, ছিঃ, দুষ্টুমি করো না, সোণা আমার, ভারী লক্ষ্মী ছেলে হবে। ঘুমোও খোকন ঘুমোও—মা চোলে গেলে বাবাকে যেন বিরক্ত কোর না—"। প্রদীপের আলোয় মনে হচ্ছিল তুমি কাঁদছো, মনে পড়ে এই ঘরোয়া দৃশ্যে অসহ্য রাগে অধৈর্য্য ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। আরও অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে, মাঝে-মাঝে তুমি কাঁদছিলে—আরও জানি একবার কাছে এসে ধীরে ধীরে মশারিটা তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলে, আমি তাড়াতাড়ি নিস্পন্দ হোয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইলাম।

হঠাৎ জেগে উঠে শুনি, কে যেন ভীষণ জোরে দরজা ঠেলছে। আমি লেপের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলাম। কতকগুলি রিক্সাওলা দাঁড়িয়ে। কিন্তু বিস্ময় আমার চরমে ঠেকলো যখন দেখলাম তারা তোমাকে বয়ে আনছে। আমি তোমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। তোমার খোলা চুল জলে ভিজে গুচ্ছ-গুচ্ছ হোয়ে জড়িয়ে আছে, তোমার জামা-কাপড় থেকে জল ঝরছে, তোমার পোষাকের নীল কালো রংগুলি জলে ভিজে মিশে গেছে। আকাশের ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলো তোমার মৃতের মত বিবর্ণ মুখের উপর অদ্ভুত পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল। চোখের পাতা দু'টি মুদ্রিত, কিন্তু ঠোঁট দুখানি ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছিলো। ভয়ে আত্মহারা হোয়ে তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বার-বার তোমার নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে চোখের পল্লব দু'টি যেন ঈষৎ উন্মুক্ত হোয়ে তখনি আবার বন্ধ হয়ে গেলো। চোখের কোণ বেয়ে ঝরছিলো অজস্র মুক্তার ধারা। হায় রে, তখনই আমি প্রাণ দিয়ে অনুভব কোরলাম যে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা আমি বুঝেছিলাম তোমার অশ্রুধারায়, কিন্তু অনুভব কোরলাম দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার সমস্ত মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

ওরা তোমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলো। গোলমালে খোকা জেগে উঠে একঘেয়ে কান্না সুরু কোরলে। বোধ হয়, ওর ঐ একঘেয়ে কান্নার শব্দে তুমি একবারটি চোখ খুললে, তার পর ধীরে ধীরে আমার দিকে চাইলে। আমি তোমার ভিজে জামা-কাপড় খুলে নিচ্ছিলাম, খোকার জন্য ব্যস্ত হোতে বারণ কোরে তোমায় ঘুমাতে বললাম। এমন সময় পাশের ঘর থেকে ঘুম ভেঙে ওর আয়া উঠে এলো কি হোয়েছে জানতে—তুমি চাইছো দেখে আমি বলেছিলাম ছেলেকে তোমার কাছে দিতে। মনে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কাছের একটা ষ্টীমার বাঁশী বাজিয়ে বন্দর ছেড়ে যাবার সঙ্কেত কোরলে। যে পনেরো

দিন হাসপাতালে অসুস্থ হোয়ে রইলে, সে ক'দিনের মত অমন প্রশান্ত নির্মল মন আমার কখনও হয়নি। সমস্ত অন্তর ভালোবাসায় আর পবিত্রতায় ভরে ছিলো। কিছু দিনের জন্য নিজেকে তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ কোরে হারিয়ে ছিলাম। প্রবল জ্বরে তুমি প্রলাপ বলতে, আর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার পাশে বসে থাকতাম।

শেষ কালে যখন আমরা 'এ্যাময়' ছাড়লাম তখন দেশে ফিরে গিয়ে থাকাই ঠিক কোরেছিলাম। আমার মনে হোয়েছিলো, আধুনিক জগতের সঙ্গে চলতে গিয়েই আমার এই দুঃখ। এমন কি যদি একটা চাকরীও পেতাম, তবুও সেটা দরকারী বলে মনে হোতো না, আমার পৈত্রিক ভিটাই সব চেয়ে ভালো মনে হোলো। সেখানে কিছুই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা ছিলো, আমাদের খেতে-পরতে তাই যথেষ্ট। তোমার এখন সাতাশ বছর আর আমার আটাশ। ধর, আমাদের আয়ু—জোর পঞ্চাশ বছর, তার আর বেশী দিন তো বাকী নেই। তাছাড়া ধন-দৌলত বা যশের আকাঙ্ক্ষা, সে সব আমার কিছুই ছিল না। আর বড়লোকের মোসাহেবী কোরে রোজগারে প্রবৃত্তিও আমার নেই।

আমরা বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম বাড়ী তৈরীর জন্য নক্সা দেখে—তোমার পছন্দ করবার জন্য যেগুলি এনেছিলাম। আর সহরের উত্তর দেওয়াল ঘেঁষে নিজেদের জন্য একটি ছোট্টো ছাউনী-দেওয়া বাড়ীর নক্সা দু'জনে নানা ভাবে আঁকতাম। যখন 'গোল্ডেন স্যাণ্ড' নদীর জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, কিম্বা যখন সাংহাই এসে পৌছলাম তখনও আমার মত বদলায়নি। দ্বিতীয় দিনেও তাই ছিলো। তোমার নিশ্চয় ভালো কোরেই মনে আছে আমরা দু'জনে ছবি তুলিয়েছিলাম, তার পর একসঙ্গে রাতের খাওয়াও শেষ করি। তার পর আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোরতে গেলাম, সে সম্প্রতি জাপান থেকে এসেছে। তার সঙ্গে কথা বোলতে বোলতে আমাদের পরামর্শের কথা তাকে জানালাম। সে ভালো-মন্দ, কি হাঁ, না, কিছুই বোললে না, কেবল কিছু দূরে কতকগুলি ছেলেমেয়ে খেলা কোরছিলো তাদের দেখিয়ে বোললে, "ঐ দেখো, ওরাই আমার দায়িত্ব, আর এ দায়িত্ব আমি এড়াতেও চাই না—আমার বোঝা তোমার চেয়েও ভারী, কিন্তু আমি তা নিয়ে কখনও নালিশ জানাই না।" ভাবলাম, হায় রে! কত সহজেই আমার হার হোলো। সারারাত নিদ্রাহীন চোখে ভাবতে লাগলাম বন্ধুর কথা, আর আমার নিজের মীমাংসার কথা। তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সবই বুঝলে, তাই একটি কথাও বলনি। হয়তো ভেবেছিলে, ভয় পেয়েছিলে এই ভেবে যে একটি কথা বললেই না জানি কি নিষ্ঠুর অভিসম্পাত দেবো তোমাকে।

তোমার হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম আবার আমার মনের ভিতর সেই আগেকার ক্ষুব্ধ বিক্ষোভের সৃষ্টি হোলো। পুরো তিনটি দিন ঐ অবস্থায় কাটলো, শেষ পর্য্যন্ত কাল রাত্রে আমি যখন বিছানায় নিস্পন্দ হোয়ে পড়েছিলাম, তখন আমার দুঃখে ব্যথিত হোয়ে তুমি এসে বোললে, "তোমাকে আর আমি অসুখী দেখতে চাই না। তুমি এখানে সাংহাইতে একাই থাকো, আমি খোকাকে নিয়ে চোলে যাবো। তুমি শুধু আমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো। আর দেরী না কোরে কালই আমি পেকিং চোলে যাবো।"

আজ রাত্রে আমাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিলো, যাবো বোলে আমরা ঠিকও কোরেছিলাম। কিন্তু তোমার ভয় হোলো, পাছে আমার মত বদলে যায় তোমাকে যেতে না দিই, তাই তুমি এখনি যাবার জন্য ব্যস্ত হোলে। স্বীকার করছি, এক দিকে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ কোরছিলাম, কিন্তু অপর দিকে একটা তিক্ত অনুভূতি দমন কোরতে পারিনি। তাই তখন তুমি যখন জিনিষ-পত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলে প্রস্তুত হবার জন্য, তখন একটি কথাও তোমার সঙ্গে বলিনি। এমন কি আমরা ষ্টেশনে এসে তুমি ট্রেণে ওঠবার পরও একটি কথার বিনিময় করিনি। শেষে আমি বোকার মত প্রশ্ন কোরলাম—"দিনটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে না তো?"

তুমি বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আকাশের অবস্থা বোঝবার ভাণ করে অনেকক্ষণ ধোরে সেই দিকে চেয়ে রইলে। তুমি যদি তোমার ঐ কাণায় কাণায় ভরে আসা চোখ দু'টি একটি বারও আমার মুখের উপর তুলে ধরতে তো আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না। হয়তো তোমাকে ধরে রাখতাম কিম্বা নিজেই তোমার সঙ্গে যেতাম, অন্ততঃ হাংচাউ অবধি জোর কোরে যেতাম। কিন্তু আর একটি বারও তুমি আমার দিকে চাইলে না, আমিও আর একটি কথাও বলিনি। এমন কোরে আমরা বিদায় নিলাম। ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের উপর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার কামরার জানলার দিকে চেয়ে, যতক্ষণ না এঞ্জিন চোলতে শুরু কোরলো ততক্ষণ অবধি হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাইনি। চোখে পড়লো তোমার বাঁ দিকের গাল বেয়ে জলের ধারা। সবাই চোলে যাবার পরও বহুক্ষণ ট্রেণের দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর যখন ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে ধীরে ধীরে আসছি তখন মনে হোলো, জীবনে আর কখনও তোমাকে দেখতে পাবো না—কোনো দিনও না।

তবুও সমস্ত অন্তর কেঁদে ওঠে তোমারই জন্য।

অনুবাদিকা—শ্রীশান্তা বসু

প্রভাত-সঙ্গীত

মহাস্থবির

বাতায়নে

জানলার ধারে বসে আছি—বাইরে জগৎ গড়িয়ে চলেছে, রোদও গড়াতে গড়াতে গলি পেরিয়ে চলে গেল। ঠিকে-ঝি'রা সব কাজে আসতে লাগল। বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার রংই বদলে গেল।

দুপুরের ফেরিওয়ালার দল চলে গেছে অনেক দূরে। বিকেলের ফেরিওয়ালারা প্রায়ই খাবার-দাবার ও সৌখিন জিনিষ বিক্রি করে। একটা জিনিষ সেকালে খুবই চলত, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-বেকারির পাঁউরুটি-বিস্কুট। মাথায় টিনের বাক্স, খালি গায়ে গলায় লম্বা পৈতে-ঝোলানো ব্রাহ্মণ ফেরিওয়ালার দল বেরুত। শীতকালে জামার গলার কাছে পৈতের খানিকটা বের করা থাকত। সেদিনের হিসেবেও সেগুলো ছিল যাচ্ছে-তাই খাদ্য। সে সময় পাঁউরুটি খাওয়ার রেওয়াজ খুবই কম ছিল, বিশেষ করে মুসলমানের দোকানের কিংবা গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের পাঁউরুটি অধিকাংশ বাড়ীতেই ঢুকতে পেত না।

চলেছে বিকেলের ফেরিওয়ালার দল—ঘুগনিদানা, নকুলদানা, চীনে-বাদাম, চানাচুর, পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি, আলু কাবলু, যত সব মুখরোচক ও প্রাণঘাতক অখাদ্য। পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি ছেলেরা লুকিয়েই খেত। সাধারণ লোক প্রকাশ্যে মুর্গী অথবা মুরগীর ডিম খাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। হাঁসের ডিমও অনেক বাড়ীর হেঁশেলে ঢুকতে পেত না, বিশেষ করে যে বাড়ীতে উড়ে-বামুন পাচক থাকত। এই উড়ে-বামুনের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল।

সেকালে, শুধু সেকালে কেন, একালেও অনেক বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীতেই উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ রাখা হোতো রান্না করবার জন্য। কেন জানি না, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ডিমের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। আমাদের একটি বিশেষ জানা লোক উড়িষ্যার কোন দেশীয় রাজ্যে চাকরী করতেন। মাঝে মাঝে ছুটিতে তিনি বাড়ীতে অর্থাৎ কলকাতায় এসে কিছু দিন করে কাটিয়ে যেতেন। এই রকম সময়ে এক দিন সকাল বেলায় ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় সামনের বাড়ীর ঠাকুর কি কাজে বেরুচ্ছিল—পড়ে গেল তাঁর সামনে। লোকটাকে তিনি চিনতেন, কারণ চাকুরী-স্থানে তাঁর বাগানে সে দিন-কয়েক মালীর কাজ করেছিল। সে ছিল জাতে 'পান' অর্থাৎ হাড়ি-মুচী শ্রেণীর—কলকাতায় এসে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুন সেজে লোকের জাত মেরে বেড়াচ্ছিল। যেখানে সে কাজ করত, তাঁরা ছিলেন অব্রাহ্মণ। তাই রাঁধুনি-বামুন হলেও শাপমন্যির ভয়ে তাঁরা তাকে যত দূর সম্ভব সম্ভ্রম করেই চলতেন। কিন্তু যাঁহাতক প্রকাশ হওয়া যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়, অমনি পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাঁরাও তাকে ধড়াধ্বড় পিটতে আরম্ভ করে দিলেন। লোকটা তো পালিয়ে বাঁচল—তখুনি ঠিকে-গাড়ী চড়ে বাড়িশুদ্ধ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরা গঙ্গা নাইতে ছুটলেন এত দিনের হজম-করা পাপ খণ্ডাবার জন্য। সেদিন আর তাঁদের বাড়ী দাঁড়ি চড়ল না। এ রকম ব্যাপার নিত্য ধরা না পড়লেও অনেক অব্রাহ্মণকে কলকাতায় এসে দায়ে পড়ে যে ব্রাহ্মণ হতে হ'ত সে কথা বলাই বাহুল্য।

ছাতে

ছাতের ছবি সারা দিন ধরেই বদলে চলত সেকালে। বাড়ীর সব চাইতে উঁচে ও সবার মাথার ওপরে থেকেও প্রতিদিন নিজের অঙ্গে সে এত ধূলো মাখে কোথা থেকে, ছেলেবেলা সে একটা সমস্যা ছিল। তা ছাড়া, আর এক রকম কালো কালো গুঁড়ো, ধুলোর চেয়ে একটু শক্ত জিনিষ—সেগুলোই বা কি? দু'পা চলতে না চলতে পায়ের তলাটা একেবারে কালো হয়ে যায়।

খুব ভোরে ছাতে উঠে দেখেছি, দূরে এক বাড়ীর ছাতে এক জন সদ্য রোগমুক্ত—রাস্তায় বেরুবার শক্তি নেই কিন্তু ইচ্ছাশক্তি আছে, ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছে। দু'-এক জন অতি-বৃদ্ধকেও দেখেছি, এই সময় ছাতে উঠে তাঁরা আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করতেন। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই দল নীচে নেমে যেতেন। ব্যস্! বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে ছাতের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। কারণ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পূর্ব্বে পুরুষেরা আর ছাতে উঠতে পারতেন না—পাড়ায় সদ্ভাব রেখে যাঁরা থাকতে চাইতেন তাঁরা এ নিয়মটির প্রতি খুবই সজাগ থাকতেন।

বৃদ্ধ ও রুগ্নের দল নেমে গেলে ঝি উঠল ছাত ঝাঁট দিতে আর সন্ধ্যে বেলায় মেলে-দেওয়া কাপড়ের আগুল কুঁচিয়ে, পাট করে তুলতে। এই ছাত ঝাঁট দেবার সময়টা ছিল তাদের সকালবেলা বিশ্রামের সময়। একবার ছাতে চড়তে পারলে আর নামবার নামটি নেই। নীচে থেকে গিন্নিরা চেঁচাচ্ছেন, ঝিয়ের কানেও পৌঁচচ্ছে না। যদি বা একবার সাড়া দিলে তো কাজ তখনো অনেক বাকি। শেষ কালে গালাগালি দিয়ে এক রকম টেনে নীচে নামানো হোলো—এ ব্যাপার প্রায় প্রতি সংসারেই প্রাত্যহিকনকার ব্যাপার ছিল। অনেক গিন্নিকেই বলতে শুনেছি যে, ওরা সারা রাত জাগে কি না তাই ছাতে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল কথা, তারা ছাতে গিয়ে ঘুমোত না, সেখানে গিয়ে জেগে উঠত।

তখনকার দিনে, শুধু তখন কেন এখনকার দিনেও ঝি'রা থাকে বস্তির মধ্যে খোলার বাড়ীতে। সে সব বাড়ী আমরা দেখেছি। ছোট্ট একখানা ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে, খোলার চাল। হয়ত কোনো ঘরে একহাত চৌকো বাঁশের জালি দেওয়া একটু জানলা। সে মেজেতে শোওয়া যায় না, তাই তক্তাপোষ একখানা করতেই হয়। তক্তাপোষের চারটে পায়ার নীচে ইট দিয়ে দিয়ে সেখানাকে যত দূর সম্ভব উঁচু করা। কারণ, তক্তাপোষের নীচে সেই জায়গাটুকুতে হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন, ভাঁড়ার, জলের কলসী, পানের বাসন প্রভৃতি থাকে এবং সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া চলে।

পাশাপাশি ঘরে প্রায় চারি দিকেই, মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠোন। উঠোনের এক কোণে একটা কুয়ো। এই কুয়োর জলই ব্যবহৃত হয়, যার গতর আছে সে রাস্তার কল থেকে খাবার জল সংগ্রহ করে। ঘরের সামনে হাত-তিনেক চওড়া একটু বারান্দা মতন, এই বারান্দা অথবা দাওয়া যার ঘরের সামনে যতটুকু পড়েছে সেইটুকু রান্না করবার জায়গা। দাওয়ার চালটা উঠোনের দিকে এতখানি ঝোলা যে, যে-কোনো সাইজের বয়স্ক লোককে প্রায় ঘাড় মেরে ঢুকতে হয়, অসাবধান হ'লে মাথা বাঁচানো দায়। আলো-বাতাস একদম ঢোকে না বললেই চলে। শব্দ শুনে টের পেতে হয় যে বাইরে ঝড় উঠেছে কিন্তু চার ফোঁটা বৃষ্টি হলেই তা চালের ফাঁক দিয়ে ঘরে পড়ে। তার উপরে বাড়ীর মধ্যে কি গন্ধ! উঃ, সে কথা মনে করলেও পাপ হয়।

এই নরককুণ্ডের মধ্যে বাস করে মনিব-বাড়ীর উঁচু ছাতে উঠে সকাল বেলাকার সেই ঝলমলে আলো, দূর-দিগন্ত অবধি উঁচু, নীচু, ছোট বড় বাড়ী, এর মধ্যে মধ্যে নারকোল ও কেষ্টচূড়া ফুলের গাছ, কোন্ দূরে কলের চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কোন মন্দির-চূড়ার স্বর্ণকুম্ভ ঝক্‌ঝক্ করছে! অনেক—অনেক দূরে মনিমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম মুহূর্তেই আবার তাকে দেখা যায় না, উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে—এ সবই যে তার কাছে নতুন, তার কল্পনারাজ্যের সীমার বাইরে। এই বিস্ময়লোকে উঠে তারা আত্মহারা হয়ে যেত—গিন্নির কর্কশ চীৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার কাজে লেগে যেত।

এ আমার কল্পনা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে এক জন ঝি ছিল, তাকে আমরা জন্মাবধিই দেখেছি। খুব বয়স হয়েছিল তার, কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েছিল যে হাঁটবার সময় নীচের দিকে মুখ করে চল্‌ত। ভোর হ'তে না হতে সে আস্‌ত। বল্‌ত, সারা রাত ঘুম হয় না, রাত পোয়ালেই বেরিয়ে পড়ি। বেলা দশটা নাগাদ চলে যেত, আবার আসত তিনটেয় আর বাড়ী ফিরত রাত্রি ন'টায়—কোন দিন আমরা আব্দার ধরলে রাত্রে বাড়ী যেত না—আমাদের কাছে শুয়ে গল্প বলত। শরতের মা কে কোন কাজ করতে হোত না, শুধু আমাদের অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের তদারক করতে হোত। সে কাজ যে কতখানি শক্ত তা যেদিন সে কামাই করত সেদিন বাড়ীর সবাই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতেন। শরতের মা তার নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী-গুলো খুব মর্মস্পর্শী করে বলতে পারত। প্রধানত এই গুণেই সে আমার মতন সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলেকেও বশে এনেছিল। তারই মুখে শুনেছি যে প্রথম প্রথম চাকরী করতে এসে ছাতে গিয়ে চার দিকের ঐ দৃশ্যের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত—দু'-তিন জায়গায় এই অপরাধে চাকরীও গিয়েছে।

শরতের মা'র আর একটি গুণ ছিল এই যে, তাকে ব'কে-ঝ'কে গালাগালি দিয়ে কেউ রাগাতে পারত না। গালাগালি দিলে সে তোবলা মুখ হাঁ করে হাসতে থাকৃত। দুঃখ পেয়ে-পেয়ে সংসারের কাছে এমন নিঃশেষে সে আত্মসমর্পণ করেছিল যা 'যোগিজনোচিত' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শরতের মা বলত যে খুব ছোটবেলা থেকেই সে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে তাদের আড়াই বছরের মেয়ের খেলার সঙ্গী হয়ে যখন সে প্রথম চাকরী করতে ঢোকে তখন তার বয়েস আট বছরের বেশী হবে না। বড়-লোকের বাড়ী, চতুর্দিকে কত রকমের সব জিনিষ পড়ে থাকে যা তার চোখে আগে কখনো পড়েনি—ভাঙা চুড়ির ঝক্‌ঝকে টুক্‌রো, কাগজের ভাঙা বাক্স, হাত-পা-মাথা-ভাঙা মাটির পুতুল, ছেঁড়া রেশমের ও রঙিন কাপড়ের টুক্‌রো ইত্যাদি মহামূল্য জিনিষ যেখানে যা কুড়িয়ে পেত তাই নিয়ে বাড়ীর এক জায়গায় সে খেলা-ঘর জমিয়ে তুলেছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এই খেলা-ঘরে গিয়ে বস্‌ত। সে খেলতে থাকৃত আর মেয়েটি চুপচাপ বসে একমনে তার কথা শুনত আর খেলা দেখত।

কিছু দিন খেলা দেখতে দেখতে মেয়েটিরও খেলার সখ চাপল। তখন সুরু হোল দু'জনে ঝগড়া। এক দিন একটু বাড়াবাড়ি হ'তেই মেয়েটা উঠল কেঁদে, ফলে দু'-তিন জন গিন্নি ছুটে এলেন উপরে। দু'-পক্ষের কথা শুনে তাঁরা তার সব জিনিষপত্র টেনে এনে মেয়েটিকে দিয়ে তাকে বললে, এ সব জিনিষ কি তুই তোর বাপের ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলি?

সে বললে—আমার জিনিষ ফেরৎ না দিলে আমি কাজ করব না।

তারা বললে—দূর হ'য়ে যা।

এই অবধি বলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলত—কিন্তু দূর যে হওয়া যায় না, তা আমার অন্তরাত্মা জানত। তাই তাদের চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম গরাদ ধরে।

বেলা গড়াতে লাগ্‌ল। দু'-এক বার তা'রা খেতে ডাকলে কিন্তু আমার জিদ—জিনিষ না পেলে কিছুতেই খাব না।

ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, চারি দিক্ অন্ধকার-থম্‌থম করছে, আমার ভয় করতে লাগল। মনে হতে লাগল যে, মা'র কাছে চলে যাই কিন্তু সেও অনেকখানি অন্ধকার পেরুতে হবে। ভাবছি লাগাই দৌড়—এমন সময়ে বাগানের দিক থেকে কে যেন আমাকে ডাক্‌লে—শোন্।

এত ভয় করছিল তো, কিন্তু আওয়াজটা কানে যেতেই আমার সব ভয় চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি যে জানলা থেকে একটু দূরে এক জন লোক শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক, মুখ, চোখ কিছুই ভাল করে দেখতে না পেলেও সে যে মানুষ, তা বেশ বোঝা যেতে লাগল। আমাকে বলতে লাগ্‌ল—তুই এ বাড়ীর ঝি, ঝিয়ের আবার অভিমান কিসের রে! তোকে জীবন-ভোর ঝি-গিরি ক'রে খেতে হবে, এ রকম অভিমান করলে সারা জীবন কষ্ট পাবি।

এই রকম সব অনেক কথা, সব কথা আজ মনেও নেই, বলতে বলতে লোকটা শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

সে বলত—সেই থেকে ঠিক করলুম, ভগবান যদি আজকের দিনটা আমার ভালয় ভালয় কাটিয়ে দেয়, তা হলে আর কখনো অভিমান করব না। তা ভগবান ভালয় ভালয় কাটিয়ে দিলেম। একটু পরেই সেই মেয়েটির মা এসে আমার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন।

সেই কথাগুলো যে আমায় বলছিল সে নিশ্চয় কোন দেবতা-টেবতা হবে। কারণ, তার কথাগুলো ঠিক ফলে গেছে—আমাকে সারা জীবন খেটেই খেতে হোলো। স্বামী, পুত্র বেউ আমাকে ভাত দেয়নি। সারা জীবন ধরে বড় আপনার লোক ও পর কত অন্যায় করেছে অত্যাচার করেছে আমার ওপর কিন্তু কারুর ওপরে রাগ বা অভিমান করিনি। নিজের বরাতকেই দুষেছি। এই জন্য ভগবান আজও আমাকে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দেয়নি।

বাল্যকালে, অনুভূতির অরুণ রাগে মানসাকাশ যখন সবে মাত্র রাঙিয়ে উঠছে, সেই সময় শরতের মা'র এই কাহিনী সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলছিল, এত দিন পরে এখানে তার বর্ষণ হয়ে গেল।

আবার ছাতে ওঠা যাক।

ঝি ছাত থেকে নেমে গেলেই বাড়ীর মেয়েরা ছাতে উঠতে আরম্ভ করলে। একসঙ্গে নয়, পরে পরে, যার যখন স্নান শেষ হচ্ছে, আসছে একে একে—কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, খালি পিঠে ভিজে চুল এলানো সকলে নিজের নিজের শাড়ী প্রভৃতি পরিপাটি করে শুকাতে দিয়ে নেমে গেল।

সে যুগে বাঙলার পরিবারে ফ্রকের এত বাহুল্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে পাঁচ ছয় বছরের মেয়েরা শাড়ী পরত। তার পরে আসতে লাগল কাঁথা, মাদুর, সতরঞ্চ, মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কি নয়। ছাতে কাপড় শোকানো দেখে বাড়ীর হাল চাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে দিতে পারা যেত।

এর পরে গ্রীষ্মের খর রোদ পোহাতে এল আমসত্ত, আমচুর, জারক লেবু, কুল ইত্যাদির দল। গিন্নিরা যে যার শয়নগৃহে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ভাগ্যহীনার ওপরে রইল ছাতের ওপরকার ঐ মহার্ঘ দ্রব্যগুলির তদারকের ভার—শুধু কাক নয়, বাড়ীর ছোটরাও যে তক্কে তক্কে ফিরছে, সে কথা সবাই জানে।

প্রকৃতি দেবী নারীর স্বজাত, মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করা তাঁর স্বভাব। তাই গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো করে যেদিন তিনি ঝড় তুলতেন সেদিন লাগত মজা। রাস্তার ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল ঘরে ও ছাতে, দুমদাম্ করে দরজা জানলা পড়তে লাগল। গিন্নিদের ঘুম ছুটে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চোখ খুলেই আকাশের ঐ মূর্ত্তি দেখে ছুটলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে—যাবার সময় চিৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা ঘুমের কোলে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, উঠে সেই অবস্থাতেই ছুটলেন ছাতের দিকে—ছোটরাও হুল্লোড়ের এমন সুযোগ পেয়ে ছুটল তাঁদের পিছু-পিছু।

প্রকৃতির বুকে উঠেছে ঝঞ্ঝা আর ছাতে-ছাতে উঠেছে ঝঞ্ঝা-রূপিণীর ঝাঁক—চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, অর্দ্ধ বিবসনা কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাতও নেই—ঝড়ের উন্মাদ নর্ত্তনের মধ্যে তারা যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। আমসত্ত বাঁচাতেই হবে—ছোট ছেলেটা কি কারণে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমসত্ত পেলে খায়। অমুকে আমচুর ভালবাসে, তমুকে আম্‌সি ভালবাসে। মিষ্টি আচার ও জারক লেবুকেও ভালবাসবার লোকের অভাব সংসারে নেই। শুকনো কাপড়গুলো, বিশেষ করে ছোটদের কাপড় ও কাঁথাগুলি বাঁচাতে না পারলে বিকেলের মধ্যে সংসারচক্র লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা—বাঁচা বাঁচা, তোল তোল, ছোট্ট ছোট্ট—যাক, সব বেঁচে গেল।

ঐ যা! কুলগুলো তোলা হয়নি। সে বেচারারা ছাতের এক কোণে পড়ে ভিজতে লাগল। কুল্ খেতে কেউ ভালবাসে না, তাই তার কথা কারুরই মনে পড়ল না।

কবি বলেছেন, গ্রীষ্মের 'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ'। কথাটা সে যুগের কলকাতার লোকেদের বাড়ীর ছাত সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিকেল হবার আগে থাকতেই মেয়েদের চুল বাঁধবার পালা শুরু হোতো। তার পরে কাজ-কর্ম সেরে স্নান করে ধোপদোস্ত, একেবারে ঝকঝকে হয়ে ছাতে উঠতেন, ছোট-বড় কেউ বাদ নয়। কুমারী ও যাদের ছেলেপুলে এখনো হয়নি এমন বৌরা সাধারণতঃ কাঁচপোকা বা খয়েরের টিপ পরত। বড়রা টিপ পরতেন না এবং যত দূর মনে পড়ছে, সিঁদুরের টিপ পরার রেওয়াজ সে সময় ছিল না।

এ-ছাত ও-ছাত ও সে-ছাতে সশব্দে আলাপচারী শুরু হয়ে গেল। বাড়ীর ছেলেদের এবং কর্ত্তাদের উদ্ভাবিত অথবা সংগ্রহ করা যত সব বাতেল্লা পল্লবিত হয়ে শাখা বিস্তার করতে লাগল ছাত থেকে ছাতান্তরে। যে ছাতে পুরুষের কণ্ঠস্বর অবধি পৌঁছয় না—সেই ছাতের সঙ্গেও নিঃশব্দ ইসারায় আলাপচারী হ'তে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রত্যেকেই প্রত্যেক বাড়ী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে গেল—এমন কি ও-বাড়ীর সেজো-বৌয়ের মেজ ভাজ ক'মাস গর্ভবতী সে খবরটি পর্য্যন্ত।

এ আড্ডায় বয়সের পার্থক্য এক রকম উপেক্ষাই করা হোতো। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তারা সব বাড়ী ফিরতে লাগলেন আর মেয়েরাও একে একে ছাত থেকে নেমে পড়তে আরম্ভ করলেন। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত হয়ে পড়ল ভোঁ-ভাঁ—শুধু এখানে-সেখানে দু-একখানি অভাগিনী শাড়ী আকুল আবেগে বন্ধন-মোচনের চেষ্টা করতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

১। মঙ্গল পাণ্ডে। ২। জেম্‌স হিকি। ৩। এক জন।
৪। ৬৫৲ টাকা। ৫। জে, এফ, ম্যাডান। ৬। নল-দময়ন্তী
৭। গ্রেভ উড ও বাওবব। ৮। ব্রাহ্মী। ৯। আট আনা।

ছোটদের আসর

কমলা

(সত্য ঘটনা)

গোলোকেন্দু ঘোষ

শিক্ষিত মানুষের মনে পুরাকাল হইতে মানুষের সন্তান পশু-পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইলে কিরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠে তাহা জানিবার কৌতূহল রহিয়াছে। মানবিকতা ও চক্ষু-লজ্জার বালাই না থাকিলে বহু বৈজ্ঞানিককে এইরূপ পরীক্ষা করিতে দেখা যাইত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এই সকল বালাইএর উর্দ্ধে নয় বলিয়া এই ধরণের স্বাভাবিক সুযোগ বড় একটা নাই। দৈব সুযোগের প্রান্তে তাঁহাদিগকে যুগ যুগ অপেক্ষা করিতে হয় এবং তাহা এতো কদাচিৎ উপস্থিত হয় যে, এই ধরণের পরীক্ষার বিবরণ মোট ষোলো-সতেরটির বেশী বৈজ্ঞানিক-মহলে জানা নাই। সম্প্রতি বাংলা দেশের এইরূপ এক কাহিনীর বিবরণ নিউ হ্যাভেনের ক্লিনিক অব চাইল্ড ডেভেলেপমেণ্টের ডাঃ আর্ণল্ড গেজেল প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাটি যে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য।

মিশনারী রেভারেণ্ড জে, এল, সিং বাংলা দেশে কোন এক নেকড়ে বাঘের গুহা হইতে দু'টি শিশুকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। শিশু দু'টির নাম কমলা ও অমলা। উদ্ধার কালে কমলার বয়স আট, অমলার দেড়। শিশু দু'টিকে খুব কচি অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনুমান হয়, নেকড়ে-জননীর মানুষ-শিশুর প্রতি মাতৃত্ববোধ খুবই তীক্ষ্ণ ছিল, নতুবা সে কখনও দ্বিতীয় বার মানুষ-শিশু প্রতিপালন করিবার উৎসাহ বোধ করিত না।

মেদিনীপুরে মিঃ সিং ও তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত এক দুঃস্থ আশ্রম ছিল। শিশু দু'টিকে তিনি সেখানে লইয়া আসেন। অমলা এক বছরের মধ্যেই মারা যায় কিন্তু কমলা নয় বছর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। কিরূপ দীর্ঘ ও ধীর পদ্ধতিতে তাহার নেকড়ে-জীবনযাত্রা কাটাইয়া স্বাভাবিক মানুষ-জীবনযাত্রায় আসিতে পারিয়াছিল তাহার বিশদ দৈনন্দিন বিবরণ সিং-দম্পতির ডায়েরী পাঠে জানা যায়।

কমলার জন্ম স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মত হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ধার কালে তাহার স্বভাব ছিল নেকড়ের মত। চার হাত-পায় ভর করিয়া সে চলিত। সাধারণত হাত ও হাঁটুর উপর ভর করিত এবং এতো জোরে দৌড়াইত যে তাহাকে পরাস্ত করা কঠিন ছিল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। চার হাত-পায় ভর করিয়া করিয়া পেশী ও হাড় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দিনের বেলায় আলো হইতে দূরে এক কোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুটি পাকাইয়া অনড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রি বেলায় উঠানের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং ঘড়ি ধরিয়া যেন ঠিক রাত দশটায় ও দুপুর তিনটায় নেকড়ের মত এক অস্বাভাবিক চীৎকার করিত। সে দুধ চাটিয়া খাইত এবং খাদ্য গ্রহণের সময় হাত ব্যবহার করিত না। তাহার তীক্ষ্ণ আঘ্রাণ-শক্তি জঞ্জালের মধ্যে কোথায় মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি পড়িয়া আছে ঠিক বলিয়া দিত এবং সে উহা চুরি করিত। অন্য বালকেরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিলে সে দাঁত দেখাইয়া খেঁকানি দিত। শুধু মাত্র তার নেকড়ে গহ্বরের সঙ্গী অমলার প্রতি কোনরূপ বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাইত।

সকল প্রকার সামাজিক প্রভাব ও মানুষের সঙ্গ হারাইলে আট বছরের মানব-শিশুও যে কিরূপ অস্বাভাবিক ভয়াবহ চরিত্রের হইয়া উঠে কমলা তাহার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু কমলাকে বুঝিতে ভুল করা উচিত হইবে না। পরিণত মানুষ শিশুর মত বিকাশ লাভে শুধু যে অসমর্থ হইয়াছিল তাহা নহে, তাহার কৃতকার্যতার বিশেষ পরিচয়—নেকড়ের সংস্পর্শে আসিয়া নেকড়ে-জীবন-যাত্রা গ্রহণে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি পশুর মত ছিল বটে, কিন্তু সে পরিষ্কার করিয়া খাইত, কিছু ফেলিত না। মনে হইত, তাহাকে যেন আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। চার হাত-পায় দ্রুতবেগে চলা তাহাকে নিশ্চয়ই শিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং সে ভীত হইলে নেকড়ে-জননীর কাছ হইতে কাণ কাঁপাইবার ও দরকার মত মাংসপেশী সঙ্কোচন করিবার অনুকরণ করিয়াছিল।
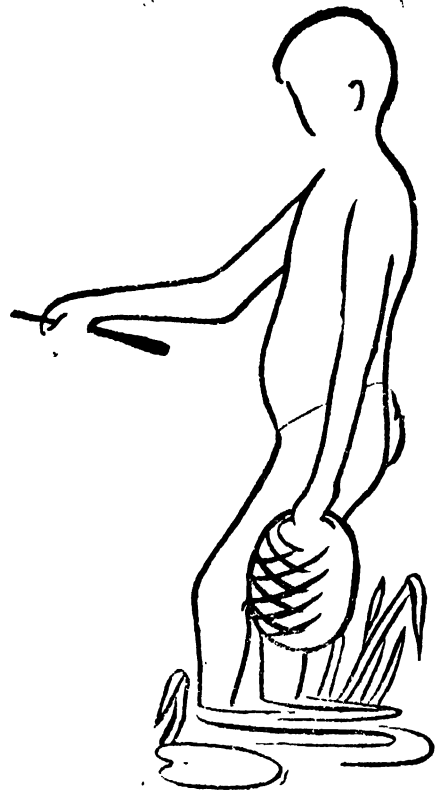
আশ্রমে সিং-দম্পতি অসীম ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করিতেন। প্রতিদিন দু'-এক ঘণ্টা ধরিয়া মিসেস্ সিং কমলাকে মালিশ করিয়া দিতেন। ইহা তাহাকে মানুষের নতুন পরিবেশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও মানুষের স্বাভাবিক ভঙ্গি ও চলাফেরা গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। দশ মাস পরে অমলার মৃত্যুতে কমলা দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলায় নাই। দু'-এক মাস পরে সে মিসেস্ সিংএর কাছে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিত। আশ্রমে আসিবার আঠারো মাস পরে সে হাঁটুর উপর ভর করিয়া হাঁটিত, কিন্তু তাহার পেশী এত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে

তাহার আরো এক বছর কাটিয়া গেল। আরো ছয় মাসে অন্ধকারকে আর ভয় না করিবার মত নেকড়ে-বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। এবং ঐ সময় সে তাহার দু'-একটা কথা বলিতে শিখিল, যথা—'হুঁঃ' ও 'আম যাব।' কিন্তু ত্রিশটি কথা শিখিতে তাহার আরো দুই বছর কাটিয়া গেল। তখন সে পায়ে হাঁটিতে পারে এবং নিজ নগ্নতায় লজ্জা বোধ করিতে শিখিয়া ফ্রককে আদর করিতে সুরু করিয়াছে; এবং তাহার তখন কিছু সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মিয়াছে; অন্যান্য শিশুদের সাহায্য করিতে পারিলে ও মিসেস্ সিংএর চিঠি বহিয়া দিতে পারিলে সে আনন্দ বোধ করিত। এই সময় আশ্রমে তাহার সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে—সে তখন স্বাভাবিক তিন বছরের শিশুর মত ব্যবহার করিত অবশ্য তখন তাহার বাস্তবিক বয়স ষোল; প্রায় এইরূপে অত্যন্ত ধীরে হইলেও একান্ত ধৈর্যের সহিত কমলাকে মানুষ-জীবনে অভ্যস্ত করা হইতেছিল, কিন্তু প্রায় সতেরো বছর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহার পূর্ণ শিক্ষার বিবরণ হইতে বহু শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমত নেকড়ে-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সে মানুষের মনের অসাধারণ সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতার প্রমাণ করিয়াছিল, কিন্তু আট বছর বয়সেও সারা শিশু-জীবনের শিক্ষা ও অভ্যাস, কষ্টসাপেক্ষ হইলেও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ও নতুন জীবন-যাত্রা গ্রহণ করিয়া মানুষের মনের অসাধারণ সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতার পরিমাণ যে কি বিরাট তাহাও সে প্রমাণ করিয়াছিল।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

শ্রীসুজিতকুমার নাগ

গোলু নিজের ঘরে বসে মাথার দিকের জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখছিল। দিনের আলোয় হরদেওর দু'তলার ঘর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে লক্ষ্য করল যে ঘরের সব ক'টি জানলাই বন্ধ রয়েছে। সে মনে মনে ভাবল যে এই জানলায় যদি কোন দিন কিছু দেখতে পায়, তাহ'লে হরদেও তখন কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। সে উঠে নীচে যাবে ভাবছে, এমন সময় হুড়মুড় করে কানাই আর বরেন ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই কানাই দু'হাত তুলে 'ছুটি—ছুটি—ছুটি' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই খাটের নীচে থেকে কালু ভীষণ জোরে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। কানাই বেচারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চমকে শূন্যে তিন হাত লাফ দিয়েই তক্তাপোষের উপর বসে পড়ল।

বরেন গম্ভীর হয়ে বলল, "তুই এত ভাল হাইজাম্প পারিস তা ত জানতাম না, স্পোর্টসের দিন তোর হাইজাম্পে ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল।"

কালু ততক্ষণে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে কানাইয়ের পায়ের তলাটা শুঁকে নিয়ে একবার ল্যাজ নেড়ে "মিত্র" এই সঙ্কেতটি জানাল। কানাই বরেনের কথায় কাণ না দিয়ে গোলুকে বলল, "এই জানোয়ারটার গর্জনই যদি এত ভীষণ হয়, তাহ'লে না জানি দংশনটি কেমন!"

গোলুর হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে তক্তাপোষের উপর বসল ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুরু করল, "আমার মাথার দিকের জানলাটা দিয়ে হরদেওর দু'তলার ঘর পরিষ্কার দেখা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওই ঘরের জানলা দিয়ে মাঝে-মাঝে কেউ কাউকে আলো দেখিয়ে সঙ্কেত জানায়, যদিও দিনের বেলা সব সময় জানলাগুলি বন্ধ থাকে। আমার পায়ের দিকের জানলা দিয়ে পোড়ো-বাড়ীর কিছু অংশ দেখা যায়, তবে আমার মনে হয় যে, হরদেওর জানলা দিয়ে পোড়া-বাড়ীটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। হরদেও এ বিষয়ে সহজে কিছু বলবে না। আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে আমরা কি উপায়ে হরদেওর কাছ থেকে এ বিষয় কিছু জানতে পারি।"

বরেন বলল, "সোজা উপায় বাতলে দিচ্ছি! আমার সঙ্গে তোরা চল, আমি গিয়ে হরদেওর ঘাড়টি টিপে ধরছি, আর তোরা যা জানতে চাস তাকে প্রশ্ন কর, উত্তর না দেয় ত—"

কানাই বলল, "থাম্ থাম্, তুই নিজের ঘাড়টা টিপে ধর ত, তা'তে বেশী কাজ হবে।"

গোলু বলল, "আঃ, ওকে চটাচ্ছিস্ কেন?"

কানাই গোলুকে বলল, "আমাদের এখন উচিত, হরদেওর বাড়ীটা নজরে রাখা এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলেই বাড়ীটায় ঢুকে সব খুঁজে দেখা।"

গোলু বলল, "সে আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে কেন?"

কানাই হেসে বলল, "সে যখন থাকবে না তখন আমাদের কাজ সারতে হবে, এবং এ বিষয়ে গয়ারাম আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।"

গোলু চিন্তিত মুখে বলল, "কথাটা মন্দ বলিসনি।"

বরেন এবারে বলল, "যাই বলিস, কতগুলো জিনিষ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যেমন, ধরেই নিলাম যে হরদেও, রামধন, বিষণলাল প্রভৃতি লোকেরা সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু এই ঘোরাঘুরি ছাড়া আর কি অন্যায় কাজ এরা করেছে? শুধু তাই নয়, ওই পোড়ো-বাড়ীর ঘটনার সঙ্গে আমরা এদের কি করে জড়াই?"

গোলু শুনে বলল, "এখন সব কথা আমি বলতে পারব না, কারণ প্রমাণের অভাবে জোর করে কিছুই বলা উচিত নয়, তবে এইটুকু আমি বলে দিচ্ছি যে আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে। যতগুলো লোককে আমরা দেখছি, তাদের মধ্যে একটাও আসল লোক নয়। এদের কার্য্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পারছি যে আসল লোকটি অত্যন্ত চতুর ও হিংস্র প্রকৃতির, সে দরকার হলে লোক খুন করতে পেছপাও হবে না।"

এই কথা শুনে বরেন সোজা হয়ে উঠে বসল। কানাই জিজ্ঞেস করল, "আসল লোক সম্বন্ধে কিছু জানতে অথবা আবিষ্কার করতে পেরেছিস?"

গোলু বলল, "কিছুই না, কারণ, সবে আমি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পেরেছি, তবে কিছুতেই বুঝতেই পারছি না যে, এত ছোট একটা জায়গায় তার মত লোকের কি দরকার থাকতে পারে?"

কথায় কথায় বেলা হয়ে গিয়েছে দেখে কানাই ও বরেন বিদায় নিল।

সেদিন বিকেল বেলা কানাই ও বরেন, গোলুকে নিয়ে গয়ারামের খোঁজে বেরোল। গয়ারাম তার আড্ডাতেই ছিল।

সেদিন বোধ হয় গোলুদের ভাগ্যটা ভাল ছিল; কারণ, নানা কথার পর হরদেওর কথা উঠলে গয়ারাম বলল যে, সে সকালের ট্রেণে কোথায় চলে গেছে এবং বোধ হয় রাত্রের ট্রেণেই ফিরবে। হরদেওর সঙ্গে তার ষ্টেশনের পথে দেখা হয়েছিল এবং তখন সে তাকে এই কথাই বলে।

গয়ারামের কথা শুনে তিন বন্ধু নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কানাই বলল, "এবারে তাহ'লে ওঠা যাক।"

বিদায় নেবার আগে গোলু গয়ারামকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে নতুন খবর কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করল। প্রশ্ন শুনে গয়ারামের মুখটা যেন একটু শুকিয়ে গেল, এবং সেটা গোলুর নজর এড়াল না। সে দু'-তিন বার রামনাম করে বলল যে, এর মধ্যে এক দিন ষ্টেশনের কাছে বিষণলালের সঙ্গে দেখা হওয়াতে, তারা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে পোড়ো-বাড়ীর সামনে চলে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সঙ্গে বিষণলাল থাকাতে তার ভয় হয়নি, তবে সেখান থেকে সে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বিষণলাল বলল, সে না কি পোড়ো-বাড়ীর জমিতে একটা লোক চলে যেতে দেখেছে। সে গয়ারামকে সেইখানেই দাঁড়াতে বলে লোকটাকে অনুসরণ করে ও নিমেষের মধ্যে গাছের আড়ালে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই পর্য্যন্ত বলে গয়ারাম ঢোক গিলে দুই-তিন বার রামনাম করল।

কানাই সাহস দিয়ে বলল, "বল, বল তার পর—"

গয়ারাম তখন বলল যে, বিষণলাল চলে যেতে সে সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রামনাম করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখে, (গয়ারামের গলার স্বর কেঁপে গেল) বাড়ীটার এক পাশ থেকে একটা লোক লম্বা-লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই আবছা আলোয় যেটুকু দেখা গেল, সেইটুকুই ভীতিজনক। লোকটার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে, চোখের বদলে দু'টো গর্ত্ত কেবল, এবং দন্তহীন মুখবিবর ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। এ অদ্ভুত মূর্ত্তিটির মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধা এবং পরনে লম্বা সাদা পায়জামা ও গায়ে একটি ফতুয়া। গয়ারামের অনুমানে এই প্রেতলোকবাসীটি লম্বায় অন্তত ১৫ ফিট! সে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো হাত দোলাতে আরম্ভ করল এবং মাঝে-মাঝে দন্তহীন মুখবিবর ব্যাদান করতে লাগল। তার দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটর যেন গয়ারামের উপরই নিবদ্ধ। অল্পক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাড়ীর এক পাশে আড়ালে সরে গেল। গয়ারামের যেন এতক্ষণ পরে বল ফিরে এল ও সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। গয়ারাম তার কাহিনী শেষ করে আরও কয়েক বার রামনাম করল ও যুক্তকর কপালে ঠেকাল। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে গোলুরা বিদায় নিল। কিছু দূর যাবার পর, কানাই জিজ্ঞেস করল, "কি রকম শুনলি,—বিশ্বাস হয়?"

গোলু গম্ভীর হয়ে বলল, "সবটাই বিশ্বাস হয়।"

কানাই তাড়াতাড়ি বলল, "এটা ঠিক যে ও কিছু একটা দেখেছে, তবে ভয়ের চোটে বাড়িয়ে বলছে না ত?"

গোলু বলল, "অনেক দিন আগে হরদেও এই রকমই কি একটা বলেছিল কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি, তবে গয়ারামের কথা মিথ্যা নয় এটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

বরেন রেগে গোলুকে বলল, "তুই কি বলতে চাস যে ওটা সত্যি ভূত?"

গোলু হেসে বলল, "তাতেই বা দোষ কি, কারণ ভূতের উদ্দেশ্য ভয় দেখান এবং সে উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছে। ওটা যদি রাক্ষস হোত, তাহলে খেয়ে ফেলত হয়ত।"

গোলুকে থামিয়ে দিয়ে কানাই জিজ্ঞেস করল, "তুই কি এই ভূতেরও সন্ধান নিবি না কি?"

গোলু বলল, "নিশ্চয়। অন্তত কি জাতীয় ভূত, সে খোঁজটা নিতে হবে,—যদিও খোঁজ না নিয়েই সেটা বুঝতে পেরেছি।" গোলু আর কোন কথা না বলে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বরেন জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কোথায় যাব?"

গোলু বলল, "হরদেওর বাড়ী"

গোলুরা যখন হরদেওর বাড়ীর কাছে এসেছে, তখনও দিনের আলো যথেষ্ট আছে। বাড়ীটার সামনে এসে গোলু দেখল, দোকান-ঘর থেকে আরম্ভ করে দু'তলার ঘর পর্য্যন্ত সব বন্ধ। গোলুরা তিন জন বাড়ীটার পিছন দিকে গেল। বাড়ীর উঠানটি ঘিরে একটা উঁচু পাঁচিল ছিল। গোলুর কথা মত বরেন আগে কানাইকে পাঁচিলে তুলে দিল। কানাই পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে উঠানের ভিতরটা বেশ করে দেখল ও তার পর গোলুকে বলল, "উঠান দেখে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

গোলু কানাইকে বলল, "যা যা দেখতে পাচ্ছিস সব বলে যা, তার পর দরকার মনে হলে আমিও উঠব।"

কানাই বলতে সুরু করল, "উঠানের এক কোণে কয়েকটা কাঠের প্যাকিং কেস্ পড়ে আছে ও অন্য কোণে একটা খড়ের গাদা। সারা উঠানময় আবর্জ্জনা—"

গোলু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "কি জাতীয় আবর্জ্জনা?"

কানাই বলল, "উঠানময় ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি ও কলসীর টুকরা এবং অনেক ভাঙ্গা কেরাসিনের বোতলও পড়ে আছে। উঠানের এক দিকে মাটিতে একটা লম্বা মই পড়ে আছে এবং একতলার ঘরের কাছে একটা জালার মত কি রয়েছে।"

গোলু এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, "ভাল করে দেখে আমায় বল সেটা কি জিনিষ।"

কানাই অনেকক্ষণ দেখে বলল, "মনে হচ্ছে যেন একটা রং-করা চিনেমাটির জালা, কাঠের পায়ার উপর বসান এবং সেই জালার নীচে মনে হচ্ছে একটা ছোট কল লাগান রয়েছে।"

গোলু উৎসাহে "ভেরী গুড্" বলে ফেলল। বরেন এবার জিজ্ঞেস করল, "কি রে আমাদেরও উঠতে হবে না কি?"

গোলু বলল, "হ্যাঁ।"

উঠানের পাঁচিলটা যদিও গোলু এবং বরেনের মাথার চেয়ে উঁচু ছিল, তবুও তারা হাত বাড়িয়ে পাঁচিলটা ধরে, শুধু হাতের জোরেই উঠে পড়ল। তার পর তারা তিন জনে সন্তর্পণে ভিতর দিকে লাফিয়ে পড়ল। গোলু মাটি থেকে মইটা তুলে দেওয়ালের উপর কাত করে রাখল। মইয়ের মাথাটা বাইরের দিকে খানিকটা বেরিয়ে রইল। গোলু চারি দিক একবার ভাল করে দেখে-নিয়ে সেই চিনেমাটির জালাটার কাছে গেল।

হঠাৎ সে মাটি থেকে কি একটা তুলে নিয়ে বলল, "এই পেয়েছি।"

কানাই তাকিয়ে দেখে, সেটা একটা লম্বা কাঠের হাতা। সে জিজ্ঞেস করল "ওটা দিয়ে কি হয়?"

গোলু বলল, "মনে হয়, এটা দিয়ে এই জালার ভিতরের পদার্থগুলি ভাল করে নেড়ে মেশান হয়।"

গোলু দেখল যে জালাটার আগাগোড়াই চিনেমাটি দিয়ে তৈরী। সে উপরের ভারী ঢাকাটা সবে তুলে দেখতে যাবে এমন সময় কানাই হঠাৎ "দেখ দেখ" করে চেঁচিয়ে উঠল। গোলু তাকিয়ে দেখে যে পাঁচিলের বাইরে থেকে কে মইটা টেনে নেবার চেষ্টা করছে। তিন জনেই দৌড়ে গিয়ে মইটাকে টেনে ধরাতে, বাইরের লোকটা মইটা ছেড়ে পালিয়ে গেল। গোলু তখন মইটা মাটিতে শুইয়ে রাখল।

বরেন আস্তিন গুটিয়ে বলল, "ব্যাটা পালিয়ে গেল, নইলে বাছাধনকে একবার দেখাতাম।"

গোলু বলল, "এই ত মুস্কিল হোল, আমি ভেবেছিলাম, উপরের ঘরটা একবার দেখতে চেষ্টা করব, এখন দেখছি তা হবে না, কারণ বাইরের লোকটার মতলব কি, বুঝতে পারছি না।"

বরেন বলল, "আজ যদি এখানে আর কাজ না থাকে, তাহলে চল সরে পড়ি।"

গোলুর সম্মতিক্রমে তিন জনেই পাঁচিল টপকে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই একটি লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হোল। সে লোকটা ভাবেইনি যে তারা অত শীগ্‌গির ভিতর থেকে চলে আসবে; কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাই হোক, গোলুদের দেখে সে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, "আবার দেখা হয়ে গেল, ভাল আছেন ত?"

গোলু অবাক্ হয়ে দেখে যে লোকটি বিষণলাল। বিষণলালই যে বাইরে থেকে মইটা টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল এ বিষয় গোলুর আর সন্দেহ ছিল না, তাই সে একটু তিক্ত ভাবেই বলল, "আজকেও কি আম পাড়তে না কি?"

বিষণলাল এক-গাল হেসে বলল যে, সে হরদেওর খোঁজে এসেছিল। সে হরদেওর দেখা পেয়েছে কি না জিজ্ঞেস করাতে বিষণলাল বলল যে, সে আজ সারা দিন হরদেওর দেখা পায়নি এবং বাড়ীতেও সে নেই। যাই হোক, গোলু বাড়ী ফিরতে উদ্যত হয়ে বিষণলালকে জিজ্ঞেস করল, সে ওই দিকে যাবে কি না, কিন্তু বিষণলাল মাথা নেড়ে জানাল, সে উল্টা দিকে যাবে।

কিছু দূর গিয়ে কানাই গোলুকে বলল, "বিষণলাল নিশ্চয় আবার হরদেওর বাড়ীতেই ফিরে গেছে, এবং আমার মনে হয় সেখানে ও কিছু খুঁজছে।"

গোলু বলল, "কিছুই আশ্চর্য্য নয়, এই লোকটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সাহেবের দরোয়ান হয়ে কতক্ষণ সে দরোয়ানী করে জানি না; কেবল ত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়।"

কানাই বলল, "বিষণলালের বন্ধু ওই খানসামাটাও শয়তান!"

গোলুরা গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরে এল। কানাই গোলুকে বলল, "চল, তোর ঘরে একটু বসি।"

গোলুর ঘরে বসে তিন জনে গল্প সুরু করল। গোলু বলল, "আজ একবার ষ্টেশনে গিয়ে দেখলে হয়। শেষ গাড়ী আসে দশটায়, সেই গাড়ীতে হরদেও ফেরে কি না দেখতে চাই। যদি সে না ফেরে, তা'হলে বুঝতে হবে যে পরের দিন ছাড়া তার আর ট্রেণে ফেরার উপায় নেই।"

কানাই এই সময় জিজ্ঞেস করল, "কেন, রাত দশটার পরে সে যদি অন্য কোন উপায়ে ফেরে?"

গোলু জিজ্ঞেস করল, "ট্রেণে না ফিরে অন্য কি উপায়ে সে ফিরতে পারে?"

কানাই বলল, "সে যদি আজ রাত্রেই ফিরতে চায় তাহলে তাকে অন্য কোন উপায়ে ফিরতে হবে, কারণ কাল সকালের আগে কোন ট্রেণ নেই; তবে সেটা সম্ভব হয় যদি সে কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে।"

গোলু বলল, "কি উপায়ে ফিরতে পারে বললি না?"

কানাই এবার মুস্কিলে পড়ল। সে বলল, "সেটাই বুঝতে পারছি না, হয়ত হেঁটে ফিরবে, আর নয় ত গরুর গাড়ীতে।"

গোলু বলল, "এর কোনটাই বলে মনে হয় না। কারণ, প্রথমত, হরদেও দৈহিক পরিশ্রমের পক্ষপাতী নয় এবং দ্বিতীয়ত সে যদি আজ রাত্রের মধ্যে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় তা'হলে গরুর গাড়ী চলবে না, গরুর গাড়ীতে দেরী হবে, জানাজানি হবে, ইত্যাদি।"

বরেন এবারে বলল, "তা'হলে সে কি উপায়ে ফিরবে শুনি?"

গোলু বলল, "আমার বিশ্বাস, তার সঙ্গে আরও লোক থাকবে এবং এই লোকেদের সাহায্যে সে ফিরবে। আমি এই লোকগুলোকেও দেখতে চাই।"

বরেন হতাশ হয়ে বলল, "কিছুই বুঝলাম না।"

কানাই বলল, "এই মেঝেতে গোটা-দশেক ডন আর গোটা-কুড়ি বৈঠক দে, তোর মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

বরেন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে "তোর বুদ্ধি খুলবে আমার কাছে 'রাম-গাঁট্টা' খেলে।"

গোলু হাসতে হাসতে বলল, "তোদের লাঠিগুলোতে তেল লাগাচ্ছিস্ ত?"

বরেন বলল, "আমার লাঠিটা তেল খেয়ে এর মধ্যেই যা তৈরী হয়েছে—চমৎকার।"

কানাই বলল, "এক কাজ কর, তোর লাঠি দিয়ে নিজের মাথায় এক ঘা দিয়ে দেখ, যদি মাথা ভাঙ্গে ত বুঝবি লাঠি ঠিক তৈরী হয়েছে, আর যদি লাঠি ভাঙ্গে, তা'হলে ত বুঝতেই পারবি যে বৃথা তেল খাইয়েছিস এত দিন ধরে।"

বরেন রেগে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা উল্টাবার জন্য গোলু তাড়াতাড়ি বলল "এখন আমাদের কি করতে হবে বলছি শোন। রাত্রে খাওয়ার পর আমরা ষ্টেশনে যাব ও রাত দশটার ট্রেণে কেউ আসে কি না দেখব। যদি দরকার হয় তাহলে আরও রাত পর্য্যন্ত থাকব।"

কানাই গোলুকে বলল "তুই এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকবি কি করে?"

গোলু বলল, "স ব্যবস্থা আমি করে নেব। সেদিন আমি বাবাকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলেছি এবং তিনি জানেন যে আমরা খোঁজ-খবর নিচ্ছি এবং গোয়েন্দাগিরী করছি। কাজেই আমার মনে হয়, তাঁর কিছু আপত্তি হবে না।"

বরেন বলল, "আমার ত কোনই বাধা নেই। সে বছর আমার মনে আছে ওই নদীটা পেরিয়ে বিকেল বেলা চলে গিয়েছিলাম দূরের শালবনে। খেয়াল ছিল না, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ রাত হয়ে চারি দিক এত অন্ধকার হয়ে গেল যে পথ হারিয়ে ফেললাম। পাছে উল্টো দিকে চলে যাই এই ভেবে একটা গাছে উঠে সারা রাত কাটালাম। নীচে দিয়ে, খড়-খড় সর-সর করে কত কি যে সারা রাত চলা-ফেরা করল। সকাল বেলা গাছ থেকে নেমে বাড়ী চলে এলাম।"

কানাই বলল, "বাড়ী ফিরে কাকুর কাছে রাম-গাঁট্টা খেলি না?"

বরেন হেসে বলল, "সকলে এত ভয় পেয়েছিল যে, অক্ষত শরীরে ফিরে আসাতেই সকলে খুসী। এর পর থেকে আমি অবাধে ঘোরা-ফেরা করি।"

কানাই বলল, "আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব, কারণ কাকা এখানে নেই এবং সারা ছুটির মধ্যে আর ফিরবেন না। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা জানেন যে আমি নিজের দেখা-শোনা নিজেই করতে পারি, কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামান না বা অযথা গোলমাল করেন না।"

গোলু সব শুনে বলল, "তাহ'লে ত ভালই হোল। এখন এক কাজ করা যাক্। তোরা বাড়ী চলে যা এবং রাত্রের খাওয়া শেষ করে বরেনের বাড়ী দু'জনে অপেক্ষা করিস, আমি বরেনের বাড়ীতেই তোদের সঙ্গে দেখা করব।"

যাবার আগে কানাই জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গে লাঠি বা টর্চ্চ নেবার দরকার আছে।"

গোলু বলল, "আজ আর দরকার হবে না।"

[ক্রমশঃ

এ্যাটমের বিচিত্র কথা

(জন্ম-কথা)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার

আমরা আলোচনা করছিলুম এ্যাটম নিয়ে নয় কি? এ্যাটম কাকে বলে? এক কথায় বলতে গেলে এ্যাটমের অর্থ হচ্ছে 'যাকে ভাগ করা যায় না'। কথাটা ঠিক বুঝলে না? বুঝিয়ে বলছি শোন। তোমার হাত থেকে এক টুকরো কয়লা মেজের উপরে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল! এইবার যে টুকরোগুলো হল তাদেরও যদি আরও ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে? পাওয়া যাবে এক-একটি ছোট্ট কয়লার কণা। এমনি ধারা ক্রমাগত যদি ভাগই করে যাওয়া যায় তবে কি হবে?—এমন একটা অবস্থা কি আসবে না যার পরে ভাগ করা অসম্ভব? এই যে সব চেয়ে ক্ষুদ্র কয়লার টুকরো একেই বলা হবে একটা কয়লার এ্যাটম। অল্প কথায় বলতে গেলে এ্যাটম হচ্ছে কোনও মৌলিক পদার্থের সব চেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা।

সে হচ্ছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা, আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষি মহর্ষি কণাদ সর্ব্বপ্রথম পরমাণু বা এ্যাটম সম্বন্ধে নানা প্রকারের তথ্য আবিষ্কার করেন। তার পরে কেটে গেছে বহু যুগ, এ নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর আগে গ্রীস দেশের পণ্ডিত ডিমোক্রিটাস বহু দিন পরে এই তথ্য নিয়ে হঠাৎ এক দিন চিন্তা করলেন। দুপুর বেলায় টেবিলের উপরে ছুরি দিয়ে তিনি কাটছিলেন এক টুকরো খড়, হঠাৎ তিনি ভাবলেন, "এই যে খড়ের টুকরোগুলো হল, এগুলোকে কি এমন করে কাটা যায় না যার চেয়ে ছোট খণ্ড খড় থেকে পাওয়া সম্ভব নয়?" ডিমোক্রিটাসের এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আজকের দিনের 'এ্যাটম-তথ্য'। ডিমোক্রিটাস এ্যাটমদের কথা আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্তু দেশের বড়-বড় পণ্ডিতেরা তাঁর ঐ সব কথাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিল। নানা রকমের প্রশ্ন-বাণে তাঁকে করে তুলল ব্যতিব্যস্ত। তখন তিনি শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দিলেন সব কথা।

কঠিন আর তরল পদার্থের কথা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তরল পদার্থের 'ক্ষুদ্রতম কণা'গুলো তেলতেলে, এই জন্যে তারা ইতস্তত গড়িয়ে চলতে পারে। কঠিন পদার্থের 'ক্ষুদ্র-কণা'-গুলো খসখসে আর তাদের গায়ে লাগানো আছে 'হুক'; এই হুকের সাহায্যেই তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তোমরা কি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটল-এর নাম শুনেছ?—তিনি ছিলেন ডিমোক্রিটাসের তথ্যের ঘোর বিরোধী। এই জন্যেই কিছু কালের জন্যে এই তথ্য জনসমাজে মিথ্যা বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ঐ তথ্যের মূলের সত্য প্রকাশ পেতেই সকলে সমাদরে তা গ্রহণ করলে।

আজকালকার যুগের এ্যাটম-তথ্য' ডিমোক্রিটাসের তথ্যের চেয়ে অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের। এর প্রায় অনেকটুকুনই বিজ্ঞানী ডালটনের গবেষণার ফল। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রসায়নবিদ্ জন ডালটন ডিমোক্রিটাসের 'এ্যাটম-তথ্য' নিয়ে পরীক্ষা করে ১৮০৮ সালে এক বইয়ে তাঁর মত লিপিবদ্ধ করলেন। ডালটনের ঐ মতের উপরেই হচ্ছে আজকের রাসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি।

এ্যাটমই হচ্ছে কেন একটা পদার্থের সব চেয়ে ক্ষুদ্র কণা। কাজেই এ কথা বলা ভুল হবে না যে এ্যাটমের সমষ্টিই হচ্ছে পদার্থ। আমাদের চার পাশে যা-কিছু আমরা দেখি সবই তো তবে এ্যাটমের সমষ্টি এমন কি আমাদের নরদেহও হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের কতকগুলো এ্যাটমের সমষ্টি মাত্র। কাজেই বেশ বোঝা যায় যে, কোনও কিছু গুণ নির্ভর করে যে প্রকারের এ্যাটম দিয়ে তা গড়ে উঠে তার উপরে ওজনের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি ধারা। তুলা আর লোহা,—এদের মধ্যে কোনটা হালকা? কি বললে, তুলা? এইবার বল তো এক মণ তুলাই বেশী ভারী না এক মণ লোহা?—দু'টোই সমান কি পরিমাণের দিক থেকে দেখতে গেলে তুলাই হবে বেশী! যে জিনি পরিমাণে কম হয়ে ওজনে হয় বেশী তাকেই বলা হয় ভারী। এ যে ভারী-লঘুর কথা হচ্ছে এর মূলেও কিন্তু রয়েছে তোমার এ্যাটম। ভারী জিনিষের যে এ্যাটমগুলো থাকে তার ওজনও বেশী তা তো সহজেই বোঝা যায়?

কোন জিনিষের ওজন সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে এ্যাটমের ওজনের উপরে। দুনিয়ার সব চেয়ে হাল্কা পদার্থ কি জানে—'হাইড্রোজেন।' এ হচ্ছে এক রকমের বাতাস। সব চেয়ে ভ পদার্থ হচ্ছে এক রকম ধাতু, নাম তার ইউরেনিয়ম। এ্যাটম বো যুগে এই ধাতুর কদর একটু বেশী রকমের। কারণ, এ ছাড়া 'এ্যা বোমা' তৈরী করা যায় না বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। হাইড্রো সব চেয়ে হাল্কা, তার এ্যাটমও হচ্ছে সব চেয়ে হাল্কা। এই কা

হাইড্রোজেনের একটা এ্যাটমের ওজন ধরা হয় এক, আর অন্য সব মৌলিকদের এ্যাটমগুলোকে ওজন করা হয় হাইড্রোজেনের এ্যাটমের তুলনায়! যেমন ধরো, সের-বাটখারার তুলনায় ওজন করা হয় সব জিনিষ—চাল, ডাল, চিনি···। ওই ভাবে ওজন করে দেখা গেছে যে, ইউরেনিয়মের এক-একটা এ্যাটম ওজনে ২৩৮টা হাইড্রোজেন এ্যাটমের সমান। বাজারে যেমন কোন জিনিষের ওজন বলতে গিয়ে দোকানী বলে—পাঁচ সের-ছ'সের-সাত সের,—এ্যাটমের ওজনের বেলায় কিন্তু শুধু পাঁচ-ছ-সাত বললেই যথেষ্ট। কিসের তুলনায় তা আর বলতে হয় না, শুধু বলতে হয় সংখ্যাটা। যেমন ধরো, ইউরেনিয়মের এ্যাটমে ওজন ২৩৮ (হাইড্রোজেন এ্যাটমের তুলনায় তা আর বলা হল না)। এই যে সংখ্যা একেই বলা হয় 'এ্যাটমের ওজন' (Atomic weight)।

আগেই বলেছি, এ্যাটম 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' কাজেই এর আকার কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তাঁদের মতে ওজনের সাথে সাথে এ্যাটমের আকারও ছোট-বড় হয়। নানা রকমের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, হাইড্রোজেনের ২৫০,০০০,০০০টা এ্যাটম সারি দিয়ে দাঁড়ালে তবে এক ইঞ্চি জায়গা লাগে, কিন্তু ইউরেনিয়ম ধাতুর মাত্র ১০০,০০০,০০ এ্যাটমেই এক ইঞ্চি জায়গা নেয়।

"পাঁচ জুতি"

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস

কথায় বলে, পয়সায় বাঘের চোখ মেলে। তার মানেই হল মূল্য দিয়ে কি না পাওয়া যায়। অতি সত্যি কথা! পয়সা পেলে লোক গোখরো-চন্দ্রবোড়া সাপের মাথায় কামড়িয়ে দেয়, কাচ চিবিয়ে খায়, আগুনের ভেতর হেঁটে চলে, সাগরের তলায় পর্যন্ত চলে যায়, মাটির নীচে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। পয়সায় কি অসাধ্য না হয়, আর কি ঘটান না যায়!

বুঝলাম, সবই মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীতে এমনি একটি জিনিষ আছে যা কোন মূল্য দিয়েই সংগ্রহ করতে পারবে না। অথচ একেবারে বিনা পয়সায় তা পেতে পার! মজা বটে! এক দিকে সে দ্রব্য যেমন অমূল্য, আবার নগদ কিনতে গেলে কাণাকড়িও লাগে না। একটু হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে তোমাদের ভেবে যে ব্যাপারখানা কি তবে।

শত শত বছর ধরে সেটা লোকের হস্তান্তর হয়ে চলেছে। এরা সাধারণ রাম-রহিম নয় কেউ! মস্ত বড়-বড় সব রাজা-বাদশা! শক্তির জাহাজ এক-একটা। বলপ্রয়োগ করে এক রাজা আর এক জন থেকে আদায় করেছে সেটা। আদায়ের সাথে রাজার রাজ্যটিও বকশিস্ মিলেছে। আর না পাবেই বা কেন? কেড়ে নিতে গেলে সে যে কি ঝক্কি পোহাতে হয়! কষ্ট করার পুরস্কার যতটা মিললো! যে রাজার শিরোভূষণ চলে গেল, তাঁর বেঁচে থেকে রাজ্য দিয়েই কি আর লাভ! মাথার মণি হারিয়ে অসম্মান পুঁজি করে ক'টা রাজা-বাদশা বেঁচে থাকতে পারেন!

গোলকুণ্ডার নাম শুনে থাকবে তোমরা। কত শত মণির আকর সেখানে আছে! ভূগোলের ছাত্র, ছাত্রীদের অন্তত পরীক্ষা পাশের জন্য একবার করে ওর নামটা কিছুদিন মুখস্থ করতে হয়েই। ভারতের বাইরে যে সব রাজ্য আছে, সেখানকার রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের গোলকুণ্ডার নাম মনে আসতে আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্যের কথা ভেবে মনে একটু ঈর্ষা জাগবে বৈ কি।

প্রথমে ছিল তা গোলকুণ্ডার আকরে। সেখান থেকে উঠিয়ে এনে অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণের রাজকোষে তুলে রাখা হল। এক সময়ে সেটা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণের শোভা বর্দ্ধিত করেছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ জয় করে তা নিজ অধিকারে আনলেন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংসের সংগে মোগলরা পেল সেটা। নাদির শাহ পেয়েছিলেন মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে পরাজিত করে। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ, আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র শাহসুজা সে জিনিষ হস্তগত করলেন। শেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহসুজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে পেয়েছিলেন তা। সর্বশেষ পড়ল যেয়ে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের হাতে। ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আছে এখন সেটা।

এক দিন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি রণজিৎ সিংহকে ওর মূল্য জিগগেস্ করলে উত্তরে বললেন তিনি, "এস্কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" জোর যার মুলুক তার যেমন করে হয়। মুরোদ যার হয়েছে, কেড়ে নিয়েছেন।

এক যে ছিল ছোট্ট পরী

প্রভাকর মাঝি

এক যে ছিল ছোট্ট পরী রামধনুকের দেশে,
খুকুর চোখে ঘুম দিতো রোজ সন্ধ্যে বেলা এসে।
টুকটুকে তার রাঙা শাড়ি, মিষ্টি চাহনিটি,
রূপনগরের চম্পাবতীর ঝিকিকলাগা দিঠি।
তার তরে ঐ কানন জুড়ে ফুটছে রঙীন ফুল
একশো পাখী গান ধরিছে আনন্দে মসগুল।
একশো তারার প্রদীপ আঁকে তাহার পথ-রেখা,
রামধনুকের সাতটি রঙে তার কথাটি লেখা।
আকাশ-বীণার গোপন তারে তার কথাটি ঝরে,
নির্ঝরিণীর কলধ্বনি জাগছে তারি তরে।
সবুজ দু'টি পাখনা মেলে আসতো লঘু বায়ে,
ঝুমুর-ঝুমুর ঝনক নূপুর বাজতো রাঙা পায়ে।
যেথায় যতো দস্যি ছেলে কথায় কথায় আড়ি,
তাদের কাছে ছোট্ট পরী যায় যে তাড়াতাড়ি।
ছুষ্টু মিতে তুমি খুকুর কাজল দু'টি চোখে,
সোনার স্বপন দেয় বুনে সে নাম-না-জানা লোকে।

জেমস্ জয়েস

নর্থ রিচমণ্ড স্ট্রীট কানা। কোন পথ বেরোয়নি ওখান থেকে রাস্তাটা তাই নির্জন—নির্ঝিঝিলি। এক কেবল ছুটির পর পাদরীদের ইস্কুলের ছেলেরা ওটাকে মাতিয়ে তুলত মুখর কলকাকলিতে। কানা পথটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে একখানা দোতলা বাড়ী ছিল সেখানটায়। চার-কোণা একখণ্ড জমি বাড়ীটাকে পৃথক্ করে রেখেছিল পাশের বাড়ীগুলো থেকে। কেমন দুরন্ত অপর বাড়ীগুলো বুঝি নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করত ওটার দিকে চেয়ে!

আমাদের এই বাড়ীখানা পূর্বে ভাড়া নিয়েছিলেন এক পাদরী সাহেব। ভিতরকার বৈঠকখানা-ঘরেই তিনি মারা যান। অনেক দিন তার পর বাড়ীখানা খালি পড়েছিল। কেমন একটা পচা, ভ্যাপসা গন্ধ বেরোত রুদ্ধ ঘরগুলি থেকে। রান্না-ঘরের পেছন দিককার পোড়ো ঘরটায় পুরোন এক গাদা কাগজ-পত্র জমে উঠেছিল। কাগজ-পত্রের গাদা থেকে কাগজে-মোড়া খানকয়েক বই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম এক দিন: স্কটের Abbot, Devout communicant আর ভিদকের Memoirs. বইগুলো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পাতাগুলি গিয়েছিল দুমড়ে। শেষের বইখানা আমার খুব ভালো লাগত। কেন না, ওটার পাতাগুলো ছিল হলদে। বাড়ীর পিছনকার অযত্ন-রক্ষিত বাগানের মাঝখানটায় ছিল একটা আতা গাছ আর আশপাশের লতা-পাতার কয়েকটা ঝোপ। ওই ঝোপের মাঝখান থেকেও আমি এক দিন আগের ভাড়াটিয়েদের একটা মরচে-ধরা সাইকেল পাম্প কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পাদরী সাহেব অকাতরে দান করতেন। উইলে তিনি তাঁর টাকা-পয়সা সব কিছু দান করে গেছেন দেশের সৎ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে। আসবাব-পত্রগুলিও দিয়ে গেছেন তাঁর বোনকে।

শীতকালের দিনগুলি দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে আসত। 'ডিনার' খেয়ে নেবার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার আসত নেমে। খেয়ে-দেয়ে আমর যখন রাস্তায় এসে জড়ো হতাম, আশ পাশের বাড়ীগুলো তখন ঝিমিয়ে পড়ত। মাথার উপরে শুধু ধোঁয়াটে অনন্ত আকাশ। মিটমিটে রাস্তার আলোগুলো চেয়ে আছে মুখ তুলে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়-গোড় আমাদের পাকিয়ে উঠত। আমরা তাই ছুটোছুটি করে বেড়াতাম। নির্ঝিঝিলি রাস্তাটা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত আমাদের চিৎকারে। খেলতে খেলতে আমরা অনেক সময় বাড়ীগুলোর পেছন দিকটায় এসে পড়তাম। খিড়কির দরজা দিয়ে তার পর ঢুকে পড়তাম অন্ধকার বাগানে। এঁদো নর্দমার গন্ধ নাকে এসে লাগত। অন্ধকার আস্তাবলে হয়ত এসে দেখতাম, কোচমান ঘোড়াটার গুচ্ছ আঁচড়ে দিচ্ছে আদর করে। কিংবা হয়ত ওর বকলীর পোষাকটা বাজাচ্ছে টুং-টাং করে। ফিরে এসে দেখতাম, রান্না ঘরের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। কাকাকে রাস্তার মোড় ফিরতে দেখলে আমরা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তাম। বাড়ীর মধ্যে তিনি যখন ঢুকে পড়তেন তখন বেরুতাম। ম্যানগানের বোন ভাইকে চায়ের টেবিলে ডাকতে যখন এসে দাঁড়াত দরজার সামনে, অন্ধকারের আড়াল থেকে আমরা তখন ওকে উঁকি মেরে দেখতাম। দেখতাম, ও চলে যায় কি না। ও যদি দাঁড়িয়ে থাকত ম্যানগানের পিছু-পিছু আমরাও এক সময় বেরিয়ে আসতাম অন্ধকার থেকে। ম্যানগানের বোন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। খোলা দরজা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়েছে ওর গায়ে। ম্যানগান দিদিকে জ্বালিয়ে মারত। আমি কিন্তু রেলিং ধরে চেয়ে থাকতাম ওর দিকে। চলবার সময় ওর পোষাকটা আর চুলের ফিতেটা দুলে উঠত এদিক্-ওদিক্।

রোজ সকাল বেলা সামনের বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে আমি চেয়ে থাকতাম ওদের দরজার দিকে। শার্সিটা এমনি করে ভেজিয়ে দিতাম কেউ যেন আমায় দেখতে না পায়। দোরগোড়ায় ও এসে দাঁড়ালে বুকটা আমার নেচে উঠত। বইখানা নিয়ে আমি তখন হল-ঘরের দিকে ছুটে যেতাম। ওর কটা মূর্তিটা সব সময় ভেসে উঠত চোখের উপর। যেখানটায় পৌঁছে আমরা দু'জন দু'দিক চলে যেতাম, পা চালিয়ে আমি তখন কয়েক পা এগিয়ে আসতাম। তার পর পাশ কেটে যেতাম ওর। এমনি করতাম রোজই। কাটা-কাটা গোটা-কয়েক কথা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার আর কোন কথাই হোত না। তবু ওর নামটি কি ঝড়টাই না তুলত আমার মুগ্ধ হৃদয়ে!

যেখানে রোমান্সের কোন নাম-গন্ধও নেই এমন স্থানেও ওর মুখখানা ভেসে উঠত আমার চোখের উপর। প্রত্যেক শনিবারের বিকেল বেলা খুড়িমা বেরুতেন সওদা করতে। জিনিষ-পত্র বয়ে আনতে আমাকেও যেতে হোত সঙ্গে। রাস্তার দু'পাশের কড়া আলোগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। কোথাও হয়ত মাতালেরা ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে। পথে-পথে সওদা করে বেড়াচ্ছে মেয়েরা। দিন-মজুরেরা বসে বসে কোথাও হয়ত মুখখিস্তি করছে। শুওরের মাংসের পিপার পাশে দাঁড়িয়ে দোকানী-ছোকরারা বুঝি পথিকদের ডাকাডাকি করছে বাজখাই গলায়। পথের গায়কেরা নাকি-সুরে কোথাও বা বুঝি গান শুরু করে দিয়েছে। আমার বুকে কিন্তু একটা কথাই খালি অনুরণিত হোত: আর যাই হোক, ওকে আমি ভুলিনি! টেরও পেতাম না কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওর নামটি বেরিয়ে পড়ত আমার ঠোঁট দিয়ে। চোখ দু'টি আমার তখন ঝাপসা হয়ে আসত। মাঝে মাঝে একেবারে ভেঙে পড়তাম আবেগের বন্যায়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখতাম না। প্রথমে কি কথা বলব—অসংবৃত আমার ভালোবাসা কি করে ওকে জানাব—কিছুই তার কূল-কিনারা করে উঠতে পারতাম না। মনে হোত, দেহখানা আমার যেন একটি বীণা আর ওর প্রতিটি কথা ও ইঙ্গিত যেন বীণার তারের উপর দ্রুত সঞ্চরমান আঙুল।

যে ঘরটায় পাদরী সাহেবের মৃত্যু হয়েছিল এক দিন সন্ধ্যে বেলা আমি প্রবেশ করলাম সেখানে। বাইরে তখন একঘেয়ে বৃষ্টি পড়ছে। ভিতরে জমাট অন্ধকার। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভাঙা শার্সিটার উপর আমি কান পেতে রইলাম। বাইরে পৃথিবীর রসসিক্ত বুকের উপর বৃষ্টির টিপ-টিপ ফোঁটাগুলি অবিশ্রাম নৃত্য করছে। দূর জানালার একটা ক্ষীণ আলো-রেখা চোখে পড়ল হঠাৎ। পলক না পালটাতেই আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। তবু যেন দেখলাম বারেক। সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার মুখর ঝঙ্কারিত হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞতায় কম্পিত কর দু'টি যুক্ত হয়ে এল। অস্পষ্ট কলকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম: ভালবাসি—ভালবাসি—ওগো, তোমায় ভালবাসি!

ও-ই প্রথম কথা কইল। আমি অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলাম অনেক, কি জবাব দেব ভেবে উঠতেই পারলাম না। ও বুঝি শুধিয়েছিল : 'Araby'দের মেলায় আমি যাচ্ছি কি না। প্রকাণ্ড মেলা বসছে ওখানে। ও বুঝি আরও জানিয়েছিল : সেও যেতে চায়।

'বেশ তো চলো না?'

কব্জির উপরকার রূপোর ব্রেসলেটখানা নাড়া-চাড়া করতে করতে জবাব দিয়েছিল সে : 'যাই কি করে? আমাদের মঠে এ সপ্তায় ভর্তি হচ্ছে এক গুচ্ছ ছেলে এসে।'

ওর ভাই আর অপরের দু'টি ছেলে টুপি নিয়ে তখন ঝগড়া করছিল। রেলিংএর কাছে আমরাই কেবল একা। রেলিংএর একটা শিক ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল ও আমার দিকে মুখ করে। খোলা দরজা দিয়ে আলো ছিটকে এসে পড়েছে ওর শাদা ধবধবে ঘাড়, চুল আর রেলিংএর উপর এলিয়ে-পড়া একখানি হাতের উপর। ফেঁপে-ওঠা ওর পরিপূর্ণ বক্ষিশের একটা পাশ আমার নজরে পড়ল।

'আমি না গেলে তোমার তো ভালই হয়।' ও জানালে।

'আমি যদি যাই, কিছু কিনে আনব তোমার জন্য।'

সেদিনকার সন্ধ্যের সেই মুহূর্তগুলির পর থেকে কে যেন আমায় পেয়ে বসল। শনিবার রাত্রিতে মেলায় যাবার জন্ম আমি ছুটি চাইলাম। খুড়িমা মুখ তুলে তাকালেন। ভাবখানা এই : আমি কি আমার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা ভুলে গেলাম? ক্লাশেও সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠতে পারলাম না। মাষ্টার মশাইয়ের মুখখানা ক্রমশ: কঠিন হয়ে উঠল। এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগলাম বসে বসে। কিছু একটা করতে গেলেই মনটা পড়ে থাকত আর কোথায়। সব কিছুই মনে হতে লাগল তুচ্ছ, একঘেয়ে, ছেলেমানুষী।

শনিবার সকালে কাকাকে আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম কথাটা। হল-ঘরের সামনে তিনি তখন টুপি বুরুস করবার ব্রাসটা খুঁজছিলেন। বললেন : 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

কাকা ছিলেন হল-ঘরে। অপর দিনের মত সেদিন আর বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে ওদের জানলার দিকে তাকান হোল না আমার। ক্লাশের দিকে পা বাড়ালাম।

খেতে এসে দেখলাম কাকা তখনও ফেরেননি। ফিরবার সময় হয়নি তাঁর তখনও। ঘড়িটার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ঘড়িটার টিক-টিক শব্দগুলি ভারী বিশ্রী লাগল। অসহ্য বোধ হোল। আমি বেরিয়ে উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। উপরের খোলা ঠাণ্ডা ঘরটায় এসে যেন বাঁচলাম হাঁপ ছেড়ে। গুন-গুন করে গান করতে করতে আমি পায়চারী করতে লাগলাম এক ঘর থেকে অপর ঘরে। জানলা দিয়ে দেখলাম, অপর সঙ্গীরা খেলছে রাস্তায়। ওদের ক্ষীণ অস্পষ্ট চিৎকার এসে পৌছতে লাগল আমার কানে। ঠাণ্ডা কাচের উপর মুখ রেখে ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলাম আমি ওদের বাড়ীর দিকে। ঘন্টা-খানেক বোধ হয় কেটে গেল। তবু একবারটি যদি দেখতাম ওকে। ওর ধূসর সে মূর্তিটি, আলোকোজ্জ্বল শাদা ধবধবে ওর ঘাড়, রেলিংএর উপর লতিয়ে পড়া ওর হাতখানা, ফেঁপে-ওঠা ওর বক্ষিশের একাংশ কিন্তু ভেসে উঠল আমার চোখের উপর।

নীচে নেমে এসে দেখলাম, মিসেস্ মারসার বসে আছেন আগুনটার কাছে। তিনি হলেন এক মহাজনের বিধবা পত্নী। বয়েস হয়েছে অনেক। কথা কইতে খুব ভালবাসেন। কোন একটা মহৎ কাজের জন্ম এখন তিনি সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন পুরোন টিকিট। চায়ের টেবিলে বসে বসে ঘ্যানঘ্যানানী তাঁর শুনে যেতে হোল। ঘন্টা-খানেক বুঝি কেটে গেল। কাকার তবু দেখা নেই। মিসেস্ মারসারও উঠে পড়লেন। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। আটটা বেজে গেছে। অস্থির পা ফেলে আমি পায়চারী করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে। টন-টন করে উঠল মুঠোর আঙুলগুলো।

খুড়িমা বলে উঠলেন : 'আজ তোমার বুঝি আর যাওয়া হোল না মেলায়।'

ন'টা বাজল। হল-ঘরের দরজায় এবার চাবি ঘুরানোর শব্দ শোনা গেল। কাকা বিড়-বিড় করে আপন মনে কি যেন বললেন। আলনায় তাঁর ভারী ওভার-কোটটা রাখার শব্দ কানে এল।

খাবার খেয়ে নেবার আগেই আমি কাকার কাছে মেলায় যাবার টাকা চেয়ে বসলাম। তিনি বুঝি কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন : 'এখন মেলা কি রে? সবাই এতক্ষণে এক ঘুম দিয়ে নিয়েছে।'

আমার কিন্তু একটুও হাসি পেল না।

'তুমিই তো দেরী করে দিলে ওর।' খুড়িমা ওকালতি করলেন। —'পয়সা-কড়ি কিছু দিয়ে দাও না ওকে?'

কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন বলে কাকা অনুতাপ করলেন। বললেন : 'হ্যাঁ, আমোদ-আহ্লাদ একটু-আধটু করাটা ভালো। এক কাজে একঘেয়ে লেগে থাকলে বোকা বনে যেতে হয়।'

কোথায় যাচ্ছি কাকা আমায় জিজ্ঞেস করলেন। এবার অন্ততঃ নিয়ে দু'বার তাঁকে বলেছি। তিনি তখন আমায় প্রশ্ন করলেন, The Arab's Farewell Too His Steed কবিতাটি আমি পড়েছি কি না। খাবার-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলাম, কাকা কবিতাটির প্রথম কয়টি পংক্তি আবৃত্তি করে শুনাচ্ছেন খুড়িমাকে।

বাকিংহাম ষ্ট্রীট ধরে আমি ছুটে চললাম ইষ্টিশানের দিকে। হাতের ফ্লোরিনটাকে আঁকড়ে ধরলাম মুঠোর মধ্যে। গ্যাসের আলোগুলো জ্বলছে রাস্তার দু'পাশে। এখানে-ওখানে চাপ চাপ ভীড় জমিয়েছে ক্রেতারা। দৃশ্যটা আমায় স্মরণ করিয়ে দিল মেলায় যাবার আমার উদ্দেশ্য।

তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কেটে ট্রেণের এক পরিত্যক্ত কামরায় আমি গিয়ে উঠে বসলাম। বহু দেরী করেই ছাড়ল গাড়ীটা। ছুটে চলেছে ট্রেণ হু-হু করে—বস্তু ভগ্নস্তূপ আর ঝিলমিল নদীটার পাশ কেটে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড রো ইষ্টিশানে গাড়ী এসে থামল। এক দল যাত্রী ভীড় করে দাঁড়াল কামরার সামনে। গার্ড এসে কিন্তু ওদের হটিয়ে দিল। জানাল, এটা মেলার স্পেশ্যাল ট্রেণ। একাই থাকতে হোল আমায় গাড়ীতে। মিনিট কয়েক পরে গাড়ীটা এসে থামল কাঠের জীর্ণ এক প্ল্যাটফরমে। ছুট করে আমি নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। ঘড়িতে তখন দশটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকী।

ছ' পেনীর টিকিটের কোন ব্যবস্থা নেই। মেলা পাছে ভেঙে যায় এই ভয়ে গোটা একটা শিলিংই আমি গেট-কিপারের হাতে গুঁজে দিলাম। একটু পরেই প্রকাণ্ড এক হল-ঘরে এসে পড়লাম। বহু ষ্টলই তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আলোগুলোও প্রায় নিবে গেছে। গির্জায় উপাসনার পর স্তব্ধ যে নীরবতা থম-থম করতে থাকে এ যেন তারই পূর্বাভাষ! ভীরু পা ফেলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মেলার মধ্যে। যে কয়টি ষ্টল এখনও খোলা আছে, কিছু-কিছু লোক গিয়ে জড় হয়েছে ওদিকটায়। রঙিন আলোর বর্ণমালায় দেখলাম লেখা আছে এক জায়গায়: কাফে ক্যানটন। দু'জন লোককে দেখা গেল টাকা গুণে সাজাচ্ছে একখানা থালা থেকে। টাকার টুং-টাং শব্দ ভেসে এল আমার কানে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মেলায় আসা—কথাটা মনে পড়ে যেতেই একটা ষ্টলের সামনে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। একমনে তার পর দেখতে লাগলাম ষ্টলের চীনা বাসন আর ফুল-তোলা চায়ের সেটগুলি নেড়ে-চেড়ে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে দু'টি যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল হেসে হেসে। কাটা-কাটা ওদের অস্পষ্ট কথাগুলি আমি শুনতে লাগলাম কান পেতে।

'উহুঁ, কখ্‌খনো অমন কথা আমি বলিনি!'

'উহুঁ, বলেছিলে!'

'উহুঁ, আমি বলিনি।'

'কি রে, বলে নি?'

'হুঁ, আমি শুনেছি!'

মেয়েটি আমায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল! শুধাল, কি কিনতে চাই। নির্লিপ্ত কণ্ঠ। কোন আগ্রহই প্রকাশ পেল না ওর গলায়। কর্তব্যের খাতিরেই যেন প্রশ্নটা করা। ষ্টলে প্রবেশ-পথের দু'পাশের প্রহরীর মত দণ্ডায়মান বড়ো 'জার' দু'টোর দিকে আমি তাকালাম পঙ্গু অসহায়ের মত। আমতা আমতা করে তার পর জবাব দিলাম: 'না, ধন্যবাদ।'

মেয়েটি একটা 'জারকে' সরিয়ে রাখল। তার পর ফিরে গেল যুবক দু'টোর পাশে। ওরা আবার আগেকার কথার জের টেনে চলল। বার দু'য়েক বুঝি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে।

পায়চারী করতে লাগলাম আমি ষ্টলটার সামনে। জানি, কোন ফল হবে না তাতে। 'জার' দু'টো আমার কোন দিনই কেনা হবে না। ওখান থেকে আমি চলে এলাম আস্তে আস্তে পা ফেলে। হল-ঘরটা থেকেও বেরিয়ে এলাম এক সময়। পকেটের আধ শিলিংটা আর পেনী দু'টো বাজাতে লাগলাম টুং-টাং করে। হল-ঘরের এক প্রান্ত থেকে কে যেন ডেকে বলে উঠল, আলোগুলো সব নিভিয়ে দিতে। অন্ধকারে ছেয়ে গেল হল-ঘরটা।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমি তাকিয়ে রইলাম অপলক। মনে হোল, মুগ্ধ একটা কীট যেন ছুটে এসেছে এত দূর শুধু অহমিকায়। ব্যর্থ রাগ ও যন্ত্রণায় চোখ দু'টো আমার জ্বলে উঠল দপ্‌ করে।

অনুবাদ: নিখিল সেন

কোন এক জগৎ

সুশীলকুমার গুপ্ত

রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে কোন এক বিপন্ন নিমেষে
অন্ধকারে খিল খুলে ছাদে উঠে এসে—
ধর যদি আকাশের মত কোন স্বপনের হাত
তাহ'লে পেতেও পার কোন এক জগতের
চকিত সাক্ষাৎ!

হঠাৎ তখন হবে মনে—
আশে-পাশে ঘর দোর, সিঁড়ি, মাচা, উঠোনের কোণে,
ঐ দূরে নদী-সাঁকো, শাল-বাঁশ-ঝাড়ে
আলেয়ার আলো হাতে ঘন অন্ধকারে
সারা দেহ ঢেকে কুয়াশায়—
কোন সে জগৎ এক হেঁটে চলে যায়;
তাহার নিশ্বাসে
উথলায় রাশি রাশি আঁধারের ঢেউ,
মাঠ, পথ, ক্ষেত, বন ঘুমে ঢুলে আসে।
ঝিঁঝিঁদের সুরে
সে জগৎ কা'কে যেন ডাকে ঘুরে ঘুরে।

কখনও বা এক দিন বিষণ্ণ দুপুরে
কোন ক্লান্ত মেঠো পথে বহু ক্রোশ ঘুরে
থমকে পড়েছ যবে পরিচিত অশথ-ছায়ায়,
দূরে বাঁকা নদীটির শাণিত রেখায়
সহসা তখন
ঝিকমিক করে যাবে কোন এক অবাক পৃথিবী,
কোন এক বিস্মিত স্বপন;
খাঁচা-পোষা স্তিমিত হৃদয়
উড়ে যাবে আকাশের গাঢ় নীলিমায়,
জড়িয়ে ডানায়
ঘুঘুর করুণ সুরে কেঁপে ওঠা এক মুঠো
সোনালী সময়!

ভোল তুমি, যতই ভোল না,
তবু এর আনাগোনা
জীবনের অরক্ষিত প্রহরে প্রহরে
কোন এক দীপ্ত অর্থ কৌতুকের ভরে!
দেখে নিতে তবু তার মুখ
হয়ে ওঠে এ-হৃদয় উদ্দাম-উৎসুক।
দিতে সে ত পারে না কো অর্থ-স্বচ্ছলতা,
ক্ষুধিত বিস্ময় তবু, অনুভূতি, কথা—
ফেলেছে প্রেমের মোহ-ফাঁদে,
তাই আজও এ-হৃদয় মাঝে মাঝে কাঁদে,
ছুঁড়ে ফেলে চারি পাশে ধুলো, ধোঁয়া, ছাই,
লাভ-ক্ষতি, ভীড়, রোশনাই—
ছুটে যায় তাহার আহ্বানে
মাঠ, বন, আকাশের পানে।

দেশের কথা
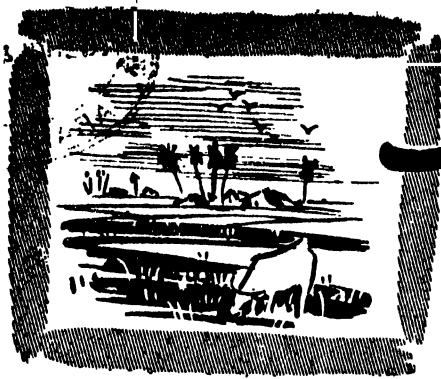
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিছু দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে চাষী সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতিরূপে কতকগুলি সুচিন্তিত এবং সর্ব্বজন-প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়াছেন ডাঃ ঘোষ বলেন : "পশ্চিম বাংলায় বিঘা-প্রতি গড়ে ৫-৬/মণ ধান উৎপন্ন হয়। শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় বিঘা-প্রতি গড়ে ১২/মণ এবং স্পেনে ১৭/মণ। আমাদের এই প্রদেশে যদি গড়ে বিঘা-প্রতি ৮/মণ ধান উৎপন্ন হয় তা'হলে শুধু বর্ত্তমান অধিবাসীদেরই যে খাওয়া চলতে পারে তা নয়, অন্ততঃ আগামী ২৫ বৎসরে যারা আসছে তাদের ব্যবস্থাও হতে পারে। চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে বেশী খাদ্য উৎপন্ন করার কথা ভাবার চেয়ে যে পরিমাণ জমি চাষ হয় তাতেই বেশী উৎপন্ন করার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যাতে বিঘা-প্রতি গড়ে অন্ততঃ ৮/মণ ধান উৎপন্ন হয় পশ্চিম বাংলার বেঁচে থাকবার জন্যই এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।" পশ্চিম বাংলা সরকারের একটি কৃষি বিভাগ আছে! কৃষি-মন্ত্রীও এক জন আছেন। আশা করি, তাঁহারা ডাঃ ঘোষের উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—অবসর মত। কিন্তু এ-বিষয় কেবল সরকারই নহেন, চাষী এবং যাঁহারা বেশী জমি লইয়া চাষবাস করেন, তাঁহারাও আশা করি এ-বিষয় মনোযোগ দিবেন। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গলাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। ইহা চিরসম্ভব নহে। বাঙ্গলার খাদ্য-সমস্যা বাঙ্গালীকেই যেমন করিয়া হউক মিটাইতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের পাঁচ-দশ বছরী পরিকল্পনা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু খাদ্য-সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন।

* * * *

তাহার পর ডাঃ ঘোষ প্রসঙ্গক্রমে আর একটি সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষের মতে : "পশ্চিম বাংলায় ধান চাষ হতে ধান কাটার যখন সময়, তখন প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া দেখা দেয় বেশ কঠোররূপে। এরা ছাড়তে না ছাড়তেই ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহে যেতে হয় অনেককে মাঠে। এতে ফসল যদি বেশী না হয় তাতে আশ্চর্য্য হবার কি? তারা উৎপন্ন করে বটে কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়ে—সৃষ্টির ভিতরে যে আনন্দ রয়েছে, যে মাধুর্য রয়েছে তা তারা বুঝতেই পারে না। অঘ্রাণে ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি তাদের প্রাণে আনন্দের জোয়ার এনে দেয় না। ধান কাটতে গিয়ে কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া এসে অনেকে শীতের আমেজ ভরা রোদে মাঠের আ'লে শুয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা খুব ভালো ভাবেই হওয়া দরকার। প্রতি ইউনিয়নে একটি এমন কি সম্ভবপর হলে দুইটি ডাক্তারখানা হওয়া প্রয়োজন।" 'সৃষ্টির আনন্দ বা মাধুর্য্যে'—প্রভৃতি কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাস্তব দিক হইতে বিচার করিলে সমস্যাটি গুরুতর। চাষীদের সাধারণ স্বাস্থ্য বছরের পর বছর খারাপের দিকে চলিয়াছে। অথচ ব্যাপক ভাবে ইহার কোন প্রতিকার-চেষ্টা অদ্যাবধি হয় নাই। বিদেশী সরকারকে ইহা লইয়া আমরা কম গালি-গালাজ করি নাই। কিন্তু দেশী সরকার কায়েম হইবার পরেও অবস্থার কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলার বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা ডাঃ রায় খ্যাতিমান চিকিৎসক। আশা করি, তিনি ভাল করিয়া গ্রামাঞ্চলের ম্যালেরিয়ার কথা জানেন। কলিকাতা শহরে ডাক্তার এবং হাসপাতালের বাহুল্য না করিয়া গ্রামের দিকে কিছু চালান করিলে কোন দোষ হইবে কি? দেশীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর কর্ত্তব্য এ-বিষয়ে যথেষ্ট রহিয়াছে।

* * * *

কৃষিকার্য্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বাঙ্গলার মৎস্য-সমস্যারও হয়তো কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। কি করিয়া তাহা করা যায়, ডাঃ ঘোষ তাহাও বলিয়াছেন : "বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলার কোন কোন অঞ্চলে আমাদের পূর্ব্বজরা সেচের জন্য মাঠে মাঠে বহু পুকুর কাটিয়েছিলেন, বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের অবহেলায় তাদের অধিকাংশই আজ অকেজো। সেগুলির পুনঃ সংস্কার প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব বাংলা সরকার একজন পুষ্করিণী সংস্কার বিল করেছিলেন। সে বিলের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সে বিলে রয়েছে মালিক ভিন্ন পুষ্করিণী অন্য কেহ সংস্কার করলে ২০ বৎসরের জন্য তার অধিকার থাকবে, পরে পুনরায় মালিকের দখলে যাবে। আমার মনে হয়, এই ধারাটির পরিবর্ত্তন দরকার। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিক যদি পুকুর সংস্কার না করে, তাহার পরে যে কাটিয়ে নিবে তাহারই স্থায়ী স্বত্ব হওয়া উচিত,—অবশ্য যে যে জমি সেচের জন্য জল পাওয়ার অধিকারী তারা জল পাবে এবং যে হারে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা দিতে হবে। এখানে এ কথাও বলে রাখা প্রয়োজন, মালিক কাটাতে অক্ষম হলে প্রথম সরকার, তার পর কোন সেবা অথবা কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান এবং সর্ব্বশেষে ব্যক্তিবিশেষকে কাটাবার অধিকার দেওয়া সঙ্গত। এই পরিবর্ত্তন হলে, বহু পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হবে—ফলে বহু জমি পুনরায় দো-ফসলা হবে—মাছ চাষও কিছু বেশী হবে। জাতির কল্যাণের জন্য পুষ্করিণী সংস্কার বিলের এই অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন বিষয়ে আশা করি পশ্চিম বাংলা সরকার অবহিত হবেন।" এ-কথাও যুক্তিযুক্ত। স্বার্থ-সংযুক্ত—বাৎসরিক চার আনা (বিঘা) হিসাবে জমা লওয়া খাল-বিলগুলিকে প্রায় ত্রিশ টাকা বিঘা হিসাবে বিলি-ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তি-বিশেষের হয়ত লাভ হইবে—

দেশের কিছুই হইবে না। বাঙ্গলা সরকার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

* * *

ডাঃ ঘোষ ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতেও কসুর করেন নাই: "কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলালজী বলেছিলেন, নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পরে কয়েক মাসের মধ্যে কাপড় তৈরী ও বিক্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাদাররা প্রায় ১০০ কোটি টাকা অন্যায় মুনাফা করেছে—কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে টাকা বের করার কোন উপায় সরকার এখনো স্থির করতে পারেননি। শিশুরাষ্ট্রের প্রথম নম্বরের শত্রু এই ধরণের পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার। এরাই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কার্যে লিপ্ত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-বিরোধী কার্যে যারা নিযুক্ত তাদের অগ্রণী হচ্ছে এরা। কিন্তু শিল্পপতিরা সঙ্ঘবদ্ধ, তাই তারা এমন কি অন্যায় কার্য করেও উঁচু-মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে, আর চাষীরা নিজেদের ন্যায্য দাবী পূরণের কথা বললেও তাদেরকে অপরাধী বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়। তাই আপনাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে—ঐ শিল্পপতিদের মত অন্যায় মুনাফার জন্য নয়—আপনাদের ন্যায্য দাবীর কথা সংযত অথচ সুদৃঢ় ভাবে সরকারকে বলে দেশের কল্যাণে বেঁচে থাকার জন্য।" ইহাদের সঙ্গে কোটিপতি কালোবাজারীদের নামও করা যাইতে পারে। প্রধান মন্ত্রী, কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে—পণ্ডিত নেতৃরূপে বলেছিলেন যে, ক্ষমতা হাতে থাকিলে এবং পাইলে তিনি দেশের কালোবাজারীদের ফাঁসী দিতেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর তাঁহার এ সাধু ইচ্ছা কোন্ কারণে কর্পূরের মত উবিয়া গেল? এখন ত দেখা যাইতেছে, কালোবাজারীরা শশিকলার মত দিনের পর দিন আত্ম এবং পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন বেশী করিয়াই করিতেছে। পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারও এ বিষয় নীরব। দুষ্ট লোকে যখন বলে যে বর্ত্তমান সরকার কালোবাজারীদের দ্বারাই পরিচালিত, তখন প্রতিবাদ করিবার কিছু পাই না। তবে ইহাও হয়ত কমিউনিষ্টদের কারসাজি হইতে পারে! ডাঃ ঘোষও দেখিতেছি কমিউনিষ্ট বনিয়া গেলেন! তাহা না হইলে তিনি ঘোর কংগ্রেসী হইয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারদের নিন্দা করেন কোন্ সাহসে?

* * * *

ডাঃ ঘোষের নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও হয়ত কুবাক্য নহে: "ধানের দাম বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি বা inflation হবে, ইহা নিতান্তই অপযুক্তি। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য তুলনায় অত্যধিক বেশী হওয়া মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ। আর একটি কারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মোটা মোটা বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং সরকারী দপ্তরখানায় কর্ম্মচারী সংখ্যা-বৃদ্ধি বশতঃ ব্যয়-বৃদ্ধি। আর একটি কারণ সরকার কর্তৃক ক্রমবর্দ্ধমান নোট চালু করা। এই মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারে সরকারী দায়িত্বই সর্ব্বাধিক।" মিলওয়ালারা কাপড়ের দাম বাড়াইতে পারে, সরকার তাহাতে সানন্দে অনুমতি দিবেন, কিন্তু যত দোষ বেচারা গরীব চাষীদের! ধান-চাউলের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে চাহিলে তাহাদের বলা হইবে দেশদ্রোহী! তাহারা সাম্যবাদ-প্রভাবান্বিত। অথচ চাষীদের ধান-চাউল বিক্রয়লব্ধ পয়সায় সংসার চালাইতে হইবে! যাহার দশ কোটি আছে, তাহার বিশ কোটি হইলে দোষ নাই, কিন্তু যাহার মাসিক আয় দশ টাকা না হইলে সংসার অচল হয়, তাহার সেই দশ টাকা আয়-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং ন্যায্য দাবী অতীব অপরাধজনক কার্য্য! দেশের বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশানের জন্য যাহারা সত্যই দায়ী, তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার সাহস বর্ত্তমান সরকারের নাই বলিয়া আমরা মনে করি।

* * * *

'বর্দ্ধমান' পাঠে জানিতে পারি:—"শুনা যাইতেছে, দুর্নীতি দমন-কার্যে রত স্বেচ্ছাসেবকগণ চোরাবাজার বন্ধ করিবার সময় স্থানীয় পেট্রলগার্ড কর্তৃক নানারূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন। কালনা থানার রায়জামনা গ্রামের দুই জন স্বেচ্ছাসেবকের চেষ্টায় গত কয়েক দিনের মধ্যে কতকগুলি ধান ও চাউলের চোরাকারবার ধরা পড়িয়াছে। স্থানীয় পেট্রলগার্ড তাহাদের কার্যে সাহায্য করা দূরে থাকুক বাধা দিতেছেন। সরকারী নুণ খাওয়ার পরিবর্ত্তে এইরূপ ব্যবহার সরকার আর কত দিন সহ্য করিবেন?" এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। জানিবেন, বর্ত্তমান সরকারের চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই, লম্বা কাণ আছে—শ্রবণশক্তি নাই, হাত আছে—দড়ি-বাঁধা অবস্থা, পা আছে—অচল। দেশের লোক যদি নিজের হাতে পাপ এবং অন্যায় বন্ধ করিবার ভার গ্রহণ করে, এক দিনেই সব বন্ধ হইবে। কলিকাতা সহরেও এমন বহু বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেছি। গরীব গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দুই সের চাউল বিক্রি করিতে আসিয়া পুলিশের খরদৃষ্টি এড়াইতে পারে না, কিন্তু লরি-বোঝাই মাল সাদা-বাজার হইতে প্রকাশ্য কালোবাজারে অন্তর্ধান করিতেছে! বিদেশী সরকারের আমলে দেশীয় পুলিশের সুনাম যে-সব বিষয়ে ছিল, সাময়িক ভাবে তাহা দেশীয় সরকারের উদয়ে বন্ধ হয়, কিন্তু গত কিছু কাল হইতে আবার সেই সব গুণাবলী মহামারী স্কেলে দেখা যাইতেছে। কর্ত্তা-মহল একটু চোখ মেলিয়া চাহিলে অনেক কিছুই দেখিতে পাইবেন।

* * * *

হয়ত যুক্তিযুক্ত হইবে না—কিন্তু শ্রীবলরাম রায়-চৌধুরী লিখিত কবিতাটি 'গণরাজ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। 'মহাশয়' ব্যক্তিগণ ক্ষমা করিবেন—

> "টিকটিকি হয়ে কুমীরের মত করিয়াছে যারা কাজ,
> সুখ-সংসার ভাঙ্গিয়াছে যারা, হানিয়াছে শিরে বাজ,
> বিধবা'র আঁখি-তারকায় যারা উপাড়ি লয়েছে কাড়ি,
> প্রিয়-বিচ্ছেদ-বেদনার ভারে কাঁদায়েছে শত নারী,
> তাজা প্রাণ যত পচায়ে মেরেছে অন্ধ-কারার ঘরে,
> কারো প্রাণ গেছে ফাঁসির কাষ্ঠে, কারো বা দ্বীপান্তরে,
> আজ হাসি পাই শুনি হবে তারা 'বিশ্বাসী-লোক' ভাই,
> খুঁজে আনো আজ টিকটিকিগুলো, বিচার তাদের চাই!
>
> বন্ধু, আজিও তারা আছে সুখে রাষ্ট্রের অনুগত,
> মরে তো মরুক অন্ন-অভাবে মানুষ তোমার মত!
> তুমি ত বন্ধু অনেক দিয়েছ সয়েছ অনেক জ্বালা,
> আজিও পৃষ্ঠে বেত্রের দাগ, নাগিনীর বিষ ঢালা,
> ভালবাসিয়াছ দেশ-জননীরে তার দুখে প্রাণ কাঁদে,
> কারাগারে তুমি বন্দী হয়েছ শুধু এই অপরাধে!
> দেশের বক্ষে হানিয়াছে ছুরি অর্থের লালসায়,—
> কারা হীন-চেতা দেশ-সন্তান? বিচার তাদের চাই!"

বিচার করিবে কে? দেশটা বাঙ্গলা না হইলে অবশ্যই বিচারব্যবস্থা সম্যক্‌ ভাবেই হইত। কিন্তু আমরা এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই বাস করিতেছি—কেবল মাত্র এক দল লোকের চ্যাঙড়ামো দমন করিতেই পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকার ক্ষীণ কণ্ঠে আবেদন-নিবেদন ছাড়িতেছেন!

* * *

'দামোদর' পত্রিকা কিছু কাল পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছেন: "সরকারী আইন অমান্য করিলে এবং সরকারকে অবজ্ঞা করিলে বৃটিশ আমলে অপরাধীকে শুধু সাজাই দেওয়া হইত না, উপরন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত সরকারী অনুগ্রহ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইতেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন ভারতের কোন কোন হাকিমের বিচার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এম, সি, সেন বর্দ্ধমান সদরঘাটের অপর তীরে মূলকাঠি-উচালন বাস সার্ভিসের মালিক বিশিষ্ট ধনী শ্রীরামমোহন বসুকে বিনা লাইসেন্স ও বিনা পারমিটে অযোগ্য বাস চালাইবার অপরাধ হইতে বেকসুর মুক্তিদান করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত বাস-মালিকের বাস খারাপ থাকায় বেন্দুড় গ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গোলকগোবিন্দ ভট্টাচার্যের প্রাণহানি ঘটে। ইতিমধ্যে উক্ত বাসের চালক সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। অতএব সে এখন মানুষের বিচারের বাহিরে। আমরা অনুসন্ধান জানিলাম, এই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ ভাল থাকিতেও বাস-চালককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা আইনজীবী না হইলেও সাধারণ যুক্তিতে বলিতে চাহি, সরকারী লাইসেন্স ও পারমিট না লইয়া উক্ত বাস-মালিক কোন্‌ সাহসে এবং কাহার আদেশে বাস চালাইলেন? ইহাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার বিচার করিবে কে? যাহার বা যাহাদের অপরাধে এক জন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে অগাধ বিপদে ফেলিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এই নরঘাতক-তার বিচার কি আইনের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? তাঁহার অমূল্য জীবনের ক্ষতিপূরণ করিবে কে?" বিষয়টি অবহেলার নহে। জানি না, এদিকে পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না। না হইয়া থাকিলে অবিলম্বে হওয়া উচিত। মহামান্য হাই-কোর্টের দৃষ্টি এ-বিষয় আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

বর্দ্ধমান হাসপাতালের আলোচনা সম্পর্কে 'বিদ্রোহী' মন্তব্য করিতেছেন: "যাহাদের পয়সা ব্যয় করিয়া চিকিৎসিত হইবার সাধ্য নাই তাহাদের আবার ঠাঁই দিবার ব্যবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা! নচেৎ বহু পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িত যে বর্তমান সময়ে অখাদ্য কু-খাদ্যের বাহুল্যতায় ও পূর্ববঙ্গের বহু লোক বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রত্যহ বহু দরিদ্র রোগী স্থানাভাবে ফিরিয়া গিয়া গাছতলায় ও পথের ধারে পড়িয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিতেছে। এমতাবস্থায় সত্যই হাসপাতালের ঘর ও বেড বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই বলিবেন যে, যাহা হইতেছে হইতে দাও, বেড বৃদ্ধি বর্তমানে অসম্ভব। এইরূপ মনোভাবের ফলেই আজ বর্দ্ধমান হইতে মেডিকেল স্কুল উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার এই চতুঃসীমায় কিরূপ কুফল ফলিবে সরকারের তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর কোথায়? বর্দ্ধমান ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের ত্রিসীমানায় আর এত বড় চিকিৎসালয় নাই, তাহা যদি আজ অব্যবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় তবে আমাদের আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি নাই বলিয়া অভিশপ্ত হইব। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ও অন্যান্য প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন ইহাই আমরা শীঘ্র দেখিতে চাই।" 'বিদ্রোহী' অপেক্ষা করিতে থাকুন। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, দেশের নেতারা, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর জনকল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! হাসপাতালে অনাচার-অবিচার আজ দেশের সর্ব্বত্র একই প্রকার। কলিকাতার সরকারী হাসপাতাল-গুলির কথা না বলাই ভাল। ঐ সকল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ রোগী এবং তাহার আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে কি প্রকার ভদ্র ব্যবহার করেন, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

* * * *

পাকিস্তান-আগত দুর্গতদের জীবিকার্জ্জনের বিষয়ে 'শিল্প ও সম্পদ' পরামর্শ দিতেছেন: "বর্তমানে চাকুরির বাজার ভাল নয়—বিভিন্ন অস্থায়ী অফিস ও কল-কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বহু বেকার সৃষ্টি হইয়াছে; আমদানী-বাণিজ্যও বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত, এবং যে সমস্ত মাল আসিতেছে তাহাদের ভাণ্ডার-রেটে মাল দেওয়ায় দেশী বাজার পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী পুঁজিদার নাই যাঁহারা আছেন তাঁহারা সুবৃহৎ মৌলিক শিল্প-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কাজেই ব্যাপক ভাবে ছোট ও মাঝারী শিল্প-ব্যবসায়গুলি আমাদিগকে হস্তগত করিতে হইবে। চাকরী ও স্বাধীন ব্যবসা দুই-ই ইহাতে আছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু টিঁকিতে পারে। যে সব কাজ-কারবারে বাঙ্গালী হিন্দু আত্মনিয়োগ করে নাই, অবিলম্বে সেগুলিতে নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা প্রথমে ছাপাখানার মেসিনম্যান, কালিওয়ালা প্রভৃতি কাজগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কলিকাতা ও মফঃস্বলে যে সব ছাপাখানা আছে তাহাতে সর্ব্বসাকুল্যে তিন হাজার হিন্দু জমাদার, মেসিনম্যান, কালিওয়ালা প্রভৃতি আছে কি না সন্দেহ, অথচ মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা তিরিশ হাজার হইবে। মেসিনের কাজে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে—রীতিমত পারিশ্রমিকও পাওয়া যায়। কাজেই শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও কারিগরী-কার্য্যে আগ্রহসম্পন্ন বাঙ্গালী হিন্দু অবিলম্বে তৎপর হইলে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু আরামপ্রিয় ও অকর্ম্মণ্য—বেশী পরিশ্রমে অভ্যস্ত নহে। বসিয়া থাকিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইবে তবু স্বাধীন ভাবে গতর খাটাইয়া পেট ভরিয়া খাইবে না। সে হিসাবে পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুগণ বিহার, যুক্তপ্রদেশের অবাঙ্গালীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, কাজেই পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দুদের এই জীবিকাটিতে অবিলম্বে যোগদান করা দরকার।" অনস্বীকার্য্য কথা। এ-বিষয় সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে আমরাও বহু কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু ফলোদয় কিছুই হয় নাই। সুদূর পাঞ্জাব হইতে বহু বাস্তুত্যাগী কলিকাতায় আসিয়া চাকরির খোঁজ করে নাই। কোন না কোন ব্যবসা করিয়া দিন চালাইতেছে। কিন্তু হতভাগা বাঙ্গালী যুবকের দল বাজে হৈ-চৈ এবং সিনেমা-ম্যাচ প্রভৃতির 'কিউ' এ দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে! মাথায় সুপারি রাখিয়া খড়ম-পেটা করিলেও ইহাদের কোন জ্ঞানোদয় হইবে না!

ভাগ্যের সন্ধানে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৯৩৪ ও ১৯৪৮ বহু দূর। ১৯৩৪ সালে আমি হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদের কথা বলিতে চলিয়াছি। চৌদ্দ বৎসর বনবাস করিয়া আসিয়া রাজার কুমার রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রজানুরঞ্জন করিয়াছিলেন, নজীর আছে; ক্ষুদ্র মানবক, তৃণাদপি তুচ্ছ ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর পরে মৌনব্রত ভঙ্গ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি বা থাকিতে পারে? সুদীর্ঘ-কালব্যাপী মৌনব্রতের কারণ ছিল। হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে হইলে কেবল অপমান ও লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইত; তাহাতে রুচি ছিল না। উত্তর কালে দেখা গেল, হায়দ্রাবাদ ষ্টেট ঐগুলো নিজস্ব আর্ট হিসাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহাতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। নহিলে মীর লায়েক আলি বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে এ কথা কেমন করিয়া বলে, যদি দরকারী কথা থাকে, তাহা হইলে হিন্দু যমুনার তীরে, মুসি নদীর ধারে, দিল্লীতে নহে, হায়দ্রাবাদে আসিতে ইচ্ছা হোক। কথাগুলা ভাবিয়া দেখিবার মত। বলিতেছেন, নাইজামের প্রধান মন্ত্রী, মীর লায়েক আলি: শ্রোতা, অপর কেহ নহে, ইংলণ্ডেশ্বরের ভ্রাতা, লর্ডস কার্জ্জন ও রেডিঙের উত্তর-পুরুষ, ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনেরাল, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। সন্তান-সন্ততি সূতিকাগার হইতে বাহির হইলেও তাহাদের অঙ্গে আঁতুড়ের গন্ধ লাগিয়া থাকে. লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের ভাইসরয়ালটি মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে খসিলেও অঙ্গ হইতে সৌরভ তখনও ঘুচে নাই। লর্ডস কার্জ্জন ও রেডিঙের নাম এই সঙ্গে কেন করিলাম, সে কথাটা বলা দরকার। লর্ড কার্জ্জন ছেলের হাতের মোয়া বেরার কাড়িয়া লইয়াছিলেন; আর, লর্ড রেডিং বৃটিশের বিশ্বস্ত বন্ধুর নাইজামের স্বাধীনতা-কামতরুটির শিকড় কাটিয়া ভূষণ্ডটির উপর দিয়া প্রথমে লাঙ্গল, পরে মই চালনা করিয়া সমতল ভূমিতে চীনা-বাদামের চাষ করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাদেরই উত্তর-পুরুষ কিন্তু তা হইলে কি হয়! কালের সূক্ষ্ম গতি এইরূপই বটে। আবার এইখানেই শেষ নহে। "কাহার গোলাম কে বাহার মাহিনা চৌদ্দ সিকে" সেই কাশিম রাজভীই বা কম যাইবে কেন? পণ্ডিত জওহরলালকেও এই ব্যক্তি বোকা ভেজিয়াছিল, মহম্মদ অচলায়তন ও অচল অতএব সচল পর্ব্বতেরই আসিতে আজ্ঞা হোক। লোকে, সেই সময়ে একবাক্যে নিদারুণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল; এমন কি বিলাতের লোকেও বলিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট এবম্বিধ প্রেম-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলে 'কি' উত্তর দিতেন। সে কথা যাক্। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির পরে আমার মান-অপমানের গোড়ায় ছাই ঢালিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। হায়দ্রাবাদের একটা পানি-পাঁড়েও আমাদিগকে ঠাণ্ডা-গারদে পুরিতে চাহিয়াছিল; 'জুতা কসুও' বলিয়াছিল দেখিয়া লইবে। যে যেমন মানুষ, যাহার যেমন দর, তাহার সমাদর তেমন লোকের দ্বারা তেমন ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কাজেই দুঃখ জল হইয়া গিয়াছে। এখন দু'টা কথা বলিতেও পারি। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী লিখিব না; ভ্রমণের বৃত্তান্ত স্মরণ নাই এবং থাকিলেও মেঘ ও গিরির মত একাকার হইয়া গিয়াছে, পাঠকের চিত্তবিনোদনের আশা অল্প। তথাপি বলিবার কথা কিছু আছে এবং দায়ে পড়িয়া অনেকেই রায় মহাশয় হইতে হইয়াছে, আমিই বা না হই কেন? দায় যে, দারুণ বিষম দায়।

মনে আছে, হায়দ্রাবাদ মরুভূমি না হইলেও নির্জ্জন নীরবতা মনপ্রাণকেই মরণ করাইয়া দিত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ মানুষেই ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ঠোকাঠুকি করিয়া বাস করিতেছে; স্থানাভাবে গুঁতাগুঁতি, হাতাহাতি, সময়বিশেষে মাথা ফাটাফাটি করিয়াও মরিতেছে, কোথায় 'ভেটো' লইয়া, কেহ বা এ্যাটম বোমা লইয়া হস্ত-পদ ছড়াইবার চেষ্টায় পাড়া-প্রতিবাসীকে শাসাইতেছে; একমাত্র হায়দ্রাবাদ যেন সেই জনকণ্টকাকীর্ণ বিশ্বের বাহিরে—বহু দূরে। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ কাশীধাম না কি বিশ্বনাথের ত্রিশূলের ডগায় অবস্থিত, সেই জন্য কাশীতে ভূমিকম্প হয় না, সৃষ্টি রসাতলে ভাসিয়া গেলেও বারাণসী মহা প্লাবনে দ্বীপটির মত জাগিয়া থাকে। এ সবই শোনা কথা, সত্য-মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে, হায়দ্রাবাদ এক বিপুল বিস্ময়। বিস্ময় ঐ একটি মাত্র নহে; আরও আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে, কলিকাতা সহরের চৌরঙ্গীর ভোজনশালায় যখন পান-ভোজন পরিতৃপ্ত সুপ্রসন্নভাগ্য নর-নারীর কলহাস্যে মহানগরী মুহুর্মুহুঃ সচকিত হইতেছিল, মদিরাপ্রমত্ত বিলাসী-বিলাসিনীর সঙ্গীত-গুঞ্জনে, নর্ত্তনের রণনে স্বর্গের ইন্দ্রসভা বারম্বার লজ্জা মানিতেছিল, ঠিক তখনই সম্মুখবর্ত্তী আবর্জ্জনা-কুণ্ডের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট খাদ্যের জন্য মানুষে-গরুতে কুকুরে-বিড়ালে প্রবল প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত মানুষের শবে চৌরঙ্গীর রাজবর্ত্ম আকীর্ণ হইতে অনেকেই দেখিয়াছিলেন। ভগবান মঙ্গলময়, অধিক কাল এই দৃশ্য দেখিতে হয় নাই, পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদে পট-পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মুসি, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, তিনটি নদীর ধারেই দেখিয়াছি এক দিকে ধনৈশ্বর্য্যের প্রবল প্রবাহ, বিলাসের উত্তাল স্রোতাবর্ত্ত, উদ্দণ্ড শক্তিমদমত্ততা, আর তাহারই পাশে দারিদ্র্যের সে কি ভীষণ, নগ্ন কঙ্কালমূর্ত্তি! বন্যার উচ্ছ্বাসী বারিপ্রবাহ হইতে গ্রাম, নগর, গৃহ, গরু, বাছুর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার রক্ষা করিতে যে ভাবে বাঁধের পর বাঁধ তুলিতে হয়, ভারতবর্ষের বৈদ্যুতিক বেয়োভাটগুলিকেও তেমনই যত্ন সহকারে আটকাইতে হইয়াছে হায়দ্রাবাদকে। জল কভু নীচু বিনা উঁচু দিকে যায় না, কমলা ঠাকুরাণীরও না কি নীচের দিকেই অবাধ গতি-বিধি, নাইজামের পক্ষে সে'ও এক দারুণ দুর্ভাবনা। অপাত্রে অথবা কুপাত্রে ধনরত্ন ন্যস্ত না হয়, তাহার জন্য নাইজাম সরকারের যত্ন ও অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল; লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সে সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গের শ্রীবৃদ্ধির পাশে অ-ধার্ম্মিকদিগের চরম দুর্দ্দশা সেই জন্যই সারা হায়দ্রাবাদময় মেঘ ও রৌদ্র, আলো ও আঁধার, হাসি ও অশ্রুর চিরন্তন করুণ চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছিল। আজ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে এক জাতীয় মনুষ্য অবস্থিতি করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে মারে না, কাটে না, তাহাদের ঘরে আগুন দেয় না, তথাপি তাহারা সেখানে থাকিতে চাহে না, থাকিতে পারে না, পালাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। কি জানি, জন্মস্থান, পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি, স্মরণাতীত কালের কত স্মৃতি, কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত অশ্রু, কত আনন্দ, কত শোক, কত আসা, কত যাওয়া, কত পাওয়া, কত হারানোর কত শত কাহিনী জড়ানো মর্ম্মবেদনা, দিন ছিল, যখন বুকে জড়াইয়া ধরিতে বুক ভরিয়া যাইত, তাহার অবহানি দেখিলে আপন অঙ্গে ব্যথা বাজিত, সেই

[illegible]দেশের মৃত্তিকা-সমষ্টি রক্ষা করিতে সর্ব্বস্ব ত অতি তুচ্ছ, প্রাণ পর্য্যন্ত ডালি দিতে পারিত; আর, আজ, আশ্চর্য্য মানুষের মন! আর ততোধিক আশ্চর্য্য তাহার পরিবর্ত্তন, ফেলিয়া পালাইবার সময় একবার কি পিছু ফিরিয়াও চাহে না? চোখের জলের কথা ধরি না, চোখের জল যে পড়ে না, তাহাতেও আশ্চর্য্য হই না; কারণ, যাহা সারা জীবনের সম্বল, আজই তাহা শেষ করিবে কেন? অনাগত চিরদিনের সঙ্গীটিকে সযত্ন সঙ্গোপনে লইয়াই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে। কাঁদিবার অনেক সময় পাইবে; অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত চোখের জলের আলপনা দিয়াই সাজানো রহিল; আজ, বিদায়-বেলায় বিড়ম্বনায় কাজ নাই। কি জানি, অশ্রু ত নিঃশব্দ নহে, তাহার শব্দে লোক জড়ো হইয়া যদি বলিয়া বসে, "যেতে নাহি দিব!" আকাশে চাহিয়া দেখে, নীলিমা ঘুচে নাই, নদীর জল বিস্বাদ হয় নাই, বায়ুমণ্ডল বিষ-বাষ্পে ভরে নাই, গ্রাম, ঘর, বৃক্ষ-লতা চিরকাল যেমন ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে, তবু কোথা দিয়া কি যে বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সে যেন কাহাকেও আর বিশ্বাস করিতে পারে না; আসল কথা, ভরসা হারাইয়াছে। গ্রহণের ছায়াপাতে বিশাল বিশ্ব যেমন মলিন বিবর্ণ হইয়া যায়, নির্ভরসাও তেমনই চির পরিচিত বহু পুরাতন পৃথিবীকেও বিবর্ণ, বিস্বাদ ও ম্লান করিয়া দিয়াছে। হায়দ্রাবাদে হিন্দুর মুখে সেই ম্লান ছায়া আমরা সেই সেকালেও দেখিয়াছিলাম। আমাদের তিন দিনের বন্ধু তিরুমল রাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ গা, এইটিই কি তোমার ঘর? তিরুমল বলিল, এইখানে আমরা থাকি। জমি, তিরুমল ইজারা বা ক্রয় করিয়া লইয়াছে, ঘর, সে নিজে বাঁধিয়াছে. বেড়া তাহারাই দিয়াছে, বেড়ায় রাংচিত্রের গাছ উঠাইয়াছে, উঠানে চিনাবাদামের চাষ করিয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্ধ জননী লইয়া বাস করিতেছে, তবু তাহার মুখ দিয়া প্রাণান্তেও "আমার" শব্দটা বাহির হইল না। জীবের জীবন পদ্মপত্রে নীর, তাহা আমরা না জানি কে? তাই বলিয়া আমার জিনিষকে আমার বলিব না? তিরুমল বলিয়াছিল ইহাদের ঘর-সংসার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কচু পাতার জলের মত; অহমিকা প্রকাশে লাভ কি? অহমিকার বিরুদ্ধে স্থায়ী আইন ছিল, তাহাও শুনিয়াছি। আমরাও, তিন দিন তিন রাত্রি—'তীর্থ স্থানে' ত্রিরাত্র যাপন করা বিধি—হায়দ্রাবাদে বাস করিয়াছিলাম, বাপের আভাবেও অহমিকা প্রকাশ পাইতে দিই নাই। পানি-পাণ্ডে ও সেলাই 'রুমের' কথা আগেই বলিয়াছি, গাড়োয়ান গাড়ী-ভাড়ার নামে গালে চড়াইয়াছে, ভাগ্যে যীশুর জীবন-কাহিনী পাঠ করা ছিল, তাই রক্ষা। যে লোকটি হোটেলে স্নানের জল দিত—ভিস্তি, কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়া দিয়াছে, আমরা নবদ্বীপচন্দ্র হইয়া গুঞ্জন করিয়াছি—"মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?' তিরুমলের জননী চিনাবাদামের ক্ষেত আগলাইত, দিবা দ্বিপ্রহরে কাহারা আসিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, বৃদ্ধা বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদবধি অন্ধ।

কিন্তু, তবু বলিব, চোখে হায়দ্রাবাদ ভাল লাগিয়াছিল। ভবঘুরে জন্মেও ধনক্ষয়; রাশিতে জন্ম, ভ্রমণ করি নাই ভারতবর্ষে এমন স্থানও মনে পড়ে না; কিন্তু হায়দ্রাবাদের মত এমন সুন্দর রাস্তা খুব কম দেখিয়াছি। রাজ্যটাকে রেলের লৌহ-নিগড় পরাইয়াও তাহাদের সাধ মেটে নাই, রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পাশাপাশি রাস্তায় "লারারী" মোটর ছুটাইয়াছে। Charabancs (সারাব্যাঙ্কসের) কথা বিলাতের গল্পে পড়া ছিল, হায়দ্রাবাদে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। বৃটিশ-ভারতে বহু বার বহু জন বহু নক্সা ছকিয়াছে, তথাপি যে কারণেই হৌক, ভারতবর্ষে রেল-রোড কো-অর্ডিনেটেড সার্ভিস হয় নাই, হায়দ্রাবাদে হইয়াছিল। সমগ্র প্রাচীতে ইহার জোড়া ছিল না, এইটিই ছিল অদ্বিতীয়। বৃটিশ-ভারতে একটি অপাংক্তেয় নীচ জাতি ছিল, নাম ভারতীয় জাতি। সেই অপাংক্তেয় জাতি বৃটিশের রেলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় বৃটিশের ইহা অনভিপ্রেত ছিল বলিয়াই নক্সাগুলা বাজে কাগজের ঝুড়িতে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার অবস্থা স্বতন্ত্র। অপাংক্তেয় জাতি এখানেও ছিল, বিপুল সংখ্যাগুরু হইয়াই ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুরাশা মনের কোণেও ঠাঁই পাইত না। নদ-নদী-হ্রদ-নির্ঝরিণী সকলেরই যেমন এক লক্ষ্য ও এক পরমা গতি—সাগর, হায়দ্রাবাদেও তেমনই অর্থকোষ একটি—নাইজামের রত্ন-ভাণ্ডার; কাজেই স্বার্থ সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের জাতীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী যে 'ফুস মন্তরে' "আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়োলো" করিতে পারিয়াছিলেন, রাজ্যের রাস্তাগুলিই তাহার পথ সহজ ও সুগম করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আজ আমরা কাশিম রাজভীর সহিত পরলোকগত (!) ফুয়েরার হের হিটলারের সাদৃশ্য খুঁজিয়া তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া কালহরণ করিতেছি, অদ্ভুত নরখাদক বোধে গালি-গালাজও বড় কম করি নাই; কিন্তু রাজভী বা মীর লায়েক আলি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। রাস্তার ধারে গাছের চেয়ে আগাছারই যেমন শ্রীবৃদ্ধি, অসংখ্য অগণিত রাজভীকে সদা-সতর্ক প্রহরীর মত হায়দ্রাবাদ পাহারা—রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আমরাই দেখিয়াছি। কি পাহারা দিত, জানি না; কিন্তু পাহারাদার ভিন্ন অমন চোখ-মুখ হয় না। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হয়ত ভাল জবাব দিতে পারিবে, আমি তখন জবাব খুঁজিয়া পাই নাই। পাঠকের নিশ্চয়ও স্মরণ আছে আমি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। বিশ্বযুদ্ধের তূর্য্য নাদ তখনও হয় নাই, পঞ্চবর্ষাধিক কাল বিলম্ব রহিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন সুদূর-পরাহত, সশিষ্য মহাত্মাজী কারাগারে দুর্ব্বাসার পারণ করিতেছেন, পাকিস্তান জিন্না সাহেবের মগজেও গুটি বাঁধে নাই, গলিত নখ-দন্ত পলিত-কেশর বৃটিশসিংহ যে ভারতে 'ভবের খেলা' সাঙ্গ করিবে, বৃটিশেরও তাহা কল্পনা-বহির্ভূত দুঃস্বপ্নেও স্থান পায় নাই, এ-হেন সময়েও রাজভী-বংশাবতংসদিগের দাপটে হায়দ্রাবাদের বৃহত্তর অংশ ও অধিকাংশ মানুষের পক্ষে, বিহারের ভূমিকম্প। জিন্না, সুরাবর্দ্দী, মুস্লিম লীগ ত বহু কাল হইতে রাজনীতি করিতেছিল, কিন্তু ১৯৪৬ সালের গোড়ায় ইলেকসানের পূর্ব্বে কেহ কি সুদূর কল্পনাতেও চিন্তা করিতে পারিত যে ইহারাই অতঃপর পারস্য দেশাগত নাদির শাহের পদাঙ্কানুসরণে পৈশাচিক উল্লাসে নরমেধ রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? নৃশংস নাদিরশাহী অভিযানের সূচনা ঐ ইলেকসানে এবং ১৬ই আগষ্টের ইতিহাস-কলঙ্কিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সেদিনের কথা পাঠকের স্মরণ আছে ত? বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে, ইলেকসানে আত্মনেপদীর প্রাকল ছুটে কলকাতার

আসমান-তারা ফুটে, গ্রাম, সহর, নগর, মহকুমা, জেলা নিতুই নব নামাবলী পরিধান করে, শ্রীচৈতন্যের বিনয়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, আকাশেরও অমাবস্যার চাঁদ ধরিয়া টানাটানি. চলে ; লোকের এ সকলই গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লীগ এক অভিনব ও অভাবনীয় কৌশল প্রদর্শন করিল। লীগ আবিষ্কার করিল, 'বলং বলং বাহুবলং' ; বাহির করিল, ন্যাশানাল গার্ড, কাটারী কুড়ালী হইতে বোমা বন্দুক বর্শা তলোয়ার ঝলসিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্রে লেখে, ধোঁয়া দেখিলে অগ্নি অনুমান করিতে হয়। ইলেকসানে নবীন সাজ-সজ্জা দেখিয়া আমাদেরও অনুমান করা উচিত ছিল, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অত্যাসন্ন। সতর্ক হইলে ভাল হইত ; প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম পর্ব্বে শত-সহস্র বলি না পড়িতেও পারিত। কেঁচো, কেন্নুই, সাপ-খোপ হঠাৎ জন্মায় না, তাহারা পৃথিবীতেই বাস করে এবং ঋতুকালে ও সময় বুঝিলে বহির্বিকাশ ঘটে। কাশিম রাজভী-লায়েক আলি চিরকালই ছিল এবং স্বকার্য্য সাধনে অবহেলা করিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই, বাহিরে দংষ্ট্রাবিকাশের যত দিন প্রয়োজন হয় নাই, করে নাই ; পাদপ্রদীপের সম্মুখীনও হইত না যদি না যে হিন্দু দলন ও দমন করাই রাজধর্ম্ম, সেই হিন্দু-ভারতের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার আহ্বান আসিত। চিরাচরিত ধর্ম্মে বৈপরীত্য কে কবে বরদাস্ত করিতে পারিয়াছে ? হায়দ্রাবাদের প্রাচীন অপিচ মহান্ ঐতিহ্য বিস্মৃত হইলেই বা চলিবে কেন ? জিজিয়া-প্রবর্ত্তক ঔরঙ্গজীব ভারতবর্ষ জ্বালাইয়া, অবশেষে রাজপুতানার রাজসিংহ ও মারাঠার শিবাজীর—ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর—সাঁড়াশীর ত্রাসে স্খলিত-শিরস্ত্রাণ এই দাক্ষিণাত্যেই মরিতে আসিয়াছিল এবং শেষ গরল-শ্বাস এইখানেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ সে ঐতিহ্য রক্ষা করিবে না ত কে করিবে ? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে বর্ষাধিক কালের রাজাকার-সংগ্রামে কত হিন্দু মরিয়াছে, হিন্দুর কত ঘর-বাড়ী পুড়িয়াছে, কত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে, কত নারী মদনোৎসবে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে, সংখ্যা নির্ণয় কে করিবে ? সে ত রাজ-করেরই সামিল, রাজভাণ্ডারে রাজকর দিতেই হয়, স্বতন্ত্র হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন দেখি না। প্রয়োজন থাকিলেও হিসাব দিবে কে ? কলিকাতার হিসাব কি আজও পাওয়া গিয়াছে ? দেশে সংখ্যাতত্ত্ববিদের অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু আগ্রহের অভাব নাই এ কথা কে বলিবে ? হায়দ্রাবাদেই বা সে সম্ভাবনা কোথায় ? আর তাও বলি, ঘটি-বাটি করিয়া জল তুলিয়া গোদাবরীর জলের মাপ পাওয়া যায় কি ?

অজন্তা-ইলোরার গুহা হইতেই আমাদের সদাশয় গাইড, হায়দ্রাবাদের সুখ-সমৃদ্ধির কলগানে কর্ণ সুশীতল করিতেছিল কিন্তু চিঁড়া ভিজে নাই ; দ্বিতীয় তাজমহলের উচ্ছ্বাসে বাজীমাৎ করিয়া ফেলিল। বলিল, ঔরঙ্গাবাদের বিবি-কা-মুকবরা না দেখিলে ভারত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ ও অতীত কীর্ত্তি দর্শন অসিদ্ধ। লোকটি মনস্তাত্ত্বিক, ঝোপ চিনে কোপ মারিতে জানে ! ঔরঙ্গজীব পিতামহের রাজনীতিতে বদনা বদনা জল ঢালিয়া দিয়াছিল, জিজিয়া তাহার প্রমাণ ; পিতার কীর্ত্তি তাজমহলকে ছুয়ো দিবার সাধও হইয়াছিল, রাবেয়া বিবির সমাধি-মন্দির তাহার নিদর্শন। সে যাই হোক, বিবি-কা-মুকবরা দেখিয়া খুশী হইয়াছিলাম এবং সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই গাইড সাহেব আলমগীর কীর্ত্তি-কলাপ দর্শনের প্রস্তাবে সম্মতিটাও আদায় করিয়া লইয়াছিল। বিধাতা সূতিকাগৃহে ভাগ্যে বিড়ম্বনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে দোষী করিয়া লাভ কি ? ঔরঙ্গাবাদ হইতে হায়দ্রাবাদ পথ অনেক, দূরত্বও কম নহে ; কখনও রেলে, কখনও 'সাঙ্গারী ট্রাভেলে,' যখনই, যে দিক্ দিয়া গিয়াছি, জনহীন নীরবতা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি। অনন্ত বিস্তারিত, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত ধূসর প্রান্তরের কাছে কোথায়ও একটি পত্রপুষ্পবিহীন বিচিত্রাবয়ব তরুবরকে দেখিয়া বারম্বার কেবল ইহাই মনে হইয়াছে, বেচারীর নিঃসঙ্গ জীবনের চির বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস শুনিবার জন্য, হায়, যদি আর একটি বৃক্ষও তথায় থাকিত। বিশুষ্ক, করুণ মর্ম্মর বিনিময় করিয়াও অভিশপ্ত জীবনের গুরুভার লাঘব করিতে পারিত। পূর্ব্বাঞ্চলে বনানী প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পক্ষিকূজন শুনি নাই। আমরা সৌভাগ্যবানে বাঙ্গলা দেশের লোক; পাখীরা কেবল ঘুম পাড়ায় ও ঘুম হইতে জাগায় না, আমাদের অহর্নিশ শ্রবণ বিনোদন তাহারাই করে। হায়দ্রাবাদে দিবা-রাত্রি উৎকর্ণ থাকিতাম, হায় রে হায়, কর্কশ কাকও কি আমাদিগকে বর্জ্জন করিল ? আজ ভাবি, ভগবান দয়াময়, যাহা করিয়াছেন, ভালর জন্যই করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদের পরিধি এক লক্ষ চারশ' পঁয়ষট্টি বর্গ-মাইল ; লোক-সংখ্যা এক কোটি আশী লক্ষ—রাজাকররা কতগুলি 'রাজকর' আদায় করিয়াছে, তাহা জানি না, দশ-বিশ লক্ষ হ্রাস করিয়া থাকিলে বিশেষ কিছু যায়-আসে না। এই সঙ্গে হতভাগিনী পশ্চিম-বাঙ্গলার হিসাবটা স্মরণ করা অসঙ্গত হইবে না। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কি অসীম অনুকম্পা ! দুই কোটি উনিশ লক্ষ ছেঁচল্লিশ সহস্র এক শত ত্রয়োদশটি প্রাণীর (মাত্র !) অবস্থানের জন্য সুবিশাল আটাশ হাজার তেত্রিশ বর্গ-মাইল ভূমি দানসাগর করিয়া গিয়াছেন। এতখানিটাই যে দিয়াছেন সেই ঢের, না দিলেই বা আমরা কি করিতাম ? কংগ্রেস কলায় পাতায় সর্ত্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন সাহেব যাহা করিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের সুশীল সুবোধ ছেলেটির মত তাহাই শিরোধার্য্য করা হইবে। উক্ত নাট্যের 'ভিলেন অফ দি পিস্'টার মত মাসীর নাসিকাগ্র দন্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইবে না। প্রাকৃতিক বিধানে পিতার এক পিতা, অর্থাৎ পিতামহ থাকিতে বাধ্য, অনিবার্য্য বা অপরিহার্য্য বলা যায়। আইনের বিধানও দেখি, ছোট আদালতের উপর (জেলা) আদালত, তদুপরি হাইকোর্ট, তস্যোপরি ফেডারেল কোর্ট, বুঝি-বা তাহারও উপরে ভূতপূর্ব্ব প্রিভি কাউন্সিল, বর্ত্তমানে বড়লাট এবং রাজার বকলমে রাজাজী মহারাজ। কিন্তু কংগ্রেসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে আগাগোড়া বৈপরীত্য দৃষ্ট হইল। "শুন বাঙ্গালী (পাঞ্জাবী) ভাই, সবার উপরে সিরিল্ সত্য, তাহার উপরে নাই !" আগু এবং আপোষে দিগ্বিজয়ের মোহ এমনই টিকে ধরাইয়া করিয়া ফেলিয়াছে যে বৃটিশ ডাইনের হস্তে পুত সমর্পণেও দ্বিধা জাগিল না। "ভস্ম গেল ছেলে খেয়ে" আজ তাহাকে ডাইনী বলে কাহার সাধ্য ? বাড়ীতে বেরালের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইলে ছেলেরা ধরিতে পারিলে, বেরালটাকে থলের পূরিয়া মুখ বাঁধিয়া দশ পাক পেটে। সিরিল্ র‍্যাডক্লিফ সাহেবও পশ্চিম-বাঙ্গলাকে বোঁ বোঁ ভরিয়া যে উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন, বেরালের ন'টা প্রাণ, একটা এক করিয়া খাঁচা ছাড়িতে অনেক সময় লাগে বলিয়াই বোধ করি আ

বাঙ্গালীরা বাঁচিয়া থাকিয়া "ম্যাঁও ম্যাঁও" করিতে পারিতেছে। ২৮ হাজার বর্গ-মাইলে সওয়া দুই কোটি সুজন সজ্জন নরনারী তেঁতুল পাতায় বসতি। কিন্তু সওদা কিনিলে ফাউ পাওয়া যায়, বোঝা থাকিলেই শাকের আঁটি চাপে, বিশ-পঁচিশ লক্ষ ইতিমধ্যেই পদ্মা পার হইয়াছে, এখনও হইতেছে, পরে আরও হইবে। তেঁতুল পাতাতেও আর যে কুলায় না।

পাঞ্জাবের কথা থাক্, পরনিন্দার মত পরচর্চ্চাও পরিত্যাজ্য। ভাল হৌক, মন্দ হৌক, কংগ্রেস-নীতি পালিত অথবা পদদলিত—যাহাই হোক, পাঞ্জাব পত্রপ্রত্যাশী হইয়া, পরের মুখের পানে চাহিয়া, 'দিন কৈনু রাতি ও রাতি কৈনু দিন' ভাবিয়া বসিয়া ছিল না। গোঁজামিল দিয়াই হৌক কিম্বা পরীক্ষা-ঘরে অবলম্বিত অসাধু উপায়েই হৌক, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করিয়া হেস্ত-নেস্ত—হিসাব-নিকাশ—শোধ-বোধ করিয়া লইয়া, কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক দুশ্চিন্তা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে। দুর্ভাবনা নাই বলি না, আছে, তার অনেকখানি হাল্কা করিয়া দিয়াছে। মুখে স্বীকার করিতে শুনি নাই বটে, কিন্তু, ভাষাই ত সব নহে, নিশ্বাসেও যে অন্তরের ভাষার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়, বুঝিতে একটু কষ্ট হয় না। কিন্তু হায়, হতভাগ্য বঙ্গদেশ! আরও হায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মাপীঠ পশ্চিম-বঙ্গ!

পশ্চিম-বাঙ্গলা 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' হাঁকিয়া কণ্ঠ চৌচির করিয়া ফেলিলেও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে পশ্চিমাস্ত হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না। রেল, ষ্টীমার বন্ধ করিলেও তাহাদের আগমন বন্ধ হইবে না। আমাদের এমত লক্ষাও আছে, ডিনামাইট্ ফাটাইয়া সাঁড়ার পুল উড়াইয়া দিলেও তাহারা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড—বিষমঙ্গল চিন্তামণি সংযুক্ত হইয়া সাঁতরাইয়া পদ্মা পার হইবে। কচু-কাটবের এ্যাটম্ বম্ ছুঁড়িয়া মারিলেও নিরুদ্দেশ যাত্রা থামিবে না। কিন্তু ভরাডুবির বিলম্ব কত? আমাদের সজ্জন প্রান্তবাসিগণের মনোভাব জানিতেও আজ বাকী নাই। পশ্চিম-বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নাবিক লোক, সকল বন্দরেই ঘর বাঁধিয়াছেন; স্বমুখে প্রকাশ, বিহারে জন্ম, অতএব বিহারী, বঙ্গদেশে ক্রিয়া-কলাপ, কাজেই বাঙ্গালী, আসামে তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য, সুতরাং অসমিয়া (অনুমতি হইলে আমরা দু-একটি আভ্যভিমান সংযোগ করিতে পারি। যথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে সংযুক্ত প্রদেশের প্রথম গভর্ণর নিয়োগের কথাটা ধরিলে তাঁহাকে সংযুক্তা না বলিয়া পারা যাইবে কি?), প্রাদেশিকতার ছোঁয়াচ যে তাঁহার ত্রিসীমানা স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করে। সম্প্রতি আসামের শিলঙে তিনি তাঁহার অসমিয়া ভ্রাতৃবর্গকে (শুধু গন্ডে যদি না কুলাইয়া উঠে) গন্ডে-পন্ডে স্তবস্তুতি করিয়া-ছেন কিন্তু ফলং মড়কং। বিহারের কাছা ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করিলে বিহারী ভেইয়াগণ পশ্চিম-বঙ্গের কোঁচা মালদহ হেঁচকা টানে খিচিয়া লইবার বাসনা ব্যক্ত করিতেছেন। উড়িষ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের পদধূলি পড়িয়াছিল, বৈষ্ণব-বিনয় একেবারে বিসর্জ্জন দিতে আজও বোধ হয় পারে নাই, তাই বাস্তহারা ছন্নছাড়াদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই-দশ জন ভাস্তারকে স্থান দিতেও পারে। অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রান্তপ্রবাহী বঙ্গোপসাগর হইতে কয়েক কলসী লবণ জল তুলিয়া ফুল-বাগানে ঢালিয়া বৈজ্ঞানিক সারের উপযোগিতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমস্যা যেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এক বৎসর তিন মাস পরেও ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। বিন্ধ্য মহোদয়ের অগস্ত্য-প্রণাম বলিব কি?

তাই ভাবিতেছিলাম, হায়দ্রাবাদের একাংশে বাঙ্গালীকে আশ্রয় দেওয়া কি সম্ভব হইবে না? নাইজাম মাথার মণি হইয়া থাকুন, আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই। রাজভী অনন্ত কাল দিল্লীর লাল কেল্লায় সুখাসীন হৌক অথবা অসীম বেহেস্তে রাজাকার বাহিনী সংগঠনে মনোনিবেশ করুক, তাহাতেও আমরা কথাটি বলিব না। আমরা গৃহহারা, লক্ষ্মীছাড়া, ছন্নছাড়া, বুঝি বা লক্ষ্মীছাড়াদের জন্য মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, ভিক্ষার চাল কাঁড়া ও আকাঁড়া, সে বিচার-বিশ্লেষণের অধিকার আমাদের থাকিতে পারে না। অঙ্কশাস্ত্রে আমি দ্বিতীয় বিভাদিগ্‌গজ উপাধি বালক কালে অর্জ্জন করিয়াছিলাম, অদ্যাবধি উপাধি উপভোগ করিতেছি, কাজেই ত্রৈরাশিক কষিবার ভার পাঠক সমাজের উপর দিতে হইতেছে। তাঁহারাই ঝটিতি গণিতাঙ্ক কষিয়া ফেলুন। অঙ্কটি এই: হায়দ্রাবাদে স্থান অফুরন্ত, মনুষ্যের অত্যন্তাভাব; আর, পশ্চিম-বাঙ্গালায় মা-ষষ্ঠী ও দেবী ধূমাবতীর কল্যাণে মনুষ্য জাতি প্রবাদের রক্তবীজকেও পরাজিত করিয়াছে কিন্তু স্থানের একান্তই অভাব। অঙ্ক-ফল কি বলে? সবুর, আরও একটু বাকী আছে। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গোলকুণ্ডায় অদ্যাপি হীরকখণ্ড জন্ম গ্রহণ করে কি না জানি না, আমাদের সর্ব্বজ্ঞ গাইড্, বিদেশী ও বিধর্ম্মী বলিয়াই বোধ করি বহু সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও সে সংবাদটা প্রকাশ করে নাই; তবে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধি, সে না বলিলেও, দর্শকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই— করিতে পারে না। মিশর দেশের সূক্ষ্ম তুলার বড় গরব, হায়দ্রাবাদের "কৃষ্ণ ভূখণ্ডের" (black soil area) তুলা মিশরকে হেলা বিট্ করিতে পারে। হায়দ্রাবাদ তাহার নিজস্ব কয়লা জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিত। আমরা তখনই সাংঘা কাপড়ের কল, চিনি, সিমেন্ট, কাগজ ও চামড়ার বড়-বড় কারখানা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। হায়দ্রাবাদের হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক সম্পদ ভারতের ঈর্ষ্যার বস্তু। তথাপি এ সমস্তই বৃহৎ ও বিশালের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। মহামান্য নাইজাম ও রাজভী ছিয়াশীকে বোধনে বিসর্জ্জন ও ত্রয়োদশের "মামলিকৎ আসাফিয়া" সাম্রাজ্য সজ্জটনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, কি বহিঃপ্রকৃতি, কি অন্তঃপ্রকৃতি, সম্যক বুঝা-পড়া করিবার সুযোগ হয় নাই। আজ সুযোগ প্রশস্ত হইলে এই গৃহহারা ছন্নছাড়ারা প্রকৃতি দেবীর সহিত আপোষ নিষ্পত্তি অনায়াসে ও ভালরূপেই করিতে পারিবে। এমন ঘটিয়াছে; অনেক দেশের ইতিহাসে সে কথা সোনার অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কৃতঘ্ন আফ্রিকা, অকৃতজ্ঞ ব্রহ্মদেশ ও নিমকহারাম সিংহল ইতিহাসের লিখন মুছিবে কেমন করিয়া আমি কেবল তাই ভাবি।

পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলিকে বাস্তহারা আবাসে রূপান্তরিত করিবার কল্পনা করিতেছেন শুনিতে পাই। খবর সত্য হইলে প্রাণর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে কাহারও দ্বিধা হইবে না। আন্দামানের ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল ও বন-জঙ্গল সাফ করিয়া বসবাস ও চাষ-আবাদ করিয়া হতভাগ্যেরা সুখের জীবন যাপন করিতে পারিবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে, সকলের অজ্ঞাতসারে, হয়ত বা তাহাদেরও অজ্ঞানে, একটা দুর্দ্ধর্ষ সামুদ্রিক সৌজাতির সৃষ্টি হইয়া স্বাধীন

ভারতের সিংহদ্বার রক্ষা করিতেও শিখিবে। আজ অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত মনে পড়ে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কালে ভারতবাসী যদ্যপি তাহার জলপথটা আগুলিয়া রাখিতে পারিত, এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল স্বীয় বিক্রমভরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারিত। বৃটিশের দায়ে-পড়া দয়াদত্ত স্বাধীনতার গলিতকুষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পাকিস্তান ও বাস্তুহারার সমস্যায় শুদ্ধব ভারতের শরশয্যায় শয়ান ঘটিত না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই বিরামবিহীন আপোষহীন সংগ্রামের তূর্য্য-নিনাদের দ্বারাই স্বাধীনতা নাটকের প্রস্তাবনা রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ভারতের, নেতাজীর "জয়-হিন্দ" শব্দ গ্রহণ করিয়া নেতাজীকে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। নীর ত্যজি ক্ষীর গ্রহণ করা বিশ্বের রীতি: আমরা ক্ষীর ত্যজিয়া নীর লইয়াছি। অপার দুর্ভাগ্য!

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কঠিন ও দুরূহ সমস্যা সমাধানকল্পে আন্দামান অপেক্ষা হায়দ্রাবাদের উপর আমরা অধিক গুরুত্ব অর্পণ করি বলিয়াই আজ যাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র-তরণীর কাণ্ডারী তাঁহাদিগকেও তৎপ্রতি অবহিত হইতে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ পশ্চিম-বঙ্গ দেহ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সঙ্গত। মনের অগোচর পাপ নাই, শশকবৃত্ত হইয়া মনকে আঁখি ঠারা সম্ভব কিন্তু ব্যাধের শর হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব। যে হিন্দু-বিদ্বেষের উপর ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র মুস্লিম রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সে রাষ্ট্রে হিন্দুর স্থান নাই। সে রাষ্ট্র তাহারা নিজেরা গড়িবে, অপরের সাহায্য লইবে কেন, অপরকে সাহায্য করিবেই বা কেন? সে ইচ্ছা থাকিলে হাঁড়ী আলাদা করিত না।

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবগণের দুশ্চিন্তার অবধি নাই: তাঁহারা বলেন, হায়দ্রাবাদ বড় দূর: আন্দামানের ভারি দুর্নাম। হায়দ্রাবাদে জলাভাব: আন্দামানে স্থল অদৃশ্য; এবং আরও কত কি! অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দুঃখে, ক্ষোভে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় ভর্ৎসনার ছলে বলিয়াছিলেন, "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি, রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি।" দেখিতেছি সে মর্ম্মান্তিক দুঃখের হেতু আজও ঘুচে নাই; গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়াও শীর্ণ, শান্ত, সাধু পুত্রগণ পদে পদে ছোট ছোট নিবেদের ডোবে আজও ভাল ছেলে হইয়া রহিয়াছে। শিয়ালদা ষ্টেশনের বাহিরে ভাগাড়ে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবে, তবু "দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান"—তাহাতে রুচি দেখি না। তাই বিশ্বকবির কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া, এখনও মুগ্ধ জননী বঙ্গমাতার উদ্দেশেই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।"

চাই না আমি

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

রাজপথে আজ এখানে-ওখানে কিসের রেশ
হৈ-চৈ শুধু ভাবছি আজ এই তো বেশ—কিসের রেশ ?
তবুও আমি জানি না কেনো কিসের টানে—
কি যেন দোলা দিয়ে যায় মোর এই প্রাণে—কিসের টানে ?
বেশ তো বেশ এই যদি হয় খুব ভালো
তোমার-আমার সবার প্রাণে দীপ জ্বালো—খুব ভালো !
অতি নির্জনে এখানে বসে ভাবছি তাই
'নোতুন আলো' উঠেছে দেখো ভয় তো নাই—ভাবছি তাই।
তবুও আমি জানি না কেন কিসের টানে
মন যে আমার দোলা দিয়ে যায় কি এক গানে ?
বেশ আছি ভাই বেশ আছি আমি বহু দূরে
মিছা কেনো বলো জ্বালাতে আসো সেই সে সুরে ?
চলে যাও তুমি—সরে যাও তুমি সেই তো ভালো—
কেন মিছা শুধু ভীরু অন্তরে দীপ জ্বালো ?
চাই না আমি—কিছু এই সব কিসের রেশ ?
হৈ-চৈ তবু ভাবছি আমি এই তো বেশ—কিসের রেশ ?

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তী অধ্যায়

১৯০৬—১৯১৮

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আচার্য্য হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে বাংলায় আগমন করিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি দেশের মধ্যে নূতন ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হইলেন। শ্রীঅরবিন্দই সর্ব প্রথম 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় তরুণ ভারতের লক্ষ্য বর্ণনা করিয়া লিখিলেন, "We want absolute autonomy—free from British Control"—আমরা বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার চাই।' শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা দেশবাসীর চিত্তে নূতন আদর্শ ও নূতন উদ্দীপনা জাগ্রত করিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই তারিখে রাজদ্রোহকর রচনা প্রকাশের জন্য 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলিলেন, 'বিধাতা-নির্দিষ্ট' স্বরাজ অর্জনের প্রচেষ্টায় আমি যে সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছি, সে জন্য আমি কোন বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট জবাবদিহি করিতে রাজী নহি।' আদালতে মামলা চলিবার কালেই এই নির্ভীক, দেশহিতৈষী নেতা ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেন যে, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই দুঃখ ও বেদনার দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উভয় বঙ্গের মিলনের প্রতীক-স্বরূপ রাখীবন্ধন উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঠিক করেন যে ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের জন্য ১৬ই অক্টোবর তারিখটিতে বাংলার জনসাধারণ অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। সেদিন কোন বাঙ্গালীর গৃহে চুল্লী জ্বলিবে না। সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ থাকিবে এবং সকলেই খালি পায় থাকিবেন। বাংলার জনসাধারণ অক্ষরে অক্ষরে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ পালন করিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাখীবন্ধনের উৎসব পরিচালনা করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বিখ্যাত সঙ্গীতটি রচনা করেন,

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান—
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান—
বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান—
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।"

রাখীবন্ধন দিবসে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে এই অপূর্ব সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। ঐ দিন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা-পত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণা-পত্রটি বাংলায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত ঘোষণা-পত্রে বলা হয়, "যে-হেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সে-হেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

দ্রুতগতিতে আন্দোলন বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনে অগ্রণী হইল। আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলন হইতে ছাত্র সম্প্রদায়কে দূরে রাখিবার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর কঠোর দমননীতি প্রযুক্ত হইল।

রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্রকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইল। এই সকল ছাত্রের জন্য কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। রাজা সুবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করিলেন। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন বরিশালের নেতা। তাঁহার নেতৃত্বে বরিশালে বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন অসামান্য সাফল্য লাভ করিল। বরিশালের জনসাধারণের প্রতিরোধ শক্তি ভাঙ্গিবার জন্য নবগঠিত প্রদেশের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার বরিশালের নানা স্থানে গুর্খা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি নিজে বরিশালে গমন করিয়া অশ্বিনীকুমার দত্ত-প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে নিজ লঞ্চে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। সম্মেলনের নির্দিষ্ট তারিখ ১৩ই এপ্রিল তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বরিশালে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে পূর্ব বাংলায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের শোভাযাত্রায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করার জন্য পুলিশ নেতৃবৃন্দের উপর লাঠিচালনা করিল। ইহার ফলে কয়েক জন গুরুতররূপে আহত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। বরিশালের সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের উপর পুলিশের অত্যাচারের ফলে বাংলার জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে মনস্থ করিল। ব্যামফিল্ড ফুলার ও

শাসন-কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আন্দোলন শক্তিশালী হইতে লাগিল। ইহার কিছু দিন পরে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিলেন লোকমান্য তিলক। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী'-শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন।

১৯০৫ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিলেন, "বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার ফলে বাংলা দেশে যে বিরাট গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।" লালা লজপৎ রায় বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে অভিনন্দন জানাইলেন। বাংলায় সরকারী দমননীতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "I am rather inclined to congratulate them on the splendid oppertunity, which an all wise providence in his dispensation has afforded to them by heralding the dawn of a new political era for this country. I think the honour was reserved for Bengal"— 'এ দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে নব যুগ আনয়নের জন্য ভগবান বাঙ্গালীদিগকে যে অপূর্ব সুযোগ দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার মনে হয় যে বাঙ্গালীদের জন্যই এই সম্মান সংরক্ষিত ছিল।'

১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী আন্দোলন ও স্বার্থত্যাগের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই অধিবেশনেই দাদাভাই নৌরজী সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, ভারতের লক্ষ্য হইতেছে 'স্বরাজ' অর্জন। কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে এই সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি উচ্চারিত হইল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাংলা দেশের বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ রুশিয়ার জারের নির্মম দেশ-শাসনের সহিত বাংলার তদানীন্তন সরকারী শাসনের তুলনা করিলেন। কংগ্রেস-সপ্তাহে কলিকাতায় একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে বাঙ্গালী জাতির বিপুল স্বার্থত্যাগ ব্যর্থ হইল না। আন্দোলন আরম্ভ হইবার ছয় বৎসর পরে উভয় বঙ্গকে পুনরায় যুক্ত করা হইল। এই জয়লাভের ফলে পরাধীন জাতির মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল এবং সমগ্র জাতি উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হইল।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নানা দিক্ দিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগান্তর আনয়ন করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়া যে ভারতের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নহে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে দেশবাসী তাহা বুঝিতে পারিল। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা নরমপন্থী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ উপস্থিত হইল। লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নির্দেশে কংগ্রেসের চরমপন্থী দল কংগ্রেসকে অধিকতর বিপ্লবমুখীন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসে চরমপন্থী দল জয়লাভ করিল। তাঁহাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিক পথ ত্যাগ করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে চরমে উঠিল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সুরাট অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল নাগপুরে, কিন্তু গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরাটে অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণ্ডগোলের জন্য সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙিয়া যায়। কংগ্রেসে চরমপন্থীদের সহিত নরমপন্থীদের এই যে বিরোধ, ইহা ছিল আদর্শগত সংঘাত। আবেদন-নিবেদন ও ভিক্ষার সাহায্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নহে, ইহাই ছিল চরমপন্থীদের অভিমত। নরমপন্থীরা গতানুগতিক ভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবের লালা লজপৎ রায়, বাংলার শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীঅরবিন্দ চরমপন্থীদের কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "অপরের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নহে। জাতিকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।" বিপিনচন্দ্র পাল স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যে স্বরাজ বলিতে আত্মকর্তৃত্বকেই বোঝায়। তিনি বলিলেন, "স্বরাজ কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। স্বরাজ অর্জন করিতে হয়।" লোকমান্য তিলক দলের কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "আমাদের আদর্শ হইতেছে আত্মনির্ভরতা। আমরা ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধী। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। আমরা কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী নহি। কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া যদি আমাদিগকে দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, আমরা তাহা করিতেও পশ্চাদপদ হইব না।"

১৯০৮ সালে চরমপন্থীদের বাদ দিয়া মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতিত্ব করিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচিত হইল। উক্ত গঠনতন্ত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জন করা কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া স্থির হইল। কনভেনশনে এই মর্মে আর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, যাঁহারা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। ১৯০৮ সালে সরকারী দমননীতি রুদ্ররূপ ধারণ করিল। লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলকের কারাদণ্ডে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। বাংলার অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট জন-নায়ক ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রচার বন্ধ করা হইল, কয়েকটি ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইল। ১৯০৮ সালের কংগ্রেসে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯০৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের

অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সেই সময়ে ভারতে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের তোড়জোড় চলিতেছিল। ১৯০৯ সালের কংগ্রেসে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হইল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ভারতে প্রবর্তিত হইল। ১৯১০ সালে ভারতবন্ধু স্যার উইলিয়ম ওয়েডার্বর্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দিলেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ দূর করার জন্যও তিনি আবেদন জানাইলেন। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে দেশের কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সংগে সংগে পূর্ণবেগে সরকারী দমননীতিও চলিতে লাগিল। ১৯১১ সালে পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। পণ্ডিত বিষণনারায়ণ তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন, "ভারতে এমন এক দল সাহসী লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবেন না। আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা দেশের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।" ১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ায় ভারতবাসী নূতন প্রেরণা লাভ করিল। ১৯১২ সালে বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই বৎসর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া এ বৎসরের কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বৎসরের অধিবেশনে মহামতি গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী স্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। মিসেস্ অ্যানী বেশান্ত এই বৎসর সর্বপ্রথম কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা কারণে তখন উভয় দলে মীমাংসা সম্ভব হইল না। ১৯১৫ সালে বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির মঞ্চ হইতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিলেন, 'কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত, Government of the people for the people and by the people.' ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বৃটেনকে সাহায্য করিবার নীতি গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের জুন মাসে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকমান্য তিলক যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইলেন এবং ইহার কিছু দিন পরে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধী সক্রিয় ভাবে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যুদ্ধ চলিবার কালে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে হোমরুল আন্দোলন। মিসেস্ বেশান্ত হোমরুল আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে হোমরুল আন্দোলন পরিচালিত হয়। মিসেস বেশান্ত ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্য তিলক হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করিয়া তাঁহার দৈনিক সংবাদপত্র 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মারাঠা' পত্রিকার সাহায্যে হোমরুলের বার্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দেশের সর্বত্র হোমরুলের অনুকূলে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সরকার দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইলেন। বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। মিসেস্ বেশান্ত ও তাঁহার সহকর্মী এরুণ্ডেল ভারত সরকারের নির্দেশে অন্তরীণ হইলেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মিসেস্ বেশান্তকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। অ্যানী বেশান্তের সভাপতি পদ লাভের ফলে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের জয়লাভ সম্পূর্ণ হইল। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্ব করিলেন। এ বারের অধিবেশনে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইয়া কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯১৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক পথে চলার পালা শেষ হইল। ইহার পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দ্রুতগতিতে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

[ক্রমশ

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মানুষ এ-ভাবে ছাতু খায় এটা হয়তো জীবনে কোন দিন চোখেও পড়ত না মণির। যদি না ময়দানের পাশে ট্রাম-লাইনের ধারে গাছ-তলায় উবু হয়ে বসে গোকুলকে ও-ভাবে স ছাতু খেতে দেখত। নীলিমার ভাই গোকুল? রিক্সাওলা বা ঠেলা-গাড়ীওলা বা ফিরিওলারা সে গাছতলায় ছাতু খায়?

বাড়ীতে দম আটকে আসায় মণি হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। সুশীলের সঙ্গে দ্বিতীয় বার ঝগড়ার পরে এবং কোথায় যাবে কি করবে না জেনে। শুধু পরনের সাধারণ কাপড়টা বদলে ফেলেছিল আর পাঁচ টাকার একটা নোট ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। বাড়ীর বাইরে দু'দণ্ডের মুক্তি ও শান্তি খোঁজার এমন অন্ধ তাগিদ জীবনে তার এই প্রথম এল। অনেক দিন আগে এ-বাড়ী থেকে অনেক বার সে পালিয়েছিল, চিরতরে পালিয়েছিল, এই সুশীলকেই দেনদাবা করে। আজ একলা কোথায় যাবে? ট্রাম চলেছে, ট্রামেই উঠে বসা যাক। ট্রামটাতেই না হয় একটা চক্র দিয়ে ঘুরে এসে ফের এখানে নামবে।

আপিসগামী যাত্রীতে ট্রাম ভরা। মেয়েদের রিজার্ভ সিট থেকে দু'জন বৃদ্ধকে উঠিয়ে বসে আনমনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ভেসে উঠে মনের মধ্যে রূপ পেতে থাকে। তার পরিত্যক্ত ছোট নীড়টিতে ফিরে গেলে কেমন হয়? থাক সেখানে কার্ফিউ আর গোপন ছোরা, আতঙ্কে ভরাট হয়ে থাক দিন ও রাত্রি। তবু সেখানে সে ধাতস্থ ছিল, নিজের ভেতর থেকে নিজে এরকম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে হয়নি। সেখানে থাকার সময় সুশীল যদি যতীনের দয়ায় বালীগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবার ব্যবস্থা করত, কত খুশীই না সে হত? মনে মনে যতীনকে কৃতজ্ঞতার কত অর্ঘ্যই না জানাত—ঠিক করে ফেলত যে শীঘ্রই এক দিন বেড়াতে গিয়ে যতীনের স্ত্রীকে আপ্যায়িত করে আসাটা বিশেষ জরুরী কর্ত্তব্য। কী অদ্ভুত পাগলামিতেই তাকে পেয়েছে যে এমন একটা সুবিবেচনার প্রস্তাব করায় সুশীলকে সে যা মুখে এল বলে বসল? একবার নয়, দু'বার? পাড়ার অবস্থাটা দেখে এলে কেমন হয়, তার নিজের বাড়ী যে পাড়ায়, কুক্ষণে সেখান থেকে প্রাণের ভয়ে সে প্রণবের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে? এখন যাবে! একা? অন্তত কাছাকাছি যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে বুঝে আসবে হাঙ্গামা কমেছে কি না, ফিরে যাওয়া যায় কি না?

এই ভাবনার মধ্যে ছাতু খাওয়ায় রত গোকুলকে দেখে ট্রাম থেকে নেমে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সহরে কারা রাঁধে আর কারা পথে ঘাটে খাবার কুড়িয়ে খায়, প্রকাণ্ড হোটেলের প্রায় সামনেই কেমন সস্তায় সহজে ছাতু খাবার ব্যবস্থা থাকে, এ সব বর্ণনা গোকুল তাকে শুনায়। নিজেই শোনায়, জল খেয়ে কোঁচায় মুখ-হাত মুছে, ভূমিকাও করে না। মণি যে একা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এতে যেন আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, স্বাভাবিক ঘটনা।

'ছাতু খুব পুষ্টিকর জিনিষ। এক দিন খেয়ে দেখবেন।'

'আর কিছু পুষ্টিকর নেই?'

'বেশী পয়সা লাগে। গাঁটে পয়সা কম থাকলে সস্তায় পুষ্টি চাই তো।'

'অত ভোরে কি খাব?'

'কত ভোরে বেরোন? রাত থাকতে?'

'না, ভোরেই বেরোই। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

'কেন?'

'ছেলে পড়াই, দু'জায়গায় দু'জনকে। এক জনকে ছ'টায় পড়ানো সুরু করতে হয়, নইলে সময় কুলোয় না।'

'ছেলে পড়িয়ে দশটা নাগাদ এখানে এসে ছাতু খান? ছাতু খেয়ে যান কোথায়? আপনাকে কিন্তু আমি দশটা-এগারোটার সময় বাড়ীতে দেখেছি মনে পড়ছে—'

কথাটা বলে মণি ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। গোকুল বাড়ীতে থাকে, নীলিমার সে ভাই। এত দিন এক বাড়ীতে বাস করে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের জলজ্যান্ত এই রোগা মানুষটা কখন বাড়ীতে থাকে, কখন যায়, কি করে, কিছুই সে সত্যই খেয়াল করেনি।

'গোকুল হেসে বলে, রোজ এখানে ছাতু খাই না, ছেলে পড়িয়ে বাড়ী ফিরি। আজ একটা কাজ আছে তাই। আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমি? আমি যাব রাজাপাড়া লেন।'

'ও-পাড়ায় একা যাবেন?'

'কেন? পাড়ার খবর জানেন আপনি? এখনো গোলমাল চলছে? আচমকা বাড়ী ছেড়ে এলাম, ভাবছিলাম গিয়ে দেখে আসি—'

গোকুল ধীরে-ধীরে সার্টের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট ধরায়, একটি বার ক্ষণেকের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মণির মুখখানা দেখে নেয়। বলে, 'শুনেছি ওদিকে হাঙ্গামা চলছে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বরং খবর নিয়ে ও-বেলা আপনাকে জানাব। আপনি বাড়ী ফিরে যান।'

'তাহ'লে তো ভালই হয়।' মণি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে।

পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তার পর এত জোরে এসপ্ল্যানেডের দিকে পা চালায় যে বেশ বোঝা যায়, মণির সঙ্গে কথায় তার জরুরী কাজের সময় নষ্ট হয়েছে। কথা বলার সময় কিন্তু মণি সেটা টেরও পায়নি।

বাড়ী ফিরে নীলিমাকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার ভাই কি করেন?'

অসময়ে এই আকস্মিক প্রশ্নে নীলিমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কত কিছু করে। ছেলে পড়ায়, কবিতা লেখে, খবরের কাগজে লেখে, মজুর উস্কায়—'

জবাব শুনে নীলিমা তামাসা করছে ভেবে মণি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এদের সঙ্গে নিজের অমিলটা আরও স্পষ্ট অনুভব করে। মুখ ফিরিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, নীলিমা কোথা থেকে একটি চ্যাপ্টা আকারের হাল্কা বই তার হাতে দিয়ে বলে, 'ওর লেখা কবিতা।'

গোকুল তবে সত্যই কবিতা লেখে? কবিতার ছাপানো বই পর্য্যন্ত তার আছে? ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে পাতা উল্টোতে প্রথমেই পৃষ্ঠার মাঝামাঝি ছোট হরফে নামহীন ক'লাইন কবিতা চোখে পড়ে। উৎসর্গ বা ভূমিকা হবে—কবিতার বই-এ বোধ হয় এ রকম লেখা রীতি।

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছে অধিকার
দখল করেছে ভবিষ্যৎ।
সে প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু-পরোয়ানা।
দু'টো দিন বাকী আছে,
থাক,
পড়ো না ঘোষণা।

পড়ে মানে যে মণি ভাল বুঝতে পারে তা নয়। মৃদু অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক অনুভব করে। জাপানী বোমা বা দাঙ্গার আতঙ্কের মত নয়। এ আতঙ্কের স্থান যেন হৃদয়ের অন্য স্থানে, সমস্ত অনুভূতির একেবারে মূলে।

এত বড় সহরের জীবনযাত্রা যখন বেশী দিনের জন্য পঙ্গু ও ব্যাহত হয়, যুদ্ধ-বিপ্লব বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে কারণেই হোক, সেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার মারাত্মক সঙ্গেই সামঞ্জস্য করে নিয়ম-রীতি গড়ে ওঠে। কোন এলাকা কার পক্ষে কতখানি নিরাপদ বা বিপজ্জনক, কোন পথে দিবা-রাত্রির কখন যাতায়াত চলে, কখন চলে না, এ সব মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলে মানুষ। উন্মাদ ও গুণ্ডাদের রক্তপিপাসাকে ফাঁকি দেবার দু'-একটা কৌশলও শিখে ফেলে। তেমন দরকার হলে সাজ-পোষাকের অদল-বদল ঘটিয়ে অন্য ধর্মীর সব চেয়ে বড় ঘাঁটির ভেতর থেকেও যে ঘুরে আসা চলে দুঃসাহসী কর্মী বা সাংবাদিক দু'-চার জন এটা প্রমাণ করেই দেয়। ধর্ম যেন উভয় পক্ষেই নিছক পোষাকী চরমতায় উঠে গেছে। সায়েবী পোষাকে তবু খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে, গুণ্ডারা মাঝে-মাঝে যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে, কি নাম কি দরকারে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তুমি যে হিন্দু কিম্বা তুমি যে মুসলমান বাইরে তার একটা চিহ্ন ধারণ করে, একটা গান্ধী-টুপি বা ফেজ হলেই যথেষ্ট, হত্যার জন্য উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দু বা মুসলমান-পাড়ায় তুমি অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পার। গুণ্ডারা বিরক্ত করতে সাহস পাবে না। গুণ্ডারাও তো জানে তারা কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সুন্দর নরকে পরিণত করে রাখতে পেরেছে সহরটাকে!

যে পথে সম্ভব যতক্ষণ সম্ভব ট্রাম বাস গাড়ী আর পদাতিক মানুষ চলাচল করে, সাজার বসে, দোকানে বেচা-কেনা হয়, আপিস চলে, কারখানা চলে, সিনেমা চলে, রেডিও বাজে, বস্তিতে বস্তিতে মানুষ বাঁচে আর অভিশাপ দেয়, ফুটপাতে ঘুমানোর লোকদের পর্য্যন্ত ফুটপাতে ঘুমোতে দেখা যায়। বিরাট মহানগরীর বিপুল জনসাধারণ দাঙ্গাকে সয়ে চলেছে, কিন্তু জীবনকে সস্তা হতে দেয়নি। এই তো সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরে গেল হিন্দু-মুসলমানের বাংলায়, সহরের অলিতে-গলিতে মরা ইঁদুরের চেয়ে অগুণতি মানুষ চোরাকারবারীর লোভ আর লাভের অস্ত্রে খুন হয়ে পড়েছিল, পচেছিল। ওটা জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে, সকলের অন্ন আর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠী হাতে পাওয়ার জন্যই যুগ-যুগ ধরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আনন্দ বেদনা বিশ্বাস ও আবেগ পর্য্যন্ত বশীকরণের ওষুধ মিশিয়ে কর্তারা পরিবেশন করে এসেছে। দুর্ভিক্ষ দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষকে হত্যা করা হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে, ওটা হল কৌশলে হত্যা করা। কৌশলটা ধরি-ধরি করেও সাধারণ মানুষ ধরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ধর্মের নামে, একটা অর্থহীন 'স্থান' লড়ে নেবার এবং তাতে বাধা দেবার নামে, রাজপথে ছোরা মেরে হত্যা চলতে দেবার অসঙ্গতি জনসাধারণ অনুভব করে। তাই এ রকম হত্যা ঠিক যতটুকু চলতে দিয়েও মোটামুটি বাঁচা যায় শুধু ততটুকু হত্যাই জনসাধারণ সইতে রাজী হয়েছে।

রাজাপাড়া লেনের মধ্যে আটকা পড়ে গোকুলের তাই আত্মরক্ষায় দুঃসাহসিক প্রেরণা জাগে। মণিদের বাড়ীর সংবাদ নিতে এদিকে এসেছে, পাড়াটা শান্ত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সব ধর্মের সব পোষাকের মানুষের স্বাধীন ভাবে চলাচলের পিচ-ঢালা নোংরা সঙ্কীর্ণ পথটুকু তার মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে—ধুতি-পরা সে হিন্দু যুবক।

হেঁটে, জোরে হেঁটে, এ পথটুকু পেরোতে মিনিট তিনেক লাগবে, তার পর ট্রাম-রাস্তা, নিরাপত্তা। কিন্তু এই তিন মিনিটের পথে শ'খানেক ছোরা কিল-বিল করছে। পিছন থেকে পিঠে বা সামনে থেকে বুকে একটা ছোরা বসাতে দুই কি তিন সেকেণ্ড লাগে। গোকুল পিছনে তাকায়। ওদিকে জবরদস্ত ঘাঁটি—ওদিকে ফেরা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব। সামনে তাকে এগোতেই হবে। দু'শ-আড়াইশ' গজ গলিটুকু পেরোতে যদি মরতে হয়, মরবে। অন্য কোন দিকে অন্য কোন উপায়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

দু'-এক পলকের মধ্যে সহজ স্পষ্ট বাস্তব অবস্থাটা গোকুল আয়ত্ত করে ফেলে আর আয়ত্ত করতে করতে সেই দু'-এক পলকের মধ্যেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে পান বিড়ির দোকানটাতে যায়। দোকানে পাঁচ জন বিড়ি বানাচ্ছে একমনে। তাদের এই গলিতে যে একটা খুন হয়ে গেল, আরও খুনের জন্য গলিটায় তৃষ্ণা চরমে উঠে গেল, এ সব তুচ্ছ বিষয়ে তাদের যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। বিড়ি পাকানো শেষ না করলে হয়তো আজও তাদের, আস্তানার বাল-বাচ্চার, দু'-এক দিনের ভূখা থাকার মীমাংসা হবে না।

নারকেলের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে গোকুল বেপরোয়া ভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ে। বিড়িতে টান দিতে দিতে হেলে-দুলে ধীর-পদে অগ্রসর হয়। তার তাড়া নেই, তার আতঙ্ক নেই, সে এই পাড়ারই লোক—চকচকে শাণানো ছোরা যারা নিয়ে আসে তাদেরই আপন জন। নইলে, বিধর্মী অনাত্মীয় কেউ কি এ সময় এখান দিয়ে এ ভাবে চলতে পারে? পরনে অবশ্য সার্ট আর ধুতি, কিন্তু আজকাল কোন মুসলমান-ছেলে কি সার্ট আর ধুতি পরে না?

দশ-এগার বছরের একটা ছেলে, তার পরনে মকমলের পোকায় কাটা পরিত্যক্ত ট্রাউজার কেটে তৈরী করা হাফ-প্যান্ট, গায়ে হাত-কাটা নকল খদ্দর, ছিটের বোতাম-ছেঁড়া কোট, সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তুম কোন হায়?'

গোকুল গর্জন করে বলে, 'চোপরাও! শালা বাঞ্চোত!'

ছেলেটা ছিটকে সরে যায়।

ধীরে ধীরে এগোয় গোকুল। সেই যেন এই গলির কর্তা, বাদশা! সে জানে, প্রত্যেক পলকে জানে, প্রাণটা সে বজায়

রাখছে অভিনয় দিয়ে, ঢং করে। কেউ কখনো যা করে না সে তাই করছে।

গলির মোড়ে পৌঁছে, ট্রাম বাস গাড়ী ঘোড়া লোকজনের চলাচলের মধ্যে এসে, সে যেন হঠাৎ দিশে হারিয়ে ফেলে। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে পিতলের শূন্য কুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে এক জন উড়িয়া দোকানে দোকানে ঘণ্টা নেড়ে একটা ফুল আর একটু জল ছিটিয়ে হিন্দুধর্মের ব্যবসা চালিয়ে চলেছিল, অসাবধানে পা বাড়াবার ফলে সে বেচারীকে গোকুল না জেনে লেংড়ি মেরে বসে।

মুখ থুবড়ে সে ফুটপাতে পড়ে যায়। তার জীর্ণ তসরের কাপড়ের তলা থেকে একটা বোতল ফেটে কাচ আর ধেনো মদের গন্ধ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সহরেও সে হিন্দুর ধর্মকে আশ্রয় করে দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছিল। এক পয়সা মূলধন দরকার হয়নি, গায়ে দেবার সাধারণ একটা চাদরের বদলে নামাবলী চাদর, কয়েকটা ফুল-পাতা, একটু কলের জল। কলকাতার কলে গঙ্গার পবিত্র জলই সরবরাহ হয়।

সামলে-সুমলে উঠে ধর্ম-ব্যবসায়ী উড়িয়াটি গোকুলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তার পর পরিষ্কার বাংলায় বলে, 'লেংড়ি মারার মানেটা কি মশায়?'

'কে লেংড়ি মেরেছে?'

শুনে লোকটি সিধে হয়ে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে পিতলের ফুল-চন্দন সজ্জিত দেবতার সাজিটি যে গড়াগড়ি যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালও করে না। গায়ের নামাবলীটা খুলে কোমড়ে জড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'দেখুন, আপনিও বাঙ্গালী। আপনি দাঁতের মাজন ফিরি করছেন, আমি অন্য জিনিষ ফিরি করছি। আমাকে লেংড়ি মেরে ফেলে দেবার মানেটা কি মশায়?'

সামনেই একটা ট্রাম যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে লাফিয়ে গোকুল ট্রামটায় উঠে বসে, ওখানে ওই অবস্থায় জীবন-যুদ্ধের দুই ফিরিওলার যুদ্ধ-সৃষ্টির সাধ তার ছিল না। বেচারীর দেশী মদের বোতলটা চূর্ণ হয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় ও-জ্বালা শান্ত হবার নয়। মার খেলে শীর্ণ শরীরে আরও ব্যথা পাবে। তার চেয়ে হার মেনে তার পলায়ন করাই ভাল।

আরও একটু কাজ ছিল। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধান করে গিয়ে দেখতে পায়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মণি রান্না-বান্নার কাজে নেমেছে,—একা। নীলিমা, সরস্বতী বা উষা এরা কেউ ধারে-কাছে নেই।

মণি বলে, 'এত দেরী হল? যাক গে, এক টুকরো রুটি আছে, চা খেয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাত দেব।'

গোকুল বলে, 'বলেন কি? সন্ধ্যা বেলা ভাত খেয়ে নিলে মাঝ-রাতে খিদে পাবে যে? চা-টা খাই, ভাত ঠিক সময়েই খাব। একা রাঁধছেন কেন?'

'ভারি রান্না, এতে আবার ক'জন দরকার?'

মুখ-হাত ধুয়ে এসে গোকুল চা খায়, তার বাড়ীর কথা মণি তোলে না। আসলে, কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল।

গোকুল নিজে থেকে বলে, 'আপনাদের ও-পাড়াটা দেখে এলাম। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মাল-পত্র কিছু রেখে এসেছিলেন?'

'ভাঙা টেবিল খাট, ক'মণ কয়লা, এই সব ছিল।'

'বোধ হয় আর নেই।'

'বাড়ীতে ঢুকেছিলেন? তালা দিয়ে এসেছিলাম।'

'তালা নেই। অন্য লোক বাড়ী দখল করেছে, ভেতরে যেতে পারিনি। এমনিই প্রাণটা যেতে বসেছিল।'

মণি ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কেন গেলেন পাড়ার মধ্যে? আমি শুধু বলেছিলাম ভাসা-ভাসা পাড়ার অবস্থাটা একটু জেনে আসতে। বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে তো বলিনি আপনাকে?'

যে বিপদ ঘটতে পারত তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে মণিকে কাতর হয়ে পড়তে দেখে গোকুল বুঝিয়ে বলে, 'জানলে আমিই কি যেতাম? প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কি একটা ঘটল, নইলে ভাবনা ছিল না।'

নীলিমাকে গোকুল জিজ্ঞাসা করে, 'ওঁকে একা রাঁধতে দিলে কেন?'

'ওঁনার সখ। আমাদের খেদিয়ে দিলেন। কারো কিছু করবার দরকার নেই, উনি একা সব করবেন।'

মণি হঠাৎ প্রায় গায়ের জোরে সেই যে রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করল, মনে হল মরলেও আর এ দায়িত্ব ছাড়বে না। অধিকাংশ সময় সে রান্না-ঘরেই কাটায়। এ দেশের মেয়েরা যে সত্যই নিছক পুরুষের ভোগের সামগ্রী, রাঁধুনী চাকরাণী আর পুরুষের সন্তান-সন্ততির দুধ-মা ধাই এ খবরটা সে চিরকালই জানত। মাসিক-পত্রাদিতে কি কম লেখা সে পড়েছে এ বিষয়ে! এ দেশের নারী-সমাজকে মনে মনে সে কি কম আহা জানিয়েছে! সুশীলকে কেঁচো বানিয়ে নিজের ঘর-সংসারে তার ছিল অখণ্ড প্রতাপ, নিজেকে ওই অভাগীদের দলে সে ভাবতে পারত না। অহির্নিশি মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে, স্নেহ-সেবা কান্না-অভিমানের জাল বুনে, কি অধ্যবসায়ের সঙ্গেই একটি দুর্ব্বল পুরুষ আর তিনটি ছেলে-মেয়ে এই চারটি প্রজা নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য বশে রেখে সে অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে এসেছে! নিজের ঘরের কোণে নিজেকে সে যাই ভাবুক, আসলে সে-ও ওই বিরাট রাঁধুনী চাকরাণী-মার্কা মেয়েদেরই দলে, এটা টের পেয়ে তার প্রচণ্ড অভিমান ফেটে পড়েছিল। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব রাজনীতি নেতা নিয়ে বেশী মাথা-ঘামানোর বিরুদ্ধে তার সেদিনের অসহিষ্ণুতা সুশীলের সঙ্গে শত্রুর মত ঝগড়া, রান্না-ঘরে আশ্রয় নেওয়া সবই তার প্রতিক্রিয়া। দেশটা বড়, দেশ-বিদেশ আরও বিরাট, রাজনীতির সূতো টানলে নিরালা ঘরের কোণে মশারির অন্তরালের গোপন মুহূর্ত্তগুলিতে পর্য্যন্ত বুঝি টান পড়ে: এ-সব কথা সামনে রাখলে নিজেকে তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়।

তুচ্ছ যে হয়ে গেছে তার প্রতিকার মণির জানা নেই, নিজের ছোট সংসারটিতে ফিরে গেলেও আগের দিনগুলি তার ফিরবে না। নিজেকে বড়ই সে অসহায় বোধ করছিল। রান্না বান্নায় মেতে যদি ভুলে থাকা যায়। প্রহৃত আদুরে ছেলের মত শঙ্কিত কাঁদো-কাঁদো মুখ করে সুশীল যে আশে পাশে ঘুর-ঘুর করবে, এটা থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া গেছে।

তার রান্না-ঘরে আশ্রয় নেওয়ার মানে সুশীল বুঝেছে এক রকম! সে ভেবেছে, ঝগড়া করে মণি এখন অনুতাপে কাতর। মণিকে নরম কল্পনা করে তার পৌরুষ ধাতস্থ হয়েছে। সে-ও গম্ভীর মুখে বই আর কাগজে মন দিয়েছে।

সকালে প্রণব এসে রান্না-ঘরে টুলটা টেনে বসে। বলে, 'হঠাৎ রান্নার মধ্যে ডুব মারলে যেন?'

'কারো সঙ্গে বনে না, কি করব।'

'কারো সঙ্গে বনে না বলে একা এতগুলো লোকের রান্না রেঁধে মরতে হয় বুঝি?'

'যে যে-কাজের যোগ্য। রাঁধা-বাড়া বাসন-মাজা ছেলে-বিয়োনো আমার কাজ। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ মার্কসবাদ এ সব কি আমার জন্ত? আমার চাল-চলন কথা-বার্তায় তোমাদের হাসি পায়, তোমরা বিরক্ত হও। তার চেয়ে যা পারি তাই করছি।'

কথাগুলি করুণ কিন্তু তাতে কী ঝাঁঝ! ঝাঝটা বোধ হয় প্রণব পছন্দ করে, নইলে মণির কথাগুলি সত্যই নিছক ন্যাকামি হয়ে যেত।

'আমরা যে মনে-মনে হাসি, বিরক্ত হই, এটা তোমার মনগড়া হতে পারে তো?'

'ও-সব আমি বুঝি ঠাকুরপো।'

'তুমি কিছুই বোঝ না। নিজেই বলছ, এত কাল ঘর-কন্নায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছো, বড়-বড় কথা তোমার জন্ত নয়। নিজেই আমায় বলছ তুমি সব বোঝো। এই ক'টা দিনে তোমার বুঝবার ক্ষমতায় ম্যাজিক ঘটে গেল? তুমি বুঝে ফেললে যে রাজনীতি সমাজনীতি বোঝ না বলে আমরা মনে-মনে হাসি? নিজেকেই তুমি বুঝতে পার না, তুমি আমাদের কি বুঝবে? তোমার গোলমাল নিজের সঙ্গে, নিজের মনগড়া ধাঁধায় তুমি পাক খাচ্ছ।'

শুনতে শুনতে মণির দু'চোখে রোষের দীপ্তি ঝলক মেরে যায়। খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সে এমন ভঙ্গি করে যেন খুন্তি দিয়ে প্রণবকে মেরে বসবার ঝোঁক সামলাচ্ছে। বলে, 'ঠাকুরপো, আমার স্বামীও মস্ত বিদ্বান, ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে যেও, কেঁচো বনে যাবে। অনেক বড়-বড় পণ্ডিত প্রোফেসার আমার বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে বড়-বড় কথা বলেছে, আমার দেওয়া চা-বিস্কুট খেয়েছে। তাদের কথা এক বর্ণ বুঝিনি। তাই বলে কি আমার মনটা জুবুথুবু উই-ঢিবি হয়েছিল? আমি হাসিনি কাঁদিনি ভাবিনি? তোমার বিদ্বান দাদার মনের খুসী-অখুসীতে পুতুল নেচেছি? কি বুঝ তোমার ঠাকুরপো! বড়-বড় কথায় মেতে তোমার সহজ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা নিয়ে আমি থাকব না তো কি তোমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা ধার করতে যাব? আমার মনটা যেমন ছোট তোমার মনটা তেমনি বড়, তাই বলে কি তোমায় আমি বলব যে তোমার মনটা দিয়ে আমার মনটা চালাও?'

মণির দু'চোখ জলে ভরে যায়। গাল বেয়ে টপ-টপ জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে হিসাবী মেয়ে, বাপ-দাদার জুটিয়ে দেওয়া পুরুষটার সঙ্গে বহু বছর তিনটে ছেলে-মেয়ে বিইয়ে খাওয়া পড়া রোগ-ব্যারাম সামলে, নিজে খেয়ে-পরে আর সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে জীবন কাটিয়েছে, সে জানে এখন কাঁদলেই সর্ব্বনাশ হবে। চোখ দিয়ে জল পড়ে তবু সে তাই কাঁদে না। হাতা দিয়ে কড়াই মুছে নতুন ব্যঞ্জন রান্না সুরু করার মত আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নতুন সুরে বলে, 'দু'বার তুমি আমায় দিশেহারা করেছ ঠাকুরপো, আর পারবে না।'

'দু'বার তোমায় দিশেহারা করেছি? আমি?'

'ভিক্ষু নতুন বৌ পেয়ে একবার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। সবাই নিয়মে চালাত, ওঠাত বসাত, তুমি তোমার কলেজী চ্যাংড়ামি আর গোঁয়ার্ত্তুমি দিয়ে নিয়ম ভাঙতে, আমার রাইট নিয়ে ফাইট করতে, বিদ্রোহ শেখাতে। মনে আছে সে সব কথা? তোমার পাল্লায় পড়ে সংসারের দশ জনের সঙ্গে মানিয়ে চলার বদলে স্বাধীন হতে শিখলাম,—আহা, কি স্বাধীনতাই শেখালে! বড় ছেলের বৌ, বাড়ীর হাল-চাল বুঝে আস্তে-আস্তে দশটা দায়িত্ব নিয়ে বাড়ীর এক জন হয়ে উঠব সবাই এটা চেয়েছিল—কাজেই ঠিক তার উল্টোটা কর, সবাইকে পর করে দাও। উঠতে-বসতে ঠোকাঠুকি লাগাও। একটু যে স্নেহ চায় গালে তার চড় মারো। নইলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, সবাই তোমায় গিলে ফেলবে। কেন ঠাকুরপো? আমায় কি খেতে-পরতে দিত না, গাল দিত, মারত কেউ? আমায় একটু খুশী করার জন্তেই বরং কে কি করবে ভেবে পেত না। তুমি মাথা বিগড়ে না দিলে আজ কি আমার এ দশা হত? এ বাড়ীতে ফিরে এসে মনে হত শত্রুপুরীতে এসেছি? মা বেঁচে থাকলে এ সংসারে যে ঠাঁই পেতেন, আমি আজ সেখানে থাকতাম।'

'শেষের দিকে মা'র মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল মণি বৌদি। তীর্থে যাবার নাম করে পালাতেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনতে হত। মা'র চিকিৎসায় দু'বছরে বাবার সমস্ত জমা টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মা এক দিন ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।'

'বেশী জ্বরে মা হার্টফেল করেছিলেন।' মণির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। তার নিশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে।

'তাই আমরা সবাইকে বলেছিলাম। বাড়ীর সকলেও জানত না। গুরুদেব এসেছিলেন। মা'র কথা সব শুনে বাবাকে বললেন, ছাতে একটা সর্বতীর্থ সৃষ্টি করতে হবে, তিন দিন হোম-পূজা হবে। মা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, সারা দিন ছাতে সব আয়োজন করতে মেতে গেলেন। আমি বাড়ী ছিলাম না, অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেই মা আমায় ছাতে ডেকে নিয়ে গেলেন। বোধ হয় আমার জন্তই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, খোকা, আমায় সব তীর্থ দেখাবি বলেছিলি, এই ভাখ, সব তীর্থ তৈরী হচ্ছে। তোরা বাপ-ব্যাটায় আমায় ঠকাচ্ছিস কেন রে?'

'ঠাকুরপো!'

'বুড়ো বয়সে তীর্থও করতে দিবি না তোরা? গরু-ছাগলের মত ঘরের গোয়ালে মরতে পারব না খোকা! তীর্থে আমি যাবই। বলে সোজা গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

কড়াই-এ তরকারী পুড়ে যেতে সুরু করে। মণির হাত থেকে খুন্তি খসে পড়েছে। কথা বলতে বলতে প্রণব এমন ভাবে হাতে হাত কচলিয়ে চলেছিল যেন তার মায়ের হত্যাকারীদের টুঁটি দু'হাতে চেপে মারছে।

'মা কোন্ তীর্থে যেতে চেয়েছিলেন মণি বৌদি? সে তীর্থ এ জগতে নেই, সমাজ-জীবনে নেই। দু'বার ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেক বার দু' একটা জায়গা ঘুরে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে একা এই বাড়ীতে ফিরে এলেন। বেঁচে থাকতে সব কাজ ফুরিয়ে গেলে, মানুষ কাজছু

হলে, এ রকম হয়। সবার বেলা আমার মা'র মত চরম হয় না, মা'র মান-অভিমান চিরদিন খুব উগ্র ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে পুরানো মায়েদের এই গতি, অবলম্বনহীন শেষ জীবন। শুধু সংসারটুকু জীবনের ভিৎ, সংসারের ভিৎটাই ধ্বসে যাচ্ছে।'

'তুমি আবার আমায় দিশেহারা করছ ঠাকুরপো।'

'মাপ চাইছি। মা'র কথা তুললে কি না, আমারে জন্ম এ সংসারে মার স্থানটি নিতে পারনি বললে কি না, তাই এ সব বলে ফেললাম। অবান্তর কথা আমি বলি না মণি বৌদি।'

কড়াই-এ তরকারী পুড়েই চলেছিল, খেয়াল করে মণি তাড়াতাড়ি ঘটি কাৎ করে জল ঢেলে দেয়। ক্ষুব্ধ চোখে তরকারীটার দিকেই চেয়ে থাকে। এ তরকারী আর পরিবেশন করা চলবে না, খানিক আগেও যা ছিল সবুজ সতেজ আলু-কুমড়া, ভেজাল তেলে সাঁতলে খাদ্য হচ্ছিল, দু'দণ্ডে তা কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। দু'-এক মিনিটে জগতে কি অঘটন ঘটে যায়! সকলে নিন্দা করবে, যা-তা বলবে। অন্ততঃ মনে মনে ভাববে যে, আহা, গায়ের জোরে রান্নার ভার নিয়ে কি সুন্দর পোড়া তরকারীই ইনি খাওয়াচ্ছেন!

'একটু বোস ঠাকুরপো।'

তরকারীর ঝুড়ি দেখে মণির কান্না পায়। আধখানা বেগুন, গোটা-তিনেক আলু, একটু টুকরো আদা, কয়েকটা পেঁয়াজ আর কালচে-মারা শুকনো গোটা-দুই কাঁচা কলা ছাড়া তরকারীর ঝুড়িতে কিছু নেই। ডাল আর তরকারী দিয়ে একুশ জন লোক ভাত খাবে।

মণি ফিরে গিয়ে বলে, 'ঠাকুরপো, আমায় কিছু তরকারী এনে দাও, এদিকের বাজারে তো কারফিউ হয়নি?'

পুরোনো ভাঙা বাঁকানো হাতাটা দিয়ে উনুন খুঁচিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে হাত ধুয়ে মণি আবার মিনতি করে বলে, 'আলু পটোল বেগুন কুমড়ো যা পাও এনে দাও ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি। আমাদের কথা শেষ হয়নি, অনেক কথা আছে। তরকারীটা রেঁধে সারা রাত তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

প্রণব উঠে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। বলে, 'গোকুলকে বাজারে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে। দ্বিতীয় বার কবে তোমায় দিশেহারা করলাম বল ত শুনি?'

'প্রথম বারের সব কথা বলা হয়নি। তুমি কেমন বিশ্বাসঘাতক সেটা শোনো।'

'বলো।'

'তুমি হঠাৎ মাকে টেনে আনলে। তুমি বিগড়ে না দিলে আমি এ সংসারেই মানিয়ে থাকতাম, মা'র আসনটি পেতাম। তার মানে কি এই, আমি অবিকল মা'র মত হতাম? সংসার বদলাত না? সংসার যেমন বদলেছে, আমিও তেমনি বদলে যেতাম—আমিও একালের মেয়ে। তুমি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে, বড় সার্থকতার পথ দেখালে। বেশ, আমি আজও বলি, তোমার ওই বিদ্রোহের পথেই ফাঁকি থেকে মুক্তি পেতাম, জীবনটা সত্য হতে পারত। কিন্তু তুমি কি করলে? তোমার বাইরের জীবন বড় উঠল, দু'দিন পরে আর তোমার পাত্তা পাই না। একটু যেনো জল ঢুকিয়ে তুমি নাগালের বাইরে সরে গেলে। নিজের পথ খুঁজে নিতে লাগলে, আমায় ছেড়ে দিলে এক অদ্ভুত অসহ্য অবস্থায়। সবার সঙ্গে বিরোধ, শুধু অশান্তি, আর কিছুই নেই। কেন, কি তোমার দরকার ছিল গোবেচারী আমার মনটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার? বিচার বুদ্ধিতে ধাঁধা লাগিয়ে তোমার পথে দু'পা সাথে করে এগিয়ে নিয়ে ফেলে পালাবার?'

'আমার সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালাতে চেয়েছিলে। আজও কি তুমি মনে কর সেটা ঠিক হত? ওই ছিল তোমার আমার মুক্তির পথ?'

'তোমার কথা জানি না। আমি মুক্তি পেতাম। দু'জনের জীবন না হয় ধ্বংস হয়ে যেত, তুমি হয়তো এক রকম কিছু হতে, আমি হয়তো বেশ্যাপাড়ায় ঘর ভাড়া নিতাম। ধ্বংসের মধ্যে কি মীমাংসা নেই? মনের মধ্যে ঝড় নিয়ে জড়-ভরত হয়ে থাকার চেয়ে যে ভাল।'

'আজও তুমি আমায় ভুল বুঝে রেখেছ। আমি কি এই ঝড় তুলতে চেয়েছিলাম? জীবনে কত কাজ, তোমার মত ঘর-সংসারে থেকেও কত হাজার হাজার মেয়ে—'

'উপদেশ ঝেড়ো না ঠাকুরপো। বড়-বড় কাজ, বড়-বড় আদর্শ সবার সামনেই থাকে। আমি সে কথা বলিনি। আজ বুড়ো হয়েছি, স্পষ্ট বলতে আটকাবে না, তোমার সঙ্গে পালাতে চেয়েছিলাম কি শুধু পিরীত করতে? পালিয়ে গিয়ে নাম-সম্পর্ক ভাঁড়িয়ে একসঙ্গে থাকতে গেলে পিরীত আমরা নিশ্চয় করতাম, কিন্তু তাই কি আমার উদ্দেশ্য ছিল? তোমার সঙ্গে ঘর ছাড়ার সাধ নিয়ে তো এ বাড়ীর বৌ হয়ে আসিনি। ও ঝোঁকটা তুমিই জাগিয়েছিলে। বেশ তো, ঝোঁকটা শুধরে নিয়ে ঘরে থেকেই যাতে বড় আদর্শ মেনে বড় কাজ করতে পারি, সেটা করলেই পারতে? আমি তো তোমা বই আর জানতাম না? তুমি হুকুম দিলেই তো আমি দেশের জন্য প্রাণটা দিতে পারতাম। বোকা-সোকা একটা সাধারণ বৌ, সে তো শিখত সবাই তোমায় ও-সব সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। তাকে শুধু ক্ষেপিয়েই দেবে, ঠিক পথে চলতে শেখানো দায়িত্ব নেবে না? সেটাই তো বিশ্বাসঘাতকতা।'

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকচিত্র মুদ্রিত হল। আলোকচিত্রশিল্পী—সুধীরচন্দ্র ঘোষাল, সাধন দে, চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎকুমার ঘোষ।

প্রসাদ রায়

হলিউডের বাইরেটা যত চক্‌চকে, ভিতরটা তত নয়। তত নয় কেন, মোটেই নয় বলাও চলে।

ও-দেশী সিনেমার চিত্র-বিচিত্র সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যখন-তখন বিজ্ঞাপিত হয়, চিত্রনট রব মণ্টগোমারি না কি এত বড় পণ্ডিত যে, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজনীতি আছে তাঁর নখদর্পণে,—এমন কি তিনি বৈজ্ঞানিক, পুরাবিদ্যাবিশারদ, ডাক্তার ও বড়-বড় অধ্যাপকের সঙ্গে সমযোগ্য ব্যক্তির মত আলাপ করতে পারেন; এবং চিত্রনটী ডিয়ানা ডারবিন না কি প্রতি বৎসরে ত্রিশখানারও বেশী পুস্তক পাঠ করেন, বার্ব্বরা ষ্টান্‌উইক না কি কোরোটের নিসর্গ-চিত্র ও থ্যাকারের উপন্যাস ভারি পছন্দ করেন, এবং রে মিল্যাণ্ড না কি বলেছেন যে, "আমি জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসি। আপাতত আমি 'এনসাইকোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র চব্বিশ খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে দৃষ্টিচালনা করছি" প্রভৃতি।

কিন্তু আসলে হলিউডের যে কয় জন "তারকা" চিত্র বা গ্রন্থ—অর্থাৎ আর্ট বা সাহিত্য নিয়ে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করেন, তাঁদের সংখ্যা এক রকম নগণ্য। বরং অধিকাংশ নট-নটীই আজেবাজে টুকিটাকি জিনিষ সংগ্রহের জন্যে আগ্রহ জাহির করেন রীতিমত শিশুর মতই। যেমন জোয়ান ক্রফোর্ড পুতুল সংগ্রহ করতে ভালোবাসেন, ক্লার্ক গেবেলের ঝোঁক আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে এবং জো ই ব্রাউনের সখ হরেক রকম এসেন্সের শিশি সংগ্রহ করা। হলিউডের অনেক নট-নটীর আবার বাতিক হচ্ছে, থিয়েটারের পুরাতন 'প্রোগ্রাম' জোগাড় করা।

অবশ্য হলিউডের অনেক বাড়ীতেই আলমারি-সাজানো বই যে নেই, এমন অপবাদ দেওয়া যায় না। সে-সব কেতাবকে ভাগ করা যায় তিন শ্রেণীতে। প্রথম: যে সব বিখ্যাত বই সাজিয়ে না রাখলে ফ্যাসনের মুখ রক্ষা হয় না। দ্বিতীয়: সৌখীন লোকদের বই—যেমন কুকুর ও ঘোড়া পালন, ঘর-বাড়ী সাজানো, নৌকা চালানো প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। তৃতীয়: যে সব পুঁথির ভিতরে এই সব বিষয় থাকে—কেমন করে হাতের বা পায়ের যত্ন নিতে হয় বা কেমন করে লাগসৈ চিঠিপত্র লিখতে হয় বা ব্যবসায়ের গুপ্তকথা কি, প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, হলিউডে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কেতাবেরই চাহিদা বেশী।

চিরদিনই পূজার প্রতিমার ভিতরে থাকে সাধারণ মাটি। সেই পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দেও রোমের সৌখীন ধনীদের ভবনে গিয়ে সেনেকা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানে যে সব বই কিনে সাজিয়ে রাখা হয় তা কখনো পাঠ করা হয় না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন সহর সম্বন্ধে দার্শনিক এমার্সন সাহেব বলেছিলেন, "বোষ্টন জ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত ও ললিত কলা নিয়ে উত্তেজিত তরুণের মত আগ্রহ-চঞ্চল হয়ে উঠবে, এইটে দেখবারই সাধ ছিল। কিন্তু তার বদলে দেখছি সে তার পকেটে হাত পুরে সাবধানে হিসাব করছে।"

সেকালের সেই আমেরিকা এক শতাব্দীর পরে হয়ে উঠেছে আরো বেশী হিসেবী। এবং হলিউড সেই ফ্যাসনদুরস্ত ও ডলারকুঞ্জ ইয়াঙ্কিস্থানেরই অংশবিশেষ বৈ তো নয়।

এই হাল-ফ্যাসনের রাজ্য হলিউডের চিত্রতারকারা লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত নাটক "An Ideal Husband"কে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবার জন্যে। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল বিশ্রাম করবার পর আলেকজাণ্ডার কোর্ডা এই ছবিখানির প্রযোজনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। ছবিখানি প্রস্তুত করেছেন লণ্ডন ফিল্ম। "একটি আদর্শ স্বামী" কলকাতায় প্রদর্শিত হবে অদূর ভবিষ্যতেই।

উনিশ শতাব্দীর শেষ যুগে হাল-ফ্যাসনের মানসপুত্র ছিলেন ঐ অস্কার ওয়াইল্ড। পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায়, আকৃতি-প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন উপাধিধারী সৌখীন সমাজের আদর্শ পুরুষ। তাঁর সরস সংলাপের শক্তি ছিল অসাধারণ, তাঁর মুখের এক-একটি সুনির্ব্বাচিত বচন ফিরত অন্যান্য লোকেরও মুখে-মুখে। তার উপরে লিপিকুশলতাতেও তিনি করেছিলেন নব্য সমাজের হৃদয় জয়। তাঁর প্রথম নাটক Lady Windermere's Fan" যখন প্রথম অভিনীত হয়ে সাফল্য লাভ করে, তখন লণ্ডন সহর লুটিয়ে পড়ে যেন তাঁর পায়ের তলায়।

কিন্তু চরম উত্থানের পরেই চরম পতন। কুৎসিত অপরাধের জন্যে অস্কার হলেন কারাগারে বন্দী। মুক্তি পেয়ে বাইরণের মতন তিনিও করলেন স্বদেশ ত্যাগ। ছদ্মনামের আড়ালে এখানে-ওখানে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন অভিশপ্তের মত। তাঁর "একটি আদর্শ স্বামী" নাটকখানি রচিত হয় ঐ সময়েই। যে সৌখীন ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি বিলাসে-ব্যসনে যৌবন কাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন, নাটকখানির মধ্যে আছে তারই সমুজ্জ্বল চিত্র। আদর্শ স্বামীর চারি দিক্ ঘিরে আনাগোনা করে যে-সব মানুষ, তারা সাবিত্রীও নয়, সত্যবানও নয় এবং অনেকেরই দেহ পঙ্কিল মাটি দিয়েই গড়া। তাদের মুখেও অস্কারের ব্যক্তিগত সরস সংলাপ শোনবার সুযোগ পেয়ে চিত্রপ্রিয়রা নিশ্চয়ই আনন্দ উপভোগ করবেন।

এই চিত্রাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন পলেট গডার্ড, স্যর অব্রে স্মিথ, হিউগ উইলিয়মস, ডায়ানা উইনওয়ার্ড ও মাইকেল উইল্ডিং প্রভৃতি বিখ্যাত নট-নটীরা। কোর্ডা সাহেব ছবিখানি সব দিক্

অবিলম্বে মুক্তি পাইবে

নিউ থিয়েটার্স কৃত

নবতর রস কথা-চিত্র
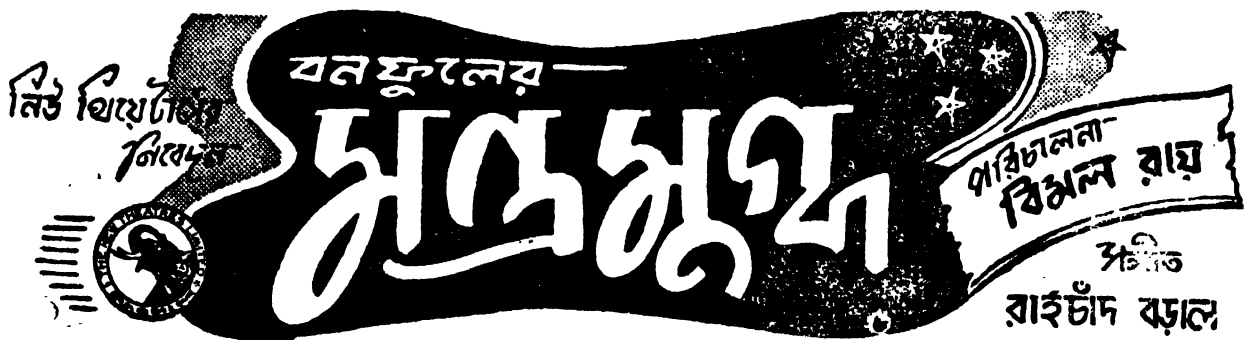
পরিবেশনা : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা

দিয়ে নিখুঁৎ ও স্মরণীয় করে তোলবার জন্তে জলের মত টাকা খরচ করেছেন। ধনী ও উপাধিধারী পাত্র-পাত্রীদের ভবনে যে-সব আসবাব-পত্তর দেখানো হয়েছে তা 'ষ্টুডিয়ো'র নকল ও খেলো মাল নয়, একেবারে আসল ও বহুমূল্য জিনিষ। একটি মাত্র ঘরে যে-সব চিত্র-যবনিকা (tapestries) ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিরই মূল্য দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়! নাটকে লণ্ডনের হাইড পার্কের দৃশ্য আছে। সেখানে থাকবে শতাধিক অশ্বারোহী, শত শত ক্ষুদ্র নটের জনতা এবং পঞ্চাশখানা গাড়ী। কর্ম্মব্যস্ত ও জনবহুল লণ্ডনের বুকের উপরে এ-রকম দৃশ্য তোলা দুঃসাধ্য বলে 'ষ্টুডিয়ো'র ভিতরেই অজস্র অর্থব্যয় করে প্রকাণ্ড এক নকল হাইড পার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য চিত্র-নির্ম্মাতারা ছবির জন্তে মুক্তহস্তে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, তার পরিমাণ শুনে এ-দেশী ছবিওয়ালারা এত দিন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়তেন। কিন্তু আর বোধ করি তাঁদের হতবাক্ হতে হবে না। কারণ, বিজ্ঞাপনের প্রসাদে জানা গেল, মাদ্রাজী ষ্টুডিয়োতে এমন একখানি আশ্চর্য্য হিন্দী ছবি প্রস্তুত হয়েছে যার পিছনে খরচ করা হয়েছে মোট পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা! এর পরেও দেখছি ভারতবর্ষকে আর গরীব দেশ বলে রোদন করা চলবে না।

প্রকাশ, ছবিখানির মধ্যে দেখা যাবে, আড়াই হাজার শিল্পী, বারো ফুট উঁচু ছয় শত 'ড্রামে'র উপরে দাঁড়িয়ে ছয় শত বালক-বালিকার নৃত্য, দুই-দুইটি সার্কাসের দলের ক্রীড়া এবং রাজা শশাঙ্কের প্রমোদ-কক্ষ (যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা)। সবই বুঝলুম, কেবল বুঝলুম না এই রাজা শশাঙ্ক কে? ইনি কি সেই হর্ষবর্দ্ধনের যুগের বাংলা-বিহারের রাজা শশাঙ্ক? তাহ'লে তাঁর সময়ে সার্কাসের খেলোয়াড়রা খেলা দেখায় কেমন করে?

ছবিখানি হয়তো সত্য সত্যই ভালো হয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে করি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঢাললেই কোন ছবি ভালো হয় না। অর্থব্যয়ে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের অভাবে সমস্ত অর্থব্যয়ই হয়ে পড়ে ব্যর্থ। কিছু দিন আগেই এক জন বিখ্যাত পরিচালক এ-দেশের এক অমর ঔপন্যাসিকের রচনার চিত্ররূপ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাজেও বড় কম অর্থব্যয় হয়নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খোদার উপরে খোদকারী করতে গিয়ে পণ্ড হয়ে যায় তাঁর সমস্ত চেষ্টা।

আমরা পাশ্চাত্য চিত্র-নির্ম্মাতাদের অর্থব্যয়টাই বড় করে দেখি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের মস্তিষ্ক ও প্রতিভা যে কত নব নব ভাব, রূপ ও রস-নিবেদনের চেষ্টা করে সে-সব কেউ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখি না। ঘি দিয়ে ভালো খাবার তৈরি হয়, আবার অনেক নির্ব্বোধ মেয় ভস্মেও ঘৃতাহুতি।

অভিনয়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জনৈক পেশাদার

কৃত্রিম স্বর-নিক্ষেপের ফলে যে ভাবে অভিনেতার কণ্ঠের বিকৃতি ঘটে এবং তার দ্বারা তার অভিনয় শত চেষ্টাতেও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব-সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি এবং তার প্রতিকারকল্পে যে বিশেষ অনুশীলন করা প্রয়োজন তার উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর স্বভাবতঃই আসে বাচনের আলোচনা। লেখক তার মানস-জগৎ থেকে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেন যার সঙ্গে বাস্তবের গভীর মিল থাকাই স্বাভাবিক। সেই কাহিনীতে নাট্যকার বর্ণনার সুযোগে তার চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য অথবা স্থান-কালের বিশদ বর্ণনা দিতে পারেন না। যে সুযোগ গল্প-লিখিয়ে অথবা উপন্যাস-রচয়িতার আছে, তা থেকে নাট্যকার বঞ্চিত। ভাষার দ্বারা যে রস সঞ্চিত হয় পাঠকের মনে, নাটকের সামান্য মাত্র সংলাপে সেই রস দর্শক ও শ্রোতার মনে সঞ্চিত করার মধ্যেই নাট্যকারের পুরাপুরি কৃতিত্ব। সে হিসাবে নাট্যকার সংযত শিল্পী। নাটকের চরিত্রগুলির মুখেও যথেচ্ছ এবং প্রচুর সংলাপ দিলে নাটক এতো দীর্ঘ হয়ে ওঠে যে এক রাত্রে এতখানি নাটক জমিয়ে শেষ করা নয়। বিশেষ করে বর্ত্তমান কালে যখন দর্শকের হাতে সময় কম, তখন সম্পূর্ণ একটি কাহিনীকে শুরু থেকে শেষ অবধি নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে চালনা করার জন্য নাট্যকারের সুযোগ পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক কমে গিয়েছে সন্দেহ নেই।

সেই স্বল্প এবং সংযত সংলাপের মধ্যেই চরিত্রগুলি যাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সেই দিকেই নাট্যকার ও পরিচালকের চারি চোখের দৃষ্টি। সুতরাং অভিনেতার মুখে সুষ্ঠু বাচনই হোল নাটকের প্রাণ যেন। অথচ সাধারণ অভিনেতা এইখানেই চরম ভুল করে বসতে পারে। যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে মন দিয়ে নিজের সংলাপগুলি আবৃত্তি করার সময় অভিনেতা যদি যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন থাকে তাহ'লে নাটকের রস বিনষ্ট হয়।

এ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে আমরা বলেছি যে সংলাপে এই কৃত্রিম স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই যেমন নাটক হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনি অভিনেতার কৃতিত্ব বাড়ারও সুযোগ থাকে। সেই কৃত্রিম স্বাভাবিকতাই হোল অভিনয়ের ধারক। সুতরাং বাচনভঙ্গী যদি চেষ্টাকৃত হয় তবে গোড়াতেই গলদ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র যখন কথা কইছে তখন দর্শক ও শ্রোতার মনে হওয়া দরকার যে এইমাত্র কথাগুলি নাটকীয় চরিত্রের মনে জেগেছে এবং সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এর জন্য প্রত্যেক পরিচালক আশা করেন যে অভিনেতা নিজের সম্বন্ধেই কেবল যে বিস্মৃত হবে তা নয়, পাদপ্রদীপের সামনে অসংখ্য দর্শকের মুখোমুখী হয়ে তিনি ভুলে যাবেন নাট্যকার সম্বন্ধে অথবা নাটকের যে কাপি থেকে তিনি পার্ট মুখস্থ করেছেন। বার-বার আবৃত্তির দ্বারা এ ভাবটিও যেমন নষ্ট হয় বড় কম নয়, তেমনি যে সব অভিনেতা প্রম্পটারের সাহায্যে বাজীমাৎ করার চেষ্টা করেন, তারাও কম হাস্যাস্পদ হন না রঙ্গমঞ্চে। তবু এ কথা ভুললে চলবে না ভাঙা-ভাঙা অংশের উচ্চারণের দ্বারা যে ক্ষতি হয় অভিনয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয় যদি অভিনেতা পার্টের সংলাপ বুঝে-বুঝে উচ্চারণ করেন। এর বহু দৃষ্টান্ত আমরা বহু রাত্রিতে নানা রঙ্গমঞ্চে দেখেছি।

চেঁচিয়ে পড়া, বক্তৃতা দেওয়া এবং অভিনয় করা এ সব আলাদা টেকনিকের জিনিষ, এ-কথা ভোলা উচিত নয় অভিনেতার পক্ষে। কাউকে শুনিয়ে যখন আমরা পড়ি বা বলি, তখন শ্রোতার কা

প্রত্যেকটি কথা পৌছিয়ে দেওয়াতেই আমাদের দায়িত্ব সারা হয় না, বক্তব্যের মূল ভাবটুকুও শ্রোতার মনে পৌছিয়ে দেওয়াও দরকার। কিন্তু সেই তার সীমা'না। তার অতিরিক্ত আর কিছু আশা করে না সে। যেমন স্কুল অথবা কলেজে বক্তৃতা-মঞ্চে। যেখানে শিক্ষক অথবা অধ্যাপক বা বক্তা ছাত্র বা জনসাধারণের মনে মূল বক্তব্যটুকু ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে কসুর করেন না।

কিন্তু জীবন ত আর পাঠ্য-বস্তুর বক্তব্য বিষয় না। বরং বক্তৃতা-মঞ্চে অনেক সময় অভিনয়ের টেকনিকের উপর বক্তৃতার সাফল্য নির্ভর করে। যদিও অধিকাংশ বক্তা এই বাচনশৈলীকে উপেক্ষা করে চলেন।

ছোট-ছোট সংলাপের মধ্যে যেখানে জীবন-স্রোত বেগবান প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, পাদপ্রদীপের এতটুকু জমির উপর যেখানে নাটকীয় সংঘাতে ঘটনা বৃহত্তর পরিণতির দিকে কখনো ধীরে, কখনো তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং অভিনেতাদের বাচনে ও ভঙ্গীতে যেখানে জীবন-ব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করছে, সেখানে কেবল মাত্র স্পষ্ট ও উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণেই সর্বসিদ্ধি লাভ হতে পারে না। যে রস সেই বিশেষ অংশে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাকে সার্থক করে তোলার জন্য অভিনেতার সহযোগিতা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। এবং স্বাভাবিকতা ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে আর তার চারা থাকে না। পার্ট ঝাড়া মুখস্থ করে, স্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে এবং সুন্দর চেহারার অধিকারী হয়েও, আমি দেখেছি দেবদাস নাটকের করুণতম দৃশ্যে অভিনেতা-দেবদাস দর্শকদের হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। অথবা গৈরিক পতাকা অভিনয়ে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র চিত্রণের বিফল প্রচেষ্টায় দর্শকদের পরিহাস-প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিয়েছেন। বাচনের অস্বাভাবিকতাই এই ধরণের সৃষ্টিছাড়া পরিস্থিতি রচনা করার সুযোগ করে দেয়।

সেই জন্য অভিনেতা নিজেকে প্রথম উপদেশ দেবেন—আত্মবিস্মৃত হও। তুমি যে ডেলী প্যাসেঞ্জার সে কথা ভোলো। দশটায় অফিস করার জন্য তুমি যে ঠিক সময়ে বাড়ীতে ভাত না পাওয়ায় রোজ সংসারে অশান্তি করো সে কথা ভুলে যাও। এই খানিক আগে তোমার পড়শী রাম বাবুর সঙ্গে তোমার যে কটু কথার বিনিময় হলো তা ভুলে যাও। মনে করো তুমি দেবদাস, তুমি শিবাজী, তুমি গোলাম হোসেন।

শোনো, এইমাত্র পার্ব্বতী তোমায় কি কথা বল্লে—তার পর তার জবাব দাও। কি জবাব দেবে? এইমাত্র তোমার মনের তল থেকে উঠে এসেছে তার জবাব, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক জবাব। কোন স্মরণ নয়, কোন প্রম্পটার নয়, হাতে-লেখা কপির কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তা মনে করে নয়। পারুর কথা শুনে যে স্বাভাবিক ভাব তোমার মনে উদয় হয়েছে, ঠিক সেই ভাবের বাহনে উচ্চারণ করো তার জবাবগুলি। মুখ থেকে উচ্চারণ নয়, মন থেকে উচ্চারণ। যেমন করো তোমার ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, নিজের সচেতন জ্ঞাতসারেই হয়ত নয়।

যদিও তোমার সহ-অভিনেতা তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কান তোমার মুখ থেকে দু'হাতের অন্তরও নয়, তবু তুমি ভাবছ যে সে আছে ঘরের দূরতম কোণে, তাকে শুনিয়ে তুমি জবাব দিলে। সেই হোল তোমার বাচনভঙ্গীর চরম সফলতা।

ভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস, ভাব এবং বাচন এক সাথে মিলে তোমার অভিনয় জীবন্ত শুধু দেখাল না, শোনালও বটে।

অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা ভাব পরিস্ফুটনের জন্য অভিনেতাকে আরো অগ্রসর ও সাহসী হতে উপদেশ দেন। কথার পর কথা পার্ট মুখস্থ কোরো না। তার দ্বারা বার বার আবৃত্তির ফলে ভাবের মধ্যে সহজক্রিয়া বস্তুটুকু হারিয়ে যাবে। এ উপদেশ অলস ফাঁকিবাজ অভিনেতার পক্ষে আশীর্বাদের মতো। পার্ট মুখস্থ করার কষ্ট স্বীকার না করে যদি একেবারে রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়া যায়, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু এর দ্বারা সেই সব অভিজ্ঞ পরিচালক এই গুরুতর কথাই বোঝাতে চান যে ভাবপ্রকাশের সহজ আনন্দটুকু যেন বাঁধা কথার আবৃত্তির দ্বারা ব্যাহত না হয়। যে মানুষটি যে চরিত্র অভিনয় করছে তার মনের স্বাভাবিক গঠনের সঙ্গেই যেন নাটকের সংলাপটুকু সহজে মিল খায়। সেই জন্য তরুণ অভিনেতাদের নির্বাচন করার দায়িত্ব এত গুরুতর। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে, অভিনেতা বহু দিন ধরে রঙ্গমঞ্চে যশস্বী হতে পারছেন না, তাকে কোন এক পরিচালক এক বিশেষ শ্রেণীর পার্টে নির্বাচিত করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ করে দেন।

পার্ট মুখস্থ করার কষ্টকর পরিশ্রমকে যখন অভিনেতা আনন্দের বলে মনে করবেন তখনই পার্ট নির্বাচন সার্থক হয়েছে বলতে হবে। আর নাট্যকার তখনই সার্থকনামা যখন প্রত্যেকটি অভিনেতা এ কথা তাঁর কাছে স্বীকার করেছে যে তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রটির রূপায়ণে নাটকের সংলাপের মধ্যেই সে আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে।

ভাব পরিস্ফুটন এবং বাচনের মধ্যে এই যে ঐকান্তিক সম্বন্ধ তা ভুললে চলে না কোন অভিনেতার। এবং নাট্যকারের ও পরিচালকের যৌথ দায়িত্ব এইখানেই।

[ক্রমশঃ

ঢাকায় ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার

শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস অধিক দিনের পুরাতন নয়। রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim Lebedeff) ১৭৯৫ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় এক ক্ষণস্থায়ী বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার পর ১৮৩৩ সালে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারস্থিত বাড়ীতে যে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাও স্থায়ী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই। বাংলা নাট্যশালার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। সতু বাবুর (আশুতোষ দেব) সিমলার বাড়ীতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৭), মার্চের প্রথম সপ্তাহে নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব', ইহার দশ-বার বৎসরের মধ্যে মেট্রোপলিটান থিয়েটার (২৩শে এপ্রিল, ১৮৫৯), শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮ই জুলাই, ১৮৬৫), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫), জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালা (৫ই জানুয়ারী, ১৮৬৭), বলদেব ধর ও চুণীলাল বসুর উদ্যোগে স্থাপিত বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৮) প্রভৃতি কতকগুলি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চই বাংলা নাট্যশালার স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং পরবর্ত্তী কালে বাংলার প্রথম পেশাদারী ন্যাশনেল থিয়েটারের (ডিসেম্বর, ১৮৭২) উৎপত্তিও ইহাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাতেই ঘটে।

ন্যাশনেল থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার মাত্র চার মাস পরে নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে 'হিন্দু ন্যাশনেল' ও 'ন্যাশনেল' নাম গ্রহণ করিয়া পৃথক্ ভাবে অভিনয় দেখাইতে শুরু করেন। দুই দলে বিভক্ত হইবার দেড় মাস পরে উভয় দলই বাংলার দ্বিতীয় শহর ও রাজধানী ঢাকাতে অভিনয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। এই ইতিহাস এখন সকলের অগোচরে। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সুপরিচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। 'নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটি বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয়;—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ও বিজ্ঞাপনের তাড়া।' তাহা না করিয়া কিংবদন্তী, স্মৃতিকথা, অথবা পরবর্ত্তী কালের রচনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে গেলে মৌলিক উপাদানের অভাব ঘটে এবং রচনার মধ্যেও নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি ও মতবিরোধ দেখা দেয়। সঠিক তারিখ নির্ণয়ের বেলাতেই উহাতে গুরুতর ভুল রহিয়া যায়। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' এই নীতি অনুসরণ করিয়া লেখা। আমরাও ব্রজেন্দ্রীয় এই নীতি অনুসরণ করিয়া যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য উপকরণের উপরে নির্ভর করিয়া ঢাকায় 'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের প্রদর্শিত অভিনয়গুলি সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে 'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের পূর্ব-ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

'ন্যাশনেল' ও 'হিন্দু ন্যাশনেল' থিয়েটারের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হইবে 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'এর কথা। পরে উহা 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' এই পরিবর্ত্তিত নামে পরিচিত হয়। বাগবাজারের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি জন কয়েক উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় এই সখের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ইঁহারা সকলেই বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

বাগবাজারের এই সখের নাট্য সম্প্রদায় প্রথমে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৮৭০ সালের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে এই নাটকের চতুর্থ বারের অভিনয়-সাফল্যে উদ্যোগীরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। পরে ১৮৭২ সালের মে মাসে উক্ত নাট্যসমাজ 'লীলাবতী' নাটক অভিনয় করিয়া বিপুল সাফল্য ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ইহাতে উক্ত দলের অভিনেতা ও সংগঠকদের মত অনেক লোকের মনেই একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চিন্তা উদয় হয়। সংবাদপত্র সমূহে এই নিয়া বিস্তৃত আলোচনা চলে। 'কশ্চিৎ দর্শকঃ' এই ছদ্মনামে জনৈক ভদ্রলোক 'এডুকেশন গেজেটে' লেখেন: "...আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি 'দেশীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশেরও একটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।"

এই সমস্ত আন্দোলন এবং কলিকাতাতে একটি সাধারণ

রঙ্গালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাগবাজারের এই সব যুবকেরাই 'ন্যাশনেল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা করেন। নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশনেল থিয়েটার' এই নামকরণ লইয়া দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের অভাবে 'ন্যাশনেল' থিয়েটার নাম গ্রহণ এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম ও টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শন প্রভৃতি প্রস্তাব বজায় রাখেন। ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনয়-খ্যাতি ক্রমেই বিস্তৃততর হইয়া পড়ে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'A Father', 'A Spectator' ইত্যাদি ছদ্মনামে এবং স্ব-নামে সাময়িক পত্রিকাদিতে ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে কঠোর নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা সুরু করেন। তিনি মনে মনে 'ন্যাশনেল থিয়েটারে'র সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু উহা যখন ক্রমেই দেশবাসীর প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করিতে থাকে তখন গিরিশচন্দ্র বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়াই এই সব অবাঞ্ছিত ত্রুটিপূর্ণ নিন্দা বদ্ধপরিকর হইয়া প্রচার করিতে থাকেন। অবশ্য ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারীর' যে অভিনয় হয় তাহাতে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়া খ্যাতির সংগে ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নাটকটির অভিনয়ের কিছু পূর্বে ন্যাশনেল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে জনৈক পত্র-প্রেরক 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' বলবেন:

"The cause of this faction, as the secretary of the society announces, is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some short coming on the part of the secretary."

এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য 'ন্যাশনেল পেপারে'র নবগোপাল মিত্র, 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মনমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া এক সালিশী বসে। কিছু দিন বিবাদ চলিবার পর সৌভাগ্যক্রমে সালিশী কমিটির প্রচেষ্টাতেই উহা মিটিয়া যায় এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই পুনরায় সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

সালিশী কমিটির হস্তক্ষেপে বিবাদ সাময়িক ভাবে মিটিয়া গেলেও অর্থ-সম্পর্কিত মনোমালিন্যই বৃহদাকারে ৮ই মার্চের পূর্বে আবার বিরোধের সৃষ্টি করে। ন্যাশনেল থিয়েটারের কর্মকর্তারা এই সময়ে পাকাপাকি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দলে নগেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর, বেল বাবু, ক্ষেত্র বাবু প্রভৃতি; অন্য দলে ধর্ম্মদাস, মতিলাল, মহেন্দ্র প্রভৃতি প্রধান হইয়া দাঁড়ান। ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুরের নিকট ষ্টেজ থাকায় তাঁহারা ষ্টেজ পান এবং নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে পোষাক থাকিত, কাজেই তাঁহারা পোষাক পান। ধর্ম্মদাস সুর প্রাপ্য জিনিষপত্র সহ গিরিশচন্দ্রের শরণ নেন এবং 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম লইয়া তাঁহারা অভিনয় করিতে সংকল্প করেন। এই 'নাম' লইয়া দুই দলে কিছু দিন টানা-হেঁচড়া চলে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এবং চাতুরীতে তাঁহারাই 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করিয়া টাউন-হলে ও পরে রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় দেখাইতে সুরু করেন। অগত্যা অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নগেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার নামে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের এক অপেরা হাউসে অভিনয় দেখাইতে সংকল্প করেন। ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের ইহাই পূর্ব-ইতিহাস। সুতরাং অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নগেন্দ্রনাথের চেষ্টায় যে ন্যাশনেল থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাই মনোমালিন্যে বিভক্ত হইয়া ন্যাশনেল ও হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার নাম গ্রহণ করিয়া শহরে এবং মফঃস্বলে অভিনয় দেখাইতে সুরু করেন। আমরা প্রথমে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের প্রদর্শিত অভিনয়ের কথা বলিয়া পরে ন্যাশনেল থিয়েটারের কথা বলিব।

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার ১৮৭৩, ২৬শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় করিয়া মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি ঢাকায় আগমন করেন। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "মে মাসের গোড়ায় হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যায়।" ব্রজেন্দ্র বাবু উপকরণের অভাবে সঠিক তারিখ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দুই তিন তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ১২ই মে, সোমবার, ১৮৭৩ (৩১শে বৈশাখ, ১২৮০) তারিখে ঢাকায় আসিয়া পৌছেন। এ সম্পর্কে স্থানীয় পত্রিকা 'ঢাকা-প্রকাশ' ঘোষণা করিতে যাইয়া থিয়েটারের নাম সম্পর্কে ভুল করেন। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যায় তাহা সংশোধন করিয়া নেন। ১৮ই মে, ১৮৭৩ (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) তারিখের 'ঢাকা-প্রকাশে' লেখেন: "কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েটারের সভ্যগণ গত সোমবার এখানে পৌঁছিয়া গত রাত্রিতে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় করিয়াছেন। এখন বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকাতে ইঁহাদের আশানুরূপ লাভ না হইতে পারে ভাবিয়া কলেজ খোলা পর্য্যন্ত ইঁহারা এখানে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিবেন। ঢাকার ধনাঢ্যগণ ইঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন প্রার্থনীয়। ইঁহাদের দুই দল, অন্য দলও শীঘ্রই ঢাকায় আসিবেন।" পরের সপ্তাহে আবার লেখেন: "সম্প্রতি কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েটারের কতিপয় ব্যক্তি ঢাকায় আগমন করিয়াছেন। পূর্বে যাঁহারা আসিয়া অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা 'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা কেবল 'ন্যাশনেল থিয়েটার' নামে অভিহিত। আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই শেষোক্ত থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইবে।"

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের ঢাকা আগমনের তারিখ সম্পর্কে অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় 'জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও দুই-তিন দিনের গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে তখন ঢাকায় এক দিনে আসা সম্ভব হইলেও 'ঢাকা-প্রকাশে'র বিজ্ঞাপিত সংবাদ

অনুযায়ী ঢাকায় তাঁহারা যদি ৩১শে বৈশাখ তারিখে আসিয়া পৌছেন তাহা হইলে রওনা হইয়াছেন ১২৮০, ৩০শে বৈশাখ তারিখে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা সত্য নয়।

'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' ঢাকায় আসিয়া সহরের বাঁধা ষ্টেজ 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে অভিনয় দেখাইতে থাকেন। ঢাকার নাটক-প্রিয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিষয়ে তাঁহাদের প্রচুর সাহায্য করেন। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা ১২ই মে সোমবার ঢাকায় আগমন করিয়া প্রথম অভিনয় দেখান—দীনবন্ধুর বহুখ্যাত 'নীলদর্পণ' ১৭ই মে শনিবার দিন। উহার পর ২১শে মে বুধবার 'সধবার একাদশী'। সঙ্গে কতগুলি পেণ্টোমাইন ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়। ১৮ই মে'র এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় :

"আগামী ২১শে মে বুধবার হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের সভ্যগণ 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'The Hemch back' (?) 'বিলাতী বাবু' 'সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণী এবং তৎপরীক্ষা', 'মস্তবী সাহেব কা পাকা তামাসা' প্রভৃতির অভিনয় করিবেন। ২৪শে মে শনিবার 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হইবে।"

'হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার' সর্বপ্রথম 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করিবেন শুনিয়া ঢাকার লোকেরা বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন বাংলা দেশে নীলদর্পণের মত খ্যাতি আর কোন নাটকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত ঢাকা বাংলা যন্ত্রেই ইহা প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ঢাকাবাসী ইহার অভিনয় বিষয়ে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার অভিনয় দেখিতেও বিস্তর লোক-সমাগম হইয়াছিল। 'ঢাকা-প্রকাশ' এ সম্পর্কে লেখেন :

"কলিকাতার উক্ত থিয়েটার (হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার) কর্ত্তৃক অত্রত্য 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে গত-পূর্ব্ব শনিবার 'নীলদর্পণে'র, গত বুধবার 'সধবার একাদশী'র এবং গত শনিবার 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নীলদর্পণ যে একখানি অতি-প্রসিদ্ধ নাটক, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বঙ্গভাষায় আর কোন নাটকের ভাগ্যেই এত প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার এই ঢাকা নগরীতে আমাদিকের 'বাঙ্গলা যন্ত্রে'ই এই 'নীলদর্পণে'র জন্ম হয়। তৎপর সমস্ত বঙ্গদেশের—ভারতবর্ষের—ইংলণ্ডের—এমন কি সমুদয় ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করে। ঢাকাস্থ ব্যক্তিগণ যখন শুনিতে পাইলেন, সেই সর্ব্ববিখ্যাত নীলদর্পণ তাঁহাদের নাটকের অভিনয় এই ঢাকাতেই হইতেছে, তখন তদ্দর্শনার্থ কতদূর কৌতূহল জন্মিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যাবতীয় বিদ্যালয় বন্ধ, সুতরাং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় লোক স্থানান্তরিত থাকাতেও সেদিন নাট্যালয়ে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, উপযুক্ত স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেক দর্শককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয় দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কারণ, নীলদর্পণ যে-যে কারণে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা এবং নাটকোচিত গুণাবলী একই পদার্থ নহে। ফলতঃ, নীলদর্পণে নাটকোচিত গুণাবলী বা তুর্য্য বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। সুতরাং হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনেতৃগণ সবিশেষ যত্ন সহকারে অভিনয় করিয়াও দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই।···গুণপণার তারতম্যানুসারে নীলদর্পণের অভিনেতৃবর্গকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গোলোকচন্দ্র বসু, আই, আই, উড, তোরাপ এবং মোক্তার প্রথম শ্রেণীতে ; সরলা, ক্ষেত্রমণি, আদুরী ও সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং অবশিষ্ট অভিনেতৃগণ তৃতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত।···

সীন, উপকরণ ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয়ের জন্য এক-খানি সীন অথবা একটি উপকরণও সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। অত্রত্য রামাভিষেকের নাটকাভিনয়ের সীন লইয়া নীলদর্পণাদির অভিনয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এক নাটকের সীন অন্য নাটকে ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুসঙ্গত হওয়া অসম্ভব।···আমাদের সংস্কার ছিল ঢাকার রামাভিষেক নায়িকাদের পরিচ্ছদ বিষয়ে সবিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবেন কিন্তু বাস্তবিক তদপেক্ষা অপকর্ষতাই দৃষ্ট হইয়াছে।

···বাস্তবিক ঢাকার রামাভিষেক, জামাই বারিক ও চক্ষুদান প্রভৃতির অভিনয় অপেক্ষা নীলদর্পণের অভিনয় অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল।

গত বুধবাসরীয় 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির অভিনয়ও ভালই হইয়াছে।"

নীলদর্পণ অভিনয়ে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার যে কেন সীন আনিতে পারেন নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ন্যাশনেল থিয়েটারের অধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ষ্টেজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর উক্ত থিয়েটারের ষ্টেজের সমস্ত উপকরণ পান। তাঁহারা ঢাকাতেও সেই সমস্ত সীন ও ষ্টেজ আনিয়াছিলেন এবং ঢাকাবাসীদের প্রশংসা পাইয়াছিলেন। সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। মোট কথা, হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার উপরি-উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় করিয়া ঢাকা সহরে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, 'এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম'—ইহা সত্য। [ক্রমশঃ

কথিকা

এক স্থানে এক জন কথক দক্ষযজ্ঞের কথা কহিতেছিলেন। ঐ স্থানে দাশরথি রায় যেমন আগমন করেন, কথক রহস্যচ্ছলে দাশরথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এস বাপু, ভূত এস।" সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া হাস্য করেন। দাশরথি সভাস্থ-গণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"আপনারা একটা ভূতের কথাতে যে হেসে পাগল হলেন ; আর দু'টো-পাঁচটা জুটলে কি হইত, বলিতে পারি না।" কথক শুনিয়া অধোবদন হইলেন।
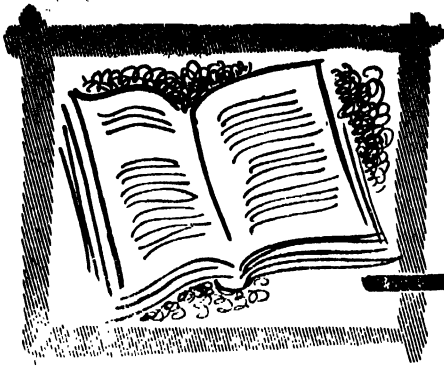
বইয়ের বাজার

বাংলা দেশের প্রকাশকদের সাম্প্রতিক অভিযোগ হচ্ছে—হালে না কি বইয়ের বাজার অত্যন্ত মন্দা। কথাটা মিথ্যা তা নয়। সাধারণ বাজারটাই যখন মন্দা, তখন বইয়ের বাজার তেজী হবার কোন পার্থিব কারণ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতেই লোকে হিমঝিম খেয়ে যাচ্ছে, কন্‌ট্রোলের সমস্যা আজও দূর হয়নি। যুদ্ধের মরশুমে সাময়িক কাজে নিযুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁরা পথে পথে ভবঘুরের মতন ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন। "জাতীয় সরকারের" দপ্তরে এমন কোন বাস্তব শিল্প-পরিকল্পনার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের অদূর ভবিষ্যতে বেকারত্ব ঘোচার সম্ভাবনা আছে। তার ওপর মায়াবিনী মুদ্রার কলেবর যে-রকম ক্রমেই স্ফীত হয়ে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে আশার জোনাকি পর্য্যন্ত জ্বলার কোন আশা নেই। বাঁধ-ভাঙা মুদ্রার বন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছে সাধারণ মানুষ, থৈ পাচ্ছে না, পানিও পাচ্ছে না হালে। টাকা বাড়ছে, অথচ টাকা নেই লোকের। তার কারণ রাজকোষ থেকে যে টাকার বন্যা নেমে আসছে তাতে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের ব্যাঙ্কের আমানত ফাঁপছে মাত্র। সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল সেই তিমির দিন দিন আরও গাঢ়তর হচ্ছে। ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য লাল বাতি জ্বালছে। ইতিমধ্যে যে কতো ছোট দোকানের গণেশ উল্টেছে তার হিসেব নেই। দানবীয় মনোপলি ও ফিনান্স ক্যাপিটালের যুগে ক্ষুদে ব্যবসাদার ও দোকানদাররা চোখে সরষের ফুল দেখছেন। এক কথায় বলা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক স্তরের লোকেরই জীবনযাত্রা আজ বানচাল হয়ে গেছে। বাংলা দেশের তো কথাই নেই, কারণ বাংলায় আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে রয়েছে "বঙ্গবিভাগের" সঙ্কট। তার ফলে, বাংলা দেশে শুধু অন্নের নয়, বাস্তুভিটের হাহাকারটাও বড় সত্য।

মধ্যবিত্ত পাঠকগোষ্ঠীর সর্ব্বাত্মক সঙ্কট

বইয়ের পাঠক প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা আজ কঠিন উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, বিশেষ ক'রে বাঙালী মধ্যবিত্তরা। তাঁদের না আছে বাসস্থান, না আছে অন্নের সংস্থান। এই অবস্থায় বই পড়ার কথা বলাটা তাঁদের কাছে ইয়ার্কি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বই পড়ার জন্যে চাই সুস্থ মন। অসুস্থ মন যাঁদের তাঁরা যে বই পড়েন না তা নয়, গোগ্রাসে সস্তা যৌন-সাহিত্য ও রহস্য সিরীজের বই তাঁরা গিলতে থাকেন। কিন্তু তা-ও চানাচুর বা তেলেভাজার মতন কিনে গিলতে গেলে পয়সা দরকার। পয়সার আজ যথেষ্ট অভাব, সুতরাং সস্তা সুড়সুড়ি দেওয়ার মতন "সাহিত্য" ও আজ বাজারে কম বিকোচ্ছে। অন্যান্য বইয়ের তুলনায় অবশ্য বেশী বিকোচ্ছে ঠিকই, কারণ নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে লোকের মানসিক সুস্থতা পর্য্যন্ত বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। শোনা যায়, আজকাল না কি আগের তুলনায় মদের বিক্রী বেড়েছে। যে কারণে বেড়েছে, ঠিক সেই কারণেই অশ্লীল ও রোমাঞ্চকর "সাহিত্যের" চাহিদাও বেড়েছে। তবু যতটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সেই অনুপাতে বাড়েনি। এমন কি, চীৎপুরের দু-এক জন বনেদী প্রকাশকের মুখ থেকে যা শুনেছি তাতে বিক্রী ক্রমেই কমছে বলা চলে। পড়ার ইচ্ছে আছে, কিন্তু কেনার পয়সা নেই। অতএব প্রকাশকরা বিক্রীর সঙ্গে বই পড়তে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ বই তাঁরা বিক্রীও করেন, ভাড়াও দেন।

সস্তা সাহিত্যের যখন এই অবস্থা তখন ভাল সাহিত্যের যে আরও দুরবস্থা হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ভাল সাহিত্যের ভাল পাঠকের সংখ্যা অনেক কম। তার মধ্যে আবার কিনে পড়ার মতন ক্ষমতা আছে এ-রকম ভাল পাঠকের সংখ্যা আরও কম। বছর দুই আগে এ-রকম পাঠকের সংখ্যা বাংলা দেশে ছিল ৫০০০ থেকে ৬০০০ মাত্র। বইয়ের দাম ৩ টাকা থেকে ৪ টাকার মধ্যে হলে ৩০০০ কপির দু'টো সংস্করণ প্রায়ই হ'তে দেখা যায়। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের কথা বলছি। ১৯৪৭ সাল থেকে বইয়ের বাজার মন্দা হতে থাকে। এই মন্দা হবার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল :

(ক) সাধারণ আর্থিক সঙ্কট।

(খ) ছাপা, ব্লক ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি।

(গ) বঙ্গবিভাগের ফলে বইয়ের বাজারে বিপর্য্যয়।

আর্থিক সঙ্কটের কথা আগেই বলেছি। সে কথা বাদ দিলেও বলা যায়, ছাপাখানার বড়-বড় মালিকদের চক্রান্তের ফলে বইয়ের বাজার আরও খারাপ হয়েছে। ছাপাখানার মালিকরা ক্রমেই ফর্মার মুদ্রণ-হার বাড়িয়ে চলেছেন, ব্লক-মেকাররাও তাই। কাগজের তথাকথিত কনট্রোল থাকলেও, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাদা-বাজারে কাগজ পাওয়া যায় না, কালো-বাজার থেকে চড়া দামে কাগজ কিনে বই ছাপতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি বইয়ের প্রকাশন-মূল্য (Publication costs) আগের তুলনায় (যুদ্ধের আগে) গড়ে প্রায় চার গুণ বেড়েছে বলা চলে। এই অবস্থায়, লেখকদের রয়্যালটি দিয়ে, বিক্রেতাদের কমিশন দিয়ে, যে-কোন বই অন্তত ২০০০ কপির

কম ছাপলে প্রকাশকদের চলে না। প্রকাশকরা একখানা বইয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ সাধারণতঃ এই ভাবে করে থাকেন :

লেখক :	২০%
প্রকাশন-ব্যয় :	২৫%
বিক্রেতার কমিশন :	২৫%
প্রকাশকের লাভ :	২০%
ক্ষয়-ক্ষতি :	৫%
বিজ্ঞাপন :	৫%

অর্থাৎ একখানা বইয়ের দাম যদি ২।০ টাকা হয় তাহ'লে প্রত্যেকে তার এই হারে অংশ পান :

লেখক :	।০
প্রকাশন-ব্যয় :	।৵০
বিক্রেতার কমিশন :	।৵০
প্রকাশকের লাভ :	।০
ক্ষয়-ক্ষতি :	৵০
বিজ্ঞাপন :	৵০

একখানা বই ২০০০ কপি ছাপার খরচ (ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, আর্টিষ্ট, ব্লক, কভার ইত্যাদির খরচ "প্রকাশন-ব্যয়" হিসেবে ধরা হয়েছে) যদি ১২৫০ টাকা আন্দাজ হয় তা'হলে তার দাম ২।০ টাকা করা চলে। আজ-কালকার ছাপার খরচ, কাগজ ব্লক বাঁধাই ইত্যাদির মূল্য ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, ডবল ক্রাউন (১'১৬) সাইজের একখানা সাধারণ ৮ ফর্মার (১২৮ পৃষ্ঠার) বইয়ের প্রকাশন-ব্যয় এই রকম পড়ে।

১২৮ পৃষ্ঠার একখানা সাধারণ বইয়ের দাম যদি ২।০ টাকা করা যায় তাহ'লে ক্রেতারা তাকে দুর্ম্মূল্য বলে অভিযোগ করেন। অভিযোগটা সাধারণতঃ প্রকাশকদের বিরুদ্ধেই করা হয়ে থাকে। অন্যায় মুনাফালোভী প্রকাশক যে আমাদের দেশে নেই তা নয়, অনেকে আছেন। সাধারণতঃ তাঁরা লেখকের প্রাপ্য মজুরীটা আত্মসাৎ করে থাকেন। বিক্রেতার কমিশন তাঁদের দিতে হয়, ছাপার সব খরচও তাঁদের লাগে, অবশ্য তার পরিমাণটা আগে অনেক কম ছিল। তাহ'লেও উপরি মুনাফাটা ছিল তাঁদের লেখক ঠকিয়ে এবং লেখকদের বইয়ের সমস্ত স্বত্ব কিনে নিয়ে। এখন যাঁদের সামান্য প্রতিষ্ঠা আছে সে-রকম প্রত্যেক লেখককেই প্রত্যেক সংস্করণের (Edition) জন্য রয়ালটি দিতে হয় এবং লেখক হিসেবে তার অংশ ১০% থেকে ২০% পর্য্যন্ত দিতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য খরচও এখন যথেষ্ট বেড়েছে। সুতরাং প্রকাশকরা বইয়ের দাম বিশেষ কমাতে পারেন না। ছাপাখানার মালিকরা যদি দলবদ্ধ হয়ে মুদ্রণ-হার বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন, ব্লক-মেকাররা যদি মুনাফার হার একটু কমান, কাগজের চড়া-বাজার ও কালো-বাজার যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাহ'লে লেখককে না ঠকিয়েও সাধু প্রকাশকেরা বইয়ের দাম কিছুটা কমাতে পারেন। তা কি সম্ভব?

আর এক উপায়ে বইয়ের দাম কিছুটা কমতে পারে। বই যদি তাড়াতাড়ি বিক্রী হয় এবং মোট প্রকাশ-সংখ্যা যদি বাড়ে, অর্থাৎ পাঠকদের সংখ্যা যদি আরও বাড়ে। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, ধার করে, অথবা না-কিনে যাঁরা বই পড়েন সে-রকম পাঠকের সংখ্যা বেড়ে বিশেষ লাভ নেই। ক্রেতা-পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে লাভ আছে। কিন্তু সে-রকম ক্রেতা-পাঠকের সংখ্যা আমাদের মতন গরীবের দেশে অত্যন্ত কম। যে-দেশের মধ্যবিত্তদের ভাত কাপড়ের সংস্থানই নেই, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধটুকু সম্বল করেই যাঁরা ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত, তাঁরা বই কিনে পড়বেন কোথা থেকে? বই কিনে পড়াটা তাঁদের কাছে অনাবশ্যক বিলাসিতা মাত্র। তাছাড়া, বর্ত্তমানে মধ্যবিত্তের সামনে যে সর্ব্বাত্মক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাতে বই কিনে পড়ার ক্ষমতা তো অনেকের নেই ই, এমন কি বই পড়ার যে মেজাজ, ইচ্ছা ও অবসর থাকা দরকার তা-ও অনেকের নেই। সাধারণতঃ দেখা যায়, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে বইয়ের অনুরাগীর সংখ্যা অনেক কম, সিনেমা জুয়া ক্লাব হোটেল ইত্যাদির অনুরাগীর সংখ্যাই বেশী। বই দু'-দশখানা চকচকে শেলফে তাঁদের বাড়ীতে থাকে অন্যান্য আসবাবের মতন গৃহের শোভা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য। ক্রেতা-পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পাঠক এবং তাঁদের অবস্থা আজ এত দূর শোচনীয় যে বই যত ভালই হোক না কেন, তা কিনে পড়ার ক্ষমতা, এমন কি চেয়ে পড়ার মেজাজ পর্য্যন্ত তাঁদের অনেকেরই নেই।

প্রকাশক, এমন কি লেখকদের মধ্যে অনেককে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে ভাল সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা অনেক কম, সমাদরও তেমন নেই। এটা হঠোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যা-কিছু "ভাল" তার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজে অনেক কম। "ভাল" মানুষেরই সমাদর নেই, "ভাল" বইয়ের থাকবে কোথা থেকে? তার মানে এই নয় যে মন্দ লোক ছাড়া সমাজে আর কিছুই নেই এবং ভাল মানুষের সমাদর হয়ই না। হয় এবং যথেষ্ট হয়, তা না হলে সমাজ ও সভ্যতা সব এত দিনে ধ্বংস হয়ে যেত, কিছুই আর এগুতো না। "Gulter Press", "Pornography", "Crime stories" ইত্যাদির সমঝদার ও পাঠকদের সংখ্যা এ-সমাজে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এ-সত্যকে কেউ-ই অস্বীকার করছে না। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো সত্য হল এই যে ভাল বই, ভাল লেখা, ভাল সাহিত্যের সমাদর ও সমঝদার সমাজে বাড়তে থাকে, সমাজে তারই প্রতিষ্ঠা হয় সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। ভাল বইয়ের পাঠক-সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক বেড়েছে। কি ভাবে বেড়েছে তার একটা আনুমানিক হিসেব এই ভাবে দেওয়া যেতে পারে :

	বইয়ের দাম	বিষয়	বিক্রয়-সংখ্যা	সময়
১৯৩০-'৩১	১৲—২৲	উপন্যাস	৫০০ থেকে ১০০০	২ বছর
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	৪-৫ ঐ
	১৲—২৲	প্রবন্ধ	ঐ	৪-৫ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১০ ঐ
	১৲—২৲	ছোট গল্প ও কবিতা	৫০০	৫-১০ ঐ
১৯৪৪-'৪৭	১৲—২৲	উপন্যাস	২০০০—৩০০০	১ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১-২ ঐ
	১৲—২৲	প্রবন্ধ	ঐ	১ ঐ
	২।০—৪৲	ঐ	ঐ	১-২ ঐ
	১৲—২৲	গল্প	১০০০	২ ঐ
	১৲—২৲	কবিতা	৫০০	২ ঐ

বাংলা দেশের প্রকাশকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ের বইয়ের বিক্রয়-হারের যে হিসেব পাওয়া যায় তা থেকে এই ধরণের একটা বিক্রয়-সূচী তৈরী করা যায়! এখনও এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে, ১৯৪৮ সালে প্রত্যেক ভাল প্রবন্ধ ও উপন্যাসের বই যে বিক্রী আছে, যুদ্ধের আগের তুলনায় তা দ্বিগুণের কম নয়। সুতরাং ভাল বইয়ের বাজার নিশ্চিত বেড়েছে, ভাল পাঠকদের সংখ্যাও যে অন্ততঃ দ্বিগুণ বেড়েছে তাতে কোন ভুল নেই। তাই ভাল বইয়ের বাজার মন্দা বলে এ কথা বলা যায় না যে ভাল লেখার পাঠক কমে যাচ্ছে। ভাল সাহিত্যের পাঠক বাড়ছে, বাজারও অনেক ভাল হচ্ছে। লোকের শিক্ষা ও সুরুচির উন্নতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই হয়ে থাকে। ভাল জিনিষ যদি লোককে দেওয়া যায় তাহ'লে তাদের রুচিও বদলায়, তারা তারিফও করে। সম্প্রতি বইয়ের বাজার যে বিশেষ ভাবে মন্দা হয়েছে তার কারণ:

(১) মধ্যবিত্তের আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কট
(২) প্রকাশনের ব্যয়বৃদ্ধি
(৩) ভাল লেখা ও নতুন লেখার অভাব

এক কথায় বইয়ের বাজার যে মন্দা হয়েছে তার কারণ প্রেসের মালিকদের লোভ বেড়েছে, কাগজের বাজার কালোই রয়েছে, প্রকাশকদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং লেখকদের ভাল বই লেখার অক্ষমতা। ভাল পাঠকের সংখ্যা বাড়লেও ভাল লেখকের সংখ্যা কমছে—এইটাই বড় সত্য। পাঠকদের বিচার-বুদ্ধি বাড়ছে, সুতরাং প্রকাশক বা লেখক কারও মন-ভোলানো ধাপ্পাতে আর তাদের ভুলানো সম্ভব হচ্ছে না। আর্থিক সঙ্কট যে বইয়ের মন্দা বাজারের একমাত্র কারণ তা কখনই নয়।

বিদেশী বইয়ের বাজার

বিদেশী বইয়ের বাজারও এখানকার মতন। অনেকের ধারণা আছে, বিলেতে বা আমেরিকায় বই পড়ে অসংখ্য লোক, বই বিক্রীও হয় অসংখ্য। ও-সব হল গালগল্প। বিলেতে যুদ্ধের আগে ভাল উপন্যাসই প্রথম সংস্করণ ছাপা হত খুব বেশী হলে ৫০০০ কপি। এখনও অবশ্য এর বেশী ছাপা সম্ভব হয় না, কাগজের অভাবের জন্যে। কবিতার বই যুদ্ধের আগে বিলেতে ছাপা হত ৩০০ থেকে ৪০০ কপি মাত্র। আজকাল প্রায় ১০০০ কপি ছাপা হয়। বইয়ের বাজার বিলেতেও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে—

বইয়ের ব্যবসা

১৯৩৭	—	১০,৫০৭,২০৪ পাউণ্ড
১৯৪৭	—	৩০,২০৩,৭৬৩ পাউণ্ড

প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা

১৯৩৭	—	১৭,১৩৭ কপি
১৯৪৫	—	প্রায় ৭০০০ "
১৯৪৭	—	১৩,০৪৬ "

(নিউজ রিভিউ, ২৩।১।৪৮)

খারাপ বইয়ের সংখ্যা ও পাঠক যুদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট বাড়লেও, বিলেতে যুদ্ধের মধ্যে ভাল বই ও পাঠকের সংখ্যাও যে যথেষ্ট বেড়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বই পড়ার অভ্যাস

সম্প্রতি বিলেতের কয়েকটি শহরে মধ্যবিত্তের বই পড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তের ফলে দেখা গেছে—

১৬—২০ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বই পড়ে
২০—৪০ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বই পড়ে
৪০—বছর বয়সের বেশী শতকরা ২০ জন বই পড়ে।

অর্থাৎ বয়স যত বাড়ে, বই পড়ার অভ্যাস তত কমে। এ-ছাড়া অন্য ঘটনা হ'ল এই—

বই যারা পড়ে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন ক্রেতা-পাঠক
পুরুষ-ক্রেতার সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে তিন গুণ বেশী

বিলেতেও বই কিনে পড়ার অভ্যাসের দৌড় এই পর্য্যন্ত। তার মধ্যে আবার যে-শ্রেণীর বই সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয় তা'হল ঐ "Crime, Mystery, Pornography" ইত্যাদি। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষা বিলেতের মধ্য-বিত্তের তুলনায় ভাল তো নয়ই, অনেক খারাপ। সুতরাং এখানেও যদি তদন্ত করা যায় তাহ'লে হয়ত আরও খারাপ ফলাফল জানা যাবে। বিলেতে আজও (সাম্প্রতিক তদন্তে) জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম দেখা যায় Edgar Wallace-এর নাম, এবং সর্ব্বশেষে দেখা যায় Shakespeare-এর নাম। আমাদের দেশেও যদি তাই রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তার পথে সকলের পিছনে পড়ে থাকেন এবং "মোহন সিরীজের" অথবা "উদয়ের পথের" লেখকরা সকলের আগে হঠাৎ গিয়ে পড়েন, তাহ'লে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কথা হল, এইটা সত্য নয়, বড় সত্যও নয়। বড় সত্য হল, ভাল বইয়ের ভাল পাঠকও বাড়ছে। সেই অনুপাতে ভাল লেখা বাড়ছে কি?

আগামী সংখ্যায়

"বই পড়া"

সজনীকান্ত দাস
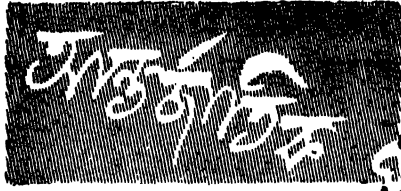
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মানুষের অধিকার—

১০ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বলিত ঘোষণা-বাণী (The Human Bill of Rights) ৪৮—০ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। হনোরাস এবং ইয়েমেন ভোটের সময় অনুপস্থিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব্ব-ইউরোপের পাঁচটি রাষ্ট্র এবং সৌদী আরব ভোট দেয় নাই। সাধারণতঃ ভোটের ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, রাশিয়ার সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ৩ নং ধারা সংশোধনের জন্য বৃটেনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের এই সনদে মোট ৩১টি ধারা আছে। আড়াই বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এই যে একত্রিশটি ধারা রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। এই ঘোষণা ইংলণ্ডের 'ম্যাগনা কার্টা', আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণা' এবং ফ্রান্সের 'মানুষের অধিকারের' প্রতিধ্বনি মাত্র। উহাদের মধ্যে যে আশাবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, এ-পর্য্যন্ত উহা শুধু মরীচিকা বলিয়াই কি প্রমাণিত হয় নাই? মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই ঘোষণা-বাণী পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অদম্য বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারিবে, এইরূপ আশা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। এই ঘোষণা-বাণীর মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, "স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শেষ পন্থা হিসাবে মানুষকে যদি বিদ্রোহ করিতে না হয়, তাহা হইলে আইনের শাসন দ্বারা মানুষের অধিকার রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।" কিন্তু মানুষ স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলিয়া দেয়, এই কাল্পনিক অবাস্তব ভিত্তির উপর যত দিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তত দিন মানুষের এমন কোন অধিকার নাই যাহা এই সকল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যে-কোন অজুহাতে কাড়িয়া লইতে না পারিবেন। শুধু দ্বিতীয় মহাসমরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নয়, শুধু দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যেই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে চিরকালই মানুষকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত অধিকারও যে শুধু কাগজে-পত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এই ঘোষণা-বাণীতে অবাধ মেলা-মেশা, স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম ও বাসস্থান নির্ব্বাচন, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, বেতন সহ ছুটি এবং বিশ্রামের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ঘোষণা-বাণীতে এ-কথাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার গ্রহণ করা না করা সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের শুধু নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকিবে। সুতরাং এই সকল অধিকার শুধু এক মহান্ আদর্শ হইয়াই থাকিবে, কিন্তু এই আদর্শে পৌছিবার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত হইবে না। রাশিয়া একটি সংশোধন প্রস্তাবে বিশেষ ভাবে ঔপনিবেশিক জনগণের জন্য মানুষের অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা উত্থাপন করিয়াছিল। প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য সব কয়েকটি রাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আইন সংশোধন করা উচিত, এই মর্ম্মে রাশিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহার পক্ষে ১০ ভোট এবং বিপক্ষে ৩২ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। চৌদ্দটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই। খসড়া ঘোষণা-বাণীর একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে, এই ঘোষণা-বাণীতে বর্ণিত সমস্ত অধিকারই ঔপনিবেশিক ও ট্রাষ্টীশিপের অধীনস্থ জনগণের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। এই ধারাটি সংশোধন করিয়া বৃটেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করে, তাহা গৃহীত হইয়াছে। খসড়া প্রস্তাবে সোজাসুজি উপনিবেশ ও ট্রাষ্টীশিপের দেশগুলিতে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল। গৃহীত সংশোধন প্রস্তাবে সোজা ভাষায় কিছুই বলা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে দেশটি স্বাধীন, না ট্রাষ্ট, না স্বায়ত্তশাসনবিহীন মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে সে সম্পর্কে কোন পার্থক্য করা হইবে না। বৃটেনের সাম্রাজ্য এখনও বহু বিস্তৃত, এ-কথা স্মরণ রাখিলেই এই সংশোধন প্রস্তাবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁহারা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, প্রত্যেক দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁহাদের করতলগত, তাঁহারা এই ঘোষণা-বাণীকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই প্রদান করিবেন। এই ঘোষণা তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার হইতে একটুকুও বঞ্চিত করে নাই। বরং তাঁহাদের সুবিধাই হইয়াছে। নিপীড়িত মানব-সমাজ শুধু এই ঘোষণা-বাণীর আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া মরিবে, আর কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ক্ষমতা ভোগদখল করিতে পারিবেন।

ব্যর্থ অধিবেশন—

বার সপ্তাহ পর গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তৃতীয় অধিবেশনের প্রথমার্দ্ধ। সুতরাং আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৪৯) লেকসাকসেসে তৃতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী রহিল। ক্লান্তি-শ্রান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই প্যারী অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। প্রতিনিধিবৃন্দ শান্ত ভাবে কোনরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বার্লিন-সমস্যার কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় প্রবল যুদ্ধাশঙ্কার মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল

অধিবেশনের শেষ মুহূর্ত্তে হয়ত অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্যারী অধিবেশনে কাজের মত কাজ কিছুই হয় নাই। এই অধিবেশনের কার্য্যসূচীতে যে সকল বিষয় স্থান পাইয়াছিল, তন্মধ্যে বার্লিন-সমস্যা ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন :—(১) প্যালেষ্টাইন, (২) কোরিয়া, (৩) গ্রীস, (৪) ইন্দোনেশিয়া, (৫) কাশ্মীর-সমস্যা, (৬) পরমাণু শক্তিনিয়ন্ত্রণ, (৭) সমর-সজ্জা হ্রাস এবং (৮) ইটালীর উপনিবেশ সমূহ। এই সকল সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতটুকু সমর্থ হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হইয়া পারা যায় না।

প্যারী অধিবেশনে প্রকৃত কাজ কি কি হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে প্রথমেই মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলিতে হয়। সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা-বাণী গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাতি-হত্যা নিষিদ্ধ করিয়া চুক্তির একটি খসড়া রচিত হইয়াছে। এই চুক্তি এখন বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষা করিতেছে। বৃটিশ প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে ঘোষণা করেন যে, জাতি-হত্যা নিরোধ সংক্রান্ত চুক্তি বৃটেন মানিয়া লইবে। জাতি-হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জ্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক আইন কমিশন গঠনের প্রস্তাবও সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতি-গত জাতিবিনাশ বে-আইনী করিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা গৃহীত হয় নাই। জাতি-হত্যা বা genocide এর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :

কোন জাতি, বর্ণ, কৌম বা ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে,

(১) উহার লোকজনকে হত্যা করিয়া,

(২) তাহাদের দৈহিক বা মানসিক গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়া,

(৩) উক্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগকে জীবনধারণের অনুপযোগী অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য করিয়া,

(৪) তাহাদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া, এবং

(৫) এক সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে বলপূর্ব্বক অন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনই জাতি-হত্যা (Genocide)।

কার্য্যক্ষেত্রে এই জাতি-হত্যা নিরোধের চুক্তিও যে নিষ্ঠুর পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই হইবে না, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে পাকিস্তানকে আমরা জাতিবিনাশ নিরোধ করিবার প্রস্তাবের গোঁড়া সমর্থকরূপে দেখিয়াছি। ইহাও কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিহাসেরই অন্তর্গত ?

উল্লিখিত দুইটি বিষয় ব্যতীত পরমাণু-শক্তি কমিশনকে আরও এক বৎসর জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু আগামী এক বৎসরে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হইতেছে না কেন, তাহা বুঝিতে খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। বর্ত্তমানে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই পরমাণু-বোমা তৈয়ার করিতে জানে, তাহার অস্ত্রাগারে কিছু সংখ্যক পরমাণু-বোমা মজুতও আছে। এই অবস্থায় পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—আর কোন দেশ যেন পরমাণু-বোমা তৈয়ারীর ফরমূলা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালাইতে না পারে। এই কারণেই কমিশনের প্রস্তাবে রাশিয়ার আপত্তি।

গত ১১ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইনে শান্তিস্থাপনের জন্য একটি নূতন আপোষ-কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তিন জন লইয়া গঠিত একটি আপোষ-কমিশন প্যালেষ্টাইনে যাইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কাউণ্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া গেল এবং বৃটেনের প্রস্তাবেরও বিশেষ কিছুই আর রহিল না। এই দিক্ দিয়া প্রস্তাবটিকে ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু আপোষ-কমিশনকে কোন কর্ম্মসূচী প্রদান করা হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রস্তাবে এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনের তীর্থস্থানগুলি রক্ষা করিতে হইবে, জেরুজালেম জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে এবং উহা হইতে সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগকে তাহাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে হইবে। আপোষ-কমিশন গঠিত হইবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং তুরস্কের প্রতিনিধি লইয়া। এই কমিশনের চেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই।

ইটালীর উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা প্যারী অধিবেশনে উত্থাপন না করিয়া মুলতুবী রাখা হইয়াছে। রাশিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও বলকান কমিশনকে আরও এক বৎসর জীয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিবেশনের শেষ মুহূর্ত্তে রাশিয়ার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমানের অস্থায়ী কমিশনের পরিবর্ত্তে একটি স্থায়ী কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই কমিশন কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা এবং কোরিয়া হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী অপসারণের উদ্যোগ করিবে। কোরিয়া-কমিশন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ-কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে তাঁহারা না কি আরও দুই বৎসর কোরিয়ায় মার্কিণ সৈন্য রাখিবার জন্য আমেরিকাকে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সদস্য হইবার ১২টি দেশের আবেদন এবং ভেটো ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য 'ক্ষুদ্র পরিষদে'র সুপারিশ সম্বন্ধে কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ১২টি দেশের আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে :—(১) আলবানিয়া, (২) অষ্ট্রিয়া, (৩) বুলগেরিয়া, (৪) সিংহল, (৫) আয়ার, (৬) ফিনল্যাণ্ড, (৭) হাঙ্গেরী, (৮) ইটালী, (৯) মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্র, (১০) পর্ত্তুগাল, (১১) রুমানিয়া এবং (১২) ট্রান্সজর্ডান। গত ১৮শে নবেম্বর (১৯৪৮) এড হক রাজনৈতিক কমিটিতে উল্লিখিত ১২টি দেশের মধ্যে ৬টি দেশের আবেদন পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহাদের নাম :—ইটালী, পর্ত্তুগাল, ফিনল্যাণ্ড, আয়ার, অষ্ট্রিয়া এবং ট্রান্সজর্ডান। এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট হইয়াছে। সিংহলের আবেদনকে

একটা বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাশিয়ার বিরোধিতা সত্বেও সিংহলের আবেদন সমর্থন করিয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদকে উহা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়া গত ১ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উল্লিখিত বারটি দেশের মধ্যে সাতটি দেশের আবেদন মঞ্জুর করা বৃটেন ও আমেরিকা সমর্থন করেন। রাশিয়ার ভেটোর জন্য উহাদের আবেদন মঞ্জুর হইতেছে না, এ-কথাও সত্য। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ভেটোর জন্য আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রের আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না। এই কয়েকটি দেশ রাশিয়ার অনুকূল হইবে, ইহাই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র কারণ বলিয়াই কি মনে হয় না? সুতরাং রাশিয়ার জন্যই এই ১২টি আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না, ইহা মনে করা ভুল। বরং বলিতে পারা যায় যে, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিরোধের ফলেই এই বারটি রাষ্ট্রের আবেদন মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না। ইসরাইল রাষ্ট্রও সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছে।

গত বৎসর যে ক্ষুদ্র পরিষদ (Little Assembly) গঠিত হয়, সেই পরিষদ ভেটো ক্ষমতা সংশোধন করিবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলির মধ্যে সাধারণ সম্মেলন (General Conference) আহ্বান অন্যতম। এই সকল সুপারিশ এতই সুদূরপ্রসারী যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ পর্য্যন্ত সেগুলি সমর্থন করিতে পারে নাই। আর্জ্জেনটিনার ডাঃ আর্কের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ ব্যক্তিরাই এইরূপ সুপারিশ সমর্থন করিতে পারিয়াছেন। মঃ মানুলিস্কি ডাঃ আর্ককে ডন কুইকজোটের সহিতও তুলনা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে ডন্ কুইকজোটের ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৪৮) এড হক্ রাজনৈতিক কমিটিতে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পক্ষ হইতে উত্থাপিত ভেটো নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবকে ৩৫টি বিষয়কে কার্য্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলিবে না। সাধারণ পরিষদে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হইতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইলেও সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা। কোন্‌টি কার্য্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় ইহা লইয়া প্রবল মতভেদের অবকাশ থাকিবে। গত ৩রা ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে ক্ষুদ্র পরিষদকে আরও এক বৎসরের জন্য বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিষদ যে ভেটো সমস্যা এড়াইবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপায়স্বরূপ, রাশিয়া সে-কথা গোপন রাখে নাই। রাশিয়ার সহিত বুঝা-পড়ার উহা একটি প্রধান অন্তরায়।

প্যারী অধিবেশনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর-সমস্যায় হাত দিতে পারে নাই। হায়দ্রাবাদ-সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আর উত্থাপিত হইবে না বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই আশা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ-সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্তই রহিয়াছে। রাজনৈতিক কমিটিতে প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনায় ভারত আরব-রাষ্ট্রবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। উহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় এই সমর্থনের জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই সিরিয়া অবিলম্বে হায়দ্রাবাদ-সমস্যা আলোচনার জন্য দাবী উত্থাপন করে। পাকিস্তানও হায়দ্রাবাদ সমস্যা আলোচনার জন্য দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ সমস্যাকে কার্য্যসূচীতে বহাল রাখিতে শুধু যে আরব রাষ্ট্রগুলি, পাকিস্তান এবং আর্জ্জেণ্টিনাই ইচ্ছুক তাহা নয়। ওয়াকিবহাল মহলের ইহা দৃঢ় ধারণা যে, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের অন্যতম এক বৃহৎ রাষ্ট্রও হায়দ্রাবাদ-সমস্যাকে চালু রাখিতে চায়। এই বৃহৎ রাষ্ট্রটির পরিচয় স্পষ্ট করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের দৃষ্টি সতর্ক ও সুদূরপ্রসারী হওয়া আবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন ১২ই ডিসেম্বর শেষ হওয়ায় সাধারণ পরিষদে বার্লিন-সমস্যা লইয়া আলোচনা হওয়া সম্ভব হইল না। বার্লিন-সমস্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও এই সমস্যা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সাধারণ পরিষদ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের উপর পর্য্যাপ্ত নৈতিক চাপ দিতে পারিত ইহা স্বীকার করা কঠিন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের উপগ্রহস্বরূপ। বৃহৎ রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়াই তাহাদের চলিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাইতে অসমর্থ। এই অবস্থায় বার্লিন-সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের অভিমত কি হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বার্লিন-বিরোধ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ ব্রামুগলিয়া ছয় জন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ লইয়া যে কমিশন গঠন করিয়াছেন তাহার ফল কি তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বার্লিনের সোভিয়েট অধিকৃত এলাকার ঐ এলাকার বার্লিন পৌর-পরিষদের সদস্যগণ উক্ত অঞ্চলের জন্য একটি অস্থায়ী পৌর-পরিষদ গঠন করিয়াছেন এবং সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমী ত্রিশক্তি ইহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা বার্লিনকে কার্য্যতঃ বিভাগ করা হইয়াছে। আবার পশ্চিম বার্লিনে যে পৌর-সভার নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে কম্যুনিষ্টরা পরাজিত হইয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, একটি শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদ বন্ সহরে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পশ্চিমী শক্তিত্রয় জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে এবং রাশিয়া উহাতে প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। বার্লিন-সমস্যা উহারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন কার্য্যতঃ ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধই ইহার কারণ, শুধু রাশিয়াকে দোষ দিয়া লাভ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন ইলিয়টের কবিতাই স্মরণ করাইয়া দেয়: "In my beginning is my end."

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ—

গত ৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের অচল অবস্থা সমাধানের জন্য শেষ মুহূর্ত্তের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। হল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। স্বদেশে

প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভা প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ই, এম, ভ্রে সাসেন অবশ্য বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি দল হয়তো আবার ফিরিয়া আসিতেও পারেন। তিনি না কি এখনও আশা ছাড়েন নাই। প্রতিনিধি দলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল হেগ হইতে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় নেদারল্যাণ্ডের হাই কমিশনার ডাঃ লুই বীল ৩রা ডিসেম্বরের বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বেই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় ইহাই হল্যাণ্ডের অভিপ্রায়। এই সকল আশা ও অভিপ্রায় সত্ত্বেও আলোচনা কেন নিষ্ফল হইল, এই প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। ইন্দোনেশিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল জাপানের অধীনে ছিল। তিন বৎসরের অধিক কাল হইল ইন্দোনেশিয়া জাপ-কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা এখনও পায় নাই। লিঙ্গাজাতি চুক্তি হওয়ার সময় যে সামান্য আশা দেখা গিয়াছিল, তাহাও এখন লুপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতেই উহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা যে-চেষ্টা করিয়া আসিতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে বড় বেশী বাকী নাই। তাহাদের এই চেষ্টা ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই তারিখেই সামরিক আক্রমণের আকার গ্রহণ করে। হল্যাণ্ড ইহাকে পুলিসী কর্ম্মতৎপরতা বলিয়া অভিহিত করিলেও উহার প্রকৃত স্বরূপ কাহারও অজ্ঞানা নাই। জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা কমিশনের চেষ্টায় আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উহার নাম রেনভাইল চুক্তি (Renville Agreement)। এই চুক্তি দ্বারাই হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে পুনরায় আলোচনা চালাইতে

সমত করা সম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছে প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল। কিন্তু মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

তিন বৎসরের পুরাতন এই বিরোধের মীমাংসার জন্য পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে গত ২৪শে নবেম্বর (১৯৪৮) ডাচ-মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দল বাটাভিয়ায় আগমন করেন। আলোচনা চালাইবার জন্য তাঁহারা গত ২৭শে নবেম্বর ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী যোগজাকার্তায় গিয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বরের (১৯৪৮) সংবাদে প্রকাশ যে, চারি দিন আলোচনার পর আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। ডাচ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি দলের স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে বাটাভিয়ায় মীমাংসার জন্য শেষ মুহূর্তের যে-চেষ্টা হয় তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী বৎসর অন্তর্বর্ত্তী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় ওলন্দাজ সৈন্য সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় সময়ই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাত্তা দাবী করেন যে, অন্তর্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওলন্দাজ সৈন্য নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। ডাচ প্রতিনিধি দল দাবী করেন যে, সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিবে ওলন্দাজ হাই কমিশনারের হাতে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে শুভেচ্ছা কমিশনের জনৈক সদস্য বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে যে-সকল প্রস্তাব আলোচনার বিষয়, সেগুলি গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রস্তাবের অনুরূপ। শুভেচ্ছা মিশনের মার্কিণ সদস্য Mr. Merle Cochran হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র উভয় পক্ষের নিকট গত সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যুক্ত ইন্দোনেশীয় গণ-পরিষদের জন্য এবং জানুয়ারী মাসে অন্তর্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হইবে এবং ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। নূতন গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা এবং নেদারল্যাণ্ড ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের জন্য বিধান রচনা করিবেন। এই কাজ সম্পন্ন হইলে পর নেদারল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার হাতে সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন। এই প্রস্তাব না কি উভয় পক্ষই গ্রহণ করেন। এত দূর অগ্রসর হওয়ার পর যে কারণে সাম্প্রতিক আলোচনা ব্যর্থ হইল তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হাই কমিশনার অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিতে পারিবেন না এবং যুক্ত সামরিক ষ্টাফ বোর্ড গঠন করিতে হইবে, এই দুইটি দাবী সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ডের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ, ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় জয় করিবার অভিপ্রায়ের লক্ষ্য হইতেই আলোচনা চালাইতেছিলেন।

হয়তো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই হল্যাণ্ড পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। আবার যদি আলোচনা আরম্ভ হয় তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই আরম্ভ হইবে। ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা যে বিদ্রোহ করিয়াছিল ওলন্দাজদের সাহায্য ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদিও বিপদ এখনও কাটে নাই, তথাপি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয়তো মনে করে যে, কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধে ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্র একটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা মিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে চতুর্থ অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "The truce between the Netherlands and the Indonesian Republic is being increasingly strained towards breaking-point." অর্থাৎ 'নেদারল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির উপর ক্রমেই চাপ এত বাড়িতেছে যে, উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। আবার যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে উহার পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র অবরোধ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। কাহারও নিকট হইতে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য পাওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের চক্রান্তের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। এই সুযোগে ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা এতই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে যে, ল্যাপষ্টোনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থ নৈতিক কমিশনের বৈঠকে ইন্দোনেশিয়া উক্ত কমিশনের সহযোগী সদস্যরূপে গৃহীত হইলে নেদারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি উক্ত কমিশনের অধিবেশন হইতে চলিয়া যান। ইন্দোনেশিয়াকে সহযোগিরূপে গ্রহণের প্রস্তাব সম্পর্কে ভোটের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃটেন, ফ্রান্স ও শ্যাম ভোট দানে বিরত ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যাণ্ড এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেয় ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, চীন, ফিলিপাইন এবং সোভিয়েট রাশিয়া।

চীনে গৃহযুদ্ধের শেষ অধ্যায়—

চীনা কম্যুনিষ্টদের নানকিং অধিকারের অভিযান পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। নানকিং অধিকার করিতে চীনা কম্যুনিষ্টদের কত দিন লাগিবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। অবশ্য ইয়াংসী নদী যে একটি দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক বাধা তাহাতে কেহই সন্দেহ করে না। কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে এই নদী অবশ্যই পাড়ি দিতে হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইয়োলো নদীকেও দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক বাধা বলিয়া গণ্য করা হইত। ইয়োলো নদীর উপর অনেক ভরসাই স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নানকিং হইতে প্রেরিত গত ৭ই ডিসেম্বরের (১৯৪৮) সংবাদে প্রকাশ যে, নানকিং-এর সত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ সরকারী ব্যূহে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে ইয়াংসী নদী অতিক্রম করিবার জন্য চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী বহু জলযান তলব করিয়াছে। চীনের সাধারণ লোকের ধারণা, রাজধানী হিসাবে নানকিং পতন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী মহল হইতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করা সত্ত্বেও রাজধানী নানকিং হইতে ক্যানটনে স্থানান্তরের আয়োজন চলিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিজনবর্গকে দ্রুত স্থানান্তরিত করা হইতেছে। বে-সরকারী লোকজন নানকিং ও সাংহাই পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং নানকিং পতন সম্বন্ধে কাহারই কোন সন্দেহ আর নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কুয়োমিণ্টাং চীনের জন্য অধিকতর সাহায্য আদায়ের চেষ্টা করিবার জন্য মাদাম চিয়াং কাইশেক গত ১লা ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ

কোন সুবিধাই তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৮) যে, আমেরিকাস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত ডাঃ ওয়েলিংটন কু চীনকে সাহায্য করিবার জন্য চারি দফা প্রস্তাব-সম্বলিত একটি কর্মসূচী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই কার্য্যসূচী যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক হয়তো তাহাই চাহিতেছেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ঝুঁকি না লইয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না। মার্কিণ সামরিক মুখপাত্র 'আর্মি ও নেভী জার্ণালে' চীনা কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি বন্ধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় চিয়াং কাইশেকের সেনাপতিদের কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ওয়াশিংটনস্থ 'নিউইয়র্ক টাইমসের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, মাদাম চিয়াং কাইশেক কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে পারেন নাই এবং কম্যুনিষ্টদিগকে বাধা দান করা চীন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব করিয়া তুলিতে একমাত্র শক্তি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করিতেও তিনি সমর্থ হন নাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আধ ঘণ্টাব্যাপী বে-সরকারী বৈঠকে মাদাম চিয়াং কাইশেকের আবেদন বিশেষ সহানুভূতি সহকারেই শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মহল মনে করেন, সহানুভূতির অর্থ মাদাম চিয়াং কাইশেকের পরিকল্পনা গ্রহণ করা বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। ইকনমিক কো-অপারেশন এডমিনিষ্ট্রেটর মিঃ পল জে, হফম্যান চীনে গিয়াছেন। মাদাম চিয়াং কাইশেকের আবেদনের সহিত তাঁহার চীনে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই প্রকাশ। চীনে ই-সি-এর (E C A) কাজ কিরূপ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে তাহা পরিদর্শন করাই না কি তাঁহার চীনে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

নানকিং হইতে ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক তাঁহার অন্তরঙ্গদের কাছে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম ব্যর্থ হইলে তিনি নানকিংস্থ সান ইয়াৎসানের স্মৃতিসৌধে আত্মহত্যা করিবেন। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে একটা অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই আত্মহত্যার সঙ্কল্প ঘোষণায় কোয়ামিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি যদি সান ইয়াৎসানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে চীন গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইত না। গত ১০ই ডিসেম্বর জেঃ চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীনে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। যেখানে সামরিক শক্তিরই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেখানে সামরিক আইন জারী করার কোন সার্থকতা নাই। আজ সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের অধিকারে চলিয়া যাইবার প্রবল সম্ভাবনার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়ার ভরসা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। মিঃ বেভিন কমন্স সভায় চীনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার নীতিই ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ হইলে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" তাঁহার এই উক্তি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, মিঃ বেভিনের বিবৃতি চীনা কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত চীনে বৃটিশারদের পূর্ব্বেরই মতই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, আমেরিকার অভিপ্রায়ও উহা হইতে স্বতন্ত্র নয়। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত চীনে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা করিবার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ আমেরিকায় দেখা দিতেছে।

কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কুয়োমিণ্টাং চীনকে আরও সাহায্য করিবে কি না সে-সম্বন্ধে জেঃ চিয়াং কাইশেকের মনেও বোধ হয় সন্দেহ জাগিয়াছে। বস্তুতঃ নবেম্বর মাসের (১৯৪৮) শেষ ভাগে ডাঃ সান ফুকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার উদ্দেশ্য যে আমেরিকার সমর্থন লাভের চেষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। জেঃ চিয়াং কাইশেক হয়তো মনে করিয়াছেন, ডাঃ সান ফুকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিলে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমেরিকার আস্থা ফিরিয়া আসিবে। ডাঃ সান ফু-ও বোধ হয় আমেরিকার সাহায্য সম্বন্ধে খুব আশান্বিত নহেন। সাংহাই হইতে ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মাদাম চিয়াং কাইশেক যদি চীনের জন্য পর্য্যাপ্ত মার্কিণ-সাহায্যের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সান ফু নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কম্যুনিষ্টদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করিবেন। সাংহাই হইতে ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চীনের ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত শান্তি-চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য চিয়াং কাইশেকের উপর চাপ দিতেছে। ওয়াশিংটনে মাদাম চিয়াং কাইশেকের মারফৎ এবং নানকিংস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ লাইটন ষ্টুয়াটের মারফৎ না কি এই চাপ দেওয়া হইতেছে। এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হোয়াইট হাউস কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। চীনা কম্যুনিষ্টরা অতি দ্রুত জয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে। আলাপ-আলোচনা চালাইতে গেলেই যুদ্ধ-বিরতির কথা উঠিবে। আসন্ন বিপুল বিজয়ের সম্মুখে কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধ-বিরতিতে রাজী হইবে কি? তাহারা হয়তো মনে করিবে যে, যুদ্ধ-বিরতির অর্থ শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিয়াং কাইশেককে সময় দান মাত্র। আর একবার যখন শান্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল তখন চিয়াং কাইশেক যেরূপ অশোভন দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে-কথাও এই প্রসঙ্গে মনে না পড়িয়া পারিবে না।

লাল চীন ও তাহার প্রতিক্রিয়া—

সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে এই প্রশ্ন কেহই আর এখন উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করেন না। চীনের তথাকথিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে চীনের অবস্থা কিরূপ হইবে, সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড চীনের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, চীন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। সকলে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন না। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে

পারিবে না কেন, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। চীন ঐক্যবদ্ধ থাকিলেও তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হইবে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। আমেরিকার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি, চোরা-কারবার, মুদ্রাস্ফীতি এবং গৃহ-বিবাদের জন্য কুয়োমিন্টাং চীন চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি তো করিতে পারেই নাই, অধিকন্তু চীনের অর্থনৈতিক দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। কিয়োমিন্টাং চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার কারণও এইখানেই। লাল চীনেও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না, বরং অর্থনৈতিক দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বিদেশের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর একান্ত বিশ্বাসী। লাল চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য দিবার মত সামর্থ্য সোভিয়েট রাশিয়ার নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতেও লাল চীন অর্থ সাহায্য পাইবে না। কাজেই কম্যুনিষ্টদের পক্ষে চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। ফলে লাল চীনে চরম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, চীনের কম্যুনিষ্টরা যতখানি কম্যুনিষ্ট তাহা অপেক্ষা বেশী জাতীয়তাবাদী। কাজেই রুশ-মার্কা কম্যুনিজম ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে 'বাফার ষ্টেট' হিসাবে লাল চীনকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে। অর্থনৈতিক সাহায্য না দিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লাল চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কেহ কেহ প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাহির হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য না পাইলেও কম্যুনিষ্টরা চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় লাল চীনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়াই অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, লাল চীনের সাফল্য এবং প্ররোচনায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ মনে করেন, লাল চীনের কম্যুনিষ্টরা তাহাদের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করিবার এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এত ব্যাপৃত থাকিবে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্ট-বিদ্রোহের প্ররোচনা দিবার মুহূর্ত্ত সময়ও তাহারা পাইবে না। কিন্তু চীনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কম্যুনিষ্টদিগকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করিবার আশঙ্কা তাঁহারাও উপেক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ প্ররোচনা না দিলেও চীনের কম্যুনিষ্টরা যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের ভাবধারা প্রচারে প্রধান সহায় হইবে, তাহাও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইন্দোচীনে একটি জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ডাঃ হো চি মিনের বিরুদ্ধে এই তাঁবেদার জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার প্রতিক্রিয়া ইন্দোচীনে কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। মালয়ে কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে দমন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা অধিকারের জন্য কম্যুনিষ্টরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। হল্যাণ্ড এই বিদ্রোহ দমনে কোনরূপ সাহায্য না করিলেও ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এই বিদ্রোহ আপাততঃ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা এখনও জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া মাঝে-মাঝে হঠাৎ আক্রমণ করিতেছে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ১২ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় অবিলম্বে অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই অবস্থায় ক্ষমতা অধিকারের জন্য কম্যুনিষ্টরা যদি আবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সাফল্য লাভ করা বোধ হয় কঠিন হইবে না। প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় উহার প্রতিক্রিয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না। ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ট-বিদ্রোহ প্রশমিত করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদ কাটে নাই। ব্রহ্মদেশের সুদীর্ঘ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাহির হইতে কম্যুনিষ্টদের প্রবেশ নিরোধ করাও অসম্ভব। থাকিন নু গবর্ণমেণ্টের বামপন্থী প্রীতিও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শ্যাম দেশে সঙ্করামের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়হস্তে কম্যুনিষ্ট দমনের যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমনি উদারনৈতিক দলেরও গলা চাপিয়া ধরিতে ত্রুটি করেন নাই। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট চরম বামপন্থীদের অভ্যুত্থানের সম্মুখে এইরূপ গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কাও উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান স্তম্ভরূপে শ্যামের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতেছে। ৩রা আগষ্ট তারিখে মালয়ে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উ তিয়েনওয়াং যে-পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ পাইয়াই মালয়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই শুধু গ্রহণ করেন নাই, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশ-অধিকার রক্ষার জন্য কম্যুনিজমবিরোধী পরিকল্পনা গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তদনুসারে ৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলন আহূত হয়। হংকং-এর গবর্ণর, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমিশনার জেনারেল, মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী হাই-কমিশনার এবং সারওয়াকের গবর্ণর এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া তিন দিন ধরিয়া গোপনে আলোচনা করেন। ইহার পরেই কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মালয়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইন্দোনেশিয়ার ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ এবং শ্যামের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি ৮ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য বৃটেন ও শ্যাম ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকাও ব্রহ্মের সঙ্করাম গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিতে ইচ্ছুক।

সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও কম কঠিন সমস্যা দেখা দিবে না। রাশিয়া চীনের নূতন কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহিবে, কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্ট যেখানেই থাকুক না কেন তাহাকেই চীনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া গণ্য করিবার দাবী ছাড়িবে না। এইরূপ অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। নিরাপত্তা পরিষদে যে পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য তাহাদের মধ্যে চীন ও ফ্রান্স অন্যতম। উভয়ের ঘাড়েই বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রই বিনা আপত্তিতে মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের মতে মত দিয়া থাকে। চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেন্টই হইবে প্রকৃত পক্ষে চীনের গবর্ণমেন্ট এবং এই গবর্ণমেন্টই নিরাপত্তা পরিষদের জন্ম সদস্য মনোনয়নের অধিকার দাবী করিবে। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে এবং বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে। উভয় পক্ষেরই ভেটো ক্ষমতা রহিয়াছে। কাজেই এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। চীনের বাহিরে চীনের গবর্ণমেন্টরূপে চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেন্টের অবস্থান চীনের শান্তি ও উন্নতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, তাহাও খুব গুরুতর প্রশ্ন। চীনের নির্ব্বাসিত জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেন্ট পুনরায় চীনদখলের চেষ্টায় বিরত থাকিবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের অধিকারে যাওয়ার পরেও, চীনের বাহিরে জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেন্টের অবস্থান, গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিবে।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক সম্মেলন—

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক চতুর্থ অধিবেশন ব্যর্থতার মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। গত ২১শে নবেম্বর (১৯৪৮) অষ্ট্রেলিয়ার ল্যাপস্টোন সহরে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশন শেষ হয় ১১ই ডিসেম্বর (১৯৪৮)। আঠারটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যে বিপুল আশা লইয়া এই অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল, অধিবেশনের শেষে তাহা অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই কমিশনের (E.C.A.F.E) প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, এশিয়ার পুনর্ব্বসতি ও পুনর্গঠনের জন্ম কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা। কমিশনের ওয়াকিং পার্টি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্ম একটি পঞ্চ বার্ষিকী ব্যাপক পরিকল্পনা (master plan) রচনা করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা এক দিতে পারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, আর দিতে পারে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলেন, ইউরোপকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা একান্তই প্রয়োজন এবং ইউরোপ তাহার জন্ম প্রস্তুতও হইয়াছে। পক্ষান্তরে এশিয়ার অবস্থা এখনও অশান্ত। ইহার জন্মই প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এই অধিবেশনে একটি মাত্র ভাল কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়াকে এই কমিশনের সহযোগী সদস্য করার প্রশ্ন লইয়া গত তিনটি অধিবেশনে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এই অধিবেশনে ভোটের সংখ্যাধিক্যে ইন্দোনেশিয়া সহযোগী সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু হল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা রাগ করিয়া অধিবেশন ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই অধিবেশনে যে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে জাপানের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করার সুপারিশ অন্যতম। কিন্তু জাপানের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হইবে ষ্টার্লিং-এর ভিত্তিতে। কাজেই জাপানের সহিত বাণিজ্য বাড়িলেও ডলার পাওয়া সম্ভব হইবে না।

আরব-প্যালেষ্টাইন ও রাজা আবদুল্লা—

প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী বিরোধটা যেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে 'টাগ অব্ ওয়ারে' পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বার্ণাডোট পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম বৃটেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে খুশী করিবার জন্ম বার তিনেক সংশোধনের পর উহার বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনের জন্ম আপোষ-কমিশন নিয়োগ করিয়া সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বার্ণাডোট-পরিকল্পনার কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু অন্য উপায়ে উহাকে চালু করিবার চেষ্টা চলিতেছে, জেরিকোতে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লার সমর্থকদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে রাজা আবদুল্লাকে আরব-প্যালেষ্টাইনের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্ম অনুরোধ করা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনকে ট্রান্সজর্ডানের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব রাজা আবদুল্লার মন্ত্রিসভাও অনুমোদন করিয়াছেন। রাজা আবদুল্লাও নিজেকে প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্সজর্ডানের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আরব-মহল হইতে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, জেরিকোতে যে সম্মেলন হইয়াছে তাহা প্যালেষ্টাইনের আরব আশ্রয়প্রার্থীদের সভা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার এই সম্মেলনের নাই। এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্যাংশন কমিটিতে বৃটেন এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছে যে, ইসরাইল সৈন্য দুইটি ক্ষেত্রে ট্রান্সজর্ডান সীমান্তে হানা দিয়াছে এবং ইহার ফলে ট্রান্সজর্ডানের সহিত চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারে। ইসরাইল গবর্ণমেন্ট দুইটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, বৃটেন আরব সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। আরব-প্যালেষ্টাইনকে ট্রান্সজর্ডানের সহিত সংযোগ করিয়া নিজেকে হাসেমী যুক্তরাষ্ট্রের অধিপতি বলিয়া রাজা আবদুল্লার ঘোষণা যে বৃটিশেরই একটা চাল তাহাতে সন্দেহ নাই। বার্ণাডোট-পরিকল্পনায় নেগেভ অঞ্চল হইতে ইহুদীদিগকে বঞ্চিত করিবার এবং আরব-প্যালেষ্টাইন ট্রান্সজর্ডানের সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই বৃটেন ঐ পরিকল্পনা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে দিয়া গ্রহণ করাইতে পারে নাই। কাজেই অন্য উপায়ে নেগেভ অঞ্চল সহ আরব-প্যালেষ্টাইন রাজা আবদুল্লাকে দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ট্রান্সজর্ডান মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ-প্রভাবাধীন দেশ। এই জন্ম রাজা আবদুল্লার দাবী বৃটিশের সমর্থন লাভ করিতেছে। তিন জন সদস্য লইয়া যে আপোষ কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহার হাতেই প্যালেষ্টাইন-সমস্যা সমাধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গত মনে করিলে যে কোন সুপারিশ করিবার অধিকার এই কমিশনের আছে। নেগেভ অঞ্চল না পাইলে ইসরাইল রাষ্ট্র যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিশন কি ইহুদীদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার সুপারিশ করিবেন? আপোষ-কমিশনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও রহিয়াছে। এই কমিশনের সুপারিশ রচনায় মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

গণ-পরিষদ

বিচার ও শাসন বিভাগ—

ভারতীয় গণ-পরিষদে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক্ করা সংক্রান্তে ডঃ আম্বেদকর প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, "শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবার তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ করার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।" পরের দিন তিনি নিজেই তাঁহার প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যাহার উদ্দেশ্য মূল প্রস্তাব হইতে 'তিন বৎসর' কথাটি বাদ দেওয়া। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন যে, এই সংস্কারটি যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন হউক তাহা গবর্ণমেণ্ট চান না বলিয়াই সংশোধন প্রস্তাবের অবতারণা। মূল প্রস্তাবের সময়ের মেয়াদ তুলিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র এই সংস্কারের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। পণ্ডিত নেহরু ইহার উত্তরে বলেন যে, এই পরিষদে উত্থাপিত যে কোন বিষয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। এই উক্তির ফর্মের দিক্ দিয়া যুক্তি আছে। কিন্তু বাস্তব দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, যাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। (অর্থাৎ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব), তাঁহারাই গণ-পরিষদেও নেতৃত্ব করিতেছেন এবং গণ-পরিষদে কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য-সংখ্যাই বেশী। কাজেই পণ্ডিত কুঞ্জরু কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন নাই। 'তিন বৎসর' কথাটি তুলিয়া দিবার সমর্থনে পণ্ডিত নেহরু যুক্তি দিয়াছেন, "তিন বৎসর খুবই দীর্ঘকাল। এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন কি? ইহার চেয়ে অল্প সময়ে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে।" কথার মার-প্যাঁচে যুক্তিটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু ইহাই কি সত্য কারণ?

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ দেশের বর্ত্তমান শাসকদের সম্বন্ধে বিহার সরকারের বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এত দিন যাঁহারা সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, বিচার ও শাসন-ক্ষমতার একত্র সমাবেশ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে কতখানি বিপন্ন হয়, সে কথা তাঁহাদের অজানা নয়। অথচ এই বেদনাদায়ক অবস্থার উন্নতির জন্য যাঁহারা শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য এ যাবৎ প্রায় কিছুই করেন নাই। ক্ষমতা হাতে পড়িলেই যে মানুষের অবনতি ঘটে, তাঁহাদের আচরণে এই কথাই প্রমাণিত হয়।" নিজ দলীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা কি না করিতেছেন! ন্যায়বিচার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছেন। যে অর্ডিন্যান্স-রাজত্ব এত দিন দেশবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত, আজ তাহাই কায়েম হইতে বসিয়াছে।

পণ্ডিতজী শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি কোন প্রাদেশিক সরকার তিন বৎসরের পূর্ব্বেই বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করিতে পারেন, তাঁহাকে এই 'তিন বৎসর' কথাটি দিয়া আটকাইয়া রাখা ঠিক হইবে না।" এই সম্পর্কে সার ক্লিফোর্ড আগরওয়ালা বলিয়াছেন যে, "কিছুদিন পূর্ব্বে বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করার একটি পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা ধামা-চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থাকে সকলে অপরিহার্য্য মনে করিতেন, আজ তাহার সমর্থন নাই কেন? এক কালে যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা আজ নীরব কেন?" উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন,—"ক্ষমতা হাতে আসিলেই মানুষের অবনতি ঘটে।" ইহার অধিক সদুত্তর হইতে পারে না।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ—

ভারতীয় গণ-পরিষদে অস্পৃশ্যতাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্রে একটি ধারা গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সমস্ত নাগরিকই সমান, সুতরাং ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি অথবা স্ত্রী-পুরুষভেদে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই নিষিদ্ধ করিয়া আইনগত দিক্ হইতে ভারতীয় সমাজের একটা কলঙ্ক দূর করিবার ব্যবস্থা যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল আইন থাকিলেই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? আধুনিক ভারতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের সমস্যা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা দূর করার সমস্যা হইতে ভিন্ন কিছু নহে। সমাজে আজ যাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বলিয়া পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া ইহাদের পার্থক্য এতই অধিক যে, পার্থক্য দূর না হইলে সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নাই।

মৌলিক অধিকার—

ভারতীয় গণ-পরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৩ নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের সাত রকম স্বাধীনতার কথা আছে:

(১) কথা বলার এবং মনের ভাব প্রকাশ করার স্বাধীনতা,

(২) শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা,

(৩) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা,

(৪) ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিবার অধিকার,

(৫) ভারতের যে কোন অংশে বাস করবার স্বাধীনতা,

(৬) কোন সম্পত্তি অর্জ্জন করা, উহার মালিক থাকা এবং উহা হস্তান্তর করিবার স্বাধীনতা,

(৭) যে কোন বৃত্তি গ্রহণ অথবা যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের স্বাধীনতা।

আপাত দৃষ্টিতে এইগুলি নেহাৎ মন্দ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু পাঁচটি উপধারায় এই সকল স্বাধীনতা যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া মৌলিক অধিকারের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদ এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে যদি মৌলিক অধিকার সমূহ সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে মৌলিক অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক কে, টি, শা তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবে 'চিন্তা ও উপাসনা' এবং 'সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রকাশের' স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অঙ্গীভূত করিবার কথা বলিয়াছেন। অতীতে যাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া তাঁহারাই খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার সময় উহাকে মৌলিক অধিকারভুক্ত করেন নাই। ইহাকে ভুল বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে উহা বাদ রাখার ব্যবস্থা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত কামাথ তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবে প্রত্যেক নাগরিকেরই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবেও এই দাবী সমর্থন করা হইয়াছিল।

ভোটদানের অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই অধিকার যদি শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের অঙ্গীভূত না হয় এবং প্রচলিত আইন যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় নাগরিকদের যে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে বলিতে গেলেই সিডিশন বা রাজদ্রোহের কথাও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। মূল ধারায় রাজদ্রোহ কথাটির অস্তিত্ব খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪(এ) ধারাটি রাজদ্রোহ সম্পর্কে। বৃটিশ আমলে এই ধারাটির এত ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে যে কোন সমালোচনাকেই রাজদ্রোহ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। এই জন্য শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী 'রাজদ্রোহ' শব্দটি বাদ দিবার জন্য সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই শব্দটি যদি মূলধারা হইতে বাদ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সরকারী কোন কাজেরই ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনা করাও সম্ভব হইবে না। আমাদের নেতৃবর্গ মুখে সর্ব্বদাই গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান, কিন্তু যে ভাবে মৌলিক অধিকারের বিধান রচিত হইতেছে, তাহাতে স্বাধীন ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে না।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিধান—

ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে জনসাধারণকে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্ট আবেদন করিবার অধিকার প্রদান করিয়া যে ধারাটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা যে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ আম্বেদকর এই ২৫ নং ধারাটিকে খসড়াতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কেবল মৌলিক অধিকার প্রদানই যথেষ্ট নহে, সেগুলির সংরক্ষণের বিধান ছাড়া কোন শাসনতন্ত্রই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু এই ধারায় জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা ব্যয়বহুল ব্যাপার। কোন দরিদ্রের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে শাসনতন্ত্রে ২৫ নং ধারার বিধান সত্ত্বেও শুধু দারিদ্র্যের জন্যই প্রতিকারপ্রার্থী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অথচ ভারতের ৩০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ২১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকই দরিদ্র। ডাঃ আম্বেদকরের ২৫ নং ধারার ৩ নং উপধারায় যে সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রীম কোর্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে কোন আদালতকে স্বীয় এলাকায় সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিতে পারিবেন। কিন্তু বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক্ না করা পর্য্যন্ত এই উপধারার কোন ফলই হইবে না। শাসন-তন্ত্রে এই দুইটি বিভাগকে পৃথক্ করিবার নির্দ্দেশ আছে বটে, কিন্তু ঐ নির্দ্দেশকে বাধ্যতামূলক এবং কার্য্যকরী করিবার কোন বিধান রচিত হয় নাই। ২৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ৪ নং উপধারায় তাহা আবার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ৪নং উপধারায় বলা হইয়াছে যে, এই ধারায় যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, শাসনতন্ত্র-বিহিত বিধান ব্যতীত উহা স্থগিত রাখা যাইবে না। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ার কারণ ঘটিয়াছে কি না তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব শাসন-কর্তৃপক্ষের। তাঁহারা নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার প্রয়োজনে যে কোন সময়েই বা অতি সামান্য কারণেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে ২৫ নং ধারার অধিকার প্রয়োগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার কেহ থাকিবে না।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা—

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয় গণ-পরিষদে একটি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে প্রথমে বলা হইয়াছে, "সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে না।" ইহার পরেই বলা হইয়াছে,—"কিন্তু যে সকল বিদ্যালয় ধর্ম্মশিক্ষা দানের সর্ত্তে কোন দান বা ট্রাষ্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও ঐগুলির প্রতি এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।" উক্ত অনুচ্ছেদের অপর এক অংশে বলা হইয়াছে,—"কোন শিক্ষায়তনের ছুটির পর উহাতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা-দানে বাধা নাই।" উল্লিখিত বিধানগুলির আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতারা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে মতস্থির করিতে পারেন নাই। যে সকল পরস্পরবিরোধী বিধান তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাহার ফলে কতকগুলি বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে এবং কতকগুলিতে হইবে না।

হিন্দু-পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহু হইলেও বিদ্যালয়ে হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এই দিক্ দিয়া যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়, হিন্দুদের অর্থে ও পরিচালনে চালিত বিদ্যালয়-গুলিই প্রকৃতপক্ষে লৌকিক বিদ্যালয়। কোন ধর্ম্ম-ব্যবস্থাই এই সকল বিদ্যালয়ে নাই। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ মুখে লৌকিক রাষ্ট্রের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যে বিধান রচনা করিলেন, তাহাতে লৌকিক রাষ্ট্র গঠনের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দান নিষিদ্ধ করিয়া

যে মূল ধারা রচিত হইয়াছে, তাহাও বানচাল হইয়া গিয়াছে পরবর্ত্তী উপধারাগুলির দ্বারা। ফলে ভারতের বিদ্যালয়ে খৃষ্টানধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইবে মাত্র। সর্ব্বোপরি বিদ্যালয়ে ছুটির পর কোন সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের কাছে আরও বেশী মারাত্মক বলিয়া মনে হয়। কারণ, হিন্দুদের অর্থে ও পরিচালনায় চালিত বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে ঐ স্কুল-গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় অনায়াসে দাবী করিতে পারিবে। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের এই দাবী পূরণ না করিলে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং লৌকিক রাষ্ট্রের কোপে পড়িয়া বিদ্যালয়টি উঠিয়াও যাইতে পারে।

সর্দ্দারজীর সুভাষিতাবলী

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এই দুইটি দিক্ হইতেই দেশ এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পাদক্ষেপ একবার ভুল হইলেই ধ্বংস অনিবার্য্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, উৎপাদন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ে নাই, একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই ব্যয় বহন করা দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।" উৎপাদন অবশ্য আশানুরূপ বাড়ে নাই, কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এ পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ দাম না কমিয়া বাড়িয়াই

লাটপ্রাসাদে সাংবাদিক সম্মেলন
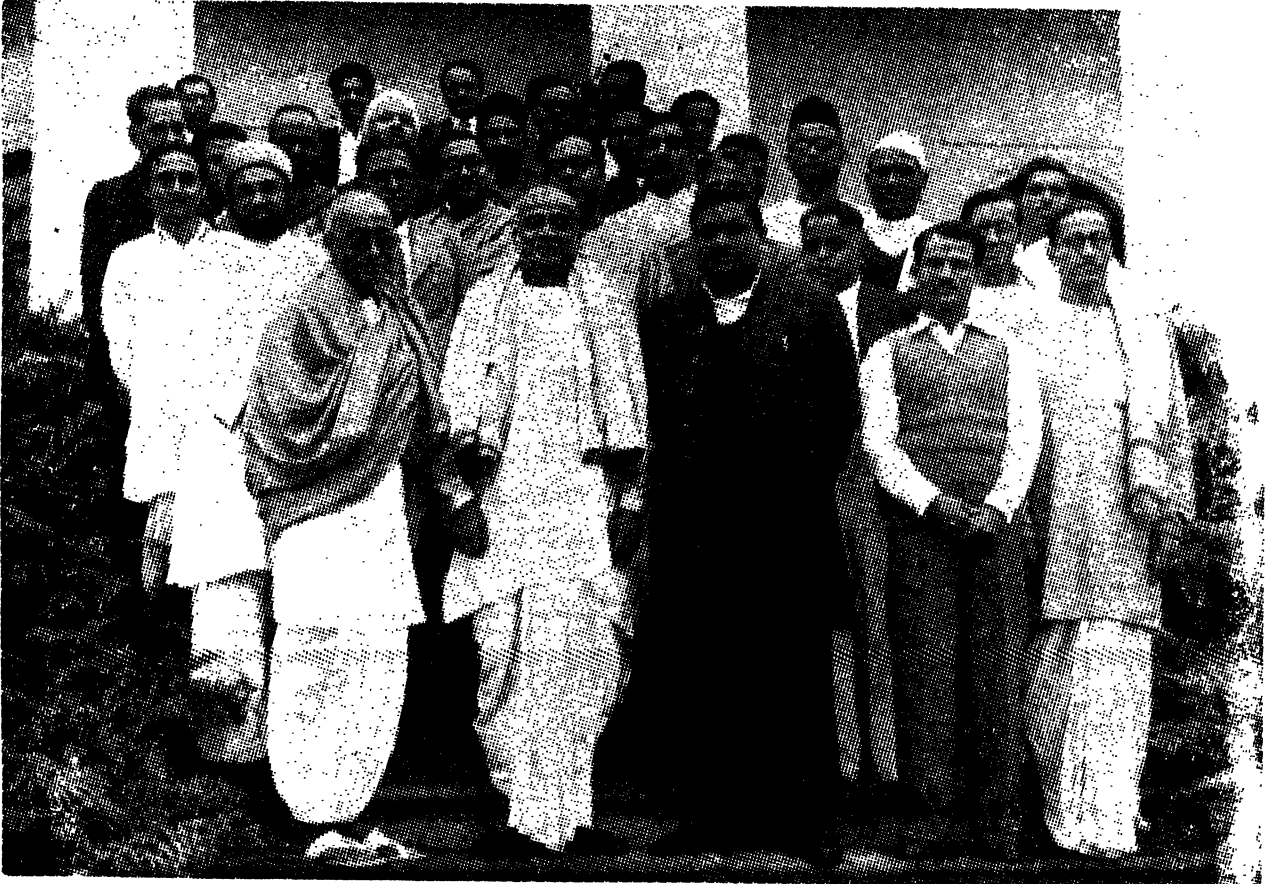
প্রথম সারিতে—(বাম হইতে দক্ষিণে) ভারতের গভর্ণর জেনারেল রাজাজী, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা, শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য (আনন্দবাজার)। দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীসুধীন্দ্রলাল ঘোষ (যুগান্তর), শ্রীঅজিত বসু-মল্লিক (হিন্দুস্থান), শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় (এডভান্স) শ্রী, কে. এন. রামনাথম্ (এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার), শ্রীরমেন গোস্বামী (বসুমতী)। তৃতীয় সারিতে—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস (অমৃতবাজার), শ্রীবিজয় দাশগুপ্ত (যুগান্তর), শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য্য (হিন্দুস্থান), শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য (এসোসিয়েটেড প্রেস), শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (কিশোর), শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগীয় ডিরেক্টর), শ্রীপুণ্যপ্রিয় দাশগুপ্ত (ইউনাইটেড প্রেস), শ্রীসত্যেন সেন (অমৃতবাজার), মিঃ আবদুল গণি (ইত্তেহাদ) প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

চলিয়াছে। সুতরাং উৎপাদন কম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কারণ স্বতন্ত্র।

সর্দারজী জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য তাঁহারা যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন, তাহাতে জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়িবে এবং শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ধনীদের হাতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—"আজ যে সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। আদর্শগত পার্থক্যের জন্য নয়, শুধু নেতৃত্ব লইয়া সংগ্রাম।" সহজ অর্থ এই যে, কংগ্রেস ব্যতীত আর সকল দলই স্বার্থান্বেষী, অতএব জনসাধারণকে অন্য কোন দলে টানিবার অধিকার কাহারও নাই। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাত্মক যুদ্ধে জনসাধারণই দেশরক্ষার দ্বিতীয় ব্যূহ। অন্য কোন রাজনৈতিক দল না থাকিলে কেবল মাত্র কংগ্রেসের অর্থাৎ শাসকদের নেতৃত্বে সজীব প্রাণবাণ ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিবে না।

সর্দার প্যাটেল প্রাদেশিকতারও নিন্দা করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিকতা কি, তাহা বুঝিতে হইলে পশ্চিম-বঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে পাঞ্জাবীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীকে ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হয়। বিহারে ও আসামে যখন বাঙ্গালীকে জোর করিয়া মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ও অসমীয়া ভাষা শিখান হয়, তাহা প্রাদেশিকতা হয় না। কিন্তু বিহারের বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চল দাবী করিলেই প্রাদেশিকতা হয়। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীকে চাকরী না দেওয়া প্রাদেশিকতা নয়, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে বাঙ্গালীরা ট্যাক্সির লাইসেন্স পাইলেই প্রাদেশিকতা হইয়া দাঁড়ায়। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি এবং বাসচালক ও কণ্ডাক্টররা যে রকম দুর্ব্যবহার করে, বাঙ্গালা প্রদেশই তাহা সহ্য করিয়া লয়। অন্য প্রদেশ হইলে তাহাদের কি অবস্থা হইত তাহা না বলাই ভাল।

* * * *

বেনারসের এক জনসভায় দেশের বস্ত্রাভাবের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া সর্দারজী বলিয়াছেন,—"শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মজুরী বাড়াইবার দাবী করিতেছে। বস্ত্রশিল্পের কলকব্জাও বিদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। অবস্থা যদি এইরূপ চলিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতকে আমদানী বস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।" অথচ ভারত সরকারের শিল্পসচিব কিছু দিন পূর্ব্বে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের কাপড়-কলের মালিকদের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় বলিয়াছেন,—"দেশে যে পরিমাণ কাপড় আছে, তাহাতে ঠিকমত বণ্টন হইলে সহজেই দেশবাসীর অভাব মিটিতে পারে।" সরকারী অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য আর একটু কৌশলপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল!

* * * *

গোয়ালিয়রে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দারজী বলিয়াছেন,—"যে সকল মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি নিজ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কেহ মনে করিয়া থাকে যে, মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে, তবে আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন ছিল না।" যে ভাষায় তিনি এই অপ্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচারকার্য্য চালাইবার সুযোগ প্রদান করিবে। পাকিস্তানের কোন

কলিকাতা টেলিফোন কোম্পানীর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে (বাম দিক হইতে) জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভাইস, শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, রাধানাথ দাস, পান্নালাল সারোগী, মিঃ স্মিথ্‌উইথ, মোহনলাল সাহা এবং কনট্যাক্ট অফিসার, আর, এন, বসুকে দেখা যাইতেছে।

সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই ভারতের বুকের উপর একটি পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী তুলিয়াছেন। এই রকম কথায় সেই দাবী দৃঢ়তর হইবে।

*   *   *   *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সঙ্ঘকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। যদি এই সঙ্ঘ না থাকিত, তাহা হইলে পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে একটি হিন্দু ও শিখও জীবিত অবস্থায় ভারতে আসিতে পারিত না। তাঁহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করিতে উদ্যত, এই কথাই তিনি ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। সরকারের এই মনোভাবের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের কোন কোন সেবক সত্যাগ্রহ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—"আমি জানাইয়া দিতেছি যে, এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা আমাদের আছে। সত্যাগ্রহীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সহজ। কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই ধরণের হুমকী দিতেন বৃটিশ শাসকগণ কংগ্রেস সত্যাগ্রহীদের প্রতি।

উপদেশ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুত্ব কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আমরা হিন্দু।" 'আমরা' বলিতে তিনি কাহাদের বুঝাইয়াছেন, জানি না। তবে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, হিন্দুত্ব হিন্দুদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। হিন্দুত্বকে ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দু সাজিবার অধিকার কাহারও নাই।

তার পর উপদেশ দিয়াছেন দেশীয় নৃপতিদের। আজ তিনি পূর্ব্বেকার কুখ্যাত দেশীয় নৃপতিদের ভাল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা পূর্ব্বে ছিলেন ভারতে বৃটিশরাজ কায়েম রাখিবার প্রধান স্তম্ভ। আজও সেই ভূমিকাতেই রহিয়াছেন, কেবল 'বৃটিশ' শব্দটি কাটিয়া 'কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব' বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পরিশেষে অত্যন্ত উদার ভাব দেখাইয়া সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"যদি অধিকতর কার্য্যক্ষম গবর্ণমেণ্ট খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অপসারিত করা যাইতে পারে। যাঁহারা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিব।" কিন্তু দক্ষতার বিচার তো সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়করাই করিবেন? আর পাছে ভবিষ্যতে কোন দক্ষ দল তাঁহাদের গদীচ্যুত করে সেই ভয়েই তো সকল দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। তাঁহার এই সকল উপদেশ লাভে দেশবাসীর মনে কিরূপ ধারণা হইবে, তাহা আলোচনা না করাই ভাল।

ভারত ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি সন্দেহ নিরসনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করার নীতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়াই শুনিয়াছি। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, কংগ্রেসী দলের সদস্যগণ পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করেন। কেহ এই নীতির স্বপক্ষে, কেহ বিপক্ষে। বিপক্ষ দল মনে করেন যে, ভারত যদি কমনওয়েলথের বাহিরে থাকে, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে বেশী। কিন্তু ভিতরে থাকিলে রুশ-পন্থী দলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইবে। উভয় দলের মধ্যে পার্থক্যটা এতই সূক্ষ্ম যে, একমত বলিলে ভুল হইবে না। সংবাদের এক অংশে প্রকাশ যে, গত কয়েক দিনের আলোচনায় যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ নিরসনের জন্য পণ্ডিত নেহরু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। সংবাদের অপর অংশে প্রকাশ, কোন সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে কংগ্রেসী দল কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। সেই জন্য ভারতের প্রজাতন্ত্রী মর্য্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সূত্র বাহির করিবার জন্য দুই গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, নেতৃবৃন্দের ইচ্ছায় ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথেই থাকুক, এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটির প্রেস কনফারেন্স

শীঘ্রই গৃহীত হইবে বলিয়া আশাও প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং হইবেও, কারণ এই গণ-পরিষদের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই মত ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইবে। বিলম্বে এই দুইটি কার্য্য সম্ভব না-ও হইতে পারে। তাহার পর বোধ হয়, ভারতের এবং বৃটেনের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় যুগপৎ এমন কোন ঘোষণা করিবেন, যাহাতে ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে রহিল, ইহা স্বীকৃত হয়। তথাকথিত স্বাধীনতার এই স্বরূপ!

কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশন

কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১৪ই ডিসেম্বর হইতে। ভারত স্বাধীন হইবার পর কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। জয়পুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী স্থির করিয়াছেন:

১৪ই ডিসেম্বর বেলা ৩ ঘটিকায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে কর্তৃক সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন।

১৫ই ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় স্পেশ্যাল-ট্রেণযোগে জয়পুর রেল-ষ্টেশনে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতির আগমন এবং বেলা তিন ঘটিকা হইতে সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভাপতির শোভাযাত্রা।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায় গান্ধীনগরে পতাকা উত্তোলন। বেলা ১০ ঘটিকায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা এবং পুনরায় সাড়ে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

১৭ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা হইতে সাড়ে ১১টা, বেলা ২টা হইতে ৪টা এবং সাড়ে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

১৮ই ও ১৯শে ডিসেম্বর বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন।

এই অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া নয়, স্বাধীন ভারতের শাসন-কর্তৃত্ব আজ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বেরই করতলগত, সেই কারণেই ইহার গুরুত্ব। এই অধিবেশনের প্রস্তাব ও আলোচনার মধ্যে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নীতি কি হইবে, তাহা ফুটিয়া উঠিবে। সোস্তালিষ্ট দল কংগ্রেস পরিত্যাগ করায় কংগ্রেসের ভিতর এমন কোন গ্রুপ নাই, যাঁহারা সাহস করিয়া বৃহৎ নেতৃত্বের নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন। তথাপি নীতি সমর্থন করেন না, এরূপ বহু কংগ্রেসসেবী আছেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা কতখানি নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, তাহা অনুমান করা শক্ত। তবে দৃঢ়তার সহিত নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে না পারিলে শত জাঁক-জমক সত্ত্বেও অধিবেশন মূল্যহীন এবং প্রাণহীন হইবে। ভোটে তাঁহারা হারিয়া যাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৃহৎ নেতৃত্বের নীতিরও যে সমালোচনা হইতে পারে, তাহা স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গের জানা উচিত।

কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বের কার্য্যকলাপ গণতন্ত্রবিরোধী। মুখে তাঁহারা গণতন্ত্রের জয়গান করিলেও সকল বিরোধী দল ধ্বংস করিতে উন্মুখ। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। কেবল স্বদলীয় 'বাহবা'-ধ্বনিতে নিরপেক্ষ ভাবে দেশের কল্যাণ ও গঠনমূলক কাজ করা যায় না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে, কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বও করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কেউ সেই ভুল দেখাইয়া দিলে শোধরান সম্ভব হয়। ইহা ধ্বংসাত্মক কার্য্য নহে, গঠনমূলক কার্য্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহা চান না। অথচ দেশের কল্যাণের জন্য নিরপেক্ষ সমালোচনা একান্ত প্রয়োজন। জয়পুর অধিবেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই কথাটি যদি মনে রাখেন, তাহা হইলে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁহারা অনেকখানি সহায় হইতে পারিবেন। এই অধিবেশনে আর একটি বড় প্রশ্ন উঠিবে কংগ্রেসের সহিত শাসন-কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ লইয়া। এ সম্পর্কে যে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ উঠিয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই জয়পুর অধিবেশনে বিবেচিত হইবে এবং যথাবিহিত নির্দ্দেশও প্রদান করা হইবে।

কংগ্রেসসেবীরা এক দিন ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ত্যাগের পথে যাইতে রাজী নহেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ কাজ গুছাইতে ব্যস্ত। তরুণ-প্রাণ স্বভাবতঃই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়। আজিকার কংগ্রেসের মধ্যে এই আদর্শের অভাবের জন্যই তরুণরা বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগদান করিয়া থাকেন। দেশের তরুণ-প্রাণকে নিজের দিকে টানিতে হইলে অন্য সকল দলকে দমন এবং তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিলে কোন সুফল তো হইবেই না, বরং কুফলই ফলিবে। ত্যাগের ও সেবার আদর্শে তাহাদের মন জয় করিতে হইবে। কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দের এই সত্যটিও মনে রাখিতে হইবে।

বসুমতী-কর্তৃপক্ষের এক ঘরোয়া উৎসবে ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মধ্যে) ও (বাম দিক থেকে) চিত্ততোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখো, মনোতোষ, সত্যবিকাশ বন্দ্যো, বামাপ্রসাদ মুখো, শিবতোষ ও (শেষে) কলিকাতার হাইকোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি

কলিকাতা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার গ্রামে জন্মলাভ করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এস-সি ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস-সি উপাধি লাভ করেন। এম, এস-সি পরীক্ষায় তিনি গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।
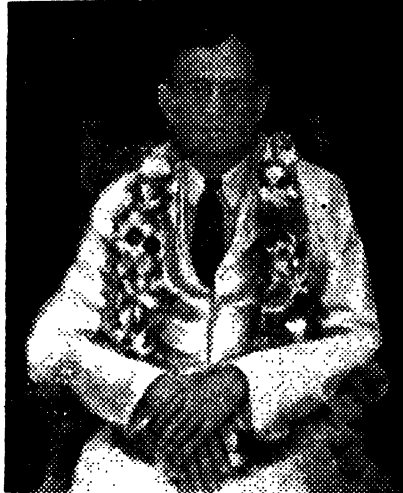
তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে একটি মামলা সম্পর্কে লণ্ডন গমন করিয়া তথা হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী ও কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইনি ব্যারিষ্টারীতে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা যেমনই বিরল ঠিক তেমনই বিস্ময়কর। ধর্ম্মপ্রাণ শম্ভুচন্দ্র নীরবে সমাজ-সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং ঢক্কা-নিনাদী তথাকথিত বদান্যতার বিরোধী। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।

উত্তর-কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-পরিবারের ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা আগামী বৎসরের (১৯৪১) জন্য কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এই পরিবার হইতে মোট ছয় জন শেরিফ নিযুক্ত হইলেন। প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা ব্যতীত ডাঃ লাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর, পশ্চিম-বঙ্গের শিল্প-বোর্ডের চেয়ারম্যান, পশ্চিম-বঙ্গ শিক্ষা কমিটির সদস্য এবং কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কলিকাতা পোর্টের কমিশনার এবং বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সভাপতি ছিলেন।

শোক সংবাদ

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিজিটিং সার্জ্জন ডাঃ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ অল্প দিন রোগ ভোগের পর গত ২রা নবেম্বর রাত্রে প্রিন্স অফ ওয়েলস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষ ছাত্র-জীবনে বি[illegible]ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯২১ সালে তিনি প্যাথলজি ও ফা[illegible]কোলজিতে অনার্স সহ এম, বি প[illegible]ক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ড গিয়া ১৯৩৪ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. আর, সি, এস পরীক্ষা পাশ করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলার ষ্টেট মেডিক্যাল ফেকাল্টির সার্জ্জারী ও এনাটমির পরীক্ষক ছিলেন।

তিনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ এণ্ড কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পরলোকগত ডিরেক্টর রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র। তিনি বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী মায়ারাণীকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী, একটি শিশু কন্যা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ও অনুরক্ত ছাত্রকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ছাত্র নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শবানুগমন করেন।

গত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জে, এন, ব্যানার্জ্জি এল, এম, এস, ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ ব্যানার্জ্জি তাঁহার কর্ম্ম-বহুল জীবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসার ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিখিল বঙ্গ হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন সংগঠনের ব্যবস্থা হয়। তিনি কয়েক বৎসর এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ভারতে হোমিওপ্যাথি যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় তজ্জন্য তিনি মৃত্যুকাল অবধি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক হানিম্যানিয়ান সোসাইটির ভারতীয় শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক হোমিওপ্যাথি লীগ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। ডাঃ ব্যানার্জ্জি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, পাঁচ কন্যা, ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দণ্ডায়মান ঃ বাম দিক হইতে—উডবার্ণ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সার ফিরোজশাহ মেটা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন [illegible]

উপবিষ্ট ঃ বাম দিক হইতে—টি, পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, আয়েঙ্গার, দ্বারবঙ্গের মহারাজা, দাদাভাই নওরোজী, রাসবিহারী [illegible]

"হাতীকে ছাড়িয়া দিলে সে চারিদিকের বৃক্ষাদি ভাঙ্গিতে থাকে, তাহার মস্তকে ডাঙ্গস মারিলে স্থির হয়, এইরূপ মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানা কুচিন্তা করিতে থাকে, বিবেকরূপ ডাঙ্গস মারিলে মন সুস্থির হইয়া থাকে। ধ্যানেতে মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য হাততালি দিয়া কিয়ৎক্ষণ হরিবোল হরিবোল বলিবে। গাছের তলায় দাঁড়াইয়া হাতে তালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়িয়া যায়, সেইরূপ তাহাতে মনোবৃক্ষের অন্য চিন্তারূপ পক্ষী সকল উড়িয়া যায়।"

"সতী স্ত্রী বিদ্যার শক্তি; তিনি আপন স্বামীকে বিষয়সুখের জন্য লালায়িত দেখিলে সাবধান করিয়া বলেন, ছি ছি জঘন্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর। মন্দ স্ত্রী অবিদ্যার শক্তি, সে ভগবদ্ভক্ত পতিকে সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে।"

"লোকে পৃথিবীর শোভা কামিনী প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হয়। যিনি পৃথিবী সৃজন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহে না। প্রায় সকলেই বাগান ও পরির মূর্ত্তি দেখে ভুলে যায়, যাহার বাগান ও পরির মূর্ত্তি তাঁহাকে অতি অল্প লোকই দেখিতে চায়। স্ত্রীলোকেরাই পরি, তাহারা মোহিনী মায়া। মেয়ে আর মায়া এক। অবিদ্যারূপ মেয়ে কাল সাপের ন্যায় পুরুষের চৈতন্য হরণ করে। কিন্তু যাঁহারা প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক মেয়ে জগজ্জননীর প্রেরিতা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইলবর্ট বিল ও লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল হইবে এই যে, লোকেদের মধ্যে পলিটিক্যাল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে, লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনষ্টিটিউসানেল হিষ্ট্রী পড়া, ইংরাজি বক্তৃতার শিলা-বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে পলিটিক্যাল এডুকেশন প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি, ঐ সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ব লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না।"

"আমাদের চারিদিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারও সাড়া পাই না, কেহ কাহারও সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ। আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে; কেন করিতে হইবে? না, সহরের কলেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন, তাহাই মনে করা উচিত।"

"আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে, চারিদিকে স্বদেশীয়েরা সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে। তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতার কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রমরক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব, স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কি, আস্ফালনই বা কি। আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা agitate করিতে যাইব?"

"স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কলকৌশল, ধূর্ত্ততা, চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাকে গম্য স্থানে পৌঁছাইতে যদি বিলম্ব হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুড়ঙ্গ-পথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।"

"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি চর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপট চিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের

বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া যায় ; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে, দুদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগ-স্বীকারের সময় আসে, ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত থাকি, তারপরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হৌক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধূমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে, ধৈর্য্যসাধ্য কাজে হাত দিতে তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শত জীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে---তাহারা কি মনে করিবে ?"

—ভারতী, ১২৯১

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোট্ট একটি গ্রাম, ছোট্ট নদীর তীর,—
যেখানে এক মেলা লক্ষ লোকের ভীড়।
কিসের লাগি মেলা ?, কার লাগি উৎসব ?
কোন সে মহাত্মার প্রাপ্য এ গৌরব ?
কোন্ সে দিগ্বিজয়ীর জয়ের স্মরণ-তিথি ?
কোন্ বা মহারাজার বহন করে স্মৃতি ?

বৃদ্ধজনেক কয়, শুনুন মহাশয়।
সামান্য এক লোক, বড় কেহই নয়।
লোকটি ছিল ভাল, লোকটি ছিল খাঁটি,
একাই ছিলেন তিনি উজল করে গাঁটি।
শিক্ষা দিলেন তিনি 'হিংসা করা পাপ'
করলে প্রাণী বধ আসবে অভিশাপ।
গ্রামে যে সব পাখী আছে এবং আসে,
কুলায় যারা বাঁধে বাড়ীর চারি পাশে,
রক্ষা সবাই করো, রক্ষা করাই চাই
তাহার চেয়ে বেশী পুণ্য কিছুই নাই।
গ্রামের অধিবাসী তখন থেকে আর
বধ করে না পাখী ভাবছে আপনার।
গ্রামের প্রতি ঘরে, গ্রামের প্রতি গাছে,
আনন্দেতে সব কুলায় বেঁধে আছে।
দুষ্ট শিশুটিও মারবে নাকো ঢিল—
জানে, পাখীর দল ভয় করে না তিল।
হেথা সবাই থাকে যেন মায়ের কোলে—
ওই যে তেঁতুল গাছে হাজার বাদুড় দোলে।

কেল্লে দীঘি ছেয়ে বুনো হাঁসের ঝাঁক,
পাড়ায় পাড়ায় শুনুন পাপিয়াদের ডাক।
অযুত কাকের ডেরা বেণুর বনে বনে,
মিলায় বাঁশের ডগা পুকুর-জলের সনে।
দেখুন বকুল-শাখায় উপনিবেশ বকের,
'বটে' হরিয়ালের শিবির কত সখের।
তালের প্রতি শাখায় বাবুই বুনে বাসা,
থাকে কুলের গাছে টুনটুনি দল খাসা।
পড়বে যখন বেলা দেখতে পাবেন গ্রামে—
জোড়মাণিকের দল জোড়ায় জোড়ায় নামে!
এই যে গ্রামের শোভা এই যে বিশিষ্টতা,
স্মরয়ে তা'রা শুধু একটি লোকের কথা।
ছিলেন নাকো ধনী, ছিলেন নাকো বীর,
পরাক্রমে তাঁর হয়নি কেউ অস্থির।
নন কো মুনি-ঋষি—কিন্তু তিনি সব
দেবের মত প্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব!
জীবনে তাঁর কেহ লক্ষ্য করে নাই
করছে স্মৃতি-পূজা লক্ষ লোকে তাই।

আলডুস হাক্সলি

বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলি এবং কবি ম্যাথু আরনল্ড, দু'জনেরই রক্তের ধারা বহন করেছেন দার্শনিক সাহিত্যিক আলডুস হাক্সলি। কবি এলিয়ট ও নাট্যকার ইসারউডের সমসাময়িক হাক্সলি, চিন্তা-ধারায় একই গোত্রের। আজকের দিনে ইউরোপ ও আমেরিকা যে পথে এগিয়ে চলেছে তার প্রতি এঁদের সকলেরই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি। বস্তুবাদী সভ্যতার তাগিদে পশ্চিম দেশগুলি যে ভাবে বিজ্ঞানকে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের জন্য ব্যবহার করছে, তার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক হাতিয়ার কঠিন করে ব্যবহার করছেন তাঁরা। ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে জিজ্ঞাসাকে টুঁটি টিপে মেরে কোন দেশের সরকারই যে সমষ্টিগত মানুষের সত্যকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না, তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং সে কথা প্রচার করেছেন পবিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে।

কেউ বলে হাক্সলির পতন ঘটছে, কেউ বলে আত্মোপলব্ধির দ্বারা তিনি জীবনের বৃহৎ তত্ত্বকে আয়ত্ত করার সাধনায় মগ্ন হয়েছেন।

আর হাক্সলি বলেন, 'পশ্চিম দেশগুলির পক্ষে ভারত-তীর্থের পথ আজো চীনের মৃত্তিকার উপর দিয়ে। তাও, বৌদ্ধ এবং জেন বৌদ্ধধর্মের সাধনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে তবেই বেদান্ত অধ্যাত্মবাদে আমাদের মনস্থির হতে পারবে।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের ইতিহাস যে ভাবে বিকৃত হয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে বর্তমান যুগের একান্ত অজ্ঞতা নিয়ে হাক্সলি গভীর বেদনা বোধ করেছেন। মানব-সভ্যতার বিবর্তন আমরা ঠিক ভাবে ধরতে পারিনি, এই কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'অজ্ঞতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তির উপর নির্ভর করেই ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিকই সেই হিসাবে মিথ্যাকারী। অন্ধ-সংস্কার যুগের কথা আমরা আলোচনা করি, যে সময় মানুষ ডাইনীর ক্ষমতায় বিশ্বাস করত এবং শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ের চেষ্টা করত। আসলে কার্য-কারণ নিয়ে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ি। সমগ্র একটা যুগকে আমরা ঐতিহাসিক মুহূর্তের মুঠির মধ্যে ধরে নিয়ে বিচার করি। আমরা বলি যে অমুক যুগে এই নিয়ে ঐ নিয়ে মানুষের মন বিব্রত ছিল, যেন সত্য ভাবে সেই যুগের কথা আমরা সব কিছু জেনে ফেলেছি। মূল নিবন্ধগুলি আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত, তবেই না আমরা জানতে পারব যে 'রোমান ও বর্বর,' 'ক্যাডেলিয়ার ও রাউণ্ড হেড' সম্বন্ধে আমাদের বিচার কত ভ্রান্তিপূর্ণ। আর ইতিহাস রচনা করা যদি প্রায় অসম্ভবই হয় (কেন না, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তথ্য নিয়ে যে ইতিহাস তা হেরোডোটাস ও গিবনসের মতই মিথ্যা ইতিহাস এবং সেই ইতিবৃত্তে সেই বিশেষ যুগের ভাবধারা ও আদর্শের যথার্থ স্বাক্ষর থাকতে পারে না), তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আরো কত দুরূহ।'

বর্তমানে হাক্সলি হলিউডের জন্য চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু সে ভিন্ন আরো দু'টি রচনায় তিনি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন এবং সেই সম্বন্ধে পড়ছেন ও চিন্তা করছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফ্লোরেন্স নিয়ে তিনি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করছেন তার চরিত্রাংশে আছেন বোকাসিও, সিয়েনার সেন্ট ক্যাথারিন এবং স্যার জন হকউড। আর একটি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নিয়ে গবেষণা করছেন তা হোল বুদ্ধের মূর্তি ভাস্কর্য। ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে সুরু করে এই ভাস্কর্য কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে নিজের গবেষণা প্রতিষ্ঠা করতে হাক্সলি শুধু যে আশ্চর্য উৎসাহী তা নয়, সমগ্র শরীরের ব্যঞ্জনায় তিনি কি অপূর্ব ভাবে নিজের বক্তব্য বোধগম্য করে দিচ্ছিলেন শ্রোতার কাছে তার সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন 'হোরাইজন' পত্রিকার সম্পাদক।

নিজের জীবনের পথে হাক্সলি এক আশ্চর্য তীর্থ-পরিক্রমায় এগিয়ে চলেছেন। তাঁর তরুণ জীবনের শিক্ষা তাঁকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল উত্তর-জীবনে তিনি তা হননি। গুণী অধ্যাপক, বৃটিশ কাউন্সিলের ধুরন্ধর সদস্য অথবা রাষ্ট্রসেবার পুরস্কার স্বরূপ নাইটত্ব, সে সব দিক্ দিয়ে তিনি গেলেন না। সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর সমস্ত রচনায় অনবদ্য জীবন-শিল্পের ছাপ রেখেছিল, তা থেকে তিনি সরে এসেছেন পরে। পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, ক্রোম ইয়োলো, দোজ ব্যারেণ লিভস, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড রচয়িতা হাক্সলি নিশ্চিত ভাবে বিবর্তিত হয়েছেন জীবনে ও সাহিত্যে। আজ তিনি এক জন ধর্ম-সংস্কারক, চিন্তানিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী। হলিউডের চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করছেন।

হাক্সলির জীবনের যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছিল বারো বছর আগে তার একমাত্র কারণ সমসাময়িক য়ুরোপ আমেরিকার জীবনবাদী বিপ্লব। যে সব চিন্তা সামগ্রীকে পৃথিবী যুগে যুগে আহরণ করেছে এবং সযত্নে রক্ষা করে এসেছে, তার যথার্থ মূল্য যখন দিতে চাইল না রাষ্ট্র তখনই চিন্তাশ্রয়ীদের মধ্যে শিবির ভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সে এঞ্জেলসের এক ক্ষুদ্র মরুভূতে হাক্সলি আত্মনির্বাসনে গেলেন। সেই সময় থেকেই আপন সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়ে আছে হাক্সলি।

আজ তিনি ইউরোপকে ভালও বাসেন, ঘৃণাও করেন এবং দুই-ই ঐকান্তিক ভাবে। তার মধ্যে তাঁর কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। বার্টাণ্ড রাসেলের পর এত বড়ো তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক আসেননি বলে অনেক সমালোচকের মত, কিন্তু আপন জীবনে অধ্যাত্মবাদকে উপলব্ধি করার সাধনায় হাক্সলি যেন তার পূর্বগামীদের পিছনে রেখে আগে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে হাক্সলির মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আরো প্রখর হয়েছে। সমস্ত অবয়বে এসেছে শান্ত শ্রী। স্নিগ্ধ ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ করে দেন সকলকে। এক দিন তাঁকে দেখে সবাই বলত—'আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক'। আজ যারা তার কাছে গিয়ে বসে, তার কথা শোনে, তারা বলে, 'কি শান্তশীল মানুষটি!' পৃথিবীর তুচ্ছতাকে হারিয়ে দিয়ে তিনি চিত্তলোকে অগাধ শান্তি ভোগ করছেন এবং সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তির পথ চিন্তা করছেন। সত্যাসত্যের চিরকালীন সংঘর্ষে যে ভাবে মানুষের চেতনা আপন কল্যাণ থেকে, সত্য থেকে, আনন্দ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে, তা নিবারণের উপায় আবিষ্কার করার জন্য সাধনা করছেন যোগী।

মৎস্যভোজী হাক্সলি মাংস স্পর্শ করেন না। মদ্যপান করা ত্যাগ করেছেন। সকাল সকাল শয্যাগ্রহণের নিয়ম-নিষ্ঠা তাঁর শরীর-মনকে উপকৃত করেছে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। অথচ হলিউডের বড়ো বড়ো প্রযোজকরা বহু সময় তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হন। আপাত দৃষ্টিতে হাক্সলিকে যেন সমসাময়িক পৃথিবী সম্বন্ধে একান্ত উদাসী বলে ভুল হয়। কিন্তু মানুষটির শান্ত সুন্দর উজ্জল অথচ নিরাড়ম্বর

পরিচয়ের অন্তরালে গোপন আছে একটি সচেতন সত্তা। বর্তমান যুগের যত কিছু সমস্যা মানুষকে আর্ত করছে তার কোনটিই তাঁর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী-দৃষ্টির অগোচর নয়।

পৃথিবীর বহু বৎসরের ইতিহাসে মানুষের সভ্যতার যে সংঘর্ষময় অগ্রগতি হয়েছে, তার চরম বিপন্নতা আজকের মত এমন প্রত্যক্ষ হয়নি কোন দিন। ব্যক্তি হয়েছে সমষ্টির হাতের ক্রীড়নক। অগ্রগতির নামে সেই সব জীর্ণ বস্তু প্রথারই প্রবর্তন হচ্ছে যা একদা বিশ্ব-শান্তিকে খণ্ডিত করেছিল। জাতীয়তার নামে এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রই জনসাধারণকে বর্তমানের দুঃখ-দৈন্য ও অভাবকে মেনে নিতে বলছে এবং সেই ভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার চক্রান্ত করে চলেছে। বর্তমান সভ্যতার এই কৃত্রিমতা ও ধাপ্পাকে হাক্সলি তার লেখনী-মুখে তীক্ষ্ণ যুক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন।

● আলডুস হাক্সলির সাম্প্রতিক ছবি

বিংশ শতাব্দীতে আমরা আবার দেখছি ক্রীতদাস ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন, পীড়ন, বলপূর্বক স্থানচ্যুতি, মতবাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং সব-কিছুর উপর কড়া সেন্সর। গত আড়াই হাজার বৎসরের ন'শ জাতিগত লড়াই ও ষোলো-শোর অধিক ঘরোয়া-দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত ঘেঁটে অধ্যাপক সোরোকিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান শতাব্দীই হোল পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত যুগ এবং গত পঞ্চাশ বৎসরে যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমরা প্রগতির অলীক স্বপ্ন ত্যাগ করছি না।

বর্তমান যুগের দু'টি সর্বশ্রেষ্ঠ ধাপ্পা হোল প্রগতি ও জাতীয়তা। প্রথমটির বক্তব্য হোল, স্বর্গ অনন্তসীন নয়, স্বর্গ ভবিষ্যৎ কালের গর্ভে নিহিত। এই তত্ত্ব থেকে একনায়করা, (যাঁরা অতি মাত্রায় প্রগতিবাদী) তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমান কাল হোল সেই ভবিষ্যৎ কালে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ মাত্র এবং সেই মহিমামণ্ডিত, (একান্ত অলীক) বলিষ্ঠ নূতন পৃথিবী যার পত্তনী হয়ত বাস্তব হবে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে, তার জন্য মানুষকে দাস করা চলবে, আইনের সাহায্যে পীড়ন করা চলবে এবং প্রয়োজন বোধে তাদের স্বার্থ বলি দেওয়া চলবে।

প্রগতির ধাপ্পার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত যে জাতীয়তার ধাপ্পা, তা আরো বিপজ্জনক, কেন না, তার বক্তব্য হোল ঈশ্বর ব্যক্তিগত মানুষের অন্তর্বাসী নন, সার্বভৌম রাষ্ট্রেই তাঁর অধিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্র হোল দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের নামে জনসাধারণকে সে দ্রব্যের মত যেমন খুশী ব্যবহার করা চলতে পারে।

সাধারণতঃ এই সকল ধাপ্পা যুক্তির দ্বারা সারবান নয়, পরিকল্পনার দ্বারা পুষ্ট। যে সকল দেশে জাতীয় অর্থনীতি রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে প্রগতির ধাপ্পার প্রতীক হোল পরিকল্পনা। 'আজ তোমার দৈন্যদশা, কিন্তু বর্তমান দুর্গতির বিনিময়ে আমাদের পঞ্চ-বার্ষিকী, দশ-বার্ষিকী অনিশ্চিত বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ সম্পদ একান্ত নিশ্চিত।' ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্য এ সকল পরিকল্পনার বালাই নেই। সেখানে প্রগতির ধাপ্পার পরিচয় মেলে জনপ্রিয় পত্রিকার পৃষ্ঠায়।
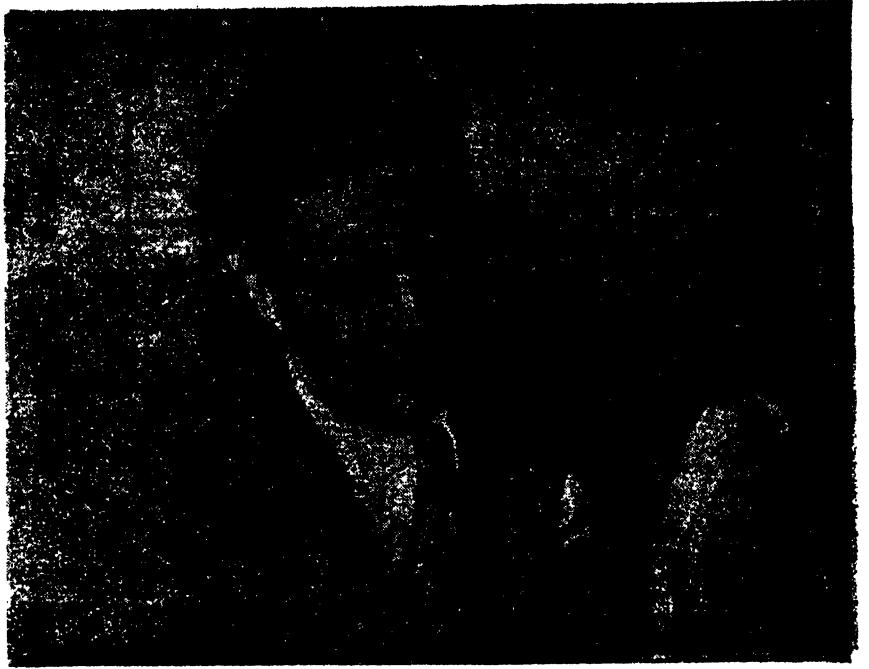
এ সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে হাক্সলি লিখেছেন—'প্রগতির জনপ্রিয়তা এই প্রকাণ্ড যুক্তিহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে কিছু না থেকেও কিছু পাওয়া সম্ভব।' কিন্তু এই পৃথিবীতে (একমাত্র দান ভিন্ন) আর সব কিছুর জন্য দাম লাগে। মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লাভ ও উন্নতির জন্য মূল্য দিতে হয়। কখনো বা সে মূল্য কিছু কম, কখনো বা সে মূল্য এত অধিক যে বর্তমান সুবিধাগুলির চেয়ে অসুবিধাগুলিই হয়ে ওঠে প্রধান। কৃষিতে, বনজ সম্পদে, যন্ত্রশিল্পে এবং ভূসম্পদের উত্তোলনে আমরা কি পরিমাণ উন্নতিশীল তার পরিমাপ হোল ওজনে এবং বিনিময় মূল্যে। কিন্তু রক্ষণশীল-গোষ্ঠী এই যুক্তি প্রদর্শনে ক্লান্ত নন যে সেই উন্নতি আমরা লাভ করছি প্রকৃতিকে শোষণ করে। মৃত্তিকাকে দেউলে করে এবং প্রকৃতির অপূরণীয় সম্পদকে মাত্র কয়েক শতাব্দীতে নিঃশেষ করে আমরা সেই উন্নতি লাভ করছি।'

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সংকটে মানুষের জীবন যে ভাবে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিয়ে হাক্সলি ইউরোপীয় সমাজকে বলেছেন—'অসুস্থ সমাজ।' মানুষের জীবন ও চিন্তা যে নৈসর্গিক পরিবেশে সহজে বিকশিত হতে পারে, বর্তমান যান্ত্রিক আবেষ্টনীতে তা সর্বদিকে বিনষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। নব নব ঔষধের উদ্ভাবনে যেমন নানা রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে মানুষ, তেমনি এই অসুস্থ জীবন-ব্যবস্থায় ট্রাজেডীতে সে নিয়ন্ত্রণ

ক্লান্ত হচ্ছে। আজকের দিনে ইউরোপ-আমেরিকার সমাজে নারী-পুরুষ এমন বিচিত্র বিবিধ মনোবিকারে পীড়িত, যার কোন ধারণাই ছিল না আমাদের পূর্বপুরুষদের। আর সভ্যতার রোগ ত বর্তমানে মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।

তথাকথিত বস্তুবাদীরা বিশ্বাসই করেন না যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বেদী এবং সেখানে তিনি নিত্য বিরাজমান। তাই বাহিরের জগতে ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে দিয়ে তারা জনসাধারণের চিত্ত জয় করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার দ্বারা যে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, তা তারা বিস্মৃত হন।

আসলে আপন অন্তর্লোককে পরাজিত করে এই যে মানব-সমাজের প্রগতির ধুয়া তা কোন কালেই জয়ী ও সার্থক হতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই উদাহরণ প্রচুর। হাক্সলি তাই প্রচেষ্টাকে পরিহাস করে লিখেছেন—'রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রগতির আর এক সোপান বলে যা মনে হয়েছিল, সেই আমাদের কৃতকর্মের কত দাম আমরা দিলাম, তা আমরা আবিষ্কার করি পরে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেমস মিল স্থিরবিশ্বাসী হয়েছিলেন যে যদি প্রত্যেক নরনারী লিখতে পড়তে শেখে, নির্বাচনে যুক্তি ও সততা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বজায় থাকবে। মিলের পর দু'টি যুগ অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা হোল। কিন্তু তার ফল কল্যাণপ্রসূ হোল না। বরং ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর দিক দিয়ে এই সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসার অত্যাচারী শাসকশ্রেণী, সমর-নায়ক ও কুযুক্তি প্রচারকদের হাতের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।'

ষোলো বছর আগে ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড রচনা করেন যখন তখন তিনি বৈজ্ঞানিকের কল্পিত এক নূতন পৃথিবীর কথা লিখেছিলেন যেখানে মেয়েরা সন্তান-প্রসবের মধুর বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, কেন না টেষ্টটিউবে দক্ষ বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন মত শিশু জাত হতে পারবে। মানুষের বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা হবে নানা বৈজ্ঞানিক ঔষধ, হরমোন ও ট্যাবলেটের দ্বারা। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে আর এক নূতন শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হবে এবং সেই শ্রেণি-স্বার্থের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষ থাকবে, কেন না, মানুষ নিয়ন্ত্রণ তখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে। প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ হবে রাষ্ট্রের বেদীতে নিবেদিত। অতি শিশুকাল হতেই তার অবচেতন মনের মধ্যে সেই সব চিন্তা, বোধ এবং কর্মপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া হবে যা ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্র তার কাছে দাবী করবে। ভয়, সংশয় এবং নীতির বালাই থাকবে না।

ষোলো বছর পরে আর এক হাক্সলি লিখেছেন—'আমার উপন্যাসে যে জগতের কল্পনা ছিল তার কাল ছিল ছ' শতাব্দী পরে। আজ মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী বন্যা এবং ব্যাপক মহামারীর হাত থেকে মানব-সমাজ যদি কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করতে পারে, তবে অনতিদূর ভবিষ্যতেই সেই নূতন জগতের অবতারণা ঘটতে পারে। গত ষোলো বৎসরে কেবল যে যান্ত্রিক টেকনিকই যথেষ্ট উন্নত হয়েছে তা নয়, জাতীয় সরকারদের কর্তৃত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসাধারণের মঙ্গলের অজুহাতে সেই কর্তৃত্ব অবাধে চালনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে।

হাক্সলি তাই বলছেন যে, সুস্থ মানব-সমাজ সৃষ্টি করাই যদি আমাদের বাসনা ও কর্তব্য হয়ে থাকে এবং এই সুন্দর পৃথিবীতে আনন্দের সঙ্গে বাস করা এবং ভাবী সমাজের জন্য সুন্দরতর পরিবেশের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়াই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সব প্রকারের ধাপ্পাবাজী থেকে আমাদের নিরস্ত হতে হবে। ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধি যদি না ঘটে তবে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হতে পারে না এবং পৃথিবীর চিরস্থায়ী শান্তির স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে না।

তাই তিনি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছেন আরো গভীর ভাবে যার দ্বারা তিনি সমগ্র মানব সমাজকে জানতে পারেন এবং সেই ভাবে এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্য মন্থন করে পরম সত্যকে আবিষ্কার করতে পারেন।

নিজের জীবনবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে হাক্সলি বলেছেন—'কোন মাধ্যমকে অবলম্বন না করেই বহু মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌছবার চেষ্টা করেছে যুগে-যুগে। সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছেন সর্বধর্ম-প্রতিষ্ঠানেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের, তাদের এক জন হওয়া বড়ো দুরূহ সাধনা। ডাক পড়ে ত অনেকেরই, কিন্তু নির্বাচিত হন বড়ো অল্প।'

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'এ অত্যন্ত শুভ নিদর্শন যে বর্তমানে রোম-গীর্জা প্রাচ্যধর্ম নিয়ে আরো অধিক গবেষণা করছেন।...পশ্চিম ভূখণ্ডের পক্ষে ভারত-তীর্থের পথ আজো চীনের মৃত্তিকার উপর দিয়ে। তাও, বৌদ্ধ ও জৈন বৌদ্ধধর্মের সাধনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে তবেই বেদান্ত অধ্যাত্মবাদে মনস্থির হবে।'

বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক—সাহিত্যিক হাক্সলি তাই যোগীর আসনে বসেছেন। বেদান্তের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি।

ভারতায় চিত্রকলার চরম সঙ্কট

"The true beauties of art are eternal—all generations will accept them; but they wear the habit of their century."—DELACROIX.

রূপানন্দ গুপ্ত

চিড়িয়াখানা আর চারুকলা—এই দু'টো জিনিসই ক্রিস্‌মাসের মরশুমে কলকাতা শহরে হঠাৎ যেন একটা যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে সকলের মনে। চিড়িয়াখানার বাঘ-ভাল্লুক, বাঁদর-শিম্পাঞ্জীগুলো এই সময় যে হঠাৎ মনের আনন্দে হুংকার ছাড়ে বা কিচির-মিচির করে তা নয়, কোন দৈহিক রূপান্তরও তাদের ঘটে না। আর পৌষ মাস এমন একটা মাসও নয় যে, শিল্পীদের প্রেরণার উত্তাপ খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে যাবে। তাহলে হঠাৎ এই পৌষ মাসের ক্রিস্‌মাসের সময় হাজার হাজার লোক চিড়িয়াখানায় যায় কেন, আর চারি দিকে চারুকলার প্রদর্শনীরই বা এ-রকম হিড়িক লাগে কেন? প্রত্যেক পথচারীর মনে এই প্রশ্নটা জাগা খুবই স্বাভাবিক। উত্তরটাও খুব সোজা।

কলকাতা শহরটাকে ক্রিস্‌মাসের সময় মদের বোতল, হোটেলের হুল্লোড়, ফিরিঙ্গি মেমসাহেব, ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে চাঙ্গা করে তোলার কৃতিত্বটা পুরোপুরি ইংরেজ সাহেবদেরই প্রাপ্য। সারা বছর রাজদণ্ড ধারণ করে ক্লান্ত হয়ে ইংরেজ রাজপুরুষরা এই সময় কয়েকটা দিনের জন্যে কলকাতা শহরে আসতেন ত্রিমকারের সাধনায় ক্লান্তি দূর করতে। তাঁদের পিছু-পিছু রাজভক্ত পোষা দেশী কুকুরদেরও আমদানি হত কলকাতায়। নেটিভ ষ্টেটের মহারাজা, মহারাণী, নিজাম, বেগমসাহেবা, রাজা-বাদশাহ, নাইট-কমাণ্ডার-কর্ণেল-কাপ্তেন, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর সকলেই একে-একে এসে কলকাতার হোটেল, বাগানবাড়ী, রাজবাড়ীগুলো দখল করে বসতেন। হীরে-মুক্তো-জহর-পান্নার দোকান ঝলমলিয়ে উঠতো, জুতো থেকে শীতের হরেক রকমের পোশাক-পরিচ্ছদে ছেয়ে যেত দোকান-বাজার। জুয়োখেলার কার্নিভাল, ঘোড়দৌড়, কুত্তাদৌড়, সার্কাস, চিড়িয়াখানা চতুর্দ্দিকে গজগজিয়ে উঠতো। পিপে পিপে স্কচ, হুইস্কি রম্ জিন্ উজাড় হয়ে যেত। রাত দুপুর পর্য্যন্ত ক্যাবারেনর্ত্তকীর নাচ আর গিটারবাগের আওয়াজ শোনা যেত চৌরঙ্গীতে, শহরতলীর বাগান-বাড়ীতে। রঙচঙে, চকচকে স্ত্রীলোকদের বগলে করে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে যেত শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ট্যালবট পণ্টিয়াক্। গোটা কলকাতা শহরটা এমন একটা বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করত, যাকে স্বচ্ছন্দে আপনি "গ্র্যাণ্ড কার্নিভাল" বা "গ্র্যাণ্ড সার্কাস" বলতে পারেন। এই ছিল ক্রিস্‌মাসের কলকাতা।

কার্নিভাল, সার্কাস, জুয়ো, ঘোড়দৌড়, হোটেল, বাগান-বাড়ীর নাচ-গান খানা-পিনা নিয়ে মশগুল ক্রিস্‌মাসের কলকাতায় কেন যে জন্তু-জানোয়ারদের চিড়িয়াখানা, চিত্রশিল্পীদের চারুকলা-প্রদর্শনী এবং সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের যাবতীয় কনফারেন্স এতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতো তা এখন যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন। এত বড়-বড় সাহেব মেমসাহেব, এত রাজা-মহারাজা, নিজাম, বাদশাহ, আমীর-অমাত্যের ভীড় আর অন্য কোন সময় কলকাতায় হত না। এই সব লাট-বেলাট রাজা-মহারাজার মনোরঞ্জন ও পুলক-শিহরণের জন্যেই আমাদের দেশের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন, বিশেষ করে সঙ্গীত ও শিল্পকলা। তাই এঁরা যখন শহরের কয়েকটা দিন লুঠতে আসেন তখন এঁদের পৃষ্ঠপোষকতার আশায় কনফারেন্স ও এক্জিবিশনের ব্যবস্থা করা হয়। বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস ও কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন এঁরাই, চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এঁরাই গুরু-গম্ভীর রায় দেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য ও রসাস্বাদনের জন্মগত অধিকার এঁরাই পান। বাইরের যে বিশাল জীবন্ত সমাজ, যে বিপুল বাস্তব জীবন, যে অগণিত জনসাধারণ তারা সব এঁদের বিচারে স্থূল, নীরেট প্রস্তরখণ্ড মাত্র। আমাদের চিত্রশিল্পী ও সুরশিল্পীদের কাছেও তাই। সেই জন্যই সাধারণ সামাজিক মানুষের কাছে এই সব কনফারেন্স, আর্ট এক্জিবিশন, সঙ্গীত সম্মেলনও যা, আর ঐ চিড়িয়াখানা, গ্রাণ্ড সার্কাস আর কার্নিভালও ঠিক তাই। কারও কোন বৈশিষ্ট্য, কোন পার্থক্য বা কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। চারুকলার প্রদর্শনীও যা, চিড়িয়াখানাও তাই; সঙ্গীত-সম্মেলনও যা, বাঁদরের কিচিরমিচিরও তাই; বড়-বড় কনফারেন্স এবং তার জরাজীর্ণ বাণী-বক্তৃতাও যা, এসিয়ান সার্কাসের ভেলকি খেলাও ঠিক তাই। সবই হাস্যকর মজার ব্যাপার, ক্রিস্‌মাস ফান্।

আগে ডোম বাগে ডোম··· —অনাথবন্ধু সেন

মজুর —তাপস দত্ত

একাডেমী অফ ফাইন আর্টস

প্রত্যেক বছর ক্রিস্‌মাসের সময় কলকাতার মিউজিয়মে "একাডেমী অফ ফাইন্ আর্টসের" বাদ্‌শাহী প্রদর্শনী দেখে যে-কোন ব্যক্তির ই সার্কাসের আর কার্নিভালের কথা মনে হবে। এ-বছরেও তার চেয়ে অভিনব কিছু মনে হয়নি। প্রদর্শনীর মাননীয় দর্শকবৃন্দের মধ্যে রাজা মহারাজা নিজাম আমীর লর্ড লেডীরাই উল্লেখযোগ্য। চিত্রকলার সমঝ্‌দার তাঁরাই, পৃষ্ঠপোষকও তাঁরা এবং ক্রেতাও তাঁরা। একে একে পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁরা চারুকলা প্রদর্শনীতে পদধূলি দেন, মিউজিয়মের বিশাল সিঁড়ি দিয়ে শিল্পিবৃন্দ (বিশেষ করে উদ্‌যোগী শিল্পরথীরা) তাঁদের পিছু-পিছু উঠতে থাকেন, বারান্দায় লট্‌কানো ছবির পাশে-পাশে মহারাজা ও রাণীকে মাছির মতন ঘিরে তাঁরা ধীর পদক্ষেপে চলতে থাকেন। মহারাজা হাতের ছড়িটা দিয়ে ছবি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে যান, পেছনের অনুচরদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। ঠোকা মানেই কেনা। শিল্পীরা উদ্যত ছড়ির দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকেন, যদি ছবির কপালে ঠোকাটা লাগে। তার পর হয়ত এক দিন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এসে ভারতীয় শিল্পকলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সোনালী বক্তৃতা দিয়ে যান এবং চা-পানের পর চারুকলার বাৎসরিক প্রদর্শনী শেষ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা যদি এই ভাবেই শেষ হয়ে যেত তাহ'লে আপত্তির কিছু থাকত না। কিন্তু তা হয় না। প্রত্যেক বছরেই ঢাক পিটিয়ে নবত্ বাজিয়ে প্রচার করা হয় যে, ভারতীয় চারুকলার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে মিউজিয়মে। এত-বড় একটা হাসি-তামাসার সার্কাস্-শো যদি চারুকলার প্রদর্শনী বলে বাজারে চলে তাহ'লে সাধারণ লোকের এবং দেশেরও তাতে ক্ষতি হয়। আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতি দুই-ই হয় এবং কি ভাবে হয়, বলছি।

এ-বছর প্রদর্শনী দেখতে যাবার দিন মিউজিয়মের সামনের ফুটপাথে দেখলাম এক দল গ্রাম্য মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমেছে। উট আর হাতির কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম যে তারা চিড়িয়াখানা-ফেরত যাত্রী, চব্বিশ পরগণার সোনারপুর অঞ্চলের চাষী, জাদুঘর ঘুরে হাওড়া ময়দানে এসিয়ান সার্কাস দেখতে যাওয়াই তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু একাডেমির নবত্ বাজনায় তাদের মাথা ঘুরে গেছে। মিউজিয়মের বিরাট অট্টালিকার গহ্বর থেকে যদি সানাই পোঁ ধরে তাহ'লে সাপ-খেলানোর মতন কিছু একটা ভেল্কি খেলার ব্যাপার ভেতরে হচ্ছে, এ-কথা ভাবা গাঁয়ের চাষীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তারা ভেতরে ঢুকলো আট গণ্ডা করে পয়সা নগদ দর্শনী দিয়ে। ঢুকে যা ব্যাপারটা হ'ল তা স্বচক্ষে দেখলাম এবং আপনারা না দেখলেও সহজেই কল্পনা করতে পারেন। তারা হতভম্ব হয়ে বসে পড়ল বারান্দার উপর, কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত দেশী ভাষায় গালাগাল দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল। এই ভাবে এই অসহায় বেচারীদের আর্থিক দোহন করা কি উচিত হয়েছে?

নৈতিক ক্ষতি যা একাডেমী করছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চারুকলার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী বলে একে প্রচার করাটাই অন্যায়। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১১৩৩ সালে যে সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতায় "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রতিষ্ঠা করে থাকুন না কেন এবং তার আবদুল গজনভী বা লেডী রাণু মুখার্জ্জি বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যতই উদ্‌বুদ্ধ হ'ন না কেন, "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রদর্শনীকে চারুকলার প্রদর্শনী না বলে, অভিজাত উল্লাসিত কাগজের বাহারে ফুলের মতন কৃত্রিম সমাজের উগ্র ছলা-কলার একটা মনোরম এক্‌জিবিশন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। একেই যদি শ্রেষ্ঠ চারুকলার আদর্শ অথবা ভারতীয় চারুকলার ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ নতুন সৃষ্টি বলে লোকসমাজে প্রচার করা হয় তাহ'লে তাদের নৈতিক ক্ষতি করা হয় বলেই আমরা মনে করি।

এলতলা বেলতলা ঘুরে সেই ভাগাড়ের ছাতিমতলা
ভারতীয় চারুকলার অগ্রগতি

ভারতীয় চারুকলার অগ্রগতির যে পদচিহ্ন আমরা "একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের" প্রদর্শনীতে প্রত্যেক বছর দেখতে পাই, তাকে অগ্রগতি না বলে পশ্চাদ্‌গতি বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে "পশ্চাদ্‌গতি" বলতেও আমরা রাজী নই, কারণ আগে-পিছে কোন দিকেই ভারতীয় চিত্রকলার গতি নেই। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের নিয়ে নব জাগরণের যুগের যে শিল্পিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল এক দিন, তাঁদের সৃষ্টির পালা অনেক দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্পের মৃত ও বিকৃত কঙ্কালে রক্তমাংস দিয়ে প্রাণসঞ্চার করার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণের দায়িত্ব তাঁরা এক দিন পালন করেছিলেন। তাঁদের শক্তি ছিল, প্রতিভা ছিল, তাই তাঁরা সারা দেশব্যাপী একটা শিল্পান্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আজ তাঁর আদর্শের ক্ষীণ রশ্মিটুকু রয়েছে,

একমাত্র সন্তান —সতীশ সিংহ

আর রয়েছেন সেই আদর্শের তথাকথিত উত্তরাধিকারীরা, যাঁদের শক্তিও নেই, প্রতিভা তো নেই-ই। তা ছাড়া অবনীন্দ্র-যুগের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকা ছিল, আজকের ভারতীয় শিল্পীদের ভূমিকা নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিল্পীদের কোন চেতনা আছে বলে মনেই হয় না। তাঁরা শুধু কাকাতুয়া পাখীর মতন কতকগুলো বাঁধা বুলি শিখেছেন, যেমন "ওরিয়েণ্টাল", "ভারতীয়", "রাজপুত", "মুঘল" ইত্যাদি। সেই অজন্তার গুহা-চিত্রের রূপ, সেই রাজপুত ও ও মুঘল-দরবারের রাজকীয় আর্ট—এই হল ভারতীয় শিল্পের চরম কথা। এর আগেও কিছু ছিল না, পরেও যেন আর কিছু হয় না। ভারতীয় চারুকলার পরিত্যক্ত ভাগাড়ে শুধু কতকগুলো হাড়গিলে শকুন আর শিয়াল-কুকুরের বিকট চীৎকার শুনতে পাওয়া যায়, যাঁরা রঙ আর তুলির ব্যবহার জানেন বলে "শিল্পীর" সম্মান দাবী করেন। এঁরা সকলেই ভাল "ড্রাফ্‌টসম্যান", আমিন ও কানুনগো হবার যোগ্যতা হয়ত এঁদের আছে, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা-শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার কোন বালাই নেই এঁদের। একাডেমীর এক্‌জিবিশনে মিউজিয়মের প্রশস্ত করিডোরের এপার-ওপার বার-বার ঘুরে এই কথাই মনে হয়, শুধু এ-বছর নয়, প্রত্যেক বছর।

কি আছে প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য? কিছুই না। সেই জে, পি, রাজা ও পল-রাজের দৃশ্য-চিত্র, তেল-রঙের ছবি। চমৎকার ঠিকই, একটা স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ছবিগুলোর মধ্যে, কিন্তু তাতে হ'ল কি? একই রূপসী মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে যদি বার-বার বলা হয় "দেখে যাও, কিবা শোভা", তাহ'লে হাবা-গোবাদের যতই পুলক জাগুক, বুদ্ধিমান চক্ষুষ্মান্ দর্শকের তৃপ্তি হয় কি তাতে? এ ছাড়া সতীশ সিংহের সেই হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়-তোলা, নিতম্বভারি, আধা-গেঁয়ো ধরণের স্ত্রীলোক বা মা-ছেলের ছবি, অথবা জাঁকাল ঐতিহাসিক চিত্র বাগান-বাড়ীর নাচঘরের পক্ষে ভাল, অন্যত্র অসহ্য। আর যাঁরা বৌদ্ধ, মোগলাই ও রাজস্থানী টেক্‌নিকের কসরৎ দেখিয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা করেছেন তাঁদের "এক্‌জিবিশনের" বদলে 'শিল্পের সার্কাস' খোলা উচিত ছিল। তামাম্ দুনিয়া ঘুরে সেই বৌদ্ধ, মোগলাই ও রাজপুত যুগে ফিরে যাওয়া ছাড়া যাঁদের গত্যন্তর নেই তাঁদের ছবি "এক্‌জিবিট্" করার অত আগ্রহ কেন? দেশের লোকের চোখ দু'টো আজও অন্ধ হয়ে যায়নি, মাথাও খারাপ হয়নি যে দিল্লীর শৈলজ ('শৈলজা' নহে) মুখার্জ্জির মোগলাই ও রাজপুত প্যাঁচ অথবা রাম শ্যাম যদুর "ওরিয়েণ্টাল" টেক্‌নিক দেখার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হবে। শৈলজ বাবু নিজেই ভেবে দেখুন, বিংশ শতাব্দীতে জন্মে তিনি যদি মোগলাই যুগের দরবেশ ফকিরদের আলখাল্লা, অথবা অভিজাতদের চোগা চাপকান পাশায়াজ জামাকাবাদার প'রে কোন চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আসেন তাহ'লে তাঁকে পাগলা গারদের রুগী বলে মনে করা স্বাভাবিক কি না। মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যথেষ্ট আছে, "হাম্‌জা-নামার" চিত্রাবলী অথবা সৈয়দ আলী, আবদুল সামেদ, দেশমণ্ড, কেশবলাল প্রমুখ চিত্রকরদের কথা কোন যুগে কোন মানুষই বিস্মৃত হবে না। অজন্তার গুহা-চিত্রও আমরা দেখেছি, জন্ মার্শালের ভাষায় বলা চলে, আজও ভুলিনি তাদের "rhythmic composition, their instinctive beauty of line, the majestic grace of their

নালন্দার কৃষ্ণ বুদ্ধ   —এন, এস, বেন্দ্রে

figures and the boundless wealth of their decorative imagery"—কিন্তু তাই ব'লে তার অত্যন্ত অক্ষম অনুকরণ দেখে চোখ খারাপ করতে কেউ রাজী নয়। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী দেলাক্রোয়ার (Delacroix) কথা মনে পড়ে : "The true beauties of art are eternal—all generations will accept them ; but they wear the habit of their century." এত সুন্দর সহজ কথাটার সুগভীর তাৎপর্য্য যদি আমাদের দেশের শৈলজ মুখার্জ্জিরা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন তাহ'লে তাঁদের নিজেদের এবং ভারতীয় শিল্পের কল্যাণ হতে পারে। শ্রেষ্ঠ

মহিষ   —হ, ন, ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় বসন্ত —শৈলজ মুখোপাধ্যায়

শিল্পকলার যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য, সব যুগেই তা সমাদৃত হয়, তা সকলের সম্পদ অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ। কিন্তু কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা, সব কিছুই "wear the habit of their century", তাদের যুগের পোশাক পরে থাকে। কথাটা হ'ল শিল্পকলার 'টেকনিক' বা 'আঙ্গিক' (Form) ও 'উপাদানের' (Content) কথা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তু বিচ্ছিন্ন নয়, একসূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক যুগের শিল্পকলার আঙ্গিকের সঙ্গে সেই যুগের জীবনাদর্শ ও বাস্তব সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অজন্তার গুহা-চিত্রে কি বৌদ্ধ যুগের সমাজ-জীবনের ইতিহাস আঁকা নেই? রাজপুত ও মুঘল চিত্রকলাতেও কি রাজকীয় জীবনের প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট নয়? প্রাচীন যুগের প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পীরা এ-কথা জানতেন, জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ ছিল তখন। "প্রতিভা" সম্বন্ধে তাই ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন: "Genius was not an individual achievement, but the quality of the society at any given period." এ-কথা তলিয়ে বোঝার মতন শক্তি আমাদের দেশের ক'জন সাহিত্যিক, ক'জন শিল্পীর আছে?

একাডেমীতে যাঁদের ছবি লটকানো হয়েছে তাঁদের অন্তত কারো নেই। এ-কথা আজ খুব জোর করে বলার সময় হয়েছে, ভারতীয় চারুকলার নামে যে জঘন্য ন্যাকামি-কলার চর্চ্চা চলেছে আজ কয়েক বছর ধরে, এবারে তাকে ঝাড়ে-বংশে নির্ম্মূল করার সময় এসেছে। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। এইবার সোজাসুজি এই সব অর্দ্ধশিক্ষিত ন্যাকা-চূড়ামণি তথাকথিত "ভারতীয়" শিল্পীদের বলার সময় হয়েছে—আর নয়, ক্ষান্ত হন, দয়ায় তুলি সংযত করুন। অজন্তার অক্ষম অনুকরণ যদি করতেই হয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বা চির বসন্তের চিরাচরিত রঙিন ছবি যদি আঁকতেই হয় তাহ'লে ময়ূরভঞ্জ বা পাতিয়ালার রাজ-দরবারে চাকুরী নিয়ে চ'লে যান। রাজপুত ছবি আঁকার জন্যে যোধপুর জয়পুরের মহারাজার বিলাস-ভবনে যান এবং মোগলাই প্যাঁচ নিজামের চিত্রশালায় গিয়ে মনের আনন্দে দেখান। বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান যুগ ও জীবনের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরা প্রত্যেক বছর মিউজিয়মে ছবি না দেখিয়ে নিজেরাই সশরীরে কাচের আলমারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন অথবা দেয়ালের গায়ে ঝুলতে পারেন। সেটা অনেক বেশী দর্শনীয় হতে পারে।

সঙ্কটের মুক্তি কোথায়?

ভারতীয় শিল্পকলার এই চরম সঙ্কটের মধ্যেও যে মুক্তির পথরেখা দেখা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বছরেই গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের তরুণ ছাত্র-শিল্পীদের অনেকের ছবির মধ্যে তার আভাস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র ভট্টাচার্য্যের "মহিষ" (৩০৩), সীতেশ দাশগুপ্তের "ওরা কাজ করে" (৪২৫), তাপস দত্তের "মজুর" (৪১৮), এবং সোমনাথ হোড়ের তেলরঙা ছবি। প্রত্যেকটির যুগোপযোগী চিত্রোপাদান এবং প্রকাশভঙ্গী এত বলিষ্ঠ যে তার মধ্যে জীবন্ত শিল্পী-মনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। আর্থিক সামাজিক দুর্বিপাকে প'ড়ে যদি এই তরুণ শিল্পীদের ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবন কেন্দ্রচ্যুত না হয়ে যায়, তাহ'লে এঁদের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আশান্বিত হবার কারণ আছে।

অবনীন্দ্র-যুগের পরে ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে, বিশেষ করে বাংলায়, বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পান্দোলন হিসেবে দু'টির কথা এখানে বলা উচিত। এই "ছাতিমতলাপন্থী" শিল্পীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন শিল্পী ভোলা চ্যাটার্জ্জির (ভি. সি.) নেতৃত্বে এক দল বিদ্রোহী শিল্পী। তার পরবর্ত্তী যুগে উল্লেখযোগ্য হ'ল "ক্যালকাটা গ্রুপের" স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ। ভোলা চ্যাটার্জ্জি অথবা ক্যালকাটা গ্রুপের গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের কাউকেই মিউজিয়মে দেখা যায়নি। তার কারণ এঁরা মনে-প্রাণে "ভারতীয়" হয়েও প্রতিভাবান, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-চেতনা হারিয়ে ফেলেননি। ভারতীয় শিল্পকলার সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এপ্.ম্যানের মতন কপি না করে এঁরা তাকে সমীকৃত করে নতুন যুগোপযোগী আঙ্গিকের বিকাশের জন্যে চেষ্টা করছেন। চেষ্টা এঁদের অনেকটা সার্থকও হয়েছে। এঁরাই সত্যিকারের ভারতীয় শিল্পকলার ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। মিউজিয়মের "একাডেমীতে" এঁদের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। মিউজিয়ম মিউজিয়মই, চলন্ত ও জীবন্ত সমাজ-সভ্যতার ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁদের ছবি মিউজিয়মের দেয়ালে এখনই না লটকানোই ভাল।

চতুঃষষ্টি কলা কি কি ?

(সংগ্রহ)

প্রাণতোষ ঘটক

['কলা' অর্থে মূলধনবৃদ্ধিঃ, অর্থাৎ যে শিল্পের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি বা অর্থবৃদ্ধি হয়। এক কথায় সরস্বতী ও লক্ষ্মীর একত্র যোগাযোগ। চতুঃষষ্টি কলা বা চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত একদা ব্যবহৃত হত। অধুনা কয়েকটি 'কলা'র প্রচলন নেই প্রয়োজন ও পোষকতার অভাবে। এই রচনাটির জন্য 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি]

। গীতম্—গীত কি, সকলেই জানেন। গীতে কোন শিল্প-সংযোগ আছে কি না এবং গীত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন হয় কি না তাও সকলেই জানেন।

। বাদ্যম্—বাদ্য গীতের সহচর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গীতের সঙ্গে বাদ্যের যোগাযোগ পছন্দ করতেন না, সেই কারণে হয়তো আধুনিক গীতের সঙ্গে বাদ্যের খুব বেশী যোগ নেই। বাদ্য বহু প্রকার। আধুনিক কালে বাদ্যই আয়ের একমাত্র মাধ্যম। নিজের ঢাকে নিজের বাদ্য বাজাতে না পারলে আজকাল না কি কোন আয় হয় না।

। নৃত্যম্—নৃত্যকলা আজ ঘরে ঘরে উৎকর্ষ লাভ করছে। দিন দিন নতুন নতুন নৃত্যকলার বিকাশ হচ্ছে অভিনব নামকরণে। বাঙলা দেশে খেমটা নাচের কথা সকলেই জানেন। উদয়শঙ্করের নামে আজ আমেরিকার অধিবাসীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাচ দেখিয়ে অর্থোপায় সম্ভব কি না 'কল্পনা' চিত্রই তার প্রমাণ দেয়। নৃত্যকলা দেখবার জন্য যদিও আজ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না, রাস্তায় বেরুলেই কত শত নরনারীর কত রকমের নাচ দেখতে পাওয়া যায়।

। নাট্যম্—নাট্যকলা বাঙলা দেশে যত উন্নতি লাভ করেছে, ভারতবর্ষে আর কোন দেশে তত হয়নি। গত দশ বৎসর যাবৎ প্রথম শ্রেণীর নাটকের দেখা না পাওয়া গেলেও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বহু গুণী ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই বিষয়টির জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পাঠ করতে পারেন ও অর্থোপায় হয় কি না কলিকাতার ষ্টার রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর দিতে পারবেন। তৃতীয় শ্রেণীর নাটক প্রদর্শন ক'রে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন আজকাল অনেকেই করছেন। তথাপি নাট্যকাররা বলেন, বাংলায় না কি নাটকের মাল-মশলার বড় অভাব। আমরা বলি, মাল-মশলার অভাব নয়, নাট্যকারের অভাব।

। আলেখ্যম্—চিত্রকার্য্যের অপর নাম আলেখ্য। লেখ্য ও চিত্র-কার্য্য একই পর্য্যায়ভুক্ত। কালীঘাটের পটশিল্প থেকে আজকের আধুনিক চিত্রকলা বাঙলা দেশে এক ক্রমোন্নতির পথে বিকাশ লাভ করেছে। প্রচুর রঙে প্রচুর চিত্র অঙ্কিত করতে পারলে যে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয় শিল্পী যামিনী রায় তার সমুজ্জ্বল পথ বলে দিতে পারেন। চিত্র-কার্য্যের বড় সমাদর নেই দেশে, শিল্পীরা অন্ততঃ এই অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু আমরা জানি, ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা-মহারাজা নেই, যাঁর খাসমহলে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একখানি সিক্তবসনের ছবি নেই। চিত্রকলার পোষণ দরিদ্র বাঙালীর দ্বারা সম্ভব হয় না, তাই দরিদ্র বাঙালী শিল্পীরা বহু করদ রাজ্যের সভা-শিল্পীর পদ গ্রহণ ক'রে থাকেন। এমন কি, বহু বিলাতি প্রচার-ব্যবসায়ের কার্য্যালয়ে বহু বাঙালী শিল্পী আছেন।

৬। বিশেষকচ্ছেদ্যম্—পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নরনারীগণ চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা শরীর চিত্রিত করতেন। এই চিত্র রচনার (অলকা-তিলকা প্রভৃতি) কৌশল-বিশেষকে "বিশেষকচ্ছেদ্য" বলা হয়। মালীর মেয়ে ও নাপ্তিনী প্রভৃতির এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ হত। আধুনিক কালে সভ্য সমাজে সাধারণতঃ কেউ অলকা-তিলকার ব্যবহার করে না। সে জন্য "বিশেষকচ্ছেদ্য" এখন আর জীবিকা পদবাচ্য নয়। কেবল মাত্র নাপ্তিনীরা কোন কোন গৃহে আলতা লাগিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ এখনও উপার্জ্জন করে। 'বিশেষকচ্ছেদ্য' কি ও তার নিদর্শন এখনও কলিকাতা ও কাশীধামের গঙ্গাস্নানার্থীর কপালে ও কপোলে দেখা যায়। গঙ্গাতীরস্থ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালারা যে চন্দনের ছাপা দেয় তা পূর্ব্বকালের বিশেষকচ্ছেদ্যের অপভ্রংশ বা অনুকরণ বলা যায়। কেবল মাত্র বিবাহের দিনে আজও অনেকে কপালে চন্দন-রেখার ব্যবহার করে থাকেন।

৭। তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারা—পূজা কিংবা যাগ-যজ্ঞের জন্য তণ্ডুলের নৈবেদ্য রচনা, কুসুমের স্তবক রচনা ও উপহার-দ্রব্যের সংস্থান রচনা। পূর্ব্বকালে অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের এই কার্য্য ছিল। এখন আর এই বিশেষ কলার প্রচলন নেই, প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এ যুগে ঘরে ঘরে তণ্ডুলের অভাব। কুসুমের আদর নেই। উপহার দেওয়ার বাসনা থাকলেও সামর্থ্যের একান্ত অভাব।

৮। পুষ্পাস্তরণম্—ফুলের শয্যা ও ব্যজন প্রভৃতি নির্ম্মাণের বিশেষ কলাকে 'পুষ্পাস্তরণং' বলা হয়। মালীদের এই কার্য্য ছিল। এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া), পাখা ও নানা প্রকার গহনা

প্রভৃতি রচনা করে মালীরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বাজারে এই ব্যবসায়ীদের দোকান আছে। বিবাহের লগ্ন-কালে তারা নির্দ্ধারিত মূল্য বর্দ্ধিত করে এবং অধিক অর্থ লাভ করে। কলিকাতার হগ সাহেবের বাজারে এই ব্যবসায়ীদের একটি পৃথক্ বিভাগ আছে।

৯। দশনবসনাঙ্গরাগাঃ—দন্তরঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন। সেকালে দাঁতে বহু প্রকার ছককাটা ও গায়ে উলকী দেওয়ার রীতি ছিল। বস্ত্ররঞ্জনের নূতন ব্যবসা আজকাল প্রচুর দেখা যায়। সুসজ্জিত শাড়ীর অভাব হেতু রমণীরা থান কাপড় কিংবা ধুতি প্রভৃতি নিজেদের ইচ্ছামত রঞ্জিত করিয়ে থাকেন। অঙ্গরঞ্জনের জন্য এখন তাঁরা আর পরের সাহায্য বিনা নিজেরাই এ কাজ সমাধা করেন। সাগর-পারের অঙ্গরাগ ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দেশী অঙ্গরাগের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। ম্যাক্স ফ্যাক্টর, বটকৃষ্ণ পাল ও বেঙ্গল কেমিক্যাল এই ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক হিসাবে পরিচিত। দন্তরঞ্জন এখন আর ভদ্র সমাজে চলে না।

১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম—মণি অর্থে প্রস্তর। এই প্রস্তর দ্বারা চত্বর, পিণ্ডিকা ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার বিশেষ কলাকে মণিভূমিকর্ম্ম বলা হয়। এই জীবিকাটি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের ব্যবসা হয়েছে। বার্ড কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা প্রস্তর দ্বারা এই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করে থাকেন। বহু ভাস্কর প্রস্তর দ্বারা কেবল মাত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। বিদেশে হেনরী মুর ও বাঙলায় শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

১১। শয়নরচনম্—খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করণ একটি স্বাধীন ও উত্তম জীবিকা। কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ফিরিঙ্গী কালীর চতুষ্পার্শ্বে এই ব্যবসায়ীদের বহু বিপণী দেখা যায়। আধুনিক রুচিসম্মত নিত্য-নূতন ধারায় এই শয়ন-রচনা উন্নতি লাভ করছে। কলিকাতায় 'ল্যাজারাস' ও 'প্রবর্ত্তক' এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট সুনাম লাভ করেছেন।

১২। উদকবাদ্যম্—জলে কোন পাত্র স্থাপন করে কিংবা পাত্র জলে পূর্ণ করে নানা তালে বাদ্য করণ। আমোদ-প্রমোদের জীবিকা, সে জন্য এই কলা ব্যাপক নয়। জলতরঙ্গ বাদ্যকেই উদকবাদ্য বলা হয়। তিমিরবরণ এই বাদ্যের এক জন ওস্তাদ।

১৩। উদকঘাতঃ—প্রাচীন গ্রন্থে উদকঘাত শব্দের "জলস্তম্ভ বিদ্যা" এরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা জানতেন এবং এই বিদ্যার দ্বারা তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হয়েছিলেন। এ ছাড়া উদকঘাতঃ শব্দের অন্য কোন অর্থ আমাদের জানা নেই। জলমগ্ন জাহাজের বস্তু উত্তোলন-কারী ডুবুরিরাই এখন জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুকরণ করে। জলস্তম্ভ বিদ্যা জ্ঞাত হলে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে।

১৪। চিত্রযোগাঃ—অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করণ। এক প্রকার বাজী।

১৫। মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ—বিভিন্ন প্রকার মালা ও হার প্রস্তুতের বিশেষ কলা। কেবল মাত্র পুষ্পমাল্য নয়, পুঁতি, কাচ ও প্রস্তরের মাল্য নির্ম্মাণকলা।

১৬। শেখরাপীড়যোজনম্—শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপি, পাগড়ী ও তার অলঙ্কার প্রস্তুত করণ। বাঙালীর মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকে সে জন্য বাঙলা দেশে এই শিল্পকলার প্রচলন নেই। বড়বাজার ও কলুটোলা অঞ্চলে যে কয়েকটি ব্যবসায়ী আছেন তাঁরা মাড়োয়ারী ও মুসলমানদের শিরোভূষণ তৈয়ারী করে থাকেন।

১৭। নেপথ্যযোগাঃ—রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজানো ও তার উপকরণ প্রস্তুত করণের কলা। প্রত্যেক মঞ্চের জন্য এই শিল্পীর প্রয়োজন।

১৮। কর্ণপত্রভঙ্গাঃ—সেকালে স্ত্রীলোকরা মৃগমদ ও চন্দনাদির তিলকশ্রেণী ধারণ করতেন এবং এই রীতির নাম কর্ণপত্রভঙ্গ। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা সেই নারীই পূর্ব্বে রাজমহিষীগণের নিকট সৈরিন্ধ্রী নামক দাসীর পদ প্রাপ্ত হতেন।

১৯। গন্ধযুক্তিঃ—নানা প্রকার সুগন্ধ প্রস্তুত করণ। আতর, নির্য্যাস ও পারফিউম (perfume) এখন উপার্জ্জনের এক প্রশস্ত পথ।

২০। ভূষণযোজনম্—অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণ কার্য্যটি এখন স্যাকরার হস্তে ও গ্রন্থন-কার্য্যটি পাটওয়ারদের হাতে আছে। বহুবাজারের সরকার-পরিবার এই ব্যবসাটির যথেষ্ট উন্নতি করেছেন।

২১। ইন্দ্রজালম্—ভোজবাজী। এই ব্যবসায়ে লোককে বিস্মিত ও আশ্চর্য্য করে এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করায়। বাঙলার ইন্দ্র-জাল পৃথিবীতে আজ খ্যাতিলাভ করেছে। যাদুকর রাজা বসু ও পি, সি সরকার পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকর।

২২। কৌচুমারযোগাঃ—নানা প্রকার লিপিক্রিয়াকে কৌচুমার যোগ বলে। ইতর ভাষায় 'জাল' শব্দের নামান্তর। অত্যন্ত অসাধু জীবিকা। তস্কর-জীবিকা নামে অভিহিত। বহু লেখক এই পন্থা অবলম্বন করেন এবং অবশেষে এক দিন ধরা পড়েন।

২৩। হস্তলাঘবম্—অলক্ষ্যে অতি শীঘ্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করা। এখনও বহু হস্তলাঘবপটু বাজীকর আছেন।

২৪। চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া—হরেক রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করণের দক্ষতা প্রদর্শন। রন্ধন বিলক্ষণ শিল্প সংযোগ না থাকলে মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত হয় না। দিন দিন নূতন কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এই বিশেষ শিল্পে বাঙলা দেশের বহু মহিলার বহু স্থানে সুনাম আছে। অর্থোপায়ের জন্য এই শিল্পটি অনেকে অবলম্বন করেন। বাবুর্চ্চি ও হালুইকারের উপার্জ্জন সামান্য নয়।

২৫। পানকরসরাগাসবযোজনম্—মদ্য, বহু প্রকার সরবৎ ও আচার মোরব্বা প্রভৃতির মিশ্রণ ও প্রস্তুত করণের শিল্প। বাঙলা দেশে প্রথমটি এবং শেষোক্ত বিষয় তিনটি বাঙলার বাইরে প্রচলিত। এই শিল্পটিতে প্রচুর আয়ের পথ আছে।

২৬। সূচীবাপকর্ম্মাণি—সূচীকার্য্য ও বস্ত্র বয়নকার্য্য। এই বিশেষ শিল্প-পদ্ধতির বিনাশ সাধনের জন্য ইংরেজ আমাদের দেশে তাঁতিদের হাতের আঙুল কেটে নিয়েছিল। তাদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে, তাঁত কেড়ে নিয়ে শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, বহু তাঁতির জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছিল। মিলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ফরাস-ডাঙ্গা ও শান্তিপুর এখনও শিল্পের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

২৭। সূত্রক্রীড়া— সূত্র সংযোগে পুত্তলিকা পরিচালন। অর্থাৎ পুতুলের নাচ। আজকাল এ -শিল্পের সমাদর নেই। সে জন্য বড় আয় হয় না।

২৮। প্রহেলিকা—কবিতার গোপনীয় অর্থ পরিজ্ঞান। সেকালে লোকে চমৎকৃত হয়ে অর্থ পুরস্কার দিত। এখন কেউ কানেও শোনে না।

২৯। প্রতিমালা—বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিদ্যার একটি শাখা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নাম আলোকচিত্রশিল্প বা ফটোগ্রাফী।

৩০। দুর্বচকযোগাঃ—যে সকল বাক্যের লিপির অর্থ সাধারণ লোকে বলতে পারে না, সেগুলি বলে দেওয়া। এ বিদ্যাটি পুরাতত্ত্বানুসন্ধানিগণের বিশেষ উপকারী।

৩১। পুস্তকবাচনম্—অতি শীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ যোজনার দ্বারা পুস্তক পাঠ করা এবং নানা প্রকার অক্ষর পড়ার দক্ষতা অর্জ্জন করা। এটিও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানিদের সাহায্যকারী।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকাদর্শনম্—যাত্রাওয়ালাদের এক প্রকার কার্য্য কিংবা নাটকাভিনয় দেখানো।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণম্—কোন কাব্যের কিংবা শ্লোকের একাংশ বললে তৎক্ষণাৎ তাদের অবশিষ্টাংশ পূরণ করে দেওয়া।

৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ—হস্তী, ঘোটক ও উষ্ট্র প্রভৃতির সাজ প্রস্তুত এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ-শিল্প। বহুবাজারের চীনা পাড়ায় ঐরূপ সাজের দোকান আছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে যুদ্ধাস্ত্র শিল্প যে বিদেশে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছে জাপানের হিরোসিমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্ট দেখা যায়।

৩৫। তর্কুকর্মাণি—ভ্রমিযন্ত্র ও তার সূক্ষ্ম শলাকার নাম তর্কু। এই তর্কু দ্বারা বহুবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করণ।

৩৬। তক্ষণম্—কাষ্ঠের কার্য্য। ছুতার-মিস্ত্রীদের জীবিকা।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা—গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য। রাজমিস্ত্রীদের উপজীবিকা।

৩৮। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা—সোনা, রূপা ও হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্নের পরীক্ষা করা। জহুরীরা এই বিদ্যার উপকারিতা জানে। বহু ধনী পরিবারের বাবুরা এই বিদ্যায় পারদর্শী।

৩৯। ধাতুবাদঃ—সুবর্ণাদি ধাতুর সাঙ্কর্য্য পরিহার করণ ও তার প্রস্তুত করণের বিধি।

৪০। মণিরাগজ্ঞানম্—হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণ পরীক্ষা ও নির্ম্মল করণ প্রভৃতি জানা।

৪১। আকরজ্ঞানম্—পরীক্ষার দ্বারা কোথায় কোন বস্তুর খনি আছে, তা জানতে পারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পরীক্ষার প্রচলন আছে।

৪২। বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রভৃতি উদ্ভিদসমূহের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞান। নার্সারী ব্যবসায়ীরা এই বিদ্যা জানেন।

৪৩। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ—মেষের লড়াই, মোরগের লড়াই, বটেরের লড়াই প্রভৃতি এ সকল খেলা এখন নেই। মুসলমান বাদশাহদের সময় এই শিল্পের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হত।

৪৪। শুকসারিকাপ্রলাপনম্—পক্ষীদের বুলি শেখানো। পূর্ব্বে এই শিল্পের অধিক প্রচলন ছিল। এখন সচরাচর দেখা যায় না।

৪৫। উৎসাদনম্—কৌশলে শত্রুর বাস উচ্ছেদ করা।

৪৬। কেশমার্জ্জনকৌশলম্—চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনাঢ্যগণ এ জন্য ভৃত্য পোষণ করতেন। এখন 'সেলুন' যা করে তাতেই বাবুরা খুশী থাকেন।

৪৭। অক্ষরমুষ্টিকাকথনম—সাঙ্কেতিক লিপি-বিজ্ঞান। ইংরেজীতে 'কোড' শব্দের অর্থ অনেকেই জানেন।

৪৮। ম্লেচ্ছিতকবিকল্পাঃ—ম্লেচ্ছ শাস্ত্র ও ম্লেচ্ছ ভাষা জানা।

৪৯। দেশভাষাজ্ঞানম্—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হরিনাথ দে বহু ভাষা জ্ঞাত ছিলেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চাটোপাধ্যায় বহু ভাষা জানেন।

৫০। পুষ্পশাকটিকানিমিত্তজ্ঞানম—পুষ্পশাকটিকা নামক বিদ্যার মূল উপকরণ জানা। পুষ্পশাকটিকা বিদ্যা কি তা আমরা জানি না।

৫১। যন্ত্রমাতৃকা—অল্প আয়াসে যন্ত্র নির্ম্মাণ করবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৫২। ধারণমাতৃকা—পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনার বিদ্যা।

৫৩। সংপাট্যম্—মণি-মুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা ও কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুত করা। আধুনিক জহুরীদের এই বিদ্যায় পারদর্শী দেখা যায়। কৃত্রিম রত্ন আসল ব'লে বাজারে চালিয়ে দেন।

৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া—অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা। এরূপ কৌতুক আর নেই।

৫৫। ক্রিয়াবিকল্পাঃ—একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করতে জানা।

৫৬। ছলিতকযোগাঃ—পর-প্রতারণার কৌশল। এক প্রকার বাজী। অনেকেই করেন।

৫৭। অভিধানকোষচ্ছন্দোজ্ঞানম্—শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

৫৮। বস্ত্রগোপনানি—এক বস্ত্র থেকে অন্য প্রকার বস্ত্র দেখানো। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্রে পরিণত করে দেখানো।

৫৯। দ্যূতবিশেষঃ—নানা প্রকার জুয়া খেলায় দক্ষতা। বাঙলা দেশে এ বিদ্যার বড় সমাদর।

৬০। আকর্ষক্রীড়া—এক প্রকার খেলা, অর্থাৎ আকর্ষণ ক্রীড়া। আধুনিক যুগের সম্মোহন বিদ্যা এই শিল্পের অন্যতম শাখা।

৬১। বালক্রীড়নকানি—বালকদের জন্য নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করা।

৬২। বৈনায়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—বিনয় বা শালীনতা (modesty) বিদ্যা। বাঙলা দেশে আজ এই শিল্পকলাটির অত্যন্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে অভদ্রতা ও নির্লজ্জতা অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করছে। ভদ্র ও অভদ্রে আর কোন পার্থক্য থাকছে না।

৬৩। বৈজয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—যুদ্ধে ও রণে বিজয়লাভের বিশেষ শিল্প। বিরাট সৈন্য-সমাবেশ ও বহু পন্থা অবলম্বন সত্ত্বেও যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। এই শিল্প আয়ত্ত হলে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য থাকলেও যে কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়।

৬৪। বৈতালিকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—এক প্রকার সঙ্গীত-বিদ্যা। সেকালে বহু রাজসভায় বৈতালিকদের সমাদর ছিল। সভার কার্য্যারম্ভে ও কয়েকটি বিশেষ লগ্নে বৈতালিকের প্রয়োজন হত।

জীবন, সাহিত্য ও দর্শন

শ্রীসরোজকুমার দাস

(দর্শনাধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ)

উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়কল্পে প্রাথমিক প্রয়োজন "সাহিত্য" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থবোধ। বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে হিত্য" অর্থাৎ নানা উপকরণের মেলন-বোধক যে শব্দ তাহাই হিত্য"। বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাব অভিব্যক্ত তাহা সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার বা পরিহার নিয়মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত াধারণ গ্রাহ্য। ("সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার পরিহার নিয়মানধ্যবসায়াৎ ারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ") এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হইয়া উদ্বেলিত হয় অন্য-ান-জ্ঞেয়-বস্তু-সম্পর্ক-বিরহিত একটি অপরিমিত ভাব এবং সকল দয় ব্যক্তির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য থাকাতে, এই ভাবরসের ার্থ অনুভূতি হয় ("সাধারণোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিত—পরিমিত াতৃভাব বশোন্মিষিতবেদ্যান্তর সম্পর্ক শূন্যাপরিমিতভাবেন াত্রা সকল সহৃদয়সংবাদভাজা⋯গোচরীকৃতঃ")। এই অপূর্ব্ব নির্ব্বচনীয় রসের স্বরূপ-নির্ণয়কল্পে রূপকের ভাষায় সাহিত্যরসিক ীয় ব্যাখ্যানে নির্দ্দেশ করিলেন—"সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য সারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক রিয়া অলৌকিক চমৎকারকারী (ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর) এই রস, পের আভাস দেয় ("অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানু-বয়ন অলৌকিক চমৎকারকারী⋯রসঃ")। অতএব সার কথা এই তাহাকেই "সাহিত্য" নামে অভিহিত করা যায় যাহাতে রসানু-ভর মধ্যস্থতায় হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ সাধিত হয়। কারণ, র পর্য্যন্ত রস ভিন্ন আর কিছুতেই মানুষের সহিত মানুষের মেলা বপর হয় না। "সাহিত্য"ই এই সেতুবন্ধ রচনা করিতে পারে। বই অনুরূপ আভাস পাই "সভা" শব্দটির মধ্যে। "সভা" শব্দটি খানেই প্রযোজ্য যেখানে আভা, যেখানে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। আলোক ত জড়চক্ষুর আলোক নয়—এ যে হৃদয়ের আলোক, প্রীতির, লোক, অদ্বৈতত্ব উপলব্ধির আলোক। এই আলোকেই মানুষের রূপ, সত্যরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই প্রাচীনতম যুগের সেই র্মস্পর্শী প্রার্থনা নবযুগের সকল সাংস্কৃতিক মেলন-চেষ্টায় আজও ব-প্রেরণারূপে কাজ করিয়া চলিয়াছে—

"তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"—"হে জগতের পোষক াদিত্যমণ্ডল! সত্যধর্ম্মাশ্রয় দৃষ্টির জন্য (সত্যের যে মুখ হিরণ্ময় পাত্রে াচ্ছাদিত রহিয়াছে) তাহা অপসারিত কর।" ইহাই নবযুগের স্তরতম বাণী—"হে মানব, তোমার আবরণ উন্মোচন কর, তোমার উদার, উন্মুক্ত স্বরূপ তাহাই প্রকাশ কর। 'তোমার একলা াপনের' আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া 'তোমার সকল আপনের সত্যে কাশিত হও,' সেইখানেই তোমার মুক্তি।"

তবেই দেখিতেছি, মানুষের প্রকাশের আলোক নিজ একাকিত্বের ধ্যে আবদ্ধ নয়, সে আলোক পাই সকলের সহিত মেলাতে। ণিতের রাজ্যের এক আর একে পাই দুই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ক আর একের যোগফল দু'য়ের পরিবর্ত্তে হয় তিন—কোথা হ'তে আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব। আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অনুশাসনের রাজত্বে যেখানেই একান্ত ভাবে দু'য়ের সংমিশ্রণ বা মেলন, সেখানেই ঋতরক্ষক অর্থাৎ সত্য ও নীতি-শাসন-বিধায়ক বরুণ তৃতীয় পক্ষরূপে বিদ্যমান ("বরুণস্তৃতীয়ঃ") ঋগ্বেদের এই উচ্ছ্বাসোক্তি সমর্থন লাভ করে ভাষ্য ও টীকার যুগে, ভামতী-টীকার প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অধিকতর ব্যাপক অর্থে :—"নাপি স্বার্থমাত্রপরত্বৈব পদানাম্। তথা সতি ন বাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ" অর্থাৎ "বাক্যান্তর্গত পদ-সমুদায় একান্ত নিজস্ব, স্বীয় স্বীয় অর্থ প্রকাশ দ্বারাই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তবে কোনও সম্পূর্ণ বাক্যার্থ-বোধ হইতে পারিত না।" কারণ একটি বাক্য এক অখণ্ড, সমস্ত সত্তা, সমষ্টিমাত্র নয়। ইহা এক অখণ্ডার্থ বা এক প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য্যজনিত সত্তা। ইহার অন্তর্গত পদগুলি এক নৈর্ব্যাক্তিক "আকাঙ্ক্ষা" ও "তাৎপর্য্য" বা তাৎপরতা অথবা পরার্থপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও একত্রীকৃত। ভাবার্থ এই যে, পদসমুদায়ের স্বার্থ-(মাত্র) পরতায় কোনও একটি বাক্যার্থপ্রত্যয়, সম্পূর্ণ বাক্যও রচনা করা যায় না, স্বার্থ-(মাত্র) পর ব্যক্তি সমূহের সমাবেশে কোনও সমাজ-বন্ধন রচনা করা ত দূরের কথা। এই মেলনতত্ত্ব যেখানে, যে পরিমাণে অবজ্ঞাত বা ক্ষুণ্ণ হয় সেখানেই মানুষের সত্য পরিচয় সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন বা ব্যাহত হয়। এই তত্ত্বের গভীরতম উপলব্ধি পাই ভক্তসাধক রজ্জবের ঋষিসুলভ ভাগবত দৃষ্টি ও উক্তির মধ্যে :—

"প্রীত অকেলী ব্যর্থ মহাসিন্ধু বিরহী দিল হোয়।
বুঁদ পুকারৈ বুঁদকো গতিমিলে সংজোয়।
অকেলবুঁদ পহুচৈ নহী সুখৈ পংথ জীবজোর।
পংথ ভর ভরে একহোয় দরশ দয়া প্রভু তোর।"

"একেলার প্রেম ত ব্যর্থ। যদি বিন্দুর হৃদয়ে সিন্ধুর বিরহ জাগিয়া থাকে তবেই একটি বিন্দু ডাক দেয় অপর সকল বিন্দুকে, কারণ সবাই এক হইলেই স্রোতরূপে চলিতে পারে বহিয়া অর্থাৎ তাহাতে মেলে গতি। একলা একটি বিন্দু ত পৌছিতেই পারে না। পথের ব্যবধানই ফেলে শুকাইয়া তাহার সব শক্তি ও জীবন। আর সব বিন্দু এক হইলে, সেই পথকেই পারে সে আপন প্রাচুর্য্যের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে। হে প্রভু, তখন তোমার দয়াতেই মেলে তোমার দরশন।"* "এই মেলার মধ্যে যে নিয়ম বা সংযমের অনুশাসন রহিয়াছে, তাহার যোগেই সত্যের শান্তরূপ এবং সত্য শান্তম্ অতএব শিবম্। আবার যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশমান। মঙ্গলই শক্তিযোগে সকল ঐক্যবন্ধন বা সংহতির প্রতিষ্ঠানভূমি এবং বিরোধ বা বিচ্ছেদ অমঙ্গলেরই নামান্তর"। এই জন্যই বোধ করি মহারাজ অশোক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিলালিপি অনুশাসনে স্বীয় আধ্যাত্মিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ যে সারগর্ভ-বাণী জনসমাজে প্রচার করিয়া

* শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ ও ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য—"সমবায় এব সাধুঃ" অর্থাৎ সংহতিই পরমক্ষেম ও পরম ধর্ম্ম।

দর্শনের পারিভাষিক ও ব্যবহারিক অর্থ

প্রসঙ্গতঃ, "দর্শন" শব্দটির একটি কার্য্যকরী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা এক্ষণে অপরিহার্য্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে যে "দর্শন" শব্দটির যৌগিক বা যোগরূঢ় অর্থ এবং তার ক্রম-বিবর্ত্তনধারা অনুধাবন করার চেষ্টা—স্থান, কাল ও অধিকার বিবেচনায়—সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ জন্য বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করিয়াই বলিব যে তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন অর্থে—ইংরাজী philosophyর প্রতিশব্দরূপে—সংস্কৃত সাহিত্যে "দর্শন" বা "দার্শনিক" শব্দটির প্রয়োগ অতিবিরল, নাই বলিলেও চলে। তবে আমরা যে সাধারণ ভাবে "দর্শন" শব্দ ব্যবহার করি তাহার বৈকল্পিক অর্থনিচয় এই ভাবে তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) প্রথমতঃ, ঐন্দ্রিয়ক বা চাক্ষুষ জ্ঞান (২) মনশ্চক্ষুঃ দ্বারা মানস-বস্তু বা অন্তঃকরণ-বৃত্তিসকল নিরীক্ষণ (৩) ধ্যানের দ্বারা বস্তুবিশেষের উপলব্ধি বা ধ্যানজ প্রমা, যেমন রামায়ণে আছে—"দৃষ্টা বৈ ধ্যানচক্ষুষা"—অথবা রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে যেমন পাই, "ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনীয়রূপতা" ধ্যান বা চিন্তনের অবিচ্ছিন্ন বিস্তার ও উপচয় হইতে যে দর্শন-রূপের উদ্ভব হয় (৪) অলৌকিক অনুভূতি বা সমাধিজাত-প্রজ্ঞা। এই অর্থ-সমূহ-ব্যতিরেকে উত্তরকালে "দর্শন" শব্দটি বিচার, বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ-প্রভৃত বিশিষ্ট মতবাদ, এই অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব অর্থক্রিয়াকারিত্বের প্রমাণ প্রয়োগে "দর্শনে"র এই অর্থই গ্রহণীয়—মতবাদ বা চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে মননের আনুকূল্যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সাহায্যে পরীক্ষিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভাষায় প্রকাশ ও অবলম্বনে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্রৌত জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক সত্য উপলব্ধি, সমাধিলব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অনধিকার প্রবেশ। কারণ, যখনই এই তথাকথিত অলৌকিক দর্শন বা জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করি তখনই তার আবিমিশ্র, বিশুদ্ধ সত্য অংশতঃ বিনষ্ট হয় এবং শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বলিতে হয় সত্য ও মিথ্যা সংমিশ্রণ পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হয় এই লোকব্যবহার ("সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য···অয়ং লোকব্যবহারঃ")।

অতএব দর্শন শব্দের ইতিবৃত্ত হইতে প্রতীয়মান এই হয় যে, প্রমাসিদ্ধ প্রণালীলব্ধ যে লৌকিক জ্ঞান (এবং বিশেষ অর্থে বিজ্ঞানও অন্তর্গত), তাহা দর্শনের একমাত্র উপজীব্য। এই জন্যই ব্যাপক অর্থে জীবনের সহিত দর্শনের নাড়ীর যোগ—উভয়েই অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। চিত্রার্পিত অনুলেখনে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষভাগে "জীবন"কে স্থাপিত করিলে তলদেশের দুই কোণে যথাক্রমে "সাহিত্য" ও "দর্শন" স্থান পাইতে পারে। কোণদ্বয়স্থিত দুইটিই জীবনের গহন-গুহাহিত "জিজ্ঞাসায়" সঞ্জাত ও সংবর্দ্ধিত এবং এই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচন (definition) "জীবন-যোনি-প্রযত্ন" (instinctive activity), এই অভিধানে। বিচার ও মীমাংসা-সম্ভূত জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ এই যে জিজ্ঞাসা, তাহার জীবন-পুরঃসর প্রবৃত্তির মধ্যেই সন্ধান পাই, ইহার প্রাণস্পর্শ ও জৈব প্রেরণায়। সাংখ্য-দর্শনে বলা হয় যে বোধ বা জ্ঞান প্রাকৃতিক বিকারের অনুগ্রহ বা পশ্চাদ্‌গ্রহণ প্রভৃত ফলমাত্র ("বস্চেতনাশক্তেরনুগ্রহঃ তৎফলং প্রমা বোধঃ")। এই উক্তিটির যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সোরেন্ কিএর্কাগার্ড (Soren Kiarkegaard) নামক এক ডেনমার্ক দেশীয় দার্শনিক বলিয়াছেন—"We live forwards but understand backwards" অর্থাৎ "আমাদের জীবনের গতি পুরোভাগে কিন্তু অবগতি পশ্চাদ্‌ভাগে। জীবন আগ্রহাত্মক, চিন্তন অনুগ্রহণাত্মক।' ইংরাজীর "reflection" শব্দটির মৌলিক অর্থ এই পরাবৃত্ত-গতিরই ইঙ্গিত করে, জ্ঞান বা চিন্তন-ক্রিয়া সম্পর্কে। বিচার, মীমাংসা বা চিন্তনের সহজ-ধারা যেন শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত গতিচ্ছন্দ!

জীবন ও জিজ্ঞাসা

জীবনের ভূমিকায় নিখিল জ্ঞানের উৎসভূত জিজ্ঞাসার স্থান-নির্দ্দেশ-কল্পে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "ভামতী" টীকায় বলিয়া গিয়াছেন—"জিজ্ঞাসা সংশয়ের কার্য্য এবং (সেই অধিকার) তৎ-কারণীভূত সংশয়ের সূচনা করে। পরন্তু সংশয়ই (সকল) মীমাংসার সূত্রপাত করে।" ("জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্য কার্য্যমিতি স্বকারণং সূচয়তি। সংশয়শ্চ মীমাংসারম্ভং প্রযোজয়াতি") প্রতীচ্য দর্শনেও দেখি কেহ বলেন তত্ত্ববিদ্যার বা দর্শনের জনক বিস্ময় ("wonder"), আবার কাহারও মতে তাহা সংশয় ("doubt")। প্রথম উক্তিটির সম্প্রসারণ দেখি কবি কোলরিজের বাণীতে—"All our knowledge begins and ends in wonder; the first is the child of ignorance, the last is the parent of adoration"—অর্থাৎ "আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি বিস্ময়ে এবং বিস্ময়েই তার পরিণতি। প্রাথমিক বিস্ময়টি অজ্ঞানতার সন্ততি, প্রান্তিক বা অন্তিম বিস্ময়টি অর্চ্চনার প্রসূতি।" দর্শন, বিচার, বা মীমাংসার মূলীভূত কারণ যাহাই হউক না কেন, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে মানুষ জীবনের সর্ব্ব-বিভাগে শান্তি ও আরাম অন্বেষণ করে এবং সেই কারণেই এই সংশয় ও জিজ্ঞাসার অশান্তি সভয়ে পরিহার করে। তাই চিন্তার রাজ্যে ইহারা অস্পৃশ্যজাতির মধ্যে গণ্য; এবং তৎসম্পর্কে চিন্তার আভিজাত্য ও অভিমানকে প্রতিপদেই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। সত্যসন্ধ যে ব্যক্তি এই দুর্গম পথের যাত্রী তাঁহাকে সংশয় ও জিজ্ঞাসার অবশ্যম্ভাবী অনিশ্চয় ও অস্বস্তি বরণ করিয়া লইলেই হইবে। বার্টরাণ্ড রাসেল এক স্থানে বলিয়াছেন—"Men fear to think as children fear to go into darkness"—অর্থাৎ "শিশুরা যেমন অন্ধকারে ভয় পায়, পরিণত-বয়স্ক মানুষও তদ্রূপ (নিরঙ্কুশ) চিন্তাকে ভয় করে।" রাসেলের মত সংশয়বাদী নাস্তিকের এ ক্ষেত্রে কিছু বলা অশোভন এবং অনধিকার-চর্চ্চা বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং গীতাকার এবং অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে কেবল তত্ত্বাজ্ঞে ইহার মূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নয়; ধর্ম্মজীবনের অন্যতম অপরিহার্য্য সাধনজ্ঞানে প্রণিপাত, সেবা, অভ্যর্চ্চা প্রভৃতির সহিত একযোগেই "পরিপ্রশ্নে"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, জর্ম্মণ্যদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক হেগেল (Hegel) অন্যান্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় ধর্ম্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগদান করিতেন না। পক্ষান্তরে সেই

সময়ে তাঁহার গৃহকোণে সমাসীন হেগেল তদীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থরাজি রচনা করিতেন। এই অনাচার ক্রমেই তাঁর ধর্মভীরু পরিচারিকার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার পারলৌকিক সদ্গতি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া এক দিন সসম্ভ্রমে তার মর্মব্যথা হেগেলকে জানাইলে জ্ঞানতপস্বী হেগেল স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন—"ভদ্রে, সুগভীর চিন্তা (জ্ঞান-সাধনা) ও ঈশ্বরোপাসনা" ["Denken ist auch Gottes dienst"—"Thinking is also Divine Service]"

জীবন-জিজ্ঞাসা-সম্ভূত দর্শনের চলমান ধারা

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জিজ্ঞাসা মানব-জীবনের আকস্মিক উপদ্রব মাত্র নয়, তাহার চিরন্তন উপসর্গ। বস্তুতঃ পক্ষে উপচীয়মান জিজ্ঞাসা আশা ও আনন্দ উভয়ই সূচিত করে, সংশয়-জিজ্ঞাসা-নির্বাণ জ্ঞানের যে শান্তি তাহা রিক্তের, প্রেতভূমির শান্তি। আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকুক অসমাহিত চিত্তের সেই অনির্বাণ জিজ্ঞাসা, যাহা মানবাত্মার স্বাস্থ্যের নিশ্চিত লক্ষণ। এই কারণেই জীবন-জিজ্ঞাসা-সম্ভূত যে দর্শন—কি ভারতীয়, কি ইউরোপীয়—তাহার সাধনায় একটি চলমান ধারা আছে! ভারতীয়-দর্শন-ক্ষেত্রে ইহার শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক নজীর পাই ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ-ঋষি-তনয় শূদ্রী গর্ভজাত মহীদাস ছিলেন ইহার রচয়িতা। শিক্ষা ও দীক্ষা বিষয়ে পিতা কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানভিক্ষু পুত্র মাতার নির্দেশে আদিমাতা বসুন্ধরায় শরণাপন্ন হইলেন। মাতা মহীর দীক্ষায় দীক্ষিত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আপনাকে "মহীদাস" এবং "ঐতরেয়" বা "ইতরাপুত্র" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণেতরা শূদ্রীমাতার পুত্র" এই নামকরণেই স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকায় এই "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" প্রাগৈতিহাসিক তথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ভারত-পন্থে"র এক অপূর্ব জয়-তিলক রচনা করিয়া গিয়াছে। ইহারই এক অপ্রাত আখ্যায়িকায় রূপকের ভাষায় গ্রন্থকার ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম-সাধনার তথা দর্শন-মীমাংসার মর্মকথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম-লাভের আশায় যখন গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া এই প্রত্যাদেশ করিলেন—"হে রোহিত, চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে শ্রান্ত, তাহার শ্রী বা সৌন্দর্য্যের অন্ত থাকে না; শ্রেষ্ঠ জনও যদি চলিতে বিমুখ হয় সে অধোগামী, অপদার্থ হইয়া যায়; আর যে চলে স্বয়ং ইন্দ্র তার সখা ও সহচর হন;—অতএব হে রোহিত চলিতে থাক, চলিতে থাক।"

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুমা
পাপো নৃষদ্বরো জনঃ ইন্দ্রইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

"যে চলে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে পুষ্পিত হইয়া উঠে তাহার চলার পথ, বৃহৎ বৃহত্তর ফললাভ করে তাহার আত্মা। মুক্ত পথে চলার শ্রমে হতবীর্য্য হইয়া ঝরিয়া পড়ে তাহার যত পাপক্লেদ; অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।...কারণ নিদ্রাতুর হইয়া শয়ন করাই কলিযুগ, জাগরণই দ্বাপর, গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হওয়াই ত্রেতা এবং অগ্রসর হওয়াই সত্যযুগ; অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! যে চলিতে থাকে, সেই অমৃতলাভ করে। চাহিয়া দেখ সূর্য্যের কি আলোক-সম্পদ, কারণ সে যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এক দিনের জন্যও চলিতে চলিতে তন্দ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব হে রোহিত, অগ্রসর হও অগ্রসর হও।"

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্।"
চরৈবেতি চরৈবেতি।"

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম-সাধনার এই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান একাধারে এত প্রাচীন, অথচ এত নবীন। "ইহাই ভারতের সনাতন পন্থা—অতএব ইহা অদ্যতনজীবনোপযোগী হইতেই পারে না" এইরূপ মনোবৃত্তি সত্যানুসন্ধিৎসার চরম পরিপন্থী। অথচ অথর্ববেদে কুৎস ঋষি "সনাতন" শব্দটির মনোরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সনাতন-মেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ"; "ইহাকে বলা হয় সনাতন কিন্তু অদ্য ইহা নবজীবনে সঞ্জীবিত"। এই ঋষিবাক্যের সমর্থনে নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, স্মরণাতীত যুগের এই "চরৈবেতি" মন্ত্রী বিশ্বতির [illegible] হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গানে [illegible] পান্থজনের সখা হে, পথে চলা [illegible] ত তোমায় পাওয়া" [illegible] ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের (Walt Whitman) "Song of the Open Road"-এ এই চক্রের মধ্যে—

"Allons! Whoever you are,
come travel with me!
Travelling with me you find
what never tires.
* * *
Be not discouraged, keep on, there
are divine things, well envelop'd."

ভয়ের রাজ্য হইতে আত্মার [illegible] বা অভয়-লোক প্রাপ্তি

জ্ঞান-পরিপন্থী যে অজ্ঞান সকল অনর্থের মূল, তাহার অত্যাচার সমূলে বিনাশ করিতে হইলে মানুষ যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী, তাহার জ্ঞানই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। মানব-সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় অথবা আদিম অসভ্য অবস্থা হইতেই এই অজ্ঞানতা-প্রসূত ভয়-প্রণোদিত স্তব ও আরাধনা, প্রশস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে এবং ধর্মজীবনের ইতিহাসে প্রথম সোপানরূপে পরিগণিত হইতেছে। কেহ বলিলেন, জগতে ভয় হইতেই দেবতাদের প্রথম সৃষ্টি, যথা, Lucretius—"It was fear that first made gods in the world." কেহ বা বলিলেন—"fear is the mother of all morals" অর্থাৎ "ভয়ই সমস্ত পাপ-পুণ্য-জ্ঞানের প্রসূতি"। ঋগ্বেদের সংহিতাভাগ এই ভাবের স্তব, স্তুতি, প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। কোথাও অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও ইন্দ্র, কোথাও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ভয়-বিহ্বলচিত্ত উপাসক কর্তৃক অভিনন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। এই ভয়-শাসিত রাজ্যের পরিধি যতই বিস্তৃত হউক, ইহার একটি অবধি আছে এবং সেই সীমা-নির্দ্দেশ-কল্পে কঠোপনিষদের ঋষি বলিলেন:—

[৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বই পড়া

পাঠক ও সমালোচক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বই বস্তুটি আধুনিক সভ্যতার দান। বিজ্ঞানসম্মত মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত, নির্ম্মিত ও প্রচারিত হওয়ার পর এই বস্তুটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য এবং এর বহুল প্রচারের ফলে এটি বর্ত্তমান জগতের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ছিল পাথরে-খোদাই স্তম্ভলিপি বা শিলালিপি, তার পর তাম্র প্রভৃতি ধাতুর ওপর উৎকীর্ণ শাসন বা দান-ঘটিত অনুজ্ঞা। মানুষের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে ভূর্জপত্র, তালপত্র ও তুলাপত্রের ব্যবহারের দ্বারা মনের ভাব লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সে আয়ত্ত করতে থাকে। ফলে পুঁথির জন্ম হয়। দুষ্প্রাপ্যতা গুণে পুঁথি ছিল মহা মূল্যবান বস্তু। এক বা একাধিক পুঁথি যে দেশে থাকত দেশ-বিদেশ থেকে সেখানে শুধু নকলনবিশদের নয়, শ্রদ্ধাশীল পণ্ডিতদেরও সমাবেশ হত, তাঁরা পুঁথি আয়ত্ত করে স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে যে পুঁথির প্রচলন ছিল না—মুখে মুখে এবং কানে শুনে যে ঋষিদের তপস্যালব্ধ জ্ঞান প্রচারিত হ'ত তার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি-কথা দু'টির মধ্যেই পাওয়া যায়। সৌতিক বৈশম্পায়ন প্রভৃতি প্রচারকেরা আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাচীন কালের লোকেরা সত্যিই ভাগ্যবান ছিলেন। পুঁথির সংখ্যা কম ছিল বলেই পুঁথির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। [illegible] পুঁথি তাঁরা নিজেদের [illegible] অবকাশ পেতেন। [illegible]র হাতে আগ্রহ চাপিয়ে [illegible] না। পুঁথির [illegible] করতে গেলেই [illegible] অনুধাবনার প্রয়োজন [illegible] ইউরোপে [illegible] আবির্ভাবের [illegible] পুঁথির সংখ্যা এত কম ছিল [illegible] আছে—সিসেরোর [illegible] নকল করবার জন্যে ফ্রান্স [illegible] করে রাষ্ট্রদূত [illegible] হয়েছিল। সমগ্র ফ্রান্সে [illegible] পুঁথির একটি সম্পূর্ণ [illegible] ছিল না। জেমস্ [illegible] পরিশ্রম করে [illegible] পুঁথি তার লাইব্রেরীতে [illegible] সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর [illegible] লাইব্রেরী একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। [illegible] উইনচেষ্টারের বিশপের সুবিখ্যাত লাইব্রেরীতে মাত্র [illegible] পুস্তক ছিল, তারও সবগুলি খণ্ডিত, সেণ্ট স্যুইদিনের [illegible] থেকে একখণ্ড বাইবেল একবার ধার নেবার জন্যে তাঁকে [illegible] একটা মূল্যবান চুক্তিপত্র সই করতে হয়েছিল। এই সময়ে [illegible] যদি একটা বই খরিদ করতেন দেশ-দেশান্তর থেকে গণ্যমান্য [illegible] ব্যক্তিরা এই ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার জন্যে উপস্থিত [illegible] আনন্দ লাভ করতেন।

২

পাইথোরনান পিথাগোরাস সোলন প্লেটো হিরোডোটাস প্রিনিথো প্রভৃতিকে কি ভাবে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে মিশর পারস্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করতে হয়েছিল তার কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর। এ সত্ত্বেও সেই বিরল পুস্তক-যুগে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে যে শ্রেণীর মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ বইয়ের ছড়াছড়ির মধ্যেও তার তুলনা মেলে না। পাণিনি বেদব্যাস শঙ্কর প্লেটো অ্যারিষ্টটলের আবির্ভাব এ যুগে সম্ভব নয়।

এর প্রধান কারণ এই যে আমরা গাদা-গাদা বই পড়িও, কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করি না। চিন্তা করবার দায়িত্ব আমরা অন্য লোকের অর্থাৎ গ্রন্থকারদের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। বিবিধ খাদ্য আমাদের সম্মুখে থরে-থরে সাজানো রয়েছে, আমরা খাবার আগ্রহে নয়, চোখের নেশায় এটা চাখছি ওটা চাখছি, কিন্তু কোন খাদ্যই হজম করবার মত পরিশ্রমও করছি না। পরিপাকের সময়ও দিচ্ছি না। মহাকবি সেক্সপীয়র চাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন—

"And this our life exempt from public hawnts
Finds tongues in trees, books in the
running brooks,
Sermons in stones, and good in every thing."

আমরা তারা নই, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে আমরা প্রাতঃকালে খবরের কাগজ থেকে আরম্ভ করে মধ্য-রাত্রে নৈশভোজনান্তিক হালকা গল্প পর্য্যন্ত একটার পর একটা গিলে খাচ্ছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হচ্ছি লক্ষ লক্ষ বইয়ের চটকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা, কি পড়ব কি পড়ব না এ ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে ফ্যাশনের খাতিরে কতকগুলো চালু বইয়ে চোখ বুলিয়ে জ্ঞানাঞ্জন-স্পৃহা নিবৃত্ত করছি, কিন্তু আসলে আমাদের মনে ও মজ্জায় কিছুই প্রবেশ করছে না। আমরা এ যুগে সকলেই বই পড়ার ব্যাপারে মন্দাগ্নি রোগে ভুগছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ বিষয়ে মহা মহা চিকিৎসক জন্মেছেন, তাঁদের উপদেশ ও ব্যবস্থায় সাধারণে কতকটা আশ্বস্ত হতেও পেরেছে, প্লিনি, সেনেকো, বেকন, এমার্সন, অ্যাডামস্, টড, কবেট এবং বর্ত্তমান কালে আর্থার কুইলার, আর্ণল্ড বেনেট, ল্যাসেলস অ্যাবার, ক্রন্ধি, মিডলটন মারে, টি, এস, এলিয়ট প্রভৃতির সাহায্য ও নির্দ্দেশে বইয়ের দুর্গম অরণ্যের মধ্যে সাধারণ মানুষে পথ খুঁজেও পেয়েছে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য বাংলা দেশে তেমন পথ-প্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটেনি। আমরা এই রাজ্যে সবে নতুন প্রবেশ করেছি বলে বিস্ময়ের ঘোর আমাদের কাটেনি। এই প্রচণ্ড বিস্ময়ের মধ্যেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ক্ষীণ আহ্বান-ধ্বনি উত্থিত হয়েছে, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে এই পুস্তক-কল্লোলের মধ্যে সাধ্যমত তরঙ্গ তুলতে ডাক দিয়েছেন, মানব-সমাজকে আমাদের নিজস্ব কিছু সংবাদ দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস এখানে এস, এখানে আলোকের জন্ম-সঙ্গীত গান হইতেছে।

"অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোন দিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্য-ধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠেই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?...

"দেশ-বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব জাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দু'টি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পথে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে? জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকর্দ্দমা ও আপীল চালাইতে থাকিব?"

প্রায় ষাট বছর আগেকার এই ডাক, এর আগে রামমোহন মধুসূদন ভূদেব বঙ্কিম এবং এর পরে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা দেশের কিছু কথা পৃথিবীর মানব-সমাজকে শুনিয়েছেন কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? সৃষ্টির আদিকাল থেকে আহৃত পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের পূর্ণ উত্তরাধিকারী আমরা, সে উত্তরাধিকারের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারছি কই? তার জন্যে দরকার মননশীলতা, ছাপা বই শুধু ইঙ্গিত দেয়, সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী মানুষকে ভাবতে হয়, তবেই মানুষ কিছু দান করতে পারে। আজকের দিনে অসংখ্য বই সারি-সারি সাজানো রয়েছে চার দিকে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা পথ্য, কোনটা অপথ্য—এর মধ্যে থেকে নিজের ক্ষমতা ও প্রয়োজন মত বাছাই করে কাজে লাগানো সাধারণ পাঠকের কাজ নয়; এর জন্যে প্রয়োজন সমালোচকদের সাহায্য। নিভৃত সাধনায় ঋষি-মুখে বেদমন্ত্র উদ্গীত হয়েছিল কিন্তু তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে পেরেছেন সায়ণ তাঁর টীকার সাহায্যে, বেদান্তসূত্রকে সহজ করেছেন শঙ্কর-রামানুজ, পুরাণ ভাগবত বুঝতেও নীলকণ্ঠ প্রভৃতির সমালোচকদের নির্দেশ প্রয়োজন হয়েছে। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়রকে সহজ ও বিশদ করেছেন হাজার খানেক টীকাকার, ব্রাউনিংকে বুঝতে ও বোঝাতে ব্রাউনিং-চক্রের কাজ এখনও শেষ হয়নি। পৃথক্ পৃথক্ কবিদের কাব্যরস হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে যেমন সমালোচকের প্রয়োজন, পৃথিবীর পুস্তক-গহনে পথ খুঁজে পাবার জন্যেও তেমনি তাদিকে দরকার। এ যুগে বইকে বাদ দিয়ে কোনও মানুষের চলে না, চলা উচিত নয়!

এক জন বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী বলেছেন—পৃথিবীর যাবতীয় বিশিষ্ট লোকের অভ্যাস হচ্ছে অবিরাম বই পড়া। এই অভ্যাস ছাড়া সাধারণ থেকে বিশেষ হয়ে ওঠার আর কোনও পথ নেই। বেকন বলেছেন, 'Reading makes a full man ; conversation a ready man writing an exact man.' অর্থাৎ গোটা মানুষ হতে হলে পড়া চাই। বেকন "গোটা" বলতে যা বুঝেছেন প্রভূত অধ্যয়ন ও বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তা হবার জো নেই। বই পড়ে যে জ্ঞান লাভ হয় ভগবদ্দত্ত প্রতিভার বলে তা আপনা থেকে অর্জ্জিত হয় না; অতি মনস্বী দু'-এক জন মানুষ হয়তো নিজস্ব একটা পথ বের করতে পারেন, কিন্তু যখন আদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষের সমবেত চেষ্টায় প্রশস্ত পথ প্রস্তুতই রয়েছে তখন চেষ্টা করে নতুন পথ গড়ার সার্থকতা কি? মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, এই অনন্ত কালের সমুদ্রে সাধারণ পাঠকদের ভাসবার ভেলা হচ্ছেন টীকাকাররা, সমালোচকরা যাঁরা নিজেরা সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে জটিল দুর্গম পথকে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করে তোলেন, যাঁরা গন্ধমাদন বহন করে আনেন না, সেখান থেকে বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী সংগ্রহ করে এনে সকলকে দান করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুরুকরণ যতটা দরকার এমনটি আর জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নয়।

ইংরেজী সাহিত্য বা পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত বিরল-সন্ন অরণ্যে যথার্থ পথনির্দ্দেশ করার লোকেরও অভাব আছে। অতীতে যেখানে বনস্পতির বাহুল্য সেখানে আমাদের ভয় নেই, কারণ আমাদের অতীত অতি দূরবর্তী নয়। বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদে আমাদের সুরু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এই সূত্রপাত যুগের যত দূর সম্ভব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের দিয়েছেন। আঁধার তিমিরগর্ভ থেকে সংগৃহীত মণিগুলি ও কালি-ঝুলি আবর্জনার আবরণ মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বকীয় উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পাচ্ছে। তার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাংলা ভাষার আদিতম খাঁটি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মশায়ের চেষ্টায় আমাদের আয়ত্তাধীন হয়েছে। এর পর বাংলা সাহিত্যে পদাবলী-শাখা, মংগল কাব্যশাখা ও অনুবাদ শাখা জড়াজড়ি হয়ে আছে। কিছুটা জট ছাড়িয়ে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়েছেন নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন মল্লিক, সারদাচরণ মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী পাঠকেরা চেষ্টা করলে এখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, গোবিন্দদাসের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, মাণিক গাংগুলী ও ঘনরামের ধর্মমংগল, কাণা হরিদত্ত ও বিজয় গুপ্তের মনসামংগল, কৃত্তিবাস ও জগৎরামের রামায়ণ, কাশীদাস ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে, কৃষ্ণপ্রেমতরংগিণী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ফেলবে না। তারা সহজেই বলতে পারবে যে, চণ্ডীদাস যেমন পদাবলী-শাখার শ্রেষ্ঠ কবি, মংগলকাব্যে তেমনি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকংকণ, বলতে পারবে কাশীরাম দাস অনুবাদে অতুলনীয়, বলতে পারবে ভারতের প্রথম নিখুঁত ছন্দ ও শব্দশিল্পী। তার পর এসেছে চৈতন্য-যুগ—বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রৌপ্যযুগ। এই যুগে জীবনী-শাখায় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ; পদাবলী-শাখায় বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ দাস সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তার পর মাঝখানে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রায় সমকালে বাংলা দেশে এসেছে কবির যুগ—অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকারেও আলোকপাত করে গেছেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ওদিকে পূর্ব্ববংগে যে অপরূপ কাব্যকথা-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল—চন্দ্রকুমার দে, দীনেশচন্দ্র সেনের চেষ্টায় সে অপূর্ব্ব রস থেকেও বাংগালী পাঠক আজ বঞ্চিত নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এসেছেন পাদরি কেরি। আরম্ভ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে গদ্য-যুগ—এসেছেন রাম রাম বাবু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন ও কৃষ্ণমোহন, সুরু হয়েছে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে শিথিল গদ্যকে

শিল্প-সংগত করে সাহিত্য সৃষ্টি—তার পর আধুনিক যুগ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ-যুগের পত্তন, গুরু ঈশ্বর গুপ্ত, শিষ্য বংকিমচন্দ্র, দীনবন্ধু। এর পরে বন্যা-স্রোতের মত সাহিত্য ক্ষেত্রে ঢুকেছে বইয়ের স্রোত, ভাল-মন্দ মাঝারি নাটকই ছাপা হয়েছে হাজার হাজার, কবিতার বই দশ হাজারের হিসেবে। রাজা রাজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, দ্বারকানাথ এক দিকে, অন্য দিকে রংগলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল। এল বংগদর্শনের যুগ, সমালোচনার হস্তে গগনে অবতীর্ণ হলেন বংকিমচন্দ্র, অসহায় বাঙালী পাঠক যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেল, বংকিমচন্দ্রের তীব্র কশাঘাতে যাচাই হতে লাগল ভালমন্দ—অনেক জঞ্জাল সাফ হয়ে গেল। এলেন রবীন্দ্রনাথ—তিনিও গুরু বংকিমচন্দ্রের পদাংক অনুসরণ করে সাধনা নব পর্য্যায় বংগদর্শন মারফৎ দিগ্‌ভ্রান্তদের দিক্‌নির্ণয়ে সাহায্য করলেন। বিংশ শতাব্দীর দশক থেকে পশ্চিম-সমুদ্র থেকে যে বেনোজল ঘরে ঢুকল তারি ধাক্কায় বাংলা দেশের সাহিত্য-প্রাংগণ ভরে উঠল ভাল-মন্দ গাছে ও আগাছায়। এখন দিশেহারা পাঠককে রক্ষা করবার জন্যে প্রয়োজন দরদী সত্যনিষ্ঠ সমালোচকের। বাংলা সাহিত্যকে ভরা-ডুবি থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁদের আবির্ভাব এবার প্রয়োজন হয়েছে।

আন্টুনী ফিরিঙ্গী

ক খ, গ

বাঙলা দেশে কবিগানে আন্টুনী অত্যধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জাতে পর্ত্তুগীজ. ব্যবসায়-কর্ম্ম উপলক্ষে বাংলা দেশে আগমন করেন, ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার প্রথম অধিবাস এবং এই স্থানেই তিনি এক ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রেমে পড়েন। শেষে যুবতীকে লইয়া গরীটির নিকট গিয়া বসবাস করেন। তাঁহার প্রস্তুত বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ বহু কাল তথায় দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"আমার কোন আত্মীয় বলেন,—"আন্টুনী সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙ্গার নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড্ হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আন্টুনী সাহেবের ভগ্নবাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।"

আন্টুনী যৌবন কালে ফরাসডাঙ্গার কয়েকটি অসৎ প্রকৃতি লোকের সংসর্গে পড়িয়া নষ্টচরিত্র হন। তিনি প্রথমে এক জন হিন্দু কবিওয়ালার দলে প্রবিষ্ট হন, পরে নিজেই দল গঠন করেন।

আন্টুনীর প্রেমিকা ব্রাহ্মণকন্যা ম্লেচ্ছস্পৃষ্টা হইলেও তিনি হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবতী ছিলেন,—নিজ গৃহে দুর্গোৎসবাদি করিতেন। পূজায় তাঁহার বাটীতে কবি হইত। বাঙালী ব্রাহ্মণ-কন্যার সম্পর্কে থাকিয়া, আন্টুনী সাহেবও উত্তমরূপে বাঙলা শিখিয়াছিলেন। কবির গান বেশ বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাঁহার কবির নেশা জমিয়া যায়, তিনি সখের দল গঠন করিলেন। প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, এক্ষণে যা কিছু সঞ্চিত বিত্ত ছিল, সখের কবির দলে তাহাও নিঃশেষ করিলেন। কাজেই তখন সখের দলকে পেশাদারী করিতে হইল। ক্রমে ক্রমে দলের পসার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইল, —অর্জ্জিত অর্থে পরম সুখ ও সচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ ঠাকুর প্রথমতঃ ইঁহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। শেষে আন্টুনী নিজেই উত্তম উত্তম গান রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একবার ঠাকুরদাস সিংহের দলে রাম বসু আন্টুনীকে বলেন,—

"কও হে এনটুনী! আমি এইটি শুনতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে, তোমার গায়ে, কেন কুর্ত্তি নাই।"

আন্টুনী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরে সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি-টুপী ছেড়েছি।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আন্টুনী সাহেবী বেশ—কোর্ত্তা কিংবা টুপি পরিতেন না,—তৎকালীন বাঙালীর ন্যায় ধুতি-চাদরই ব্যবহার করিতেন।

আর একবার নিজের দলে থাকিয়া রাম বসু আন্টুনী সাহেবকে বলেন,—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মুড়ালি।
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে গালে দিবে চূণ-কালি।"

আন্টুনী জবাব দিলেন—

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই!
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,—
আমার মানব-জনম সফল হবে,—যদি রাঙ্গা চরণ পাই।"

একবার দুর্গোৎসবের সময় চুঁচুড়ার কোন ধনবান লোকের বাড়ী আন্টুনীর দলের বায়না হয়। গোরক্ষনাথ ঠাকুর তখন সাহেবের দলের বাঁধনদার। গোরক্ষনাথ আন্টুনীকে বলিলেন,—"আমার সংবৎসরের মাহিনা এই পূজার আগে শেষ করিয়া দিতেই হইবে,—না দিলে,—আমি নূতন আগমনী বাঁধিয়া দিব না।" সাহেব এবার বড়ই রাগিয়া উঠিলেন। তিনি আর গোরক্ষনাথের তোয়াক্কা রাখিলেন না,—নিজেই আগমনীর নূতন গান বাঁধিয়া লইলেন। এই গানের দুই ছত্র এইরূপ;—

"আমি ভজন-সাধন জানিনে মা! নিজে তো ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গি!

একটি বিপক্ষ দল আন্টুনী সাহেবকে বলেন,—

আন্টুনী ফিরিঙ্গী কফন চোর। ভাঙ্গে রাত হলে সব মৌত গোর।
টাটকা গোরে শুটকী ভূতের রব,—এ কি অসম্ভব,—
এ হুমকি দিয়ে বস্তু লোটে সব,—এর ঠাঁর-ঠিকানা গেল জানা,
মানুষ হলো তিন সহর।"

ললিতকলা ও সুভাষচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সুভাষচন্দ্র বসুর অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম, রাজনীতিক জ্ঞান ও ঘটনাবহুল কর্ম্মজীবন নিয়ে বড় বড় লেখক ও বক্তা বড় বড় আলোচনা করেছেন। সেগুলি পাঠ বা শ্রবণ করলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কেবল এই কথাই মনে করি, অতি-আধুনিক ভারতে অবহেলিত ক্ষুদ্র বাংলা দেশ এখনো হারিয়ে ফেলেনি এমন মহামানুষকে জন্ম দেবার শক্তি!

কিন্তু আজ আমি সুভাষচন্দ্রকে ঐ-রকম বড় বড় দিক্ থেকে দেখতে বা দেখাতে চাই না। মহামানুষরা কেবল বড় বড় আসর-জমানো ব্যাপার নিয়ে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করেন না, তাঁদের জীবন বিচিত্র এবং বহুধা বিভক্ত এবং সাধারণতার মধ্যেও তাঁরা হন অসাধারণ।

ধরুন নেপোলিয়নের কথা। তাঁর নাম করলেই মনে হয় এমন এক জন একাধিপতি দিগ্বিজয়ীর মূর্ত্তি, যাঁর নিষ্ঠুর রক্তরঞ্জিত তরবারি কোন দিন হয়নি কোষবদ্ধ। কিন্তু আসলে এই মূর্ত্তিই তাঁর সমগ্র মূর্ত্তি নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তগঙ্গায় যখন মানুষের প্রাণ নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা, যখন জয় হবে কি পরাজয় হবে সেটাও সুনিশ্চিত নয় বলে মন দুলছে সন্দেহ-দোলায়, যখন চারি দিক থেকে ক্রমাগত আসছে যুদ্ধরত সেনানীদের কাছ থেকে রকম-রকম আবেদন, তখন সেই মারাত্মক গণ্ডগোলের মধ্যেও দেখি অশ্বারোহী নেপোলিয়ন করছেন সুদূর প্যারি সহরের মেয়ে-বিদ্যালয়ের জন্যে জরুরী ব্যবস্থা! নেপোলিয়নের আর একটা বিশেষত্ব দেখি মস্কো সহরে, যেখান থেকে তাঁর অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সেখানে যখন তাঁর নিজের জীবন অশান্তিময় এবং সমগ্র সৈন্যদল বিপদগ্রস্ত, তখনও তিনি মস্কো নগরে ফরাসী নাট্য-জগতের প্রভাব বিস্তারের জন্যে বন্দোবস্ত করছেন! নেপোলিয়ন কেবল যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য চালনাই করেননি, তিনি ইতিহাস ও ছোট গল্প রচনাও করেছেন এবং তিনি ছিলেন সাহিত্য ও নাট্য-কলারও বিশিষ্ট ভক্ত। তাঁর আরও অনেক রূপ আছে, কিন্তু এখানে সে-সব দেখাবার দরকার নেই।

একালের হিটলারের কথাও ধরুন। নেপোলিয়নের মত বিচিত্র ও সুবৃহৎ প্রতিভার অধিকারী না হলেও, তিনিও এক জন নির্ম্মম একাধিপতি ও রাজনীতিবিদ্ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে ভয়াবহ রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছেন, আজও তা শুকিয়ে যায়নি। কিন্তু হিটলারের আর এক মূর্ত্তি দেখেছি যখন তিনি গিয়েছেন রঙ্গালয়ে গীতি-নাট্যাভিনয় উপভোগ করতে। সঙ্গীতবিদ্ না হলেও সঙ্গীতকলা ছিল তাঁর পরম প্রিয়। তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন এমন এক ব্যক্তি বলেছিলেন: "Hitler needs music like dope?" নিজের সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলতেন: "I think I am one of the most musical people in the world." কেবল তাই নয়, তিনি স্থাপত্য ও চিত্রকলারও অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

অমন যে নিরক্ষর, দুর্দ্ধর্ষ ও হত্যাকারী রণবীর তৈমুরলং, তাঁরও মনের মধ্যে ছিল ললিতকলার প্রভাব! উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন তাঁর পায়ের তলায় রক্ত-বন্যায় ভাসছে, তখনও তিনি মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছেন ভারতের শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিকে। অনুভব করলেন শ্রেষ্ঠ স্থপতির অভাবে তাঁর নিজের দেশ স্থাপত্যকলায় কি দরিদ্র! অতএব যাবার সময় এখান থেকে তিনি ধরে নিয়ে গেলেন দলে দলে ভারতীয় শিল্পীকে!

যদি আরো প্রাচীন যুগের দিকে তাকাই তাহ'লে দেখি, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (ভিনসেন্ট স্মিথ যাঁকে "ভারতের নেপোলিয়ন" উপাধি দিয়েছেন) কেবল রাজ্য ও অস্ত্র-চালনাই নয়, সেই সঙ্গে করেছেন বীণার উপরে অঙ্গুলিচালনাও। তাঁর সভাকবি হরিষেণ বলেন, তিনি সুকবি ও সুগায়কও ছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও ছিলেন একাধারে যোদ্ধা, কবি ও অভিনেতা।

সুভাষচন্দ্রের মনও ছিল বহুমুখী। কেবল রাজনীতি নিয়েই তিনি একান্ত ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকতেন না, "অসামরিক" বলে নিন্দিত বাঙালীর ছেলে হয়েও দরকার হ'লে তিনি যে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক্ ভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক সৈন্য চালনা করতে পারতেন প্রবীণ সেনাধ্যক্ষের মত, এ সত্যও আজ কারুর অবিদিত নেই।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ থেকে তিনি 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর জীবনের আর একটি দিক্ দেখতে পাই। পত্রের একাংশ এই: "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। 'নিবেদিতা'র মত আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে'র একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—এ কথা বলা বাহুল্য।"

কূট রাজনীতি নিয়ে যাঁরা সর্ব্বদাই নাড়া-চাড়া করেন তাঁদের অধিকাংশেরই মন এমন নীরস ও এক দিক-ঘেঁষা হয়ে যায় যে, সাহিত্য ও সূক্ষ্মতর ললিতকলা তাঁদের আর আকর্ষণ করতে পারে না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করে সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে কিছু বলতে বাধ্য হলে মুখরক্ষার জন্যে তাঁরা অল্প নয়—বিস্তর বাক্যোচ্ছ্বাসই প্রকাশ করতে পারেন বটে, কিন্তু সে-সব কথা হয় এতই শূন্যগর্ভ যে উচ্চতর চিত্তকে স্পর্শই করতে পারে না। এ জন্যে দোষ দিই না, কারণ কর্ম্মব্যস্ত জীবনে "রসের ক্ষেত্রে চাষ দেবা"র প্রতিভা বা অবসর থাকে না সাধারণ রাজনৈতিকদের।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা হচ্ছে অসাধারণ এবং সর্ব্বতোমুখী। কখনো তিনি আত্মত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক, কখনো সৈনিক, কখনো কূট যোদ্ধা রাজনৈতিক, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো পরমহংস-বিবেকানন্দের অনুগত এবং কখনো যুবকদের নিয়ে সংগঠন-কার্য্যে নিযুক্ত। বিদেশী রাজদণ্ডের নির্দ্দয় শাসনে বার বার তিনি কারাগারের ভিতরে বন্দী হয়েছেন, স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন, বা অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু কখনো নির্ব্বাপিত হয়নি তাঁর জ্বলন্ত দেশ-হিতৈষণা এবং কখনো রুদ্ধ হয়নি তাঁর ভাব থেকে ভাবান্তরে আনাগোনা।

বিশ্বের বিস্তৃত রাজপথে মিছিলের নেতারূপে সবাই দেখেছে সুভাষচন্দ্রকে। কিন্তু যেখানে তিনি রূপ-রসের কুঞ্জবনে আত্মস্থ,

সেখানে কলারসিক সুভাষচন্দ্রকে বাইরের খুব কম লোকই দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এখন থেকে বাইশ বৎসর আগে সুভাষচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ম্যাণ্ডেলে জেলে বন্দী তখন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের একখানি পত্রের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন: "আমি নিজে এক জন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি, আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাকে বল, আমি নই। * * * কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই।"

কার্লাইল তাঁর "হিরো-ওয়ারসিপ" গ্রন্থে বলেছিলেন, যিনি কবিতা রচনা করেন কেবল তিনিই কবি নন, যিনি কবিতা পাঠ করেন তিনিও কবি।

উক্তিটী ভ্রান্ত নয়। পাঠকের মনের মধ্যে কাব্যরস না থাকলে তাঁর পক্ষে কাব্যরসজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য কাব্যপাঠক মাত্রেই কবি নন, কারণ অধিকাংশ পাঠকই কাব্যরসে বঞ্চিত এবং যারা পাঠ করেন তাঁরা হয়তো কোন হুজুগের বা খেয়ালের খাতিরে এবং কাব্য পাঠ করেও কোন রসই উপলব্ধি করতে পারেন না।

কবি সম্বন্ধে কার্লাইলের ঐ উক্তিটি অন্যান্য কলাবিদদের সম্বন্ধেও প্রযোগ করা চলে। চিত্র, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ কলারসিক, এমন লোক কোন দেশেই বেশী নেই। কিন্তু এঁরা হাতে ছবি না এঁকেও, গলায় গান না গেয়েও এবং পায়ে নাচ না নেচেও চিত্রকর, গায়ক ও নর্ত্তকের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর কলাবিদ্ নন।

প্রত্যেক আর্টের মূল রসটি থাকে মানুষের মনের অন্তঃপুরে। আসল শিল্পী মানস-চক্ষু দিয়ে দেখতে পান, প্রাণের কাণ দিয়ে শুনতে পান। চিত্রকর লোমাজ্জো একুশ বৎসর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি মারা যান ষাট বৎসর বয়সে। সেই সুদীর্ঘ অন্ধ-জীবন-কালটা তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন অন্যান্য শিল্পীদের চিত্র-সমালোচনা করে এবং কেউ ভ্রান্ত বলে মনে করত না তাঁর মতামত। বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য বেটোফেন বধির হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালা হয়েও কিছুমাত্র কমেনি তাঁর নব নব সুরসৃষ্টির ক্ষমতা।

অমনি কলাকুশলী মনের অধিকারী সুভাষচন্দ্র। তাঁর মনের ভিতরে দেখি সঙ্গীত ও নৃত্যকলার ছন্দ। রাজনৈতিক টানাটানির মধ্যে ঘটনা-বহুল জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েও ললিতকলাকে তিনি ভুলতে পারেননি। এবং সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হয়ে নির্জ্জন নিরানন্দ রাজ-কারাগারে বসে-বসেও তিনি মনে মনে শুনেছেন সঙ্গীতের ঝঙ্কার ও নৃত্যের নূপুর-নিক্কণ!

প্রকৃত কলাজ্ঞান না থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারেন না: "বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জ্জিত ও খর্ব্বই হয়ে যায়।"

এদেশের সেরা-সেরা ওস্তাদরা দেশী গান আর নাচকে বাছা-বাছা লোকের বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ঐ দু'টি শিল্পের প্রায় জীবনশূন্য করে তুলেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আজ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত

হচ্ছে আমাদের সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আজও একাধিক ওস্তাদ-গায়ককে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে অনুরোধ ক'রে এমনি কথাই শুনেছি যে, সে-সব গান গাইলে তাঁরা না কি আর গাইয়ে-সমাজে কল্কে পাবেন না, তাঁদের না কি জাত যাবে।

যে-শ্রেণীর নৃত্য ও সঙ্গীতকে গত যুগের রাজা-মহারাজা এবং ধনপতিরা সুরক্ষিত রাজসভায় বা বৈঠকের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'উচ্চাঙ্গের ললিতকলা'। সেখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং থাকলেও মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ছিল না তাদের। তথাকথিত উচ্চাঙ্গের ললিতকলা কাব্যকে প্রায় বর্জ্জন করে মেতে থাকত শুকনো ব্যাকরণ নিয়েই এবং যে আর্টের মধ্যে সরলতা, সরসতা ও স্বাভাবিকতার অভাব, সর্বসাধারণের জীবনযাত্রা ও হৃদয়ের ছন্দের সঙ্গে কোন দিনই সে যোগস্থাপন করতে পারে না। উপরন্তু তাকে জাতীয় আর্ট ব'লেও মানা যায় না।

বাংলা দেশে আগে মেঠো কবি, বাউল কবি ও কীর্ত্তন-শিল্পী প্রভৃতি বরাবরই চেষ্টা করে এসেছেন জনসাধারণের মানসিক ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। সত্যিকার অকৃত্রিম বাংলার আকাশ-বাতাস, মাটি, ফুল-ফল, পাখীর গান, নদীর জল ও শ্যামলতার রূপ-রস-স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁদেরই অনাহত কণ্ঠের মধ্যে। তাঁরাই করে গিয়েছেন বাংলা দেশে জাতীয় আর্টের সৃষ্টি, কারণ বাছা-বাছা জন'কয়েককে নিয়ে নয়, সর্বজনকে নিয়েই ছিল তাঁদের কারবার। এবং এই সত্য উপলব্ধি করেই শিল্পনায়ক রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলার সঙ্গীতে এনেছেন যুগোপযোগী নব রসের ধারা। প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তিনি ঘটিয়েছেন লোক-সঙ্গীতের বিচিত্র ও অপূর্ব্ব মিলন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতিও এ-বিষয়ে তাঁকে করেছেন অল্প-বিস্তর সাহায্য।

বাংলার আধুনিক সঙ্গীত আজ বিদ্রোহী হয়ে রাজসভার সোনার পিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, বিপুল জনতার হৃদয়ের মধ্যে এবং জনতাও তাকে গ্রহণ করেছে সাগ্রহ আনন্দে। সে এখন জাতীয় সম্পত্তি, সে এখন (সুভাষচন্দ্রের ভাষায়) "জনসাধারণের কাছে সুগম।"

আর বেশী বাক্যব্যয় না করে সুভাষচন্দ্রের সমগ্র পত্রখানি উদ্ধার করে দিলুম। পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানি সাধারণ পত্র নয়, এ হচ্ছে পত্র-সাহিত্য; কারণ এর মধ্যে বাংলা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের রচনা-শক্তিরও পরিচয় আছে যথেষ্ট। তিনি বলছেন:

"এ কথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number" এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive,". নয় "unproductive", তবে কোন্ কাজ যে "productive," তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করি নে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে এক জন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর-জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক্, এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হলুম না তার কারণ, হতে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, "শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না," এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই। আর কোনও কলার সমঝদার হতে গেলে তা'তে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

"দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, এ আক্ষেপ কোরো না যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন সেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint" বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ ও মহৎ কিছু সম্পাদন করা কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন, সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হউক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

"কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট-ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত, কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জ্জিত ও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয়, লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে। অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্য-দশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে, তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে বলে' ত আমি জানি নে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,—যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাংলা দেশে লোক-সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও

বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরায় যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা এ-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

"লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের দিক্ থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি শিল্পী নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর শুধু সঙ্গীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির অনুশীলনের পর তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না।

"সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করিবার যে ক্ষমতা তার আছে, অন্ততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি না কি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মার আর্ট চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধ হয় এই কারণে, আর লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয়ে আরও কথা হবে।"

"আত্মহত্যা কি পাপ?"

[প্রতিবাদ]

শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়ের 'বসুমতী'তে "আত্মহত্যা কি পাপ" প্রবন্ধটি পড়িলাম, এ রকম প্রবন্ধ মাসিক কাগজে আলোচিত হওয়া সমাজ-জীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ এই প্রশ্নটা আজকের জগতে অনেকের জীবনেই এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রশ্নটা খুবই ব্যাপক। লেখক বিষয়টির যে দিক্ থেকে যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন সেটা মোটেই ঠিক নয়।

বিষয়টির আলোচনা করতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে—পাপ এবং পুণ্য কি? লেখক এদিক্‌টার কোনও পরিষ্কার উত্তর দেন নাই। তিনি লিখেছেন, পাপ ও পুণ্য "সূক্ষ্ম ন্যায় ও সূক্ষ্ম অন্যায়"—আবার ব্যক্তিবিশেষের জন্যে যাহা ন্যায়—অপরের পক্ষে সেটা অন্যায়। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ নয়, এবং লেখকের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে বিষয়টা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই।

পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা দিতে হলে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হবে। পাপ-পুণ্যের ভিত্তি জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা জীবাত্মার জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাঁহারা "যাবৎ জীবেৎ" নীতি অনুসরণ করেন; যাহা পার্থিব সুখের অনুকূল তাহাকেই পুণ্য বলে মনে করতে পারেন এবং সাময়িক দুঃখে মোহগ্রস্ত হয়ে এ দেহ নষ্ট করতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা জীবাত্মার কর্ম্ম দ্বারা ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন। যাহা জীবাত্মার উন্নতি সহায়ক তাহাই পুণ্য এবং যে কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মার অবনতি হয়ে থাকে তাহাই পাপ। এখন দেখতে হবে, আত্মার উন্নতি বা অবনতি বলতে কি বুঝায়। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি, "এ লোকটির মন দেবতার মত," বা "এ লোকটা একেবারে নীচ"—কিন্তু কেন? মানুষের মন "সত্ত্ব", "রজ" ও "তম" এই তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, সাত্ত্বিক ব্যক্তি ধীসম্পন্ন, উদার ও নিঃস্বার্থপর এবং তামসিক ব্যক্তি ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুর একান্ত অধীন হয়ে থাকে। তম গুণের দ্বারা যে মন পরিচালিত হয় তাহার কোনও বিচার-শক্তি থাকে না এবং তাহার প্রবৃত্তি পশুর ন্যায় হয়ে থাকে। তাই সাত্ত্বিক গুণের বৃদ্ধিই উন্নতির পরিচয় এবং ইহার হ্রাস অবনতির সূচনা করে।

এখন দেখতে হবে, আত্মহত্যার সময়ে মানুষের মনের অবস্থা কিরূপ হয়ে থাকে। মানুষ নিশ্চয়ই দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। যে সুখী, সে কখনও নিজের জীবনকে অল্পায়ু বলে কল্পনা করতে চায় না। তাই'লেই আত্মহত্যার পূর্ব্বক্ষণে মন দুঃখের দ্বারা একান্ত ভাবে আচ্ছন্ন থাকে, নিজের উপরে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস হারায়—ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার ক্ষমতা থাকে না এবং শুধু নিজের বর্ত্তমান পার্থিব দুঃখ ভিন্ন অপর কোন বিষয় চিন্তাও করতে চায় না। এক কথায় মন সে সময় মোহাচ্ছন্ন ও তম গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকে। এই অবস্থায় যদি জোর করিয়া জীবাত্মাকে দেহত্যাগ করতে বাধ্য করা যায়, তবে দেহত্যাগের সময় যে মনটি নিয়ে সে বাহির হয়ে যায় সেই মনটি নিয়ে বহু কাল অসীম কষ্ট পায়; কারণ, যে কারণে সে আত্মহত্যা করেছে সে কারণটি তখনও তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া শাস্ত্র বলেন, মানুষের মনে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে-ভাব প্রবল হয় তাহাই তাহার পরজন্মের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে মন তম গুণাচ্ছন্ন থাকিলে পরজন্মও তম গুণাচ্ছন্ন আবেষ্টনেই হ'য়ে থাকে। তাই হিন্দু-শাস্ত্র মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই কারণেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে বর্ণনা করেছেন।

লেখক শ্রীরামচন্দ্র, সক্রেটীশ ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের "আত্মহত্যা" ও অধ্যাত্ম তত্ত্বে বলীয়ান যোগী-ঋষিদের "দেহত্যাগ" এক নয়। যাক, এ-বিষয়ে আর বেশী লিখলে হয়ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই এখানেই সিদ্ধান্ত করছি, "আত্মহত্যা" মহাপাপ এবং আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী মহাত্মাগণ যে-সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন আমাদের অল্প চিন্তায় তাহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করা খুবই অনুচিত ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি

[কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতীয় কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়া মাননীয় লেফটেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্র।]

"বহুবিধ সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

শ্রীযুক্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের উৎসাহ ও উদ্যোগে আগামী জানুয়ারি মাসে আলীপুরে সপ্তাহ ব্যাপিয়া এক বৃহৎ কৃষি-কার্য্যের প্রদর্শন-ব্যাপার হইবে। ভারতবর্ষের কৃষিকার্যের উৎসাহ প্রদান এবং উন্নতিসাধন করাই উক্ত প্রদর্শন-ব্যাপারের প্রধান তাৎপর্য্য। আপনাদিগকে উহার তাৎপর্য্য অবগত এবং উক্ত প্রদর্শন-স্থলে আহ্বান করণার্থে উক্ত গবর্ণর বাহাদুর ভারতবর্ষীয় সভাকে এবং লোয়ার প্রবিন্সের কমিশনরদিগকে যে পত্র লেখেন, উক্ত দুই পত্রেরই অনুবাদ এতৎ পত্রসহ প্রেরিত হইতেছে ; পাঠ করিলে তন্মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

ফলতঃ কৃষিবিদ্যার উন্নতিসাধনই যে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির নিদান সে বিষয়ে কোন ব্যক্তিরই সংশয় জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু এক্ষণে এ দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থা যে প্রকার দুর্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা মনে হইলে এবং অন্যান্য দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষু লোকের মনে অবশ্যই লজ্জা ও ক্ষোভের উদয় হয়, সন্দেহ নাই। দয়াবান লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কেবল এ দেশের কৃষিবিদ্যার এই দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশেই প্রস্তাবিত প্রদর্শন-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব আপনারা তাঁহার উক্ত মহৎ উদ্দেশের সহকারিতা করিয়া স্বদেশের শ্রীসাধন ও স্ব-স্ব নামের গৌরব বর্দ্ধন করিলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের বিষয় হয়।

উক্ত প্রদর্শন-স্থলে বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশজাত গো, বৎস, অশ্ব, মেষ, মহিষ প্রভৃতি নানা প্রকার জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রকার ফল, শস্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বহুবিধ যন্ত্র সংগৃহীত হইবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো কি মহিষ ও মেষাদি প্রদর্শন করাইতে পারিবে কি যে কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল কি শস্য আনিয়া ঐ প্রদর্শন-স্থলে উপস্থিত করিবে, তাহারা আপন-আপন যোগ্যতা ও পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আপনারা স্বীয় স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগকে ইহা অবগত করিয়া উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করাইয়া উক্ত প্রদর্শন-স্থলে প্রেরণ করিবেন অথবা সমভিব্যবহারে লইয়া আসিবেন। এই প্রদর্শন-ব্যাপারের এই প্রথম সূত্র, ইহাতে যে সকল কৃষকেই কৃতকার্য্য হইয়া তুল্যরূপ পারিতোষিক লাভ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যাহারা পারিতোষিক না পাইবে, তাহারা অন্য দেশের পারিতোষিক যোগ্য উৎকৃষ্ট উৎপন্ন বস্তু দেখিয়া তদ্রূপ করিতে পারিবার জ্ঞান লাভ ও আশা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর উপকৃত হইতে পারিবে। অতএব কেবল পারিতোষিক-লোভে প্রদর্শন-স্থলে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রদর্শন-স্থলে কৃষকদিগের স্ব স্ব উপস্থিত হওয়া উচিত। উপস্থিত হইলে আপন অপেক্ষা অন্যের উৎপন্ন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি দেখিয়া উভয় বস্তুর আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ তুলনা করিয়া অনায়াসক্রমে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভবনা। প্রত্যেক প্রদর্শন-স্থলে যদি গ্রামের অধিকাংশ প্রজার উপস্থিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সহজ ও সাধ্য না হয়, তত্রাপি অন্ততঃ এক-এক গ্রাম হইতে এক-এক জন প্রধান ও বুদ্ধিজীবি প্রজারও এ ব্যাপারে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেও লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনেক অভিলাষ পূর্ণ ও কৃষকদিগের মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া মহাশয় স্বীয় ও অন্য অন্য অধিকারের প্রজালোকদিগকে সঙ্গে লইয়া এই ব্যাপারে উপস্থিত হইয়া কৃষি-কার্য্যের উৎসাহ প্রদান করিবেন ইহাতে যে কেবল লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ রক্ষন এবং প্রদর্শন-দর্শনে নিজ নিজ কৌতূহল নিবারণ হইবে, এরূপ নহে, ইহাতে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কেবল প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজাকে প্রদান করা জমিদারের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া প্রজার মঙ্গল হয়, জমিদারদিগের সর্ব্বতোভাবে তাহার যত্ন করা বিধেয়। জমিদারেরা প্রজার উপস্বত্বভোগী ; প্রজার মঙ্গল হইলে অবশ্যই জমিদারও তাহার কুশলভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব যাহাতে উপস্থিত ব্যাপারে আপনাদিগের স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজালোকের সমাগম হইয়া কৃষিকার্য্যের উৎসাহ প্রদান করা হয়, আমাদিগের এই একান্ত নিবেদন, এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরেরও এই প্রধান তাৎপর্য্য। ইতি।

সম্পাদকস্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

নেপোলিয়ানের চিঠি

[রক্তাক্ত বিজয়-শকট চালিয়ে যে ক'জন মানুষ দিগ্বিজয়ের অভিযানে বেরিয়েছিলেন নেপোলিয়ান তাদের অন্যতম। সফল তিনি হননি বটে পৃথিবী-জয়ে, কিন্তু বীরত্বের এক অতুলনীয় কাহিনী তিনি রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়।

নেপোলিয়ান তখন চিন্তা করছিলেন প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হবার। ভারতবর্ষে ইংরেজকে পরাজিত করে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব স্থাপনের দুরাশায় অধীর হয়েছিলেন তিনি। প্রাচ্য জয় করবার জন্য রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি জানতেন। ১৮০৬ সালের দুরন্ত শীতকালে ওয়ারসর রাজপ্রাসাদে বসে নেপোলিয়ান নিজের হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন সম্রাটের তরুণ যৌবন, রক্তে জোয়ার, মনে ভালবাসার পিপাসা। বয়সে বড়ো সম্রাজ্ঞী জোসেফিনকে নিয়ে তাঁর হৃদয়ে শান্তি ছিল না। এই সময় এক দিন একটি আঠারো বছরের কিশোরী মেয়ের সাথে নেপোলিয়ানের পরিচয় ঘটল এবং সে মেয়েটির নীল নয়নের দ্যুতি সম্রাটকে বন্দী করল। নেপোলিয়ান জানতে পারলেন যে পোলাণ্ডের এক বৃদ্ধ কাউণ্টের সঙ্গে মেয়েটি বিবাহিতা, কেন না, তার পিতৃ-গৃহের অবস্থা স্বচ্ছল নয়।

পরদিন সকালেই নেপোলিয়ান পত্রবাহক ডুরকের হাতে তাঁর প্রেমপত্র পাঠালেন। কিন্তু তার উত্তর মিলল না। যে সম্রাট কোন দিন কোন রাজকুমারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হতে অভ্যস্ত ছিলেন না সেই দাম্ভিক সম্রাটের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যান আশ্চর্য কাজ করল। নেপোলিয়ান আরো উন্মত্ত হলেন প্রেমে। গেল দ্বিতীয় চিঠি। তাতে নেপোলিয়ান নিবেদন করলেন নিজেকে কিশোরীর হৃদয়ের বিনিময়ে। তৃতীয় লিপিতে তিনি কাঙালপনা করলেন আর যোগ করে দিলেন যে তার সঙ্গে প্রেমের আসনে সম্মত হলে পোলাণ্ডেরও উদ্ধার হবে। ভালবাসা এবং মাতৃভূমির বৃহত্তর মঙ্গল দুয়ের মধ্যে পড়ে মেয়েটি নেপোলিয়ানকে গ্রহণ করলেন।

এমিল লুডউইগ লিখেছেন যে সম্রাট কিছু কাল তার রাজনীতি, যুদ্ধ, আমোদ, দিগ্বিজয় সব কিছু সরিয়ে রাখলেন দূরে। ভালবাসার কাঙাল হলেন তিনি। একটি কিশোরীর হৃদয়ের ভালবাসা সবটুকু পাবার জন্য সম্রাট সব কিছু ঢেলে দিলেন তার সমীপে। যৌবনের লীলা চলল আনন্দে শিহরণে মাধুর্যে। নেপোলিয়ানের জীবনের সে এক অপূর্ব অধ্যায়।

বীর সম্রাট নেপোলিয়ানের হৃদয়ে যে ভালবাসার তৃষ্ণা ছিল, তার অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে এই তিনখানি পত্রে। মনে রাখা প্রয়োজন যে সেই তম্বী কিশোরীর নাম ছিল মেরী ওয়ালেস্কা।]

১

আমার দু'টি নয়ন ভরে তোমাকে শুধু দেখেছি, চিত্তশিখায় জ্বেলেছি তোমার আরতি, আমার সারা হৃদয়ের আকুতি শুধু তোমাকেই চায়। একটি অধীর প্রাণের জ্বালা নেবাতে অবিলম্বে উত্তর দাও।

'এন্'

২

আমি কি তোমায় অসুখী করেছি? আশা করি তা সত্যি নয়। তবে কি প্রথম অনুভূতির মধুরতা তোমার মন থেকে

সরে গেছে? আমার কামনা বেড়ে চলেছে। আমার শান্তি অপহরণ করেছ তুমি। যে দীন প্রাণ তোমার আরতি করে তার জন্য সামান্য একটু আনন্দ, স্বল্প একটু সুখ তুলে রাখতে তুমি কার্পণ্য করো না। একখানা চিঠি দেওয়া কি এতই কঠিন কাজ? দু'খানা চিঠির ঋণজালে আবদ্ধ তুমি ইতিমধ্যেই।

(স্বাক্ষরহীন)

৩

জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে যখন বড়ো প্রতিষ্ঠা দুর্বহ বোঝার মত বোধ হয়। সেই বোঝার দুর্বহতা ভোগ করছি আমি এখন এই মুহূর্তে······শুধু তুমি যদি কৃপা করো। যে প্রতিবন্ধক তোমায় আমায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তা অপসরণ করতে পারো শুধু তুমিই তোমার পক্ষে কাজ করার জন্য আমার বন্ধু ডুরক যথাসাধ্য করবে' ওগো, তুমি এসো, চলে এসো। তোমার সব বাসনা চরিতার্থ হবে। তুমি যদি আমায় দয়া করো, তোমার মাতৃভূমি আমার কাছেও প্রিয়তর হবে।

'এন্'

মিস্ হেষ্টিংসের চিঠি

[মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিষ্ঠুর মৃত্যু Maric Bashkirtseftকে ছিনিয়ে নিয়েছে পৃথিবীর কোল থেকে। কিন্তু এই গুণবতী রাশিয়ান মহিলা একধারে যেমন নিষ্পাপ ও চতুরিকা ছিলেন তেমনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অতি গভীর। যত দিন তিনি বেঁচেছিলেন রোগ তাঁকে এক দিনের জন্যেও পরিত্যাগ করেনি। তবুও তার চিঠি ও রোজ-নামচার দ্বারা তিনি সেদিন বহু পাঠকের চিত্ত জয় করেছিলেন। সেই অনবদ্য চিঠিগুলিতে শুধু যে তাঁর জটিল মানসেরই পরিচয়

পাওয়া যায় তা নয়, বরং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজের একটি উজ্জ্বল নিখুঁত চিত্রও দেখতে পাই আমরা।

বারো বছর বয়স থেকে সুরু হয়েছে মেরীর বিখ্যাত ডায়রী লেখা আর সেই সঙ্গে বহু অপরিচিতের সাথে প্রেমানুরাগ, মান-অভিমানের পালা। প্রাক্তন রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ও ডিউক অফ হ্যামিলটনও এই প্রেমাস্পদের দলভুক্ত ছিলেন। মেরী সংগীত বা চিত্রাংকনে তেমন পারদর্শিতা লাভ করতে পারেননি বটে, কিন্তু তার চিঠি ও রোজ-নামচা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তখনকার দিনের বহু সাহিত্যিকের সাথেই তার একটি মধুর সম্পর্ক ছিল এবং রোমান্টিক পত্রের মাধ্যমে চলত এই প্রেম নিবেদন।

মৃত্যুর কিছু কাল আগে মেরী মোঁপাসাকে চিঠি লিখতে সুরু করেন। সাহিত্য-জগতে মোঁপাসা তখন উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। উদ্ধত শ্লেষে ঝাঁঝাল অথচ হৃদয়াবেগের স্নিগ্ধ ধারায় সিক্ত মন নিয়ে লেখা চিঠিগুলি। মিস্ হেষ্টিংস এই ছদ্মনাম নিয়ে মেরী চিঠি লিখতেন। Le gaulois পত্রিকায় এই নামেই মোঁপাসার একটি গল্পও ছাপা হয়েছে। অবশ্য পরে গল্পটির নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'মিস্ হ্যারিয়েট।']

আপনার লেখা পড়ে সত্যি খুবই আনন্দ পাই। আপনার রচনায় প্রকৃতি আপন প্রকাশ। ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে আপনি প্রকৃতির অনুকরণ করেন এবং এমন এক অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন যা সত্যিই মহান্। আপনার লেখা পড়ে পাঠকদের চিত্ত তাই এমন একটি প্রগাঢ় মানবীয় অনুভূতির স্পর্শে বিচলিত হয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন নিজেদেরই ছবি দেখছি, আপনার লেখার পাতায় পাতায় এবং আপনার প্রতিও এক নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ওঠে মন। একে কি নিছক অর্থহীন স্তুতিবাদ বলবেন? ক্ষমা করবেন, এতে কপটতার লেশ মাত্র নেই।

বুঝতেই পারছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর চটকদার কথা আপনাকে বলতে আমি চাই, কিন্তু এই ভাবে সুরুতেই হৃদয় উদ্ঘাটিত করে সব কথা বলাও সম্ভব নয়! আমার ক্ষোভ তাই এত অধিক—আপনি এত বড়ো যে, আপনার সুন্দর হৃদয়ের প্রিয়জন হওয়ার মধুর স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং সেই সুন্দর হৃদয়কে তুলে ধরার প্রত্যাশা করা যায় না।

আর সত্যিই যদি আপনার হৃদয় অত সুন্দর না হয় এবং সত্যি যদি প্রকৃতির অনুলিখন না থাকে আপনার রচনায়, তবে আপনার হয়ে আমি না হয় দুঃখ করছি—তার পর সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে আপনাকে আমার মনের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করব এবং প্রতিষ্ঠা করে আগেকার সব কিছুকে মুছে ফেলব মন থেকে।

একটি বছর ধরে আপনাকে চিঠি লিখব ভাবছি এবং অনেক বার প্রায় লিখেওছি। সময় সময় মনে হয়েছে, আপনার গুণপণার অতিরঞ্জন করছি যার যোগ্য আপনি নন। দু'দিন আগে Gaulois এ হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন আপনাকে স্তুতিবাদ করে চিঠি লিখেছে এবং আপনি সেই সদাশয় ব্যক্তির চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য তার ঠিকানা খোঁজ করছেন। তখুনি ঈর্ষায় মন সজাগ হয়ে উঠল—আপনার সাহিত্যিক দ্যুতি নতুন করে চোখ ঝলসে দিল আর সেই কারণেই আমার এই লিপি।

এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, আমার পরিচয় সব সময় গোপন থাকবে। এমন কি, দূর থেকেও আপনাকে চোখে দেখার ইচ্ছা আমার নেই—আপনার মুখশ্রী হয়ত আমাকে খুশী না-ও করতে পারে। কে বলতে পারে সে কথা? বর্তমানে আপনার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি—আপনি তরুণ যুবক, অবিবাহিত। দূর থেকে বিমুগ্ধ চিত্ততার পক্ষে এই দু'টিই একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমিও মনোরমা মেয়ে। এই মধুর কল্পনা আপনাকে চিঠি লিখতে প্রেরণা যোগাবে। অনেক সময় মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতাম, যে যা-ই ভাবুক না কেন এক জন আতংক-সৃষ্টিকারী বুড়ী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতাম না—এমন কি চিঠির ভিতর দিয়েও নয়।

মিস্ হেষ্টিংস

ডাকঘর—ম্যাডেলিন ষ্টেশন।

[এই চিঠি পেয়ে মোঁপাসা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। জোলা, গঁকোর্টও এই ধরণের বহু চিঠি পেয়েছেন মেরীর কাছ থেকে। কিন্তু তাঁরা কেউ তার উত্তর দেননি। কিন্তু মোঁপাসা এ চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে অজানিতাকে চিঠি লিখেছিলেন।]

(মোঁপাসার উত্তর)

সুচরিতাসু—

আমার চিঠি নিশ্চয়ই তোমার আশানুরূপ হবে না। অবশ্য গোড়াতেই তোমার স্তুতিবাদ ও আমার প্রতি অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। এবার প্রকৃতিস্থের মত কথা কওয়া যাক।

তুমি আমার মনের মিতা হতে চেয়েছ। কিন্তু কিসের অধিকারে? আমি ত তোমায় চিনি না। যে কথা আমি আমার মেয়ে-বন্ধুদের অতি সঙ্গোপনে বা মৃদুভাবে বলব সে কথা তোমায় কেন বলতে যাব—তুমি আমার অপরিচিতা, যার মন-মেজাজ-প্রকৃতি আমার মানসিকের সঙ্গে হয়ত এক সুরে বাঁধা না-ও ত হতে পারে? এটা কি অত্যন্ত নির্বোধ অবিশ্বাসী বন্ধুর কাজ হবে না?

রহস্যময় চিঠি-বিনিময়ে কি মধুর সম্পর্ক সঞ্চারিত হতে পারে? নারী ও পুরুষের মধ্যে অনুরাগ, নিষ্পাপ অনুরাগের মাধুর্য বেশী ভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশায়, কথা-বার্তায় এবং বন্ধুর কাছে চিঠিতে, মানসীর মূর্তি ধ্যানে ও রূপায়নেই শুধু সম্ভব হতে পারে।

হৃদয়ের গোপন কথা তার কাছে কি করে প্রকাশ করা যেতে পারে যার তনুদেহ, চুলের রং, মুখের হাসি ও বর্ণিমা—কোন কিছুর সঙ্গেই যখন পরিচয় নেই?

সম্প্রতি পাওয়া একখানা চিঠির উল্লেখ করেছ তুমি? চিঠিখানি এসেছে এক জন পুরুষের কাছ থেকে যে উপদেশপ্রার্থী। আর অজানিতা মেয়ের চিঠি পাওয়ার কথা যদি ধর, গত দু'বছরে আমি প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা এমনি ধারা চিঠি পেয়েছি। তোমার ভাষায় এদের ভিতর থেকে কাকে আমি মনের মিতা বেছে নেব বল ত?

যখন তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক এবং সভ্য সমাজের রীতিসংগত ভাবেই ঘনিষ্ঠতার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব, তখনই একমাত্র বন্ধুত্ব আর মিতালির সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। নতুবা, কেন আমি এক জন অজ্ঞাতকুলশীলা বান্ধবীর জন্য—হলই বা সে মাধুর্যময়ী,—আমার জানিত বান্ধবীদের ত্যাগ করব? সেই অজ্ঞাতকুলশীলা বাহ্যতঃ এবং মনের দিক্ থেকেও হয়ত প্রীতিকর না-ও হতে পারে?

কাজেই এ ঠিক উচিত হবে না, নয় কি? ধর, আমি যদি নিজেকে তোমার চরণপ্রান্তে উৎসর্গ করি, তাহ'লেই কি আমায় তুমি প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ভাবতে পারবে?

ক্ষমা করো সুচরিতাসু। মানুষের চিন্তাধারা যত না কবিত্বময় তার চেয়ে আরো বাস্তব। ইতি—

অনুগত

মোঁপাসা

পুনঃ—লেখায় কাটাকুটির জন্য ক্ষমা করো। কাটাকুটি না করে আমি লিখতে পারি না এবং আবার নতুন করে টোকার সময়ও আমার নেই।

[কিছু কাল এই পত্র-বিনিময় চলেছিল। মোঁপাসার চিঠির উত্তরে মেরী রহস্য করে লিখেছিলেন—'মাত্র ষাট জন? আপনাকে যতটা জনপ্রিয় ভাবা গিয়েছিল আপনি ঠিক তা নন। আপনার এক-ষষ্টিতম প্রেমিকা, হবার বাসনা আমার নেই। আরো ঢের বেশী রহস্যময়ী আমি।

যতই দিন যেতে লাগল, চিঠিগুলিতে ক্রমশঃ মেরীর মনের বিভিন্ন মানসিকেরও ছাপ পড়তে লাগল। মোঁপাসা পরে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি প্রথম যে চিঠি লিখেছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু বৃথাই তিনি মিস্ হেষ্টিংসের সহানুভূতির প্রত্যাশা করতে লাগলেন। মেরী আর তাঁকে আমল দিতে নারাজ। মোঁপাসা তখন মিস্ হেষ্টিংসকে পুরুষ ভাবার ভাণ করলেন এবং মেরীও সঙ্গে সঙ্গে এই ছলনার ফাঁদে ধরা দিলেন। আবার চলল চিঠির পর চিঠি।

শেষে মেরী নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন সমস্ত ঘটনার উপর এবং এই ভাবে চিঠি লেখালেখির পালা শেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু মোঁপাসা তখন অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন—অজানিতার রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর তিনি। কিন্তু মেরী তাঁর পরিচয় কখনো প্রকাশ করেননি।

তবে জনশ্রুতি এই যে, মৃত্যুর পূর্বে দু'জনের না কি দেখা হয়েছিল।]

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

[যে বিরাট ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেই বাংলার শার্দূল শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙালীর চির নমস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁরই সৃষ্টি। যে কয় জন বাঙালী সেদিন বাংলার শিক্ষা, সমাজ ও জাতীয় জীবনে গঠনমূলক পরিকল্পনাকে সার্থক সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আশুতোষ তাঁদের অন্যতম। রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে আশুতোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সেই পদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নীচের এই চিঠিখানা লিখেছিলেন।]

সিনেট হাউস

কলিকাতা

২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডক্টর রায়,

আপনার হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সিনেটের সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কোন চেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে আপনাকে আমি এই আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের চেয়ার অদূর ভবিষ্যতেই সৃষ্টি হইয়া যাইতে পারে। শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে এবং আপনার ও আমার এত দিনের আশাও সফল হইয়াছে। আমরা রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার দুইটি প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়াছি। অচিরাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পালিতের বদান্যতা ও আমাদের সংরক্ষিত তহবিল হইতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্যের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। গত শনিবার সিনেটের বক্তৃতায় আমি সমস্তই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি। আমার বক্তৃতার একটি অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রথম প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আপনাকে আমি সানন্দে আহ্বান জানাইতেছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আপনাকে যাহাতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তাহারও যথাযথ ব্যবস্থা করা হইবে। আপনি ফিরিয়া আসিলেই আপনার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত গবেষণাগারের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত নির্মাণ-কার্য সুরু করিয়া দেওয়া যাইবে। ফিরিয়া আসিবার পূর্বে যদি ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের কার্যের পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

আপনি সি, আই, ই, উপাধি ভূষিত হইয়াছেন দেখিয়া পরম প্রীত

হইয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বেই আপনাকে এ উপাধি প্রদান করা উচিত ছিল।

আশা করি, কুশলে আছেন। ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে নিশ্চিত উপকৃত হইয়াছেন। ইতি

শুভার্থী
আশুতোষ মুখার্জি

[আচার্যদেব এই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন—'আমার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সফল হইতেছে, ইহাই আমার ধারণা এবং কেবল মাত্র কর্ত্তব্য হিসাবেই নয় পরন্তু ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতার সহিতই আমি ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিব এবং আমার সমস্ত ক্ষমতা তাহাতে নিয়োজিত করিব।'

আচার্যদেব যত দিন বেঁচে ছিলেন এই কলেজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কলেজের উন্নতিই ছিল তাঁর শয়নে-জাগরণের একমাত্র স্বপ্ন।]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিঠি

১২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা (ভারতবর্ষ)
১৩ই অক্টোবর, ১৯২৪

প্রিয় অধ্যাপক উইনি,

আপনার ১৭ই তারিখের টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। রসায়ন-সংসদের কার্যকরী সমিতি এবং আপনার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমার পক্ষে যে কত মূল্যবান তাহা প্রকাশ করাই বাহুল্য। সি, সি, এসকে আমরা চিরদিনই আমাদের প্রতিষ্ঠানের জনয়িত্রী মনে করিব। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রসায়ন-সংসদের জার্ণালই বহু দিন রাসায়নিকদের একমাত্র মুখপত্র ছিল এবং ইহার প্রকাশনী সংসদের পক্ষে গবেষণা-প্রসূত রচনার আয়তনের স্থান সংকুলান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায়ই তাঁহারা লেখকগণকে তাঁহাদের রচনা সংক্ষিপ্ত করিবার আবেদন জানাইতে বাধ্য হইতেন। এক মাত্র এই উদ্দেশ্যেই নিজস্ব মুখপত্র সহ ভারতীয় রসায়ন-সংসদ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় যখন এডিনবরায় ছিলাম তখন স্বপ্ন দেখিতাম, ঈশ্বরের করুণায় এমন এক দিন নিশ্চিত আসিবে, যেদিন আমাদের ভারতবর্ষও বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ঋদ্ধিশালিনী করিতে সক্ষম হইবে। সেই স্বপ্নই এত দিনে বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। ভারতীয় রসায়নের ইতিহাসে আমি দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের এই শাখাতেও অতি আন্তরিকতার সহিত প্রচুর গবেষণা হইয়াছিল। আজ পরম সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করিয়াছে আমারই ছাত্রেরা এবং তাহারা প্রত্যেকেই জার্ণালের নিয়মিত লেখক।

আপনাদের মূল সংসদের সহিত কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণই নয়, অনুজোচিত সম্পর্ক রাখিতেই আমি সতত চেষ্টা করিব এবং ইহা হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিব তাহা আমাদের পক্ষে পরম মূল্যবান হইবে। এই পত্র লিখিবার সময় মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হইতেছে তাহা বোধ করা অতি কঠিন আমার পক্ষে আমার স্মৃতি স্বতঃই সেই চিরস্মরণীয় আঠারশ' একচল্লিশ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের দিকেই ধাবিত হইতেছে, যেদিন উদ্যোক্তাগণ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি যে, লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রথম সদস্যদের অন্যতম লর্ড প্লেফেয়ারকে আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ক্রেমবাউ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। ইতি

আপনার শুভাকাংখার জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত
পি, সি, রায়।

"এসেছে শীত গাহিতে শীত বসন্তেরি জয়—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়তোরণ গড়ে আনন্দের তানে—
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

বাঁধন যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবো না যে,
পালিছ তারে আঁধার-মাঝে—
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে, অরুণ দ্বার খোলে—
জাগে মূরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

-আশুতোষ সেনগুপ্ত (উপরে)
—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পাশে)
—নীরোদ রায় (নীচে)

—রনেশ চক্রবর্ত্তী (পাশে

—রণজিৎ রায়চৌধুরী (নীচে)

ধীবর

উৎস

—বিভাস মিত্র (পাশে)
—সরলকুমার দত্ত (নীচে)

"এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে।"

—রবীন্দ্রনাথ
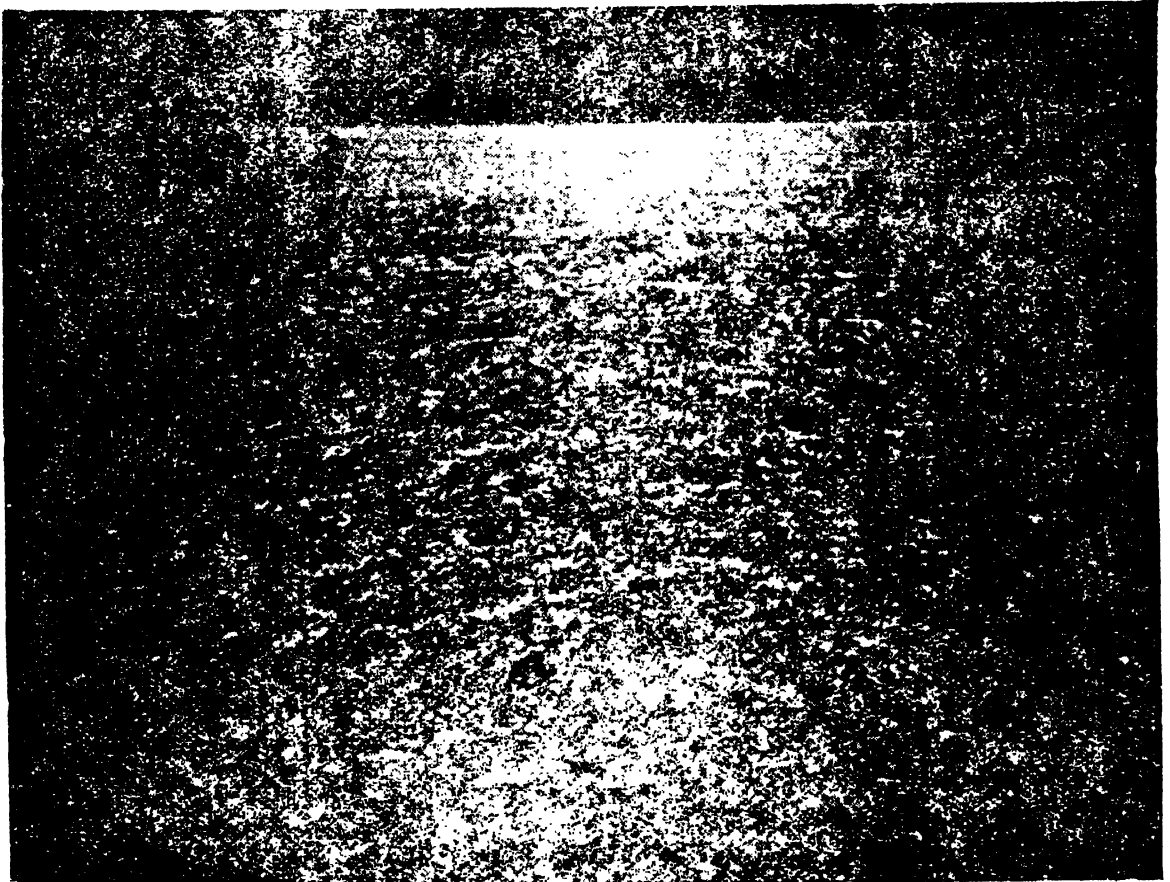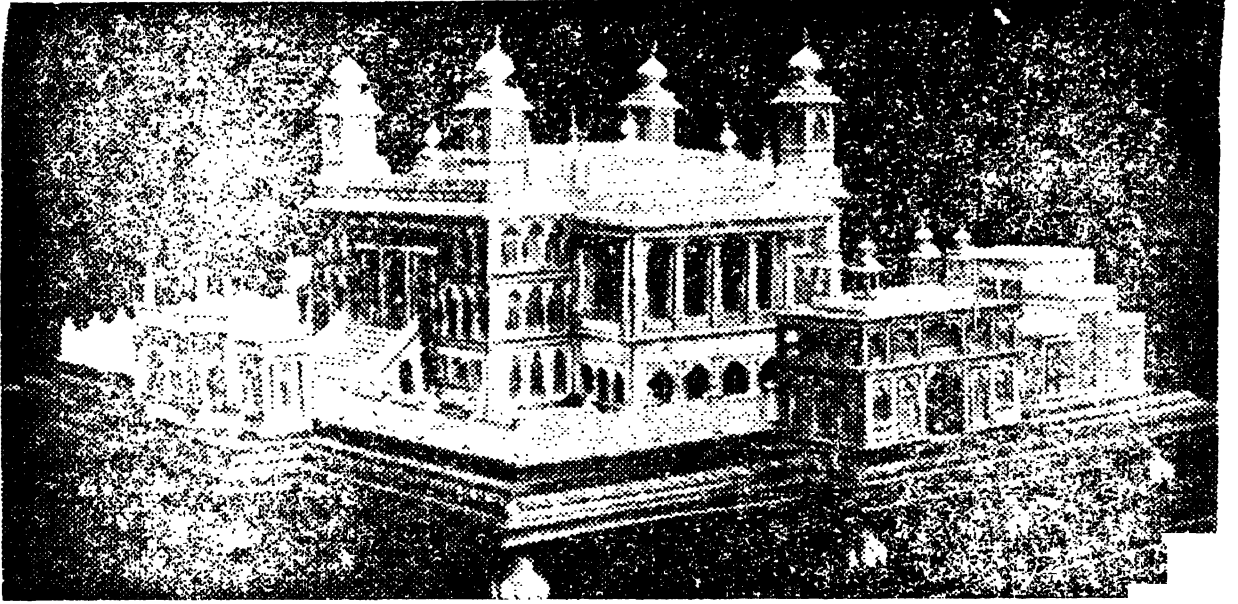
প্রাসাদ —ক, খ, গ
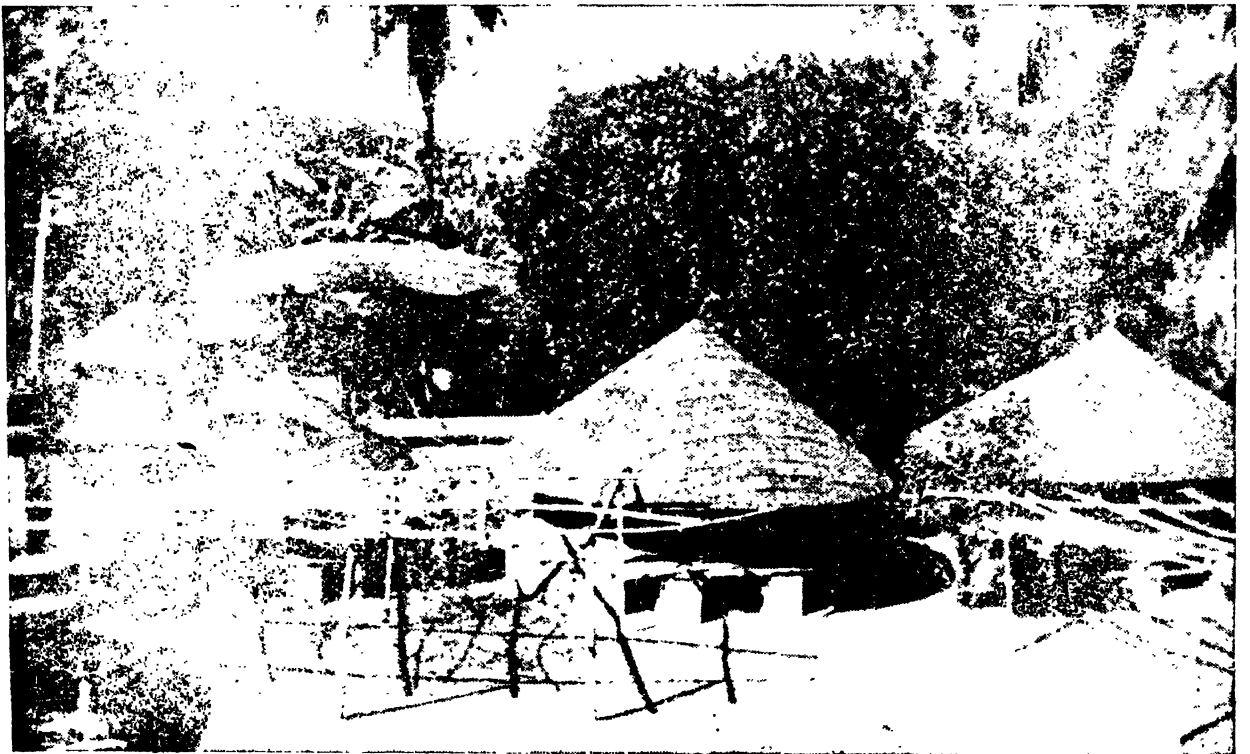
পর্ণ-কুটীর —অজ্ঞাতনামা

মার্ক টোয়াইনের ভালবাসা

'কোয়েকার সিটি' এপাশ থেকে ওপাশে আন্দোলিত হচ্ছিল, আর মার্ক টোয়াইন এবং তার সহযাত্রীকে বাঙ্ক থেকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল। জাহাজের পাশের ছিদ্রপথ দিয়ে সারা আটলান্টিক যেন ভেঙ্গে পড়ছে জাহাজের মধ্যে। মিসিসিপির নৌ-চালক, সম্পাদক, রিপোর্টার, কালিফোর্ণিয়ার খনি-অনুসন্ধানীদের অগ্রতম মার্ক টোয়াইনের মুখ দিয়েও গালি-গালাজ আর অভিসম্পাতের খই ফুটছিল। মার্ক টোয়াইন উঠে ঘরের ছিদ্রমুখ বন্ধ করে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মত টলতে টলতে ভিজে জবজবে সাদা চাদরে মোড়া একটি অপচ্ছায়া মূর্তি প্রবেশ করল ঘরে। মার্কের অনুপম ভাষায় সহসা ফেটে পড়ল—মুখাবয়বের ভাবও হয়ে উঠল অতি কোমল। ছেলেটিকে তিনি স্বাগতম্ জানালেন। 'আজকের রাতটা আপনার ঘরে থাকতে দেবেন? আমার ঘর জলে ভেসে গেছে।' মার্ক হেসে উঠলেন হো-হো করে—তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে ধরাধরি করে উপরের খটখটে বাঙ্কে তুলে দিলেন।

কয়েক দিন আগে ছেলেটি মার্ককে তার বোন অলিভিয়ার একখানি ছোট ছবি দেখিয়েছিল। পুরোনো হাতীর দাঁতের উপর রঙ্গীন রঙে আঁকা এক অপরূপ সুন্দর মুখ। বিনিময়ে অবশ্য লেখক মহাশয় তার বিশেষ কোন উপকার করতে পারেননি। মাঝে-মাঝে তিনি কোন ছল করে ছেলেটির ঘরে গিয়ে ছবিটা দেখে এসেছেন। এমন কি একবার ছবিখানি চেয়েওছিলেন তার কাছে। কিন্তু বোনের ছবি হস্তান্তরিত করতে একান্ত নারাজ ভাইটি।

জাহাজখানি বাত্যা-তাড়িত হয়ে দুলছে সমুদ্রবক্ষে, আর জাহাজের আরোহীরা নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছে। মার্ক টোয়াইন ঐ ছোট প্রতিকৃতিটি সম্বন্ধে বার-বার আতিশয্য প্রকাশ করায় ছেলেটি তার বোনের কথাই সুরু করলে। ছেলেটির নাম ল্যাংডন।—'একবার রাত্রে আমরা এলমিরাতে স্কেট করতে গিয়েছিলাম। অলিভিয়া পড়ে গিয়ে চোট খায় মেরুদণ্ডে। দু'টি বছর তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়। সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা। বাবা শহরের সেরা-সেরা ডাক্তারদের দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। শুধু এক জন ডাক্তার একটি কপিকলের ব্যবস্থা করে দিলেন, যার সাহায্যে তাকে শোয়া অবস্থা থেকে তুলে বসান হোত। এত আস্তে আস্তে তোলা হোত যে শোওয়া আর বসার মাঝ পথে আসতেই এক ঘণ্টা লেগে যেত। কিন্তু এত করেও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ত যন্ত্রণায়।'

মার্ক টোয়াইনের কাছে তখন আটলান্টিকের ঝড় থেমে গেছে। ঝড় সুরু হয়েছে তাঁর বুকে। তাঁর মনে তখন একটি মাত্র চিন্তা। নির্জন কক্ষে একটি কিশোরী শুয়ে—পুলীর সাহায্যে যাকে তুলে বসান হয় আর ব্যথায় যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

—'এক দিন বাতাস তার ঘরে উড়িয়ে নিয়ে এল একটুকরো কাগজ। কাগজটি দৈব-চিকিৎসার বিজ্ঞাপন। মা বিষয়টি নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করলেন। বাবার এই সব দৈব-চিকিৎসায় বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। একবার চেষ্টা করে দেখতেই বা দোষ কি? কাজেই এক শুভক্ষণে দৈব-চিকিৎসক এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়ীতে। মানুষটি কৃশ কিন্তু তার চোখ দু'টি থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। অলিভিয়ার ঘরটি অন্ধকার ছিল। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—'আলোয় ভরে উঠুক ঘর।' মশারি খুলে দিলেন। অলিভিয়ার দেহের উপর ঝুঁকে বিড়বিড় করে কি বীজমন্ত্র পড়লেন। তার পর অলিভিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে উঠে বসতে বললেন। এবং অলিভিয়াও উঠে বসল। আমাদের ত নিজের চোখকেই অবিশ্বাস হতে লাগল। পরের দিন লোকটি তাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। আর সত্যিই উঠে দাঁড়াল অলিভিয়া। একটুও কষ্ট হোল না। আমাদের দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তৃতীয় দিন সারা ঘর হেঁটে সে লোকটির কাছে গেল। লোকটি তখন বললেন—'স্বাস্থ্য আর শক্তি ফিরে আসুক তোমাতে।' বাবা টাকা দিতে গেলেন কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না। আর কোন দিন তাকে আমরা চোখেও দেখিনি। কিন্তু সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত অলিভিয়া ভালই আছে।'

সমস্ত কাহিনী শোনার পর মার্ক টোয়াইন শুধু মুখ ফুটে বলতে পেরেছিলেন—'তোমার সঙ্গে এক দিন দেখতে যেতে হবে তোমার বোনকে। অদ্ভুত ব্যাপার, এ রকম ভাবে রোগ-সারানোর কথা আর আগে কখনো শুনিনি ত!'

অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার এ ছ'মাস আগেকার ঘটনা। ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে 'কোয়েকার সিটি' নিউইয়র্কে ফিরে আসে। তরুণ লেখক সহরে পদার্পণ করেই চাকুরীর সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। 'ইনোসেন্টস এ্যাবরড' নামক যে বইখানি লিখেছেন জাহাজে, সেটিকেও ছাপাতে হবে। আর—আর একবার সাক্ষাৎ করতে হবে অলিভিয়ার সঙ্গে। ক্রিষ্টমাসের সময় ল্যাংডন লিখে পাঠাল—'বাড়ীর লোকেরা সবে ফিরে এসেছেন এলমিরা থেকে। তাঁদের সঙ্গে আপনার একবার দেখা হওয়া দরকার।'

ষ্টিনওয়ে হল'য়েতে চার্লস ডিকেন্স কি পড়ে শোনাবেন। মার্কও একটি বক্সে আসন নিয়েছেন। ল্যাংডনদের আসার আধ ঘণ্টা আগেই এসেছেন তিনি। অলিভিয়াকে দেখে মার্ক একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেল। এত সুন্দর, এত লঘু নারীমূর্তি তার জীবনে কখনো চোখে পড়েনি। সে রাত্রে ডিকেন্স ষ্টীয়ারফোর্থের মৃত্যু আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কের কানে তার একটি কথাও প্রবেশ করেনি। এর আগে বহু বার প্রেমে পড়েছেন এমন ধারণা ছিল মার্কের। কিন্তু আজকের অনুভূতিই হোল তাঁর জীবনের সর্বোত্তম উদ্‌ঘাটন।

নব-বর্ষের দিনে মার্ক টোয়াইন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলেন কিন্তু তার পর বহু মাস আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই মেয়েটির সঙ্গে। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নানান জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে টোয়াইনের, কিন্তু অলিভিয়ার কাছে থেকে একটি ছত্রও আসে না। টোয়াইন একেবারে মুশড়ে পড়লেন। তাই এক দিন সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজা এলমিরার ট্রেণ ধরতে সংকল্প করলেন তিনি। এমনি সময় একখানি চিঠি এল ল্যাংডনের কাছ থেকে। সে অনুরোধ জানিয়েছে সপ্তাহ খানেক তাদের ওখানে কাটিয়ে আসতে।

চলে আসার দিন মার্ক টোয়াইন ল্যাংডনকে বললেন—'অলিভিয়াকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।' ল্যাংডন ত একেবারে থ। লোকটি বলে কি ল্যাংডন মনে মনে মার্ক টোয়াইনকে

পুজো করলেও এক জন পশ্চিমী দেহাতী লোক যে তার বোনের পাণিপ্রার্থী হবে এ তার ধারণার অতীত। মার্ক টোয়াইন কখনই তার বোনের উপযুক্ত হতে পারে না। তাই সে বললে—'বাবা শুনলে ভয়ংকর রাগ করবেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা ট্রেণ আছে। চলুন আপনাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসি।'

অলিভিয়া স্মিত হেসে বিদায় জানাল মার্ক টোয়াইনকে। ঘোড়া ছুটল লাফাতে লাফাতে। কিন্তু গাড়ীর পিছনের আসন খুব ভাল করে বাঁধা না থাকায় ঘোড়া ছোটার সঙ্গে সঙ্গেই আসন খুলে পড়ে গেল রাস্তায়, আর আরোহী দু'জন ছিটকে গিয়ে পড়ল ইটের পাঁজায়। মার্ক চলতে না পারার ভাণ করলেন। এমন যন্ত্রণা-কাতর ভাব দেখালেন যে তাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না ভাই-বোনের। যত দিন না সেরে ওঠেন তত দিন থেকে যাওয়ার জন্য বার-বার অনুরোধ আসতে লাগল অলিভিয়ার কাছ থেকে। অলভিয়া তাঁর রাত্রি-দিনের শুশ্রূষার ভার তুলে নিল নিজের হাতে। মার্ক টোয়াইন আরো দু'সপ্তাহ রয়ে গেলেন সেখানে।

এই ঘটনার পর মার্ক টোয়াইন ল্যাংডনের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। কিন্তু বিয়ের দিক্ থেকে কোন যোগাযোগের লক্ষণ দেখা গেল না। এক দিন তিনি মেয়েটিকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আহ্বান করলেন। বক্তৃতা শোনার পর সে-রাত্রে মেয়েটি আর দেখাই করলে না মার্কের সঙ্গে। দ্বিতীয় রাত্রে মেয়েটি স্বীকার করলে যে সে-ও ভালবাসে তাঁকে, কিন্তু সে ভালবাসা তার বেদনা মাত্র, কিন্তু পরদিনই স্বীকার করল অলিভিয়া যে দুঃখের বদলে সে গর্বই অনুভব করে।

অবশেষে মার্ক টোয়াইন জয় করতে পেরেছেন তাঁর মানসীকে। কিন্তু প্রণয়িনীর বাপকে তখনও জয় করা হয়নি। এলমিরার 'কয়লা-সম্রাট' জেরভিস ল্যাংডন তাঁর মেয়েকে ত আর সামান্য এক জন সৌখীন লেখকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন না। মার্ক উপদেশ দিলেন অলিভিয়ার ভাইকে—'স্যানফ্রানসিসকোর জোকে চিঠি লেখ। তার জন্য হাজারো বার আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমার জন্য সে অন্ততঃ একবার মিথ্যা বলবেই।' মার্ক ল্যাংডনকে খোঁজ-খবর নেবার সময় দিলেন। ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চূড়ান্ত বোঝা-পড়ার জন্য কোমর বাঁধলেন। ল্যাংডন জানাল—'আপনার বন্ধু অবশ্য জানিয়েছেন, আপনি বড় লেখক কিন্তু স্বামী হিসেবে এ পৃথিবীতে আপনার স্থান সবার পিছনে। এ দিক্ থেকে সুপারিশ করবার মত আপনার মত আপনার জানা আর কেউ আছেন?' মার্ক টোয়াইন মাথা নাড়লেন। বৃদ্ধ তখন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'বেশ, কেউ যখন এ সম্বন্ধে তোমার হয়ে সুপারিশ করতে নারাজ আমাকেই তাহ'লে তোমার জামীন দাঁড়াতে হচ্ছে।'

মার্ক টোয়াইন তাঁর বন্ধু জো টুইচেলকে চিঠি লিখে জানালেন। 'এবার বাজাও ডঙ্কা। এত দিনে জিতেছি লড়াইয়ে। তিন বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি—একবার সসম্মানে স্থান ত্যাগ করার উপদেশও পেয়েছিলাম—অবশেষে স্বাগতম্ সম্ভাষণ পেয়েছি। পেয়েছি প্রীতি ও ভালবাসা। সহরে যদি খুব উঁচু চূড়ার গীর্জা থাকত······একবার লাফিয়ে দেখতাম।'

এক বছর পরে তাদের বিয়ে হোল। ল্যাংডনের এজেন্ট স্ত্রীকে মার্ক টোয়াইন ছোট-খাট একটা বোর্ডিং-হাউস খুঁজে দিতে অনুরোধ করলেন। বিয়ের পর স্ত্রী বর-কনেকে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এনে তুললেন। তারা গৃহ-প্রবেশ করল। আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। চাকরেরা সুসজ্জিত কক্ষে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। মার্ক ত ভীত-সন্ত্রস্ত। এত সবের দাম দেবার ক্ষমতা নেই তার।

—'বাবা এই বাড়ীটা আমাদের যৌতুক হিসেবে দিয়েছেন। অলিভিয়া জানাল। বুড়ো ল্যাংডন উইলের কাগজ-পত্র হাতে নিয়ে সহাস্য মুখে এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। মার্ক টোয়াইনের মুখে অবশেষে কথা যোগাল। 'আপনি ভারী ভাল লোক। যখনই এই সহরে আসবেন আমাদের বাড়ীতে উঠবেন। এমন কি রাতে হলেও। কোন খরচা লাগবে না আপনার।'

বহু বিষয়েই মার্ক আর তাঁর স্ত্রীর মতের মিল হোত না কিন্তু তাঁদের মিলন আদর্শস্থানীয় ছিল। মার্ক যেমন স্ফূর্তিবাজ ছিলেন তেমনি চটেও যেতেন সহজে। 'আর অলিভিয়া'—উইলিয়ম ডীন হাওয়েল লিখেছেন—'তার মতন চমৎকার মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। যেমন মধুর আচরণ তেমনি অতি দয়া-মায়ার শরীর। তাই বলে তার মন একটুও দুর্বল ছিল না। ক্লেমনস বিনা প্রতিবাদেই কেবল তার অভিভাবকত্ব মেনে নেননি গর্বও করতেন।'

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁদের প্রেমমধুর জীবন ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে। অলিভিয়া কোন দিনই শরীরে যথেষ্ট শক্তি পায়নি। তার প্রথম শিশু শৈশবেই মারা যায়। আরো অনেকগুলি পর-পর শোকের কারণ ঘটেছিল যা ধীরে-ধীরে ক্ষয় করেছিল তার স্বাস্থ্য। মৃত্যুর দু'বছর আগে থেকে অলিভিয়া সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এমন বহু দিনই গেছে যখন তার স্বামী সারা দিন ও রাত্রে মাত্র কয়েক মিনিট তাকে সঙ্গ দিতে পেরেছেন। তার সূক্ষ্মতম পরিবর্তন স্বামীকে যেমন খুশীতে আত্মহারা করে দিত তেমনি ভীত সন্ত্রস্তও করে তুলত। মার্ক টোয়াইন তখন এক ছত্রও লিখতে পারতেন না— ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি খুশীর মুহূর্তের জন্য রোগিণীর ঘরে বসে থাকতেন চুপটি করে।

১৯৩০ সালের জুন মাসে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। চিকিৎসকেরা শীতের সময় ইতালীতে বায়ু-বদলের নির্দেশ দিলেন। মার্ক ফ্লোরেন্সের দিকে একটি প্রাচীন প্রাসাদ ভাড়া নিলেন। এইখানেই ১৯০৪ সালের ৫ই জুন এই মধুর রোমান্সের চির-পরিসমাপ্তি ঘটল। সেদিন মার্ককে পুরো একটি ঘণ্টা রোগিণীর ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। যখন তাঁকে বাইরে ডেকে পাঠান হোল মার্ক নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। কিন্তু অলিভিয়া বললে, এতে এমন কি ক্ষতি হয়েছে।—তার পর চুমু খেলে মার্ককে।

—'আবার ফিরে আসছ ত?' প্রশ্ন করলে সে।

—'নিশ্চয়। শুভরাত্রি জানাতে আসব বই কি।'

মার্ক টোয়াইন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উপরে গিয়ে সোজা পিয়ানোর ধারে বসলেন। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর আর এক দিনও তিনি পিয়ানো স্পর্শ করেননি। মার্ক টোয়াইন আজ নিজেই থেকে পিয়ানো বাজিয়ে অনেকগুলি গান গাইলেন। সেই গান শুনে

নীচে মৃত্যুপথযাত্রিণী অলিভিয়ার রোগ-পাণ্ডুর মুখ মধুর হাসিতে ভরে গেল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে সে—'মার্ক ত ভাল। সে শুভরাত্রির গান গেয়ে শোনাচ্ছে আমায়।' তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দিতে গেলে সে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রাণ তাকে ছেড়ে পালাল। উপরে মার্ক বাজিয়েই চলেছেন—মনে আজ তার খুশীর জোয়ার নেমেছে—প্রাচীন ইতালীয় রাজপ্রাসাদে সেই অপূর্ব সংগীত শ্রবণ করে সময়ের প্রবাহও থমকে থেমেছিল বোধ হয়।

মার্ক শুভরাত্রি জানাতে এল—'আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, মনে হোল কথাও বললাম কিন্তু সে আমাকে লক্ষ্য করছে না দেখে আমার কেমন খটকা লাগল এবং বিস্ময় বোধ হোল। তার পর সব বুঝতে পারলাম—আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। ......আমি ক্লান্ত, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আমাকেও লিভি যদি তার সঙ্গে নিত।'

প্রিন্স অস্কার জাহাজে করে অলিভিয়ার মৃতদেহ আমেরিকায় নিয়ে আসা হোল। সেদিন নির্জন কেবিনে জাহাজের দোলায় পৃথিবীর পূজ্য লেখক যখন এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন তখন নিশ্চিত তাঁর মনে বহু দিন আগে ঘটা আর একটি ঘটনার কথা উদয় হয়েছিল। সেদিনও এমনি ধারা জাহাজে চলেছিলেন তিনি। তবে সেদিন সে ছিল শুধু ছবি—পটে লিখা।

মার্ক টোয়াইন অলিভিয়ার কবরের ফলকে নীচের এই ক'টি কথা লিখে দিলেন—'আমার আনন্দের শিখা, ভগবানের করুণা ঝরে পড়ুক তোমার উপর।' আর 'ঈভস ডায়রী'তে অলিভিয়ার সঙ্গে এই প্রেমকে তিনি অমর করে রেখেছেন এই ক'টি কথার বন্ধনীতে—'যেখানেই সে গেছে অমরাবতীতে পরিণত হয়েছে।'

সেদিন থেকে সত্যিই তিনি ক্লান্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। জীবনের সকল আকর্ষণ মুছে গেছে তাঁর। ১৯১০ সালে তাঁর চির বিদায়ের লগ্ন এল যেদিন মার্ক টোয়াইন একটুও অসুখী হননি—একটুও ক্ষোভ ছিল না তাঁর মনে, কারণ এবার তিনিও অলিভিয়ার পাশেই চিরশয্যা নিতে পারবেন।

কবি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দিনের পর দিন, কত দিন
প্রায়ই সকাল বেলায় সরু গলি-পথে
তোমার জানালার তলা দিয়ে আমি যাই।
দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ
কি দেখ কা'কে প্রত্যাশা কর জানি না।
কিন্তু কৌতূহল বা প্রতীক্ষায় প্রদীপ্ত
তোমার চোখ দু'টি যেন প্রশ্ন করে,
কে তুমি প্রতিদিনের অচেনা পথিক
তুমি কি দুঃখী?

আমি কবি, বাঙ্গলার কবি
আমার খ্যাতি ভাগীরথীর তীর
পদ্মা যমুনা মেঘনার তীরে তীরে
ছড়িয়ে গেছে। আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিভা নিয়ে তরুণেরা যখন তর্কযুদ্ধে
উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তুমি জেনো
সে আমারই কবিতা নিয়ে।
ওরা অর্থ খুঁজে পায় না বলেই
আমার প্রতিভা সার্থক।

দুঃখী? ওটা বাঙ্গলার কবিদের নিয়তি।
কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত
যমজ ভাই-বোনের মত
কবি ও দুঃখ।
দুঃখে দুঃখময় জীবন নিয়ে
ওরা যখন আলোচনায় গদগদ হয়
নিশ্চয় জেনো, সে আমি, সে যে আমি।

স্মৃতিস্তম্ভ

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

একটি পুলের ধারে এসে ঠিকাদার বললেন: ঐখানেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল দশ বৎসর পূর্ব্বে। কোথাও তেমন কিছু ত্রুটি ছিল না। ইটের গাঁথুনির উপর সিমেন্টের নিঁখুত প্রলেপ। কিন্তু, তথাপি তা এমন আকস্মিক ভাবে ধ্বসে পড়ল যে আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম।

ঠিকাদার যা বললেন না, লোকেরা তা বুঝে নিল। প্রাচীর ধ্বসে পড়ে কয়েকটি জীবন শেষ হয়ে গেল। দেহগুলি অনায়াসেই মাটির বুকে আশ্রয় নিল। তাদের মৃতদেহগুলি উদ্ধার করাও সম্ভবপর ছিল না।

ঠিকাদার সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: কিন্তু লোকগুলি যদি একটু সতর্ক হয়ে কাজ করত, তবে হয়ত এমন ঘটত না।

বিপদ ঘটত কি ঘটত না, সেটা তর্কের বিষয়। আপাততঃ সেটা বন্ধ রেখে কাজ করবার জন্য লোকগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠিকাদার তা বুঝতে পারলেন। বললেন: বিপদের কথা চিন্তা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আবার, এখানেই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

এসিষ্টাণ্টের হাত থেকে একটি 'প্লান' নিজের হাতে তুলে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বললেন: দেরী করে লাভ নাই, কাজ আরম্ভ করা যাক।

মাটির বুকে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর পাঁজরগুলি স্তরে স্তরে খুলে গেল এবং লোকগুলি পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ইঞ্জিনিয়ার সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: আর মাত্র কয়েক ফিট, এর নীচেই ম্যাঙ্গানীজের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আবার চলল ডায়নামো। বিপুল আর্ত্তনাদ করে পৃথিবীর বুক চিরে-ফুঁড়ে সে যা নিয়ে আসল, তা ম্যাঙ্গানীজ বা অন্য কোন পদার্থ নয়। সামান্য কিছু জল ও কাদামাটি। সে মাটি ও জল নিয়ে তারা ছুটে গেল রাসায়নিকের তাঁবুতে। মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা চলল সে জল-সম্পদের। এসিড মিলিয়ে ধাতব ও ক্ষার জাতীয় জিনিষগুলিকে আলাদা করে ফেলা হল। কিন্তু কই, ম্যাঙ্গানীজের চিহ্ন মাত্রও নাই! আবার চলল পরীক্ষা। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। প্রতিটির অণু-পরমাণুর গতি-পথে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম ও সন্ধানী দৃষ্টি বিরচণ করছে। সন্ধান করছেন তিনি ম্যাঙ্গানীজ-কণিকার। কিন্তু কোথাও নাই, কোথাও তা পাওয়া গেল না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য ফুটে উঠল। বললেন: ধাতব পদার্থের কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল কয়েকটি জান্তব পদার্থের সন্ধান, পৃথিবীর গহ্বরে সুরক্ষিত জীব-কঙ্কাল, গলিত অবস্থায় কয়েকটি ফুলের পাপড়ি।

সকলের দৃষ্টিতেই প্রশ্ন ও কৌতূহল। বৈজ্ঞানিক তা লক্ষ্য করলেন। বললেন: এ অবিশ্বাস্য কিছু নয়। যে ভাবেই হউক, পৃথিবীর কয়েকটি জীবজন্তু ও অরণ্যের ফুল ডুবে গিয়েছে এখানে, আজ তাই ভেসে উঠেছে।

ঠিকাদারের দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের কালো শিখা জ্বলে উঠল। সকলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। বৈজ্ঞানিকের টেবিলের উপর অনেকটা ঝুঁকে পড়ে তিনি প্রশ্ন করলেন: আর কোন জিনিষেরই কি সন্ধান পাওয়া গেল না?

পুনরায় ডায়নামো আর্ত্তনাদ করে উঠল। পৃথিবীর বক্ষপঞ্জর হাতড়ে দেখার উল্লাসেরও যেন পরিসীমা নাই। এদিকে পৃথিবীও কাঁপছে। তার বুকের গোপন সম্পদকে বাইরে উজাড় করে দিয়ে সে যেন অসহায় বেদনায় কাঁপছে। লক্ষ বা কোটি বৎসর যাবৎ পৃথিবী এ সম্পদকে রূপ দিয়েছে, তিলে-তিলে সঞ্চয় করেছে, মানুষের লোভী দৃষ্টি থেকে এ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর সে কি অপরিসীম ও নিঃশব্দ ব্যগ্রতা! আজ পৃথিবীর মানুষ বহু সন্ধান করে বের করে দিয়ে আসল সে সম্পদকে।

কথাটি বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। অরণ্য অঞ্চলকে অতিক্রম করে তা চলে গেল বহু দূরে, দলে দলে আসল সম্পদ-সন্ধানীরা। আসল পৃথিবীর বৃহৎ লোক-সমাজ। অরণ্যের আদিম নীরবতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে আধুনিক জীবন উঠল কলরব করে। ধূমে আর ধূলিতে আকাশের নীলাম্বর উঠল মলিন হয়ে।

দুই

সে সহরে একদা এক জন মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এ সহর বা কোন সহরকেই সে চিনে না। তথাপি, এর ধূলি-সমাকীর্ণ রাজপথ ও অট্টালিকাশ্রেণী তার ভাল লাগল। ভাল লাগল সহরের প্রাত্যহিক জীবনধারা। সে এগিয়ে চলল।

লাঠিতে ভর করে সে এগিয়ে চলছে। চলার শক্তি তার নাই। তথাপি সে এগিয়ে চলছে। স্রোতের মুখে এক টুকরা খড়ের ন্যায় সে এগিয়ে চলেছে। এক-এক বার ইচ্ছা হয়, এদের সংগে সে কথা বলে। অপরিচিত জগতের অধিবাসীদের সংগে সে মৈত্রীর রাখি বেঁধে যায়। কিন্তু তা অসম্ভব। এরা অন্য ভাষায় কথা বলে, অন্য দৃষ্টিতে তাকায়। তথাপি সে ভালবাসল এই নগরকে। একটি জলের কলের সম্মুখে এসে সে দাঁড়াল। এ এক অপূর্ব্ব বিস্ময়! পৃথিবীর ইতিহাস থেকে ঝর্ণা মুছে গেলেই বা ক্ষতি কি? অঞ্জলি ভরে জলপান করে সে এগিয়ে চলল। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ সহরে আসে নাই। নানা স্থান পর্য্যটন করে সে নিতান্ত আকস্মিক অনেকটা অনাহূত ভাবেই এখানে এসে পৌঁছেছে। অবশ্য এ সহর সম্পর্কে সে কিছু শোনে নাই, তা নয়। যেদিন অরণ্য অঞ্চলের নিঃশব্দতা ভেদ করে প্রথম বার ডায়নামো আর্ত্তনাদ করে উঠল, সেদিনই কথাটা তার কানে পৌঁছেছিল। তার পর দলে-দলে প্রতিবেশীরা এ কারখানা-সহরের দিকে যাত্রা করল। ফিরে গেল যখন, তখন তাদের জীবনধারা, এমন কি, কথা বলার ভঙ্গীটিরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গ্রামবাসীরা বিস্মিত দৃষ্টিতে সহর-প্রত্যাগত এ সকল মহাজন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকত। রতনলালের মনেও সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম কল্পনার উদয় হত। তথাপি কোন দিন তার সখ হয় নাই যে, সহরে যায় বা সহরবাসীদের সংগে পরিচিত হয়ে উঠে। সাঁওতাল পরগণার এক অখ্যাত পল্লীতে তার জীবন নিঃশব্দ, আপন গতিতেই বয়ে চলেছিল। কিন্তু, একদা আকাশে উঠল মেঘ, আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় অরণ্যের আদিম বিটপী স্তব্ধ হয়ে উঠল।

সে ঝড়ের মুখে শুধু অরণ্যের লতা-পত্রই উড়ে গেল না।

রতনলালের জীবনেরও একটি অধ্যায় ছিঁড়ে গেল। সে অধ্যায়টিকে পুনরায় সংগ্রহ করে এনে যথাস্থানে জুড়ে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে সে পারল না। তার ভালবাসার কাহিনী তার হৃদয়েই সমাধিস্থ হল। সেটাকে খুঁড়ে বের করে আনা সম্ভবপর ছিল না।

তার পর বহু দিন কেটে গেছে। রতনলালের দেহে ও মনে বহু পরিবর্ত্তনের পর আজ একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে সে বহু স্থান পর্য্যটন করেছে ও বহু লোকের সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু কোথাও জীবনের পুরাতন দিন বা পুরাতন মানুষগুলির সন্ধান সে পায় নাই। অনেকটা ভবঘুরের ন্যায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ এই সহরে আসারও তেমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি সে আসল—স্রোতের মুখে ভেসেই সে আসল।

পিঠের উপর একটা পুঁটলিতে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। সহরের জনস্রোতে সে যেন একটি বুদ্বুদ। কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য তার নাই। কিন্তু তার চোখগুলির দিকে তাকালে তাকে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। সে চোখগুলি কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই তাকাচ্ছে না যে—আশে-পাশেও কিসের যেন সন্ধান করছে।

পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে একটা মোটর গাড়ী এগিয়ে গেল। অরণ্যের লতা-পত্র বা অজানা-অনামা ফুলের গন্ধ এটা নয়। তথাপি তার ভাল লাগল। রাজপথের অন্য সকলকে ফাঁকি দিয়ে সে সেই গন্ধ নাকে টেনে নিল।

রাজপথের এক ধারে একটি খোলা জায়গায় পাতলুন-পরিহিত এক জন মধ্যম-বয়সী লোক বক্তৃতা দিচ্ছে এবং তার চতুর্দ্দিকে বহু লোক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশের সংগে সে-বক্তৃতা শুনছে। রতনলাল এগিয়ে গেল এবং লোকগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে কান পেতে দিল।

অদূরে একটি কারখানার দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে লোকটি যা বলছে, তার মর্ম্মকথা এই যে, ওখানে চাকুরী করলে প্রচুর অর্থ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হবে।

রিক্রুটিং অফিসার সকলের হাতে একটি করে সিগ্রেট বণ্টন করে দিলেন। তার পর সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সংগে বলে উঠলেন: যত খাটবে তত পয়সা। বড়-বড় বাংলো রয়েছে, সেখানেই হবে তোমাদের বাসস্থান। কেরোসিনের বাতির কাছে বসে রাত কাটাতে হবে না—ইলেক্ট্রিক পাখার নিচে বসে দিন কাটাতে পারবে—এসো সকলে মিলে চাকুরী নাও।

লোকগুলি নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে রিক্রুটিং অফিসারের দিকে তাকাল। তিনি আবার বেশ জোরের সংগেই বললেন: নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির মতলব আমার নাই। এসো, সকলে মিলে ওখানে চাকুরী নিই।

অনেকেই এ আহ্বান শুনে সরে আসল। আবার কেউ-কেউ দ্বিধা-জড়িত ভাবে এগিয়েও গেল।

লাঠিটি এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে এবং পুঁটলিটি মাটিতে রেখে রতনলাল রিক্রুটিং অফিসারের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রিক্রুটিং অফিসার তার আপাদমস্তক ধীর ভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন: হাঁ, তুমি পারবে, এমন কঠিন কিছু কাজ নয়।

একটি প্রকাণ্ড কারখানার ফটকে এসে তারা জন কয়েক লোক দাঁড়াল। ভিতরে যে কি কাণ্ড চলছে, বাইরে দাঁড়িয়ে তা অনুমান করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও কৌতূহল! অপরিচিত পৃথিবীতে শঙ্কিত ভাবে পা ফেলে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

পাশের একটি ঘর থেকে য়্যামোনিয়া গ্যাস এসে তাদের নাকে-মুখে প্রবেশ করল। কোন রকমে নাক-মুখ বন্ধ করে অনেকটা নীচু হয়ে তারা এগিয়ে চলল। তাদের এই অসহায় অবস্থা দেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য শ্রমিকরা মুচকি হাসছে।···ওখানে বয়লার থেকে অত্যন্ত জোরে ষ্টীম বের করে দেওয়া হচ্ছে। মাথার ঠিক উপরে ইলেকট্রিক ক্রেণ কখনও সামনের দিকে, কখনও তা পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জীবনের একটি নূতন অধ্যায়। রতনলালের ভাল লাগল, নেশার মত ভাল লাগল। এই বিপুল কর্ম্ম-ব্যস্ততা, অসংখ্য যন্ত্রের অক্লান্ত আর্ত্তনাদ—রতনলালের দেহ-মন শিহরিত হয়ে উঠল।

সে এগিয়ে চলল। এই যন্ত্রকে সে ভালবাসবে। পুরাতন জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সে নূতন মানুষ হয়ে উঠবে। হাঁ, নূতন জীবনধারায় সে দীক্ষিত হয়ে উঠবে। তবেই না সন্ধ্যা কালে বাংলোতে বসে সিগ্রেট টানার অপূর্ব্ব আরাম!

সামনেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য যন্ত্রপাতির রুক্ষ আলাপ। তার মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ লতা পত্র ও তৃণকুঞ্জের মধ্যে শুধু সান্ত্বনার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

"যাঁরা নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করে এই খনি আবিষ্কার করেছেন,—বিশেষতঃ সেই একমাত্র নারীটি—তাঁদের কথা স্মরণ করেই এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হল।"

নিঃশব্দ পাষাণ কোন কালেই মুখর হয়ে উঠবে না—এমন কি কোন দিন কারু কানে-কানেও বিস্মৃত জীবনের গোপন কাহিনী প্রকাশ করবে না, এ কথা রতনলাল জানে। তথাপি এই স্মৃতি-স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আজ তার ইচ্ছা হয়, চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটির চুলের বেণীতে কোন ফুল ছিল কি? লাল ফুল?

চতুর্দ্দিকে বিস্ফোরণ চলছে। পৃথিবীর বক্ষ-পঞ্জরে বিপুল কম্পন। অরণ্যে অগ্নি-সংযোগ করে অরণ্য-অধিবাসীকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। পৃথিবীর গভীর অন্ধকারে দু'টি সজল ও শান্ত চোখের নিঃশব্দ প্রতীক্ষা।

রতনলাল রেলিংয়ের উপর আরও অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। মেয়েটির চোখ দু'টি আজও তার মনে আছে। মুখের আদলটি সে আজও বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু, ও-পাশে ব্লাষ্ট ফারনেস চার্জ্জ করা হচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে বিপুল রবে আর্ত্তনাদ করছে। কার্ব্বণ গ্যাসের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ ভরে উঠেছে। সামনে "পাওয়ার হাউসের" সুইস-বোর্ডে সার-সারি লাল বাতি। লাল ফুল নয়—ইলেকট্রিকের লাল বাতি!

জীবনের এই দ্বিতীয় প্রিয়তমা। প্রথমা মরে যাক—ঘুমিয়ে থাকুক স্মৃতিস্তম্ভের নীচে হিম-শীতলতায়। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কি-ই-বা লাভ হবে? তার চাইতে দ্বিতীয়াকেই সে আজ ভালবাসবে—বাসর জাগবে তারই সংগে।

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রণব নিজের মনে বলে, 'শিশুর সমান! সংসারের ব্যাপারে নয়, সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। সংসার-ছাড়া ব্যাপার! শিশুর সমান!'

মণি বলে, 'আগে শুনে নাও, পরে সমালোচনা করবে। এই তো গেল সস্তা পুরানো বাবের হিসেব। এবার কি করলে? একটু বীরত্ব দেখিয়ে থতমত খাইয়ে সাজানো সংসার থেকে হ্যাঁচকা টানে শিকড়-শুদ্ধ তুলে ফেলতে চাইলে। আমায় যদি দলে টানার সাধ, গড়ে-পিটে নাও, জানতে-বুঝতে শেখাও? মুখ্যু তো আছিই, জ্ঞানও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। সেটা নতুন কিছু নয়। ডেকে নিয়ে, টেনে নিয়ে অপদস্থ করা কেন? আমার চালচলন কথাবার্তায় তোমরা যে হাসাহাসি কর, সেটা তোমাদের লজ্জা বুঝতে পার না?'

'বুঝতে একটা অসুবিধা আছে, তাই বুঝতে পারি না। তোমায় নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে এটা তোমার মনগড়া কথা। তোমার মনের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। তোমার মনের মধ্যে না ঢুকলে কি করে এটা আমাদের বোধগম্য হবে?'

প্রণবের কথা যেমন বাঁকা কথার সুর তেমনি কড়া হয়ে উঠছে খেয়াল করে মণি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর প্রণবের মেজাজকে উপেক্ষা করে বলে, 'হাসাহাসি মানে কি ইয়ার্কি তামাসা? আমার কথায় ব্যবহারে তোমাদের অবজ্ঞা কখনো জাগেনি—বলতে চাও ঠাকুরপো?'

'অবজ্ঞা জাগার তো কোন কারণ নেই।'

'নেই? সেদিন তোমরা খালি বড়-বড় কথা বলছিলে, আমি বিরক্ত হয়ে গান-টান শুনতে চাইলাম। সবাই তোমরা কি রকম চুপ হয়ে গেলে আমি টের পাইনি ভেবেছ?'

'মনগড়া টের পেয়েছ। নইলে এটুকু নিশ্চয় টের পেতে, তোমার মত আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, তখন শুধু জাবর-কাটা চলছিল। একঘেয়ে লাগছিল সবারি, তুমি মুখ ফুটে বলে আলোচনাটা থামিয়ে দেওয়ায় সকলে বরং কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিল। তুমি উল্টোটা বুঝলে। মনগড়া বোঝা এই রকম হয়। বোঝাটা মনের মত হলেই হল, আর কিছুই দরকার হয় না।'

প্রণব উঠে দাঁড়ায়।

'অন্য সব কিছুও তোমার মনগড়া মণিবৌদি। যার সংস্পর্শে আসবে, যে তোমায় নতুন কিছু শোনাবে, একটু বিচলিত করবে, তাকেই যদি তোমার দায়িত্ব নিতে হয়, সংসারে একা থাকা ছাড়া তোমার গতি নেই। তোমার হিসাবে দাঁড়ায়, বন্ধু মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।'

'রাগ করলে? আমি কিন্তু সাধারণ লাভ-লোকসান নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিনি। ওটা আদর্শগত বিশ্বাস রাখা-না-রাখার কথা।'

'তোমার বিশ্বাসও তবে দু'রকমের? একটা সাধারণ লাভ-লোকসানের, আরেকটা আদর্শগত? কখন কোন হিসাবটা ধরবে ঠিক কর কি করে?'

মণি দু'চোখে আগুন জ্বালিয়ে তাকায়, তাতে তার চোখ দু'টিই শুধু কটমটে মনে হয়, যেনো মদখোর মেয়ের চোখের মত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও সে বুঝতে শিখেছিল যে চোখের ধমকে কাউকে কাবু করার সাধ্য তার আর নেই।

'তর্ক করে আমার কাছে পার পেলে, জগতের কাছে পাবে না।'

'তর্কটাও তবে আমিই করলাম?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রণব বেরিয়ে যায়।

গোকুল চটের থলিতে তরকারী এনে ঢেলে দিচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী মেনে মণি বলে, 'দেখলে? গাল দিয়ে জবাবটা শুনবার ধৈর্য রইল না, গট-গট করে বেরিয়ে গেল? এরাই দেশোদ্ধার করবে!'

ঝিঙে-বেগুন গুছিয়ে রাখতে রাখতে গোকুল হেসে বলে, 'ভাবছেন কেন? আপনার জবাব না শুনে যাবেন কোথা? যেচে এসে জবাব শুনতে হবে।'

'মানে কি হল?'

'মানে খুব সোজা। আপনার বিষয়ে অজানা কিছুই নেই। মানুষটা আপনি কেমন, কি ভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সব জানা কথা। যে আপনাকে জানে তার মনে আগে প্রথম প্রশ্ন জাগা উচিত: আপনার মধ্যে এমন তোলপাড় উঠল কেন? এক সংসারী মানুষ আপনি, কেন আপনি এমন ভাবে নাড়া খেলেন। দেখে-শুনে মন-রাখা কথা কইতেন, মিষ্টি করে হাসতেন, চুকে যেত। তার বদলে, সবাই কি ভাবে কি বলে কি করে তাই নিয়ে হয়েছে আপনার জ্বালা। কেন? এর জবাব তো আপনার কাছেই পেতে হবে।'

খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে মণি সংশয় ভরে তাকায়। তার আশঙ্কা হয়, হয়তো গোকুল তার ক্ষোভ দূর করতে মন-রাখা কথা বলছে।

'আমি আবার একটা মানুষ!'

গোকুল হাসিমুখেই বলে, 'ও প্রমাণ আপনি তো দিলেন যে এক কালে চোখ-কান বুজে সংসার করেও মানুষ রয়ে গেছেন। নইলে আপনার এত জ্বালা হবে কেন? শুধু যদি আপনার মনে হত, আমাদের রকম-সকম আপনার পছন্দ নয়, সেটা আপনার মনে মনেই থাকত। কিন্তু আপনি একেবারে ছটফট করছেন—এ তো সোজা ব্যাপার নয়। আপনার ভেতরে ওলোট-পালোট চলেছে। ফল কি দাঁড়াবে সে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আপনি আর আপনি থাকবেন না মণিবৌদি, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'কি হব?'

'কে জানে কি হবেন—বন্ধু অথবা শত্রু। কিন্তু বাইরের জগৎকে ঠেলে সরিয়ে উদাসীন হয়ে সংসার নিয়ে মেতে আর থাকতে পারবেন না।'

'বন্ধু হওয়া কপালে নেই। কারো সঙ্গে মিলছে না।'

'গলায়-গলায় ভাব দিয়েই বুঝি শুধু বন্ধুত্ব সুরু হয়? শুধু মিল নিয়ে সৃষ্টি চলে? মিল আর অমিল আছে বলেই জগৎটা এগোচ্ছে, নইলে কবে পচে-গলে যেত। তা জানেন?'—এক মুহূর্ত না থেমে এই কথার সঙ্গেই গোকুল যোগ দেয়, 'আবার কেন তরকারী রাঁধার হাঙ্গামা করবেন? বেগুন ভেজে ফেলুন।'

'বেগুন ভাজায় হাঙ্গামা কম না কি? না, ক্ষিদে পেয়েছে?'

কয়েক দিন গোকুলের কথাগুলিই মণির মনে ঘুরে বেড়ায়। কথাগুলি সরল কিন্তু সাংঘাতিক, তবু মণির বড় ভাল লেগেছে। নিজের মাধ্যমে জগৎকে বিচার করা তার চিরদিনের অভ্যাস। গোকুল এই মাধ্যমকে আমল দেয়নি, কিন্তু ওর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। সেটা মণির কাছে গোকুলের সততার একটা বিরাট প্রমাণ হয়ে উঠেছে। প্রণব যেন সে তুলনায় অনেক বেশী অনুদার।

চার

নাজিমের প্রথমে মনে হয়েছিল, পাড়ায় এবং জানা-চেনা লোকেদের কাছে সে আর কোন দিন মুখ দেখাতে পারবে না। বেঁচে থাকতে মাকে সে যে খেতে দিত না, বাড়ী-বাড়ী ঘুঁটে বেচে সে [illegible] চালাত, এ জন্য নাজিমের বিশেষ কোন লজ্জা ছিল না। [illegible] কঠোর বাস্তব জগতে মনগড়া লজ্জার ঠাঁই নেই। কোন [illegible] পেটে খেয়ে কে বেঁচে আছে সেটাই চরম কথা, কি ভাবে [illegible] সে যোগাড় করছে, কজে খেটে না ঘুঁটে ফিরি করে, তা নিয়ে [illegible] মাথা-ঘামানোর [illegible] কারো নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ুক, [illegible] ঘুঁটে বেচে নাজিমের [illegible] রেখেছিল, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি [illegible] যে নিজের পেট চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নিজেরই [illegible] সুতরাং তাকে খেতে-পরতে না দেওয়ায় নাজিমের কোন [illegible] হয়নি। দয়া-মায়ায় কারো পেট ভরে না, [illegible] নামে [illegible] যে খায় সে যোগাড় করেই খায়। কথার কথা যে যতই বলুক, [illegible] ছেড়ে সুন্দরী বৌ নিয়ে থাকার জন্যে সত্যিকারের নিন্দা [illegible] নাজিমের করেনি। বৌ নিয়ে, খাপসুরৎ বৌ নিয়ে থাকবে [illegible] কাকে নিয়ে থাকবে মানুষ? বুড়ী যদি কাৎ হয়ে পড়ত, [illegible] অনাহারে সত্যই মরতে বসত পথের ধারে, তখন তার [illegible] নাজিমের। লোকে বলত, ছিঃ, [illegible] তার চেয়েও বুঝি আপশোষের [illegible] কাপুরুষ তাকে কুৎসিত ভাবে হত্যা [illegible]

[illegible] কথা ছিল, শক্ত-সমর্থ স্ত্রীলোক হলেও [illegible] ওরা শয়তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু [illegible] ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিয়েছে, শণের মত সাদা করে [illegible] মাথার চুল, মুখের চামড়া কুঁচকে যার গায়ের চামড়া লোল [illegible] পড়েছে, এক পা কবরে দিয়ে যে প্রতিদিন মরণের অপেক্ষাই [illegible]—তাকে এ ভাবে হত্যা করা কিসের পরিচয়? কেন, আর [illegible] ছিল না বেছে নেবার? শিশুর মত নিরীহ ভাল মানুষ এ [illegible] কেন?

আপশোষে এমনিই নাজিমের বুক পুড়ে যায়, মানুষের মুখের দিকে তাকাতে না পারায় গুম খেয়ে সে মাটিতে চোখ পেতে রাখে, [illegible] উপর ক'জন চেনা লোক নানা কথা বলে তাকে উন্মাদ করে [illegible] চায়। বলে, এ কেবল দাঙ্গার ব্যাপার নয়, পাকিস্তানের ঝগড়া নয়। আমি তোমায় মারলাম, তুমি আমায় মারলে, এ তা নয়। এ নাজিমের কলঙ্ক, সমস্ত বস্তির কলঙ্ক, মুসলমান সমাজের কলঙ্ক। প্রাণ যাক, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নাজিমকে নিতে হবে। বেছে বেছে নাজিমের মাকে ওরা সাবাড় করেছে, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। শুধু ওই ভদ্রপাড়ার হুবমণদের নয়, হিন্দু-প্রধান সে বস্তি থেকে বৌকে নিয়ে এদিকে সরে আসতে হয়েছে নাজিমের, যে বস্তির লোকেদেরও কারসাজি আছে তলায়-তলায়। রাত্রে ওরাই তো টেনে বার করেছে নানীকে, হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে মন্দিরের কাছে···

এক জন বলে আপশোষের সুরে, এক জন বলে খোঁচা দিয়ে, নাজিমের মরদের রক্তে তারা আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। সে আগুন যাতে সামনের ওই বস্তিটাতে লাগে, সেখান থেকে চারি দিকে আরো দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এত করেও এদিকে ভাল করে হাঙ্গামা বাড়েনি, ইয়াসীন-সিংহীর চাল ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। বস্তিতে অধিকাংশই মজুর, দাঙ্গায় তাদের মন নেই। উত্তেজিত হয়ে প্রায় বাধিয়ে বসবার উপক্রম করেও কি ভেবে যেন তারা আবার অল্পেই সামলে নিয়ে থমকে থেমে গেছে।

নাজিম যদি সক্রিয় হয়ে নামে তাহ'লে বেধে যাবে। দো-মনা মন কম নয়। নাজিম ডাক দিলে নানীর কথা ভেবেও অনেকে মরিয়া হয়ে নেমে পড়বে।

পরীবাণু বলে, 'না।'

'মুখ দেখাতে সরম লাগে।'

'আরও সরম লাগবে। ওরা যে এ সব বলছে ওদের মতলব আছে। অর্দ্ধেক মিছে কথা।'

'মিছে কথা?' নাজিম চোখ তুলে তাকায়। তার দু'চোখে আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে যায়।

'টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল কে বললে? আবদুলের মা আমায় বলেছে, তোমার ব্যারাম বলে কে যেন ডেকে নিয়েছিল। আরও কেউ কেউ জানে।'

'কে ডেকে নিয়েছিল?'

'তা শুধোয়নি আবদুলের মা।'

কি বলতে চায় পরীবাণু, কি বোঝাতে চায়? ছেলের ব্যায়ামের কথায় ভুলিয়ে তার মাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এতে বড় জোর প্রমাণ হয় একেবারে ঘর থেকেই কুকুর-বেড়ালের মত তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাতেই হত্যাটা শুধরে গেছে পরীবাণুর কাছে? অথবা পরীবাণু শুধু কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখে তাকে বাঁচাতেই ব্যাকুল, দিশে হারিয়ে যা মনে আসছে তাই বলছে? ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বৌটার ওপর ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা জেগেছে নাজিমের। পরীবাণু সহরে এই দাঙ্গা বাধায়নি। তার মার অপমৃত্যুর জন্যও সে কোন দিক্ দিয়ে দায়ী নয়। এ সব কথা অবশ্য মনেও আসে না নাজিমের, পরীবাণুর বিশেষ কোন দোষ খুঁজে মন তার বিগড়ে যায়নি। পরীবাণুকে নিয়ে মশগুল হয়ে দিন-যাপনের অদ্ভুত খাপছাড়া একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া।

রূপ যেন এত দিন সে চোখ মেলে চেয়ে ত্থাখেনি বৌয়ের, শুধুই মুগ্ধ হয়ে মেতে ছিল—আর সব বিষয়ে আনমনা হয়ে। রূপ? রূপ আছে পরীবাণুর, এমন ছিপছিপে নিটোল দেহ, এমন মোলায়েম রং, সুন্দর কোমল এই মুখ এমন আর কারো ঘরে নেই। কিন্তু বৌয়ের রূপ আছে বলে কি আর কিছু থাকতে নেই জগতে? সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে আলগোছে কোন রকমে সমাজ-সংসার বন্ধু-বান্ধব পুরুষের

জীবন ধারণের নিয়ম-রীতি বজায় রেখে কেবল বৌয়ের রূপে মশগুল হয়ে দিন-রাত্রি কাটাতে হবে? পরীবাণুকে পাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নিজের জীবনটা খুঁজে এই একটি নেশা ছাড়া আর কিছুই নাজিম দেখতে পায় না। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এ সবও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভিন্ন এক জগতে ঘটেছে, তার শুধু ছিল নিজের ঘরটি, যে ঘরে তার পরীবাণু থাকে!

পরীবাণু ঝুঁকে ঘরের কাজ করে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, সামনে দিয়ে এদিক ওদিক চলা-ফেরা করে—তার দেহের চেনা রেখা ও ভঙ্গিগুলি, সজীব লতার মত গড়নে যৌবনের পুষ্ট সম্ভারগুলি নাজিমের অচেনা মনে হয়। মনে হয়, ঘরের বৌ রূপ দিয়ে এমন ভাবেই ভুলিয়ে রেখেছিল যে এ রূপও সে ঠিক মত ভোগ করেনি, নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পরীবাণুকেও সে যেন স্বপ্নের মত গ্রহণ করেছে!

বাস্তব সংসার হয়ত নরম হয়ে গেলে এই রকম হয় পুরুষের, সব দিকে সে ঠকে, ফাঁকিটুকু নিয়ে সে খুশী হয়ে থাকে।

নাজিমের বিতৃষ্ণা নতুন। রুক্ষ কঠোর বাস্তব জগৎ তাকে আচমকা কুৎসিত আঘাত দিয়ে সচেতন করেছে। সেই সঙ্গে তার তৃষ্ণাও জেগেছে নতুন—পরীবাণুর রূপেরই তৃষ্ণা, নতুন ধরণের। উগ্র নিষ্ঠুর উপভোগের মধ্যে এত দিন পরীবাণুকে পায়নি বলে নিজেকে তার বঞ্চিত প্রতারিত মনে হয়। রহমৎ খলিলেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রূপহীনা নোংরা সাধারণ স্ত্রীলোককে নিয়ে কি প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে নিজেদের পৌরুষ জাহির করে, হৈ-চৈ করে সাত্যকারের মরদের মত দিন কাটায়। পরীবাণুর মত বৌ থাকতে সে নিরীহ গোবেচারী সেজে ভীরু কাপুরুষের মত মিইয়ে মিইয়ে জীবনটা কাটিয়ে এসেছে! এমনি পৌরুষহীন হয়ে গেছে সে যে বেছে-বেছে তার মাকে খুন করেছে বিধর্মীরা।

খপ করে সে হাত ধরে পরীবাণুর। হ্যাঁচকা টানে গায়ের ওপর এনে ফেলে। চিরকাল যে ডাকলে খুশী হয়ে হাসিমুখে যেচে এসে বুকে আশ্রয় নেয়, কোমল দু'টি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে—সকাল না সন্ধ্যা না মাঝরাত্রি খেয়াল রাখে না!

পরীবাণু ভয় পেয়ে বলে, 'কি হল? কি হল?'

সকাল বেলা ন'টার সময় তার বড়-বড় চোখের সে বিস্ফারিত চাহনি নাজিমের সহ্য হয় না, তার বিগড়ানো মনের উগ্র ভাব মিইয়ে শীতল হয়ে যায়। আরও বেশী যায় হ্যাঁচকা টানের ব্যথায় যখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে!

'লাগল?'

'লাগবে না? হাতটা তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ!'

পরীবাণুর ভয় ও রাগ ভাঙ্গিয়ে আপিস যেতে সেদিন দেরী হয়ে যায় নাজিমের। দপ্তরীর কাজ নিয়ে এই তার প্রথম গাফিলতি।

আপিসের কাজের পর সেদিন ইয়াসিনের কাছে তার ডাক আসে। ডাকতে আসে বুড়ো একটি লোক, মাথার সমস্ত পাকা চুল তার রঙ করা, গোল-গাল মুখখানা মেয়েদের চেয়ে কোমল। মুখ দেখলে আর মিহি-গলার কথা শুনলে মনে হবে এমন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বুঝি জগতে আর হয় না, মনটা না জানি কত কোমল। তার নাম রেজ্জাক, স্ত্রীলোক সেজে শিশুহরণ তার প্রধান পেশা। অজানা পুরুষের চেয়ে অচেনা স্ত্রীলোকের কাছে ছোট ছেলেমেয়ে সহজে বশ হয়।

রেজ্জাক রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রেজ্জাক মেয়েলি ঢংয়ে মেয়েলি সুরে কথা কয়। বলে, 'ইয়াসিন সা'ব একটু ডাকছিল গো।'

নাজিম ইতস্ততঃ করে।

'আজ আস্‌লি বিলাতী মাল।'

গলির মধ্যে মদের দোকানে ইয়াসিন দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে গেলাস সামনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল। বিলাতী মদের এই সাদাসিধে দেশী বারটিতে দাঙ্গার আগে এক দিন নাজিম এসেছিল, আপিস-ফেরত বাবুদের ভীড়ে সেদিন এত বড় ঘরটা সন্ধ্যার আগেই গমগম করছিল। বসবার ব্যবস্থা সস্তা কাঠের লম্বা-লম্বা টেবিল ও বেঞ্চে, আজ সেগুলি বেশীর ভাগ খালি পড়ে আছে। বারটা যে পাড়ার মধ্যে পড়েছে তাতে ইয়াসিনের জাত-ভাই ছাড়া ভরসা করে কেউ ফূর্ত্তি করতে আসবে না সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ ভাবে ইয়াসিনরা সদলবলে দখল করে থাকায় তাদের জাত-ভাইদের অনেকে এখানে ঢুকতে সাহস পায় না। ইয়াসিনদের কাছে নিজের জাত পরের জাত খানিকটা সুবিধার ব্যাপার মাত্র—তার বেশী কিছু নয়। এ সহরে অত ধর্মের আত্মীয়তা মেনে গুণ্ডামির ব্যবসা চালানো যায় না। ইয়াসিন নিজেই বলে যে অত মানতে গেলে পলিটিক্‌স করতে হয়, তাদের ব্যবসা চলে না।

নাজিমের এ সব অজানা নয়। তার গা ছমছম করে। তবু সেই আতঙ্কের মধ্যেই সে এক নতুন উন্মাদনার সন্ধান পায়। যে হিংসা ও ক্ষোভের জ্বালা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারে না এমনি সব ভয়ানক মানুষের সংস্পর্শে এমনি পরিবেশে একটা বেপরোয়া মরিয়া ভাবের মধ্যে সে তা থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। এক চুমুকে সে গ্লাসের অনভ্যস্ত পানীয় অর্দ্ধেকটা পেটে চালান করে দেয়, আগলহীন বিহ্বল কল্পনায় নানীর হত্যার উদ্ভট অমানুষিক প্রতিশোধের ঘটনা ঘটিয়ে চলতে থাকে।

ইয়াসিন বলে, 'ঔর মৎ পিজিয়ে ভাই।'

নাজিম বলে, 'আরে ভাই, লাও লাও। সব ঠিক হ্যায়।'

ইয়াসিন মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকায়। দু'দিন দেখে মানুষটার ওপর তার পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। একে দিয়ে কি হবে? কোন কাজের, কোন দায়িত্বের যোগ্যতা কি এর আছে? মানুষ মাপার মাপকাটি ইয়াসিনেরও আছে, এক দিকে তাকেও কঠোর ভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনেক ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে তার কারবার, নিজে শক্ত না হলে শক্ত হাতে দলকে শাসনে রাখার, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার হত না, কবে সে ধ্বংস হয়ে যেত তার মিথ্যার ভাঁওতার স্বার্থের বিরামহীন সংঘাতের জগতে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বার বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই চেঁচামেচি সুরু হয়ে যায় নাজিমের।

রাস্তায় তাকে একা রেখে ইয়াসিনেরা চলে যায়। ইয়াসিন কেন তাকে ডেকেছিল জানবার কৌতূহলও দেখা যায় না নাজিমের। চলতে চলতে ইয়াসিন বলে, 'বাজে মার্কা লোক।'

রেজ্জাক বলে, 'বৌটা ওকে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে।'

'বৌ?'

'আঃ!' রেজ্জাক যেন মেয়েলি ভঙ্গিতে জিভে চেটে স্বাদ পায়, 'বহুৎ খাপসুরৎ বিবি আছে ওর। সিনেমা-স্টারসে আচ্ছা।'

শুনে ইয়াসিন কৌতূহল অনুভব করে।

নাজিম টলতে টলতে এগিয়ে চলে। নেশার সঙ্গে রাগটা তার হয়াৎ বেঁধেছে পরীবাণুর ওপর! মনটা গিয়েছে বাড়ীর দিকে। কখন কখন সঙ্গ নেয় সে ভাল বুঝতে পারে না। কাল্লুই তাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়।

সেদিন রাত্রে প্রতিবেশীরা প্রথম পরীবাণুর কান্না ও চীৎকার শোনে।

কাল্লু মিস্ত্রীর ঘর নাজিমের ঘরের লাগাও। তার স্ত্রী রাবেয়া বলে '...কটার হল কি?'

কাল্লু বলে, 'শয়তানের খপ্পরে পড়ছে, মাথা বিগড়ে গেছে। খুব মদ টানছে ইয়াসিন মিয়াদের সাথে।'

'এমনি বেশ ভাল ছিল লোকটা।'

'অমন ভাল সবাই থাকে। কে কেমন চিজ ইমানদারিতে জানা যায়। সব খবর না জানতে পারে, মোটমাট তো জানা আছে নানীর মানটা কেন গেল? কিন্তু জেনেও জানবে না, সে মুরোদ নেই—নাজেরালি সা'বের মোসায়েব তো' বড়লোকের পা-চাটা কুত্তা এমনি করে, ঘরে বিবির ওপর ঝাল ঝেড়ে দেখায় আমি মস্ত মরদ!'

কাল্লুর ঝাঁঝালো সমালোচনায় রাবেয়া একটু হকচকিয়ে যায়। মানুষটার চিরদিন এ রকম সহজ স্পষ্ট কথা। গুজনদার লোকেরা তাকে তাই বড়ই অপছন্দ করে। তবে গরীব খাটিয়েদের মধ্যে খাতির কিছু সেটা বোধ হয় পুষিয়েও বেশী হয়েছে। বস্তির লোকে তাকে বিশ্বাস করে, এ-পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠেও যে ঝিমিয়ে আছে, নানীর হত্যা নাজেরালিদের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি, সে জন্ম কাল্লুও অনেকটা দায়ী।

পরীবাণুর চাপা-কান্নার আওয়াজ থেমে যায়—বাইরে থেকে আর শোনা যায় না। ঘরে কান্না তার থেমেছে কি না সেটা অবশ্য অনুমান করা যায় না। কয়েকটি কণ্ঠ থেকে আচমকা উগ্র হিংসার ... রাত্রির আকাশে কর্কশ আঁচড় কাটে—আরও কতগুলি কণ্ঠ ... ওঠে তার প্রতিধ্বনি। জবাবের মত দূরে শোনা যায় তেমনি কর্কশ আওয়াজের ওঠা-নামা। খানিক আগে পরীবাণুর তীক্ষ্ণ বেদনার্ত্ত চীৎকার যেন স্বপ্নের পর্য্যায়ে চলে যায়।

রাবেয়া বলে, 'লোকটা হয়তো জানে না? ওরা হয়তো অন্ত রকম বুঝিয়েছে? কাল এক দফা বাত-চিত কর না?'

কাল্লু বলে, 'কুলি-মজুরের সাথে বাত-চিত করতে কি গরজ হবে?'

তবু সে রাবেয়ার কথা রাখে, সকালে কাজে যাবার আগে নাজিমের ঘর হয়ে যায়। নাজিম তখন মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। রাত্রির আঘাতের চিহ্ন গোপন করতে পরীবাণু মুখ ঢেকে কাল্লুর সামনে আসে, কাল্লুর কাছে তার পর্দা ছিল না। তাকে কাল্লু জানিয়ে যায়, বিকালে সে আপিসে নাজিমের সঙ্গে দেখা করবে, জরুরী কথা আছে। কাল্লুর খাটুনি চারটে পর্যান্ত, তবু যদি কোন কারণে দেরী হয়, নাজিম যেন কাজের পরেও তার জন্ম অপেক্ষা করে।

পাঁচটার সময় ডালহাউসী স্কোয়ারে আপিসে খবর নিয়ে কাল্লু শুনতে পায়, দপ্তরী নাজিম এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কাল্লু নিজের মনে বলে, শালা বেইমান।

দপ্তরীর এই চাকরীটা পেয়ে মস্ত লোক হবার আগে বড়ই যখন খারাপ সময় চলছিল তখন কাল্লুর কাছে পাওয়া উপকারগুলির কথা নাজিমের মনে নেই। মনে থাকলে নেহাৎ জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হলেও অন্ততঃ একটা খবর সে রেখে যেত কাল্লুর জন্ম।

বস্তিতে ফিরে ঘরের সামনে ছোট মোড়ায় নাজিমকে বসে থাকতে দেখে কাল্লু একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তবে বুঝতে পারে, এটা কালকের প্রতিক্রিয়া। পাকা গুণ্ডাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করা এখনো তার আয়ত্ত হয়নি. নেশার ঝোঁকে এক দিন বৌকে মার-ধর করলে পরদিন মনটা এখনো বিগড়েও যায়—তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ভাল ছেলে হয়ে একটু প্রায়শ্চিত্ত করার সাধ জাগে।

'এই যে কাল্লু ভাই! কি কথা আছে বলছিলে?'

সস্তা কাঠের একটা জলচৌকিতে সে কাল্লুকে বসতে দেয়, একটা বিড়িও দেয়। এটাও কালকের গুণ্ডামির প্রতিক্রিয়া, নয় তো কাল্লুকে এতটুকু খাতির করতেও অনেক দিন আগেই নাজিম ভুলে গিয়েছিল।

[ক্রমশঃ

আপনি কি জানেন?

১। পৃথিবী কমলালেবুর উত্তরার্ধে না দক্ষিণার্ধে স্থলভাগ বেশী? বলুন তো, আমরা কোন্ দিকে?
২। যতীন সেনগুপ্ত, যতীন মুখোপাধ্যায় ও যতীন দাস, কে আমাদের বাঘা যতীন?
৩। যে ডাক-টিকিটের মাত্র দু'খানি সংগৃহীত আছে, একখানি ভারত সরকারের দপ্তরে আর একখানি বাকিংহাম প্রাসাদের সংগ্রহে। সেই প্রথম ভারতীয় ডাক টিকিটের প্রবর্তন হয় কবে?
৪। 'বাংলার স্কট' বলে এক সময় আমরা ছোট করতাম এক জন স্রষ্টা সাহিত্যিককে। তিনি কে বলুন?
৫। ভারতের শতকরা ৯০ জন লোক বাস করে গ্রামে। কিন্তু শতকরা ৯০ জন ডাক্তার কোথায় বাস করে জানেন?
৬। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জিয়াউদ্দিন কে?
৭। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা' এ সত্য ভাষণ কার?
৮। আজ পর্যন্ত এক জন মাত্র মহিলা দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সেই মহীয়সী মহিলার নাম কি বলুন তো?
৯। ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যা কত?

[উত্তর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

নয়

পরিব্রাজকের ঝোলাটাতে অবশ্য-বহনীয় কতগুলি জিনিস আছে—যেমন দাড়ী কামাবার সরঞ্জাম, ফ্লাস্ক, বাড়তি মোজা-রুমাল-অন্তর্বাস, ফার্স্ট এইডের বাক্স ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি সঙ্গে না থাকলে বিদেশ-বিভুঁয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ভ্রাম্যমানের মানসিক ঝুলিতে যে দু'টি জিনিস না থাকলে পরিব্রজনই ব্যর্থ হয় তা হচ্ছে কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ।

আদর্শ পর্যটক এই দু'টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত। সে ঘর ছাড়ে বহির্বিশ্বকে আবিষ্কার করতে, আবিষ্কার করে ঘরে ফিরে সবাইকে সে কাহিনী শোনাতে। তার চোখজোড়া জিহ্বার চর মাত্র, নানা খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহের ভার তাদের উপর। কোথায় কোন জিনিস ভাল, কোন কোন দোকানে কি কিনলে সস্তায় পাওয়া যায়, কোন হোটেলের খাবার সব চেয়ে ভাল আর কোন স্টেসের শয্যা, এমনিতর সহস্র প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভারে সংগ্রহ তার সমৃদ্ধ। তার পরিচিত পরিবেষ্টনীর বাইরে সে যা-কিছু দেখে তার নূতনত্ব তার মনকে আকৃষ্ট করে প্রবল ভাবে, তাই কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। সে নিজেকে মনে করে পথিকৃৎ বলে। তার সংগৃহীত সংবাদে পরবর্তী পদাংক অনুসরণকারী সবাই উপকৃত হবে, তার কাহিনীর বিবৃতি শুনে পিছে-পড়ে-থাকা সবাই চমৎকৃত হবে—এবং ঈর্ষিত হবে—এমনিতর অনেক ভাবনা তার বহিরাগত চোখকে জাগ্রত রাখে প্রতিটি প্রহর।

আমি এই দ্বিবিধ বোধ থেকেই একেবারে মুক্ত। আমার এ কৌতূহল তার প্রত্যক্ষ নিবৃত্তির সন্ধানে আমার রুচি সামান্যই। ছাপার অক্ষরের দৌত্যে, অর্থাৎ অপরের রচনার মধ্যস্থতায়, জ্ঞান-সংগ্রহেই আমার পক্ষপাতিত্ব। তার অনেক সুবিধা। এতে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা অনেক কম, কেন না, রচনার কৌশলে সাধারণে অসাধারণের বৈচিত্র্য-সমন্বিত হয়ে ওঠে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরের সম্বন্ধেও কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং একান্ত তুচ্ছ বস্তুও পরম উপাদেয়তা লাভ করে।

পরের মুখে ঝাল খাওয়ার সুবিধাই এই যে এতে রস থেকে বঞ্চিত হতে হয় না, অথচ রসনাও লাঞ্ছিত হয় না।

তা'ছাড়া নিজের ভ্রমণের চাইতে পরের বিবরণের আরো একটা সুবিধা এই যে, কাহিনীতে অভিজ্ঞতার সেটুকুই শুধু গ্রহণ করতে হয় যা উপভোগ্য। ডি-এচ রেলওয়ের খেলনা-গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে উঠতে যে দীর্ঘ, প্রায় নিঃসীম, ক্লান্তিকর ঘণ্টাগুলি অতিবাহিত হয়, পাঠকের সে শাস্তি ভোগ করতে হয় না একেবারেই। মধ্য-রাত্রে শয্যা ত্যাগ করে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে টাইগার হিলে আরোহণ করে যে অবর্ণনীয় সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে পাওয়া যায়, পাঠককে শুধু সেই আনন্দেরই অংশ গ্রহণ করতে হয়; পরের সাত দিনের সর্দিতে তাঁকে হাঁচতে হয় না, তিন দিনের পায়ের ব্যথাটাও পুরোপুরিই পরিব্রাজকের নিজের। আমি আতকুঁড়ে, অর্থাৎ সামান্যতম শারীরিক পরিশ্রমে আমার অপরিসীম বিরাগ। দিনে কুড়ি ঘণ্টা টেবিল-চেয়ারে বসে ভ্রমণ

কাহিনী বা যে-কোনো বই পড়তে পারি, বা লিখতে, কিন্তু হাতের কাজে আমি বিশ্বের অক্ষমতম ব্যক্তি। মহাত্মা গান্ধীর বেসিক এডুকেশনে আমার অচলা ভক্তি, কিন্তু আপনি আচরি কখনো সে ধর্ম পরকে শেখাতে আদিষ্ট হলে বড়ই বিপন্ন বোধ করব।

পরিব্রজনের আবিষ্কার আবার দু'রকমের। কারো কৌতূহল বস্তুতে, কারো বা ব্যক্তিতে। কেউ কলকাতা এলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে যান, কেউ বা সাক্ষাৎ করতে যান প্রদেশপাল বা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে। এদিক্ থেকেও আমার কৌতূহল অত্যন্ত পরিমিত। আগ্রায় যে তাজমহল আছে তা আমি ঐতিহাসিকের জবানিতে এবং কবির কবিতায় জেনেই সন্তুষ্ট থাকি, প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি নে। আর ব্যক্তিদর্শনে যে আদৌ স্পৃহা ছিল না তা তো বলাই বাহুল্য—তার জন্যে কি আর কেউ শীতের সময় জনশূন্য দার্জিলিঙে আসে?

আমি যে-আবিষ্কারের জন্যে আলস্য পরিহার করে ঘরের বাইরে গেছি তা একান্তই আভ্যন্তরীণ। চক্ষু দ্বারা সাধ্য নয় সে-আবিষ্কার, আদৌ সম্ভব কি না তা-ও নিশ্চিত ভাবে জানি নে। আমার একমাত্র কাম্য আবিষ্কার নিজের আবিষ্কার, নিজকে আবিষ্কার। আমার ভ্রমণ দ্রষ্টব্যের সন্ধান নয়, দর্শনের সন্ধান। দার্জিলিং বা যেখানেই আমি যাই না কেন তা আমার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। আত্মাবিষ্কারের পরিবেশ মাত্র। সে শুধু পট-ভূমিকা, চিত্র নয়; সে শুধু ভূমিকা, গ্রন্থ নয়।

দার্জিলিঙের নির্জনতায় এসেছিলেম অনেকগুলি জিজ্ঞাসার বোঝা বহন করে। এসেছিলেম অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের আশায়, অনেকগুলি সমাধানের পুনর্বিবেচনার বাসনা নিয়ে। ভেবেছিলেম সম্পূর্ণ অবিভক্ত অবসরের মধ্যে একটু চেষ্টা করব আমার দ্বিধাবিভক্ত, শতধা-বিক্ষত মনের মধ্যে কিঞ্চিদধিক শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যের বিধান করতে। ঈশ্বর, মানব, দৈব, কর্ম্ম, ভাল, মন্দ, হিংসা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মতত্ত্বের বিবেচনা করে অন্তত সাময়িক একটা আত্মতুষ্টিজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবো, এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেম নিজের কাছে।

এই ধরণের অ্যাবষ্ট্রাক্ট চিন্তায় আমার অধিকার অল্পই, দার্শনিকের শিক্ষা নেই আমার। সাম্প্রতিকতার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা আমার চিন্তাক্ষেত্রে নিরাকার চিরন্তনতার প্রবেশ-পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু মিনিট তো ঘণ্টার অংশ, সাময়িকতা চিরন্তনীর খণ্ড।

অংশকে না জানলে যেমন সমগ্রকে জানবার উপায় নেই, তেমনি সমগ্রকে না জানলেও বোধ হয় সাময়িককে সম্যক্ জানা হয় না। বৃক্ষকে বাদ দিয়ে অরণ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র বৃক্ষেই আবদ্ধ থাকে তা'হলে অরণ্য অজ্ঞাত থেকে যায়। আমার সংসার-অরণ্য বৃক্ষসংকুল, কিন্তু অরণ্যকেও উপেক্ষা করতে পারিনে। এই বনের মোষ তাড়ানোর বিলাসে বন্ধুজনের হাস্যোদ্রেক ঘরের খেয়ে হবে, সে আপত্তি করব না। কিন্তু ধনিজনের শিকার-বীরত্বের চাইতে আমার এই স্বভাব যে অপেক্ষাকৃত অহিংস তা অস্বীকার করা হবে না আশা করি।

আমার এই চিন্তানুশীলন থেকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, এমন দুরাশা পোষণ করি নে। এ আমার নিজেরই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যায়াম মাত্র। যারা বেতারে-রেকর্ডে শুধু মাত্র আধুনিক গান গেয়ে থাকেন তাঁরাও যেমন কণ্ঠের উন্নতিসাধন মানসে স্বরগ্রাম সাধনা করেন, আমার এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-বহির্ভূত চিন্তার অভ্যাসও সেই রকম।

উপরে যে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির উল্লেখ করেছি সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু সেগুলিকে যোগ করলে যে দু'টো প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে কেন বাঁচব? কেমন করে বাঁচব? চিন্তাশক্তির বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে বহু বার এই দুই প্রশ্নের বহু উত্তর স্থির করেছি নিজের মনে। কিন্তু হায়, সেই স্থিরতাগুলি স্থায়ী হতে পারল না আজও। আমার সকল গত কল্যকার সেই অসংখ্য উত্তরগুলি যেন সংখ্যাহীন শূন্যের অন্তহীন মালা—তার বাঁয়ে একটা এক নেই বলে তারা সব শূন্যই রয়ে গেল, সংখ্যা হতে পারল না।

জীবনকে তখন মনে হয় একটা বোবা দেয়াল বলে, শত মাথা কুটলেও যার কাছ থেকে কোন উত্তর মেলে না, মেলে শুধু আপন প্রশ্নের বিকৃত প্রতিধ্বনি। বেঁচে থাকার দিনগুলিকে তখন মনে হয় একটা সংখ্যাতীত সিঁড়ির সমষ্টি বলে, দিনের পর দিন একটি একটি করে তাদের অতিক্রম করা শুধু অতিক্রম করারই জন্যে—কোথাও পৌঁছোবার জন্যে নয় যেন।

দার্জিলিঙের অনবচ্ছিন্ন অবসর আর অনাবিল রৌদ্র আর আলোর মধ্যে আমার সেই অনুচিন্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে যা বলি তার মর্মটা মোটামুটি এই যে সকল রকম চিন্তা যেন শত হস্ত দূরে রাখতে পারি। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল, শূন্য শূন্যই।

এদিকে দেখাও হোলো না কিছু। অবজার্ভেটরি, মহাকাল, লয়েড, বটানিক্স্, ম্যুজিয়ম, ভিক্টোরিয়া ঝর্ণা, মন্দির-মসজিদ-মনাষ্টেরি ইত্যাদি যত কিছু টুরিষ্টের হৃদয় জয় করবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার সব-কিছু রয়ে গেল দেখার বাইরে। ওগুলি দেখতে যাওয়ার মত উৎসাহই অবশিষ্ট নেই। মনের ক্লান্তি সংক্রামিত হয়েছে দেহে।

না পেলেম প্রশ্নের উত্তর, না হোলো দৃশ্য দেখা। না পেলেম চিত্তের প্রশান্তি, পর্যটকের উত্তেজনাও রইল অজানা।

অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হবে না কেন এর পরে প্লিভা-র অভিমুখে যাত্রা করলেম।

দার্জিলিঙের অনাবাসিক খাবার-জায়গাগুলির মধ্যে প্লিভারই খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। শুনেছি, দোকানটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোন সুইস্ ব্যবসায়ী। বর্তমানে ভারতীয় তত্ত্বাবধানে খাদ্যের অবনতি ঘটেছে বলে যে অভিযোগ শুনেছিলেম তা পরীক্ষা করে না দেখলেও সত্য বলে মনে করি নে। অন্তত অন্যান্য সার্ভিসে যে অবনতি ঘটেনি তার প্রমাণ পেয়েছি। কলকাতায় দুর্লভ এমন বহু জিনিস ওখানে মেলে।

বাকী দার্জিলিঙের মতো এই রেষ্টুরেণ্টটাও এখন প্রায় জনহীন। শূন্য টেবিলগুলি করুণ ভাবে শূন্য চেয়ারগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। নীরব বাদ্যযন্ত্রগুলি—একটা পিয়ানো, গোটা-দুই ড্রাম আর একটা ডাবল্ বেস্ বা চেলো—অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সামনের উঁচু জায়গাটায়। এক দিন তাদের বাজনায় অনেক আনন্দসন্ধানীর

পদযুগল চঞ্চল হয়েছে। আজ কেউ নেই সে-বাজনা শুনতে। তাই বাজাতেও কেউ নেই। কাউন্টারের এক কোণে দু'টো বেয়ারা শীতে কাঁপছে চোখ মুদে। অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে কখন বন্ধ করবার সময় হবে। বাইরের অন্ধকার রাত আপন ধ্যানে স্থির, তাড়া নেই কোনো কিছুরই জন্তে, বেয়ারাদের অধৈর্য সত্বেও। কাল নিরবধি।

আমার যা দরকার ছিল তা নিয়ে আমি জানালার ধারে একটা টেবিলে এসে বসলেম। জানালাটা বন্ধ, কিন্তু কাচের। দেখবার বাধা ছিল না।

লোকগুলি ক্ষুদ্রকায়, বাড়ীগুলি ছোটো, রেলগাড়ীগুলি শিশুদের খেলার উপযুক্ত, এই সব মিলিয়ে দার্জিলিঙ জায়গাটা এমনিতেই অদ্ভুত। ওখানে উঁচু, এত উঁচু যে আকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। এখানে নীচু, এত নীচু যে তার অতল গহ্বরে পড়লে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওখানে একটা অতি আধুনিক ধরণের বাড়ী, আগামী কালের ডিজাইনে তৈরী। এখানে একটা কুঁড়ে ঘর, সেটা যেন মানুষেরই তৈরী নয়, তার যেন সৃষ্টি হয়েছিল ধরা-বক্ষে মানবের আবির্ভাবেও আগে, বুঝি বা ইতিহাসের আরম্ভের পূর্বে। দার্জিলিঙ দর্শনে কল্পনাবিলাসী আগন্তুকের মনে প্রথম যে ধারণা মনে আসে তা এই যে জায়গাটা যেন বিশ্বকর্মার সৃষ্টি নয়, বিশ্ববিধাতা যেন খেলার ছলে তৈরি করেছেন বাঙলা দেশের উত্তর কোণের এই খেলা-ঘরটা। গোয়েস্কার রোপ্‌ওয়ের লাইনটা ওই যে দূরে আকাশের গায়ে বেত্রাঘাতের দাগের মত দীর্ঘায়ত হয়ে শুয়ে আছে, ওটা যেন বৃহৎ একটা অসঙ্গতি। খেলার মধ্যে বাণিজ্যের অপ্রীতিকর স্মারক, যেন ছবির খাতায় প্রোডাক্‌শন কার্ড।

রাতের বেলায় শহরটার এই খেলা-ঘরের রূপটা যেন আরো বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। দূরে সারি সারি কয়েক ঘরে টিম-টিম করে আলো জ্বলছে, চতুর্দিকের কালো একটা বিরাট জন্তুর হাঁ-র মতো ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্ষীণ আলোর ঔদ্ধত্য হাস্তকর। ছোট বাড়িগুলিকে আরো ছোট বলে মনে হচ্ছে, তাদের ভিতরের আলোর মালা যেন কোন শিশুর কোমল হাতে সাজানো পঞ্জিকাস্বাধীন দীপালি। দূর থেকে দেখা এই আলো আর অন্ধকারে অদৃশ্য বৃহতী প্রকৃতি, সব কিছু জড়িয়ে আমার চার দিকের বিশ্বকে মনে হচ্ছিল কোন বিরাট শিশুর নিঃশব্দ অট্টহাস্তের মত।

* * * *

বাইরে থেকে চোখ ফেরাতে হোলো সশব্দ এক অট্টহাস্ত শুনে। এই প্রথম বুঝতে পারলেম যে আমি একা নেই। হাসির শব্দ অনুসরণ করে প্লিভার দোতলার খাবার ঘরের দূরতম স্বল্পালোকিত কোণে যাকে দেখলেম তাকে চেনবার উপায় ছিল না। সারা গায়ে গরম জামা, মাথায় এবং গলায় মোটা মাফ্‌লার, হাতে দস্তানা; শুধু রক্তবর্ণ চোখ দু'টো জ্বল-জ্বল করছে।

আমার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের তিনি যে অর্থ করলেন তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। ভদ্রলোক উঠে এসে আমার টেবিলে বসলেন। অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। স্থানবিশেষে, কালবিশেষে সকল লৌকিকতা বিসর্জন দেওয়া হয় উভয় পক্ষের অনুক্ত সম্মতিতে। আলাপের সুরু ইংরেজিতে।

"What will you have?"

"The same poison, if I may" আমি মামুলি উত্তর দিলেম।

ভদ্রলোক বেয়ারাকে তদনুযায়ী আদেশ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অত ভাবছিলেন বাইরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থেকে?"

যা ভাবছিলেম তা কাউকে বলবার মতো নয়। বললেম, "বিশেষ কিছু নয়। এমনি বসেছিলেম। আপনি কতক্ষণ থেকে আছেন?"

"আপনারও অনেক আগে থেকে। আপনাকে লক্ষ্য করছিলেম অনেকক্ষণ থেকেই। একা-একা ভালো লাগছিল না বলে এখানে এলেম।"

"আমারও একা ভালো লাগছিল না।" কথাটা কেবল মাত্র ভদ্রতার জন্তই বলিনি।

"তাহ'লে এবার বলুন অবিশেষ কি ভাবছিলেন।"

"এই—অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ," আমি এমনি একটা সর্বকালীন উত্তর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের পথ রোধ করবার চেষ্টা করলেম।

ভদ্রলোক কথা বলবার জন্তে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। আমার অনির্দিষ্ট উত্তরও তার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে, প্রায় আপন মনে বলে চললেন, "ভাবতে গেলেই মুস্কিল। ভাবিয়া কোরো না কাজ, করিয়া ভাবিও না—এই হচ্ছে ঠিক কথা।" আপন মনে হাসলেন ভদ্রলোক।

ভাবতে বারণ করে নিজেই বোধ হয় একটু ভেবে যোগ করলেন, "অবিশ্যি সব চেয়ে ভালো কাজ না করা। যেমন আমি করি নে।" আবার হাসলেন।

তাঁর বাক্যের জড়তার মত চিন্তার জড়তাকেও স্মিতহাস্তে ক্ষমা করলেম। আমার হাসি তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু তিনি ক্ষুব্ধ হননি। বরং আমারই অজ্ঞতাকে যেন তিনি ক্ষমা করছেন, এমনি ভাবে হাসলেন, বোধ হয় আমার মতো সকল পণ্ডিত-মূর্খের উদ্দেশে আবৃত্তি করলেন:

"And if the Wine you drink, the Lip you press
End in the Nothing all Things end in—Yes—
Then fancy while Thou art, thou art but what
Thou shalt be—Nothing—Thou shalt not be less,

এবং বেশীও নয়, এক কাণাকড়িও নয়। শত পরিশ্রম করলেও নয়।"

শ্লোকটির গঠন একটু ঘোরালো। তবু পূর্ব-পরিচিতি এবং ভদ্রলোকের আবৃত্তির শুদ্ধ বিরতির জন্তে অর্থোদ্ধারে কষ্ট হয়নি। কিন্তু কাব্যের অথবা উদ্ধৃতির সঙ্গে তো যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। বললেম, "হুঁ, মুস্কিল এই যে জীবনটা কাব্য নয়। কঠোর সত্য।"

"কঠোর, কিন্তু সত্য নয়। কাব্যই সত্য।"

"ডিপেণ্ডস্, সত্যের কোন সংজ্ঞা আপনার মনঃপূত।"

"কোনটাই নয়। এর মধ্যেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে মেটাফিজিক্‌স্ আমার লাইন নয়। তাছাড়া বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে বলে যদিও বিশ্বাস করি নে, তর্কে যে মেলে না তা জানি।" একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, জীবন যদি কাব্য না-ও হয়, তাকে কাব্যের মতো সুষম, সুন্দর করলে দোষ কী?"

"দোষ কিছু নেই হয়তো, কিন্তু সম্ভব কি না সেইটেই প্রশ্ন।"

"আমার উত্তর হচ্ছে এই যে চেষ্টাই করা হয়নি। যারা চেষ্টা করেছে তাদের উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, কেবলই বাধা দেওয়া হয়েছে।"

আমি নিজে প্রায়শই বিশ্বের, সমাজের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করে থাকি। তখন সেগুলি অত্যন্তই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু অপরের মুখে অপরের অভিযোগ শুনে মৃদু বিরক্তি হোলো, ভাল লাগল না। আপন অক্ষমতা, আপন ব্যর্থতার জন্য আর সবাইকে দোষী করাকে মনে হোলো কাপুরুষতা বলে। ভদ্রলোককে সে কথা স্মরণ করিয়ে না দিয়ে বললেম, "তাই তো বলেছিলেম, এই বাধা অস্বীকার করা যায় না বলেই জীবন কঠোর সত্য।"

"হয়তো আপনি ঠিক বলেছেন, হয়তো নয়। তর্ক করব না। জীবন কঠোর সত্য বলেই হয়তো কোমল সত্য বনকে বরণ করে নিয়েছিলাম। ভুল করিনি, এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি। অনেক দিন আগেই আমি

Divorced old barren Reason from my Bed,
And took the Daughter of the Vine to Spouse"

আমি বললেম, "আধুনিক পরিভাষায় তাকে পলায়ন বলে কিন্তু। নতুন সমাজ যে এই সব পলাতকদের ক্ষমা করবে না সেই হুঁসিয়ারি আপনার এখানে এসে পৌঁছোয়নি বোধ হয়।"

"পৌঁছেছে, কিন্তু আর যারই অভিযোগ থাক আমাদের বিরুদ্ধে সমাজের কিছু বলা উচিত নয়। সমাজের ক্ষতি আমরা করিনি। সমাজের ক্ষতি করেছে আপনার নিষ্কলংক, চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ সমাজহিতৈষীরা। যারা সমাজের ভাল করবার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে বলে উচ্চৈস্বরে গগন বিদীর্ণ করে সহস্র সহস্র অপরের দেহ বিদীর্ণ করে প্রাণ নিয়েছে নির্মম ভাবে, ভাল করবার অজুহাতে। আপনার মুসোলিনী অ্যাবিসীনিয়াকে সভ্য করবে বলে যুদ্ধ বাধিয়েছে, আপনার হিটলার জর্মাণ সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিকিরণ করে মানব জাতির উন্নতি বিধান করবে বলে লড়াই করেছে, আপনার ষ্ট্যালিন শোষণের নিষ্পেষণের উচ্ছেদের নামে অগণ্য নিরপরাধের রক্তধারায় অবগাহন করেছে। আমরা পলাতকেরা নিজেদের নিয়ে যাই করে থাকি অপরের বা সমাজের কোনো ক্ষতি করিনি। তার সকল দায়িত্ব আপনার হিতৈষীদের দরজায় রাখতে হবে। তাদের দরজায় যারা জগতের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ মঙ্গল সম্বন্ধে তার নিজের যা ধারণা তা আর সকলের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে—বিরোধ বাধিয়েছে। আমরা অন্তত এই ধারায় নট্ গিলটি।" ভদ্রলোক বক্তৃতার শেষ লাইনে এসে একটু হাসলেন, কিন্তু উত্তেজনার আভাস ছিল সেই হাসিতেও।

প্রতিবাদ করলেম না। বক্তৃতা শেষে পূর্বের সৌজন্যের প্রতিদানের জন্যে বেয়ারাকে নিঃশব্দে আদেশ দিলেম হস্তসঞ্চালন করে।

সামাজিক মানুষের সকল আলোচনার যে অবশ্যম্ভাবী সাম্প্রতিকতা আছে, তা পরিহার করবার জন্যেই আমিও সাময়িক ভাবে পলায়ন করে দার্জিলিঙে এসেছিলেম। এই তর্কে যোগ দিতে তাই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, সত্যি, উত্তর কী এই প্রশ্নের? মনুষ্য-সমাজে এত যে মন্দের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি হবে কি উপায়ে? বক্তৃতা আর প্রচার করে যদি অর্থলোভী ব্যবসায়ী আর শক্তিগৃধ্নু রাজনীতিকের বিবেকের পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তবে কত যুগ লাগবে সেই চিকিৎসায়? আর দ্রুত আরোগ্যের লোভে যদি ছুরি ওঠে সার্জেনের হাতে, তা'হলে সে ছুরি শেষে কার বুকে বসবে কে জানে?

বেয়ারা আদেশ পালন করলে ভদ্রলোকের দিকে সময়োচিত ইঙ্গিত করে বললেম, "সমাজের কথা ভাবছিলেম না ঠিক। যে লোক নিজেরই জীবনে সামঞ্জস্য আনতে পারলে না তার অপরকে ভালো করবার মতো ঔদ্ধত্য নেই। আমি ভাবছিলেম নিজের কথা।"

আমার অনাহূত সঙ্গীও তাই ভাবছিলেন, তাঁর নিজের কথা। সহসা আত্মসচেতন হয়ে বললেন, "আমারও সে ঔদ্ধত্য নেই। আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক। এমন কি, পরজন্মে ব্রজের রাখাল বালক হবারও বাসনা নেই। গতজন্ম ছিল না এবং ঈশপের গল্পের বোকা কুকুরের মতো পরজন্মের ছায়ার লোভে ইহজন্মের মাংসের টুকরোটা হারাতে মোটেই রাজি নই।" আবার আবৃত্তি করলেন,

"A Muezzin from the Tower of Darkness cries
Fools ! your Reward is neither Here nor There"

ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং শুধু ক্লান্ত নয়। কিন্তু তাঁর কথা ফুরোয়নি, হয়তো আরম্ভই হয়নি এখনো। আবার মাথা তুলে বললেন, "আমার কি মনে হয় জানেন? মানুষের কর্ম-ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে তার শুভবুদ্ধিকে। তার উদ্ভাবনী শক্তি উন্মত্ত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে তার মঙ্গলবুদ্ধিকে পিছনে ফেলে রেখে। মানুষ আজ দুরন্ত শিশুর মত নিজের ধ্বংস-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যা-কিছু সামনে পাচ্ছে তাকেই ভাঙছে।" উদ্দাম, অদ্ভুত হাস্যে যোগ করলেন, "ভাঙছে যে নিজেরই বর্তমানকে এবং নিজেরই ভবিষ্যৎকে তা যখন বুঝতে পারবে তখন হয়তো বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নামক দু'টো খেলনারই অবস্থা মেরামতের বাইরে চলে গেছে।" আবার বিপুল, বিকট হাসি। "অবস্থাটা উপভোগ্য বটে।"

উপভোগ্য? না কি অশ্রু-বিসর্জনের যোগ্য? ভদ্রলোকের হাসির অর্থ বুঝতে পারলেম না। শুধু বললেম, "আপনার বিভীষিকা-ময়ী ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে হাসির উচ্ছ্বাসের যোগ খুঁজে পাচ্ছি নে তো?"

"যোগ আছে", ভদ্রলোক এক মুহূর্তও না ভেবে উত্তর দিলেন, "যোগ আছে। কেন না, যে পৃথিবীর ধ্বংসসাধন হচ্ছে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ঈশ্বরকে, অর্থাৎ আমাকে, ধন্যবাদ; আমি সময় থাকতে সরে এসেছি।"

"ভাজার মাছ যেমন তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনানে সরে আসে।"

"মোটেই নয়। নোয়া যেমন করে বন্যা থেকে তার নৌকায় সরে এসেছিল। আমি তেমনি সরে এসেছি। এখন আমি দর্শক—গ্রাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড থেকে দেখব আর হাসব।"

"এতে আর যাই থাক বীরত্ব নেই। বিচক্ষণতাও আছে কি না সন্দেহ করি।"

"বীরত্বে লোভ নেই। বিচক্ষণতা ঘৃণা করি। আপনারা বোকা ক্যাসাবিয়াংকার মতো বার্ণিং ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ুন! আপনাদের জন্যে করুণাও হয় না।" কণ্ঠে তীব্র তিক্ততা।

"যারা দাঁড়িয়ে পুড়ছে তাদের আপনার করুণায় প্রয়োজন নেই।" তারা জানে কেন মরছে। তাদের কাজে আর যাই থাক বা না থাক, তাদের উদ্দেশ্যের মহত্ব অস্বীকার করবেন কী করে?"

"দোহাই আপনার, মূর্খতাকে মহত্বের আখ্যা দেবেন না। দু'টো একেবারেই আলাদা জিনিষ। বরং বলি একটা বস্তু, আরেকটা মিথ্যা—একেবারে মীথ। দু'টোরই পরিণাম অবিশ্যি এক।

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish prophets forth, their Words to Scorn
Are Scattered,, and their Mouths are Stopt with Dust.

ডাষ্ট। ধুলো। সেখানেই সুরু এবং সেখানেই শেষ। এই দু'য়ের মাঝের সময়টায় আপনারা পরিশ্রমীরা ঘাম ফেলে তাই দিয়ে ধুলোকে কাদা তৈরি করুন। সেই কাদা দিয়ে মূর্তি গড়ে আত্মসান্ত্বনা লাভ করুন। We know better, আমরা জীবন নামক উইণ্ডমিলের সঙ্গে ডন্ কুইক্সোটের মতো লড়াইয়ের আস্ফালন করি নে। পরিহাসকে আমরা পরিহাস বলে জানি। তাই আমি হাসছি আর আপনি লম্বা মুখ নিয়ে বসে আছেন।"

উচ্চ হাস্যে চীৎকার করলেন, "বেয়ারা—"

"মুখ যতই লম্বা করুন, জীবনটা দীর্ঘ নয়। সময় নেই সময় নষ্ট করবার। আসুন।"

"কিন্তু সময় অল্প বলেই তো তার অপব্যয় আরো বেশী অন্যায়।"

"ডিপেণ্ডস্, আপনি কাকে অপব্যয় বলেন।"

"কিছু না করা নিশ্চয়ই অপব্যয়।"

"টাকার বেলায় তাকেই তো সঞ্চয় বলে।" ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম রসবোধ তখনো অক্ষুণ্ণ আছে, হেসে বললেন, "কিন্তু রসিকতা থাক। কোনো কিছু করা—তা সে যতই ভুল হোক, যতই অন্যায় হোক, যতই ক্ষতিকর হোক—তাকে যদি সময়ের সদ্ব্যবহার বলেন তা'হলে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই।"

"না, তা বলছি নে। কিন্তু ভাল কাজ বলেও তো সংসারে কিছু আছে।"

"আছে না কি? জানি নে তো! কার ভালো?" মৃদু বিদ্রূপের আভাস।

"নিজের এবং অপরের। সকলের ভাল।"

"নিজের ভাল মানে তো laissez faire অর্থাৎ পাঁচ বছরের শিশুকে সুতোর কলে খাটানো আর তিন দিনের শিশুকে কোলে নিয়ে তার মাকে কয়লা খনির তলায় পাঠানো। এই তো নিজের ভাল।"

"কিন্তু—"

"দাঁড়ান। আর পরের ভাল মানে তো হিটলার আর ষ্টালিন। অর্থাৎ যুদ্ধ আর বিপ্লব। অর্থাৎ রক্ত আর রক্ত।"

"কিন্তু এ দু'য়ের মাঝখানে কি কিছু নেই?"

"কিচ্ছু না। নট এ থিং! অন্তত..."

এবারে আমি বাধা দিলেম, "কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস্ যদি বা ঠিক, চিকিৎসা কি? সে সম্বন্ধে তো কিছু বলছেন না।"

"চিকিৎসা নেই। থাকলেও আমাদের তা জানা নেই।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু নেই আর। শান্তিপূর্ণ উপায়ে একক চেষ্টা দ্বারা ভাল করতে যান, কোন লাভ হবে না। কেউ শুনবে না। এই মুহূর্তে দিল্লীতে এক পাগল এই মোহের ভুলে কেঁদে মরছে আপন দুঃখে। কেউ কানে তুলছে না তার কথা।"

এর উত্তর ছিল না। উনাশি বছরের বৃদ্ধ মহাত্মা সেদিন দু'টো বৃহৎ সম্প্রদায়ের হিংস্র উন্মত্ততা শান্ত করবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে অনশন করেছিলেন। বহু সহস্র সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের মনে তাইতে শোকের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তদের চিত্তের পরিবর্তন হোলো কই? অন্যায় চলেছে অপ্রতিহত। এদিকে শুদ্ধ হতে চলেছে মহত্তম জীবনের জীর্ণ আধারের ক্ষীণ স্পন্দন।

শ্রান্ত কণ্ঠকে একটু বিশ্রাম দিয়ে ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, "আর জোর করে দল বেঁধে ভালো করতে যান, দেখবেন, দলের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে তাদেরই হাতে যাদের ইচ্ছা আপনার সৎ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। দলের পাণ্ডা হয়ে দাঁড়াবে গুণ্ডারা। বহু হিংসা বহু হত্যার পরে আপনার দল যদি বা যখন জয়লাভ করে তখন দেখবেন সেই জয়ের প্রথম ক্যাসুয়েল্টি আপনার আইডিয়াল। তাতে এক অন্যায়কে সরিয়ে অপর অন্যায়কে সে-জায়গায় বসানো হবে। আর কিছু লাভ হবে না।"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু। কিন্তু নেই। এ দু'য়ের মাঝে আর কিছু নেই।"

এ তো অসীম নৈরাশ্য। এ তো শুধু সমস্যার ব্যাখ্যান। সমাধান কোথায়? এ তো শুধু প্রশ্ন। উত্তর কোথায়? হতাশ অনুত্তরতার অতৃপ্তি নিয়ে আমি চুপ করে রইলেম।

আমার সঙ্গী আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে আপন মনে হাসছিলেন। বললেন, "আমি যা বললেম তা আপনার মনঃপূত হোলো না নিশ্চয়ই। আপনার বোধ হয় ধারণা একটা কিছু করা চাই-ই চাই তা সে যতই ভুল হোক।" একেবারে কাছে এসে বললেন, "আমি জানি, শুনুন আমার কথা। কিছু করবার নেই। একেবারে কিছু নয়। মাষ্টারলি ইনয়্যাকিটিভিটি—য়্যস্।" আমার কানের আরো কাছে এসে ভীত, কর্কশ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "কিছু করবার নেই। কিছু করবার নেই। ধ্বংস এগিয়ে আসছে ভীষণ বেগে। তার আগে যে কটা মুহূর্ত আছে, মেক্ দি মোষ্ট অব দেম্। এই একমাত্র সত্য কথা

...that life flies;
One thing is certain, and the Rest is Lies."

আর কিছু বলার শক্তি ছিল না ভদ্রলোকের। জড় প্রস্তর-খণ্ডের মত তাঁর মাথাটা টেবিলের উপর পড়ল একটা বিকট শব্দ করে।

আমি তাঁকে জাগালেম না। ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে। ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি। দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে; যাক্ ভুলে, যাক্ ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা।

* * *

এ নয়, এ নয়। নেতি, নেতি। অনিশ্চিত পদক্ষেপে প্লিভার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নেমে এলেম তখন রাস্তার দূরের স্তিমিত আলোর ভীরু শিখা হৃদয়ে আশার সঞ্চার করল না। কিন্তু নিজের মনে জপতে থাকলেম, এ নয়, এ নয়! নেতি নেতি!

যখন বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছোলেম তখন ভদ্রলোকের চেহারাটা স্পষ্ট মনে আনতে পারলেম না। কার সঙ্গে এতক্ষণ বসে এত কথা বলেছিলেম; এত কথা শুনছিলেম?

সত্যি কি কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল? না কি আমারই একটা বিচ্ছিন্ন, অর্ধপরিচিত, অবজ্ঞাত একটা অংশকে বসিয়েছিলেম আমার টেবিলের উল্টো দিকে? আমার জীবনের উল্টো দিকে?

কিছুতেই মনে করতে পারলেম না।

দার্জিলিং জায়গাটাই কিছুটা অলৌকিক। এখানে কোথায় যে ধরণীর শেষ আর কোথায় আকাশের সুরু, বাস্তবের আরম্ভ আর কল্পনার শেষ, তা বোঝা যায় না। এখানে সত্য আর মিথ্যার মাঝখানে সীমা-রেখা যদি বা থেকে থাকে তা দৃষ্টির অতীত।

না কি, ওই লোকটা যা বলেছিল, এ দু'য়ের মাঝখানে কিছু নেই অন্তহীন, অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া? [ক্রমশ।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

শ্রীধর কথক

প্রতি সংখ্যায় এক এক জন কংগ্রেস-নেতার জীবন-কাহিনী শোনাবার ভার নিয়েছেন শ্রীধর কথক। এই সংখ্যায় ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী আজাদের বৈচিত্র্যময় কাহিনী শুনুন।

"দাসত্ব দাসত্বই এবং ইহা ভগবানের অভিপ্রায় ও নির্দেশের বিরোধী। আমার দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা আমি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি"—১৯২৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বজ্রগর্ভ বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আহ্বান করেন। বর্ত্তমান ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌলানা আজাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মৌলানা আজাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শক্তিশালী লেখক ও বক্তা হিসাবে মৌলানা আজাদ প্রখ্যাত। মৌলানা আজাদ ১৮৮৮ সালে মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আরব দেশেই তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পণ্ডিত, ধর্মগুরু ও বিপ্লবী হিসাবে মুসলমান সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তাঁহার অন্যতম পূর্বপুরুষ হজরৎ শেখ জামালুদ্দীন আকবর বাদশাহের বিরাগভাজন হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পিতা মৌলানা খায়রুদ্দীন ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান করেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ভারত হইতে পলায়ন করিয়া মক্কা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। মৌলানা খায়রুদ্দিন [illegible] মতবাদের সমর্থক ছিলেন। সুফী ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি [illegible] মুসলমান-জগতে খ্যাতিলাভ করেন। ধর্মগুরু হিসাবে আরবের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেও তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মৌলানা আজাদের মাতাও বিদুষী মহিলা ছিলেন। মৌলানা আজাদ শৈশব কালেই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। মাতার নিকট হইতে আরবী শিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে উর্দু ও ফারসী শিক্ষা করেন। ১৮৯৮

সালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় কিছু দিন পড়াশুনা করিয়া তিনি মিশরের বিখ্যাত 'আল আজহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৫ বৎসর বয়সেই মৌলানা আজাদের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বালক আজাদের জ্ঞানের গভীরতা ও কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুসলমান সমাজের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইতেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ১৬ বৎসর, তখন তিনি লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত সমাজে বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। প্রধান অতিথির বক্তৃতা শুনিবার জন্য কবি হালি, কবি নজির আহমদ ও কবি ইকবাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হন। প্রধান অতিথি হিসাবে এই অজাতশ্মশ্রু বালককে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণের পর তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বয়সে বালক হইলেও তিনি পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানের গভীরতায় বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতকে অতিক্রম করিয়াছেন। মৌলানা আজাদকে লক্ষ্য করিয়া কবি হালি রহস্য করিয়া বলেন—'An old head on young shoulders'. পিতার মৃত্যুর পর মৌলানা আজাদ সহজেই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু হিসাবে সম্মানের সহিত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, তিনি ভারতের মুসলমান সমাজকে মুক্তির পথ

নির্দেশের ভার গ্রহণ করিলেন—এই মুক্তি আধ্যাত্মিক মুক্তি নহে, বিদেশী শাসকের দাসত্ব হইতে মুক্তি। সেই সময়ে ভারতের মুসলমান সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় ইংরাজের দাসত্বকে পরম কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের ভুল ভাঙাইবার জন্য মৌলানা আজাদ ১৯১২ সালে 'আল হেলাল' নামক বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'আল হেলাল' খুব অল্প দিনের মধ্যে মুসলমান সমাজের চিন্তাধারায় যুগান্তরকারী পরিবর্তন সাধন করে। 'আল হেলাল' (অর্ধচন্দ্র) প্রকাশিত হইত কলিকাতায়, কিন্তু এই পত্রিকার প্রভাব ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। 'আল হেলালে'র সম্পাদক ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি ও গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচনা করিয়া ভারতের মুসলমান সমাজকে নূতন আদর্শ ও নূতন পথের সন্ধান দিল। 'আল হেলাল'এ ইসলাম ধর্মের যে উদার ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা মুসলমান সমাজের বহু যুগের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিল। সে যুগে বহু বিশিষ্ট মুসলমান নেতা 'আল হেলালে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 'আল হেলালে'র তরুণ নির্ভীক সম্পাদক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মনোবৃত্তির সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ইহার ফলে 'আল হেলালে'র উপর রাজরোষ পতিত হইল। প্রকাশিত হইবার ১৮ মাস পরে 'আল হেলালে'র প্রকাশ বন্ধ হইল। তরুণ সম্পাদক মৌলানা আজাদ ভারত সরকারের নির্দেশে রাঁচিতে অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন।

১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া মৌলানা আজাদ অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ও গান্ধীজীকে নেতা হিসাবে বরণ করিয়া বিশ্বস্ত সৈনিকের ন্যায় গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। কংগ্রেসে যোগদানের পর হইতে মৌলানা আজাদ আজ পর্যন্ত অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া আসিতেছেন। মৌলানা আজাদ সত্যের উপাসক। জীবনে যাহা তিনি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করার জন্য কোন দিন তিনি কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা, অনন্যসাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সর্বদাই শ্রদ্ধার সহিত মৌলানা আজাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা গান্ধী মৌলানা আজাদের মতামতকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। মৌলানা আজাদ যখন ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। এত অল্প বয়সে আর কেহ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার সম্মান লাভ করেন নাই। মৌলানা আজাদ বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে মৌলানা আজাদকে বহু বার কারাগারে যাইতে হইয়াছে। লাঞ্ছনা ও অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন, কোন কিছুই তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে মৌলানা আজাদ দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে জাতিকে পরিচালিত করিবার সম্মান লাভ করেন। সভাপতি হিসাবে রামগড়ে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও জনসাধারণের কর্তব্য নির্দেশ, এই উভয় দিক্ দিয়াই তাহা অনবদ্য হইয়াছিল। মৌলানা আজাদ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শান্তি ও সুবিচারের পরিপন্থী। ভারতের দাবীই বৃটেনের ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করিবার কষ্টিপাথর।" ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই কয়েক বৎসর কংগ্রেসের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল।

১৯৪২ সালের আগষ্টে পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। নগর হইতে নগরে, গ্রাম হইতে গ্রামে সর্বাত্মক বিপ্লবের অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত মৌলানা আজাদও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আমেদনগর বন্দিশালায় অবস্থান কালে তাঁহার পত্নী ও ভগিনী পরলোক গমন করেন। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিদেশী শাসক-শক্তি তাঁহাকে পত্নীর মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিবার অনুমতিও প্রদান করে নাই। তিনি নিঃশব্দে এই তীব্র আঘাত সহ্য করেন। ধর্মগুরুর নিরুপদ্রব পথ পরিত্যাগ করিয়া যেদিন তিনি পরাধীন জাতির মুক্তিসাধনায় যোগদান করেন, সেদিনই তিনি সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরাধীন জাতির রাজনৈতিক নেতার জীবনে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোন স্থান নাই, মৌলানা আজাদ তাহা ভালো ভাবেই জানিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে তিনি কোন দিন কোন বিপদে বিচলিত হন নাই। হাসিমুখে তিনি কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্রিপস প্রস্তাবের আলোচনার সময় ও পরবর্তী কালে সিমলায় ওয়াভেলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মৌলানা আজাদ অসাধারণ দৃঢ়তা, বাস্তববুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন।

অনেকের ধারণা এই যে মৌলানা আজাদ ইংরাজী জানেন না। ইহা সত্য নহে। মৌলানা আজাদ ইংরাজী ভাষা ভালো ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন যদিও তিনি কথাবার্তায় কদাচিৎ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর বক্তা। বিতর্ক সভায় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা বহু বার উপস্থিত ব্যক্তিদের মুগ্ধ করিয়াছে। মুসলমান দেশগুলির সম্পর্কে মৌলানা আজাদের গভীর জ্ঞান আছে। তিনিই সর্বপ্রথম 'আল হেলালে'র সাহায্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে মুসলমান-জগতের নূতন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করান। কোর-আন শরীফের ভাষ্যকার হিসাবে মৌলানা আজাদের নাম মুসলিম-জগতে প্রখ্যাত। তাঁহার এই বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "তারজুমানুল কোর-আন।" রাঁচিতে অন্তরীণাবদ্ধ থাকিবার সময় তিনি এই পুস্তকের অধিকাংশ রচনা করেন। ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পুস্তক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মৌলানা আজাদ সমগ্র জীবন ধরিয়া সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও দীনতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া দেশবাসীর সম্মুখে স্বাধীনতার ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিব। তাঁহার পরিচালনায় অদূর ভবিষ্যতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেকে যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়া নব ভারত রচনায় আত্মনিয়োগ করিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

তখন হয়ে পড়েছে তার এক জন অতি শাঁসালো খরিদ্দার। সেই বছরই বিপিন কলেজ-ইউনিয়নের সাহিত্য সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হল। ভার পেল মাস মাস সাহিত্য সভা আর কমন-রুমের পত্র-পত্রিকা কেনবার। মনে পড়ল তার মঙ্গল বাবুর ষ্টলের কথা। এবার সে কিনবে সাময়িক পত্র, বই, অন্তত্র কিনবে মঙ্গল বাবুর ষ্টল হতে। দেখাবে মঙ্গল বাবুকে সে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ফাউ-পড়া খদ্দের নয়।

প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রের এক একখানা কপি মাস মাস কিনতে লাগল বিপিন গম্ভীর মুখে—দশ টাকা পাঁচ টাকার করকরে নোট মঙ্গল বাবুর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে। দু'-এক মাসের মধ্যেই বুঝলেন তিনি তার গুরুত্ব। খাতির করতে লাগলেন আপনা থেকেই। বন্ধুত্বও পরে দানা বাঁধল এই কেনা-বেচার পথে। যদিও মঙ্গল বাবুর বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহ বেশী ছিল বিপিনেরই।

মঙ্গল বাবুর ষ্টলে হ'ল তার অবাধ আধিপত্য। ষ্টলের পাশে লোহার চেয়ারটায় বসে বিকালে ছুটীর পর পেটুক ছেলের মত বিপিন গিলে চলে যত রাজ্যের মাসিক, সাপ্তাহিক, ছ' পেন্সএর পেঙ্গুইন সিরিজ, ডিটেকৃটিভ বই···। মঙ্গল বাবু এখন আর আপত্তি করেন না। বরং নতুন বইয়ের প্যাক খুলে আগেই তাকে একখানা এগিয়ে দেন। ঘনিষ্ঠতা জমে গেছে ঘন। এক-আধ ঘণ্টার জন্য বাড়ী ঘুরে আসবার প্রয়োজন হলে, বিপিনের হাতে দোকানের ভার দিয়ে যান মঙ্গল বাবু।

কলেজ ছাড়বার পর বিহারে চাকরী নিয়েও বন্ধুত্বের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি তাদের। যাতায়াতের পথে এই ষ্টেশনেই মঙ্গল বাবুরই ছিল তার এখানকার প্রথম ও শেষ স্নিগ্ধ হাসিমুখর বন্ধু-মুখ।

কুলিটিকে ভাগিয়ে দিয়ে বিপিন ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল ষ্টলটা। একটা নতুন মুখ দেখতে পেল সেখানে। ঢিলে পাজামা, কালো কোট গায়ে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে ষ্টলের মাঝে, যেখানে মঙ্গল বাবুকে দেখা যেত। দোকানটা তা হলে হাত-বদল হয়েছে। সুটকেশ আর বিছানা মঙ্গল বাবুর ষ্টলে রেখে নির্ঝঞ্চাটে অন্তবারের মত সে আর বাড়ী যেতে পারবে না। ডাকতে হবে একটা ছ্যাকরা গাড়ী। অন্তবার সে এখানে রেখে যেত সুটকেশ আর বিছানা। তার পর ওদের বুড়ো চাকর সংনামী এসে নিয়ে যেত।

ঘড়ির পকেট থেকে টিকিটটা বার করল বিপিন। সুটকেশ আর বিছানাটা তুলে নিল হাতে।

ষ্টেশনের লম্বা টিনের সেডের এক পাশে ঘেরা জায়গাটা যাত্রীদের কামরা। আর এক পাশে ষ্টেশন-মাষ্টার, মাল-বাবু, বুকিং-ক্লার্ক ও গার্ডদের অপিস। মাঝে সদর গেট, টিনের পাতের সঙ্করমান কবাট লাগানো। তার একখানা বন্ধ করে আর একখানা ঈষৎ উন্মুক্ত করে অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন টিকিট-কালেকটর মহিম বাবু। সেখানে আজ আর মহিম বাবুকে দেখতে পেল না। 'অপট' করে হিন্দুস্থানে চলে গেছেন নিশ্চয়ই। তার জায়গায় এক জন নতুন লোক দাঁড়িয়ে। মুখে চাপদাড়ী। পশ্চিমা বলে মনে হল। তার হাতে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে রেলিং-এর বাইরে এসেই বিপিনের চোখে পড়ল, খাকির ফুল প্যান্ট, বুশ সার্ট পরনে, হাতে ছোট ছড়ি, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক তাকে লক্ষ্য করছে।

আমেদ না? চিনতে পারল বিপিন।

হ,—বিপিন নাহি? একেবারে বদলে গিছিস দেহি। জিজ্ঞাসা করে আমেদ। আমেদের কথাবার্ত্তায় একটা ভারিক্কি চাল। উঁচু-উঁচু ভাব।

মিলিটারী পরিছিস ক্যান রে?

ন্যাশনাল গার্ডের সালারে হইছি যে!

ওঃ, তাই ক। তা, এহানে দাঁড়ায়ে কি এরিস্?

আমেদ মাতব্বরি চালে বললে: তা বোঝবা না তুমি।

পরে অবশ্য বুঝেছিল তাদের মত ছেলেদের আসা-যাওয়ার উপর নজর রাখার জন্যই তার ওখানে অবস্থিতি। আমেদ আর ইব্রাহিম দু'ভাই স্কুলে একসঙ্গে বিপিনের সঙ্গে পড়ত। ছিল পিছনের বেঞ্চে বসে নরক গুলজার করবার সাথী।

ইব্রাহিম কি এরতিছে রে?

চাকরি পাইছে সিভিল সাপ্লাইতি।

পথের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিপিন। প্রবহমান যাত্রীদের বাক্স-প্যাটরার খোঁচা লাগছিল তার গায়ে। সে আর দাঁড়ালো না সেখানে। এগিয়ে গেল রিকসা আর ঘোড়া-গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।

আচ্ছা পরে দেখা হবে।

ষ্টেশনের শেডের বাইরে আসতেই তার কানে ভেসে এল সাইকেল-রিকসা-বাহিনীর সমবেত চিৎকার: রূপসো, রূপসো—

ষ্টেশনের নিচেই গোল বৃত্তাকার পিচের রাস্তা। মাঝখানের বৃত্তাকার জায়গাটাতে সাইকেল, রিকসা আর ঘোড়া-গাড়ীর ভীড়। অনেকগুলি রিকসা বৃত্তাকার পথের বাঁ হাতে সহরে যাবার রাস্তার ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা বিপিনের চোখে পড়ল বাঁ-হাতি রাস্তার পাশে হিন্দু হোটেলের গায়ে প্রকাণ্ড একটা দেওয়াল-বিজ্ঞাপন। সুগন্ধি তেলের শিশি হাতে নারীমূর্তি।

এ বিজ্ঞাপনটা করে লাগালো। আগে ত দেখিনি!

রূপসো, রূপসো। সাইকেলের বেল বাজিয়ে হেঁকে চলেছে রিকসা-ওয়ালারা। সহরের দক্ষিণে রূপসার খেয়া-ঘাট। মাইল দেড়েকের পথ। আট আনা ভাড়া। ফেরী ষ্টীমারের অনেক আগে গিয়ে ধরিয়ে দিতে পারবে রূপসার ওপারের ট্রেণ। রূপসার যাত্রী পেলে আর সহরের যাত্রী তুলবে না। সহরের ভাড়া যে অনেক কম। তা ছাড়া রূপসার যাত্রীদের মত তাদের তাড়া নেই ট্রেণ ধরবার। কবুল করে না বেশী ভাড়া। বরং উল্টে আরও দর-দস্তর করে, চোট-পাট করে ভাড়া যেতে রাজী না হলে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় ঘোড়া-গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডে ধলা আর মাধুদের গাড়ী খুঁজতে লাগল বিপিন।

কই, ধলা বা মাধু, কারও গাড়ী ত সে দেখতে পাচ্ছে না কৃষ্ণচূড়ার তলায়।

এগিয়ে এল করিমুদ্দি। বুড়ো হয়ে গেছে। বাঁকানো, পাকানো শরীর। এখনও ছাড়েনি গাড়ী চালানো? বিপিন ভাবতে লাগল আশ্চর্য্য হয়ে।

গাড়ী চাই বাবু?

মাধুর গাড়ী কোহানে কতি পার?

মাধু গাড়ী বেচে হিন্দুস্থানে চলে গেছে। বনগাঁয়।

করিমুদ্দি তার জিনিষ-পত্র তুলে নিল গাড়ীতে। বিপিন আপত্তি

করল না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। করিমুদ্দি কোচবক্সে উঠে লাগামটা টেনে নিয়ে আছাড় মারলে ঘোড়াগুলির পিঠে।

হেট হেট।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে গাড়ীটা চলতে সুরু করল।

মাধুরাও চলে গেছে। অস্ফুট স্বরে কথাগুলি বেরিয়ে পড়ল তার মুখ দিয়ে।

ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান হিসাবে ধলা আর মাধু দুই ভাই এ সহরে বিখ্যাত।

ছোটবেলায় ধলা আর মাধু সম্বন্ধে নানা রকমের রোমাঞ্চকর কাহিনী সে শুনত। ধলা আর মাধু অন্য গাড়োয়ানদের মত পশ্চিমা নয়, বাঙ্গালী। সহরে যে কয়খানা ঘোড়া-গাড়ী ছিল তার মধ্যে ধলা আর মাধুদের গাড়ী আর ঘোড়াই সব চেয়ে বেশী জাঁকালো। উঃ, কে তেজী ঘোড়া! বিপিনের মনে পড়ে, চকচকে নতুন কেনা গাড়ীতে জোড়া ধলার সাদা রংএর ঘোড়াটা যখন টগবগ করে হাওয়ার বেগে গাড়ীখানা উড়িয়ে নিয়ে চলত খোয়ার দাঁতবার-করা রাস্তার উপর দিয়ে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসে সে ভীড় করত রাস্তায়। ছেলেদের সরে যাবার জন্য পায়ের নিচের ঘণ্টা বাজাত ধলা অনবরতঃ ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং! তখনও সহরে পিচের রাস্তা [illegible] পুরো উঁচু। [illegible] রোজ সকালে চলে যেত গাড়ী যখন ষ্টেশনের দিকে রেলের শব্দে পড়া ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ত বিপিন আর তার জ্যাঠতুত ভাই নিতাই চৌরাস্তার মোড়ে।

ধলার গাড়ী যাচ্ছে।

চার ফুটের উপর উঁচু ঘোড়াটা। গায়ের ছাঁটা রোঁয়াগুলি ব্রুশ দিয়ে ঘষা-মাজা। মখমলের মত চিকণ মসৃণ। মাংসপেশীর শক্ত বাঁধনে সুদৃশ্য আঁটসাট দেহ। দৃপ্ত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে রাস্তা কাঁপিয়ে।

'জানিস, যুদ্ধের ঘোড়া। খারাপ হয়েছিল, ধলা নিলামে কিনে এনেছে।' ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলত নিতাই।

এ খবরটা নিতাই কোথায় পেল বিপিন তা জানে না। ঘোড়াটা যে করিমুদ্দি বা লক্ষ্মণ সিংএর হাড়গোড় বার-করা হ্যাংলা অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রাণী নয়, তার কাছে স্পষ্ট হবার কারণ, কিছু দিন পূর্ব্বে সহরে মিলিটারীর আগমন।

১৯৩৪-৩৫ সাল। সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদ করতে এন্ডারসন জেলায় জেলায় সৈন্যের ছাউনী ফেলেছেন। এক দল এসেছিল বিপিনদের ছোট সহরেও। যেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলে সেই সার্কিট হাউসের মাঠে তারা তাঁবু ফেলে। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকটা কুলীন জাতের ঘোড়া এক দিন সহরে টহল দেবার সময় সেগুলি নিতায়ের চোখে পড়ে। প্রাণীগুলির মনোহর দেহকান্তি নিমেষে নিতায়ের মন হরণ করে। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে সে বিপিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেখ, ঘোড়া দেখ একখানা!

ধলার ঘোড়ার সঙ্গে মিলিটারীর ঘোড়ার কৌলিন্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে তার দেরী হয়নি।

ধলার গাড়ীতে ছিল একটা ঘোড়া। মাধুর দু'টো। এ দু'টি অভিজাত টাটু। করিমুদ্দি বা লক্ষ্মণ সিংহের দেশজ প্রাণীগুলির সঙ্গে সহজেই পার্থক্য ধরা পড়ত চোখে।

ধলা আর মাধুর সম্বন্ধে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর খবর হল, ওরা না কি আসলে গাড়োয়ানই নয়। শাপভ্রষ্ট হয়ে গাড়োয়ানী করছে শুধু। না হলে অমন দামী চকচকে গাড়ী, আর তেজীয়ান ঘোড়া কিনবে কি করে? ফিসফিসানিতে শোনা যেত সহরের এক জন ধনাঢ্য জমিদারের নাম! ওদের মা ছিল তার রক্ষিতা।

'আরে, এ জান না, আসলে কান্তি রায়, আর ধলা মাধু ত সৎভাই!' এই মুক্ত গোপন তথ্যটি সকলে সত্য বলেই যেন ধরে নিয়েছে।

ঘোড়া-গাড়ী রাস্তায় বার হলেই ছোট ছেলেরা, যারা একটু বেশী দুঃসাহসী তারা গাড়ীর পিছনে ছুটবে। ছুটতে ছুটতে গাড়ীর সমগতিতে এসে এক সময় বুক পেতে জড়িয়ে ঝুলতে থাকবে সহিসের দাঁড়াবার জায়গাটা ধরে। তার পর আশ্চর্য্য কৌশলে পাশ ফিরে উঠে বসবে জায়গাটায়। এই ভাবে চলে তাদের বিনামূল্যে গাড়ী চড়ার আনন্দ। গাড়ী খালি থাকলে কোচোয়ান বুঝতে পারে। সপাং করে কষে দেয় পিছনে চাবুক। চাবুকটা হয়ত গায়ে লাগে না! কিন্তু ভয় পেয়ে ছেলেরা ছেড়ে দেয়। চলন্ত গাড়ী ছেড়ে দিয়ে কেউ-বা হুমড়ি খেয়ে পড়েও যায় রাস্তায়!

ধলার আর মাধুর একটা গুণ ছিল তারা পিছনে চাবুক মারে না, বলে দিলেও না। পিছনে বসা ছেলে দেখলে অনেক দুষ্টবুদ্ধি ছেলের ধর্ম্মবুদ্ধি জেগে ওঠে। চেঁচিয়ে সচেতন করে দেয় গাড়োয়ানকে:

পিছনে চাবুক, পিছনে চাবুক!

ধলা আর মাধু তাতে সাড়া দিত না। বিনামূল্যে গাড়ী চড়া শিশু-মহলে ধলা মাধুর ছিল তাই দুর্লভ সুযশ।

মাধুদা, ষ্টেশনে নিয়ে যাবে?

ওঠ। রাশ টেনে গাড়ীর গতি মন্থর করে রাজকীয় ভঙ্গীতে বলত মাধু।

বিপিনের চমক ভাঙ্গল করিমুদ্দির হাঁকে: সব চলে যাচ্ছে বাবু। ছোট বেলা থেহে দেখতিছি আপনাগো, বড় দুঃখ্যু হয় আপনাগো যাতি দেহে···

আমাদের বাড়ী ত সকলে আছে। আমরা ত যাইনি। বিপিন বলল।

আপনাগো কথা কচ্ছি নে। আপনি ত আজ কত কাল দেশছাড়া। কচ্ছি যারা যাচ্ছে, তাগো কথা। এই মাধুরে কতো কলাম, যাইস নে। তা শোনলো না। আচ্ছা বাবু, এমন অবস্থা আর ক'দিন চলবে।

এই সব ওলট-পালট ব্যাপার দেখে করিমুদ্দি হয়ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছে না কোথায় কি অনর্থ ঘটেছে। কেন ঘটেছে। বিপিন চুপ করে রইল। কথা বাড়িয়ে ওর সান্ত্বনা নষ্ট করে লাভ কি? করিমুদ্দি বলে চলল: মারা গেলাম বাবু আমরা। সারা দিনির মধ্যি একটা ভাড়া মেলে না। চড়বে কেডা গাড়ী, সব ত চলে যাচ্ছেন আপনারা। মাধুরই বা কি দোষ দিই। ভাড়া-পত্তর নেই। এহানে মানবি খাহে ক্যামবায়? ভাবিলাম রিক্সো চালাবো। তা রিকসোআলাগোও ঐ দশা। সারা দিনি মালেকের টাহা ওঠে না।

ছোট সহর। পুরানো অধিবাসীরা সকলের চেনা। বিপিনরা

ত সহরের আদিবাসী বললেও চলে। বিপিন জিজ্ঞাসা করল: ধলা কোথানে?

ধলা ত আগেই ভাগিছে!

যেতে যেতে বিপিন লক্ষ্য করল, ষ্টেশনের রাস্তার দু'পাশে নতুন চালা-ঘর উঠেছে। পথের দু'ধারে পাকা ড্রেনের উপর বাঁশের মাচা গড়ে তার উপর চালা তোলা হয়েছে। হোগলা ও চাঁচের তৈরী ছোট-ছোট খুপরি। খুপরিতে ছোট-ছোট দোকান। বেশীর ভাগই পান-বিড়ি আর ফুলুরীর পেঁয়াজীর। দু'-একটা চায়ের দোকানও লক্ষ্য করলে। সামনে টিনের তোলা-উনুনে কেটলিতে জল ফুটছে। দু'টিন সিগারেট, এক ডজন ম্যাচবাক্স, সামনের দড়িতে টাঙান এক ছড়া কালো দাগ-ধরা কলা, কোলের উপর বিড়ির কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে নবাগত দোকানী। নোংরা অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছে রাস্তাটা। অথচ আগে কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছিল এ রাস্তাগুলি। বিকালে হাওয়া খেতে, বেড়াতে আসত লোকে এধারে। সহরের এক পাশে পড়ে ষ্টেশনটা। লোকের সদা-সর্ব্বদা যাতায়াতের পথে নয় জায়গাটা। এখানে দোকান ফেঁদে এরা কি আয় করবে বিপিন তা বুঝতে পারে না।

ষ্টেশনের এলেকা ছাড়িয়ে বাজারের রাস্তায় পড়ল গাড়ীটা। এখান থেকে মিউনিসপ্যাল এলেকা আরম্ভ হয়েছে। এখানে মোড়ের মাথায় বট গাছটার নিচে গোবিন্দ ঘোষের 'গাড়ীর দোকান'। কেরোসিন কাঠের তৈরী এই সচল 'গাড়ীর দোকানটা' কবে কোন কালে গোবিন্দ ঘোষের ছিল। গোবিন্দ সহরে প্রথম ঘোড়া-গাড়ী আনায়। পাঁচ-ছ'খানা গাড়ী ছিল তার। দোকানের গায়েই রাস্তার পাশে শান-বাঁধানো ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে থাকত যাত্রীর অপেক্ষায়। পান-বিড়ির দোকানের খদ্দের সামলেও গোবিন্দ নজর রাখত, কোন কোচোয়ান কখন গাড়ী নিয়ে বার হল। তার পর গোবিন্দ ঘোষের গাড়ী একে একে সব অদৃশ্য হয়েছে সহরের রাস্তা থেকে। গোবিন্দ ঘোষ গাড়ীর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তার খোঁজ রাখে না। দোকানটা হাত-বদল হয়েছে। কিন্তু তবু দোকানটার নাম রয়ে গেছে গোবিন্দ ঘোষের দোকান। বিপিন লক্ষ্য করলে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করছে।

বেলা হয়েছে বেশ। বারোটা বাজে। ট্রেণটা লেট করেছে অনেক।

করিমুদ্দিনের গাড়ীখানা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে চলেছে একটানা। রাস্তায় লোক-চলাচল কম। সদর রোডের সোজা রাস্তাটা সরল রেখায় দূরে মিলিয়ে গেছে ষ্টেশন এলেকার পাশ দিয়ে। রাস্তার নিচে রেলওয়ে কলোনীর খেলার মাঠটায় কয়েকটা সাদা বক আর যুথভ্রষ্ট গরু আসন্ন দুপুরের মৃদু রোদে ঝিমাচ্ছে। মাঠের পাশের ছোট জলাটায় লাল শালুকের কুঁড়িগুলি এখনও ফোটেনি। জলার পাড়ের কুল গাছটার দিকে দৃষ্টি পড়ল বিপিনের। এ হে, কুল গাছটা একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে যে। ডালগুলি শুকনো, পাতাগুলি তামাটে, ঝরে পড়বার পূর্ব্ব-লক্ষণ। স্কুলে পড়বার সময় টিফিনের সময় গাছটার উপর দৌরাত্ম্য করে কত দিন কুল খেয়েছে সে আর নিতাই। চ্যাদ্দা মেরে কুল পাড়তে নিতায়ের হাতের টিপ ছিল অব্যর্থ। দু'-চার ক্ষেপ জোরে চ্যাদ্দা মারলেই ঘুম ভেঙ্গে যেত রেলওয়ে হাসপাতালের উড়ে মালি রঘুরামের। গাছটা হাসপাতাল কম-পাউণ্ডের লাগোয়া, কাজেই তার উপর রঘুরামের অধিকার রয়েছে বই কি?

এই, চ্যাদ্দা মারুচি কৌন? মাড়ি কিড়ি পকাই দিব··· রঘুরাম তেড়ে আসবার আগেই নিতাই আর বিপিন দে ছুট।

স্কুল কমপাউণ্ডে এসে নিতাই বিপিনকে ধমকায়: অত জোরে চ্যাদ্দা মারতি বারণ করিলাম না? শুনলি নে ক্যান তখন! বা টের না পালি আরও কড়া পারা যাত!

মাত্র এক-পকেট কুলের ফসলে তার মন ওঠেনি। থরে-থরে লালচে হলদে কুলের গুচ্ছ তখনও তার চোখের সামনে ভাসছে।

কুল গাছটার দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। তেজালো রোদে খাঁ-খাঁ করছে খাবলা-ওঠা পিচ-ঢালা সদর রোড, রেল কম্পাউণ্ডের মাঠ, শিরিষ গাছের ছায়া-ঘেরা জলাটা।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। একটানা শব্দ উঠছে গাড়ীখানা থেকে। সদর রোডটা বাঁয়ে রেখে গাড়ীখানা এবার পড়ল শীতলাতলা রোডে। রাস্তার দু'ধারে একতলা বাড়ী। টিনের ঘর। খোলা জমি। মাঝে মাঝে দু'-একটা দু'তলা তিনতলা বাড়ী মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে নিচের একতলাগুলির উপর। বিপিনদের পাড়া সুরু হল এখান থেকে। নতুন সহর গড়ে উঠছিল। সমৃদ্ধ মধ্যবিত্তের বসতি। এ সহরের প্রতিটি বাড়ী বিপিনের চেনা, অর্দ্ধেক বাড়ী সে তৈরী হতে দেখেছে। অনেক বাড়ী তৈরী হবার ইতিহাসও সে জানে। এই জ্যোতিষ ডাক্তার। বিধবা শালীর টাকা ভেঙ্গে তৈরী করেছিল বাড়ীটা। শালীও তেমনি জাঁহাবাজ মেয়ে। ডিসপেনসারির পরদার আড়ালে বসে থাকত, জ্যোতিষের রোগী দেখবার সময়। রোগীরা চলে গেলে ছোঁ মেরে এসে দখল করত ক্যাশ-বাক্স। এত দিনে বোধ হয় উঠে গেছে তার টাকাটা। আর ঐ যে নারকেল গাছ ফোড়া ধর্ম্মনিধির বাড়ী। ও ত মটগেজ দেওয়া তিন জনের কাছে। উঁকি মেরে লক্ষ্য করতে লাগল বিপিন কোন বাড়ীর বারান্দায় কোন চেনা-মুখ দেখা যায় কি না। শীতলাতলার মোড় পেরিয়ে, কালী দত্তের বাড়ী পেরিয়ে, হরি সান্ন্যালের ডাইং ক্লিনিং বাঁয়ে রেখে, দেখা গেল বুলু মল্লিকদের বাড়ী। বুলু মল্লিকদের বাড়ীর পর রণুদের বাড়ী। তার পর দ্বিজপদ উকিলের দোতলায় ঝুল-বারান্দার জন্ত লোহার বরগা তিনখানা বেরিয়ে আছে। ঝুল-বারান্দা হব-হব করেও আর হয়নি। তার পর মুড়িওয়ালীদের কাঁচা খোড়ো ঘরগুলির সারি। আর একটু এগিয়েই সোনার চায়ের দোকান। দোকানে পরিচিত কাউকে লক্ষ্য করলে না। আশ্চর্য্য! কোন বাড়ীতেও কোন চেনা-মুখের সাক্ষাৎ নেই।···

হঠাৎ কখন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। তাদের বাড়ী এসে গেছে, বিপিন দেখতে পেল।

সামনের বারান্দায় দরজা-জানলাগুলি বন্ধ। বাড়ীখানা ঘিরে কেমন একটা থমথমে ভাব। আশঙ্কায় শিউরে উঠল বিপিন।

করিমুদ্দির প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে স্যুটকেশ আর বিছানা বারান্দায় তুলল। বাঁ দিকের দরজাটার কড়া ধরে আস্তে নাড়া দিল।

মা।

মনে পড়ল আগে তার আসবার খবর পেলে মা রাস্তার উপরকার ঐ বড় জানলাটার কাছে বসে থাকতেন সদর রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কড়া নাড়বার দরকার হত না। দূর থেকে দেখতে পেয়েই মা দরজা

খুলে দিতেন। আজকে কেউ মা বসে নেই ওখানে। হয়ত রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া দুপুরের ট্রেণে সে ত বড় আসে না।

দরজাটা খুলে দিল ছোট বোন প্রেমা। বিপিনকে সে ছল-ছল চোখে বলল: দাদা আর দু'দিন আগে আসলে না কেন?

ঘরটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বিপিন। ঘরের দু'খানা খাটের একখানাও নেই। এরই একটাতে সেজ বোন বিনি অসুখের সময় শুতেন। 'ওর বিছানা কি ছোট ঘরে করেছিস আজকাল?' জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল বিপিন। অকস্মাৎ প্রেমার চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোণ দিয়ে।

তাহ'লে কি—

পরশু দিন মারা গেছে। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ফেলল সে।

ছোট ঘরে মা শুয়েছিলেন। বিপিন প্রণাম করলে তাঁকে গিয়ে।

মা ছল-ছল চোখে বললেন: বেশী কাঁদা-কাটা করিস না। ছেলেটাকে বুঝতে দিইনি যে মা মারা গেছে। বুঝতে পারলে ঐ কচি ছেলেটাকে আর বাঁচানো যাবে না!

বিপিন চলে এল সে ঘর থেকে। মুগ্ধ হয়ে গেল মায়ের দৃঢ়তা দেখে। ভেবেছিল মা একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন। এই বোনটিকে মা অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অল্প বয়সে বিপিনদের বাবা মারা যান। সামান্য ক'টা লাইফ ইনসিওরের টাকা বড় মেয়েটির বিয়ের দেনাদারিক, ওঁর মৃত্যুকালীন অসুখের খরচেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। বাকী যেটুকু ছিল তা তার এক হিতৈষী ভাইপো ভেঙ্গে-চুরে সরে পড়েন। বিনির তখন বয়স এগারো বছর। বিপিনের বারো। বিপিন পড়ছে ইস্কুলে। বিনিকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল। একমাসি খারিজা তালুকের নায়েব-গোমস্তার ফাঁকি দেওয়া আয়ের সামান্য তলানি, আর বর্গা জমির করারী ধান এই সম্বল করে সত্যরে উপর সংসার চালিয়ে এসেছেন-জগময়ী টানা-হ্যাঁচড়া করে। বিপিনকে স্কুলে পড়িয়েছেন। দু'টো বছর কলেজের খরচও টেনেছেন! সেই দুঃখের দিনে সংসারের ভার মাথায় করেছিল মেয়েটা। টাকা-পয়সার অভাবে ভালো বিয়ে দিতে পারেননি। সামান্য মশলা-পাতির দোকান রতনের। লেখা-পড়া জানেই না। তার সঙ্গে বিনির মত মেয়েকে মানায় না। তবু দিতে হল। অথচ ওরই বড় বোনের বিয়ে দিয়ে গেছেন বিপিনের বাপ ধুমধাম করে। সেই যুদ্ধের আগের বাজারেই দু'-তিন হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। অবশ্য জগময়ীর গহনাগুলি সব অদৃশ্য হয়েছিল। তা হোক, মেয়েটা ত সুখী হক। যেমন ঘর তেমনি বর। তার কাছে রতন!

দিদির বর, দিদির বিয়ের আড়ম্বরের সঙ্গে বিনি মনে-মনে তুলনা করত বোধ হয়, নিজের উৎসবহীন গরীবানা বিয়ে। শ্বশুর-বাড়ীর দুঃখের সংসার। বিপিন বোঝে, বিয়ের রাত থেকেই কাল অসুখটা ঢোকে ওর শরীরে। অমাবস্যার অন্ধকারের মত বিনির মৌনস্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হু-হু করে উঠত বিপিনের মন। অপরাধী মনে হত নিজেকে বিপিনের!

তবু মাঝে-মাঝে বিপিনের মনে হত, বিনি বুঝি চেষ্টা করছে রতন বাবুদের অসংস্কৃত সংসারের মাঝে নিজেকে মানিয়ে নেবার। বুঝি ভুলে গেছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা···ভালো স্বামী, শ্বশুর-ঘরের যে স্বপ্ন বিনির মত সব মেয়েরাই দেখে থাকে···

ভেতরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারটায় অভিভূতের মত বসে পড়ল বিপিন। প্রেমা বলতে লাগল: এমনিই ত মনমরা বিয়ের পর থেকে, তার পর যে দিন থেকে লোক পালাতে লাগলো, ভয়ে কঁকিয়ে উঠল: আমরা কোথায় যাব? সবাই চলে যাচ্ছে···

মা ধমক দিতেন: তোর অত ভাবতে হবে না। খোকা যা হয় করবে আইসে।

হ্যাঁ, দাদার ভরসায় থাক তোমরা। দাদা একটা অপদার্থ। আমি চিনি।

বিপিনের মা চুপ করে থাকেন। বিয়ের পর থেকে বিপিনের উপর বিনির ক্ষোভের কারণ তিনি বোঝেন।

রতন বাবু অস্থির হয়ে হাঁক-পাক করেন: দোকান ত অচল। খদ্দেররা সব চলে যাচ্ছে। মাল-পত্তর পাওয়া যায় না। কারবার করব কি ছাই···

সেই যে শুকিয়ে যেতে লাগল সেজদি, কিছু হল না ডাক্তার-কবিরাজে। ডাক্তারেরা বলল টি বি। এখানে আর আমরা কিছু করতে পারব না।

অর্থহীন দৃষ্টিতে বিপিন লক্ষ্য করতে লাগল উঠানের ওপর দিকে তুলসী-তলাটা। তার বাবা, সেজ জেঠা মশায় মারা যাবার পর শবদেহ ওখানে রাখা হয়েছিল শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে। বিনিকেও বোধ হয় ওখানে রাখা হয়েছিল।

উঠানের উপর সুরেন বাবুর বাড়ীর বেল গাছটার ডালগুলি আবার প্রসারিত হয়ে পড়েছে। সারা উঠান ঝরা-পাতায় ছেয়ে গেছে। বিপিন বাড়ী থাকে না। কে আর ঝগড়া-ঝাঁটি করে কাটবে ডাল। মা শান্তিপ্রিয় মানুষ। সুরেন বাবুরা বড়লোক। মা এ নিয়ে তাই ঝগড়া-ঝাঁটিও করতে সাহস করেন না। পড়ছে পড়ুক। ঝাড় দিয়ে ফেলব আমি।

অকস্মাৎ বহু দিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে মৃদু হাসি এল বিপিনের মনে।

এক দিন বিপিনদের বাড়ীতে তার এক দূর-সম্পর্কের মেসো মশায় এসেছিলেন। তার ছিল ডাইরী লেখার বাতিক। মস্ত ডাইরীটা থাকত তার পাঞ্জাবীর পকেটে। এক দিন চুপি-চুপি বার করে সেটার পাতা উল্টাচ্ছিল বিপিন। ডাইরীর প্রথম দিকে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য, পোষ্টেজ-রেট, রেজিষ্ট্রী-রেট, ছুটির তালিকা, সাধারণ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, ফার্ষ্ট এড-নির্দেশ, সাধারণ আইনের টুকি-টাকি জ্ঞাতব্য বিষয়। আইনের পাতায় বিপিন এক জায়গায় পড়ল লেখা রয়েছে, প্রতিবেশীর বাড়ীর গাছের ডাল-পালা যদি কারও বাড়ীর সীমার মধ্যে প্রসারিত হয়ে আসে, আইনের আশ্রয় না নিয়ে অনায়াসেই তা কেটে দেওয়া যেতে পারে। তার পরদিনই বিপিন মহোৎসাহে একটা 'জন' ডেকে সুরেন বাবুর বেল গাছের ডাল সাফ করে দিল।

ডাল কাটতিছ যে বড়: সুরেন বাবু হা-হা করে তেড়ে এলেন।

বিপিন ভারিক্কি চালে বলে: আপনি কোর্ট করতি পারেন। সে নিশ্চিন্ত, আইনে সে অপরাধযোগ্য কোন কাজই করেনি।

আমায় বললি হত। আমি কাটায়ে দেতাম। গজ-গজ করতে থাকেন সুরেন বাবু।

বিপিনের হাসি পেল ঘটনাটা মনে পড়ে। সুরেন বাবুর দিকে তাকাল। দোতলার জানালাগুলি বন্ধ। কেউ নেই হয়ত।

বিপিনকে ও-বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রেমা বলল: ওরা সব হাওড়া গেছে। বাসা পেয়েছে। শুধু বুড়ো-বুড়ী পড়ে আছে···বাড়ী বেচতে পারলে ওরাও চলে যাবে।

প্রতিবেশী হিসাবে সুরেন বাবুদের সঙ্গে ওদের কোন দিনই সখ্যতা ছিল না। সীমানা নিয়ে মামলাও হয়েছিল। কিন্তু তবু আজ ওদের দেশ-ত্যাগের সম্ভাবনায় কেন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠল বিপিনের মন।

বসু-ভিলার রণুরা আছে?

ওরা ত চলে গেল আর মাসেই।

বুলু মল্লিকরা?

বাড়ী বেচে দিয়েছে ওরা। ওর দাদা না কি বহরমপুরে মোক্তারি করবে।

শান্তিধামের মিত্ররা?

ওরা যায়নি এখনও। বিষয়-সম্পত্তির একটা বিলি করতে পারছে না—

শ্যামলরা?

ওর কাকা হিন্দুস্থান লিভারে। বদলি করিয়েছে ওর কাকাকে খড়গপুর।

পরিচিত প্রতিবেশী জনের ছবি একে-একে ভেসে উঠতে থাকে মনে। মোনা, রণু, মিত্ররা, বুলু মল্লিক, শ্যামল, তার বাল্যের সাথী। জীবিকার টানে এক-এক দিকে ছিটকে পড়েছিল তারা এক-এক জন। তবু ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি পরস্পরের কাছ থেকে। লম্বা ছুটী-ছাটাতে জড় হত সবাই একত্র। চলত নতুন বইয়ের বিশ্লেষণ, ফুটবলের মাতন, স্বানার দোকানে সেই আগের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার হুল্লোড়। দূর প্রবাসের একঘেয়েমি উঠে গিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠত মন-প্রাণ। কি এক যাদু আছে যেন এই ছোট মফঃস্বল সহরের মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলা জীবনের। দূর থেকে তাকে হাতছানি দেয় দেশ। আমার দেশ, বাল্য-শৈশবের মিষ্টি-মধুর স্বপ্নে-ঘেরা আমার দেশ। সহস্র স্মৃতি-জড়ানো, হোক মলিন, হোক তুচ্ছ, তবু একে সে ভুলবে কি করে এক নিমেষে···

সুরেন বাবুর বাড়ীর বেল গাছটার নতুন চিকণ পাতাগুলির দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে বিপিন ভাবতে থাকে: কোথায় হবে তার স্বদেশ? কোথায় সে বাঁধবে তার ঘর। এক কলমের খোঁচায় তারা যাযাবরের সামিল হয়ে পড়েছে। দু'হাতে উপড়ে তার মত শত-সহস্র বিপিনদের সংসারের সহস্রমূল শেকড় আলাদা করে দিয়ে গেছে বহু যুগের পুরানো মাটির স্নেহ হতে। এ-মাটিতে নেই আর তাদের কোন অধিকার। কোথায় বাঁধবে সে ঘর? বিনি মরেছে তিলে-তিলে এই চিন্তায়, দুর্ভাবনায়। কোথায় বাঁধবে তারা ঘর? আরও কত বিপিন, কত বিনি এমনি ধারা চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে কে রাখে তার হিসাব? বাহির থেকে ঘুণ-ধরা বাঁশের মত মনে হয়, সবই ত ঠিক আছে। ভেতরে-ভেতরে কুরে খাচ্ছে বিনাশের কীট সংসারের মর্মমূল। মা, ছোট বোন প্রেমা, এমন কি ঐ বুড়ো চাকর সংনামী পর্যন্ত বুঝেছে তা। পায়ের নিচে নেই শক্তিদায়িনী মাটি—যে মাটিকে আপনার বলে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে পারে আদরে স্নেহে। শুকিয়ে যাচ্ছে সংসারের মর্মমূল। প্রথমে গেল বিনি। তার পর কার পালা কে জানে?

ও ঘর থেকে মা বললেন: আর বেলা করিস্ না বিপিন। পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়।

যন্ত্রচালিতের মত বিপিন উঠে পড়ল। টেনে নিল বারান্দায় বাঁশের আড়ায় টাঙ্গান গামছাটা। খিড়কির দিকে চলল স্বপ্নাবিষ্টের মত।

তেল মাখলে না দাদা: প্রেমা বলল।

ওঃ, ভুলে গেছি। লজ্জিত হয়ে বলল বিপিন।

পাঁচ রাস্তার মোড়ে গোকুলের দোকানে কয়েকটি অপরিচিত ছেলে ভিড় করেছিল। বিপিনকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে গোকুল চেঁচিয়ে ডাকল: আরে, বিপিন নাকি···

হ। থামল বিপিন।

কখন আলি?

এগারোটার ট্রেনে।

আজ মাঠে যাবেন। ক্রাউন ক্লাব ইনেস স্পোর্টিং-এর খেলা আছে যাবানে।

বিপিন আবার চলল এগিয়ে তার কাঁটা-ঘেরা মিউনিসিপ্যাল পুকুরের দিকে।

এখনও কি ক্রাউন ক্লাব আর ইউনিয়ন স্পোর্টিং নিয়ে তেমনি মাতামাতি আছে? ওই দু'টো ফুটবল টীমের মাঝে খেলার আগে সারা সহর যেন দু'টো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে যেত। দু'টোই এখানকার লীগের উপরের দিকের টীম। খেলার আগে সমর্থকদের চোখে ঘুম নেই। কাটে নিজ নিজ দলের যুদ্ধায়োজনের গোপন তথ্য সংগ্রহের কর্মব্যস্ত দিন। কলকাতা থেকে আসবে কে কে: হাফ-ব্যাক আর লেফট আউট বড় উইক। কাকে নাবানো হবে: বলাই মিস্ত্রি আর নন্দ সেন। ওরা এ-বয়সে খেলছে। ওদের আনা হলে প্রতিপক্ষ প্রোটেষ্ট করতে পারে কি না তা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনগত বিতর্কের ঝড় ওঠে স্বানার রেস্তোরাঁর চায়ের কাপের উপর। মুখর হয়ে ওঠে শুধু স্বানার রেস্তোরা নয়, কলেজের কমন রুম, লাটল ট্রেনের কামরা, রাস্তার মোড়ের জটলা, বার লাইব্রেরীতে জুনিয়ার উকিলের বৈঠক।

বিপিনদের ক্লাশেও দু'টো দল ছিল ছেলেদের মধ্যে। এক দল ক্রাউন ক্লাবের সমর্থক, আর এক দল ইউনিয়ান স্পোর্টিং-এর।

ক্লাশ বসবার আগে সমর্থকদের মধ্যে এক পশলা বাক্‌যুদ্ধ হয়ে যেত নিত্যই খেলার ক'দিন আগে থেকে।

ক্রাউন ক্লাব: হাঁক ছাড়ত উৎসাহী সমর্থক দল। অর্থাৎ জিতবে ক্রাউন ক্লাব।

ইনেস পোটিং: আর এক দল অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিত।

আমাদের আসতিছে, এরিয়ানের বলাই মিস্ত্রির, নন্দ সেন। সেন্টার ফরোয়ার্ডে জয়কালি। দেবে তিন গোল ঠুকে!

ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর সমর্থক সদর্পে ঘোষণা করত: আমাদের আছে মোহনবাগানের রবি ঘোষ, অস্ত···

এলেই হোল আর কি! হায়ার-করা প্লেয়ারে স্পোর্টিং প্রোটেষ্ট করবে না?

হায়ার-করা কি রকম? ওরা ত খেলত আগে ইনেসস্পোর্টিং-এ।

এই সব ওয়াকেবহাল মহলের গোপন তথ্য ছেলেরা কি ভাবে পেত ভেবে আশ্চর্য্য হত বিপিন।

বিপিন এ বিষয়ে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত্ত। সে ক্রাউন ক্লাব বা [illegible]উনিয়ন স্পোর্টিং কোন দলের হয়েই আগে থেকে চেঁচাত না ক্লাশে। [illegible] যে জিতবে তার ঠিক নেই। কোন দলের সঙ্গে নিজেকে এখন [illegible]ড়িয়ে ফেলে পরে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে মুখ কালি করে সে [illegible]সে থাকতে পারবে না ক্লাশে। সে বরং চেঁচানির যুদ্ধে এ সময় নেপথ্যে থাকত। তার পর মীমাংসার শেষে জয়োন্মত্ত দলের চেঁচামেচির উল্লাসে সে ভীড়ে পড়ত।

বলিলাম না, ক্রাউন ক্লাব জেতবে।

ঘাটে ক্রাউন ক্লাবের 'বস' সুধো ঘোষের সঙ্গে দেখা হল। [illegible] বেঁটে খাট লোকটি। কনট্রাক[illegible] করেন। খেলায় অদম্য [illegible]সাহ। কনট্রাক্টরীর কাজে সাই[illegible] সারা সহর চষে বেড়ান। [illegible] আগে সে সময় [illegible]বপক্ষের সমর্থকদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর [illegible]দের আয়োজনের। সাধারণ বিষণ্ণতা সুধো ঘোষের [illegible] আক্রমিত হয়েছে। বিপিন জিজ্ঞাসা করল: এবারও খেলা [illegible] হোতো কি…

[illegible] করে একসঙ্গে দু'-তিনটে ডুব দিয়ে, তোয়ালেখানা [illegible] কয়েক গায়ের উপর সশব্দে চালনা করে সুধো ঘোষ বললেন: [illegible] খেলা! কবে মাদুর-বিছানা গুটোতে হয় তার নেই ঠিক…
[illegible]লায় রাখতে হয় তাই হচ্ছে ত,বই। প্রাণ আছে না কি কারও [illegible]র। তুমি আইলে কবে? বিহারেই আছ ত?

হ্যাঁ।

সুধোদা'র সেই প্রাণখোলা আসর-মাতানো হাসি আর নেই [illegible]। নেই আর অনর্গল কথা বলার উৎসাহ। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কোচিত [illegible] এসেছেন তিনি। লুঙ্গিটা সামলে, সর্ব্বাঙ্গে জল টানতে টানতে [illegible] পড়লেন।

ইস্, কি শ্যাওলা জমেছে সিঁড়ির ধাপে-ধাপে। পা পিছলে [illegible] বিপিনের। পা টিপে-টিপে নাবতে লাগল সে। এই [illegible]পুরানো পরিচিত ঘাটেও পায়ের উপর তার বিশ্বাস নেই…

খাবার সময় মা বললেন: এখানে থাকা চলবে না আর। [illegible]রাই চলে যাচ্ছে। বাড়ী-ঘর যদি বিক্রী করা যায়, চেষ্টা দেখ।

লোভীর মত নারকেলের বড়াটা আপন মনে চিবোতে থাকে [illegible]পিন। নিজেদের গাছের নারকেল, আলো চালের খুদ, ব্যাসন। একেবারে বিনামূল্যে মা তৈরী করেন অমৃত। কি লোভ ছিল বড়াটির উপর ছোট-বেলায় বিপিনের। মনে হল এখনও যায়নি।

বিক্রি ত করতি চায় সহর শুদ্ধ সকলি। কেনবে কেডা?

ও-বাড়ীর যতীশ বলতিছিলো রেজা আলিরা নাহি খুব কেনা-কাটা করতিছে। সেই যে পুব-পাড়ার রেজা আলি, তোর সঙ্গে পড়ত।

যতীশ অর্থাৎ বিপিনের খুড়তুত ভাই।

রেজা আলিদের বেশ পয়সা-কড়ি হয়েছে আজ-কাল। কাকাদের সম্পত্তি পেয়েছে। তার উপর বিস্তর ধানী জমি। ধান-চালের চড়া দামে লাল হয়ে গেছে।

ওরা কি কেনবে?

না কেনে, বলে দেখ না। দু'খানা ত কিনিছে। কালী ডাক্তারের আর ভুবন সেনের। আমাদের এ-বাড়ীর কতই বা দাম হবে!

আচ্ছা; বলবানে।

দুপুরে একটু গড়িয়ে নেবার পর বিপিন মনে মনে ভাবতে লাগল কি করবে সে। দুঃস্বপ্নের মত সারা সহরের বুকে পরিবর্ত্তনটা চেপে বসে আছে। চলে যাবার জন্য মনে-মনে সকলেই প্রস্তুত। গেছেও অনেকে। যাবেও অনেকে। তারাই বা এখানে থাকবে কাদের ভরসায়? গত দু'বছরের বিভীষিকাময় ঘটনাগুলির কথা মনে পড়ল। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকবেই বা কিসের মায়ায়?

ঘরের কোণের ছোট টেবিলটার উপর দৃষ্টি পড়ল। তার পাশে টিনের চেয়ারটাও তেমনি আছে।

ওখানে বসে এই ত সেদিন সে রাত জেগে গায়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ম্যাট্রিকের পড়া তৈরী করেছে। শীতের কাঁপুনির মাঝে অতন্দ্র চোখে মুখস্থ করেছে কেমিষ্ট্রীর ফরমূলাগুলি। বিনি ধমক দিত। মা লণ্ঠনে তেল কম পুরতেন যাতে তাড়াতাড়ি নিবে যায় আলো।

অত রাত জেগে পড়তে হবে না। ঐ ত শরীর। বাঁচবি কি করে।

পুরানো বইগুলি টেবিলের উপর এখনও তেমনি সাজানো রয়েছে। ওর আর ভাই নেই যে পড়বে। তবু মা কাউকে দেননি বইগুলি। কি যে মমতা ও-গুলির প্রতি কে জানে! মুখ ফিরিয়ে নিল বিপিন। ডান দিকের জানলা দিয়ে উঠোনটা চোখে প[illegible] ত এখানে সেদিন ছাদনাতলা গড়া হয়েছিল দিদির বিয়ের। [illegible] অবশ্য অনেক আগেই মারা গেছে। তার পর বিনির বি[illegible] সরে তা-ও ওখানে। উঠানটা আগাগোড়া শান-বাঁধানো—একটা [illegible] শুধু কাঁচা। এ জায়গাটা বাবা পাকা করেননি। বিনির বাসি বিয়েতে কলা গাছ পোঁতা যাবে না। উঠানের অপর প্রান্তে ঐ নতুন রান্না-ঘরটা বাবা নিজে তদারক করে তৈরী করেছেন। রান্না ঘর সম্বন্ধে বাবার ক্ষ্যাপামির কথা মনে পড়ল। বিপিনদের কোঠা বাড়'টা অনেক দিনের পুরানো। কাঁচা গাঁথুনি। বেশী বৃষ্টি হলে ছাদের নলের গোড়ায় জল জমত। চুইয়ে চুইয়ে জলও ঝরত তখন ভিতরে। রান্না-ঘর তৈরী করার সময় বাবা এ জল-জমা বন্ধের পরিকল্পনা বার করলেন। এবার নল বসানো হবে না। তার বদলে ছাদের কার্নিশের নীচে ফুটো রাখা হবে। দেওয়াল বেয়ে জল ঝরবে। জল জমবে না নলের গোড়ায়। রসিক মিস্ত্রী বললে রেগে: বলেন কি বাবু! দেওয়াল বেয়ে দরজা-জানলা দিয়ে জল যাবে যে ঘরে। যা বলি তাই কর, কঠোর আদেশের স্বরে বললেন বাবা। রসিক গজ-গজ করতে করতে তাই করল। বর্ষায় রান্না-ঘরের মেঝে থৈ-থৈ করতে লাগল জলে। রসিক বিজয়-গর্ব্বে বলল: বলেছিলাম না। শেষে নলই বসানো হল। পুরানো দালানের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি ছিল না। রান্না-ঘরে কাঠের সিঁড়ি হল। বিপিনের আর আনন্দ দেখে কে? ছাদের কোণে লুকিয়ে বাবার বইয়ের বাক্সের নিষিদ্ধ বইগুলি পড়বার একটা নিরাপদ স্থান হল তার। বঙ্কিম, গিরিশ, মাইকেল, বাঁধানো বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে ঐ ছাদের কোণে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় বিপিনের। কতই বয়স তার। ক্লাশ সিক্সথ-এর ছেলে। সব বুঝত না ভাল করে, শুধু যেন নেশার ঝোঁকে গিলে চলত।

এ-বাড়ীর প্রতিটি ইট কাঠ, প্রতিটি গাছ-পালা, অঙ্গন-প্রাঙ্গণ এক-একটি ইতিহাস বহন করছে। এ যেন সজীব প্রাণবন্ত কোন আত্মজন। তারই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন জীবনেতিহাসের অচ্ছেদ্য

অঙ্গ। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিপিনের। বৃথা ভাবালুতা। জীবনের শ্লেটের এই হিজিবিজি আঁকা-বাঁকা টানগুলি মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করতে হবে তাকে। যেমন আর সকলে চেষ্টা করছে।

কলতলার উপরে নিম গাছের আড়ালে সূর্য্য আশ্রয় নিয়েছে। নিম গাছের সরু পাতাগুলির মাঝে ঝিলমিল করছে রোদ্দুর। কয়েকটা কাক তাক করে আছে কলতলার উচ্ছিষ্ট বাসনগুলির প্রতি।

বিপিন বিছানায় উঠে বসল। দুপুর দুটো। পশ্চিমে নিম গাছের আড়ালে সূর্য্যটা ঢাকা পড়লেই বোঝা যাবে দু'টো বেজে গেছে। দল বেঁধে রাজমিস্ত্রীরা কি এখনও ফিরছে তেমনি আগের মত টুটপাড়ার পথে?

সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল বিপিন। বসল গিয়ে বাড়ীর সামনের সিমেন্টের কালভার্টের উপর। বাড়ীখানার ছায়া পড়েছে কালভার্টের উপর। রাস্তার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গেছে ছায়াটা। খাঁ-খাঁ করছে রাস্তা। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির ক্যাঁ কলতলায় জড় হয়েছে উড়ে-মালিদের টিন, মুড়িওয়ালীদের কলসি, বালতি। উড়ে-মালিদের জটলা তখনও সুরু হয়নি [illegible]। ৪টায় জল আসবে কলে। সাড়ে তিনটার আগে [illegible]না তারা। জল আসলেই সুরু হবে কে আগে টিন পেতে রেখে গেছে, তার মীমাংসা নিয়ে এক পশলা ঝগড়া। কিন্তু চুণ আর সুরকি মেখে ধুলি-ধূসরিত দেহে রাজমিস্ত্রীর দল ফিরছে না ত এখন টুটপাড়ার পথে?

ক্লান্ত দুপুরে কত দিন বিপিন দেখেছে সহরের এই অলস ছবি। ভারী ভাল লাগে তার। আজ ত কোন মিস্ত্রিকে ফিরতে দেখছ না বিপিন—এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা পেয়ে বসল বিপিনকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল আকবরকে। পাঁচ মাথার মোড় থেকে সে যাচ্ছিল টুটপাড়ার দিকে।

বিপিন ডাকল আকবর, ও আকবর।

আকবর ফিরে দাঁড়াল।

কাজে যাওনি?

কাজ কোথায়? রাজমিস্ত্রী আমরা ত বিড়ি বাঁধতিছি। করাবে কে কাজ?

বিপিন ঘরে ফিরে এল। রোদটা এখনও বেশ চড়া। এখন বার হওয়া যাবে না। পাঁচটায় পর বার হবে। হ্যাঁ, রেজা আলির কাছেই সে যাবে একবার। পুরানো দিনের স্মৃতির মমতায় লাভ কি নিজেদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তায় ভরে রেখে? যদি সে পায় কোথায়ও নিরাপদ পোতাশ্রয়, কেন ফেলবে না সেখানে নোঙর। হিরুয়া, রঞ্জু, বুলু মল্লিকের সৌহৃদ্য, ক্রাউন ক্লাব-ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর উন্মাদনা, ধলা-মাধুর গাড়ী, রেলওয়ে কলোনীর কুল গাছের স্মৃতি, কলনাদিনী রূপসার রোদ-পড়া চিকচিকে ঢেউ মুছে যাক এ-সব তার জীবন থেকে। নূতন পরিবেশে আবার সে সুরু করবে নূতন হিরুয়া, রঞ্জু, বুলু মল্লিকদের নিয়ে।···হ্যাঁ। রেজা আলিরই শরণাগত হবে সে।

কাঁপতে থাকে বিপিনের বুক রেজা আলির বাড়ীর সামনে এসে। স্বপ্নাবিষ্টের মত উঠে পড়ে রেজা আলিদের সামনের বারান্দায়। হিরুয়া, রঞ্জু, বুলু মল্লিক, স্যানার দোকান, ক্রাউন ক্লাব-ইউনিয়ন স্পোর্টিং, বাবা, দিদি, বিনি, রূপসা, রেলওয়ে কলোনীর মাঠ, ধলা-মাধুর তেজী ঘোড়া—লুপ্ত হয়ে যাক তার জীবন থেকে। সে কঠিন হবে। হবে বস্তুতান্ত্রিক। ছেলেমানুষী এই ভাবালুতা। হে অজানা, হে অজ্ঞেয়, তোমার বন্ধুর পথে পা বাড়াল বিপিন। চলার পথে তুমি তাকে শক্তি দিও, শান্তি দিও, অমূল তরুর অসহায়তায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না মহাকালের ধ্বংস-স্তূপে।

রেজা আছিস্: কড়াটা আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল বিপিন।

দুপুরের ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে এল রেজা।

আরে বিপিন যে, কি মনে করে?

না, না, না! অকস্মাৎ মনের বাঁধন শক্ত করে ফেলল বিপিন। তার ধূলার স্বর্গ সে নিজ-হাতে ধ্বংস করবে না। এ তার দুর্লভ সম্পদ—কোন মূল্যে হবে না এর ক্ষতিপূরণ। মহাবিশ্বের আর কোন প্রান্তে গড়তে পারবে না সে এর বিকল্প।

স্বরে স্বাভাবিকতা টেনে বলল বিপিন: এই আসায় তোর সঙ্গে দেখা করতি—কেমন আছিস?

বস: একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল রেজা। নিজে বসল সামনেরটায়।

দুই সহপাঠীতে মাতল গল্পে।

বাড়ী বিক্রীর প্রস্তাব তুলল না বিপিন।

রাত্রে মা জিজ্ঞাসা করলেন: গিছলি রেজার কাছে?

হাঁ। ওরা কেনবে না।

২১

আজ যা হক একটা কিছু হয়ে যাবে। তাই যথেষ্ট লোক-সমাগম হয়েছে।

মেহেরপুরের বাঁকে একখানা প্রকাণ্ড কোষ নৌকা নোঙর-করা রয়েছে। সাত-সাত জন মাল্লা কোনও কাজ নেই, বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আজ যাই কাল যাই করে প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল, শুধু বনিবনাও হয় না—খরিদ্দার মেলে না, যাওয়াও হয় না। সেন মশাই মহা বিরক্ত হয়ে গেছেন। আজ যা হক একটা কাতার-কিনার করতেই হবে। খাজনা থেকে বাজনা এবার বেশী হয়ে গেল। তালুক বেচে যে টাকা পাবেন তা যদি মাঝি-মাল্লার জাঁক-জমকে খরচ হয়ে যায় তবে আর লাভ রইল কি! বড়লোকের বড় জ্বালা! তিনি মরে গেলেও কি কোষ নৌকা পেয়াদা-সিপাই না নিয়ে এ মহালে আসতে পারেন! তাঁদের পূর্বপুরুষরাও কি কেউ বিনা জাঁক-জমকে এখানে এসেছেন!

এক কালে এদিকের সমস্ত চকগুলিই তাঁদের ছিল। যেখানে নৌকা ভিড়েছে সেখানেই সহস্র হাতের সেলাম পেয়েছেন। কত ভেট-নজর খাসি পাঠা মদ ঘি মশলা যে প্রজারা নিয়ে এসেছে তার কথা ভাবলে আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়। যখন সমস্ত সরিকের তিনিই কমন-ম্যানেজার ছিলেন, তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। তিনি অসংযম ও ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন এ মুলুকে। এখনও তাঁর নাম শুনলে লোকে শিউরে ওঠে। নিঁখুত মেয়েমানুষ ব্যতীত তিনি ভুলেও কারুর কোন আর্জি মঞ্জুর করেছেন বলে তাঁর মনে নেই! দিনের মধ্যে তিনি তিন-তিনটা মেয়েমানুষও অদল-বদল করে চেখে দেখেছেন। ছেনে নিংড়ে ভোগ করে দেখেছেন স্ত্রী-দেহ! তিনি ছিলেন এ দেশের জমিদার—মূর্ত্তিমন্ত অভিশাপ! মদে মাগীতে চুর!

তাঁর পেশা ছিল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রজা-শাসন এবং হীন-বীর্য সরিক-লুণ্ঠন। হঠাৎ একটা মেয়েমানুষ খুন হয়—প্রতিবাদ করতে এসে গুম হয় তার পিতা। ভাইটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে নদীর জলে। একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ডাকিনী ডাকায়। মেয়েটা মুসলমানের হলেও হিন্দুরা সমবেত হয়। আসে পুলিশ—জোর দেয় মরা সরিকেরা। মামলা চলে—ঘোর মামলা! তিনি অতি কষ্টে বাঙ্গালী পুলিশ সাহেবকে বাধ্য করেন ইংরেজ রাজার লক্ষ্মী ছাপওয়ালা টাকার বকলোশ পরিয়ে। সাহেবটি প্রজা ও মনিবের মধ্যে পড়ে একটা নিরপেক্ষতার ভাণ করে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন সেন মশাইকে! প্রাণে বাঁচলেও তাঁকে যে কস্তু রৌভৈরব করতে হয়েছিল তার ঠেলায় এ গেরদের জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে। দু'-একটা তালুক-মুলুকও যায় সেই ধাক্কায়। প্রজারা তাঁকে এখনও মহারাজ বলেই ডাকে!

কিন্তু তাঁর হাসি পায়। তিনি কি সেনবংশীয় শেষ রাজাধি-রাজ? রাজ্য গেছে কিন্তু খেতাবটা এখনও দাঁত বের করে হাসছে! মেয়েটার নাম ছিল মরিয়ম। মরিয়ম মরেছে, কিন্তু মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে ডাকিনী ডাকার বর্বর উদ্ধত অত্যাচারের।

সন্ধ্যা অতীত। কোষ নৌকার বড় কামরায় একটা ডে-লাইট জ্বলছে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল—তার দু'পাশে দু'খানা চেয়ার, সুমুখে একটা বেঞ্চ—বেঞ্চটার ঠিক বিপরীত দিকে একখানা আরাম-কেদারায় স্বয়ং সেন মশাই উপবিষ্ট। তিনি অম্বুরী তামাক টানছেন। সুগন্ধে কামরাটা ভরে গেছে। কামরাটার গায় বড় বড় ফ্রেমে আঁটা অনেকগুলি বিলাতি ছবি। তার মধ্যে অর্দ্ধনগ্ন নারী, উলংগ নর্ত্তকীর মূর্ত্তিই বেশী। সেগুলির অযত্নে রং নষ্ট হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। সব চেয়ে যেখানা সুন্দরী রমণীর চিত্র, সেখানাই বড় বেমানান দেখাচ্ছে—বুড়ো সেন মশাইর মত অনেক কিছুই গেছে যেন গড়িয়ে তার দেহের ওপর দিয়ে, তবু কাল তাকে ক্ষমা করেনি। তার অব্যর্থ সন্ধানে রমণী নেত্রহীনা।

এগুলি সেন মশাই ও তাঁর স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। যৌবনের প্রমোদ-তরী, অদৃষ্টের পরিহাসে আজ বার্দ্ধক্যের বিক্রয়-বিপণীতে পরিণত হয়েছে।

ঘোষালেরা তিন ভাই, এস্তেজদ্দিরা পিতা-পুত্রে এবং সদল বলে বিপ্রপদ এসেছেন। দীনুও এসেছে। কিন্তু সে একটু দূরে সরে বসেছে—ঠিক কোন্ দলের বোঝা যায় না। সে একটু একটু হাসছে। এ হাসির অর্থ যে তার মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে। বাঘে-মোষে লড়াই বেধেছে!

বিপ্রপদ ভাবছেন: দীনুদা তাঁর স্বপক্ষে থেকে বিপক্ষকে কটাক্ষ করছে—আর ঘোষালেরা ভাবছে ঠিক তার উল্টো। এস্তেজদ্দি ভাবছে যে তার কাছ থেকে যে টাকা পাঁচটা কর্জ নিয়ে দীনু মুদী-দোকান ফেঁদেছে, এ হাসি সেই টাকারই সুদের হাসি। রূপোর মতই শাণিত কিন্তু বক্র তার অর্থ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তামাক টেনে টেনে সেন মশাই বলেন, 'কত কথাই তো হলো—কিন্তু কেউ তো টাকার কথা বলছেন না? লজ্জা করলে যে যার আমাকে গোপনেও বলতে পারেন। আমি কারুরটা কেউকে বলব না।'

ঘোষালেরা যেখানে বসেছে ঠিক তার পাশেই একটা কামরা—একটা পর্দার অন্তরালে একটি মহিলা উপবিষ্টা। সে খোপেও একটা বাতি জ্বলছে। বাতির আলো উজ্জ্বল, শতোধিক উজ্জ্বল তাঁর তপ্ত গৌর কান্তি। মুখে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। তিনি দু'টি সরিকের অভিভাবিকা। বললেন, 'আপনি একটা দর চাইলে তো খরিদ্দারেরা

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

যা-হক একটা কিছু বলবেন। না আপনি তো আমার সুমুখে খোলসা করতে চাইছেন না? তাই গোপন এবং গড়িমসি।'

'সে কি, সে কি কথা বোঠান—এ সব বলছেন কি! আমি কি নাবালক ভাইদের ঠকাব না কি? আমার টাকা কে খাবে? ওরা ছাড়া আমার কে আছে?'

'থাকা না থাকার কথা হচ্ছে না—এখন একটা টাকার অংক বলুন, আমিও শুনি, যাঁরা এসেছেন তারাও জানুন, তা না হলে মাথা-মুণ্ড কি বলবে।'

দীনু বলে, 'মহারাজের থৈই ধরিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে বোঝা-বুঝি হবে কি নিয়ে?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে এস্তেজদ্দি একটু হাসে।

দীনু আবার বলে, 'এঁরা সব তীরন্দাজ—লক্ষ্যটা তো এঁদের সুমুখে উপস্থিত করবেন! মহারাজ, রাজধর্ম্মে ভুল করছেন কেন? এ-ও তো একটা স্বয়ম্বর সভা।' দীনু হাসে।

সেন মশাই নীরবে সে হাসির অর্থ গ্রহণ করেন।

'তালুকটা একটা জমিদারীর সামিল—এর দাম কম পক্ষে বার হাজার টাকা। সেই বার হাজার টাকা না পেলে আমাদের বিক্রি করায় কোন লাভই থাকে না। ওর কমে আমরা হস্তান্তর করবও না।'

এস্তেজদ্দি কঞ্জুষ প্রকৃতির লোক। দামটা শুনে বলে ওঠে, 'ছোবান আল্লা,—আমার গো কম্ম না তালুক কেনা।' সে তৈল-সিক্ত টুপীটা খুলে ফুঁ দিয়ে আবার মাথায় পরে।

ব্যস্ত হয়ে দীনু বলে, 'কেন, কেন বার হাজার চাইলেই কি বার হাজার দিতে হবে? চাওয়া আর দেওয়া এক কথা নয় তালুকদার সাহেব। অস্থির হয়ে কি সওদা করা যায়?'

ঘোষালেরা বার হাজার তো দূরের কথা বার আনায় পেলেও আর এজমালীতে কোনও সম্পত্তি খরিদ করবে না। তারা খরিদ্দারের ছদ্মবেশে এসেছে বিপ্রপদর ক্রয়ে বিঘ্ন জন্মাতে। এস্তেজদ্দি বাস্তবিক বিপ্রপদর প্রতিযোগী। সে উঠে যায় দেখে, তারা তিন ভাই ধরে বসায়। অবশ্য এর মধ্যে দীনুরও ইসারা আছে।

সে বলে, 'মহারাজ, আপনি যদি নামমাত্র মূল্যে বিপ্রপদকে দিয়ে যান তবে ভায়া রাখতে পারে। না হলে ওর পক্ষে অসম্ভব। কারণ এর পরেও যথেষ্ট অর্থব্যয় আছে হাতী পুষতে।'

দ্বিতীয় কামরা থেকে তীব্র স্বরে মন্তব্য হয়, 'তার চেয়ে দান করাই ভাল। হাতী দান ঘোড়া দান তো রীতিই রয়েছে হিন্দুদের।'

'বিপ্রপদ যে কায়স্থ, মহারাণী? দান গ্রহণ করবে কে?'

'তবে ঘোষালদের জিজ্ঞাসা করুন—তাঁরা তো ব্রাহ্মণ। লাখ টাকায়ও ব্রাহ্মণ না কি ভিখারী!'

'বৌঠান, এ সব ব্যংগে লাভ কি! সকলে শুনুন—আমি যা চাই না কেন, আপনারা কি দিতে পারবেন একে একে বলুন, বিপ্রপদ বাবু?'

বিপ্রপদর হ'য়ে ইসমাইল মিঞা বলে, 'পাঁচ হাজার।'

এস্তেজদ্দির জিদ হয়, সে দাঁড়িয়ে বলে, 'ছ' হাজার।'

ইসমাইল মিঞা বলে, 'সাড়ে ছ হাজার বাবু দেবে ওগ্যা।'

এস্তেজদ্দির ছেলেটা রুখে উঠে বলে, 'সাত হাজার দেবে বা'জান সুপারি বেইচ্যা।'

ইসমাইল মিঞা জবাবে ডাক আরও চড়ায়। 'জেদের ভাত কুত্তায় খায়—দিমু সাড়ে সাত হাজার, দিমু আট হাজার, দেহি কেডা রাখতে পারে। আমরা কি মরইয়া গেছি না কি?'

এস্তেজদ্দি চুপ করে থাকে। তার ছেলেই সকলকে স্তম্ভিত করে বলে, 'দিমু দশ হাজার, দিমু পোনর হাজার—যা লাগে হান্ডা খাতা বেইচ্যা দিমু। হইছে কি? কেনতে আইছি কিনইয়া যামু।'

ঘোষালেরা হাসতে থাকে। দীনুও পা নাচাতে নাচাতে মুখ টিপে হাসে। বিপ্রপদ হাসেনও না কিছু বলেনও না। তাঁর বুকটা ঢিব-ঢিব করছে।

সেন মশাই একটু স্মিতমুখে বলেন, 'আহা উত্তেজিত হয়ে লাভ কি? সেই বার হাজার দিতে রাজী আছ এস্তেজদ্দি? চৌদ্দ পনর হাজার বাত্‌কে বাত্‌ কথা।'

ঘোষালেরা বলে, 'রাজী আবার না? নিশ্চয় রাজী আছে।'

'তা হলে এখনই বায়না-পত্তর করো। কি ঘোষাল মশাইরা, আপনাদের কি কোনও আপত্তি আছে? বিপ্রপদ বাবু আপনার?'

ঘোষালেরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে, 'না না, কিছু না। এস্তেজদ্দি রাখাও যা আমরা রাখাও তাই। ও বুদ্ধিমান, পয়সা-ওয়ালা বন্ধু লোক, ওর সঙ্গে যাবো একটা সামান্য তালুক নিয়ে ডাকাডাকি করতে! আমাদের তো কত রয়েছে, ওর সখ হয়েছে, ও রাখুক। এখন চলি—সেন মশাই নমস্কার! নমস্কার বিপ্রপদ বাবু!'

টাকার অংক শুনে বিপ্রপদ নীরব—এবং তার পক্ষের লোকজনও।

রাগে-দুঃখে ইমাম দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে। টাকার কাজ তো মুখের কথায় সারে না।

দীনু বিপ্রপদর কানে কানে বলে, 'ভালই হয়েছে। মূর্খের মত অর্থব্যয় করায় কোন পৌরুষই নেই। এমন দিন আসবে যে এস্তেজদ্দি সেধে তোমায় তালুক দেবে। ওটার কাজ কি তালুক রক্ষা করা? গো-মূর্খ, তা না হলে বার হাজার টাকা দিয়ে কি কেউ রাখে তিন শো টাকা মুনফার তালুক! চলো, আমরাও এখন উঠে পড়ি। রাত কম হয়নি। ঐ ঘোষালেরা তাদের নৌকা ছাড়ল।'

ব্যংগহাস্য-মুখরিত একখানা নৌকা জানালার কাছ দিয়ে ভেসে যায়।

দীনু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এখনও সন্ধ্যাহ্নিক বাকী।

বিপ্রপদ বিমর্ষ মুখে বসে থাকেন।

ইমাম আর সহ্য করতে পারে না। সে বলে ওঠে—"দিমু সেই বার হাজার—দিমু আমার সব জমি-খ্যাত বেইচ্যা বাবুরে টাহা! এহনও কি চাবে না মহারাজ পুরান পেরজার দিকে? পুরান ছাওয়াল কি বাঘের ডে বেইচ্যা খাবে? পরকালের ডর নাই একটুও।'

কিন্তু ইহকালের, বিশেষত বর্ত্তমান কালের হিসেবী সেন মশাই চোখের জলে ভোলেন না। তিনি এ সব অনেক দেখেছেন—তাই ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে থাকেন।

কিন্তু নৌকার মধ্যে এক জন অশ্রুমুখী হয়ে ওঠেন। তিনি দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এস্তেজদ্দির ছেলেটা ক্ষেপে ওঠে, 'আর এক হাজার বেশী দিলে হইবে কি? আমরা পুরান পেরজাও না রাইওৎও না, আমরা দিমু আকেল-সেলামী।'

বিপ্রপদ উঠে পড়েন, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। লোভ এবং লাভ এদের মনুষ্যের গণ্ডী থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। 'চলো ইমাম, আমরা যাই, ভাগ্যে থাকলে যথেষ্ট সম্পত্তি হবে। নমস্কার সেন মশাই, নমস্কার।'

বুড়ো সেন মশাই সেদিকে ফিরেও তাকান না। এন্তেজদ্দির ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, 'দাও বায়নার টাকা—এক্ষুণি লেখাপড়া হক। নায়েব, নায়েব!'

'এই যে মহারাজ, হাজির।' বলে, বৃদ্ধ নায়েব বিড়ালের মত এগিয়ে আসে। এটি তাঁর যৌবনের সহচর। অনেক প্রসাদীকৃত মদ ও মেয়েমানুষ এটি ভক্তিভরে মহারাজের উচ্ছিষ্ট পাত্র থেকে এক কালে গ্রহণ করেছে। তাই সব কর্মচারী একে একে বিদায় হলেও নায়েব কৃতজ্ঞতা-পাশ ছিন্ন করতে পারেনি।—কত কটু ভাষা, বঙ্গ-প্রয়োগ, ঘাড়-ধাক্কা সে বেচারা সয়ে টিঁকে আছে! বেতন পায় না তবু ব্যভিচারের সংগী, মনিব-চাকরের অংগাংগী সম্বন্ধটুকুর নেশা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি! এ নেশা এমন চিত্তহারী যে জীবনে কোনও দিনই কাটবে কি না সন্দেহ।

এতগুলো টাকার কথা শুনেও নায়েব ব্যস্ত হয় না। এমন কত বার-তের হাজারের যে বায়না-পত্র সে লিখেছে তার কাগজপত্র অদ্যাবধি তার জিম্মায় আছে! অনেক হিসাব তার মুখস্থও রয়েছে। জমিদারী গেল পাঁচ আইনে নিলাম হয়ে, তার পর কত যে তালুক বেচা হলো, খাসের জমি পত্তন দেওয়া হলো, কিছুতেই খরচ আর পোষায় না। হিসাব হয় প্রতিবারই কিন্তু খরচ হয় হিসাবের বাইরে। আয় করে খাওয়ার প্রশস্ত পথ ছিল জমিদারী, সেটা গিয়ে আসল ভেঙ্গে খাওয়া সুরু হয়েছে। বয়স ও অবস্থার ভাঁটার সংগে সংগে মেয়েমানুষ অবশ্য ভাঁটিয়ে তলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রিয়পাত্রের কাছে সহস্র গেলাদের অজস্র বুদ্বুদের রঙিন খোসবু লগ্নি করে রেখে গেছে, সে নাগপাশ সেন মশাই এখনও এড়াতে পারেননি। সমস্ত বেচে-কিনেও শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাঁকে এক ফোঁটা মুখে দিয়ে মরতে হবে। নায়েব তা জানে, তাই ভাবে: এ বার হাজার কিম্বা তের হাজারের ভাগের ভাগে আর ক'দিন চলবে! এবার করবেন কি! দামী এবং বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি তো এইটাই শেষ।

নায়েব বিষণ্ণ মুখে বলে, 'কই, টাকা দাও?'

এন্তেজদ্দির ছেলে বলে, 'বা'জান, এহন টাহা দেও—বায়না করো।'

এন্তেজদ্দি এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল, সে বলে উঠল, 'পাড়াড়া টাহা দিবি তুই। তুই না কইছ বার হাজার না তের হাজার। আমার ডে কিছু জিগাইয়া কইছ? আমি ঠেকছি কি সে যে টাহা দিমু? তুই আমার এষ্টাড রাখতে পারবি না। তুই আমার পোলা তো না একটা পাড়া—ছাল ছাড়া হইয়া পাড়া তুই এহানে থাক, আমি যাই।' সে রাগে গর্‌গর করতে করতে কোষ নৌকা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ছেলেটাও অপ্রতিভ হয়ে পিছু নেয়। ক্রুদ্ধ পিতাকে প্রবোধ দেয়, 'রাগ হইও না বা'জান, আমি কি কিছু বুঝি না কি? আমি কি তোমার নাবালক পোলা!'

'বাইশ বছর বয়স হইল এহনও তোর নাক দিয়া দুধ গলে! খাসীডা তোরে জবাই দিয়া বাবুরা সব সরইয়া গেছে। আর, আমাগো তালুক-মুলুকে কাম নাই। আমরা তুবের ব্যান গালাইয়া পয়সা কামাই করি, আমাগো সেই ভাল। এহন চল্ খাসীর-পো খাসী! চল্ চল্।'

ওরা ডোঙ্গায় উঠে ভাটা দেয়।

সেন মশাইর চোখের ও মুখের ওপর কে যেন কালি মেড়ে দেয়।

এবার দুর্দান্ত সেন নিরুপায় হয়ে বিপ্রপদকে অপেক্ষা করতে বলেন। 'দেখুন আপনি ভাগ্যবান, এ তালুক আপনার কপালেই আছে। এখন দর-দস্তুর আপনার কাছে। আমি জানি ওরা কেউ তালুক রাখবে না—ওদের আস্ফালন বৃথা।' বলতে বলতে সেন মশাই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এখন আপনার দয়া, বুঝে-সুজে যা হক আজই করে যান—আমি কাল নৌকা খুলতে চাই। বড্ড খরচ—আর সামলাতে পারি নে।'

ধার-করা পেয়াদা-সিপাই, ঠিকা-করা নৌকার মাঝি-মাল্লা সব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এদের এক সপ্তাহের কথা বলে এনে প্রায় দু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছেন—আর একটি দিনও এরা থাকবে না। গিয়েই তো এদের বিদায় করতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। ক্রয়-বিক্রয়ের এরা ধার ধারে কি! একটু বেতাল হলে সব গোমর ফাঁক হয়ে যাবে! ঠসখ যাবে গুঁড়িয়ে!

ভিতর থেকে মহিলাটি বলেন, 'এবার ঠাকুরপো ঠেকে সোজা পথ ধরেছেন! টাকা-কড়ি এক দিকে আর প্রজার মনস্তুষ্টি এক দিকে। শুনেছি, পূর্বে কর্তা'রা এ সব খুব বিবেচনা করেই করতেন।'

দীনু বলে, 'ঠিক বলেছেন মহারাণী! আমিও ভাবছিলাম, রাণী-মা যখন উপস্থিত রয়েছেন তখন বিপ্রপদর ভাবনা কি! ওর জন্ত বিশেষতঃ এই মুসলমান প্রজাদের জন্ত তিনিই তো ঢেলে দেবেন করুণার স্নেহধারা। মা, আপনাকে প্রণাম, আপনি জগন্মাতা।'

কথাবার্তা একটা স্থির হয়—টাকার অংক কমের দিকেই যায়—বায়না বাবদ নগদ দেওয়া হয় কিছু—সপ্তাহ মধ্যে দলীল রেজিষ্ট্রী হবে। সেন মশাইর হিসাবে গরমিল বাধে—আর করতে গিয়ে ব্যয়ের অংকটা দাঁড়ায় মোটা, তবু বিপ্রপদর প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে হয়।

ইসমাইল মিঞা, ইমাম খুবই খুশী হয়েছে। বিপ্রপদও খুশী—শুধু মুখ শুকিয়ে গেল দীনুর। এত দিন বসে যা ভেবে-চিন্তে ঘোষালদের সাথে পরামর্শ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে এনেছিল, তা বানচাল হয়ে গেল। তা ছাড়া এন্তেজদ্দির কাছ থেকে যে পাঁচ টাকা আনা হয়েছে তাও ফিরিয়ে দিতে হবে। তালুক যখন কিনে নিতে পারল না তখন টাকা রাখবে কি করে? এবার দোকানটিও গেল।

সপ্তাহ কাল মধ্যে দীনুর হবে সর্বনাশ আর বিপ্রপদ হবেন গাঁয়ের ভিতর মহারাজাধিরাজ—এর চেয়ে ওর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!

নৌকা চলে, হাসি-গল্প হয়—দীনু হিংসায় অন্তরে অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরে।

ঘাটে এসে নৌকা থামতেই সবাই উঠে গেল দীনুকে কেউ ডাকল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাঝি বলে, 'ঠাহুর ভাই, ঘুম ভাঙছে? ওঠেন, সকলডি চলইয়া গেছে।'

দীনু ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ রগড়ায়, হাই তোলে—পরে নেমে যায় নৌকা থেকে। 'সকলে ফেলে গেল, এখন যাই কি করে—যে পিছল পথ, তাতে ঘোর অন্ধকার।'

'তাগো দোষ কি ? তারা তো ভাবছে আপনে ঘুমে।'

এ যে কি ঘুম তা দীনুর বুঝতে কষ্ট হয় না। দাবানলের পর নিস্তব্ধতা।

'চলেন, আমিও বাড়ীর মধ্যে যামু।' একটা লণ্ঠন নিয়ে মাঝি নেমে আসে। চার দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, বর্ষাকাল—জল-কাদায় হাঁটু সমান। মাঝি আগে আগে যায় পথ দেখিয়ে দীনু যায় পিছে পিছে।

বোসোদের বাড়ীর ভিতর থেকে উলুধ্বনি শোনা যায়—কমলকামিনী হয়ত বায়না-পত্রখানা বরণ করে ঘরে তুলছেন, হয়ত গ্রাম্য প্রতিবেশীদের ডেকে পান-বাতাসা বিলাচ্ছেন।

দীনুর মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে! সে অন্ধকার অগ্রাহ্য করে, মাঝিটাকে একা ফেলে ভিন্ন পথ ধরে।

চিরদিনই তার অভিযান এইরূপ ভিন্ন পথে।

১২

কবসা রেজেষ্ট্রী হয়ে গেছে কাল—তাই একটা ছোট-খাট প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছেন কমলকামিনী ও বিপ্রপদ। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত হ'য়েছে। হিন্দুরা খাবে বাড়ীর ভিতর, মুসলমানরা খাবে বাইরে রেঁধে। কমলকামিনী মেয়েদের নিয়ে তাই জোগাড় করে দিতে ব্যস্ত। ইমাম না কি রান্নায় ওস্তাদ, সে নিয়েছে তাদের স্বজাতির রান্নার ভার। একটা উনুন তৈরী করে তার চারি দিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে নাট-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বড় আম গাছটার তলায়। অমরেশের আজ আর আনন্দ ধরে না—সে যেন ইমামের সহকর্মী। কারুর নিষেধ সে শুনছে না—এই জল আনছে, এই পাতা কেটে দিচ্ছে, বার-বার হুকুম করছে বিনুকে। প্রয়োজনের তাগিদ আসারও আগেই সব জোগাড় করে আনছে, তরি-তরকারী ধুয়ে আনছে ঘাট থেকে। ছোট কাল থেকে সে মা ও বাবার কাছে যা শিখেছে তাই শিখিয়ে দিচ্ছে বিনুকে। তা ছাড়া ইমামদের বাড়ী গেলে যা আদর-যত্ন পায় তার বিনিময়ে সে আজ চুপ করে থাকবে কি করে ?

বিপ্রপদ ছেলের রকম-সকম দেখে হাসেন। শ্রীমান একেবারে হাঁপিয়ে গেছে। ফুটফুটে মুখখানা ঘেমে রাঙা হয়ে উঠেছে।

কমলকামিনী এসে বলেন, 'ইমাম, আমার ইচ্ছা করে তোমাদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে, কিন্তু তোমরা তা খাবে না—খেলে দোষ কি ?'

'কিছুই দোষ নাই মাঠাইন। ভাবলে আমরা সকলডি এক। কিন্তু তোমরা যে আমাগো ঘরে ওঠ্‌তে দাও না, আমরা ক্যান খামু তোমাগো হাতে ?'

'তুমি ঘরে উঠলে—আমাদের ভাতের হাঁড়ী ছুঁলে কি হয় ইমাম সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি নে! অথচ তুমি তো জান না, আমার এক দূর-সম্পর্কের মামা বিলাত থেকে এসে ঘরে না কি রান্নার জন্য মুসলমান বাবুর্চি রেখেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব আসছে-যাচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, তাতে তো তাঁর কিছু হয়নি। কিন্তু এ কথা এদেশে কেউ শুনলে শিউরে উঠবে—দশ হাত পিছিয়ে যাবে। আমার ছেলে আজ খাবে না আমার হাতে, উঠতে পারবে না আমার ঘরে—এ ব্যবস্থা নিতান্ত অচল।' কিন্তু তিনিই কি পারেন সচল করে নিতে ? না, তা পারেন না। তাঁর সংস্কারে বাধে। কেন বাধে এর সঠিক জবাব খুঁজে পান না। নিতাই ও ইমামের ভিতর কি পার্থক্য—যখন এক জন আসবে ঘরে ঠিক তখনই আর এক জন থাকবে নীরবে বাইরে দাঁড়িয়ে! তিনি একটা ব্যথা নিয়ে ইমামের সুমুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার এখন আর কি কি লাগবে ? কোন জিনিষের অভাব হলে আমাকে জানিও।'

'তা আমার আর জানান্ লাগবে না—দাদু-ভাইরা আমার থিক্যাও করিত-কর্ম্মা।' বলে ইমাম একটা সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমরেশ ও বিনুর দিকে।

'অমরেশ, আজ আর তুই কিছু খেলি নে সকালে ? বিনু তো খেয়ে এসেছে। আয়, চারটি গরম-গরম ভাত ফুটন্ত ডাল দিয়ে খেয়ে যা। বাবা, নইলে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে তোমার।'

'মা একটু থামো—এই কাঠগুলো সাজিয়ে রাখি।'

'কাঠ আমি সাজিয়ে রাখছি, তুই খেয়ে আয়—যা।'

'তুমি পারবে না, আবার ভিজে কাঠ রাখবে ওপরে সাজিয়ে—কত কষ্ট হবে মিঞা-ভাইর রাঁধতে।'

'ইস্, বড্ড দরদ তো দেখছি মিঞা-ভাইর জন্তে। বড় হয়ে এ দরদ থাকলে বাঁচি!'

'তহন ভুলইয়া যাবে বিদ্যাশে গিয়া। কি দাদু-ভাই, ঠিক কইছিনি ?' বলে ইমাম অমরেশকে বুকের মধ্যে টেনে আনে, 'কি, ভুলইয়া যাবা না কি ?'

জবাবে অমরেশ কিছু বলে না। কিন্তু মিঞা-ভাইকে সে কিছুতেই ভুলবে না এমনই একটা দৃঢ়তা তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে। তা ইমাম ও কমলকামিনীর দৃষ্টি এড়ায় না।

ইমাম বলে, 'যাও এহন কিছু খাইয়া আয়ো দাদু-ভাই।'

'না, একটু পরে যাবো—এখন না।'

কমলকামিনী জোর করেই তাঁর আঁচল দিয়ে অমরেশের সুকুমার মুখখানি মুছিয়ে দেন। 'চল আমি ভাত মেখে দেবো—চারটি খেয়ে আসবি, এখন তো কত দেরী।'

'যাও দাদু-ভাই, যাও।'

'হ্যাঁ রে অমরেশ, তুই রাঁধতে পারিস ? বল্ তো মাছের ঝোল রাঁধে কি দিয়ে ?'

'আমি আবার রাঁধতে জানি নে ? মাছের ঝোল তো সহজ, অম্বলও রাঁধতে পারি।'

'আয়, খেতে বসে আমায় বলবি চল।'

রান্না-ঘরে এসে একখানা পিঁড়ি টেনে এনে অমরেশকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন বল্।'

'শুনবে কি করে রাঁধতে হয় অম্বল ?'

এক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে দিয়ে বলেন, 'শুনব না আবার! বলে যা।'

'আগে ধনে-লঙ্কা দিয়ে তার পর দেবে তেঁতুল।'

'বেশ ঝাল-ঝাল হবে, কেমন অমরেশ ?' কমলকামিনী হাসি চেপে থাকেন।

'হুঁ, বেশী না, একটু-একটু ঝাল হবে।'

এমন সময় বিমলা এসে পড়ে। 'কিসে ঝাল হবে মা ?'

'অমরেশের অম্বলে।'

'ওমা গো, ভাইটি আমার পাকা রাঁধুনী! অম্বলে দেবে ঝাল, আর ঝোলে দেবে তেঁতুল!'

'ওমা, আমি খাবো না ভাত—আমি তাই বলেছি না কি? বিমলিকে চুপ করতে বলো—না হলে এই উঠলাম কিন্তু।'

'আঃ বিমলা, চুপ কর! ও রাঁধবে আমি খাবো—তোদের মুখে লাগবে না কি ঝাল? তোরা শুধু-শুধু জ্বলে মরছিস কেন? সব রাঁধুনী কি এক রকম রাঁধে? ও যেমন রাঁধবে আমাকে তেমনি খেতে হবে।' চোখ ইশারা করে কমলকামিনী বিমলাকে শাসন করেন। ও মুখে আঁচল গোঁজে। হাসি কি থামতে চায়!

অমরেশের শেষ গ্রাসটা মুখে দেওয়া পর্যান্ত বিমলা অতিকষ্টে হাসি চেপে ছিল, এখন একেবারে হেসে উঠল খিল-খিল করে। 'মা, তুমি ওকে বোকা পেয়ে ঠাট্টা করলে—ও না-হয় রাঁধতে না-ই বা জানে, তা তো তোমার ছেলে। তোমার কি ওর সাথে ঠাট্টা সাজে?'

'কি মা?' অমরেশ কমলকামিনীর মুখে-চোখে একটা চাপা হাসি দেখতে পেয়ে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। 'আমায় ঠাট্টা, খাব না, খাব না। আর কোনও দিন খাব না তোমার হাতে।'

'না, না, আমি তোমায় ঠাট্টা করতে পারি বাবা?—বিমলা মিথ্যা বলছে।'

'তবে হাসলে কেন?'

'তাহ'লে কি কাঁদব?'

'না, না, আমি সব বুঝি—তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে—আমি সব বুঝি।'

'তবে এটুকু বোঝ না কেন যে অম্বলে লঙ্কা দিতে নেই?'

অমরেশ এবার কেঁদে-কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টা দু'-তিন বাদে দেখা যায়: সে আবার ইমামের কাছে বসে গল্প করছে। হাসছে তার কথায়।

অম্বলের ঐতিহাসিক ঘটনাটা বিপ্রপদর কানে যায়। তিনি স্নান করতে যাওয়ার সময় ছেলেকে ডেকে সংগে নিয়ে যান। তাকে বুঝিয়ে বলেন, 'আমরা বড় হয়েছি, তোমরাও বড় হবে—তখন আমরা যাবো বুড়ো হয়ে—এখন থেকে দেখে-শুনে না শিখলে তখন পারবে কেন? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, যারা আসবে তাদের আদরযত্ন করে আপ্যায়িত করে খাওয়াতে হবে। ধুলো-কাদা থাকলে তারা তোমাকে দেখলে বলবে কি? বিনুটা কোথায়? তাকেও তুমি সাজিয়ে-পরিয়ে আন গে? তুমি বড় বাবু, সে মেজ বাবু। যাও তাড়াতাড়ি—এক্ষুণি সব এসে পড়বে।'

বড় বাবু সগর্বে মেজ বাবুকে ডাকতে বাড়ীর ভিতর যায়।

রান্নার সাথে-সাথেই সব তুলে ফেলা হয় নাট-মন্দিরের এক পাশে। বর্ষা কাল, বৃষ্টি নামতে কতক্ষণ! ইমাম বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেই রেঁধেছে। কিন্তু লঙ্কা ও পেঁয়াজ-রসুনের ভাগটা বেশী দিয়েছে নিজেদের রুচি অনুসারে। তাই সব ব্যঞ্জনই লাল টকৃ-টকে হয়েছে। পাতলা তেল ভাসছে ওপরে।

কমলকামিনী ঘর থেকে হাতে তৈরী নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলেন। এখানে তো মিঠাইর দোকান নাই, তাই ক'দিন ঘরের কেউ বিশ্রাম পায়নি।

একটু উচ্চাংগের মুসলমানী প্রথায় বিপ্রপদ প্রজাদের অভ্যর্থনা করেন—সমাদর করে বসতে দেন নাটমন্দিরে। আহারান্তে তারা খুশী মনে পান তামাক খায়। বলে যে হিন্দুর মধ্যে এমন আদপ কায়দা খুব কম লোকেই জানে। ঘোষালেরা এ দেশের বনেদী ঘর হলেও কত যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সে কথাও এখানে ওঠে। এবং সে জন্য লজ্জা বোধ করেন বিপ্রপদ। তিনি মুসলমানদের কেন হিন্দু প্রজাদেরও সমান আদর-যত্ন করেছেন। অবজ্ঞা করেননি কাউকে। তাই সকলে একবাক্যে তাঁকে প্রশংসা করে। খাওয়ার সময় প্রজারা নজর দেয়। টাকাগুলো দেখে তাঁর মন অহংকারে ভরে ওঠে। এই তো রাজোচিত সম্মান! আজ সেনেদের বদলে এ-সব তাঁরই পাওনা। তাঁরই ন্যায্য দাবী। অমরেশ এবং বিনুও কিছু-কিছু নজর পায়' তারা চকচকে টাকাগুলো নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে যায়—সবাইকে দেখাবে।

এই খাওয়া-দাওয়া মেলা-মেশা নতুন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল শক্তিগড়ে। ইসমাইল মিঞারা যে কত সন্তুষ্ট হয়েছে তা আর বলা যায় না। তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিক্ত হয়ে উঠল বয়োবৃদ্ধ হিংসুকেরা—প্রাচীনপন্থীর দল। কিন্তু কেউ সাহস করে বিপ্রপদর সুমুখে কিছু বলতে পারল না। কি জানি আবার আর্জি দায়ের করে দিতে কতক্ষণ! তাই এমন একটা মধুময় জটলার আস্বাদ আনাচে-কানাচে বসেই নিতে হয়। [ক্রমশঃ

প্রভাত-সঙ্গীত
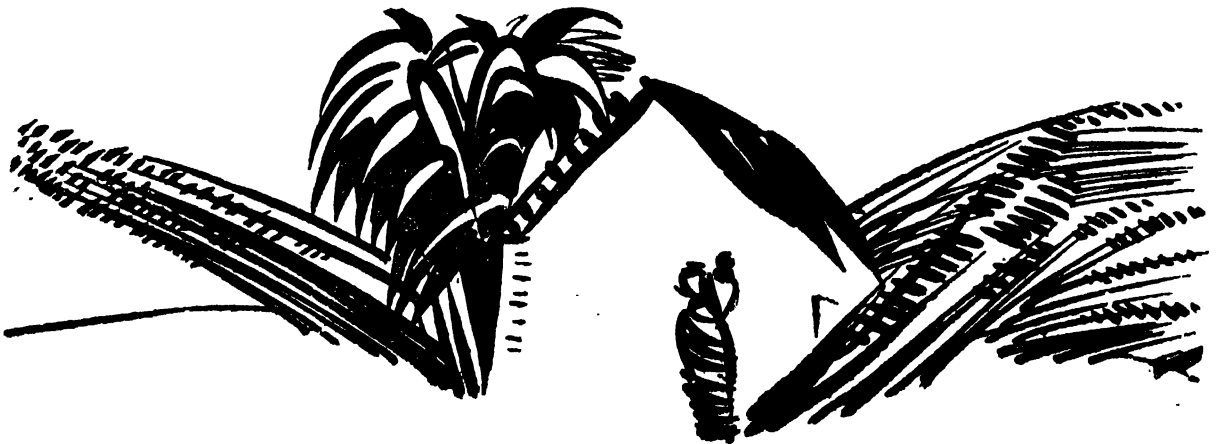
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মহাস্থবির

ছা'তে

ছাতের সঙ্গে আরও কিছু স্মৃতি জীবনকে জড়িয়ে আছে, যা না বললে ছাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করা হবে। সুখ-স্মৃতি হলেও তা অশ্রুময় সুখ-স্মৃতি।

গ্রীষ্মকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই, মানে বড়রা রাত্রে ছাতে শুতেন। ছোটদের ছাতে শোওয়া বারণ ছিল। ছাতে শুতে আমাদের দুই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ইতিপূর্বেই ছোটদের ছাতে শোওয়ার বিরুদ্ধে বাড়ীতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল যে, মনের ইচ্ছাটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহসই হত না। ছাতে শুলে ছোটাদের বিছে, সাপ ও নানা প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়াতে পারে, তা ছাড়া ঠাণ্ডা লেগে কি না হতে পারে!

সংসারে এত ভাল-ভাল জায়গা থাকতে ঐ কাঁকড়া-বিছে প্রমুখ সাংঘাতিক জীবগুলি ছাতে বাস করেন কেন এবং দংশনবিলাসের ভাল-ভাল উপকরণ ছাতময় এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে ছোটদের ওপরে তাঁদের এত আক্রোশের কারণ কি—এ প্রশ্নটা সে সময় খুবই পীড়া দিয়েছিল।

তথাপি এক দিন এই বিরুদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে মা'র কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করে ফেলা গেল। কিন্তু মা হাঁ কিম্বা না কিছুই না বলায় আমাদের সাহস বেড়ে গেল। দুই ভাই, মাকে একলা পেলেই ছাতে শোবার জন্য বায়না সুরু করে দিলুম। শেষ কালে মা-ই আমাদের হ'য়ে সুপারিশ করায় বাবা আমাদের ছাতে শোওয়া মঞ্জুর করলেন—কিন্তু সব দিন নয়। কেবল মাত্র শনি ও রবিবার রাতে, তবে জামা গায়ে দিয়ে শুতে হবে। শনিবার আমার জীবন-প্রভাতেই মধুবার-রূপে দেখা দিয়েছিল।

ছাতে শোবার আবেদন মঞ্জুর হওয়াতে যে কি রকম খুশী হলুম, তা উল্লেখ করাই বাহুল্য। প্রায় শৈশব থেকেই আমাদের আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেহাৎ অসুখ-বিসুখ না করলে রাতে মাকে কাছে পেতুম না। ছাতে শোওয়া হবে, আর মা'র কাছে শোওয়া হবে, এটা কম খুশীর কথা ছিল না সেদিন।

একটা বড় সতরঞ্চির ওপরে পাশাপাশি তিনটে বালিশ। মধ্যে মা শুয়ে, দু'পাশ থেকে আমরা দু'-ভাই তাঁকে একান্ত দখল করেছি। বাবা একটু দূরে শুয়ে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে—কারণ তাঁর বিছানাটা আমরাই করেছি কি না। আর আর দু'-চার জন, তাঁরাও দূরে দূরে শুয়ে আছেন।

ছাতে শুয়ে আকাশের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে আমসত্ব বা আচার চুরি করতে উঠে কিংবা দিনের বেলায় কখনো-সখনো ঘাড় তুলে যে আকাশ এত দিন দেখেছি, সে আকাশ আকাশই নয়। চোখের সামনে আলোর আড়াল দিয়ে আকাশ তার আসল রূপ আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল—আকাশের স্বরূপ প্রকাশ হয় রাত্রে।

কোনো আয়াস নেই, চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলেছে। নীল পটে হাল্কা মেঘ দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে বাতাস। কত সম্ভব ও অসম্ভব চিত্রলেখা—কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। তারাদের কথা ভাবতে ভাবতে কল্পনা হাঁপিয়ে পড়ত—এই রহস্যের আবরণ মা একটু একটু ক'রে মোচন করতেন।

ঐ যে চাঁদ, ওকে ঘিরে সাতাশটি তারা আছে, তারা সব চাঁদের স্ত্রী—দক্ষ রাজার মেয়ে তারা। দেবতা হোলেও এক দিন ওরা আমাদেরই মতন পৃথিবীতে বিচরণ করত। চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের দাগ কেমন করে হলো, এম্‌নি কত কি কাহিনী—কত যুগ-যুগ আগের লোকেরাও চাঁদকে ঠিক এম্‌নিই দেখেছে আজ আমরা যেমনটি দেখ্‌ছি। এখানে আর ওরা আসতে পারে না, আমরাও ওখানে যেতে পারি না, তবুও এইখানকার কত অশ্রু ও বেদনার ইতিহাস ওদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। ওরা এই পৃথিবীর লোকের কত কীর্ত্তিই না দেখেছে। ওরা আমাদেরই আপনার লোক, আজ অনেক দূরে চলে গেলে কি হবে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়নি। ওদের আমরা সব জানি, ওরাও আমাদের সব জানে। ঐ যে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তারার দল, ওর নাম সপ্তর্ষি। বশিষ্ঠ ঋষিরা ঐখানে থাকেন। কোন এক রাজার সঙ্গে বশিষ্ঠের বাধল ঝগড়া, তার ফলে ত্রিশঙ্কু বেচারা সপরিবারে ঐখানে আটকে আছেন। কি আর করবেন, ঐখানেই তাঁরা ঘর-বাড়ী বানিয়ে নিয়েছেন।

শুনতে শুনতে রহস্যলোকের অনেক গুপ্তকথাই আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হত—আমাদের সঙ্গে তারারাও যেন গল্প শুনছে। আমরা ওদের কথা জানতে পেরেছি দেখে মিট্‌-মিট করে কৌতুক-ভরা হাসি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত। দোষ ধরা পড়ে গেলে যেমন ধরা পড়বার ভয় আর থাকে না, থাকে মাত্র একটু লজ্জা, তারার দল তেমনি যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ত আমাদের কাছে। একটু পরেই দুই দলে হয়ে যেত ভাব, মনের কথা সুরু হ'য়ে যেত।

মা গল্প বলতেন খুবই আস্তে আস্তে। গল্প সুরু হবার আগেই আমাদের কল্পনা-ঘোড়া চনমন্ করতে থাকত ছোটবার জন্য—গল্প আরম্ভ হওয়া মাত্র আসল কাহিনীকে পেছনে ফেলে সে মাইলের পর মাইল এগিয়ে ছুটত। প্রায়ই গল্প পুরো শোনা হত না, ঘুম এসে করত বিশ্বাসঘাতকতা—আজ যে ঘুমের প্রতীক্ষায় সারা রাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়।

এক দিন, সেদিন ভয়ানক গরম। বাড়ীশুদ্ধ সব কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। খালি পায়ে রাস্তায় বেরুনো-রূপ অন্যায় কার্যের

শান্তি-স্বরূপ সেই নিমন্ত্রণ-স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে গৃহারণ্যের একতলা তেতলা করে বেড়াচ্ছি। নিম্নপ্রকৃতি কুলচুর আমচুর প্রভৃতির সন্ধানে ফিরতে থাকলেও, সংসারে আমি একক, আমার কেউ নেই, আমিও কারুর নই, এই রকম একটা উচ্চ ভাব মনের মধ্যে লালন করে চলেছি বিকেল থেকে। এই ভাবটিকে মনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে ছাতে চড়া গেল শোবার উদ্দেশ্যে—যদিও ছাতে শোওয়া সেদিন আমার বারণ ছিল।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বাড়ীতে কেউ নেই এই ভরসায় বীরদর্পে ছাতে উঠেই চোখে পড়ল, সেখানে বাবা শুয়ে রয়েছেন। নিঃশব্দ ত্বরিতগতিতে একেবারে উল্টোমুখ হ'য়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবা যে সে সময়ে ছাতে শুয়ে আছেন বা তাঁর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। যা হোক, উপায় নেই, কাছে যেতেই হোলো।

বাবার ভয়াল গাম্ভীর্য্য, কঠিন শাসন, সামনে পড়লেই পাঠ্যবিষয়ক অপ্রীতিকর প্রশ্ন, চরিত্র সংশোধনের জন্য তস্মিন্ প্রীতি ও তস্য প্রিয়-কার্য সাধনের উপদেশাবলী—এই সব মাল-মশলা মিলিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হয়ে উঠেছিল। মোট কথা, তাঁর সান্নিধ্যে এলে আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করতুম।

কাছে যেতেই বাবা বললেন—এইখানে, আমার পাশে শোও।

বাক্যব্যয় না করে শুয়ে পড়লুম। একটু বাদেই তিনি আদর করে আমার মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন। বিকেল থেকে 'সংসারে আমার কেউ নেই' এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ করে শুতে এসে বাবার এই আদর—দুই বিপরীত ভাব-তরঙ্গের মাঝখানে পড়ে মন-তরী টাল-মটাল খেতে সুরু করলে।

বাবা বলতে লাগলেন—আজ সারা বিকেলটা ধরে তোমাকে দেখলুম যে তুমি খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কেন, তোমার কি চটি নেই?

—আছে।

—তবে? এই এক বছরও এখনো হয়নি, পায়ে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে কত দিন কষ্ট পেলে। তিন তিন-বার অস্ত্র করে কাঁটা বেরুল না, শেষে অজ্ঞান করে কাঁটা বের করতে হলো—ভুলে গেছ! সে কষ্ট পেলে শুধু খালি পায়ে ঘোরার অভ্যেসে।

চুপ করে রইলুম। বাবা বলে চল্লেন—শুধু কি তুমিই কষ্ট পেলে? তোমার সেই কষ্ট দেখে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি? তোমার পায়ে এক-এক বার অস্ত্র করা হয়েছে, আর চিন্তায় ও কষ্টে দু'-তিন রাত্রি ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি, আপিসেও কাজ করতে পারিনি। তুমি বড় হচ্ছ, এ-সব তোমার বোঝা উচিত।

এমন করুণ ও স্নেহের সুর বাবার কণ্ঠে এর আগে আর শুনিনি—বাধার প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বাবা বল্লেন—প্রতিজ্ঞা কর যে আজ থেকে আর কখনো খালি পায়ে ঘোরা-ফেরা করব না।

সেদিনের বাবার দেওয়া দেড় টাকা মূল্যের জুতো জোড়া আজ নিজের পয়সায় পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এমন দুরদৃষ্টের কথা শুধু আমি কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন বালকেরই কল্পনায় আসেনি, তাই প্রতিজ্ঞাটা টপ্ করেই করে ফেলেছিলুম। সেই কথা মনে হচ্ছে আর ভাবছি, বাবা এখন থাকলে কি সুবিধেটাই না হতো?

জুতোর পাট শেষ করেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন—আচ্ছা, এই যে আকাশ দেখছ, এর শেষ কোথায় বল তো?

বললুম—এর শেষ নেই, আকাশ অসীম।

শৈশব থেকেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, অখিল ইত্যাদি কথা-গুলোর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—কথাটা তাল মতন লাগাতে পেরে বেশ খুশী হয়ে উঠলুম।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল তো, এই আকাশ কে তৈরি করেছে?

বললুম—ভগবান।

উপরি উপরি তত্ত্ববিদ্যার এই রকম দু'টি দুরূহ প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর পেয়ে বাবা দস্তুর মতন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবান কোথায় থাকেন বল তো?

খুব ছেলেবেলা থেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় খাবার আগে আমরা চোখ বুজে হাত-জোড় করে প্রার্থনা করতুম। খাবার ও শোবার পূর্বের প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন বয়েৎ বাবাই আমাদের শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া, অন্যায় কাজ করে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, না-পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কড়া মাষ্টারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, জাগ্রত অবস্থায় প্রায় প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেও তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার কৌতূহলই কখনো হয়নি—কাজেই এবারকার প্রশ্নে কাৎই হলুম।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই চুপ-চাপ। শেষ কালে আমিই উল্টে প্রশ্ন করলুম—ভগবান কোথায় থাকেন বাবা?

—তিনি সব জায়গাতে সব সময়েই থাকেন।

—তাঁকে দেখা যায় না কেন বাবা?

—যারা তাঁকে দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তুমি ধ্রুবর গল্প জানো তো? ধ্রুব তাঁকে দেখবার জন্য কত কষ্ট করেছিলেন—শেষ কালে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—সাধু লোককে ভগবান দেখা দেন।

—আচ্ছা বাবা, তাঁকে চিঠি লেখা যায় না?

—না।

—তিনি কারুকে চিঠি লেখেন?

—হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের জন্যই চিঠি লিখে লিখে রেখে-ছেন—ফুলে, ফলে, গাছের পাতায়, কত জায়গায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে রয়েছে—সাধু লোকেরা সে সব লেখা পড়তে পারেন।

বাবা বলতে লাগলেন—আমরা ঐ যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে তারা-ভরা আকাশ, ওখানেও কত কথা লেখা আছে।

বল্লুম—কৈ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না বাবা?

বাবা বল্লেন—মনে কর, আকাশটা যেন একখানা বিরাট শ্লেট—তার ওপরে তিনি জ্যোতির অক্ষরে ঐ সব লেখা লিখে রেখেছেন—কায়মনে চেষ্টা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কি বলছেন।

—আমরা বুঝতে পারি না বাবা?

এবার তিনি নিবিড় ভাবে আমায় আদর করতে করতে ধরা-ধরা গলায় বললেন—তুমি যখন বড় হবে বাবা, তখন চেষ্টা কোরো, ঠিক বুঝতে পারবে।

বাবা আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু সে-সব আর আমার কানে গেল না। ঐ কালো প্লেটে আলোর অক্ষরে চিঠির কথাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জরণ করতে লাগল।

সেই থেকে, সেই সুদূর অতীতে, বাল্যকালের বিস্মৃতিপ্রায় এক রাত্রির অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে যে আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়েছিলুম, সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সারা জীবন ধরে, সুখে দুঃখে শোকে ও ভোগে সর্ব অবস্থায় আকাশ আমাকে টেনেছে তার কাছে—ভোগের অজস্র উপাদানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে সমাজ, সংস্কার ও সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছি, তারই মধ্যে আহ্বান পাঠিয়েছে আমাকে সেই কালো প্লেটে আঁকা জ্যোতির অক্ষর। উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে বসেছি তার নীচে। কত দিন আকাশের দিকে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ঐ সুনীল রহস্যের যবনিকা এইবার বোধ হয় খসে পড়ল—ঐ জ্যোতির ইঙ্গিত এত দিনে বুঝি বা ধরা দেয়। কিন্তু হায়! বারে বারেই আমারই মানসাকাশ আত্ম-অভিমানের মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে, আর সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশের চেয়ে বড় আকর্ষণ আমার আর নেই।

[ক্রমশঃ।

বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ভারতবর্ষ নানা প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ তাহাদের মধ্যে নদ-নদীর প্রাচুর্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বহু পুরাকাল হইতেই এই সব নদ-নদী আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

যদিও ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ, তথাপি নদীর সম্যক্ ব্যবহার আজিও আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। মোটামুটি হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে যতগুলি নদ-নদী আছে, তাহাদের স্রোতশক্তির কেবল মাত্র শতকরা ছয় ভাগ জল সেচনের জন্য ও দেড় ভাগ জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়; বাকী সমস্ত স্রোতশক্তি নষ্ট হয় এবং প্রায়ই এই সকল অনিয়ন্ত্রিত ও অব্যবহৃত জলের জন্য দেশের স্থানে স্থানে ভীষণ বন্যা দেখা দেয়।

ইহা সুচিন্তিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এই অতুলনীয় জল-সম্পদ যদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যুদ্ধোত্তর ভারতে এই জল-সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা করা হইতেছে। সাধারণ ভাবে আমাদের জল-সম্পদকে নিম্নলিখিত যে কোনও উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে,—(১) বন্যা-নিরোধ, (২) জলসেচ, (৩) জলপথের সুব্যবস্থা, (৪) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, (৫) মৎস্য-চাষ, (৬) ভূমি-ক্ষয় নিবারণ, (৭) পরিশ্রুত জল-সরবরাহ, (৮) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (৯) অবসরবিনোদন, (১০) বন-আবাদের সুব্যবস্থা, ইত্যাদি। আধুনিক কালে যাহাতে এই জল-সম্পদকে এককালীন বহু প্রকার কার্য্যে ব্যবহার করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকার পরিকল্পনাকে Multi-purpose project বা বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়।

ইংরাজ শাসন-কালে আমাদের দেশের নদ-নদীগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতে স্বাধীনতা-সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সরকার দেশের নানা প্রকার সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকটি বহুমুখী নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা আশু প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল:—

(১) বঙ্গদেশ ও বিহারের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা:—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর ও তাহার শাখা বরাকর ও কোনার নদীতে ৮টি বাঁধ যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে করা হইবে:—(১) তিলাইয়া, (২) বেল পাহাড়ী, (৩) মাইথন, (৪) আয়ার, (৫) বারমো, (৬) পাঞ্চেৎ পাহাড়, (৭) কোনার ও (৮) বোকারো। এই সকল বাঁধ দ্বারা প্রায় ৪৭ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং প্রায় ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদরের বন্যা-নিরোধ, ন্যূনাধিক ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও তিন লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া অণ্ডাল হইতে হুগলী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল জলপথে যাতায়াতের সুবিধা হইবে। এই পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

(২) উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা:—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ যথাক্রমে হীরাকুণ্ড, টিকারপাড়া ও নারাজ নামক স্থানে নির্ম্মাণ করা হইবে। এই সকল বাঁধ দ্বারা প্রায় ২,৩০,০০,০০০ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। নির্ম্মাণের ব্যয় আনুমানিক ৪৮ কোটি টাকা এবং নির্ম্মাণকার্য্য ৫ বৎসরে শেষ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে ন্যূনাধিক ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৩ শত মাইল দীর্ঘ জলপথে যাতায়াত ও মাল পাঠানোর সুবিধা হইবে। ব্যাপক আকারে মৎস্য-চাষও সম্ভব হইবে।

মহানদী পরিকল্পনার কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত ১২ই এপ্রিল ভারতের মহামান্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল সম্বলপুর সহর হইতে নয় মাইল পশ্চিমে হীরাকুণ্ডে নদীর বুকে প্রথম বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে ১০ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে সেচ-কার্য্যের সুবিধা হইবে এবং প্রায় ৩ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। অন্য দুইটি বাঁধের বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।

(৩) নেপাল ও বিহারের কোশী নদী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের ছত্রগিরি খাতের সন্নিকটে একটি সুদীর্ঘ বাঁধ কোশী নদীর উপর নির্ম্মাণ করা হইবে। এই বাঁধ দ্বারা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বিহারে বন্যা-নিরোধ ও প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং প্রায় ১৮ লক্ষ কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। কোশী নদী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইতে ১ শত কোটির উপর টাকা ব্যয় হইবে এবং ন্যূনতম ১০ বৎসর সময় লাগিবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়ূরাক্ষী নদীর গমন-পথে দুইটা বাঁধ—একটা বাঁধ সিউড়ীর সন্নিকটে এবং অপরটি সাঁওতাল পরগণার মেসোঞ্জোর নামক স্থানে নির্ম্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটিতে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা এবং ৪ হাজার কিলো-ওয়াটের উপর বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যাইবে। পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

(৫) উত্তর-বঙ্গে তিস্তা উপত্যকা পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনায় তিস্তা নদীর উপর দুইটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং তাহার দ্বারা প্রায় ৪০ লক্ষ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা যাইবে। ইহাতে ৪৫ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ৩ লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এই পরিকল্পনাটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ এখনও অনুমিত হয় নাই।

(৬) বোম্বাইএর নর্ম্মদা-তাপ্তী পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর গমন-পথে ৪টি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে বোম্বাই প্রদেশের বন্যা-পীড়িত জেলাগুলিতে বন্যা নিবারণ হইবে এবং ৪০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ এবং ১০ লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর হইবে।

(৭) পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের ভাকরা বাঁধ পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর উপরে একটা বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে ২০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিলো-ওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ইহার দ্বারা পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও শিল্প-সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাইবে।

(৮) মাদ্রাজের রামপদ সাগর পরিকল্পনা :—এই পরিকল্পনায় রামপদ সাগরের সন্নিকটে গোদাবরী নদীর উপর একটা বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে ২০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ ও ৭৫ হাজার কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনাটির আনুমানিক ব্যয় ন্যূনপক্ষে ১ শত কোটি টাকা হইবে।

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে জল-বিদ্যুৎ

অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়

কৃষিক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের জন্য এবং কল-কারখানা চালাইবার জন্য জল-বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। কল-কারখানা চালাইবার জন্য কয়লা, পেট্রল অথবা প্রচুর কাষ্ঠের প্রয়োজন, বাংলা ও বিহারেই সমগ্র ভারতে উৎপন্ন কয়লার দশ ভাগের নয় ভাগ উৎপন্ন হয়। সেই উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ভারতে উৎপন্ন পেট্রলের পরিমাণ খুবই অপর্য্যাপ্ত। মোটর ও বিমান-বহর চালু রাখিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে বহির্জগতের পেট্রলের উপর নির্ভর করা ভিন্ন ভারতের গত্যন্তর নাই। নূতন তৈল-খনি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তৈলের সাহায্যে কল-কারখানা চালু রাখিবার কোন ভরসাই নাই। পরিশেষে কাষ্ঠ সংগ্রহের কথা উঠিবে। বিভক্ত ভারতে ১,৫৫,০০০ বর্গ-মাইল বনভূমি আছে। পাহাড়ের সংলগ্ন বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। নচেৎ বর্ষার স্রোত পাহাড়-পর্ব্বতের দেহ হইতে প্রস্তরখণ্ডগুলি খসাইয়া ফেলিলে সেই অঞ্চলে পুনরায় বৃক্ষ জন্মানোর পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থান এইরূপে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের মত বৃহৎ দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এই বনভূমি হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ এই ভাবে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। জলস্রোত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কৃষি ও শিল্পে তাহা ব্যবহার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয় এবং ইহার খরচও খুবই কম। এ কথা স্বীকার্য্য যে, ভারতের বৃষ্টিপাত জলশক্তি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। পার্ব্বত্য নদী ও জলপ্রপাতগুলির মত সহজে ও প্রভূত পরিমাণে জলশক্তি নদীর জলে বাঁধ সৃষ্টি করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে জল-প্রপাতেরও অভাব নাই। ইউরোপ, আমেরিকা ও মিশরের ন্যায় এই জলশক্তির সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

নদীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গতি হইতে এই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বহু দূরবর্ত্তী সহরের কল-কারখানাগুলি চালিত হইয়া থাকে। জলশক্তির প্রভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মিনিয়াপোলিস নামক একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান এবং সেণ্ট পল নামক একটি সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গম-পেশা কলটি এই সহরে অবস্থিত। এখানকার কাগজের কল, কার্পাস-শিল্প, পশম-শিল্প এবং লৌহ-শিল্পের কারখানাগুলির অধিকাংশই এই জল-বিদ্যুতের শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ বন্দরের যাবতীয় কাপড়ের কল উপ-সাগরীয় জলস্রোত হইতে সংগৃহীত জল-বিদ্যুতের সাহায্যে চালনা করা হয়। ইউরোপে আল্পীয় অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া অনেক কল-কারখানা চালানো হইতেছে। সুইডেনে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কাগজ, দেশলাই, কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির কারখানাগুলি চলিতেছে। ভারতবর্ষেও টাটা কোম্পানীর পরিচালনায় দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে লোনাভ্‌লা, নীলামুলা ও অন্ধ্‌ উপত্যকায় জলশক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া অনেকগুলি কল-কারখানা চালানো হইতেছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টন, ১৯৪৫-৪৬ সালে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার টন এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ২ ,কাটি ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার টন, এই ক্রমক্ষীয়মান উৎপাদনের ফলে কল-কারখানা চালনার শক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের শিল্প-উন্নয়নের পক্ষে যে পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন, তাহার চেয়ে অনেক গুণ অধিক শক্তি জল-বিদ্যুতের সাহায্যে সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের বাঁশলে, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, শিলাই, কশাই, হলদী প্রভৃতি ছোট-বড় নদীগুলি বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীর বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, এই জলের পরিমাণ কখনো কখনো এত অধিক হয় যে ইহার ফলে প্লাবনের সৃষ্টি হয়, ১৯১৩, ১৯১৭, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৩ সালের দামোদর বন্যার স্মৃতি অতীব হৃদয়বিদারক, অথচ বর্দ্ধিত জলের এই গতিবেগকে সংহত করিয়া কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে শস্যের ঘাটতি পূরণ করিয়া অতি শীঘ্রই এই দেশকে শস্যভাণ্ডারে পরিণত করা যায়। এই পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসরের চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮ কোটি ৯১ লক্ষ মণ। কিন্তু মাথা-পিছু দৈনিক অর্দ্ধ সের হিসাবে এখানকার ২ কোটি ২৫ লক্ষ অধিবাসীর জন্য প্রয়োজন ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৮ হাজার ২৫০ মণ। বাহির হইতে আমদানী চাউল অথবা গমজাত দ্রব্যাদিকে যোগ করিলে খাদ্য ঘাটতির কোন কারণই থাকে না। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গকে অনায়াসে কেবলমাত্র ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত করাই সম্ভবপর নয়, ইহাকে শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করাও সম্ভবপর।

দামোদর ও বরাকর নদীতে ৭টি বাঁধ নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার ১০ লক্ষ একর জমীতে চাষের জন্য জল সেচন করা যাইবে, এবং ১,০৮,০০,০০০ মণ শস্য উৎপন্ন হইবে। প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের রবিশস্য পাওয়া যাইবে। এই সাতটি বাঁধের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে ইহার সাহায্যে যে জলস্রোতকে সংহত করা যাইবে, তাহার ফলে তিন লক্ষ কিলো-ওয়াট জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। এই জল-বিদ্যুতের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া দামোদরের তীরে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা সম্ভব, তাহা দেশের চাহিদা পূরণ করিবার পক্ষে খুবই কার্য্যকরী হইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৫,১৫,০০০ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে, ১,০০,০০০ একর জমীতে রবিশস্য উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং দুমকা ও সিউড়ী সহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের জন্য সাধারণতঃ ৪০০০ K. W. Farm Power সরবরাহ করা চলিবে। দুমকা ও

সিউড়ীর জন্য প্রয়োজন হইবে মাত্র ৫০০ K. W. F. P. অবশিষ্ট ৩৫০০ K. W. সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা যাইবে। এই বাঁধের ফলে ১৫ লক্ষ মণের কাছাকাছি ফসল ফলিবে। সাঁওতাল পরগণার কুটীর-শিল্প এই জল-বিদ্যুতের সাহায্যে যথেষ্ট উন্নত হইবে।

বিদ্যাধরী ও পিয়ালী নদীতে যে জল-নিষ্কাষণের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইতেছে, তাহা কার্য্যকরী হইলেও কলিকাতার পূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের গ্রামগুলি বিশেষ উপকৃত হইবে। হীরাকুঁদ বাঁধের পরিকল্পনাও অচিরে কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন।

আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইউরোপের আল্পস্ অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে সাধারণতঃ জল-বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করা হয়। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে হাজা-মজা নদী কাটিয়া ও প্লাবনমুখী নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা জলস্রোত সংহত করিয়া জলবিদ্যুৎ সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। মিশরের নীল নদের জলকে সংহত করিয়া যে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ফলে মিশরের ভূমি উর্ব্বর হইয়া সেখানে ফসলের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। শুধু তাই নয়, মিশরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নীল নদের জল-বিদ্যুৎশক্তির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে কলোরেডো নদীর তীরে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে জলপ্রপাতের অভাব নাই। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথমে কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালোর ও মহীশূরের প্রায় দুই শত সহরে এই জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। পাঞ্জাবের উল নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি অমৃতসর, লাহোর ও লুধিয়ানার অনেকগুলি কল চালাইতেছে। নীলগিরির পিকারা নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কোয়েম্বাটুর, মাদুরা প্রভৃতি সহরে কল-কারখানাগুলি চালানো হইতেছে। শিলং ও দার্জ্জিলিং-এও বৈদ্যুতিক শক্তি জলপ্রপাত হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে।

নদীতে বাঁধ দিয়া ও বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা হইতেছে। ঝেলাম নদীর উপর বাঁধ দিয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইতেছে, তদ্দারা শ্রীনগরের রেশমের কারখানাগুলি চালানো হইতেছে। সেতুর বাঁধের জল হইতে ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের কল-কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে, এইরূপে নদীর জলে বাঁধ সৃষ্টি করিয়া জল-বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের সমৃদ্ধি সাধন খুবই লাভজনক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা ভারত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা যদি বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে জল-বিদ্যুৎশক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং ইহার ফলে ভারতের কৃষি ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। আমাদের কয়লার অভাবের জন্য কল-কারখানা বন্ধ রাখিতে হইবে না এবং উৎপাদন হ্রাসের কোন সম্ভাবনাও থাকিবে না, বরং অনেক অল্প খরচে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইবে, কৃষিজাত ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, গ্রামে গ্রামে ছোট-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং পরিত্যক্ত জনবিরল গ্রামগুলি জনবহুল সমৃদ্ধিশালী সহর ও বন্দরে পরিণত হইবে।

প্রতীক্ষা —গোপাল ঘোষ

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

১
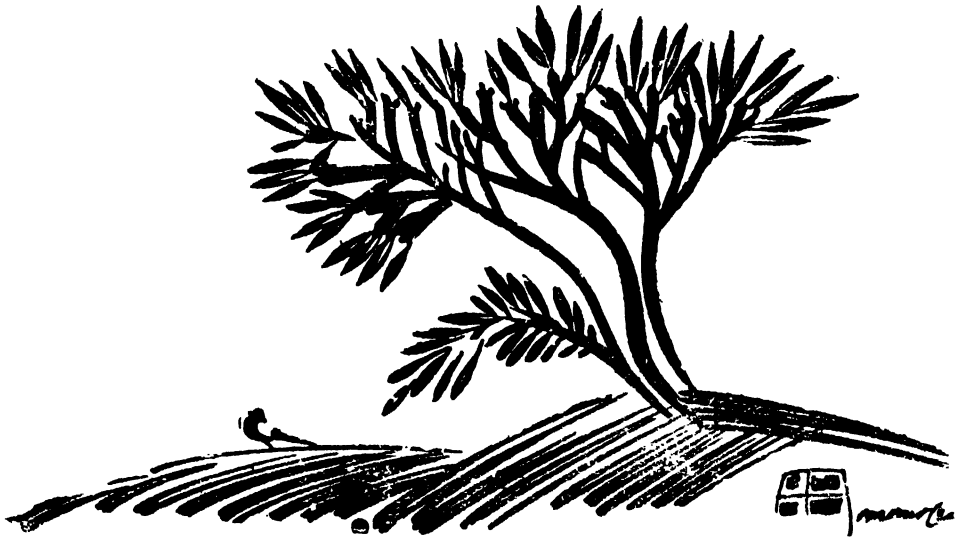
পরদিন রবিবার। সোমবার অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হইয়াছে। সকালেই গাঙ্গুলী মশায় মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া ডাক দিলেন। মাষ্টার মশায় বৈঠকখানাতে বসিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া বসাইলেন। কহিলেন—"কি ব্যাপার? সকালেই বেরিয়ে পড়েছেন যে?"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"বেরিয়ে না পড়ে উপায় কি? রেধো কি বাড়ীতে থাকতে দেবে। সব খবর চাউর হয়ে গিয়েছে—জান তো?"

—"জানি।"

—"রেধো চর লাগিয়েছে। তারা রাত-দিন গিন্নীর কাছে আনাগোণা করে—এতে ভাল হবে না, এতে আমার পরমায়ু ক্ষয় হবে—এই সব বলে তাঁর মন খারাপ করে দিচ্ছে। আর গিন্নীকে জান তো? পরের কথায় কেমন নেচে উঠেন। বাড়ীতে পা দিলেই নাচন সুরু করছেন। তাও কোন রকমে—ও-সব কথা শুনো না, ও মুখ্যু মেয়েমানুষগুলো কিছু জানে না—ইত্যাদি বলে ঠাণ্ডা করেছিলাম। কাল রাত্রে আবার অপয়া হতভাগা সহর থেকে এসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সারা রাত দাউ-দাউ করে জ্বলেছেন; সকালেও গন-গন করছেন দেখে পালিয়ে এলাম বাড়ী থেকে।"

—"কি বলছেন দিদিমা?"

—"যা বলা উচিত—বন্ধ করে দাও। বললাম—হাকিমদের নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে, তো বললেন—বেশ তো, আসুন তারা, খান, দান, চলে যান, জন্মদিন চলবে না। বুঝালাম সব খুলে বলে—এটা অত্যন্ত দরকার, তাতেও সেই একই কথা! তা কি করবে, বন্ধ করেই দেবে না কি?

মাষ্টার কহিলেন—"পাগল! তা কি আর হয়! সব প্রস্তুত। 'জন্মদিন' বলে নেমন্তন্ন করা হয়েছে সবাইকে, না হলে লোক-হাসানো হবে যে!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তা তো সত্যি!" একটু চুপ করিয়া কহিলেন—"তাও তো মেয়েরা বরণ করবে—এ কথাটা কানে যায়নি। তাহ'লে কি করতেন জানি না—"

—"ওরা কি এ কথাটা জানে না?"

—"তা কি হয়! সব কথাই জানে, এটা আর জানবে না? তবে রেধোর বজ্জাতি তো! ধাপে ধাপে দাওয়াই দিচ্ছে। ওটা হয়তো দেবে সব শেষে, যখন আর কোন উপায় থাকবে না।"

মাষ্টার নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"তোমার কথা তো খুব শোনে, তুমি যদি একবার বুঝিয়ে দাও—"

—"আমার বিরুদ্ধেই কি বলে নাই ভেবেছেন? ঠিক বলেছে—"

—"তাহ'লেও তোমাকে ভারী স্নেহ করে তো! দেখলেই জল হয়ে যাবে।"

—"এখন থাক। ওদের যা'-যা' অস্ত্র আছে, প্রয়োগ করা হয়ে যাক্। ইতিমধ্যে শ্যামলাল বাবু এসে পড়বেন। বিকেলে ঠিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমরা দিদিমাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব।"

—"যদি ঠাণ্ডা না হয়?"

—"না হলেও শ্যামলাল বাবুর সামনে অসৌজন্য কিছু করতে পারবেন না।"

গাঙ্গুলী মশায় করুণ স্বরে কহিলেন—"রেগে গেলে যে ওঁর জ্ঞান গম্যি থাকে না। বলছিলেন কি জান—ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটা পুকুরের জলে ফেলে দেব।"

মাষ্টার হাসিয়া কহিলেন—"যা বলেন বলুন, চুপ করে শুনে যান। বলবেন, বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। তার পর আমরা ওঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব এখন। এখন কাজের কথা শুনুন। ছেলেদের আয়োজন সব প্রস্তুত। বিকেলে একবার গিয়ে দেখে-শুনে আসতে বলেছে। বাগ্‌দী-পাড়ার মোড়ল মাহিন্দী বলে পাঠিয়েছে—ওদের ওখানে গিয়ে গানটা শুনে আসতে হবে; আর কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। বিকেলে তাহ'লে দু'জনে বেরিয়ে প্রথমে ছেলেদের ওখানে যাব, ওখানটা সেরে বাগ্‌দী-পাড়ায় যাব।"

গাঙ্গুলী মশায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আচ্ছা ভায়া, বলতে পার, কে কথাটা চাউর করলে?"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

—"আমার মনে হয়, মহেশ পণ্ডিতের কাজ। টোলো পণ্ডিত-গুলো চটলে ওদের কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।"

—"তা আপনি চটালেন কেন? ওকে পাত্তা দিলেন না। বিনয়ের দিকেই ঢলে পড়লেন!"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"চটালাম আবার কি? বলেছিলাম তো পদ্য পড়তে, তো নিজে থেকেই পড়ল না। বিনয়ের দিকে ঢলা তো তোমাদেরই কথায়। তোমরাই বললে—মেয়েদের দিয়ে বরণ করানো রেওয়াজ। বিনয় বলল—ও সব ব্যবস্থা করতে পারবে। এ কাজটি তো গাঁয়ে ও ছাড়া কারও দ্বারা হ'ত না।"

মাষ্টার মুচকি হাসিয়া কহিলেন—"তা বটে।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"হাসলে যে?"

—"এমনই। মানে—বিনয়ের অন্য মতলব কিছু নাই তো?"

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—"পাগল না কি? ঐ রকমই ছেলেমানুষী বুদ্ধি! কথার আঁট-সাট নাই। যা-তা বলে ফেলে। না হলে লোকটা খারাপ নয়?"

—"খারাপ তো নয়। কিন্তু বিপদেও তো কম পড়েনি। তিন-তিনটি শালী ঘাড়ে চড়ে বসেছে। গোদের উপর এক-আধটি নয়, তিন-তিনটে বিষ-ফোড়া! কোন গতিকে কারও ঘাড়ে একটাকেও চাপিয়ে দিতে পারলে কতকটা রেহাই পায়।"

—"সত্যি? তা কাজটা চুকে-বুকে যাক! একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! আমাদের তিল্লে যখন ধরেছে—"

—"সত্যি! শ্যামলাল বাবু আসুন, ওঁকে ধরে যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়।"

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"ওদের কথা ছেড়ে দাও, ভায়া। ওরা বক্তৃতাই করতে পারে। কাজের বেলায় কিছু না। আমারই কি হবে দেখ—"

গাঙ্গুলী মশায় বৈঠকখানায় আসিতেই দেখিলেন—বিনয় বসিয়া আছে। কহিলেন—"কি খবর?"

বিনয় কহিল—"সব ব্যবস্থাই ঠিক। উদ্বোধন-সঙ্গীত, সমাপ্তি-সঙ্গীত দু'টোই মিনু গাইবে। ছোকরাদের ত তাই ইচ্ছে। গান অভ্যেস হয়ে গেছে।" মৃদু হাসিয়া কহিল—"মেয়েগুলোর খুব উৎসাহ! ফুলের ব্যবস্থা করেছে দারোগা বাবুর বাগান থেকে। আরও যা-যা দরকার সংগ্রহ করেছে। মোট কথা, আমার মনে হচ্ছে, যে ভাবে অনুষ্ঠানটি হবে, সহরের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হবে না।"

গাঙ্গুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন—"ভগবানের কৃপা আর তোমাদের চেষ্টা! এখন ভালয়-ভালয় সব হয়ে যায় তাহ'লেই। তবে তোমাদের উপকার আমি কোন দিন ভুলব না—" শেষ-দিকটায় কণ্ঠস্বর সরস হইয়া উঠিল।

বিনয় কহিল—"মেয়েরা বলছে, আজ একবার আপনাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে নেবে। থিয়েটারের যেমন ড্রেস-রিহার্সাল হয়, তেমনই আর কি!"

—"বেশ, মাষ্টারকে নিয়ে যাব এখন।"

—"না, না, মাষ্টার মশায় থাকুন এবার। মানে, সে রকম দেখবার-শুনবার তো দরকার নাই। মিনুর তো এ সব অনেক বারই করা আছে। ত্রুটি কিছু হবে না। তবে আপনার পছন্দ হওয়া চাই তো?"

—"আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? যা করবে তাই আমার পছন্দ।"

বিনয় আবদারের সুরে কহিল—"তবু মেয়েদের ইচ্ছে, আপনাকে একবার দেখায়।"

—"বেশ, যাব তাহ'লে। কখন যেতে হবে?"

—"সন্ধ্যের সময়।"

—"সন্ধ্যেতে তো হবে না। মাষ্টারকে নিয়ে মনসা-মেলায় যাব। বাগ্‌দী ছোঁড়াগুলো কি রকম রপ্ত করলে দেখবার জন্যে।"

—"বেশ, ওটা শেষ করে আমাদের ওখানে আসবেন। আমরা সব প্রস্তুত করে রাখব। বেশী দেরী হবে না।"

বিকাল বেলায় গাঙ্গুলী মশায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় বেরোচ্ছ এত বেলাবেলি?"

গাঙ্গুলী মশায় রাগতঃ স্বরে কহিলেন—"যাচ্ছি আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। সব তো ভণ্ডুল হয়ে গেল তোমার একগুঁয়েমির জন্যে। সহর থেকে হাকিমরা আসবেন, কলকাতা থেকে শ্যামলাল আসবে, তাল সামলাতে হবে তো! তারই জন্যে পরামর্শ করতে যাচ্ছি সবার সঙ্গে।"

সন্ধ্যায় গাঙ্গুলী-গৃহিণী গা-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া তুলসী-তলায় প্রণাম সারিয়া, রান্না-ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী আসিল। সঙ্গে সৌদামিনী।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"কি করছেন জ্যেঠাইমা?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী আপ্যায়ন সহকারে কহিলেন—"এস মা এস, অনেক দিন আসনি; কেমন আছ?"

ঝি আসিয়া মাদুর পাতিয়া দিতেই দুই জনে বসিল। প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আপনিও বসুন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।"

যে ভাবে কথাটা বলিল, তাহাতে গাঙ্গুলী-গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বসিয়া উদ্বেগের স্বরে কহিলেন—"কি কথা?"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"ছেলেটার আজ জ্বর। বাড়ী থেকে বেরোতাম না। কিন্তু ব্যাপার দেখে থাকতে পারলাম না, ছুটে চলে এলাম—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ব্যাপার বল দেখি?"

—"আপনার কর্তাটির 'জন্মদিন' হচ্ছে আপনি জানেন?"

—"সে তো বারণ করে দিয়েছি। উনি বলে গেছেন—হবে না। তবে হাকিমদের নেমন্তন্ন হয়ে গেছে; তাঁরা আসবেন তো। তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে পরামর্শ করতে বেরিয়েছেন।"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"উনি বললেন—হবে না। আপনিও ভালমানুষ; বুঝে বসে রইলেন হবে না!"

সৌদামিনী কহিল—"তাই বটে! চিরদিন ভালমানুষী করে জ্বলে-পুড়ে মরল আমার খুড়িটি!"

গাঙ্গুলী-গিন্নীর রাগ হইল; কি এমন জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিয়াছেন তিনি স্বামীর জন্য! স্বামী কি তাঁহার মাতাল না বদচরিত্র! কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"উনি বলে গেলে কি হবে, বন্ধ হয়নি। আমাদের পাড়ায় সারা দিন গান-বাজনা আর বক্তৃতা চলছে। বাড়ীতে টেকা যাচ্ছে না! বাড়ীতে অসুখ। তবু তো কিছু বলবার যো নাই। স্কুলের কর্তার জন্যে হচ্ছে।"

সৌদামিনী কহিল—"তা ছাড়া কর্ত্তার পেয়ারের লোক সব। দু'দিন বাদে একেবারে আপনার লোক হয়ে যাবে।"

কথাটা গাঙ্গুলী-গিন্নীর কানে খোঁচার মত লাগিল। তবু কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন—"তোমাদের পাড়ায় গান-বাজনা হচ্ছে কেন?"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিল—"হবে না? বিনয় বাবুর ত্রিশ বছরের ধুমড়ো, আইবুড়ো শালীটি সভায় গান গাইবে—বক্তৃতা করবে যে।"

সৌদামিনী কহিল—"গলায় মালাও পরাবে। তা ছাড়া আরও ডাগর মেয়ে আছে কতকগুলো। আমাদের সধবা মেয়েরা যেমন পূজোর সময় মা দুর্গাকে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে না? তেমনই করে কাকাকে বরণ করবে।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"এত সব ব্যাপার হবে, সে কথা তো কেউ বলেনি?" সৌদামিনীকে কহিলেন—"তুইও তো বলিসনি, বাছা?"

সৌদামিনী গদ্-গদ করিয়া বলিল—"আমি কি জানতাম না কি এত সব! আজই তো শুনলাম। তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে, খুড়ি, শোন তো, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে!"

আতঙ্কে গাঙ্গুলী-গিন্নীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"আবার কি!"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আপনাদের বাগান থেকে রোজ তরি-তরকারী বিনয়ের বাড়ী যাচ্ছে—পুকুর থেকে বড়-বড় মাছ যাচ্ছে! নূতন করে ঘর ছাওয়া হয়ে গেছে, বিনয় বাবুর শালীর জন্যে ভাল শাড়ী, ব্লাউস কেনবার জন্যে সহরে না কি লোক পাঠানো হয়েছে—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী নীরস কণ্ঠে কহিলেন—"শাড়ী-টাড়ীর কথা জানি না। কিন্তু মাছ-তরকারী তো সব মাষ্টারদের বাড়ীতেই যায়। তোমাদের বাড়ীতেও যায়—"

—"সে কথা কে অস্বীকার করবে জ্যেঠাইমা! ওঁর খুব অনুগ্রহ আমাদের উপর। খুব ভাল লোক উনি। কিন্তু ওঁর ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে যদি কেউ ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে, ওঁর শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে, ওঁর মা ভগবতীর মত স্ত্রী'কে পথে বসাবার চেষ্টা করে—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"সে আবার কি?"

—"ব্যাপার কি জানেন? বিনয় মাষ্টার চেষ্টা করছে, ওর শালীটার সঙ্গে আপনার কর্ত্তাটির বিয়ে দিতে।"

গাঙ্গুলী-গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের স্পন্দন যেন থামিয়া আসিল। কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। বিহ্বল চক্ষে প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী'র মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সৌদামিনী কহিল—"দেখ খুড়ি, ও-রকম করে হাল ছেড়ে দিলে হবে না। বুড়ো বয়সে ভীমরথী হয়েছে কাকার। তুমি শক্ত না হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী ক্ষীণ স্বরে কহিলেন—"আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না—"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"আমার সঙ্গে আসুন। নিজের চোখে সব দেখুন, নিজের কানে সব শুনুন। তার পর যদি বিশ্বেস হয়তো, যা ব্যবস্থা করতে হয়, করবেন।"

১১

রাত্রি আটটা। গাঙ্গুলী মশায় একা বিনয় মাষ্টারের বাড়ীতে হাজির হইলেন। বিনয় মাষ্টার বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইল।

বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর পাশেই প্রফুল্ল মাষ্টারের বাড়ী। মাটীর দোতলা। খড়ে ছাওয়া। দোতলার ঘরটির একটি ছোট জানালা বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর দিকে। সেটি দিয়া বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর সমস্ত উঠানটা, বারান্দারও কতকটা দেখা যায়। জানালাটি সারা দিন বন্ধ থাকে, রাত্রে খোলা হয়। তবে প্রফুল্ল-গৃহিণীর বিনয়-গৃহিণীর সঙ্গে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে দিনের বেলাতেও জানালাটি কিছুক্ষণের জন্য খোলা হয়। সম্প্রতি জানালাটি অর্দ্ধোন্মুক্ত; তাহার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কয়েক জোড়া চোখ বিনয় মাষ্টারের বাড়ীর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

গাঙ্গুলী মশায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই কয়েকটি মেয়ে উলুধ্বনি করিল ও শাঁখ বাজাইল। মেয়েগুলি সাজগোজ করিয়াছে, পরনে রং-বেরংএর শাড়ী, ব্লাউস। মাথার চুল লম্বা বেণীতে আবদ্ধ হইয়া সাপের মত পিঠে লুঠাইতেছে। উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা বায়ু-হিল্লোলিত বেতস লতার মত আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সৌদামিনী কহিল—"কাকার আমার শালী-ভাগ্য বরাবরই ভাল। তোমারাও তো চার-পাঁচ বোন ছিলে, নয় গো খুড়ী?

সৌদামিনীর কথাগুলি একমুঠো গরম নুণের মত গাঙ্গুলী-গিন্নীর মনের উপর ছড়াইয়া পড়িল। জ্বালা ধরিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীর যাহার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাহাকে লোকে ঠাট্টা করিবে বৈ কি!

গাঙ্গুলী মশায় ঘরে ঢুকিলেন। মেজের উপর একটি গালিচার আসন পাতা। তাহার সামনে একটি থালায় লুচি, থালার চারি দিকে কয়েকটি বাটিতে নানা রকমের তরকারী, রেকাবীতে মিষ্টি ও পায়স, এক পাশে এক গ্লাস জল। একটু দূরে একটি ফ্রক-পরা ছোট মেয়ে পাখা হাতে বসিয়া আছে।

গাঙ্গুলী মশায় বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"এ আবার কি?"

বিনয় সবিনয়ে কহিল—"একটু খেয়ে যেতে হবে।"

"এ বয়সে এত খাওয়া সহ্য হবে কি"—গাঙ্গুলী মশায়ের মুখে আসিল, কিন্তু চাপিয়া গেলেন। আসনে বসিতেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—"থাক্, থাক্, পাখা করতে হবে না।"

বিনয় কহিল, "করুক। এখন থেকে মানী লোকদের সেবা করতে শেখা দরকার। তা ছাড়া আপনার মত লোকের সেবা করবার সৌভাগ্য ক'দিন হয় ওদের!"

খাওয়া শেষ হইলে গাঙ্গুলী মশায় বারান্দায় আসিলেন। একটি মেয়ে আসিয়া হাতে জল ঢালিতে লাগিল।

সৌদামিনী কহিল—"এতক্ষণে খাওয়া শেষ হল; তবু শ্বশুর বাড়ীর খাওয়াটা ভালই হল বোধ হয়!"

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"প্রায়ই তো আসেন, খান-দান।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"না তো। দিনই রাত্রে তো বাড়ী খান।"

সৌদামিনী কহিল—"তোমাকে খাপ্পা দেবার জন্তে দিনই দু'বার করে খেতে হয় বেচারাকে। এই বয়সে এই করতে গিয়ে পেটের রোগ না হয়ে যায় শেষে।"

হাত ধোওয়া শেষ হইলে গাঙ্গুলী মশায় ঘরে গিয়া মাদুরে বসিলেন। অদূরে আর একটি মাদুর পাতা, তাহার উপরে একটি হারমোনিয়াম বসানো। কিছুক্ষণ পরে বিনয় মাষ্টারের বড় শালী ঘরে ঢুকিল। সাজগোজের বাহার আজ সেদিনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। মেয়েটি গাঙ্গুলী মশায়কে নমস্কার করিয়া মাদুরে বসিল ও অবিলম্বে গান সুরু করিল।

মেয়েদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কোমল ও মধুর। তাহা ছাড়াও এ মেয়েটির কণ্ঠস্বরে বহু দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া গেল। গাঙ্গুলী মশায় মেয়েদের গান, গ্রামোফোনে ছাড়া, সামনে বসিয়া কখনও শুনেন নাই। একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"বিনয় বাবুর বড় শালী গান গাচ্ছে; সভায় গাইবে কি না।"

সৌদামিনী কহিল—"হ্যাঁ গা, নাচতে জানে?"

—"জানে বৈ কি।" পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে, ওরা নাচতে জানে, নাচাতেও জানে।"

সৌদামিনী কহিল—"নাচুনে, গাউনে মেয়ে দেখে কাকার আমার মুণ্ডু ঘুরে গেছে। ওকে পেলে আমার বুড়া খুড়ীটিকে যে বনবাসে পাঠাবে, তাতে আশ্চর্য্য কি।"

চমকিয়া উঠিলেন গাঙ্গুলী-গিন্নী। বনবাস! বনবাস না হোক কাশীবাস তো বটে! গাঙ্গুলী মশায় তাঁহাকে কাশীবাস করিবার জন্ত সেদিনও জপাইতেছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল।

গান শেষ হইল। সুরের মধুর রেশটুকু ঘরের বাতাসে পাক খাইয়া খাইয়া ক্রমশঃ লীন হইয়া গেল। গাঙ্গুলী মশায় সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে।"

তার পর কবিতা পাঠ। ধীরে, ধীরে, সুস্পষ্ট কণ্ঠে ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত মেয়েটি কবিতা পাঠ করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল মাষ্টারের কোঠার উপরেও তাহা শুনা যাইতে লাগিল। প্রফুল্ল মাষ্টারের স্ত্রী কহিল—"বক্তৃতা করছে মেয়েটা—"

সৌদামিনী কহিল—"কতই জানে! ধন্তি মেয়ে বাবা! থুরে দণ্ডবৎ। খুড়ীর কপালে এমন শত্রু ছিল কে জানত।"

কবিতা পাঠের পর বিনয় মেয়েটিকে কহিল—"মালাটা কি ভাবে পরাতে হবে, একবার দেখে নেবে না কি?"

মেয়েটি লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। গাঙ্গুলী মশায় শশব্যস্তে কহিলেন—"থাক, থাক, ও আর আজ কেন?"

বিনয় কহিল—"একটা মালা তৈরী করা আছে যে—"

—"তা থাক গে।"

বিনয় মেয়েটিকে কহিল—"তাহ'লে এক কাজ কর মিনু, মালাটি ওঁর পায়ে দিয়ে, ওঁকে প্রণাম করে চলে যাও।"

বিনয়ের চোখের ইঙ্গিতে একটি ছোট মেয়ে একটি ফুলের মালা আনিয়া মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি মালাটি হাতে লইয়া দ্রুতপদে, নত-মস্তকে গাঙ্গুলী মশায়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মালাটি পর-পর গাঙ্গুলী মশায়ের দুই পায়ে ঠেকাইয়া গাঙ্গুলী মশায়ের কোলের উপরে নামাইয়া রাখিল, তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গাঙ্গুলী মশায়ের আপাদ-মস্তক ঘন-ঘন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল, নেশাগ্রস্ত লোকের মত মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল এবং কয়েক মুহূর্তের জন্ত বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র চেতনা রহিল না। সম্বিত লাভ করিতেই দেখিলেন—মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে এবং বাহিরে মেয়েরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে।

সৌদামিনী কহিল—"সব দেখলে শুনলে তো? এততেও বিশ্বাস হল না?"

রাগে, দুঃখে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সারা মন জ্বলিতেছিল, কান্নার আবেগ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সবলে তিনি নিজেকে সংযত করিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে মেয়েটি উঠানে নামিল। তাহার বোনেরা তাহাকে ঘেরিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—"কি দিদি! কতখানি ঘায়েল হল?"

এক জন কহিল—"যে রকম মাতালের মত টলতে-টলতে গেলেন, বাড়ীতে পৌছবেন তো, না রাস্তায় কাৎ হয়ে থাকবেন।"

আর এক জন কহিল—"মালাটা আজ কোল পর্য্যন্ত উঠল, এর পর গলায় উঠবে।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী দুই চোখ ভরিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া লইলেন। কান ভরিয়া কথাগুলি শুনিলেন। সমস্ত ব্যাপারটির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

১২

সৌদামিনীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। মুখ-চোখ জ্বালা করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। চলিতে কষ্ট হইতেছে। নিদারুণ ক্রোধ ও লজ্জা। বুড়া বয়সে এই কেলেঙ্কারী! বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে! এত দিন যাহার সঙ্গে সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করিয়াছে, তাহাকে পথে বসাইয়া কোথাকার কে একটা মেয়েকে ঘরে ঢুকাইবার চেষ্টা! মাঝে-মাঝে ক্রোধের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে দুই চোয়াল আপনা হইতে দৃঢ় হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিতেছে। মাঝে-মাঝে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছেন—"ছিঃ ছিঃ, এই দেখতে হল! এর চেয়ে মরণ হ'ল না কেন?"

সৌদামিনী নীরবে তাঁহার সঙ্গে পথ চলিতেছে। কোন উত্তেজক কথা বলিতেছে না, সান্ত্বনাও দিতেছে না। গাঙ্গুলী-গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছে সে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিয়া উঠিলেন—"বুড়োর সামনে আজ গলায় দড়ি দেব।"

সৌদামিনী এতক্ষণে কথা কহিল—"ও-সব কোরো না, খুড়ী। ওতে কি আর লাভ হবে। বুড়ো নিশ্চিন্তি হয়ে দশ দিন পেরোতে না পেরোতে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসবে।"

গাঙ্গুলী-গিন্নী রোষ-তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—"ঠিক বলেছিস! কি করা যায় বল দেখি?"

—"কোথাও নিয়ে পালিয়ে যাও। কোন মেয়ের কাছে। তোমার তো যাবার যায়গার অভাব নাই।"

কাশী যাওয়ার কথা মনে পড়িল। বেয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কহিলেন—"ঠিক বলেছিস! তাই করব। বুড়োকে নিয়ে পালাব। গাঁয়ে ফিরব না, যত দিন না ঐ ডাকিনী মাগীগুলো গাঁ থেকে সরে যায়।"

পাড়ায় ঢুকিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী সৌদামিনীকে কহিলেন—"আমাকে রাধানাথ ঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চল।"

সৌদামিনী বিস্ময়ের স্বরে কহিল—"কেন?"

—"রাধানাথ ঠাকুরপোকে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করাব। ও ছাড়া কেউ পারবে না।"

রাধানাথ বাড়ীতেই ছিল। গাঙ্গুলী-গিন্নী বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন না। সৌদামিনী গিয়া রাধানাথকে ডাকিয়া আনিল। রাধানাথ সসম্মানে কহিল—"বৌঠান! এত রাত্রে? কি খবর? সব ভাল তো?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"ভাই! আমার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে—"

রাধানাথ বিস্ময় ও ত্রাসের ভাণ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"কি হয়েছে?"

—"বুড়ো আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

—"সে কি? তা তো শুনিনি? শুনেছিলাম, কি সব হচ্ছে! জন্মদিন, টন্মদিন—"

গাঙ্গুলী-গিন্নী সরোষে কহিলেন—"ও সব ধাপ্পা! বিনয় মাষ্টারের একটা ধাড়ী শালী আছে। এই ফন্দিতে মেয়েটার সঙ্গে মাথামাখি করে, তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা—"

রাধানাথ সবিস্ময়ে কহিল—"এ্যাঁ! বলেন কি? এই সব ব্যাপার!" সৌদামিনীর দিকে তাকাইয়া কহিল—"আমি বলিনি তোকে—গাঙ্গুলী দাদার বুদ্ধি-শুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে?"

সৌদামিনী কহিল—"শুধু তুমি কেন, গাঁ-শুদ্ধ সবাই বলছে—ভীমরথী হয়েছে বুড়োর!"

গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন—"কি উপায় বল দেখি?"

রাধানাথ কহিল—"কি আর উপায় করবেন? কুলীন বামুনরা আগে পঞ্চাশ-ষাটটা বিয়ে করতো। এখন যদি আর একটি মাত্র বিয়ে করতে চায় তো কে মানা করবে?"

—"মেয়ে-জামাই রয়েছে। এক-ঘর নাতি-নাতনী রয়েছে, তা সত্ত্বেও বিয়ে করবে?"

রাধানাথ মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিল—"তা তো করা উচিত নয়, বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে ভদ্রলোকে তা করে না আজকাল। তবে যদি ঐ দু'টোই কারও বিগড়ে গিয়ে থাকে—"

—"যদি এখান থেকে নিয়ে চলে যাই?"

"কোথা যাবেন?"

—"কাশী। সেখানে আমার বেয়াই-বেয়ান থাকেন—আমাদের যেতে বলেছেনও—"

—"আপনি তো নিয়ে যেতে চান, কিন্তু উনি যদি যেতে না চান?"

—"তাই তো তোমার কাছে এসেছি, ঠাকুরপো, তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না। তোমার গাড়ী আছে, লোক-জন আছে। যদি বুড়ো না যেতে চায় তো হাতে-পায়ে বেঁধে চ্যাংদোলা করে গাড়ীতে উঠিয়ে দেবে।"

রাধানাথ মুখ টিপিয়া হাসিল, সৌদামিনীও পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকারে গাঙ্গুলী-গিন্নীর কিছুই ঠাহর হইল না।

সৌদামিনী কহিল—"তোমাদের তো লোকজন, গরুর গাড়ী, কিছুরই অভাব নাই। রাধানাথ কাকাকে বলবার দরকার কি?"

গাঙ্গুলী-গিন্নী তীব্র কণ্ঠে জবাব দিলেন—"আছে তো। তাতে আমার কি! কর্ত্তারই যদি এমন মতি-গতি হয় তো চাকর-বাকর আমার কথা শুনবে কেন?"

রাধানাথ কহিল—"বেশ, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। দু'জন লোক সঙ্গে যাবে। তারা টিকিট করে আপনাদের ট্রেণে তুলে দেবে। কাল সকালের গাড়ীতে যাবেন তো? রাত তিনটেয় বেরোতে হবে এখান থেকে। আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।"

১৩

পরদিন বেলা আটটায় হেড-মাষ্টার, বিনয় মাষ্টার ও গ্রামের কয়েকটি মাতব্বর ছেলে গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায় হাজির হইল। খামার-বাড়ীতে একটা লোক কাজ করিতেছিল। কহিল—"কর্ত্তা এখনও আসেন নাই, এজ্ঞে—"

মাষ্টার মশায় আশ্চর্য্য হইলেন। কাল গাঙ্গুলী মশায় নিজেই তাহাকে সকলকে সঙ্গে করিয়া এই সময়ে বৈঠকখানায় আসিতে বলিয়াছিলেন, আর নিজেই অনুপস্থিত! শরীর খারাপ হইয়াছে না কি? আজই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান, আজ যদি তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ হইয়া থাকে তো বিপদের কথা।

সকলে বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। ঝি উঠান ঝাঁট দিতেছিল। ডাকাডাকিতে ঝাঁটা-হাতেই বাহির হইয়া আসিল। সমস্বরে প্রশ্ন হইল—"গাঙ্গুলী মশায় কোথায়?"

ঝি সাফ, জবাব দিল—"ওনারা তো ভোর রেতে চলে গেলেন।"

সমবেত, সন্ত্রস্ত স্বরে প্রশ্ন হইল, "কোথায়?"

ঝি কহিল—"তীর্থ করতে কাশী"—বলিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সকলে হতবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমাপ্ত

ভাগ্যলিপি

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ভাগ্যলিপি জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, এই সম্বন্ধে আলোচনা চলিলে সকলেই তাহাতে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ দশ জনের আড্ডায় কিংবা মজলিসে হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের ফলাফল বলিতে পারেন, এমন কেহ উপস্থিত হইলে প্রায় সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যফল জানিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন। নিজেকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দেন, কিংবা পুরুষকারে বিশ্বাসী ব্যক্তিকেও এইরূপ ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। হাত দেখিয়া মনের মত দুই-চারিটা কথা বলিতে পারিলে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুবিধাও করা যায়। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কাহিনীও শুনা যায়। যাঁহারা জ্যোতিষের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই,—কোন কোন জ্যোতিষী হাত কিংবা কোষ্ঠী বিচার করিয়া নির্ভুল ভাবে অনেক কথা বলিতে পারেন। ভবিষ্যতের কথা যে কোন কোন স্থলে সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অভিজ্ঞতারও অভাব নাই।

ভাগ্যলিপি জানিবার জন্য কেহ কেহ আবার বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়েন: কোথাও কোন জ্যোতিষীর খ্যাতি শুনিলে তাহার কাছে ছুটিয়া যান। ভৃগুসংহিতার সন্ধানে কেহ কেহ অজস্র অর্থব্যয়ও করেন। মানুষের এই দুর্ব্বলতায় সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ী জ্যোতিষীরাও নিজেদের সুবিধা করিয়া লন। কবচ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা গ্রহদোষ কাটাইবার জন্য কেহ কেহ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। এই রকম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী জ্যোতিষীরা যেন মক্কেলের হইয়া গ্রহের দরবারে ওকালতির ভূমিকায় নামিয়া আসেন।

মানুষ যে ভাগ্যলিপি জানিতে কিরূপ বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে, তাহার বহু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সম্বন্ধে এইরূপ একটি অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তিনি এক বার শুনিলেন যে শ্রীরামপুরের কোন এক দুর্গম পল্লীতে এক জন তান্ত্রিক জ্যোতিষী আছেন, তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমতা। এই কথা শুনিয়া মাত্র সাহিত্যিক মহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তাঁহার সন্ধানে গেলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক জন গ্রাজুয়েট ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তান্ত্রিক মহাশয় বলিলেন, 'তুমি বাপু ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারবে না।' ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে, আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি।' তখন তান্ত্রিক বলিলেন, 'তবে কিছুতেই তুমি আই-এ পাশ করিতে পারিবে না।' উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন, 'আজ্ঞে, তাও করিয়াছি।' তান্ত্রিক বলিলেন, 'তাহা হইলে কিছুতেই বি-এ পাশ করিতে পারিবে না।' ইহার উত্তরে যখন শুনিলেন বি-এ পাশ করিয়াছেন; তখন তান্ত্রিক ক্ষেপিয়া গিয়া বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি ফাঁকি দিয়া পাশ করিয়াছ।' এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াও তাঁহার যেখানে-সেখানে ভাগ্য যাচাই করিবার বাতিক সারে নাই!

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'এই সকল হাত-দেখা কিংবা কোষ্ঠী-বিচারে তাঁহাদের মোটেই বিশ্বাস নাই।' অথচ দেখি,—যখন কোন জ্যোতিষী বলিল, 'মহাশয়, অমুক বর্ষে আপনার পত্নীহানি যোগ আছে।' তাহার দুই-চারি দিন পরে তাঁহারই হাতে প্রতিষেধকরূপে প্রবালের আংটী রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমাদের এক নিরাকারবাদী প্রবীণ সাহিত্যিক বন্ধু তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে নিরাকার পরম ব্রহ্মের প্রভাব অপেক্ষা নবগ্রহের প্রভাবই অধিক স্বীকার করিয়া তাহার প্রতীকস্বরূপ প্রবালের হার পরেন ও হাতে গোমেদের আংটী ধারণ করেন।

খ্যাতনামা জ্যোতিষীদিগের বিজ্ঞাপন দেখিলেই বুঝা যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলার কর্ত্তা, মন্ত্রী, জমিদার, অধ্যাপক, কেরাণী প্রভৃতি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য লোকই তাঁহাদের গণনায় এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসী। এখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই জ্যোতিষ-বিদ্যার মূলে কি কোন সত্য আছে? কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর কি ইহা প্রতিষ্ঠিত? বর্ত্তমান যুগে বেদের বাণী অথবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বাণী বলিয়া কোন বিষয় চালাইয়া দেওয়া শক্ত। সুতরাং ইহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। দুঃখের বিষয়, আমাদের গবেষণা-বৃত্তি নানা দিকে পরিচালিত হইলেও এই দিকে তেমন কেহই দৃষ্টি দেন নাই। শুধু বুজরুকি বলিয়া উড়াইয়া যে জিনিষকে দেওয়া যায় না, তাহার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই উচিত।

জন্ম-সময়ের উপর যে মানুষের দেহ-মনের অনেকখানি নির্ভর করে, তাহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে বুঝা কঠিন। এইরূপ করিলে বুঝা যাইবে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য সত্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সম্ভবতঃ সুদীর্ঘ কাল পর্য্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার তথ্যগুলি গৃহীত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বচনগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, পরীক্ষা করিলে তাহাই প্রমাণিত হয়। জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের দেহ-মনের যে বিকাশ সাধন কিরূপে হইতে পারে, একটি সাধারণ অথচ সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রবি একটি প্রধান গ্রহ। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও সৌরমণ্ডলে রবির প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, এই পরিভ্রমণে সূর্য্য হইতে দূরত্ব অনুযায়ী গ্রীষ্মাদি ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। দেখা যায়, সকল মাসে বা সকল সময়ে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের প্রভাব সমান থাকে না; সুতরাং বৈশাখ মাসে যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, নিশ্চয়ই পৌষ মাসে সেরূপ হয় না। বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান। এই মাসে যে সকল ব্যক্তির জন্ম, তাঁহাদের মধ্যে মানসিক কতকটা সাদৃশ্য থাকিবে। প্রত্যেক মাসের বেলায়ই সেই কথা খাটে। বৈশাখে নূতন পত্র-পল্লবশোভিতা পৃথিবী, অপর দিকে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ। এক দিকে নব উন্মাদনা, অপর দিকে বিরাট অসহিষ্ণুতা। বৈশাখে জাত ব্যক্তির দেহ-মনে প্রকৃতির এই ছাপ পড়ে। তাহার অল্পে উত্তেজনা আসে, মান-অভিমান প্রবল হয়। সামান্য জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ইহাদের জন্মে। আবার নব নব সৃষ্টির উদ্ভাবনী প্রতিভাও থাকে। অন্যান্য গ্রহ প্রবল হইলে এইরূপ জাতক কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হইতে পারেন। আবার কু-গ্রহের প্রভাবে মান-অভিমান হইতে প্রতিশোধপরায়ণ, অল্প উত্তেজনা হইতে অতি-ক্রোধী, অস্থির-চিত্ত হইতে পারেন। মোটের উপর তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করিলে এই কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশে মানুষের দেহ-মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, তাহা শুধু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী না বুঝাইয়া আমরা অন্য ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমাদের আদর্শ হইবে। এই জন্য বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া আমরা বিভিন্ন রাশিচক্রের তুলনামূলক আলোচনা করিব। রাশিচক্রের আলোচনা করিতে হইলে এই সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক কথা আসিয়া পড়ে, এই জন্য আমাদের আলোচনার সাহায্য করে এমন কতকগুলি পরিভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমেই একটি রাশিচক্র দেখুন—
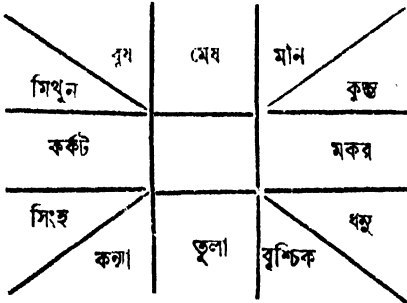
দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের মধ্যে যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন—এই বারোটি রাশির উদয় হইয়া থাকে; এইগুলিকে বলে লগ্ন। জন্মের সময় অনুযায়ী জাত-ব্যক্তির লগ্ন নির্ণয় করা হয়। জন্মকুণ্ডলীতে 'লং' এই সাঙ্কেতিক কথার দ্বারা লগ্ন সূচিত হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে দ্বাদশটি স্থানে তৎকালীন গ্রহ-সন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের ভাগ্যফল নির্দ্ধারিত হয়। যথা—১। তনুভাব, ২। ধনভাব, ৩। সহজ বা ভ্রাতৃভাব, ৪। বন্ধু বা মাতৃভাব, ৫। পুত্রভাব, ৬। রিপুভাব, ৭। জায়াভাব, ৮। নিধনভাব, ৯। ধর্ম্ম বা ভাগ্যভাব, ১০। কর্ম্মভাব, ১১। আয়ভাব, ১২। ব্যয়ভাব। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারিটি গৃহকে 'কেন্দ্র' বলা হয়। কেন্দ্রস্থিত গ্রহ মহা বলবান হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে নবম ও পঞ্চম গৃহকে 'ত্রিকোণ' বলা হয়। দ্বাদশটি গৃহের মধ্যে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ—এই আটটি গৃহকে শুভ গৃহ বা শুভ ভাব এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারিটি গৃহকে অশুভ গৃহ বা অশুভ ভাব বলা হয়। প্রত্যেক গৃহ বা ভাবের আবার অধিপতি গ্রহ আছেন। যেমন,—মেষের অধিপতি মঙ্গল, বৃষের শুক্র, মিথুনের বুধ, কর্কটের চন্দ্র, সিংহের রবি, কন্যার বুধ, তুলার শুক্র, বৃশ্চিকের মঙ্গল, ধনুর বৃহস্পতি, মকর ও কুম্ভের শনি, মীনের বৃহস্পতি। যে যে রাশির গৃহ শুভ ভাব, সেই সেই রাশির অধিপতি গ্রহকে শুভ ভাবাধিপতি আর যে যে রাশির গৃহ অশুভ ভাব হয়, সেই সেই রাশির অধিপতিকে অশুভ ভাবাধিপতি বলা হয়। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—এই তিনটি শুভগ্রহ; রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতুকে পাপগ্রহ বলা হয়। বুধ আবার পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্ষীণ চন্দ্র পাপগ্রহরূপে পরিগণিত। চন্দ্র যে গৃহে অবস্থান করে, তাহাই জাতকের রাশি। গ্রহগণের আবার তুঙ্গস্থান ও নীচস্থান আছে। মোটামুটি মনে রাখিতে হইবে যে মেষরাশি রবির, বৃষরাশি চন্দ্রের, মকররাশি মঙ্গলের, কন্যারাশি বুধের, কর্কটরাশি বৃহস্পতির, মীনরাশি শুক্রের, তুলারাশি শনির তুঙ্গ বা উচ্চস্থান। রাহুর উচ্চস্থান মিথুন, কেতুর উচ্চস্থান ধনু। তুঙ্গ বা উচ্চস্থানস্থ গ্রহ বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে। এখন নীচস্থানের কথা বলা হইতেছে—রবির নীচস্থান তুলারাশি, চন্দ্রের নীচস্থান বৃশ্চিকরাশি, মঙ্গলের নীচস্থান কর্কট, বুধের মীন, বৃহস্পতির মকর, শুক্রের কন্যা, শনির মেষ, রাহুর ধনু ও কেতুর বৃষরাশি নীচস্থান। প্রত্যেক রাশির অধিপতি গ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার মিত্র এবং সপ্তম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার শত্রু।

আমরা রাশিচক্র বিচারের জটিল বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে করিব না। নির্ভুল গণনা করিতে হইলে বা অধিকতর স্থির ফল নির্ণয় করিতে স্ফুট-অনুযায়ী ভাবচক্র নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এখানে তাহা না করিলেও আমাদের বিশেষ বাধা হইবে না। শুধু গ্রহগণের দৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। গ্রহ যে গৃহে অবস্থান করে, সেই গৃহ হইতে তৃতীয় ও দশম স্থানে (শনি ব্যতীত) গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে (মঙ্গল ব্যতীত) গ্রহগণের ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে (বৃহস্পতি ব্যতীত) অপর গ্রহগণের দ্বিপাদ দৃষ্টি, সপ্তম স্থানে সকলেরই পূর্ণ দৃষ্টি। অধিকন্তু তৃতীয় ও দশমে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি। পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে (দাক্ষিণাবর্ত্তে) রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; কেতুর কোন দৃষ্টি নাই। কোষ্ঠী-বিচারের অসংখ্য যোগ ও জটিল বিচার পদ্ধতির কথা আলোচনা না করিয়াই আমরা সাধারণ ভাবে গ্রহগণের অবস্থিতি অনুযায়ী জাত-ব্যক্তির জীবনের একটা আভাস পাইতে পারি।

মনে রাখিতে হইবে যে, পাপগ্রহ যে গৃহে থাকে বা দৃষ্টি করে, সেই ভাবেরই হানি হয়; তবে স্বগৃহে থাকিলে অনিষ্ট হয় না। শত্রুগৃহস্থ গ্রহ ভাবফলের হানি করে, মিত্রগৃহে ভাবফলের বৃদ্ধি করে, তুঙ্গীগ্রহ অত্যন্ত শুভ। আবার যদি কোন শুভ ভাবের অধিপতি অশুভ স্থানে অবস্থান করেন, তবে সেই শুভ ভাবের হানি হয়।

আমরা প্রায় একধর্ম্মী কয়েকটি রাশিচক্রের পর পর আলোচনা করিব। পৃথক্ ভাবে বিচার না করিয়া সাদৃশ্যমূলক আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। প্রথমেই সংসারবিরাগী জগতের হিতবাণী প্রচারক মহাপুরুষদের কথাই বলিব। প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মকুণ্ডলী দেখুন—

শ্রীচৈতন্যদেব

রা ২৫
র বু শু ২৫
লং
কে ১১
চ ১১
বৃ ২০
ম ২০
শ ১৮
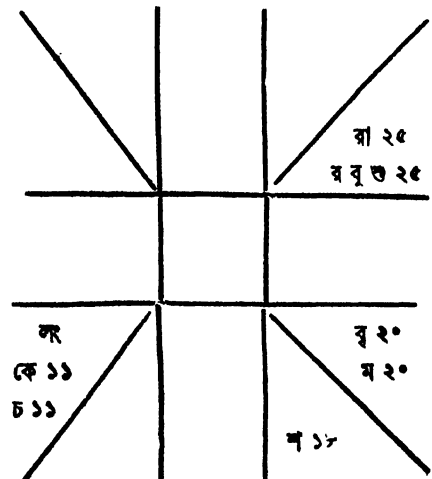
শ্রীচৈতন্যদেবের সিংহলগ্নে জন্ম, লগ্নে চন্দ্র ও কেতু, চতুর্থে শনি, ... বৃহস্পতি ও মঙ্গল, সপ্তমে রবি, বুধ ও রাহু অবস্থান করিতেছেন। ... সাতটি গ্রহ কেন্দ্রে এবং দুইটি গ্রহ কোণে। ইহা একটি প্রবল ... যোগ। চতুর্থস্থানে ও পঞ্চমস্থানে বিদ্যার বিচার হইয়া থাকে। ... চতুর্থের অধিপতি মঙ্গলে ও পঞ্চমের অধিপতি বৃহস্পতি একত্রে ... স্থানে অবস্থান করায় বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় শুভ হইয়াছে। ...তর তুল্য জ্ঞানী ও মহাপাণ্ডিত্য জাতক লাভ করিয়াছেন। ... লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ রহিয়াছে, পত্নীকারক গ্রহ শুক্র পাপযুক্ত, চন্দ্রও পাপযুক্ত সুতরাং পত্নীহানি যোগ ও দাম্পত্যজীবনে অনাসক্তি বুঝাইতেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব
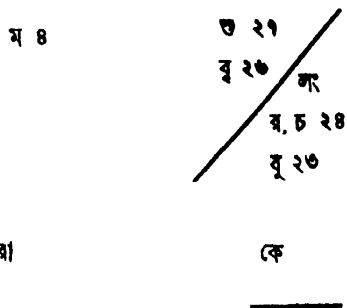
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকুণ্ডলীতে দেখা যায়, পঞ্চমাধিপতি বুধ ও ... শনি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করিয়াছে; নবমাধিপতি ... ও শনির সঙ্গে পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ। শনির ... পঞ্চমপতি ও নবমপতির সম্বন্ধই তাঁহাকে তপশ্চর্য্যায় ... করিয়াছে। মৃত্যুভাবে শনি, শুক্র ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, ... গ্রহ ও দশমপতি মঙ্গল চতুর্থে, সেই হেতু জাতক সিদ্ধিলাভ ... হন এবং একটি সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইয়াছেন। ইঁহার পত্নীস্থান ...গত অর্থাৎ রাহু ও শনির মধ্যবর্ত্তী; মঙ্গলের অবস্থানও ...কারক, এতদ্ভিন্ন সন্ন্যাসযোগ থাকায় দাম্পত্য-জীবন সূচনা ... না —এইরূপ ব্যাখ্যা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুযায়ী ও জটিল। ... সাধারণ-বুদ্ধি অনুযায়ী উভয় রাশিচক্র পরীক্ষা করুন, উভয় ... কতকটা সাদৃশ্য আছে; একটি চক্রে লগ্নে দুইটি গ্রহ ও সপ্তমে ... অপরটিতে লগ্নে তিনটি, কিন্তু সপ্তম স্থান গ্রহশূন্য। এক জনের সপ্তম স্থান শনির ক্ষেত্রে, অপর জনের লগ্ন শনির ক্ষেত্র। সাধারণ ... বিচার করিলেও দেখা যাইবে, উভয় রাশিচক্রেই সংসারধর্ম্মের ... একই হেতুতে বিনষ্ট হইয়াছে।

...স, সিদ্ধি ও মোক্ষলাভের সূচনা করে, এইরূপে বিভিন্ন যোগ ...শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা এখানে সম্ভব ... নিম্নে দেশে সুপরিচিত এবং জীবনে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রদ্ধেয় বন্ধুর জন্মকুণ্ডলী দেওয়া হইল, তাঁহার জীবনে প্রব্রজ্যার ভাব পরিস্ফুট, তিনি চিরকুমার ও স্বাধীনচেতা। সুতরাং পরীক্ষামূলক রাশিচক্র হিসাবে তাহা প্রকাশিত হইল :—
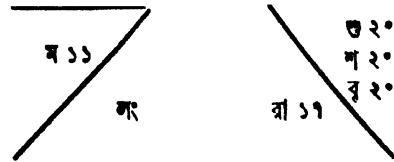
মঙ্গলের অবস্থান পত্নীহানিকারক এবং ইহা বিবাহের সূচনাও করিতেছে না। চতুর্থপতি বৃহস্পতি ও পঞ্চমপতি শনি একত্রে চতুর্থে অবস্থান করায় ইঁহাকে বিদ্বান ও যশস্বী করিতেছে; কিন্তু পঞ্চমস্থ বুধ ও রবি যশে ও বিদ্যাফলে বিলম্ব ঘটাইয়াছে। তথাপি মনে হয়, শনি ইঁহাকে গূঢ় রহস্যে বলীয়ান ও আত্মিক শক্তির বোদ্ধা করিবে। এইরূপ জাতক বিবাহ করিতে পারে না, সন্ন্যাসী হওয়ারই কথা। বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, লগ্নাধিপতি বুধ যদিও পঞ্চমে শুভ স্থানে, কিন্তু পাপগ্রহের ক্ষেত্রে একটি পাপগ্রহ সহ, আবার সেই পাপগ্রহ অর্থাৎ রবি, একটি অশুভ ভাবের অর্থাৎ দ্বাদশের অধিপতি; সুতরাং লগ্ন অর্থাৎ তনুস্থান এবং পঞ্চম অর্থাৎ পুত্রস্থানের হানি ঘটিয়াছে, লগ্নকে কোন শুভগ্রহই দেখিতেছে না। দ্বিতীয় স্থান বা ধনস্থানের অধিপতি শুক্র, চতুর্থ কেন্দ্রে, সুতরাং শুভ ও বলবান, কিন্তু বৃহস্পতি ইহার শত্রু এবং শনি একটি পাপগ্রহ; ইহারা তিন জন একত্রে অবস্থান করার ফলে কতকটা বিঘ্ন ঘটিতেছে, তবুও এখানে স্বক্ষেত্রে থাকায় বৃহস্পতিই প্রবল; সুতরাং বিদ্যা ও সুখে পরিণাম মঙ্গলজনকই হইবে। তৃতীয়ে রাহু, ইহার অধিপতি মঙ্গল দ্বাদশে, সুতরাং ভাবফলের হানি ঘটিয়াছে। ষষ্ঠে একাদশ পতি চন্দ্র, সুতরাং একাদশ ভাবের ফলহানি ঘটিয়াছে। সপ্তমের অধিপতি বৃহস্পতি চতুর্থে বিবাহের যোগ প্রবল হইলেও পত্নীকারক গ্রহ শুক্র শনিই পাপযুক্ত, আবার দ্বাদশে মঙ্গল, সুতরাং ফলের হানি হইয়াছে। অষ্টমাধিপতি মঙ্গল দ্বাদশে, নবমাধিপতি শুক্র চতুর্থে বলবান হইয়াও স্বস্থান দেখিতেছে না, দশমাধিপতি বুধ পঞ্চমে থাকিয়া আয়স্থান দেখিতেছে, এই জন্য বিদ্যাচর্চায় আয় বুঝায়। ভাগ্যস্থানে শুক্র ও বৃহস্পতি, এই দুইটি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকায় শুভ সূচনা করে। এমন সম্ভাবনাও আছে যে, ইনি কোন নূতন আত্মিক তত্ত্বের প্রচারে মানব সমাজের মঙ্গল করিয়া জগতে যশস্বী হইবেন।

উপরি-উক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণ ভাবে বিচার করিলেও রাশিচক্র সম্বন্ধে একটি ভাল-মন্দ ধারণা করা কঠিন নহে।

একটি অদ্ভুত ঘটনা

(এডগার এলেন পো)

আর্নেষ্ট ভেল্ডমার সম্পর্কীয় অদ্ভুত ঘটনাটি লইয়া লোক-সমাজে বেশ একটু উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল এবং ইহাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নাই ; বরং ব্যাপারটি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আলোচনা না হইলেই অবাক হইয়া যাইবার কথা। আমি এবং আর যাঁহারা এই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম—আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলাম, লোক-সমাজে যেন ঘটনাটি প্রকাশ না হইয়া পড়ে। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঘটনাটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার সুযোগ আমাদের না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঘটনা জনসাধারণ যাহাতে না জানিতে পারে, সে চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম। ইহার ফলে সত্য ঘটনার পরিবর্ত্তে মিথ্যার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও বিকৃত এক কাহিনী সমাজে চলিতে থাকে। এই কাহিনীও আবার সমাজের বিভিন্ন লোকের মুখে কুৎসিত ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ার দরুণ লোকের মনে স্বভাবতঃই এই ঘটনা সম্বন্ধে দৃঢ় অবিশ্বাস জন্মাইয়া যায়।

এরূপ অবস্থায় আমি এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

গত তিন বৎসর ধরিয়া আমার মন সম্মোহন বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় নয় মাস আগে হঠাৎ আমার মনে হয় যে, আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যত কিছু পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে একটি দিক্ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইয়াছে। আজও পর্য্যন্ত মরণোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা হয় নাই। প্রধানতঃ—তিনটি বিষয় আমার মনে কৌতূহল জাগাইয়াছিল।

প্রথমত ঐরূপ কোন রোগীকে সম্মোহিত করা যায় কি না ?

দ্বিতীয়ত—ঐরূপ রোগীকে সম্মোহিত করায় সুবিধা বেশী না অসুবিধা বেশী ?

তৃতীয়ত—ঐরূপ রোগীকে সম্মোহিত করিয়া মৃত্যুর আগমন বিলম্বিত করা যায় কি না ? অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আরও কিছুক্ষণের জন্য রোধ করা যায় কি না ?

আরও অনেক জানিবার ছিল, কিন্তু এই তিনটি প্রশ্নই বিশেষ ভাবে আমার মনকে নাড়া দিয়াছিল—বিশেষ করিয়া শেষেরটি, কারণ এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সম্মোহনের উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করার কথা মনে হইতেই আমার মনে পড়িল আমার বন্ধুর কথা। আমার বন্ধুর নাম আর্নেষ্ট ভেল্ডমার, ইনি "বিব্লোথিকা ফোরেনসিকা" নামক গ্রন্থের সংগ্রাহকরূপে সুধী-সমাজে সুপরিচিত। ইনিই আবার ওয়ালেনষ্টেইন ও গারগানটুয়া নামে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ পোল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ সাল হইতে আমার বন্ধু নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত হার্লেমে বসবাস করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিম্নাঙ্গের দিকে দৃষ্টি পড়িলে জন্ র‍্যাণ্ডল্ফের কথা মনে পড়িত। তাঁহার কেশ ছিল যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ—তাঁহার পক্ব শ্মশ্রু ছিল সেই তুলনায় সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ। অনেকে তাঁহার চুলকে পরচুলা বলিয়া মনে করিত। তিনি অতি অল্পেই বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং সেই কারণে সম্মোহনের পাত্র হিসাবে তিনি খুব উপযুক্ত পাত্রই ছিলেন। দুই-তিন বার তাঁহাকে আমি অতি অল্প আয়াসেই সম্মোহন-নিদ্রায় অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শীর্ণকায় গঠন হেতু অন্য যে সমস্ত সুবিধা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাই নাই। কোন সময়েই তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে আমি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে পারি নাই এবং তাঁহার উপর এই বিদ্যারই পরীক্ষা দ্বারা এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই নাই, যাহাতে বিশ্বাস করিতে পারি যে, আমার দ্বারা সম্মোহিত হইবার পর তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত ও দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত কোন বস্তু দেখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতেন। প্রত্যেক সময়েই আমি তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যকে আমার অসাফল্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম। কারণ, আমার সহিত পরিচয় হইবার কিছু কাল পূর্ব্বেই তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকে খুব ধীর ভাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকে তিনি মনে করিতেন অবশ্যম্ভাবী—ইহাতে যেন তাঁহার দুঃখ করিবার কিছুই ছিল না।

এখন বুঝিতে পারিতেছেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিবার কথা মনে উদয় হইতেই উপযুক্ত পাত্র হিসাবে আমার বন্ধু ভেল্ডমারের নামই আমার মনে আসাটাই স্বাভাবিক। এই ভদ্রলোকের অবিচল জীবনাদর্শের সহিত আমি সুপরিচিত ছিলাম এবং সেই কারণেই তাঁহার তরফ হইতে কোন বাধার আশঙ্কা করি নাই। আমেরিকাতে তাঁহার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না যাঁহাদের নিকট হইতে বাধার আশঙ্কা করা যাইতে পারে। আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত খোলাখুলি ভাবে কথা কহিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে এই ব্যাপারে খুব বেশী রকম উৎসাহিত দেখিয়া বেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। আমি সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম কারণ, যদিও ইহার পূর্ব্বে যত বার তাঁহার উপর সম্মোহন-বিদ্যার পরীক্ষা করিয়াছি, কোন বারই তাঁহাকে অসন্তুষ্ট দেখি নাই, তথাপি এই ব্যাপারে ইঁহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় কখনও পাই নাই। ইঁহার রোগও এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ও প্রায় ঠিক করিয়া বলিয়া দেওয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত আমার ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার চিকিৎসকগণ যে সময়কে তাঁহার অন্তিম কাল বলিয়া ঠিক করিবেন, তাহার চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি যেন আমাকে সংবাদ দেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন মাস আগে আমি তাঁহার নিকট হইতে এই চিঠিটি পাই।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার জীবনের মেয়াদ যে আগামী কল্য মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, এ বিষয়ে দুই জন চিকিৎসকই একমত এবং আমারও মনে হয় ইঁহারা ঠিকই হিসাব করিয়াছেন।

ভেল্ডমার

এই চিঠিটা লেখার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইহা আমার হস্তগত হয় এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হই। প্রায় দশ দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দেহের উপর যে ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল সীসকের বর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং চক্ষু জ্যোতিঃহীন বোধ হইতেছিল। তিনি এত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে মনে হইতেছিল, তাঁহার গণ্ডদেশের অস্থি-মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া

আসিতেছে। যদিও তিনি খুব ঘন-ঘন কাসিতেছিলেন ও তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার মানসিক শক্তি ঠিকই ছিল এবং কিছু পরিমাণে শারীরিক শক্তিও তখনও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি তখনও বেশ স্পষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিলেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়াই ঔষধ গ্রহণ করিতেছিলেন। নীচে বালিশ দিয়া বিছানার উপর তাঁহার মস্তক একটু উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন তিনি ঐরূপ অবস্থায় শায়িত হইয়া ডায়েরীতে স্মৃতি-লিখনে নিযুক্ত ছিলেন। দুই জন চিকিৎসক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। আমার বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া আমি চিকিৎসক দুই জনকে অন্ত পার্শ্বে লইয়া গিয়া রোগীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলাম। শুনিলাম, আঠারো মাস ধরিয়া বাম দিকের ফুসফুসটি প্রায় ক্ষমতাহীন ও নিস্তেজ এবং বর্ত্তমানে প্রাণশক্তিমূলক যে কোনও কার্য্যের পক্ষে অযোগ্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ দিকেরটির উপরের অংশের অবস্থাও তদ্রূপ এবং নীচের অংশটিও পুঁজে পরিপূর্ণ, কতকগুলি স্ফোটকাকার ক্ষতের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। এই স্ফোটকাকার ক্ষতগুলির আবার একটির মুখ অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েক স্থানে ক্ষতমুখ বেশ বোঝা যাইতেছিল এবং এক স্থানে নালীক্ষতের মুখ পাঁজর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। যাহা হউক, দক্ষিণ দিকের ফুস-ফুসের এই পরিণতি অল্প দিন হইল সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকদিগের অভিমত। তবে এ কথা সত্য যে, এই দিকটিও খুব দ্রুত হীনবল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে নাই এবং ক্ষতের মুখে যে পাঁজর আক্রমণ করিয়াছে ইহাও চারি দিন পূর্ব্বে ধরা যায় নাই। প্রধানত, রোগীর রোগটি ছিল যক্ষ্মা, কিন্তু ইহা ছাড়া রোগীর হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রধান রক্তনালীটি মারাত্মক রকম ফুলিয়া উঠিয়াছিল—অন্তত চিকিৎসকগণ এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা এতই খারাপ যে, এই শেষের ব্যাপারটি সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যাইতে-ছিল না। সেই দিন শনিবার সন্ধ্যা সাতটা। পরদিন রবিবার মধ্যরাত্রি নাগাদ আমার বন্ধুর যে মৃত্যু হইবে, এ বিষয়ে দুই জন চিকিৎসকই একমত ছিলেন। চিকিৎসক দুই জন আমার সহিত কথা কহিতে যাইবার পূর্ব্বেই আমার বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ইহাই তাঁহাদের শেষ বিদায় গ্রহণ। পুনরায় আসিবার ইচ্ছা আর তাঁহাদের ছিল না। যাহা হউক, আমার অনুরোধে তাঁহারা পরদিন রাত্রি দশটায় আবার আসিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমি আমার বন্ধুর সহিত তাঁহার আসন্ন মৃত্যু ও আমার প্রস্তাবিত পরীক্ষা সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি উৎসুক ও আগ্রহান্বিত ত বটেই, এমন কি পরীক্ষা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিতে তিনি আমায় অনুরোধ জানাইলেন। দেখিলাম, এক জন পুরুষ ও এক জন সেবিকা তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। পরীক্ষা আরম্ভ করিতে গিয়া আমার মনে ভয় হইতে লাগিল, যদি কোন অঘটন ঘটিয়া যায়! পূর্ব্বোক্ত ওই শুশ্রূষাকারী ও শুশ্রূষাকারিণী মাত্র ঐ দুই জনকে সাক্ষী রাখিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতে আমার মন সম্মতি দিল না। আমি পরীক্ষা স্থগিত রাখিলাম। পরদিন রাত্রি আটটার সময় আমার পরিচিত এক জন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্র রোগীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর আমার এই আশঙ্কা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইল। প্রথমে ঠিক করিয়াছিলাম, চিকিৎসক দুই জন না আসা অবধি অপেক্ষা করিব। কিন্তু দুইটি কারণে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমত, দেখিলাম রোগীর নিজের উৎসাহ খুব, তিনি আমাকে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য আগ্রহ সহকারে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিতে-ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেখিলাম তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ, আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা যায় না। কারণ, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম তিনি দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছেন। আমার অদৃষ্ট ভালই বলিতে হইবে। কারণ ছাত্রটিও দেখিলাম খুব সদাশয় ভদ্রলোক। এমন কি আমি যখন তাঁহাকে পরীক্ষাটির বর্ণনা লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ জানাইলাম, তিনি তাহাতে সহজেই সম্মত হইলেন। তাঁহারই লেখা হইতে কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া আমি আপনাদের নিকট পরীক্ষাটির বর্ণনা দিতেছি।

তখন আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। রোগীর একটি হাত আমার হাতের মধ্যে লইয়া আমি তাঁহাকে শেষ বারের মত অনুরোধ করিলাম যে, তাঁহার এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সম্মতি আছে এ কথা তিনি যেন একবার নিজ মুখে ছাত্রটিকে জানাইয়া দেন।

খুব ক্ষীণ স্বরে অথচ সম্পূর্ণ শোনা যায় এমন ভাবে উত্তর আসিল, "হাঁ, আমার সম্মোহিত হইবার ইচ্ছা আছে।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে আপনি বড় বেশী বিলম্ব করিতেছেন।" যতক্ষণ তিনি কথা বলিতেছিলেন ততক্ষণ আমি পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করা সহজ, সেই সমস্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। প্রাথমিক প্রক্রিয়ার পর তাঁহার কপালের উপর আড়াআড়ি ভাবে প্রথম মৃদু আঘাতেই তিনি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। ইহার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া আমার সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়াও বিশেষ কোন সুফল পাইলাম না। দশটার পর পূর্ব্বের কথামত চিকিৎসক দুই জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি কি ভাবে পরীক্ষা চালাইতেছি তাহা তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। যখন দেখিলাম তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, তখন তাঁহাদিগকে রোগী যে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, এ কথা জানাইয়া দিয়া আমি রোগীর কাছে আসিয়া কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া আমার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে রোগীর দক্ষিণ চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া, আমি নিম্নমুখী আড়াআড়ি আঘাতের প্রক্রিয়া আবার আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন খুব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ দেরী করিয়া তাঁহার নিশ্বাস পড়িতেছিল। নিশ্বাসের সংগে একটি ঘড়-ঘড় করিয়া শব্দও হইতেছিল। একবার নিশ্বাস পড়ার পর অন্তত আধ মিনিট পর আবার নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছিল। প্রায় পনেরো মিনিট কাল এই অবস্থায় কাটিল। পনরো মিনিট কাটিবার পর রোগীর অন্তস্তল হইতে একটি স্বাভাবিক দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, ঘড়-ঘড় শব্দটিও বন্ধ হইয়া গেল, অন্তত ঐরূপ শব্দ আর শুনা যায় নাই। কিন্তু নিশ্বাসের মধ্যে

বিরতি দেখিলাম সেই আধ মিনিটই রহিয়াছে। রোগীর দেহের নিচের অংশ অনুভব করিয়া দেখিলাম খুব শীতল। এগারোটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটের সময় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, রোগী সম্মোহনের প্রভাবে সাড়া দিতেছেন। তাঁহার কাগজের ন্যায় অভিব্যক্তিহীন চক্ষুতে এক পরিবর্তন দেখা দিল। দেখা দিল এক অদ্ভুত দৃষ্টির অভিব্যক্তি—তাহাতে সাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র নাই—তাহা যেন রোগীর অন্তস্তল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে—সে দৃষ্টি সম্মোহন-নিদ্রায় অভিভূত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও চক্ষুতে কখনও দেখা যায় নাই—সে দৃষ্টি আমার ভুল হইবার নহে। আড়াআড়ি ভাবে দ্রুত আরও কয়েক বার হাত চালাইবার পর আমি তাঁহার দুই চক্ষুর পাতা কাঁপাইয়া দিতে সক্ষম হইলাম—ঠিক যেমন নিদ্রার প্রারম্ভে লোকের চক্ষুর পাতা কাঁপিতে থাকে। আর কয়েক বার ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর তাঁহার দুই চক্ষু বুজিয়া আসিল। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঘন-ঘন ঐ প্রক্রিয়া চালাইয়া গেলাম, অবশ্য রোগীর হস্ত-পদ ইত্যাদি সামান্য সরাইয়া সরাইয়া এরূপ অবস্থায় সাজাইয়া দিয়াছিলাম যাহাতে দেখিলে মনে হয়, সেগুলি যথাস্থানে সহজ ভাবেই আছে। পদদ্বয় সম্পূর্ণ লম্বিত করিয়া দিয়াছিলাম, বাহুদ্বয়ও দেহ-পার্শ্ব হইতে বেশ কিছুটা দূরে দূরে সরল ও সহজ ভাবে বিছানার উপর লম্বালম্বি ভাবে শোয়াইয়া দিয়াছিলাম। রোগীর মস্তক সামান্য একটু তুলিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। আমি ঠিক মধ্যরাত্রির সময় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলাম। কয়েকটি পরীক্ষার পর তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে রোগী সম্পূর্ণরূপে সম্মোহন-নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছে। দুই জন চিকিৎসকই দারুণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। এক জন ত স্থির করিয়াই ফেলিলেন যে, তিনি রোগীর নিকট সমস্ত রাত্রি থাকিবেন। আর এক জন যদিও তখন বিদায় গ্রহণ করিলেন তথাপি কথা দিয়া গেলেন যে তিনি প্রত্যূষে আবার আসিবেন। আমি শুশ্রূষা করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত দুই জন ও ঐ ছাত্রটি রহিয়া গেলাম।

রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত আমরা রোগীকে কোনরূপ বিরক্ত করি নাই যাহাতে তাঁহার নিদ্রায় ব্যাঘাত না হয়। তিনটা বাজিলে রোগীর নিকট গিয়া দেখিলাম রোগীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ। দেখিলাম, প্রথম চিকিৎসক চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তাঁহার অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই; নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ—প্রায় অনুভব করা যায় না। নিশ্বাস-প্রশ্বাস এত ধীরে ধীরে বহিতেছে যে মুখের কাছে কাচের আয়না না ধরিলে বুঝিতেই পারা যায় না। চক্ষুর পাতা স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ অবস্থায় ছিল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল মার্ব্বল-প্রস্তরের মত কঠিন ও শীতল। কিন্তু তথাপি বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া এ কথা পরিষ্কার মনে হইতেছিল যে রোগীর মৃত্যু হয় নাই!

আমি যতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার শয্যার নিকটে ছিলাম, সেই সময়ে তাঁহাকে এরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যাহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অনুযায়ী নড়াচড়া করে। আমার এই বন্ধুর উপর পূর্বে যত বারই এই পরীক্ষা করিয়াছি কোন-বারই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই এবং এবারেও আমার সাফল্য লাভ করিবার আশা খুব অল্পই ছিল! কিন্তু এবারে বিস্ময়ান্বিত হইয়া লক্ষ্য করিলাম, রোগীর দক্ষিণ হস্ত খুব তৎপরতার সহিত আমার দক্ষিণ হস্ত অনুযায়ী অল্প অল্প নড়াচড়া করিতেছে—আমি যে দিকে হাত নাড়িতেছি ঠিক সেই দিকেই রোগীর হস্ত নড়িতেছে। ইহা দেখিয়া আমি রোগীর সহিত কিছু কথাবার্তা কহিব বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলাম।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি নিদ্রিত?" কোন উত্তর আসিল না। এই সময় তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া আমি আরও দুই বার একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলাম। তৃতীয় বার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার পর দেহে অল্প কম্পন দেখা দিল, চক্ষুর পাতা সামান্য একটু খুলিয়া গেল, রেখার ন্যায় সামান্য একটু সাদা অংশ দেখা যাইতে লাগিল, ওষ্ঠদ্বয় খুব ধীরে ধীরে নড়িতে আরম্ভ করিল। খুব মৃদু স্বরের কয়েকটি কথা কানে আসিল—খুব মৃদু স্বরে—স্বর এত মৃদু যে প্রায় শোনা যায় না বলিলেই হয়:

"হ্যাঁ, আমি এখন নিদ্রিত, আমাকে জাগাইবেন না। এই ভাবে আমাকে মরিতে দিন।"

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম পূর্ব্ববৎ। দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্বের মতই আমার দক্ষিণ হস্তের অনুবর্ত্তী। আমি আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম: "আপনি কি এখনও বুকে বেদনা অনুভব করিতেছেন?" উত্তর আসিল তৎক্ষণাৎ যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু স্বরে: "এখন আর কোনও বেদনা নাই—মৃত্যু অতি সন্নিকট।" আমি তখন আর তাঁহাকে বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না এবং প্রথম চিকিৎসক ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত করি নাই। চিকিৎসক আসিলেন সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্বে এবং রোগীকে তখনও জীবিত দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং ওষ্ঠের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ইহার পর তিনি আমায় পুনরায় রোগীর সহিত কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার কথামত রোগীর সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম।

পুনর্বার রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "আপনি কি এখনও নিদ্রিত?" বেশ কিছুক্ষণ পর উত্তর পাইলাম। দেখিয়া মনে হইল, রোগী যেন কথা কহিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। ঐ একই প্রশ্ন চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করিবার পর অতি ধীর ও মৃদু স্বরে উত্তর আসিল: "হ্যাঁ, আমি এখনও নিদ্রিত—মৃত্যু সন্নিকট।" চিকিৎসক দুই জনেরই ইচ্ছা, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত রোগীর মৃত্যু হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন এইরূপ শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় রাখা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। আমি ঠিক করিলাম, আর একবার তাঁহার সহিত কথা কহিব এবং পূর্ব্বের প্রশ্নই পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম সেই সময় রোগীর মুখমণ্ডলের উপর এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। বন্ধুর চক্ষুর পাতা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল, দুই চক্ষুর মণি উপর দিকে ঢুকিয়া গেল, গাত্রচর্ম্মের উপর সাদা কাগজের মত বর্ণের বীভৎস আভা দেখা গিয়াছিল। দুই গণ্ডস্থলের মাঝখানে যে দুইটি গোলাকার স্পষ্ট দাগ ছিল, তাহা যেন কে তৎক্ষণাৎ মুছিয়া দিল। হঠাৎ একটি ফুৎকারে বাতি যেমন নিবিয়া যায়, সেই ভাবে দাগ দুইটিও যেন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। উপর দিকের

এতক্ষণ রোগীর দন্ত সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়াছিল হঠাৎ তাহা খুলিয়া গেল—রোগীর দন্তপংক্তি দেখা যাইতে লাগিল। বেশ শব্দ করিয়া রোগীর নীচের দিকের চোয়াল খুলিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে মুখ হাঁ হইয়া গেল এবং কৃষ্ণবর্ণের ফুলিয়া উঠা জিহ্বাটি সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতে লাগিল। আমার মনে হয়, মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে থাকিতে অভ্যস্ত নহেন, এমন কেহ সেই ঘরে তখন ছিলেন না। কিন্তু রোগীকে এতই ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল যে, প্রায় সকলেই শিহরিয়া উঠিয়া রোগীর শয্যা-পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিলেন। আমার মনে হয়, উপরি-উক্ত বর্ণনা পাঠ করিবার পর পাঠকের মনে এই ঘটনা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মাইয়া যাওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। যাহা হউক, ইহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমার কর্ত্তব্য, ঘটনাটি যেরূপ ভাবে ঘটিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই পাঠকদের সম্মুখে আমি ইহা উপস্থিত করিতেছি।

ভেল্ডমারের মধ্যে প্রাণশক্তি বর্ত্তমান থাকার লেশমাত্র চিহ্নও ছিল না। নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ইহা স্থির করিয়া তাঁহার দেহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার শুশ্রূষাকারিণীর হস্তে ছাড়িয়া দিব ঠিক করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, তাঁহার জিহ্বা দ্রুত কম্পিত হইতেছে। এইরূপ কম্পন চলিল প্রায় এক মিনিট ধরিয়া, তাহার পর ঘটিল এক অদ্ভুত ঘটনা! মুখ যেরূপ হাঁ করা অবস্থায় ছিল, সেই-রূপই রহিল, চোয়াল এতটুকু নড়িল না, সমস্ত মুখমণ্ডল স্থির—অচঞ্চল, তথাপি মুখের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল অদ্ভুত এক স্বর। সেই কণ্ঠস্বর বর্ণনা করিতে যাওয়া হইবে উন্মাদের প্রচেষ্টা। তাহার পূর্ণ বর্ণনা দিতে আমি সক্ষম হইব না আর আংশিক বর্ণনাই বা কি দিব—শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, অত্যন্ত কর্কশ ও দুর্ব্বল আওয়াজ, মাঝে মাঝে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা এত বীভৎস ও ভয়ানক সেই কণ্ঠস্বর যে, আমার ত মনে হয়, ঐরূপ কোন স্বর আজও পর্য্যন্ত মানুষের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। তখন আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও আমার মনে হয়, এই কণ্ঠস্বরের এমন দুইটি বিশেষত্ব ছিল, যাহার জন্য বোধ হইতেছিল, ইহা এ পৃথিবীর নয়। প্রথমত আমাদের মনে হইতেছিল, বহু দূর হইতে কণ্ঠস্বরটি যেন কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে কিংবা অতি গভীর ভূ-গহ্বরের নিম্নতম প্রদেশ হইতে স্বরটি যেন ভাসিয়া আসিতেছে! দ্বিতীয়ত, আমার মনে হইতেছিল, ইহা যেন আচারের মত চটচটে একটি বস্তু। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইল না, বোধ হয় আর তাহা হইবেও না; কারণ আমার নিজেরই মনে মনে আশঙ্কা জাগিতেছে যে, আমি যাহা মনে অনুভব করিতেছিলাম, তাহা আপনাদের বোধগম্য করাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয় যে, আমি "শব্দ" এবং "কণ্ঠস্বর" দু'টি কথাই ব্যবহার করিয়াছি। যে শব্দটি শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহা খুবই স্পষ্ট এবং আশ্চর্য্য রকম পরিষ্কার ভাবে পদাংশে ভাগ করা। এ কথা বোধ হয় আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভেল্ডমার কথা বলিয়াছিলেন, আর এ কথাও আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম—তিনি নিদ্রিত কি না? ঐরূপ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে তিনি এখন উত্তর দিলেন!

"হাঁ···না···আমি নিদ্রিত ছিলাম···এখন আমি মৃত।"

এই কথাগুলি শুনিবা মাত্রই যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এমন একটি ভীষণ অব্যক্ত ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাদের তাহা অস্বীকার করিবার বা চাপিবার ক্ষমতা ছিল না বা সে চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যে দুই জন রোগীর সেবাকার্য্যে রত ছিলেন, তাঁহারা ত ভয়ে ঘর হইতে পলাইয়া গেলেন—বহু অনুরোধেও তাঁহাদের আর সেই ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। আমার নিজের মনের ভাব যে কি হইয়াছিল তাহা আপনাদের নিকট বলিতে যাওয়া হইবে বাতুলের কাজ! ইহার পর এক ঘণ্টা লাগিল ঐ ছাত্রটির জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে পর আমরা পুনরায় ভেল্ডমারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। অবস্থা দেখিলাম পূর্ব্বের মতই, কেবল এখন আর দর্পণের সাহায্যেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ ধরা যাইতেছিল না। বাহু হইতে রক্ত লইবার চেষ্টা করিয়াও আমরা বিফল হইলাম। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার হস্ত পরিচালিত করিবার চেষ্টাও বিফল হইল দেখিলাম, এখন আর তাঁহার কোন বাহুই আমার ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তাধীন নহে। তিনি যে সম্মোহিত অবস্থায় আছেন, ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতে-ছিল কেবল মাত্র যখন আমি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলাম কেবল সেই সময় তাহার জিহ্বায় একটি কম্পন দেখা যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, তিনি যেন উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যথেষ্ট শক্তির অভাবে পারিতেছেন না। সেই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি ভেল্ডমারের সহিত একই সম্মোহন-চক্রে স্থাপন করিয়া মিলিত শক্তির সাহায্যে তাঁহার নিকট হইতে আমার প্রশ্নের উত্তর পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। আমার মনে হয়, এই সময় পর্য্যন্ত রোগীর সম্মোহিত অবস্থার সম্যক্ বর্ণনা দিতে আমি সক্ষম হইয়াছি। রোগীর সেবা করিবার জন্য অন্য দু'জন লোক ঠিক করিয়া দিয়া আমি দুই জন চিকিৎসক ও ছাত্রটির সহিত বেলা দশটার সময় সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। সেই দিন বৈকালে আমরা আবার রোগীকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, রোগীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ। তাঁহাকে পুনরায় জাগরিত করিবার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধেও আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহাকে জাগরিত করিয়া লাভ কিছুই হইবে না। তবে এটুকু সকলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, মানুষের মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা আমরা জানি, তাহার আগমন সম্মোহন-ক্রিয়ার দ্বারা রোধ করা যায়। ইহাও বেশ পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল যে, এখন ভেল্ডমারকে জাগরিত করার অর্থই হইতেছে, তাঁহাকে নিশ্চিত অথবা দ্রুত-মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। এই সময় হইতে গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাত মাস ধরিয়া প্রত্যহই আমরা ভেল্ডমারকে দেখিতে যাইতাম, অনেক সময় আমাদের পরিচিত অন্যান্য চিকিৎসক ও বন্ধু-বান্ধবও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। এই সাত মাস ধরিয়া তাঁহার অবস্থা ছিল একই রূপ, বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহাকে দেখা-শুনা করিবার লোকও বরাবর নিযুক্ত ছিল এবং পরিচর্য্যা-কার্য্য এক দিনও বন্ধ রাখা হয় নাই।

অবশেষে গত শুক্রবার আমরা স্থির করিলাম, এইবার

সম্মোহন-নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার পরীক্ষা তাঁহার উপর আরম্ভ করিব—অন্তত চেষ্টা করিয়া দেখিব তাঁহাকে জাগরিত করা যায় কি না। আর আমার মনে হয়, আমাদের এই নূতন পরীক্ষার দুঃখময় পরিণতির জন্যই সমাজে এই ঘটনা লইয়া এত আলোচনা হইয়াছে এবং লোকের মনে অমূলক সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ভেল্ডমারকে সম্মোহন-নিদ্রা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি প্রথামত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ কোনই ফল পাইলাম না। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার প্রথম লক্ষণ দেখিতে পাইলাম যখন চক্ষুর মণি কিছুটা নামিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল এই যে চক্ষুর মণি নামিয়া আসার মধ্যে মধ্যে চক্ষুর পাতার নীচে হইতে প্রচুর পরিমাণে ঝরিতে লাগিল পীতাভ এক প্রকার তরল পদার্থ। উঃ, কি উৎকট দুর্গন্ধ সেই তরল পদার্থের !

আমার সঙ্গীদের কথা-মত আমি রোগীর বাহু পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রভাবাধীন করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত দুই জন চিকিৎসকের এক জন রোগীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি রোগীকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি করিলাম :

"ভেল্ডমার, আপনার মনের বর্ত্তমান অনুভূতি ও কামনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলিতে পারেন কি ?"

সেই মুহূর্ত্তে গণ্ডস্থলের গোলাকার দাগটি আবার দেখা গেল : জিহ্বায় দেখা দিল কম্পন—শুধু কম্পন বলিলে ভুল হইবে—দেখা গেল, জিহ্বা মুখ-বিবরের মধ্যে দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু চোয়াল ও ওষ্ঠের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। অবশেষে শুনিতে পাইলাম পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই ভয়ানক বীভৎস কণ্ঠস্বর :

"উঃ, কি অসহ্য অবস্থা···ঈশ্বরের দোহাই···যাহা করিবার শীঘ্র করুন···হয় আমাকে শীঘ্র নিদ্রাভিভূত করিয়া দিন···না হয় শীঘ্র আমাকে জাগ্রত অবস্থায় আনিয়া দিন···আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি এখন মৃত।"

প্রথমে আমি সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, কি যে করিব তাহা ঠিক করিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রোগীকে পুনরায় সম্পূর্ণ সম্মোহিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু রোগীর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি রোগীকে জাগ্রত অবস্থায় আনিবার জন্য প্রক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলাম··· রোগী যাহাতে জাগরিত হইয়া উঠে তজ্জন্য আমি প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, আমার এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে—অন্তত আমার মনে হইল আমি পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব। ঘরে আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন যে রোগীকে এইবার তাঁহারা জাগ্রত অবস্থায় দেখিবেন।

কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই কোন দিনই ধারণা করিতে পারিবেন না এবং নিজেকে ঐরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত করিয়াও রাখিতে পারিবেন না।

রোগীর ওষ্ঠাধর স্থির—অনড় জিহ্বাতে রহিয়াছে কম্পন—ক্রমাগত জিহ্বা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সেই অদ্ভুত স্বর—শুধু শুনা যাইতেছে দু'টি কথা—"আমি মৃত"······"আমি মৃত"······! আমি আমার প্রক্রিয়া দ্রুততার সহিত আরম্ভ করিলাম। ঠিক সেই সময় বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত সময় লাগিল কি না সন্দেহ, সমস্ত দেহটা কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া গেল—হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গেল—উঃ, কি ভয়ানক ঘটনা—সকলে বিছানার উপর তাকাইয়া দেখি সেখানে রোগীর চিহ্নমাত্র নাই—তাহার পরিবর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছে অনেকটা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, বমনোদক গলিত এক তরল পদার্থ।

অনুবাদ : অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রোদ

অরবিন্দ গুহ

রোদের নরম হাত ঘাসের সবুজ থেকে সকল শিশির
যদি আহা মুছে ফেলে ; আকাশের নীল দিয়ে যদি বাঁধে নীড়
মাঠের ইতির দুটি ; যদি আহা সাগরের দু'-চামচ জল
তোমার চোখের তারা ক'রে তোলে বিদারিত সুনীল শ্যামল !
একা তবে জানালায় মাঘের ভোরের শীত না-ই পোহালাম ;
আমার মনের পাশে জেগে থাক ছোটো মিঠে তোমার ও-নাম !

তোমার চুলের স্রোতে ছায়া-কালো রাত ধুয়ে কবিতার ভোর
এসে গেছে ; উড়ে গেলো মাথার ওপর দিয়ে একটি কি দুইটি চকোর !
আমার জানালা ছুঁয়ে সাঁইবাকনার বনে মাঘের সকাল—
তোমার মুখের মতো, তাই বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে হরিয়াল !
ঝোলানো লতার গায়ে নীল পাখি মুখ উঁচু ক'রে দেয় দোল,—
তোমার দু'চোখে আহা এখনো কী আঁকা আছে ঘুমের কাজল ?
আমার মনের কাছে ভেঙে দিয়ে রাত ভরা সব অবরোধ,—
মাঘের নরম ভোরে তুমি না কি হয়ে এলে সকালের রোদ ?

শীত

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। পাতা-ঝরা গাছের শূন্য ডালে ডালে আঘাত করছে উত্তুরে হাওয়া। ঘরে-বাইরে ঘাটে-মাঠে সর্বত্র লেগেছে তার হিমশীতল স্পর্শ। এই হাড়-কাঁপানো শীতের অসহ্য আড়ষ্টতায় এক পেয়ালা গরম চায়ের চেয়ে আরামের জিনিস বুঝি আর কিছু নেই। আর শুধু তাই নয়, সস্তা এবং সহজ-লভ্য বলেও চা আজ ঘরে ঘরে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

চা

সব সময়েই চলে

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

নূতন যুগের ভোরে

(কৃষাণ-মজুর-মধ্যবিত্ত সমস্যা)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোদাত্ত প্রখ্যাতবংশীয় প্রতাপবান্ ভাগ্যবন্ত লোকদের প্রশস্তি ছাড়িয়া যেদিন হইতে কবি, সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষাণ-মজুরদের জয়গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীতে যে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য যাহারা নিপীড়িত, যাহারা লাঞ্ছিত, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি যে আমাদের কোনও দিন ছিল না তাহা নহে, তবে সে দৃষ্টি ছিল করুণার দৃষ্টি,—উপর হইতে উৎক্ষিপ্ত করুণায় নিম্নবিত্ত অথবা নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি একটা অনুগ্রহের দৃষ্টি, সমাজের শাসক ও পালকদের তরফ হইতে সমাজের নাবালক অথবা কুপোষ্য-স্থানীয়দের প্রতি একটা অভিভাবক-জনোচিত আত্মপ্রসাদ-পরিপুষ্ট স্নেহদৃষ্টি। তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের পেট ভরিলেও মন ভরিত না, তাহারা নিজেদের ন্যায্য পাওনা যে অসম্ভব রকমের একটা উপরি-পাওনা মনে করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত, দাতা তাহাদিগকে দান করিত ধনীর উচ্চাসন হইতে, আর গ্রহীতা তাহা গ্রহণ করিত নতজানু হইয়া দীন ভিখারীর ভঙ্গীতে, তাহাতে গ্রহীতার অভাব মিটিলেও মনের দীনতা মিটিত না।

আজকাল যে কৃষাণ-মজুরদের কথা উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বর্তমানের গণ-নায়কেরা আজ কৃষাণ-মজুরদের দয়া করিবার কথা বলিতেছেন না, তাঁহারা তাহাদের দাবীর কথা বলিতেছেন; তাহাদের প্রতি করুণা করিতে অথবা স্নেহ দেখাইতে বলিতেছেন না, তাঁহারা তাহাদের দাবী সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্ত আমাদের বলিতেছেন। এইখানেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতা।

অকপট বিশ্বাসে যাঁহারা কৃষাণ-মজুরদের দাবীর কথা বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অমত থাকিতে পারে না। কিন্তু এই দাবীর ব্যর্থ আস্ফালনে ও ভুয়া শ্লোগানে যে আজ আকাশ-বাতাস ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহার সবটুকুই ঠিক হইতেছে না। কচি কবি এবং ছাত্র-সাহিত্যিক হইতে শুরু রাজনৈতিক নেতা পর্য্যন্ত যে কৃষাণ-মজুরদের কথা বলেন, তাহার মধ্যে অনেকেই গড্ডালিকা-প্রবাহে পড়িয়াই তাহা করেন; তাঁহাদের গালভরা বড় কথার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক হিসাবের গলদ আছে, অনেক আপত্তিকর যুক্তি আছে; তাঁহাদের শ্লোগান অন্তরের আন্তরিক অনুভূতির স্ফুরণ নহে, চলতি ফ্যাসানের অনুরণন মাত্র। একটু ভাবিলেই তাঁহাদের যুক্তির ভুল বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ হইতেছে কৃষাণ ও মজুরদের যে একসঙ্গে ধরা হয়, তাহা ঠিক নয়। কারণ তাহাদের সমস্যা এক জাতীয় নয়, তাহাদের জীবন-যাত্রা ও জীবন-পরিবেশও সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রমিক বা মজুর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতেছে শহরের কল-কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের দল, সাধারণতঃ তাহারা হইতেছে সহরের ভাসমান জন-সমাজের মধ্যে প্রায় নাম-গোত্রহীন বস্তীবাসীর দল। তাছাড়া বাস করে একসঙ্গে বহু লোক ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের তাহাদের সামাজিক সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, এবং শুধু কর্ম্ম-জগতের প্রতিযোগিতামূলক পরিচয় ছাড়া কর্ম্ম-জগতের বাহিরে আর কোনও হৃদয়গত পরিচয় তাহাদের নাই। কিন্তু তাহাদের এ বোধটুকু আছে যে, সংহতি ও সংখ্যাগুরুত্বের জন্য তাহাদের শক্তি আছে প্রচুর, তাহাদের পিছনে "ইউনিয়ন" নামক একটি বিরাট শক্তির উৎস আছে। এই ইউনিয়নের সাহায্যে, পার্টির খবরের কাগজের সাহায্যে তাহারা অনেক কিছু করিতে পারে। তাহারা ইহাও জানে, একটি বস্তীর লোক যদি পাড়ার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কলহ করে, তাহা হইলে সমস্ত বস্তীর লোক তাহার হইয়া লাঠি ধরিবে, পুলিস-হাঙ্গামা হইলে সে সহজেই আত্মগোপন করিতে পারিবে, ধরা পড়িলেও বহুর মধ্য হইতে তাহাকে সনাক্ত করার ব্যাপার লইয়া তাহার নাগাল পাওয়া পুলিসের পক্ষে কঠিন হইবে। ফলে তাহারা পুলিসকে ভয় করে না, ধনিককে গ্রাহ্য করে না, সাধারণ ভদ্রলোকের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না।

কৃষাণদের অবস্থা ঠিক একরূপ নয়; তাহারা বাস করে বিচ্ছিন্ন ভাবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু-পুরুষ ধরিয়া সামাজিক পরিচয়ে এবং বৈষয়িক সম্পর্কে সম্পর্কিত, বিদ্যা-বুদ্ধি খুব না থাকিলেও তাহাদের একটা সংযম ও সাধুত্বের বন্ধন আছে, তাহাদের 'ইউনিয়ন' তেমন নাই, মাটির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা জড়াইয়া আছে বলিয়া তাহারা ভাসমান নাগরিকদের মত বেপরোয়া হইতে পারে না, সমাজ-বন্ধনে তাহারা নানা দিক্ দিয়া নানা লোকের সঙ্গে জড়াইয়া আছে বলিয়া এক দিকে আলগা দিতে হইলে তাহাদের বহু দিকে টান পড়ে; এক জনের সঙ্গে শত্রুতা করিতে হইলে বহু লোক লইয়া দলাদলি করিতে হয়। ফলে তাহারা কল-কারখানার লোকেদের মত বেপরোয়া হইতে পারে না। তাহাদের আঘাত তেমন শক্তিশালীও নয়, সংহতও নয়, তাহারা বস্তীবাসী অপেক্ষা শান্ত, ভদ্র ও দুর্ব্বল। জমিদারকে তাহারা ভয় করে জমির খাতিরে, পুলিসকে ভয় করে তাহারা ভাসমান জনতা নয় বলিয়া এবং তাহাদের নাম-গোত্র-ঠিকানা সুপরিচিত বলিয়া। পাড়ায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের তাহারা খাতির করে, তাঁহাদের কলা-কৃষ্টির সহিত তাহাদের পরিচয় আছে বলিয়া।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃষাণ এবং মজুররা এক-জাতীয় মানুষ নয়। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সমস্যাগুলিও এক-জাতীয় নয়; মজুরদের সমস্যা হইতেছে—কি ভাবে তাহাদের শান্ত, সংযত, সুখী নাগরিক করিয়া তোলা যায়। আর কৃষাণদের সমস্যা হইতেছে—কি ভাবে তাহাদের শক্তিশালী ও সংহত করিতে পারা যায়।

কৃষাণ-মজুর লইয়া অনেক নিরর্থক 'শ্লোগানের' কথা আজকাল সুলভ নেতা ও সাহিত্যিকদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। "দুনিয়া কাহার?—মজুরদের।" "দুনিয়ার মালিক কাহারা?—মজুররা।" ইত্যাদি। অবশ্য স্রষ্টা এবং কর্ম্মী মাত্রকেই যদি মজুর বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর হইতে কবি ইঞ্জিনিয়ার; কামার, কুমার, ছুতার, কেরাণী হইতে কুলি, মুটিয়া পর্য্যন্ত সকলেই মজুর হইয়া পড়ে। দুনিয়া তাহাদের নিশ্চয়ই। কিন্তু মজুর বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহাদিগকে বুঝি, দুনিয়া কেবল শুদ্ধ তাহাদেরই? এক দিন দুনিয়া ছিল যাজক-শক্তির হাতে; তার পর ক্ষাত্রশক্তির সহিত যাজক-শক্তির সংঘর্ষ হইয়া দুনিয়াকে তাহারা কখনও বা ভাগাভাগি করিয়া, কখনও বা এক জনে অপরের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া (আমরা এখানে

সম্বন্ধে
কাণ্ডজ্ঞানহীন
প্রসবের পূর্বে
ঠিক থাকে
হ্যাঁ রাখব.
এদিকে মনে মনে ভাবছে
"কিছু বিপদ হবে না—
অযথা কেন "ডেটল"
কিনে রাখা ?"
জরুরী অবস্থায়
জন্য ডাক্তার তৈরি
হয়ে এসেছিলেন—
তাঁর সঙ্গে "ডেটল"
ছিল
এঁরা "ডেটল"
রাখেনি কেন
বিপদের ঝুঁকি নিতে
যাবেন না — ঘরে
সর্বদা "ডেটল"
রাখবেন।
বলেন
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই
ব্যবহারের উপর নির্ভর
করতে বলি এবং
ঘরেও সর্বদা "ডেটল"
রাখতে বলি
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ,
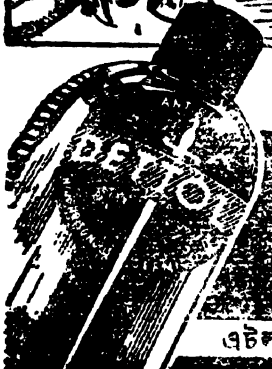
আশ্রমবাসী সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণদের কথা বলিতেছি না) দুনিয়াকে ভোগ করিয়াছে। আজ দেখিতেছি, রাজ-শক্তি-ক্ষাত্র-শক্তিকে পিছাইয়া হটাইয়া দিয়া বৈশ্য-শক্তি ও শূদ্র-শক্তির (মজুর) মধ্যে দুনিয়ার মালিকানি লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিয়াছে। এ যুদ্ধে যাহারা জিতিবে দুনিয়া তাহার হইবে—বীর্য্যশুল্কা ধরণী বিজয়ীরই হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই কথাটা কঠোর সত্য কথা হইলেও ইহা আদর্শের কথা নয়। "বসুন্ধরা সর্ব্বসাধারণ-ভোগ্যা" ইহাই হইল আদর্শের কথা। দুনিয়াতে যাহারা আছে—ছোট হউক, বড় হউক, সংখ্যালঘু হউক, সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক, সকলকেই ভদ্র ভাবে নিরাপত্তার সহিত বাঁচিবার অধিকার দেওয়াই হইতেছে আদর্শের কথা। স্লোগান তুলিতে হয় সেই আদর্শ লইয়াই,—যাহা অত্যন্ত রূঢ় ভাবে ঘটিতেছে, সেই কুৎসিত কঠোর বাস্তবকে লইয়া স্লোগান তুলিবার প্রয়োজন নাই, তাহার সংস্কারের প্রয়োজনেই স্লোগানের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রশ্ন আসিতে পারে—"হঠাৎ এ কথা উত্থাপিত হইল কেন? মজুরদের বিরুদ্ধে হঠাৎ এ বিক্ষোভ কেন?"

তাহার উত্তর হইতেছে—আজকাল মজুরদের চাপে ধনিকদের না হউক মধ্যবিত্তদের পিষ্ট হইবার ভয় দেখা গিয়াছে, সেই জন্যই এই সতর্ক-বাণীর প্রয়োজন হইয়াছে। যখন একটা নূতন কথা ওঠে, তখন তাহা লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি হয় যে, পুরাতন কথা চাপা পড়িয়া যায়। মানুষের মনের মধ্যে একটা ঘড়ির দোলকের (pendulum) মত আতিশয্যপ্রিয়তার দোষ আছে, তাহা একবার এক প্রান্তে গিয়া ভুল করিয়া বসে, আবার সেই ভুলটি সংশোধন করিবার জন্য একেবারে বিপরীত প্রান্তে যাইয়া আর একটি ভুল করে, অথচ এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী অনেকখানি যে একটা জায়গা থাকিতে পারে, সে কথা স্মরণ করে না।

"শ্রমিকের চাপে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা পিষ্ট হইতেছে কিরূপে?" —এইরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে। একটু উদাহরণ দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ধরা যাইতে পারে, রমানাথ বাবু এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করিয়া মাসে ১২০ টাকা ঘরে আনেন। তাঁহার ঘরে মা আছেন, দু'টি অবিবাহিতা বোন, দু'টি ভাই, স্ত্রী এবং একটি পুত্র আছে। এই আট জনের খাওয়া-পরা লোক-লৌকিকতা, এমন কি ছোট ভাই দু'টির পড়া-শুনার খরচ, শিশু-পুত্রটির দুধ-সাগু—এই সমস্তই ঐ ১২০ টাকাতেই করিতে হয়। উপরের চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি নিজেকে পেটে মারিলেন, ছেলে-পুলেদের ভোগ-বঞ্চিত করিলেন, তবুও তাঁহার সঙ্কুলান হয় না। তখন বাড়ীর পাশের পুরানো গোয়াল-ঘরটির কিছু সংস্কার করিয়া ঘরখানি ঝামরু বেহারিকে ভাড়া দিলেন মাসিক চারটি টাকায়। ঐ টাকাটিতে খোকার দুধের ব্যবস্থা হইল। ঝামরু রিক্শা চালায়, দিনে সে ৬৷৭ টাকা উপায় করে, তার স্ত্রী ধানপাতিয়া একটা জুট-মিলে কাজ করে, সে-ও মাসে ৭০।৭২ টাকা আনে, তাছাড়া সস্তায় রেশনও পায়। ঝামরুর দু'টি ভাই আছে, এক জন গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্ আর এক জন একটা মিলের বাইস্ম্যান্। এই চারটি বেহারী শ্রমিক রমানাথ বাবুর ঐ একখানি ঘরেই বাস করে। এরা সকলে একত্রে রমানাথ বাবুর প্রায় ৫ গুণ উপায় করে, অথচ এদের সাংসারিক খরচ রমানাথ বাবুর এক-চতুর্থাংশও নয়। রমানাথ বাবু দিন-দিন কৃশ হইয়া যাইতেছেন, অভাবের চাপে শুকাইয়া শুকাইয়া তিনি অকালে বার্দ্ধক্যে পৌঁছিতেছেন; তাঁর ভাই দু'টি পুষ্টির অভাবে টি বি'র দিকে চলিতেছে; ছেলেটি রিকেটি হইয়া যাইতেছে; ভগিনী দুইটি সময়ে পাত্রস্থা না হইবার জন্য পাকাইয়া শ্রীভ্রষ্টা হইয়া যাইতেছে; জননীর অলঙ্কার বিক্রী হইয়া যাইতেছে, স্ত্রী রুগ্না হৃত-যৌবনা হইয়া যাইতেছেন, অভাবের জন্য সংসারে নিত্যই খিটিমিটি লাগিতেছে। ঝামরুর ঘরের ছবি অন্য প্রকার। তাহাদের অভাবের সংসার নহে, দেশে তাহারা জমি-জমা কিনিতেছে, মাঝে-মাঝে বাড়ীর উঠানে রামায়ণ গান দিতেছে। রমানাথ বাবু যখন পাঁচ সিকা সের আলু কিনিতে সমর্থ না হইয়া কচুর দ্বারা তরকারীর সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ঝামরু তখন আলু-মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কিনিতেছে, তাহারা সুখে আছে। রমানাথ বাবুকে মাঝে-মাঝে ঝামরুর কাছে ঋণ করিতে হয়। কিছু দিন পরে হয়ত দেখা গেল, ঝামরু চারিখানি গোরুর গাড়ী ও পাঁচটি রিক্সা কিনিয়াছে এবং রমানাথ বাবুর বাড়ীর পাশের বাগানটি কিনিয়া তাহাতে দ্বিতল বাড়ী হাঁকরাইয়াছে। তাহার ছেলে শিওপ্রসাদকে প্রচুর মাহিনায় ভাল প্রাইভেট টিউটার রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং তাহার চাল-চলন রীতিমত অভিজাত-ঘেঁসা হইয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে রমানাথ বাবুর অবস্থা কঠিন দারিদ্র্যের চাপে দীন হইতে দীনতর হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার পুত্রটি শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে মূর্খ ও অসংযত হইয়া উঠিতেছে।

রমানাথ বাবুর সংসারই হইতেছে বাংলা দেশের সহর অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের খাঁটি চিত্র। বাংলার কৃষাণদের ঘরের ছবিও এইরূপ। এদিক্ দিয়া কৃষাণ এবং মধ্যবিত্তেরা এক-জাতীয়। মজুর বলিতে সহর অঞ্চলে আমরা যাহাদের বুঝি—সেই বেহারী, পশ্চিমা, মাদ্রাজী, জব্বলপুরী, বিলাসপুরী প্রভৃতির দল, তাহারা অন্য শ্রেণীর। বাঙ্গালী শুধু অবাঙ্গালী কোটিপতিদিগের দ্বারাই শোষিত ও পিষ্ট হইতেছে না, এই অবাঙ্গালী শ্রমিকদের দ্বারা আরও বেশী ভাবে শোষিত হইতেছে। উপর হইতে ধনিক এবং নীচের দিক্ হইতে শ্রমিকদের চাপে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। শুনা যায়, দিনে দশ কোটি টাকা এই ভাবে বাংলা হইতে শোষিত হইতেছে এবং এই শোষণ চলিতেছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্য হইতেই সর্ব্বাধিক। অথচ এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই দেশে-দেশে যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, শিল্পী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি অর্থাৎ যাহাদের কেন্দ্র করিয়া জাতির সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠে।

ইহাদেরও বাঁচাইতে হইবে। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখিতে যাইয়া যদি ইহাদের স্বার্থ ব্যাহত হয়, তাহা হইলেও দেশের কল্যাণ হইবে না।

কি ভাবে ইহাদের বাঁচাইতে হইবে? শ্রমিকদের দাবাইয়া? না; শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু অভিযান চালাইতে বলিতেছি না, কিন্তু যে ভাবে তাহাদের মাঝে-মাঝে তোষণের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে অনেক হিসাবের ভুল থাকে, এইটুকুই বলিতেছি। এই তোষণের ফলে শ্রমিকদের তেমন মঙ্গল হয় না, কিন্তু মধ্যবিত্তদের ক্ষতি হয়। সে-বার শ্রীরামপুরের চার-পাঁচটা মিলে প্রত্যেক

শ্রমিককে ১০৩ টাকা করিয়া পূজা-বোনাস্ দেওয়া হইল। শ্রমিকরা শ্রমিক নেতাকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া ফুলের মালায়, আলোক-সজ্জায়, ব্যাণ্ডবাদ্যে হৈ-চৈ করিল, মিল-মালিকের জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্থায়ী লাভ হইল কতটুকু? শ্রমিকদের যদি শিক্ষা, দীক্ষা, সংযম, সদ্ভাব ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে ঐ অর্থের অধিকাংশই যাইবে অস্থানে এবং অপাত্রে এবং বাকী অর্থ দিয়া তাহারা বেপরোয়া ভাবে খরচ করিয়া প্রতিযোগিতায় হাট-বাজারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য বাড়াইয়া দিয়া কালোবাজারকে প্রশ্রয় দিবে; ফলে অসুবিধায় পড়িবে শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী, সাংবাদিক প্রভৃতির দল। মিল-মালিক ঐ ১০৩ টাকা কাঁচা টাকা হিসাবে শ্রমিকদের হাতে তুলিয়া না দিয়া (আমরা এ ক্ষেত্রে ছাঁপোষা গৃহস্থ শ্রমিকদের বাদ দিতেছি) যদি তাহাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খাটাইতেন অথবা তাহাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, রিলিফ্ ফাণ্ড বা ঐ জাতীয় একটা ফাণ্ডে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ঐ হঠাৎ-পাওয়া টাকার অহঙ্কারে মধ্যবিত্তদের প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতে সমর্থ হইত না। সৈনিকদের মধ্যে যেমন খাওয়া-পরার সব-কিছু ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ হইতে ঠিক করিয়া দিয়া কাঁচা পয়সার বেপরোয়া খরচ সংযত করিবার জন্য family allotment এর ব্যবস্থা থাকে, অশিক্ষিত অথবা অসংযমী শ্রমিকদের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা ভাল। তাহাদের হাতে বেশী কাঁচা টাকা থাকিলে মদের দোকানের যতটা লাভ হইবে, তাহাদের নিজেদের পুত্র-কন্যা-পরিবারের ততটা লাভ হইবে না এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ক্ষতিই হইবে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যা গঠনভঙ্গী, তাহাতে পুরুষেরা উপার্জ্জন করে এবং নারীরা ঘরের কার্য্য করে। অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র পরিবারের মাথার উপর একটি মাত্র উপার্জ্জনশীল পুরুষ থাকে। এই অবস্থায় যদি বাহির হইতে এমন বহু শ্রমিকের আমদানি হয়, যাহারা স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা-নির্ব্বিশেষে উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই শ্রমিকদের চাপে বাঙ্গালী সমাজের ক্ষতি হইবেই। কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকার করা অসম্ভব নহে। যাহাদের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর, তাহাদের দেশে যদি নিম্নতর মানের জীবনবিশিষ্ট লোকের প্রচুর আমদানি হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিতায় উচ্চতর মানের লোকেরা হটিয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেক দেশেই এই অবাঞ্ছনীয় আমদানি বন্ধ অথবা সংযত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ আইন আছে। আমাদের দেশেও তাহা করা উচিত—কথাটা হঠাৎ শুনিতে খুব খারাপ লাগিলেও। ঠিক বিধিবদ্ধ আইন করিলে যদি সেই জিনিষটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে একটু পরোক্ষ ভাবে এই কাজটি করা যাইতে পারে। শ্রমিকদের নিয়োগের সময় কলকারখানার মালিকদের দেখা উচিত, যে সমস্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষে বাহিরে কাজ করিতে পারে—সেই জাতীয় প্রার্থীদের সকলেরই চাকরি পাওয়া ঠিক হইবে কি না। যদি দেখা যায়, একটি শ্রমিক-পরিবারে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তখন সেই পরিবারস্থ অন্য কোন প্রার্থীকে সহজে চাকরি না দিয়া অভাবগ্রস্ত স্থানীয় বাঙ্গালী শ্রমিকের সন্ধান করা উচিত।
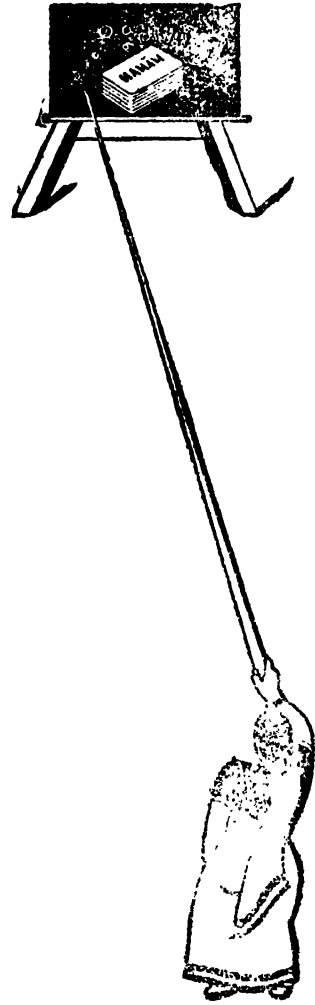
মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকদের উভয়েরই মঙ্গলের জন্য, আরও অনেক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ; যথা—(১) দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ীতে অবসর সময়ে যাহাতে বিধবা ও নিরাশ্রয়া নারীরা তাঁহাদের সম্মান ও আবরু বজায় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এই জাতীয় কুটীর-শিল্পের প্রচলন হওয়া উচিত।

(২) যখন ইহা স্পষ্ট ভাবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাঙ্গালীদের অপেক্ষা নিম্নতর হওয়ার জন্য তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীরা হটিয়া যাইতেছে তখন বাংলা দেশে প্রত্যেক কল-কারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা কত জন থাকিতে পারিবে তাহার একটা ঊর্দ্ধতন সীমা-রেখা থাকা উচিত।

(৩) শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বস্তী প্রভৃতির কিছু আলোচনা থাকা অবান্তর হইবে না। বস্তী প্রভৃতি নির্ম্মাণের সময় কল-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন মতেই বস্তীগুলি পাড়ার ভদ্রলোকদের বিভীষিকার কারণ হইয়া না উঠে। পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা যাহাতে সব সময়েই বস্তীর ভাসমান জনসংখ্যার অপেক্ষা অনেকখানি বেশী থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তীবাসীদের সংহতি এবং জুজুৎসা অনেক সময়েই নিরীহ পল্লীবাসীদের ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। একটু কিছু উপলক্ষ পাইলেই তাহারা যে দলে-দলে বাহির হইয়া অভিযান আরম্ভ করিবে, তাহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৪) প্রত্যেক বস্তীরই এক জন করিয়া সুপারিন্টেনডেণ্ট জাতীয় অফিসার থাকা প্রয়োজন ; তিনি ভাসমান অধিবাসীদের হিসাব-নিকাশ রাখিবেন, তাহাদের নাগরিক কর্ত্তব্য, শুচিতা, স্বাস্থ্য এবং সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) বস্তীর মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক, বা প্রাদেশিক বিদ্বেষের অপপ্রচার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৬) বস্তীবাসীর জন্য ব্যাপক ভাবে বয়স্ক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রচারের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৭) পাড়ার ভদ্রলোকদের তরফ হইতে বস্তীবাসীর প্রতি ঘৃণা এবং বস্তীবাসীর তরফ হইতে ভদ্রলোকদের প্রতি হিংসা ...ভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মাঝে-মাঝে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা করা উচিত। বস্তী-সুপারিন্টেনডেণ্ট মাঝে মাঝে পাড়ার ভদ্রলোকদের আহ্বান করিয়া বস্তীবাসীদের ... উন্নতির জন্য সভা-সমিতির ব্যবস্থা করিতে পারেন, ... সহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি করিয়া তাহাদের নগর-স্বাস্থ্য ও নাগরিক... সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখান যাইতে পারে। বস্তীবাসীরা ... সাধারণ ভদ্রলোকদের নিকট হইতে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ...উপকার পায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রীতি জাগি... তাহা হইলে বস্তী জিনিষটা পাড়ার লোকের মনে বিভীষিকা ... করিবে না।

কৃষাণদিগের সমস্যা আরও গুরুতর ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ... কবি গোল্ডস্মিথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে দেশে ... বাড়িয়া চলে আর মানুষ (বিশেষ ভাবে কৃষক সম্প্রদায়) শীর্ণ ... থাকে, সে দেশ দুর্ভাগা দেশ।" আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া এই মহাপুরুষের বাক্যের সার্থকতা মর্ম্মে-মর্ম্মে ... করিতেছি। আজ কালোবাজারের কৃপায় দেশে ধনী ... খুব অভাব নাই, কিন্তু দেশের জনসাধারণের উন্নতি ... মোটেই হয় নাই। সহরের আকর্ষণে আজ পল্লীগ্রামগুলি ... হইয়া যাইতেছে কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে তাহার জমির খাতিরে পল্লীগ্রামের শ্মশান আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে—শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, গোচরণ-ব্যবস্থা নাই, শস্যবীজ নাই, সেচ-ব্যবস্থা নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, বস্ত্র নাই, ... অন্ধকার দূর করিবার জন্য কেরোসিন্ নাই, মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিদ্যালয় লাইব্রেরী সংবাদপত্র নাই, শুধু আছে আদিম যুগের নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক পরিবেশ, বর্ত্তমান যুগের নিষ্ঠুর ... এবং উদাসীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত, হৃত-... ক্ষীণ-প্রাণ মুমূর্ষু কৃষকবৃন্দ !

ইহাদেরও বাঁচাইতেই হইবে এবং সে জন্য প্রয়োজন আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর পরিকল্পনা। ষ্টেটের অধিকাংশ শক্তিই ... দিকে নিযুক্ত করিতে হইবে, কৃষকদিগের জন্য শুধু কতগুলি ... চমকবিশিষ্ট ফাঁকা শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ... নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া ক্ষমতার সিংহাসনে দলবিশেষকে বসাইবার মধ্যে গণতন্ত্রের কোন আদর্শই ফলপ্রসূ হয় ... দেশের সাধারণ মানুষকে মানুষের মত হইয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতার নূতন যুগের ভোরে ইহাই হইবে জাতির আদর্শ।

(আয়ার্লণ্ড)

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

এবার তোমাদের শোনাব আয়ার্লণ্ডের বিপ্লবের কথা। এই বিপ্লবের ইতিহাস পড়তে পড়তে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেক বিষয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে।

একাদশ শতাব্দীতে "উইলিয়াম দি কন্‌কারারে"র নেতৃত্বে নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ড জয় করেন। তার প্রায় একশ' বছর পরে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ঈঙ্গ-নর্ম্মাণরা আয়ার্লণ্ড আক্রমণ করে "পেল" (Pale) নামে একটি জায়গা দখল করেন। তারপরে একশ' বছর ধরে ক্রমাগত তাঁরা আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ইংরাজরা তখন থেকে আয়ার্লণ্ডবাসীদের অর্দ্ধ অসভ্য জাত বলে ঘৃণা করতে শুরু করেন এবং আয়ার্লণ্ড বিজয়ের পরেই আইন করে ইংরাজ ও আয়ার্লণ্ডবাসীদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। তার কারণ, ইংরাজরা ছিলেন ঈঙ্গ-স্যাক্‌সন জাতি আর আয়ার্লণ্ডবাসীরা ছিলেন কেল্ট। এই জাতিগত পার্থক্য ছাড়া তাঁদের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল। ইংরাজরা ছিলেন প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও আয়ার্লণ্ডবাসীরা রোমান ক্যাথলিক।

বিজিত আইরিশরা সহজে পরাজয় মেনে নিলেন না। তাঁরা ক্রমাগত বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সৃষ্টি করে চল্‌লেন এবং যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, এমন কি ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমনি ভাবে ইংরাজ পদে পদে আয়ার্লণ্ডের শত্রুতায় জর্জ্জরিত হয়ে প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজরা ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্থির করলেন যে, আয়ার্লণ্ডে ইংরাজ জমিদারদের বসান হবে। সেই জমিদাররা আয়ার্লণ্ডবাসীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে অনায়াসেই প্রজাদের দমন করতে পারবেন। তদনুযায়ী আয়ার্লণ্ডীয় জমিদারদের কাছ থেকে তাঁরা জমি কেড়ে নিয়ে বিদেশী জমিদারদের হাতে দিয়ে দিলেন। এলিজাবেথের পর ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস ছ'টি জেলা-সমেত সমগ্র আলষ্টারে বিদেশী ঔপনিবেশিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। দলে-দলে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে লোক আসতে লাগলো আলষ্টারে। এই জমিদার বসান কাজে সহায়তা করবার জন্য ইংলণ্ডে একটি সমিতি পর্য্যন্ত গঠিত হল। এই সমিতির কাজ 'Plantation of Ulster' অর্থাৎ 'আয়ার্লণ্ডের রোপণ' নামে খ্যাত ছিল। আয়ার্লণ্ডের এই রোপণ বীজ-রোপণ নয়, এ হল বিদেশী জমিদার-রোপণ। এই বিদেশী জমিদাররা আয়ার্লণ্ডীয় কৃষক প্রজাদের ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন এবং চিরদিনই তাঁরা আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর এই এত বছর পরেও সে বাধা দূর হল না। আজও এই বিদেশীরা আয়ার্লণ্ডীয়দের থেকে আলাদা হয়ে রইলেন।

ইংরাজদের বিদেশী জমিদার বসানর কাজ শেষ হওয়ার অনতি-বিলম্বেই তখনকার রাজা প্রথম চার্লস ও পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে গৃহ বিবাদ সুরু হয়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী আয়ার্লণ্ড রাজার পক্ষে ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট আলষ্টার পিউরিটান প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের স্বপক্ষে হলেন। এই সময় আয়ার্লণ্ডকে এক মহা দুর্য্যোগময় কাল অতিক্রম করতে হয়েছিল। দুই পক্ষে অবিরত হানাহানি যুদ্ধবিগ্রহ চলতে চলতে অবশেষে লিমারিকের যুদ্ধের পর ইংরাজ ও আয়ার্লণ্ডের মধ্যে এক মীমাংসা হল। ইংরাজরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, ক্যাথলিক আয়ার্লণ্ডকে নাগরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে; কিন্তু কার্যতঃ আলষ্টারের ইংরাজ জমিদাররা তা ভঙ্গ ত করলেনই, অধিকন্তু ডাবলিনে অবস্থিত নিম্ন পার্লিয়ামেণ্টে আইন প্রণয়ন করে আয়ার্লণ্ডবাসীদের পশম ব্যবসায় নষ্ট করে দিলেন!

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আয়ার্লণ্ড থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য পাঠিয়ে দিতে হল। এই সময় বৃটিশের শত্রু ফ্রান্স আয়ার্লণ্ড আক্রমণ করতে পারে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে প্রটেষ্ট্যাণ্ট প্রজা ও ক্যাথলিক জমিদাররা একত্রে দেশ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পাছে আমেরিকার মত আয়ার্লণ্ডও সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এই আশঙ্কায় আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট গঠনের ক্ষমতা দিলেন।

এর কিছু কাল পরেই অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লব সুরু হয়। তার ফলে আয়ার্লণ্ডে আশার সঞ্চার হয় এবং ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ই একত্রে একটি সঙ্ঘ গঠন করে নাম দিলেন United Irishmen বা মিলিত আয়ার্লণ্ডবাসী। বৃটিশ কিন্তু এই নব জাগরণে প্রমাদ গণলেন। সে জন্য তাঁরা এই সমিতিকে সমর্থন করলেন না। ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন এবং এর নেতা উলফ টোনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

'ইউনাইটেড আইরিশমেন' দলকে বিভক্ত করবার জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "Act of Union" অর্থাৎ "মিলন আইন" পাশ করেন

এবং ইংলণ্ডে অবস্থিত স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্টকে ভেঙ্গে দেন। আয়ার্লণ্ড ও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের মিলন হল বটে, কিন্তু আয়ার্লণ্ডের মিলনের বদলে বিভাগ দেখা দিল এবং আয়ার্লণ্ডে যে একতার বন্ধন গড়ে উঠছিল তার অবসান হল। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত আয়ার্লণ্ড থেকে ক্যাথলিক আলষ্টার আলাদা হয়ে গেল। এ ছাড়া আরও একটি বিভেদ দেখা দিল। আলষ্টার শীঘ্রই শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হল; কিন্তু আয়ার্লণ্ড চাষ-আবাদ নিয়েই থাকলো।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডের নেতা ডেনিয়েল ও' কোনেলের চেষ্টায় ক্যাথলিক আয়ার্লণ্ডবাসীরা বৃটিশ সাধারণ সভায় (British House of Commons) যোগ দেবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেন। এর আগে ক্যাথলিকদের সে অধিকার ছিল না। ক্রমে ক্রমে আরও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হতে লাগলো। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সংস্কার-বিলের ফলে বৃটিশের সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্লণ্ডীয়দের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং বৃটিশ সাধারণ সভা পুরাপুরি জমিদারদের অধিকারে থাকার পরিবর্ত্তে আয়ার্লণ্ডের ক্যাথলিক প্রজাদের মুখপাত্র হ'য়ে দাঁড়াল।

দরিদ্র আয়ার্লণ্ডের প্রধান জীবিকা ছিল আলু; সুতরাং এই আলুর ফসল যখন ব্যর্থ হল তখন দেখা দিল এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও জমিদারেরা প্রজাদের খাজনা মাপ করলেন না। ফলে তারা দেশ ছেড়ে দলে-দলে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে চলে গেলেন।

আয়ার্লণ্ডের কৃষকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে জমি-চাষ বন্ধ হয়ে গেল; সুতরাং এই সব ছেড়ে যাওয়া জমিকে কালক্রমে মেষ-চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করা হল। এর কারণ হচ্ছে ইংলণ্ডে ক্রমাগত উলের পোষাক তৈয়ারীর কারখানা বেড়ে চলছিল। এর চাহিদা মেটাবার জন্য আয়ার্লণ্ডের জমিদারেরা মেষ-পালন বাড়াতে লাগলেন। জমিদারদের এতে জমি চাষ করানর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হতে লাগলো।

এই মেষপালন ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হওয়াতে চাষীরা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়লো; কারণ মেষ-পালনের কাজ খুব কম লোক দিয়েই হয়ে যেত। এই বেকার লোকদের জমিদারেরা তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। বিতাড়িত লোকের অনেকে তখন আমেরিকায় এসে বসবাস সুরু করে। কালক্রমে এরা আমেরিকাতেই আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন করলো। এদের নাম হল ফেনিয়ান্‌স্ (Fenians)। দেশের জনগণের সঙ্গে বিদেশের এই দলের যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। তাই জনগণের সহযোগিতার অভাবে এই দুর্ব্বল দলকে অনায়াসেই দমন করা হল।

ওদিকে জমি নিয়ে জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হল তাকে বন্ধ করার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনে প্রজাদের ভাগ করে দিলেন। জমিদারেরা জমির দাম পাওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না। পক্ষান্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও কোন ক্ষতি হল না; কারণ তাঁরা এ সব জমির মূল্য বাবদ সম্পূর্ণ টাকাটা যে সমস্ত চাষীরা জমি পেলে তাদের উপরেই চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য এ টাকাটা তাদের একসঙ্গে দিতে হ'বে না—বছর বছর কিস্তিতে টাকাটা শোধ করতে হবে।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে আয়ার্লণ্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছে; তাই আয়ার্লণ্ড থেকে যখন পুরান স্বাধীনতার দাবীর বদলে Home Rule বা স্বায়ত্ত-শাসন চাওয়া হল তখন অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ "হোম রুলের" পক্ষপাতি হল, কারণ দেশবাসীরা তখন আর অশান্তির মধ্যে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এই হোম রুলের উদ্দেশ্য হল, আয়ার্লণ্ডে স্থানীয় ব্যাপারে কাজ করার জন্য একটি নিম্ন পার্লিয়ামেণ্ট পুনঃপ্রবর্ত্তন করা। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট পারনেল British Home of Cmomons-এ 'হোম রুলের' নেতৃত্ব করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে পার্লিয়ামেণ্টে বৃটিশ দলগুলি তা প্রাচীনপন্থীই হোন বা উদারনৈতিক দলই হোন কেউই আয়ার্লণ্ডের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না; সুতরাং তিনি এঁদের পার্লিয়ামেণ্ট সম্বন্ধীয় কাজে দীর্ঘ বক্তৃতা বা অন্যান্য নানা রকম কৌশলে বিলম্ব ঘটাতে লাগলেন। ইংরাজরা এই কাজকে বে-আইনী, অন্যায়, অভদ্রোচিত প্রভৃতি বলে সমালোচনা করতে লাগলেন। তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেছেন দেশ সেবার জন্য; তাই সেখানে অনবরত আয়ার্লণ্ডের সমস্যাকে জাগিয়ে রাখলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন নিজে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'হোম রুল' বিল আনলেন। এই বিলের বিপক্ষে প্রাচীনপন্থীরাও গেলেনই, এমন কি গ্লাডষ্টোনের উদারনৈতিক দলেও ভাঙ্গন ধরলো। এই দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল ইউনিয়নিষ্ট (Unionist) বা মিলনকামী নাম দিয়ে বিলের বিরোধিতা করলেন। ফলে এই বিল ও তা'র সঙ্গে সঙ্গে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভার পতন হ'ল।

এর সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন আবার প্রধান মন্ত্রী হলেন। আবার তিনি হোম রুল আনলেন। এবার সামান্য ভোটে তিনি জিতে গেলেন; কিন্তু House of Lords বা লর্ডদের সভায় বিল পাশ হ'ল না। কোন বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে তাকে লর্ডসভায় অনুমোদন করতে হবে নতুবা আইন হবে না। সুতরাং হোম রুল বিল লর্ড-সভার সমর্থন না পাওয়াতে কার্য্যকরী হতে পারলো না।

হোম রুল বা আইরিশ জাতীয় দল বিফল-মনোরথ হলেও ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হওয়ার আশায় পার্লিয়ামেণ্টের কাজ করে চললেন। কিন্তু দেশের লোক তাঁদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ও রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত হলেন।

দেশবাসী বুঝতে পারলেন যে, দেশকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হলে নিজের দেশের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে—বিদেশী ভাষার সাহায্যে তা সম্ভব নয়, তাই তাঁরা গ্যেলিক লীগ (Gaelic Leugue) স্থাপন করলেন। ইংরাজী ভাষা সেখানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকা সত্বেও তাঁরা গ্যেলিক ভাষার সাহায্যে তাঁদের পুরান সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

আগেই বলেছি, আয়ার্লণ্ডের জাতীয় দলের উপর দেশবাসী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এখন তাঁরা দেখলেন যে, এঁদের এই বক্তৃতায় কোন কাজই হ'বে না। ফেনিয়ানরাও (Fennians) এঁদের 'হোম রুল' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বর্ত্তমানে দেশের যুবকরাও হোম রুল নীতি সমর্থন করলেন না। তখন দেশের মধ্যে আবার সশস্ত্র বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। আর্থার গ্রিফিথস্ নামে একটি

এক নতুন নীতি প্রচার শুরু করলেন, তার নাম হল—সিন্ ফেন (Sinn Fein) অর্থাৎ আমরা নিজেদের (We ourselves)। এই দলের উদ্দেশ্য হল ইংলণ্ডের কাছে তাঁরা ভিক্ষে করতে যাবেন না। তাঁরা দাঁড়াবেন নিজেদের পায়ে। তাঁরা Gaelic আন্দোলনকে সমর্থন করলেন; কিন্তু হোম রুল বা ন্যাশানালিষ্ট দলের পার্লিয়ামেন্ট সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপ সমর্থন করলেন না, কারণ তাতে বৃটিশের সহযোগিতা করা হয়। আবার সশস্ত্র বিদ্রোহকে সেই মুহূর্তে সম্ভব মনে করলেন না। তাঁরা যে নীতি প্রচার করলেন সেটা এক রকম অসহযোগ আন্দোলন এবং এর নাম হল ডিরেক্ট এ্যাকসন্ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সিন ফেনের নীতি যুবকদের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করলো। এর মধ্যে লিবারাল দল বা গ্লাডষ্টোনের দল শক্তিশালী হয়ে তৃতীয় বার হোম রুল বিল উপস্থিত উত্থাপন করে পাশ করিয়ে নিলেন।

আয়ার্লণ্ড হোম রুল পেলেন: কিন্তু আলষ্টারের তা সহ্য হল না। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রস্তুত হতে লাগলেন। বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র আমদানি হতে লাগলো এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তাদের প্রকাশ্যে কুচ-কাওয়াজ শেখান হতে লাগলো। এই বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের বিরুদ্ধে, কারণ পার্লিয়ামেন্টই আয়ার্লণ্ডকে হোম রুলের অধিকার দিয়েছে। তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল দল আলষ্টারের এই বিদ্রোহকে সব রকমে সাহায্য করতে লাগলেন, এমন কি দরকার হলে বিদ্রোহীদের টাকা দিতে লাগলেন। তোমরা আরও আশ্চর্য্য হবে যে, এই বিদ্রোহী দলের এক জন নেতা উত্তর-কালে গবর্ণমেন্টের বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলষ্টার পার্লিয়ামেন্টের ঘোষণার বিরুদ্ধতা করলেও বৃটিশ রক্ষণশীল দল তাঁদের সাহায্য করলেন। তার কারণ হল, তাঁরা বৃটিশের চির-শত্রু ও বিদ্রোহী আয়ার্লণ্ড থেকে আলাদা হতে চেয়েছেন এবং আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছেন।

কিছু দিন পরে আয়ার্লণ্ডও আলষ্টারের অনুকরণে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করলেন। এই দলের উদ্দেশ্য হল হোম রুলের হয়ে লড়া এবং দরকার হলে আলষ্টারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এঁরা হোম রুলের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এঁদের দমন করতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা যে আলষ্টার কার্য্যতঃ পার্লিয়ামেন্টের বিরুদ্ধতা করলেন তাঁদেরই সাহায্য করলেন। এটাই মজার ব্যাপার এবং এর কারণ তোমাদের আগেই বলেছি।

আয়ার্লণ্ড ও আলষ্টার এই দু'দলের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ হবার উপক্রম হল; কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাসমর লাগার জন্য গৃহ-যুদ্ধ চাপা পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হোম রুলও চাপা পড়লো। বৃটিশ জানিয়ে দিলেন, হোম রুল আইনে পরিণত হলেও তা কার্য্যকরী হবে যুদ্ধের পরে।

বিদ্রোহী আলষ্টার বৃটিশ কর্ত্তৃক নানা ভাবে পুরস্কৃত হওয়ায় আয়ার্লণ্ডে অসন্তোষ দেখা দিল। তাঁরা তখন স্থির করলেন যে ইংলণ্ডের জন্য তাঁরা আত্মবলি দেবেন না। তদনুযায়ী আয়ার্লণ্ডের সকল সক্ষম লোককেই সৈন্য হতে বাধ্য থাকতে হবে, এই নিয়ম ঘোষিত হলে তাঁরা একে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ঈষ্টারের ছুটির সপ্তাহে এক জাগরণ হল। তার ফলে আয়ার্লণ্ডে গণতন্ত্র ঘোষিত হল। এই জাগরণকে বলা হয় ঈষ্টার অভ্যুত্থান (Easter Rising)। বৃটিশ এই অভ্যুত্থানকে দমন করলেন। ঈষ্টার জাগরণ ব্যর্থ হল, কিন্তু বৃটিশ এর নেতাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করেছিলেন তা আয়ার্লণ্ডের লোকের মনে ছাপ রেখে গেল। তাঁরা যে বিদ্রোহের আগুনকে ছাই-চাপা দিলেন সেই আগুন আবার দেখা দিল 'সিন ফেনের' মধ্যে।

মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন হল। আয়ার্লণ্ডে সিন ফেন দলের লোকেরাই অধিকাংশ আসন দখল করলেন। ফলে জাতীয়তাবাদীরা যাঁরা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিলেন তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হলেন। সিন ফেন দল ১৯১৯ সালে আবার ডাবলিনে গণতন্ত্র ঘোষণা করলেন এবং তার নাম দিলেন ডেইল ঈরীন (Dail Eireann)। এর সভাপতি হলেন ডি ভ্যালেরা এবং সহ-সভাপতি হলেন গ্রিফিথস্। এই দলের নীতি হল অসহযোগ ও বয়কট বা বর্জ্জন। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হিংসাত্মক গেরিলা যুদ্ধ করে ইংরাজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাঁরা আবার জেলের মধ্যে অনশন করে ইংরাজদের আরও বিব্রত করতে লাগলেন। টেরেন্স ম্যাকসুইনীর অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৫ দিন উপবাসের পর মারা যান।

গেরিলা যুদ্ধ দমনের জন্য ইংরাজরা যুদ্ধ-ফেরত হিংসাপ্রবণ সৈন্যদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। এদের পোষাক থেকে এরা Black and Tans (কৃষ্ণ ও পিঙ্গল) বলে পরিচিত হল। Black and Tans দল নানা ভাবে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগলো। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করতে লাগলো। এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তারা সিন ফেন দলকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করলো; কিন্তু আয়ার্লণ্ড তাতে দমলো না। তাঁরা ১৯১৯—১৯২১ পর্য্যন্ত ৩ বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

এর মধ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট অতি দ্রুত নতুন হোম রুল বিল পাশ করলেন। এই বিলের উদ্দেশ্য হল আয়ার্লণ্ডকে আলষ্টার বা উত্তর-আয়ার্লণ্ড ও বাকী সমগ্র আয়ার্লণ্ড বা দক্ষিণ-আয়ার্লণ্ড এই দু'ভাগে বিভক্ত করা। দু'ভাগে আবার দু'টি আলাদা পার্লিয়ামেণ্ট হল। আলষ্টারে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল; কিন্তু আয়ার্লণ্ডের অপর অংশ একে সমর্থন না করে সিন ফেন দল কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহে মত্ত হলেন।

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ আয়ার্লণ্ডের নেতাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ করলেন এবং ডিসেম্বর মাসে উভয় পক্ষে একটি আপোষ হল। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ইংরাজরা চুক্তি করতে বাধ্য হলেন আর ক্রমাগত যুদ্ধে বিব্রত ও শ্রান্ত হয়ে আয়ার্লণ্ডের অধিকাংশ নেতা মেনে নিলেন। কিন্তু সিন ফেন দলের মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। এক দলে হলেন ডেইল ঈরীনের সভাপতি ডি ভ্যালেরা অপর, দিকে গেলেন সহ-সভাপতি গ্রীফিথস্, মাইকেল কলিনস্ প্রভৃতি। ডি ভ্যালেরার দল চুক্তির বিরুদ্ধে এবং গ্রীফিথসের দল হলেন স্বপক্ষে। গ্রীফিথসের দল আয়ার্লণ্ডে ইংরাজ-পরিকল্পিত আইরিশ ফ্রী ষ্টেট স্থাপন করলেন। এই নিয়ে দু'দলের মধ্যে লাগলো ঘরোয়া যুদ্ধ। বিপক্ষ অর্থাৎ ডি ভ্যালেরার

দলকে দমন করবার জন্য ইংরাজ ফ্রী ষ্টেটকে সাহায্য করতে লাগলেন। মাইকেল কলিনকে ডি ভ্যালেরার দল (রিপাবলিক দল) গুলী করে মারলেন। তার পাল্টা আবার আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের লোকেরা রিপাবলিক দলের অনেক নেতাকে মারলেন, হত্যা করলেন এবং দলকে দল গ্রেপ্তার করে আয়ার্লণ্ডের জেল ভর্ত্তি করে ফেললেন। আয়ার্লণ্ডের লোকের বিরুদ্ধে আয়ার্লণ্ডকে লাগিয়ে দিয়ে বৃটিশ মজা দেখতে লাগলেন।

কালক্রমে গৃহ-বিবাদ থেমে গেল; কিন্তু ডি ভ্যালেরার দল ও কস্গ্রেভের আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়ে গেল। ডি ভ্যালেরার দল গরীব চাষী ও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। তাঁরা আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের বাইরে রইলেন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, ইংরাজরা তাঁদের গণতন্ত্র স্বীকার করেননি বলে; দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে বলে। কস্গ্রেভের দল ধনীদের প্রতিনিধি। তাঁরা রাজ্য-শাসন পরিচালনার ভার নিলেন।

ক্রমে ডি ভ্যালেরা দেখলেন যে, তাঁদের বাধা সত্ত্বেও যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর তা থেকে দূরে থাকলে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। কাজেই তিনি স্থির করলেন যে, প্রথমে আনুগত্য স্বীকার করে শাসন পরিষদে প্রবেশ করবেন তার পরে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ১৯৩২ সালের নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার দলের বেশীর ভাগ লোকেরই জয় হল। তখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে আর তাঁরা রাজার আনুগত্য স্বীকার করবেন না এবং ভবিষ্যতে জমির মূল্য বাবদ কিস্তির টাকা দেবেন না।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এর প্রতিবাদ করলেন। তখন দু'দলের মধ্যে আইনের প্রশ্ন উঠলো। আইনের প্রশ্ন নিয়ে মতদ্বৈধ হলে সালিশীর দরকার হয় এবং দু'পক্ষই তা মানতে রাজী; কিন্তু কা'কে সালিশী মানা হবে তাই নিয়েই তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। বৃটিশ মত প্রকাশ করলেন, সাম্রাজ্যের মধ্য থেকেই লোক নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে; কিন্তু মুস্কিল হল ডি ভ্যালেরা তাঁদের বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন—আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে এর মীমাংসা হ'বে। আবার বৃটিশ তাতে রাজী নন। এমনি ভাবে ঝগড়া চলতে চলতে বাৎসরিক কিস্তির টাকা দেবার সময় এসে পড়লো, অথচ আয়ার্লণ্ড তা দিলেন না। ইংলণ্ড তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা তখন আয়ার্লণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এ যুদ্ধ অস্ত্র-যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ অর্থনৈতিক যুদ্ধ। তাঁরা ইংলণ্ডে আয়ার্লণ্ডের মাল আমদানীর উপর বেশী শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন আয়ার্লণ্ড এতে জব্দ হয়ে সন্ধি করবেন; কিন্তু তা হিতে বিপরীত হল। এর প্রত্যুত্তরে আয়ার্লণ্ড বৃটিশ মাল আমদানীর উপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। এতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলেন, কিন্তু কেউই কারও কাছে নতি স্বীকার করলেন না। ১৯৩৩ সালে ডি ভ্যালেরার দল আবার নির্ব্বাচিত হওয়াতে বৃটিশ আয়ার্লণ্ড বিজয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন।

আয়ার্লণ্ড স্বাধীন হল; কিন্তু সেই স্বাধীনতা-সূর্য্যের অগ্রগতির পথে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত দাঁড়িয়ে আছে আলষ্টার-সমস্যা। কে সেই অগস্ত্য যিনি এই বাধা সরিয়ে দেবেন? আয়ার্লণ্ডে হবে কি তাঁর আবির্ভাব?

আয়ার্লণ্ডের রাষ্ট্র-নায়কেরা ভাবছেন, কেমন করে এই বিভক্ত আয়ার্লণ্ডকে এক করা যায়। তবে তাঁরা আজও কূল-কিনারা করতে পারেননি, আজও সে দেশ বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এই সম্বন্ধে খণ্ড-বিখণ্ড ভারত সম্বন্ধে ভুক্তভোগী আয়ার্লণ্ড বলেছিলেন—[illegible] ভাল হল না। আমাদেরই মত অবস্থা হল ভারতবর্ষের।

ধীরে ধীরে ফল ফলে

শ্রীইন্দিরা দেবী

সেদিন কুমকুমের একেবারে পড়া হয়নি, তার মানে পড়া তৈরী করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? একে [illegible] স্কুলের দল এসে যা তাড়া লাগালো খেলতে যাবার জন্য, সেই জন্য ভাল করে খাবার খাওয়াই হ'লো না। হালুয়া আর পাঁপড়-ভাজা খেতে কতটুকুই বা সময় লাগে কিন্তু তাও খেয়ে উঠতে পারলো না। খাবার জলের গেলাসে পাঁপড়-ভাজা ডুবিয়ে যেই না খেতে গেছে, পড়বি তো পড়, একেবারে পিসির চোখে! পিসি একালের আধুনিক মেয়ে হলে কি হবে, যা রাগী মেয়ে, বাবা! ওকে পড়বার সময় দেখলে আর পড়া হয় না। হবে কেমন করে? বই হাতে দেখলেই বলে বসবে—কই দেখি কুমকুম, কেমন পড়া হয়েছে? ও-কথা শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—না পারলেই বকুনী আর ঐ সব শব্দগুলো—[illegible] শুনে-শুনে কুমকুম মুখস্থ বলতে পারে: এ সব মেয়েদের কিছু হবে না। কেবল খেলা, নাচ, গান! কোথায় মিটিং হচ্ছে, স্কুল পালিয়ে চল সেখানে, আজ ষ্ট্রাইক, কাল এর ছুটি, হেন-তেন, একটা না একটা বুদ্ধি বেরুবেই। বড়দা যেমন কিছু বলে না! দেখবে কেমন মেয়ে হবে···ইত্যাদি।

কুমকুম ভাবে পিসি যে অত বলে, তা ওরা কি ছোট বেলায় গঙ্গার ঘাটের সাধুর মত চোখ বুজে বসে থাকতো, না ঠাকুমার মত ঠাকুর-ঘরে মালা জপ করতো—তা করলে কেমন করে পাশ করলো আবার কলেজ থেকে? হঠাৎ কুমকুমের কানে আসে—ওর ছোটদা পিসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে বকুনী খাওয়াবার জন্য যেন পড়ছে: ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর AD লম্ব টানা হইয়াছে। প্রমাণ করিতে হইবে যে—

কুমকুমের আরো বেশী রাগ হয়, জ্যামিতির ঐ ABC শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে, ছোটদা জানে বলে বেশী করে অমনি করে। তাছাড়া গাধার মত চেঁচালে ওখানে পড়া যায় না কি? এই কথা বলেছিল বলেই তো ছোটদা ওর বেণী ধরে টান মারলো! [illegible] পাজী ছেলে, আর পিসি বলবে অলকের মত পড়াশুনোয় ভালো ছেলে দেখা যায় না, কুমিটা হচ্ছে ফাঁকিবাজ। এ কথা শুনলে কার না কান্না পায়? আবার সুন্দর নামটাকে কাট-ছাঁট করে কুমি বলা হচ্ছে। ছোটদা তো শিখলেই যখন-তখন বলবে বন্ধু বান্ধবের সামনেই। মাকে বলেও তো ফল হলো না, বললেন: আচ্ছা', সবাই তোমায় কুমু বলবে, রবীন্দ্রনাথ এই নাম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছিলেন—

ধুত্তোর রবীন্দ্রনাথ, কুমকুমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে ওর অমন সুন্দর নামটাকে যা-তা করবে সবাই, অথচ অনুযোগ করলে কেউ আমোল দেয় না। সব চেয়ে রাগ তার পিসির উপর। অত যে সাধু সেজে বলা হয়, মিটিং, ষ্ট্রাইক—যেন নিজেরা কিছু করেননি—এই সেদিন স্বকর্ণে কুমকুম শুনছে, পিসির সেই ব[illegible]

অলকা সেনকে পিসি বলছে : তোর মনে পড়ে অলকা, স্কুল পালিয়ে প্রমীলাদের বাড়ীর ছাদে লুকোচুরি খেলা আর তেঁতুল খাওয়া ? এক দিন ছাদের আলসেতে নামা হয়েছিল আর পাশের বাড়ীর গিন্নী কাপড় তুলতে এসে চীৎকার করেছিল আমাদের দিকে চেয়ে ?

অলকা সেনও তো বলছিল : মনে নেই আবার, সেদিন তো শুধু বকুনি নয়, মারও খেতে হয়েছিল—

তবে যে পিসি অমন করে বলে, এবার এক দিন স্পষ্ট কুমকুম বলে দেবে, তার পর মার খেতে হয় খাবে।

কিন্তু মুস্কিল তো ঐখানে, আজই রুণুরা এলো, আজই খেলতে খাবার জন্যে পাঁপড়গুলো জলে ডুবিয়ে খাওয়া হলো, সবই আজ, আর পিসিই দেখলো—নাঃ, কুমকুম আর ভাবতে পারে না। পড়া ছেড়ে আস্তে-আস্তে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের পিছনকার জানলাগুলোর কাছে একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছে থাকতো এক-ঘর শালিক। কর্ত্তা, গিন্নী আর বাচ্চা-কাচ্চা। কুমকুম অনেক সময় লক্ষ্য করেছে ওরা কি বলাবলি করে, কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে না। আজ যেন কুমকুমের মনে হচ্ছে, ওরাই ওর সঙ্গে বকা-ঝকা করে না, কালো চোখ বার করে মিটমিট করে ওর দিকে তাকায়, আবার বন্ধ করে, মাঝে-মাঝে বাসা ছেড়ে উড়ে ডাল ওড়াল করে বেড়ায়। খেলা-ধূলো না থাকলে কুমকুম এই সব দেখে।

গাছটাও মস্ত গাছ, ডালে-পাতায় ভরতি, একটুকু ফাঁক নেই। উপর তলা নীচে তলা হয়ে গেছে তিন-চার তলা বাড়ীর মত। সব উপরের তলায় থাকে এক-ঘর চন্দনা, মাঝের তলার ভাড়াটে শালিক-পরিবার আর নীচের তলায় চড়াই-গিন্নী ছানা-পানা নিয়ে আরাম করে বাস করে। তাদের খাবার-দাবার কুমকুমদের ভাঁড়ার থেকে যা আসে তাই যথেষ্ট—ইচ্ছা করলে কিছু বিলিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু যে সুবিধাটা চড়াই-গিন্নী এই রেশন-এর দিনে পাচ্ছে, তা কিন্তু উপরতলা বা মাঝের তলার ভাড়াটেরা পায় না। তা না পাক, তাদের খাবার সংগ্রহ করবার শক্তি আছে।

এই ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নীচে যদি দাঁড়ানো যায়, বেশ খানিক জায়গা জুড়ে নীল আকাশের একটুও দেখা পাবে না। খাটে শুয়ে কুমকুম কত রাতে ঘুম ভেঙ্গে ভয় পেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সারা দিন ধরে দিনের আলোয় যে গাছকে দেখেছে, গভীর রাতে নিস্তব্ধ পৃথিবীতে তার যেন অন্য রূপ দেখে সে আতঙ্কিত হয়েছে।

তবু তিন তলার তিন-ঘর অধিবাসীদেরই সে চেনে। বেশী ভালো লাগে তার মাঝের তলার বাসিন্দাদের। তাদের বাসার সঙ্গে তাদের ঘর একেবারে এক সমান লাইনে। কুমকুম ভারী-মুখে জানলার রেলিং ধরে গাছের দিকে চেয়ে রইল।

শালিক-গিন্নীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : দেখেছ, বাগচি-বাড়ীর মেয়েটা অভিমানে মুখ ফুলিয়ে রয়েছে।

কর্ত্তা ঘাড় গুঁজে আরাম করছিল, বললে : দেখেছি বই কি, বেচারার পড়া হয়নি আর ওদের বাড়ীর ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে পড়ছে, শুনছো না ?

—শুনছি বৈ কি। আহা একরত্তি দুধের মেয়ে, এত পড়ার চাপ দেওয়াই বা কেন ? ঐ ওর পিসিটা, উঁচু জুতো পরে খট্‌খটিয়ে ছাতা হাতে করে বেরোয়—ওই তো বেশী শাসন করে। শালিক-গিন্নী স্নেহভরে একবার কুমকুমের দিকে তাকালো।

কর্ত্তা বললে : কিন্তু যে বয়সের যা। এখন ছোট কিন্তু এক দিন তো বড় হবে, চিরদিন ছোট থাকবে না, লেখা-পড়া তো করতেই হবে।

গিন্নী ঠোঁটটা একবার গাছের ডালে ঘষে নিলো, তার পর বললে : তা তো বটেই—তবে বড় ছেলেমানুষ।

কর্ত্তা বললে : তা আর কি হবে বলো ? একটু-একটু করে সব দিক্ দিয়ে বড় হবার চেষ্টা করা উচিত, আর এখন থেকেই—এই ছোট থেকেই।

গিন্নী আর একবার নরম চোখে তাকালো কুমকুমের দিকে, তার পর বলে উঠলো : আহা, তা হোক, কচি বাচ্ছা।

কর্ত্তা রেগে বাধা দিয়ে বললে : কচি বাচ্চা—কচি বাচ্চা করে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেরও মাথা খেয়েছ, বিশেষ করে বড় ছেলেটার।

—কেন কি করেছে সে ?

কর্ত্তার মেজাজ তখনও সমান পর্দ্দায় : হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু !

গিন্নী কিছু বলবার আগে ছোট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এসে ডাকলো : মা ! বাবা !

গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বললে : কি হয়েছে রে, এত হাঁপাচ্ছিস্ কেন ?

ছোটর সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে : অনেক—অ—নে—ক দূর উড়ে বেড়িয়ে এলাম। দিদি সঙ্গে ছিল। আকাশটা কোথায় শেষ হয়েছে কেবল তাই দেখতে ইচ্ছা করে।

গিন্নী ছোটর কাছে সরে এসে বললে : ষাট, ষাট,, অত দূর যাস নে বাপু

কর্ত্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ; না যাবে না, তোমার কোলের কাছে বসে থাকবে ?

—আচ্ছা, তুমি থামো, তোর দাদা কোথায় রে ছোট ?

আবার কর্ত্তার সপ্তমে-চড়া কণ্ঠ শোনা গেল : কোথায় আবার যাবে, বাসায় পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, একটুও উড়তে পারে না, পোকা ধরতে পারে না—একবারে হাঁদা গঙ্গারাম—অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়া ভালো।

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : বলি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে না কি ? ষাট, বাছা আমার বেঁচে থাক।

—বেঁচে থাকবে কি করে ? শক্তি চাই, বুঝলে গিন্নি ! নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলে এ যুগে বাঁচা চলবে না। উড়তে পারবি না, পোকা ধরতে পাবরি না, তবে পাখী হয়ে জন্মেছিস্ কেন ? মানুষের ঘরে জন্মালেই তো পারতিস !

—তা বেচারা পারে না কি হবে ? গিন্নীর কথার সুরে অনুকম্পা।

—পারে না কেন শুনি ? তার ছোট ভাই, ছোট বোন যখন আকাশের শেষ কোথায় দেখবার চেষ্টা করে, পোকা-মাকড় ধরে খায়, তখন ধেড়ে ছেলে বাসায় খেয়ে পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, আর মা-বাপের হাত-তোলা খাচ্ছে, লজ্জা করে না—ছিঃ !

—তা কি করবে ? বেচারার ডানায় জোর নেই।

—কে বললে জোর নেই ? ভয়েই সারা, এ যুগে ঐ কুঁড়েমী আর ভয় থাকলে তোমার ছেলে ঐ বাসায় পচে মরবে, বুঝলে ?

গিন্নী রেগে বললে : একশো বার ঐ ছাই কথাগুলো বলো না বলছি।

ছোট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, এবার বলে উঠলো : আমারও এই রকম ভয় করতো, মনে হতো উড়তে পারবো না, ডানা ভেঙ্গে পড়ে মরবো।

কর্তাও বলে উঠলো : হ্যা, হ্যা, ছোটবেলায় আমারও অমনি হতো, সকলেরই হয়।

ছোট একদমে বলে চললো : চেষ্টা করতেই দেখলাম, বেশ উড়তে পাচ্ছি। আর সে কি মজা আর আনন্দ !

গিন্নী একটু ভেবে বললে : বড়কে একবার চেষ্টা করে দেখতে বললে হয়।

কর্তা বিরক্ত হয়ে বললে : কিন্তু চেষ্টা করে দেখবার কি মন আছে ? মন থেকে ভয়কে মুছে ফেলতে না পারলে কোনো কালেই কিছু হবে না, শুধু বয়সই বাড়বে, বুদ্ধি আর পাকবে না। শোনো গিন্নি, বড়কে ওড়া শেখাতেই হবে, আজ কেউ ওকে খাবার দিতে যেও না।

—বা রে, না খেয়ে থাকবে ছেলেটা ? গিন্নীর কণ্ঠস্বর ভিজে।

—না, না নিজের চেষ্টায় ও খাবার খুঁজে নিক, উড়তে শিখুক। আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার, শক্তি চাই। কর্তা জোর দিয়ে বলে উঠলো।

ছোট তার দিদির সঙ্গে আবার উড়ে চললো আকাশে। উড়তে উড়তে নীল আকাশের কোন্ অসীম শূন্যে তারা মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ।

বাসায় শুয়ে বড় ঝিমুচ্ছিল—সে দেখলো ওরা উড়ে গেল, নীচের তলায় চড়াই-গিন্নীর সে-দিনের কচি বাচ্চাটা পর্য্যন্ত তার আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। উপরতলা থেকে সে আসতো মাঝে-মাঝে, কথা বলতো। চন্দনার সেই ভাইটাও পাখা মেলে উড়ে গেল।

বড় দেখছে এক-মনে, একমাত্র সে-ই বাসায় পড়ে আছে অথর্ব্বের মত।

মা ডাকলো : বড় এসো, খাবার নাও।

বড় এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না ! মা আবার ডাকলো, বললে : চেষ্টা কর বড়, ঠিক পারবে।

বড় নড়ে-চড়ে উঠলো : না মা, পড়ে যাচ্ছি যে !

—একবার পড়বে, দু'বার পড়বে, তিন বারে ঠিক উড়তে পারবে।

বড় প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। শালিক-গিন্নী তখনও বলছে : নিজের শক্তি জাগাতে হবে, ওঠো বড়, ঠিক উড়তে পারবে।

কুমকুম তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হলো, তাদের সব কথা সে বুঝতে পেরেছে। ভারী আরাম আর আনন্দ হচ্ছিল তার। মনে হলো, সে-ও যদি ডানা মেলে অমনি অসীম শূন্যে উড়তে পারতো !

শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে মাটিতে পড়ে গেছে, উড়তে চেষ্টা করছিল, পারেনি।

মা এসে ছেলের মুখে খাবার দিয়ে বললে : ঠিক উড়তে পারবে বড়, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে।

পিসির কণ্ঠ শোনা গেল : কুমকুম কই রে ? পড়তে বসেনি ?

ছোটদের উচ্চকণ্ঠ তখনও ঘোষণা করছে : ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর লম্ব টানা হইয়াছে—

কুমকুম আর একবার নীল আকাশের দিকে চাইলো—দেখলে, শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে উড়ে চলেছে…।

কুমকুমের কানে বাজতে লাগলো : মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে…।

সত্যের পূজা

(কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের "Three Mendicants" গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ

পৌষ মাস—সংক্রান্তির আর দেরী নেই। বিশাল নদী স্রোতে কতগুলি যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। নৌকার যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন জয়রামপুরের বিষ্ণুপদ শর্ম্মা। বিষ্ণুপদ পণ্ডিত লোক, সে জন্য সকলেই তাঁকে মান্য কোরত।

শীতে নৌকার যাত্রীরা জড়সড় হয়ে বসে-বসে গল্প করছিল। বিষ্ণুপদ এক ধারে নীরবে বসেছিলেন। হঠাৎ এক জন যাত্রী চেঁচিয়ে উঠল—"ওই দূরে, নদীর জলের মধ্যে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট ওটা কি ?"

এক জন মাঝি শুনে বলল—"ওটা একফালি জমি, চারি ধারে জল। ওখানে তিন জন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী থাকে।"

সে কথা শুনে বিষ্ণুপদ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বললেন—"সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী ! এরা কে, তুমি জান ? আমার এদের বিষয় খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মাঝি উত্তর করল—"আজ্ঞে, আমি এদের কথা আগেও অনেক শুনেছিলাম। এবারে চোত মাসে একবার এখানে ঝড়ে আমার নৌকখানাকে ঠেলে নিয়ে যায় ওই চরে। কোথায় এলাম বুঝতে না পেরে খানিক দূর হেঁটে যেতেই দেখি সামনে একটা মাটীর ঘর। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তিন জন বুড়ো লোক ! তারাই আমায় খাওয়ালে, কত যত্ন করলে—আমার নৌকো সারাতে তারাই সাহায্য করলে।"

তারা কি ধরণের লোক—জিজ্ঞাসা করায় মাঝি বলল—"এক জন বাঁটকুল মত, কুঁজো আর খুব বুড়ো। সে পরেছিল একটা পুরানো আলখাল্লা মত। তাকে দেখে আমার মনে হোল, তার বয়স একশ' বছরেরও বেশী। তার দাড়ী তো একেবারে সাদা। কিন্তু তার মুখে সব সময় হাসিটি ঠিক লেগেছিল। আর এক জন আর একটু ঢেঙ্গা, আর বেশ বুড়ো। সে পরেছিল একটা ছেঁড়া জামা—তার লম্বা দাড়ী যেন হলুদ মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু উঃ ! তার গায়ে কি জোর,—একাই আমার নৌকখানা উল্টে দিলে, আর কি স্ফূর্ত্তি ! অন্য লোকটি খুব লম্বা, তার ধবধবে দাড়ী হাঁটু

অবধি নেমে এসেছিল—কোমরে একখানি কাপড় ছাড়া তার গায়ে কিছু ছিল না। এর মুখে কোন কথা ছিল না, যেন মনমরা মত।"

"তারা তোমার সঙ্গে কি কথা বলল?" বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করল।

"তারা কথা খুব কম বলছিল। কত দিন ধরে ওই চরে তারা আছে আমি জিজ্ঞেস করায় খুব ঢেঙ্গা ঋষি, যেন তার রাগ হয়ে গেল। তখন খাটো বুড়ো লোকটি একটু হেসে তার হাতটি চেপে ধরতে সে আর কিছু বললে না।"

নৌকাটি তখন ক্রমশঃ সম্মুখবর্ত্তী চরটির সন্নিকটে এসে পড়েছিল। বিষ্ণুপদ নৌকার বুড়ো মাঝিকে ডেকে বললেন—"আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে একবার এই অদ্ভুত লোকগুলিকে দেখতে। ওই চরে একবার কি আমায় নিয়ে যেতে পারবে?"

বুড়ো মাঝি বিষ্ণুপদকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল—"আপনাকে আমি নিয়ে যেতে খুব পারব, কিন্তু শুধু সময় নষ্ট হবে তা আপনাকে বলে দিচ্ছি, কারণ ওদের দেখে আপনার কিছুই লাভ হবে না। আমি লোকদের মুখে শুনেছি, এই বুড়ো লোক তিনটি একেবারে একা, না কিছু বোঝে, না কিছু বলতে পারে।"

"তবু আমি যেতে ইচ্ছে করি"—বললে বিষ্ণুপদ। "এর জন্য আমি আলাদা কিছু তোমাদের দেব। আমাকে নিয়ে চল।"

মাঝিরা তখন নৌকাটা সেই চরের নিকটে বেয়ে নিয়ে এসে নোঙর ফেলে দিল। নৌকার সকলেই দেখতে পেল, জলের ধারে তিন জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক জন খুব দীর্ঘদেহ, তার কোমরে শুধু এক টুকরা কাপড়। ছিন্নবস্ত্র গায়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি অতটা দীর্ঘ নয়। তৃতীয় ব্যক্তিটি কুব্জ ও ক্ষুদ্রকায়—তার অঙ্গে পুরাতন একটি আলখাল্লা।

বিষ্ণুপদ নৌকা থেকে নামতেই সেই তিন জন বুড়ো তাঁকে প্রণাম জানাল। বিষ্ণুপদ তাদের আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"আমি তোমাদের কথা শুনলাম যে, তোমরা এখানে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর। আমিও তাঁরই অযোগ্য ভক্ত, সে জন্য আমি তোমাদের দেখতে এলাম,—যদি তোমাদের কিছু জানবার থাকে আমি তা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারব।"

এ কথা শুনে সেই লোকগুলি শুধু নীরবে হাসল।

"তোমরা ভগবানকে কি ভাবে পূজো কর?"—বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করল।

অতি-বৃদ্ধ সাধুটি হেসে উত্তর দেয়—"ঠাকুর, আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা ভগবানের পূজো করব। আমরা যাতে নিজেরা দু'টো খেতে পাই তারই চেষ্টা করি।"

"তবু, তোমরা তাঁকে কি ভাবে ডাক?" জিজ্ঞাসা করলেন বিষ্ণুপদ।

লোকটি বলল—"আমরা শুধু বলি—হে ত্রিশক্তি, আমাদের তিন জনকে দয়া কর।"

বিষ্ণুপদ শুনে হাসলেন—"তোমরা ভগবানের ত্রিশক্তির কথা হয়ত কিছু শুনেছ, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁর বিষয়ে তোমাদের সম্যক্ জ্ঞান নেই। এস, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

তার পর বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ ধরে সেই সাধুদের অনেক তত্ত্বকথা বোঝালেন এবং তার পর একটি সুন্দর স্তোত্র আবৃত্তি করে তাদের বললেন—"এই স্তোত্রটি আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এখন থেকে এই স্তোত্রটি বলে ভগবানের আরাধনা কর।"

প্রথমে লোকগুলি স্তোত্রটির একটি কথাও বলতে পারল না। তখন বিষ্ণুপদ বার-বার করে একটি-একটি কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁট-নাড়া দেখে তারা ধীরে ধীরে সেই রকম উচ্চারণ করতে চেষ্টা করতে লাগল। বহুক্ষণ চেষ্টা করার পর তারা একে একে তিন জনই স্তোত্রটি বলতে পারল।

তখন বিষ্ণুপদ তাদের বার-বার তাঁর সঙ্গে স্তোত্রটি আবৃত্তি করালেন। যখন তাদের কথাগুলি একেবারে কণ্ঠস্থ হয়ে গেল, তখন বিষ্ণুপদ তাদের আশীর্ব্বাদ করে নৌকায় ফিরে গেলেন।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, এবং চাঁদ ধীরে-ধীরে আকাশে উঠছিল। নৌকা ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ অবধি নৌকা থেকে চরের লোকগুলি তখনও যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করছিল, তার কথাগুলি শোনা যাচ্ছিল। তার পর আর কিছু শোনা গেল না। নৌকা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল—চরের লোক তিনটিকে ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হোল না, শুধুই জল।

রাত্রি গভীর হতে লাগল, যাত্রীরা একে একে নীরব হয়ে গেল। চারি ধার নিস্তব্ধ। বিষ্ণুপদ একা—পশ্চাতে যেখানে তাঁরা চরটি ফেলে এসেছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বসেছিলেন, এবং সেই অদ্ভুত লোক তিনটির কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি যে তাদের ভগবানের বিষয়ে শিক্ষা দিতে পেরেছেন, সে জন্য তিনি মনে-মনে আনন্দ অনুভব করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হোল, যেন চাঁদের আলোয় জলের মধ্যে কিছু একটা ঝিকমিক করছে। তার মনে হতে লাগল, যেন একটা সাদা পালের নৌকা তাঁদের নৌকার দিকে জলে ভেসে আসছে।

বিষ্ণুপদ মাঝিকে আহ্বান করলেন—"দেখ তো ভাই মাঝি, ওটা কি? কিছু বুঝতে পারছ?" কিন্তু তখন তিনি নিজেই দেখতে পেলেন। দূরে জলের উপর দিয়ে সেই তিন জন বুড়ো দ্রুত পদবিক্ষেপে চলে আসছে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় তাদের সাদা দাড়ী ঝকঝক করছিল।

মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—"ওরে, এ কি রে—সেই সাধুরা যে জলের উপর দিয়ে চলে আসছে, যেন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে!"

মাঝির চীৎকার শুনে নৌকার লোকেরা সকলেই উঠে বসল। ততক্ষণে সেই তিন জন সাধু নৌকার উপরে উঠে এসেছে। তারা বিষ্ণুপদর নিকটে এসে বলল—"ঠাকুর, আপনি যে আমাদের ভগবানকে পূজো করবার জন্য স্তোত্রটি শিখিয়েছিলেন, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। যতক্ষণ আপনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ আমাদের তা বেশ মনে ছিল, কিন্তু ঘণ্টা খানিক পরে আমরা স্তোত্রটি বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখি, আমরা সবটাই ভুলে গিয়েছি। আপনি আবার আমাদের স্তোত্রটি শিখিয়ে দিন।"

বিষ্ণুপদ সাধুদের সম্মুখে মাথা নত করে বললেন—"আপনাদের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেছেন—আমার পক্ষে আপনাদের কিছু শিক্ষা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আপনারা আমাদের মত পাপীদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করবেন।"

এই বলে পণ্ডিত বিষ্ণুপদ মাথা নত করে সাধুদের পদধূলি দিলেন। তাঁরা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর জলের উপর দিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

শুধু সকালে দেখা গেল, নৌকার উপরে যেখানে সেই সাধুরা তিন জন এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানে যেন এক টুকরা আলো ঝকঝক করছে।

দোষ স্বীকার

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(Marienkind—Grimm)

কাঠুরে।	রাজপুত্র।
কাঠুরের মেয়ে সুখী।	রাজবাড়ীর মেয়েরা।
দেবকন্যারা।	প্রজারা।
বনদেবী।	শিকারীর দল।

প্রথম দৃশ্য

[গভীর বন···প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—কাঠুরে একটি কাঠের আঁটি বাঁধিতেছে—কাঠুরের মেয়ে]

সুখী। বাবা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে—

কাঠুরে। ক্ষিদে তো পেয়েছে জানি···কিন্তু এ বনের ভেতর তোকে কি খেতে দি বল তো।

সুখী। আমার পেটের ভেতর জ্বালা করছে বাবা (ক্রন্দন)।

কাঠুরে। একটা মেয়ে···হে ভগবান, তাকেও পেট ভরে খেতে দিতে পারি না···মেয়েটার কষ্ট আর সহ্য করতে পারি না।

(হঠাৎ চারি দিক্ আলোকিত হয়ে উঠল—বনদেবী তাদের সামনে এসে হাজির হলো)

কাঠুরে। কে তুমি মা!

বনদেবী। আমি বনদেবী···তোমার মেয়েটিকে আমায় দেবে?

কাঠুরে। (সুখীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল) সে কি! আমার যে আর কেউ নেই।

বনদেবী। আমি মেয়ে বড় ভালোবাসি—দাও না তোমার মেয়েটি, ওকে আমি কত সুখে রাখবো।

কাঠুরে। কিন্তু মা, ওই যে আমার সম্বল।

বনদেবী। তোমার যখনই ইচ্ছে হ'বে তখনই তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে।

কাঠুরে। তা হ'লে······

বনদেবী। তা হ'লে সুখীকে আমি নিয়ে যাই।

(হঠাৎ চারি দিক্ আলোকিত হয়ে উঠলো—দেখা গেল সুখী আর বনদেবী নেই, আর কাঠুরের কুড়ুলটা সোনার হয়ে গেছে)

কাঠুরে। (কুড়ুলের দিকে চেয়ে) এ কি! ষ্যাঁ! এ যে একেবারে খাঁটি সোনা···সুখী···সুখী···কই, সুখী কোথা গেল···হ্যা, আমার সুখী নেই···সুখী সুখী···(ছুটিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল—তার গলার আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে লাগলো)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্বর্গের উদ্যান—নানা রকম অদ্ভুত ফুল—দূরে একটি ঝর্ণা—সোনার মত তার জল—চারি দিকে মিষ্টি গান—বনদেবী আর সুখী)

বনদেবী। সুখী, তোমার বাবার জন্তে মন কেমন করছে না?

সুখী। না···বাবার কথা আমি ভাববারও সময় পাই না—এখানে বসে।

বনদেবী। আজীবন তোমায় আমি আমার কাছে রেখে দেবো—দেবকন্যারা হবে তোমার খেলার সাথী—স্বর্গের পাখীরা শোনাবে তোমায় মিষ্টি গান···কিন্তু সাবধান, আমার অবাধ্য হলেই তোমায় মহা বিপদে পড়তে হবে। কাল আমি দেশ-ভ্রমণে যা'বো···তুমি স্বর্গের সব জায়গায় যেতে পারবে—সব জিনিষই তুমি নিতে পারবে, কিন্তু সাবধান, ঐ ঝর্ণার জলে যেন কখনো হাত দিও না···বুঝলে?

সুখী। আচ্ছা।

বনদেবী। ঐ ঝর্ণার ধারে বসে থাকবে···ঐ ঝর্ণার জলে দেখতে পাবে সারা পৃথিবী···পৃথিবীর দৃশ্য ছবির মত একে একে তোমার সামনে ভেসে উঠবে—কিন্তু সাবধান, ঐ ঝর্ণার জলে যেন তুমি হাত দিও না।

সুখী। আমার বাবাকে ঐ ঝর্ণার জলে দেখতে পাবো?

বনদেবী। হ্যাঁ, তোমার বাবাকে দেখতে পাবে···দেখতে পাবে তোমার খেলার সাথীদের···কিন্তু দেখো যেন ঐ ঝর্ণার জলে হাত দিও না।

সুখী। না।

বনদেবী। কাল সকালেই আমি চলে যাবো···আমার কথা তোমার মনে থাকবে তো?

সুখী। হ্যাঁ, (বনদেবী চলে গেলেন···কতগুলি দেবকন্যা নাচিতে নাচিতে সেখানে এলো)

এক জন দেবকন্যা। বা রে, আমরা তোমায় খুঁজে মরছি আর তুমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো—চাঁদের মা যে আজ আমাদের খাওয়াবেন, তুমি ভুলে গেছো বুঝি?

সুখী। আচ্ছা বোন···ঐ ঝর্ণার জলে কি আছে?

দেবকন্যা। ঐ ঝর্ণার জলে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর ছবি···কিন্তু কারুর ঐ ঝর্ণার জলে হাত দেবার হুকুম নেই।

সুখী। কেন ভাই?

দেবকন্যা। তা কি করে জানবো ভাই···আর জেনেই বা আমাদের লাভ কি বল?

সুখী। তা বটে।

দেবকন্যা। চ', তুই যাবি নে?

সুখী। আমার মনটা আজ ভালো নেই, তোরা যা।

(দেবকন্যারা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল)

সুখী। কি আশ্চর্য্য ঝর্ণা! অথচ হাত দেবার হুকুম নেই!

(সুখী চলিয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে বনদেবী বাগানের ভেতর এলেন) (১০ মিনিট কাটিয়ে দিতে হবে—নেপথ্যে কোন সঙ্গীত)

বনদেবী। সুখী···সুখী···কোথায় গেল মেয়েটা—

(ছুটিতে ছুটিতে সুখীর প্রবেশ—একটি হাত সে আঁচলের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে—সামনে বনদেবীকে দেখিয়া)

সুখী। ষ্যাঁ! আপনি!

বনদেবী। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি অমন কাঁপছ কেন?

সুখী। কাঁপছি···না···কই কাঁপিনি তো

বনদেবী। তুমি ঝর্ণার জলে হাত দিয়েছো?

সুখী। না না—হাত দেব কেন! আমি দেখছিলাম আমার বাবাকে, তিনি আমার জন্যে কাঁদছেন···মস্ত বড় কোটা বাড়ী আমাদের—কত দাস-দাসী···কিন্তু বাবা আমার কাঁদছেন আর সুখী সুখী বলে ডাকছেন···আমি হাত বাড়িয়ে বাবাকে ধরতে গেলেম···

বনদেবী। তুমি ঝর্ণার জলে হাত দিয়েছিলে?

সুখী। না না, আমি কেন হাত দেবো?

বনদেবী। মিছে কথা বলছো।

সুখী। না না, আমি হাত দিইনি!

বনদেবী। দোষ স্বীকার করো সুখী···তা না হ'লে আমি তোমায় ভীষণ শাস্তি দেবো।

সুখী। না না, আমি হাত দিইনি।

বনদেবী। বেশ, তবে তুমি আবার পৃথিবীতে ফিরে যাও···আজ থেকে আমি তোমার কথা কইবার শক্তি হরণ ক'র নিলাম—যেদিন তুমি তোমার দোষ স্বীকার করবে সেই দিন আবার তুমি কথা কইবার শক্তি ফিরে পাবে···যাও···

(সুখী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা দু' ফাঁক হয়ে গেল—সেই সঙ্গে অদৃশ্য হল সুখী)

তৃতীয় দৃশ্য

(গভীর বন—একটা গাছের গুঁড়ির কাছে সুখী দাঁড়িয়ে···তার কাপড়-জামা কিছু নেই—মেঘের মত কালো চুল তার সারা অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। চারি দিকে বাজনা-বাদ্যি···আর কুকুরের ডাক —হঠাৎ একটি সুন্দর যুবক সুখীর কাছে ঘোড়ায় চড়ে এসে পড়ল···সুখী ভয়ে জড়সড় হয়ে গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। (মিনিট পাঁচেক পরে)

রাজপুত্র। কি সুন্দরী মেয়ে! কিন্তু একলা ও বনের ভেতরে কেন···তুমি কে?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। তুমি একলা এখানে কেন?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সুখী। (কোন উত্তর দিল না)

রাজপুত্র। উত্তর দাও···তুমি কি কথা কইতে পারো না?

সুখী। (ঘাড় নাড়িল)

রাজপুত্র। আমার সঙ্গে যাবে···আমি তোমায় ভালো করে দেবো।

সুখী। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাবে) (সেই সময় চার জন শিকারী সেখানে এসে পৌছাল)

রাজপুত্র। আমার হাতীটা এখানে নিয়ে এসো, একে আমি নিয়ে যাবো!

সকলে। সে কি! রাজকুমার···ও ডাইনি···চুপ করে বোবা সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুত্র। যাও, যা বলছি শোনো—

(শিকারীরা চলে গেলো)

সুখী। (কাঁদিতেছে)

রাজপুত্র। তোমার কোন ভয় নেই···আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় বিয়ে করবো—

সুখী। (আরো কাঁদিতে লাগিল)

রাজপুত্র। কাঁদছ কেন?···আমায় বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে নেই?

সুখী। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আছে)

(হাতী আসিয়া পড়িল—রাজকুমার সুখীকে হাতীর উপর তুলিয়া লইয়া চলিল)

১ম শিকারী। দেখলে একবার রাজকুমারের কাণ্ড?

২য়। ছেড়ে দাও ভাই, রাজ-রাজড়ার ব্যাপার!

৩য়। ও নিশ্চয় ডাইনি!

৪র্থ। দু'দিন পরেই বোঝা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

(দুই বছর পরে)

(রাজ-প্রাসাদ—একটি কক্ষ—সুখী একটি সোনার পালঙ্কে শুয়ে—তার পাশে সুন্দর একটি শিশু···ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর কেউ নেই—হঠাৎ ঘরের দরজা ফুঁড়ে একটা আলো এসে সুখীর মুখের উপর পড়তেই সুখী চমকে বিছানার উপর উঠে বসলো··· দেখতে দেখতে বনদেবী ঘরের ভিতর এসে হাজির হলো)

সুখী। আবার—আবার আপনি এসেছেন?

বনদেবী। হ্যাঁ, তোমার দোষ স্বীকার করবে?

সুখী। দোষ···কি দোষ···কত বার তো বলেছি আমি হাত দিইনি ঝর্ণার জলে?

বনদেবী। এখনো তোমার দোষ স্বীকার কর সুখী, তোমার একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে আমি নিয়ে গেছি···যদি তুমি দোষ স্বীকার না করো তাহ'লে এ ছেলেটিকেও আমি নিয়ে যাবো, বল, হাত দিয়েছিলে ঝর্ণার জলে?

সুখী। না।

বনদেবী। না, তবে দাও ও-ছেলেটিকে।

সুখী। না না, দেব না কিছুতেই দেব না।

বনদেবী। তুমি দোষ স্বীকার করলে সব ফিরে পাবে, তোমার সুখের আর সীমা থাকবে না। তোমার কথা কইবার শক্তি ফিরে পাবে···তোমার ছেলে-মেয়েকে ফিরে পাবে···এখন বলো, তোমার দোষ স্বীকার করবে?

সুখী। না, আমি সে ঝর্ণার জলে হাত দিইনি।

বনদেবী। বেশ···দাও তোমার ছেলেকে (দেবী সুখীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কোল থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো ···ভোর হতে পাখী ডেকে উঠলো···ঘরে ঝি প্রবেশ করলো··· সুখীকে বিছানার উপর বসে থাকতে দেখে)

দাসী। ও মা! এ কি গো···তোমার ছেলে কই···এটাকেও খেয়ে ফেললে! যাই রাজপুত্তুরকে খবর দি। [প্রস্থান।

(সুখী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল···প্রাসাদময় খুব গোলমাল—রাজা ও তার সঙ্গে দু'টি স্ত্রীলোক সুখীর ঘরে এসে প্রবেশ করলে

রাজা। (সুখীর কাছে গিয়া) ছেলে কোথা ?

সুখী। (কাঁদিতে লাগিল)

১ম স্ত্রী। ন্যাকা! চুপ করে আছেন···মা হয়ে নিজের ছেলেকে খায় এমন তো কখনো দেখিনি !

২য় স্ত্রী। দেখছো না, পাছে কেউ বুঝতে পারে সে জন্যে হাড়গুলোকে পর্য্যন্ত কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে।

রাজা। তোমায় কি শাস্তি দেবো তাই ভাবছি।

১ম স্ত্রী। কি শাস্তি আবার দেবে—উপরে নীচে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেল।

২য়। তার চেয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারো।

রাজা। তাই হক···কাল সকাল বেলা সূর্য্যি ওঠবার আগে তোমায় জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হবে···কি করব! তোমায় বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই···আবার একটা ছেলেকে তুমি খেয়ে ফেলেছ শুনলে প্রজারা ভীষণ ব্যাপার বাধিয়ে তুলবে। কাল তোমায় মরতে হবে—ভোর হবার আগে।

[সকলের প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

(রাজার কক্ষ—রাজা একাকী—ঘরের পিছনে একটি জানলা খোলা···দূরে কোলাহল)

রাজা। কিছু বুঝতে পারলাম না, প্রজাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে রাণীকে এই ভীষণ শাস্তি দিতে হলো—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না রাণী রাক্ষসী! (চিন্তিত ভাবে) না না না, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—মা কখনও নিজের ছেলেকে খেয়ে ফেলতে পারে ? (বাহিরে ভীষণ কোলাহল···"পুড়িয়ে মারো" "পুড়িয়ে মারো" বলে চিৎকার) রাণীকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে··· ···তাই তো কোন উপায় কি নেই রাণীকে বাঁচাবার (চিন্তিত ভাবে) না না, আর কোন উপায় নেই।

(একটি দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ !

রাজা। কি সংবাদ ?

দূত। মহারাজ, প্রজারা আপনার জয়গান করছে।

রাজা। আমার জয়গান করছে! রাণী কি করছেন ?

দূত। তিনি কেবল কাঁদছেন···আর আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যাও।

[দূতের প্রস্থান।

(দূরে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল···বাহিরে চিৎকার···"দাও আগুন"···"আগুন দাও") আগুন দিচ্ছে ওরা রাণীকে পুড়িয়ে মারবে। আগুনের আলো রাজার ঘরে এলো—বাহিরে কোলাহল—"দাও এই রাক্ষসীকে আগুনের ভেতর ফেলে"···"ফেলে দাও") হ্যাঁ···সত্যি তাহ'লে পুড়িয়ে মারবে (হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠিল—মেঘ ডাকিয়া উঠিল—ভীষণ বৃষ্টি)।

(একটি দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মহারাজ!

রাজা। রাণী পুড়ে গেল ?

দূত। কি অদ্ভুত! আশ্চর্য্য কাণ্ড···আকাশ কুল করে উঠলো—ঘন কালো মেঘের দল···আর সেই মেঘের বুক চিরে নেমে এলো—আলোর রথে চড়ে স্বর্গের দেবী আপনার দু'টি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে—কি সুন্দর ছেলে!

রাজা। সে কি ?

দূত। হ্যাঁ, মহারাজ···রাণীকে যেই চিতার উপর জোর করে তুলে দেওয়া হল। রাণী জোড় হাত করে আকাশের দিকে চেয়ে বললে ···"আমি দোষ স্বীকার করবো"···সঙ্গে সঙ্গে মুশল-ধারে বৃষ্টি—কার সাধ্য আগুন জ্বালে।

রাজা। কোথা তারা ?

দূত। আসছেন···প্রজারা আনন্দে নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসছে!

রাজা। চলো চলো, আমিও যাই···তাদের নিয়ে আসি।

চিন্তা

শ্রীঅনসূয়া সান্যাল

রতন পড়েছে আজ মহা চিন্তায়—
ভূতগুলো সন্ধ্যায় কোন্ গান গায় ?
সহরের ভূতগুলো কেন গান গায় না ?—
মালদে'য় বসে সে যে ভেবে কূল পায় না।
এক সুরে ঝিঁ-ঝিঁ করে কি যে বলে উহারা!
ওরাও কি পড়ে বসে কোনখানে সাহারা ?
ভূতেদের মাসি-পিসি কতখানি লম্বায় ?—
শীতকালে ওরা সব কোন্ জামা গায় দেয় ?
কালোপানা গেছো-ভূত বাস তার কোন গাছ ?
আঁকা-বাঁকা জল-ভূত ভালবাসে কোন মাছ ?
ভূতেদের পণ্ডিত চোখে দিয়ে চশমা,
কুড়মুড় করে খালি চিবোয় কি কদ্‌মা ?
কদ্‌মা ও আরশোলা এক সাথে মাখি রে—
কচমচ খায় না কি এক গাল হাসি রে ?
কত শত প্রশ্নই ওঠে মোর মাথাতে,
উত্তর পাই বল কাহারই বা কাছেতে ?
ও-পাড়ার জটে-বুড়ী নাম তার ডাইনী,
সেই না কি জানে সব ভূতেদের কাহিনী;
পেত্নীর সাথে সেই ডাইনীর ভারী ভাব,
ছোট ছেলে মেরে না কি পেত্নীরে দেয় ভাগ।
তার কাছে যেতে হবে সবায়েরে লুকিয়ে—
পড়িলে মামুর চোখে উঠিবে রে খেঁকিয়ে।
মামুদের ভারী মজা পড়তে তো হয় না,
আটটা বাজার সাথে ঘুম তাই পায় না!
এত যার চিন্তা, তার পড়া হয় কি ?
পড়া-শুনো সে তো সোজা কতগুলো ফুটকি!
মাষ্টারগুলো সব সেরা পাজী দুনিয়ায়!
এই সব ভেবে ভেবে মাথা তার ধরে যায়।
টেবিলেতে মাথা রাখি ঘুমোয় সে শেষটায়,
ভোর বেলা উঠে দেখে শুয়ে আছে বিছনায়।

বয়স্য কর্তৃক এইরূপে প্রোৎসাহিত হইয়া সুন্দর সেন যখন সানন্দে দেখিতেছিলেন সেই সময় শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদেরই প্রসঙ্গ মত এই গানটি গাহিতেছে—

"অর্বুদের পৃষ্ঠখানি অমর নিবাস জিনি
যাঁর আঁখি না জুড়াল হেরি,
ভ্রমিয়া বিবিধ দেশ সহিয়া অশেষ ক্লেশ
বিফলে সে ফিরিয়াছে ঘুরি।"

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এই মহাত্মা ঠিকই বলিয়াছেন; চল বয়স্য, পর্বতের উপর উঠিয়া উহার রমণীয় শিখর দেশ দেখিব।" [২৫৪-২৫৬]

অনন্তর পর্বতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বহু দেবালয়, বাপী, উদ্যান-ভূমি, সরোবর, স্রোতস্বিনী প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(এমন সময়ে) তাঁহারা পুষ্প-সমাকীর্ণ রমণীয় উপবন-ভূমিতে এক ললনাকে সখীসহ ক্রীড়াভরে বিচরণ করিতে দেখিলেন। সে যেন মেঘ-বিচ্যুতা ক্ষণপ্রভা, চন্দ্র-হীনা জ্যোৎস্না, মন্মথ-রহিতা রতি, হরিবক্ষ-চ্যুতা লক্ষ্মী; বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সকল জীবের সার, রমণীয়ের দৃষ্টান্ত, মনোভবের বিজয়াস্ত্র; পুষ্পসমৃদ্ধ বসন্ত ঋতুটি, শৃঙ্গার রসে সন্তরণরতা কলহংসীটি, লীলা-পল্লব-সমাচ্ছন্না বল্লীটি, তপস্বিগণের সমাধি-বর্ম-ভেদিকা ভল্লীটি। [২৫৭-২৬১]

দেখিতে দেখিতে মদন-বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি (সুন্দর সেন) বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—

কে এই রমণী! যাহাকে সৃজন করিতে বিধাতা অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন? যাহার ফলে বিরুদ্ধ ভাব সকলের একত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে, যেমন—নয়ন-তারকার উজ্জ্বল দীপ্তিতে রমণীয় নির্দোষ তাহার ললিত দেহ, অনির্বচনীয় তাহার বদন-কমল-(শোভা), বীণা-নিন্দিত তাহার কণ্ঠঝংকার, প্রকটিত(১) তাহার শরীরবিন্যাস, অতিশোভন তাহার অবয়বসংশ্লেষ, পীনোন্নত তাহার পয়োধর যুগল, শরদিন্দু জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার দেহকান্তি, মনোরম তাহার সুন্দর গতি ও স্থিতিভঙ্গী, তাহার চরণ যুগলের আকৃতি দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, অতি বিপুল তাহার জঘনদেশ এবং বিধ্বস্তদেহ (মদন) তাহার সমস্ত শোভার বিধান করিয়াছেন।* [২৬২-২৬৬]

---

(১) পরিস্ফুট অর্থাৎ যেন 'পাথরে কোঁদা' (beautiful in high-relief)।

* ২৬৪-২৬৬ পর্যন্ত শ্লোক তিনটিতে কবি পদশ্লেষ সাহায্যে 'বিরোধাভাস অলংকার' দ্বারা নায়কের নায়িকা-দর্শনজনিত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অনুবাদে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আমরা শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি—

"ললিতবপুর্নির্দোষা স্ফুরদুজ্জ্বলতারকাভিরামা চ।
নির্বাচ্য বদনকমলা জিতবীণাক্বণিতবাণী চ।
প্রকটিত বিগ্রহসংস্থিতিরতিশোভাঘটিত সন্ধিবন্ধা চ।
উন্নতপয়োধরাঢ্যা শরদিন্দুকরাবদাতা চ।
অভিমত সুগতাবস্থিতিরভিনন্দিতচরণযুগলরচনা চ।
অতিবিপুলজঘনদেশা বিধ্বস্তশরীরবিহিতশোভা চ।

'দোস্' অর্থে 'হস্ত' পক্ষে 'রাত্রি' এবং 'দোষ' অর্থে 'গুণের বিপরীত' সুতরাং 'নির্দোষা' অর্থে 'বাহুহীনা' পক্ষে 'রাত্রিহীনা' পক্ষে 'দোষহীনা' অতএব 'নির্দোষা' অর্থাৎ বাহুহীনা হইলে 'ললিতবপু' কিরূপে বলা যায়, আবার 'রাত্রিহীনা' হইলে 'স্ফুরদুজ্জ্বলতারকাভিরামা' কিরূপে হওয়া সম্ভব?

'নির্বাচ্য' অর্থে 'বাচ্যহীনা' পক্ষে 'অনির্বচনীয়া' সুতরাং বদন-কমল নির্বাচ্য হইলে তাহা 'জিতবীণাক্বণিতবাণী' কিরূপ হয়?

'বিগ্রহ' অর্থে 'যুদ্ধ' পক্ষে 'শরীর' এবং 'সন্ধি' অর্থে 'বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মিলন' পক্ষে দেহের অবয়বের সংযোগ স্থল (joints) সুতরাং 'বিগ্রহসংস্থিতি' (অর্থাৎ যুদ্ধের অবস্থা) স্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকিলে 'সন্ধিবন্ধন' ঘটিত হইবে কিরূপে?

'পয়োধর' অর্থে 'কুচ' পক্ষে 'মেঘ' সুতরাং 'পয়োধরাঢ্যা' অর্থাৎ 'মেঘাবৃতা' হইলে 'শরদিন্দুকরাবদাতা' কিরূপে সম্ভব?

'সুগত' অর্থে 'বুদ্ধ' পক্ষে 'সুন্দর গতি' এবং 'অবস্থিতি' অর্থে অবস্থানের ভাব (presence) পক্ষে 'স্থিতি-ভঙ্গী'; 'চরণযুগলরচনা' অর্থে বেদশাখাদ্বয়ের (ঋক্ ও সাম বা ঋক্ ও যজু বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ) রচনা, পক্ষে পদদ্বয়ের আকৃতি (shape) সুতরাং সুগতের অভিমত হইলে তাহা আবার বেদের চরণ যুগল রচনা দ্বারা অভিনন্দিত হইবে কিরূপে?

'বিধ্বস্ত শরীর' অর্থে 'দগ্ধদেহমদন', পক্ষে 'জীর্ণদেহ' সুতরাং বিপুলজঘনার শরীর-শোভাকে 'বিধ্বস্ত শরীর' বলা যায় কিরূপে?

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনন্তর সেই মৃগলোচনাও তাঁহার প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করায় সে-ও অনুরাগের আবির্ভাব হেতু কুসুমেষুর বশবর্তিনী হইয়া পড়িল। অপর সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সে তরুমূলে উপবেশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বিক ভাবের (২) উদয় হওয়ায় তাহার গাত্রলতা অংকুরিত (৩) হইয়া উঠিল। (বসন্তকালোচিত) উপবনসমৃদ্ধি সেই সময়ে যেন কামদেবকে স্মরণ করিয়া (৪) তাহাকে বেদনা দিতে আরম্ভ করিল— সকলেই প্রভুর কার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। অন্তর্জ্বলিত কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাহার গাত্র-শিরা-সন্ধি সকল হইতে স্বেদজল নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই তন্বী মদনজ্বালে পতিত হইয়া ঘন

---

(২) সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ যথা—"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ-স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।"

(৩) রোমাঞ্চিত এ স্থলে দেহকে লতার সহিত তুলনা করায় অংকুরিত শব্দের প্রয়োগ শোভন হইয়াছে।

(৪) উপবন-সমৃদ্ধি মদনের সহায়, সুতরাং তাহা যেন মদনের কার্য স্মরণ করিয়াই নায়িকাকে পীড়িত করিতে লাগিল। অনুচরের স্বভাবই প্রভুর অনুকরণ করা।

ঘন গাত্র বিবর্তন করিতে লাগিল এবং মৎস্তবধূর ন্যায় নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিতে লাগিল। পঞ্চবাণের প্রকোপে তাহার দেহ স্তম্ভিত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। শঠ ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিকে নিজ করলে পাইলে এইরূপই করিয়া থাকে। তাহার উচ্চ কুচযুগল উচ্ছ্বাস ভরে আরও উদ্বেলিত করিয়া, অভিলাষ দ্বারা বিলাস-সমূহের অধিকতর চারুতা সম্পাদন করিয়া, প্রেম দ্বারা নয়নদ্বয়ের স্নিগ্ধত্বকে আরও মনোহর করিয়া, অনুরাগে বদনের রক্তিমাভাকে আরও রক্তিম করিয়া, বাক্যে ও গমনে সাধ্বসহেতু(৫) স্খলন দ্বারা মদন তাহার চারুতাকে চরম অবস্থায় লইয়া গিয়াছিল। প্রিয় নিকটে অবস্থিতি করা সত্ত্বেও কামশরাসন দ্বারা পীড়িত হইয়াও সে প্রণয়-ভঙ্গ ভয়ে নিজ মনোভিলাষ নিবেদন করিতে পারিল না।(৬) [২৬৭-২৭৫]

অনন্তর তাহার দৃষ্টি প্রিয়তমের প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া সখী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মদনতাপে দহ্যমানা তাহাকে (একান্তে) আকর্ষণ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—

"অয়ি, হারলতে, হরহুঙ্কৃতিতে দগ্ধদেহ মদন কর্তৃক তোমার যে দেহ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা সম্বরণ কর। পণ্য-নারী-গণের পক্ষে আভিমানিকী প্রীতি(৭) হিতকারী নহে। ধনহীন ব্যক্তিকে অবজ্ঞা কর, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকে গৌরবদান কর, হে মুগ্ধে, আমাদের রূপসৃষ্টি ধনসংগ্রহের হেতু। কেবল মাত্র রূপ ও তারুণ্যযুক্ত পুরুষের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিবিধ লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। হে সুমধ্যে, ব্যবসায়-চতুরা বারাঙ্গনা-কুল ইহাতে উপহাস করিবে। যৌবন যাহাদের শ্লাঘনীয়, বিধি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন, যাহাদের সৌভাগ্য সুফল প্রদান করিয়াছে, যাহাদের জীবন কেবল সুখের জন্য তাহারা অবশ্য আপনা হইতেই মদন-বাণবিদ্ধ হইয়া তোমাকে কামনা করিবে। হে কৃশোদরি, ভ্রমরগণ চ্যুতমঞ্জরী কর্তৃক অম্বেষিত হয় না (বরং তাহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।)" [২৭৬-২৮১]

সখী এইরূপ বলিলে কামবাণবিদ্ধসর্বাঙ্গী হারলতা কষ্টের সহিত অব্যক্ত ও স্খলিত বাক্যে তাহাকে বলিল—

"সখি, তৎক্ষণ (আমার) বেদনার প্রতিকার যাহাতে হয় সেই জন্য নিপুণতর যত্ন কর, বিপদ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তখন উপদেশের সময় নহে। অনায়ত্ত (৮) প্রিয়, মৃদু পবন, চৈত্র মাস ও উদ্যান এই সকল সামগ্রী (বিরহিণীর) আয়ুক্ষয়ের কারণ।" [২৮২-২৮৪]

শশীপ্রভা সখীকে মদনাশীবিষের বিষবেগে আকুলিত দেহ দেখিয়া পুরন্দরের পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

"যদিও গণিকা বলিয়া লজ্জায় আপনাকে বলিতে আমার কণ্ঠ বাধিয়া যাইতেছে তথাপি আমাকে বলিতে হইতেছে ; সখীর বিপদে ভালমন্দ বিচার করিবার সময় নহে: এই বিরাট সংসারে যে সকল উদ্দীপ্ত-বুদ্ধি সার্থকজন্মা ব্যক্তি বিপন্নকে পরিত্রাণ করিতে ব্যাকুল হৃদয় হন তাঁহাদের সংখ্যা বিরল। যে মুহূর্তে আপনি আমার সখীর নয়নপথে পতিত হইয়াছেন তখন হইতেই সে পোড়া মদনের করায়ত্ত হইয়াছে। মনোভবের কোদণ্ড-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল তাহার অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যেন রোমাঞ্চরূপে তাহার দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে (৯) শৃঙ্গার-রসানুকূল মৃদু পবন নিত্য মুহুর্মুহু পীড়ন করিতেছে। সেই দীনা কি-ই বা বলিবে, কোথায় বা আশ্বাস পাইবে আর কাহারই বা শরণ লইবে? (স্বরভঙ্গ হেতু) তাহার বাক্য গদ্‌গদ্ হইয়াছে দেখিয়া (বৈরনির্যাতনে) আনন্দিত পিকগণ অবসর বুঝিয়া অচিরে মৌনব্রত ত্যাগ করতঃ অনর্গল কুহুধ্বনি করিয়া সখীকে বাধা দিতেছে। (১০) বেপথু হেতু সেই তন্বঙ্গীর গমন স্খলিত হওয়ায় (দীর্ঘ বিশ্রামে) অপগতশ্রম হংস সকল বহু কাল পরে অবসর পাইয়া সানন্দে যাতায়াত করিতেছে (১১)। তাহার উষ্ণ নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া মধুকরগণ তাহার অলকস্থিত কুসুম-সমূহ ত্যাগ করে না; কারণ হইলেও বিষয় ত্যাগ করা কঠিন। সে দেহভার বহনে অক্ষম, তাহার কর্ণস্থিত কুবলয় পুষ্প সমীপে গুঞ্জনরত মধুকর তাহার কাণে কাণে যেন বলিতেছে, 'আমাকে এখন তাড়াইয়া দিও না। (স্মরদশায়) (১২) তাহার ভুজলতা বিশীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহা হইতে বিগলিত সুবর্ণকংকণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহার মুক্তহস্ততার (১৩) সূচনা করিতেছে। তাহার নিতম্ব হইতে একই সময়ে রশনাবন্ধন রজ্জু

---

(৫) ভয়হেতু। নবযৌবনের উদয়ে রমণীর মনে যে প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহাকে 'সাধ্বস' বলে।

(৬) পাছে প্রিয় তাহাকে নির্লজ্জা মনে করিয়া অনাদর করে এই আশংকায় সে নিজের মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারিল না। "সর্বা এব হি কন্যাঃ পুরুষেণ প্রযুজ্যমানং বচনং বিষহন্তে ন তু লঘুমিশ্রামপি বাচং বদন্তীতি ঘোটকমুখ" [কা, সু ৩।২।১৭]। অর্থাৎ সমস্ত কন্যাই প্রযুজ্যমান পুরুষের বাক্য (সানন্দে) শ্রবণ করে কিন্তু স্বয়ং (লজ্জাবশতঃ) একটি কথাও বলে না।

(৭) প্রীতি চতুর্বিধ, যথা—"অভ্যাসাদভিমানাচ্চ তথা সংপ্রত্যয়াদপি। বিষয়েভ্যশ্চ তত্ত্বজ্ঞাঃ প্রীতিমাহুশ্চতুর্বিধাম্।" [কা, সু, ২।১।৭১] তাহার মধ্যে অভিমানিকী প্রীতি হইতেছে - "অনভ্যস্তেষপি পুরাকর্মস্ববিষয়াত্মিকা। সংকল্পাজ্জায়তে প্রীতির্যা সা স্যাদভিমানিকী।" [কা, সু ২।১।৭৩] রূপগোস্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—"সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।" অর্থাৎ ভূরি ভূরি রমণীয় বস্তু আছে, থাকুক, কিন্তু আমার এইটিই প্রার্থনীয় এই নিশ্চয়করণকে পণ্ডিতগণ অভিমান বলেন। এ ক্ষেত্রে সখী বলিতেছে—'অনুরাগ-বন্ধন বেশ্যাদিগের পন্থা নহে।'

(৮) যে নায়কের সঙ্গ কামনা করা হয় তাহাকে যদি লাভ করা না যায়।

(৯) মদনের বাণ তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া স্তব্ধগতি হইয়াছে, তাহাই যেন রোমাঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

(১০) ইহাতে নায়িকার কোকিল-নিন্দিত বাণী সূচিত হইতেছে

(১১) ইহাতে তাহার মরাল-নিন্দিত গতি সূচিত হইতেছে।

(১২) নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, নিদ্রানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু ইহাই কায়িক স্মরদশা। মানসিক স্মরদশা, যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

(১৩) বিরহজনিত শীর্ণতাহেতু শিথিলহস্ততা, পক্ষে উদারতা।

স্তন বড়ই বিচিত্র! না হইবেই বা কেন! গুরু-কলত্রের (১৪) সতত নিষেবন (১৫) পতনের কারণই হইয়া থাকে। পোড়া হার (প্রিয়ের ন্যায়) বক্ষের উপর লালিত হইয়াও মনোভবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেই কাল হইতে সখীকে কষ্ট দিতেছে। অন্তর্ভিন্ন (১৬) ব্যক্তি হইতে কোথায় বা মঙ্গল হইয়া থাকে? তাহার গৌর-দেহনিঃসৃত শ্বেত স্বেদধারা কজ্জল-মলিন অশ্রুধারার সহিত মিলিত হইয়া কুচতটে পতিত হইয়া প্রয়াগস্থ গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বারিধারাকে অনুকরণ করিতেছে। আপনার আলিঙ্গনসুখলালসিতা বালা পিকতান, মলয়পবন, পুষ্পরাশি, মদন ও ভৃঙ্গ এই পঞ্চ অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত পঞ্চতপ(১৭) আচরণ করিতেছে। যাবৎ সেই দীনা স্মরদশার শেষ(১৮) অবস্থায় পতিতা না হয় হে সুভগ, তাবৎ তাহাকে রক্ষা করুন। শরণাগতগণকে রক্ষা করাই মহৎ ব্যক্তিগণের ব্রত।" [২৮৫-৩০০]

অনন্তর তাহার বাক্যবিন্যাসে সুহৃদের অনুরাগ সম্যকরূপে উদিত হইয়াছে দেখিয়া বেশ্যানুসরণজনিত নিন্দার ভয়ে গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—

"যদ্যপি তরুণ বয়সে জীবগণের কামবিকার দুর্বার হইয়া উঠে তথাপি বিবেকশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বারাঙ্গনাগণের প্রেমের পরিণাম চিন্তা করা উচিত। বারস্ত্রীগণের বিভ্রম, অনুরাগ, স্নেহ, অভিলাষ ও রতিস্পৃহা (১৯) কামুকদিগের সম্পদের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের সম্পদগণের ন্যায়, বৃদ্ধিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (২০)। যাহাদিগের নিকট অদৃষ্ট ব্যক্তি প্রণয়ভাজন হয় আবার বহু কালের প্রণয়ীকে যাহারা 'ইহা পূর্বে কখনও দেখে নাই' এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া উপেক্ষা করে সেই সকল নারীর সহিত সৎকুলজাত ব্যক্তি কিরূপে সঙ্গ করে? ধনবান ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে গণিকাগণ সতত প্রদ্যুম্ন বা দ্বিতীয় কামদেব বলিয়া গণনা করে; যে ব্যক্তি অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে তাহারা কুৎসিত বলিয়া মনে করে; বহু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিমাত্রই তাহাদিগের নিকট স্নেহশীল এবং (অর্থহীন) স্নেহশীল ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট রুক্ষ-প্রকৃতি বলিয়া বিবেচিত হয়।"

"তাহারা অপরের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যই জঘন আবরণ করে, লজ্জায় (২১) নহে, তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্রালংকারাদিতে বেশবিন্যাস কামিজনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, লোকমর্যাদার জন্য নহে। মাংস ও তৃপ্তিকর খাদ্য তাহারা অত্যন্ত-পুরুষ-সংসর্গজনিত দেহক্ষয়ের পুষ্টি হেতু আহার করিয়া থাকে, স্পৃহাবশতঃ নহে (২২)। চিত্রাংকনাদি ব্যসন তাহাদের বৈদগ্ধখ্যাতির জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য নহে। 'রাগ'(২৩) তাহাদের অধরে, অন্তরে নহে; সরলতা ভুজলতায়, প্রকৃতিতে নহে; সমুন্নতি কেবল তাহাদের কুচভারে, সজ্জন-অভিনন্দনোচিত আচরণে নহে। গৌরব(২৪) তাহাদের জঘনস্থলে, আকৃষ্ট-ধন সৎকুলজাত ব্যক্তির প্রতি নহে। অলসতা তাহাদের গতিতে, মানব-বঞ্চনাভিযোগে নহে (২৫)।"

"প্রসাধনের সময় তাহারা বর্ণবিশেষের বিচার করে, অন্যথা রতিপ্রসঙ্গে তাহাদের বর্ণবিচার নাই (২৬); ওষ্ঠে তাহারা মদন (২৭) আসঙ্গ (২৮) করিয়া থাকে, অন্যথা পুরুষবিশেষের সহিত সম্ভোগে তাহাদের মদনোদয় হয় না। বালকের প্রতিও তাহারা অনুরাগবতী, বৃদ্ধকেও কামাবেগ প্রদর্শন করে, ক্লীবের প্রতিও কান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিও আকাংক্ষিত হয়। (রতিশ্রমজনিত) স্বেদাম্বুকণা দ্বারা তাহাদের দেহ সিক্ত হইলেও মনের আবাস ভূমি যে হৃদয় তাহা কিছু মাত্র আর্দ্র নহে। (পুরুষপ্রতারণার জন্য) বাহিরে বেপথুভাব দেখাইলেও অন্তরে তাহারা হীরকখণ্ডের ন্যায় কঠিন।"

"তাহারা জঘনচপলা" ও অনার্যা (২৯), পরভৃতিকা ও

---

(১৪) গুরুকলত্র-গুরুপত্নী, পক্ষে নিবিড় নিতম্ব।

(১৫) নিষেবন—কামভাবে উপসেবন, পক্ষে সতত সংশ্লিষ্ট হওন।

(১৬) 'গৃহে বা মনে কলহাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন', পক্ষে 'সচ্ছিদ্র'। মুক্তা প্রভৃতি বিদ্ধ না হইলে হার গাঁথা যায় না সেই জন্য হার বা হারের মুক্তা সকলকে 'অন্তর্ভিন্ন' বলা হইয়াছে।

(১৭) পঞ্চতপ বা পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা-বিশেষ, যথা—"বহ্নিভি-র্জ্বলিতৈঃ শুষ্কৈশ্চতুর্দিক্ষু চতুষ্কতম্। বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশু-স্তত্র পঞ্চমঃ।...তন্মধ্যস্থা সূর্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা।" ইত্যাদি—কালিকাপুরাণে।

(১৮) স্মরদশার শেষ অবস্থা অর্থাৎ 'মৃত্যু'।

(১৯) "প্রেমাভিলাষো রাগশ্চ স্নেহপ্রেমরতিস্তথা। শৃঙ্গার-শ্চেতি সংভোগঃ সপ্তাবস্থঃ প্রকীর্তিতঃ।"

(২০) অর্থাৎ যতক্ষণ কামুকদিগের সম্পদ থাকে ততক্ষণ তাহাদের বিভ্রমাদির বিকাশ এবং সম্পদের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও হ্রাস হইতে থাকে। সেইরূপ "সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়। অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।"

(২১) অর্থাৎ জঘনদেশ অনাবৃত থাকিলে তাহারা যে তাহা আবৃত করে তাহা লজ্জাহেতু নহে, কামুকগণের কৌতূহলোদ্দীপনের জন্য।

(২২) সুখাদ্যে তাহাদের অনুরাগ রসনা-তৃপ্তির জন্য নহে, রতিক্ষয়জনিত বলাধানের জন্য।

(২৩) রাগ—'রক্তিমাভা' পক্ষে 'অনুরাগ'।

(২৪) গৌরব—'গুরুত্ব' পক্ষে 'সম্মানপ্রদর্শন'।

(২৫) অলসতা—'মন্থরগামিত্ব' পক্ষে 'দীর্ঘসূত্রতা'। অর্থাৎ তাহারা শ্রোণিকুচভারে অলসগমনা বটে কিন্তু লোকবঞ্চনায় তাহাদের দীর্ঘসূত্রতা নাই।

(২৬) অর্থাৎ প্রসাধনকালে তাহারা অঙ্গরাগে এবং বেশাদির বর্ণবিচার করে কিন্তু রতিপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বর্ণবিচার করে না। (২৭) মদন—'কাম,' পক্ষে 'মোম'। (২৮) আসঙ্গ—নিবেশন, পক্ষে 'অনুরাগ'। এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ সম্ভব, যথা—(১) তাহারা ওষ্ঠে শীত হেতু বা অধর দংশনজনিত ক্ষতের ব্যথা প্রশমনের জন্য 'মদন' অর্থাৎ 'মোম' ব্যবহার করে; অথবা (২) তাহাদের যে কামপ্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রেম তাহা কেবল মুখেই, অন্তরে নহে। আমাদের মনে হয়, কবি প্রথম অর্থই বুঝাইতে চাহিয়াছেন; কারণ পরেই দ্বিতীয় অর্থের অনুরূপ উক্তি আছে, সুতরাং একই কথা দুই বার বলিবার কোন অর্থ হয় না। (২৯) জঘন-চপলা—আর্যা ছন্দের অন্তর্গত একটি বিশেষ ছন্দ সুতরাং 'জঘনচপলা' ও 'অনার্যা' (অর্থাৎ আর্যা ছন্দ নহে) বলিলে বিরুদ্ধ উক্তি হয়। কিন্তু অপর পক্ষে 'জঘনচপলা' অর্থে যে বহু ব্যক্তিকে জঘন দান করিয়া থাকে

কৃত্রিমনয়নরাগসম্পন্না (৩০), (কামুককে) সমস্ত দেহদানে দক্ষ অথচ হৃদয় দান করে না তাহারা (সৎ-)কুল সমুৎপন্না নহে (সুতরাং ন-কুলা (৩১) এবং ভুজঙ্গ দংশনের (৩২) বেদনায় অভিজ্ঞা , কন্দর্পের দীপিকা হইয়াও তাহাদের হৃদয়ে স্নেহের(৩৩) সংপর্ক নাই। বৃষ যোগ(৩৪) বর্জন করিয়াও রতিকালে নরবিশেষ(৩৫) কোন অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণে(৩৬) নিতান্ত অনুরক্তা অথচ সতত হিরণ্যকশিপুপ্রিয়া(৩৭)। মেরুপর্বতের নিতম্বের ন্যায় তাহাদের নিতম্ব সহস্র কিম্পুরুষ দ্বারা(৩৮) সেবিত , রাজনীতিতে যেরূপ অনর্থ-সংযোগ(৩৯) পরিহার করা হইয়া থাকে ইহারাও সেইরূপ অনর্থের সংযোগ সযত্নে পরিহার করে। পদ্মসমূহের ন্যায় তাহারা বহু-মিত্র-কর-বিদারণ দ্বারা অভ্যুদয় (৪০) লাভ করে, ডাকিনীদিগের ন্যায় তাহারা রক্ত-আকর্ষণ-কৌশল(৪১) জানে। গণিকাগণ পতি পুরুষের(৪২) সন্নিহিতা হইয়া কৃত্যপরা(৪৩) বিবিধবিকারযুক্তা(৪৪) ও বহু অর্থ-গ্রাহিনী(৪৫) হইয়া প্রকৃতির(৪৬) ন্যায় দুর্গ্রহ(৪৭)।* ক্ষুদ্র[illegible] (অর্থাৎ মধুমক্ষিকাগণ) যেরূপ কুসুমস্তবক হইতে নিঃশেষে মধু [illegible] করিবার জন্য তাহাকে বহুক্ষণ চুম্বন করে সেইরূপ এই ক্ষুদ্রা[illegible] (অর্থাৎ গণিকাগণ) নরবিশেষকে (আকর্ষণ করিয়া) যাবৎ সে নিঃস্ব না হয় তাবৎ তাহাকে চুম্বনাদি করিয়া থাকে। ([illegible]) চুম্বক প্রস্তর যেরূপ অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলেও [illegible] আকর্ষণ করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তরে কঠোর-হৃদয়া বেশ্যাগণ [illegible]-সক্ত পুরুষগণকেও নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হস্তি[illegible]গণ যেরূপ পুরুষগণ কর্তৃক আক্রান্তা (অর্থাৎ আরূঢ়া) হইয়া সর্বদা [illegible]-রাগে সজ্জিতা (অর্থাৎ সিন্দুর ভূষণাদিতে অলংকৃতা) ও ([illegible] কর্তৃক) নিতম্বদেশে অংকুশ দ্বারা আহতা হইয়া থাকে [illegible]রূপ বারযোষাগণ পুরুষগণ কর্তৃক পরিবৃতা হইয়া সর্বদা কৃত্রিম শৃঙ্গার [illegible] অভিব্যক্তি হেতু রমণীয়তা প্রদর্শন করিয়া (সুরত কালে সম[illegible]) তাড়ন (৪৮) উপভোগ করিয়া থাকে। উচিত (অর্থাৎ [illegible])

অর্থাৎ ব্যভিচারিণী, অনার্যা অর্থ হীনপ্রকৃতি বা বিবেকশূন্যা। (৩০) পরভৃতিকা—যে পরের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে, পক্ষে কোকিল। কোকিলের চক্ষু স্বভাবতঃই রক্তিম কিন্তু পরভৃতিকা গণিকার মানাদি হেতু যে নয়নের রক্তিমা তাহা কৃত্রিম , সুতরাং এখানে বিরোধালংকার হইতেছে। (৩১) নকুলা—কুলহীনা, পক্ষে স্ত্রী-বেজী (৩২) ভুজঙ্গ—সর্প, পক্ষে বিট। সুতরাং যে নকুল সর্পের ভীতিস্থানীয় সে ভুজঙ্গ-দংশনে অভিজ্ঞ হইবে কিরূপে ?

(৩৩) 'দীপিকা' অর্থে প্রদীপ, পক্ষে 'উদ্দীপনকারিণী' এবং 'স্নেহ' অর্থে 'অনুরাগ', পক্ষে 'তৈল', সুতরাং গণিকাগণ মদনোদ্দীপন করে কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্নেহের লেশ নাই, পক্ষে তাহারা কন্দর্পের দীপ অথচ তৈললেশহীন। (৩৪) 'কামশাস্ত্রোক্ত [illegible]লক্ষণযুক্ত পুরুষের সংযোগ', পক্ষে বৃষ অর্থাৎ ধর্মের সহিত সংযোগ। সুতরাং অর্থ হইতেছে গণিকা ধর্মহীনা ও রতিকালে শশ, বৃষ বা অশ্ব যে কোন জাতীয় পুরুষের সংযোগে তাহাদিগের আপত্তি নাই। (৩৫)যদি তাহারা নরবিশেষের অপেক্ষা না করে তবে 'উজ্ঝিত-বৃষযোগা' বলা হইয়াছে কেন ? ইহাই বিরোধালংকার। কাম-শাস্ত্রকারগণ লিঙ্গের পরিমাণ-ভেদে ছয় অঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট শশ, নয় অঙ্গুলি বৃষ ও দ্বাদশাঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব এইরূপে পুরুষের জাতিনির্দেশ করিয়াছেন। (৩৬) কৃষ্ণ—'বাসুদেব', পক্ষে 'পাপ'। (৩৭) হিরণ্যকশিপু—'স্বনামধন্য দৈত্যরাজ', পক্ষে হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ এবং কশিপু অর্থাৎ অন্নবস্ত্র। (৩৮) কিম্পুরুষ—'দেবযোনিবিশেষ', পক্ষে 'কিং' অর্থাৎ 'কুৎসিত' পুরুষ। (৩৯) অনর্থ-সংযোগ—'নাশ বা ভয়োৎপত্তির উপলব্ধি', পক্ষে 'অর্থহীন ব্যক্তির সহিত সমাগম।' (৪০) বহু-মিত্র-কর বিদারণ—মিত্র অর্থাৎ প্রণয়িগণের বহু নখরক্ষত তাহা দ্বারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভ করে, পক্ষে বহু সূর্যকিরণ দ্বারা পত্রোদ্‌ঘাটনে পদ্মের অভ্যুদয় বা বিকাশ লাভ হয়। (৪১) রক্ত—'রুধির', পক্ষে 'অনুরক্ত ব্যক্তি', আকর্ষণ 'শোষণ' পক্ষে 'আকৃষ্টকরণ।'

(৪২) পুরুষ- (১) ব্যাকরণের প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ ; (২) যে শরীরে বাস করে অর্থাৎ আত্মা। "যৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।" (৩) জীবাত্মা ; (৪) প্রজান্তর্গত প্রতি পুরুষ। (৪৩) কৃত্য—(১) তব্যাদি প্রত্যয় ; (২) সুখ, দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য ; (৩) নিজ নিজ করণীয় কার্য , (৪) সপ্তরাজ্যাঙ্গের ক[illegible] (functions)। (৪৪) বিকার (১) শপ্‌,শ্যনাদি প্রত্যয়ে[illegible] যে বৃদ্ধি আদি বিকার হইয়া থাকে ; (২) সাংখ্যদর্শনোক্ত [illegible] বিকার ; (৩) ক্রোধলোভাদি ; (৪) বিবিধ উপকরণ।

(৪৫) অর্থ—(১) শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য , ([illegible] ও পরিণামিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ ; (৩) ধর্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গে[illegible] ঐহিক ধনজাত সৌভাগ্য , (৪) স্বরাজ্যের রক্ষা ও প[illegible] অনুসন্ধানাদিরূপ রাজনীতি অথবা রাজকর। (৪৬) প্রকৃতি—(১) ব্যাকরণের প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ (subject) ও ধাতু (predicate , (২) সত্ত্বরজঃতম গুণাত্মক জগতের মূল কারণ ; (৩) জীবাত্মার [illegible], (৪) স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই [illegible] রাজ্যাঙ্গ। (৪৭) দুর্গ্রহ—(১) দুর্‌ এই উপসর্গকে যা[illegible] ক[illegible], (২) শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা যাহা কষ্টে বুঝিতে পারা [illegible], (৩) কষ্টের সহিত যাহাকে নিয়মিত করা যায় , (৪) অপরাজেয়

* এইবার সম্পূর্ণ শ্লোকের চারিটি গূঢ়ার্থ দেখান হইতে[illegible] ব্যাকরণের প্রকৃতি প্রথমাদি পুরুষ ভেদে, কৃত্যাদি প্রত[illegible] শপ্‌,শ্যনাদি বিকরণ প্রত্যয়ের প্রয়োগে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হ[illegible] দুর্‌ এই উপসর্গও গ্রহণ করিয়া থাকে। (২) ত্রিগুণাত্মক [illegible] বা আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ মোহাত্মক মহদা[illegible] কার্য করে, বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হয়, দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্ব বি[illegible] পদার্থ গ্রহণ করে, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপল[illegible] হয় না। (৩) জীবাত্মার প্রকৃতি বা স্বভাব (nature) প্রত্যেক [illegible] বা জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, নিজ নিজ করণীয় কা[illegible] করে, কাম-ক্রোধ-লোভাদি বিবিধ বিকারে পুষ্ট হয়, নানাবিধ [illegible] লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে নিয়মিত করা অত্যন্ত [illegible]। (৪) রাজনীতির স্বামী মন্ত্রী সহায় প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রজা[illegible] পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য করিয়া বিবিধ [illegible] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্য রক্ষাদি অর্থ সম্যক্ আয়ত্ত করি[illegible] অথবা বহু রাজকর দ্বারা শক্তিশালী হইয়া অপরাজেয় হইয়া [illegible]কে। (৪৮) তাড়ন বা প্রহণন দ্বিবিধ, পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য ও রমণী কর্তৃক প্রযোজ্য। পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য তাড়ন চতুর্বিধ—অপ[illegible]মুষ্ঠিক,

ব্যক্তি কর্তৃক গুণ (অর্থাৎ সূত্র) দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তুলাযন্ত্র যেরূপ সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে সেইরূপ বেশ্যাগণও যদ্যপি উচিত গুণশালী ব্যক্তির প্রতি প্রবৃত্তকামা হয় তথাপি সম্মুখে সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রেই তাহারা সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যেরূপ স্বভাবতঃ কঠিন কাঁটার বহির্ভাগ নানা বর্ণে চিত্রিত অথচ তাহা অন্তঃসারশূন্য এবং যন্ত্র দ্বারা আহত হইলেই ঝনংকার করে সেইরূপ স্বভাবতঃ কঠিনহৃদয়া বেশ্যাও বাহিরে নানা বেশ ও অলংকারাদিতে সুসজ্জিতা হইলেও অন্তঃসারশূন্যা এবং যন্ত্র প্রয়োগে (অর্থাৎ ছল ব্যাপারে) অনুকূলভাষিণী হইয়া উঠে। যে সকল হতভাগ্য বারবনিতাগণের প্রতি বদ্ধপ্রণয় হয় তাহারা পরিণামে (ভিক্ষার্থ) যুক্তহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বেশ্যাবাটী হইতে নির্গত হয়।" [৩০১-৩২৪]

মন্মথ-ব্যথিত সুন্দর সেনকে বয়স্য যখন এইরূপ উপদেশ দিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহারা শুনিলেন, কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত গীতিকা তিনটি গান করিল—

"কামবশীভূতা রূপগুণযুতা
তরুণী রমণী কভু
আপনি আসিয়া প্রেম নিবেদিয়া
সমুখে দাঁড়ায় তবু
যে জন তাহায় বিফলে ফিরায়
জানিব সকলে তারে
মূর্খের মাঝে চূড়ামণি সে যে
নহিলে ইহা কি পারে ?"

"জনম কারণ জীবন ধারণ
পুরুষ কামনা করে
সারাটি যৌবন করি 'নিধুবন'
পরম আনন্দ ভরে
বরারোহা ধনী সুন্দরী রমণী
তাহার সহিত সুখে
কাটে বারো মাস এই তার আশ
বুকে বুকে মুখে মুখে"

"কুসুমেষু অগ্নিদাতে দগ্ধ হয়ে সর্বদেহে,
প্রেমাবেগে যাহার রমণ
যুবতী কামিনী চাহে জুড়াইতে কামদাহে,
অতি পুণ্যবান সেই জন।"

এই সকল গীত শুনিয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃদকে বলিলেন, "এই সাধু ব্যক্তি আমার অন্তরের কথাই গীতচ্ছলে বলিয়াছেন। অতএব তে গুণপালিত, চল, সেই কামবাণবিকলা হরিণশাবকতরলাক্ষী হারলতাকে আশ্বাস দান করিতে যাই।" [৩২৫—৩৩০]

—— — —— —

*স্তক, মুষ্টি ও সমতলক তাহার প্রয়োগ স্থান, যথা—স্কন্ধদ্বয়, মস্তক স্তনদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব।

যতীন দাস
—মণি পাল নির্ম্মিত মর্ম্মর মূর্ত্তি

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
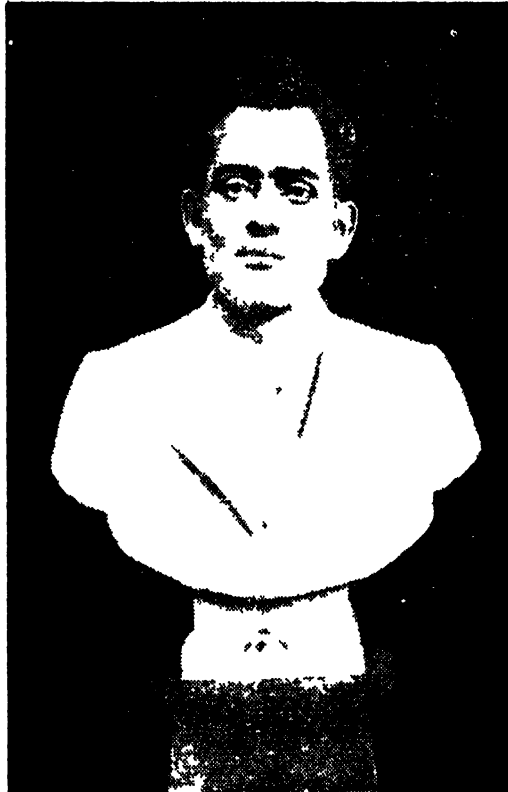
দিদি ভাই,

অনেক দিন পরে হঠাৎ এই ওজনওলা চিঠিটা হাতে পড়লে তুমি একটু অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে খুলবে। কিন্তু যদি না এত দিনে আমার হাতের লেখাটা ভুলে থাক, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গেই চিনবে। তুমি ত আর চিঠিপত্র দিয়ে আমার কোন খোঁজ-খবর রাখলে না, অথচ এমন এক দিন ছিল, যখন আমাদের মধ্যে কেউ অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে, সেখান থেকে চিঠিপত্র চালাচালিতে বাড়ীর লোকে কত হাসি ঠাট্টা করত। দিদিমা কৌতুক করে বলতেন, যেন বর-কনের চিঠি চলছে, পাড়ার লোকে গালে হাত দিয়ে বলত, দু'বোনের এত ভাব জন্মে কখনও দেখিনি। সত্যিই, অসাধারণ মিল ছিল না কি আমাদের? বাড়ীতে সব ভাইদের চেয়ে আমরা দু'জন ছোট ছিলাম, আদরও আমরা মা-বাবা-ভাইদের কাছে বেশী পেয়েছিলাম বৈ কি! সে জন্যই অনাদরটা আজ এত তীব্র হয়ে গায়ে বাজছে।

তুমি বাবার বেশী প্রিয় ছিলে, এর মূলে ছিল তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চরিত্রের দৃঢ়তা, সংসারের পুরোভাগে নেত্রী হয়ে চলবার অসীম যোগ্যতা। চোখে তোমার সহজে জল আসত না, দুঃখে হঠাৎ বিচলিত হতে না, কিন্তু আমি জানতাম অভিমান ছিল তোমার প্রচুর, সংসারে রাজেন্দ্রাণীর মত চলতে তুমি অভ্যস্ত, সামান্য এতটুকু ত্রুটি সইতে পারতে না। তোমার সামান্য একটু মুখ-ভার হলে বাড়ীর লোকে তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি তার মূল্য দিত। আর আমি কি ছিলাম?—অল্পে হাসতাম, অল্পেই কাঁদতাম, সামান্য কারণে মুখ-ভার করে তার পর দু'একটা মিষ্টি কথা শুনলে গলে যেতাম। এই ছিল আমার স্বভাব, গভীরতা বা গুরুত্ব কোনটাই ছিল না, লঘুতা ছিল যথেষ্ট। এই চপলতার জন্য তোমার কাছে কত দিন বকুনি খেয়েছি।

মনে পড়ে দিদি, সখ করে একটা কুকুর-ছানা পুষেছিলাম, দু'জনে মিলে বোধ হয় রুদ্ধ অপত্য-স্নেহ ঢেলে তাকে পালন করছিলাম। এক দিন দুপুর বেলা কোথা থেকে একটা নেড়ী কুত্তা হঠাৎ এসে বাচ্চাটার নরম গলায় তার ধারাল দাঁত বসিয়ে ঝিঁকিয়ে ঝিঁকিয়ে দিয়ে ফেলে পালাল। আর মাটির উপর শুয়ে পড়ে বাচ্চাটার কি করুণ আকুতি—তোমার মুখখানি থমথমে হয়ে উঠল, বাচ্চাটাকে নিয়ে সারা রাত বসে রইলে, আগুনের সেঁক আর মুখে জল দিতে লাগলে। আর আমি কিছু ত করতে পারিনি, কেবল বাচ্চাটার থেকে থেকে করুণ আহত আর্তনাদ শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছি। তার পর দিন অবশ্য বাচ্চাটা মরে গেল।

প্রতি মুহূর্তে মনে প্রশ্ন জাগত, তোমার বিহনে এ সংসার কেমন করে চলবে। সত্যিকারের কাজের লোক ছিলে তুমি, আমি অল্প-বিস্তর কাজ করে তোমার যোগান দিয়ে যেতাম মাত্র। আমাদের ভাব ছিল যদিও প্রচুর, কিন্তু প্রভেদ ছিল বহু। মনে হত, তুমি চাঁদ—আমি শুকতারা, তোমার প্রতিভাদীপ্ত ঔজ্জ্বল্যের কাছে আমি ম্লান হয়ে টিপ্-টিপ্ করে জ্বলতাম। তোমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজের কাছে আমার দায়ে সারা কাজগুলি কত মিষ্টি বকুনি না জুগিয়েছে। সবার প্রাণসঞ্চার করতে তুমি, আমি শুধু জল ছিটিয়ে যেতাম।

এক দিন সেই মুহূর্ত্ত এল, যেদিন দিন ও রাত্রির মিলন-ক্ষণে একটি নূতন অতিথির গলায় মালা পরিয়ে তুমি তার হাত ধরে অজানা জায়গায় ঘর বাঁধতে গেলে। সেদিন তোমার বিরহে কত যে কেঁদেছিলাম, ভেবেছিলাম জামাই বাবু বুঝি এক জন নির্ম্মম দস্যু—এমনি করে বুকের ধন হরণ করে নিয়ে যান। তার পর যখন তুমি জামাই বাবুর সঙ্গে বাড়ী আসতে, আমি সারাক্ষণ তোমার কাছে যেতে চাইতাম, কিন্তু দেখতাম, তুমি একটু-আধটু কথা কয়ে জামাই বাবুর সঙ্গে গিয়ে মিলেছ, খুব হাসি-গল্প করছ। রুদ্ধ অভিমানে ঈর্ষায় বুক ভরে উঠত, ফুলতে-ফুলতে নিজের মনে বলতাম, তুমি সুখী হও, তুমি সুখী হও। এ ভুল আমারই ভাই, কারণ তখন তোমার সামনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে সোনার মত পাকা শস্যগুলি ভবিষ্যতের সুখে আশায় আনন্দে টলমল্ করছে। প্রাণে তোমার কত আবেগ-চঞ্চলতা!

দিদি

শ্রীমতী বিজলী রায়

এমনি করে কিছু দিন কেটে যাবার পর আমারও এক দিন বিয়ে হল। কিন্তু সে বিয়ে আমার জীবনে যেন "রোদন-ভরা বসন্ত" এল—অশ্রু-ভরা আনন্দের সাধুজী নিয়ে জীবনে পথিক এসে দাঁড়ালেন। বাবা সম্প্রতি মারা গিছলেন, বাড়ীর অবস্থা বিপর্য্যয়, সবই ত তুমি সেদিনের কথা জান।

এর পর ত মাঝে পাঁচ-ছ' বৎসর কেটে গেছে, অনেক দিন তোমার কথা ভেবেছি, কিন্তু আর দেখা হয়নি। একদিন সে সুযোগ মিলল, হঠাৎ তোমার আমন্ত্রণ পেয়ে খোকনমণির অন্নপ্রাশনে যোগ দিতে কলকাতা যাত্রা করলুম। শুধু লোভার্ত্তের মত তোমায় দেখতে পাব বলেই গেলাম। কিন্তু না গেলেই ছিল ভাল, কি দেখলাম গিয়ে মাঝে ছ'বৎসরের ব্যবধানে অনেক দূরত্ব বেড়ে গেছে। সহরের স্বচ্ছলতায়, ধনীর বধূ হয়ে কত বদলে গেছ। দিদি—সেই আমার ছোটবেলার দিদি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এত ওজন করে কথা তুমি বলছ! তখন থেকেই অনেক সঙ্কোচভরে একটু দূরে দূরে রইলাম, ভয়ে লজ্জায় নিরীক্ষণ করতাম তোমার গৃহের দামী দামী আসবাব-পত্র-সাজান আলমারী, বুক শেলফ। যে সব আত্মীয়স্বজন বান্ধবীরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তাদের নতুন ফ্যাসানের গয়না, শাড়ী, ব্লাউজ, জুতো, ব্যাগ সবই আমার চোখে অপরূপ ঠেকত। পাড়াগাঁতে থাকি, হাল আমলের খোঁজ অত পাই না। নিজের দৈন্যতা স্মরণ করে অত সমারোহ লোক-জনের মাঝে আমার মন কাঁদত—সেই নিভৃত পল্লী-জীবনের জন্য। তোমার সোনার খোকাকে সব সময় নিয়ে ভুলতে চাইতাম।

খোকার ভাতের দিন তোমার বড়লোক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই একটা-একটা গয়না দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে। তোমার শাশুড়ী নাতিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন, রূপার পাতার গড়নে আশীর্ব্বাদের পাত্রখানি থেকে ধান-দূর্ব্বা তুলে খোকনকে আমি প্রাণ-ভরে আশীর্ব্বাদ করে আমারই গলার ক্ষয়ে-যাওয়া রং-ওঠা সরু বিছেটা খুলে খোকাকে দিতে যাব, তোমার শাশুড়ী তখন গম্ভীর মুখে বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক বাছা, এখন পুরোন জিনিষ গায়ে ঠেকিও না, ঐ ধান-দূর্ব্বোই যথেষ্ট! নতুন নতুন পালিশ-করা ঝকঝকে গয়নাগুলির কাছ থেকে আমার গরীবের ধন কেঁদে ফিরে এল। লজ্জায় মাথা হেঁট করে ভাবলাম, সত্যিই ত, রাজার দুলালকে আমি কি সামান্য জিনিষ দিতে গেছি! তাতেও অত দুঃখ পাইনি দিদি, যত দুঃখ পেলাম আমার প্রতি তোমার আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করে। সেদিনই ভোরের ট্রেণে ফিরে আসতে চাইলুম, তোমাকে জানাতে তুমি কোন আপত্তিই করলে না। আমি যে বুকভরা আশা নিয়ে ভেবেছিলাম, তুমি তোমার স্নেহের ধমক দিয়ে যাওয়া বন্ধ করবে! ভাবলাম হয়ত বলবে, 'সরো, আর দু'দিন থাক, লোক-জনের ভীড়ে তোর সঙ্গে আমার ভাল করে কথাই হয়নি।' মনে হল, ছেলেবেলার কথা নিয়ে কিছু আলোচনা করি। মনে পড়ে, হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে কম্বল পেতে দু'জনকার পড়া-শোনা করা—তুমি পড়তে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস', আমি পড়তাম 'ধ্রুব-চরিত্র'—মনটা পড়তে পড়তে কখন যে সেই পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুবর সঙ্গে গহন অরণ্যে চলে যেত তা জানতেও পারতাম না।

যাক, সেদিন ভোরে উঠে শেষ বারের মত তোমার বিছানার কাছে দাঁড়ালাম, সাদা ধপধপে নেটের মশারি ফেলা দুধের মত শুভ্র বিছানায় তুমি শুয়ে আছ। সেই রকম সম্রাজ্ঞীর মত চেহারা, কি শান্তি তোমার মুখে, কোলের কাছে নবমীর চাঁদের মত সুন্দর সন্তান। দিদি তোমার মত সুখী কে আছে? ক্ষুধিত মাতৃহৃদয় থেকে নিঃসাড়ে বেদনা নিংড়ে পড়ছিল। ছোটবেলা থেকে তোমার জন্য ভগবানকে জানাতাম যে, সংসার যেন তোমার অভিমানের মূল্য দেয়। তোমার অবহেলা আমার প্রাণে সহ্য হবে না! আজ তাই দেখলাম, এত-বড় বৃহৎ পরিবারের তুমি নেত্রী, তোমার পথ ছেড়ে দিতে সবাই যেন বাধ্য। মনটা সুখী হল, কিন্তু আমি সর্ব্বহারা হয়ে যেন বাড়ী ফিরে এলাম। তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেল, আমি আর কোন চিঠি তোমায় দিইনি, তুমিও দাওনি। সে-দিন আমাদের গ্রামের রাঙা-দিদির সঙ্গে তোমার না কি কলকাতায় কালীঘাটে দেখা হয়েছিল, শুনলাম। তুমি ওকে আমার কথা জিগ্গেস করেছিলে, শেষ কালে এ-কথাও বলেছিলে, 'সেই খোকার ভাতে সরো এসেছিল, তার পর গিয়ে অবধি আমায় একখানি চিঠিও দেয়নি, মায়ের পেটের বোন এমনি অকৃতজ্ঞ বটে!' দিদি, আজ আমাদের বাবা-মা নেই, দু'দিন যে সংসারের জ্বালা থেকে কোথাও গিয়ে জুড়িয়ে আসব, তার ঠাঁই নেই। ভাইরা পরের মেয়ে ঘরে এনেছে, ওখানে আমি পর, তা ছাড়া কেউ আমার খোঁজ-খবর করেও না। অথচ শুনি, তোমার ওখানে খুব যাওয়া-আসা করে। এখন এটুকু জানি, বোন, গরীবরা যদি বড়লোক আত্মীয়ের খোঁজ করে তাহ'লে ধরে নেবে খোসামুদি, আর বড়লোকরা যদি গরীবের খোঁজ করে তাহ'লে বলবে, উঃ, কি মহানুভবতা! তুমি ত দিদি আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি একটি বারও খোঁজ করনি। শুনেছি খোকনের পর তোমার আর একটি মেয়ে হয়েছে, দু'টি ছেলেমেয়ে না কি দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে, সাহেবী স্কুলে পড়ে। রাঙা দিদির মুখেই সব শুনলাম। আমার দিন এখন কি ভাবে কাটছে, শুনবে? ছ'বছরে ছ'টি সন্তান, তার মধ্যে দু'টি গেছে, বাকী চারটি কোন মতে মরে-বেঁচে আছে। রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ী, বিধবা একটি ননদ, আর আমি আমার স্বামী এই আমার সংসার। এর মধ্যে হাড়-পাঁজরা বের করা একটা গাই আছে, তাকে নিঙড়ে যে এক ফোঁটা দুধ পাই তাই কোলের মেয়েটাকে দিই। পাকিস্তানে দেশ পড়েছে বলে রোজই পালাই পালাই হচ্ছে। তবু এখানে সামান্য একটু জমির দৌলতে পরিবারের সকলের মুখে এক বেলা অন্ন উঠছে, এ সব ছেড়ে গেলেই যে শুকিয়ে মরব।

এক-এক সময় আমি সংসারের জ্বালায় পাগল হয়ে উঠি, সময় মত পথ্য না পেলে শ্বশুর-শাশুড়ীর গালাগালি, ননদের টিপ্পনি কেটে কথা এবং সব চেয়ে মজা—লেটার পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে আমিও গ্রাম্য নারীর মত প্রত্যুত্তরে ঝাঁঝাল কথা শুনিয়ে বার্লির বাটি, সাবুর বাটি ঠকাস্ করে রেখে আসি!

সন্ধ্যা বেলা ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সকলকার প্রয়োজন মিটিয়ে রান্না-ঘরে কাঠের উনানের জ্বাল কমিয়ে প্রদীপের আলোয় যখন কন্ট্রোলের ছেঁড়া কাপড়টা সেলাই করতে বসি, তখন চোখে আচমকা জল এসে পড়ে। তখন ভাবি, মনে পড়ে দাদামশায়ের ঋষির মত চেহারাখানির কথা। বাসি বিয়ের

আশীর্ব্বাদের দিন পদ্ম-পাপড়ীর মত ধবধবে দু'খানি হাত মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন "সর্ব্ব অবস্থায় সুখী হয়ো মা!" দু'টি চক্ষু বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। স্বামী দোকানের কাজ সেরে রাত্রে ফেরেন, খেতে বসেন, চোখে জল দেখেও কোন দিন প্রশ্ন করেন না, মুখে হাসি দেখলেও তার কারণ খোঁজেন না। গীতার সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যেন! হায় রে, বি-এ পাশের অভিশাপ…! এর মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর আমাদের সঙ্গে মিশালী পাতিয়েই আছে, যমে-মানুষে টানাটানি চলে। কী আশা আছে জীবনে, কি সুখ আছে!

যাক্, নিজের দুঃখের কাহিনী লিখে চিঠি আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে, যদি ভাব, তোমার করুণা উদ্রেকের প্রয়াস করছি, তাহ'লে মস্ত ভুল করবে ভাই!

আজ চলি, প্রণাম নাও। ইতি সরযূ।

"আমাকে ভুলিও না—"

(ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীমতী তৃপ্তি বসু

অনেক—অনেক দিন আগে এক দিন এক বাগানে কতকগুলি ফুল মৃদু-মন্দ বাতাসে দুলে-দুলে গল্প করছিল। এই রকম ভাবে দুলে-দুলে তারা গল্প করত, গান করত আর ঝগড়াও করত বটে, কিন্তু তাদের নিজেদের কোনও নাম ছিল না। এই জন্যে বিশেষ করে ঝগড়ার সময়ই—তাদের অসুবিধার সীমা ছিল না। কারণ উদ্দেশ্যহীন ঝগড়ায় এক জনের দোষ আর এক জনের ঘাড়ে চাপাতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করত না।

এক দিন এই অদ্ভুত বাগানে ঈশ্বর বেড়াতে এসে নামহীন ফুলগুলির এই অসুবিধা লক্ষ্য করে প্রত্যেকের এক-একটি নামকরণ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও জানিয়ে দিলেন যে, সপ্তাহ শেষে প্রত্যেক ফুলকে একবার করে নিজেদের নাম ঈশ্বরের কাছে বলে আসতে হবে।

ঈশ্বরের আদেশানুসারে সাত দিন পরে প্রত্যেক ফুলটি নিজের নিজের সৌন্দর্য্যে ভরপূর হয়ে স্বর্গে যাওয়ার পরে ঈশ্বর এক-এক করে তাদের কাছে ডেকে আদর করে নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ফুলগুলিও হাসিমুখে একে-একে তাদের নাম বলে যেতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ফুল অনেক চেষ্টা করেও তার নিজের নাম মনে করতে পারল না। ভয়ে ফুলটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত সৌন্দর্য্যও নষ্ট হোল। এক-এক করে সব শেষে তার পালা এলে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম কি?" অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে জড়িত স্বরে ফুলটি উত্তর দিল, "আমি—আমি ভুলে গেছি।" কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাকে অত্যন্ত আদর করে মিষ্টি কথায় তার নাম মনে করিয়ে দিলেন।

এর ঠিক সাত দিন পরেই আবার সমস্ত ফুলগুলি সেজে-গুজে ঈশ্বরের সভার উদ্দেশ্যে রওনা হোল। বাগান থেকে বের হবার সময় সেই ছোট্ট ফুলটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে পা ফেলে চলতে লাগল; কারণ, এবার তার নাম কণ্ঠস্থ—ঠোঁটস্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু দু'-চার জন তাদের নাম বলার পরই হঠাৎ ফুলটির স্মরণ হোল, সে তার নিজের নাম ভুলে গেছে। তার দুই পা ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, আজ নিশ্চয়ই ঈশ্বর তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। সব শেষে মধুর স্বরে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম?"

"আমি…আমি…" অবস্থা বুঝতে পেরে আগের দিনের চেয়েও বেশী আদর করে ঈশ্বর আবার তার নাম বলে দিলেন।

এর পর আরও দুই-এক সপ্তাহ ঠিক ঐ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হোল। পরের সপ্তাহে পালা মত সেই ছোট্ট ফুলটিকে ঈশ্বর সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় ফুলটি নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর তার গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের দু'টি ধারা।

প্রচুর হাসি আর অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ঈশ্বর বললেন, "আচ্ছা, আজ থেকে তোমাকে এমন একটি নাম দেব যা তুমিও ভুলবে না, যা অন্যেরও ভুল হবে না। তোমার নাম দিলাম আমি—ফরগেট্ মি নট্—অর্থাৎ…আমাকে ভুলিও না।"

—

অন্তরা

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

সোনালী পাতা-ঝরা নিরাভরণ নীল চৈত্রের আলো চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে! লেডিজ হস্টেলের একটি কক্ষ। নিভৃত, নিঃশব্দ, অস্ত-গোধূলির আলোয় অন্তরা ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দ্রুত-হস্তে বেশ-বিন্যাস সমাপন করছিলো। রাঙা আলো এসে পড়েছে তার ঈষৎ কুঞ্চিত তাম্রাভ বেণী-বন্ধনে, নিটোল দু'টি বাহুর ভাঁজে-ভাঁজে, তার উদ্ধত কালো চোখের সুগভীর ইসারায়।

কি শাড়ীখানা পরা যায়? চাঁপা রঙের ওপর জরীর পাড় বোনা ওইখানা? আর গেরুয়ার ওপর সোনার সুতোর কাজ-করা ওই ব্লাউজটাই বোধ হয় চলতে পারে। অন্তরা মনে-মনে ভেবে নিলে। ছন্দোবদ্ধ দেহ তার চাঁপার বাহু-বন্ধনে বাঁধা পড়ল; অতি সুদৃশ্য আভরণ সুন্দরতর তনু-দেহে ঝিকিয়ে উঠছে…আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি চেয়ে অন্তরা মৃদু হাসল। বিজয়িনীর হাসি। নিটোল দু'টি গালে টোল পড়ল। আর বেশীক্ষণ নয়, এখনি। সে আসবে, ওই গোলাপের আভাময় গাল দু'টি তার মৃদু চুম্বনে রক্তিমতর হয়ে উঠবে, তাই নয় কি অন্তরা?

নীচে ট্রামের ঝড়-ঝড়, বাসের ঘড়-ঘড় শব্দ ভেদ করে শোনা গেল মোটরের ষ্টার্টার থামবার সুগভীর গর্জ্জন। অন্তরা তোমার অন্তরতর এসে পড়েছে! শেষ বারের মতো দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখখানি দেখে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে অন্তরা বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ির মাঝখানে ছোট একটি টেবিল, বোর্ডারদের নাম, গন্তব্য-ধাম এবং আগমন-নির্গমনের সময় তাতে লিখে রাখতেই হবে, এই নিয়ম—এক এই সব ঝঞ্চাট। বিরক্তিতে ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত করে সে লিখল:

অন্তরা বসু
৫১, রসা রোড
সন্ধ্যে ছ'টা।

ওমা, অন্তরা যে! কোথাও বেরোচ্ছ বুঝি ভাই?…

অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুরে আর একটি মেয়ে ইতিমধ্যে গায়ে ঘেঁষে পড়ে প্রশ্ন করছে; পুনশ্চ সে শুধোলো: নীচে দেখলাম প্রাইভেট কার। সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। কোথায় বেরোচ্ছ ভাই?

উত্তরের অপেক্ষা না করে ইলা অদম্য কৌতূহলে খাতাখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

খট্-খট্ হাই-হীল জুতোর সুউচ্চ শব্দ···। সচকিত হয়ে মুখ তুলে ইলা দেখলো, তার এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সেখানে কেউ নাই। অন্তরা নীচে নেমে গেছে।

বটে, এতখানি! মুখখানি ঘোরাল করে ইলা পা টিপে-টিপে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ির সামনের ঘরটি নিভাননীর। সেখানে ঢুকে ও দরজা বন্ধ করে দেয়।

···মোটর চলার গর্জ্জন শোনা গেল। হষ্টেলের ওপরে অনেকগুলি কৌতূহলী আঁখি যে তাদের লক্ষ্য করছে, সেদিকে ওদের লক্ষ্যই নাই। তাহলে কি আর অন্তরা সেই সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকটির অতখানি গা ঘেঁষে বসতে পারত? আর লক্ষ্য থাকবেই বা কি করে? ওরা যতই গলা সাফাই করুক না কেন, যাদের প্রেমের খেলা সুরু হয়েছে, তারা তা খেলবেই! অপর দিকে ওরা এখন লক্ষ্য রাখে কি করে?···

• • • •

নিভাননীর গৃহে ইলা, নিভা, রাধা সকল বোর্ডারদের একটি বৈঠক বসেছে। এমন কি সুপারও উপস্থিত আছেন। আলোচনাটি যে এর পূর্ব্বে অত্যুগ্র হয়ে গেছে, তা বোঝা যায়। এখনও কণ্ঠস্বর সকলের একটু নরম হলেও আলোচনার তীব্রতার হ্রাস হয়নি।

ইলা হাতখানি আন্দোলিত করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বোঝাচ্ছে, আপনি অন্তরার ভুল-দোষ-ত্রুটি তো দেখবেনই না। আমাদের হষ্টেলের একটি মেয়ে যদি সর্ব্বদা ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে ঘুরে বেড়ায়, তাতে আমাদেরো morality সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি!

নির্ম্মলা এদের মধ্যে বয়সে ছোট, অভিজ্ঞতাতেও। মুখখানি ঘুরিয়ে সে অনেক কষ্টে হাসি চাপল। মরালিটি আশঙ্কা? তাই বটে! কিন্তু অন্তরার বেলায় না হয় বোঝা যায় আশঙ্কাটা কোথা থেকে আসছে; যে রকম সুন্দর মেয়ে! আর ওর হাসিমাখা কথাবার্ত্তার একটা অন্য রকম আকর্ষণ। কিন্তু এদের? যৌবন গেছে পেরিয়ে, বিয়ের কোন দিকেই কোন আশা নাই, ভবিষ্যতে স্কুল-মাষ্টার না হওয়া ছাড়া এদের নাস্তি গতিরন্যথা, এদেরো আশঙ্কা!···

নিভা বললো, না, সে কথা ছাড়াও কথা হচ্ছে হষ্টেলের তো একটা সুনাম-দুর্ণাম বলে বস্তু আছে! আমাদেরি হষ্টেলের একটি মেয়ের নামে যদি সকলে অখ্যাতি করে, তাতে সমস্ত হষ্টেলেরই······

রাধা কথাটা লুফে নিয়ে বললো: তাতে আমাদের নামেও কথা উঠতে কতক্ষণ?

কমলা ঈর্ষ্যা-কুটিল আঁখির কটাক্ষ হেনে বললো: সে কথা আর বলতে? আর ভাই রাধাদি, ওর সবি যেন কেমন কেমন! হষ্টেলে এসে ওর আলাদা প্রাইভেট রুম চাই, আর অত দামী-দামী জামা-কাপড় পরে থাকবার সব সময় কি প্রয়োজন? বি-এ পড়ছে না থিয়েটারে অভিনয় করছে, বোঝা মুস্কিল!

নির্ম্মলা হেসে ফেলে বললো: তা কমলাদি, ওই মেয়েই কিন্তু আই-এতে ষ্ট্যাণ্ড করে স্কলারশিপ পেয়েছে। আর ও যাই করুক না কেন, তাতে আমাদের বলবার কী প্রয়োজন ভাই?

কমলা রোষবিকৃত মুখে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার পূর্ব্বেই নির্ম্মলাকে বললেন: দেখ নির্ম্মলা, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না। আজ অন্তরা এলে সকলের সামনেই আমি তাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করব।

সুপার উঠে চলে গেলেন। অন্তরাকে তিনি সত্যই আন্তরিক স্নেহ করতেন। আজ তাকে নিয়েই এত সব কুৎসিত আলোচনা তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

• • • •

ছোট্ট একখানি রম্য গৃহ! বাইরের ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অন্তরা বসে, তার সুন্দর মুখে-চোখে-বক্ষে সূর্য্যের অপর্য্যাপ্ত আলো এসে পড়েছে। অসিত পোর্ট্রেটের সামনে তুলিতে রং মাখাতে-মাখাতে মুগ্ধ কণ্ঠে বললো: তুমি সৃষ্টির প্রথম কবিতা!

সত্যি না কি? অন্তরার বাঁকা চাহনিতে বিদ্যুতের ইঙ্গিত।

···আহা-হা! অন্তরা, এক মিনিট, লক্ষ্মীটি! ঠিক ওই 'পোজে' একটুখানি থাক তো। এঁকে নিই।

বাবা রে বাবা! 'আর্টিষ্ট' প্রেমিক যে এমন হয়, কে জানতো! অন্তরার চোখে-মুখে কৌতুক ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু এবার শেষ কর, আমায় হষ্টেলে ফিরতে হবে এবার।

অসিত নিবিষ্ট মনে তুলি চালাতে চালাতে বলে: আর একটু, অন্তরা লক্ষ্মীটি!

বা রে, হষ্টেলে যে···

আঃ! অসিত এবার ধৈর্য্যহারা হয়। কবে যে ওই হষ্টেল থেকে তোমায় বার করে আনতে পারব।

আনলেই তো হয়! অন্তরা সহসা অনামিকার হীরকাঙ্গুরীয়ের পানে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

অসিত তুলি ফেলে অন্তরার কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায়। বাহুপাশে প্রিয় দেহ-বল্লরীকে বেষ্টন করে বলে: অন্তরা, সত্যি বলছ? এখনো বল; তোমায় পেলে আমার সমস্ত কিছু ধন্য হয়ে উঠবে। শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা আমি মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলি, জানো রাণী! কিন্তু তুমি এলে তুমিই হবে আমার অফুরন্ত প্রেরণা! তুমিই তো বলেছিলে, তোমার বি-এ পরীক্ষা হবার পূর্ব্বে তুমি এ সব চাও না!

প্রিয়-বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে অন্তরার দেহ বারে-বারে কেঁপে উঠছে। সুখাবেশে আচ্ছন্ন নয়নে সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো: ছাই পরীক্ষা!

অসিতের মুখ ধীরে-ধীরে গভীর আবেশে অন্তরার মুখের উপর নত হয়ে পড়ছে। নিরাবরণ গোধূলির রিক্ত আলো ওরা নিজেদের প্রেমের ঐশ্বর্য্যে রাঙিয়ে দিলো।

• • •

রাত্রি আটটা! লেডিজ হষ্টেলের সিঁড়িতে 'অন্তরার জন্য সুপরিচিত পদশব্দ শোনা গেল। ওপরে ওঠা মাত্র সুপার নিভার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন: অন্তরা, শোনো।

ঘরের ভিতরে ইলা, নির্ম্মলা, রাধার ভীড়! সকলেরই মুখভাব কঠোর, উত্তেজিত। এ যেন সত্যিই কোনো অপরাধীর সন্ধান পেয়ে আদালতে জুরীর দল বসেছে মহা সমস্যা নিয়ে!

অন্তরা অবাক্! সুপার ডাকলেন: শোনো, অন্তরা! আজ যিনি তোমায় মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি তোমার কে?

অন্তরার মুখ সহসা গভীর লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল। চাঁপা রঙের সাড়ীর ভেতর থেকে ক্যালিফর্ণিয়া পপির উগ্র সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তারি সাথে মেশা অন্তরার আশ্চর্য্য সুন্দর চোখ দু'টির মায়া। বুনে দিয়ে গেছে ওর ঈষৎ লজ্জিত আঁখির কালো মায়া রাত্রির করুণ ছায়া।

ইলা নিভার প্রতি ইঙ্গিত-ভরা কটাক্ষ হানল।

বলো, উনি তোমার কে?

অতি অস্ফুট কণ্ঠে অন্তরা উত্তর দিলো: আমি ওর সাথে এনগেজড্।

গৃহের সকলে স্তব্ধ অবাক্। সুপার নির্ব্বাক্। শুধু দূর আকাশের তারার হাসির সাথে তাল রেখে নিরুপমার হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠলো।

নারী ও পুরুষ

নমিতা পালচৌধুরী

পরেশ বাড়ী ফিরছে। বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটা দিনের কলম-পেশা চুকিয়ে পরেশ বাড়ী ফিরছে। ভারী পায়ের শব্দ তুলে সে একটানা পথ চলে। তার চলার শব্দে ফুটে ওঠে বেশ একটা ছন্দ। অশান্ত, এলোমেলো পদক্ষেপ তার নয়।

ক্লান্ত অবসন্ন পরেশ অবশেষে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছয়। গেটের বাইরে থেকেই সে দেখতে পায় লাল রঙের জরাজীর্ণ বড়ো বাড়ীটা। এ তার সেই ঠাকুর্দ্দার আমলের বাড়ী। পরেশ ভাবে—ঠাকুর্দ্দা চলে গেলেন, বাবা চলে গেলেন, কিন্তু বাড়ীটা আজও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। পরেশ ভাবতে ভাবতে আনমনে এগিয়ে যায়। পেয়ারা গাছটা পেরিয়ে যেতেই পরেশের চোখে পড়ে তার ঘরের ছোট জানলাটা, জানলার গায়ে ঝুলছে সেই বিবর্ণ মলিন পর্দ্দা। মনে পড়ে তার বিয়ের দু' মাস পরেই অলকা সখ করে এই পর্দ্দাটা টাঙিয়েছিল। তার পুরান ছাপা শাড়ীখানা কেটেই সে তৈরী করেছিল এই পর্দ্দা।

পরেশ ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। শ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কি, আজ জ্বর আসে নি তো?" তার কণ্ঠস্বরে কোন ব্যস্ততা প্রকাশ পায় না। দেড় মাস আগে অলকা যখন প্রথম রোগশয্যা গ্রহণ করেছিল, তখন যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠতো তার প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে, আজ তার লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না।

অলকা শুকনো মুখে তার স্বাভাবিক হাসি টেনে এনে বলে—"হ্যাঁ, আজও এসেছে।"

পরেশের কাছ থেকে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। সে ভাবলেশহীন মুখে গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলতে থাকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে আলগোছে সে জামা খোলে। যে অবস্থা হয়েছে পাঞ্জাবিটার!

জামা খুলে পরেশ ফিরে দাঁড়াতেই অলকা তার মুখ পানে চেয়ে হাসে। ছোট্ট মিষ্টি হাসি। যে হাসি অলকার অসুন্দর মুখকে কোরে তোলে অপরূপ। পরেশের হঠাৎ মনে হয়, অলকার মুখপানে সে যেন কত দিন ভাল করে চেয়ে দেখেনি—অলকা যেন কত দূরে সরে গেছে। আবার সে তাকিয়ে দেখে ঐ ছোট্ট মিষ্টি হাসিটুকু। পরেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়। হঠাৎ সে উপলব্ধি করে তার নিজের মনের অসম্ভব পরিবর্ত্তন। অলকার হাসি তো আজ তাকে স্পর্শ করছে না। তার মন তো আজ উচ্ছ্বাসে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠছে না। তবে কি মনটা তার মরে গেছে!

মনে পড়ে ফুলশয্যার রাত্রের কথা। সে রাত্রে অলকার এই হাসিটুকুই পরেশকে পাগল কোরে তুলেছিল। নববধূর সৌন্দর্য্যের অভাব তার মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার করেনি। মুগ্ধ পরেশ অলকার পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার হাত দু'টি ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল —"রাণী আমার, আমি অর্থ চাই না, মান-সম্মান চাই না, তোমার মুখের হাসিই আমার জীবনকে ভরিয়ে রাখবে।" অলকা হেসে মাথা নত করেছিল। পরেশের মনে পড়ে সে রাত্রের প্রতিটি কথা। আরও মনে পড়ে আশাভরা দু'টি চোখ তুলে সেদিন সে বিহ্বল হয়ে বলেছিল—"অলকা, আমি বেশী আশা রাখি না—বড় বাড়ী, দামী গাড়ী আমি চাই না। আমার এই ছোট বাড়ীতেই আমি তোমায় নিয়ে বাঁধব আনন্দের নীড়। কেমন?"

আজ পরেশের হাসি পায় সেদিনের কথা মনে করতে। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মন তার আজ ক্ষত-বিক্ষত। সমস্ত দেহ-মন জর্জ্জরিত। তাই তো অলকার মিষ্টি হাসি তাকে আর উন্মনা কোরে তোলে না। অলকার মুখের পানে তাকিয়ে দেখতে সে ভুলে যায়। ভুলে যায়, রুগ্না অসুস্থা অলকাকে একটু আদর করতে। পরেশ বুঝতে পেরেছে মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজন কতখানি। সে বুঝতে পেরেছে টাকার দাম। অর্থের অভাব মানুষকে পশুত্বের পর্য্যায়ে টেনে নামায়—অভাবের তাড়নায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে ফেলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পরেশের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে তিক্ত শ্লেষপূর্ণ হাসি। এই সেই অলকা—তার জীবনের রাণী! যার কাছে সে বড়-মুখ কোরে নির্ব্বোধের মতই বলেছিল—"অর্থ চাই না, মান-সম্মান চাই না!" পরেশের মুখ ঠেলে হঠাৎ একটা বিপুল অট্টহাসি বেরিয়ে আসতে চায়—উন্মত্তের মত হো-হো করে সশব্দে হাসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু পাগল হ'তে এখনও বাকী আছে—তাই সে নিঃশব্দে ফের অলকার দিকেই তাকিয়ে দেখে। পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছে অলকা। ও যেন কত ছোট হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটাই যেন ওর হ'য়ে গেছে ছোট্ট মেয়ের মত। আহা বেচারী! পরেশ তাকে এক দিনও ভাল করে খেতে দিতে পারেনি। পারেনি দিতে একখানা ভাল শাড়ী। অনাদরে, অযত্নে অলকা তাই অকালে শুকিয়ে চুপসে গেছে। কিন্তু—কিন্তু উপায়ই বা কি! পরেশের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস। সে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয়, "ওরে রেণু, তোর চায়ের জল তোল?"

কথার শেষে পরেশ এগিয়ে গিয়ে অলকার শয্যার একপাশে গা ঢেলে দেয়। অলকা শশব্যস্তে বলে ওঠে—"ওমা, ও কি! ওখানে শুয়ে পড়লে কেন? পায়ে পা লাগবে যে!"

পরেশ তার ব্যস্ততার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না—নির্ব্বিকার ভাবে শুয়ে থাকে। অলকা ফের বলে—হাত বাড়িয়ে স্বামীর একটা হাত ধরে আব্দারের সুরে বলে—"লক্ষ্মীটি, ভাল হোয়ে শোও। স্বামীর গায়ে পা লাগলে দোষ হয়, জান না বুঝি?"

পরেশ অকারণে হঠাৎ চটে ওঠে। অলকার হাতখানা এক ঝাঁকুনিতে সরিয়ে দিয়ে বলে—"যাও, আর ন্যাকামী করতে হবে না। যত্তো সব—!"

পরেশের কথার সাথে ঝরে পড়ে অসীম বিরক্তি। ভাল লাগে না তার এ সব আদর-আব্দার। অলকা কেন ভুলে যায় তাদের বিয়ের পর পেরিয়ে গেছে সুদীর্ঘ দু'টি বছর! এখন কি আর এ সব শোভা পায়! কেরাণীদের জীবনে যে দু'টো বছরই বিশ বছরের সমান! ভীত-স্তম্ভিত অলকা স্বামীর পানে একবার তাকিয়ে দেখেই দৃষ্টি অবনত করে। অশ্রুভারে চোখ দু'টি যেন তার আপনিই নত হয়ে আসে।

সন্ধ্যা হতেই হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে রেণু এসে এ ঘরে ঢোকে। সাদা চিম্‌নীটা ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আজও সেটা পরিষ্কার করা হয়নি। পরেশ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—"হ্যা রে রেণু, তুই করিস্ কি সারা দিন? চিম্‌নীটা একটু পরিষ্কার করতে পারিস না?"

রেণু মুখ ভার করে হাতের লণ্ঠনটা মেঝের উপর ঠক্ করে নামিয়ে রাখে। তার পর গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে যায়—"সারা দিন কি করি একবার চোখ চেয়ে দেখো। সব কিছু যদি এত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে চাই, তা'হলে একটা চাকর রাখলেই হয়!"

পরেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ কি সেই রেণু! মাত্র বছর খানেক আগে নিজের পৈত্রিক বাড়ীখানা বাঁধা রেখে পরেশ যার বিয়ে দিল! মনে পড়ে বোনটির বিয়ের সময় অনেকেই বলেছিল—"দরকার কি তোমার বিয়ের এত আড়ম্বর করার? নিজের ভবিষ্যৎ সকলের আগে-বুঝলে হে? নিজের সাধ্যে যা কুলোয় তাই কর—নইলে পরে তুমিই পস্তাবে।"

পরেশের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়ে রেণু ফের এ ঘরে এসে ঢোকে। নীচু হয়ে বসে কি যেন করে। হ্যারিকেনের মৃদু আলোকেও পরেশ দেখতে পায় রেণুর সীঁথের সিঁদূর। সীমন্তের ঐ জ্বলন্ত রেখাটুকুই যেন রেণুকে ছিনিয়ে নিয়েছে পরেশের কাছ থেকে অনেক দূরে।

"একটু মিছরী দিবি দিদি—এই নেবুর টুকরোটা দিয়ে একটু সরবত করে খেতে?" ধীরেশকে হঠাৎ দোর-গোড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। পরেশের ছোট ভাই ধীরেশ। সলজ্জ বোকা-বোকা ভাবটা তার। কিন্তু রেণু কোন উত্তর দেবার আগেই পরেশ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বলে ওঠে—"রেণু, ধীরুর হাতে নেবু কেন? জানো একটু সাবু মিছরী—দু'টো নেবু জোগাড় করতেই আমার জিভ্ বেরিয়ে পড়ে?"

"তা ধীরুরও যে পেটের অসুখ দাদা।" রেণু কৈফিয়ৎ দেয়।

"হোক পেটের অসুখ"—পরেশ সবেগে উঠে বসে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মুখ-ভাব ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে—চোখে ফুটে ওঠে হিংস্র-কুটিল দৃষ্টি। সে চিৎকার করে বলে—"পাবে না ধীরু নেবু। ওকে যদি দেওয়া হয় তাহলে বলে দিচ্ছি এর পর থেকে আর পারব না আমি এ সব আনতে।"

এক মুহূর্ত্তে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। অলকা তার স্বামীর এই নতুন মূর্ত্তি দেখে লজ্জায়-দুঃখে মুখ ঢেকে পড়ে থাকে। একবার একটু হেসে ধীরেশের পক্ষ নিয়ে কি যেন বলতে যায় কিন্তু পারে না। শত অভাব-অনটনের ভেতরও তার মুখের যে মিষ্টি হাসিটুকু ছিল অম্লান—আজকের ঘটনায় সে হাসি হয়ে গেল ম্লান—বিকৃত।

নিস্তব্ধ রাত্রি। পাশাপাশি শুয়ে পরেশ ও অলকা। কারুর মুখে কথা নেই। কেবল দূর থেকে মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে দু'-একটা কুকুরের ডাক। পরেশের মন আজ অনুতপ্ত, ক্ষত-বিক্ষত। সে হঠাৎ করুণ অসহায়ের সুরে বলে ওঠে—"অলকা, আর পারি না। অভাবের তাড়নায় আমি একটা পশুরও অধম হয়ে গেছি। এত দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না।"

একটু থেমে পরেশ হঠাৎ অলকার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে উত্তেজিত স্বরে বলে—"জানো অলকা—জানো, এক-এক সময় মনে হয় বুকে দিই ছুরি বসিয়ে—আগে তোমার তার পর আমার। বাস্—তাহ'লেই সব দুঃখ-কষ্টের শেষ!"

অলকার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা অস্ফুট কাতর-ধ্বনি। সে শিউরে উঠে নিজের পেটের ওপর একটা হাত রাখে। সে যে আজ মা। সন্তানের অমঙ্গল কি সে সইতে পারে, অলকা তার স্বামীর কাছ থেকে সভয়ে একটু দূরে সরে যায়। বারে-বারে সে হাত দিয়ে অনুভব করে তার গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব। সন্তানের মঙ্গল-কামনায় কাছে তার স্বামীও বুঝি আজ তুচ্ছ হয়ে যায়।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতরও পরেশ অনুভব করে অলকার ভাবান্তর—তার নিভৃত মনের গোপন কথা। সে ঈষৎ ম্লান হেসে তার শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—"এ খবরও আমার আনন্দ দেয় না অলকা। কারণ—কারণ শুধু ঐ অভাব!"

অজন্তা

শর্ব্বাণী ভট্টাচার্য্য

সমাধি-মন্দির।

অতীতের বেদনা-পুঞ্জীভূত সমাধির উপরে নিস্তব্ধ প্রকৃতির সমাপ্তিহীন সাধনার নীরব দেউল। দিগন্তের বিলীনমান রশ্মি আজি ধীরে ধীরে তাহারই উপরে অস্পষ্ট ম্লানিমার পরশ বুলাইয়া দিয়া দিক্‌চক্রবালে শেষ অভিনন্দন জানাইয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণের আঁধার ঘনাইয়া আসে।

কিন্তু ইহা ক্ষণিকের।

সন্ধ্যা দেবী যখন তাহার স্খলিত অঞ্চল লুটাইয়া বরণডালা হাতে এই ধ্যানমগ্ন চরাচরের উপরে নামিয়া আসিবেন, প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ স্পন্দিত হইবে এক অপরূপ উন্মাদনায়। প্রদীপ্ত তারকার দীপালিতে, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিনীর দূরাগত কলনাদে এই নিস্তব্ধতার বক্ষ উজাড় করা শান্তি-চন্দনলিপ্ত শ্রদ্ধাপুষ্প-অর্ঘ্যে প্রকৃতি অপরূপ আবেগে এই সমাধি-মন্দিরে সন্ধ্যারতি করিবেন।

কিন্তু আমি ঈর্ষা-দ্বেষ জর্জ্জরিত মানব জাতির প্রতিভূ, সভ্যতার নিদারুণ অভিশাপে সংশয়-কুটিল আমার মন। আমার অধিকার নাই এই পবিত্র দৃশ্যকে নয়ন মেলিয়া উপভোগ করিতে। শুধু একবার ইহাকে দর্শন করিতে। সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপ-বিজড়িত পার্থিব মানুষের অনাঘ্রাত ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জানাইতে, লুপ্ত সংস্কৃতির অবদানের পাদমূলে বসিয়া বর্ত্তমান কৃষ্টিকে হৃদয়ের প্রতি অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিতে আমি সশঙ্ক হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম অতীত সভ্যতার এই নিস্তব্ধ সমাধি মূলে।

অজন্তার প্রাসাদ-গুহা।

সম্মুখে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী ঈষৎ বঙ্কিম গতিতে তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। যেন কোন ভয়াল বিষধর সর্প সব দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া নীল আকাশের বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি শান্ত সে রূপ। তাহারই কোল ঘেঁসিয়া একটি ক্ষীণ স্রোতস্বতী মৃদুগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আর এই নিবিড় অরণ্যাবৃত পাহাড়ের বুকে স্থানে-স্থানে শূন্যবিবর প্রসারিত করিয়া আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গুহা, সুবিখ্যাত অজন্তার গুহা।

যাত্রী আমি একা নহি। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তর হইতে কত যাত্রী কত পর্যটক কত শিল্পী কত কবি আসিয়াছে অজন্তার পাদমূলে তাহাদের ভক্তি-অর্ঘ উৎসর্গ করিতে। কিন্তু ইহাদের মিলিত কলরোলের অন্তরালে প্রকাশমান উচ্ছৃঙ্খলতা আমাকে আঘাত দিল। মনে হইল, অজন্তার আত্মা যেন আর্ত রোলে ইহারই নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এ ভ্রান্তি আমার টুটিল যখন অজন্তার প্রথম গুহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভাব যেখানে আসিয়া ভাষার প্রকাশকে, কাব্যের আবেগকে, উচ্ছ্বাসের অসংযমকে হারাইয়া ফেলে। বুঝি আজ বাস্তব আসিয়া কল্পনার সেই সীমান্তে পৌঁছিয়াছে। বিরাট 'হল'-এর চারি পার্শ্বে অগণ্য স্তম্ভ জাগ্রত প্রহরীর মত উন্নতশীর্ষ। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় লতা-পাতা ইত্যাদি চিত্রে আপাদমস্তক পরিব্যাপ্ত। ইহাদের পিছনে প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য রঙ্গিন মানব-মূর্তি অপরূপ প্রতিভায় চিত্রিত। কালের ব্যবধানে কোনটি বা ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্য মুছিয়া যায় নাই। দু'হাজার বছর যেন একটি মাত্র দিনের মত কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এই বর্ণের প্রখরতাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। শুধু মাত্র বৌদ্ধযুগের যে সব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, আজ কালির আখর, কালের ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া প্রস্তরের বুকে তাহারাই চিরঞ্জীব হইয়া রহিয়াছে।

স্থানে-স্থানে ভগবান তথাগতের শান্ত, সুস্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্তি। সর্ব অবয়বে কি গভীর প্রশান্তি। বর্তমান হিংসা-উন্মত্ত বিংশ শতাব্দী মানুষকে প্রস্তরে পরিণত করে কিন্তু প্রস্তরের বুকে মানুষের সাধনা করিবার অমানুষিক শক্তি এই শিল্পীদের ছিল বলিয়াই এই প্রস্তরের বুদ্ধের মুখে শান্ত নির্বিকার ঔদাসীন্যের সহিত মানব প্রেমিকতার অনির্বচনীয় ভাবের মিলন হইয়াছে, যাহার সম্মুখে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী সম্রাটের মস্তকও আনত হইয়া আসে।

গুহার পর গুহা দেখিয়া গেলাম। অনেক অযত্ন অসাবধানতার সুনিশ্চিত ফল চোখে পড়িল, কিন্তু তাহাকেই বড় করিয়া ধরিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। হঠাৎ মনে হইল, যেন নিস্তব্ধতার এক ভয়াল সমুদ্র আমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, আমি যেন বড় একা। সত্রাসে চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, সহযাত্রীরা সকলেই তো আছে। নাই শুধু ইহাদের মাঝের ক্ষণিক পূর্বের সেই রূঢ় পৃথিবীর বৈষয়িক মানুষেরা। ইহাদের কাহারো মাঝে নাই কোন ব্যবধান, সবাই এখানে সত্য, শুভ ও সুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্যের অগাধ সমুদ্রে সকলেই এখানে একান্তে অবগাহন করিতে চায়। তাই এখানে সকলেই একা, সকলেই নিঃসঙ্গ সর্বশেষে দেখিলাম ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ দৃশ্য। শোক ও শোকাতীতের একাঙ্গ অপূর্ব মিলন।

অজন্তার নিভৃত গহ্বর হইতে যখন বাহির হইয়া আসিলাম, সন্ধ্যা হইতে তখনও বাকী। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সশব্দে গুহা-দ্বার বন্ধ করিতে লাগিল। জাগিয়া উঠিল কলকোলাহল-মুখরিত মানব-প্রকৃতি। ইহার স্পর্শ হইতে সরিয়া আরেক বার নয়ন ভরিয়া অজন্তাকে দেখিলাম। কি পাইলাম আর কি হারাইলাম বিচার-শক্তির সেই অবশিষ্ট শক্তিটুকু খর্ব করিয়া একটি প্রণামে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম।

দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—

কোথায় অজন্তা? কোথায় তাহার প্রাসাদ-গুহা? বিংশ শতাব্দী আবার আমাকে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করিয়াছে। সহর-সভ্যতার আবেষ্টনী চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। নিয়মের কঠোর শৃঙ্খলপাশ আবার আমি সর্ব অঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি।

উত্তর

১। উত্তরে। ২। যতীন মুখোপাধ্যায়। ৩। ১৮৫২।

৪। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ৫। শহরে। ৬। নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

৭। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৮। মাদাম কুরী।

৯। আড়াই কোটি প্রায়।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

(অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন)

১৯১৯—১৯২৪

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৯ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভে ভারতের অবদান ছিল অসামান্য—ভারতের অপরিমিত অর্থ ও সম্পদ এবং দুর্দ্ধর্ষ ও অপরাজেয় সৈন্যদল যুদ্ধজয়ে বৃটিশ-শক্তির প্রধান সহায় ছিল। যুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের অন্যান্য নেতা অকুণ্ঠ চিত্তে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করা হইবে। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ১৯১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হইল। ভারতবাসী দেখিতে পাইল যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে দায়িত্বশীল লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধে সাহায্যের পরিবর্তে আত্মশাসনের অধিকার চাহিয়াছিল—ভারতের ভাগ্যে জুটিল অপরিমেয় লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদী, বলগর্বী, বিদেশী শাসক ভারতের ক্রমবর্ধমান মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে বিনষ্ট করার জন্য দমননীতি ও অত্যাচারের সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করিল। এক দিকে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের নামে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করা হইল আর অন্য দিকে কুখ্যাত রাওলেট বিল আইনে পরিণত করিয়া ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে হরণ করা হইল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতের নেতৃবৃন্দ দলনির্বিশেষে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল এই রিপোর্ট সমর্থন করিল না। এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী শাসন-সংস্কার গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে যে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহাই অবিলম্বে কার্য্যকরী করার জন্য বিশেষ অধিবেশনে দাবী জানান হইল। ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসে বিশেষ অধিবেশনের এই সকল দাবী সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের এই দাবীর উত্তরে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলেট বিল উত্থাপনের ব্যবস্থা করিল। ১৯শে জানুয়ারী তারিখে রাওলেট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে রাওলেট বিল উত্থাপিত হইল—মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বিলটি আইনে পরিণত হইল। এই বিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার ভার লইলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, রাওলেট কমিটির সুপারিশ আইন করিয়া বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করিলে, সমগ্র দেশ এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবে। মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে পরিভ্রমণ করিলেন—দেশবাসী সাগ্রহে গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। রাওলেট বিল সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার সংগে সংগে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহার পূর্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্মপ্রচেষ্টা আবেদন-নিবেদন ও প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই কমবেশী পরিমাণে সীমাবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসী সক্রিয় ভাবে কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও ছিল না। গান্ধীজীই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে জানাইলেন যে ভারতবাসীর পক্ষে বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা সম্ভব। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেসের কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীজী কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন। তিনি তাঁহার অভিনব পন্থায় দেশকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন পরীক্ষা সুরু হইল। রাওলেট আইনের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, আন্দোলন আরম্ভের প্রাক্কালে সমগ্র জাতি উপবাস ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মিক প্রতিরোধের জন্য শক্তি সংগ্রহ করিবে। ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ তারিখটি উপবাস ও প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট হইল। পরে এই তারিখটি পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল করা হইল। ৬ই এপ্রিল তারিখে দেশের সর্বত্র জনসাধারণ উৎসাহ সহকারে গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমান, ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায় হাতে হাত মিলাইল। জনসাধারণের আত্মিক প্রতিরোধের শক্তি দেখিয়া বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণিল। কঠোর দমননীতির সাহায্যে জনসাধারণের মনোবল বিনষ্ট করার জন্য বিদেশী সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। সরকারী অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হইল। জনসাধারণ কর্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করায় তাহাদের উপর গুলী চালান হইল। ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিওয়ানাবাগে সমবেত বিশ সহস্র নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুর উপর ১৬০০ রাউণ্ড গুলী চালান হইল। বাগের একমাত্র প্রশস্ত নির্গম-পথ রুদ্ধ করিয়া সৈন্যদল জনতার উপর গুলী চালনা করিল। ইহার ফলে কয়েক সহস্র নরনারী হতাহত হইল। জালিওয়ানাবাগের নিষ্ঠুর বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র দেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশবাসী ও নেতৃবৃন্দ নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করার প্রতিবাদে স্যার শঙ্করণ নায়ার বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। দেশের সর্বত্র পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের দাবী করা হইল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও মহাত্মা গান্ধীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। গান্ধীজীর দিল্লী প্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। দিল্লীর পথে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইল। তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী, আহমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে হাঙ্গামা হইল। বোম্বাইএ লইয়া গিয়া গান্ধীজীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কয়েক স্থানে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সরকার হাণ্টার কমিটি নামে এক কমিটি গঠন করিলেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে পাঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি বেসরকারী কমিটি গঠিত হইল। ১৯১৯ সালে পণ্ডিত মতিলাল

নেহরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। এই বারের কংগ্রেস অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অন্য একটি প্রস্তাবে পাঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার মাইকেল ও জেনারেল ডায়ারের পদচ্যুতি দাবী করা হইল। রাওলেট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাবও কংগ্রেসে গৃহীত হইল।

১৯২০ সালের প্রথম দিকে খিলাফৎ সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিল। যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদিগকে খিলাফৎ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করা হইল না। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইএ তৃতীয় খিলাফৎ সম্মেলন হইল। খিলাফৎ সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মতামত জানিবার জন্য ইংলণ্ডে এক মুসলমান প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রতিনিধি দলকে যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে ভারতের মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, তুরস্কের সহিত যে সন্ধি করা হইবে তাহার সর্ত্ত যদি ভারতীয় মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ১৯২০ সালের ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপিত হইল। যে মাসে তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতের মুসলমান সমাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে গান্ধীজী মুসলমানদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা লোকমান্য তিলক গান্ধীজীর প্রস্তাবিত আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তিনি কোনরূপ বাধা সৃষ্টিও করিলেন না। গান্ধীজী-প্রস্তাবিত আন্দোলন সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়া বলিলেন, যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। গান্ধীজী বলিলেন, "I believe that it is possible to introduce uncompromising truth and honesty in the political life of the country. Whilst I would not expect the league to follow me in my civil disobedience methods, I would strain every nerve to make truth and non-violence accepted in all our national activities." ১৯২০ সালের ২৮শে মে তারিখে খিলাফৎ কমিটি গান্ধীজীর অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ২৮শে মে তারিখে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। এই রিপোর্টে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট হইল। খিলাফৎ সমস্যা ও পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ তুরস্কের সহিত সন্ধির প্রতিবাদে 'হিজরাত' আন্দোলন আরম্ভ করিল। সহস্র সহস্র মুসলমান বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সিন্ধুতে এই আন্দোলন আরম্ভ হইল। শীঘ্রই ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক স্থানে সৈন্যবাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে বহু যাত্রী হতাহত হইল। আফগান কর্তৃপক্ষ আফগানিস্থানে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইল। লালা লজপৎ রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী নাগপুর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ সমস্যার কথা বর্ণনা করিয়া অসহযোগ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইল, "উপরোক্ত অন্যায় দুইটির প্রতিকার করা না হইলে ভারতে কোন প্রকার শান্তি আসিতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এই ধরণের অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে না পারে এবং ভারতবাসীর জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উপায়। কংগ্রেস আরও মনে করেন যে, যে পর্য্যন্ত উপরোক্ত অন্যায় দুইটির প্রতিবিধান করা না হয় এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত ক্রম-পরিণতিমূলক অহিংস অসহযোগ নীতি অনুমোদন ও গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন পথ নাই।" নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়া। নাগপুর অধিবেশনে ইহাও ঠিক হইল যে, 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।'

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নবযুগ আরম্ভ হইল। নিরস্ত্র, অসহায়, লাঞ্ছিত ভারতবাসীর অন্তরে নূতন আশার আলোক প্রজ্বলিত হইল। গান্ধীজী দেশবাসীকে স্বরাজ লাভের জন্য দুঃখ ও ত্যাগের পথে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী বলিলেন যে, সত্য ও অহিংসাই হইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ—সত্য ও অহিংসার পথে অবিচলিত থাকিয়া জনসাধারণকে দুঃখ বরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—দুঃখ ও ত্যাগের পথেই স্বরাজ আসিবে। দেশবাসী আগ্রহের সহিত গান্ধীজীর এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিল। অসহযোগ আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করিল। জনসাধারণ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল, আইনজীবীরা সরকারী আদালত পরিত্যাগ করিল, উপাধিধারীরা সরকারী উপাধি ত্যাগ করিয়া বিদেশী সরকারের সহিত অসহযোগ করিল। অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বাংলা দেশ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। দেশবন্ধুর আহ্বানে সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী দ্রব্য বয়কট এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশের সর্বত্র জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে বহু যুগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেশ জাগিয়া উঠিল। দেশবাসী নূতন আদর্শে ও নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য সরকার দমন-নীতিমূলক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। দেশপ্রেমিক অসহযোগীদের পাদস্পর্শে ভারতের কারাগার সমূহ পবিত্র হইয়া উঠিল। সরকার একে-একে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১৯২১

সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে দেশের সর্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হইল। বোম্বাইএ জনসাধারণের সহিত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের ফলে কয়েক শত লোক হতাহত হইল। কর্তৃপক্ষ বাংলায় দেশবন্ধু দাশ, বাসন্তী দেবী ও তাঁহাদের পুত্রকে গ্রেপ্তার করিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লালা লজপৎ রায়-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একে একে গ্রেপ্তার হইলেন। স্বরাজ লাভের জন্য দেশবাসী হাসিমুখে সরকারী দমন-নীতির সম্মুখীন হইল। সরকার ৩০ হাজারের অধিক লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসী সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তিনি কারাগারে থাকায় হাকিম আজমল খাঁ আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দেশবন্ধুর অভিভাষণ পাঠ করিলেন। আমেদাবাদ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতি সমর্থন করা হইল এবং দেশবাসীকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইল, "এই অধিবেশনের মতে সকল প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকার হিসাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে একমাত্র কার্যাকরী পন্থা হইতেছে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা। সুতরাং যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মী বিশ্বাস করেন যে, এই দায়িত্বহীন সরকারকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হইলে আত্মত্যাগ ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই, এই অধিবেশন তাহাদিগকে ব্যক্তিগত আইন অমান্য ও যেখানে জনগণকে অহিংস থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেখানে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে।" আমেদাবাদ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সক্রিয় আন্দোলনের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। গান্ধীজী নিজ তত্ত্বাবধানে গুজরাটের বরদোলী তালুকে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড রিডিং এর নিকট লিখিত এক পত্রে গান্ধীজী বলিলেন, "Had the Government policy remained neutral and allowed public opinion to ripen and have its full effect, it would have been possible to advise postponement of the adoption of civil disobedience of an aggressive type till the congress had acquired fuller control over the forces of violence in the country and enforced greater discipline among the millions of its adherents. But the lawless repression (in a way unparalleled in the history of this unfortunate country) has made immediate adoption of mass civil disobedience an imperative duty." অর্থাৎ "গবর্ণমেণ্ট যদি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের জনমতকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে দিতেন, তাহা হইলে দেশের হিংসাত্মক শক্তি সমূহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ না করা পর্যান্ত কংগ্রেস দেশবাসীকে আক্রমণাত্মক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বে-আইনী দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় কংগ্রেসের পক্ষে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা ব্যতীত আর কোন পথ নাই।" আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেশের তরুণ সম্প্রদায় সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে আইন অমান্য করিয়া হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে জনসাধারণ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করিল। ইহার ফলে কয়েক জন পুলিশ কনস্টেবল অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গেল। ইহার পূর্বে বোম্বাইএ ও মাদ্রাজে জনসাধারণের মধ্যে হিংসার মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। এই সকল হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হইল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ব্যক্তিগত আইন অমান্য করিবার অনুমতি দিল, কিন্তু এই বৈঠকে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীজীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইল। ১৩ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিচার আরম্ভ হইল। গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুত ব্যাংকারও অভিযুক্ত হইলেন। গান্ধীজী এক লিখিত বিবৃতিতে বলিলেন, "In fact I believe, I have rendered a service to India and England by showing in non-co-operation the way out of the unnatural state in which both are living. In my humble opinion non-co-operation with evil is as much a duty as co-operation with good." অর্থাৎ "ভারত ও ইংলণ্ড যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অসহযোগের মধ্য দিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া, আমি উভয় দেশের সেবা করিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি। আমার মতে শুভের সহিত সহযোগিতা করাও যেরূপ আমাদের কর্তব্য, অশুভের সহিত অসহযোগিতা করাও আমাদের সেইরূপ কর্তব্য।" বিচারে গান্ধীজীর ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। শ্রীযুত ব্যাংকারের এক বৎসর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের পর সরকার কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইল। নবেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হইল। এই বৈঠকে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, দেশ ব্যাপক ভাবে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত নহে। কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখা হইল। ১৯২২ সালে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতিত্ব করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কংগ্রেসের অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল—কাউনসিল বয়কটের পক্ষেই

অধিকাংশ প্রতিনিধি মত দিলেন। ইহার ফলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন। স্বরাজ্য দলের সভাপতি হইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সম্পাদক হইলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠনে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় সংগঠন-প্রতিভা ও কুশাগ্রবুদ্ধি নিযুক্ত করিলেন। দেশবন্ধু দাশের নেতৃত্বে অচিরেই স্বরাজ্য দল আইন সভা সমূহে প্রবেশ করিয়া সরকারকে অচল করিয়া তুলিল। কাউনসিল প্রবেশ সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। দিল্লীতে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী আইন সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন, দিল্লী অধিবেশনে তাঁহাদিগকে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হইল। দিল্লী অধিবেশনের কিছু দিন পূর্বে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সত্যাগ্রহীদের অভিনন্দিত করিয়া দিল্লী কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯২৩ সালে কোকনদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। মৌলানা মহম্মদ আলী কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কোকনদে দিল্লী কংগ্রেসের কাউনসিল প্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে গান্ধীজী কারাগারে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে সমগ্র দেশে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কর্ত্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে মুক্তিদান করিলেন। গান্ধীজী কিছু দিন সমুদ্রতীরে জুহুতে অতিবাহিত করিলেন। সেখানে স্বরাজ্য দল সম্পর্কে তাঁহার সহিত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আলোচনা হইল। এই আলোচনার পর গান্ধীজী এক বিবৃতিতে কাউনসিল বয়কটের পক্ষপাতী কংগ্রেসকর্মীদের গঠনমূলক কর্ম্মসূচী অনুসরণ করিতে বলিলেন। ১৯২৪ সালে দেশের নানা স্থানে—দিল্লীতে, নাগপুরে, এলাহাবাদ ও কোহাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিশেষ ভাবে ব্যথিত হইয়া গান্ধীজী মৌলানা মহম্মদ আলীর গৃহে ২১ দিনব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। গান্ধীজী সাফল্যের সহিত অনশন সমাপ্ত করেন। ১৯২৪ সালের শেষ দিকে গান্ধীজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলালজীর কাউনসিল প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ১৯২৪ সালের বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করিলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, "I would strive for swaraj within the Empire but would not hesitate to sever all connection if severence became a necessity through Britain's own fault" অর্থাৎ—"আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সাম্রাজ্যের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ইতস্ততঃ করিব না।" গান্ধীজী স্বরাজ লাভের জন্য চরকা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের উপর জোর দিলেন এবং স্বরাজের ভিত্তি সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। এ বৎসর বাংলা দেশে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হইল। সুভাষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হইলেন। কঠোর দমন-নীতির সাহায্যে সরকার বাংলার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলকে আঘাত করা গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলা দেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া উঠিল। দেশবন্ধু বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অস্বীকার করিলেন এবং অন্য কাহারও পক্ষে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইল না। মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কম-বেশী পরিমাণে আইন সভার অভ্যন্তরে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিবার নীতি কার্য্যকরী করা হইল। স্বরাজ্য দলের সমবেত চেষ্টার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রায় অচল হইয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বিকেলের আলো যেন ডানা-ভেঙে-যাওয়া ছোট পাখি-
হলুদ-ডানার সুরে নেমে এলো রূপালি নদীতে,
ওপারে শ্যামলী সন্ধ্যা শ্লথনীবি—অঞ্চল ছড়ালো ;
ঘনিষ্ঠ আকাশ হ'য়ে আমারে কি এসেছিলে নিতে ?

তবে কেন সেই মাঠ-বন আর নদীর আঁচলে
চলে-যাওয়াটির ছায়া পড়ে-আসা বাতাসে ঘনালো ?

আজ আমি মুছে গেছি যেন কা'র চোখের কাজলে !

সেদিনের দেয়ালিতে যার মুখ লেগেছিলো ভালো,
[illegible] হ'য়ে ছায়া-পাখা সে বেলা [illegible]

[৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

জীবন, সাহিত্য ও দর্শন

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

"(যিনি উদ্যত বজ্র, ভয়াভিভবকারী মহত্তর) তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনে তৎপর"। অতএব আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দ্বৈতশাসন, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাও অদ্বৈত-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই ঈশোপনিষদের মর্ম্মস্থল হইতে এই সত্যধর্ম্মাশ্রয় অদ্বৈত-তত্ত্ব সূর্য্যোপাসনা-প্রসঙ্গে প্রচারিত হইল :—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহ সাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।"

"হে জগতের পোষক সূর্য্য, হে একচারী, হে সংযমনকারী, হে প্রজাপতি-তনয় সূর্য্য, তোমার তেজ সংবরণ কর এবং তোমার রশ্মিসমূহ সংহত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহাই আমি দর্শন করি। ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনিই আমি।" ইহারই ব্যাখ্যাক্রমে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"কিন্তু ন তু অহং ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে"—"অধিকন্তু (হে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) আমি তোমার সমীপে ভৃত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না"। এই উক্তিটি আকারে সামান্য হইলেও ইহার ব্যঞ্জনা অসামান্য। মানুষের এই বোধ যখন জাগ্রত হয়, তখন সে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে স্বভাবের মহিমায়, ভয়ের নৈরাজ্য হইতে আত্মার স্বারাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের ইতিহাসে এই স্বাধিকার-বোধ, এই আত্ম-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা, এই অভয়লোক-প্রাপ্তি এক যুগসন্ধির সূচনা করে। যদিও এ ক্ষেত্রে প্রায়ই বলা হয়—"Fear of the Lord is the beginning of all wisdom"—কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বিশ্বেশ্বরের এই রুদ্ররূপধ্যান প্রজ্ঞানের উপক্রমণিকা মাত্র, কদাচ তাহার উপসংহার হইতে পারে না।

সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে "স্ব"—অধীনতার সাধনা

এই স্বাধীনতা বা "স্ব"-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ। ইহা নঞর্থক বন্ধন-মুক্তির অবস্থা মাত্র নয়, কিন্তু সদর্থক স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের অনুশাসন। এই মুক্তিতত্ত্বই সকল দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাভূমি। অধিকাংশ স্থলেই মুক্তিকে বাসনা-কামনার অতীত এক চাঞ্চল্যবিহীন, পরিতৃপ্ত, আত্মকেন্দ্রিক অবস্থারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষ মুক্তি চায় অর্থাৎ অভাবের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্ব-ভাবের, আত্মকাম, আত্মরতি, আত্মার স্বাধিকারে স্থির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বাধীনতা" শব্দটির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা, যা'র উৎপত্তি ছিল তাঁর "জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" ধ্যানজ-প্রমায়, সহজ প্রত্যয়ের মধ্যে। তাঁরই ভাষায় বলি "স্বাধীনতা আত্মার অন্তরের ভাব। সেই স্বাধীনতা সুখই সকল সুখ, যাহা আমরা লাভ করিতে পারি স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের অধীন হওয়ায়।" স্বাধীনতার সম্পর্কে এই অধীন হওয়ার শিক্ষাও সাধনা যে অপরিহার্য্য, তাহা এখনও আমাদের উপলব্ধিতে আসে নাই। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য-সুন্দর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশী চায়। মানুষ অধীন হ'তেই চায়—যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে।···সে বলছে "হে নাথ, আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও।" আধ্যাত্মিক জীবনের এই চরম সার্থকতা অপরূপ প্রকাশ-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত সেই বাউলের দোঁহাতে, যিনি উচ্ছসিত ভাষায় গাহিয়া উঠিয়াছিলেন :—

"হৃদয় কমল উঠ্‌তেছে ফুটি কত যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি?
ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ,
আমার প্রভুর একটি কমল, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তা'তে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই।"

যেমন মুক্তিতত্ত্বে তেমনই সৃষ্টিতত্ত্বে পাই এইরূপ "ব্রাত্য" অর্থাৎ অসংস্কৃত বাউল, আউল, সহজিয়া প্রভৃতি "ভারত-পন্থ" সাধকের প্রাণময় স্পর্শ ও তাহাদের চিরন্তন অবদান। এর সমর্থনও দেখি ঔপনিষদ ঋষির প্রাণপ্রশস্তিতে—"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণঃ"—"হে প্রাণ, তুমি প্রথমজাত ও অসংস্কৃত এবং (সেই কারণেই) তুমি আত্মস্বতন্ত্র ও সংস্কারপ্রয়োজনরহিত"। সংস্কৃত সাহিত্য-সভায় অপাংক্তেয় এই সব কবি ও ভক্ত-সাধকদের একমাত্র উপজীব্য লৌকিক ভাষা—রূপকনাট্য, দেহতত্ত্বের গান ইত্যাদি। এই জন্যই ভক্ত কবীরের খেদোক্তি মনে পড়ে—"সংস্কৃত হৈ কূপজল ভাষা বহতানীর।" অবরোধ সুরক্ষিত কূপজলেরই শোধন-প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু চিরপ্রবহমান জলধারায় সহজ নৈর্ম্মল্য ও শুদ্ধসত্ত্ব ত প্রত্যক্ষ। ভারতীয় সংস্কৃতি এই ভাব ভাষার সাহচর্য্যে আবহমান কাল ফল্গুধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে জনগণচিত্তকে অভিষিক্ত ও অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে। পঠন-পাঠনে অক্ষম লোকদের মধ্যেও এইভাবে সার্থক হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছিলেন—"শিক্ষার বিকিরণ"।

সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য দর্শনের বিবিধ শাখা-প্রশাখায় যে সকল মতবাদ—যথা, দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ কিংবা সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ প্রভৃতি এ যাবৎ পল্লবিত হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টির মূলতত্ত্বই আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে অণু-পরমাণু, সংযোগ-বিয়োগাত্মক তাড়িত-শক্তির তাড়নায় রেখাকার-মাত্রিক এমন এক জগতের ("metrical world") সীমানায় উপনীত হয়, যেখানে সত্যদৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, থাকিলেও প্রলয়েরই নামান্তর। জড়বস্তু বা জগৎ কেবল মাত্র আকার-নির্দ্দেশক চিহ্নসমষ্টি (schedule of pointer-readings") নয়। দেশকালের বৈচিত্র্য-ভূমিকায় আমাদের মন, আমাদের চেতনাশক্তি, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা গ্রহণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই "সৃষ্টি"-পদবাচ্য। জ্ঞানমাত্রেই যে মানসী-ক্রিয়া, তাহা ছায়ামাত্র গ্রহণে পর্য্যবসিত হইতেই পারে না—সৃষ্টিতে মনের সম্পর্ক নিবিড়তর, মন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। এই মনের ব্যাপক অথবা সমগ্র দৃষ্টি আপেক্ষিক বা ঐকদেশিক ভগ্নাংশ দৃষ্টিসমষ্টির সমন্বয়ে লাভ করা যায় না। সেই সৃষ্টির উদ্ভব হয় এই বোধে যে, জগতটা আমার—আমার জ্ঞানের, আমার হৃদয়াবেগের, আমার আনন্দ বা

সৌন্দর্য্যরসানুভূতির যোগেই সৃষ্ট—ওটা রেডিয়ো চাঞ্চল্য মাত্র নয়। "ঈথর" (ether) পদার্থের কম্পন মাত্রেই আলোকের সৃষ্টি হয় না, আলোকের উদ্ভব আলোকের অনুভবে। "অনুগ্রহ" বা পশ্চাদ্‌-গ্রহণ যেরূপ পৌরুষেয় বোধের কারণ,—"অনুনয়" সেরূপ সৌন্দর্য্য-বোধের প্রাণ। যখনই কোনও সুন্দর বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার অন্তস্তল হইতে যেন এই আবেদন শুনিতে পাই—"তোমাদেরই মন পাইবার জন্য এই বিশ্বের প্রাঙ্গণে আমরা উন্মুখ হইয়া আছি। আমাদের দিকে কি একবার তাকাইয়া দেখিবে না? তাকাইয়া দেখিতেই হয়, কারণ কোথায় যেন নিবিড় নাড়ীর যোগ অনুভব করি, কি যেন পরিচিত আলোকের আভা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। এ ক্ষেত্রেও দেখি, পূর্ব্ববঙ্গের এক অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা করিয়া সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।"

এই আপনার রূপ, এই "স্ব"-রূপকে কেন্দ্র করিয়াই ত আমাদের সব ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বন্ধন ও মুক্তি। মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবই এই যে, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের তুলনায় সে এক অসমাপিকা সৃষ্টি। মানুষ তার সমস্ত বেদনা ও কামনা, আকূতি ও আপ্তির মাধ্যমে নিরন্তর আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই জন্যই প্রত্যেক মানুষ এক একটি "ব্যক্তি" অর্থাৎ এক অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত শক্তির সহিত ব্যক্ত রূপের একটি যোজক সেতু মাত্র। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সে জন্য বলা হয়—"selfhood is a process", "ব্যক্তিত্ব একটি নিরবচ্ছিন্ন পরিণাম-পদ্ধতি।" ঔপনিষদ দর্শনে ইহাকে "অতিসৃষ্টি" বলা হইয়াছে এবং ইহার সৃষ্ট্যূর্দ্ধ সত্তা যে অথর্ব্ববেদোক্ত "উচ্ছিষ্ট" দ্বারা প্রভাবিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। "ব্যক্তি" শব্দটির মৌলিক অর্থ প্রকাশ অর্থাৎ আমার প্রতি মুহূর্ত্তের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহারে আমি আপনাকেই প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এই প্রকাশকে আমি অতিক্রম করিয়াও আছি। "আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য, আমার ব্যক্ত—আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।" এরই জন্য আমার এই "আমিত্ব" বা "ব্যক্তিত্ব" অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয়।

তথাপি এই "স্ব" বা "ব্যক্তি"কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল শিক্ষা ও দীক্ষা, প্রেরণা ও প্রয়াস। একে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে লাভ করা যায় না, অথচ মনে করি যে, আমাদের এত কাছে-কাছে যে রয়েছে অনুক্ষণ, সে ত চোখে-চোখেই আছে। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় পঞ্চ নলের মধ্যে চির-আকাঙ্ক্ষিত মানুষ নলকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে নির্ব্বাচন-অসমর্থা দময়ন্তীর বিহ্বলতার মধ্যে, রূপকের ভূমিকায় এই সত্যেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রতীচীর কবিও সেই গহন-গোপন, প্রেমিকসুলভ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে এই নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন—

"Room after room
I hunt the house through
We inhabit together,
Heart, fear nothing, for, heart,
thou shalt find her,
Next time, herself !......
Yet the day wears,
And door suceeeds door,
I try the fresh fortune—
Range the wide house from the
wing to the centre,
Still the same chance ! She goes
out as I enter"...

—(Browning : "Love in a life")

"নাই, তুমি নাই।
এ-ঘর ও-ঘর শুধু আতি-পাতি খুঁজিয়া বেড়াই।
এই গৃহে আছ তুমি জানে এ হৃদয়,
তাই তার অটুট প্রত্যয়
—পাবে তব দেখা !...
বেলা যায় বৃথা অন্বেষণে,
দ্বার হতে দ্বারান্তরে ফিরি শুধু চঞ্চল চরণে।
সুবিপুল এই গৃহে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াই,
হই ব্যর্থ, তবু ভাবি এইবার যদি দেখা পাই।
যেমনি ঢুকিনু কোনো ঘরে,
মনে হল অমনি সে পালাল সত্বরে।
ধীরে ধীরে গোধূলি ঘনায়,
কত ঘর আছে বাকী! শূন্য মনে ফিরি পায় পায়।"

—(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র "ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা"—"অন্বেষণ")

চাক্ষুষ-দৃষ্টিতে যদি এই একান্ত-প্রার্থিত ব্যক্তিকে না পাই, তবে কি প্রত্যয়, ভাব-ব্যঞ্জনা, বা সংকল্পের মধ্যে পাই? তাও ত নয়। এই জন্যই ত শিশুর মা বুঝিতে পারেন না, কি যাদুমন্ত্রে সর্ব্বসাধারণী "খোকা" তাঁর অনন্য-সাধারণ খোকাতে বিকশিত হয়ে উঠে—

"নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।"

ব্যক্তিত্বের এই চিরন্তন রহস্য উপলব্ধি করলেন দুঃখদাহের মধ্যে বিপ্রলব্ধা রাণী সুদর্শনা তাঁর অশ্রুসজল স্বীকৃতিতে—

"তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও তুমি অনুপম"। এই নির্ব্বাচনত্বের নিরন্তন প্রয়াসের মধ্যে এই যে অনির্ব্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি, ইহাই সৃষ্টির নিগূঢ়তম রহস্য, একাধারে ইহার তথ্য ও তত্ত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সুন্দর ভাষায় বলিতে হয়—"আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করচি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টি ভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলা-ভবন, আমার প্রেমের মিলন-তীর্থ।"
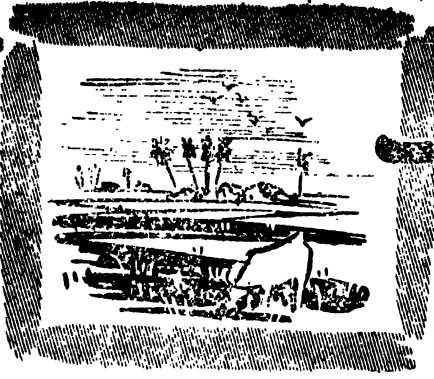
'আসানসোল হিতৈষী' বলিতেছেন :—"স্বাধীন ভারতে সাহেবেরা দেশ ছাড়িয়া গেল। কিন্তু লজ্জার কথা, সাহেবীয়ানা দেশ ছাড়িল না। সেদিন কার্য্যোপলক্ষে আসানসোল আদালতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইংরাজী আমলের মত সেই কোট, প্যান্ট, হ্যাট প্রভৃতি ইংরাজী পোষাক-পরিহিত হাকিম এবং উকিল। সেই "বিলাতি ধরণে হাসি, বিলাতি ধরণে কাশি এবং পা ফাঁক্ করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি"। এখনও সেই ইংরাজী আদব-কায়দা আয়ত্ত করিবার উৎকট প্রয়াস। কেবল তাহাই নহে, যিনি যত বেশী নিখুঁত ভাবে বিজাতীয় পোষাক পরিতে পারিয়াছেন, তিনি তত বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন এবং তাঁহার এই এই সাহেবী পোষাকের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে সম্ভ্রম করুক, ইহাই যেন আশা করিতেছেন এবং জাতীয় পোষাক-পরিহিত জন-সাধারণের প্রতি যেন অনুকম্পা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। স্বাধীন ভারতে এই লজ্জাকর দৃশ্য আর কত দিন দেখিতে হইবে? এই সকল দাঁড়কাকদিগকে কে বুঝাইবে—এই ধার-করা ময়ূরপুচ্ছের জৌলুস দেখাইবার দিন আর নাই। যাহাদের খুসী করিবার জন্য তাঁহারা দেশী পোষাক ছাড়িয়া এই দাসত্বের সাজ গায়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহারাই যে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে না হয় বুঝিতাম, ইংরাজ লাটকে খুসী করিবার জন্য দেশী কমিশনার, ইংরাজ কমিশনারকে খুসী করিবার জন্য দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুসী করিবার জন্য দেশী এস, ডি, ও বিলাতি পোষাক পরিতেন। কিন্তু আজ তো লাট সাহেবের দেশী পোষাক, গভর্ণর জেনারেলের ধুতি, পাঞ্জাবী, উত্তরীয়, আজ কাহার জন্য তাঁহাদের এই বিসদৃশ আচরণ?" সহযোগীর বক্তব্য আমরা অতি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি এবং দেশ ও সমাজ-নায়কদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

সহযোগী আরো বলিতেছেন :—"আজ স্বাধীন ভারতে যাঁহারা সরকারী দায়িত্বশীল এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং যাঁহারা সমাজে সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া বিবেচিত—যেমন উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি। তাঁহাদিগের এই দণ্ডেই, অন্ততঃ কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজী পোষাক ছাড়িয়া দেশী পোষাক গ্রহণ করা উচিত। জাতীয় সরকারের উচিত, অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দান; কেন না, বর্ত্তমানে ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আদালতে উকিলগণ কেন যে ইংরাজী পোষাক পরিবেন, তাহার কোন কারণই আমরা খুঁজিয়া পাই না এবং উহাকে জাতির আত্ম-সম্মানের হানিকর এবং নৈতিক বিকাশের ও জাতীয়তা পথের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। আজ যদি দেশের জনসাধারণ না দেখে যে, তাহাদেরই মত ধুতি পাঞ্জাবী বা পায়জামা পাঞ্জাবী-পরিহিত তাহাদেরই দেশের লোক দেশের সর্ব্ববিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাহেবদের অপেক্ষাও ভাল ভাবে করিয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ, সাহস এবং নৈতিক বলের স্ফুরণ হইবে কিসে? ইংরাজী পোষাকের ভূতের ভয় স্বাধীন ভারতে আজিও কি চালাইয়া যাইতে হইবে? সরকারী কর্ম্মচারীরা Public Servant বা জনসেবক। ইংরাজী পোষাক পরিয়া সার্কেল অফিসার পল্লীগ্রামে যাইলে কেহ তাঁহাকে জনসেবক মনে করিবে, না মনে করিবে, আমাদের উপর কতকগুলা হুকুম চালাইতে আসিয়াছে। সেই জন্য এই সকল ব্যবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং ইংরাজী পোষাক পরিহিত সরকারী কর্ম্মচারী-রূপ কুদৃশ্য হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সাহেবী পোষাকের বিরুদ্ধে বলিবার বহু কিছু থাকিলেও ইহার স্বপক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই? এমন কতকগুলি কাজ-কর্ম্ম বর্ত্তমান জগতে আছে যাহা ধুতী-চাদর পরিয়া করা সহজ নহে—উচিতও নয়। কাজেই সামাজিক ভাবে বিদেশী পোষাক বর্জ্জন সমর্থন করিলেও ইহা কোন কোন বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করিতে হইবেই।

* * * *

'বর্দ্ধমান' বলেন :—"জমিদারগণ কর্ত্তৃক বেগার ও বাজে আদায় বহু দিন হইতে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদে জমিদার ও জোতদারগণের নিকট দেশ ও রাষ্ট্রের কোন আইনই বড় কথা নয়। নিজ নিজ এলাকায় তাহারাই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। দরিদ্র শ্রমিকগণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহারা আজও নিরঙ্কুশ ভাবে এই বে-আইনী কার্য্য চালাইতেছেন। সরকারী কর্ম্মচারিগণ স্বার্থের লোভে ইহাদের চটাইতে রাজী নহেন। অতঃপর যাহাতে এই বে-আইনী কার্য বন্ধ হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার জন্য আমরা জেলা-শাসককে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং জমিদার-দিগকেও সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।" ইহার প্রতিকার বোধ হয় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নহে। জনগণ এ-অত্যাচারের প্রতিবাদ অতি সহজে এবং এক দিনেই করিতে পারেন। কেমন করিয়া, তাহা বোধ হয় খুলিয়া বলিবার দরকার নাই।

* * * *

ঢাকার 'জিন্দেগী' পত্রিকায় প্রকাশ :—"ইদানিং বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী অফিস ও ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, উজিরে আজমের বাণী দেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা এখনও বিদ্যমান। উৎকোচের উৎখাত এখনও হয় নাই। ডিপুটি সার্জ্জেন জেনারেলের নারায়ণগঞ্জস্থ ষ্টোরের যে সমস্ত সংবাদ ও দলিলপত্র আমরা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সরকার আশু ইহার প্রতি মনোযোগ না দিলে অবস্থা আরো খারাপ হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে উক্ত অফিস হইতে কড়া আর্ম্‌ গার্ডের প্রহরার মধ্য হইতে গবর্ণমেন্টের বহু টাকার কাপড় রহস্যজনক ভাবে চুরি হয়। যদিও অধিকাংশ চোরাইমাল উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু সুদক্ষ কূট-কৌশলী চোর চোখের সামনে ঘুরিয়াও ধরা পড়িতেছে না। প্রহরারত পুলিশদিগকে ঘটনার পর কৌশলে অপসারণ করিয়া তৎস্থলে নতুন পুলিশ আমদানী করার ফলে তাহাদের নিকট হইতে চুরির কোন হদিসই পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অধিকন্তু কতিপয় নিরপরাধ যোগ্যতাসম্পন্ন সিনিয়ার অফিসারকে অন্যায় ভাবে বদলী, বরখাস্ত ও নিম্নস্থ পদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মজার কথা, রাতারাতি নিম্নপদস্থ এসিষ্টেন্টদিগকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। জনৈক গ্রাজুয়েট সিনিয়ার এসিষ্ট্যান্টকে ছুটিতে কিছু দিন অনুপস্থিত রাখিয়া নানা ছুতানাতায় তাহাকে আর কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই; পরন্তু তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছে। উক্ত ভদ্রসন্তানটি অভাবের তাড়নায় প্রকৃতই পাগল হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী?" এ-দিকেও যা' ও-দিকেও তা। অর্থাৎ কি না দ্রব্যবিশেষের এ-পিঠ ও-পিঠ! তাই নয় কি?

* * * *

'নীহার'-এ প্রকাশ সংবাদ :—"রাজ্য-পরিচালন, দেশ ও জাতি গঠন এবং সমাজ ও জনমত সুনিয়ন্ত্রণাদি দুরূহ কর্ত্তব্য-সাধনে সংবাদ-পত্রের শক্তি অসাধারণ বলিয়া স্বাধীন দেশে সংবাদপত্রের মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে সংরক্ষিত হয়। এই সংবাদপত্রসেবিগণের সঙ্ঘবদ্ধতা আবার উহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন বিরাট কাজই সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কলিকাতার সাপ্তাহিক সহযোগী 'বিশ্ববার্ত্তা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেদিন ডায়মণ্ড হারবারে উপনীত হইয়া মফঃস্বলের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলিকে লইয়া একটি শক্তিশালী সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ নামে সমিতি স্থাপনের বিষয় উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া সহযোগী 'ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী' ঐ প্রস্তাবের সমীচীনতা উল্লেখ করিয়া ইহার সাফল্য উপভোগের কামনা করিয়াছেন। আজকাল লব্ধ-স্বাধীনতার উৎকট অধৈর্য্যে চারি দিকেই যেরূপ নানা বিভেদ ও বিক্ষোভ বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ দেশ ও জন-কল্যাণকর প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যে সুরেন্দ্র বাবুর যেরূপ দূরদর্শিতা ও নৈপুণ্য রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত সুফল ফলিবে, যদি মফঃস্বলস্থ সংবাদপত্রসেবিগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হন। আমরা এই কার্য্যে মফঃস্বল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালক-মণ্ডলীর সহযোগিতা কামনা করিতেছি।" আমরাও করিতেছি। আশা করি, এই মফঃস্বল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সঙ্ঘ নির্ভীক ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন। পত্র জোতজোর করিয়া কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে ভয় পাইবেন না।

* * *

'বৃষ্টি'র খবর :—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সরকারী দপ্তরখানায় সাংবাদিকদের সম্মুখে বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে ফসল বণ্টন সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি ঘোষণা করেন। ডাঃ রায় বলেন যে, বীজধান্য বাদে জমীর মোট উৎপন্ন ফসল তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ জমির মালিক, এক ভাগ বর্গাদার ও অবশিষ্ট এক ভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই ভাগ চাষের বলদ ও লাঙ্গল সরবরাহকারী এবং বাকী এক ভাগ জমির সার ও যান-বাহন প্রভৃতির ব্যয়বহনকারী পাইবেন। ফসল বণ্টনের এই নীতি বর্ত্তমান ফসলের মরশুম্ হইতেই প্রযোজ্য হইবে এবং ফসল বণ্টনে কোথাও কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে বিভিন্ন কালেক্টার-গণ উপরোক্ত নীতি অনুসারেই বিরোধের মীমাংসা করিবেন বলিয়া গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" শেষ পর্য্যন্ত সেই তে-ভাগা! কিছু দিন পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা হইলে নানা হাঙ্গামা বাঁচিত, অনেকগুলি প্রাণও রক্ষা পাইত। নীতি ঘোষণা অবশ্য ভালই হইল, কিন্তু ইহার বাস্তব প্রয়োগ কি ভাবে হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম। সরকার একটা কথা মনে রাখিলে ভাল করিবেন, নীতি প্রয়োগ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে।

* * *

ভাগচাষীদের সম্বন্ধে 'ত্রিস্রোতা বলিতেছেন :—"জেলার সর্ব্বত্র ধান কাটা সুরু হইয়াছে। নূতন ধান জোতদারের গোলায় উঠিতেছে। যাহারা ধান্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ভাগচাষী অর্থাৎ আধিয়ার। আধিয়ার হইতেছে উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধাংশের মালিক। এই উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধাংশও পায় না বলিয়া আধিয়ারদের দুঃখের অন্ত নাই এবং উদয়াস্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রে ধান্য উৎপন্ন করিয়াও বৎসরের নিতান্ত পক্ষে ছয় সাত মাস তাহাদের অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয়, না হয় নিজ নিজ জোতদারের নিকট হইতে কর্জ্জা ধান্য লইয়া সংসার চালাইতে হয়। নূতন ধান্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সুদ সহ জোতদার কর্জ্জা ধান্য আদায় করিয়া লয়। এই কর্জ্জা ধান্যের জের আধিয়ার তাহার আধিয়ারী জীবনে পরিশোধ করিয়া যাইতে পারে না। শুধু কেবল কর্জ্জা ধান্য ও তাহার সুদ আদায়ই শেষ নয়, ইহার উপর আরও কয়েক প্রকার আদায় আছে। প্রকৃত চাষী যাহারা, তাহাদের উৎপন্ন ধান্যে অর্দ্ধভাগ এবং যাহারা জমির মালিক তাহাদের অর্দ্ধভাগ। আইনে এই সকল আধিয়ারদের জমিতে কোন স্বত্ব দেওয়া হয় নাই। তাহারা মজুরদার মাত্র অর্থাৎ ফসলের অর্দ্ধ-ভাগের জন্য জোতদারের মুজুরী খাটে মাত্র। এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অভাবে জর্জ্জরিত, নিরন্ন ভাগচাষীদের দিয়া আবাদ চলিতেছে, আর আমরা বলিতেছি—জমিতে অধিক ফসল ফলাও। কাহার জমিতে কে অধিক ফসল ফলাইবে? জোতদার হাল চাষের বলদ দিলে তাহার জন্যও আধিয়ারদের অর্দ্ধভাগ হইতে ধান্য কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। জোতদারের এই সকল দাবী-দাওয়া মিটাইয়া ধান্য

উৎপন্ন করিয়াও ধান্য কাটা-মারার পর যে ভাগচাষীদের প্রায় শূন্য-হস্তে ঘরে আসিয়া বসিতে হয়, তাহাদের নিকট গিয়া অধিক শস্য উৎপন্ন কর—এ কথা বলা প্রায় পরিহাসেরই সামিল !"

* * * *

'ত্রিস্রোতা' আরো বলেন :—"ধান্য কাটা-মাড়ার পর প্রবল জোতদার ও দুর্গত আধিয়ারদের মধ্যে ধান্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। আধিয়ার নিজ গৃহে কিছু ধান্য লইয়া যাক, ইহা অনেক জোতদার চায় না। অনেক জোতদার তখন তাহার কর্জ্জা ধান্য, ঐ ধান্যের সুদ, হাল ও বলদ বাবদ পাওনা, ইত্যাদি বহু পাওনা সম্বলিত দীর্ঘ তালিকা অথবা হিসাব দিয়া আধিয়ারদের অর্দ্ধভাগ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করে। এই সকল বিরোধকে ভিত্তি করিয়া বিক্ষুব্ধ আধিয়ারদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এ জেলায় কোন কোন অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে তে-ভাগা আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। তাহাতে গুলীও চলিয়াছিল। এই অশান্তির আগুন যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আধিয়ারদের দাবী-দাওয়া মিটিতে পারে, তাহার জন্য গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগের নির্দ্দেশক্রমে জেলায় ভাগচাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তখন এরূপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল ও আধিয়ারগণও শুনিয়াছিল যে, শীঘ্রই এরূপ আইন হইতেছে, যাহাতে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হইবে।" 'ত্রিস্রোতার' কথা অবহেলার নহে। সহরবাসীরা সহরে বসিয়া এ-সব বিষয় হয়ত যথার্থ বুঝিবেন না। চাষী এবং ভাগচাষীদের সমস্যার উপর দেশের এবং জনগণের ভালমন্দ বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এ সমস্যা সমাধানে কেবল নীতি ঘোষণা করিয়াই সরকার কর্ত্তব্য সমাপন করিতে পারিবেন না, নীতির মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষা পায়, সে-বিষয়েও তাঁহাদের সজাগ থাকিতে হইবে।

* * * *

'দৃষ্টি' মন্তব্য করিতেছেন :—"বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী হইতেছে, তবুও সঙ্কট অবস্থার অবসান হইতেছে না। শুধু খাদ্যেই নয়, পরিধান বস্ত্র সমস্যাও তদ্রূপ। লক্ষ্য করিয়া দেখা যাইতেছে, যে দ্রব্যই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই বাজারে আত্মগোপন করে। বিনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের মূল্য বেশী হইলেও প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যায়। এইখানেই সরকারকে বিশেষ ভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এর কারণ সন্ধানে সবিশেষ তৎপর হইতে হইবে। এই বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যে কোনরূপ ঔদাসীন্য বা অসাধুতা প্রকাশ পাইলে তাহাদের এইরূপ সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তির জন্য কঠোর দণ্ড দিতে হইবে। চোরাকারবারী এবং তাহাদের সমর্থকদেরও অনুরূপ ভাবে দণ্ডণীয় করিতে হইবে। সমাজের এই সকল দুর্নীতিপরায়ণদের দমন করিবার জন্য সরকারকে শুধু জনগণের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেকেই অধিকতর সক্রিয় হইতে হইবে। তবেই এইরূপ দুর্নীতি দূর হওয়া সম্ভব। জনগণ দুর্নীতি দমনে প্রয়াসী হইলেও বহু ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের দরুণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। সরকার যদি দেশের দুর্নীতি দমনকল্পে অধিক তৎপরতার সহিত সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন, তবে দেশের জনসাধারণও সরকারকে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবে, এবং সরকারও জনগণের ধন্যবাদার্হ হইবেন। অপর পক্ষে সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বরাদ্দ-প্রথার প্রবর্ত্তনে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। প্রদেশের রাজধানী এবং সহর অঞ্চলগুলিতেই নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দ ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, মফঃস্বল অঞ্চলেও করিতে হইবে। এই সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাও সরকার এবং সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। অর্থাৎ পল্লী ও সহর অঞ্চলে কৃষি এবং শিল্প উৎপাদন-শক্তি যত দূর সম্ভব সরকার এবং সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, এবং উৎপাদিত দ্রব্যও সরকারের ও সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে বন্টন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে বন্টনেরও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার নিমিত্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া অত্যধিক আয়ের পথ বন্ধ করিতে হইবে। দ্রব্য-মূল্য যাহাতে না বাড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সাধারণের প্রয়োজনার্থে বাজারে দ্রব্য আমদানীর উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্রব্য-মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রমিকদের আয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তবেই এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সার্থক হইতে পারে।" সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দৃষ্টি উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই, যদিও জানি, তিনি ঐ সব সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ এবং সমাধানেও তৎপর রহিয়াছেন। তাহা হইলেও গরীবদের কথার মধ্যে হয়ত বা কিছু সারবস্তুর সন্ধান পাইতে পারেন।

* * * *

'জিন্দেগী' সংবাদ দিতেছেন :—"সম্প্রতি হবিগঞ্জ সহরে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বাজারের একটি মাঠে প্রায় ২০০ লোক কতক দিন যাবৎ সামরিক কুচকাওয়াজ শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ২।৩ দিন পূর্ব্বে এক দিন তাঁহারা মাঠে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন লোকের পায়ে ভাঙ্গা বোতলের টুকরা ও আরও নানা জাতীয় কাঁটা গাঁথিয়া যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে সমস্ত মাঠেই ঘাসের নীচে ঐরূপ অসংখ্য কাঁটা ও বোতলের টুকরা পুতিয়া রাখা হইয়াছে। পরদিন রাত্রে স্থানীয় কয়েক জন লোক কয়েকটি হিন্দু যুবককে ঐ কাজ করিতে দেখিয়া হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলেন ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহারা বয়স্ক লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ঐ কাজ করিয়াছে এবং এই কাজটি না কি বড় রকমের একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা মাত্র। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের নিকট এ যাবৎ যে উদারতা ও সদ্ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন ইহা কি ঐ সমস্তেরই প্রতিদান ?" সত্য কথা। প্রতিদান হিসাবে ইহা সত্যই অতি কম ! তবে সংবাদটি আমরা 'গাঁজা' হিসাবেই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু নেশা হইল না। মজার কথা এই যে, অন্য কোনো পত্রিকায় এই বহুমূল্য সংবাদ প্রকাশ হয় নাই। কেন ? 'জিন্দেগী' special !
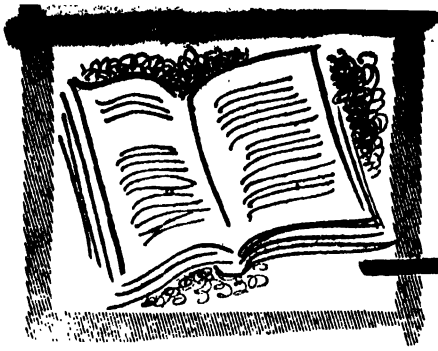
বাংলা কাব্যের ধারা

ফেরারী ফৌজ : প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রকাশক সিগ্‌নেট প্রেস, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগের আধুনিক কবিদের মধ্যে দু'জন কবির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। যতীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিস্বাতন্ত্র্য ও কাব্যবৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলার কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আজও তাঁরা জলাঞ্জলি দেননি, যদিও দু'জনেরই সাম্প্রতিক কাব্যপরিণতি দেখে আশান্বিত হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। দু'জন কবিই সমাজের এমন এক শ্রেণীর মানুষ যে-শ্রেণীর নিজস্ব কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলছি। সমাজের উপর-তলা ও নীচের তলার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী "সেতুবন্ধন" ছাড়া আর কিছুই না। যে পরিবেশের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের জীবন কাটে, সেই পরিবেশেই তার বৃহত্তর জীবনাদর্শ তৈরী হয়। কৃষাণ ও মজুরের চোখে মানুষ ও সমাজের যে চেহারাটা যেমন ভাবে ধরা পড়ে, যে ধারণা যেমন ভাবে জন্মায়, নিশ্চয়ই কোন "আলালের ঘরের দুলালের" চোখে তেমন ভাবে পড়ে না, পড়তে পারে না। মধ্যবিত্তের যে সামাজিক পরিবেশ সেটা হল আত্মচিন্তা ও আত্মতৃপ্তির অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ, জীবনটা বসরাই গোলাপ না হলেও ফণিমনসার কাঁটা নয়। "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন" দেখার যে লোকপ্রবাদ, তার উৎপত্তি মধ্যবিত্ত জীবনের বদ্ধ ডোবা থেকেই হয়েছে। কবজা-ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের সৌন্দর্য্য মধ্যবিত্ত-চিত্ত যেমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত, আর কেউ সে-রকম অভ্যস্ত নয়। "চিত্ত" নামক বস্তুটা "বিত্তের" সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে চিত্তের যত কিছু বুদ্‌বুদ্‌ সবই ঐ বিত্তের উস্‌কানিতে। সুযোগ-সুবিধার সুখ-স্বপ্নে বিভোর মধ্যবিত্তের কাছে জীবনটা তাই একটা "লটারী" ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেই জন্যই দেখা যায়, সমাজে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বাড়তে লটারী নামক জুয়াখেলার প্রচলনও খুব বেশী হয়েছে। মধ্যবিত্ত ভাবুক, কবি, দার্শনিক, সকলেরই জীবনদর্শন তাই "অজ্ঞেয়তাবাদ" "অনিশ্চয়তাবাদ" থেকে কঠিন "নৈরাশ্যবাদ" অথবা অসহায় "অদৃষ্টবাদের" পাকচক্রে ঘুরপাক খায়। হাক্সলি-অডেন-ইশারউড-কোয়েষ্টলার-এলিয়ট-প্রাট্-মানবেন্দ্রের মতন অনেকে আবার ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যের ফলে "অধ্যাত্মবাদের" মধ্যে আত্মসমাধিস্থ হয়ে যান। এক কথায় বলা চলে, মধ্যবিত্তের চোখে (বিশেষ করে যাঁরা মোটামুটি আরামে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আছেন) জীবনটা ক্লাস্-ঘোড়দৌড়-লটারীর মত একটা জুয়াখেলা বিশেষ, লাগে তাক্ না-লাগে তুক্, অর্থাৎ মারি তো বাজি একেবারে উজীর, আর না-মারি তো বিল্‌কুল ফকির। সংগ্রাম ও সংঘাতের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে গলি-ঘুপচির "শর্ট কাট্" মেরে চলার জন্যেই যাঁরা আজীবন ব্যস্ত, তাঁদের জীবন-দর্শন বলিষ্ঠ ও সহজবোধ্য হবে কেন? জুয়াখেলার হার-জিতের মধ্যেই যাঁদের জীবনের চরম সার্থকতা ও ব্যর্থতা, তাঁদের অনিশ্চয়তা-বাদ-নৈরাশ্যবাদ-অধ্যাত্মবাদের চক্রে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

যতীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জনেই অত্যন্ত সমাজ-সচেতন কবি এবং যতীন্দ্রনাথ খানিকটা পড়লেও, প্রেমেন্দ্র মিত্র আজও নৈরাশ্যবাদ-অধ্যাত্মবাদের পাকচক্রে পড়েননি। অবশ্য সমাজ-সচেতন সকলেই, এমন কি যে-সব কবি ও শিল্পী সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলে বৈষ্ণবী ন্যাকামি করেন তাঁরাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী সমাজ-সচেতন। সমাজের বুক থেকে লেজটা গুটিয়ে যাঁরা যত বেশী নিজের বুকের মধ্যে সেটা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন তাঁরাই যে সব চেয়ে বেশী বাইরের মোচড় সম্বন্ধে সজাগ, সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না যাই হোক্, সেই অর্থে যতীন্দ্রনাথ বা প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজ-সচেতন নন। তাঁদের সমাজ-চেতনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। গতিশীল বাস্তব সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে দু'জনেই সচেতন, দৃষ্টিও দু'জনের তাই শ্রেণী-সীমানা ছাড়িয়ে অনেকটা দূর প্রসারিত। তবু শ্রেণী-কৌলীন্য সম্বন্ধেও দু'জনেই অত্যন্ত সজাগ। তাই বাংলার এই দুই আধুনিক কবির কাব্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সুর অত্যন্ত প্রবল। এবং ঠিক সেই জন্যই আজও এঁরা বেঁচে আছেন কবি হিসাবে।

বর্ত্তমান যুগে কবির মানসিক দ্বন্দ্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। দ্বন্দ্ব ও বিরোধই যে-সমাজের সব চেয়ে বড় সত্য, সেই সমাজে দ্বন্দ্বহীন কাব্য-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি কি করে সম্ভব? তা'ছাড়া জীবনের (Life) মূল কথাই হল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, প্রগতিরও (Progress) তাই। সুতরাং সমাজ-সচেতন কবির কাব্যে দ্বন্দ্ব থাকবে না, সংঘাত থাকবে না, এমন ব্যাপার হতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলতঃ রোমাণ্টিক কবি, যতীন্দ্রনাথ কড়া রিয়ালিষ্ট—দু'জনের কাব্যের 'ইমেজ' দেখলেই বোঝা যায়। তার চেয়েও বড় কথা হল, দু'জনেই জীবনকে অত্যন্ত ভালবাসেন, জীবনের একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু এই সমাজে জীবনকে ভালবাসার পথে অন্তরায় আছে, প্রাণের পূজার আয়োজনে বিঘ্ন আছে, তাই দু'জনের চিত্তই সংশয়াকুল। প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমাণ্টিক, তাই তাঁর সংশয় স্বপ্নাচ্ছন্ন কুয়াশার মতন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বটাও

আশা-নিরাশার দোলায় প্রবল ভাবে দুলতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ রিয়ালিষ্ট, তাই তাঁর "সংশয়" নৈরাশ্যের গ্র্যানিট্ মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হতে চায়, তাঁর দ্বন্দ্বও অত্যন্ত তীব্র, বিষ-জর্জ্জরিত বলে মনে হয়। নির্ম্মম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষের দিকে তাই যতীন্দ্র-কাব্যের ঝোঁক বেশী, আর কুয়াশাচ্ছন্ন কথার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত হওয়ার দিকেই প্রেমেন্দ্র কাব্যের গতি। যতীন্দ্রনাথ বাংলার স্যাঁতসেঁতে কালবোশেখী, বাংলার একঘেয়ে শ্যামল প্রান্তর তাই ভালবাসতে পারেননি, তিনি ভালবেসেছেন মরু-জীবনের বিশালতা ও উগ্রতাকে; শ্রাবণ-সন্ধ্যায় পসারিণীকে দেখে নয়, শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ রুটি ভাবওয়ালাকে দেখে তাঁর মন কেঁদেছে; বেদে-বেদেনীর প্রাণোচ্ছ্বাসকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, কারণ "ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ তো ওড়ে না"—"লোহার ব্যথা" ইঞ্জিনিয়ার-কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছেন। আর "জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল, সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল"—যে-কবির বাণী সেই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও নৈরাশ্যবাদী বলি কি করে? প্রেমেন্দ্র মিত্রও ভালবেসেছেন তাঁদের "অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম" এবং "দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে" যারা উদ্দাম, "দুয়েরি বল্গা নাই" তাদেরই তিনি চিনতে চান। তিনি কবি "কর্ম্মের ও ঘর্ম্মের", "বিলাস-বিবশ মর্ম্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই" তাঁর "সময় যে যায় নাই।" কিন্তু মরু-বন্যা ও বেদে-বেদেনীর জীবনছন্দের বিদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ আজ অধ্যাত্মবাদের হাড়িকাঠে আত্মহত্যা করার জন্যে উদ্গ্রীব, আর "প্রথমার" কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ "ফেরারী" হতে চান।

"প্রথমার" কবি "সম্রাট" থেকে "ফেরারী ফৌজ"

কে কবে এই পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছিল, আর সেই থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সূর্য্যের চারি দিকে এই পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে—"প্রথমার" এই করুণ সুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্ত্তী কাব্য "সম্রাট" এবং আলোচ্য "ফেরারী ফৌজের" মধ্যে অনেক শান্ত স্থির সংযত হয়েছে। কিন্তু "প্রথমার" মধ্যে জীবনের যে "প্রভাতী" সুরের ঝঙ্কার ছিল "সম্রাট" থেকে "ফেরারী ফৌজের" মধ্যে ক্রমেই তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই!
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
দুয়েরি বল্গা নাই!
* * *
বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী;
রক্তে আমার এমনি গতির নেশা;—(প্রথমা)

'প্রথমা'র এই উদ্দাম সুর "সম্রাটে" অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে, কারণ

বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
উদ্গারিছে বিষ-বাষ্প;
—আজ শুধু বাতাসে বারুদ।—(সম্রাট)

বাতাসে বারুদ, তাই মধ্যবিত্ত মনের সংশয় আরও গভীর হয়েছে, আরও দানা বেঁধেছে—

অকাতরে কত রক্ত বৃথা হ'ল পাত;
শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত
আজো কই দিল না'ত দেখা।
—দেবে কি কখনো?—(সম্রাট)

দেবে কি কখনো? এ-প্রশ্ন "প্রথমার" কবির মনে জাগেনি, জাগলেও তা উদ্দাম আশা ও রঙিন স্বপ্নের বন্যায় ভেসে গেছে, কিন্তু তার পর বাতাসে বারুদ দেখে কবি আর "জীবন-শিয়রের স্বপ্ন" দেখতে চান না, "সম্রাট" হতে চান—

শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট।
* * *
একচ্ছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেও না হটাতে;
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহ'লেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।—(সম্রাট)

বাইরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ক্রমেই যত উগ্র হয়েছে, আত্ম-নিরাপত্তার প্রশ্ন ক্রমেই যত বড় হয়ে উঠেছে, ততই যে "প্রথমার" কবির সুপ্ত রাজকীয় চেতনা উগ্র হয়ে উঠেছে, তা "ফেরারী ফৌজের" মধ্যেই বোঝা যায়। "ফেরারী ফৌজ" কাব্যের মূল রাগিণী হল তাই—

গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা,—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্ত্তি শুধু।—(ফেরারী ফৌজ)

কবি বলছেন—

মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্ম্মর,
বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্ম্মল।—(ফেরারী ফৌজ)

"প্রথমার" কবি, কামারের ছুতোরের কাঁসারীর আর মুটে-মজুরের কবি শেষ পর্য্যন্ত খাঁ-খাঁ রোদে নিস্তব্ধ দুপুরে শুষ্ককণ্ঠ কাকের ডাক শুনছেন "ফেরারী ফৌজে" এবং তাঁর পরিণত কাব্যে দেখা যায়—

অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।
* * *
তার পর জীবনের কাটলে ফাটলে
কুয়াশা ছড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।
—(ফেরারী ফৌজ)

কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের আজও যে অপমৃত্যু হয়নি তার প্রমাণ "সম্রাটের" মধ্যেও যেমন "ফেরারী ফৌজের" মধ্যেও তেমনি রয়েছে। "সম্রাট" হয়েও সম্রাটের কবি স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি—

অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি !—(সম্রাট)

নিস্তব্ধ দুপুরে খাঁ-খাঁ রোদে কাকের ডাকের মধ্যেও কবি "ফেরারী ফৌজের" কথা ভেবেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন "কবে তারা গড়ে তুলবে সপ্তক বাহিনী"—

সূর্যের কণা চূর্ণ
তাই হেথা সেথা ছড়ানো।
আজো তারা সব ফেরারী
রাত যারা মুছে ফেলবে।

তবু গুঁড়ো গুঁড়ো সূর্য
মাঝে মাঝে ওঠে ঝলসি
কালে কালে দেশে বিদেশে
গুপ্তসেনার কৃপাণে।

জড় করে সব কণিকা
আগামী দিনের সূর্য
কবে তারা গড়ে তুলবে
সংশপ্তক বাহিনী।—(ফেরারী ফৌজ)

কল্পনার ঐশ্বর্য্যে, ইমেজের মাধুর্য্যে, কথার গভীর ব্যঞ্জনায় ও অব্যক্ত ইঙ্গিতময়তায়, অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যে ও কাব্যনিষ্ঠায় বাংলার আধুনিক কবিদের মধ্যে যিনি নিঃসংশয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ফেরারী ফৌজ" পড়ে তাঁকে বলতে ইচ্ছা হয়—

সপ্তসাগর কিনারে
আজো শিঙা বাজে অবিরাম,
ফেরারী ফৌজ সাড়া দাও
অজ্ঞাতবাস হলো শেষ।—(ফেরারী ফৌজ)

ছাড়পত্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য্য : প্রকাশক, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

শিল্পি-জীবনে ফেরারীর অজ্ঞাতবাস প্রয়োজন হয়নি যাদের তাদের মধ্যে বাংলার তরুণ বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য অন্যতম। বিপ্লবী রুশ কবি মায়াকভ্‌স্কির মতন সুকান্তও বলতে পারত :

40 Crores speak through these lips of mine.

আর সত্যিই মায়াকভ্‌স্কির মতনই বালক-কবি সুকান্ত বলেছে :

I don't want to be a wayside flower.
Plucked after work in an idle hour…
I want the pen to equal the gun…

বিপ্লবী বালক-কবি সুকান্তর অন্তরোৎসারিত বাণী তার সমস্ত কবিতার মধ্যে অনুরণিত হয়েছে—

And I, like the spring of humanity,
born in labour and the fighting line,
sing of my society,
this motherland of mine.—(Mayakovsky)

সুকান্তরই সহযোগী বাংলার অন্যতম বিপ্লবী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় "ছাড়পত্রের" কবিতাগুলি সংকলিত করেছেন এবং ভূমিকায় লিখেছেন—

"১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রের' রচনা-কাল। এক দিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্য দিকে জীবনপ্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয়-পরাজয় আর উত্থান পতনে, সুখ দুঃখ আর আশা-নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।"

যুগসন্ধিক্ষণের পাঁচটা বছর ধরে সুকান্ত যখন কবিতা লিখতে শুরু করল তখন আর কতই বা তার বয়স হবে? সুকান্ত তখন স্কুলে পড়ে, বয়স তার বছর পনের-ষোল। তবু "আঠারো বছর বয়স" বলে যে কবিতা তাতেই বালক সুকান্তর কবি-মন যে কি ধাতু দিয়ে গড়া তা বোঝা যায়—

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সের কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে। —(ছাড়পত্র)

সুকান্তর প্রথম দিকের কবিতা "প্রস্তুত," "দুরাশার মৃত্যু," "ফসলের ডাক," "কৃষকের গান," "এই নবান্নে" ইত্যাদির মধ্যে তার জীবন-দর্শন অত্যন্ত উগ্র মনে হতে পারে। কাব্য-রসিকরা কবিতার মধ্যে অতটা উগ্রতা, অতটা স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করবেন না। কিন্তু এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নিয়ে এবং কবিতায় বক্তব্য বা মতবাদ প্রকাশের তত্ত্বকথা নিয়ে বৃথা তর্ক করে লাভ নেই এখানে, বিশেষ করে সুকান্তর প্রসঙ্গে। কারণ সুকান্ত যে বয়সের কবি এবং যে সময়ের কবি, বিশেষ করে প্রথম দিকের কবিতাগুলি যে বয়সে লেখা, তখন কাব্যের প্রকাশভঙ্গীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় নয় এবং সেটা আয়ত্ত করাও প্রায় সাধনাতীত ব্যাপার বলা চলে। তবু মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুকান্তর শেষের দিকে লেখা "খবর," "চিল," "প্রার্থী" প্রভৃতি কবিতা যাঁরা পড়বেন তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন, এমন কি গজদন্ত-মিনারবাসীরাও। সুকান্তর "প্রার্থী" কবিতার তুলনা কোথায়—

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
এক দিন হয়ত আমরা প্রত্যেকে এক-একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হবো,
তার পর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়ত গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।
—(ছাড়পত্র)

বাস্তবিকই সুকান্ত নতুন যুগের সার্থক কবি। তার কাব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি অপূর্ণতা হয়ত আছে, থাকাই স্বাভাবিক। তবু বলতে হয়, বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও সুকান্তর মতন কবিত্ব শক্তি নিয়ে বাংলার ক'জন আধুনিক কবি জন্মেছেন? বিচারসাপেক্ষ-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরাও সমর্থন করি—

"সুকান্তর কবিতা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এ-কথা স্বীকার করবেন যে, সুকান্তর কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি। 'ছাড়পত্র' তাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।"

অনুবাদ-সাহিত্য

Anandamath: Translated by Sree Aurobindo. and Barindra kumar Ghose. Published by Basumati Sahitya Mandir. 166 Bowbazar Street, Calcutta. Price Rs 3 only.

পাশ্চাত্য ও বিদেশী সাহিত্যের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্যে যেমন প্রয়োজন, আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য-সম্পদ বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদ করাও ঠিক সেই কারণেই আরও বেশী প্রয়োজন। কাজটা অবশ্য বিদেশীদেরই করা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশেই যদি সুযোগ্য ব্যক্তি থাকেন তাহ'লে সে কাজ তাঁদের দিয়ে করানো আরও ভাল। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের জাতীয় সম্পদ "আনন্দমঠ" বলা চলে। "আনন্দমঠ" বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হওয়া তো নিশ্চয়ই উচিত, ইংরেজীতেও সর্বাগ্রে অনূদিত হওয়া দরকার। আর শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া, শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে, আর কোন যোগ্য ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" ইংরেজী অনুবাদ করার দায়িত্ব নিতে পারেন। "আনন্দমঠের" সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। শ্রীঅরবিন্দ ১৪ বছর বিলাতে থাকার পর এ দেশে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল মারা যান। তখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স ২২ বছর। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্কিম-প্রতিভার নানা দিক্ নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। ১৬ই জুলাই থেকে ২৭শে আগষ্ট, ১৮৯৪ পর্যন্ত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন:

"Youth to College Life" (july 16)
"The Bengal he lived in" (July 23)
"His official career" (July 30)
"His Versatility" (Aug-6)
"His Literary History" (Aug 13)
"What He did for Bengal" (Aug 20)
"Our hope in the future" (Aug 27)

প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ, আজ পর্যন্ত বোধ হয় বঙ্কিম প্রতিভার নানা দিক্ নিয়ে এত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আ: কেউ লেখেননি। এর মধ্যে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমে ঔপন্যাসিক প্রতিভার সঙ্গে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর তুলনা করেন, এবং স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যাঁরা কথায় কথায় তুলনা করে তাঁদের তিনি বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন—

..."he bears a striking resemblance to the fathe of English fiction; Henry Fielding; ... Bankim, after a silly fashion now greatly in vogue, ha been pointed out by some as the Scott of Bengal......it conveys an insult,......Scott coul paint outlines but he could not fill them in Here Bankim excels, speech and action wit him are so closely interpenetrated and suffused with a deeper existence that his characters giv us the sense of being real men and women."

—(Indu Prakash, Aug 23, 1894)

১৯০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে "ভবানী মন্দির" লেখেন এ-বই হল বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ধর্মগ্রন্থ। "ভবানী মন্দির" যে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" দ্বারা প্রভাবান্বিত তা রৌলা কমিটির রিপোর্টে পর্যন্ত স্বীকার করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে "আনন্দমঠের" কি গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। আর বাস্তবিকই "আনন্দমঠ"ই তো বাংলার তথা সারা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের "ইশতেহার"। ১৯০১ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে 'কর্মযোগী' পত্রিকায় "আনন্দমঠের" ইংরেজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এই ভাবে প্রথম ভাগের পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি নিজে অনুবাদ করেন পরবর্তী অংশ তাঁর সহোদর বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অনূদিত।

তাই "আনন্দমঠের" এই ইংরেজী অনুবাদের শুধু সাহিত্যিক মূল্য নয়, ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর মূল্যবান ভূমিকায় তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের "আনন্দমঠ" নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মূল্য দাবী করতে পারে এবং সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দের এই ইংরেজী "আনন্দমঠ" শুধু অন্য ভাষাভাষীদের নয়, বাঙ্গালীদেরও অবশ্যপাঠ্য। বসুমতী সাহিত্য মন্দির এই মূল্যবান ঐতিহাসিক অনুবাদ প্রকাশ করে সত্যই দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের গতিপথে—

খৃষ্টীয় নববর্ষ ১৯৪৯ সালে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের গতিধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে, তাহা হয়ত অনুমান করা খুব সহজ নয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ১৯৪৮ সাল যখন আরম্ভ হয়, তখন আন্তর্জ্জাতিক আকাশের ঈশান কোণে তৃতীয় মহাসমরের ঘন মেঘাড়ম্বর জমিয়া উঠিতেছিল। এই যুদ্ধাশঙ্কার গভীর অন্ধকারের মধ্যেও সামান্য আশার আলোক যে একেবারেই দেখা যায় নাই, তাহাও নয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পাঁচ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪৮) বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ অনেকের কাছেই পরাধীন এশিয়ার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহার পরেই ১৭ই জানুয়ারী ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত ডাচ গবর্ণমেণ্টের রেনভাইল চুক্তি (Renvilla Agreement) সম্পাদিত হওয়ায় অবশেষে ইন্দোনেশীয় সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভের এক মাস পরে ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) সিংহলের বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসনশীল ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা লাভ অনেকের কাছেই স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া যে মনে হয় নাই তাহাও নয়। সিংহলের ডোমিনিয়ন-মর্য্যাদা লাভের পূর্ব্বেই ২১শে জানুয়ারী (১৯৪৮) মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। মালয় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, ইহা ব্যতীত মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আর কোনই সার্থকতা অবশ্য ছিল না। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে মালয় পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে, এই আশাও অনেকের মনে স্থান পাইয়াছিল। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে আশার যে আলোক দেখা যাইতেছিল, তাহা যে বিদ্যুৎচমকের মতই 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় আঁধার মাত্র পথিকে', তাহা বুঝিতে খুব বেশী সময় লাগে না। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানের ফলে ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। মালয়েও নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর হইতেই বিভিন্ন ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়া নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে মে মাসের শেষ ভাগেই উহা পরিণত হয় কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। চীনের গৃহযুদ্ধ পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। নূতন শাসনকেন্দ্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ১৯শে এপ্রিল (১৯৪৮) জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক চীনের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। কম্যুনিষ্টদের সহিত কোনরূপ আপোষ মীমাংসা করিতে তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হন। ফলে চীনের গৃহযুদ্ধ নূতন করিয়া প্রবল আকার ধারণ করে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' যে ভাবে ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহার সম্মুখে এই সকল ঘটনাবলী যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আকস্মিক ভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক আকাশে যুদ্ধাশঙ্কার মেঘসঞ্চার হইতে থাকে এবং উহা ঘনীভূত হইয়া উঠে রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) লণ্ডন সম্মেলনে জার্ম্মাণীর মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলত্রয়ে যৌথ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার মধ্যে। ইহার পরই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিবেশন হইতে বাহির হইয়া আসে এবং জার্ম্মাণীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয় হইতে সড়ক ও রেলপথে বার্লিন যাতায়াত এবং মাল প্রেরণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে। বার্লিন-সঙ্কটের প্রথম সূত্রপাত এইখানেই! এই প্রথম বার্লিন-সঙ্কটের মধ্যেই অনেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনি শুনিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রথম বার্লিন-সঙ্কট সাময়িক ভাবে ধামাচাপা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কটের বীজ বপন করিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু উহার পূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য আয়োজনের একটা কূটনৈতিক পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ১৭ই মার্চ্চ (১৯৪৮) ব্রুসেলস নগরীতে পশ্চিমী ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং সেই সময়েই মঃ স্পাক (Spaak) এবং তাঁহার সহযোগিবৃন্দ পশ্চিমী ইউনিয়নকে সম্প্রসারিত করিবার এবং এই ইউনিয়নকে রিও ডি জেনেরিও চুক্তির সহিত সংযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পশ্চিম গোলার্দ্ধের যৌথ রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য রিও ডি জেনেরিওতে আন্তঃ-আমেরিকা চুক্তিতে (pan American pact) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি রিও ডি জেনেরিও চুক্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। জুন মাসের (১৯৪৮) প্রথম ভাগে লণ্ডনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই ষড়রাষ্ট্রের সম্মেলনে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং জার্ম্মাণীর বৃটেন, মার্কিণ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে জুন জার্ম্মাণীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয়ে নূতন মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ২৩শে জুন হইতে বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে এবং রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে পরস্পরের মুদ্রাকে নিজ নিজ অঞ্চলে অচল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কট। বৃটেন ও আমেরিকা বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনে খাদ্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে এবং এখনও ঐ ভাবেই খাদ্য প্রেরণ করা হইতেছে। দ্বিতীয় বার্লিন-সঙ্কটের ফলে এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এবং অপর দিকে রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেকেই এই বার্লিন-সঙ্কট লইয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া

উঠিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এই আশঙ্কাও বাস্তব রূপ গ্রহণ করে নাই।

বার্লিন-সঙ্কটকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত করিতে হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়। কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কি বৃটেন কেহই তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করে নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এবং সংযত-ক্রোধ হইয়া পশ্চিমী শক্তিত্রয় বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের জন্য মস্কোতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মস্কোতে যে মতৈক্য হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক বার্লিন-সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর সমগ্র বার্লিনে সোভিয়েট মার্ক প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বিদায়ী সভাপতি মঃ ব্রামুগলিয়া যে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার তীব্র আপত্তি সত্বেও বার্লিনের পশ্চিম অঞ্চলে বার্লিন সিটি কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হওয়ায় বার্লিন-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আশা পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হওয়া ১৯৪৮ সালে ইউরোপের একটি প্রধান ঘটনা হইলেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মধ্য-প্রাচীর ঘটনাবলীর কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে মধ্য-প্রাচী নূতন আর একটি সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা লইয়া প্রবল সমস্যা দেখা দেয়। ১৫ই মে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসান হওয়ার তারিখ ধার্য্য হয়। আরব-ইহুদী সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এপ্রিল মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া ট্রাষ্টিশিপের এক প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং জাতিপুঞ্জ-সজ্ঞও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বিলম্ব করেন নাই। ১৪ই মে (১৯৪৮) ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে নূতন ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। এই নূতন শিশুরাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার পরই তিন দিক্‌ হইতে আরব বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাউণ্ট বার্ণাডোটকে সালিশ নিযুক্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় একটা সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হয়। কিন্তু আরবরা বার্ণাডোট পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। ইহুদীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার কোন মূল্যই ছিল না। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহুদী এলাকায় যাইবার সময় কাউণ্ট বার্ণাডোট আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলে ডাঃ বাঞ্চে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অক্টোবর মাসে খোলাখুলি ভাবেই যুদ্ধ-বিরতি ভঙ্গ করিয়া প্যালেষ্টাইনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে নিরাপত্তা পরিষদ আবার যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং ১১ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইনের জন্য একটি আপোষ কমিশন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ২৬শে ডিসেম্বর হইতে নেগেভ অঞ্চলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা নিজকে আরব-প্যালেষ্টাইনের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করায় আরব লীগের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র লইয়া মুসলিম ব্লক গঠনের একটা অভিপ্রায় পাকিস্তানের ছিল। সে সম্ভাবনা সফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। অধিকন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি মধ্য-প্রাচীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে। আরব রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া মিশর, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন বৃটেনের সহিত চুক্তি করিবার জন্য না কি বর্ত্তমানে খুব ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আরব রাজনৈতিক মহলগুলির দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতীত শিল্প-সম্পদবিহীন আরব জগতের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। আরবদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, মিশর এবং ইরাক এই দুইটি বৃহৎ আরব রাষ্ট্র সমস্ত মতভেদ ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৃটেনের সহিত যদি সন্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইত না। কারণ, তাহারা বৃটিশ সামরিক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ পাইত, বৃটিশের নিকট হইতে পাইত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্যালেষ্টাইন-সমস্যাই না কি আরব রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেনের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সন্ধির সর্ত্তগুলি কি হইবে, তাহা লইয়া এখন আলোচনা করা সম্ভব নহে। তবে দেশরক্ষার জন্য পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে যে চুক্তি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই আরব দেশগুলিকে বৃটিশ সৈন্যের জন্য ঘাঁটি প্রদান করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আরবরা পাইবে বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক মিশনের সাহায্য। সুদান সম্পর্কে মিশরকে বৃটিশের সর্ত্ত না মানিয়া লইলে চলিবে না। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের ইজরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে ইঙ্গ-আরব চুক্তি যে খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ হইবে তাহা অনস্বীকার্য্য। ইজরাইল রাষ্ট্র টিকিয়া গিয়াছে এবং টিকিয়া থাকিবেই। কিন্তু বৃটিশ সামরিক সাহায্যে শক্তিশালী এবং শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইজরাইল রাষ্ট্রের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, অপর দিকে রাশিয়া, এই উভয় পক্ষের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ঠাণ্ডা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কখন যে উহা সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হইবে, এই আশঙ্কা কেহই উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' মূল কোথায়, তাহাও কাহারও অজানা নাই। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন রাশিয়ার তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণের আশঙ্কা তুলিয়া উহা নিরোধের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। রাশিয়াও ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে নিজকে নিঃসঙ্গ ভাবিয়া ভীত না হইয়া পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল-পরিকল্পনা দিয়া রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ ঠেকাইবার আয়োজন করিয়াছে। কমিনফরমও তেমনি রাশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গকে সংহত করিবার প্রচেষ্টা মাত্র। মার্শাল-পরিকল্পনার প্রতিষেধকরূপেই কমিনফরমের সৃষ্টি। অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতে মার্শাল-পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দিক্‌ হইতে উহা যে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, পশ্চিমী ইউনিয়ন গঠন ও উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া প্রণয়নই তাহার প্রমাণ। মার্শাল-পরিকল্পনার

দেশগুলি প্রত্যেকেই আর্থিক উন্নয়নের পৃথক্ পৃথক্ পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের পরিকল্পনায় অন্যান্য দেশগুলি বিশেষ করিয়া ফ্রান্স সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিবাদ কতটুকু কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে রূঢ় সম্পর্কে যে নূতন ফরমুলা গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, পশ্চিমী ইউনিয়নের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্ট হইতে দেওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না। রূঢ় অঞ্চলে উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের ব্যাপারে ফ্রান্সকেও কথা বলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকার সৈন্যবাহিনী জার্মাণী হইতে চলিয়া গেলেও ফ্রান্সের এই অধিকার বজায় থাকিবে। রাজনৈতিক দিক্ হইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া গেলেও ফ্রান্সে এবং ইটালীতে কম্যুনিজমকে কতক পরিমাণে ঠেকান সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপে কম্যুনিজমের প্রসার ঠেকান সম্ভব হইলেও এশিয়ায় সম্ভব হয় নাই। চীনে কম্যুনিষ্টদের উত্তরোত্তর জয়লাভ তাহার প্রমাণ। এশিয়ার আর এক বিপদ—সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। ওলন্দাজদের অতর্কিত আক্রমণে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য-বিপর্যয় এশিয়ার পক্ষে কম্যুনিজম অপেক্ষা কম বিপদ সূচনা করিতেছে কি না, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১৯৪৮ সালের উল্লিখিত ঘটনাবলী ১৯৪৯ সালের অবস্থা সম্বন্ধে কি সূচনা করিতেছে? যদিও বার্লিন-সঙ্কটের সমাধান হয় নাই, যদিও গ্রীসে, প্যালেষ্টাইনে, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে এবং চীনে অশান্ত অবস্থা অব্যাহতই রহিয়াছে, যদিও চীনের নানকিন গবর্ণমেণ্টের পতন আসন্ন বলিয়াই মনে হয়, তথাপি ১৯৪৯ সালেই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাশিয়া পরমাণু বোমা আবিষ্কারের পূর্ব্বেই প্রতিষেধক যুদ্ধ আরম্ভ করার কথা অনেকে বলেন বটে; কিন্তু প্রতিষেধক যুদ্ধ আরম্ভ করার অর্থ সর্ব্বাগ্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই পরমাণু বোমার দ্বারা রাশিয়া আক্রমণ করিতে হইবে। ইহাতে বিশ্ববাসীর কাছে আমেরিকার নৈতিক মর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তা ছাড়া পরমাণু বোমা লইয়া রাশিয়া আক্রমণের সামরিক পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া আমেরিকাও বোধ হয় মনে করে না। পশ্চিমী ইউনিয়ন এখনও শিশু। সুতরাং রাশিয়াকে আক্রমণ করিলেই রাশিয়া অতি সহজেই সমগ্র ইউরোপ দখল করিয়া বসিবে। পরমাণু বোমাবাহী বিমান ধ্বংস করিবার জন্য রাশিয়া যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না, সে-কথাই বা বলা যায় কিরূপে? কাজেই পরমাণু বোমা থাকা সত্ত্বেও প্রথম আক্রমণের ঝুঁকি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লইবে না। প্রথম আক্রমণ রাশিয়া আরম্ভ করিবে, তাহাও কল্পনা করা যায় না। সশস্ত্র সংগ্রাম যত বিলম্বে আরম্ভ হইবে, রাশিয়া ততই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিতে পারিবে, হয়ত পরমাণু বোমা আবিষ্কার করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। হিরোসিমা ও নাগাসিকির ভীতিপ্রদ পরিণামের পরে রাশিয়ার হাতে পরমাণু বোমা যে আমেরিকাবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষের হাতে পরমাণু বোমা থাকিলে যুদ্ধে উহা না-ও ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং ১৯৪৯ সালে তৃতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাণী—

৩রা জানুয়ারী (১৯৪৯) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একাশীতিতম কংগ্রেসের যে দুয় মাসব্যাপী প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৫ই জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের নিকট তাঁহার বাণীতে যে কর্ম্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আশাপূর্ণ সাগ্রহ দৃষ্টি তাহার উপর বিশেষ ভাবেই নিবদ্ধ হইয়াছে। এক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচী যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নব-বিধান বা New Deal হইতেও বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কংগ্রেসে ডেমোক্রাটিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৯৪২ সাল বা ১৯৪৪ সাল অপেক্ষাও অনেক বেশী। নূতন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটদলের সদস্য-সংখ্যা ২৬২ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ১৭১ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ২৪৩ এবং ডেমোক্রাটিক দলের সদস্য-সংখ্যা ১৮৫ জন ছিল। নূতন সিনেটে ডেমোক্রাটিক দলের সদস্য-সংখ্যা ৫৪ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ৪২ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী সিনেটে রিপাবলিকান দলের সদস্য-সংখ্যা ৫১ এবং ডেমোক্রাটিক দলের সংখ্যা ৪৫ জন ছিল। সুতরাং নূতন কংগ্রেস যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কার্য্যসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাতে বাধা না হইবারই কথা। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাণীতে পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার কর্ম্মসূচী শুধু ব্যাপকই নহে, উহাকে অনেকে সমাজতন্ত্রবাদ-ঘেঁষা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ রিপাবলিকান দলের কোন কোন সেনেটর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচীকে 'সোশ্যালিষ্ট মেনিফেষ্টো' বা সমাজতান্ত্রিক ফতোয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কর্ম্মসূচীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কংগ্রেসের নিকট তাঁহার ঘোষণা-বাণীর কর্ম্মসূচীতে সেই সকল প্রতিশ্রুতিই স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বাণীতে নূতনত্ব না থাকিলেও সুপারিশগুলির বাস্তব গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। কংগ্রেসে ডেমোক্রাটিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করিলে, এই সকল সুপারিশকে বাস্তব ভিত্তিহীন শুভেচ্ছা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। আগামী দুই বৎসরের মধ্যে এই সকল সুপারিশ কার্য্যে পরিণত হইয়া আইনের রূপ গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ম্যাক্ করম্যাক প্রেসিডেণ্টের বাণীকে সত্যিকার প্রগতিশীল (Real progressive Message) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেনেটর স্কট লুকাস বলিয়াছেন, "এই কার্য্যসূচীর অধিকাংশই আমরা আইনে পরিণত করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা করিতেছি।"

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কর্ম্মসূচী বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা কত পরিমাণে হ্রাস করিবার এবং জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি করিবার অভিপ্রায়

অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাণীতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার, অধিকতর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এবং সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদিগকে অধিকতর সুযোগ দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোনও শ্রেণীর কথাই তিনি বিস্মৃত হন নাই। আমেরিকার মত ধনী দেশেও মুদ্রাস্ফীতির জন্য সাধারণ পণ্যব্যবহারকারীদের সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রেসিডেন্ট টুম্যান তাহাদের জন্য মূল্য হ্রাসের আট দফা-সম্বলিত এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়হ্রাসের জন্য তিনি পুনরায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ৪০০ কোটি ডলার সরকারী আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন বাতিল করিয়া ওয়েগ্‌নার আইন পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ওয়েগ্‌নার আইনে সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকদিগকে অধিকতর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বস্তী আছে, কাজেই বস্তিবাসীও আছে। গৃহহীন লোকের সংখ্যাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকায় বড় কম নয়। বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদিগকে প্রেসিডেন্ট টুম্যান বস্তী সংস্কারের এবং অল্প ভাড়ায় গৃহ সরবরাহের আশ্বাস দিয়াছেন। করদাতাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ট্যাক্সের বোঝা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করা হইবে। নিগ্রোদিগকে যাহাতে একঘরে করিয়া রাখা না হয় এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা না হয় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ নাগরিকদিগকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধা অধিকতর বিস্তৃত করিবার আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা বিবেচনা করিলে এই সকল আশ্বাসকে সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আসলে ইহা যে মার্কিণ ধনতন্ত্রকে আসন্ন সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক আবরণে আবৃত করিবার প্রচেষ্টা, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, প্রেসিডেন্ট টুম্যান নিজেই বলিয়াছেন, "যে সকল নৈরাশ্যবাদী ভবিষ্যদ্বক্তা মার্কিণ ধনতন্ত্রের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাঁহারা বোকা বনিয়া গিয়াছেন।" মার্কিণ ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সমগ্র পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক আধিপত্য রক্ষা করা প্রয়োজন। রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ নিরোধ উহারই নেতিবোধক দিক্ মাত্র। এই প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই মার্শাল-পরিকল্পনা, পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন, উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা দান ব্যবস্থার উদ্ভব। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে, কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই একই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার এবং জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা-নির্ব্বাহের উন্নয়ন ও সমর আয়োজনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা সম্ভব নয়। মাখন অথবা বন্দুক এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়। হিটলারের জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ইহা যে সত্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সমগ্র পৃথিবীকেই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নবাজারে পরিণত করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রয়োজন সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার পরোক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা। আবার রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিতে হইলে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা এবং উহার জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ঠিক সেই পথেই চলিতেছে না? প্রেসিডেন্ট টুম্যান তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন, "আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে কার্য্যকরী ভাবে সংগঠন করার কাজে গত বৎসর আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন করার প্রয়োজন।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুবকদিগকে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমরা নির্ভর করিতে পারি, এরূপ ভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে-পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্ন না হয়, সে-পর্য্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পর্য্যাপ্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন ও রক্ষা করার [illegible] আমরা মুক্তি পাইতে পারি না।" উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপকে সামরিক সাহায্য দান এবং মার্শাল-পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ সম্পর্কে তিনি খুব অল্প কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অল্প কথাই ব্যাকরণের সূত্রের মত বহু অর্থ প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকাবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, বেকার-সমস্যা নিরোধের জন্য প্রচুর উৎপাদন করা প্রয়োজন। কিন্তু এত পণ্য আমেরিকাবাসীর প্রয়োজন হইবে না। তাই পশ্চিম ইউরোপকে সামরিক সাহায্য দান, সামরিক প্রস্তুতি এবং মার্শাল-পরিকল্পনার ভিতর দিয়া এই সকল পণ্য কাটাইবার এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে বটে। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের লাভ কি?

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নিহত—

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশী পাশা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এ-পর্য্যন্ত মিশরের তিন জন প্রধান মন্ত্রী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। ১৯১০ সা[illegible] ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী বুতরস ঘালি নিহত হন। তৎপরে ১৯৪৫ সালে মিশরের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী [illegible]হের পাশা নিহত হন। ইহা ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মিশরে আরও তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ময়েন, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াফদ দলের প্রাক্তন অর্থসচিব আমীন ওসমান পাশা, ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে কায়রোর আপীল আদালতের সহকারী সভাপতি আহমদ হাজিন্দর বে নিহত হন। ওয়াফদ দলের নেতা ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশাকে হত্যা করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত আট বার চেষ্টা করা হইয়াছে। শেষ চেষ্টা হয় গত নবেম্বর মাসে।

মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করার তিন সপ্তাহ পর নোকরশী পাশাকে হত্যা করা হয়। তিনি যখন কয়রোস্থিত স্বরাষ্ট্র-দপ্তর ভবনের লিফটে আরোহণ করেন, সেই সময় জনৈক যুবক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। যুবকটি পুলিশ অফিসারের পোষাক পরিহিত ছিল বলিয়া নোকরশী পাশার দেহরক্ষী সহকারী চাকুরিয়া মনে করিয়া তাহাকে কোনরূপ বাধা দেয় নাই।

খুব নিকট হইতে সে নোকরশী পাশার উপর গুলী নিক্ষেপ করে। প্রথম দুইটি গুলী তাঁহার মুখে ও বুকে লাগে। তিনি মেঝেয় পড়িয়া যাইবার সময় আততায়ী আরও চারি বার গুলী করে। তিনি পড়িয়া যান এবং প্রচুর রক্তমোক্ষণ হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকগণ আসিয়া আর তাঁহাকে জীবিত পান নাই। আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার নাম আবদুল মেগুইড হাসান। যুবকটি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের ছাত্র এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের সদস্য।

নোকরশী পাশা এক সময়ে ওয়াফদ দলের প্রধান হুইপ হইয়াছিলেন। ওয়াফদ দলের উদ্ভব হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর জগলুল পাশার নেতৃত্বে। মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনই এই দলের লক্ষ্য। ... নার মিশরের সুপারিশ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে, ইহা ... ওয়াফদ দলের মধ্যে ম... দেখা দেয়। ফলে ওয়াফদ দল ... কতক ব্যক্তির ... তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন। ... পাশার নেতৃ... গঠিত হয়। দ্বিতীয় আর একটি দল ... ওয়াফদী ... পাশার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য- ... ওয়াফদীরা বিপ্লবের পরিবর্ত্তে আলাপ-আলোচনা দ্বারা স্বাধীনতা ... পথ সমর্থন করেন। অতএব দল বিপ্লববিরোধী। তাঁহারা ...আপোষের সমর্থক। ওয়াফদী দল দাবী করেন যে, ... সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার পূর্ব্বে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়া আবশ্যক। ক্রমে ওয়াফদী দলের শক্তি আরও হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩৭ সালে এক দল ওয়াফদী ওয়াফদ দল হইতে পৃথক হইয়া আহমদ মাহের পাশার নেতৃত্বে সাদ দল গঠন করেন। নোকরশী পাশা এই নূতন দলের সহকারী সভাপতি হন। পরে এক দল পুরাতন ওয়াফদীকে সংহত করিয়া নাহাশ পাশা কুৎলা আল ওয়াফদ নাম দিয়া এক নূতন দল গঠন করেন। মিশরের বর্ত্তমান বিভিন্ন দলের প্রত্যেকেই জগলুল পাশার ওয়াফদ দলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক দিক্ হইতে কোন সত্যিকার পার্থক্য দেখা যায় না।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাহাস পাশা প্রধান মন্ত্রী হন ... অক্টোবর মাসেই তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিতে ... তাঁহার নীতি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পছন্দ না হওয়াই ইহার কারণ। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা বলার ... তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল, এ কথা বলিলেও ভুল হয় না। বস্তুতঃ ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর আরব জাতীয় ...নের প্রোটোকোল স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের দিনই তিনি ... মন্ত্রীর পদ হইতে বিচ্যুত হন। অনেকে মনে করেন ... মাক্রাম ওবেদ পাশার বিদ্রোহের সহিত তাঁহার পতন ঘনিষ্ঠ ... জড়িত। অতঃপর সাদ দলের নেতা আহমদ মাহের পাশা ...য়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ওয়াফদ দল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দলই এই কোয়ালিশনে যোগদান করে। যে-সকল দেশ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই তাহারা সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় মাহের পাশা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন এই সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯৪৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মাহের পাশা নিহত হওয়ায় নোক্রশী পাশা প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রথম মন্ত্রিসভার পতন হয়। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। মধ্যবর্ত্তী সময় সিদ্কী পাশার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার শাসন-কাল। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি সংশোধনের জন্য নোকরশী পাশার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব যে সম্পূর্ণ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের তাহা অনস্বীকার্য্য। সিদকী পাশা মিঃ বেভিনের মতে মত দেওয়াতেই তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন হয়। ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধ, বিশেষ করিয়া সুদানের ভবিষ্যৎ লইয়া বিবাদের মীমাংসার জন্য নোকরশী পাশা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ব্যর্থ হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই ব্যর্থতার জন্যই তিনি উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। মিশরের প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র আক্রমণ যে জনমতকে সন্তুষ্ট করাবই প্রয়াস তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাজয়ের গ্লানিই এই আক্রমণের একমাত্র ফল এ কথা বলা যায় না। আততায়ীর হস্তে নোকরশী পাশার প্রাণ বিসর্জ্জন যে এই পরাজয়েরই অন্যতম ফল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নোকরশী পাশার মৃত্যুতে মিশরের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা করার কোন কারণ দেখা যায় না। মিশরের রাজা, সাদ দল এবং ওয়াফদ দলের মধ্যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ির ফলে মিশরের রাজনীতি ক্ষেত্রের সঙ্কট চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আছে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। অর্থনৈতিক কারণে জনসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছে। মিশরের ফেল্লাহিনদের (কৃষক) দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রতি কৃষক-পরিবারের জমির পরিমাণ এক একরের বেশী নয়। অনেক কৃষকের আদৌ জমি নাই। দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার জন্য তাহাদের রাজনৈতিক-চেতনাও জাগ্রত হইতেছে না। রাজার প্রতি তাহাদের গভীর ভক্তি। গ্রাম্য মোল্লাদের দ্বারা তাহারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরসঙ্কট এবং অর্থক্ষেত্রে চিরস্থায়ী দুর্দ্দশার জন্যই জনসাধারণের অসন্তোষ মাঝে-মাঝে হিংস্র বিস্ফোরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ইহাই কারণ। এই সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। প্রথমে প্রবল মুসলিম মনোভাব দ্বারাই এই সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত ছিল। ক্রমে উহা রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্ট বলপ্রয়োগে ধ্বংস করিয়া ক্ষমতা অধিকার করাই এই দলের লক্ষ্য। ইহাদের নিজেদের অস্ত্রাগার পর্য্যন্ত আছে। দলের তরুণদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতি তাহাদের শক্তিবৃদ্ধির নূতন সুযোগ প্রদান করে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের হিংসামূলক কার্য্যকলাপের জন্যই এই সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধানই হইবে না। মিশরে কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দল নাই, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণতান্ত্রিক ভাবধারা মিশরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মিশরে সমাজতন্ত্রী দলের অভাবও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা মিশরকে ক্রমেই

অশান্ত করিয়া তুলিতেছে। কম্যুনিজম মিশরে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, তাহাও অবশ্য বলা কঠিন। কিন্তু এই সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যে মিশরের গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষেরই ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজমের সঙ্ঘাতের মধ্যে মিশরে যদি ব্যাপক রাজনৈতিক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহার পরিণাম কি হইবে তাহা বলা কঠিন।

ইন্দোনেশীয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয়—

ইন্দোনেশীয়ার ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, রেনভাইল চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিমান-বাহিনী ওলন্দাজ সৈন্য গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) অতর্কিতে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের রাজধানী যোগ্যকর্ত্তা দখল করিয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকরণো, প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণ এবং প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ওলন্দাজদের হাতে বন্দী হইয়াছেন। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারীতে অবস্থিত ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের মুখপাত্র অবশ্য দাবী করিয়াছেন যে, প্রজাতন্ত্রী বাহিনী পুনরায় জোগ্যকর্ত্তা দখল করিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর আছে কি না, তাহাতেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিঙ্গাপুর হইতে ২৪শে ডিসেম্বরের এক সংবাদ প্রকাশ, সুমাত্রার কোনও স্থানে হাত্তা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের নেতৃত্বে অস্থায়ী ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের সমগ্র রাজ্য দখল করিবার জন্য এই আক্রমণের পরিকল্পনা যে অত্যন্ত গোপনে এবং খুব সুকৌশলে করা হইয়াছিল এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এবং অতর্কিত ভাবে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) প্যারী নগরীতে প্রকাশিত এক ওলন্দাজ-বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডের প্রতি প্রজাতন্ত্রীরা তাহাদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করায় হল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা একমত হইয়া ইন্দোনেশিয়ায় আক্রমণ চালান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। গত ১২ই ডিসেম্বর ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং অবিলম্বে প্রজাতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। সুতরাং ১২ই ডিসেম্বর বা পরবর্ত্তী কোন দিন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র আক্রমণের জন্য সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বিমান-বাহিত সৈন্য দ্বারা অতর্কিতে শুধু যোগ্যকর্ত্তাই দখল করা হয় নাই, স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ তিন দিক্ হইতে যবদ্বীপ আক্রমণ করা হয়। সুমাত্রাও যে আক্রমণ করা হয়, সে-সম্বন্ধে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে নীরব ছিলেন। ২১শে ডিসেম্বর তারিখের বিশ্বাসযোগ্য বে-সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, যবদ্বীপ এবং সুমাত্রা উভয়ই ডাচ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের গতি অতিদ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং এই আক্রমণের জন্য হল্যাণ্ড যে অনেক পূর্ব্ব হইতেই গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেনভাইল চুক্তি হইয়াছিল এই আয়োজন গোপন রাখিবার কৌশলপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আবরণ।

১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে লিঙ্গাজ্জাতি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং ১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির সময়ই এই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, শক্তি সংহত করিয়া পুনরায় আক্রমণের জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীরা এই চুক্তি করিয়াছিল। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই হঠাৎ হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করাতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য শুভেচ্ছা কমিটি (good office commitee) গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৪৭ সালের আগষ্ট সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব সুমাত্রায় ব্যাপক ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করেন এবং মোগোক দখল করিয়া বসেন। বস্তুতঃ শুভেচ্ছা কমিটি তিন বার ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিরতি সর্ত্ত ভঙ্গ করিবার অভিযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ আলোচনার পর 'রেনভাইল' (Renville) নামক মার্কিণ জাহাজে ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাই রেনভাইল চুক্তি নামে খ্যাত। নূতন আক্রমণের জন্য শক্তিসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই যে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল, ১৯শে ডিসেম্বরের আক্রমণ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। অদৃষ্টের মর্ম্মান্তিক পরিহাস এই যে, জয়পুর কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে-সময়ে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ওলন্দাজ বাহিনী যোগ্যকর্ত্তা দখল করিতেছিল। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের অহমিকা এবং প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি এত বেশী যে, ডাঃ সোয়েকরণো এবং অন্যান্য প্রজাতন্ত্রী নেতাদিগকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যোগ্যকর্ত্তার রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করান হইয়াছিল।

প্রজাতন্ত্রীরা সরল বিশ্বাসেই রেনভাইল চুক্তি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে রাজী না হইয়া ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই চুক্তি কার্য্যতঃ অগ্রাহ্যই করিয়াছিলেন। গত জুন মাসে (১৯৪৮) শুভেচ্ছা কমিটির মার্কিণ সদস্য ইন্দোনেশীয়া সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করেন, আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রজাতন্ত্রীরা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৮) মার্কিণ সদস্য চুক্তির একটি খসড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ উহা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুভেচ্ছা কমিটি নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আলাপ-আলোচনার সমস্ত পথ নিঃশেষে শেষ হইয়া যায় নাই, আলোচনা চালাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক্ ভাবে বিবেচনা করাও হয় নাই এবং ডাচ প্রতিনিধি দল উত্তরের জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা পূরণ করাও অসম্ভব ছিল। বস্তুতঃ গত ডিসেম্বর মাসে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরও ডাঃ হাত্তা বিশেষ ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মার্কিণ প্রতিনিধির নিকট ১৩ই ডিসেম্বর এক পত্রে ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষকে আরও সুবিধা দিবার জন্য স্বীকৃত হওয়ার কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ডাচ-কর্ত্তৃপক্ষ ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে ইচ্ছুক বলিয়াই মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। রেনভাইল চুক্তির ১০ নং ধারায় এই সর্ত্ত

আছে যে, যুদ্ধ-বিরতির অবসান ঘটাইতে হইলে অপর পক্ষকে এবং শুভেচ্ছা কমিটিকে নোটিশ দিতে হইবে। শুভেচ্ছা কমিটির সদস্যরা অনেক বিলম্বে নোটিশ পাইয়াছেন এবং আক্রমণ আরম্ভ করার পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিরতির নোটিশ যোগাকর্ত্তার পৌঁছে নাই। রেনভাইল চুক্তিকে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের মতই মনে করিয়াছে, নিরাপত্তা পরিষদকে অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধা করে নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-সমম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। এই ব্যাপারে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও যে ওলন্দাজদের সহায়, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া ও নিরাপত্তা পরিষদ—

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর নির্ভর করা যে নিরর্থক, তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা গিয়াছে। অবশ্য ডাচ-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরই ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারীতে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ দিন রাশিয়া, ইউক্রেন ও কলম্বিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত থাকায় কোরাম হয় নাই। অতঃপর ২৪শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ওলন্দাজ ও প্রজাতন্ত্র উভয় পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া এবং ডাঃ সোয়েকরণো এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডাচ-আক্রমণের নিন্দা করিয়া একটি কথাও এই প্রস্তাবে বলা হয় নাই। এমন কি আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বের স্থানে ডাচ সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইবার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। ডাঃ ..র্ণমেণ্টের মুখপাত্র ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারই স্বীকার করেন নাই। তিনি ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ লোকের প্রতিনিধি। ভারতবাসী আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের এই ধরণের যুক্তির সহিত অপরিচিত নই। ডাচ মুখপাত্র আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির সময় প্রজাতন্ত্রীরা যত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে, ডাচ আক্রমণের ফলে যে তাহা অপেক্ষা কম লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্টদিগকে আস্কারা দিতে ইচ্ছুক এবং ওলন্দাজদের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন ইন্দোনেশীয়দের উপর অত্যাচার করিতেছিল, এইরূপ অভিযোগও তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু লণ্ডনস্থ ইন্দোনেশিয়া অফিসের প্রচার বিভাগের অফিসার মিঃ এট কিনসন নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউনে (ইউরোপীয় সংস্করণ) এই সকল অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "যবদ্বীপে কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিয়াছেন। ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ এই অভ্যুত্থানের অতিরঞ্জিত বিবরণই শুধু প্রকাশ করেন নাই, পলায়নপর বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয়ও দিয়াছেন।......প্রজাতন্ত্রের বহির্ভূত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওলন্দাজরা যে হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। সেলিবেস দ্বীপে ক্যাপ্টেন ওয়েষ্টার্লিং যে ৩০ হাজার ইন্দোনেশীয়কে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার কথাও উল্লেখ করা হয় নাই।"

২৪শে ডিসেম্বর যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পাঁচ দিন পরে ডাচ-মুখপাত্র নিরাপত্তা পরিষদকে জানান যে, জাভায় ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ থামিবে এবং সুমাত্রায় আরও কিছু বিলম্ব হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আক্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ওলন্দাজরা যুদ্ধ বন্ধ করিবে না। হইয়াছেও তাহাই প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সদস্যদিগকেও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। গত ৭ই জানুয়ারী (১৯৪৯) ওলন্দাজ প্রতিনিধি ডাঃ ভান রায়েন নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়াছেন, 'বন্দী প্রজাতন্ত্রী নেতৃবর্গকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বত্র তাঁহাদিগকে চলাফেরা করিতে দিলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে বলিয়া সাময়িক ভাবে তাঁহাদিগকে শুধু বানকা দ্বীপেই চলাফেরা করিতে দেওয়া হইবে।' ইহার সোজা অর্থ, বানকা দ্বীপে তাঁহাদিগকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতেছেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নিরাপত্তা পরিষদে ওলন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের স্থানে ফিরাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ দিবার জন্য ইউক্রেন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া রাশিয়াও এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইউক্রেনের প্রস্তাবে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আর্জ্জেনটিনা ও কানাডা এবং রাশিয়ার প্রস্তাবে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আর্জ্জেনটিনা, কানাডা ও কলম্বো ভোটদানে বিরত ছিল। কাজেই প্রস্তাবের পক্ষে ৭ ভোট না হওয়ায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইউক্রেনের প্রস্তাবে যাহারা ভোট দেন নাই, তাঁহারা চান না যে, ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী আক্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসুক। যাঁহারা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাবে ভোট দেন নাই, তাঁহারা চান না যে, যুদ্ধ-বিরতির জন্য ওলন্দাজদের উপর কোন সময় নির্দ্দেশ করা হউক। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

গত ৭ই জানুয়ারী হইতে লেকসাকসেসে পুনরায় নিরাপত্তা-পরিষদের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে বটে; কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্য-বিপর্যায় তাহাতে রোধ হইবে না। বৃটেন এবং ফ্রান্স দুই-ই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। নিরাপত্তা পরিষদ কার্য্যকরী ভাবে কোন ব্যবস্থা যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারে, সেই জন্যই তাহারা চাপ দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও প্রত্যাশা করিবার কিছুই নাই।

ইন্দোনেশিয়া ও এশিয়া সম্মেলন :—

ওলন্দাজদের ইন্দোনেশিয়া আক্রমণে ভারত তথা এশিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভারতের আকাশের উপর দিয়া ওলন্দাজ কে-এল-এম বিমান কোম্পানীর বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সিংহলের জাহাজ ও বিমান বন্দরে ওলন্দাজ সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ ও বিমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৯) সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার

দিন ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত ২০টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছে :—মিশর, ইরাণ, আফগানিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, শ্যাম, তুরস্ক, ইথোপিয়া, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন, ইরাক, ইয়েমন, চীন, নেপাল, পাকিস্তান, নিউজীল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইন। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রথম ছয়টি দেশ কর্তৃক নিমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্যাম সম্মেলনে যোগদান করিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছে।

এশিয়ার দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ চাপ দিয়া ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আক্রমণের অবসান ঘটান এবং ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই সম্মেলনের জন্য কোন কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কি পন্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা অনুমান করা হয়ত কঠিন নয়। আক্রমণের পূর্ব্বের স্থানে সৈন্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য হল্যাণ্ডকে নির্দ্দেশ দিতে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট দাবী এবং এই নির্দ্দেশ প্রতিপালিত না হইলে হল্যাণ্ডকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে বহিষ্কৃত করিবার দাবী করা হইবে কি না, এবং দাবী করা হইলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বৃটেনকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সম্মেলন আহ্বান করায় বৃটিশ যেমন বিস্মিত হইয়াছে তেমনি সন্তুষ্টও হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া হইতে ডাচদের বিতাড়ন অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতকায়গণ শ্বেত-অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে এই সম্মেলনের মধ্যে নেহরু-ডকট্রিন ও প্রাচ্য ব্লক সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্যবস্থা করিতে সাহসী না হয়, তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি সম্বন্ধে কোন ভরসা করা অসম্ভব। এই সম্মেলনের কার্য্যসূচীর মধ্যে ভিয়েটনামের স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

চীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার গোলকধাঁধা :—

চীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চীনা গোলকধাঁধার কথাই শুধু স্মরণ করাইয়া দেয়। জেনারেল চিয়াং কাইশেক পদত্যাগ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন নাই। নববর্ষ উপলক্ষে তাঁহার বাণীতে চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে গৃহ-যুদ্ধের মীমাংসা করিতে কম্যুনিষ্টরা যদি আন্তরিক আগ্রহ দেখায়, তাহা হইলে আমার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ভবিষ্যতে যাহাই হউক তাহাতে কিছু আসে-যায় না।" কম্যুনিষ্টরা এ-পর্য্যন্ত বহু বার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু চিয়াং কাইশেকের জন্যই মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের যদি দেশবাসীর কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি আগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত শান্তি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্টের শাসনে চীনবাসীদের যে কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কাহারও অজানা নাই। চিয়াং কাইশেক কম্যুনিষ্টদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা যদি আগ্রহান্বিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। গৃহ-যুদ্ধের গতি দেখিয়া তাঁহার এই হুমকী যে অর্থহীন তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। ২৭শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বড়দিন উপলক্ষে কম্যুনিষ্ট বেতারে চীনের সরকারী নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াং কাইশেক আছেন।

চীন গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতা করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার পর সমস্ত রণাঙ্গনে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত সরাসরি আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালাইবার চেষ্টা চলিবে বলিয়া ২১শে ডিসেম্বর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর প্রিন্স তে ওয়াং নানকিংএ আগমন করায় এই ধারণাও সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মীমাংসার ভার তাঁহার উপরেই দেওয়া হইবে। কিন্তু চিয়াং কাইশেকের নববর্ষের ঘোষণার সহিত শান্তি-প্রচেষ্টার কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইয়াংসি নদীর তীরবর্ত্তী ৬৫০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনে কম্যুনিষ্টরা ১০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে চীনা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিমান হইতে শান্তিপত্র বিতরণকে আপোষ মীমাংসার পথ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করা যায় না।

২রা জানুয়ারী কম্যুনিষ্ট রেডিও হইতে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কম্যুনিষ্টদের নির্দ্ধারিত সর্ত্তেই তাহা করিতে হইবে। চীনে পিপলস্ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করাই তাহাদের দাবী। শান্তি আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতকদিগকে ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকদিগকে নিশ্চিহ্ন করার দাবীও কম্যুনিষ্টরা করিয়াছে। ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে চীন গবর্ণমেণ্টের শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার অভিপ্রায়ের মধ্যে ৮ই জানুয়ারী নানকিংএর এক শত মাইল উত্তরে কম্যুনিষ্ট বাহিনী যখন নূতন অভিযান আরম্ভ করিল, তখন চীনের সরকারী মহলে নূতন করিয়া শান্তির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। নানকিং হইতে ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিষ্টদের সহিত মীমাংসার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য চীন গবর্ণমেণ্ট বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কূটনীতির গহন-পথে পরিচালিত এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু অসমর্থিত সংবাদে চিয়াং কাইশেক নানকিং হইতে তল্পিতল্পা গুটাইবার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

প্যালেষ্টাইন ও বৃটেন—

প্যালেষ্টাইন বিরোধে বৃটেনের জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা প্যালেষ্টাইন সমস্যার যে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা খুবই গুরুতর। নেগেভ অঞ্চলে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির জন্য বৃটেনের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও গত ২৮শে ডিসেম্বর হইতে নেগেভ অঞ্চলে মিশর ও ইহুদীদের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। গত ২৯শে ডিসেম্বর বৃটিশ প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে জানান যে, ইসরাইল সৈন্যরা মিশর আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহারা মিশর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এল আরিশ বন্দরের ছয় মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে। মিশরের ভিতরে সীমান্ত হইতে ৩৫ মাইল দূরে

এল আরিশ অবস্থিত। ইহুদীরা প্রথমে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিলেও পরে তাহা স্বীকার করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ইহুদী-বাহিনীকে মিশর হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের সন্ধি অনুসারে বৃটেন যদি মিশরকে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থা বড় সহজ হইবে না। নেগেভ অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহুদী বিমান পাঁচখানি টহলদার বৃটিশ বিমান ভূপতিত করার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। ১৯৪৮ সালের ইঙ্গ-ট্রান্সজর্ডান চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন প্যালেষ্টাইন সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ট্রান্সজর্ডানের বন্দর আকাবায় ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। আম্মানে বৃটিশ বিমানের এবং মিশরের খান অঞ্চলে মোতায়েন বৃটিশ-সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাও শোনা যায়। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু ইসরাইল হইতে বৃটিশ নাগরিকদিগকে অপসারণ করা হইতেছে।

ইসরাইল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ সত্যই না-ও বাধিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু অবস্থার ক্রমাবনতি বিবেচনা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ইসরাইল রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন। ইসরাইল রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার প্রভাবাধীন, ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বৃটেন বেশ কৌশলপূর্ণ উপায়ে আরব রাষ্ট্রগুলির উপর তাহার প্রভাবকে সংহত করিবার আয়োজন করিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে বৃটেনের কর্ম্মতৎপরতার ইহাই প্রধান তাৎপর্য্য।

জেনারেল তোজোর ফাঁসী—

আন্তর্জ্জাতিক সামরিক আদালতের রায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৪৮) জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকী তোজো এবং অপর ছয় জন জাপ সমরনেতার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসীর অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনারেল তোজো জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের মারফৎ বিশ্বের চিন্তাশীল নরনারীর নিকট এই আবেদন জানাইয়াছেন, "এশিয়ার জনসাধারণের প্রতি আপনারা সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন এবং তাহাদের মনোভাব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।"

তাঁহার এই অন্তিম আবেদনের কি ফল হইত, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণবিদ্বেষই যে জাপানকে বিগত মহাসমরে বৃটিশ ও মার্কিণ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার কথা বহু শুনিয়াছি। সাম্রাজ্য-লিপ্সু জাপান তো দূরের কথা, স্বাধীন রাষ্ট্ররূপেও তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়াই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক এশিয়াবাসীই জাপানের জন্য দুঃখ বোধ না করিয়া পারিবে কি?

প্রসাদ রায়

কাংগ্রা ভ্যালির পালামুর থেকে শ্রীমতী নোরা রিচার্ড নামে এক ইংরেজ-মহিলা সংপ্রতি একখানি দৈনিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেছেন: "বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও লেখকরা মিলে যে সুবিখ্যাত অ্যাবি থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন, দিল্লী সহরেও তেমনি কোন 'ষ্টুডিয়ো থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা কি সম্ভবপর নয়? আমি শীঘ্রই দিল্লীতে গিয়ে স্থানীয় নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।"

সাধু সংকল্প। কিন্তু ও-শ্রেণীর রঙ্গালয়ের পক্ষে দিল্লী নগর উপযোগী কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও অঞ্চলটি উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী বা নাট্যরসিকের জন্যে বিখ্যাত নয় আদৌ। আধুনিক ভারতে এ বিভাগে সব চেয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে কলকাতা। শ্রীমতী নোরা রিচার্ড যদি কলকাতায় এসে চেষ্টা করেন তাহলে হয়তো সফল হলেও হতে পারেন।

এই সূত্রে আর একটি কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বাছা-বাছা রসিকদের আসরে উচ্চশ্রেণীর নাটকাদির জন্যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করতেন। কেবল তাই নয়, তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও তিনি যে রঙ্গালয় নিয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করবার অবসর পেতেন, এক দিন আমরা সে প্রমাণও পেয়েছিলুম।

একুশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কথায় কথায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রসঙ্গ উঠল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছিলেন, আমি বাড়ীতে এসে একখানি খাতায় তার সার মর্ম্ম নিজের ভাষায় টুকে রেখেছিলুম। তা হচ্ছে এই:

"যে ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে, সেখানে গিয়ে তাঁদের প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারবে না। সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়,—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান তাঁদের জন্যে কি বাংলা দেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না? সাধারণ রঙ্গালয়ে হপ্তায় অনেক দিন করে অভিনয় হয়। এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে তা হবে না। সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে একই নাটকে একই নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, আসল শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে কোন নাটকই দীর্ঘকাল ধরে চালানো হবে না। এমন একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় অবশ্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে চলতে পারে না। এ জন্যে কয়েক জন গুণগ্রাহী রসিকের সাহায্য আবশ্যক। দেশে খুঁজলে এমন ছ'শো লোক নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যাঁরা মাসে দশ টাকা করে দর্শনী দিতে পারেন। তার উপরে অন্যান্য দর্শকের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে। তাতেই এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের ব্যয় সংকুলান হবে। অতিরিক্ত রঙ্গালয় আকারে খুব বড় না হলেও চলবে, কারণ সেখানে যাঁদের মিলনক্ষেত্র হবে তাঁরা সকলেই বাছা-বাছা ব্যক্তি। সেখানকার আসনাদির সমস্ত ব্যবস্থাই

দেবী চৌধুরাণী চিত্রের নায়িকা সুমিত্রা
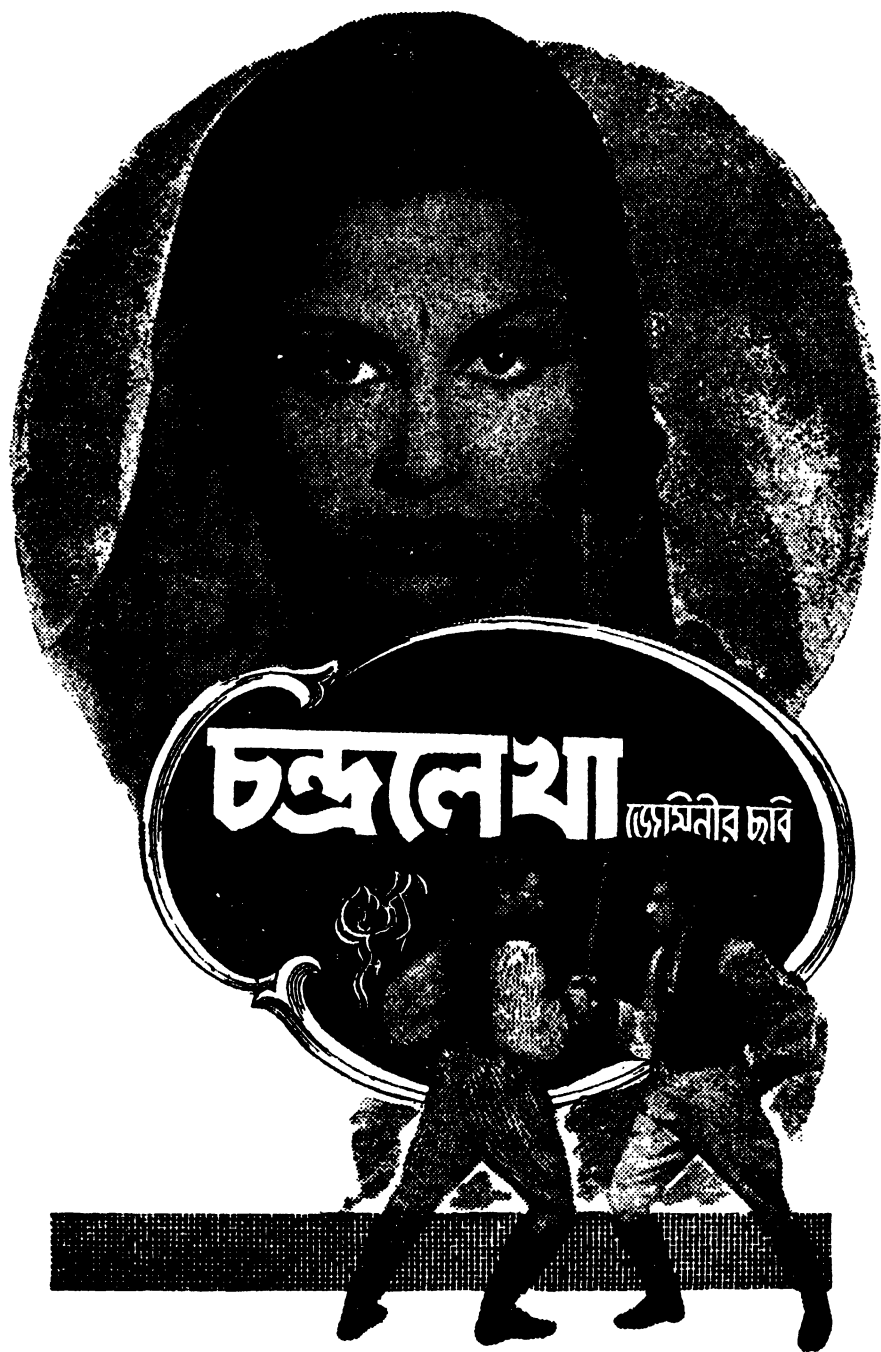
এক্ষণে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে

ওরিয়েণ্ট, বসুশ্রী ও বীণা

হবে উচ্চশ্রেণীর উপযোগী। পাশ্চাত্য দেশে 'লিটল্ থিয়েটার' নামে যে ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আদর্শেই। দর্শকদের মুখ চেয়ে সাধারণ রঙ্গালয় যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্ব্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে সব উঁচু দরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভবপর হবে। এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।"

বিশ্বকবির ঐ বাণী যে সময়ে আমরা শুনেছিলুম, তার পর আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় ধাপে-ধাপে উপর দিকে ওঠেনি, নেমে এসেছে নীচের দিকেই। শক্তিশালী নূতন নাট্যকারের এত অভাব যে, বস্তা-পচা কুনাটক "বঙ্গে বর্গী" ও "কিন্নরী" প্রভৃতিরও পুনরভিনয় হয় মহা সমারোহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও বার-বার ঢেলে না সাজলে এখনো নাটকের দুর্ভিক্ষ দূর হয় না। শিশিরকুমার, নির্ম্মলেন্দু ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির অবসর-গ্রহণের কাল আসন্ন হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁদের আসনের পাশে এখনো দাঁড়াতে পারে, এমন এক জন মাত্র তরুণ অভিনেতারও দর্শন নেই। এমন অবস্থায়ও যদি রবীন্দ্রনাথ-কথিত অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা না হয়, তবে আমাদের নাট্য-জগতের ভবিষ্যৎ যে রীতিমত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এবং অদূর ভবিষ্যতে এটা দেখলেও আমরা বিস্মিত হব না যে, রাজনীতি ক্ষেত্রের মত নাট্যকলার ক্ষেত্রেও বাঙালীকে পিছনে ঠেলে এগিয়ে গিয়েছে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ!

শ্রীমতী নোরা রিচার্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের যে অ্যাবি থিয়েটারের কথা বলেছেন তার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে এই:

আয়ার্ল্যাণ্ডে যখন নাট্যকলার অবস্থা শোচনীয়, সেই সময়ে পৃথিবী-বিখ্যাত কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স্ স্থির করলেন, তাঁর স্বদেশে জাতীয় রঙ্গালয়ের অভাব মোচন করতে হবে। আদর্শরূপে তখন তাঁর সামনে ছিল ষ্টানিস্লাভ্স্কির মস্কো আর্ট থিয়েটার। তিনি এডওয়ার্ড মার্টিন, জর্জ্জ মুর ও লেডি গ্রিগরি প্রভৃতি আইরিস লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে পরামর্শ করে "আইরিস লিটারেরি থিয়েটার" স্থাপন করলেন এবং সেই সঙ্গেই হ'ল আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় নাটকের জন্ম। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব রঙ্গালয়ের কাজ চালাতে পারেন এমন আইরিস অভিনেতার অভাবে প্রথম প্রথম অভিনেতা আমদানি করতে হল ইংলণ্ড থেকেই। ওখানকার প্রথম দু'খানি নাটক হচ্ছে ইয়েট্সের The Countess Cathleen ও মার্টিনের The Heather Field. পর-বৎসরেও (১৯০০ খৃঃ) ওখানে মার্টিন, জর্জ্জ মুর ও অ্যালিস মিলিগান প্রভৃতির নাটকাবলী অভিনীত হয়।

ইয়েটসের উপরে মেটারলিঙ্কের প্রভাব ছিল অত্যন্ত। তিনি চেয়েছিলেন এক কবিত্বপূর্ণ রঙ্গালয়। কিন্তু তাঁর সহকর্ম্মীরা পরে যখন ইয়েটসের প্রতিষ্ঠানকে পরিচিত করলেন অ্যাবি থিয়েটার নামে (১৯০৪ খৃঃ), তখন তাঁরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। উদার ইয়েট্সও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা দমন করে বন্ধুদের মতেই সায় দিলেন। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন, "The Hour Glass" হচ্ছে সেগুলির মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। ঐ পালাটির জন্যে দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন নাট্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ গর্ডন ক্রেগ।

অ্যাবি থিয়েটারের দৌলতে যত শক্তিশালী নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেছেন এখানে তাঁদের সকলকার কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জন মিলিংটন সিঞ্জ (১৮৭১—১৯০৯)। আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ইয়েটসের পরামর্শে তিনি আরান দ্বীপে গিয়ে কয়েক বৎসর বাস করেছিলেন আইরিস কৃষকদের ভাষা ও কথার ছন্দে দক্ষতা অর্জ্জন করবার জন্যে। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যখন তিনি লেখনী ধারণ করলেন, তখন আয়ার্ল্যাণ্ড লাভ করলে এমন অপূর্ব্ব এক জাতীয় নাট্য-সম্পদ, যার মধ্যে সর্ব্বত্রই আছে প্রতিভার শীলমোহর। সিঞ্জ দীর্ঘজীবী হননি অনেক নাটক রচনা করবারও অবসর পাননি, কিন্তু স্বদেশের জন্যে তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, তাই-ই তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে The Playboy of the Western World (১৯০৭ খৃঃ)। এই নাটকখানি য়ুরোপ ও আমেরিকায় অর্জ্জন করেছে একসঙ্গে সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতি। আমেরিকার জনসাধারণ এই পালাটিকে নিশ্চয়ই বর্জ্জন করত, কিন্তু প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট তার পক্ষাবলম্বন করেই নাটকখানিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকখানি জনসাধারণের চেয়ে নাট্য-সমালোচকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অধিকতর। অমর রূপ-লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন, "এই নাটকের মধ্যে যা হাস্যকর তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই পরিণত হয়েছে ভয়ঙ্করে এবং তেমনি সহজেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে হাস্যকর।"

পেশাদার রঙ্গালয়ের বিকিকিনির হিসাব ছেড়ে অ্যাবি থিয়েটার সৃষ্টি করতে চেয়েছে উচ্চশ্রেণীর জাতীয় নাট্যকলা ও সাহিত্য এবং সার্থক হয়েছে তার সে প্রচেষ্টা। সে আশ্রয় পেয়েছে স্বদেশের প্রাণকেন্দ্রে, তাই সামলাতে পেরেছে উপর-উপরি দুই-দুইটি পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধের ধাক্কা। কিন্তু তবু চিরদিন সমান যায় না। অ্যাবি থিয়েটারের নাট্যকারদের উচ্চতর প্রতিভা আর নেই এবং তার শ্রেষ্ঠতর অভিনেতৃগণ এখন পাড়ি দিয়েছেন আটলান্টিক মহাসাগরের ও-পারে—নিউ ইয়র্কে কিংবা হলিউডে।

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হচ্ছেন ইউজিন ও-নীল। নিজের অসাধারণ প্রতিভার প্রসাদে তিনি আজ আসন লাভ করেছেন বিশ্ব-সাহিত্যেও। নিশ্চিত তাঁর অমরত্ব। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করলেও কোন সাধারণ রঙ্গালয়ই সেগুলি মঞ্চস্থ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত Provincetown Thatre নামে স্বাধীন রঙ্গালয়ই সর্ব্বপ্রথমে তাঁর নাটক অভিনয় করে তাঁকে সুপরিচিত করেছিল নিউ ইয়র্কে। তার পর থেকেই তাঁর নাটক অভিনয় করবার সুযোগ পেলে আমেরিকার প্রত্যেক সাধারণ রঙ্গালয় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে।

কলকাতাতেও এই শ্রেণীর কোন স্বাধীন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে যে একাধিক শক্তিশালী নাট্যকারের আবির্ভাব সম্ভবপর নয়, কে ক'রে বলা যায় না এমন কথা।

পেশাদারী অভিনয়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জনৈক পেশাদার

অভিনয়কে স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য অভিনেতা কি ভাবে আপনার সংলাপকে প্রকাশ করবেন এবং কি ভাবে কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করবেন তা আমরা বারান্তরে আলোচনা করেছি। তথাপি অভিনয় তো কোন ব্যক্তিবিশেষের আপন দক্ষতার উপরেই নির্ভরশীল নয়। অভিনয় মূলতঃ জমে ওঠে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সহযোগী অভিনয়-কুশলতায়।

খুব সহজ উদাহরণ হিসাবে আমরা কোন একটি নাটকের বিশেষ একটি দৃশ্যের উল্লেখ করছি। মনে করা যাক্, এই বিশেষ দৃশ্যে নাটকের দু'টি টাইপ চরিত্রকে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার অপূর্ব সংলাপ যোজনা করেছেন। এই দৃশ্যে দু'জনেই কোমলতম হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিক অনুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হলে দু'জনেই এমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আপন মনের ভাবকে প্রকাশ করছেন যে সামান্য ক্ষণ পরেই দর্শক শ্রোতা অধীর হয়ে উঠছেন। তারা বলছেন যে অভিনয় ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়বৃত্তির বিকাশের মধ্যে রোমান্সের নামগন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না, বরং বলা চলে ন্যাকামি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রেম-দৃশ্যে যে ট্র্যাজেডী ফুটে ওঠে, সেই মারাত্মক ভুল দানার হতে বসেছে। অথবা মনে করা যাক্, দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখী হয়েছেন নাটকের এক জটিল ঘটনাবর্ত্তে। দু'জনই বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা আপন আপন প্রতিষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। দু'জনেই ব্যক্তিত্বের চরম বলিষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য উন্মুখ এবং নাটকের সংলাপও সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দৃশ্যেও দেখা যায় যে দর্শক সেই বীর-রসের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। উপরের দু'টি উদাহরণ অবশ্য উদাহরণই মাত্র। যে কোন নাটক, তা সে সামাজিক, পৌরাণিক, রাজনৈতিক অথবা নৃত্য-গীতসম্বলিত হোক না কেন, তার মধ্যে এই ধরণের ভাবাবেগ প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে থাকে। এবং নাটকীয় সংঘাতের সর্বোত্তম মুহূর্ত্তে দর্শক যদি অসন্তুষ্ট থেকে যায়, তবে সমগ্র নাটকটির উপরেই তার প্রত্যাশা কমে যেতে বাধ্য। নাটকীয় চরিত্র স্ফুটনের পক্ষে সেই কারণেই কেবল মাত্র স্বাভাবিক আবৃত্তিই সব শেষের কথা নয়।

এ অবধি আমরা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখই করিনি। অথচ বৈচিত্র্য কেবল যে সংলাপকে হৃদয়স্পর্শী করে তা নয়, ঘটনাকেও বেগবান করে। সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের এই নিয়ন্ত্রিত বৈচিত্র্য আমরা কদাচিৎ শুনতে পাই এবং পাই না বলেই আমরা নিরাশ হয়ে থাকি। সৌখীন থিয়েটারের সমস্ত কান্নার ঢঙ এক, বীর-রসের অভিব্যক্তিও এক, প্রণয়-নিবেদনেরও বিশিষ্ট ভঙ্গী ও বাক্যালাপ। অথচ এ সত্য আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় অর্জিত যে সব মানুষ এক ঢঙে কাঁদে না, অথবা শোক প্রকাশের সময় সকলেই সমান অধীরতা প্রকাশ করে না। কেউ বা স্থির হয়, কেউ বা উথল হয়। এ বাস্তব ভুললে অভিনয়ে মানব-জীবনের প্রকাশকেই অস্বীকার করা হবে এবং তা আসলে অভিনয়ই হবে না। অপর দিকে ক্রোধেও কেউ উদ্দাম, প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, কেউ বা বলিষ্ঠ অথচ নিঃশব্দ পাদচারণার মধ্যেই নিজের মনের তীব্র আবেগকে চাপা দিয়ে যান। এবং সেই প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যেই চরিত্রের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত দর্শক-শ্রোতার সম্মুখে। প্রেমের দৃশ্যে কোন নায়ক বাঙ্‌ময়, কেউ বা বাক্যহারা। অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গী ও বাচনভঙ্গীর বৈচিত্র্যেই নাটকের অভিব্যক্তি। এবং সেই বৈচিত্র্যকে যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করতে না পারলে দর্শককে খুশী করা সম্ভব নয় এ কথা অভিনেতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবেই। একটানা ছন্দে কবিতা যেমন তার আকর্ষণী শক্তি হারিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি ভাবেই একই ধ্বনিমুখর সংলাপ যথাসম্ভব স্বাভাবিক মনের আবেগের অনুরণিত হয়েও প্রীতিপ্রদ নয়। স্বাভাবিকতা অর্জ্জনের জন্য অভিনেতাকে যে পরিমাণ কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেই হয়, যে সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করে এসেছি, বাক্যবিন্যাসের দ্বারা চরিত্রের স্বকীয় বিশিষ্টতা বিকসিত করার জন্য তেমনি কিছু পরিমাণ কৃত্রিমতার প্রয়োজন হয়েই পড়ে।

সাধারণতঃ বাচনের মূল আশ্রয় হোল, ধ্বনির গভীরতা, গতি, ছন্দ এবং বর্ণ। নূতন অভিনেতারা বাণীর এই ক'টি একান্ত প্রয়োজনীয় মূল বস্তুকে ভুলে যান। এর সব কটিই হোল প্রয়োজনের এবং যে কোন একটির অভাবেই বাচন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এ কথাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এই বৈচিত্র্যের প্রকাশ-শৈলীর মধ্যে সত্যভ্রষ্টতার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। যেমন, ক্রোধান্বিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে পড়ে এবং আবৃত্তি হয় দ্রুততর। কিন্তু যদি সেই মুহূর্ত্তে মানুষটি তার ক্রোধকে প্রকাশ করতে না চান, তবে তার ভঙ্গী ও ও বাচনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে অন্য দিকে। সুতরাং নাটকীয় চরিত্রটির মুখে সেই নাটকীয় মুহূর্ত্তে কি ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশিত হওয়া উচিত তা যেমন নাট্যকার সংলাপ রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, অভিনেতাকেও তার মর্মাংশ প্রথমে গ্রহণ করে তবে আপন আবৃত্তির গভীরতা, গতি, ছন্দ এবং বর্ণকে ব্যক্ত করতে হবে। অভিনয়ে একঘেয়েমির এই দোষ হতে মুক্ত হবার জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ রাখতে হবে পরিচালক ও অভিনেতা-বৃন্দকে। একটি বিশেষ দৃশ্যে কোন দু'টি অভিনেতার বাচন ও প্রকাশভঙ্গী যেন কোন প্রকারেই একই ঢঙের হয়ে না যায়। মানুষে মানুষে যেমন ভিন্নতা, তাদের মনের আবেগ প্রকাশের রীতিতেও তেমনি ভিন্নতা। সুতরাং একই দৃশ্যে দু'টি মানুষের একই প্রকারের আবেগ প্রকাশের মধ্যেও এই সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য ফুটে ওঠা প্রয়োজন। নাটকীয় চরিত্রটিই যেমন এই বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণের প্রধান অবলম্বন, তেমনি পরিচালকের মহৎ দায়িত্ব হোল অভিনেতা নির্বাচনের সময় এই বৈচিত্র্যের পরিস্ফূরণের দিকে লক্ষ্য রাখা। সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই নাটকীয় চরিত্রে কাল্পনিক ঘটনার চেয়ে বাস্তব মানুষটির প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখা আশু প্রয়োজন। এই বৈচিত্র্যের অভাবই অধিকাংশ দৃশ্যের একঘেয়েমির কারণ হতে পারে এ কথা কিছুতেই ভোলা উচিত নয়। অভিনেতা ও সহযোগী অভিনেতার প্রকাশভঙ্গী ও বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে মহড়া দিলে এই দোষ-মুক্ত হতে পারবেন সহজে এবং নিজেদের মধ্যে একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থায় দর্শককে খুশী করার আনন্দ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারবেন। অভিনেতার পক্ষে তার চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আর কিছু নেই। এ কথা ভোলা চলবে না যে রঙ্গমঞ্চের সব থেকে অবাঞ্ছিত অতিথি হোল একঘেয়েমি, যাকে শিষ্ট ভাষায় বলে অভিনয় নিষ্প্রাণ হওয়া এবং সাধারণ ভাষায় বলে অভিনয় ঝুলে যাওয়া।

[ক্রমশঃ]

১৯৪৭—১৯৪৮

ছবি	প্রযোজক	মান
প্রতিবাদ	(নিউ থিয়েটার্স)	* *
স্যার শংকরনাথ	(রাধা ফিল্ম)	* * *
সাধারণ মেয়ে	(ভানগার্ড)	* *
জয়যাত্রা	(„)	* * * *
অঞ্জনগড়	(নিউ থিয়েটার্স)	* * *
ভুলি নাই	(ন্যাশানাল)	* *
অরক্ষণীয়া	(পি, আর, প্রোঃ)	* *
মুক্তিস্নান	(এস, বি, প্রোঃ)	*
নন্দরাণীর সংসার	(ইষ্টার্ণ টঃ)	* * *
বিশ বছর আগে	(এম, ভি, প্রোঃ)	* * * *
সর্বহারা	(মজুমদার স্বামী)	* * * *
বঞ্চিতা	(ইন্দ্রপুরী)	* * * *
নারীর রূপ	(এস, এল, কারনানী)	* * * *
মনে ছিল আশা	(নিউ, ইণ্ডিয়া ফিঃ)	* * * * *
অনির্বাণ	(এম, পি, প্রোঃ)	* * * *
সমাপিকা	(এসোসিয়েটেড ডিঃ)	* * *
শেষ নিবেদন	(ডি, জি, লিঃ)	* * * * *
কালো ঘোড়া	(ফিল্ম সিঃ)	* * * *
মহাকাল	(চিত্রবাণী)	* * * *
পদ্মা প্রমত্তা নদী	(রংগশ্রী)	* * *
প্রিয়তমা	(বোসার্ট প্রোঃ)	* *
ভাইবোন	(সরোজ পিঃ)	* * * *
বাঁকালেখা	(এস, ডি, প্রোঃ)	* * * *
পূরবী	(কে, সি, দে)	* * * *
ধাত্রীদেবতা	(ইষ্টার্ণ ফিঃ)	* * * *
মায়ের ডাক	(সিনে লিঃ)	* * * * *
শাঁখাসিন্দুর	(রূপশ্রী)	* * * *
কালোছায়া	(বন্ধুমিত্র)	*

* তারকা চিহ্নের ব্যবহারে আমরা এই বৎসরের ছায়াচিত্রের জাত বিচার করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্ত মাত্র তারকার সংখ্যায় উপর বিচারের মানদণ্ড নির্ণয় করা হইয়াছে। সংখ্যার তারতম্যে চিত্রের শ্রেণী-বিভাগ হইবে। যথা—

* প্রথম শ্রেণী
* * দ্বিতীয় শ্রেণী
* * * তৃতীয় শ্রেণী
* * * * চতুর্থ শ্রেণী
* * * * * নিকৃষ্ট

কথা কম কাণ্ড

সবাকচিত্রে চিত্রের স্থান

রঙ্গমঞ্চের অভিনয় আর সবাক চিত্র—দু'টোই তো আমরা একই সঙ্গে চোখে দেখি এবং কানে শুনি; তবু রঙ্গমঞ্চের নাটককে আমরা নাটকই বলি শুধু, অথচ ছায়াচিত্রের নাটককে বলি চিত্রনাট্য। এর একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে কানে-শোনার ওজনটাই বেশী, চোখে-দেখার ওজনটা অনেক হাল্কা। সেখানে রাজার দৌবারিক এসে খবর দেয়,—"মহারাজ, আপনার হীরা মহলে, যেখানে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করতে লজ্জা পায়, যেখানের হীরায় হীরায় সপ্তসূর্য্যের দ্যুতি, যেখানে পান্নায় পান্নায় শত-চন্দ্রের জ্যোতি, যেখানে ··ইত্যাদি, সেই ভুবনবিখ্যাত হীরা-মহলে অপেক্ষা করছে এক বিদেশী আগন্তুক।"

মহারাজের ভুবন-বিখ্যাত হীরা-মহলটিকে রঙ্গমঞ্চওয়ালারা কানে শুনিয়েই মালুম করাতে চান, চোখে দেখাবার দুশ্চেষ্টা করেন না কোন দিন। রঙ্গমঞ্চের চাঁদ ওঠে উইংসের আড়ালে, দর্শকদের চোখের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মঞ্চনাটকের বিদ্রোহীরা রাজার ধনভাণ্ডার লুঠ করে শুধু রাজকর্মচারীদের চোখের আড়ালেই নয়, রঙ্গমঞ্চের দর্শকদেরও চোখের আড়ালে। খবরটা রাজার দূতের মুখে শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দর্শকদের;—চোখে দেখবার বায়না করা চলে না। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় উপভোগ করবার জন্তে যাঁরা টিকিট কাটেন, তাঁরা বারো আনা শ্রোতা, চার আনা দর্শক! তাঁরা পনেরো শিলিং অডিয়েন্স, পাঁচ শিলিং স্পেক্টেটর। কিন্তু ছায়াচিত্রের বেলায় এ হিসেব খাটে না। সেখানে টিকিট যাঁরা কাটেন, তাঁরা আট আনা শ্রোতা এবং আট আনা দর্শক। তাঁরা দশ শিলিং অডিয়েন্স, দশ শিলিং স্পেক্টেটর।

তাই মঞ্চের অভিনীত গ্রন্থটিকে বলা হয় নাটক, আর ছায়াচিত্রের অভিনীত গ্রন্থটিকে বলতে হয় চিত্রনাট্য। ছায়াচিত্রের দাঁড়ি-পাল্লায় চিত্র এবং নাট্য সমান ওজন রাখতে চায়। দরকার পড়লে ছায়াচিত্রের তুলাদণ্ডে চিত্রের পাল্লা ঝুঁকে পড়তে পারে বরং, কিন্তু নাট্যের পাল্লা ভারী করা চলে না। আমাদের দেশের ছায়াচিত্র কিন্তু এ-অনুশাসন মেনে চলে না। চলে না বলেই সত্যিকারের ভাল ছবি আজও হল না আমাদের দেশে। আমরা চিত্রনাট্যের চিত্রের মুখে হাত-চাপা দিয়ে নাট্যকে দিয়েই কথা বলাই বেশী।

ছোটবেলায় আমাদের মামার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় সময় যাত্রা হোতো। একবার একটি পালার একটি দৃশ্যের কথা আমার আজও মনে আছে।—গুটি কয়েক গুণ্ডামার্কা লোক সাজ-ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে যাত্রার আসরের স্বল্পপরিসর স্থানটিতে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করে বলতে লাগলো,—"উঃ, কি ভীষণ গভীর অরণ্য! চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুর তর্জ্জন, সূচীভেদ্য অন্ধকার, আমরা কি করে আত্মরক্ষা করি? এস ভাই, আমরা ঐ সুউচ্চ বৃক্ষের উপরে রাত্রি কাটাই।" যাত্রার আসরের ধূলিমলিন যে সতরঞ্চিটি এতক্ষণ গভীর অরণ্য হয়েছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইটেই হয়ে দাঁড়ালো সুউচ্চ বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের উপরে বসে পড়লো সেই গুণ্ডামার্কা লোকগুলি। আজও মনে আছে, তাদের কথাবার্ত্তা এবং রকম-সকম দেখে সেদিন কি হাসিই না হেসেছিলুম। কিন্তু সেদিন কি জানতুম যে, সে-হাসির জের আজও চালাতে হবে? আজও ঠিক সেই হাসিই হাসতে হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ সিনেমা দেখে। কিন্তু দু'টো হাসিতে তফাৎ আছে প্রচুর। যাত্রা দেখে যখন হাসি, তখন মনে-মনে এ কথাটাও মেনে নিতে হয় যে এছাড়া উপায় নেই তাদের,—কিন্তু সিনেমার বেলায় হাসির সঙ্গে মিশে থাকে বিরক্তি এবং রাগ। সিনেমায় যখন দেখি, ইডেন উদ্যানের ছবি দেখিয়ে বলা হচ্ছে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, কিংবা সরস্বতী পাকো-মার্কা নুড়ি আর কাগজ দিয়ে তৈরী পাহাড় দেখিয়ে দার্জ্জিলিংয়ের effect দেওয়া হচ্ছে—তখন মনে হয়, এত যন্ত্রপাতি আর এত সুযোগ পেয়েও সেই ছোট-বেলার মামার বাড়ীর 'যাত্রা'র আসর থেকে আমাদের সিনেমা কোম্পানীরা বেশী দূর এগোতে পারেনি। যাত্রা বা রঙ্গমঞ্চের পাত্র-পাত্রীরা কথা বলে বেশী, কারণ চোখে-দেখার অনেক জিনিষকেই সেখানে কানে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়—চোখে-দেখাবার উপায় নেই বোলে। কিন্তু ছায়াচিত্রের পাত্র-পাত্রীরা অনায়াসেই কম কথা বলতে পারেন, কারণ সেখানে চোখে দেখানোর উপায়টা অত্যন্ত বেশী।

রঙ্গমঞ্চের বিরহিণীকে শব্দ করে কেঁদে, কিংবা সই-এর কাছে মনের কথা জানিয়ে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে হয় যে সে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আলো-আলো আধো-অন্ধকারে দু'ফোঁটা চোখের জল নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়েই ছায়াচিত্রের বিরহিণী তার বেদনা সঞ্চারিত করে দিতে পারে দর্শকদের মনে। চিত্রের সাহায্যে অনেক কথাই যেখানে অনেক ভাল করেই বোঝানো যেতে পারে, সেখানে মুখের কথা কম করাই উচিত নয় কি? আমাদের দেশের সবাক চিত্র কিন্তু যতখানি 'সবাক' ততখানি 'চিত্র' নয়!

আমাদের যাত্রায় ভীম এবং দুর্য্যোধনের মুখ থেকে বেরোয় অনেক আস্ফালন, অনেক বীরত্বের কথা, অনেক হুঙ্কার;—কিন্তু তাদের গদা থেকে বেরোয় তুলো! গদার ভেতর তুলো আছে বলেই তো যাত্রার দুর্য্যোধন ও ভীমকে অতো হুঙ্কার ছাড়তে হয়; অতো দাঁতভাঙ্গা ব্ল্যাঙ্কভার্স আওড়াতে হয়। গদার ওজনটা হাল্কা বোলেই কথার ওজনে সেটা পুষিয়ে দিতে হয় বেচারাদের। আমাদের দেশনেতাদের দিনে বাহান্নটা করে বক্তৃতায় মানবের মঙ্গলের কথা শোনাতে হয়, কারণ কাজে মানবের মঙ্গল করা বড়ো একটা হয়ে ওঠে না। কাজের ফাঁকটা তাই কথায় সারতে হয়।

আমাদের দেশের সবাক চিত্র এত বেশী কথা বলে ঠিক ঐ একই কারণে। তার 'চিত্রে'র দিকটা এত কম-জোরী যে বাক্যের জোরে সেটা ব্যালান্স করতে হয়। আমাদের দেশের চিত্রনাট্যের কাহিনী'র নায়িকার বয়সটা শ্রোতাদের সামনে নানা ছুতোয় পাঁচ বার করে শুনিয়ে দিতে হয়। মনে করিয়ে দিতে হয় নাট্যোল্লিখিত স্ত্রী-চরিত্রটির বয়স মাত্র কুড়ি। কারণ যে অভিনেত্রীটি ঐ চরিত্রে অভিনয় করছেন, তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে দু'কুড়ি বসন্ত চলে গেছে। কাজেই চোখে-দেখার ভুলটা কানে-শুনিয়ে শুধরে নিতে হয়,—চিত্রের ফাঁকটা বাক্যের সিমেন্ট দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হয়, তুলোর গদাকে বাক্যের ওজন দিয়ে ভারী করতে হয়। আমাদের সবাক চিত্রের চিত্রের দিকটায় যদি আমরা মন দিই একটু বেশী, তাহ'লে আমাদের সিনেমার পাত্র-পাত্রীর এত কথা বাক্যব্যয় করতে হয় না। চিত্রের সাহায্যে কত কথা কত সহজে এবং কত ভাল করে ফুটিয়ে তোলা যায়, একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আপনাদের মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করা যাক।

বিদেশী চিত্রের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেরই একটি ছবির কথা ধরা যাক। এমন একটি ছবি, যে-ছবি প্রায় সকলেই দেখেছেন। ধরা যাক 'দেবদাসে'র কথা। রোগার্ত্ত দেবদাস যখন ধর্মদাসকে নিয়ে অস্থির ভাবে ভারতবর্ষের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মানসিক যন্ত্রণার হাত এড়াবার জন্যে,—তখন ঐ দ্রুত ধাবমান ট্রেণের ক্রমাগত ছবিগুলি কত কথাই শুনিয়েছে ভাবুন দিকি! ঐ দ্রুত ধাবমান রেল-গাড়ী দেবদাসকে শুধু আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-কাশী-পাটনা-নাগপুরেই পৌঁছে দেয়নি, সেই সঙ্গে দর্শকদের পৌঁছে দিয়েছে দেবদাসের অন্তরের সেই [illegible] প্রদেশটিতে, যেখানে দেবদাসের অতীত এবং বর্ত্তমান রেলগাড়ীর চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে। ঐ রেলগাড়ীর ছবিটি বার কয়েক পর্দ্দার উপর ছুটে এসে এত অল্পে এত কথা বলে গেল, যেটা বাক্যের সাহায্যে কোন দিনই সম্ভব হত না। দেবদাসে'র চন্দ্রমুখীকে জানলার ধারে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দূর থেকে ভেসে-আসা নহবৎ-এর রাগিণীটুকু শুনিয়ে চন্দ্রমুখীর মনের এত কথা পরিচালক মশাই দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা হাজার কথা বলেও সম্ভব হত না। ঐ ভাবে চিত্রের সাহায্য যদি না নেওয়া হত, তাহ'লে চন্দ্রমুখীকে স্বগতোক্তি কোরে বলতে হোত, "পতিতা কি মানুষ নয়? তার কি প্রাণ নেই, হৃদয় নেই? এক দিনের একটা ভুলের জন্য তার কাছে কি সমাজের সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে? মানুষের এতটুকু সমবেদনা কি সে পাবে না? তার কি ভাল হবার পথ কোন রাস্তাই নেই? ছোট একটি নীড় বেঁধে সে কি পারে না নতুন করে জীবন সুরু করতে?........"

এত-বড়ো একটা বক্তৃতা দিয়েও কি ফুটে উঠতে পারত চন্দ্রমুখীর চরিত্রের গভীরতম দিকটির পরিচয়? তাই বলছিলাম, —'চিত্রনাট্যে'র নাট্যটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না, চিত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের। ছায়াচিত্রকে অনেক বেশী চিত্রধর্ম্মী করে তুলতে হবে। 'চিত্রে'র অস্বচ্ছলতা 'নাট্যে'র আধিক্য দিয়ে ভরিয়ে তুললে চলবে না। বাজে 'কথা'র জৌলুষে পয়সা ছড়িয়ে সার্থক 'চিত্রে'র একটি মাত্র টাকা বের করলে ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকে।

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

রঙ্গমঞ্চ বনাম মঞ্চরঙ্গ

আমাদের দেশে রঙ্গের অভাবে কি মঞ্চের স্বভাবেই হবে, কে জানে, রঙ্গমঞ্চগুলি ক্রমশঃ যেন কাহিল হয়ে আসছে ; ছিন্ন [illegible]পট সম্বল, বেতন-বঞ্চিত প্রায়-নিঃসম্বল অভিনেতা-অভিনেত্রী [illegible] দেশীয় রঙ্গমঞ্চের আজ যা হচ্ছে তাকে farce বলাই উচিত [illegible], সে-আরেক মঞ্চরঙ্গই হবেও বা। রঙ্গমঞ্চের এই দুর্দশায় দেশের [illegible] ক্ষতি হচ্ছে বলে আর্তনাদ করছেন যাঁরা, তাঁরা কোন [illegible] লোক-সমাজের জন্ত নয়, সেণ্টিমেণ্টের জন্তই এই মায়া-কান্নায় [illegible]। পিতার মৃত্যু হবেই জেনেও আমরা যেমন পিতৃহীন হলে [illegible] মুহ্যমান হই, রঙ্গমঞ্চের যুগ অতিক্রম করে এসেও তার জন্তে [illegible] আমাদের অর্থহীন হা-হুতাশ। মানুষ প্রথম তার বক্তব্যকে [illegible] করেছে পাথরের ওপর ; তার দ্বিতীয় বাণী-মুক্তি তালপাতায় [illegible] এবং তার পর সে এলো বাণী-বিস্তারের সহজ রাস্তায়— [illegible]না মারফৎ। কিন্তু ছাপাখানা তৈরী করেও সে নিশ্চিন্ত হতে [illegible] না। তখন তার একমাত্র চিন্তা হলে যারা লেখা পড়তে [illegible] তাদের কাছে কেমন করে পৌঁছে দেওয়া যায় মানুষের [illegible] চিন্তাকে। এলো যাত্রার যুগ। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর [illegible] আনন্দের সঙ্গেই বিতরিত হল শিক্ষা। কিন্তু কিছুতেই সে [illegible] হয় না, সেই মানুষের মন বললে : 'আরো চাই ; আরো দাও'। [illegible] তৈরী হল। পৌরাণিক আখ্যান থেকে আরম্ভ করে [illegible] কালের আধুনিকতম সমস্তা পর্য্যন্ত আলোকিত হল পাদ-[illegible] আলোয়। তার পর যার সৌভাগ্যসূর্য কখনও অস্ত যাবে [illegible] হয়েছিলো, সেই বই মঞ্চকে মনে করে এক দিন ছায়াচিত্র [illegible] নিঃশব্দে। তার পর তার মুখে ভাষাও ফুটলো বহু প্রচেষ্টা, [illegible] পরীক্ষার পর। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করল মানুষের [illegible] ছায়াচিত্র যেদিন perfect হবে, সেদিন থিয়েটারের কোন [illegible]তাই থাকবে না ; তার জন্তে অনর্থক শোকান্বিত হবারও দরকার [illegible]। ছায়াচিত্রকে আজও যারা শুধু entertainment ভাবে নয়, [illegible] যে কি বিপুল সম্ভাবনা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, সেই সম্বন্ধে [illegible] সরকারের মত আজও যারা ভাবতে পারছে না একমাত্র তারাই [illegible]র সঙ্গে সংস্কৃতিরও পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে মাতোয়ারা। অনেকটা [illegible] মতই, যারা 'সংস্কৃতকে' Lingua Franca করবার আদর্শ-[illegible]সে মজে আছেন আজও।

হ্যামলেট উইদাউট দি

প্রপার সিনারিও। ফলে সেক্সপীয়ারের নাটক নিয়ে সিনেমা [illegible] গিয়ে সিনেমাও হয়ই-নি, থিয়েটারও হয়নি, যা হয়েছে [illegible] বিলাতি যাত্রা। কিন্তু বিলিতি বেগুণ যদি বা খাওয়া যায়, [illegible] যাত্রা তাও বায়স্কোপের বদলে ভেজাল হিসেবে মোটেই [illegible]যোগ্য ব্যাপার নয়। আর্থার র‍্যাঙ্কের এই প্রচেষ্টা খুবই নীচু [illegible] হয়েছে শুধু এক গোয়ার্তুমীর ফলে যে হুবহু সেক্সপীয়ারের [illegible]লেট যেমনি লেখা তেমনি সিনেমায় দেখাতে হবে। সেক্সপীয়ারের [illegible] অরিজিন্যালি সিনেমার জন্যে নয়। তিনি যদি সিনেমার জন্যে [illegible] তাহ'লে একেবারেই অন্য টেকনিকে লিখতেন। ফলে 'হ্যাম'-[illegible] হয়েছে কিন্তু 'হ্যামলেট' হতে এখনও অনেক লেট হবে।

নাম-ভূমিকায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা

জেমিনী পিকচার্সের 'চন্দ্রলেখা' এখন কলকাতায় সব চেয়ে বে[শী] লোক টানছে। ছবিটিতে ক্যামেরার কাজ হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এর জন্যে যিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন তিনি এক জন বাঙ্গালী শ্রীকমল ঘোষ। 'চন্দ্রলেখা' দেখে একটা ভরসা হয় যে উপযুক্ত স্কোপ পেলে আমাদের দেশেও সত্যিকারের বায়স্কোপ হওয়া সম্ভব এই 'টেকনিক্যাল'-দিকটায় যদি বাঙ্গালী প্রযোজকরা এখনং নজর না দেন ত বম্বে-মাদ্রাজ বাঙ্গলাকে অনেক দূর ফেলে যাবে অদূর ভবিষ্যতেই। এখনও পর্যন্ত বাঙ্গলার কোন ষ্টুডিওতে ক্রেন বলে কোন বস্তু নেই। ক্রেন হচ্ছে ভালো শটের জন্যে বড় সেটের জন্তে এক অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রোরেন্স, ইউক্রেন যেমন রাশিয়ার।

Censor না more Sense Sir ?

আমাদের পরিচালকদের এখনও সত্যিকারের ছবি-তোলার হাতখড়ি হয়নি, আমাদের ষ্টুডিওর অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়, আমাদের ছায়াছবির কাহিনীকার ওরিজিন্যাল গল্প ভাবা ত দূরের কথা, সুস্থ ভাষান্তর করতেও সক্ষম হননি আজও, কিন্তু আমাদের যেমন সেন্সর-বোর্ড পৃথিবীর আর কোথাও এত নন-সেন্স-bo বোধ হয় নয়। সত্যিকারের সাহিত্য-রসসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব-সমৃদ্ধ শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানেই সব চেয়ে পচা আপেলগুলি' গন্ধে ভুরভুর করছে। হবেই বা না কেন ? যে দেশে খাবারের মধ্যেও ভেজাল দেয় সে দেশে ছবি Censor-ওয়ালাদের কাছে "আরোও Sense Sir" বলা অরণ্যে রোদন করা ছাড়া আর কি হবে ? হতে পারে আর একটা অবশ্য। সে হল শুয়োরের সামনে মুক্তো ছড়ানো। কিন্তু আর কিছু হবে না এ ছাড়া, এটা ঠিকই।

'জয় হিন্দ' নয়, জয় হিন্দি বলুন

'উদয়ের পথের' পর থেকেই বাংলা ছবি দ্রুত অধঃপাতের দিকে এগুচ্ছে, গল্পবিহীন ছবির শেষে শুধু পতাকা উড়িয়েই তার দর্শক-চিত্ত হরণের বৃথা চেষ্টা। কিন্তু পতাকা যার-তার হাতে কি সয় ? 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' ফলে যে দিকে তাকাই, শুধু পতাকাই দেখি, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে দু'উইকের পর লোক দেখি নে আর, পরিবেশকের কাৎরানি শুনি—ছবি too week। কাজেই পতাকা একাই ওড়ে। 'জয় হিন্দ' মতই বাংলা ছবিতে পর্দা বিদীর্ণ করুক, আসলে বাংলাকেও খোদ হিন্দি ছবির জয়-জয়কার। যদি নাক উঁচু করে আর বেশী দিন 'হিন্দি ছবি ও যাচ্ছে তাই।—ও-যাত্রা' ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহ'লে এর পর নিজেদের নাক কেটেও ওদের যাত্রা ভঙ্গ করা যাবে না। মহৎ ছবি তুলতে গিয়ে লোক না হাসিয়ে লোকে যাতে হাসে সেই রকম হিন্দি ছবির এনটারটেনমেন্ট, এনতার এনটারটেনমেন্ট যদি বাংলা ছবিতে না দেওয়া যায় তাহ'লে ১৯৫৫তেই ৬৫ দিতে হবে বাংলা ছবির প্রযোজকদের।

বাংলায় প্রথম রহস্যচিত্র কালোছায়া

শেষ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের বহু দিনের অভিযোগ দূর করলেন একটি নতুন ধরণের ছবি তুলে। ললিত 'সঙ্গীত ও গলিত রোমান্সে'র বিবর্জিত কালোছায়া সত্যিকারের রহস্যচিত্র হতে পেরেছে শুধু গল্পটিকে সাজানো এবং চমৎকার টিম-ওয়ার্কের জন্যে। সব চেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন আমার মতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কালোছায়ার' প্রযোজক ছবিটির হিন্দি চিত্ররূপ দিলে ভালোই করবেন।

তারাশঙ্করের কবি : দেবকী বসুর প্রযোজনা

দেবকীকুমার বসু প্রযোজিত 'কবি' তারাশঙ্করের সুবিখ্যাত রচনা। কিছু দিন আগে দেবকী বাবুর চন্দ্রশেখরে বঙ্কিম-বিকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্করের বিবৃতি পড়ে ভয় হয়েছিল তারাশঙ্করের 'কবি'তে 'শঙ্কর' দোষে না 'ভুলি নাই'-রচয়িতা মনোজ বসুর আপত্তি হয়? তখন আবার মনোজ বসুর 'বিপর্যয়' নিয়ে নারাণ গাঙ্গুলীর 'সুবিচার চাই' বলে ফতোয়া ঝাড়ায় ফের নারাণ বাবুর "উপনিবেশ" নিয়ে···ওরে বাবা দেবকী বাবু তাহ'লে কোথায় গড়াবেন? সে যাক। শোনা যাচ্ছে, 'অমুক' না কি 'কবি'তে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হবেন 'ঠাকুরঝি'র ভূমিকায়। হতেও পারে, এ-যুগে ঠাকুরপো ও ঠাকুরঝিদের অসাধ্য নেই কিছুই, ছবিটি জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তি পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার ছায়াচিত্রে

'দেবীচৌধুরাণী' তুলতে সুরু করেছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত। জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যাবলীগুলি তোলবার জন্যে প্রফুল্ল রায়ের সহযোগিতায় ছবিটি প্রায় শেষ হয়ে এলো। সুমিত্রা আছেন নাম-ভূমিকায়। ক্যামেরায় কাজ করছেন বহু-অভিজ্ঞ শৈলেন বসু। এ-বছর বোধ হয় সব চেয়ে বেশী ব্যয়ে প্রস্তুত হবে এই ছবিটি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে ছায়ায় রূপান্তর করতে হলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হল সিনেমায় উপযোগী বর্ণান্তর। ছায়া-ছবি করবে অথচ তার জন্য যা দরকার তা করব না এ হচ্ছে সেই আব্দার যা না কি হাফ টিকিটে রেলে যেতে হবে বলে ভগবানের কাছে 'বামন' হয়ে জন্মাবার আরজি পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ফের চাঁদ ধরবার বায়না!

আগামী সংখ্যায়

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা

(জীবন-কথা)

শ্রমণ রায়োকোয়ান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সৈয়দ মুজতবা আলী

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রায়োকোয়ানের জন্ম হয়। রায়োকোয়ান বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রায়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রায়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পাননি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক্ করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রায়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রায়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবন ও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারেনি। রায়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রায়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রায়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রায়োকোয়ান জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেননি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেননি।

• • • • •

ফিশার বলেন, রায়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্ত-প্রকৃতির পরিচয় দেন। অন্যান্য বালকেরা যখন খেলা-ধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রায়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বেগগ্রস্ত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়াছেন।

রায়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দু'টি কথা বার-বার জোর দিয়ে বলেছেন। রায়োকোয়ান বালক বয়সেও কখন মিথ্যা কথা বলেননি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রায়োকোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রায়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরি সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রায়োকোয়ান অত্যন্ত ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা রায়োকোয়ানের আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রায়োকোয়ান বাড়ী ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রায়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, রায়োকোয়ান পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ী এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রায়োকোয়ান বড়-বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাইনি, আমি না দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রায়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রায়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেননি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রায়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়:—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'* দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রায়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রায়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রায়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রায়োকোয়ানের কবিজনসুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রায়োকোয়ান না কি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা† তরুণীর বাড়ীতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা তরুণীরা রায়োকোয়ানকে খুশী করার জন্যে নাচল, গাইল—

---

* রায়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

† 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীয়া।

প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু বায়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার-বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ' টাকা খরচ করে বায়োকোয়ান বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা বায়োকোয়ান বাড়ীর পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল বায়োকোয়ানের মুণ্ডিত-মস্তক আর দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয় স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্যও বায়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার উপর বাড়ী ছেড়ে পাশের কত শহস্রী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ী পড়ে। সে দেখে অবাক, বায়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয় বিনয় করে বলল, "প্রিয়, তুমি এ কি করেছ। তোমার গায়ে এ বেশ কেন ?"

বায়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বজ্রকে ঠেকাতে পারে ?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে বায়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, বায়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম-বসন্তে যে-রকম মধুর শান্ত ভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা, বায়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল ; এক দিকে ঋজু শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্র-তরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—বায়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন না—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তার সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায়নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সন্ন্যাস নেয় না ? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশী, মৃত্যুর ভয়ে
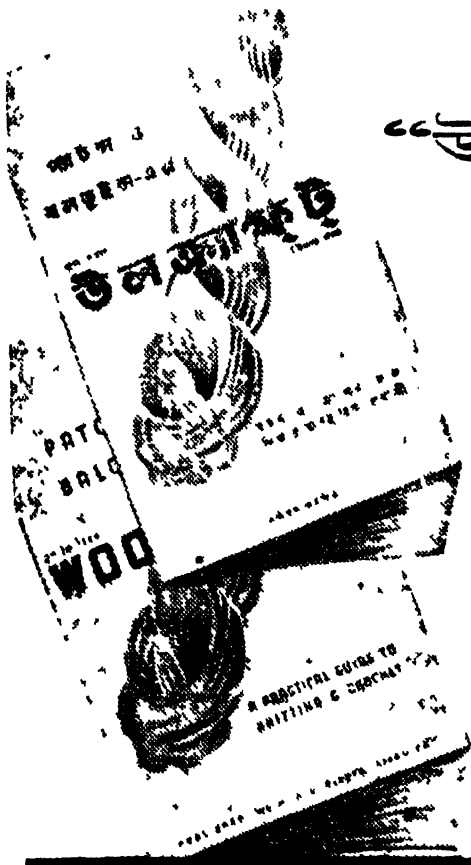
মৃদুলার ত্বক্
কোমল ও কমনীয়
থাকে
লাক্স টয়লেট্
সাবান মেখে
সুন্দরী মৃদুলা বলেন "আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবান ব্যবহার করি ও এই রূপ চর্চ্চাই আমার যথেষ্ট হয়। ইহার চমৎকার সক্রিয় ফেনা আমার ত্বক্‌কে পরিষ্কার রাখে ও কি সুন্দর নির্ম্মল, নরম ও লাবণ্যময় ক'রে দ্যায়। ত্বক্-সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত প্রত্যেক নারীরই উচিত কোমল লাক্স্ টয়লেট সাবান দিয়ে নিয়মিত ধোয়া মোছা করা।"
LUX
TOILET SOAP
লাক্স্ টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 187-193 BG
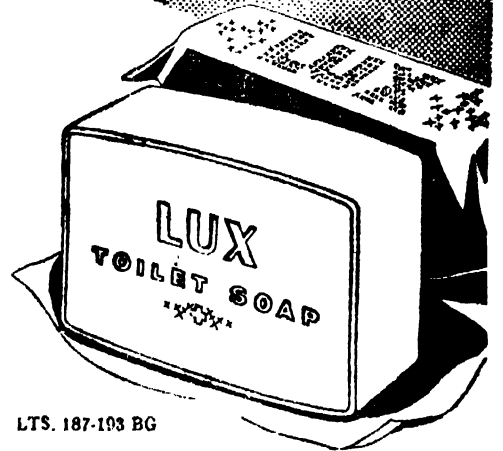
তারা বৈজ্ঞব্যাঙ্কের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈভবের দাস করে তোলে।

গাইদা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রায়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রায়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই তাঁর গাইশা প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন:—

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত সজীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র ; সংসারে প্রণিপাত। (—সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালী জানি। ‘ওরে বেলা যে পড়ে এল’—অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলি কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার না কি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখন তিনি শোনেননি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পাল্কী থেকে বেরিয়ে একবস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তিরও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন্ শুক্তি কোন মুক্তায় মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানলার সামনেই বসল কেন? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, ‘তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ।’ (১, ২১) অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলিও তো দেননি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হবে, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।’

রায়োকোয়ান ঊনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, ‘অপাতদৃষ্টিতে রায়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।’

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোন অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে নয়।

নিজামের স্বাধীনতা-স্বপ্ন

শ্রীসত্যসাধন মুখোপাধ্যায়

আসফ্‌ঝাহী সে বংশ। হায়দ্রাবাদের তক্ত-তাউসে
আছে সুখাসনে নিজামীতে ব'সে কিরীটে শোভিত হীরকের দ্যুতি
মোগল-কুলাবতংশ।

উঠে উতরোল ক্রন্দন। প্রজার দুঃখ বুঝিবে কে হায়
অন্ন নাহি যে, রাজার কি দায় উঠুক লাস্য নৃত্য-ছন্দ
ঐ নূপুরের শিঞ্জন।

কালের কুটিল ধারা। মোগলে-পাঠানে হ'ল সঙ্ঘাত
ভারত-নাট্যে নব ধারাপাত দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী
হয় বৈভব-হারা।

চতুর সে ইংরাজ। কপট যুদ্ধে সন্ধিপত্রে
লাল ক'রে দিল সে মানচিত্রে মারাঠা ও শিখে ফিরিল বিবরে
ছাড়ি তার রণ-সাজ।

শতাব্দী পরপারে। ভারত-গগনে উদিল সূর্য্য
ধ্বনিল গান্ধী নবীন তূর্য্য কাশ্মীর হ'তে কন্যাকুমারী
বিশ্ব-দেউল দ্বারে।

এল বাঞ্ছিত সেই দিন। সন্তান ছিঁড়ি শৃঙ্খল-ভার
মুক্ত আজি রে জননী আবার রাজন্য যত আনে উপহার
একতায় হয় লীন।

নিজাম সে উন্মুক্ত। শ্বেতকায় জাতি তার চাটুকার
রাজা চলে গেছে আছে "রাজাকার" স্বাধীন তাহারা ভারত-যাঝায়
দিবে না কাহারে শুল্ক।

উঠে রব "দীন দীন"। "রাজ্‌ভী" কহিল হায়দ্রাবাদীরে
তোরা যে আরব ফিরে যাবি কি রে আসফঝাহী সে পতাকাটি ছিঁড়ে
মুসলীমে করি হীন।

ছুটে আসি "রাজাকার"। নির্মম ভাবে পশিয়া নগরে
আগুন লাগাল প্রতি ঘরে ঘরে হিন্দু নারীর হরিল লজ্জা
উঠে কলরোল হাহাকার।

দীনা নহে মাতা আর! শুনিলা জননী ক্রন্দন-ধ্বনি
প্রহরণ-করা জাগিল তখনি দিল সন্তানে অভয় কবচ
মা ভৈঃ মন্ত্র তাঁর।

জননীর আহ্বান। ছুটিয়া চলিল ভারত-বাহিনী
রাখি পশ্চাতে বিজয়-কাহিনী হায়দ্রাবাদের স্বাধীন স্বপ্ন
হ'ল চির অবসান।

কংগ্রেস সম্পর্কে নেতাদের উক্তি

গান্ধীনগরে সর্বোদয় প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলিয়াছেন,—"কংগ্রেসসেবীরা আজ তাঁহাদের পূর্ব্বেকার স্বার্থত্যাগ ভাঙ্গাইয়া চলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে নূতন ত্যাগস্বীকার করিবার কোন আগ্রহই দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেস আপনার প্রাচীন নীতি ভুলিয়া গিয়া ক্ষমতা-লোলুপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেসের ভিতর এখন আর সততা নাই।" কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের কংগ্রেসী নেতারা শাসকের আসনে বসিয়াই জাতীয়তাবাদবিরোধী দুর্নীতিপরায়ণ বৃটিশ আমলের আমলাতন্ত্রের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হইয়াছেন। শাসকশ্রেণীতে উন্নতি হওয়ার পর হইতেই দেশীয় রাজন্যবর্গের অশেষ সদ্গুণ তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন। দেশবাসীর মধ্যে আর কোন সদ্গুণই নজরে পড়িতেছে না। তাঁহারা মনে করেন, দেশপ্রেমে তাঁহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এই অবস্থায় আচার্য্য বিনোবা ভাবের কথিত মত উঁচু দরের কংগ্রেসসেবীরা যদি অতি দ্রুত জনগণের আস্থা হারাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এ সত্য কংগ্রেস নেতারা নিজেরা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন,—"দেশের জনসাধারণের কাছে গেলে দেখিতে পাইবেন আমাদের প্রভাব হ্রাস পাইতেছে। অন্য লোকেরা কাজ করিয়া আমাদের স্থলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন।" পণ্ডিতজীর বিশ্বাস, দেশের ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের উপরেই নির্ভর করিতেছে। ভারতের রাজসিংহাসন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার লোভে পণ্ডিতজী যদি মোহগ্রস্ত না হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, কংগ্রেস বৃহৎ-নেতৃত্বের অভ্রভেদী আত্মম্ভরিতা, দেশপ্রেমের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিবার দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ এবং ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইবার ভয়ে অন্যান্য সমস্ত দলকে ধ্বংস করিবার হীন ব্যবস্থাই জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস হওয়ার কারণ। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,—"আমরা সতর্ক না থাকিলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।" ভারতের স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে ভারতের শাসকরূপে বৃহৎ-নেতৃত্বের জন্যই হইবে। দেশের যাহারা প্রাণশক্তি, নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের ধ্বংস করা হইতেছে। বৃটিশ আমলের আমলাতন্ত্র এবং সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের রাজত্ব বজায় রাখিতে চান।

সেই সভায় সর্দ্দার প্যাটেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক-সঙ্ঘ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"গোপনে কার্য্যরত এই প্রতিষ্ঠানকে হিন্দু-সংস্কৃতির ধ্বজাধারী বলিয়া মনে হয়। সরকার ইহাদের চ্যালেঞ্জ সহ্য করিবে না।" তাঁহার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহাদের চ্যালেঞ্জ সহ্য না করার অর্থ কি হিন্দু-সংস্কৃতির বিনাশ করাই নয়? ভারতের ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসীই হিন্দু। সর্দ্দারজীকে এই সাড়ে পঁচিশ কোটি হিন্দুর সংস্কৃতি বিনাশ করিবার অধিকার কে দিয়াছে? তিনি মনে করেন, ভারতের শত্রু ভারতের ভিতরেই রহিয়াছে। এই শত্রু কাহারা তাহা তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু যে ভাবে বিরোধী দলগুলিকে ধ্বংস করা হইতেছে, তাহাতে কাহাদের তিনি শত্রু বলিয়া মনে করেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না! তাহাদের গুলী করিতেও যে তিনি দ্বিধা করিবেন না, সে কথাও তিনি জানাইয়া দিতে ভুলেন নাই। এই সর্দ্দারজী আবার মহাত্মাজীর আদর্শের কথা বলিয়াছেন এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী চলাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। মহাত্মাজীর আদর্শের অনুকরণ এবং গুলী করিতে চাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

নবনির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"কেবল স্বাধীনতা লাভ করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। এখন আমাদের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করিতে হইবে।" কেবল ফাঁকা বড়-বড় বুলি! স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কাহারা?—কেবল কংগ্রেসী নেতারা; জনসাধারণ নহে। সর্দ্দার প্যাটেল পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, জনসাধারণের মুখে তিনি সততার দীপ্তি দেখিতে পাইতেছেন না। অন্ন-বস্ত্র অভাবে জর্জ্জরিত দেশবাসীর অবস্থা এক চুল উন্নত হয় নাই। যে কংগ্রেস নিজের দেশের জন্যই কিছু করিতে পারিল না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা তাহার পক্ষে চিন্তা করা ধৃষ্টতা মাত্র!

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়া আমরা একান্তই নিরাশ হইয়াছি। আশা করিয়াছিলাম, দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের অব্যর্থ পথের সন্ধান দিবেন, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নীতি ডিফাইন করিবেন, কিন্তু অভিভাষণে তাহার কিছুই নাই। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির যে বিবরণ তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বোধ হয় এ সকল বিষয় ভাবিবার কোন সময়ই পান নাই অথবা কিছুই বুঝেন না। তাঁহার অভিভাষণে আছে কেবল কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের পক্ষে ওকালতি। তাও নিপুণতার সহিত নহে। ডাঃ পট্টভী বৃহৎ নেতৃত্বেরই লোক, সুতরাং তাঁহার অভিভাষণ এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। পররাষ্ট্র-নীতি, ঘরের কথা, দেশীয় রাজ্য, শ্রমিক-সমস্যা, পল্লী পুনর্গঠন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ইত্যাদি বহু কথাই তিনি বলিয়াছেন কিন্তু কোনটাই তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি অথবা তীক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই। পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি যেন তাঁহার বক্তব্যই খুঁজিয়া পান নাই। বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্বন্ধের কথা বলিতে যাইয়া

স্ববিরোধী-উক্তি করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশক্তির অস্বচ্ছ অবস্থাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমর্থন করিয়াছেন। আবার এই রাজতন্ত্রের অধীনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বিলোপ করিতে চাহিয়াছেন। শ্রম ও শ্রমিকের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করিয়া তিনি তাঁহার শ্রমিক-হিতৈষণার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান। তাহা ছাড়া কেবল কি-কি শ্রমিক আইন পাশ হইয়াছে, তাহাই আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। ভাষাগত প্রদেশ গঠনের কথা বলিতে যাইয়া তিনি মূল বিষয়কেই এড়াইয়া গিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে কংগ্রেসী শাসকদের অরুচি সম্বন্ধে একটি কথা বলিবারও সাহস তাঁহার হয় নাই। কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতির এমন অভিভাষণ পড়িবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আমাদের কখনও হয় নাই।

আচরণের মান

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ "সাধারণের সহিত আচরণের মান" সংক্রান্ত যে-প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তাহাতে বলা হয়,— "সমস্ত কংগ্রেসসেবী এবং বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে এইরূপ সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং আচরণের উচ্চমান রক্ষা করিতে হইবে।" ইহা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্তাব এবং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও। এই প্রস্তাবের যে সকল সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেশদত্ত মিশ্রের সংশোধন প্রস্তাবটি ১০৭-৫২ ভোটে গৃহীত হয়। সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি এইরূপ দাঁড়ায়: "সমস্ত কংগ্রেসসেবী, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ অধিকতর বিশেষ ভাবে মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং আচরণের উচ্চমান রক্ষা করিতে হইবে।" এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন পণ্ডিত নেহরু অথবা সর্দ্দার প্যাটেল উপস্থিত ছিলেন না। পরদিন পণ্ডিত নেহরুর এক-চোখরাঙানী এবং সর্দ্দার প্যাটেলের এক ধমকে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির সদস্যরা সুড়সুড় করিয়া তাহা বাতিল করিয়া পণ্ডিত নেহরুর সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাবে "কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ এবং অধিকতর বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ" এই বাক্যাংশ বাদ দিবার কথা বলা হয়। শেষ পর্য্যন্ত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাহা এইরূপ: "সমস্ত কংগ্রেসসেবীকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং আচরণের উচ্চমান রক্ষা করিতে হইবে।" পণ্ডিত নেহরু মহেশ বাবুর প্রস্তাবকে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহেশ বাবু পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহরুর সংশোধন প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভোটাধিক্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"A number of ammendments were moved and speeches made which were nonsensical." বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশনের পর যখন তিনি শুনিলেন যে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"What is this nonsense? Who has changed the programme of the session?" দেখা যাইতেছে, তাঁহার মত না লইয়া যাহা করা হয় তাহাই "ননসেন্স।" ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বসিয়া স্বদেশবাসীর সহিত ব্যবহারেই নয়, বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের সহিত ব্যবহারেও শিষ্টাচার রক্ষা করা পদ-মর্য্যাদার উপযুক্ত বলিয়া তিনি মনে করেন না। আশ্চর্য্য যে, অন্যান্য সদস্যগণ এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন।

প্রস্তাবের "সমস্ত কংগ্রেসসেবী" কথাটিতে পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী কোন আপত্তি করেন নাই। আপত্তি কেবল "মন্ত্রিসভার সদস্যগণ" কথাটিতেই, তাঁহারা বোধ হয় নিজেদের কংগ্রেসসেবী বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বৃহৎ-নেতৃত্বের অর্থাৎ কংগ্রেসের কর্ত্তা। সুতরাং তাঁহারা যে কংগ্রেসসেবীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, এই জ্ঞানটি তাঁহাদের খুব টনটনে। যে বিরাট তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা কংগ্রেসসেবীদিগকে দেখিয়া থাকেন তাহাতেই কি বুঝা যায় না যে, ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু গলদ রহিয়াছে?

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া সেই সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিশন সর্ব্বপ্রধান যুক্তি দেখাইয়াছেন, —"বর্ত্তমানে ভারতকে একটি জাতিরূপে গঠন করিয়া তোলাই মুখ্য প্রয়োজন। ভারতে যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইতেছে এবং যে বহুবিধ সমস্যার আশু সমাধান আবশ্যক, তাহাদের সবগুলিকেই ঐ মুখ্য প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। যাহাই জাতীয়তা বৃদ্ধির সহায়তা করিবে তাহাকেই অগ্রে স্থান দিতে হইবে এবং যাহা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।" "একজাতীয়তার" নাম করিয়া আজ কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন নেতারা এবং তাঁহাদের ইচ্ছামত তদন্ত কমিশন যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে জাতীয়তাবাদের মৃত্যু হইবে এবং তাহার স্থান লইবে সাম্রাজ্যবাদ। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কি তবে এত দিন ভুল করিতেছিলেন? এই প্রশ্নেরই যেন উত্তর দিতে গিয়া কমিশন লিখিয়াছেন, "১৯২১ সাল হইতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের অনুকূলে কংগ্রেস মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম চালাইতেছিলেন, আজ কংগ্রেসই দেশের কর্ণধার এবং শাসক। গণপরিষদ এই রায়কেই মানিয়া লইবেন কি না জানি না, কিন্তু মানিয়া লইলে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরোধের একটা চিরস্থায়ী বীজ বপন করা হইবে সন্দেহ নাই। এ সত্য কংগ্রেসের বৃহৎ-নেতৃত্বও উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই জনমতকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গান্ধীনগরে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, একই ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলির বর্ত্তমান সীমানা প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন সম্পর্কে দীর্ঘ দিন যাবৎ জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দৃঢ় ইচ্ছা সম্পর্কে কংগ্রেস অবগত আছেন এবং আদর্শ হিসাবে উক্ত নীতি মানিয়া লইয়াছেন। গণপরিষদের সভাপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিশন

যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাধীনতা লাভের ফলে যে নূতন সমস্যাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং অতীতে কংগ্রেস যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ও বর্ত্তমানের আলোকে অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য তিন জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করিতেছেন :—(১) ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া (২) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (৩) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কমিটি তিন মাসের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। আমাদের শুধু বক্তব্য, বে-সরকারী নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করিলেই ভাল হইত। পণ্ডিতজী এবং সর্দ্দারজীর মনোভাব আমরা জানি। আর নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট যে তাঁহাদের ছায়া মাত্র তাহাও বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সুতরাং ফলাফল এখন হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কমনওয়েলথ ও কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল,—"বিশ্বশান্তির রক্ষার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্য সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে। বিশ্ব-রাজনীতিতে কোন সাময়িক দলাদলির মধ্যে ভারত জড়াইয়া পড়িবে না। এশিয়ার দেশগুলির সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ ভাবে করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যেহেতু সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই হেতু বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের সহিত ভারতের বর্ত্তমান সম্পর্কের স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু ভারত সকলের সহিতই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে ইচ্ছুক; সুতরাং বিশ্বশান্তি ও পরস্পরের উন্নতির জন্য কমনওয়েলথের স্বাধীন দেশগুলির সহিত স্বাধীন ভাবে সকল প্রকার সম্পর্ক বজায় রাখিতে কংগ্রেস ইচ্ছুক।" প্রস্তাবের ভাষা যতটা সম্ভব ঘোঁয়াটে এবং তাহা ইচ্ছাকৃত। "কমনওয়েলথের সহিত বর্ত্তমান সম্পর্কের পরিবর্ত্তন" বাক্যাংশে মনে হয়, ভারত বোধ হয় কমনওয়েলথ হইতে বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মদেশের মত বন্ধুত্ব সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এবং পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রস্তাবটির আলোচনা কালে অধ্যাপক সাকসেনা কমনওয়েলথ হইতে সোজাসুজি বাহির হইয়া আসিবার পরামর্শ দেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস প্রস্তাব হইতে "কমনওয়েলথের সহিত সহযোগিতা করার" অংশটুকু বাদ দিতে বলেন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও প্রস্তাব করেন যে, "কমনওয়েলথ যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বর্ণ বা অন্যান্য কারণে পার্থক্য না করে" কেবল তবেই কমনওয়েলথের সহিত সহযোগিতা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হউক। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন,—"কংগ্রেস বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কংগ্রেস দেশকে নিরপেক্ষ রাখিতে চাহে। ভারত যদি নিজের আদর্শ ঠিক রাখিয়া কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি কি?" পণ্ডিত নেহরু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"আজিকার জগতে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। বস্তুত পক্ষে কোনও দেশই বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যাঁহারা ভারতকে কমনওয়েলথের বাহিরে লইয়া আসিতে বলেন, তাঁহারা বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে চান।" মূল কথা, কংগ্রেস বৃহৎ-নেতৃত্ব এবং ওয়ার্কিং কমিটি ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যেই রাখিতে চা'ন। পণ্ডিত পন্থ আবার অতিরিক্ত বীরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন—"কমনওয়েলথে থাকিতে এত ভয় কিসের? আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। পৃথিবীর কোন শক্তিই আজ আমাদের নীতিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।" কিন্তু জাতিসঙ্ঘের ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুদের মুখ চাহিয়াই যে কাশ্মীরে হানাদার বিতাড়ন বন্ধ রাখিতে ভারত স্বীকৃত হইয়াছে, এ কথা তো এত শীঘ্র ভুলিবার নয়। বৃটিশ কমনওয়েলথের মুখ চাহিয়াই যে ভারতের বৃটিশ ধনপতিদের কেশাগ্র স্পর্শ করা হয় না, তাহা ভারত সরকারের অর্থসচিব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বক্তৃতার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া সত্য অবস্থা গোপন করা কিছুতেই যাইবে না। এই সম্পর্কে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরাতন বন্ধু মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে লণ্ডনে ভারতীয়দের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সমগ্র এশিয়া বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে ভারতবর্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া সকলে আশা করেন। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তাহার পক্ষে যে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনামের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হইয়া উঠিবে, সে কথা আজ তাহার উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ এবং বিশ্বের ক্ষমতালোলুপ রাজনীতি-চক্রে জড়াইয়া পড়া—এই দুইটি জিনিষ পরস্পরবিরোধী।" প্রকৃত পক্ষে এ দেশের অনেকেই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিত নেহরু সমেত কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতম নেতারা সে-সব কথায় কর্ণপাত করা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মিঃ ব্রকওয়ে বহু কাল পণ্ডিত নেহরুর ভক্ত ছিলেন এবং বৃটিশ আমলে চিরদিন কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। এখন কংগ্রেসের কথা বলিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"একদলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও একদলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।" প্রকৃতপক্ষে আশঙ্কা রহিয়াছে বলিলে সবটুকু বলা হয় না। আজ এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন,—"কোন বৈদেশিক শক্তির এশিয়াতে এবং বলা বাহুল্য ভারতেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থাকিতে পারিবে না। এই সব বিদেশী অধিকৃত স্থানগুলিকে অবশ্যই রাজনৈতিক দিক্ হইতে ভারতের সহিত যোগদান করিতে হইবে। ভারতকে এই নীতিই অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ, এ দেশের বুকে বিদেশী অধিকার আমরা সহ্য করিতে পারি না।" ভারত সরকার যদি সত্যই এই নীতি অনুসরণ করেন তবে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কবে তাঁহারা এই শুভ সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহাই প্রশ্ন। ভারতের বুকে আজ ফরাসীরা মাহের জনসাধারণকে নির্য্যাতন করিতেছে; পর্ত্তুগালের ক্ষুদে

সাম্রাজ্যবাদীরা পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থানের অধিবাসীদের হুমকী দিতেছে। এই অবস্থায় দূর হইতে শুধু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে নির্য্যাতিত ব্যক্তিদের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা

কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কালে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন,—"ভারত অবিরত ধারায় আশ্রয়-প্রার্থী আগমন কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। পাকিস্তান যদি সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বসবাসের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে না পারেন, তবে ভারত মুখ বুজিয়া কিছুতেই তাহা সহ্য করিবে না।" অসহ্য হইলে কি করিবেন সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নাই। পাকিস্তান সংখ্যালঘু সমস্যা বলিতে আজ শুধু পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যাই বুঝায়, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যালঘু বলিতে আজ কেহই অবশিষ্ট নাই। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পূর্ব্ববঙ্গের কথা ভাবিয়া দেখিতে নারাজ। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"পাঞ্জাবী ও সিন্ধিরা তবু মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীরা শুধু কাঁদিতেই জানে।" বাঙ্গালীরা না হয় কাঁদিতেই জানে, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কর্ণধারগণ এ পর্য্যন্ত নাকে কাঁদুনী ও পাকিস্তানের নিকট আবেদন-নিবেদন ছাড়া আর কি করিয়াছেন? ডোমিনিয়ন সম্মেলনে আসল সমস্যার কোন সমাধান হইল না, শুধু কয়েকটি মুখরোচক সুমিষ্ট প্রতিশ্রুতিতে ভারত ও পাকিস্তানের কর্ত্তারা সহি করিয়া গেলেন। পাকিস্তানের কর্ত্তারা যদি তাঁহাদের স্বভাবসুলভ মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বেকার মত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে থাকেন, ভারত সরকার কি করিয়া তাহার প্রতীকার করিবেন? পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যার পর ভারতে যে সব আশ্রয়প্রার্থী ইতিমধ্যেই আসিয়াছে তাহাদের পুনর্বসতি সম্পর্কে সর্দ্দারজী বলিয়াছেন,—"গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করিবেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।" কিন্তু তাহারা যাইবে কোথায়? সর্দ্দারজী তো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের মান-সম্ভ্রম আজ বিপন্ন। কেবল সম্মেলনের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যাওয়া সম্ভব কি? পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্য কোন কিছু করিবার দায়িত্ব এই ভাবে অস্বীকার করার পর বাকী রহিল পশ্চিম-পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের কথা। সে সম্বন্ধেও যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই সর্দ্দারজী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে আশ্রয়প্রার্থীরা আজ অনাহারের সম্মুখীন হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের কাজে বাহবা দিতে ক্রটি করেন নাই। নির্লজ্জ তোষণকেও বলিহারী! মাত্র তিন মাস সময়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য যদি গান্ধীনগর তৈয়ারী হইতে পারে এবং তার জন্য অর্থের অভাব না হয় তবে বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয় না কেন? সর্দ্দার প্যাটেল গবর্ণমেণ্টের নীতি ব্যক্ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আশ্রয়-প্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ আছে বলিয়া যাঁহারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কথা বলেন তাঁহারা ভুল করেন। ভারতে চীন, মালয় বা ব্রহ্মের অবস্থার পুনরাবৃত্তি গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। দেশের শান্তি যে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকেই কঠোর হস্তে ধ্বংস করা হইবে।" কিন্তু সমস্যার সমাধানে অক্ষম হইলে শুধু দমন-নীতিতে দেশের শান্তি বজায় রাখা কি সম্ভব হইবে?

কংগ্রেসের স্বরূপ

যে দেশে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী এখনও গৃহহীন, যে দেশের প্রত্যেক সহরে বাসগৃহের একান্ত অভাব, কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবাসীকে ব্যয়-বাহুল্য ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রতার সহিত জীবন যাপন করিতে অনুরোধ গৃহীত হইয়াছে, সেই দেশে তিন দিনের জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তোলা হইয়াছিল একটা অস্থায়ী বিরাট সহর। শোনা যাইতেছে, এই সহর তুলিবার এবং ভাঙ্গিবার ভার পাইয়াছেন বড়কর্ত্তাদেরই এক জন পোষ্য। আরও শোনা যাইতেছে যে, যদিও আটা ময়দা ঘী ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য কণ্ট্রোল দরেই সরকারের সাহায্যে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রতিনিধিদের আহারের জন্য গলা-কাটা দরে মূল্য দিতে হইয়াছে। কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠানে অর্থের এইরূপ অপব্যয় এবং ন্যায্য মূল্যের এত অধিক চার্জ্জ সত্যই চিন্তা করা যায় না। জয়পুর কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক লৌকিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে গড়িয়া তোলা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের জন্য, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ইহার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি বোঝা যায় না। তবে অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মনে হয় বৃহৎ-নেতৃত্বের শ্রেণিহীন গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনাবিলাস যেন দরিদ্র দুর্গত জাতিকে নিষ্ঠুর পরিহাস।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে কতকগুলি খাঁটি সত্য অনাবৃতরূপে দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বোধ হয় কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনের ইহাই প্রধান সার্থকতা। এই অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট বা মন্ত্রিসভার সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ কি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের বৃহৎ-নেতৃত্ব কোন স্তরে নামাইয়াছেন তাহাও পরিস্ফুট। পররাষ্ট্র-নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের এক অংশে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইতে পারে এরূপ কোন সামরিক চুক্তিতে ভারত আবদ্ধ হইবে না এবং অপর অংশে বলা হইয়াছে যে, ভারত কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের সহিত স্বাধীন সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিবে, ইহা কংগ্রেস অনুমোদন করিতেছেন। ইহার মধ্যে যেটুকু অস্পষ্টতা ছিল, পণ্ডিত নেহরু তাহা তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ১৯২১ সালে লাহোরে কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই পণ্ডিতজীই ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"ভারত কখনও কমনওয়েলথের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন সদস্য হইবে না, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস যে কোন আকারে ভারতে প্রযোজ্য হউক না কেন, তাহা আমাদিগকে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না।" আর আজ কমনওয়েলথে থাকিবার জন্য বুলোবুলি! পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন,—"অন্যান্য দেশের সহিত ভারতকে সংযুক্ত রাখা আমি সমর্থন করি না। বর্ত্তমানে পৃথিবী বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এই অবস্থায় কোন দেশের সহিত সংযুক্ত

থাকার অর্থ ভারতের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা।" অথচ বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সংযুক্ত থাকা সমর্থন করিয়া সেই সর্বনাশই তাঁহারা ডাকিয়া আনিতেছেন সমগ্র দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন এবং কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে ১৬টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রস্তাব আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, এই সকল বিষয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র। প্রস্তাবগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার প্যাটেলের নির্দ্দেশ অনুসারে রচিত হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, এবারের কংগ্রেস শুধু পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার প্যাটেল ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার প্যাটেল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে মন্ত্রীর আসনে বসিয়া যাহা করিতেছেন কংগ্রেসে আসিয়া বৃহৎ-নেতৃত্বের আসন হইতে তাহাই কংগ্রেসকে দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতেছেন। সমর্থন করিতে সামান্য আপত্তি করিলে অথবা তাঁহাদের অমনোমত কিছু করিলে চোখ রাঙাইয়া, গাল-মন্দ করিয়া, পদত্যাগের হুমকী দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের কাজ হাসিল করিয়াছেন। জয়পুর কংগ্রেসের হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায়,—কংগ্রেস বৃহৎ-নেতৃত্বের জমীদারী।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া কমিটি গঠিত হইবে :—(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, (২) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, (৪) জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই, (৫) শ্রীজগজীবন রাম, (৬) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, (৭) সর্দ্দার প্রতাপসিং, (৮) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (৯) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (১০) শ্রীশঙ্কররাও দেও, (১১) শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, (১২) মাদ্রাজের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকালাবেঙ্কট রাও, (১৩) বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীএস, কে, পাতিল, (১৪) অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীএন, জি, রঙ্গ, (১৫) তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, (১৬) আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা, (১৭) কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা মহীশূর রাজ্য, (১৮) রাজপুতানা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীগোকুলভাই ভট্ট, (১৯) শ্রীরাম সহায় (গোয়ালিয়র, মালব)।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীকালাবেঙ্কট রাও ও শ্রীশঙ্কররাও দেও সাধারণ সম্পাদক হইবেন।

শাসক রাজনৈতিক দলের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে যেরূপ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সম্ভব, ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া যে সেইরূপ ওয়ার্কিং কমিটিই গঠন করিয়াছেন, সে কথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু অনেক ভাবিয়াও নাম-নির্ব্বাচনের মধ্যে কোন নীতির পরিচয় আমরা পাইলাম না। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী তো থাকিবেনই, কারণ শিবহীন যজ্ঞ সম্ভব নয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও বোধ হয় বৃহৎ-নেতৃত্বের মধ্যেই পড়েন। কাজেই তিনি না থাকিলে চলিবে কেন? যুক্তপ্রদেশ হইতে পণ্ডিত নেহরু, জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই থাকা সত্ত্বেও আবার পণ্ডিত পন্থকে লওয়া হইল কেন? পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষই বা কেন নির্ব্বাচিত হইলেন? প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির স্থান কমিটিতে থাকা উচিত ছিল। আচার্য্য কৃপালনী কি জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। তাঁহারই পত্নীকে কমিটিতে লওয়া হইল কেন এবং তিনি রাজী হইলেনই বা কি করিয়া বোঝা যায় না। যে সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিনা বাক্যব্যয়ে বৃহৎ-নেতৃত্বের হুকুম তামিল করিবেন, তাঁহাদিগকেই লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যাহাতে মতভেদের সামান্য অবসরও না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার প্যাটেল পরিচালনা করিবেন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, তাঁহারাই আবার নেতৃত্ব করিবেন ওয়ার্কিং কমিটিতে। সরকারের কার্য্যকলাপ কংগ্রেসের (অর্থাৎ জনসাধারণের?) অনুমোদন লাভ করিবে। ইহার পর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।

ভারত পাকিস্তান চুক্তি

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই নূতন চুক্তি আসলে পূর্ব্বের চুক্তিগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘ দিন ধরিয়া মুসলিম লীগকে তোষামোদ করিতে করিতে তোষামোদ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের শাসকবর্গের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। যখনই তাঁহারা বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারত গবর্ণমেণ্ট একমত হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, পাকিস্তানের সর্ত্তাবলী ভারত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন, পাকিস্তান ভারতের সর্ত্তাবলী স্বীকার করেন নাই। আমাদের নেতাদের আর একটা দুর্ব্বলতা আছে। হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কোন কথা বলিতে তাঁহারা ভয় পান, পাছে তাঁহাদের অসাম্প্রদায়িকতার জাত যায়। ফলে কলিকাতা চুক্তির পূর্ব্বে এবং পরে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা যাহা ছিল, নূতন চুক্তির ফলেও তাহাই রহিয়া গেল। প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তথ্য সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক ডোমিনিয়নের এক জন মন্ত্রী, অনধিক দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী, সংবাদপত্রের দুই জন প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি শুধু সংবাদপত্রই নয়, পুস্তক ও অন্যান্য প্রচারকার্য্য, বেতার, ছায়াচিত্র প্রভৃতির উপরেও দৃষ্টি রাখিবে। ফল যাহা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতে সত্য সংবাদও প্রকাশ করা চলিবে না আর পাকিস্তানে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ চলিতে থাকিবে। স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য গত এক বৎসরে ভারত বহু ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের মন গলে নাই। ভবিষ্যতেও যে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে সে সম্বন্ধেও কোন ভরসা নাই। না করিলে ভারত সরকার কি করিবেন তাহারও ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব অবস্থা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্'।

বিদেশী বণিক

কলিকাতায় বিদেশী বণিক সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত সরকারের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে জিনিস-পত্রের মূল্য যুদ্ধ-পূর্ব্ব আমলের মূল্যের তুলনায় এমন কিছু বেশী নহে। বিশেষতঃ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে মূল্য যেরূপ দাঁড়াইবে, বর্ত্তমান মূল্য তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নহে।" যুদ্ধপূর্ব্বের মূল্যের তুলনায় বর্ত্তমান মূল্য অন্ততঃ ছয় গুণ এবং যদি এই মূল্য না কমে দেশবাসীর অবস্থা কি শোচনীয় হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থসচিবের সত্য উক্তি প্রণিধানযোগ্য! সরকারের মুদ্রাস্ফীতি রোধের চেষ্টার ফলে জিনিষ-পত্রের মূল্য যে ভবিষ্যতে বিশেষ কমিবার আশা নাই, তাহাও এই উক্তি হইতে বুঝা যায়। দেশের মধ্যে যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তখন একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব বলিয়াই ডাঃ মাথাই মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন? ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতিরোধের নামে নূতন শিল্পের উপর করভার হ্রাস করিয়া, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা-করের মজুত অংশের পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া, শিল্প জাতীয়করণের প্রশ্ন দশ বৎসর পিছাইয়া দিয়া শিল্পপতিদের প্রচুর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শিল্পপতিরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। বিদেশী বণিকদের মুখপাত্র মিঃ বেস্থ দাবী করিয়াছেন—করভারে শিল্পপতিরা মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছেন, সুতরাং শিল্পের উপর আয়কর আরো কমাইতে হইবে; ব্যবসায়ীরা যাহাতে আরো লাভ করিতে পারেন তাহার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে; শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে; ট্রাইবুনাল শ্রমিকদের যাহাতে অত্যধিক বেতন বরাদ্দ না করেন তাহা দেখিতে হইবে; শ্রমিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। এক কথায় ব্যবসায়ীদের অবাধ লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত না করিয়া দিলে দেশের কোন উন্নতির আশা নাই।

কোন স্বাধীন দেশেই বিদেশী বণিক-শ্রেণীকে দেশ-শোষণের অধিকার দিতে পারে না। এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ বরাবরই বৃটিশ কল-কারখানাগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবী করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু জনপ্রিয় স্বদেশী সরকারের বিদেশী বণিক-প্রীতি অসীম। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অভয় দিয়া ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন,—"ভারতে বৃটিশ বণিক-স্বার্থের গায়ে আঁচড়টুকু লাগে এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ভারত সরকারের নাই। বরং ভারত ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই বলিয়াই আপনাদের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উন্নতি লাভ করে, তাহাই আমরা আনন্দের সহিত করিব।" অর্থাৎ ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকিবে এবং সেই কারণে ভারত সরকার ভারতে বৃটিশ শোষণ-ব্যবস্থার কেশস্পর্শও করিতে পারিবেন না। যে শোষণ ব্যবস্থার অবসান এ দেশের লোক চিরকাল চাহিয়াছে, তাহারই শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছেন ভারত সরকারের মেম্বগণ।

টিম-ওয়ার্ক

জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রীজগজীবন রামকে জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা করিয়া পাঠান হয়, আবার শিল্পপতিদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্দ্দারজী এবং রাজাজীকে ছুটিতে হয়। দুই দলকেই হাতে রাখিতে হইবে, কাহাকে চটাইলে চলিবে না। ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রী বোম্বাই শ্রমিকদের এক সভায় খুব গরম-গরম বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"এ দেশের ধনিক-শ্রেণী স্বদেশপ্রেমিক ও ভারতের স্বাধীনতাকামী বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, লাভের অঙ্ক ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছুই বুঝিতে পারেন না।" ঘন-ঘন করতালি! কিন্তু লোক ইহাতে খুশী হইলেও "ভারত-ভাগ্যবিধাতা" শেঠজীরা হয়ত চটিতে পারেন। তাহা হইলে কংগ্রেস চলিবে কি করিয়া? অতএব সর্দ্দারজী এবং রাজাজী আবার শেঠজীদের তোয়াজ করিতে যান। রাজাজী বলেন,—"ছেলে-ছোকরা মন্ত্রীরা যাহাই বলুন কেন, আপনারা যেন ভয় পাইবেন না। মন্ত্রীরা যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে নৈরাশ্য এবং অনিশ্চয়তা আছে বটে কিন্তু তাহা কেবল কথার কথা। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় তাঁহারা বক্তৃতা দিবার যে অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করা খুব সোজা নয়। কাজেই মন্ত্রীদের কথার উপর আপনারা অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করিবেন না।" কিন্তু রাষ্ট্রপাল হওয়া সত্ত্বেও রাজাজী পূর্ব্বেকার মত বক্তৃতার অভ্যাস এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। তাই বোধ হয় তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকরা যে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কেন তাহারা করিবে? যে অবস্থায় তাহারা দিন যাপন করিতেছে, তাহাতে আমিও কর্ত্তব্য পালন করিতাম না।" বলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন,—"যাহা আমি শ্রমিকদিগকে বলিব তাহা শিল্পপতিদের বলিবার অথবা যাহা শিল্পপতিদের বলিব তাহা শ্রমিকদের নিকট বলায় কোন সার্থকতা নাই।" অর্থাৎ দু'জনেরই মন রাখিব। কিন্তু এইরূপ দু'মুখো নীতি দেশের পক্ষে সত্যই কল্যাণকর বলিয়াই কি তিনি মনে করেন?

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৫০ সালে ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার প্রস্তাব ২৪শে পৌষ ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে লোক-সংখ্যারই শুধু পরিবর্ত্তন হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, বোম্বাই, এমন কি যুক্তপ্রদেশেও জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক গঠনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কতকগুলি ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়কে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশে এই সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা যদি নির্ভুল ভাবে জানা না হয় এবং ১৯৪১ সালের লোক-গণনা অনুসারে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে যদি ঐ সকল সম্প্রদায়ের সদস্য নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব হওয়ায় লোকের মনে যে সন্দেহ ও অসন্তোষ জাগ্রত হইয়াছে, আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ তাহা উপেক্ষা করিতে

পারেন নাই। অনেকে মনে করিতেছেন যে, খুব শীঘ্র সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহা আমাদের রাষ্ট্র-নায়কগণের অভিপ্রায় নয়। এইরূপ সন্দেহ যাঁহাদের মনে জাগিয়াছে, তাঁহাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়করা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহাদের ক্ষমতাকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, যাহাতে নির্ব্বাচনে তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী জয় হয়। অবশ্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা সত্বর করিলেও এ কথা বলিতে পারা যায় যে, কংগ্রেসের প্রতি লোকের মনোভাব বিরূপ হওয়ার পূর্ব্বেই সাধারণ নির্ব্বাচনটা তাঁহারা সারিয়া ফেলিতে চান। ১৯৫০ সালে যত শীঘ্র সম্ভব সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন কোন কথা নাই যে ১৯৫০ সালেই সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। নির্ব্বাচন হওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা করা হইলেই যে নির্ব্বাচন হইবে, এমন কোন কথা নাই এবং গৃহীত প্রস্তাবেও এমন কোন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে যে গুরু দায়িত্ব উপস্থিত করিয়াছে তাহা সম্পাদনের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকিলে উহা ফ্যাসিজম ছাড়া আর কিছুই হয় না, এ কথা দেশবাসীর উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কংগ্রেসী শাসকগণ এই এক বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে সকল বিরোধী দল ধ্বংস করিয়াছেন। যেগুলি এখনও টিঁকিয়া আছে তাহা এতই হীনবীর্য্য যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান গণপরিষদের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের অনুকূল নহে। উহাকে বর্জ্জন করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র গঠন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সকলের গ্রহণযোগ্য ভাষা গ্রহণ, এই কয়েকটি দাবী লইয়া আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য এখন হইতেই আয়োজন হওয়া আবশ্যক।

কাশ্মীর

১লা জানুয়ারী মধ্যরাত্রি হইতে কমিশন যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিয়াছেন এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এখন কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে গণভোটের উপর। জাতিসঙ্ঘের গণভোট-সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে,—(১) আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং সকলের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বশালী কাহাকেও গণভোট পরিচালক নিযুক্ত করা হইবে; (২) আগষ্ট প্রস্তাবের প্রথম দুই অংশ কার্য্যকরী করার পর কমিশন যদি মনে করেন যে রাজ্যে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে, তখন কমিশন ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত ও কাশ্মীর সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন; (৩) হাঙ্গামার দরুণ যাহারা রাজ্য ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের লইয়া দুইটি সাব-কমিশন গঠিত হইবে। জাতিসঙ্ঘ আজ ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত-ধরা প্রতিষ্ঠান মাত্র; সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেল কাশ্মীর-গণভোট পরিচালক নিযুক্ত করিবেন। গণভোট গ্রহণের ব্যাপারে শেখ আবদুল্লার গভর্ণমেণ্ট নিরুপায় দর্শক মাত্র। যে সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত বিভাগ করিয়াছে, কাশ্মীরের যুদ্ধে পাকিস্তানকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই এক জন প্রতিনিধি গণভোট গ্রহণ কালে কাশ্মীরের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া বসিবেন। সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষে আপত্তি করিবার আর কি থাকিতে পারে? ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত জাতিসঙ্ঘের সর্ত্তের সব চেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, কাশ্মীর ও জম্মুর পাকিস্তান-অধিকৃত অংশে কার্য্যতঃ পৃথক্ গণভোটের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কবলে পড়িয়া ইন্দোনেশিয়ার যে দুর্গতি হইয়াছে, কাশ্মীরেরও সেই দুর্গতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আইনতঃ গণভোটের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভারত সরকার গণভোটের ফাঁদে পা দিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে হানাদার বিতাড়নের বারংবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ-বিরতি করিয়া সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন! বস্তুতঃ ভারত সরকার যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তাহা আত্মহত্যারই পথ বলিয়া আমাদের আশঙ্কা!

শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র। ১৯১৯ সালে এম, এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন—স্কুলে ও কলেজে ইনি নেতাজীর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। ১৯২১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়া যথাক্রমে

কটক র‍্যাভেনশ কলেজের এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল-কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৬ সালে মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া তৎপরে বিভিন্ন স্থানে সব-জজ এবং এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট জজের কাজ করিয়া ১৯৪৭ সালে কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা ছোট আদালতের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি। ইনি ধর্ম্মপ্রাণ রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি

৺নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি

শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখার্জ্জী সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সমগ্র ভারতে তিনিই

সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বিচারপতি। বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। আইনজীবী হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা আশা করি, বিচারপতিরূপে তিনি অধিকতর খ্যাতি ও সুনাম লাভ করিবেন।

মোহিনীমোহন বর্ম্মণ

১৬ই পৌষ শুক্রবার রাত্রিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ আর্টীস্যাল হোমে আর্দ্দালী কর্ত্তৃক রিভলভারের গুলীবর্ষণে গুরুতর আহত পশ্চিম-বঙ্গের আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মোহিনীমোহন বর্ম্মণ ১৭ই পৌষ শনিবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তিনি জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ চন্দনবাড়ী গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীগঞ্জ হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সিটি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভার আইন-সচিব ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথমে রাজস্ব-সচিব ও পরে আবগারী বিভাগের মন্ত্রী হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী

২৫শে পৌষ রাত্রি ৮ টা ৪৫ মিনিটে 'বম্বে ক্রনিক্যাল' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে তিনি 'বম্বে ক্রনিকাল' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগদান করেন। তখন হইতে এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে সম্পাদক হন। তিনি কংগ্রেসের বিশিষ্ট সেবক ছিলেন; আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কয়েক বার কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে মাদ্রাজে ও ১৯৪৫ সালে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বোম্বাই সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ভারতের বড়লাটকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত এক জন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দেশহিতব্রতীকে হারাইল।

জি, এ, নটেশান

মাদ্রাজের বিশিষ্ট সাংবাদিক, 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'র সম্পাদক মিঃ জি, এ, নটেশান ২৬শে পৌষ রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। বিগত কিছু কাল ধরিয়া তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন।

অধ্যাপক শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিতে কলিকাতায় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক এবং হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এ দেশের শিক্ষা-সাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দুইটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

লেঃ কঃ অম্বুজনাথ বসু

গত ৩১শে অক্টোবর (১৯৪৮) ভারতের কৃতবিদ্য সন্তান নাগপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লেঃ কঃ অম্বুজনাথ বসু ও-বি-ই, এম-ডি (লণ্ডন), এফ আর-সি-পি (লণ্ডন ও এডিনবরা), ডি-টি-এম্ ও এইচ (ক্যান্টাব), আই-এম-এস্ (রিটায়ার্ড) মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনলীলা সমাপ্ত করেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনি প্রথম লণ্ডনের এফ-আর-সি-পি। মেধা ও উদ্যম গুণে লেঃ কঃ বসু কৃতী ছাত্র, বিচক্ষণ অধ্যাপক এবং কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সুদক্ষ কর্ম্ম-পরিচালক বলিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন, নাগপুর ও পাটনার চিকিৎসাকেন্দ্রে লেঃ কঃ বসু দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করুক।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

◐ ◐ কবরী-বিন্যাস

২৭শ বর্ষ—মাঘ : ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড : ৪র্থ সংখ্যা।

"আর তোমরা কি কচ্ছো? সারা জীবন কেবল বাজে বকছো। এস, এদের দেখে যাও, তার পর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পৌরোহিত্য আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে, না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ! ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাংখা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও বলে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব, আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও।"

—বিবেকানন্দ

রাজনারায়ণ বসু

"সে দিবস রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে আমাদের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তারা উত্তমরূপে দেশ শাসন করিতেছেন, বহুল পরিমাণে আমাদিগের উপকার সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের অতি কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তজ্জন্য চির পরাধীনতা কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বঙ্গের পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ হইল। বিশেষতঃ বঙ্গের সেই কালের ছবি মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল, যখন দেবপালদেব প্রভৃতি পালবংশীয় সম্রাটেরা তিব্বত হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর কোমল শৃংখলে আমার শরীর ক্রমে বন্দীভূত হইল। নিদ্রাযোগে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম; যাহা দেখিলাম তাহা পাঠকবর্গকে নিম্নে জ্ঞাপন করিতেছি।

বোধ হইল, বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছে ও ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন সুসভ্য হইয়াছে যে, পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন দেশ এমন সভ্য হয় নাই। আর ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হারাইবার সময় যে প্রকার সভ্য ছিল তাহাই রহিয়াছে। বঙ্গদেশ এইরূপ সভ্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে পর বাঙ্গালীরা অর্ণবপোত আরোহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড গমন করিয়া ইংলণ্ড জয় করিলেন। ইংলণ্ড জয়ের পর বঙ্গরাজ ইংলণ্ডকে এক জন বাঙ্গালী ভাইসরয়ের (Viceroy) অধীনে স্থাপন করিলেন।

কিছু দিন পরে আমি বিলাত গমন করিলাম এবং দেখিলাম যে ইংলণ্ড বাঙ্গালীদের অধীনে থাকিয়া আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কলেজ, স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের আলোচনা হইতেছে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকেরা বিজেতাদিগকে রীতি নীতি সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মনে করিয়া তসরের জোড় পরিধান পূর্ব্বক টিকি রাখিয়া শম্বুকের নস্যাধার হইতে নস্য লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। ইংরাজী দর্শন অপেক্ষা সংস্কৃত দর্শন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া লোকে তাহা অধ্যয়ন করিতেছে এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল প্রকার তত্ত্বই মন্থন করিয়া লইতেছে। সিবলিয়র বুনসেন বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে, সে সকল তত্ত্ব রূপকাকারে সেই সকল গ্রন্থে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সকলে বুনসেন মহোদয়ের কথার যথার্থ ভাব উপলব্ধি করিতেছেন। তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, লোকে পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থকে কেবল কল্পনা-সম্ভূত উপন্যাস কেন মনে করিত। লোকে ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছে। বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থ কলেজে ও স্কুলে অধীত হইতেছে এবং বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন ইংরাজ শিক্ষক সেই সকল গ্রন্থের কি (Key) প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডের আচার-ব্যবহারও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সংস্কৃত শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ ভোজন ও মদ্যপান হইতে বিরতির গুণ কীর্ত্তিত আছে। সেই গুণবর্ণন পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোকে মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকে বাঙ্গালী বিজেতারা মাছ ও পাঁটা খাইয়া থাকেন ইহা দেখিয়া মাংসের মধ্যে কেবল মাত্র পাঁটা ও মাছ খাইতেছেন। পল্লীগ্রামের কোন কোন চষা ইংলণ্ডের সনাতন রীতি গোমাংস ভক্ষণ হইতে কোন মতে বিরত হইতে না পারিয়া গোপনে গোহত্যা করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে। গোপনে গোহত্যার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বাইসুরয় এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে গোহত্যা করিবে তাহাকে শক্ত সাজা দেওয়া যাইবে। দেখিলাম, ইংরাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা গোমাংস ভক্ষণের অনিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত মাছ ও পাঁটা ভক্ষণের ইষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন। লোকে ইংরাজী পিকেল (Pikle) ও সাস্ (Sauce) পরিত্যাগ করিয়াছে। আবার আচার ও কাসুন্দি বঙ্গদেশে হইতে প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতেছে। এখানকার রাশি রাশি মাগুর মাছ ও পয়জারে ক প্রতি বৎসর তৈল ও লবণে সংরক্ষিত হইয়া বিলাত যাইতেছে ও সভ্যদেশের মাছ বলিয়া আদরে রক্ষিত হইতেছে।

অন্যান্য বাঙ্গালা ব্যঞ্জনের মধ্যে সুক্তনী, চড়চড়ি ও ফুলবড়ি ভাজার অধিকতর আদর দেখিলাম। তৈলমর্দ্দন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইষ্টকর, কিন্তু দেখিলাম অনেক সাহেব তৈলমর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছেন, ও এই রীতি অবলম্বন জন্য লর্ড মনবড্ডোকে (Lord Monboddo)কে প্রশংসা করিতেছেন ও তাঁহাকে তাঁহার কালের অগ্রবর্ত্তী পুরুষ ছিলেন বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। আরও দেখিলাম তাঁহারা চুরট পরিত্যাগ করিয়া হুঁকায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকের পরিচ্ছদেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম।

দেখিলাম, ইংলণ্ড শীত দেশ হইলেও অধিকাংশ লোক ধুতি চাদর ও পিরাণ পরিধান করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, শীতে হিহি করিতেছেন, কিন্তু তথাপি এইরূপ পরিচ্ছদ সুসভ্য পরিচ্ছদ জ্ঞান করিয়া তৎপরিধানে বিরত হইতেছেন না। যখন আমি স্মরণ করিলাম যে, বঙ্গদেশে পরাধীনতার কালে সাহেবি পরিচ্ছদ পরিধান গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে কষ্টকর জানিয়াও কোন কোন বাঙ্গালী তাহা পরিধান করিতেন তখন আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম না। দেখিলাম, বিবিদিগকে আর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, তাঁহারা সাটী পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা গাউন অপেক্ষা সাটীকে সৌন্দর্য্যসাধক জ্ঞান করিতেছেন। ইংলণ্ড যখন স্বাধীন দেশ ছিল, তখনও সকল লোকে স্ত্রীদিগের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় বিরক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তঃপুরবাসের সম্পূর্ণ উপকারিত্ব উপলব্ধি করিতেছেন।

দেখিলাম অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং পল্লীগ্রামের যে সকল চষ্য তাহা অবলম্বন করে নাই তাহাদিগকে শিষ্ট লোকেরা গ্রাম্য (Pagan) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা কালে ধনমূলক জাতিবিভেদ ছিল, এক্ষণে দেখিলাম জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক জাতিভেদ হইয়াছে। কতকগুলি লোক কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গরাজ উপবীত প্রদান করিয়া শ্বেতদ্বীপী ব্রাহ্মণ এই আখ্যায় এই নূতন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও দেখিলাম, লোকে মৃতদেহ সমাধি দেওয়া প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তাহা দাহ করিতেছে; শুনিলাম যে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতার কালেই এই হিন্দু অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এইরূপে ইংলণ্ডে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। এমত সময়ে সংবাদ আসিল যে, বঙ্গরাজ তাহার দূরস্থ রাজ্য ইংলণ্ড দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি বাষ্পীয় পোতে আসিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য লণ্ডনে মহা আয়োজন হইতে লাগিল। যে দিন তিনি লণ্ডন প্রবেশ করেন, সে দিন লণ্ডনের শোভন রাজমার্গে অশেষ জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই জনস্রোতের কলরবে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলাম, কলিকাতার প্রাতঃকালের কলরব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।"

—বিবিধ প্রবন্ধ

বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় ঈশ্বরের নাম

দেশ	ভাষা	দেশ	ভাষা
হিব্রু	ইলোহা	কানডেক	ইলা
আবিসিয়ান	ইলিয়া	তুরস্ক	আল্লা
মালে	আল্লা	আরবি	আল্লা
আরমেনিয়ান	টিউটী	ইজিপসিয়ান	টিয়ুম
গ্রীক	থিয়স	লাটিন	ডিউস
ফ্রেঞ্চ	ডিউ	স্পানিস	ডিয়স
পর্ত্তুগীস	ডেয়স	জার্ম্মাণ	টাইট
ইটালিয়ান	ডিও	আইরিস	ডিয়া
সুইস	গট	ক্রেমিস	গেইড
ডচ্	গড	ইংরেজী	গড
ডানিন	গাট	নরোজিয়ান	গাড
পোলিস	বগ	পার্সী	সায়ার
টারটার	মাগাটান	জাপানিজ	গাইজার
চাইনীজ	ক্রাসা	ভারতীয়	ঈশ্বর

[একদা বাঙলার মা-জননীরা সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করতেন,—জগদীশ্বর, ছেলে যেন রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বিত্তি (বৃত্তি) পায়।

কিন্তু রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি যে কি এবং কোন্ সুমহান্ ব্যক্তির কল্যাণে এই পুরস্কারের প্রচলন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। এই লেখাটি পড়লে জানতে পারবেন। ইংরেজী "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকা থেকে লেখাটি অনূদিত করা হয়েছে।]

বোম্বাইয়ের সুপরিচিত লেখক ও জনসেবক মিঃ দিনশা এতুলজি ওয়াচা বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দানবীর স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের চমৎকার এক জীবনী লিখেছেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ভারতে উচ্চশিক্ষার্থীদের বৃত্তিদানের জন্য বহু অর্থ দান করে গেছেন এবং তাঁর সেই অতুলনীয় বদান্যতার জন্য চিরদিন তিনি সকলের স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৮৩১ সালে সুরাটে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রায়চাঁদ দীপচাঁদ ছিলেন ছোট-খাট কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী। জাতিতে তিনি ছিলেন বেনিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন। কাঠের ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় দীপচাঁদ ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য বোম্বাইতে আসেন। বোম্বাইতে এসে দীপচাঁদ তাঁর পুত্র প্রেমচাঁদকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলে প্রেমচাঁদ কাজ চালাবার মত ইংরাজি শিখে নেন। ১৮৫২ সালে দীপচাঁদ এক বিখ্যাত দালালের অধীনে চাকুরী পান। সহকারী হিসাবে তাঁর পুত্রও পরে সেই দালালের অধীনে নিযুক্ত হন। ঘটনাক্রমে পিতাপুত্রে মিলে নিজেরাই তাঁরা দালালী ব্যবসা আরম্ভ করে দেন এবং তাঁদের প্রভুর মৃত্যুর পর প্রভুর সমগ্র লাভজনক ব্যবসাটাই তাঁদের হাতে চলে যায়। দালালী ব্যবসায়ে তাঁদের সমৃদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। দালালী ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্যাঙ্কের হুণ্ডী ও শেয়ার বেচা-কেনা করতে আরম্ভ করেন। চাকুরী গ্রহণের ছয় বছরের মধ্যেই দীপচাঁদ এবং তাঁর পুত্র লক্ষপতি হয়ে পড়েন। তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকার মূল্য যে এখনকার দিনের চেয়েও অনেক বেশী ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠিক সেই সময় বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ১৮৫৪—৫৫ সালে যে দশাব্দের শেষ হয়, সেই দশাব্দে বোম্বাইয়ে আমদানী ও বোম্বাই থেকে রপ্তানী মালপত্র ও সম্পদের মোট মূল্যের পরিমাণ ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায় উঠেছিল। ঠিক তার আগের দশাব্দে আমদানী ও রপ্তানী মালপত্র ও সম্পদের মোট মূল্যের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ঝুঁকিদারী (speculative) ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সম্প্রসারণ হয়নি। ভারতে ইউরোপীয় মালপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইউরোপে ভারতীয় কাঁচা মালের চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়েছিল। তুলা রপ্তানীর পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১৮৬০ সালে মোট ৫,৬৬,০০০ গাঁইট তুলা রপ্তানি হয়। প্রায় ঠিক এই সময়েই উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকায় মধ্যে সংঘর্ষের আভাষ দিগন্তে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তার পর হঠাৎ যখন সত্য সত্যই সংঘর্ষ বেধে উঠল, তখন আমেরিকা থেকে ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলা আমদানী বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় তুলার চাহিদা বেড়ে গেল সীমাহীন ভাবে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বোম্বাইয়ের সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। ইতিমধ্যেই প্রেমচাঁদ এবং তাঁর পিতা দীপচাঁদ দালাল হিসাবে বোম্বাইয়ে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। নাম-করা ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের উপর তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অসীম। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ যতই এগোতে লাগল, ততই তুলার দাম বাড়তে লাগল বেপরোয়া ভাবে। বোম্বাইয়ের রপ্তানী-ব্যবসায়ীরা ধুলো-মুটি ধরে সোনা বানাতে লাগলেন। বিখ্যাত রিচি ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোং প্রেমচাঁদকে তাঁদের প্রধান দালাল নিযুক্ত করেন। ১৮৬০ সালের মধ্যেই প্রেমচাঁদ বোম্বাই সহরে ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে অপরিহার্য্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি শুধু নিজের ব্যবসাই চালাতেন না, অন্যের ব্যবসায়েও টাকা লগ্নী করতেন।

লিভারপুলে তুলা চালান দিয়ে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা কল্পনাতীত ভাবে মুনাফা লুঠে বিরাট বিরাট ধনী হয়ে পড়লেন। এমন কি তুলা-চাষীরা পর্য্যন্ত এত বড়লোক হয়ে পড়ল যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রূপোর বাসন-পত্র তৈরী করে এবং লাঙ্গলের গায়ে ও গরুর গাড়ীর চাকায় রূপোর কারুকার্য্য করে নিজেদের নবলব্ধ ধনের গরিমা জাহির করতে লাগল। ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত এই চার বছরে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা ৫০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছিলেন। এই বিরাট অর্থ বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা কি ভাবে ব্যয় করেছিলেন? এর বেশীর ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং এবং লগ্নী কারবারে লাগান হয়। ঝুঁকিদারীর (speculation) স্পৃহা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায় এবং বোম্বাই রিক্লেমেসন কোম্পানীর একটি শেয়ার ৫০ হাজার টাকা, অর্থাৎ শেয়ারের প্রকৃত মূল্যের দশ গুণ বেশী দামে পর্যন্ত বিক্রয় হতে থাকে। ১৮৬৪ সালের গোড়ার দিকে এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের একটি শেয়ারের দাম ২ শত টাকা পর্যন্ত ওঠে। সেই বছরই আগষ্ট মাসে ঐ শেয়ারের দাম ওঠে ৪৬০ টাকা। ব্যাঙ্ক অফ বোম্বাইয়ের প্রকৃত মালিক ছিলেন প্রেমচাঁদ। ইচ্ছা করলে এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক নিয়েও তিনি যা খুশী

তাই করতে পারতেন। কিন্তু ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ে ব্যাপক ভাবে অর্থ লগ্নীর স্পৃহাই বোম্বাইতে সর্বনাশ ডেকে আনল। ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে আমেরিকায় ফেডারেলদের চূড়ান্ত জয়লাভের সংবাদ এসে পৌঁছোলো বোম্বাইয়ে এবং মার্কিণ গৃহ-যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তুলার দাম ভীষণ ভাবে পড়ে গেল। যে তুলা আগের দিন ৭০০ টাকা গাঁইট (সওয়া ছয় মণ) দরে বিক্রয় হয়েছে, সেই তুলার গাঁইটের দাম পরের দিনে এসে দাঁড়াল ২৫০ টাকায়। দাম আরও নীচে নামতে লাগল। অকস্মাৎ বাজারের এই অধোগতির ফলে প্রেমচাঁদ এবং অন্যান্য তুলা-ব্যবসায়ীরা একেবারে পথে বসলেন। শেয়ারের বাজারেও ভীষণ মন্দা দেখা দিল। সমস্ত রকম শেয়ারের দাম ভীষণ ভাবে কমতে লাগল। ব্যাঙ্ক অফ বোম্বাইয়ের শেয়ারের দাম ২৮৫০ টাকা থেকে একেবারে ৮৭ টাকায় নেমে গেল। ব্যাঙ্ক বে কোম্পানীর ৫০,০০০ টাকা দামের শেয়ার বিক্রয় হতে লাগল ১৭৫০ টাকায়। বাজারের সকল ক্ষেত্রেই তখন এই অবস্থা। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক এবং কোম্পানীই এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসের শ্মশান হল। ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডাররা তাঁদের লগ্নী অর্থের বড় অংশই এই ভাবে হারালেন, কিন্তু সেই বাজারে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন প্রেমচাঁদ। পুরোনো ব্যাঙ্ক অফ বোম্বাই দুই কোটি টাকা লোকসান দিয়ে ভেঙ্গে একেবারে তচনচ হয়ে গেল। প্রেমচাঁদ ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয়ের জন্য এই হতভাগ্য ব্যাঙ্ক থেকে ৪২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে শেয়ার কিনেছিলেন তার মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকার শেয়ার অকেজো হয়ে গেল। ফলে এই ৪৪ লক্ষ টাকার মায়া তাঁকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হল। প্রেমচাঁদ এই ব্যাঙ্কের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান করেন। এই ব্যাঙ্ক এবং এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েই প্রেমচাঁদ তাঁর ববসায়ে খাটাতেন। দুর্ভাগ্য বশত এই ব্যাঙ্ক দুটোই সব চেয়ে বেশী মার খায়। ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেমচাঁদ তাঁর উত্তমর্ণদের কাছে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে বাধ্য হন। তিন বছর বাদে ব্যাঙ্কে শতকরা ১ টাকা হারে এবং পরে শতকরা ৮ আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। এই বিপর্যয়ের অবসানের পর প্রেমচাঁদ আবার ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু হৃত অবস্থার পুনরুদ্ধার তিনি কোন কালেই করতে পারেননি।

তিনি জন-কল্যাণের জন্য যে অর্থ দান করে গেছেন, তার পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অট্টালিকা নির্মাণের জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর মাতা রাজা বাইয়ের নামানুসারে এই অট্টালিকার নামকরণ হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আরও দুই লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর কাছ থেকে ঠিক অনুরূপ পরিমাণ অর্থ দান হিসাবে লাভ করেছিল। সেই অর্থের সুদ থেকেই প্রতি বছর গবেষক ছাত্রদের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়। তাঁর দানের তালিকা করলে ছোট-খাট একটা পুস্তিকা রচিত হতে পারে। তিনি খুব সহজ সরল জীবন যাপন করতেন এবং ৩০ বছর বয়সেই বোম্বাইয়ের ব্যবসা-জগতে "গ্রাণ্ড নেপোলিয়ন" নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর পতনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থাস্থাপনকারী বহু লোকেরই পতন হয়, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কখনও অসাধুতার অভিযোগ শোনা যায়নি। ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রেমচাঁদের মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু প্রেমচাঁদের নাম আজও অমর হ'য়ে আছে। তাঁর অফুরন্ত দানের মহিমা প্রতিদিনই আমরা উপলব্ধি করছি। ভারতবাসী যুগে-যুগে গভীর ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করবে।

"তুমি অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে ও ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিবে তাহাকে নির্ভর বলে না। এক জ্ঞানী ও একজন প্রেমিক অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখে এক ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়। জ্ঞানী তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আমাদের পলায়ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই, পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু প্রেমিক বলিলেন, "না ভাই, চল পলাইয়া যাই, যে কার্য্য আমাদের দ্বারা হইবে, সেই কার্য্যের ভার কেন ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিব?"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

প্রবা মালা
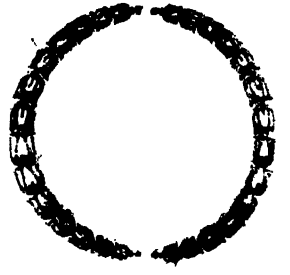
রেভাঃ লঙ্ সম্পাদিত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

[প্রবাদ আর জনশ্রুতি—বেদের মন্ত্রের মতই স্বয়ম্প্রকাশ। মন-দরিয়ার ডুবুরীরা নীতির বচন ছড়ালেন পুঁথির পাতায়, শিষ্টরা তা দিয়ে সদাচারের মালা পরালেন মানুষের কণ্ঠে। প্রবাদ তা নয়, প্রবাদ হল শ্রুতি। সাধারণ মানুষের সহজ মনের আকস্মিক বৈদ্যুতিক প্রকাশ যুগ-প্রবাহে ভেসে চলেছে। গতি অপ্রতিরোধ্য। ধরা-বাঁধা কঠিন কাঠামোর নাগপাশ একে বাঁধতে পারে না। নীতির চাণক্যরা জনসাধারণের—যাকে ওরা নাম দিয়েছিল ইতর, তাদের নুণ, লকড়ি-তেলের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি। প্রবাদের কর্তা-গিন্নী থেকে মালিনী মাসী পর্য্যন্ত এ রহস্য ভেদ করেছেন কখনও মিঠে আওয়াজে, কখনও মিছরীর ছুরির ধারে।

সব দেশেই এক কথা। সব দেশেরই জন প্রবাদের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভাবের মিলন আছে। এ থেকে সাধারণ মানুষের মন যে অভিন্ন—দেশ-কাল ও পাত্রের উপর যে সত্য—মানুষদেরই সহজ প্রমাণ আমরা পাই। আবার এ থেকেই আমরা প্রত্যেক জাতের স্বভাবরূপের পরিচয় পাই।

প্রবাদের মধ্যে আজও অমর হয়ে আছে প্রত্যেক জাতির ভাব, ভাষা, সংস্কৃতির নিজস্ব ভঙ্গি, সাধারণ মানুষের সহজ সাবলীল সত্তা। ভাষা সংস্কৃত হয়েছে, সংস্কৃত হয়েছে দেশ, দেশের মানুষ, তার কর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি—কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়ায় মানুষের আদিম ক্ষুধা ও বেদনার উপর পোষাক আর চড়ান যায়নি। দেশ-বিদেশের প্রবাদের এই চিরন্তন ক্ষুধা ও ব্যথা মনোহর ভঙ্গিতে আজও ব্যক্ত করছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ লঙ্ দুই খণ্ডে যে 'প্রবাদমালা' প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রথম খণ্ডে বাংলা প্রবাদ সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার প্রবাদগুলি লঙ্ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাদমালার দ্বিতীয় খণ্ডে আছে: জার্ম্মাণীয়, ইতালীয়, স্পানীয়, পোর্তুগীস, ওলন্দাজী, দিনামার, ফরাসীয়, বাদাগাদিগের, মালেয়ালম, দ্রাবিড় দেশীয়, চীন দেশীয়, পাঞ্জাবী, সর্ব্বিয়া দেশীয়, মহারাষ্ট্রীয়, উৎকল দেশীয় ও রুশীয় প্রবাদ সঙ্কলন। বইখানি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। সে জন্য আমরা এই সংখ্যা হইতে প্রতি সংখ্যায় উক্ত দেশীয় প্রবাদমালা সমূহ পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে উপস্থাপিত করিব।]

জার্মাণীয় প্রবাদ

১। অধিক দিন বাঁচিতে চাহ তো কুকুরের মত পান কর, আর বিড়ালের মত আহার কর।

২। অনুতাপই অন্তঃকরণের ঔষধ।

৩। আগুন আর জল উত্তম দাস বটে; কিন্তু প্রভু ভাল নহে।

৪। আত্মাহীন কলেবর, নারীহীন নর। নরহীন নারী, শিরশূন্য কলেবর।

৫। আলস্য দারিদ্রতার চাবি।

৬। আলো মাত্রেই সূর্য্য নহে।

৭। আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

৮। উকীল আর গাড়ীর চাকায় তেল-চর্ব্বীর প্রয়োজন।

৯। উৎক্রোশ কখন মাছি মারে না।

১০। উদর বড় কুমন্ত্রী।

১১। একখানা কুঁদোয় কখন বরাবর আগুন থাকে না।

১২। একটি মৌমাছি একমুঠা মাছির সমান।

১৩। এক বিন্দু সের্কা অপেক্ষা এক বিন্দু মধুতে অনেক মাছি আটক হয়।

১৪। এ কখন সম্ভব বিড়াল দুধ না খেয়ে চুপ করে বসে থাকবে?

১৫। ঔষধের বড়ী গিলিয়া খাও, চিবিও না।

১৬। ক্রোধ নিবারণের ঔষধ কাল।

১৭। গোলাপ আর কুমারীগণের লাবণ্য অচিরে বিগত হয়।

১৮। ঘুমন্ত কুকুরকে চেঁচিও না।

১৯। চক্ষের জলের ন্যায় কোন পদার্থ ই শীঘ্র শুকায় না।

২০। চাক্তী যথায় বলবতী, যুক্তি না হয় ফলবতী।

২১। চামড়া চুরি করে ঈশ্বরোদ্দেশে জুতা দান।

২২। চোর আপন ফাঁসীকাঠের উপযুক্ত গাছ খুঁজে পায় না।

২৩। চোর দিয়ে চোর ধরা।

২৪। ডিম্বের স্থলে মুরগী দান।

২৫। তিনটি নারী, তিনটি হাঁস আর তিনটি ব্যাঙে একটি হাট।

২৬। তীর্থযাত্রার ফেরৎ লোক প্রায় যতি নয়।

২৭। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, কিন্তু একটি মাত্র মুখ। অর্থাৎ অধিক দেখা-শুনা ভাল, অধিক কথা কহা ভাল নয়।

২৮। ধুঁয়া যার নাহি সয়, সে কখনও কামার নয়।

২৯। ধৈর্য্য আর কালক্রমে তুঁত পাতাও খাসা গরদ হয়, "কালে বাণুও পণ্ডিত।"

৩০। নদীতীরে কূপ খনন্।

৩১। নারীর রূপ, বনের প্রতিধ্বনি, আর রামধনু শীঘ্র উপে যায়।

৩২। নিষ্পাপ আত্মা খাসা বালিস।

৩৩। নেকড়ে বলে "তোমার কথা মিষ্টি বটে, কিন্তু আমি গাঁয়ের ভিতর যাব না।"

৩৪। পর্ব্বতের গর্ভে সোনা কিন্তু রাজপথে ধূলো।

৩৫। পাগল গাছ বাড়াইতে জল সেচনের প্রয়োজন নাই।

৩৬। পীরিত আর গান করা জোরের কাজ নয়।

৩৭। পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়া ছিল বলে খচ্চরদের বড় ধুমধাম।

৩৮। প্রতিবাসীর প্রতি প্রীতি কর, কিন্তু তার বেড়া নেড়ো না।

৩৯। বড় হলেই সব দিকে বড় হয় না, তাহ'লে গাই গরু খরগোসকে দৌড়ঝাঁপে হারাইত।

৪০। বহু কাল উপবাস থাকা, আহারের সম্বন্ধে পরিমিত ব্যয় নয়।

৪১। বাড়ী বানায় অজ্ঞগণ, ক্রয় করে বিজ্ঞ জন।

৪২। বিচারপতির দুই কর্ণই সমান হওয়া উচিত।

৪৩। বেড়া নীচু দেখিলেই মানুষ তাকে ডিঙ্গিয়ে যায়।

৪৪। ভুমে পড়ে থাকে যেই, মাড়ামাড়ি যায় সেই।

৪৫। ময়ুর, ময়ুর ময়ুর, আপনার পা দেখ।

৪৬। মাছী ধরা ভিন্ন কোন কার্য্যই শীঘ্র কর্ত্তব্য নয়।

৪৭। মাছীর উৎপাত হতে সিংহকেও আত্মরক্ষা করতে হয়।

৪৮। মিথ্যা কথা ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিবার প্রথম সিঁড়ি।

৪৯। মিথ্যা কথার চরণ খাট, অর্থাৎ শীঘ্র ধরা পড়ে।

৫০। যত আইনের আঁটাআঁটি, বিচারের দফায় ততই ঘাঁটি।

৫১। যদি থাক কাচের ঘরে, ঢিল ছুঁড় না পরের তরে।

৫২। যাহা তিন জনে শুনেছে, তাহা ত্রিশ জনে শুনেছে। "ষট্‌কাণে মন্ত্রণা ভ্রষ্ট।"

৫৩। যাহা বড় উচ্চ, তারে কর তুচ্ছ।

৫৪। যুদ্ধের দূরবর্ত্তী সকলে লোকেই যোদ্ধা।

৫৫। যুবার মৃত্যু স্থির নয়, বুড়ার মৃত্যু সুনিশ্চয়।

৫৬। যে ঘরেতে মদ ঢোকে, লজ্জা পালায় সে ঘর থেকে।

৫৭। যে জন বিড়াল নাহি পালে, পালুক তবে নেংটের পালে।

৫৮। সিঁড়ির আগায় উঠতে গোড়া থেকে আরম্ভ করতেই হয়।

৫৯। রাজমুকুট কিছু শিরঃপীড়ার ঔষধ নয়।

৬০। লাঙ্গলের খবর নিলে সে তোমার খবর নেবে।

৬১। লুণের সংস্থান দেখে মাছ কাট।

৬২। লেপের পরিসর অনুসারে পা ছড়াও।

৬৩। শাঁস অপেক্ষা খোলার জন্য অধিক বিবাদ।

৬৪। শিকারী পক্ষীরা গান গায় না।

৬৫ শীঘ্র পাকে, শীঘ্র পচে।

৬৬। শূন্যোদরে হৃদয় ভারি।

৬৭। সরদারী করতে হলে কানে শুনে কালা হও, আর চোখে দেখে কানা হও।

৬৮। সোনার বাগ্‌ডোর হইলেই উত্তম ঘোড়া হয় না।

৬৯। স্বদেশে দাসত্ব অপেক্ষা বিদেশে স্বাধীনতা শ্রেয়ঃ।

৭০। স্বপ্ন সকল ফেনা মাত্র।

৭১। ক্ষুধার্ত জঠরের কর্ণ নাই।

আগামী সংখ্যায়

ইতালীয় ও স্পানীয় প্রবাদমালা

প্রাচ্য বিদ্যার কলাম্বাস-

সোমা ডি কুরেশ (কুরুশ ?)

জ্ঞানান্বেষক

সদাগরী রাজ্যের কলাম্বাসকে কে না জানেন ? কিন্তু জ্ঞান-রাজ্যের কলাম্বাসদের অনেককেই আমরা চিনি না, জানি না, নাম পর্য্যন্ত তাঁদের শুনিনি। ধন নয়, সম্পদ নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, পার্থিব কোন প্রলোভনই নয়—কেবল বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্বেষণে, মানসিক ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির প্রেরণায় যাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের কথা ইতিহাস না ভুলে গেলেও, মানুষ আমরা দৈনন্দিন জীবনের স্তূপাকার তুচ্ছতা ও দীনতার মধ্যে অতি সহজেই ভুলে যাই। শ্মশানে ও সমাধিক্ষেত্রে তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভের দাম্ভিক আত্মপ্রকাশ কোন দিনই চাটুলুব্ধ জনতার অত্যন্ত সস্তা শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করে না। পৃথিবীর কোন এক নির্জ্জন নগণ্য কোণে স্মৃতি তাঁদের অতি ক্ষুদ্র স্তম্ভাকারে স্তব্ধ হয়ে থাকে। এক শতাব্দীর মধ্যে এক শত মানুষ সেই নিস্তব্ধ কোণটিতে প্রাণের টানে হয়ত তাদের নিবিড় ভালবাসা জানাতে যায়। তাঁরা এই স্বার্থপর সমাজের স্বার্থের লড়াইয়ে দেবত্ব বা অতি-মানবত্ব অর্জ্জন করেননি, সুতরাং লক্ষ কণ্ঠের স্তুতিগানে তাঁদের সমাধি-স্থান মুখর হয়ে ওঠে না। তাঁরা সাধক, কোন পারলৌকিক শক্তির জন্যে নয়। তাঁরা সর্ব্বস্বত্যাগী ঋষি, কোন আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতির জন্যে নয়। তাঁরা হলেন ইহলোকের জ্ঞানের সাধক, সর্ব্বস্বত্যাগী, জ্ঞানের সন্ন্যাসী। এই পৃথিবী, এই মানুষ, এই সভ্যতার লুপ্ত রত্নোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁদের আজীবন অক্লান্ত অভিযান। দুর্গম জ্ঞান-রাজ্যের দুঃসাহসী অভিযাত্রী তাঁরা। তাঁরা নমস্য, একাল-সেকালের নয়, সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের নমস্য তাঁরা। তাঁদেরই এক জন হচ্ছেন হঙ্গেরীয় মনীষী পণ্ডিত সোমা ডি কুরেশ।

আমাদের এই দেশে পাহাড়ী দার্জ্জিলিঙের নিস্তব্ধ গোরস্থানে সোমার পরিশ্রান্ত শীর্ণ দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। চারি দিকে সেই সমাধি বেষ্টন করে "দেওদার স্তব্ধ সারে সারে" দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ঝরা পাতায় ঢাকা রয়েছে মাটির উপরের অনুচ্চ একটা পাথুরে প্রমাণ। তারই তলায়, মাটির গভীর অন্ধকারে, বাস্তব পৃথিবীর ছ্যাকড়া গাড়ীর ক্যাঁচক্যাঁচানি থেকে অনেক দূরে হঙ্গেরীর জ্ঞানসাধক সোমা ডি কুরেশের ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমরা তা জানি না, জানার বাসনাও নেই আমাদের। আমরা জানি না, সুদূর হঙ্গেরীর এক নির্জ্জন গ্রামে যিনি জন্মেছিলেন, কেমন করে তিনি বাংলা দেশের দার্জ্জিলিঙে এসে সমাধিস্থ হলেন ? হঙ্গেরী থেকে দার্জ্জিলিঙ, আজকের উড়ন্ত মানুষের পক্ষে কল্পনা করা কিছুই নয়। কিন্তু সোমার কথা এক শতাব্দীরও আগের কথা। পাহাড় পর্ব্বত সাগর মরু ডিঙিয়ে সোনার লোভে, রাজ্যের লোভে বণিক ও বিদেশী বোম্বেটেদের অভিযানের কথা ইতিহাসে আমরা অনেক পড়েছি। কিন্তু জ্ঞান-রাজ্যের কলাম্বাস ও ওডেসীউসদের কথা জানি না আমরা। দেবতার সাধকদের জানি, শক্তির সাধকদের জানি, অর্থের ও স্বার্থের সাধকদের কথাও আমরা বাল্যবয়স থেকে পাঠ্যপুস্তকে পড়ি, কিন্তু জ্ঞানের সাধক, বিদ্যার সাধকদের আমরা জানি না। দার্জ্জিলিঙে আমরা তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয় দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু জ্ঞান-বিদ্যার দুর্লঙ্ঘ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতম চূড়ায় যুগে-যুগে অকস্মাৎ যে সূর্য্যোদয় হয় তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার মত চোখ বা মন কোনটাই আমাদের নেই। এই রকম সূর্য্যোদয় হয়েছিল এক দিন আমাদের দেশে হঙ্গেরীর জ্ঞান-তপস্বী সোমার মধ্যে। আমরা তা দেখতে পাইনি। চোখে আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ছানি পড়েছে, মন নুয়ে পড়েছে প্রাত্যহিক জীবনের বোঝার ভারে। অলস অপদার্থ অকর্ম্মণ্য অমেরুদণ্ডীর দেশে সোমা ডি কুরেশ আজ তাই অপরিচিত অজ্ঞাত।

নিষিদ্ধ দেশাভিমুখে বিদ্যা-পথিক সোমা

আধুনিক যুগের জ্ঞান-রাজ্যের ওডেসীউস্ সোমা ডি কুরেশ হঙ্গেরী থেকে তিব্বত পর্য্যন্ত যে অভিযান করেছিলেন, বিগত শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই। প্রাচ্যবিদ্যার রত্ন-গুহার সন্ধানে রূপকথার রাজপুত্রের মতো তাঁর অভিযান শুরু হয়েছিল হঙ্গেরী থেকে, শেষ হয়েছিল এই পৃথিবীর চিরতুষারাবৃত নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে। ভাষাতত্ত্বে ছাত্রজীবন থেকেই ডি কুরেশ উৎসাহী। ভাবের বাহন ভাষা, ভাষায় মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তর-বাহিরের লেন-দেন হয়। আজকের হাজার রকমের সুসমৃদ্ধ বিচিত্র ভাষায় হঠাৎ এক দিন মানুষ কথা বলতে বা সাহিত্য ইতিহাস রচনা করতে আরম্ভ করেনি। যেমন নানা জাতি-উপজাতির শাখা-প্রশাখায় মানুষ এক দিনে বা এক যুগে প্রসারিত হয়নি, হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ফলে হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাষারও বিকাশ ও প্রসার এক যুগে হয়নি, হাজার-হাজার বছরে হয়েছে। ভাষার সঙ্গে ভাষার যোগসূত্র খুঁজে বার করতে পারলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও জানা যায়। সোমা ডি কুরেশ বাল্যকাল থেকে কল্পনা করতেন, হঙ্গেরীর মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের পার্থক্য কোথায়, কোথায় তাদের হঙ্গেরীয় স্বাতন্ত্র্য, কোথা থেকে তাদের উৎপত্তি ? এই সব গভীর জটিল প্রশ্ন তাঁর বালক-চিত্তকে তোলপাড় করত। ছাত্র-জীবনে যৌবনে যখন তিনি ভাষাতত্ত্বে দীক্ষা পেলেন, তখন বুঝলেন যে, এই ভাষার সূত্র ধরেই তিনি জাতি ও তার সংস্কৃতির উৎসমুখে পৌঁছতে পারেন। ভাষা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান তাঁর হয়েছিল তাতে তিনি দেখলেন যে, অনেক হঙ্গেরীয় নাম ও শব্দের সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন সোমা। জ্ঞানানুসন্ধানের নেশায় তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। তার পরই শুরু হল সুদূর হঙ্গেরী থেকে তিব্বতের পথে যাত্রা। কেন ?

জ্ঞানভিক্ষুর তিব্বত যাত্রা

দশ হাজার থেকে ষোল হাজার ফিট উঁচুতে মধ্য-এসিয়ার একটা বিশাল উপত্যকা প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ-মাইল জুড়ে পাহাড়ের কোলে

[৫৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী

শ্রীসুশীলকুমার দে

ঋগ্‌বেদের দু'একটি সূক্তের রচয়িতা বা মন্ত্রদ্রষ্টার নামোল্লেখ থাকিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম ও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের যে সকল আনুষঙ্গিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা এবং ঋগ্‌বেদের বিবিধ অনুক্রমণীতে সূক্ত, দেবদেবী ও মন্ত্র-রচয়িতাদের নাম, বিবরণ ও কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ঋগ্‌বেদাদির সমসাময়িক না হইলেও খৃষ্টীয় শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের সকল গল্প ও ঐতিহ্য বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সাক্ষ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল গ্রন্থে ঋগ্‌বেদের সূক্তের রচয়িত্রী হিসাবে সাতাশ জন ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে (বৃহদ্দেবতা ২।৮২-৮৬)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক দিকে অদিতি, জুহূ, ব্রহ্মজায়া, ইন্দ্রাণী, অপ্সরস্, সরমা, সার্পরাজ্ঞী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীদের বৈদিক দেবীদের পর্য্যায়ে ধরিতে পারা যায়, অন্য দিকে শ্রী, মেধা, দক্ষিণা, শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে কোন ভাব বা গুণের রূপক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহাদের ছাড়িয়া দিলে, প্রকৃত নারী-ঋষি বা মহিলা-কবি হিসাবে কেবল মাত্র আটটি বা নয়টি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে ব্রহ্মবাদিনী আখ্যার বহুবিধ অর্থ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দের এখানে কোন নিগূঢ় দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ ইহাদের রচনাগুলি পড়িলে বুঝা যাইবে যে, ঋগ্‌বেদের ব্রহ্মবাদিনীরা কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চা করেন নাই, বরং নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ অবলম্বন করিয়া দেবদেবীগণের স্তুতি বা উপাসনা করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম অর্থে বৈদিক দেবগণের স্তুতি বা আরাধনা বুঝিতে হইবে; সেকালে স্তববাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। এবং 'সূক্ত'-শব্দের 'যাহা উত্তমরূপে উক্ত' (সু + উক্ত) 'সদুক্তি', 'সুভাষিত', এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। অনেকে বলেন, ঋগ্‌বেদের যে সমস্ত সূক্ত বা ঋক্ এই ব্রহ্মবাদিনীদের নামে ধরা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের রচনা নয়; অন্য কেহ তাঁহাদের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী সময়ে সেগুলি তাঁহাদের নামেই চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা অনুমান বা অভিমত মাত্র, ইহার মূলে কোন যুক্তি বা তথ্য নাই।

যে আটটি ব্রহ্মবাদিনীর কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, গোধা, অগস্ত্য-ভগিনী, শশ্বতী, লোপামুদ্রা ও রোমশা। ইহা ছাড়া বাক্ এই নামে আর একটি ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা যে সত্যই কোনও মহিলা-ঋষির নাম, সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বাক্ নাম্নী ব্রহ্মবিদুষীর রচিত ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত বর্ত্তমান কালে দেবীসূক্ত বলিয়া পরিচিত। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে শরৎ কালের দেবীপূজায় এই সূক্তটি গৃহে-গৃহে পঠিত হয়; কারণ, দেবীভক্ত শাক্ত-সাধকেরা এই বৈদিক রচনাটিকে তাঁহাদের শক্তিবাদের আদিসূক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা এই সূক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এই রচনার যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহা বিভিন্ন। সেখানে এই সূক্তটির নাম বাগাম্ভৃণী, অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্ নাম্নী ব্রহ্মবাদিনীর রচিত এইরূপ পাওয়া যায়; সায়ণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সূক্তের বক্তা বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন, বাক্ এই নামটি রূপকচ্ছলে কল্পিত নাম; এই নামে কোন প্রকৃত নারী-ঋষি সম্ভবতঃ ছিলেন না। সুতরাং বাক্ অর্থে বাগ্‌দেবী সরস্বতী অথবা শব্দব্রহ্মের কল্পনা, পরবর্ত্তী যুগে, এই সূক্তের নানাবিধ তত্ত্বদর্শী ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিয়াছে। রচনার অন্তর্গত mystic mood বা লোকোত্তীর্ণ ভাবনার পরিচয় এবং রচয়িত্রীর ভাবমূলক নাম হইতেই এইরূপ কল্পনা সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইতে বোঝা যায় যে, প্রাচীন কালে এইরূপ কোনও ধারণা ছিল না, এবং সূক্তটিকে বাক্-নাম্নী স্ত্রীকবির উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা কম গৌরবের কথা নয় যে, এক জন মহিলার রচনা আমাদের সাহিত্য ও চিন্তার ইতিহাসে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, এই সূক্তটির অপূর্ব্ব কবি-কল্পনা এবং লোকাতীত ভাবের উৎকর্ষ। ইহার মহিলা-কবি আপনার আত্মগত অথচ আত্মবিলোপী ভাববৃত্ত এইরূপ বিবৃত করিতেছেন—

আমি রুদ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করি
আদিত্য-বসু-বিশ্বদেবের গণে;
মিত্র, বরুণ উভয়েরে আমি ধরি
ইন্দ্র-অগ্নি যুগল-অশ্বী সনে।

ধরি সোমে, যারে সবনের শিলা হানে;
ত্বষ্টারে ধরি পূষণ ও ভগদেবে;
তুষি ধনদানে দেবতোষী যজমানে,
হবি আর সোমে যে জন আমারে সেবে।

রাষ্ট্রধারিণী দ্রবিণদাত্রী আমি,
প্রথমা বিদুষী যজ্ঞিয়দের জ্ঞানে;
ব্যাপিনী আমারে দেবতারা দিনযামী
নিবেশিত করি' রাখিল সকল স্থানে।

চোখে দেখে যারা, কানে শোনে, প্রাণে বাঁচে,
বলে সবে—আমি তাদের অন্ন আনি;
না জানিয়া তারা নিবসে আমার কাছে;
হে সুধী, আমার শোন শ্রদ্ধার বাণী।

এ সকল শুধু আমিই আপনি বলি,
দেব ও মানবে বাঞ্ছিত মানে যারে;
যাহারে ইচ্ছা তারে করি আমি বলী,
ব্রহ্মবিদ্ বা মেধাবান্ ঋষি তারে।

আমি রুদ্রের ধনুটি বিথারি' ধরি
ব্রহ্মদ্বেষী বৈরি-বিনাশ তরে ;
জনগণমাঝে বিরোধ সৃষ্টি করি ;
দ্যাবাপৃথিবীর প্রবেশিনু অন্তরে।

পিতার প্রসূতি আমি সকলের শিরে,
আমার জন্ম সমুদ্রজল'পরে ;
সকল সৃষ্ট জীবে আছি আমি ঘিরে ;
মম উন্নতি দ্যুলোক পরশ করে।

বায়ুর প্রবাহে বহি আমি অনিবার,
সকল জীবের সৃষ্টি আরম্ভিয়া ;
দ্যুলোকের আর ভূলোকের পরপার
বিরাজিনু আমি আমার মহিমা দিয়া।

আপনার মধ্য দিয়া বিশ্বের একাত্মতা অনুভবের যে হর্ষাবেগ এই সূক্তের কল্পনায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ঋগ্‌বেদের বহুদেবতাবাদের যুগে অপূর্ব্ব হইলেও অচিন্তনীয় নয়। কারণ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান মানবচিন্তার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। বৈদিক যুগেও যে তাহার অভাব ছিল না, তাহা একটি দিক্ দিয়া বর্ত্তমান সূক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহার মধ্যে যুক্তি বা দার্শনিক চিন্তার শৃঙ্খলতা নাই ; সহজ জ্ঞান বা অনুভূতির উৎকর্ষ হইতেছে ইহার আত্মগত অথচ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য। সেইরূপ, সৃষ্টিশক্তির রূপক-নাম হিসাবে অথবা উৎপত্তির উপাদান হিসাবে নামচিহ্নের অতীত হিরণ্যগর্ভ, সর্ব্বব্যাপী সহস্রশীর্ষ পুরুষ, অথবা সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতির কল্পনা, অন্য দিক্ দিয়া বৈদিকচিন্তায় এই অনুসন্ধানের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তার ইতিহাসে বর্ত্তমান সূক্ত একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বাক্-উচ্চারিত এই সূক্তকে কোন বিদেশী লেখক 'The Word speaketh' এইরূপ অনুবাদ করিয়া, ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসম্মত ঐশী শক্তির আবেশের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, এই সূক্তের একটি সার্ব্বজনীন অর্থ করাও কঠিন নয়। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে যে ইহা শক্তিবাদের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিচিত্র নয়।

উল্লিখিত অন্য আট জন ব্রহ্মবাদিনীদের রচনায় এই ধরণের ভাবাবেশ বা উচ্চ তত্ত্বের আভাস নাই। তাঁহারা নিজেদের নারী-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, ঘোষা ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্তের রচয়িত্রী ; উভয় সূক্তই অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে রচিত এবং প্রত্যেক সূক্তে ১৪টি করিয়া ঋক্ বা স্তবক আছে। যে কয়টি নারী-ঋষির ঋক্ ঋগ্‌বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঘোষার মত এতগুলি ঋক্ আর কেহই রচনা করেন নাই। সূক্ত-রচয়িতা প্রাচীন ঋষিবংশে ঘোষার জন্ম ; তাঁহার পিতামহের নাম দীর্ঘতমস্, পিতার নাম কক্ষীবৎ। ইঁহারা ছিলেন অশ্বীদ্বয়ের উপাসক এবং ইঁহাদের উভয়েরই অনেকগুলি সূক্ত ঋগ্‌বেদে রক্ষিত হইয়াছে। সম্রান্ত বংশে জন্মিলেও কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা ৭।৪২-৪৮) যে, ঘোষায় সর্ব্বশরীর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল বলিয়া বয়স্থা হইয়াও তিনি পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। পরে পিতৃ-পিতামহ আরাধিত অশ্বীদ্বয়ের অর্চ্চনা করিয়া, রোগমুক্ত হইয়া বিবাহিতা ও সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। দশম মণ্ডলের ৪১ সংখ্যক পরবর্ত্তী সূক্ত ঘোষার পুত্র সুহস্তের রচিত বলিয়া কথিত আছে। এই গল্পের আভাস ঘোষা-রচিত সূক্তদ্বয়ের মধ্যেও রহিয়াছে ; এবং দীর্ঘতমস্ ও উশীজের পুত্র ও তাঁহার পিতা কক্ষীবৎ তাঁহার স্বরচিত একটি সূক্তে (১।১২২।৫) অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে বলিতেছেন—

ধবল ব্যাধির নিরাময় তরে ঘোষা ডেকেছিল যথা,
উশীজপুত্র আমি আগ্রহে তোমাদের ডাকি তথা।

৩৯ সংখ্যক সূক্তেও ঘোষা নিজের পিতৃগৃহে অনূঢ়াবস্থা ও পরে সুখ-সৌভাগ্যলাভের উল্লেখ করিয়া অশ্বীদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন—

ভবনে নিষণ্ণা জীর্ণা হয়েছে যে নারী,
তোমরা আনিয়া দিলে সুখভোগ তারি।

ঋগ্‌বেদের ১।১১৭।৭ সংখ্যক ঋকে কক্ষীবৎ এ-কথারও প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

উল্লিখিত দুইটি রচনায় ঘোষা তাঁহার প্রতি অশ্বীদ্বয়ের বিশেষ অনুকম্পার জন্য তাঁহাদের বন্দনা করিতেছেন। প্রথমটিতে অশ্বীদ্বয় কিরূপ বিবিধ ব্যক্তিকে বিপদ হইতে রক্ষা ও রোগ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহার বিবৃতি আছে ; ইহাতে ঘোষার নিজের কথা অল্প। দ্বিতীয়টি অধিকতর ব্যক্তিগত ; ইহাতে ঘোষা সরল ভাবে মনের নিগূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অশ্বীদ্বয়ের নিকট ব্যক্ত করিয়া অভিলাষপূরণের জন্য তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন। ইহার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ঘোষা যে স্বামী লাভ করিয়াছিলেন, পাণিগ্রহণের সময় তিনি বিপত্নীক হইয়া পূর্ব্বপত্নীর জন্য রোদন করিতেন ; এবং ঘোষা তাঁহার সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের জন্য অশ্বীদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঘোষা বিবাহের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—

হে নর-যুগল, বিভূষিত করে কেবা কবে কোন্‌খানে
তোমাদের রথ স্তুতির স্তবকে সুখসমৃদ্ধি লাগি' ;
বৃহৎ সে রথ দিবসে-দিবসে তোমাদের বহি' আনে
সদা চলন্ত, জনে-জনে দ্যুতি বিকাশি' প্রভাতে জাগি'।

নিশীথে কোথা, হে অশ্বী-যুগল, কোথা রহ দিনমানে,
বসতি করেছ কোথায় তোমরা, অভিসার কার সনে ?
নারী যথা নরে, বিধবা দেবরে যথা শয্যায় টানে,
তোমাদের বল টানে কোন জন আপনার নিকেতনে ?

সমৃদ্ধ দু'টি রাজার মতন, নিদ্রাভঙ্গ তরে
গীত হয় প্রাতে দিবসে-দিবসে কত তোমাদের স্তুতি,
ওগো আরাধ্য, ধ্বংসি' অশুভ যাও কোথা কার ঘরে,
রাজপুত্রের মত লও কার সোমের সবনাহুতি ?

ব্যাধ ডাকে যথা বৃহৎ মৃগেরে, তেমনি ত বারে বারে
তোমাদের ডাকি দিবস-রজনী আমিও হবিষ্মতী ;
যথাঋতু সবে তোমাদের পূজে যজ্ঞের সম্ভারে,
সকলের লাগি অন্ন বহন কর, হে শুভস্পতি।

রাজার কন্যা ঘোষা আমি, ওগো অশ্বী যুগল-সাথী,
তোমাদের কথা কহি, জিজ্ঞাসি সবারে চতুর্দ্দিকে ;
তোমরা রহিও কাছে কাছে মোর সকল দিবস-রাতি ;
নাশিও আমার অশ্বারোহী ও রথী সে শত্রুটিকে।

বিশ্‌পতি যেন, রথে চড়ি' কোথা চল কুৎসের মত ?
হে যুগল-কবি, ডাকে তোমাদের কেবা কোন স্তুতিগানে,
অভিসারে যায় রমণী যেমন, মধুমক্ষিকা যত
চলে, তোমাদের ভূরি মধুধারা মুখে বহি' তারা আনে।

তারি সখা তুমি যে দেয় হব্য ; বশ কৃশ উশনারে
শয়ু ভুজ্যুরে অভয় দিয়েছ বিপদে রক্ষা করি' ;
সাতমুখী মেঘ বিদারি' ধরারে ডুবাও বৃষ্টিধারে ;
লভি' তোমাদের সখ্য, আমিও সুখের আশাটি ধরি।

ঘোষা বয়স্থা, আজ তার বর এসেছে কন্যাকামী ;
তোমার বৃষ্টি তাহার লাগিয়া ওষধি-শস্য আনে ;
তুর্জ্জয় সে যে, পতি-অধিকার আছে তার—জানি আমি ;
নিম্নাভিমুখী নদীর প্রবাহ বহুক্‌ তাহারি পানে।

যে জন জায়ার জীবনের লাগি' দেবতার কাছে কাঁদে,
যজ্ঞের ভাগ দেয় পত্নীরে, পিতৃগণের তরে
সন্তানে দিয়া জনম প্রিয়ারে দীর্ঘ বাঁধনে বাঁধে,—
পতি সেই জন, পত্নী তাহারে সুখে বাহুযুগে ধরে।

তার সেই সুখ নাহি আমি জানি ; দাও মোরে বুঝাইয়া
কেমনে তরুণ তরুণীসঙ্গ লভে তার মন্দিরে ;
কামনা মোর, হে অশ্বী-যুগল, তেমনি আমিও গিয়া
গৃহে তার রহি, লয়ে বলিষ্ঠ অনুরাগী স্বামিটিরে।

হে ধনী ধনের দাতা, আমা'পরে তোমাদের শুভমতি
থাক্‌ চিরদিন, পুরাও আমার হৃদয়ের অভিলাষ ;
তোমরা দু'জনে রক্ষক মোর হও, হে শুভস্পতি ;
আর্য্যের গৃহে প্রিয়া হয়ে তার করি যেন আমি বাস।

তোমাদের আমি স্তোত্রী, আমার পুরুষের গৃহমাঝে,
কল্যাণদাতা ! বীরপুত্রের সনে দিও ধনরাশি ;
যাত্রার পথে প্রপাণযুক্ত সুতীর্থ যেন রাজে,
পথের বিঘ্ন দূর করে দিও, দুর্ম্মতি জনে নাশি'।

বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘোষা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অত্রিগোত্রজাতা বিশ্ববারাও তাঁহার বর্ত্তমান দাম্পত্য-জীবনের সুখ ও শান্তির জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের নিকট যজ্ঞপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং আহুতি দান করিয়া বলিতেছেন—

সমিদ্ধ হয়ে অগ্নি আকাশে উষাপানে মহাদীপ্তি ধরে ;
নমিছে বিশ্ববারা দেবগণে প্রাচীমুখে হবিপাত্র করে।

হে অগ্নি, তুমি অমৃতের রাজা, সঙ্গী তাহার যে দেয় হবি ;
কর তার শুভ, দাও ধন তারে, আতিথ্য তার ভবনে লভি'।

উজ্জ্বল যতই দীপ্তি তোমার, মোদের ভাগ্য উজ্জ্বল তত ;
দমন করিয়া শত্রুরে, কর দম্পতী-প্রীতি সুসংযত।

হে বৃষভ, তুমি সমিধ্যমান উজ্জ্বলিয়া রহ যজ্ঞভূমি ;
বন্দি তোমার মহাতেজস্বী কান্তি, ধনের দাতা যে তুমি।

ওগো সুযজ্ঞ অগ্নি, আমার যজ্ঞে আহূত, দীপ্যমান,
মোর লাগি' কর যজ্ঞ, পুরোধা, দেবগণে কর হব্যদান।

অধ্বরে মোর জেগেছে অগ্নি, সকলে আদরে আহুতি ধর,
পরিচরণের যতনে এখন হব্যবাহনে বরণ কর।

এই সূক্ত (ঋঃ ৫।২৮) হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশ্ববারা যে কেবল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি স্বয়ং ঋত্বিকও ছিলেন এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। ব্রাহ্মণের যুগে নারীগণ এইরূপ যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অত্রিবংশীয়া অপালা বিবাহিতা হইলেও বিশ্ববারার মত স্বামি-সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। ত্বক্‌রোগের আক্রমণে তিনি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের অপালা-রচিত ৯১ সূক্তের ৭টি ঋকের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় ও রুচিকর জানিয়া অপালা জল আনিবার পথে একটি সোমলতা পাইয়া তাহা দন্তে চর্ব্বণ করিয়া ইন্দ্রের অভিষব করেন। দন্তঘর্ষণের শব্দ সোম-পেষণের প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে মুখ দিয়া সোমরস পান করেন ও তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর দান করেন। পিতার কেশবিরল মস্তক, তাঁহার শস্যবিহীন ক্ষেত্র, ও অপালার ত্বক্‌রোগ-জনিত রোমশূন্য অঙ্গ—এই তিনটিকেই ইন্দ্র উৎপাদনশীল করেন। এবং এই উপলক্ষ্যে অপালার দেহ শকট ও যুগের মধ্যবর্ত্তী রথ-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া তিন বার আকর্ষণ করিয়া অপালাকে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রের সহিত অপালার যে ঘনিষ্ঠতার আভাস রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃহদ্দেবতাকার (৬।৯৯-১০৬) প্রাচীন কালের দেব-মানবীর প্রেম-কাহিনীর অনুযায়ী অনুমান করিয়াছেন যে, ইন্দ্র অপালাকে ভালবাসিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। সূক্তটি এইরূপ—

জল-অভিমুখে চলিতে কন্যা লভে
সোমলতাগাছি, তাহারে দন্তে ধরি'
কহে গৃহপথে—ইন্দ্রের অভিষবে
শক্রের লাগি' তোমারে পিষ্ট করি।

হে বীর ইন্দ্র, যেথা রহে যজমান,
দীপ্তি বিকাশি' যাও তার নিকেতনে,
মন্ত্রাভিষুত মোর সোম কর পান
যব-করম্ভ-অপূপ-উক্থ সনে।

তোমারে, ইন্দ্র, জানিতে ইচ্ছা করি ;
লভিনি তোমারে এখনো নিকটে এসে ;
মন্দ মন্দ, হে সোমবিন্দু, ক্ষরি'
প্রবাহিত হও ইন্দ্রের উদ্দেশে।

ইন্দ্র কি দিবে ধন যার নাহি শেষ ?
দিবে কি মোদের সামর্থ্য মনোরম ?
কত বার আমি পেয়েছি পতির দ্বেষ,
এসেছি লভিতে ইন্দ্রের সমাগম।

ইন্দ্র, পিতার হের কেশহারা শির,
উষর ক্ষেত্র, দেহ মোর রোমহীন ;
হে শতক্রতু, ডাকি আমি, এস বীর,—
উর্ব্বর কর তুমি আজ এই তিন।

শকটের আর যুগের বিবরে তারে,
হে ইন্দ্র, তব রথের রন্ধ্রে ধরি'
কর, তিন বার আবর্ত্তি' অপালারে,
সূর্য্য-সমান ত্বক্ তার, দোষ হরি'।

অবশিষ্ট কয় জন ব্রহ্মবাদিনীর যে সকল রচনা ঋগ্‌বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প ; প্রত্যেকের একটি বা দুইটি ঋক্‌মাত্র, কাহারও কোন সম্পূর্ণ সূক্ত পাওয়া যায় না। গোধার দেড়খানি মাত্র ঋক্ ; অগস্ত্য-ভগিনী, শশ্বতী ও রোমশার প্রত্যেকের একটি ঋক্, লোপামুদ্রার দুইটি।

দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের প্রথম সাড়ে ছয়টি ঋক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে মান্ধাতা ঋষি কর্ত্তৃক রচিত ; পরের ষষ্ঠ ঋকের অর্দ্ধাংশ ও সপ্তম ঋক্ গোধার রচিত। ইহাতে ব্যক্তিগত কিছুই নাই, কেবল ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি আছে—

দীর্ঘ তোমার অঙ্কুশ আর শক্তি-অস্ত্র রয়েছে করে,
সমুখচরণে ছাগ যথা শাখা, তথা শত্রুরে আঁকড়ি ধরে।
(হে ইন্দ্র, দেবী কল্যাণময়ী জননী তোমারে প্রসব করে)*

যেমন মন্ত্র শিখেছি তেমনি আরাধনা করি, করিনি ত্রুটি ;
দেবগণ, ধরি তোমাদের যেন প্রসারি' বাহু ও পক্ষ দু'টি।

দশম মণ্ডলের ৬০ সূক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে ষষ্ঠ ঋক্‌টি অগস্ত্য-ভগিনীর রচিত ; বাকীগুলি তাঁহার পুত্র গোপায়নের। রচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায় না। কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা, ৭।৮৫-৯০) ইঁহার চারি পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমাতির গৃহ-পুরোহিত ছিলেন। কোন কারণে অসমাতি সেই পুত্রদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য দুইটি পুরোহিত নিযুক্ত করেন। নব-নিযুক্ত পুরোহিতগণ সুবন্ধু নামক অগস্ত্য-ভগিনীর এক পুত্রকে নিহত করিলে, অন্য তিন পুত্র শত্রু দমন করিবার জন্য রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ষষ্ঠ ঋকে দেখা যায়, পুত্রশোকাতুরা অগস্ত্য-ভগিনী রাজা অসমাতির উদ্দেশে বলিতেছেন—

লোহিত অশ্ব রথে জুড়ি' চল অগস্ত্য-নপ্তদিগের* তরে।
নাশ' তাহাদের কৃপণ যাহারা দেবগণে নাহি হব্য ধরে।

পরবর্ত্তী ঋক্‌গুলিতে সুবন্ধুর পুনর্জীবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট তিন জন ব্রহ্মবাদিনী—শশ্বতী, লোপামুদ্রা ও রোমশা—তাঁহাদের নারী-জীবনের নিগূঢ়তম কথা অকপট ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঋক্‌গুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও স্বাভাবিক স্পষ্টবাদিতার জন্য উল্লেখযোগ্য। শশ্বতী ছিলেন অঙ্গিরস ঋষির তনয়া ও যাদব অসঙ্গের পত্নী। অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের শেষ ঋক্‌টি তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত আছে। এই ঋকে শশ্বতীকে, নারীধর্ম্মের উৎকর্ষের জন্য বিশিষ্ট ভাবে নারী বলা হইয়াছে। তাঁহার পতি রাজপুত্র অসঙ্গ কোন সময়ে পুরুষত্ববর্জ্জিত হন, পরে মেধাতিথির প্রভাবে পুনরায় ভোগক্ষম হইলে—

হেরিয়া সমুখে স্থূল মাংসল লম্বিত দেহ তারি,
"এনেছ, আর্য্য, সুভদ্র ভোগ" কহে শশ্বতী নারী।

অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রার গল্প প্রায় অনুরূপ। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম দুইটি ঋক্ তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা ৪।৫৭-৫৮)। সংযমী ও ভোগস্পৃহাশূন্য অগস্ত্য দিবা-রাত্রি যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পত্নীর নিকট হইতে সর্ব্বদা নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তপস্বী স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করিয়া লোপামুদ্রা বলিতেছেন—

দিবস-রজনী শ্রান্ত আমারে দীর্ঘ বয়স জীর্ণ করে,
প্রতি-উষা হরে কায়ার কান্তি,—আসুক্ পুরুষ নারীর তরে।

দেব-সম্ভাষী সত্যপালক পূর্ব্ব ঋষিরা, তাদের ঘরে
ছিল জায়া, তবু ছিল তপস্যা,—যাক্ নারী আজ পুরুষ তরে।

এই সূক্তেরই অগস্ত্য-রচিত তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্ হইতে জানা যায় যে, লোপামুদ্রার অনুযোগ ব্যর্থ হয় নাই।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্ বৃহস্পতি-তনয়া রোমশার উক্তি বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার স্বামী প্রতাপশালী রাজা স্বনয় ভাবয়ব্য, তাঁহাকে অল্পবয়স্কা ও নিজের

* এই পাদটি ধ্রুব বা refrain, পূর্ব্বের পাঁচটি ঋকেও রহিয়াছে। পরবর্ত্তী ঋকে ইহা নাই।

* 'নপ্তা' শব্দ মূলে আছে ; এখানে ভাগিনেয় অর্থ বুঝিতে হইবে।

তুলনায় নিতান্ত অনুপযোগী মনে করিয়া অবহেলা করিতেন। রোমশা নিজ অঙ্গে 'প্রথম যৌবনের আগমন অনুভব করিয়া, নবযৌবন-সুলভ স্পর্দ্ধা ও আনন্দে স্বামীর উদ্দেশে বলিতেছেন* —

> হের কাছে এসে পরশি' অঙ্গ—বাল্য আমার হয়েছে গত ;
> আমি যে এখন হয়েছি রোমশা গন্ধারীদের মেষীর মত।

উক্ত সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌টি ভাবয়ব্য স্বনয়ের রচিত, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি রোমশার উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে বা ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হিসাবে উল্লিখিত রচনাগুলির অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া মনে হইবে না ; কিন্তু এগুলি যদি যথানির্দ্দিষ্ট মহিলা-ঋষিদের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সে-যুগের সমাজ-জীবনের, বিশেষতঃ নারী-জীবনের দিক, দিয়া ইহাদের মূল্য অস্বীকার করা যাইবে না। তখনও নারীগণ স্বয়ং যজ্ঞ-সম্পাদন প্রভৃতি কতকগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। স্ত্রীলোকেরাও মন্ত্র রচনা করিতেন, এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাই হউক না কেন, সেই মন্ত্র বেদমন্ত্র বলিয়া সমাদৃত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যে সমাজ Tribe বা জন-সমষ্টির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে কুলপতি বা গৃহস্বামীর ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান ও অনিয়ন্ত্রিত ছিল ; সমাজে ও গৃহে গৃহস্বামিনীর উচ্চ মর্য্যাদা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তথাপি পরবর্ত্তী যুগে তাহার অবস্থার যে অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ ঋগ্‌বেদের সময়ে দেখা যায় না। নারী-জীবনের নিষ্কপট ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হিসাবেও এই সকল ঋক্-রচয়িত্রীদের ঋক্‌গুলির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে ; তাঁহাদের আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-দুঃখের যে ঈষদ্-দৃষ্টি পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ-ভঙ্গীর সারল্যে ও সততায় বিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

* বৃহদ্দেবতায় (৪।১-৩) গল্পটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেওয়া আছে।

যুব-শক্তি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "নিজেদের মূঢ়তার কাছে আমরা বন্দী।"—বস্তুত এর চেয়ে বেশি কেউ আমাদের বাঁধেনি।

আমরা ভয় করি কাকে ? করি তো অনেককেই, কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভয় করি মানব জীবনের সত্য চিন্তাকে। মোহগ্রস্ত মন কিছুতেই ভাবতে চায় না যে কালের পরিবর্তনে এক দিনের সত্য আর এক দিন মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। এই সত্য-বিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির মূল—সমাজেও তাই, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তা।

অহিংসা দিয়ে যখন কাজ হল না, তখন বুদ্ধের অহিংসা চাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের পর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল, তখন চরকার প্রবর্তন, স্কুল-কলেজ বয়কট প্রভৃতি item এর সৃষ্টি হল। সমস্ত কলের তৈরী বস্ত্রও বয়কট করা উক্ত তালিকাতে ছিল। কিন্তু একে-একে সবই নিষ্ফল হল। এখন বাকী—আইন অমান্য। এই অস্ত্র এখন তূণে আবদ্ধ। আগামী বৎসর তার প্রয়োগ হবে। এতগুলি কৌশলের কোনটাই যে লাগল না, তার বেশির ভাগ অখ্যাতির ভার শিক্ষিত যুবকদের উপর পড়ল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাই, এতে কোন ত্রুটি আছে কি না ? ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। তা অসত্য। একবার আরম্ভ করে দেখা গেছে তার গতি পিছনে যায়।

এই যুব-সভাই সত্য। একান্ত সত্য। প্রাচীনদের মুখেও এর সত্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন যে, চীন ও তুর্কীর ন্যায় স্বাধীনতা অর্জনের সত্যকার দায়িত্ব নবজাগ্রত যৌবনের উপর। অতএব তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। অনেকে বলে, গঠনমূলক কার্য করো। এ কাজে যে কিছু না হয়, তা আমি বলি না। গঠনমূলক কাজের আমি বিরোধী নই। গঠনটা যে ঠিক কি এবং কোন্ উপায়ে সার্থক হতে পারে, এ কথাটি তোমাদের নির্ভীক সত্য চিন্তা দ্বারা নূতন করে স্থির করে নিতে বলি।

এখন যুবকরা জিজ্ঞাসা করতে পারে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে করব কি ? কি আমাদের programme ? শক্তির উৎস কি ? কোথায় এর সন্ধান পাওয়া যায় ?—তার উত্তরে বলব, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাই একটা বড় programme। ভিড় করে একত্র জমা হওয়ার নাম সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া নয়। যেদিন প্রকৃত সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে, সেদিন তোমাদের শক্তির অবধি থাকবে না।

একটা বছরও যদি তোমরা একের হাতে সকলের সমবেত দায়িত্ব অর্পণ করে সুকঠোর শৃঙ্খলায় নিজেদের আবদ্ধ করতে পারো, সেদিন পথ রোধ করতে পারে এমন কোন বাধাই তোমাদের চোখে পড়বে না। সেই অজেয় শক্তিকে তোমরা যার বিরুদ্ধে নিয়োগ করবে, তার পরাভব হবেই হবে। এ ছাড়া ঐক্য সাধনার আমি কোনও পথই দেখতে পাই না।

তোমাদের সম্মুখে তিনটি নীতি বর্তমান,—সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি। তোমাদের মুখ্য হউক রাজনীতি, অপর দুই নীতির জন্য অনেক লোক আছেন। তোমরা যুবক, রাজনীতিই তোমাদের বরণীয়।

যাই কেন না তোমরা কর, এই সত্য কথাটা তোমাদের নিরন্তর মনে রাখতে হবে—তোমরা যুবক। তাই তোমরা দরিদ্র। সাংসারিক নিয়মে যাঁরা মালিক, তাঁরা প্রবীণ, তাঁদের বয়স হয়েছে। সৎপরামর্শ দেওয়া ছাড়া কোন দিন টাকা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করার সাহস তাঁদের থাকবে না। দৈন্যের ভিতর দিয়ে তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তোমাদের গভীর অন্ধকারেও সত্যের পথের সন্ধান দেবে।

আজও সপ্তাহ অতীত হয়নি, যতীনের মৃতদেহ একটা রাত্রির জন্য এই সহরের বুকে বিশ্রাম লাভ করেছিল। সেই মৃত্যুর ইতিহাস তোমাদের অন্তরে যেন চিরদিন ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল হয়ে থাকে। যেদিন থেকে মৃত্যুকে সে সত্যরূপে চেয়েছিল, সেদিন থেকেই সে হয়েছিল অপরাজেয়। তাকে পরাস্ত করার শক্তি এত বড় দুর্জয় সরকারেরও ছিল না। মৃত্যু দিয়ে সে এই খবরটি তোমাদের দিয়ে গিয়েছে।"

[পাঠক-পাঠিকাদের ভৌতিক ভয়ে ভীতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে এই রচনাটি রাত্রিকালে না পড়িতে অনুরোধ করা হইতেছে।]

দেশ-বিদেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

"ওয়াকে-নবীশ"

অন্ত্য অর্থাৎ শেষ ক্রিয়ার নাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। গুরুজন ও প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম সভ্যতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। মানুষের জীবদ্দশায় এই ভক্তি ও প্রীতি পরিপূর্ণরূপে প্রদর্শিত হতে পারে কিন্তু স্বজন-বন্ধুদের বিয়োগের পরেও তাঁদের প্রতি যদি এই আন্তরিকতা অটুট থাকে তবেই না কি সভ্যতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রকাশের নিমিত্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়। মনুষ্য-জাতি মধ্যে যে জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী ভদ্র সে জাতি না কি তত সভ্য। সভ্যতা, প্রাচীন প্রথা আর ধর্ম্মানুরোধে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী পৃথক্ হয়। কথায় আছে, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।"

ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির শব দাহ করা হয়। যদিও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও যুগীরা শবের সমাধি প্রদান করে থাকেন। মুসলমান মাত্রেই গোর দেওয়ার রীতি অনুমোদন করেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে হিন্দুদের শ্মশান থাকে এবং কবরের জন্য মুসলমানগণ গোরস্থান নির্ম্মাণ করেন। দেহান্তরের পর হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক্ পৃথক্ পালনীয়বিধি আছে।

ইউরোপ-খণ্ডের খৃষ্টানগণ স্বজাতীয়দের শবদেহ কবর মধ্যে স্থাপন করেন। অন্যান্য দেশের খৃষ্টানগণও এই প্রথা অবলম্বন করেন।

ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য দেশে বহু অসভ্য জাতির বসবাস। তাদের দেবতা প্রায় একরূপ; সকলেই বনস্পতি, নদী, পর্ব্বত, ভূত ও বাঘ প্রভৃতির পূজা করে। কিন্তু তাদের সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক প্রকার নয়। খন্দ ও ভিল জাতিরা পুরুষকে দাহ করে এবং স্ত্রীলোককে মাটিতে প্রোথিত করে। নীলগিরির তোডা জাতির শিশুদের গোর দেওয়া হয় এবং বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদের দাহ করে। হিমালয় পর্ব্বতের প্রায় সকল বাসিন্দা মৃত শরীর ভূগর্ভে প্রোথিত করে। গারো জাতি মৃতদেহ সৎকারের সময় কুকুর বলি দেয়। কারণ কুকুর মৃত ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে প্রেত-লোকে নিয়ে যায়। মহাভারতে আছে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ গমনের পথ একটি কুকুর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়।

ব্রহ্মদেশে সজ্জন ব্যক্তিদের মধ্যে দাহ ব্যবহার আছে। কেবল দুষ্ট লোক ও জঘন্য রোগার্ত্ত ব্যক্তিদের শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়। এই সমাধি-রীতি ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন নয়, অসম্ভ্রম সূচক রীতি।

ব্রহ্মদেশের কারেন জাতীয়ের বাসিন্দারা প্রেতাত্মাকে অত্যন্ত ভয় করে। সৎকারের পূর্ব্বে তারা মশাল কিংবা বাতি জ্বালে। পরে সেই জ্বলন্ত বাতি পরিবর্ত্তন করতে করতে মৃতদেহকে পরিবেষ্টন করে এবং অতঃপর উল্টা দিকে প্রদক্ষিণ করে। শেষে প্রেতাত্মাকে বলে, তুমি বাড়ী থেকে যাও, আমাদের অনিষ্ট ক'র না। কিন্তু এত ব্যাপারেও কারেনদের প্রেতাত্মার ভয় দূর হয় না। তাই কোন গ্রামে কোন মানুষের মৃত্যু হলে সেই গ্রাম তারা পুড়িয়ে ফেলে।

কাফ্রীদের সমাধিকরণের প্রথা কেবল মাত্র রাজার জন্য অবলম্বিত হয়। অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের শবদেহ কাফ্রীরা বন্য পশুদের সম্মুখে নিক্ষেপ করে। মৃত্যুর প্রথম চিহ্ন দেখা মাত্রেই আপন আপন জ্ঞাতি-পরিজনদের জীবিত শরীর বনে নিক্ষেপ করে। কাফ্রীরা মনে করে, যে স্থানে কারও মৃত্যু হয়েছে অশেষ কাল পর্য্যন্ত সে স্থানে দুর্ভাগ্য বিরাজ করবে।

হল্যাণ্ড-দেশীয় প্রথায় মৃত ব্যক্তির দেহ কোন বৃহৎ বৃক্ষের কোটরে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা হয় এবং শবের মস্তক ও অস্থি শ্বেত কিংবা রক্তবর্ণে আবৃত করে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অরণকো নদী তীরের বাসিন্দারা শব রজ্জু দ্বারা বন্ধন ক'রে নদীর জলে নিক্ষেপ করে। ঐ রজ্জু তীরের কোন গাছে বেঁধে রাখে। নদীর মৎস্য ও অন্যান্য জলচর এক দিন এক রাত্রির মধ্যেই ঐ শবের মাংস ভক্ষণ করে। পরে অবশিষ্ট অস্থি গৃহে রক্ষা করা হয়। ঐ স্থানের অপর এক অসভ্য জাতি ঐ অস্থি চূর্ণ করে এবং ধর্ম্ম-ক্রিয়ার সময়ে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। অরণকো নদীর তীরে মকো নামক এক জাতি জনারের আটায় ঐ অস্থিচূর্ণের সংমিশ্রণে পিষ্টক প্রস্তুত করে এবং বন্ধুত্ব রক্ষার নিমিত্ত পরম মিত্রতার চিহ্নস্থানে পিতা-মাতা ও ভ্রাতাদের অস্থিচূর্ণের পিষ্টক ভক্ষণ করে।

আফ্রিকার কঙ্গ নদীর তীরে এক জঘন্য রীতির প্রচলন আছে। সে স্থানের লোকেরা ছয়-সাত বৎসর কাল মৃতের শরীর গৃহে রক্ষা করে এবং দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য ঐ শব বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করে। ব্যক্তি-ভেদে ও সম্পত্তি অনুসারে ঐ বেষ্টন-কার্য্যের বাহুল্য হয়। অত্যন্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের শব ক্রমশঃ বস্ত্রবেষ্টিত করতে করতে এত বৃহৎ আকার ধারণ করে যে তখন আর ক্ষুদ্র ঘরে স্থান সঙ্কুলান হয় না। পরে বৃহত্তর ঘরে ঐ শব রাখা হয় ও পুনরায় বস্ত্র বেষ্টন শুরু হয়। এইরূপে শবের আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হয় ও ক্রমে ক্রমে ছয় গৃহে শব স্থাপনের কাজ শেষ হওয়ার পরে ঐ শব মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত দেহোমীর লোকে মৃত ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাঠাবার জন্য মধ্যে মধ্যে এক-এক জন ক্রীতদাসের প্রাণ বিনষ্ট করে। সেই ভৃত্যের আত্মা গৃহের সমাচার লোকান্তরে নিয়ে যায়।

গেয়ানো প্রদেশে এক প্রথা প্রচলিত আছে যা অত্যন্ত নির্দ্দয়তার পরিচয় দেয়। সেখানে কোন পণ্ডিত বা ধর্ম্মগুরুর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীরা ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত স্বামীর শব ত্যাগ করেন না, দিবা-রাত্রি মৃতের পাশে অবস্থান করেন। গলিত শবের দুর্গন্ধে লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ স্ত্রীদের সাবধানতায় একটি মক্ষিকাও শব স্পর্শ করতে পারে না। ত্রিশ দিন অতীত হওয়ার পর শব ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এক জন স্ত্রীকে সহমরণ বরণ ক'রে মাটির নীচে প্রোথিত হতে হয়।

চীন দেশে মৃত্যুর পরে দেহ বাক্সের মধ্যে স্থাপন করে এবং নানা প্রকার বাদ্যের সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুরাকালে ফ্রেজিয়া দেশে কোন অধ্যাপকের মৃত্যু হলে শবদেহ কোন এক উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হত। মরণান্তেও তিনি সকলকে উপদেশ দিতে পারবেন এই বিশ্বাসে।

পেরু দেশের পার্ব্বত্য বাসিন্দারা মৃত ব্যক্তিকে দুর্গের উপরে রাখে। শব অনাচ্ছাদিত থাকে।

সিংহল দেশে সেকালে কোন রাজার মৃত্যু হলে দেশবাসী রাজার শব কোন শকটের উপর স্থাপন করে ও নগর পরিভ্রমণ

করে। রাজার মাথা গাড়ী থেকে মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অতঃপর দেশীয় রমণীগণ রাজার লুণ্ঠিত মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিন দিন ঐরূপে নগর পর্য্যটনের পর রাজার দেহে চন্দন, কর্পূর ও কেশরাদি গন্ধদ্রব্যের লেপন করা হয় এবং চিতায় স্থাপন করা হয়। দেহ ভস্মসাৎ হওয়ার পর ঐ ভস্ম আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়।

সরকেশীয়া দেশের একটি জাতি অধ্যক্ষদের শব সিন্দুকের ভিতরে রাখে এবং অধ্যক্ষের চক্ষু যাতে স্বর্গ দেখতে পান এ জন্য সিন্দুক-গাত্রে দু'টি ছিদ্র প্রস্তুত করে। পরে ঐ সিন্দুক বৃক্ষের শাখায় বদ্ধ করে রাখা হয়। মধুমক্ষিকার দল ঐ ছিদ্রদ্বয় দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করে এবং মধু ও মোমের সাহায্যে অধ্যক্ষের শরীর আবৃত করে। দেশের লোকেরা উপযুক্ত সময়ে সেই সঞ্চিত মধু বাজারে বিক্রয় করে।

মিশরের 'মমি' সকলেই জানেন। 'মমি' রক্ষার প্রথা—বহু প্রকার গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে সমস্ত দেহ বস্ত্রে আবৃত ক'রে এক সমাধি গৃহে স্থাপন করা হয়। কেবল পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু হলে অথবা পতি বর্ত্তমানে প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃত্যু হলে শব সমাধি-গৃহে না রেখে নিজ নিজ বাসগৃহে রেখে দেওয়ার প্রথা ছিল। এই গন্ধবাসিত শবের নাম মুমিয়া বা মমি। মুসলমান চিকিৎসকেরা ঐ মমি উত্তম ঔষধির ন্যায় নানাবিধ ব্যাধি উপশমের ও পথ্যের বিধান দিতেন। বিত্তশালী ব্যক্তিদের গন্ধবাসিত কার্য্যের জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় হত। এখনও পর্য্যন্ত তিন হাজার বছরের পুরানো 'মমি' পাওয়া যায়। মিশর দেশে আর এই প্রথার প্রচলন নেই, কারণ মিশরের বাসিন্দাদের আজ সকলেই প্রায় মুসলমান।

আন্দামান দ্বীপবাসীরা ভক্তি ও স্নেহ প্রদর্শনের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তিদের মুণ্ড নিয়ে মালা গাঁথে এবং গলায় পরে।

সেকালে ওয়েলসে একটি আশ্চর্য্য নিয়ম ছিল। আমাদের দেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণ যেমন প্রেতপিণ্ড ভোজন করে, ওয়েল্‌স দেশে সেরূপ এক সম্প্রদায় পাপভোজী লোক ছিল। কাকেও গোর দেওয়ার সময় তারা শবের হাত থেকে একখানি রুটি নিয়ে আহার করত এবং এই রীতির জন্য প্রেতাত্মার সকল পাপ নষ্ট হয়ে যেত। এই রীতির কতক আভাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীরাদি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। অশৌচান্তের দিন হিন্দুরা জনৈক ব্রাহ্মণকে কাদা-ধূলা মাখিয়ে প্রেত সাজিয়ে থাকেন। পিণ্ডদানের পর প্রেত-ব্রাহ্মণকে সেই পিণ্ড খেতে দেন। এই ব্রাহ্মণের দল বিলক্ষণ আর্থিক বিদায় পেয়ে থাকেন। পূর্ণিয়া জেলায় শ্রাদ্ধের দিন একটি কুটীর নির্ম্মাণ করা হয়। ভিতরে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী ও প্রেত-নৈবেদ্য সাজানো থাকে। অগ্রব্রাহ্মণ সস্ত্রীক সেই নৈবেদ্য ভোজন করতে শুরু করলে কুটীরের দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ দরজা ভেঙ্গে কুটীরের বাইরে আসে।

সেকালে যাযাবর ক্যালমক জাতির কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না থাকার জন্য স্বজাতি মধ্যে কারও মৃত্যু হলে শবদেহ ফেলে রেখে আবার কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে তারা তাঁবু ফেলত।

ইথিওপিয়ার বাসিন্দারা মৃত-দেহের কণ্ঠে দড়ি ও কলসী বেঁধে জলে নিমজ্জিত করত। অধুনা এই প্রথার আর বড় প্রচলন নেই সে স্থানে। কোন কোন হাবসী সম্প্রদায় আত্মীয় ব্যক্তির অস্থি রেখে দেয়। ইচ্ছা হলে তারা না কি সেই অস্থির সঙ্গে কথোপকথন করে।

পারশ্য দেশীয়দের বিশ্বাস, যে কোন ধার্ম্মিক মুসলমানের কোন বিধর্ম্মীদের দেশে জীবনান্ত হলে স্বর্গীয় দূতেরা ঐ মন্দ স্থানে তাকে থাকতে দেয় না। উপরন্তু আকাশ-পথে শব অন্য বিশ্বাসী দেশে রেখে আসে। পারস্য জাতীয়ের শবদেহ "দখমা" অর্থাৎ "নীরব মন্দির" (Tower of silence) নামে সংকার-স্থানে নির্দ্দিষ্ট এক গর্ত্তে শুইয়ে রেখে দেওয়া হয়। ঐ গর্ত্তের উপর লোহার ঝাঁজ পাতা থাকে। শব ক্রমশঃ রৌদ্র ও শিশিরে গলিত হয় এবং কাক ও শকুনেতে ঐ দেহের মাংস ভক্ষণ করে। শেষে দেহের অস্থিসমূহ খসে নীচের গর্ত্তের ভিতর পড়ে। অতঃপর সেই হাড় সংগ্রহ করে গোর দেওয়া হয়।

সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কামস্কাটকা উপদ্বীপে কামাস্কাডেল নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। তারা মৃতদেহ কুকুরকে ভক্ষণ করতে দেয়। এ জন্য তারা ঘরে ঘরে কুকুর পুষে রাখে। তাদের বিশ্বাস, মৃতদেহ কুকুর কর্ত্তৃক ভুক্ত হলে পরলোকে সুখভোগের কোন অন্তরায় থাকে না। কিন্তু তাদের এই কুকুগুলির বিশেষত্ব এই যে, তারা একেবারেই ডাকতে পারে না।

শ্যাম ও গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদের বিশ্বাস এই, মৃতদেহকে গৃহের যে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রেতাত্মা না কি পুনরায় সেই পথ ধরে ফিরে আসে। সেজন্য তারা গৃহের প্রাচীর ভেঙ্গে নূতন পথ নির্ম্মাণ করে এবং কার্য্য সমাধা হওয়ার পর প্রাচীরের ভগ্ন অংশ পুনরায় গেঁথে দেয়। শ্যামবাসীরা শব জানালা দিয়ে গৃহের বাইরে নিয়ে যায়। গ্রীনল্যাণ্ডে শিশুর মৃত্যু হলে একটি কুকুরকে কেটে গোরে দেওয়া হয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মৃতদেহের হাত-পায়ের নখ তুলে ফেলে এবং হাত পা বেঁধে রেখে দেয়। কাজেই প্রেতাত্মা আর মাটি আঁচড়ে বুকে হাঁটতে হাঁটতে গৃহে ফিরতে পারে না।

উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে রান্না করবার পাত্র, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, বসন-ভূষণ ও ধনুর্ব্বাণ দেয়। প্রেতলোকে দীর্ঘকাল থাকতে হবে, কাজেই পরিধানের মৃগচর্ম্ম ছিন্ন হলে তালি দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু চর্ম্ম গোরের অভ্যন্তরে রেখে দেওয়া হয়।

অধুনা বিজ্ঞানের কল্যাণে এক অভিনব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। মৃত্যুর পর দেহ বৈদ্যুতিক বাক্সের মধ্যে স্থাপন ক'রে বিদ্যুৎ চালনা করা হয়। দেহ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই প্রথা ইউরোপস্থ ধনী-পরিবারে প্রচলন আছে। কলিকাতায় কয়েক জন ধনী ব্রাহ্মের এই প্রথা অবলম্বনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে এই পদ্ধতিতে দাহ করা হয়।

আমাদের দেশে "শ্মশানে সবাই সমান"—এই কথাটির প্রচলন আছে এবং বিদেশের Death the leveller কথাটি অনেকেই পড়েছেন। তবুও বহু শ্মশানক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট চিতার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজা-মহারাজা আর বড় বড় বাবুদের জন্য পৃথক্ আয়োজন এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থা। অবশ্য পৃথক্ স্থানে কোন মহামানবের জীবন-সমাধি সর্ব্বদেশের সর্বকালের রীতি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যের পৃথক্ রাজসূয় আয়োজনের কথায় বিত্ত ও সম্পত্তির কথা আসে। সত্য কথা বলতে কি, যারা সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত তারাই আজ "শ্মশানে সবাই সমান" প্রবাদটি রক্ষা করে চলেছে। প্রসঙ্গ এইখানে ইতি করতে হয়, কারণ মহাজনরা বলে গেছেন—"Man wars not with the dead"—অর্থাৎ, মৃতের সহিত যুদ্ধ করিতে নাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গ এইখানেই খতম।

স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

শ্রীতারানাথ রায়

পলাশীর আম-বাগিচায় না কি স্বাধীনতার সমাধি হয়েছিল। মিথ্যে কথা। ইংরেজের ৬৭ জন আর সিরাজের ১৫।২০ জন সৈন্য মাত্র যেখানে মরল, সেই মস্করা-লড়াই কি গোটা জাতকে বেকুব বানিয়ে দিয়েছিল? মিথ্যে কথা। ইংরেজের মাত্র চারশ' সেপাই পলাশীর যুদ্ধের পর যখন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে, তাদের দেখবার জন্য পথের দু'ধারে ভীড় হয়েছিল—

"The inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones" (Evidence of Lord Clive)—দেশের মানুষগুলো শতে সহস্রে তামাসা দেখতে এসেছিল—ইচ্ছে করলে তারা লাঠি আর ঢিল মেরেই শ্বেতাঙ্গদের সাবাড় করতে পারত। কিন্তু করেনি। কেন?

সেদিন লুণ্ঠন-ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গদের আবার ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়েছিল বাংলার নাগরীরাও। তারা বলেছিল—

"ভরা সাঁজে আউলা ক্যাশে
যাচ্ছ কার বাড়ী?
কাঁচা দুধে, মাথার ক্যাশে
সাহেব, মুছাই তোমার চরণ
জোরে জোরে হাজোৎ দিব,
সাহেব, আইসো আমার বাড়ী।
জোড়ে জোড়ে খাসী দিব,
সাহেব, আইসো আমার বাড়ী।
বসতে দিব শীতল পাটি—
আইসো আমার বাড়ী।"

কেন? কেন?

শত্রু পরাবে শেকল, তবু ওরা তামাসা দেখে বাধা দেয় না। কেন? অত্যাচারে আর অত্যাচারে। ওদের আতঙ্কের সুরে শিশুরাও ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, "বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?" বর্গী এসছিল,— they attacked, too and plundered; perpetrating everywhere the most execrable cruelties, cutting off the ears, noses and hands of many of the inhabitants whom they suspected of concealing the wealth or valuable moveables, sometimes carrying their barbarity so far as cutting off the breasts of women of the same pretence, neither sex or age proving any security against these enraged barbarians."—(Holwell's Historical Events)

আর এই হৃতসর্বস্ব জনসাধারণকে পেষণ করেই রাজারও অর্থ শোষণ—বিদেশী বণিকদেরও অর্থ শোষণ। রাজার শোষণে প্রজা যায় মরে—"The new Government (1737—38) gave a loose to their rapacity and violence, till they reduced the country to a state of comparative poverty and desolation" (Stewart)। বিদেশী বণিকদের অর্থ শোষণের প্রতিযোগিতায় মৃতাবশিষ্ট দেশবাসীর শিল্প-বাণিজ্য হয় লুপ্ত। দেশী তস্কর আর বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের সহায়তা করেছিল সেদিন আমাদেরই দেশবাসী, আজ যাদের বলা হচ্ছে বড় লোক, তাদের পূর্ব্বপুরুষ। এই সমবেত শোষণের ফলেই বাংলার তিন ভাগ লোক সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, তবু জনসাধারণকে পেষণ করে ওরা টাকা আদায় করতে ছাড়েনি।

"Before the famine reached its height, almost all the rice in the country was bought up by the servants of the Company" (Beveridge)···

"The gomastas of English gentlemen, not barely for monopolising grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next hervest" (Auber)

আরও শোন—

"লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ, ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটাবি পত্রমিদং। সণ এগারা শত সাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে। অকালে অন্নাভাবে মরি। মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম। ভরণ পোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন। একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন, এতদর্থে বন্দা আটাবি পত্র দিলাম। ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র।"

সেদিন শ্বেতাঙ্গদেরও পা ধরে বুভুক্ষু দেশবাসী বলেছিল—আমাদের ক্রীতদাস কর—"Throwing at the feet of the Europeans, entreating them to make them as their slaves" (Abbe Raynal)

রাজা আর বণিক প্রতিযোগিতা করে জনসাধারণকে ভিটাহীন করেছিল। টাকা থাকলে তা কেড়ে নিয়েছিল। কারু তাঁত থাকলে তার শিল্পের সর্ব্বনাশ করেছিল। কারু শস্য থাকলে তা লুঠ করে নিয়েছিল। গুপ্তধন আছে সন্দেহ হলে পীড়ন পেষণ করে তা আবিষ্কার করেছিল (Sir Wiliam Meredith)।

তবু জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়নি। ফরাসী বিপ্লব তখন ইউরোপ মাতাচ্ছে। তাই ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী (Abbe Raynal) সেদিন অবাক হয়ে বলেছিলেন—"All the Europeans, specially the English, were posessed of magazines, and even these were not touched; private houses were so too; no revolt, no massacre, nor the least violence prevailed. The unhappy Indians reigned to despair, confined themselves to the request of succour they did not obtain, and peaceably waited the relief of death."—শ্বেতাঙ্গ সমাজ,

বিশেষ করে ইংরেজদের, হাতে ছিল ম্যাগাজিন, তাও কেউ স্পর্শ করল না, ধনীর বাড়ী-ঘরও কেউ লুঠল না—হল না বিদ্রোহ—হল না বেপরোয়া খুন-খারাপী—একটুও হিংসার আমেজ পর্য্যন্ত নেই। হতভাগা ভারতবাসী নৈরাশ্যে গা ছেড়ে দিয়ে থালি হুঁমুঠির জন্য ভিক্ষের হাত পেতেছিল, ভিক্ষে কেউ দেয়নি—ভিক্ষে না পেয়ে মরে শান্তি পাবার জন্য নীরবে ওরা দিন গুণছিল।

কোম্পানী লুঠছে, ক্লাইভ লুঠেছে, দেখাদেখি দেশী রাজবল্লভ, রেজা খাঁ-রাও লুঠছে। এরাই পরে সাদা বিদেশীর হাতেও দেশ তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল—আর দিয়েছিলও। এরা জনসাধারণের কথা মোটেই ভাবেনি। রাষ্ট্র-বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে ভেবেছিল মাত্র আপনাদের স্বার্থের কথা।

তাদের সাথে লুঠেছে হেষ্টিংস; আর দুনিয়ার কাছে জোর-গলায় প্রচার করেছে—"I had arbitrary powers to exercise and I exercised it. Slaves I found the people; slaves they are. They are so by their constitution: I did not make it for them. I was unfortunately bound to exercise it. I did exercise it. The whole history of Asia is nothing more than mere precedents to prove the invariable exercise of arbitrary power."

যা খুসী করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা খুসী করেছি। পেলাম জাত গোলাম—গোলামই ওরা—গোলামী ওদের অস্থি-মজ্জাগত—ওদের গোলাম আমি ত বানাইনি। যথেচ্ছ বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম বলে দুঃখিত। যা খুসী আমি অবশ্য করেছি। এশিয়ার গোটা ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই জুলুমবাজীর কাহিনীতে ভরপুর।

ভাবতে বেপরোয়া লুণ্ঠন আর নরহত্যার কাহিনী ইউরোপকে বা কি সেদিন লজ্জা দিয়েছিল। ওরা দয়া করে একটা সঙ্ঘ তৈরী করেছিল। সঙ্ঘের নাম Aboriginies Protection Society—ভারতবাসীকেও এই বুনো-জাতের সামিল করে তাদের বাঁচাবার জন্য শুধু ইচ্ছা তারা প্রকাশ করেছিল। ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। সোসাইটী ভেঙ্গে গেছল। তখন লর্ড ব্রুহামের নেতৃত্বে লণ্ডনের ফ্রি ম্যাসনস হলের এক সভায় মিঃ টমসন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর এক অস্থায়ী কমিটী গড়েছিলেন।

ভারতের নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন, এই কমিটীর সেকালের কার্য্যকলাপের খবর তাঁদের দিতে হবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রথম প্রেরণা দেননি ডাফরিন হিউম। বিপন্ন জনসাধারণকে বৈপ্লবিক প্রেরণা দেবার চেষ্টা প্রথম কে করেছিলেন, তার সন্ধানও যেমন করতে হবে, তেমনি বিপ্লব পন্থার নিয়মতান্ত্রিক প্রচারকরূপে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদেরও সন্ধান করতে হবে।

এমনি একটা প্রচার আয়োজনের চেষ্টা হয়েছিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বুকে। যোগ দিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মেজাঃ কে এম ব্যানার্জ্জি, প্যারিচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, ডাঃ দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রভৃতি।

১৮৪৩, ৬ই মার্চ্চ সোমবার। ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানা। গুপ্ত মিত্র এণ্ড কোম্পানীর ডিসপেন্সারীর উপর-তলায় বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হল। উদ্বোধন সভার সভাপতি বাবু হরকুমার ঠাকুর। প্রধান বক্তা মিঃ জর্জ্জ টমসন। তাঁর সেদিনকার বক্তৃতার একটু একটু শোনাব—

"এই চার দেয়ালের মধ্যে যারা সমবেত হয়েছে আজ রাতে, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের নামে আহ্বান করি তাঁদের—স্বাগত! কোটি কোটি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার মত কর্ত্তব্যে—স্বাগত! স্বাগত বরেণ্য কর্ম্মক্ষেত্রে! দেশসেবার পূত ব্রতে এ স্থান পবিত্র হোক! এ কক্ষের সর্ব্ব আলোচনা ও পরামর্শ যেন এই মহাদেশের নর-নারীর কল্যাণপ্রদ হয়।

"সম্মুখে ঐ তোমার স্বদেশ। বাংলার শ্যাম ক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি প্রসারিত কর পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। এই তোমার মহাদেশ—মহা সাম্রাজ্য। রেঙ্গুনের মন্দির চূড়া থেকে গজনীর ধ্বংসাবশেষ আর সিংহলের মুক্তাক্ষেত্র থেকে তুষার কিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই দেশ—এদেশের মাঠে মাঠে শস্য-তরঙ্গ, এর মাঠে মাঠে বিচরণ করে অগণিত গোধন।

"শত শতাব্দী এসেছে আর কাল-সমুদ্রে বিলীন হয়েছে—কত কত সাম্রাজ্য উঠেছে আর পড়েছে, এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশ শাসন করেছে দেশ—রক্তলোলুপ নির্মম জেতা একের পর এক এসে এদেশের সন্তানদের সমাধিক্ষেত্রে অশ্বখুর প্রোথিত করেছে—সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের সাথে জাতের নৈতিক চরিত্রের অবনতিও হয়েছে আর দেশপ্রাণতার চিহ্নমাত্র নাই—তবু—তবু এ জাত বেঁচে আছে।

"···জাত সজীব! রাষ্ট্র অবনমিত তবু মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়নি। যশ, সমৃদ্ধির তিরোধান হয়ত হয়েছে—জাতের সন্তানরা তবু বেঁচে আছে। এরা যা ছিল তা থেকেই প্রমাণ, এরা এখনও কি হতে পারবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী জেতার ক্রূর পদ ওদের কণ্ঠ নিপীড়ন করছে। ওরা চূর্ণ হয়েছে, তবু মেরে ফেলতে কেউ পারেনি; ওদের লুঠে নিয়েছে, তবু নিশ্চিহ্ন করতে কেউ পারেনি, ওরা নীচে নেমে গেছে সত্যি, কিন্তু আবার যে উঠতে পারবে না, এ কথা কে বললে?

"মনু যখন করতেন জ্ঞানদান—আর বাল্মীকি গাইতেন গান, তখন যেমন ভারতের শ্যামল উপত্যকার উপর দিয়ে তরঙ্গ তুলে বয়ে যেত নদনদী, আজও বয়ে যায় তেমনি। বসুন্ধরা এখনও করে প্রাচুর্য্য দান, তরুশিরে আজও তেমনি ফোটে ফুল, গিরিগাত্রে তেমনি শ্যাম-শোভা। ভগবান এ পুণ্যভূমির যে প্রাচুর্য্য আশীর্বাদ করেছেন, সে আশীষ উপলব্ধি করে সে দান ভোগ করবার উপযুক্ত হতে আজও এ দেশের নরনারীকে শেখান যেতে পারে।

"ওদের টেনে তুলতে মানুষ চাই। বিদেশের প্রতাপ, স্বদেশে গৃহভেদ ও স্বজন বিরোধ—বহু শতাব্দীর কুশাসনে জনসাধারণ ডুবে গেছে। মনে হচ্ছে, বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক। দেশের অতুলনীয় সুবিধা আর দেশবাসীর সহজাত বুদ্ধিমত্তা থাকলেও তাদের তুলে ধরবার জন্য একটা উত্থান-দণ্ড প্রয়োগ করতেই হবে। এ কাজের ভার কে নেবে? নেবে আমার দেশ।···আমার দেশবাসীর শক্তিতে আমি সন্দেহ করছি না কোথাও। কিন্তু এ শক্তির প্রয়োগ যে ভাবে করা উচিত ছিল তা কি সে করেছে? ধূর্ত্ত বণিক হিসাবে ওরা শ্রেষ্ঠ—

যোদ্ধা হিসাবে ওরা সাহসী—কূটনৈতিক হিসাবে ওরা বড়। কিন্তু এ-দেশের নরনারীর সেবা করতে ওরা পারেনি। কেন? কারণ ওদের মতলবই হচ্ছে, সব কেড়ে খাওয়া…'আমি' ওদের মূলনীতি।… এদেশে আমাদের নীতি মাত্র স্বার্থপর নয়—অন্ধও।…বলা হয়ে থাকে ভারতবাসীর কল্যাণই আমাদের মুখ্য ও পরম লক্ষ্য। অত্যন্ত বাজে কথা, জঘন্য মিথ্যা কথা। বৃটিশ মর্য্যাদার বাহবা কীর্ত্তন আমরা করেছি নতুন নতুন রাজ্য গ্রাস করতে…জাগ ভারতের নরনারী। জাগ!"

এরই আগে এক দিন। ১৮৪৩, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার। বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংএর মানিকতলার বাগান-বাড়ী। রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সভাপতিত্বে আলোচনা বৈঠক। মিঃ টমসন প্রস্তাব করলেন, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার যাতে ইংরেজের অত্যাচারক্লিষ্টরা প্রতিকার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য অভারতীয় দরদীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারবে। তখন অনেকে বলেছিলেন, ও হলে সরকারের চোখে আমরা দুষমন হয়ে দাঁড়াব। টমসন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন,—ভয় নেই, সরকারই তা চায়—

"You see, week after week, announcements of proposed changes, and new laws, and new systems. You offer no advice, you threaten no opposition, you recommend no modification. What is everybody's business is nobody's business, and the law is passed, or it is not passed according to the sole will and pleasure or veiws of Govt." হপ্তার পর হপ্তা নতুন নতুন ব্যবস্থা, বিধি আর পরিবর্ত্তনের কথা জারী করা হচ্ছে, তোমরা কোন পরামর্শও দিচ্ছ না, বাধা দেবার ভয়ও দেখাচ্ছ না, অদলবদলের সুপারিশও করছ না। যাতে সবারই স্বার্থ, তাতে দেখছি কেউ-ই মাথা ঘামাচ্ছে না। কাজেই একমাত্র সরকারের খেয়াল খুশী আর মতলব মত আইন কখন পাশ হচ্ছে কখন বা হচ্ছে না। এর পর কোন ক্ষতি ও অকল্যাণ হলে সরকারের এ অজুহাত দেখান কি অন্যায় হবে যে, যত দোষ তোমাদেরই?

এই ভাবে সেদিন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনে যেমন উপদেশ দিয়ে এই হিতৈষী ইংরেজ বলেছিলেন—"Yours is one that can only be commenced by you, and which future generations must carry on and perfect"—এই সমিতির কাজ তোমরা মাত্র সুরু করতে পার, ভবিষ্যৎ বংশীয়রা এ কাজ চালিয়ে নিয়ে তাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবে—তেমনি আবার তিনি দেশের তরুণদের নব চেতনা সম্পাদনের জন্যও প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন—"এদেশের তরুণরা নির্ব্বিকার—তারা হয়ে পড়েছে আরামপ্রিয়। এক জনও কি তরুণ নেই, যে স্বদেশের জন্য আত্মবলি দেয়? আজ এই সভায় অন্ততঃ এক জনও উঠে বল—

"I will henceforth live not into myself, but for the sake of my own, my native, my beloved land; I will understand its situation, I will study its laws I will acquaint myself with the wants of its population, I will grasp the principles on which its Government should be based, I will understand the various means by which its good may be promoted, I will quaify myself by patient application to communicate my thoughts; and from this time forth, I will labour to enlighten extort and persuade all with whom I meet. What, think you, would be the result, at the end of a few years? Would that individual though now a solitary and despised youth, stand alone, without companionship, without respect, and without co-operation? Would all the wise and liberal and just, minded keep aloof, and leave him pursue his lonely path of patriotic virtue, with no other reward than the soothing whisper of his own conscience? No! The zeal of his youth would rebuke the sluggishness of riper years. The influence of his example would kindle up the kindred elements of other youthful minds. His noble devotion would extort the homage of all good men, who would love to be his co uncellors and helpmates. As he moved along, he would attract by the magnetic influence of his conduct, all beings in sympathy with himself. He would live to inoculate many minds; these in turn many others; and thus the fire would spread, and future ages would feel the cheering influence of this morning star, in the dark horizon of your country."

—অন্ততঃ এক জনও জোয়ান এগিয়ে এসে বল—'আজ থেকে নিজের দিকে আর আমি চাইব না। আমার জীবন উৎসর্গ রইল, আমার দেশ—আমার স্বদেশ—আমার প্রিয় থেকে প্রিয়তর জন্মভূমির জন্য। আজ দেশের কি হাল তা বুঝে নেব, এর বিধিবিধান ভাল করে জেনে নেব, দেশের জনসাধারণের কি কি অভাব তার পরিচয় নেব, কি আদর্শের উপর এদেশের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তা অনুধাবন করব, দেশের কল্যাণ সাধন কি উপায়ে করা যেতে পারে তা আমি জানব—ধীর প্রযত্নে আমার চিন্তাধারা অভিব্যক্ত করবার শক্তি আমি অর্জ্জন করব। আর আজ থেকে যার সঙ্গে দেখা হবে, তাকেই অনুপ্রাণিত, প্ররোচিত ও উদ্বোধিত করবার জন্য আমি অশেষ শ্রম করব।' কয় বছর পর ফল কি হবে বলতে পার? যে আজ নিঃসঙ্গ একা—একটা তুচ্ছ যুবক, সে কি একাই চলবে? তার সঙ্গী কেউ হবে না? শ্রদ্ধাহারা, সহযোগিতাশূন্য যুবক চলবে একা? যত বিজ্ঞ, যারা উদার ও ন্যায়বুদ্ধি-সম্পন্ন তারা দূরে রইবে সরে আর দেশপ্রেমের নির্জ্জন পথে তাকে চলতে হবে একা? আর অন্তরই মাত্র তার কাণে কাণে প্রেরণার উৎসাহ গুঞ্জন করবে? আর কোন পুরস্কার তার জুটবে না? না—না—সে হতে পারে না। তার তারুণ্যের ব্যগ্র আগ্রহ, পক্বাস্থিপক্কদের অচল জড়তাকে ধিক্,

করবে। তার আদর্শ, সে আদর্শের উদ্দীপনায় আরও আরও তরুণ-চিত্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে। যারা সত্যিকার ভাল লোক, এই প্রত্যাবর্তনের বরেণ্য নিষ্ঠার কাছে তারা নোয়াবে মাথা—এগুবে ওদের পরামর্শ দিতে—চাইবে সাহায্য করতে। নওজোয়ান যতই চলবে এগিয়ে, তার চরিত্রের যাদু প্রভাব ততই দরদীদের ডাক দিতে দিতে যাবে। কত কত অন্তরে সে করবে শক্তি সঞ্চার। তার শক্তি-মন্ত্রের শিষ্যরা আরও অনেকের মনে নব নব অগ্নি প্রজ্বলিত করবে। এইভাবে ছড়িয়ে পড়বে বহ্নি। ভবিষ্যতে কি দেখতে পাবে না? তোমার স্বদেশের তম-ঘন গগনের এই প্রভাতী জ্যোতিষ্কের মহানন্দ প্রভাবে তোমরা হবে অনুপ্রাণিত।

সম্ভবত, টমসন ইংরেজ রাজনীতি পরিচালকদেরই প্রতিনিধি হিসাবে এদেশে এসে ইংরেজ জাত তার রাজনীতি আর শাসননীতির উপর নির্ভর করতে শেখাচ্ছিলেন। যেমন শেখাচ্ছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে—"Aglicising education in India" ভারতের শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজের মতলবী নীতি চালিয়ে ইংরেজের এসব প্রচারক ঘনায়মান বর্ণ-ঝুরকে বাধা দিতে চেয়েছিল ধনী ও ধনপ্রত্যাশী দলকে দিয়ে সামাজিক ও ধর্মবিপ্লব বাধিয়ে দিয়ে।

টমসন কিন্তু এদেশে এসে অনাগত মহাবিপ্লবের আভাস যেন পেয়েছিলেন—তিনিও যেন বুঝেছিলেন—

"There is no hostility, but in place of it a cold, dead, apathetic indifference which would lead the people to change masters otmorrow without struggle or a sign" (Adam Report).

তাই অনাগত বিপ্লবী নবভারতের আবির্ভাব-ইঙ্গিত তিনি পেয়ে তাদের সম্বর্দ্ধিত করেছিলেন। যুবভারত আবির্ভূত হয়েছিল এর প্রায় ২০ বছর পরে।

"যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর"

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

যত্নে গাঁথি রত্নমালা জ্বলছে যেথা লক্ষ হীরে
সমর্পিলে কণ্ঠে যাহা ভক্তিভরে বাক্‌দেবীরে
উজল করে ভারতভূমি, বঙ্গমাতার সুসন্তান,
গাহিলে তুমি বিশ্বজোড়া নূতন সুরে নূতন গান।
আছে বটে সৃষ্টি রসের বঙ্কিমেরই উপন্যাসে,
অমূল্য ধন বিশ্বাগারে সাহিত্যেরই ইতিহাসে;
অভ্র-বিহীন আকাশতলে শুভ্র তরল জ্যোৎস্না-মাখা,
গাহিছে যেথা বিহঙ্গম কণ্ঠ ভরে মেলিয়ে পাখা।
তৃপ্তি যাহার আস্বাদনে প্রেমের যেথা স্বচ্ছ ধারা
জটাজুটের শিখর হতে ছুটছে যেন অম্বুহারা।
আদর্শ যার ত্যাগে মহান্ সৌন্দর্য্যে যে টল-টল,
নিষ্ঠা-ন্যায়ের নিখুঁত ছবি,—পবিত্রতায় গঙ্গাজল।
শিল্পী সরল তারকনাথের করুণ রসের উদ্বোধনে
বঙ্গগৃহে পড়ল সাড়া কৃত্রিমতা বিসর্জ্জনে।
"স্বর্ণলতা"র চিত্র মধুর দিব্য শোভায় সমুজ্জ্বল;
"অদৃষ্ট" যা বিধির লিখন ঘটবে তাহা নিত্যফল।
ঐতিহাসিক চিত্রপটে চণ্ডীচরণ মহৎপ্রাণ
আঁকল ছবি দুঃখভরা দেশের তরে স্বার্থদান।
রবির কিরণ উঠল যখন বঙ্গবাসী মুগ্ধ হয়ে
গড়তে চাহে সৃষ্টি নূতন আত্মহারা হর্ষে ভয়ে!
শান্ত শীতল গন্ধবহ জুড়িয়ে দিল প্রাণটি সবার
মাধুর্য্যের চিত্র যবে তুললে ধরে প্রভাতকুমার।
চিন্তা যাহার সঙ্গ-সাথী সংযত ভাব, সরলভাষি'
প্রকাশিল সমাজ-ছবি অনুরূপা দেবী আসি'।
শিক্ষা যাহার মহৎ উদার দীক্ষা চির মন্ত্রপূত,
সৃষ্ট তাহা নিরুপমা দেবীর সদা অনুষ্ঠিত।

শারদীয় নীলাম্বরে শরৎচন্দ্র হলে উদয়
স্বর্গ-ছবি উঠল ফুটে,—(হ'ল) অন্ধকারের পরাজয়।
দৈন্যভরা যবনিকা উঠে গেল রঙ্গভূমে
হৃদয় হ'ল মহান্ করুণ, সোনার কাঠির পরশ চুমে।
রূপ-সোহাগের বুকভরা ধন পল্লীবালার শতেক আশা
ভক্তিমাখা হৃদয়-সাগর, অপ্রমেয় ভালবাসা।
নয় ত ইহা খেয়ালরাশি অন্ধ ফিকে কল্পনার,
সরস্বতীর মন্দিরে এ চিত্র উজল আলপনার;
সত্য যাহা, দেখছ যাহা, লিখছ তুমি অবিকৃত,
শ্রীমণ্ডিত ভাষা তব, সরলতা মজ্জাগত।
নূতন প্রেমের তীব্রবেগে ভাসিয়ে দিয়ে গিরি দরী
"পরিণীতা"য় কিশোরীকে মারলে তুমি ফুলের ছড়ি।
সাধ্বী সতী "বিরাজ বউ"য়ে কি দৃশ্য যে আনলে টেনে
উঠল বেজে ঝঙ্কার এক হৃদয়-তারের সকল খানে।
সাবিত্রীর সে অতীন্দ্রিয় তৃপ্তিবিহীন প্রেমের ধারা
মুগ্ধ করে সবার হৃদয়, বিশ্ব ভুবন উজল পারা।
বঙ্গবধূর হৃদয়-কোণে মিষ্ট যে সুর সুপ্ত ছিল
নিপুণতায় শিল্প, চারু, ক্ষিপ্র হাতে বাজিয়ে দিল।
পল্লীমাতার আঁচল-তলে গুপ্ত ছিল ধনের ঘড়া
ছড়িয়ে দিলে দেশ-বিদেশে লক্ষ মাণিক টাকার তোড়া।
ভ্রাতৃজায়ার অগাধ স্নেহ, পতি-পূজা আত্ম ভুলে,
ভালবাসা বিশ্বজনীন, পর-সেবা পরাণ খুলে
দেখালে গো, হে চিত্তহর, প্রকৃতির প্রিয় শিশু,—
পৃথক্ ভাবে পৃথক্ ছবি দেবতা ও মানব পশু।
দেখালে গো অশিক্ষিতা নারীর হৃদয় উচ্চ কত
স্তব্ধ সবে মনের মাঝে, জেগে উঠে গর্ব্ব শত।

সৃষ্টি তব প্রজ্ঞাবৃত, সৌন্দর্য্যের চিত্রকর,
কীর্ত্তি তব হউক উজল যাবচ্চন্দ্র দিবাকর।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল্লুকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হয়। যে কথা সে বলতে এসেছে তা আচমকা বলার নয়। নাজিমের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়, কি বলতে সে কি বুঝে ফেলে কিছুই ঠিক নেই। ভাল কথা শুনে হঠাৎ রেগে যাওয়াই তার পক্ষে বেশী সম্ভব।

বেশ খানিকটা ভূমিকা করে রইয়ে-সইয়ে কাল্লু তাকে নানীর হত্যাকাণ্ডের পিছনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানায়। নাজিম শান্ত ভাবেই সব কথা শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, 'এ-সব ঝুটা বাত।'

'আজিজকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে। ক'রোজ নাজের-আলি ইয়াসিন সিংহী এরা সলা করেছিল।'

'আজিজের মোকাবিলা সলা করেছিল? খাতির করে পাশে বসিয়ে? বাতচিত কি হয়েছিল আজিজ কি জানবে?'

'কেরামৎ আর খালেকও জানে।'

'ওরা তোমাদের দলের লোক।'

কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলে, 'এটা কি কথা বলছ তুমি, এঁ্যা? বানিয়ে-বানিয়ে মিছে কথা তোমাকে আমিই বা বলব কেন, ওরাই বা বলবে কেন?'

'অ'ল্লা জানে কি মতলব তোমাদের। নাজের আলি সা'ব বলেন, পাকিস্তানে গরীবের কিছু হবে না, এ বাত যারা বলে তারা বেইমান।'

'তারা যদি ফের এ বাতও বলে যে হিন্দুস্থানের গরীবের কিছু হবে না? যদি বলে আপোষের এ কারবার বেইমানী?'

নাজিম আর কথা কয় না। এ-বিষয়ে তর্ক করতেও তাকে নারাজ দেখা যায়। সে কিছু বুঝতে চায় না, যে ধারণাটা জন্মেছে তাই অন্ধ ভাবে আঁকড়ে থাকবে। কাল্লু জানত, সহজ সাধারণ যুক্তি মানবার মত মনের অবস্থা নাজিমের নেই, নাজেরআলি ইয়াসিনেরা মনকে তার বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার বৌ জোর না করলে নাজিমকে বোঝাবার এই মিথ্যা চেষ্টাও সে করত না। সে-ও আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে যায়।

তার বৌ বলে, 'কি হল?'

কাল্লু মাথা নাড়ে।

সেদিন রাত্রে আবার নাজিম মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে, নাজের-আলির মোটরে। বস্তির কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে আজিজ তাকে ধরাধরি করে ঘরে পৌঁছে দেয়।

পরদিন জানা যায়, নাজেরআলি ড্রাইভার আজিজকে বরখাস্ত করেছে। কাল্লু শুনে বলে, 'শালা নাজিমের কাজ এটা।'

আচমকা এ ভাবে আজিজের চাকরী যাওয়ার কারণটা সে সহজেই অনুমান করতে পারে। নানীর বিষয় কথা বলার সময় প্রসঙ্গক্রমে সে আজিজের নাম উল্লেখ করেছিল। নাজিম সে কথা নাজেরআলিকে জানিয়ে দিয়েছে। তার সম্বন্ধেও যে অনেক কথা নাজিম নাজের আলিকে জানিয়েছে তার প্রমাণ পেতেও বেশী বিলম্ব হয় না।

সন্ধ্যা বেলা মুর্গী দোকান থেকে কয়েকটা সওদা কিনে কাল্লু ঘরে ফিরছে, বস্তিতে ঢুকবার মুখে আবদুলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাতের ডাল-মশলা ছড়িয়ে পড়ে, তেলের শিশিটা ছিটকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। ইচ্ছা করে গায়ে না পড়লে পথ-চলতি দু'টি মানুষের মধ্যে এত জোরে সংঘর্ষ সম্ভব হয় না এবং যে ধাক্কা দেয় প্রতিবাদ শোনা মাত্র নরম হয়ে মাপ চাওয়ার বদলে সে এমন ভাবে রুখেও ওঠে না।

দু'জনে বচসা বাধতে না বাধতে কোথা থেকে আরও পাঁচ-সাত জন এসে জোটে, সকলে মিলে একা কাল্লুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারতে আরম্ভ করে দেয়। বস্তির কাছাকাছি ঘরের মানুষগুলি হৈ-চৈ করে বেরিয়ে এসে কাল্লুকে ছাড়িয়ে নেয়।

কি ব্যাপার?

আবদুল পাতলা পাঞ্জাবী-পরা আধ-বুড়ো একটি লোককে দেখিয়ে বলে, 'এর পকেট মেরেছে। ব্যাগটা নিয়ে ভাগছিল।' লোকটির হাতে একটা জীর্ণ মনিব্যাগ ছিল, সেটি সে তুলে ধরে দেখায়।

পকেট মেরেছে! আবদুল নামে করা পকেট-মার, দাগী আসামী, তাকে বুক ফুলিয়ে কাল্লুর নামে পকেটমারার অভিযোগ করতে শুনে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যেও অনেকের হাসি পায়। জগতে সব'ই যেন পকেট মারে আবদুলের মত এবং ধরা পড়লে মার খায়। তবে ধরা পড়ে মার খেয়ে আবদুলের যেমন প্রাণ বাঁচিয়ে পালানো সাধটাই বড় হয়ে ওঠে, কাল্লুর তা দেখা যায় না। আবদুলের গালে সে প্রচণ্ড একটা চাপড় বসিয়ে দিল।

কাল্লুর পক্ষ নিতে বস্তির লোকেরা একটু ইতস্তত: করছিল। তারা বেশীর ভাগ কল-কারখানার মজুর, কাল্লুকে তারা ভাল করে চেনে,—কিন্তু এতগুলি লোক বলছে পকেট থেকে ব্যাগটা তোলার সময় কাল্লুকে তারা হাতে-নাতে ধরেছে। বুড়ো রহমান এগিয়ে আরেকটা দলবদ্ধ উদ্যত আক্রমণ থেকে কাল্লুকে টেনে সরিয়ে আড়াল করে দাঁড়ানোয় বস্তির লোকেরাও এগিয়ে যায়।

রহমান বলে, 'খবর্দ্দার, মার-পিট চলবে না!'

আবদুলেরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'পকেটমারকে পিটব না? কি তাজ্জব!'

রহমান বলে, 'পকেট মেরেছে, থানায় নিয়ে চলো। তোমরা এত আদমি সাক্ষী আছ, কয়েদ হয়ে যাবে। চলো, আমরা ভি সাথে যাব।'

প্রস্তাব শুনে তারা ভড়কে যায়। আধ-বুড়ো লোকটি, যার পকেট মারা গেছে, সে বলে, 'অত হাঙ্গামায় কাজ কি? মাল তো মিলে গেছে। ছেড়ে দাও, যাক গে।'

রহমান বলে, 'তোমার নাম সালেক না? তুমি দর্গা লেনের বস্তিতে থাক?'

সালেক বোধ হয় ভাবতেও পারেনি এত দূরে এখানে তার চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়বে, এই বেশেও তাকে চিনতে পারবে। সে জবাব দেয় না।

রহমান আবার বলে, 'এবার তোমার কয়েদ হয়েছিল কেন সালেক? কত রোজ থেকে ছাড়া পেয়েছ?'

সালেক বিব্রত হয়ে বলে, 'কি বলছ তুমি আবোল-তাবোল যা-তা কথা? এক জনার নামে বানিয়ে-বানিয়ে বললেই হল। চলো চলো, আমরা যাই।'

রহমান বলে, 'আরে আরে, যাবে কোথা? মোদের পাড়ায় এসে পকেটমার পাকড়েছো, তাকে নিয়ে থানায় চলো আগে। চলো থানায় ডাইরী করবে। মোদের আদমিকে ঝুটমুট পকেটমার বলে পিটে ভেগে যাবে, সেটি চলবে না হুজুর!'

আবদুল সালেকেরা তখন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলে বাঁচে। এটা যে প্রধানতঃ মজুর-বস্তি তাদের তা জানা ছিল না, আসলে এখানে এসে এ ভাবে কাল্লুকে মার-পিট করতে সাহস পেত কি না সন্দেহ। পালাতে পালাতে ক্রুদ্ধ বস্তিবাসীর হাতে তারা কাল্লুকে যত না মেরেছিল সুদে-আসলে তার অনেক-গুণ তাদের জুটে যায়।

কালুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে আশ্চর্য্য রকম খুসী আর চাঙ্গা মনে হয়। কিছু তেল, ডাল, মশলার চাল আর কতগুলি গুণ্ডার হাতে কিছু মার খাওয়ার পরিবর্ত্তে সে যেন অনেক বেশী দামী কিছু প্রতিদান পেয়েছে তার বস্তিবাসী মানুষদের কাছে।

এই ব্যস্ত নগরের প্রাসাদ থেকে আস্তাকুঁড়েতে পর্য্যন্ত মানুষের এ ব্যস্ততা তার তুলনা নেই। জীবনের গতি এখানে তীব্র, এক সময়ে অনেকখানি জীবন-ঠাসা গ্রাম্য শিথিলতা এখানে মানুষ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। চলা-ফেরা আহার-বিহার কাজ-কর্ম্ম সব বিষয়েই অসীম ব্যস্ততা। জীবনধারণের জন্য যে খাদ্য গ্রহণ করতেও দেবার মত যথেষ্ট সময় নেই।

তবু এই ব্যস্ততার মধ্যেও মানুষ অবসর খুঁজে নেয়, বিলাসের অবসর। সিনেমা দেখে রেডিও শুনে তাস পিটে রেস খেলে মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নাচিয়ে হোটেলে ভোজ খেয়ে সহরের টাকার পিছে ব্যস্ত পাগলেরা ঊর্দ্ধশ্বাস গতিতে ঢিল দেবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার পর সঙ্গীতমুখর আলো ঝলমল বড় হোটেলে গেলে প্রথমে মনে হবে, সত্যই বুঝি এখানে ব্যস্ততা নেই—শান্ত না হোক, জীবন এখানে ধীর। দশ মিনিট বসলে ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। আপিসের চেয়ারে মানুষগুলি বসে থাকে শান্ত ধীর ভাবে অথচ প্রতিটি মুহূর্ত্ত লাভের পিছনে উদ্দাম গতিতে তার সমস্ত কামনা ছুটে চলে, এখানেও তেমনি ভাবে হোটেলের চেয়ারে বসে জীবন থেকে পান-ভোজন ও উপভোগ আদায়ের লিপ্সায় সে উন্মত্ত হয়েই থাকে। সন্ধ্যার দিকে এটা আড়াল থাকে, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে বাইরে ফুটে বেরোয়। উন্মাদের মতই তারা তখন নাচে গায় আর হাত-পা ছোঁড়ে কথা কয়।

নীচের স্তরে নামতে থাক—একই ব্যাপার। শুধু পরিবেশ রূপ হয়ে যাবে উপকরণ ও আয়োজনের রিক্ততা ও দীনতায়।

প্রণবদের বাড়ী যে দুর্গা ঝি কাজ করে তার মাসী প্রমদা ফুলুরি বেগুনি পেঁয়াজ-বড়া বেচে দিন চালায়। সম্বল তার একটি তোলা উনান, একটা লোহার কড়াই, একটি বারকোশ আর কয়েকটা ছোট-বড় মুখকাটা টিন। দেশী মদের দোকানটার গা ঘেঁষে একটা পতন-ধরা একতলা বাড়ীর ভাঙ্গা সরু রোয়াকটির কোণে বসে সে তার সুখাদ্যগুলি তেলে ভেজে বারকোশে সাজিয়ে রাখে। কড়াই-এর তেল কখনো বদল হয় না, তেল কমে এলে তাতেই আবার খানিকটা কাঁচা তেল ঢেলে দেয়। বিক্রী না হলেও বাসি ভাজি কখন ফেলা যায় না, গরম তেলে ডুবিয়ে একবার শুধু শুধরে নেওয়া হয়।

মদের দোকান আজকাল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। মদ পেটে গিয়ে মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রবৃত্তি উসকিয়ে দেয়, আইডিয়াটা হল এই। মাতাল যেন কোন দিন বৌকে মারা আর এলোমেলো হল্লা করা ছাড়া বড় হাঙ্গামায় মাতার সাধ-আহ্লাদ রাখে বা তাতে স্বোয়াদ পায়! মদের পিপাসা একটা ব্যারাম—মানসিক ব্যাধি নয়, অত্যন্ত স্থূল বাস্তব রোগ। রোগী না কি দাঙ্গা করে!

দুর্গার মাসী প্রমদা পর্য্যন্ত এটা জানে। তার সাধ্য মত জানে। সে বলে, 'এ রোগে ধরলে যার অদেষ্টে যেমন। ঠিক যেমন জ্বর-জারি কলেরা মা'র দয়া—একে অল্পে খালাস দিচ্ছ, ওকে সাবাড় করছ। অ্যাদ্দিন তো দেখ'ছি, আমি জানি। এক জন চুপ-চাপ আসে, অল্প করে খায়, চুপ-চাপ ঘর চলে যায়। দিন নয়, মাস নয়, বছরের পর বছর—এক দিন একটি বার বাড়াবাড়ি নেই। আরেক জন সুরু করতে না করতে আকাশে চড়িয়ে দেয়, রোজ খানায় পড়ে। বছর ঘুরতে দেখায় যেন শ্মশানঘাটের জ্যান্ত মড়া। এ বড় ব্যারাম বাবা, ধনে-প্রাণে মারে।'

দু'দিন নাজিমের ধেনো খাওয়ার রকম দেখেই টের পাওয়া যায়, সে শেষের পর্য্যায়ের রোগী।

ইয়াসিন তাকে ছেঁটে ফেলার কথা ভাবছিল। কোন মতলব হাঁসিল করতেই লোকটা কাজে আসবে না এই হয়েছিল নাজিমের সম্পর্কে তার ধারণা। রেজ্জাকের সঙ্গে আচমকা এক দিন বেলা এগারটার সময় তার বাড়ীতে হাজির হয়ে পরীবাণুকে সে দু'-তিন মিনিটের জন্য দেখে গেছে। নাজিম অবশ্য ই তখন বাড়ী ছিল না, কাজে গিয়েছিল। রেজ্জাক মেয়ে সেজে গিয়েছিল, মফস্বলের পোষাক জরি-চুমকি বসানো ওড়নায় সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রৌঢ়া মহিলার বেশ ধরে। সঙ্গে ছিল আট-ন' বছরের একটি ছেলে পরীবাণুকে পর্দ্দা বাতিল করিয়ে সে ইয়াসিনের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তবে কথা বলাতে পারেনি, দু'-এক মিনিটের বেশী দাঁড় করিয়ে রাখতেও পারেনি। ইয়াসিনের দৃষ্টিপাতে পরীবাণুর সর্ব্বাঙ্গ উৎকট লজ্জায় শির-শির করে উঠেছিল। আচমকা সে পালিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

তার পর থেকে ইয়াসিন আবার নাজিমের সঙ্গে খাতির করছে। পর পর দু'সন্ধ্যা নিজের সঙ্গে বিলাতী-বারে বিলাতী খাইয়েছে, যত সে খেতে পারে। এক জন দোস্ত সে জুটিয়ে দিয়েছে নাজিমকে।

তার নাম ইয়াকুব। নাজিমের সমান পর্য্যায়ের মানুষ, বেশ-ভূষা চাল-চলন কথাবার্ত্তা সব দিক্ দিয়ে। শুধু বয়সটা তার কিছু বেশী হবে। মনটা তার আশ্চর্য্য রকম উদার! নাজিমের চেয়ে বিশেষ বড়লোক না হলেও দু'দিন সে নাজিমকে মদ খাইয়াছে। ইয়াসিন সেদিন তাকে ডাকেনি, কোথায় যাবে কি করবে ভেবে কাজের শেষে বিকালের দিকে গভীর হতাশা আর জোরদার কিছু করার অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষাময় উত্তেজনা জেগেছিল নাজিমের।

হঠাৎ ইয়াকুব এসে হাজির। তার ফূর্ত্তি করার সাধ জেগেছে, কিন্তু একা কি ফূর্ত্তি করা যায়? নাজিমকে সঙ্গে যেতে হবে। যেতে হবেই, ইয়াকুব ছাড়বে না, নাজিমকে তার বড়ই পছন্দ হয়েছে। ছুটি হতে এখনো এক ঘণ্টা বাকী? ছোঃ, একটা বাচ্চার বুদ্ধিও নাজিমের নেই! লীগ গবর্ণমেণ্ট আছে না দেশে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে একটু আগে আপিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলে নাজিমকে কিছু বলবে?

ইয়াকুব সেদিন তাকে প্রথম দেশী মদ খাওয়ায়। অ্যালকোহল নয়, স্পিরিট। যত সে খেতে পারে। সে রাত্রে অজ্ঞান মৃতপ্রায় নাজিমকে নিজের গাড়ীতে ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়ে ইয়াসিন ইচ্ছা করলেই পরীবানুকে ভোগ করতে পারত। পরীবানুর মেয়েলি বোধ-শক্তিকে ভাবছিল যে ওই রকম কিছু বোধ হয় ঘটবে। কিন্তু ইয়াসিন সস্তা সাধারণ গুণ্ডা নয়, সে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী এই কলকাতায় প্রায় পৌণে এক স্কোয়ার-মাইল এলাকায় গুণ্ডাদের বাদশা। সে ইংরাজী জানে, ইংরাজী বই পড়তে পারে, ইংরাজী সকল ছায়াছবির কথোপকথনের মোটামুটি মানে বোঝে।

তাই, পরীবানুকে অভয় দিয়ে সে ফিরে যায়। কৃতজ্ঞতায় মুগ্ধ অচল ও বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরীবানু তার বস্তির ঘরের বাঁশের বাতায় শিক-বসানো ছোট জানালাটিতে মুখ রেখে আকাশ-পাতাল ভাবে। ভাবনায় আকাশেও থাকে তার নসিব, পাতালেও থাকে তার নসিব। বুকের মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভ উথলে ওঠে, কেন তার নসিব এমন হল? তার না কি রূপ-যৌবন আছে, অনেক মেয়ের চেয়ে সে না কি অনেক বেশী খাপসুরৎ। কেন তবে তার বস্তির এই ছোট ঘরটিতেও লাঞ্ছন মরণ?

নেশায় অচৈতন্য নাজিম ভিতরের যন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখবার সাধও পরীবানুর হয় না। নাজিমের আকস্মিক পরিবর্তনে প্রথমটা সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হতাশ হয়নি। ভেবেছিল, নানীর মরণের আঘাতে সাময়িক ভাবে মাথাটা তার বিগড়ে গেছে, ঠিক হয়ে যাবে। নেশার ঘোরে নাজিমের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারেও সে দমেনি। ভেবেছে, নাজিম তো তাকে মারেনি, নাজিমের মগজ দখল করে তার দিয়ে তাকে মেরেছে ওই শয়তান নেশা। ওই নেশা তার দুষমণ, নাজিম নয়। নেশা করা কোন দিন নাজিমের ধাতে ছিল না, গভীর দুঃখে সে মদ খায়, মদ খেয়ে নিজেকে সামলাতে পারে না। তার কি দোষ?

কিন্তু সব আশা ঘুচে গেছে পরীবানুর। ভয়ে-ভয়ে আজকেই সে নাজিমকে ইয়াসিনের কথা বলেছিল, লোকটার যে মতলব সে আন্দাজ করেছে তা-ও জানিয়েছিল। শুনে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল নাজিমের। তখন সকাল, মাথা থেকে নেশার শয়তান উপে গেছে, রেখে গেছে শুধু অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া।

'শালাকে খুন করব।'

'না না, হাঙ্গামা কোরো না। ওর সাথে না মিশলেই ফুরিয়ে গেল! সকাল সকাল ঘরে চলে এসো।'

সেই নাজিম আজ রাত্রেই আবার সেই ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেয়ে তারই গাড়ীতে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী ফিরেছে। এ অবস্থায় না হয় তার খেয়াল নেই যে তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে এসে আবর্জনার মত তাকে এক পাশে ফেলে রেখে ইয়াসিন তার পরীবানুর দিকে হাত বাড়ালে কারো কিছু করবার থাকত না। কিন্তু ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেতে বসার আগেও কি পরীবানুর সকাল বেলার কথাগুলি নাজিমের মনে পড়েনি? মদ খেতে-খেতে জ্ঞান লোপ পাবার আগে একবারও কি খেয়াল হয়নি গাঁটের পয়সা খরচ করে কেন এ লোকটা তাকে মদ খাওয়ায়?

নিশ্চয় মনে পড়েছে, খেয়ালও হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। নতুন নেশার কাছে পরীবানু তার তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দূরে কোথায় আগুন লেগেছে। পরীবানুর এই জানালা থেকে আগুন দেখা যায় না, শুধু চোখে পড়ে খানিকটা রক্তিম আকাশ। সেদিকে চেয়ে পরীবানুর ভাবনায় ভাবনায় কাজল-মাখা চোখ ফেটে জল আসে।

পরদিন দুপুরে রেজ্জাক আসে। হেমনি মেয়েমানুষের বেশে

কানের একজোড়া সোনার ফুল পরীবানুকে দিয়ে সে বলে, 'ইয়াসিন সাব পাঠিয়েছে। তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে লোকটা।'

তাকে ইয়াসিনের কথা শোনায় রেজ্জাক। কত তার টাকা, কত তার প্রভাব-প্রতিপত্তি আর কি দরাজ তার দিল। সোনার ফুল হাতে করে পরীবানু নিঃশব্দে শুনে যায়।

রেজ্জাক বলে, 'চল না, গাড়ী চেপে হাওয়া খেয়ে আসি?'

পরীবানু মাথা নাড়ে—'ঘর ছেড়ে যেতে পারব না।'

ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে তার আতঙ্ক টের পেয়ে রেজ্জাক মেয়েলি ভঙ্গিতে মুখ টিপে হাসে। বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আগে ভাব হোক, ভয় ভাঙুক, কেমন কি না? আজ রাতে এসে ভাব করে যাক!'

'ঘরের মালিকের সামনে?'

রেজ্জাক আবার মুখ টিপে হাসে।—'মালিক আজ ঘরে ফিরবে না গো, তার মন বাইরে গেছে। কাল ইয়াসিন সাব কোলে করে তুলে এনে ঘরে পৌঁছে দিল বলে তো, নইলে নতুন বিবির ঘরেই ঘুমিয়ে থাকত।'

একথা পরীবানু কাল রাত্রেই শুনেছিল। এ কথা শোনার পর মনটা তার একেবারে বিগড়ে গেছে। যার ঘরে রাত কাটাতে এত ব্যাকুল নাজিম, সে কি তার চেয়েও খাপসুরৎ?

প্রমদার একটু জ্বর এসেছিল। দুর্গা তাই সেদিন গিয়েছিল তার তেলে-ভাজার কারবার বজায় রাখতে। মাঝে-মাঝে দুর্গা গিয়ে মাসীর কাছে বসে, ফুলুরি বেগুনি পেঁয়াজ-বড়া বিক্রী ছাখে। প্রমদা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গেলে নিজেও বিক্রী করে। কোনটার কত দাম তার জানা আছে। মাতাল ক্রেতা তেলে-ভাজার বদলে তাকেই কিনতে চাইলে কি ভাবে তাকে ঠেকাতে হয় তাও দুর্গার অজানা নয়।

বস্তিতে বাস, ঝি-গিরি করে পেট চালায়, বয়স কম। এসব না জানা থাকলে চলে না।

নাজিম সেদিন হাঙ্গামা করে। ইয়াকুবের সঙ্গে মদের দোকানে ঢোকার সময় দুর্গার কাছ থেকে সে তেলে-ভাজা কিনেছে, দুর্গার দিকে ভাল করে চেয়েও ছাখেনি। দোকান থেকে বেরিয়ে নজর পড়তেই তার মনে হয় দুর্গা ছাড়া তার এ জগতে আর কেউ নেই।

দুর্গা কড়া-গলায় ইয়াকুবকে বলে, 'সামলে নিয়ে চলে যাও না বাবু?'

ইয়াকুব একটা আস্ত দশ টাকার নোট তার সামনে ধরে বলে, 'আজ রাতটা তুমিই সামলাও না?'

দশ টাকা। এক বাড়ীতে পুরো এক মাস বাসন-মাজা ঘর ঝাঁটানো মসলা-বাটা কয়লা-ভাঙ্গা জল-তোলার খাটুনির দাম!

দুর্গা তবু বলে, 'আমি পারবোনি।'

ইয়াকুব কাঁচা একটা টাকা বার করে বলে, 'কে পারবে দেখিয়ে ... না। নোটটা সে নেবে, তুমি টাকাটা নিও।'

এগারটা করকরে টাকা! দুর্গা নাজিমকে ভাল করে চেয়ে ... । মোটামুটি ভদ্র চেহারা, ধুতি আর পাঞ্জাবী ফর্সা। দুর্গা ... হয়ে নোট আর টাকাটা ছিনিয়ে নেয়, বলে, 'আচ্ছা, আমিই ...বো।'

নাজিমকে দুর্গা ঘরে নিয়ে যায়। এগারটা টাকা পেয়েছে, ... বাড়ীতে পুরো এক মাস খেটেও যা সে পায় না, তাই ...তাড়ি মাটির ঘরের মাটির প্রদীপ নিবিয়ে সে নাজিমের পাশে ...। পুরুষালি ব্যবহারের ভয়ঙ্করতম নমুনা পাবার ভয়ে দাঁতে ... লাগিয়ে রাখে।

মড়ার মত পড়ে থাকে নাজিম।

খানিক পরে দুর্গা ওঠে। আবার তার মাটির ঘরের মাটির ... জ্বালে। জল এনে নাজিমের মাথা ধুইয়ে দেয়। পাখাটা ... এনে নাজিমের মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

তখন অল্পে অল্পে তার মনে হতে থাকে মানুষটা যেন চেনা-চেনা ...! পথে-বাজারে হোক, অন্য কোথাও হোক, আগে যেন ...ক বার দেখেছে এ লোকটাকে। প্রদীপটা তুলে এনে মুখের কাছে ... দুর্গা ঠাহর করে দ্যাখে। মনে পড়ি-পড়ি করে মনে পড়তে ... না, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মানুষটা এমন ভাবে রহস্যময় হয়ে ওঠে ...মিশ্রিত ভয়-ভাবনার বিষয় দুর্গার পক্ষে!

প্রদীপটা রাখতে রাখতে আচকা নাজিমের পথে দেখা মূর্তিটা ... মনে ঝলক মেরে যায়—ধুতির বদলে লুঙ্গি পরা নাজিম, ছক ... ছাপ-মারা লুঙ্গি!

কি সর্বনাশ! দুর্গার গা কাঁপে, সে শিউরে ওঠে। মাতাল ... মুসলমানকে সে ঘরে এনেছে, বিছানায় শুইয়েছে! জানা-... হলে কি হবে? পাড়ায়, ঝি-সমাজে তার লজ্জা আর ...স্কারের সীমা থাকবে না। মানুষটা ও-পাড়ার বস্তির, তার ... দেখী হলেও এ-পাড়ার অনেকেই হয়তো তাকে ভাল করেই ..., নাম জানে, পরিচয় জানে। কে জানে, কেউ দেখেছে কি না ... আনবার সময়?

প্রমদা এক-নজর তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। অনেক দিন ... করে দুর্গা যে আজ মনস্থির করেছে, প্রথম বার পুরুষ নিয়ে ... এসেছে, এটা প্রমদার খুশী-অখুশীর ব্যাপার নয়। দেশে যাবার ... করে দুর্গার স্বামী এক বছরের ওপর ভেগেছে, পরে জানা গেছে ... রেল-পুলের কাছের বস্তিতে আরেকটি মেয়েমানুষের সঙ্গে বসবাস ...ছে। এ অবস্থায় কি করবে না করবে দুর্গারই স্থির করার কথা, ... কোন চারা নেই। তবে ভাজি বেচতে গিয়ে পথ থেকে ...মকা এক জনকে কুড়িয়ে না আনলেই দুর্গা সুখী হত। ... চেয়ে ক'দিন চেনা-জানা হবার পর একটু যাচাই-করা মানুষের ...পে ঘর বাঁধা ভাল।

কি করবে ভেবে না পেয়ে দুর্গা এসে প্রমদাকে বলে, 'মাসী, ...কটাকে চিনিস্ না কি দেখবি আয় তো?'

'আমি যাব না।'

'বড় ঝনঝাট হল মাসী, পায়ে পড়ি আয়। বেঘোর হয়ে পড়ে ...ছে, তোর ভয়টা কি?'

'ঝনঝাট কিসের?'

প্রমদা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে আসে। নাজিমকে দেখে আতঙ্কে উঠে বলে, 'মা গো মা দুগ্গা, তোর কাণ্ডজ্ঞান নাই? একটা বেজাতকে নিয়ে এসেছিস্!'

'আস্তে কথা বল মাসী, লোকে শুনবে না? কি করি এখন বল দিকি?'

'আনলি কেন?'

'কেমন ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসেছে, মোটে চিনতে পারিনি গোড়ায়।'

প্রমদা, 'গোষ্ঠকে ডাকি? মোরা মেয়েলোক কি করব?'

দুর্গা ভয় পেয়ে বলে, 'না না, গোষ্ঠকে নয়। ওর খপ্পরে পড়ব না বাবা, দফা নিকেশ করে দেবে।'

'তবে চুপ মেরে থাক। রাত বাড়লে মোরা ধরাধরি করে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে আসব।'

'তুইও থাক মাসী। ঘোর কেটে যদি জেগে ওঠে?'

'জ্বর গায়ে বসতে পারবনি। মোর মাথা ঘুরছে।'

প্রমদা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বেজাত পুরুষটাকে আগলে ঘরে একা জেগে বসে থাকে দুর্গা। অস্পষ্ট আওয়াজ করে নাজিম একটু নড়লে-চড়লে তার বুক ঢিপ-ঢিপ করে। একগাদা মদ খেয়েছে বলেই শুধু গোড়ায় মানুষটার সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল, নইলে সুন্দর চেহারার যোয়ান মানুষটাকে বিশেষ তার অপছন্দ হয়নি। প্রদীপ নিবিয়ে পাশে শোয়ার সময় ভয়ের মধ্যেও প্রত্যাশার উত্তেজনা বোধ করেছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের অনেকগুলি রাত তার এই শয্যায় নিঃসঙ্গ কেটেছিল। নেশায় মানুষটাকে কাবু দেখে মাথায় জল ঢেলে সেবা করার সময় মন তার ভরে গিয়েছিল মমতায়। শুধু জাতটা টের পাওয়া মাত্র সেই মন তার ভয়ে-বিতৃষ্ণায় শত যোজন তফাতে সরে গেছে! এখন ওকে যদি বাঘে টেনে নিয়ে যায় সে যেন বাঁচে! অধীর হয়ে সে সময় গুণছে কতক্ষণে রাত্রি গভীর হয়ে পাড়া নির্জন নিঝুম হয়ে যাবে, মাসীর সঙ্গে ধরাধরি করে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবে মানুষটাকে।

ক্রমে ক্রমে নাজিমের ছটফটানি বাড়ে, যন্ত্রণার অস্ফুট শব্দ স্পষ্টতর হয়। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে-ধীরে দুর্গার বোধগম্য হতে থাকে যে লোকটা ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে, অদ্ভুত রকম বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখটা। বেশী মদ খেলে কি এ রকম হয়? না মদের সঙ্গে অন্য কিছু খেয়েছে? বিষ-টিষ কিছু? সঙ্গের সেই লোকটা খাইয়ে দিয়েছে?

হাত পা অবশ অবসন্ন হয়ে আসে দুর্গার। হয়তো মেরে ফেলার মতলবে সঙ্গের লোকটা সত্যই একে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, তার পর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেটে পড়েছে। নইলে এক রাত্রির জন্য তাকে কেউ এগারটা টাকা কখনো দেয়? তার ঘরে এ ভাবে লোকটা যদি মরে যায় কি সর্বনাশ হবে তার।

কি কুক্ষণে আজ তার এই কুমতি হয়েছিল।

দুর্গা এখন করবে কি?

তার মধ্যে এক সময় বমি করে নাজিম দুর্গার বিছানা ঘর-দুয়ার ভাসিয়ে দেয়। দুর্গা নিজের হাতে আজ যে ভাজি বিক্রী করেছিল সে সবও বেরিয়ে আসে তার পেট থেকে। দুর্গার গা ঘিন-ঘিন

করে। নিজের মরণ চাইতে চাইতে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। নাজিম আর ছটফট করে না, গোঁঙায় না। নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। দুর্গা ভাবে, এইবার কি মরবে মানুষটা ?

খানিক পরে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে নাজিম জল চায়। কোন রকমে উঠে বসে।

তার ঘরে সে যে মরবে না, মরে তাকে যে ভীষণ বিপদে ফেলবে না, নাজিমের এই অনুগ্রহে দুর্গার যেন কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না—সে যে বেজাত বিধর্মী, বমি করে সে যে তার ঘর-দুয়ার নোংরা করে দিয়েছে সব দুর্গা ভুলে যায়। জল গড়িয়ে গেলাসটা সে নিজে নাজিমের মুখে ধরে।

জল খেয়ে নিজের বমির মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে এক রকম সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুর্গা বলে, 'শুনছ ? কথা শুনছ !'

গেলাসের তলাটা দিয়ে মাথায় ঠেলা দেয়। নাজিম নড়েও না, সাড়াও দেয় না। ভোঁস-ভোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে থাকে।

কলসী আর বালতিতে জল তোলা ছিল, জল ঢেলে ঝাঁটিয়ে দুর্গা মেঝেটা সাফ করে। এটা তাকে করতেই হবে, আজ অথবা কাল। এই ঘরে না থেকেও যখন তার উপায় নেই, এখনি সাফ করে ফেলা ভাল। তার স্বামী অঘোরের বমিও দু'-চার বার তাকে সাফ করতে হয়েছে। নেশার অভ্যাস ছিল না অঘোরের, খেলেই বেতাল হয়ে পড়ত। আর ঠিক এমনি ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড় তুলে অঘোরে ঘুমোত। জাগত শেষ রাত্রে।

দুর্গার ভয়-বিহ্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যায়। পিঁড়ি পেতে বসে ঘুমে বেহুঁশ নাজিমের দিকে চেয়ে সে ভাবে, এত উতলা হবার কি আছে ? তার ঘরে এসেছে মানুষটা, চারি দিকে হিন্দুর বসবাস। মুসলমান হোক খৃষ্টান হোক তার ভয়ের কি আছে—এ পাড়ায় এই লোকটারই বরং ভয় পাবার কথা। ঘুম ভেঙ্গে ভালয়-ভালয় যেতে না চায় একটু ভড়কে দিলেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবে না। বোকামি করে ঘরে যখন এনেই ফেলেছে মানুষটাকে মিছামিছি বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। মাসীর পরামর্শটা এতক্ষণে বেশ খানিকটা খাপছাড়া ঠেকে দুর্গার কাছে। ধরাধরি করে একটা জ্যান্ত মানুষকে রাস্তায় নিয়ে ফেলার ঝক্কি কম নয়। কে দেখবে, কিসে কি হবে কে জানে! তার চেয়ে মানুষটাকে ঘুমিয়ে নেশা কাটাতে দিয়ে রাতারাতি ভাগিয়ে দেওয়াই ভাল—যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যাবে, কেউ টের পাবে না।

করকরে নগদ টাকাগুলি হাত পেতে নিয়েছে, তার বিশ্বাসটাও তো রাখা উচিত ? জাত ধর্ম শুধিয়ে যখন সে টাকা নেয়নি, মাতাল দেখেও টাকা নিতে আপত্তি করেনি, রাতটা শুধু তার ঘরে ঘুমিয়ে কাটাতে না দিলে অন্যায় হবে, পাপ হবে। সে কি ঠক-জোচ্চোর যে টাকাটা হাতে পেয়ে কড়ার ভুলে যাবে, মরুক বাঁচুক অচৈতন্য মানুষটাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসবে ?

গভীর রাতে প্রমদা চুপি-চুপি খবর নিতে আসে—দুর্গাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলে তার কিছু বখরার আশা ছিল।

দুর্গা বলে, 'থাক গে মাসী। অত হাঙ্গামায় কাজ নেই। নেশা কাটলে ভোর রাতে ভাগিয়ে দেব।'

প্রমদা ক্রূর চোখে তাকায়, বলে, 'ওর সাথে তুই যাবে যেতে ?'

দুর্গা বলে, 'রাম রাম, মোর গলায় দড়ি জোটে না ?'

'তোকে ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছিস ? একে ইয়ে তায় মাতাল ?'

'এক দম কাবু হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবার সাধ্যি হবে না। তাছাড়া, প্রাণের ডর নেই ওর ? কোন্ পাড়ায় এয়েছে টের পেলে প্রাণটা নিয়ে কতক্ষণে ভাগবে তার চেষ্টা দেখবে না ?'

ক্রূর চোখে চাইতে চাইতে প্রমদা ফিরে যায়।

পিঁড়িতে বসে ঢুলতে ঢুলতে চমকে চমকে তন্দ্রা ভেঙ্গে সারা রাত জেগে কাটায়। শেষ রাত্রে ঠেলে তুলে দেয় নাজিমকে। বলে, 'মরণ-দশা পেয়েছে বুঝি তোমায়, এ পাড়ায় এয়েছ মরতে করতে ?'

দেখা যায়, হিসাব দুর্গার ভুল হয়নি। ব্যাপার বুঝতে একটু সময় লাগে নাজিমের, কিন্তু বুঝে পালাবার জন্য সত্যই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

দুর্গা তাকে সাথে নিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আসে। বস্তির ঘরে-ঘরে তখনো সকলে ঘুমোচ্ছে।

সকালে দুর্গা প্রমদার ঘরে ঢুকতে যাবে খবরটা দিতে, প্রমদা একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে! বলে, 'বেরো বেরো, ঘরে ঢুকিস নে তুই আমার! জিনিষ-পত্র ছুঁস নে আমার! তোকে ছুঁতে নেই!

মাসীর কাছে দুর্গার জাত গেছে! এক রাত্রে সে অস্পৃশ্যা হয়ে গেছে!

[ক্রমশঃ

"ইওরোপে এসে আমি সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। তাই বি, বি, সি থেকে ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয় আমি তা তুলনা করে দেখাতে পারি। বি, বি, সি ত নয়—Bluff and Blustar Corporation."

—সুভাষচন্দ্র বসু
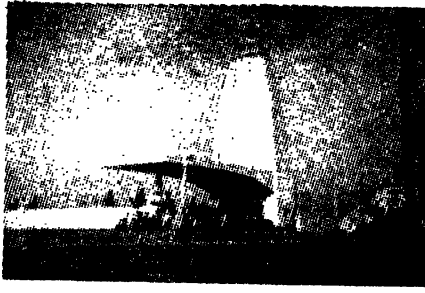
(ব্যারাকপুরের গান্ধী-ঘাট) —স্মৃতিচিহ্ন

(উপরে)—সনৎ দাস
নীচে)—তরুণ চট্টোপাধ্যায়
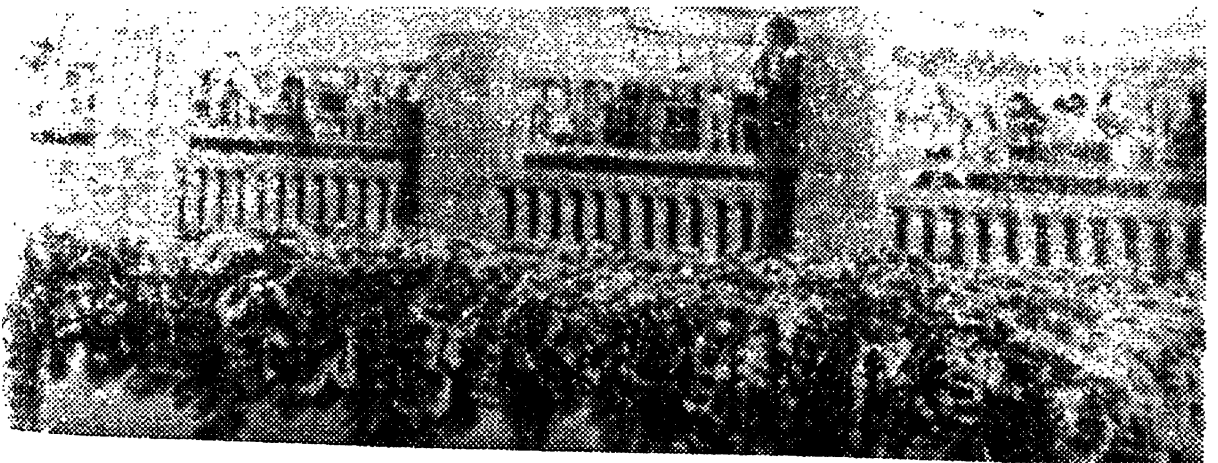
দিল্লীতে মহাত্মাজীর সমাধি-স্থান) —শেষ চিহ্ন

—কানাই পাল

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি

পুণ্যস্মৃতি

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির

পুতুল (জি, পাল স্টুডিওর অভ্যন্তরে নির্ম্মিত মূর্তিসমূহ

পুতুল —অমলেন্দু বসু

—অনিমেশ চট্টোপাধ্যায়

—মণি সেন

শাখা ও শিখা

—সমর পাল

জলন্ত তুবড়ী —দেবীপ্রসাদ

আব্দার —বিমল রায়

কান্না —সুধাংশু মণ্ডল
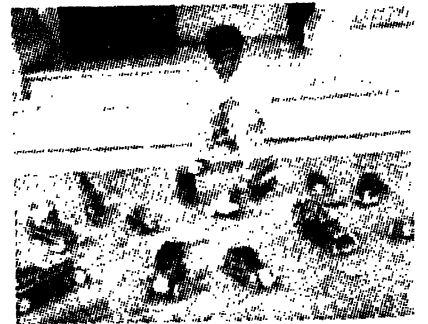
বায়না —অনিলকুমার
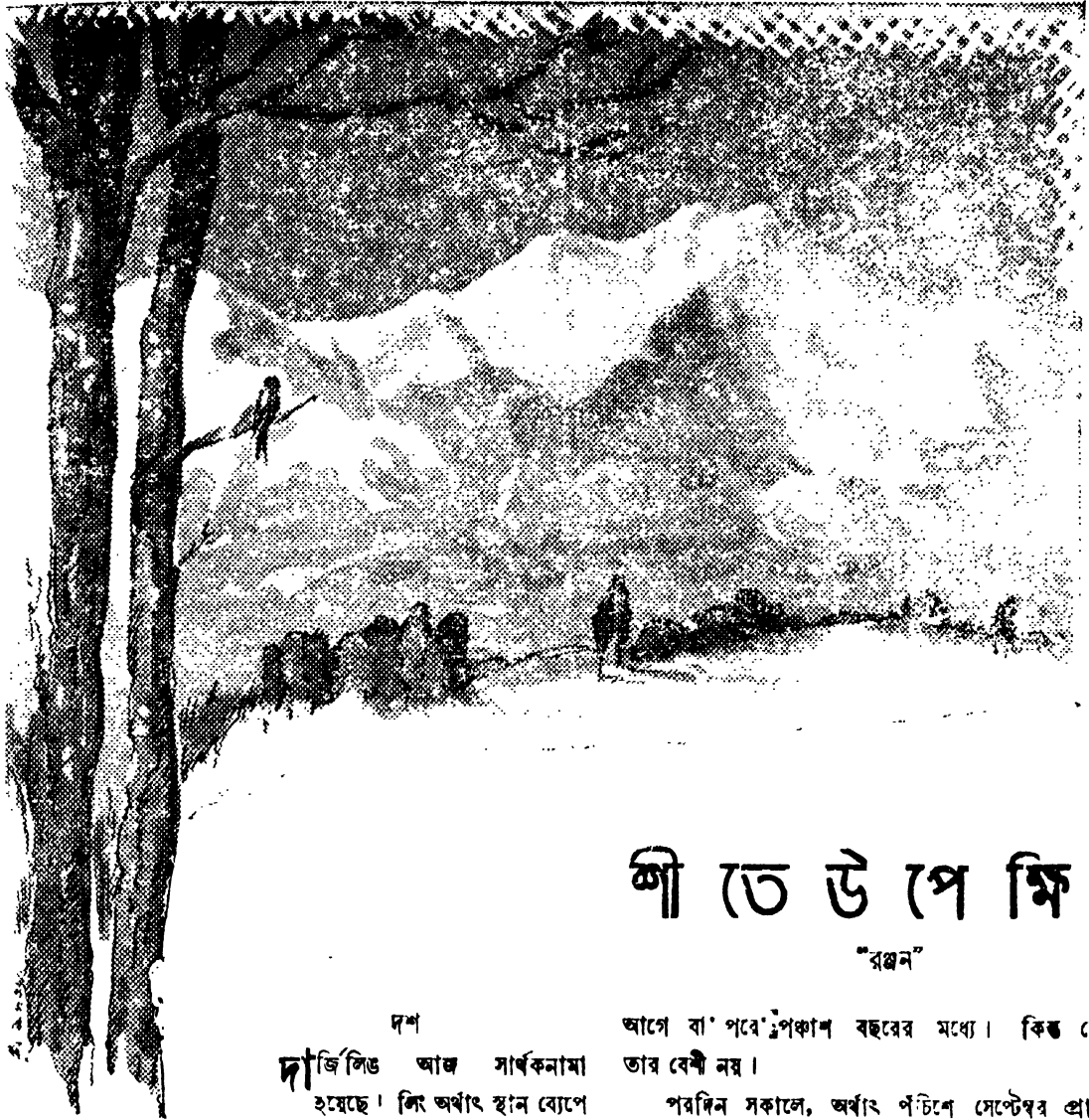
শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

দশ

দার্জিলিঙ আজ সার্থকনামা হয়েছে। লিং অর্থাৎ স্থান ব্যেপে ...য় দোর্জে অর্থাৎ ইন্দ্রের বজ্র তার প্রতাপ ঘোষণা করছে; উচ্চৈস্বরে নয়, একঘেয়ে টিপ-টিপ শব্দে। বৃষ্টি ঝরছে সকাল থেকে অবিশ্রাম। এ-বৃষ্টি সমতল ভূমির বৃষ্টির মতো সজোর এবং স্বল্পস্থায়ী নয়; এর ব্যাপ্তি বিস্তৃত, বেগ দুর্বল এবং আয়ু দীর্ঘ। এ বীরের ...ধের মতো নয়, এ যেন অভিমানিনী অবলার ক্ষুব্ধ ক্রন্দন। এ যেন তুষের আগুন যা জ্বলে ওঠে না, শুধু জ্বলতে থাকে। এ ঝড় নয়, শুধু ঝরা।

আপাতশ্রুতিতে এই বর্ষণ নিরাপদ বলে মনে হলেও এর মধ্যে গভীর বিপদের আশংকা নিহিত আছে। প্রাচীন ইতিহাস নয়, বর্তমান দার্জিলিঙে এমন বহু শত পুরাতন অধিবাসী আছে, যাদের কৈশোরের স্মৃতিতে আজো অক্ষুণ্ণ আছে বছর পঞ্চাশ আগেকার ...তো এক বিনষ্টির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আমরা সহরবাসীরা ইলেকশনের ল্যাণ্ডস্লাইডের কথাই জানি, উপমাটির উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই আমাদের।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। তেইশ এবং চব্বিশ তারিখ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে। সাধ্য ছিল না কারো বাড়ি থেকে এক পা বেরুবার। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেল প্রায় সাড়ে উনিশ ইঞ্চি। এমন বৃষ্টি এখানে হয়নি তার আগে বা পরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। কিন্তু সে শুধু বৃষ্টিই। তার বেশী নয়।

পরদিন সকালে, অর্থাৎ পঁচিশে সেপ্টেম্বর প্রায় আটটার সময় সুরু হোলো অভাবনীয় ঝড় আর বাতাস। সে বাতাসে পাহাড়ের গায়ে কাঁপন লাগে, সে ঝড়ে পৃথিবীর ভিৎ পর্যন্ত নড়ে ওঠে। মানুষের ঘর-বাড়ি তার সামনে খড়কুটো, প্রাণের মূল্যও তার কাছে খুব বেশী নয়। সেই দুরন্ত ঝড়ের তলায় অসহায় দার্জিলিং সহরে সেদিন গৃহে গৃহে শুধু এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল: ওম্ মণি পদ্মে হুং ওম্ মণি পদ্মে হুং। পদ্মমধ্যে অধিষ্ঠিত হে ঈশ্বর, রক্ষা করো রক্ষা করো।

বধির বিধাতার পুঞ্জিত অভিশাপ এদিকে বর্ষিত হতে থাকল আকাশ থেকে। রংগিত নদীতে বান ডাকল বুঝি সেই একই নির্দেশে। জল উঠল ৩০ থেকে ৫০ ফিট। অন্তত সাতষট্টি জনের মৃত্যু হোলো মাত্র অল্প কয়েকটি ঘণ্টার পরিসরে। তাদের দেহ নিয়ে বিব্রত হতে হয়নি কাউকে। নিধনকর্ত্রী নদীই তাদের বিধানের ভার নিলেন।

এদিকে তিস্তা নামল উত্তাল উদ্দামতায়। কোনো বাধা না মেনে পথে যা পড়ল তার সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে সে চলল আপন বেগে। যা ছিল তিস্তা বাজার আর তিস্তা ভ্যালি তা অচিরে পরিণত হোলো নদীবক্ষে। হাজার হাজার বিঘা চায়ের বাগান অদৃশ্য হোলো জলের অতলে। মত্ত বন্যায় বৃহৎ অরণ্য হোলো অবলুপ্ত। মাটি ভেদ করে যে উদ্ভিদ নির্ভয়ে মাথা তুলেছিল আকাশের পানে, আবার তা আর্ত

শিশুর মত মুখ লুকালো ধরণীর কোলে। পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাবের পূর্বের সর্বগ্রাসী জলমগ্নতা বুঝি হৃত রাজ্য পুনরায়ত্ত করতে উদ্যত হোলো। ডাঙায় যে জীব-জগৎ বাসা বেঁধেছিল কিয়ৎ কালের শুষ্কতার সুযোগে, তারও বুঝি অবসান এলো ঘনিয়ে।

পর্বতের পাষাণে-পাষাণে যে বন্ধন তা মাটিরই মধ্যস্থতার উপর নির্ভরশীল। দুর্বার জলস্রোতে সেই বন্ধন বিপন্ন হোলো। পর্বতপ্রমাণ প্রস্তরখণ্ডগুলির মৃত্তিকার ভিত্তি শিথিল হতেই তারা খসে পড়তে থাকল এদিক্ ওদিক্। তারই সঙ্গে ধ্বসে পড়ল অসংখ্য ঘরবাড়ি, নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বহু গৃহ, বহু গৃহবাসী। ওরা বলে পুরো দার্জিলিঙ জেলায় প্রাণহানি হয়েছিল ২১১ জনের, দার্জিলিঙ সহরে ৭২ জনের।

"তবে এই সংখ্যাগুলো যে একেবারেই অনির্ভরযোগ্য তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু আজো আমার মন থেকে সেই ভয়ংকর দৃশ্যের সুস্পষ্ট স্মৃতির এক কণাও মুছে যায়নি। আমি আমার বাবার হাত ধরে এই মহাকালেই এমনি এক সকালে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছিলেম। সহরের উপর এই জায়গাটায়ই ল্যাণ্ডস্লাইড হয়েছিল সব চাইতে বেশী। আমার চোখের সামনেই একের পর এক বিরাট পাথরগুলি এই মহাকালেরই গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবল শব্দে এবং প্রবলতর বেগে কোন এক অদৃশ্য দানবের অমোঘ আদেশের আনুগত্যে প্রলয়ের খেলায় মেতে উঠেছিল। সেই অদম্য দানবের মহাক্ষুধার শান্তি হয়েছিল মাত্র শ' তিনেক প্রাণ নিয়ে এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না কোনো প্রত্যক্ষদর্শী।"

ম্যালে বেড়াতে এসে হঠাৎ কি মনে হতে হাঁটতে হাঁটতে নিকট-বর্তী মহাকালে উঠেছিলেম। উপরে পৌঁছাতেই যখন বৃষ্টি নামল তখন আপন নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়েছি বার বার এবং নিরুপায় হয়ে যখন একটা আচ্ছাদনের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেম তখনও জানতেম না যে আমার যাত্রারোধকারী বৃষ্টির তদপেক্ষা ক্ষতিকর ক্ষমতাও আছে। যে বৃদ্ধ নেপালী ভদ্রলোক আমাকে তাঁর শৈশবের স্মৃতি থেকে নির্দয় প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাহিনী শোনালেন তাঁর বর্ণনায় অলংকারের অতিরঞ্জন ছিল না। তাঁর মুখও সাধারণ নেপালীর মতো—ভাবের অভিব্যক্তি তাতে নেই বললেই চলে। ভদ্রলোকের অন্তরমুভূত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল সামান্যই কিন্তু কথকের স্বচ্ছ আন্তরিকতা সহজেই শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। তাঁর নিরাবেগ বর্ণনায় যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সুর ছিল তা হৃদয়কে স্পর্শ করে শ্রোতার অজ্ঞাতসারে। বর্ণিত প্রলয়ের মতো বিধিপ্রেরিত সার্বজনীন সর্বনাশের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকের মনের কোথাও যেন সামান্যতম অভিযোগও সঞ্চিত ছিল না। ছিল না লেশমাত্র তিক্ততা। এই দুর্দৈব যেন ছিল দৈবের অপার করুণাময়তারই অপর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এজন্যে যেন, অভিযোগ তো দূরের কথা, ধন্যবাদই দিতে হবে ঈশ্বরকে। এ যেন ক্ষতি নয়, ক্ষত নয়, শাস্তি নয়, শুধু অনুগ্রহ।

প্রত্যক্ষ ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই ধ্বংসের অপ্রত্যক্ষ কর্তাকে এই সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানানোর বিরুদ্ধে আধুনিক মন স্বভাবতই বিদ্রোহ করে। ১৯৩৪-এর বিহার ভূমিকম্পের পরে মহাত্মাজী যখন তাকে ভারতের অস্পৃশ্যতারূপ পাপের জন্যে যোগ্য শাস্তি বলে ঘোষণা করলেন তখন তা বহুর ক্রোধের কারণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বা জহরলাল কেউই গান্ধীজীর সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। কবির বিবৃতির সমর্থন করে পণ্ডিতজী তাঁর আত্ম-জীবনীতেও ভূমিকম্পের গান্ধীভাষ্যের যুক্তিশূন্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন পরম কুশলতায়। গান্ধীজীর উক্তি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ইন্‌কুইজিশনের কথা, জিয়োর্দানো ব্রুনোর কথা, বষ্টনের পাদ্রীদের কথা। কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে পণ্ডিতজী বলেছেন, এই ভূমিকম্প যদি হয়ে থাকে পাপের শাস্তি তবে সে কোন পাপের জন্যে তা জানব কি উপায়ে? অস্পৃশ্যতাই যদি সে পাপ হয়, তাহোলে এই ভূমিকম্প কি দক্ষিণ-ভারতেই হওয়া উচিত ছিল না? আর সে পাপ যে অস্পৃশ্যতাই তাই বা প্রমাণ করবে কে? কংগ্রেসীরা তো বলতে পারে যে বিদেশী শাসন বিনা প্রতিবাদে সহ্য করবার জন্যেই এই অভিশাপ। অপর দিকে ইংরেজ সরকার যদি দাবী করে যে অসহযোগ আন্দোলনের অপরাধেরই শাস্তি এটা, তাইতেই বা বাধা দেবে কে!

সত্যি কথা। এদিক্ থেকে গান্ধীজীর তথা আমার পার্শ্বোপবিষ্ট নেপালী ভদ্রলোকের ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য নয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাখ্যা কোথায় তাহোলে? পণ্ডিতজীর প্রতিবাদে মহাত্মাজীর ব্যাখ্যার খণ্ডন আছে হয়তো, কিন্তু ব্যাখ্যার সন্ধান কোথায় এতে? আর, কোনো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে বাতিল করে দেওয়াই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক?

তবে?

আমি আমার নবলব্ধ নেপালী বন্ধুর কাছে সময় কাটানোর জন্যে গল্প শুনছিলেম মাত্র। তাঁকে এত সমস্ত সমস্যার কথা জানাবার প্রয়োজন ছিল না। বর্ণনা শেষ করেও ভদ্রলোক স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ বললেন, "একটার পর একটা যখন পাথরগুলো পড়ে নীচের মানুষদের পিষে মারছিল, মিলা রেপার মা তখন সেখানে থাকলে প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন।"

তিব্বত, সিকিম, ভুটান আর এই ত্রয়ীর ভ্রষ্ট শাখা দার্জিলিঙে মারপা আর মিলা রেপার নাম জানে শিশু-বৃদ্ধ সবাই। বৌদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ যে নির্বাণপূর্ব জন্মপর্যায় তার সবগুলি ধাপ মিলা রেপা একসঙ্গে অতিক্রম করেছিলেন একটি মাত্র জীবনে। প্রতি বৌদ্ধের উচ্চতম অভিলাষ সেই জন্ম পর্যায়ের সংক্ষেপণ। মিলা রেপার জীবনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন নিজে, অর্থাৎ নিজে বলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্য লিখে নিয়েছিল। তিব্বতী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই আত্মজীবনী এবং তার ইংরেজি আর ফরাসী অনুবাদ অবৌদ্ধ বিদেশীদের কাছেও অত্যন্ত সুখপাঠ্য।

মিলা রেপার জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করলেন আমার নেপালী বন্ধু। কণ্ঠে ছিল ভক্তির সুর, ক্ষুদ্র অক্ষিদ্বয় ছিল মুদ্রিত। বাইরের অবিরাম বর্ষণ বিবৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সম্মুখের দোর্জে লামার সমাধি স্মরণ করিয়ে দিল দার্জিলিঙের সঙ্গে তিব্বতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা। ইংরেজ কর্তৃক পুনর্গঠিত দার্জিলিঙে সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে না স্যুট-পরিহিত ইংরেজিভাষী আধুনিক নেপালীর দৈনন্দিন ব্যবহারে। সে আজ আপন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে পরসভ্যতার বহিরাবরণ অঙ্গে ধারণ করেছে। আত্মার

কথা, ধর্মের কথা ভাববার সময় নেই তার। আমার নেপালী বন্ধু আধুনিক দার্জিলিঙের প্রতিনিধি নন।

মিলা রেপার জীবনের প্রথম অধ্যায় রত্নাকরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, বাল্মীকির নয়। ব্যভিচারী হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। পিতৃবিয়োগের পরে পিতৃব্যের প্রতারণায় সম্পত্তিচ্যুত হয়েও মিলার চেতনা হোলো না. দেখে দারিদ্র্য-জর্জরিতা বিধবা মা একদিন পুত্রকে বললেন, "যারা তোর বাবার সম্পত্তি চুরি করেছে তাদের যথোচিত শাস্তি যদি না দিতে পারিস তবে তুই তোর পিতৃ-পরিচয় যেন দিস নে কারো কাছে।"

অপমানাহত মিলা রেপা ছুটে গেল কাকার কাছে সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের দাবী জানাতে। কাকা অবজ্ঞা গোপন না করে স্পষ্টই বলে দিলেন; "দল বেঁধে লড়াই করবার সাহস থাকে তো আয়, নইলে একা বসে শাপ দে। বিরক্ত করিস নে।"

মিলা রেপার সাধ্য ছিল না যুদ্ধ ঘোষণা করবার। সে বেরুলো এমন শাপের খোঁজে যাতে অসাধু কাকার শাস্তিবিধান হতে পারবে। বহু দিন নানা জায়গা পরিভ্রমণ করে সাক্ষাৎ মিলল এমন গুরুর যে তাকে শেখাল সেই ধ্বংসকারী মন্ত্র। মন্ত্রপ্রয়োগে বিলম্ব হোলো না।

সেদিন পরস্বাপহরণকারী কাকার গৃহে ছিল বিশেষ ভোজের আয়োজন। উপরের তলায় অভ্যাগতরা, নীচে বাঁধা ছিল তাঁদের অশ্ব। মিলা রেপার মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলি দিশেহারা হয়ে ছুটল চার দিকে। দাস-দাসী আর অতিথিরা সবাই সেই মারাত্মক মন্ত্রে অভিভূত হয়ে এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বাড়ীটা ভূপতিত হোলো। সেই স্তূপের তলায় নিহত হোলো সকলে। মাত্র দু'জন ছাড়া।

বাঁচল শুধু কাকা আর কাকিমা। মিলা রেপার দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্ষতির পুরো পরিমাণ পরিপূর্ণভাবে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে। পুত্রকৃত প্রতিহিংসা সাধনের সংবাদ পেয়ে বিধবা মা ছুটে এলেন হৃতসর্বস্ব দেবর-জায়ের কাটা ঘায়ে তাঁর গভীর তৃপ্তির নুণ ছিটিয়ে দিতে।

এদিকে মিলা রেপাকে কিন্তু দেশত্যাগী হতে হোলো কাকার প্রতিশোধের ভয়ে। বিদেশের নিঃসঙ্গতায় মিলার অশান্ত মনের জন্মগত অস্থিরতা এবারে প্রক্ষিপ্ত হোলো আপন মনের দিকে। পূর্বের প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্ম মিলা রেপা দগ্ধ হতে থাকল অনুতাপের অনলে।

তার চেয়েও বেশী সে দগ্ধ হোলো ছোটো কয়েকটা আত্মোদ্ভূত প্রশ্নের আগুনে। জীবনের অর্থ কী? কেন বাঁচব? এই পৃথিবীর বুকে আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কী? লক্ষ্য কী বাঁচবার? বাঁচা কি শুধু বাঁচারই জন্তে? তবে? তার পর? এর পর?

অস্থির মিলা আবার পথ নিল।

এবারে এমন গুরুর সন্ধানে নয় যে তাকে শত্রু নিধনের মন্ত্র দেবে। এবারে তার চাই এমন গুরু যে তাকে শেখাবে অন্তর থেকে সকল বিদ্বেষ-বিষ নাশ করতে। যে তাকে বলে দেবে তার প্রশ্নগুলির উত্তর। যে তাকে বলে দেবে তার নির্বাণের পথ।

অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরানো পরিচিতের সঙ্গে। তারই কাছে মিলা রেপা মারপা নামটি শুনল। শোনা মাত্র মিলা তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল যে এই মারপা তাকে তার পথ দেখাতে পারবে।

পারবে তো। কিন্তু দেখাবে কি? লোত্রকে পৌঁছে মিলা তার লামার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে উৎসাহ পেল না। মারপা অন্তর্দৃষ্টির বলে আগেই জানতেন মিলা আসছে তার কাছে। কিন্তু ভাবী শিষ্যকে সে-কথা বুঝতে দিলেন না। মিলা যখন তার সব কিছু লামার পায়ে সমর্পণ করে মন্ত্র ভিক্ষা করল, মারপা কপট ক্রোধে চেঁচিয়ে বললেন, "কি? মন্ত্র নেওয়া কি এতই সোজা। যে মন্ত্র আমি নিজে লাভ করেছি দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যায় আর কৃচ্ছ্র-সাধনে তাই বুঝি তুলে দেব প্রথম আগন্তুকের হাতে? বাপু হে, সিদ্ধিলাভ এত সোজা নয়!"

মিলা কিন্তু দমল না। বুঝল যে তার সত্যাগ্রহের পরীক্ষা হবে। লামার পায়ে আবার তার প্রতিজ্ঞা নিবেদন করে শপথ করল, যে কোনো সর্তে সে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

মারপার অধীনে মিলা রেপার শিক্ষা সুরু হোলো।

শিক্ষাই বটে। মন্ত্রদানের পূর্বে মারপা তাঁর শিষ্যকে যে ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তাকে অগ্নি-পরীক্ষা বললে অল্পভাষণের অপরাধ হবে। সেই পরীক্ষার কাহিনী মিলা রেপার আত্ম-জীবনীতে বিবৃত আছে বিশদ ভাবে। তা পাঠ করলে যে কোনো অতিব্রতীই বিস্ময়ে হতবাক্‌ হবে। হয়তো বা তার আপাত অসঙ্গতি অবিশ্বাসীর হাস্যোদ্রেক করবে।

একদিন মারপা মিলাকে ডেকে বললেন, "দেখ, ওই যে গ্রামটা দেখছিস, ওই গাঁয়ের লোকেরা একদিন আমায় অপমান করেছিল। তুই তো ধ্বংসের খেলা জানিস। ওই পুরো গাঁয়ের সব প্রাণীকে নাশ করে দে তোর শক্তি দিয়ে। তবে আমার শান্তি হবে।"

গুরুর মুখে এ কেমন আদেশ? মিলার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। যাঁর কাছে নিতে এসেছি ক্ষমার মন্ত্র দয়ার দীক্ষা,—তিনিই কি না আদেশ দিলেন এত শত প্রাণীর বিনাশের? তার মনে জাজ্বল্যমান ছিল তার পূর্বকৃত ধ্বংসের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তার জন্তে অনুতাপ আজো তাকে অস্থির করে তোলে সারাক্ষণ। আবার সেই ধ্বংস, এবং তা গুরুর আদেশে!

কিন্তু মিলা রেপা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই অবোধ্য আদেশকে মনে করল নতুন এক পরীক্ষা বলে। আজ্ঞা পালন করল অবিলম্বে।

"আবার এতগুলি প্রাণীকে হত্যা করল? তা আবার কোনো কারণ না জেনে, কেবল মাত্র একজন লোকের কৌতুকের জন্ম?" আমি অসহিষ্ণু ভাবে জিজ্ঞাসা না করে পারলেম না।

নেপালী বন্ধু মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, "কৌতুকের জন্তে নয়। তার নিজেরই শিক্ষার জন্তে। মারপার আদেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ।"

"যে শিক্ষক বেত মেরে 'বেত্র' বানান করতে শেখাবে এবং কাউকে মেরে 'হত্যা' লিখতে শেখাবে, তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে পারব না। তা আপনি যতই অর্থপূর্ণতার কথা বলুন।"

আমার পরিহাস উপেক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন, "মারপার আদেশের তাৎপর্যই হচ্ছে বৌদ্ধ শিক্ষার গোড়ার কথা। বৌদ্ধদের কাছে জ্ঞানলাভের যত মূল্য এমন আর কারো কাছে নয়। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেই অজ্ঞতা অক্ষমণীয় পাপ বলে পরিগণিত। জানি নে বা জানে না—এ জন্তে ক্ষমা নেই কোনো বৌদ্ধের। আর

এই জ্ঞানলাভের প্রথম কথাই হচ্ছে উপলব্ধি। মিলা রেপা যাতে সম্পূর্ণরূপে প্রাণনাশের নৃশংসতা উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্যেই মারপা ওই আদেশ দিয়েছিলেন।"

"সেই শিক্ষার জন্যে এক গ্রাম নরনারী এবং পশুপক্ষী প্রাণ দেবে এটা কি অন্যায় নয়?"

"আপনি আমাকে আমার কথা শেষ করতে দেননি। মারপা তাদের সবাইকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণ নিতে বলবার অধিকার একমাত্র তারই আছে যার প্রাণ দেবার ক্ষমতা আছে। সে শক্তি মারপার ছিল বলেই তিনি এমন আদেশ দিতে পেরেছিলেন।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী আমি হত্যার কথা, ধ্বংসের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু জীবনদানের কথা শুনলেই অবিশ্বাস ঘনিয়ে আসে। এই প্রথম মনে হোলো যে, যা শুনছিলেম তা খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়, যুগ যুগ ধরে এ কাহিনী বহু বিশ্বাসীর ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। অবৌদ্ধ অবিশ্বাসীর কাছে এ কাহিনী মনোরম উপকথা মাত্র। কিন্তু বিশ্বাসী বৌদ্ধ আজো এ কাহিনী ভক্তিনত চিত্তে স্মরণ করে হৃদয়ে সেই অপরিসীম প্রশান্তির স্পর্শ অনুভব করে যা তার জীবনকে করে তোলে ছন্দোময়, যা তার গতিকে দেয় স্থির লক্ষ্য আর প্রাণকে দেয় অবিচল আনন্দ।

আমার বন্ধু তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দূরে অদৃশ্য গৌরীশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ওই যে মাউন্ট এভারেষ্ট তারই কাছে অনেকগুলি গুহা আছে। মিলা রেপা তাঁর শেষ জীবন ওই গুহাগুলিরই মধ্যে ধ্যান করে কাটিয়েছিলেন।"

একটু থেমে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে যোগ করলেন, "বেশ উঁচু আর বেশ দূর। রওনা হতেই বড়ো দেরী হয়ে গেল। জানি না পৌঁছোতে পারব কি না।" এটা স্বগতোক্তি।

[ক্রমশঃ

আপনি কি জানেন?

১। দেশের লোক আদর করে বলত আমাদের লাল-বাল-পাল। তাঁদের নাম জানেন ত?

২। জার্মাণীর এক-জন বধির সুরশিল্পী পৃথিবীর সঙ্গীতের ভাণ্ডারে অমর সুর দান করে গেছেন। শোনা যায়, মৃত্যুর সময় তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের রাজত্বে আমি শ্রবণশক্তি পাবো।' তিনি কে?

৩। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, কসাইখানা থেকে গরুতেই গরুর মাংস টেনে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষে কত মানুষ মানুষকে টানে জানেন?

৪। সমুদ্রচর প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম হোল নীল তিমি। তাদের আয়ু কত জানেন?

৫। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার স্বাক্ষরবাহী তিনটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পবিত্রভূমি ভারত বিভাগে পশ্চিম পাকিস্থানে পড়েছে। মহেন-জো-দোড়ো ও হারাপ্পা ভিন্ন আর একটির নাম বলুন তো?

৬। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট কোন্ বাঙালী ব্রাহ্মণের ফাঁসী হয়?

৭। ভারতবর্ষে ক'টি আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব জানা গেছে?

৮। ললিতা ও মানস কবিতাগ্রন্থ কার লেখা? হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র?

[উত্তর ৫৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জনৈকা সুতা-কাটনির দরখাস্ত

[দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্যে লিখিত যে সকল পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে মানুষের সুখ-দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের বহু সমাচার সাধারণে অবগত হন—সমাজের বহু বিচিত্র রূপ দেখিতে পান। সাগরপারের সূতা ভারতবর্ষে আমদানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় হস্তনির্ম্মিত সূতার কদর ও মূল্য কমিয়া যায়। ফলে আমাদের সূতা-কাটনিদিগকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হয়। এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া জনৈকা সূতা-কাটনি 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র সম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র দেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন ১২৩৪ সাল অর্থাৎ এক শত এক-বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে। পত্রটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে মুদ্রিত হইল]

(৫ই জানুয়ারি, ১৮২৮। ২২ পৌষ, ১২৩৪)

শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়। আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন আপন সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে সেই আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ক্রমে ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এত পর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতা হইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমা হইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমা হইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার [illegible] বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন [illegible] যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সূতা-কাটনির দরখাস্ত।—সং চং।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের চিঠি

[বাংলা দেশের গ্রামের এক জন মহিলার চিঠি। লেখা এক জন সাহেবকে। যে যুগে সাহেব দেখলে পুরুষদেরই প্রীহা চমকে উঠত, সেই যুগে এই বঙ্গ-মহিলা সাহেবকে স্বগৃহে নিমন্ত্রিত করে এনে পরিতোষ সহকারে আহার করিয়েছিলেন।

হ্যারিসন সাহেব তখন মেদেনীপুর জেলার ইনকাম ট্যাক্স কালেকটার। একবার তিনি বীরসিংহ গ্রাম ও আশে-পাশের জেলা পরিদর্শন করতে আসেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন। অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ানের আসার সংবাদ মা'কে দেওয়া মাত্রই তিনি বলিলেন—'তা ছেলেটিকে একবার বাড়ীতে নিয়ে আয়। কিছু খাইয়ে দি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যারিসনকে মায়ের ইচ্ছার কথা জানালে তিনি বললেন—'উনি যদি নিজের হাতে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করেন, তবে যাব।' হ্যারিসন ভাল বাংলা জানতেন। তখন বিদ্যাসাগর-জননী পুত্র মারফৎ নীচের চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন।]

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

অশেষ গুণাশ্রয়

শ্রীযুত এচ এল হেরিসন মহোদয়

পরম কল্যাণভাজনেষু

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদং

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সত্বর কলিকাতা প্রতিগমন করিবেন। আমার নিতান্ত মানস, দয়া করিয়া তৎপূর্বে একবার বীরসিংহের বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যার-পর-নাই আহ্লাদিত হই। প্রার্থনা এই, আমার প্রার্থনা পরিপূরণে বিমুখ করিবেন না। ইতি

২রা ফাল্গুন, ১২৭৫ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ

শ্রীভগবতী দেব্যাঃ

হ্যারিসন এই চিঠি পেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে ভগবতী দেবী বহুবিধ উপাদেয় আহার্য প্রস্তুত করে নিজে সামনে বসে থেকে সাহেবকে খাইয়েছিলেন। হ্যারিসন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এই উদারতা ও স্নেহ-মমতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'আমি আপনার বাড়ীতে এসে খেয়ে, আপনার মা'র আদর-যত্নে ভারী মুগ্ধ হয়েছি। যত দিন বেঁচে থাকব, এ স্মৃতি আমার মন-প্রাণ অধিকার করে থাকবে।'

ফ্যারাডের প্রেম-পত্র

[মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১—১৮৬৭) বৈজ্ঞানিক জগতের এক জন কীর্তিমান পুরুষ। তাঁরই গবেষণা আর পরীক্ষার ফলে [illegible] তড়িতের ব্যবহারের পথ সুগম হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছা করলেই বিজ্ঞানের যে কোন জটিল তত্ত্ব মুহূর্তে চোখের সামনে হাজির করতে পারেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমপত্র রচনার উপাদান থাকলেই যে ইচ্ছামত প্রেমপত্র রচনা করা যায় না, ফ্যারাডের চিঠিখানি তারই প্রমাণ।

সারা বার্ণাডকে এই চিঠিখানি লেখার কিছু দিন পরে সারার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মাইকেল ফ্যারাডের। তাঁদের দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবন যে কোন দম্পতীর ঈর্ষা ও আদর্শের বিষয় হয়ে আছে।]

রয়েল ইনসটিটিউশান

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা

[ডিসেম্বর, ১৮২০]

প্রিয় সারা,

শারীরিক অবস্থা মনের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। যে মনোরম চিঠিখানি আজ বিকেলে তোমায় লিখব, সেই কথাই ভেবেছি সারা সকাল। কিন্তু এখন দেহ এত ক্লান্ত, অথচ কত কাজ না জমে আছে। ভাবনার খেই গেছে হারিয়ে আর সমস্ত চিন্তা শুধু তোমারই ভাবমূর্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। সেই উদ্দাম চিন্তা-লহরী না পারছে শান্ত হতে, না পারছে ধীর হয়ে তোমার [illegible]। হাজারো রকমের মধুর ও আন্তরিক কথা [illegible] ভাষা আমার আয়ত্তের [illegible] তখন ক্লোরাইড, তেল, [illegible] হাজারো রকমের কাজের [illegible] আমাকে শুধু দূরে—আরো [illegible] ইতি

[illegible]

মাইকেল

রাজা রামমোহন রায়ের চিঠি

[লীগ অফ নেশান বা ইউ-এন-ও'র জন্মের বহু পূর্বে আমাদের বাংলা দেশের একটি ছেলে সর্বপ্রথম বিশ্বরাষ্ট্রসংসদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রামমোহন যা স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তাই ইউ-এন-ও'তে বাস্তব রূপ নিয়েছে। ভারতের প্রথম যুবক হলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের এক জন। সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সমাজ-সংস্কারক, স্বদেশ-প্রেমিক, নব ভাবধারার [illegible] এতগুলি গুণসম্পন্ন বিরাট ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে জন্মেছেন কি না সন্দেহ। বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা থেকে যাত্রা করে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌঁছান। ইংলণ্ডে [illegible] ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্দের সহিত রামমোহনের [illegible] দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলে ফরাসী [illegible] সম্বন্ধে রামমোহন বরাবরই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখবার জন্যে তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর) প্যারিসে গমন করেছিলেন। তখন ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত স্বাগতম্ জানিয়েছিলেন। রামমোহন রায় ফ্রান্স ভ্রমণের ছাড়পত্র চেয়ে যে পত্রখানি রচনা করেছিলেন, তার একখানি নকল ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, সেকালেও যে রামমোহন রায়ের মনে একটি জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনা জেগেছিল, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আবেদন-পত্রটিতে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায় স্বজন থেকে বহু দূরে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরীতে দেহত্যাগ করেন।]

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয় সমীপেষু
প্যারিস

মহাশয়,

ফরাসী দেশ হইতে বহু হাজার মাইল দূরে এক বিদেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া আপনি হয়ত বিস্মিত হইবেন। যদি আত্মসম্মান ও পৃথিবীর সভ্যতম দেশের পুরোভাগে দণ্ডায়মান জাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা পোষণ করি, তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইতাম, তাহা হইলে কখনই আপনার চিন্তারাজ্যে অন্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতাম না।

২। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর প্রকৃতির দ্বারা অনুগৃহীত, কলা ও বিজ্ঞান [illegible] সমৃদ্ধ, [illegible] শাসনতন্ত্র দ্বারা সুশাসিত এই [illegible] পোষণ করিয়া আসিতেছি [illegible] সত্রে তাহা লক্ষ্য [illegible] এবং অন্য বহুবিধ বাধা লংঘন [illegible] দেশের বিপরীত তীরে আসিয়া উপস্থিত [illegible] হইয়াছে যে, যতক্ষণ না [illegible] রাষ্ট্রদূতের ফ্রান্সে প্রবেশের [illegible] পাইতেছি ততক্ষণ আপনাদের দেশে পদার্পণ [illegible] উচিত হইবে না।

৩। এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ আইন এমন কি এশিয়া মহাদেশে [illegible] রাজনৈতিক মতভেদ বশতঃ যদিও তাহারা পরস্পর [illegible] বিদ্বেষভাবাপন্ন) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও সম্পূর্ণ অপরিচিত— [illegible] বিদেশীর প্রতি সন্দিগ্ধ এবং মনস্তর রীতি-নীতি ও [illegible] প্রবর্তনের ভয়ে ভীত একমাত্র চীন ছাড়া। সেই কারণেই [illegible] জন্য খ্যাত এবং সর্ববিষয়ে উদার [illegible] আইন প্রচলিত থাকিতে পারে, [illegible] পড়িয়াছি।

[illegible] কেবল মাত্র ধর্মের দ্বারাই নয়, [illegible] নিক অনুশীলনপ্রসূত অভ্রান্ত [illegible] যে, মানব-গোষ্ঠী [illegible] বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সেই [illegible] শাখা মাত্র। সুতরাং পৃথিবীর সর্বদেশের [illegible] দূর সম্ভব বাধা-বিঘ্ন অপসৃত করিয়া [illegible] সুযোগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে সমগ্র [illegible] পারস্পারিক সুখ-সুবিধা ও সর্বাংগীণ কল্যাণের বিনিময় [illegible] হইতে পারে।

৫। বৈরিভাবাপন্ন ও যুদ্ধরত দুইটি দেশের মধ্যে (সম্ভবতঃ পরস্পরের স্বার্থ সঠিক উপলব্ধির অভাবেই ইহা ঘটিয়া থাকে) সাময়িককালীন সতর্কতা হিসাবে এই নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইহা যুদ্ধকালীন নীতিই মাত্র। যেমন, ফ্রান্স যদি চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তত্রস্থ অধিবাসিগণকে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে তবেই এই প্রকার যুদ্ধজনিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার সমর্থন করা যাইতে পারে।

৬। কিন্তু যখন বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপে শান্তি বিরাজিত, বিশেষতঃ যখন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সের অধিবাসিগণের মধ্যে, এমন কি দুই রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যেও ঐক্যমূলক বোঝাপড়া বিদ্যমান, তখন এবংবিধ আইনের তাৎপর্য বুঝিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম—[illegible] আইনে ফ্রান্সের তরফে সৌহার্দ্য ও বিশ্বাসের অভাবই সূচিত হইতেছে।

৭। শান্তির সময়ও এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিম্নলিখিত কারণগুলি দর্শান যাইতে পারে, যদিও আমার সামান্য বুদ্ধিমতে সুষ্ঠু বিচারে তাহাও টিকিতে পারে না।

প্রথমতঃ, যদি বলা হয়, সন্দেহভাজন লোকদের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে ইহার উত্তর হিসাবে দেখান যাইবে যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ছাড়পত্র মঞ্জুর কালে সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক দাখিলা-পত্রের সাহায্য বা তাহার কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান লওয়া হয় না। কাজেই এই কল্পিত বিপদেরও ইহা প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি ইহার দ্বারা অপরাধীদের বিচারের দণ্ড এড়াইতে বাধা দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়, সে ক্ষেত্রেও অপরাধীদের সমর্পণ করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে চুক্তি আছে, তাহাতেই সে উদ্দেশ্য সুষ্ঠু ভাবে সাধিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ইহা যদি উত্তমর্ণদের প্রতারিত করিয়া অধমর্ণদের পলায়নে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রেও বলিব, ইহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ দেউলে আইন প্রত্যেক দেশেই এমন যে, কিছু কাল দণ্ডভোগের পর আসামী মুক্তি পাইতে পারে। কাজেই এই ভাবে স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছা-নির্বাসন আমার মতে অধিকতর শাস্তি স্বরূপ।

চতুর্থতঃ, যদি ইহা রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমতঃ ইহা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমার মত এই যে, দুইটি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা উভয় দেশের পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত সমসংখ্যক সদস্য গঠিত সংসদের বিচারের উপর সমর্পণ দ্বারাই নিয়মতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্য অধিকতর সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে। উভয় দেশই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। সংসদের সভাপতি উভয় দেশ কর্তৃক এক বৎসর অন্তর পর্যায়ক্রমে মনোনীত হইবেন। এক বৎসর একটি দেশের এলাকায় সভা বসিবে এবং পরবর্তী বৎসর অন্য দেশের এলাকায়—যেমন ডোভার ও ক্যালেতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সভা বসিতে পারে।

৮। এই সংসদের সভায় নিয়মতান্ত্রিক সরকারযুক্ত দুইটি সভ্য দেশের রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক সকল প্রকার মতানৈক্য ন্যায়সংগত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা যাইবে। এবং এই ভাবে বংশ-পরম্পরায় উভয় দেশের মধ্যে প্রগাঢ় শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকিবে।

৯। ছাড়পত্র ব্যবস্থা, ব্যবসা-সংক্রান্ত জরুরী বিষয়ে ও সাংসারিক ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধাকর অবস্থার সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে তো আমি কিছুই বলি নাই। ছাড়পত্রের জন্য আবেদনে পরোক্ষ ভাবে এইটাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, আবেদনকারীকে বিনা পরীক্ষায় ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে তাহার চরিত্রের প্রত্যয়পত্র বা পরিচয়পত্র অবশ্যই দরকার। কাজেই প্রত্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে অনেকেই হয়ত ইতস্ততঃ বোধ করিতে পারেন, কারণ এই প্রত্যাখ্যানে এমন সিদ্ধান্তের ইংগিতও সূচিত

হইতে পারে, যাহা শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসাবে তাহার প্রতিকূলে যাইবে।

যাহা হউক, আপনাদের দেশভ্রমণের ইচ্ছা আমার এত বলবতী যে, আমি আরোপিত সর্ত মানিয়া লইতে রাজী আছি। অবশ্য ফরাসী সরকার যদি সমস্ত বিষয় আনুপূর্বিক বিচার করিয়া স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু রাখা উপযুক্ত ও যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন। বর্তমান প্রগতিসম্পন্ন সরকারের বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব মতবাদ উপস্থাপিত করার জন্য দুঃখিত। ইতি

ভবদীয়
রামমোহন রায়

সাদে ব্রণ্টি পত্রালাপ

[রবার্ট সাদে কবি, ঐতিহাসিক ও জীবনীকার হিসেবে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সতেরোশ' চুয়াত্তর সালে সাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জীবিত কালেই তিনি ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব দেখেছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি রক্ষণশীল হলেও যন্ত্রশিল্পের ফলে যে ভাবে জনসাধারণের দুঃস্থতা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য তাঁর সহানুভূতির ন্যূনতা ছিল না। বিশেষ করে শিশু শ্রমিক ও নারী শ্রমিকদের যে ভাবে সে সময়ে নির্যাতন করা হোত, তার বিরুদ্ধে তিনি তৎকালীন কর্তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তথাপি সাহিত্যিকতাই ছিল সাদের জীবনের আদর্শ ও ধৃতি। কবি-যশ-প্রার্থিনী তরুণী শার্লট ব্রণ্টিকে লেখা তাঁর পত্রের মধ্যে কবি সাদের চিন্তার বলিষ্ঠতাও যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাঁর কবি-প্রতিভার এক উজ্জ্বল দিক্‌ও ফুটে উঠেছে। চিঠিগুলি সর্বযুগের তরুণ লেখিকাদের চিন্তার খোরাক মেটাতে পারে।]

সাদের চিঠি

সুচরিতাসু—

সন্দেহ হচ্চে, যদিও তুমি চিঠিতে মিথ্যা নাম সই করেছ, তবুও এই চিঠিখানি থেকেই একমাত্র অনুমান করতে পারি তুমি কি কর। চিঠিখানি পড়ে তো মনে হচ্চে এতে কৃত্রিমতা কিছু নেই। যাই হোক, এই চিঠি ও কবিতায় একই হৃদয়ের ছাপ এবং এদের মুখরতায় সহজেই তোমার মানসিকতা ধরা পড়েছে·········

তোমার প্রতিভা কোন্ দিকে চালনা করবে, সে সম্বন্ধে তুমি আমার উপদেশ চাওনি, চেয়েছ আমার অভিমত। সে অভিমতের মূল্য হবে হয়ত খুবই কম, কিন্তু উপদেশের গুরুত্ব হয়ত কিছু থাকতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় যাকে বলে 'কবি-প্রতিভা' তা তোমার নিঃসন্দেহ আছে এবং আছে বেশ প্রচুর পরিমাণেই। কবি-প্রতিভা আজকাল আর সুদুর্লভ বস্তু নয়, এ-কথা যদি বলি, নিশ্চয়ই তোমার নিন্দাবাদ করা হবে না। আজকাল প্রতি বছর প্রচুর কবিতা প্রকাশিত হচ্চে কিন্তু তারা জনসাধারণের মনে একটুও আঁচড় কাটে না। অথচ মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগেও এর একটি ছত্রও প্রকাশিত হলে কবিতার মালিক প্রচুর সাধুবাদ পেতেন। কাজেই অধুনা কবিতা লিখে যিনি যশস্বী হবার দুরাকাংখা করেন, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

যদি নিজের চিত্তের আনন্দ চাও, তবে কবিযশপ্রার্থিনী হয়ে নিজের কবি-প্রতিভার অনুশীলন করো না। যে আমি সাহিত্যকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছি, সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি এবং যাকে কোন দিনই এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করতে হয়নি—আমার কাছে উপদেশ ও উৎসাহের জন্য যে সমস্ত যুবকেরা আসে, তাদের প্রত্যেককে এই পথের বিপদ সংকুলতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি। তুমি হয়ত বলতে পার, মেয়েদের এ রকম সতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের দিক্ থেকে এ পথে বিপদের সম্ভাবনা অলীক। এক দিক্ থেকে কথাটা সত্যি বই কি। কিন্তু তবু বিপদ আছেই এবং সে বিষয়ে আমি তোমাকে সাবধান হতে বলব। যে দিবা-স্বপ্নে স্বভাবতঃই বিভোর হয়ে থাক, তা তোমার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে দিতে বাধ্য। চলতি দুনিয়ার চিরাচরিত জীবন তোমার কাছে যে পরিমাণ নীরস ও অকিঞ্চিৎকর ঠেকবে, তুমি ঠিক সেই পরিমাণেই পৃথিবীর অযোগ্য হয়ে উঠবে এবং কোন কিছুর সঙ্গেই আর খাপ খাওয়াতে পারবে না নিজেকে। সাহিত্য নারীর জীবনের পেশা হতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়। যতই তারা কর্তব্যে জড়িত হয়ে পড়বে, ততই সাহিত্য-চর্চার সময়ও কম পাবে—এমন কি বিশ্রাম বিনোদন ও অতিরিক্ত গুণপনা অর্জনের উদ্দেশ্যেও সাহিত্য-সেবার সময় করে উঠতে পারবে না। সে কর্তব্য সম্পাদনের ডাক এখনো তোমার আসেনি ; কিন্তু যেদিন আসবে, সেদিন যশের কাঙালপনাও থাকবে না। উত্তেজনার খোঁজে আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে না। যত ভাল অবস্থাই হোক না কেন, যার হাত থেকে নিষ্কৃতির আশা নেই, সেই জীবনের দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা এবং দুঃখ-বিপর্যয়ে উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক মিলবে এবং মিলবে আশাতিরিক্ত ভাবেই। কিন্তু তাই বলে মনে করো না আমি তোমার প্রতিভার অনাদর করছি, অথবা তার বিকাশ-চেষ্টায় নিরুৎসাহ দিচ্ছি। আমি শুধু স্থায়ী মঙ্গল-কামনায় তোমায় সাবধান হতে বলছি, যাতে তুমি সেই ভাবে চিন্তা কর—সেই ভাবে চালনা কর নিজের প্রতিভাকে। কবিতার জন্যই কবিতা লিখো—প্রতিযোগিতার মনোভাব বা যশের লোভ যেন মনে না আসে। যশের প্রতি লোভ যত কম হবে, যশ পাওয়ার যোগ্যতাও তত বাড়বে এবং শেষে পাবেও। এই ভাবে লিখলে হৃদয় ও আত্মা উভয়েরই কল্যাণ হবে।—ধর্মের পরেই মনে স্নিগ্ধতা আনা ও মনের উৎকর্ষতা সাধনের এইটিই নিশ্চিত উপায়। তখন তোমার শ্রেষ্ঠতম চিন্তাধারা ও বিজ্ঞতম ভাব কবিতায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবে এবং এই ভাবে তাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ করতেও পারবে।

এই ভাবে লিখলাম বলে মনে করো না যে, আমি ভুলে গেছি আমিও এক দিন তরুণ যুবক ছিলাম—বরং সে কথা স্মরণ করেই লিখছি।

আশা করি, আমার অকপটতা ও শুভেচ্ছা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না। যা বলেছি তা তোমার সাম্প্রতিক ধারণা ও মেজাজের যতই প্রতিকূল হোক না কেন, দিন যত যাবে তাদের সারবত্তাও ততই উপলব্ধি করতে পারবে। হতে পারে, আমি অপ্রিয় উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু আজ এবং পরেও আমাকে তোমার এক জন অকৃত্রিম শুভাকাংখী বলে স্বীকার করবে আশা করি।

রবার্ট সাদে।

শার্লট ব্রণ্টির চিঠি

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়া অবধি কিছুতেই আর মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। যদিও আপনাকে দ্বিতীয় বার বিরক্ত করে অনধিকারিণীর মত সংকুচিত হচ্ছি। যে সস্নেহ ও বিজ্ঞোচিত উপদেশ আপনি পূর্বের পত্রে দিয়েছেন তার জন্ত আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এমন উত্তরের আশাও করিনি আমি। মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকে দমন করছি, নয় ত আপনি হয়ত আমাকে অতি উৎসাহী নির্বোধ ভাববেন।

আপনার চিঠি প্রথম বার পড়ে শুধু লজ্জাই পেয়েছি—অনুতাপ হয়েছে এই ভেবে যে কতকগুলো অপরিণত, অসংলগ্ন কথার জাল বুনে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেছি মাত্র। দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরাট করে যে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি মনে হয়েছে এবং যা আজ চিরন্তন লজ্জার কারণ হয়ে রইল, তাদের কথা যখনই ভাবি একটা বেদনাময় অনুভূতির জ্বালায় মুখ-চোখ তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু স্থিত চিন্তার পর এবং বার-বার চিঠিখানি পড়ে আপনার বক্তব্যের মূল মর্ম স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আপনি ত আমায় লিখতে নিষেধ করেননি—এমন কথা ত আপনি কোথাও বলেননি যে আমার লেখায় প্রতিভার দীপ্তি নেই। আপনি শুধু স্বপ্নময় আনন্দের অনুসরণে প্রকৃত কর্তব্যে অবহেলার মূঢ়তা সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন আমাকে। সতর্ক করেছেন যশের লোভে লেখার বিরুদ্ধে—সতর্ক করেছেন প্রতিযোগিতার স্বার্থান্ধ উত্তেজনার বিরুদ্ধে। আপনি ত আমায় পূর্ণ অনুমতি দিয়েছেন কবিতার জন্ত কবিতা লেখার। অবশ্য যদি না এই একমাত্র গভীর উত্তেজনাময় আত্ম-বিনোদনের জন্ত করণীয় সকল কিছু করতে বাকী রাখি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনি হয়ত আমাকে অতি নির্বোধ ভেবেছেন। আমি যে প্রথম চিঠি লিখেছি তার আগাগোড়া সবটাই বোধ হয় অর্বাচীন প্রলাপ মাত্র ঠেকেছে। কিন্তু আমি ত শুধু স্বপ্নবিলাসীই নই। আমার পিতা এক জন ধর্মযাজক—তাঁর আয়ের অংকও সুপরিমিত। ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই বড়ো। সকলের প্রতি সমান বিচার করে আমার শিক্ষার জন্ত বাবা সাধ্যমত অর্থব্যয় করেছেন। কাজেই যেদিন আমি স্কুল ত্যাগ করলাম, গবর্ণেস হওয়াকেই আমি কর্তব্য বলে মনে করেছিলাম। গবর্ণেসের কর্তব্যে সারা দিন মন-প্রাণ-হাত-পা-মাথাকে ব্যস্ত রাখার যথেষ্ট খোরাক পেতাম এবং মুহূর্তের জন্তেও কল্পনার স্বপ্নে উধাও পাখা মেলার সুযোগ হত না। কিন্তু সন্ধ্যা বেলাটুকু আমি চিন্তার কোলে ছেড়ে দিতাম নিজেকে, কিন্তু কাউকে আমার চিন্তার দ্বারা বিরক্ত করতাম না। খুব সতর্ক ভাবে খেয়ালিপণা বা ভাবালুতা পরিহার করবার চেষ্টা করেছি যাতে না যাদের মধ্যে আমি বাস করি তারা ঘূণাক্ষরেও আমার কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারে।

বাবার উপদেশ মত—তিনি শৈশব থেকে আমাকে উপদেশ দিয়ে আসছেন ঠিক আপনার চিঠির মতই বিচক্ষণতা ও বন্ধুত্বের সঙ্গে—আমি কেবল মাত্র নারীর উচিত কর্তব্যপালনে গভীর নিষ্ঠার সহিত চেষ্টাই করিনি, তা'তে গভীর উৎসাহও পেয়েছি। অবশ্য সব সময়েই আমার চেষ্টা সফলকাম হয়েছে বলি না; সময় সময় যখন আমি পড়িয়েছি বা সেলাই করেছি তখন হয়ত মনে হয়েছে যে এখন ছিল যথার্থই আমার পড়া বা লেখার সময়। কিন্তু আমি নিজেকে বঞ্চিত করে রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই আত্ম-প্রবঞ্চনার জন্ত বাবার প্রশংসায় নিজেকে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করেছি। আর একবার আপনাকে অকপট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর কখন ছাপার হরফে নিজের নাম দেখার দুরাকাঙ্খা করব না। যদি সে ইচ্ছা কখন হয় আপনার চিঠির শরণাপন্ন হব—দমন করব সে-ইচ্ছাকে। আপনাকে চিঠি লেখা এবং আপনার উত্তর আদায় করা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আপনার চিঠি আমার কাছে ধর্মের অনুশাসন। বাবা ও ভাই-বোন ব্যতীত আর কাউকে দেখাব না এ চিঠি। পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। এ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না আশা করি। যদি জীবনের অপরাহ্ন অবধি বেঁচে থাকি এ ঘটনা উজ্জ্বল স্বপ্নের মত আর ত্রিশ বছর মনে থাকবে। যে নাম-সই আপনার নিকট মিথ্যা প্রতীয়মান হয়েছে আসলে সেই আমার নিজের নাম! সুতরাং আবার সেই নামই সই করতে হচ্ছে আমাকে। ইতি—

শা. ব্রণ্টি

পুনঃ—

দ্বিতীয় বার বিরক্ত করার জন্ত ক্ষমা করবেন। আপনার দয়ার জন্ত আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনার অমূল্য উপদেশ আমি হেলায় হারাব না এ কথা আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। প্রথম প্রথম এ উপদেশ মত চলতে হয়ত অনেক দুঃখ, অনিচ্ছার সঙ্গে যুঝতে হবে।

শা· ব·

রবার্ট সাদের চিঠি

সুচরিতাসু—

তোমার চিঠি পেয়ে যে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি সে কথা তোমায় না জানালে কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। যে আন্তরিক প্রীতি ও বিবেচনার সঙ্গে তিরস্কারটুকু প্রেরণ করেছিলাম তুমি তা যথাযথ ভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছ। তোমায় অনুরোধ করছি, বর্তমানে যেখানে রয়েছি আমি সেই হ্রদাঞ্চলে যদি কখন এস, আমার সঙ্গে দেখা করো। দেখা হলে তুমি পরে আমার সম্বন্ধে আরো সুষ্ঠু ধারণা পোষণ করবে, কেন না তুমি দেখতে পাবে যে বয়স ও অভিজ্ঞতার দরুণ আমার মনে কোন কঠিনতা বা বিষণ্ণতা আসেনি।

ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের নিজেদের হাতেই আত্মকর্তৃত্ব লাভের ক্ষমতা রয়েছে এবং এই আত্মকর্তৃত্ব আমাদের এবং বহুলাংশে আমাদের পারিপার্শ্বিকের সকলের সুখের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অনুভূতি-প্রাবল্যের কবলিত হয়ো না কখন। মনকে সর্বদা শান্ত রাখতে চেষ্টা করো (এমন কি তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও এর চেয়ে ভাল উপদেশ আর হতে পারে না)। কেবল মাত্র সে ক্ষেত্রেই তোমার আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা তোমার মেধার সঙ্গে সমান তালে পা রেখে চলতে পারবে। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। তোমার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই আমায় জেনো। হে বন্ধু বিদায়।

রবার্ট সাদে

এডগার অ্যালেন পো'র চিঠি

[এক জন গুণমুগ্ধ তরুণকে লেখা পো'র এই চিঠিখানিতে তাঁর জীবনের স্বীকারোক্তি আছে আর আছে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর দিনগুলিতে তাঁর নিজের মনের প্রতিলিপি। এই চিঠি লেখার এক বছর আগে পো'র স্ত্রী মারা যান এবং এই চিঠি লেখার এক বছর পরে পো প্রিয়তমা পত্নীর অনুগমন করেন।

তুমি লিখেছ—'আমায় কি ইংগিতেও জানাতে পারেন, কি সেই ভয়াবহ দুর্ভাগ্য যা আপনার জীবনে শোচনীয় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছিল।' সত্যি, ইংগিতের অতিরিক্তই আমি তোমায় জানাতে পারি। মানুষের জীবনের নিষ্ঠুরতম দুর্ভাগ্য ঘটেছে আমার জীবনে। আমার স্ত্রী, যাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসতাম, ছ' বছর আগে গান গাইবার সময় আমার সেই স্ত্রীর গলা দিয়ে রক্ত বেরোয়। তাঁর জীবনের আশা ছিল না! তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করে আমি তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণার সবটুকু ভোগ করেছিলাম নিজের মধ্যে। তিনি কিছুটা সুস্থ হলে আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

এক বছর পরে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। আমার জীবনেও সেই বেদনার্ত অভিজ্ঞতা সুরু হোল। তার এক বছর পরে আবার। এমনি ভাবে বারে বারে সেই একই জিনিষ ঘটেছে।

প্রতিবার তার মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করেছি, আর তাকে ভালবেসেছি আরো গভীর ভাবে, তার জীবনকে আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছি। কিন্তু জন্মাবধি আমি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ও নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। আমি মাঝে-মাঝে উন্মাদ হয়ে যেতাম সেই অনুভূতির তাড়নে, কখনো বা মানসিক সুস্থতার শোচনীয় দুঃখে মর্মাহত হতাম। সেই সব উন্মত্ত মানসিক অবস্থায় আমি মদ্যপান করতাম—কত করতাম ভগবান জানেন। আমার শত্রুরা বলে, মদ্যপানের ফলেই আমি উন্মাদ হয়ে যাই, কিন্তু মানসিক অসুস্থতাই যে আমার মদ্যপানের কারণ তা তারা বলে না। বস্তুতঃ যখন আমি সুস্থ হবার সব আশা প্রায় ত্যাগ করেছিলাম, ঠিক তখনই স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্যে আমি সেই সুস্থতার সন্ধান পেলাম। মানুষের মতই আমি তা সহ্য করি এবং করতে পারি, কিন্তু আশা-নিরাশার মধ্যে এই বীভৎস বিরামহীন দোল খাওয়া আর আমি সহ্য করতে পারতাম না। তার দ্বারা আমার মানসিক সুস্থতা সম্পূর্ণ নষ্ট হতে চলেছিল। যে ছিল আমার প্রাণের প্রাণ, তাঁকে হারিয়ে আমি আর এক নূতন জীবন পেয়েছি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন সে বেঁচে থাকা কি দুঃখময়!

তোমার সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার নিজের পরিকল্পনার কথা বলি। নিজের রচনা নিজেই প্রকাশ করব স্থির করেছি আমি। নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অর্থই হোল বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া। আমার আকাঙ্ক্ষা খুব বড়ো। যদি সাফল্য লাভ করি, দু'বছরের মধ্যেই বিপুল সম্পদের মালিক হব আমি। সাউথ ও ওয়েষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই আমি অগ্রসর হবো এবং আমার বন্ধুদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব যাতে অন্ততঃ পাঁচশ' গ্রাহক নিয়ে আমি পত্রিকা সুরু করতে পারি। তাহলে আমার নিজের হাতেই সব দায়িত্ব তুলে রাখব। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন খুব কমই আছে যারা বিশ্বাস করে আমার হাতে অগ্রিম চাঁদা দেবে। কিন্তু সফল হবো আমি নিশ্চিতই। তুমি আমায় সাহায্য করতে পার? না করবে? আর কিছু লেখার নেই এখন।

ই, এ, পো

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা লর্ড মেটকাফের চিঠি

[চির পদদলিত অত্যাচার-নিপীড়িত ভারতবাসীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভারতবন্ধু মহাত্মা চার্লস থিওফিলাস মেটকাফের নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তরুণ মেটকাফ ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন এবং ১৮০১ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা পৌছিলেন।

তখন মারকুইস অব ওয়েলেসলি কলিকাতা নগরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার্থে "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" স্থাপিত করিয়াছেন। মেটকাফ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে ভারত-বাস তাঁহার বনবাস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মনোমধ্যে ভারত পরিত্যাগের বাসনা বলবতী হইল। অপিচ, মেটকাফ তখন এক কিশোরীর স্বপ্নে বিভোর। কিশোরীকে স্বদেশে ফেলিয়া আসিয়াছেন। বিরহ-অনলে সদাক্ষণ দগ্ধ-মন। এই জন্য মেটকাফের ইচ্ছা নিজ দেশে থাকিয়া জীবন-পথে উন্নতি লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার বহু দূরদর্শী, স্নেহপরায়ণা সুচতুরা বুদ্ধিমতী মাতৃদেবীর অবিদিত ছিল না যে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। উন্নতি লাভের কোন আশা থাকিবে না। এই কারণে পুত্রের এক পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রটি কিশোর মেটকাফকে লিখেন এবং এই সঙ্গে এক বাক্স পিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইয়া দেন।]

বাছা,

গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে পিত্তের আধিক্য হয়। সেই পিত্তাধিক্য প্রযুক্তই তুমি ভগ্নোৎসাহ এবং কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছ; আমি তজ্জন্য তোমাকে এক বাক্স পিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইতেছি। তোমার পত্র পাইয়া আমি এবং তোমার পিতা উভয়েই যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ যে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে ছাড়িয়া তুমি বিদেশে থাকিতে কষ্ট বোধ কর। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। তোমার আপন হৃদয় তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে যে, কুমারী ভি—কে দেখিবার জন্যই তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ। তোমার পিতার সাধ্য নাই যে, লর্ড গ্রেনবিলের আফিসে যৎসামান্য কার্য্যও তোমাকে জুটাইয়া দিতে পারেন। ভবিষ্যতে বড়লোক হইবার আশা যদি তোমার মনে থাকে, তবে ভারতবর্ষে থাক; অনতিবিলম্বে খ্যাতিলাভ করিতে পারিবে। বড়লোক হইবার উচ্চাভিলাষ তোমার হৃদয়ে কণিকা মাত্র থাকিলেও কখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে না। তোমার এমন কি বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, যাহা এখানে শত শত (কেন সহস্র সহস্র) লোকের নাই? তোমার এমন কি বন্ধু আছে, টাকা আছে, যাহা এখানে শত শত লোকের নাই? তবে তুমি কিরূপে এখানে উচ্চপদ লাভ করিবে? বাছা চার্লস, আমার অনুরোধে সন্তুষ্ট-চিত্তে ভারতে কিছু কাল অবস্থান কর। আমার বোধ হয়, তুমি সর্ব্বদাই কেবল অধ্যয়ন কর, তাহাতেই তোমার এইরূপ মানসিক অবস্থা হইয়াছে। অতএব কিছু হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইবে। ইতি

তোমার স্নেহময়ী

মা

প্রমথ চৌধুরী

"এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্ব্বে হাজার বার কি বলা হয়নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ্-অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেন না মানুষে এ কালে বই পড়ে না—পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দু'টি কাজ—এক চা-পান আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে, "The cup that cheers but not inebriates," অর্থাৎ,—চা-পান করলে নেশা হয় না অথচ ফুর্ত্তি হয়। চা-পান করলে নেশা না হোক্, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তার পর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।"

"কাব্যচর্চ্চা না করলে মানুষে-জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনও সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায়নি। এদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বল্‌লে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিরাকুলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চ্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলকেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে, কিছু দিন পূর্ব্বে আমারও ছিল। কেন না নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলিনে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না, কেন না সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাসান ছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, "নাগরিক" বল্‌তে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত—একালে ইংরাজিতে যাকে man-about-town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনও নাম নেই, কেন না বাংলা দেশে ও-জাত নেই। ও-বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।"

"যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এদেশে যেমন এক দল ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর এক দল ভোগী-পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক-ধর্ম্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার শুধু আত্মার নয় দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতি-নীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্তত দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন, অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশেষত ও-সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদর-পাতা একটি শয্যা থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চ্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর, রাত্রিশেষ অনুলেপন, মাল্য, সিক্‌থ্‌করণ্ডক, সৌগন্ধিকপুটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্ত্তিকা-সমুদ্‌গকঃ। এবং যে কোনও পুস্তক।"

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে—কেন না এর অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া। এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকেরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না! তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চ্চস্থান। কূর্চ্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনও অভিধানে পাইনি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ্চ। আস্তিক নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়ন-গ্রহণ করতেন না। সুতরাং কূর্চ্চ হচ্ছে এক প্রকার ব্র্যাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না: কিন্তু দেবতার ধার ষোল আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব্ব নয়। একালেও দেখা যায়, মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখা যাক্ বেদিকা বস্তুটি কি?—বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল। এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়। তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ—inlaid. অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা। কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেন না তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য্য বুঝতেন! সিক্‌থ্‌করণ্ডক হচ্ছে—মোমের কৌটা। সেকালে নাগরিকেরা, ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিস করে নিয়ে, তার পর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে—ইংরাজিতে যাকে বলে powder.box। বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের

মেঝের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ—পিকদানী। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা। টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার "নিচোল-অবগুণ্ঠিত"। বাংলার অনেক পাঠকপাঠিকার ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ী। "শাড়ীপরা বীণা"র অবশ্য কোনও মানে নেই। নিচোল অর্থে গেলাপ। জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন "ধীরয় নীল নিচোলং" তার অর্থ "নীল রঙের একটি ঘেরাটোপ পর"। ইংরাজি ভাষায় ওর তর্জ্জমা হচ্ছে—Put on a dark blue cloak. এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। তার পর পাই চিত্রফলক। সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্ত্তিকা সমুদ্গকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তার পর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজ-সজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তার পর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেন না নাগরিকেরা আর যাই হ'ন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। পুস্তক কি ভাবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোন কোন ধনী লোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে—

"এই সকল বীণাদি দ্রব্য সর্ব্বদা উপযোগের, অর্থাৎ—ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তি নিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে-ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হবে।"

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং, অর্থাৎ—"যা হোক একটা বই,"—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে বই, আর যে কারণেই হোক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই:—'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দ্দেশ হইলেও, তখনকার যে-কোনও কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও, ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে; কিন্তু কাউকে জোর করে সঙ্গীত-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনও অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন "যে-সে বই নয়, তখনকার বই"। এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরাজিতে বলে classic, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেন না অপর কোনও উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্য সমাজেও দেখতে পাই যে, "এখনকার" বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাসানের একটি প্রধান অঙ্গ। Anatole France-এর টাট্‌কা বই পড়িনি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত Kipling-এর কোনও সদ্যপ্রসূত বই পড়িনি বলতে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ Anatole France-এর লেখা যেমন সুপাঠ্য, Kipling-এর লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি নে। বিলেতে একটি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক্, যা রটে তা কিছু বটেই ত। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি এক দিন আমার কাছে, Oscar Wilde-এর বই পড়েননি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি?—Oscar Wilde-এর বই পড়েননি, এই ত। ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পাননি। বলা বাহুল্য, এ রকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই রুজুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পুরাকালে culture জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি, সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্য্যায়-শব্দ—ইংরাজিতে যাকে বলে synonyms.

* * * *

বই পড়ার সখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও, আমি কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেন না আমরা জাত হিসেবে সৌখীন নই, দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেন না আমাদের এখন ঠিক সক করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব, অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্ম্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত নয়ই—দুরাশা; কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে

পারি নে, কেন না আমাদের উদ্ধারের জন্ত কোনও সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে চাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ —তার কোনও নগর বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডিমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতি জনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, ইংরাজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডিমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক,—স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজার-খানা Law-report কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেন না তাতে ব্যবসার কোনও সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে ত জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনও মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য ত প্রত্যক্ষ, কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য নয় যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেন না ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেন না মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য—এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেন না বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাদুঘরে, কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্ত চাই লাইব্রেরি। ও চর্চা-মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেই জন্ত আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল-কলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করার নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন—এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানা-শোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক্। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গো-দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলেরও নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও-বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না? অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোর-জবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্ত মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে সুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, "আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে, উক্ত

বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের বকুতের মাথা খান, এবং চোকের পর চোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে infantile liver-এ গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।"

"আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল।"

"অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, 'বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে?' আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক যারা কেতাবি, আরেক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্ব্বদলভুক্ত নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুই-ই বাধ্য হয়ে; অর্থাৎ—পেটের দায়ে। সেই জন্য সাহিত্যচর্চ্চা দেশে এক রকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্ত্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্ম্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্ত্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু এ কথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ, মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে, জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। তার পর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জ্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মন-প্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনও নীতির অনুসারেই তা কর্ত্তব্য হতে পারে না,—অর্থনীতিরও নয় ধর্ম্মনীতিরও নয়।

"কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়,—আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জ্জীব, এ কথা যেমন সত্য, যে নির্জ্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জ্জীব করেছে। আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চায় স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে কি না জানি নে। সম্ভবত হয়নি। কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন গলা কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে-মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

"আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করিনি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করিনি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে Athens যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একধারে democratic এবং aristocratic; অর্থাৎ—সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে democratic, এবং মানসিক জীবনে aristocratic, সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনও বিচ্ছেদ নেই, বরং দু'য়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্ম্মীর দল যেমন এক দিকে বাঙালী ডিমোক্রাসী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর এক দিকে আমাদেরও পক্ষে মনের aristocracy গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্য-কলার চর্চ্চা। কর্মী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে, কাব্য-কলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চ্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।"

শ্রাবণ, ১৩২৫।

—আগামী সংখ্যায়—

বাঙলা বইয়ের দুঃখ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রাম্য গ্রন্থালয়

[বাঙলা গ্রামবহুল দেশ। শহরের সীমানা অতিক্রম না করিলে বাঙলার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়নগোচর হয় না। আমরাও শহরবাসীরা কেহ কখনও গ্রামে যাই না। অভাব, অনটন ও অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালী গ্রামবাসীর অবর্ণনীয় দুরবস্থার উল্লেখ কখনও হয়তো পাওয়া যায় কোন সংবাদপত্রের স্তম্ভে। স্থানীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ভোটলাভের পর বড় একটা পাওয়া যায় না, বাঙলার গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশাও তাই কোন কালে মোচন হয় না। আজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী গ্রামবাসীর দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া একমাত্র অশিক্ষাই সকল অনর্থের মূল জানিয়া দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী নির্দ্দেশ দেন—গ্রামে গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই রচনাটি ১২৫৮ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়। আমাদের মনে হয়, আজিকার দিনেও আমাদের গ্রামের কথঞ্চিৎ দুর্দ্দশা দূরীভূত হয় নাই, সেই হেতু রচনাটি আমরা পুনরায় মুদ্রিত করিলাম।]

গ্রন্থালোচনার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপদেশকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ।

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয়, এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম্ম ও পাঠ দ্বারা দিবসকে সফল করিবেক।" পরন্তু এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থপাঠ জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল-প্রাপ্তির উপায়। ইহা দ্বারা ঋষিগণ জ্ঞানসাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন, পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বিষয়ী ব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্টসাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণের বিধি সকল জানিতে পারেন, বণিক্ বাণিজ্য-ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন এবং শিল্পকারেরা আপন আপন ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখ মোচনের উপায় এবং শোকের সময় হৃদ্বোধক বাক্য গ্রন্থ হইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কামিজনের সহচর, ধার্ম্মিকের বন্ধু এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকল মঙ্গলের কামধেনু এবং সকল সদুপদেশের আধার; অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, সর্ব্বত্র ইহা সমরূপে আদরণীয়, এবং সর্ব্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ গুরুস্বেচ্ছার এবং উপাসনার সাপেক্ষপর, উপদেশাকাঙ্ক্ষীর মানসাধীন নহে। কিন্তু পুস্তক সর্ব্বদা আপন কার্য্য-সাধনে প্রস্তুত, এবং জিজ্ঞাসা মাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে, কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপদেশক যাহাতে সকলের গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, এমত চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং সে চেষ্টাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে এক শত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে এবং সামান্য বিষয়ী ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সংগ্রহ করিলে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে এবং এতদ্রূপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন, ইহাও বোধ হয় না।

যদ্যপি যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থপাঠরূপ সুধাপান করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে এক শত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অল্প ব্যয় ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরস্পরোপকারার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন আপন বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ-ব্যবহার-বিষয়ে কাহার হানি হয় না। এক গ্রামস্থ দশ ব্যক্তি যদিস্যাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ ক্রয় করেন, তবে এক শত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন, অথচ প্রত্যেকের এক এক শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হওত ঈশ্বরানুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গলবৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায় দ্বারা তদভীষ্ট সাধন হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বকালিক বংশ পরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারয়েয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয়ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাবপ্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সংগ্রহে অপারগ বোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোলবৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্প-জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকল দুঃখমোচনের সুলভ উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা করিয়া প্রদান করেন, তদানুকূল্যেও তত্তদ্গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয় গ্রামভেটি ও বারয়েরারির ধন, যেহেতু তদুপার্জ্জনে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অনভিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

আমরা পল্লীগ্রামবাসী জনের প্রতি অমর্যান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শপক্ষের উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক, এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে। এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে যে, তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ

করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্‌গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন! এই নিন্দার কারণ কি? গ্রামস্থ ব্যক্তিব্যূহের সৎকর্ম্মে ব্যয়কুণ্ঠতা? কি অনভিজ্ঞতা? কি বিবেকহীনতা? তাহা নহে। এতদ্দেশের রীতি এই প্রকার যে, প্রত্যেকেই একাকী অদ্বিতীয় স্বস্বমোর্দ্ধ হইব এই মানস করেন, সুতরাং তদভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে পরম সাংঘাতিক কর্ম্মেও তাঁহারা একত্র হইতে প্রবৃত্ত হন না, এবং সেই অপ্রবৃত্তিই এতদ্দেশের সংহারিকা অর্থাৎ উৎসন্ন হইবার বিস্তৃত পন্থা হইয়াছে। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পরস্পরের অধীন করিয়াছেন, ইহা কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত স্ব স্ব মনে স্থান দেন না এবং তন্নিমিত্তেই আমাদিগের জন্মভূমির এমত দুরবস্থা।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারি শত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতি মাসে সংগ্রহ হয়, এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে; অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে এক বিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া দুষ্কর নহে। গ্রামমধ্যে এমত এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠ করত মনকে প্রফুল্ল করণে সক্ষম হয়েন, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠ দ্বারা জ্ঞানজ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন। আমাদিগের ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা সাধারণের বিচার জন্যে মধ্যে মধ্যে ভাবী বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জনগণেরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারে না। সে সকল স্থানে সংবাদপত্রের প্রচলন হইলেই ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া তাহার হিতাহিত বিচার করিতে পারেন এবং পাণ্ডুলেখ্যোক্ত বিধি তাঁহাদের অনিষ্টকর হইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে পারেন। ফলতঃ ঐ স্থান সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় হয়, এবং তথায় অনেকে একত্র আসিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ, পরস্পর মিষ্টালাপ, বায়ুসেবন, গ্রন্থালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্প-বাটিকার সৌন্দর্য্যদর্শন, চতুরঙ্গ ক্রীড়াদি নানাবিধ প্রেমরসে আর্দ্র হইতে পারেন। অদ্য এ বিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্র লিখিলাম, যদ্যপি পল্লীগ্রামস্থ ভায়ারা আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমরা ইহাতে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিব এবং যাহাতে সাধারণ লোকে নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বেলী সাহেব, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত লাং সাহেব, এবং বীরভূমস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয়দিগের উৎসাহে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূম, যশোহরাদি বঙ্গদেশের দ্বাদশ স্থানে এতদ্রূপ গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে, অতএব উক্ত সদাশয়দিগকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি, এবং ভরসা করি দেশহিতৈষী মহাশয়েরা ইঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র এতদ্রূপ মাঙ্গল্য কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

—বিবিধার্থ সংগ্রহ, সাল ১২৫৮।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি

১৯২৫—১৯২৯

স্বরাজ্য দলের এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসামান্য সংগঠন-প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। দেশবন্ধু সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার মনে এইরূপ আশা জাগিয়াছিল যে, সম্মানজনক সর্ত্তে বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষ-রফা করা সম্ভব হইতে পারে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মেলনে তিনি বলেন, "যদি জনসাধারণের হাতে সত্যকার আত্মশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা না করার কোন কারণ থাকিতে পারে না।" দেশবন্ধুর মৃত্যুর ফলে বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বাংলা দেশে আগমন করেন। দেশবন্ধুর অতুলনীয় দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমরা দেশবন্ধুর ন্যায় বিরাট মনীষার অধিকারী নহি, কিন্তু তিনি যে ভাবে জন্মভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন, আমরা তাহা অনুকরণ করিতে পারি।" দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। গান্ধীজী এই সময় সর্বপ্রকারে স্বরাজ্য দলকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। স্বরাজ্য দলের সুবিধার জন্য তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন। ১৯২৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ পরিচালনার ভার স্বরাজ্য দলের হাতে অর্পণ করা হয়। গান্ধীজী স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের এটর্ণী বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯২৫ সালে কংগ্রেসে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্তা নাইডুর হাতে কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া বলেন, "যদি জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব দেখা যাইত তাহা হইলে অদ্যই আমি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।" শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহার সভানেত্রীর ভাষণে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং নির্ভীক ভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন। ১৯২৫ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক অশান্তি গুরুতর আকার ধারণ করে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। বহু বৎসর ধরিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদসৃষ্টির জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতেছিল, এই

সময়ে তাহার বিষময় ফল আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি করিয়াই দেশ-শাসন করাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজনীতিবিদদের অন্যতম মূল নীতি। তাঁহারা জগতের যেখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, সেখানেই সাফল্যের সহিত এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতের এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে পারিলে এই বিরাট দেশের শাসন ও শোষণ-কার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে, এই নীতি অনুযায়ী বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের প্রথম হইতেই ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা ও ভেদ-সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের এই ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ শাসনকালে বার-বার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। দেশ বিভাগ এই ষড়যন্ত্রেরই চরম পরিণতি। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহা অল্প দিন স্থায়ী হয়। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় জাতীয় সংহতি বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। এই বৎসর গৌহাটিতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়—সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু দিন পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়। সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁহার অভিভাষণে স্বরাজ্য দল কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, "গবর্ণমেন্টের সকল প্রকার কার্য্যের সহিত অসহযোগিতার দ্বারাই আমরা স্বরাজের পথে অগ্রসর হইব।" ভারতবাসীদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদিগকে শান্ত করার জন্য কিছু করা প্রয়োজন, এই মনোভাব হইতে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সুপারিশ করার জন্য সাইমন কমিশন নামক একটি কমিশন গঠন করা হইবে। বড়লাট লর্ড আরউইন নবেম্বর মাসে ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবিত কমিশনে কোন ভারতীয়কে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সাইমন কমিশন গঠনের ফলে যে কোনরূপ ফললাভ হইবে না, সকলেই এ সম্পর্কে একমত হন।

১৯২৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে সর্বতোভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাইমন কমিশন বয়কট সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়, "ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন করিয়াছেন। সুতরাং আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির কমিশন বর্জন করা উচিত।" কমিশন যে তারিখে ভারতে পদার্পণ করিবে, সেই তারিখে ভারতের সর্বত্র ব্যাপক ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার ভার কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর অর্পিত হয়। কংগ্রেস-বহির্ভূত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এক ইস্তাহারে কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে কংগ্রেসের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিয়া এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতীয় জনগণের জন্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাইমন কমিশনের সদস্যগণ বোম্বাইএ অবতরণ করেন। কমিশন বর্জন উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে হরতাল পালন করা হয়। মাদ্রাজে পুলিশ জনতার উপর গুলী চালনা করে, কলিকাতায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লাহোরে লালা লজপৎ রায়ের নেতৃত্বে কমিশন বয়কটের জন্য বিরাট গণ-বিক্ষোভ হয়। পুলিশের লাঠিতে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লজপৎ রায় আহত হন। চিকিৎসকেরা এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে লালাজীর অকালমৃত্যুর কারণ হইতেছে এই লাঠির আঘাত। লক্ষ্ণৌএ পুলিশের গুলী ও লাঠি চালনার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। ভারতের সর্বত্র কমিশনের সদস্যগণকে বিরুদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হইতে হয়। কমিশন যেখানে গমন করেন, সেখানেই জনসাধারণ কৃষ্ণ-পতাকা লইয়া কমিশনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। গবর্ণমেন্ট বুলেট ও লাঠির সাহায্যে কমিশনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়। সাইমন কমিশন বর্জনের ব্যাপারে দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে ঐক্য ও দৃঢ়তা দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর। ১৯২৮ সালের অন্যতম প্রধান ঘটনা হইতেছে বর্দোলী সত্যাগ্রহ। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বর্দোলীর কৃষকগণ অন্যায় কর-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্দোলনের সময় অতুলনীয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া বর্দোলীর কৃষকগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ সম্ভব-অসম্ভব সর্বপ্রকার দমননীতির আশ্রয় লইয়া কৃষকদের মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্দোলী তালুকের কৃষকগণের জয়লাভের ফলে জনসাধারণ নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে সর্বদল সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নেহরু কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে নেহরু কমিটি ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্বলিত এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইহাই নেহরু রিপোর্ট নামে বিখ্যাত। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়—সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। কলিকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দেন। কলিকাতা কংগ্রেসে কংগ্রেসের লক্ষ্য লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল দাবী জানান। ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের ভিত্তিতে নেহরু রিপোর্টে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়। কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী নেহরু কমিটি-সম্পর্কিত মূল প্রস্তাব প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। উক্ত প্রস্তাবে নেহরু কমিটির রিপোর্ট সমর্থন করিয়া বলা হয় যে, "বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নেহরু কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত শাসনতন্ত্র পুরোপুরি মানিয়া লন, তাহা

হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু যদি ঐ তারিখে বা তাহার পূর্বে এই শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইবেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অধিবেশনে এই মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হয়। কলিকাতা কংগ্রেস শেষ হইবার পর সমগ্র দেশে আসন্ন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতির কাজ চলিতে লাগিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে জনসাধারণের মনেও কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। ১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইংলণ্ডে শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন—প্রধান মন্ত্রী হইলেন মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। পরামর্শের জন্য বড়লাট লর্ড আরউইন জুন মাসে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এদিকে ভারতে ব্যাপক ভাবে খানাতল্লাসী ও ধর-পাকড় চলিতে লাগিল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েক জন সদস্যও গ্রেপ্তার হইলেন। বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ৩১শে অক্টোবর তারিখে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এক বিবৃতি দিলেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলিলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। ভারতকে ডোমিনিয়নের অনুরূপ মর্য্যাদা দান করাই ভারত শাসনের লক্ষ্য। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বড়লাটের বিবৃতির ব্যাখ্যা দাবী করিলেন। ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বান করা হইবে কি না, নেতৃবৃন্দ তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে ভারত-সচিব ওয়েজউড বেনের বিবৃতিতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা প্রদানের কোন অভিপ্রায় বৃটিশ সরকারের নাই। ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ যে প্রতিশ্রুতি দাবী করেন, বড়লাট তাহা প্রদান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। এই বৎসর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। লাহোর কংগ্রেসে ঐতিহাসিক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে বলা হয় যে, "কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে 'স্বরাজ' শব্দটির দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝা যাইবে। নেহরু কমিটির রিপোর্টে যে শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে। কংগ্রেসকর্মিগণ অতঃপর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন বলিয়া কংগ্রেস আশা করেন।"

বিভিন্ন আইন সভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। আইন অমান্য আন্দোলন করায় ক্ষমতা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইল। কলিকাতা কংগ্রেসে গবর্ণমেণ্টকে এক বৎসরের সময় দেওয়া হইয়াছিল। এক বৎসর শেষ হইবার পর কংগ্রেস ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিয়া সংগ্রামের পথে দেশকে পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর পরে লাহোরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে ছিল জাগ্রত জনমত। বৃটিশ শাসনের অব্যবস্থায় জনগণ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তি-লাভের জন্য জনসাধারণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। লাহোর প্রস্তাবে জনসাধারণের এই আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হইয়া উঠিল। ১৮৮৫ সালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে কাজ আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস ক্রমশঃ বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বায়ত্ত-শাসনের লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কংগ্রেস চেষ্টার ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিল। ১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, ভারতের গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে পূর্ণ স্বরাজের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হইবে। ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করিল। স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্যে বলা হইল—"আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীর ন্যায় ভারত-বাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জ্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন-ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে।"

[ক্রমশঃ

"বন্ধুগণ, আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে ভারতের শেষ মুক্তি-সংগ্রামে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্ত্তব্য সম্পাদন হয়ে গেলে যখন ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীন হবে তখন দেশবাসীর কাছে আমি উপস্থিত হব তখন দেশবাসীই স্থির করবে কি ধরণের স্বাধীনতা তারা চায়।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী

শ্রীধর কথক

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আচার্য্য জে, বি, কৃপালনীর জীবন ও চরিত্র নানা দিক্ দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গান্ধীজীর অন্যতম একনিষ্ঠ অনুগামী ও গান্ধীবাদের ব্যাখ্যাতা হিসাবে আচার্য্য কৃপালনী প্রখ্যাত। ১৯১৪ সালে গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকা হ'তে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর সহিত আচার্য্য কৃপালনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯১৭ সালে গান্ধীজী যখন চম্পারণে যাবার পথে মজঃফরপুরে গমন করেন, তখন তিনি আচার্য্য কৃপালনীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। আচার্য্য কৃপালনী তখন মজঃফরপুরে সরকারী কলেজের অধ্যাপক। গান্ধীজীকে আশ্রয় দেবার জন্য তাঁহার চাকুরী যায়। ইহার পর কৃপালনী গান্ধীজীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ করেন। গান্ধীজীর প্রভাবাধীনে আসবার পূর্বে কৃপালনী বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যোগ স্থাপন করেছিলেন। খুব ছেলেবেলা হতেই আচার্য্য কৃপালনীর মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের বিকাশ দেখা যায়। ১৮৮৮ সালে সিন্ধুর অন্তর্গত হায়দরাবাদে শ্রীজীওতরাম ভগবানদাস কৃপালনী এক মধ্যবিত্ত 'অমিল' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃপালনীরা সাত ভাই ও এক বোন। ভাই-বোনেরা সকলেই খাপছাড়া। কৃপালনীর পিতা কাকা ভগবানদাস গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করতো, আর অল্প কারণে রেগে উঠতেন বলে তাঁকে সকলে ভয়ও করতো। কৃপালনী-পরিবারের সকলেই অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী। আচার্য্য কৃপালনীও উত্তরাধিকার-সূত্রে এই মেজাজ পেয়েছেন। মাঝে-মাঝে তিনি এই মেজাজের পরিচয়ও দিয়ে থাকেন। ছেলেবেলায় কৃপালনী অত্যন্ত দুরন্ত-প্রকৃতির বালক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি শিক্ষক ও বাড়ীর লোকজনদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। শিক্ষকগণ তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে যান। পাঠ্য পুস্তক পড়ার দিকে তাঁর কোন দিনই ঝোঁক ছিল না, জীবনের নানা ক্ষেত্র হতে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই তাঁর কাম্য ছিল। কোন রকমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃপালনী বোম্বাইর 'উইলসন কলেজে' ভর্তি হন। স্বাধীন মনোভাব ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তিনি কলেজ হতে বিতাড়িত হন। তার পর তিনি করাচীর এক কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ এক দিন ভারতীয়দের সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্য করেন। ইহার ফলে কৃপালনীর সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। কৃপালনী এই কলেজ থেকেও বিতাড়িত হলেন। বি-এ পাশ করবার পর তিনি কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। তার পর এম-এ পাশ করে মজঃফরপুরে সরকারী কলেজে অধ্যাপকের চাকরী নিলেন। গান্ধীজীর প্রভাবে আসবার পর কৃপালনী কিছু দিন কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি এক দিন ছাত্রসহ কলেজ পরিত্যাগ করে আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহার কিছু পরে গান্ধীজীর নির্দেশে কৃপালনী গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের সংগঠন-কার্য্য শেষ করে তিনি গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থাকে বাস্তব রূপ দেবার দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মীরাটে গান্ধী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি খদ্দর প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কৃপালনী অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৩৪ সালে কৃপালনী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার পর চার বৎসর ধরে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি বিশিষ্ট কর্মী সুচেতা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৪৬ সালে নবেম্বর মাসে তিনি কংগ্রেসের মীরাট অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কিছু দিন পরে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর মতবাদ বিশ্লেষণ করে কৃপালনী কয়েকটি বই লিখেছেন। যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কৃপালনী গান্ধী-দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন, তাহা তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক।

আচার্য্য কৃপালনীর চরিত্রে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। আচার্য্য কৃপালনীর অন্তর স্নেহপূর্ণ কিন্তু বাহিরে তিনি এরূপ ভাব দেখান যে, তিনি স্নেহ-মায়ার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আচার্য্য কৃপালনী রূঢ় সত্যভাষী। তীক্ষ্ণ পরিহাস ও বিদ্রূপ করবার সুযোগ পেলে তিনি কখনও সেই সুযোগ হারান না। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আঘাতে প্রতিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করতে তিনি একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ পান। বক্তৃতার সময়ে প্রথমে তিনি সুন্দর ভাবে প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করেন। তার পর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আঘাতে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেন। সময়ে অসময়ে রূঢ় সত্য কথা বলার জন্য ও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করার জন্য আচার্য্য কৃপালনী অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির অপ্রিয় হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ সব গ্রাহ্য করেন না। তিনি জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত নহেন। কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হন না। আচার্য্য কৃপালনী অনেক সময়ে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের বিপদে ফেলেন। একবার গুজরাট

আচার্য্য কৃপালনী

বিদ্যাপীঠে মহাদেব ভাই বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতা প্রসংগে তিনি বললেন, বাপুজী বহু লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নিজের ও কৃপালনীজীর কথা উল্লেখ করলেন। কৃপালনীর নাম উল্লেখের সংগে-সংগে কৃপালনী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "মহাদেব ভাই যা বলেছেন, তা সত্য নয়। বাপুজী আমার জীবনে কোন পরিবর্তনই আনতে পারেননি। বাপুজীর সহিত পরিচিত হবার পর আমি কেবল মাত্র আমার পোষাক বদল করেছি। আমার জীবনের ইহাই একমাত্র পরিবর্তন।" কৃপালনীর এই ধরণের বক্তৃতায় মহাদেব ভাই বিশেষ ভাবে লজ্জিত হলেন। একবার গান্ধীজী ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সদলে চলেছেন, কৃপালনীজীও সংগে আছেন। ষ্টেশনে গাড়ী থামবার সংগে-সংগে জনতা গান্ধীজীর কামরার সম্মুখে এসে ভীড় করছে ও 'মহাত্মাজী কী জয়' ধ্বনিতে চার দিক্ মুখরিত করে তুলছে। একটা ষ্টেশনে জনতার মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক 'মহাত্মাজী কী জয়' ধ্বনি ক'রে গান্ধীজীর কামরায় উঠবার চেষ্টা করল। কৃপালনীজী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁদের সরিয়ে দিলেন। পুনরায় 'মহাত্মাজী কী জয়' ধ্বনি করে জনতা এগিয়ে এল। 'মহাত্মাজী উচ্ছন্নে যাক', এই কথা বলে কৃপালনীজী জনতাকে সরিয়ে দিলেন। কৃপালনীজীর কথা শুনে মহাত্মাজী ও অন্যান্য সকলে হেসে উঠলেন। গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। কস্তুরবাও দলের মধ্যে ছিলেন। তিনি বললেন, "কৃপালনীজী, আপনার এই কথা বলা ঠিক হয় নাই।" কৃপালনীজী একটু লজ্জা পেলেন, কিন্তু নিজেকে সমর্থন করতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, "আমি বাপুজী সম্পর্কে কোন কথা বলিনি, মহাত্মা সম্পর্কে বলেছি।" নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই আত্মসচেতনা কৃপালনীজীর পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। কৃপালনীজীর ছয় ভাইএর মধ্যে দু'জন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে এক জন খিলাফৎ আন্দোলনের সময় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে পলাতক অবস্থায় মারা যান। আর এক জন তুরস্কের হয়ে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান। কৃপালনীজীর অন্য এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে সংসার পরিত্যাগ করে চলে যান। কৃপালনীজীর ভাই-বোনেরা সকলেই খাপছাড়া স্বভাবের। আচার্য্য কৃপালনীর মধ্যেও এই অস্থিরচিত্ততা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। আচার্য্য কৃপালনী খুব অল্পে চটে উঠেন কিন্তু তিনি বলেন যে, ভাই-বোনদের মধ্যে তাঁর স্বভাবই সর্বাপেক্ষা মৃদু। শিক্ষক হিসাবে আচার্য্য কৃপালনী ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। তিনিও তাদের ভালবাসতেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠে অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি আচার্য্য নামে পরিচিত হন। মহাত্মাজী তাঁকে প্রফেসার বলে ডাকতেন। নিজের মতবাদ সম্পর্কে গান্ধীজী যাঁদের মতামত শ্রদ্ধার সংগে বিবেচনা করতেন, আচার্য্য কৃপালনী তাঁদের অন্যতম। আচার্য্য কৃপালনী তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে 'দাদা কৃপালনী' ব'লে পরিচিত। দাদা কৃপালনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সহকর্মীদের বকাবকিও করেন, আবার যথেষ্ট স্নেহও করেন। দাদা শব্দটিতে কৃপালনীর চরিত্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কৃপালনী খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতে ভালবাসেন। আহার বেশভূষা সব-কিছু সম্পর্কেই তিনি উদাসীন। তাঁকে দেখে মনে হয় যে জগতের কোন কিছুতে তাঁর আসক্তি নাই। সুচেতা দেবীকে বিবাহ করবার পর কৃপালনীজীর মেজাজ অনেকটা ভাল হয়েছে। সুচেতা দেবী বাঙ্গালী মেয়ে। কৃপালনীকে বিবাহ করার পূর্বে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। বয়সে তিনি কৃপালনী অপেক্ষা কুড়ি বছরের ছোট। বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সুচেতা ও কৃপালনী পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসেন। সুচেতা দেবী কাছে থাকলে কৃপালনীর মেজাজ শান্ত থাকে। সুচেতা দেবী সম্পর্কে গান্ধীজীর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। একবার গান্ধীজী রহস্য করে বলেছিলেন, 'সুচেতা দেবীর মত গুণবতী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে বিয়ে করেও আচার্য্য কৃপালনী যদি জীবনে সুখী না হয়ে থাকেন, তা'হলে বুঝতে হবে যে তাঁর চরিত্রে এমন কোন ত্রুটি আছে, যা তাঁকে সুখী হতে দিচ্ছে না।' আচার্য্য কৃপালনী বর্তমানে গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কৃপালনীজী মনে করেন যে, একমাত্র গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থার সাহায্যেই ভারতের জনসাধারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারে।

কৃপালনীজী মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। মহাত্মাজীর মতবাদ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী চললে ভারতে এক দিন কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আচার্য্য কৃপালনী আরও বহু বৎসর জাতিকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

"ঘটনাবলীর মোড় ঘুরবার সময় শীঘ্রই আসছে। সে সময় এলে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে ভারতবর্ষকে শেষ আঘাত হানতে হবে। এই শেষ আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু হবে, এই শয়তানি শক্তিকে শেষ আঘাত হানবার গৌরব ভারতবর্ষই অধিকার করবে। বন্ধুগণ, বিদেশ থেকে আমি যা দেখলাম আর আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎখাত হবেই, এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে এক দিন দেখা দেবে স্বাধীন ভারত।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

মিনাকুমারী

সতীনাথ ভাদুড়ী

তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরী ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত; মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে—এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুলনাচের সুতোটা তাঁর হাতে। চিত্রগুপ্তের নির্লিপ্ত চোখে মানুষগুলো তাঁর নির্দেশ পূরণ করবার মশলা, তার বেশী কিছু নয়; লোকে ভুল ভাবছে যে তাঁর দেখানো পুতুলনাচের উপকরণ—রক্ত-মাংসে গড়া, সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনী গড়ে তুলছে; বুঝছে না যে এ চাকা ঘোরাচ্ছেন চিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করে কারিগর; আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি।

লাইন দিয়ে বাঁধা মিনাকুমারীর জীবন। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর রিপোর্ট, বিভিন্ন মনচিত্রের নকল, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ, সব প্রমাণের উদ্যত সূচিমুখ ঐ আত্মঘাতিনীর অন্তিম মুহূর্তের দিকে কেন্দ্রিত হয়েছে কি না তাই দেখছেন চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্তের কথাই ভাবছিল শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যুর চিতার পাশে বসে। তার মত যুক্তিবাদী লোকেরও শ্মশান-বৈরাগ্য এসেছে এখন মনে। অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাগুলো। চেষ্টা করেছিল প্রথমটায় যুক্তির শলাকা দিয়ে এর গ্রন্থি আলগা করতে পারেনি। ইউনিয়ন অফিসে আবার ফিরে যাওয়ার আগে পারবেও না সে, আবছা ভাবে বুঝছে তার মন এখন স্বাভাবিক নেই। তাই সে এই শ্মশান-বৈরাগীর রুগ্ন মনটার বাঁধন আলগা করে দিয়েছে; যাক যেদিকে যেতে চায়।

১৯৪৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারী আজ। মহাত্মাজীর তিরোধানের পরদিন।

শীতের সন্ধ্যার ঝুপসী অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে নদীর পারের কুয়াশার জন্য। কালো জলে চিতার আগুনের আলো পড়েছে; বৈতরণীর উপর গড়ে উঠছে গলানো সোনার সেতু। চারি দিকে অগণিত লোকের মেলা। নির্বাক নিশ্চল জনতার ভিড়টা চিতার তিন দিকে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। একটা ছোট দলের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে রামধুনের গান। শোকাতুর লোকগুলোর, তার সঙ্গে ক্ষীণ সুরের যোগান দেওয়ারও উৎসাহ নেই।

কার প্রাপ্য কে পায়। মহাত্মাজী পরলোকে যাবার পরও যে তাঁর বিভূতি ধার দিয়ে যেতে পারেন অভিমন্যুকে, সে কথা 'বলীরামপুর জুট মিল'এর ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব ভাবতেও পারেনি। মহাত্মাজীর ছবিওয়ালা মিছিল দেখে সে এসেছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে। তার পর, সকলের সঙ্গে এসেছে শ্মশানে। তার দেখা-দেখি কারখানার অন্য সব অফিসাররাও জুতো খুলে মাটিতে বসেছে; কিন্তু কারও আন্তরিকতা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা পড়েনি শিষ্টাচারে।

তাদের কাছাকাছিই বসেছে মেয়ের মিনাকুমারী, রুক্মিণী, বলীরামপুরের আরও কত অজানা মেয়ে, কত মিলের মজুরণীরা। ঐ তো মিনাকুমারী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে;—রজনীগন্ধার ডাঁটা মুচড়ে মুচড়ে ভাঙছে কে যেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার অশ্রু বাধা মানছে না। চোখের জল যদি শুকিয়ে না গিয়ে থাকে তাহ'লে এই তো সময় চোখের জল ফেলবার। তার ইচ্ছা হয় চিতার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, চিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতগুলো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। কান্না চাপবার চেষ্টায়, ঝড়ে তোলপাড় খাওয়া বুকটা ফেটে যাবে বুঝি এইবার। রুক্মিণী তাকে ধরে রেখেছে। সে বুঝছে তার বন্ধুর মনের ব্যথা।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক আজ নিজেকে দোষী মনে করছে। দোষী মনে করছে নিজেকে ম্যাকনীল সাহেব, দোষী মনে করছে নিজেকে শিউচন্দ্রিকা, দোষী মনে করছে নিজেকে মিনাকুমারী; দোষী মনে করছে নিজেদের রুক্মিণী, রহমতের বিবি, সরযূ সিং, প্রতিটি মজুর-মজুরণী, এমন কি মিলের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ পর্যন্ত। যা ঘটেছে তা বন্ধ করার কি কোন পথ ছিল না? নানা রকমের অতি সোজা উপায় এখন সকলের মনে পড়ছে। সকলে ভাবতে চেষ্টা করছে যে, সে নিজে এই অঘটনের জন্য কতটুকু দায়ী। এত দুঃখের মধ্যেও শিউচন্দ্রিকা এই ভেবে স্বস্তি পায় যে পুলিশে পোষ্টমর্টেম করেনি দেহটাকে।

বড় আগুনটা কাছে থাকায় চারি দিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া এদিকে—একটু গরম হয়ে নেওয়ার জন্য। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে অসংখ্য শীর্ণ শুকনো ঝরা পাতা। কতক চিতার বুকে দপ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে; কোন কোনটা ছুটে যাচ্ছে নদীর বুকে, তার পর ভেসে চলে যাচ্ছে আঁধার বিস্মৃতির স্রোতে। বিচ্ছিন্ন চিন্তার টুকরোগুলোও শুকনো পাতার মত মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে চলে যায়, যে-ঝড় মনের মধ্যে দিয়ে বইছে তারই ঝাপটায়।···

শিউচন্দ্রিকার জ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে চিতার আলোর ঝলকানি লাগছে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে মানুষের জীবন-মৃত্যুর কত নতুন কথা সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।···

···কপালের লেখা···সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছিল অভিমন্যুকে। নিস্তার ছিল না তার তাদের হাত থেকে।···

চিতার আলোতে মনে হচ্ছে যে একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ফুটে উঠছে এক-একটি দলিল। জীবনের ছক কি আগে থেকে কাটা থাকে? চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই?

রায় বেরিয়ে যায় কি জন্মানোর মুহূর্তেই? রায় ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই কি চিত্রগুপ্ত তাঁর নথি-পত্র, সাক্ষী-সাবুদ, বেঁচে থাকার ছোট-খাটো খুঁটিনাটিগুলো সংগ্রহ করে ফাইলে রেখে দেন? ঠিক বোমার মামলার রায়গুলোর মত জীবনের মামলার রায়ও কি আগেই ঠিক হয়ে যায় —তার পর চলে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ? এত ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-পথ্য, ব্যায়াম শরীরচর্চা, হাওয়া-বদল, সবই কি—জীবনের প্রহসনের এক একটি দৃশ্য—নিরর্থক, অসার্থক, উদ্দেশ্যহীন? অদ্ভুত প্রমাণ সাজানোর ক্ষমতা চিত্রগুপ্তের। দূর-দূরান্তরের বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সময় সময়ান্তরের অসংলগ্ন দলিল চিতার আগুনের ঝিকমিকে রাংঝাল দিয়ে জুড়ে যাচ্ছে। মাঝের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিগুলোর উপরও চিতার ঝলকানি মশাল তুলে ধরেছে।

তবে কেন মানুষের এত চেষ্টা বেঁচে থাকবার? নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়বার এ অদম্য ইচ্ছা কেন? বেঁচে থাকার অধিকারটা একটা মোকদ্দমার জুয়ো-খেলা হলেও খেলে দেখা চলে; কিন্তু পরাজয় সম্বন্ধে যখন কোন অনিশ্চয়তাই নেই, তবু কি নিজের ঘুঁটি চালতেই হবে। লোকে নেশায় মামলা লড়ে, জিদে পড়ে লড়ে, কুপরামর্শ পেয়ে লড়ে। জীবন-যুদ্ধেও কি লোকে নামে ঐ সব কারণেই? লোকে বুঝতে পারে না—কিন্তু প্রত্যেকটি দলিলের, প্রত্যেকটি ঘটনার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কশাঘাতে; এক অদৃশ্য হাত দৃঢ় লাগাম ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বিজয়-রথ এক চক্রব্যূহের কেন্দ্রের দিকে। কোন শক্তি নেই যা তার গতিরোধ করতে পারে, কোন ঘটনা নেই যা তার গতিপথে দাঁড়াতে পারে। রথের অক্ষের সঙ্গে লাগানো আছে ক্ষুরধার ধাতুফলক—ঠিক যেমন একটা শিউচন্দ্রিকা মিউজিয়মে দেখেছে;—তার কাছে যায় কার সাধ্য।···

তুরুপের তাস অপর পক্ষের হাতে। পারবে না, মাথা কুটে মরে গেলেও পারবে না।···

আলেখাইন আর কাপাব্লাঙ্কার ফটো বের কর তোমরা কাগজে। কিন্তু দেখছো না একসঙ্গে কোটি কোটি দাবার ছকে প্রতিটি চাল কেটে, কূট গৈবী চাল পড়ছে। সামলাতে চায় মানুষ, বেশী থেকে বেশী একশ' বছর পরমায়ুর গণ্ডীর মধ্যে জোটানো অভিজ্ঞতা যার পুঁজি, মাত্র ছয় হাজার বৎসরের সভ্যতা যার গর্ব, দশ হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাস যার জ্ঞানের সম্বল। এ সৃষ্টি মানুষের জন্য নয়। নীহারিকার যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য জিনিসের মত, সৃষ্টির অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সে একটা উপকরণ মাত্র। কাকতালীয় বলে পৃথিবীতে কোন জিনিস নেই। যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটে থাকে।

···অভিমন্যুর চিতার সম্মুখে বসে শ্মশান-বৈরাগ্যের এই দর্শন সত্য বলে মনে হচ্ছে শিউচন্দ্রিকার। অভিমন্যু সম্পত্তির মধ্যে রেখে গিয়েছে এই খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা ঝোলাটা। শিউচন্দ্রিকা এটাকে সঙ্গে এনেছিল চিতায় ফেলে দেবে বলে। অতি পরিচিত এই ঝোলাটার মধ্যে কি কি আছে সে সম্বন্ধে আগে থেকেই একটা আন্দাজ করে নিয়েছে; কি আর থাকবে—পাজামা, একখান ধুতি হয়ত, আর খুচরো টুকি-টাকি জিনিস যা সফরের সময় প্রত্যহ কাজে লাগে। তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।···

ঠিক তাই। ঠিক শিউচন্দ্রিকা যা ভেবেছিল। এত কাল অভিমন্যুর সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছে, আর এটুকু জানবে না সে! ছেঁড়া কাগজ-পত্রগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। গ্রামের চাষাদের দরখাস্ত আঙুলের ছাপ দেওয়া। চিতার অস্থির আলোতে কালো দাগগুলোকে বুড়ো আঙুলের ছাপ বলে বুঝবার যো নেই; মনে হচ্ছে যে ছেঁকা লেগে পুড়ে পুড়ে গিয়েছে ঐ জায়গাগুলো। এমন অগোছাল স্বভাব অভিমন্যুর যে দরখাস্ত কাগজ-পত্র, তার সারা অফিসটি ভরে নিয়েছে ঐ ঝোলার মধ্যে। এ বদ অভ্যাস তার শেষ দিন পর্য্যন্ত গেল না। যাক, সব তো শেষই হয়ে গিয়েছে; আজকের দিনে তার স্বভাবের ঢিলেমির কথা ভেবে, আর তার স্মৃতিতে কলুষ আনতে চায় না শিউচন্দ্রিকা। দাড়ি কামানোর ক্ষুরের বাক্সটা খুলেই নজরে পড়ে দু'খানি কাগজ, সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা; প্রথমখানি ভৃগুর গণনা; এ কাগজখানিকে বহু বার দেখেছে শিউচন্দ্রিকা এর আগে। দ্বিতীয়খানি একটি চিঠি, মিনাকুমারী লিখেছে অভিমন্যুকে। আশ্চর্য্য হয়ে যায় সে। এর কথা অভিমন্যু ঘুণাক্ষরেও জানায়নি কাউকে কোন দিন। ঠিক মিনা-কুমারীরই লেখা তো। শিউচন্দ্রিকার দৃষ্টি আপনা হতে গিয়ে পড়ে মিনাকুমারীরা যে দিকে বসে আছে সেই দিকে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে মিনাকুমারী এখন বসে আছে। রুক্মিণীর হাত তার পিঠের উপর। খানিক আগেও একবার শিউচন্দ্রিকা দেখেছিল মিনাকুমারী কাঁদছে; লোক-দেখানি দুঃখ নয় তো তার?

ঝোলাটাকে আগুনে ফেলতে তার মন সরে না। অভিমন্যুর শেষ স্মৃতিটুকু তবু তো থাকবে এরই সঙ্গে মিশে।

······"জন্ম ১৩২৫, উনিশে ভাদ্র, শুক্লা অষ্টমী, প্রাতে·····
তুলা লগ্ন, ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ প্রজাপতি······জাতক বাল্যে মাতৃহীন; বুদ্ধিমূল দৃঢ় নহে; বাল্যে উদরপীড়া; পল্লবগ্রাহী; চিত্ত দুর্বল; সপ্তদশ বর্ষে পিতৃভয়; অপঘাত; দৈবরক্ষা; জাতকের কর্মের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ থাকিবে; জাতক সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয়; নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হইতে পারেন, রুদ্র ও মঙ্গলই জাতকের প্রবল মারক, উনত্রিংশ বৎসরে মহারিষ্ট; রিষ্টান্তে বাঁচিলে পূর্ণায়ু ৮০ বৎসর; আয়ুরক্ষার্থ প্রয়োজন আয়ুদযন্ত্র অথবা সন্ন্যাস; রাজদ্বারে বন্ধুস্থানে সুখ; শেষ বয়সে বন্ধুকৃত ঋণমুক্ত; পূর্বজন্মে যোগী, গুরুর সহিত বিরোধ বশতঃ পুনর্জন্ম।"······

অনেকগুলো সম্ভাব্য গণনা জ্যোতিষী পড়ে শুনিয়েছিলেন—তার মধ্যে এইটাই অভিমন্যুর ঠিক বলে মনে হয়েছিল। গণক ঠাকুর পড়ে গিয়েছিলেন, আর সে লিখে নিয়েছিল একখান কাগজে। সবটা লেখেওনি। যেটুকু লিখেছিল, তাড়াতাড়িতে সেটুকু নির্ভুল করে লিখতে পারেনি।

আসামী অভিমন্যুর বিরুদ্ধে, চিত্রগুপ্তের প্রথম দলিল ভৃগুর গণনার ঐ কাগজখান। কাশীর ভৃগু, চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানার রেকর্ডকীপার কি না জানি না, যদি না হন তা'হলে নিশ্চয়ই ওই দপ্তর থেকে দলিলের নকল আনবার তাঁর সুবিধা আছে।

তাই কাশী থেকে গণিয়ে এনেছিল অভিমন্যু। তার হাত দেখানোর বাতিক চিরকালের। তার দোষই ছিল যে সে সকলকে বিশ্বাস করতো—কেবল হাত-দেখানোর ব্যাপারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ে। এর জন্য কত বার তাকে কত বিপদ, কত অসুবিধাতে পড়তে হয়েছে। শিউচন্দ্রিকা আর অন্য বন্ধুরা কতবার তাকে সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু কারও কথা কি সে গ্রাহ্য করতো!

কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরকে দিয়ে যে সে হাত গণিয়েছে তার ঠিক নাই। কেউ বলেছে যে সে রাজা হবে, কেউ বলেছে যে সে সুখে ঘর-সংসার করবে নাতিপুতি নিয়ে, কেউ বা তার চেহারা দেখেই বুঝেছে যে সে খুব দানশীল লোক। সে শুনে গিয়েছে সব। পুরো দক্ষিণা দিয়েছে বেশ তুষ্ট চিত্তেই। এ সব শুনতে ভাল লাগে তার, কিন্তু যতক্ষণ না জ্যোতিষী ঠাকুর খারাপ কিছু বলেছেন, ততক্ষণ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আবার খারাপ লাগবার পর মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করলে মনকে বুঝোয়,—জ্যোতিষীর কথার আবার ঠিক-ঠিকানা, এক-এক জন এক এক রকম কথা বলে।······

অনেক দিন আগে সেই যে-বার লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস হয়, সেইবার রাণীপত্রার পত্তনিদার তালেবর মণ্ডল খরচ দিয়েছিলেন অভিমন্যুকে কংগ্রেস অধিবেশন দেখবার জন্ত। তাঁর ছেলেও ছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে পৌঁছুতেই পারেনি অভিমন্যু। কাশীতেই সে নেমে গিয়েছিল, আর সেখানেই তার ...হয়ে যায়। এই কথা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়ে যায়। সকলেই এ নিয়ে অভিমন্যুকে ঠাট্টা করতো। অভিমন্যু সে সব কথা গায়েও মাখতো না। হেসে জবাব দিতো, আমার প্রিয়ার অঞ্চলের ব্যায়রাম হবে কি না তাই জেনে নিতে গিয়েছিলাম; খবর্দার অম্বুলে রুগীর সঙ্গে প্রেমে পড়ো না। আর যখন মনের ভাব এতটা হালকা থাকতো না তখন বলতো—"রাজনীতিতে আমাদের চলছে জন্মগত দাবির কথা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা। আর আমি আনতে গিয়েছিলাম, চিত্রগুপ্ত দ্বারা স্বীকৃত আমার অধিকারটুকুর একখান ...দলিল; জীবনের দাবির মামলায় তাঁর দেওয়া রোয়েদাদ। তার কাছে আমার জীবনের 'চার্টার'এর মূল্য কি নাগরিকদের ...ক অধিকারের 'চার্টার'এর চাইতে কম?

সেই থেকে সকলেই অভিমন্যুর এই ভৃগুর গণনার কাগজখানার জানে।

আর দশ জন বিহারের রাজনৈতিক কর্মীর মত সে-ও ঘুরতো ...ভাণ্ডারের পেটেণ্ট মার্কা একটা খদ্দরের ঝোলা নিয়ে। অন্য ...দের মতই ঝুলিটা রাখতো হাতে চব্বিশ ঘণ্টা, কেবল রাতে শোবার সময় সেটা হয়ে যেত বালিশ। সেই ঝোলাটার মধ্যে কি থাকতো আর কি থাকতো না! পাজামা, গামছা, পার্টির চাঁদা ...বার রসিদ বই, রঙ-বেরঙের ইস্তাহার, কত রকমের দরখাস্তের ...প্রতিজ্ঞাপত্রের ফর্ম, নিমের দাঁতন, কাপড়কাচা সাবান, আরও ...কি, এরই মধ্যে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল ভৃগুর ঐ লম্বা কাগজ-...। উনত্রিশ বছর বয়সে তার মস্ত ফাঁড়া আছে, লাল পেন্সিল দিয়ে ঐ জায়গাটার নীচে দাগ দেওয়া ছিল। ঐ লেখাটির সে অর্থ ...নিয়েছিল যে সে উনত্রিশ বছরই বাঁচবে, তার বেশী নয়। বাকী কথাগুলো তাকে প্রবোধ দেবার জন্ত জ্যোতিষী ঠাকুর লিখে দিয়েছেন, এইটাই তার ছিল আন্তরিক ধারণা। আসল ভৃগু সে দেখেছিল ...গুপ্ততে লেখা। এই জন্তই কাগজখানার কালির আঁচড়গুলোর ...তার বিশ্বাস ছিল এত বেশী। নিরিবিলি থাকলে বারবার ...ঐ কথাগুলো থেকে আর কোন নতুন অর্থ বার করা যায় কি না, তারই চেষ্টা করত। বন্ধুদের কাছে ঐ কথার মানে জিজ্ঞাসা করত, অভিধান পেলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

রাজনৈতিক কর্মীর জীবন সে নিয়েছিল, ঐ জীবন সে ভালবাসে বলে নয়। অধিকাংশ লোকের মত তার কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছিল রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন-উন্মাদনা। প্রথম নেশা কাটাবার পর এর দুর্বার আকর্ষণ শিথিল হয়ে এলেও অধিকাংশের মত সে-ও থেকে গিয়েছিল গতানুগতিকতার চাপে, অলস মনের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে, কর্মী বন্ধুদের সঙ্গলিপ্সায়। এ ছাড়া আছে গাঁদা ফুলের মালার উপর লোভ, জনপ্রিয়তা এত সস্তা আর কোথাও নয়। আর এই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার প্রাথমিক সঙ্কোচ ছেড়ে যাওয়ার পথে সেটাও কম বড় বাধা নয়। বিহারে এই রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়াকে বলে 'বসে যাওয়া' —মাঝ-পথে গাড়ীর বলদের বসে পড়ার মত, হাজার চাবুক মারো নড়বার নামটি নেই,—সেই রকম আর কি।

হয়তো এই রকম আরও অনেক কারণ ছিল অভিমন্যুর রাজনীতি ক্ষেত্রে থেকে যাওয়ার, জটিল মনের গোপন প্রবৃত্তিগুলির খবর অনেক সময় নিজেই জানা যায় না।

সুন্দর চেহারা ছিল তার। রঙটা ফুটফুটে ফরসা নয়। তবে তার নিখুঁত মুখশ্রী, আর ছয় ফুট লম্বা ঋজু অথচ নমনীয় দেহ, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অনেক দিন আগে, সেই প্রথম যে-বার এই মজুর ইউনিয়নটি খোলা হয়,—তখনও রেজিষ্টারী করা হয়নি, সেই সময় এক জন মজুরের তিনটে আঙুল কেটে গিয়েছিল কলে। তারই ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য ম্যাকনীল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল ইউনিয়নের সেক্রেটারী শিউচন্দ্রিকাকে। সঙ্গে ছিল অভিমন্যু। ম্যাকনীল সাহেব তখন সবে নতুন এসেছে এদেশে। তা না হলে কখনও কি কোন ম্যানেজার, একটা বিনা রেজিষ্টারী করা, বিনা স্বীকার করা ইউনিয়নের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে? সেদিন ম্যাকনীল সাহেব অভিমন্যুকে সেক্রেটারী মনে করে তারই সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছিল। বেঁটে, কালো শিউচন্দ্রিকার উপর সাহেবের নজরই পড়েনি। শিউচন্দ্রিকার কালো মুখখানা বেগুনী রঙের হয়ে উঠেছিল। অভিমন্যু অপ্রস্তুত হয়ে সাহেবকে আসল সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাহেব বোধ হয় ভাবলো যে শিউচন্দ্রিকা মজুরদের মধ্যে থেকেই উঠেছে, আর অভিমন্যু অভিজাত বংশের ছেলে বলেই মজুররা তাকে সেক্রেটারী করেনি ইউনিয়নের। সে মনগড়া এই ধরণের একটা কিছু ভেবে নিয়েছিল। শিষ্টাচারের খাতিরে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে "আমি দুঃখিত" বলে শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করে। চেহারা দেখেই কারও সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়, এ কথা সাহেব কিছুক্ষণ শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথা বলবার পরই বোঝে। শক্ত চোয়াল, আর বুলডগের মত চওড়া থুতনিওয়ালা কালো লোকটি চমৎকার ইংরাজী বলে। অদ্ভুত উজ্জ্বল তার ছোট-ছোট চোখ দু'টো; নির্ভীক, তীক্ষ্ণ, আর গভীর তার দৃষ্টি। সাহেবের মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগছিল যে লোকটা নিশ্চয়ই তার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। সে বোঝে যে আর যাই কর, এ লোকটিকে তাচ্ছিল্য করবার উপায় নেই। সময় হয়েছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভদ্রতার খাতিরে মণিবন্ধের ঘড়ি দেখলে; ঐ চোখ দু'টোতে মুহূর্তের মধ্যে একটি আগুনের ঝিলিক জ্বলে ওঠে,—ঘড়ি কিনবার সঙ্গতি আছে

বলেই কি কাজের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘড়ি দেখবার অধিকার পেয়েছ না কি? আর সে শিষ্টাচারের ধার ধারে না। টেবিল চাপড়ে শিউচন্দ্রিকা তার বাকী কথাগুলো এই আনকোরা নূতন সাহেবটার গোবরভরা মাথায় ঢুকোতে চায়। যেই আসুক তার সম্মুখে, শিউচন্দ্রিকা থেকে সে বড় এ ভাব নিয়ে তাকে ফিরতে হবে না। এ কথাটা সেদিন বুঝেছিল ম্যাকনীল সাহেব। অভিমন্যুর মন ততক্ষণ উড়ে কোথায় চলে গিয়েছে,...অদ্ভুত আইনের এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচগুলো; ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় আঙুল দিয়ে মেপে; বুড়ো আঙুল কাটলে এত টাকা, কড়ে আঙুল কাটা গেলে এত টাকা, ডান হাত কাটলে এত, বাঁ হাত কাটলে এত: আশ্চর্য্য!...

কেন জানি না, এই শিউচন্দ্রিকার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার মর্য্যাদা পেয়েছিল অভিমন্যু। বয়সে সে শিউচন্দ্রিকার থেকে ছোট। কোন বিষয়ে দু'জনের চরিত্রে মিল নেই। রাজনীতি আর পার্টির কাজই শিউচন্দ্রিকার জীবন; আর কিছু সে জানে না; অন্য কিছু নিয়ে মাথা-ঘামানোকেও সে একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলে মনে করে। এই একমুখী চিন্তা তার সারা জীবনকে চালিত করে নিয়ে বেড়ায়। যে কোন প্রশ্ন তার সম্মুখে আসুক, সে তার পার্টির সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে সেটাকে মাপবে। অদ্ভুত তার কর্ম-প্রেরণা, আশ্চর্য তার নিষ্ঠা। তার কর্মজীবনের সম্মুখে যে কোন বাধাই আসুক তাকে আটকাতে পারবে না। তার স্বভাবটা এমনই যে সে ঐ বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে না। সে খুশী হবে যদি সেটাকে ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে রুদ্ধ পথ পরিষ্কার করে নিতে পারে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে সে অন্ততঃ পক্ষে চাইবে সেটার উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে।

এই একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ সেবার জন্য মজুরেরা তাকে ভালবাসে। তার মধ্যের সংসার-ছাড়া সন্ন্যাসীটিকে বলরামপুরের গেরস্থরা শ্রদ্ধা করে; তাদের বাড়ীর মেয়েরা করে ভক্তি। তার অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা আর দূরদৃষ্টির জন্য তার পার্টির লোকের সে আস্থাভাজন। আর কারখানার মালিকের দিকের লোকরা তাকে ভয় করে, যবে থেকে তারা জেনেছে যে এই লোকটার অনমনীয় বিবেক পয়সা দিয়েও কেনা যায় না।

বিনা যুক্তিতে শিউচন্দ্রিকার মন কোন জিনিস নেয় না, কিন্তু তার যুক্তির স্রোত চলে বাঁধা খাতে। তার প্রতিবেশের প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক লোক, তার পার্টির ভাল কিম্বা মন্দ করবার, সুবিধা কিম্বা অসুবিধা করাবার উপকরণ মাত্র। তা ছাড়া তাদের আর কোন নিজস্ব সত্তা নেই। তার চিন্তার বাঁধা লাইনে পার্টির সুবিধা-অসুবিধা, আর জনতার ভাল-মন্দর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গল করবার একচেটিয়া অধিকার শিউচন্দ্রিকার মতে আছে কেবল তার পার্টির। এই সোজা কথাটা যারা স্বীকার না করে নেয়, তারা জনতার শত্রু। তাদের সঙ্গে অযথা কথা খরচ করবার সময় শিউচন্দ্রিকার নেই।

সত্যিই এক মিনিটও তার সময় নেই। রাতে ডায়েরী লিখবার সময় একখানা কাগজে লিখে রাখে কালকের কাজগুলো। একটুও নড়চড় হওয়ার জো নেই তাতে, একথা তার বন্ধু-বান্ধব সকলেই জানে। ঘড়ির কাঁটার মত দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে সে বিরামহীন, আর ক্লান্তিহীন। তার পরিচিত সকলের কাছেই সে আশা রাখে তার নিজেরই মত নিয়মানুবর্ত্তিতার।

শিউচন্দ্রিকার ব্যবহারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অভিমন্যুর বেলায়। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কারও এ কথা অজানা ছিল না; পার্টির সদস্যরা এই নিয়ে ঠাট্টা করলে শিউচন্দ্রিকা হেসে বলতো,—"অনেক চেষ্টা করবার পর আমি হাল ছেড়েছি। এ জীবনে ও এক চুলও বদলাবে না, যা আছে তাই থাকবে। মইয়ের সব চাইতে নীচের ধাপে যে বসে আছে তাকে আর নামাবে কোথায়?"

অভিমন্যু গম্ভীর হয়ে পাল্টা জবাব দিত—"বা রে! তোমার কোন্ কথাটা শুনি না, বলো? আচ্ছা ধর, শুনিই না। আমার মাথার কাছে কালিপড়া ঝুপসী কেরোসিনের আলোটা রেখে, রোজ রাতে পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লিখতে আমি যে বারণ করি তোমাকে, সে কথায় তুমি কান দাও কোনো দিন? তুমিও আমার কথা শোনো না, আমিও তোমার কথা শুনি না। দু'জনই সমানে সমানে আছি দাঁড়িপাল্লার ওজনে।"

যত গুরুত্বপূর্ণ কথাই হোক না কেন, অভিমন্যু হেসে সেটাকে হালকা করে দেবেই।

হালকাই তার স্বভাব। হেসেই কাটিয়ে দিতে চায় জীবনের পথটাকে। চেষ্টা করে অভিমন্যুকে গম্ভীর হতে হয়, দরকার পড়লে। কোন জিনিস তলিয়ে সে ভাবে না। কোন একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ লেগে থাকতে হলে তার মন হাঁফিয়ে ওঠে।

যাচ্ছে-যেতে-দাও গোছের শান্ত মন্থর জীবনে, মধ্যে মধ্যে দু'কূল ভাঙ্গা প্লাবন আসবে, আর সেই সময় বানের মুখে গা এলিয়ে দেবে দ্বিধাহীন মনে, এই রকম জীবনই তার খেয়ালের সঙ্গে খাপ খায়। তার ভাবপ্রবণতার মধ্যে কৃত্রিমতার ভেজাল নেই; যে ভাবের বন্যায় সে যখন ভাসে, তখন তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না। জীবনের উপর তার মায়া নেই, সারা জগৎকে সে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে—কাল কি হবে সে কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে চায় না। তবু তার হাত-গোণানোর বাতিক যে কেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। তার প্রাণখোলা আপনভোলা ভাবটার জন্যই বোধ হয় আর সকলের মত শিউচন্দ্রিকাও তাকে ভালবাসত। শিউচন্দ্রিকা আরও হিসাব করে নিয়েছিল যে ইউনিয়নের কাজ নিয়মিত সুচারু ভাবে না করতে পারলেও, অভিমন্যুর মত মজুরদের সঙ্গে মিশতে আর কেউ পারবে না; পয়সার লোভ দেখিয়ে কারখানার মালিক তাকে কিনে নিতেও কোন দিন পারবে না। সে আরও জানে যে ঠিক ভাবে তাতাতে পারলে অভিমন্যু বন্দুকের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। পার্টির অন্য সদস্যরা না বুঝুক, শিউচন্দ্রিকা জানে যে, একসঙ্গে এতগুলো গুণ অভিমন্যু ছাড়া, স্থানীয় পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর পর্য্যন্ত নিজের দিকেই তাকায়।

প্রিয় শিউচন্দ্রিকা বাবু,

ডাকবাংলাতে এখনই আমার সহিত দেখা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। অভিমন্যু বাবুকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

কে, প্রসাদ

এস. ডি. ও., সদর

২৮, ১, ৪৭

এস. ডি. ও., সাহেবের তকমা-আঁটা আরদালী চিঠিখান বল্লীরামপুর মজদুর ইউনিয়ন অফিসে, শিউচন্দ্রিকার হাতে দেয়। ঢুকে আদাব করে বলে, এস. ডি. ও. সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

"অভিমন্যু! অভিমন্যু কোথায় গেল, দেখেছো না কি রহমৎ?"

রহমৎ আর রহমতের বিবি দু'জনেই মিলে কাজ করে। রহমতের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা জানতে পেরেই মিল-কর্তৃপক্ষ তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। এ আজ মাসখানেক আগেকার কথা। সে সময়েই সে তার পাওনা সাপ্তাহিক মজুরী নিয়ে নিয়েছে মিল থেকে। এত দিনে সেই কথা জানাতে এসেছে ইউনিয়ন অফিসে। সাপ্তাহিক মজুরী তুলে নেওয়ার আগে এলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লড়বার সুবিধা হয়। "যখন বরখাস্ত করেছিল তখন আসতে কি হয়েছিল?"—চটে আগুন হয়ে উঠেছিল শিউচন্দ্রিকা। তার পর একখান দরখাস্ত লিখতে বসে।

"এইখানটায় তোমার বিবির বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে এনো। রহমৎ?...কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?—সেলাই ডিপার্টমেণ্ট বললে না?..."

"এ সব করাচ্ছে হুজুর রামভরোসা সর্দার। আমি জানি ওকে ইটাগড় মিল থেকে। ও ছিল সেখানকার এক জন নামজাদা গুণ্ডা। মাইনে দিয়ে রেখেছিল মালিক তাকে। আবার এখানে এসে জুটেছে আমাদের জ্বালাতন করতে। বোধ হয় বেশী মাইনে পেয়েছে এখানকার মালিকের কাছ থেকে..."

অনর্গল বকে যাচ্ছে রহমৎ।

এস. ডি. ও. সাহেবের চাপরাসী এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এখন জিজ্ঞাসা করে, হুজুর জবাব লিখে দেবেন না কি?

ও! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ না কি? এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে দিও এখনি আসছি আমরা। রহমৎ, তুমি ততক্ষণ দেখো তো অভিমন্যু কোথায়? ডেকে নিয়ে এসো তাকে। বোলো, আমি ডাকছি। শীগ্‌গিরই। সান্ধ্য-ব্যারাকে দেখো। নিশ্চয়ই ওখানে ছেলেদের কোরাস গান শেখাচ্ছে।

রহমৎ অভিমন্যুকে খুঁজতে বার হয়। রহমতের বিবির দরখাস্ত লিখতে লিখতেও অভিমন্যুর কথাই ভাবে শিউচন্দ্রিকা।...যত বাজে কাজেই মন বসে অভিমন্যুর। কোন কাজ দায়িত্ব নিয়ে নিয়মিত করবে না।...

শিউচন্দ্রিকা উঁকি মেরে ইউনিয়ন অফিসের বাইরে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ডটা দেখে। তার উপর রোজ সকালে খড়ি দিয়ে খবর লিখে রাখবার ভার অভিমন্যুর উপর। এই ধরণের কাজ দিয়ে অভিমন্যুর আলগা কর্মজীবনকে বাঁধা-ধরার মধ্যে ফেলতে চায় শিউচন্দ্রিকা।...ছোট্টটো একটা দু'মিনিটের তো কাজ। এটুকুও করে উঠতে পারে না। হাতের কাজ রইল পড়ে, গিয়েছেন ছেলেদের গান শেখাতে।

বিরক্ত হয়ে শিউচন্দ্রিকা ব্ল্যাকবোর্ডটাকে টেনে নিয়ে তার উপর বড় বড় অক্ষরে খবর লিখতে বসে।

"অভিমন্যু!" রাস্তা থেকে কে এক জন যেন অভিমন্যুকে ডাকছে। গলা শুনে মনে হচ্ছে সরযু সিং। একবার এলে সে ঘণ্টাখানেকের আগে ওঠে না। শিউচন্দ্রিকা তার ডাকের জবাব দেয় না।

সব মজুর অভিমন্যুকে নাম ধরেই ডাকে, কিন্তু শিউচন্দ্রিকাকে নাম ধরে ডাকার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। তাকে ডাকে "মন্ত্রিজী" বলে। এ দেশের ভাষায় মন্ত্রিজীর মানে সেক্রেটারী সাহেব। অভিমন্যুকে মজুররা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তরের থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাক তো! সে পারে অভিমন্যু।

যে সরযু সিং এখন অভিমন্যুকে ডাকছে সে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। বছর দুই আগে তার গাঁয়ের ঘিনাওন সিং কলে কাটা পড়ে। দু'জনে একসঙ্গে এসেছিল বল্লীরামপুরে কাজ করতে। মজদুর ইউনিয়নের চেষ্টায় ঘিনাওন সিংয়ের স্ত্রী মিল থেকে সাড়ে আটশো টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়। বিধবা স্ত্রীলোকটি ঐ টাকা শিউচন্দ্রিকার কাছে রেখে যায়, বলে যে অত টাকা একসঙ্গে নিয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ীর লোকরা কেড়ে নেবে। ঐ টাকা থেকে মাসে মাসে শিউচন্দ্রিকা দশ টাকা করে ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাঠায়। সরযু সিং ঐ বিধবা মেয়েটির এক জন সত্যিকার হিতৈষী। মনি-অর্ডারের রসিদ এসেছে কি না সেই কথাটা জানবার জন্য প্রায়ই ইউনিয়ন অফিসে আসে। অভিমন্যুর কাছে সে স্বীকার করেছে যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার এক রকম বিয়ের ঠিকই ছিল। হঠাৎ ঘিনাওন সিংএর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। অভিমন্যু তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে যে সে তার পুরানো প্রিয়ার আঙুলের ছাপ দেখতে এসেছে। মনি-অর্ডার পাওয়ার রসিদ তার হাতে দিয়ে হেসে বলে দু'দিন তুমি রাখতে পার এখানা তোমার কাছে, তার পর ফেরৎ দিয়ে যেও। শিউচন্দ্রিকা সে সময় উপস্থিত থাকলে সরযু সিং ইসারা করে অভিমন্যুকে চুপ করতে বলে। হাত জোড় করে ফিস-ফিস করে বলে, দোহাই তোমার, মন্ত্রিজী শুনছে। আর শিউচন্দ্রিকা না থাকলে হেসে অভিমন্যুর কথা স্বীকার করে নিয়ে রসিদখানা বাটুয়াতে পুরে নেয়। তার পর গলা-জড়াজড়ি করে ধরে অভিমন্যুকে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। এই ছিল মজুরদের সঙ্গের সম্পর্কে শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর তফাৎ।

সরযু সিং শিউচন্দ্রিকাকে কাজ করতে দেখে আর অভিমন্যুর সাড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু খানিক পরেই হাসির শব্দ পেয়ে শিউচন্দ্রিকা বুঝতে পারে যে অভিমন্যু সরযু সিংকে আবার ধরে নিয়ে আসছে।

কোথায় শিউচন্দ্রিকাকে ব্ল্যাকবোর্ডে খবর লিখতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হবে, তা নয়, অভিমন্যু ঢুকেই একমুখ হাসি নিয়ে বলে—"চাবিটা দাও তো আলমারির। মনি-অর্ডারের রসিদটা বের করি। সরযু সিং বলছে যে একবার হাত বুলিয়ে নেবে আঙুলের ছাপটার উপর।"

"ধেৎ!"—সরযু সিং শিউচন্দ্রিকার সম্মুখে এ-রকম কথায় লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অফিস ছেড়ে পালিয়ে যায়। বলে যায়, ও-বেলা আসবো।

অভিমন্যু হেসে বলে, "যাক, আজকের ব্ল্যাকবোর্ডের খবরটা লোকে তবু পড়তে পারবে। লক্ষ্য করে থাকবে শিউচন্দ্রিকা যে যারা পড়তে জানে, তারাও আজকাল খবর পড়তে আসে না। আমার শ্রীহস্তের লেখা দেখে ভড়কে গিয়েছে তারা, এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো।

তোমায় আর কি, রোজ রাতে যখন পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লেখো, সেই সময় এই কাজের কথাটাও নোট করে নিলেই আপনা থেকে নিয়মিত এ কাজ হয়ে যাবে।"

শিউচন্দ্রিকা হেসে ফেলে। "নিজের ডিউটী করতে ভুলে গিয়েছে, কোথায় একটু লজ্জা পাবে, তা নয়, আমাকেই এসে উপদেশ দিতে বসলে ?"

"আমায় ভুগুখান আবার বেয় করাবে না কি ? তিনি কোথাও লিখে দেননি যে, আমি কোন দিন লজ্জা পাব।"

"আচ্ছা হয়েছে, এখন থামো। এই চিঠি দেখ এস, ডি, ও, সাহেবের। চল, যেতে হবে ডাকবাংলা।"

"তাই বল! রহমৎটা গিয়ে আমাকে খবর দিল একেবারে ফাঁসির আসামী তলব করবার মত করে। দাঁড়াও, দাড়িটা কামিয়ে নিই। এস, ডি, ও, সাহেব ডাকল কেন? লেবার কমিশনারের কাছে যে টেলিগ্রাম আর চিঠিগুলো গিয়েছিল তার ফল ধরেছে বোধ হয় এত দিনে।"

"রহমৎ মিয়া, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে ডাকবাংলাতে।"

এস, ডি, ও, সাহেবই এখানকার ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টর, আলাদা ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টর এ সাব-ডিভিসনে নাই। তাই এখানকার মিল-মালিকরা নূতন এস, ডি, ও, এলেই তাঁকে প্রথম হাত করবার চেষ্টা করে, কাউকে মদ খাইয়ে, কাউকে টাকা দিয়ে, কারও বা অন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। যা চাও সব জিনিসই ইসারা করা মাত্র পৌঁছে যাবে ডাকবাংলাতে।

সেই জন্য বলীরামপুর ডাকবাংলাটি নিত্য তিরিশ দিন সরগরম থাকে ছোট-বড় রঙ-বেরঙের হাকিমের ভিড়ে। পদ অনুযায়ী মর্য্যাদা দেখানো হয় প্রত্যেককে। এস, ডি, ও, সাহেব আর তাঁর উপরের অফিসারদের বিকালে আমন্ত্রণ আসে ম্যানেজার সাহেবের কুঠির 'লন'-এ টেনিস খেলবার জন্য। তার নীচের হাকিমদের নিমন্ত্রণ দেন মিলের সর্বেসর্বা এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ। আর চুনোপুঁটি—সরকারী কর্মচারী যাঁদের ডাকবাংলাতে উঠবার অধিকারই নাই, তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া-থাকার ব্যবস্থা আছে মিলের তরফ থেকে। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট; বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয় উপরওয়ালার আলাপী লোকদের।

বর্তমান এস, ডি, ও, সাহেবের কিছু দিন থেকে বলীরামপুর ডাকবাংলাতে আসা খুব বেড়ে গিয়েছে। মজুররা না কি ভারি 'trouble' দিচ্ছে, তারই অজুহাতে। দিনটা না হোক অন্ততঃ রাতটা এখানকার ডাকবাংলাতে কাটানোর লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। এই নিয়ে জেলাশুদ্ধ লোক কাণাঘুষো করে, এখানকার মজুরদের তো কথাই নাই। কটাক্ষের লক্ষ্য বলীরামপুর অনাথালয়ের মেয়েদের উপর। মিলের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ এই অনাথালয়ের 'প্রেসিডেণ্ট'।

এই সব নিয়ে এস, ডি, ও, আর অন্যান্য হাকিমদের বিরুদ্ধে প্রচুর বেনামী চিঠি গিয়েছে পাটনার উপরওয়ালাদের কাছে। আর মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পাটনায় লেবার কমিশনারের কাছে গিয়ে শিউচন্দ্রিকা বলে এসেছে যে এই এস, ডি, ও-র কাছ থেকে বলীরামপুরের মজুররা ন্যায়বিচার পেতে পারে না। ইঙ্গিতে কারণটাও বলেছিল। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে মজুরদের সস্তায় খাওয়ার 'ক্যাণ্টিন', আর মেয়ে-মজুরদের কাজের সময় ছোট ছেলেপিলেদের রাখবার স্থান (ক্রেশে) মিলের তরফ থেকে খুলবার জন্য লেবার কমিশনার সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন, গত বার যখন আসেন বলীরামপুরে তখন। আদেশ ছিল ছয় মাসের মধ্যে যেন খোলা হয়; তা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। তাঁরই অফিসের ফাইলের চিঠি শিউচন্দ্রিকা লেবার কমিশনার সাহেবকে দেখিয়ে দিয়েছিল;—মিল-ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব লিখছে যে "সিমেণ্ট, লোহার শিক, ইট ইত্যাদি বাড়ী তৈয়ারী করিবার মাল না পাওয়ায় আপনার হুকুম তামিল করা সম্ভব হইতেছে না। ঐ সকল জিনিস পাওয়া গেলে বাড়ী তৈয়ারী কাজ আরম্ভ করিতে এক মুহূর্তও দেরী করা হইবে না।' এর পর শিউচন্দ্রিকা দেখিয়ে দেয় কাগজে-কলমে যে এস, ডি, ও, সাহেবের সাহায্যে গত বছরে বাড়ী তৈরী করবার মাল-মশলা মিল-ম্যানেজার কত পেয়েছে; ম্যানেজার সাহেবের নূতন টেনিসকোর্ট হ'ল কোথা থেকে? এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের একটা নূতন কোয়ার্টার আর অন্য অফিসারদের আর তিনটে কোয়ার্টার তৈরী করবার জিনিস-পত্র সে পেল কোথা থেকে? এ ছাড়াও আরও কিছু অবশিষ্ট লোহার শিক আর সিমেণ্ট ব্ল্যাক মার্কেটে বেচেছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

লেবার কমিশনার সংযত ভাষায় শিউচন্দ্রিকাকে বারণ করে দেন এ সব কথা বলতে—যা প্রমাণ করতে পারবেন না সে সব কথা বলে লাভ কি? তাতে কি আপনার কাজ এগোবে?

নিশ্চয়ই প্রমাণ করবো সার। প্রতিটি কথার পূরো দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি! এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদের শালার দোকান আছে সদরে। কবে কোন গাড়োয়ান কি কি মাল নিয়ে গিয়েছে মিল থেকে সেই দোকানে, সব হিসাব দিতে পারি আপনাকে। তিন জন লোক যারা ঐ দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে সিমেণ্ট কিনেছে, তাদের দিয়ে দরকার হলে আপনার সম্মুখে বলাতে পারি। এ সব ব্যাপার এস, ডি, ও, সাহেব জানেন সার। তিনি কড়া হলে কি আর আপনার হুকুম তামিল করে না একটা মিল-ম্যানেজার? এই হ'ত ডিভিসনাল কমিশনার সাহেবের হুকুম, দেখতাম এস, ডি, ও, সাহেব কি রকম করে সেটাকে অমান্য করতেন।

লেবার কমিশনার সাহেবের আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল।

তার পরই এস, ডি, ও, সাহেব বলীরাম ডাকবাংলাতে এসে শিউচন্দ্রিকাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারা যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। উপরের কড়া চিঠি পৌঁছেছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, এস, ডি, ও, সাহেবের সম্বন্ধে।

ডাকবাংলাতে গিয়ে দেখে যে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদও চা খাচ্ছেন বসে, এস, ডি, ও, সাহেবের সঙ্গে। রহমৎ ডাকবাংলার সিঁড়ির উপর বসে থাকে।

"এই যে সেক্রেটারী সাহেব, আসুন! ভাল তো অভিমন্যু বাবু? বেয়ারা, আর দু'কাপ চা। দেখা যাক, এক টেবিলের চায়ের ধোঁয়ায় আপনাদের দু'পক্ষের সাপে-নেউলের সম্বন্ধ ঢাকতে পারে কি না, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য।" এস, ডি, ও, সাহেব নিজের রসিকতায় নিজে হাসতে আরম্ভ করায় জয়নারায়ণ প্রসাদও ভদ্রতার খাতিরে সে হাসিতে যোগ দেয়।

"না, না, চায়ের দরকার নেই। আমরা চা খাই না।"

শিউচন্দ্রিকার গলার স্বর এত দৃঢ় যে এস, ডি, ও, আর তাকে অনুরোধ করতে ভরসা পান না।

তবু বলেন, "আমরা বলছেন কেন, আমি বলুন! অভিমন্যুজী, আপনি নিশ্চয়ই খাবেন এক কাপ?"

জয়নারায়ণ টিপ্পনী কাটে, "মিল-মালিক খাওয়ালেও আপনাদের মত লোকের আপত্তি না করে খেয়ে নেওয়া উচিত, অবশ্য যদি পেটের গোলমাল না থাকে। এক পেট খাইয়ে যদি আপনাদের কিনে নিতে পারতো, তাহলে নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ ছিল খাওয়ায়। আর এ খাওয়াচ্ছেন আপনাকে এস, ডি, ও, সাহেব, মিল-মালিক নয়। তাও আবার কেবল এক কাপ চা। আমরা চাকর মানুষ, এ আপত্তির কারণ আমরা বুঝতে পারি না সেক্রেটারী সাহেব।"

সাপ আর নেউল দু'জনেই মেজাজে আছে আজ। কিন্তু এস, ডি, ও, সাহেব আজ অন্য চাল চালবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছেন।

অভিমন্যুর মনে হয়, জয়নারায়ণ প্রসাদ ঠিক কথাই বলছেন। শিউচন্দ্রিকার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। একে শুচিবাই ছাড়া আর কি বলতে পারে না সে। শিউচন্দ্রিকা কি রহমৎ বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে বলে চা খেতে অস্বীকার করছে? না সেখান থেকে এ ঘরের ভিতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।...তিলকে তাল করা অভ্যাস শিউচন্দ্রিকার। শীতকালের দিনে এক কাপ চা খাবে, তাই নিয়ে একটা হৈ-চৈ করা, অনুনয়-বিনয়ের পালার সুযোগ দেওয়ার কি দরকার ছিল? চটুক শিউচন্দ্রিকা। তার খেয়াল মিটোবার জন্য অভিমন্যু সম্ভাব্য শিষ্টাচার ছাড়তে পারে না।...

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার মুখ-চোখ লক্ষ্য করে, তার চা খাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে গেল না তো? শিউচন্দ্রিকার চোখে-মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায় না। "ঠিক!" অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়,—তার সঙ্গে থেকে থেকে তার বন্ধু তাহ'লে এ ভদ্রতাটুকু শিখেছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করেন, "চিনি ঠিক আছে? না আর একটু দেবো, অভিমন্যুজী?"

"আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। তাতে আবার কাজ করি মজুরদের মধ্যে। চা খাই খানিকটা চিনি আর দুধের লোভে। দিন, আর এক চামচ।"

"আর এই চিনির উপর এত লোভ বলেই তো দেখতে পাই যে আপনার ওখান থেকে এক বস্তা করে চিনির পারমিট প্রতি মাসে পাওয়া সত্ত্বেও গুড় মিলিয়ে 'কেসর পাক' তৈরী করতে হয় অভিমন্যুজীকে"—রসিকতার ছলে জয়নারায়ণ প্রসাদ আজকের এই ব্রহ্মাস্ত্র শত্রুর অতর্কিতে প্রথমেই ছুঁড়ে মারেন।

এর একটা ইতিহাস আছে। বলীরামপুরের অধিকাংশ মজুর এখনও ইউনিয়নের চাঁদা দিতে চায় না, অথচ তাদের শিউচন্দ্রিকার উপর অগাধ বিশ্বাস। ১১৩৭ সালে এখানে যখন প্রথম ইউনিয়ন হয়, তখন অনেক টাকা চাঁদা উঠেছিল। তার পর একটা মেয়ে সংক্রান্ত গোলমালে পড়ে, সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী ইসরাইল মিয়াকে মার খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে হয়। তিনি যাবার সময় টাকাগুলো সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন। এর পর দ্বিতীয় মজুর ইউনিয়ন করেছিল আমীরচন্দ। বেশ চলছিল ইউনিয়ন। কিছু দিন পর মজুরদের মধ্যে কাণাঘুষো শোনা যায় যে, সে মিল মালিকের কাছ থেকে টাকা খেতে আরম্ভ করেছে। একটা মিটিংএ মজুরেরা প্রকাশ্যে তাকে "ভাড়াটে দালাল" বলে গালাগালি দেয়, আর মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। সেই রাত্তেই সে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। এই সব নানা কারণে এখানকার বর্তমান ইউনিয়নটি শক্তিশালী হলেও তার অর্থবল কম; খরচ চলে না। শিউচন্দ্রিকারও মত যে, আরও কিছু দিন মজুরদের উপর চাপ না দেওয়া ভাল; এমনিই তো মিল-মালিকের দালালরা চব্বিশ ঘণ্টা বলে বেড়াচ্ছে যে, মজুরদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা পয়সা ভাঁওতা মেরে লুঠে নেওয়ার জন্য এসেছে এই ইউনিয়ন-ওয়ালারা। বিশ্বাসপ্রবণ মজুরদের মনে এ কথা যে একটুও সাড়া দেয় না তা নয়। তাই শিউচন্দ্রিকার এত সতর্কতা। কিন্তু মজুরদের উপর চাপ না দিলে ইউনিয়নের খরচ চলবে কি করে? শিউচন্দ্রিকা গুছিয়ে আইন বাঁচিয়ে হিসাবপত্র লেখে বলেই রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ম-কানুন বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে আজ পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম যখন খরচের টাকা জুটোনোর কথা ওঠে, তখন অভিমন্যুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। তার কাকা ছিলেন "বৈদ" অর্থাৎ গাঁয়ের হাতুড়ে বদ্যি। তাঁর কাছেই অভিমন্যু 'কেসর পাক' নামের জিনিসটা তৈরী করতে শেখে। 'কেসর' মানে জাফরাণ। লোকে ভাবে জাফরাণ দিয়ে তৈরী হয় 'কেসর পাক', অথচ এতে জাফরাণের নাম-গন্ধও নাই। চিনি কিম্বা গুড়, চীনাবাদামের কুচি, ছোলার বেশম, কর্পূর, ছোট এলাচ, খয়ের আর দুই-একটি কিসের যেন শিকড় না ছাল দিয়ে এক রকম হালুয়ার মত জিনিস তৈরী করা হয়। এরই নাম 'কেসর পাক'। খুব শক্তিবর্দ্ধক জিনিস বলে এর নাম আছে। অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে কেসর পাক তৈরী করা আরম্ভ করলো ইউনিয়ন অফিসের উঠানে। এগুলো দিয়ে আসে স্থানীয় অনাথালয়ে। অনাথালয়ের হাফপ্যান্ট-পরা ছেলেরা এ লাইনের প্রতি ট্রেণে তালা দেওয়া চাঁদার বাক্স, কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেওয়া প্রশংসাপত্র আর চাঁদা-সংগ্রহের রসিদ বই নিয়ে মুখস্থ করা লেকচার দিত। এর পর থেকে তারা প্যাকেটে করা 'কেসর পাক'-এর বরফিও বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এরই আয়টা নিয়ে আসে অভিমন্যু ইউনিয়ন অফিসে। অনাথালয় বিক্রির উপর কিছু কমিশন পায়। অনাথালয়েরও টাকার দরকার, তাই অনাথালয়ের প্রেসিডেন্ট জয়নারায়ণ প্রসাদ বারণ করতে পারেনি এ জিনিস বেচা। এ রকম করে ইউনিয়নের জন্য টাকা জোগাড় করা, না শিউচন্দ্রিকা, না অভিমন্যু, কেউই পছন্দ করত না। কিন্তু উপায় কি? অফিস চালাতে তো হবে! পার্টি টাকা দেবে না। লোকে চাঁদা দেবে না। কেবল বললেই তো হল না। এই 'কেসর পাক' তৈরী করার জন্য প্রতি মাসে এক বস্তা করে চিনির 'পারমিট' নিয়ে আসে অভিমন্যু এস, ডি, ও, সাহেবের কাছ থেকে। কি করে আনে, কোথা থেকে আনে, এ সব খবর অবশ্য শিউচন্দ্রিকা কোন দিন অভিমন্যুকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করেনি।

এই চিনির কথাই তুলেছিলেন জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলায় চায়ের টেবিলে। সাপ আর নেউল এস, ডি, ও, সাহেবের ফরমাশ সত্ত্বেও নিজের নিজের স্বভাব ভুলতে পারেনি। এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের কথার ইঙ্গিত ছিল যে চিনিটা এনে ব্ল্যাক-মার্কেট করা হয়, আর

গুড় দিয়ে 'কেসর পাক'-এর কাজ সারা হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করিয়ে দিতে চান দাম্ভিক শিউচন্দ্রিকাটাকে যে, যে অনাথালয়ের মেয়েদের নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত কাণাঘুষো, এত হাকিমদের বিরুদ্ধে কেচ্ছা, এত বেনামী চিঠি, তোমরাও তো বাপু এর সঙ্গে জড়িয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে রয়েছো।

এই 'কেসর পাক'-এর ব্যাপারটাই বর্ত্তমান ইউনিয়নের কার্য্যকলাপের একমাত্র অশোভন অধ্যায়। এইটারই সুযোগ নিতে চায় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

কথাটা শুনেই শিউচন্দ্রিকার চোখ দু'টো দপ্ করে জ্বলে ওঠে। অভিমন্যু ভয়ে তটস্থ হয়ে যায়—এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা চীৎকার করে বলে ওঠে যে, ম্যাকনীল সাহেবের পা-চাটা রোজগারের চেয়ে এ অনেক সম্মানজনক। শিউচন্দ্রিকা অতটা বোকা নয়। সে বোঝে যে জয়নারায়ণের কথাটার মধ্যের ইঙ্গিত এত সূক্ষ্ম যে, গায়ে পড়ে জবাব দেওয়া ভাল দেখায় না।

এস, ডি, ও, সাহেব এ কথায় খুশী কি দুঃখিত তা ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো আগে থেকেই জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে এ সব কথা হয়ে থাকবে। তবে তিনি এখন আর ঝগড়া-ঝাঁটি পছন্দ করছেন না। ছাঁ-পোষা মানুষ তিনি, চাকরী-অন্ত প্রাণ। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক কর্মীগুলো, তোমার চাকরীতে ভাল করতে না পারুক, মন্দ করতে পারে ঠিকই। তাই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বলেন, "চলুন সেক্রেটারী সাহেব, আজ মিলের ভিতর। আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। যে 'ক্যাণ্টিন' আর 'ক্রেশে'র (শিশুদের যে স্থানে রেখে সযত্নে দেখাশুনো করা হয়) দাবি ছিল আপনাদের, তার জন্য লোক নেওয়া হবে আজ। তাছাড়া কোথায় হবে, কেমন ভাবে চালানো হবে সব আপনারা সলা-পরামর্শ দেবেন; যাতে এই একই বিষয় নিয়ে বেশী বার দৌড়োদৌড়ি করতে না হয় আমাদের। বলীরামপুরের মজুরদের ছাড়াও আমার সাব-ডিভিসনে অনেক কাজ আছে।"

শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু দু'জনেই বোঝে যে উপরওয়ালার গুঁতো খেয়েছেন হাকিম সাহেব!

"এক জন মিলের মজুর বাইরে বসে আছে। সে-ও সঙ্গে যাবে তা'হলে আমাদের।"—এই বিষয়টায় শিউচন্দ্রিকার স্থির মত আছে। কোন ইউনিয়নের কর্মী মিলের ভিতর গেলেই এক-আধ জন মিল-মজুরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এই অলিখিত নিয়ম শিউচন্দ্রিকা নিজেই জারি করেছে তার সঙ্গি-সাথীদের মধ্যে। তা না হলে মজুরদের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মন, কোন কর্মীর সম্বন্ধে কখন কি ভেবে নেয় বলা যায় না। আমীরচন্দের কথা মজুররা আজও তোলেনি। যে শিউচন্দ্রিকাকে আজ মজুররা মাথায় করে রেখেছে একটা কোন গুজব রটলেই কাল তাকে লাথি মেরে নীচে ফেলে দিতে তারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না।

এস, ডি, ও, সাহেবের গাড়ীতে করেই তারা সকলে মিলের ভিতর যায়।

জনকয়েক দাই (ঝি) ছাড়া আরও দু'জন মহিলাকে চাকরীতে নেওয়া হবে; এক জন থাকবেন 'ক্যাণ্টিন'-এর মেয়ে-মজুরদের খাওয়ার চার্জ্জে, এক জন 'ক্রেশে'র ছেলে-পিলেদের চার্জ্জে। তাদের জন্য নতুন কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গিয়েছে, এস ডি, ও, সাহেবকে দেখানো হল। আসলে দেখানো হল শিউচন্দ্রিকাকে; সে যে পাটনার উপরওয়ালাদের খবর দিয়েছিল যে মিল-মালিক বাড়ী তৈরী করবার মাল-মশলা নিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট করেছে, সে খবরও তাহ'লে এদের কানে গিয়েছে। আশ্চর্য্য!

—হাসপাতালের বাইরের টিনের শেডটাতেই তাহ'লে এখন ছেলে-পিলেদের জন্য 'ক্রেশে' হোক কি বলেন? গরম হবে বলছেন? আচ্ছা, এখন তো শীতকাল আছে। তত দিনে দেখুন নতুন ঘর তোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না। 'ক্যাণ্টিন'-এর শেডটা একটু পায়খানার কাছে হয়ে যাচ্ছে না? ক্যাণ্টিন-এর ঠাকুরগুলো জুটোলেন কোথা থেকে ম্যানেজার সাহেব? আজকাল ঠাকুর-চাকর পাওয়া যা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর বলবেন না। এমন মাস নেই যে মাসে একবার করে আমার ঠাকুর পালায় না।...

যাক, এ সব পর্ব তো কোন রকমে শেষ হয়। শিউচন্দ্রিকা মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে;—তবু এটুকুও তো হল এখনকার মত। কিছু দিন যেতে দাও, তার পর আবার এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করলেই হবে।

সকলে মিলে এসে অফিস ঘরে বসে। ম্যাকনীল সাহেব গিয়েছে কলকাতায়, শনিবারের রেস খেলতে। আজ জয়নারায়ণ প্রসাদই মিলের একচ্ছত্রাধিপতি।

"এইবার ঐ চাকরী দু'টো সম্বন্ধে আপনারা আপনাদের মতামত দেন।"

"ওর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গিয়েছিল না কি?"

"আমরা কি আর বসে আছি।"—জয়নারায়ণ প্রসাদ একখান ফাইল খুলে সকলের সম্মুখে রাখে, দেওয়ানী আদালতের নীলামি ইস্তাহার ছাপানোর একখান চার পাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা: এই দেখুন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া জায়গাটা। পর-পর দু' সপ্তাহের কাগজে বেরিয়েছে এই বিজ্ঞাপন"......

"হাঁ, দু'খানি আবেদন-পত্র এসেছে এই চাকরী দু'টির জন্য; আজকে তাঁদের 'ইনটারভিউ'-এর জন্য ডাকাও হয়েছে। তাঁরা পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের ডাকি? কিছু বলবার আছে না কি, মন্ত্রিজী!"

"না। আর যখন কোন দরখাস্তই নেই......"

"চাকরীতে কর্মচারীকে নিযুক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার মিল-কর্তৃপক্ষের; কিন্তু আমরা একে অধিকার বলে মনে করি না, দায়িত্ব বলে মনে করি। ম্যাকনীল সাহেব কলকাতায় যাওয়ার সময়ও বলে গিয়েছে যে এই সব মজুরদের 'ওয়েলফেয়ার সার্ভিস' সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেও চন্দ্রিকাকে 'কনসাল্ট' করতে। আপত্তি থাকে তো বলবেন।"

শিউচন্দ্রিকার মাথায় তখন ঘুরছে রহমতের বিবির কথাটা। রহমতটা এখানেও বাইরে বসে রয়েছে। ক্রেশে কিম্বা ক্যাণ্টিনে তারা যাকে ইচ্ছা চাকরী দিক। কিন্তু সন্তানসম্ভবা মজুরাণীকে বরখাস্ত করে দেবে, সেটি হতে দিচ্ছি না। এ একটা মৌলিক দাবির প্রশ্ন। দু'মাসের মজুরী পুরো আদায় করতে হবে এদের কাছ থেকে। ইউনিয়ন অফিসে সে দরখাস্ত দিয়েছে।

বেয়ারা এক জন ভদ্রমহিলাকে পথ দেখিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে। "নমস্কার!"

"নাম কি?"

"মিনাকুমারী"

"লেখা-পড়া কত দূর করেছেন?"

"হিন্দিতে সব কাজই চালাতে পারি।"

"হিসাব লিখতে পারেন? এক সের চাল রাঁধলে কতখানি ...লাজ ডাল রাঁধবেন?"

সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। "আচ্ছা, বসুন ...পনি। এইবার ক্রেশের চাকরীটার জন্য আবেদন-পত্রটা নেওয়া ...ক, কি বলেন? বেয়ারা!"

আর এক জন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকে। "নাম?"

"রুক্মীদেবী"

"থার্মমিটার দেখতে জানেন? এরারুট কি করে তৈরী করবেন ...লুন তো?"

"দু'জনই যোগ্য, কি বলেন সেক্রেটারী সাহেব?"

শিউচন্দ্রিকা দেখে যে দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল। ভদ্রঘরের মেয়ের ...শ সাজ-পোষাক। কথাবার্তাও বেশ ভাল! সে কেবল ...সা করে, "কবে থেকে এঁরা কাজে জয়েন করবেন?"

"...ই পয়লা থেকে। পারবেন তো আপনারা? আচ্ছা তা ...ন আপনারা। পয়লা থেকে, বুঝলেন? কালই চিঠি চলে ... আপনাদের নামে। হাঁ, একটা কথা, বিজ্ঞাপনের সত ভাল ... দেখে নিয়েছেন তো? মিল-কম্পাউণ্ডের ভিতর একই ...টারে দু'জনকে থাকতে হবে। যত দিন চাকরী করবেন, বিয়ে ...লবে না। যদিই বা বিয়ে করেন, স্বামী কিম্বা ছেলেপিলে ... মিলের ভিতর থাকতে দেব না আমরা। বুঝলেন?"

ভদ্রমহিলা দু'জন ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন যে কথাটা তাঁদের ...ঙ্গম হয়েছে। তার পর উপস্থিত সকলকে নমস্কার করে ... বেরিয়ে যান ঘর থেকে। শিউচন্দ্রিকার মত লোকেরও ... এড়ায় না যে মিনাকুমারী নামের মেয়েটার তনু-দেহ দৃঢ় অথচ ...নম্র—ঠিক বেতের মত। আর রুক্মী বলে মেয়েটার চোখের ...লে মোটা করে সুর্মা দেওয়া; চলে যাওয়ার সময় মেয়েটা যখন ... ডি. ও. সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিল ...চন্দ্রিকা।

অভিমন্যু একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। সে জানে যে তাকে ...নে ডাকা হয়েছে ভদ্রতার খাতিরে—শিউচন্দ্রিকার লেজুড় হিসাবে। তার মতামতের জন্য, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার বা এস, ডি, ও, সাহেব কেউই বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন। হয়তো তাকে ডাকা হয়েছিল, তাকে উপলক্ষ করে 'কেসর পাক'-এর চিনির কথাটা ...ড় প্রথমেই শিউচন্দ্রিকাকে মুষড়ে দেওয়া।

প্রথমটায় তার এই ধারণাই হয়েছিল। মিনাকুমারী আর রুক্মীকে দেখবার পর সে আসল কারণটা বুঝতে পারে। দু'টি মেয়েই এখানকার অনাথালয়ের। 'কেসর পাক' দিতে গিয়ে ...ত দিন দেখেছে তাদের অভিমন্যু। এরাই অনাথালয়ের সারা ...রস্থালীর কাজ দেখা-শুনো করে। মিনাকুমারী 'কেসর পাক'-এর হিসাব রাখে। এই রুক্মী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধে ...দি-মস্করা করতে শুনেছে সে অনাথালয়ের অকালপক্ক ছেলেদের, —ঐ যেগুলো হাফপ্যাণ্ট পরে ট্রেণে-ট্রেণে 'কেসর পাক' বিক্রি করে বেড়ায়! অথচ এস, ডি, ও, সাহেব কিম্বা এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার কেউই এমন ভাব দেখালো না যে, এরা তাদের কারও পরিচিত! আহা, বেচারীরা চাকরী দু'টো পেলেই অভিমন্যু সন্তুষ্ট হয়। তাহ'লেই এক এদের অনাথালয়ের জীবন শেষ হতে পারে।··· অনাথালয়ের নাম শুনলেই তো এখনই শিউচন্দ্রিকা আপত্তি করবে এদের নিযুক্তির সম্বন্ধে—যতই কেসর পাক বিক্রির বিষয় নিয়ে উপকৃত থাক না কেন ইউনিয়ন অনাথালয়ের কাছে! শিউচন্দ্রিকার মুখ বন্ধ করবার জন্যই বোধ হয় জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলাতে চিনির কথাটা তুলেছিল।···এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ী কোথায়।

···যাক, শিউচন্দ্রিকা সে কথা জিজ্ঞাসা করেনি। অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়। অনাথালয়ের মেয়েদের খারাপ বলে লোকে, কিন্তু সে তো এত দিন কেসর পাক নিয়ে যাতায়াত করছে অনাথালয়ে, কোন দিন কিছু খারাপ তো তার নজরে পড়েনি। 'কেসর পাক'-এর সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ করবার সময় নম্র সংযত ব্যবহার দেখেছে মিনাকুমারীর।···

ঘর থেকে যাওয়ার সময় মিনাকুমারীর দৃষ্টিতে সাফল্যের উল্লাসের মধ্যেও অভিমন্যুর প্রতি ধন্যবাদ যেন ফুটে উঠেছিল; অন্ততঃ সেই রকমই অভিমন্যুর মনে হয়।

এতক্ষণে শিউচন্দ্রিকা তার আসল কাজের কথা পাড়ে; রহমতের বিবির দরখাস্তের কথা। এই কথাটাই তার মনের মধ্যে ঘুরছে সকাল থেকে।

আজ জয়নারায়ণ প্রসাদ উদারতায় মুক্তহস্ত। শিউচন্দ্রিকা আজ যা বলে তাই'তেই তিনি রাজী। "বিশ্বাস করুন মন্ত্রিজী, আমরা জানতাম না যে সে সন্তানসম্ভবা। বোধ হয় সর্দার-টর্দারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকবে। রামভরোসা সর্দার বলছেন যে ওর পিছনে লেগেছে? না না, সে তো ও-ধরণের লোক নয়। নিশ্চয়ই অন্য কিছু ব্যাপার ঘটে থাকবে। যাক গে, দু'মাসের মজুরীর কথা বলছেন তো? আর তো কিছু না? লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে আপনাদের এই মিল। রহমতের বিবির দু'মাসের মজুরী দিতে আর ক'টাকা খরচ?···বলেন তো মন্ত্রিজী, তাকে এই 'ক্রেশে'তে দাইয়ের কাজ দিয়ে দিই। তার জন্যও তো লোক লাগবে। আরামের কাজ, বাঁধা মাইনে, ভাল চাকরী।"···

শিউচন্দ্রিকা মনে মনে হিসাব খতিয়ে দেখে। রহমতের বিবিকে এই চাকরীতে না ঢুকিয়ে বাকী মজুরীটা পাইয়ে দিলে ভবিষ্যতে সে মজুরনীদের মধ্যে ইউনিয়নের কাজে সাহায্য করতে পারে, আর যদি এখন এই চাকরীতে ঢোকানো যায় তাহ'লে তার কাছ থেকে 'ক্রেশে' আর 'ক্যাণ্টিন'এর কাজের আর চুরির অনেক খবরাখবর সব সময়েই পাওয়া যাবে।

"আচ্ছা সার, রহমতের বিবিকে জিজ্ঞাসা করে তার পর আপনাকে খবর দেব।"

শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যু, আর রহমৎ তিন জনই সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরা মন নিয়ে মিল-গেটের বাইরে আসে। এস, ডি, ও, সাহেব টেনিস খেলবার জন্য ভিতরেই থেকে যান। সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করাও আজ আর কেউ প্রয়োজন মনে করে না।

। ক্রমশঃ।

লিয়োনিদ আন্দ্রেভের স্মৃতি

মানসী রায়

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তে মস্কো করিয়ারে "বারগণ্ট ও গারাস্কা" গল্পটি পড়িয়াছিলাম—গতানুগতিক ইষ্টারের গল্প, ছুটির দিনে পাঠকের মনে একটি বার্ত্তাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে মানুষের মাঝে আজিও কখনো কখনো কোনো বিশেষ অবস্থায় উদারতা প্রকাশমান হইয়া থাকে, একটি দিনের জন্যও, একটি মুহূর্ত্তের জন্যও শত্রু বন্ধু হইয়া উঠে।

গোগোলএর "ওভারকোট" গল্পটি প্রকাশিত হইবার পরে বহু রাশিয়ান সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় করুণ কাহিনী রচনা করিতেছিলেন, সেগুলি ড্যানডিলিয়ন পুষ্পগুচ্ছের মত বৃহৎ রুশ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব পুষ্পশোভিত উদ্যানে পল্লবরাজি বিস্তার করিয়া রুগ্ন অকোমল রুশ-জীবনের রিক্ততাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই কাহিনীটা আমার নিকট প্রতিভার যে স্নিগ্ধ প্রবল বায়ু বহিয়া আনিল, পমিয়ানোভস্কি যাওয়ার পথে সেইটুকুই বারংবার অনুভব করিতে লাগিলাম; যে সত্যগুলি লেখক কাহিনীর অন্তরালে রাখিয়াছিলেন তাহারই সত্তার প্রতি অবিশ্বাস-ভরা দুষ্ট মৃদু হাসি-মাখানো সুর এ কাহিনীর সুরে বাজিতেছিল; এই ছোট্ট হাসিটুকু মনকে সত্ত দিনের সাহিত্যের সহিত অনিবার্য্য এবং জোর করানো ভাবপ্রবণতার সহিত সন্ধিসূত্রে গাঁথিয়া দেয়। লেখককে গল্প সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। এল, আন্দ্রিভের নিকট হইতে তাহার এক কৌতুককর উত্তর পাইলাম। বিশিষ্ট হস্তলিপি-সম্বলিত, আধ-ছাপানো অক্ষরে অপ্রচলিত বাক্যাবলীবিশিষ্ট এক পত্র তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে এই অসহজ অথচ সংক্ষিপ্ত নাস্তিকদের অবিশ্বাসী বাণীটা চোখে পড়িল: "তেলা মাথায় তেল পড়িলে বস্তুটা গুরু ভোজনের পরে এক পেয়ালা কফির মতোই আনন্দ দায়ক হইয়া ওঠে।"

এমনি করিয়াই লিয়োনিদ আন্দ্রিভের সহিত পরিচয় সুরু হইল। গ্রীষ্মের মধ্যে আমি তাঁহাকে আর গোটা কয়েক গল্প এবং হালকা প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিলাম। জেমস লিকচ এই সাহিত্যিক ছদ্মনামে তিনি লিখিতেন। দেখিলাম, এই নবাগত লেখকটির প্রতিভা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

শরৎ কালে ক্রিমিয়া যাইবার পথে মস্কোর স্কুর্স্ক ষ্টেশনে কে যেন আমাদের আলাপ করাইয়া দিল। পুরানো মত একটা ওভার-কোট গায়ে, রোমশ মেষচর্ম্মের টুপী মাথার এক পার্শ্বে—তাহাকে দেখিতে যেন ইউক্রাইনের অভিনয়-সংঘের তরুণ অভিনেতার মত লাগিতেছিল। তাহার সুশ্রী মুখ-বয়বের অচঞ্চলতা লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু কালো চোখের দৃষ্টিতে যে মৃদু হাসি চমকাইয়া গেল তাহা তাহার গল্প এবং হালকা প্রবন্ধের নিহিত অর্থে নিমেষে আলোকপাত করিয়া গেল। তাহার সকল কথা আমার মনে নাই, কিন্তু সেগুলি গতানুগতিক আলাপন ছিল না, তাহার উত্তেজিত বক্তব্য প্রকাশের ধরণটাও ছিল নূতন। ভারী দ্রুতবেগে, খসখসে অথচ অত্যন্ত উঁচু গলায় সে কথা কহিত, থাকিয়া থাকিয়া অল্প শুকনা করিয়া কাসিত এবং হাত দুইখানিকে এমনি একঘেয়ে ভাবে নাড়াইতে থাকিত যেন কি একটা চালাইতেছে। মনে হইল, সুস্থ জীবন্ত মানব-প্রকৃতির এই মানুষটি হাসিয়াই এ জগতের সকল দুঃখ-বেদনা বহিতে পারে, তাহার উত্তেজিত ভঙ্গী ভারী সুন্দর লাগিল।

আমার হাতে চাপ দিয়া সে কহিল, "আসুন, বন্ধুত্ব করে নেওয় যাক।"

আমিও আনন্দে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলাম।

শীতকালে সেবার ক্রিমিয়া হইতে নিজনি যাওয়ার পথে মস্কো রহিয়া গেলাম, সেইখানে আমাদের পরিচয় দ্রুত নিবিড় বন্ধু পদে উন্নীত হইয়া গেল। বাস্তব জগতের সহিত তাহার সংস্পর্শ কম ছিল, সে বিষয়ে উৎসাহও তাহার কিছুই ছিল না অথচ তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত উপলব্ধির ক্ষমতা, কল্পনার আশ্চর্য্য শক্তি, ভাবিয়া ধা করিবার ক্ষমতায় বিস্মিত হইলাম। একটি ছোট কথা একটি-মাত্র স তাহাকে সুরু করিবার রসদ জোগাইতে যথেষ্ট ছিল, অতি তুচ্ছ বস্তুকে সে তখনি সহজে একটি দৃশ্য, কাহিনীর অংশে, চরিত্রে কোনো গল্পে পরিণত করিত।

এক দিন সমসাময়িক একটি জনপ্রিয় লেখক সম্পর্কে সে করিয়া বসিল: "স-টি কে"?

জবাব দিলাম। "একটা বাঘ, লোম কেনা-বেচার দোক থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

সে হাসিয়া উঠিল এবং ভাবি যেন একটা গোপন কহিতেছে, এমনি মৃদুকণ্ঠে দ্রুতবেগে বলিল: "দেখ, একটা লিখবো: একটি লোক নিজেকে খুব বীর ভেবে বসেছিল— কিছু আছে সব-কিছুকে ভেঙে ফেলতে পারে সে, শেষ নিজেকেই নিজে ভর করতে সুরু করল—হ্যাঁ! সে-ও আত্মশ্লাঘা করত, সকলে তাকে বিশ্বাসও করত। কিন্তু বাস্তবিক সে একেবারে হতভাগা, কিছু না! নিজের বউকে, এমন কি নি বেড়ালটাকেও সে ভয় করতো।"

এমনি করিয়াই নিজের গতিশীল চিন্তাকে ঘিরিয়া কথার কথা গাঁথিয়া সে অতি সহজে অনায়াসে নূতন সৃষ্টি করিয়া গে তাহার একখানি হাতের পাতা বুলেটে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল, আঙু গুলি কুঞ্চিত হইয়া থাকিত; কেমন করিয়া ইহা ঘটিল জিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

সে জবাব দিল: "এটা যৌবনের ভাবপ্রবণতার কীর্ত্তি। যে লোক একবারও আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেনি সে একেবা ভেড়া।" আমার কাছেই একটা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া সে অপ ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল: একবার তরুণ বয়সে মালগাড়ীর তলায় গলা পাতিতে গিয়াছিল, কিন্তু রেলের ফাঁকটায় পড়াতে সৌভাগ ক্রমে ট্রেণটা কেবল মাত্র তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া তাহার উপ দিয়া পার হইয়া গেল।

গল্পটাকে কিছু অসত্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সে এক লোকের উপর দিয়া এক শত টন ওজনের ভারী লোহা সশব্দে চলি যাওয়ার অনুভূতির অসম্ভ বর্ণনায় তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া তুলি এ অনুভূতির সহিত আমি স্বয়ং অপরিচিত ছিলাম না; ছেলেবেলা বছর দশেক বয়সে সঙ্গীদিগের সহিত সাহসের প্রতিযোগিতা দি মালগাড়ীর তলায় শুইয়া পড়িতাম। সঙ্গীদিগের ভিতর পয়েন্টসম্যানে ছেলেটি এই খেলাটা আশ্চর্য্য স্থিরতার সহিত খেলিত। ইঞ্জিনে চুল্লীটা যদি কিছু উচ্চে অবস্থিত থাকে এবং ট্রেণ যদি নীচে না নামিয়া পাহাড়ের দিকে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে এ খেলাটা নিরাপদে

...ভোগ করা যায়। কারণ, এ অবস্থায় ব্রেকচেনগুলিতে দৃঢ় ভাবে ...পড়ায় গায়ে লাগিতে পারে না, লাগিলেও মানুষটাকে ঠেলিয়া ...হইয়া যায়। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেমন যেন ভয়-ভয় করে, ...য়া মাটির সঙ্গে যতটা সম্ভব মিলিয়া পড়িয়া থাকা এবং ...চড়া করিবার, মাথা তুলিবার ইচ্ছাকে বলপূর্বক দমন করিয়া ..., উপর দিয়া লৌহ এবং কাঠের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, ...র সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যেন ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে, ...শিকলের ঝঙ্কনা যেন হাড়ের মধ্যে বাজিতেছে, ট্রেণ পার হইয়া ...ও উঠিবার ক্ষমতা থাকিত না, নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম ... ট্রেণের সঙ্গে চলিতেছি, দেহটা যেন লম্বা হইয়া গেছে, বাড়িয়া ...ছে—হাল্কা হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেছে—পরমুহূর্তেই মাটির উপরে ...য়া বেড়ানো—ভারি ভাল লাগিত।

আন্দ্রিভ শুধাইল, "এই অদ্ভুত খেলা ভাল লাগত কেন তোমার?"

কহিলাম, সম্ভবতঃ আমাদের ইচ্ছাশক্তির পরোয়া করিতাম, ...ন্ত্রিক গতির বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলির ...কৃত গতিহীনতাকে প্রয়োগ করিতাম।

সে উত্তর দিল, "না, এত বেশী করে ভাববার ক্ষমতা কোনও ...ছেলের থাকে না।"

বলিলাম, ছেলেরা দোলনা হইতে পড়িতে যায়, নূতন জমিয়া ...পুকুরের চড়চড়ে বরফে লাফাইতে ভালবাসে, অপ্রকাশ্য ...তীরে জমা বরফে লাফায়, ঠিক তেমনি বিপজ্জনক সকল খেলাই ...রা ভালবাসে।

"উঁহু, ঠিক হলো না। সব ছেলেই অন্ধকারে ভয় পায়··· ...দের কথায় আছে বটে: "যুদ্ধে আনন্দ আছে, আর আছে ...র আঁধার কিনারে···, শুনতে বেশ চমৎকার, তার বেশী ...না। আমার ধারণা অন্য, তবে সেটা এখনো ঠিক করে নিতে ...।" সহসা যেন ভিতরের অনুপ্রেরণায় চঞ্চল হইয়া বলিয়া ...: "আমাকে একটা গল্প লিখতে হবে, এমন একটা লোকের ...নী যে সারা জীবন সত্য খুঁজছে। পাগলের মত শত আঘাত ...রে সে সত্যকে খুঁজে মরেছে। সত্য তার সম্মুখে যখন দেখা ... তখন সে চোখ-কান বুজে রইল, বললে: 'আমি তোমায় ...। তুমি সুন্দর, তবু আমার জীবন, আমার দুঃখ-বেদনা ...র বিরুদ্ধে আমার প্রাণে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে।' কেমন লাগছে ...?"

পছন্দ হয় নাই, সে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল: হাঁ, সব চেয়ে ...র কথা হলো সত্য কোথায় আছে, মানুষের মনের মধ্যেই না ... বাইরে? তোমার মতে—মানুষের মনে?" বলিয়াই সে ...ে ফাটিয়া পড়িল, "তা'হলে এটা নিতান্তই বাজে, তুচ্ছ ...র!"

কোন কথাতেই প্রায় কোন দিন আমার এবং লিয়োনিদ আন্দ্রিভের ...মিল ঘটে নাই। কিন্তু এত অমিলও আমাদের পরস্পরের ... পরস্পরের দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র আকর্ষণ এবং অনুরাগের লাঘব ...তে পারে নাই, অথচ অতখানি পারস্পরিক উৎসাহ কেবল মাত্র ...ষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার মধ্যেই জন্মলাভ করিতে পারিত, আমাদের ...ন্ত আলোচনা চলিত, মনে পড়ে একবার অবিরাম কুড়ি ঘণ্টা কাল বসিয়াছিলাম—কত পাত্র চা যে ফুরাইয়াছিল—লিয়োনিদ অস্বাভাবিক পরিমাণে চা গিলিয়াছিল।

আশ্চর্য্য রকম উৎসাহী, অদম্য এবং বুদ্ধিমান বক্তা ছিল সে। তাহার মন সর্ব্বদাই আত্মার নিবিড়তম অন্ধকার কক্ষটিকে খুঁজিয়া ফিরিত—কখন তাহার চকিত চিন্তা-চঞ্চল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য লইয়া সহজেই সুসজ্জিত কৌতুকময় রূপ পরিগ্রহণ করিত। বন্ধুমহলে কথাবার্ত্তার ভিতরে তাহার যে কৌতুক-রসের সহজ জ্ঞানটি সুন্দররূপে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইত, রুশজাতি-দুর্ল্লভ এই স্বভাব-সৌন্দর্যটি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার রচনায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাগ্রত এবং অনুভূতিপ্রবণ কল্পনা লইয়াও সে ছিল অলস; সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়ে সাহিত্যালোচনাই ছিল তাহার অধিকতর প্রিয়। নিশীথের নির্জ্জন নীরবতার মাঝখানে সাদা পরিষ্কার একখণ্ড কাগজের সম্মুখে বসিয়া শতদের ন্যায় প্রাণান্ত পরিশ্রমের আনন্দ তাহার পক্ষে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না; এই সাদা কাগজখণ্ডকে বিভিন্ন শব্দ ভরাইয়া দেওয়ার আনন্দ তাহার কাছে অল্পই মূল্য লাভ করিত।

সে স্বীকার করিয়া কহিত: "বড় কষ্ট করে লিখি আমি. লেখা আমার পক্ষে একটা দারুণ পরিশ্রম। নিবগুলো যেন কেমন অসুবিধে ঠেকে. লেখার ধরণও যেন ভারি আস্তে, বড় খেলো লাগে। আমার চিন্তাগুলি তখন সেই আগুনের মধ্যে পাখিগুলি যেমন ঝটপট করে, তেমনি করতে থাকে, তাদের ঠিকমত করে গোছাতে হাঁপিয়ে উঠি। প্রায়ই কি হয় জান? একটা কথা লিখলাম হঠাৎ

লিয়োনিদ আন্দ্রিভ

মাকড়সার জালের দিকে চোখ গেল—তার পরেই মাথা নেই মুণ্ড নেই জ্যামিতি বীজগণিতের কথা ভাবতে লাগলাম, পুরোনো ইস্কুলের মাষ্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল, ওবিয়নের সেই স্কুল—ভদ্রলোক আচ্ছা বোকা ছিল। প্রায়ই এক দার্শনিকের মত আউড়ে বলতো, 'সত্যিকারের জ্ঞান স্থির।' কিন্তু জানো, সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষেরাই অস্থিরতার যন্ত্রণা সহ্য করেন। শান্ত জ্ঞানের মুখে আগুন! কিন্তু তার বদলে তাহ'লে থাকবে কি? সৌন্দর্য্য? তাই? ভেনাসকে চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁর ছবি দেখলে যেন মনে হয়, একটা বোকা মেয়েমানুষ! আর সত্যি বলতে কি, সুন্দর জিনিষগুলোই বোকা-বোকা হয়। যেমন ধর ময়ূর, গ্রেহাউণ্ড, মেয়েমানুষ…"

মনে হয়, বাস্তবতার প্রতি বিমুখ, মানুষের চিন্তা এবং ইচ্ছা-শক্তিতে অবিশ্বাসী এই লোকটি রাষ্ট্র বা আইন প্রণয়ন বা শিক্ষকতার ব্যাপারে কোন ধারণাই রাখে না, সে সব বিষয়ে কোন উৎসাহই তাহার নাই। এই ঔৎসুক্যটা থাকে তাহারই, যে বাস্তব জগতের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কিন্তু আমাদের প্রথম আলাপেই বুঝিয়াছিলাম, শিল্পীর সকল আবশ্যকীয় মহৎ ক্ষমতাগুলি আয়ত্তে রাখিয়াও এই লোকটি মনীষী এবং দার্শনিক হইবার আশাও রাখে। এই জিনিষটা আমার বিপজ্জনক বোধ হইত, কোন আশা নাই বলিয়াই জানিতাম, কারণ তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার আশ্চর্য্য রকম সম্বন্ধহীন ছিল, মনে হইত, সে যেন কাছাকাছির মধ্যে একটা শত্রুকে টের পাইয়াছে এবং প্রাণপণে যেন যুক্তি-তর্ক করিয়া তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। পড়িতে লিয়োনিদ ভালবাসিত না, নিজে গ্রন্থকার হইয়া—স্রষ্টকর্ত্তা হইয়া প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রতি অবিশ্বাসে ভরা ঔৎসুক্য-বিহীন দৃষ্টিক্ষেপ করিত।

বলিত: "তোমার কাছে তো বই সেই বুনোদের যাদুর মতো। সাধারণ স্কুলে পড়ে অভ্যেস হয়নি কি না, ইউনিভার্সিটির পড়াশুনো তো করোনি? আমার কাছে 'ইলিয়াড', 'পুশকিন' এ সবগুলো ইস্কুল-মাষ্টারদের কাঁপানো কথা বনে গেছে, মাইনে খাওয়া কর্ম্মচারীদের হাতে নষ্ট হয়ে গেছে। 'জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বেদনা'র কথাই বল আর হল এণ্ড নাইটের পাটিগণিতই বল দুই-ই আমার সমান একঘেয়ে লাগে। 'ক্যাপ্টেনের কন্যা' এবং ভাবস্থয়ের বোলভার্ড-এর ছোট্ট ভদ্রমহিলা দু'জনের সম্পর্কেই আমার ভয় আছে।'

এই সকল বহু-প্রচলিত কথাগুলি আমি বারংবার শুনিয়াছি। মানুষের সাহিত্যিক রুচির পরে স্কুলের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে এত কথাও এত দিনে আমাকে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস করাইতে পারে নাই, কারণ, সেই কথাগুলির ভিতরে রাশিয়ার অলসতার চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতাম। বরং আন্দ্রিভ যখন বলিত যে, কাগজগুলি—যেন পথের দুর্ঘটনার কথা হইতেছে, এমনিতর আলোচনা-সমালোচনা করিয়া বইগুলিকে অসংলগ্ন অঙ্গহীন করিয়া তোলে তখন তাহার বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি মৌলিকতার সুর পাইতাম।

"এগুলি যেন কারখানা। সেকস্পীয়ার, বাইবেল সব-কিছু পিষে ভাঁড়ামির ধুলো ওড়াচ্ছে। একবার দেখি কি, ওমা, ডনকুইকজোটের উপর লেখা এক সমালোচনা প্রবন্ধে ডনকুইকজোটকে আমার এক চেনা বুড়ো ভদ্রলোক বানিয়ে ছেড়েছে—ভদ্রলোক এক্সচেকার কোর্টের ডিরেক্টার ছিলেন; বারমেসে সর্দ্দির ধাত ছিল, আর ছিল এক রক্ষিতা—খুচরো দোকানের কারবার করত সে মেয়েটি, উনি তাকে একেবারে বাহারে নাম ধরে—মিলি মিলি করে ডাকতেন, আসলে কিন্তু বাইরের মহলে তার নাম ছিল সন্‌কা ব্লাডার…"

কিন্তু পুস্তকের প্রতি মনোযোগহীন হইয়া এমন কি মাঝে মাঝে বিরোধী ভাব লইয়া তাহাকে উড়াইয়া দিলেও আমি পড়ি না পড়ি সে বিষয়ে তাহার ঔৎসুক্যের অবধি ছিল না, একবার মস্কো হোটেলে আমার ঘরখানায় বসিয়া আলেক্সি থসটামের সিনিসিয়াস সম্পর্কিত "টোলেমিস-এর বিশপ" বইখানা পড়িতেছিলাম; সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল: "এখানা পড়ছ কেন হে?"

আমি তাহাকে এই বিচিত্র প্রকৃতি অর্দ্ধ পৌত্তলিক ধর্ম্মযাজকের কাহিনী বলিলাম, এবং তাঁহার "শূন্যতার স্তুতি" হইতে গোটা কয়েক পংক্তি পড়িয়া শুনাইলাম:

"কি (সিনিসিয়াস শুধাইল) সে বস্তু যাহা শূন্যতর হইয়াও স্থানের চেয়ে স্বর্গীয়?"

হারকিউলাসের বংশধরের এই বিষাদময় বাণী শুনিয়া লিয়োনিদ হাসিতে ফাটিয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ দুইটা মুছিয়া হাসিতে হাসিতেই কহিল। "জানো, এ নিয়ে খাসা গল্প লেখা যায়। এক জন নাস্তিক, আস্তিকদের বোকামি পরোখ করবার জন্য খুব ধার্ম্মিক সেজে বসলো, রীতিমত নতুন ধর্ম্ম প্রচার করে ভগবানের নতুন রূপ-টুপ নিয়ে মেতে উঠলো—হাজার হাজার ভক্ত জুটলো। তার পর এক দিন সে শিষ্যদের ডেকে বললে, 'এ সবই বাজে।' কিন্তু তারা ত আর বিশ্বাস ছাড়তে পারে না, একটা কিছু বিশ্বাস করা চাই, তাই তারা তাকে হত্যা করল।"

তাহার কথায় চমকিত হইয়া গেলাম। সিনিসিয়াস ঠিক এই কথাটাই বলিয়াছেন: "যদি কেহ আমাকে বলিত যে ধর্ম্মযাজকের জনসাধারণের সহিত একমত হওয়া প্রয়োজন, আমার স্বরূপ আমাকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ধরিতে হইত। জনমতের সহিত কখনো দর্শনের মিল ঘটিতে পারে? স্বর্গীয় সত্য চিরকাল গোপন থাকিবে! জনসাধারণের জন্য অন্য কিছু আবশ্যক।"

কিন্তু আন্দ্রিভকে এ কথা বলি নাই, ফিন্‌শিয়ার গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক হইয়া এই দীক্ষাবিহীন পৌত্তলিক দার্শনিকের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলিবার অবকাশও ঘটে নাই। যখন বাক্য-পরম্পরায় বলিয়া ফেলিলাম, বিজয়গর্ব্বে হাসিয়া সে কহিল, "দেখলে ত, জানবার ক বুঝবার জন্যে বই পড়বার কিছু দরকার পড়ে না।"

লিয়োনিদের প্রতিভা ছিল সহজাত, প্রকৃতিগত; তাহার সহজ উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য্য রকমের তীক্ষ্ণ। জীবনের আঁধার রহস্য, মানবাত্মার অন্তর্বিরোধ, প্রকৃতি-রাজ্যের কোলাহল, সব কিছুই সে এই সহজাত উপলব্ধিতে অনুভব করিয়া লইত। বিশপ সিনিসিয়াসের ঘটনাটাই একমাত্র নহে, এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি।

এমনি তাহার সহিত যাহারা স্থির বিশ্বাস খুঁজিয়া মরে,

তাহাদের লইয়া আলোচনা করিতে করিতে একবার যাজক আপোলোনভ-এর "আমার আত্মস্বীকৃতি" বইখানার মূল বক্তব্যগুলি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম—বইখানা এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা, লিও টলষ্টয়ের আত্মস্বীকৃতি বলিয়া পরিচিত ছিল। আমি নিজে অন্ধবিশ্বাসী লোকদের কি দেখিয়াছি বলিলাম। মনে হয়, যেন তাহারা স্বেচ্ছায় এক অন্ধ অনমনীয় বিশ্বাসের পায়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। কার্য্যতঃ যতই তাহারা ইহার সারবত্তা বুঝাইতে চাহে, বস্তুতঃ তেমনি একান্ত ভাবে ইহাকে সন্দেহ করিতে থাকে।

আন্দ্রিভ প্রথমটা ভারি আমোদ অনুভব করিল, চায়ের পেয়ালায় অল্প চুমুক দিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল: "তুমি এ সব বোঝ দেখে ভারি অবাক লাগে আমার; তুমি কথা বলো নাস্তিকের মত, অথচ তোমার চিন্তার ধরণে তোমার বিশ্বাসী মনকে ধরা যায়। তুমি যদি আমার আগে মর, তোমার সমাধি-স্তম্ভে লিখে দেব: অন্যকে যুক্তির পূজো করতে হুকুম দিয়ে, নিজে গোপনে সে তার যুক্তিহীনতাকে ব্যঙ্গ করেছে।"

মিনিট দুই পরে আমার স্কন্ধে হেলান দিয়া তাহার বিস্মৃত চক্ষুর কালো তারকাকে আমার চোখে নিবদ্ধ করিয়া সে নিম্ন কণ্ঠে কহিল: "একটা পাদ্রী সম্পর্কে লিখবো আমি। এটা, বুঝেছ ভাই, বেশ ভালো করে লিখবো।"

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কাহাকে যেন ভয় দেখাইয়া জোরে কপালটা ঘষিয়া সে হাসিয়া কহিল: "কাল বাড়ী যাচ্ছি, গিয়েই সুরু করে দেবো। গোড়ার লাইনটা ঠিক করে ফেললাম: 'জনতার ভিতরে সে ছিল নিঃসঙ্গ, তাহার চিত্তের অসীম রহস্যের একটি প্রতিফলিত রশ্মি তাহাকে এমনি পৃথক করিয়াছিল…'"

পরের দিনই সে মস্কো চলিয়া গেল। সপ্তাহ খানেকের ভিতরেই আমাকে লিখিয়া জানাইল, পাদ্রী লইয়া রচনা তাহার ভালই চলিতেছে, "বরফের উপরে জুতা পরিয়া" চলার মতো স্বচ্ছন্দগতিতে চলিতেছে। এমনি করিয়াই সে তাহার অন্তর্নিহিত প্রশ্নের জবাব এমনি আঁধার অসীম বেদনাঘেরা জীবন-রহস্যের ভিতর হইতে খুঁজিয়া লইত।　[ক্রমশঃ।

আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস

দেশ-বিভাগের ফলে পশ্চিম-বঙ্গে যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে, তাহার আয়তন লোকসংখ্যার হিসাবে খুবই কম। [illegible] সালের আদমসুমারীর হিসাবে পশ্চিম-বঙ্গে প্রতি বর্গ-মাইলে [illegible] লোকের বসতি। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং গত এক বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে [illegible] লক্ষ লোকের আমদানী হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের মত একটি [illegible] ক্ষুদ্র প্রদেশের পক্ষে এই বিরাট জন-সমষ্টির ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই গুরু সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দামান উপযুক্ত আমাদের কোনও কাজে লাগে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি প্রতিনিধি দল সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। এই দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে আন্দামান পরিভ্রমণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

সভ্যজগতে এত দিন পর্য্যন্ত আন্দামানের একমাত্র পরিচয় ছিল বন্দিনিবাসরূপে। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সহর পোর্ট ব্লেয়ারে জগদ্বিখ্যাত সেলুলার জেলে ভারতবর্ষ হইতে দ্বীপান্তরিত বন্দীদিগকে রাখা হইত। বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল খুনী আসামী, এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন ভারতের মুক্তিকামী বীরবৃন্দ। তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট এই সব বন্দীদিগকে ভারতবর্ষের সাধারণ জেল সমূহে রাখিতে সাহস পাইতেন না, এবং চতুর্দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত নির্জ্জন দ্বীপে পাঠাইয়া এক দিকে যেমন নিশ্চিন্ত হইতেন, তেমনি দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়-পরিজন হইতে দুর্গম্য বহু দূরদেশে রাখিয়া মনে-মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ইহার ফলে দেশে "অপরাধের" পরিমাণ কিছুমাত্র কমিয়াছে কি না, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন। কিন্তু আন্দামানের মত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর দেশ সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণের মনে যে একটা অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে দেশকে কার্য্যতঃ বন্দিশালা হিসেবেই ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কাহারও মনোভাব প্রসন্ন হইবার কথা নহে। রাজনৈতিক বন্দীরা সেখানে কারাগারের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া পরে যখন মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের মুখে আন্দামানের প্রশংসা শোনা যাইত না। কিছু দিন আগে পর্য্যন্তও বন্দী কিম্বা কারারক্ষক এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কাহার আন্দামানে যাওয়ার সুযোগ একেবারেই ছিল না, এই ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে এখনও বজায় আছে। আন্দামানের চীফ কমিশনের বিনা অনুমতিতে কেহ সেখানে যাইতে পারেন না কিম্বা সেখান হইতে চলিয়া আসিতে পারেন না। বস্তুতঃ, যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত আন্দামান সম্পূর্ণরূপে একটি বন্দিনিবাস ছিল, এবং ইহার শাসন-ব্যবস্থাও তদনুরূপ ছিল। এখন এই বন্দিনিবাস তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থায় পুরাতন নীতিই চলিয়া আসিতেছে। এই সব কারণে সাধারণ লোকের মনে আন্দামান সম্বন্ধে যে সব ভুল ধারণা আগে হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা দূর হইবার কোনও সুযোগ হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টও এত দিন এই দ্বীপপুঞ্জকে এক হিসাবে ত্যাজ্যপুত্রের মত দেখিয়া আসিয়াছেন। যদি পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে এই দ্বীপগুলিতে বসবাসের সুবিধা আছে কি না, এবং তাহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির কোন উপায় করা যায় কি না, তাহা অনুসন্ধানের জন্য কোনও ব্যবস্থা করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে।

কিন্তু যে কারণেই হউক, আজ ভারত গবর্ণমেন্ট এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আন্দামানের প্রতি পড়িয়াছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বিবৃতি সংবাদপত্রে বাহির হইবার পর সাধারণ লোকের মধ্যেও আন্দামান সম্বন্ধে কিছু আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আশা করা যায় যে, তাঁহারাও এখন আগের মত এই দ্বীপগুলিকে তাচ্ছিল্য করিবেন না। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তন খুব বেশী নয়, এবং চার-পাঁচ লক্ষের বেশী লোক স্থায়িভাবে এখানে বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে আজ লোকসংখ্যার চাপ এত বেশী যে সামান্য পরিমাণেও যদি এই লোক-ভার লাঘব হয় তাহার চেষ্টা ছাড়া উচিত হইবে না। ইহাপেক্ষাও বড় কথা এই যে, যাঁহারা সেখানে যাইয়া বসতি স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট প্রেরিত আর একটি প্রতিনিধি দলও সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাদেরই মত আন্দামানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল যে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে সব বাস্তুহারা পাঞ্জাবী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আন্দামানে বসতি স্থাপন করিবেন। দ্বীপপুঞ্জের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা বাঙ্গালীরা সেখানে না যাই এবং আমাদের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া যদি সুদূর পাঞ্জাব হইতে লোকে সেখানে যায় তাহা হইলে খুবই দুঃখের কারণ হইবে। বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রচেষ্টা আজ নূতন নহে। বাঙ্গালীর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা দ্বীপের নাম বদলাইয়া দিয়াছেন। ইতিহাসে এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার নজির দিলে কিম্বা কাব্যে তাঁহাদের জয়গান গাহিলেই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা মিটিবে না। যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখনকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যখন আমাদের যুগপৎ সঙ্কট ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন কি আমাদের পক্ষে ঘরমুখী হইয়া থাকা উচিত হইবে? পশ্চিম-বঙ্গের সীমানা পশ্চিমে আরও বর্দ্ধিত হইবে কি না তাহা লইয়া বর্ত্তমানে একটা আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলন কতখানি সফল হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু ইহার সাফল্যের উপর নির্ভর না করিয়া নূতন একটা দেশে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের মত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার সুযোগ হেলায় ছাড়িয়া দেওয়া একেবারেই সঙ্গত হইবে না।

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ২০৪টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপের সমষ্টি। মোটামুটি ভাবে এই দ্বীপপুঞ্জকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়: গ্রেট আন্দামান, লিটল আন্দামান, রিচিগ আর্কিপিলেগো এবং ল্যাবিরিন্থ আইল্যাণ্ডস্। গ্রেট আন্দামানকে আবার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণে "পোর্ট ব্লেয়ার" সহরটি প্রকৃত পক্ষে দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র। পোর্ট ব্লেয়ার কলিকাতা হইতে ৭৯১ মাইল দূরে অবস্থিত। টার্নার মরিসন কোম্পানীর জাহাজ "মহারাজা" কলিকাতা ও মাদ্রাজের সহিত আন্দামানের সংযোগ রক্ষা করে। জাহাজে যাতায়াতে প্রায় সাড়ে তিন দিন লাগে।

দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ২৫০৮ বর্গ-মাইল। এই হিসাবে ইহা পশ্চিম-বঙ্গের একটি মাঝারি জেলার সমান। প্রতি বর্গ-মাইলে ৬৪০ একর কিম্বা ১৯২০ মাইল অর্থাৎ সমগ্র দ্বীপের আয়তন প্রায় ৪৮ লক্ষ বিঘা। ইহার প্রায় সবই বর্ত্তমানে ঘন জঙ্গলে পূর্ণ এবং বন-বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে। ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২৪ লক্ষ বিঘা জমি নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র ১৬ বর্গ-মাইল পরিষ্কার করিয়া সহর এবং পল্লী অঞ্চল স্থাপন করা হইয়াছে। এই সব পল্লী অঞ্চলে ধান, ইক্ষু, শাকসব্জী ইত্যাদির চাষ হয় এবং অনেক নারিকেল বাগান ও বাঁশ এবং বেতের বন রহিয়াছে। বন্দিনিবাসের প্রয়োজনবোধেই বন-বিভাগের হস্ত হইতে এই পরিমাণ জমি লওয়া হইয়াছিল। এবং কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে কোনও দিনই মনে করেন নাই যে ইহার অতিরিক্ত খুব বেশী পরিমাণ জমি চাষের জন্য প্রয়োজন হইবে। এখনই লোকাভাবে এই অল্প পরিমাণ আবাদী জমির কতক অংশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই প্রসঙ্গে আন্দামানে জমি চাষের ইতিহাসের কথা অবান্তর হইবে না। যত দিন পর্য্যন্ত এই দ্বীপে বন্দিনিবাস ছিল সেই সময় গবর্ণমেন্ট সাধারণ কয়েদিগণকে কিছু দিন কারাদণ্ডের পর কারাগৃহের অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া দ্বীপের মধ্যেই অবাধে চলা-ফেরার অনুমতি দিতেন। তাহাদিগকে চাষের জন্য জমি দেওয়া হইত, কিন্তু কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরাইবার আগে তাহাদিগকে স্বদেশে আসিতে দেওয়া হইত না। বন্দীরা কেহ কেহ স্বদেশ হইতে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে লইয়া যাইত এবং কেহ কেহ সেখানেই বিবাহ করিয়া চাষবাস করিত। এই ভাবে গত এক শত বৎসরে আন্দামানে একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, বিহারী আসামী প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। তাহারা এখন আর নিজেদের কোনও বিশেষ প্রদেশের লোক বলিয়া পরিচয় দেয় না। এই নূতন সম্প্রদায়ের ইংরাজী নাম হইয়াছে "লোক্যাল বর্ণ" (Local born)। আন্দামানের ১৫ হাজার লোকের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার এবং বড়-বড় সরকারী কাজ ছাড়া আর প্রায় সব কাজই ইহারা করে। আফিসের কেরাণী, জঙ্গলের কুলী, যে দু'-একটি সরকারী কারখানা আছে তাহার মজুর এবং ক্ষেতের চাষী—বেশীর ভাগই এই সম্প্রদায়ের লোকরা।

কিন্তু জাপানীদের অত্যাচারে ইহাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এবং বন্দিনিবাস তুলিয়া দেওয়ার সময় কিম্বা অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সব কয়েদীকে স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরায় অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই নূতন সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। এই কারণে আন্দামানে এখন কাজের তুলনায় লোকসংখ্যা কম এবং প্রধানতঃ এই জন্যই চাষের জমির কিছু পরিমাণ আবার জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ জমির পরিমাণ ৩ হাজার একর কিম্বা ৩ হাজার বিঘা এবং প্রতি পরিবারকে যদি ৬ একর কিম্বা ১৮ বিঘা জমি দেওয়া হয় তাহা হইলে ৫০০ পরিবারের ব্যবস্থা এখনই হইতে পারিবে। এক-এক পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক থাকে সাধারণতঃ এইরূপ হিসাব ধরা হইয়া থাকে, এবং সেই হিসাবে বর্ত্তমানে দক্ষিণ-আন্দামানে সর্ব্বসমেত ৩ হাজার লোকের বসতি হইতে পারে

এই ভাবে মধ্য-আন্দামানেও ১৫০ হইতে ২০০ লোকের ব্যবস্থা হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে এই সামান্য কয়েক হাজার লোকের বসতি বিশেষ কোনও কাজে লাগিবে না। অপর পক্ষে আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা ইহাপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মাত্র ১৬ বর্গ-মাইল ছাড়া দ্বীপপুঞ্জের আর বাকী সব জমি বর্ত্তমানে বন-বিভাগের আয়ত্তাধীনে। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকৃত জমির অর্দ্ধেক উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। যদি এই সুযোগ গ্রহণ করা যায় এবং প্রতি পরিবারকে চাষের জন্য ১৮ বিঘা জমি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ৬ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা হইবে। যদি প্রতি পরিবারকে ২৭ বিঘা করিয়া জমি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ৪ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা হইবে। জমির পরিমাণ আর বাড়াইলে লোকের সংখ্যাও অনুপাতে কমিয়া যাইবে। যেরূপ হিসাবই হউক, কম পক্ষে ৪ লক্ষ লোকের বসতির ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু বন-বিভাগ যে জমি ছাড়িয়া দিবেন তাহা বাসের ও চাষের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে যেমন অনেক টাকার দরকার হইবে তেমনি অনেক সময়ও লাগিবে। জঙ্গল পরিষ্কার করার ব্যয়ভার সাধারণ ঔপনিবেশিকদের পক্ষে বহন করা ত সম্ভবই নহে, এমন কি গবর্ণমেণ্টের সাধারণ রাজস্ব-ভাণ্ডার হইতে এই টাকা যোগান কঠিন। তা ছাড়া সাধারণ নিয়মে জমি পরিষ্কার করার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও চলিবে না। যে জমি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দেওয়া হইবে তাহাতে যে বনসম্পদ আছে, তাহার মূল্য অনেক। সুতরাং জমি পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পদকে দেশের আর্থিক উন্নতির কাজে লাগাইতে হইবে এবং এই জন্য এই কাজের ভার প্রধানতঃ বন-বিভাগের হাতেই দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এবং ব্যবসার নীতি অনুসরণ করিয়া গাছ কাটিয়া জমি পরিষ্কার করিতে পারিবেন, এবং এই জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা কাঠ বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে পারিবেন। অবশ্য ইহার জন্য বন-বিভাগের বর্ত্তমান সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। তাঁহাদের বর্ত্তমান সঙ্গতির উপর নির্ভর করিলে গাছ-কাটার কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি আন্দামানে লোক-বসতির প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহে বন-বিভাগের সঙ্গতি ও শক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বন-বিভাগ কর্ত্তৃক গাছ-কাটার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ার পরও জমি পরিষ্কার করিবার অনেক কাজ থাকিয়া যাইবে। ইহার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার কিছু অংশ গবর্ণমেণ্টকেই লইতে হইবে এবং বাকীটা ঔপনিবেশিকদের বহন করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ ঔপনিবেশিকদের পক্ষে তাঁহাদের ভাগের টাকা দেওয়া হয়ত সম্ভব না হইতে পারে। এই কারণে যদি কোনও কোনও অর্থশালী ব্যক্তি আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে লোক-জন লইয়া সেখানে যান তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আর একটা কথা ভাবিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, আন্দামানে যে নূতন উপনিবেশ স্থাপন হইবে তাহাতে কৃষি-মজুর কিম্বা ভাগ-চাষের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে না, এবং প্রতি পরিবারকে ঠিক তত পরিমাণ জমিই দেওয়া উচিত হইবে যাহা পরিবারস্থ লোক দিয়া অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে চাষ করা সম্ভব। নীতির দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে এই ব্যবস্থা যতই আদর্শস্থানীয় হউক না কেন, জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে যে প্রাথমিক কার্য্যাবলীর প্রয়োজন হইবে তাহা সাধনের পক্ষে ইহা কতখানি কার্য্যকরী হইবে তাহা সন্দেহজনক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন তাহা জানিবার পূর্ব্বে ঔপনিবেশিকদের পক্ষে আন্দামানে যাওয়া সম্ভব হইবে না। কাজেই আশা করা যায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই ঘোষণা করিবেন।

আন্দামানে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সব বিশেষজ্ঞেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জমির উর্ব্বরতার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেখানে যে সব জমিতে চাষ হয়, তাহাতে ধানই বেশী উৎপাদন হয়। গমের পক্ষে জমি খুব উপযোগী নহে। দক্ষিণ-আন্দামানে প্রায় প্রত্যেক কৃষকই ইক্ষু চাষ করিয়া থাকে; তাহারা ইক্ষু চাষের কোনও আধুনিক পন্থা জানে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অযত্নবর্দ্ধিত ইক্ষু দেখিয়া মনে হয়, আন্দামানের সর্ব্বত্রই ইহার সম্ভাবনা খুব বেশী। গত বৎসর পাট চাষেরও চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু যদিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা হয় নাই, তাহা হইলেও প্রথম চেষ্টার ফল মোটামুটি ভালই হইয়াছে। আলু একেবারেই হয় না, চাষের চেষ্টাও কোনও দিন করা হয় নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন আন্দামান জাপানীদের অধীনে ছিল, তখন তাহারা সেখানে মিষ্টি আলু চাষের চেষ্টা করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বর্ত্তমানে আন্দামানে বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, করলা, মূলা, মটরশুঁটি, মাষকলাই, পান ও কলার চাষ হয়। নারিকেলের পক্ষে আন্দামান অতি প্রশস্ত দেশ, এবং চা, কফি ও রবার চাষের চেষ্টা করিয়াও ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বাঁশ এবং বেতেরও যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আন্দামানের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ১৫ হাজারের বেশী নহে। দীর্ঘকাল যাবৎ বন্দিনিবাসরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে দ্বীপের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোনও চেষ্টাই করেন নাই। এই অবস্থায় কৃষির ব্যবস্থা ইহাপেক্ষা ভাল হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু দলে-দলে মূল ভূখণ্ড হইতে ঔপনিবেশিকেরা সেখানে গেলে তাঁহাদের যত্নে এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় নানা প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যে আন্দামান স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে, এমন কি ধান, পাট ও চিনির বিষয়ে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারিবে, এইরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

নূতন উপনিবেশ স্থাপন হইলে লবণ এবং মাছের সরবরাহও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে অসংখ্য খাঁড়ি রহিয়াছে। এই সব লবণাক্ত জল হইতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় লবণ প্রস্তুত করা খুব বেশী কষ্টসাধ্য হইবে না। সমুদ্রের জলে নানা প্রকার মাছেরও যথেষ্ট প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু ধরিবার লোকের অভাবে এবং শীতলীকরণের ব্যবস্থা না থাকায় এই সুযোগ কোনও কাজেই লাগিতেছে না।

নানা প্রকার শিল্পেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আন্দামানে যে প্রচুর বন-সম্পদ আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রকারের কাষ্ঠশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বিশেষতঃ প্লাই উড, দেশলাই,

প্যাকিং বাক্স, আসবাব-পত্র—এই সব শিল্পের পক্ষে আন্দামান বিশেষ উপযোগী। বাঁশ, বেত, ও ঘাস হইতে কাগজ-শিল্প, নারিকেল হইতে তৈল ও দড়ি শিল্পেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু কৃষি, শিল্প কিম্বা মৎস্য কোনও বিষয়েই কোনও উন্নতি হইবার কোনও আশা থাকিবে না যদি দ্বীপে নূতন উপনিবেশ স্থাপন না হয়। যাঁহারা সামান্য কিছু অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিতে যাইবেন তাঁহারা যে কেবল আন্দামানেরই উন্নতি করিবেন তাহা নয়, তাঁহারা নিজেরাও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি এবং একটি সমাজ গড়িয়া তুলিতে যে সব বিভিন্ন বৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহাদের পক্ষেও একটা নূতন সুযোগ উপস্থিত হইবে। ছুতার, কর্ম্মকার, ধোবা, নাপিত, পুরোহিত, বিদ্যালয়-শিক্ষক, চিকিৎসক, দোকানী, পশারী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের কর্ম্মীদের পক্ষে নূতন দেশে নূতন করিয়া জীবনযাত্রার সুযোগ হইবে।

অবশ্য এ কথাও মনে করিতে হইবে যে, আন্দামানের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে গিয়া বসবাস সম্ভব হইবে না। কারণ আপাততঃ সেখানে জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহার জন্য এমন লোকের সেখানে যাওয়া উচিত যাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ করিতে পারিবে। সমুদ্রের জলে মাছ ধরিতে পারে এমন লোকেরও সুযোগ বর্ত্তমানে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া কল-কারখানায় মজুরের কাজের উপযুক্ত, এবং বেশী সংখ্যক চাষী ও জেলে যাইলে তাহাদের সঙ্গে সেই অনুপাতে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী প্রভৃতি শিল্পীদেরও খুব বেশী চাহিদা হইবে। এই সব কাজের জন্য দরকার হইবে এমন এক দল লোকের, যাহাদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আছে এবং শারীরিক পরিশ্রমে যাহারা বিমুখ নহে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা এই সব শ্রমজীবীদের সুখে-দুঃখে সমভাগী হইয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিতে পারিবেন, আন্দামানে তাঁহাদেরও এই মুহূর্ত্তেই নানা প্রকার সুযোগ রহিয়াছে। এই ভাবে উপনিবেশ গঠনের কাজ কিছু অগ্রসর হইলে পর আরও অনেক বুদ্ধিজীবীদের সুযোগ আসিবে। ঔপনিবেশিকদের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা প্রকার পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ এবং বেচা-কেনার নানা কাজে অনেক শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন হইবে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে শিক্ষকের এবং রোগ-নিবারণ ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকেরও চাহিদা বাড়িবে।

কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন চাষের ও কল-কারখানার জন্য অনলস কর্ম্মীর। বাংলা দেশে কল-কারখানায় বর্ত্তমানে যাহারা কাজ করে তাহাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। সেই অবস্থায় আন্দামানের কারখানায় বাঙ্গালীরা দলে দলে কাজ করিতে যাইবে এইরূপ আশা করা কতখানি সঙ্গত তাহা বলা কঠিন। এ পর্য্যন্ত সেখানে মূল ভূখণ্ড হইতে যত কুলী-মজুর কাজ করিতে গিয়াছে, তাহার শতকরা ৯১ জন অবাঙ্গালী। এই বিষয়ে আমাদিগকে এখন হইতেই অবহিত হইতে হইবে। কিন্তু কল-কারখানার কথা ছাড়িয়া দিলেও চাষের জন্য এবং গ্রামাশিল্পের জন্য বাঙ্গালী কর্ম্মীর অভাব হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বাংলা দেশে আজ লোকসংখ্যার চাপ যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীকে আর ঘরমুখী হইয়া থাকিলে চলিবে না। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সম্মুখে আজ জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত। এক দিকে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী, কারখানার মজুর, অপিসের বেয়ারা, দরোয়ান, ট্যাক্সি, রিক্সা, ঠেলা-ড্রাইভার, অন্য দিকে পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত সর্ব্বস্বান্ত আশ্রয়প্রার্থীর আগমন। দেশ বিভাগের ফলে প্রদেশের আয়তন সীমাবদ্ধ, পশ্চিম অভিযানের সাফল্য সন্দেহ-জনক। এই অবস্থায় তাহারা কি আজ কেবল অবাঙ্গালী ও পাকিস্তানীকে নিন্দা করিয়া সময় কাটাইবে? পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতিকেও কোন-না-কোনও সময়ে অনুরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আজ ইতিহাসের পাতায় কীটদষ্ট হইয়া আছে। আর যাহারা সাহস করিয়া তাহাদের দুর্য্যোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের কৃতিত্বে পৃথিবীর ইতিহাস গৌরবান্বিত। বাঙ্গালীকেও আজ এই জীবন-সঙ্কটক্ষণে তাহার পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। ঐতিহাসিক কারণে বাঙ্গালী আন্দামানের প্রতি বিরূপ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিদ্বেষের কোনও কারণ নাই। অন্য পক্ষে এ কথাও বলা চলে না যে, সেখানে অবিলম্বেই সোনার ফসল হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহারা আপাততঃ কিছু সামান্য কষ্ট ভোগ করিতে রাজী আছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি হইবে, যাহা ক্ষুদ্রায়তন জনাকীর্ণ পশ্চিম-বঙ্গে সম্ভব নহে। এই কথা মনে রাখিয়া বাঙ্গালীকে আজ আন্দামানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সেখানে না গেলেও আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু আমরা যদি এখন এই সুযোগ হারাই পরে আমাদিগকে এই জন্য অনুতাপ করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা

"কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল-কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন-যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এদেশে সার্ অশলি ইডেন, ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে, ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র

বাড়ীর ভিতর একটা সংবাদ গেল নাট-মন্দিরে এক দল অতিথ এসেছে। তারা মেয়ে দেখবে। সংগে তাদের ঘটক মাবি-মাল্লা চাকর-বাকর আছে। যেন ছোট-খাট সৈন্যবাহিনী একটা।

বিপ্রপদ তাদের আদর-যত্ন করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকালের দিকে কথাবার্ত্তা হবে। অবশ্য মেয়ে দেখে পছন্দ হলে দেনা-পাওনার জন্যে আটকাবে না।

বাড়ীর ভিতর একটা ধূমধাম পড়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা আসে। বড়লোকের মেয়ের সম্বন্ধ, একটা দেখার জিনিষ বটে—ঘরে লোক আর ধরে না। হাসি, আনন্দ, হট্টগোলে বার-মহল ভরপুর। সে ঢেউ রান্না-ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে—তার পর যায় পুকুর-পাড়ে। তার পর উঠানে ও আঙিনায়।

কমলকামিনীর অন্তর নাচতে থাকে। কখনও আশায় কখনও আশংকায়।

বিমলাকে নিয়ে একটা মহড়া চলেছে। কি ভাবে হাঁটবে—কি ভাবে কথা বলবে—তাদের প্রশ্নেরই বা জবাব দেবে কি ভাবে। এই সব নিয়ে একটা উপদেষ্টা-মণ্ডলী খাড়া হয়েছে। ঠানদিদিশ্রেণীই এ মণ্ডলীর প্রতিনিধি। তারা কেউ বা শ্লীল কেউ বা অশ্লীল দু'-একটা বিদ্রূপও করছেন কানের কাছে।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর আবার খবর এলো, যারা মেয়ে দেখতে এসেছে তারা একটি নয়—দু'টি মেয়ে চায়। এবার শ্যামলার পালা। তাকে নিয়ে পড়ে সকলে। বিমলা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের জন্য শ্যামলা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে বেচারী একেবারে কাবু হয়ে পড়ে। মাধুরী তার সই। সে এক সময়োপযোগী একটা মিষ্টি হাসির গান জুড়ে দিল। পাড়াগাঁয় মেয়ে দেখান একটা মহোৎসবের সামিল। তাই বিপ্রপদর ঘরে হাসি আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে নাট-মন্দিরে বসে বিপ্রপদর সাথে ছেলে-পক্ষের নানাবিধ আলাপ-আলোচনা হয়। কৌলিন্যের বিকট ব্যাখ্যা করল কেউ, কেউ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাড়ী-ভূড়ি টেনে আনল। কেউ বা সামাজিক অনুশাসন মন্থন করে একটা অখণ্ডিত উদ্ধার করল। বিপ্রপদ কতক বুঝে কতক না বুঝে উত্তর দিলেন।

তাঁর সংগে আলাপ করে পাত্রপক্ষ বুঝল তিনি এক জন বিশিষ্ট কুলীন এবং বিদ্বান লোক, খুব বুদ্ধিমানও বটে। কারণ তাঁর নাম আছে, আর আছে নাম রক্ষা করার মত পয়সা। তারা দেনা-পাওনার ভারটাও তাঁর ওপরই ন্যস্ত করে। এ-সব স্থানে এমনি ঠেকিয়ে দিলেই লাভ হয় বেশী।

মেয়ে দু'টি আসতেই ঘটক মশাই যাতে তাদের কোনও দোষ-ত্রুটি না হয় এমনি ভাবেই কথাবার্ত্তা বলতে থাকে। 'এসো মা, এসো মা, এঁদের প্রণাম করে এখানে বসো। দেখছেন, কেমন সুন্দরী, যেন বিলেতী পটে-আঁকা ছবি দু'টি।'

'তোমার নাম?'

'বিমলা।'

'তোমার?'

'শ্যামলা।'

'রঙ.টি তো বেশ নির্ম্মলা! যেমন বাপ তাঁর তেমনি বেটি—এ আর না দেখলেও চলে। এমন মেয়ে এ পরগণায় নেই। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত। আমি যা-যা বলেছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না এখন মিলিয়ে দেখে নিন। এর মধ্যে আর গোপনের কিছু নেই। এরা যে ঘরে যাবে সে ঘরে মা-লক্ষ্মী এসে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হবেন। তার নজির এদের মা। উপস্থিত হিন্দু মুসলমান সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমার কথা সত্যি কি না?'

বরপক্ষ বিপ্রপদর জৌলুস দেখে আগে থাকতেই হকচকিয়ে গিয়েছিল—এখন মেয়ে দেখে তারা কিছু প্রশ্ন পর্যন্ত করতে ভুলে গেল। এ-বাড়ীর মেয়ে তারা নেবেই।

এখন বিপ্রপদর অনুমোদন-সাপেক্ষ। তাঁর ছেলে দেখে পছন্দ হলে এ কাজ দু'টো অনায়াসে হতে পারে। ছেলে দু'টি কলকাতায় কাজ করে। যেমন পাশ, কামাইও করে দু'পয়সা। বিপ্রপদর এক শ্যালক কলকাতায় থাকে। তার কাছে চিঠি লিখে দেওয়া হবে পাত্র দেখতে। তার পছন্দ হলেই সকলের পছন্দ। বিয়ের দিন-তারিখ অগ্রহায়ণ মাসেই ঠিক হয়ে যায়। শুভ কাজে বেশী দেরী হওয়া ভাল না। তিনি এবার ছুটি ফুরাবার আগেই বিয়ে দিয়ে দিতে চান। আর এই তাঁর প্রথম কাজ, রীতিমত খরচ-পত্তর হবে। যে যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে তাকেই আনতে হবে। বাজনা-বাজীরও ব্যবস্থা না করলে চলবে না—হয়ত ঠেকে যাত্রা-গানও দিতে হতে পারে। এ-সব ভাবতে গেলে বিপ্রপদর মাথা ঘুরে যায়। কত খরচ যে হবে তার ঠিক কি! এই তো সবে তালুক কিনলেন—একটা ধাক্কা সামলাতে আর একটা ধাক্কা এসে হাজির।

তিনি মনে মনে টাকার একটা হিসাব করেন। কোথায় তাঁর কত টাকা জমা আছে! কমলকামিনীর বাক্সের নীচে আধুলী রয়েছে চার হাজার। তাঁর শয়নকক্ষে তক্তাপোষের নীচে একটা মটকি আছে পোঁতা—তার ওপরে কিছু চাল নীচে সব টাকা। এগুলো রাণীর মুণ্ডের টাকা, বহু পূর্বের সঞ্চয়। অনুমান তিন হাজারের বেশী কিছু হতে পারে। অনেক দিন দেখা হয়নি, একবার তুলে গুণে দেখতে হবে। কিন্তু তা তো ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা না করলেই বা চলবে কি করে? ঘরের সকলে ঘুমালে এগুলো

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

তক্তাপোষ সরিয়ে অতি সংগোপনে ঠিক চোরের মত তুলতে হবে। দু'দণ্ডটা মশার কামড়ও খেতে হবে। হয়ত কমলকামিনী জানলে প্রথম বাধা দেবেন। ওগুলো তার বুকের রক্ত। পরে অনেক বুঝিয়ে কাজ সারতে হবে। কিন্তু তাও পারাল হয়—নইলে অমনি থেকে যাবে ও-টাকা।

আর টাকা আছে একেবারে বাইরে—হাঁসের খোপের নীচে। সেখানে রাখা হয়েছে যে-বার অমরেশ হয় সে-বার এক দিন শেষ রাত্রে। রোজ হাঁসের ডিম আনতে গিয়ে কমলকামিনী একবার করে জায়গাটা দেখে আসেন। খুব হুঁশিয়ার মেয়েমানুষ এমনি না হলে চোর-ডাকাতের হাত থেকে রাখা যায়! যাক, কোন প্রকারে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবেই। বিয়ে না দিয়ে তো ঘরে মেয়ে রেখে পোষা যাবে না! বিধাতা না ঠেকালে মানুষ কিছুতেই ঠেকে না। তবে কি না বড় হাল্কা হয়ে যেতে হবে। হলে আর কি-ই বা করা যাবে! মানুষের ধারণা, তিনি লাখপতি। লাখ টাকা আর ক'টাকা? ভান-বাঁ চললেই মানুষে এমনি ভাবে। ভাবে, ভাবুক—মন্দ কি!

এই দু'টি পার হলেও নিজেরই থাকবে কতগুলি! শিবপদর তো আছেই। দেবপদর হবে। অত ভাবলে মাথা খারাপ হয়। যখন যেটার তাগিদ আসবে তখন সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আগে ভাগে অস্থির হলে লাভ কি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরনো চিটে গুড়ের টিনের মধ্যেও তো কিছু রেস্তগি সঞ্চিত আছে। যাক্ যাক্, চলে যাবে। ঈশ্বর ভরসা!

ঘটক মশাই বলে, 'মা-লক্ষ্মীরা বসে আছে—এখন আপনারা অনুমতি দিলেই ওরা উঠতে পারে।'

প্রথম বরপক্ষের এক জন বলে, 'আমাদের আর দেখার প্রয়োজন নেই। আপনাদের?' বলে দ্বিতীয় পক্ষের দিকে তাকায়।

'না, না, আমাদের নেই মোটেও।'

মেয়েরা যথারীতি প্রণাম করে উঠে যায়। এবার ঘটক মশাই জামার বুতাম খুলে বুকের ওপর সজোরে একটা ফুঁ দেয়। এ যাত্রা সে বাঁচল। মেয়েদের থেকে সেই যেন বিষম দায় ঠেকেছিল।

বিমলা ও শ্যামলা ঘরে যেতেই আর একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

মাধুরী দু'বোনের গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'পুরুষ মানুষ হলে আমি এক্ষুণি নিয়ে যেতাম তোদের নায় তুলে! এখন ভাদ্র মাস, বরে আসবে অঘ্রাণ মাস—অত দিন আমার তর সইতো না। বাপ দু'টো নিতান্ত বেরসিক—তা না হলে—' আর বলা হয় না, কমলকামিনী এসে পড়েন। তিনি চলে যেতেই বিমলা বলে, 'তুই নিতান্ত ছ্যাবলা।'

'আর তোরা একেবারে অ-ব-লা! দেখা যাবে, দেখা যাবে, আসুক শালারা।'

'অসভ্য কোথাকার!' বিমলা বলে, 'তোর সুড়সুড়ি—'

শ্যামলা বাধা দেয়, 'চুপ দিদি চুপ, বাবা আসছে এদিকে।'

'শ্যামলা বিমলা দু'জনে এদিকে আয় তো মা—তোদের নাম লিখে দে তো এই কাগজটায়। একটু ভাল করে লিখিস্।'

ওরা লিখে দেবে বলে ওঠে। বিপ্রপদ এগিয়ে আসেন। লেখা হলে তিনি কাগজখানা নিয়ে চলে যান।

মাধুরীর আবার মুখ চলতে থাকে। 'আমি একাই তোদের দু'বোনকে নিয়ে যেতাম বিয়ে করে।'

বিমলা বলে, 'অভাগীর আশা দেখ! সামলাতি কি করে?'

'কশে চাবুক মেরে।'

'মেয়েমানুষের গায় হাত তুলে দেখেছিস্?'

'কত দেখেছি।' বলে সে পুরুষের পৌরুষ নিয়ে গর্ব অনুভব করতে চায়। 'আমরা হলাম ভোমরার জাত—একটুতেই হুল ফুটিয়ে দিতে পারি।'

'এ্যাঁ, দেখব, দেখব, কত তেজ!'

'কার তেজ দেখবি? আমার না যে আসবে তার?'

এবার বিমলা লজ্জা পায়। তবু বলে, 'তোর।'

'তবে দেখ আগে আমারটাই সয়ে!' মাধুরী সবেগে বিমলাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে অনেকগুলো চুমো খায়। শ্যামলা ভয়ে পালাতে চায়—মাধুরী তাকেও রেহাই দেয় না।

আজ আনন্দের মধু-মেলা—ওরা তিনটিতে হাস্য-পরিহাসে ডগোমগো করতে থাকে।

২৮

অল্প কিছু দিন হয় দুর্গাপূজা হয়ে গেছে।···

কার্তিক মাস। দিন ক্রমশঃ ছোট হয়ে রাত বড় হচ্ছে। কাজ-কাম সেরে স্নান করে খেয়ে উঠলেই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু রাত আর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। উত্তরের বাতাসের সাথে দক্ষিণা হাওয়ার দ্বন্দ্ব বেধেছে। একটু একটু করে হিমেল হাওয়াবই জয় হচ্ছে। বিপ্রপদ ভাবেন: এবার আর গাছের মাথায় সুপারি রাখা যায় না পেড়ে বিক্রি করা দরকার। থোকা-থোকা সুপারি পেকে লাল টুকটুকে হয়েছে—কোনও কোনও ছড়া গাঢ় হলুদ দেখাচ্ছে। দু'টো চারটে যদি কাঁচা থাকে থাকুক—তা কোট ভিজিয়ে মধ্যেই করালেই চলবে। এ সুপারিতে এবার কম টাকা হবে না— সংসারী সাধারণ খরচ-পত্তর কুলিয়ে যাবে। তিনি আর থোকের টাকায় হাত দেবেন না। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাস ধরে নারকেল জমা করেছিলেন গাছ থেকে পাড়িয়ে, তাও পূজার মরসুমে বেচে কম টাকা পাননি। এ সব গাছ তাঁর নিজের হাতে লাগান, নিজেরই পরিশ্রমে জন্মান ফসল। প্রথম জীবনে খেটেছেন, এখন তার ফল বসে বসে ভোগ করছেন। এখন আর বিশেষ কোনও তদ্বির-তালাপি লাগে না বছর বছর কিছু নতুন মাটি গাছের গোড়ায় দিলেই যথেষ্ট। সাধারণ গৃহস্থেরা এ সব দিয়েই সংসার চালায়। অবশ্য প্রায় প্রত্যেকেই ধান যে কিছু না পায় তা নয়। তবে প্রায় চার-পাঁচটা মাস এই ফসলের ওপরই নির্ভর। কিন্তু এখন বিপ্রপদর খরচ বেশী এ সব টুকিটাকিতে কুলায় না। ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করতে গেলে তার চাল-চলন আলাদা—খরচ-পত্তরও বেশী যা হ'ক, তিনি সুপারি পাড়তে হুকুম দেন। কৃষাণেরা আসে—ভাগে কাজ করে যায়। সুপারি বেচে পান তিনশো টাকা। আর খাবার জন্য তো ঘরে প্রচুর মজুত থাকে। বছর ভরে কাটবে, বিলাবে, ফেলে ছড়িয়ে যাবে—তার আর হিসাব কে করে।

কিন্তু হাত একটু টান হলেও বিপ্রপদ আসল কাজে ভুল করেন না। ঐ টাকা থেকে কিছু টাকা ব্যয় করে গাছের গোড়ায় সার মাটি দেন।

আজকাল প্রায়ই খবর আসে এখানে ডাকাতি হচ্ছে, ওখানে রাহাজানী হচ্ছে বিপ্রপদর শুনে ভয় হয়। ভয়টা শেষে বিরক্তিতে পরিণত হয়। শালারা খেটে খেতে পারে না? পরের ধনে এত লোভ কেন? লোভ হবেই বা না কেন? সারা জীবন না খেটে এক রাত্রে রাজা। কিন্তু চোর-ডাকাতের বাড়ী তো দালান দেখা যায় না। যেমন আনছে, তেমনি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে পাপের ধন যায় প্রায়শ্চিত্তে।

ঠিক সেই সময় শ্যামাচরণ হেঁটে যাচ্ছিল। বিপ্রপদ তাকে ডেকে বসতে বলেন, জিজ্ঞাসা করেন, 'আজকাল খুব না কি চুরি-ডাকাতি হচ্ছে?'

'হুঁ বাবু, হচ্ছে বই কি! এই তো দু'-দু'টো ডাকাতি হল পাহাড়া আর মাণিকখালি। এই তো সেদিন।'

'বলো কি, জ্যোৎস্না রাত্রে ডাকাতি! যাই বল, শালাদের ভালই হবে না।'

শ্যামাচরণ নাট-মন্দিরে উঠে বসে, তামাক সাজে এবং বলতে থাকে, 'ভাল হওয়া না হওয়া পরের কথা—আপাততঃ কিল-চড়-লাথি-গুঁতো খায় কে? ওদের মায়া-মমতা কি ধর্মজ্ঞান আছে না কি? শ্যাওড়ার একটি বৌর নাক কেটে নিয়েছে নয়, একটি মেয়ের কান কেটে নিয়েছে মাকড়ী। বলু তো বাবু, কি বীভৎস কাণ্ড!'

'পুলিশে খবর দেয়নি তারা?'

'দিয়েছে বই কি! কিন্তু ওরা পয়সা পেলে, সে আর বলে কাজ কি—আপনি তো জানেনই সব। ওরাই তো দেশের যত নষ্টামী জুইয়ে রাখে, চোর-ডাকুকে দেয় আস্কারা। সেবার কাসেম হাতে-হাতে ধরা পড়ল কিন্তু দারোগা বাবুর দয়ায় রাজসাক্ষী হয়ে খালাস পেল—তার পর সে যে কত ডাকাতি করেছে তার কি ইয়ত্তা আছে?'

'কিন্তু করিমের ঘরে তো ভাত নাই—ছেলেমেয়েগুলো এখন ভিক্ষে করে খাচ্ছে।'

'ভাত থাকবে কি করে? বামাল ফেলে রেখে পুলিশের তাড়ায় ওরা তো বনে বাদাড়ে পালায়—এদিকে যত পুলিশের চেলা-চামুণ্ডারা লুট করে—অর্থাৎ চোরের ওপর বাটপাড়ী,—ওরা ফিরে এসে কিছুই পায় না। ধরা পড়লে জেল, এড়িয়ে থাকলে উপোষ।'

'তবু তো স্বভাব ফেরে না।'

'সেইটাই তো ওদের বড় দোষ। বুঝেও বোঝে না কিছু।'

'সোনা চোরার নাম শুনে শ্যামাচরণ? সে একটা অসাধারণ লোক ছিল।'

'না, মনে তো পড়ে না।'

'বাবার মুখে শুনেছি: সোনা ও খোনারা ছিল দু'ভাই সোনাই না কি ছিল মহা ওস্তাদ। লোকে জ্বালায় জ্বালায় অস্থির হয়ে, এক দিন জোর করে ধরে ওর কব্জি ঠেকিয়ে দেয় হাত কেটে। তবুও ওদের কি বজ্জাতি যায়! যারা ওর হাত কেটে নিশ্চিন্ত হল, ও নুলোতে মশাল বেঁধে তাদের ঘরেই দিত আগুন। আক্ত-বাক্ত কথা না বলে শেষটায় কি হল বলি শোনো: ওর বুদ্ধি ফিরল এক ফকিরের সংগে দেখা হয়ে। ফকির পরামর্শ দিল, তুমি ভিক্ষে করে রোজ যা পাবে তাই খাবে। আর অন্যায় করো না—খোদা তোমাকে মাপ করবেন। সারা দিন উপোষী থেকেও রোজ সন্ধ্যা বেলা খয়রাত করতে নামে। এক দিন এক মহাজনের গদিতে গিয়ে হাজির। সে তখন তহবিল মিলাবে—টাকা গুণছে। সোনা গিয়ে কিছু খেতে চাইল। নুলোকে দেখে মহাজন অবজ্ঞায় খেঁকিয়ে উঠল। সোনা সেদিকে খেয়াল না করে আবার কিছু খেতে চাইল। কিন্তু এবার মহাজন আরও কর্কশ হয়ে উঠে ঘাড় ধরে ঠেলে ফেলে দিল রাস্তায়। সোনা চলে গেল।'

বিপ্রপদ একটু পাশ ফিরে বসে ফের বলতে লাগলেন, 'তার পর শোন মজার কথা: রাত্রে মহাজনের সিন্দুক থেকে টাকা উধাও। এ এক ভোজবাজী! চার দিকে হৈ-চৈ দৌড়াদৌড়ি, পুলিশে সংবাদ। অনেক খোঁজ-খবর অনুসন্ধান করে জানা গেল—গত কাল যার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেছে সে এক জন পাকা চোর। এ কর্ম্ম আর কারুর নয়, তারই। সে হাটখোলা একটা ভাংগা 'কাচারীতে' থাকে কোনও রকম দু'খানা চাল আছে, বেড়ার বালাই নেই। মহাজন ছুটে গিয়ে দেখে যে সেখানে সব টাকা পড়ে রয়েছে—শুধু একটা দু'আনি নেই। টাকাগুলো পেয়ে মহাজন কাঁদবে না হাসবে বুঝতেই পারে না!

'সোনা' সিন্দুক খুলল কি করে?'

মন্তর জোরে। ও কি যে-সে লোক! ওকে কেউ কক্ষনো জেলে আটকে রাখতে পারেনি। ইঁদুর হয়ে না কি পালিয়ে আসত। ওরও তো স্বভাব ফিরেছিল, তবে এদের যে স্বভাব ফিরবে না, এ কোনও কথাই নয়।"

শ্যামাচরণ জবাব দেয়, "তাতে নাকের ঘায়ের কি? দু'টো পয়সা থাকলে আর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান যাবে না—কখন শালারা এসে চড়াও হয়। রাতারাতি আর সবাই সাধু হবে না।'

এমন ধারা আরো সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব অনেক গল্প হয়। সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা চলে, কিন্তু মনের ভয় কাটে না। ঘুমন্ত অবস্থায় কখন কি ঘটে! সাহস-শক্তি মানুষের কিছুই নয়—ঘুমালে মরার সামিল!

তবু বিপ্রপদ ছোট দু'ভাইকে ডেকে কিছু অস্ত্র শাণিয়ে রাখতে বলেন। নিজে একখানা বড় রামদায় ধার দিতে বসেন। ধার দেওয়া হলে সেখানায় তেল মাখিয়ে নিজের শিয়রে টানিয়ে রাখেন। শক্ত কয়েকখানা লাঠি-সোটাও গুছিয়ে হাতের কাছে রাখা হয়। বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল, তার পর যত দূর যা ঘটে ঘটুক।

গভীর রাত্রে বিপ্রপদ ও কমলকামিনী ফিস্-ফিস্ করে কথা বলেন। চার দিকে শংকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন। কেউ কি তাদের দেখছে? কেউ কি শুনছে তাদের কথা? না! তারা দু'জনে ঘরের ভিতরের তক্তাপোষটা সরিয়ে মটকিটার চাল তুলে ফেলেন। বিপ্রপদ শুয়ে শুয়ে তোলেন—কমলকামিনী সরিয়ে গুছিয়ে রাখেন। এবার টাকা উঠছে। টাকাগুলো কেমন ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে।

কমলকামিনী বলেন, 'খুব সাবধান—শব্দ হয় না যেন একটা টাকার …আঃ, একটু ধীরে।'

'আচ্ছা, ধামাটা এগিয়ে দাও।'

হঠাৎ কয়েকটা টাকা ঝন্‌ঝনিয়ে পড়ে যায়। কমলকামিনী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'তুমিই সর্ব্বনাশ করবে। ওই তো শিবপদ সজাগ হয়ে বাতি জ্বালাবার জন্য দেবুকে না কাকে যেন বলছে। কি বিপদ!' তিনি তাড়াতাড়ি একখানা কালো কাপড় এনে টাকার ধামাটা ঢেকে

ফেলেন। পূর্ব থেকে বন্দোবস্ত ছিল বলেই অন্ধকারে এ সব আন্দাজ করতে তেমন কষ্ট হয় না। বিপ্রপদও অপ্রস্তুত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। কমলকামিনীকেই বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হয়। 'কিছু না ঠাকুরপো, সেবার বার্লির বাটিটা সেই হুলো বেড়ালটা ফেলে দিয়েছে। ওটার জ্বালায় অস্থির—তোমরা ঘুমাও—কিছু না।'

শিবপদ আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

আবার বিপ্রপদ ও কমলকামিনীর দ্রুত হাত চলতে থাকে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকেন খুব সাবধানে।

টাকা তুলতে সময় কম লাগে না। কমলকামিনী এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে থাকেন। মটকি খালি হলে বাক্স খুলে আধুলিগুলো আনা হয়। এখন টাকাগুলো এমন স্থানে নিরাপদে সরিয়ে রাখতে হবে যে কেউ না কিছু সন্দেহ করতে পারে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হয়—কতক রাখবেন গোয়ালে আর কতক মেটে আলুর গাছের গোড়ায় ছাইয়ের ঢিবির তলায়। এ সব স্থানে বড় একটা লোকের যাতায়াত নেই।

ঘর থেকে টাকাগুলো বাইরে নিয়ে যেতে বিপ্রপদর বুকটা অস্থির হয়ে ওঠে—কিন্তু এ ছাড়া নিরাপদ করার আর দ্বিতীয় পথ নেই। তাই আর ভেবে সময় নষ্ট করেন না।

এবার চিটে গুড়ের টিনগুলো নিয়ে কোথায় রাখবেন? রোজগি তো সর্বদা কাজে লাগে। শেষ পর্য্যন্ত সেগুলো নিয়ে রাখেন গোয়ালের পাশে একটা তুষ-কুঁড়োর জঞ্জালের নীচে, বেশ নির্জ্জন অন্ধকার কোণটায়।

এখন যদি ডাকাত আসে নিতান্ত বোকা হয়ে ফিরে যাবে। তবে সোনার গহনাগুলো মাটির নীচে পুঁততে হবে। তা কাল রাত্রে করলেই চলবে—আজ আর সময় কই? পূব দিক্ ফর্সা হয়ে এল যে। ঐ মুসলমান-পাড়ায় মুরগী ডাকছে। বিপ্রপদ ও কমলকামিনী হাত-পা ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং বেশ নিশ্চিন্ত মনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হন।

স্থানে-স্থানে ওদের দৌলত সরিয়ে রেখে ভাবনা কমেছে। হঠাৎ যদি ডাকাতে হানা দেয়, মার-পিট করে, তবে ওঁরা মুখ বুজে থাকবেন—মরে গেলেও টাকার কথা বলবেন না। মিছামিছি কতক্ষণ আর হয়রাণ হবে—বিরক্ত হয়ে নিজের থেকেই সরে পড়বে। কিন্তু আগে থেকে টের পেলে সহজে বিপ্রপদ ভিড়তে দেবেন না ডাকাত বাড়ীতে।

দেনা-পাওনার ব্যাপারেও বিপ্রপদ খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলেন। কেউ টাকা-পয়সা চাইতে এলে হাতে থাকলেও বলেন যে এখন হাতে নেই, জোগাড় করে নি, অমুক সময় এসে নিয়ে যেও। অর্থাৎ ঘরে থাকলেও ঘুরিয়ে দেন এইটুকু প্রকাশ করতে যে বাস্তবিকই তাঁর হাত খালি। এমনি ধারা নানা কৌশলে ওঁরা ওদের সম্পদ রক্ষা করে রাখেন।

ওই দৌলতই বিপ্রপদকে আজ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ইমাম এসেছে, নিতাই এসেছে, দীনুও জুটেছে ওই দৌলতের জন্তই। কেউ এসেছে বন্ধু ভাবে, কেউ বা শত্রু ভাবে। বিপ্রপদ তাঁর সঞ্চিত সম্পদকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জীবন দিতে পারেন তবু অর্থের অপচয় সইতে পারেন না। যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে তার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করতেও তিনি এতটুকু পশ্চাৎপদ হবেন না। যৌবনের যশের সোপান ঐ অর্থ, বার্দ্ধক্যের ভরসা ঐ দৌলত।

২৫

অবশেষে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল।

আত্মীয়-কুটুম্বদের আনতে দেশে-দেশে লোক গেল—নৌকা গেল। ক'দিনের মধ্যেই বাড়ী ভরে গেল চেনা-অচেনা লোকে। কত ভাল-মন্দ, লম্পট-কপট সাধু-অসাধুর যে আমদানী হলো তার হিসাব রাখে কে! খাওয়া-দাওয়া হৈ-চৈ হট্টগোল দিন-রাত চলছে। ধোপা-নাপিত-ভুঁইমালী এ-ক'দিনের জন্ত আর বাড়ী ছাড়বে না। প্রত্যেক পুকুরে সাময়িক প্রয়োজনের জন্ত অস্থায়ী ঘাট দেওয়া হয়েছে সুপারি গাছ চিরে। নাট-মন্দিরে, গাছের তলায়, পূজা-মণ্ডপে, কাতারে-কাতারে বিছানা পড়ে গেছে। জুতের ঘরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল। ওটা এখন মেয়ে-মহল। নিজেদের মেয়ে-লোক খুঁজতে হলেও রীতিমত আর্জ্জি পেশ করে কাকুতি-মিনতি করতে হয় অনেকক্ষণ। তার পর ঈপ্সিতা যদিও বা আসে গোপনে কথা বলার জো নেই। হাজার কান-সহস্র চোখ উকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। পাশের বাড়ীগুলো পর্য্যন্ত বেদখল হয়ে গেল। তাদের ঘাড়েও গিয়ে পড়ল বিপ্রপদর মেয়ের বিয়ের অতিথ। এতে কেউ মন্দ বাসে না। যে যার সাধ্যমত যত্ন করে স্থান দেয়—গল্প-গুজবে সময় কাটায়।

যারা ঘা খেয়ে-খেয়ে পেকেছে, ঠকে-ঠকে শিখেছে, এমন সব প্রবীণের দল এল বিপ্রপদর ডাকে। এখন আর সময় নেই, হাট-বাজারে লোক পাঠাতে হবে—ফর্দ চাই। যেন কোন ভুলচুক না থাকে। কেউ আসে হাসতে হাসতে—কেউ বা আসে কাশতে কাশতে, যে যার যোগ্যতা প্রমাণ করবে আজ। ফর্দ-সভাটা বসে নাট-মন্দিরের এক পাশে যেখানে পান-তামাকের ডিপোটা খোলা আছে। অনেক বাক্-বিতণ্ডা হয়, হাতী-ঘোড়াও মারা পড়ে দু'-দশটা, তার পর একটা খসড়া তৈরী হয়। যে দৈ ভালবাসে, সে দৈ-দৈ করে এক অংক বলে যায়। মাছ যে ভাল বাসে, সে মাছ নিয়ে টানাটানি করে। মিষ্টির বেলা সকলে একমত—প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়োজন রাখতেই হবে, নইলে টানাটানি পড়বে নির্ঘাত, নিন্দা হবে খুবই। ফর্দ প্রায় শেষ হয়েছে, এখন যোগ দেবে, এমন সময় একটা সানাই অকরুণ স্বরে প্রবীণদের কানের কাছে বেজে ওঠে। বিরক্ত হয়ে তারা মারমুখো হয়ে ছুটে যায়।

সানাইওয়ালা সুর ঠিক করছিল। সে হতভম্ব হয়ে বলে, 'এজ্ঞে কত্তা, ক্ষেমা চাই—আপনাদের চিনি নে।' সে মহা ওস্তাদ, যাত্রা-দল ফেরৎ ঘুঘু। তার মুখের ভাব দেখে সকলে ক্ষমা করতে তো বাধ্য হয়ই, না হেসেও থাকতে পারে না।

এত বড় একটা ব্যাপারে দীনু নিজেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে না। সেদিন তালুক কেনার বিষয়ে সে যে আঘাত পেয়েছে, এত দিনে দিব্যি তা সাম্‌লে নিয়েছে। পরার্থে যার জীবন উৎসর্গীকৃত সে এমন একটা বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে থাকবে কি করে? বিশেষতঃ বিপ্রপদর এখন ভয়ানক অসময়—লোক-জনের অভাব। যে সত্যিকারের বন্ধু সে এ সময় সাহায্য না করলে আর করবে কখন? সুসময় যারা বন্ধু হয়, অসময়ে ফিরেও তাকায় না—দীনু

সে শ্রেণীর লোক না। তাই সে দধির পয়োধি মন্থন করার ভারটাই নিজের স্কন্ধে নেয়।

বিপ্রপদ বলেন, 'দেখবেন দীনুদা, দেবাসুরে আবার দ্বন্দ্ব না বাঁধে।'

'অর্থাৎ ?'

-ঘোষালদের বাড়ীও একটা বিয়ে আছে কি না।'

'তাতে আমাদের কি ? আমরা আলাদা বায়না দেব, আলাদা দৈ আনব।'

'কিন্তু তবু একটা অঘটন ঘটার আশংকা করি। আপনি বুড়ো মানুষ, ওর মধ্যে না গিয়ে বয়স্ক বরযাত্রীদের এদিকে থাকলেই ভাল হয়।'

'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছ ? এই সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপারে যদি অবিশ্বাস কর তা হলে কাজে যশ হবে না বলে দিচ্ছি।'

বিপ্রপদ কার্য্যত তাকে এড়াতে চাইলেও সে এমন কথা বলে যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। 'না না দীনুদা, আপনাকে করব আমি অবিশ্বাস—এ কি সম্ভব! আপনি মন এত ছোট করছেন কেন ? তবে সংগে ইমামকে নিয়ে যান, আজকাল পথ-ঘাট ভাল না।'

দীনু হেসে বলে, 'এই তো ভায়া, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলে না!'

'আপনাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। কিন্তু ঐ বুড়ো শরীরটাকে তো বিশ্বাস করা যায় না—তাই এক জন দেহরক্ষী দিতে চাইচি' বলে বিপ্রপদ চলে যান—যেতে যেতে ফের বলেন, 'রওনা দেওয়ার সময় বায়নায় টাকা নিয়ে যাবেন।'

দীনু মনে-মনে বলে, 'বিপ্রপদ তুমি যে আমাকে বিশ্বাস কর না তা আমি বুঝি। তুমি এক দিন আমার ভিটে-মাটি বকেয়া পাওনার দায় নিলাম করিয়ে নেবে তাও জানি। তুমি সময়ের জন্য শুধু অপেক্ষা করে দিন কাটাচ্ছ—বসে রয়েছ সুযোগের জন্য। আমিও তোমাকে সহজে স্থির হতে দেব না। আমি তোমার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু! ঘোষালদের সংগে তোমাকে কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাব দক্ষিণের বিলে। তারই উদ্যোগ-পর্বের আয়োজনে চললাম, তোমারই নায়ে, তোমারই পয়সায়। ইমান আমি ঠিক না রাখলে ইমাম আমার করবে কি ?'

সেই দিন রাত্রে দীনুকে দেখা যায় ঘোষালদের বৈঠকখানায়।...

'যাচ্ছি বিপ্রপদর মেয়ের বিয়ের দৈ আনতে। তোমাদের যদি কিছু কাজে লাগি তা জানতে এলাম। আমরা তো কোনও দিনই পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না, যদি গতর দিয়ে পারি—তাই বলতে এলাম। বিপ্রপদর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না, পাশাপাশি বাস, একটু চক্ষুলজ্জা তো আছে। তা না হলে কি আমি ওর কাজে ভিড়ি! তবু তোমাদের ভুলতে পারিনি। শক্তিগড়ের কেউ না এলেও আমি এসেছি। বাবাজীরা, খুড়োর আসলে কখনও গোল হয় না, এইটা একটু লক্ষ্য করে দেখো।'

'আমরা অন্ধ না খুড়ো।' বড় ঘোষাল হুকোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমারও তো মেয়ের বিয়ে—দৈ তো আমার চাই। কোথায় যাচ্ছেন দৈ আনতে ? দূরে গেলে তো নৌকা ভাড়া অনেক।'

'কিছু না। যাচ্ছি চিকন্দী—একেবারে খাসা দৈ, হাঁড়ি উপুড় করলেও পড়বে না। বিপ্রপদর নৌকায় বিনা ভাড়ায় তোমার ঘাটে এসে উঠবে—তার পর যাবে তার ঘাটে। পড়তা অনেক কম পড়বে—বিশ্বাস কর বাবাজী।'

এমন একটা অভাবনীয় প্রস্তাবে বড় ঘোষাল প্রলুব্ধ হয়। সে যেন হাতে আকাশ পায়। 'খুড়ো কি সত্যি বলছেন না আমাকে পরীক্ষা করছেন ?'

'সত্যি-মিথ্যে এই দেখো।' বলে বিপ্রপদর দেওয়া টাকার থলেটা দেখায়। 'আমি গরীব মানুষ এত টাকা পেলাম কোথায় ?'

'তা হলে আমিও কিছু দিয়ে দেই—আমার জন্য মণ আষ্টেকের বায়না দেবেন। আমার কিন্তু মিষ্টির ব্যবস্থা সংক্ষেপ। দৈ'র ওপরই সব ভরসা। আর কাঁহাতক পারি বলুন, ক'টা মেয়েই তো পার করলাম, তবু ভাণ্ডার খালি হয় না। যেমন একটি যায়, ভানুমতীর ভেল্কীর মত আর একটি এসে হাজির, মোটের অংক নড়ে না। বিপ্রপদর প্রথম কাজ, স্ফূর্তিতে পয়সা ব্যয় করছে—আমার আর স্ফূর্তি-টুর্তি নেই। কিন্তু তবু অতিথ-অভ্যাগতদের যত্নে ত্রুটি হলে মাথা কাটা যাবে, সেই ভয়েই আপনার কাছে এ কাজের ভার দিচ্ছি। দেখছেন তো, এখনি বাড়ীতে তিল রাখার ঠাঁই নেই, পিল-পিল করে চেনা-অচেনা সব আত্মীয়-স্বজন এসে ভরে গেছে, এর পর তো আরো আছে। আমার থাক কি না থাক—যদি এদের এতটুকুও ত্রুটি হয় তবে দেশ-বিদেশে আর মুখ দেখান যাবে না। বনেদী ঠাট, বনেদী তালুক-মুলুকে বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'টাকা-পয়সা কিছু দিতে হবে না বাবাজী, শুধু মুখের কথা দাও—দেখো দীনু খুড়ো তোমাদের কত ভালবাসে! একেবারে ঘাটে এসে হাজির হবে, তখন দেখে-শুনে দাম দিও।'

'খুড়ো, আপনি পিতৃতুল্য। আপনার নাতনীর বিয়ে, যা ভাল হয় করুন। এ তো আমি প্রত্যাশাই করতে পারি নে।'

'আচ্ছা বাবাজী, এখন উঠি।'

এক কালে ঘোষালেরা এ দেশে সত্যই বড় লোক ছিল। সেনেদের পরই নাম করলে তাদের নাম করতে হয়! কিন্তু এরাও ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে! বংশবৃদ্ধির সংগে-সংগে এদের আয় বাড়েনি—কিন্তু ব্যয় বেড়ে গেছে বহু গুণ। দেশের লোকেরা তা টের পায়নি, জনসাধারণ এখনও তাদের নিয়েই দম্ভ করে—অন্ততঃ প্রাচীনপন্থীরা। বিপ্রপদকে এখনও তারা উচ্চাসন দিতে নারাজ, কিন্তু সেনেদের খারিজা তালুকটা কেনার পর ঘোষালেরা অনেক হাল্কা হয়েছে—সংগে সংগে হাল্কা করে দিয়েছে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের, তবু প্রাণান্তে তারা গৌরব বজায় রাখতে চায়! কিন্তু রাখবে কি করে? একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠতে বড় ঘোষালের প্রাণান্ত। আর বিপ্রপদ অনায়াসেই একটা নতুন তালুক কিনে আবার পাতালেন দু'-দু'টো মেয়ের বিয়ে। যেন টাকার তোড়া খুলে দিয়েছেন। সেনেরা ধ্বংস হয়েছে অসংযম ও ব্যভিচারে—আর এরা ধ্বংস হতে বসেছে ব্যয়-বাহুল্যে। সরিকে-সরিকে তো মামলা-মকর্দমা আছেই।

ফেলে-ছড়িয়ে হিসাব করলে এখনও এদের এজমালীতে আয় দশ হাজার টাকা। কিন্তু এক ভাগে পড়ে মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশী। সে টাকা সব আদায় হয় না। ভাগে-ভাগে আর্জি দিয়ে পাওনা

উচ্ছেদ করায় যেমন ব্যয় বেশী—ভোগও যথেষ্ট। বহু জমা তামাদি হয়ে তবু নালিশ দেওয়া হয় না। প্রজা দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে শক্ত হয়। তখন মৌখিক শাসন তলে-তলে তোষণ-নীতি চালিয়ে তাদের তুষ্ট করা ছাড়া উপায় থাকে না। এক শরিকে যদিও বা আর্জি দিয়ে তর সইতে পারে আর এক জনে তা পারে না—এমনি সব নানা কারণে এত বড় বনেদী ঘরও পড়তা পড়ে আসে। আরও একটা বৃহত্তম হেতু সৃষ্টি হতে চলেছে দক্ষিণের বিলে। বলতে গেলে ঘোষালদের এখন প্রাণ ঐ জমির ধানে। বিপ্রপদ সেখানেও থাবা বাড়িয়ে নখ বসিয়েছেন বুনো বাঘের মত।

বিয়ের দিন লোক-জন পেট ভরে খেয়ে বিপ্রপদর দৈ-সন্দেশের এবং মিঠাই-মণ্ডার প্রশংসা করতে করতে বাড়ী যায়—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ঘোষালদের বাড়ী অতিথ-অভ্যাগতদের তো দূরের কথা বর-যাত্রীদেরই পাতা পড়ে না! যা দিয়ে শেষ রক্ষা তাই এসে ঘাটে পৌঁছায়নি! ঘোষালেরা বাড়ী ছেড়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কোথায় দৈ-র নৌকা! যত দূর দেখা যায়, একখানাও বড় নৌকা খালে দেখা যায় না। জাতি গেল, মান গেল—এমন তারা করবে কি!

এমন সময় লোকের মুখে সংবাদ আসে ইমাম ও নিতাই ঘোষালদের ঘাটে নৌকা ভিড়তে দেয়নি, একেবারে বিপ্রপদর বাড়ী এসে উঠেছে সব দৈ। দীনুর কথায় তারা কেউ কান দেয়নি—বিপ্রপদও না কি সে সব শুনতে চান না। তাঁর বায়নার দৈ অপরের ঘাটে উঠবে কেন? দীনু কি করবে? হাওয়া ধরে তো আর দৈ পাতা যায় না। বিপ্রপদর জন্য আজ তার লজ্জায় মাথা কাটা গেছে। সে আর ভাইপোদের এ পোড়া-মুখ দেখাবে কি করে? তাই সে আর নিজে আসেনি—লোক দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে। দীনু মনের দুঃখে না খেয়ে-দেয়ে বিপ্রপদর বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেছে। এত বড় ঔদ্ধত্যের বিচার না হলে সে আর এমুখো হবে না।

আসল কথা, সে ঘোষালদের জন্য দৈ-র বায়না মোটেই দেয়নি, তা কেউ তলিয়ে দেখে না—ঘোষালদের মাথাও সেদিকে খেলে না—নিতাই, ইমাম ও বিপ্রপদর উপর এ-বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষেপে ওঠে, ক্ষেপার কথাও বটে! এমন অসম্মান মহা শত্রুতেও করে না। বিদেশী লোকগুলো কি ভাবছে? দেশী লোকদের কথা না হয় এখন বাদ দেওয়া গেল।

সেদিন ঘোষালেরা প্রতিজ্ঞা করে, এদেশে হয় তারা, নয় বিপ্রপদ থাকবেন—এস্পার-ওস্পার যা-হক একটা হয়ে যাবে।

রাত্রে দীনু গিয়ে বিপ্রপদকে বলে—'এখন চারটি ব্যবস্থা করে দিলে খেতে পারি—পেট এখন ভালই আছে। দেখেছ ঘোষালদের বুদ্ধি, খাওয়াবে না দৈ রাজ্যশুদ্ধ হৈ-চৈ! এখন কার ঘাড়ে ফেলবে দোষ, নিতাই এবং তোমার ওপর যত অসন্তোষ। ভায়া আমাকেও বাদ দেয়নি, ছাই ফেলার ভাঙ্গা কুলোটা নিয়েও টানাটানি। ভাই তিনটি বুদ্ধির ঢেঁকি!'

সুপ্রতুল মত মেয়ে দু'টির বিয়ে হয়ে যায়। বিপ্রপদর কোন কাজেই ত্রুটি হয় না। ঘোষালদের অপযশ ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। এ নিয়ে কয়েক দিন তুমুল আন্দোলন হয়। হাটে-বাজারে ঘরে-বাইরে ঐ এক কথা, এক আলোচনা। ঘোষালেরা আর মুখ বের করতে পারে না। উঁচু মাথা হেঁট হয়ে যায়। অথচ এর জন্য সত্যই যে অপরাধী, তাকে কেউ খুঁজে বের করতে পারে না, আর খোঁজারও চেষ্টা করে না—সমস্ত দোষ বিপ্রপদর উপর গিয়ে পড়ে।

তিনি চুপ করে থাকেন। অনাবশ্যক কথার জবাব দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

কিন্তু ঘোষালেরা সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন প্রতিশোধ নিতে পারবে

খড়-কুটোতে আগুন দিয়ে দীনু-প্রেত দিব্যি দূরে বসে হাসতে থাকে

এত দিন কমলকামিনী এবং তাঁর দুই জা কুটুম্ব-কুটম্বিনী নিয়ে কি যে ব্যস্ত ছিলেন তা আর বলা যায় না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু খেটেই চলেছেন। ঠাকুর নেই, চাকর নেই, এতগুলো লোকের সর্ব্বপ্রকার চাহিদা তাঁরা নিজেরাই একান্ত আন্তরিক ভাবেই মিটিয়েছেন। নায়ের মাঝি থেকে শালগ্রাম শিলার পূজারী পর্য্যন্ত এদের যত্ন ও সেবায় তৃপ্ত—পরম আদরে মুগ্ধ।

এঁরা চান অন্তরালে থেকে এক জনকে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রকাশ করতে, তাতেই এঁদের শান্তি এবং তৃপ্তি।

কমলকামিনী শুধু দু'জাকে নিয়েই এত বড় একটা কাজ করে উঠতে পেরেছেন ভাবলে ভুল করা হবে—আজ পাশের প্রতিবেশীরা যত দূর সম্ভব এসে সাহায্য করেছে, মিষ্টিমুখে কি না হয়।

একটি মালায় ন'টি ফুল তার দু'টি আজ গ্রন্থিচ্যুত হবে—সে বিচ্ছেদ-ব্যথা যে কি তা কমলকামিনী বুঝতে পারেন। কাজের ভিড়েও কেবল চোখ ভিজে ওঠে! ঘন-ঘন মেয়েদের ডেকে কি খেয়েছে, কি করেছে তাই কেবল জিজ্ঞাসা করেন।

সকলের বুকে একটা ব্যথা দিয়ে দু'বোনে গিয়ে দু'খানা নৌকায় উঠল। অমরেশ আজ আর থাকতে পারে না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। এত ঝগড়া, এত মারামারি সব ভুলে যায়।

বিমলা জানলা দিয়ে মুখ বের করে বলে, 'মা, ওকে ডেকে নেও। অমরেশ তোর শত্তুর বিদায় হচ্ছে কাঁদবি কেন? ভাল হলো, চুপ কর।'

এ কথা'র ফল হয় উল্টো।

শ্যামলা ডেকে বলে, 'এই নে অমরেশ, চাবিটা নে—আমার পুতুল পুঁতির মালা তোকে দিয়ে গেলাম, তুই, সকলকে ভাগ করে দিস।'

সেবা দিদিদের নৌকায় যাওয়ার জন্য বায়না ধরে।

অবশেষে নৌকা ছেড়ে মাঝিরা বিপরীত দিকে বাইতে থাকে।

ঘরে এসে কমলকামিনী অনেক দিন বাদে শয্যা গ্রহণ করেন—বাইরে এসে বিপ্রপদ নির্জ্জনে আকাশটার দিকে চেয়ে থাকেন।

[ক্রমশঃ

বিংশ শতাব্দীর রাজপুত্র

[বিংশ শতাব্দীর রাজপুত্রের জীবন-কাহিনী লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে ডিউক অফ উইনডসর এই রচনাটি 'লাইফ' কাগজে উপহার দিয়েছিলেন। এডোয়ার্ডের জীবন-স্মৃতি একাধারে যেমন একটি চলে-যাওয়া যুগের আভাস দেয়, তেমনি বর্ণনার স্পষ্টতায় তরুণ-জীবনের অভিজ্ঞতা অপূর্ব রোমাঞ্চকর, উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে।]

১৮৯৪ সালের বাবার ডায়রীতে নীচের কয়েকটি কথা লেখা আছে—'হোয়াইট লজ, ২৩শে জুন—দশটার সময় একটি ছোট্ট ফুটফুটে মিষ্টি ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ওজন আট পাউণ্ড···'

আমার সম্বন্ধে খুব সম্ভবতঃ বাবার এই শব্দ বিশেষণ প্রয়োগ।

আমার নাম রাখা হল এডোয়ার্ড এলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান প্যাট্রিক ডেভিড। এডোয়ার্ড নাম সাধারণ ইংরেজের নাম এবং আমার আগে আরো ছ'জন ইংরেজ রাজা নামের পূর্বে ঐ নাম বহন করেছেন। আর এলবার্ট নামটি প্রমাতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য প্রদত্ত। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেছেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারীরা যেন তাঁর প্রিয় স্বামীর নাম সবাই বহন করে। ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানের জন্য ক্রিশ্চিয়ান নামটিও গ্রহণ করতে হয়েছে। তিনি আমার দ্বাদশ ধর্মপিতার এক জন। আর পরের চারটি নাম ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েলসের ধর্ম-গুরুর নাম। কিন্তু বাড়ীর সবার কাছে আমি চিরদিনই ডেভিড। খুব অনাড়ম্বর ভাবেই আমি বড় হয়েছি।

আমি যখন জন্মেছি সে এক অপূর্ব সময়। ভিক্টোরিয়ার বয়স তখন পঁচাত্তর। তাঁর রাজত্বের সাতান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্রিটেন জগতের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিমান জাতি। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনের এলাকা। ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভা তাঁরই নাতিপুত্রদের দ্বারা অলংকৃত। জার্মাণীর দুর্দ্ধর্ষ কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম হলেন তাঁর নাতি 'উইলিয়ম'। আর এক জন পৌত্র 'নিকি' হলেন রাশিয়ার জার।

বিশেষ করে ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর পক্ষে সে সময়কে বলা যেতে পারে ব্রিটেনের স্বর্ণযুগ। পাউণ্ড-ষ্টার্লিং পেন্সে আয়কর নির্ধারিত হত। সমাজতন্ত্র তখন নিছক কল্পনার কল্পলোকে। বস্তুতঃ, ইংরেজের সাম্রাজ্যের কাঠামোর কোন দিন যে নাড়া লাগতে পারে, এ যেন স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

আমার প্রমাতামহী ভিক্টোরিয়া আমার জন্মের পর আরো সাত বছর রাজত্ব করেছেন এবং আমার ছোট ভাই রাজা ষষ্ঠ জর্জকেও তিনি হতে দেখেছেন। সে আমার জন্মের আঠার মাস পরে জন্মেছে। রাজপুত্রী মেরী এবং ভাই ডিউক অফ গ্লষ্টার হেনরীকেও হতে দেখেছেন তিনি। কেবল সাম্রাজ্য নয়, ভিক্টোরিয়া একটি বিশিষ্ট জীবন-ধারারও প্রতীক ছিলেন। সৌজন্য ও অধ্যবসায় তাঁর রাজসভার দু'টি স্তম্ভ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এডোয়ার্ডিয়ান-যুগ ঠাকুর্দাকে কেন্দ্র করে দেখা দিল।

পরিষদীয় শাসনতন্ত্রের বিধান মত মহামান্য সম্রাটকে একটি নির্দিষ্ট কাল অন্তর লণ্ডনে বাস করতে হয়। ঠাকুর্দার এ রীতি ভারী অপছন্দ ছিল। সব চাইতে যে স্থানটা ভালবাসতেন তিনি, সে হল স্যাণ্ড্রিংহাম। সাত হাজার একরের একটি ষ্টেট বা জমিদারী। এইখানেই তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের থাকার জন্য তাঁর বিরাট প্রাসাদ-বাটী নির্মাণ করিয়েছিলেন। ষ্টেটের সীমানার মধ্যেই সিকি মাইল দূরে ইয়র্ক কটেজ। ঠাকুর্দা ঠাকুমা বিয়ের যৌতুক হিসেবে বাবাকে এই বাড়ীটা দিয়েছিলেন। বোন আর আমরা চার ভাই, সবাই জন্মেছি সেখানে। যখন পরিবারের সকলে জড় হোত বাড়ীতে—মা'র এক জন পরিচারিকা, বাবার অশ্বপাল, মেরীর গভর্ণেস্, ভাইদের ও আমার এক জন কি দু'জন শিক্ষক—তখন মনে হত, কটেজটি বুঝি ফেটে পড়বে। এমন কি একবার এক বিভ্রান্ত অতিথি দাস-দাসীরা কোথায় থাকে, জিজ্ঞেসা করেছিলেন বাবাকে। উত্তরে বাবা বলেছিলেন, কিছুই জানেন না তিনি। হয়ত বা গাছেই থাকে।

আমার ছোট বেলাটা কঠোর নিয়ম-কানুনের বেড়াজালের মধ্যে কেটেছে। কারণ বাবাও নিজের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পর্কে কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন। ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল আর ছিল ব্রিটিশ নৌবহর এবং রাজ-পরিবারের প্রাপ্য সুযোগ-

সুবিধার গভীর আস্থা। আবার তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদ ও ক্রীড়ামোদেও তাঁর ইংরেজ স্বভাবসুলভ প্রচুর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই কর্তব্য জ্ঞান তাঁর সজাগ থাকত।

বাবার এই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আমাদের ছোটদের স্থান ছিল অতি সংকীর্ণ—ছোট কুলুঙ্গীর মত। প্রাতরাশের সময় তাঁর স্টাডিতে তাঁকে সুপ্রভাত এবং বিকেলে চা-পানের পর শুভসন্ধ্যা জানাতে যেতে হোত রোজ। কিন্তু রাত্রে ডিনার খেতে যাবার সময় বাবা-মা নার্সারীতে ঢুকে আমাদের প্রত্যহ শুভরাত্রি জানাতেন। বাবা কোন দিনই বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। গম্ভীর মুখে স্তিমিত আলোয় উঁকি মারতেন আমাদের ঘরে, হয়ত বা কোন দিন গায়ের চাদরে আস্তে স্পর্শ করতেন—তার পর নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতেন ঘর ছেড়ে।

আমার প্রায়ই মনে হত, পুত্রকন্যার প্রতি বাবার ভালবাসা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। বার্টি আর বিশেষ করে আমি অপরিচ্ছন্নতা, দেরী করা, গুরুগম্ভীর কোন ব্যাপারে গোলমাল করা, গীর্জায় গিয়ে গা মোড়ামুড়ি ও চিমটি কাটাকাটি করা অথবা গুরুজন কেউ ঘরে ঢুকলে আসন থেকে না ওঠার জন্য প্রায়ই বকুনি খেতাম। শাদা কথায় শিষ্টাচার যেন গুঁড়িয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বাবা আমাদের মধ্যে।

সারা দিনের মধ্যে যে সময়টুকুর জন্য আমরা সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করে থাকতাম, সে হল দিনের শেষে চা, মাফিন ও জ্যাম দুধ খাওয়ার পর মা'র কাছে যাওয়া। এই সময়টা মা সেজে-গুজে থাকতেন না। সোফায় শুয়ে-শুয়ে গল্প করতেন আমাদের সঙ্গে বা বই পড়ে শোনাতেন। তাঁর কোমল কণ্ঠ, সুমার্জিত মন, ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনপূর্ণ ঘরের স্নিগ্ধ আরামের মধুর পরিবেশের স্মৃতি দিন-শেষে একটি ছোট্ট ছেলের মনকে আতুর করে রাখত যেন।

আমার বয়স যখন প্রায় আট তখনই এক নতুন ব্যক্তিত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল আমার জীবনে। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পারিবারিক ভৃত্যদের এক জন এল আমার জীবনে। নাম তার ফ্রেডারিক ফিঞ্চ। লোকটির বাপ লৌহকঠিন বৃদ্ধ ডিউকের খাস চাকর ছিল। তবে লোকটি একাধারে যেমন আমার জুতা পরিষ্কার করত, তেমনি রোগে পড়লে সেবা-শুশ্রূষাও করত, হাত-মুখ ধুইয়ে দিত, রাত্রে আমার সঙ্গে এক সাথে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেও হল আমার খাস চাকর। সে আমার সঙ্গে গলফ খেলত, শিকার করত, ঘোড়ায় চড়ত। আরো পরে সে হয়েছিল আমার বাটলার। এখন তার বয়স সাতাত্তর—অবসর নিয়ে বার্কশায়ারে নিজের ছোট্ট কটেজে দিন গোণে—নানা স্মৃতির সম্পদ ছাড়াও আরো হয়ত অনেক কিছু সঞ্চয়ের পুঁজি নিয়ে।

১৯০১ সাল। তখন আমার বয়স সাড়ে সাত। বাবা আট মাস ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ শেষ করে দেশে প্রত্যাগত। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাঁকে যেন আমরা নতুন করে পেলাম। তিনি ত আমার আর বার্টির অজ্ঞতা দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। চিরাচরিত প্রথামত ব্রিটিশ রাজপুত্রদের শিক্ষার ভার গৃহ-শিক্ষকের স্কন্ধে অর্পিত। এই মহা বিপর্যয়ের প্রতিবিধান-স্বরূপ তক্ষুনি তিনি আর কালবিলম্ব না করে অনিন্দনীয় চরিত্রের এক গৃহ-শিক্ষককে আমদানী করলেন আমাদের নার্সারী-জগতে।

এই ভাবে আমাদের রাজ্যে আবির্ভূত হলেন দীর্ঘাকৃতি গম্ভীরদর্শন কৃশকায় ভদ্রলোক। নাম তাঁর হেনরী পিটার হ্যানসেল। এঁরা সেই টিপিক্যাল ব্রিটিশ স্কুলমাষ্টার, যাঁদের কেবল মাত্র ক্লাসিক্স্ আর প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মগ্রন্থে জ্ঞানই অপরিহার্য ছিল না, ব্যায়াম-চর্চার বিষয়েও জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় ছিল। ভদ্রলোক অক্সফোর্ডে ফুটবল খেলতেন, হ্যাণ্ডিক্যাপ গলফ খেলোয়াড়,—রাইফেল চালাতেও জানতেন কিছু-কিছু অর্থাৎ শান্ত মেজাজ ও মধুর স্বভাববিশিষ্ট এক ভদ্রলোক—মুখে সদা বিরাজমান একটি পাইপ, গায়ে টুইডের পোষাক। ভদ্রলোক অকৃতদারও ছিলেন।

মাঝে-মাঝে বাবা-মা'র হস্তক্ষেপ ছাড়া হ্যানসেল আর ফিঞ্চ—এই দু'টি লোকই আমাকে আর আমার তিন ভাইকে মানুষ করার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছিল কাঁধে। অবশেষে এক দিন আমরা স্কুলে প্রেরিত হলাম।

ঘড়ি ধরে ঠিক ন'টার সময় আমি আর বার্টি এসে পড়ার টেবিলে বসতাম। হ্যানসেল পাঠকক্ষে ঢুকতেন ঠিক স্কুলমাষ্টারের ভংগিতে। টানা দু'ঘণ্টা চলত পাঠাভ্যাস—তার পর আধ ঘণ্টা খেলার ছুটি এবং লাঞ্চের আগে এক ঘণ্টা পঠন-লিখন। হ্যানসেল আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খেতেন যেমন মেরী তার ম্যাদাম ব্রেইলের সঙ্গে লাঞ্চ খেত। সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন লাঞ্চের সময় শুধু ফ্রেঞ্চে কথাবার্তা চলত। বিকেল বেলাটা কাটত মুক্ত বায়ুতে খেলা-ধূলায়। তার পর এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা পাঠাভ্যাস এবং শেষে চা-পান। শনিবার আমাদের ছুটির দিন। রবিবারের সকাল চার্চের জন্য নির্দিষ্ট থাকত।

একে অংকশাস্ত্রে হ্যানসেল বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, তার পর আমার নিজেরই ছিল অংকের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা। কাজেই আমরা দু'জনেই এক দিন বাবার কাছে বকুনি খেলাম। হয়ত হ্যানসেলের শিক্ষা-প্রণালী বুকিশ এবং নীরস ভেবে বাবা নিজেই অংকশাস্ত্রে আমার উৎসাহ উদ্দীপিত করার জন্য নানা প্রবলেম উদ্ভাবন করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও অকৃতকার্য হয়ে তিনি এক জন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করলেন।

আমার অকৃতকার্যতা দেখে মা বড় চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এক দিন তিনি কথায় কথায় বললেন—'এই ছেলেগুলো অদ্ভুত বোকা।' বাবা তাঁর সোজাসুজি বিশ্লেষণ-প্রণালী মত মূর্খতাকেই এর কারণ নির্দেশ করলেন। কিন্তু তবুও ভাল ছেলে হবার মত আমাদের মানসিক সংগঠন আছে কি না, সে-প্রশ্ন বাদ দিলেও আমার রাজকীয় বিধি-নিষেধের নানা প্রতিবন্ধকতা আমার প্রস্তুতি-প্রচেষ্টার গতি পদে-পদে দুর্বল ও শ্লথ করে দিতে লাগল।

যত দিন না আমার বয়স তের হয়েছে এবং আমি নৌ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, তত দিন প্রতিযোগিতার উত্তেজনা কাকে বলে জানতুম না। এখানেও নৌ-শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার জন্মগত বাধ্যবাধকতা আমার অনুশীলন প্রয়াসের চারি দিকে যেন লৌহবলয় পরিয়ে দিল। নৌ-শিক্ষায় গ্রীক ও লাটিনের প্রয়োজনীয়তা নেই দেখে বাবা ও দু'টো ভাষা শিক্ষা বন্ধ করে দিলেন। আমার বন্ধু উইনষ্টন চার্চিল গিবন মেকলে প্রমুখ লেখকদের যে অপূর্ব বইগুলি পড়েছেন, সেগুলিরও আস্বাদ আমি কোন দিন পাইনি।

আমার শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বাবার আর একটি সুগঠিত ধারণা

কয়েক জন উঁচু ক্লাশের ছেলে এক দিন ঠিক করলে, হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স এডোয়ার্ডের মাথার চুল লাল ক'রে দিলে আরো ভাল দেখাবে তাকে। সঙ্গে সঙ্গেই এক দিন বৈকালীন ড্রিলের আগে তারা আমায় কোণঠাসা করে এক বোতল লাল কালি আমার মাথায় ঢেলে দিল। ঘাড় বেয়ে কালি পড়তে লাগল। একটি শার্ট নষ্ট হোল। মুহূর্ত পরে বিউগল বেজে উঠল। ছেলের দল তো দৌড়ে চলে গেল সারবন্দী হতে, আর এদিকে আমায় যে কি সাংঘাতিক হতবুদ্ধিতায় ডুবিয়ে রেখে গেল তা থেকে উদ্ধার পাবার মত কোন শিক্ষাই আমি পাইনি হ্যানসেলের কাছ থেকে।

এই ভাবে কালি-সপসপ অবস্থায় যদি প্যারেডে যাই অফিসার নিশ্চয়ই এর কারণ জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমি তার উত্তর দিতে বাধ্য হব—যে-উত্তর ছেলেদের বিপক্ষে যাবেই। আবার যদি প্যারেডে না যাই আমার নাম সকালের রিপোর্ট-বুকে উঠে যাবে এবং আমার নামের পাশে অবাধ্যতার মন্তব্য জমা হবে। দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণের দিকেই আমার সহজাত বৃত্তি অনুপ্রাণিত করল আমায়। ফলে পরের দিন আমার নাম ডিফলটারের তালিকায় উঠে গেল। এবং শাস্তিস্বরূপ আমি পরের তিন দিন বিশ্রামের সময় যে নৌ-চালনা শিক্ষার ঘরেতে রং দেওয়া হচ্ছিল তার দিকে এক ঘণ্টা চেয়ে থাকতে আর বাকী সময় বৈঠা ঘাড়ে করে আস্তাবলে ছুটোছুটি করতে বাধ্য হলাম।

গরম কালে ছ'টায় এবং শীতের সময় সাড়ে ছ'টায় কর্কশ বিউগল-কণ্ঠে 'Reveille' ঘোষিত হত। পর-মুহূর্তেই ঘণ্টার গুরুগম্ভীর শব্দে আমরা ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠেই হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা-বাণী আউড়ে যেতাম। আর একবার ঘণ্টার শব্দ হোত অর্থাৎ হলের শেষ প্রান্তে মেরু অঞ্চলের মত ঠাণ্ডা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকেত। আমি চোখ বন্ধ করে ফেলতাম, কারণ চোখ চাইলেই দেখতে পেতাম শীতে কম্পমান এক দল উলঙ্গ ছোট ছেলে আমারই মত সকালের প্রথম আলোকে সবুজ রং-করা সুইমিং পুলের দিকে চলেছে ভেড়ার পালের মত।

প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা হোত এবং পরীক্ষার ফল মার্ক অনুসারে সাজিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হোত। ছুটিতে বাড়ীতে যাওয়ার সময় একটি শীলমোহর করা খামে কলেজের রিপোর্ট প্রত্যেককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হোত।

প্রথম টার্মে আমার নাম তলার দিক থেকে খুব বেশী উঁচুতে ছিল না। যাই হোক, বাবা তা নিয়ে বেশী অনুযোগ করেননি। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে কোন প্রকার সন্দেহ মনে না রেখে বাড়ী গেলাম। যথারীতি আদর-আপ্যায়নের পর সেই মারাত্মক লেফাফাটি বাবার হাতে দিলাম—অন্যমনস্ক ভাবে তিনি সেটিকে পকেটে রেখে দিলেন।

পরের দিন ফিঞ্চের মুখ গোমড়া। পাঠগৃহে আমার হাড় হিম-করা ডাক পড়ল। বাবা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'ডেভিড, বড় দুঃখিত। তোমার বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট এসেছে। পড়।'

দুর্ভাগ্যের কথা, সেই অংক তার বিভীষণ মূর্তি নিয়ে আমার পিছু নিয়েছে। ফলিত অংক ব্যতিরেকে নৌ-বিদ্যা অর্জন বা নৌ-সেনানায়কের শিক্ষা আমার পক্ষে অর্গলবদ্ধ। বাবা এক জন গৃহ-শিক্ষক রাখার উপদেশ দিলেন। সেবার ছুটির অনেকখানি অংককে বাগে আনতে ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু তবুও মনে হতে লাগল, অংকশাস্ত্র যেন আমার নাগালের বাইরে। পরের বসন্তে যখন বাড়ী এলাম তৃতীয় বারের রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে অসাফল্যের ধারণায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে পাঠাগারের ডাক পড়া মাত্রই বাবাকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই আমি কেঁদে ফেললাম। কিন্তু বাবা অপ্রত্যাশিত স্নেহের সঙ্গে বললেন—'কান্না তো নৌ-ক্যাডেটের পক্ষে শোভা পায় না। আর এবারের রিপোর্ট তো বেশ ভালই। তোমার উন্নতিতে আমি খুশীই হয়েছি।'

ক্রমশঃ ছুটিতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আমি নিজেকে নীচু শ্রেণী থেকে টেনে তুলতে সক্ষম হলাম। নিজের কৃতিত্বেই যে আমি এগিয়েছিলাম এ কথা আজ ভাবতে ইচ্ছা হয়। শেষ দু'বছর শিক্ষা সমাপ্তির জন্য ডার্টমাউথে যেতে পেরেছিলাম—এখানে ডাঙায় শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের সাধারণ খেলা-ধূলায় আমি যোগ দিতাম—এমন কি কয়ারে গান গাইতাম পর্যন্ত।

আমি বড় হচ্ছি এবং গৌরবোজ্জ্বল ছুটির দিনগুলিতে এখন আর আমাকে ছেলেমানুষ বলে গণ্য করা হয় না। এইবার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। আমার সম্মুখে নৌ-সেনার জীবনের গৌরবময় ঐতিহ্য—সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ানর তীব্র আকাংখা মনে।

১৯১০ সালের মে মাসে আমি আর বার্টি ইষ্টারের ছুটির পর কলেজে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এবার আমার বিরুদ্ধে একটিও দুঃখজনক মন্তব্য নেই। ঠাকুর্দা অসুস্থ হয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। যেদিন সকালে যাত্রা করার কথা বাবা আমাদের ডেকে পাঠালেন—'বাবার অবস্থা হঠাৎ খারাপের দিকে গেছে। হয়ত শেষ হবার আর দেরী নেই।'

১৯১০ সালের ৬ই মে মধ্য রাত্রের কয়েক মিনিট আগে ঠাকুর্দা মারা গেলেন। বর্তমান রাজা আমার ভাই বার্টি আমায় ডেকে তুলল ঘুম থেকে। জানলা থেকে সে চেঁচিয়ে বলল—'ঐ দেখ, পতাকা অর্ধনমিত।' ম্যালের উপান্তে ধূসর বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ নিঝুম হয়ে পড়ে আছে—ছাদে পাতাকার দণ্ডের গায়ে পতাকাটি মাথা নুইয়ে জড়িয়ে আছে। সাত বছর রাজত্বের পর উনষাট বছর বয়সে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ইহলোক ত্যাগ করলেন।

আমি আর বার্টি পোষাক বদলাচ্ছি—ফিঞ্চ এসে জানাল বাবা আমাদের নীচে ডাকছেন। বাবার মুখে ক্লান্তির ছায়া। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন,—'ঠাকুর্দা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।' আমি শোকার্ত কণ্ঠে বললাম—'অর্ধনমিত রাজ-পতাকা আগেই দেখেছি।' এ কথা শুনে বাবা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'পতাকার কথা কি বললে?' উত্তরে আমি বললাম—'রাজপ্রাসাদের চূড়ায় পতাকা অর্ধনমিত হয়ে উড়ছে।' বাবা বললেন—'এ অত্যন্ত অন্যায়।' তার পর আপন মনেই উৎসাহোদ্দীপক কথাগুলি উচ্চারিত করলেন—'রাজা দীর্ঘজীবী হউক।'

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বাবার উপর যে চাপ পড়ল তা অবর্ণনীয়। একে শোক—তার পর হাউস অফ লর্ড আর লয়েড জর্জকে কেন্দ্র করে লিবারেলদের মধ্যে কলহ। বাবা এক রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি ও শাসন-কর্তাদের লণ্ডনে উপস্থিত হবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক পক্ষ কাল পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হোল। ঠাকুর্দার মৃতদেহ

রাজ-সিংহাসনের কক্ষে রক্ষিত হল আর রত্নখচিত রাজমুকুটটিকে বসিয়ে দেওয়া হল কফিনের উপর। রাজার দেহরক্ষী দলের চার জন দৈত্যকায় শান্ত্রী চারি দিকে পাহারা দিতে লাগল।

২০শে মে, ঠাকুর্দাকে কবর দেওয়া হল। নয় জন রাজা ঘোড়ায় চড়ে শবযাত্রার আগে আগে যেতে লাগলেন আর সবার পুরোভাগে নব-নির্বাচিত রাজা—আমার বাবা। জার্মাণীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শালের পোষাকে শাদা ঘোড়ায় চড়ে বাবার পাশে ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে জানতুম বলে আমি তার দিক্ থেকে কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বাবা-মা এত দিনের 'উপগ্রহ' চক্র থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ আর ব্যালমোরাল এবার তাঁদের অধিকারে গেল। আমরা কিন্তু স্যান্ড্রিংহামের ইয়র্ক কটেজেই যথারীতি বাস করতে লাগলাম। শুধু ঠাকুমা অত বড় বাড়ীতে একা রয়ে গেলেন। মা এক দিন বাবাকে বললেন,—'উনি অত বড় বাড়ীতে একা রয়ে গেলেন।' মা এক দিন বাবাকে বললেন—'উনি অত বড় প্রাসাদে একলা থাকবেন আর রাজারাণীর কটেজ ভীড়ে এমন গিজ-গিজ করে যে সামান্য এক জন অতিথিরও জায়গা নেই—এ ব্যবস্থা অত্যন্ত হাস্যকর!' এ কথা শুনে বাবা বললেন—'ওটা মা'র বাড়ী। বাবা তাঁকে তৈরী করে দিয়েছেন।'

১৯২৫ সাল অর্থাৎ মৃত্যুকাল অবধি রাণী আলেকজেন্ড্রিয়া স্যান্ড্রিংহামেই বাস করেছেন।

বাবা রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তরাধিকার সূত্রে অনেকগুলি সম্মানের অধিকারী হলাম। তক্ষুনি আমার নতুন নাম হল ডিউক অফ কর্ণওয়াল। এই নামেই এখন আমার নতুন চিঠিপত্র আসতে লাগল—এই নামেই আমি উত্তর দিতাম।

অন্যান্য উপাধিগুলো কোন নতুন অর্থপ্রাপ্তির পথ খুলে দিল না—কোন নতুন দায়িত্ব পালনের গুরুভারও নিতে হল না আমাকে। কিন্তু ডিউক অফ কর্ণওয়াল উপাধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া গেল। ছয় শতাব্দী পূর্বে ব্ল্যাকপ্রিন্সের জন্য সৃষ্ট ডাচি তোল রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই সম্পত্তির আয় তাকে আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। সিকিউরিটি, বহু মূল্যবান লণ্ডনের সম্পত্তি ও পশ্চিম প্রদেশের হাজার হাজার একর জমি এই ষ্টেটের অন্তর্গত। নৌ-কলেজে পড়ার সময় সাপ্তাহিক বরাদ্দ শিলিং পকেট-খরচা ছাড়া এই প্রথম আমার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হল।

সাধারণের ধারণা, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেই প্রিন্স অফ ওয়েলস হওয়া যায়। এ ধারণা সত্য নয়। রাজা যদি মনে করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এ উপাধি পাওয়ার উপযুক্ত নয় তিনি এ উপাধি তাকে না-ও দিতে পারেন। বস্তুতঃ ঠাকুর্দার মৃত্যুর ছ'সপ্তাহ না যাওয়া পর্যন্ত বাবা আমাকে প্রিন্স অফ ওয়েলস উপাধি প্রদান করেননি।

ইতিমধ্যে রাজ-অভিষেক এসে গেল। পঞ্চাশ হাজার ইউনিফর্ম-পরিহিত ব্রিটিশ সৈন্যের মার্চ অনুষ্ঠান হোল। ব্রিটিশ ইতিহাসের এইটাই বোধ হয় সব চেয়ে জমকাল ব্যাপার।

এর এক মাস পরে প্রিন্স অফ ওয়েলস পদে আমার অভিষেক হল। এই উপলক্ষে যে উৎসব আয়োজন হয়েছিল তাতে আমার যে বক্তৃতা দিতে হয়েছে এবং ওয়েলস ভাষায় যে বাণী পাঠ করতে হয়েছে অগ্নি-পরীক্ষার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু দর্জি যখন আলখেল্লা, এরমাইন আর শাদা সাটিনের ব্রীচেস দেওয়া নীললোহিত রংয়ের ওয়েষ্টকোট সমেত এক কিম্ভূতকিমাকার পোষাকের মাপ নিতে এল, আমার মনে হোল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমার নৌ-বন্ধুরা যখন আমায় এই পোষাকে দেখবে তারা কি ভাববে বল ত? সেদিন রাত্রে বাড়ীতে রীতিমত একটা পারিবারিক সংঘর্ষ ঘটে গেল। অবশ্য মা সমস্ত ব্যাপারটাকে মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন। তিনি বললেন—'একটা সামাজিক অনুষ্ঠানকে তুমি এত গভীর ভাবে নিচ্ছ কেন? তোমার বন্ধুরা এটা নিশ্চিত বুঝবে যে, রাজপুত্র হিসেবে তোমায় এমন কতকগুলি কাজ করতে হয় যা আপাতঃ হাস্যকর বলেই মনে হবে।' আমাকে যা-যা কাজ করতে হয় তাই যদি করি লয়েড জর্জকে নিয়ে বাবাকে বেশী অসুবিধায় পড়তে হবে না। এই রকম একটা ধারণা হোল আমার।

এই ভাবে এক গুমোট গ্রীষ্মে কারনারভোন ক্যাসেলের ধূসর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দশ হাজার লোকের সামনে হোম-সেক্রেটারী উইনষ্টন চার্চিল মধুর ও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত করলেন আমার উপাধির সর্ত। বাবা আমায় 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' সম্মানে ভূষিত করলেন। অসহ্য গরম আর ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পাশে দণ্ডায়মান প্রাচীন কনেষ্টবলের পোষাকে লয়েড জর্জের শেখান ওয়েলশ ভাষায় গড়-গড় করে বলে গেলাম—'ওয়েলস যেন একটি সংগীতের সাগর।'

এই অনুষ্ঠানের কিছু দিন পরে বাবা আমার নৌ-সেনানী হিসেবে আমার সমুদ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি নিজেই জাহাজ নির্বাচন করলেন। 'হিন্দুস্থান' নামক যুদ্ধ-জাহাজে আমি তিন মাস কাজ করলাম। দূর সমুদ্রে বিচরণ এত দিনে আমার মনোগত ইচ্ছা-পূরণের সুযোগ করে দিল।

এই অভিজ্ঞতার পরেই বাবাকে আমি আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা জানালাম। তিনি শুনে বললেন—'আমিও নৌ-জীবন খুব পছন্দ করি। কিন্তু এখন যা বলব তা তোমাকে নিরাশ করবে।'

প্রথমতঃ, আমাকে নৌ-বিভাগ ছাড়তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কয়েক বার ফ্রান্স ও জার্মাণী সফরে যেতে হবে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের ভাষা শিখতে হবে, তাদের রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, আমাকে অক্সফোর্ডে যোগ দিতে হবে।

১৯১২ সালের বসন্ত কাল থেকে আমার শিক্ষার বৈদেশিক স্তর সুরু হোল। চার মাসের ভ্রমণে আমি ফ্রান্সে গেলাম। হ্যানসেল ও ফিঙ্ক আমার সঙ্গে গেল। আর্ল অফ চেষ্টারের ছদ্মবেশে আমি ফ্রান্স পরিভ্রমণ করলাম। এই ছদ্মবেশ অবশ্য কাউকেই বোকা বানাতে পারেনি। কিন্তু ফরাসী সংকার ব্রিটিশ রাজ-উত্তরাধিকারীকে তার উপযুক্ত সম্মান দেখানর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেলে। আমার দিক্ থেকে আমিও অনেক কঠোর পরীক্ষার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

আমার জীবনে আর এক জন শিক্ষকের আগমন ঘটল। এম, মরিস এসকোফিয়ারের উপর আমাকে ফরাসী শেখানর ভার পড়ল। প্রতিদিন সকালে তিনি দীর্ঘ কোট গায়ে মাথায় বাটির মত টুপি পরে, হাতে ধূসর গ্লাভস ও ছড়ি নিয়ে এবং এক গাদা বই বগলদাবা করে আমার বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হতেন।

এসকোফিয়ার ও আমার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ফরাসী ব্যাকরণের গোলকধাঁধায় যখনই পথ হারিয়ে ফেলতাম তিনি ল্যুভার, নটারডাম, ভার্সেলেস প্রভৃতি দেখাতে নিয়ে যেতেন। অনেকের সঙ্গে এফিলটাওয়ারেও উঠলাম। হ্যানসেল, ফিঙ্ক ও এসকোফিয়ারের সঙ্গে ফ্রান্সের বহু জায়গায় আমি ঘুরেছি। ফ্রান্সকে আমি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম।

এক দিক্ থেকে এই পর্যটন স্মরণীয় আমার জীবনে। কারণ আমার অষ্টাদশ জন্মদিনে দু'টো সুযোগ এল অযাচিত ভাবে। নৌ-জীবনের নিয়ম-কানুনের দরুণ বাবা আমাকে কখনো ধূমপান করতে দিতেন না। তাই জন্মদিনের উপহার হিসেবে সিগারেট-কেস পাওয়ায় এইটাই সূচিত হোল যে এবার থেকে আমি ইচ্ছা করলে সিগারেট খেতে পারি। আর আঠার বছর আমাকে সেই রহস্যময় জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিল যেখানে আমি নিজে ইচ্ছামত মোটর ড্রাইভও করতে পারি।

আগষ্ট মাসে আমি ব্রিটেনে ফিরলাম। অক্সফোর্ড আমার কাছে নীরস মরুভূমি বোধ হতে লাগল। সৌভাগ্যের বিষয়, আমি সহজ ভাবেই আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে চলাফেরা করতে লাগলাম। কাগজওয়ালারা এই ব্যাপারটাকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু ম্যাগডেলেন কলেজের যে সমাজতান্ত্রিক ছেলেটি আমার পাশে বসে ক্লাসের বক্তৃতা শুনত সে একটুও বিশ্বাস করত না যে আমি সাধারণ সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। 'ক্লয়েষ্টার কোয়াড' আমার নিজস্ব ঘর ছিল। কলেজে একমাত্র আমার ব্যবহারের জন্য বাথ-রুম তৈরী হয়। তাছাড়া আমার সঙ্গে থাকতেন ফিঙ্ক। আমার গৃহশিক্ষক আমার পাশেই একটি ঘরে থাকেন।

এই সমস্ত সুস্পষ্ট সুবিধা সত্ত্বেও নৌ-জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ একটুও কমল না। আমার চারি ধারে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ কলেজের ছেলের দল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নিরাশা বোধ করতাম। ইতিমধ্যে আমার খ্যাতির বিড়ম্বনা যোগ হয়েছে।

এক দল সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার আমার অক্সফোর্ড-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংবাদ নেবার জন্য হামেশাই হানা দিতে লাগল। তাদের নিখুঁত এবং বিশদ বর্ণনায় আকৃষ্ট হয়ে পর্যটকরা এসে আমায় আরও ছেঁকে ধরত। শেষটায় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আমি দিনের বেলায় জানলার ধারে এসে দাঁড়াতে সাহস করতাম না—দাঁড়ালেই সবাই প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকত আমার দিকে।

আসল কথা, অক্সফোর্ডে আমি ভেটিখাট সমস্যা হয়ে উঠেছিলাম। আমি কম্পাশ ব্যবহার করতে জানি, নৌ-সংকেত পড়তে পারি—ডিঙ্গী চালাতে সিদ্ধহস্ত—এমন কি অফিসারদের চা-ও তৈরী করতে পারি। নৌ-কেন্দ্রে এত কষ্ট করে যা শিখেছি অক্সফোর্ডের শিক্ষিত সমাজে তার কোনই মূল্য নেই। দ্রুত উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড তার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সুযোগ দিয়েছিল আমায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে অর্জিত অক্ষমতার প্রাচীর কিছুতেই আমি লংঘন করতে পারলাম না। প্রেসিডেণ্ট ওয়ারেন আমার পাঠোন্নতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—'গ্রন্থকীট হতে সে কোন দিনই পারবে না।...কিন্তু প্রতিদিন সে লোক-চরিত্র সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করছে। ইংরাজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাদের আচরণ, তাদের চরিত্র পর্য্যালোচন সম্বন্ধে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

অক্সফোর্ডে বাস করার সময়ই দু'বার আমাকে জার্মাণীতে যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য আমার জার্মাণ জ্ঞান সমৃদ্ধ করা আর জার্মাণীর কর্মচঞ্চল অধিবাসীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন—যাদের রক্ত আমার ধমণীতেও প্রবহমান। এর এক বছর পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু এ কথা আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পর্যটক হিসেবে সেই মহা বিপর্যয়ের আমি একটুও আঁচ পাইনি। সেদিনের জার্মাণী কাজ আর সঙ্গীতে মুখর ছিল—আমার ধারণায় সব চেয়ে অতিথিপরায়ণ লোকেরা বাস করে সেখানে।

পারিবারিক সম্পর্ক সত্ত্বেও রাজা দ্বিতীয় উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমায় প্রিন্স অফ ওয়েলস্ স্বাক্ষরনামা বের করতে হয়েছিল। অবশ্য তক্ষুনি আমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সম্রাটের কক্ষে। একটি বিপুল জমকাল ডেস্কের পিছনে তিনি ইউনিফর্ম পরে বসেছিলেন এবং আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য যেন ঘোড়া থেকে নামলেন এমনি অদ্ভুত ভংগীতে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। আরও কাছে এসে লক্ষ্য করলাম, সত্যি সত্যিই তিনি ছিরাক দেওয়া মিলিটারী জিন থেকেই নেমেছেন—ঘোড়ার পিঠের মত কাঠের পিঠে জিনটি বাঁধা। আমার বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে সম্রাট বললেন—'ঘোড়ার পিঠে চড়ে চড়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে চেয়ারের চেয়ে জিনই এখন বেশী আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।'

তিনি আশা প্রকাশ করলেন, আমি জার্মাণীর অধিবাসীদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, সহজ প্রবণতায় সেদিন তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করেছিলাম।

অক্সফোর্ড দ্বিতীয় বছরও এ-ও-তা করে কেটে গেল। মাঝে-মাঝে ঘোড়দৌড়ে হরিণের পিছু ধাওয়া করা, স্যাণ্ড্রিংহামে শিকার, নানা বন্ধু, হৈ-চৈ। কখনো কখনো বাবার কাছ থেকে তিরস্কার-মাখান পত্র আসত জীবনকে গভীর ভাবে নেওয়ার জন্য।

যে অবস্থার জন্য বাবা আমাকে অনবরত সতর্ক করতেন এত দিনে তা নির্দিষ্ট আকার নিতে লাগল। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে আর্ক ডিউক ফার্দিনান্দ অস্ট্রিয়ান টুরে লণ্ডনে এলেন। তিনি এসে উইণ্ডসোরে উঠলেন। জমকাল উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বাবা আমাকে অক্সফোর্ড থেকে ডেকে পাঠালেন। আর্ক ডিউকের পাখী শিকারে চমৎকার হাত ছিল। উইণ্ডসোরে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে আকাশ থেকে উড্ডীয়মান ফেজেণ্ট গুলীবিদ্ধ করে টুপটাপ নামাতে দেখেছি। সাত মাস বাদে সারাজীভোতে আততায়ীর গুলীতে অমন দেবকান্তি শরীর যে ধূলিলুণ্ঠিত হবে সে মর্মান্তিকতার কোন চিহ্নই ছিল না সেদিন।

১৯১৪ সালের জুন-জুলাই মাসে গ্রেট ব্রিটেনে তখনও একটা কপট শান্তি বিরাজিত। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রশ্ন চিরাচরিত কাঁটার মত খচখচ করছে—বাবা-মা বাইরে বের হলেই নারী ভোটাধিকার-প্রার্থীরা জ্বালাতন করত তাঁদের। কিন্তু তখনও যুদ্ধের সম্ভাবনা এত সুদূর ছিল যে, অ্যাসকট ঘোড়দৌড়ে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল, এবং সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠান কোথাও ব্যাহত হয়নি একটুও।

আমি অক্সফোর্ড ত্যাগ করেছি। তখন হাউসহোল্ড ক্যাভালরি রেজিমেণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অফিসাররা রাত্রে নানা পার্টিতে যেতেন

বলে আমিও তাদের সঙ্গে দ্রুত লণ্ডন-জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলাম।

যেদিন জার্মাণ সৈন্য বেলজিয়ামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার আগের দিন ১৯১৪ সালের ৩রা আগষ্ট যুদ্ধ এক নতুন সমস্যা নিয়ে আমার কাছে দেখা দিল। আমি যদি কুড়ি বছরের যে কোন ইংরাজ যুবক হতাম তাহলে যুদ্ধ-খাতায় নাম লিখিয়ে আমাকে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হিসেবে সামরিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে আমার অন্য মূল্য বেশী। এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে বাবা নীরব চিন্তার পর আমাকে লণ্ডনে অপেক্ষা করতে বললেন। আমার উপযোগী সুবিধা মত একটা কাজ যোগাড় হয়ে যাবেই।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগাষ্ট আমার ডায়রীর পাতায় লেখা আছে—'সাড়ে দশটার সময় সংবাদ এল, জার্মাণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।' ······তক্ষুনি যুদ্ধ-ঘোষণা পত্রে বাবার স্বাক্ষর নিতে প্রিভি কাউনসিল বসল। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। স্বদেশপ্রেমের সে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। কিন্তু এর পরও আর তিন ঘণ্টা তাদের জটলা সমান ভাবে চলল—হৈ-চৈ চেঁচামেচি করে, গান গেয়ে, শীষ দিয়ে তুমুল মাতামাতি বাধিয়ে তুললে তারা। দেড়টার সময় তাদের এই ভীতিপ্রদ আচরণের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পাশার দান পড়ে গেছে। ভগবান রক্ষা করুন ব্রিটিশ নৌবহরকে!'

তখনও যুদ্ধে আমার কোন স্থান ছিল না। কয়েক দিন অসহনীয় নৈরাশ্যের সঙ্গে যুদ্ধের পর আমি সমাধান করে ফেললাম এ বার সমস্যার।

'······পদাতিক প্রহরী সেনাদলে কমিশনের জন্য আবেদন করলুম বাবার কাছে। স্বদেশের সেবা করতে পারব না— অসহনীয় এ অবস্থা। বাবা তক্ষুনি তার সেক্রেটারী লর্ড ষ্টামফোর্ডহ্যামকে আদেশ দিলেন যুদ্ধ-দপ্তরকে এই সংবাদটি জানাতে······'

পদাতিক প্রহরী সেনাদলে আমার নাম গেজেটেড হওয়ার পর আমি প্রথম লেফটেন্যাণ্ট পদপ্রাপ্ত হলাম। আমার পক্ষে এ এক বিশেষ সম্মান। পাঁচ সপ্তাহ ধরে নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ চলল। কিন্তু এই ব্যাটেলিয়নটিকে যখন বিদেশে পাঠান হোল আমাকে নেওয়া হোল না। আমার আত্মসম্মানের পক্ষে এ এক প্রচণ্ড ধাক্কা — এমন ধাক্কা আর কখন খাইনি জীবনে। তক্ষুনি চলে এলাম দাবী করতে কেন এমন হোল।

সেক্রেটারী অফ দি ষ্টেট ফর ওয়ার লর্ড কিচেনার মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শুনলেন।

—'আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই কি এসে যাবে তাতে। আমরা চার ভাই।' বার বার আমি বলতে লাগলাম।

কিচেনারের ইস্পাতের মত নীল চক্ষুর সঙ্গে আমার চোখের দৃষ্টি-বিনিময় হোল।

—'যদি জানতাম, তুমি নিশ্চিত মারা যাবে সে ক্ষেত্রে তোমাকে বাধা দেওয়ার সত্যিকারের অধিকার আমার নেই। কিন্তু যতক্ষণ না একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত হচ্ছে ততক্ষণ শত্রুর হাতে বন্দী হতে দেওয়ার দায়িত্ব আমি তো নিতে পারি না।'

ইতিমধ্যে 'রাজার প্রহরী সেনা' হওয়ার মত উপযুক্ত শিক্ষা আমি পেয়েছি। দু'মাস আমি গার্ড মাউন্টিং উৎসবে যোগ দিয়েছি। তখন ছোট ছিলাম। কাজেই বেশ উত্তেজনা পেতাম এ সব ব্যাপারে। অবশেষে দেহরক্ষী সেনাদলের সর্বাধিনায়ক হলাম।

সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সেনাদলের ভাগ্য একটি সূক্ষ্ম সূতোয় ঝুলছিল। প্রত্যহ যে হতাহতদের তালিকা প্রকাশিত হতে লাগল তার মধ্যে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যাদের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করেছি তাদের অনেকেরই নাম দেখতে পেতে লাগলাম। আমার এক খুড়ো এবং রাজার দু'জন অশ্বপাল মারা গেলেন

এই সমস্ত আত্মত্যাগের পট-ভূমিকায় যুদ্ধে একটি সম্মানীয় স্থান লাভ করার চেষ্টা নিতান্তই মামুলি ব্যাপার মাত্র। অবশ্য একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া। যাই হোক, ১৯১৪ সালের ১৬ই নভেম্বর ব্রিটিশ অভিযাত্রিক সেনাদলের সর্বাধিনায়ক ফিল্ডমার্শাল স্যার জন ফ্রেঞ্চের সদর দপ্তরের জুনিয়র ষ্টাফ-অফিসার হয়ে বাইরে গেলুম। বহু দিন যুদ্ধক্ষেত্রের সব চেয়ে নিকটতম সৈন্যের ডিভিসন্যাল হেড কোয়ার্টার্সে রইলাম। আমার কাজ শুধু কাগজ-কলমের গণ্ডীতে— ডেচপ্যাচ পাঠানোয় সীমাবদ্ধ। শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, আমার সংগ্রামোন্মুখ প্রয়াসকে এই প্রকার কর্মচাঞ্চল্যের ক্যামোফ্লেজে ঢাকবার চেষ্টা হচ্ছে।

তখন আমার এ অভিযোগ ভদ্রলোককে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের পাঁচ মাইল দূরবর্তী সৈন্য ঘাঁটিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগীয় কার্যালয়ে মুখ-বদলানর জন্য পাঠান হল। এই ভাবে প্রথম মহাসমরে আমার দুর্জ্ঞেয় অবস্থানের কথা আর বেশী বলতে চাই না। তবুও সত্য কথা বলতে কি এই যুদ্ধেই আমার শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বই-পড়া বিদ্যের দ্বারা নয়, সকল প্রকার অবস্থা ও সকল প্রকার লোকের চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে সে শিক্ষা।

এক জন সামান্য ষ্টাফ-অফিসারের জীবনেও স্মরণযোগ্য বহু কিছু ঘটে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমি ইজিপ্টে ছিলাম; ১৯১৬—১৭র মারাত্মক শীত কাটিয়েছি সোমে আর যুদ্ধের শেষ ভাগ ইতালীতে যেদিন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হল, সেদিন আমি ছিলাম কানাডীয় সৈন্যদলের মধ্যে। এইখানেই যুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯১৪ সালে ব্রিটিশের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। ইতিমধ্যেই আমার মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হতে সুরু করেছে।

১৯১৯ সালের বসন্ত কাল পর্যন্ত আমি সৈন্যদলের সঙ্গে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স এবং দখলকারী সৈন্যদের সঙ্গে জার্মানীতে ছিলাম। দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধের পর স্বদেশে ফেরার যে আনন্দ সত্যই তা অবর্ণনীয়।

বসন্তের ব্রিটেন সৌন্দর্যে অনুপম। ভগবানকে ধন্যবাদ—এ মহিমময় সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেয়েছি আমরা। রাজকীয় জাঁকজমক ঠাট এখনও বজায় আছে। লণ্ডন নগরীর অর্থনৈতিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতা উৎসারিত চার দিকে। সম্ভবত ধনের এই বাহ্যিক উলঙ্গ প্রকাশের জন্যই এই যুদ্ধে আমাদের সত্যিকার কি প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক ধারণা জন্মাতে দেরী হয়। আমাদের জাতীয় অর্থের বনিয়াদে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে সব চেয়ে দুঃখের কথা—অর্থের চেয়েও যা আর গুরুতর—সে হো আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহসী বীর-যুবকেরা অনেকেই নিহত হয়েছে যুদ্ধে।

যুদ্ধ থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের অর্থই হোল রাজকীয় অনুষ্ঠানে এবার আমায় বাবাকে সাহায্য করতে হবে। তাঁর বাসনা, আমি আর কালবিলম্ব না করে রাজ-উত্তরাধিকারীর করণীয় চিরাচরিত কর্তব্যগুলি করি। বৃক্ষ রোপণ, ভিত্তি স্থাপন, রাজপথ উদ্‌ঘাটন, সংবর্ধনা সভায় যোগ দেওয়া—বড় বড় সাহায্য-প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সভাপতি হওয়া।

পিতার প্রস্তাবক্রমে আমি ব্রিটেনের বড় বড় শিল্পপ্রধান নগর গ্লাসগো, বার্মিংহাম, প্লিমাউথ, নিউ ক্যাসেল ও লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলের ফ্যাক্টরী ও দরিদ্র পল্লীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমার তরফ থেকে বলতে পারি, ব্রিটেনের প্রচণ্ড শক্তি ও লজ্জার স্থানগুলির নগ্ন চেহারা এই সর্বপ্রথম আমার সামাজিক কর্তব্য-বুদ্ধিকে জাগ্রত করেছিল, এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। সে চেতনা এসেছিল আরো পরে আরো অনেক তথ্যানুসন্ধান ও পরিচয়ের পর। বাবা বা আমার দ্বারা এই দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর বাস-ব্যবস্থার প্রতিকার হিসেবে একটা কিছু যে করা দরকার এই বোধ জাগ্রত হওয়ার পথে আমার শিক্ষা-দীক্ষার অনুশাসন সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। এই প্রকার দুঃখজনক অবস্থার প্রতি আমরা সহানুভূতি দেখাতে পারি মাত্র। কিন্তু সব কিছুই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সুরু থেকেই এটা আমাকে সমঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, স্বাধীন চিন্তাধারায় কোন বাধা নেই, কিন্তু সে চিন্তাধারা রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করলেই, তাকে সংহত রাখতে হবে।

কিন্তু বহু দিন আমি রাজপ্রাসাদের গণ্ডীর বাহিরে ছিলাম এবং ইতিমধ্যেই কালাপাহাড়ী যুগের প্রভাব এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে সহজেই এই সমস্ত বাধা-নিষেধকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যতই আমি সারা ব্রিটেন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম ততই এটা ভোরের আলোর মত পরিষ্কার হতে লাগল আমার কাছে যে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট, চঞ্চল হয়ে উঠেছে—তাদের মোহ ভেঙ্গে গেছে। চারি দিকে কঠিন বেকার-সমস্যা। সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনাহীন পদ্ধতিতে যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকরা বিচলিত। যাদের ইতিমধ্যেই বিদায় দেওয়া হয়েছে তারা চাকুরী ও গৃহের অভাবে বিক্ষুব্ধ। ষ্ট্রাইক, বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে লাগল। বিরাট ও বিপর্যয়কারী কিছু না ঘটলেও একটা অশান্তির কালো আবহাওয়ায় চারি দিক পরিব্যাপ্ত।

বাবা সর্বপ্রথম লণ্ডনে এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হলেন। পদচ্যুত অকর্মণ্য সৈনিকদের ধূমায়মান অসন্তোষকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে হাইড পার্কে পনের হাজার লোকের একটি দলকে দর্শন দেওয়ার জন্ত যুদ্ধ-দপ্তর আহ্বান জানাল বাবাকে। তিনি আমায় ও বার্টিকে নিয়ে গেলেন প্যারেডে।

বেসামরিক পোষাকে লোকগুলি সারবন্দী দাঁড়িয়ে। কিন্তু আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা অসহযোগী থমথমে ভাব। আমরা তিন জনেই তা স্পষ্ট অনুভব করলাম। পর্বতের মত অটল বাবা সবার আগে ঘোড়া চালাচ্ছেন। হঠাৎ সম্মুখ ভাগে চাঞ্চল্য দেখা দিল—লোকেরা শ্লোগান-লেখা লুকান পতাকা খুলে ধরল সামনে বিদ্রোহীর দৃষ্টিতে। 'বীরের সে দেশ কোথায়?' লয়েড জর্জের বিখ্যাত ইলেকশন শ্লোগানের পাল্টা জবাবের আওয়াজ তুলে তারা দল ভেঙ্গে ছুটে এল বাবার দিকে। দেখতে না দেখতে এক বিরাট জনতা ঘিরে ফেলল বাবাকে! মুহূর্তের জন্তে আমার মনে হল তারা বুঝি বাবাকে জোর করে নামাবে মাটিতে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, যারা বাবার কাছে আসতে পারছে তারা কেবলমাত্র বাবার সঙ্গে করমর্দনের চেষ্টা করছে। কোন দুরভিসন্ধি নেই তাদের। তারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা মহামান্য সম্রাটকে নিজে জানাবার সুযোগ নিয়েছে! আর যুদ্ধ-দপ্তরই অজ্ঞাতসারে সে সুযোগ করে দিয়েছে। একমাত্র বিপদের সম্ভাবনা বাবার ঘোড়া হয়ত ভয় পেয়ে যেতে পারে। এবং একবার যদি ঘোড়া ভিড়ের মধ্যে পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে কেহ না কেহ নিশ্চিত আহত হবেই। তখন এই রকম বিস্ফোরক আবহাওয়ায় যে-কোন ব্যাপার ঘটা আদৌ অসম্ভব ছিল না।

সৌভাগ্যের বিষয়, পুলিশ এসে শীঘ্রই আমাদের জনতার হাত থেকে উদ্ধার করল। আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে এলাম। বাবা ঘোড়া থেকে নেমে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'আশ্চর্য্য, হঠাৎ লোকগুলোর মাথা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল।' তার পর মাথা নেড়ে যেন একটা বিশ্রী স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি অন্দরে চলে গেলেন। যে যুদ্ধ সমগ্র দেশবাসীর মাথায় এই দুঃখ ও মৃত্যুর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, এই অসন্তোষ যে তারই অবশ্যম্ভাবী ফল এ বোঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব, এবং জার নিকোলাস ও তার পরিবার-বর্গের নৃশংস ভাবে হত্যা বাবার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। নিকি আর তাঁর মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধন ছিল। এ ধারণা বহু দিন আমার মনে বদ্ধমূল ছিল যে, বলশেভিকদের দ্বারা নিহত হবার আগে বাবা একটি বৃটিশ ক্রুজার পাঠিয়ে জারকে উদ্ধারের এক গোপন পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক রাজনৈতিক বিভাগের হস্তক্ষেপের দরুণ বাবার সে প্ল্যান কার্য্যে রূপান্তরিত হতে পারেনি। বৃটেন যে খুড়ো নিকিকে বাঁচানোর জন্য একটি হস্তও উত্তোলন করেনি এর জন্য তিনি ভারী দুঃখ পেয়েছিলেন মনে। তিনি প্রায়ই বলতেন—'কুৎসিত এই রাজনীতির খেলা। এটা যদি কোন রাজনীতির ব্যাপার হোত তারা দ্রুত কাজ করত। কিন্তু যেহেতু হতভাগ্যের সঙ্গে রাজরক্তের সম্পর্ক আছে······'

বৃটেন এবং সারা পৃথিবীতে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে সে সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে বহু দিন আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। যত বেশী আলোচনা হয়েছে ততই আমাদের মতের বিরুদ্ধতা দুস্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অটুট বন্ধুত্বই বজায় থাকত। এ দুস্তরতা হৃদয়ের নয়—যুগের। আমি শুধু রাজপুত্রই নই, যুদ্ধের হোমানলে আমি পরিশুদ্ধ। আমার একটা নিজস্ব ভাবধারা গড়ে উঠেছে। অপর পক্ষে বাবা সকল দিক্ থেকেই রাজা—ভিক্টোরিয়ান ও এডোয়ার্ডিয়ান রীতি-নীতি ও পরিবেশে সম্পূর্ণ লালিত।

যে অদ্ভুত চিন্তাধারা চুঁইয়ে আসতে লাগল আমাদের দ্বীপে তা তাঁকে বিভ্রান্ত করত। বিশেষ করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও এই সব চিন্তাধারার ধারক, পরিপোষক।

কিন্তু যে বিলাস-ব্যসনপূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের জন্ত আমি শিক্ষা পেয়েছি তার প্রতি আমার আকর্ষণ বহুলাংশে শিথিল হয়ে এসেছে। এইবার প্রিন্স অব ওয়েলস হিসেবে আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন

করার জন্য প্রেরিত হলাম। সফরের উদ্দেশ্য রাজতন্ত্রকে ব্রিটেনের জনসাধারণের হৃদয়ের দুয়ারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যদিও প্রাচীন ঐতিহ্যে গড়া ব্রিটেনের মানসিক সংগঠন রাজানুগত্যের প্রতি অনুকূল, তবুও অতীতের মত সব কিছুকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছিল ক্রমশ।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কলোনীতে যাদের মনে সাম্রাজ্যের ধারণা নাড়া খেয়েছে ভীষণ ভাবে, তাদের মনে সেই ধারণার ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করা এবং বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে সখ্যবন্ধন আরো মধুরতর করাও এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য।

লয়েড জর্জ আমার জীবন-সৌধের এক জন নিপুণ স্থপতি। বিদেশে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি ও সম্মান ক্ষুন্ন হওয়ায় দুশ্চিন্তিত লয়েড জর্জ আমাকে অতি কঠোর ভাবে চালিত করতে লাগলেন—পরবর্তী বার মাস আমাকে বিশ্রামহীন একটানা ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

এই ভাবে ঘুরে বেড়ানোর বায়োস্কোপের ছবির মত একটির পর একটি ঘটনা দ্রুত আসতে লাগল জীবনের পর্দায়। কানাডিয়ান কাউপাঞ্চার; অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়ার ষ্টেশন; র‍্যাণ্ডের স্বর্ণখনি; আর্জেন্টিয়াম প্যাম্পাস; উগাণ্ডার তেড়ে আসা ঐরাবত; ভারতের প্রাচীন কৃষক সম্প্রদায়ের বিস্ময়; হোয়াইট হাউসে লিনকোলনের গদীতে আসীন প্রেসিডেন্ট উইলসন—নানা ছবির জটলা।

এই পর্যটনে আমার শরীর ও মনের উপর ধারণাতীত চাপ পড়েছিল। চমৎকার পোষাকী বক্তৃতার বিষয়বস্তু হওয়া খুব মজার সন্দেহ নেই। কিন্তু দিনের পর দিন এবং দিনে বহু বার আমার বাকপটু তালিম দেওয়া ভোজদাতাদের আশানুরূপ মধুর অথচ সতর্ক বাছাই বাছাই কথা বলার ভয়ংকর ব্যাপারের মত এমন শোচনীয় আর কিছু আছে কি মানুষের জীবনে?

যাই হোক, এ সমস্তই বহুদিন আগেকার ঘটনা এবং আমার পর্যটনের উদ্দেশ্যও অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। অবশ্য অনেক সুখ্যাতিসূচক বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেদিন। কিন্তু আমি যে অবস্থার ক্রোড়ে জন্মেছিলাম তার উচিত মত কাজ করতে সর্বতোভাবেই চেষ্টা করেছি।

অসি খেলা

শ্রীশান্তি পাল

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাঙালীর অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দৈন্য-দুর্গতি সুরু হয়। তাহার পূর্ব্বেকার ইতিহাস এখনকার মত কলঙ্কিত নয়। দুই শত আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী স্বাস্থ্য-সম্পদে, ধনে-মানে শৌর্য্যে-বীর্য্যে মহীয়ান ছিল, তাহার যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। সেদিনকার বাঙালী-সন্তান মল্ল-যুদ্ধ, লাঠি, অসি খেলায় অতিশয় অগ্রণী ছিল। লাঠি ও তরবারির জোরেই বাঙালী এক দিন পাঠান, মোগল, মগ, পর্ত্তুগীজ ও দিনেমার দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ধন-মান-সম্পত্তি ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিত। পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এখানে সেই যুগের একটি দৃশ্যের অবতারণা করিতেছি। হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে তথাকার ভদ্রকালী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নিশীথে দুই প্রতিদ্বন্দী অসি-যোদ্ধার দল স্ব-স্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঢাক ঢোল কাঁসি ভেঁপু কাড়া-নাকাড়া বাজিতেছে। মশালের আলোকে চতুর্দ্দিক দেদীপ্যমান। এক দলের মুখপাত্রের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোলের বোল চলিতেছে :—

প্রণাম করি মুক্তকেশী মুণ্ডমালিকে।
দুঃখহরা পরাৎপরা ভদ্রকালিকে।
দাও মা মোরে চরণ-ধূলি অঙ্গে মেখে যাই,
বরাভয়া, তোর আশিসে মরণ-ভয় আর নাই।
ঝাঁ—ঝেঁ—ঝেঁ—ঝাঁ,
তাগিয়া-গিনে—তা,
গিগ্যি-গিনে-নেজা-গিনে—তা।
প্রণাম করি পণ্ডিতে আর ভূদেব ব্রাহ্মণে।
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দখিণ আর চারি কোণে।
ইন্দ্র আদি সূর্য্য দ্বাদশ রুদ্র একাদশ,
অষ্ট বসু অগ্নি বরুণ দেব ঋষি হোক বশ।
তাক-ঝাঁ ঝাঁ, নাক-ঝাঁ ঝা
ঝাউর গিজ্যা ঘ্যি-ত্যা ত্যা
তা—ঘিটি তাক্—তা।
প্রণাম করি গুরুর পদে ঘুরাই অসি রে,
আজ্‌কে শুভ রাত্রি ভরা চতুর্দ্দশী রে।
বিশাল ভুঁয়ে মশাল জ্বলে সাক্ষী থাকুন মা;
প্রথম খেলি অর্দ্ধ-পদে পরে আড়াই পা।

ঝাঁ-ঝেঁ-ঝেঁ-ঝাঁ,
তাগিয়া-গিনে—তা
গিগ্যি-গিনে-নেজা-গিনে—তা।
কাঁউ নানা কাঁউ কাঁউ
কাঁউ নানা কাঁউ কাঁউ
গিজ্যা-গিজ্যা-গিজ্যা—ঝাঁ,
গিজ্যা—জিগি্য-না-ঝাঁ,
গিজ্যা-তেনে—নেতা-তা,
ঝনন্ ঝনন্ ঝাঁ।
ঝন্—ঝন্—ঝনা—ঝন্
অরি-ভয়-ভঞ্জন।
চক্ চক্ চকা চক্ বিদ্যুৎ-রঞ্জন,—
খড়্গের ঝন্ ঝন্ বর্ম্মের বন্ধ
খড়্গের চক্ মক্ নর্ম্মের ধন্ধ,
খড়্গের ঘূর্ণন ঝঞ্ঝার শন্ শন্
গ্রহে গ্রহে ঘর্ষণ ফুলিঙ্গ বর্ষণ,
কৃপাহীন কৃপাণের মুঠিতলে নর্ত্তন;
পিনাকীর পদছায়া করে অনুবর্ত্তন।

ঝাঁকড়া চুলে বাজের পালকগলায় জবার মাল;
লোহার কলি কড়ির তাবিজ সিঁদুর ঢালা ভাল;
শক্তিময়ীর ভক্ত শিশু—বজ্র হাতের কাছ;
শিরায় শিরায় রক্ত তাজা—
পাগলা ঝোরার নাচ্।
নাচ্‌ছে কালী ভদ্রকালী জগৎপালিকা।
রক্তদাঁতী হস্তে কাতি ঘুরায় চালিকা।
হাস্‌ছে হাসি ত্রিলোক ত্রাসি চণ্ড নাশিতে,
বাজাও ভেঁপু বাজাও কাড়া—ঘা দাও কাঁসিতে।
ঝেনাক-ঝাঁ তেনাক-তা
ঝেনাক-ঝেনাক—ঝেনাক-ঝাঁ
তেনাক-তেনাক—তেনাক-তা।
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠনাক ঠন্;
জোনাক-ভরা ভাঁটের বন।
শত্রু ভীরু হঠ্‌ পিছে;
পাঁয়তারা তোর সব মিছে;
উল্কা ন্যায়ে ব্যোম ফুঁড়ে;
ফুল্কি ছোটে ভুঁই জুড়ে।

রক্ত চাই রক্ত চাই,—
দামাল অসির সামাল ধাই।
বাহেরা মেরে প্রথম ঘাতে
তামেচা দে রে দোসরা ঘাতে,
ফড়ক মেরে তেসরা ঘাতে
সাকম দে রে চতুর্ঘাতে
প্রপদ মেরে পঞ্চঘাতে
আসর দে রে ষষ্ঠ ঘাতে,
ত্রিভর মেরে সপ্ত ঘাতে
চাপনি দে রে অষ্ট ঘাতে,
ওলট মেরে নবম ঘাতে,
পালট দে রে দশম ঘাতে।
* * *
শ্যামল ঘাতে [illegible] ছোটে
বিষম ঘাতে দুই ফোটে
দুটি ফোটে দুটি ফোটে দুটি ফোটে রে,
দুটি টোটে দুটি টোটে দুটি টোটে রে!
অসির বুকে সূর্য্য-শশীর মুকুর হ'লো রে;—
অসির মুখে কোন রূপসীর সিঁথি প'লো রে।
অসির গায়ে লক্ষ হীরা মাণিক জ্বলে রে;—
অসির বাঁটে নীল ও মুকুল মুক্তা ফলে রে!—
ঝেনাক ঝাঁ তেনাক-তা
ঝেনাক-ঝেনাক—ঝেনাক-ঝাঁ
তেনাক-তেনাক—তেনাক তা।
বাজে ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া—
ওড়ে কালো কালো চুল ঝাঁকড়া।
চটপট মার, ধুলি চক্ষে,
পায়ে পায়ে বেঁধে ভুল বক্ষে।
ওত পেতে থাক্ ধর, দমকে,
যায় নাক' যেন হাত ফস্কে!
শয়তান এরা বড় দুষ্ট,
চোরা মার মারে; ভারি দুষ্টু।
পাত তাড়ি দে' ঘোর, পালটা
সমঝিয়ে নে' নয়া চালটা।
শির মোড়' চির, অম্বরে—
কক্ষ চন্দ্রমস্তরে
দ্বিঘাত ত্রিঘাত হাতকাটি
ওলট পালট দাব, মাটি।
চাপ রি চাকি ভাণ্ডারে—
বিকট প্রকট পঞ্জরে
ভ্রূকুটি কটি দক্ষিণে
মন ভুল দে লোক চিনে!
সাকম ত্রিভর অঙ্গাতে—
অসম প্রপাত শ্যাম-ঘাতে
বাণ্ডা গ্রীবাণ চতুষ্কায়
বজ্রমণি ভাঙ্গরে তায়।

অক্রূ বজ্র উত্তরে—
শৃঙ্গবাহী ঊর্দ্ধ রে
পিণ্ডি আসয় ভর্জ্জাতে
পৃষ্ঠ পুনঃ মার ঘাতে!
এক সাপ রে এক সাথে!
সৃষ্টিনাশী বন্যার বাঁশী বাজায় অসি রে,
এক এক ঘায়ে এক এক তারা পুড়ুক খসি রে।
তুই যে মায়ের দামাল ছেলে
ভয়টা তোর আর কি?
দেখ্ পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল রাজার ঝি!
রাক্ষী ভৈরবী!
ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ
ওরে বাঘের ছা!
খেল্ রে এবার আড়াই পায়ে আগড় দিয়ে বা।

কাঁউ নানা কাঁউ কাঁউ
কাঁউ নানা কাঁউ কাঁউ
গিজ্যা-গিজ্যা-গিজ্যা—ঝাঁ
গিজ্যা গিগি—না—ঝাঁ
গিজ্যা-তেনে—নেতা—তা
ঝনন ঝনন ঝাঁ।
ঝন—ঝন—ঝন—ঝন
অরি-ভয় ভঞ্জন,
চক্-চক্—চকা-চক্
বিদ্যুৎ-রঞ্জন,—

খড়্গের ঝনঝন্ কামার বক্ষ
খড়্গের চকমক্ নক্ষের ধক্ক
খড়্গের ঘূর্ণন ঝঙ্কার শনশন্
গ্রহে গ্রহে ঘর্ষণ ফুলিঙ্গ বর্ষণ,
কৃপাহীন কৃপাণের মুঠিতলে নর্ত্তন;
পিনাকীর পদছায়া করে অনুবর্ত্তন।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাক্ ঝন
গর্জ্জে ওঠে প্রভঞ্জন।
ডাকিনী আর যোগিনীরা—
শ্মশান মাঝে আজ অধীরা,
ফট ফটা ফট ফাঁড়ছে বাঁশ—
ছট্ ছটা ছট্ অট্টহাস;
রক্ত চাই রক্ত চাই—
দামাল অসির সামাল ধাই।
ঝেনাক ঝাঁ তেনাক-তা
ঝেনাক্-ঝেনাক্-ঝেনাক-ঝাঁ
তেনাক্-তেনাক্—তেনাক্-তা।
চতুর্মুখী (এবার) গিগ্যি-ঝাঁ
চন্দ্রমস্তী ত্যা-তেনে—তা।
শঙ্কাসুরী গিগ্যি—গ্যিনে ঝাঁ।

শৃঙ্গবাহী ঘিন ত্যোনে—তা,
দক্ষিণানী (এবার) গিগ্যি-ঝাঁ,
নের চুল ত্যা-ত্যানে তা,
চক্রদোলা কিটি-কিটি—ঝাঁ।
অংসদলী ঘেন-ঘেনে—তা,
বজ্রমণি ঝেনা-ঝিন—ঝাঁ।
জনার্দ্দনী তেনা-তিন—তা,
সন্দীপনী খেনে-খেনে—ঝাঁ।
সম্মোহনী তেনে-তেনে—তা
কড়ক মেরে ধিনি-দাগি—না
চাপনি দে রে ধানি-ঢিনি—তা,
ত্রিগড় মেরে (এবার) গিগ্যি-ঝাঁ।
ত্রিভর দে রে ত্যা-তোনে—তা।
(এবার) গিগ্যি-ঝাঁ—ত্যা-ত্যোনে-তা,
(এবার) গিগ্যি-ঝাঁ—ত্যা-ত্যোনে-তা,
ঝেনাক-ঝেনাক—ঝেনাক-ঝাঁ।
তেনাক-তেনাক—তেনাক-তা।
বন্ বন্ বন্ ঘুমায় বন;
রক্তের নেশায় মাতাল মন।
ডাক্‌ছে শিবা ডাক্‌ছে ফেউ
আজ বাঁচে কি সমরে কেউ?
মশাল-শিখা নাচছে নীর
ডুববে এবার—কাঁপার তীর!
রক্ত চাই, রক্ত চাই—
দামাল অসির সামাল ধাই।
মর্ম্মভেদী খড়্গ এ যে উল্কা সম ধায়,—
তুক্ক-তার দণ্ড নিয়ে মুণ্ড নিতে চায়।
সূর্য্যসম দীপ্তি এরি তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
শঙ্কাহরণ মৃত্যুতরণ বন্ধু অনুচর।
পেয়েছি মা'র বর জয় ক'রেছি ডর,
সর-সর-সর-সর—
আজকে খোঁচা মারবে কে রে বাঘের ছানাকে!
সোঁদর বনের রাজার দুলাল—
কে ছোঁয় আমাকে?
মায়ের চোখে জলের ধারা আনল টেনে কে?
সাহস থাকে সম্মুখে মোর এগিয়ে আসুক সে।
মায়ের চোখের জল দেখে,
কাঁদছে কে রে মুখ ঢেকে?
ব্যোম ভোলাকে আন্ ডেকে,
খুশী হ' তার খুন দেখে।
শত্রু রুধির পান ক'রে হ' তৃপ্ত কালিকে!
আর কেন মা ভয়ঙ্করী মুণ্ডমালিকে?
দৈত্যদানা যতেক ছিল আজ তারা নেই কেউ,
শান্তি এল, ক্লান্তি গেল, উঠছে হাসির ঢেউ।
বসন পরো দিগম্বরি, ওই পোহাল রাত;
তোমার কৃপায় আজ শ্মশানে ফুটল পারিজাত।

প্রভাত-সঙ্গীত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মহাস্থবির

রাতে

আজকাল শহর বড় হয়েছে, লোকজন গাড়ী অনেক বেড়েছে, রাস্তায় বেরুলে মনে হয় যেন রথের মেলায় ঢুকে পড়েছি। শহরের অনেক পরিবর্তন হলেও বাঙালী-চরিত্রের একটা দিকের পরিবর্তন হয়েছে খুবই কম। অর্থাৎ কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরলে তারা আর গর্ত্ত ছেড়ে বেরুতে চায় না। সাধারণতঃ বাঙালীর জীবন তার চাকরী-ব্যবসা-কাজকর্ম অর্থাৎ অর্থ অন্বেষণ ও সংসার, এই নিয়ে। মুখে যাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ অধিকাংশ লোকই এই গণ্ডির বাইরে পা দিতে চায় না। প্রায় প্রত্যেক বাঙালীই অবাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না এবং নিজের ক্ষেত্রের বাইরে অন্য আড্ডায় গিয়ে পড়লে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে আজকাল অনেকে মুক্ত হলেও আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যেতে পারত।

হিন্দু-মুসলমানে প্রেমভাব বৃদ্ধি পাবার তালে তালে দেশ, বিশেষ করে শহরে হিন্দুদের মধ্যে লুঙ্গি ও মুরগীর প্রভাব আজ যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আগে তা ছিল না।

কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে, বা স্নান করে অনেকেই একখানি আটহাতি ধুতি পরতেন। চোদ্দ হাত ধুতিতে লজ্জা নিবারণ হয় না, এমন সব শ্রীঅঙ্গে যখন সেই আটহাতি ধুতি পড়ত, তখন যে কি শোভা হত তা বলাই বাহুল্য—গোহত্যার গন্ধ থাকলেও তার তুলনায় লুঙ্গিও ঢের সভ্য। এর পরে অবস্থা-নির্বিশেষে যার যেমন জুটল, তেমনি জলযোগ করে কেউ বা বাড়ীতেই ছেলে ঠেঙাতে বসতেন আর কেউ বা হুঁকো হাতে, কেউ বা খালি হাতেই পাড়াতেই আড্ডা দিতে বেরুতেন। এই ছিল সাধারণ লোকের নিয়ম।

পথ জনবিরল হয়ে পড়ার সঙ্গে পথের দু'-ধারের বাড়ীগুলোর রকে আড্ডা জমাট হোতো। প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই এই রকম দু'টো-তিনটে রক থাকত যেখানে পাড়ার মুরুব্বীরা সন্ধ্যের পরে গিয়ে জমতেন—বে-পাড়া থেকেও কেউ কেউ আসতেন। বর্ষা ও শীতের দিনে ঘরের মধ্যে বসা হোতো আর অন্য সময়ে রকে মাদুর কিংবা শতরঞ্চি পেতে বসা হোতো সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করে সেই সাড়ে ন'টার তোপ পড়া পর্য্যন্ত। সাড়ে ন'টার তোপ কলকাতাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সাড়ে ন'টার তোপ ছাড়াও সে যুগে ঠিক ঐ সময় পোর্ট কমিশনারের ভোঁ বাজত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। অনেক দিন আগেই কলকাতা তার এই সম্পদ দু'টি হারিয়েছিল, আজ সে নিজস্ব সময়টুকুও হারিয়েছে।

সে যুগে সাড়ে ন'টায় তোপ পড়ার সঙ্গে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি আরম্ভ হোতো। আবগারী দোকান বন্ধ হোতো (অবশ্য সামনের দরজা) সাড়ে নটায়, ছেলেরা পড়া থেকে ত্রাণ পেত, বাবুদের আড্ডা ভাঙত, এ রকম কত কি!

রাতের ফেরিওয়ালারা সব সৌখিন জিনিষ নিয়ে বেরুতো—কুলপী বরফ, জামাইভত্ব লেডিকেনি, জুঁয়ের গোড়ে, বেলের মালা এই রকম সব জিনিষ। রাতে এক রকম অবাক জলপানওয়ালা আসত, তারা নানা রকম মজার কবিতা আবৃত্তি করত, কেউ কেউ গানও করত। বাবুদের আড্ডায় এদের খুবই পশার ছিল। আধুনিক যুগে অবিশ্যি অবাক জলপানওয়ালারা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে গান গায়—ফেরী করা সম্বন্ধে তারা অনেক উন্নত পন্থা অবলম্বন করেছে।

প্রায়ই এই সব আড্ডায় নিজেদের মধ্যে আপোষে তর্কাতর্কি হতে হতে এমন ঝগড়া ও গালাগালি সুরু হোতো যে বাড়ীর মধ্যেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন—একটা মারামারি খুনোখুনি হয় বুঝি! কিন্তু তখনকার লোকদের আড্ডার প্রতি এমন নিষ্ঠা ছিল যে, হাজার ঝগড়া হলেও পরদিন সন্ধ্যে বেলায় আবার গুটি-গুটি আড্ডায় গিয়ে বসা চাই। এর চাইতে অনেক কম ঝগড়াতেও ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হয়ে যেতে দেখা যেত।

সেকালে রাত্রি বেলা বহুরূপী বেরুতো নানা রকম সাজ সেজে। কালীমূর্ত্তি বহুরূপীর কথা মনে হলে আজও শিউরে উঠতে হয়। লোকটা গেঞ্জির underwear কালো রংয়ে ছুপিয়ে পরে দুই পায়ে ঘুঙুর চড়াতো। দু'টো খুব লম্বা-লম্বা ফাঁপা টিনের হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথায় কালী ঠাকুরের টিনের মুখোস পরে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন খল-খল করে হাসতে আরম্ভ করত, তখন ছোটদের দল, তা যে যতই ওস্তাদ হোক না কেন, দৌড় দিত অন্দর-মহলের দিকে।

বহুরূপীদের বেশ খাতিরও ছিল পাড়ায়। তারা যে মানুষ, অন্য কোন জীব নয়, এ জ্ঞান টনটনে থাকলেও কি জানি তবুও মনে হোতো তারা ঠিক আমাদের মতন নয়। প্রতিদিন কালী সেজে-সেজে তারা কালী ঠাকুরের অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে বলে মনে হোতো। গলায় টিনের নরমুণ্ডের মালা ঝুলছে বুঝতে পারলেও বুদ্ধিকে কল্পনার ধোকা লাগাতুম—আসলে ওগুলো সত্যিকারেরই নরমুণ্ড, তবে মা কালীর প্রভাবে ওগুলো লোকের মনে হয় যেন টিনের। আমরা মনে করতুম, ওরা লুকিয়ে নরমুণ্ড খায় ও নররক্ত পান করে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে কালী ঠাকুর নিজে আসেন ওদের কাছে পূজো নেবার জন্য। লোকেরও বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালে কিছু দিতেই হবে, নইলে শাপ-মন্যি ঝেড়ে দিলে 'একদমসে গেচিস' হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ঠাকুর-মার্কা বহুরূপীদের সম্বন্ধে এই রকম সব অতিপ্রাকৃত ধারণাগুলোকে কল্পনার বাতাস দিয়ে আমরা খুবই উঁচুতে তুলে রেখেছিলুম, এমন সময় এক দিনের একটা ঘটনায় সব উড়ে গেল।

এক দিন, সেদিন নিশ্চয় শনিবার কিংবা কোন ছুটির দিন ছিল। নইলে সে সময় পাঠাগার ছেড়ে নীচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সন্ধ্যে উৎরে যাবার কিছু পরে আমাদের সদর দরজা খোলা পেয়ে ঝম্-ঝম্ আওয়াজ করতে করতে কালীমূর্ত্তি একেবারে উঠোনে এসে হাজির হল। তার পেছনে রকের আড্ডা থেকে জন কয়েক উঠে এলেন। ভিড় বাড়ছে দেখে সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

বহুরূপী খানিকক্ষণ অট্টহাসি হাসলে, তার পর ভয় দেখাবার জন্ত দু'-একবার আমাদের দিকে তেড়ে এল। এতক্ষণ চলছিল বেশ কিন্তু হঠাৎ সে মাথার ওপর থেকে সেই দাঁত ও লম্বা জিভ বার করা প্রকাণ্ড মুখোশটা খুলে ফেল্লে।

এঃ, এ যে একেবারে আমাদের মতনই! এক মুরুব্বী ভদ্রলোক ভড়াক ভড়াক করে তামাক টেনে চলেছিলেন, বহুরূপী ঝম্-ঝম্ করে সেদিকে এগিয়ে সেই লম্বা টিনের হাত একেবারে তাঁর নাকের ডগা অবধি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—বাবু, কলকেটা দয়া করে একটু দেবেন?

আচম্কা নাকের ডগায় কালীর হাত দেখে—হোক্ না সে টিনের কালী—কিসে যে কি হয়, তা কে বলতে পারে!—ভদ্রলোক ভড়কে গিয়ে হুঁকো-হাতে তিন পা পিছিয়ে গেলেন।

একটা হাসাহাসি পড়ে গেল। ভদ্রলোক সেদিকে গ্রাহ্য না করে এক রকম কাঁপতে-কাঁপতেই হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে সেই টিনের হাতের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

বহুরূপী টপ-টপ করে দু-হাতের খোলোশ খুলে মাটিতে নামিয়ে রেখে কলকেটা নিয়ে উবু হয়ে বসে দশ আঙুল দিয়ে সেটাকে সাপটে ধরে ফক্-ফক্ করে টানতে আরম্ভ করে দিলে।

আর এক জন, তাঁর হাতে খেলো হুঁকো, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের দেশ কোথায় গা?

বহুরূপী সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কলকেটা নামিয়ে ধরে আগুনে খুব জোরে ফুঁ দিতে লাগল। তার পরে আবার গোটা কয়েক টান মেরে বল্লে—নাঃ, এতে কিছু নেই—নিন্ ঠাকুর, আপনার কলকে—

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক খালি গায়েই এসেছিলেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্তের ঘরে দিবা-রাত্রি জামা টেনকে থাকবার রেওয়াজ ছিল না। গ্রীষ্মের দিনে বাড়ীতে তো বটেই, পাড়ায় বেরুতে হলেও লোকে খালি গায়েই বেরুত।

ভদ্রলোক নিজের হুঁকোর মাথায় কলকেটা বসাচ্ছেন, এমন সময় বহুরূপী বল্লে—সাধে কি আর বলে—বামুন-চোষা কলকে!

কথাটা শুনে সভায় একেবারে হর্‌রা উঠে গেল। মেয়েরা ছিলেন আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেও চাপা হাসির দু'-চারটে টুক্‌রো ছিট্‌কে এল। ভদ্রলোক বিলক্ষণ চটে গিয়ে কি প্যাঁচে বহুরূপীকে কাৎ করা যায়, গুম্ হয়ে তাই ভাবতে লাগলেন।

বহুরূপী কিন্তু নির্বিকার হয়ে অন্য দিকে ফিরে যে ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁকে বল্লে—দিন্ বাবু আপনার কলকেটা।

ভদ্রলোক কলকেটা তুলে তার হাতে দিতেই সে আবার সেই রকম উবু হয়ে বসে সাঁই-সাঁই করে দম লাগাতে লাগল—সভা হয়ে গেল একেবারে নিস্তব্ধ। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই হাঁ করে তার কলকে-টানা দেখতে লাগলুম, সকলেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম—এবার কি হয়!

মিনিট খানেক বাদে কলকেটা নামিয়ে মুখের সামনেকার ধোঁয়া তাড়াতে তাড়াতে বহুরূপী বললে—হ্যাঁ বাবু, জিজ্ঞাসা করছিলেন দেশ কোথায়? দেশ আমাদের নদে জেলায়।

আগেকার ভদ্রলোক ততক্ষণে সামলে উঠে বহুরূপীকে বোধ হয় একেবারে পেড়ে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি জাত হে?

যার কলকে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বহুরূপী বিনীত ভাবে তাঁকে বললে—আজ্ঞে, আমরা জাতে ছুতোর।

ভদ্রলোক বেশ উৎফুল্ল হয়ে আবার একটি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন—তা বাপু, ছুতোরের ছেলে হ'য়ে জাত-ব্যবসা ছেড়ে এ উঞ্ছবৃত্তি করছ কেন?

বহুরূপী বেশ বিজ্ঞের মতন জবাব দিলে—জাত-ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করা যদি উঞ্ছবৃত্তি হয়, তা হলে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে ঠাকুর। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি কি জাত-ব্যবসা করেন, না উঞ্ছবৃত্তিই করে থাকেন আমার মতন?

সেখানে আরও দু'-চার জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, কথাটা তাঁরা রসচ্ছলে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ কেউ দু'-একটা মন্তব্যও ছাড়তে লাগলেন। এক জন বললেন—বলি ওহে, কথা তো খুব বলতে পার দেখছি, গান-টান গাইতে পার?

বহুরূপী একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে বললে—তা একটু-আধটু পারি বৈ কি! পয়সা পেলেই গাই।

গানের হুকুম হল। বহুরূপী একটু ঘুম্-ঘুম্ আওয়াজ করে গলা ভেঁজে নিয়ে গান ধরলে—শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।

পুরোনো গান কিন্তু বহুরূপী ছিল সুকণ্ঠ—গানটা ভাবের সঙ্গে দু'-তিন বার গেয়ে-গেয়ে সে থামল। অতো[illegible] কণ্ঠকর আসরের মধ্যে যেন মেঘবর্ষণ হল। তার [illegible] [illegible] রাগ করেছিলেন তাঁদের উষ্মা কেটে গেল। দু'-এক জনের চক্ষু লোক-দেখানো জলে ভরে উঠল। পাড়ার জন দুয়েক নামজাদা কালীভক্ত পুজোর দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে বেরিয়ে [illegible] জন্য ছটফট করতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে আবার গানের ফরমাশ সুরু হল।

এক জন রসিকতা করলেন—হ্যাঁ হে, নাচতে পার?

বহুরূপী হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে না।

এক জন বললেন—নাচো না হে, লজ্জা কি! পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছ আর নাচতে জান না? এ কি একটা কথা হল!

বহুরূপী আবার সেই রকম হাতজোড় করে বললে—আজ্ঞে, আমি নিজের ইচ্ছায় নাচি না—তবে আপনারা যখন বলছেন তখন নাচতেই হবে। বিদায়ের সময় ভুলবেন না।

সকলে মিলে বহুরূপীকে উৎসাহ দিতে লাগলেন—নাচো, নাচো—কোন ভয় নেই।

সবার কথায় বহুরূপী তার নাচ সুরু করলে।

বাপ রে, সে কি নাচ! কি লম্ফ কি ঝম্প! বাড়ীর ও বাইরের যত লোক ছিল সেখানে—ছেলে-বুড়ো কারুর মুখে আর বাক্যি নেই! আর সে নাচের কি শেষ আছে! থেকে থেকে ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে
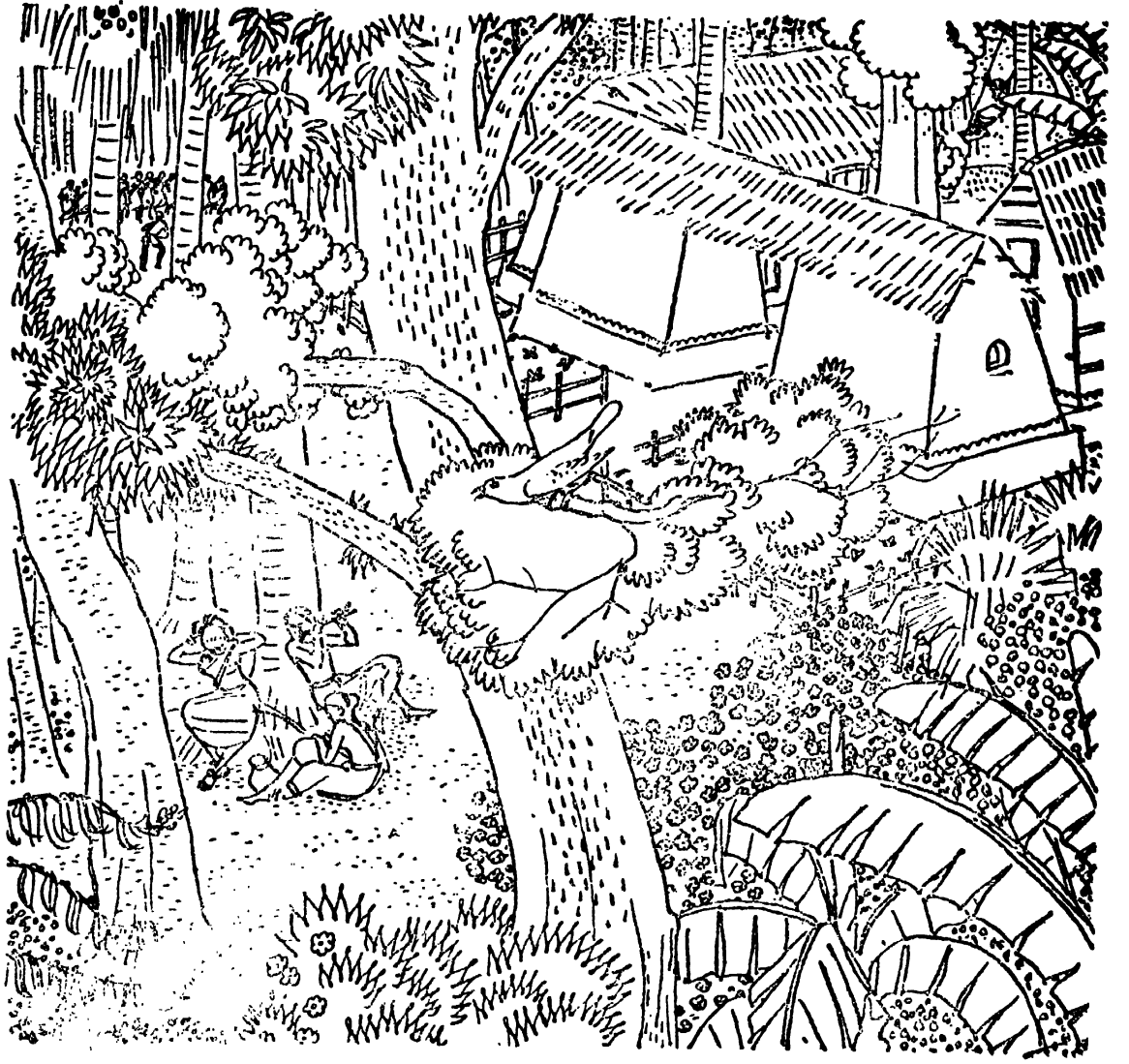
বসন্ত

আমের বোলের গন্ধে আজ বাতাস মন্থর, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায় সবুজের সমারোহ— বসন্ত এসেছে তার বর্ণগন্ধের [illegible] হিন্দোলে। তারই ছোঁয়া লেগে ধরণীর শুক্‌নো ধূলায় আজ নতুন প্রাণের শিহরণ জেগেছে, রঙে রসে ভরা তার সুরটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে মানুষের মনে মনে। বসন্তের এই দুর্লভ দিনগুলি বুঝি আরো মধুর হয়ে ওঠে এক পেয়ালা চায়ের রসধারায়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একসপ্যান্‌শন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

মাটি ছেড়ে হাত দুয়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠে এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসা, খাঁড়া দিয়ে অসুর বধ করা, যুদ্ধ করা, অসুর ধরে ধরে খাওয়া—দেখতে দেখতে আমরা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম আর মনে হতে লাগল, ধরে না থামালে বোধ হয় আমাদের জীবনভোর এই রকম দাঁড়িয়ে নাচই দেখতে হবে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে এই রকম নেচে বহুরূপী এলিয়ে পড়ল।

যা হোক, নাচ শেষ হোলো, সকলে চুপচাপ, এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, এমন সময় বহুরূপীই বললে—বাবু, এবার আমায় বিদায় দান।

সকলের টনক নড়ল, বহুরূপী বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়ে আবার আসবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল।

বহুরূপী চলে যেতেই তার নাচ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়ে গেল। কেউ বললে—ব্যাটা আমাদের খুব বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল।

কেউ বললে—বাপের জন্মে এমন নাচ দেখিনি।

বৃদ্ধ অক্রুর বাবু এক জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন, এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—অক্রুরদা কি বলেন?

অক্রুর বাবু ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের লোক। দিন-রাত্রি তিনি আফিংয়ের মৌজে ভোম্ হয়ে থাকতেন—বিশেষ করে সন্ধ্যার পর তিনি আর চোখ চাইতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই তিনি পাড়াময় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আর একটি আশ্চর্য্য গুণ ছিল, তিনি চলতে চলতে, বাজার করতে করতে, কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন। আমরা দেখেছি, অক্রুর বাবু মুদীর দোকান থেকে সওদা করে ঠোঙা কিংবা ঘিয়ের বাটি হাতে নিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছেন। পাড়ার ছোট-বড় সবার বাড়ীতেই আনন্দ-উৎসব, সুখ-দুঃখ-শোকের সময় অক্রুর বাবু যেতেন আর গিয়েই লাগাতেন ঘুম। সন্ধ্যার পর পাড়ার যত আড্ডা ও লোকের বাড়ী ঘুমিয়ে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। অথচ তিনি দুঃখ করতেন, বিছানায় বালিশ মাথায় দিয়ে সুখে ঘুম তাঁর হয় না, সারা রাত্রি জেগেই কাটাতে হয়। সবার ওপরে অক্রুর বাবু ছিলেন সবজান্তা। দিবানিশি ঘুমিয়ে এত জ্ঞান তিনি সংগ্রহ করলেন কি করে, তা পাড়ার সবার একটা গবেষণার বিষয় ছিল।

এ-হেন অক্রুর বাবু এক পাশে বসেছিলেন অর্থাৎ ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি চোখ বুজেই বললেন—না হে, একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এর মধ্যে জিনিস আছে। একে বলে তাণ্ডব নাচ।

সবার যেন একটা হদিশ লেগে গেল তাণ্ডব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়ে গেল। সে সম্বন্ধে যার যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তা আউড়ে যেতে লাগলেন। এক জন বেশ ফলাও করে বললেন—আরে বাবা, আসল তাণ্ডব কি দেখতে পারা যায়! সবার চোখ তা সহ্য করতে পারে না। অনেক সাধনা করলে তবে সে নাচ দেখবার শক্তি হয়। সবার চোখে সব নাচ সহ্য হয় না।

জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, ভদ্রলোক সেদিন একটা মহা সত্যই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে অনেক নাচই, আমার চোখে অভাব্য বলে মনে হয়েছে কিন্তু অন্যে তা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। এই বৈষম্যের কারণ যা শুনেছি, তা এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে ঐ কথাই বলতে হয়—সে নাচ বোঝবার মতন শক্তি আমার নেই।

আর এক জন ভদ্রলোক বললেন—থিয়েটারের নাচ কি আবার নাচ না কি? আসল নাচ হচ্ছে এই, তবে ব্যাটা ঠিক মত নাচতে পারলে না।

বাল্যাবস্থায় একবার থিয়েটার দেখেছিলুম। জীবনে সেই প্রথম দেখলুম নাচ। পরীর মতন দেখতে সখীদের সেই চক্কর মেরে নাচ—ওঃ, সে যে কি ভালোই লেগেছিল, কি বলব! ভবিষ্যতে নৃত্যকলাটিকে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করতে হবে, এমন বাসনাও মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল এবং থিয়েটারের সেই নাচই ছিল আদর্শ। কিন্তু সেদিন যখন শুনলুম, থিয়েটারের সেই নাচ নাচ-নামেরই যোগ্য নয় এবং এই তিড়িং-মারাই হচ্ছে আসল নাচ, সেদিন বিচলিতই হয়েছিলুম। যাই হোক, সেই রাত্রেই বিছানায় শুয়ে সংকল্প করা গেল—কুচ পরোয়া নেই, ঐ তিড়িং-মারা নাচই শিখতে হবে।

কিন্তু বিধাতা যাকে প্রতিভা দেন অথচ সেই অনুপাতে অর্থানুকূল্য করেন না, সে দুর্ভাগার দুনিয়ায় দুর্গতির আর সীমা থাকে না। তাই নাচ না শিখেও সারা জীবন ধরে নেচেই বেড়াতে হোলো—কখনো তাণ্ডব, কখনো কত্থক, কখনো বা কথাকলি। তবে সেই বহুরূপীর মতন নিজের ইচ্ছায় নয়, পরের কথায়।

মুশকিল আশান

এক দিন মা'র কাছে মুশকিল আশানের নামটা শুনলাম। মুশকিল আশান কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা চমক আছে। মুশকিল আশান দেবতার নাম। সেই দেবতাকে যারা পুজো করে, সেই সব সন্ন্যেসীরা রাত্রি বেলা বের হয়—লোকের কাছে মুশকিল আশানের নাম শোনাতে। লোকের কাছে তারাও মুশকিল আশান বলে পরিচিত। এ পাড়াতেও এক জন মুশকিল আশান আসে মাঝে-মাঝে অনেক রাত্তে। সে না কি আবার সবার বাড়ীতে যায় না। মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে মুশকিল আশানের নাম শুনিয়ে যায়, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি।

অনেক রাতে, রাস্তায় লোক জন চলা যখন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সেই নিশুতিতে অন্ধকার অলি-গলিতে বাতি হাতে নিয়ে লোকের দরজায় দাঁড়িয়ে মুশকিল আশানের নাম গান করে—বিপদকে তারা ডরায় না, কারণ তারা মুশকিল আশানের পূজারী।

মা'র কাছে আরও শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম যে, এই মুশকিল আশানেরা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফকির। তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে বটে কিন্তু জটা করে না। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন তারা ল্যাঙট পরে না, তারা পরে আলখাল্লার মতন একটা জিনিষ যাকে ওরা কফনি বলে।

মা'র মুখে শুনে 'মুশকিল আশানের' একটা ছবি মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে দেখবার ইচ্ছাও প্রবল হতে লাগল! কিন্তু সে কি করে সম্ভব হবে—সে আসে অনেক রাত্রে, এদিকে সাড়ে ন'টা বাজতে না বাজতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি যে!

আর এক দিন মা'র কাছে শুনলুম—কাল রাতে মুশকিল আশান

এসেছিল, আসছে শুক্রবারে আবার আসবে, বলে রেখেছি তাকে তোদের দেখাব।

অনেক কষ্টে আশায় শুক্রবার এসে পৌঁছল। সে রাত্রে আমরা মা'র কাছে শুলুম। অনেক রাত্তে, অর্থাৎ তখন আমরা অঘোরে ঘুমুচ্ছি, মা ডেকে তুলে বল্লেন—চল, মুশকিল-আশান এসেছে।

মা'র হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, আমরা ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে চললুম তাঁর পেছনে পেছনে—রাত্ত দুপুরে বাড়ীর সব জায়গাগুলোই যেন অপরিচিতের মতন ব্যবহার করে, তাই দু'-একটা ঠোক্করও খেতে হল। দু'টো উঁচু-নীচু ছাত, সিঁড়ি দু'টো উঠোন পেরিয়ে আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে মা সদর দরজার হুড়কো খুলে দিলেন।

প্রথমেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকল খানিকটা ধোঁয়া। তার পেছনে অদ্ভুত পোষাক-পরা, অদ্ভুত প্রদীপ হাতে নিয়ে ঢুকল এক অদ্ভুত চেহারার মানুষ!

আমাদের দুই ভাইকে সামনে রেখে মা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মুশকিল আশান এক-পা এক-পা করে এগিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—আমরাও সেই তালে পেছোতে পেছোতে একেবারে মা'র গা-সাঁটা হয়ে গেলুম।

সম্ভ্রম, বিস্ময় ও ভয়-মিশ্রিত এক বিচিত্র পুলকে আমরা দেখতে লাগলুম সেই মুশকিল আশানকে।

মাথায় তার লম্বা বাবরী, বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মুখে যেমন লম্বা তেমনি ঘন কাঁচাপাকা দাড়ি—চোখ দু'টো ছাড়া মুখের তার কিছুই দেখা যায় না। নাকের ওপরেও ইয়া লম্বা-লম্বা রোঁয়া জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতন উদ্যত হয়ে রয়েছে। অঙ্গে একটা ময়লা আলখাল্লা হাঁটু ছাড়িয়ে একটু নেমেছে, পায়ের বাকী অংশটা নগ্ন। আলখাল্লার গায়ে বড়-বড় কয়েকটা রঙিন কাপড়ের তালি। গলায় বড়-বড় শাদা ও নীল পুঁতির লম্বা মালা ঝুলছে, সেই রকমই আর একগাছা মালা বাঁ-হাতের কব্জীতে ঝুলছে। ডান হাতে অদ্ভুত এক দীপ—যেন ছোট একখানা কাঁসিতে বড় একটা ঘটি উপুড়-করা। তা থেকে বদনার মতন দু'টো চোঙা দু'-দিক দিয়ে বেরিয়েছে, তার একটাতে ইয়া মোটা পলতে জ্বলছে দাউ-দাউ করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই খোলা উঠান ধোঁয়া ও কেরাসিনের গন্ধে ভরপূর হ'য়ে গেল। কাঁসার খালি স্থানটুকুতে তেল-কালি ও পয়সা মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় আমাদের চমকে দিয়ে মুশকিল আশান সুর করে চীৎকার করে উঠল—ইয়া পীর মুশকিল আশান—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান। তার পরে গড়-গড় করে আরও কতকগুলো কি আউড়ে গেল বুঝতে পারলুম না।

মা তাকে বল্লেন—বাবা, আমার এই ছেলে দু'টো বড্ড দুরন্ত—মুশকিল আশানের কাছে একটু মিনতি কোরো এদের জন্যে।

মুশকিল আশান আমাদের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার চাইলে। বুকের মধ্যে গুর-গুর করতে আরম্ভ করল। তার পর চোখ দু'টো আকাশমুখো করে কি যেন দেখতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চোখও উঠল ওপর দিকে, কিন্তু সেখানে ফাঁকা আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

প্রায় আধ মিনিট কাল সেই উৎকণ্ঠায় কাটবার পর মুশকিল আশান খুব মিষ্টি সুরে বললে—মা, ছেলেপুলে একটু দুষ্টু-দুরন্ত হয়েই থাকে—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

মা বল্লেন—সে রকম নয়, তা হোলে আর ভাবনা কিসের! এই বলে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—এই ছেলেটা এরি মধ্যে একবার তেতলার ছাত থেকে পড়েছে আর একবার জলে ডুবেছে—এখনো তো সারা জীবনই পড়ে আছে। এই অবধি বলে আমার ছোট ভাইকে দেখিয়ে আবার বল্লেন—এটা ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এটাকেও ও ছড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এ হেন চিজটিকে মুশকিল আশান মশায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কাটবার পর মা বল্লেন—এদের জন্তে দিনে-রাতে শান্তি পাই নে বাবা!

মাতৃকণ্ঠের সেই কাতর আকুলতা দেবতাকে স্পর্শ করেছিল কি না জানি না, কিন্তু শিশু-হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তখুনি সংকল্প কর্‌লুম—মা'র মনে কষ্ট দোবো না—মায়ের অবাধ্য হব না।

এই সংকল্প জীবনে অসংখ্য বার করেছি এবং অসংখ্য বারই সংকল্পচ্যুত হয়েছি।

মুশকিল আশান আশ্বাস দিয়ে বললে—কিছু ভাববেন না, স-ঠিক হ'য়ে যাবে মা। মুশকিল আশান ভালই করবেন।

মা আঁচলের গেরো খুলে আমাদের দুই ভাইয়ের হাতে একটি করে পয়সা দিলেন। আমরা তার সেই তেলকালি-মাখানো কাঁসিতে পয়সা দু'টো ফেলে দিতেই মুশকিল আশান আবার চেঁচিয়ে উঠল—ইয়া পীর—

তার পরে একটু তেল কালি তুলে আমাদের কপালে একটা করে টিপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মা'র সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে তাঁর পাশেই শুয়ে পড়লুম। দিনান্তে পারে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে, সেদিনটা আমার শুভই ছিল জীবন্ত মুশকিল আশানের পাশে শুয়ে দূরাগত মুশকিল আশানের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—এমন দিন জীবনে কম এসেছে।

মুশকিল আশানকে আমি ভুলিনি, আর সে-ও আমায় ভোলেনি মুশকিল-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে আমার কানে এসে পৌঁছেচে তার অভয় বাণী—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান।

জীবন-পথে কত মুশকিলেরই না দেখা পেলুম—মুশকিলের মরুভূমি মরীচিকা ও চোরাবালি, মুশকিলের হাড়িকাঠ, কড়িকাঠ, খাঁড়া, ছোরা, ছুরি—কত মনোহর রূপে, কত বীভৎস রূপে এসেছে তারা! সব কাটতে কাটতে আজ মুশকিলের সিংহদ্বারের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভরসা আছে, যথাসময়ে কানে এসে পৌঁছবে মুশকিল আশানের সেই অভয় বাণী—কোন ভয় নাই—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান!

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনন্তর সেইখানে (অর্থাৎ বেশ্যাপল্লীতে) গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, কোন গণিকা হৃতসর্বস্ব কোন পরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা না করিয়া ঈর্ষার ছল করিয়া তাহার পথ রোধ করিতেছিল।* কোন বেশ্যা বঞ্চকদত্ত পুঁটুলির ভিতর একখানি জীর্ণ বস্ত্র মাত্র দেখিয়া রাত্রিটি বৃথায় অতিবাহিত হইল মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। মূল্য না দিয়া, পলায়িত কোন বিটকে দৈবাৎ দেখিতে পাইয়া কোন বেশ্যা ক্রোধে জ্বলিয়া সবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। (অর্থশালী) কোন কামী যখন গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে সেই সময়ে হৃতবিত্ত কোন এক ব্যক্তিকে গৃহদ্বারের নিকট আসিতে দেখিয়া কোন এক কুট্টনী(১) তাহাকে বলিতেছিল—'তোমার তো দেহ এখন জলতরঙ্গের মত স্বচ্ছ হইয়াছে(২) এখন ফিরিয়া যাও।' অপর একটি বারবধূ সখীগণের সম্মুখে (গত রজনীতে) রাজপুত্রের সহিত তাহার রতিযুদ্ধের নিদর্শন-স্বরূপ গাত্রস্থিত নখ-দন্ত ক্ষতাদি দেখাইয়া নিজ সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতেছিল।

কামিগণের স্পর্ধা দ্বারা বর্ধিত 'ভাটী'(৩) লাভে উৎফুল্লা কোন কোপনা নায়িকা বিলাসিনীগণমধ্যে নিজসৌভাগ্য-গর্ব দর্পভরে বর্ণনা করিতেছিল। কোন একটি কুট্টনী বিপদাশংকায় সসম্ভ্রমে ধাবিত হইয়া একই গণিকাকে লাভ করিবার জন্য বিবদমান, ক্রোধোন্মত্ত, শস্ত্র গ্রহণেচ্ছু কামযুগলকে কলহ হইতে নিবারণ করিতেছিল। 'বহু লোকের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া তাহা ভোগ করিতে হয় এক জন নাগরের সঙ্গে' এই চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া কোন বারবধূ ধনশালী কোন কামীকে বশীভূত করিতেছিল। কোন একটি বিট একটি মাত্রাগাথা(৪) দ্বিপদী তালে সৌষ্ঠব সহকারে গান করিতে করিতে একটি বেশ্যার সম্মুখে অনেক প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া পাদচারণা করিতেছিল। কোন হৃতবিত্ত কামী ঐশ্বর্যশালী অন্য পুরুষগণকে কোন পণ্যস্ত্রীর সহিত সংযোজিত করিয়া বিনিময়ে তাহার সহিত রতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল। কোন গণিকা কর্তৃক উপেক্ষিত কোন কামী 'তোমারই প্রেমে পড়িয়া ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম আর এখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না!' এই বলিয়া তাহার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল। একের অর্থ গ্রহণ করিয়া অপরের সহিত রাত্রিবাস করার জন্য বৃদ্ধ বিটগণের সম্মুখে বিচারে কোন গণিকাকে পরাজিত করিয়া কোন কামী তাহার নিকট হইতে উক্ত পণের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করিয়া লইতেছিল।(৫) [৩৩১—৩৪২]

[তাঁহারা বিটগণের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

"বিশেষক, তুমি তো শশীপ্রভার হাতের 'বলয়-কল্লাপী'(৬) জোড়া দেখিয়াছ, সত্য বল, বল, কেমন সুন্দর নয়? উহা আমি দিয়াছি!"

"আজ চার দিন হইল, বিলাসাকে এক জোড়া চীনাংশুক দিয়াছি, তবুও সে আমার প্রতি কঠোর হইয়া আছে, বল তো মদনক, এখন কি করা যায়?"

"কলহংসক, কেলী আমার প্রতি স্নেহশীলা, কিন্তু রাক্ষসী তাহার মা, সেই পাপীয়সীকে একশ' বৎসরেও অনুকূল করা যাইবে না।"

"ওহে কিঙ্কক, পুষ্পমালা, কুংকুমরঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতি সাজাইয়া রাখ, দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ কি? আজ তোমার দয়িতিকার(৭) যে নৃত্যের দিন।"

"যদিও আজ পাঁচ দিন তোমার অর্থ দেখিয়া তোমার সহিত প্রেম করিতেছে তথাপি জানিও সে তোমার প্রতি অনুরক্তা নহে, কন্দর্পক বৃথা তোমার গর্ব।"

"বিলাসক, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, মূঢ় হরিসেনাকে ছাড়িয়া দাও—দুর্দান্ত ব্যাপৃত-পুত্র(৮) তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।"

"ওহে চন্দ্রোদয়, দেখ কামিজনের কাণ্ড! কেসরা (উৎসব উপলক্ষে) তাহাকে যে বস্ত্রটি উপহার দিয়াছিল সে তাহা উত্তরীয়ের ন্যায় গলায় পরিয়া ঘাড় সোজা করিয়া বেড়াইতেছে।"(৯)

---

* 'গ' পুস্তকের পাঠান্তর অনুসারে—'কোন বেশ্যা বঞ্চকদত্ত পুঞ্জীকৃত জীর্ণবস্ত্র দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছিল, প্রভাতে উঠিয়া কি প্রতিকার করিবে।'

(১) বাড়ীওয়ালী। (২) অর্থাৎ দেহে তো বেশভূষা কিছুই নাই কেবল একখানি শ্বেতাম্বর সম্বল, সুতরাং গণিকাগৃহে আসিয়া কি হইবে।

(৩) কোন সুন্দরী বাররামাকে লাভ করিবার জন্য কয়েক জন কামী রেষারেষি করিয়া তাহাকে দেয় 'ভাটী' অর্থাৎ পণের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই রমণী সেই বর্ধিত ভাটী লাভে উৎফুল্লা হইয়া অন্য গণিকাগণকে বলিতেছিল যে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য কামিগণের এইরূপ আগ্রহ।(৪) 'খণ্ডা খণ্ডা চ মাত্রা চ সংপূর্ণেতি চতুর্বিধা। দ্বিপদী করণাখ্যেন তালেন পরিগীয়তে।'—ইতি ভরতঃ।

(৫) কোন গণিকা যদি পণ গ্রহণ করিয়া কামীকে দেহদান না করে তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বিটগণই বিচার করিয়া তাহাকে দণ্ডদান করিয়াছে।

(৬) এক প্রকার armlet জাতীয় অলংকার। ময়ূরের মুখ ও চন্দ্রাকারপুচ্ছবিশিষ্ট। পুচ্ছটি বাহুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে এই বাহু-ভূষণ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে—"শংখকলাপী কটকং তথা স্যাৎপদ্মপূরকম্। খর্জুরকাংসোপিণ্ডিকং বাহু নানা বিভূষণম্।" (২১।২৮—২৯)।

(৭) দয়িতিকা—কোন নাম হইতে পারে বা 'darling'এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ।

(৮) ব্যাপৃত-পুত্র—ব্যাপৃত নামধারী ব্যক্তির পুত্র বা 'ব্যাপৃত' নামক উচ্চ রাজকর্মচারীর পুত্র।

(৯) জন্মদিন, হোলি এইরূপ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা পর্ব উপলক্ষে গণিকা কর্তৃক দত্ত উপহার বস্ত্রখানি সর্বদা উত্তরীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সেই ব্যক্তি সকলকে জানাইতে চাহিতেছিল যে উক্ত গণিকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে।

"রতিসময়ে মদনসেনার কুমারীত্ব হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার মাতার 'হাঁ'টি (১০) অত্যন্ত বড়।"

"মদঘূর্ণিতা মদনসেনার স্বহস্তদত্ত পীতাবশিষ্ট মদিরা পান করার বিলাস কত তপস্যার ফল!"

"ওহে লীলোদয়, কুবলয়মালার বাড়ী সম্প্রতি ছাড়িলে কেন?"—"কি আর করি ভাই! মূল্য বিনা দাসীকে রাখি কি করিয়া?"

"মঞ্জীরক, আজ বহু ঐশ্বর্যবঞ্চিত ইন্দীবরের রাত্রি কাটিতেছে তিলকমঞ্জরীর চরণ সংবাহন করিয়া।" [৩৪৩—৩৫৩]

[তাঁহারা যাইতে যাইতে কুটনী, বিট, দাসী ও গণিকা প্রভৃতির পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

(কোন বৃদ্ধা বেশ্যা তাহার কন্যা সম্বন্ধে কামুককে বলিতেছিল) "বালিকার আজও বাল্যভাব যায় নাই তবুও মকরন্দ, সে প্রৌঢ়িমায়(১১) অপর সকলকে পরাজিত করে।"

(কোন বেশ্যামাতা দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল) "কুব্জা, নির্দয় নর্তনাচার্যকে গিয়া বল—হায়া (আমার) সুকুমার তনু তাহাকে (তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত) এত পরিশ্রম করাইয়াছেন কেন?"

(কোন নায়িকাকে তাহার মাতা বলিতেছিল) "সুরত দেবি, শুকশাবককে পড়াইতে তোমার এই অভিনিবেশের কোন মূল্য নাই, তোমার প্রেয় তোমার প্রতীক্ষায় বাহিরে বসিয়া আছেন।"

(কোন বেশ্যামাতা পরিচারিকাকে বলিতেছিল) "স্মরলীলা বীণা বাজাইয়া শ্রান্ত হইয়া গৃহে পর্যঙ্কে শুইয়া আছে, সত্বর গিয়া তাহাকে উঠাইয়া দাও বল—মত্ত আসিয়াছেন।"

(নায়ককে শুনাইয়া কোন নায়িকাকে তাহার মাতা বলিতেছিল) "মাধবি, তোমার হইল কি? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? বার-বার বলিতেছি তবুও বিগ্রহরাজের পুত্র যে অলংকারগুলি দিয়াছিলেন তাহা পরিতেছ না কেন?

(কোন চতুরা দাসী নায়কের নিকট হইতে অলংকার আদায় করিবার জন্য তাহাকে শুনাইয়া নায়িকার মাতাকে বলিতেছিল) —"কি করিব মা! (তোমার) ইন্দুলেখা এত অসাবধান, পানক্রীড়ার সময়(১২) তাহার কনকতাড়ী(১৩) কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছে তাহা তাহার খেয়াল নাই।"

(কোন দাসী নায়ককে শুনাইয়া নায়িকার মাতাকে বলিতেছিল) "পোষা নেউল দুধ খায় নাই এই জন্য রাগ করিয়া এই দুঃশীলা কামসেনা বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আহার করিতেছে না।" (১৪)]

(নায়ক উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা তাহার নিকট আসিতেছে না ইহাতে নায়ক উৎকণ্ঠিত হওয়ায় নায়িকার মাতা বলিতেছে) "কি করিয়া (মেষ যুদ্ধে) শ্রীবল্লের পুত্রের পালিত মেষকে পরাজিত করা যায় তাহার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া মুকুলা দিবা-রাত্র নিজ মেষটিকে পোষণ করিতেছে।" (১৫)

(কোন কন্দুকক্রীড়ারতা বেশ্যাবালিকাকে তাহার মাতা এইরূপ বলিতেছিল)—"ললিতা, তোমার করতল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, পুনরায় আর অধিকক্ষণ কন্দুকক্রীড়া করিও না।"

(প্রথম সমাগমে কোন কুটনী কামুককে বলিতেছিল)—"প্রথম আলাপ বলিয়া কুসুম দেবী আপনার দত্ত সুন্দর স্বর্ণ ভাটী (১৬) গ্রহণ করিল, প্রণয় ঘনিষ্ঠ হইলে সে আপনাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিবে।"

(কোন নবাগত পূর্বে অপরিচিত কামুককে বেশ্যামাতা এইরূপ বলিতেছিল)—"এক্ষণে গ্রহণক(১৭) প্রদান করুন, তাহার পর যদি চন্দ্রলেখাকে ভাল লাগে ফিরিবার সময় আপনার যাহা অভিরুচি সেইরূপ পুরস্কার দিবেন।"

(কোন দাসী কোন বেশ্যামাতাকে অধমবৈশিক নায়কের আচরণ বর্ণনা করিতেছিল) "মা, ঐ বাসুদেব ভট্টের পুত্র বিশেষ কিছু দেয় না, (অথচ) নির্লজ্জ(১৮) শঠ(১৯) বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও সুরতসেনার বসনাদি জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দেয়—'ভেড়া না দেয় পশম গুঁড়োয়। কাপাস গাছ খেয়ে মুড়োয়'।"

(কোন একটি গণিকা অপরাকে আক্রোশের সহিত কামুকের শঠতার কথা বলিতেছিল) "ভগিনি, ঐ ক্ষপটবাজের পুত্র এক মুহূর্ত ও আমার গৃহ ছাড়িয়া যায় না—(যেমন) উলঙ্গ লোক ঘাটে বসিয়া থাকিয়া অপরকে সেখানে আসিতে দেয় না।"(২০)

বিট ও কুটনীগণের মুখ হইতে এই প্রকার কথোপকথন শুনিতে শুনিতে বেশ্যাপল্লী দেখিতে দেখিতে (সুন্দরসেন) সেই বালিকার (অর্থাৎ হারলতার) গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উৎকণ্ঠায় যেন আকৃষ্ট, নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টির স্নেহধারায় যেন স্নাত, নিকটে আগত তাঁহাকে হারলতা পূজা করিল। সুন্দরসের উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার সখী শুভ অবসর বুঝিয়া অবনত শিরে প্রণাম করিয়া অতি নম্র বচনে এইরূপ বলিল—

'প্রিয়দর্শন, কামপীড়িত দীন বচন সন্দর্ভসমূহে আর কি প্রয়োজন! এই হারলতা রহিল, উহার জীবন আপনারই হাতে।

---

(১০) মূলে আছে—"কিন্তু তস্যা মাত্রাঽতীব প্রসারিতং বদনম্"। ভাষায় যাহাকে বলে—"খাঁই অত্যন্ত বেশী"। (১১) বয়সে 'মুগ্ধা' হইলেও কামচেষ্টিতে 'প্রৌঢ়া' নায়িকার ন্যায়। "প্রৌঢ়া হ্যধিককন্দর্পা পত্যাবখিল কেলিকৃৎ" ইতি রসরত্নহারে।

(১২) drinking orgy. (১৩) কর্ণভূষণ—ক্ষুদ্র তালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণনির্মিত তুল বিশেষ। (১৪) যাহাতে নায়ক গিয়া তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করে এই জন্য দাসী নায়কের শ্রুতিগোচরে ইহা বলিতেছিল।

(১৫) নায়কের অনুরাগ বর্ধনের জন্য নায়িকার অন্য কার্যে ব্যাপৃতিচ্ছলে সময় ও অবকাশের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। (১৬) বহু স্বর্ণ মুদ্রা বা স্বর্ণালংকার ভাটী বা পণরূপে যাহা দেওয়া হইয়াছে। (১৭) Usual preliminary fees. রতমূল্য। (১৮) "বার্যমাণো দৃঢ়তরং যো নারীমুপসর্পতি। সচিহ্ন সাপরাধশ্চ স নির্লজ্জ ইতি স্মৃতঃ।"—(ভরত নাট্যশাস্ত্র ২৩৩০১)। (১৯) "বাচৈব মধুরো যস্তু কর্মণা নোপপাদয়েৎ। যোষিতাং কশ্চিদপ্যর্থং স শঠঃ পরিকীর্তিতঃ।"—(ভরত নাট্যশাস্ত্র ২৩।২১৮)

(২০) সময় মাতৃকায় ইহার অনুরূপ উক্তি আছে—"ন ভবত্যেব ধূর্তস্য বেশ্যাবেশ্মসমাতৃকে। চুল্লীসুপ্তস্য হেমন্তে মার্জারস্যেব নির্গমঃ।" উলঙ্গ লোক যদি জলে না নামিয়া ঘাটের ধারে বসিয়া থাকে তাহা হইলে অন্য কেহ লজ্জায় ঘাটের ধারে আসিতে পারে না।

আপনাদিগের যৌবন অযন্ত্রিত রত(২১) দ্বারা, প্রস্ফুট, সহজ প্রেমের(২২) নিগূঢ় বন্ধন দ্বারা রমণীয় ও কার্যান্তর রূপ অন্তরায় দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত না হইয়া অতিবাহিত হউক। নির্দয় ভাবে (অর্থাৎ মৃদুতা পরিহার করিয়া) (২৩), বাঞ্ছার বিরাম না দিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, (বস্ত্রাদি) আবরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া, উত্তরোত্তর বর্ধমান (২৪) অনুরাগের সহিত আপনারা নিরন্তর সুরত সম্ভোগ করুন।"

সুতরাং এই আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিজন সকল গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলে তাহাদের অঙ্গ সমূহে প্রণয়ের দ্বারা পবিত্র মদনরসাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যে সুরত চণ্ডবেগ কামের উপযুক্ত, অনুরাগের অনুরূপ, যৌবনহেতু অভিরাম এবং জীবিতব্যের ফলস্বরূপ(২৫), যাহাতে অবিনয় ভূষণস্বরূপ, অশ্লীলাচরণ বহুমান, নিঃশংকতা সৌষ্ঠব ও চাঞ্চল্য গৌরবাধান, কেশগ্রহণ(২৬) অনুগ্রহ, তাড়ন(২৭) উপকার, দংশন আনন্দ দান, নখবিলেখন সৌভাগ্য, দৃঢ় দেহ নিপীড়ন সমুৎকর্ষ(২৮)। চুম্বন যাহাতে অতিপ্রসক্ত ও সতৃষ্ণ(২৯) অধরবাদি নিস্পিষ্ট করিয়া নিস্পৃহ নির্দয় মর্দন যাহার বৈশিষ্ট্য(৩০) যাহাতে দৃঢ় আলিঙ্গনকালে (নায়ক-নায়িকা) পরস্পরের দেহের ভিতর যেন পরস্পরের দেহ প্রবেশ করাইয়া দিতে চায়,(৩১) যাহা বহু অনঙ্গ দ্বারা বিহিত,(৩২) বহু অনুরাগের দ্বারা উদ্দীপিত, বহু প্রেমদ্বারা নিশ্চলীকৃত এবং বহু শৃঙ্গার দ্বারা বিকশিত যাহাতে অপ্রগল্ভতা ব্যসন, ধৈর্য অকার্য, বিবেক ক্ষতির কারণ, এবং লজ্জা অগুণ সেই সুরতে তাহারা প্রবৃত্ত হইল। [৩৭৫—৩৮০]

যাহার প্রারম্ভেই মদন ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই সুরতের প্রবৃদ্ধ বিশেষাবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। সেই যুবক-যুবতীর (অধ্যয়নলব্ধ) জড়ীকৃত (যৌন) পাণ্ডিত্য সহজাত শৃঙ্গার রসের দ্বারা (প্রবুদ্ধ হইয়া) কামশাস্ত্রে বর্ণিত নানাবিধ করণ সমূহের (আভ্যাসিক অনুষ্ঠানে) লালিত্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল।(৩৩) তাহা-দিগের সেই সুরতপরিমর্দ আরম্ভ হইলে তাহাদিগের নিকট কিছুই অকরণীয় বা অকথ্য, বিচার্য, গোপনীয় বা অসহনীয় রহিল না। সেই তবী সুরতবিধির জন্য যে সকল পরিপাটী চাটুবাক্য অভ্যাস করিয়াছিল সহজাত স্মরাবেগ সেই সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

---

(২১) "উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চ পরস্পরানকূল্যাদযন্ত্রিতরতম (কাঃসূঃ ২।১০।৩১) পরস্পরের প্রতি জাত বিশ্বাস নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে অপ্রতিবদ্ধ সম্প্রয়োগ তাহাকে বলে অযন্ত্রিতরত।

(২২) সহজ প্রেম—নৈসর্গিকী প্রীতি। "দম্পত্যোঃ সহজা তু যা। সান্দ্রা নিগড়ভূতা চ প্রীতির্নৈসর্গিকী মতা।" [অনঙ্গরঙ্গঃ ৪।২৬] যে প্রেম ঘনিষ্ঠতা বা বৈষয়িক লাভ হইতে উদ্ভূত নহে যাহা দম্পতির মনে আপনা হইতে উদ্ভূত হয় এবং পরস্পরকে শৃংখলের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। (২৩) অর্থাৎ নখদন্তাঘাত ও তাড়নাদিতে কোন প্রকার মৃদুতা না প্রকাশ করিয়া। (২৪) 'রসার্ণব সুধাকরে' লিখিত আছে "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে। যেন স্নেহপ্রকর্ষেণ স রাগ ইতি কথ্যতে।" এবং "অচিরেনৈব সংসক্তশ্চিরাদপি ন নশ্যতি। অতীব শোভতে যোহসৌ মাঞ্জিষ্ঠো রাগ উচ্যতে।" (২৫) এই স্থলে উভয়ে মন্মথ তন্ত্রে প্রৌঢ়—হারলতা বয়সে নবযৌবনা হইলেও গণিকা বলিয়া বাল্যকাল হইতেই সকল কামতন্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং সুন্দরসেনও কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং "সৌন্দর্যং প্রীতিসংপত্তিশ্চণ্ডবেগোহথ যৌবনম্। একৈকমনু-রাগায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।" এই ভাব। (২৬) অনঙ্গ-রঙ্গে কয়েক প্রকার কেশগ্রহণের উল্লেখ আছে—সমহস্তক, তরঙ্গরঙ্গক, ভুজঙ্গবল্লী ও কামাবতংস। "চিকুরান পরিগৃহ্য চুম্বতি করযুগ্মেন পতিঃ প্রিয়াং যদি। সমহস্তকমিত্যথৈ কতো যদি হস্তেন তরঙ্গ রঙ্গকম্। পরিবেষ্ট্য করেন কুন্তলাস্যদনার্তো যদি ধারয়েৎ প্রিয়াম্। রতি-কেলিকলাপকোবিদাঃ কথয়ন্তীতি ভুজঙ্গ-বল্লিকম্। কর্ণপ্রদেশস্থ কচান্ বিগৃহ পরস্পরং চুম্বতি যত্র নারী। পতিশ্চরাগাৎ-সুরতাবতারে কামাবতংসঃ স কচগ্রহঃস্যাৎ।" [১।৩৮।৪০] (২৭) পৃষ্ঠে মুষ্টি, মস্তকে ফণাকার হস্তদ্বারা প্রসৃতক, স্তনান্তরে বা স্তনে অপহস্তক এবং পার্শ্বে বা জঘনে সমতল। (২৮) স্তনাদির দৃঢ়মর্দন বা দৃঢ় আলিঙ্গন। এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—"কচগ্রহঅনুগ্রহং দশনখণ্ডন মণ্ডনং দৃগঞ্চনমবঞ্চনং মুখরসার্পনং তর্পণং। নখার্দনমতর্দনং দৃঢ়মপীড়নং পীড়নং করোতি রতিসঙ্গরে মকরকেতনঃ কামিনাম্।" শৃঙ্গারদীপিকায় লিখিত আছে—"হাস্যৈর্বচোভির্ঘনমুষ্টিঘাতৈর্নখক্ষতৈর্দন্তনিপীড়নৈশ্চ। বিশ্বাসবাচা মণিতৈঃ প্রসিদ্ধৈর্বশংনয়েত প্রিয়বাক্ প্রগল্ভাম্।" শিশুপালবধে "বাহুপীড়ন-কচগ্রহণাভ্যামাহতেন নখদন্তনিপাতৈঃ। বোধিতস্তনুশয়স্তরুণীনামুন্মিমীল বিশদং বিষমেষুঃ।" [১০।১২]

(২৯) মূলে আছে "বিলগ্নোলংচুম্বনম্" অর্থাৎ যে চুম্বনে জিহ্বা অধিক অংশ গ্রহণ করে। জিহ্বাযুদ্ধ নামক চুম্বনযুদ্ধে অন্তর্মুখচুম্বন, দশনচুম্বন, জিহ্বাচুম্বন ও তালুচুম্বন এই চারি প্রকার চুম্বন অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকাই ইহা সহ্য করিতে পারে।

(৩০) উরু, বাহু, কুচ, নিতম্ব, পার্শ্ব, নিম্নোদর ও জঘন প্রভৃতি নির্দয় ভাবে মর্দন করিলেও রতিমদাকুলা কামিনী বেদনা অনুভব করে না বরং সুখানুভব করে।

(৩১) 'ক্ষীরনীরক' আলিঙ্গন—"রাগান্ধাবনপেক্ষিতাত্যয়ৌ পরস্পর-মনুবিশত ইবোৎসঙ্গ গতায়ামভিমুখোপবিষ্টায়াং শয়নে বেতি ক্ষীর-জলকম্" [কাঃ সূঃ ২।২০]

(৩২) অর্থাৎ একটি অনঙ্গ যাহা সম্পাদন করিতে অশক্ত। অনঙ্গ সুরতের উৎপাদক, রাগ তাহার বর্ধক, প্রেমা তাহার স্থৈর্য সম্পাদক এবং শৃঙ্গার তাহার গুণ সম্পাদক। অনঙ্গ, রাগ, প্রেম ও শৃঙ্গার সকলই অত্যন্ত অধিক ইহা বুঝাইবার জন্য বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রতি, প্রেম ইত্যাদির সূক্ষ্মভেদ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—'স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব, ইত্যপি। বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড় খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা। অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। প্রায়ো ব্যবহ্রিয়স্তেঽমী প্রেম শব্দেন সূরিভিঃ।" (৩৩) নানাবিধ করণ অর্থে বাহ্য ও অভ্যন্তর রতের আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, সম্বেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টকের প্রত্যেকটি আট প্রকার ভেদে চতুঃষষ্টি অঙ্গকে বুঝাইতে পারে অথবা রতিবন্ধের চতুরশীতি সংখ্যক ভেদকেও বুঝাইতে পারে প্রধানতঃ

রতিচক্রাবিষ্ট(৩৪) যুবক-যুবতীর সম্ভাব ও অনুরাগ দ্বারা উদ্দীপিত এবং (স্বয়ং) মদনরূপ আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট চেষ্টা সমূহের কে কল্পনা করিতে পারে? মৃদুগাত্রী সেই বালা (বলশালী) পুরুষ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে আক্রান্তদেহা হইয়াও মোটেই বেদনা অনুভব করিল না (বরং) আনন্দিত হইল। অচিন্তনীয় এই মনোভাবের শক্তি(৩৫)! রমণীর দেহে রমণ প্রবেশ করিল অথবা রমণের দেহে রমণী প্রবেশ করিল তাহা আমরা জানি না—তখন তাহাদের নিজ দেহ-বোধও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল(৩৬)। সুরতান্তে তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত ও দেহ নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল কেবল (শরীর ব্যাপিয়া) অনঙ্গচ্ছায়া তাহার জীবিত সত্তানুমানের চিহ্নস্বরূপে বিদ্যমান ছিল(৩৭)। বিপরীত রতির পরিশ্রমে তাহার দেহে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কেশ ও বসনাদি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজকার্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া পড়ায় তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল(৩৮)। অকপটে পরস্পরকে দেহদান করিয়া বিশ্বকে আনন্দময় কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষার প্রশমন না হইলেও তাহাদের রাত্রি যেন মুহূর্তে কাটিয়া গেল। রমণবিমর্দে ক্লিষ্ট দেহা বিজৃম্ভমানা নিদ্রাকষায়িতাক্ষী হারলতা শয়ন-গৃহ হইতে স্খলিতপদে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। [৩৮১—৩৯১]

[সুন্দরসেন যখন প্রভাতে গণিকাপল্লীর পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন গণিকাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

[মন্দবেগ, শীঘ্রকাল কামীর সহিত নীচরতে অসন্তুষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "পরিচয়ের পর নিকটে গিয়া তাহার সহিত পান-ভোজন করিয়া ও যৎকিঞ্চিৎ সুরতকার্যে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

[চণ্ডবেগ, চিরকাল কামুকের সহিত উচ্চরতে অসন্তুষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "অবিদগ্ধ, শ্রমকঠিনদেহ, নারী অভাবে (কামক্ষুধাতুর) মূর্খ এক ব্রাহ্মণ-যুবা কামী হইয়া আসিয়া রাত্রিতে আমার অপমৃত্যু ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল।"

[রতিশক্তিশূন্য বৃদ্ধ সমাগমে বিড়ম্বিতা কোন গণিকা বলিতেছিল] "এক বৃদ্ধ যাহার ক্ষণমাত্র ইচ্ছার বিরাম নাই অথচ শক্তিও নাই বস্তুও নাই তাহার রতিপ্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা আজ আমি অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছি।" (৩৯)

[কোন সুখসুপ্তা গণিকা বলিতেছিল] "আমার অভিযোক্তা(৪০) অত্যধিক মদ্যপানে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে আমি শয্যার এক পার্শ্বে শুইয়া নির্বিঘ্নে নিদ্রিত হইয়া সুখে রাত্রি কাটাইয়াছি।"

[উত্তম নায়ক লাভে সমরতে হৃষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "সখি, ভাগ্যবশে আমি যে নাগরটিকে পাইয়াছিলাম সে দেখিতে যেমন সুন্দর, চাটূক্তি ও বক্র পরিহাসেও তেমনি পটু এবং সম্প্রয়োগেও তেমনি সুকুমার।"

[কোন গ্রামবাসী কামীর মূঢ়তায় পরিহাস করিয়া কোন গণিকা বলিতেছিল] সখি, আজ ক্ষীণ কামোত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যাওয়ায় একটি গ্রামবাসী লোক আমার প্রেরণা সত্ত্বেও কোনরূপ কামোত্তেজনা অনুভব না করায় অবশেষে আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পালংকে আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, স্বেদসিক্তগাত্রে সমস্ত রাত্রি না ঘুমাইয়া, রাত্রি প্রভাতের জন্য উদ্গ্রীব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুইয়াছিল।"

[কোন গ্রামবাসীর মূঢ়তায় কৌতুহল অনুভব করিয়া কোন গণিকা তাহার সখীকে বলিতেছিল] "আজ সখি, এক গ্রামবাসী কামী এক কৌতুক করিয়াছে শোন, আমাকে সুরতরসে নিমীলিতনয়না দেখিয়া আমি মরিয়া গিয়াছি মনে করিয়া সে ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে(৪১)।"

রতিবন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত: উত্তান, পার্শ্ব, আসিন, আনত, স্থিত ও উৎক্ষিপ্ত। তাহার প্রত্যেক বিভাগে যে বিভিন্ন ভেদ আছে তদনুসারে ৮৪ বন্ধ কামশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। (৩৪) বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্যাবন্মন্দরসা নরাঃ। রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ।" পুনশ্চ "নাস্ত্যত্র গণনা কাচিন্ন চ শাস্ত্রপরিগ্রহঃ। প্রবৃত্তে রতিসংযোগে রাগ এবাত্র কারণম্। স্বপ্নেষ্বপি ন দৃশ্যন্তে তে ভাবাস্তে চ বিভ্রমাঃ। সুরতব্যবহারেষু যে স্যুস্তৎক্ষণকল্পিতাঃ। যথা হি পঞ্চমীং ধারামাস্থায় তুরগঃ পথি। স্মৃতং (৩৫) রত্যাবেগে কুসুম-কোমলা কামিনী বলবান্ পুরুষের অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কোন কবি বলিয়াছেন—"যা সা চন্দনপংকমণ্ডিতং ভারং গুরুং মন্যতে, সুপ্তা কোমল পদ্মপত্রশয়নে খেদং পরং গচ্ছতি। সা সর্বাঙ্গ ভরং প্রিয়স্য সহতে কেনাপ্যহো হেতুনা, চিত্রং পশ্য কিমত্র চিত্রমথবা কামস্য কিং দুষ্করম্।" (৩৬) সুরতযোগে তাহাদের দেহসাযুজ্যরূপ অদ্বৈত হইয়া গিয়াছিল এবং হৃদয়ও অদ্বৈত হইয়া গিয়াছিল—এই অবয়ব আমার বা পরের এই ভেদবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রুদ্রট বা রুদ্রভট্ট তাঁহার শৃঙ্গারতিলকে প্রগল্ভা নায়িকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"লব্ধায়তিঃ প্রগল্ভা স্যাৎ সমস্তরতিকোবিদা। আক্রান্ত নায়িকা বাঢ়ং বিরাজদ্বিভ্রমা যথা। নিরাকুলা রতাবেষা দ্রবতীব প্রিয়াঙ্গকে। কোঽয়ং কাস্মি রতং কিংবা ন বেত্তি চ রসাদ্ যথা।" (৩৭) সুরত বর্ণনা করিয়া তাহার পর সুরত তৃপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। সুরত রসের সুখানুভূতিতে তাহার নয়ন মুদ্রিত, দেহ নিশ্চল হইয়া সে মৃতের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাহার সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া সুরত-সুখের অনুভূতির যে উদ্ভাসিত ভাব জাগিয়াছিল তাহাতেই বুঝা যাইতেছিল, সে মৃত নহে জীবিত। (৩৮) সুভাষিত সমূহে বিপরীতকারিণী প্রগল্ভার তিন প্রকার লীলা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—আদি—"পাতিতোঽসি কিতবাধুনা ময়া, হন্মি, সংবৃণু, কুতোঽসি নির্মদঃ। নিঘ্নতী ক্বণিত কংকণং মুহুঃ, কুঞ্চকুন্তলবিচুম্বিতাধরা, সান্দ্রদোলিতনিতম্বমাকুলা।" মধ্য যথা—"চলৎকুচং ব্যাকুলকেশপাশং খিন্নমুখং স্বীকৃতমন্দহাসম্। পুণ্যাতিরেকাৎ পুরুষা লভন্তে পুংভাবরক্তোৎপললোচনানাম্। অবসানে যথা "আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং, কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং জালকৈঃ। তন্ব্যা যৎসুরতান্ত তান্তনয়নং বক্ত্রং রতব্যত্যয়ে, তত্ত্বাং পাতুচিরায় কিং হরিহর-ব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ।"(৩৯) অর্থাৎ বৃদ্ধ অক্ষম অথচ তাহার রতি-তৃষ্ণা পূর্ণ রহিয়াছে সুতরাং সে নানাবিধ অকরণীয় প্রক্রিয়া যথা ঔপারিষ্টকাদি দ্বারা কার্য্যক্ষম হইবার চেষ্টা করায় নায়িকা নিজকে বিড়ম্বিত মনে করিতেছে।

(৪০) অভিযোক্তা—অর্থাৎ রতাভিযোগকারী কামী। রতিক্রীড়ার পর মদ্যপানে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই বুঝাইতেছে। (৪১) গাথাসপ্তশতীতে একটি অনুরূপ উক্তি আছে—"অজ্জং

[কোন অশ্লীলভাষী ভাঁড় কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা বেশ্যা বলিতেছিল] "দেশ প্রকৃতিতে অনভিজ্ঞ, শঠাত্মা, এক বেরসিক (বিদেশী) রাজপুত্র হইতে আমরা (৪২) কেবল (অত্যধিক) ভাঁড়ামির (৪৩) বিড়ম্বনা ক্লেশ সহ্য করিয়াছি।"

[লোকাপবাদে অবমানিতা কোন গণিকা দুঃখ করিয়া বলিতেছিল] "প্রিয় সখি, নগরাধ্যক্ষ আমাকে লোকসমক্ষে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ভাবে জোর করিয়া অধিক অর্থ প্রার্থনায় কখনও ন্যায় কার্য করা হয় নাই।"*

[দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কামুক কর্ত্তৃক উপভুক্তা গণিকাকে অপর বেশ্যা সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল] "কেরলি, (চলিবার সময়) তুমি জঘন আকর্ষণ করিয়া চলিতেছ এবং তোমায় সর্বাঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট নখক্ষত দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি কোন দাক্ষিণাত্যবাসী কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছ।"(৪৪)

[কোন কামশাস্ত্রবিৎ নাগরের রমণে সৌভাগ্যগর্ব্বিতা গণিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া অপর গণিকা বলিতেছিল] "কেতকি, তোমার অধরে বিন্দু, (৪৫) কণ্ঠে মণিমালা, (৪৬) ও স্তনযুগে শশপ্লুতক (৪৭) দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি কোন কামশাস্ত্রবিশারদের সহিত রতি উপভোগ করিয়াছ।"

প্রভাতে গণিকাগণের নৈশ অভিযোগ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন শুনিতে শুনিতে তিনিও (অর্থাৎ সুন্দরসেনও) যথা ক্রিয়মাণ কর্ত্তব্য করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

এইরূপ সুন্দর ভাবে উদ্ভূত প্রেম ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে তাহাতে বশীভূত হইয়া তিনি তাহার (অর্থাৎ হারলতার) সহিত যৌবন-সুখ অনুভব করিতে করিতে দেড় বৎসর কাটাইয়া দিলেন।

[৩১২—৪০৫]

মোহন সুত্তং ভিঅন্তি মোত্তু পলাইএ হলিএ। দরফুড়িঅবোড়ভারোঅরাহি হসিঅং ব ফলহীহিং।" (আর্য্যাং মোহনসুপ্তাং মুক্তোতি মুক্তা পলায়িতে হালিকে। দরস্ফুটিতফলোদরাভিঃ হসিতংইব কার্পাসীভিঃ।)

(৪২) গৃহস্থিত সকলে। (৪৩) অশ্লীল ইয়ার্কি।

* (গ) পুস্তকে পাঠ অনুসারে—"এই প্রকার বঞ্চক দাতার নিকট হইতে দ্বিগুণ অর্থ-প্রার্থনায় কি অন্যায় হইয়াছে।" উপরে যে (খ) পুস্তকের পাঠ অনুসারে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নগরাধ্যক্ষ গণিকার নিকট হইতে কামিদণ্ড ভাটা অনুসারে রাজার প্রাপ্য শুল্কের অধিক প্রার্থনা করিতেছিল বলিয়া গণিকা অনুযোগ করিতেছে। (৪৪), দাক্ষিণাত্যবাসিগণের নখ হ্রস্ব, কর্ম্মসহিষ্ণু এবং বিবিধ নখরেখাংকন করিতে সক্ষম। তাহারা চণ্ড প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া নখচ্ছেদে পটু—"হ্রস্বানি কর্ম্মসহিষ্ণূনি বিকল্পযোজনাসু চ স্বেচ্ছাপাতীনি দাক্ষিণাত্যানাম্" (কা, সূ, ২।৪।১০) "তানি খররাগত্বাদ্দাক্ষিণাত্যানাম্" (জয়মঙ্গলা ২।৪।১০) জঘন আকর্ষণ করিয়া চলিবার কারণ চণ্ডবেগ দাক্ষিণাত্যবাসী কর্ত্তৃক উপভোগ অথবা "অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্" (কা, সূ, ২।৬।৪৬)। (৪৫) নায়িকার অধর আকর্ষণ করিয়া সম্মুখের রাজ দন্তদ্বয় দ্বারা তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষত করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে বলে 'বিন্দু'। "When a small portion of the lip of the wife is bitten by the husband with one upper and one lower front tooth then it is called Bindu" ("Ananga Ranga" 2nd ed 192) (৪৬) দন্ত ও ওষ্ঠ সংযোগে বারংবার গ্রহণ করিয়া যে পীড়ন করা যায় তাহাতে যে রক্তবর্ণ অল্পস্ফীত দন্তচিহ্ন হয় তাহাকে বলে 'প্রবালমণি'। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মালাকারে পীড়ন করা হইলে যে মালাকার লোহিত পদবিন্যাস হয় তাহাকে বলে 'মণিমালা'। এই 'মণিমালা' গলদেশ কক্ষ ও বংক্ষণ প্রদেশে অংকিত করিতে হয়। (—কারণ ঐ সকল স্থানের ত্বক মাংসল নহে)। [কা, সূ, ২।৫।১০—১১,১৪] (৪৭) যে নায়িকা নায়কের সম্প্রয়োগকে শ্লাঘার বিষয় মনে করে, তাহার স্তন-চূচুকে নখপঞ্চক সম্মিলিত ভাবে স্থাপিত করিয়া বল-পূর্ব্বক ছুপিয়া ধরিবে, তাহাতে যে রেখা হইবে, তাহাকে 'শশপ্লুতক' বলে। [কা, সূ, ২।৪।২০]

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় মহারাজা দ্বারবঙ্গ সহ অন্যান্য দেশনায়কদের এক সম্মিলিত আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হয়। উক্ত চিত্রে ভ্রমবশতঃ যে কয়েকটি নাম দেওয়া হয় আমাদের এক সহৃদয় পাঠক সেই ভ্রম দূর করিয়াছেন। উডবার্ণ, ফিরোজ শা মেটা, আয়েঙ্গার ও টি পালিতের স্থলে যথাক্রমে ওয়াদিয়া, দীনশা ই ওয়াচা, ভি রাঘবাচার্য্য ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী হইবে।

ভারতের প্রাচীনতম আদালত
কলকাতার ছোট আদালত

শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(প্রধান বিচারক, ছোট আদালত, কলকাতা)

ভারতের প্রাচীনতম আদালত

এক রাজকীয় সনদ অনুযায়ী "ছোট-খাট অঙ্কের দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তির জন্য" ১৭৫৩ সালের ৮ই জানুয়ারী কলকাতায় কোর্ট অফ রিকোয়েষ্ট (Court of Request) স্থাপন করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল ১৭৭৪ সালের ২৬শে মার্চ এবং বিচার সনদ (Charter of Justice) এবং ঘোষণা (Proclamation) অনুযায়ী প্রেসিডেন্সী কোর্ট অফ রিকোয়েষ্ট সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ১৮৫০ সালের আইনের নবম ধারা অনুযায়ী ১৮৫০ সালের ১লা মে প্রেসিডেন্সী ছোট আদালত (Presedency Small Causes Court) স্থাপিত হয়।

এই আদালতের উদ্দেশ্য ছিল "ছোট-খাট দায়দাবী উশুলের জন্য ব্যবস্থা করা"। বিভিন্ন কোর্ট অফ রিকোয়েষ্টগুলি প্রেসিডেন্সী ছোট আদালতের মধ্যে আত্মবিলুপ্ত হয়।

পেশাদার ও অপেশাদার বিচারক

প্রথমে তিন জন কমিশনার নিয়ে কোর্ট অফ রিকোয়েষ্টের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁরা একত্রে বসে মামলার নিষ্পত্তি করতেন। এই আদালতে প্রথম ভারতীয় কমিশনার ছিলেন বাবু রসময় দত্ত। ১৮৩৭ সালে তাঁকে কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৪ সালে বাবু ...চন্দ্র ঘোষ কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৪০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ১৮৩২ সালের ১লা জুন পর্যন্ত মিঃ ডেভিড হেয়ার এই আদালতে তৃতীয় কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৮৪৬ সালে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বাবু ভূদেব মুখার্জী এই আদালতে হেড ক্লার্কের পদপ্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু "হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র" এই আবেদনকারীর না কি উক্ত পদলাভের "কোন যোগ্যতাই ছিল না"। তাই তিনি চাকরীটা পাননি। ১৮১৪ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন জন কমিশনার ছিলেন ব্যবহারজীবী। ব্যবহারজীবী কমিশনারদের বলা হত "পেশাদার বিচারক" এবং আইন অনভিজ্ঞ কমিশনারদের বলা হত "অ-পেশাদার বিচারক।"

এ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ অনুযায়ী বিচার

আইনজ্ঞ হিসাবে সাব-জজ শ্রীযদুনাথ রায়ই এই আদালতের প্রথম "পেশাদার বিচারক" এবং মুন্সেফ শ্রীতারাপদ চ্যাটার্জি প্রথম রেজিষ্ট্রার। অধিকাংশ বিচারকই আইনজ্ঞ ছিলেন না, তাই কোন জটিল মামলা উঠলেই বিচারকরা এ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নিয়ে মামলার রায় দিতেন। ১৮২৬ সাল থেকে সংরক্ষিত আদালতের নথিপত্রে লিখিত মন্তব্য থেকে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

মামলা সম্পর্কে এ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ চেয়ে বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীর কাছে পত্র লেখেন : বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জনের ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। চার টাকা হারে ডাক্তারী দর্শনী বাবদ সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এইচ জিফ্রের কাছ থেকে তাঁর পাওনা দাঁড়িয়েছিল ৩১৲ টাকা। এই টাকা আদায়ের জন্য তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। মিঃ জিফ্রে বাবু শ্যামাচরণ ঘোষকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : "বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ আমায় ১১ বার পরীক্ষা করেছেন। প্রতিবারের পরীক্ষার জন্য তাঁর প্রাপ্য চার টাকা। এই টাকা শোধের অবস্থা ফিরে পেলেই আমি তাঁর টাকা সানন্দে শোধ করে দেব।—স্বাঃ এইচ জিফ্রে, ১লা অক্টোবর, ১৮৪২।" কিন্তু নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল যে বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ যখন মিঃ জিফ্রেকে পরীক্ষা করেন, তখনও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের ডিপ্লোমা পাননি। তিনি তখনও মেডিকাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। মামলার প্রধান বিষয় ছিল "জিফ্রেকে পরীক্ষা করার সময় বাদী যখন চিকিৎসা ব্যবসায়ের ডিপ্লোমা পাননি, তখন তিনি কি কোন আদালত মারফৎ তখনকার সময়ের বকেয়া ডাক্তারী দর্শনী উশুল করতে পারেন?"

(খ) ১৮২৮ সালের ৮ই অক্টোবর এক দাবীর মামলায় (claim case) কমিশনাররা গবর্ণমেন্টের আইন-অফিসারদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, দাবীদারের পক্ষে রায় দেওয়া হবে, না সম্পত্তি বিক্রীর আদেশ দেওয়া হবে ?

(গ) ১৮৩৭ সালের ২৮শে আগষ্ট প্রধান কমিশনার এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ পিয়ার্সনকে লেখেন : আদালতের কমিশনারদের মধ্যে একটা বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে জমিদারের স্বার্থ জড়িত। বিষয়টির উপর আপনাদের অভিমত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি :—

(১) যে-ক্ষেত্রে বিবাদীর সম্পত্তির উপর আদালত ডিগ্রি দিয়েছেন এবং সম্পত্তি আদালতের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে আছে, সে-ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক কি আদালতের কর্মচারীদের উচ্ছেদ করে সেই সম্পত্তি বিক্রী করতে পারেন ? প্রস্তাবিত বিক্রীর পাঁচ দিন আগে বাড়ীর দরজায় একটা বিক্রয় নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিশে বলা হয়েছিল যে, উক্ত সম্পত্তির উপর যাদের দাবী-দাওয়া আছে, তারা যেন ভবিষ্যৎ সালিশের জন্য তাদের নাম আদালতে তালিকাভুক্ত করে।

(২) সম্পত্তি বিক্রীর পর যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাদীকে প্রত্যর্পণের জন্য আদালতে জমা করা হবে, সেই জমার টাকা থেকে মালিকের ভাড়া শোধ করা যেতে পারে কি ?

বিচারকদের বিরুদ্ধে মামলা

১৮০২ সালের ঘোষণায় প্রেসিডেন্সী ছোট আদালতকে নিজস্ব আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন আইন-কানুনই প্রণয়ন করা হয়নি এবং বিচারকরা নিজেদের দায়িত্বেই বিচারকার্য্য চালিয়ে যেতেন। এই রকম আইন-কানুনবিহীন আদালতের কাজ চালাতে চালাতে বিচারকরা অনেক সময়ই নিজেদের ক্ষমতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতেন এবং তখন তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত।

(ক) একবার মিঃ নফার নামক এক ব্যক্তি মিঃ বৃচার নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাড়ীভাড়ার মামলা করেন। এক জন মাত্র কমিশনার এই মামলার বিচার করে ১২-১১-১৮৪৩ সালে ডিগ্রি দেন। মিঃ বৃচারের এটর্নী মিঃ ডব্লিউ জে শ এ বিষয়ে কমিশনারদের কাছে পত্র লেখেন। কমিশনাররা এই পত্র এবং মিঃ বৃচারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিগ্রির ওয়ারেন্ট নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেন: "ঘটনাক্রমে মামলাটি মাত্র এক জনের দ্বারা বিচার হওয়ায় আমাদের আশঙ্কা হয় মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে উঠলে এই বিচার-পদ্ধতির ব্যাপার নিয়ে আইনগত আপত্তি উঠবে। তেমন কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা এড়াবার জন্য বৃচারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিগ্রি কার্য্যকরী করা আপাততঃ স্থগিত রাখাই স্থির করেছি। আমরা আগের পত্রেও জানিয়েছি এবং এই পত্রেও জানাচ্ছি যে, আমাদের আদালতের পরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবিলম্বে আইনগত সিদ্ধান্ত হওয়া কর্তব্য।"

(খ) ১৮২৭ সালের ১২ই জানুয়ারী কমিশনার সি ডব্লিউ ব্রিটিজেকি, জে ডব্লিউ ম্যাকলিয়ড এবং আর বি লয়েডের উপর কোর্ট উইলিয়মের প্রধান বিচারপতি সার চার্লস এডওয়ার্ড গ্রে ম্যাণ্ডামুস আদেশ জারী করে বিবাদী রাজনারায়ণ দাসের এটর্নী মি. এইচ এ স্মিথকে একটি এফিডেভিটের নকল দেবার নির্দেশ দেন। এই এফিডেভিটের উপর ভিত্তি করে কোর্ট অফ রিকোয়েষ্ট একটি ওয়ারেন্ট জারী করিলেন। সার চার্লস গ্রে আদেশ দেন যে, সন্তোষজনক কারণ না দেখাতে পারলে এফিডেভিটের নকল লাভের আবেদনের জন্য যে অর্থব্যয় হয়েছে সেই অর্থও কমিশনারদের দিতে হবে, কারণ এফিডেভিটের নকল দিতে কমিশনাররা প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন।

(গ) ১৮৪৭ সালের ২রা নবেম্বর কমিশনররা বাঙলার ডেপুটি গবর্ণরের কাছে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তাঁরা জানান যে, আদালতের প্রধান কমিশনরের বিরুদ্ধে শেখ নিমৎ খাঁ অভিযোগ করেছে যে তাকে মিছামিছি আটক করা হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, এক মামলায় ডাঃ বেগের চাকর নিমৎ খাঁ ছিল বাদী পক্ষের সাক্ষী এবং ডাঃ বেগ ছিলেন বিবাদী। নিমৎকে আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সে আদালতে হাজির না হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে বাদী এক দিনের সময় চাওয়ায় নিমৎকে শুনানীর দিন ১৮-৮-১৮৪৭ পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। যে আদেশ-বলে নিমৎকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই আদেশটাই হারিয়ে গিয়েছিল। এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ষ্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের পরামর্শ অনুযায়ী মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রধান কমিশনার ক্ষতিপূরণ বাবদ নিমৎকে ২০০ টাকা দেন। এ ছাড়া নিমৎকে মামলার খরচ দেবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর আইন-বিশেষজ্ঞরা এই রকম পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ওয়ারেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছিল মাত্র এক জনের কমিশনারের দ্বারা এবং সাক্ষীকে আদালত অবমাননার অভিযোগে বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করা হয়নি।

(ঘ) ১৮৪৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী কমিশনার রসময় দত্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল যে, তিনি মিঃ জন ওয়ারের বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট জারী করে তাকে মিথ্যা আটকে রেখেছেন।

(ঙ) ১১৪০ সালে মিঃ এ্যাণ্ডার্সন কমিশনার রসময় দত্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এই অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগে কোর্ট অব রিকোয়েষ্টের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন জড়িত ছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, কোন সম্পত্তির পরিচালকের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা কি আদালতের বিচার্য্য বিষয় হতে পারে?

(চ) ১৮২৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কমিশনাররা বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীকে লেখেন: "ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে আমাদের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ এসেছে। কমিশনার রবিনসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে তিনি এক জন সাক্ষীকে ১০ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন অথচ গবর্ণমেণ্ট এই মামলার উভয় পক্ষকে মামলার খরচ দিয়ে মামলা মিটিয়ে নিয়েছেন।

"দ্বিতীয়তঃ প্রধান বেলিফের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সে অভিযোগ এই আদালতের বিরুদ্ধেই, কারণ এই আদালতের জন্মের (১৭৫৩) সুরু থেকেই বিচারের পর বিবাদীকে আদালতে আটক রাখার রীতি প্রচলিত।"

বিচারক ও তাঁদের বিচারের স্বাধীনতা

প্রথম ও দ্বিতীয় ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের সেনাপতি ক্যাপ্টেন বোল্টনের এক বাবুর্চি তার মনিবের বিরুদ্ধে ৩৮০ টাকার এক পাওনা বকেয়া বেতনের মামলা দায়ের করে। ধৃত ক্যাপ্টেনকে আদালতে হাজির থেকে ভারতের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এতে ক্যাপ্টেন সাহেবের সম্মানে আঘাত লাগে। তিনি এ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল এবং সামরিক দপ্তরের সেক্রেটারী লেঃ কঃ ওয়াটসনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি আবার কমিশনারদের কাছে পত্র লেখেন। এই পত্রের উত্তরে কমিশনাররা বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীকে লেখেন: আমরা মনে করি যে, আমাদের এই আদালত সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে হলে একমাত্র বিচার বিভাগ মারফৎই করা যেতে পারে। আইনগত পন্থাই সেইটা বলে আমরা মনে করি এবং কমিশনারদের পক্ষে একমাত্র বিচার বিভাগ মারফৎ প্রাপ্ত পত্রই গ্রহণযোগ্য হবে। সুপ্রীম কোর্টে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা করেছেন, সেই ঘোষণায় কমিশনারদের উপর বিচারের ভার পরিষ্কার ভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ বিচার বিভাগের উপর যে রকম হস্তক্ষেপ করতে আসছেন, তার ফলে কমিশনারদের অসংখ্য পত্রালাপ করতে হবে এবং কমিশনারদের ক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।"

দেশী মামলা ও অন্যান্য মামলা

আদালতের আইন-কানুন ঘন ঘন বদল করা হত। অনেক সময়ই অধিকাংশ কমিশনারের অনুমতি ছাড়াই বদল হত। তার ফলে এই সমস্ত আইন-কানুনের উপর ভিত্তি করে বিচার করার গুরুত্ব অনেক কমে গেল। ১৮২৫ সালের জুলাই মাস থেকে আদালতে মামলার সংখ্যা কমে গেল। গোড়ার দিকে রোজই আদালত বসত কিন্তু ১৮২৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর কমিশনাররা সিদ্ধান্ত করেন যে, সপ্তাহে তিন দিন মাত্র আদালত বসবে। ১৮৩৭ সাল থেকে

মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিচারকরা রোজই আদালতে বসতেন এবং প্রত্যেক বিচারক গড়ে রোজ ১২টা করে মামলার নিষ্পত্তি করতেন।

১৮৫২-৫৩ সালে মোট ২৬৮৮১টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার আগের বছর হয়েছিল ২৭৭৪১টি। ১৮৫৩ সালে গড়ে প্রত্যেক মামলায় ব্যয় হয়েছিল ৫ টাকা করে। মামলাগুলো দু'ভাগে ভাগ করা হত: "দেশী মামলা" ও "অন্যান্য মামলা।"

১৪-৮-১৮৩৮ সালের এক পত্রে জানা যায় যে, দুর্গা পুজার সময় আদালত তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকত।

আদালতের ছুটি ও ছুটির সময়ের আদালত

১৮৪৩ সালের ৩০শে নভেম্বর কমিশনাররা বাঙলার ডেপুটি গবর্ণরের বিবেচনার জন্য বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীকে লেখেন: কোর্ট অব রিকোয়েষ্ট ও জেনারেল ট্রেজারীতে খৃষ্টান ও হিন্দু পার্বণে ছুটির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মুসলমান পার্বণে ছুটির ব্যবস্থা নেই। বিচারকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, মুসলমান পার্বণে আদালতের মুসলমান আমলাদের ছুটি দেওয়া উচিত। বাঙলা গবর্ণমেন্টের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী ২৬-৮-১৮৫৩ সালে যে পত্র লেখেন, সেই পত্র থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর গরমের সময় আদালত ১লা থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত ছুটি থাকত, আর শীতের সময় থাকত ১৫ই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২১-৪-১৮৫৪ সালে ক্যালকাটা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন আদালতের ছুটিতে আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন যে, আদালতের ছুটির সময় খাতকের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না, অথচ সেই সময়ের মধ্যে খাতক আদালতের আওতার বাইরে চলে যেতে পারে। এ অবস্থায় আদালত বন্ধ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফলে ১৮৫৪ সাল থেকে ছুটির সময়ও আদালত বসবার ব্যবস্থা হয়।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যখন প্রথম কোর্ট অব রিকোয়েষ্ট স্থাপিত হয়, তখন ২০ টাকার মামলা পর্যন্ত তার বিচার্য ছিল। ধীরে ধীরে টাকার অঙ্ক বাড়াতে বাড়তে ৪০০ টাকা পর্যন্ত হয়। ১৮৫০ সালের নবম আইন অনুযায়ী আদালত ৫০০ টাকার মামলা পর্যন্ত বিচার করার ক্ষমতা পেলেন। ১৮৭৪ সালের ২৬ আইন এবং ১৮৮২ সালের ১৫ আইন অনুযায়ী আদালত যথাক্রমে এক হাজার এবং দুই হাজার টাকার মামলা পর্যন্ত নিষ্পত্তি করার অধিকার পান। অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে সব চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন ট্রেজারার বাবু গণেশচন্দ্র বসু, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু এবং বাবু হরচন্দ্র বসু। ১৮১৪, ১৮১৮ এবং ১৮২১ সালে যথাক্রমে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। হরচন্দ্রের বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা। তাঁকে ১৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ জমা দিতে হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে সমস্ত বেলিফ এবং ডেপুটি বেলিফ ছিল ইংরাজ অথবা ফিরিজি এবং তাদের বেতন ছিল ৬০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। ১৮৪৮ সালের ৩১শে জুলাই কমিশনাররা সরকারের কাছে লেখেন যে, তাঁদের উপর বেলিফের এমন একটি বেতনের হার নির্দিষ্ট করার দেওয়া হোক যাতে বেলিফরা বেশ সম্মানজনক অবস্থায় থাকতে পারে। দেশীয় বেলিফ, ইয়োরোপীয় বেলিফ, বেলিফ সুপার এবং নিলামদারদের যথাক্রমে ৫০০, ১০০০, ২০০০, ২৮০০ এবং ১০০০০ টাকা জামানত দিতে হোত। ১৮৮৫ সালের ৭ই জুলাই তারিখে অস্থায়ী পঞ্চম বিচারক ও আদালতের মুহুরী জামানত হিসাবে ৪০০০ টাকা জমা দেয়।

উকিলদের মুহুরীদের ১০ টাকা করে জমা রাখতে হোত। ১৯০২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের একখানি রসিদ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা চলে। রসিদটি এইরূপ:—

"আদালতের উকিল বাবু শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের কেরাণীরূপে আমার যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত হওয়ায় আমি আমার জমা ১০ টাকা স্মল কজেস কোর্টের কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে ফিরে পেলাম। আমি এখানে স্বীকার করছি যে আমাকে প্রকৃত রসিদ না দেওয়া সত্ত্বেও আমাকে যে জামানতের টাকা ফিরৎ দেওয়া হয়েছে সেই টাকার উপর আমার আর কোন দাবী রহিল না।"

স্বা:—গিরিশচন্দ্র মণ্ডল।

গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণ ও কোরাণী মোল্লা

১৮২৮ সালের ১লা মে তারিখের বাজেটে দেখা যায় যে, গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণ নামে দু'জন ব্রাহ্মণ এবং কোরাণী মোল্লা নামে দু'জন মুসলমান আদালতে পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মাইনে ছিল ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত। বিশেষ ধরণের হলফ পড়ানই তাঁদের কাজ ছিল।

শতকরা ২৫টি মামলাই উড়িয়া বস্ত্র ব্যবসায়ীদের

১৮৪০ সালের ২৫শে মে তারিখে কমিশনাররা জুডিসিয়াল সেক্রেটারীকে লেখেন যে, হলফ পড়াবার জন্য যাদের রাখা হয়েছে তাদের ১৮৪০ সালের ৩১শে মে তারিখ থেকে বরখাস্ত করা হোক। কমিশনাররা লেখেন যে ছুতোর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের উড়িয়া কারিগরদের মামলাগুলি ছাড়াও শতকরা ২৫টি মামলাই হল উড়িয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের—সুতরাং মাসিক ৭ টাকা মাহিনা দিয়ে গোপীনাথ পাণ্ডা নামে এক জন গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণকেই তা রেখে দেওয়া হোক। তিনিই উড়িয়া হিসাব-পত্র দেখবেন। কমিশনাররা আরও লেখেন যে মামলার হিসাব-পত্র উড়িয়া ভাষায় এবং তালপত্রে লেখা।

বাজেট

১৮২৭ সালের ১লা মে তারিখের বাজেটে দেখা যায় যে, সিনিয়র, সেকেণ্ড এবং থার্ড কমিশনারদের মাহিনা ছিল যথাক্রমে যে ১৪০০৲, ১২০০৲ এবং ১০০০৲। প্রধান মুহুরীর মাহিনা ছিল ৩৫০৲, ৩৫০৲, ৩০০৲ এবং ২৫০৲ টাকা মাহিনায় তিন জন মুহুরী কাজ করতেন। ডেপুটি বেলিফের মাহিনা ছিল ৬০৲ টাকা ইনিও সর্বনিম্ন বেতনভোগী ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন। ভারতী মুহুরীদের সর্বোচ্চ মাহিনা ছিল ৪০৲ টাকা এবং সর্বনিম্ন মাহিনা ছিল ৮৲ টাকা। দারোয়ানের মাহিনা ছিল ৪৲ টাকা।

১৮২৮ সালের ১লা মে'র বাজেটে জানা যায় যে, আদালতে

মাসিক খরচ ছিল ৭৭০৬৲ টাকা। এর মধ্যে বাড়ীভাড়া বাবদ খরচ মাসিক ৮৫০৲ টাকা।

১৮৪৪ সালের ১লা মে তারিখের হিসাবে বিভিন্ন মাহিনা ও খরচের নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া যায় :—

সিনিয়র কমিশনার ১৪৬৩৲; সেকেণ্ড কমিশনার ১২০০৲; হেড ক্লার্ক ৬৫০৲; সহকারী কেরাণী ৩১৩।০; কমিশনারের ফার্ষ্ট ক্লার্ক ১৫০৲; ইনস্পেক্টর ১৫০৲; সেকেণ্ড ইনস্পেক্টর ১৫০৲; থার্ড ইনস্পেক্টর ৮০৲; হেড বেলিফ ৬০৲; ডেপুটি বেলিফ ৪০৲; ঐ ২০৲; ঐ ২০৲; উড়িয়া ইনস্পেক্টর ৭৲; ইংরাজী রাইটারবৃন্দ :—৪১।৶১, ১৪৲, ৩৩।৵০, ৩৩।৶০, ২৫৲, ২৫৸৵০, ২৫৲, ২৪৲, ২০৲, ১৮৲, ১০৲, রেকর্ড-কীপার ২৩৲; হেড একাউন্টেন্ট ২৬৲; বাঙ্গালা চেক একাউন্টেন্ট ১০৲; হেড ক্যাশকীপার ৭০৲; ডেপুটি ক্যাশকীপার ২০৲; মোহারের ও ইংরাজী রাইটার ১৬৲; হেড মুহুরী ১৪।৭; মুহুরী ১২৲; ঐ ১০৲; পোদ্দার ১০।৶২; সমন অফিসের বাঙ্গালা রাইটার ১২।৭; ঐ ১০।৶২; ২৫৲; বন্দি অফিসের ব্যয় ১৬।৶৬, মামলার ব্যয়ের হিসাব রক্ষক ১০।৶২; ৩৪৲; ১২।৵৭; কম্প্রোমাইজ অফিস ১।৵৫; ডিপোজিশন অফিস ১৬৲, ১৬।৶৬, ১২।৶৭, ১২৲, ১০৲, ১০৲, কমিশনারের পক্ষ হইতে জনসাধারণের নিকট যাঁহারা পত্র লিখিতেন ১০৲, মামলার হিসাব-পত্র পরীক্ষক ৮।/১; সাব-পইনা অফিস ৮/১১; বাঙ্গালা রাইটার ৮/১১, ঐ ৮/১১; দপ্তরী ৫/২, ঐ ৫/২, ঐ ৫/২; আমুবদার ৭।/০; দরোয়ান ৪।৶৭, ঐ ৪।৶৭, ঐ ৪।৶৭, মেথর ৪।৶০, ঐ ৪।৶০; ভিস্তি ৪৲, ঐ ৪৲; এক জন ফরাস ৪৲; দুই জন জমাদার ৪৲; আদালতের ঘোষকবৃন্দ ১৬।/০; ২৮ জন পিওন ১১৩৸৪; কমিশনারের হেড-ক্লার্কের দুই জন হরকরা ১০৶৭; সীল আকমন ১২৲, জেল সরকার ১২।৭, ঐ ১৲; আদালতের কাজ চলিবার কালে যে আট জন বরকন্দাজ প্রয়োজন হয় ৪০৸৵৪; আদালতগৃহের ভাড়া ৫০০৲। মোট ব্যয় ৫৭৭০৵১০।

১৮২৭ সালে এই আদালতের একটি নিজস্ব কারাগার ছিল। ১৮২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৩৪ জন। এই সংখ্যার মধ্যে ৬ জন ইয়োরোপীয়, ৭ জন মুসলমান এবং ২১ জন হিন্দু। বন্দীদের ঋণ ৩ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৩৭০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

বন্দী খাতকের জন্য ঋণদাতাকে প্রতিদিন ছয় পয়সা হারে দিতে হোত। এক দিনের জন্য এই পয়সা না পাওয়া গেলে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোত। মূল ঋণ এবং খরচ অনুসারে বন্দিত্বের মেয়াদ নির্দ্ধারিত হোত। ১৮১১ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখের সরকারী ঘোষণা হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন অঙ্কের ঋণের জন্য এই ভাবে বন্দিত্বের কাল স্থির করা হোত—

ঋণ		বন্দিত্বের মেয়াদ
১০ টাকা	(খরচ সহ)	১ মাস
৫০ টাকা	"	৪ মাস
২০০ টাকা	"	৮ মাস
২০০ টাকার অধিক	"	১ বছর

১৮৩০ সালের ১১শে জুন তারিখের কমিশনারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কোর্ট অফ রিকোয়েষ্টএর জেলখানা ১২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে ১টি ছিল ভারতীয় স্ত্রী ও পুরুষ বন্দীদের জন্য। স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্ধারিত ওয়ার্ডগুলি পৃথক্ জায়গায় থাকত। প্রতি ওয়ার্ডে ৩৫ জন বন্দীর স্থান ছিল। তিনটি ওয়ার্ড কেবল মাত্র ইয়োরোপীয় বন্দীদের রাখার জন্যই ব্যবহৃত হোত। এই তিনটি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে ১টি করে বন্দী রাখা হোত। মিঃ এস জোহানসএর কাছ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যে কেনা জমির উপরই এই জেলখানা অবস্থিত ছিল। ক্যাপ্টেন উড ১৮০৮ সালে আরম্ভ করে ১৮১১ সালে এই জেলখানা নির্ম্মাণের কাজ শেষ করেন।

১৮৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে মোট বন্দী ছিল ২৭ জন। এর মধ্যে ২ জন ভারতীয় স্ত্রীলোক, ৫ জন মুসলমান পুরুষ, ২ জন ইয়োরোপীয় এবং অবশিষ্ট কয় জন হিন্দু পুরুষ। এই যে ২৭ জন মোট বন্দী—তাদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৬১৸০, খরচ—১৭৩।৶, খাওয়ার খরচ—৪০।৶৬; মোট ৮৮৩।০।

১৮৫০ সালের ১লা মে তারিখে যখন কলিকাতা স্মল কজ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাংলার ডেপুটি গবর্ণর কর্ত্তৃক কলিকাতার সুবৃহৎ জেলখানাটিকে উক্ত কোর্টের বন্দিশালায় পরিণত করা হয়।

কোর্টের দরিদ্র-ভাণ্ডারে এখন মোট ২৩৮৮২।/১০ আছে। ১৮৪৪ সালের ৩রা মে তারিখে কমিশনারদের যে চিঠি বাঙ্গালার একাউন্টেন্ট জেনারেলের নিকট লেখা হয় তা থেকে জানা যায় যে, ১৮১০ সাল থেকে এই দরিদ্র-ভাণ্ডার আছে। এমন কি ১৮১০ সালের পূর্ব্বেও এই দরিদ্র-ভাণ্ডারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। ১৮৪৪ সালের ১১শে এপ্রিল তারিখে কমিশনাররা একাউন্টেন্ট জেনারেলকে লেখেন—"এই কোর্টের আমলাদের যে অল্পস্বল্প জরিমানা করা হয় সেই সব জরিমানা নিয়মিত ভাবে দরিদ্র-ভাণ্ডারের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারী পেন্সনের আইন অনুযায়ী যে সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী পেন্সন পেতে পারেন না তাঁদের পেন্সনের কারণে এবং সময়ে সময়ে দরিদ্র খাতকদের ঋণ শোধের কারণে এই অর্থ-ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা হয়।"

১৮৪৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কমিশনাররা জুডিসিয়াল সেক্রেটারীদের নিকট লেখেন—"৪১০০ টাকার যে দরিদ্র-ভাণ্ডার রয়েছে তা' দিয়ে গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি কেনা হয়েছে। বয়স বেশী হওয়ার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কম মাইনে হওয়ার জন্য সরকারী নিয়ম অনুসারে পেন্সন পান না তাঁদের বাবদ এবং সৎ দরিদ্র খাতকদের ঋণ শোধ করার কারণে এই সমস্ত সরকারী কাগজের ঋণ ব্যয় করা হয়।"

১৮১১ সালে চীফ-ক্লার্ক পদে রবার্ট লেসলীকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সিনিয়র কমিশনার ব্রিটজেককে জানান যে, ক্রোকের আদেশ জারি করার সময় অল্প পরিমাণে অর্থ দাবী করে যে অর্থ পাওয়া যায়, আদালতের ইউরোপীয় ও ভারতীয় অফিসারদের ছোট-খাট অপরাধের জন্য জরিমানা করা হইলে যে অর্থ আসে এবং দানশীল পুরুষ ও মহিলারা দরিদ্র খাতকদের জন্য যে সব সাহায্য করেন তা দিয়েই এই সাহায্য-ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে।

ক্রোকের নোটিশের উপর যে টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বে-আইনী বলিয়া কিছু দিন বাদে কমিশনাররা তা' বন্ধ করে দেন।

১৮৪৪ সালের ৫ই আগষ্ট থেকে জরিমানার অর্থ সরকারী হিসাবে জমা হ'তে থাকে। ১৮৪৫ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে কমিশনার জুডিসিয়াল সেক্রেটারীকে লেখেন—"দরিদ্র খাতকদের সাহায্য দিবার যে ব্যবস্থা আছে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রিত হয় না। শুধু মাত্র এক জন কমিশনার ঐ সব খাতকের ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। যখন আদালত থেকে ঋণের টাকা দেওয়া হয় তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই আদালত থেকে ঋণদাতাকে বলা হয় যে, তিনি যেন ঋণের একটা অংশ ছেড়ে দেন।"

বিবিধ

কমিশনারের ১৮২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে, যখন কোন চাকর তার প্রভুর কাজের জন্য অন্য এক জন চাকরের ব্যবস্থা না করেই চলে যেতো এবং তার পর মাইনের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হোত, তখন প্রভুর অসুবিধা ঘটাবার অপরাধে ঐ চাকরের প্রাপ্য মাহিনা থেকে আদালত আধ মাস বা এক মাসের মাহিনা কেটে নিতেন।

চাকরের জন্য কোন জিনিষ হারালে বা চাকরের অসাবধানতার জন্য কিছু জিনিষ-পত্রের ক্ষতি হইলে তার জন্য সেই চাকরের প্রাপ্য মাইনে কাটার রেওয়াজও তখন আদালতে প্রচলিত ছিল।

১৮৫০ সালের ১১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রথম কোন মামলা ইংরাজি ভাষাতে দায়ের করা হলে তাকে বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত করা হোত এবং মামলা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হলে তখন আবার তাকে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করা হোত। অন্তর্বর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ মামলাটি ভালো ভাবে রূপ পরিগ্রহ করার সময় শুধু মাত্র তা অফিসের আমলাদের তত্ত্বাবধানেই অগ্রসর হোত এবং তখন বাদী ও বিবাদী পক্ষের কাছে তার পরিচয় দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হোত। আদালতের মুহুরী মিঃ জকিং বিচারকদের জানান যে, সমস্ত মামলা যেন ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে চলে।

১৮৫৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে বিচারক মিঃ ওয়েলি, মিঃ ব্রিৎসেক এবং মিঃ আর দত্ত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

উপসংহার : প্রেসিডেন্সি স্মল কজ কোর্ট অ্যাক্ট এবং সংশোধন প্রয়োজন

১৮৮২ সালের প্রেসিডেন্সি স্মল কজ কোর্ট অ্যাক্ট-এর সংশোধন বহু পূর্ব্বেই হওয়া প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সামাজিক অর্থ নৈতিক ও ব্যবসায়িক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় এবং ভারতীয় বিচার-পদ্ধতির মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে—এই ভাবেই এই আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিচারকদের মতামত উদ্ধৃত করা চলে—

"প্রেসিডেন্সি স্মল কজ কোর্ট অ্যাক্ট অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে রচিত আইনের নিদর্শন" (মিঃ সি ও রেমফ্রে, বি এ, এল এল বি (ক্যান্টাব), বার-এট-ল, প্রধান বিচারক, কলিকাতার স্মল কজ কোর্ট) ইংলণ্ডের কাউন্টি কোর্টের আইন অনুকরণে রচিত বলিয়া প্রেসিডেন্সি স্মল কজ কোর্টের আইন খানিকটা পুরাকালীন নিদর্শনের সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর এই আইন ভারতের অবশিষ্টাংশের বিচার-পদ্ধতির সঙ্গে খাপও খায় না। এমন সমস্ত বিষয় এখানে আলোচিত হয়, যেগুলি এখানকার লোকদের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী ঠেকে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সমস্ত প্রসঙ্গও আদালতে আলোচিত হয় যেগুলি ইংলণ্ডের অতীত ইতিহাসের সামগ্রী বলে বিবেচিত হচ্ছে।"

(স্যার মাথুস্বামী আয়ার, অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি, মাদ্রাজ হাই-কোর্ট; মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি স্মল কজ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক)

ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কি, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবল মাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কি, দেশের মূল মর্ম্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ় ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কি করিয়া?

—রবীন্দ্রনাথ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

—শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত

বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণ

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

হিংসায় উন্মত্ত ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে আজ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্যোগ-আয়োজন অপেক্ষা শান্তি-স্থাপন ও সর্ব্বত্র পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তাই বেশী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

চারি দিকেই মানুষের সমাজের আজ যে অবস্থা দেখা যাইতেছে ও মানুষের মনে যে প্রকার তীব্র হিংসা ও লোভের বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বোঝা যাইতেছে তাহাতে নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর আর নাই। এই সকল ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে মুক্তির উপায় আবার মানুষকেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল, নতুবা বিরাট ধ্বংসস্তূপের চাপে পড়িয়া সকলকেই পিষ্ট হইতে হইবে।

একটি দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গ ও কোনো উন্নত আদর্শ প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান যদি প্রথমে অধঃ-পতিত মনুষ্যত্বের পুনঃ উদ্বোধন করিতে এবং মানুষের সমাজ-জীবনকে বাধ্যতামূলক ভাবে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করিয়া মানুষের জীবনধারায় নিয়ম-শৃঙ্খলাকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যথোচিত সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই সত্বর চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সেই সুন্দর ও মহান্ প্রচেষ্টার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে, স্বেচ্ছায় বহু দেশ তাঁহাদের অনুসরণ করিবে এবং কালের চাকা নিশ্চয় ঘুরিয়া যাইবে আবার সেই দিকে, যেদিকে চাহিয়া দেখিলে "রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা" আর কাহারও কল্পনার বস্তু বলিয়া মনে হইবে না, বাস্তবে তাহার সূচনা দেখিয়া মানুষের অন্তরে নূতন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইবে। সেই উৎসাহের প্রবল বন্যায় দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনার স্তূপ স্রোতের মুখে তৃণের মতই এক দিন ভাসিয়া যাইবে, ইহাই নূতন দিনের নূতন আশা।

মানুষের সমাজ

মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা সমস্ত ইতর প্রাণী হইতে পৃথক্ এবং উন্নত, সুতরাং অন্যান্য জীব-জীবনের পক্ষে যা যথেষ্ট মানুষের পক্ষে তা একেবারেই যথেষ্ট নহে, আহার নিদ্রা মৈথুন ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ এইগুলির সাদৃশ্য থাকিলেও, ত্যাগ, প্রেম, বিচার, বিবেচনা এবং মোক্ষাভিলাষ এইগুলি মানুষের পক্ষে একান্ত নিজস্ব সম্পদ। যে সকল মানুষের চিন্তাধারায় ও ব্যবহারে এই সকল সম্পদের কিছু মাত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। এই সকল বিশেষত্ব বা গুণাবলী হইতে যাহারা স্বেচ্ছায় বা অন্যের প্ররোচনায় আপনাদের বঞ্চিত করে তাহারাই চিরদিন মানুষের গৌরবকে ম্লান করিতে ও মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা-প্রণালীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে সাহায্য করিয়া থাকে, এক কথায় তাহারাই সৃষ্টিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যায়। কঠোর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া এবং প্রয়োজন মত আইন প্রণয়ন করিয়া ঐ প্রকার অমানুষিক মনোভাব ও দুষ্কার্য্যাদি দমনের জন্য সত্বর চেষ্টা করা প্রয়োজন। মানুষের সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যতগুলি শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে নরনারীর বিবাহ-বন্ধন একটি বিশেষ এবং প্রাথমিক নিয়ম। সমাজে বিবাহ-বন্ধন বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে যে প্রাথমিক ইতিহাস প্রচলিত আছে তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন।

ইতর প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট প্রাণীর প্রথম পরিচয়-পত্র অর্থাৎ "অভিজ্ঞান" এই বিবাহ-বিধি। অবশ্য কালের পরিবর্ত্তনের সহিত বিবাহরূপ সামাজিক বিধানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া বিচিত্র নহে বরং তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যায়, কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য ও পবিত্রতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। সৃষ্টির প্রেরণার মূলে যে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে ও ঐশ্বরিক লীলার যে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রমাণ-প্রয়োগাদি সহকারে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতেও মানুষের সমাজে বিবাহ-রূপ পবিত্র বন্ধন দ্বারা নরনারীর মিলনের সার্থকতাকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং সৃষ্টি-প্রবাহকে অব্যাহত রাখিবার উপায়স্বরূপ ঐ প্রকার মিলনের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ মূল্য দেওয়া হইয়াছে। হয়তো সেই জন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা ও সর্ব্বোচ্চ আদর্শরূপ সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাস ধর্ম্মকে পরিণত মনুষ্যত্বসম্পন্ন

মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া বোঝানো হইয়াছে এবং গৃহীর ধর্ম্মকে অধিকাংশের পালনীয় বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যভিচার অর্থাৎ অবৈধ মিলন সমাজ-জীবনের কণ্টকস্বরূপ। কোনো যুক্তির দ্বারাই সমাজে উহার স্থান হওয়া উচিত নহে, যাহারা সমাজ-জীবনের ভিত্তিমূল ও পবিত্রতা স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করে অথবা কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া সামাজিক নিয়ম বিধি-ব্যবস্থাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, অবশ্যই তাহারা সামাজিক দণ্ডলাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং যথানিয়মে অপরাধের তারতম্য অনুসারে তাহাদের শাস্তি দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কর্তৃপক্ষের সেইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে হয়। ঐ সকল অপরাধীদের প্রয়োজন মত "একঘরে" করা বা সতর্ক করা সত্ত্বেও সৎ হইবার চেষ্টা না থাকিলে অসামাজিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সমাজ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য করা ভাল মনে হয়। বহু দিন যাবৎ বিদেশী শাসকবর্গের অধীনে থাকার ফলে পূর্ব্বে যাহারা পবিত্র সমাজ-ব্যবস্থাদির প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত এবং আস্থাশীল ছিল তাহারাও আজ সেই মানসিক দৃঢ়তা ও স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিতেছে; সে জন্য এ দেশেও বর্ত্তমান সময়ে চারি দিকে অপবিত্রতা দুর্নীতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব ও মেরুদণ্ড-হীন সামাজিক ও সাংসারিক বিচার-ব্যবস্থার প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, আজিকার জগৎ "মহাজন বাণী"র প্রতি নির্ম্মম উপেক্ষা প্রদর্শন করার ফলেই এমনি ভাবে দিনের পর দিন অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে। "কাম-কাঞ্চনে" অত্যধিক আসক্তিরূপ আলেয়ার আলোকের আকর্ষণে মানুষরূপ পতঙ্গ আজ নিজের কর্ম্মফলে নিজের ধ্বংস নিয়তই ডাকিয়া আনিতেছে। "ঈশ্বর সত্য জগৎ মিথ্যা" "কাম-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ" ইহা ভিন্ন মোক্ষলাভের আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু আজ আমরা কি দেখিতেছি? চারি দিকেই দেখিতেছি, "যেন তেন প্রকারেণ" অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা, তা সে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবে হইলেও বহু অধিক ব্যক্তির চিত্তে পর্য্যন্ত তাহাতে একটুকু দ্বিধা জাগিতে দেখা যায় না। আর দেখিতেছি, সমাজে সংসারে ধনীর আদর, ধনের প্রকোপ। যাহাদের টাকা আছে তাহারা অবাধে সমাজের বুকের উপর দিয়াই স্বচ্ছন্দে ধ্বংসবীজ বপন করিতেছে, ছোট-বড় বহুর চিত্তে অন্যায় কাজ করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, ব্যভিচার এবং মানসিক অবৈধ আসক্তি বন্ধ করিবার জন্য গভীর আগ্রহ আজ কয় জনের মধ্যে তাহা বোধ হয় গণনা করিয়া দেখা শক্ত নহে। কিন্তু তথাপি সংসারের হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

দৈহিক অপরাধ—যেমন অবৈধ মিলন ও প্রকাশ্য চৌর্য্যবৃত্তি ইত্যাদির তবু কিছু প্রায়শ্চিত্ত, অনুশোচনা ও দণ্ডের ভয় এখনো আছে, কিন্তু নীতিশিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের অভাবে মানসিক অবনতি বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক জন সৎ-লোক ব্যতীত চিন্তাধারার পবিত্রতা রক্ষা করিতে, সাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে বড় একটা আর কাহাকেও দেখা যায় না। এরূপ অবস্থার পরিণতি কখনই সুন্দর শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

অবৈধ মানসিক আসক্তি, যাহার তৃপ্তি বা অতৃপ্তি কোনোটাই ব্যক্তি-জীবনের অথবা সমাজ-জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ নহে এবং যাহার অপ্রকাশিত রূপ অশান্তির সৃষ্টিকারক ও বিরক্তি-পূর্ণ, তাহা কখনই মানুষের জীবনকে উন্নত ও শান্তিময় করিয়া তুলিতে পারে না। সংসারে শান্তিরক্ষা করা তো দূরের কথা, মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিগণই সাধারণতঃ চারি দিকে গোলযোগ বাধাইয়া তুলিতে সাহায্য করে ও গৃহ-সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। এই প্রকার মানসিক অবনতির কুফল উত্তমরূপে জনগণকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

সমাজের কল্যাণের জন্য আশু কতগুলি নিয়ম-ব্যবস্থাদির রদ-বদল করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় এবং তাহার ন্যায়সঙ্গত উপায়ও অবশ্যই আছে। মানুষের সমাজকে উন্নত ও দুর্নীতি-মুক্ত করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করাই আজ সর্ব্ব দেশের হিতৈষিগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, বর্ত্তমান স্বার্থকোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে "একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর"-রূপে যদি দিকে দিকে ভারতের মন্ত্রবাণী প্রচারিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ আশীর্ব্বাদে সৃষ্টিরক্ষা-কার্য্যে ভারত তাঁহার কল্যাণ-হস্তরূপে কার্য্য করিয়া সমস্ত জগৎকে অবশ্যই বাঁচিবার ও বাঁচিতে দিবার পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে।

মনুষ্যত্বের পুনঃ উদ্বোধন

সুসভ্য গৌরবান্বিত মানব-সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্বর প্রয়োজন—লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বের পুনঃ উদ্বোধন। ধনী-নির্ধন, জাতি-ধর্ম্ম-নরনারীনির্বিশেষে সর্ব্ব শ্রেণীর সকল অবস্থার মানুষকেই যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য হইতে হইবে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য ন্যায় ও সত্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় সরকারের শুভ প্রচেষ্টা ও তাহার পশ্চাতে গণশক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন এ জন্য একান্ত প্রয়োজন। এমনি ভাবে সহযোগিতা ও কর্ম্ম-তৎপরতার দ্বারা ভারত নিশ্চয়ই জগতে মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিতে ও প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার করিতে অগ্রণী হইতে পারিবে। বিশেষ বিশেষ স্থলে অভিযোগ প্রতিবাদ ইত্যাদি করিবার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত, তাহা ভিন্ন দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া সমাজের জীর্ণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আজিকার মানুষকে প্রথমেই স্বার্থদ্বেষাদি ত্যাগ করিতে এবং একতা রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো সহজসাধ্য হইবে না। "সর্ব্বোদয় সমাজ" বা অপর কোন যথার্থ দেশহিতৈষী ও মানব-কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের মিলিত প্রতিষ্ঠান, কার্য্যারম্ভ করিলে অবশ্যই আদর্শবাদী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু-সন্ন্যাসী, সেবাব্রতী, উৎসাহী, গৃহী কর্ম্মী প্রভৃতির সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভ করিবেন। প্রথমে যদি "গ্রাম্য পঞ্চায়েতের" ধরণে গ্রামে গ্রামে ও সহরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলন-সভার বন্দোবস্ত করা হয় এবং সেখানে সাধারণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণের ব্যবস্থা, প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা এবং বাধ্যতামূলক ভাবে শিষ্টাচার ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং দেশের শাসনকার্য্যাদি যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের সহিত যদি ঐ সকল হিতকারী সমিতির কেন্দ্রের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলে অবশ্যই দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সর্ব্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। স্থলবিশেষে উহা

বিনামূল্যে বিতরণ-ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক, নতুবা সকলের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ না হইতে পারে।

স্কুলের শিক্ষা অন্তে অর্থাৎ একটি পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর অর্থ উপার্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা সীমাবদ্ধ করা ভাল মনে হয়, অবশ্য কেহ কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে শিক্ষালাভের যাহাতে সুযোগ-সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়। বাল্যকাল হইতেই যাহাতে ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরবিশ্বাসী ও স্বধর্মে আস্থাশীল হইতে শিক্ষা পায় এবং স্বধর্ম্ম ও স্বদেশকে আপন আপন মাতা-পিতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে শেখে, ধর্ম্মপিতা ও দেশমাতা এই ভাবে ভাবিত হইতে পারিলেও গভীর ঈশ্বরানুরক্তির দ্বারা বাল্যকাল হইতে অহঙ্কার দমন করিতে পারিলে সাধারণতঃ প্রত্যেকের ব্যক্তি-জীবন নিঃসন্দেহে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলে এবং তাহাতে দেশের কল্যাণ-পথ প্রশস্ততর হয় সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। উপরি-উক্ত ভাবে শিশুদের জীবন গঠনের সুবিধার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন ও নির্ব্বাচন করা উচিত বলিয়া মনে করি।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হইতেই নারী ও পুরুষের শিক্ষার ধারাকে আপনাপন জীবনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, নারীকে তাহার নারীত্ব মাতৃত্ব এবং সতীধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তোলা ও তাহার কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব-বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সাহায্য করাই হইল নারীশিক্ষার সার্থকতা এবং পুরুষকে তাহার জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, তাহার সমাজ, সংসার, দেশ ও জাতির প্রতি যে গুরুতর দায়িত্ব আছে তাহা যথাযথ ভাবে পালন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং শারীরিক ও মানসিক সবলতা লাভ করিয়া সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করা ইত্যাদি যাহা পুরুষগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই হইল তাহাদের উপযোগী শিক্ষা। সকলের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূল কথা—জ্ঞানার্জ্জন ও নৈতিক শক্তি-লাভ। এই দিক্ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সকলেরই এক প্রকার ইহা মনে করা যায়। ব্যবহারিক জগতে নরনারীর জীবনের সাধারণ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে শিক্ষা করাই শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে উত্তম, এ কথা সকলেরই ভাবিয়া বুঝিয়া চলা উচিত।

সমাজ-জীবনকে দুর্নীতি-মুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা যত শীঘ্র আরম্ভ করা যায় ততই ভাল ; যেমন—থিয়েটার-বায়স্কোপাদি আমোদ-প্রমোদের স্থান ও সময় বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা, অসৎ চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের যথাসম্ভব শাসন করা ও সুশিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা, তাহাতে ফল না হইলে তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে সমাজ হইতে দূরে থাকার জন্য নিয়ম-নির্দ্দেশাদি পালনে অভ্যস্ত করা। সর্ব্বত্রই একটি সুনীতির প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেই হইবে, নতুবা "নবীন ভারত" গড়িয়া তোলা অসম্ভব।

চারি দিকে যে অর্থলোভ স্বার্থপরতা ও নৈতিক শক্তির একান্ত অভাব দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমাজকে যথাসম্ভব সত্বর মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য এখনি সব লোক সত্যনিষ্ঠ মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায় না ; কিন্তু আদর্শবাদী ন্যায়নিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ আন্তরিক চেষ্টা ও তৎপরতা প্রকাশ করিলে অবশ্যই এখনি পরি[illegible] সূচনা করিতে পারিবেন। আমরা জানি,এমন মানুষ যাঁহারা— আজিকার রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের ও বিভিন্ন হিতকর প্রতিষ্ঠানা[illegible] কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে, সুতরাং আশার যে আলো দেখা দিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আজিকার দুঃখ আগামী কালের সম্পদে পরিণত হইবে।

চারি দিকেই নূতন নির্ব্বাচনে সৎচরিত্রতার দিকে, সত্যনিষ্ঠার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া প্রার্থী নির্ব্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন। [illegible] বড় পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াও যাঁহারা যোগ্য মানুষের উপযুক্ত [illegible] করিতে পারেন না, সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বত্রই প্রথমে তাঁহাদের যথাযত ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং যেখানে তাহাতে কোনো ফল হয় না, সেখানে বিভিন্ন পদাদি হইতে সরাইয়া দেওয়া উচিত মনে হয়। বিভিন্ন দ্রব্যাদির ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও উপযুক্ত স[illegible] তার দ্বারা সুফল লাভ করা সম্ভব না হইলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে হয়। আজিকার দিনে দেশবাসী একান্ত আ[illegible] যাঁহাদের দিকে সুবিচার ও সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পথে "অগ্রগামি[illegible] ভাবিয়া চাহিয়া আছে, আমার এই আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া রচি[illegible] প্রস্তাবটি তাঁহাদের নিকটেই আবেদনরূপে প্রেরিত হইতেছে।

যাঁহারা প্রকৃত ভারত হিতৈষী এবং গঠনমূলক কার্য্যে দৃঢ়বিশ্বা[illegible] আজ সর্ব্ব ক্ষেত্রে তাঁহাদের কল্যাণ-হস্তের সুস্পষ্ট ছাপ পড়া এক[illegible] প্রয়োজন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার স[illegible] এবং সমস্ত বিশিষ্ট মর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে সৎকার্য্য সাহ[illegible] জন্যও নিষ্ঠার সহিত আপনাপন কর্ত্তব্য পালনের জন্য জনগণকে [illegible] সাহিত করিবার জন্য নানা ভাবে "সততার পুরস্কার" দিবার ব্যবস্থা [illegible] একটি সুন্দর উপায়। এত দিন অর্থাৎ বহু দিন হইতেই অনেক [illegible] সাধুতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রতি বিশেষ সম্মান বা উৎসাহ দেখা[illegible] হইত না, বরং স্বার্থপ্রবণ ও কূটকৌশলী ব্যক্তিদেরই নানা স্থলে অ[illegible] কতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত, ফলে বহু লোকই সুবিধাবাদী[illegible] দৃষ্টান্ত ও কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইত।

স্বাধীন ভারত আজ কালের গতি পরিবর্ত্তনের শুভ লক্ষণ প্রকা[illegible] যে সুবিধা ও অধিকার লাভ করিয়াছে, সম্পূর্ণ ভাবে তাহার সুযো[illegible] গ্রহণ করিয়া সারা জগতে ভারতীয় ভাবধারার অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ[illegible] গৌরব প্রদর্শন করিতে এবং প্রকৃত মানবধর্ম্ম পালন করিবার প[illegible] প্রদর্শন করিয়া নীতি-শাস্ত্রের জয়ঘোষণা করিতে সক্ষম হউক, ইহাই আজ বিশ্বনিয়ন্তার অভয় চরণে আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

দু'খানা রুটী

(চন্দ্রকিরণ সৌনরেক্সা)

[শ্রীমতী চন্দ্রকিরণ সৌনরেক্সা হিন্দী সাহিত্যের খ্যাতনা[illegible] লেখিকা। "আদমখোর" নামক গল্প-পুস্তকের জন্য হিন্দী-সাহি[illegible] সম্মেলনে এঁকে সাকসেরিয়া পারিতোষিক দিয়াছেন। এই গল্প উ[illegible] পুস্তকের অন্তর্ভূত।]

উমা মাথায় মাত্র এক ঘটি জল ঢেলেছে কি অমনি বা[illegible] থেকে তার ছোট ননদ শ্যামা ডাক দিল—"বৌদি, ও বৌ[illegible] মুন্না হি-সি করে দিয়েছে। শীগ্‌গির এস।"

"হায় ভগবান!" ক্লান্তি ও বিরক্তির স্বর উমার মুখ দিয়ে বার হল। তার পর সাবান-মাখা হাত দিয়েই কলটা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুম থেকেই বলল—"ঠাকুরঝি, আমার মাথায় সাবান দেওয়া রয়েছে—তুমিই···ধুয়ে দাও।"

"বেশ বলেছ,"—শ্যামা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল—"না বাপু, নাওয়ানো খাওয়ানো সব করতে পারি, কিন্তু এ সব নোংরা ধোওয়ানো হবে না আমাকে দিয়ে···।"

"তবে থাক্, আমিই এসে ধুয়ে দেব," কান্নার স্বরে উমা বলল আর তাড়াতাড়ি করে জল ঢেলে মাথার সাবান ধুয়ে ফেলতে লাগল। বাইরে সেই অবস্থাতেই মুন্না গড়াগড়ি করে চীৎকার করতে লাগল—"ওয়া—ওয়া!"

"ও বউমা, কানে তেল দিয়ে কি ঘুমিয়ে রয়েছ বাছা?" বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশরত শাশুড়ী গর্জন করে বলল—"বাবা রে বাবা? ছেলেটা কেঁদে-কেঁদে সারা হল আর মহারাণী তার প্রসাধনে ব্যস্ত! দেখ ত এসে, একেবারে তোষক বিছানা সতরঞ্চি সব-কিছু নোংরা করে ফেলেছে।" তার পরেই একটুও না থেমেই ডাকতে লাগল—"বউমা, ও বউমা!"

"আমি বাথরুমে রয়েছি।" গা না মুছেই তাড়াতাড়ি কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমের ভেতর থেকেই উমা উত্তর দিল।

"বেগম স্নান করছেন!" শ্যামা মায়ের ডাকের উত্তরে বলল—"হুকুম দিয়েছেন, আমার আসবার আগেই ছেলেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে দাও।"

"ও তো!" শাশুড়ী চমকে গিয়ে বলল—"ওর বাপের চাকর বসে আছে কি না যে নাইয়ে-ধুইয়ে দেবে? ও বউমা, তোমার স্নান কি এখনও সারা হল না?"

"আসছি মা"—জামা না পরেই কাপড় গায়ে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বার হয়েই উমা রান্না-ঘরের দিকে গেল। তরকারী চড়িয়ে রেখেছিল, সেগুলি একবার দেখা দরকার।

"প্রথমে ওকে দেখ।" শাশুড়ী নাতীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল। উমা ফিরে এল। ক্রন্দনরত শিশুকে কলের নীচে নিয়ে এল। কলটা খুলে দিয়ে ছেলেকে স্নান করাতে করাতে উমা ডেকে বলল—"ঠাকুরঝি, তরকারীটা একটু দেখ, পুড়ে না যায়।"

শ্যামা শুনতে পেয়েও না শুনবার ভাণ করে গল্পের বই পড়তে লাগল। উমা মুন্নাকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে ফ্রক পরাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ই তরকারী-পোড়ার তীব্র গন্ধ নাকে গিয়ে জানিয়ে দিল যে তরকারী পুড়ে যাচ্ছে। ফ্রকটা মুন্নার গলায় দিয়েই সে রান্না-ঘরের দিকে দৌড়াল। আঁচল দিয়ে ডেকচি নামিয়ে রেখে সে দুধের কড়াই উনুনে চাপিয়ে দিল। তার পর এসে মুন্নাকে জামা পরাল।

উমা মুন্নার নোংরা কাপড়গুলি জড়ো করে এক কোণে রেখে দিল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, নয়টার মধ্যে তাকে সমস্ত রান্না সারতে হবে। কাপড়গুলি ধোবার জন্য দু'টি ঘণ্টা সময় চাই। এখনও উপরের ঘর আর ছাদ ঝাঁট দিতে হবে। আজকে উমা একটু দেরী করে উঠেছে, অর্থাৎ চারটের জায়গায় সাড়ে চারটার সময় সে উঠেছে। তাই এত দেরী করে উঠবার ফলে এই হয়েছে।

"বিবি, বিবি!" দুই বৎসরের মুন্না মায়ের বস্ত্রাঞ্চল টেনে বলল—"দাদারা, এসেছে—কত জিনিষ এনেছে।"

"ভাগ পাজী!" তাকে এক ধমক দিয়ে মুন্নাকে কোলে নিয়ে উমা রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

মশলার দু'-একটা কৌটো মুন্নার সম্মুখে খেলতে দিয়ে সে আটা মাখতে লাগল।

উনুনে তাওয়া চড়িয়েছে কি অমনি বাইরে থেকে তার ছোট দেবর এসে বলল—"বৌদি, বাবা বলেছেন আজ তাঁর পেটটা একটু খারাপ, তাই রুটী খাবেন না, একটু দালিয়া (গমের সুজি) বানিয়ে দিও।"

"আচ্ছা" বলে উমা প্রথম রুটীখানা তাওয়ায় দিল। ওনার জন্য কিছু রুটী সেঁকে তাওয়া নামিয়ে রাখব, তার পর দালিয়া তৈরী করে বাকী রুটীটা শেষে করব। উমা ভেবে রাখল।

"বিবি, ক্ষিদে পেয়েছে, দুধ দাও।" তক্ষুনি মুন্না এসে তার ঘাড়ে পড়ল।

"একটু সবুর কর, দিচ্ছি"—উমা উনুনে ফুঁ দিতে দিতে বলল। কাঠগুলি ভিজে থাকবার দরুণ জ্বলছিল না। ধোঁয়ায় তার চোখ অন্ধের মত হয়ে যাচ্ছিল।

"এক্ষুনি দাও—শীগ্‌গির দাও।" মুন্না চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। উমার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করছিল। আটা-মাখা হাত দিয়ে মুন্নার গালে এক চড় লাগিয়ে বলল—"চুপ পাজী!"

বাসায় যেন ঝড় উঠল। মুন্না উঠোনে আছড়ে পড়ল। মাটিতে শুয়ে সে ডাকতে লাগল—"মা! মা! বিবি—বিবি মেরেছে···!"

মুন্নার ঠাকুমা তখন মালা জপ করছিলেন, নাতনীর কান্না শুনে সেখানে বসে বসেই চীৎকার করতে লাগলেন—"বাবা রে বাবা, ও ত মা নয়—জল্লাদ! মেয়েটা একটু কাছে গেছে কি না গেছে, একটু সময়ও কি ভাল ব্যবহার করতে পারে না ছেলে-মেয়ের সঙ্গে। দু'বেলা ত দু'খানা রুটী সেঁকতে হয় তাতেই বেচারা একেবারে অস্থির!"

উমা বিষের মত কথাগুলি হজম করে নিল। রাত্রি চারটের সময় সে উঠেছে, আর এখন বেজেছে সাড়ে নয়টা। তখন থেকে সে এক পায়ের উপরেই আছে। বাড়ীর সব বিছানা উঠোতে হবে, ঘর ঝাঁট দিতে হবে, সকলের সরবৎ তৈরী করা, ছেলে-মেয়েকে স্নান করানো, খাইয়ে দেওয়া, রান্না করা···আর কত বলব? সকাল থেকে চরকীর মত ঘুরছে সে। এখনও অনেক কাপড় ধোওয়া বাকী। আচারের জন্য মশলা কুটতে হবে। গরম কাপড়-জামাগুলো রৌদ্রে দিতে হবে। আটা ফুরিয়ে এসেছে, গমও বাছতে হবে। এ সমস্ত কাজগুলি ছেলেকে কোলে করে, কখনও ঘুম পাড়িয়ে কখনও বা কাছে বসিয়ে রেখে করতে হবে। মধ্যে মধ্যে আবার কাউকে পান দেওয়া, জল দেওয়া, মাথায় তেল দিয়ে দিতে হবে। সন্ধ্যার সময় আবার সবাইর জন্য রান্না করতে হবে, বিছানা বিছাতে হবে।

"আমার কোট প্যান্ট বার করে দাও"—রামেশ্বর হাঁক দিয়ে বলল। "আর বাথরুমে তেল সাবান তোয়ালে রেখে দাও।"

তাওয়ার রুটীটা তাড়াতাড়ি করে সেঁকে উমা উঠল। মুন্না কাঁদতে লাগল। উমা নিরুপায় হয়ে মুন্নাকে কোলে নিয়েই তেল সাবান দিতে গেল। সাবান-জল রেখে সে উপরে উঠে গেল, তার পর বাক্স

থেকে সার্ট প্যান্ট বার করে খাটের উপর রেখে দিল ; তার পর রান্না-ঘরে এসে আবার রুটী সেঁকতে লাগল। মুন্না কিছুতেই শান্ত হয়ে বসবে না, উমা হার মেনে ননদকে ডাক দিল—"ঠাকুরঝি, একবার এসে ওকে নিয়ে যাও। রুটী করতে দিচ্ছে না।"

শ্যামা গর্-গর করতে করতে এসে মুন্নাকে নিয়ে গেল। যেতে-যেতে বলল—"এর চেয়ে ত কাজ করাই ভাল। এক জন চাকর এর ছেলেকে রাখবে তবে মহারাণী দু'খানা রুটী করবেন।"

"তাহ'লে ঠাকুরঝি, রুটী দু'খানা তুমিই সেঁকে নাও। আমি ওকে নিচ্ছি।" উমা একটু রেগে গিয়ে বলল।

দুখানা রু'টীর জন্য মাখা আটার পরিমাণ দেখে শ্যামা মুখ-ভঙ্গী করে জবাব দিল—"না বাপু, আমি কারও করা কাজের বাহাদুরি নিতে চাই নে। তুমিই যখন সব করেছ, তখন আমি দু'খানা রুটী সেঁকে নাম করতে চাই নে।" এই বলে সে মুন্নাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

"সার্টে বোতাম ঠিক নেই—প্যান্টে বক্‌লস নেই!" রামেশ্বর উপর থেকে গন-গন করতে লাগল—"তোমাকে দিয়ে কি এটুকুও হবে না যে ধোপা-বাড়ী থেকে কাপড় এলেই সেগুলি দেখে ঠিক-ঠাক করে রাখবে?"

উনুন থেকে তাওয়াটা নীচে নামিয়ে রেখে উমা সার্টটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটা বোতাম লাগিয়ে দ্বিতীয়টার সূঁচ লাগিয়েছে কি অমনি বাইরে থেকে শাশুড়ী বলল—"হরি হরি! উনুন খালি জ্বলে যাচ্ছে আর তিনি না জানি কোথায় ঘুমিয়ে আছেন!"

তাড়াতাড়িতে উমার আঙুলে সূঁচ ফুটে গেল। 'ইস্!' বলে উমা সূঁচটা টেনে বার করল। দু'ফোঁটা রক্ত কাপড়ের উপর পড়ল। কোন রকমে বোতাম লাগিয়ে বক্‌লস হাতে নিয়ে সে বাইরে এল। চারপায়ার উপর সব-কিছু রেখে আবার-সে রুটী সেঁকতে লাগল। শাশুড়ী বলছিল—"তাড়াতাড়ি রুটী করে নাও। আমি গম ঝেড়ে রাখছি, বেছে পরিষ্কার করতে হবে।"

* * *

পৌণে এগারোটার সময় রামেশ্বর সিনেমা দেখে বাসায় এল। উমা এসে দরজা খুলে দিল। তার পর সে এই বলে উপরে চলে গেল—"রান্না-ঘরে জালের আলমারীর ভেতর দুধ আছে, খেয়ে নিও। ওখানেই কাপড়ে জড়ানো পান সাজা রয়েছে।"

রামেশ্বর রান্না ঘরে গিয়ে দুধ খেয়ে মুখ ধুয়ে নিয়ে পানের খিলিটা মুখে পুরে উপরে চলে গেল। ঘরে এসে দেখল, মুন্নী তার চারপায়াতে আর মুন্না উমার চারপায়াতে ঘুমিয়ে আছে। আর উমা রামেশ্বরের বাক্স খুলে তার সামনে বসে কি যেন সেলাই করছে।

"এত রাত্রেও তোমার খুটিনাটি কাজ সারা হল না!" নিজের খাটের উপর বসে রামেশ্বর বলল—"কি করছ?"

"এই সার্টটায় একটু বোতাম লাগাচ্ছি—" একটা ছেঁড়া ইজার সেলাই করতে করতে উমা মৃদু স্বরে জবাব দিল।

"এর জন্য দিনে কি সময় পাওয়া যাবে না? কি কর সমস্ত দিন? আগে ত বাসন মাজতে হত বলে কান্না ছিল, এখন ত ঝি রয়েছে।" রামেশ্বর মেজাজ চড়িয়ে বলল। উমা চুপ করে রইল।

"রেখে দাও। এগুলি কাল কর। এখন ঘুমোও। স্বামীর অধিকারে রামেশ্বর বলল।

উমা নীরবে সব গুছিয়ে বাক্সে রেখে দিল। ঘুমে তার চোখ বুজে আসছে। হাল্কা পায়ে সে তার চারপায়ার দিকে অগ্রসর হল।

"এদিকে এস!" রামেশ্বর আহ্বান করল।

* * * *

উমা আবার এক বিপদে পড়ল। অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে সে তৃতীয় সন্তানের জননী হতে চলছে। মুন্নার বয়স এক বৎসর মাত্র। ভাল করে এখনও হাঁটা শেখেনি। মুন্নীও বেশি 'কসে' সাড়ে তিন বৎসরের হবে। এর মধ্যে আবার তৃতীয় প্রাণী আসছে। সে ত কখনও তার আগমন কামনা করেনি। সে ত এদের সামলাতেই অক্ষম। তার উপরে তাকে কি করে পালবে? আজকাল আবার মুন্না অসুখে ভুগছে। সমস্ত দিন শাশুড়ীই তাকে রাখে। উমা ত দুখানা রুটী করে আর সময়ই পায় না। হ্যাঁ, তবে রাত্রিটা তাকেই জাগতে হয়। সে জাগবে না ত কে জাগবে? সে জেগে থাকে ওষুধ দেয়, দুধ খাওয়ায়, আর যাতে রামেশ্বরের ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে জন্য সারা রাত মুন্নাকে কোলে নিয়ে পায়চারি করে। রুগ্ন শিশু সামান্য কারণে কেঁদে ওঠে। উমার শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হল না। তিন মাস থেকে তার একটু একটু কাসি হচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু'-চার বার জ্বরও হয়েছে। আজ মুন্নার শরীরটা বেশি খারাপ হয়েছিল। ডাক্তার দেখতে এসেছিলেন। মুন্নাকে দেখে যখন বাইরে এলেন তখন রামেশ্বরকে বললেন—"মিঃ বর্মা, আপনার ওয়াইফ বড় দুর্ব্বল। ডেলিভেরীর সময় কাছিয়ে আসছে। উপযুক্ত খাদ্য আর বিশ্রাম প্রয়োজন। হুপিং কাসি হয়েছে, শীতকাল। ঠাণ্ডা থেকে সাবধানে রাখবেন।

* * * *

সেদিন ত কেটে গেল, যার কল্পনা এবং প্রতীক্ষা দু'টোই উমার দেহের অণু-অণুতে শিহরণ জাগাত, যার অনুভব সে ইতিপূর্ব্বে দু'বার করেছে প্রসবের সেই কালরাত্রি আবার এল। বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ঠোঁট চেপে বেদনা সহ্য করতে করতে উমা তেইশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। কিন্তু প্রসব হল না। উমার প্রাণ তার চোখের কাছে এসে আটকে আছে। হায় ঈশ্বর, কোন পাপের দণ্ড সে ভুগছে···!

'রামু!' শাশুড়ী একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—"যা, লেডি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। দাই বলছে, ও সামলাতে পারবে না।" তার পর গর-গর করে বলল—"আজকালকার সব কিছুই অদ্ভুত। সন্তানও 'কলিযুগি' হয়ে গেছে। লেডি ডাক্তার ছাড়া পৃথিবীতে আসতেই চায় না। আজকালকার কলিযুগের মেয়েরাও এমনি হয়েছে যে এক দিনের ব্যথাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়!"

ঠিক ছয় ঘণ্টা পরে মূর্চ্ছিতা উমা একটি মৃত সন্তান প্রসব করল।

* * * *

দশ-বারো দিনের মধ্যেই উমা ওঠা-বসার যোগ্য হল। উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেতেই আবার তার ঘাড়ে দু'বেলা রুটী করবার ভার পড়ল। যখন এক বেলায় সে চারখানা রুটী খেতে পারে তখন দু'বেলা চারখানা রুটী করাটা কিছু বড় কাজ নয়। আর ছেলেই যখন নেই তখন এক মাস অশৌচ কেন থাকবে? সে সময়টা ত ছেলের যত্ন করবার জন্য, প্রসূতির বিশ্রামের জন্য নয়।

কম্পিত চরণে উমা আবার বাড়ীতে চরকীর মত ঘুরতে লাগল। কোন রকমে সে তার 'ডিউটি' তিন মাস সামলাল।

তার পর এক দিন সবার অলক্ষ্যে মাত্র চার দিনের জ্বরে ভুগে—চিরদিনের জন্য ছুটী নিল। উমা মারা গেল।

* * * *

'শ্যামা, সাবানটা একটু দে।' বাথরুম থেকে রামেশ্বর ডাক দিল।

"আমি মুন্নাকে নিয়ে আছি।" শ্যামা ওজর দেখিয়ে বাইরে চলে গেল।

"মা, আমার সাবান কোথায়?" রামেশ্বর চীৎকার করে উঠল।

"কি জানি বাবা, কোথায় আছে, আমি ত রুটী সেঁকছি। খুঁজে কি করে?"

"একটু উঠে দেখে দাও।"

"না বাবু, বারে-বারে উঠতে পারি না। বাতের জন্য ব্যথা করছে।" মা গন-গন্ করতে লাগল।

বিনা সাবানেই রামেশ্বর স্নান করতে গেল। গা মুছবার জন্য তোয়ালে উঠিয়েই সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কত দিন থেকে ধোওয়া হয় না কে জানে, দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। ভিজে শরীরে কাপড় পরেই সে বাইরে এল।

"মা!" রামেশ্বর রান্না-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—'তোয়ালে থেকে গন্ধ আসছে, কত দিন থেকে ধোওয়া হয় না?"

"নে; মাত্র চার দিন ত হল ধোওয়া হয়েছে।"

"চার দিন! বেশ!" রামেশ্বর বলল, "তোয়ালেটা রোজ সাবান দেওয়া উচিত।"

"তা বাবা, দেখছো ত, কারো সময় নেই। তুমিই একটু দেখে ধুয়ে নিও।"

দাঁতে দাঁত ঘষে রামেশ্বর উপরে চলে গেল।

"শ্যামা, আমার কাপড় ধোপা-বাড়ী দেওয়া হয়নি?" সে উপর থেকে চীৎকার করে বলল—"বাক্সে একটাও নেই।"

"আমি জানি না, নীচেরগুলো ত সব দিয়ে দিয়েছি।" শ্যামা গর-গর করে বলল—"সমস্ত দিন ত মুন্নাকে নিয়েই থাকি।"

রামেশ্বর খাটের নীচে ঝুঁকে দেখল। ময়লা কাপড়গুলি স্তূপাকার হয়ে আছে। এক-একটা করে সে কাপড়গুলি টেনে বার করতে লাগল। "ওঃ ভগবান!" তার মুখ দিয়ে বার হল। তার নতুন কোটটা ইঁদুরে কেটে ফেলেছে। কিন্তু রাগ করবে কার উপরে? নিজেই দুধ খেয়েই গ্লাসটা খাটের নীচে ঠেলে দিয়েছিল। সেটা বোধ হয় পড়ে গিয়েছিল। সেই দুধের লোভেই ইঁদুরে কোটটা দিয়ে ভোজন-পর্ব্ব সমাধা করেছে।

ধপ্ করে খাটের উপরে বসে সে বকতে লাগল—"আমি সারা দিন খেটে উপার্জ্জন করি আর কেউ আমার দিকে একটু নজরও দেবে না। সময় মত রুটীটাও পাওয়া যায় না। বাড়ীতে কি বা কাজ আছে? 'টন' ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজল। লাফ দিয়ে উঠে রামেশ্বর আয়না-চিরুণী খুঁজতে লাগল। চিরুণীটা দু'টুকরো হয়ে টেবিলের নীচে পড়ে আছে।

"মা, আমার চিরুণী ভেঙেছে কে?" সে গর-গর করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

"কে আবার ভাঙবে? মুন্নাই ভেঙেছে হয় ত।" মা ধোঁয়ার দরুণ চোখ ডলতে ডলতে বলল।—"এই শ্যামা মেয়েটাকে দিয়ে এটুকুও হবে না যে এক বেলার রুটীটা করবে। দু'বেলাই আমাকে উনুনের কাছে বসতে হবে।"

"মুন্না, এই মুন্না, এদিকে একবার আয় পাজী!" উঠোন দিয়ে মুন্না যাচ্ছিল, রামেশ্বর তার হাত ধরে তাকে দুই চড় কষিয়ে দিল।

"ও মাগো"—মুন্না চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

রামেশ্বর রুটী না খেয়েই অফিস চলে গেল।

মা বলছিল—"না বাপু, এত মেজাজ সহ্য করবে কে? আমি ত বেরেলিতে চিঠি লিখে দেব। মেয়ে ছোট হোক আর বড়ই হোক, আমি নিয়েই আসব। ছোট ছিল যদি বিয়ে দিয়েছে কেন? আর কিছু না করুক, দু'বেলা দু'খানা রুটী ত করতে পারবে।"

অনুবাদ: জয়ন্তী দেবী

অভিনেত্রী

(ইলিয়া এরেনবার্গের "The Actress" গল্পের অনুবাদ)

লীলা গুপ্তা

ছোট অভিনেত্রী লিসা বেলোগরস্কায়া যখন জানলো যে তাকে ফ্রন্টে যেতে হবে, আনন্দের আবেগে শুধু কাঁদাটাই সে বাকী রাখল। কিন্তু তার পরেই আবার নানা দুশ্চিন্তা তাকে পীড়িত করতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় লাউড-স্পীকার যখন কর্কশ স্বরে ধ্বংস-প্রাপ্ত নগরী ও মৃত শিশুদের বিবরণ ঘোষণা করে, তখন কি কারও কোন নাটকের কল্পিত নায়িকার বাক আড়ম্বর শুনবার ইচ্ছা হবে! লিসা তার রোজ নামচায় লিখল:—"তিমিরাবৃত জীবনের মুহূর্ত্তে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রকাশ ও আবির্ভাবকে সৃষ্টি করতে চলছি।"

একটি ছোট্ট শহরের অভিনেত্রী সে। অতীতের সেই নীরব শহরটি বর্ত্তমানে উদ্বাস্তুদের ভীড়ে ঘিনজি হয়ে উঠেছে। তাদের সবারই কোন না কোন প্রিয় পরিজন ফ্রন্টে লড়ছে। পোষ্টম্যানের শীতে জমে যাওয়া ক্লান্ত-করুণ পদধ্বনি ভাগ্যবিধাতার পদধ্বনির মতই যেন শোনায়। সেনাদল পিছনে হটছে। স্থানীয় দলের বৈঠক-বাড়ীর বাইরে খবর শোনবার অপেক্ষায় ভীড় করে জনতা দাঁড়ায়। সন্তর্পণে পরস্পরের দৃষ্টি তারা এড়িয়ে চলে। বাড়ীর বৌ-ঝিরা, সেনা-নায়কদের স্ত্রীরা, ছাত্রীরা মরিয়া হয়ে শুধু মাটী খোঁড়ে ও শেল (shell) তৈরী করে।

পুরনো ধাঁচের বিয়োগান্ত নাটক ও মেলো ড্রামাই নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়। ফুট-লাইটের চোখ-ঝলসানো আলো, ও নিখুঁত রূপসজ্জা। তার মাঝে নায়িকার সেই কলিটি "যদি তোমার হৃদয়ে প্রেম জাগে, তবে দেখবে সারা জগতই তোমার অন্তরে ব্যাপ্ত, আর তখনই মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে"—উচ্চারিত হলেই লিসার মনে প্রশ্ন জাগে "কেন?" সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে। আর নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে। এক-একটি রজনীর অভিনয় শেষে দর্শকমণ্ডলীর মাঝে নানা কথোপকথন সে শোনে। তারা বলে রুটীর কথা, তাদের ঘায়েল স্বামী বা ভাইদের কথা, বা ক্রাসানডোরে যে জার্ম্মাণরা এসেছে তাদের কথা। লিসা তার পর একটি বাড়ীর ছোট্ট অন্ধকার ঘরেতে ঢোকে। কয়েকটি বুড়ো মেয়েমানুষ আর অপোগণ্ড শিশুরা সেই বাড়ীর বাসিন্দা। লিসা ওর ডায়েরীতে লেখে:—"আমি আর অভিনয় করতে পারছি না।"

প্রশ্ন জাগে, কিসের জন্য সে রঙ্গমঞ্চকে অবলম্বন করেছিল? তরুণ, খাঁটী ও মনখোলা প্রকৃতির স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী নিজের এই নির্ম্মম কঠিন প্রশ্নের উত্তর তার অন্তস্তল হাতড়িয়েও সে পায়নি। এ তো তার জীবনের আদর্শ নয়। মাঝে-মাঝে মনে হয়, এ তার শিল্পের প্রতি অন্ধ ও নির্ব্বোধ পূজা। প্রায়ই তার মা বলতেন, "নিজেকে প্রকাশ কর, জগতের সম্মুখে তুলে ধর।" লিসা নিজেকে তো শুধু তুলে ধরে না বরং প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে, সে এ্যানা ক্যারেনিনা বা টুর্গেনিভের এ্যাসিয়া বা চলচ্চিত্রের অন্ধ ফুলবালা। সবাই তাকে গম্ভীর ও অমিশুক ভাবে। নানা ধরণের ভাবনা তার বিনিদ্র রজনীর সাথী হয়। শ্যামাঙ্গী নীলনয়না এই ছোট্ট অভিনেত্রীটি সত্যই বড় একা। মা মারা গিয়েছেন অনেক দিন, আর বন্ধুরা করেছে বর্জ্জন। তার সত্তার মাঝে কোন একটি স্বতন্ত্র পার্থক্য তাদের মনে অস্বাচ্ছন্দ্য জাগায়। যুদ্ধের আগে প্রোমিন নামে এঞ্জিনিয়ারটি তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব এক সন্ধ্যায় শহরের বাগানটিতে করেছিল। লিসা তাকে যত না পছন্দ করেছিল, তত বোধ হয় করেছিল সেই সন্ধ্যাটিকে, হাসনুহানার সুবাস আর যৌবনের উন্মাদনাকে। তখন লিসাকে বাহুবন্ধ করাতে লিসা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। পরস্পরকে বোঝা যে কত দুরূহ, তাতে কত বাধা, কত বিপত্তি, সেই প্রসঙ্গে লিসা আলোচনা শুরু করাতে সে হেসে বললো, "শুধু অভিনয়েরই মায়া খেলা……।" তাদের আর কোন দিন দেখা হয়নি।

এই অভিনয় করার জন্য নিজেকে সে কত তিরস্কার করেছে। কখনও কখনও নাট্যমঞ্চকে সে গালাগালি করেছে, কিন্তু সকালে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করা মাত্রই কনকনে ধূলা ভরে হওয়া যখন তার নাকে আসত তখন সম্মুখের শূন্য আসনগুলির দিকে তাকিয়ে সে উপলব্ধি করত যে এর কবল থেকে তার কোন দিন আর মুক্তি নেই।

সবাই বলে যে তার প্রতিভা আছে। এক দিন সে সত্যিকারের উঁচু দরের অভিনেত্রী হবে। কিন্তু লিসার মনে হয়, তার মাঝে একটা কিছুর অভাব আছে। যতই সে অভিনয়ের কোন চরিত্রের কথা ভাবে, ততই যেন সে তার অভিনয়, সহকারী অভিনেতাদের সঙ্গ ও দর্শকদের সান্নিধ্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়। কখনও সে অভিনয়ের সংলাপকে দোষারোপ করে। এই যে সে অতীতের কোন এক তরুণীর অভিনয় করছে, আবার এই যুদ্ধক্ষেত্রের লম্বা-লম্বা বক্তৃতাকারিণী পার্টির মেয়ের ভূমিকায় নামছে। লিসা ভাবে, বোধ হয় প্রেমের কোন অস্তিত্বই নেই, আর মৃত ও মৃতপ্রায় লোকদের কাছে এ রকম বাগ্মিতা প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীতে এখন অন্য ধাতুতে গঠিত নায়কেরা দল ভারী করছে। গ্যাষ্টেলোর বীরত্বে কি তার মনে শিহরণ জাগেনি? বা জোহয়া কস্‌মোডে-মিয়ানস্কায়ার ফাঁসী যাবার সময় তার সাথে সে যায়নি? ডাইরীতে সে লেখে, "জীবনের পরিধি এখন এত বড় হয়েছে যে শিল্পের স্থান সেখানে আর নেই।"

এখন তাকে যেতে হবে ফ্রণ্টে। পায়চারী করতে করতে ভাবে, "এ কি সত্যই হবে?" তার অজ্ঞাতে ঠোঁট দু'টিতে হাসির চিহ্ন। "আমি কি সত্যই একটি ক্ষণের জন্যও এই পবিত্রমনা আত্মত্যাগীদের মনে আনন্দ-রস সঞ্চার করতে পারবো?"

দারুণ উত্তেজনায় অভিনয়ের দল রওনা হল। কিন্তু একটু পরেই শোনা কথাগুলিকে প্রত্যক্ষ দেখে একবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল; ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী, ঝলসানো কালো গাছ, বরফের মধ্যে হাঁ-করা গ[…] ও ছাইয়ের গাদায় নারী ও শিশুদের ধ্বংসাবশেষ!

একটি ছোট্ট কুড়ে শুধু নিষ্কৃতি পেয়েছিল। রাতটুকু কাটালো তারা সেই বাড়ীতে। শুকিয়ে যাওয়া একটি যুবতী তার ভাঙ্গা গালে বেমানান বড় বড় চোখ দু'টি মেলে ভয়ংকর একটি কাহিনী তাদের শোনাল: "ছেলেটিকে তো বরফের মাঝে লুকিয়ে রাখলাম। আবার ভয় হল শীতে জমে যাবে। তাই বার করে বাড়ীতে আনলাম গরম করবার জন্য। সেই জানোয়ারটি এসে বেরিয়ে যেতে হুকুম করল। তাকে আঁকড়িয়ে ধরলাম, যেতে দিলাম না। ঠিক এই উনুনটির পাশে তখন জানোয়ারটি দাঁড়িয়ে। ছেলেটিকে করল এক আঘাত। আমি ছুটে গেলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই সে মারা গেল।"—জ্বলন্ত উনুনটিতে কয়লা ঢালতে ঢালতে মেয়েটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার যাত্রার উদ্দেশ্য বেমালুম ভুলে গেল। মূর্ত্তিমতী বেদনার সম্মুখে তার শেখা কথাগুলি বা নানা থিয়েটার-ভঙ্গিমাগুলি মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। সে রাত্রে সেই গরম বাড়ীর বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে সে ভাবলে—"আমি হাসতে বা কথা বলতে চাই না। গুলী ছোঁড়া ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারব না।" প্রভাতে উঠেই শবের স্তূপ, ভাঙ্গা গাড়ী আর অঙ্গহীন ঘোড়াদের দেখতে পেল। ষ্ট্রেচারে করে আহত সৈনিকদের বয়ে নিয়ে যেতেও সে দেখল। তারা শীতের শূন্য আকাশের পানে নীরব হয়ে তাকিয়ে আছে। একটি সৈন্য হাততালি দিয়ে চলেছে শুধু গরম হবার জন্যে। বেলস্কি গায়ক বলল—"আমরা কেন এখানে এসেছি! ওরা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

স্কুল-বাড়ীতে সমবেত বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠানটি হল। আগে জার্ম্মাণরা এ বাড়ীতে একবার হানা দিয়ে গিয়েছে। অভিনেতাদের সাজঘর[…] —তাদের ফেলে-যাওয়া খালি টিন, টমি গান ও কাগজের টুকরোতে নোংরা হয়েছিল। সূতী জামা আর ফেল্টের বুট জুতো খুলে ফেলে একটি লম্বা রেশমের পোষাক লিসা পরল। শুকিয়ে যাওয়া ফ্যা[…] ঠোঁটে রং লাগাবার সময় তার হাত কাঁপতে লাগল। তার [...] অপূর্ব্ব ভয়চকিত ভাবটি অভিনয়ের সময়ে দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ[…] করে দিল। তারা তো মাত্র গত কালই বরফের উপর বুকে [...] বেড়িয়েছে। প্রেম আর বিশ্বাসের উপর যখন লিসা আবৃত্তি করে তখন সে ভারী ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। এমন সে কোন দিন ঘাবড়ায়নি। হঠাৎ সে অনুভব করলো যে, এই দাড়ি-গোঁফ [...] কামানো গোবেচারীর দল যেন তার প্রতিটি কথা পান করছে। বিপুল ভাবে যখন তারা তাকে সম্বর্দ্ধনা করল, ও শুধু অসহায় ভা[…] একটু হাসল। যেমন করে লোকে রক্তদান করে, ও ঠিক তেমনি তার হৃদয়কে উপচিয়ে ঢেলে দিয়েছে অভিনয়ে। ধীরে ধীরে অন্য অভিনেতারা যেখানে বসেছিল সেখানে ফিরে এল। দোরের উপর ভর করে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে, বেলস্কির প্রশ্নের উত্তরে বলল— "কি জানি বলতে পারি না—মনে হয় সব ঠিক মতই হয়ে গেছে।"

তার পর এয়ারোড্রোমের হাসপাতালে, আর বনের মাঝে লিসা নানা অভিনয়ানুষ্ঠান করল। প্রায়ই হাওয়াই হামলার সতর্ক ধ্বনিতে তাদের বাধা পড়ত। লিসা এই প্রথম আবিষ্কার করল কি ভাবে বোমাগুলি ফাটে আর আঠাল কাদা-মাটিতে শুকে কেমন

লাগে। অনেক রাতই তাকে ট্রেঞ্চে কাটাতে হল। বন্দুকের আওয়াজে এত অভ্যস্ত হল যেন সে বাড়ীতে থেকেই ঐ আওয়াজ শুনছে। স্থূলকায় এক সেনাধিপতির সাথে ম্যাডেরিয়ায় চুমুক দিতে দিতে তাঁকে বলতে শুনল—"থিয়েটার দেখা আমার পুরনো নেশা। ছোট বেলায় একটি অভিনয়ও বাদ দিতাম না।" একটি তরুণ এ্যারোপ্লেন চালক বলল—"তুমি আমার প্রথম প্রেমকে মনে করিয়ে দিয়েছ।"

মে মাস এল। তার সাথে এল অপ্রত্যাশিত ঘন বর্ষণ, বনের মধ্যে কোকিলের কুহু ধ্বনি, মোহিনী মায়া-ভরা ভবিষ্যতের পানে আশার দৃষ্টি, ছেলেমানুষী-ভরা রঙ্গরস, আর মাতাল করা চাঞ্চল্য।

গত রজনীর অভিনয় শেষে মেজর ডরোনিনের সাথে লিসা কোয়ার্টারে ফিরছিল। যুদ্ধের আগে রসায়ন-শাস্ত্রের ছাত্র ছিল ডরোনিন। গত রাত্রেই তারা বসন্তের কথা, টলষ্টয়ের কথা, বা তাদেরও যে এক দিন শৈশব ছিল তার কথা বলেছিল। হঠাৎ নীরবতার ভার যাতে না সইতে হয়, সেই আশংকায় এলোমেলো নানা কথা তারা বলেছিল। তবুও সেই মুহূর্ত এল যখন তারা একেবারে চুপ হয়ে পড়ল।

শুধু চার দিন আগেই তাদের প্রথম দেখা হয়েছে। ডরোনিনের সাহায্যেই অভিনয়ের দলটি গ্রামে বাড়ী পেয়েছে। যদিও ডরোনিন মোটেই সুপুরুষ নয়, তবুও প্রথমেই লিসা তাকে পছন্দ করে ফেলল।

লিসা নিজেকে প্রশ্ন করল, "কেন? ওর মত তো আমি অনেককেই দেখেছি।" কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সংশোধন করে "এ তো সত্যি নয়। কোন দিনও ওর মত লোকের সাথে আমার

পরিচয় হয়নি। এটা ঠিক, ওর চেহারাটা ভারী সাধারণ। কোন অভিনেতাও সে নয়। তবুও যেন অনন্যসাধারণ।" তার সেই দৃঢ় চোখের স্থির দৃষ্টিতে যখন সে বলল—"তোমাকে লিসা বলে ডাকলে কিছু মনে করবে না তো ?"

তার পর আবার বলল—"তুমি তা'হলে কাল চলে যাচ্ছ ?" তার পর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। লিসা তার হাত দু'টিকে ডরোনিনের কাঁধের উপর ন্যস্ত করে চুম্বন করল। কালো আকাশের বুক চিরে হঠাৎ এক সবুজ আলো ঝিলিক দিয়ে গেল, যেন একটি উল্কা।

লিসা যখন তার চিরপরিচিত সেই বাড়ীতে ফিরল, সবই তার কাছে অপরিচিত ও অদ্ভুত মনে হতে লাগল। বাড়ীর লোকদের গৃহস্থালীর কলরব যেন সে আর সইতে পারে না। যখন এক জন অভিনেতা বলে ওঠে—"আজ আমাদের দল কোন শহর নিতে পারেনি" তখন সে বারুদের মত জ্বলে ওঠে—"তুমি কোন্ সাহসে এ কথা বলতে পার ?···সবাই যুদ্ধ করছে আর মরছে।···" তার কাছে থিয়েটার এখন বড়ই একঘেয়ে, অতি সাধারণ স্থান লাগে। দর্শকরা যেন অতি শ্রান্ত। তারা যেন কলের মত তাকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। রোজকার মত শেষ অংক শেষ হবার আগেই তাদের মাঝে কোট নেবার তাড়া-হুড়া পড়ে যায়। প্রথম শ্রেণীর দর্শকদের প্রশংসা কুড়াবার জন্য আগে কি দারুণ পিপাসিত থাকত। এখন সেনা বিভাগের 'পি, ও' সংখ্যাটি তার বুকে যাদুকরের অমোঘ মন্ত্র। প্রথমে নিজে থেকেই ডরোনিনকে চিঠি লিখতে তার মন চাইল না। ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রথমে কি লেখেন তাই দেখবে। কিন্তু একটু পরেই নিজের সাথে বোঝাপড়া করে নিল। ভাবল, তিনি হয়তো এত ব্যস্ত যে চিঠি লেখার একটুও ফাঁক পান না। মনে মনে আওড়াল—"তাঁরা তো এখন অগ্রসর হচ্ছেন।" তাই নিজের ঈর্ষা, উত্তেজনা, আর তাঁর নিরাপত্তার জন্য যে আকুল-করা ঔৎসুক্য, সব কিছুকে ঢেকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখল। একটি তিক্ত কিন্তু প্রাণস্পর্শী উত্তর এল। রেগে সে চিঠিটাকে তখুনি ছিঁড়ে ফেলল। ডরোনিন লিখেছে—"মানুষের জীবন সত্যিই ভারী অদ্ভুত। ফ্রন্টের বিচিত্র সমাবেশেই হয়তো আমার পক্ষে তোমাকে আকর্ষিত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তোমার আমাকে একটি নগণ্য অতি বৈচিত্র্যহীন লোক মনে হবে। কারণ হাজার হক, তুমি অভিনেত্রী, আর তোমার সম্মুখে একটি উন্মাদনা-ভরা জীবন পড়ে রয়েছে। আর যদি কোন গুলী বা মাইন এসে আমার আয়ুর পথে বাধা না দেয় তো সাধারণ রাসায়নিক ছাড়া আমি আর কিছুই হতে পারব না।"

মর্ম্মান্তিক বেদনাক্রান্ত হয়ে তার প্রেমটিকে লিসা হৃদয় থেকে একেবারে উপড়িয়ে ফেলতে চাইল। "ঠিকই বলেছেন"—মনে মনে সে ভাবে। "আমি বোধ হয় অভিনয়ই করছিলাম। সত্য ও কাহিনীকে পৃথক্ করে দেখতে হয়তো আমি জানি না।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ভাবে—"আমাকে ভালবাসেন না বলেই তিনি এমনি বলতে পেরেছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিনয় করা আর সত্যিই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মাঝে আসল পার্থক্যটা আমি এখন জানি।" এক সপ্তাহ ধরে এমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে যখন সে ক্ষত-বিক্ষত, তখন একটি আবেগভরা চিঠি তাঁকে লিখল। যা মনে এল তাই লিখল। মনে ভাবল—"শেষে একটি অতি দুর্বলমনা মেয়ের মত চিঠি লিখে ফেললাম।" নিজের প্রেমের কথা স্বীকার করেছে সেই চিঠিতে। "আমি অভিনয় করা ছেড়ে দেব যদি তুমি তাই চাও। আমি শিল্পকে ছেড়ে বাঁচতে পারি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে পারি না।" ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলা মাত্রই ভয় এসে তাকে নিঃসাড় করে দিল। মনে হল—"তোমার অভিনয়ের খেলা এখানেই শেষ।"

অনেক দিন সে উত্তরের অপেক্ষায় রইল। অবশেষে বেদনা ও আনন্দের প্রতীক পোষ্টম্যান এল। কম্পিত বক্ষে যে চিঠি সে ডাক-বাক্সে ফেলেছিল সেটাই আবার তার হাতে সে দিল। "যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটা লেখা হয়েছে, এখন সেই ইউনিটে তিনি নেই" খামের ওপর লেখা ছিল। সারা দিন অবশের মত সে পড়ে রইল। সন্ধ্যার অভিনয় তার খুবই খারাপ হল। যেন পাখী-পড়া মুখস্থ-করা আবৃত্তি। ডরোনিন যে মারা গেছে সেটা জানা তার কাছে আর বাকী নেই। জীবনের সব অর্থই যেন শেষ হয়ে গেছে। ওঠে, বসে, পোষাক পরে, রিহার্সাল দেয়, খায়। সব কিছুই যেন অবাস্তব।

তার পর পোষ্টম্যান একটি চিঠি নিয়ে এল। "প্রিয় কমরেড, একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার ভাবী পতি মেজর ডরোনিন আমাদের হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। যত সাধ্য চেষ্টা আমরা করেছিলাম, কিন্তু তাঁর আঘাত খুবই গভীর ছিল। শেষ পর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্য তিনি দেখিয়েছেন। আমাকে তোমার কাছে চিটি লিখতে তিনি বলেছেন আর তোমাকে এই হাতঘড়ি দিয়েছেন। আমি বৃদ্ধা। তোমার মা'র মতই আমি। ইচ্ছে হচ্ছে, এক ছুটে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরি।"

দু'দিন অসুখের অজুহাতে বাড়ী থেকে সে বেরুল না। তৃতীয় দিনে যে চরিত্রের ভূমিকায় তার কোন দিন অভিনয় করতে ইচ্ছা হত না থিয়েটারে এসে তাই করতে হল। কিন্তু লিসা একেবারে বদলে গেছে। তার পর যখন তাকে বলতে হল: "যদি তোমার হৃদয়ে প্রেম জাগে, তখন দেখবে সারা জগৎই তোমার অন্তরে ব্যাপ্ত আর তখনই মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।" তখন নিঃশ্বাস রোধ করে দর্শকরা শুনছিল। তার পর বিপুল ভাবে তাকে তারা সম্বর্দ্ধনা করল। টেকো-মাথা পরিচালক করুণ মুখে বললেন, "লিসা, তুমি এখন বড় হয়েছ, সত্যিকারের অভিনেত্রী হয়েছ।" চুপি চুপি মৃদুস্বরে লিসা বলল, "বলবেন না এমনি করে।" বাড়ী ফিরে শত-বার পড়া অনামধেয়ার সেই চিঠিটা লিসা আবার পড়ল। "আমি তাঁর বাগদত্তা এই পরিচয়ই তিনি বৃদ্ধাটিকে দিয়েছিলেন।" ডরোনিনের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরছে। হঠাৎ লিসার মনে হল "বোধ হয় অভিনয় করাই আমার কপালের লিখন।"

উড়ো জাহাজ

শ্রীকল্যাণী রায়

ছোট্ট খোকা-খুকুরা, তোমরা কেউ কি কোন দিন উড়ো জাহাজে চড়ে নীল আকাশে পাখীর মত উড়ে বেড়িয়েছ? আকাশে এঞ্জিনের শব্দ শুনে অন্ধকার রাতে অথবা চাঁদের আলোয় কিম্বা ঝলমলে রোদের দিনে অথবা মেঘলা সময়ে কখনো ভয়ে, কখনো বিস্ময়ে এবং কখনো বা আনন্দে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখ আর একবার ওই রকম করে আকাশে উড়ে বেড়াবার দারুণ ইচ্ছে, তোমাদের ছোট্ট মনকে দোলা দিয়ে যায়, নয় কি?

কিন্তু সত্যি বলতে কি, উড়ো জাহাজে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়াবার সুযোগ তোমাদের মধ্যে অনেকেই এখনো পাওনি, নয় কি? ঠাকুমা'র ঝুলির পক্ষীরাজ ঘোড়ার আকাশে উড়ে যাওয়া, অথবা রামায়ণ-মহাভারতের পুষ্পক রথের গল্প শোনার পর উড়ো জাহাজে ওড়ার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আজ তোমাদের আমি উড়ো জাহাজে ওড়ার গল্প শোনাব; দেখ তো, ঠাকুমা'র ঝুলির পক্ষীরাজ ঘোড়া বা রামায়ণ-মহাভারতের পুষ্পক রথের সাথে এর কোন মিল পাও কি না? এবার তাহ'লে শোন: সে বছর ছিল ১৯৪৭ সাল, একটি মেঘলা দিনের সকাল বেলা সাড়ে দশটার সময় সবাই মিলে আমরা দমদম এরোড্রোমে গেলাম। দু'দিন আগেই ১৫ই আগাষ্টের স্বাধীনতা উৎসব হয়ে গেছে। জাতীয় পতাকা, ফুল-মালায় সাজান 'এরোড্রোম' ঘুরে-ঘুরে দেখছি আর আকাশে উঠে, এই নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে এবং শূন্যে ওড়ার কি এক অজানা ভয়ে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে আছি। জাহাজের সামনে সিঁড়ি লাগান হলে একে একে আমরা জাহাজের ভিতরে গেলাম। সকলের ওঠা হয়ে গেলে জাহাজের দরজা বন্ধ করা হল ও সিঁড়ি সরান হল।

বিরাট 'ডাকোটা' জাহাজখানি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একেবারে সামনে নানা রকম কলকব্জা ও যন্ত্র বসান। ছোট্ট ঘরখানি, দু'টি আসন। একটি প্রধান পাইলটের, অন্যটি সহকারী পাইলটের। এক জায়গায় এতগুলি যন্ত্র দেখে মনে ভয় ও বিস্ময় আরও বেশী হল। তার পরের ছোট ঘরটায় রেডিও যন্ত্র বসান—আকাশ ও মাটির সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য, এবং সেখানেই রেডিও অপারেটরের দাঁড়ানর জায়গা। তার পর প্রথম শ্রেণীর কামরা, ঠিক যেন একটি ড্রয়িং-রুম সাজান। প্রথম শ্রেণী কামরার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনগুলি গদিমোড়া ও পিছনে হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা। একটির পিছনে একটি আসন অনেকখানি চলে গেছে দরজা পর্য্যন্ত। মাঝখানে যাতায়াতের পথটি সোজা চলে গেছে বরাবর পাইলটের ঘর পর্য্যন্ত। জাহাজখানির পিছন দিকে বাইরে যাওয়া ও ভিতরে আসার দরজা। পিছনে সব শেষে গোসলখানা ও সঙ্গের জিনিষ-পত্র রাখার খানিকটা খোলা জায়গা। সমস্ত জাহাজখানি নরম রঙ্গীন কার্পেটে মোড়া। প্রতি আসনের পাশে ছোট-ছোট কাচের জানালা। রঙ্গীন সিল্কের পরদা দেওয়া। চারি দিক্ ঘুরে-ঘুরে কেবলই মনে হচ্ছিল, সৌখিন ভাবে সাজান একটি বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি রূপকথার রাজকন্যার বাড়ী মনে কর তাহ'লে কিছুই অন্যায় হবে না। আমাদের সকলকে বসতে বলে জাহাজের কর্ম্মচারীরা সকলকে খুব মোটা ও চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। কানে ও মাথার ওপর দিয়েও একটা ঐ রকম বেল্ট আটকে দিলেন। ছোট খোকা-খুকু যারা ছিল তাদের আমাদের কোলে বসিয়ে চেয়ারের সাথে একসঙ্গে আমাদের বাঁধা হয়েছিল। এই সব আয়োজন দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি একবার দরজা খোলা পাই তাহ'লে দৌড়ে মাটির মাঝে নেবে যাই। জাহাজটা তখনো শূন্যে ওড়েনি। এই সব ভাবছি আরও ভয়ে শরীর-মন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে জাহাজখানি ভীষণ গর্জ্জন করে আস্তে আস্তে সামনে চলতে লাগল। অনেকটা এই রকম গিয়ে হঠাৎ জাহাজখানি সামনের ডানা দু'টি শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল! আমরা পাশের জানলা দিয়ে দেখলাম, মাটি ছেড়ে আমরা কত উঁচুতে উঠেছি। চারি দিকে সবুজ মাঠ; ধান-ক্ষেত। বর্ষার জলে ভরা ছলছলে জলা জমী, মাঝে-মাঝে ছোট ছোট চাসা-ঘরের বসতি, বাঙ্গালা দেশের গ্রাম। অভাবের, দারিদ্র্যের চিহ্ন, গ্রামবাসীরা ও তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা—রোগা দুর্ব্বল শিশুরা ছবির মত ভেসে যেতে লাগল। জাহাজখানি কয়েক বার ওঠা-নামা করে এখন নীল আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের মনও ভয়-ভাবনা থেকে ছুটী পেয়ে আনন্দে চারি দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের সীমানা শেষ হতেই সহরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলাম—এখন সহরের ভেতরে এসে পড়েছি। নীচের
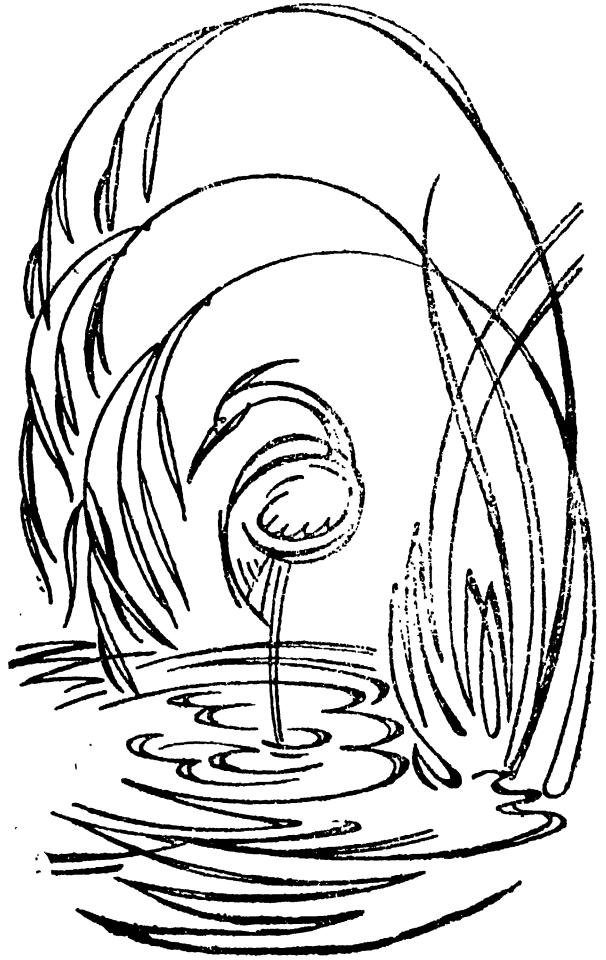
ছোটদের আসর

দিকে দুই পাশে কেবলই সারি-সারি রাস্তা, ঘন-ঘন বসতি, ক্রমে বড়-বড় বাড়ী, চওড়া রাস্তা, বাজার, দোকান, লোকের ভীড়, তার কোল দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা গেরুয়া রং-এর ঢেউ তুলে, তার দু'পাশে গেরুয়া রং-এর মাটির চড়া পড়ে আছে শাড়ীর পাড়ের মত। হাবড়ার পুল, চৌরঙ্গী রোড, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ—সব ছবির মত ভেসে যাচ্ছে একটার পর একটা। গঙ্গার ওপারে সারি-সারি পাট-কলের বাড়ী, বড়-বড় কারখানা, সব দেখতে দেখতে উড়ে চলেছি। রূপকথার গল্প পড়ে তোমাদের মতন বয়সে যে আনন্দ পেয়েছি, এখন জাহাজে উড়ে আবার সেই ছোট বেলার আনন্দ যেন নতুন করে বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, "মাটির সাথে আমাদের কোন পরিচয় নেই, আমরা কল্পনা-রাজ্যের লোক, আকাশে উঠে মাটির পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখে বেড়াচ্ছি। ছোট খোকা-খুকুরা তাদের বাঁধন খুলে ফেলেছে, আর তাদের মনে পড়ে যাবার ভয় নেই। জানলা দিয়ে সবাই মিলে ছবির মত মাটির দেশ দেখছে ও খুশীতে গান শোনাতে ও কবিতা বলতে সুরু করেছে। মাঝে-মাঝে জাহাজখানি খুব নীচুতে নেবে আবার লাফিয়ে উপরে উঠতে লাগল। অনেকক্ষণ এই ভাবে উড়ছি। একটি ছোট্ট খুকু ঘুমিয়ে পড়ল। অন্যদের উৎসাহের শেষ নেই। তারা নিজেদের মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। এই ভাবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা উড়ে বেড়ালাম। তার পর আমরা বাঙলা মায়ের শ্যামল কোলে আবার ফিরে এলাম।

যাঁদের মৃত্যু নেই

রঞ্জিত ভাই

এলিসের ডায়েরী পড়ছিলাম।

সে দিনগুলোর কথা আমরা ভুলতে পারি না। আমার বেশ মনে আছে সে-সব কথা, নদীর ধারে আমাদের গল্প শোনার আসর···

ভরা গ্রীষ্মের দিন। প্রখর সূর্য্যের আলোয় চারি দিক্ উজ্জ্বল। এখানে আমরা এসেছি গ্রীষ্মের ছুটিতে। বেশ সুন্দর গ্রাম। আমাদের অনেক দিনের ছুটি—পড়াশোনা নেই। শুধু খেলা আর গল্প শোনা। সব সময় আমরা তিন বোনে থাকি খেলা নিয়ে, খুব আনন্দে দিন কাটছে···

গ্রামের ছোট বাড়ী। সকাল হয়ে গেছে। জানলার ধারে বসে আছি। ঘরে এসে ঢুকলো ঝড়ের মত আমার বোন প্রাইমা (এখন অবশ্য সে মিসেস্ স্কিন হয়েছে), আনন্দে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল।

—মিষ্টার ডজসন। প্রাইমা কথাটা বলে হাঁপাতে থাকে।

—কে? আমি প্রশ্ন করি।

—মিষ্টার ডজসন এসেছেন, এলিস। প্রাইমা বললে।

আমার সব চেয়ে ছোট বোন এডিথ ছুটে এলো। তার পর আমরা তিন জনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে পড়লাম। দেখলাম, সত্যি সত্যিই অধ্যাপক ডজসন এসেছেন। আমাদের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হোলো। আমাদের আর আনন্দের সীমা নেই।

অধ্যাপক ডজসন বললেন: এখন কলেজের ছুটি, তাই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে তোমাদের বাড়ী এলাম।

—খুব ভালো। প্রাইমা নেচে উঠলো।

—কি মজা। আমি বললুম।

—ধন্যবাদ। এডিথ লাফিয়ে উঠলো অধ্যাপকের পিঠে।

অধ্যাপক ডজসন বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমরা তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম।

—মিঃ লিডেল কোথায়? তাঁকে দেখছি না? অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

—বাবা? প্রাইমা বললে: অক্সফোর্ডে গেছেন কি একটা কাজে।

—যাক, পরে দেখা হবে। এখন এখানে তোমাদের সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটবে।

সে রাত্রি আমাদের শুধু গল্প আর হৈ-হৈ করে কাটলো।

তার পর দিন সকাল বেলা অধ্যাপক ডজসন ঠিক করলেন যে, আমরা আজ দুপুরে পিক্‌নিক্ করতে যাব। গ্রামের পাশেই নদী। নদীটা চলে গেছে বরাবর উত্তরে।

আমরা বললুম: আজ আমরা নানহামে (Nuneham) যাব।

অধ্যাপক ডজসন বললেন: বেশ, তাই চলো।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম নৌকা নিয়ে। আমি, প্রাইমা, এডিথ আর অধ্যাপক ডজসন। নানহামের দিকে আমাদের নৌকা চললো।···

ক্রমশঃ বেলা হয়ে আসছে। আমাদের নৌকা এসে পৌছলো নানহামে। চারি দিকে অবারিত মাঠ আর গমের ক্ষেত। গ্রীষ্মের সূর্য্য আকাশে ঝলমল করছে। দূরে একটি ছোট গ্রাম······

আমরা একটি গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে নেমে পড়লাম তীরে। কাছেই একটু খোলা জায়গা, ধানের গোলা-ঘর। গম-ক্ষেতের পাশে ছোট একটি চাষীর বাড়ী। সেইখানেই আমরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম।

অভ্যাস মত আমরা তিন জনেই বলে উঠলাম: আমাদের একটা গল্প বলো, অধ্যাপক?

—কি গল্প তোমরা শুনতে চাও? অধ্যাপক বললেন।

এডিথ বললে: খুব মজার একটা গল্প।

প্রাইমা বললে: না, না, রূপকথা।

আমি বললুম: তার চেয়ে কোন দুঃসাহসী কাহিনী।

অধ্যাপক ডজসন হাসতে হাসতে বললেন: তিন রকম গল্প বলতে পারব না। এমন একটা গল্প বলছি যাতে এই তিন রকম জিনিসই আছে। বলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমরা অধ্যাপক ডজসনের কাছে বিভোর হয়ে গল্প শুনতে লাগলাম······

···আজব দেশের (Wonderland) কথা অধ্যাপকের কাছে শুনতে শুনতে আমার মন উড়ে চলেছে সেই রাজার দেশে, যেখানে আছে খরগোস আর তাসের রাজা আর মহাপণ্ডিত Caterpillar, আরও সব কত অদ্ভুত জীব-জন্তুর দল···গল্প বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ অধ্যাপক মাঝখানে থেমে গিয়ে খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন: আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, আর এক দিন হবে।

সেদিন মনের আনন্দে আমরা ফিরে এলাম। পরদিন আবার আমাদের ভ্রমণ শুরু হোলো। আজকে আমরা যাবো গ্যাডষ্টো (Gadstow) দিকে। নৌকাতে উঠেই আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম: আমাদের একটা গল্প বলো, অধ্যাপক!

অধ্যাপক সেদিন শুরু করলেন এক ভ্রমণ কাহিনী (Looking through the glass). এই ভাবে আমরা নিয়মিত পিক্‌নিক্ করতে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তাম, আর অধ্যাপক ডজসনের কাছে গল্প শুনতাম।

এই রকম গ্রীষ্মের সন্ধ্যা এলেই আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে যায়। গল্প বলতে বলতে আমাদের রাগিয়ে দেবার জন্য কিংবা নিজে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে অধ্যাপক ডজসন বলতেন : বেশ, আমার কথাটি ফুরুলো। এর পর কি হোলো আবার পরে বলবো :

—হায়, সে তো পরের কথা। আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। অমনি আবার অধ্যাপক নতুন গল্প বলতে শুরু করতেন। আর এক দিনের কথা মনে পড়ছে—সেদিন নৌকায় বসে আমরা 'আজব দেশের' কাহিনী শুনছি। হঠাৎ তিনি গল্প বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমাদেরও খেয়াল নেই। আমরা বোকার মত সেদিন শুধু হাঁ করে বসে রইলাম······অধ্যাপক ডজসনের বেশীর ভাগ গল্প আমরা এই ভাবে মাঠে-বনে-পথেই বেড়াতে গিয়ে শুনেছি······

এলিসের ডায়েরী পড়ে মনে পড়লো লুইস ক্যারলের নাম। শিশু-সাহিত্যে তিনি লুইস ক্যারল নামেই বিখ্যাত, অন্য নামে তাঁকে কেউ জানে না। কিন্তু তাঁর আসল নাম Charles Lutwidge Dodgson। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই অমর রচনা 'আজব দেশে এলিস' (Alice in Wonderland) বিশ্বের শিশু-সাহিত্যে এক যুগান্তকারী বই। আধুনিক রূপকথা বললে হয়ত তার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে। কিন্তু সেই তার শেষ পরিচয় নয়। কারণ, শুধু গল্প বলবার জন্য 'আজব দেশে এলিসের' সৃষ্টি হয়নি। তার অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন আধুনিক মন ও সমস্যা ছিলো, যা সেই সময়কার সমাজ ও দেশের প্রতিচ্ছবি বহন করে নিয়ে আসে। মনে হতে পারে যে, 'আজব দেশে এলিস' সমস্তটাই হেঁয়ালী, কিন্তু আসলে তারই মধ্যে নিহিত আছে লুইস ক্যারলের প্রতিভার দীপ্তি······!

লুইস ক্যারল ছিলেন সত্যিকারের শিল্পী মানুষ। যে-সময়ে তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করছিলেন, সেটা উনিশ শতকের শেষের দিক। ইংলণ্ডের অবস্থা স্বচ্ছল হলেও তার সমাজে তখন ঘুণ ধরেছে ; সেই সমাজকেই লুইস ক্যারল প্রচুর ব্যঙ্গ করে গেছেন এই 'আজব দেশে এলিসের' ভেতর দিয়ে। কিন্তু সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা নয়। ছোটদের কাছে আজব দেশ চিরকাল আজব কথাই বহন করে নিয়ে আসবে।

সরু দেওয়ালের ওপর Humpty-Dumpty বসে ছিলো, এমন সময় এলিসের সঙ্গে তার দেখা। চট্ করে সে চটে ওঠে, বেচারী এলিস তার মেজাজের কূল-কিনারা পায় না। এমনি করে খানিকক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর এলিস বললে : তর্কে হেরে যাওয়াটাই খুব গৌরবের কথা নয় হে!

অবজ্ঞাজড়িত কণ্ঠে তারা বললে : আমরা যখন কথা বলি, তখন আমরা সেই কথাটুকুই বলতে চাই, যা আমাদের বলা দরকার মনে করি, তার বেশি বা কম কথা বলি না!

এলিস তাদের কথা বুঝতে পারলে না। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো তাদের দিকে। তখন তারা চোখ মিটমিট করে বললে : কোন্ কথাটা বলতে চাই সেইটেই হোলো আসল কথা।

তখন এলিস তাদের সঙ্গে খুব বিজ্ঞ ভাবে গল্প শুরু করে দিলে।

এখানে শিল্পীর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। লুইস ক্যারল ছিলেন সেই রকম খেয়ালী শিল্পী। যা-কিছু আজগুবি, যা-কিছু উদ্ভট, যা-কিছু অসম্ভব ও হেঁয়ালী—তাদের নিয়েই লুইস ক্যারলের কারবার। নিছক কল্পনা ও আমোদ ছাড়া এর ভেতর আর কোন আর্ট নেই।

ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আর এক জনের নাম মনে পড়ছে। তাঁর নাম এডওয়ার্ড লিয়র। লিয়রের কবিতা পড়তে পড়তে হাসিতে মন ফেনিয়ে ওঠে। নিয়ম হারা আর যত বেয়াড়া ধরণের লেখা আর কাহিনী। 'আজব দেশের' মতোই সেখানকার জীব-জন্তুরা কারণে-অকারণে নাচে, গান গায়, আর রেগে চীৎকার করতে থাকে। সে এক অদ্ভুত জগত, আশ্চর্য পরিবেশ······

লিয়রের একটা কবিতা বেশ মনে পড়ছে। কবিতাটির নাম 'The Jumblies.' ম্যাকবেথ নাটকের সেই ডাইনী বুড়ীর একটা কথা নিয়ে লিয়র এই অপূর্ব কবিতাটি রচনা করেন।

জাম্বলিদের চালুনি করে কবি সমুদ্র অভিযানে চলেছেন। সবুজ মাথা, নীল হাতওয়ালা এক ছোট চালুনি, তাতে চড়ে কবি চলেছেন তাঁর কল্পনার রাজ্যে! সেখানে কুড়ি বছর কাটলো। দীর্ঘ দিন পরে জাম্বলিরা ফিরে এলো, সঙ্গে কত সব অদ্ভুত জিনিস, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কাহিনীতে অসঙ্গতি কিছু নেই। হোক না মানুষের সবুজ মাথা, নীল হাত, আর জাহাজ হোক না চালুনি, মাস্তুল পাইপ, আর ছোট একটা ন্যাকড়া সেই জাহাজের পাল। জাম্বলিদের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি, যখন দেখি সমুদ্রের ওপর দিয়ে তারা ভীষণ জোরে জাহাজ চালিয়ে দিয়েছে!

যারা তাদের দেখলো,
তারা সবাই বললো—
এক্ষুনি যে যাবে ভেসে
মরবে না কি সবাই শেষে?
দেখছ না যে আকাশ কেমন কালো,
এখন তাদের যাত্রা নয়কো ভালো!
যা হয় কিছু ঘটে
ভয়ের কথা বটে!

লুইস ক্যারলও এমনি জাতের কবিতা লিখতেন। তাঁর আজব দেশের সবাই প্রায় কবি। আর তাঁদের কবিতাও সব অদ্ভুত।

সুন্দর ডানলা টাটকা ও সবজে ;
আছে ভাই উষ্ণ সে-পাত্রে,
স্বাদে কে-বা তাই হচ্ছে না উতলা?
সুন্দর ডানলা খেতে পেলে রাত্রে!
রাত্রের ডানলা, সুন্দর ডানলা!
সুন্দর ডাগলা হে
সুন্দর ডানলা!
ডানলা সে রাত্রের, সুন্দর ডানলা!

এলিসের কাহিনী পড়ে আমরা যেন বেশ কল্পনা করতে পারি এই রূপকথার খেয়ালী শিল্পীকে। মনে হয় যেন হাসি-খুশি মানুষ,

জীবনে কোন দুঃখ নেই। বয়স খুব বেশি নয়। সব সময় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেন জীবন। কিন্তু হাসির গল্প বলতেন বলেই তিনি ছিলেন আশ্চর্য গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা তাঁকে রীতিমত ভয় করতো, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভালোবাসতো। প্রধানত তিনি ছিলেন গণিতের অধ্যাপক, জীবনে কল্পনা বা আনন্দের অবকাশ নেই। সুতরাং অক্সফোর্ডে তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতো গণিতের নানা সমস্যার গবেষণা নিয়ে। জীবনে তাঁর যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো, সে জন্য তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিলো সঙ্গীর। তাই তিনি মাঝে-মাঝে গ্রীষ্মের ছুটিতে অথবা অন্য কোন অবকাশে বিশ্রামের জন্য ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়তেন ভ্রমণে এবং তাঁর একমাত্র আশ্রয়-কেন্দ্র ছিলো সেই এলিস ও প্রাইমার দল।

আজব দেশের সেই যে বেচারী এলিস, সত্যি সত্যি লুইস ক্যারলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো। এলিসের বাবার নাম ছিলো ডিন লিডেল (Dean Liddel), অক্সফোর্ডেই থাকতেন। লুইস ক্যারলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিলো তাঁর। মিঃ লিডেল ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, গল্প শোনাবার সময় তার নেই। তাঁর তিন মেয়ে—এলিস, প্রাইমা ও এডিথ। তিন জনেই গল্প শুনতে চায়। কিন্তু মিঃ লিডেল ও-সব পারেন না। অগত্যা এক দিন তিনি অধ্যাপক ডজসনের কাছে গিয়ে উপস্থিত। তাঁদের মেয়েদের গল্প বলতে হবে। অধ্যাপক ডজসনের সঙ্গে এই ভাবে তিন বোনের আলাপ হোলো। এবং সেই থেকেই আজব দেশে এলিসের সূত্রপাত।

১৮৩৫ সাল। লুইস ক্যারল গিয়েছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে। অক্সফোর্ডে ফিরে এসেই তিনি ঠিক করলেন যে, এলিস ও প্রাইমার দলকে তিনি যে কাহিনী শুনিয়ে এসেছেন, তাই নিয়ে একটা বই লিখে ফেললে বেশ হয়। তার পর তিনি লেখা শুরু করলেন। সেই বছর তিনি Alice in Wonderland প্রকাশ করলেন। ইংলণ্ডে সাহিত্যিক-মহলে সাড়া পড়ে গেলো। পরের বছর তিনি Looking through the glass লেখেন। এলিসের ডায়েরী থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, Alice in Wonderland রচনার প্রথম সূত্রপাত কেমন করে হোলো। সেই ভরা-গ্রীষ্মের দিনে, নদীর ধারে বসে লুইস ক্যারল এলিস, প্রাইমা ও এডিথকে গল্প বলছেন। তার পর কিছু দূর যেতে না যেতেই হাই তুলে বলছেন: 'আজ এই পর্যন্ত থাক, আর এক দিন হবে।' অমনি তিন বোনে চীৎকার করে উঠছে। আবার গল্প বলার পালা। তাই অক্সফোর্ডে গিয়ে যখন লুইস ক্যারল এলিসের ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন, তখন তার ভূমিকায় লিখলেন সেই মজার কাহিনী:

"সেই সব সোনালি বিকেলে আমরা ঘুরে বেড়াতাম নদীর ধারে-ধারে, আমাদের নৌকা বাইতো ছোট্ট বন্ধুরা, তারাই নিয়ে যেতো আমাকে তাদের খুশীমত যেখানে-সেখানে। উঃ! সেই তিন জন! সেই সময়ে আর সেই ভরা-গ্রীষ্মের দিনের বেলায় গল্প বলা কি কষ্টের ব্যাপার কি বলব। কিন্তু তবু উপায় ছিলো না, ওদের তিন জনের বিরুদ্ধে কথা বলার এমন সাহস কারো নেই। প্রাইমা প্রথমটা শুরু করত: 'গল্প বলো।' এলিস ভাবত যে গল্পটা নিশ্চয় মিথ্যে হবে না। আর এডিথ প্রতি মিনিটে প্রশ্ন করত: তার পর? যখন আমার গল্প বলা শেষ হয়ে যেতো তখনও তাদের আশা মিটতো না। আমি যখন বলতাম: 'বাকীটা আর এক দিন বলব।' তিন জনে একসঙ্গে বলত: 'সে তো পরের কথা।'"…

বইখানির শেষে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন সবাইকে উদ্দেশ করে, যারা এলিসকে ভালোবাসে। সে চিঠিখানি পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি ছোটদের কি গভীর ভাবে ভালোবাসতেন।

—ঈষ্টারের আশীর্বাদ—

যারা 'এলিস'-কে ভালোবাসে।

প্রিয় বন্ধু,

মনে করে নিতে পারো যে, কোনো এক তোমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর একটি চিঠি পড়ছো, যাঁকে তোমরা দেখেছ, এবং যাঁর কথা তোমরা হয়ত শুনেছ। আজকের এই আনন্দের দিনে (ঈষ্টার) তোমাদের সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি।

গ্রীষ্মের কোনো এক ভোর বেলা ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কি এক আশ্চর্য স্বপ্নের অনুভূতি মনে জাগে বলতে পারো? যখন বাতাসে ভোরের পাখির কল-কাকলি ভেসে আসে, আর খোলা জানলা দিয়ে ভোরের হাওয়া এসে গায়ে লাগে, যখন আধো ঘুমের মাঝে অলস ভাবে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে, তখন কি স্বপ্নে মনে হয় না যে, তোমার সামনে কচি সবুজ পাতা দুলছে নদীর ঢেউয়ের মত কিংবা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে নদীর জল? এ যেন সেই বেদনা-ভরা আনন্দ, কোন সুন্দর ছবি ও কবিতার মত যা আনন্দের মাঝখানে অশ্রুর ছাপ দিয়ে যায়। আর এ কথা সত্যি যে, মা যখন তাঁর সস্নেহ পরশ নিয়ে তোমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ান ও মধুর স্বরে ডাকেন, তাই শুনে কি তোমার ঘুম ভাঙে না? ঘুম ভাঙলে বিগত দিনের সব ভুলে যাও, তোমার সামনে তখন সেই রৌদ্র-ঝলোমলো সকাল; অন্ধকার রাত্রিতে যে সব দুঃস্বপ্ন দেখে তোমার ভয় করেছে, ঘুম থেকে জেগে উঠে তুমি তখন আর একটি নতুন দিনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করো, আর সেই 'অদৃশ্য বন্ধু'কে প্রণাম জানাও, যিনি তোমার সামনে ঐ সূর্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'আজব দেশে এলিসে'র লেখকের কাছ থেকে এমন সব কথা শুনে বোধ হয় অবাক্ লাগছে, আর আমার এই মজার বইয়েতে এই রকম চিঠি খুব আশ্চর্যের কথা নয়? অনেকে হয়ত হাসি ও অশ্রুর মিলনে আমাকে দোষী করবে; অনেকে হয়ত হাসবে, আর ভাববে যে, যদি কেউ গম্ভীর জিনিস আলোচনা করতে চায়, তার জন্য আছে গির্জা আর রবিবারের দিন। কিন্তু আমার মনে হয়,—হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, অনেক ছেলেমেয়েই এই চিঠি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়বে; এবং আমি যে দরদ নিয়ে লিখছি সেই ভাবেই গ্রহণ করবে…

আমি যদি এমন কিছু লিখে থাকি, যা ছোটদের নির্মল আনন্দ পরিবেশন করতে পারে—যাদের আমি এতো গভীর ভালোবাসি—তাহ'লে আমি আশা করতে পারি যে, কোন দুঃখ বা লজ্জা না করেই আমি বৃদ্ধ হয়ে আমার শৈশব কালের দিন স্মরণ করতে

পরে হয়ত (তখন জীবনের কতখানিই বা মনে পড়বে!) যখন তোমার সময় হয়ে আসবে মৃত্যুর দেশে পাড়ি দেবার।

এই ঈষ্টারের সূর্য তোমাদের কাছে আনন্দের বাণী বহন করে নিয়ে আসবে বন্ধু! তোমাদের জীবনকে আরো মধুর করে তুলবে। যখন ভোরের হাওয়া অনুভব করতে তোমরা ঘর থেকে ছুটে আসবে। এমনি কত ঈষ্টারের দিন আসবে আবার চলে যাবে, যখন তোমাদের বয়স হবে আর চুলে পাক ধরবে তখন শিশুর মত তোমরা সূর্যের আলো দেখতে বাইরে ছুটে আসবে; কিন্তু এখন এ কথা ভেবে আনন্দ পেতে পারো যে হয়ত পরে এমন একটি সুন্দর একটি সকাল আসবে, যে দিন সূর্য উঠবে তার আলোর পাখায় শান্তির বাণী নিয়ে।

তোমাদের মনের আনন্দ যেন কোন দিন শেষ না হয়। হয়ত অনেক দিন পর এর চেয়েও আরো সুন্দর প্রভাত তোমাদের জীবনে আসবে—যখন তোমাদের চোখে অনেক সুন্দর দৃশ্য সেই দোলায়মান গাছের পাতা ও নদীর জলের চেয়েও ভালো লাগবে, যখন আকাশের পাখীরা এসে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবে এবং মায়ের চেয়ে আর কোন মধুর কণ্ঠস্বর শুনে তোমরা কোন নতুন ও উজ্জ্বল দিনকে অভিনন্দন জানাবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও পাপ ঘুচে যাবে, তোমার জীবনে সেই অন্ধকার তারা আর আসবে না, আর রাত্রির পর প্রভাতের অরুণালোকের মত তোমরা সে সমস্ত ভুলে যাবে।

তোমাদের বন্ধু
লুইস ক্যারল।

আর একটি বিখ্যাত কাহিনী মনে পড়ছে। সেটা লুইস ক্যারলের ছোটদের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন।

এক দিন অক্সফোর্ড থেকে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। যাবেন গ্রানহামে। খানিকটা রেলগাড়ী করে যেতে হবে, খানিকটা মোটরে।

রেল-কামরায় খুব ভীড়। এক দিকে একটু জায়গা নিয়ে বসে পড়লেন লুইস ক্যারল। তাঁর পাশেই এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে। তার হাতে একটি বই—Alice in Wonderland। খুব মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। ক্যারলকে তাঁরা চেনেন না, তাই তিনি মেয়েটির সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিলেন। অনেকক্ষণ কাটলো। হঠাৎ মেয়েটি বলল: তোমার নাম কি?

ক্যারল বললেন: চার্লস্ ডজসন!

—বিশ্রী! মেয়েটি মুখ বেঁকিয়ে বললে।

—কেন? ক্যারল কৌতুক করে বললেন।

মেয়েটি বললে: তোমার নাম মোটেই ভালো নয়। এই বইটা তুমি পড়েছ?

ক্যারল হেসে বললেন: না!

—তুমি তা'হলে কিছুই জানো না! মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে—এর ভেতর কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে। আর কি মজার মজার গল্প। বলে সে ক্যারলকে বইটা দেখাতে লাগলো আর বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলো যে, ডজসন নামটা মোটেই ভালো নয়।

ক্যারল তখন মুখ ভার করে বললেন: আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে বইটা রয়েছে, ওর লেখক কে?

মেয়েটি বললে: লুইস ক্যারল!

মেয়ের মুখে ঐ নামটা শুনে তার মা এগিয়ে এলেন ক্যারলের সঙ্গে গল্প করবার জন্য! বললেন: আচ্ছা, মিঃ ডজসন, লুইস ক্যারলের জীবনটা খুব দুঃখের, নয়?

—বোধ হয়! ক্যারল বললেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।

ভদ্রমহিলা তখন ফিস্‌ফিস্ করে বললেন: জানেন, তিনি পাগল হয়ে গেছেন?

—সত্যি না কি? ক্যারল স্তম্ভিত কণ্ঠে বললেন—আমি তো এ খবর জানি না!

তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। মেয়েটি ভুলে গেছে সেই রেল-যাত্রীর কথা। হঠাৎ এক দিন তার নামে একটা উপহার এলো। খুলে দেখলে একটা বই—Looking through the glass। তার প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে: সেই ভ্রমণের স্মৃতি মনে করে তোমায় উপহার দিলাম. লেখক। (From the author in memory of pleasant journey!)

খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন লুইস ক্যারল। জীবনে তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী কেউ ছিলো না। সারা জীবন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটেছে—যে-স্বপ্ন ধু-ধু মাঠের উদাস হাওয়া আর বনমর্মরের বার্তা নিয়ে আসে।...

দিন শেষ হয়ে এলো। বয়স হয়েছে। তখন চুলে পাক ধরেছে। ১৮৯৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী ফুরিয়ে এলো তাঁর অশ্রু-[illegible]র জীবন। কিন্তু ফুরিয়ে গেলো না তাঁর প্রতিভার আলো, শেষ হোলো না জীবনস্মৃতির সুখ-সৌন্দর্যের ইতিহাস।

কর্তব্য

শামসুদ্দীন

তোমাদের মন হোক নির্মল স্বচ্ছ আকাশের প্রায়,
উদার মহান্ প্রাণ হোক তোমাদের নিখিল সভায়।
হিংসা দ্বেষ যাও ভুলি এ মর জগতে রেখ নাকো মনে,
সকলেরে কোলে তুলে নিও ভালবেসে নিজ গৃহ-কোণে।
ছোট বড় ভেদাভেদ ধ্বংস আনে যাহা মানুষের গেহে,
ভুলে যেও, ক'র মনে সকলে আপন জন—আপনার স্নেহে!
যে জন প্রাসাদ মাঝে যে জন কুটিরে স্রষ্টা এক জানি,
মুদিলে আঁখির পাতা সব একাকার—নাহি কোন গ্লানি।
হাতেতে মিলাও হাত সকলের সাথে যাবে অহংকার,
ধরার মংগল তরে লও তুলে জীবনের কর্তব্যের ভার।

সত্যি কথার গল্প

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

আমেরিকার শিকাগো শহরের সঙ্গে এক জন ভারতীয় সন্ন্যাসীর স্মৃতি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, তাঁর কথা বলতে গেলেই শিকাগোর কথা মনে পড়ে; আবার শিকাগোর কথা বলতে গেলেই তাঁরই জীবনের সত্যি গল্প না বলে উপায় থাকে না।

সন্ন্যাসীটি ভারতীয় হলেও তিনি জন্মেছিলেন বাংলা দেশে।

একবার তিনি কিছু দিনের জন্য সেই শিকাগো শহরে জর্জ হেল নামে এক সাহেবের বাড়িতে আছেন। হাতের ও পায়ের আঙুলের নখগুলি একটু বড় হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন বলে এই নখগুলি তাঁর পক্ষে একটা যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কোনো রকমের নোংরামি তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তক্ষুনি নখ কাটবার উপায় খুঁজতে লাগলেন।

তখন আমেরিকানরা ভারতীয়দের রীতিমত ঘৃণা করতো। ওদের দেশের সেলুনে ভারতীয় তো দূরের কথা, ওদের মধ্যেই সাধারণ লোকেরা সেলুনে ঢুকতে পেত না। এ ছাড়াও বিশেষ নিয়ম ছিল—সেলুনের ভদ্রবেশী নাপিতরা চুল-দাড়ি কাটলেও হাত-পায়ের নখ কেটে দেওয়াকে অপমানজনক নীচ কাজ মনে করতো, সে জন্যে সেলুনে গিয়ে নখ কাটার ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না বললেই হয়।

সন্ন্যাসী বোধ হয় সেই খবর জানতেন, হয়তো বা একেবারেই জানবার প্রয়োজন বোধ করতেন কি না কে জানে। যে কথা ভেবেই হোক, তিনি গৃহকর্তা জর্জ হেলের ছেলেমেয়েদের এক জনকে ডেকে বললেন, "আমাকে একটা পেন্‌-নাইফ দিতে পারিস্?"

ওদের এক জন তখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "পেন্‌-নাইফ নিয়ে আপনি কি করবেন?"

সন্ন্যাসী বললেন, "সে কথা জেনে দরকার নেই।"

মেয়েটি এগিয়ে এসে বললে, "তবুও জানতে হবে। পেন্‌-নাইফ দিয়ে হঠাৎ আপনি কি করবেন, সে-কথা না বললে তা দেবো না আমরা।"

তার পর ছেলেটিরও মুখে সেই একই কথা। সন্ন্যাসী না বলে যান কোথায়। বলতে হল তাঁকে—"আঙুলের বাড়তি নখগুলো আমাকে কাটতে হবে রে।" এই কথা বের হতে না হতেই দু'ভাই-বোনের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল—কে ছুটে এসে আগে তাঁদের প্রিয় স্বামীজীর নখ কেটে দেবে। শেষ কালে কিন্তু মেয়েটিরই জিৎ হলো।

সন্ন্যাসী শুধু স্নেহদৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর পায়ের নখ কাটতে শুরু করেছে দেখেও আপত্তি করলেন না কিছু মাত্র। তাঁদের সব চাইতে বেশি আপন স্বামীজীর পায়ের হাতের নখগুলি সেই আমেরিকান মেয়েটি কি আগ্রহ ভরেই না কাটছিল! পরিপাটি করে সন্ন্যাসীকে সেই গালিচার উপর বসিয়েও দিয়েছিল।

নখ কাটা তো শেষ হল। পায়ের থেকে যে জুতো-মোজা সন্ন্যাসীর সে খুলেছিল তা আবার পরিয়ে দিলো। পরিশ্রম দূর করবার জন্যই যেন অন্য একটা চেয়ার টেনে তাতে গা এলিয়ে দিলো। সন্ন্যাসীকে সে বলতে লাগলো—"আমার কাজের মজুরি দিন, আমরা আমেরিকান, বিনা মাহিনায় কারো কোনো কাজ করি না।"

মেয়েটি আরও বললো—"নাপিতের দোকানে গিয়ে কাটলেও এর জন্য আপনাকে দু'-তিন ডলার দিতে হত। আমার মজুরি তার চাইতেও বেশি হওয়া উচিত, কারণ আমি ঘরে বসিয়ে কেটে দিয়েছি।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আমেরিকান হয়ে তুমি যে আমার পা ছুঁতে পেরেছো, শুধু তাই নয়, সন্ন্যাসীদের অতি পবিত্র রক্ষণীয় বস্তু নখ পর্যন্ত কেটে ফেলবার অধিকার পেয়েছো, তার জন্যে আমার পাওনা কমিশনটা আগে মিটিয়ে দাও দিকিন!"

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। জর্জ হেলের ছেলেমেয়েরাও তাতে যোগ দিলো।

এই সন্ন্যাসীটির পরিচয় তোমরা বোধ হয় 'স্বামীজী' শুনেই ঠিক করে ফেলেছো মনে মনে।

যারা পারোনি, তাদেরকেই বলে দিচ্ছি—মনে রেখো—ইনি হচ্ছেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য আর আমাদের প্রিয় নেতাজীর অগ্রবর্তী স্বাধীনতার উপাসক স্বামী বিবেকানন্দ।

এ কি লোভ মানুষের

শ্রী প্রমোদরঞ্জন রায়

মানুষেরা ঘর বাঁধে পৃথিবীতে নিরালায়
পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু তারা আসে যায়;
শুধু দু'দিনের তরে কত গান, ভালবাসা,
আপনার মনে শুধু কভু কাঁদা, কভু হাসা;
স্বপনের মাঝে শুধু কামনার জাল বোনা
আলো আর আঁধারের চলে তাই আনাগোনা।

আকাশের নীল রঙে জীবনের জয়গান
শ্রাবণের মেঘে ঝরে হৃদয়ের অভিমান,
ফাগুন বাতাসে জাগে ভরা প্রাণ ছলছল
বুক ভরে ভাল লাগে পৃথিবীর কোলাহল।
খেলা ঘর বাঁধি শুধু গাহে জীবনের জয়
ভুলে যেতে চায় তারা মরণের পরিচয়!

দু'দিনের আসা-যাওয়া—এ কি লোভ মানুষের
কত দিনে হবে হায় অবসান এ ভুলের।

ভগবান আছেন

শ্রীঅজিতকুমার রায়চৌধুরী

চিৎপুর হাটায় নিমাই বসু কলকাতার অনেক দিনের বাসিন্দে। ...লেতে গেলে জঙ্গল কেটেই একতলা বাড়ী করেছিলেন ...ধারের কাছে। তাঁর ছেলে কানাই বসু কোনও রকমে সামান্য লেখাপড়া শিখে অসামান্য লাইন ধরলেন। অর্থাৎ সন্ধ্যে হলে সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে, পায়ে লাল নাগরা এঁটে, মাথায় জলতরঙ্গ টেরীর ঢেউ তুলে মনমোহন থিয়েটারে সবান্ধবে গিয়ে সখীদের নৃত্যে 'হায় হায়' করে রসোপভোগ করতেন এবং সকাল বেলা চোখের কোল ভর্ত্তি কালি নিয়ে বাড়ীতে ফিরতেন। বাপ নিমাই বসু বললেন—দেখ ব্যাটা, এই কলকাতা, কত মাস্তুল এখানে তলিয়ে যায়, তোর বাপের ত পাঁচ সিকের সম্পত্তি, তুই এতটা বাড়ছিস্ কেন?

কানাই খালি কান চুলকে সরে পড়লেন। বাপ ভাবলেন কথাটা ছেলের কানে গেছে। ছেলে ভাবলেন, বুড়োর কথা কানে না তোলাই ভাল। ... দিন গুণতে লাগলেন, বাপের কবে ফৌত হবে। বাপ চোখ বুজলেন, ছেলে ভাল করে চোখ খুললেন। ...টা প্রাণের পাখী খোঁজার ঠেলায় বাঁধা পড়ল, ...এক দিন অন্তর এক বেলা জল খেয়ে কড়িকাঠ গোণা সুরু হল। ...য় পড়ে কানাই বসু এক বিদেশী সওদাগরী আপিসে চাকরী ...লেন। সংসারে তখন নিজে, স্ত্রী, চারটি অবিবাহিত মেয়ে আর ...টি ছেলে তারাপদ।

তারাপদ বাপের এক ছেলে, বি-এ পাস করেছে, বংশের প্রথম বি-এ।

কানাই বললেন—তারু, এবার বে' কর। আমি পাত্রী দেখেছি।

তারাপদ মাকে বললে—মা, বিয়ের কথা বলো না। বিয়েতে আমার মন নেই। তা ছাড়া কাকেই বা বিয়ে করব।

বাপ চটে-মটে বিষড়েয় মেয়ে দেখতে গেলেন। ছেলে নিজের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে লাগল দূরে দিগন্তের কোলে যেখানে অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটা আর চিম্‌নীর ধোঁয়া মিলে একটা বিতিকিচ্ছিরি রং-এর সৃষ্টি করেছে। ছেলে সেই রং-এর মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে কার কালো হরিণ চোখ, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশরাশি। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাবে কি না, অজানা। খুঁজছে আর বাপের কৌটা থেকে সরিয়ে রাখা লাল সুতোর মিঠে-কড়া বিড়ি টানছে।

বাপ দেখলেন, নিজের সময় হয়ে এসেছে। চাকরীতে ঢুকে এদিক্ ওদিক্ করে যা দু'পয়সা করেছিলেন চার মেয়ের বিয়েতে তা শেষ হয়েছে। তারাপদকে অতি কষ্টে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে চাকরীতে ঢুকিয়েছেন বটে, কিন্তু সংসারে না ঢোকালে মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না। এদিকে নিজের তেষট্টি পেরুল, ছেলেরও তেত্রিশ। অবশেষে তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হল। আর না হয়েই বা উপায় কি? বিয়ের কয়েক মাস বাদে কানাই বসু ও তাঁর পত্নী তিন দিন আগে-পরে দেহ-রক্ষা করলেন। তারাপদ গঙ্গার ঘাটে একই দিনে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ করে দায়মুক্ত হল।

বিয়ের চার বছর পরে অর্থাৎ তারাপদর বয়স যখন আটত্রিশ, তখন 'গোবিন্দর ইচ্ছেয়' তারাপদ-গৃহিণী পঙ্কজিনী একটি কন্যারত্ন প্রসব করলেন। যম আর টাকায় 'টাগ-অফ-ওয়ার' হল প্রসূতিকে নিয়ে, যম হেরে গেলেন। তারাপদর বাড়ীটা বাঁধা পড়ল। মাইনে তখন ওর ৪৫ টাকা।

তারাপদ মেয়ের নাম রাখল মালিকা, ডাক-নাম মিলি এবং মেয়ের কল্যাণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কিছু টাকা ওর হাতে এসে গেল। মেয়ে যে বিশেষ পয়মন্ত, এটা তারাপদ ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিলে।

তারাপদর বোনেরা মাঝে-মাঝে ভাই-এর বাড়ীতে কেবল বেড়াতে আসত। তারা এসে ভাজকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজুবন্ধ, আড়াই-পেঁচী আর মটর-মালা দেখাত পিঠের খেকের দাগগুলো লুকিয়ে। এক-মুখ পান ও জর্দার লালার ওপর বুদ্‌বুদ কেটে গায়ে পিক্ পড়বার ভয়ে ঠোঁট ওপরে তুলে ঘড়-ঘড় করে বলত, লজ্জায় আর বাঁচি নে বৌদি ভাই। রাতে বলে কি না সারা রাত ঘুমুতে পারবে না। বল, আমি মেয়েমানুষ,—আঃ মরণ আমার। কাপড়ে পিক্ পড়ল, শাশুড়ী মাগী দেখতে পেলে ঝেঁটিয়ে বিষ ছাড়াবে।

এই সব পতি-সোহাগিনীরা বেশী দিন পতির সোহাগ ভোগ করতে পারল না। তারাপদর বড় ভগিনীপতি স্থানবিশেষে খুন হল, মেজটি মল লিভার এ্যাব্‌সেসে আর তৃতীয়টি গ্যালাপিং টিবিতে। চতুর্থ ভগিনীপতিও ভুগছিল, কিন্তু তারাপদর সৌভাগ্যক্রমে সে না মরে ভগিনীটিই ড্যাং-ড্যাং করে হাতের নোয়া নিয়ে স্বর্গে গেল।

প্রথম বোন সতু এসে ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি ছাড়া আর কেউ নেই দাদা, একটা পেট তুমি চালাতে পারবে না? সেখানে ঠাঁই হল না, তারা তাড়িয়ে দিলে।

মেজ বোন কাদু এল একটি মেয়েকে নিয়ে। এসেই তারাপদর পায়ের কাছে খান কয়েক গয়না ফেলে বললে, তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নীকে মানুষ করবার জন্যে রাখ দাদা। ভাগ্নীর বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না, আমি আসবার সময় কিছু হাতিয়ে এনেছি। বাবাঃ, মিন্‌সে মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে। মদ খেয়ে আমায় নিয়ে যেন ফুটবল খেলত। কই বৌদি, তোর মেয়ে কই? ওমা, এ কি মেয়ের ছিরি, এ যে একেবারে মেমসাহেব! না বৌদি, এতটা ভাল নয়।

তৃতীয় বোন সিদু পাণ্ডুর মুখে এসে দাঁড়াল, সঙ্গে দু'টি

ছেলে-মেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স বার আর ছোট ছেলেটির ন' মাস। ছেলে-মেয়েগুলোকে পর-পর দাঁড় করালে মনে হবে যেন কাশীর কৌটো বিক্রী করবার জন্যে সাজান হয়েছে।

বোনেরা একে একে এল; তারাপদ কোন কথা বললে না, মাইনে তখন তার ৭৫ টাকা, পোষ্য নিজেকে নিয়ে সতের। কথা বলার মত অবস্থাও তার নয়।

মিলি মানুষ হচ্ছিল বেগমী কায়দায়। সকালে মাখন-রুটী সহযোগে চা খেত, কোন কোন দিন-দুপুরে স্কুলে যেত, মনে হত যেন হোরমিলার কোম্পানীর বড়বাবুর মেয়ে পড়তে যাচ্ছে। সন্ধ্যে বেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে আধ-সুরো গলায় 'মাঝি তরী হেথায় বেঁধো নাকো আজকের এই সাঁঝে' গান গাইত। এমন সময় ওর পিসীমা এল। কায়দা ঠিকই রইল, কিন্তু খাওয়ার ঠাট কমল। মাখন-রুটীর বদলে ফুলুরী, পুরো কাপ চা-এর বদলে রোজ ডবল-হাফ চা, দুধ নয়।

মাঝখানে কয়েকটা বছর কেটে গেল—যুদ্ধের নিদারুণ কয়েকটা বছর। কিন্তু তারাপদর বিশেষ লোকসান হয়নি। আয়ের পাঁচ রকম রাস্তা খোলা ছিল, তা ছাড়া সরকার দয়ালু ছিলেন, মাইনে বেড়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে এই সংসারটা টানতে গিয়ে তারাপদ মুখ থুবড়ে পড়ল। আয়ের রাস্তা যেটা বাড়তি ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ফলে টান পড়ল পঙ্কজিনীর গয়নায়। পুরো কাপ চা-এর জায়গায় হাফ কাপ চা, মাথায় তেল বন্ধ, এক বেলা খাওয়া অর্থাৎ বাড়ীর ভেতরে তারাপদরা মধ্যবিত্ত থেকে একেবারে উঞ্ছবৃত্তের দলে এসে পড়ল। পয়মন্ত মেয়ের ঠাট কিন্তু ঠিক বজায় রইল। মেয়ে তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী, সঙ্গীত, নৃত্য এবং সীবনকুশলা অর্থাৎ যোল কলার পনের কলা অবধি মিলির আয়ত্তে।

সন্ধ্যায় পঙ্কজিনী বললে—আটা নেই, চাল এক জনের মত আছে।

তারাপদ দু'চোখ কপালে তুলে বললে—সে কি! পরশু আনলুম, এরি মধ্যে নেই?

—রাত্তিরে চোদ্দখানা রুটী দিয়ে জল খেলে মাসে এক জনের জন্যে কত মণ আটা লাগে, তা হুঁস থাকে না?

—চোদ্দখানা রুটী কে খায়?

—কেন সদু!

—মরেচে রে!

সদুর কাছে গিয়ে তারাপদ খানিকটা এ-কথা সে-কথার পর বললে, সদু, রাত্তিরে আটা-ময়দা খাস্‌নি, কাঁইবীচি মেশান আছে, শেষে একটা কিছু হবে।

সদু মুখ ভার করে বললে—কি আর হবে, বড় জোর পেটে গাছ হবে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না দাদা।—বলেই হঠাৎ দু'চোখের জল ছেড়ে পরলোকগত স্বামীকে ডাকতে সুরু করে দিলে। তারাপদ পালিয়ে এল।

মিলি এসে বললে—বাবা, দুটো টাকা দাও না?

—কেন?

—আমাদের ক্লাশের মেয়েরা আজ টীচারদের খাওয়াবে। নাচ-গান হবে।

—আচ্ছা, দোব'খন। কিন্তু দেখিস্ মা, বেশী নাচিস্ না যেন।

—কেন বাবা?

—নাচলে ক্ষিদে বেশী পাবে, র‍্যাশানের চাল-টাল ত ভাল নয়, তাই।

মাসের কুড়ি তারিখ তখন, নিজের হাত-খরচার তিনটি টাকা থেকে মেয়েকে দু'টাকা দিয়ে তারাপদ ন'টার জায়গায় আটটায় অপিসে রওনা হতে লাগল।

কথায় আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। সময় বুঝে সিদু ওরফে সিদ্ধেশ্বরী এগার দিন টাইফয়েডে ভুগে তারাপদর কিছু খসিয়ে ন'টি গুঁড়ো চোখ বুজল। পঙ্কজিনী তারাপদকে বললে—আমি আর এ হুজ্জুত পোয়াতে পারব না, আমি ত আর দশভুজা নয়। তুমি আর একটা বে কর। তারাপদ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—তাই করতে হবে।

—আ মরণ!—কথার উত্তর দিয়েই পঙ্কজিনী বিছানা নিলে অম্লশূলের বেদনায়। তারাপদ নিজে রান্না করে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের খাওয়ালে, মেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে কলেজে পাঠিয়ে নিজে ন'টা পঁয়তাল্লিশে অপিসে গিয়ে বড়বাবুর ধমকানি খেলে।

মিলি ম্যাট্রিক পাশ করে স্কটিশে ভর্তি হয়েছে, এবার সেকেণ্ড ইয়ার। কলেজে পড়বার তার ইচ্ছে ছিল না। মিলি যে নিজের অবস্থা না বুঝত এমন নয়, কিন্তু বুঝে সেই মত চলবার চেষ্টা করেও সে চলতে পারেনি। এবং এই চলতে না দেওয়ার দায়িত্ব বারো আনা তারাপদর।

মিলি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, তখন পথচারীরা চেয়ে দেখত অপূর্ব গতিভঙ্গিমা। ও যখন ক্লাসে সন্তর্পণে বিশেষ ভঙ্গীতে বসত, তখন ছেলেদের বুকে যেন হাফশূল পড়ত। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত,—'মিস্ বোসের বসবার কি কায়দা! সি ইজ রিয়্যাল এ বরন ডানসার।' কিন্তু তারা ত জানত না, কেন মিস্ বোস সন্তর্পণে নৃত্যের ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে বসত, উঠত। পরনের কাপড় মায়ের বিয়ের সময়কার, পরতে পরতে জীর্ণ হয়ে আছে; সাবধানে ওঠা-বসা না করলে লজ্জায় কর্ণমূল রাঙা হবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। ওর গায়ের গয়নাগুলো অবধি ঝকঝক করত, ছেলেরা ভাবত, প্রায়ই নতুন গয়না গড়ায়। কিন্তু আসলে গয়নাগুলো প্রতি রবিবারে তারাপদ নিজের হাতে পরিষ্কার করে দেয়।

মিলি কলেজের নাম-করা মেয়ে। ওর 'পয়েন্টেড ক্রস' (মুড়ো খ্যাংরা) ও 'আলোক নৃত্য' অনেক মফঃস্বলবাসী ধনী ছাত্রের চিত্তের গ্রাম্য ভাব ঝেঁটিয়ে দূর করে নাগরিক সভ্যতার রেড লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে পার্টি ও পিকনিকেও মিলিকে যেতে হত। মিলি যেত, আর ঘরে গামছা পরে উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুকতে ফুকতে তারাপদ মেয়ের সম্বন্ধে রঙীন স্বপ্ন দেখত, আর মাঝে-মাঝে তালি দেওয়া কাপড়-পরা পঙ্কজিনীর কৃশকায় দেহের দিকে তাকিয়ে ভাবত, কি রোগাই হয়েছে ও আজকাল।

তারাপদর আশা ছিল, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শোনা গল্পের মত বোধ হয় তারও মেয়ে এক দিন একটি ছেলের সঙ্গে মোটর থেকে নেমে তাকে প্রণাম করে সলজ্জ ভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে, আর তারাপদ 'বেশ বেশ' বলে ওদের মাথায় হাত রাখবে। মোটরে করে দু'-একটি ছেলে যে না আসত, তা নয়। তারা আসত মিস্ বোসের কাছে,

চা জল-খাবার খেত মিস্ বোসের বাপের পয়সায়, তার পর মিস্ বোসকে নিয়ে যেত কলেজে প্লের রিহার্সাল দিতে।

আপিসের কয়েক জন সহকর্মী বললে, তারা, আর বিলম্ব করলে পরে পস্তাবে। বরং এক কাজ কর, খবরের কাগজে দু'রকমের বিজ্ঞাপন দাও। বেশ ফলাও করে যত রকমের বিশেষণ আছে, সব জুড়ে দাও। মেয়ে খুব আপ-টু ডেট, স্মানো-ত্যানো। আর এক রকম বিজ্ঞাপন দাও, হিন্দুমতে প্রতিপালিতা, সকাল-সন্ধ্যায় গীতা পাঠে অভ্যস্তা, ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে পরে দাও আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে পথ পরিবর্তনে সক্ষমা। বুঝলে না? মনে কর, ছেলের বাপ গোঁড়া হিন্দু, ছেলে বাপের কন্টে্রালে, বাড়ীতে স্নো-ফ্লু করবার জো নেই; ছেলে কিন্তু তোমার বাইরে অক্স-টাঙ (Ox touge) দিয়ে টিফিন করে। বাপ চোখ বুজল, ছেলে পৈতৃক ভাটিখানা বসালে, বৌ যদি তখন বেঁকে বসে তাহলে খিটি-মিটি, বৌ-এর কপালে অশেষ দুঃখ। এ বাবা আগে থেকেই হিন্টস (hints) দিয়ে রাখা হল।

বিজ্ঞাপন দেবার দশ দিন বাদে এক প্রৌঢ় সঙ্গে একটি যুবক ও আধা লোককে নিয়ে মেয়ে দেখতে এলেন। মিলি সেজে-গুজে এল। প্রৌঢ়টি পাস করে দেখলেন। মিলি হাঁটল পায়ের খুঁত নেই দেখাবার জন্তে। দাঁত দেখাল কোদাল-দাঁতী নয় প্রমাণ করবার জন্তে। হাতের নখ প্রৌঢ়ের চোখের সামনে মেলে ধরল শূর্পণখার সে কেউ নয় এটা বোঝাবার জন্তে। চুল খুলে দেখাল তার খোঁপায় কাল রেশমের জল ঢোকান ছিল না। দেখে-শুনে প্রৌঢ় বললেন—হুঁ, গান-টান জানে?

তারাপদ—আজ্ঞে, জানে বই কি। গান, নাচ—।

—থাক্ থাক্, আর নাচে দরকার নেই। একটা গান শুনি বরং। বেশ ভাল দেখে একটা টপ্পাই শোনা যাক না, কি বল ভবতারণ। না থাক, টপ্পা আবার বড্ড সেকেলে, তার চেয়ে বরং 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গানখানাই হোক্, গানটা খুব চলছে আজকাল।

গান শেষে মিলিকে হাতের কয়েকটা মুদ্রা দেখাতে হল। প্রৌঢ় পরীক্ষা করে দেখলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক এর দ্বারা হবে কি না। এত দেখেও ভদ্রলোক শেষ কালে নাক কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—বয়স কত?

—আজ্ঞে কুড়ি, কাগজে ত দেওয়াই ছিল।

—কই দেখিনি ত। তা ছাড়া এর বয়স কুড়ি কি বলছেন?

—সত্যি বলছি, বিশ্বাস না হয় ওর মাকে ডেকে দিচ্ছি, জিজ্ঞাসা করুন?

—আর মাকে ডাকৃতে হবে না। মুখ দেখলেই বয়েস বলতে পারি। আমরাও বাপ ত বটে, না কি বল পঞ্চুধন?

তারাপদ ভাবলে পঞ্চুধন বুঝি প্রৌঢ়ের পৌত্র এবং ভাবী জামাতা, তাই সে বললে—বাবাজীর মতটা যদি জানা—

প্রৌঢ় খেঁকিয়ে বলে উঠল—ও কি বলবে? বিয়ে করব আমি আর মত দেবে ও? আমি বলছি মশাই, হিন্দুধর্মে আছে কুড়ি বছরের মেয়েকে বিয়ে করলে সবংশে নরকবাস করতে হয়। চল হে পঞ্চুধন, ওঠ না ভবতারণ, গ্যাঁট্ হয়ে বসেই আছ যে! বলি খ্যাঁট্ ত এক-পেট হয়েছে, না হয়নি? আচ্ছা খবরের কাগজই দেখেছিলে!

মিলি বাবাকে বললে—বাবা, শুধু তোমার মুখ চেয়ে আমি এই জানোয়ারগুলোকে কিছু বলিনি। কিন্তু আর নয়, আমার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি আজ থেকে আর কলেজে যাব না।

—কি করবি?

—চাকরী করব।

—কি বলছিস যা-তা। খেয়ে-দেয়ে কলেজে যা। অমন হয়, তোর মাকে সাতাশ জায়গা থেকে দেখেছিল, তার পর তার বিয়ে হয় আমার সঙ্গে। লোকে কথায় বলে, লাখ কথা নইলে বিয়ে নয় না।

আপিস যাবার মুখে সামনের বাড়ীর হরিসাধন গুহ'র ছেলের সঙ্গে দেখা। ছেলেটি বি, এস-সি পড়ে, নাম তারক। তারাপদ তারককে দেখে বললে—কেমন আছ বাবা, যাও না কেন আমাদের বাড়ী?

—আজ্ঞে, সময় পাই না।

—যেও বাবা, মিলি আছে, তোমার কাকীও রোজ তোমার কথা বলে।

এমন সময় সমুন্নত গলদা চিংড়ির সুপুষ্ট গোঁপওয়ালা বাজারের থলে নিয়ে হরিসাধন এল। হরিসাধন ছেলেকে দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে—কলেজ নেই?

—আছে, বেলায়।

—বাড়ী যা, এই কপিগুলোও নে যা।

তারাপদ বললে—কেমন আছেন গু'মশাই, অনেকদিন দেখা নেই।

—ভালই আছি। তা আমার ছেলের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

—কিছু না, এমনিই দেখা হল তাই। ছেলেটি আপনার সত্যিই বড় ভাল।

—আমারই ত ছেলে মশাই।

ফট করে হরিসাধনের হাত দু'টো ধরে তারাপদ বললে—যদি আমার মিলিকে নেন আমি আজীবন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

হাত ছাড়িয়ে হরিসাধন বললে—তা হয় না, খলসেকাঠীর মিত্তিররা মেয়ে আর দশ হাজার টাকা নিয়ে বসে আছে। ছেলে বি, এস-সি পাশ করবে, মেয়েও ঘরে আনব।

—আপনারও ত মেয়ে আছে।

—আছে বৈ কি। ছেলের বে'তে দশ হাজার পাব, তিন হাজার মেয়ের বে'তে খরচ করব।

আপিসে পৌঁছতে তারাপদর এক ঘণ্টা দেরী হল। বড়বাবু তারাপদকে দেখেই বললে—তোমরা সব শাঁখ বাজাও হে, তারাপদ বাবু এয়েচেন। বলি, এত দেরী হল ক্যানে?

তারাপদ কোন জবাব না দিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। বড়বাবু ছাড়বার পাত্র নন। একটা কাগজে কি লিখে এনে তারাপদকে দিয়ে বললেন—এর জবাব দাও হে।

—দিচ্ছি একটু পরে।

—তা'হলে এখানে লিখে দাও যে একটু পরে দেবে।

—আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই!

—আচ্ছা কি হে? কোম্পানী মাইনা দিচ্ছে ক্যানে?

—মাইনে যা দিচ্ছে তাতে ত দু'বেলা ভাত জোটে না।

পাশ থেকে এক জন মন্তব্য করলে—মাইনে দিচ্ছে ত মাথা কিনে নিয়েচে।

—বটে।—বড়বাবু গট্-গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেয়ারা এসে কিছুক্ষণ পরে তারাপদকে বললে—সাহাব সেলাম দিয়া।

—কোন সাহেব ?

—কিষ্টফোনী সাহেব।

—এবার যাও হে, শুনে এসো ডাকছে ক্যানে।

আপিসের মেজ সাহেব হচ্ছেন টি, সি, ক্রিশ্চিয়ানী। বুড়োরা এঁকে বলত মেজদা আর ছোকরারা বলত কেষ্টফনী, তুলসীচরণ কেষ্টফনী। কেষ্টফনী সাহেবের মেজাজ তখন ভাল অর্থাৎ তখন তিনি রসস্থ। তারাপদ সেলাম দিয়ে দাঁড়াতেই কেষ্টফনী বললেন—ওয়েল তারাপদ, তুমি না কি সেকশ্যনে খুব য়্যাজিটেশন চালাচ্ছ। তুমি কি কমিউনিষ্ট।

—না স্যর।

—দেন ? তোমার বাবা এখানে কাজ করেছেন, তুমি এখানে কাজ করছ, তোমাদের হোল ফ্যামিলিই ত অফিসের সারভেন্টস্।

—ইয়েস স্যর।

—দেন ? হোয়াই য়্যাজিটেশন ?

—আমাদের দু'বেলা পেট ভরে না।

—পেট ভরে না ত কোম্পানী কি করবে ? কোম্পানী ত দূরের কথা, ষ্টেটও কিছু করতে পারে না, ষ্টিল ইন ইনফ্যান্সি। আর এ কথা বলতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

—আমার যদি কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন।

—হাউ ?…ওয়েল, তুমি জেলে গেছ, I mean as a security prisoners ?

—না স্যর, আগে ত জেলে গেলে চাকরী থাকত না।

—এখন থাকে। তোমার ফ্যামিলিতে কেউ জেলে গেছে ?

—না স্যর।

—দেন, হাউ ক্যান আই রেকমণ্ড ইওর নেম। দেখ, আমি তোমায় স্নেহ করি, আই মীন আই পিটি ইউ। আচ্ছা, তোমার ছেলে আছে ? অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ যদি সে করে থাকে, তাকে নিয়ে এস, চাকরী করে দেব।

—আমার স্যর এক মেয়ে, আর সেই মেয়ে নিয়েই বিপদ।

—হোয়াট্ বিপদ ?

—মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছি না। যা টাকার দরকার, তা আমার নেই।

—তোমার মেয়ে দেখতে কেমন ?

—ভাল স্যর। বি-এ দেবে এবার, নাচতে পারে, গাইতে পারে।

—দেন, এ য়্যাকমপ্লিসিড গার্ল। আচ্ছা, টাকার সন্ধান আমি দিচ্ছি, তুমি এক কাজ কর, পরশু রেসে যাবে। আমার আগেকার ওয়াইফ, উইচ এখন ঘোড়াওয়ালা ভালচাঁদকে বিয়ে করেছে। ভালচাঁদের একটা ঘোড়া আছে, 'নেভার উইন,' তাকে ব্যাক কর। সিওর সাকসেস্।

—আমি স্যর রেস কখনও খেলিনি। তা ছাড়া স্যর, জন্তু-জানোয়ারের কাণ্ড।

—ডু ইউ নো দি য়্যাভারেজ ইনকাম্ অব এ রেস হর্স ?

তারাপদ চুপ করে রইল। সাহেব আবার বললেন—'রেসে ত যাবেই, আর তার পরের সপ্তাহে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেষ্ট খেলা দেখতে তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে। আমার পরিচিত মিলিওনিয়ার মিঃ ডশের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়েকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। ছেলেটি খুব ফ্লেক্সিবল (flexible), বহু মেয়ের সঙ্গে লভে পড়েছে, কিন্তু নট্ আপ টু দি মার্ক বলে কারুকে বিয়ে করেনি। তোমার মেয়ে যদি তাকে বাগাতে পারে, দেন, ইট্স রিয়ালি এ বিস্ গেম।'

তারাপদ শনিবার দিন রেসে গেল না। সোমবার দিন দুরু দুরু বক্ষে আপিসে গেল। কেষ্টফনী এদিকে জনবুল কিন্তু ক্ষুরের ব্যাপারে বুদ্ধি ক্ষুরধার। তারাপদ যা ভেবেছিল তাই, বেয়ারা এসে বললে—সাহাব সেলাম দিয়া।

ঘরে ঢুকতেই কেষ্টফনী বললেন—ডিড ইউ ব্যাক' নেভার উইন ?

—না স্যার, আমার পেটের অসুখ হয় বলে আমি আর মাঠে যেতে পারিনি।

সাহেব তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে তারাপদর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে বললেন—তোমাকে কনগ্রাচ্যুলেশন জানাচ্ছি। আমার তিন হাজার গেছে, ভাগ্যে আমার কথা শুনে খেলনি। বাই দি ওয়ে, তোমাকে শনিবার 'নেভার উইন'কে ব্যাক করতে বলিনি ?

—ইয়েস্ স্যর।

—দেন, হোয়াই ডিড ইউ নট ওবে মাই অডারস্। বেয়ারা—

—হুজুর!

খস-খস করে একটা কাগজে সাহেব লিখলেন, তারাপদর যেন সামনের মাসের মাইনে থেকে দশ টাকা কেটে নেওয়া হয়। কারণ সে সাহেবের কথা শোনেনি। কি কথা সেটা লেখা নেই। য়ুনিয়ন সরকার ভেঙ্গে দিয়েছেন, কাজেই কোন ভয় নেই।

—লে যাও ক্যাশ মে।

কাগজটা বেয়ারাকে দিয়ে তারাপদকে বললেন—শনিবার যা করেছ করেছ, কিন্তু ক্যামিং ফ্রাইডেতে যদি খেলা দেখতে না যাও, দেন, ইউ উইল লুস্ ইওর জব।

তারাপদ জ্বলতে জ্বলতে নিজের চেয়ারে এসে বসতেই বড়বাবু বললেন—কই হে, কালকের চিঠিগুলোর জবাব দাও।

—একটু দাঁড়ান, এই তো সাহেবের ঘর থেকে এলুম।

—তাতে দাঁড়াব ক্যানে। সাহেবের ঘর থেকে আসা মানে তীর্থ থেকে আসা বটে, তাতে দাঁড়াবে ক্যানে ? আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়লুম।

তারাপদ রেগে গিয়ে দু'হাত বড়বাবুর মুখের কাছে নেড়ে বললে, আর জ্বালাতনে পড়তে হবে না।

—ক্যানে, যাবে কোথায় ?

—যমের বাড়ী যাব বিষ খেয়ে।

—তা যাও ক্যানে। তবে যাবার আগে বলে যেও বটে. মেজ শালির ন' ছেলেটাকে তোমার জায়গায় নেবার জন্যে সাহেবকে বলে রাখব।

তারাপদর এক পিসী পরামর্শ দিলেন, রোজ শিব তৈরী করে মিলি যেন তাতে জল দেয়। তাতে বাবা তুষ্ট হয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। জল ঢালা হল কিন্তু তাতেও কিছু হল না। পিসী বুধবারে এলেন, এসে বৌকে বললেন—কিছু সম্বন্ধ-টম্বন্ধ হল ?

পঙ্কজিনী বললে—না পিসীমা। আপনার কথামত রোজ জল দিচ্ছি। জল দিয়ে ত কোন লাভ হচ্ছে না।

—তারা কোথায় ?

—কোথায় যেন গেছে। শুক্রবারে মিলিকে নিয়ে কোথায় যেন যাবে, মাঠে না কোথায়। তাই সব দূরবীণ-টুরবীণ চাইতে গেছে।

পিসী মুখ ভার করে বললেন—জল ঢালতে বারণ করিস্ বৌ। ও মেয়ের হাতে জল নিলে বাবার সর্দ্দি হবে শেষে। তারাকে বলিস্, মেয়ে আমরাও পেটে ধরেছি, কিন্তু হুট্-হুট্ করে মেয়েকে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মত চড়ে বেড়াই নে। আ মরণ ! চল্, লো ক্ষেন্তী।

পরদিন রাত্রে তারাপদকে পঙ্কজিনী বললে—কাল তোমাদের কি ? পিসী কত কি বলে গেলেন।

—বলে ত অনেকেই যান, তা শুধু বলেন কেন, মেয়ে পার করে দিয়ে যান না।

—কাল কোথায় যাবে ?

—খেলা দেখতে।

খেলা দেখতে ? কি খেলা ? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।

—ভীমরতি নয়। কেষ্টকর্ণী সাহেব মিলিকে নিয়ে টেষ্ট খেলা দেখতে যেতে বলেছে, না গেলে চাকরী থাকবে না।

—কেষ্টোকর্নের কি ভীমরতি ধরেছে ? তা তুমি যাবে যাও, মিলি কেন ? ও মেয়েছেলে, খেলার কি বোঝে ?

—হাসালে গিন্নী ! যে সব পুরুষরা যায়, তাদের মধ্যে ক'টা লোক খেলা বোঝে ? মেয়েদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, মেয়েরা না হয় পুরুষদের খেলা দেখার ইনস্পিরেশ্যান বাড়াতে যায়। মাঠে গিয়ে দেখ, মেয়ে-পুরুষের হরিহর-ছত্রের মেলা ! সারি-সারি গাড়ী, রং-বেরংএর শাড়ী। কারুর বুকে দূরবীণ ঝুলেছে, তাতে খেলাও দেখা চলে দূরের মানুষ কাছে এনেও দেখা চলে।

—ঢের হয়েছে।

—ভাবছ কেন ? এত চেষ্টা করছি, ফল কি পাব না, ভগবান আছেন, তিনি মঙ্গলময় ! আন্তরিক চেষ্টার ফললাভ অনিবার্য্য। ভগবান মুখ তুলে চাইবেনই।

—তাঁর চাইতে ভারী বয়েই গেছে। ক্ষেন্তীর বোন গেঁড়ীর কেমন পট্ করে বিয়ে হয়ে গেল। ছোট কুঁদির মেজ মেয়েটা যেন বর ঠিক করে জন্মেছিল। এত মেয়ে পার হল, আর আমার মেয়ের বেলা মুখপোড়া ভগবান যেন অন্ধ হয়ে গেছে !

—ছিঃ গিন্নী, ও কথা বলতে নেই। হিল্লে তিনি ঠিকই করে দেবেন। হাঁ, ভাল কথা, মিলির সেই পাঞ্জাবী মেয়েদের পোষাকটা বার করে দিও।

—কোন্‌টা ? যেটা পরে 'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল' করেছিল ?

—হ্যাঁ।

—সেটা পরে মিলি খেলা দেখতে যাবে ?

—হ্যাঁ, তুমি বুঝছ না। পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরলে বেশ স্মার্ট দেখতে হবে, বাঙ্গালী বলে মনেই হবে না। দেখনি, আজকাল বড়-বড় লোকের মেয়েরা অবধি শাড়ী ছেড়ে ওড়না উড়িয়ে উড়ে বেড়ায়।

মিলি ঘোর আপত্তি জানালে। ও পোষাকটা অনেক দিনের, বড্ড ছোট হয়ে গেছে। ওটা পরলে অতি বিশ্রী দেখাবে তাকে। তারাপদ হার মানল।

শুক্রবার সকালে তারাপদ আর মিলি বের হল। তারাপদর গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, হাতাটা কিছু ছোট বলে প্রায় কনুই অবধি ভাঁজ করা। এতে ভারিক্কী আর বনেদী ভাব আনে। কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের দু'পাশে ঝলছে বিয়ের সময়কার শাল; সম্প্রতি এটি কঞ্চিতে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ বহু স্থানে ছিড়েছে, রং জ্বলে গেছে। এক কাঁধে ঝুলছে বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে আনা ফ্ল্যাস্ক, অন্য কাঁধে খাবারের থলে। বাঁ হাতে মুঠো করে কোঁচাটা ধরা, ডান হাতে তর্জ্জনীর ডগায় চুণ আর মুঠোয় পান। মিলির পরনের শাড়ী গয়না ইত্যাদি পূর্ববৎ, কেবল বাঁ দিকে একটা বাইনকুলার ঝুলছে। কার কুলে বাইয়ে নিয়ে তুলবে কে জানবে।

পিতা-পুত্রী দুর্গা শরণ করে খেলা দেখতে বের হল। পঙ্কজিনী মেয়ের ছেঁড়া একটা তালি-দেওয়া সায়া পরে গায়ে স্বামীর গামছা জড়িয়ে সেদ্ধ-করা কাপড়-জামা কাচতে বসল, যার মধ্যে অধিকাংশ কাপড়-জামাই মেয়ের।

মিলির সামনে এক অবাঙ্গালী পরিবার পর-পর দু'টো বেঞ্চিতে জুড়ে বসেছিল। পরিবারটি সংখ্যায় দশ জন ড্রাইভার ও আয়াকে নিয়ে। গোটা সংসার নিয়ে এসেছে খেলার মাঠে; বসবার আসন, জলের কুঁজো, খাবার থেকে আরম্ভ করে ভুর্ রা টানবার কলকে অবধি। পরিবারের কর্ত্তাটি কখনও দুই উরুর ওপর কাপড় তুলে বেঞ্চিতে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছে মৌজে, কখনও বা খাবার খাচ্ছে, আর যখন সবাই হাততালি দিচ্ছে তখন হাততালি দিয়ে মিলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছে, বহুৎ আচ্ছা, ও হো-হো, উইগম ক্যায়সা খেলিস্।

মিলির পাশে বসেছিল এক নব-বিবাহিত দম্পতী। অবস্থাপন্ন না অবস্থাপন্নের ক'ঙ্গাল তা বলা শক্ত। তারা বেশীর ভাগ সময় নিজেদের দেখছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল।

প্রথম দিনে কিছু হল না, দ্বিতীয় দিনেও না। কেষ্টকর্নী বললেন—কাল নিশ্চয়ই আসবে। তারাপদ ভগবানকে প্রার্থনা জানাল, একটা উপায় কর প্রভু !

পঙ্কজিনীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল, দ্বিতীয় দিন রাতে যখন তারাপদ বললে—কালও যেতে হবে।

—কোথায়ও যেতে হবে না। এক কাজ কর, আমায় মেরে পুড়িয়ে এস। আমি ওপরে গিয়ে একবার তোমার ভগবানের সঙ্গে বোঝা-পড়া করি গে।

পরদিন মাঠে যাবার পথে মিলি বললে—বাবা, আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। কাল রাত্তিরে জ্বর হয়েছিল, এখনও বোধ হয় জ্বর আছে।

—ও কিছু নয় মা, আজকের দিনটা কোনও রকমে কষ্ট কর মা !

মাঠে ঢুকতেই মিলির সঙ্গে ওর এক বাল্য-সখীর দেখা হয়ে গেল। এই সখীটির বিয়েতে মিলি ভয়ানক জ্বরের অজুহাতে যায়নি। আসল ব্যাপার ছিল, মাসের তখন শেষাশেষি, টানাটানি চলছিল ভয়ানক ! ওর সখীর নাম রিনি। রিনি যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। রিনির পরনে প্রকাণ্ড একটি সিল্কের জাতীয় পতাকা। জামার হাতায় জাতীয় পতাকা, স্যাণ্ডেলে ষ্ট্র্যাপ অবধি তিন রঙের। প্রতি পদক্ষেপে রিনি তার শাড়ীর প্রান্তদেশে ঠোক্কর মারছে আর আশে-পাশে বঙ্কিম ভাবে কটাক্ষপাত করছে, কেউ মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছে কি না তা' লক্ষ্য করবার জন্যে। সভ্যতার চূড়ান্ত বটে !

মিলিকে দেখতে পেয়ে রিনি যেন হাতে চাঁদ পেল। দু'জনে পাশাপাশি বসল, রিনির সঙ্গে ওর বোন মিনিও ছিল।

খেলা আরম্ভ হল, রিনিদের গল্প সুরু হল। মিলি বললে—কর্তাটি কোথায় ?

—আজ আসতে পারেনি, কোথায় জরুরী কাজ আছে, সেইখানে গেছে। তুই কিন্তু আচ্ছা মেয়ে, আমার বিয়েতে এলি নে কেন ?

—বিশ্বাস কর, আমার নড়বার ক্ষমতা ছিল না সেদিন।

—তোকে কিন্তু আজ ছাড়ছিনি, খেলা শেষ হলেই বাড়ী নিয়ে যাব। তোকে দেখবার জন্যে ও ভারী ব্যস্ত।

মিলি বাপের কান এড়িয়ে চাপা-গলায় বললে—তুই কি এর মধ্যে পুরোন হয়ে গেলি ?

—যেতেও ত পারি। Frality thy name is man, Shakespeare পুরুষ ছিলেন বলেই woman লিখেছেন। পুরুষদের মতন এমন অল্পে-ভোলা জীব আর নেই। আবার এমনিই মজা, ওদের নইলে চলেই না, এইখানেই মেয়েদের ট্রাজিডি। মিলি, তুই বিয়ে করবি নে ? বিয়ে কর, নইলে জীবনটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে।

মিনি বললে—দিদি, চাঙ্গাবে আউট হয়ে গেল।

—আউট হয়েছে, বেশ হয়েছে, তুই চুপ কর !

তারাপদ মিনিকে ডেকে বললে—তুমি আমার কাছে এস মা, দিদিদের গল্প করতে দাও। মিলি ওদিকে একটু সরে যাও।

—শোন ভাই মিলি, আমার এক দেওর আছে, মিলিওনিয়ার আমার খুড়শ্বশুর মিঃ টি, সি, দাসের একমাত্র ছেলে. সে ঠিক তোর মত একটি মেয়ে চায়।

দুই সখীতে গল্প করে চলল। লাঞ্চে গণ্ডেপিণ্ডে গেলা হল, তিনটেয় চা। খাবার রকম দেখলে মনে হবে যেন কত কাল সব খায়নি। মিলির অবস্থা শোচনীয়। জ্বর এসেছে, সমস্ত শরীরে অবসাদ, চোখে ঝাপসা দেখছে। খেলা শেষ হতেই বাবাকে বললে—বাবা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চল, তোমার সাহেবের জন্যে আর দাঁড়াতে হবে না। রিনি, আর এক দিন তোদের বাড়ী যাব ভাই, আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার জ্বর হয়েছে।

রিনি আর মিনি চলে গেল। অদূরে কেষ্টফনীর সঙ্গে একটি সুবেশধারী ছোকরাকে আসতে দেখা গেল। ছোকরাটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু মুখ-চোখ দেখলে মনে হয়, কেমন যেন দরকচা মেরে গেছে। তারাপদর মনে হল, ছেলেটি বিশ্ব-বখাটে। মিলি ঝাপসা চোখে দেখলে, একটি রাঘব বোয়াল যা পায় তাই খায়। তারাপদর বুকটা দমে গেল, তবু মিষ্টি হাসি হেসে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশী হলুম। আচ্ছা চলি, মিলির আবার জ্বর গায়ে, বেশী স্ট্রেন সহ্য হবে না।

ছোকরার মুখের আলো যেন নিবে গেল। তারাপদ কেষ্টফনীকে সেলাম বাজিয়ে ছোকরাকে নমস্কার করে মেয়ের হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তিন দিন অবধি দেখে পাড়ার ডাক্তার বললে—আমার ভাল মনে হচ্ছে না, পেশ্যান্ট কেমন রেষ্টলেস্ হয়ে পড়ছে তা ছাড়া গলার টোনটাও কেমন চেঞ্জ করছে। আপনি বড় ডাক্তার দেখান, না হয় হাসপাতালে দিন।

হাসপাতাল মানে দাতব্য চিকিৎসালয় অর্থাৎ গরীবদের সেখানে সুবিধে হওয়ার কথা। তারাপদ যে রকম সুপারিশ করে মেয়ের জন্যে বেড ঠিক করলে, তাতে এই ধামাধরার দিনে একটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী কিংবা রিজিওনাল কণ্ট্রোলার প্রোকিওরমেণ্ট হওয়া যেত।

সকাল-সন্ধ্যায় তারাপদ মেয়ের খোঁজ নেয়। সকালে খোঁজ নেবার দরুণ প্রতিদিন আপিসে দেরী হয়। সেদিন কেষ্টফনী জিজ্ঞেস করলেন—রোজ দেরী হয় কেন ?

—মেয়েকে হাসপাতালে দিয়েছি, তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেরী হয় স্যর।

—মেয়ের কি রোগ যে দু'বেলা তার খোঁজ নিতে হবে ?

—রোগ ত স্যর, ডাক্তারাও ধরতে পারছে না।

—হুঁ, ডাক্তার, লণ্ডনে না পড়লে ডাক্তার হওয়া যায় না ; ও-সব কথা ছেড়ে দাও, আর তিন দিন দেখব যদি লেট হয়, দেন ইউ আর ফায়ারড।

চতুর্থ দিনের দিন কেষ্টফনী বসে আছেন তারাপদকে নোটিশ দেবেন বলে ; এগারটা বেজে গেছে অথচ তারাপদর দেখা নেই। কেষ্টফনী ভাবলেন, লোকটা কি মেয়ে-মেয়ে করে ক্ষেপে গেল না কি।

তারাপদ পৌনে একটায় আপিসে এল এবং এসেই দৌড়ে চলে গেল কেষ্টফনীর ঘরে। দড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকে হাতের কাগজটা টেবিলের ওপর ফেলে বললে—নাউ, কিপ ইওর প্রমিস, স্যর।

কেষ্টফনী অবাক হয়ে বললেন—প্রমিস্, হোয়াট প্রমিস্ ?

—এ সার্ভিস্ ফর মাই সন।

—কিন্তু তোমার ত একটি মাত্র মেয়ে, ছেলে নেই ত ?

—ইউ আর রাইট স্যর, বাট সি ইজ হি নাউ, স্যর।

কেষ্টফনী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হোয়াট ?

—মেডিকেল কলেজের রিপোর্টটা পড়ুন স্যার, তা ছাড়া কালকের খবরের কাগজেও পাবেন।

কেষ্টফনী পড়ে দেখলেন, তারাপদ যা বলছে, তা সত্যি। ওর মেয়েটির মধ্যে পুরুষের সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ডাক্তারেরা অনুমান করেন, ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত organs fully developed হবে।

কেষ্টফনী তারাপদর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে বললেন—'ওয়েল, কনগ্র্যাচুলেশ্যান। তোমার ট্রান্সফরমড ছেলের জন্যে চাকরী আমি দেব। ত্রিং হার আই মীন হিম্ টুমরো ইফ পসিবল।

বাড়ী ঢোকার মুখে হরিসাধন গুহের সঙ্গে দেখা। হরিসাধন আগেই হাত তুলে নমস্কার করে বললে—বোস মশাই যে, নমস্কার।

—নমস্কার।

—শুনলুম সব, শুনে ইস্তক কি আনন্দ যে হল মশাই, তা আর বলবার নয়। ভগবানের অসীম দয়া আপনার ওপর, আপনি মহাজন।—বলেই ফট করে তারাপদর হাত ধরে বললে—আমার মেয়েটিকে যদি পুত্রবধূ করেন, আমি আজীবন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

—তা কি করে হয়। বাবুইহাটার দত্তরা মেয়ে আর পনের হাজার টাকা নিয়ে পাঁজি খুলে বসে আছে। মিলি মানে আমার ছেলে বাড়ী আসবে আর সানাইও বাজবে। আপনার মেয়েকে কি করে পুত্রবধূ করি বলুন ?

'ত্রিস্রোতা' বলেন : "যেখানে যাওয়া যাইবে, সেখানেই বক্তৃতা কিম্বা দৈনিক সংবাদপত্র খুলিলেই চমকপ্রদ বক্তৃতায় তাহা [illegible]ক যে কম তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। মনে হয় যে, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। কিন্তু বক্তৃতার বাহিরেই হউক অথবা ভিতরেই হউক, কাজের কোন তালিকা নাই। বক্তৃতা অপেক্ষা সম্পন্ন কাজের তালিকা অনেক সুখপাঠ্য হইত। যাহা হউক, বক্তৃতা [illegible] সত্যিকার কাজ না করিতে পারিলে মানুষের কোন উপকার হইবে না। বক্তৃতার লোভ সম্বরণ করিয়া এখন সকলের কাজে মন দেওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণ আজ নানা ভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত। তাহারা সদা-সর্ব্বদা যাহাদের সান্নিধ্য লাভ করে, তাহাদের সামান্য মিষ্ট ব্যবহারেই ভুলিয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক। [illegible] জনসাধারণকে ভুলাইবার দিন প্রায় চলিয়া গিয়াছে।" কিন্তু আমাদের নেতারা মনে করেন, এখনও তাঁহারা কেবল বাজে [illegible] দিয়া জনগণকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন। সামনের নির্বাচন-সাগরও হয়ত পার হইবেন। জনগণের মনের গতি এখন কোন দিকে, কোন আদর্শ মতবাদের পক্ষে, কর্ত্তারা সে-বিষয়ে সামান্য খোঁজ-খবর রাখিলে ভাল কাজ করিবেন।

*   *   *   *

'সমবায়' মন্তব্য করিতেছেন : "প্রায়ই সংবাদ পাইতেছি, কলিকাতার একই এলাকাতে নূতন নূতন সমিতি রেজিষ্টারি হইতেছে। সমবায়ের নীতি অনুসারে সাধারণতঃ ইহা হয় না। অথচ ইহা হইতেছে। সমবায় বিভাগের এইরূপ অসমবায়ী কার্য্য-কলাপে আমরা দুঃখিত হইতেছি। ইহার প্রতিবিধান কিন্তু জনসাধারণকেই করিতে হইবে। জনসাধারণকে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সমবায় আন্দোলন সাধারণ মানুষের আন্দোলন। সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে সমবায় আন্দোলন হয় না। যে সকল এলাকায় এইরূপ একাধিক সমিতি রেজেষ্টারি হইয়াছে, সেইখানকার অধিবাসীদেরই অগ্রণী হইয়া হয় সকল সমিতিগুলিকে মিলাইয়া এক করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা ভিন্ন ভিন্ন এলাকা পৃথক করিয়া লইয়া এক একটি সমিতিকে সেই সেই এলাকার মধ্যেই কাজ করিতে হইবে। কলিকাতার এক-একটি ওয়ার্ডের এলাকা ও জনসংখ্যা খুবই বেশী, সেই জন্য এক-একটি ওয়ার্ডকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া কাজ করাই বিধেয়। কলিকাতায় যে সকল সমিতি হইতেছে, তাহার প্রায় সকলেই দ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রেই কাজ করিতেছেন। কিন্তু বণ্টন ব্যতিরেকে মানুষের আরো অনেক কিছু প্রয়োজন আছে। সেই জন্য যাহাতে অন্যান্য বিভাগও খোলা যায় তাহার জন্যও সমিতিগুলির মাথা ঘামান উচিত। ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান বিভাগ, শিল্প বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, অবসর-বিনোদন বিভাগ, গৃহনির্ম্মাণ বিভাগ প্রভৃতি বিভাগ খুলিবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার তাহা ছাড়া ভাণ্ডার বিভাগে এখনো অনেক সমিতিই মানুষের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় নাই। কেন তাহা হয় নাই, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের অসুবিধাগুলি যদি আমাদের নিয়মিত ভাবে জানান হয় তাহা হইলে আমরা সেই সকল অসুবিধা যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারি। আমরা জানি, অনেক সময় অনেক ফার্ম, ব্যবসাদার বা কারখানা তাহাদের জিনিষ সমবায় সমিতিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দেয় না। কিন্তু তাহারা জানে, এলাকার অধিকাংশ ক্রেতার সমর্থন ও দাবী এই সকল সমিতি-সমূহের পিছনে আছে তাহা হইলে জিনিষ-পত্র না দিয়া পারিবে না। ইহার ফলে ব্যবসাদাররা যে লাভ খাইত তাহা ক্রেতাগণ পাইবেন। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া উঠিলে এবং তাহা সুপথে পরিচালিত হইলে, আজিকার অনেক সমস্যা সমাধান হইবে।" কলিকাতার সমবায় সমিতিগুলি (নূতন) সম্বন্ধে আমরাও নানা কথা শুনিতেছি। কেহ কেহ বলেন, এগুলি তেলা মাথায় তেল ঢালিবার নূতম যন্ত্র। দরিদ্র জনসাধারণের উপকার সমিতিগুলি করুক বা না করুক, ব্যক্তি বা দলবিশেষের পক্ষে ইহা অতীব সুখের আকর হইয়াছে।

*   *   *   *

'দৃষ্টি' দুঃখ করিয়া বলিতেছেন : "চোরাবাজার দখল করার সঙ্কল্পের কথা চোরাবাজার শব্দটির উৎপত্তির দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। বিশেষ আইন আছে, গোয়েন্দা পুলিশ আছে, নেতৃবৃন্দের ভীতি ও সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা আছে, সংবাদপত্রে সুযুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় আছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, কোন চোরাকারবারীকে আজ পর্য্যন্ত ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণদান করিতে হইল না। কোন মেদবহুল স্ফীতোদর চোরাকারবারীকে সরকারী আতঙ্কে ওজনে এক পাউণ্ডও কমিতে দেখা গেল না। চোরাকারবার দমনে সরকার অথবা জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের সহিত জনসাধারণকেও খুব বেশী ক্ষেত্রে সক্রিয় হইতে দেখা যায় নাই। প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়? ক্রয়শক্তি (টাকা) বিভিন্ন স্তরের লোকের হাতে অসম ভাবে বণ্টিত, ফলে প্রয়োজন সমান হইলেও সকলের ক্রয়শক্তি সমান নয়। উৎপাদন না করিয়া মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্যবসায়ের নামে লাভ করিবার লোকের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। প্রয়োজনের বা চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অতিশয় কম অথচ মুদ্রাস্ফীতি বর্ত্তমান, এইরূপ অবস্থায় চোরাকারবার সম্ভব না হইয়া পারে না। চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, যত দূর সম্ভব ক্রয়শক্তির সমভাবে বণ্টন, ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে অনাবশ্যক মধ্যবর্ত্তী লোকের

বিলোপ সাধন, এবং সরকারী কর্মচারিগণের সততাপূর্ণ সহৃদয় আচরণ এবং সর্ব্ব স্তরের জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত সমাজবোধই চোরাকারবার রোধ ও উচ্ছেদ করিতে সক্ষম। যে পরিবেশে চোরাকারবার সম্ভব হইতেছে সব দিক্ দিয়া সেই পরিবেশকে আক্রমণ করিতে না পারিলে চোরাকারবার রোধ করা সম্ভব হইবে। যাহা চোরাকারবার বা চোরাবাজার তাহাই ত স্বাভাবিক। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিষ কোথায় মেলে? মূল্য নিয়ন্ত্রণ হইলেই জিনিষ বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যে জিনিষ পাওয়া যায় না কালাবাজারের দরে তাহা পাওয়া যায়। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ্যে দিবালোকে "কালোবাজারে" কেনা-বেচা চলিতে থাকে। পুলিশ দেখিয়াও দেখে না, দেখিলেও তাহার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। এক দরজা বন্ধ হইলে সহস্র দরজা উন্মুক্ত হইয়া যায়। মনে হয় যাহা নিয়ন্ত্রিত তাহাই বুঝি কালো, যাহা নিয়ন্ত্রিত তাহাই অস্বাভাবিক। দেশে মনের দিক্ দিয়া কার্যাতঃ না হইলেও কম-বেশী সকলেই চোরাকারবারী। এই অবস্থায় সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া দুই-একটি বক্তৃতা বা বিবৃতি দিয়া, এক-আধটা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া চোরাকারবার দমন সম্ভব হইবে না। শ্রমিক কৃষকের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা, যুবকের নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা, জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে বলিষ্ঠ সরকার কর্তৃক কায়েমী স্বার্থের মূলে নির্মম কুঠারাঘাতই চোরাকারবারের মূলোচ্ছেদ করিতে পারে। যাহা সর্ব্বব্যাপ্ত তাহাকে সব দিক্ দিয়াই আক্রমণ করিতে হইবে; অন্যথায় চোরাকারবার চোরাকারবারই থাকিয়া যাইবে। নেতার বক্তৃতা, সরকারের নিষ্ফল হুমকী কোন কাজেই লাগিবে না। গভীর জলের মাছ গভীর জলেই থাকিয়া যাইবে।" 'দৃষ্টি' একটা কথা কেন বলিলেন না, বুঝিলাম না। চোরাবাজার যত দিন কেবল চোরদের দখলে ছিল, তত দিন ইহা উপর মহলে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে সাধু ব্যক্তিরা এই বাজার একচেটিয়া করিলেন, সেদিন হইতে চোরাবাজার পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বহু কংগ্রেসী নেতা আজ চোরাবাজারের দৌলতে দৌলতমান হইয়াছেন, এমন কথাও শুনা যায়। আমরাই কেবল বোকা গর্দ্দভের দল! লোককে গালি দিয়া, নিন্দা করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিলাম।

* * * *

জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে প্রবন্ধের এক স্থানে 'দৃষ্টি'তে দেখিতে পাই: "বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষক নিয়োগের পরেই প্রশ্ন উঠে শিক্ষকের বেতন এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন খরচ-পত্র। সমস্ত রকমের ভাতা সহ বর্ত্তমানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক মাসিক ৩৪।• টাকা, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক মাসিক ২৪।• টাকা এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ ২•।• টাকা হিসাবে বেতন পান। স্থানীয় স্কুলবোর্ড আরও ৭৲ টাকা হইতে ১•৲ টাকা বেশী বেতন দিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন এবং সরকার মঞ্জুর করিবেন বলিয়া শোনা যায়। তাহাতে সর্ব্বাধিক বেতনের হার মাসিক ৪৩।• টাকা। এই অল্প বেতনে আজকালকার দিনে জীবনধারণ করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। বেতনের হার গড়ে ৩৫৲ ধরিলে ৭১২৫জন শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন হয় বাৎসরিক প্রায় ৩• লক্ষ টাকা। কিন্তু স্কুলবোর্ডের সাম্প্রতিক আয় শিক্ষাকর বাবদ সাড়ে নয় লক্ষ টাকা এবং সরকার-প্রাপ্তি অন্যান্য সাহায্য বাবদ আরও সাড়ে চার লক্ষ টাকা অর্থাৎ বাৎসরিক মোট ১৪ লক্ষ টাকা। অতএব দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যকের অর্দ্ধেকের বেশী শিক্ষক পোষণ করিবার ক্ষমতা বোর্ডের নাই।" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। ভবিষ্যৎ দেশের আশা-ভরসা মানুষ যাঁহারা নির্ম্মাণ করিবেন, তাঁহাদের পেট ভরিয়া খাইতে দিবার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের, জনগণের নহে।

* * * *

'রাঢ়দীপিকা' একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সত্য-মিথ্যা বিচার করিবেন প্রাদেশিক সরকার, বিশেষ করিয়া সরবরাহ বিভাগের মহামান্য মন্ত্রী মহাশয়—"পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশের গবর্ণমেন্ট ভেজাল দ্রব্য জনসাধারণকে নির্ব্বিবাদে খাওয়াইয়া জনসাধারণকে মারিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে একটি মাত্র উত্তর—পঃ বঙ্গের সরকার। ভেজাল ধরার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু ভেজাল ধরা হয় না, নইলে বাজারের আটা, ময়দা, তেল, কোন দিন বিশুদ্ধ হইত।" আমাদের এ-বিষয় বলিবার কিছুই না। কারণ কোন খাদ্য ভেজাল, কোন নহে, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রায় লোপ পাইয়াছে এখন বরং ভেজাল খাদ্যই আমাদের পেটে সহ্য হয়, বিশুদ্ধ ঘি-তেল আটা-ময়দা হজম করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই বলিলেই চলে।

* * * *

'নীহার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রলেখক বলিতেছেন: "বাস্তু সমস্যা বড়ই বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন জেলায় বাসোপযোগী অনেক জায়গা অপ্রয়োজনীয় বা অনাবাদী রহিয়াছে, অথচ এই পশ্চিমবঙ্গেরই বহু ব্যক্তি স্থানাভাবে অতি সংকীর্ণ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। কেউ বা বাস করিতে পারিতেছে না, কেউ বা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে কালাতিপাত করিতেছে, কেউ বা বাস্তুহীন হইয়া অপরের আশ্রয়ে দিন যাপন করিতেছে। ইহাদের অনেকের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে ঐ সব অতি প্রয়োজনীয় জায়গা কিনিতে পারিতেছে না। জমি জায়গার বর্ত্তমান অবস্থিতি সাংসারিক, পারিবারিক ও শারীরিক উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। একের বাস্তু ও জল-জমির সংলগ্ন সামান্য কিছু অনাবশ্যক জায়গা রহিয়াছে, তাহা সে প্রথম ব্যক্তিকে দিতে চাহিতেছে না, যদি বা কেহ দিতে রাজী হয় তাহাতে সে যে মূল্য দাবী করে তাহা গৃহীতার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে জমি-জায়গার বণ্টন-ব্যবস্থায় ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা অহেতুক অশান্তি বিরাজমান রহিয়াছে। পল্লীতে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে জরিপ করিয়া জমি-জায়গায় পুনর্বণ্টন এবং ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োগের সুযোগ দিয়া Land Acquisition Actটি সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা, আইন সভা ও প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" ঠিক এই বিষয় এবং সমস্যা লইয়া আমরাও বহু কথা এবং বহু প্রস্তাব করিয়াছি, কিন্তু এখনো কাজে কিছুই হয় নাই। কলিকাতার আশে-পাশে বহু ভাল জমি বেকার পড়িয়া আছে—সেগুলিকেও কাজে লাগাইতে কর্ত্তারা নারাজ কেন, তাহা জানি না!

* * * *

'দামোদর' মন্তব্য করিতেছেন : "পানাগড় বেসের বাস্তুহারাগণ সম্প্রতি এক সভায় দাবী করিয়াছেন যে, এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব সরকার অধিকৃত তাহাদের বাস্তু ও কৃষির জমিগুলি অবিলম্বে তাহাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হউক। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ঐ জমি লইয়াছিলেন, তখন জমি ফেরৎ দিবার প্রতিশ্রুতিই ছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, সরকার জমিগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন এবং জমির মালিকগণকে জমির নির্দ্ধারিত মূল্য লইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত ভিটা ও জমি ফেরৎ পাইবার আশায় এত দিন ধরিয়া কোথাও স্থায়ী আস্তানা না করিয়া আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেই কাটাইতেছেন। এখন জমি ফেরৎ দেওয়া হইবে না শুনিয়া আত্মীয়-স্বজনগণও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন এবং বাস্তুহারাদিগকে নিজ নিজ পথ দেখিতে বলিতেছেন ; ইহা অস্বাভাবিক নয়।" অস্বাভাবিক কিছুই নহে। অস্বাভাবিক কেবল মাত্র জনগণের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার চেষ্টা ! সরকার হইতে যাহাদের বাস্তুহারা করা হইয়াছে, তাহাদের পুরানো বাস্তুতে, কিংবা অন্যত্র অন্য কোন স্থানে যেমন করিয়াই হোক বসবাসের সকল সুবিধা দান করিতে হইবে। সরকার বাহাদুর সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া জনগণের মনে যে প্রকার বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার ফল ভাল হইবে না। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যায়-বুদ্ধি এখনো সকল বিষয়ে লোপ পায় নাই।

*   *   *   *

"পত্রিকান্তরে প্রকাশ : বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর প্রতি কেন্দ্রীয় ও সংলগ্ন প্রদেশের সরকারী অবিচার ও পশ্চিম-বাঙালা সরকারের অবাঙালী প্রীতির সম্পর্ক আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিহার সরকার কর্তৃক সিংভূম ও মানভূম জেলা হইতে বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারীদের বিতাড়ন কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। অক্লান্ত কর্ম্মী, অভিজ্ঞ, উপযুক্ত ও বিজ্ঞ বাঙালী সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যন্ত অশোভন তৎপরতার সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারযোগে খামখেয়ালীর সহিত বদলী করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদেরও বাদ দেওয়া হইতেছে না। সাধারণ নিয়মানুযায়ী বদলী করিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু সিংভূম মানভূম জেলায় বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে, তাহার একমাত্র অর্থ হইতেছে যে, এই দুইটি বাঙলা-ভাষাভাষী জেলায় বাঙালী সরকারী কর্ম্মচারী রাখা হইবে না। অর্থাৎ বাঙালী কর্ম্মচারীদের বিহার সরকার এই দুইটি জেলার কর্তৃত্ব-ভার দিয়া বিশ্বাস করেন না। এহেন ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি এইরূপ অহেতুক আচরণ করার উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। অথচ নেতারা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বিশেষ ভাবে বাঙালীকে এই সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙলায় প্রাদেশিকতা দোষ আদৌ নাই বলিলেই হয়। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে বাঙলা দেশে লক্ষ লক্ষ অবাঙালীর পেট মোটা হইত না। বাঙালী নিজের উদরশূন্য করিয়া অবাঙালীদের পেট ভরাইতে পারিত না। বাঙালী নিজের জাতির প্রতি চিরদিনই উদাসীন। না হইলে অবাঙালী ষড়যন্ত্রে বাঙালী ব্যাঙ্কগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর অবাঙালী ব্যাঙ্কগুলি বাঙালীদের অর্থেই পরিপুষ্ট কখনও হইতে পারে? এক বাঙলায়ই ইহা সম্ভব হয়, অন্য প্রদেশ হইলে বিশেষতঃ বিহার হইলে এইরূপ কখনও সম্ভবপর হইত না।" কিন্তু এ ভাবে কেবল ক্রন্দন করিয়া আর কোনো লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার চোরাই অঞ্চলগুলিকে বিহারের কবল হইতে উদ্ধার করার আর কোনো চেষ্টা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। উৎসাহ প্রায় নিবিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালী যে-দুই জন মহামন্ত্রী আছেন, তাঁহারাও এ-বিষয়ে এবং বাঙলার অন্যান্য দাবীর বিষয়ে আর কোন কথা বলিতে ভরসা করেন না। কেন? হুকুম নাই বলিয়া। এদিকে খাস বাঙলায় বাঙালী ছেলে-ছোকরা এবং যুবকের দল বাজে হৈ-হুল্লোড়ে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক দল ট্রাম-বাস পোড়াইতেছেন, আর এক দল তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। এই অবসরে অবাঙালীর দল বাঙালার ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কি ক্ষেত-খামারের কাজগুলিও দখল করিয়া লইতেছে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি কাহারো নাই। না জনগণের, না সরকারের। নিজেদের দাবী যদি কর্ত্তাদের স্বীকার করাইতে হয়, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। এ কথা বলিতে হইবে যে—"কাহাকেও মারিয়া আমরা বাঁচিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মারিয়া অন্যকেও বাঁচিতে দিব না।" দ্বিতীয় পথ কি আছে?

*   *   *

'মেদিনীপুর হিতৈষী' বলিতেছেন : "ভারতের অধিবাসী বড় আশায় বড় উদ্যমে কংগ্রেসকে মনে-প্রাণে সর্ব্বস্ব দান করিয়া সাহায্য করিয়াছিল যে, ইহাদের উদ্যমে দেশ স্বাধীন হইলে ভারতের জনগণ খাইয়া-পরিয়া সুখী হইবে, দেশে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিবে, শিল্প-বাণিজ্যে ভারত জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। সে আশায় তাহারা আজ নিরাশ হইয়াছে! দেখিতেছে চারি দিকে হাহাকার! তাহারা ভাত-কাপড়ের জন্য হায়-হায় করিতেছে, সুখ-শান্তি শিল্প-বাণিজ্য দূরে যাউক, এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান জন্য তাহাদিগকে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। কণ্ট্রোলের ধমকে তাহারা অর্দ্ধমৃত হইয়াছে। ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত সেই সবই বর্ত্তমান আছে। সেই ট্যাক্স-ট্যাক্সে তাহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। যাহা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আহার্য্য, তাহাতেও ট্যাক্সের ধুম। চাল, চিনি, আটা, ময়দা, ডাউল, মসলা, দেশলাই, কাপড়, কাগজ সবেই—ট্যাক্স জনসাধারণের ট্যাক্স ধ্বংস করিতেছে। ২৲ ও ২।• টাকা মণ ধানের মূল্য এখন ১০।১২ টাকা বা ১৫।১৬ টাকা ; চাউলের ত কথাই নাই। দরিদ্র জনসাধারণ বাঁচে কেমন করিয়া? যে কৃষকের প্রতি দরদের সীমা নাই, সেই কৃষকই খাইতে না পাইয়া মরিবে। দিন-মজুর এখন ২৲ টাকা! ধানের মূল্য চড়াইয়া কৃষকের কি লাভ হইল? ধানের মূল্য ২।২।• থাকিলে ।• আনায় মজুর পাওয়া যাইত। ধান-চালের স্বচ্ছলতায় তাহারা উল্লসিত ও শান্তিলাভ করিত। কৃষককে উল্টা বুঝাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশই করা হইতেছে।" সর্ব্বত্র একই কথা! আমরা এ-বিষয় নূতন করিয়া কিছু বলিব না। কিন্তু সরকার বাহাদুরকে স্থিরমস্তিষ্কে আর একবার দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং জনগণের মনের কথার সন্ধান লইতে বলিব। দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া জনগণ দিশাহারা হইয়া কখন কি করিবে তাহা বলা যায় না।

মীনা মুখোপাধ্যায়

সারা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর সন্ধ্যার দিকে আকাশটা একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, রাস্তায় আবার লোকের আনাগোনা সুরু হয়েছে।

জানলাটা এতক্ষণ বন্ধই ছিল। সুমিত্রা কি মনে করে জানলাটা হঠাৎ খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশি ভিজে হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সুমিত্রার এলোমেলো চুলের মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা চলে গেল—আরও এলোমেলো করে দিয়ে গেল তার কৃষ্ণকালো চুলের গোছাগুলোকে। চুলগুলো সামলাতে সামলাতে বাইরের দিকে চাইল। চাউনির মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই ছিল না—এমনি অর্থহীন।

রাস্তার ওপারের ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে ছোট একটি মেয়ে ভিজে চুপচুপে শতচ্ছিন্ন একটি জামা গায়ে—না থাকারই সামিল—ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। হয়ত বা ভিখেরী—কেউ নেই। কে এক জন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে মেয়েটি কাতর কণ্ঠে বললে—"সারা দিন কিছু পাইনি বাবু, একটি পয়সা—" কথা শেষ করতে পারল না; তার আগেই তাকে এক ধমক দিয়ে ভদ্রলোকটি সামনেই একটি রেঁস্তোরায় প্রবেশ করল।

সহরের পথে-ঘাটে এ দৃশ্য নতুন নয়। স্থানে, অস্থানে অবস্থাবানের অহেতুকী ক্রোধের অভিব্যক্তিও সুমিত্রা বহু বার লক্ষ্য করেছে। কিন্তু আজকের এই ছোট ঘটনাটি সহসা তার মানসলোকে এত অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করল! কি অদ্ভুত মানুষের প্রবৃত্তি! মেয়েটিকে একটা ধমক দিয়ে সে নিজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে ঢুকল। এতগুলো ছেলের মধ্যে এক জনেও কি একটা ফুটো পয়সা দিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করতে পারল না? মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সঙ্গতি তার নেই। তাই বলে কি তার বাঁচবার অধিকারও নাই? সারা দিন বড়লোকদের ধমক খাবে, আর পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে! ওদের কি এই জীবন! এমনি ভাবেই বড় হবে—এমনি ভাবেই খেতে না পেয়ে-পেয়ে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে! ওদের কি এই সমাজের মধ্যে একটুও স্থান নেই—একটুও মেশবার অধিকার নেই? হয়ত নেই! ওরা যে নিঃস্ব!

সামাজিক ব্যবস্থার এই অসঙ্গতি নিয়েই অনিলদার সঙ্গে আজ তার ঝগড়া হয়ে গেছে! তাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল এক উৎসবে। কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল, "যে টাকা খরচ করে তোমরা এই উৎসব রোজই করছ, সেই টাকাটা অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিও। যে দেশের লোকেরা দিনের পর দিন না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, সেই দেশেই এক শ্রেণীর লোক অজস্র টাকা খরচ করে ফুর্ত্তি করছে! তোমার লজ্জা করছে না? আমি তোমাদের ও-উৎসবে যোগ দিতে কিছুতেই পারব না দিদি যদি যায় ওকে নিয়ে যেও।"

"অনিলদা জবাবে বলেছিল, "সুমি, এটা তোমার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।" সুমিত্রা উত্তর দিয়েছিল—"হতে পারে। কিন্তু জেনে রেখো, তোমাদের ও-সমাজের সঙ্গে আমি নিজেকে একটুও খাপ খাওয়াতে পারব না। পারব না ওদের ভুলে থাকতে—যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না—চোখের জল যাদের শুকয় না—আমি যে পাচ্ছি না তাদের ভুলে থাকতে।"

সুমিত্রার বড় ইচ্ছা হল, অনিলদাকে ডেকে এনে একবার দেখায় কিন্তু বৃথা! ওরা তো সব সময়ই এ সব দেখছে, ওদের ধমকেই তো এরা সব সময় জর্জ্জরিত! অনেক রকম কথা মনের মধ্যে তার তোলপাড় করতে লাগল। হঠাৎ চমক ভাঙল। আরে! মেয়েটিকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল? একটু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, পাশের ঐ গাছটার তলায় বসে মেয়েটি একদৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

* * *

সুমিত্রাদের বাড়ীটা খুব বড় না হলেও একেবারে ছোট ছিল না। নীচের ঘরগুলোকে একেবারে খালি না ফেলে রেখে, তার বাবা ওরই মধ্যে ভাড়াটে বসিয়েছিলেন। ভাড়াটেরা তিনটি প্রাণী—অজিত, অণিমা ও তাদের মা।

অজিত এম-এ ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু অবসর সময়ের পেশা ছিল তার ছবি আঁকা। আরও হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু সে যে কি তা কেউ জানত না। শোনা যায়, ইতিপূর্ব্বে দু'-এক বার পুলিসের নেক নজরে পড়ে জেল খেটেও এসেছে।

উপরের লোককে নীচে নামতে হলে অজিতদের এই বারান্দা পার হয়ে তাকে যেতে হয়। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে অজিত দেখল বাড়ীতে কেউ নাই। ঠাণ্ডার দিনে ভেবেছিল বাড়ী থেকে এক কাপ চা খেয়েই ক্লাবের দিকে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। তবু যে এক কাপ চা না হলে তার চলছিল না। কি একটু ভেবে সে সুমিত্রাদের উপরের দিকে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা দিতেই সুমিত্রার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল।

অজিত সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "সুমি, এত রাত্রে একলা কোথায় বেরুচ্ছ?"

সুমিত্রা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। জবাবে আমতা-আমতা করে বল্লে—"কোথাও না, আপনাদের এখানেই আসছিলাম। অনিমা কোথায়?"

"জানি না তো, ওরা সবাই কোথায় বেরিয়েছে। ভিজে ভিজে কলেজ থেকে এসে এক কাপ চা পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম তোমাদের ওখানে গেলে হয়তো এক কাপ জুটতেও পারে। দেবে এক কাপ? আমাদের উনুনে আগুন নাই, থাকলে হয়তো তোমাকে জ্বালাতন কোরতাম না।"

সুমিত্রা কৃত্রিম অভিমানের সুরে জবাব দিলে, "বললেই হয় এক কাপ চা দাও, এত বিনয় কেন? কোনও দিন কি আপনাকে চা দিইনি?"

"আহা, রাগ করছ কেন? আমি কি বলছি তুমি দাওনি? কথা রেখে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো তো লক্ষ্মীটি!"

সুমিত্রা কি উদ্দেশ্যে নীচে নেমেছিল তা অজিতকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু ভয়ই বা কি? অজিতদা তো এদেরই জন্য কত বার জেল খেটেছেন—এদের সুবিধার জন্য কত বার কত আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিসের কাছ থেকে লাঠি খেয়েছেন। সেদিন তো অজিতদাই বলছিলেন, "ওরা যত দিন না সুখী হবে তত দিন আমাদের কাজের বিরাম নাই। ওদের জন্য সংগ্রাম আমাদের চিরদিন করতে হবে। যত দিন না পর্য্যন্ত ধনীদের

কাছ হতে ওদের দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত হচ্ছে যত দিন পর্য্যন্ত না ওরা হাসিমুখে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।"

এতক্ষণ একদৃষ্টিতে ও অজিতদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অজিতও একটু অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ ওকে এখনো পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লে, "কি সুমি, তুমি এখনোও গেলে না?"

সুমিত্রা চোখটা নীচু করে জবাব দিলে, "আমি যে একটু বাইরে যাবো। বাইরে ঐ গাছতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ে কাপড় নেই, যেটুকুও আছে, তাও শতছিন্ন আর তাও আবার গেছে বৃষ্টিতে ভিজে। তাকে এটা দিয়ে এসে চা করে দিচ্ছি। এক্ষণি আসবো।"

সুমিত্রার উদ্দেশ্যে অজিত বিস্মিত হল না। জবাবে গম্ভীর ভাবে বললে, "আচ্ছা সুমি, এ রকম তো অনেক আছে। তুমি এক জনকে দিয়ে দুঃখীর দুঃখ মেটাতে পারবে? ওর বর্ত্তমানে কষ্ট হয়তো মিটবে, কিন্তু আরেক জন যখন দেখবে ওর এই ভিক্ষের উপার্জ্জন, তার কষ্ট আরও বাড়বে। তুমি এমনি করে ক'জনের দুঃখ মেটাতে পারবে? দুঃখীর দুঃখ তো এমনি করে মেটানো যায় না সুমি।"

"জানি, কিন্তু অজিতদা, চোখের সামনে ওর কষ্ট যে দেখতে পাচ্ছি না।"

"তোমাকে আমি দিতে বারণ তো করছি না সুমি, আমি বলছিলাম, দানে কখনোও দুঃখ মেটানো যায় না।" তার পর কি একটু ভেবে অজিত পুনরায় বললে—"কৈ, দাও তো আমায় ওটা। আমি দিয়ে আসছি। রাত্রে আর একা বাইরে যেও না।"

"আচ্ছা অজিতদা, আপনি তো বলেছেন সাহস না থাকলে কোন কাজ করা যায় না। আবার আপনি একা আমায় বাইরে যেতে দিচ্ছেন না। এমনি করেই তো আপনারা আমাদের পেছনে টেনে রাখছেন।"

অজিত একটু হেসে জবাব দিলে—"একা বাইরে গিয়ে ভিক্ষে দিয়ে কি এমন সাহসের পরিচয় দেবে? এক্ষুণি তোমার বাবা কি মা দেখলে একটা ধমক দেবে অমনি ভালমানুষের মত সুড়-সুড় করে পড়ার ঘরে ঢুকবে। এইটুকু তো তোমার দৌড়। সাহসের পরিচয় এমনি ভাবে দেওয়া যায় না, আর এটা তো সাহসের পরিচয় নয় সুমি, এটা দাতার অভিমান।"

"তা হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।"

"বেশ চলো।" বলে অজিত বাইরে বেরুল, সুমিত্রাও সঙ্গে চললো। গলি দিয়ে গিয়ে খানিকটা পর রাস্তা। অজিত জিজ্ঞাসা করলো, "কৈ, মেয়েটা এখানে নেই তো?"

সুমিত্রা একটু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বললে, "ঐ যে, ঐ ফুটপাথে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, ডেকে আনুন না ওকে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

অজিত একটু এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ডাকল। মেয়েটি ছুটতে-ছুটতে এসে অজিতের সামনে দাঁড়াল। অজিত ওকে সুমিত্রার কাছে নিয়ে এল। সুমিত্রা ওর ছোট্ট হাত দু'খানির মধ্যে কাপড়খানা ও নোটটা গুঁজে দিয়ে বললে,—"ভিজে কাপড়টা খুলে ফেল। আর এটা দিয়ে কিছু কিনে খেয়ো, কেমন?" আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু অজিতের সামনে ভয়ে-লজ্জায় তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

মেয়েটির মনে হ'ল, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কিছুক্ষণ অর্থহীন অবাক্ দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে থেকে, সহসা হেঁট হয়ে সুমিত্রাকে প্রণাম করতে গেল। সুমিত্রা এক পা পিছিয়ে এসে বললে—"ছি, প্রণাম কচ্ছ কেন? ছুটে বাড়ী চলে যাও—বৃষ্টিতে ভিজো না।"

মেয়েটি আরও খানিকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে চলে গেল।

অজিত ও সুমিত্রা অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, হয়ত মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। হঠাৎ সুমিত্রা খেয়াল হতেই ফিরে গেল। অজিত সেই অন্ধকারের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবপ্রবণ মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীগুলোর ওপর দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কিসের একটা আলোড়ন বয়ে গেল—সমস্ত তন্ত্রীগুলো একসঙ্গে শব্দমুখর হয়ে উঠল।

অজিতের সহসা আজ মনে হল, সুমিত্রা অতি সুন্দর। দেহে, মনে, কর্ম্মে, করুণায় অপরূপ। তুলনা নাই, সর্ব্বহারার দুঃখে বিগলিত-চিত্ত তাদের অবজ্ঞাত ব্যর্থ জীবনের সমস্ত গ্লানির যত কিছু অভিশাপ সব যেন আজ সে সুমিত্রার করুণ দু'টি চোখের মধ্যে দেখতে পেল। দেখতে পেল, অধঃপতিত একটা জাতির সমগ্র দুঃখের এক পাষাণী মূর্ত্তিকে।

মাঝে-মাঝে অজিতের ইচ্ছে হয়, ওর পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সুমুখের ঐ দুরন্ত ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই ঝড়ের উদ্দাম গতিমুখে ভেসে গেছে কত সাধক। ভয় কি? যদি তাই সম্ভব হয়—হাজারে হাজারে আসবে সুমিত্রা আর অজিতের দল। অসম্ভব শক্তি প্রয়োগ করে রুদ্ধ করে দেবে ঝড়ের গতিকে। সুপ্রতিষ্ঠিত করবে জাতির ভাগ্যলক্ষ্মীকে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। দেখল সুমিত্রা তার পাশে নাই। ছুটে বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পেল, সুমিত্রা ওপর থেকে চা নিয়ে নামছে।

অজিত হেসে বললে, "আমায় একলা ফেলে তুমি যে বড় পালিয়ে এলে?"

"আমার তো আর আপনার মত ভাববার ফুরসৎ নেই? চা করতে ছুটে এলুম। এই নিন, ধরুন, খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। আমি চললুম—কাল আবার স্কুল আছে।" বলে সামনের টি-পয়ের ওপর চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে উপরে উঠতে গেল।

অজিত বাধা দিয়ে বললে, "শোন। যেও না, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব।"

সুমিত্রা ফিরল। বললে, "বলুন।"

অজিত আবিষ্টের মত তাকে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা সুমিত্রা, তুমি তোমার দেশকে ভালবাস?

সুমিত্রা হেসে ফেলল। জবাবে বললে, "ওমা, এ আবার কি কথা! নিজের দেশকে কে আবার ভালবাসে না?"

"না সুমি, সে রকম ভালবাসা নয়। এই দেশের যত কিছু কল্যাণ অকল্যাণ, যত কিছু সঞ্চিত অভিশাপ, সব কিছুকে সমান ভাবে তুমি ভালবাসতে পারবে?"

আবহাওয়াটা হালকা করবার অছিলায় সুমিত্রা বললে, "এদিকে আপনার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

অজিতের কানে ও-কথা ঢুকল না ; পুনরায় প্রশ্ন করলে—"কই, বললে না ?"

সুমিত্রা সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে এল, স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অজিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিলে, "অজিতদা, আমি বিচার করে কখনও কারুকে ভালবাসিনি। যেদিন থেকে দেশকে ভালবাসতে শিখেছি, সেদিন থেকেই এই হতভাগ্য দেশটার পাপ-পুণ্য, ছোট-বড় সব কিছুই ভালবেসেছি। ভালবেসেছি এই দেশের মাটিকে, ভালবেসেছি এই দেশের সোনাকে।" বলতে বলতে সুমিত্রার চোখ দু'টো জলে ভরে এল। আর কিছু সে বলতে পারলে না—মুহূর্তের মধ্যে ছুটে ওপরে চলে গেল।

অজিত বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

* * * *

কোয়াসার অন্তরালে অরুণালোকের মত উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত একটা জলন্ত বিশ্বাসের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! অবাক হয়ে গেল সে। ভারলে সুমিত্রার এই মহীয়সী রূপ, এ তো এর পূর্ব্বে আর কখনও দেখিনি। সে সুমিত্রাকে দেখেছে অনিলের পাশে। ধন-গর্ব্বিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার মিথ্যা অনুকরণ-মুগ্ধ অনিলের ভাবী স্ত্রীর এ রূপ সে কল্পনাও করতে পারেনি।

সুমিত্রার পিতা সাহেবীয়ানায় ভরপূর। সাহেবীখানা, সাহেবী পোষাক, নানা রকম দেশী, বিদেশী, মেম-সাহেবের আনাগোনা এই ছিল তাদের বাড়ীর বিশেষত্ব।

সুমিত্রার পিতা চাইতেন, যাতে তার ছেলেমেয়েরা সব সময় বেশ ফিট্‌ফাট ভাবে সেজেগুজে থাকে। কত দিন তিনি বলেছেন, "সুমিত্রা, তুমি এমনি আগোছানো ভাবে থাকো কেন? লোকে দেখে তোমাকে কি বলবে? তোমার দিদি, মা তো সব সময় ফিট্‌ফাট থাকেন, তোমার কিসের অভাব?"

সুমিত্রা কিছুই বলে না, নীরবে থাকে।

এদিকে অনিলের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ের ব্যবস্থা যতই পাকাপাকি হয়ে আসতে লাগল, আর সুমিত্রার নীচে আনাগোনা সেই পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগল। মাঝে-মাঝে সে অজিতদের ক্লাবে আনাগোনাও করে। অজিতের সঙ্গে সুমিত্রার দাদা অমিতের খুব আলাপ ছিল, আর সে অজিতের বিশেষ বন্ধু ও তাদের দলের এক জন। অমিতের কাজ-কর্ম্মে অজিত খুব সন্তুষ্ট ছিল এবং তার জন্যই বিশেষ করে বেশী ভালবাসতো তাকে। অমিত যখন জানতে পারল, সুমিত্রা তাদের দলে যোগ দিয়েছে এবং ক্লাবে আনাগোনা ক্রমশঃই বাড়ছে, তখন এক দিন তাকে জানালো, "সুমি, তুই কি ঠিক করলি এ পথে এসে? এ পথ যে বড় কঠিন, আমি তোকে এর থেকে আর বেশী কি বলবো। অজিত তো সবই বলেছে—তোকে বোঝাতেও চেষ্টা করেছে শুনলাম।"

সুমিত্রা জবাবে জানায় যে সে কিছু ভুল করেনি।

অমিতেরও খুব ইচ্ছে নয় যে, অনিলের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হয়। কিন্তু উপায় কি। তার তো এতে কোন হাত নেই, আর সুমিত্রার উপযুক্ত স্বামী কে-ই বা আছে। অজিত? কিন্তু সে তো এখন বিয়ে করবে না। আর তাছাড়া, পিতা অমরেশ বাবুর কাছে সুমিত্রার সঙ্গে অজিতের বিবাহের কথা উত্থাপন করে কোন সদুত্তর তো পায়নি, উল্টে তিনি অজিতের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে দিলেন তাকে।

ক্রমেই যখন অমরেশ বাবু জানতে পারলেন, অমিত তাঁর মতের বিরোধী এবং কন্যা সুমিত্রাও ঐ পথের অনুসন্ধানী, তখন তিনি অজিতদের নীচের তলা থেকে উঠিয়ে দেবার জন্য নোটিশ দেন। অজিতকে ডেকে তিনি এক দিন বলেন—"আমার ছেলেমেয়েকে নষ্ট করার জন্য তুমি একমাত্র দায়ী।" সুমিত্রা ও অমিতের দৃষ্টি রেখে বললেন—"তোমাদের এ পথ ছাড়তে হবে। আমি চাই না যে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ এমনি ভাবে নষ্ট কর।" বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট বাদে টেলিফোন বেজে উঠল, অমিত রিসিভার তুলে শুনে নিল, এবং অজিতকে বলল—"পুলিশ আমাদের ক্লাব সার্চ করতে এসেছে, উপস্থিত সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে।"

সুমিত্রা ও অজিত দু'জনেই মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। অমিতও তাড়াতাড়ি করে বেরুতে যাবে, পথে অমরেশ বাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছো এত ব্যস্ত হয়ে?"

অমিত বললো—"একটু বিশেষ কাজে।"

"কোথায় যাচ্ছো আমি জানি, এবং কিসের জন্য যাচ্ছো তাও জানি।" ততক্ষণে অমিত রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছে। অমরেশ বাবু একটু মুচকি হেসে বললেন—"তোমাদের বড়-বড় লেকচার দেওয়া এইবার বেরিয়ে যাবে।" বলে তিনি ওপরে গেলেন।

কয়েক বার সুমিত্রাকে ডাকলেন, কিন্তু উত্তর পেলেন না। নীচে লোক পাঠালেন, আছে কি না জানবার জন্য, কিন্তু সেখানেও নাই জেনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

* * * *

এদিকে অমিত ক্লাবে পৌঁছে দেখে সব খাতা-বই কাগজ-পত্র মাটিতে এখানে-ওখানে ছড়ান রয়েছে। মনে হল, পুলিশ নানা ভাবে সন্ধান করেছে জিনিষ-পত্রের। একটি লোক নাই ক্লাবে। সুমিত্রা অজিত দু'জনেই গ্রেপ্তার হয়েছে তাহ'লে।

ভাবতে ভাবতে অমিত নীচে নামছে এমন সময় অলোক (ওদেরি দলের একটি ছেলে) ব্যস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সামনেই অমিতকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—"কি রে, তুই এখানে? আমাদের এখানে সার্চ করতে এসেছিল শুনলাম, অমরেশ ব্যানার্জ্জী বলে কে এক জন ব্যারিষ্টার আমাদের এখানে কাল এসেছিলেন। শাসিয়ে গেছেন সবাইকে। সকলের ধারণা, তিনিই না কি ফোন করে আজকে সকালে পুলিশ পাঠিয়েছেন।"

অমিত চিৎকার করে উঠল, "কি নাম? অমরেশ ব্যানার্জ্জী!" অমিতের সমস্ত দেহ থর-থর করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত মুখের মধ্যে একটা কালো ছায়া পড়ে গেল, নিঃশব্দে সে সুমুখের চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল।

অলোক তার এই রকম চিৎকারে অবাক্ হয়ে গেল। কেউ জানত না যে ক্লাবে অমিত এক জন ব্যারিষ্টারের ছেলে। সকলেই জানত এক জন সামান্য গৃহস্থের ছেলে। কারণ, অমিতের ক্লাবের বন্ধু-বান্ধব বাড়ীতে এলে সকলেই অজিতদের ঘরে বসত, অতএব অমিতের এই বাড়ীর সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল না। কারণ, অমিত বেশীর ভাগ সময় অজিতের কাছে থাকত।

অমিত অলোককে কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মনস্থির করতে পারলে না। অলোকও সামনের একটা চেয়ার টেনে চুপ করে বসে পড়ল। অলোক ভাবল, অমিতের হয়তো বন্ধু অজিতের জন্ম মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে অমিত অলোককে একটা কাগজ-কলম আনতে বলে, পিতার কাছে চিঠি লিখতে বসল। তার হাত কাঁপছে। পিতার অন্ধ ক্রোধের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আজ যতগুলি তরুণ-তরুণী নিজেদের জীবন আহুতি দিলে, তার বাস্তব ছবিটা তার চোখের সামনে বারংবার ভেসে উঠতে লাগল।

কলিকাতা

শ্রীচরণেষু—

বাবা

আজ আপনি অজিতের সর্ব্বনাশ করতে গিয়ে নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ করলেন। আপনি এখানকার সন্ধান দিয়েছেন পুলিশকে তা সবাই জেনেছে। হয়তো আপনি আপনার কাজ করেছেন, ভেবেছিলেন এর পরে আপনার ছেলে-মেয়েকে ভাল করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তা অসম্ভব। এ পথ আজ থেকে সুমিত্রার কাছে আরো নতুন করে দেখা দিল। এ সর্ব্বনাশ না করলে হয়ত ফেরানো সম্ভব ছিল ওকে। কিন্তু এখন আর পারবেন না।

ওর বদলে আমাকে যদি ধরে নিয়ে যেত! অজিত ও আমাদের ক্লাবের সর্ব্বনাশ আপনি কিছুই করতে পারেননি, করেছেন আপনার মেয়ের, আজ থেকে আমি ও সুমিত্রা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আপনি, মা ও দিদি আমাদের প্রনাম জানবেন।

অমিত।

পরে অমিত অলোককে ডেকে বললে—"এই চিঠিটা এই ঠিকানাতে দিয়ে আসতে পারবি ভাই, দিয়েই চলে আসবি।"

অমরেশ বাবু অমিতের চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি যা করেছেন তার বাস্তব রূপটি সহসা যেন তাকে এখন চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে এল। যেন সে চিৎকার করে বলছে, অমরেশ, ভুল করেছিস্, মানুষের দুঃখে মানুষের প্রাণ কাঁদবে এ যে তার প্রাণধর্ম্ম, একে তুই কেমন করে রুখেরাখবি? দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়? যা, ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে আয়।

অমরেশ বাবুর মাথা ঘুরতে লাগল। যাদের নিয়ে তাঁর ভই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে থেকে সুমিত্রা ও অমিতের অনুপস্থিতি সেই জগতে যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা এনে দিল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, কারুকে কিছু না বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাদের সন্ধানে। থানায় গিয়ে সুমিত্রাকে জামিনে খালাস করতে চাইলেন।

সুমিত্রা বেরিয়ে এসে বাবাকে বললে, "বাবা, তুমি ছাড়িয়ে নিতে এসেছ আমাকে? কিন্তু আমি তো যাবো না। আমার সঙ্গী, যাদের সবাইকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছো—তাদের সবাইকে পারবে তুমি ছাড়াতে? তা যখন পারবে না, তখন কেন তুমি এলে? আর ছাড়াতে পারলেও তারা তো বেরিয়ে আসবে না।—তারা শাস্তি গ্রহণ করবার জন্ম প্রস্তুত। তুমি ফিরে যাও। প্রার্থনা কর, যেন তোমার দেওয়া এ শাস্তি আমার জীবনে পরম সার্থকতা এনে দেয়।"

অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলেন অমরেশ বাবু।

তার পর হতে তিনি বিলিতী পোষাক ছেড়ে ধরলেন একেবারে খদ্দর। সমস্ত সম্পত্তি দেশের জন্য ত্যাগ করলেন বাড়ীতে এখন আর রোজ সন্ধ্যায় সাহেবের আনাগোণা রইল না—অনিলদের মত ছেলেদের আসা-যাওয়াও বন্ধ হল। সন্ধ্যার জমাটি মশগুল একেবারেই আর রইল না। এই ভাবেই নানা রকম পরিবর্ত্তন হল অমরেশ বাবুর ও তাঁর বাড়ীর আবহাওয়ার।

এক দিন সন্ধ্যায় একটি কৃষক-সভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। সভার শেষে দেখেন, তার পায়ে হাত দিয়ে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে প্রণাম করল। তিনি ভাল করে ফিরে চেয়ে দেখলেন—সুমিত্রা, অজিত ও অমিত।

তিনি তাদেরকে আনন্দের সঙ্গে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বললেন, "আমাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের আদর্শ ফলবতী হোক।' বলতে বলতে অমরেশ বাবুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

সুমিত্রার মনটা আনন্দে ফুলে উঠল। আজ তার এত দিনের স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে, সে তার বাড়ীর আবহাওয়া ফেরাতে পেরেছে। সে পারবে অজিতের পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করতে। আজ আর কোন রকম সংকোচ তার মনে নাই, জয়ী হতে পেরেছে।

উত্তর

১। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ২। বীটোভেন ৩। প্রায়: পঞ্চাশ হাজার ৪। ৫০০ বছর ৫। তক্ষশিলা ৬। মহারাজ নন্দকুমার ৭। একটিও না ৮। বঙ্কিমচন্দ্র।

[৪৪৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রাচ্যবিদ্যার কলাম্বাস—
সোমা ডি কুরেশ (কুরুশ ?)

তুষারের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এরই নাম তিব্বত, চিরন্তন তুষারের নিষিদ্ধ দেশ। উত্তরে তুর্কীস্থান, দক্ষিণে নেপাল ও ভুটান, পশ্চিমে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, পূবে মহাচীন। অসংখ্য গিরিশ্রেণী তারই বুকের উপর দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে পশ্চিম থেকে পূবে গেছে। এই হল তিব্বত—এসিয়ার শ্রেষ্ঠ নদ-নদীর উৎসকেন্দ্র। এই তিব্বতেরই দক্ষিণ-পূব কোণ থেকে সিন্ধু শতদ্রু ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি, এরই পূব দিক থেকে ইয়াংসি, মেকং ও সালুইন নদীর জলপ্রবাহ শুরু। এখানেই মানস-সরোবর। মানব-সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে এখানে না যাত্রা করলে আর কোথায় করবে মানুষ?

তিব্বতের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত, বিশেষ করে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অনুসন্ধিৎসুরা জানেন। এই তিব্বতী ভাষা সোমা ডি কুরেশের আবিষ্কারের আগে বাইরের পৃথিবীতে অজানা ছিল বলা চলে। ১৭১১ সালে কাপুচিনদের লাসা যাত্রার পরে ১৭৬২ সালে যে "এলফাবেটাম্ টিবেটানাম্" (Alphabetum Tibetanum) সংকলন করা হয় তা নির্ভুল নয়। ১৮২০ সালে আবেল রেমুসাত, তাঁর "Recherches sur les langues Tartares" নামক গ্রন্থে তিব্বতী ভাষা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লেখেন এবং ১৮২৬ সালে সোমা ডি কুরেশের বিশেষ বন্ধু জন মার্শম্যান শ্রীরামপুর প্রেস থেকে একটি তিব্বতী ভাষার অভিধান সংকলন করে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৩৪ সালে সোমা ডি কুরেশের (১) Dictionary, Tibetan and English; (২) Grammar of the Tibetan Language in English প্রকাশিত হবার আগে পর্য্যন্ত তিব্বতী ভাষার আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্য বাইরের জগতের কাছে অজানা ছিল বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনীষী কুরেশ তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরুরূপে সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। তিব্বতী ভাষার সন্ধানে, সেই ভাষায় পুঁথির পাতায় রচিত তিব্বতী সাহিত্য-সম্ভারের প্রলোভনে, প্রাচ্য-সংস্কৃতি তথা মানব-সংস্কৃতির নিষিদ্ধ রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটনের মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত কুরেশ তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল, প্রাচ্যবিদ্যা ও অনাবিষ্কৃত ভাষার কঠোর তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

১৮১১ সালের বসন্তের এক প্রত্যূষে ট্রানসিলভেনিয়ার পথের উপর দুই বন্ধু বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দু'জন বোধ হয় থমকেই দাঁড়ালেন। এক জন বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃখে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলেন, আর এক জনের দিগন্তরেখায় নিবদ্ধ ছোট ছোট চোখ দু'টো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি কি অনন্ত অসীম জ্ঞান-রাজ্যের অস্পষ্ট তুষারাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় কোন আবিষ্কারের সূর্যোদয় দেখে অনাস্বাদিত আনন্দে শিউরে উঠলেন না কি? সত্যিই তিনি শিহরে উঠলেন আনন্দে ও বিস্ময়ে। তিনিই সোমা ডি কুরেশ।

সোমার যাত্রা শুরু হল জ্ঞানতীর্থের পথে। সঙ্গে একটা ঝোলার মধ্যে কিছু বই, কয়েকটা জামা-পাতলুন, আর মাত্র এক শত ফ্লোরি[illegible] নগদ টাকা। প্রথমে সোমা গেলেন ক্রোশিয়ায়, সেখানে কয়েক মা[illegible] থেকে স্লাভ ভাষার সম্বন্ধে গবেষণা করলেন। সেখান থেকে পা[illegible] হেঁটে, পণ্যবাহী ক্যারাভানের সঙ্গে তিনি এলেন কনষ্টানটিনোপোল[illegible] সেখান থেকে নৌকা করে পৌঁছলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। এখানে তিনি আরবী ভাষা শিখলেন। কিছু দিনের মধ্যে শহরে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল, সোমা শহর ছাড়তে বাধ্য হলেন। নৌকা করে আলেপ্পো, আলেপ্পো থেকে বগদাদ পৌঁছলেন। বগদাদ থেকে আবার এক দল ক্যারাভানের সঙ্গে সোমা তেহারান যাত্রা করলেন। তেহারানে পার্সী ও ইংরেজী শিখলেন। তার পরেই তো আসল অভিযানের সময় ঘনিয়ে এল। মধ্য-এসিয়ায় রুশ জারের হানাদার সৈন্যদের উৎপাতের গুজব তখন চারি দিকে রটেছে। তুর্কীস্থানের ভেতর দিয়ে অভিযান করা সম্ভব নয়। সুতরাং পূবে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে পঞ্জাবের ভেতর দিয়ে উত্তরে কাশ্মীর পৌঁছান ছাড়া উপায় নেই, তার পর কাশ্মীর থেকে তিব্বত যাত্রা করতে হবে। পথটা সহজ পথ নয়।

সোমার সামনে এখন হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দুর্ভেদ্য গিরিপথ, আফগানিস্থানের দুর্দ্ধর্ষ আদিম জাতি, রণজিৎ সিং-এর বিশাল সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম-হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গতরঙ্গ। এ সব অতিক্রম করে তাঁকে অভিযান করতে হবে তিব্বতের দিকে, তাঁর বিদ্যা-সাধনার মহাতীর্থে। খর্ব্বকায় হাঙ্গেরীয় এই লোকটির মধ্যে যে এত বড় মহাসমুদ্রের মতো একটা মন ছিল তা কে জানত? সোমা সেই পথেই যাত্রা করলেন। তিনি তখনও নিশ্চিত নন তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে। ভাবলেন, হয়ত তীর্থযাত্রার পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। তাই যাত্রার আগে তাঁর সঙ্গে যে সব মূল্যবাণ পাণ্ডুলিপি পুঁথিপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল সেগুলো তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে রেখে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, যদি তিনি না ফেরেন তাহ'লে সেগুলো যেন যথা-স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী সোমা লিখে জাননি। এমন কি কোন চিঠিতেও তিনি কাউকে লেখেননি। কারণ অভিযানের রোমাঞ্চ অনুভব করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সাবাথু থেকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে যে দু'-চারখানা ছোট-ছোট চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাতে শুধু জানান যে ১৮২২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বামিয়েন গিরিপথ অতিক্রম করেন, মার্চ মাসে লাহোর পৌঁছন, সেখান থেকে কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে লে যান জুন মাসে। এইখানে বিখ্যাত পর্য্যটক উইলিয়ম মুরক্রফ্‌টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মুরক্রফ্‌ট অনেক বছর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঘুরেছেন এবং এ-অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তিনি একখানা প্রাচীন তিব্বতী ভাষার অভিধান সংগ্রহ করেছিলেন। এই অভিধানখানি প্রায় এক শতাব্দী আগে এক জন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক সংকলন করেছিলেন। অভিধানখানি মুরক্রফ্‌ট সোমাকে উপহার দেন। সেই অভিধানের মধ্যে সোমা তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের অফুরন্ত সম্ভারের সন্ধান পান। আরও দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর অভিযান শুরু হয়।

তিব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মঠ, লোক-জন, লামা পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে সোমা আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। চিরন্তন তুষারের নিষিদ্ধ দেশের গোপন রহস্যটি যেন তাঁর চোখে ধরা পড়ে যায়।

তিনি জনস্কর জেলার বিখ্যাত জংলা মঠে উপস্থিত হন। সেখানে চারি দিকের অবিশ্রান্ত তুষার-প্রবাহের মধ্যে মঠের ছোট্ট বদ্ধ ঘরের মধ্যে নির্ব্বাক্ নীরব লামা পণ্ডিত পরিবেষ্টিত হয়ে সোমা মাসের পর মাসে তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের তপস্যা করেন। সোমা নিজে কোন দিন এ সব আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করা পছন্দ করতেন না। তা না হলে তাঁর এই কঠোর জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর কাহিনী হ'ত। ১৮২৭ সালে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের ডাঃ জেরাড সোমার সঙ্গে তিব্বতে সাক্ষাৎ করেন। সোমার অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তিনি যা দিয়েছেন তা পড়লে হতবাক্ হতে হয় :

"নয় ফিট্ স্কয়ার একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে সোমা, তাঁর এক জন লামা পণ্ডিত এবং এক জন ভৃত্যকে মাসের পর মাস আত্ম'বন্দী হয়ে থাকতে দেখেছি। ঘরের বাইরে আসার সাধ্য নেই মানুষের। বাইরে তখন অনর্গল তুষার-প্রবাহ, গোটা প্রকৃতিটাই যেন জমাট-বাঁধা বরফের চাই হয়ে গেছে। জীবনের এতটুকুও সাড়া-শব্দ কোথাও নেই বাইরে। এই অবস্থায় একটা ছোট মঠের ঘরে বসে, ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সোমা তাঁর লামা পণ্ডিতের কাছে সকাল থেকে সারা রাত অধ্যয়ন করতেন। এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যে হাত বার ক'রে বইয়ের পাতা উল্টানোও অনেক সময় সম্ভব হ'ত না।"

১৮২৪ সালের নবেম্বর মাসে সিমলার কয়েক মাইল দূরে সাবাথুর সামরিক ঘাঁটির কাছে এক জন ছোট-খাট বিদেশীকে হঠাৎ এক দিন দেখা গেল। অম্বালার পলিটিকাল এজেন্টের নির্দ্দেশে কাপ্তেন কেনেডি তাঁকে গুপ্তচর সন্দেহ করে বন্দী করলেন। সন্দেহ করারই কথা। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে এক অদ্ভুত জীবের এ অঞ্চলে হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ কি? এই জীবটি সোমা ডি কুরেশ। মুরক্রফ্‌ট তাঁর সহায় হলেন। গবর্ণমেণ্ট দেখলেন সোমা গুপ্তচর নন, গবেষণার জন্যে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন, আবার যেতে চান। সোমার ভাগ্যে মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটা সরকারী বৃত্তিও জুটল। ১৮২৫ সালের জুন মাসে সোমা আবার তিব্বতের পথে পা বাড়ালেন। দু'বছর পরে ১৮২৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। জ্ঞানার্জ্জনে সোমার তৃপ্তি হ'ল না। তাঁর গুরু লামা পণ্ডিতরাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন ছাত্রের উপর। গুরুর পাণ্ডিত্যের ঝুলি শূন্য হয়ে গেছে, কিন্তু সোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়নি। তিনি বললেন, সরকারী বৃত্তি আর তিনি গ্রহণ করবেন না। কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির কাছে তিনি তাঁর এত দিনের গবেষণা-লব্ধ সম্পদ দান করবেন স্থির করলেন। সুন্দর করে লেখা তিব্বতী ভাষার একটি অভিধানের পাণ্ডুলিপি, একটি তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ এবং তিব্বতী সাহিত্য ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান এক রাশ তথ্য। সোমার কাছে এই আহরণ কিছুই নয়, এতে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট নন। ১৮২৭ সালের জুন মাসে তাই কাপ্তেন কেনেডি যখন তাঁকে জানালেন যে, গবর্ণমেণ্ট আরও তিন বছর তাঁর গবেষণার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতে রাজী আছেন, তখন তিনি আবার তিব্বত যাত্রা করলেন। এবারে তিনি কানুম গেলেন। ১৫০০০ ফিট উঁচুতে একখানা ঘরে বন্দী হয়ে তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করলেন। আরও চল্লিশ হাজার তিব্বতী শব্দ তার অভিধানের জন্যে এই সময় তিনি সংগ্রহ করলেন। এ ছাড়া "ক্যাঞ্জুর" নামক বিখ্যাত তিব্বতী বিশ্বকোষ (২২৫ খণ্ডে সমাপ্ত, প্রত্যেক খণ্ড ৫০০—৭০০ পৃষ্ঠা) এই সময় সোমা আগাগোড়া পড়ে শেষ করেন। ১৮৩১ সালে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁর বৃহৎ অভিধান প্রকাশ করার ভার নেন। ১৮৩৪ সালের পর বাংলা দেশ ভ্রমণে বার হন এবং বাংলা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শেখেন। ১৮৩৭ সালে তাঁকে আমরা কলকাতার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে লাইব্রেরি-য়ানের পদে দেখতে পাই। মেজের ওপর চাটাই পেতে, চারি দিকে স্তূপাকার বই সাজিয়ে, তার মধ্যিখানে তিনি বসে পড়তেন, খেতেন এবং ঘুমুতেন। কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত ছাড়ার তাঁর সময় হ'ত না।

সোমার শেষ অভিযান

সোমার বয়স প্রায় আটান্ন হ'ল। প্রকৃতির কঠোর পরীক্ষায় তাঁর নশ্বর দেহ প্রায় শিথিল হয়ে এসেছে। তবু বৃদ্ধের চোখে সেই যৌবনের স্বপ্নাবেশ যেন মুছে যায়নি। আজও তাঁর ঝাপসা দৃষ্টিপথে ভেসে উঠছে রহস্যাবৃত লাসার সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মঠের চূড়ো, তার ভেতরের অসংখ্য অমূল্য সব পুঁথি-পুস্তক; লাসা ছাড়িয়ে আরও দূরে চীন, চীনের ভাষা ও সাহিত্যের লুকানো সম্পদ; হয়ত বা মধ্য-এসিয়ার স্টেপীর অন্ধকার বুকের মধ্যে লুকানো কোন মাণিক, যার সন্ধান পেলে সোমার আজীবনের স্বপ্ন হঙ্গেরীয় জাতির রহস্যাবৃত উৎসকেন্দ্র আলোকিত হয়ে উঠবে। এ সব কল্পনা করতে এখনও বৃদ্ধ সোমার চোখে শিশুর বিস্ময় জেগে ওঠে। এখনও আর অভিযান করা যায় না কি?

সোমার বিশ্রাম নেই। জ্ঞানানুসন্ধানীর বিশ্রাম কোথায়? বন্ধুরা বললেন, বহু দিন দেশছাড়া, একবার স্বদেশ ঘুরে এসো। কোথায় দেশ? দেশ-বিদেশের সমস্ত ব্যবধান সোমার কাছে ভেঙে একাকার হয়ে গেছে। আবার তার নতুন যাত্রা শুরু হল। পায়ে হেঁটে টেরাই অতিক্রম করে তিনি দার্জ্জিলিঙে পৌঁছলেন ২৪শে মার্চ (১৮৩৭)। লাসা যাবার ছাড়পত্রের জন্যে আবেদন করলেন সিকিমের রাজার কাছে। এমন সময় অকস্মাৎ ছাড়পত্র এল পরলোক থেকে। টেরাইয়ের জংগলে কঠিন ম্যালেরিয়ায় তিনি সংক্রমিত হয়েছিলেন। ৬ই এপ্রিল তার জ্বর হ'ল, পাঁচ দিন পরে তিনি মারা গেলেন। দার্জ্জিলিঙ গোরস্থানে দেবদারু গাছের তলায় তাঁকে কবর দেওয়া হ'ল।

অভিযানের আগে সোমার সন্দেহ হয়েছিল, এই বোধ হয় তাঁর শেষ অভিযান। আর বোধ হয় তিনি বাঁচবেন না। তাই যাবার সময় তিনি চিঠি লিখে "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলকে" তাঁর একজিকিউটর করে যান। কিন্তু কি তাঁর সম্পত্তি? দার্জ্জিলিঙএর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাঃ ক্যাম্পবেল লিখেছেন :

"সম্পত্তি বলতে সোমার ছিল বড়-বড় চার বাক্স বই পাণ্ডুলিপি পুঁথিপত্র, কয়েকটা নীল রঙের কোট-পাতলুন, যা তিনি সব সময় পরতেন এবং যা পরে তিনি মারা যান, কয়েকটা চাদর আর রান্নার পাত্র।"

এই সম্পত্তির ট্রাষ্টি বাংলার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি। কিন্তু যে জ্ঞান-সাধকের যাত্রা শুরু ইয়োরোপ থেকে এবং মধ্যপথেই শেষ বিদ্যার মানস-সরোবরে, মহা-এসিয়ার তুষার-বক্ষে, তাঁর ট্রাষ্টি শুধু বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটি নয়। সোমার সম্পত্তি ট্রাষ্টি বিশ্বমানব। সোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যতের বাংলা, ভবিষ্যতের ভারত, ভবিষ্যতের মহা-এসিয়া।
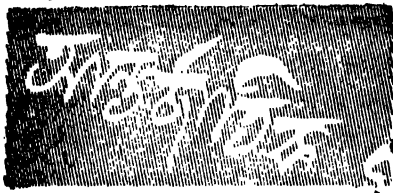
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

'শান্তি ও স্বাধীনতার' কর্ম্মসূচী—

আগামী চারি বৎসরের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে কার্য্যারম্ভের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৯) মিঃ ট্রুম্যান তাঁহার বক্তৃতায় 'শান্তি ও স্বাধীনতার' কর্ম্মসূচী সংক্রান্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নীতির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আশা-আনন্দের এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার 'শান্তি ও স্বাধীনতা' কর্ম্মসূচীতে যে-চারটি বিষয় স্থান পাইয়াছে তন্মধ্যে চতুর্থ বিষয়টিই এত আশা-আনন্দের মূল কারণ। কর্ম্মসূচীর চতুর্থ দফাটিকে সাহসিকতাপূর্ণ নূতন পরিকল্পনা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার 'শান্তি ও স্বাধীনতা' কর্ম্মসূচীতে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় স্থান পাইয়াছে: (১) সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে সমর্থন করিয়া চলা এবং উহার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিকে শক্তিশালী করিবার উপায়ের সন্ধান, (২) পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিণ পরিকল্পনা সমূহ অব্যাহত রাখা, (৩) স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিগুলিকে আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করা এবং (৪) অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পোন্নতির নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণ। যে-চতুর্থ কর্ম্মসূচী লইয়া আশা ও আনন্দের এত বিপুল উচ্ছ্বাস তাহা যে অত্যন্ত অস্পষ্ট, এ কথা অস্বীকার করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের জন্য ইউরোপীয়-উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুরূপ কোন পরিকল্পনা তিনি রচনা করিতেছেন বা রচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বক্তৃতার কোথাও তাহার আভাষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। অবশ্য গত নবেম্বর (১৯৪৮) মাসে খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (Food & Agriculture Organization) সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছিলেন, "অনুন্নত দেশের সম্পদ বৃহত্তর দেশগুলির উন্নত দেশগুলির তাহাদের কর্ম্মকুশলতাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছে। অন্যান্য দেশের সহিত মিলিত হইয়া আমরা আমাদের টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অকাতরে দান করিতে পারিতেছি বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আনন্দিত।" তাঁহার এই উক্তিকে 'শান্তি ও স্বাধীনতা' কর্ম্মসূচীর চতুর্থ দফার পূর্ব্বাভাষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহার চতুর্থ দফা কর্ম্মসূচী যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিকট সাম্রাজ্য বজায় রাখিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, এ কথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলি বলিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকেই বুঝায়। অবশ্য দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিকেও যে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা একেবারেই যায় না তাহা নয়। কিন্তু উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্য বলিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকেই বুঝায়। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করিবার অভিপ্রায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানই এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন নাই। হিটলারও বিশ্বাস করিতেন যে, আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতে হইলে ইউরোপীয় দক্ষতা ও মূলধনের প্রয়োজন। হিটলার বিজয়ী হইলে তিনি তাঁহার এই বিশ্বাসকে অবশ্যই কার্য্যে পরিণত করিতেন। বৃটিশ টোরী দল গত ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদের ইম্পিরিয়াল পলিসি কমিটির মুখপত্র 'Review of World Affairs'-এর একটি বিশেষ আফ্রিকা-সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আফ্রিকা উন্নয়নের প্রস্তাব আছে। বেশী দিনের কথা নয়, ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে বৃটিশ শ্রমিক দলের কার্য্যকরী সমিতি—"The Labour Party's Plan for Western Europe" প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, "এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত যে পশ্চিম-ইউরোপ একক স্বাধীন অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে টিঁকিতে পারে না।... আমেরিকার যোগানের উপর নির্ভরতা যদি সত্যই হ্রাস করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোপরি আমাদিগকে আফ্রিকার বিপুল সম্পদের উন্নয়ন করিতে হইবে।" ১৯৪৮ সালের ২২শে জানুয়ারী কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছিলেন যে, শুধু ইউরোপের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইউরোপের যে প্রভাব আছে তাহার প্রতি এবং তাহা ছাড়াইয়া আরও দূরে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "প্রথমতঃ আমরা আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। আফ্রিকায় আমরা দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও পর্ত্তুগালের সহিত গুরু-দায়িত্বের অংশীদার। সমস্ত অধীনস্থ দেশের প্রতি, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতি আমরা অনুরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সহিত ওলন্দাজগণ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।" সুতরাং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি উন্নত করিবার ইচ্ছার মধ্যে নূতনত্ব যেমন কিছু নাই, তেমনি উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা অনবহিত থাকিতে পারে না। তাঁহার পরিকল্পনায় পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ—বৈদেশিক লাভের জন্য শোষণের (exploitation for foreign profit) যে কোন স্থান নাই, সে কথাও তিনি অবশ্য শুনাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চারি দফাযুক্ত কর্ম্মসূচীতে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের স্থান না থাকিলেও নূতন সাম্রাজ্যবাদেরই যে উহা অভিব্যক্তি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরবর্ত্তী এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি গণতান্ত্রিক ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের ভিত্তির উপর তাঁহার উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। মিঃ ট্রুম্যান নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার, সমান সুবিধা, সমান সমৃদ্ধির কথা বলিলেই এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের

মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, অনুন্নত দেশগুলির উন্নতি করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে এবং নিপীড়নকারী মানুষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার মহান্ উদ্দেশ্য ছাড়া আমেরিকার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু গত দেড় শত পৌনে-দুই শত বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক মূলধন ও বৈদেশিক শিল্প-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উপনিবেশগুলির কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, পরাধীন জাতিসমূহ তাহা ভাল করিয়াই জানে। মার্কিণ মূলধন ও মার্কিণ বিশেষজ্ঞকে আমদানি করিলেই অনুন্নত-দেশগুলির দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইবে, তাহা মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? মার্শাল-পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমেরিকার উপর ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক নির্ভরতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই নির্ভরতার সঙ্গে উত্তর-আটলাণ্টিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা সংযুক্ত হইয়া পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত করিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদান করিবার পর মার্কিণ জেনারেল জে লটন কলিন্স পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নের রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক হইবেন। অধিকাংশ সমরোপকরণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই সরবরাহ করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পরিকল্পনায় পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের স্থান নাই, মুখে এ কথা বলিলেই কি সকলে তাহা বিশ্বাস করিবে? গত ৩০শে জানুয়ারী যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ইন্দোনেশিয়াকে মার্শাল-সাহায্যরূপে ৬,১৭,৪১,০০০ ডলার প্রদান করা হইয়াছে। এই সাহায্য যে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হউক, চোরকে চুরি করিতে এবং গৃহস্থকে সজাগ থাকিতে বলার নীতি দীর্ঘ দিন অনুসরণ করিতে পারে না।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মনে করেন, একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সমগ্র পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা, শান্তিদাতা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বোপরি আমাদের লোকেরা সমগ্র পৃথিবীতে ন্যায়-সঙ্গত এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে ইচ্ছুক এবং কৃতসঙ্কল্প। সমমর্য্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র-সমূহের স্বাধীন ভাবে সম্পাদিত অকৃত্রিম চুক্তির ভিত্তির উপর এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।" তাঁহার ধারণা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার সমপ্রাণ (like minded) দেশসমূহের শান্তি প্রতিষ্ঠার এই কাজ প্রত্যক্ষ ভাবে অপর একটি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। এই রাষ্ট্রের তিনি নাম করেন নাই, শুধু বলিয়াছেন যে, এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তাহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং মানব-জীবন সম্বন্ধে এই রাষ্ট্রের মতবাদও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নাম না বলিলেও এই রাষ্ট্র যে সোভিয়েট রাশিয়া তাহা বুঝিতে কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু রাশিয়ার অভিপ্রায় কি এবং এই অভিপ্রায়ের কি কি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই প্রশ্নকে বাদ দিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উক্তিকে, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে এ কথাও সত্য যে, তাঁহার উক্তিকে বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিলে যাঁহাদের লাভ তাঁহারা উহাকে অভ্রান্ত বলিয়াই মনে করিবে, কোন যুক্তি-প্রমাণই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই রুশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কম্যুনিজমের প্রসারের ধ্বনি তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জগতের ত্রাতা এবং শান্তিদাতার

ছদ্মবেশে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে। এই আয়োজন সামরিক বিজয়ের জন্ম তো নহে-ই, প্রথমে উহার রাজনৈতিক রূপটিও কাহারও চোখে পড়ে নাই। সমগ্র পৃথিবী অধিকারের জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজয়-অভিযান আরম্ভ হইয়াছে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে। ঋণদান ও ডলার সাহায্যের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অবশেষে মার্শাল-পরিকল্পনার সুচিন্তিত ও সুসংহত রূপ গ্রহণ করে এবং উহারই অনুসঙ্গিরূপে পশ্চিম-ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি উহারই অবশ্যম্ভাবী সামরিক পরিণতি। গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে লণ্ডনে পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নের পঞ্চ শক্তির পররাষ্ট্র-সচিবদের যে সম্মেলন হয়, এই সম্মেলনে গত ২৮শে জানুয়ারী কাউন্সিল অব ইউরোপ গঠনের এবং ইটালীকে এই কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে এই কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্ম পশ্চিম-জার্ম্মাণীকেও যে আমন্ত্রণ করা হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে এই আশা এবং বিশ্বাস ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে এখনও নূতন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে অসহিষ্ণু মনোভাবও বড় কম সৃষ্টি হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-আটলান্টিক চুক্তিকে অধিকতর ব্যাপক করিতে ইচ্ছুক। এই চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম নরওয়ে, ডেনমার্ক, আয়ার, পর্ত্তুগাল, আইসল্যাও এবং ইটালীও আমন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি রাশিয়ার দৃষ্টিতে কি ভাবে প্রতিভাত হইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-দপ্তর হইতে প্রচারিত বিবৃতির মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিবৃতিতে উত্তর আটলান্টিক চুক্তিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকশ্রেণীর আক্রমণাত্মক নীতির প্রধান অস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার দৃষ্টিতে নয়া পবিত্র মিত্রতা (new holy alliance) ছাড়া যে আর কিছুই হয় নাই, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। রাশিয়া মনে করে, এই ইউনিয়ন সমগ্র পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনার প্রধান অংশ না হইলেও একটি অংশ বটে।

পশ্চিম-ইউরোপে সোভিয়েটবিরোধী ব্লক গঠনের পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। এশিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এত দিন পর্য্যন্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। চীনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্যে তাহার নিশ্চিন্ত ভাব কাটিয়া গিয়াছে। এশিয়াতেও সোভিয়েটবিরোধী ব্লক গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নতি সাধন করিতে তাঁহার অভিপ্রায়ের মধ্যে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শাসন দ্বারা এশিয়ার দেশগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা রোধ করা আর সম্ভব নয়। আবার স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশগুলিতে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা আরও কঠিন। ইহাকেই এশিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্য বিস্তারের শ্রেষ্ঠ সুযোগ বলিয়া যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এখানেও ইউরোপের মতই কম্যুনিজম-ভীতি এবং ডলার ঋণদানই যে তাঁহার প্রধান অস্ত্র তাহাও অনস্বীকার্য্য। কাজেই কম্যুনিজমের নিন্দায় এবং গণতন্ত্রের প্রশংসায় প্রেসিডেণ্ট-ট্রুম্যান পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন।

কম্যুনিজম বনাম গণতন্ত্র—

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উদ্বোধনী বক্তৃতার একটা বিশিষ্ট অংশ কম্যুনিজম ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার এই আলোচনা সত্ত্বেও গণতন্ত্র বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝা গেল না। তবে এইটুকু বুঝা গেল যে, গণতন্ত্র রাশিয়াকে আঘাত হানিবার একটি প্রধান অস্ত্র এবং কম্যুনিজম বিরোধিতার নামই গণতন্ত্র। কিন্তু কম্যুনিজম কি? প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কম্যুনিজমকে ভ্রান্ত মতবাদ (false philosophy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কম্যুনিজম ভ্রান্ত মতবাদ হইতেও পারে, আবার না-ও হইতে পারে, কিন্তু চীনে মার্কিণ ডলার এবং সমরোপকরণ দ্বারা কম্যুনিজমকে দমন করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এ কথা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পক্ষেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই যে, মার্কিণ ডলার এবং সমরোপকরণের আকারে কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে যে গণতন্ত্র আমদানি করিয়াছেন তাহাতে এক দিকে দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আর এক দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা। পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশেও কম্যুনিজমের আতঙ্ক অত্যন্ত প্রবল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতেও সংখ্যায় এমন এক ধনী শ্রেণী আছেন যাঁহারা শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধনৈশ্বর্য্যে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ধনীদের প্রায় সমকক্ষ। দরিদ্র শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অভিযোগের মধ্যে তাঁহারা কম্যুনিজমের দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার কথা যাহারা বলে তাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিতে কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৪৭ সালে মিশরের সংবাদপত্রে এইরূপ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, "অল্প কয়েক জন মিশরবাসী প্রচুর বিলাসিতার মধ্যে বাস করেন, আর তাঁহাদেরই লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী গৃহহীন ও নগ্ন অবস্থায় দিন কাটায়, পশুর মত তাহারা জীবন যাপন করে।" আর একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল, "কায়রোতে রাজা ইবন সাউদের অভ্যর্থনার জন্ম যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা গরীব ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বাবদ ব্যয় করিলেই এই অর্থের সদ্ব্যয় করা হইত।" এই বিবৃতির লেখকদ্বয়কে কম্যুনিষ্ট আখ্যায় অভিহিত করিতে বিলম্ব হয় নাই।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সমপ্রাণ (like minded) দেশগুলির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকার সহিত সমপ্রাণ দেশ বলিতে কি বুঝায় তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে এই যুদ্ধের প্রতি মিশরের মনোভাব কম্যুনিজমের প্রতি মিশরের মনোভাব দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে, এই প্রস্তাব লইয়া সম্প্রতি মিশরে যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন জনৈক মিশরীয় লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Which Egypt? ......Was it the Egypt the of overfed few or the underfed millions? অর্থাৎ "কোন্ মিশর?.........এই

মিশর কি মুষ্টিমেয় ভূরিভোজীদের মিশর, না লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরদের মিশর?" প্রত্যেক দেশই ভূরিভোজীদের দেশ ও ক্ষুধাতুরদের দেশ এই দুই অংশে বিভক্ত। কম্যুনিজম লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেই পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে, এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এই দুঃখ-দুর্দ্দশাকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়া কি কম্যুনিজমকেই পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার কাজে সাহায্য করিতেছে না? হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়া এবং ফ্রান্স ইন্দোচীনের হো চি মীন গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ করিতে অস্বীকার করিয়া কি কম্যুনিজম প্রসারের সুযোগই সৃষ্টি করে নাই? মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও ঠিক এই কাজই করিতেছে। গণতন্ত্র যদি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে না পারে, তাহা হইলে মার্কিণ ডলার এবং সমরোপকরণ কিরূপে এশিয়ায় কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবে, এই প্রশ্ন অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতি বিশ্লেষণ করিলে তাহার উত্তরও যে পাওয়া যায় না তাহা নয়। ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল-পরিকল্পনা, পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি দ্বারা যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদকেই শক্তিশালী করিয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট হইয়া এই সাম্রাজ্যবাদ যে ইউরোপেই শুধু কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবে তাহা নয়, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকেও অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমেরিকার বিশ্বাস। অনুন্নত অঞ্চলসমূহের ধনিকশ্রেণী নিজেদের সুখ সুবিধা ও অধিকার রক্ষার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য" গ্রহণে আপত্তি করিবেন না। এই ভাবে এক বিরাট অতিসাম্রাজ্যবাদের শীর্ষদেশে অবস্থান করিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের 'শান্তি ও স্বাধীনতা' কর্ম্মসূচীর উহার একমাত্র লক্ষ্য। যুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে নূতন নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই নূতন নীতি ঔপনিবেশিক শোষণের পুরাতন ধারার পরিবর্ত্তন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে, তাহার অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া এবং তাহার সমর-সজ্জায় শক্তিমান হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নূতন পথে ঔপনিবেশিক শোষণ আরম্ভ করিবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে সকলের কল্যাণসাধনের (common good) কথা বলিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য জনগণের কল্যাণ-সাধনের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পক্ষে শুধু উপনিবেশিক শোষণ ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

ষ্ট্যালিনের শান্তি-প্রস্তাবের ভাগ্য—

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত মার্শাল ষ্ট্যালিনের শান্তি আলোচনার প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে। মার্শাল ষ্ট্যালিনের সহিত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা করিতে রাজী হইবেন, অতি বড় আশাবাদীও তাহা বোধ হয় আশা করেন নাই। এই শান্তি-প্রস্তাব মার্শাল ষ্ট্যালিনের একটা চাল মাত্র কি না, উহার মধ্যে তাঁহার আন্তরিকতার অভাব আছে কি না, একমাত্র শান্তি আলোচনার বৈঠকেই তাহা প্রমাণিত হইতে পারিত। রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি এবং সহযোগিতা যে সম্ভব এ সম্পর্কে মার্শাল ষ্ট্যালিন এই প্রথম তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন নাই। অষ্ট্রিয়াকে কম্যুনিষ্ট দেশে পরিণত করিবার অভিপ্রায় হইতে তিনি এই শান্তি-প্রস্তাবের চাল চালিয়াছেন তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৪৯) আমেরিকার ইণ্টার নেশন্যাল নিউজ সার্ভিসের পক্ষ হইতে মিঃ কিংসবারী স্মিথ মার্শাল ষ্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে এক প্রশ্নাবলী উত্থাপন করেন। এই প্রশ্নাবলীর উত্তর-দান প্রসঙ্গেই মার্শাল ষ্ট্যালিন উল্লিখিত শান্তি-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রশ্নাবলীর শেষ এবং চতুর্থ প্রশ্নে ষ্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "বিশ্বচুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট টম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনি কি সম্মত আছেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে ষ্ট্যালিন বলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এইরূপ সাক্ষাৎকারে আমার কোন আপত্তি নাই।" প্রশ্নাবলী এবং ষ্ট্যালিনের উত্তর ৩০শে জানুয়ারী রাত্রে বেতারযোগে ঘোষণা করা হয়।

বেতারযোগে মার্শাল ষ্ট্যালিনের যে উত্তর ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না এইরূপ ঘোষণায় স্বাক্ষর করিতে ষ্ট্যালিন আগ্রহ তো প্রকাশ করিয়াছেনই, তা ছাড়া অন্যান্য সকল দেশের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতেও আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ক্রমশ নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে রুশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত থাকার কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মঃ ষ্ট্যালিনের প্রস্তাবকে যে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। কাজেই ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ চার্লস রস যখন সাংবাদিকদিগকে জানাইলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্শাল ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই, তখন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। বরং মার্শাল ষ্ট্যালিন ওয়াশিংটনে আসিলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মিঃ রসের এই উক্তি লোকের মনে একটা মিথ্যা আশার সঞ্চারই করিয়াছিল। সাক্ষাৎকারের স্থান-নির্ণয় পারস্পরিক মর্য্যাদা-জ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভর করে, এ কথাও সত্য। মঃ ষ্ট্যালিন ওয়াশিংটনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দীর্ঘ ভ্রমণে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মস্কো, কালিনগ্রাড, ওডেসা অথবা পোল্যাণ্ড কিম্বা চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ওয়াশিংটনেই সাক্ষাৎকার হওয়ার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায়, লোকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সাক্ষাৎকারের স্থান-নির্ণয়ের প্রশ্ন লইয়াই ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অবশ্য স্থানের প্রশ্নই যদি প্রধান হইত, তাহা হইলে মধ্যপন্থা হিসাবে জেনেভায় উভয়ের সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব হইত না। আসল ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ অন্যরূপ, ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে নূতন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডিন একিসন যখন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট টম্যানের সহিত মার্শাল

ষ্ট্যালিনের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কথা ঘোষণা করিলেন, তখনই তাহা বুঝিতে পারা গেল। অতঃপর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার সহিত মঃ ষ্ট্যালিনের দ্বৈত আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

মঃ ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সম্পর্কে মিঃ একিসন যে-সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মিঃ ট্রুম্যানও সেই সকল যুক্তিতেই মঃ ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার যে তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেগুলি যে খুব ভাল যুক্তি তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু যুক্তি খুব ভাল হইলেও প্রস্তাব অগ্রাহ্যের উহাই প্রকৃত কারণ না-ও হইতে পারে। কোন দেশের প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই দেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের সহিত আলোচনা করিতে অস্বীকার করার মধ্যে গণতান্ত্রিক উদার মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া আর সকল রাষ্ট্রই যে মার্কিণ তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষেও বুঝিতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সহিতই শান্তি-চুক্তি আলোচনা করিতে রাজী ছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একত্রে ছাড়া বার্লিন-সমস্যা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব বিবেচনা না করার অভিপ্রায় বৃটেন ও ফ্রান্সকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমান মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অমতে কিছুই করিতে পারে না, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। বার্লিন অবরোধ তুলিয়া লইলেই জার্ম্মাণ-সমস্যা লইয়া পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব নূতন নয়। রাশিয়ার দাবী উহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ জার্ম্মাণী সম্পর্কে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহূত হইলেই বার্লিন অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইবে। মঃ ষ্ট্যালিন যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি এবং ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ কুইলের সহিত একযোগে আলোচনা করিতে রাজী হন, তাহা হইলেই যে তাঁহারাও রাজী হইবেন, তাহা আজ অনুমান করা কঠিন।

মঃ ষ্ট্যালিনের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অবশ্যই সাধারণ মানুষের বিবেচনার বিষয়। এই প্রস্তাবকে ধাপ্পা বলিয়া মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে সম্ভব, এই বিশ্বাস ফ্রান্সের প্রবীণ কম্যুনিষ্ট নেতা মারসেল কাচিন (Marcel Cachin), ইটালীর কম্যুনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তা এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কম্যুনিষ্ট নেতা ম্যাক্স রেইম্যানও প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই শান্তি আলোচনার প্রস্তাবকে ধাপ্পা মনে করিবার কারণ নাই। আর ধাপ্পাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হইলে লাভ না হইলেও লোকসান কিছুই হইত না। বরং প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় রাশিয়ার মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছে যে, আটলাণ্টিক ব্লক গঠনের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা নিহিত রহিয়াছে শান্তি-চুক্তি তাহার বিরোধী বলিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মঃ ষ্ট্যালিনের শান্তি আলোচনা অগ্রাহ্য করিয়াছে। তাহাদের মনে এই আশঙ্কাও জাগিতে পারে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন এবং উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি দ্বারা রুশ-বিরোধী শক্তিকে এমন সুদৃঢ় করা হইয়াছে যে, রাশিয়ার সহিত কোন মীমাংসা করিবার প্রয়োজনীয়তাই আমেরিকা অনুভব করিতে পারিতেছে না। সর্ব্বোপরি আরও একটি বৃহৎ সমস্যা আছে। ধনতন্ত্র সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্ববিরোধ এবং দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ, এই আত্মবিশ্বাস ধনতন্ত্রবাদীদের নাই। যদি এই সকল সামাজিক স্ব-বিরোধ ও দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতেই কম্যুনিজমের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনতন্ত্রবাদীরা কম্যুনিজমকে সন্দেহের চক্ষে না দেখিয়া পারে না। হয়ত এই আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং সন্দেহ ষ্ট্যালিনের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার সর্ব্বশেষ কারণ।

মিঃ বেভিনের প্যালেষ্টাইন-নীতির পরাজয়

মিঃ বেভিনের প্যালেষ্টাইন-নীতি শুধু ইঙ্গ-মার্কিণ বন্ধুত্বের মধ্যেই ফাটল ধরায় নাই, তাহার নিজের পতনকেও আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার প্যালেষ্টাইন-নীতি পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্যেরই শুধু নিন্দা লাভ করে নাই, যে মিঃ চার্চ্চিল মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র-নীতির প্রশংসা বরাবরই করিয়া আসিতেছেন, সেই মিঃ চার্চ্চিল পর্য্যন্ত কঠোর ভাষায় তাঁহার প্যালেষ্টাইন-নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের ভাষায় প্যালেষ্টাইন-নীতি বিস্ময়কর 'কু-ব্যবস্থার' সহিত পরিচালিত হইয়াছে। কমন্স সভায় মিঃ বেভিনের প্যালেষ্টাইন-নীতি ১১৩ ভোটে সমর্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মাত্র ১° ভোট বেশী হইয়াছিল, এ কথাও শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়। বস্তুতঃ সরকার পক্ষে ভোটের এত কম সংখ্যাধিক্য ১৯৪° সালে নরওয়ে অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ভোট হইয়াছিল, তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মিঃ চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট ৮১ ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। মিঃ বেভিনকে যে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ ত্যাগ করিতে হয় নাই তাহার কারণ সমগ্র মন্ত্রিসভাই তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। শুধু একমাত্র শ্রমিক-সদস্য ডাঃ সেগল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও ৬° জন শ্রমিক-সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কমন্স সভায় প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বিতর্কের সময় মিঃ বেভিন গোড়া হইতে বিভিন্ন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্যালেষ্টাইন-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং মধ্য-প্রাচ্যে বৃটিশের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের কথাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব সৃষ্টি হইয়াছে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর হইতে। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তে অর্পণ করিয়া মিঃ বেভিন যে রাজনৈতিক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা দিতে পারেন নাই। এবং বৃটিশ-স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে কূটনৈতিক চাল তিনি চালিলেন তাহাতে আমেরিকার সহিত বৃটেনের মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বৃটেনের দায়িত্ব ও বাধ্য-বাধকতার কথা যতই তিনি বলুক না কেন, অবশেষে আমেরিকার চাপের নিকট তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, কার্য্যতঃ হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। অবশ্য আমেরিকাও ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়াছেন, এ কথাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সাইপ্রাস দ্বীপ হইতে সামরিক বিভাগে যোগদান করিবার উপযোগী বয়স্ক ইহুদীদের মুক্তিদান বৃটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরাজয়। নিরাপত্তা পরিষদ এবং প্যালেষ্টাইনের শালিস কাউণ্ট বার্ণাডোটের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এই ধূয়া তুলিয়া ঐ সকল ইহুদীকে আটক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত সত্যের অপলাপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বেলফুর-ঘোষণায় প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্র ব্যতীত জাতীয় আবাস সম্ভব নয়, মিঃ বেভিন তাহা বুঝেন না তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হওয়াই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না এবং তাঁহার বোধ হয় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যা লইয়া জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থ হওয়াই তাঁহার ভুল হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় মেণ্ডেট শেষ হওয়ার ১৫ দিন পূর্ব্বে ব্যতীত জাতিপুঞ্জের কমিশনকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। মিঃ বেভিন অস্বীকার করিলেও ইহা সকলেরই বিশ্বাস যে, বৃটিশের উস্কানিতেই আরব রাষ্ট্রসমূহ শিশু ইস্রাইল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ইস্রাইল রাষ্ট্র যখন নিজের শক্তিতে টিঁকিয়া গেল, তখন এই রাষ্ট্র যত ক্ষুদ্র হয় তাহার জন্য বৃটেন চেষ্টা করিতেছে। বার্ণাডোট-পরিকল্পনা সমর্থন করিবার কারণও এইখানেই। নেগেভ অঞ্চল বৃটিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা চাই। ট্রান্সজর্ডান বা মিশর যাহার হাতেই নেগেভ অঞ্চল থাকুক, উহার উপর বৃটিশের নিয়ন্ত্রণ থাকিবেই। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল ইহুদীর বাস তাহাদের স্থান-সঙ্কুলানের জন্য নেগেভ অঞ্চল ইস্রাইল রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। অবশ্য সুয়েজ ক্যানেলের চিন্তাও বৃটেনের আছে। সুয়েজ ক্যানেলের চুক্তি ১৯৬৮ সালে শেষ হইবে। আবার যে নূতন চুক্তি হইবে সে আশা কম। কাজেই মিশরকে দলে টানিবার চেষ্টায় রোডস্ দ্বীপে ইস্রাইল ও মিশরের যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে মিশর-ইস্রাইল সীমান্তে পাঁচখানি বৃটিশ বিমান টহল দিতে গিয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। সুয়েজ ক্যানেলের বিকল্প নূতন একটি ক্যানেল কাটিবার প্রস্তাবও আছে। এই ক্যানেল আকাবা উপসাগর হইয়া যাইবে। এই আকাবা উপসাগরের মাথায় আকাবা বন্দর অবস্থিত। ট্রান্সজর্ডানে এই বন্দর অবস্থিত হইলেও উহা মিশর, সৌদী আরব ও প্যালেষ্টাইন সীমান্তের কাছে অবস্থিত। এই জন্যই নেগেভ অঞ্চলে বৃটিশ আধিপত্য রক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে।

ডারবানে ভারতীয় হত্যা—

১৩ই জানুয়ারী (১৯৪৮) হইতে তিন দিন ধরিয়া ডারবানে ভারতীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বোধ হয় 'মার্ডার অব দি ইনোসেন্টস' এবং সেণ্ট বার্থালোমিউ দিবসের হত্যাকাণ্ডের সহিতই ইহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। বে-সরকারী হিসাব অনুযায়ী দাঙ্গায় তিন শত জন নিহত হইয়াছে। সরকারী হিসাবে নিহতের নষ্ট হইয়াছে, সহস্রাধিক লোক হইয়াছে আহত, ভারতীয়দের শত শত বাসভবন লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সমগ্র ভারতীয় পরিবার একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি পরিবারকে গৃহমধ্যে হত্যা করা হইয়াছে এবং কতকগুলি ভারতীয় পরিবারকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দাঙ্গাকারীরা সেই গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। ৩০ হাজার ভারতীয় নরনারী নিরাশ্রয় হইয়া আশ্রয়-শিবিরে স্থান পাইয়াছে। দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে সংবাদে বলা হয় যে, একখানি চলন্ত বাসের মধ্যে জনৈক ভারতীয় ষ্টোর-কিপার এবং জনৈক আফ্রিকানের মধ্যে কলহের ফলে এই দাঙ্গা আরম্ভ হয়। আফ্রিকানরা জুলু সমর-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আক্রমণ আরম্ভ করে। আফ্রিকানদের সহিত ভারতীয়দের বিবাদ বাধিবার কোনই কারণ নাই। বরং শ্বেতকায়দের হাতে সমান ভাবে নিপীড়িত আফ্রিকান এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল বলিয়া জানা যায় না। সামান্য কলহ হইতে এত বড় একটা বৃহৎ হাঙ্গামায় উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া যেমন স্বীকার করা যায় না, তেমনি এই হাঙ্গামা যে পূর্ব্ব-পরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে জেনারেল স্মাটস বলিয়াছেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা তাহার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিপীড়ন-মূলক নীতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ফল আস্বাদন করিতেছে।" মলান গবর্ণমেণ্টের বর্ণবিদ্বেষ এবং নিপীড়নমূলক নীতিই যে এই দাঙ্গার অব্যবহিত কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জেনারেল স্মাটসের গবর্ণমেণ্টের সময় হইতে, এমন কি তাহারও পূর্ব্ব হইতে যে বর্ণবিদ্বেষ ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহাও এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী কম নয়।

মলান গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতীয়দিগকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজটি সম্পন্ন করা বড় সহজ যে হইবে না, তাহা ডাঃ মলানও জানেন। কিন্তু আফ্রিকানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভারতীয়রা যদি দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে চলিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্যেই ডাঃ মলানের ফ্যাসিষ্টপন্থী জাতীয়তাবাদী দল জুলুদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছে। তাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে জুলুদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্যে। এই হাঙ্গামা হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন যে, জুলুরা যখন লুণ্ঠন করিতেছিল সেই সময় কতকগুলি অজ্ঞাত লোক লরী করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়, গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য জুলুদিগকে পেট্রল সরবরাহ করে। হাঙ্গামা বন্ধ করিতে মলান গবর্ণমেণ্টের তিন দিন লাগিয়াছিল, ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই যে আয়োজন করা হইয়াছিল তাঁহাতে সন্দেহ নাই। তবে সময় নির্দ্ধারণে কোন ভুল হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। নতুবা এই হাঙ্গামায় ভারতীয়রা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। হাঙ্গামা থামিলেও বিক্ষিপ্ত

আক্রমণ আরম্ভ করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এই হাঙ্গামাকেও যে-ভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের মধ্যে আরও প্রচার-কার্য্যের উপায়রূপে ব্যবহার করা হইতেছে এবং হাঙ্গামার সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ডারবানের পুলিশ ডেপুটি কমিশনর বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দের চোরাকারবার চালানই এই দাঙ্গার মূল কারণ। বৃটিশ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাণ্ডে পোষ্ট' লিখিয়াছেন, "ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চোরাকারবার করায় আফ্রিকানদের প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। উহাই যদি একটি স্ফুলিঙ্গ সংযোগে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।" ডাঃ মলান নিগ্রোদের মধ্যে আফ্রিকান ও ভারতীয়দের যে সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও এই বিভেদকে প্রজ্বলিত রাখিবার প্রয়াস মাত্র। মলান-গবর্ণমেণ্ট হাঙ্গামার কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারত স্বাধীন হইয়াও দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

চীনে শান্তির মরীচিকা—

চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা শেষ পর্য্যন্ত মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, চিয়াং কাইশেকের পদত্যাগের ফলে শান্তি আলোচনার পথে শেষ বাধা অপসারিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর হইতে বিলম্ব হয় নাই। গত ২১শে জানুয়ারী (১১৪১) জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক অস্থায়ী ভাবে প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করেন এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট লি সুং জেন প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ২২শে জানুয়ারী তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুং শান্তি-চুক্তির জন্য যে আট দফা সর্ত্ত দিয়াছিলেন চীন গবর্ণমেণ্ট তাহার ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক। এই আট দফা চুক্তি নিম্নলিখিত-রূপ :—(১) সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সহিত 'বিশ্বাসঘাতকতামূলক' চুক্তি বাতিল করিতে হইবে; (২) শাসনতন্ত্র বাতিল করিতে হইবে; (৩) সমস্ত যুদ্ধাপরাধীর বিচার হইবে; (৪) গবর্ণমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনী হইতে প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে অপসারিত করিতে হইবে; (৫) 'আমলা-তান্ত্রিক' মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে; (৬) ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে; (৭) প্রতিক্রিয়াশীল লোক বাদ দিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠন করিতে এবং (৮) চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিবস হইতে না ধরিয়া পাশ্চাত্য পঞ্জিকা অনুযায়ী দিন গণনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারই যে কঠিন ও প্রধান সর্ত্ত তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্বয়ং চিয়াংকাইশেকও যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে এক জন। কিন্তু এই সকল সর্ত্তের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চালনার অর্থ এই সকল সর্ত্ত স্বীকার করা নয়। তবু শেষ পর্য্যন্ত শান্তি আলোচনা আরম্ভ হওয়াই সম্ভব হইল না। চিয়াং কাইশেক পদত্যাগ করিলেও কম্যুনিষ্টদের সহিত আন্তরিকতার সঙ্গে শান্তি আলোচনা আরম্ভ করিবার প্রকৃত অন্তরায় যে দূর হয় নাই, তাহা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

২৪শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিষ্টরা নানকিং গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য পাঁচ জন প্রতিনিধি মনোনয়নে স্বীকৃত হইয়াছেন। পিপিংএ শান্তি-বৈঠকের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট লিং সুং জেন কম্যুনিষ্টদের সর্ত্ত অনুযায়ী শান্তি আলোচনা চালাইতে স্বীকৃত হইয়া ২২শে জানুয়ারী যে প্রস্তাব করেন, তাহার ফলেই কম্যুনিষ্টরা প্রতিনিধিমণ্ডলী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরদিনই চীনের আইন পরিষদের অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী চীনের রাজধানী নানকিং হইতে সাংহাইয়ে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরদিন ২৫শে জানুয়ারী চীন মন্ত্রিসভার অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী সান কো দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত শান্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে সরকারী প্রতিনিধি দলকে লইয়া যাইবার জন্য একখানি বিমান প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দেন। কিন্তু সাংহাই হইতে ২১শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, কম্যুনিষ্ট বেতারে শান্তি আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্ব-সর্ত্ত স্বরূপ চিয়াং কাইশেক, কুয়োমিণ্টাং দলের অন্যান্য নেতা এবং চীনের প্রাক্তন জাপ সেনাপতি লেঃ জেনারেল যাসাৎসুগী আমুরাকে গ্রেফ্‌তার করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, চীন গবর্ণমেণ্টের শান্তির প্রচেষ্টা সময় লইবার অছিলা মাত্র। প্রেসিডেণ্ট লিং সুং জেন কম্যুনিষ্টদের এই দাবী মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, গত ২৮শে জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট লিং সুং জেন বেতার যোগে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষার জন্য কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুংয়ের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ আবেদন জানান। তাহার কিছু পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী সান্‌ কো এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ নানকিং ত্যাগ করিয়া সাংহাই যাত্রা করেন। সাংহাইয়ে চীনের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া এবং সেখানে কম্যুনিষ্টদিগকে প্রচণ্ড বাধা দিবার জন্য ৩০ হাজার সৈন্যের সমাবেশ, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চীন গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ সূচনা করে কি না, তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শান্তি প্রচেষ্টার ব্যাপারে চীন গবর্ণমেণ্টের মধ্যেই যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সান্‌ কো মন্ত্রিসভার ভিতরে যাঁহারা কম্যুনিষ্টদের সহিত আপোষ করার বিরোধী সাংহাইয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করা তাঁহাদেরই বিজয় সূচনা করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মন্ত্রিসভার এই দক্ষিণপন্থী দল সি, সি, ক্লিক্ (C. C. Clique) নামে অভিহিত। ইঁহারা কম্যুনিষ্টদের সহিত আপোষ-মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণে সরিয়া যাইয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকাই ইঁহাদের অভিপ্রায়। নানকিং-সাংহাই অঞ্চলের সৈন্য-বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল তান সেনপো এই দলের সমর্থক এবং চীনের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যাঙ্কার এবং কাইনেন্‌সিয়ারগণ এই দলের পৃষ্ঠপোষক। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এবং বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য ওয়াং ওয়েন হাও-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি দল আছে। কুয়োমিণ্টাং আমলারা এই দলের সমর্থক। অপেক্ষা করিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করাই ইহাদের নীতি। শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে ইঁহারা ফরমোসায় চলিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী। মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জেঃ চান

চিন্-চুং-এর আর একটি দল আছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের শান্তি-প্রচেষ্টা এই দলের নৈতিক সমর্থন লাভ করিতেছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চারিটি প্রদেশের গবর্ণর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জে: চাং চুন এই দলকে সমর্থন করিয়া থাকেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে জে: চাং কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে পৃথক্ মীমাংসা করিতে পারেন, ইহাও অনেকের ধারণা। শান্তি সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার ভিতরেই যদি মতভেদ থাকে, তাহা হইলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের শান্তি-প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে কিরূপে? সর্ব্বোপরি অনেকে আশঙ্কা করেন, চিয়াং কাইসেক অস্থায়ী ভাবে পদত্যাগ করিলেও, প্রকৃত ক্ষমতা তিনিই পরিচালনা করিতেছেন। যুদ্ধের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক জীবন হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন, অনেক মার্কিণ কূটনীতিবিদও তাহা বিশ্বাস করেন না। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রায় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের যত ধনসম্পদ আছে চিয়াং কাইশেক সমস্তই ফরমোসার দুর্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাসভাজন তিন ডিভিসন সৈন্যও সেখানে রাখা হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, শান্তি-প্রচেষ্টার অছিলায় যেটুকু সময় পাওয়া যাইবে সেই সময়ের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিবে। তখন চিয়াং কাইশেকও আমেরিকার নিকট হইতে অধিকতর সামরিক সাহায্য লাভ করিবেন। তিনি না কি গত ৮ই জানুয়ারী মাদাম চিয়াং কাইশেকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিবে, মার্কিণ শিল্পপতিদের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে।

চিয়াং কাইশেক আবার প্রবল ভাবে কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিবেন কি না, সে সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিবার সময় এখনও হয় নাই। চীনের প্রধান মন্ত্রী সান্ ফো গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীনের জাতীয় সরকার বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণে রাজী হইবেন না এবং যুক্তিসঙ্গত ও উভয় পক্ষের সুবিধামত সর্ত্তে কম্যুনিষ্টরা সম্মত না হইলে চীনের জাতীয় সরকার শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট জাতীয়তাবাদী শান্তি-মিশনের পিপিং যাত্রাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের নিকট ইতিপূর্ব্বেই (২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৯) চীনের প্রাচীন রাজধানী পিপিং সহর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার কম্যুনিষ্ট বাহিনী ভাঁটির দিকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং ব্যাপক ভাবে ইয়াংসী নদী অতিক্রমের আয়োজন হইয়াছে।

জাপানের সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ২৪শে জানুয়ারী জাপানের যে সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, যুদ্ধের পরে ইহা জাপানের তৃতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন। জাপ পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদের মোট ৪৬৬টি আসনের মধ্যে ডেমোক্রাটিক লিবারেল পার্টি ২৬২টি আসন দখল করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পার্লামেন্টে তাহাদের সদস্য-সংখ্যা ছিল ১৫২ জন। ডেমোক্রাট দল ৭০টি এবং সোশ্যালিষ্ট দল ৪১টি আসন দখল করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পার্লামেন্টে তাহাদের সদস্য-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০ ও ১১১ জন। কম্যুনিষ্ট পার্টি ৩৬টি এবং পিপলস্ কো-অপারেটিভ পার্টি ১৩টি আসন দখল করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পার্লামেন্টে তাহাদের সদস্য-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ এবং ২১ জন। যদিও রক্ষণশীল ডেমোক্রাটিক লিবারেল দল এককই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তথাপি নূতন পার্লামেন্টে কম্যুনিষ্ট পার্টির পূর্ব্ববর্ত্তী পার্লামেন্ট অপেক্ষা ৩২টি আসন বেশী লাভ করার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারী ইউনিয়ন সাধারণ ধর্ম্মঘট করিবার হুমকী দেওয়ায় জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের নির্দ্দেশে জাপ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি ৩২টি আসন বেশী লাভ করা তাহারই প্রতিক্রিয়া বলিয়া অনেকে মনে করেন। টোকিও সহরের সাতটি আসনের সব কয়েকটিই কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছে। যদিও বিরোধী দল হিসাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিদের সহিত কম্যুনিষ্টদের কোয়ালিশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচন যে জাপানে কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিই সূচনা করিতেছে তাহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বিজিত দেশে বিজয়ী রাষ্ট্রের দখলকার সৈন্যবাহিনী তিন বৎসরের অধিক কাল থাকিলে প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়া দেয়।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঘুষ গ্রহণের দুর্নামে জড়িত হইয়া আশিদা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় ডেমোক্রাটিক লিবারেল পার্টির নেতা যোশিদা ৭ই অক্টোবর (১৯৪৮) সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। আলোচ্য নির্ব্বাচনে যোশিদার দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই এই দলে আছেন।

ব্রহ্মদেশে কি ঘটিতেছে—

গত নবেম্বর মাসের (১৯৪৮) প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল ব্রহ্মদেশের বিপদ বুঝি কাটিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সাদা ঝাণ্ডা পি-ভি-ওর যুদ্ধ-বিরতির পর কম্যুনিষ্টরা ব্রহ্ম-গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে চোর-ডাকাতের দল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত সাদা ঝাণ্ডা পি-ভি-ওর সহিত গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা আর সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কিরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে থাকিন নু মন্ত্রিসভার পদত্যাগ উপলক্ষে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে। ঐ বিবৃতিতে বিভিন্ন কারণে ব্রহ্মদেশের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠার কথা বলা হইয়াছে। এই বিভিন্ন কারণের মধ্যে সাম্প্রতিক কারেণ বিদ্রোহ অন্যতম। অবস্থার গুরুত্বই থাকিন নু মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কারণ না হইলেও এবং থাকিন নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেও কারেণ বিদ্রোহ উত্তরোত্তর প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বিদ্রোহী কারেণরা টঙ্গু, পিউ এবং বেসিন দখল করাতেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য ১ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বেসিনের 'এয়ারষ্ট্রিপ' সরকার পক্ষ পুনরায় দখল করিয়াছেন এবং বিদ্রোহীদিগকে সহর হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ইনসিনের বহির্ভাগে সরকারী বাহিনী কারেণদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। কিন্তু অবস্থা এখনও অত্যন্ত গুরুতর। কম্যুনিষ্টরাও কারেণদের সহিত মিলিত হওয়ায় এবং সাদা ঝাণ্ডা পি-ভি-ওর সহিত আপোষ না হওয়ায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্রহ্ম রিজিওনেল আটোনমি কমিশন কারেণদের পৃথক্ রাষ্ট্র-গঠনের নীতি স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ থাকিন নুও ঘোষণা করিয়াছেন যে, কারেণদের পৃথক্ রাষ্ট্র গঠনে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশ হইতে কারেণ রাষ্ট্রের পৃথক্ হওয়ার নীতি তিনি স্বীকার করিবেন না। ইহাতেও কারেণ-বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এক সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, কারেণ-বিদ্রোহ ব্রহ্মদেশকে কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু কম্যুনিষ্টরাও কারেণদের সহিত যোগদান করায় প্রকৃত অবস্থা রহস্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। কম্যুনিষ্টরা ব্রহ্মদেশ হইতে যাহাতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ব্রহ্ম-সীমান্ত অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের সঙ্কট বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়াছে। মালয়ের সঙ্কট এখনও কাটে নাই। বৃটিশ, মালয়ী ও শ্যাম দেশের সৈন্য একযোগে মালয়ের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ-বিরতির সমস্যা—

গত ১৭ই জানুয়ারী হইতে রোডস্ দ্বীপে মিশর ও ইজরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। ডাঃ বাঞ্চে নেগেভ মরুভূমি সম্পর্কে যুদ্ধ-বিরতির যে নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন, উভয় পক্ষ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। মিশর ও ইজরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ না কি অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ডাঃ বাঞ্চে আরও ছয়টি আরব রাষ্ট্রকে এই আলোচনা-বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন কি না সরকারী ভাবে তাহা কিছুই জানা যায় নাই।

সম্প্রতি ইহুদী-প্যালেষ্টাইনে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ইজরাইল গণ-পরিষদ ১২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক দল মোট আসন-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ দখল করিয়াছেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে এই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, গঠনকামী দলগুলি লইয়া তিনি শ্রমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। এ পর্য্যন্ত ৩১টি রাষ্ট্র ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী জেরুজালেমে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট জেরুজালেমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জেরুজালেম অতঃপর ইজরাইল-অধিকৃত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে না, উহা ইজরাইল রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। গত আগষ্ট (১৯৪৮) মাসে জেরুজালেমে সামরিক গবর্ণরের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

লিন্সকী ট্রাইবুন্যালের রায়—

বৃটেনের মন্ত্রিগণ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গঠিত লিন্সকী ট্রাইবুন্যালের রায় গত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪৯) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ১৫ই নবেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই ট্রাইবুন্যাল ২৫ দিন তদন্ত-কার্য্য করেন। ট্রাইবুন্যালের রায়ে বৃটিশ বাণিজ্য-বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ বেলচার এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ গিবসন উপঢৌকনের বিনিময়ে ব্যবসায়ীদিগকে সুবিধা প্রদানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। অন্যান্য সকলে অভিযোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। মিঃ বেলচার ও মিঃ গিবসন উভয়েই পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রীদের এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যাবলী কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয়, এই তদন্ত হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। মন্ত্রিসভার কয়েক জন সদস্য পোলিশ ইহুদী সিডনী ষ্ট্যানলীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই গুজব হইতেই উক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য উক্ত সিডনী ষ্ট্যানলীও তাহার উক্তি দ্বারা এই গুজবকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। ট্রাইবুন্যালের রায়ে তাহার সম্বন্ধে বলা [illegible] হইয়াছে যে, সিডনী ষ্ট্যানলী এমন লোক যে তাহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্য-মিথ্যা যে কোন উক্তি সে করিতে পারে।

পারস্যের রাজা গুলীতে আহ[illegible]

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) পারস্যের শাহ মহম্মদ রেজা পহ্লবী আততায়ীর গুলীতে সামান্য আহত হন। জনতা ও সামরিক পুলিশ আততায়ীকে প্রহার করে এবং প্রহারের ফলে ঐ দিন রাত্রেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

শাহের আততায়ী চরমপন্থী তুদে দলের সদস্য বলিয়া কথিত। পারস্য গবর্ণমেণ্ট বামপন্থী তুদে দল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রপক্ষের চাপে পারস্যের নৃপতি রে[illegible] পহ্লবী পদত্যাগ করায় শাহ মহম্মদ রেজা পহ্লবী পারস্যের রাজা হন।

এশিয়া স[illegible]—

ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে [illegible] গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৯) নয়া দিল্লীতে [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে [illegible] জানুয়ারী। এই সম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান, ইরাণ, [illegible], ইয়েমেন, ইরাক, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, লেবানন, মিশর, [illegible], সৌদী-আরব, সিরিয়া এবং ব্রহ্মদেশ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। নিউজিল্যাণ্ড, চীন, নেপাল এবং শ্যাম এই সম্মেলনে পর্য্যবেক্ষক পাঠাইয়াছিলেন। ২২শে জানুয়ারী এশিয়া সম্মেলনের এক গোপন অধিবেশন হয়। এই গোপন অধিবেশনে যে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, ২৩শে জানুয়ারীর প্রকাশ্য অধিবেশনে সেই প্রস্তাব তিনটিই পঠিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটি ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে। এই প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে যে আট দফা কর্ম্মসূচী সুপারিশ করা হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল :

(১) ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণ এবং অন্যান্য নেতা ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান; (২) প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দান এবং ১৮ই ডিসেম্বরের (১৯৪৮) যে-সকল এলাকা প্রজাতন্ত্রী সরকারের দখলে ছিল, সেগুলি ১৯৪৯ সালের ১৫ই

মার্চ্চের পূর্ব্বে প্রজাতন্ত্রী সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ; (৩) ১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন; (৪) সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ সমস্ত বিষয়ে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের স্বাধীনতা; (৫) পররাষ্ট্র ব্যাপারে কতখানি স্বাধীনতা থাকিবে, তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির করা হইবে; (৬) গণ-পরিষদের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবরের মধ্যে নির্ব্বাচন সমাপন; (৭) ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে এবং (৮) এই সকল সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম শুভেচ্ছা কমিটি বা অন্ত কোন কমিটি গঠন।

প্রস্তাব হিসাবে এই প্রস্তাবকে অবশ্যই নিন্দা করা যায় না এবং সত্যই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এই প্রস্তাব যে ভাল প্রস্তাব, তাহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া যে আরও অধিক আশা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের স্মারকলিপি হইতেই বুঝা যায়। এই স্মারকলিপিতে নিরাপত্তা পরিষদ যদি [illegible] আক্রমণ বন্ধ করার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী এশিয়ার [illegible] উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ওলন্দাজরা প্রস্তাবগুলি গ্রাহ্য করিলে [illegible] বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্মও স্মারকলিপিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এশিয়া সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার উল্লিখিত দাবী দুইটি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কাজেই এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের গোড়াতেই গলদ রহিয়া গিয়াছে। এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার কোন ভরসা দেখা যায় না।

নিরাপত্তা পরিষদের ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাব—

গত ২৮শে জানুয়ারী লেক সাক্‌সেসে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে [illegible] যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। নিরাপত্তা পরিষদ এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য হয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, না হয় উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার, ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিবার এবং যোগাকর্ত্তা এলাকায় তাঁহাদের কাজ করিবার স্বাধীনতা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবে ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বে ইন্দোনেশিয়ায় অন্তর্ব্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আলোচনায় সাহায্য করিবার জন্ম নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক কমিশন নিয়োগের কথাও আছে; আগামী ১লা অক্টোবরের মধ্যে নির্ব্বাচন শেষ করিবার এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেও ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র তাহার পূর্ব্ব-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। উহা ব্যতীত প্রজাতন্ত্র এবং ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন মীমাংসা হওয়াও সম্ভব নয়।

এই প্রস্তাবে ১৮ই ডিসেম্বরের (১৯৪৮) পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চল প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল, সেগুলি প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বত্র ওলন্দাজ সৈন্যের অবস্থিতির জন্ম নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়াও সম্ভব হইবে না। অন্ততঃ রেনভাইল চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজ সৈন্য যেস্থানে ছিল সেই স্থানে ফিরাইয়া নেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। কোন না কোন অজুহাত তুলিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট যে এই প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত করিবেন না, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা নির্ভুল ভাবে অনুমান করা যায়।

দেশালাই

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

মনে হয় [illegible] বুঁদ,
[illegible] বারুদ।

তার পর পুড়ে গেছে গ্রাম,
জনপদ বুঝি কোন বিদ্রোহী প্রজার
নিশ্চিহ্ন হয়েছে যার নাম।

সেআগুন বুঝি ফের জ্বলে
অন্ধকার কোন গুহাতলে,
সে-আলোয় শুধু যায় দেখা
নিঃসঙ্গ বেদনায় একা
সন্ন্যাসী খুঁজিছে কোন পথের ইসারা
সাক্ষী যার সঙ্গিহীন তারা।

সমস্ত জীবন ধরে এ-উত্তাপ সয়ে সয়ে,
একেবারে নিবে যাওয়া একবার শুধু আলো হয়ে
এরি মধ্যে, ভাবি কোনখানে,
আছে না কি অন্য কোন মানে?
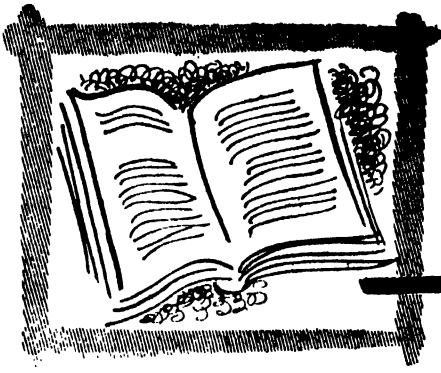
সংস্কৃতানুবাদ

ভগবদ্‌গীতা ঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ঃ প্রকাশক গ্রন্থকার। মূল্য সাড়ে নয় টাকা।

জর্জ বর্ণার্ড শ'র জীবনীকার হ্যসকেথ পিয়ারসনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ' বলেন, "আমাদের বুড়ো খোকারা যদি বটতলার উপন্যাসগুলো না পড়ে বাইবেলটা ভালো করে আবার পড়তেন ত কাজ দিতো। পিয়ারসন খুশী না হয়ে পুনরায় আক্রমণ করেন: "বাইবেলের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। ছেলেবেলায় বাইবেল এত পড়েছি যে আর না পড়লেও···"

"ও-বই ছেলেবেলায় পড়ে বুঝবার নয়।"

"এটা কি আপনার একটু ভুল হল না মিটার শ'? সমস্ত ভালো লেখাই ত একেবারে সহজ করে লেখা—শিশুরাও যা বুঝতে পারে। তাই নয় কি?"

"সে ক্ষেত্রে অবশ্য" শ' এবার ধুলিসাৎ করেন পিয়ারসনকে।

"সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সব চেয়ে মহৎ সাহিত্য হল ইংলিশ এ্যালফাবেট।"

পরিহাসের তলায় যে কথাটি শ'য়ের মর্ম বিদ্ধ করে তা হলে উপন্যাস নাটকের চেয়ে বাইবেল পঠনীয় বেশি অন্য কোন কারণে চিন্তা এবং রস দুইয়েরই জোগান দেয় বলে। আমাদের দেশের বুড়ো খোকারাও এখন কিছু দিন যদি বটতলার উপন্যাসগুলো না গিলে মহাভারতটাকে আরেক বার পড়েন কিম্বা গীতাকে যদি তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন ত নিজেদেরই উপকার করবেন।

গীতা পড়া দরকার অন্য কোন কারণে নয়। এইটে অনুভব করবার জন্যে গীতার শ্রীকৃষ্ণই সত্যিকারের কৃষ্ণের রূপ,—আমরা যার ভক্ত সে যাত্রার কেষ্ট অর্থাৎ ধিনিকেষ্ট! এই ভক্তি যত তাড়াতাড়ি উবে যায়, ততই ভালো।

মুখবন্ধে ভাষ্যকার বলছেন, গীতার সংখ্যাহীন ভাষ্যের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার ছাপ বা মার্গ-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বর্তমান। কিন্তু ভাষ্যকারের কর্তব্য হচ্ছে নিরপেক্ষ হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রই সেই নিরপেক্ষ ভাষ্যের প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু তিনিও চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত মাত্র ব্যাখ্যা লিখে গেছেন।

গিরীন্দ্রশেখরের ব্যাখ্যা মনোবিদ্যার দিক থেকে এবং তাঁর মতে মনোবিদের দৃষ্টি মূল্যবান। এবং তিনি বলেছেন, ধর্মভাব প্রণোদিত হয়ে তিনি এ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হননি। তাঁর মতে গীতার যা প্রাণ হল অধ্যায়ের সঙ্গে অধ্যায়ের যে সঙ্গতি—তাই-ই!—এবং তিনি যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, কোনও অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি।

গ্রন্থের শেষ অংশে শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত শ্লোক বাঙলা অক্ষরে দেওয়া আছে।

মুখবন্ধের শেষে বসু মহাশয় গতানুগতিক প্রথায় অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চাননি—এ জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

বন্দীজীবনের স্মৃতি-সাহিত্য

জেনানা ফাটক ঃ রাণী চন্দ ঃ প্রকাশক মডার্ণ বুক্স লিমিটেড, ১৬০।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে "কারাগার" একটা মস্ত-বড় আসন দখল করে আছে। থাকারই কথা। পরাধীন দেশ, মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক যারা কারা-জীবন তাদের বরণ করতেই হয়েছে। সুদীর্ঘ মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বন্দী-জীবনের এই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যে যে অনেকটা স্থান দখল করে বসবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এই বন্দী-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাংলার অনেক শিল্পী সাহিত্যিককে সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু "স্মৃতি-সাহিত্য" বলতে যা বোঝা যায় তা বিশেষ কেউ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। রচনা হয়ত অনেকেই করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ রচনাই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি না হয়ে নিছক দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জীর বিবৃতি হয়েছে মাত্র। বাংলা ভাষায় বন্দী-জীবনের স্মৃতি-সাহিত্যের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।" বন্দী-জীবনের স্মৃতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে এমন সরস দরদী সাহিত্য-সৃষ্টি উপেন বাবুর আগে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে মূল্যবান স্মৃতিকথা অনেক আছে, কিন্তু তার কোনটাই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" বন্দী-জীবনের স্মৃতি-সাহিত্য হিসেবে অতুলনীয়। তার পর অমলেন্দু দাশগুপ্তের "ডেটিনিউ" উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। বীণা দাসের "শৃঙ্খল ঝঙ্কার" ভাল বই, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলা যায় না। এদিক্ দিয়ে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, "নির্ব্বাসিতের আত্মকথার" পর রাণী চন্দের "জেনানা ফাটক" বন্দী-জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

আগষ্ট আন্দোলনের সময় রাণী চন্দের বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ (সৌভাগ্য?) ঘটেছিল। সেই সময় বীরভূম থেকে রাজসাহী পর্য্যন্ত বিভিন্ন সদর জেলে তিনি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে দিন কাটিয়েছেন এবং সেই সব দিনের বিচিত্র স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথাই "জেনানা ফাটকের" মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। রাণী চন্দ লেখিকা হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের কথাকে লেখ্য ভাষায় রূপ দিয়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর মন ও কলম দুই-ই এই সময় শিক্ষানবীশের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পীর স্তরে পৌঁছেচে। অবনীন্দ্রনাথের কথা ও কল্পনার প্রভাব তাঁর ওপর অত্যন্ত বেশী হলেও, রাণী চন্দ অবনীন্দ্রনাথের "কেরাণী" নন, যদিও সেটুকু হতে পারাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। রাণী চন্দ তাঁর নিজস্ব একটা "ষ্টাইল্" গড়ে তুলেছেন। তাঁর শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে যে কত উজ্জল তা তাঁর "জেনানা ফাটক" পড়লেই বোঝা যায়। খরস্রোতা অভিজ্ঞতার নদীতে ঝিরঝিরে কল্পনার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে রাণী চন্দ তাঁর অপূর্ব্ব কথার নৌকাটিকে বেয়ে নিয়ে গেছেন। "জেনানা ফাটক" তাই শুধু বন্দী-জীবনের স্মৃতিকথা হিসেবে নয়, অন্যতম কথা-সাহিত্য হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দাবী করতে পারে।

রাণী চন্দের মনের ক্যানভাসটি যে কত উদার এবং দৃষ্টি যে তাঁর কত সন্ধানী ও দরদী, তা শিউড়ি ও রাজসাহী জেলের জমাদারণী ও কয়েদীদের অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্রণ থেকেই বোঝা যায়। শিউড়ি জেলের বুড়ো জমাদারণী ইন্দুমতী যদিও "মস্ত লম্বা-চওড়া মজবুত কাঠামোর এক মেয়েমানুষ—তার তীব্র দু'টো খুদে চোখ, পুরু ওল্টানো নীচের ঠোঁট, কালো কালো গুড়ি-গুড়ি দাঁত বের করা—হাঁ-করা মুখে বিশ্রী এক রকম হাসি; সব মিলিয়ে আবছা আলোতে যেন এক বিভীষিকা।" —তবুও তার অদ্ভুত চরিত্র ভোলা যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না রাজসাহী জেলের মেয়ে কয়েদীদের, "নানা বয়েসের মেয়ে। বেশির ভাগই যুবতী—কারো বয়স ষোল, কারো আঠারো, কারো বা উনিশ, কুড়ি, বাইশ। কচি কচি ঢলঢলে মুখ···"। এরা সকলেই মেয়ে কয়েদী, স্বামী-খুনের দায়ে ধরা পড়েছে সব, অর্থাৎ খুনী। "জামিনা—ছোট্ট মেয়েটি; চোখে-মুখে মিষ্টি হাসি", "কালো মেয়ে সৈয়দা," "সুরাতন—ফরসা রংয়ের সুন্দর মেয়েটি", "চোখ দু'টোতে দুষ্টু মি-ভরা" মিছিরণ, "রোগা, পাতলা, লম্বা মেয়েটি" আরা—সকলে খুনী। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। তবু এই সমাজে দৃষ্টির অন্তরালে জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রতিদিন যে ট্র্যাজিডির মর্ম্মান্তিক অভিনয় হচ্ছে তারই নায়িকা এরা সব। খুনী হলেও এরা যে মানুষ, সবার উপরে এরা যে নারী, তার পরিচয় এদের সান্নিধ্যে রাণী চন্দ পেয়েছেন। তাঁর কোমল নারীহৃদয়, তাঁর সজাগ দরদী শিল্পীমন এই সব কয়েদীর সুপ্ত নারীত্বের স্পর্শ পেয়েছে। তারই কথা তিনি কলম ও তুলির আঁচড়ে "জেনানা ফাটকে" বর্ণনা করেছেন এবং "জেনানা ফাটক" যাঁরা পড়বেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে রাণী চন্দ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম: শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশক: এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা একমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই, করলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং নলিনীনাথ দাশগুপ্তের বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কি না ঠিক জানা যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একখানি শিলা-লিপিতে জানা যায় যে বাংলা দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফা-হিয়ান লিখেছেন যে, তখন তাম্রলিপ্তি নগরীতেই ২২টা বৌদ্ধবিহার ছিল। তিনি সেখানে দু'বছর থেকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তির ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বর্ণনার মধ্যে তাম্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধ-সংঘের একটা উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। ৫০৬—'০৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আর একখানা শিলা-লিপিতে জানা যায় যে কুমিল্লা অঞ্চলে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল, তার নাম "রাজ-বিহার।" সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্ব্বত্রই যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি ছিল তা সিদ্ধান্ত করতে কোন বাধা নেই।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে বেশ প্রভাবশালী ছিল বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজকের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। তাঁদের মধ্যে হুয়েন সাং-এর বিবরণ উল্লেখযোগ্য। হুয়েন সাং-এর বিবরণের সারমর্ম্ম হল এই:

"কজঙ্গল (রাজমহলের কাছে) প্রদেশে ছ'-সাতটা বিহারে তিন শতেরও বেশী বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করতেন। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দশটা মন্দির আছে। এই প্রদেশের উত্তরে গঙ্গাতীরের কাছে যে বিশাল দেবালয় আছে তার চারি দিকের দেয়ালে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বৌদ্ধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তর-বঙ্গ) ২০টি বিহারে তিন শতেরও বেশী হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করতেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০ মন্দির আছে। উলঙ্গ নির্গ্রন্থপন্থীদের (জৈন) সংখ্যাও খুব বেশী। রাজধানীর তিন-চার মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সংঘারাম। এর ভিক্ষু-সংখ্যা প্রায় ৭০০, সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ) প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বিহারে ২০০০ ভিক্ষু থাকেন। তাম্রলিপ্তে ১০টি বিহারে প্রায় ১০০০ ভিক্ষু থাকেন। কর্ণসুবর্ণে ১০টি বিহারে প্রায় ২০০০ হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ-ভিক্ষু থাকেন। রাজধানীর কাছে লো-টো-বি-চি বিহার; বহু-তলায় নির্ম্মিত সুউচ্চ। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক এখানে সমবেত হন।"

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময়েই বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের উদয় হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই সময় জন্মলাভ করে বলা চলে। বাংলা শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের চরম শ্রীবৃদ্ধি হয়। সুতরাং বাংলার বৌদ্ধযুগের ইতিহাস এই দিক্ থেকে যুগান্তকারী বললেও ভুল হয় না। এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা ও রচনা করা সেই জন্যই একান্ত দরকার। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এই ইতিহাস ধৈর্য্যসহকারে রচনা করেছেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু প্রকাশভঙ্গী যদি তাঁর আরও সহজ ও সাবলীল হত, তাহ'লে এই মূল্যবান ইতিহাসখানি আরও সুখপাঠ্য হত বলে মনে হয়।

রঙ্গ-পট

হ্যামলেট-প্রসঙ্গ

মঞ্চের এবং পর্দ্দার আদর্শ যেখানে একই রসরূপ ফোটাবার চেষ্টা করে, আজকের কথা সুরু হবে সেইখান থেকেই।

সংপ্রতি কলিকাতায় সার লরেন্স অলিভিয়ারের তোলা "হ্যামলেট" ছবিখানি চিত্রপ্রিয়দের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ-আগ্রহ জাগ্রত করেছিল। গোটা-কয় কথা বলতে চাই সেই প্রসঙ্গেই।

হ্যামলেট—সারা বার্ণাদোত্তে

চিত্র ছিল আগে কেবল দ্রষ্টব্য। কিন্তু আজ সে দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য দুই-ই। তার ফলে চিত্রনাট্য এখন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেয় নাটকের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

নির্ব্বাক্ যুগের চিত্রজগতে গিয়ে আমরা সেক্সপিয়ারের অনেক নাটকের চিত্ররূপ দেখে এসেছি, কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি পাইনি। কারণ সে-সব ছিল কেবল ঘটনার ছবি। ও-রকম ছবি সাধারণ মেলোড্রামা বা রোমাঞ্চকর কাহিনী দেখিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করতে পারে বটে, কিন্তু সেক্সপিয়ারের নাটক তো ঘটনার জন্যেই অমরতা অর্জ্জন করেনি! বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন, সেক্সপিয়ারের অধিকাংশ নাটকেরই আখ্যান-বস্তু মৌলিক নয়, তা ধার-করা বা চুরি-করা, কিন্তু তবু সে জন্যে নাট্যকারের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি, কারণ ঘটনাকে অবলম্বন করলেও, মাত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির দিকে, যার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় সাধারণ ঘটনার উত্তেজনা। এবং সেই সব চরিত্রও সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অতুলনীয় কাব্যাংশের শব্দ-সৌন্দর্য্যের দ্বারা। এই জন্যেই সেক্সপিয়ারের কথার ঐশ্বর্য্যকে বাদ দিয়ে কেবল ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে মৌন চিত্র তাঁর কোন নাটকই সার্থক ক'রে তুলতে পারেনি।

হ্যামলেট—রবার্টসন

ছবি যত দিন বোবা ছিল, রঙ্গমঞ্চের আশঙ্কার কারণ ছিল না তত দিন। চিত্রশিল্পীরা কাব্য বা কথার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারতেন না, কাজেই তাঁদের পড়ে থাকতে হত মঞ্চশিল্পীদের পিছনে। কিন্তু আজ চিত্রশিল্পীরা বিপুল উৎসাহে কারবার চালিয়েছেন বড়-বড় মঞ্চ-নাটক নিয়ে। এমন কি অস্কার ওয়াইল্ডের "The Ideal Husdand"এর মতন বাক্যপ্রধান নাটক অবলম্বন করতেও আজ তাঁরা একটুও ভয় পান না! ফলে সাধারণ রঙ্গালয়ের চেয়ে চিত্রালয়ের দর্শকের দল ক্রমেই বেশী ভারি হয়ে উঠছে।

তবে এখনো সাধারণ রঙ্গালয়ের হাল ছাড়বার সময় হয়নি। কারণ প্রথমত, পাদ-প্রদীপের আলোকের কাছে গিয়ে, আমরা জীবন্ত নট-নটীর তপ্ত রক্ত-মাংসের সান্নিধ্য অনুভব করি, ছবির পর্দ্দা যা কখনো দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, যে-সব নাটক বিশেষ করে বাক্যাংশের জন্যে বিখ্যাত, চিত্রালয়ে সেগুলিকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্যর লরেন্স অলিভিয়ারের "হ্যামলেট" তুলে দেখাতে গেলে ছয় ঘণ্টায় কম সময় লাগত না এবং বলা বাহুল্য, তা দেখানোও হয়নি, নাটকের বাক্যাংশের উপর নির্দ্দয় ভাবে কাঁচি চালিয়ে তাকে রীতি-মত ছোট করে আনতে হয়েছে।

নাট্যজগতের সঙ্গে "হ্যামলেটে"র কি অপূর্ব্ব সম্পর্ক, এইবারে তা নিয়ে

হ্যামলেট—হেনরী আরভিং

আলোচনা করা যেতে পারে। সেক্সপিয়ার হচ্ছেন সর্ব্বমানবের, সর্ব্বযুগ ও সর্ব্বজাতির জন্যে! তিনি নিখিল মানবতার কবি। তাই তাঁর নাটক পৃথিবীর সব দেশেই জনপ্রিয়। এই বাংলা দেশেও তাঁর Cymbeline (কুসুমকুমারী), Macbeth, Comedy of Errors (ভ্রান্তিবিলাস), Hamlet (হরিরাজ), All's well that ends well (কাজের খতম), A Mid-summer Night's Dream (মধুযামিনী), Merchant of Venice (সওদাগর), Antony and Cleopetra (ক্লিওপেট্রা) ও Othello নাটক রসিকদের কাছে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর মধ্যে "হ্যামলেট" অসাধারণতা অর্জ্জন করেছে বিশেষ এক কারণে। পাশ্চাত্য নাট্যজগতে "হ্যামলেট" পালাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় কষ্টিপাথরের মত। কে যে কতখানি খাঁটি এই পালায় নাম-ভূমিকায় দেখা দিয়ে বড়-বড় নটরা তা প্রমাণিত করেন। নানা দেশের নানা নট 'হ্যামলেট' চরিত্রটিকে পরস্পরবিরোধী নব-নব রূপে ও রসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং সেই জন্যে "হ্যামলেট" নাটকের মঞ্চ তার অভিনয়ের ইতিহাসও কম বিস্ময়কর হয়ে ওঠেনি। বিখ্যাত ফরাসী নট কোকোলিন বলেন, "হ্যামলেটের মধ্যে কেবল ইংরেজী প্রকৃতি নয়, ফরাসী প্রকৃতিও দেখানো উচিত।" নাট্য-সমালোচক ক্লেমেন্ট স্কট তার উত্তর বলেন, "কেবল ইংরেজী বা ফরাসী প্রকৃতি কেন, হ্যামলেটের মধ্যে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি অগণ্য প্রকৃতি। জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'হ্যামলেট' এমিল ডেভ্রিয়েন্ট নিজের অভিনয়ে প্রকাশ করেছিলেন জার্ম্মাণ প্রকৃতির দার্শনিকতাই। আবার ইতালীর রোশি ও সালভিনি, আমেরিকার এডুইন বুথ, ফ্রান্সের মৌনেট সালি, চার্লস ফেচার ও সারা বার্ণার্ড প্রভৃতি হ্যামলেটের মধ্যে দেখিয়েছিলেন নিজের নিজের জাতের প্রকৃতি বা স্বভাবই।" এখানে একটি ছোট্ট কথা মনে হচ্ছে। বাংলা দেশেও ক্লাসিক থিয়েটারে হ্যামলেট বা "হরিরাজ" খোলা হয়েছিল এবং প্রধান দু'টি ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারাসুন্দরী। সে অভিনয় আমি দেখিনি বটে, তবে গ্রামোফোন কোম্পানীর পুরাতন রেকর্ডে অভিনয়ের যে কথাগুলি শুনেছিলুম, তা এদেশী হ্যামলেটেরই উপযোগী বটে! প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথাও বলা যায়। শিশিরকুমার প্রভৃতির সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবার কিছু কাল আগে ষ্টার থিয়েটারে দেবেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা অনূদিত "ওথেলো"র অভিনয় হয়েছিল। প্রধান প্রধান ভূমিকায় নেমেছিলেন তারকনাথ পালিত, (ওথেলো) তারাসুন্দরী (ডেসডিমোনা) ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইয়াগো) প্রভৃতি এবং তাঁদের অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু সেখানেও ওথেলোর ও ইয়াগোর মধ্যে ভারতীয় ভাবই ফুটে উঠেছিল বেশী মাত্রায়। একমাত্র প্রতিভাময়ী তারাসুন্দরীই ডেস্‌ডিমোনা চরিত্রের মধ্যে অল্প-বিস্তর পরিমাণে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বৈদেশিক ভাব। ছবির পর্দ্দাতেও বিলাতী "ওথেলো" দেখেছি, কিন্তু হাব-ভাব ও চাল-চলন ছিল একেবারে অন্য রকম! যাক্, এখন হ্যামলেটের কথাই হোক্। এ এক অদ্ভুত নাটক। সত্যিকার প্রতিভার স্পর্শ থাকলে এ নাটককে মনে হয় চিরনূতন। আগেকার বিলাতী রঙ্গালয়ে ফেল্‌পস, চার্লস কীন, ব্যারি সালিভান,ও ম্যাক্রেডি প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু অমর নাট্য-সমালোচক হ্যাজলিট পূর্ব্ববর্ত্তী হ্যামলেটদের দেখে তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, "এ ভূমিকায় অভিনেতার রূপ থাকা উচিত যত অল্প, সুধী ও ভদ্রলোকের মূর্ত্তি ফুটিয়ে তোলা উচিত তত বেশী।" ম্যাকবেথের মত হ্যামলেটের চরিত্রের মধ্যেও পাওয়া যায় নৈতিক বিষের প্রভাব। জার্ম্মাণ কবি গেটে দেখিয়েছেন সুন্দর এক যুবক, ললিতকলায় অনুরাগী, পিতার স্নেহের পাত্র, সুচরিতা তরুণীর প্রিয়তম, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মানবতার ও প্রকৃতির মধ্যে সে সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও সমারোহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। এমনি এক অচঞ্চল-বিচলিত আত্মার উপরে নেমে এল দুর্ভাগ্যের গুরু ভার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার প্রকৃতির রূপান্তর। সেক্সপিয়ারের সৃষ্ট এই চরিত্রের সৌন্দর্য্য সমালোচক হ্যাজলিটকে অত্যন্ত অভিভূত করেছিল বলেই হ্যামলেটকে তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তিনি মনে করতেন যে, মঞ্চের উপরে এলে সব চেয়ে দুর্দ্দশা হবার সম্ভাবনা এই পালাটিরই। হ্যাজলিট আরো বলছেন, "হ্যামলেট একটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। তার বক্তৃতা ও বচন কবির উদ্ভাবনা-শক্তির পরিচয় দেয় মাত্র। তবে কি সেগুলি বাস্তব নয়? হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের চিন্তার মতই বাস্তব। সে বাস্তবতা আছে আমাদের মনের মধ্যেই। আমরা নিজেরাই হচ্ছি হ্যামলেট।" ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্যর হেনরি আর্ভিং হ্যামলেটের ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করেন। তিনি দেখালেন এক স্বপ্নালস, সুধী, দার্শনিক, শিক্ষার্থী ও রাজকুমার হ্যামলেটকে।

তার পর এলেন উইলসন ব্যারেট (১৮৮৪) ও হার্বার্ট বীরবম ট্রি (১৮৯২)। এঁরাও আর্ভিংয়ের সমকক্ষ না হয়েও হ্যামলেটকে নূতন নূতন দিক্ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা ক'রে সুখ্যাতি অর্জ্জন করলেন। তার পর স্যর ফোর্বস রবার্টসনের আত্মপ্রকাশ (১৮৯৭)। দর্শকরা বললে, এই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে প্রীতিপ্রদ হ্যামলেটের মূর্ত্তি।

ইংলণ্ডের আর এক জনের হ্যামলেটও পরে বিখ্যাত হয়েছিল। তাঁর নাম এইচ, বি, আর্ভিং, তিনি স্যর হেনরি আর্ভিংয়েরই পুত্র। অকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করবার সময়ে অধিকাংশ ইংরেজ নটই এই চরিত্রের 'ট্রাজেডি'র দিক্‌টাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ফরাসী শিল্পী চার্লস ফেচার ও সারা বার্ণার্ড দেখিয়ে গিয়েছেন, হ্যামলেটের চরিত্রের উপরে 'কমেডি'র প্রভাবও বড় অল্প নয়। কেবল মাত্র দুই জন ইংরেজ নট—স্যর হেনরি আর্ভিং ও স্যর ফোর্বস রবার্টসন—হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করে ও-রকম এক দেশদর্শিতার পরিচয় দেয়নি। হ্যাজলিটের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হ্যামলেট ভূমিকায় চার্লস কীন তাঁর যুগে না কি অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি আকস্মিক থিয়েটারি চাল (coup) চেলে দর্শকদের চমকে দিয়ে অভিভূত করবার চেষ্টা করতেন এবং অস্বাভাবিক হলেও সফল হত তাঁর সে চেষ্টা! কিন্তু আর্ভিংয়ের হ্যামলেট কোথাও চমকপ্রদ কোন কিছুর আশ্রয় নেয়নি, তার সমস্তই ছিল সহজ ও স্বাভাবিক—এবং এতটা সহজ ও স্বাভাবিক যে, প্রথম দুই অঙ্কে তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করতে পারত না! আর্ভিং আর একটা নূতনত্বও দেখিয়েছিলেন, হ্যাজলিটের মতানুসারে তাঁর হ্যামলেট "সচীৎকারে চিন্তা করত"।

ভদ্রলোক, দার্শনিক ও যুবরাজকে। উপরন্তু তার নিখুঁত শিষ্টাচার, সরল স্বভাব ও প্রেমাস্পদ প্রকৃতি সকলকেই আকৃষ্ট করত। এবং এ হ্যামলেটের মনের উপরে ধর্মের ছাপ পড়ত খুব সহজেই। হ্যামলেট-রূপে ফোর্বস রবার্টসনের কৃতিত্ব দেখে সমালোচক মত প্রকাশ করে গিয়েছেন যে, তিনিই হচ্ছেন "The most human, the most natural, and in temperament the most lovable of all the Hamlets of our time, English, French, Italian, or German।" উইলসন ব্যারেটের "হ্যামলেটে"র কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর্ভিংয়ের "হ্যামলেট" নিয়ে ইংরেজরা যখন মেতে আছে, সেই সময়েই উইলসন ব্যারেট আত্মপ্রকাশ ক'রে রীতিমত সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং প্রথম অভিনয়-রাত্রেই দর্শকরা নিশ্চয়ই তাঁকে পরম আদরে গ্রহণ করেছিল, নইলে যবনিকা পতনের পর পাদ-প্রদীপের সামনে এসে তিনি এই চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাটি দিতে পারতেন না:

"আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি সহায়-সম্পদহীন ছোকরা, এইখানে আগে যে থিয়েটার বাড়ী ছিল তার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল একাকী। তার পকেটে ছিল মোটে ছয় গণ্ডা পয়সা। সে-রাত্রে সেখানে সুবিখ্যাত চার্লস কীনের "হ্যামলেটে"র পুনরভিনয় হবার কথা। ছোকরা একখানা গ্যালারির টিকিট কিনে রঙ্গালয়ের ভিতরে গেল। তার পর অভিনয়ের শেষে বেরিয়ে এসে সে প্রতিজ্ঞা করলে, 'এক দিন আমি কেবল এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষই হবো না, অদূর-ভবিষ্যতে ঠিক এইখানে দাঁড়িয়েই অভিনয় করব এই হ্যামলেটের ভূমিকাতেই।'

"আজ তার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে। কারণ আমিই হচ্ছি সেই ছোকরা এবং আজ আমি আপনাদের সামনেই হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করলুম।"

সেই অভাবিত ও নাটকীয় বক্তৃতার পর সমগ্র প্রেক্ষাগার যে বিপুল আনন্দ-কোলাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সমসাময়িক সমালোচক এ কথাটাও উল্লেখ করতে ভুলে যাননি।

সাধারণ রঙ্গালয়ে "হ্যামলেটে"কে অবলম্বন করে এমনি ভাবে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর প্রতিযোগিতা বরাবরই জনসাধারণের উপভোগ-আনন্দ জাগ্রত করে রেখেছে। ও-দেশে প্রবাদের মত একটি চলতি কথা আছে। হ্যামলেট না কি এমন একটি ভূমিকা, কোন অভিনেতাই তা গ্রহণ করে ব্যর্থ হতে পারে না। এ-রকম বিশ্বাসের কারণ হয়তো এই। হ্যামলেটের মতন চরিত্র গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতে পারে দর্শকের একান্ত সহানুভূতি। এমন কি লোকের মুখে শুনেছি, এদেশেও বাঙালী হ্যামলেট "হরিরাজে"র ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয় না কি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। অথচ অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়-শক্তি কোন দিনই আমাকে অভিভূত করেনি—তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করলেও থাকবেন শ্রেণীর পিছন দিকে। তারক পালিত ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর চেয়ে ভালো অভিনয় করতেন, অথচ তাঁরা অমরেন্দ্রনাথের মত বিখ্যাত নন।

সাধারণ নাট্যজগতের মত চিত্রজগতেও "হ্যামলেটে"র আবির্ভাব হয়েছে একাধিক বার, যদিও এ ক্ষেত্রে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নিয়ে কোন বিশেষ আন্দোলন হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এবারে "হ্যামলেট" নিয়ে যে স্যর লরেন্স অলিভিয়ার এগিয়ে এসেছেন, তিনি মঞ্চে ও পটে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে উচ্চ রাজোপাধি লাভ করেছেন। বিলাতী শিল্পী সমাজে বহু প্রতিভাবান ও শক্তিধর যথেষ্ট কাঠ-খড় পুড়িয়েও "স্যর" উপাধিতে ভূষিত হতে পারেননি। যদিও কোন উপাধিই কোন আর্টকে বড় করে তুলতে পারে না, তবু সাধারণ বুদ্ধিতে এ-রকম উপাধিকে গুণীর গুণের একটা মাপকাঠি বলে গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই।

স্যর লরেন্স অলিভিয়ারও ছবির "হ্যামলেটে"র সাজ-পোষাকে ও দৃশ্য-সংস্থানে বহু সংস্কারের ও নূতনত্বের আশ্রয় নিয়েছেন—এমন কি এলিজাবেথীয় যুগের নাটকেও প্রয়োগ করেছেন অতি-আধুনিক 'সুরিয়ালিষ্টিক' আর্টের বিশেষত্ব। কিন্তু এ জন্যে চমকিত না হলেও চলবে। কারণ "গোলাপ যে নামে ডাকো, সুগন্ধ বিতরে।" সেক্সপিয়ার হচ্ছেন সেক্সপিয়ার। তাঁর নাট্যকাব্যের মধ্যেই আছে তাঁর প্রাণপদার্থ—বাইরে তাকে যে খোলস পরাতে চাও পরাও। প্রসাদ রায়

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

আমি বাংলা ছবি দেখি নে:

এই কথাটি বলাই আজকের লেটেষ্ট ফ্যাসান। অথচ যে সমস্ত ইংরেজী ছবি দেখে আমরা মুহ্যমান হই, তার যে-সব সমালোচনা ওদের দেশের কাগজে বেরোয়, তা পড়লে আমাদের চক্ষু কিছুটা উন্মিলিত হতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হ'লউডের একটি প্রোডাকসনও ওদের দেশের Intellectualদের খুশী করতে পারেনি। আমাদের জ্ঞানপাপীরা শুনলে লজ্জিত হবেন Brave New Worldএর রচয়িতা সুদর্শন অলডাস হাক্সলি কি বলেছেন তাঁর Do what you will গ্রন্থের Silence is Golden প্রবন্ধে। হাক্সলী বলছেন তাঁর অভ্যাস-নিপুণ ষ্টাইলে যে, বহু দিন পর্য্যন্ত একটি ছায়াচিত্র-প্রেক্ষাগৃহে তিনি পদার্পণ করেননি। অবশেষে তিনি সেই পুরাতন প্রবাদ Better late than Never স্মরণ করতে করতে এ-যুগের সভ্যতার বিশিষ্ট 'সিনেমা' দেখতে ঢুকলেন। কিন্তু ফিরে এলেন এই অভিমত নিয়ে যে, 'সিনেমা' হ'ল সেই অল্প কয়েকটি দ্রষ্টব্যের অন্তর্গত যা না কি না দেখলে কোন ক্ষতিই হয় না: Better Never than Late. আধুনিক এ্যামেরিকান ছবি দেখলে আপনি লজ্জিত হবেন। সারা পৃথিবীর মার্কেট, বিপুল অর্থ, প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়েও তারা যে-কাণ্ড করছেন, তাতে তাকে সিনেমা বলা চলে না আর। Sin বলাই ভালো। সে আর এক obscene-উল্লাস মাত্র।

আমাদের সিনেমা এবং সিনেমা রিভিউ:

আমাদের সিনেমা যদি হয় K. G. অর্থাৎ কিণ্ডার গার্ডেন ক্লাসের, তাহ'লে আমাদের সিনেমা রিভিউ হল N. K. G. ক্লাসের অর্থাৎ Not Kinder Garden ক্লাস even. বিজ্ঞাপনের পদতলে দাসখত লিখে-দেওয়া আমাদের চিত্র-সমালোচনার নির্লজ্জ স্তুতির জন্যে যত না লজ্জিত হই, তার চেয়ে ঢের অবাক হই হাস্যকর

মতামতে। লক্ষ্য করে দেখবেন, ছবির মিউজিক, ক্যামেরা এবং সাউণ্ড সম্বন্ধে কিছু যখন এঁরা বলবার চেষ্টা করেন, তখনই উদ্‌ঘাটিত হয় এঁদের ভিত্তি কত কাঁচা, চিন্তার সমস্ত প্রোসেসটি কত আন সাউণ্ড। ষ্টুডিওর সঙ্গে রীতিমত যোগ না থাকলে সিনেমা রিভিউ করা, ষ্টেজের সঙ্গে আত্মিক যোগ-বিচ্ছিন্ন থিয়েটার ক্রিটিক হওয়ার মতই অসম্ভব। ছবির সমালোচনা করা মানে 'এটা ভালো হয়েছে,' 'ওটা ভালো হয়নি' লেখা নয়; ছবির সমালোচককে visualise করতে হবে ঠিক সেই ভাবে, যে Visualisation দরকার একটি সার্থক ছবি সৃষ্টি করার জন্যে। কারণ ছবি যদি হয় Creation, তাহ'লে রিভিউ হল আরেক নতুন সৃষ্টি—সে আরেক recreation. কি হলে নাটক হয়, তা বলা ভারি শক্ত, কি হলে নাটক হয় না—তা বলা বরং সহজ। কারণ এটুকু অন্ততঃ ঠিক যে, রেডিওতে যে playগুলি হয় ওগুলি নাটক নয়, ঠিক যেমন review নয় আমাদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিটিকদের viewগুলি!

থিয়েটার ও থিয়েটারের বিজ্ঞাপন :

"Life is a Stage"—এ-কথাটা আমাদের পক্ষে মর্মান্তিক সত্য;—এমন সত্য বোধ হয় আর কোনও দেশের আর কোনও নরনারীর পক্ষে নয়। আমাদের life যে-রকম dull আমাদের stageও তেমনি colourless। এমন নড়বড়ে, মুমূর্ষু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে একমাত্র আমাদের স্বাদহীন বৈচিত্র্যহীন জীবনেরই তুলনা হতে পারে। যে-কোনও রঙ্গালয়ে ঢুকে দেখুন, কি দরিদ্র অবস্থা! অপরিচ্ছন্ন, অবিশ্রান্ত পান-বিড়িওয়ালার চীৎকার—দীর্ণ, জীর্ণ সীটের ওপর বসে ছারপোকার কামড় খেতে-খেতে নাটক দেখার চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার আর কি হতে পারে? আমাদের থিয়েটার খারাপ; থিয়েটারের গান আরো খারাপ; কিন্তু সব চেয়ে যা খারাপ, তা হল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। থিয়েটার সিনেমার মত জোর চলে না, এ কথা সত্যি, কিন্তু একেবারে চলে না, এ কথা নয়। আর আরেকটু ভালো চালানো যে না যায়, এ কথাও মিথ্যে। আসলে উদ্যম গেছে শেষ হয়ে, হতাশা সঞ্চারিত হচ্ছে রঙ্গমঞ্চের অন্ধকার কোণে-কোণে। পাদপ্রদীপের আলো আসছে নিষ্প্রভ হয়ে। কিন্তু কেন নেই চেষ্টা সুযোগ্য পরিচালনার! যেন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি বিজ্ঞাপন দিয়ে শেষ হবে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য. প্রত্যেক কাগজে News, রিভিউ, ছবি ছাপানো, মাসিক, সাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং, ব্যানার, নানা রকম পোষ্টার দিয়ে নাটককে বিজ্ঞাপিত করলে দুর্দিন এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসত না ষ্টেজের। 'রামপ্রসাদ', 'যুগ-দেবতা,' ষ্টারের প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক নাটক প্রচুর পয়সা দেয় আজও। যদি জনসাধারণের সঙ্গে যোগ আরো সুদৃঢ় করে তোলা যায় সুষ্ঠু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে, তাহ'লে এখনও বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবস্থা এত বিয়োগান্ত হয় না। বিজ্ঞাপন বাদে আজকের দিনে পয়সা আনা অসম্ভব। "Only the mint can make money without advertising"

দেবী চৌধুরাণী সমাপ্ত :

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'দেবী চৌধুরাণী' মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবির মধ্যে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসটির মধ্যে যে দুরন্ত জীবনের সঞ্চার আছে, ছায়াচিত্রে তাকে রূপ দেওয়ার পক্ষে যাঁর নির্দেশ সব চেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, তিনিই এ-ছবিটির তত্ত্বাবধান করছেন। তিনি হলেন চাঁদ সদাগর, অভিজ্ঞান, পরশমণি, টিকাদার ছবির পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

ঠাকুরঝির ভূমিকায় অনুভা :

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন দেবকীকুমার বসু। ছবিটিতে অনুভার অভিনয় হয়েছে অপূর্ব। তাঁকে মানিয়েছেও ভালো। এমন একটা সংযত অথচ অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় হয়েছে তার যাকে মনে হয় অভিনয় নয়। অভিনয়ের মধ্যে যা দুরূহ তা হল স্বাভাবিকত্ব। গোয়ালিনীর জীবনকে এমন ভাবে ফোটানোর কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে, এবং সেই সঙ্গে দেবকীকুমার বসুকেও! কবির আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এর প্রচার-নৈপুণ্য। বহু কাল কোন ভারতীয় ছবির এত অপূর্ব্ব প্রচার-পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

ডিষ্ট্রিবিউসনে দৃষ্টি দিন :

ছবি যাঁরা তোলেন, তাঁরা আর ছবি সমাপ্ত করেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। ছবি ভাল চললেও না। তাঁদের অংশের টাকা না কি ঠিকমত পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ছে। এ কাজের প্রাপ্য টাকার ডিষ্ট্রিবিউটর হয়ত আরেক জনের ছবির পরিবেশন স্বত্ব কিনে বসছে। ব্যাপার গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে এর জন্যে নিজেরাই নিজেদের ছবি পরিবেশনা করবেন, ভাবছেন। এতে লাভ হবে না কোন পক্ষেরই। নিজেরা সব কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ যদি টাকাই না পাওয়া যায় সময় মত, তাহলে নোতুন প্রযোজকদের পক্ষেও ছবি তোলা অসম্ভব ব্যাপার। বি, এম, পি, এ-র এদিকে নজর দেওয়া দরকার। সত্যিই ডিষ্ট্রিবিউসনে গলদ যদি থাকে, তাহ'লে তা দূর করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হওয়া দরকার। তা না হলে ছবি পরিবেশন স্বত্ব নেওয়ার সময় যে কামধেনু হাউস থেকে প্রাপ্য অংশের টাকা যার কাছ থেকে আদায় করা শক্ত, সেই ডিষ্ট্রিবিউটর তখন কিন্তু প্রোডিওসারের চোখে সেই পুরাতন নজীরের রকমফের হয়ে দাঁড়ায়, আর কি All that glitters is not gold"—অন্ততঃ অনেকের তো আজকাল এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে!

ভালো অপেরা চলে ভালো :

অপরে যা করে এসেছে, সেই গতানুগতিক পথে না গিয়ে স্বাদ বদলানোর সময় এসেছে সিনেমায়, থিয়েটারে, রেডিওতে। ভালো অপেরা এখনও ভালো চলে। নাচ আর গান চোখ আর কানকে যেমন ভোলাতে পারে, তেমন আর কিছুই নয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, রোমান্সের গলিত ক্ষত নয়। নাচে গানে ভরে দেওয়া দু'টি ঘন্টার জন্যে আজও অনেক লোক অনেক বেশী পয়সা দিতে রাজী হবে। একটা ভালো অপেরা রঙ্গমঞ্চের চেহারা বদলে দিতে পারে। উপযুক্ত লোকের দেওয়া সুর, যোগ্য লোকের নৃত্য-পরিকল্পনা, শ্রুতিমধুর গানের কথায় মানুষের প্রাণ যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কিছুতেই নয়। এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখলে ঠকবেন না!

বাংলায় ছাপুন টিকিট :

সিনেমার টিকিট ইংরেজীতে ছাপার কোন মানে হয় না। এক দিকে বাংলা, অন্ত দিকে হিন্দিতে তার বর্ণান্তর হওয়া দরকার। এ ভাবে না

করলে এক দিনে ইংরেজীকে গুডবাই করা চলবে না। বাঙালী দর্শক, বাঙালীর ছবিঘরে, বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে ইংরেজীতে টিকিট কেন ছাপা হবে—এর অর্থ আমার মাথায় আজও ঢোকে না। ছবির মধ্যে দিয়ে বিদেশীদের প্রতি চিন্তাহীন গালাগাল না দিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে স্বদেশীয় হবার চেষ্টা করলেই তা মঙ্গলজনক হবে।

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ :

এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্সের বহু দিন হয়ে যোলা ছবি বহু-প্রচারিত চিত্র রাঙা মাটিতে আছেন চন্দ্রাবতী, অভয় গাঙ্গুলী এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত-শিল্পী সত্য চৌধুরী। এর প্রযোজক জোর গলায় বলেছেন যে, পরিচালকদের যে-কেফিত অভিযোগ শোনা যায় যে, বহু অসুবিধের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় অর্থের ও সুযোগের অভাবে, রাঙা মাটিতে সে-অভাব বা অভিযোগ করতে দেওয়া হয়নি। যা কিছু সম্ভব, তার জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করেননি এর প্রযোজক নরেশ চন্দ্র ঘোষ। ছবিটির কাহিনী এক সঙ্গীত-প্রতিভার আদর্শ-সংঘাত নিয়ে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার কর্মোদ্যম :

ছবির রাজ্যে বহু দিন অনুপস্থিত বড়ুয়া ছবি করবার জন্যে প্রস্তুত। দ্রুত কর্মক্ষমতায়, সর্ব রকম বিভাগে হাতে কাজ করার অভিজ্ঞতায়, নোতুন পরীক্ষার দুঃসাহসিকতায় বড়ুয়ার সমকক্ষ কোন পরিচালক আজও ভারতবর্ষে নেই। তাঁকে দিয়ে ভালো ছবি করানো এখনও সম্ভব। যে তার জন্যে চাই ভালো গল্প, দু'টি থেকেও তাঁকে মুক্ত থাকতে হবে। একটি নিজে অভিনয় করা আর একটি যমুনাকে দিয়ে অভিনয় করানো। এ দু'টিই চাঁদের কলঙ্ক, এ ছাড়া তিনি সর্ব বিষয়ে ভালো ছবি তুলবার দাবী রাখতে সক্ষম। তাঁর ছবি দেখতে আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা আজও অটুট আছে।

বং-বেরং, পদ্মা প্রমত্তা নদী, কালো ছায়া—পর পর কয়েকটি চিত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রে সু-অভিনয় করে শিপ্রা দেবী প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পর্য্যায়ে উচ্চ আসন পেয়েছেন। 'রাঙামাটি' চিত্রে তাঁর কণ্ঠের কয়েকটি গান গায়িকা হিসাবেও তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

চিত্রগৃহ ও রঙ্গালয়ের বিয়োগান্ত অবস্থা

মেট্রোতে আপনি যদি ছবি দেখতে না-ও যান তা'হলেও যেতে পারেন শুধু খানিকক্ষণ আরামে কাটাবার জন্যেই। গোলমালবিহীন অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে, আরাম-কেদারায় বসে সত্যি সত্যিই এনটারটেনমেণ্টের জন্য মন অপ্রস্তুত হয় না একবারও। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি একবার আমাদের বেশীর ভাগ চিত্রগৃহগুলির অবস্থা। চেয়ার থেকে আরম্ভ করে পান-বিড়ি, বুকস্টেওয়ালার শ্রীবদন-বস্তুত সমস্ত বাড়ীটার চেহারাই যে-কোন ভালো মুডের দফা সারতে সক্ষম। অথচ হিসেব করে যদি দেখেন ত বুঝতে পারবেন যে বহু বছর আগে একবার কিছু টাকা invest করে এরা গেড়ে বসেছে, তার পর শুধু লাভের অঙ্ক এবং ভুঁড়ির মেদ স্ফীত করা ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই। প্রত্যেক সপ্তাহের মিনিমাম গ্যারান্টির সঙ্গে হাউসের সেয়ারের টাকার যোগ যা হয় তার কিঞ্চিৎও যদি প্রেক্ষাগৃহের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হত তা'হলে যে তা এদের ব্যবসায়ির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা দিত চিরকালের সে কথা কে বোঝাবে এদের? অবশ্য বুঝতে পারলে আর বাঙালী এক্সিবিটরের এ-মতিভ্রম হবে কেন?—রঙ্গালয়ের কথা বাদ দিলাম। এঁরা বিজ্ঞাপন করাকে বাজে খরচা ভাবেন, নতুন ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি ছাপা অনর্থক মনে করেন, ওপরের ছবি দেখে না পড়া পর্যন্ত কোন সংস্কার-কার্যই অপ্রয়োজনীয় এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকেন। নতুন চিত্রগৃহ কর্তৃপক্ষ হাউস যে শুধু বসবার জায়গার জন্যেই নয় এনটারটেইনমেণ্টের যথার্থ মুডের সহায়কও, এ কথা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, ততই ভালো।

সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে মহিলা সংগীতজ্ঞদের অবদান যে কিছু নেই, এমন কথা বলা চলে না। মানদা দাসী, কাশীদাসী, পান্নাময়ী, যাদুমণি, হীরা বাই, সরমা বাই, কৃষ্ণমণি প্রভৃতির পর মধ্যম যুগে আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া ও উষারাণীর নাম করা চলে।

বাংলার পূর্ব্ববর্ত্তিনী গায়িকাদের প্রাচীনপন্থী গাইবার পদ্ধতি থেকে এঁরা এক নতুন ধারা প্রবাহিত করলেন। যন্ত্রসহ গীত হলেও এঁদের গান আমাদের কর্ণে অপূর্ব মধুময় ঠেকে।

তদানীন্তন যুগে আঙ্গুরবালার নাম বিশেষ ভাবে জনসমাজে পরিচিত ছিল। সংগীত রসকে শ্রোতার অনুরূপ আকারে পরিবেশন করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আঙ্গুরবালার গলা তত সরু নয়, কণ্ঠস্বরেও ঠিক তেমন পরিমার্জ্জনার ছাপ নেই। তবু তাঁর গানে আছে সুরের ভবিষ্যৎ, ঠুংরী গাইবার পক্ষে যা হচ্ছে অপরিহার্য্য।

এর পরই আসে সংগীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার কথা, যাঁর কর্ম-জীবনকে কেন্দ্র করে লিখতে গিয়ে এত তর্জ্জমা, এত ভূমিকা।

আজ বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন দেশে ইন্দুবালার পরিচয় আর বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন হবে না। তিনি বর্ত্তমানের সংগীত-জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, সংগীত-মহলে তাঁর প্রশংসার অন্ত নেই, কণ্ঠের মাধুর্য্য তাঁর অসাধারণ, ভারতের বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে প্রশংসা ও সম্মান পেয়েছেন প্রচুর। অথচ ইন্দুবালা বাংলার দুহিতা হয়েও বাংলায় জন্মগ্রহণ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে পারেননি।

বহুপূর্বে "গ্রেট বেংগল সার্কাস" সে-যুগের সর্বজন-পরিচিত ছিল।

প্রোঃ বোস ছিলেন তার মালিক; প্রোঃ বোস তাঁর সার্কাস পার্টি নিয়ে ভারতের নানা স্থানে খেলা দেখিয়ে কৌতূহলী দর্শকদের প্রশংসা ও সুনাম অর্জ্জন করতেন। গ্রেট বেংগল সার্কাস তখন অমৃতসরে। সেই অমৃতসরে কার্ত্তিক মাসের এক বুধবারে এক শুভ মুহূর্ত্তে ইন্দুবালা জন্মগ্রহণ করেন। মনে সেদিন যে আনন্দ হয়েছিল, তা ছ'ছত্র লিখে প্রকাশ করা যায় না। ইন্দুবালার জন্মদিনে তাঁর সার্কাসে তিনি দ্বিগুণ লাভ করেছিলেন। ইন্দুবালার মা ছিলেন এই সার্কাস দলের এক জন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। প্রোঃ বসু তাঁকে এই দলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন তাঁর অল্প বয়সে।

ক্রমে শিশুর জ্ঞানবিকাশ হল, অন্তরের ভাব সে ভাষায় প্রকাশ করতে শিখলো। দিনে দিনে বাড়েন ইন্দুবালা। বাল্য থেকে কৈশোরে পদার্পণ করলেন। সে সময় তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন তাঁর আবছা-আবছা আজো মনে আছে, যেদিন কোন কারণ বশত তাঁর পিতার সংগে তাঁর মাতার মনোমালিন্য হয়েছিল। এই মনোমালিন্যের ফলেই ইন্দুকে তার পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন হতে হয়েছিল, পিতার স্নেহযত্নে বঞ্চিতা হয়ে সেদিন যে ব্যথা ইন্দুবালা পেয়েছিলেন, তিনি তা কখনও ভুলবেন না। ইন্দুকে নিয়ে ক্রোধ বশতঃ তাঁর মা কলকাতায় চলে এলেন।

কলকাতায় আসবার পর ইন্দুবালার জীবনের গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হল, যা তাঁর পিতার নিকট থাকলে হয়ত ঘটত না। মা মেয়েকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দর্জ্জিপাড়ায় বীণাপাণি হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেন। ইন্দু লেখা-পড়া শিখে নিজের মনে স্কুল থেকে বাড়ী এসে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, অথচ তার মুখের পানে তাকালে মনে হয়, মন তার যেন কোথায় উড়ে গিয়ে কি যেন সন্ধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যাশিক্ষার কিন্তু শেষ নেই, জ্ঞানের পথ যে অনন্ত, শিক্ষয়িত্রী করুণাময়ী ও ননীবালা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে তিনি লেখা-পড়া করতে থাকেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পান, পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর এই সাফল্যের সংবাদ অবগত হয়ে আনন্দিত হলেন, সুখ্যাতির প্রবল স্রোতে ইন্দুবালার জীবন হল ধন্য।

এইবার নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁর জীবনের চরম পরীক্ষার দিন আগত হল। মাতা গুরুতর পীড়িতা হলেন। ইন্দুবালাকে পড়াশুনা ছাড়তে হল। মার সেবাই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। তাঁর অপরিসীম সেবায় তাঁর মা অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। ইন্দুবালার নার্সিং-এ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের গৃহ-চিকিৎসক এইচ ডি মান্নার স্থানীয় ঔষধালয়ের ডাক্তার বিনোদ-বিহারী চাটুজ্যে এল-এম-এস এর পরামর্শ মত ইন্দুর মা তাঁর কন্যাকে হাসপাতালে নার্স-এর পদে নিযুক্ত করলেন। এ কাজ ইন্দুবালার মনঃপূত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে এক দিন সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে এসে মার কাছে আশ্রয় নিতে হল। অগত্যা মা ইন্দুবালাকে গান-বাজনা শেখাবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করলেন অনেকটা অনিচ্ছায়। ইন্দুবালা গান-বাজনায় মনোযোগ দিলেন। সংগীত-বিদ্যা যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াবে এ তাঁর কল্পনাতীত ছিল। ছবি আঁকতে, গৃহ-সজ্জায় তার খুব উৎসাহ ছিল। ক্রমে সংগীত-সাধনায় ইন্দুবালার মনে উৎসাহ এল। মা কিন্তু তাঁর এই উৎসাহকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। মার একান্ত অনুরোধে ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ গৌরীশংকর ইন্দুকে গান শেখাবেন বলে কথা দিলেন। ইন্দুবালা ওস্তাদের কাছে প্রথম পাঠ শুরু করলেন।

গৌরীশংকরের পরিচয় দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। বেনারস হতে এই ওস্তাদ তখনকার দিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উত্তর-ভারতের উচ্চাংগ সংগীতের ক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান তিনি অধিকার করেছিলেন।

ইন্দুবালা গানকে তখনই ভালবাসতে শিখেছেন, যখন গানে তিনি আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। সংগীত-বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে যে অসহ্য কষ্ট ও নির্য্যাতন তিনি সহ্য করেছিলেন, আজো তাঁর সে সব কথা স্মরণ হলে সব আনন্দ সব সুখ কর্পূরের মত উবে যায়। শিক্ষকের মনস্তুষ্টির জন্য মান-সম্ভ্রমের সংগে কোন সম্পর্ক তিনি রাখেননি এবং রাখতে চেষ্টা করলেও তা টেঁকেনি।

ইন্দুবালা বলেন—গান-বাজনায় যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে যদি একাগ্রতার অভাব না থাকে তবে শ্রোতার কাছে কারুর অপ্রিয় হওয়া অসম্ভব। নিত্য আমরা অনেক নতুন গায়ক-গায়িকার নাম শুনি, তাঁদের মধ্যে উঁচুদরের গুণীর সংখ্যাও কম নেই, অথচ এ ক্ষেত্রে অধিকাংশের কৃতিত্ব অল্পস্থায়ী, এইটে বড় আশ্চর্য্য!

ইন্দুবালার উন্নতির মূলে আছেন আর এক জন সংগীতজ্ঞ, যাঁর নাম গহরজান। তখনকার দিনে তাঁর মত গাইয়ে সারা ভারতে ছিল কি না সন্দেহ। তাঁর মত অতুলনীয়া গায়িকা যে-কোন দেশের গৌরব। গীতরাণী গহরজান মহীশূরের সভা-গায়িকা ছিলেন। তাঁর জীবন মহীশূরেই অতিবাহিত হয়েছিল। গহরজানের সংগে ইন্দুবালার পরিচয় ঘটে ওস্তাদ গৌরীশংকরের বাড়ীতে। সে সময় গৌরীশংকরের বাড়ীতে ভারতের নানা স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞদের আগমন হত। কোন কারণ বশত গৌরীশংকরের আবাসে ইন্দুবালা গাইবার অনুমতি না পাওয়ায় তিনি তাঁর মার কাছে আক্ষেপ করেছিলেন, সেই আক্ষেপের কথা শুনে গৌরীশংকর বলেছিলেন—গানে যারা অপটু, দৈহিক সৌন্দর্য্য তাদের অসাধারণ হয়ে থাকে। গুণকে অনুভব করতে হলে তাতে সময় লাগে। কিন্তু রূপ নয়নাভিরাম। সহজেই এতে আত্মসমর্পণ করা যেতে পারে। সুতরাং চোখকে উপবাসী রেখে কানের তুষ্টি সাধন করা ভয়ানক দুরূহ কাজ। শ্রোতার মনে শ্রদ্ধার আসন পেতে হ'লে সেই দুর্লভ সম্পদের অধিকারিণী হতে হবে, নইলে লোকের কাছে অসম্মানের অবধি থাকবে না। গুরুজীর অমোঘ বাণীই ইন্দুবালাকে আরো নিষ্ঠা সহকারে সংগীত-সাধনায় প্রেরণা দিয়েছিল। যার জন্য সত্যি আজ তিনি সংগীত-সম্রাজ্ঞী। গৌরীশংকরের কাছে সংগীত-বিদ্যা শিখবার পর গহরজানের সাহচর্য্য পেয়ে ইনি গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী হলেন। গীতরাণী গহরজানের অপরিমিত স্নেহের ঋণ তিনি কখনও অস্বীকার করতে পারেন না। সব সুখ-দুঃখের সাথে তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। গহরজানের সংগে তিনি বহু সংগীত-অনুষ্ঠানে যোগদান করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

এর পর ইনি ওস্তাদ এলাহি বক্সের কাছে টপ্পা শিখে সংগীত-জগতে অদ্বিতীয়া গায়িকার সম্মান অর্জ্জন করলেন। এখন ইন্দুবালার গান শুনলে অনেকে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বিরাটত্বের

সুসংযত বিকাশ তাঁর গানে এত অনুরাগ নিয়ে ফুটে ওঠে যে, তা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। ইন্দুবালা যে অবিচল নিষ্ঠায় সংগীত-সাধনা করে চলেছিলেন, এত দিনে তার সফলতা দেখা দিল।

নেশা থেকে গান এবার পেশায় পরিণত হল। গায়িকা হিসাবে পরিচিত হয়ে সর্বদা বিবিধ প্রমোদানুষ্ঠানে যোগদান সুরু করেন। ১৯১৬ খৃঃ ইন্দুবালার জীবনের একটি স্মরণীয় বছর। এইচ-এম-ভির বাংলা বিভাগে সর্বাধ্যক্ষ ভগবতী ভট্টাচার্য্য ও রেকর্ড-জগতের ম্যোনতা বাবু কর্ত্তৃক তিনি রেকর্ডে গাইবার জন্য অনুরুদ্ধা হলেন। একেই বলে অযাচিত করুণা!

কলের গান রেকর্ড নামে একটা যে অদ্ভুত জিনিষ আছে এ তিনি আগে জানতেন না।

তিনি প্রথম বারে ছয়খানি গান রেকর্ড করাবার জন্য চুক্তিবদ্ধা হন। তাঁর প্রথম রেকর্ড হচ্ছে—

পি ৪১০, ওরে মাঝি তরী হেথা,

তুমি এস হে আমার দলিত হিয়ার,

তাঁর প্রথম রেকর্ডখানিই সংগীত-রাজ্যে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

তাঁর গীত রেকর্ড একটি এচ-এম-ভি তাঁকে উপহার দেন। নিজের গ্রামোফোন নেই, পরের সাহায্য নেওয়া লজ্জার বিষয়, তাই রাগের প্রভাব হোল অত্যধিক, রাগে মোনতা বাবুর কাছে রেকর্ডটি ভেঙে ফেলেন। পরে তাঁকে একটি মূল্যবান গ্রামোফোন উপহার দেওয়া হয়, প্রায় বিশ বছর যাবৎ ইনি দুই শতাধিকের বেশী রেকর্ড করেছেন। কিন্তু কোন কারণ বশত তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে।

তিনিই প্রথম বাঙ্গালী শিল্পী যিনি উর্দ্দু গান রেকর্ড করেন। কোন বাঙ্গালী শিল্পী পূর্বে এইচ-এম-ভি-তে হিন্দী বা উর্দ্দু গান রেকর্ড করতে পারতেন না। কর্ত্তৃপক্ষের দৃঢ় ধারণা ছিল যে বাংলার শিল্পীরা অবাঙ্গালী সংগীতের অনুপযুক্ত। কর্মকর্তাদের এই অমূলক মনের ভাব পরিবর্ত্তন করবার জন্যই ইন্দু জেদ করলেন হিন্দী গান তিনি রেকর্ড করবেন। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে এ প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেও ইন্দুর কাছে তাঁদের পরাজয় বরণ করে নিতে হল। দুর্লভকে পাবার বাসনা—অজানাকে জানবার আকাংখা তাঁরই আছে, যে এসেছে এই পৃথিবীতে প্রতিভা ও কীর্ত্তির মুকুট মাথায় নিয়ে।

উর্দ্দু ও হিন্দী বিভাগের কর্মকর্ত্তা মিঃ এ ওয়াহেড ওরফে মুন্সীজি তাঁকে হিন্দী গান রেকর্ড করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ইন্দুবালার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

হিন্দীতে তাঁর প্রথম রেকর্ড—

পি ১৮৩৬,

জগ ঝুটা মরো সাঁইয়া

বিষয় বাতমম।

শ্রোতৃ-সমাজে এই রেকর্ডখানির প্রচুর জনপ্রিয়তা দেখে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিস্মিত হলেন। বাণীর স্পষ্টতার নিখুঁত উচ্চারণে অবাঙ্গালী শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গায়িকার কৃতিত্বকে প্রশংসা করলেন। এর পর কোম্পানীর পূর্ব নিয়ম চিরদিনের জন্ম বন্ধ হ'ল। ইন্দুবালা গ্রামোফোন কোম্পানীতে সর্বপ্রথম নতুন প্রথা সৃষ্টি ও বিজাতীয়দের কাছে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। বাঙ্গালীর গীত-শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সকলের পূর্বে এ গৌরবের অধিকারিণী হন। এর পর তিনি খাঁ সাহেব জমিরুদ্দিনের শিষ্যা হন। জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের পরিচয় সবাই হয়ত জানেন। ১৮১১ খৃঃ আম্বালায় জন্মগ্রহণ করলেও কলকাতায় তিনি জীবনের বেশী ভাগ সময় অতিবাহিত করেন, এবং সেখানেই মারা যান; তাঁর পিতা এক জন বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন এবং তদানীন্তন বিখ্যাত ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে যান সংগীত শিক্ষার বাসনা নিয়ে। বাদল খাঁর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধিক বয়সে জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব পুটিয়ার মহারাণীর সভা-গায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে আব্বাস উদ্দিন, কাজী নজরুল ইসলাম ও ইন্দুবালার নাম উল্লেখযোগ্য। করিম খাঁ তাঁর পুত্র হয়েও পিতার ন্যায় যশের অধিকারী হতে পারেননি। তিনি শুধু ঠুংরীর সম্রাট ছিলেন না, ধ্রুপদ টপ্পা ও খেয়ালও বেশ ভাল জানতেন, সারা ভারতে অত বড় ঠুংরী-গায়ক তাঁর মত ছিল না। ঠুংরী গানের ধারা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। পরিপূর্ণ সৃজনী-শক্তি নিয়ে তিনি যে পরিবেশন পদ্ধতি সৃষ্টি করেন সংগীত-জগতে স্রষ্টা হিসাবে তাঁর নাম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জমিরুদ্দিনের প্রিয় শিষ্যারূপে ইন্দুবালা তাঁর গুরুজীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে ইন্দুবালার আমন্ত্রণ আসতে থাকে। হিমালয় থেকে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান সুরু হল। প্রত্যেক জায়গায় তাঁর বিজয়-গৌরব ঘোষিত হল। তাঁর জীবনের স্মৃতি-পটে হায়দ্রাবাদের মহীশূর ও বাংগালোরের স্মৃতি চিরদিন জাগরুক থাকবে। জীবনে এই আমন্ত্রণ তিনি কখনও বিস্মৃত হবেন না।

সেখানে বাঙ্গালী শিল্পীর মর্য্যাদা যে কি তা কেউ কল্পনাও
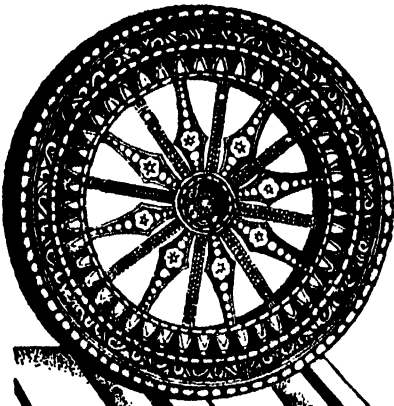
করতে পারবে না। তাঁরা শিল্পীদের দেবতার মত ভক্তি করেন, এর জন্যই ইন্দুবালার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ভাল লাগে। যদি তাঁরা শিল্পীদের ঘৃণা বলে মনে করতেন তবে ইন্দুবালার ভাগ্যে সেখানে সম্মানের বদলে অসম্মানের মালা বহন করে ফিরে আসতে হত। ইন্দুবালার জীবনে সেইটাই সব চেয়ে চিরস্মরণীয়—যদিন মহীশূর মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে গাইবার জন্য আমন্ত্রণ-পত্র এল। এই সম্মান তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না, বিশেষতঃ গহরজান যখন এখানকার সভা-গায়িকা ছিলেন। ইন্দুবালার কাছ থেকে সম্মতি পাওয়া মাত্র সারা সহরময় সেখানে বিজ্ঞাপনের ধুম পড়ে গেল।

অনুষ্ঠানে তিন দিন গান করে তিনি সমাগত অতিথিবৃন্দকে অশেষ তৃপ্তি দেন। আসরে তিনি যেন দৈবশক্তির অধিকারিণী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই সুখ্যাতির কথা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হল। ইন্দুবালা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "সংগীত সার্থক হয় তখনই, যখন তা আনন্দ দেয় এবং যখন তা বিশুদ্ধ।" মহারাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রতি মাসে ২৫০৲ টাকা ভাতা দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

মহীশূরে সাফল্যের পর ভারত সরকারের অষ্টম বার্ষিক শ্রম-শিল্প অধিবেশনে ইন্দুবালা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানেও বাঙ্গালীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

তিনি শুধু সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শিনী নন, অভিনয়-দক্ষতাও তাঁর আছে। তিনি বহু নাটকে [illegible] অভিনয় করেছেন। পূর্বে পুরুষের সাহচর্য্য ব্যতীত কেবল মেয়েরাই যাত্রাগান করতেন [illegible] দূর জানা যায়, এঁদের অভিনয় দেখেই তাঁর নটী-জীবন আরম্ভের সূচনা হয়। জননীর সাহায্যে ইনি রামবাগানে 'কালী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের (দানী বাবু) কাছে অভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন এবং পরে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

'কালী থিয়েটার' কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, রামবাগানের নটীরা বেশীর ভাগ কালীর উপাসিকা, তাই নাট্য-সম্প্রদায়ের নাম ঐরূপ করা হয়েছিল। এঁরা দেশের কাজে সাহায্য করবার জন্য অভিনয় করে দেশের কাজে ব্যয় করতেন। সে বার যখন পশ্চিম-বঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়, তখন এঁরা অকাতরে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, ১৩২১ সনের ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার 'বসুমতী'তে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, রামবাগান নারী সমিতির কাছ থেকে গত ৫ই কার্ত্তিক ১৩৬৫৫৲১২। পেয়েছি। বেলা ৮টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত এঁরা অর্থ ও চাউল বন্যা-পীড়িতদের দান করেন।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২১ সনে 'বসুমতী'তে আর একটি সংবাদ বেরোয়—রামবাগান নারী সমিতি ইন্দুবালা মারফৎ ১১০০ টাকা ৬ আনা ৬ পাই উত্তর-বঙ্গের বন্যা সাহায্যার্থে আচার্য্য প্রফুল্ল রায়ের নিকট প্রদান করেছিলেন। ইন্দুবালা ৪১০ টাকা স্বয়ং দান করেছেন।

সত্যি তখনকার এ বদান্যতার কথা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ইন্দুবালার ভেতর যে স্বদেশপ্রীতি ছিল, তা আমরা এ থেকে প্রমাণ পাই। তিনি কংগ্রেসের জন্য আপ্রাণ কাজ করেছিলেন। আজ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর দানও বড় কম নয়। অথচ এ কথা কজনে জানেন!

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনে পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু (ডাইনে) ও শরৎ স্মৃতি সমিতির শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট

আদর্শহীন কংগ্রেস

গঠনমূলক কর্মসূচী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে বরাবরই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস আসলে আলাপ আলোচনার পথেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছে এবং ভারতকে বিভক্ত করিয়া বৃহৎ নেতৃত্ব বৃটিশের হাত হইতে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিবার জন্য যে ভাবে তোড়জোড় চলিতেছে, তাহাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্যই আমরা লাভ করিয়াছি কি না, সে প্রশ্ন মনে জাগে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা হইলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায় কি? জয়পুর কংগ্রেসে যে অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে রূপ দিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, কৃচ্ছ্র জীবন-যাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চয়, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সমবায় পদ্ধতিতে বণ্টন এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শান্তি প্রতিষ্ঠা—এই ছয়টি উক্তিই সেই পরিকল্পনার মূল কথা। জয়পুর কংগ্রেসে শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার কথা হইলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উল্লিখিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে সমাজ-বিপ্লবকারী কোন কর্ম-পদ্ধতির ইঙ্গিত নাই। জনসাধারণকে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছে। চোরাকারবার করিয়া যাহারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের অনেকেই আজ কংগ্রেসের গোঁড়া ভক্ত; কিন্তু তরুণ দলকে কংগ্রেস আর আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। কারণ তরুণ-প্রাণ মহান্ আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। কংগ্রেসের আজ কোন মহান্ আদর্শ নাই। সুতরাং কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কি, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সীতারামিয়া আশা করেন যে, ভবিষ্যতে কংগ্রেস দল ও প্ল্যাটফর্ম এই দুই রূপেই কাজ করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব ব্যাপার; সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মরূপে কাজ করিবে কি প্রকারে? কংগ্রেসে মুসলিম লীগের স্থান হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু মহাসভার স্থান নাই। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মুসলিম লীগের কোন কর্ত্তা হিন্দু মহাসভার কর্ত্তাদের মত দল ছাড়িয়া কংগ্রেসকে ভজেন নাই। হিন্দু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়াই কি কংগ্রেস বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হইবে?

কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য

ডাঃ সীতারামিয়া মনে করেন যে, ভারত শুধু বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীন ও ক্রমবিবর্ত্তনশীল স্বরাজ লাভ করে নাই। ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ না হইলেও কংগ্রেসরাজ লাভ হইয়াছে, ইহা খাঁটি সত্য। বাকিটার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ মাথা-ব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ সীতারামিয়া বলিয়াছে[ন] যে, গবর্ণমেণ্টের উপর কংগ্রেসের প্রভাবটা হইবে প্রধানতঃ নৈতিক; কেবল যেখানে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে নৈতিক দিক্ হইতে [ভু]ল করিবে, সেই সময় কংগ্রেসের ক্ষমতা গ্রহণ করিবে বাস্তব রূপ। জয়পু[র] কংগ্রেস যে ভাবে একান্ত বশম্বদ ভৃত্যের মত ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছেই সায় দিয়াছে, তাহার পর এই সাফাই-এর আর কোন মূল্য থাকে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিতে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার প্যাটেলকেই বুঝায়। আবার কংগ্রেস বলিতেও তাঁহারাই। কংগ্রেসসেবীরা যদি কখনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার প্যাটেলের এক ধমকেই তাঁহারা শায়েস্তা হইয়া যাইবেন। জয়পুর কংগ্রেসে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কংগ্রেস তাঁহাদের হাতে ক্রীড়ণক মাত্র।

কংগ্রেসে দুর্নীতি

জনমতকে কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব ওরফে ভারত গবর্ণমেণ্ট ওর[ফে] পণ্ডিতজী-সর্দ্দারজী কানে তোলা পছন্দ করেন না। অভিজ্ঞ[তা] হইতে সকলেই জানেন যে, কংগ্রেসের ছোট-বড় অধিকাং[শ] কেন্দ্রগুলিই পারমিট কেনা-বেচার, কনট্রোল দ্রব্যের চো[রা] চালান দিবার, চোরাবাজারীদের নিকট হইতে তাহা[দের] সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া দিবার সংগঠনে পরিণত হইয়াছে। গোড়ায় গোড়ায় কংগ্রেসী নেতারা এই সব দুর্নীতির ব[িষয়] বিরোধী পক্ষের মিথ্যা প্রচার বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কর[িতে]ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, দুর্নীতি এইরূপ অবাধে চলিতে থাকিলে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইবে কংগ্রেস গ[বর্ণ]মেণ্টের পক্ষে তাহা খুব সুখকর হইবে না। সুতরাং কং[গ্রেস] কর্ম্মীদের অন্ততঃ কিছুটা সংযত না করিলে আর চলে না। সেই জন্য জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে "কংগ্রেসসেবীদের আচরণ" সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ সীতারামিয়া [তা] কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন সুরু করায়ও [ত্রুটি] করেন নাই। কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কা[রণ] "শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা।" কংগ্রেস ক্ষ[মতার] আসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এমন বহু লোক কংগ্রেসের খা[তায়] নাম লিখাইয়াছে যাহারা চিরকাল দেশের স্বাধীনতা আন্দো[লন] হইতে শত হস্ত দূরে থাকিত। সাধারণ লোককে ত্যাগ ক[রিয়া] কংগ্রেস তাহাদেরই আপন করিয়া লইয়াছে।' কারণ, সামনেই নি[র্বা]চন আসিতেছে। কয়েক জন ধনী ও গুণী ব্যক্তিকে হাতে রা[খিলে] সুবিধা বিস্তর। কংগ্রেস সভাপতি বলিয়াছেন,—"কংগ্রেস-কর্মী সরকারী কর্ত্তাদের উপর প্রভাব লাভের জন্য ব্যবহার করার বর্দ্ধমান অভ্যাস রোধ করিবার জন্য সুসম্বদ্ধ ভাবে চেষ্টা ক[রিতে]

হইবে।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাহা সম্ভব হইবে না। কংগ্রেসের নূতন ভক্তের দল যে উদ্দেশ্য আজ হঠাৎ এত গোঁড়া ভক্ত সাজিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইলে তাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিবে। জনসাধারণকে তো কংগ্রেস আগেই ত্যাগ করিয়াছে। ইহারাও চলিয়া গেলে কংগ্রেস বাঁচিবে কাহাকে লইয়া? কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করিতে হইলে তাহাকে সরকারী প্রভাব-মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজা প্রয়োজন।

সংবাদপত্রের অবস্থা

মাদ্রাজে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৃটিশ আমলাতন্ত্রের রাজত্বের সময় সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা ভোগ করিত, এখন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে সে স্বাধীনতা অনেকখানি খর্ব্ব করা হইয়াছে।" সংবাদপত্র জনসাধারণের মতামতের মানযন্ত্র। কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব অথবা গবর্ণমেণ্ট জনমত শুনিতে নারাজ, সেই জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া জনগণের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতির এই স্বীকারোক্তিতে দেশের নূতন শাসকেরা যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইবেন, এমন আশা নাই; কিন্তু সভাপতি নিজেই স্বীকারোক্তি করা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই "থুড়ি" বলিয়াই তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া লইলেন—"বিদেশী শাসনের সময় সংবাদপত্র অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতই ছিল দেশপ্রেমিক সংগঠনের অংশ; কিন্তু জাতীয় সরকারের আমলে উহা গবর্ণমেণ্টের অংশবিশেষ; সুতরাং জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে অনেকখানি খর্ব্ব করা হইয়াছে, ইহা খুবই ন্যায্য কথা।" যুক্তি অপূর্ব্ব! তবে জনসাধারণ কংগ্রেস সভাপতির শ্রীমুখ হইতে জানিয়া কৃতার্থ হইল যে, স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রকে সরকারী চাটুকার বলিতে হইবে; অন্যথা কংগ্রেসী গণতন্ত্রে তাহাদের স্থান হইবে না। এইটুকু জানাও মন্দের ভাল। কারণ বারংবার অভিযোগ সত্ত্বেও কংগ্রেস-শাসকরা সংবাদপত্রসেবীদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বরং স্বার্থান্বেষী মহলের মিথ্যা প্রচার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। মিথ্যা প্রচার যে কাহারা করিয়াছে, অন্ততঃ সেই সত্যটুকু জানাইয়া দিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

মহাত্মাজীর আদর্শ ও রাষ্ট্রনায়কগণ

ব্যারাকপুর ভাগীরথীর তীরে গান্ধীঘাট উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশবাসীকে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মহাত্মাজীর শিক্ষা দেশবাসীর অজানা নয়। কিন্তু সেই শিক্ষা কি ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে? পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন,—"মহাত্মাজীর যে বাণী পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর বেগে বিশ্বময় ভ্রমণ করিতেছে, তাহা পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রশ্ন করিতেছে—'তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ কি?' এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে দিতে হইবে।" রাষ্ট্রনায়করা দেশবাসীর যত ঊর্দ্ধেই অবস্থান করুন না কেন, ইতিহাসের দরবারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব হইতে তাঁহারাও মুক্তি পাইবেন না। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির উপর বেশী জোর দিতেন, সেই জন্যই স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসকে তিনি লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই। কেন? তাহার কোন সদুত্তর কি তাঁহারা দিতে পারিবেন?

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব এই কথাই প্রচার করিতেন যে, ভারতীয় জনগণের যাহা কিছু দুঃখ-কষ্ট সমস্তই বিদেশী শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল। দেশ স্বাধীন হইলে, স্বরাজ পাইলে এই সব কিছুই থাকিবে না। আজ তাঁহারাই দেশের শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন? ১৯৪৫ সালে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন যে, চোরাকারবারীদের নিকটবর্ত্তী ল্যাম্প-পোষ্টে ফাঁসী দেওয়া উচিত। আজ সেই চোরাকারবারীরাই কংগ্রেসের ও গবর্ণমেণ্টের প্রধান স্তম্ভ। একেবারে হরিহর অবস্থা! রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতীয় শিল্পপতিদের মন গলাইতে চাহিতেছেন নানা রকম মিষ্ট কথা বলিয়া আর উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত দায়িত্ব চাপাইতেছেন শ্রমিকদের উপর। শুধু মিষ্ট কথা নয়, খুশী মত লাভ করিবার জন্য অনেক রকম সুযোগ-সুবিধাও তাঁহাদের দিয়াছেন। অথচ শ্রমিকরা অন্ন বস্ত্রাভাবে মরিতেছে। অসহ্য হইলে ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার পর্য্যন্ত ছিনাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গঠিত আমেদাবাদের মজদুর সঙ্ঘকেও বহু বার ধর্ম্মঘটের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, সকলের মধ্যে ঐক্য সাধন ছিল মহাত্মাজীর প্রথম সাধনা; কিন্তু এই ঐক্য সাধনের পরিপন্থী হইয়াছে কাহারা? মহাত্মাজী এবং দেশবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাহারা ভারত বিভাগে মত দিয়াছিলেন? ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে, তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে দশ বৎসরের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা কি ঐক্য-সাধনের পক্ষে সত্যই অনুকূল ব্যবস্থা? দশ বৎসর পরে তাহারা আরও অনেক রকম পৃথক্ অধিকার দাবী করিবে না তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? এই ভাবেই মুসলিম লীগের তোষণ করিয়া কংগ্রেস ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তোষণের দ্বারা ঐক্য সাধিত হয় না। পণ্ডিতজী আরও বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাণী ছিল, উপায় যদি হীন হয়, তবে সিদ্ধিও কখনও মহৎ হয় না। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ কি উপায় গ্রহণ করিতেছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ভুল-ত্রুটির সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী নিজের ভুল স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার প্রদর্শিত এই পথটিও যদি আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হইত।

গবর্ণমেণ্ট ও জনগণ

লক্ষ্ণৌয়ের এক বক্তৃতায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন,—"যদি উচ্ছৃঙ্খল জনতাই প্রতিপত্তি লাভ করে

এবং উঁহাদিগকেই যদি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ধরণের শাসনযন্ত্র আমি এক দিনের জন্যও পরিচালন করিতে প্রস্তুত নহি।" কোন গবর্ণমেণ্টই উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে উপলক্ষ করিয়া যে এই মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে জনসাধারণের যে জন্মগত অধিকার রহিয়াছে পণ্ডিত নেহরু তাহা অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাহাদের শাসন করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ হওয়ার প্রকৃতই কোন কারণ আছে কি না। পণ্ডিত নেহরু যদি জনসাধারণের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান না করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, জনসাধারণ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতের সম্মুখে আজ যে সমস্যাবলী দেখা দিয়াছে উহার সমাধান করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত বুঝা-পড়া ও সহযোগিতার প্রয়োজন। কলিকাতার সাম্প্রতিক অশুভ ঘটনাবলী হইতে বুঝা যায় যে, বে-সরকারী ভাবে জনগণের সহিত যদি সর্ব্বদা সংযোগ রক্ষা করা না যায়, তবে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় সরকারও সন্তোষজনক ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। জনসাধারণেরও বুঝা উচিত যে, এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যাহা কোন সরকারের পক্ষেই দ্রুত সমাধান করা সম্ভব নহে। খাদ্য, বস্ত্র, স্থানাভাব প্রভৃতি সমস্যাগুলি এতই ব্যাপক যে, সর্ব্বাধিক শ্রমশীল ও কর্ম্মঠ সরকারের পক্ষেও উহার সমাধান করিতে কতিপয় বৎসর সময় লাগিবে। অতএব ঐ সমস্ত সমস্যার আশু নিরাকরণের জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে গেলে এমন এক শ্রেণীর লোকের হাতের মুঠার মধ্যে পড়িতে হইবে, যাহারা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করিতে উৎসুক।

মৌলানা আজাদের কথাই না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু সমাধান করিবার তাঁহারা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভুল-ত্রুটি করিতেছেন, সেগুলি স্বীকার করার নামই কি সহযোগিতা? পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা সমস্যা সমাধানে শুধু বাধাই সৃষ্টি করে। তাহাদের জন্যই কি গবর্ণমেণ্ট অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছেন না? বাজারে জিনিষ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। ওদিকে শিল্পপতিরা পণ্য দ্বারা গুদাম বোঝাই করিয়া রাখিতেছেন। এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার সার্থকতা কোথায়? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, দেশে খাদ্যাভাব যত বেশী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে, বাস্তবিক তত নাই। দেশে খাদ্যাভাব থাকিলে যাহাদের লাভ, তাহাদের জন্যই কৃত্রিম অভাব অব্যাহত রাখা হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা যে অবিলম্বে সমাধান করা সম্ভব নয়, এ কথা দেশবাসীর পক্ষে স্বীকার করা অসম্ভব। অতি লোভী চোরাকারবারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের জন্য যে অব্যবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্যই জনসাধারণ দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। এই অযোগ্যতার সহিত জনসাধারণ সহযোগিতা করুক, ইহাই কি পণ্ডিত নেহরুর দাবী?

ধর্ম্মমত ও লৌকিক রাষ্ট্র

ভারতে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতবাসী মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পোষকতা করিবার উপদেশ দিয়াছেন: আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা আপন আপন ধর্ম্ম ও কৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত রাজনীতির কোনরূপ সংস্রব থাকিলেই তাহা রাষ্ট্রবিরোধী বলিয়া গণ্য হইবে। এখন ভারতবর্ষে যে লৌকিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহার আদর্শ বোধ হয় সকল ধর্ম্মমতকে সম্মান মর্য্যাদা দেওয়া। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় নানাবিধ বিল আলোচিত হয়; কিন্তু মুসলমান বা অন্যান্য সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে রাষ্ট্রের কর্ত্তাদের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। মাদ্রাজের হিন্দু মন্দিরগুলিতে না কি লৌকিক রাষ্ট্রের কর্ত্তারা পশুবলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের নামে যাঁহারা গোহত্যা করেন, তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উদাসীন। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় যে, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই।

ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি ও নীতি

নয়া দিল্লীর সংবাদে ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খুবই আশঙ্কাজনক। ১৯৪৯ সালে ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৬০ লক্ষ টন। তন্মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবুও ২০ লক্ষ টনের ঘাটতি থাকিয়া যায়। গুজরাটে তো ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বরোদা রাজ্যেও খাদ্য পরিস্থিতি বিশেষ সন্তোষজনক নয়। পশ্চিম-বঙ্গ বরাবরই ঘাটতি অঞ্চল। পশ্চিম-ভারতে, যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অত্যধিক বর্ষণের ফলে মধ্যপ্রদেশে শস্যহানি ঘটিয়াছে। বোম্বাই-এ বন্যা ও সাইক্লোন প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। এই সকল মিলিয়াই ১৯৪৯ সালে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি হইয়াছে। এই অবস্থার জন্যই খাদ্যশস্য সম্বন্ধে নূতন নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং অধিকাংশ প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে পুনরায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্য সমূহের কৃষি ও অর্থ-সচিবদের যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইবে। কিন্তু কত দিনে এবং কত অর্থব্যয়ে তাহাই প্রশ্ন। আর ইহাতেই যে আমাদের অভাব মিটিয়া যাইবে তাহাও অনুমান করা কঠিন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ২ শত কোটি টাকার খাদ্যশস্য

আমদানী করা কি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার নয়? শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের যে উদ্বেগ তাহার শতাংশের এক অংশও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত নাই। দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি থাকিলেও বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, ফলে দর চড়া না হইয়া পারে না। খাদ্যশস্যের দর চড়া হইলেই শ্রমিকরা মজুরী বেশী দাবী করিবে এবং মজুরী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া জিনিষ-পত্রেরও দাম বাড়িবে।

ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ একর পতিত জমি আছে। এই পতিত জমি আবাদের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বিস্তৃত এবং গভীর চাষ কোন দিকেই সরকার মন দেন নাই। গত বৎসর এপ্রিল মাসে 'ফুড গ্রেণ পলিসি কমিটির' যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে ভারতে প্রতি বৎসর ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন। তন্মধ্যে উৎপন্ন হয় ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টন। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কম পড়ে। নানা কারণে ১৯৪৯ সালে এই ঘাটতি দাঁড়াইবে ৬০ লক্ষ টনে। এই কমিটির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, খাদ্য-সচিব ভারতীয় পার্লামেন্টে তাঁহার বক্তৃতায় সেগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অসুবিধা বা বাধার কথা জানিয়া দেশবাসীর পেট ভরিবে না। অসুবিধা দূর করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। তাঁহারা যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহা হইলে কেবল কৈফিয়ৎ দিবার জন্ত মন্ত্রীর আসনে বসিবার কোন সার্থকতা আছে কি?

কলিকাতার হাঙ্গামা

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতার বুকের উপর যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা শুধু মর্ম্মান্তিকই নহে, ১৯৪৫ সালের ২১শে নবেম্বর হইতে কয়েক দিন ধরিয়া কলিকাতায় পুলিশের যে তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল, তাহার কথাও আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন দেশে বৃটিশ শাসন প্রচলিত ছিল। আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু পরিবর্ত্তন তো কিছুই দেখা যাইতেছে না। বৃটিশ আমলের জাতীয়তা বিরোধী সেই আমলাতন্ত্রই প্রকৃতপক্ষে এখনও দেশ শাসন করিতেছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতা শহরে আশ্রয়প্রার্থী শোভাযাত্রীদের উপর এবং ইন্দোনেশিয়া দিবসে ছাত্র-শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছিল। গত কয়েক মাস যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারী থাকিবার কারণ কি? এখনও রাইটার্স বিল্ডিংকে ঘিরিয়া চতুর্দ্দিকে ১৪৪ ধারা জারী রহিয়াছে কেন? পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীরা তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জানাইবার জন্ত শোভাযাত্রা করিয়া ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ও নিরস্ত্র ছিলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দিলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হইত বটে, কিন্তু তাহা একটি টেকনিক্যাল অপরাধ ছাড়া আর কিছুই হইত না। পশ্চিম-বঙ্গের কোন মন্ত্রী যদি তাঁহাদের কাছে যাইয়া বুঝাইয়া বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই শোভাযাত্রার পরিবর্ত্তে প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে রাজী হইতেন। ফলে, ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও কোন প্রয়োজন হইত না। ইন্দোনেশিয়া দিবস সম্বন্ধেও আমরা এই কথাই বলিতে পারি। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনসাধারণের আছে কি না, সে প্রশ্নের উত্তরও খুব সহজ। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় পুলিশের অনাচার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছিলেন যে, বিক্ষোভ প্রদর্শন নাগরিকদের জন্মগত অধিকার। আজ দেশ স্বাধীন হওয়ায় সে অধিকারও কি দেশবাসী হারাইয়াছে?

এই হাঙ্গামার দায়িত্ব কলিকাতার ছাত্রদের উপর অর্পণ করা অনুচিত। বাঙ্গালার ছাত্র-সমাজ বহু বার সংযম ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং কংগ্রেস নেতারাও সেজন্ত তাহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর নেতারা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পুলিশ বিভাগেও অনেক অবনতি হইয়াছে। বৃটিশ আমলেও যাঁহারা যে সকল পদ পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই, স্বাধীনতা লাভের পর হঠাৎ তাঁহারা সেই সকল পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাই বৃটিশ আমল অপেক্ষাও বর্ত্তমানে তাঁহাদের কাছে মানুষের জীবন অধিকতর সস্তা বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে নিরপরাধ বারো বৎসরের বালক অথবা ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে গুলী করিয়া মারিতে পারে? ক্ষমতা লাভ করিলে মানুষ বদলাইয়া যায়। যোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা আসিলে তবুও খানিকটা বাঁচোয়া, কিন্তু অযোগ্যদের হাতে ক্ষমতা দিলে ফল এই রকমই শোচনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিকার

দেবানন্দপুরে শরৎ-স্মৃতি উৎসবে (উপরে) সভাপতি শ্রীরজনীকান্ত দাস, প্রধান অতিথি শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও (নীচে) শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

করিবে কে? যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান হইবে তাহাই যে ভূতে পাওয়া।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিল

৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থসচিব মিঃ জন মাথাই সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিল ভারতীয় পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। এই সম্পর্কে তীব্র বিতর্ক হয়। সিলেক্ট কমিটি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিলে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত ধারা, ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কর্ত্তৃক অন্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা সংক্রান্ত বিধান, অংশীদারদের ভোটদানের বিধান সংক্রান্ত ধারা এবং ব্যাঙ্কগুলি কোন কোন জাতীয় লেনদেনের ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিবে না, তাহা নির্দ্ধারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর লাভের বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রভাবের কথা বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির লভ্যাংশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধান থাকা উচিত এবং লভ্যাংশের হারও নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার স্বতন্ত্র অভিমতে আরও বলিয়াছেন যে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির হিসাব রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট অথবা ভারতীয় অডিটার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার বিধান থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বিলে কোন কোন ব্যাঙ্ককে প্রস্তাবিত আইনের আওতা হইতে বাদ দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসার পক্ষে ইহা আদৌ কল্যাণকর হইবে না।

অংশীদারের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ধারাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিলেক্ট কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোনও এক জন অংশীদারের ভোটাধিকার অংশীদারদের মোট ভোট-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না। কিন্তু এই বিধানও ১৯৩৭ সালের ৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে অনুমোদিত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না। আমাদের মনে হয়, ব্যাঙ্ক যে কোন সময়েই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, সকল ব্যাঙ্ক সম্পর্কেই এই বিধান প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সিলেক্ট কমিটি মনে করেন যে, ব্যাঙ্ককে কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ উক্ত কোম্পানীর মোট শেয়ারের শতকরা ২০ ভাগ করিলে কার্য্যতঃ ব্যাঙ্কের আইনসঙ্গত কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই জন্য তাঁহারা শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার ক্রয়ের অধিকার দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ ভারতীয় পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করিবার আর একটি প্রয়াস বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বলেন, ভারত সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলিকে সোস্যালাইজড করিবার বিধান প্রস্তাবিত খসড়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিলে থাকা উচিত ছিল।

মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার রায়

মহাত্মা গান্ধী হত্যা-মামলার স্পেশ্যাল জজ শ্রীআত্মাচরণ তাঁহার রায়ে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্ততঃ পক্ষে নাথুরাম গডসে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণুরামচন্দ্র কারকারে মদনলাল কাশ্মীরীলাল পাহোয়া, শঙ্কর কিষ্টয়া, গোপাল গডসে, ডাঃ দত্তরায় সদাশিব পারচুরে এবং দিগম্বর বাড়্গে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন। প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ইহাও ধার্য্য করেন যে নাথুরাম গডসে কর্ত্তৃক মহাত্মা গান্ধীর হত্যা স্বেচ্ছাকৃত এবং সুপরিকল্পিত। মহাত্মা গান্ধীর হত্যায় নারায়ণ আপ্তে যাহা করিয়াছেন, তাহাও কম জঘন্য নয়। আগাগোড়া অপরাধের প্রত্যেকটি স্তরে নারায়ণ আপ্তেই নেতৃত্ব করিয়াছেন। বিচারপতি ইহাও মনে করেন যে, নারায়ণ আপ্তের বুদ্ধি যদি ইহার পিছনে না থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিতই হইত না। তিনি নাথুরাম গডসেকে হত্যার অপরাধে এবং নারায়ণ আপ্তেকে হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী কারকারে, মদনলাল, গোপাল গডসে ও ডাঃ পারচুরেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্কর কিষ্টায়ার প্রতিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। পরে তাহা কমাইয়া সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর নিরপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দিবার আদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে তাঁহাকে লাল কেল্লায় অবস্থান করিতে বলিয়া তাঁহার উপর এক সরকারী আদেশ জারী করা হয়। রাজসাক্ষী বাড়্গেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বিচারপতি দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা আপীল করিতে চায়, তাহা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে তাহা করিতে হইবে।

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু

৭ই মাঘ, রাত্রি ১১টা ৩৫ মিঃ স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু তাঁহার এলাহাবাদস্থিত ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত এক জন উদারচেতা, পরহিতব্রতী রাজনীতিজ্ঞকে হারাইল। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঘুম ভাঙ্গার পর　　　　অজিতকুমার নিয়োগী অঙ্কিত

"যখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন টুপ্ টুপ করিয়া জমীর জল পুকুর ও খালে যাইয়া পড়ে, কিন্তু অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইলে পুকুর খানা ডোবা সমুদায় একাকার হইয়া যায়। এরূপ মানুষ অল্প বিদ্যা ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া বাহ্যাড়ম্বর করে, কিন্তু ধর্ম্ম ও জ্ঞানের গম্ভীরতা জন্মিলে আর সেরূপ করিতে পারে না।"

"এক জন মেছুনী মাছ বিক্রয় করিয়া বাড়ী যাইতে ছিল, পথে রাত্রি হওয়াতে এক মালীর বাড়ীতে যাইয়া রাত্রি যাপনে প্রবৃত্ত হয়। সেখানে গোলাপ বেল জুই ইত্যাদি ফুলের গন্ধে সে ছট্‌ফট করিতে থাকে, কিছুতেই তাহার নিদ্রা হয় না। পরে মাছের চুপ্‌ড়িতে জল ছিট্‌কাইয়া, সেই চুপড়ি নাকের কাছে ধরে, সেই গন্ধে তাহার আরাম বোধ হয়, এবং গভীর নিদ্রা হয়। এইরূপ সংসারীদের মনে ভগবানের মধুর তত্ত্ব ভাল লাগে না, সংসারের জঘন্য দুর্গন্ধই তাহাদের ভাল বোধ হয়।"

"শূন্য সিন্ধুকের প্রতি কেহ যত্ন করে না, যে সিন্ধুকে টাকা মোহর প্রভৃতি মূল্যবান্ সামগ্রী আছে সেই সিন্ধুককে লোকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে। যে আত্মায় ভগবানের আবির্ভাব, সেই আত্মার আধার শরীরকে সাধু লোকেরা যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
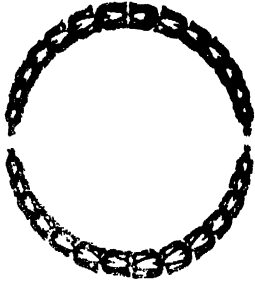
বাঙলা প্রবাদ

রেভাঃ লঙ সম্পাদিত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

বাঙলা প্রবাদমালার ইংরেজী ভূমিকা

Preface

The following contains a free translation into Bengali by Babu Ranga Lal Banerjea of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badager, Malayalam, Tamil, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages.

The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit and wisdom of peasants and women in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in mumber though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.

Calcutta, November 15, 1869.

J. Long.

৭২। অন্ধকে পথ দেখান সহজ নয়।

৭৩। আগুনে আগুন নিবায় না।

৭৪। উকীলের চাপ্‌কানের আস্তর বোয়াক্কেলের জিদ।

৭৫। এক জন মারে ঝাড়া, অন্য জন ধরে খড়া (খরগোস)।

৭৬। এক সের বিদ্যা চেয়ে এক ছটাক অক্কফ্ ভাল।

৭৭। এক হাতে দ্বিতীয় হাত পরিষ্কার, দুই হাতে মুখ পরিষ্কার।

৭৮। ওষ্ঠের শীলতা, বিনা ব্যয়ে বহু সন্তোষের সৃষ্টি।

৭৯। কথা কহা আর করা, এ দু'য়ের মধ্যে অনেক জোড়া জুতা ক্ষয়।

৮০। কথা স্ত্রী, কার্য্য পুরুষ।

৮১। কাকের চক্ষু কাকে উৎপাটন করে না।
"কাকের মাংস কাকে খায় না।"

৮২। কাছিমের পিঠে কাঁমড় মেরে মাছীর ওষ্ঠ ভগ্ন।
"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

রু প্রবাদ

৮৩ কাল, একটি শব্দহীন উখা।

৮৪ কুকুর মাত্রেই আপন কোটে সিংহ।

৮৫ কুকুরের চীৎকারের প্রতি চন্দ্র শ্রুতিপাত করেন না।

৮৬ কুকুরের প্রতি হাড় ছুড়িলে তাহার ক্রোধের বি কি?

৮৭ কুকুরের সঙ্গে শয়ন করিলে এঁটুলি গাত্রে উঠিতে হে

৮৮ কুওর সঙ্গে লড়াই করলে, কলসীর মাথা ফাটে।

৮৯ কৌলীন্য অন্নের সহিত জঘন্য ব্যঞ্জন।

৯০ খড়ের পুরুষের সোনার স্ত্রী চাই।

৯১ ঘরে আগুন লাগিলে দূরস্থ জলে নিবায় না।

৯২ ঘেউ ঘেউয়া রোগা কুকুরের চামড়ার পক্ষে সর্ব্বনাশ।

৯৩ চক্ষু নাহি দেখে যাহা, মন নাহি শোনে তাহা।

৯৪ চাকা যত জেবুবার, ততই তার শোরশার।

৯৫ ছাগল চুরি করে ঈশ্বরোদ্দেশে কলায় উৎসর্গ।
"গরু মেরে জুতো দান।"

৯৬। ছোট চোর ফাঁসীতে মরে, বড় চোর গেঁজের ডোরে।

৯৭। ছোট ছেলেদের শিরঃপীড়া, বড় ছেলেদের মনঃপীড়া।

৯৮। ছোটলোকের প্রতি নির্ভর, বালীর উপর বাঁধ দেওয়া।

৯৯। যে যুবতী জানালায় যেতে ভালবাসে,
সে তো যেন অঙ্গুরের থোবা পথপাশে

১০০। টাজন ঘোড়ায় যাহা খায়, বেতো ঘোড়ায় তাহাই চায়।

১০১। টোপে টোপে পড়ে বারি, পাষাণের ক্ষয়কারী।
"ধীর জলে পাষাণ বিঁধে।"

১০২। তাঁহার পাঁচক্ষুরে ভেড়ার অন্বেষণ।

১০৩। তিনি পেরেক বাহির করে গোঁজ চালান।

১০৪। দাঁত থাকিলে ব্যাংও কামড়াইত।

১০৫। ধীরে সুস্থে ক্রয় করে, পায় দ্রব্য সস্তা দরে।

১০৬। নারী, গর্দ্দভ, আর বাদামের জন্যে শক্ত হাত চাই।

১০৭। নিজে গাধা হইয়া যে আপনাকে হরিণ ভাবে, সে পগার ডিঙ্গাইবার সময় আপন ভ্রম টের পায়।

১০৮। নিরাপদে যদি ইচ্ছা সংসার যাপন।
শিকরার (দূরদৃষ্টি) মত তব হউক নয়ন॥
গর্দ্দভের (দূরে শ্রবণশীল) ন্যায় কর্ণ, বপিৎ (অতি কঠিন) মুণ্ড।
উষ্ট্রের সমান স্কন্ধ (গুরুভারবাহী), শূকরের তুণ্ড॥
(কণ্টক পর্য্যন্ত আহারক্ষম)॥
হরিণের (অতি দ্রুতগামী) সম রাখ যুগল চরণ।
অনায়াসে পরিত্রাণ পাবে জনগণ॥

১০৯। নোঙ্গরের মত সমুদ্রে বাস, কিন্তু সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নাই।

১১০। পত্রের পতনে ভয় হয় যার মনে।
সে জন কখন যেন নাহি যায় বনে॥

১১১। পূর্ণোদরে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া সহজ।

১১২। পেটুকতায় যত মরে, অস্ত্রঘাতে তত নয়।

১১৩। প্রচুর থাকলেই নিরিখ চেরা।
"পেট ভরিলেই পাতের গঁদা।"

১১৪। প্রেমের রাজ্যে তলবার নাই।

১১৫। বজ্রের শব্দে চোরও সাধু।

১১৬। বড় বড় গাছের ফল অপেক্ষা ছায়ার আধিক্য।

১১৭। বড় মাছীরা মাকড়শার জাল ভাঙ্গিয়া যায়।

১১৮। বরং সে গাধা ভাল বোঝা যেই বয়,
ভার ফেলে দেয় যেই, কাজ কিসে হয়?

১১৯। বাক্যে কখন বিড়ালের পেট ভরে না।

১২০। বিড়াল মাছ ভালবাসে, কিন্তু পা ভিজাতে নারাজ।

১২১। বিড়ালের পিঠে হাত বুলাইবে যত,
ততই সে নিজ ল্যাজ করিবে উন্নত।

১২২। বৈদ্য প্রায় পাচন খায় না।

১২৩। বৈদ্যের ভুল শ্মশানে লুপ্ত।

১২৪। বোকার দাড়ীতে নাপিতের কামান শিক্ষা।

১২৫। ভরা পেটে ক্ষুধায় অবিশ্বাস।

১২৬। ভাঙ্গা অপেক্ষা নোয়া ভাল।

১২৭। ভাল ঘোড়ার লাগাম চাই নে।

১২৮। ভিক্ষা দানে কেহ কখন কাঙ্গাল হয় নাই।

১২৯। ভেড়া চরাইতে বাঘের প্রতি ভার।
"ডাইনের কোলে পো সমর্পণ।"

১৩০। মাল-মসলার জন্য অট্টালিকা ভঙ্গ।

১৩১। যদি এক ইন্দুর নড়ে, চোরের প্রাণ ধড় ফড়ে।

১৩২। যদি তব গৃহে কাচের ছাদ।
অন্যে মারিবারে না কর সাধ।

১৩৩। যার দুওর নীচু, তাকে অবশ্য হেঁট হইতে হবে।

১৩৪। যার নাই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।

১৩৫। যার নিকট রুটী, তারি নিকট কুকুর।

১৩৬। যার ল্যাজ খড়ে নিশ্চিত, তারি সদা আগুনে ভয়।

১৩৭। যাহার মোমের মাথা, সে যেন রৌদ্রে না যায়।
"ননীর পুতুল যেন, রৌদ্র পেলে গলে যাবে।"

১৩৮। যাহার হৃদয়ে প্রেমের স্থিতি।
তার আশে-পাশে কণ্টক নিতি।

১৩৯। যেই ফুলে মধুকর মধু পান করে।
বোলতা কেবল তাহে তিক্তরস হরে।

১৪০। রন্ধনশালে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস।

১৪১। রাজমুকুট কিছু মাথা-ব্যথার ঔষধ নয়।

১৪২। শকটারোহণে শশমৃগয়া।

১৪৩। শত্রু পলাইলে সকলেই সাহসী।
"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।"

১৪৪। শৃগাল ফাঁদে ল্যাজ হারাইয়া স্বজাতির প্রতি উপদেশ দিল, সকলে ল্যাজ কাটাও

১৪৫। সংসার এক সিঁড়ী, কেউ উঠে, কেউ নাবে।

১৪৬। সূর্য্য মলপিণ্ডের উপর দিয়া গমন করিলে অপবিত্র হন না।

১৪৭। সে ডালের পক্ষী বিক্রয় করে।

১৪৮। সোনার চাবিতে সকল দ্বার খোলে।

১৪৯। সোনার বাগডোর হইলেই ভাল ঘোড়া হয় না।

১৫০। স্থির জলে কীটের জন্ম।

১৫১। হস্তী মক্ষিকার দংশন অনুভবে অপারগ।

১৫২। হাড়হাঁচার পালক ছেঁড়, কিন্তু তাকে চেঁচাইতে দিও না।

১৫৩। ক্ষত-চক্ষুতে আলোক পীড়াদায়ক।

১৫৪। অনলে দগ্ধ বিড়ালের শীতল বারিতে ভয়।
"ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।"

১৫৫। অন্ধের দেশে একাক্ষ পুরুষ রাজা।
"আদাড় গায়ে শিয়াল বাঘ।"

১৫৬। আগে আমাকে পাড়, তবে জলপাই বলিয়া ডাকিও।
"না আঁচালে বিশ্বাস নাই।"

১৫৭। এক বালতি জলের চেয়ে একটা মিষ্ট কথায় অধিক নির্ব্বাণ করে।

১৫৮। এক মুষ্টি উপস্থিত বুদ্ধি, এক হাজারী বিদ্যার সমতুল্য।

১৫৯। কলসী পাতরকে আঘাত করুক, আর পাতর কলসীকে আঘাত করুক, কলসীরই সর্ব্বনাশ।

১৬০। কাজের বেলা গা শিহরে, খাবার বেলা ঘর্ম্ম ঝরে।
"কাজে কুড়ে ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।"

১৬১। কুঁজো আপন কুঁজ দেখিতে পায় না, পরের দেখিতে পটু।

১৬২। "গম্যং গচ্ছ." "নাস্তি" বাটী গমনের পথ।

১৬৩। চোটের তাড়না সহ হইলে নেহাই।
হাতুড়ী যদ্যপি হও চোট মার ভাই।

১৬৪। ছুরীর মার (প্রহার) মিটে, কিন্তু জিহ্বার মার মিটে নয়।

১৬৫। তিন জনের যে গুপ্ত কথা, তাহা সকল লোকের গুপ্ত কথা।

১৬৬। তিনটি বিষয়ে আনে মানুষের দাহ—
দ্বর রৌদ্র, রাত্রে ভোজ, আর চিন্তাজাল।

১৬৭। দরিদ্র হইলে দাতা, ধনী হইলে কৃপণ।

১৬৮। দুই উকীলের মধ্যে মূর্খ মওয়াক্কেল, যেন দুই বিড়ালের মধ্যে একটি মাছ।

১৬৯। দুই চক্ষু অপেক্ষা চারি চক্ষুতে অধিক দৃষ্ট হয়।

১৭০। দুই জনের মধ্যে গুপ্ত কথা, ঈশ্বরের গুপ্ত কথা।

১৭১। পঙ্গু অপেক্ষা মিথ্যাবাদী শীঘ্র ধরা পড়ে।

১৭২। পরের হাত দিয়া গর্ত্ত থেকে সাপ বাহির করা।

১৭৩। বৈদ্যদের ভ্রম যত, পৃথিবীর গর্ভগত।

১৭৪। মাহলা মদিরা আর তামাক ও তাস।
মানুষের এই চারে বুদ্ধি হয় নাশ।

১৭৫। মাতাল আর ষাঁড়কে পথ ছাড়িয়া দেও।

১৭৬। মামলার পিরীতে ধন নাশ, বৈদ্যের পিরীতে দেহ নাশ।

১৭৭। যার গরু হারায়, সে সর্ব্বদাই ঘণ্টার শব্দ শুনে।

১৭৮। যেখানেতে কম জোর, সেইখানে ছিঁড়ে ডোর।

১৭৯। নির্দ্দোষ হচ্চর যে জন চায়,
পদব্রজে যেন সে জন যায়।

১৮০। যে জন সমাজে নাহিক মিশে,
হইবে তাহার সুজ্ঞান কিসে?

১৮১। যে বন্ধু পাখা দিয়ে ঢেকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে মারে, সে বন্ধুকে ত্যাগ কর।

১৮২। যে স্থানে গভীর নীর, সেই স্থান সদা স্থির।

১৮৩। সত্য তেলের মত, উপরেই ভাসিয়া উঠে।

১৮৪। হাট ভাঙ্গিল নির্ব্বোধের উদ্যোগ আরম্ভ।

১৮৫। হাতের ঢিল আর মুখের কথা ছাড়িয়া দিলে আর ফেরে না।

আপনি কি জানেন?

১। "অজিত কেশকম্বলী" কে জানেন? এমম উদ্ভট নামে তিনি পরিচিত হলেন কেন?

২। "গোপিকা" কে?

৩। "তাম্রপর্ণী" কোথায়?

৪। "চালা" "উপচালা" "শিশুপচালা"—এরা কার তিন বোন?

৫। কলকাতায় "বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড" বা "গোরস্থান রোড" কোথায়?

৬। কলকাতার "মেডিকাল কলেজ" কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৭। "ষড়দর্শন" কাকে বলে, তাদের প্রণেতা কারা?

৮। পুরীর বিখ্যাত "জগন্নাথের মন্দির" কোন্ সময় কে তৈরী করেন?

৯। "নালন্দা" বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র পড়ত এবং তার কয়টা বক্তৃতা-গৃহ ছিল জানেন?

১০। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীনতম কোনটি?

(উত্তর ৭০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(বড় গল্প)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ও তুফানি! ও তুফানি। দেখ—বাড়ীতে মন টেঁকে না! এই চোত মাসের ধূপ-রোদে কোথা গিয়ে হাজির হয়েছে! আই একবার বাড়ি, তার পর তোর পিঠের ছাল তুলব তবে ছাড়ব। একটু হায়া নাই গো! এত বড় মেয়ে, একটু নজ্জা হয় না? তুমি তো পড়ে-পড়ে ঘমুচো! মেয়েটা কোথা? তার সাড়া নাই শব্দ নাই। এই দুপুর রোদে দাপাতে-দাপাতে হাট থেকে এসে বাড়িতে একটু জলের পিত্তোশা নাই! এমন দুষমন পেটে ধরেছিলাম! এঁ্যা, ছি ছি রে অদেষ্ট!'

পটু বায়েন ধুঁকতে-ধুঁকতে উঠে বসল। বললে, 'কি করব! আমার যদি ক্ষেমতা থাকবে, তাহলে কি আমি ঘরে চুপ করে বসে থাকি? বদ্দমান বাঁকড়ো সোনামুখী আসানসোল ঘুরে কাঁসার বেবসা করে এসেছি। এখন ঘঘুর মত কাসছি। কি করব।' খক-খক করে ক'টা পাজর-ভাঙা কাসি কেসে এক ঘটি জল এগিয়ে দিল।

সন্তোষী জল খেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, 'তোমার শরীর কাহিল, তোমাকে তো বুলছি না। সে হারামজাদি গেল কোথায়? ঘরবাড়ি বন, যেন পাখিকে বাড়ী! গোল-গোবর-টিপ—তাকে না পেয়ে আমি ছাড়ছি না।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল সন্তোষী। হ্যা রে, দেখেছিস তুফানিকে? দেখেছিস?

'ওগো—প্যানাদের দুয়োরে ঘুমুচে—'

সত্যিই তাই। প্যানাদের ঘরের দাওয়ায় মাটিতে কাপড় বিছিয়ে পিঠ খালি করে ঘুমুচ্ছে তুফানি।

'ও ঘুম! ও ঘুম! ওঠ ক্যানে।'

তুফানির সাড়াও নাই, ধারাও নাই। ঘুমে একেবারে নিশ্চল পাথর।

'ও পাথর! ও পাথর! ওঠ ক্যানে।'

তবুও তুফানি নিরেট।

উঠোনে একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল, তাই তুলে নিয়ে সন্তোষী সট-সট করে তিন-চার ঘা বসিয়ে দিলে।

অমনি আঁও-আঁও করে চীৎকার করে ধুড়মুড়িয়ে উঠে বসল তুফানি।

'নিজের বাড়ি ঘুম আসে না! মন টেঁকে না। চৌদ্দ বছুরী, বাড়ির কাজ একটিও করবে না। রাশখাগী, এক রাশ করে খাবে! আর পাড়ায়-পাড়ায় ঘরবে! ক্যানে, এক পোছ গোবর আনাতে পারো না? দু'টি কাঠ-খড়ি দেখতে পারো না? ছাঁক-জালি নিয়ে দুটি মাছ-কাঁকড়া ধরতে পারো না? চল, বাড়ি চল—' ঠেলা দিতে-দিতে তুফানিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। 'বল, পরের বাড়ি যাস ক্যানে? তুই যদি বাড়ির কোনো কাজ করতে না পারিস তুই দূর হয়ে যা। ক্যানে, অত বড় মেয়ে থেকে ক্যানে কোনো কাজ হবে না? লোকের ছেলে-পিলে দুঃখের ভাত সুখ করে খায়। আর, তুই পোড়ামুখি আমার সুখের ভাতে ছাই দিচ্ছিস—'

বাড়িতে এসেও হিঁপে-হিঁপে কাঁদতে লাগল তুফানি।

'হাঁড়িতে ভাত আছে—দে আমাকে, দু'টি খায়—'

তুফানির কান্না তবু থামে না।

'এই দ্যাখ, কাঁদন থো। তোর কাঁদনের কিছু হয়নি। দে, ভাত দে।'

কান্নার মাঝেই ঝিলিক দিয়ে তুফানি বললে, 'ভাত আছে নাকি তাই দেবে!'

'সব ভাত খেয়েছিস?'

তুফানির মুখে আর রা-বোল নেই।

'কে কে খেলি? তরকারি পেলি কোথা?'

'তরকারি লাগেনি। ঘরের একটা হাঁসের ডিম ভেজে বাবা আমি খুদু উদু সবাই খেয়েছি।'

সন্তোষী এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে রইল। বললে, 'যখন সবাই খেলি তখন কই আমার ভাবনা ভাবিসনি? আমি যে সেই ভোরে গিয়ে ধূপ রোদে বাড়ী এলাম, আমি এখন খাব কি? না, আমার খিদে নাই, না, আমি মানুষ নই। ভাত যদি খেলি, তা বেশ, দু'টি চাল ভেজে থুলিনে ক্যানে? তুমি কি কাঁচা কাঠ? নিজের পেটের জ্বলন খুব বোঝো। নয়? এখুনি চাল ভেজে দিবি তবে ছাড়ব।'

'আমি পারব না।' তুফানি ঘাড়ে বাড়া মারল। 'তু আমাকে

মেলি ক্যানে। আমাকে সট-সট বসিয়ে দিলি! আমাকে বাজে না? এই স্তাখ দিখি কেমন দাগ পড়েছে।'

'এখন দাগ থো। শীগ্‌গিরি ভেজে দে, নইলে তোর আজ নিস্তার নাই।'

'আমি পারব না। পারব না।'

দু'-তিন ছড়ি আবার বসিয়ে দিল সন্তোষী। আর রাক্ষুসে চীৎকার করে তুফানি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

'হাঁ গো, কি হল? কি হল? বেপার কি?' পাড়ার কাকি-মামিরা ভীড় করলে।

'শোন গো কাকি শোন—' সন্তোষী মেয়ের কেচ্ছা-কেত্তন সুরু করলে। অনেকক্ষণ লাগবে মনে করে সেই সঙ্গে নিজের চুল বাঁধতে বসল। শেষ নাগাদ বললে, 'ওকে আজ খেতে দেব না। বাড়ি ঢুকতে দেব না। ও কি কাঁচা খুঁকি? ভাত বোঁ ঝোর্চোনি? বাড়ির একটি কাজ করবে না। আবার মুখের মাঝে দাঁত ক'টা দেখ ক্যানে, মাথায় তো উকুনে উড়ুলি-ঝড়ুলি! নিকি থিকথিক করছে। ওর মত কার ছেলে আছে বলো দেখিনি। উঃ, মরুক, মরুক, মোছল-মানে যাক—'

উঠোনে একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল, তাই তুলে নিয়ে সন্তোষী সট-সট করে তিন-চার ঘা বসিয়ে দিলে।

পাড়ার মেয়েরা ধুয়ো ধরল: "ওঃ ছিঃ, ওঃ ছিঃ, ও কি কাজ! ও কি কথা! ওরে, ওর সেঙা দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দে। সে নফরা তিন্দ্‌বে ব্যাটা তো আর নিলে না। অত বড় ধুমড়ী এক পেছে গোবর আনতে পারে না, দু'ঘরে ধান ভানতে পারে না। এ কি অনাছিষ্টি কথা। বাপের তো আর ওস্তগার নেই যে সব সুড়ক-ভুড়ক চলবে। আবার চেঁচানি দেখিস! বাবাঃ, নিজের মায়েই তো মেরেছে! ক্যানে, মাকে দু'টি খেতে দিলে পার্যব নে? উলটে আবার ভাতগুলো সব খেয়েছিস। ও মাগী

কি খায়? খিদেয় জলে ম'ল। যা যা দু'টো কিছু খা গা। বেলা ঢলকে গেল। যে প্যাটে ছেলে ধরেছিস সে প্যাট অন্নে ভরে না—তা তো জানি, কিন্তু কি করবি বল, এটা প্যাটের ছেলে নয়, এটা শত্তুর—'

আ.রা আছে।

'এমন ঢিপির মাকাল মেয়ে তো কই দেখিনি বাপের বয়সে। ছুঁড়ির আকার পেকার দেখে মাইরি কিছু ভাল লাগে না। তাইতে তো সোয়ামী নিলে না। ওর গায়ের গন্ধ দেখিস ক্যানে, ভূত পালায়। ওকে কেও দেখতে পারে না। সবারি চোখের বিষ। তাকাচে দ্যাখ—মিচকেমুখী ভুসকুমরী—'

বাড়ির কানাচেই শুয়েছিল তুফানি, হঠাৎ তেড়ে এল। বললে, তোদের আমি কি করেচি, সবাই মিলে নেগেছিস? তোদের বাবার খেয়ে না পরি? আমি বাড়ির কাজ করি না, তোরা সব করে দিয়ে যাস? সবাই মিলে নেগেছে!'

'চুপ কর উনুনমুখী! চুপ! আবার ঠুঁকবো।'

'এবার মারলে তোমাকেও বসাব।' তুফানি দুই কোমরে হাত রাখল।

'এই দেখ!' কাশির ঝোঁক সামলে পটু বায়েন বললে, 'বেশি জাল ভাল নয়। মারবে কি করে? তাকিয়ে হাট বসাচ্ছিস ক্যানে? বাজারে দু'চার পয়সার কিছু কিনে খেতে পারনি? কি আমার বুদ্ধি রে! ঘরে যা আছে তাই খা। না থাকে তো না-ই খা। ওপর বেলায় কেড়ামাতুনি জুড়ে দিয়েছে। যা সব—'

ধমক খেয়ে পাড়ার মেয়েরা সটকান দিলে। যাবার সময় তুফানিকে উদ্দেশ করে বললে, 'এত ঠ্যাঙা-লাথি খেয়েও বেঁচে আছিস? তোরে কি তোর ভাতারি লাগে না?'

২

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! ও হে, আমার খোলটা সারা হয়েছে? বুড়ি—শ্রীখোল! প্রাণগৌর নিত্যানন্দ!'

পায়ে খড়ম, গায়ে গেরুয়া, হাতে কুঁড়োজালি—মাথা-ছোলা এক বাবাজী এসে উপস্থিত।

'আজ্ঞে আসুন। শেষ হয়েছে। এখন এই "চিগার" (স্ত্রীগার) করে দিলেই হয়। এ দু'দিন তেমন রোদ হয়নি বলেই হয়নি। বসুন, এখান হয়ে যাবে।'

'না, বসব না! বসবার সময় নাই। কাজের জিনিস বেশি দিন পড়ে থাকলে চলে? নাম হয় না যে। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! ও হে সতীশ, ও মেয়েটা কে! ওকে তো এ বাড়ীতে কই দেখিনি।'

'আজ্ঞে ও আমার শালী। দু' পাঁচ মাস এখানে এসেছে।'

'তা বেশ, তা বেশ। আগে দেখিনি কি না—'

'স্বামী নিলে না, বাড়িতে হামেসা ঝগড়াঝাটি, তাই আমাদের এখানে আছে।'

'তা বেশ, তা বেশ। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। হে সতীশ, এ দোকান তোমার কত দিনের হল? নিমাই তো ছিল তোমার মামা, তাই না?' বাবাজী দোকানের সামনেকার টুলের উপর বসলেন।

'আজ্ঞে, দোকান দাদামশায়ের আমল থেকেই চলে আসছে। আমার বাড়ি তো রাঢ় দেশে। মামা আমাকে এনে কাজ শিখিয়ে দিলেন।'

'তা কাজ শিখেছ ভাল। কাজও তো খুব।'

'আজ্ঞে, খরচাও তেমনি। তিন জন কারিকর পুষতে হয়, দৈনিক তিন টাকা মজুরি। চামড়ার বাজারও বড় তেজ। টাউন জায়গায় বাস করা বড় কঠিন ব্যাপার। নবদ্বীপধাম আগে ভাল ছিল গোঁসাই, এখন ভারি চোরের জায়গা হয়েছে।'

'আগেই তো বেশি ছিল গো। সেই কারণেই তো মহাপ্রভু এই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। হে গো, খোলে লাগবে কত?'

'যেমন বাজার দর তেমনি নেব। এই দেখুন সব নতুন সাজ দিয়েছি, নতুন কোলাট দেয়েছি, মাটিটাও বদলে দিয়েছি। আপনার কাছে কি নোব, আটাশটি টাকা দেন!'

বাবাজী আঁক করে উঠলেন: 'এত! তোমরা হরিনাম করা বন্ধ করবে দেখছি। আমরা কি ব্যবসা করি, না, চাকরি করি? প্রাণগৌর নিত্যানন্দ—'

সতীশ জোড়হাত করল। বললে, 'কি করব, প্রভু, উপায় নাই। মাল মশলার দর কত! কারিকরের মজুরি কত? তার পর বাড়িতে এক পাল পুষ্যি, নতুন আবার একটা শালী এয়েছে—সব দিক চালাতে হবে তো? আচ্ছা আপনি এক টাকা কম দেন—'

বাবাজী দশ টাকার দুই কিতা নোট দিলেন।

'বাকীটা?'

কুড়ি টাকাতেই চূড়ান্ত করে দেবেন ঠিক করেছিলেন বাবাজী। হঠাৎ বলে ফেললেন, 'বাকী টাকা দু'দিন বাদে ঐ মেয়েটাকে পাঠিয়ে নিয়ে যাস।'

খোল বাজাতে-বাজাতে চলে গেলেন বাবাজী। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

'ও হে, ঐ যে পোয়ানা তালার দক্ষিণ দিকে লাল বাড়ী—চেন?' দিন পাঁচ-সাত পরে এক দিন তুফানিকে জিগগেস করলে সতীশ।

'না চিনি তো, চিনে লোব।'

'সেই লাল বাড়িটার পেছনে আখড়া। ভাদু গোঁসাইয়ের আখড়া। ঐখানে একবার গিয়ে খোলের তাগাদা'টা করে এস ভাই। দেখছ তো, আমার যাবার সময় নাই। কারিকররা কাজে ব্যস্ত।'

তুফানি বললে, 'সে আর কি বেশি কথা? ন্যায্য পাওনা আদায় করা! বকতে-মারতে তো পারবে না।'

আখড়াতে কোনো লোক নেই, শুধু বাবাজী বসে-বসে বিড়ি ফুঁকছেন।

'এসো গো এসো, বোসো।' যেন কত কালের চেনা বাবাজী এমনি ভাবে ডাক দিলেন: 'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। ভালো আছ সকলে?'

তুফানি মাটির দিকে চোখ রেখে মৃদু স্বরে বললে, 'আমাদের সেই পাওনা সাতটা টাকা—'

'হবে গো হবে, তুমি বোসো। আমরা চোর নই, তোমার টাকা আমরা মারব না। সব গঙ্গার ঘাটে গিয়েছে, আসুক। তুমি একটু জিরোও, ঠাণ্ডা হও। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। তোমার পাওনা-গণ্ডা সব তুমি বুঝে পাবে—'

দাওয়ার এক কোণে জবথুব হয়ে বসল তুফানি।

'হেঁ গো, দেশে তোমার কে আছে?'

'কে আবার থাকবে। সবাই আছে। মা বাবা ভাই—যেমন থাকে।'

প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। সোয়ামী কই?

'সেই আটগণ্ডবণ্ডেকে কোথায় তা কে জানে?'

'আহা! বিয়ে ছাড়াছিড়া হয়ে গিয়েছে?'

'তা নইলে পড়ে-পড়ে শুধু মার খাব না কি? আমার জ্ঞানগম্যির নাই বলে কি শুকিয়ে-শুকিয়ে শ্যাস হয়ে যাব?

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। এই আখড়ায় কাজ করো না।'

তুফানি আকাটের মত তাকিয়ে রইল।

'খেতে-পরতে দেব। মাইনেও কিছু পাবে। কাজ তোমার বেশি নাই। দু'টি গরুর সেবা আর ঘর-বাড়ি ঝাঁট দেওয়া। আর, বাসন-কড়া ধোওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়। তা ছাড়া, আমাদের রান্না সব দিন হয়ও না—'

যেমনি তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে রইল তুফানি।

'হেঁ, শোনো, আরেক কথা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। যদি তোমার মত হয় তোমাকে শুদ্ধ করে নেব। শিষ্য করে নেব মন্ত্র দিয়ে। তখন ঘাট থেকে গঙ্গার জল আনতে পারবে। আর, গঙ্গার জল একবার আনতে পারলেই সব চলে গেল। মোট কথা, তোমার ইহকাল-পরকাল দু'কালই ভাল হল, খোলসা হল—'

এক দাওয়ায় বসা তা হলে ঠিক হয়নি এখনো। তুফানি ঝট করে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তা আমার দিদিকে-বুনুইকে শোধাবো। তারা যা বলবে তাই হবে। আপনি একবার দোকানে গিয়ে বলেন ক্যানে—'

মেয়েটার তা হলে অমত নেই। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। নামের এমনি আকর্ষণ।

'বাকি টাকাটা—' তুফানি পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল।

গঙ্গার ঘাট থেকে মা-গোঁসাই এল স্নান করে।

'ওগো, ওকে দু'টো টাকা দাও। সেই খোলের বাবদ। থুড়ি—শ্রীখোল। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।' বাবাজী হাই তুললেন।

মেয়েটার দিকে তাকাল একবার মা-গোসাঁই। ছিরি-ছাঁদ নেই, কিন্তু কেমন একটা টাটকা গেঁয়োলি ভাব আছে। তরতাজা আনাজের মতন।

ভিতর থেকে দু'টো টাকা এনে দিল মা-গোসাঁই।

'আর?' তুফানি তর্জন করে উঠল।

'কিছু হাতে রেখে দিলাম। নইলে আবার আরেক দিন আসবে কি করে তাগাদায়?' বলে মা-গোঁসাই বাবাজীর দিকে তীব্র কটাক্ষ করলে।

বাড়ি এসে তুফানি বলল সব দিদিকে।

শুনে সতীশ বললে, বেশ তো, বোষ্টমি হবি। নিন্দে কি! দেশে তো ধান ভাঙা আর গোবর কুড়ানো। পরের ভাতে পেট নষ্ট। এ বেশ থাকবি। কোঁটা-তিলক কাটবি, দোরে-দোরে ডাক-হাঁক দিয়ে বেড়াবি। এক দুয়ার বন্ধ তো হাজার দুয়ার খোলা। নিজের জোরে দাঁড়াবি, পর-ভরসা করতে হবে না। কুয়ো আসে আমের ক্ষয়, তাল-তেঁতুলের কিছুই নয়।'

'দিদি, তুই কি বলিস?'

'তরে যাবি লো তরে যাবি। গোঁসাই ধরা কি সোজা কথা?'

৩

'তিন-তিনখানা চিঠি দিলাম একটা খবর নাই। ছুড়ির ভাবনায় রেতে ঘুম হয় না। ওস্তাকার বলতে লবডঙ্কা। সংসার কেমন করে চলে? নিজে মেয়ে হয়ে তিন মাস বাসনের কারবার করলাম। যা দু'পয়সা পেলাম তা সব পেটে ঢুকে গেল। এখন করি কি? তার উপরে ছুড়িটা বেপাত্তা—'

'ওগো, আজ চিঠি এসেছে।' পটু বায়েন বললে ঘরের ভিতর থেকে।

'এ্যাঁ! কই, তা তো তুমি বল না—'

'এই তো এলে দাপাতে-দাপাতে। এসেই তো গলার ত্যাজ ছেড়েছ। বলি কখন?'

'বলো গো বলো। কি লিখেছে? হে বাবা রুদ্রদেব! হে বাবা কালী!'

'সব ভাল আছে। তুফানি ওদের কাছেই আছে, এক আখড়ায় কাজে লেগেছে। সে সেজো-সোমোদ কিছু করবে না, প্রভুর দয়া হলে মন্তর নিয়ে বোষ্টমি হবে।

সন্তোষী কোমর বাঁধল।

'লোকে তো থা পাত্তে দেয় না। বলে বেরিয়ে গিয়েছে, মোছলমানের ঘরে বিবি হয়েছে। জেতে লোব না, পতিত করব, একঘরে করব। দু'সাঁজ ভোজ, পঞ্চাশ টাকা দোব—সহজে ছাড়ব? বাবাঃ, কত কথা সব। এমন ছোটলোক জাত—তা না হলে মুচি ছোটজাত বলবে ক্যানে?

পটুও গলা তুললো।

'আমার বিটি কাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে? ধরে দিক দেখি, কেমন সব মরোদ। বাড়িতে গোঁজের গোড়ায় হামলালে তো হবে না—রীতিমত পেমাণ দিতে হবে। তা না হলে পটু বায়েন মানবে না! আপন বুন-ভগিনপোতের বাড়ি যেতে পাবে না?'

দু'-একটি পড়শি এসে হাজির হল।

'হা গো বকবক করছ ক্যানে? কি, হলো কি?'

'এই দ্যাখো কাকী, আমার তুফনি নবদ্বীপের বিটির কাছে আছে আজি চিঠি এল। তাই বুলছি পাড়ার কথা, যার যা মনে আসে সে তাই বলে—'

'বলুক, লোকে বলে লেক, দিন পেয়েছে বলবে বৈ কি মা! তাতে আর আগ-দুঃখ কি?' দাধু কাকী সোহাগের সুর ছাড়লে।

'এই দ্যাখো কাকী, আমি আগেই কানাঘুষো শুনেছি, নবদ্বীপ আছে, তাইতে চুপ করে আছি। তা না হলে কি চুপ করে থাকতাম! বিধি-বেপার করতাম। জামাই আমার সতীশ বেশ বুদ্ধিমান, বেশ ওস্তাকার করে, বেশ বেবসা। বিটি তো আমার আনী গো। বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে হয়। না উপ যেন ফেটে পড়ছে। বুনকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। সেজা-টেজা দেবে না, মানুষ করে দেবে। আজ চিঠি এল। তাই বুলছি, দ্যাখো তো: এই মাসটা যাক আমি একবার ধাঁ করে যাব—'

'তা যাবি বৈ কি, পেরাণ কাঁদে বৈ কি।' দু'-একটা সোহাগের

কথা পটুকেও বলা দরকার, তাই দাখু কাকী ওদিকে মুখ ফেরাল: 'আজ-কাল কেমন আছ পটু?'

'আগের চেয়ে একটু ভাল। এ তো জুয়োড়ি ওগ, তখুনি কমে তখুনি বাড়ে। মরব না কাকী, কপালে কত কষ্ট আছে—'

'ষাট, মরবি ক্যানে বাছা। ওগে তোকে বুড়ো করেছে, নইলে তোর বয়েস কি। তা এ ওগে ধুঁকে-ধুঁকেও বেঁচে থাকবি অনেক দিন—'

'শোনো কাকী।' সন্তোষী পিছু ডাকল। বললে, 'ছুঁড়িকে সেদিন আগের মাথায় মেরেছিলাম। তা বলো ক্যানে, মায়ে কি ছেলেকে মারে না? তাই রাগ করে অভিমান করে চলে গেলি? সব দোষ আমারি। পেটে ধরেছি। তখন জায়গা দিতে খেতে দিতে হোত রে। তা আর পারি'নে কাকী, দেখছ তো অবোস্থা। তা গেছিস তো না বলে গেলি ক্যানে? বলে গেলে আমার এত দুঃখু হত না।' সন্তোষী কাপড়ে চোখ মুছল।

দাখু কাকী পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিল। বললে, 'কাঁদিস নে লো। সে বেশ করেছে, বেশ আছে। কথায় বলে, যাকে ভাতারে করে হেলা, তাকে রাখালে মারে ঢেলা! স্বামী যখন নিলে না, তখন কি করবে? ও তো আর যাব না-খাব না বলেনি—ওর দোষ কি। বাপের সংসারে কুলোয় না, তাই খাটতে-পিটতে গেছে। বেশ করেছে। বেশ সময়ে বেশ কাজ। কুলে কালি দিয়ে তো যায়নি—'

'এমন মেয়ে ও নয় কাকী। ওর জ্ঞানগম্যি কম। ওকে কেউ না ফুসলে নিলে ওর থেকে কিছু হবার জো নাই। তাই যখন ও চলে গেল তখন মনে ঠিক আন্দাজ করলাম ও বুনের বাড়ীই গেছে। বুনে-বুনে বেজায় টান। তাই কেবল চিঠি ঠুকছি সেখানে। শ্যামা ছুঁড়ি সেই নবদ্বীপ যেতল না? ঘরে এসে বললে, তোর তুকনিকে দেখে এলাম মাসি। মুখের কথায় কান দিচ্ছি না, চিঠি চাই। সেই চিঠি আজ এল—লোকের যত কূট কাটা—'

'ও মেয়ে তোর সুখে থাকবে। দু'টি খেতে-মাখতে পাবে। গা-গতরে-পায় একটু ছিরি হবে। আবার দু'টাকা হাতে হবে। দুগ্ধ্য'র জানা ছিল, শাড়ি-জামা হবে। যা কাঁদিস নে, ভাল জায়গায় পড়েছে, ওর নিকালাও ভাল হবে।'

'তোমরাই পাঁচ জনা আছ—' সন্তোষী আবার চোখ মুছল।

৪

'তু' দিয়ে অক্ষর নিয়ে নাম রাখতে হবে। তুফানি শব্দের আদিতে তু।

তুই বালা, তুষানল, উঁহু, বড্ড স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তুফভদ্রা, তুবকন্যা —বড্ড কঠিন-কঠিন ঠেকে। তুভিয়াকালী, তুলোমালি, তুকুমণি—বড্ড গেঁয়ো-গেঁয়ো শোনায়। একটু সভ্য-মত নাম দরকার। তু—তু—তুলসী! 'আজ্ঞা হাঁ, যার গোড়ায় তিন বেলা মাথা ঠুকি, তার নামটাই মনে পড়ছিল না? নিতাইচাঁদের খেলা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ'।

মা নিজে দেব না। অন্য মাবফৎ কবিয়ে নেব। না, নিজেই দিতে হবে। তা হলেই একটা বাঁধন থাকবে। সহজে ছিঁড়তে পারবে না।

'কি গো তুফানের নদী, দিদি সে-কথার কি বললে? রাজি?'

এক ভুর আঁচল মুখের মধ্যে পুরে তুফানি বললে, 'রাজি।' আধেক-বোঝা আধেক-না-বোঝা কি রকম ভয়-ভয়-মেশানো ছুট-ছুট্ হাসি।

'তা বেশ, তা বেশ, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। দিদি-ভাগ্নীপোত ঠিকই বুঝেছে—বুঝলি, মানুষ হয়ে যাবি, খেরো হয়ে থাকবি না কারু কাছে। অষ্টধাতুর বিগ্রহ আছে আখড়ায়, ফুল তুলবি বেলপাতা তুলবি সেবা-পুজা করবি তুলসীতলায় মাড়্‌লি দিবি—নামটও হবে তুলসী, তুলসীমঞ্জরী। বেশ হবে। তখন কে আর বলবে তোকে মুচির মেয়ে? প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। আয়, ভেতরে আয়। পাঁজি-পুঁথি দেখে দিনক্ষণ এবার ঠিক করে ফেলি—'

তুফানিকে মা-গোঁসাইর জিম্মায় গছিয়ে দিল। একটু ধোয়া-মাজা সাফসুতরো করে দাও। ইদুতে মেয়েটার ভোল ফেরাও।

'কি লো ছুঁড়ি, বোষ্টুমি হবি?' মা-গোঁসাই তুফানিকে নিয়ে পড়ল একান্তে।

কি বোঝে-না-বোঝে কে জানে তুফানি বুকের কাছে চিবুক নামিয়ে হাসে।

'তোর দিদি কি আর তোর মরণের জায়গা পেল না? কেন, পাঠাতে পারলে না কলকাতা?'

সে কোন ইল্লি-দিল্লি তুফানি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'এ পথে এসে তোর কী ভাল হবে? ভাতও খোরাবি পেটও ভরবে না। কাঁধে করে হরনামের ঝুলি বয়ে বেড়াবি সারা জীবন। অথচ এদিকে অষ্টরম্ভা। ভেক মেলে তো ভিখ মিলবে না। হাঁড়িতে কালি পড়েনি এমন বয়স তুই মাটি করবি কেন? কেন আখের খোয়াবি? তোর দিদিটা কি চোখে দেখতে পায় না?'

'আমি কিছুই জানি না—'

'জান নাই জানবা, ছেঁড়া কানি গায়ে দিয়ে পথে পথে কাঁদবা।' চার দিকে চেয়ে গলা নামাল মা-গোঁসাই। 'আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি। থাকতে সোনার মান হয় না, হারালে সোনার মান। আমি নিজে এখন বুঝছি। লোকই যখন ধরবি, বাবাজী ধরবি কোন দুঃখে? বাবুজী ধরবি। আমার সঙ্গে যাস গঙ্গার ঘাটে, ঠিক লোক ধরিয়ে দেব। হিল্লে হয়ে যাবে। বসতে জানলে আর উঠতে চাইবি না।'

'দিদিকে গিয়ে বুলব।'

'এ কি তোর মানতের ঢাক বাজানো? যখন বাড়ি থেকে পালা বেরিয়ে এসেছিলি দিদির কাছে শোধাতে গিয়েছিলি? দিদির তো এই বিবেচনা। মাথা মুড়িয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছে। শোন, এইখানে থাকলে, তোর ধানও যাবে ধুকুড়িও যাবে। তার চেয়ে—আসিস বিকেলে গঙ্গার ঘাটে। বোষ্টুমি হবার দিন কি তোর ফুরিয়ে গিয়েছে?'

অনেক পরে তুফানি বললে, 'আমার ভয় করছে।'

মা-গোঁসাই বললে তার চিবুক ধরে: 'ওলো, বাড়ব-বাড়ব বড় ভয়। বাড়লে পরে সকলি সয়।'

৫

গাঁয়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পুজোর তুমুল ধুমধাম। কিন্তু এবার সবাই বড় ম্রিয়মাণ।

এইবারে আয়-আদায় বড় কম। পণ্ডিত-রহিত করবার কেউ নেই, ভোজ-জরিমানারও লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জাতনাশা কোনো ব্যাপার ঘটেনি। কারু সঙ্গে কারুর ঘটনা হয়নি একটাও। বড় মন্দার বাজার।

গাঁয়ের মাথা যামিনী ভট্‌চাজ, করালী মুখুজ্জে, হরিনাথ বাঁড়ুয্যে আর কমলকৃষ্ণ গোঁসাই মন্দিরে এসেছেন। গোল হয়ে বসেছেন পরামর্শে। গাঁয়ের আরো বহু লোক উপস্থিত। কিন্তু সবাই কেমন মনমরা। টাকা-পয়সা যা আছে তা দিয়ে পূজো কোনো মতে হবে, কিন্তু কবি-যাত্রা কিছুই হবে না। আসল আমোদই মাটি।

রামহরি মণ্ডল এগিয়ে এল। বললে, 'সবাই তো দেখি এলিয়ে পড়েছেন, কিন্তু গোটা কতক টাকা আপনা হতেই হাতে আসতে চাইছে যে—'

বামুনের দল হকচকিয়ে উঠল। তার মানে?

'তার মানে কেউ হাত পেতে নিচ্ছে না। যাচা ভাত আর কাচা কাপড় ফেলতে নাই। ধর্মরাজের যাত্রা যদি শুনতে চান, তা হলে একটু মাথা নাড়া দিলেই হয়।'

কি রকম? কি রকম?

'আজ্ঞে, বায়েন পাড়ায় যে বেজায় ধুমধাম।'

কি রকম? কি রকম?

'আরে মাশায়, পটু বায়েনের কন্যা কলকাতা হনে আলছে। তার কি গয়না গো! তার চহট দেখলে তাক লেগে যাবে। সঙ্গে আবার এক ল্যাংবোটও এসেছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খুব খানিকক্ষণ দেখলাম। খুব ফুর্তি! যদি যাত্রা শোনবার ইচ্ছা হয়, তবে, বলতে হবে না, একাই একরাত্রি।'

তবে ধরো, ধরো পটু বায়েনকে। গাঁয়ের মধ্যে এ কি কেলেঙ্কার!

গাঁয়ের ছোকরারা এতক্ষণে তেতে উঠল। চল, চল মুচিপাড়ায়।

পটুর বাড়ী ঘেরাও করে ফেললে সবাই। বিদেশী লোককে হাজির কর্। ধর শালাকে, বাঁধ শালাকে। ছুঁড়িকে টেনে আন। গাঁয়ের বার করে দে। সহজে ছাড়ন-ছোড়ন নাই।

রৈ-রৈ ব্যাপার।

মুচিপাড়ার যত মুচি-মুচিনী পটু আর সন্তোষীর সৌভাগ্যে পুড়ে যাচ্ছিল হিংসেয়। এবার তারাও গাঁয়ের পক্ষ হল। সত্যিই তো, বিদেশী লোকই তো, চোর-ছেঁচড় না গুণ্ডা-ডাকাত তার ঠিক কি। সত্যিই তো, গাঁয়ে-ঘরে চলেনি এমন ঢলাঢলি। এ বাবুলোকের গাঁ। দশটা ভদ্দরলোকের বাস। রস-বিলাসের লহর জুটানো চলবে না। পারবে না সারা গাঁ মজিয়ে যেতে। হ্যাঁ বাবু—আমরা তোমাদের পক্ষ।

গলায় কাপড় দিয়ে পটু বায়েন বেরিয়ে এল। বললে, 'থামুন, থামুন মাশায়। আমার উপর এত খাপ্পা ক্যানে! আমি গরিব, এই গাঁয়ে বহু দিন থেকে আছি। আমার অপরাধ কি হল?'

'ওহে অপরাট-টপরাধ বুঝি না। তোমার নতুন জামাই-বিটিকে হাজির কর ছাড়ব না, এক ধার থেকে পেটন জুড়ব। মুচি মেরে আসর জাগাব। বিদেশী লোককে ঘরে ভরো—কই সে শালা? মার সে শালাকে—শালো আমোদ মারতে এসেছে দাসপুরে! মনে ভেবেছ, গাঁয়ে লোক নাই, চ্যাংরা নেই? বের করো সে শালাকে।'

'ওরে ছুঁড়িকে ধর। কান ধরলেই মাথা আপনি আসবে!'

কোঠার উপরে তুফানি আর তার সেই লোকটা ভান হয়ে বসে আছে দরজা এঁটে। লোকটি বললে, 'কি বিপদ হলো দিখো দিখি! তোমার মুলুকে হে রকম বেপার আছে আমায় তো আও বোলে নাই? হামি ভি লড়াই জানে। দিখিয়ে দিতে পারে কুস্তি—'

'ওগো তুমি যেয়ো না, তুমি থামো। কোনো ভয় নাই। কিছু টাকা নেবে আর কি! দেখি, আমিই যাই।'

তুফানি আস্তে-আস্তে নেমে জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

সবাই একেবারে হতভোম্ব! সেই মুচির মেয়ে তুফানিই কি এই? আচোট মাটি কেটে কুপিয়ে একেবারে সোনা-ফলন্ত হয়ে উঠেছে যে। চোখের পলক যে আর পড়তে চায় না।

পরনে হাবড়ার ডুরে, নীল রং তার উপরে শাদার বড় বড় খর দেওয়া। গায়ে আঁটা হাতা-কাটা ব্লাউজ। গলায় বিছে হার, ওপর হাতে আমলেট, নিচে হাতে ঝুরো চুড়ি। কানে মোটা ট্যাপ ফুল, নাকে আপেল। চুলটা বিনুনিকরে ঝুলানো, ডগায় জরির একটা ঝাপটা। ঠোঁট দু'টি পানের ছোবে লাল, মুখখানা নেশায় টুসটুসে।

নাটুকে ভঙ্গিতে কোমর হেলিয়ে তুফানি জিগগেস করলে, 'আমার অপরাধ?'

কোনো মুখেই চট করে কোনো কথা আসে না। এত যেখানে রূপের চমক, সবাইর কেমন ধাঁধা লাগে। শুধু একটা রগ-চটা ছোকরা তেরিয়া হয়ে বললে, 'বিদেশী লোকে গাঁয়ে চ্যাংরামি করতে আসবে?'

টাস-টাস করে বলতে লাগল তুফানি। 'বিদেশী লোকে খেতে দেয় পরতে দেয়, আপদে-বিপদে দেখে, বিদেশী লোকে চ্যাংরামি করবে না তো দিশী লোকে করবে না কি? চ্যাংরা কি? আমাদের সেঙা আছে, সেঙা করেছি। পুষুকিয়ে—সেঙা, তা পাব না? গাঁয়ের ভেতর তো গোলমাল করতে যাইনি। কারু তো শান্তিভঙ্গ করিনি!'

'এই দেখ, বেশি তিড়িং-বিড়িং কোরো না। তোমাকে ধর্মরাজ তলা যেতে হবে। না যাবে তো মুচির বংশ থাকবে না। ওরে, আরো জন কতককে ডাক, নইলে সুবিধে হবে না। গামছা কই? গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে চল—'

'ওগো আপনারা ভদ্দর লোকের ছেলে, আপনারা মুচিপাড়ায় আলছেন কেনে?'

ভয়-খেকো চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সন্তোষী। 'ডাক দিলেই তো আমরা সবাই গাঁয়ের ভেতর যেতাম, বিচেরে যে দণ্ড হত তাই দিতাম। বেশ, যখন যেতে বলছেন তখন যাব —এতে আবার হুমুমুমু কি? যখন ধর্ম্মরাজের ডাক, যেতেই হবে। চলুন, আপনাদের পেছু-পেছু যেছি। ওরে, ঘরে কুলুপ দে—'

সবাই চলল মিছিল করে। মুচিপাড়ার যত জোয়ান-বুড়ো ছিল সবাই। ভদ্দরলোকের কি বিচার হয় সেই মতো তাদের রীতকরণ।

'এক গপ্‌পা তামাক দাও হে, চৌকিদার।' বাবুরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কান্নিখেকো ঘুড়ির মতো বসে-বসে ঝোঁকবার সময় নেই।

গলায় কাপড় দিয়ে জোড়হাতে দাঁড়াল সন্তোষী। বললে, 'আমাকে ডাক কেন মাশায়? আমার কোনো অপরাধ নাই।'

'নাই?' একমুখ ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ভট্‌চাজ গর্জে উঠলেন।

দাওয়ার এক কোণে জবথুব হয়ে
বসল তুফানি।

'কি তসকির হুজুর?'

'কিছু জানিসনি? ন্যাকা সাজছিস? ছোটলোকের এত আস্পাদ্দা? নগদ একশো টাকা এই ধর্মরাজের দুয়োরে দিয়ে উঠো। ফের যদি গিঁটকিরি করবি ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। কি মুখুজ্জে, কথা বলছ না যে—'

মুখুজ্জে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললে, 'হ্যাঁ, যখন ধম্মরাজ মাথা নাড়া দিয়েছেন তখন যা হয় ধম্মরাজই করবেন।'

সন্তোষী ভয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল। বললে, 'আমরা যখন কোনো কথা বলতেই পাব না তখন আমাদের গলায় পা দিয়ে চিপে মারুন কেনে। পাড়ার লোককে শোধান, কি হালে আমাদের

দিন যায়। জমি নাই জিরেত নাই, বিত্তি বুনে শুয়োর ভাগে নিয়ে দিন চলে। বিটির কথা বলবেন? বিটি সাত বছর বাদে এই দেশে আসছে। এত দিনে এই একটু মন পাতিয়ে বসেছে—'

'কে ঐ লোকটা?' হুংকার ছাড়ল ভটচাজ।

'মাস্তের নোক, মাশায়। পশ্চিম মুলুকে ঘর। কলকাতায় ভূষিমালের কারবার।'

সভায় একটা চাপা রাগের রোল উঠল।

'তাকে আমার বিটি সেভা করেছে। এই তো মাশায় দোষ। দোষ হয় বিটি আর গাঁয়ে আসবে না, আমরাও না হয় উঠে যাব। কি করব! আপনাদের সঙ্গে কি আমরা যুঝতে পারি?'

পটু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে এক ধারে। তার বলবার-কইবার কিছু নেই। দেবতা-গোঁসাইরা বিচার করে দেবে তাই সে ঘাড় কাৎ করে মেনে নেবে।

যত মুচি ভয়ত্রাসে চোখে হাঁ করে চেয়ে আছে, কি বিচার হয়! কতক্ষণে মজলিশে তেহাই পড়ে।

তুক্কানির দিকে সবাইর হঠাৎ চোখ পড়ল। সে এগিয়ে আসছে
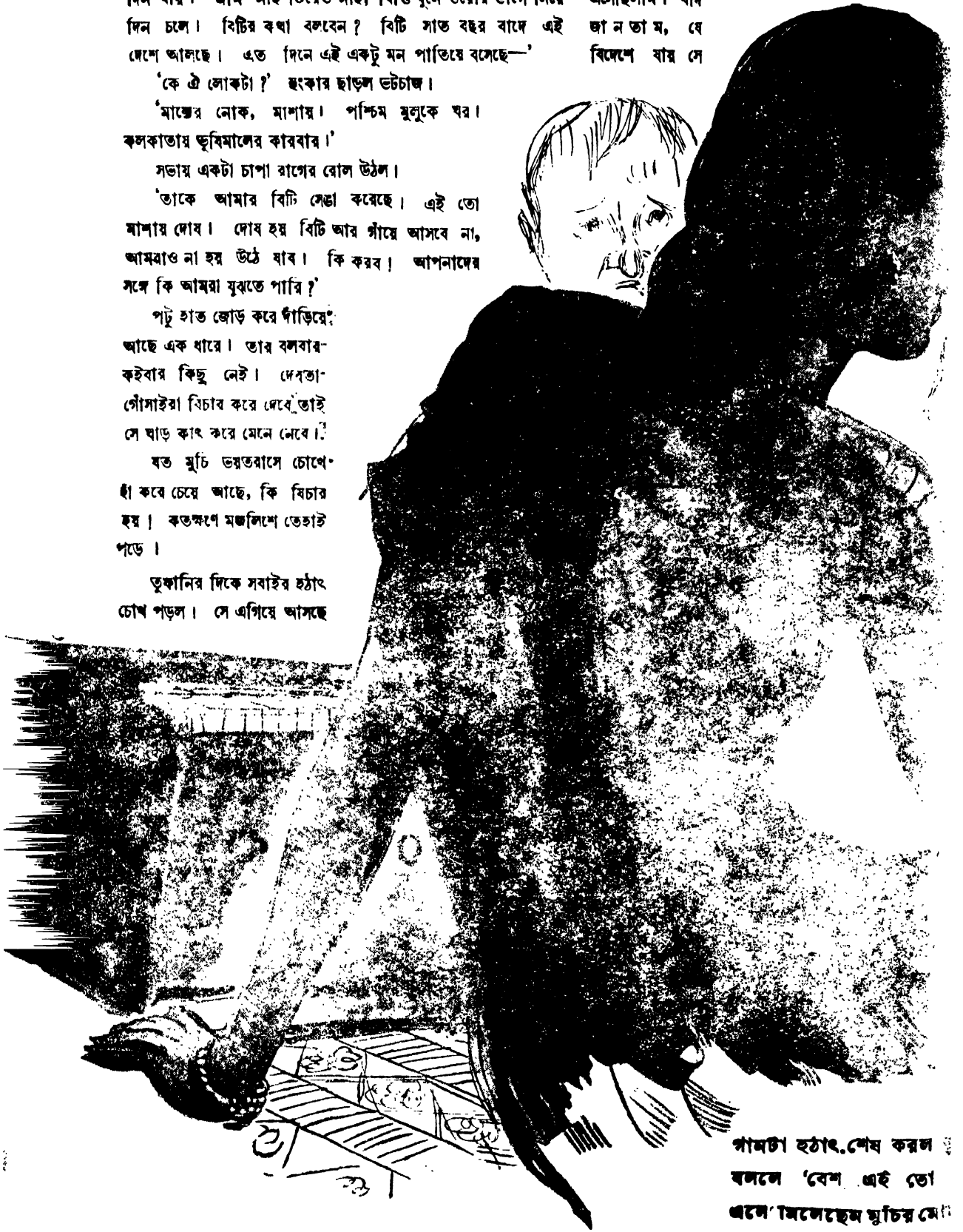
গামছা হঠাৎ শেষ করল বললে 'বেশ এই তো এলে' মিলেছেম মুচির মে

মজলিশের দিকে। গলার স্বর নরম করে তাতে মিঠানি ঢেলে সে বললে, 'মহাশয়, আমার অপরাধ হয়েছে। আমার জন্মভূমি এই গ্রামমা-বাপ-ভাইদের অনেক দিন দেখি নাই—তাই একবার এসেছিলাম। যদি জানতাম, যে বিদেশে যায় সে আর জন্মভূমিতে আসতে পারে না তা হলে আমি আসতুম না। দেশভক্তির, মাতৃপিতৃভক্তির অপরাধের দরুণ আমার কি দেন, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমার একটা কথা:

...চোখ বুলিয়ে নিল : 'আমার মা-বাপ যখন খেতে পায় না, ...ভোগে, তখন কে দেন, কে দেখেন ? থাকবার সামান্য কুঁড়ে ...জল পড়ে, ভিজে সবাই একশা হয়ে যায়, তখন কোন ... এগিয়ে আসেন ? তবু, যদি হুকুম করেন, এই দণ্ডে আমরা ...ক চলে যাব। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মা-বাপের দুঃখ-দুর্দশা দিচ্ছি, পরে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেব যদি সুযোগ পাই। কার কাছে দেব বলুন ? তবে এর জন্যে একখানা রসিদ দিলে ভাল হয়। কারণ যদি গাপ হয়ে যায় গহনা।'

যেন যাত্রা হচ্ছে ধর্মরাজের থানে ! যাত্রা নয়, বাঁধানো ষ্টেজে সিন-ফেলা থিয়েটার ! যেন কোন অভিনেত্রী অভিনয় দেখাচ্ছে !

এতগুলো লোককে চুপ করিয়ে রেখেছে তুফানি। বা রে তুফানি ! বা রে মুচিনি ! বা রে সেই প্যানাদের দুয়োরের ঘুম !

ভদ্রলোকদের মধ্যে কানাকানি সুরু হল। গয়নার রসিদ কি বলে রে বাবা ! না, না, নগদ টাকা দিতে হবে। কি বলো হে গোসাঁই ? কিছু না নিলে তো চলবে না। মান-সম্মান তো আছে।

নগদ টাকা পাবে কোথা ? কে এক ছোঁড়া ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল : 'আমি জামিন হব। ও গাঁয়ের মেয়ে, দিন দুই ওকে সময় দেয়া হোক।'

'আমি জামিন হব।' কে আরেক জন চেঁচিয়ে উঠল : 'টাকা নিশ্চয় মারা যাবে না।'

এ আবার কোন্ খেলা হে বাঁড়ুয্যে ! যারা ফরিয়াদী তারাই যে আসামীর জামিন হতে চাচ্ছে।

বাঁড়ুয্যে তাম্বি করে উঠলেন : 'ও সব বারফট্টাই চলবে না। জামিন-টামিন নেই, গয়না-গাটিতে আমরা হাত দিই না। নগদ টাকা চাই, করকরে টাকা। একশো না দাও, পঞ্চাশ। কি বলো হে গোঁসাই প্রভু ?'

'হ্যাঁ, পঞ্চাশই সই। আলটপকা যা হাতে আসে।'

'তবে, বেশ।' ভটচাজ্জ ফরমান ঝাড়লেন : 'আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে টাকা এনে দিতে হবে। নইলে ভীষণ কাণ্ড হবে, মুচির পাট লোপাট হয়ে যাবে গ্রাম থেকে।'

রাম-রহিম আর কিছু বললে না তুফানি। মা'র সঙ্গে বাড়ী চলল। মনে থাকে যেন, আধ ঘণ্টা !

পিছনে আবার ভিড় চলেছে।

...করবার চেষ্টা করছি, এই যদি অপরাধ হয় তো আমি ...পরাধী, একশো বার অপরাধী। যদি বিদেশী সন্তানের দেশে ...রে আসা অপরাধ হয়, আমি অপরাধী, হাজার বার অপরাধী। ...এলেই যে জরিমানা লাগবে তা আমার জানা ছিল না, তা ...লে টাকা আনতুম। টাকার বদল আমার গায়ের গহনা একখান

ছোকরাদের মধ্যেই কেউ-কেউ আবার বলছে, এ কি অন্যায় জুলুম ! আমি ঘরে বসে যাই কেন না করি, তাতে পরের কি আসে যায় ? আমি যদি আপন ঘোড়ায় ঘাস কেটে চড়ি তাতে কার কি মাথাব্যথা ? শুধু টাকা আদায়ের ফন্দি ! এ বাবলাবনী বিচার আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা আছি পিছনে। একের বোঝা দশের লাঠি।

'ঠিক, ঠিক।' ল্যাদাড়ে মুচির দল সায় দিয়ে উঠল। বাইরের ব্যাপারে এরা নয়-ছয় কিছু জানে না, এক জায়গার খাল কেটে আরেক জায়গার খাল ভরায়।

সবাই জুড়িয়ে গেল, যখন নতুন সুটকেস খুলে তুফানি পাঁচখানা দশ টাকার নতুন নোট বের করে দিলে। মাকে বললে, 'যাও, শিগ্‌গির দিয়ে এস। আর শুধিয়ে এস, গাঁয়ে থাকতে পাব কি না।'

গরবে গা ধরে না সন্তোষীর। আমার মেয়েকে কি তোমারা হেঁজি-পেঁজি পেয়েছ? এ কি তোমাদের সেই এঁটো-বাঁটা ধোয়া বাসন-কড়া মাজার ঝি? অন্তান্তরে আর নাই হে কত্তারা যে জরমকে ধরম দেখাবে। এই লাও টাকা। মজলিশে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিল সন্তোষী।

সভায় সকলে চমকে উঠল। রফা রেয়াৎ না করলেই ভাল ছিল। মুচিনীর যে আয়ু পয়সা!

জোড়হাত করে সন্তোষী বললে, 'মাশায়, পাঁতি দিন, আমার মেয়ে থাকতে পাবে তো?'

'হ্যাঁ, পাবে। তবে বিদেশী লোক থাকতে পাবে না।'

কে এক ছোকরা টিপ্পনি কাটলে: 'তার মানে, পগাড় ডিঙো ঘাস খেতে পাবে না।'

এতক্ষণে পাড়ার মুচিরা হাঁপ ছাড়ল। বুঝল কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়ায়। তারা এবার বলাবলি শুরু করল: 'বেশ বাপু, ভাল হল। একটা ঝনঝাট মিটে গেল। এখন গিঁরাত মিটাও—তা হলেই নিঃপরোয়া।'

'ছু' সঙ্গে ভোজ আর অঢেল মদ।'

'মিটবে গো মিটবে।' গর্বভরা একমুখ হাসি নিয়ে সন্তোষী বললে, 'কেও ভেবো না। তোমাদের সঙ্গে তো নিত্যিকালের সুহৃদ, তোমাদের কি ঠকাতে পারি?'

'এত খাই অত খাই, তবু গায়ে গতর নাই! আমাদের মুখে একটা কথা বেরোয় না, সান কেড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর তুফনি, আমাদের সেই তুফনি—তাজ্জব গেলাম বাবা—ভদ্দর মজলিশে বেশ কথা শুনিয়ে দিলে। কথার ধোপ কি গো! হা গো, ও কি নেকাপড়া শিখেছে না কি? বাবাঃ, বুকের কলেজা বটে! আমি তো ভয়ে হিল-হিল করে কাঁপছি। বেশ বোলচাল মা, বেশ বোলচাল—লোক সব থো বনে গেল—' পড়শিনিরা কথা ছুটালে।

'ঐ তুফনির মুখে রা সরত না। কেও ডেকে শোদাতো না! এখন আমরা কেও ওর কাছে-ভিতেও দাঁড়াতে পারবো না। ও লোকটি কি লোক হা তুফানির মা?'

সন্তোষীর চোখে-মুখে দেমাক ঠিকরে পড়ল: 'পশ্চিমে ছতিরি। পৈতে আছে গো, গোছা পৈতে। কলকাতায় মস্ত কারবার। লোকটি ভাল, ঠাণ্ডা লোক। হাত খুব দরাজ। কালকে দেখো ক্যানে।'

'দেখব মা, দেখব বৈ কি। যার দৌলতে এমন চারচৌকস কপাল তাকে দেখব না! সে যে দেবতার সামিল গো!'

'মানুষের কখন কি হয় তা তো বুলবার জো নাই। দেখতে হবে বৈ কি। বলতেই বলে না, মানুষের দশ দশা, কখন হাতি কখন মশা। নইলে আমাদের সেই তুফনি, যার মাথায় উকুনে উড়্‌্‌লি-ঝুড়লি, নাকে বারো মাস পোঁটা, তার আর কোনো চিহ্ন নাই গা—'

'ওলো অমন মেয়ে আমাদের মুচি বগ্‌গে নাই। কি বা মুখের বাণী! মন ঠাণ্ডা করে দিচে। তখন তো বাপু সমাই ঘেন্না করতে, কেউ ভালবাসতে না। সমারি যেন চক্ষের শূল ছিল। এখন সমাই চোখের কাজল করতে চায়!'

'খায় ভালি কি মায় ভালি। সবি ওদেষ্টের লীলে লেখন। দেশের গুণ! বেশ বাপু, এখন দু'দিন এখানে থাকুক। সমারি সঙ্গে আলাপ-মিলাপ করুক। মা-বাপের হিয়ে ঠাণ্ডা হোক।'

'চো চো, রাত হয়েছে। পরের ধনে পোদ্দারগিরি, তাকে বলে লক্ষেশ্বরী। আমাদের কি আর সেই অদেষ্ট আছে, মা? চো চো, আমাদের ধান-খুকুড়ি ভুই যেছে। পরের দিকে চেয়ে হা পিত্যেশ করে আর কি হবে।'

কিন্তু ছোট-বড় মেয়েগুলো তুফানির আশে-পাশে ঘুরঘুর করছে। এটা ধরছে ওটা ধরছে ওটা দেখছে ওটা শুঁকছে—ওদের ড্যাবড্যা চোখ আর ছোট হতে চায় না। ওটা 'সটকেশ' মা, ওটা টিপ-বাতি। টিপলেই কেমন আলো বেরিয়ে আসে ধক করে। আর, দেখেছ, থলের মধ্যে বিছানা! কত সাজগোজের দব্য গো! গালে ঠোঁটে রঙ বঙ। মেয়েমানুষের জুতো দেখেছ, মা? রুমাল?

জিনিস-পত্র সবাই নাড়ে-চাড়ে, তুফানি একটুও বিরক্ত হয় না। বরং সবাইকে দেখিয়ে-শিখিয়ে দেয়। আদর করে কারু মুখে বা একটু পাউডার বুলোয়।

শুধু কি জিনিস! শুধু কি শাড়ি-গয়না? কথার জলুস দেখ। জানো মা, তুফনীদি 'আকা'কে উনুন বলে, ঘসিকে বলে ঘুঁটে। গোঁজাকে বলে জঞ্জাল, এঁটুকে বলে সকড়ি। দেয়াকাটিকে বলে দেশালাই, আর কাঁসাকে বলে পেলেট। আর সব চেয়ে মজার কথা, মা, আমাদের পাঁচুই মদকে বলে মাল!

একটু বড় মতন একটা মেয়ের এক তেলো পাউডারের ও সখ হয়েছে। তার মাকে তা বলতেই সে তার গালে ঠোনা বসিয়ে দিলে: 'ক্যানে লিজে চাইতে পারিস না? চাইতে লারিস তো চুপ করে থাক। বুদ্ধি-দোষে হা-ভাত, বুদ্ধিগুণে খা-ভাত। তেমন বুদ্ধি কি আছে? তেমন বুদ্ধি থাকলে আর রূপদস্তার চুড়ি পরতিস না, অমনি সোনার চুড়ির বাহার দিতিস। তোর বুদ্ধির কথা থো। চুপ মেরে থাক। দুখের কপালে সুখ নাই, ভোজের ঘরে ভাত নাই। বলি, কলকাতার কথুনু নাম শুনেছিস? কান্দি হয়ে খাগড়াঘাট হয়ে যে রেলে করে? কোকিলপাতা নয় লো, কলকাতা!'

কলকাতার কি মাহাত্ম্য! ধর্মরাজের থানে মাতব্বরেরা বলাবলি করতে লাগল। ছুঁড়ি কিছু অর্থসঞ্চয় করেছে! বোলচাল শিখেছে খুব, খুব চটক-ভড়ক। একেই বলে পুলি-পিঠের লেজ বেরনো! শোনো গোঁসাই-প্রভু, এবার নিষঘাত যাত্রা—শেয়ালকে কাঁকুরে ভুঁই দেখিয়েছে—

'যাত্রা হবে, না, চপ হবে? ছুঁড়ি, একটু চপ শিখেছে শুনছি—'

'ভালো কথা। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। আর শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে। চপ না হয় আবার আরেক বার হবে। গাঁয়ে যখন থাকতে দিয়েছি তখন যাবে কোথা?'

'চল হে এবার চল। রাত ঢের হয়েছে। ওহে চৌকিদার, খুনের বিছানাটা তোলো হে—'

৬

'ডিম আছে গো ?'

'হাসে আর ডিম দেয় না।' সন্তোষী বেরিয়ে এলো। এসেই লজ্জায় জিভ কাটলে। ভুল বুঝেছিল সন্তোষী। তুফানির খবর স্বরাষ্ট্র হয়ে যাবার পর থেকে এ পথে লোকের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। সন্তোষী ভেবেছে এ বুঝি তেমন ধারারই একটা লোক। কিন্তু, না, এ যে ধলু বাবু। গোঁসাই-প্রভুর ছেলে।

'আমরা তা হলে গাঁয়ে থাকতে পাবো না ?'

'তোমরা সব ভারি মজার লোক। জরিমানা দিলে, তবু থাকতে পাবে না ?'

'কি জানি কি বাপু—একে ছোট জাত—তায় পেটের ধান্দায়—'

'তোমরা খুব ভীতু। জরিমানাই বা দিতে গেলে কেন ? আমি তখন জামিন হতে চাইলাম, তোমরা কেউ তা কানেই শুনলে না। টাকাটা আগে থাকতে সব দিতে আছে ? কিছু দিয়ে কিছু বাকি রাখতে হতো। যাক গে, যা হয়ে গেছে। শোনো, সে বিদেশীটা চলে গেছে, না ? বেশ, একটু আগুন দাও দেখি, বিড়ি ধরাই।' বিড়িতে ফস-ফস করে দু'টান দিয়ে বললে, 'শোনো, যার জন্যে এসেছি—একটু গান-টান চলে তো ? বেশ —তুফানিকে আমাদের বাড়ি. পাঠিয়ে দিও বিকেল বেলা। বাড়ির মেয়েছেলের সব সখ একবার দেখবে—'

মুখ দিয়ে রক্ত বেরুলেও উট কাঁটা-গাছ খেতে ভালবাসে। এও সেই উট না কি ?

'ভয়-ভাবনা কিছু নেই, মায়ে-ঝিয়েই যেও ক্যানে একসঙ্গে। গান-টান একটু গেয়ে টাকা ক'টা উশুল করে নেওয়া ভালো হবে না ?'

'না বাবু, ছি,' তুফানি মুখ-চোখ বিমর্ষ করল: 'দেশ-গাঁ আমার আপনার জিনিস, সেখানে আবার টাকা-পয়সার সম্পর্ক কি ? ব্যবসা-বাজারের কথা হবে গিয়ে কলকাতায়—বিদেশে।'

'বেশ, টাকা না নাও, দেশ-গাঁ থেকে খাতির-সম্মানটা নেবে না কেন ?'

ভয়ে-ভয়ে গেল দু'জনে মায়ে-ঝিয়ে। সঙ্গে মা থাকাটা কত বড় আশ্রয়। মায়ের পক্ষে মেয়েও একটা কত বড় ভরসা।

বাড়ির মেয়েরা তো মহা খুশি, হেসে লুটপুটু। সেই গোবর-কুড়ুনি তুফান কলকাতা থেকে কী হয়ে এসেছে। রূপের ঘরে গুণের বাসা বেঁধে বসেছে। দু'খানা চাটাই বিছিয়ে দিল। বোসো ক্যানে, বোসো। চেয়ার থাকলে চেয়ার দিতাম। এবার আর কি, টকি এসেছে কান্দিতে, টকিতে নেমে যা। কি লো, গান কদ্দুর শিখলি ? একখান গা ক্যানে।

কাঁধের কাছে মুখ লুকিয়ে তুফানি বললে, 'হারমোনিয়ম আছে ?'

জোগাড় হল হারমোনিয়ম। যেই আওয়াজ বেরিয়েছে অমনি পাড়ার ছেলে-মেয়ের দল একে একে এসে জুটতে লাগল। তুফানি মাথুর ধরল একখানা:

বিরহ-বিচ্ছেদে সখি জ্বলি দিবানিশি,
পাগলিনী করে গেছে সেই কালো শশী।
(বলে দে গো) (তোরাই আমার মরম-সখী)
(চিন্তামণির চিন্তার পন্থা বলে দে গো)—

সুন্দর কণ্ঠে সুন্দর গান। সবাই তো অবাক।

সদর ঘরে ধুলুর বাবা কমলকৃষ্ণ গোঁসাই তাওয়াদার তামাক খাচ্ছিলেন, গানের আওয়াজ পেতে চমকে ও কিছু পরে চলকে উঠলেন। গোঁসাই কীর্তনাঙ্গের লোক, চন্দনসই খোল বাজাতে জানেন। তাল-মান সব ঠিক হচ্ছে, গোঁসাই মেতে উঠলেন, গানের ঝোঁকে হঠাৎ খোল নিয়ে এসে বাজাতে বসলেন। মরে যাই, মরে যাই!

রূপা-সোনা চাই না, আমি উপাসনা চাই গো—
(বলে দে গো) (সেই কালোসোনার কি বাসনা)
(বলে দে গো)—

জোল জমাট হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

বা রে তুফনি! বা রে মুচিনি! আর তোর কী চাই ? নাম পেয়েছিস, আর তোর কিসের অভাব! এমনি এখানে পড়ে থাকলে কী হতিস ? ঝি হতিস। বাসন মাজতিস। এখন যে তোরই বাসন মাজতে আমাদের সাধ হয়।

গোঁসাই-গিন্নি প্রসাদের নিমন্ত্রণ করে দিলেন। পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন কিছু জল খেয়ে যেতে।

'না মা, আজ থাক। যদি থাকি, তা হলে আরেক দিন নাম শোনাব। দোহার ভিন্ন এ সব গান হয় না—' সবাইকে একে একে প্রণাম করলে তুফানি। শেষকালে শ্রীখোলকে।

সন্ধে লাগতে-না-লাগতেই গোঁসাইর বৈঠকখানায় মাথালদের মজলিশ বসে গেছে।

'ভাই মুখুজ্জে, কি আর বলব! ছুঁড়ি যা গান শিখেছে, তুমি যদি শুনতে তাহলে মোহিত হয়ে যেতে!'

'আমি হই আর না হই, আপনি তো হয়েছেন!' মুখুজ্জে চাপা রাগে ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'মানুষ বুড়োলে তার আর হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। একটা হেটো মুচিনিকে বাড়ি এনে মহা ধুমধাম। ভাবে আবার এত বিভোর হয়েছিলেন যে নিজে খোল না বাজিয়ে থাকতে পারেননি। ওকে নিয়ে এবার একটা দল খুলুন ক্যানে—'

'ওহে ভায়া, হরিনামে দোষ কি ? আহা হা, চার দণ্ড হরিনাম হল, সে তো ভালই হল। এতে নিন্দে-মন্দ কি হে ? লাও, তামাক খাও, হুঁকো ধর।'

'মুচির দলের বায়েনের হুঁকো না খাওয়াই ভালো। বলি, বৌদি কিছু বলেননি ? ধন্য আক্কেল তোমার।'

বাড়ুয্যেও ফোড়ন দিল: 'ওহে এ সব হাসি-হাসি নয়। ও মাগীকে গাঁ থেকে না তাড়ালে গাঁয়ের প্রতুল নাই। ওর যে রকম চালচলন—যে রকম ষ্টাইল—দেখলে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। ওর সেন্টের গন্ধে নিশ্বেস ফেলা যায় না।'

'শালার মুচি, গো-খাদক, অস্পৃশ্য, ওকে আবার বাড়ি ঢুকতে দেয়!' ভটচাজও ওয়াক-থু করে উঠলেন।

'কিন্তু ও যদি গাঁ থেকে না যায় ?' দৃষ্টিটা একটু বাঁকা করলেন গোঁসাই।

কথা শেষ হতে না হতেই বাড়ুয্যে খেপে উঠলেন: 'ওকে পিটে তাড়াতে হবে। গোঁসাই-প্রভু গোঁ-গোঁ সাঁই-সাঁই করলেও

ছাড়ব না। মুচির পাঁজো থাকবে না আর এ তল্লাটে। তা না হলে জাতধর্ম সব যাবে। যে সব গুণধর ছেলে একেক জনের—'

'ধুলু গোঁসাই তো এরি মধ্যে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছেন।' বললেন মুখুজ্জে: 'ওকে বলে দাও, কালই চলে যাক। জরিমানা দিয়ে আর ছাড় চলবে না, একেবারে উড়কুড় তুলে দিতে হবে। দিন-রাত আমাদের বুকে বসে ভাত রাঁধতে দেব না।'

'যত সব বে-আক্কেলে লোক! মান-ইজ্জৎ সব গেল এবার। কথা আছে, যে হয় ঘরের শত্রু সেই যায় বরযাত্রী। আপনি একটা বামুন-পণ্ডিত হয়ে একটা ছোট জাতকে আদর-যত্ন করতে গেলেন। এত মোহিত হলেন যে আরেক দিন আবার নেমন্তন্ন করে দিলেন—'

'ভজুনে লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি ঐ রকমই হয়ে থাকে! কাচা-কোঁচার সীমেনা বলতে পারে না। যত সব—ইয়ে! গোঁসাই, ওয়ার্নিং দিচ্ছি—'

গোঁসাই মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'তোমরা বড় পরশ্রীকাতর। এত খুঁটিনাটিও তোমাদের চোখে পড়ে?'

'আমরা পরশ্রীকাতর?' বাঁড়ুয্যে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: 'বেল পাকলে কাকের কি হে? মুচিনীর খাপরা জ্বললে আমরা ম্যাড়মেড়ে হব কেন হে? তুমি তো আচ্ছা আদমি—'

'বনের অগ্নি দিগ্‌দাহ করে বলেই আমাদের ভয়। বেশ, আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন গে, আমরা এরূপ স্থানে থাকতে রাজি নই।'

'আরে ভাই, সামান্য বিষয় নিয়ে কেন মাথা-গরম?' গোঁসাই-প্রভু মিনতি করলেন: 'পরের ঝগড়া কেন ঘরে আনা? বোসো ভাই বোসো, ঠাণ্ডা হও।'

'তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন স্বীকার করুন—' ভটচায তাঁর নাকের ডগাটি উঁচিয়ে ধরলেন।

'আরে ভায়া, হরিনামে বিপত্তি অনেক। ন্যায়-অন্যায়—যে যেমনি বোঝো।'

'ও সব ভড়ংজে কথায় ভুলছি নে। দোষ আগে স্বীকার করুন।'

ধুলু সব শুনছিল এতক্ষণ। সে এবার উপ করে লাফিয়ে পড়ল। বললে, 'যত দোষ গোঁসাই-বাড়িরই হয়। আর কোনো বাড়িতে হয় না! মুচিনী গোঁসাই-বাড়িতে ভোজ রেঁধেছে, না, পরিবেশন করেছে? মুড়ি ভেজেছে, না, ঠাকুরের ভোগ-রাগ করেছে? একটা তামাসা জুড়ে দিয়েছে সবাই। বাবাকে নিরীহ মানুষ পেয়ে যার যা খুশি তাই বলছে? যখন বলতে লাগব সবাইর কুলের কথা খুলে, কুলীনের কুল বনকুল শিয়ালকুল করে দেব! বেশি চ্যাত্রক পুঁ আমার কাছে করতে হবে না—'

'আহা হা, সেই কথা নয়। ন্যায়-অন্যায় ছাড়ো, কথা হচ্ছে, সবাই বুক্তি আঁটো, ও-মাগীকে কি করে তাড়ানো যায়।' মুখুজ্জে সালিশের সুর ধরলেন: 'যা হবার তা হয়েছে। এখন আর না হয় সেই ব্যবস্থা। কি বলেন গো গোঁসাই, মেয়েটাকে তাড়াবার মধ্যে আছেন তো?'

'আছি বই কি।' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গোঁসাই বললেন, 'সৎকর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হবার ইচ্ছে নেই।'

হাসির গররা পড়ে গেল।

৭

হায়! হায়! চিরদিনটা দুঃখেই গেল। ভাতের কষ্টই আর ছিল না বটে, কিন্তু বেহাদির কষ্ট তো আসান হল না। এই সঙ্গে আমার মরণ হল না ক্যানে? কি করে কি করব আমি? আজ ছ'দিন হল গো। আর তো চারটা দিন! ও ভগমান, এত যন্তন্না আমার কপালে লিখেছিলে!

সন্তোষী শোক করছে।

'ছুটকি, কাঁদিস নে, অমন সবারি হয়।' প্রতিবেশিনী খানার মা বললে, 'বিটিদিকে চিঠি করে দিলি? আসবে তো সব?'

চিঠি সেই দিনই দিয়েছি কাকি। বোধ হয় কেউ আসবে না। তুকনি সেই এসেছিল একবার পাঁচ-ছ' বছর আগে, কত হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ গেল—আর কি সে আসবে?'

'বলিস কি? জন্মদাতা বাপের মরার খবর পেয়েও আসবে না? চিঠিও দেবে না একটা?'

চিঠি-ফিঠি সে দেয় না, কাকি। বলে, সোময় নাই। মাস-কাবরার টাকা পাঠায়। কই, টাকাও তো এল না।' সন্তোষীর শোকের পাথারে আবার ঢেউ জাগল: 'হা কাকি, আমার মরণ হল না ক্যানে? উদুর বাবা ক্যানে মলো? আমার কোনো কাজ করতে না পারলেও আমার দুয়োর আগলে বসে থাকত। কথা না শুনতাম, কাশির বগ্গটাও তো শুনতাম কাকি—'

'এই পাড়ায় তুলসী দাসী কে আছে গো? দরজায় ডাক-পিওন এসে হাঁক দিল। 'ঠিকানা দিয়েছে পটু মুচির বাড়ী। কই, কার নাম তুলসী দাসী?'

'আমার মেয়ের নামই হবে।' সন্তোষী ছুটে এল। কি সমাচার?

'তোমার মেয়ের নাম তো তুকানি। সে নয়, আর কেউ হবে। তুলসী দাসীর নামে একশো টাকার মনি-অর্ডার আছে।'

সন্তোষী এক মুখ হেসে ফেলল। ওগো, ঐ তুকানিই এখন তুলসী। মান-সম্মান কত, কত মকদ্দমা! আর কি তাকে আগের ঐ গাঁ-ঘরের নামে মানায়? তার এখন শহুরে বোলচাল। চটক-চমক কত, কত রাব-দাব। কেনে, দেখনি আমার বিটিকে?

'ওগো, এ পাড়ায় আমার মেয়ে ছাড়া আর কারু সাধ্যি নাই তুকনি থেকে তুলসী হয়। টাকাটা দয়া করে দেন, মাশায়। টাকা ফেরৎ গেলে আমার স্বামীর ছাদ্দ-কিরিয়া কিছুই হবে না।'

পাড়ার দু'-তিন জন পুরুষ হাঁ করে শুনতে লাগল দূরে দাঁড়িয়ে। বিধিও নেই ব্যাপারও নেই—এমনি ভাব।

একটা মেয়েছেলে কে আসছে এদিকে।

'হ্যাঁ গা, তুলসীকে চেন?' পিওন জিগগেস করলে।

'আজ্ঞে মাশায়, না। এ পাড়ায় তুলসী বলে কেউ নাই। অত ভদ্দ-শব্দর নাম মুচিপাড়ায় চলে না।'

'তুমি বাপু ডাকঘরে একবার যেও। টাকা তো আমার সঙ্গে নাই, সেখান থেকেই বিলি হবে।' পিওন চলে গেল।

সন্তোষী পড়ল এবার গুবনির মাকে নিয়ে।

'আচ্ছা নেকি বটিস তো তোরা! তুকনিকে কলকাতায় সুবাই তুলসী বলে না? ডাক-নাম আর ভাল-নাম থাকে না ভদ্দরলোকের?

[৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধ দিনের প্রচার-কলা

"শিল্পপ্রচারণী"

এক দিকে হিটলার আর এক দিকে আমাদের কর্মশক্তি

[লণ্ডন তখন শহর একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হিটলারের বোমারু ...ান প্রহরে প্রহরে হানা দিচ্ছে রাইন নদীর তীরে—রাজপ্রাসাদের ... কেঁপে উঠছে, পার্লামেন্ট হাউস আর সারি সারি আকাশ চাঁচা ...দ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে—লণ্ডনবাসীরা সরীসৃপের মত মাটির ...রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

রাজার জাতের এই ভীতি-কাতর অবস্থায় জীবনর-রক্ষার একমাত্র উপায় ...বে তারা গ্রহণ করল প্রচারকলার আশ্রয়। এক দিকে গোয়েবলসের ... সুদক্ষ প্রচার-বিশারদ আর অন্য দিকে লণ্ডনের অন্ধকার দেওয়ালে, ...র দৈনিক কাগজের পাতায় কয়েকটি ইস্তাহার, নির্দেশ-নামা ও সাবধান-...র বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। দেশে যুদ্ধ বাধলে কি করতে হয় আর কি করতে হয় না তারই সরকারী আর বেসরকারী বিবৃতি ...াপন মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হত। কে জানে শুধু কী এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনের জোরেই ইংরেজের জয় হয়েছিল?]
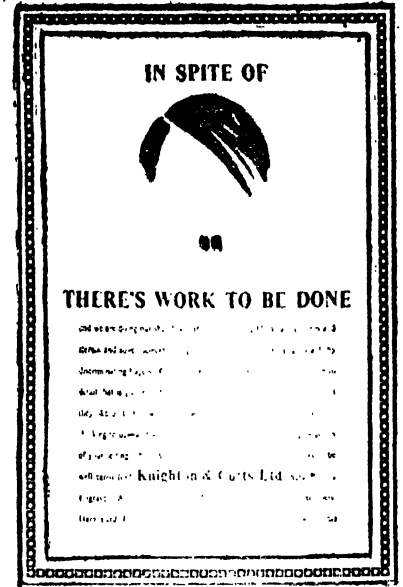
বিজ্ঞাপন ও প্রচার-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনসাধা...র কাছে উপস্থাপিত করার ধারণা ...প্রতিক। আসলে প্রচার কিছু ... আগেও ছিল নিছক ব্যক্তিগত ...র উপর নির্ভরশীল এবং তার ...ত্বও ছিল অভাজনদের হাতে। ...াপনের পয়সা লোকসান বলেই ...া ছিল ব্যবসায়ীদের। তবে ...াপন দেওয়া হত নিজেদের নাম ও মাল জাহির করার জন্যই। সেই কারণেই আগেকার দিনে ...াপনের চেহারাও ছিল তেমনি অমার্জিত। দু'ইঞ্চি বাই ...ঞ্চি এলাকায় ক্ষুদ্রতম টাইপে মহাকাব্যের ভাষায় বেনো ... মিশিয়ে বর্ণনা করা হত মালের গুণাবলী এবং এক কোণে ... একখানি ফটো থাকত মালিকের।

জয়ী হওয়ার যোগ্য—কিন্তু কে?

কিন্তু সে ধারণার বদল হয়েছে গত কিছু দিন। অর্থাৎ গত ...ম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর ধারণা বদল হয়েছে প্রচার সম্বন্ধে। ...চীনদের কামারশালা থেকে প্রচার উঠে এসেছে শিল্পীদের ...গশালায়। সেখানে প্রচারকে শিল্প ও বিজ্ঞানের যৌথ দায়িত্ব ...া হচ্ছে। শিল্পের সুষমা এবং বিজ্ঞানের সুসমতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর এক একটা বিপুল অংশ ছিল ... একটি শক্তির অধীন। দাসত্ব ছিল ব্যাপক ও কুৎসিত। ...র্জাতিক বাণিজ্য বলতে কয়েকটি রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ...ত আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম থাকার জন্যে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীও ... অকুশল।

কিন্তু এ সব হল অসামরিক মাল-সরবরাহের ক্ষেত্রে। তাই

প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে একটি মাত্র প্রচারপত্র চালু হয়েছিল তার নির্দেশও ছিল, একমুখী—'ব্যবসা চালু রাখ।' অর্থাৎ কি না বৃটিশের নৌ-বহর আজো সমুদ্রের রাণী এবং অক্ষত। আমাদের বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্বত্র আমাদের মাল রপ্তানী হতে পারে—দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় রাখতে হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল বন্দর থেকে পয়সা লুঠে আনা চাই। 'রপ্তানী চালু রাখো'—'ঘরে খরচ কর কম, বিদেশে আরো মাল পাঠাও।'

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় অনেক দিনই—ইংলণ্ডে দু'টি মাত্র প্রচার-পত্র জনসাধারণকে টেনে রেখেছিল। প্রথমটিতে ছিল তর্জনী উদ্যত লর্ড কিচেনারের ছবি—'দেশ তোমাকে চায়।' আর দ্বিতীয়টি হল—'ব্যবসা চালু রাখ।' যুদ্ধের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ডে প্রচার-দপ্তর গঠিত হয়। সেই দপ্তরের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন লর্ড বীভারব্রুক। এখানে স্মরণ করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না যে, প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজের জয়ের পিছনে তার প্রচারের

ফসল বাড়াও
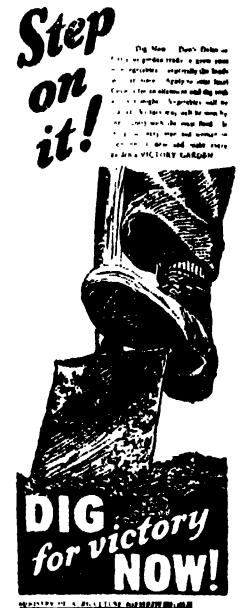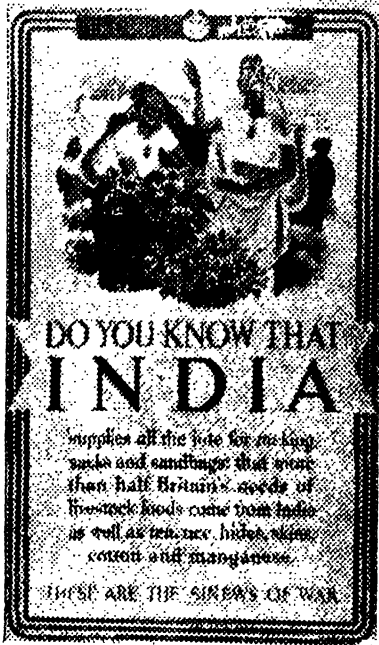
আপনি কি জানেন—ভারতবর্ষের পণ্য রপ্তানি?

শ্রেষ্ঠত্ব অনেকখানি কাজ করেছিল। সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগিতা সে আদায় করেছিল প্রচার ও স্তোক বাক্যের সাহায্যে।

প্রচার-দপ্তরের কাজ বড় মারাত্মক। প্রথমতঃ জন-সাধারণের কাছে যে প্রচার তার মধ্যে হুমকী দেওয়া চলে না। সেই জন্তে প্রচারের ভাষা যত সোজা তত তীক্ষ্ণ এবং তার মধ্যে তত আবেদন থাকা চাই। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা প্রয়োজন দেশের চেতনাকে। আর এই দেশপ্রেম এমন এক আশ্চর্য জিনিষ যে তার পরিবেশে লোকে ন্যায়-অন্যায়কে চিনতে পারে না। এই দেশপ্রেমের ধূয়ো তুলে নিরীহ মানুষকে হত্যা করার উন্মত্ততায় জাগিয়ে তোলা যায়। পৃথিবীতে দাস প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশপ্রেম,—অন্য দেশের নরনারীকে শোষণ করে রক্তহীন করার জন্য দেশপ্রেম,—নিজের দেশে ক'টি মাত্র লোকের হাতে শাসন ও শোষণ ক্ষমতা চিরস্থায়ী রাখার ষড়যন্ত্র দেশপ্রেম। আর তার মধ্যে অর্ধসত্যই প্রধান বলে তার ভঙ্গীতে বলিষ্ঠ নির্লজ্জতা থাকা প্রয়োজন।

ফ্যাসিষ্ট দেশের প্রচারের মধ্যে এই আবেদনটুকুর অভাব খুব প্রচুর। সেখানে জনসাধারণকে হুকুম করা হয় প্রচারের সাহায্যে—তা সে কি নিজের দেশে কি অধিকৃত এলাকায়। সেই জন্তই জার্মাণী এবং জাপান যেখানেই সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে সেখানেই প্রচার-প[...] নির্দেশ বহন করেছে—'পুলিশকে মেনে চলাই জনসাধারণের কর্তব্য' পুলিশ যে জনসেবক সে বোধ না দিলে জনসাধারণের পক্ষে পুলি[...] ও মিলিটারীর কুৎসিত কর্তৃত্ব মেনে চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এ[...] জোরের রাজত্ব চালান চলে না।

শত্রুর বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে প্রচারকে অবশ্য প্র[...] মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই কার্যকরী করা হয়েছিল। লোকমু[...] অর্ধসত্য প্রচারের দ্বারা শত্রু-সৈন্যের এবং শত্রু-রাষ্ট্রের অসামরি[...] জনসাধারণের মনোবলকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা ইতিহাসের ম[...] প্রাচীন। প্রচার-পত্র সাহায্যে এই অভিযান অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতি[...] নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লর্ড কক্‌রেন ফরাসী উপকূলে জা[...] ভিড়িয়ে ঘুড়ির সাহায্যে শত্রুব্যূহের পিছনে প্রচার-পত্র ছ[...] দিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিমান থেকে এই ভাবে প্রচার-পত্র বিলি ক[...] সুরু হয় এবং এর প্রত্যক্ষ ফল সেই সময়ই বিশেষ ভাবে [...] করেছিলেন সেনাপতিরা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিতে যখন ইউরোপের আকাশে প্র[...] ঝটিকা শান্ত, তখন জার্মাণীতে ঘরোয়া প্রচারের একটি মাত্র [...] ছিল—'মাখনের বদলে বারুদ।'

প্রথম মহাযুদ্ধের আত্ম-সমর্পণের প্রতিশোধকল্পে এর [...] উত্তেজক আর কোন বাণী সেদিন চায়নি জার্মাণীর যুবচে[...] রাষ্ট্রের কাছে। এই প্রতিশোধের নেশায় তারা চরম ত্যা[...] জন্তই প্রস্তুত হচ্ছিল গোপনে গোপনে। [...] বৃটিশ রাষ্ট্র-রথীরা তখন ঝড়ের পূর্বাভা[...] স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই [...] যখন লাগল তখন তারা ও 'সব ঠিক হ[...]' বলে প্রচার চালাতে লাগলেন।

ব্যাধি সংক্রমণের বিরুদ্ধে বেভিনের নিষেধ

কিন্তু ভুল ভাঙতে তাদের দেরী হল [...] এবারের যুদ্ধ যে আর রণাঙ্গনেই আ[...] থাকবে না, তা গোড়াতেই বোঝা গিয়ে[...] বরং এবার যুদ্ধক্ষেত্রের তৎপরতার চেয়ে [...] বেসামরিক নর-নারীর ক্ষতিসাধন কর[...] তার ঝোঁক বেশী, এ বোঝা গেল। [...] প্রতিকার হিসেবে নিষ্প্রদীপ সুরু হল স[...]

নিষ্প্রদীপ ব্যাপক হারে প্রচারের [...] অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমতঃ, আকাশে আলোয় যে ভাবে ব্যবসাদাররা প্রচার করতেন তাতে জনসাধারণে[...] উৎসাহ ছিল, কিন্তু এবার তা করা হোল না। দ্বিতীয়তঃ, দোকান [...] প্রভৃতির বাতায়নে স্বল্পতম আলোকের [...] হওয়ায় রাত্রে প্রচারের কাজ প্রা[...] করতেই হল। তার উপর ছিল সাই[...] বোমা-বর্ষণ। আকাশে শত্রু-বিমানের [...] —জলপথে ডুবো-জাহাজের রাহাজা[...] এরাও প্রচারকে ব্যাহত করেছে পদে [...] সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে—সংবাদ-চ[...] ব্যাঘাত ঘটেছে। কিন্তু ধ্বংস যত [...]
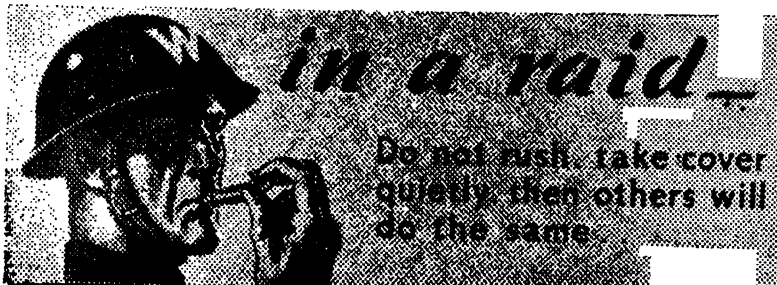
বোমা পড়লে ভিড় করবেন না—যে যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন

...হচ্ছে এবং বাণিজ্য যত ব্যাহত হয়েছে ততই বেশী প্রয়োজন হচ্ছে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রচারের।

যে দেশ যে ভাবে যুদ্ধকে দেখেছে তার প্রচারের ভঙ্গীও যে ...নি হবে তা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের স্বাধীন আত্মার আওয়াজ ...ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে—'এক পাই না—এক ভাই না।' ...রত ছাড়ো।' কিন্তু যে ভারতবর্ষকে ইংরেজরা জোর করে ...নামিয়েছিল—বিশ্বাসঘাতক আর লোভীদের ভারতবর্ষে ইংরেজের ...হায্যের জন্য প্রচার-দপ্তর বিপুল কাজ করেছিল। ইংলণ্ডের ...ত ও নীতি সম্পূর্ণ অনুসৃত হয়েছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু তার ...বেদন জন-সমাজের কাছে সফল হয়নি। তার কারণ বিশ্লেষণ ...নে অবান্তর। এবার অধিকাংশ দেশের আইন সভা যুদ্ধের ...তেই জনসাধারণের ধন, ও জন যৌবনকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করায় ...বারের মত সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এবার ...রেষি হয়নি।

'চালু রাখ'—এই একটি মাত্র নির্দেশ ছিল যুদ্ধের গোড়ার ...ক বেশ কিছু দিন। শুধু যুদ্ধের ছাপ পড়েছিল তাদের বিজ্ঞাপনের ...। সৈনিক, গোলন্দাজ ও এ, আর, পি, মেয়েরা বিজ্ঞাপনের ...য় নানা ভাবে আসা-যাওয়া করত। যে পুরুষ কোট-প্যান্টে একটি মেয়ের মনোজয় করতে পারেনি, সে যে নেভির পোষাকে সহজেই মেয়েটিকে বধূ হিসেবে পেয়েছিল এ প্রচার চলত বিজ্ঞাপনের পাতায়। ... যতই ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল, ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারলেন ... এবার আর সহজে এর নিষ্পত্তি হবে না—তখন এল গভীর ...বর্তন। সামরিক কারণে বহু উচ্চাঙ্গ সামগ্রীর কারখানা যুদ্ধের ...ন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। তা ভিন্ন জনসাধারণ যাতে মিতব্যয়ী ... সে নির্দেশও ছিল সরকারের। সুতরাং এমন ভাবে প্রচারের ... হল, যাতে লোকে সৌখীন ভাল জিনিষের পরিবর্তে সাধারণ ...নিষ নিয়ে কাজ চালাতে পারে। আর অভাবে পড়ে মানুষেরও ...শ্য তখন আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিনা আপত্তিতে কি ...কে তাদের স্বভাব ছাড়তে পারে? সেই আপত্তির গোড়ায় ...আঘাত করার জন্যই প্রচার-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে লাগলেন ...সায়ীরা। প্রচারের ক্ষেত্রে এই সময় থেকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও ...শভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল।

—'যুদ্ধে গেছে শীগ্‌গির ফিরবে'—এই রকম নির্দেশ থাকত কতক... বিজ্ঞাপনে। যে সব মালের বাজারে চাহিদা ছিল প্রচুর অথচ যাদের ...বারে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ঘরে এবং বাইরে সেই সব কোম্পানী ...দের জিনিষের নামকে লোকের স্মরণে রাখবার জন্যে এই পদ্ধতি ...লন।

যুদ্ধ এবং অভাব লোকের চাহিদার ভঙ্গীই বদলে দিয়ে গেল ভাবে। পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করে লোকে নূতন অভ্যাস ধরেছে, অভ্যাসে মিতব্যয়িতার জয়-জয়কার। যুদ্ধান্ত পৃথিবীতে দেশে ...শ ব্যবসায়ীদের এক নূতন বাজারের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কাজের অভাব ছিল আর এক অন্তরায়। অবশ্য এবারের যুদ্ধে ...পক দায়িত্ব নিয়েছিল অনেকে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রচার-..., প্রচার-পুস্তিকা, শুভ দিনের পত্রলিপি, প্রাচীর-পত্র, সংবাদ-...ষ্ঠান ও প্রেস। মাইক্রোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র এবং সবার ...রে সরকারের নিজস্ব প্রচার-দপ্তর। সবাই মিলে এবার প্রচারের
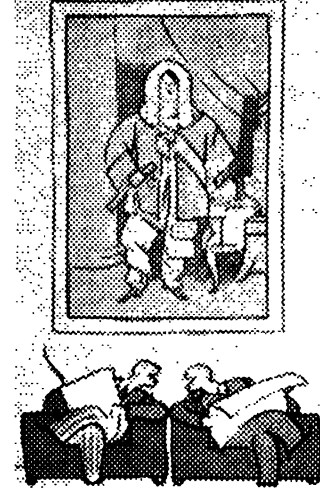
আজে-বাজে কথায় মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে
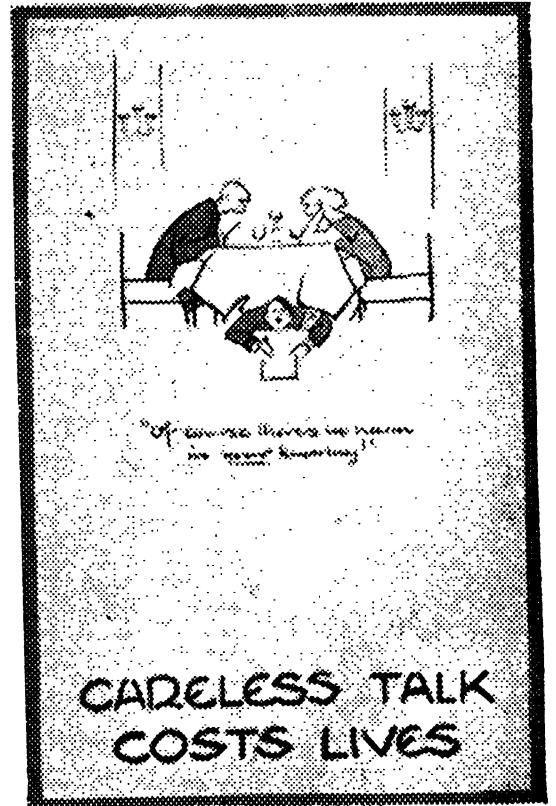
কানাকানি করবেন না—শত্রুরও কান আছে

দায়িত্ব নেওয়ায় শুধু কাগজের উপর নির্ভরশীল যে প্রচার তা অনেকখানি দায়িত্বমুক্ত হয়েছিল।

এবারের যুদ্ধে ইংলণ্ডের বেতার রীতিমত প্রাধান্য পেয়েছিল। বেতার-ষ্টেশন থেকে যারা পৃথিবীর দূরতম অংশের শ্রোতার জন্য যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করতেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই বাচনভঙ্গী ও বক্তব্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করার কৌশল বেশ মর্ম্মস্পর্শী হত। কিন্তু জাপানী ও জার্মাণ-অধিকৃত-বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে যে প্রচার হত তার মধ্যে আস্ফালন ও নিছক মিথ্যার আশ্রয় থাকত অতিমাত্রায়।

প্রচারের মধ্যে নিছক সত্যও থাকে না—নিছক মিথ্যাও থাকে না। সত্য-ঘেঁষা প্রচারকে নিপুণ শিল্পী দরদ দিয়ে যে ভাবে উপস্থাপিত করেন তার মধ্যেই প্রচারের কর্ম্মকারিতা নির্ভর করে। নইলে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যত জার্মাণ সৈন্য মরেছিল প্রচার-দপ্তরের নিত্য সংবাদপত্রে, আজো যে জার্মাণীতে মানুষ আছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। প্রচারের এই আতিশয্যে প্রচার-দপ্তরই জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলে জনসাধারণের মনে যে বিভ্রান্তির জন্ম হয় তাতে সরকারের মূলতঃ ক্ষতিই ঘটতে থাকে। অবশ্য এ হল ঘরোয়া প্রচারের ক্ষেত্রে। বিদেশী সৈন্য-ব্যূহের মধ্যে অথবা শত্রু-রাষ্ট্রে এই ধরণের প্রচারের ফলে কিছুটা কাজ হয়ই—যখন নিজের সরকারের শক্তির উপর দেশের লোকের আস্থা হ্রাস হতে থাকে নানা কারণে।
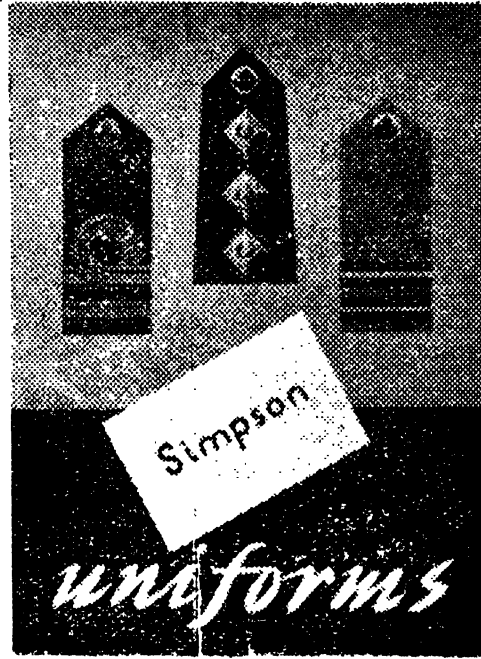
দর্জ্জী সিম্পসন কোম্পানী তখন যুদ্ধের ইউনিফর্ম্ম তৈরীর কাজে

সেই সময়েই প্রচার মারাত্মক অস্ত্রের কাজ করে। যে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে তাকে যেমন নিঃশব্দে রোগ আক্রমণ ও দখল করে—প্রচারও তেমনি ভাবে দখল করে দেশকে যেখানে মনোবল ক্ষুণ্ন।

নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্ব-ব্যবস্থা

আমরা একলা নই। বিমান আক্রমণ ও যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে এই একটি কথা আমাদের অপরিসীম ধৈর্য ও সাহসের ... করে। আমরা সবাই সমদুঃখের ... এ বোধ জাগাতে পারলে সমষ্টি... ভাবে জনসাধারণ অনেক ক্লেশ নি... বহন করতে পারে।

গত মহাযুদ্ধের এই ধর... কয়েকটি মাত্র প্রচার-নির্দেশ ... কতার সঙ্গে কাজ করেছিল। ... যুদ্ধের রসদ—অপচয় করবেন ... সর্বত্র শত্রুর কান—কানাকানি কর... না। বাসে চড়ে দু'টি মেয়ে ... করছে আর তাদের পিছনের ... বসে আছে হিটলার—এ বিজ্ঞাপ... মূল্য অনেক গালভরা বক্তব্যের ... গুরুত্বপূর্ণ। গুজবে কান দেবেন ... অর্থাৎ আপনি যখন বাজারে গেছ... —সিনেমায় গেছেন—পার্টিতে গে... আপনার মুখ বিকর্ণ—এ ছবি ম... রাখা সহজ। 'লাঙল চালাও—ফসল ফলাও' ভারতবর্ষে ... ব্যর্থ হয়েছিল, কেন না সে মাত্র কথার কথা এখানে। ... ইংলণ্ডে এ প্রচণ্ড সার্থক হয়েছিল। 'মাল খালাস করতে যাচ্ছ —দাঁড়াবার অবসর নেই'—স্ত্রী-ড্রাইভার পুলিশের নির্দেশ ডিঙি... চলে যাচ্ছে—আঁকার কৌশলে এ ছবি অনেক বেশী মর্ম্মস্পর্শী।

'অনাথ গৃহহারা ছেলেমেয়ে—এদের দিকে তাকান।' বো... বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে বহু পরিবার এমনি ধরণের চাঙার হা... ছেলে-মেয়েকে খাইয়েছে, পরিয়েছে। মৃত সৈনিক পিতার ঊর্ধ্ব... অস্থা স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আপনার দিকে—আপনি শিশু কোলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এর মধ্যে অনুভূতির চেয়ে ত্যাগি... দাবী আগে।

এবারের যুদ্ধে বিশেষ ভাবে মেয়েদের ও গৃহিণীদের জ... প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শান্তির সময় যে মেয়ে অভিজা... সমাজের বৌরাণী—যুদ্ধের কাজে সে অক্লান্তকর্মী। গৃহিণীরা যুদ্ধে বিশেষ সাহায্য করেছেন। খাবার টেবিলে এবং পরিচ... তাদের বিচক্ষণতা যে ভাবে অপচয় নিবারণ করেছে এবং মিতব্যয়ি... সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে যে ভাবে গৃহের ও জা... স্বাস্থ্য রক্ষা করেছে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

অত বিমান আক্রমণ এবং অভাব-অনটনের মধ্যেও ইংল্যা... মনোবল যে অক্ষুণ্ন ছিল তার পিছনে ইংরেজ মেয়েদের ও গিন্নী... স্বার্থত্যাগ ও নৈপুণ্য কম নয়।

অবশ্য ভারতবর্ষের কথাই আলাদা। যুদ্ধকালীন ভারতব... একমাত্র দায়িত্ব ছিল ততটুকু প্রচারের, যার মধ্য দিয়ে শো... নীতি অব্যাহত থাকতে পারে। জনসাধারণের খাদ্য ও স্বা... সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব সে নেয়নি—নিতে চায়ওনি। তার জ... যুদ্ধের মধ্যেও আমরা ভুগেছি—এখনও ভুগছি।

ন্যাশানাল সেভিংস কমিটী এই সময় দৈত্যের মত কাজ করেছে

প্রচারের সাহায্যে সে মুঠো-মুঠো টাকা নিয়ে এসেছে জনসাধারণের পকেট থেকে সরকারী তহবিলে। কাগজে প্রচার ছাড়াও ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্রের সাহায্যে সে দূরতম গ্রামে অবধি সার্থক ভাবে প্রচার চালিয়েছে ও জন-সমাজের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করে নিয়েছে। আর গাড়ী করে বক্তারা যখন প্রচারে বেরোতেন প্রথমেই বাজাত গান ও যন্ত্রসংগীত—তাতে লোকের ভীড় জমত সহজেই। পল্লীর হাটের ধারে বসত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সাময়িক আস্তানা। এই ভাবে প্রচার ভারতবর্ষেও চালান হয়েছিল। এতে চমক থাকার দরুণ লোকের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে পারত না। এই ধরণের প্রচারের সাহায্যে ইংলণ্ডে ১৯৪০ সালেই জাতীয় তহবিলে সংগৃহীত হয়েছিল আটচল্লিশ কোটি পাউণ্ড।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসুবিধাগুলির মধ্যেও জনসাধারণের মন লঘুতা ও হাস্যরসের সন্ধান পায়। অর্থাৎ যখন লোকে জানে যে, এর থেকে পরিত্রাণ নেই তখন তার মধ্য থেকেই লোকে বাঁচার আনন্দ খুঁজে নিতে চায়। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশেও লোকে যুদ্ধের খবর, বিমান আক্রমণ, খাওয়া-পরার দরুণ অনটনের প্রসঙ্গ নিয়েও হাসাহাসি করেছে—এ আমরা সবাই দেখেছি। সামনে এই আপাতঃ লঘুতা জাতির মনোবলকে ভিতর থেকে ধ্বসে যেতে দেয় না। এর মধ্যে জাতির জীবনীশক্তির অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। যাই হোক, আমরা ঠিক আছি—এ কথা বলার মধ্যে অন্ততঃ হেরে যাওয়ার মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় না। সরকার পক্ষ থেকে এই ধরণের হাস্যরসকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সেই কারণেই যুদ্ধের সময় বেতারে, চলচ্চিত্রে এবং বইতে দেখা যায় এই ধরণের হাল্কা রসের প্রাধান্য।

ঘৃণা হল প্রচারের আর এক অস্ত্র। শত্রু-সৈন্য ও শত্রু-নায়কদের ব্যভিচার ও অমানুষিকতার বিরুদ্ধে দেশের জন-সমাজের মনে তীব্র ঘৃণার বোধ জাতিকে প্রেরণা দেয় কষ্টসহিষ্ণুতার। আরও কঠিন হয়ে ওঠে আক্রোশে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা যে সব চিঠি পায় ঘর থেকে—সেগুলির গুরুত্ব অনেক। দেশ-গাঁ থেকে দূর এলাকায় কখনও বা ভিন্ন মহাদেশে সৈনিককে লড়তে হয়। সেখানে ঘর থেকে যেদিন চিঠি আসে, সেদিন সৈনিকের উৎসব। তার একার নয়, এ চিঠি সে দেখায়, দেখিয়ে আনন্দ পায় তার অনেক সাথীদের। এই সব চিঠির আবেদন সব থেকে শ্রেষ্ঠতম প্রচারের চেয়েও বেশী মর্মস্পর্শী। যুদ্ধকালীন রাশিয়ার মেয়েদের লেখা এই রকম কতকগুলি চিঠি রাশিয়ার জন-সমাজের জার্মাণ-বিরোধী মানসের এমন প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরে আমাদের সমক্ষে যে ভাবলে বিস্ময় লাগে।

এ ছাড়া দেশে-দেশে শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীরা সব প্রচারপত্র ও প্রচার-পুস্তিকার জন্য কলম ও তুলি ধরেন কখনও বা দেশের তাগিদে, কখনও বা লোভ ও বাধ্যতার তাগিদে। নিজের দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লেখা বা ছবি আঁকাই অনেকের মতে নিছক প্রচার, কিন্তু মৃত্তিকা যখন কলংকিত এবং মানুষ যখন বিপন্ন তখন এ দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেই হয় শিল্পীদের। এবং তখন প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গী সব সময় সাহিত্যিকতার মার্জিত পথেও চলতে পারে না। যুদ্ধ-মধ্য প্রচারের ভাষায় সে বাস্তবতা দেশে-দেশে-বারে-বারে প্রকট হয়ে পড়েছিল। তা ভিন্ন যুদ্ধ আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। ব্যাপক ভাবে প্রচার দূরতম গ্রামে সর্বজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায় দুনিয়ার খবর। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লোকে সহজ ভাষায় জানতে শেখে অনেক কিছু। শিক্ষা-দপ্তর যা বহু দিন ধরে করতে পারে না, যুদ্ধের প্রচার-দপ্তর তার জমি তৈরী করে দেয় বহুলাংশে। শান্তির সময়ই হক বা যুদ্ধের সময়ই হক, প্রচার সব সময়ই নিপুণ অস্ত্র। তাকে ব্যবহার করার কৌশল জানলে তা অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা রাখে। আসলে প্রচার বাদ দিয়ে আজকের দুনিয়ায় এক পা নড়তে পারে না রাষ্ট্র। বাঁচার তাগিদেই প্রচার।

নিষ্প্রদীপ রাত্রে কি ভাবে দেখতে হয়—একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন

"আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্বকেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে-তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্যরশ্মি-নির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ফিরিঙ্গী বণিক ও মির কাশিমের পত্র

[পলাশীর ৬ বৎসর পর। নবাব মির কাশিম আলির হুকুম—দেশ থেকে হটাও ফিরিঙ্গী বণিক—যেমন ক'রে পার। চার দিকে ফিরিঙ্গীরা ব্যতিব্যস্ত।

একখানা চিঠি লিখছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির কুঠিয়াল জন চেম্বার্স।]

কাশিমবাজার
৩রা এপ্রিল, ১৭৬৩

হ্যানরেক ব্যাষ্টন, এস্কোয়ার সমীপে

মহাশয়,

এখানে প্রত্যহ এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে এবং অন্যান্য যে সব সংবাদ পাইতেছি তাহাতে নিঃসংশয় হইয়াছি যে, কোন প্রকারের প্রতিবিধান ব্যবস্থা না করিলে, আমাদের সওদাগরী মাত্র নহে, সমস্তই শীঘ্র বন্ধ হইয়া যাইবে। দেশের সব তুঁতের চাষ নষ্ট করিয়া ফেলিবার এক আদেশ জারী হইয়াছে। এ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে এই চেষ্টা রোধ করিতে না পারিলে আগামী বৎসর কোন রেশম বা রেশমী বস্ত্রের প্রত্যাশা নাই। তুলার চাষ সম্বন্ধেও একই প্রকারের হুকুম হইয়াছে। ইহার ফলে সাদা কাপড়ের ব্যবসারও সমান ক্ষতি হইবে। সহরে খোলাখুলি ভাবে সকলেই বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নবাব যে কোন উপায়ে আমাদের বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প—সওদাগরী হারাইয়া আমরা এ দেশে যত দিন তিষ্ঠিতে পারিব, তাহার অধিক কাল আপন সৈন্যদের বেতন দিবার মত যথেষ্ট অর্থ তাঁহার আছে; এ জন্য দেশের যে সকল উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায় চলিতে পারে, সে সকল দ্রব্য তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। আমরা এ দেশে থাকি বা না থাকি, তাঁহার ধারণা, যদি আমরা তাঁহাকে কোন শুল্ক না দেই, তাহা হইলে তিনি হয় আমাদের শুল্ক দিতে, না হয় দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন।

গত দুই-তিন দিনের মধ্যে সহরে বহু সওয়ারী ও পদাতিক সৈন্য আসিয়াছে। ওদিকে সংবাদ আসিয়াছে যে, আমাদেরও সৈন্যদল আসিতেছে এবং কতক দূর অগ্রসর হইবার পর তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমাদের সৈন্যদল যদি এদিকে বাধা দেয় সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার ব্যাপক আয়োজনও করা হইতেছে। তুঁত গাছ ও তুলা গাছ সম্বন্ধে হুকুম আপনাকে জানান আমি কর্তব্য মনে করিলাম। আমার মনে হয়, এ বিষয় গবর্ণর ও কাউন্সিলকে জানাইলে, আমাদের সওদাগরী ধ্বংসের সম্ভাবনা যে কিরূপে হইয়াছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হুকুম জারী করিবার জন্য চারি দিকে ঢ্যাঁরা দেওয়া হইতেছে এবং তুঁতের চাষ নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য বহু লোক প্রেরিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এ সকল কথা বোর্ডকে জানান কর্তব্য। আপনিও যদি তাহাই মনে করেন তাহা হইলে ফলাফল আমাকে জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব।

বশম্বদ
জন চেম্বার্স

পুনশ্চ—এই ফ্যাক্টরীতে আরও কয় জন সিপাই পাঠান অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। চারি দিকে প্রবল জনরব এবং আমারও বিশ্বাস যে, (আমাদের) ফৌজ যদি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে উহারা এই ফ্যাক্টরীতে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। সুতরাং আমাদের আত্মরক্ষার জন্য কয়েক জন সিপাই পাইলে আনন্দিত হইব। এখানে যে সকল সিপাই আছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত কদর্য্য, আশা করি, কিছু অস্ত্রের জন্য আপনি আবেদন করিবেন।

অমিয়টকে হত্যার প্রতিক্রিয়া

[জুলাই মাসের প্রথমেই—কাশিমবাজার ফ্যাক্টরী নবাব সৈন্য ঘিরে ফেলে। এ সময় কলকাতা থেকে বারাণসী পর্য্যন্ত ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা ছিল অগ্রদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শিকরি গলি, ভাগলপুর প্রভৃতির পথে। নবাবের লোক ইংরেজের ডাক ধরতে লেগেছিল।

কলকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলে ভ্যান্সিটার্টের সহযোগী ছিল পিটার অমিয়ট (Peter Amyatt)। ভ্যান্সিটার্ট ক্লাইভের প্রিয়পাত্র, তাই বাংলার গবর্ণরের পদ পেল। অমিয়ট পলাশী যুদ্ধের পরে পাটনায় ফ্যাক্টরীর ভার পেয়েছিল মাত্র। ... কলকাতার কাউন্সিলে অমিয়ট হয়েছিল বিরোধী দলের নেতা। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যবস্থায় ইংরেজের সর্ত মানাবার জন্য কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাব মির কাশিমের কাছে অমিয়ট আর ... পাঠিয়েছিল। ১৭৬৩, ৪ঠা এপ্রিল ওদের কলকাতা থেকে ... হবার কথা। কিন্তু ৬ই এপ্রিল অমিয়ট (৩৫) মেরিয়া উওলাষ্টন (২৩) বিয়ে করেই গঙ্গার জলপথে যাত্রা করে। কলকাতা ... পাটনা ফ্যাক্টরীর জন্যে অস্ত্র-বোঝাই নৌকো যখন গিয়ে ... পৌঁছল, তখন মির কাশিম নৌকো করলেন আটক। ...

পৌঁছবার আগেই অমিয়ট ও হে কাশিমের সঙ্গে দেখা করে। কাশিম :দের আপোষে প্রায় রাজী হয়েছিলেন কিন্তু পাটনার ফ্যাক্টরীর এলিশ :কাশ্যে যুদ্ধের আয়োজন মাত্র নয়, পাটনা সহর আক্রমণ করায় :শিম আদেশ দেন—'যেখানে ইংরেজ পাও বন্দী কর।' অমিয়ট :পোষের কথাবার্ত্তা বলে কলকাতায় ফিরছিল। হঠাৎ নৌকো :মিয়ে তাদের মুঙ্গের পাঠিয়ে দেওয়া হল। নৌকো থামাতে বললে :মিয়ট অস্বীকার করে। মাত্র তাই না, সে নবাবের লোককে :রলে গুলী। ফলে তারা নৌকো চড়াও করে। হাতাহাতির ফলে :মিয়ট ও আরও কয় জন নিহত হয় (৩রা বা ৪ঠা জুলাই)। ২১ :ছর ধরে লোকটা লুঠছিল বেশ। তার অগাধ সম্পত্তি পেয়েছিল :ার ৩ মাসের দাম্পত্য-জীবনের বধূ। এর দু'মাস পর (১ই :সপ্টেম্বর) মির কাশিম মেজর এ্যাডামস্‌কে পত্র দেন]

শুকরী গলি,
৩০শে, সেফের

গত ৩ মাস যাবৎ তোমার সৈন্যদের দিয়া তুমি বাদশাহের :লুক উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছ। কি অধিকারে? আমার :রেখাস্তের জন্য কোন দরবারী সনদ যদি তোমার হাতে থাকে, :তাহা হইলে মূল সনদ বা তাহার একখানি নকল আমার নিকট :তোমার পাঠান কর্ত্তব্য। সনদ আমি দেখিব, আমার সৈন্যদলকে :দেখাইব, তাহার পর এই দেশ ত্যাগ করিয়া, বাদশাহের নিকট :উপস্থিত হইব। আমি সাধারণের কোন বিশ্বাস ভঙ্গ না করিলেও :মিঃ এলিশ আপোষ আলোচনা ও সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া এবং :জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া প্রবঞ্চকের মত আমার বিরুদ্ধে :রাতারাতি চোরা-গোপ্তা আক্রমণ করিতেছে। কাজেই আমার :লোকজন মনে করিতেছে যে, এখন যখন ইংরেজের সাথে আর কোন :সন্ধি নাই, সুসম্পর্কও নাই, তখন যেখানে ইংরেজ পাইবে :সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে। :এই ধারণা লইয়া মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারীরা মিঃ অমিয়টকে হত্যা :করিয়াছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকটিকে হত্যা করা আমার নিজের :জ্ঞান মতেই ভাল লাগে নাই। এ জন্য যদি তুমি আপনার কর্তৃত্বে :এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা :হইলে ইহা স্থির জানিও, মিঃ এলিশের ও তোমার অন্যান্য প্রধান :ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়া কাটা মাথাগুলি তোমার নিকট পাঠাইব। :আমার প্রেরিত জেমতদারদের মাত্র শঠতা ও রাত-বিরাতে আক্রমণ :করিয়া ২৩ স্থানে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া উল্লসিত হইও না। :কি ভাবে এ কুকর্ম্মের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা সাধন করা হইবে :ভগবানের ইচ্ছায় তাহা প্রত্যক্ষ করিবে।

নবাবের চিঠির উত্তরে

উত্তর লিখেছিল কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট—

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩

মেজর য্যাডামস্‌কে ৩০শে সেফের তারিখে যে পত্র দিয়াছিলেন :তাহার নকল আমি পাইয়াছি। মিঃ অমিয়ট ও মিঃ হে'কে দূতরূপে :আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। দূত সব জাতের নিকটই :পবিত্র, তবু এই পবিত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আপনি ছাড়পত্র :দিয়াও মিঃ অমিয়টকে তাঁহার ফিরিবার সময় আক্রান্ত হইতে ও নিহত হইতে দিয়াছেন এবং মিঃ হে'কে অন্যায় ভাবে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি আমাদের কাশিমবাজার কুঠি ঘেরাও করিয়া আক্রমণ করিয়াছেন এবং তথা হইতে আমাদের ভদ্রলোকদের অত্যন্ত অমর্য্যাদাকর ভাবে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে চালান দিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত লড়াইয়ের কোন সংস্রব ছিল না এবং তাঁহারা আপনার লোকজনকে বাধাও দেন নাই। এই ভাবে অন্যান্য স্থানেও যে সব ইংরেজ এজেন্ট শান্ত ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছিল তাহাদিগকেও আপনি আক্রমণ করিয়াছেন, কাহাকেও হত্যা করিয়াছেন, কাহাকেও বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বত্র লুঠিয়া লইয়াছেন। এই সকল কার্য্যকলাপের পরও কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন মেজর য্যাডামস্‌কে ফৌজসহ কেন পাঠান হইয়াছিল? ভগবৎ ও মানুষের বিধি কি তাহা আপনি অবশ্য জানেন। আপনি যখন ঘোষণাই করিয়াছেন যে ইংরেজদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাশক্তি কার্য্য করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এ পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্যদল সাফল্য লাভই করিয়াছে। দেশকে অরাজকতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং দেশবাসীকে যুদ্ধের গ্রাসমুক্ত করিবার জন্য এই ভাবেই কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্য অগ্রসর হইবে। আমাদের যে সকল প্রধানকে দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যায় ভাবে আপনি বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তাহাদের প্রাণ লইবার যে ভয় আপনি দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সর্ব্বধর্ম ও সর্ব্বজাতির লোকের ইহাতে স্তম্ভিত হইবার কথা। তবু আমাদের জাতির মর্য্যাদা ও কোম্পানীর স্বার্থ এই ভয়ে বিসর্জ্জন দেওয়াও হইবে না বা আমাদের সৈন্যদলের কার্য্যকলাপ বন্ধ করাও হইবে না। যুদ্ধের বন্দীকে হত্যা মাত্র খৃষ্টান ও মুসলমানদের নিকট নহে, অতি-বড় বর্ব্বর কাফেরদের নিকটও উহা অবৈধ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বনের পশুদের মধ্যে ছাড়া এরূপ মনোভাব আর কোথাও দেখা যায় না। উদয়নালার যুদ্ধের পর আপনার সহস্রাধিক সেনা-নায়ক ও সৈনিক মেজর য্যাডামসের হাতে বন্দী হয়, তিনি তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি না করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। এই আচরণ ও আপনার আচরণের তুলনা করুন। ইহলোকে ও পরলোকে ইহার ফল কি হইবে অনুভব করুন। ইহাও মনে রাখিবেন যে, আপনি যদি আমার পরামর্শ লইতেন তাহা হইলে এই যুদ্ধ কখন ঘটিত না।

কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

[নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। "কেশব-চরিত" হইতে গৃহীত।]

"তারা-ভিউ", সিমলা,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ

পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গতবর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ-সেবা করি। বহু দিন হইতে এই ইচ্ছা। ইহা কি পূর্ণ হইবার

কোন সম্ভাবনা নাই ? হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে তত দিন ব্রহ্ম সূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্ম-চন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে-বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনও হয় নাই। আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা! যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত ? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদয় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাত্তনস্ত করতল ন্যস্ত! হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তি-প্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারি দিকে নূতন শোভা! কোথাও গভীর নিনাদে, কোথাও মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যুগেশ্বরের খেলা যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি, ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী—
সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর

হিমালয় পর্ব্বত,
১৪ই আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ,

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না। আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেম-সহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর :

"নিম্নে বসুন্ধরা ঊর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।
আনন্দময়ের মঙ্গল স্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।"

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য। তোমার কথা আশ্চর্য্য। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা, যাও তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দজনক সুন্দর আনন দেখ রে নয়ন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

মসুরী পর্ব্বত।

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ,

৩০শে আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল। তাহার শিরোনামাতে চির-পরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার প[ত্র] বলিয়া অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই পত্র খুলিয়[া] দেখি যে সত্য সত্যই তোমারই পত্র। তাহা পড়িতেই তোম[ার] সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকে মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাই[য়া] আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আক্ষে[প] করিয়া বলিয়া গিয়াছেন : "কাহাকেও এমন পাই না আমার কথা[য়] সায় দেয়।" তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্র[তি] কথার সায় পেয়ে সে মত্ত হয়ে উঠত আর খুসি হয়ে বলতে থাকিত,— "কি মস্তি জানি যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমা[কে] আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হই[তে] তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভ লক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছি[ল]। নানা প্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে না[ই]। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ। এই কাজেই তু[মি] উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব করেন নাই। তুমি ফকিরের বে[শে] বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হই[তে] অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করি[ব]। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা"—যেখানে পিতা অপি[তা] হন মাতা অমাতা, সেখানে প্রেম সমান—উচ্চ-নীচুর কোন বিচা[র] নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ, ব্রাঃ সং ৫৩।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শ[র্ম্মা]

ভলটেয়ারের প্রেমপত্র

[ভলটেয়ারের যৌবনের ঘটনা। ভলটেয়ারের বয়স তখন উ[নিশ] —নেদারল্যাণ্ডে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সহকারী হয়ে তিনি তখন [সে]খা[নে] অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি মাদামোয়াসেল ডুনোয়ে[র] প্রেমে পাগল হয়ে ওঠেন। মেয়েটি এক দরিদ্রা নারীর ক[ন্যা]। রাষ্ট্রদূত ও মেয়েটির মা—দু'জনেই এই বিয়ের প্রবল বিরু[দ্ধে]। ভলটেয়ার বন্দী হলেন রাষ্ট্রদূতের নির্দেশে, কিন্তু পরে তিনি জা[নালা] বেয়ে পলায়ন করলেন জেল থেকে—পিমপেটকে (তাই ডাক[তেন] মেয়েটির) নিয়ে উধাও হলেন পাঁচ মাইল দূরে শেবনিঙে[ন]। সেখান থেকে প্যারিসে পলায়নই হল আসল উদ্দেশ্য। [জেলে] বন্দী থাকা কালীন ভলটেয়ার পিমপেটকে যে চিঠিপত্র লিখেছি[লেন] এটি তার একটি।]

হেগ, ১১...

আমি এখন রাজবন্দী,—এরা আমার প্রাণ নিতে পারে [কিন্তু] তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কেড়ে নিতে পারবে না। [প্রি]য়া, আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব—ফাঁসীকাঠে

...তে হলেও যাব—কেউ আটকাতে পারবে না। যে মর্মান্তিক ...য় চিঠি লিখেছ, দোহাই তোমার, সে ভাষায় কথা কয়ো না ...ন আমার সাথে। তোমার মাকে সাবধান—তিনিই তোমার ...তম শত্রু। আর কি বলব? সবাইকে সাবধান—কাউকে ...াস কর না। ঠিক যে মুহূর্তে চাঁদ দেখা দেবে আকাশে, ...ত হয়ে থাকবে। গোপনে আমি হোটেল ত্যাগ করব। চার ...বা দু'চাকার গাড়ী, যা পাওয়া যায় তাতে চড়েই বাতাসের ...উড়ে যাব শেবর্নিগ্রেনে। সঙ্গে করে আমি কালি-কলম নিয়ে ...। সেখান থেকে চিঠি লিখব।

যদি আমায় সত্যি ভালবেসে থাক ধৈর্য ধরতেই হবে। এখন ... নিজের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাও। তোমার মা ... কিছুই বুঝতে না পারেন। তোমার ছবিখানাও সাথে নিও। ... ধর। চরম যাতনার ভীতিও তোমাকে প্রীতিদানের ইচ্ছা ... কিছুতেই বিরত করতে পারবে না আমাকে।

তোমার কাছ থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করবে এমন কোন শক্তি ... পৃথিবীতে। নেই-ই। আমাদের প্রেম ধার্মিকতার ভিত্তির ... প্রতিষ্ঠিত। যত দিন বেঁচে থাকব এর মৃত্যু নেই। বিদায়। ... এমন কোন সাহসের কাজ নেই যা আমি তোমার জন্য ... না পারি। আরও অধিক পাওয়ার যোগ্যা তুমি। বিদায়— ... প্রিয়ে। ইতি

আরুয়ে

কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই মর্মান্তিক বিফলতায় পর্যবসিত হল। ...যুগল ধরা পড়ে গেল। ভলটেয়ার প্রেরিত হলেন প্যারিসে ...নের পাঠ নিতে। আর পিমপেটেরও বিয়ে হয়ে গেল আর এক ... সাথে—পিমপেট হলেন 'কাউনটেস অফ উইন্টারফিল্ড।' এই ...র কয়েক বছর পরে পিমপেটের মা কিছু ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে ...টেয়ারের চিঠিগুলি কাগজে ছাপিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

এদিকে ভলটেয়ার আইন ছেড়ে সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ ...ছেন। 'ইডিপি' নাটকটির সাফল্য ভলটেয়ারকে এনে দিল ... যশমান আর দিল অভিজাত ও বিখ্যাত সুন্দরী দাচেস দ্যু মেনের সাহিত্য-চক্রে প্রবেশের পরিচয়-টীকা। ক্রমশঃ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক আসনে বসবার দাবীও হোল স্বীকৃত। যৌবনের সেই প্রণয়-অভিযান ও কারাদুর্গে সাময়িক বন্দিজীবনের স্মৃতি ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এল মন থেকে। ভলটেয়ার গেলেন ইংলণ্ডে—তিন বছর কাটালেন সেখানে—মার্কুই দ্যু শাতেলে, গ্যাব্রিয়েল-এমিলি লা তনেলিয়ের দ্য ব্রেতিউ আইয়ের সঙ্গে গড়ে উঠল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মার্কুই একাধারে সুগায়িকা, দার্শনিক, বহু ভাষাবিদ্ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিনী, সর্বগুণালংকৃতা মহিলা। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটি দিনের তরেও এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক একটুও শিথিল হয়নি। মৃত্যুকালে মার্কুইয়ের বয়স হয়েছিল তেতাল্লিশ আর ভলটেয়ার তখন পঞ্চান্ন।]

বিদ্যাসাগরের স্ত্রীকে লেখা চিঠি

গুণালঙ্কৃতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী কল্যাণনিলয়েষু,—

শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদনমিদং,—আমার সাংসারিক সুখ-ভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানী আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে * * * ইত্যাদি। এক্ষণে তোমার নিকট এই জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয়-বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্ব্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনা পূর্ব্বক চলিলে, তদ্দ্বারা সচ্ছন্দে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬।

শুভাকাংক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

বাংলা বইয়ের দুঃখ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের ... গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, হয়তো তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের ... লেগেছে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চার দিক্ থেকে অভিযোগ ওঠে, আমাদের ভাণ্ডারে ভালো বই নেই—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন। কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতি-নিন্দিত গল্প-লেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়তো দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয়, সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে, তা না বলাই ভালো। অনেকের হয়তো ধারণাই নেই যে এই সব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়!

বিলাতে কিন্তু গল্প-লেখকদের অবস্থা অন্য রকম। তারা ধনী; তাদের এক এক জনের আয় আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়, কারণ ও-দেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক্ থেকেও বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ও-দেশে বাড়িতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনা অভ্যাস আছে, না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়তো বা কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটে।

আর অবস্থাপন্ন লোকেদের তো কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক-একটা গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না থাকুক, গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই। অনেকে হয়তো মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালিগালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন তো দেখতে পাবেন, তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্যন্ত পড়েননি। আমি নিজেও এক জন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি গেছি, খোঁজ নিয়ে দেখেছি,—তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছে অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একটুও আছে, তাঁরা কয়েকখানা চকচকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু বাংলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাংলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলেন—সে হয় না, কারণ বিক্রি নেই। বিক্রি হয় না বলেই প্রকাশকরা ছাপাতে চান না। তাঁরা বলেন, ও-সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এসো গল্প। লোকে ভাবে গল্প লেখাটা বড্ড সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোক যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয়—তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিওপ্যাথি কর্ গে যা, অথচ হোমিওপ্যাথির মতো শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্ছে, যে জিনিসটা সকলের চেয়ে শক্ত, তাকেই অনেকে সব চেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবানের সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দোষ, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনও বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ঘটে না।

গল্প-লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভালো-ভালো কল্পনা—কত বড়-বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল, একটা উচ্চাশা ছিল যে, "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরি করব। যেমন—সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য,—এই রকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে "নারীর মূল্য" লিখি। সেটা বহু দিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু আমার সেই "দ্বাদশ মূল্য" আর শেষ করতে পারিনি; পারিনি—কারণ, অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু'বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না। প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ও-সব চলবে না। তুমি যা-তা করে তার চেয়ে দু'টো গল্প লিখে দাও, তবু হাজার খানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন—বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সংগতি আছে—তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরের যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তা এই গল্পের ভিতর দিয়েই।

কত বড়-বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেননি পরলোকগত সত্যেন দত্তের শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যই কাঁদছেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সে দিন বলেছিলুম—এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাচশ'খানা বই বিক্রি হয়নি? অনেকে হয়তো তাঁর পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না, অথচ আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে!

আমাদের বড়লোকেরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বই কেনেন অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়, এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, তবে তো তাঁরা "জ্ঞানগর্ভ" বই লিখতে পারবেন।

রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা কথা আমাদের মনে করে নজরে পড়ে যে, ও-দেশের যা কিছু হয়েছে তা করেছে ও-দেশের জনসাধারণ। তারা মস্ত লোক, তাদেরই মোটা-মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগাল দিই, কিন্তু এই আমাদেরই দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরল কতটুকু? তিনি দেশের জন্যে কত করেছেন। তাঁর স্মৃতি-রক্ষার জন্য কত আবেদনই না বেরুল, কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হল না। অথচ ইংলণ্ডে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির এক কোণে সামান্য ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন্ কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের জন্য এক আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা এলো যে শেষে তিনি ফাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা যে নাম বাজাবার জন্যে দান করেননি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ কাগজে কারও নাম বেরোয়নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই, যখন লোকের মনে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।

আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবী হোন, উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরি-আন্দোলনের জন্যে তাই দেন তো দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়তো অবসর ঘটবে না, কিন্তু আশা হয়, আজ যাঁরা তরুণ—যাঁরা বয়সে ছোট, তাঁরা নিশ্চয়ই এ কাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।

কোন্নগর পাঠচক্রের চেষ্টায় এই যে সব মূল্যবান কথা শোনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম,—শিক্ষা পেলাম,—মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ! যুগ-যুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর তো কোন উপায় দেখি না।

—বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩

স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীতারানাথ রায়

সেপাই বিদ্রোহের ঢের আগের কথা। বাংলায় গুপ্ত-বিপ্লবী দলের পত্তন হয়েছিল। মুসলমান যেদিন এদেশের স্বাধীনতা ... করে বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছিল, সেদিনও এমনি গুপ্ত-...রিলা দল জনসাধারণের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল। হয়ত ...ক্ষকের দেশাত্মবোধের বুলি তারা বলত না, তবে তাদের ...মসাহসিকতা যে আর্ত্তত্রাণের জন্যই, তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। ... প্রমাণ আজও সংগ্রহ করে রাখা দরকার, নৈলে লুপ্ত হবে।

ফারসী বণিকের ব্রাহ্মণ ক্রীতদাস মহম্মদ হাদী যেদিন মুর্শিদকুলী ... সেজে বাংলার কর্তৃত্ব করতে বসেছিল, তখন দেশের তৎকালীন ...প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রেষ্ঠরা নীরবে সব সহ্য করেছিল। তার পর ...াচার যখন বাড়ল, ধর্ম্ম যখন বিপন্ন হল, যখন লুণ্ঠনই হল রাজ-..., তখন এই সমাজ-শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে বিত্তবানরাও ষড়যন্ত্র করেছিল। ...জ দেশভক্ত—এর প্রমাণ নেই। মুসলমানদের দেশহিতৈষী বানাবার ... এ হ'ল ৺অক্ষয় মৈত্রের সিরাজ-স্তুতি। সিরাজ জাতের দিকে ...য়নি—জনসাধারণের দুঃখ মোটেই আমলে আনেনি, দেশের ...দের নিত্য অপমানিত করেছে। সিরাজকে দেশের মানুষ ...না ভালবাসেনি, তার অপদার্থতায় সবাই তার বিরুদ্ধে ...য়েছিল। মীরজাফরকে চলতি ঐতিহাসিকরা যত কালো ... দেখিয়েছে, তত কালো সে ছিল না। চলতি অত্যাচারের ...দ্ধে গুপ্ত-বিপ্লব যারা করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল ফিরিঙ্গী ...কের বন্ধু নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা দুর্লভরাম. রাজা ...নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, জগৎ শেঠ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ... বিপ্লবীদের একখানা চিঠির মর্ম্ম—

"নবাবের অত্যাচারে মুর্শিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘর-দ্বার ত্যাগ ... পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কথা শুনেন না। ...বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান ...তেছি, আপনি শীঘ্র আসিবেন।"

জগৎ শেঠের গৃহে বিপ্লবীদের বৈঠক। কেউ বলল—মুসলমানের ... হিন্দু রাজ্য স্থাপন কর। কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ—

"আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববলদৃপ্ত ইংরাজ-... সহিত যোগ দিয়া বর্ত্তমানে নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য ...। বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব ..., সুতরাং এ বিষয়ে আমি চেষ্টা করিতে পারিব।"

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই দলকে 'Hindu Party' নাম ... ছিল। ইংরেজকে কায়েম করবার মতলব ওদের মোটেই ... না। বেণে ইংরেজদের কাঁটা দিয়ে ওরা মুসলমান স্বেচ্ছা-...কে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, ইংরেজকে উচ্ছেদ ...ও সময় বেশি লাগবে না।

জনসাধারণ তখন বিপন্ন। বাংলার পল্লী পঞ্চায়েৎ ইসলাম-...ধী বলে মুসলমানরা তা ভেঙে সেপাই লেলিয়ে রক্ত শুষেছে, ... তাদের দেখাদেখি ইংরেজও মেরেছে—গ্রামের সহজাত ...তিক কাঠামো ভেঙে, আর সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠন করে—

"The Musalmans when they came into Bengal and acting on feudal principles were opposed to the beautiful system of village self-government which had so long been tower of strength to the rayats, instead of it a military tenure was adopted and revenues are collected by sepoys, the Zeminder were semi-military collector of revenue, which was realized at the point of sword, a practice adopted even by the English when they foist took possession of Burdwan, Birbhum and Nadiya."

—Long's Unpublished Records.

পলাশীর ১০ বছর পর তাই গোটা বাংলা বিদ্রোহ করেছিল ইংরেজের কাঁটা খুলে ফেলতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে সময় বর্দ্ধমান, বীরভূম নদীয়া, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ভোগের অধিকার পেয়ে দেশের পরাধীনতা কায়েম করতে চেষ্টা করছিল, দেশের জনসাধারণ তা মানতে পারেনি। সরকারী দপ্তর বলছে—

To Ensign John Fergusson

Midnapore,
30th January, 1767

Sir,

To the westward of Midnapore there is a very large tract of country comprehended within the limit of the Province, but of which the Zemindars, taking advantage of their situation, support themselves in a kind of independence. The continuation of this independence is judged to be highly unsuitable in the present situation of our Government and is also thought to obstruct a commercial intercourse, which used to subsist between the Bengali Provinces and the districts to the westward of the Hills···

John Graham.

ইংরেজ ফৌজ পাঠিয়েছিল স্বাধীনতার এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে। জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজকে করেছিল আক্রমণ।

ঝাড়গ্রাম অভিযান। ওদের সেনানায়ক কর্ত্তাদের লিখছে (৫ ফেব্রু, ১৭৬৭)

রাত্রে আর এগোনো গেল না। বাঙ্গোরা গ্রামের কাছে হঠাৎ এসে পড়ে বলদ, শস্য লুটা গেল। পাহারা মোতায়েন—"Not withstanding our picks, we were alarmed several times by about 300 of them whose aim seemed to be

carrying off the grains etc, but none of the sepoys suffered in the least...

John Fergusson.

১৩ই ফেব্রুয়ারীতে এই সেনানায়ক লিখছে, "From other quarter we are told the Zeminder of Ghatseela has posted troops in all the avenues and inlets to his Pargana and is determined not to admit a Phrygo (ফিরিঙ্গী) in his country on any account."

We still hear from the other quarter of the preparation of Ghatseela Zeminder such as the breakiug of the road, barricading all narrow passes by felling of trees etc.

J. F.

...The Zeminders of Roypore and Foolksma have taken advantage of their situation to avoid making their submission.

পরবর্তী সংবাদ—দামোদর সিং ঘাটশিলার আরও ছোট ছোট জমিদারদের সঙ্গে মিলেছে। মানভূমের জমিদার সেদিন ভদ্রতাও দেখিয়েছিল, 'but at the sametime absolutely denying to pay any revenue" ভাত বুনির যোগান বার দুই হাজার সশস্ত্র পাইক নিয়ে ইংরেজের সম্মুখীন হয়েছিল, আর জঙ্গলা যুদ্ধে ইংরেজের সাথে বেশ লড়াই করেছিল, ১৬ ক্রোশ জঙ্গল ভেঙে এই বিপ্লব স্তিমিত করতে ইংরেজ চেষ্টা করেছিল।

২২ মার্চ, ১৭৬৭

"On this day's march they fought very warmly, showing themselves a good deal, firs' in front and then in the rear, but were not able to make any impression. About 9 o' clock, we made his fort which we found in flames, and his people all round in small parties in the jungle on the outside to attack us in the rear."

ওরা গাঁ পুড়িয়ে, রাজবাড়ী ও তার সব সম্পত্তি পুড়িয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেছল। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়করা ইংরেজের কাছে হয়েছিল—"barbarous monster that he is by no means to be countenanced by a civilised nation"

এ তুচ্ছ বিদ্রোহ নয়। স্বাধীনতার জন্ত সমবেত মহা সংগ্রাম। পঞ্চায়েৎ সমর্থিত জমিদারদের পুরোভাগে নিয়ে সাধারণ মানুষগুলো আক্রমণকারীকে বাধা দিয়েছে, যেমন বাধা দিয়েছিল সে দিন —যেদিন এই মুসলমানরা তাদের লুণ্ঠিত ভারত, তাদের পদপিষ্ট ভারতকে আর এক বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছিল নির্মম ভাবে। মধ্যযুগের এই যাযাবর দাস-ব্যবসায়ীরা হঠাৎ বসেছিল মসনদে, এরা ভারতবাসীকে অস্থাবর সম্পত্তিই মনে করেছিল, আর এই সম্পত্তিই নির্মম ভাবে বেচেছিল দরিয়া-পারের লুব্ধ বণিকের হাতে। দূরদৃষ্টি ওদের ছিল না মোটেই, যেমন ছিল এই নয়া বণিকদের।

প্রহারখিন্ন, ভেদ-বিচ্ছিন্ন ভারত যেদিন বুঝল, নয়া মানুষগুলো মসনদে বসতে চায় না, মসনদ মাত্র নয়, দেশের মানুষকে নির্বীর্য করে—তার অর্থনৈতিক কাঠামো বেচাল করে—সব কুক্ষিগত করে চায় ইংলণ্ডকে দরিয়ার রাণী বানাবার জন্তে, সেদিন তারা প্রতিরোধ করেছে।

পারেনি। ওরা দুনিয়া লুঠবার জন্তে—দুনিয়ার সেরা হাতিয়ার আর দুনিয়ার সেরা সংগঠন-সিদ্ধ। এদের সে সব কিছু নেই, কাজেই পলাশীর দশ বছর পরের এই মহা স্বাধীনতার অভিযান কামান আর বন্দুকের কাছে, ইংরেজের পাটোয়ারী বুদ্ধির কাছে তীর ধনুক ও নীতিবোধ নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি।

হিন্দু-চিত্তে বিদেশী-বিদ্বেষ সহজাত। আপোষ সে করে না। বিদেশীর সাথে বলে না পারলেও তাকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ করে রাখে। তলোয়ার বা আইন তাকে কোন দিনই বিজেতাকে সম্মান দিতে বাধ্য করতে পারেনি। তাই যেদিন দিল্লীর বাদশা থেকে বাংলার ক্লীব নবাবরা পর্য্যন্ত যখন তাদের অদৃষ্ট বাঁধা দিল ফিরিঙ্গী বণিকের কাছে, তখন দেশের শ্রেষ্ঠ হিন্দুকে গোপন বিপ্লবের জন্ত সজ্ঘবদ্ধ হতে হয়েছিল বৈ কি? সেই বিপ্লবী হিন্দু সঙ্ঘেরই প্রেরণায় ইংরেজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রথম ব্যাপক সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা ইংরেজ সৈনিকদের চিঠিপত্র থেকে অকিঞ্চিৎকর ভাবে নিবেদন করলাম।

এই হিন্দুসঙ্ঘের চেষ্টার একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা আছে। বার বার চেষ্টা করেছে—বার বার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—নতুন উদ্যমে চেষ্টা আবার চলেছে—এই বিপ্লব ধারা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলেছে।

সেপাই বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। প্রথম সংগ্রাম বাংলার হিন্দুদের। এ সংগ্রাম ব্যর্থ যখন হল তখন নতুন বিপ্লবের জন্য যে প্রস্তুত হচ্ছিল হিন্দু বিপ্লবী নেতারা, তা একটু অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। প্রথম সংগ্রামের নেতা ও সংগ্রামীরা পরবর্তী সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিয়েছিল। একটু আভাস দিয়ে বর্ত্তমান ইঙ্গিতের পরিসমাপ্তি করব।

৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী হিরাবসে সরকারী ভাবে এডজুটেন্ট জেনারলের অফিসে জানিয়েছিল—"A report has been spread by some designing persons most like Brahmins, or agents of the religious Hindoo Party in Calcutta (I believe it is called Dharma Sobha) that Sepoys are to be forced to embrace the Christian faith."...

"The telegraph station at Barrackpore was burnt down. Then night after night, followed other fires. Burning arrows were shot into the thatched roofs of officers bungalows...

"This incendiary fires were soon followed by nocturnal meetings. Men met each other with muffled faces and discussed, in excited language, the intolerable outrage which British Government had deliberately committed upon them. It is probable that they were not all Sepoys who attended these nightly musters. It is probable that they were not all Sepoys who signed the letters that went forth from the post offices of Calcutta and Barrackpore calling upon the soldiery at all the principal stations of the Bengal Army to resist the sacrilegions encroachment of the English."

—অমলেন্দু বসু

"মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি;
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্য্যলোক হতে—
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলা-নৃত্য করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।"

—রবীন্দ্রনাথ

—ব্রজগোপাল নায়ক

-বীথি সরকার

—লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী

—জে, এম, দত্ত

—অজিতকুমার নিয়োগী

জলপথ —তপতী ঘোষ

"জগৎ— —অমলকুমার নাগচৌধুরী

পারাবারের তীরে— —এস, পি রায়চৌধুরী

স্থলপথ —অনিলকুমার গুপ্ত

শিশুরা— —[illegible]নীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জলপথ —রেবা বসু

করে খেলা।" —রামপ্রসাদ সিং

আলোক-বিন্যাস —ব্রজগোপাল নায়ক

(কলিকাতা পরেশনাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে)

স্থপতি-বিন্যাস —রাসবিহারী আঢ্য

শয্যা-বিন্যাস —অনিলকুমার গুপ্ত

রাজস্থানে রাজসূয়

[অত্যন্ত বিলম্বে প্রাপ্ত]

শ্রীঅনাথবন্ধু দাস
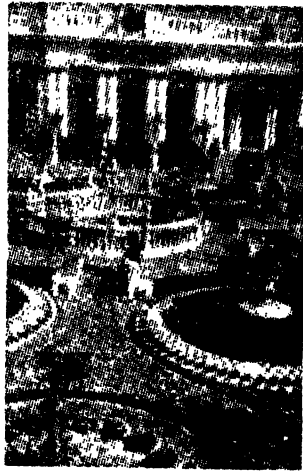
রাজপাট অধিকারের পর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নজীর আছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক। আয়োজনের প্রাচুর্য্যে, আড়ম্বরের বিপুলতায়, জনতার সমাবেশে জয়পুরের কংগ্রেস বার্ষিকী রাজসূয়েরই তুলনীয়। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে এমন সমারোহ দেখা যায় নাই! এক্‌সলটেড্‌ গুচ্ছ ছোট-বড় হাইনেসেরা একে-একে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করার পর রাজস্থানে বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান সুসঙ্গত হইয়াছিল। কিন্তু স্থান নির্ব্বাচনে বিচক্ষণ বুদ্ধি থাকিলেও কাল নির্ব্বাচনে সুবিবেচনা ছিল না। আরও পাঁচ-ছয় সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিলে উৎসবের কোন অঙ্গহানি কিংবা রাজনৈতিক কোন গুরুতর সঙ্কটের আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু দর্শকেরা পৌষের তীব্র শীতক্লেশ ও শীতবস্ত্র ক্রয়ের অযথা অপব্যয় হইতে রক্ষা পাইত।

আমাদের কাগজওয়ালাদের কাছে প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিবেশন হিষ্টোরিক ও মমেন্‌টাস্‌, যেমন রাজা-মহারাজা ও নাইটদের কাছে বড়লাট মাত্রই ছিলেন দি গ্রেটেষ্ট ভাইসরয়। এই অতিরঞ্জন বাদ দিলে জয়পুর কংগ্রেসকে আলোচিত বিষয়-বস্তু সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না। গৃহীত রিজ্যলিউসন কয়টি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনায়াসে স্থির করিতে পারিতেন। কার্য্যতঃ হইয়াছে তাহাই। ওয়ার্কিং কমিটি, অর্থাৎ পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী যাহা স্থির করিয়াছেন বিষয়-নির্ব্বাচনী ও পরে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য বিনা বাক্যব্যয়ে বলা যায় না, জন-কয়েক বাক্‌-বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে উষ্মা ছিল প্রচুর, হয়ত বা ব্যথাও ছিল খানিকটা, কিন্তু প্রভাতের মেঘডম্বুরের মত তাহা গর্জ্জন মাত্রই, এর বেশী কিছু নহে।

জয়পুর কংগ্রেসের ব্যয়বহুল আয়োজন দেখিয়া মনে হইল, আমাদের নবলব্ধ মর্য্যাদাজ্ঞানের কথা। স্বাধীনতা না কি আমাদের একটা নূতন মর্য্যাদা আনিয়া দিয়াছে। এই কৌলিন্যের গৌরব রক্ষার জন্য দেশে শুধু মনসবদারদের রং বদলাইয়াছে, মসনদের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বড়লাট ছোটলাটরা আগেকার মতই প্রাইভেট সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী, প্রেস এটাচী, এডিকং, জমকালো পোষাকের চাপরাসী, আর্দ্দালী ও প্রহরী পরিশোভিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা পথে বাহির হইলে পূর্ব্বের মত ক্রাউন-মার্কা মোটরের আগে চলে সার্জ্জেণ্ট পাইলট, পিছনে চলে সঙ্গীনধারী পুলিশ বাহিনী। লাট-ভবনে তেমনি চলিতেছে লাঞ্চ, ডিনার, টি-পার্টি, শুধু নিমন্ত্রিতের টেবিলে ডিনার-জেকেটের সঙ্গে গান্ধীটুপি ও সুরার পরিবর্ত্তে অরেঞ্জ স্কোয়াস স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছে। শুনিয়াছি, তান্ত্রিক সাধুরা না কি শোধন মন্ত্রের গুণে মদকে মধু করিতে পারিতেন, কথাটা এখন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, যখন দেখি স্বাধীনতার শোধনমন্ত্রে ইংরাজের বহু পাপ পুণ্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, এই মর্য্যাদা-মোহের আবেশে দরিদ্র দেশের কৃচ্ছ্রসাধনরত সেবকদের কংগ্রেস যেন যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ টাকাওয়ালার মত জয়পুরে নিজের ঐশ্বর্য্যের পসরা বিস্তার করিয়াছিল। মোট পোনরটি রিজ্যলিউশান পাশের জন্য অর্দ্ধ কোটি টাকা ব্যয় মহামান্য আগা খাঁর অশ্ব-বিলাসকেও নিষ্প্রভ করে।

রাজস্থানের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মধ্য দিয়া। রাজপুতানার অমর কাহিনী একদা বাঙ্গালী তরুণের সদ্যজাগ্রত দেশপ্রেমের অগ্নিতে প্রচুর ইন্ধন যোগাইয়াছে। বড়বাজারে গদী-সমাসীন যে সব ভুঁড়িওয়ালা রাজস্থানী বাবুজীরা তেজি-মন্দীর ভেল্কিবাজিতে তাক্‌ লাগাইয়া দেন, আমাদের মানসলোকের রাজপুতের সহিত তাঁহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। সেখানে বিরাজ করেন মহারাণা প্রতাপসিংহ, ভীমসিং, অমরসিংহ, রাজসিংহ, পুত্ত, বাদল, পান্না, পদ্মিনী, মীরাবাঈ, দুর্গাবতী, আরো অনেকে,—আর তাঁহাদের ঘিরিয়া এক বীর্য্যবান, অকুতোভয়, স্বদেশপ্রেমিক বীরের জাতি যাহারা স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। বাঙ্গালী আজো ইহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া পূজা করে। এ পূজা-মন্দিরে সাহু-শেঠজীরা শুধু অপাংক্তেয় নয়, অশ্রদ্ধেয়—যতই না বড় ইনডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট তাঁরা হউন।

রাজপুত-কাহিনীতে অম্বর-জয়পুরের খ্যাতি চিতোর, মেবার, উদয়পুর বা বিকানীরের মত উজ্জ্বল নহে। বাদশাহী দিল্লীর নাকের ডগার উপর থাকিয়া প্রবল-প্রতাপ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সংগ্রাম জীয়াইয়া রাখা সহজসাধ্য নয়। বোধ করি, এই কারণেই বিরোধের বিঘ্ন-সংকুল পন্থা ত্যাগ করিয়া অম্বরপতিরা আনুগত্যের সহজ পন্থাকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মনে করিয়াছিলেন। রাজশক্তির সহিত প্রীতি ও সৌখ্য রক্ষার ফলে অম্বর-জয়পুর ঐশ্বর্য্যশালিনী হইতে পারিয়াছিল। জয়পুর নগরী না কি প্রাচ্যের প্যারি,—ততটা না হউক, কিন্তু রাজস্থানের পিয়ারী ত বটেই। নগরীর পরিচ্ছন্ন সরল ও প্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের উপরে লাল পাথরে গড়া মনোরম প্রাসাদাবলী ও উদ্যান-বাটিকা, প্রাসাদ-গাত্রের মনোহর ভাস্কর্য্য স্থাপয়িতার সুরুচি ও শিল্পি-মনের পরিচয় দেয়। এই সুপরিকল্পিত নগরীর ঐশ্বর্য্যে একটা শান্ত মধুরতা আছে যা আধুনিক কালের সহরে গগনস্পর্শী অট্টালিকার দাম্ভিক উচ্চতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এ যুগেও এই প্রাচীন নগরীর উন্নতি ঘটিয়াছে দেখিলে মনে হয়, দেশী রাজন্যরা সকলেই শুধু আত্মসুখ ও বিলাসিতায় নিমগ্ন থাকেন এই অপবাদ বোধ করি সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাঙ্গালী গৌরব বোধ করিতে পারে, জয়পুর নগরী এক জন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পিত—দুই শত বৎসর পর ইংরাজের নয়া দিল্লীর গঠন পরিকল্পনায় যার অনুকরণের স্পষ্ট প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বরপতি মানসিংহ ছিলেন বাংলার মোগল সম্রাটের গবর্ণর। বোধ হয়, সেই সময় হইতে জয়পুরের সহিত বঙ্গদেশের সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপিত হয়। পূর্ব্ব-বাংলার অষ্টভূজা শীলা দেবী, যাঁকে কেহ কেহ যশোরেশ্বরী মনে করেন, মহারাজা মানসিংহের সঙ্গে অম্বরে গিয়াছিলেন। অম্বরপতির অধুনা ভগ্ন প্রাসাদে আজও তিনি সমাদরে অধিষ্ঠিতা। দেবী কি পাকিস্থানের শুভাগমন পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন? আরও এক জন মহামান্য আশ্রয়প্রার্থী জয়পুরে আছেন, তিনি বৃন্দাবনের গোবিন্দজী। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ভয়ে তিনি

বৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করিয়া জয়পুর-রাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাণা গোবিন্দজীকে নিজ রাজপুরীতে মর্ম্মর মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছেন। দেবলোকবাসী বলিয়াই গোবিন্দজীকে ভাঙ্গা মিলিটারী ব্যারাক বা আন্দামানে যাইতে হয় নাই। নরনারায়ণ হইলেও দরিদ্র-নারায়ণ, কিন্তু নারায়ণ কখনও দরিদ্র নয় হন না।

জয়পুর নগরীর গা ঘেঁষিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আরাবীর পাদদেশে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে ৭৭ হাজার বর্গ-একর ভূমি জুড়িয়াছিল গান্ধী-নগরের আয়তন। বিশাল এই প্রান্তর ধূলিতে শুধু ধূলিময়। রাজস্থানের মরুভূমির উল্লেখ আছে রাজপুত-কাহিনীর পাতায় পাতায় উজ্জ্বল ও মসৃণ তার ধূলিকণা, অঙ্গে বা অঙ্গরাখায়। কোন কলঙ্কের দাগ আঁকে না, গায়ে লাগিলে ঝাড়িয়া লইলেই নিশ্চিহ্ন পরিষ্কার। গ্রীষ্মতাপে এর বালুকা তপ্ত হইলে পীড়াদায়ক, অন্য সময়ে তুলার গালিচার মত শীতল ও কোমল। শ্রান্তদেহ রাজস্থানী নর-নারীরা এই ধূলিশয্যার উপর গড়াইয়া বিশ্রাম করে, শুইতে বা বসিতে আর কোন আচ্ছাদনের প্রয়োজন তাহাদের হয় না। মাড়োয়ারীরা কেন ময়লা কাপড় পরিতে লজ্জা বোধ করে না রাজস্থানের ধূলি দেখিলে বুঝা যায়, কিন্তু বাংলা দেশের মাটি নিজের ছাপ না দিয়া কাহাকেও ছাড়ে না এ কথাটা বোধ হয় অভ্যাসের দোষে তাহারা এ দেশে আসিয়া ভুলিয়া যায়।

রাজধানী হইতে দুই মাইল দূরে ছিল কংগ্রেস নগরীর প্রধান প্রবেশ-পথ—গান্ধীনগর রেলওয়ে ষ্টেশন। রেল কর্তৃপক্ষ ষ্টেশনটিকে মনোরম করিতে যেমন কার্পণ্য করেন নাই, তাহাদের ব্যবস্থাগুলিও সুষ্ঠু ছিল। ষ্টেশনের বাইরে একটি ছোট সুন্দর পুষ্পোদ্যান, তার চারি দিকে যাত্রিবাহী মোটর ষ্ট্যাণ্ড। উদ্যান হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা গান্ধীনগরের বুক চিরিয়া জয়পুরের রাজপথে মিশিয়া গিয়াছে। নগরীর কেন্দ্রস্থলে ঝাণ্ডিচকের উপর উর্দ্ধ নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান বৃহদাকার তে-রঙা জাতীয় পতাকা। চকের চতুষ্পার্শে বিস্তৃত ও উন্মুক্ত মরু-প্রাঙ্গণকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া সতেরটি তোরণের মধ্য দিয়া সতেরটি প্রশস্ত পথ। তার আশে-পাশে বিভিন্ন নিবাস-শিবির, সভা-মণ্ডপ, অফিস, দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও প্রদর্শনীর হল। শ্রান্তিহীন জনতার কোলাহল, কলরব ও বাক্-বিতর্কের বিরাম নাই কোথাও কিবা রাত্রি কিবা দিন। জয়পুর ভারতবিখ্যাত বহু ধনকুবের শেঠজীর দেশ, তবু এত দরিদ্র দেশের জনসাধারণ—বিস্মিত হইতে হয় ইহাদের অবস্থা দেখিয়া। হিমশীতল গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অসংখ্য মজুরের দল নিবাস-শিবিরের পথে পথে হাঁকিয়া চলিয়াছে—কুলি, কুলি, খামান কা লিয়ে কুলি! মজুরী আট আনা হইতে চার পয়সা! মলিন-বাস মজুরদের দেখিতে দেখিতে মনে হয় শেঠ বিরলার বাড়ী এই জয়পুরে, আনন্দীলালের বাড়ী জয়পুরে। বৈভবের রংমহলে রিক্তের আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া রাজপথ তৈরি হয় কম্যুনিজমের,—দণ্ডবিধির দণ্ড দেখাইয়া তাহাকে ঠেকান যায় না।

বহু ব্যয় হইলেই যে ব্যবস্থা সুন্দর হইতে পারে না জয়পুর কংগ্রেসের ইহাও এক বিশেষত্ব। সদিচ্ছার অভাব ছিল না কর্ম্মকর্ত্তাদের; ছিল অভিজ্ঞতার, ছিল কংগ্রেসের রীতি-নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের। সমস্ত ব্যবস্থাদিতে এই আনাড়িত্বের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সপরিবারে কংগ্রেস দেখিতে ১২৫৲ ও ২০০৲ টাকায় তিন দিনের জন্য পৃথক্ গৃহ ভাড়া করিয়াও অনেককে সপরিবারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কলিকাতায় যে ভদ্রলোক বঙ্গ, বিহার ও আসামের দর্শনার্থীদের বহু ভরসা দিয়া আগাম কেরায়া আদায় করিয়াছিলেন অবস্থা দেখিয়া তিনি হইয়াছেন নিরুদ্দিষ্ট। নিবাস-বিভাগের কর্ম্মকর্তা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া নির্দ্দেশ দিলেন—ঐ ষ্টেশনের মাথায় পরিবার-কুটীর, খালি একটা দেখিয়া দখল করিয়া নিন্। শোনা গেল, দুই শত টাকার কুটীর তখনও অর্থাৎ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন তৈরী হইতেছে।

কিন্তু দুর্দ্দশার পরিমাণ সকলের সমান ছিল না, পদ-মর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে লঘুগুরু হইয়াছিল। নেতা-নিবাস ও কৃষাণ-নিবাসে ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল যেমন ফার্ষ্ট ক্লাস ও থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে। আবার নেতা-নিবাসেরও উর্দ্ধে ছিলেন কেবিনেট মিনিষ্টারগণ; তাঁহাদের স্থান হইয়াছিল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন সভাপতি পট্টভি সীতারামায়া মহাশয় ও তাঁহার অ-মিনিষ্টার পরিষদ-সভ্যগণ পর্দ্দার আবেষ্টনীর অন্তরালে শিবির-বাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী স্তরে ছিলেন এ-আই-সি-সি সদস্যরা, প্রত্যেকের সবান্ধব বাসের জন্য এক-একটি শিবির বরাদ্দ ছিল; তাদের প্রত্যেক শিবিরের পাশেই দুই-তিনটা করিয়া ফালতু শিবির লোকাভাবে সদস্যদের স্নানাগার ও আপৎকালীন শৌচাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। নেতা-নিবাসের পর প্রতিনিধি-নিবাস, চটাস্তরণের অভ্যন্তরে সাধারণ প্রতিনিধির বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তার পর ছিলেন একে একে কর্ম্মী, কৃষাণ ও সাধারণ দর্শক। বাসস্থানের ন্যায় আহারেও অধিকারীভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা—যদিও দক্ষিণার হার সকলেরই ছিল সমান। রাজস্থানের নাম-মাহাত্ম্যেই হউক কিংবা মহারাজাদের কর্ম্মচারীদের হাতে পড়িয়াই হউক, শ্রেণিভেদের এমন মারাত্মক পরাকাষ্ঠা কংগ্রেসে ইতঃপূর্ব্বে কদাপি দেখা যায় নাই। রাজস্থানের মরুভূমিতে গণতন্ত্রের শিকড় গজাইতে বিলম্ব আছে নিঃসন্দেহ।

গাঁওমে কংগ্রেস—গান্ধীজীর বহু বিচিত্র অনুশাসনের একটি। কিন্তু তাঁহার বহু ক্রীড যেমন অনুগামীদের হাতে পড়িয়া পলিসিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তেমনি ইহাও হইয়া পড়িয়াছে ফ্যাসনি পোষাক। তাই গাঁয়ে কংগ্রেস করিতে গিয়া ইঁহারা গড়িয়া তোলেন সহর—নাম হয় গান্ধীনগর, দেশবন্ধু-নগর, বিদ্যার্থী-নগর, সুভাষ-নগর। আসে নগরের সাজ-সজ্জা বিলাস-বিভব—হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাঁটা-চামচ, চপ-কাটলেট সায় চানাচুর বাদামভাজা—পিচ দেওয়া রাস্তার দুই পাশে জ্বলিয়া উঠে বিজলীর আলো—আসে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও—আসে লণ্ড্রি সেলুন—যাত্রী নিয়ে চলে মাথার উপর হাওয়াই জাহাজ, মাটির উপর ছুটে টাঙ্গা, এক্কা, বাস্, লরি, মোটর। গ্রাম্য নর-নারীর বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টির উপর পক্ষকালের জন্য জাগিয়া উঠে দীপমালা-উদ্ভাসিত কোলাহল-মুখরিত এক বিস্ময়কর নগরী যার সঙ্গে গ্রামের কোন দূর-আত্মীয় সম্পর্কও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এ যেন দরিদ্রার জীর্ণ কুটীরে জড়োয়া-পরা বিলাসিনী ধনী আত্মীয়ার আবির্ভাব যা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয় এক জনের দীনতা ও অপর জনের দাম্ভিকতা।

আমাদের গ্রামের গৌরব-কথা কল্পনালোকচারী কবির কাব্যে সুখ-পাঠ্য এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা-মঞ্চে রোমাঞ্চকর, কিন্তু গ্রাম্য-জীবনের

বাস্তব অবস্থার সহিত না আছে বক্তার সাক্ষাৎ পরিচয়, না আছে বক্তব্যের সঙ্গতি। গ্রামে ফিরিয়া যাও বলা সহজ, শুনিতেও হয়ত মধুর, কিন্তু এ-নির্দ্দেশ শুধু পরকে দেওয়াই চলে, "আপনি আচার ধর্ম্ম জীবকে শিখাইতে" কারও দুঃসাহস সহসা হয় না—হইবার কথাও নহে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নিদারুণ দৈন্যের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ব্যক্তির বাস করা অসম্ভব এ-কথাটা শ্রুতিকটু হইতে পারে, কিন্তু সত্য। যে যুগে ভারতীয় জীবন গ্রামাশ্রয়ী ছিল সে যুগ বিগত, সে গ্রামও মৃত। বিংশ শতাব্দী নগর-সভ্যতার যুগ গ্রামকে ধনে-জনে উজাড় করিয়া নগর সৃষ্ট ও পুষ্ট হইতেছে, গ্রামে যাহারা পড়িয়া আছে তাহাদের না আছে শ্রী, না আছে ধন, না আছে মান। ইহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম খাটিয়া মরে তবু দিনান্তে সকলের একমুষ্টি অন্নও জুটে না, পরিধানের কটিবস্ত্রও সংগ্রহ হয় না। ইহারাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তবে সে মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া না গেলে বাঁকিয়া গিয়াছে, বক্তৃতার প্রলেপে তাহা সবল করা যাইবে না। জাতির নগরমুখী মনকে গ্রামের পানে ফিরাইতে হইলে গ্রাম্য-জীবনকে সুশ্রী ও শিক্ষিত রুচির উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

কংগ্রেস অধিবেশনকে যাহারা গান্ধী-মেলা বলেন তাঁরা খুব ভুল করেন না। মেলাই বটে। এই মেলার মূল্যও আছে। প্রাচীন যুগে ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক সম্মেলনের ক্ষেত্র ছিল মেলা। সুলভ ও দ্রুত যান-বাহনের বালাই ছিল না, তবু দিনের পর দিন ক্ষুৎপিপাসা ও পর্য্যটন-ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া যুবা-বৃদ্ধ নরনারী দল বাঁধিয়া দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইত মেলা দেখিতে। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাটি, মাদ্রাজী, মারাঠি নানা দিগ্‌দেশের সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র মেলায় আসিয়া জড় হইত। পুণ্যসঞ্চয়ের একটা লোভ ছিল, কিন্তু মেলাতে শুধু যে পুণ্যলোভাতুররাই ভীড় করিত ইহা সত্য নহে। নূতন দেশ দেখিবার, দশ জনের সঙ্গে মিশিবার, একটা দুঃসাহসিক কার্য্য করিবার আগ্রহ নরনারীকে আকর্ষণ করিত। মেলায় দেশের রাজা দেখাইতেন ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মাত্মা প্রচার করিতেন তাঁর ধর্ম্মমত, বেপারী বিক্রয় করিত তার পণ্য—এক প্রদেশের বার্ত্তা ও বিত্ত প্রদেশান্তরে চলিয়া যাইত মেলা-যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে। সেদিন মেলা ছিল লোক-শিক্ষার সুলভ বিদ্যালয়।

জয়পুরের গান্ধী-মেলায় পাগড়ী-পরা পুরুষ ও ঘাগরী-পরা নারীর দল যারা ভীড় জমাইয়াছিল রাজনৈতিক সমস্যার জটিলতার সহিত তাহাদের পরিচয়ও ছিল না, কিংবা এ সম্বন্ধে মাথা-ব্যাথাও ছিল না। তাহারা দেখিতে আসিয়াছিল হাস্যমুখর নগরের সমারোহ, বিপুল জনতার সমাবেশ, প্রদর্শনীর দোকান-পাট ও যান-বাহনের কোলাহল। গান্ধীবাবা নাই, নইলে এই সুযোগে দর্শনের পুণ্যসঞ্চয় হইয়া যাইত, তবে পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজীকে তারা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাঁহাদের ভাষণ, কলের ভিতর দিয়া তাঁহাদের আওয়াজ কি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে স্তব্ধ বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করিয়াছে। বক্তব্য কতটুকু বুঝিয়াছে পরমাত্মাই জানেন, মোটামুটি জানিয়া গিয়াছে কংগ্রেসের আদমীরা দেশের ভাল করেন—দেশের ভালয় তাদেরও ভাল। রয়েল এক্সচেঞ্জে ফটকা-বাজারে বসিয়া ভাগবত পাঠ যদি বা কোন স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে সম্ভব হয়, জনসমুদ্রের এই উদ্দাম কলরবের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা সম্ভব নহে—হয়ও নাই। কিন্তু সাধারণের মন মাতাইতে, তাদের আকর্ষণ করিতে মেলার উপযোগিতা প্রচুর। গান্ধীজী ভারতীয় গণ-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য পরিজ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু হায়! শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় এবার গান্ধী-মেলায় গান্ধীজীই উপস্থিত ছিলেন না। বর্ত্তমান কংগ্রেস গান্ধীজীর সৃষ্টি, তাঁর কথাই ছিল কংগ্রেসের কথা, তিনি চার আনার কংগ্রেস-সভ্য না থাকিলেও। রাজনীতিক গান্ধীর উত্তরাধিকারিত্বের দাবী হয়ত বা কারও থাকিতে পারে, কিন্তু মহাত্মার অলৌকিক মাহাত্ম্যের উত্তরাধিকারী কেহ নাই—কোন যুগে এমন মানুষ দুই জন এক সঙ্গে জন্মায় না। বিদেহী গান্ধীজীর নাম নেতারা উচ্চারণ করিয়াছিলেন সংখ্যাতীত বার—প্রমাণ হইয়াছে মহাত্মার নামের শক্তি এখনও এটোমিক্।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে, উৎকণ্ঠাও দেখা দিয়াছে খানিকটা। কামাল পাশা তুরস্কে খলিফার এন্তেকাল ঘটাইবার পর খেলাফৎ কমিটির আসর জমাইয়া রাখা এ দেশের মোল্লা-মৌলানাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আচম্বিতে ইংরাজ চলিয়া যাওয়ায় ইন্‌কেলাবের শ্লোগানে তেমন আর জোর পাওয়া যাইতেছে না আমাদের কংগ্রেসকর্ম্মীরা বুঝিতে পারিতেছেন। ইংরাজই এত কাল কংগ্রেসের কর্ম্মে দিয়াছে শক্তি, বক্তৃতায় যোগাইয়াছে উচ্ছাস। ইংরাজ বিহনে এখন আর নূতন প্রেরণা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তাই দেশমাতৃকার সেবায় সর্ব্বত্যাগী আশ্রমবাসী গৃহী-জীবনের শান্তি ও সাচ্ছন্দ্য আকর্ষণ করিতেছে। কর্ম্মীর দীর্ঘকালব্যাপী বুভুক্ষু দেহ ও মন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিতেছে—আর কেন? ইংরাজ চলিয়া গিয়াছে, স্বাধীন হইয়াছি, এবারে আরামে জীবনের বাকী দিন কাটাইতে দাও। জাতির জনক বোধ করি সন্তানদের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে এখন লিকুইডিসনে দেওয়া হউক! কিন্তু এ প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাত করিলেন না, কংগ্রেসের প্রেষ্টিজ ইলেকসনের কাজে লাগিবে এই ভরসায়। কিন্তু আদর্শ ত্যাগ করিয়া শুধু প্রেষ্টিজ সম্বল হইয়া কত দিন বাঁচিয়া থাকিবে কংগ্রেস?

★

বণিকের রাজদণ্ড

(ইংরাজের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রাথমিক ইতিহাস)

শৈলসুতা দেবী

কাল—১৬৫১ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ

১৬৫১ খৃষ্টাব্দ

ডাঃ বাউটন। জাঁহাপনা, হুজুর সুজা বাহাদুর। সেলাম। আপনার কাছে আপনার এক আর্জ্জি আছে।

সুজা। ডাক্তার বাউটন। তোমাদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেমন চলছে? তোমরা তো তেপান্তরের মাঠ, কালাপানি পার হয়ে আমাদের দেশে এসেছ ব্যবসা করতে। সম্রাট সাজাহান-পুত্র সুজার কাছে তোমার কি আর্জ্জি আছে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাঃ বাউটন। জাঁহাপনা। আপনার পায়ের তলাতে আমি আছি হুজুর। আমি সেবা করিব; আপনি মালিক, সেবা লইবেন। আমার ডাক্তারীতে খুশী হয়েছেন নিশ্চয়?

সুজা। হুঁ, তোমার সু-চিকিৎসায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি ডাক্তার, কিন্তু আমি ভাবছি তোমরা এ দেশে এসেছ কেন, কি স্বার্থ আছে তোমাদের?

ডাঃ বাউটন। আমরা বাদশাহ সাজাহানের গোলাম, ব্যবসা আর বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি।

সুজা। হিন্দুস্থানে ইংরাজের ব্যবসার ইতিহাসটা বলতে পার ডাক্তার?

ডাঃ বাউটন। কেন পারিব না হুজুর? আমরা ইংরাজ, আমাদের হিসটি্রি আছে। ইণ্ডিয়াতে আমাদের প্রথম ফ্যাক্টরী হয় সুরাটে ১৬১২ সালে। তার পর আমরা বাদশাহের সহর দিল্লী ও আগ্রাতে ব্যবসা করিবার চেষ্টা করি, পরে পাটনায় গমন করি। জাঁহাপনা রাস্তা-ঘাট বড় খারাপ থাকায় সফল হই নাই। তার পর ১৬৩৩ সালে সুবেদারকে বলিয়া উড়িষ্যাতে বিনাশুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইয়া বালাসোর ও হরিহরপুরে ফ্যাক্টরী করি। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ১৬৪০ সালে বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে জমি কিনিয়া মাদ্রাজে সেণ্ট জর্জ ফোর্ট অর্থাৎ কেল্লা স্থাপন করি।

সুজা। চমৎকার। হিন্দুস্থানে তোমরা ব্যবসা করতে এলে, কিন্তু তৈরী করলে কেল্লা। কার হুকুমে কেল্লা তৈরী হল ডাক্তার?

ডাঃ বাউটন। আমরা বাদশাহের রাজত্বের সীমার বাহিরে জমি কিনিয়া মালিক হইয়া কেল্লা স্থাপন করি হুজুর।

সুজা। বলে যাও, থামলে কেন? ব্যবসার ইতিহাস বল।

ডাঃ বাউটন। মাদ্রাজে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য আমাদের ব্যবসায়ের বড় মন্দা পড়াতে আমরা বেঙ্গলে আসিলাম। দেখিলাম, দেশটা বড় সুন্দর; এখানকার লোকও বড় ভাল। ভাবিলাম, এই দেশেই বাণিজ্য করিতে হইবে।

সুজা। বাহবা! ডাঃ বাউটন। দেখছি সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে বাংলা দেশ তোমাদের মত ব্যবসায়ীর চোখে নেশা লাগিয়ে দিল। এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশকে দিল্লী আগ্রার চেয়ে ভাল লাগে ডাক্তার?

ডাঃ বাউটন। লাগে হুকুর!

সুজা। তার পর?

ডাঃ বাউটন। ১৬৫১ সালে আমরা গ্যাঞ্জেস নদীর তীরে হুগলীতে কুঠী স্থাপন করি।

সুজা। তোমার চিকিৎসায় আমি খুশী হয়েছি, তুমি কি চাও ডাক্তার।

ডাঃ বাউটন। জাঁহাপনা, আমি নিজে কিছুই চাহি না, আমাদের জাতি অর্থাৎ ইংরাজ জাতিকে ব্যবসার জন্য লাইসেন্স দিলে গোলাম কৃতার্থ হইবে।

সুজা। বেশ, তোমরা বাদশাহকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে তোমরা হিন্দুস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে।

ডাঃ বাউটন। Thank you, your excellency Prince Shuja.

হুগলী—১৬৫৮ সাল

টমাস। হ্যালো জন, আমাদের তো হুগলীতে অনেক লোকসান হইয়া গেল। ১৬৫১ সালে কুঠী হইল, এখন ১৬৫৮ সাল, কিন্তু এই সব কর্ম্মচারীদের ডিস্‌অনেষ্টির জন্য লাভ হইতেছে না। বালাসোর বড় nasty place আছে. সেখানেও সুবিধা হইতেছে না।

জন। কিন্তু টমাস্, শুনিতেছি হোম অর্থাৎ লণ্ডন হইতে অর্ডার আসিয়াছে যে সুরাটে আমাদের হেডকোয়ার্টার হইবে ও মাদ্রাজ, হুগলী, বালাসোর ও কাসেম বাজারে ছোট অফিস থাকিবে।

টমাস। জানো জন, বাংলা দেশের লোকেরা কহে 'সোনার বাংলা'। Really, this a land of gold. এ দেশে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

(পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবেশ)

পণ্ডিত মহাশয়। কি হে সাহেব, কটা চামড়ার লোক, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। কি করছো?

টমাস। Hullo Pundit। তোমার টিকি বড়ো চমৎকার আছে। সোনা-রূপা নেবে?

পণ্ডিত। হুঁ, আমাদের মেয়েরা তোমাদের কাছ থেকে সোনা-রূপা নেবে, আর তোমরা নেবে চাল-ডাল। সোনা দিয়ে কি পেট ভরে সাহেব?

জন। এই trade আছে, টুমি business বা exchange ও commerce বুঝে না; ইংরাজি শেখ বুঝিয়ে দেব।

পণ্ডিত। তোমাদের হটর-মটর ভাষা বুঝিতে পারি না। দরকার নেই আমার ইংরিজি শিখে। শোনো সাহেব, আমাদের ভাষা—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

জন ও টমাস। Excellent। Pundit।

পণ্ডিত। তোমাদের এ দেশে দিন ঘনিয়ে এসেছে সাহেব। সাজাহানের ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই লেগেছে।

জন। হামরা ঠিক থাকিব, দেখিও পণ্ডিত।

হুগলী—১৬৮১ সাল

উইলিয়াম হেজেস My friends, Comrades and countrymen। আমরা ব্যবসা করিতে এই দেশে আসিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহে হামাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সেই জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে হুগলীতে আমরা আলাদা ভাবে ব্যবসা করিব। আমাকে ঐজন্য তাঁহারা গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়াছেন।

রিচার্ড। May I put a question Sir? বাংলা দেশে ইংরাজদের ব্যবসার অবস্থা কিরূপ?

হেজেস্। Thank you, Mr. Richard। হুগলী, ঢাকা, মালদহ হইতে জিনিষ আনিয়া গ্যাঞ্জেস দিয়া আমরা Bay of Bengal হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ চালান করিয়াছি। মীরজুমলার timeএ হামাদের একটু কষ্ট হইয়াছে, কিন্ট সায়েস্তা খান্ সুবাদার হওয়াতে অনেক সুবিধা হইয়াছে, কারণ দেশে শান্টি আসিয়াছে। এখন আমাদের problem হইতেছে Gustom Superintendent বালচাঁদের অত্যাচার। ইহাতে হামাদের tradeএর ক্ষতি হইতেছে।

রিচার্ড। মিঃ হেজেস্, এই বিষয় আপনি ঢাকায় নবাব ও দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করিবে।

হেজেস্। Good idea। আমি ঢাকায় যাইব।

রিচার্ড। Long live East India Company।

ঢাকা—১৬৮১ সাল

উইলিয়াম হেজেস্। সেলাম্, সুবাদার সায়েস্তা খান্, Good morning, your Excellency! আমার এক আবেদন আছে।

সায়েস্তা খাঁ। সাহেব হেজেস্, তুমি বিদেশী ইংরাজ, তোমার কি বলবার আছে, তাড়াতাড়ি বলতে পার। দেশের ও আমার প্রজাদের কাজ তোমার আবেদনের অনেক আগে জেনে রেখ হেজেস্।

হেজেস্। খোদাবন্দ! আমরা আপনার গরীব প্রজা আছি; ব্যবসা করিটে আসিয়াছে এ দেশে। কিন্ট আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি করিবার কাহারও ক্ষমটা নেই।

সায়েস্তা খাঁ। চোপরাও হেজেস্! বড় বড় কথা বল না। জানো দেশটা কাদের,—কোথায় দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছ? জান কাকে তুমি চোখ রাঙাচ্ছ? শুনে যাও, তোমরা বিদেশী, তোমাদের স্বার্থের চেয়ে আমার দেশের লোকের স্বার্থ আগে। আমরা মুসলমান, কিন্তু হিন্দুস্থানে আমরা হিন্দুদের সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে আছি। জানো বোধ হয়, যশোবন্ত সিংহ হিন্দু, কিন্তু ভাই হিসাবে তিনি মোগল-সেনাপতি। এখানে ভাষা, রীতি-নীতি, ভ্রাতৃভাবের আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাবে। কিন্তু তোমরা সাহেব, আমাদের দেশের লোককে লাথিও মারবে, আবার ফসলও খাবে।

হেজেস। হামার বেয়াদবী মাফ করিবেন, হুজুর। আপনি আমাদের মা-বাপ্। আমরা মাশুলদার বালচাঁদের অত্যাচারে পাগল হইতেছি।

সায়েস্তা খাঁ। বালচাঁদ তোমাদের কি করেছে?

হেজেস। আমাদের উপর অত্যাচার করেন, ব্যবসার ক্ষতি হয়।

সায়েস্তা খাঁ। বেশ, তুমি যেতে পার, আমি দিল্লীতে বাদশাহের কাছে এ বিষয় লিখব। হয়ত তোমাদের সুবিধা হবে। আর জেনে রেখ সাহেব হেজেস, এই বাঙ্গালী বড় ভীষণ জাত, এরা সইতে জানে, কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে এরা বিদ্রোহী হয়ে সব কিছু শক্তিকে খর্ব্ব করতে পারে। তুমি বাঙ্গালী বলতে শুধু হিন্দুকে বুঝো না। হিন্দু-মুসলমান যারা বাংলা দেশে থাকে, বাংলা ভাষায় কথা বলে তারাই বাঙ্গালী।

হেজেস্। এবার আমি চলিলাম্। সেলাম your Excellency.

কাশিমবাজার—১৬৮৬ সাল

জব চার্ণক। My friends, you have all come at Cosslm Bazar. I, as the chief of the factory, thank you all. আপনাদের কাছে হামাদের ব্যবসার রিপোর্ট দিতেছি। আমাদের তিনটি অসুবিধা হইতেছে—১। আমাদের শুল্ক দিটে হইতেছে, ২। সায়েস্তা খান, প্রিন্স আজিম ইসান্, সুবাদার ও ফৌজদাররা হামাদের জিনিষ অল্প মূল্যে কিনিয়া থাকে এবং ৩। হামাদের জিজিয়া কর দিটে হইতেছে।

ফিলিপ। Unbearable sir!

চার্ণক। Thank you, Mr. Philip.

[বাহিরে ভীষণ হট্টগোল]

(কোতোয়ালের প্রবেশ)

কোতোয়াল। সাহেব, তোমায় কাজী সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে; অভিযোগ আছে—তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ ও তোমার বিরুদ্ধে।

জব চার্ণক। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ...complaint? আমরা বাণিজ্য করিটে আসিয়াছি, আমরা আপনাদের কি করিয়াছি কোতোয়াল সাহেব?

কোতোয়াল। কাজীর হুকুম, তোমাদের যেতেই হবে। না গেলে বাইরে ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে, তোমাদের বেঁধে নিয়ে যাবে।

ফিলিপ। (রাগে) Shut Kup otwal।

কোতোয়াল। নসির বেগ, ঐ সাহেবকে গ্রেপ্তার কর। কি চার্ণক সাহেব, তোমরা ব্যবসা করতে এসেছ, না বিদেশে দূর-হিন্দুস্থানে বাদশাহের কর্ম্মচারীদের চোখ রাঙাতে এসেছ?

চার্ণক। We are sorry Mr. Kotwal, excuse us, আমরা চলিতেছি।

কাশিমবাজার—১৬৮৫ সাল

বিচার-কক্ষ

কাজী। আসামীরা হাজির, কোতোয়াল?

কোতোয়াল। গোলামের সেলাম কাজী সাহেব। জব চার্ণক ও তার দলবল হাজির। এরা আমার অপমান করেছে হুজুর।

কাজী। দাঁড়াও, আগে এদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগের বিচার হোক। জব চার্ণক (খুব জোরে)!

চার্ণক। Your Justice!

কাজী। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন শেঠজী, নন্দী মশাই ও চৌধুরী সাহেব। তোমরা ব্যবসা করতে এসে এঁদের পাওনার টাকা দাও নি, দালালীর টাকা দাওনি। এ বিষয় তোমার কি কৈফিয়ৎ আছে চার্ণক সাহেব?

জব চার্ণক। আমাদের কাছে কেহ টাকা পাইবে না।

কাজী। শেঠজী, নন্দী মশাই ও চৌধুরী সাহেব, আপনারা বলুন।

শেঠজী। আমি টাকা ধার দিয়েছিলাম রসিদ আছে, ফেরত পাইনি।

নন্দী মশাই। আমার লোক কাজ করে টাকা পায়নি।

চৌধুরী সাহেব। আমি ঢাকার মশলিন ও মুর্শিদাবাদের সিল্কের দাম পাইনি।

কাজী। কি চার্ণক সাহেব, মাথা হেঁট করে রইলে কেন? আর ফিলিপ, তোমার রাঙা চোখে কি সর্ষে ফুল দেখছ না কি?

জব চার্ণক। এখন আমাদের লোকসান যাইতেছে। আমরা এখন টাকা দিতে পারিব না।

কাজী। বেশ, তোমরা যদি কাশিমবাজারে থাকতে চাও, তাহ'লে এঁদের ৪৩ হাজার টাকা দিতে হবে।

জব চার্ণক। Your Lordship! এবার আপনার অনুমতি লইয়া আমি চলিলাম। আমি ঢাকাতে সুবেদার সায়েস্তা খানের কাছে আপীল করিবেক।

* * * *

সায়েস্তা খান। দেখছি ইংরেজদের স্পর্দ্ধা দিন-দিন বেড়ে চলেছে। কাশিমবাজারের ব্যাপারে চার্ণককে ঢাকায় ডেকে পাঠালাম, তবু এল না। (জোরে)···ফৌজদার, সিপাহসালার! কাজী সাহেবকে লিখে দাও, তাঁর হুকুমে মোগল সেনা যেন কাশিমবাজার কুঠী লুঠ করে।

ফৌজদার। হুজুর, খবর এসেছে চার্ণক কাশিমবাজার ছেড়ে হুগলীতে পালিয়েছে।

হুগলী—১৬৮৬

সৈনিক। ফৌজদার সাহেব, ঢাকা থেকে সুবেদার সায়েস্তা খান হুগলীতে আপনাকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

আবদুল গণি (হুগলীর ফৌজদার)। আচ্ছা, তুমি ঢাকায় ফিরে যাও সৈনিক। সুবেদার সাহেবকে সেলাম জানিয়ে বল, হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণি তাঁর চিঠি পেয়েছেন। গোলাম আলি!

গোলাম আলি (জনৈক সৈনিক)। হুজুর!

আবদুল গণি। ঘোষণা কর, হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণি হুকুম দিয়েছেন, ইংরাজদের বাণিজ্য এ দেশে চলবে না, কেউ তাদের সঙ্গে জিনিষ কেনা-বেচা করতে পারবে না।

গোলাম আলি। জো হুকুম হুজুর!

(কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় আসিয়া)

গোলাম আলি। হুজুর, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গ্যাছে, তারা বাজার লুঠ করতে এসেছিল, অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন লেসলী আবার সৈন্য নিয়ে আসছে।

আবদুল গণি। চল, আমি নিজে যাচ্ছি—এদের ঠাণ্ডা করতে হবে। বণিকবৃত্তির সঙ্গে রাজদণ্ডের সম্পর্ক এদের বোঝাতে হবে।

* * * *

আবদুল গণি। ভাই সব, চালাও কামান! দয়া নেই, মায়া নেই; দেশের স্বাধীনতা আগে। হে বাঙ্গালী, এগিয়ে চল···

(কামান গর্জ্জন)

গোলাম আলি। লেসলি পালাচ্ছে, হুজুর! তারা নৌকায় উঠেছে।

আবদুল গণি। চালাও কামান, লুঠ কর কুঠী, থামলে চলবে না!

(কামান গর্জ্জন)

গোলাম আলি। ওদের আরো অনেক সৈন্য এসে গেল—ওরা যে নদী থেকে বড় কামান দাগে (দূরে কামান গর্জ্জন)। ওরা এগিয়ে আসছে।

আবদুল গণি। না, দাঁড়ান যাবে না; ফিরে চল; তোমরা আমার সঙ্গে চুঁচড়োয় চল, ওলন্দাজদের সাহায্য নিতে হবে।

* * * *

ক্যাপ্টেন লেসলী। আমি এসেছি ফৌজদার আবদুল গণি সাহেব, যুদ্ধ করে কি লাভ আছে? আসেন, আমরা সন্ধি করি।

আবদুল গণি। আচ্ছা, এখন সন্ধি হোক, লেসলী সাহেব। এবার বড় জোর লড়েছ—দেখা যাক্ শেষ রক্ষা করতে পার কি না। জেনে রেখ দেশটা বাঙ্গালীর—তোমাদের জোর জুলুম চলবে না। বাণিজ্য করতে এসেছ, ব্যবসা কর—রাজার শক্তিকে আঘাত হানবার চেষ্টা কর না—ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঢাকা—১৬৮৬

সায়েস্তা খান। হুঁ, ইংরাজরা বাড়িয়ে তুলল দেখছি। এরা সুবেদার সায়েস্তা খাঁকে মানে না, হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।···ফৌজদার!

ফৌজদার। হুজুর!

সায়েস্তা খান। সিপাহ সালারকে আমার নাম করে বলে দাও ইংরাজদের হুগলী ও পাটনার কুঠী যেন ধ্বংস করা হয়। সিপাহ সালার।

(সিপাহ সালারের প্রবেশ)

সিপাহ সালার। হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণি সাহেব জানিয়েছেন যে ইংরাজরা হুগলী খালি করে দিয়ে সুতানটীতে আশ্রয় নিয়েছে।

সায়েস্তা খান। আচ্ছা, এখন দিন কতক চুপচাপ থাকুন।

(কয়েক মাস পরে)

সায়েস্তা খান। কি করা যায়? ইংরাজের অত্যাচারে দেশটা উচ্ছন্ন গেল দেখছি! খবর আসছে তারা মেটিয়াবুরুজের সরকারী গোলা লুঠ করেছে, থানা দুর্গ আক্রমণ করেছে, হিজলী দখল করেছে, বালাসোর মোগলদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, আমাদের জাহাজ জালিয়েছে।···আবদুস্ সামাদ!

(আবদুস্ সামাদের প্রবেশ)

আবদুস সামাদ। আমায় ডেকেছেন, সুবাদার সাহেব ?

সায়েস্তা খান। আপনাকে সৈন্য নিয়ে গিয়ে ইংরাজদের তাড়িয়ে হিজলী দখল করতে হবে।

সামাদ। তাই হবে, সুবাদার সাহেব। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

(কিছু দিন বাদে)

সায়েস্তা খান। কি খবর দূত ?

দূত। আবদুস সামাদ প্রথমে হিজলী ধ্বংস করে ইংরেজদের পরাস্ত করেন, কিন্তু তাঁকে পরে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়।

সায়েস্তা খান। একটু দাঁড়াও, এই চিঠিটা জব চার্ণকের কাছে পাঠিয়ে দিও. আর চার্ণক সাহেবকে বলে দিও, বাংলার সুবাদার সায়েস্তা খান ইংরাজদের অত্যাচারী হতে বারণ করে দিয়েছেন ও তারা উলুবেড়িয়ায় তাদের ছোট কেল্লা করে হুগলীতে ব্যবসা করতে পারে।

(কয়েক মাস বাদে)

সায়েস্তা খান। দিল্লী থেকে খবর পেলাম, ইংরাজরা আবার মোগলদের সাথে গুজরাটের কাছে গণ্ডগোল করেছে। নাঃ, এদের দেশ থেকে তাড়াতেই হবে। তাদের সুতানটীতে বাস করতে দেওয়া চলবে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হুজুর খবর এসেছে, চার্ণক সাহেবের জায়গায় হিথ সাহেব এসেছে। ইংরাজরা বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

সায়েস্তা খান। সুখবর এনেছ দূত। এ তবু মন্দের ভালো। তবু কেন ভবিষ্যতের কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছি, তা তো জানি না !

ঢাকা—১৬৮৯

ইব্রাহিম খান। সায়েস্তা খান তো চলে গেলেন আমায় বাংলার সুবাদার করে। ইংরাজ ব্যাপারীদের জন্য দুঃখ হয়। তারা কত আশা নিয়ে এসেছে ব্যবসা করতে, কত কষ্টই না সইতে হয়। আচ্ছা, আমি মাদ্রাজে জব চার্ণককে লিখে দিচ্ছি তাদের বাংলা দেশে আসতে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। বাদশাহের পত্র আছে, সুবাদার সাহেব !

ইব্রাহিম খান। ওঃ, বাদশাহ আওরঙ্গজীব লিখেছেন যে বার্ষিক তিন হাজার টাকার খাজনায় ইংরাজদের যেন বাংলা দেশে বাণিজ্য করতে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তুমি যাও সৈনিক ! দিল্লী যাবার পথে আমার সমস্ত কর্মচারীদের ইংরাজদের ওপর কোন অত্যাচার করতে বারণ করে দিও।

জব চার্ণক (বাহির হতে)। May I come in your Excellency Subadar Sahib, আমি কি আসিতে পারি ?

ইব্রাহিম খান। এসো বন্ধু চার্ণক, কি খবর ?

জব চার্ণক। আপনার দয়া হামি স্মরণ করিবে। পাটনার friendship এখনো আমার মনে আছে। তবে সুবাদার সাহেব, গত কয়েক বছরে আমাদের বড় কষ্ট গিয়েছে।

ইব্রাহিম খান। আর কষ্ট পাবে না সাহেব, ফিরে যাও—

চার্ণক। Goob bye ইব্রাহিম খান্ !

(বাহিরে যাইতে যাইতে)

চার্ণক। এখন হামি যাইতেছি—পরে আর হামরা বাণিজ্য করিব না, হামরা রাজা হইবে ; কবে সেদিন আসিবে ?

"বুদ্ধ-বাণী"

শ্রীদিলীপকুমার বসু

সব্ব পাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদনং এতং বুদ্ধানসাসনং ॥

বর্জ্জিয়া সকল পাপ কুশল কাজের সদ্‌গুণে,
নির্ম্মলিয়া চিত্ত তাপ কহেন বুদ্ধ অনুশাসনে।

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্‌ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্‌ঝতি ॥

গৃহীর গৃহ আচ্ছাদিত সুযত্নে,
ভেদ করিতে বারির কণা পায় না পথ।
চিত্ত তোমার বদ্ধ যদি সুভাবনায়
আসক্তি যে পায় না তাতে প্রবেশ-পথ ॥

অভিত্বরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করাতো পুণ্যং পাপস্মিং রমতীমনো ॥

মানব তুমি আশ্রয় নাও কল্যাণে
পাপ হতে মন ফিরাও তুমি সজ্ঞানে।
আলস্যহীন মনকে তোমার বাচাই করে
যত্নসহ কর্ম্ম ত্যাগে রাখো ধরে ॥

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিক বাদিনং ॥

ক্রোধকে তুমি আপন কর অক্রোধে,
অসাধুকে সাধুর দ্বারায় বশ কর।
কৃপণ যে, সে দানেই হবে আপনি বড়,
অসত্যকে সত্যে বেঁধে জয় কর ॥

মিনাকুমারী

সতীনাথ ভাদুড়ী

"তোমার চিঠি পেয়েছি। আজ সন্ধ্যার পর অনাথালয়ে যাব হেঁটে। রুকণী আগেই চলে যাবে রিক্‌শাতে। দেখা কোর। তোমার মিনাকুমারী"

১১-২-৪৭

এ দ লি ল খা না ও শিউচন্দ্রিকা পেয়েছিল অভিমন্যুর ঝোলার মধ্যে থেকে। প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা।··· মেয়েলি হাতের লেখা। সযত্নে বাঁচিয়ে তুলে রেখেছিল এখানাকে অভিমন্যু। ভৃগুর গণনার কাগজখানার মতই এখানিরও মূল্য ছিল তার কাছে। অথচ এর কথা ঘুণাক্ষরেও কোন দিন বলেনি অভিমন্যু কারও কাছে। সময়ে বললে হয়ত তার জীবনের রূপ বদলে যেতে পারত। আগে এটা ছিল তার গোপন কথা; একান্ত আপন কথা; যার চিঠি তাকে ছাড়া বলা চলে না। পরে যেদিন এই মধুর গোপন কথাটা এক কুৎসিত নগ্ন রূপ নিয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত পরিবেশে, সেদিন সে এই চিঠিখানা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবে দিতে পারত। ঐ অবস্থায় পড়লে ঐ রকম পাল্টা জবাব দিয়ে জয়নারায়ণপ্রসাদের মুখ বন্ধ করতে পারত হয়ত শিউচন্দ্রিকা। কিন্তু অভিমন্যু অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। পার্টির ভাল-মন্দর মানদণ্ড ছাড়াও অন্য মাপকাঠির খোঁজ সে রাখে। তার সূক্ষ্ম শালীনতা বোধ তাকে বিরত করেছিল আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে চিঠিখানা ব্যবহার করা থেকে। সে তখন তার পৌরুষের অপমানে—ভালবাসার অপমানে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল; উত্তর দিত কি করে?

শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে অভিমন্যু সময়ে বলেনি কেন এ কথা।··· শিউচন্দ্রিকার ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে কিন্তু দরদী মন নেই। ক্ষুর দিয়ে চুল চেরা যায়, কিন্তু কুঁচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুল নজরে পড়বার পর তবে তো সেটাকে চেরার প্রশ্ন ওঠে।

এখন শিউচন্দ্রিকা সব বোঝে। অভিমন্যুর জীবনের একটা গোপন কথার সন্ধান সে পেয়েছিল। তাও নিজে নয়; যার কাছ থেকে সে আশা করেনি এমন লোক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পর। ক্ষতি তার আগেই হয়ে গিয়েছে; পার্টির সম্মান ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। হয়ত তখন এই চিঠিখানার কথা শিউচন্দ্রিকা জানতে পারলে, সেই সময়ের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে একটি চিরাচরিত সামাজিক বন্ধনের পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারত সে। উৎসবের উপহার ছিল যার প্রাপ্য, সে পেয়েছিল নির্বাসনের দণ্ড।

ভাগ্যকে দোষ দেয়নি অভিমন্যু সে সময়ও। অস্পষ্ট ভাবে সে হয়ত বুঝেছিল যে তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যা অনেক কাল আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে, তারই দিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলছে সে। এর মধ্যে ভাগ্যের দোষ-গুণের প্রশ্ন অবান্তর। যে জিনিষের যা ধর্ম; তার মধ্যে ভাল-মন্দর প্রশ্ন ওঠে কোথায়?

রুকণী আর মিনাকুমারী চাকরীতে ভর্তি হওয়ার দিন কয়েক পর শিউচন্দ্রিকা জানতে পারে যে তারা অনাথালয়ের মেয়ে। তখন আর কিছু করবার ছিল না। সে নিজে সম্মতি দিয়েছে চাকরীতে তাদের নিযুক্ত করতে। ঐ মেয়ে দু'টি যদি এসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের হাতের মুঠোর লোক না হত, তাহলে হয়তো তাদের ইউনিয়নে টেনে আনা যেত; বিলক্ষণ ভুল করে ফেলেছে সে। আর সব চেয়ে বড় কথা, মজুররা সকলেই জানে যে এই মেয়েদের নিযুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীজির মতামত নেওয়া হয়েছে। তারা কি ভাবছে! অনাথালয়টাকে অধিকাংশ মজুর প্রায় গণিকালয় বলেই ভাবে। তাও আবার যে-সে ধরণের নয়,—এসিষ্টান্ট ম্যানেজার চালায়, ম্যানেজার আর হাকীম কি হুকুমদের জন্য; মিলের অন্যান্য বড় চাকুরেরাও পাত-কুড়োনো এঁটোটা-কাঁটাটা পায়।···দেখিস না, মিলের ভিতর কোয়ার্টার করে দিয়েছে। কেন বাপু, অনাথালয় খুলেছ, বর জুটিয়ে দাও মেয়েদের, বিয়ে দিয়ে দাও যেখানে পার। তা নয়! অনাথালয়ের ছোট ছেলের বিভাগটা পর্য্যন্ত অতি বদ। ঐ এঁচড়ে পাকা ছেলের দল, ফৌজের ব্যাণ্ড বাজিয়ে যখন চাঁদা তুলতে যায় সদরে, তখন কঞ্জুস মাড়োয়ারীগুলোও হেসে ঝনাঝন্ টাকা ফেলে শালুর কাপড়খানার উপর। মন্ত্রীজি অনাথালয়ের খেলাপ যেতে পারে না কেন জানিস তো? ঐ ছেলেগুলোই অভিমন্যুর কেসরপাক বিক্রি করে ষ্টেশনে। খাসনি 'কেসরপাক'? মোদকের মত খেতে; নিশ্চয়ই ভাং দেওয়া থাকে ওতে।···আর লক্ষ্য করেছিস, ঐ পটের বিবি দু'জনের রোজ মিল থেকে অনাথালয়ে যাওয়া চাই,—সন্ধ্যার পর।···

এ নিয়ে শিউচন্দ্রিকার কথা হয়েছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। অভিমন্যু বলে যে রুকণী আর মিনাকুমারী সন্ধ্যা বেলায় দু'ঘণ্টা করে অনাথালয়ে কাজ করে। দশ টাকা করে তার জন্য মাইনে পায় অনাথালয় থেকে, আর যাতায়াতের রিকশা-ভাড়া। ছোট বেলা থেকে সেখানে মানুষ। কত ছেলেমেয়ে অনাথালয়ে আসে যায়, ওরা কিন্তু চিরকাল থেকে গিয়েছিল। এখনও রোজ সাঁঝে হিসাব লেখে মিনাকুমারী। রুকণী তদারক করে রান্না-বাড়ীর ব্যবস্থার আর ছেলেপিলেদের খাওয়া-দাওয়ার। জয়নারায়ণ প্রসাদই করিয়ে দিয়েছে এই কাজ। আহা, করুক বেচারীরা দু'-পয়সা উপরী রোজগার।···না, না, শিউচন্দ্রিকা তুমিও সাধারণ বাজারের লোকের মত অনাথালয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে একটা যা-তা ভেবে নিও না। আমাকে তো কেসরপাক নিয়ে কত সময় যেতে হয় ওখানে। দেখেছি তো! তোমার-আমারই মত তাদেরও আত্মমর্য্যাদা-বোধ আছে। রক্ত-মাংসের শরীর; ভুল-ত্রুটি সকলেরই হতে পারে; তোমারও হতে পারে, আমারও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঢালা রায় দিয়ে দেওয়া যে অনাথালয়ের সব মেয়েই খারাপ, এ তোমার মত লোকের শোভা পায় না। একটা সাধারণ লোকের মত রটানো খার হুজুগে পড়ে সায় দিও না।

এমন করে শিউচন্দ্রিকাকে হক কথা শোনাবার সাহস এক অভিমন্যুরই আছে, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লে সে নিজের কথার মধ্যে একেবারে নিজেকে ঢেলে দেয়।

শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন অভিমন্যু, একটা সামান্য অনাথালয়ের কথায়। নিশ্চয়ই তার মনের কোন স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত লেগেছে। এ তো আগে ছিল না। পূর্বে এত সময় সে নিজেই অনাথালয় নিয়ে ঠাট্টা করেছে, বলেছে কেসর-পাক নিয়ে ওখানে যেতে লজ্জা করে; মনে হয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাকিয়ে দেখছে তার দিকে।

পরিবর্তনটা এসেছিল ইদানীং।

অভিমন্যুর দৃষ্টি ছিল ভাবুকের, মন ছিল কবির। তার ব্যবহারে ছিল খানিকটা খামখেয়ালী ভাব। বেলা বাড়ার সঙ্গে কোন সময় যেন নিখুঁত সাদা স্থলপদ্মে গোলাপী রঙের আমেজ লেগেছে। দৃষ্টি হয়ে এসেছে গভীর। একটা কিসের যেন ভার পড়েছে হাল্কা মনটার উপর। মেপে কথা সে কোন দিন বলতে পারে না বলেই হঠাৎ ভারিক্কে হয়ে ওঠেনি সে। তবে তার মন বলে, সে এত দিনে এমন একটা জিনিষের সন্ধান পেয়েছে, যা আঁকড়ে তার উড়নচড়ে মন চিরকাল স্থির থাকতে পারে। অভিমন্যু বোকা নয়; এর আগেও যখনই সে এক-একটা নতুন হুজুগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখনই তার মনে হয়েছে যে, সে ঐ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তার মন হাঁফিয়ে উঠেছে। তার মনের এই ধারাটা তার চাইতে কেউ বেশী জানে না। তবু অভিমন্যুর মনে হয়েছে যে এবারকার জিনিষটা কেবল একটা সাময়িক হুজুগ মাত্র নয়। এর মাদকতা অনেক মধুর, আকর্ষণ অনেক তীব্র আর বেশী বোধ হয় চিরস্থায়ী। সে আশ্চর্য্য হয়নি। ফল্গুতেও ভাদরে বান ডাকে তা সে জানে।

সেই 'ইনটারভিউ'এর পর কত দিন তার দেখা হয়েছে মিনা-কুমারী আর রুকণীর সঙ্গে অনাথালয়ে। লোকে যতই নিন্দা করুক, অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের উপর অভিমন্যুর ছিল এক সহজাত সহানুভূতি। সেইটাই যেন একটু বেশী ভাবে অনুভব করেছিল মিনা-কুমারীর বেলা। বেশ শান্ত সংযত ভাব মেয়েটির। ভারি গোছাল; 'কেসরপাক'-এর হিসাব-নিকাশ করবার সময় এর মনে মনে প্রশংসা করত অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে। অভিমন্যুর বোধ হয় মিনাকুমারীকে বেশী ভাল লেগেছিল পাশাপাশি তার বন্ধু রুকণীর সঙ্গে তুলনা করবার সুযোগ পেয়ে। রুকণী ছিল চটুলা, আর হয়তো একটু গায়েপড়া গায়েপড়া ভাবের। চঞ্চল কর্মব্যস্ততার মধ্যে খিল-খিল করে হেসে ফেটে পড়ত কথায়-কথায়।

রুকণী ভালবাসত ক্ষমতা আর অন্যকে একেবারে হাতের মুঠোয় রাখার আনন্দ। মিনাকুমারী ছিল তার অনুগত। সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসে। ঠিক লতা গাছের মত তারও দাঁড়াতে হলে একটা আশ্রয়ের দরকার হয়। রুকণীর তাঁবেদারী সে দ্বিধাহীন অন্তরে মেনে নিয়েছিল। তাই সে হতে পেরেছিল রুকণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রুকণীর সঙ্গে কেসরপাকের সূত্রে দেখা হওয়ার কথা নয়; কেন না, সন্ধ্যার পর দু'ঘণ্টার মধ্যে তাকে অনেক কাজ করতে হয় অনাথালয়ের। তবু রুকণী এর মধ্যেও সময় করে নিয়ে এসে, দু'টো হাসির কথা বলে যেতে ছাড়ত না অভিমন্যুর সঙ্গে, যেদিন সে যেত কেসরপাকের হিসাব করাতে।

মিলে চাকরী নেওয়ার আগে অভিমন্যুর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মিনাকুমারীর ছিল একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা। কবে সে বাধা কেটে গিয়ে একটা সহজ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা তারা বুঝতেও পারে না। আঁকড়ে ধরতে চায় মেয়েটি একটি আশ্রয়। তার মা-বাপের পরিচয় সে জানে না। অনাথালয়ের পুরানো খাতায় সে দেখেছে যে, তাকে পাওয়া গিয়েছিল বলীরামপুর জংশন-ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সেই যে এসে পড়েছিল এখানকার অনাথালয়ে, আর কোথাও যেতে পারেনি। কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি। শুক্‌নো রুটিন-বাঁধা জীবন এখানকার, থাকতে থাকতে সয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকই মনে হত এটাকে। কম দিনের কথা তো হল না, তখনও অনাথালয়ের উত্তরের দালানটা তৈরী হয়নি। তার পর কত লোক এল-গেল। কত মেয়ের বিয়ের যোগাড় করে দেওয়া হল ঐ তো মিলের গেনা সর্দারের স্ত্রী, সে তো অনাথালয়ের মেয়ে। কত মেয়ের পাঞ্জাবে বিয়ে দিয়ে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করল জয়নারায়ণ প্রসাদ। সব খবরই রাখে মিনাকুমারী। এখানকার একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনে নিত্য-নূতন ছেলে-মেয়ে-যুবতীর দল, যারা এখানে আসে, আবার চলে যায়। তারাই থাকে উত্তরের দালানে। বিচিত্র তাদের অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত তাদের জীবনের পিছল পথের কাহিনী।

অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষ যে তার আর রুকণীর বিয়ে দেওয়ানোর চেষ্টা করেননি, বাইরের লোকে তার নানা রকম কদর্থ করে। এ কথা মিনাকুমারী বা রুকণী কেউ বোধ হয় হলপ নিয়ে বলতে পারবে না যে পাবলিকের তাদের সম্বন্ধে সন্দেহের কোন ভিত্তিই নেই। এখানকার পরিবেশে কারও সে কথা বলার সাহস থাকতেই পারে না। এক-আধ বার এরই মধ্যে তারাও দমকা হাওয়ার ঝাপটায় মধ্যে পড়ে গিয়েছে জীবনে। তবে তার জন্য দায়ী তারা নিজেরাই; অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষের কোন হাত ছিল না তার মধ্যে। লোকে যা বলে বলুক। তাদের চাইতে বেশী তো আর কেউ জানে না। তবে তারা আসল কথাটা জানে, তাদের বিয়ের সম্বন্ধে অনাথালয়ের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার। জয়নারায়ণ প্রসাদরা এ কথা বোঝে যে মিনাকুমারী আর রুকণী চলে গেলে অনাথালয়ের কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে চলা সম্ভব নয়। ঝানু লোক জয়নারায়ণ প্রসাদ। সে জানে যে অনাথালয়ের হাড়-বজ্জাত মুনীমজী, দারোয়ান, দারোয়ানের স্ত্রী, আর ঐ ব্যাণ্ড মাষ্টারটা মিলে সব চুরি করে ফতুর করে দেবে যদি রুকণী আর মিনাকুমারী দেখা-শুনা না করে। তা'হলে আর চাঁদার পয়সা হিসাবের খাতায় উঠবে না, চালের বস্তা চালান হয়ে যাবে রান্নাঘরের পিছনের খিড়কির দুয়োর দিয়ে। অনাথালয়ের যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্যই এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সাহেব জুট মিলে মিনাকুমারীদের চাকরী জুটিয়ে দিয়েছেন। একবার করে সন্ধ্যার সময় এসে দেখা-শুনা করে গেলেই মুনীমজীর দলটা একটু ভয়ে-সয়ে চলবে। এই মেয়ে দুটিকে পঙ্কিল পথে নিয়ে যাওয়ার আস্কারা দেওয়া অনাথালয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেই জন্য অনাথালয়ের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা সকলেই জানে, এখানকার কার্য্য-কলাপের আঁধার অধ্যায়ের নায়িকা, যারা দু'চার

দিনের জন্য আসে তারাই ; এখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা কোন কালেই নয়।

শিউচন্দ্রিকার মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এ কথা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে অভিমন্যু, কিন্তু সাধারণ মজুরদের এ কথা কে বিশ্বাস করাতে পারবে ?

বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় কেবল জগতের আঁধার আর উদর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ-ভালবাসা, আদর-আবদার এ সবের জায়গা কোথায় এখানকার আবহাওয়ায় ? স্বার্থের রুক্ষতার ছোঁয়াচ লেগে সব শুকিয়ে যায় এখানে। নিজের মা-বাবা যে মেয়েদের ভালবাসতে ভুলেছে, তাদের মনের স্নেহ পাওয়ার জায়গাটুকু থেকে যায় একেবারে খালি। আপন বলতে যাদের জগতে কিছু নেই, কেউ নেই, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চায় এক জন জীবনের সাথী। তাই চেয়েছিল মিনাকুমারী। এ পৃথিবীর উপর তার বিশ্বাস নেই, এর ঝড়-ঝাপটা যাকে অনাথালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, তার সে বিশ্বাস থাকতে পারে না। তার বুভুক্ষু মন চায় তার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে গভীর ভালবাসা, এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য-জীবনের সব বাকী-বকেয়া উসুল করে নেওয়ার পরও যেন পুঁজিতে হাত না পড়ে। সে চায় একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ; বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখান নিকানো অঙ্গন ; উঠানের তুলসীমঞ্চটার পাশে একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। এই অঙ্গনটা হবে তার একান্ত আপন ; নিজেকে নিঃশেষ করা দরদ দিয়ে সে গড়ে তুলবে এই নীড়। সে নিত্য-নূতন চমক চায় না, চায় গেরস্থালীর জীবনের নিবিড় সুখ। তার সাথী নিজের দেহের প্রাচীর আর বাহুর শক্তি দিয়ে আগলে থাকবে তাকে বাইরের ঝড়-ঝাপটা থেকে। অধিকাংশ মেয়ের মত এই ছিল তার কাম্য। সাধারণ মেয়েছেলের মত মিনাকুমারীর মনটাও ছিল কিন্তু আত্মমর্যাদায় হিসাবী। অনাথালয়ের হিসাবের খাতা লিখতো বলে নয় ; স্বভাব থেকেই। ভারী সাবধানী মানুষ সে। না ভেবে-চিন্তে এক পা এগোয় না। নিছক ভাবের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে না। এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তার হয়েছে।

এরই মধ্যে তার জীবনে এল আপনভোলা অভিমন্যু। মিলে চাকরী নেবার আগেই মিনাকুমারীর ভাল লেগেছিল এই লোকটির অকৃত্রিম সৌজন্য। এই ছোট শহরের প্রতিটি লোক, এমন কি বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর নাম শুনেছে। বলীরাম-পুরের লোকের গল্পের বিষয়-বস্তু মাত্র দু'টি—মিল আর অনাথালয়। রসের খোরাক যোগায় অনাথালয়ের মেয়েরা, আর উদ্দীপনার যোগান দেয় মিলের মজুররা। প্রত্যহ লেগে আছে তাদের মিটিং ; ময়দানের বড় মিটিং, ভাঙ্গা হাটের খুচরো মিটিং, ছুটির সময়ের 'মিল গেট'-এর ছোট মিটিং। এ ছাড়া আছে কারণে অকারণে মিছিল, কত রকমের দিবস-পালন, হরতালের হিড়িক, মজুরদের ড্রিলের ক্লাস, তাড়ির দোকানের কোলাহল, মজুর-ব্যারাকের কীর্তন আর রক্ত গরম-করা গানের সমারোহ, থানা-পুলিশ, নিত্য-নূতন চাঞ্চল্যের অহোরাত্র উৎসব। তাই মিনাকুমারীও চিনত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুকে। অনাথালয়ে, মুনীমজী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের কাছে কত দিন শুনেছে যে এরা দু'জন মজুরদের ঠকিয়ে, নিজেদের পকেট ভরবার জন্য এখানে এসে জুটেছে ; তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু টাকা রোজগারের পর এক দিন উড়ে যাবে ফুড়ুৎ করে।

এ কথায় মিনাকুমারীরা বিশ্বাস করেনি কোন দিন। বলীরাম-পুরের আর দশ জন লোকের মত মিনাকুমারীও এদের শ্রদ্ধা করত, মনে মনে প্রশংসা করত। তখনও ভালবাসার প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে। সেটা উঠল কেসরপাক নিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক পর। মিনাকুমারী আর রুকণীর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এই সব সন্ন্যাসী-গোছের লোকদের শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ নাগাল পায় না ; সব কিছুর মধ্যে থাকলেও না কি শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর এমন একটা আলগা আলগা ভাব আছে, যার জন্য কেউ তাদের মনের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু কাজের সূত্রে অভিমন্যুর সান্নিধ্যে এসে মিনাকুমারীর ভুল ভাঙ্গে। ভয় আর সঙ্কোচ কেটে যায়। অভিমন্যুর সহজ প্রাণখোলা ব্যবহারে প্রতি-বেশের উপর ঔদাসীন্য নেই, অনাবিল উৎসাহের অভাব নেই তার কোন বিষয়ে, সে হেসে কথা বলতেও জানে, মধুর ব্যবহারে পরকে আপন করে নিতে অভিমন্যুর এক মুহূর্তও দেরী লাগে না ; প্রথমটায় মিনাকুমারী আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল ত্যাগী সন্ন্যাসীটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সব দেখে। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে সে ক্রমে জানতে পারে যে অভিমন্যু কোন লোককেই দূরে ঠেলে দেয় না, দরদী মনকে তো নয়ই।

যে তার সম্পর্কে আসে তারই উপর অভিমন্যুর মন হালকা পরশ রেখে যায়। মিনাকুমারীর উপর রঙের পরশ এত হালকা ভাবে লাগেনি। অনেককে কেবল দূর থেকেই ভাল লাগে ; কিন্তু মিনাকুমারী বুঝেছিল যে অভিমন্যুকে দূর থেকে তো ভাল লাগেই, কাছ থেকে আরও ভাল লাগে।

এই ভাল লাগালাগির পথে, অন্য লোক যেখানে হেঁটে চলে, অভিমন্যু সেখানে ছুটে চলে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে ? মনের নদীতে বান ডেকেছে ; দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। তাতে বাধা দেবার কে মনের রাজ্যের বাইরের লোকরা ? আর বাইরের লোকরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়ওনি।

শিউচন্দ্রিকা পার্টির ভাল-মন্দর ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পারে না। সেই যেদিন এস, ডি, ও সাহেবের সম্মুখে এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার খোঁটা দিয়েছিল তাদের কেসরপাকের চিনির সম্বন্ধে, সেই দিন থেকেই শিউচন্দ্রিকা ঠিক করে নিয়েছিল যে এই পর্ব যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করতে হবে। মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে স্থানীয় অনাথালয়ের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ মজুররা কি চোখে দেখে, তা শিউচন্দ্রিকা বেশ বোঝে। সে জানে যে তার ব্যক্তিত্বের জোরেই মজুরদের মধ্যে এই বিষয়ের কাণাঘুষোটা একটু কম আছে।

সেই জন্য শিউচন্দ্রিকা উঠে-পড়ে লাগে ইউনিয়নের আয় বাড়ানোর জন্য। ইউনিয়নের কিছু কাজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে মজুরদের দেখাতে পারলে তবে না এর উপর মজুরদের আস্থা বাড়বে। এবারে তোমাদের দু-দু'টো দাবী মিল কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে—'ক্রেশে' আর 'ক্যাণ্টিন'। তোমাদের ইউনিয়ন না থাকলে কোন দিন হত ?

ছেলে-পিলে হওয়ার আগে এক মাস আর পরে এক মাস বসে মজুরী দেওয়াচ্ছে তোমাদের এই ইউনিয়ন।

ও তো মন্ত্রীজি সমস্তিপুর মিলেও হয়েছে।

ভাল করে খোঁজ নিয়ো। হয়েছে ঐ নামেই। কাজে কত দূর কি হচ্ছে তাই দিয়ে না মিল-মালিকের শয়তানীর যাচাই করতে হবে তোমাদের।

ঠিক বলছে মন্ত্রীজি। রহমতের বিবিকে ভাল কাজ পাইয়ে দিয়েছে। দাইয়ের কাজ মিলে।

আরও অনেক দাবীর দরখাস্ত গিয়েছে পাটনায়। কেবল দরখাস্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে কড়া করে লিখে দেওয়া হয়েছে, দাবী না মেনে নেওয়া হলে কি করা হবে। বেশী মেম্বর না হলে সরকার তোমাদের কথা শুনবেই না, তোমাদের দরখাস্ত পড়বেই না। আর শুনেছ তো, দালালদের দিয়ে আর একটা লোক-দেখান ইউনিয়ন খোলার চেষ্টা করছে জয়নারায়ণ প্রসাদ। এই বলে দিলাম, তোমরা যদি নিজেদের ইউনিয়নের চাঁদা-দেওয়া মেম্বর না হও, তাহ'লে এক দিন কলেক্টর সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে দেবে ম্যাকনীল সাহেব যে ঐ দালাল ইউনিয়নটারই মেম্বর বেশী, সেইটাই আসল ইউনিয়ন। শীগগিরই ঝটপট্‌ সবাই মেম্বর হয়ে যাও। নিয়ে যাও কালু সর্দ্দার মেম্বর করবার রসিদ-বই। তাঁত-ঘরের প্রত্যেকটি লোককে মেম্বর করা চাই। আলবাৎ দেবে যেতে মিলের মধ্যে রসিদ-বই নিয়ে। তাঁত-ঘরের অধিকাংশ মজুর মুসলমান বলে তুমি বেশী মেম্বর করতে পারবে না বলছ। বাজে ছুতো দেখিও না। রহমৎ তো আছে তোমার সঙ্গে। না, না, কোন ওজর শোনা হবে না কালু সর্দ্দার, এই নাও চারখানা মেম্বরী রসিদ-বই। এখানে দস্তখত কর, এই ডান দিকে। কেউ চাঁদা বলে আলাদা কিছু দিলে নেবে বৈ কি। তার জন্য কিন্তু এই আলাদা চাঁদার রসিদ দেবে।···

ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

শিউচন্দ্রিকা মনে মনে হিসাব করে যে কেসরপাক তৈরী করা তুলে দিলে, অভিমন্যু সপ্তাহে পুরো এক দিন করে সময় বেশী পাবে পার্টির কাগজ আর বই-টই বেচবার জন্য। তার জন্যও কিছু আয় বাড়বে। চলে যাবে এক রকম করে ইউনিয়নের খরচ। যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে সে।···আর গোটা কয়েক ইউনিয়নের দরকারী জিনিষ কিনবার পরই, শিউচন্দ্রিকা তুলে দেবে কেসরপাকের পাট। কত জিনিষের তাদের দরকার এখনও,—মিটিংয়ের জন্য সতরঞ্চি, একটা বড় লণ্ঠন, অফিস-ঘরের জন্য আলমারী, একটা বড় সাইনবোর্ড, গোটা কয়েক টিনের ভেঁপু, ফ্যাক্টরী আইন সংক্রান্ত দু'খান দরকারী বই, আরও কত কি। ছেড়ে দেব বললেই কি অমনি ছেড়ে দেওয়া যায় কেসরপাক তৈরী? অনেক হিসাব করে চলতে হয় শিউচন্দ্রিকাকে।

হতে-করতে বছরখানেক কেটে যায়।

তার পর এক দিন শিউচন্দ্রিকা হুকুম দিয়ে দেয়, অভিমন্যু আর এ মাস থেকে চিনি এনো না—'কেসরপাক'এর জন্য।

এ দুর্দিন অভিমন্যুর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু হতাশায় তার মন মুষড়ে পড়ে। সাজা প্রত্যাশিত বলে কি ফাঁসির রায় বেরুনর পর খুনী আসামী হাসে? প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সে যায় অনাথালয়ে, আগামী সপ্তাহের 'কেশরপাক' দিতে, আর গত সপ্তাহের দেওয়া 'কেসরপাক'এর দামটা আনতে। শনিবারটা আর আসতেই চায় না। ঐ দিনের ঐ সময়টুকুর প্রতীক্ষায় সারা সপ্তাহ দিন গোণা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে গত দেড় বছরের মধ্যে। এই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা তার মনে জুগিয়েছে একটা মধুর উত্তেজনার রস, জ্বালিয়েছে তার মন্থর জীবনে অনভ্যস্ত উৎসাহের আগুন, রঙীন করে তুলেছে তার রুক্ষ কোলাহলমুখর আবেষ্টনী। এই মিষ্টি আলো-আঁধারি প্রতীক্ষার উপর শিউচন্দ্রিকা হঠাৎ রূঢ় হাতে যবনিকা টেনে দিচ্ছে!

অভিমন্যুর সন্দেহ হয়,—শিউচন্দ্রিকা তাহ'লে বোধ হয় তার মনের মধুর গোপন কথাটার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয় সে এই অধ্যায় শেষ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। জ্ঞানী-মূর্খ শিউচন্দ্রিকা। মনের সূক্ষ্ম জটিল গ্রন্থির বালাই নেই তার। তাই সে জানে না যে এ গ্রন্থি যত জোর করে খুলতে যাবে, তত আরও জট পাকিয়ে যাবে। গুড়ের মধ্যে মাছি আরও জড়িয়ে পড়বে।···

সেই জন্যই এই 'কেসরপাক' তৈরী বন্ধ করার অনুরোধকেও অতি আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল, অভিমন্যুর।

অনুরোধ? না আদেশ? তার মনটা কি বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীর হাতের এক তাল কাদা না কি? সেটাকে দিয়ে যেমন ইচ্ছে পুতুল তৈরী করবার অধিকার মন্ত্রীজিকে কে দিয়েছে?

এই খবরে অভিমন্যুর চাইতেও অভিভূত হয়ে পড়ে বেশী মিনাকুমারী। এমনিই সে কম কথা বলে। সেদিন নিজেকে নিজের মধ্যে আরও গুটিয়ে নেয় শামুকের মত। কেসরপাকের শেষ হিসাবে ভুল করে ফেলে। কানে ভেসে আসে অভিমন্যুর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরের কথার টুকরোগুলো। শেষ পর্য্যন্ত চোখের জলে হিসাবের খাতার কালির আঁচড়গুলো আর দেখা যায় না।···

···মিলের মধ্যে তোমাদের কোয়ার্টার। সেখানে তো আমরা যেতে পারি না।···দেখা না হলেও এক জায়গাতেই তো আমরা আছি।···রহমতের বিবিই তো 'ক্রেশের' দাই। তারই মারফৎ খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া চলবে। কিন্তু রহমতের বিবিকে বলে দেবে যে খবরদার! শিউচন্দ্রিকা যেন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতে না পারে। ···লক্ষ্য করেছ মিনা, ছেলের আর মেয়ের মনের মধ্যে কত তফাৎ? আমি এ সব কথা ইঙ্গিতেও জানাইনি শিউচন্দ্রিকাকে; কিন্তু তোমার বন্ধু রুকনীকে মনের সব কথাই তুমি বলেছ।···তোমরা দুই বন্ধুতে রিক্‌শা চড়ে রোজ যখন আসবে অনাথালয়ে সেই সময় চোখের দেখা দেখে নেওয়া যাবে মাঝে-মাঝে।···

অভিমন্যুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। জোর করে মুখে হাসি এনে, পুরুষের মনের জোর মেয়েদের চেয়ে কত বেশী তাই দেখাতে চেষ্টা করে। কখন যেন মিনাকুমারীর নরম আঙুল ক'টা এসে পড়ে অভিমন্যুর শক্ত মুঠোর মধ্যে।

হঠাৎ রুকনী এসে পড়ায় দু'জনেই হাত সরিয়ে নেয়। রুকনী দেখেও দেখে না;—এত লুকোচুরির কি দরকার ছিল তার কাছে? অন্য দিনের মত আজও সে ক্ষণিকের উচ্ছল হাসিতে ঘর মাতিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়।—'ভাঁড়ারের ছিষ্টি কাজ বলে আমার পড়ে রয়েছে এখনও।'···

তার পর মাঝে-মাঝে রহমতের বিবির মারফৎ খবরাখবরের আদান-প্রদান চালিয়েছে মিনাকুমারী আর অভিমন্যু। ভাবপ্রবণ অভিমন্যু কত সময় তার মনের ব্যথা ঢেলে উজাড় করে দিয়েছে চিঠির কাগজের উপর। দেখাও হয়েছে তার মিনাকুমারীর সঙ্গে দিন কয়েক। অনাথালয়ে যাওয়ার পথে রুকণীই বোধ হয় ইচ্ছে করে সুযোগ ঘটিয়ে দিয়ে থাকবে। মিল থেকে বলরামপুর বাজারের অনাথালয় আড়াই মাইল দূর হবে। পথের দু'ধারে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল আম বাগান। বাজারের কাছাকাছি গিয়ে ঘন বসতি আরম্ভ হয়েছে।

এই পথের ধারের দীক্ষিৎদের আম-বাগানে দেখা হয়েছিল তাদের মিনাকুমারীর কাছ থেকে ঐ চিঠিখানা পাওয়ার পর।

মিনাকুমারী বড় সাবধানী বেশী। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও গভীর আবর্তের দিকে যাতে সে না চলে যায়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি আছে। তাই সে সাধারণতঃ রহমতের বিবিকে মুখে মুখেই খবর পাঠাতো দরকার হলে। মিনাকুমারীর অভিমন্যুকে দেওয়া চিঠি, এইখানাই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষ। তাই এই চিঠিখানিকে যত্নের ধনের মত আগলে ঝোলার মধ্যে রেখেছিল অভিমন্যু।

সেদিন দেখা হয়েছিল তাদের, অনেক দিনের পর। যত দিন অভিমন্যুর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দেখা হত অনাথালয়ে তত দিন মিনাকুমারী বেশী ভাববার সময় পায়নি; দুর্নিবার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। তার পর এত দিনের অদর্শনের ছুটিতে, তার হিসাবী মন সমস্ত ব্যাপারটা সুস্থির হয়ে ভাববার সময় পায়। মনের তুলাদণ্ডে সে ওজন করে দেখতে চেষ্টা করে, জীবনের সাথীরূপে অভিমন্যুকে নেওয়ার লাভ-লোকসান। অভিমন্যুর বাড়ীতে আর কে আছে, বাড়ীর অবস্থা কেমন, জমি-জমা আছে কি না কত কথা তার জানতে ইচ্ছা করে। মিনাকুমারী বোঝে মনে মনে যে টাকা আনা পাইয়ের হিসাব খতিয়ে জীবনের সাথী বাছবার কথা শুনলে অভিমন্যু হাসবে। সে জানে যে দু'দিনের ভালবাসার বেলা এ প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে, কিন্তু সারা জীবনের সঙ্গী যাকে করতে হবে, তার সম্বন্ধে এ সব খোঁজ নেওয়া অনুচিত নয়। চোখ বুজে সে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।···ইউনিয়নের কাজ থেকে নিশ্চয়ই কিছু রোজগার আছে অভিমন্যুর। না থাকলে খাওয়া-পরা চলে কি করে? একেবারে বিনা মাইনেতে লোকে সারা জীবন কাজ করতে পারে এ কথা মিনাকুমারী ভাবতে পারে না।··· যে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবন সে চায়, তা অভিমন্যুকে পেলে পূর্ণ হবে তো? অভিমন্যু যদি রাজনীতির কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন চাকরী-বাকরী বা রোজগার করে তা'হলে বড় ভাল হয়। থানা-পুলিশ, জেল, অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা, নিত্য নূতন ঝঞ্ঝাট রাজনৈতিক কর্মীর জীবনে। মিনাকুমারীর জন্য, আর গার্হস্থ্য জীবনের লোভে অভিমন্যু কি কোন দিন ছাড়তে পারবে এই জীবন? রুকণীর কাছেও সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করে। রুকণীর তাই মত —সব খবর ভাল ভাবে না জেনে ফাঁদে পা দেওয়া ঠিক নয়। তুই বড়লোক স্বামী চাস না। অতি সামান্য তোর প্রার্থনা। তাও যদি না পাস অভিমন্যুর কাছ থেকে তা'হলে খবরদার, ও-পথ মাড়াস না। না হলে সারা জীবন কেঁদে মরবি। তার চাইতে এখানকার জীবন অনেক ভাল। সুখ না থাকুক আরাম তো আছে। আবার ভাবিস না যেন যে তুই চলে গেলে আমাকে একলা থাকতে হবে বলে আমি ভাঙচি দিচ্ছি। আমি হিংসায়ও ফেটে পড়ছি না বুঝলি। ঐ কুলী-মজুরদের সর্দারদের উপর আমার লোভ নেই তোর মত।···

তার পরই মিনাকুমারী লিখেছিল ঐ চিঠিখান অভিমন্যুকে। মনে মনে ভেবেছিল, অভিমন্যুর জীবনের সম্বন্ধের সব দরকারী খবর আজ কোন রকমে জেনে নিতেই হবে। এর জন্য বেশী চেষ্টা করতে হয়'ন। এত দিনের মনের রুদ্ধ স্রোত ছাড়া পাওয়ার আবেগে অনর্গল কথা বলে যায় অভিমন্যু।······বাড়ীতে কেই বা আছে তাঁর। থাকার মধ্যে আছেন তো কাকা আর কাকীমা। তবে বুঝলে মিনা, সেদিকে যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার জরিমানার টাকা সেবার কাকা দিয়েছিলেন। তার পর কাকা-কাকীমার দিন-রাত আমাকে গালাগালি। আমি বলি যে, আমি ক'দিন বাড়ী থাকি? আমার জমির ফসল তো কখনও খেতে আসি না। তা এত রাগারাগির দরকার কি, ও জমি ক'বিঘা তোমার নামেই লিখে দিচ্ছি ঐ জরিমানার টাকাটার বদলে। আমাদের বাড়ী দেখতে যাবে বলছ? সে গুড়ে বালি। গেলেই কাকীমা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে আসবে। ওদেরই বা দোষ দিই কি করে। একবার যখন ফেরার ছিলাম, তখন পুলিশে কাকার গরুর গাড়ী নীলাম করবে বলে নিয়ে গিয়েছিল কাছারীতে। এখন তাঁদের ইচ্ছে যে আমি গ্রামে বসে হাতুড়ে বদ্যির কাজ করি, বংশলোচন আর সোনাই-পাতা বেচি আমার বাবা-কাকার মত। তবেই আমাদের বংশের নাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আরও সব এলোমেলো কথা এক জায়গায় করে মিনাকুমারী ধরে নেয় যে অভিমন্যু যে ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা এঁকেছে মনে মনে, তাতে রাজনৈতিক কর্মজীবন ছাড়বার কোন কথাই তার মনে ওঠেনি। তা হলে কি মিনাকুমারীকেও তার কর্মজীবনের সঙ্গিনী হতে হবে? রাজনৈতিক জীবনের কুশ্রী কর্মব্যস্ততা আর অনিশ্চয়তা তার সত্যিই খারাপ লাগে। যদি তাকে অভিমন্যু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করতে না ও বলে, তা হলেও সংসারের খরচ চালাবার জন্য তাকে চাকরী করতেই হবে। এ মিলের চাকরী কিন্তু থাকবে না। করতে হবে অন্য চাকরী, সে কাজ আবার কেমন হবে তা কে জানে। মিনাকুমারী হিসাব করে দেখে। এর বদলে সে পাবে অভিমন্যুকে। সে লাভটা অনেকখানি। তার লোভ কম নয়। তবুও খানিকটা দোল খাওয়ার পর মনের দাঁড়িপাল্লায় লোকসানের দিকটা ঝুঁকে পড়ে নীচে। ঘরপোড়া গরু সে। অনিশ্চিত জীবনের ঝক্কি পোহাতে সে রাজী নয়।

অথচ সত্যি ভাল লাগে তার অভিমন্যুকে। এ ভাল লাগার মধ্যে ভেজাল নেই। তাই তার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলেও, আজকের মনের ভাব সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবে না অভিমন্যুকে।

খানিক আগের দাঁড়িপাল্লার হিসাবটা ছিল পাইকারী, সারা জীবনের পণ্যের। খুচরো হিসাবের দাঁড়িপাল্লা আলাদা। এ হিসাবের অভিমন্যু, তার ভালবাসার অভিমন্যু, সেই অনাথালয়ের 'কেসরপাক'-এর অভিমন্যু। এত দিনের অদর্শনের পর দেখা মানে একেবারে নতুন করে পাওয়া। সেই অভিমন্যুর কথা মনে

করে সে হিসাব খতিয়ে বেহিসাবী হতে পারে ;—সারা জীবনের জন্ত নয়, খুচরো এক দিনের জন্ত। কেবল আজকের দিনটার জন্ত।

সারা জগৎ আজ বেহিসাবী হয়ে উঠেছে। দীক্ষিৎদের আম-বাগানে আমের মুকুলের হিসাব নেই, মৌমাছির গুঞ্জনের বিরাম নেই, পশ্চিমে বাতাসে পাতা-ঝরার শেষ নেই। আজকের দিনে মিনাকুমারী নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কেবল আজকের দিনটার জন্ত, আঁধারের কাছ থেকে চুরি করা এই সময়টুকুর জন্ত।

এক ঝাঁক ফড়িংএর মত ছোট-ছোট পোকা ফড়-ফড় করে উড়ে তাদের জ্বালাতন করে মারলো। সাত্যকার বেহিসেবী অভিমন্যুর উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে হিসেব-করা বেহিসেবী মিনাকুমারীর সীঁথির চুলে। আমের মুকুল থেকে দু'জনের দেহে টপ-টপ করে মধু-ঝরার বিরাম নেই। দু'টি দেহের দুয়ারে রসের কৌটার টোকা পড়ছে, কিসের যেন সঙ্কেত ক'রে। মধুতে চটচটে হয়ে উঠেছে ঝরাপাতার রাশি। মিনাকুমারীর আর অভিমন্যুর গায়ে, কাপড়ে, সর্বাঙ্গে যেখানে লাগছে এঁটে যাচ্ছে।...

[ক্রমশঃ

ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের সহিত বাঙ্গালীর রক্ত-সম্পর্ক

যতীন্দ্রনাথ নন্দী

শৈশব কাল হইতে শ্রীহট্ট প্রদেশে একটি জনপ্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি যে, শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত ছইলাগ্রামের পঞ্চপ্রবর মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত দাস-বংশের পদ্মিনী জাতীয়া কোন এক কন্যা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজমহিষী ও রাজ-মাতা হইয়াছিলেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া উক্ত দাস-বংশের আম-শ্রদ্ধেয় বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত ডি, এস, পি শ্রীযুত বিপিনবিহারী দাস মহাশয়কে কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি নিম্নলিখিত বিবরণ জানাইয়াছিলেন। বিপিন বাবুর অনুজ শিলং কন্‌ট্রোলার অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত পার্ব্বতীমোহন দাস মহাশয়ের কাছেও ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত পত্র কয়েকখানা দেখিয়াছি।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে উক্ত দাস-বংশের স্বর্গীয় রামনারায়ণ দাস মহাশয়ের ঔরসজাতা পদ্মিনী জাতীয়া কন্যা স্বর্গীয়া চন্দ্রতারা দেবীর সহিত ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুরের বিবাহ হয়। তিনি উক্ত মহারাজা বাহাদুরের পাটরাণী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী ছিলেন এবং স্বর্গীয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের জননী ছিলেন। বর্ত্তমান রাজবংশ ইঁহারই উত্তর-পুরুষ ইহা সত্য। চন্দ্রতারা দেবীর ছয় জন সাহোদর তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় মোহনলাল দাস ঠাকুর সাহেবের উপাধিতে ভূষিত হইয়া রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহারই নামানুসারে হরষপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট মোহনগঞ্জ নামে একটি বাজার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রাজমহিষী চন্দ্রতারা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী দুই জন ৺রী ব্রজেশ্বরী দেবী ও ৺রী রসমঞ্জরী দেবীকে ত্রিপুরার অভিজাত বংশে বিবাহ দেওয়া হয়। স্বর্গীয় জানকীবল্লভ মহারাজ ব্রজেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি ঢাকা জিলার ফরিদাবাদে রাজা উপাধিবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী ছিলেন। ব্রজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত পুত্র মুকুন্দরাম রাজা বাহাদুর ঢাকা ফরিদাবাদ হইতে আগরতলা চলিয়া আসেন। তাঁহাকে রাজা বাবুও বলা হইত। ইঁহার পুত্র ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় আগর-তলায় উক্ত রাজা বাবুর বাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন।

রসমঞ্জরী দেবীকে ত্রিপুরা সিঙ্গারবিলের শিবজয় উজীর বিবাহ করেন। উক্ত দম্পতির পুত্র ঠাকুর স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দেববর্ম্মণ কিছু দিন হইল একটি মাত্র কন্যা-সন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গ আগরতলা উজীর-বাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন।

স্বর্গীয় রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুর পদ্মিনী কন্যা চন্দ্রতারা দেবীকে বিবাহ করার পর তাঁহার শ্বশুর রামনারায়ণ দাস মহাশয়কে মোহনগঞ্জ মনতলা অঞ্চল হইতে আগরতলা রাজ্যের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একুশটি তালুক দান করেন।

শ্রীযুত বিপিন বাবু হইতে জানিলাম, ১১৩০ সনে তিনি পুলিশ কনফারেন্স উপলক্ষে আগরতলা যাওয়ার পর স্বর্গীয় মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র কর্ত্তা বাহাদুর, শ্রীযুত ঠাকুর প্রতাপ রায় ও কিশোরী-মোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহাদের নিজ-নিজ বাড়ীতে দেখা করিয়া পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের সকলের কাছেই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীযুত বিপিন বাবুর কাছে ঠাকুর শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায়ের ও তাঁহার জনৈক পুত্র মেজর শ্রীমান্ প্রমোদচন্দ্র রায়ের সম্প্রতি লিখিত অনেক পত্র দেখিয়াছি। ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের সহিত (বর্ণিত পদ্মিনী কন্যা বিষয়ক) বাঙ্গালীর রক্ত-সম্পর্ক কাহিনী অধুনা দেশের লোক বিস্মৃত হইয়াছিল। এ জন্য পুরাতন কাহিনী পুনঃ প্রকাশের আশায় বিখ্যাত 'বসুমতী' পত্রিকায় মুদ্রণ জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। অনুসন্ধিৎসু যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয় উপযুক্ত চেষ্টা লইয়া এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়

শ্রীঅজিত বিশ্বাস

রাত্রির অন্ধকার বাইরের পৃথিবীতে। কালো, ঘোলাটে অন্ধকার। গ্রীষ্মের রাত্রি, ফ্যানের তলায় চমৎকার রাত্রি। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইটের ছটায় মেয়েটির সারা দেহ যেন পরিপূর্ণ যৌবনভারে ফুটে উঠেছে, ফুলের পাঁপড়ির মত নরম তনু শিরশিরিয়ে উঠল। তরুণ শিল্পী অরিন্দম রায় খুঁজতে বেরিয়েছিল মডেল, বন্ধু যতীনের পরামর্শে সে এসেছিল রত্নাশ্রীর কাছে। রত্নাশ্রীকে পেল না, তার ভেতর ফুটে উঠল সিঁদুরপুরের একটি মেয়ে, তার অতীতের খেলার সাথী বেলা, বেল ফুলের মত স্নিগ্ধ, সুন্দর।

"জীবনে আমরা বেছে নিয়েছি দুর্গম পথ। আমার এ পথ দুর্গম কিন্তু হেয় নয়। তুমি টাকা ফিরে নিয়ে যাও, তোমরা যখন পার না আমাদের সম্মান করতে তখন টাকার প্রলোভন দেখিও না।" উঠে দাঁড়াল বেলা, চকিত বিদ্যুৎ:

"রাগ কর না। আমার মনে কোনও দুরভিসন্ধি নেই। আমিও মানুষ, নারীকে আমিও সম্মান করি। কিন্তু নীচে নেমে-যাওয়া নারীর দলকে নয়, তাদের আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না।

"মনুষ্যত্বের নামে গর্ব তুমি কর না বেলা, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে মানুষের মত অন্তঃসারশূন্য সেখানে গর্ব হয় খর্ব। বলছি না তুমি তোমার মনুষ্যত্ব একেবারেই হারিয়েছ, কিন্তু তুমি হারিয়েছ নিজেকে। হারিয়েছ তোমার আত্মাকে, তোমার বিবেককে। তোমার পবিত্র দেহ-মন্দির দেবতার পূজায় লাগতে পারত, তাকে তুমি হীন করেছ, সামান্য লোভে তুমি যে পথে নেমে এসেছ সেটা সমাজের নিম্নস্তর। সেখানে প্রেম নেই, মনুষ্যত্ব নেই, নেই নিজেকে বিস্তার করবার প্রয়াস; আছে শুধু আত্মদান। তুমি নিজেকে বিক্রী করেছ বেলা, নিজেকে করেছ হীন, বিকৃত।"

"তোমার কাছে বলবার মুখ আমার আজ নেই। তবুও অতীতের সেই স্নেহের দাবীতে তোমায় আমি অনুরোধ করছি, আমায় বারবনিতা বলে ঘৃণা করতে পার, কারণ তোমাদের মন আমাদের প্রতি এতটা উদার হয়নি, কিন্তু দোহাই তোমার, আমায় মনুষ্যত্বহীন বল না। আমি মানুষ, অমানুষ নই, বর্বর নই। আমার এই দেহ শিল্পীর কাম্য, এই দেহের মডেলে শিল্পীর সাধনা হয় পূর্ণ। কিন্তু বিশ্বাস কর, বর্বরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমার এ দেহ নয়।"

"কিন্তু তাই তো সবাই জানে। তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি বারবনিতা।"

"লোকে তাই জানে। শিল্পীর কাছে আমার দেহের বাইরের আবরণটা খুলে ফেললেই কি আমি হীন হয়ে পড়লাম? আমি লজ্জাহীনা হোতে পারি কিন্তু চরিত্রহীনা নই।"

তোমার পথ শ্রদ্ধার পথ নয়। সিঁদুরপুরের বেলা আজ আর তুমি নও, তোমার মানসিক পরিবর্তনের সংগে সংগে তুমি তোমার নামটাও বদলে দিয়েছ। আগে তুমি ছিলে বেলা, ঘরের এককোণে তুমি গোপনে সুরভি বিলাতে, আজ তুমি রত্নাশ্রী; আগে তোমার মূল্য ছিল না, ছিল সৌরভ, এখন সৌরভ হারিয়ে তোমার মূল্য গেছে বেড়ে।"

অরিন্দমের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রত্নাশ্রী। নিজের ঘরে এসে সে বাতি জ্বাললে, আয়নায় চোখে পড়ল নিজেকে। তলার ঠোঁটটা অভিমানিনীর মত ফুলে উঠল। মনুষ্যত্বহীন, বর্বর, হীন, স্বার্থপর। লোভ দেখাতে এসেছিল আমায়, অর্থের লোভ। চেয়েছিল টাকা দিয়ে আমার নারীত্বকে কেড়ে নিতে। আয়নায় প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিচ্ছবির দিকে সরোষে দৃষ্টিপাত করে খুলে ফেললে উত্তমাংগের আভরণ ও আবরণ। উন্নত সুস্পষ্ট বক্ষ, নিটোল দুই বাহুলতা, ভগবানের সৃষ্টি, শিল্পীর সাধনা।

কালো চোখে ছায়া নেমে এল। রাত্রির ছায়া, অন্ধকারের ছায়া, ঘুমের আমেজ। মিথ্যা উত্তেজনায় রত্নাশ্রী ফুলে উঠল, দুলে উঠল। এ তার গতি, চলার পথে গতি তার ব্যাহত হতে পারে না, হতে সে দেবে না। তার চোখে আছে তীক্ষ্ণতা, আছে মৃত্যুর ইসারা। আজ তার সামনে ফুলে-ফেঁপে উঠল পুরানো অতীত। সোনায় মোড়া; রক্তের প্লাবনে ভেসে যাওয়া ঝাপসা অতীত। পাশ-বালিশটা চেপে ধরল বুকের ভিতর। নরম বিছানার মত নরম বুক শিউরে উঠল, দুলে উঠল। কোন অতীতের

ফেলে-আসা, গড়িয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভেবে রত্নাশ্রীর অন্তরাত্মা উদ্বেলিত হয়ে উঠল বিচ্ছেদ মর্মবেদনায়।

তখন তার নাম ছিল বেলা। সিঁদূরপুরের এই একটি মাত্র মেয়ে যার স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। ঘরের বাঁধনে, স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্য তার মন ক্ষণিকের জন্যও ব্যাকুল হয়নি। সেই বেলা হঠাৎ ধরা পড়ল তার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী অরুদা'র নিকট। দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়, কামনার তীব্র জ্বালার উত্তেজনায় নয়—সাধারণ প্রেমের পুনরাবৃত্তির জন্যও নয়। ধরা দিয়েছিল বৃহত্তর মুক্তির প্রেরণায়, অরুদা'র সাথে সে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। জীবন তার চলত ঠিক, কিন্তু ভীরু অরুদা'র ভীরুতার জন্য তাকে ত্যাগ করতে হল। অতীতের পথে তার অরুদা' ফিরে গেল। বেলার বুকে অরুদা'র নিস্পৃহতা বড় বেশী বেজেছিল। কিন্তু কোনই উপায় ছিল না, অরুদা' ফিরে গেলেও বেলা ফিরল না, সে রয়ে গেল কলকাতায়। আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে সে করতে লাগল শিল্পের সাধনা। হঠাৎ তার জীবনে এল নীরোদ। এইবার সত্যিকারের সাথীর মিলনানন্দে আত্মহারা হয়ে সে নীরোদের তালে তালে উদ্দাম ছন্দে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু নীরোদের সংগে বেলার বিয়ে গেল ভেঙে—যখন সে জানতে পারলে বেলা ইতিপূর্বে অন্য একটি ছেলের সংগে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল। পিতা আপত্তি তুললেন, নীরোদ স্বীকার করল।

এইখানেই বেলার জীবনে এল পরিবর্তন। স্বার্থপর পুরুষ-জাতটার ওপর হল তার অপরিসীম ক্রোধ। ঘৃণায়, বিরক্তিতে সে ছেড়ে দিলে আর্ট স্কুল এবং চলে এল তার বান্ধবী ইংরাজ যুবতী জোসেফার সাথে তাদেরই জাতের একটি পল্লীতে।

জোসেফা ছিল শিল্পীর মডেল। বেলা দেখতো জোসেফার নিকট আসত শিল্পীরা, জোসেফার উলংগ মূর্তি চিত্রে ও মৃন্ময়ে প্রতিফলিত করতে। কেমন অসংকোচ নির্লজ্জতায় তাদের সামনে জোসেফার যৌবনোচিত দেহ বিকশিত হোত; সুডৌল, সুন্দর যৌবন-উদ্ভাসিত দেহবল্লরী।

"তোমার এতে লজ্জা করে না জোসেফা?" এক দিন বেলা শুধোলে।

"বাই জোভ্! এতে লজ্জা পাবার কি আছে? আমি শিল্পী, তারাও শিল্পী, শিল্পী আসে আমার কাছে আবিষ্কারের লোভে, নূতনত্বের লোভে; সুন্দরকে বিকশিত করবার জন্য আমার কি লজ্জিত হওয়া উচিত? আমার এ দেহ, এ তো ভগবানের সৃষ্ট, এ দেহ দেখাতে আমার তো লজ্জা করে না?"

কথাগুলো বেলা শুনলে কিন্তু সুস্থির হোতে পারলে না।

জোসেফা বলে, "বিলেতে মেয়েরা নগ্ন দেহে রৌদ্রে সমুদ্র-সৈকতে পড়ে বেড়ায় স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য। ডাইভ্ মারতে মেয়েদের লজ্জা করে না, পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লজ্জা করে না, মডেল হলেই লজ্জা। এ সব প্রেজুডিস্ আমাদের দেশে নেই।"

গোপনে এক দিন জোসেফা দেখল বেলার দেহ। কানায় কানায় যৌবনের অফুরন্ত লাবণ্যশ্রী। ভেতরে কেঁপে-ওঠা যৌবন যেন দু'কূল ছাপিয়ে উছ্‌লে উঠছে। এ দেহ শিল্পীর কাম্য। "হবে তুমি মডেল?"

"মডেল? ছিঃ ছিঃ! তা আমি পারবো না!" লজ্জায় যেন কেঁপে উঠ্‌লো বেলা।

"কেন, ক্ষতি কি? আচ্ছা, আজ তুমি হও আমার মডেল, দেখবো কেমন তুমি পারো।" বললে জোসেফা।

সত্যিই রাত্রি বেলা বেলা মডেল হোল। টেব্‌লের ওপর উঠে দাঁড়ালে। বসনহীন সুপুষ্ট দেহের প্রতিকৃতি সারা রাত ধরে করলে জোসেফা।

"চমৎকার!"

ভোরের আলো এসে পড়েছে বেলার চোখে-মুখে, ঠাণ্ডা হাওয়া বেলাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। ঠিক তেমনি ভাবে একটি বড় সোফার ওপর তন্দ্রাঘোরে ঢুলে পড়লো বেলা। এমন সময় এলো জোসেফার বন্ধু শিল্পী স্কট্। বেলাকে দেখে সে মুগ্ধ হোল, বললে জোসেফাকে "কেমন করে পেলে তুমি একে? এমন নিখুঁত রূপ আমি ইণ্ডিয়ান মেয়ের মধ্যে দেখিনি কখনোও—এ পারফেক্ট লেডী টু বী এ মডেল। আমায় দেবে সুযোগ?"

"অফ্‌কোর্স।"

স্কটের ঝোঁক চেপে গেল। সেই দিন থেকে বেলা জোসেফার পাশের ফ্ল্যাটে উঠে এলো এবং স্কটই হোল তার প্রথম শিল্পী। বেলা নামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই তার নূতন নাম হোল রত্নাশ্রী।

* * * *

ভোরবেলাতেই রত্নাশ্রীর ঘুম ভেঙে গেল। সারা দেহে যেন অবসাদ। বিছানার মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লো রত্নাশ্রী। কিন্তু এ কি! ঘুম তার সত্যিই ভেঙেছে তো! না সে স্বপ্ন দেখছে? দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম। গত রাত্রের প্রত্যাখ্যানের পরও অরিন্দম এসেছে। "আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি বেলা।"

রত্নাশ্রী কিন্তু কথার জবাব দেবার সময় পেলো না, শাড়ীটা, কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে নিল, তার পর বলল, "তোমার দোষ কি অরুদা'?"

"আমার মনে হয়েছিল, কাল রাত্রে আমি বোধ হয় তোমার অসম্মান করিছি।"

"লোকের খোঁটা আমার গায়ে লাগে না অরুদা', ওপরের চামড়াটা দেখতে নরম হলেও এটাকে গণ্ডারের মত করে রেখেছি। সে যাক, সকালে তোমায় দেখে আমার কিন্তু আনন্দই হোল।" সত্যিই রত্নাশ্রীর আনন্দই হয়েছিল। গত রাত্রে মডেলের খোঁজে অরিন্দম তার কাছে এসেছিল—অরিন্দমের এতটুকু সম্মানও সে করেনি। তাকে ফিরিয়ে দিলেও ভিতরে ভিতরে অন্তর্জ্বালায় গুমরে উঠেছিল রত্নাশ্রী। অরিন্দম তার দেশের ছেলে, ছেলেবেলার সাথী। অরিন্দমের কাছে সে নির্লজ্জা কোন মতেই হতে পারে না। শিল্পী অরিন্দমের জীবনে বহু নারী আসতে পারে, রত্নাশ্রী কোন দিন আর দাঁড়াবে না, অরিন্দম তার অরুদা ই হোয়ে থাক্ চিরকাল।

অরিন্দমকে খুব যত্ন করে চা খাওয়াল রত্নাশ্রী, নিজের হাতে তৈরী করল খাবার। আজ যেন তার বড় আনন্দ। এত দিন ছন্নছাড়া হয়ে থেকে দেশের একটি লোককে কাছে পেয়ে সে যেন আর স্থির থাকতে পারছে না। গত রাত্রের সে সব আলোচনার পর

রত্নাশ্রীর মনটা একটু ব্যথাতুর হয়ে পড়েছিল, আজকের প্রত্যুষের এই নির্মলতা ও অরিন্দমের ক্ষমার্হ রূপ দেখে বাস্তবিক রত্নাশ্রী অন্তরে অন্তরে পুলকিত না হোয়ে পারল না।

"তুমি তো চমৎকার রান্না শিখেছ বেলা? বিশেষ করে এই চচ্চড়ীটা—"

"থামো!" বাধা দেয় রত্নাশ্রী, "চচ্চড়ী খেয়ে আর ফক্কড়ী করতে হ'বে না। আমি যে কতো রাঁধি তা আমিই জানি। আচ্ছা অরুদা', আমাদের সেই পিকনিকের কথা মনে পড়ে? সেই সিঁদুরপুরে তুমি খিঁচুড়ীতে এতো নুণ দিয়েছিলে যে কেউ আর খেতে পারলে না!" হি-হি করে ছোট্ট মেয়ের মত হেসে উঠলো রত্নাশ্রী। এ হাসি তার নিজের কাছেও নূতন লাগলো।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ-চাপ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। অরিন্দম বললে, "বেলা, কিছু মনে কোর না, আমি শিল্পী, মডেলের খোঁজে এসেছিলেম তোমার কাছে গত রাত্রে তোমার নাম শুনে। তোমায় দেখবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবতে পারিনি যে তুমিই বেলা। তোমায় খুঁজে পেয়ে আমার আনন্দ হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু ব্যথাও পেয়েছিলাম।"

রত্নাশ্রী এবার একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে, "ব্যথা তুমি কেন পেয়েছ আমি জানি অরুদা'—"

"কেন?"

"আমার জীবন তোমার পছন্দ হয়নি বলে। আমার এ পথ যে সমাজের হেয় পথ, আমি যে এক জন বারবনিতা, এ কথা কাল তুমি স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলে। কিন্তু তুমি তো আমায় জানো অরুদা', আমার আজ এ পথ যে তোমারি দেওয়া! তুমি যদি না আমায় ছেড়ে ফেলে যেতে তাহলে আজ কি আমার এমন হত? কিন্তু এতে আমার দুঃখ নেই অরুদা,' আমি শান্তিতেই আছি।" রত্নাশ্রী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। এ বেদনার স্ফুরণ না অন্তর্লোকের নিষ্করুণ অভিব্যক্তি তা বোঝা কঠিন। দুর্জ্ঞেয় এ অন্তর্লোকের রহস্য সমাধান করা বুঝি দেবতাদেরও দুঃসাধ্য। এ কথাগুলো বলার পর রত্নাশ্রী একটু অন্যমনস্কা হোয়ে পড়ল। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ; থমথমে ভাবটা অরিন্দমের অসহ্য লাগছিল, সে উঠে বললে, "আজ আমি যাই বেলা।"

"যাবে? বেশ, কাল আবার এস কিন্তু।"

"আসব।"

* * * *

জোসেফাকে যারা মডেল করেছিল তারা প্রত্যেকেই চায় রত্নাশ্রীকে। সেই কারণে জোসেফার পসার যায় কমে এবং রৌপ্যচক্রে রত্নাশ্রীর দেরাজ পূর্ণ হয়। রত্নাশ্রী জোসেফার বন্ধু হলেও মনে মনে তার ঈর্ষা গেল বেড়ে। এই জায়গায় মেয়ে জাতটা কাঁচা। অন্তর্লোকের সন্ধান তারা যেমন নিখুঁত ভাবে চট করে পায়, তেমনি স্বজাতি-বিদ্বেষ তাদের মর্ম্মে এসে কর্ম্মের পথে দেয় বাধা। চিরাচরিত এই নিয়ম কেউ-ই লংঘন করতে পারেনি। জোসেফা তো সামান্যা নারী।

স্কট বলেছে, "এ যেন দেবী-মূর্ত্তি, গডেস্! কত ছন্দে ভরা ওর দেহ, কত সুঠাম ছন্দে বাঁধা! আই লাইক্ টু স্যাক্রিফাইস্—" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, জোসেফা এতে বিরক্তই হয়েছিল। তাই যখন এক দিন স্কট এসে বললে, "ওয়েল ডার্লিং, কাম্, আজ তোমার প্রতিকৃতি সুন্দর করে আঁকব।"

জোসেফা স্পষ্ট জানাল, "গোর ইন্ন্য্যানাদার লেডী, তারি ছবি আঁকো না! হোয়াই য়্যাপ্রোচিং মি?" জোসেফার লাল ঠোঁটে অভিমানিনীর ভংগিমা।

স্কট এক দিন সন্ধ্যায় এল। জোসেফা গেছে সিনেমায়। রত্নাশ্রী একলা তার ঘরে বসে-বসে বই পড়ছে, সোফার ওপর নিজেকে শিথিল ভাবে এলিয়ে দিয়েছে। শিথিল দেহ-বল্লরীর ওপর স্থিরদৃষ্টি রেখে স্কট বললে, "গুড ইভনিং!"

উঠে দাঁড়ালে রত্নাশ্রী, "আসুন মিঃ স্কট।"

সেই দিন স্কট গভীর আবেগে জানালে, "আমি আর ওয়েট করতে পারি না, আই উইসড টু ম্যারী জোসেফা, কিন্তু তার চাইতে তুমি অনেক সুন্দর, চার্মিং! ইউ কাম্ টু মাই হোম্ য়্যাণ্ড মেক্ ছাট হেভেন্। বল রত্না, তুমি যাবে আমার ঘরে?" স্কট রত্নাশ্রীর একটা হাত ধরে গভীর আগ্রহে নাড়া দিল।

"লেট মি থিংক মিঃ স্কট!" রত্নাশ্রীর মনে ক্ষণিক বিহ্বলতা এলেও সে সেদিনের মত স্কটকে বিদায় দিলে। বড্ড শক্ত মেয়ে রত্নাশ্রী—ভাবতে বসল তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা।

জোসেফা যখন এলো, তখন রাত্রি বারোটা। পথে তার সংগে স্কটের দেখা হয়েছিল এবং স্কট বলেছিল, "আই য়্যাম্ গোয়িং টু ম্যারী রত্না, সে রাজী।" এ কথা শুনে আগুনের মত গরম হয়ে জোসেফা বাড়ী ফিরেছিল। জোসেফাকেই তো বিয়ে করতে চেয়েছিল স্কট, রত্নাশ্রী যদি তার পথে এসে না দাঁড়াত স্কট তো তাহলে তারই হত! গভীর ক্রোধে ও উত্তেজনায় জোসেফার অন্তরাত্মা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে ঢুকল রত্নাশ্রীর ঘরে।

রত্নাশ্রী তখন গভীর ঘুমে অচেতন। সুন্দর মুখ, সুন্দর দেহ, চার্মিং! জোসেফা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, কিছুক্ষণ পর হাতে করে নিয়ে এল এক বোতল নাইট্রিক্ য়্যাসিড। স্থির ভাবে তাকাল একবার রত্নাশ্রীর সুন্দর মুখের দিকে, চাঁদের মত কপালে ও নাকের ডগায় মুক্তোর মত বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তার পর জোসেফা রত্নাশ্রীর বুকের কাপড়টা এক হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিলে। গভীর অবসাদের নিশ্বাসে রত্নাশ্রীর বক্ষ ধীরে-ধীরে স্পন্দিত হচ্ছে। নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জোসেফা, তার পর ধীরে ধীরে নাইট্রিক্ য়্যাসিডের বোতলটা উপুড় করে দিল রত্নাশ্রীর চোখে, মুখে, বুকে, সারা অংগে।

নুণ দেওয়া কেঁচোর মত গভীর জ্বালায় বিছানার মধ্যে কুঁকড়ে উঠল রত্নাশ্রী।

লিয়োনিদ আন্দ্রিভের স্মৃতি

মানসী রায়

"বেশ লাগে ! কিন্তু, আচ্ছা বলো ত, তুমি কবিতা লেখ কেন ? ও মোটেই তোমায় মানায় না ! যাই বল না কেন, কবিতা লেখাটা যেন কেমন ধারা কৃত্রিম ব্যাপার !"

ইহার পরে সিকটালেঙ্ক-এর মতো আমরা প্যারোডি রচিয়া গেলাম :

মস্তো একটা গাছের শক্ত ডাল নেবো
কঠিন আমার হাতে,
তোমাদের—সাত পুরুষ অবধি—
মেরে চিত করে দেবো ।
তার পরেও···বোকা বানিয়ে দেব তোমাকেও
হো-হো মজা ! কাঁপো ! খুশী হই আমি—
কাসবেক দেবো মাথার উপরে ঠেলে
আরারাট টেনে আনবো তোমার 'পরে ।

পদের পর কৌতুককর ছন্দ গাঁথিতে গাঁথিতে সে খুশী হইয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা হাতে মদের গেলাস লইয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া মৃদু কণ্ঠে গম্ভীর সুরে কহিল "সেদিন ছোট্ট একটা ভারি মজার গল্প পড়লুম। ইংরেজদের দেশে এক সহরে কবি রবার্ট বার্ণসের স্মৃতিস্তম্ভ ছিলো। কিন্তু স্তম্ভের উপর কার স্মৃতির উদ্দেশে যে এ স্তম্ভ, তা কিছু লেখা ছিল না। তারই তলে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে খবরের কাগজ বেচছিলো। একটি লেখক এসে প্রশ্ন করলেন : 'কার নামে এ স্তম্ভ যদি বলতে পার তাহলে তোমার কাগজ কিনবো।' ছেলেটি জবাব দিলে, 'রবার্ট বার্ণসের।' লেখকটি বললেন : 'বেশ ! যদি বলতে পার যে, কেন এই স্তম্ভ তাঁর নামে পোঁতা হয়েছে, তাহলে তোমার সব কাগজ কিনে নেব। 'কেন বল ত ?' ছেলেটি জবাব করলে : কারণ তিনি মারা গেছেন।" কেমন লাগল ?"

বিশেষ পছন্দ হয় নাই। বস্তুতঃ লিয়োনিদের মেজাজের এই অকস্মাৎ অনেকখানি পরিবর্তনে আমার বড় বিরক্ত লাগিত।

যশ তাহার নিকট কেবল মাত্র "কবির প্রাচীন গাত্রবস্ত্রে উজ্জ্বল বর্ণ-প্রলেপ"এর মতো ছিল না। সে যথেষ্ট পরিমাণে ইহা চাহিত, লোভীর মতো চাহিত এবং সে আকাঙ্ক্ষা কখনো গোপন করে নাই। বলিত : "যখন বছর চোদ্দ বয়স আমার, নিজের মনে বলতুম, নামজাদা হতেই হবে, নইলে জীবনই ব্যর্থ। আর এখনো আমি সাহস করে বলতে পারি, আমার পূর্ব্বে যে যা লিখে গেছেন, সেগুলি আমি যা লিখতে পারি, তার চেয়ে একটু ভালো বলে আমার মনে হয় না। তোমার নিজের সম্বন্ধে যদি ওই ধারণা করে থাক, তাহলে কিন্তু ভুল করেছ, বুঝেছ ? যারা দশ জনের এক জন হতে চায়, ও কেবল তাদেরই ধারণা হওয়া উচিত। নিজের বৈশিষ্ট্যের ওপর নিজের বিশ্বাসই সৃষ্টি-ক্ষমতার রসদ জোগায়। প্রথমেই নিজেকে নিজে বলতে হবে, আমি আর পাঁচ জনের মতো নই, এ কথা সবার সমুখে শীগ্‌গিরই প্রমাণিত হয়ে যাবে।"

তাহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের অসাধারণ সাফল্য তাহার তরুণ মনকে আনন্দে আলোড়িত করিয়া দিল। একটা নূতন ছাই রঙের পোষাক পরিয়া সে নিজনিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। সদ্য ধোপভাঙা মটমটে সার্টটার সম্মুখে অত্যন্ত চকচকে টাই বাঁধা, পায়ে হলুদ রংয়ের জুতো।

"একটা খড়ো রঙের দস্তানা চাইলুম, তা কুজনেটস্কির দোকানদারনী বলে কি ; ও রং এর আজকাল চল নেই। মিছে কথা বলে দিলে হয়তো ! আসলে খড়ো রংয়ের দস্তানা পরলে আমাকে যা সুন্দর দেখাতো, তাতে ওর প্রাণের দায় ঠেকানো দায় হতো, এই ভয়ই ওর ছিলো তার কি। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, তোমায় বলি, এত গোমরা-চোমরা পোষাকে বড়ো অস্বস্তি লাগছে ; সাদাসিদে একটা ছোট জামা ঢের ভালো এর চেয়ে !"

সহসা আমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে কহিল : "একটা স্তোত্র লিখব, বুঝেছ ? কি নিয়ে লিখবো এখনো স্থির করিনি। কিন্তু লিখবোই, লিসারিয়ান কিছু লিখবো, অ্যাঁ ? খুব বড়ো কিছু, গমগমে—বুম্‌-ম্‌ !"

ঠাট্টা করিলাম।

সে হাসিমুখে কহিল : "বেশ ! আচ্ছা, পুরুতেরা যখন বলে যে, 'শান্ত মরণের চেয়ে দুর্বিসহ জীবনও ভাল।' ঠিকই বলে, না ? ঠিক এমনি করে বলে না অবশ্য, তারা একটু সিংহ কুকুরের উপমা দিয়ে কথা কয়, বলে : 'গৃহ-কর্মাদির জন্য বলবান সিংহ অপেক্ষা নেড়ী কুকুরও ভালো।' আচ্ছা, বলতে পার, জব কি ধর্মতত্ত্বের বইখানা পড়েছিলো ?"

আনন্দ-উচ্ছলতায় অধীর হইয়া সে ভল্গা একখানা নৌকায় ভলগা ভ্রমণ, ক্রিমিয়া অবধি হাঁটিয়া যাওয়া এই সকল পরিকল্পনা করিতে সুরু করিয়া দিল।

"তোমাকেও টেনে নিয়ে যাব।" বইগুলির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া কহিল, "নইলে এই সব পচা জিনিষে জমে যাবে।"

তার খুশী-ভাবটা যেন সেই শিশুর মতন, যে দীর্ঘকাল ক্ষুধার তাড়নার পরে এইমাত্র খাইয়া মনে করিতেছে যে, এই পেট ভরাটা আর ফুরাইবে না।

বড়ো একটা চৌকীতে সেই ছোট ঘরখানায় বসিয়া দুই জনে লাল মদ্য পান করিলাম ; আন্দ্রিভ শেলফ হইতে ছোট একটা কবিতা-পুস্তক বাহির করিয়া কহিল : "পড়বো ?" এবং তৎক্ষণাৎ উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া গেল :

"তামাটে কার গাছের সারি
সাগরের একঘেয়ে সুর।

এই হলো ক্রিমিয়া ! নাঃ, কবিতা আমি লিখতেও পারি নে, ইচ্ছেও করে না। ছোট-ছোট গানগুলি সব চেয়ে ভাল লাগে আমার। সত্যি বলতে কি :

যা কিছু নোতুন তাই ভালবাসি আমি,
যা কিছু অর্থহীন আর স্বপ্নময়,
পুরানো যুগের সেই
কবিদের মতো।

এই গানটা বোধ হয় 'সবুজ দ্বীপে' সঙ্গীত আলেখ্যে শুনে থাকবো :

গাছগুলি কাঁদে
ছন্দহীন কবিতার মতো।"

"এক কথায় তুমি হচ্ছো যে সব বাচ্ছা ধাই-মার দুধ খেতে চায় না, তাদের মতো।"

"ঠিক তাই। আমি কেবল আমারই আত্মার রস পান করতে চাই। মানুষ ভালবাসা চায়, যত্ন চায়, কিন্তু অন্ততঃ লোকে তাকে ভয় করুক এটা একেবারে তার একান্ত চাহিদা। চাষারাও যখন যাদুকরের মুখোস পরে, এইটা বোঝে। যারা ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা পায়, তারাই সুখী। যেমন ধরো নেপোলিয়ন।"

"তাঁর আত্মজীবনী পড়েছ ?"

"না, দরকার মনে করিনি।"

সে চোখ দুইটা পিট্-পিট্ করিয়া চাহিয়া একটু হাসিল: "আমি নিজেও ডায়েরী লিখি, ভাবি ও-বস্তুটা কি হয়। আত্মজীবনী, আত্ম-স্বীকৃতি, এই সব ধরণের জিনিষগুলি হলো আত্মার খারাপ খাবার খাওয়ার ফলে বদহজমের দাস্ত।"

এই ধরণের কথাবার্ত্তা কহিতে সে ভালবাসিত। যখন ভাল ভাবে বলিতে পারিত, আন্তরিক খুশী হইতে দেখিয়াছি। সাধারণ ভাবে নিরপরাধী হইলেও তাহার ভিতরে একটি অবিশ্বাস্য রকম সব ছেলেমানুষী ছিল—তাহার মধ্যে একটা ছিল আয়ত্তাধীন ভাষার প্রাচুর্য্য সম্পর্কে সহজ দম্ভ-প্রকাশ।

একবার তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের গল্প করিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটি তাহার "সং" জীবনের গর্ব্বে সকলকে সেইটা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টায় বড় কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়াছিল, তাহারই প্রখরতায় যাহারা তাহার আশে-পাশে ঘিরিয়াছিল বিরক্ত হইয়া কেহ বা এই ধর্ম্মের প্রতীকটির ধার-কাছ ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিল, কেহ বা ঘৃণায় আকণ্ঠ হইয়া উঠিল।

আন্দ্রিভ শুনিয়া গেল, একটুখানি হাসিল, তাহার প… সহসা বলিয়া উঠিল: "আমি খুব ধার্ম্মিক মেয়েছেলে। আমার কাপড়ে নখে মাটি উঠলেও ধোয়া-কাচার দরকার নেই।"

এই ছোট কয়টি কথায় অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে সে যে মেয়েটির কথা কহিতেছিলাম, তাহার চরিত্র এমন কি অভ্যাসের বর্ণনা করিয়া দিল—স্ত্রীলোকটির আপন দেহের প্রতি সত্যই কোন যত্ন ছিল না। কথাটা বলিলাম, সে খুশী হইয়া উঠিল। শিশুর মত আন্তরিকতায় গর্ব্ব করিয়া কহিল: "বুঝলে বন্ধু, এত নির্ভুল ভাবে দুই-এক কথায় আসল কথাটি একেবারে বার করে ফেলি যে নিজেরই অবাক লাগে।"

নিজের প্রশংসায় সে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই এই ব্যাপারের তুচ্ছতা ধরিতে পারে, সেও বুঝিল এবং তাহার দীর্ঘ বাণী একটু হালকা সুরের তামাসায় শেষ করিয়া দিল: "কালে এই প্রতিভাকে এমন জাগিয়ে তুলব যে একটি মাত্র কথায় একটি মানুষের পুরো জীবনের একটি জাতির একটা যুগের মূল কথা বলে দেব একেবারে"···তবু আত্ম-সমালোচনার শক্তি তাহার ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, এই অভাবটা অনেক সময়ে তাহার রচনা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

আমার মতে প্রতি মানুষের ভিতরে বহুতর ব্যক্তিত্বের অঙ্কুর জন্মলাভ করে এবং ভিতরে ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলে। যত দিন না সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বটি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে নানা অনুভূতির মধ্য দিয়া মানুষের চরম আধ্যাত্মিক সত্তাটি গড়িয়া তুলে এবং তাহারই মধ্য দিয়া একটি মানসিক বৈশিষ্ট্যকে জন্মদান করে তত দিন এ দ্বন্দ্বের যেন আর অবধি নাই।

ভারি অবাক লাগিত: দেখিতাম আন্দ্রিভের মধ্যে অত্যন্ত বেদনার মত দুইটি বিপরীত সত্তা বাজিয়া উঠিত। একই সপ্তাহে সে একবার পৃথিবীর উদ্দেশ্যে 'আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা' গাহিয়া পরমুহূর্ত্তেই 'অভিশাপ' গাহিয়া উঠিত।

ইহা কেবল মাত্র বাহিরের বিরোধ ছিল না। তাহার মূল স্বভাব, অভ্যাস, আকাঙ্ক্ষা সব কিছুতেই এ বিরোধ বাজিতে থাকিত। যতই উচ্চকণ্ঠে সে আশীর্ব্বাদ চাহিত, ঠিক তেমনি জোরে 'অভিশাপ' তাহার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিত। সে বলিত: "যারা মুখের রং পুড়ে যাওয়ার ভয়ে বা জ্যাকেটের রং চটে যাবে বলে রৌদ্রের পথে হাঁটে না তাদের আমি ঘৃণা করি। প্রত্যেকে—যারাই নিজেদের খেয়ালে স্বভাবের সহজ মুক্ত প্রকাশ হতে দেয় না—আমার দু'চক্ষের বিষ।" একবার সেই ছায়াচ্ছন্ন পথে-চলা লোকেদের অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত তিক্ত ভাবে সে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বসিল, এবং তাহারই অল্প পরে এমিল জোলার বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু উপলক্ষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে যে বর্ব্বর কৃচ্ছ্রসাধন তখন সুপ্রচলিত, তাহার 'পরে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়া দিল। কিন্তু এই আক্রমণ লইয়া কথা কহিতে কহিতে সে সহসা আমাকে কহিল: "তবু জানো, আমার প্রতিপক্ষ আমার চেয়ে ঢের বেশি স্থির চিত্ত; লেখকদের হওয়া উচিত ঘরছাড়া ভবঘুরের মত থাকা। মোপাসাঁর ইয়াৎ এক অসম্ভব কল্পনা।"

সে তামাসা করিতেছিল না। কিছুক্ষণ তর্ক করিলাম। আমি বলিতেছিলাম: মানুষের যত বিভিন্ন প্রয়োজন বাড়িয়া উঠে, বিভিন্ন আনন্দ—সে যতই তুচ্ছ হউক না কেন, তাহার জন্য সে যতই উদগ্রীব হইয়া উঠে, তাহার আত্মিক এবং দৈহিক সংস্কৃতি ততই শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে প্রত্যুত্তর করিল: না। টলষ্টয় যথার্থ করিয়াছেন, সংস্কৃতি বস্তুটা কিছুই না, কেবল আত্মার গতি-পথের বাধা মাত্র।

সে বলিত: "বস্তুর প্রতি মমতা বুনোদের যাদুমন্ত্রের 'পরে টানের মত—এক দম পৌত্তলিক কুসংস্কার। নিজের মনে একটা আদর্শ প্রতিমা খাড়া করতে নেই, করেছ কি, মরেছ। আজ একখানা বই লিখলে, কাল একটা যন্ত্র বানাও। বই লেখার কথা ইতিমধ্যে ভুলে গেছ। এই ভুলে যাওয়াটা আমাদের শিখতেই হবে।"

আমি কহিলাম: "প্রতিটি বস্তুই যে মানবসত্তারই প্রতীক, এ কথা ভুললে চলবে কেন? আর বস্তুর মধ্যে নিহিত সত্য অনেক সময়ে মানুষের চেয়েও অর্থপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

সে মন্তব্য করিল: "একেই বলে মৃত জড়তার পূজা।"

"জড়তার মধ্যেই যে অমর চিন্তা মূর্ত্তি নিয়েছে।"

"কাকে চিন্তা বলো তুমি? অর্থহীন। মিথ্যে প্রতারণা আর ঘৃণিত অর্থহীন জিনিষ।"

তর্ক ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, তীব্রতাও বাড়িল। সবার বড়ো অমিল ছিল আমাদের চিন্তা সম্পর্কিত মতামত লইয়া।

আমার কাছে চিন্তা সকল কিছু অস্তিত্বের মূল। যাহা কিছু দেখি, যাহা শুনি, সবই চিন্তা হইতে জন্মলাভ করিতেছে। সমাধান

করিবার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আত্মচেতনায় চিন্তা আরও নিবিড়, মহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

আমি অনুভব করিতাম, চিন্তার হাওয়ায় আমি বাঁচিয়া আছি, ইহারই রচিত অপরূপ এই জগতটা দেখিতেছি—হয়তো তাহার মধ্যে কিছু অর্থহীনতা আছে, তবু তাহা সাময়িক। হয়তো আমি কল্পনার চিন্তাশক্তির সৃষ্টি-ক্ষমতাকে কাঁপাইয়া তুলিতাম, কিন্তু রাশিয়ার মতো দেশে, যেখানে আধ্যাত্মিক সমন্বয় বলিয়া কোন বস্তু নাই, যে দেশ অন্ধ ইন্দ্রিয়বদ্ধ, অসহ নিষ্ঠুরতায় ভরা, সে দেশে ইহাকে এইটুকু বাড়াইয়া তোলা খুবই স্বাভাবিক।

লিয়োনিদের মতে 'চিন্তা' "মানুষকে লইয়া শয়তানের অন্যায় খেলা।" ইহাকে সে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপক্ষ বলিয়া বোধ করিত। সমাধানহীন জটিল রহস্য-জগতে ইহা মানুষকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সকল রহস্যের মাঝখানে অসহায় বেদনা-ব্যাকুল নিঃসঙ্গ নরনারীকে পরিত্যাগ করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করে।

এই চিন্তার আধার মানুষকে লইয়াও আমাদের মত-বিরোধের অবধি ছিল না। আমার নিকট মানুষ চিরদিন অপরাজেয়,—তাহার নশ্বর দেহ আঘাত লাভ করুক, নিঃশেষে মিলাইয়া যাক, তবু সে অজেয়। আপনাকে জানিবার, জগতকে চিনিবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় সে অপরূপ। জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা উল্লঙ্ঘন করিয়াও সে তাহার আপন সীমা বাড়াইয়া চলিয়াছে, আপন চিন্তায় বিজ্ঞান অপূর্ব্ব শিল্প সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের প্রতি ঐকান্তিক সচেতন প্রীতি চিরদিন অনুভব করিয়াছি,—যে মানুষ এক জীবনে পাশে পাশে চলিতেছে, সাথে সাথে কাজ করিতেছে—যে মানুষ ভাবী কালে চেতনা, শুভ, শক্তি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। আন্দ্রিভের কাছে মানুষ সত্তার শক্তিহীন, ভিতরে প্রকৃতি এবং বুদ্ধির অবিশ্রাম দ্বন্দ্বে ব্যাকুল—সমন্বয়ের সম্ভাবনাবিহীন সে দ্বন্দ্ব। তাহার সকল কিছু কীর্ত্তি শুধু মাত্র চরম দম্ভেরই প্রকাশ, আত্মপ্রবঞ্চনা আর অবনতির কীর্ত্তি। সবার বড় কথা, সে মৃত্যুর ক্রীতদাস এবং সারাটা জীবন তাহারই শৃঙ্খল টানিয়া টানিয়া চলিতেছে।

যে মানুষকে বড়ো বেশী চিনি, তাহার সম্বন্ধে বলা বড় কঠিন।

হয়তো উলটা শুনাইতেছে, কিন্তু ইহাই সত্য। আরেকটি মানুষের বিশিষ্ট সত্তা, যাহাকে একান্ত ভালবাসি তাহার তেজোদীপ্তিমান রশ্মি যখন চিত্তকে রহস্য-আলোক চঞ্চল করিয়া তুলে, তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া শিহরণ লাগে—সেই অদৃশ্য আলোক রেখাটিকে ভঙ্গুর অর্থহীন কথার বন্ধনে বাঁধিতে ভয় করে; হয়তো সব কিছুই ভুল হইয়া যাইবে। সেই অবর্ণনীয় অনুভূতিটিকে এমনি করিয়া বিকৃত করিতে ইচ্ছা করে না; হয়তো সাধারণের বিচারে সবটাই ঠিক বলা হইল, তবু আর একটি মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সযত্ন-রচিত বাক্যে প্রকাশ দিতে ভরসা হয় না। যাহাকে অল্প অনুভব করি তাহার সম্বন্ধে বলা ঢের সহজ। সে ক্ষেত্রে নিজের আবশ্যক মত অনেক কিছুই জুড়িয়া দেওয়া চলে।

লিয়োনিদ আন্দ্রিভকে ঠিকই চিনিয়াছিলাম। দেখিতাম, খাড়া প্রস্তরসঙ্কুল বন্ধুর পথে সে চলিয়াছে—সে পথ উন্মত্ততার পঙ্কে নামিয়া গেছে, সে খাড়া পাহাড়ের চিন্তা মাত্রেই মনের ছবি নিঃশেষে মুছিয়া যায়।

তখন শরৎকাল। পিটার্সবার্গের চারতলা বাড়ীর একখানি ছোট চাপা কক্ষে বসিয়া কথা কহিতেছিলাম। ঘন কুয়াশায় শহর ঢাকা। তাহারই মাঝখানে প্রেতের মতন রাস্তার ধারের আলোক-স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান, তারই 'পরে রামধনু রংয়ের আলোগুলি ঝুলিয়া যেন বুদ্‌বুদের মত দেখাইতেছে। তুলার ন্যায় জমা কুয়াশার মধ্য হইতে শহরের কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। রাস্তার কাঠ-বাঁধানো অংশটায় চলন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিকর ভাবে কানে বাজিতে লাগিল। লিয়োনিদ উঠিয়া পিছু ফিরিয়া জানালায় দাঁড়াইল। বুঝিলাম, এই মুহূর্ত্তে আমার প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি নাই, সেই আমি—যে কাঁধ হইতে সকল তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় বোঝা ফেলিয়া দিয়া তাহার চেয়েও সহজ ভাবে মুক্ত ভাবে এ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বেও তাহার আমার বিরুদ্ধে আকস্মিক ক্রোধের প্রকাশ দেখিয়াছি—আহত হইয়াছি, এমন নহে, চমক লাগিয়াছে সত্য; মনে মনে তাহার এই রাগের কারণটা টের পাইতাম, আর আমার প্রীতিভাজন এই লোকটি—যে তখন আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল—সেই অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিটির জীবনে কত বেদনা—বুঝিতাম।

কলরব তুলিয়া পথ দিয়া 'দমকল' গেল। লিয়োনিদ ফিরিয়া আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িল, কহিল: "আগুন দেখবে না কি গিয়ে?"

"পিটার্সবার্গের আগুন লাগায় দেখার তো কিছু নেই।"

সে কথাটা মানিয়া লইল। কহিল: "মফঃস্বলে ওরিয়লে যখন কাঠের বাড়ী আগুন পোড়ে, লোকগুলি পতঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে, বেশ লাগে দেখতে। ধোঁয়ায় মেঘ হয়ে গেছে, আর তার উপর দিয়ে পায়রা উড়ছে, দেখেছ কখনো?"

আমার কাঁধটাতে ঝাঁকুনি দিয়া হাসিয়া কহিল: "সব কিছু দেখেছে এ হতভাগা। 'কঠিন শূন্যতা' বেশ জিনিষ। কঠিন আঁধার আর শূন্যতা। বন্দীদের মেজাজ বেশ বোঝো তুমি···"

আমার পাজরে মাথা দিয়া একটা গুঁতা দিয়া সে পুনশ্চ কহিল: "যে মেয়েকে ভালবাসি সে যদি আমার চেয়ে বেশী চালাক হয় তাহ'লে যেমন রাগ ধরে, তোমার 'পরে এই জন্যে আমার মধ্যে মধ্যে তেমনি ঘেন্না ধরে যায়।"

কহিলাম: সে আমি টের পাই এবং মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে এমনি ঘৃণা বোধ করিতেছিল।

আমার হাঁটুতে মাথাটা ন্যস্ত করিয়া সে সায় দিয়া কহিল: "হ্যাঁ। কেন জান? মনে হলো, যদি তুমি আমার মতো এমনি দুঃখ পেতে, তাহ'লে হয়তো আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হ'তে পারতুম। তুমি তো জান, আমি কত একা।"

সত্য, সে ছিল একান্ত নিঃসঙ্গ; মধ্যে মধ্যে মনে হইত, সে যেন এই নিঃসঙ্গতাকে সাবধানে পাহারা দিয়া ফিরিতেছে, এই সঙ্গহীনতা যেন তাহার ভারি প্রিয়, তাহার বৈশিষ্ট্যের মূল ধারা, তাহার স্বচ্ছন্দ কল্পনার মূল ধারা এই নিঃসঙ্গতা হইতে শক্তিলাভ করিত।

নিবিড় তীক্ষ্ণ স্থিরদৃষ্টিতে ঘরের ছাদের দিকে চাহিয়া সে তীক্ষ্ণ

কণ্ঠে কহিল : "তুমি যে বলো, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় তোমার আনন্দ লাগে, সে মিছে কথা। বিজ্ঞান মানে, বুঝেছ বন্ধু, তথ্যকে নিয়ে শুধু রহস্য সৃষ্টি করা ; কোন লোকই কিছু জানে না, এই হ'ল সত্য। এই যে সমস্যা, কেন চিন্তা করি, কি করে করি এই সবই মানুষের সমস্ত দুঃখের গোড়া। এই নির্মম সত্য। চল, কোথাও ঘুরে আসি গে, লক্ষ্মিটি চল!"

চিন্তার গঠনভঙ্গীর সমস্যা লইয়া কথা কহিতে গেলেই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ভয় পাইত।

গায়ের উপর কোটটা চাপাইয়া আমরা হিমের মধ্যে নামিয়া আসিলাম। নেভস্কিতে সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে, চাঁদা মাছ যেমন পঙ্কিল নদীতে সাঁতার দিয়া ফিরে তেমনি করিয়া ঘণ্টা দুই সাঁতরাইয়া বেড়াইলাম। তাহার পর 'কাফে'তে গিয়া বসিলাম এবং তিনটি মেয়ে, আমাদের আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল। একটির নাম অ্যালফ্রিডা, এটি এস্টোনিয়ান মেয়ে এবং বেশ সুশ্রী। তাহার মুখখানা যেন পাথরে খোদা, কফির পেয়ালা হইতে তীব্র সবুজ সুরা পান করিতে করিতে সে বড় বড় চোখে ধোঁয়াটে চমকহীন দৃষ্টি মেলিয়া কেমন যেন ভীতিজনক স্তব্ধতার সৃষ্টি করিয়া আন্দ্রিভের দিকে চাহিয়া রহিল। পানীয় হইতে পোড়া চামড়ার গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

লিয়োনিদ কগন্যাক পান করিয়া শীঘ্রই মাতাল হইয়া উঠিল, তাহার মাথা অসম্ভব রকম খুলিয়া গেল এবং আশ্চর্য্য সব তীক্ষ্ণ সহজ ব্যঙ্গোক্তিতে মেয়ে তিনটিকে হাসাইতে লাগিল। অবশেষে সে মেয়েগুলির বাসায় যাইতে মনস্থ করিয়া ফেলিল, তাহাদেরও বারংবার অনুরোধের অবধি রহিল না। লিয়োনিদকে ফেলিয়া আসা সম্ভবপর ছিল না, মদ্যপান করিলে তাহার ভিতরে কেমন একটা অসহজতা দেখা দিত, সব কিছু ভাঙিবার প্রতিশোধ-স্পৃহা, "বন্দী পশু"র উন্মত্ততা!

তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম। মদ্য, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কিনিয়া নিলাম এবং র‍্যাজেকায়া ষ্ট্রীটের এক অপরিচ্ছন্ন মদের বোতল আর কাঠে বোঝাই পথপ্রান্তে একখানি কাঠের বাড়ীর দ্বিতলে আসিয়া উপনীত হইলাম। দু'খানি ছোট ঘর, দেওয়ালগুলি অত্যন্ত জঘন্য এবং অসুন্দর ভাবে কাগজের ছবিতে ভরা।—আমরা পান করিতে সুরু করিলাম।

একেবারে জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে লিয়োনিদ অত্যন্ত সাংঘাতিক রকম এবং আশ্চর্য্য রকমের উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহার মস্তিষ্ক উন্মত্তের মত তাতিয়া উঠিত, কল্পনা চঞ্চল হইত, এবং কথা-বার্ত্তা অসহ্য রকম সুন্দর করিয়া বলিত।

এই মেয়েগুলির মধ্যে মোটা-সোটা নরম-সরম ইঁদুরের মত ত্রস্ত একটি মেয়ে আনন্দে উচ্ছল হইয়া একবার সহকারী ক্রাউন প্রসিকিউটর কেমন করিয়া তাহার হাঁটুর উপরিভাগের পায়ে কামড় দিয়াছিল, তাহার গল্প করিয়া ফেলিল। এই আইনজীবীটির আচরণ যে তাহার জীবনে বেশ অর্থপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে এ সত্যটাও সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া নিতে ভুলিল না। উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাসে সে তাহার ক্ষতস্থানটার চিহ্ন দেখাইল, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটা খুশীতে চকচক করিতে লাগিল: "সে একেবারে আমাতে মজে গেছিলো ভাবতেও ভয় করে! জান, তার দাঁত ছিল বাঁধানো ; কামড় দিল আর দাঁতটা আমার চামড়ায় বসে গেল।"

মেয়েটি শীঘ্রই মাতাল হইয়া কৌচের এক প্রান্তে ঢলিয়া পড়িল এবং অল্প পরেই ঘুমের মধ্যে তাহার নাসিকা-ধ্বনির আওয়াজ উঠিতে লাগিল। পূর্ণযৌবনা, দীর্ঘকেশী বাদামী রংয়ের মেয়েটি অদ্ভুত লম্বা হাত দুইখানায় গিটার বাজাইতেছিল, অ্যালফ্রিডা স্বেচ্ছায় প্রতিটি পরিধেয় খুলিয়া নিজেকে নগ্ন করিয়া ফেলিল—বোতল এবং প্লেটগুলি মেঝেতে সরাইয়া টেবিলে উঠিয়া নিঃশব্দে লিয়োনিদের দিকে অপলক চক্ষু মেলিয়া নৃত্যে মগ্ন হইয়া গেল। সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া সে নাচিল এবং তার পরে মিষ্টতাহীন মোটা গলায় গান গাহিতে সুরু করিয়া দিল, নিষ্ঠুর চঞ্চল চোখ দুইটা মেলিয়া মাঝে-মাঝে থামিয়া সে আন্দ্রিভের দিকে ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। আন্দ্রিভ এই অদ্ভুত বিদেশী গান হইতে কয়টা উদ্ধৃত বাক্য পুনর্ব্বার আবৃত্তি করিয়া তাহার জানু চুম্বন করিল এবং আমাকে কনুইয়ের একটা গুঁতা দিয়া কহিল : "দেখ, ও কিছু বোঝে, দেখেছ? এ মেয়েটা বোঝে!"

মাঝে-মাঝে লিয়োনিদের উত্তেজিত চোখ দুইটা যেন অন্ধ হইয়া যাইতেছে এমনি বোধ হইতে লাগিল, ক্রমেই ঘন-কালো হইয়া সে দুইটা যেন গভীরতার অতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল—যেন মনের মধ্যে কি খুঁজিতে চাহিতেছে!

এস্টোনিয়ান মেয়েটি ক্লান্ত হইয়া অবশেষে টেবিল হইতে বিছানায় লাফাইয়া নামিয়া গেল, সোজা হইয়া মুখটা হাঁ করিয়া শুইয়া পড়িয়া মেয়ে-ছাগলের মত সুঁচালো ক্ষুদ্র স্তন দুইটা হাত দিয়া ঘষিতে লাগিল।

লিয়োনিদ বলিল : "মানুষের সব চেয়ে বেশী এবং গভীর আনন্দ এই যৌনসঙ্গমে—হ্যাঁ হ্যাঁ! সমস্ত পৃথিবী হয়তো এখন এই বস্তুর সঙ্গে ঘুরে ফিরছে জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করে, আমি তাকে গর্ভদান করবো বলে এবং আমার মধ্যে যত মহত্বই থাক, যত সৌন্দর্য্যই থাক, আসলে আমি এই জন্মদানের বীজবহ মাত্র!"

কহিলাম, এখন বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া ভাল!

"যাও, আমি এখানে থাকবো···"

তাহাকে রাখিয়া আসিতে পারি নাই, তখনি সে অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে তাহার বেশ কিছু টাকা আছে। বিছানায় বসিয়া সে মেয়েটির সুগঠিত উরুতে টোকা দিতে লাগিল এবং সে যে তাহাকে ভালবাসে এই কথাটা হাস্যকর ভঙ্গীতে বলিতে সুরু করিল। মেয়েটি হাতের 'পরে মাথা ন্যস্ত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

লিয়োনিদ কহিল: "শেকড়-বাকড় থেকেই ব্যারণদের পাখা গজায়!"

"মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না, বাজে কথা!"

মদোন্মত্ত আনন্দে লিয়োনিদ বলিয়া উঠিল : "দেখেছ, বলেছি ও বোঝে, কিছু কিছু বোঝে!" মুহূর্ত্ত কয়েক পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মেয়েটিকে টাকা দিয়া কহিলাম-লিয়োনিদকে সে যেন একটু বেড়াইয়া লইয়া আসিতে অনুরোধ করে। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া পোষাক পরিতে লাগিল।

মৃদু স্বরে কহিল: "লোকটাকে বড় ভয় কচ্ছে। এমনি ধারা লোকেরা বন্দুক রাখে সঙ্গে।"

যে মেয়েটি গীটার বাজাইতেছিল, সে যে কৌচখানায় তাহার বান্ধবী নিদ্রামগ্ন, তাহারই কাছে মেঝেয় বসিয়া গভীর নিদ্রায় নাক ডাকাইতেছিল।

লিয়োনিদ ফিরিয়া আসিতেই এষ্টোনিয়ান মেয়েটির পোষাক পরা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। সে আসিয়াই উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে কহিল: "আমি যাব না। একটা মাংসের ভোজ করা যাক বরং, এসো হে।"

মেয়েটিকে সে পুনর্ব্বার নগ্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, বাধা দিয়া এমনি তীব্র দৃষ্টিতে সে তাহার চোখের দিকে চহিল, লিয়োনিদ উত্যক্ত ভাবে সায় দিয়া কহিলেন: "আচ্ছা চল, যাওয়াই যাক।"

কিন্তু প্রিয়ার টুপীতে 'আ লা রেম ব্রাভং' করিবার প্রয়াসে তৎক্ষণাৎ পালকগুলি উঠাইয়া ফেলিল। পাকা ব্যবসায়ীর মত মেয়েটি প্রশ্ন করিল: "টুপীর দাম কি তুমি দেবে?"

লিয়োনিদ ভ্রূ তুলিয়াই হাসিতে ফাটিয়া পড়িল: "এই তো টুপী দিয়েই ঠিক হয়ে গেল হুররে।"

পথে নামিয়া ভাড়াটে গাড়ীতে চাপিয়া আমরা কুয়াশার মধ্য দিয়া চলিলাম। রাত্রি তখন শেষ হয় নাই, মাঝ রাত! বড় বড় বাতি-সজ্জিত নেভাস্কি যেন পাহাড় হইতে গুহাপথাভিমুখী রাস্তার মত দেখাইতেছিল। বাতির চতুর্দিকে ভিজা ধূলার গুঁড়া, ধোঁয়াটে হিমে কালো মাছগুলি লেজে ভর দিয়া সাঁতার দিয়া ফিরিতেছে, অর্দ্ধোন্মুক্ত ছাতা যেন মানুষগুলিকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে, সব কিছু অপার্থিব নূতন, ম্লান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

খোলা বাতাসে আন্দ্রিভ পূরাপুরি মাতাল হইয়া গেল। এ-পাশে ও-পাশে ঢুলিতে ঢুলিতে সে অর্দ্ধ নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মেয়েটি অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে আমাকে শুধাইল: "আমি নেমে যাই? যাব?" আমার হাঁটু ডিঙাইয়া লাফ দিয়া সে কর্দমাক্ত পথে নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কামেনোষ্ট্রোভস্কি রাস্তাটার শেষে আসিয়া চকিতে লিয়োনিদ চোখ মেলিয়া প্রশ্ন করিল: "আমরা কি গাড়ী চেপে চলেছি? একটা সরাইয়া যাব চল। তাড়িয়েছ ত তাকে?"

"সে চলে গেছে।"

"মিছে কথা। তুমিও যেমন চালাক, আমিও কম নই। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে শুধু দেখলুম তুমি কি কর। দরোজার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলুম, যাতে আমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসতে বলে ও, তার জন্যে অনুরোধ-উপরোধ শুরু করে দিয়েছ। তুমি ভাব দেখাও যেন ভারি নির্দ্দোষ, ভারি মহৎ। দরকারের সময় তোমার বদমায়েসী টের পাওয়া যায়। গেলাস গেলাস মদ গিলেও তুমি মাতাল হও না, দেখো, তোমার ছেলেপিলেরা সব মদের পোকা হবে। আমার বাপ এমনি গুচ্ছের মদ খেলেও মাতাল হত না, আমি একটি পাঁড় মাতাল হয়েছি।"

"ট্রেলকা'তে ঘন কুয়াশা বুদবুদের তলে বসিয়া আমরা ধূমপানে মগ্ন হইলাম, সিগারেটের প্রজ্বলিত আলোকে দেখি, হিমের কণাগুলি ঝরা কাচের মত ওভারকোট ঘিরিয়া ধোঁয়াটে হইয়া উঠিয়াছে।

লিয়োনিদ সরল ভাবে অনর্গল কথা বলিয়া গেল—সে মাতালের সরলতা নহে। সুরার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ না তাহার মস্তিষ্কে পূরাপুরি শেষ হইত, ততক্ষণ তাহার মনে ইহার কোন প্রতিফলনই দেখা দিত না।

"আমার অনেক করেছ তুমি—আজও অনেক করলে, বুঝি আমি! এই মেয়েগুলির সঙ্গে যদি থাকতুম, হয় ত কারও কিছু ক্ষতি হয়ে যেত শেষ অবধি। ঠিকই! আর ঠিক এই জন্যেই তোমায় ভালবাসি না আমি, শুধু এই জন্যে। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ আমি হয়ে উঠতে দাও না। ছেড়ে দাও। আমায় বাড়তে দাও। তুমি হচ্ছ—বোতলের বাঁধন, খসে যাও, সঙ্গে সঙ্গে বোতল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, সেই ভেঙ্গে যেতেই দাও, বুঝেছ? কিছুতে বাধা থাকবে না, সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে যাক। হয়তো এমন কোন বস্তুকে ধ্বংস করে দেবার মধ্যেই জীবনের সত্য নিহিত আছে, যাকে আমরা জানি না, হয়তো আমাদের সকল চিন্তা, সব সৃষ্টিই তার সাথে ধ্বংস হবে।"

তাহার কালো চক্ষু দুইটা চারি ধারে ঘেরা ধূমল হিমস্তূপে নিবদ্ধ ছিল, থাকিয়া থাকিয়া সেগুলিকে সে পাতাঝরা মাটির দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল এবং মাটিটার দৃঢ়তা পরোখ করিয়া পা দিয়া গুঁতা মারিতেছিল।

"আমি জানি না তুমি কি ভাব, কিন্তু সব সময়ে যা তুমি বল তা তোমার সত্য বিশ্বাসও নয়, সত্য কামনাও নয়। তুমি বল, সমতার ব্যতিক্রমেই জীবনের শক্তি জন্ম নেয়, কিন্তু নিজে তুমি এই সমতাকে, এই সমন্বয়কে খুঁজে বেড়াও আমাকেও সেই একই বস্তু খোঁজাতে চাও, তোমার দেখানো মতে ত এই ভারসাম্য ক্ষমতা মৃত্যুরই সমান।"

আমি কহিলাম, তাহার সহিত তর্ক করিতে আমি ইচ্ছুক নহি, তাহাকে দিয়া জোর করিয়া কিছু করাই এমন ইচ্ছাও নাই, কিন্তু তাহার জীবন আমার প্রিয়, তাহার স্বাস্থ্য, তাহার কর্ম্ম সব-কিছুই আমার প্রীতির সামগ্রী।

"আমার কাজটাই শুধু তোমার ভাল লাগে, আমার বহিরের সত্তাটা? কিন্তু আমি নিজে—যে আমাকে আমার কাজে প্রকাশ করতে পারি নে, সে তোমার প্রিয় নয়। তুমি আমার পথ আটকেছ, সকলের পথের বাধা তুমি, উচ্ছন্নে যাও।"

আমার স্কন্ধে ভর দিয়া সে আমার মুখে উঁকি মারিয়া হাসিল, কহিল: "তুমি ভাবছ, মাতাল হয়ে আমি যে বাজে বলছি, কি বলছি তা' টের পাচ্ছি না? আমি শুধু তোমায় খোঁচাচ্ছি। তুমি দুর্লভ বন্ধু জানি, কিন্তু তোমার কোন ঔৎসুক্য নেই। আর আমি পথের হতভাগা তামাসা দেখানেওয়ালা লোকগুলির মতো ভিখিরী যেমন করে তার ঘা দেখায়, তেমনি করে তোমার লক্ষ্য আকর্ষণ করতে চাই।"

এ কথা সে এই প্রথম বলিল না, ইহার মধ্যে কিছু সত্যও ছিল, কিংবা এটা তাহার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিবার একটা ধরণও ছিল বটে।

"আমি বন্ধু, একটা হতভাগা অধঃপেতে লোক, রোগা মানুষ। কিন্তু ওসটয়েভস্কিও রুগ্ন ছিলেন। সব বড় লোকেরাই দুর্ব্বল হন। কার যেন লেখা একখানা বইয়ে পড়ছিলুম প্রতিভা আর পাগলামি

সম্বন্ধে; বইখানায় লিখেছিল: প্রতিভা এক রকম মানসিক ব্যাধি। এই ছোট বইখানাই আমায় মাটি করেছে, যদি না পড়তুম হয়তো সহজ মানুষ হতে পারতুম। এখন আমি যে প্রতিভাবান এ বিষয়ে সন্দেহ রাখি নে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে উন্মাদ হয়েছি কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হত পারিনি, বুঝেছ? নিজেকে যে পাগল বলে দেখতে চাই, সে কেবল মাত্র আমি যে প্রতিভাশালী এইটেই স্থিরনিশ্চয় করে জানবার জন্ম, বুঝতে পার তা?

হাসিয়া উঠিলাম। এ আবিষ্কারের কোন মূল্য দেখি নাই, অসত্য বলিয়াই বোধ হইল। কহিলাম, সেও হাসিয়া ফেলিল এবং সহসা সমস্ত চিন্তা পরিবর্তিত করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির মতো উৎকণ্ঠিত হইয়া সে কণ্ঠস্বরকে কৌতুকের পর্য্যায়ে নামাইয়া ফেলিল: "বাঃ, শুঁড়িখানা কোথা হে, সাহিত্যিকের পূজা-বেদী সরাই গেল কোথা? প্রতিভাশালী রাশিয়ানরা সর্বদা সরাইয়ে বসে কথাবার্ত্তা কইবে, এই হচ্ছে রীতি, এ না মানলে সমালোচকেরা প্রতিভা স্বীকারই করবে না যে।"

কোচোয়ানদের রাত্রিবাসের জন্ম খোলা ঠাণ্ডা, ধূমাচ্ছন্ন, চাপা একটা সরাইয়ে গিয়া বসিলাম। "ওয়েটার"রা নোংরা ঘরগুলির মধ্যে ক্রুদ্ধ ক্লান্ত ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, মাতালেরা "জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী" শাপ-শাপান্ত করিতেছে, ভয়াবহ গণিকার হুল্লোর,—তাহাদেরই এক জন তাহার বাম স্তন উন্মুক্ত করিল এবং সেই পুষ্ট পীত স্তন গাত্রে ন্যস্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল: "এক পাউণ্ড কেনা হবে না কি?"

লিয়োনিদ কহিল: "বেহায়াপণা ভালবাসি আমি রূঢ়তার একটা দুঃখ টের পাওয়া যায়, যে মানুষ বুঝেছে যে সে কিছুই করতে পারে না, তার হতাশার চেহারা এর মধ্যে দেখা যায়, বুঝেছ? সে আপনিই রূঢ় জন্তুর মত হয়ে ওঠে। সে তা হতে চায় না। এমন নয়, অথচ তার না হয়েও উপায় নেই, বুঝেছ?"

সে কড়া কালো চা গিলিতে লাগিল। জানিতাম, এ জিনিষটা সে ভালবাসে এবং ইহাতে তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলে, প্রকৃতিস্থ করে, তাই ইচ্ছা করিয়াই কড়া চায়ের হুকুম দিয়াছিলাম। তিক্ত চায়ে চুমুক দিয়া চারি পাশে মাতালের ফোলা ফোলা মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লিয়োনিদ অনর্গল কহিয়া গেল: "মেয়েদের কাছে অবশ্য আমি খুব খোলাখুলি। সেই-ই খাঁটি উপায়—তারা এটা ভালও বাসে। আধা সন্ন্যিসীর চেয়ে পুরোপুরি পাপী হওয়া ঢের ভাল।"

চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মুহূর্তের জন্ম নীরব হইল, তাহার পর কহিল: "এ জায়গাটা ঠিক পাত্রীদের সভার মতোই বিশ্রী।" বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। "আমি কখনো পাত্রীদের সভায় যাইনি, নিশ্চয় মাছভরা পুকুরের মত সে জায়গাটা…"

চা তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছে। সরাই ছাড়িয়া আসিলাম। কুয়াসা ঘন হইয়া উঠিয়াছে, রাস্তার বাতিগুলির বিচ্ছুরিত শুভ্র আলো বরফের মত গলিয়া পড়ে।

নেভার উপরে যে বাঁধ, তাহারই দেওয়ালে কনুই ভর করিয়া লিয়োনিদ কহিল: "মাছ খেতে পেলে বেশ হত, বেশ লাগে আমার।" সজীব কণ্ঠে সে বলিয়া চলিল: "কি রকম সব ভাবি, জান? বাচ্চা ছেলেরা বোধ হয় এমন করে ভাবে। একটা ছোট্ট ছেলের মনে একটা কথা এল, অমনি সে তার সঙ্গে মিলোনো কথা ভাবে: মাছ, গাছ, মাখন, ঢাকন—কিন্তু আমি কবিতা লিখতে পারি নে।"

একটু ভাবিয়া সে জুড়িয়া দিল: "যারা ছেলেদের অ আ ক খ বর্ণপরিচয় লিখেছে তারা এমনি করে ভাবত।"

আবার একটা সরাইয়ে ঢুকিয়া সলিয়াঙ্কা মাছ খাইলাম, লিয়োনিদ কহিল, "অবনতির দল" তাহাদের ভিয়েসি পত্রিকায় লিখিবার জন্ম আমন্ত্রণ জানাইয়াছে।

"আমি নেব না, ওদের আমার পছন্দ হয় না। ওদের কথার পিছনে প্রাণ নেই। বালমমন্ট যেমন কথার পিয়াসী তেমনি এরাও কথার মদে ডুবে থাকে। ও-লোকটাও প্রতিভাবান আর রুগ্ন।"

আরেক বার মনে পড়ে, স্কোর পিয়ন দলের কথায় সে কহিয়াছিল সোপেন হাওয়ার আমার ভাল লাগে, ওরা তাঁকে নিন্দা করে, তাই আমি ওদের ঘৃণা করি।

কিন্তু তাহার মুখে কথাটা ভারি রূঢ় শুনাইয়াছিল, ঘৃণা করা তাহার সাধ্যের অতীত ছিল—তাহার সহজাত ভদ্রতা তাহাকে বাধা দিত। একবার সে তাহার ডায়েরীতে লেখা 'ঘৃণার বচন' পড়িয়া শুনাইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কথাগুলি কৌতুক কথায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল, সে নিজেও আন্তরিক ভাবে হাসিয়াছিল।

ভাড়াটে গাড়ীতে তাহাকে তাহার হোটেলে পৌঁছাইয়া একেবারে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আসিলাম, অপরাহ্নে ডাকিতে গিয়া শুনি, আমি চলিয়া আসার সাথে সাথেই সে উঠিয়া পড়ে এবং জামা-কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া যায়। সারা দিন তাহাকে খুঁজিলাম, পাইলাম না।

চার দিন সে ক্রমাগত মদ গিলিল এবং তাহার পরে মস্কো চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

"দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলিয়েছি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভাগ্যালাপ

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

এইবার বিশ্ববরেণ্য দুই জন মহাপুরুষের জন্মকুণ্ডলী লইয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধীর জন্মকুণ্ডলীতে দেখা যায়, লগ্নপতি শুক্র স্বক্ষেত্র তুলায় দ্বাদশ ও নবম পতি বুধ এবং দ্বিতীয় ও সপ্তম পতি মঙ্গল সহ একত্রে অবস্থান করিতেছে। দ্বিতীয়ে চতুর্থ ও পঞ্চমপতি শনি, চতুর্থে কেতু, সপ্তমে তৃতীয় ও ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি, দশমে রাহু, একাদশে দশম পতি চন্দ্র এবং দ্বাদশে একাদশ পতি রবি অবস্থান করিতেছে। ইহার চারিটি কেন্দ্রে শুভাশুভ প্রবল গ্রহগণ বর্ত্তমান। এই অনুযায়ী বিচার করিলেও দেখা যায়, জাতক বিখ্যাত কীর্ত্তি, সুখী ও গুণী হইতে পারেন। লগ্নস্থানে শুক্র, বুধ ও মঙ্গল, সপ্তমে বৃহস্পতি এবং একাদশস্থ চন্দ্র জাতককে মহান্ ও বরণীয় করিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্বগৃহে বিশেষতঃ তাহা যদি কেন্দ্র হয়, গ্রহগণ মহা বলবান্ হইয়া থাকে; সুতরাং এ স্থলে শুক্রগ্রহ মহা বলবান্। শুক্রগ্রহ ব্রাহ্মণ, রজোগুণ প্রধান, ইহার আনুকূল্যের ফল—পবিত্র প্রমোদ, শান্তি, ধীরতা, পারিপাট্য, প্রফুল্লতা, সামাজিকতা, সঙ্গীত-সুগন্ধি-প্রিয়তা, কাব্য, শাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞান, সাধনাজনিত বিভূতি, গর্ব্ব, যৌবনলিপ্সা ইত্যাদি। এই শুক্রই জাতককে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিদ্ করিয়াছে। জাতকের তুলালগ্নে জন্ম, সুতরাং তুলায় ইহার অধিপতি শুক্র থাকায়, লগ্নের ফলও পূর্ণমাত্রায় জাতকে পরিস্ফুট। এইরূপ জাতক ইন্দ্রিয়জয়, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, কৌশলী ও একাগ্রচিত্ত। শান্তি ও আনন্দ এইরূপ জাতকের লক্ষ্য হইলেও আজীবন ইহার মধ্যে একটি অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু জাতক অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া থাকেন। নেতৃত্ব ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে গুপ্ত ব্যাপার কিছুই থাকে না; নিজেরাই তাহা খোলাখুলি প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে কোন পরিবেশের মধ্যে ইঁহারা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। ইঁহারা অন্যের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি যেমন সহজে ধরিতে পারেন, তেমনি নিজের দোষ-ত্রুটিও সহজে ধরিতে পারেন ও সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন।

লগ্নে মঙ্গল ও বুধ জাতককে অন্য ভাবে গুণান্বিত করিয়াছে। মঙ্গলের অনুকূল ফল—শক্তি, পরাক্রম, স্বাধীনতা, সেনা, জয়লাভ, চিকিৎসা, ও রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি। বুধের অনুকূল ফল—ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, শিল্পকলা, ন্যায়পরতা, রচনাশক্তি, গণিতবিদ্যা, অধ্যাপনা ও ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি। সপ্তমস্থ বৃহস্পতি লগ্নস্থ শুক্রকে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে; পত্নীস্থান শুভ হওয়ায় স্ত্রী দ্বারা সুখী হইয়াছেন। গান্ধীজির রাশিচক্রে বিবিধ গ্রহ বলবান্। তিনটি কেন্দ্রে পাপগ্রহই তাঁহার অপমৃত্যুর কারণ এবং মঙ্গল গ্রহই বিশেষ ভাবে এইরূপ মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকুণ্ডলীতে পঞ্চমে বৃহস্পতি তুঙ্গী; দ্বিতীয়ে রবি তুঙ্গী। বৃহস্পতি আবার লগ্ন ও দশম স্থানের অধিপতি; পঞ্চমপতি চন্দ্র বৃহস্পতির সঙ্গে স্থানবিনিময় করিয়াছে; এইরূপ বিনিময়-যোগ অতিশয় শুভকর। বৃহস্পতি জাতকের নবম অর্থাৎ ভাগ্যস্থান একাদশ স্থান ও লগ্নস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে। সুতরাং এই স্থানগুলির
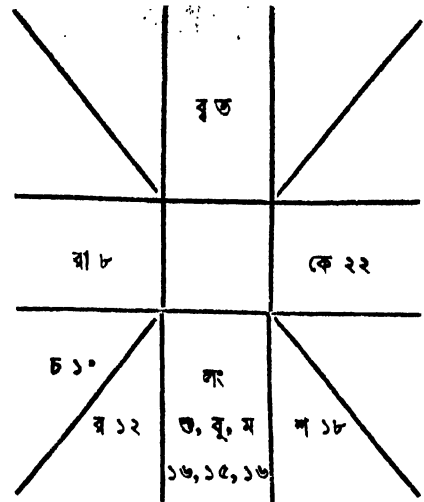
মহাত্মা গান্ধী

ফল অত্যন্ত শুভ হইয়াছে। নবম স্থানের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; মানুষের আয়ু, বিদ্যা, যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি এই স্থানের উপরই নির্ভর করে। উক্ত জন্মকুণ্ডলীতে এই স্থান মঙ্গলের গৃহ, মঙ্গল ভাগ্যস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে। ভাগ্যপতি মঙ্গল দৃষ্টি দেওয়ায় এই স্থানের শুভ হইতেছে, অধিকন্তু শুভ ও বলবান্ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়ায় জাতককে বিশিষ্ট ভাগ্যবান্ করিয়াছে। মীনলগ্নে জন্ম, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এই দুইটি শুভগ্রহ অত্যন্ত প্রবল থাকায় জাতকের খ্যাতি, ও প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম হইয়াছে। রবি দ্বিতীয়ে তুঙ্গী, সুতরাং অত্যন্ত বলবান্। এই স্থলে বুধ ও শুক্র যুক্ত হইয়াছে। বৃহস্পতি জাতকের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান সহায়, এই গ্রহই তাঁহাকে ঋষিতুল্য জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কাব্য-কলার অধিকারী করিয়াছে; বুধ ও শুক্র দুইটি গ্রহ একত্রে অবস্থান করায় জাতককে সাহিত্য ও কাব্য-কলাবিদ্ করিয়াছে। বৃহস্পতির অনুকূল ফল—সত্ত্বগুণ, ধর্ম্মভাব, ন্যায়পরতা, বদান্যতা, আত্মশুদ্ধি, সচ্চরিত্র, বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চ-প্রেরণা, মহান্ পদ ও সম্মান প্রভৃতি। বুধের অনুকূল ফল—ধীশক্তি, বিদ্যা, কল্পনাশক্তি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, শিল্পনৈপুণ্য, শ্রেষ্ঠ রচনাশক্তি প্রভৃতি। শুক্রের অনুকূল ফল—সঙ্গীত, পবিত্র প্রমোদ, পারিপাট্য, সুগন্ধ, ষোড়শীলিপ্সা, কাব্য ও কলাবিদ্যা প্রভৃতি। বুধ ও শুক্র ধনস্থানে অবস্থিত। এই দুইটি গ্রহ জাতককে অতুল কাব্য-সম্পদের
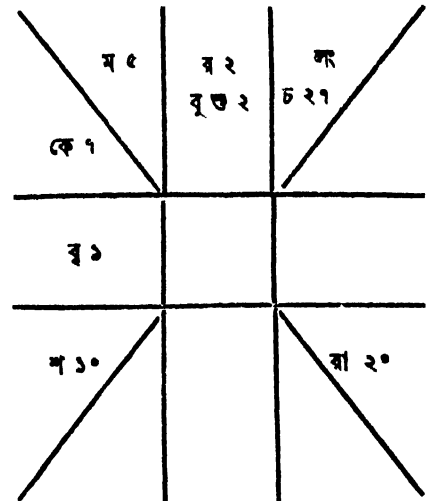
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধিকারী করিয়াছে। বিশেষতঃ, এই দুইটি গ্রহ নানারূপ বিদ্যারও কারক। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকগণের জন্মকুণ্ডলীতে বুধ ও শুক্রের মধ্যে অন্ততঃ একটি গ্রহের অবস্থান শুভভাবে আছে; কিংবা একটি না হয় অপরটি বলবান্। রবীন্দ্রনাথের জন্মকুণ্ডলীতে বহুবিধ সৌভাগ্যযোগ রহিয়াছে; সেগুলির আলোচনা না করিলেও মোটামুটি ইহার অসাধারণত্ব বুঝা যায়। একমাত্র মীনলগ্নের ফলেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া যায়; অবশ্য অন্যান্য গ্রহের বলাবলের উপর উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষেরও এই মীনলগ্নে জন্ম। শরৎচন্দ্রের পঞ্চমে শুক্র ও চন্দ্রের সমন্বয় ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়ে রবি তুঙ্গী, রবি তাঁহার পক্ষে উপকারী হইলেও স্বাস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে বিবিধ ভাবে ক্ষতিকর হইয়াছে। বৈশাখের নব পত্রপুষ্পমণ্ডিতা বসুধার খর রৌদ্রতাপে যাঁহার জন্ম, তাঁহার চিত্তে যে সৃজনী-প্রতিভা থাকিবে, তাহা স্বাভাবিক; প্রচণ্ড সূর্য্য তাঁহাকে তেজোসম্পন্ন করিয়াছে, আবার সামান্য ব্যাপারেও অসহিষ্ণু ও চঞ্চল করিয়াছে।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধনুলগ্নে জন্ম। জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্র ও বুধ তুঙ্গস্থানে; শনি, রাহু, রবি, বুধ ও কেতু এই পাঁচটি গ্রহ কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। একমাত্র দুইটি তুঙ্গীগ্রহের ফলেই জাতক বিশিষ্ট ভাগ্য লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশের অধিপতি মঙ্গল একাদশ স্থানে; এই স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় জাতক দানশীল ও সৎকার্য্যে ব্যয়ী হইয়াছেন। কেন্দ্রে বিবিধ অশুভ গ্রহের সমাবেশ হেতু ইঁহার জীবন নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। বিশেষতঃ, শনি ও রাহু পারিবারিক জীবনে শান্তি দিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম ধনুলগ্নে, এইরূপ জাতক সাধারণতঃ কর্ম্মপ্রিয় হইয়া থাকেন। ইঁহারা স্বাধীন-চেতা; উদ্দামতাও যথেষ্ট পরিমাণে ইঁহাদের চরিত্রে আছে। ন্যায়-বুদ্ধি ইঁহাদের তীক্ষ্ণ; যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করেন না। ইঁহাদের মধ্যে সংস্কারকের গুণ থাকা স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দেরও এই লগ্নে জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ জাতক ধনী অথবা নির্ধনের গৃহে, যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, নিজেই নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারেন। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে দিনার্দ্ধ বা নিশার্দ্ধের পর সার্দ্ধ দ্বিদণ্ড কাল অতি শুভ সময়। এই সময়ে যাঁহার জন্ম হয়, তিনি রাজা, ধনাঢ্য বা তৎসমকক্ষ হইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দশমপতি অর্থাৎ কর্ম্মের অধিপতি বুধ স্বস্থানে তুঙ্গী অবস্থায় আছে, সুতরাং বুধের পূর্ণ ফল তিনি লাভ করিয়াছেন। তুঙ্গী বুধ জাতককে বিদ্যাবান, আনন্দযুক্ত ও নানা সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছে। দশম স্থান মানুষের কর্ম্ম ও জীবনের উপায় নির্দ্দেশ করে। বুধ নানা শাস্ত্র, কলাবিদ্যা, গণিত ও ব্যবহার শাস্ত্র, অধ্যাপনা ও বাগ্মিতা প্রভৃতির কারক। এই বুধের জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ রচনা-শক্তি লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা বাংলা সাহিত্যে নবযুগের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রাশিচক্রের আলোচনা করিতেছি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে কথাশিল্পী ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার উদার ও সংস্কার-মুক্ত মন
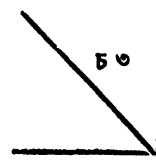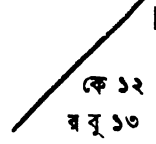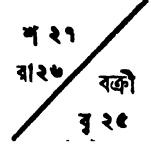
পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রকৃত পক্ষে বাংলার জীবন-ক্ষেত্রে সংস্কারকের কার্য্য করিয়া গিয়াছে; তাঁহার স্বদেশ মন্ত্র, সাহিত্য-প্রেরণা বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকগণের আদর্শ স্বরূপ। মকর লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। এই লগ্নে অনেক মনীষী ও সাহিত্যিকের জন্ম। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক 'বনফুল' এই মকর লগ্নেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, ছত্রপতি শিবাজীর এই লগ্নে জন্ম। এই লগ্নের বিশেষত্ব অদম্য সৃজনী-প্রতিভা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। অবসাদ ও নৈরাশ্যকে ইঁহারা কর্ম্মের মধ্য দিয়া জয় করিতে চান; ইঁহাদের স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার সম্মুখে অন্যের দাঁড়ান শক্ত। অনেকের মতে ইঁহারা রূঢ়ভাষী; অল্পে ইঁহারা ক্ষান্ত হইতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রাশিচক্রে শুক্র ও বুধের অবস্থান শুভকর। বুধ ও শুক্রই তাঁহার অতুলনীয় রচনা-শক্তির বিকাশ করিয়াছে। পঞ্চমস্থ শুক্র স্বক্ষেত্রে; শুক্র কলাবিদ্যা ও নীতি-বিদ্যার কারক। এই শুক্র আবার এখানে পঞ্চম পতি ও দশম পতি। শুক্রের কারকত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বুধ ও রবি একত্রে অবস্থান করায় অন্য একটি বিশিষ্ট যোগ হইয়াছে। শুক্র জাতকের পঞ্চম ও দশম পতি, বুধ নবম ও ষষ্ঠ পতি। এই দুইটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে আছে। সুতরাং বিদ্যা ও ভাগ্য সম্বন্ধে অতিশয় শুভ করিয়াছে। বুধ ও শুক্রের এইরূপ অবস্থান বিরল; তিনি যে কোন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, শুক্র
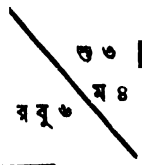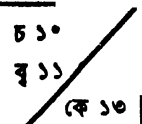
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁহাদের পঞ্চমে থাকেন, এবং সেই রাশি যদি স্ত্রীরাশি (অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা-বৃশ্চিক, মকর ও মীন) হয়, তাহা হইলে বেশির ভাগই কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিয়াছে। স্ত্রীরাশিগুলি অন্যান্য বলবান্ গ্রহ দ্বারা প্রেক্ষিত না হইলেও এইরূপ ঘটিতে পারে। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম স্থান কন্যা রাশি, অবশ্য এখানে শুক্র অথবা অন্য কোন স্ত্রীগ্রহের অবস্থান নাই। তথাপি অন্য বলশালী গ্রহের বিশেষ কোন প্রভাব না থাকায় তাঁহার একটি মাত্র পুত্র এবং অনেকগুলি কন্যা-সন্তান হইয়াছে। আবার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পঞ্চম স্থান স্ত্রীরাশি মীন, কিন্তু তাহাতে শুক্র অবস্থান করায় তাঁহারও একটি মাত্র পুত্র ও পাঁচটি কন্যা-সন্তান হইয়াছে। পঞ্চম স্থান যেমন অপত্য স্থান, তেমনই এই স্থান হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৃজনী-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চমে শুক্র থাকিলে জাতক অবশ্যই কবি কিংবা কাব্যরসজ্ঞ হইবে, ইহার ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। এই শুক্র শুধু কাব্য নহে, প্রাকৃত গ্রন্থ অর্থাৎ নাটক, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, কথাশিল্প প্রভৃতিরও কারক। শ্রীযুক্ত সজনীকান্তের পঞ্চমে শুক্রের অবস্থান হেতুই কবি হইতে পারিয়াছেন। নূতন লেখকদিগের মধ্যে 'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়েরও পঞ্চম স্থানে শুক্র অবস্থিত। পরীক্ষামূলক ভাবে নবীন হইলেও আমরা পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য ইঁহার নাম উল্লেখ করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সৃজনী-শক্তির মূলে বুধ ও শুক্রের প্রভাবই সমধিক। বৃহস্পতির বিশেষ কোন শুভ ফল তাঁহার জীবনে পড়ে নাই। প্রসিদ্ধ কথাশিল্পীদিগের উপর বুধের প্রভাবই অধিক পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের দুই জন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর রাশিচক্র আলোচনা করিয়া এই ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'বনফুল'—এই দুই জনের জন্মকুণ্ডলীতে বুধের অবস্থান বিশেষ অনুকূল। তারাশঙ্কর বাবুর জন্মলগ্নে বুধ অবস্থান করিতেছে; 'বনফুলে'র লগ্নের সপ্তমে বুধ আছে। ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথম ও দশম ভাবের দ্বারা মানুষের বৃত্তি বা জীবনোপায় নির্ণয় করা যায়, এই সত্য বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মকুণ্ডলী আলোচনায় আমাদের মনে দৃঢ়তর হইতেছে।

জ্যোতিষের আলোচনায় ভাগ্যলিপি সর্বাপেক্ষা জটিল। এই ভাগ্য জানিবার জন্যই সকলের কৌতূহল। গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী মানুষ ভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্য হইতে পারে; কিন্তু রাশিচক্রে গ্রহের সন্নিবেশ দেখিয়া গ্রহগণের বলাবল বিচার করা উচিত। যে যে কারণে মানুষকে দুর্ভাগ্যের দিকে টানিয়া লইতেছে, সেই সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিলে তাহাকে ভাগ্যবান করা না গেলেও দুর্ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রাষ্ট্রনায়কগণের প্রতিভার আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য।

"একটা সার কথা বলিয়া রাখিতেছি। ইংরাজ যতই ভোজ খাউন, মদের গ্লাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তুমি রাজা বা মহারাজ বা বড়লোক যে কেবল উঁহার খোসামোদ করিতেছ—কোন "মতলব" আছে, তাহা উনি বিলক্ষণ জানেন, তুমি উঁহার প্রতি ভয়প্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ ভালবাসার জন্য তিলার্দ্ধও নয় তাহাও জানেন; এবং তাহা জানিয়া তুমি একটু ঘেঁসিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের ওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পূজা। পূর্ব্বোল্লিখিত দব সেবকটী ঐ ভোজ দেওয়ার পর তাঁহার ইনকমট্যাক্স বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া যখন আপীল করিলেন তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নবাগত কালেক্টর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, "যে এক রাত্রে পাঁচ হাজার টাকা ভোজে খরচ করিতে পারে, তাহার আয় অত কম কখনই হইতে পারে না।"

যদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান কর; কিন্তু এমন ভাবে কর, যাহাতে সম্মানিত ইংরাজের নাম থাকে এবং দেশীয় লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়া আলো জ্বালিয়া টাকা নষ্ট করিও না। ভোজ দিয়া অনর্থক অপব্যয় এবং অপকর্ম্ম করিও না। যে ইংরাজের তুষ্টিসাধনার্থ ঐ সকল করিয়া থাক, তাঁহার নামে ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রাস্তা, ঘাট, স্কুল, অতিথিশালা, ছাত্রবৃত্তি, মেডাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা কিছু পার, স্থাপন কর। এরূপ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইবে যে বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ "সত্য সত্যই" তোমার গৌরব করিবেন। এখন তোমার খরচে তোমার বাটী বসিয়া ভোজ খাইয়া মনে মনে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন।"

—ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্যাম দেশে ভাষায় ভারতীয় প্রভাব

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্যাম দেশের ভাষার উপর ভারতীয় সংস্কৃত ও পালী ভাষার প্রভাব অসামান্য। বর্ত্তমান এশিয়াবাসীদের কৃষ্টিগত সংগঠনের এই ভাষাগত ঐক্যের অসাধারণ মূল্য সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বহু যুগের কল্যাণময় প্রচেষ্টা যে এই মিলনের পিছনে নিহিত আছে, সে বিষয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সমস্ত ঐতিহাসিকরাই একমত।

সিংহলের বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ "মহাবংশ" থেকে জানা যায় যে, খৃঃ-পূঃ ৩য় শতকে ভারতবর্ষের সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে "সুবর্ণভূমিতে" সোন এবং উত্তর নামে দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এখন "সুবর্ণভূমি" যে কোন্ দেশ এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা আছে। শ্যাম দেশের ঐতিহাসিকদের মতে "সুবর্ণভূমি" তাঁদের মাতৃভূমির অন্তর্গত কোনও দেশ ছিল। "থাই"দের একটি জনপ্রবাদ অনুযায়ী অশোকের উল্লিখিত ধর্ম্মপ্রচারকদ্বয় দক্ষিণ-শ্যামের অন্তর্গত "নগর প্রথমে" ("নাখোন পাথোম") প্রথম অবতরণ করেছিলেন। এখন "সুবর্ণভূমি"র অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, সুদূর প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে যে শ্যাম দেশে পালী ভাষার বিশেষ প্রচার এবং সমাদর হয়, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহ।

চীন দেশের কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং ইন্দোচীনে অবস্থিত আনামের (প্রাচীন "চম্পা") একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কৌণ্ডিন্য নামে কোনও এক জন ভারতীয় ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়ায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন। পরবর্ত্তী কালে আরও কয়েক জন ভারতীয় সুদূর প্রাচ্যে, বিশেষতঃ শ্যাম, মালয় এবং ইন্দোচীনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করেন। এই রকম ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব্ব-এশিয়া এবং দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার হয়। এর প্রমাণস্বরূপ অসংখ্য সংস্কৃত অনুশাসন সুদূর প্রাচ্যের নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ত্তমান শ্যামরাজ্যের অনেকাংশ নিয়ে গঠিত খেমির জাতি-অধ্যুষিত প্রাচীন কম্বোডিয়ার (চীনা গ্রন্থে "ফুনান" নামে পরিচিত) অনুশাসনগুলি এর অন্যতম।

প্রাচীন কালে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্যাম দেশে "মন্" ও "খেমির" জাতির প্রাধান্য ছিল। "খেমির"রা "কম্বুজ" অথবা "খোম" নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ-শ্যামে তাদের অধ্যুষিত দুইটি রাজ্য "লোপ বুরি" এবং "দ্বারাবতী" যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ভারতীয় গুপ্তযুগের (৩২৫-৫১০ খৃঃ অঃ) সংস্কৃতি দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। পরবর্ত্তী কালে "পাল" নৃপতিদের দ্বারা শাসিত বাঙলার দ্বারাও শ্যাম দেশ অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়। এই সব কারণে ভারতীয় এবং বিশেষ করে পূর্ব্ব-ভারতীয় ভাষাগুলির প্রভাব "মন-খেমির"দের ভাষার উপর অসাধারণ ভাবে অনুভূত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীন থেকে আগত "থাই"দের দ্বারা শ্যাম দেশ আক্রান্ত হয় এবং এক শতাব্দীর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে "মন" ও "খেমির"রা সম্পূর্ণ ভাবে পর্য্যুদস্ত হয়। "থাই"রা "মন" ও "খমির"দের পদা-বনত ক'রলেও তাদের উন্নততর সভ্যতার উপর বিশেষ ভাবে আস্থাবান হ'য়ে ওঠে। এই কারণে "থাই" ভাষাতেও সংস্কৃত ও পালী ভাষার যথেষ্ট শব্দ প্রবেশ করে। বিজয়ী থাইরা কম্বুজ অথবা খেমিরদের কাছ থেকে অক্ষরও গ্রহণ করে। ফলে থাই ভাষা এবং অক্ষর প্রায় সর্ব্বতোভাবে ভারতীয় ভাষার অনুকরণে গড়ে ওঠে। বর্ত্তমানে থাই ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত এবং পালী থেকে উদ্ভূত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, থাই ভাষার উপর বাংলা ভাষার প্রভাব অতুলনীয়। সুদূর প্রাচ্যের এই ভাষাটির উচ্চারণ-পদ্ধতি বর্ত্তমানে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার থেকে স্বতন্ত্র হলেও বাঙলার সাথে তার অনেকটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এর কারণ, বোধ হয়, প্রাচীন কালে বাঙালীর অসাধারণ ঔপনিবেশিক মনোভাব এবং কৃষ্টিগত উৎকর্ষতা। এক কালে যে স্থলপথেও বাঙালী রাজপুত্র, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক এবং ভ্রমণকারীরা দক্ষিণ-ব্রহ্ম দেশ এবং শ্যাম দেশের সংস্পর্শে আসতেন এমন প্রমাণ আমাদের আছে। এখানে সে বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করবার স্থান আমাদের নেই।

নীচে বারটি থাই শব্দ এবং তাদের বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হল। এই শব্দ ক'টি দেখলেই শ্যামদেশীয় ভাষার সাথে আমাদের ভাষার (বাঙলা, সংস্কৃত ইত্যাদি) ঐক্য যথেষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

	থাই	বাঙলা
১।	রথ	রথ
২।	চল	জল
৩।	মহা	মহা
৪।	পতিমা	প্রতিমা
৫।	ভাত	ভাত
৬।	সুরা	সুরা
৭।	নিথান	নিদান
৮।	মেখ	মেঘ
৯।	কালাসি	খালাসি
১০।	কাম্ফল	কম্বল
১১।	কি ?	কি ?
১২।	আহার	আহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত শব্দসমূহ সমস্তই সংস্কৃত এবং পালী থেকে গৃহীত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১০নং "কাম্ফল" অথবা "কম্বল" (Blanket) শব্দটি অষ্ট্রীক (Austric)। ক্রমবর্দ্ধমান ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা জানা গিয়েছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অষ্ট্রীকজাতি প্রাগৈতিহাসিক কালে, আর্য্য ও দ্রাবিড়দের ভারত আগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং বৃহত্তর বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বাঙলা এবং শ্যাম দেশের ভাষায় প্রচুর "অষ্ট্রীক" শব্দ বিদ্যমান। এই শব্দসমূহের গবেষণায় সত্যিই এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মহাস্থবির

পথে

এক দিন ইস্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল মুষলধারায়—ইস্কুল থেকে বেরুতেই পারলুম না। পেটে দুর্দম ক্ষুধা এবং আকাশের কর্ণভিদ্ গর্জন ফাঁকা ক্লাসে বসে পরিপাক করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘণ্টা দেড়েক দারুণ বর্ষণের পর প্রকৃতি শান্ত হলেন। বেরিয়ে পড়লুম দুই ভাইয়ে—ইস্কুল থেকে বাড়ী অনেক দূরে, পড়ি ডফ্ সাহেবের ইস্কুলে।

সেকালে কলকাতায় ঘণ্টা খানেক ঝেড়ে বিষ্টি হ'লে—যিনি যেখানে তাঁকে সেইখানেই থাকতে হোতো দু'-তিন ঘণ্টার জন্য। প্রায় সব রাস্তাতেই জল দাঁড়াত। ইস্কুলের ছোট ছেলেদের ডুব-জল, বুক-জল—হাঁটু-জল কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। খাটা-পায়খানার যত ময়লা ভাসত সেই জলে আর তারই ওপরে দাপাদাপি ও লাফালাফি করতে করতে ছাত্রদল বাড়ী ফিরত। এমন দিনে বাড়ীতে ফিরে আমাদের সাবান দিয়ে স্নান করতে হোতো।

যে সব রাস্তায় জল দাঁড়াত না অথবা বেশী দাঁড়াত না, সে সব রাস্তায় হোতো কাদা—সে এক রকম চটচটে ঘন এবং সাংঘাতিক রকমের পেছল কাদা, শতকরা পঁচিশ জন পথিককে আছাড় খেতেই হোতো। এই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হওয়াটাকে ছেলেদের ভাষায় বলা হোতো—আলুর দম হওয়া। কত দিন যে আলুর দম হ'য়ে বাড়ী ফিরেছি তার আর ঠিকানা নেই।

বর্ষাকালে জলও দাঁড়ায় না, কাদাও হয় না এমন রাস্তা সে সময়ের শহর-রক্ষকেরা দেশী পাড়ায় রাখা বোধ হয় পছন্দ করতেন না। এ যুগেও এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

যাই হোক, বই, ছাতা, জুতা, কোঁচা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে অর্থাৎ দু'হাতে দশ হাতের কেরামতি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলুম ফুটপাথের ওপরে খানিকটা ডাঙা জায়গায় বেশ একটা ভিড় গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বস্তুটিও যে নেহাৎ মামুলী নয় তা ভিড়ের হালচাল দেখে বাইরে থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সেদিন ক্ষুধার টান ছিল প্রবল, তাই মজা দেখবার প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেই এগিয়ে চললুম; এমন সময় ভিড় থেকে হো-হো হাসির হর্রা শুনতে পাওয়া গেল—ছুটলুম সেদিকে। জুতো, ছাতা, বই সমেত কোনো রকমে এঁকে-বেঁকে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলুম—পাগলিনী।

রাস্তার পাগলী বলতে লোকের মনে যে ছবি জাগে এ সে রকম নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, রাস্তার সঙ্গে তার পরিচয় সবে মাত্র শুরু হয়েছে। পাগলিনীর মাথা রুক্ষ নয়, দিব্যি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো, তেল-চকচকে এলানো চুল—সীঁথেয় ঝক্ ঝক্ করছে সিঁদুর, কানে ও হাতে সোনার গয়না। অঙ্গে চওড়া কালাপেড়ে পাতলা শাড়ী, একেবারে ধোপদস্ত, বেশ বাগিয়ে পরা। স্থূলকায়া হ'লেও দেখতে খারাপ নয়। চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে, বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না।

দেখলুম, পাগলিনী নিঃশব্দে কাঁদছে আর ভিড়ের লোকেরা উচ্চরবে হাসছে।

ভিড় থেকে এক জন লোক জিজ্ঞাসা করলে—শ্যাম বাবুকে এত ভালবাসিস্ তো তাকে ছাড়লি কেন?

পাগলিনী কাঁদতে কাঁদতে বললে—তাড়িয়ে দিলে যে!

ইতিমধ্যে আর এক জন বললে—তোর শ্যাম বাবু আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কোথায় গিয়েছে! কত নম্বরের বাড়ী?

লোকটা যা-তা একটা ঠিকানা বলে দিলে। পাগলী বার দু'-তিন তা আওড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কত দূর, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে পৌঁছতে পারব সেই ঠিকানায়?

এক জন রসিকতা ক'রে বললেন—তোকে সেখানে যেতে হবে কেন? শ্যাম বাবু বলেছে, সে নিজে এসে তোকে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

পাগলিনীর মুখে হাসি ফুটল। খুসীতে ভরপুর হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলেছে! তোকে বলেছে! তাকে নিয়ে এলি না কেন?

লোকটা বললে—চতুর্দ্দোলা ভাড়া করবে, ব্যাণ্ড ভাড়া করবে তবে তো আসবে। তোকে তো আর এমনি নিয়ে যেতে পারে না?

চার দিকের সবাই হেসে উঠল—পাগলিনী আবার কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে।

ভিড়ের লোকেরা পাগলিনী সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতে লাগল। কেউ বললে—ও ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, শ্যাম বাবু বলে একটা লোক ওকে বের ক'রে নিয়ে এসে কিছু দিন বাদে ফেলে পালিয়েছে, তাইতে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

আর এক জন বললে—ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—তবে শ্যাম বাবুর জন্যই ও পাগল হয়েছে।

পাগলিনীকে দেখে মনের মধ্যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল কিন্তু তার জীবনকাহিনী করুণতর বলে মনে হোলো।

সেই রাত্রে খাবার সময় সবার সামনে পাগলিনীর গল্প করলুম। দেখলুম আসরের সবাই গম্ভীর হ'য়ে পড়লেন—দু'-এক জন সহানুভূতি-সূচক একটু শব্দ উচ্চারণ করলেন মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সকলেই মুখ খুলল। এক জন শেষ রায় দিয়ে দিলেন—ও মেয়েগুলোর শেষ কালে এ-ই হ'য়ে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার তো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল শ্যাম বাবু লোকটাই খারাপ। নেই বা হোলো সে ভদ্র গৃহস্থঘরের কন্যা। কিন্তু ভালো সে বেসেছিল এক জনকে, যার জন্ম আজ পাগলিনী হ'য়ে রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে—এত বড় সত্যটাকে এরা দু'টো চুক্চুক্ আওয়াজ ক'রে রায় দিয়ে দিলে, যত দোষ ঐ মেয়েটার!

কিন্তু মানুষের চিত্তলোক, যেখানে নিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ চলেছে, সেই আমার চিত্তলোকে পাগলিনীর জন্ম নতুন মহল তৈরি হ'তে সুরু হোলো।

পাগলিনীকে ইস্কুল-যাতায়াতের পথে রোজই দেখি। প্রায় রোজই তাকে একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, রাজ্যের ছোট ছেলে এবং সকল বয়সী স্ত্রী পুরুষ তাকে সর্বদাই ঘিরে রয়েছে, তার আকুলতা দেখে হাসাহাসি করছে। ছেলেরা বলছে—ঐ দেখ, ঐ দূরে তোর শ্যাম বাবু পালিয়ে যাচ্ছে।

পাগলী উঠে থপ্-থপ্ ক'রে দৌড়ল সেই কাল্পনিক শ্যাম বাবুর উদ্দেশ্যে—কিছু দূর গিয়ে শ্যাম বাবুকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। তার ব্যর্থতা দেখে সবাই হেসে উঠল।

এক দিন ইস্কুলে যাবার সময় দেখি পাগলিনীকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। দু'-এক জন ভদ্রলোক উত্তেজিত হোয়ে চেঁচামেচি করছেন। এক জন বললেন—এ সব লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি, পাগলিনী ফুটপাথের ধারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে তার কপালের খানিকটা বেশ কেটে গিয়েছে, দু'-তিন জন লোক মিলে দমকল থেকে আঁজলা ক'রে জল এনে এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনলুম, সেদিন সকাল থেকেই পাগলিনী শ্যাম বাবু, শ্যাম বাবু ক'রে চেঁচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় ক'রে তুলেছিল। একটা লোক তাকে বলে যে, শ্যাম বাবু বলে এখানে চ্যাঁচালে কি হবে, সে তো ঐ ও-পাড়ায় থাকে।

আর যায় কোথায়! সংবাদটি শুনেই পাগলী উঠে দৌড় মেরেছিল সেই ও-পাড়ার দিকে। স্থূল শরীর, কয়েক পা যেতে না যেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গেছে। নিঃস্বার্থ ভাবে সকলে যখন সেই নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগে আত্মহারা, তখন জন কয়েক সহৃদয় লোক এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন।

কিছু দিনের মধ্যেই পাগলিনীর নামকরণ হ'য়ে গেল। শ্যাম বাবু-পাগলী বললেই ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই বুঝতে পারত কার নাম করা হচ্ছে।

বছর দেড়েক পরে আমরা ও-পাড়ার ইস্কুল ছেড়ে দিলুম। শ্যাম বাবু-পাগলীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, এমন সময় এক দিন দেখি, পাগলিনী হেদোর ধারে বেশ একটি জনতার মধ্যে বসে তার সেই সনাতন শ্যাম বাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পাগলিনী সেই থেকে হেদোর ধারেই রয়ে গেল।

হেদোর গায়ে ফুটপাথের ধারেই সে বসে থাকে। কখনো বা ভিক্ষে করে। কিন্তু 'একটি পয়সা দে বাবা'র চাইতে 'ওরে, শ্যাম বাবু কোথায় বলতে পারিস' কথাটাই বলে বেশী। ক্রমে তার দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গিয়ে পথেরই মতন সে মলিন হ'য়ে উঠতে লাগল। বস্ত্র ছিঁড়ে গেলে দু'-এক দিনের মধ্যেই দেখতুম কোথা থেকে নতুন একখানা কোরা ধুতি কিংবা শাড়ী সে জোগাড় করেছে। কোথায় খেত জানি না, মধ্যে মধ্যে তেলে-ভাজা খেতে দেখতুম—সে সময়ে হেদোর ধারের মুখরোচক তেলেভাজা অনেকেরই নরক-যাত্রার পথ সুগম করেছিল।

কখনো ফুটপাথের ধারে, কখনো বাগানের মধ্যে, বৃষ্টি-বাদলের সময় কাছাকাছি কোনো গাড়ী-বারান্দার তলায়—এই ভাবে তার জীবন অগ্রসর হ'তে লাগল।

আমরাও বড় হ'তে লাগলুম—লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেটে একটা-আধটা টান মারার বয়সে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু পাগলিনীর সেই এক ভাব—শীতাতপবর্ষণ মাথায় নিয়ে সেই পথচারীদের জিজ্ঞাসা ক'রে চলেছে শ্যাম বাবুর ঠিকানা, কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে তার বাড়ীতে পৌঁছতে পারা যাবে।

ক্রমে—পথচারী বা পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সেই একঘেয়ে আমোদে অরুচি ধরে গেল, তাই তারা তাকে ত্যক্ত করা ছেড়ে দিলে। পথে যারা নিত্য যাওয়া-আসা করে তাদেরও কৌতূহল মিটে গিয়েছে। সবাই নিজের মনের মতন তার একটা ইতিহাস তৈরী ক'রে নিয়েছে, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছে। শ্যাম বাবু-পাগলীর মধ্যে নূতনত্ব আর কিছুই নেই—তার সম্বন্ধে জগৎ ক্রমেই নিরপেক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে যদি কোন কৌতূহলী পথিক তার কথার জবাব দিত তো পাগলী তার সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে শ্যাম বাবু সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকত। অশ্রুজল আর তার চোখে দেখিনি তবে কণ্ঠে তখনো অশ্রু জমাট ছিল।

দিন যেতে লাগল, আমরা লায়েক হ'য়ে উঠতে লাগলুম। 'স্বদেশী'র পূত স্পর্শে 'বিড়ি' দ্রব্যটি জাতে উঠে গেল এবং আধুনিক যুগের খদ্দরের মতন সকলেই সেই দেশজাত শিল্পটির প্রতি মনোযোগী হ'য়ে উঠতে লাগল। লুকিয়ে ঝোঁপঝাড়ের পাশে বসে বিড়ি ফোঁকবার জন্ম প্রায় রোজই বিকেলে আমরা হেদোয় যেতুম—পাগলিনীর সে রূপ আর নেই, যা দেখে এক দিন চমকে উঠেছিলুম। সে ছিল যাকে বলে বেশ স্থূলকায়া। ক্রমে তার অঙ্গের মেদ ও পেশীগুলো শুকিয়ে গিয়ে চামড়া ঝুলে পড়তে লাগল, সুন্দর চোখ দু'টো নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। চুলগুলো কিছু উঠে গিয়ে ও জট পড়ে বিশ্রি হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু এক দিন দেখলুম কে তার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। দু'-পাশ থেকে গাল-দু'টো ঝুলে চিবুক ছেড়ে নেমে পড়ল—হঠাৎ কোনো অজানা লোকের সামনে পড়লে সে ব্যক্তি ঠিকরে পালিয়ে যেত।

পাগলিনী এখন আর পথের লোককে শ্যাম বাবুর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে না। যে কোনো সুবেশ পুরুষ, তা সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক—আলিঙ্গনে উদ্যতা হ'য়ে তার দিকে ধাওয়া করে। বেচারী পথচারী ধোপদোস্ত জামা-কাপড় প'রে চলেছে আনমনে হঠাৎ সম্মুখে আলিঙ্গনোদ্যতা সেই তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, মুহূর্ত পরেই প্রাণভয়ে সেই পলায়ন দৃশ্য, পথিক মাত্রেই উপভোগ করত।

কিছু দিন আমোদ উপভোগ ক'রে লোকে এলে গেল। এ ব্যাপারটাও তাদের সয়ে গেল, আর কিছু মজা পায় না তারা! কিন্তু পাগলিনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সমানে একে-ওকে-তাকে

ধরে বেড়াতে লাগল—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে কোনো বিকার নেই, সেই এক ভাব।

তার পর আমাকেও এক দিন পথ ডেকে নিল যাত্রার তপস্যায়। সাত বৎসর ধরে মাতৃভূমির রাজপথে ঘুরে ঘুরে কত ঘটনাই দেখলুম, কত কাহিনীই শুনলুম। কত পাগলের পাশে শুয়ে-বসে রাস্তায় রাত কাটিয়ে পথের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, আবার তেমনি অকস্মাৎ পথের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটে গেল। আবার ঘরের ছেলে ফিরে এলুম ঘরে।

কলকাতায় ফিরে আত্মস্থ হ'য়ে দেখতে পেলুম এখানেও পরিবর্ত্তনের ঝড় ছুটেছে হু-হু ক'রে। পরিবর্ত্তন ঘটছে তার সামাজিকতায়, তার আধ্যাত্মিকতায়, পরিবর্ত্তন ঘটছে তার মিত্রতায় তার ব্যস্ততায়। অঙ্গের পরিবর্ত্তন তার এমন ঘটেছে যে চমকে উঠতে হয়। কত খোলার বাড়ী হয়েছে বাগানবাড়ী, কত বস্তিতে বসেছে বাজার, কত বাজার হয়েছে ওজোড়, কত এঁদো পাঁদাড় হয়েছে গুলজার। এরই মধ্যে, এক দিন দেখলুম, এই তরঙ্গসঙ্কুল পরিবর্ত্তন-পারাবারের মধ্যে পাগলিনী ঠিক হেদোর ধারে বসে আছে, সাত বছর আগে যেমনটি তাকে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

পাগলিনীর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেদিন তাকে যে রকম দেখে গিয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক কৃশ হ'য়ে পড়েছে কিন্তু কৃশ হ'লেও সেদিনকার সেই বীভৎসতার ছাপ তার চেহারায় আর নেই। কয়েক দিন বাদেই বুঝতে পারলুম, তার সেই শ্যামবাবু-শীকার করার ভাবটাও একেবারে কেটে গিয়েছে। কথা-বার্ত্তা একেবারেই বলে না বললেই হয়, কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে চুপ ক'রে থাকে, নয় ত বিশ্রি গালাগাল দেয়। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলেছে সেদিকে তার দৃক্‌পাতও নেই, হঠাৎ মুখ তুলে যার দিকে চোখ পড়ল তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—একটা পয়সা দাও না।

সকলকে সমান ভাবে সম্বোধনও করে না, কারুকে তুমি, কারুকে বা তুই, শহরশুদ্ধ লোকের টনক নড়ে গেল—হেদোর ধারের শ্যাম বাবু-পাগলী আর শ্যাম বাবুর খোঁজ করে না।

আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। এক দিন, তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজা হয়ে গিয়েছে, সামনেই কালীপূজা। সন্ধ্যে থেকে ঘণ্টা দু'-তিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আশ্বিনের বুকে অঘ্রাণের আমেজ লাগিয়ে দিলে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার তেজ যেন বেড়ে গেল।

রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে। নিঃশব্দপ্রায় জনহীন পথ বেয়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম···দেখলুম, হেদোর সামনের ফুটপাথে পাগলিনী বসে আছে। আঁচলের খানিকটা ফুটপাথের ওপরে পাতা, তার ওপরে চারটি মুড়ি। আমাকে দেখেই বললে—একটা পয়সা দে না রে!

আশ্চর্য! তার কণ্ঠস্বর ঠিক তেমনিই রয়েছে—সেই অশ্রু-সজল তীক্ষ্ণ অথচ করুণ কণ্ঠস্বর।

একটা পয়সা বের ক'রে তার কাছে যেতেই সে হাত তুলে পয়সাটা নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলে। তাকে দেখতে দেখতে কি জানি আমার কেমন একটা কৌতূহল হোলো, আমি তাকে একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললুম।

বিশ বছর ধরে দেখলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি কখনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করলুম—হ্যাঁ রে, তোর শ্যাম বাবু এখন কোথায় থাকে?

পাগলী একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, তার পরে তার অর্দ্ধাবৃত বুকের আবরণ সরিয়ে বুকের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

একেবারে চমকে উঠলুম! তবে! তবে কি এত দিন ধরে তাকে যা দেখে এলুম তা কি তার আসল রূপ নয়! এই দীর্ঘ দিন ধরে তার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কত ভাঙা-গড়া চলেছে সে কি সব বৃথাই গিয়েছে! হোতেই পারে। বিচিত্র নয় যে, পাগলিনীর শ্যাম বাবু—রাম-শ্যাম-যদুর শ্যাম নয়। তার শ্যাম অন্তরে থেকেও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ইঙ্গিতে তারই আহ্বানে সে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসেছে। একে-তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় গেলে পাব তাকে? যার-তার কথায় ছুটেছে দিগ্বিদিকে—কোনো বাধা মানেনি, সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে অঙ্গে, রক্তাক্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছে পথের ওপর—যে পথে এক দিন শ্যামের পদপাত হবেই। নয় ত বা পথের এক পাশে বসে কাতর কণ্ঠে কেঁদেছে—কোথায় গেলে শ্যামের দেখা পাব।

তার পরে এক দিন শ্যাম এসে তাকে দেখা দিলেন সুন্দর বেশে, পথচারীর রূপ ধরে। শ্যাম এলেন কখনো যুবক, কখনো কিশোর, কখনো বা বালকের রূপ ধরে। পাগলিনী আহ্লাদে আটখানা—ছুটেছে আলিঙ্গন করতে কিন্তু শ্যাম তবু ধরা দেয় না। বিগতযৌবনা লোলচর্মা কুৎসিতা পাগলিনী শবরী'র মত প্রতীক্ষায় ছিল এমন সময় শ্যাম সাড়া দিলেন অন্তরে—চাপল্য তার স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরের জগৎ রইল পড়ে বাইরে, তার প্রেমালাপ চলতে লাগল শ্যামের সঙ্গে অন্তরে। কিছুই বিচিত্র নয়!

[ক্রমশঃ

চার্চিল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গুণী তুমি বট, কর্ম্মশক্তিও প্রবল
লণ্ডনকেই ভাবো তুমি গোটা ভূমণ্ডল
মেটে গর্ব্বে ফেটেই মর' জাতির অহঙ্কারে।
সাম্রাজ্যমদ্ একচেটে ভূত চেপেই আছে ঘাড়ে।
শাণিত সব বচন তোমার—দৃঢ় তোমার পণ,
জিহ্বা তোমার দরাজ বটে, বড্ড ছোট মন।
অলক্ষুণে কণ্ঠ তোমার, বিঘ্ন ধরিত্রীর
যেন ভয়াল ডাক নিশীথ শ্মশান শকুনির।

নাই ক' সুদূর দৃষ্টি তোমার—সংকীর্ণতায় ভরা
সভ্য যুগের 'গুহা-মানব' দম্ভ দিয়ে গড়া।
নিম্নশ্রেণীর রাজনীতিবিদ্, শ্রেষ্ঠ যত খলের,
রাজ-দেউড়ির রক্ষী, নেতা ডাণ্ডাকুত্তা দলের।
প্রতিভা নয়-কম তো নেহাৎ—আস্ফালন অসীম
'মতিরায়ের' যাত্রা দলের কোপন-স্বভাব ভীম।
হাসি দেখে ফণার বাহার শোভন দর্পটি
জন্মেজয়ের যজ্ঞে যাবার শেষের সর্পটি।

ঢুম-ঢুম করে গোণা বাইশটা শব্দ হলো।

বিপ্রপদ ছুটে বাগানের দিকে যান। ঐ শব্দে তাঁর বুকটা যেন ভেঙে যায়। এমন সাহস কার যে তাঁকে না জানিয়ে এই সর্বনাশ করছে। এমনিতেই তাঁর মনটা ভাল না—এখন একেবারে বিরক্তি ও ক্রোধে ভরে ওঠে।

'সানদার' ভাল কথায় বাজকর কোম্পানী নারকোল গাছে উঠেছে। রাত জেগে মাছ-মাংস খেয়ে তাদের শরীর না কি বড্ড গরম হয়েছে—এমন কচি ডাবের জল খেয়ে চড়া বাতিক ঠাণ্ডা করবে। যাদের বদহজম কিম্বা অম্বলে নাড়া দিয়েছে পেট তারাও দু'-একটা খাবে। যে বাড়ীতেই এরা যায় সে বাড়ীতেই এ সব অত্যাচার করে। কখনও বা গোপনে কখনও হয়ত প্রকাশ্যে বিপ্রপদকে সকলেই ভয় করে—এখানে চুপে-চুপেই কাজ সারবে ভেবেছিল কিন্তু সময়ের দোষে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল। ত্রেতাযুগে লঙ্কেশ্বরের কাছে যেভাবে পরাজিত বানর-চমূ দাঁড়িয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই আজ আত্মসমর্পণের ভাণ করে এই বাজকর-চমূ দাঁড়িয়ে থাকে। এরা এসেছে বিয়ের তিন দিন আগে—যাবে চার দিন পরে, এত দিন এদের অত্যাচার সহ্য করা যে সে গৃহস্থের কর্ম নয়।

'কি, তোরা পেয়েছিস কি বল ত? একেবারে মগের মুল্লুক না কি যে উজাড় করে দিবি? এই, এতগুলো কচি ডাব পাড়ল কে? খাবি, দু'টো-চারটে খা। একেবারে কুড়ি বাইশটা। তোদের পেটে কি রাক্ষস না কি? লুঠের মাল পেয়েছিস বুঝি? কে এমন কর্ম করলে বল ত?'

সেই যাত্রার দল-ফেরত ঘুগু বলে, 'এজ্ঞে আমি।'

বিপ্রপদ তেড়ে উঠে বলেন, 'এজ্ঞে আমি! কেন পাড়লি—কার হুকুমে গাছে উঠলি?'

'বরযাত্রীদের হুকুমে কত্তা।'

'তারা কোথায়? অনেকক্ষণ তো নৌকা ছেড়ে গেছে।'

'খালের বাঁকে নাও লাগিয়ে আছে। কয়েকটা ডাব চাইছে।'

বিপ্রপদর সুর নরম হয়। 'সত্যি না কি?'

'সত্যি-মিথ্যে আপনি দেখবেন কত্তা, চলুন।'

'যা, আমি আর দেখব কি, তোরা বাবা দিয়ে আয়!' বিপ্রপদ বাড়ীর ভিতর ফিরে আসতে আসতে বলেন, 'আমাকে জানিয়ে পাড়লে কি আমি নিষেধ করতাম, না বাধা দিতাম। যত মূর্খের দল, মিছেমিছি কটু কথা শুনল।'

ওদের কথা বিপ্রপদর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না, তবু এত সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস হয় না—কারণ সত্যই যদি বরপক্ষ ডাব খেতে চেয়ে থাকে তবে খুবই লজ্জার বিষয় হবে।

বলা বাহুল্য, বিপ্রপদর সন্দেহ সত্য। তিনি চলে যেতেই বানর-চমূ ডাবগুলি নিয়ে ভীষণ কাড়াকাড়ি জুড়ে দেয় এবং অল্প কালের মধ্যেই সেগুলি পুকুরের কাদার তলে গয়েব করে ফেলে—বিকালে ঠাণ্ডা হলে তুলে তুলে খাবে।

মেয়েদের কথা বিপ্রপদ বেশীক্ষণ ভাবতে সময় পান না। নানা দিকের নানা কাজ তাঁর কাছে এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। কেউ জোড় হাতে সুবিচার চায়—কেউ করে দিতে বলে মীমাংসা, কেউ উপদেশের আশায় অপেক্ষা করে বসে থাকে।

বিপ্রপদ আজ গ্রামের প্রধান—হাকিমের আসনে সমাসীন। দেশের লোক বিনা দ্বিধায় তাঁকে সম্মানিত করেছে। তিনি কি করে উপেক্ষা করবেন তাদের আবেদন? কি করে অবজ্ঞা করবেন তাদের এজাহার? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, খাওয়া-দাওয়ার সময় বয়ে যায় তবু তাঁকে থাকতে হয় কাছারী সাজিয়ে—পান-তামাকের অবারিত ব্যবস্থা নিয়ে। তালুক কেনার পর থেকে তাঁর এ খাটুনী ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক যে নিত্য দু'বেলা তাঁর কাছে আসে নানা জটিল বৈষয়িক প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে তার ইয়ত্তা নেই। দূরাগত যারা, তারা তাঁরই ভাত খেয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁরই পরামর্শ নিয়ে চলে যায়। কেউ সরিকের কাছে ঠকে ঠকে ভদ্রাসন ছেড়ে যাওয়ার জোগাড়, কেউ পরাক্রান্ত শত্রুর হাতে মুখ গুঁজে কেবলই মার খাচ্ছে, কেউ বা পুলিশের হাতে নাজেহাল—জোর ক'রেই দেবে জেলে—এমনি শত-সহস্র কূট সমস্যার মীমাংসার পথ খুঁজে দিতে হয় তাঁকে। বিপ্রপদ ক্লান্তি বোধ করেন না। নিতান্ত অসময়ে কেউ এলেও তাকে অনাদর করেন না। বরঞ্চ এ সব কাজে তাঁর যথেষ্ট অধ্যবসায় দেখা যায় এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করেন যথেষ্ট। বাড়ী যত দিন আছেন এমনি ক্ষত-বিক্ষত মনঃক্লিষ্ট মানবের সেবা করে যাবেন, জাতি-ধর্ম্মের বিচার না করে করবেন যে আসে তারই মনোরঞ্জন।

এক দিন এক জন অপরিচিত ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এসে জিজ্ঞাসা করে, 'বলতে পারেন বোস ঠাকুর কোথায়?'

বিপ্রপদ নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ বোস ঠাকুর? এখানে তো তিন ঘর বোস আছে, কাকে চাই?'

'বিপ্রপদ বাবুকে চাই।'

'কি দরকার? আমার নামই তাই।' বিপ্রপদ বুঝতে পারেন না, তুমি না আপনি কোন্ সর্বনামটা ব্যবহার করবেন! লোকটিকে কথায় বার্তায় বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হয়, কিন্তু জামা-কাপড়ের দিকে চাইলে আপনি বলতেও দ্বিধা বোধ হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

দেখা যাক আর কিছুক্ষণ। মাঝামাঝি ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'নাম? বাড়ী?'

'বাড়ী রাইসাড়ী। নাম স্বরূপ, কিন্তু আমি বহুরূপ, বিধাতা আমার ওপর বিরূপ—তাই নিলাম আপনার শরণ, আপনি না কি মহাজন। রক্ষে করুন দীনজনে, এই আকিঞ্চন করি প্রাণে।'

'পেশা?'

'কথকতা।'

'জাতি?'

'ব্রাহ্মণ।'

লোকটির প্রতি লক্ষ্য করে বিপ্রপদ দেখেন, ওর বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে, কপালের রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট দেখাচ্ছে। কানের দু'-পাশের চুলগুলিও পেকে এসেছে। লোকটি রসিক, কিন্তু ওর বাড়ীর অবস্থায় কতটুকু রস আছে বোঝা দায়।

'কি চান আপনি?'

'শিশুকালে পুষলাম যারে সে শিক্ষা দেয় হাড়ে হাড়ে। সে একটা বুনো বাঘ, এখন আমাকেই ভাবে নধর ছাগ। তার ভয়ে পালিয়ে ফিরি দেশ-বিদেশে, অবশেষে উঠলাম শক্তিগড়ে এসে। আপনি না কি বিপদ-বারণ, তাই নিলাম আপনার শরণ। রক্ষে করুন হে মহাশয়, আপনার হবে জয় জয়।'

লোকটি অদ্ভুত। চমৎকার ছড়া মিলিয়ে কথা বলে। অন্ধকারে মুখখানার ভাবভংগি এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না, তাই তিনি একটা আলো দিতে বলেন। ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রীলোকেরা
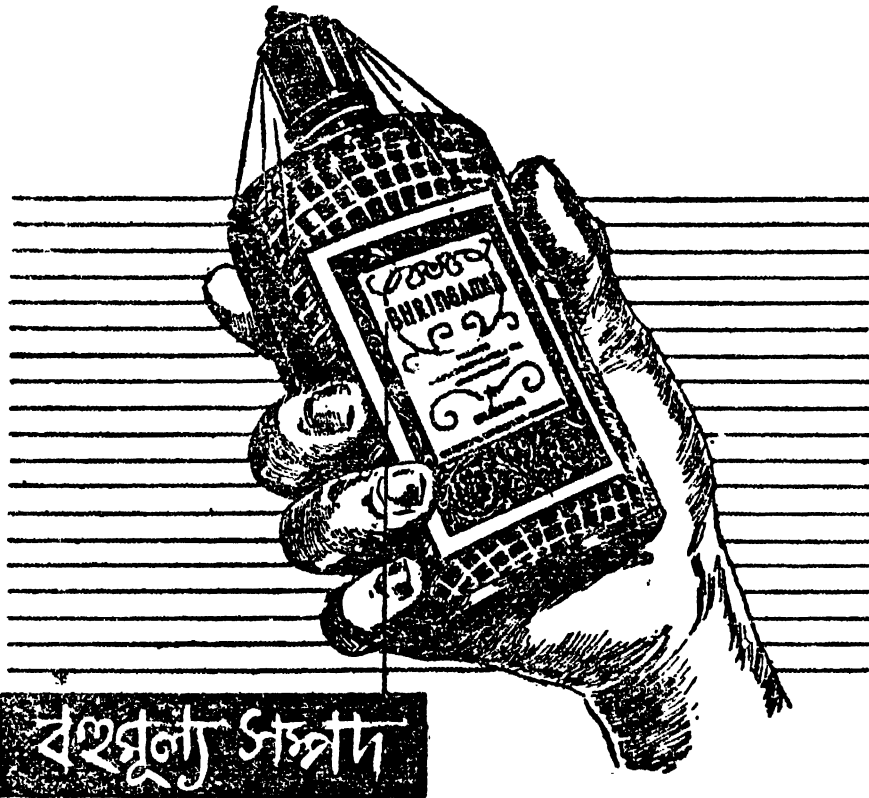
আবৃত্তি শুনে অন্ধকারেই নাট-মন্দিরে এসে ভীড় করে। কয়েক জন দাঁড়িয়ে থাকেন জুতের ঘরের পশ্চিম বারান্দায়। সকলেই সদ্য আগন্তুকের জন্য একটা বিশেষ কৌতূহল বোধ করতে থাকে। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার এ এক ব্যতিক্রম বটে।

অন্ধকার আর একটু গাঢ় হয়ে এলো।

সহসা লোকটা চীৎকার করে উঠল। 'একটা বাঘ, বাঘ—ছেলেমেয়েরা লাগবে তাক, মশাই যেন না হন রাগ।'

বিপ্রপদ একেবারে লাফিয়ে ওঠেন। বাঘ এলো কোথেকে? ছেলেমেয়েরা হাউ-মাউ করে ওঠে। একটা জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কেউ কেউ কেঁদে ফেলে।

বিপ্রপদ কি করবেন! সজোরে হেঁকে বলেন, 'একটা আলো, আলো দাও।'

কমলকামিনী এ সব কত দেখেছেন ছোটবেলায়। একটা লণ্ঠন নিয়ে এসে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'পুরুষ মানুষের এত ভয়?'

লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায়, সত্য সত্যই একটা প্রকাণ্ড সুন্দর বনের বাঘ লোকটার হাত কামড়ে ধরেছে। একেবারে রক্তে নদী হয়ে গেছে। অমরেশের পায়ের কাছে লেজটা প'ড়েছিল, সে আঁৎকে উঠে সরে যায়। ছেলেমেয়েরা সব স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

বিপ্রপদ এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—'বহুরূপী।'

অমরেশও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারে, এ সজীব ব্যাঘ্র না—নির্জীব। কারণ লেজটা ব্যাঘ্র মশাই নিজের থাবা দিয়ে গুছিয়ে রেখে একটা বিড়ি ধরায়।

বিপ্রপদ বলেন, 'এখন দিয়ে দাও এদের যা দেবার—বিদায় করো।'

'দেখবেন মা-ঠাকরুণ, বুনো বাঘের খোরাকী যেন পোষায়। অনেক দূর থেকে আসছি আপনাদের নাম শুনে। দু'টি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, কত লোকজন খেয়েছে নিয়েছে। আমাদের এই ছাগ ও বুনো বাঘের যেন পেট ভরে। ঘরে বাঘিনী ও ছাগিনী রয়েছে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমাদের পথ চেয়ে, তাদের কথাও মনে রাখবেন। তারা অনেক দিনের উপোষী।'

'একটু বুঝে-সুঝে বিদায় করো বুঝলে?' বিপ্রপদ বিদেশী লোকের সামনে খাটো হতে চান না। বলেন, 'এরা কিন্তু নানা দেশ-বিদেশে ঘোরে।'

'এই নেও।' বলে কমলকামিনী একটা ধামায় করে সের দশেক চাল নামিয়ে দেন।

বিপ্রপদ মুখে বলেন, 'কি, খুশী তো?' কিন্তু এতগুলি চাল দেখে মনটা কেমন করতে থাকে যেন। এত বড় একটা খরচের পর একটু সামলে চলা উচিত।

'হুঁ, খুব খুশী।' বলে বাঘে ও ছাগে বিবাদ ভুলে হাসতে হাসতে চলে যায়। জ্যোৎস্না রাত—গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরাও পিছু নেয়। অনেক ভীড় দেখে বাঘ আবার ঘোঁৎ করে ওঠে। ছেলে-মেয়ের দল সভয়ে পিছিয়ে যায়।

আত্মীয়-স্বজন লতার লতা পাতার পাতা যারা এসেছিল তারা একে একে চলে যায়। যেতে যেতেও প্রায় মাস খানেক সময় লাগে। এবার বিপ্রপদ কমলকামিনীকে ডেকে বলেন, 'এক দিন জুতের ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দরকার। কত ঝুল নোংরা জমেছে যে ঘরে! মানুষ দিয়ে এ কাজ হয় না, অন্ততঃ মনের মত হয় না। নিজেদেরই করতে হবে। কবে পারবে?'

'আমিও তো তাই ভাবছি। শুধু ঘর না বা'রও ভাল করে পরিষ্কার করা দরকার। এখন বিমলা শ্যামলা নেই, একা-একা সাহস হয় না—বৌরা তো সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তুমি যদি একটু সাহায্য করো। কিন্তু তা কি এখন তুমি ক'রবে? এখন তো বড়লোক হয়েছ—তালুকদার!'

'অত আর আমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। আমি বাবু হলেও যে বিপ্রপদ সেই বিপ্রপদই আছি—ওতে আমার মান যাবে না। তবে কাল সকালেই আরম্ভ করা যাক, কি বলো? ঘরটাই প্রথম পরিষ্কার করতে হবে। ওখানা তুলতে আমার রক্ত জল হয়ে গেছে। কি ছিল কমল তুমি তো সবই জানো! একখানা মাত্র ছোট ঘর; তার না ছিল ভাল ছাউনী, ভাল বেড়া। বৃষ্টি এলে মাথায় পড়ত জল, ঝাপটা এলে ভিজে যেত ঘর-বারান্দা। কি যে দুঃখে দিন কাটিয়েছি তা এখনও ভুলতে পারিনি। তুমি তো ভুক্তভোগী, সবই নীরবে সয়েছ!'

'থাক থাক এখন সে সব কথা। তবে মনে রেখো, তুমি গরীব ছিলে, গরীব-দুঃখী যেন তোমার কাছে [illegible] আঘাত না পায়।'

'তাই ভাবছি প্রজাদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখব? যারা নিতান্ত গরীব তাদের মধ্যে আমার এই তালুকের আয়টা খয়রাত করে দেবো। আমি সামান্য মানুষ, আমার যা সামান্য সাধ্য তাই করব।'

'যা করো নীরবেই করো। এ সব কথা প্রকাশ হলে ক্রমে ক্রমে সদর খাজনাও আদায় হবে না। প্রজারা মাথায় উঠে বসবে। এত কাল জমিদারী সেরেস্তায় তুমি কাজ করে মানুষ চিনলে না, গরীব ও বজ্জাত দু'টো আলাদা জাত। তাদের পৃথক করে চেনাই দায়। আমার বাবা সে সব চিনতেন—তাই তাঁর দয়া-মায়া আদায়-উসুল সব ভালই ছিল।'

'বাপ না থাক তাঁর বেটি তো ঘরে আছে—তার কাছেই না হয় হাতেখড়ি দেওয়া যাবে। এখনও তো আমার বয়স বেশী হয়নি, কি বলো?'

'বয়স আবার বেশী হয়নি! বুড়ো ছাত্তর—হাতেখড়ি না দিয়ে যদি বাড়ি দেই?'

'দিও, তোমার যা ইচ্ছা দিও।'

দু'জনে হাসতে থাকেন।

ঘর তো না যেন একটা মিউজিয়াম। গৃহস্থালীর কত জিনিস-পত্তর—তার সাথে বনেদী আসবাব-পত্তর যে রয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স তৈরী করিয়েছেন কমলকামিনী। তার ওপর অনায়াসে শুতে পারে তিন জন। বাক্সটার ওপরের দিকে ডালা। ডালা তুললে তাতে অসংখ্য কাঁসা-পিতল-তামার জিনিষ-পত্তর বাসন-কোসন দেখতে পাওয়া যায়। বড় দু'টো পিতলের হাঁড়ি এবার কিনেছেন বিয়ের নিমন্ত্রণ রাঁধার জন্য। একটা প্রকাণ্ড বড় গামলাও খরিদ করা হয়েছে গত বছর। খাঁগড়াই কাঁসা, পশ্চিমা বাটলাই, হাতা-খুন্তিবেড়ি, জলের কলসী ধীরে ধীরে সঞ্চয় করেছেন। এমন সব জিনিষ এক-পুরুষে কেন দশ-পুরুষেও নষ্ট হবে না।

ঘরখানার চার দিকে ঘোরান চারটে বারান্দা—মাঝখানে টোপের ঘর। তার পর আবার পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণ দীঘলি একটানা খোলা বারান্দা। মাঝের ঘরটা আবার তিনতলা। তার প্রত্যেক তলায় কত যে পট-ঘট, কত যে ডালা-কুলা, কত যে সাবেকী জিনিষ-পত্তর তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। হরিণের সিং থেকে বাঘের ছাল পর্যান্ত সবই আছে। তবে পরিপাটি করে গুছান না। বিপ্রপদ ও কমলকামিনী সৌখীন ছিলেন, কিন্তু কখনও তাঁদের মধ্যে পারিপাট্য-বোধ জন্মায়নি। তার সুযোগ তাঁরা পাননি। সংগ্রহ করেছেন কিন্তু কি করে ভোগ করতে হয় তা হদিস্ করে উঠতে পারেননি। এখানে সেখানে সব গাদা-মারা রয়েছে। তবু এগুলির জন্য বড় মায়া, বড় মমতা তাঁদের প্রায়ই ওপরে উঠে এগুলি দেখে যান [illegible] কিন্তু [illegible] ঘরের দ্বারদেশে একটা সহজাত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] বুনো মোষের শিং সমেত দু [illegible] মাথা দু'পাশে টাঙান—যেন [illegible] বীরত্বের প্রতীক।

ঘরখানা ঝাড়া-পোঁছা [illegible] স্ত্রীর [illegible] গত হয়ে যায়। [illegible] একমনে [illegible] ব্যবহার করে যান। [illegible] তায়, কেউ হয়ত [illegible]। বিপ্রপদর এ সব [illegible] করে তিনি এগুলি [illegible] এমন ক্ষতি করত না। [illegible], দেখ, কৃষ্ণকালীর ছবিটা নেই। কে যেন সরিয়েছে। [illegible] ছবিখানা [illegible] পুরোন। বাবা ওখানার দিকে চেয়ে চেয়ে [illegible]ত্যাগ করেছেন। কোন্ পাষণ্ড এ অপকর্ম করল। দু'খানা [illegible] জন্য আমার দশ টাকা গেলেও দুঃখ ছিল না।'

'কি করব, এখন তো আর উপায় নেই—আর একখানা কিনে নো।'

'কিন্তু ওখানা তো [illegible] পাব না—ওর সংগে যে বাবার স্মৃতি [illegible]ড়িত।'

'তা তো ঠিক, কিন্তু কি করবে বলো?'

এর পর যতক্ষণ বিপ্রপদ কাজ করেন আর কোন কথাই লেন না। ওখানা কি আজকালের ছবি!

অমরেশ একবার মাকে খুঁজতে খুঁজতে দোতলায় ওঠে। ন বলতে, বাবাকে দেখে আর বলা হয় না।

বিপ্রপদ খুব নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'অমরেশ, বাবা, বলতে রো, কৃষ্ণকালীর ছবিখানা এখান থেকে নিল কে?'

'কোন্ ছবিটা?'

'এই যে এখানে টাঙান ছিল। মাঝখানে কৃষ্ণ ও কালীর বি, এক দিকে রাধিকা, অপর দিকে আয়ান ঘোষ।'

'কৃষ্ণর হাতে বাঁশী আর কালীর হাতে খাঁড়া? জোড় হাতে একটা বুড়ো এক দিকে বসে—আর একটি মেয়ে মুখ টিপে হাসছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছবিটা বাবা। তুমি দেখেছ, দেখেছ বাবা?'

'কে যেন দলামোচা করে ফেলে দিয়েছিল ওইখানে, আমি তুলে রেখেছি আমার বাক্সে। নিয়ে আসব?'

'যাও যাও, নিয়ে এসো—নিয়ে এসো।'

অমরেশ ছুটে গিয়ে ছবিখানা নিয়ে আসে।

'দাও বাবা, দাও, তোমাকে একটা টাকা পুরস্কার দেবো।'

'তবে দাও টাকা।'

'এখন না, একটু পরে নিও।'

'না, না—এক্ষুণি দিতে হবে।'

'আচ্ছা চলো' বলে ছবিখানা বিপ্রপদ মাথায় ঠেকিয়ে বেশ করে টেনে-টেনে সমান করতে করতে নীচে নেমে যান। এখানা তাঁর কাছে অমূল্য সম্পদ। পিতার স্মৃতিচিহ্ন।

২৭

খুব ভোরে বিপ্রপদ আজ প্রজাদের বাড়ী যাবেন। এরা প্রায় সকলেই পরিচিত। চিরদিন বোসেদের বাড়ী আসছে, বোসেরা ওদের বাড়ী যাচ্ছে। কত কাল ধরে যে এ যাওয়া আসা চলেছে তা কেউ জানে না। একটা সহজাত গ্রাম্য প্রীতির বন্ধনে ধীরে ধীরে সকলে বাঁধা পড়ে গেছে। প্রজারা বেশীর ভাগই মুসলমান এবং গরীব। অনেকেরই বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু এদের কৃষ্টি যে কত প্রাচীন তা ভাবাই যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা হ'য়ে যায়—একটু একটু দেরী করতে করতে সময় কাটে। কোনও বাড়ী থেকেই সহজে উঠতে পারেন না। প্রত্যেকেই ভাবে, শুধু তার বাড়ীই বাবু এসেছেন, তাই একটু পরে চলে যেতে চাইলেই ক্ষুণ্ণ হয়।

অমনি এক বাড়ী থেকে বিপ্রপদ উঠি উঠি করছেন, এক বৃদ্ধা এসে বলে যে সে আবদুলের মা। তাকে বিপ্রপদ চেনেন না, না চিনলেও তার ঘরে একটু গিয়ে না বসলে সে খুবই দুঃখিত হবে।

'কোন্ ঘরে?'

'বাড়ীর মধ্যে আমরা হইছি সকলডির থিইক্যা গরীব। ঐ কুড়িয়া খান—পূবের ভিডিতে ঐ যে ছোট্ট ঘরডুক, ঐখান আমাগো। মনে আছে আবদুলের কথা?'

'কেন থাকবে না? সেই সেই যে খালের চরে বাঘ গরুটা পুঁতে গিয়েছিল—সেই আবদুল তো?'

'হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ।'

'আজ তোমাদের ওখানে না, গেলে হয় না এই তো তোমাদের বাড়ীই এসেছি—আজ অনেক বাড়ী ঘুরতে হবে কি না, সময় বড় অল্প।'

'আমরা বড় গরীব, বাড়ীর মধ্যে আমরাই রোজ আনি রোজ খাই—তাইর জন্য বুঝি তুচ্ছ করলেন? আপনে তালুক কেনছেন শুনইয়া আমি পথের দিকে চাইয়া আছি কহন একবার আসেন রাইওৎ-বাড়ী। আবদুলরে এক দিন পাঠাইছিলামও ডাকতে, ও গেছিল কিন্তু দেখা হয় নাই।' বৃদ্ধা মুসলমানী গ্রাম্য কবিতা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় সে যেন শবরীর মত চেয়ে আছে পথের দিকে। কখন আসবেন নবঘন শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র? কখন তাঁর শ্যামছায়া পড়বে অংগনে? পথ চেয়ে চেয়ে তার দিন যায়, মাস, বর্ষ যায়, তবু বাঞ্ছিত আসে না! কুঞ্চিত কালো অলকদাম আজ শফেদ হয়েছে, এখনও কি তাঁর সময় হলো না! এখনও কি তার দুয়ার থেকে ফিরে যাবে এই মুসলমান শবরীকে প্রত্যাখ্যান করে? বৃদ্ধা সামান্য চাষীর মেয়ে হলেও জ্ঞানী—গ্রাম্য কাব্যজ্ঞান তার নিদর্শন।

বিপ্রপদর মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠে—হৃদয় যায় আর্দ্র হয়ে। তিনি বৃন্দার দাওয়ার ওপর একখানা হেউলী পাতার হোগলায় গিয়ে বসে পড়েন।

একটা ডাব কেটে দেয় ইমাম—নিজ হাতে ফুটো করে খান বিপ্রপদ।

ঝগড়া করতে করতে একটা মুরগীর ছানা বিপ্রপদর জামার ওপর উড়ে এসে পড়ে। সকলে হা-হা করে ওঠে।

'থাক্ থাক্, ওতে কি হয়েছে—ও ভয় পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমার কাছে। ওকে কেউ তাড়িও না।' ফুটন্ত কদম ফুলের মত ছানাটি পরম নির্ভয়ে বসে থাকে।

বৃন্দা বলে, 'সুলক্ষণ।'

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের?'

'এই ত্যাগের।'

এর পর উঠতে চাইলে বিপ্রপদকে অনুরোধ করা হয় রান্না করে আহার করতে। নিতাই ইমামকেও যত্ন করতে ত্রুটি হয় না। বৃন্দার প্রস্তাব বাড়ীর সকলেরই খুব ভাল লাগে। তারাও ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু তা আজ সম্ভব না। আর এক দিন হবে বলে সবাই উঠে পড়ে। বাবুর সংগে সংগে লোকজন চলে যায়—যেন রাজসভা ভেঙে গেল।

বৃন্দা তার একটা ছড়া আওড়ায়। ক্ষণিকের জন্য আঁধার ঘরে আলো জ্বলে আবার খানিক বাদেই মিলিয়ে গেল। যাক্, তবু সে চোখ বোজার আগে তো আলো দেখল! আলো, আলো!

বিপ্রপদকে নিয়ে কয়েকটা বাগান ছাড়িয়ে, কয়েকটা গোশালা ডাইনে রেখে, একটা তিন-কোণা ধানের ক্ষেতের পশ্চিম দিকের বাড়ীতে ইমাম ও নিতাই প্রবেশ করে।

আশ্চর্য্য, বাড়ীর ভিতর জনপ্রাণী নেই। তিন ভিটিতে তিন-খানা ঘর শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু মানুষের যে বনবাস আছে তা বোঝা যায় ঘরের পোতার পাশের লংকা ও বেগুন গাছ ক'টি দেখলে। অসংখ্য লংকা ফলেছে, বেগুন ঝুলছে অগুণতি।

'এ-বাড়ীর বাসিন্দারা গেল কোথায়?'

পুরুষেরা জেলে গেছে—মেয়েরা ভিক্ষায় বেরিয়েছে।' নিতাই বলে, 'আজ চার বছর হয় এদের জেল হয়েছে।'

'এদের কাছে খাজনা পাওনা ক'সন? জেলে গেল কেন?'

'আপনি তো জানেন—খুনের দায়।'

'এক দেশে বাড়ী, জানি সবই, কিন্তু সব কথা তো স্মরণ থাকে না।'

'এদের দাইমূল হয়েছে—আপনি তখন বাড়ী ছিলেন না, তাই সব জানেন না। দূরে বসে যা শুনেছেন, তা হয়ত মনে নেই! অর্থাৎ কালাপানী হয়েছে এদের—ভিটে-মাটি এরা ছাড়া, কিন্তু দোষ এন্তেজদ্দির।'

ইমাম বলে, 'ঐ হালাই তো যত নষ্টের মূল!'

নিতাই বলে, 'হিন্দুর মধ্যে ঘোষালেরা, আর মোছলমানের মধ্যে এন্তাই দেশে আগুন জ্বালায়। ঘোষালেরা জমি দখল করতে পারেন না, নিলামী জমি। নিলাম কবলা দিয়ে দেয় এন্তেজদ্দিকে। সে এদের সরল সাহসী মানুষ পেয়ে মুখে মুখে কবুলিয়ৎ নেয়, কাগজে কলম ছোঁয়ায় না পাছে ওদের স্বত্ব হয়। আশ্বাস দেয়; কবুলিয়তে এখন কাজ কি, জমি দখল করে দিতে পারলে পাঁচ বিঘে বর্গা না দিয়ে কয়েমী পাট্টা দিয়ে দেবে বিনা বহায়তে। খরচ-খরচা এন্তেজদ্দির, গায়ের জোর আহম্মকদের। বিপক্ষও খুব তেজীয়ান্। দু'দল নামল জমিতে। খুন হলো দু'টো।

পয়সার জোরে এন্তেজদ্দি এড়িয়ে গেল, কিন্তু দু'দলের আর একটিও এড়াতে পারল না। টাকা এবং তদ্বির হ'লে এ পক্ষের লোক খালাস পেত—কিন্তু এন্তেজদ্দি বুঝল, এরা খালাস হলে জমি দিতে হবে। সে পয়সায় থলেটার গলা বেঁধে চুপ করে আসমানের তারা গুণতে লাগল। দিনের পর দিন যায়, জেলের গরাদে ওরা মাথা ঠুকে মরে—এন্তেজদ্দি সহরমুখো হয় না। বাড়ী বসে মেয়ে-লোকদের আশ্বাস দেয়: এই তো এলো বলে! ভাবনা কি, পাঁচ বিঘে জমি দেবে, তার পাকা ফসল ওরা এসে নিজের হাতেই কাটবে! কোথায় ওরা আসবে? জজের বিচারে ওদের সাজা হয়। এন্তেজদ্দি বলছে দাইমূল হয়েছে, কিন্তু সঠিক সংবাদ যারা রাখে তারা বলে যে কয়েক বছর জেল খেটে বাড়ী এলো বলে তিন ভাই। বাড়ী এসে ওকে নিয়ে ফের দাইমূল যাবে।'

ইমাম বলে, 'কে আছে, কে মরছে, কোনও চিডি-পত্তর আয় না—মাইয়ালোক সোমাচার রাহে না কিচ্ছুর! যদি ওরা বাড়ী থাকতো ঘর-দুয়ারের কি এই হাল হয়! আর কবুল করা জমি না দিয়া পারে এন্তা? এক রাত্তিরে জাহান্নামে পাঠাইত ওরা!'

বিপ্রপদ ভাবেন; ওদের খাজনা মকুব করে দিতে হবে, যত দিন না ওরা বাড়ী ফেরে। মুখে বলেন, 'চলো নিতাই, চলো ইমাম, আজ বাড়ী চলো—এখানে আর থাকতে ভাল লাগে না।'

খালটা পার হওয়ার আগেই একটা বাধা পড়ে। একটি ঘোমটা-টানা মেয়েলোক এক প্রকার ছুটতে ছুটতেই আসে। হাতে তার একখানা ছোট ডালা—তাতে কয়েকটি লংকা ও বেগুন কুড়ি তিনেক। মনিবকে সে উপহার দেবে।

'না, না, ও দিতে হবে না। তোমরা বেচে দু'টো পয়সা পেলে তোমাদের কাজে লাগবে। দুঃসময়ে ও জিনিষও তোমাদের পক্ষে কম নয়।'

কিন্তু সে শুনবে না—দাঁড়িয়ে থাকে।

'নিয়ে যাও বলছি—নিয়ে যাও ফিরিয়ে।'

সে বলে যে তার গাছে আরও ফলবে, কিন্তু মনিব তো নিত্য আসবে না!

'তাতে হয়েছে কি? তুমি নিয়ে যাও গো—ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

না, নতুন মালিককে সে শুধু-হাতে ফিরতে দেবে না কিছুতেই।

'কিছুতেই যখন ছাড়বে না তখন নিয়ে এসো নিতাই। ওদের দুঃখের ফসল আমি উপেক্ষা করলে ওরা আরও দুঃখ পাবে।'

একে একে আরও দু'টি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ায়। সকলের মিলিত নিবেদনই ঐ ফসগুলি!

বিপ্রপদ চলে যান।

খালের পারে তিনটি অশ্রুমুখী স্ত্রীলোক নীরবে দাঁড়িয়ে কি যেন আর্জি পেশ করে নতুন ভূস্বামীর কাছে।
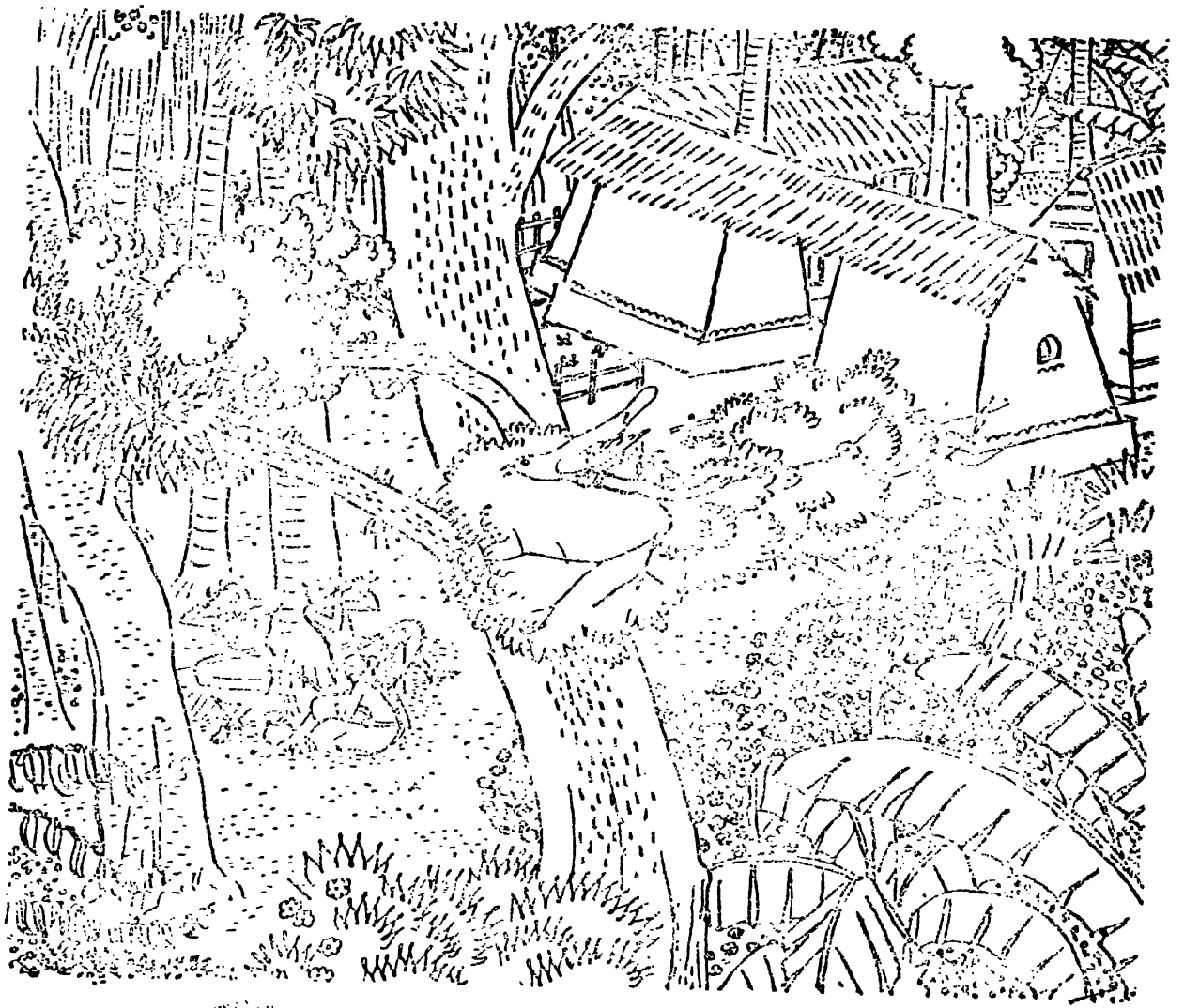
[ক্রমশঃ

সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা একমাত্র উপাদান মানুষ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

গর্কীর মতে মানুষকে বাদ দিয়ে কোন চারু-কলার সৃষ্টি হতে পারে না, না পারে কোন সুন্দর কিছু গড়ে উঠতে। মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত ঘটনা, তথ্য ইত্যাদির মধ্যে মানুষ রস খুঁজে পায়; এমন কি বিশ্ববিখ্যাত হাতে আঁকা ছবি পর্যন্ত মানুষের ততটা ভাল লাগত না যদি না সেগুলোর মধ্যে মানুষের অলখ উপস্থিতির ইঙ্গিত থাকত, যদি না ছবিগুলোর মধ্যে মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত, প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে মানুষের উচ্ছাস ও মনের অভিনব ভাব ফুটে না উঠতো। তাই মানুষ আর মানুষ জাতি হোল কলার উপকরণ।

সাহিত্যও কলার অন্তর্গত। সাহিত্য-কলা নিয়ে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদীদের চলে ঠোকাঠুকি। আধুনিক যুগে বাস্তববাদের দিকেই নবীন সাহিত্যিকদের ঝোঁক বেশী। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তার সার্থকতা কতটা, তাই হোল প্রশ্ন।

সমাজতন্ত্রের বায়না দেবার যুগ এটা; সাম্রাজ্যবাদের শেষ আর সমাজতন্ত্রের আরম্ভ, এই দু'টো ব্যাপার অবিচ্ছেদ্য। তাই আজকের যুগে প্রগতি-সাহিত্য বলতে নতুন যুগের উপযুক্ত সাহিত্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদী সাহিত্য বুঝতে হবে। সে সাহিত্য কি রকমের?

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা দুই জনের মধ্যে এক জন এঙ্গেলস্। তিনি এক জায়গায় বলেছেন:—"খুঁটিনাটি বর্ণনার সদর্থ তো চাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে চাই বিশিষ্ট পারিস্থিতি অনুযায়ী বিশিষ্ট চরিত্র আঁকা···যে পরিস্থিতি সেই চরিত্রকে ঘিরে থেকে তার আচরণকে প্রভাবান্বিত করছে।"

যে সাহিত্য-রসিকেরা বলেন যে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে, প্রিয় ও অপ্রিয় সত্যকে এঁকে গেলেই বাস্তববাদী সাহিত্য-কলার সৃষ্টি হয় তাঁদের মতের সঙ্গে এঙ্গেলসের বা গর্কীর মত মিলবে না। ঐ ধরণের সস্তার বাস্তববাদ (realism) বা স্বাভাবিকবাদ (naturalism) সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের উপযুক্ত নয়। আমেরিকার মিলেট, ব্রিটেনের টোমাব্‌বি হলেন এই মতের সমর্থক। খালি খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে সাহিত্য-কলা সৃষ্টি করা যায় না। বিশেষ পরিবেশে বিশেষ চরিত্রের, বিশিষ্ট আচরণকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মার্কস্ ও এঙ্গেলস "খুঁটিনাটির খাতিরে খুঁটিনাটি বর্ণনাকে" (অর্থাৎ খুঁটিনাটির লক্ষ্য যেখানে খুঁটিনাটিই) নিন্দা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে রেমার্কের "অল্ কোয়ায়েটের" নাম করা যেতে পারে। বইখানিতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের খারাপ দিকটি পুংখানুপুংখ ভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে সৈন্যদলে যে অনাগত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-চেতনার জন্ম হয়েছিল সেই বরণীয় ব্যাপারটি তাঁর চোখে পড়েনি। এইখানে ঘটনা ও পরিস্থিতির আপেক্ষিক সম্পর্ককে তিনি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাননি, ফলে মহাযুদ্ধের ছবি তাঁর বাস্তবতার দিক্ থেকে অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। রেমার্কের বই পড়ে পাঠক বাস্তবকে সব দিক্ থেকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু সৈন্য-জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার দিক্ থেকে বইখানি অতুলনীয়। যে লেখক খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোকে এমন ভাবে আঁকতে পারেন যাতে করে পাঠকের সামনে সেই ঘটনাগুলোর পিছনে কি কি কার্য-কারণ রয়েছে এবং কি কি চিন্তাধারা কাজ করছে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে—তিনিই বাস্তব সাহিত্য-স্রষ্টা। উদাহরণ হিসাবে ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁর নাম করা যেতে পারে আগেকার যুগের।

তখনকার সামন্ততন্ত্রী জার্মানী সম্পর্কে এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন:—"যতক্ষণ পর্যন্ত না জার্মানীতে সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হয়ে ওঠে, শ্রেণী-বিভেদ আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে হঠাৎ এক দিন, ততদিন পর্যন্ত জার্মাণীর কাছ থেকে জার্মাণ সাহিত্যিকের বেশী [illegible] সাহিত্যোপকরণ আশা করা বৃথা। প্রথমতঃ, সমাজে বিপ্লবী-চেতনা ভাল করে জাগ্রত না হওয়ায় সাহিত্যিকের পক্ষে বিপ্লবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মজ্জাগত দারিদ্র্যের মধ্যে বাঁধা পড়ে সাহিত্যিকের পুরুষত্ব কমতে বাধ্য, [illegible] ফলে তিনি সে দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে পারবেন না, দারিদ্র্যকে প্রাণ-ভরে স্বাধীনচেতার মত ঘৃণা করার যোগ্যতাও হবে না। তাই বর্তমানে জার্মাণ কবিদের শুধু এইটুকুই পরামর্শ আমরা দিতে পারি যে বাসস্থান বদলে সভ্য দেশে বাসা বাঁধুন।"

এঙ্গেলসের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে সাহিত্য-সৃষ্টির বাস্তব মুখিতা নির্ভর করে সমাজের গতির উপর। সমাজের বাস্তব চরিত্র আঁকার অনুকূল ও প্রতিকূল দুই রকম যুগই আছে। ঘটনাবলী তীব্রতর না হলে খোঁচা দিয়ে সাহিত্যিকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। মানুষের প্রগতি ও সাহিত্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে উপলব্ধি করে তাই ব্যালজ্যাক্ লেখককে বলেছেন "Secretary of history"। টলষ্টয় সম্পর্কে লেনিন বলেছেন:— "টলষ্টয় আজ বেঁচে নেই। লেখক হিসাবে তাঁর বিশ্বমুখী তাৎপর্য, মনীষী ও আচার্য হিসাবে তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত যশ রুশ-বিপ্লবেরই বিশিষ্ট প্রতিচ্ছবি।"

উনবিংশ শতাব্দী রুশিয়ার ইতিহাসে এক অপূর্ব সন্ধিক্ষণ। নেপোলিয়ঁ ও অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম ও বিপ্লবী-চেতনার উন্মেষের এই যুগে রুশিয়ায় আমরা অপূর্ব সাহিত্য-সম্পদের সৃষ্টি দেখতে পাই। রুশিয়ায় অন্যান্য দেশের মত বুর্জোয়া বিপ্লব হয়নি আকস্মিক ভাবে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মত। সামন্ততান্ত্রিক রুশিয়ায় অনগ্রসর বুর্জোয়া শ্রেণীও সামন্ত রাজাদের সঙ্গে গণ-শোষণে পাল্লা দিত। তাই রুশ-সাহিত্যে আমরা একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা দেখেছি। রুশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতন্ত্রী বিপ্লব একই ঘটনার দু'টি পর্যায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে রুশ-সাহিত্যে। রুশ সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল সকলের পুরোভাগে। রুশিয়াতেই ঘটেছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রী বিপ্লব।

কলার সৌন্দর্য গঠনে, যে গঠন জীবনকে প্রতিফলিত করবে। গঠন নির্ভর করে কি উপাদান দিয়ে গড়া তার ওপর। আকার ও উপাদান সব সময় অবিচ্ছেদ্য। তাহলে বলতে পারি, বিষয়-বস্তুর উপর সাহিত্য-কলা নির্ভরশীল। সাহিত্যে রূপ থেকে উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রুশ-সমালোচক দব্রোল্যুবফ, অস্ত্রোভস্কির নাটকের ত্রুটি দেখিয়েছেন।

অবশ্য আকৃতি যে উপাদানের হুবহু নকল হবে, তা নয়। ফটোগ্রাফ আর আঁকা, ছবির মধ্যে যে পার্থক্য, নকল আর কলার মধ্যে সেই পার্থক্য। একটা এবড়ো-খেবড়ো গ্রাম্য-পথ। [illegible]

ফটো হবে তার হুবহু নকল। কিন্তু সেই পথটিরই যদি কেউ ছবি আঁকে সে ছবির অনুভূতি হবে অনেক বেশী।

আকার ও উপাদানের ধর্ম আর কন্টেন্টের সামঞ্জস্য ও ঐক্য—উপাদানের ওপর আকারের নির্ভরতা—এই হোল কলার ওপর জীবনের প্রভাবের একটি অভিব্যক্তি। শিল্পীর কল্পনাশক্তির ওপর জীবনের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবের একটি উদাহরণ টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা'। "পতিতা" হিসাবে আনাকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করে জীবনের অবিসম্বাদী সত্যের প্রভাবে টলষ্টয় শেষ পর্যন্ত তাঁর রায় দিলেন সমাজেরই অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ব্যালজ্যাকের বাস্তব উপলব্ধিকে প্রশংসা করে এঙ্গেলস্ লিখেছেন :—"ব্যালজ্যাক তাঁর নিজের শ্রেণীর ওপর সহানুভূতি ও পক্ষপাত হারাতে বাধ্য হয়েছিলেন, অভিজাত শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী পতনকে তিনি আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেই পতনকে তাদের ন্যায্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেখতে পেরেছিলেন, ব্যালজ্যাকের এই উপলব্ধি বাস্তববাদের এক বিরাট জয়লাভ।"

শিল্পীর মনন-শক্তি যত বেশী প্রগাঢ় গভীর হয়, তাঁর প্রতিভা যত বেশী উজ্জ্বল হয়, জীবনের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাব তাঁকে তত বেশী প্রভাবান্বিত করে, এমন কি তাঁর নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিয়ে যায় তাঁর সৃষ্টিকে। টলষ্টয়ই তার উদাহরণ।

কলার উপর জীবনের প্রভাব, কলাকে প্রগতিধর্মী করে গড়ে তোলে, যে কলার সাহায্য নিয়ে মানুষ সমাজকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে—তার নিজের সামাজিক সত্তাকে উন্নত করতে পারবে।

বাস্তবমুখী ফ্লবেয়ারও শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া-দর্শনের মায়ায় পড়েন এবং "খুঁটিনাটির" দিকে ঝোঁক দিতে বলেন নবীন সাহিত্যিকদের "রকমারি অভিজ্ঞতা" সৃষ্টির জন্য। সেই হোল তাঁর "ইস্থেটিক্স্"। ফলে ফ্লবেয়ারপন্থীরা সমাজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে "আয়ভরি টাওয়ারে" আত্মগোপন করে আত্মস্থ হয়ে লিখতে সুরু করলেন। ফলে কলার আকারের সার্থকতা আকারেই শেষ হয়ে গেল। অন্য কোন উদ্দেশ্য রইল না। কলাকে তাঁরা সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেন না বরং সমাজের বিরুদ্ধে লাগালেন।

সোমার সেট মমও "কলার জন্য কলার" পূজারী। তিনি বলছেন :—ঔপন্যাসিকের সার্থকতা ভাল ঔপন্যাসিক হওয়া; তাঁর আদর্শপ্রচারক বা রাজনীতিবিদ হবার কোন প্রয়োজন নেই। উপন্যাস হচ্ছে কলা এবং কলার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, আনন্দ দান।" জাঁপল সাত্রে, আন্দ্রে মালরো এঁরা সবাই একই পথের পথিক এবং হতাশাগ্রস্ত। মালরো বলছেন :—"কম্যুনিষ্ট হোক বা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী হোক, উদারপন্থী হোক বা না হোক, একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে ব্যষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।" আধুনিক বুর্জোয়া-সাহিত্যে তথাকথিত ব্যষ্টি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

আর এক দল সাহিত্যিক আছেন যাঁরা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে মনের সাথে কলমের ডগা দিয়ে আক্রোশ মেটান, ভাষার কেরামতিও যথেষ্ট, কিন্তু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু নতুন ও প্রগতিপন্থী তাও তাঁরা ঘৃণায় সরিয়ে রাখেন। ফলে তাঁদের বিদ্রোহী নৌকা কোন কূলেই ভিড়তে পারে না, খালি নিজের কল্পনার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে মরে। এঁদের বাস্তবপন্থা, ধনিকতন্ত্রের সাংস্কৃতিক "ডিসপোজালের পচা মাল।" এই পচা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেও যাঁরা অবিরত সংগ্রামের পথে সুন্দর ও বাস্তবের রূপ উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা হলেন আঁরি বার্বুসে, রোমা রোলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, হেনরিশ ম্যান ও বার্ণাড শ'। এঁরা অবশ্য পুরানো যুগের মানুষ। আর আজকের যুগের পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্বিরোধমূলক প্রচণ্ড সংগ্রামের গর্ভে যাঁদের জন্ম, তাঁরা হলেন লুই আরাগঁ, জীন রিচার্ড ব্লক, থিয়োডোর ড্রেইজার, মার্টিন এণ্ডারসন নেক্সো ইত্যাদি। এঁরা বাস্তবের প্রকৃত ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। Renville for Writer প্রবন্ধে আমেরিকার বিপ্লবী সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাষ্ট লিখছেন :—"যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্যাসিবাদের শেষ পচা বীজটা পর্যন্ত নষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লেখকের পক্ষে নিরপেক্ষতা সম্ভব কি করে?" 'আয়ভারী টাওয়ার' কি এটম বোমা থেকে কাউকে আগলে রাখতে পারবে?...আজ আমরা যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে আকাশের তারাগুলো ছাড়া আর কেউ নিরপেক্ষ নয়। আজ ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে হয় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, না হয় ধিক্কারে মাথা নোয়াতে হবে।"

সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার জন্ম অতীতের "ক্লাসিক" সাহিত্যের বাস্তবমুখী ধারার গর্ভে। সে সাহিত্যের গণতান্ত্রিক, মানবপ্রেমের যে ঐতিহ্য আছে, সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা হবে তার উত্তরাধিকারী। সমাজতন্ত্রী পরিবেশ ভিন্ন সমাজতন্ত্রী বাস্তব সাহিত্য বা কলার সৃষ্টি হতে পারে না। এক মাত্র সমাজতন্ত্রী পরিবেশেই সাহিত্যিকের পক্ষে বর্তমানের অতীতের ও ভবিষ্যতের সমাজের গতিকে বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব। তাই গর্কী বলেছেন :—"শুধু সমাজতন্ত্রের মধ্যে সৃজনী শক্তির প্রতিবিম্ব হিসাবেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তব সাহিত্য রূপ নিতে পারে। গোগলের সময়ে সমাজতন্ত্রী পরিবেশ ছিল না, তাই তাঁর পক্ষে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না।" রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে গর্কীর "মা" সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছে। "মা" বইখানির মধ্যে আমরা দেখি, সাহিত্য আর জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের অপূর্ব মিলন।

গোগল, টলষ্টয়, ব্যালজাক, ইবসেন, ডিকেন্স প্রমুখ অতীতের বাস্তবধর্মী সাহিত্যিকরা সমাজের কঠোর সমালোচক ছিলেন; কিন্তু তাঁদের পক্ষে কতকগুলো বাধা ছিল। তখন যুগোচিত বাধা সেগুলো যার জন্য তাঁরা শ্রেণীগত চিন্তাধারাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রকে উপলব্ধি করতে পারেননি। তারই ফলে এতটা উঁচুতে তাঁরা উঠতে পারেননি যেখান থেকে বর্তমান থেকে সুরু করে সুদূর ভবিষ্যতের দিগন্ত পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে। তাই তাঁরা তখনকার সমাজের কঠোর সমালোচনাই করেছেন, কোন বাস্তব সমাধান দেখতে পাননি। বুর্জোয়া সমাজের মাটিতে শিকড় গেড়ে তাঁদের জন্ম ও বিকাশ; তাই সেই সমাজের নানা অবিচার-অন্যায় চোখে পড়লেও, সে সমাজ থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেও, সেই সমাজের মায়ায় শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়েছেন। তাই আনা কারেনিনাকে শেষ পর্যন্ত এই সমাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আত্মহত্যা করতে হয়েছে, তাও ট্রেণের তলায় পড়ে। বাষ্পীয়-যন্ত্র জগতে এনেছে আধুনিক যুগ। তারই পায়ে আত্মবলি দিইয়েছেন আনা কারেনিনাকে

টলষ্টয়; গর্কীর মতে এটা টলষ্টয়ের যন্ত্রের প্রতি অসাধারণ ঘৃণার অভিব্যক্তি। দোষ কিন্তু যন্ত্রের নয়, দোষ যারা যন্ত্রকে অপব্যবহার করে তাদের।

সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার কাছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতটা খুব বড় কথা। গর্কীর রুশ-ধনতন্ত্র সম্পর্কে যে সব রচনা আছে সেগুলো পড়লে ভবিষ্যতের আশা, ভবিষ্যতের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও মানুষের সৃজনী-শক্তির ওপর অগাধ আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন:—আমাদের আজকের সাফল্যের এবং আগামী কালের লক্ষ্যের উচ্চ শিখর থেকে অতীতের ফেলে-আসা পাপাত্মক দিনগুলোকে বিচার করতে শিখতে হবে। সেই মহান্ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নতুন ঢঙে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে সমাজতন্ত্রী অভিজ্ঞতার পটভূমিকায়।

ইলিয়া এরেনবুর্গের "প্যারীর পতনের" কথাই ধরা যাক। ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৩৯-৪০ সালের ফ্রান্সের মর্মন্তুদ কাহিনী সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। বইগুলোতে দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ও বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে খুব খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে যার মধ্যে দিয়ে লেখকের নিজের মত ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটাতেই কিছু-না-কিছু "সত্যের" অস্তিত্ব আছে। কিন্তু শুধু এরেনবুর্গের বইতেই সমস্ত সত্যগুলোর জাল বুনে ঘটনাবলীর একটি পূর্ণাবয়ব ছবি আঁকা হয়েছে; বইএর মধ্যে আমরা পাই একই ফ্রান্সের মধ্যে দু'টি ফ্রান্সের ছবি—যে ফ্রান্স হোল বিভীষণ, আর যে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত আপোষহীন সংগ্রাম করে গেল। বুর্জোয়া ফ্রান্স আর জনগণের ফ্রান্স! পেত্যাঁর ফ্রান্স আর থোরের ফ্রান্স। অশ্রুসিক্ত নয়নে এরেনবুর্গ জনগণের ফ্রান্সের ভাবী জয়লাভের ইঙ্গিত দিতে গিয়েছেন। সেই জনগণের ফ্রান্সই প্যারীকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছিল।

বর্তমানের বুকে ভবিষ্যতের যে বীজ নিহিত রয়েছে এবং বাড়ছে, তাকে দেখতে পাওয়া এবং তাকে ফুটিয়ে তোলা গতিশীল প্রাণবান আশাবাদী সাহিত্যের লক্ষণ; সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা এই ক্ষমতা নিয়েই গড়ে ওঠে। একেই গর্কী বলেছেন:—"সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা শুধু অস্তিত্বকে স্বীকার করে না; সে অস্তিত্ব কর্মময়। (বেঁচে আছি নয়, বাঁচছি) সেই কর্মের সৃজনী-শক্তি মানুষের পৌরুষত্ব, গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বকে বাধাহীন ভাবে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করতে সাহায্য করবে, মানুষকে দেবে অটুট স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন।" ভবিষ্যতের স্রষ্টা কর্মময় সংগ্রামী নায়ক হিসাবে প্রথম যার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে হোল গর্কীর "মা"র পাভেল ভ্লাসফ।

আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্রী পরিবেশ না হলে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা সৃষ্টি করা যায় না। সমাজতন্ত্রী পরিবেশে বুর্জোয়া সমাজের মারামারি, গলা-কাটাকাটি নেই, সমাজ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধ নেই। সেখানে সমাজের কাজ করা মানে নিজের জন্য কাজ করা। সমাজে উৎপাদন বাড়লে নিজের ভাগেও বেশী পড়বে, মালিকের মুনাফা বাড়াবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে না। সেখানে নিজের মঙ্গল নির্ভর করে গোটা সমাজটার মঙ্গলের ওপর। সে সমাজের নায়কের রূপ হবে অভিনব। মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতা (Socialist emulation), শ্রমের মর্যাদা এইগুলোই হবে নায়কের প্রেরণা।

গর্কী আধুনিক লেখকদের উপদেশ দিয়েছেন যে, লেখকেরা যেন মনে রাখেন যে তাঁদের "প্রতিবেশী" মাত্রই ইহজীবনের ভাল ভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চায় সুখে-স্বচ্ছন্দে। ধনিকতন্ত্র এই বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টাটা "অহমিকা" ও পরকে মেরে নিজে বড় হবার চেষ্টা হয়ে দেখা দেয়। ফ্যাসিবাদ এই "পশুবৃত্তি"কে আরো বাড়িয়ে তোলে যার ফলে ফ্যাসিবাদের ভিত্তিই হোল জাতিগত্তাত্ত্ব। Struggle for existence কথাটাকে সেখানে কদর্থ করে পাশবিকতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এই জীবন উপভোগ করার ইচ্ছাটাই সম্পূর্ণ অন্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যৌথ ভাবে সমাজের তথা সকলের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতে শেখে এবং সজ্ঞানে নতুন সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্রী সাহিত্যিকের কর্তব্য মানুষের মধ্যে পশুবৃত্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার এই অধ্যবসায়কে ফুটিয়ে তোলা। শোলকফের সাহিত্য এই আদর্শের উপরই রচিত হয়েছে।

বাস্তব সাহিত্যে অতিরঞ্জন করার প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না। অনেক সময় কিছুটা অতিরঞ্জিত করার ফলে জীবনের এক-একটা দিক আরও মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই গর্কীর মতে "হার্কিউলিস, প্রমিথিয়ুস, ডন কুইক্সোট, ফাউষ্টের চরিত্র কল্পনা-জগতের নয়, বাস্তব সত্যের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয় অতিরঞ্জন মাত্র। ...বাস্তবের মূল চিন্তাধারা ও সত্যগুলো নিয়ে প্রতিমূর্তি গড়তে হবে, তার সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত অতিরঞ্জন করলে যে রোমান্সের সৃষ্টি হয় তা বাস্তবের প্রতি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। খাঁটি আর্টের অতিরঞ্জনের অধিকার অবশ্যই আছে।"

তেমনি বাস্তব সাহিত্যে মানুষের বা জীবনের অসুন্দর দিকটাও ফুটিয়ে তুলতে কোন বাধা নেই। অসুন্দর দিকটা ফুটিয়ে তোলাও সাহিত্য-কলা হতে পারে যদি তার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক মানুষের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং জীবনের প্রতি সেই অসুন্দরের তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। খোলা মাঠে আবর্জনার স্তূপ আর্টের উপকরণ হতে পারে না; কিন্তু সেই আবর্জনা যদি নগরের রাস্তায় জমা হয়ে লোকের যাতায়াতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, বায়ু দূষিত করে, সে ক্ষেত্রে আবর্জনাও আর্টের উপকরণ হ'তে পারে। মানুষের জীবন থেকে সমস্ত রকম অসুন্দরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানে অসুন্দরের নগ্ন রূপকে বর্ণনা করা হয় সেখানে সেটা হয় সাহিত্য-কলা।

তাহলে সমাজতন্ত্রী বাস্তবধর্মী সাহিত্য বা কলা সমাজতন্ত্রী সাহিত্যিকের মতে কি রকম হওয়া উচিত তার একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা গেল। স্তালিনের একটি উক্তি দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব:—"বাস্তবের যুগোচিত (ঐতিহাসিক) বর্ণনা এবং তার বিপ্লবধর্মী প্রগতি, এই হোল শিল্পীর কাছে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের দাবী। এই সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে মেহনৎকারী জনগণের মনে জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টির এবং তাদের সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা দানের প্রয়াস।"

বনস্পতির মৃত্যু

শ্রীগৌতম সেন

ছোট্ট একটি বটের চারা···কবে সকলের অলক্ষ্যে মন্দিরগাত্রে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। সেদিনের সেই শিশু চারা তলে তলে তার শিকড় বিস্তার করিয়া যেদিন আত্ম-প্রকাশ করিল, সেদিন মন্দিরের ছাদ হইতে প্রাচীরের অনেকখানি ভাঙিয়া পড়িল। শুধু গোপীনাথের মাথার উপরকার ছাদটুকু রক্ষা পাইল।

দত্ত-বাড়ীর প্রাচীন দেবালয়। শোনা যায়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ এককালে জমিদার ছিলেন। আজ ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার কিয়দংশ ছাড়া জমিদারীর আর কোনো চিহ্ন নাই। বৃদ্ধ নীলাম্বর দত্তের কিন্তু সে-ঐশ্বর্য্যের দম্ভ কাটে নাই। শুধু বংশানুক্রমিক আভিজাত্যটুকু তাঁহার রক্তের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়।

প্রাসাদ সংলগ্ন গোপীনাথের মন্দির···আজ ভাঙিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কাছারি-বাড়ীর চিহ্নও লোপ পাইয়াছে। বৈঠকখানার সুবৃহৎ পিলান ও একটি থামের ভগ্নাংশ এখনো অবশিষ্ট আছে। অনেকগুলি ঘরই ব্যবহারোপযোগী নয়··· সেগুলি দত্ত মশাই পরিত্যাগই করিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ঘরগুলিকে এক করিয়া দত্ত মশায় মনে মনে এই বৃহৎ বাড়ীটার একটা রূপ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ইহার ঠিক রূপটি ধরিতে পারেন না। ছেলেদের বলেন, আমার জীবন তো কাটিল, পারো তো তোমরা মেরামত করিয়া লইও।

দুই পুত্রই কৃতী। জ্যেষ্ঠ বিজয়মাধব ইঞ্জিনীয়ার। কনিষ্ঠ অমিয়মাধব 'পি ডব্লু ডি'র বড় অফিসার। দুই পুত্রবধূই তাঁদের ছেলেপুলে লইয়া শ্বশুরের কাছে থাকেন। এককালে শক্তি-সামর্থ্য ছিলো তাই আজো এই বয়সে নীলাম্বর দত্ত সোজা হইয়া চলাফিরা করিতে পারেন। আজো নিয়মিত গোপীনাথের মন্দিরে আরতির সময় নিজে উপস্থিত থাকেন। বলেন, এমনি করিয়াই একদিন গোপীনাথের চরণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিব।

একবার মরিস সাহেব শীকার করিতে আসিয়া অমিয়মাধবকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তো 'বিগ-ম্যান'···এত বড় 'প্যালেস' নষ্ট করিলে কেন?

সেই সময় সাহেব এই প্যালেসের একটি সুরঙ্গ পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, যাহা নীলাম্বর দত্তও জানিতেন না। এই পথ কোথায় গিয়া মিশিয়াছে তাহা জানা যায়নি। কারণ, পথটি কিছু দূর গিয়া বুজিয়া পড়িয়াছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার এই ভগ্নাংশ অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। বাড়ীর গঠন-চাতুর্য্য ও রক্ষণ-কৌশলও অপূর্ব্ব। সিঁড়ির দরজার মুখে ফেলা-কপাট এখনও তেমনি আছে। পূর্ব্বে চোর-ডাকাতের ভয়ে এইরূপ কপাট ব্যবহার করা হইত। আজ আর কপাট ফেলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া দত্ত মশায় উহা খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন।

কয়েক পুরুষ আগেও এই গ্রামের শহর বলিয়া খ্যাতি ছিল। আজ শহর নাই বটে, কিন্তু শহরের বিদ্রূপস্বরূপ এই মহানন্দপুর গ্রামে একটি ছোটো-খাটো মিউনিসিপ্যালিটি বর্ত্তমানেও আছে, আর আছে ইস্কুল-বাড়ী, থানা, ডাকঘর, লাল ইটের পাকা রাস্তা। 'দত্ত-ঘাট' বলিয়া একটা জায়গা গ্রামের বাহিরে পড়িয়া আছে···যেখানে ঘাটের চিহ্ন নাই বটে, হয়তো জঙ্গল কাটিলে বাঁধা-ঘাটের দু'-একটা সিঁড়ি আজো মিলিলেও মিলিতে পারে।

বহু কালের কথা। সেকালের লোকও আজ বাঁচিয়া নাই··· থাকিলে, হয়তো এ-বাড়ীর অনেক ইতিহাসই বলিতে পারিত। কিছু-কিছু জানেন, গোপীনাথের কুল পুরোহিত হরিদাসের পিসীমা। তিনি বয়সে নীলাম্বর দত্ত অপেক্ষাও দশ বৎসরের বড়। এই নব্বই বৎসরের বৃদ্ধার মুখ হইতে এখন যাহা বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা রচা কাহিনী। অবশ্য তিনি অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু যাহা দেখেন নাই, তাহাও তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল শোনা যায়। মন্দির-চাতালে এই বৃদ্ধা জপের মালা লইয়া নিয়মিত বসিয়া থাকেন। আর চাহিয়া চাহিয়া দেখেন দূরের ঘন বোপঝাড়ের দিকে। কত কালের কত স্মৃতি···বিস্মরণের পার হইতেও ভাসিয়া আসে। হরিদাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, ঐখানে ছিলো খাজাঞ্চিখানা। কি কাল-ভূমিকম্প এলো—সব ওলোট পালোট হয়ে গেলো! নইলে এদের পয়সা আজ খায় কে। ঘড়া-ঘড়া মোহর—আজ ঐ মাটির তলায়! তুই শুনলে পেত্যয় যাবি না হরি, অনেকে শুনেছে···নিশুতি রাতে ঐ জঙ্গল থেকে আসে মোহর গোণার ঝন-ঝন শব্দ!

—তুমি কি যে বলো পিসীমা। দত্ত মশায় জানেন না এও কখনো হয় না কি?

পিসীমার জপের মালা থামিয়া যায়। বলেন, ও একটা মানুষ, না ছাই। নইলে আজ এমন দশা হয়! একবার চেষ্টাও তো মানুষ করে···বন কাটিয়ে মাটি খোঁড়াতে কতই আর খরচ!

এ সব কথা হরিদাস বহু বার শুনিয়াছে—তবু শুনিয়া যায়। অন্ধকারে কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পায় না। কথাগুলি অশরীরী হইয়া অন্ধকারে ভাসিতে থাকে। আর তাহার চোখের উপর ভাসিতে থাকে খাজাঞ্চিখানার ঘড়া-ঘড়া মোহর।

বিশ্বাস না করিলেও, সেই ঘড়া-ঘড়া মোহরের কথা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারে না। সত্যই কি মাটি খুঁড়িলে কিছু পাওয়া যায়? গোপীনাথের আরতি সে যথারীতি করে বটে, কিন্তু মন পড়িয়া থাকে ঐ দূর জঙ্গলে। পঞ্চপ্রদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকে। গোপীনাথের মুখেও সেই আলো-ছায়ার কম্পন।

হরিদাস আরতি করে আর দেখে। কি দেখে, সে-ও জানে না। তবু দেখে।

দীর্ঘ ছায়া পড়ে জীর্ণ মন্দির-গাত্রে। দৈত্যের মতো সেই ছায়া

যেন মন্দিরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মন্দির-গাত্রে ভাঙা বুলুজিতে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই তাহা জ্বলিয়া আসিতেছে। তাহারই কালো শিখার ছোপ পড়িয়াছে ভাঙা দেয়ালের গায়ে। পঞ্চপ্রদীপের আলো-ছায়ায় ঐ বীভৎস কালের দাগ যেন আরও ভয়াবহ হইয়া ওঠে। আরতি করিতে করিতেও হরিদাসের হৃৎস্পন্দন থামে না।

অতি পুরাতন ইতিহাস···ঘাঁটাইতেও ইচ্ছা করে না, শুনিতেও ভালো লাগে। নীলাম্বর দত্ত কতটুকু জানেন, কে জানে। কিন্তু তাঁর মুখ হইতে কোনো কথাই কেহ কখনো শোনেনি। শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছে, এই অতি-প্রাচীন ভগ্নপ্রায় পৈতৃক বাসভূমির প্রতি তাঁর অসামান্য দরদ। সংস্কার অভাবে একটু একটু করিয়া তাঁহারই চোখের উপর অনেক কিছু ভাঙিয়া পড়িতেছে, তবু তাঁহার দরদের অন্ত নাই। কত কালের ভাঙা ইটের স্তূপ···তাহার ফাঁকে-ফাঁকে কত আগাছা নিয়তই জন্মলাভ করিতেছে, তবুও নীলাম্বর প্রতিদিন অন্তত একবার করিয়াও সেই স্থানগুলি দর্শন করিয়া আসেন। যেন প্রতিদিনের নিয়মিত তীর্থদর্শন।

স্বদেশ বলিতে একটা বড়-কিছু ধারণা নীলাম্বর দত্তের মনে ছিল না। তিনি জানিতেন, তাঁহার গ্রামকে, তাঁহার প্রতিবেশিদের ···আর জানিতেন, সেই গ্রামের পরিবেশকে। আবাল্য যাঁহারা তাঁহার কাছে কাছে রহিয়াছেন, তাঁহাদের লইয়াই তো স্বদেশ। নহিলে ভূমির মাধুর্য্য আর কিসে? ভৈরব আচার্য্য, মধু রায়, ষষ্ঠী গাঙ্গুলী···ইহাদের বাদ দিয়াও যেমন মহানন্দপুর নয়, আবার ষষ্ঠীতলার ঐ 'শানে-বাঁধানো' রোয়াক, গোঁসাই-পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ, রায়েদের আটচালাহীন মহানন্দপুরও তাঁহার পিতৃভূমি নয়। বনে-জঙ্গলে-ঘেরা এই মহানন্দপুরের যে-ছবি তিনি আবাল্য দেখিয়া আসিতেছেন, যে-দেশের প্রতিটি তরু-লতার সহিত তিনি আজন্ম পরিচিত, সেই সব-কিছু লইয়াই তো তাঁহার পিতৃভূমি। নহিলে, মাটির আর পৃথক্ মূল্য কোথায়?

মূল্য মাটিরও নাই, মূল্য তাঁহার নিজেরও নাই। এই সব-কিছু লইয়াই তাঁহার গৌরব। তাঁহার সমাজ, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার কালচার—সমস্তই ইহাদের লইয়া। এত-বড় প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাংশ···তাহারও গৌরব উহাদের লইয়াই। নহিলে আজিকার নীলাম্বর দত্ত আর কতটুকু?

যুদ্ধের কয়েক বছর পর পর কতকগুলি কণ্ট্রাক্ট পাইয়া দুই পুত্রই বেশ-কিছু কামাইয়া লইয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহারা জানাইল, সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্ল্যানে বাড়ী তৈয়ার করিবে। নীলাম্বর বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। কত পুরুষের পুরোনো স্মৃতি···লোপ করা চলবে না। কাঠামো আমি ভাঙতে দেবো না।

জ্যেষ্ঠ বিজয়মাধব অনেক বুঝাইল। কোনো ফল হইল না। করিয়াই বলিল, এই কাঠামো আর কত দিন রাখতে পারবেন? যখন একসঙ্গে সব (পড়বে, তখন কি হবে?

'তখন কি হইবে' সে-প্রশ্নের সমাধান আর হইল না। দুই পুত্রই রাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

ইহার অল্প দিন পরেই কোন কোম্পানীর হইয়া পি ডব্লু ডি শহর বানাইবে বলিয়া গ্রাম জরিপ করতে আসিল।

মাপ-জোক হইয়া গেল। বন কাটা সুরু হইল। অমিয়মাধব আসিয়া জানাইল, এইবারে কোম্পানীর হইয়া আমাকে কাজ করিতে হইবে। এ-বাড়ী আমি না ভাঙিলেও কোম্পানী রাখিবে না। শহরের যা দস্তুর।

নীলাম্বর গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়াও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গ্রামের চতুর্দিকে কারখানা বসিয়া গেল। দিন-রাত্রি কাজ হইতেছে—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

মস্ত-বড় ডিনামাইট বসাইয়া গ্রাম আলোকিত করা হইল। হাজার হাজার মজুর কোথা হইতে পঙ্গপালের মতো আসিয়া জুটিয়াছে। কালো কালো মানুষ—দানবের মতো প্রকৃতি। সব ভাঙিয়া তছনছ করিয়া ফেলিতেছে। হৃদয়হীনের মতো অমিয়মাধব সর্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বড় বড় ইঞ্জিন আসিয়া পড়িয়াছে, পীচের রাস্তা বানাইবে। বন কাটিয়া গ্রাম সাফ হইয়াছে। বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলো মেসিনে ফেলিয়া এখন চেলাই হইতেছে। যন্ত্র-দানবের নানাবিধ বিকট আওয়াজে নীলাম্বর দত্তের বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। রাত্রে ভাল করিয়া তিনি ঘুমাইতে পারেন না। ঘুমের ঘোরেও চীৎকার করিয়া ওঠেন। বধূরাও শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল।

নীলাম্বর শয্যাগ্রহণ করিলেন।

এক দিন নিশুতি রাত্রে নীলাম্বর ঘুমের ঘোরেই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার কাণের কাছে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। ধড়-মড় করিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বধূ ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল।

—ও কিসের শব্দ বৌমা?

—মুখুজ্জেদের বাড়ী ভাঙা হচ্ছে বাবা!

—অমনি শব্দ করে?

—ভাঙতে গেলে তো শব্দ হবেই বাবা!

নীলাম্বর সে কথা যে জানেন না এমন নয়। কিন্তু মনে করিতে ভয় হয়। অমনি শব্দ করিয়া তো তাঁহার বাড়ীও ভাঙা হইবে।

ঠক্—ঠক্—ঠক্···শব্দ নয়, শেলাঘাত। প্রতিটি শব্দ যেন তাঁহারই বক্ষ-পঞ্জরে গিয়া আঘাত করিতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে আবার তিনি বিছানায় শুইয়া পড়েন।

—আপনি ঘুমোন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি'। বলিয়া বধূ শয্যার এক প্রান্তে বসিল।

দিন পরে বিজয়মাধব আসিয়া সকলকে কলিকাতা লইয়া গেল।

আরও কিছু দিন কাটিল। নীলাম্বর দত্তের মানসিক অবস্থা সহজ হইয়া আসিল। নূতন বাড়ীর প্ল্যান তিনিই ছকিয়া দিবেন জানাইলেন।

ছক প্রস্তুত হইল। সেই প্রাচীন দত্ত-বাড়ীর ছকে-ফেলা প্ল্যান। তেমনি দত্ত-সড়কের ধারে···তেমনি বড় বড় থামওয়ালা দক্ষিণ-

দুয়ারি বাড়ী। তেমনি উঠানের একধারে অন্দর, অপর ধারে মন্দির-চত্বর। সব সেইরূপই আছে···শুধু, যাহা ভাঙিয়া গিয়াছিল, তাহা জোড়া দেওয়া হইয়াছে। আছে সেই কাছারি-বাড়ী, খাজাঞ্চিখানা, সদর-দেউড়ি। গ্রামের বাহিরে দত্ত-ঘাটকেও তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

কলিকাতায় বসিয়া নীলাম্বর দত্ত প্ল্যানের পর প্ল্যান তৈয়ারি করিতেছেন, আর ওদিকে কোম্পানী তাহার ইচ্ছামত বাড়ী বানাইতেছে।

বিধাতার অদ্ভুত পরিহাস।

তিন বছর পরে নীলাম্বর দত্ত দেশে ফিরিলেন।

শহর দেখিয়া তাঁহার সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। যেদিকে চোখ ফিরাইয়া দেখেন, সবই তাঁহার কাছে অপরিচিতের মতো ঠেকে। তিনি সর্বত্রই কি যেন খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন। কোথায় গেল রায়েদের সেই আটচালা, কোথায় বা গোঁসাই-পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ—নাই পাকুড়তলার পাঠশালা, নাই শানে-বাঁধানো বটতলা। ছেলেদের ডাকিয়া বলেন, আমাকে তোমরা কোথায় আনিলে? এ কি আমার সেই মহানন্দপুর?

সত্যই সে মহানন্দপুর নয়।

এ মহানন্দপুর গ্রাম নয়, শহর। নূতন শহরে নূতন অধিবাসী আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে। প্রাচীন বাসিন্দা যাহারা, তাহারা গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। নাই অঘোর চাটুয্যে, ভৈরব আচার্য্য···নাই মধু রায়, ষষ্ঠী গাঙ্গুলী···শুধু দত্ত-বাড়ীর সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য আজো রহিয়া গিয়াছেন গোপীনাথের কুল-পুরোহিত হরিদাস ও তাঁহার বৃদ্ধা পিসীমা।

গোপীনাথের মন্দিরে নীলাম্বর আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিদা-হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। ভাঙা ইট-বাহির-করা চাতালের পরিবর্তে মার্বেল-পাথরের ঝকঝকে চাতাল বৃদ্ধা পিসীমাকে আজ খুসীই করিয়াছে দেখিলেন। শুধু খুসী হইতে পারিতেছেন না নীলাম্বর নিজে।

মন্দির নয়···ঐশ্বর্য্যের দম্ভ।

তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন, এখানে তাঁহার গোপীনাথকে মানাইতেছে না। দেখিলেন, প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় পূর্বে গোপীনাথের যে রূপ খুলিত, সেই স্বয়ংপ্রকাশ-দিব্য জ্যোতি আজ বিজলি বাতির কৃত্রিম আলোয় যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পুরোহিতের হাতে পঞ্চ-প্রদীপের আলো হাজার বাতির নীচে আজ কোনো মহিমাই প্রকাশ করিতেছে না।

মানাইতেছে না তাঁহার নিজেকেও। চেষ্টা করিতেছেন মানাইয়া লইবার, কিন্তু পারিতেছেন না। পুরাতন চোখ সেই পুরাতনকেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

● ● ● ●

মহানন্দপুর আবার শহর হইয়াছে। ঘুমন্ত পল্লীর বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে নব নব সৌধ। নূতন মানুষের নূতন রচনা। শুধু মহাকাল মাঝখানের কয়েকটি বছরের দুঃস্বপ্ন লইয়া একমাত্র নীলাম্বরকেই বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে।

"বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইএর যত প্রচার হয় ততই ভাল। কেবল শিক্ষার বিস্তারের দিক্ থেকে বলছি না। সভ্যতার আজ সঙ্কটময় অবস্থা। জ্ঞানের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ নিকট, তাই আজ জ্ঞানের ইতিহাসেও সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত এসেছে। বিশেষজ্ঞ-সম্প্রদায় জ্ঞান-বৃদ্ধির অজুহাতে তাঁদের বিষয়গুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে এসেছেন। লোকচক্ষুর অর্থ সাধারণের চোখ নয়, মার্জ্জিত-বুদ্ধি ভদ্রলোকের চোখ। অ্যামেটার কথাটি গালাগালির সামিল হয়ে উঠেছে, ফলে বিশেষজ্ঞের চোখে ঠুলি উঠেছে এবং তাঁদের ওপর অগাধ বিশ্বাসে জনসাধারণ অন্ধ হয়ে উঠেছেন। এই প্রকার অন্ধত্ব ধর্মান্ধতা অপেক্ষা কম ক্ষতিকর নয়। জনসাধারণকে অনেক কষ্টে জীবন ধারণ করতে হয়, সেই জন্য তাঁদের সাধারণ-বুদ্ধি খোলে, এবং সাধারণ-বুদ্ধির সমালোচনায় বিশেষজ্ঞের দিব্যানুভূতি ও দৈব-দাবী একটু সংযত হয়। সাধারণ-বুদ্ধির সমালোচনা এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান গুহ্যধর্ম্মে পরিণত হয়। গুহ্যধর্ম্মাবলম্বীর দাম্ভিকতার তুলনা নেই। বিশেষজ্ঞেরা জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার দরুণ অ-সামাজিক হয়ে পড়েছেন। অ-সামাজিক হওয়াও যা, আর সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করাও তাই। জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের যোগ খণ্ডিত হবার দরুণই পণ্ডিতবর্গের হাত থেকে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করবার ভার চালাক লোকেদের হাতে সরে এসেছে। সভ্যতাকে আর তাঁরা উদ্ধার করতে পারছেন না। এবং উদ্ধার করতে পারছেন না বলেই যে ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার নেই তার ওপর অধিকার-বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছেন।"

—ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এই নিয়ে নীলিমার ছ'নম্বর ইনটারভিউ।

বিরাট উঁচু তিনতলা প্রাসাদের মোটা-মোটা থামগুলো যেন নীলিমার মনকে বিষিয়ে তোলে। থামগুলোই যেন নীলিমার চাকরীর সকল বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।

এই যে, অনেকগুলি থাম সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সবল, শক্ত, মসৃণ,—যেমন নির্বাক্ তেমনি অকরুণ।

থামগুলোর মাঝখান দিয়ে নীলিমা ঢুকল এসে বিরাট একটি আধো-অন্ধকার ঘরে। খৃষ্টানদের কারখানার মতো সারি সারি লাইন-বাঁধা টেবিল-চেয়ার; টেবিলগুলোর ওপর নথীপত্র, ফাইল।

তখনো দশটা বাজেনি। অফিস-ঘর কেরাণীতে গম্‌গম্ করছে না। চার-পাঁচ জন লোক এখানে-ওখানে বসে আয়াসে পান চিবোচ্ছে। ঐ পাশের ঐ মাথা-গোঁজা বুড়োটা এখনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি লিখে চলেছে।

নীলিমা সোজা এগিয়ে চলল। এটা হল তার ছ'নম্বর ইনটারভিউ। প্রথম প্রথম ভয় হতো তার ড্যালহৌসীর এই বড়-বড় দালানে পা ছোঁয়াতে। ইনটারভিউ দেবার আগ-পর্যন্ত বুকখানা টিপ-টিপ করে কাঁপতো, আর ইনটারভিউর সময় তো কথাই নেই, ওর সুন্দর কান দু'টো ক্যালেণ্ডারের রবিবারের তারিখগুলোর মতো লাল হয়ে উঠতো।

এখন তার সে ভয়টুকু কেটেছে। সহজ সরল ভাবে যায় সে ইনটারভিউ দিতে এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা দিয়ে আসে। নীলিমা বুঝতে পেরেছে, ইনটারভিউ যারা 'বস' করে, তারা সুন্দরবনের বাঘও নয়, কিংবা আসামের বুনো হাতীও নয়।

নীলিমার দাদা প্রশান্ত বলে, ওরা হাতি-বাঘ নয় বটে, কিন্তু ওরা হচ্ছে মানুষ—জানোয়ার। স্বজাতি ছাড়া আর সকলেরই ওপর আক্রোশ।

বড়দা'র বাড়াবাড়ি এ সব। নীলিমা ওর কথাবার্তার ঢং ও ধরণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।'

'আইয়ে মাইজী", লিফ্‌টম্যান ওকে লিফ্‌টটা দেখিয়ে দিয়ে বলল। নীলিমা লিফ্‌টের দিকেই যাচ্ছিল; লিফ্‌টে উঠে বলল, তিনতলা।

প্রায় উনিশ-বিশটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও ইনটারভিউ দিতে এসেছে। তিনতলায় ডেপুটী ডাইরেক্টরের ঘরে ইনটারভিউ হবে। নীলিমা বাঁ-হাতি ঘরে একটা খালি চেয়ারে বসল। সেখানে আরও চারটে মেয়ে বসে আছে। নীলিমার দিকে ওরা তাকাল।

এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ লোকেরা যে বোকামি করে থাকে—নীলিমাও সহজ ভাবে তাই করল। অর্থাৎ জেনে-শুনেও প্রশ্ন করল, "আপনারা নিশ্চয়ই ইনটারভিউতে এসেছেন।"

একটি মেয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিল, "হুঁ। আপনি ?"

নীলিমা হেসে বলল, "আমিও"।

এই ধরণের জানা-কথাকে যারা না জানার ভাণ করে, তাদের আমরা আর যা-ই বলি বাগাড়ম্বর বলি না। কারণ, আমাদের সমাজের কথার চেয়ে বক্তৃতার দিকেই ঝোঁক বেশী।

যে মেয়েটি নীলিমার কথার জবাব দিয়েছিল, ওর নাম নিভা। বেশ বুদ্ধিমতী দেখতে, মুখে একটা ধারালো কান্তি আছে। নিভা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

নিভার প্রশ্নে সজাগ কৌতুহল পরিষ্কার ধরা পড়ল। সে যেন পরিচিত হতে চায় নীলিমার সংগে—আরো অনেকের সঙ্গে। কণ্ঠস্বরে তার আহ্বানের ইংগিত।

"শ্যামবাজার, আর জি কর রোডে।"

"আমিও ত ঐদিকে থাকি, বাগবাজার শ্রীদুর্গা প্রেসের পেছনের বাড়ীটা যোলোর সতেরোয়।

নীলিমা ক্ষীণ বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, "তাই না কি ?" ইনটারভিউতে এসে নীলিমা আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলল নিভার সংগে। ওরা বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট নিয়েই কথা বলল বেশী, চেয়ে বেশী। কথায় কথায় নিভা বলল, "এটা আমার তিন নম্বর ইনটারভিউ।"

নীলিমা পুরোপুরি মিথ্যে বলল, "আমারও এটা দ্বিতীয় ইনটারভিউ।"

ইনটারভিউ

সুধাংশু গুপ্ত

এতগুলো ইনটারভিউ দিয়েছে এটা বলতেও যেন নীলিমার ভীষণ লজ্জা, এমনি অদ্ভুত আমাদের লজ্জা।

ওদিকে ছেলেগুলো লাইন দিচ্ছে ইনটারভিউর জন্য। এদের অধিকাংশেরই বয়স হবে কুড়ি থেকে বাইশের ভিতর। মুখগুলি শিশুর মত কচি-কচি; বাস্তব জীবনের কোনো কশাঘাতের চিহ্নই যেন নেই মুখে। শুধু এক বাস্তব তাড়নায় এখানে সমবেত হয়েছে এরা সব,—এই মাত্র।

প্যাণ্ট-পরা এক ভদ্রলোক জোরে-জোরে নামগুলো পড়ছেন, আর ছেলেরা 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলে একের পর এক লাইনে যোগ দিচ্ছে।

প্রেজেণ্ট স্যার! ছেলেগুলো যেন কলেজে ওদের উপস্থিতি জানাচ্ছে।

"নিভা ব্যানার্জি কে?···আপনি? আসুন আমার সংগে।" পেট-মোটা প্রৌঢ় এক জন ভদ্রলোক ডেপুটি ডাইরেক্টর সাহেবের ঘরে নিয়ে গেলেন নিভাকে।

নীলিমা ভাবতে লাগল, কবে এই ইনটারভিউ-সমুদ্রের অকূল তীরে তার তরী ভিড়বে। বড়দা' বলে, "ইনটারভিউ" হল ফার্স, যাদের হবার তাদের নাম আগে থেকেই সিলেক্‌টেড হয়ে আছে। নীলিমা বিশ্বাস করে না বড়দা'র কথা। কত ছেলে-মেয়েই ত এই ভাবে চাকুরি পাচ্ছে নানান জায়গায়। বড়দা'র সব-কিছুতেই বাড়াবাড়ি। নীলিমা ওর পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার কি মনে হয়, ইনটারভিউটা একটা ফার্স নয় কি?"

ইনটারভিউ দিতে এসে নীলিমার এ ধরণের প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। নীলিমা নিজের প্রশ্নে নিজেই যেন বিস্মিত হল কিছুটা।

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, "ফার্স হলে কি আর এখানে আসি?"

নীলিমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, "না না, আমি তা মিন্ করছি না। আমার বড়দা' আমাকে বলেছিল, ও-সব ইনটারভিউতে আর কি হবে, ও-সব ফার্স ছাড়া ত কিছুই নয়! কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয় না। তা হলে কি এতগুলো ছেলে-মেয়েকে এখানে রোজ-রোজ ডাকা হয়?" শেষ দিকের কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতো শোনালো।

ওদিকে অফিস তখন পুরো দমে ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে টাইপিষ্টের নির্বাক্ টকাটক আঙুলের শব্দে, নিঃশব্দ কেরাণীর নথী পর্যবেক্ষণে ও নোট লেখায়।

নীলিমা আড়চোখে দেখতে লাগল এই সব আত্মনিমগ্ন জীবগুলোকে। কী ভীষণ ম্লান ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের! নীলিমার বড় দুঃখ হল। ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। এ কি নীলিমার সহানুভূতি? কা'কে সহানুভূতি করছে সে? নিজেকেই ত, সে-ও যে এদেরই মতন এক জন হতে চায়! আর তার জন্যে নীলিমার কী অধ্যবসায়! পর পর পাঁচটা ইনটারভিউ ব্যর্থ ও বিফল হওয়া সত্বেও তার মনের উত্তেজনার শেষ নেই। 'একবারে না পারিলে দেখ শত বার।' একটা চাকুরীর যে তার বড় প্রয়োজন।

ওর কলেজের বান্ধবীরা বলত, নীলির চিন্তা নেই, ওর বাপ-মায়ের ও একটি মেয়ে।"

নীলির হাসি পায় কথাগুলো মনে করে। নীলি বলেছিল ওর সতীর্থাকে, "আমি ভাই চাকরী করবো। কারো ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে চাই নে।"

সীতা হেসে বলেছিল, "তোকে চাকরী করতে দেবে কে? তোর বাবা? হুঁ। এ সব কথা আমাদের বললে তবু পোষায়।"

"আশালতা চৌধুরী কে?···আপনি? আসুন। সেই পেট-মোটা ভদ্রলোকটির সংগে আর একটি মেয়ে ইণ্টারভিউতে গেল ডেপুটী ডাইরেক্টরের ঘরে।

এমনি কোনো এক অফিস-ঘরে সমরেশ বাবু নিশ্চয়ই নির্বাক্ মনে এখন নথীপত্র দেখছেন। সমরেশ বাবুর মাথায় টাক পড়তে সুরু হয়েছে এখনি—এই ছেচল্লিশ বছরেই। নীলিমা দেখেছে, সমরেশ বাবু যখন বিকেলে অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন, তখন মুখের করুণ বেদনা-পীড়িত অব্যক্ত অভিব্যক্তি। আস্তে আস্তে তিনি দোতলার সিঁড়িগুলোর দুরতিক্রম্য বাধা ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠেন। এক হাতে তার এটা-ওটা আর এক হাতে তারই মতন শেষ সীমায়-ঠেকা একটা ভাঙ্গা রং-ওঠে-যাওয়া ছাতা।

সমরেশ বাবু নীলিমারই বাবা।

ঐদিকের ঐ ষ্টেনোগ্রাফারটা আড়-চোখে নীলিমার দিকে তাকাচ্ছে।

নীলিমার রাগ হয় এদের ওপর। দুঃখও যে না হয় তা নয়। সাহস করে যে তাকাবে, তেমন জোর নেই বুকের, তাই সাহস হারিয়ে অসভ্য উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে। এরা প্রত্যেক মেয়ের দেহের উপর দিয়েই নিজের অশ্লীল দৃষ্টির তীর চালায়, কিন্তু নিজের মা কিংবা বোনের এতটুকু বেআব্রু জায়গা অন্যের চোখের ওপর অতর্কিত খুলে পড়লে খুনোখুনি করতে বেরোয়। মা-বোনের প্রতি কি অসীম ও অদ্ভুত শ্রদ্ধা!

নীলিমা এমন অবস্থায় বসেছে যে এখান থেকে উঠেও যাওয়া যায় না, চেয়ারটা ঘুরিয়েও বসা চলে না, বড় বিশ্রী লাগছে তার।

এদেরই সংগে সারা জীবন চাকরী করতে হবে?

নীলিমা এই অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে কথা জুড়ে দেয় তার পাশের মেয়েটির সংগে।

"বেশ ঠাণ্ডা লাগছে যেন। উলের চাদরটা না এনে ভুলই করেছি। আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?"

"হুঁ। লাগছে ত।" অল্প হেসে মেয়েটি একটু রসিকতা করল। "কিন্তু ইনটারভিউর টাইম যত ঘনিয়ে আসছে ততই কেমন যেন নাক-কানগুলো তেতে উঠছে, তাই না?"

নীলিমা কোনো উত্তর না দিয়ে স্মিতমুখে "কিউর" দিকে তাকাল। মেয়েটা বোধ হয় নতুন ইনটারভিউ দিতে এসেছে। কিন্তু তাই-বা কেমন করে হয়,—তাহলে কি ইনটারভিউ নামক অদ্ভুত ভীতিময় ব্যাপার নিয়ে এমন অনায়াস ব্যংগ করতে পারত ও? হ্যাঁ, ওর গলায় অনায়াস স্পষ্ট স্বর নীলিমার এখনো কানে লেগে আছে।

জিজ্ঞেস করবে না কি নীলিমা এটা ওর ক'নম্বর ইনটারভিউ? মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এ সব ব্যাপারে একটু বেশী খোলা-মেলা। কোনো দ্বিধা না করে নীলিমা এখনি প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু—না, থাক, নীলিমা 'কিউ'টার দিকে তাকাতে তাকাতেই ভাবলো এই কথাগুলো।

ছেলেদের ইনটারভিউ এখনো আরম্ভ হয়নি। ওরা শুধু লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের প্রথমেই যে চার জন যুবক দাঁড়িয়েছে, ওদের হাতে একটা করে "অন হিজ ম্যাজিষ্টিজ সার্ভিসের" বড় লম্বা খাম। ওগুলো ইনটারভিউ লেটার। আর তারই সংগে আছে অজস্র সার্টিফিকেট্। মেট্রিকুলেশান, আই-এ, বি-এ, এম-এ ল, বি এস-সি, এম এস-সি—খুঁজলে দু'চারটে বি-ইও কি পাওয়া যাবে না? আরো অনেক সার্টিফিকেট আছে ওদের সংগে—চরিত্রের, খেলা-ধূলার শরীরের, টেনিসের, ফুটবলের, ক্রিকেটের, আবৃত্তির, ঘোড়দৌড়ের, আছে অফিসিয়াল, ব্যক্তিগত, কত না তার রচনা-কৌশল, কত না তার ভাষার বাহাদুরি।

নীলিমা নিজেও এই ধরণের সার্টিফিকেট এনেছে তিন-চারটে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আছে অবসরপ্রাপ্ত এক সাব-জজের, হাইকোর্টের এক বড় উকীলের, আর আছে নীলিমারই এক মামার,—তিনি পুনা কলেজের এক জন পুরাতন অধ্যাপক। মাঝে-মাঝে কাগজে-পত্তরে তাঁর বক্তৃতার সার মর্ম ছোট-ছোট অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

নীলিমার বড়দা'র মতে সার্টিফিকেটের মস্ত একটা 'ওয়াণ্ডারাল ভ্যালু' আছে। সার্টিফিকেট ছাড়া না কি এ সমাজে হালে জল পাওয়া যায় না। বাঁদরের লেজের মত এক-একটা সার্টিফিকেট এই সমাজের এক একটা মানুষকে শোভিত করে আছে।

"নীলিমা ভটাচার্য্য কে?······আপনি? আসুন আমার সংগে।" মোটা ভদ্রলোকটি তাঁর গৎ-বাধা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

নীলিমা তাকে অনুসরণ করল ডেপুটী ডাইরেক্টরের ঘরের দিকে।

অন্যান্য ডেপুটী ডাইরেক্টরের ঘরের মতো এই ঘরখানিও একটা বিশিষ্টতা-মণ্ডিত। সমস্ত ঘর-ময় সবুজ রংএর পুরু কার্পেট পাতা; পাৎলা হলুদ রংএর দেয়ালের গায়ে বার্মা শেলের একটি দামী কেলেণ্ডার, ও-পাশের খোলা জানালা দু'টোর ও-পর কাঁপছে শাদা সিল্কের ছোট দু'টো পর্দা, এক পাশে একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল; টেবিলের এক পাশে একটা টেলিফোন, আরেক পাশে বেতের বাস্কেটে কয়েকটা ফাইল। তারই মাঝখানে গদিওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন সাহেবি পোষাক-পরা এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ইনিই সেই বাঞ্ছিত ব্যক্তি অর্থাৎ ডেপুটী ডাইরেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীসঞ্জীবনকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে আরো চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁদের কেউ বা স্যুট-পরা, কেউ-কেউ আবার শুভ্র ও শুদ্ধ খদ্দরমণ্ডিত। এঁরা এমন একটা বিশেষ অবস্থায় বসে আছেন যে এঁদের দিকে তাকালেই নীলিমার গ্রহ এবং উপগ্রহের কথা মনে পড়ে যায়।

"বসুন।" এঁদেরই এক জন নীলিমাকে একটি চেয়ারে বসবার নির্দেশ দিলেন।

দ্বিধা ও লজ্জায় নীলিমা আরক্তিম হয়ে উঠল। বসবে সে? এদের সামনে?

কোনো মতে একটু সাহস সঞ্চয় করে পা দু'টো টেনে নিয়ে গেল সে চেয়ারের সামনে, তার পর যন্ত্র-চালিতের মতো বসে পড়ল তার ওপর। কিন্তু বসে পড়ে নীলিমা অভদ্রতা করল না ত? এরই জন্যে চাকরী পাবার অতি ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও বাতিল হয়ে যায় যদি?

এতক্ষণ পরে আরম্ভ হল নীলিমার ছ'নম্বর ইনটারভিউ।

"আপনার ইনটারভিউ লেটার?"

"এই যে।" নীলিমা ওর হাতব্যাগ থেকে খুলে ইনটারভিউ চিঠিখানা এক জন 'উপগ্রহের' হাতে দিল।

"আপনার নাম?" ডেপুটী ডাইরেক্টর শ্রীসঞ্জীবনকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরাট একটা ড্রামের ভেতর থেকে যেন প্রশ্নটি করলেন।

একটু বিমূঢ় গলায় নীলিমা বলল, "নীলিমা ভট্টাচার্য্য।"

"কত দূর পড়া-শুনা করেছেন?"

এ সব প্রশ্ন করার যে কি মানে, নীলিমা তা বুঝে উঠতে পারে না। ওর দরখাস্তেই ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে লেখা আছে সব-কিছু।

নীলিমার স্বর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, বলল্ সে, "আই-এ।"

"আপনি এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?"

তাও ত বলাই আছে দরখাস্তে। নীলিমা শান্ত গলায় বললে, "না।" এমন ভাবে নীলিমা শব্দটা উচ্চারণ করল যে মনে হল, এর জন্যে সে খুবই লজ্জিত।

"আপনি কোন পলিটিক্যাল পার্টিতে 'বিলঙ' করেন?"

নীলিমা আকাশ থেকে পড়ল যেন। কলকাতা এসে প্রথম ট্রামগাড়ী দেখেও সে এতো অবাক্ হয়নি। কিন্তু চালাক মেয়ে নীলিমা তার সকল বিস্ময়কে মুখ থেকে এক নিমিষে সরিয়ে বাংলা সিনেমার অভিনেত্রীদের হাসির নকল করে একটু হেসে বলল, "আমি কোনো পার্টিতেই বিলঙ করি না।"

"তবু কোন্ পার্টির প্রতি আপনার সব চেয়ে বেশী সহানুভূতি?" —ডেপুটী ডাইরেক্টার পুনরায় প্রশ্ন করলেন বেশ একটু মৃদু ও মিষ্টি কণ্ঠে।

নীলিমা মিষ্টতর কণ্ঠে জবাব দেয়, "কংগ্রেস।"

আরো দু'-তিনটে প্রশ্ন করে ডেপুটী ডাইরেক্টর বললেন, "আচ্ছা, এবার আপনি যেতে পারেন।"

নীলিমা লম্বা একটা নমস্কার করল সঞ্জীবনকুমার চট্টোপাধ্যায়কে, তার পর কাগজ-পত্রগুলো হাতে নিয়ে বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতোই হেলতে-দুলতে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে হ্যাণ্ডেল লাগানো চকচকে বার্ণিশ-করা দরজাটা খুলে ও আবার বন্ধ করে। সেই বড়-বড় থামগুলোর পাশ দিয়ে নীলিমা এসে দাঁড়াল ফুটপাতে। নীলিমার সামনে স্থির মোটরগুলো লালদীঘির দিকে মুখ করে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীগুলো সূর্য্যের আলোয় চিক-চিক করছে।

যাক, অবশেষে ইনটারভিউটা চুকে গেল। নীলিমার মনে হল, এবার হয়ত সাকসেকফুল হতে পারবে সে। বিশেষ কিছুই ত জিজ্ঞেস করেনি ওরা, আর নীলিমাও বেশ ঝরঝরে জবাব দিয়েছে প্রশ্নগুলোর।

"আইয়ে, আইয়ে, শিয়ালদা, মাণিকতলা, শ্যামবাজার, শিয়ালদা, শিয়ালদা—"

'তিনের এ' বাস-নম্বর। নীলিমা উঠে পড়ল বাসটায়। সেদিনের মতো সুষমা যদি আজ তার সংগে থাকতো তাহলে কোন মতেই এ 'রুটে' যেতে পারত না নীলিমা। আধ ঘণ্টা দেরী হলেও সুষমা দু'নম্বরের জন্ম অপেক্ষা করতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তিনের এ-তে কি ভদ্রলোক যাতায়াত করে? ও তো ডেলি-প্যাসেঞ্জার আর কুলি-মজুরের বাস।

বড় অদ্ভুত ধারণা সুষমার।

প্রশান্ত তো নীলিমার ইনটারভিউর সব কথা শুনে হেসেই খুন। তার পর গম্ভীর গলায় বলল যে, "কেন বারে বারে ইনটারভিউ দিয়ে মরছিস? চাকরী কি আর ইনটারভিউতে হয়" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল প্রশান্ত। তার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কিন্তু কি-ই বা করতে পারি তোর জন্যে?"

নীলিমা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলল, "কিন্তু আমারও মনে হয়, এবার হয়ত—"

কথাগুলো শেষ করতে পারলো না সে। বড়দা'কে তার ভয় করতে লাগলো। হয়ত কিছু বেফাঁস বলে ফেলেছে নিজের অজ্ঞানতায়।

প্রশান্ত মৃদু হেসে নীলিমার পিঠ চাপড়ে বললে, "বোন, চাকরী হলে তো ভালই, তুই কি মনে করেছিস্ চাকরী পেলে আমি মনে কষ্ট পাব? আরে তাও কি হয়?" তার পর প্রশান্ত একটু হালকা কণ্ঠে বললে, "যা, এক কাপ চা নিয়ে আয়, বেরিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, আড়াইটায় আবার অনার্স ক্লাশ নিতে হবে একটা।"

নীলিমাকে যখন প্রশান্ত আদর করে, তখন বড় ভালো লাগে নীলিমার। এ আদরে কোথাও যেন ভেজাল বলে কিছু নেই;—প্রশান্তর কণ্ঠস্বর কোমল স্নেহে ও ভালোবাসায় ভেজা। ওর দাবী-গুলো আকাশের মত উদার ও সূর্য্যের আলোর মত পরিষ্কার।

নীলিমা গত পাঁচ মাসে মোট সাতটা ইনটারভিউ দিয়েছিল আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডখানা তিন বার রিনিউয়েল করিয়েছিল। আগামী সতেরো তারিখ আবার সেটা রিনিউয়েল করাতে হবে।

নঈতালিম

শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে ভারতে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিবার জন্ম বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাসে যে বিরাট ওলট-পালট হইয়া গেল, ভারতের অগণিত জনসাধারণকে তাহার বিষময় ফলভোগ করিতে হইতেছে আজিও। জনসাধারণের এই অস্বাভাবিক দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সরকারী দায়িত্ব যথেষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার তাঁহাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়া সমস্যার অস্বাভাবিক গুরুত্বকে কিছুটা লাঘব করিতে পারেন মাত্র, তবে ইহার দ্বারা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে একমাত্র অস্ত্র শিক্ষা। অশিক্ষিতের দেশে যে কোন নৈতিক মতবাদ কার্য্যকরী করা অসম্ভব। নব্য রাশিয়ার জন্মদাতা লেনিন বলিয়াছেন: 'In an illiterate country it is impossible to preach communism' জাতীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইহার উপর কতটা জোর দিয়া আসিতেছেন বলিতে পারি না। মজদুর এবং কৃষকশ্রেণীর যাহা আয় তাহার বহু অংশ ব্যয়িত হয় পচুই মদের দোকানগুলিতে এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যভিচারের পরিপোষকরূপে। শিক্ষার বহুল প্রচার তাই অপরিহার্য্য। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, কোন্ শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের গ্রহণ করা উচিত—যাহার সহজ ও বহুল প্রচার ও জাতীয় নৈতিক চরিত্রের সানুকূল হইবে? বর্ত্তমান সংখ্যা বাড়াইয়া চলি তাহাতে লাভ হইবে না কিছুই। বিদেশী শাসকের শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্যই এই শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভব। বর্ত্তমান স্কুল-কলেজগুলি সস্তাই কেরাণী তৈয়ারী করিবার যন্ত্রস্বরূপ। তাই ভারতীয় যুবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জনের পরও চাতক পাখীর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হয়। এই ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা দিয়া দেশের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইবার অবকাশ কোথায়? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী হইতে যে সার্জেণ্ট স্কীমের কথা আমরা শুনিয়াছি তাহা অনেকাংশে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের সাধ্যায়ত্তে আনিবার জন্ম যে পরিমাণ ব্যয়ভার সরকারের বহন করা প্রয়োজন তাহা কোন জাতীয় সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সার্জেণ্ট-স্কীম অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা অসম্ভব। ইহার জন্ম বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে শুধু বাংলা দেশে প্রয়োগ করিবার জন্ম ৫৭ কোটি টাকার প্রয়োজন। বাংলা অবিভক্ত থাকিলেও এই ব্যয়ভার বাংলা সরকার স্বপ্নেও বহন করিতে পারিতেন না।

তাই শিক্ষাকে সকলের আয়ত্তাধীন এবং যথার্থ কল্যাণকরী করিতে হইলে, ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমাধানের পরিপোষক করিতে হইলে বর্ত্তমানে এমন এক নূতন ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের চাই যাহার সহিত বাস্তব জীবনের গভীর যোগ থাকিবে। তাই শিক্ষাকে মুখ্যতঃ কর্মকেন্দ্রিক হইতে হইবে। একমাত্র কর্মের ভিতর দিয়াই

personality' হইতেছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। তাই গান্ধীজী যে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থিত করিলেন তাহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করা। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা বা নঈতালিমের কথা বলিতে গিয়া শিক্ষা বলিতে প্রকৃত কি বুঝায় 'হরিজন' পত্রিকায় ১১৩৭ সালের জুলাই সংখ্যায় তিনি পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন—'Literacy in itself is no education. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its traning. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the state takes over the manufactures of these schools. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education.' বস্তুতঃ, পৃথিবীতে যত প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমরা দেখিয়াছি তাহার মূল উৎস হইতেছে সমস্যা হইতে, সমস্যার উৎপত্তি কর্ম হইতে। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অনুসন্ধিৎসু ভাব কর্মের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা এবং 'কি এবং কেন'—সংগ্রহ করিবে, ভবিষ্যতে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই পিপাসা আরও বলবতী হইয়া প্রকৃত গবেষণামূলক কাজে ছাত্রদের ব্রতী এবং উৎসাহী করিয়া তুলিবে।

কোন এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলেই বুঝা যাইবে, শিশুর আসল নজরটা কোথায়। তাহার ছটফটে ভাঙ্গা-গড়া স্বভাব দিয়া সে হয়তো ছুরি দিয়া বেঞ্চির আগাটা কাটিতে থাকিবে। শিশুর এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গাগড়া স্বভাবকে কাজে লাগান যায় একমাত্র কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিতর দিয়া। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে এই ভাবে যদি কর্মকেন্দ্রিক করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে বর্তমান কালের মত শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পরস্পর অহি-নকুল সম্বন্ধ কাটিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অধ্যাপক জাকীর হোসেন বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: Socially considered the introduction of such practical productive work in education, to be participated in by all the children of the nature will tend to breakdown the existing barriers between manual and inteclletual workers, harmful alike for both'. এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে, 'Knowledge will thus become related to life and its various aspects will be correlated with one another.

সুখের বিষয়, কয়েকটি প্রদেশে ইতিপূর্বে এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার কাজ সুরু হইয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় মেদিনীপুর জেলায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক এবং এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছাত্রদের তুলনায় এই সমস্ত শিক্ষায়তনের ছাত্রদের কর্মক্ষমতা ও অনুসন্ধিৎসু ভাব অনেক বেশী। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষায় জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়েই বুনিয়াদী শিক্ষার ছাত্রেরা জানিতে পারিবে কোন এক বিশেষ শিল্পের ভিতর দিয়া। তবে এই শিক্ষায় ইংরাজীর স্থান থাকিবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য-তালিকার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, গান্ধীজী বর্ত্তমান ভারতের অবস্থার সব দিক্ বিবেচনা করিয়া এমন এক সুন্দর শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা সব দিক্ দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং সর্বোপরি চারিত্রিক্ উন্নতির সহায়ক।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক অমলেশ ঘোষের 'The scope and possibilities of Mass Education in India' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত—'Some modifications of the Wardha Scheme of education, in so far as curriculum is concerned, may be introduced making them adaptable to the needs of the locality in which the schools are situated. A place which is preponderatingly agricultural will be most benefited by a course of instruction which besides giving the essentials of the foundations of knowledge and of the three R's will endeavour to train up the students in the principles and practices of the agricultural products of that locality. A diatrict which is inhabited by industrial workers will be best benefited by a course of instruction in the arts and crafts of that locality.'—উল্লেখযোগ্য।

জাকীর হোসেন প্রণীত পাঠ্য-তালিকায় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই Suggestionকে সম্পূর্ণ ভাবে না করিলে মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। এই দিকে প্রাদেশিক সরকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে, শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্যসঞ্চার হইয়া, দেহধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য; সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০—১৯৩৪)

১৯৩০ সালে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সময় জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। কংগ্রেসের সহিত সংগ্রাম আসন্ন বুঝিয়া বিদেশী সরকার ব্যাপক ভাবে দমন-নীতির প্রয়োগ করিলেন, দেশের সর্বত্র শত শত কংগ্রেস-কর্মী গ্রেপ্তার হইলেন, কারণে-অকারণে পুলিশের গুলী ও লাঠির আঘাতে বহু নিরপরাধ ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটিল। কলিকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মহাত্মা গান্ধীর উপর আন্দোলন পরিচালনার ভার প্রদত্ত হইল।

গান্ধীজী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। লবণ আইন ভঙ্গ করার পূর্বে গান্ধীজী তাঁহার পরিকল্পনার কথা এক পত্রযোগে বড়লাট লর্ড আরউইনকে জানাইলেন। সবরমতী আশ্রম হইতে লিখিত এই ঐতিহাসিক পত্রে গান্ধীজী বড়লাটকে জানাইলেন যে, ১১ই মার্চ তারিখে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য যাত্রা করিবেন। বড়লাট গান্ধীজীর পত্রের যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে প্রস্তাবিত আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে গান্ধীজীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক দাণ্ডি অভিযান আরম্ভ হইল। উনআশি জন অনুচর সহ গান্ধীজী আশ্রম হইতে পদব্রজে সমুদ্র-তীরবর্তী দাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

এক কটিবাস-পরিহিত অর্ধনগ্ন ফকির বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পৃথিবীর জনসাধারণ অবাক হইয়া এই অসমান সংগ্রামের ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গান্ধীজী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের ভিতর দিয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমগ্র দেশ রুদ্ধ নিশ্বাসে গান্ধীজীর গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিল। যাত্রাপথে সহস্র সহস্র লোক গান্ধীজীর সহিত যোগদান করিল। গান্ধীজী বলিলেন, "বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক সর্বনাশ ঘটিয়াছে, ভারতের পক্ষে বৃটিশ শাসন অভিশাপস্বরূপ। এই শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্যই আমি বাহির হইয়াছি।" গান্ধীজীর অভিযান তীর্থযাত্রায় পরিণত হইল। তিনি যে গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিলেন তাহার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসিগণ স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর নির্দেশে প্রাণ দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। গান্ধীজীর এই অভিযানের ফলে শত শত গ্রাম্য-প্রধান সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিল। ৫ই এপ্রিল তারিখে এই অভিযান সমাপ্ত হইল। গান্ধীজী সদলে দাণ্ডি পৌঁছিলেন। ৬ই এপ্রিল দেশের সর্বত্র লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া যারবেদা কারাগারে প্রেরণ করা হইল। গ্রেপ্তারের পূর্বে এক বাণীতে দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "স্বার্থত্যাগ ব্যতীত স্বরাজ লাভ ঘটিলে তাহা স্থায়ী হইবে না। জনসাধারণকে স্বরাজের জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। আমি গ্রেপ্তার হইলে আমার অনুগামী ও জনসাধারণ—কাহারও ভয় পাইবার কিছু নাই। ঈশ্বর এই আন্দোলনের পরিচালক, আমি নহি। তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিলে তিনিই আমাদের পরিচালিত করিবেন।" গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র সভ্য-জগতে আলোড়ন উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। আব্বাস তায়েবজী গান্ধীজীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ধরসানা লবণ-গোলায় অভিযান আরম্ভ হইল। পুলিশ ও সৈন্যদলের সতর্কতা ও বাধা সত্ত্বেও অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল। অন্যান্য লবণ-গোলা আক্রমণের জন্যও দলে দলে সত্যাগ্রহী প্রেরিত হইল। লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া দেশের সর্বত্র হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার হইল। পুলিশ ও সৈন্যগণ বেপরোয়া ভাবে সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি ও গুলী চালনা করিতে আরম্ভ করিল। চণ্ডনীতির সাহায্যে বিদেশী সরকার গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হাজার হাজার দেশকর্মীকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল, অসংখ্য গ্রামবাসীর উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইল। সুকুমারমতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হইল। পুত্রের দেশপ্রেমের জন্য পিতার শাস্তি হইল, এক জনের অপরাধে সমগ্র পল্লীর উপর অত্যাচার চলিল। কিন্তু সরকারী রুদ্রনীতি যতই প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল, আন্দোলনও ততই শক্তি অর্জন করিতে লাগিল। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উকিল আদালত পরিত্যাগ করিল, ব্যবসায়ী কারবার বন্ধ করিল, ডাক্তার চিকিৎসা-ব্যবসায় বন্ধ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিল। ভারতের বীর রমণীরা পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সন্তান পিতা-মাতার স্নেহ-বন্ধন কাটাইয়া হাসি মুখে বুলেটের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিল। কৃষক কৃষিকার্য্য বন্ধ রাখিয়া কারাগারে গমন করিল; দোকানী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দেশমাতৃকার অপমান দূর করিতে অগ্রসর হইল। দেশকর্মীদের আগমনে কারাগার তীর্থে পরিণত হইল। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কংগ্রেস-কর্মীদের মনোবল ভাঙ্গিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলনের তরঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কেবল যে বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী আন্দোলনে যোগদান করিল তাহা নহে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বীর পাঠানেরা খাঁ আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সহজে উত্তেজনা-প্রবণ অস্ত্রধারী সীমান্ত পাঠানদের অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী অহিংস আন্দোলনের এক গৌরবদীপ্ত স্বতন্ত্র অধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইল সর্বত্র হারাইয়াও জনসাধারণ তাহাদের সংকল্পে অবিচলিত রহিল। ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অত্যাচার ও উৎপীড়নের তাণ্ডবলীলা চলিতে লাগিল; কিন্তু বিদেশী সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ভারতের চল্লিশ কোটি নর-নারী স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আন্দোলন আরম্ভের কয়েক মাস

পরে বৃটিশ সরকার ও ভারতের কয়েক জন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে মিটমাটের জন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল নবেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইল কংগ্রেস প্রতিনিধি ব্যতীত গোলটেবিল বৈঠক যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, বৃটিশ সরকার তাহা বুঝিতে পারিলেন ভারতে আইন অমান্ত আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া বিদেশী সরকার ভীত হইলেন। বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত কংগ্রেসের সহিত মিটমাট করার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্তদের কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ এলাহাবাদে স্বরাজ ভবনে সমবেত হইলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সন্তান পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পরলোকে গমন করিলেন। গান্ধীজী দেশবাসীকে মতিলালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নয়া দিল্লীর লাট-প্রাসাদে ঐতিহাসিক গান্ধী-আরউইন আলোচনা আরম্ভ হইল। ১৫ দিন আলাপ-আলোচনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হইল। চুক্তি অনুযায়ী নিজ ব্যবহারের জন্ত জনসাধারণের লবণ তৈয়ারীর অধিকার স্বীকৃত হইল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল। সরকার কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিলেন এবং কংগ্রেস-কর্মীদের মুক্তি দিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ এই চুক্তি সমর্থন করিলেন না। সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেল এই চুক্তির সমালোচনা করিয়া এক বিবৃতি দিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির অব্যবহিত পরেই করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইয়া আসিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল করাচী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিলেন। এই সময়ে বিপ্লবী ভগৎ সিং ও তাঁহার দুই সহকর্মীর ফাঁসী হওয়ায় সমগ্র দেশে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দিল। ভগৎ সিংয়ের জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় গান্ধীজীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইলে।

এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হইবার পর লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট হইলেন। লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইবার অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্ত লংঘন করিয়া দেশের সর্বত্র দমন-নীতি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। বাংলা, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও অন্তান্ত স্থানে বহু কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হইলেন। বিভিন্ন স্থানে আরও নানা ধরণের অত্যাচার চলিতে লাগিল। গান্ধীজী বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে সরকারী অত্যাচারের ও চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিলেন। লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় মনোভাবের জন্ত কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব হইল না। কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে বিরোধিতা বাড়িয়া চলিল। লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, লর্ড উইলিংডন তাহা রক্ষা করিলেন না। কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নয়ায় পু আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪ই আগষ্ট তারিখে বড়লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে গান্ধীজী সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। বড়লাট ইহার উত্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে গান্ধীজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্ত ইংলণ্ড গমনের সিদ্ধান্ত করিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে গান্ধীজীর কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। তিনি জানিতেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ হইতেন না। কংগ্রেসের মতামত ও ভারতবাসীর দাবী গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত করার জন্ত গান্ধীজী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের দাবী উপস্থিত করিলেন। তাঁহার ন্যায্য দাবী স্বীকার করার মত মনোভাব প্রতিপক্ষের ছিল না। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। গান্ধীজীর ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারতের পরিস্থিতি অশান্ত হইয়া উঠিল। দেশের সর্বত্র পুনরায় ধর-পাকড় আরম্ভ হইল। ১৩৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গান্ধীজী বোম্বাই পৌঁছিবার কয়েক দিন পূর্বেই সরকার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ ও অন্তান্ত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিলেন। গান্ধীজী ভারতে পৌঁছিবার পূর্বেই সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিরোধ এড়াইবার জন্ত গান্ধীজী যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস পুনরায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল। সমগ্র দেশে পুনরায় বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধীজীর নির্দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের পথে অগ্রসর হইল। এবারের সংগ্রামে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকদের কঠোরতর দমন-নীতির সম্মুখীন হইতে হইল। পশুশক্তির সাহায্যে ভারতের নবজাগ্রত প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করার জন্ত সরকার চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। লাঠি ও বুলেট, পাইকারী জরিমানা ও সম্পত্তি দখল, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, কোন কিছুই আন্দোলনের গতিরোধ করিতে পারিল না। আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইল, পুলিশ ও সৈন্তদল কংগ্রেস অফিস ও আশ্রমসমূহ দখল করিল, খদ্দর ও গান্ধী-টুপি ব্যবহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নানারূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশবাসীর মনোবল হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। ১৩৩২ সালে দিল্লীর চাঁদনী চকে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। দিল্লী কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দিল্লী আসিবার পথে গ্রেপ্তার হইলেন। শেঠ রণছোড় দাস অমৃতলাল দিল্লী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিলেন।

১৩৩৩ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা কলিকাতা অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করিলেন।

১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী কারাগারের অভ্যন্তরে আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। ১৭ই আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় ভারতের হরিজন সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। গান্ধীজী বহু পূর্বেই এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, হরিজন সম্প্রদায়কে হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করিলে তিনি জীবন দিয়া তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গান্ধীজী আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। গান্ধীজীর অনশনে পৃথিবীর সর্বত্র গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইল। গান্ধীজীর অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে সমবেত হইলেন।

কয়েক দিন আলোচনার পর হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইল। ইহাই পুণা-চুক্তি নামে বিখ্যাত। বৃটিশ সরকার পুণা-চুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত শাসন আইনের পরিবর্তন সাধিত হইল। গান্ধীজী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিলেন। সমগ্র দেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গান্ধীজী হরিজন উন্নয়ন ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সমাজ-দেহ হইতে অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করার জন্য গান্ধীজী ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গান্ধীজীর চেষ্টায় দক্ষিণ-ভারতে-বহু মন্দিরের দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত হইল। বহু স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহিত তাহাদের সমানাধিকার স্বীকৃত হইল। সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। যুদ্ধ-বিরতির পর যে সাময়িক অবকাশ মিলিল, তাহা পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য গান্ধীজী কংগ্রেস-কর্মীদের নির্দেশ দিলেন। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করিয়া তোলার জন্য কংগ্রেসকর্মিগণ আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রস্তুতির পর সংঘর্ষ, সংগ্রামের শেষে পুনরায় প্রস্তুতি গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইহাই বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

বসন্তে বসন্তের প্রকোপ

(সমাচার চন্দ্রিকা হইতে কয়েকটি সংবাদ)

বসন্ত রোগ—এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যেং লোকের টীকা না ছিল তাহাদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠা রোগ-নিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা দিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কাল পর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

—(৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫)

বসন্ত রোগ—মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে তিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

—(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬)

বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন।—পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তগত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিপ ওলাওঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যেং ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অবিরোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোনং স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা ভীত হইয়া লিখিতেছি যে যদ্যপি তাঁহারদিগের পরস্পর পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শক্র পরেং অর্থাৎ তাঁহারদের উভয়ের কোন হানি হইবেক না মধ্যেং মাদারি মারা যায় অর্থাৎ অস্মদাদির প্রাণপক্ষী তদুভয়ের একতয়ের পক্ষপাতে পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধ্যস্থ হইয়া করেন তবেই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ। সং চং।

—(১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪)
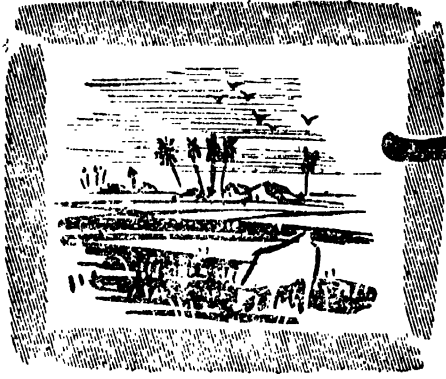
'নির্ণয়' পত্রিকার সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ বলিতেছেন : "কংগ্রেস কেবলমাত্র জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রামকারী একটি প্রতিষ্ঠানমাত্রই নয়, কংগ্রেস জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। এই কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হইয়াছে, মর্ম্মের ব্যথা রূপলাভ করিয়াছে, তাই একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র জাতিকে পথের নির্দ্দেশ দান করিতে পারে, সঠিক পথে পরিচালনা করিতে পারে। আজ দেশে কংগ্রেস ব্যতীত এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যাহার আহ্বানে সমগ্র জাতি একসঙ্গে একভাবে অগ্রসর হইবে, সংগ্রাম করিবে এবং দুঃখ বরণ করিবে।" ঘোষ মহাশয়ের কথা বোধ হয় এক বৎসর পূর্ব্বেও লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। কিন্তু আজ দেশের জনগণের নিকট এই মহাজাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সংবাদই কি অতুল্য বাবু রাখেন না? একদা যে কংগ্রেস-নেতাদের বক্তৃতা এবং বাণী শ্রবণ করিতে লোকে দশ-বিশ ক্রোশ হইতে ছুটিয়া আসিত, আজ সেই কংগ্রেস-নেতারা কোন কথা বলিতে গেলে লোকে তাঁহাদের দশ-বিশ ক্রোশ দূরে হাঁকাইয়া দিবার কথা মনে করিতেছে কেন? কলিকাতার কয়েকটি পার্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া কংগ্রেসী নেতাদের কি হাল হয়, তাহা কি অতুল্য বাবু জানেন না?

দেশে সত্যই আজ কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে বা দাঁড়াইতে পারে এমন কোন দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান নাই। কিন্তু এই কথা মনে করিয়া অতুল্য বাবুর খুসী হইবার কোন কারণ নাই। দেশের এবং দশের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক দল যে-কোন মুহূর্ত্তে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। এমন যদি ঘটে, তবে সেই প্রতিষ্ঠান জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিবে বলিয়া মনে করি। কংগ্রেসীদের বর্ত্তমান জীবনধারা এবং বিলাস-ব্যসনে আসক্তি লোকের মনে সত্যই ঘৃণা এবং বিরক্তির ভাব তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে কংগ্রেসী নেতারা এই ঘৃণা এবং বিরক্তির ভাবকে এখনও তিরোহিত করিয়া—আবার দেশের জনগণের নিকট হইতে পূর্ব্বকালের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আদায় করিতে পারেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে-ত্যাগ এবং যে-কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের পুনরায় করিতে হইবে, তাহা আর তাঁহারা পারিবেন কি? একবার অভ্যাস 'খারাপ' হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করা বড় কঠিন কাজ। বিশেষতঃ 'পাকা-বাঁশ' বাঁকানো এক প্রকার অসম্ভব।

• • •

'আসানসোল হিতৈষী পত্রিকা' পাঠে জানিতে পারি : "কলিকাতা নগরী ও বিভিন্ন জেলা সমূহে দুর্নীতি সংক্রান্ত কার্য্য-কলাপ বেশ সন্তোষজনক ভাবেই চলিতেছে। বিগত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত ৪০টি ঘটনার বিষয় জানা গিয়াছে এবং এতদ্‌সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।" সংবাদ হয়ত সত্য। দুই-চারিটা কেস্ ধরা পড়িতেছে—শাস্তিও কেহ কেহ পাইতেছে এমন সংবাদ আমরাও মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। কিন্তু রুই-কাৎলা ধরা পড়িতেছে কতগুলি? কালোবাজার যে সকল পুণ্যাত্মা আলো করিয়া আছেন, তাঁহাদের কয় জনকে ধরা হইয়াছে বা হইতেছে? কিছু কাল পূর্ব্বে দুর্নীতি-দমন সম্পর্কে বড়কর্ত্তাদের মুখে যে প্রকার বড় বড় কথা শুনা গিয়াছিল, সেই মত কোন কার্য্য আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি? কয় জন সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স এবং অন্যান্য ধন-দৌলতের, সম্পত্তি-সামগ্রীর সন্ধান লওয়া হইয়াছে? তিন শত টাকা বেতনভোগী, দশ জন পোষ্য প্রতিপালনকারী সরকারী কর্ম্মচারী কেমন করিয়া কলিকাতা কিংবা অন্যত্র বিশাল সম্পত্তির মালিক হইল, তাহার কোন এনকোয়ারী হইয়াছে কি? কথাগুলা সাধারণ ভাবেই বলিতেছি, বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। দুর্নীতি কি একই প্রকার? সরকারী এবং অন্যান্য কর্ম্মশালায় অন্যান্য দুর্নীতি-দমনের বিষয় সরকার বাহাদুর কোন চিন্তা করেন কি?

এ-বিষয় কেবল মাত্র সরকার বাহাদুরকে গালি দিয়া লাভ নাই। আমাদের দায়িত্ব কম নহে। কিন্তু সে-দায়িত্ব পালন আমরা কতটুকু করিতেছি? অনাচার এবং ব্যভিচারের বহু কথা জানিয়া-শুনিয়া আমরা কি তাহা যথাস্থানে জানাইয়া দি, না ফ্যাসাদে পড়িবার ভয়ে চাপিয়া থাকাকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করি? জাতীয় জীবনে, তাহা যে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, দুর্নীতি দমন করিতে হইলে সরকার বাহাদুর একক ভাবে কিছুই করিতে পারেন না। জনগণের সহযোগিতা না পাইলে এ কার্য্য অসম্ভব। কিন্তু জনগণের সহযোগিতা অর্জ্জন সরকারকেই করিতে হইবে—জনগণকে 'আপন' করিবার কায়দা-কানুন তাঁহাদেরই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। জন-চেতনা জাগ্রত করিবার ভার দেশনেতাদের। একবার যদি তাহারা জন-চেতনা জাগ্রত করিয়া জনগণের হৃদয় জয় করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশ হইতে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটিত করিতে সময় খুব বেশী লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। জনগণ হইতে দূরে থাকিয়া কেবল রেডিও বক্তৃতা, ইস্তাহার জারী এবং সংবাদপত্রে মহতী বাণী প্রচার করিয়া সরকার বাহাদুরের বর্ত্তমান পরিচালকগণ বিশেষ কোন কাজের কাজ করিতে পারিতেছেন না, ভবিষ্যতেও পারিবেন না।

'রাঢ়দীপিকা' ঠিকই মন্তব্য করিতেছেন : মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের যা স্থান অধিকার করিয়া আছে তাই ভাল-মন্দ ভোগ ইহাদের অদৃষ্টেই বেশী। ভাল ত নাই, মন্দই ষোল আনা। কিন্তু যত ঝড় ইহাদের উপর দিয়াই বহিয়া যাইতেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক যে কিছু বিপর্য্যয়ে ইহারাই ভোগে বেশী। ইহারা সমাজের, জাতির মেরুদণ্ড, ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তার উপর রাষ্ট্রনীতি ইহাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিবার যত প্রকার অস্ত্র হানিতেছেন। যে ধনিক আছেন, বেশ আছেন রাষ্ট্রের পোষকতায় ধন বাড়াইয়াই চলেছেন, তথাকথিত দরিদ্র আছে তাহাদিগকে দরিদ্র বলা চলে না। কৃষক-মজুরদের অবস্থা মধ্যবিত্তদের চেয়ে হীন নহে।" আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, কাজেই দুঃখ যে কি, তাহা হাড়ে-হাড়েই বুঝিতেছি। প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইতেছে। 'পান্তা আনতে লবণ ফুরায়, আর লবণ আনতে পান্তা'। খরচের মাত্রা এবং পরিমাণ প্রত্যহ বাড়িতেছে, কিন্তু আয় হয় স্থির আর না হয় নিম্নের মুখে। সমাজের এবং দেশের মেরুদণ্ড এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অবস্থায় থাকলে আর অল্প কাল মধ্যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেই ভয়ানক অবস্থার দিনেই বোধ হয় আমরা চলিতেছি—ইহার টান রুখিবার উপায় কি?

* * * *

বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা ভাষার শেষ শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থায় পরিকল্পনা এবং আয়োজন বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ভাল ভাবেই চলিতেছে। এই সম্পর্কে মানভুম হইতে প্রকাশিত 'সংগঠন' পত্রিকা ঘোষণা করিতেছেন : "আমরা পুনরায় বিহার সরকারকে জানাইতেছি। ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁহারা এই সমস্যার সমাধানে যদি এখনই অগ্রণী না হন, তাহা হইলে সমগ্র মানভূমে যে আন্দোলন সুরু হইবে ও যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের। আমরা চাই, প্রত্যেক ভাষাভাষী তাঁহাদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করুন। কোনরূপ দলগত, সম্প্রদায়গত, বা ভাষাগত বিদ্বেষ আমাদের নাই। আমরা নিজেদের মাতৃভাষাকে যেমন শ্রদ্ধা করি অন্য ভাষার প্রতিও সমভাবে শ্রদ্ধাবান। কিন্তু অন্যায় ভাবে জবরদস্তির উপর এক ভাষা-ভাষীর উপর অন্য ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইবে ও অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হইবে, এই অন্যায় অমার্জ্জনীয় প্রচেষ্টার প্রতিরোধে আমরা আমাদের সকল শক্তি লইয়া নিশ্চয়ই অগ্রসর হইব।" এ-ঘোষণায় দোষের বা আপত্তির কিছু নাই কিন্তু এই কার্য্যে সাধারণ ভাবে বাঙ্গলার কি কিছুই করিবার নাই? আমরা কি এই মহানাটকে মাত্র দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিব? পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকার বিহার এবং আসাম সরকারের বাঙ্গলা ভাষা বিনাশ চেষ্টার কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ এখনও করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি বাঙ্গালী জনসাধারণও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? 'সংগঠন'-সম্পাদক স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন : "নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা (বাঙ্গলা ভাষার পুনঃপ্রবর্ত্তন) কার্য্যতঃ প্রতিপালিত না হইলে মানভূমে এক অনিবার্য্য চরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। বলা বাহুল্য, কেহই এই সংগ্রামকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।" সকল বাঙ্গালী স্বামীজীর সমর্থন করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ব বাঙ্গলার কথা আসিয়া পড়ে। আরবী-হরফে বাঙ্গলা লেখার ব্যবস্থা পূর্ব্ব-বাঙ্গলার হিন্দু এবং মুসলমান কি নীরবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে? ইহাও বাঙ্গলা ভাষাকে জবেহ করিবার বিচিত্র পরিকল্পনা!

* * * *

'নবসঙ্ঘ' বলিতেছেন : "বাঙ্গলার গর্ব্ব চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে আমরা নদী মেখলা শস্য-শ্যামলা পূর্ব্ব-বঙ্গের কথাই ভাবিয়া সুখ পাইতাম। পশ্চিম-বাঙ্গলার বর্দ্ধমান জিলাগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গমাতার শ্রী ও ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। পূর্ব্ববঙ্গ যখন পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে, তখন বঙ্গ-জননীর পাঁজর যে ভাঙ্গিয়াছে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।" চিরদিনের জন্য না হইলেও আপাততঃ বহু দিনের জন্য যে বাঙ্গলার গর্ব্ব লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গ-বিভাগের ফলে কেবল বাঙ্গলার গর্ব্বই নহে, পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু "কত আশা লইয়া পশ্চিম বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিল, আমরা অবজ্ঞার দায়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলাম। এই দুঃখের ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির চিরস্মরণে থাকিবে। আমরা আজ আতঙ্কেতেই বলিব—যাও বন্ধুগণ। ফিরিয়া যাও নিজ নিজ আবাসে। ধর্ম্ম যায়, সংস্কৃতি যায়, কি করিবে তোমরা। ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন—তোমরা রক্ষা পাইবে, নতুবা বড়-গলা করিয়া স্বাধীনতার ঘোষণায় যে স্বাধীনতা মিলিল—তাহার বিনিময়ে বাঙ্গালীর বুকে যে ছুরি বসিল, সে বেদনা চিরস্থায়ী হইয়াই জাতিকে অতিষ্ঠ করিয়া রাখিবে। এক্ষণে পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুকে আমরা বলিতে বাধ্য, আশায় আশায় আর বাঁচার প্রতীক্ষা করিও না, কথায় আর মজিও না, আত্মশক্তির উপর ভর করিয়া যদি বাঁচিতে সমর্থ হও—তোমরা বাঁচিয়া যাইবে। তোমাদের স্মরণ করিয়া আমরা পশ্চিম-বঙ্গবাসী নয়নের জল মার্জ্জন করিব।" ইহার বেশী আর কি আমরা করিতে পারি? পাঞ্জাব হইতে যাহারা উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়াছে, দিল্লীর নিকট তাহাদের জন্য নূতন শহর পত্তন হইয়া গেল, আরও হইবে। এমন কি পশ্চিম-বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে অবাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বসবাসের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আসা-যাওয়া করিতেছেন। হয়ত বা ব্যবস্থাও কিছু হইয়া গিয়াছে। অচিরে কার্য্য আরম্ভ হইবে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তাকর্ত্তারা পাঞ্জাবী এবং অবাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য যে-চিন্তা, যে পরিশ্রম করিতেছেন, বাঙ্গালী বাস্তুহারাদের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও করিতেছেন কি? বাঙ্গলার গুঁতার জোর কম, ইহাই বোধ হয় মূল কারণ।

* * * *

কলিকাতার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন : "আমাদের প্রধান প্রধান দৈনিকগুলি আজ কোন না কোন সংরক্ষিত স্বার্থ ব্যক্তি বা দলবিশেষের কুক্ষিগত হইয়াছে এবং ইহারা আপন আপন স্বার্থরক্ষার জন্য শাসকগণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছাইয়া লইতেই ব্যস্ত আছেন। দেশের কল্যাণ চিন্তার চাইতে আত্মচিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ফলে সম্পাদকগণের স্বাধীনতা আজ সম্পূর্ণই লুপ্ত হইয়াছে। মালিকের নির্দ্দেশ অনুসারেই তাঁহাদিগকে লেখনী পরিচালনা করিতে

হইতেছে।" বড় বড় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কথাগুলি সত্য হইলেও, সৌভাগ্যক্রমে অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু দেশপ্রীতিতে হীনতর নহে, এমন দু'-একটি পত্রিকা সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। সুখের কথা, 'দৈনিক বসুমতী' এই শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে। কিছু কাল পূর্বে মালিকের হীন সর্ত্তে কাজ করিতে রাজী না হওয়ায় এবং হীনতর চুক্তিপত্রে সহি না করার জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবীর কর্ম্মচ্যুতির কথা দেশবাসী এখন ভুলিয়া যায় নাই! কিন্তু কেবল মনে রাখাই সার।

সহযোগী দেশের বর্ত্তমান বড় বড় কাগজগুলি সম্পর্কে আরও কতকগুলি সত্য কথা বলিয়াছেন। এই সকল কথায় যদি কোন মিথ্যা বা অত্যুক্তি থাকে, আশা করি, বড় বড় কাগজের তরফ হইতে অবশ্যই প্রতিবাদ করা হইবে। সহযোগী মন্তব্য করিতেছেন: "আরো দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই সব বড় বড় কাগজওয়ালারাই আজ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রকাশের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সংবাদপত্র একটি লাভজনক ব্যবসা বা ইণ্ডাষ্ট্রী হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেখানে প্রতিনিয়তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুনোপুটিগুলি বড় বড় রাঘব বোয়ালদের কুক্ষিগত হইতেছে। সাংবাদিক ও সম্পাদকগণ নিজ নিজ নিষ্ঠা ও আদর্শ হারাইয়া চাকুরী রক্ষার জন্য প্রভুর কথাকেই দেশের কথা বলিয়া চালাইয়া যাইতেছেন।" সাধারণ ভাবে এ-অভিযোগও সত্য বলিয়া মনে হয়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা নগণ্য। ছোট ছোট কাগজগুলিকে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেমন করিয়া গ্রাস করিতেছে বা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহাও ভাবিবার কথা।

সহযোগীর নিম্নলিখিত মন্তব্যেও প্রতিবাদ করিবার কিছু পাইলাম না: "আমাদের বড় বড় মাসিকগুলির আর সে উদাত্ত কণ্ঠ নাই, ফলে ইহারা সংবাদিকতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সিনেমার চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাপ্তাহিকগুলিরও প্রায় অন্তিম দশা দেখা দিয়াছে।" কিন্তু দোষ কাহার এবং প্রতিকার কোন্ পথে? বর্ত্তমানে N. P. P-র দল সাহিত্যের আসর দখল করিয়াছেন। গত যুগে সাহিত্যিক হইতে হইলে যে-সাধনা, যে-অধ্যবসায় এবং যে প্রকার পাঠানুরাগী হইতে হইতে, আজ তাহার কিছুই দরকার নাই। সর্ব্ব বিষয়ে, সকল স্তরে এবং সকল দিক্ হইতে দেশের ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছুই নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

* * * *

সরিষা, সরিষার তেল, দিয়াশলাই, পাথুরে ও কাঠ কয়লা, চামড়া, হাতে প্রস্তুত কাগজ, কয়লা গ্যাস, জ্বালানী কাঠ, তাজা ফল, এবং সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রায় ১৫টি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর উপর বিক্রয়-কর বিল পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে! এই সম্পর্কে এক সহযোগী মন্তব্য করিতেছেন: "আর বাকী রহিল কি? দরিদ্র জনসাধারণ যে কি করিয়া শতকরা পৌনে পাঁচ টাকা কর দিয়া অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিবে—ইহা একবারও দরিদ্র জনসাধারণের মনোনীত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ চিন্তা করিলেন না!" সহযোগী বাজে বকিতেছেন। এত চিন্তা করিয়া কাজ করিতে গেলে কাজ করা সম্ভব হইবে না। সরকারের টাকার দরকার। সরকার এখন ত দেশের জনসাধারণের, কাজেই এই প্রয়োজনের টাকা দেশের জনসাধারণকেই যেমন করিয়াই হউক যোগাইতে হইবে। জনসাধারণ কেমন করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে, সে চিন্তা সরকারের নহে। যে টাকা যোগাইবে তাহার!

"কিন্তু আমরা ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করি, ইহার শেষ কোথায়? দরিদ্র জনগণ যে এই ভাবে সরকারী ও বে-সরকারী নির্য্যাতন দিনের পর দিন সহ্য করিতেছে—না খাইয়া—না পরিয়া—কুকুর-বিড়ালের মত দিন যাপন করিতেছে—নিজের সন্তানদের এক মুঠা অন্ন জুটাইতে নাজেহাল হইয়া যাইতেছে—ইহা কি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না? ইহারই নাম কি জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট?" জিজ্ঞাসা হাজার বার করিতে পারেন। কিন্তু জবাব একবারও পাইবেন কি না বলিতে পারি না। একই প্রকার প্রশ্ন আমরাও পূর্ব্বে নানা ভাবে করিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তা-মহল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল প্রশ্নের কোন জবাব আসে নাই।

শ্রী বটকৃষ্ণ দত্ত

অকস্মাৎ দ্বন্দ্ব শেষ, নির্ব্বাপিত বিষবাষ্প ধ্বংস দাবানল,
তাণ্ডব অসুর আজি পরাজিত, নিষ্পেষিত চক্ষের নিমেষে,
সমুজ্জ্বল সত্যের নিশান উচ্চশির পুনরায় উড়িছে আকাশে,
ধরণীর বক্ষে তাই প্রতিষ্ঠিত পুনঃ প্রেম প্রীতি সুবিতল।

মৃত্যুনীল নরমেধে মদমত্ত সৈনিকের অভিযান হ'লো শেষ,
আবার হাসিছে চাঁদ, থেমে গেছে মৃত্যুদূত বোমারু বিমান
শান্তির প্রশস্তি শোন, গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনি সৃষ্টিছে মহান
সংঘাত চাহিনু কভু, মেগেছিনু আন্তরিক শান্তির নির্দ্দেশ।

হৃদয়ের রুদ্রতেজে ভূলুণ্ঠিত মারণাস্ত্র বিভীষিকা তাই,
এই মুহূর্ত্তটিরে চেয়েছিনু কত রঙে, কত স্বপ্ন দিয়া।
দূর হোক অহর্নিশি ক্ষুব্ধ কোলাহল স্বার্থের লাগিয়া
নবশঙ্খে ধ্বনি উঠুক্, প্রশান্তির তপোবন ফুটুক আবার

মৃত্যুরে করি না ভয়, দুঃখের আস্বাদ নব মোর শিরে চাই,
সত্যকার হোক্ পরিচয়, ভেঙ্গে যাক্ যন্ত্রসৃষ্ট মিথ্যায় প্রাকার।

ছোটদের আসর

নারদ ঋষির বিয়ে

রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
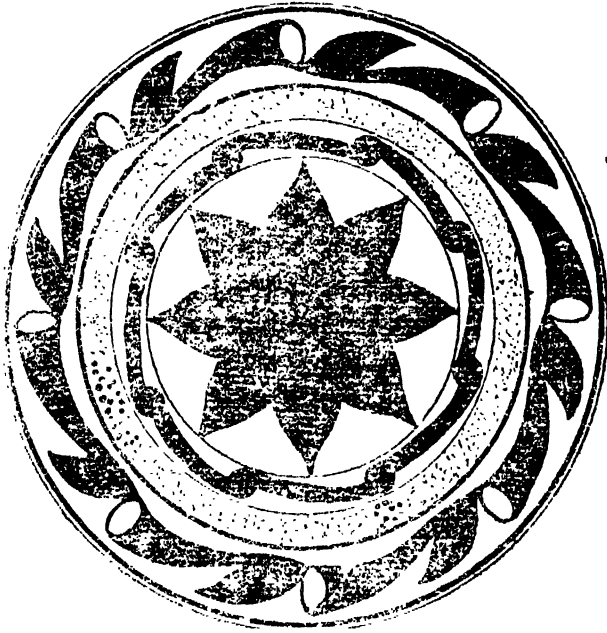
—তোমরা অনেকেই নারদ ঋষির সঙ্গে পরিচয় করে রেখেছ। আজ সেই নারদ ঋষির বিয়ের কথা তোমাদের বলবো। তোমরা মনে মনে হাসছ আর ভাবছো যে, বড়-বড় দাড়িওলা বুড়ো ঋষি, তাঁর আবার বিয়ে কি? কিন্তু ভেবে দেখলে দেখতে পাবে দু'-চার জন ঋষির একটা না একটা হট্টগোলে পড়ে ভেঙে গিয়ে যা বিয়ে হয়নি, তা না হলে প্রায় ঋষিরাই বিয়েটা করতেন। আজকাল যেমন বিয়েটা একটা ভয়ের ব্যাপার, আগেকার দিনে প্রায় তা ছিল না। ঋষিরা এক-এক জনে দু'-চারটে বিয়ে করতেও পিছপা হতেন না। তার পর তপস্যার সময় দু'-চারটে অপ্সরা-বিভ্রাট ত ঘটতই। এই রকম ঋষিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েও নারদ ঠাকুরের বিয়ে হওয়াটা কিছু চিচিত্র নয়।

নারদের বিয়ের কথাটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি গল্পটি আছে যে-বইয়েতে, তার নামও অদ্ভুত রামায়ণ। এই অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করেন মহর্ষি বাল্মীকি। বাল্মীকির তিনখানি রামায়ণ আমরা দেখতে পাই। একটি শুধু রামায়ণ, দ্বিতীয়টি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, তৃতীয়টি অদ্ভুত রামায়ণ। এই অদ্ভুত রামায়ণ নারদের বিয়ের যে কল্পনাটি করেছেন, তাই এখন বলব।

পূর্ব্বকালে রাজা ত্রিশঙ্কুর এক ছেলে হয়, তাঁর নাম অম্বরীষ। অম্বরীষ খুব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। অম্বরীষ রাজা হয়েই নারায়ণকে তুষ্ট করবার জন্যে তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ বর দিতে এলেন। অম্বরীষ বর চাইলেন, ভগবান্, আমি তোমার দয়ায় যেন সমস্ত জগদ্বাসীর বৈষ্ণবধর্ম্মে মতি করাতে পারি। ভগবান্ তুষ্ট হয়ে বললেন—তাই হবে, তোমাকে আমি আমার চক্র দিলাম। এই চক্র দিয়ে পৃথিবী পালন করবে, ঋষিরা কখনও কোন শাপ দিলে এই চক্র তোমায় রক্ষা করবে। অম্বরীষ এই বর নিয়ে রাজ্যে ফিরে এসে মনের আনন্দে রাজ্যপালন ও সংসার-ধর্ম্ম করতে লাগলেন। কিছু দিন পরে রাজার এক মেয়ে হলো, তাঁর নাম শ্রীমতী। শ্রীমতী ক্রমে ক্রমে রাজভোগে বেশ বেড়ে উঠলেন, ক্রমে তাঁর বিয়ের বয়েসও হলো। এই সময় তোমাদের ঝগড়ার ঠাকুর বোধ হয় একটা ঝগড়া-গণ্ডগোল বাধাবার ইচ্ছেয় তাঁর বীণাটি হাতে করে টুং-টুং করে বাজাতে বাজাতে তাঁর বন্ধু পর্ব্বত মুনিকে সঙ্গে করে নিয়ে অম্বরীষের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা অম্বরীষ এই দুই ঋষি ঠাকুরের আগমনে শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছেলে মেয়ে বউ সকলকে ডেকে এঁদের পা ধোয়াবার, খাওয়াবার সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রাজপুরীতে যেমন ছুটো-পুটি লেগে গেল, তেমনি আবার ভয়ও লেগে গেল। কারণ, তোমরা যেমন তোমাদের কারুর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে দু'কাঠি বাজিয়ে বাজিয়ে বল—

> "নারদ নারদ খ্যাংরা কাঠি।
> লেগে যা নারদ ঝটাপটি।"

তেমনি ধারা আগেকার রাজা-রাজড়ারাও নারদ ঋষিকে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়ার জন্যে বেশ ভয়ই করতেন। নারদ ঠাকুর বেশ করে গুছিয়ে বসেছেন, তখন অম্বরীষের মেয়ে শ্রীমতী একটি পাখা হাতে করে এসে নারদের পাশে বসলেন। পাশেই পর্ব্বত মুনিও ছিলেন। নারদ ঋষি আর পর্ব্বত মুনি দু'জনে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। কৈ, এত দেশে এত রাজা-রাজড়ার বাড়ী যাই, স্বর্গেও দেখি, কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ে ত কখনও দেখিনি?

নারদ রাজাকে বললেন—অম্বরীষ, এই সুন্দরী মেয়েটি কে?

রাজা অম্বরীষ বললেন—প্রভু, এ আমার কন্যা, নাম শ্রীমতী।

পর্ব্বত বললেন—বাঃ বাঃ বেশ, নাম ত তোমার মেয়ের সত্যই শ্রীমতী। এমন দেবকন্যার মতন সর্ব্বলক্ষণযুক্তা মেয়ে আর দেখিনি।

নারদ বললেন—অম্বরীষ, তোমার মেয়ে ত বেশ বয়স্থা হয়েছে, এর বিয়ের কি করছ?

রাজা বললেন—প্রভু, আপনি ত ত্রিজগৎ ঘুরে বেড়ান, এখন দেখে-শুনে একটি যোগ্য-পাত্র ঠিক করে দিন।

নারদ ফের মেয়েটিকে ভাল করে দেখলেন। দেখে মনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। নারদ ঋষি বোধ হয় মনে মনে ভাবলেন যে, দূর ছাই, সমস্ত ঋষিরাই কেমন বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করে, তাদের একটা করে আশ্রম থাকে। মুনিপত্নীরা কেমন রেঁধে-বেড়ে রাখে, ঋষিরা তপস্যা করেই খেতে পায়, সময় সময় পিঠে-পার্ব্বণও হয়। আর আমার সে সব বালাই নেই। কেবল ত্রিজগৎ ঘুরে বেড়াও আর নারায়ণের নাম কর। তার চেয়ে একটা বিয়ে-থা করে, আশ্রমে দিন কতক বিশ্রাম করলে মন্দ হয় না।

পর্ব্বত মুনিও এই মেয়েটিকে দেখে একটু ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিনিও বিয়ে-থা করেননি, এই জন্যে মনে মনে ভাবছেন যে,—চিরকালই রাজারা মেয়েদের মুনিপত্নী করে দিতে অসম্মত হয়নি, বরং ভাগ্য বলেই মনে করেছে। রাজাও এখনই বলবেন—মেয়ের বিয়ে দেবেন। তবে আর দেরী করে লাভ কি? আমিই রাজাকে বলব—এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। এই সময় দুই ঋষি ঠাকুরেরই ভোজনের জন্যে ডাক এল। তখন তাঁরা বিয়ের চিন্তা কমিয়ে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে নিলেন। তার পর অতি চালাক নারদ ঠাকুর পর্ব্বত মুনির সামনে কোন কথা

না বলে রাজাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাজা মনে করলেন, নারদ ঋষি না জানি কি গুপ্ত কথাই আলোচনা করবেন। কিন্তু নারদ ঠাকুর তাঁর প্রকাণ্ড দাড়িতে দু'-চার বার হাত বুলিয়ে যা বললেন তাতে রাজা যে কি মনে করলেন, তা তোমরাই ভেবে নিয়ো।

নারদ বললেন—অম্বরীষ, তোমার মেয়েটি খুব ভাল। অতএব তোমার মেয়েকে আমিই বিয়ে করব।

রাজার ভাববার অবসর নেই, কারণ ঋষিদের সেকালে কোন রাজারাই চটাতে পারত না। চটালেই শাপ দিয়ে সব ছারখার করে দিতেন।

রাজা ভয়ে-ভয়ে বললেন—প্রভু, এ আর বেশি কথা কি! আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন। এত-বড় সৌভাগ্য যে আমার হ'বে, তা ত জানি না!

নারদ বললেন—হ্যাঁ, আমি তোমার সেবা-যত্নে আর তোমার মেয়েটিকে দেখে খুব খুসী হয়েছি। এই জন্যেই তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছি।

রাজা বললেন—তাই হবে প্রভু।

রাজা নারদকে নিয়ে ঘরে যেই ফিরে এলেন, অমনি পর্ব্বত মুনি মনে করলেন, রাজাকে এই সময় একটু আড়ালে ডেকে বিয়ের কথাটা বলে ফেলি। কি জানি, না হলে নারদের আবার যে ঘটকালি করা রোগ, তাতে রাজকন্যার আবার একটা সম্বন্ধ কোথাও না করে বসে। এই ভেবে পর্ব্বত মুনি রাজাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন।

পর্ব্বত মুনির মাথায় ছিল পর্ব্বতের মতন জটা, সেই জটার ওপর দু'-চার বার হাত বুলিয়ে পর্ব্বত মুনি বললেন—রাজা, তোমার মেয়েটি বড় সুন্দরী আর বড় ভাল। তাকে আমি একটু ভালবেসে ফেলেছি, অতএব ওর সঙ্গেই আমার বিয়েটা দিয়ে ফেল। এই সময় অতি চালাক নারদ ঠাকুরও পর্ব্বত মুনি কি বলেন শোনবার জন্যে সেইখানে এসে হাজির হ'য়েছিলেন। রাজা দুই ঋষিকে এক জায়গায় দেখে তাঁদের বললেন—প্রভু! আপনারা দু'জনেই আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চান্, আমি কি করি বলুন ত?

নারদ বললেন—আরে পর্ব্বত এখন ছোট, ওর বিয়ে না করলেও চলবে। এখন আমার বিয়েটা হয়ে যাক্।

পর্ব্বত বললেন—তা কি হয়, আমি হলুম পর্ব্বত ঋষি, আমার ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন আমি বিয়ে করবোই। বুড়ো নারদের বিয়ে না করলেও চলবে।

নারদ বললেন—খবরদার রাজা, ওর সঙ্গে বিয়ে দিলেই তোমায় ভস্ম করে ফেলবো।

রাজা অম্বরীষ এই উভয়-সঙ্কটে পড়ে বললেন—প্রভু! আপনারা দু'জনেই যখন আমার মেয়ের পাণিপীড়ন করতে চান তখন আমার ঐ একটি মেয়েকে কি করে দু'জনকে দিই বলুন?

ঋষি ঠাকুররা দু'জনেই বললেন—তা জানি না, আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেই হ'বে।

রাজা বললেন—বেশ প্রভু! তাই হ'বে, কিন্তু এক কাজ করা যাক্! আমি কালই স্বয়ম্বর-সভা করি, আমার মেয়ে যার গলায় মালা দেবে, সেই আমার জামাই হবে।

ঋষিরা দু'জনেই এতে সম্মত হলেন এবং রাজাকে স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করতে বলে যে যাঁর স্থানে চলে গেলেন। যদিও আসবার সময় দুই ঠাকুর এক সঙ্গে এসেছিলেন, যাবার সময় বিয়ের ব্যাপারে একটু মন-খারাপ হওয়ায় আলাদা আলাদা চলে গেলেন।

* * *

নারদ ঠাকুর রাস্তায় বেরিয়েই মনে করলেন যে, পর্ব্বত মুনিটা খুব ভাল লোক নয়, আর দেখতে আমার চেয়ে বোধ হয় একটু ভাল। কেন না, ওর মুখে এত বড় দাড়ি নেই। স্বয়ম্বর-সভায় রাজি ত হলুম, কিন্তু রাজকুমারী যদি ঐ পর্ব্বতটাকে মালা দিয়ে ফেলে, তা হলে বুড়ো বয়েসে অপমান রাখতে জায়গা থাকবে না। আর বুড়ো বয়েসে এখন যদি অমন টুকটুকে মেয়েটিকে হাতছাড়া করি ত হ'লে আর বিয়ে হবে না। এখন কি করা যায়! তখনই ঠাকুরের মনে পড়লো—তাঁর ভগবান নারায়ণের কথা। নারায়ণকে এই শুভ সংবাদটা দিয়ে এর একটা বিহিত করা দরকার। নারায়ণ ঠাকুরের বিয়ের বিষয়ে বেশ একটা হাতযশ আছে। নিজেও অনেকগুলি বিয়ে করেছেন, আর আমি যখন তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার একটা ব্যবস্থা তিনি করবেনই। নারদ তখন মনের আনন্দে বীণাটিতে টুং-টুং করে গান ধরে বৈকুণ্ঠে এসে হাজির হলেন।

নারায়ণ তখন একাই বৈকুণ্ঠে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন। নারদ সেইখানে গিয়ে হাজির হয়ে প্রভুকে নমস্কার করে বসলেন। নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি নারদ, সংবাদ সব ভাল ত?

নারদ একগাল হেসে বললেন—প্রভু! সংবাদ সব শুভ। তবে আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে।

নারায়ণ বললেন—বল বল, তোমার নিবেদন আমায় আগেই শুনতে হ'বে।

নারদ বললেন—প্রভু! আমি এইবার বিয়ে করবো।

নারায়ণ বললেন—বেশ বেশ, নারদ, এত দিন তোমার বিয়ে করাই উচিত ছিল। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়ে এত দিন বিয়ে করনি এটাই ত অন্যায়। বেশ, আমি শীঘ্র স্বর্গরাজ্যে খোঁজ-খবর করি, কোন্ দেবকন্যা তোমায় বিয়ে করতে রাজি হন।

নারদ বললে—না না প্রভু! তার দরকার নেই, অত কষ্ট আপনার সইবে কেন? আমি নিজেই বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি।

নারায়ণ বললেন—তবে ত উত্তম কথা, বিয়ের বরযাত্রী যাওয়া প্রভৃতি কবে হবে বল। আর কোথায় বিয়ে হচ্ছে বল?

নারদ বললেন—আপনার পরম ভক্ত রাজা অম্বরীষের মেয়ে শ্রীমতীর রূপ দেখে আর আমি বিয়ে না করে থাকতে পারলুম না প্রভু। তাই রাজকন্যাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

নারায়ণ বললেন—তাহ'লে ঠিক ত হয়েই গেছে, আমার ভক্ত অম্বরীষ, তার মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে যখন চেয়েছ তখন ত সে না বলবে না।

নারদ বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত হলো, কিন্তু একটা বিভ্রাট বেধেছে প্রভু! আমার সঙ্গে পর্ব্বত মুনি রাজার বাড়ীতে গেছলো, সেও শ্রীমতীকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তাইতে রাজা কাল স্বয়ম্বর-সভা করবেন, তাতে আমরা দু'জনেই কাল উপস্থিত হ'বো, শ্রীমতীর যাকে পছন্দ হবে তাকেই মালা দেবেন।

নারায়ণ বললেন—তাতে আমি আর কি করবো বল? তুমি ভেব না নারদ, তোমাকেই রাজকন্যা মালা দেবেন।

নারদ বললেন—প্রভু! তা হোক্, তবু বিশ্বাস নেই। পর্ব্বত বড় ভাল লোক নয়, যদি ওর গলায়ই ভুলে রাজকুমারী মালা দেয়?

নারায়ণ বললেন—আমি কি করবো বল?

নারদ বললেন—প্রভু, এক কাজ করুন, আপনি কাল স্বয়ম্বর সভায় যখন পর্ব্বত যাবে, ওর মুখটি তখন বাঁদরের মতন করে দেবেন। আর সেই বাঁদর মুখটি শুধু রাজকন্যাই দেখবে, অন্তে পর্ব্বত মুনিকেই দেখবে। তাহ'লে আর ঐ বাঁদরের গলায় রাজকন্যা মালা দেবে না।

নারায়ণ বললেন—এ আর শক্ত কি! তাই হবে, তুমি এখন বিশ্রাম কর নারদ।

নারদ এই কথা শুনে মনের আনন্দে চললেন বিশ্রাম করতে।

এর কিছুক্ষণ পরেই পর্ব্বত মুনিও নারায়ণের কাছে এসে হাজির হলেন। তিনিও রাস্তায় কিছুক্ষণ এ-ধার ও-ধার ঘুরে মনে করলেন, ভগবানের কাছে কথাটা বলে তাঁর কাছ থেকে একটা বর নিয়ে নারদকে জব্দ করতে হবে, না হলে কি জানি, নারদ বড় চালাক লোক, ফাঁকি দিয়ে শেষটায় রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফেলবে, আমার এই জটা দেখে রাজকন্যা ভয় পেয়েও যেতে পারে ত! যাই হোক্, অনেক ভেবে-চিন্তে পর্ব্বত ঋষি নারায়ণের কাছে এলেন। নারায়ণ তাঁকে যথারীতি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বললেন—পর্ব্বত, এখন কি মনে করে এখানে এলে; তপস্যার কোন বিঘ্ন ঘটেনি ত?

পর্ব্বত বললেন—না প্রভু! তবে একটা বিশেষ নিবেদন নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি, যদি দয়া করে শোনেন।

নারায়ণ বললেন—বল কি পর্ব্বত, তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার কথা আমি শুনবো না? বল বল পর্ব্বত, শীগ্‌গির বল, তোমার কি কথা আছে।

পর্ব্বত বললেন—ঠাকুর, আমি বিয়ে করবো।

নারায়ণ বললেন—অতি সুসংবাদ, অতি সুসংবাদ। কোন্ মুনিকন্যা বা দেবকন্যার সঙ্গে বিয়ে পর্ব্বত?

পর্ব্বত বললেন—প্রভু! রাজা অম্বরীষের কন্যাকে আমি বিয়ে করবো; কিন্তু ঠাকুর, নারদ ঋষি বড় গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আর জানেনই ত নারদের স্বভাব, যেখানে যাবে একটা না একটা গণ্ডগোল করবে।

নারায়ণ বললেন—নারদ আবার তোমার বিয়েতে কি গণ্ডগোল করলে?

পর্ব্বত বললেন—আর বলেন কেন, নারদ এই বুড়ো বয়েসে বলে কি না বিয়ে করবো! রাজা অম্বরীষ আমাদের দু'জনকেই বিয়ের জন্তে কন্যাপ্রার্থী দেখে কাল এক স্বয়ম্বর-সভা করছেন, তাতে আমরা দু'জনেই উপস্থিত হবো। রাজকুমারীর যাঁকে পছন্দ হবে সেই শ্রীমতীকে বিয়ে করবে।

নারায়ণ বললেন—তাতে তোমার আর ভয় কি, নারদ কি আর তোমার সঙ্গে পারবে?

পর্ব্বত বললেন—না প্রভু, ও বড় চালাক লোক। ওকে বিশ্বাস নেই। আপনি একটা উপায় করে দিন যাতে নারদ শ্রীমতীকে বিয়ে করতে না পারে।

নারায়ণ বললেন—কি করবো বল?

পর্ব্বত অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন—প্রভু, এক কাজ করুন, ঐ বিশ্রীমুখো গোলাঙ্গুল বাঁদর আছে, তাদের মতন মুখ করে দিন ঐ নারদ ঋষির, কিন্তু সেটা স্বয়ম্বর-সভায় শুধু শ্রীমতীই দেখবে, অন্তে নারদকে দেখবে। তাহ'লে শ্রীমতী নিশ্চয় আমার গলায় মালা দেবেন।

নারায়ণ একটু হেসে বললেন—এ আর বেশী কথা কি, তাই হবে। তুমি এখন আশ্রমে যাও।

পর্ব্বত মুনি মনের আনন্দে আশ্রমে ফিরলেন।

* * * *

পরদিন রাজা অম্বরীষ তাঁর বাড়ী বেশ করে সাজিয়ে রাখলেন। চতুর্দ্দিকে যথারীতি বিবাহের উপযোগী সব ব্যবস্থা করে রাখলেন। কি জানি, যদি ঋষিরা এসে দেখেন যে বিয়ের জন্যে বাড়ী সাজান নেই, উৎসব নেই, তাহ'লে রেগে শাপ দিয়ে বসতে পারেন। তাই রাজা সব ব্যবস্থা ভাল ভাবেই করে রেখেছেন। তার পর যথা-সময়ে নারদ ঋষি ঢেঁকিতে চড়ে বীণা বাজাতে বাজাতে মনের আনন্দে রাজ-ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। পর্ব্বত মুনির কোন বাহন না থাকায় মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে জটা দুলিয়ে সভায় উপস্থিত হলেন। তখন রাজা স্বয়ম্বর-সভায় রাজকুমারীকে আনবার জন্যে তাঁদের দু'জনের অনুমতি নিলেন। ঋষিরাও তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর দেরি করা কেন, নিয়ে আসুন। রাজার অনুমতি পেয়ে রাজকুমারীর সখীরা শ্রীমতীকে কনে সাজিয়ে সভায় নিয়ে এলেন। সভায় অপরূপ সাজে সাজান সেই রাজকুমারীকে দেখে এক জন ঘন-ঘন দাড়িতে হাত বুলোন আর এক জন জটায় হাত বুলোতে লাগলেন। তখন রাজা শ্রীমতীর হাতে মালা দিয়ে বললেন ক'ন্তে! তুমি এগিয়ে যাও, দেখবে এক আসনে ঋষিশ্রেষ্ঠ পরম ভক্ত নারদ আছেন। অন্য আসনে মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত পর্ব্বত মুনি আছেন। যাঁকে তোমার পছন্দ হবে, তাঁকেই বরমাল্য দেবে।

রাজকুমারী এই কথা শুনে যেখানে নারদ আর পর্ব্বত দুই সিংহাসনে দু'জনে বসেছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু নারদ আর পর্ব্বত কৈ? এ যে দুই সিংহাসনে দু'টি বিকটাকার বাঁদর বসে আছে! রাজকুমারী মনে করলেন, তবে কি বাবা আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন! এবারে রাজকুমারী দু'জনের এক জনকেও মালা না দেওয়ায় ঋষিরা দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, আর মনে করছেন, রাজকুমারীর মালা দিতে এত দেরী কেন? ক্রমে তাঁরা অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। রাজাও মেয়েকে কাকেও মালা দিতে না দেখে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৎসে! তুমি আর দেরী করছো কেন? ঋষিদের মালা দিয়ে দাও। এঁরা বড় অধীর হচ্ছেন।

তখন রাজকুমারী বললেন—বাবা, ঋষিরা কৈ? সিংহাসনে দু'টি বাঁদর বসে আছে।

রাজা ত কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—শ্রীমতী, তুই কি বলছিস্ মা! সিংহাসনে ত দুই ঋষি বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কাকেও শীগ্‌গির মালা দাও, তা না হলে সব গেল!

শ্রীমতী বললেন—না বাবা, ওখানে ঋষি নেই, ওখানে আছে দু'টি বানর আর তার মধ্যে আছেন এক সুন্দর সুঠাম নবীন দূর্ব্বাদল মূর্ত্তি দু'হাতে ধনুর্ব্বাণধারী এক পরম সুন্দর যুবা। —এই বলেই সেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন শ্রীমতী। ভগবান্ নারায়ণ তাঁর পরম ভক্তিমতী শ্রীমতীকে মায়াবলে বৈকুণ্ঠে নিয়ে

চলে গেলেন। এধারে ঋষিরা শ্রীমতীকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর দেখতে না পেয়ে মনে করলেন, রাজা কোন মায়াবলে নিজের কন্যাকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেললেন। তখন ঋষিরা দু'জনেই রাগে ফুলে উঠে বললেন—"অম্বরীষ! শীগ্‌গির তোমার মেয়ে আনো, আমরা তাকে বিয়ে করবো। না হলে এখনই শাপ দেবো।

রাজা বললেন—প্রভু! মেয়ে কোথায় গেল আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি ঠকাইনি।

সে কথা ঋষিদের বিশ্বাস হ'লো না। তখন তাঁরা দু'জনে রাজাকে শাপ দিলেন—"রাজা, তুমি আমাদের যেমন মোহ দিয়ে কন্যা অপহরণ করেছ, তেমনি তোমাকে ঘোর অন্ধকার গিয়ে ধরুক। তোমার সমস্তই মোহগ্রস্ত হউক।" এই শাপ দেওয়ায় একটা সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ কাল ধোঁয়া রাজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। রাজা সেই কাল ধোঁয়া দেখে সভয়ে শ্রীহরির স্মরণ করলেন। তখন সেই পূর্বের বরলব্ধ ভগবানের চক্র জ্বলতে জ্বলতে কালো ধোঁয়ার দিকে ছুটে গেল। তখন সেই কালো ধোঁয়া রাজাকে ধরতে না পেরে যারা শাপ দিয়ে সেই ধোঁয়াকে ডেকে এনেছিলেন, সেই ভীষণ ধোঁয়া তাঁদের ধরতে গেল। ঋষিরা তাই দেখে ভয় পেয়ে একেবারে ভীষণ ভাবে দৌড় দিলেন। আর ধোঁয়াও ঋষিদের পেছু-পেছু তাড়া করলো। তখন ঋষিরা ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। ভগবান্ তাঁদের দেখে বললেন—কি হলো তোমাদের এত দৌড়ে আসছ কেন?

নারদ বললেন—নারায়ণ, বাঁচাও, ঐ কালো ধোঁয়া আমাদের খেলে, আমরা মলুম।

নারায়ণ তখন চক্রকে বললেন—যাও, ঐ ধোঁয়াদের সব ফিরিয়ে দাও। আমি এঁদের কথা শুনি। তখন নারদ আশ্বস্ত হয়ে বিয়ের কথা সব বললেন। ভবদান শুনে শুধু একটু হাসলেন।

পর্ব্বত জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু! আমাদের এই অপমান দেখে আপনি হাসলেন? আমায় মুখ বলে কি না বাঁদরের মতন?

নারদ বললেন—প্রভু! আমাকে বলে কি না বিশ্রীমুখো গোলাঙ্গুল বাঁদর? বুড়ো বয়েসে একরত্তি ঐ মেয়েটার মুখে এ কথা সহ্য করা যায়?

ভগবান্ তখন হেসে বললেন—কেন নারদ, তুমি ত পর্ব্বতের ঐ মুখই চেয়েছিলে।

বললেন—প্র ! আমি পর্ব্বতের ঐ মুখ চেয়েছিলুম, কিন্তু আমার মুখটা ও-রকম হ'বে কেন?

নারায়ণ বললেন—নারদ, পর্ব্বতও আমার ভক্ত। ও এসেও ঠিক তোমার মুখ যাতে গোলাঙ্গুলের মতন হয় তাই চেয়েছিল। তাই তোমাকেও যেমন বর দিয়েছিলাম, ওকেও ঠিক তেমনি বর দিয়েছিলাম।

নারদ আর পর্ব্বত এই কথা শুনে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাইতে লাগলেন। তখন হঠাৎ নারদ দেখলেন যে দৌড়তে গিয়ে বেচারির পা-হাতে ছিঁড়ে গেছে, বীণাটি ভেঙ্গে গেছে, দাড়িও খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। আর নড়তে-চড়তেও কষ্ট হ'চ্ছে। বিশ্রী কাল ধোঁয়া যে ভাবে তেড়ে এসেছিল নাকে-মুখে ঢুকলে আর জ্ঞান থাকতো না। বাপ রে বাপ! বুড়ো বয়েসে বিয়ে করতে গিয়ে কি দুর্ভোগ! সেই থেকে নারদ ঋষি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, আর কখনও তিনি বিয়ে করবেন না। তবে তোমাদের মধ্যে বড় হয়ে যারা বিয়ে করবে, তারা যদি নারদকে খবর দাও, তিনি ঘটকালি করবেন।

লাউৎজে

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য

যে সমস্ত মহামানব পৃথিবীতে ত্যাগ ও মহত্ত্বের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, লাউৎজে তাহাদের মধ্যে অন্যতম। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দে লাউৎজে চীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসাবে চীন দেশে ইনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম। লাউৎজে শুধু দার্শনিকই ছিলেন না, এক জন ধর্মপ্রচারক হিসাবেও তাঁর নাম অদ্যাবধি খ্যাত হইয়া আছে। ইঁহার প্রচারিত ধর্মের নাম "তও"। এবং ধর্মের সার মতবাদ ছিল সত্য, সংযম ও ত্যাগ। সেই কারণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ যুগগুরু শ্রীচৈতন্যের সাথে ইঁহার তুলনা করেন।

লাউৎজে গরীবের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে মধ্য-জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া "কাউ" (Kaw) রাজপ্রাসাদে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

* * * *

সকল সময় ইনি চিন্তা করিতেন যে, কেন তিনি মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছেন। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত তাঁহার তুলনাই বা কি? জগতে এত গাছ-পালা, লতা-গুল্ম পাহাড়-পর্ব্বত আর নদী-জলাশয়েরই বা তুলনা কি? প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের চিন্তাগুলি তাঁহার বাস্তব জীবনের জিজ্ঞাস্য ছিল। লাউৎজে প্রায় অধিকাংশ সময়েই রাজবাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু রাজৈশ্বর্য্য বা ভোগ-লালসা তাঁহার মনকে উদ্ব্যস্ত করিত। তাই এক দিন গভীর রাত্রে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রহরী তাঁহার লুকোচুরি টের পাইয়াছিল। তাই সে লাউৎজের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া বলিল—"হে মহামানব, আমি আপনার সদভিপ্রায় অনুভব করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, কি কারণে আপনি ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু জগদ্বাসীকে এ ভাবে নিঃসম্বল রাখিয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে। সেই কারণ এই পাপী-জগতের মুক্তির জন্য একটি আদর্শবাদী গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান।" মহামানব ঐ দিন যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রহরীকে দিয়া সংসার ত্যাগ করেন। এই গ্রন্থ "তও" ধর্মের সার কথা। উক্ত গ্রন্থের মর্ম-ব্যাখ্যায় উপনিষদের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে, লাউৎজে তদানীন্তন আর্য্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ছিলেন পরিপোষক এবং তাই তাহার উপর প্রভাব ছিল খুব বেশী। তাহার প্রমাণ চীন দেশের তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এখনও ব্রাহ্মণদের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করে এবং শিখাও রাখে।

এই মহামানব আনুমানিক ৫৩১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পরলোক গমন করেন।

যারা বাঁচবে

শ্রীঅরুণাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

মার্চ্চ ১৯৪০ সাল।······

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড নগরী। কন্‌কনে শীত পড়েছে ভোর বেলায়। আগের রাত্রিরে বরফ পড়েছে থরে-থরে। রাস্তায় বড় একটা কেউ বেরোয়নি। দু'-একটা দুধের গাড়ী শুধু ছুটছে তীব্রবেগে দু'দিকে হাল্কা বরফের টুকরোগুলোকে ছড়িয়ে। দূরের লন'টাতে ছোট ছেলেগুলো স্কিট্ করতে সুরু করেছে মহা হৈ-হুল্লুড় করে।

ক্রমে রোদ ওঠে চারি দিক্ সোনার আলোয় রাঙ্গিয়ে। বরফ গলতে আরম্ভ করে—রাস্তায় বেরোয় দু'-এক জন—সহর জেগে ওঠে ধীরে—প্রাণের পরশ লাগে তার শিরায় শিরায়।

হঠাৎ পশ্চিম আকাশের এক কোণে দেখা দিল দিগন্তভেদী শব্দ এক বিমান-বহর! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে—সংখ্যায় তারা অনেক। এর আগে যুগোশ্লাভিয়ার অধিবাসীরা এতগুলো বিমান একসঙ্গে দেখেনি। আজ কি কোনও উৎসব? না! তা'ছাড়া যুগোশ্লাভিয়ার তো এতগুলো বিমানও নেই। তবে কি হিটলার···? তাই বা কি করে হয়? এই তো সে দিন বেলগ্রেড 'উন্মুক্ত' নগরী বলে ঘোষিত হয়েছে—এখনও যারা শয্যায় ছিল সবাই ছুটে এল 'ব্যাল্কনি'তে ব্যাপারটি কি দেখতে। কেউ কেউ চোখে 'বাইনকুলার' লাগিয়ে দেখতে লাগল গভীর মনযোগে।

—স্বস্তিক চিহ্ন না?—এক জন চেঁচিয়ে উঠল।

—নিঃসন্দেহে।—অপর এক জন প্রতিধ্বনি করে।

—তা হ'লে জার্ম্মাণ--

তার অসমাপ্ত কথাকে ছাপিয়ে ওঠে গুড়ুম্ গুড়ুম জার্ম্মাণ বোমা বিদীর্ণ হওয়ার শব্দ। আগুন জ্বলে ওঠে দাউ-দাউ করে উঁচু বাড়ীগুলোর মাথায়—চক্ষের পলকে সেগুলো পড়ে ভেঙ্গে—যারা সবাই হতবাক্ হয়ে পরস্পরের মুখের পানে চায়। তারা জানে না এ কী বা কেন? পালাবে? কোথায়? রাস্তায় যে চলার জো নেই—সেখানে চলেছে ধ্বংস, মৃত্যু আর রক্তের প্রতিযোগিতা—চার দিকে জমে উঠছে ধ্বংসের জঞ্জাল—মাথার উপরে উঠছে নাম্‌ছে অগ্নিস্রাবী মৃত্যু-দানব—মূর্ত্তিমান প্রলয়ের প্রতীক। ধোঁয়ার বিদ্‌ঘুটে গন্ধ—অন্ধকার—দীর্ণ বিস্ফোরকের বিকট আর্ত্তনাদ—'স্প্লিন্টারের' শোক-গীত—'মেশিন গানের' পৈশাচিক উল্লাসের বিকট অট্টহাস্য—এ যেন সুরু হ'য়েছে প্রলয় সঙ্গীত—জরাদীর্ণ পৃথিবীর শেষ মহা অভিসার! কোথায় তারা আশ্রয় নেবে? ঘর-বাড়ী সবই ভেঙ্গে পড়ছে মাথার উপর—মুহূর্ত্তে উড়ে গেল ষ্টেশনের বিরাট চালাটা—হতভাগ্য নর-নারীগুলো আত্ম-সমর্পণ করলে অকাল, আকস্মিক আর অজ্ঞাত মৃত্যুর কবলে! রক্ত, শুধু রক্ত—তাজা রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে স্রোতের আবর্ত্ত সৃষ্টি করে—ওখানে বাঁধ পড়েছে স্রোতের একটা ট্রাম গাড়ী দিয়ে, যেটা গেছে উল্টে আর যার চাকাগুলো তখনও ঘুরছে বন্‌বন্ করে সমান বেগে···।

—না, আমরা আর এখানে থাকব না—মার্শাল (অধুনা) টিটোর সহকর্ম্মী পিরাড বলে।

—কিন্তু টিটোকে তো খুঁজে বের করতে হয়—ভেল্‌ডো বলে।

উভয়ে চলে টিটোর উদ্ধারকল্পে। নগরীর কোণের এক ধ্বংস-স্তূপ থেকে ওরা বের করলে অর্দ্ধমৃত টিটোর দেহ। এখানেই আশ্রয় নিয়ে ছিলেন টিটো—তথাকথিত রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী আর বিশ্বাসঘাতক টিটো, যাঁকে কি জীবিত কি মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তারের বিনিময়ে ঘোষিত হয়েছিল মোটা রকমের পুরস্কার—আর যাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য এক সময়ে নিযুক্ত হয়েছিল যুগোশ্লাভিয়ার পনের শ' পুলিশ অফিসার। কিন্তু এত সব অনুষ্ঠান সত্ত্বেও টিটো প্রতি রাত্রিতে বেলগ্রেড নগরীতে আসতেন আর ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই ফিরে যেতেন 'বেলো পুল'-এর জঙ্গলে—তাঁর ভূগর্ভস্থ দপ্তরে।

—সমস্ত বেলগ্রেড নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—টিটোর জ্ঞান ফিরে এলে পিরাড বলে—দলের কেউ বোধ হয় আর বেঁচে নেই।

টিটোর গম্ভীর মুখে ফুটে ওঠে বিষাদের করুণ হাসি। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে সজোরে ছুঁড়ে মেরে জিজ্ঞেস করেন—পারবে?

—শুধু আজ্ঞার অপেক্ষা—দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় পিরাড—কারাগারের শৃঙ্খল যাদের হাতে পরিয়েছে 'রক্ত বলয়'—প্রকাশ্য জীবন যাদের কাছে পেচকের 'সূর্য্যদর্শন'—অত্যাচারের শিলাবৃষ্টি যাদের মাথায় পড়ে দিন-রাত, তাদের যে সবই পারতে হয়!—সুযোগ এসেছে উত্তম। এত দিনের স্বপ্ন সফল হবে অত্যাচারের অবসানে—ফ্যাসীদের ধ্বংসে আর মানবের মুক্তিতে·············।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা বেরিয়ে পড়ে সদলবলে। সহরের যথাসম্ভব নর-নারীকে নিয়েছে ওদের সঙ্গে। বিশৃঙ্খল জনতার এ ছিন্ন সমষ্টিকে চালিয়ে নিয়েছে পিরাড। আগে বাঁচাতে হবে এদের প্রাণে। রাতের অন্ধকারে গা' ঢাকা দিয়ে তারা সহর থেকে স'রে পড়বে যত দূর সম্ভব। তার পর গিয়ে উঠবে 'বেলো পুলের' নিবিড় পর্ব্বতে,—টিটোর ভূগর্ভস্থ দপ্তরে। চল্‌তে চল্‌তে রাত শেষ হ'য়ে আসে। দলের সকলেই ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে—তারা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত, অবসন্ন, ক্লান্ত। তার উপরে রয়েছে আবার আঘাতের ক্ষত। পচতে সুরু করেছে এরই মধ্যে—তারা না পেয়েছে ঔষধ আর না হয়েছে উপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ।

দিনের আলোয় তারা চলতে সাহস করে না—কি যেন কখন মাথার উপর ভেসে উঠবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতীক 'বম্বার।' রাত্রির অভিযানও বিপদসঙ্কুল—কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকার কোণ থেকে হয়ত বেরিয়ে আসবে লেলিহান অগ্নি-শিখা—সবাই মৃত্যু-আতঙ্কিত—বাঁচাও, বাঁচাও—!

দ্বিতীয় দিন। শিশুগুলো নিস্তেজ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। অনেকে এরি মাঝে শেষ-শয্যা নিয়েছে পথের ধারে—অনন্ত নীল আকাশ জাগবে তাদের বাসর রাত্রি—ভোরের শুকতারাটা জল্‌বে বিনিদ্র প্রহরী হ'য়ে।

—মিসেস্ পিরাড যে আর পারছেন না—এক জন সহকর্ম্মী বলেন পিরাডকে লক্ষ্য করে।

—কেন, কি হয়েছে তার?—পিরাড সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

—ক্ষতটা তাঁর বড্ড বেশী রকম পচন ধরেছে।

পিরাডের খেয়ালই ছিল না সেদিকে। দু'দিন ধরে সে দলের এ-মাথা ও-মাথা ছুটে বেড়াচ্ছে—মাথার চুলগুলো হয়ে উঠেছে রুক্ষ—মুখে তার দুশ্চিন্তার ছায়া—এতগুলো প্রাণকে বাঁচাতে হ'বে—তার পর রয়েছে শত্রু-কবলিত মাতৃভূমি।

—কেমন আছ এখন?—সংযত উৎকণ্ঠার স্বরে জিজ্ঞেস করে পিরাড। সম্বিৎ ফিরে আসে মিসেস্ পিরাডের। বুকের উপর ঝুঁকে পড়া মুখখানাকে তুলে তাকায় পিরাডের দিকে। ডান হাতখানাতে স্লিং বাঁধা হয়েছে তাঁরই গাউনের নীচের দিকের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে।

—তুমি এসেছো? বেশ তো ভাল আছি। শুধু একটু জল। তার পরই আবার চলতে পারব কিন্তু এ যেন ঠিক সত্য নয়—শুধু উৎসাহের বাণী, পাছে তারই জন্য স্বামীর পুণ্য কাজে ঘটে বিঘ্ন আর এ হতভাগ্য জীবগুলো আরও বিপন্ন হয়ে পড়ে শুধু তারই জন্য।

এক বর্ষীয়সী মহিলা দিলেন তাঁর বোতলে সঞ্চিত জলের অর্দ্ধেকটা। জলটুকু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন রাস্তার ধারের একটা ঝরণা থেকে।

ওরা আবার চলে অলস মন্থর পদবিক্ষেপে।

ক্ষতের যন্ত্রণা ক্রমে হয়ে ওঠে অসহ্য—রাস্তার মাঝে মিসেস্ পিরাড পড়েন দু'-একবার মুখ থুবড়ে। তবু চলেন মিসেস্ পিরাড —পাছে তারই জন্য সমস্ত দলটাকে পড়তে হয় শত্রু-কবলে।

কুয়াসার জালের ভিতর দিয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় ফুটে ওঠে ভোরের অস্পষ্ট আলো—ওরা থেমে পড়ে একটা ঝরণার ধারে। দলে ছিল একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সে বলে, 'অস্ত্রোপচারে সমূলে হাতখানাকে বাদ দিতে হবে মিসেস্ পিরাডের। কিন্তু অস্ত্র কোথায়? ব্যাণ্ডেজ? আর প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রই বা কোথায়? পিরাড এগিয়ে দিল তার ছুরিখানা—ভেলডো খুলে দিল তার টুপির উপরে জড়ানো লম্বা কাপড়ের ফালিটুকু।

অতি সহজ অনাড়ম্বর ঘটনা।

একটা পাথরের উপর বসানো হল মিসেস্ পিরাডকে, আর একটা পাথরে হেলান দিয়ে। হাতের উপর ছোরাখানাকে দু'-একবার রগড়ে নিয়ে ডাক্তার ছেলেটি এগিয়ে যায় মিসেস্ পিরাডের দিকে। সন্তর্পণে খুলে ফেলে ছেঁড়া গাউনে বাঁধা স্লিং আর ব্যাণ্ডেজটা।

তার পর—

জনতা চোখ বোজে।

রক্ত আর পুঁয গড়িয়ে পড়ে পাথরের উপর। কিছুটা তার জমে যায় পাথরের বুকে আর কিছুটা ঝরণার জলে মিশে বিচিত্র রং-এর সৃষ্টি করে। ঝরণার শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়।

বেলা বেড়ে ওঠে। কে এক জন কোত্থেকে সংগ্রহ করে দেয় একটা টাটু ঘোড়া। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিসেস্ পিরাড শুধু তার দিকে চেয়ে থাকেন—ভাষা গেছে তাঁর হারিয়ে···।

ওরা আবার চলে। গতি তাদের হয়ে আসে ক্রমেই মন্থর—ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন তারা। মায়ের কোলের শিশুগুলোও আর কাঁদে না। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা যেন মহাপ্রলয়ের আগমনী গান গায়। মাঝে মাঝে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে মিসেস্ পিরাডের মাথা—আবার উঠে প'ড়ে মনকে তিনি বাঁধেন কখনও কখনও পিরাড এসে দেখে যায়—উৎসাহ পায় মিসেস্ পিরাড আর বলেন, বেশ তো ভাল আছি, তুমি সঙ্গে থাকতে কোনও ভয় নেই।

দুপুরের দিকে একটি ছেলে নিয়ে এল কোত্থেকে দু'টো ষ্টিমুলেণ্ট পিল। সাগ্রহে ভেলডো বাড়িয়ে দিল মিসেস্ পিরাডের দিকে। বিস্ময় ডাগর চোখে দেখা দিল তাঁর দু'ফোটা অশ্রুবিন্দু। ইঙ্গিতে ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন—স্নেহচুম্বন এঁকে দিলেন তার গণ্ডে আর বললেন, যারা বাঁচবে তাঁদের দিও। আর বলতে পারেন না কিছু—ঝর-ঝর করে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুবিন্দু।

অবস্থা তাঁর ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ে। ডাক্তার ছেলেটি চলে সাথে-সাথে। বেলা-শেষের অস্তমান সূর্য্যের ম্লান রশ্মিতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় টাটু ঘোড়াটা—তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে মিসেস্ পিরাডের অবসন্ন দেহভার। খবর পেয়ে পিরাড ছুটে আসে।

—এই যে তুমি এসেছো?—আরও কাছে, আরও কাছে এসে পিরাড এগিয়ে গেল। ধীরে মিসেস্ পিরাড উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠের উপর। বাম হাতে তাঁর জড়িয়ে ধরলেন পিরাডের কণ্ঠ।

মুখের কাছে মুখ এনে নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন, যারা বাঁচবে তাদের বাঁচাও! হঠাৎ থেমে যায় তার স্বর—এলিয়ে পড়ে প্রাণহীন দেহটা মাটীর বুকে—ব্যাণ্ডেজ উপচে ছোটে রক্তধারা।···

মুহূর্ত্তের মধ্যে দলটা ভেঙ্গে পড়ে সেখানে। এ শুধু মুহূর্ত্তের অবকাশ।—সহজ অনাড়ম্বর ভাবে তাঁর দেহকে রাখা হয় একটা পাথরের টুকরো সরানো গর্ত্তে। উপরে দেওয়া হয় শুকনো পাতা আর মাটির ঢাকনা। রাস্তার ধারের একটা গাছের ডালে তৈরী ক্রুশটি বসিয়ে দিল পিরাড স্বয়ং সে কবরের উপড়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে ধীরে দলটা—আবার চলতে সুরু করে—

ফেলে আসা পথের উপর জমাট বাঁধা রক্তে অক্ষরে লেখা থাকে যুগোশ্লাভিয়ার ইতিহাস! দলটা এগিয়ে চলে সামনে। মুহূর্ত্তের অবকাশ নেই দাঁড়াবার—পশ্চাতে কুয়াসা কুহেলী জালের অন্তরাল থেকে ভেসে আসে অস্পষ্ট ধ্বনি—যারা বাঁচবে তাদের বাঁচাও···।'

ছোটদের খেলা-ধূলা—নাট্যকার ইবসেন

শ্রীসুলতা কর

ছোটবেলায় শিশুরা যে সব খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যায় তাদের মানসিক গড়ন, ভবিষ্যতে তারা কি হয়ে উঠবে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবিরা ছোটবেলায় কে কেমন খেলা-ধূলা নিয়ে মেতে থাকতেন, যদি আমরা তার খোঁজ নিই তবে বুঝতে পারি যে, তাঁরা বাল্যের খেলা-ধূলার ভিতর দিয়েই ভবিষ্যতের গৌরবময় জীবনের আভাস দিয়ে গেছেন।

ইউরোপের বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের বাল্যের খেলা-ধূলার কাহিনী শুনলে বোঝা যায়, এ কথা কত দূর সত্য।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখতে পাই, একশো বছর আগের নরওয়ের এক গ্রামের পুরানো বাড়ীর ভাঙ্গা রান্নাঘরের ভিতরে বসে রয়েছেন গরীব বালক ইবসেন। পরে রয়েছেন ছেঁড়া প্যাণ্ট আর জোড়াতালি দেওয়া কোট!

রান্নাঘরের সামনের খোলা মাঠে চারটি ছোট-ছোট ভাই-বোন খেলা করছে। খেলতে খেলতে তারা 'ইবসেন' বলে চেঁচিয়ে ডাকছে, কিন্তু ইবসেনের কোন সাড়া নাই। রান্নাঘরের দরজায়

[খি]ল লাগিয়ে কতকগুলি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন আর একমনে কত কি ভাবছেন।

ভাই-বোনেরা প্রথমে বরফের বল তৈরী করে রান্নাঘরে ছুঁড়তে লাগল, তার পর ইটের টুকরা ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ইবসেন সাড়া দেন না। তখন তারা দল বেঁধে রান্নাঘরের ছোট জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল আর চেঁচাতে আরম্ভ করল। এর পর আর বালক ইবসেনের বই পড়া চলল না। ছুটে বাগানে বেরিয়ে এসে ভাই-বোনদের তাড়া করলেন। ভাই-বোনেরা তাঁর রাগে টকটকে লাল মুখ আর মাথার খাড়া চুল দেখে ভয়ে যে যেখানে পারল ছুটে পালাল। আসলে কিন্তু ইবসেন একটুও রাগেননি, ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আবার বইগুলি নিয়ে বসাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সব ভাই-বোনেরা পালিয়ে যাবার পর মুচকে হাসতে হাসতে আবার পুরানো বইগুলি নিয়ে রান্নাঘরে খিল লাগিয়ে বসলেন।

ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে পুরানো বইগুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন আর কত কি ভেবে চলেছেন। গরীবের ছেলে লেখাপড়া কিছুই শেখা নেই। বেশীর ভাগ বইয়ের ভাষা ইংরাজী, কাজেই কিছু পড়তে পারতেন না, খালি পাতা উল্টাচ্ছেন আর ছবি দেখছেন।

ছোটবেলায় এই একটি তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। যেখানে বই পাওয়া যায় তা কুড়িয়ে এনে নির্জ্জনে বসে তার পাতা উল্টানো আর পড়বার চেষ্টা করা।

বালক ইবসেনের আর একটি প্রিয় খেলা ছিল কার্ডবোর্ডের উপর ছবি আঁকা। কোন ছবিটি হত গ্রামের স্কুল-মাষ্টারের মত, কোনটি হত উকীল বা পাদ্রী সাহেবের মত। ছবিগুলি তিনি ঘরময় সাজাতেন আর তাদের সামনে বসে স্কুল-মাষ্টার পাদ্রী সাহেব যেমন ভাবে কথা বয় ঠিক সেই ভাবে কথা বলে বলে অভিনয় করতেন।

একটি অভিনয় তিনি সব চেয়ে ভালবাসতেন। অভিনয়টির তিনি নাম দিয়েছিলেন—"বড় লোক আর গরীব লোক।"

কার্ডবোর্ডে আঁকা একটি গরীব পুতুলের সামনে বসে তিনি তার হয়ে একটি বড়লোক পুতুলকে জিগেস করতেন—"আচ্ছা, আমি না হয় গরীব তা বলে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন কেন?"

বড়লোক পুতুলটি কোন উত্তর দিতে পারল না। তখন গরীব পুতুলটি আবার বলতে আরম্ভ করল—"এক সময় আমিও বড়লোক ছিলাম, তখন আপনি আমায় কত ভালবাসতেন, এখন এত অবজ্ঞা করেন কেন?"

এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নির্জ্জন ঘরে বসে তিনি অভিনয় করে যেতেন। বালক ইবসেনের মনে সে সময় যে সব দুঃখ জমা হয়েছিল তাঁর পুতুলরা সেই সব কথা বলে যেত।

ইবসেনের ছোটবেলার এই সব খেলার গল্প শুনলে তিনি যে ভবিষ্যতে বিখ্যাত পণ্ডিত আর নাট্যকার হয়ে উঠবেন, সেটা কেমন স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিশ্বাস কোর না যেন

[ইংরাজী ছড়ার অনুসরণে]

প্রভাত বসু

হাসি-হাসি মুখ তার
যে এসেছে সোমবার
　　এ ধরায়।

মঙ্গলে যে এল ঘরে
লাবণী উছলি পড়ে
　　তার গায়।

সেই লোক সহৃদয়
বুধবারে যার হয়
　　জন্ম।

বিষ্যুতে জনমিলে
দূর দেশে তার মিলে
　　কর্ম।

দুঃখের বয় ভার
আগমন হয় যার
　　শুক্রে!

শনিতে এলেন যিনি
পড়িবেন জেনো তিনি
　　চক্রে।

সব চেয়ে ভাল তাই
চুপি-চুপি বলি, ভাই
　　রবিবার!

বুদ্ধি ও বিদ্যায়
কভু নাহি পরাজয়

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
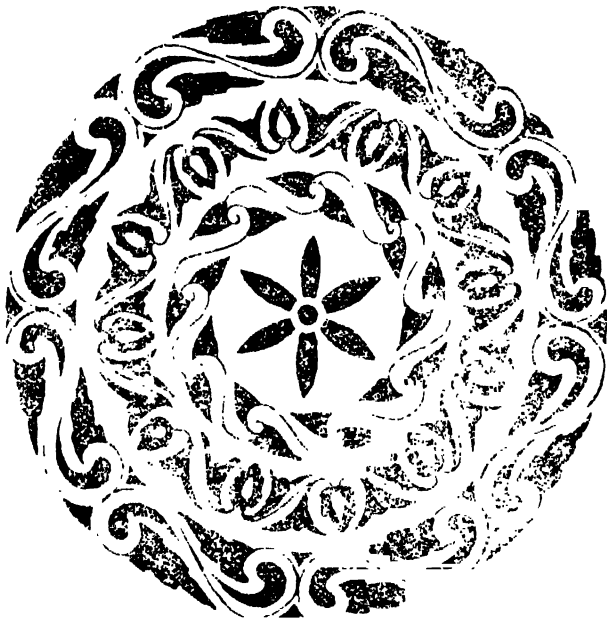
দিল্লীতে নারী-জাগরণের এক অধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাংলার বাইরে বঙ্গীয় নারী-প্রগতির ইতিহাস যদি কোন দিন সঙ্কলিত হয়, তাহ'লে করোলবাগ বাঙালী বালক বালিকা বিদ্যালয়—অধুনাতন, ইউনিয়ন একাডেমী, করোলবাগ শাখা—তার কিছুটা অংশ অবশ্যই অলংকৃত করবে।

দিল্লীতে নারী-জাগরণের দ্রষ্টারূপে বিদ্যায়তনটি আজও দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির মূলে যে আছেন বাঙালী মহিলা এক জন, তা অনেকেরই অবিদিত। মধ্যবিত্ত—সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মহিলা ইনি। লীলাবতী চট্টোপাধ্যায় এঁর নাম।

নারীর সমাজ-সেবার পথ যে কত কণ্টকাকীর্ণ—পদে পদে যে কি পরিমাণ বাধা, বিধি-নিষেধের গণ্ডী যে কি সঙ্কীর্ণ ও কঠোর—তা কারো অবিদিত নেই। বাংলায় তো বটেই—বাংলার বাইরেও এ বেড়া-জালের অবসান হয় না; এ সবই তেমনি অটুট ও গ্রন্থিমুক্ত থেকে যায়।

পথ এই রকম বিঘ্নিত জেনেও যিনি সমাজ-সেবাকে জীবনের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেন, পরিশেষে জয়যুক্ত হতে পারেন—তিনি নমস্য। তাই শিক্ষা পরিবেশনার মত অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের মূলে বাঙালী নারীর কৃতিত্ব শুনে স্বতঃই শ্রদ্ধায় শির নত হয়ে যায়।

লীলাবতী চট্টোপাধ্যায়ের পথ সাধারণ নারীদের তুলনায় আরো দুর্গম ছিল—আত্মগত কারণে। বাঙালী-ঘরের বিধবা তিনি। অশ্রুসিক্ত পিছল পথ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়। তবু বিচলিত হননি তিনি।

তাঁকে কেন্দ্র করেই দিল্লীতে—করোলবাগ অঞ্চলে নারী-জাগরণের সূত্রপাত। হয়তো আপন জীবনের অপূর্ণতা সবায়ের সম্মেলনের মাঝে সার্থকময় করে তুলতেই এ পথে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কর্মধারা ও জীবনাদর্শের সম্মিলিত প্রকাশ—আজকের ইউনিয়ন একাডেমী, করোলবাগ শাখা।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। ১১৩৮ সাল। নতুন দিল্লী ও পুরানো দিল্লীতে তখন বাঙালীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়; তবে করোলবাগ অঞ্চল তখন সবে মাত্র শিশুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

দিল্লীতে অভাব যদি কিছুর থাকে তো সে বাসস্থানের; দিল্লীর চিরন্তন অভাব এটি। এর বিরুদ্ধে দিল্লী কর্তৃপক্ষের সংগ্রাম আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি! কিন্তু বাঙালী এই অভাব-তাড়নায় সেই সময়ে করোলবাগ অঞ্চলে কক্ষচ্যুত তারকার মত স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। জীবিকার্জনের জন্য জন্মস্থানের দুর্বার মায়া ছিন্ন করেও দূরে থাকা সম্ভব, যদি বন্ধু-বান্ধবপরিবৃত থাকার সৌভাগ্য ঘটে। করোলবাগে তখনও পরিবেশ গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। অথচ, দূর পাড়ি জমিয়ে নয়া দিল্লীর সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগ রাখাও সব সময় সম্ভব নয়। অতএব অস্বস্তি আর অশান্তি হল এঁদের জীবনযাত্রার পাথেয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙালী যেখানে যায়, নিয়ে যায় তার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগঠন। করোলবাগের বাঙালী অধিবাসিগণের মধ্যেও তা ছিল না এমন নয়, তবে তখনও সুপ্তাবস্থায়। ইস্পাতখণ্ড চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত—সংহত করবার জন্য প্রয়োজন কেবল চুম্বক-শক্তির। ঠিক এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে এলেন লীলাবতী চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক স্কুল-কলেজের বাঁধা পাঠ্যপুস্তকে কোন দিন সীমাবদ্ধ হয়নি তাঁর শিক্ষাধারা। পৃথিবীর বৃহত্তর বিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র। তাই দৃষ্টি হতে পেরেছিল তাঁর স্বচ্ছ—সুদূরপ্রসারী; মত দৃঢ় অথচ উদার; ব্যবহার সহজ সরল; আলাপ-আলোচনায় ছিল না তাঁর জটিলতার লেশ। ভাগ্যাহত বাল-বিধবা হলেও কর্মশক্তি কিছু মাত্র ব্যাহত হয়নি তাঁর; অন্তরের সুপ্ত সংগঠন-স্পৃহাকে বরং উদ্‌বুদ্ধ করেছে তা,—দিয়েছে আরো গতিবেগ।

লক্ষ্য স্থির থাকলে পথ সরল হয়,—সময়ের অপচয় অনেকখানি কমে আসে। ঘরে-ঘরে গিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই লীলাবতী দেবী সাক্ষাৎ-পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে তুললেন। দুপুর বেলা কথা কওয়ার সাথী পেলে গৃহস্থ মহিলারা বড় একটা কিছু চান না। লীলাবতীর মাঝে সবাই সেই সঙ্গিনীর খোঁজ পেলেন। অতএব পরিচয় অন্তরঙ্গতায় গাঢ় হতেও দেরী হল না।

কিন্তু অলস আলাপ ও কল্পনা-বিলাসের নাগরদোলায় আরামে সময়ক্ষেপ লীলাবতীর জন্য নয়। অল্প দিনের মধ্যেই আপনার অন্তরের কথা ব্যক্ত করলেন তিনি। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল—সুফল পাবার পথে অন্তরায় ছিল না। সবাই পরম আগ্রহে গ্রহণ করলেন তাঁর পরিকল্পনা।

লীলাবতীর সঙ্গে একমত হয়ে সভা আহ্বান করা হল—সে এক পুণ্যময় দিন। পাঁচ-ছ' জন মহিলা যোগ দিলেন তাতে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল—মহিলা সমিতি স্থাপনের, জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্য হবে যার লক্ষ্য।

চেষ্টা-যত্ন-অনুরাগ পরিকল্পনাকে দেয় অভীষ্ট রূপ; উৎসাহ উদ্দীপনা-উচ্ছ্বাস তাতে জোগায় বিদ্যুদ্বেগ। বাধা-বিঘ্ন স্রোতের মুখে

শৈবালের মত ভেসে যায় তখন। অর্থের—কর্মকর্তার—কিছুরই অভাব ঘটে না। মন্ত্রশক্তিতে সব হয় যেন। এ ক্ষেত্রে হল তাই। পুরুষ দল যখনও পিছিয়ে আছেন, কার্যক্রম স্থির করতে পারেননি যখন—পথ-সন্ধানে ইতস্ততঃপরায়ণ,—করোলবাগে স্থাপিত হল মহিলা সমিতি।

ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র গুপ্তের সহধর্মিণী উষা গুপ্ত করোলবাগের বহু পুরাতন বাসিন্দা; তিনি রইলেন সমিতির পুরোধায়; তাঁদের পুত্রবধূ প্রনীতা হলেন সম্পাদিকা। গৌরীবালা গুপ্তকে কোষাধ্যক্ষ স্থির করা হল। কোন উচ্চাসনের মোহ ছিল না লীলাবতীর, তিনি রইলেন সাধারণ সভ্য।

কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য মহিলা দল সম্মিলিত হতে থাকলেন প্রতি সপ্তাহে—ডাঃ গুপ্তের বাড়ী। সেখানে আলাপ-আলোচনা চলত। মাসিক চাঁদাও সংগৃহীত হত সেই অধিবেশনে।

কিছু দিনের মধ্যে মহিলাদের মধ্যে কর্মিরূপে দেখা দিলেন—বিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, শান্তি মিত্র। সভ্যা-সংখ্যা পাঁচ থেকে উন্নীত হল পঁচিশে। সমস্ত করোলবাগে সে মহা চাঞ্চল্য!

লীলাবতীর মনে তবু শান্তি ছিল না। ঠিক এ রকমটি যেন চাননি তিনি; চেয়েছিলেন আর কিছু যা পশ্চাৎপটে ঢাকা পড়ে গেছে।

প্রকৃত কথা হল, গঠনমূলক চিন্তাধারা সবারের মধ্যে থাকে না! সর্বসাধারণ বাইরের আড়ম্বরে সহজেই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে; কথার চটক ফুলঝুরির তারা-ফুলের মত তাঁদের মুগ্ধ করে দেয়—কাজের ফটক দৃষ্টি হতে দূরে থেকে যায় তাঁদের। কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে সেই দুঃখ-বেদনা লীলাবতীর অন্তরে। সভা অঙ্গের কাছে যতখানি মনোলোভা, তাঁর কাছে তেমন নয়।

সময় বুঝে এক সাপ্তাহিক সভায় তিনি প্রস্তাব করে বসলেন,—জনকল্যাণ যদি আদর্শ ও নীতি হয়—ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করোলবাগ অঞ্চলে নেই, তার কি মহিলা সমিতি নিতে পারেন না?

অভিনবত্বের দাবী নিয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রস্তাব। সবাই যেন নতুন আস্বাদ পেলেন তার মধ্যে। অনেকের মনে হল, এ রকম অত্যাবশ্যক বিষয়টির প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন কেমন করে? নব জাগরণ এল মহিলা সমিতির—নব চেতনার হল উদ্বোধন।

আবার সভা হল। আবার কর্মচাঞ্চল্য করোলবাগকে আচ্ছন্ন করল। বন্যার জলধারা যেন প্রবাহ-পথ পেল! করোলবাগ বাঙালী বালক-বালিকা বিদ্যালয় তার অবদান।

কস্তুরবাঈ

নমিতা পালচৌধুরী

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সাল। মনে পড়ছে পাঁচ বছর আগের ঐ দিনটির কথা যেদিন নারীজাতির আদর্শস্বরূপা, ভারতের মহীয়সী মহিলা কস্তুরবা গান্ধীর বিয়োগ-ব্যথায় সারা ভারতবর্ষের বুকে কান্নার রোল উঠেছিল।

কস্তুরবার মৃত্যু—শহীদের মৃত্যু। পুণার আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দিকারায় তিনি অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তথাপি পরাধীন জাতির কাছে তখন এর চাইতে গৌরবজনক মৃত্যু আর ছিল না।

১৯৪৩ সালের ১১শে মার্চ্চ কস্তুরবার অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—এক সপ্তাহের ভেতর তিনি না কি দু'বার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তার পর যদিও তিনি সে আক্রমণ থেকে সেরে উঠলেন কিন্তু শরীর তাঁর অত্যন্ত দুর্ব্বল রইল। সেই সময় কস্তুরবার অনুরোধে ভারত সরকার তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের বন্দিনিবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য ভারতীয় জাতি যে অনুনয় করল—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাতে কর্ণপাতও করলেন না। কস্তুরবার অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগল এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৭টা ৩৫ মিনিটে তিনি স্বামীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। মৃত্যু-সময়ে তাঁর দুই পুত্র—হীরালাল ও দেবদাস এবং ভাই মাধবদাস গোকুলদাস উপস্থিত ছিলেন।

কস্তুরবাঈ রাজকোটের মেয়ে ছিলেন। এক গোঁড়া পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি জীবনে কখনও স্কুলে যাননি, এই জন্য বিবাহের সময় তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর গান্ধীজীর চেষ্টা ও যত্নে তিনি অতিকষ্টে সামান্য লিখতে এবং সরল গুজরাটী ভাষা পড়তে শেখেন। শেষ জীবনে কস্তুরবা লেখাপড়া শেখেননি বলে অত্যন্ত অনুতাপ করে গেছেন। প্রায়ই তাঁকে রিপোর্টারদের কাছে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। প্রথম জীবনে কস্তুরবা তাঁর অসম্পূর্ণতার জন্য অসুবিধা বোধ করতেন না; কিন্তু শেষ জীবনে তিনি গুজরাটী সংবাদপত্র পড়ে, রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁর ভাণ্ডারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। অতীত জীবনের ত্রুটি তিনি এই ভাবে সংশোধন করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সহজাত বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি গান্ধীদর্শনের মূলনীতি ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন।

কস্তুরবার বিনয়নম্র আচরণ, তাঁর একনিষ্ঠ সেবা ও অতুলনীয় ত্যাগ তাঁকে অসীম শক্তিসম্পন্না করে তুলেছিল। তিনি বরাবরই দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্না নারী ছিলেন। যদিও তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, তথাপি তাঁর এই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই তাঁকে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের নীতি ও তার আচরণে স্বামীর শিক্ষাদাত্রী হতে সমর্থ করেছিল।

তিনি গান্ধীজীর চল্লিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। নানা বিষয়ে গান্ধীজী তাঁর কাছে যথার্থই ঋণী ছিলেন।

তের বছর বয়সে কস্তুরবার বিবাহ হয়েছিল। তার পর থেকে তিনি শুধু স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগীই ছিলেন না—তিনি তাঁর সীমার ভেতর থেকে গান্ধীজীর বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকর কাজেও যোগ দিয়েছিলেন এবং কয়েক ক্ষেত্রে যেখানে গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন।

কস্তুরবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও প্রশংসনীয়। একবার গান্ধীজী অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকদের মতে দুধ পান করা তখন তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। অথচ গান্ধীজীর প্রতিজ্ঞা, তিনি দুধ পান করবেন না। সেই সঙ্কট সময়ে সকলেই যখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তখন কস্তুরবা তাঁর সহজ সরল বুদ্ধির প্রভাবে সেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সেই সময় থেকেই কস্তুরবার যুক্তি অনুসারে গান্ধীজী ছাগলের দুধ পান করা সুরু করলেন।

স্ত্রীরূপে কস্তুরবা তাঁর অন্তর ও আত্মাকে ভারতীয় সতী নারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সরলতা ও সেবায় তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যখনই গান্ধীজী কোনও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, তখনই কস্তুরবা এসে নিঃসংশয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রথম সত্যাগ্রহের সময় তিনি বলেছিলেন—"আমার মধ্যে কি এমন ত্রুটি আছে—যাহার জন্য আমি জেলে যাইবার-অযোগ্য? তুমি যে পথে অন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছ—সেই পথে আমিও যাইতে চাই।"

১৯১৭ সালে চম্পারণের গ্রামে গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন, তখন কস্তুরবা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই সময় তিনি অন্যান্য নারী-কর্মীর সঙ্গে সকল গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছিলেন। দরিদ্র নিরক্ষর জনগণের সেবা করবার এবং তাদের জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগও তিনি এই সময়ে পান। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০—৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে একাধিক বার কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯২২ সালে গান্ধীজী যখন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কস্তুরবাই তাঁর স্বামীর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন।

১৯১৫ সালে গান্ধীজী আমেদাবাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই মহৎ কাজে ও কস্তুরবা সর্বান্তঃকরণে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন। পরবর্তী কালে সবরমতী আশ্রম ও ওয়ার্ধা আশ্রমে তিনি অধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। সেবাগ্রামের জীবনধারা তাঁকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা দুষ্কর ছিল। তাঁর সেবা-যত্নে, অসীম ধৈর্য্যে ও নীরব আত্মদানে তিনি প্রকৃতই মহীয়সী নারী ছিলেন।

গান্ধীজী কস্তুরবাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়ে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যেও মতবৈষম্য ঘটতো। দু'জনের ভেতর সংঘর্ষ ও তীব্র বিরোধ পর্য্যন্ত ঘটে যেত। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর সমাপ্তি হতো স্বামীর কাছে কস্তুরবার আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে। কস্তুরবার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাই গান্ধীজীর ইচ্ছা ও আদর্শের কাছে মাথা নোয়াতে বালিকা কস্তুরবাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। গান্ধীজী নিজে স্বীকার করে গেছেন—প্রথম জীবনে তিনি ঈর্ষাকাতর স্বামী ছিলেন এবং কস্তুরবার জীবনও তিনি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। কিন্তু কস্তুরবার প্রতি গান্ধীজীর প্রগাঢ় অনুরাগই এর মূল কারণ।

অস্পৃশ্যতা ঘোচাবার জন্য গান্ধীজী যখন আন্দোলন সুরু করেছিলেন, কস্তুরবা তাতে প্রথমে যোগ দিতে পারেননি। তিনি গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে এসেছিলেন; সুতরাং অস্পৃশ্যতার সংস্কার তাঁর মনে স্বভাবতঃই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। অথচ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ গান্ধীজীর জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ—কাজেই পত্নীকে তিনি নিজের আদর্শে আনবার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে থাকেন। আফ্রিকাতে তিনি কস্তুরবাকে দিয়ে স্নানাগার ও প্রস্রাবের পাত্র পরিষ্কার করাতেন। এমন কি, জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁর বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রস্রাবের পাত্রই কস্তুরবাকে পরিষ্কার করতে হোত। তিনি এ সকল কাজ করতে ঘৃণাবোধ করতেন এবং বহু বার তাঁকে এ জন্য চোখের জলও ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীকে সুখী করবার জন্য তিনি তাঁর মনের এই সংস্কার ও অপছন্দগুলো প্রাণপণে জয় করবার চেষ্টা করতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ে সফলও হয়েছিলেন। তাঁর সফলতা প্রকাশ পায় হরিজন বালিকা লক্ষ্মীকে তাঁর পোষ্য কন্যারূপে গ্রহণ করার ভিতর।

কস্তুরবাকে জীবনে আরও একবার দুঃখভোগ করতে হয়েছিল। তিনি খুব গহনা পছন্দ করতেন। কিন্তু আফ্রিকায় থাকা কালীন তিনি নিজের সব গহনাই স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন; কেবল তাঁর পুত্রদের অলঙ্কারগুলি তিনি ছেড়ে দিতে রাজী হননি। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর তীব্র মত-বিরোধ উপস্থিত হয়—যদিও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে গান্ধীজীর ইচ্ছাই শিরোধার্য্য করতে হয়েছিল। কস্তুরবা গান্ধীজীর অভ্রান্ততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর মহত্ত্বও তিনি বুঝতে পারতেন। তিনি গান্ধীজীর জীবনে কোনও বাধা না হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

১৯০৬ সালে গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। কস্তুরবা এ বিষয়ে কোন আপত্তিই করেননি। এই ভাবে তিনি স্বামীর সকল কার্য্যেই তাঁর সহযোগিনী হয়ে উঠেছিলেন।

যদিও কস্তুরবা বহু বার কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, তথাপি ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তিনি যখন গ্রেপ্তার হন, তখন এই বন্দিদশা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে উঠেছিল এবং গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হন। এই সময়ে বন্দী-শিবিরে গান্ধীজীকে দেখতে পেয়ে তিনি বিনা ওষুধ-পত্রেই সেরে উঠলেন; কিন্তু তাঁর মনের তিক্ততা গেল না। তাঁর মেজাজ ক্রমেই খিট্‌খিটে হয়ে যেতে লাগলো এবং শরীর যে ভাবে নিঃশেষে ক্ষয় হ'য়ে যেতে লাগলো তা সত্যই বেদনাদায়ক। অবশেষে মৃত্যু এসে তাঁকে সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেল। মৃত্যুর কোলে তিনি শান্তি লাভ করলেন।

আদর্শ দম্পতি যুগলের কেউ-ই আজ জীবিত নেই, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রেমময়ী, কল্যাণময়ী কস্তুরবার জীবন-আদর্শ—তাঁর সেবাধর্ম্ম, নীরব আত্মত্যাগ যুগ যুগ ধরে আমাদের নারী জাতির আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবে। কস্তুরবা আমাদের নারীকুলের গৌরবস্বরূপ!

বন্দনং

শ্রীমতী খেলা দেবী

ভক্তি-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বন্দনা। ভক্তি নববিধ। এই তত্ত্বটি প্রচার করিলেন দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদ।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি।' অর্থাৎ শ্রীনারদ-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-সাধনই কলির জনসাধারণের পরম আশ্রয়। কিন্তু এই নারদ কে এবং কিরূপ? শ্রীভগবানই আদিগুরু জগদ্গুরু। শ্রীনারদ তাঁহার বাণীর বাহক ও প্রচারক। সেই জগদ্গুরুর প্রিয় শিষ্যটি তাঁহার নিকট হইতে একটি বস্তু আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন—যাহা একটি বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা দ্বারা কি হইবে? ইহা দ্বারা যাহা হইবে তাহা আর কখনও হয় নাই, হইবে কি না কে জানে? মোহ-মূর্চ্ছিত মানুষকে ভগবানের প্রতি টানিয়া লইবার জন্য মধুর বীণা-গুঞ্জন তুলিয়া তিনি পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহা ভিখারীর একতারা দোতারা কম্মাল

মহামন্ত্রেরই বিস্তৃত রূপ, নূতন সংস্করণ। শ্রীভাগবতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ শ্লোকে যে "সত্যং পরং ধীমহি" কথাটি রহিয়াছে তাহাকে বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর অঙ্গভূতা বলা হয়। শ্রীভাগবতের "ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ"—স্বার্থশূন্য নিষ্কাম ধর্ম্ম।

মানবের আত্মা যখন আনন্দে পূর্ণ হয় তখন তাহার প্রাণ হইতে আনন্দধারার উদ্দেশ্যে স্বতঃই বন্দনা জাগিয়া উঠে।

আদি মধ্য অন্ত ইত্যাদি ক্রম-ধ্যায় বিচার না করিয়া শ্রীভাগবতে এবং অন্যান্য গ্রন্থের যে স্থান হইতে যতটুকু ভাল লাগিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়া বন্দনা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম।

(১)

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ভাঃ, ১২।১৩।১

ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু যাঁহাকে (দিব্যৈঃ স্তবৈঃ) স্তবরাজি দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন (স্তুন্বন্তি), সামবেদীরা (সামগাঃ) যাঁহার সম্বন্ধে বেদাঙ্গ পদ ক্রম ও উপনিষৎসহ বেদসমূহের দ্বারা গান করিয়া থাকেন, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যানাবস্থায়, তদ্গতচিত্ত হইয়া (তদ্গতেন মনসা) দর্শন করেন, দেব ও অসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না (যস্যান্তং ন বিদুঃ) সেই দেবকে নমস্কার (দেবায় তস্মৈ নমঃ)।

(২)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

—ভাঃ, ১১।৫।৩৩

হে শরণাগতপালক, হে মহাপুরুষ তোমার চরণকমল সদা ধ্যানযোগ্য (ধ্যেয়), ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদিকৃত জীবের স্বরূপ তিরস্কৃতিরূপ লাঞ্ছনার নাশক (পরিভবঘ্নং), মনোরথপূরক (অভীষ্টদোহং) তীর্থ স্বরূপ, ব্রহ্মা-শিবাদিনমিত, আশ্রয়প্রদ, ভক্তজনের দুঃখহারী (ভৃত্যার্ত্তিহং) এবং ভবসমুদ্রের তরণী-স্বরূপ (ভবাব্ধিপোতং) তোমার চরণকমলকে বন্দনা করি।

(৩)

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

ত্রিভুবনকে উন্মত্ত করিয়া (উন্মদয়ন্) বেদকে মুখরিত করিয়া (শ্রুতিং মুখরয়ন্) তরুরাজিকে (ক্ষৌণীরুহান্) হর্ষান্বিত করিয়া, প্রস্তর সমূহকে বিগলিত করিয়া (বিদ্রবয়ন্) পশুদিগকে বিবশ করিয়া, গোবৃন্দকে উল্লসিত করিয়া, গোপগণকে ভ্রমান্বিত করিয়া (সম্ভ্রময়ন্—সং সম্যক্ ভ্রময়ন্), মুনিদিগকে পুলকিত করিয়া (মুকুলয়ন্), সপ্তস্বরকে মূর্চ্ছিত করিয়া (জৃম্ভয়ন্), প্রণবার্থ প্রকটিত করিয়া (উদীরয়ন্), গোপশিশুর (কৃষ্ণের) বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হউক।

(৪)

কং প্রতি কথয়িতুমীশে কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥

—পদাবলী

কালিন্দী-তটবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে (গোপতিতনয়াকুঞ্জে—গো অর্থে কিরণ, তাহার পতি যিনি তিনি সূর্য্যদেব। যমুনা দেবী সেই 'গোপতি'র তনয়া) পূর্ণব্রহ্ম গোপবধূগণের মনশ্চোররূপে বিরাজ করেন এ কথা কাহার নিকটই বা বলি আর কে-ই বা বিশ্বাস করিবে ইনি "ব্রহ্মগোপাল বেশ।"

যমুনা=ভক্তিযমুনা। তুলনীয়—"নমঃ বেণুবাদনশীলায় কালিন্দী-কূললোলায় গোপালায়।"—গোপালপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ

(৫)

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডম্
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্॥

ময়ূরপুচ্ছের চূড়ায় মনোরম শোভিত (বর্হ=ময়ূরপুচ্ছ; আপীড়=চূড়া; অভিরাম=মনোজ্ঞ), মৃগমদতিলকযুক্ত কুণ্ডলশোভিত গণ্ডশালী, পদ্মবৎ মনোজ্ঞ আঁখিযুক্ত (কঞ্জাক্ষং), কম্বুকণ্ঠী, সদা-হাস্য ও আনন্দময় বদন (স্মিত সুভগমুখং), অধরে ন্যস্ত বেণু, শ্যাম, শান্ত, ত্রিভঙ্গ, নবীনরবি কিরণসমোজ্জ্বল পীতবসনধারী, বৈজয়ন্তীমালাশোভী, বৃন্দাবনস্থ, ব্রজগোপীজনবেষ্টিত (অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মসিদ্ধা ব্রজগোপীদিগের ন্যায় সিদ্ধজনসেবিত) গোপাল বেশধারী ব্রহ্মকে আমি বন্দনা করি।

গোপীগণ মুনিপূর্ব্বা ও শ্রুতিপূর্ব্বা। তাঁহারা সচ্চিদানন্দঘন, নির্ম্মলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দেরই প্রহ্লাদিনী শক্তিবৃত্তিরূপিণী—'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা'—শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকণা ও আনন্দলীলাময়ী শ্রীমূর্ত্তি।

জন্মান্তরে তপঃসিদ্ধ মুনিগণ ভগবানকে মধুর ভাবে ভজনের কামনার ফলে কৃষ্ণসহচরী গোপীরূপে অবতীর্ণা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে:—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥"

—ভাঃ, ১০।৪৪।১৪

(মথুরার পুরনারীগণ বলিতেছেন) ব্রজাঙ্গনাগণ ধন্য, তাঁহারা না জানি কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা ব্রজভূমিতে বিচরণশীল নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ("নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষঃ বিক্রীড়য়ঞ্চতি [গচ্ছতি, চলতি] ব্রজভুবৌ," ভাঃ, ১০।৪৪।১৩), অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্য, স্বভাবসিদ্ধ যশ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আধাররূপ দুর্লভ সৌন্দর্য্য অনুক্ষণ দর্শন করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্যের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তথাপি:—

"যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।

গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানা।"

—ভাঃ, ১০।৪৪।১৫

বৃন্দাবন ধন্য, ব্রজগোপী ধন্য, যাঁহারা গো-দোহন অবহনন (ধান্যাদি কুট্টন), মন্থন, উপালেপ, ক্রন্দনশীল শিশুর দোলা-আন্দোলন, জলসেচন (উক্ষণ) এবং গৃহমার্জ্জনকালে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রুবর্ষী, শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্তা এবং তাঁহাতেই মনোনিবেশ হেতু সর্ব্ববিষয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিষয় গান করিয়া থাকেন সেই ব্রজরমণীগণ ধন্য। আবার—

"প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্।"

—ভাঃ, ১০।৪৪।১৬

প্রাতঃকালে (পূর্ব্ব বা গমন গোষ্ঠলীলায়) ধেনুগণের সহিত, ব্রজ হইতে বহির্গমন এবং সায়ংকালে (উত্তর গোষ্ঠলীলায়) ব্রজে প্রবেশ-কালে যাঁহারা বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণে সত্বরপদে বহির্গত হইয়া তাঁহার সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ সস্মিত বদনকমল দর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েন সেই সকল ব্রজবালা অতিশয় পুণ্যশালিনী (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত সৌভাগ্যশালিনী)।

বৃন্দাবনের ব্রজগোপবেশী শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন' (চৈঃ চঃ) এবং ব্রজকিশোরীরা তাঁহার আনন্দচিন্ময় লীলারসের পরিপুষ্টি ও সহায়কারিণী তাঁহারই অংশভূতা শক্তি। ব্রজবালাগণের এই অসামান্য সৌভাগ্যের মূলে রহিয়াছে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ও ভগবৎ-কৃপা বা তাঁহার নির্ব্বাচন বা বরণ—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (উপনিষৎ) যথা বাইবেল-তত্ত্ব—"The elect and chosen noes"

দুঃসাহস

শ্রীমতী নীলিমা সরকার

গরজি উঠুক বিশাল সাগর উদ্দাম কলরোলে;
তরণী আমার শত তরঙ্গে নাচুক প্রলয় দোলে।
কাল বোশেখীর করাল ভ্রূকুটি
ঝড়ের অট্টহাসে,
কাঁপিবে না কর ত্রাসে।
তুলি দিব পাল, ধরি রব হাল,
জানি তুমি আছ পাশে।

ডোবে যদি মোর ছোট ডিঙাখানি,
জানিও তাহাতে ভয় নাহি মানি;
দিন যাবে মোর সাগরের তলে
উজল মুকুতা-দেশে,
যেথায় আপন মূল্য গর্ব্ব ভুলিয়া
ঝিনুকের কোলে দুলিয়া দুলিয়া
ঘুমায় মুকুতা আপনা ভুলিয়া
বালুকণা সাথে মিশে।

(আমি) একেলা বসিয়া সেথা জলতলে,
রতন প্রবাল লইয়া আঁচলে,
মালা গেঁথে গেঁথে দিব গো ভাসায়ে
কল্লোলে কল্লোলে।
আকাশে, ভূতলে, ভূধরে সাগরে
যেথা ল'য়ে যাবে মোর হাত ধরে',
দ্বিধা নাহি কোন জানি আমি সে যে
তোমার খেলার ছল;
তাই ত আমার মুখে হাসি ফোটে;
নয়নে অশ্রুজল।

সরোজিনী নাইডু

শ্রীধর কথক

এগার বৎসর বয়সের এক সুশ্রী বালিকা বীজগণিতের একটি দুরূহ অঙ্ক কষিতে অসমর্থ হইয়া ইংরাজীতে এক ছত্র কবিতা রচনা করিল, এই ভাবে ভারতের বুলবুল শ্রীমতী সরোজিনীর কাব্য-জীবন আরম্ভ হইল; খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সরোজিনী তাঁহার মাতা বরদাসুন্দরী দেবীর কাব্য-প্রতিভার উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ১৩ বৎসর বয়সে সরোজিনী একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য ও নাটিকা রচনা করেন। ইহার পূর্বে বার বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া তিনি সারা দেশে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সরোজিনীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হায়দরাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় হায়দরাবাদে নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের আদি বাসস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও। সরোজিনীর ভাই-বোনেরা সকলেই পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ বিপ্লবী হিসাবে দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা হারীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তাঁহার ভগিনী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন।

নিজামের বৃত্তি লইয়া ১৬ বৎসর বয়সে সরোজিনী শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা ছাত্রী। তিন বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সরোজিনীর কাব্য-প্রতিভা ইংলণ্ডের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এডমণ্ড গস্ ও আর্থার সাইমন্স প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকগণ সরোজিনীর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এডমণ্ড গস্ তাঁহাকে পাশ্চাত্য ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ না করিয়া কাব্যের মধ্যে ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী সময়ে সরোজিনীর কাব্যে ভারতীয় ভাবধারা ও ভারতের অতুলনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য শতদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠে। কাব্যের মধ্য দিয়া স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে শ্রীমতী সরোজিনী অদ্বিতীয়া। ছন্দ-মাধুর্য্য ও ভাব-কান্তিতে তাঁহার কবিতা কিরূপ অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নোক্ত কাব্যাংশ হইতে তাহা বোঝা যাইবে।

"O brilliant blossoms,
that strew my way,
You are only woodland flowers,
they say.

But I sometimes think that Perchance you are
Fragments of some new fallen star,
Or golden lamps for a fairy shrine
Or golden pitchers for a fairy wine."

১৯০৫ সালে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড' প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ১৯১২ সালে 'দি বার্ড অফ টাইম' ও ১৯১৭ সালে 'দি ব্রোকেন উইং' প্রকাশিত হয়। এডমণ্ড গস্ তাঁহার কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন, "হিন্দুস্থানের যাঁহারা ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্মধী ও মৌলিক।"

পরবর্তী জীবনে সরোজিনী কাব্যের মানসালোক হইতে রাজনীতির বাস্তব-জগতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল কর্মে কবি সরোজিনীর ছাপ সুস্পষ্ট। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ১৮৯৮ সালে ডাঃ গোবিন্দরাজলু নাইডুকে বিবাহ করেন। সে যুগে ব্রাহ্মণ-কন্যা সরোজিনীর পক্ষে মাদ্রাজদেশীয় এক অব্রাহ্মণ ডাক্তারকে বিবাহ করা খুবই সাহসের পরিচায়ক। নিজের বিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও আমি অব্রাহ্মণকে বিবাহ করিয়াছি। সমাজের কোন অস্বাভাবিক গণ্ডী আমি

স্বীকার করি নাই। সমাজের সমস্ত যুক্তিহীন প্রথার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করিয়াছি।" তাঁহার স্বামী ডাঃ নাইডু হায়দরাবাদ সরকারের চিকিৎসা বিভাগের কর্তা। সরোজিনীর পারিবারিক জীবন খুবই শান্তিময় ছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে পদ্মজা নাইডু জনসেবার ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

পরাধীন দেশের দুহিতা সরোজিনী কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়া ও নিভৃত পরিবেশে সুখনীড় রচনা করিয়া দিন কাটাইতে পারেন নাই। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা ও পরাধীনতার জ্বালা তাঁহার স্পর্শ-কাতর, সংবেদনশীল চিত্তে আগুন ধরাইয়া দেয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিলে কবি হিসাবে জীবনে তিনি অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারিণী হইবেন, কিন্তু তাহাতে পরাধীন সর্বহারা জাতির দুঃখ-দুর্দশার অবসান হইবে না। ভারতের বুলবুলের কণ্ঠ স্তব্ধ হইল—সরোজিনী সক্রিয় ভাবে ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। অ্যানী বেশান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি নেতা হিসাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে মহাত্মা গান্ধী-নির্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়াই তিনি অগ্রসর হন। রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের পর তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাগ্মী হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা ভারতের সহস্র সহস্র নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যোগদানের পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সরোজিনীর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হন। শ্রীমতী সরোজিনী সুললিত কণ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারিতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার কালেও তিনি চমৎকার হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই জন্যই তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হইয়া উঠিত। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পর সরোজিনী সংবাদপত্রে ইহার তীব্র সমালোচনা করেন। তদানীন্তন ভারত-সচিব তাহার প্রতিবাদ করিলে উভয়ের মধ্যে কয়েক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ১৯২৫ সালে শ্রীমতী সরোজিনী কানপুর কংগ্রেসে সভানেত্রীত্ব করেন। আজ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন নাই। বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করেন। সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন, "ভয় ও দুর্বলতাই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বপ্রধান শত্রু। আমাদিগকে সর্বপ্রথমে ভয় ও দুর্বলতার উপর জয়লাভ করিতে হইবে।" তাঁহার ভাষণে তিনি দেশবাসীকে অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান জানান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট ভারতের দাবী সম্পর্কে প্রচারকার্য্য করার জন্য ১৯২৮ সালে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবীর কথা প্রচার করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। পর-বৎসর তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করার জন্য আহুত হন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রীযুক্তা নাইডু এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও আব্বাস তায়েবজী
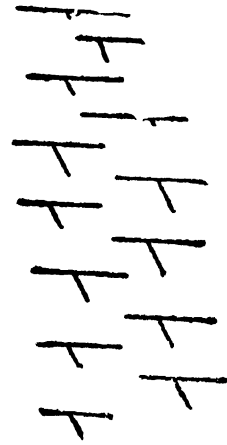
গ্রেপ্তার হইবার পর তিনি অতুলনীয় সাহস ও দক্ষতার সহিত আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার নেতৃত্বে দর্শনায় লবণ-গোলা আক্রমণ ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা দাবী করার জন্য তাঁহাকে কয়েক বার কারাগারে গমন করিতে হয়। কিন্তু কোন বাধা-বিঘ্নই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। প্রাণশক্তিতে ভরপুর শ্রীযুক্তা নাইডুর সরস কথাবার্ত্তা ও হাস্য-পরিহাসে কারাগারের অন্ধকার কক্ষ প্রাণময় হইয়া উঠিত। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ভারতের নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সরোজিনী বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবার পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন ও কারারুদ্ধা হন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট-বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি গ্রেপ্তার হন। কারাগারে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে কয়েক মাস পরে মুক্তি দেওয়া হয়। শ্রীমতী সরোজিনী বহু বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় বরাবর তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, শ্রীযুক্তা নাইডু যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত এই দুরূহ কার্য্যভার সম্পাদন করেন। গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া তিনি রহস্য করিয়া বলেন, মুক্ত বিহঙ্গীকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তিনি ভারতের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি বরাবর কাজ করিয়া গিয়াছেন। মৌলানা সৌকত আলী একবার বলিয়াছিলেন যে হিন্দুদের মধ্যে শ্রীযুক্তা নাইডু ভারতীয় মুসলমান সমাজের সর্ব্বাধিক আস্থাভাজন। তিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। দেশকে গভীর ভাবে ভালবাসিলেও তিনি কোন দিন সংকীর্ণ জাতীয়তার সমর্থন করেন নাই। মতামতে ও কার্য্যকলাপে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক। ভারতের নারী-জাগরণে তিনি এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন পর্দাপ্রথা, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন করেন। তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস করিতেন। ভারতের নারী সমাজের সমানাধিকারের দাবী লইয়া তিনি বহু দিন যাবৎ আন্দোলন করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে কংগ্রেসে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী গৃহীত হয়। ভারতীয় নারী সমাজের দাবী লইয়া তিনি বিলাতেও আন্দোলন করেন। একাধিক বার তিনি নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন। নারীর আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভারতীয় নারীকে প্রতি গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে। সেই অগ্নিতে গৃহচুল্লী, পূজার হোম ও পুরুষদের অন্ধকার পথ আলোকিত হইয়া উঠিবে"। সরোজিনী ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। তাঁহার জীবন ছিল আনন্দোজ্জ্বল। জীবনে কোন অবস্থাতেই তিনি হাস্য-পরিহাস করিতে ভুলিতেন না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, আমার দেহাবসানের পর আমার স্মৃতিস্তম্ভে যেন এই কথা লিখিয়া রাখা হয়—'She loved the youth of India.' পারিবারিক জীবনে তিনি কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী ও স্নেহময়ী জননীর কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। সামাজিক জীবনে সরোজিনীর আতিথেয়তার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল। তাঁহার পিতা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনকে আদর-আপ্যায়ন করিতে খুব ভালবাসিতেন। সরোজিনী উত্তরাধিকারসূত্রে এই গুণের অধিকারিণী হন। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় কাব্য-প্রতিভা ও বাগ্মিতাশক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার ফলে সরোজিনী বিশ্বের নারী সমাজে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। বিগত ১লা মার্চ রাত্রে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর জীবন-দীপ নির্বাপিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত কর্মবহুল জীবন-কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ছাত্রদের প্রতি সরোজিনী

"You have inherited great dreams. You have had great duties laid upon you. You have been bequeathed legacies for whose suffrage and whose growth and accumulation you are responsible. It does not matter where you are and who you are. Even a sweeper of streets can be a patriot. You can find in him a moralising spirit that can inspire your mind. There is not one of you who is so humble and so insignificant that you can evade the duties that belong to you, that are predestined to you, and which no body but you can perform. Therefore each of you is bound to dedicate his life to the uplifting of his country."

—SAROJINI NAIDU
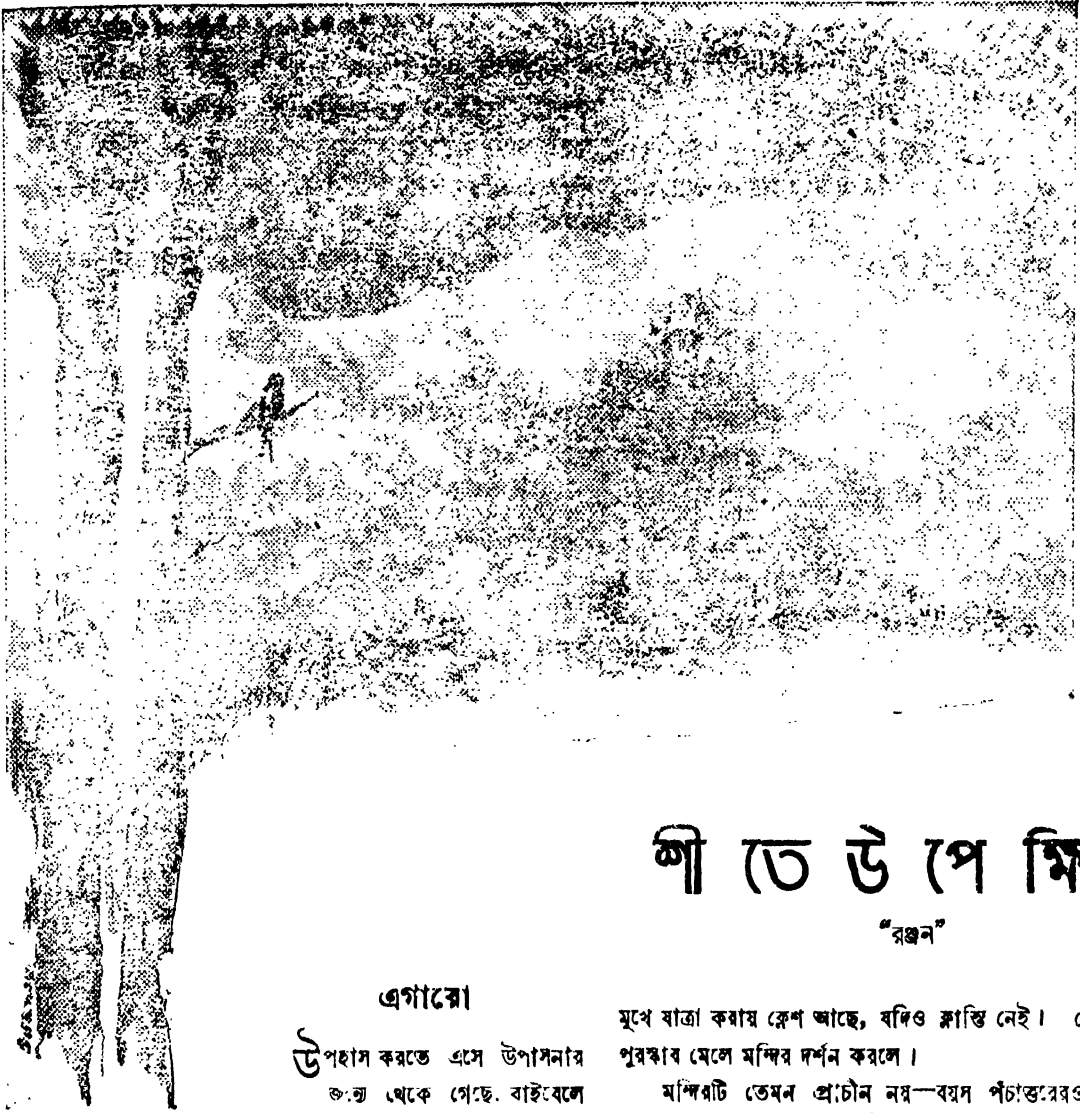
শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

এগারো

উপহাস করতে এসে উপাসনায় জন্য থেকে গেছে, বাইবেলে এমন লোকের উল্লেখ আছে। আমার ভাগ্য তার ঠিক বিপরীত। আমি যাই উপাসনায়, ফিরি উপহাস করে। আমি যাই দেবদর্শনে, ফিরি মন্দির পরিদর্শন করে।

মহাকালে সেই নেপালী ভদ্রলোকের মুখে মিলা রেপার কাহিনী শুনছিলেম মন দিয়ে। কিন্তু যেই মাত্র কাহিনীর একটা অংশ একটু মাত্র অবিশ্বাস্য মনে হল অমনি তাকিয়ে দেখলেম বৃষ্টি থেমেছে কিনা। কমেছে দেখেই ফিরে এলেম ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে। তাঁর অবিচল বিশ্বাসের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরেছিলেম, এমন বললে মিথ্যা বলা হবে।

কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপিত হয়েছিল অনেকখানি। ভদ্রলোক সম্বন্ধে ততটা নয়, যতটা তাঁর বিশ্বাস তাঁর লক্ষ্য সম্বন্ধে।

তাই গিয়েছিলেম ঘুমের মনাষ্টেরি দেখতে। চার মাইল দূরে দার্জিলিং থেকে প্রায় ছ-শ' ফিট উপরে অবস্থিত এই তিব্বতী মন্দিরটির খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত। ওল্ড ক্যালকাটা রোড ধরে পথ আরোহণ করতে করতে চোখে পড়ে পথের দু'ধারে অসংখ্য প্রস্তর-খণ্ড, ১৮৯৯ সালের ল্যাণ্ডস্লাইডের সাক্ষ্য ওরা। আঁকা-বাঁকা অনেকগুলি রাস্তা অতিক্রম করে ঘুম বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করায় ক্লেশ আছে, যদিও ক্লান্তি নেই। ক্লেশের পর্য্যাপ্ত পুরস্কার মেলে মন্দির দর্শন করলে।

মন্দিরটি তেমন প্রাচীন নয়—বয়স পঁচাত্তরেরও কম। মাত্র তিরিশ বছর আগে চম্প বা মৈত্রেয় বৌদ্ধের মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রের ষোলখানি গ্রন্থ। দর্শকের চিত্ত চমৎকরণের জন্যে ওখানে এমন বলবারও লোক রয়েছে যে, মূর্তির ভিতর শুধু পুঁথিই নেই, হীরা মাণিক্যও সঞ্চিত আছে অজস্র। আমার গাইডের মতে এতে মূর্তির মূল্য নিশ্চয়ই বহু গুণ বর্ধিত হয়েছে।

স্বল্পালোকিত এই মন্দিরটির ভিতরের চারটি দেয়ালই পুঁথি কিম্বা দীপ দিয়ে ঢাকা। সেই অসংখ্য প্রদীপগুলিতে তেল দেবার জন্যে নিযুক্ত আছে কয়েক জন পীতপরিহিত পুরোহিত। দীপ অনেকগুলি জ্বলছে কিন্তু তবু মন্দিরের ভিতরের বেশির ভাগ জায়গাই অন্ধকার। শুধু মাঝখানে—যেখানে সুবৃহৎ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত—সেই স্থানটি আলোকে উজ্জ্বল। সে আলো প্রদীপের না মূর্তির, আজো তা শপথ করে বলতে পারব না।

মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র নিজের অজ্ঞাতসারে যে অবর্ণনীয় অনুভূতি দ্বারা আচ্ছন্ন হতে হয় তার প্রকাশের চেষ্টা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অপরের উপলব্ধির জন্যে অনুভূতির ভাষা দিতে হয় অনুরূপ অনুভূতির প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু যে অনুভূতি একেবারেই অনন্য, যার সঙ্গে আর কোনো আনন্দ-বেদনা-বিস্ময়ের

সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই, তাকে বোঝাব কেমন করে? এই মন্দিরের গঠনচাতুর্যের বর্ণনা দিতে পারি, এখানকার পুরোহিতদের ধূসর বেশের সর্বাঙ্গবিন্যাস নিয়ে বাক্যবিন্যাস করতে পারি, এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির বৃহতী আকৃতি বা মহতী প্রকৃতি নিয়ে বিস্তার করতে পারি বাগ্‌জাল, কিন্তু তাই দিয়ে আমার অনুভূতির রহস্যের সামান্যই সঞ্চারিত হবে আর কারো মনে।

সে সময় নৈঃশব্দ্য এই মন্দিরে যে ভাষায় কথা কয় তার মর্ম আমি জানিনে, তার অনির্দেশ্য রূপ আমার দৃষ্টিতে ধরা দেয় না, চতুর্দিকের পুঁথিপুঞ্জের লিখিত জ্ঞানের অধিকাংশই আমার বুদ্ধিবহির্ভূত, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আমার বোধবহির্ভূত। কিন্তু, হায়, সেখানেই বা শেষ করে দিতে পারি কই! যে-অনুভূতির ভাষা নেই, রূপ নেই, এমন অনুভূতি তবু কেন আচ্ছন্ন করে আমার সমগ্র সত্তাকে? ফলে যা নাকি অর্থপূর্ণ তারও অর্থ বুঝিনে—এদিকে আর সব কিছুকে মনে হয় অর্থহীন বলে।

তাই ফিরে গেলেম মহাকালে, সেই নেপালী বন্ধুর সন্ধানে। না জানতেম তাঁর নাম, না তাঁর ঠিকানা।

সেই একই জায়গায় গিয়ে তৃতীয় দিন একই সময়ে অপেক্ষা করছিলেম। সেখানে হিমালয়ের নানা শৃঙ্গের যে বিশদ মানচিত্রটি আছে, তাই দেখছিলেম। কোনটির কত উচ্চতা আর কোনটির অবস্থান কোথায়, তার নির্দেশ আছে এই মানচিত্রে। আমার আশ্রয়টির কিছু দূরেই ছিল মহাকাল গুহার মোহানা। এ-গুহা কোথায় গেছে জানিনে। কেউ কেউ বলে এই সুড়ঙ্গের পথে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়া যায়। এ নিয়ে যে মতভেদ আছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, আধুনিক ইতিহাসে কেউ সাহস করেনি এ-পথে লাসা যাবার চেষ্টা করতে।

সেই গুহারই মোহানার দিক থেকে হঠাৎ সেই নেপালী ভদ্রলোক কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে হেসে বললেন, "কি, এ পথে লাসা যাবেন নাকি?"

আমি হেসে বললেম, "তিন দিন আগে ঘুমে গিয়েছিলেম হেঁটে, তারই পায়ের ব্যথা এখনো যায়নি।"

"হঠাৎ ঘুমে যে?"

"এমনি।" আর কিছু বলতে পারলেম না।

"কী দেখলেন?"

যা দেখেছি তার চাইতে যা দেখিনি, তাই যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা বলতে পারলেম না। যে-সংশয় নিয়ে ঘুম থেকে ফিরেই মহাকালে এসেছিলেম এই বিশ্বাসীরই সন্ধানে, তার কথাও বলতে পারলেম না। আমার কাছ থেকে তাঁর সহজ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, "মন্দিরে প্রার্থনা করতে পূজারী হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু মুজিয়ম দেখতে দর্শক তো যায় গাড়িতে! আপনি কেন পায়ে ব্যথা করতে গেলেন?" ভদ্রলোকের মৃদু হাসিতে স্নিগ্ধ কৌতুক ছিল, কিন্তু কঠোর শ্লেষের আভাস মাত্র ছিল না। আমি চুপ করে রইলেম। ভদ্রলোকও।

আমার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছিল অনেকগুলি অন্ধ, অস্পষ্ট অস্বস্তি। অপর দিকে আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকের আনন ছিল গভীর শান্তির নিশ্চিত আলোয় উদ্ভাসিত। কোথায় পাবো এই শান্তির সন্ধান? কে আমায় বলে দেবে? আমার না আছে আত্মসচেতনতা পরিহার করে আত্মসমর্পণ করবার বিনয়, না আছে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা জয় করে পুরোপুরি আত্মসচেতন হবার সাহস। আমি নিজেকে করি অবিশ্বাস, ঈশ্বরে করি সন্দেহ। আমার পাখা নেই আকাশে ওড়বার মত, শিকড় নেই ভূমিতে স্থির হবার মত। ডাঙায় আমি হাঁপিয়ে উঠি, জলে নামতে পারিনে সাঁতার জানিনে বলে।

ভদ্রলোক স্থিরনেত্রে দূরের হিমালয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন, কেন না ধীর স্বরে যা বললেন, তা আমার উদ্দেশে বলার কোন কারণ ছিল না। তার ভাষা আমি জানিনে। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পৌঁছোতে পারব, কি বলেন?"

"কোথায়?"

"সেদিন বললেম যে, ওই হিমালয়ের শীর্ষের কাছাকাছি।"

"কেন যাচ্ছেন অত দূর? এই বয়েসে?"

"কেন?, না গিয়ে পারব না বলে।" একটু হেসে যোগ করলেন, "অনেক দিন তো অপব্যয় করেছি অজ্ঞানের অন্ধকারে মিথ্যার ধাঁধাঁয়। এবারেও কি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তির সন্ধান করবার সময় হয়নি?"

এই উক্তির পৃথক কথাগুলির অর্থ আমার অজানা নয়, কিন্তু এর সামগ্রিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য নেই আমার। বললেম, "বুঝলেম না কিছু।"

"আমিই কি ছাই বুঝি? আর, বুঝিনে বলেই তো চলেছি ওদিকে, যাতে অন্তত চেষ্টা করতে পারি বুঝবার।"

"কিন্তু ওখানে উঠে যদি বুঝতে হয়, তাহ'লে তো ভয়ের কথা! পৌঁছোবার আগেই তো…" আমি শেষ করতে গিয়ে বুঝলেম যে, যা বলতে যাচ্ছিলেম, তা বলার নয়। বিব্রত বোধ করলেম।

ভদ্রলোক কিন্তু আদৌ বিব্রত হলেন না, "বুঝেছি কি বলতে যাচ্ছিলেন।" হেসে বললেন, "আর শেষ হলেই বা কি! এ তো শেষ নয়, যতি মাত্র, আবার সুরুর আগে একটু বিরাম শুধু। একবার মৃত্যুর দরজা দিয়ে কোনক্রমে বেরিয়ে গেলেই যদি মুক্তি পাওয়া যেত তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি? তা'হলে তো সারাটা জীবন ওই গ্রিভায় বা ভুটিয়া-বস্তীতে কাটিয়ে দিলেই হত! না, অত সোজা নয়, অত সোজা নয়।"

পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাসও করিনে, অবিশ্বাসও করিনে। কিন্তু এই জীবনটার জন্মেই সুরু এবং মৃত্যুতেই শেষ—তার আগেও অর্থহীন মহাশূন্য এবং তার পরেও অর্থহীন মহাশূন্য—এই কথাটাও মেনে নিতে বাধে। যা নিজেই ভাল করে জানিনে, তা নিয়ে কিছু বললেম না আর। শুনতেই ভাল লাগছিল।

"আমাদের অস্তিত্ব যদি হয় বিরাট একটা গ্রন্থ, তাহলে এই মনুষ্য-জীবন তো তার মাঝামাঝি একটা অধ্যায় মাত্র। আগের আর পরের অধ্যায়গুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে মাঝের অধ্যায়ের অর্থ খুঁজতে গেলে জীবনকে যে অর্থহীন মনে হবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে?"

"কিন্তু দু'টোই যে অজানা।"

"জানতে হবে, এইটেই তো আমার ধর্মের গোড়ার কথা! ভগবান বুদ্ধের বাণীর মধ্যে যা চতুঃসত্য নামে বিখ্যাত, তার ভিত্তিই

হচ্ছে জ্ঞান, উপলব্ধি। মানব-জীবনের বৃহত্তম সমস্যা যে দুঃখ, তার সাময়িক নিরসনের জন্তে আপনার সভ্য জগতে অ্যাস্পিরিন আছে অসংখ্য কিন্তু সেই সর্বব্যাপী দুঃখের অবসানের জন্তে কোন চিকিৎসা জানা নেই সে জগতের। তার কারণ দুঃখের কারণই যে তাদের কাছে অজ্ঞাত। তাই রোগের বাইরের উপসর্গের উপশমের জন্ত আপনারা উদ্ভাবন করেছেন নানা পানীয়, নানা দৃশ্য, নানা খাদ্য, নানা ভোগ্য। কিন্তু রোগের কারণ যার জানা নেই, সে রোগের বারণ করবে কি করে।"

এই কথাগুলি অনায়াসেই সর্বজ্ঞতার দম্ভের মত শোনাতে পারত। কিন্তু শোনায়নি। স্নিগ্ধ আন্তরিকতার সুরটি কানে বড়ো মধুর হয়ে বাজছিল। কেন না অপরের অজ্ঞানতায় অসহিষ্ণুতা ছিল না বক্তার মনে, ছিল সবেদন অনুকম্পা।

"আর এই কারণ জানিনে বলেই তো জন্মচক্র নিরন্তর ঘুরে চলেছে, থামছে না। তাই আমি আকুল, আপনি ব্যাকুল, দু'জনেই অস্থির। আপনি এসেছেন দার্জিলিঙে, আমি চলেছি আরো উপরে।"

আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে এমনিতর মন্তব্যে অল্প সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেম। এখন সে সব কথা মনে ছিল না। প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে আপন মনে বললেন, "আপনি অন্তত জানেন যে কিসের সন্ধানে যাচ্ছেন, আমি যে কেন এসেছি, তাও জানিনে, যদিও ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে এল।"

"আমিও যে ঠিক জানি, এমন বলবার ঔদ্ধত্য নেই আমার। তবে সম্প্রতি আমার দাদার কাছে যে ক'টি সূত্র শিখেছি, তার সাহায্যে জানতে চেষ্টা করছি, এইটুকুই বলতে পারি।"

আমার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ছিল।

"সংক্ষেপে বলতে গেলে সূত্র চারটি, প্রথম সুস্পষ্ট এবং একেবারে অনস্বীকার্য সত্য হচ্ছে দুঃখ। সকল প্রকার জীবনেরই, অস্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে দুঃখ। এই দুঃখ এড়াবার উপায় নেই, এ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। জন্মচক্রের প্রতি স্তরে অপেক্ষা করছে এই দুঃখ। তাই জন্মচক্রের মধ্যে আনন্দের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ যেন অন্ধকার ঘরে চোখ বুঁজে অনস্তিত্ব কাল বিড়ালের অন্বেষণে হাতড়ে বেড়ান। অনস্তিত্ব কাল বিড়ালটি হচ্ছে আনন্দ, অন্ধকার ঘরটি হচ্ছে জন্মচক্র আর অন্ধ সন্ধান হচ্ছে মানুষের অন্ধ বাসনা।

"দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞান, এইটিই হল দ্বিতীয় সূত্র। এ কিসের অজ্ঞান? এ অজ্ঞান আমাদের পারিপার্শ্বিক সব কিছুর সত্যকার প্রকৃতি সম্বন্ধে, আমাদের সঙ্গে সেই সবের সম্পর্কের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে। এই অজ্ঞান শুধু অজ্ঞতা নয়, তাই এ থেকে মুক্তিও শুধু অধ্যয়নে নেই। এই অজ্ঞানের উত্তর হচ্ছে জ্ঞান আর জ্ঞানের গোড়ার কথাই হচ্ছে উপলব্ধি। জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে দূর করতে হবে আর অজ্ঞান দূর হলেই দুঃখ দূর হবে। এই হল তৃতীয় সূত্র। চতুর্থ সূত্রটি এ থেকে অভিন্ন এবং তেমনি সহজ। তা হচ্ছে আমার উপমার সেই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া, জ্ঞানের দ্বার দিয়ে অজ্ঞানের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে উপলব্ধির মুক্ত আলোয় চোখ খোলা। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের অবলোপসাধন হলেই অবসান হবে অন্ধ বাসনার, অন্ধ বাসনা নিঃশেষ হলেই শেষ হবে অন্ধ কর্মের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি, আর তার সঙ্গেই থামবে জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তন। কেন না, সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের প্রতি কাজেরই উৎস হচ্ছে কোন না কোন বাসনা আর প্রতি বাসনাই তো অজ্ঞানের সন্তান। কর্মের শেষ হলে জন্মচক্রের ঘূর্ণনেরও শেষ হতে বাধ্য, কেন না পরিপূর্ণ জ্ঞান যেখানে বিরাজ করবে সেখানে তো সব কিছু পূর্ণতা লাভ করেছে, সেখানে আর পরিবর্তনের অবকাশ কোথায়? সেই যে কর্মাতীত, স্থির, অপরিবর্তনীয় পূর্ণতা, তাকেই বলি মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ।"

ভদ্রলোক আবার দূরের হিমালয়ের পানে তাকালেন।

তাঁর তর্করীতি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারি এমন সাধ্য নেই আমার; কিন্তু তাঁর কাছে যে এই যুক্তি নিতান্তই সহজ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুদ্ধি আমার চাইতে তীক্ষ্ণ, একথা স্বীকার করতে বাধে; কিন্তু তাঁর বোধ যে সহস্রগুণ সূক্ষ্মতর, সেকথা অস্বীকার করতে পারলেম না। বুদ্ধির সর্বক্ষমত্বে সন্দেহ জন্মেছিল আগেই, তাই বোধকে অবজ্ঞা করবার দুর্বুদ্ধি আর নেই। আর, সাধারণত এ দু'য়ে যে সন্ধিবিহীন বিরোধ আছে বলে মনে করা হয়, তাও ঠিক বলে মানিনে। কোনো যুক্তি আমার বুঝবার মতো সহজ নয় বলেই তাকে অসত্য বলে ঘোষণা করব, এমন ঔদ্ধত্যও আজ আর নেই।

"কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য যত সহজে বিবৃত করে গেলেম, তার সিদ্ধি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। বহু সংখ্যক পর্যায় অতিক্রম করতে হয় বহু জন্মের বহুতর সুকৃতির মধ্য দিয়ে, তবেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। মিলা রেপার মতো অসাধারণ শক্তি তো আর সকলের নেই যে, কিণ্ডারগার্টেন থেকে সোজা সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হবে। তাই আমাদের দুর্গম, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে প্রতি মুহূর্তের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। শর্ট কাট নেই স্বর্গের।"

ভদ্রলোকের বিশ্বাস-বিশুদ্ধ চিন্তাধারা যে আমার কাছে এ-পর্যন্ত স্বচ্ছ স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল তা নয়, অনেকটাই তার বুঝিনি, কিন্তু এই জন্মপর্যায়ের কথা যদি মেনেও নিই, তাহলেও প্রশ্ন থাকে তার পর কি? অজ্ঞান নেই, অতএব বাসনা নেই, অতএব কর্ম নেই, অতএব আর জন্ম নেই—কিন্তু তার পর? নির্বাণোত্তর স্থিতির রূপটা কি রকম? আমার প্রশ্ন নিবেদন করলেম।

"জানিনে। জানলেও হয়তো বলতে পারতেম না। নির্বাণোত্তর অবস্থার সঙ্গে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার এতটুকু মিল নেই কোনোখানে। জাগতিক পরিভাষায় তার বর্ণনা হবে কি করে? বর্ণনা করতে গেলেই হাস্যকর হবে। দেখুন না, আমাদের পরিকল্পিত স্বর্গের চেহারাটা কেমন। দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা করুন তার কোন স্বর্গে সাধ। সে বলবে, এমন জায়গা যেখানে অভাব নেই, যেখানে সে যা চাইবে তাই পাবে। তাকে যদি বলি, স্বর্গে অভাব নেই, কেন না প্রয়োজন নেই; পাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর কেন না চাওয়াই নেই, সে নিশ্চয় বলবে—অমন স্বর্গে তার কাজ নেই। ইসলামী স্বর্গের সহজলভ্য বস্তুগুলির তালিকা আপনি জানেন নিশ্চয়ই—সে তো স্বর্গ নয়, সে শুধু কামনা-কণ্টকিত এই পৃথিবীরই রাজসংস্করণ। ঠিক তেমনি নির্বাণের পরের নিরস্তিত্ব স্থিতির কথা বললেও এমনি হাস্যকর হবে।"

আমার নির্বোধ প্রশ্নের জন্ত লজ্জিত হলেম।

"আমাদের স্বর্গের কল্পনা রূপায়িত হয় আপন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। এই চিরন্তন আমিত্বই যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে সে নিরবচ্ছিন্ন

উপর নির্ভরশীল সব কিছুও তো সমান ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই আমিত্বই তো মুক্তির বৃহত্তম অন্তরায়, এর অবসানই তো নির্বাণ।"

এখানে এসেই পূর্বেও বহুবার ঠেকেছি। আমি নেই, অথচ আমারই নির্বাণ; আমার শেষ হলে যার শুরু, সে কে? আর আমিই যদি না রইলেম, তাহোলে আর কার কি হোলো বা না হোলো তাতে আমার কী? এই যে পরিপূর্ণ আমি-স্বাধীন চিন্তা এতে আমি একেবারেই অক্ষম। আমার সকল চিন্তা সকল কর্মের উপর আমার ব্যক্তিত্ব প্রক্ষিপ্ত হয় সকল সময়। বাকি পৃথিবী থেকে সেই ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি পৃথক নয়, তার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আছে, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক পৃথিবীর অস্তিত্বই নেই আমার কাছে। আমি গেলে আমার আর রইল কি?

অসম্বদ্ধ ভাষায় আমার অসম্বদ্ধ সন্দেহ জানাতে ভদ্রলোক বললেন, "এই নির্ব্যক্তিক অস্তিত্ব যে কি তা ঠিক আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না বোধ হয়। তবে কয়েক বছর আগে এক ইংরেজ পর্যটক এসেছিলেন এদিকে; তাঁর লামা এবং আমার লামা একই লামার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাই এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনিও এসেছিলেন অবিশ্বাস নিয়ে বা শুধু কৌতূহল নিয়ে; ফিরে গেছেন গভীর ভক্তি নিয়ে। তাঁর কাছে একটা উপমা শুনেছিলেম, আপনার ভালো লাগতে পারে।

"জীবনপ্রবাহ কথাটা প্রচলিত। তাই থেকে জীবনকে মনে করুন একটা নদী বলে, সে-নদীর জল হচ্ছে মানুষের কাজ। নদী আপন বেগে পাগল-পারা, সে বেগের উৎস হচ্ছে অজ্ঞানজাত কামনা। সে-কামনা যে অবিমিশ্র অমঙ্গল তা নয়—নদী যেখানে বয়ে যায় সেখানে ভূমি হয় উর্বর, সে-নদী তৃষ্ণা মেটায় কত জনের। কিন্তু নদীর শ্রেষ্ঠ সার্থকতা তো তা নয়। তার গতির লক্ষ্য তো পূর্ত-বিভাগের সহকারিতা নয়, তার আসল লক্ষ্য সাগর। সে ছুটে চলেছে সেই দিকে—পথে কোথাও গড়েছে, কোথাও ভেঙেছে কিন্তু থামেনি কোথাও। সেই সাগরে পৌঁছোলে তবেই নদী পূর্ণতা লাভ করল, নিজের পৃথক সত্তা হারিয়ে সার্থক হোলো। তখন কে বলবে সাগরের কোন জায়গার জল কোন নদীর? জলের কোন অংশ তখন মাথা তুলে বলবে, আমি পদ্মা আর আমি ইচ্ছামতী? অথচ পদ্মা আর ইচ্ছামতী দুই-ই যে সাগরে মিশে আছে, তা তো অস্বীকার করা যাবে না। তাদের পূর্বেকার পৃথক অস্তিত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে মানচিত্রকরের কাছে কিন্তু, নদী দু'টির দিক থেকে, তারা সার্থক হয় তখনি যখন তারা সাগরে এসে হারিয়ে যায়। সেই তাদের পূর্ণতা। নির্বাণের পরে মানুষেরও পূর্ণতা সেই রকম। এই পূর্ণতা, এই নির্বাণ—যা লাভ করলে সকল প্রাণী, সকল বস্তু বুদ্ধ—সে তো আমাদের জন্ম-পর্যায়ের অন্তিম স্তর নয়, সে একেবারে এই পর্যায়ের বাইরে, তাই তার রূপ নিয়ে আলোচনা অযথা কালক্ষয় মাত্র। মানুষের তার আগের অবস্থাগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট। কেন না আমাদের বর্তমানের প্রতি মুহূর্তের কার্য এবং চিন্তা দিয়েই নির্ধারিত হচ্ছে আমাদের পথের দৈর্ঘ্য এবং লক্ষ্যের দূরত্ব।"

দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা ছিল এক দল মেঘের পিছনে। ধীরে ধীরে মেঘগুলি ভেসে গেল অন্য দিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার প্রতিভাত হোলো অবর্ণনীয় শুভ্রশুভ্রতায়। পৃথিবী অর্থহীন এবং অসার কি না মনে এলো না, কিন্তু দূরের দুর্গম গিরিশৃঙ্গকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় মনে হোলো। ভদ্রলোকের হিমালয় যাবার অভিলাষ নিছক বিলাস বা পাগলামি বলে আর মনে হোলো না। তিনিও ছলছল চোখে তাকিয়েছিলেন হিমালয়েরই দিকে।

আমার তর্ক-তূণ যেন শূন্য হয়ে গেল। বললেম, "আচ্ছা, আপনি যা বললেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার হিমালয় ছাড়া কি আর পথ নেই? মনুষ্যসমাজ ত্যাগ না করলে মানুষের নেই শান্তি?"

"না, তা নয়। প্রকৃত শান্তি হৃদয়ে, পরিবেশ বড়ো জোর সহায়তা করতে পারে, তার বেশী নয়। যেই হৃদয় যার সকল বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠেনি, সে গৌরীশৃঙ্গের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেও অস্থির থাকবে। শান্তি পাবে না। অপর দিকে যার উপলব্ধি হয়েছে, তার পক্ষে সংসারের সব কিছুর মধ্যে পরিবৃত থেকেও নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব। গুরু মারপা তাঁর শিষ্য মিলা রেপাকে আদেশ দিয়েছিলেন সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে ধ্যানে মগ্ন হতে, অথচ তিনি নিজে কাজ করে গেছেন পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যে; বিবাহ করেছেন, চাষ করেছেন আর সকলের মত। যে যার প্রকৃতি এবং রুচি এবং সাধ্য অনুযায়ী পথ বেছে নেবে, সেই পথেই তার মুক্তি।"

"আপনি কি না বেছে নিলেন হিমালয়ের পথ?" দুর্গম, বন্ধুর পথ যেন আমাকেই অতিক্রম করতে হবে, এমন ভাবে বললেম।

"হ্যাঁ, এই পথই বেছে নিয়েছি। এত দিন তো এখানে রইলেম। মন কেবলি এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, না না বাজে কাজে বেলা যায়, তাই ডাক আর উপেক্ষা করব না। একবার তাকিয়ে দেখুন না ওই হিমালয়ের দিকে, কে উপেক্ষা করতে পারে তার আহ্বান? ওখানকার ওই নিভৃত নির্জনতার আহ্বান আমার কানে আজ ছাপিয়ে গেছে পৃথিবীর সকল বন্ধু-পরিবার-পরিজনের আহ্বানকে। তাই সব ছেড়ে চলেছি, এক মুহূর্তের জন্যে এতটুকু বেদনা বোধ হচ্ছে না বিয়োগের জন্য, সব কিছু ছাড়তে পারায় মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে গভীর পরিতৃপ্তিতে। ওখানে যদি পৌঁছোতে পারি ভাল, পথেই যদি শেষ হয়ে যাই তা'হলেও এই পরিতৃপ্তি নিয়ে মরতে পারব।"

ভদ্রলোকের স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূর পাহাড়ের উপর। আমাকে যখন ওই কথাগুলি বলছিলেন, তখন তাঁর আরক্তিম আননে যে সুস্পষ্ট আনন্দোজ্জ্বল আভা ছিল, তা শুধু শৈলবাসলব্ধ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করা আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ভদ্রলোক মনে-মনে তিব্বতীয় ভাষায় কয়েকটা শ্লোকের আবৃত্তি করছিলেন। সে স্বর কণ্ঠের নয়, হৃদয়ের।

হঠাৎ বোধ হয় আমার কথা মনে পড়ল, বললেন, "নির্জনতার স্তুতি-স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেম, মিলা রেপার রচনা। অপূর্ব। অনেকগুলি শ্লোকের শুরু এই রকমের: অনুবাদকশ্রেষ্ঠ মারপা, তোমার পায়ে প্রণাম করি, তুমি আমায় বল দাও আমার নিভৃত পর্বতকন্দরে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমাহিত হয়ে থাকবার। পর্বতের নিভৃতির প্রয়োজন এইখানেই। অপরিহার্য নয়, কিন্তু সহায়ক।"

যে মাধ্যাকর্ষণ আমাকে বেঁধে রেখেছে মাটির সঙ্গে তার বন্ধন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল বলে মনে হল কি না জানিনে, কিন্তু দূরের পাহাড়কে অত দূর যেন মনে হল না। আমার মুখের

ভাবে তার প্রকাশ ছিল কি না জানিনে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, "কি, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?"

এমন প্রশ্নের সহজ উত্তর 'না'; সেই উত্তরই আমার দেবার কথা মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে। কিন্তু কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলেম না যেন। তিন দিন পরে আমার ছুটি ফুরোবে এবং সোমবারে আমাকে আপিসে হাজির হতে হবে, এমনি কোনো নির্বোধ কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারলেম না। বস্তুত, কিছুই বলতে পারলেম না। উত্তর এড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেম হিমালয়ের দিকে।

আমার নিরুত্তরতার অর্থ স্পষ্ট। বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই, কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, "অবিশ্যি না গেলে আক্ষেপের কিছু নেই। আগেই বলেছি তো, স্বয়ং মারপাও বানপ্রস্থে যাননি।"

মারপার সঙ্গে আমার এই সাদৃশ্যে সান্ত্বনা ছিল অল্পই। অনেক তো দেখলেম, কোন কিছুই তো ভাল লাগল না। আনন্দের সন্ধান পেলেম না কোথাও। তবু কেন পারিনে সব ছেড়ে দিয়ে সব পাওয়ার শেষ চেষ্টায় ঝাঁপ দিতে? হারাব যা তা তো চাইনে, তবু কেন হারাতে এত দ্বিধা, এত ভয়? বন্দীদশার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ করে শেষে দরজা যখন খুলল, তখন কেন পারিনে ছুটে বেরিয়ে পড়তে?

কেন জানিনে, কিন্তু পারিনে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে হিমালয় যাত্রার অভিসার আমার আসক্তির চাইতে প্রবল নয়। তাই চুপ করে ছিলেম। কিন্তু, বোধ হয় এই অপূরণীয়তারই জন্যে, অসাধ্য সাধ মনের মধ্যে কেবলি আলোড়িত হচ্ছিল। পর্বতের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিকতার কোথায় যেন অচ্ছেদ্য যোগ আছে। গ্রীক দেবতারা আর কোথাও থাকেননি, বাসা বেঁধেছেন অলিম্পিক পাহাড়ে। আমাদের হর-পার্ব্বতী অরণ্যে থাকেননি, হিমালয়ে। দশ আদেশ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উচ্চারিত হয়নি, সিনাই পর্বত থেকে ঘোষিত হয়েছে। পাহাড়ের পায়ের তলায় দার্জিলিঙে এসে এই কথা বার বার মনে পড়ে।

তবু পারিনে।

অন্যান্য মায়ার কথা বাদ দিলেও, তর্কলোভী মনে 'পলায়ন' কথাটা বার বার এসে বিরক্ত করতে থাকে। যদি ধরেও নিই যে, পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে গিয়ে আমি নিজে বাঁচতে পারব, আর সকলের হবে কি? সবাই তো আর পাহাড়ে যেতে পারবে না। আর যদি যায়ও তাহলে তো সেখানে আবার গড়ে উঠবে কলকাতা আর লণ্ডন, বোম্বাই আর নিউইয়র্কের নব সংস্করণ। তার মানেই তো আবার যুদ্ধ, আবার শোষণ, আবার পীড়ন, আবার অশান্তি। তখন কি ধ্যান করতে নেমে আসব শ্যামবাজারে আর ক্যামডেনে?

আমার সন্দেহের কথা জানাতে ভদ্রলোক বললেন, "আমি কোন কিছু পড়িনি অনেক দিন, এমন কি খবরের কাগজও নয়। তাই ভাল করে জানিনে আপনাদের সমস্যার কথা, তবে এইটুকু জানি যে, তাদের সমাধান নেই সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়। তাতে পীড়ক-পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পীড়ন শেষ হবে মা! শোষক পরিবর্তন হতে পারে, শোষণ শেষ হবে না। যুদ্ধে এক দল না জিতে অপর

'কে যায় ?' গোঁসাই হাঁক পাড়লেন।

'আমরা গো। ভক্তহরি, ত্রিলোচন—'

'কোথায় গেছলে ?'

'আমরা একটু হরিনাম গেয়ে এলাম।'

'কোথা হে ?'

এত কথা পথে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। ভক্তহরিরা বৈঠকখানায় উঠে এল। ভরা-গলায় বলল, 'পটু বায়েনের বিটি তো জবর দরের লোক হয়েছে মাশায়। আমরা বোষ্টম গোঁসাই গেলাম, নাম গাইতে—বিদায় দিলে প্রত্যেককে একখানা লতুন কাপড়, লগদ পাঁচ টাকা—একটা সিদে, তাও প্রায় পাঁচ টাকা হবে গো। তা ছাড়া এক সের ময়দা, এক পো ঘি আর মিষ্টির বাবদ এক টাকা! মিথ্যা কথা লয় বানিজ্যে মাশায়। এই দেখুন—' ঝুলি-ঝোলা ফাঁক করল, টাকা খুলে দেখাল: 'তার পর আমাদের সঙ্গে হরিনাম যা করলে আমরা তো বাজাতেই পারলাম না। তার পর গান ভাঙার পর জানলাম, ও অনেক টাকার মানুষ। ব্যাঙ্কে ছ' হাজারের মতন না কি আছে, গায়ের গহনাও প্রায় পনেরো-কুড়ি ভরি। তা ছাড়া কলকাতায় ভালের দোকান, বাড়িও না কি একখান হয়েছে। সোজা কথা লয়—'

'বাজে কথা। বিশ্বাস করি না।' মুখুজ্জে সবলে মাথা ঝাড়া দিলে।

'কি বলেন দাদাঠাকুর, আমাদের মিথ্যা বলবার দরকার? আপনারাই খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন। লোক মাশায় ভাল। খুব উঁচ লজর। আমরা দু' পয়সা পেয়েছি বলে খোসামুদির কথা বুলছি না। শুনছি খুব বড় করে খাওয়া দেবে জাত-গুষ্টিদের। তার পর না কি জোলান জমি কিনছে ক'বিঘে, ঘর তুলছে—'

পরস্পরের চোখ তাকাতাকি করে চকিতে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

এত যার টাকা, এত যার প্রতাপ, তাকে কি আর তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা যায়?

৮

উঃ, কী খাওয়াটা খাওয়ালে বলো তো। আর মদের কী সোয়োত!

জগু মুচির খুব নেশা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকেই স্ত্রীকে ডাকলে: 'ও লোক, ও লোকটা, ইধার আও। হামারা বাত শোনো।'

কোলের ছেলেটা কাঁদছিল, তাকে বুকের গরমে ঠাণ্ডা করছিল সুবাসী। কাছে এসে বললে, 'কি বুলছ?'

'বুলছি ভাল। দেখ দেখি, চোখ মেলে বেশ ভাল করে তাকিয়ে, আমার চোখ বুজে যাচ্ছে—দেখ দেখি ঐ দিকে, ঐ লাল শাড়ির দিকে, অমন শাড়ি কখনো দেখেছিস? দেখেছিস অমন ঘুরন-পাক! বাপ রে বাপ, যা শুনিনি কানে তা দেখলাম নয়ানে। শালোর ভগবান আমাদিকিন কেনে মানুষ করেছিল তাই ভাবছি। হা রে, কথায় বোলে, আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়। তা দেখছি হয়।'

সুবাসী সরে এল বাড়ির খোলে। বললে, 'কলা গাছ ছেড়ে শাল গাছ।'

'আরে, শাল গাছ ছেড়ে লাল চন্দনের গাছ। বাহবা মেয়ে, বাহবা কপাল! আমি তো বাপের জন্মে শুনিনি কি দেখিনি মুচির জোজে মুচি-কন্যার! বাবাঃ, দেশের মুচিকে তাক লাগিয়ে দেছে।'

'লাগাবে না কেনে? টাকার কুমির হয়েছে যে।'

'তুমিও তো মেয়ে বটো, ঐ রকম কর দেখি অত গয়না, অত কাপড়, অত টাকা।'

'আমি ওর মত ব্যবসা করব না কি? আমি অমন গয়না-টাকায় লাথি মারি।'

'আহা হা, লাথি মেরো না, পায়ে লাগবে। একটি পয়সা আনবার ক্ষেমতা নাই, আগটুকু আছে। বিষ নাই কামড়ানি আছে। তোর হাড়ে লক্ষ্মী আছে হা টে? তুই তুফনির পায়ের কাছে বসতে পারিস?'

'তবে তুমি শোন্দ কলকাতা চল ক্যানে, ব্যবসাটা একবার দেখে আসি। চল ওর সঙ্গেই যাই। কিছু বলতে পারবে না। কান ঠসা, চোখ অন্ধ করে বসে থাকতে হবে। বল, আজি হও, দেখি তুমি কেমন মরোদ! মদ মেরে এসে হচুক জুড়ে দিয়েছে। ভগমান যাকে দেবে সেই পাবে। গয়না পরলেই সে ভাগ্যিমানি হয় না কি? আমি কি কম ভাগ্যিমানি?'

হেসে উঠল জগু মুচি। বললে, 'তুই ছিবাধিকে!'

'তুমি তো দশ দেশে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসছ তুমি কই ওন্নতি করতে পারলে? নিজে পারবে না, পরের দেখে টাটানি কেনে? মাগকে বুলছ বাজারে যেতে! এত কাল গেল, বুলে কেউ পাত্তা পেলে না। কে বুলবে বুলুক তো দেখি, কেমন বাপের বেটা, চড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব না? মুচি হলেই হল, পথে পড়ে আছে। ভগমান যাকে যেমন থোবে সেই তেমনি থাকবে—এতে আবার কথা কি?'

'তুকে থুয়েছে শেওড়া গাছের ডাকের উপর বসিয়ে।'

'বেশী বোকো না বুলছি। তা হলে আজ ঝগড়ার চরম হবে। তুমি যেখানে মদ ঢুকেছ সেইখানে যাও। তুমি গিয়ে বড়লোক হও'

'আরে, আমি যদি বড়লোক হই তা হলে কি তোকে থোবো? যদি থাকে আমার চূড়োবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী।'

'ক্যানে? এখন ধান ভেনে গোবর কুড়িয়ে পেটে খেয়ে-না-খেয়ে ঘরকন্না করছি, দু'বেলা পিণ্ডি রাঁদছি, বড়লোক হলে থাকব না ক্যানে? তা হলে আমি যদি বড়লোক হই, তা হলে তোমাকে খেতে-পরতে দেব ক্যানে? আমার ভাইদিকিন দেব। তোমার এখন ভারি পয়সা-পয়সা টান ধরেছে। নিজে ওজকার করো, তবু পরের ধন দেখলে হিংসে হয়। ওর কি ওই সব কিছু ধন না দৌলত? আথার ছাই, আথার ছাই! ওর চেয়ে আমার অনেক বেশী ঐশ্বর্য্য।'

বকাবকিতে বিশেষ আরাম পাচ্ছিল না জগু, তাই সুবাসীর পিঠে গদাগদ বসিয়ে দিলে।

উলটে মারতে পারল না সুবাসী। কেন না তার দুই হাত জোড়া বুকের উপর ঘুমন্ত ছেলে।

চেঁচামেচি শুনে চলে এসেছে তুফানি। তাকে জগু দেখে মুহূর্ত্তে হাত গুটিয়ে নিল। তাকিয়ে রহিল হাঁ করে।

তুফানি মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, 'এখনো তেমনি আছিস তোরা সব? সেই বকাবকি, সেই গালাগাল। কি রে, এখনো সেই মদ খেলে মন মেতে যায়, বউকে একটু না বকে-মেরে

থাকতে পারিস না ? ও কি কথা, মারবি কেন ? মদ খাবি তো গান করবি—'

অনেক কাছে থেকে তাকে দেখল সুবাসী। মহামহিম কিছুই খুঁজে পেল না। নিজের কান্না ভুলে গিয়ে বুকের গরমে ছেলের কান্না ভোলাতে বসল। দেখল, আশ্চর্য, তুফানিই তাকে বেশী রেখেছে।

৯

সকাল বেলা চেন-বাঁধা কুকুর সঙ্গে নিয়ে তুফানি গাঁয়ের রাস্তায় হাওয়া খায়। শ্রাদ্ধশান্তি করে হয়ে গিয়েছে। নতুন ঘরও তৈরি হয়েছে। বিঘে তিনেক জোলান জমির কবালাও সম্পাদন হয়েছে। রেজিষ্ট্রিটা হলেই চলে যাবে কলকাতা।

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে তুফানি, এমন সময় এক জন লোক এসে বললে, করালী মুখুজ্জে মশায় তাকে ডেকেছেন। যেন বেড়াতে বেড়াতে একবার যায়।

আজকাল তুফানিকে কেউ তাড়াবার কথা ভাবতেও পারে না। তার কুকুর লেলিয়ে দেবে সে ভয়ে নয়—তার টাকা হয়েছে সে টাকার ভয়ে। এখন সে মাথা উঁচু করে গট্‌-গট্‌ করে হেঁটে বেড়ায়—সবাই পথ ছেড়ে দেয়। বাড়িতে বসে যা খুশী সে করে, ঘুমায় বা গান গায়, একটা পাটকেলও কেউ ছুঁড়ে মারে না। সব টাকার কারচুপি। জমির জোটপাট।

কেন ডাকছে কে জানে। বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়েছে এমনি ভাবে যেতে হবে। যেন কী গোপন কথা। কেউ না দেখে ফেলে। কেউ না শুনে ফেলে।

তেমনি ভাবেই তুফানি গেল। একেবারে ভিতর-বাড়িতে।

অনেকক্ষণ এটা-সেটা আগড়ম-বাগড়ম বলে শেষকালে মুখুজ্জে বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।'

এতক্ষণ অথৈ জলে খাবি খাচ্ছিল তুফানি, এবার যেন পাড়ের ধোঁয়া দেখা গেল। কিন্তু গোপে-চুপে নিবেদন, অথচ বাড়ির ভিতরে এনে—এ কি ব্যাপার।

'আসছে তারিখে আমার ছেলের পৈতে দেব ঠিক করেছি—'

তাতে কি ? তুফানিকে মাথুর গাইতে হবে না কি ?

'না। তুমি আমার ছেলের মুখ দেখবে।'

সে আবার কি ?

উপনয়নে ব্রত-ভঙ্গের পর বামুনের ছেলের মুখ দেখতে হয় না ? যার সন্তান নেই তেমনি মেয়েছেলে সে মুখ দেখে ? জান না তুমি ? ছেলে এসে সেই মার কাছে ভিক্ষে চায়, আর সেই মা ছেলেকে কিছু ভিক্ষে দেয় ? শোননি কিছু ?

'শুনেছি বই কি।'

'তেমনি ধারা তুমি হবে আমার ছেলের ভিক্ষে-মা। আমার ছেলে তোমার কাছে এসে বলবে, দেহি ভবতি ভিক্ষাং, আর তুমি তাকে কিছু দান করবে—মা'র যুগ্যি দান।'

'সে তো ভালো কথা।' কি রকম একটা আবেগে তুফানি চোখ নামাল।

'ভালো কথা মানে ? মহা পুণ্য। বামুনের ছেলে মুচির মেয়েকে মা বলবে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ? তোর একটা পাকাপাকি হিল্লে হয়ে যাবে—মা হয়ে যাবে—একটা অঘটনের ঘটনা। পাষাণে ফুল ফোটার মত। তোমার বল-ভরসা হল ছেলে, ছেলের বল-ভরসা হলে তুমি। আর মা-ছেলের সম্পর্কে শুধু এ ইহকাল নয়, পরকালও পার হয়ে গেলে। পুন্নকে আর যেতে হল না। কি রাজি ?

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল তুফানি। বললে, 'রাজি বৈ কি। এ তো পুণ্যির কাজ।'

'এ কথা কাউকে বোলো না যেন। এ গাঁয়ের লোক সোজা নয়।'

মুখ লুকিয়ে হাসল তুফানি।

'খালি হিংসে আর হিংসে। পরহিংসে নরকে বাস। বুঝবে সব এক দিন। আমি তা হলে সব ঠিক-ঠাক করি—আমিই কিন্তু তোমাকে প্রথম বললাম—'

মাঠের পথ ধরে বাড়ি ফিরছিল তুফানি, হঠাৎ কে যেন তার উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কি রে বাবা, ধান-ক্ষেতের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল না কি ?

'আমি রে আমি। হরিনাথ বাঁড়ুয্যে। চেন না ?'

সত্যিই তো। 'বাসিজ্যে' মশাইই তো! ভয়ে-লজ্জায় কেঁচো হয়ে গেল তুফানি। আরেকটু হলে ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল আর কি।

'আজ এত দেরিতে বেড়াতে বেরিয়েছ ? তোমার সেই কুকুর কই ?'

'কুকুরটাকেই খুঁজছি।'

'আহা, বড় ভাল কুকুর, বাঘের কুকুর। ঠিক বাড়ি গিয়ে হাজির হবে দেখো। চিন্তা কোরো না।' বললে বাঁড়ুয্যে। 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বেশ তো। বলুন, আপনার বাড়ি যাব ?'

'না ধান-ক্ষেতই ভাল। স্থানটি বেশ নিরিবিলি। এ দেশ তো বড় সুবিধের নয়। কুচ্ছা করার জন্যে সব সময়েই এদের মুখ কুটকুট করছে।'

'কথাটা কি বলুন—'

'কথাটি যৎসামান্য। এই আসছে তারিখে আমার ছেলের পৈতে হবে—'

মুখ টিপে হাসল তুফানি : আমাকে নেমন্তন্ন করবেন না কি ?'

'তোমাকে নেমন্তন্ন মানে ? পঙক্তির প্রথম পিঁড়ি তোমার। তুমি হবে ছেলের মা—ভিক্ষে-মা—ভবতী, ভবতারিণী। এ কি চারটিখানি কথা ? উপবীতধারী বামুনের ছেলে তোমার কাছে হাত পেতে বলবে, দেহি ভবতি ভিক্ষাং—'

আনন্দে চোখ জল-জল করে উঠল তুফানির। বললে, 'নিচু কুলে জন্ম, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে ?'

'তুমি রাজি হলেই এ সম্পদ তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসে। নিচু কুল থেকে নাগাল ধরতে পার ব্রাহ্মণকুলের। বামুনের ছেলের মা-ডাক শুনে হিয়ের তাপ ঠাণ্ডা হয়—'

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব এমন আমি ছারকপালী নই। এক কথায় আমি রাজি।'

'তুমি লক্ষ্মীশ্বরী, লক্ষ্মীবরী বললেই লক্ষেশ্বরী।' বাঁড়ুয্যে গলার স্বরটাকে মুহূর্তে হাই-মন্ত্রের করে ফেললে : 'তোমাকে এই

সঙ্গে সাবধান করে দিচ্ছি, আরো তোমাকে ধরাধরি করতে আসবে হয়তো, তুমি আর কারু কথায় যেও না। বুঝলে না, তোমার টাকা-পয়সা জমি-জায়গার ওপরে সবাইর লোভ, তাই হয়তো জল ঘোলা করে চার ফেলবে। আমি শুধু তোমার ব্যবহারটি ভালো বলে তোমাকে বলছি। তোমার ছেলেকে তুমি যা ইচ্ছে হয় দেবে, ইচ্ছে না হয় তো দেবে না। তোমার জমি-জায়গা যা রয়েছে তার উপর আমার নজর নেই, আমার ঠিক নিজ-বাড়ী এ গ্রামে নয়—এখান থেকে খাড়া উত্তরে আঠারো মাইল দূরে নবগ্রাম—'

'আপনি সব ঠিক করুন। এ চান্স জীবনে একবারই আসে। এ আমি ছাড়ব না।'

'শোনো, এ কথা কাউকে প্রকাশ কোরো না যেন। পাত্তির পা-ঝাড়া সব—আর, দেখো, আমিই প্রথম—একেবারে পথের মধ্যে ধরেছি—'

সন্ধের ঝোঁকে দুর্গাটাকে বেঁধে আপন মনে একটু হরিনামের তোড়জোড় করছে, এমন সময় বাড়ির বেড়ার বাইরে কে ঝাপসা গলায় ডাকতে লেগেছে: 'তুফানি তুফান, বাড়ি আছ গো—'

উনু ছিল কাছাকাছি, তাকে লক্ষ্য করে তুফানি বললে, 'বলে দে এ বাড়ি তুলসী দাসীর বাড়ি—এ বাড়িতে তুফান বলে কেউ নাই।'

'ওরে, ওতেই হল।' বাইরের লোক বললে মস্করার সুরে: যা তুফানি তাই তুলসী। যা দুর্গা তাই কালী।'

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে আলো হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল তুফানি। ওমা, এ যে ভটচাজ মশাই। যামিনী ভটচাজ।

'আপনি? গায়ের আঁচল কি ভাবে পাট করবে দিশা পায় না তুফানি।

'অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলে এলাম। বুড়ো মানুষ, ঠোক্কর খেয়েছি অনেকগুলো। সাপে-খোপে যে ধরেনি রাস্তার মাঝে। তোর ঐ কুকুরটাকে থামতে বল তো। আশে-পাশের লোক না কিছু সন্দেহ করে—'

'পাপ, চোপ।' কুকুরকে ধমক দিল তুফানি। পরে কি বলবে—কি বুঝবে কিছু ঠাহর করতে না পেরে বললে, 'ভিতরে আসবেন?'

'তারি জন্যেই তো আসা। জীবনে এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে চার পাশ দেখে-সমঝে কোনো বাড়ি কখনো ঢুকিনি। কিন্তু ধর্মকাজে সব সয়।

ঘরের ভিতরে এসে তুফানি মোড়া দিল বসতে।

'তোর এই তুলসী নাম কোথায় পেলি?'

'নবদ্বীপের ভাদু গোঁসাই দিয়েছেন।'

'সে কি কথা? বল আমাকে সব খুলে-মেলে।'

'সে এক ইতিহাস।'

'ভিতরে যখন এসেছি, তখন অন্তরেই এসেছি বলতে পারিস। অন্তর আর অন্দর বেশি তফাৎ নয়।'

প্রথম এসে ঠাঁই পাই এই ভাদু গোঁসাইর আখড়ায়। ভাদু গোঁসাইর বড় সাধ ছিল আমাকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে নেন, তুফানিকে ধুয়ে-মুছে তুলসী বানান। কিন্তু মা গোঁসাই হিতমঙ্গলের পথ দেখলেন অন্য রকম। একটা লোক ধরিয়ে দিলেন কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে। কিছু দিন পরে সুরকি কুটাতে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে লোকটা লম্বা দিলে। দশ দিক অন্ধকার, যাই কোথা? নবদ্বীপে ভাদু গোঁসাইকে লিখলাম, তিনি চলে এলেন। বললেন, তুমি আমার আখড়াতে না যাও, আমি তোমার আখড়াতে এসেছি। বললাম, ত্রাণ করুন। বললেন, আমাকে যে ত্রাণ করবে তোমাকেও সেই ত্রাণ করবে। বললাম, মন্ত্র দিন। বললেন, এখন আর মন্ত্র নয়, এবার নাম দেব। এক নাম, তুলসী, আমার বড় সাধের নাম—আর—আরেক নাম—

'আর?'

'আরেক নাম হরিনাম। কীর্তন শেখাতে লাগলেন ভাদু গোঁসাই। বললেন, নাম পেয়েছ এবার সব পাবে। টাকা পাবে, খ্যাতি পাবে উঁচু-নীচু সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা পাবে। আর কী চাই? আর কী চাইবার আছে?'

'খাসা। তুই তো একটা মহা বোষ্টমি। আমি তা হলে ঠিক লোকের ঘরেই এসেছি।'

'আমার এই অপবিত্র ঘরে আসতে আপনার দোষ লাগবে না?' তুফানি চোখ নাচাল।

'এইখানা নতুন ঘর তুলেছিল তো? নতুন মাটিতে দোষ নাই।'

'আমাদের কোনো মাটিতেই দোষ নাই। আপনাদের বিয়ের সময় আমাদের ঘরের মাটি লাগে।'

'ওরে, তোর সঙ্গে আমার নতুন সম্বন্ধ হচ্ছে। তুই আমার বিয়েন।'

'বিয়েন?'

'আমার একটা নামলা বেটা আছে—বুড়ো বয়সের ছেলে—তার এই আসছে তারিখে পৈতে দেব। তুই তার মুখ দেখবি, ভিক্ষে-মা হবি, তোকে সে মা বলে ডাকবে।'

'এ তো বহুৎ ভাগ্যের কথা। একেবারে এক চোটেই তৈরী ছেলের মুখে মা-ডাক শোনা।' তুফানি গলার স্বরটা আবেগে ভারি করল।

'আর এ তোর মুচির ছেলে নয়, বামুনের ছেলে। কি রে, হবি?'

'এ আবার জিগগেস করছেন কি?'

'বেশ বিয়েন, বেশ। কিন্তু কি দিবি আমার ছেলেকে?'

'মা ছেলেকে দিতে কি কখনো ত্রুটি করে?'

'তবু—'

'দেখি একটু ভেবে-চিন্তে। সম-সম কালে জানাব আপনাকে।'

'তাখ, আমি একেবারে বাড়ি বয়ে এসেছি, আমার দাবি সবাইর আগে। আরও আসবে হয়ত ঘুঘুরা—'

'ভয় নেই, আমি চড়ইকেই ঠিক বেছে নেব।'

'বিয়েন আমার খুব রসিক! এবার তা হলে উঠি। দেখো, যেন মুখহাসানী হয়ো না।'

কমলকৃষ্ণ গোঁসাইর বৈঠকখানায় আজও মজলিস বসেছে।

'কই হে গোঁসাই-প্রভু, একটা পৈতের দিন দেখ তো হে—' বলতে বলতে ভটচাজ এসে ঢুকল।

মুখুজ্জে-বাড়ুয্যের দিন জানা আগেই হয়ে গিয়েছে। সেই এক দিন—পঁচিশে অঘ্রাণ। এ ছাড়া এ বৎসরে আর দিন নেই।

'কি রকম? সব বাড়িতেই পৈতে! ভোজগুলো কি ভাবে হবে? আর মুখ-দেখানোর লোকই বা এত মিলবে কোথা?

গোঁসাইর শেষের প্রশ্নে কথাটা দানা বাঁধল। ভটচাজ বললেন, 'আচ্ছা, এ প্রথাটা কি শাস্ত্রসম্মত। যদি শাস্ত্রসম্মত না হয় বাদ দিয়ে দেয়া উচিত।'

'আমি তো কোনো শাস্ত্রেই দেখি নাই।' বললেন মুখুজ্জে: 'যত সব বাজে সংস্কার।'

'বাদ দিয়ে দাও।' সায় দিলেন বাঁড়ুয্যে। 'এখন রিফর্ম দরকার। আর আমরা সমাজের মাথা, আমরা যা বলব তাই চলবে।'

বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে দাও—তিন জনেই গলা মেলাল।

'বাদ দেবে কেন হে?' গোঁসাই-প্রভু শান্তিজল ঢাললেন: 'ওটা বামুনদের একটা প্রাপ্তিযোগ। উপপুরাণে আছে হে। 'সাথে বামুন ভিখারী' বলে না? এই প্রথার থেকেই এই কথার উৎপত্তি। লাখ টাকা থাকলেও সেই ভিক্ষেই করতে হবে।'

'কালীঘাটে যে এক দিনেই পৈতে দেওয়া হয়—ঘরেও থাকতে হয় না, কেউ মুখও দেখে না—তা চলে কি করে?' মুখুজ্জে প্রতিবাদ করলেন।

'ওটাও আরেক দিক থেকে বামুনেরই প্রাপ্তিযোগ। পুরুত-বামুন।'

'কিন্তু পুরাকালে তপোবনে মুনি-ঋষিরা যে পৈতে দিত, তখন ভিক্ষে-মা পেত কোথা?' প্রতিবাদে বাঁড়ুয্যেও ঝাঁজ মেশালেন।

'ওহে ও একটা কুটুম্ব পাতানো। গঙ্গাতীরে দেবালয়ে তীর্থ ক্ষেত্রে সই-সাঙাত মন মিশুরি, গঙ্গাজল বা বকুল ফুল পাতায় না, শুনেও নাই। হিঁদুরা যে কাজই করে তাতে একটু ধর্মের ছিটে থাকে।'

'কিন্তু অত ভিক্ষে-মা জুটবে কোত্থেকে? ভটচাজ বাই তুললেন।

'সংজেতে না ঘেঁসে হাড়িনী-মুচিনী ধর। ওদের ধরলে বরং দু'পয়সা পাবার আশা থাকে।'

কচ্ছপের নলির মত যার-যার মাথা তার-তার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'তাই কি হয় দাদা? একেবারেই অধঃপতন তা হলে। সমাজ বলে তা হলে আর কিছুই থাকে না।' বললেন মুখুজ্জে।

'তা তো বটেই।' বাঁড়ুয্যে সায় দিলেন: 'তার চেয়ে শূদ্রকে মুখ দেখালেই চলে যায়। বজ্জাট থাকে না।'

ভটচাজ তেড়ে এলেন: 'আপনারা গোঁসাইরা তো সর্বভুক হুতাশন—আপনিই আরম্ভ করে দিন না।'

'তাতে দোষ কি? রামচন্দ্র গুহকের সঙ্গে মিতা পাতিয়েছিলেন, মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন। কুটুম করায় দোষ কি? ধাইকে মা বলা হয় না? সে তো হাড়ি। তবে মুচি কি দোষ করল? এ তো বর্ণ-মুচি। ভাল-বেয়ানও হবে, ভাল হরিনামও হবে—'

কথা ঘোরাও, মুখ চাপা দাও। লেপ চাপা দাও। এ কি কাকচরিত্র জানে না কি? এর পাকা হাড়ে ভেলকি খেলে না কি রে? না, কি ঘোল কড়াই কাণা?

'সংজেতের ভিক্ষা-মা'রা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষে দেয় তফাতে থেকে, হাড়ি-মুচিরা তফাতে থাকতে যাবে কেন? যেই মাণবক 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে এগিয়ে আসবে, অমনি হাড়ি-মুচি হাতে হাত লাগিয়ে ভিক্ষে দেবে—হয় জমির দলিল নয় টাকার তোড়া। নতুন গোড়াপত্তন হোক। যে যার পাও সে তার খাও—'

১০

দিন-ক্ষণ ঠিক করে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে তুফানি।

সন্ধে ছ'টায় মুখুজ্জে, সাড়ে ছ'টায় বাঁড়ুয্যে, সাতটায় ভটচাজ।

কেনা জমির থেকে এক কেতা জমিই সে দান করবে ভিক্ষা-পুত্রকে। নগদ যা দেবার তা তোড়া বাঁধা আছে। এখন, দলিলের একটা মুসাবিদা দরকার। এ বিষয়ে একটু শলা-পরামর্শ করব, আসবেন আপনারা। সঙ্গে একটু হরিনাম।

আহা, বাঁচিয়েছে। হরিনামের ভেলায় চড়ে অনেক দূর যাওয়া যায়। যদি কেউ ধরেও ফেলে, বলা যাবে মুখের উপর, একটু হরিনাম শুনতে গিয়েছিলাম।

সাঁঝ লাগতে-না-লাগতেই হার্মোনিয়ম নিয়ে বসেছে তুফানি। সামনে সতরঞ্চি পাতা, বসবেন সব হুমড়ো-চুমড়োরা। ঢেউ তুলেছেন সবাই। তোমরাও যখন ঢেউ তুলেছ আমিও নাচব সেই ঢেউয়ের আগে-আগে। যেই-সা-কে তেই-সা।

প্রথমে এলেন মুখুজ্জে। গলার আওয়াজ পেয়েই গান ধরে ফেলেছে তুফানি। উনি এসে ঘরের মধ্যে সতরঞ্চির উপর বসাল। গান যখন সুরু হয়ে গেছে তখন আর আলাপ চালানো যায় না। শুকনো মুখে নিরস্ত্র একটু হেসে মুখুজ্জে কলের পুতুলের মত বসলেন। ভাবলেন সতরঞ্চখানা এত বড় কেন?

কি গান রে বাবা, কি গমক, কি গিটকিরি! ক্ষ্যামা যে খানিকক্ষণ; পেটের কথাটা সেরে ফেলি।

সে কি, গান যে সুরু করে দিয়েছে এরি মধ্যে! গজ-খোদল না মেনে পড়ি-মরি করে ছুটে এলেন বাঁড়ুয্যে। ডাক্তারখানা থেকে ঘড়ি দেখে এসেছে সে সাড়ে ছ'টা হতে এখনো মিনিট পনেরো বাকি, কে জানে, এ হয়তো প্রতীক্ষার গান—অদর্শনের আকুলতা।

তাঁকে আর ডাকাডাকি করতে হল না, গানই তাঁকে ডেকে আনল।

দোর-গোড়ায় ক'টা ছেলে-মেয়ের ভীড়, তা থাক। কিন্তু ভিতরে এসে সতরঞ্চিতে বসে পাশে তিনি এ কাকে দেখছেন? উনিই বা ওঁকাকে দেখছেন? শুধু এক নজরের পর একে-অন্যকে আর দেখছেনই বা না কেন?

এ কি দাওয়া-পাওয়া মেয়ে রে বাবা! কিন্তু গান থামায় না যে।

কে বলে সে কথা! বাঘে ধান খায়, ডাকায় কে! হরিগুণ-গান কে বন্ধ করায়!

শুধু উঠু বললে, 'আরেক জন আসবে।'

'ওগো, তুলসী আছ? আহা, কি মধু-ঢালা গলা! ওরে, তোর সেই 'পাপী'-তাপীকে বেঁধে রেখেছিস তো?'

অন্তরের লোক একেবারে অন্দরে চলে এলেন। ভিতরের আলোটা কি একটু কম-কম? এঁ্যা, এঁরা কারা?

গানটা হঠাৎ শেষ করল তুফানি। বললে, 'বেশ' এই তো ত্রিধারা এসে মিলেছেন মুচির মোহানায়! বলুন, কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? আগের দিনে রাজার কন্যে সভায় এসে বর বাছত, আজকের দিনে মুচির মেয়ে সভায় এসে ছেলে বাছছে। তাও, উমেদার, ছেলেরা নয়, ছেলেদের বাপেরা। আপনারাই ঠিক করে দিন কে আমার বেয়াই হবেন, কার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হবে—'

তিন মরদ তখন উলটা-রথে চড়তে পেলে রক্ষে পান। দরজায় কে তাদের আটকাল।

'জাতনাশা এঁটো-পাতচাটাদের যেতে দিও না—ঠেলায় পড়ে ঢেলায় পেন্নাম করতে এসেছে!' দরজার কাছে ধলু বাবু। কাপড়-কাচার মত করে বলতে লাগল: 'কুলকুল করে কুলীনের কাল-ঘাম ছুটেছে এখন! কুলীন! গাঁয়ে মানে না মাঠে মোড়ল! ফেরৎ গোষ্ঠ আর করতে হবে না আজ, ভোজ বেঁধে খাইয়ে দাও বামুনদের। আচারে গগন ফাটে, কুকুরে হাঁড়ি চাটে। যত পারবে পয়সা হাতড়ে নেবার ফন্দি! বসুধারার মত ফোঁটা-ফোঁটা পড়বে, আর এঁরা নিত্যি পাবেন, নিত্যি পাবেন। ছুঁচো কোথাকার! যার যর তার ঘর নয়, নেপোয় মারবে দই! দই ঘেঁটে ঘোল খাইয়ে দাও। জরিমানাও নেবে ট্যাক্সোও নেবে। থাকনাও নেবে খেসারৎও নেবে। এক হাত ঘাড়ে এক হাত পায়, এমন পাজি দুনিয়ায় নাই—'

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' বামুনের দল কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

খিল-খিল করে হেসে উঠল তুফানি: 'ছেলেরা না ডেকে বাপেরাই শেষ কালে মা ডাকলে। এবার তবে ছেড়ে দাও ধলু বাবু। কিছু ভিক্ষে দিতে হয় তো ছেলেদের—মুষ্টিভিক্ষে ঢের হয়েছে, এবার মুক্তি-ভিক্ষে দিয়ে দাও।'

কাল সকালে চলে যাবে তুফানি, কিন্তু সমস্ত রাত তার ঘুম নেই। ঘোরঘোরে থেকে থেকে কেবলই স্বপ্ন দেখছে, কে যেন তাকে ডাকছে। তুফনি, তুলসী—এমন কোনো নামে নয়। সে একটা কি ভারি মজার নাম, অদ্ভুত নাম। কোনো দিন তা সে শোনেনি। পায়নি সে নাম। হরিনামের চেয়েও মধুর!

ছোট-ছোট দুটো মুঠি-বোঝা হাতে আঁকুপাঁকু করে কে ভিক্ষে চাইছে তার বুকের কাছে। বলছে, ভবতি, ভিক্ষাং দেহি। টাকা নয় পয়সা নয়, জমি নয় জায়গা নয়—সে কি এক অদ্ভুত ভিক্ষে!

ক্লান্তির মত ঘুম ভাঙল তুফানির। ক্লান্তের মত সে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। বড় জয় হয়ে গেল তার, সমস্ত মুচিবংশের সে মুখোজ্জ্বল করলে, তবু তার মনে সুখ নেই, চোখে-বলায় স্ফূর্তি নেই। যেন তারই সব চেয়ে বড় হার। ভিক্ষার সম্ভার নেই তার ভাণ্ডারে।

গরুর গাড়ি এসে গিয়েছে। কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুচি-পাড়ার মেয়ে-পুরুষ।

তাদের রানি যাচ্ছে গো রাজধানীতে।

সকলের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছে তুফানি। হঠাৎ নজরে পড়ল সুবাসীকে, বুকের উপর তার সেই একতাল ছেলেটা।

ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকের উপর চেপে, পিষে ধরল তুফানি। ছেলেটির সে কি কান্না, কিছুতেই থাকবে না তুফানির কাছে, না, এক মুহূর্তও না। মায়ের গায়ের নরম ফিরে যেতে পেলে সে ঠাণ্ডা হয়, চোখের বৃষ্টিতে হাসির রোদের গুঁড়ো পড়ে।

শূন্য-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে সব তুফানি। গরুর গাড়ি চলেছে ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে। [illegible] দেখা যাচ্ছে। সব মাটির ঘর, [illegible] গায়ে-গায়ে [illegible], এক পালিপতন। দেয়ালের কাঠায়-কাঠায় ঘসি। [illegible] জঙ্গল। তার পরে ধানক্ষেত। তার পরে মাঠ [illegible] আরেকটা মুচিপাড়ার চৌহদ্দি। তার শ্বশুরবাড়ি [illegible]।

মাঠে ধান কেউ-কেউ কাটছে চাষারা। কোমর খাড়া করে কাস্তে হাতে নিয়ে কেউ কেউ দেখছে তুফানিকে। সারা গা-হাত-পা খালি, মাঝখানে শুধু একটা ন্যাকড়ার ঘের। রোগে ভোগা মরাটে চেহারা, বছর ভোর পরিশ্রমে ক্লান্ত।

কে ওই লোকটা? মাঠ ছাড়িয়ে পথের উপর উঠে আসছে?

তার সেই স্বামী নফর মুচি না? অনেকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে দেখল তুফানি। কে জানে!
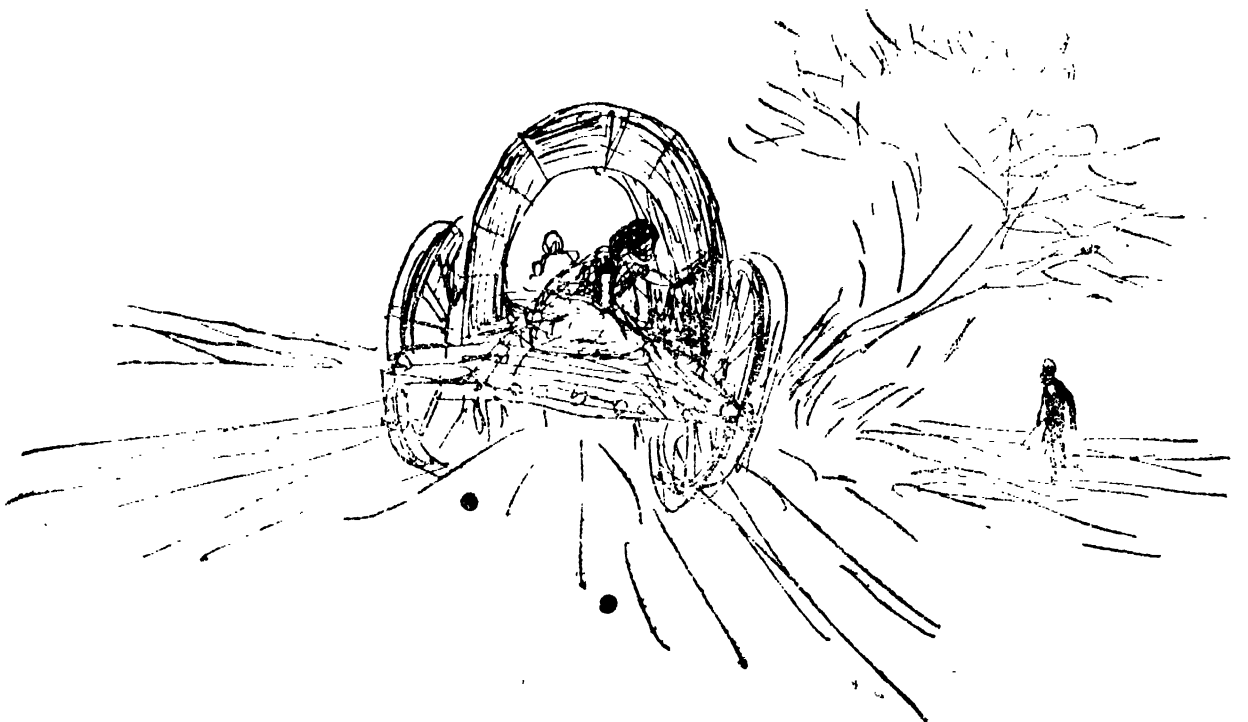
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৬৬ নং বহুবাজারে ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের [illegible]। সুতরাং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে [illegible] কলেজের ১২৫ বৎসর বয়স পরিপূর্ণ হয়েছে। [illegible] স্মরণীয় ঘটনার উপলক্ষ্যেই সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ (?) ... [illegible]বিমল চৌধুরী তিন খণ্ডে সমাপ্ত সংস্কৃত কলেজের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশেরই শিক্ষাপদ্ধতির আদিযুগের ইতিহাস। সুতরাং এই ইতিহাস রচনার গুরুত্ব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন; তাছাড়া, এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড (১৮২৪—১৮৫৮ সাল) রচনার ভার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ [illegible] পরিচয় দিয়েছেন [illegible] বলাই বাহুল্য। [illegible] অনুসন্ধান [illegible] কোশলতা ও অধ্যবসায় থাকা প্রয়োজন [illegible] দেশে বর্তমানে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিকের আছে কি না। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তিকেই যে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাতে কারও সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে-বিভাগ এই সব কাজকর্মের তদারক করেন তাঁরাও এই কারণে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিলেন। একমাত্র রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এ দেশবাসীর শিক্ষা বা জনকল্যাণকর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করার সময়ই তখন তাঁদের বিশেষ ছিল না। ১৭৮১ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসার সূচনা এবং ১৭৯২ সালে রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান বারাণসীধামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করেন সত্য, কিন্তু তারও উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী গড়ে তোলা। ১৮০০ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয় সেই একই উদ্দেশ্যে। এদিকে হিন্দু-সমাজের নেতারা স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। নানা কাজের ভিতর দিয়ে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব তাঁরা দিন দিন উপলব্ধি করছিলেন। প্রধানতঃ তাঁদেরই উদ্যোগে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কাজে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্টের এবং প্রসিদ্ধ ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারকল্পে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যথাক্রমে ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ এদেশীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুরবস্থা লক্ষ্য ক'রে যে মিনিট স্বাক্ষর করেন তাতে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দু'টি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮২১ সালে লর্ড হেষ্টিংস বা ময়রার আমলে তাঁর জুনিয়র সেক্রেটারী হোরেস হেম্যান উইলসন বলেন যে, মফঃস্বলে দু'টি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করে, তার বদলে কাশী সংস্কৃত কলেজের আদর্শে কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় একটি মাত্র সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। বড়লাট এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং ১৮২১ সালে ২১শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করে তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন: "সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার আদি উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশঃ এই কলেজ হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও উপায়স্বরূপ হবে।" কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশের সমস্ত জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) কেনা হল। এর মধ্যে ২ বিঘা জমি, ৫০০ টাকা প্রতি কাঠা দরে, ডেভিড হেয়ারের কাছ থেকে কেনা হয়। বার্ণ কোম্পানী কলেজ-মন্দির নির্মাণের ভার নেন এবং সরকার প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মহা সমারোহে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর সংস্থাপিত হয়। বাড়ী তৈরী হতে প্রায় আড়াই বছর সময় লাগে। ১৮২৬ সালের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ) নতুন গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু গৃহপ্রবেশের দু'বছর আগেই ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়।

পাঠারম্ভ কালে সংস্কৃত কলেজে যে সব অধ্যাপক ও কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, পুরাতন নথিপত্র থেকে, বেতনের হিসাব সহ, তাঁদের নামের তালিকা ব্রজেন বাবু প্রকাশ করেছেন:

সেক্রেটারী	উইলিয়ম প্রাইস	৩০০৲
ব্যাকরণ	হরনাথ তর্কভূষণ	৪০৲
	রামনাথ সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন	৪০৲
পাণিনি	গোবিন্দরাম উপাধ্যায়	৪০৲
অলঙ্কার	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	৬০৲
কাব্য	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	৬০৲
স্মৃতি	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৬০৲
ন্যায়	নিমাইচন্দ্র শিরোমণি	৬০৲
বেদান্ত	কুদেমাণ দীক্ষিত	৬০৲
গ্রন্থাধ্যক্ষ	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	৬০৲
হিসাব-রক্ষক	রামকমল সেন	৪০৲

সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থায় ১৫ বছরের কম ছাত্রদের গ্রহণ করা হত না। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তান ছাড়া আর কাহারও কলেজে পড়বার অধিকার ছিল না। ১২ বছর ছাত্রদের পড়তে হত. ১৮৪৬ সালে ১২ থেকে ১৫ বছর করা হয়। রবিবারেও কলেজ খোলা থাকত. প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্বাহে কলেজ বন্ধ থাকত।

১৮৫০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি এবং কি ভাবে তার উন্নতি করা যায়, এই বিষয়ে রিপোর্ট করার ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। কলেজ পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্যপ্রণালীর বহু পরিবর্তন সমর্থন করে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক রিপোর্ট শিক্ষা-সংসদে দাখিল করেন। তার পর ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের ইতিহাস এবং তার সর্বপ্রধান উদ্যোগী হলেন বিদ্যাসাগর।

শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্য সন্তানের পরিবর্তে কায়স্থ ও যে-কোন হিন্দুর ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে পড়বার অবাধ অনুমতি দিলেন বিদ্যাসাগর। প্রতিপদ অষ্টমী ইত্যাদিতে ছুটির পরিবর্তে শুধু সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটি ধার্য করলেন। প্রত্যেক শিক্ষাবিভাগ ও পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার ও পরিবর্তন করলেন তিনি। আগে ছাত্রদের বোপদেবের সংস্কৃত "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র ভাস্করাচার্যের "লীলাবতী" ও "বীজগণিত", ইত্যাদি পড়তে হত। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই দুরূহ বইগুলি পড়তে ছাত্রদের রীতিমত অসুবিধা হত। তার বদলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বাংলা ভাষায় "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা" এবং "ব্যাকরণ কৌমুদী" লিখে ছাত্রদের পাঠ্য করলেন। এই সঙ্গে "ঋজুপাঠ" পড়ান হল। ইংরেজীতে গণিত শিক্ষার প্রচলন করা হল। ইংরেজী বিভাগ আরও বিস্তৃত করা হল। মাতৃভাষায় বিদ্যানুশীলন এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মহা কেন্দ্ররূপে সংস্কৃত কলেজ পরিণত হল বিদ্যাসাগরের আমলে। এটা এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন। সংস্কৃত কলেজের এই পরিবর্তন পর্যন্ত ইতিহাসই ব্রজেন বাবু রচনা করেছেন। বইখানি বাংলা দেশের প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর অবশ্যপাঠ্য বলে আমরা মনে করি।

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ—ক্ষিতিমোহন সেন। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী পূর্ব্বে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় "ভারতের সংস্কৃতি" ও "বাংলার সাধনা" নামে দু'খানি গ্রন্থিকা রচনা করেছেন। শাস্ত্রীয় তথ্যালোচনার দিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থিকাগুলি আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত মূল্যবান। এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত তাঁর "হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ" এই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শাস্ত্রবিদ্যায় ক্ষিতিমোহন বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর বাচনভঙ্গী এত প্রাঞ্জল ও চমৎকার যে, সাধারণ পাঠকেরও পড়তে বা বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় না। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে সমন্বয়, এই হল ভারতীয় সংস্কৃতি তথা হিন্দু-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংস্কৃতি আর হিন্দু-সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন কি না, তা নিয়ে অবশ্য তর্কের অবসর আছে যথেষ্ট। যুগে যুগে এই ভারতবর্ষে অনেক সংস্কৃতির স্রোতধারা এসে মিলিত হয়েছে। তারা তরঙ্গ-বিক্ষোভ ও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। সমস্ত বিচিত্র ও বিপরীত ধারাকে আত্মসাৎ করে ভারতীয় সংস্কৃতির সুসমৃদ্ধ সমন্বয়ের (synthesis) ধারা প্রবাহিত হয়েছে। তাকে ঠিক হিন্দু-সংস্কৃতি না বলা গেলেও, প্রধানতঃ বা মূলতঃ হিন্দু-সংস্কৃতি বলতে কোন আপত্তি নেই। হিন্দু সংস্কৃতির বৈচিত্র্য দেখলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। হিন্দুদের মধ্যে বেদাচার আছে, তন্ত্রাচার আছে আবার স্ত্রী-আচারও আছে। হিন্দুদের মধ্যে দিবা-বিবাহ ও রাত্রি-বিবাহ দুই-ই আছে। প্রদেশ-ভেদে মাতুলকন্যা বিবাহও আছে, আবার তার জন্যে জাতিচ্যুতিরও অনুশাসন আছে। এক সময় হিন্দুদের মধ্যে গো-বধও প্রচলিত ছিল, এখন তা কল্পনা করাও মহাপাপ। প্রদেশ-ভেদে হিন্দুদের মধ্যে বেশভূষা, শাড়ী পরা, চুল বাঁধার প্রসাধন-কলারও তারতম্য আছে। কিন্তু এ সব বৈচিত্র্যের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির যে একটা অখণ্ডতা আছে, তা বাস্তবিকই অতুলনীয়। "প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা নূতন আমদানী বস্তু" বলে ক্ষিতিমোহন বাবু মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটা আংশিক সত্য। প্রাদেশিকতার মধ্যে যে সংকীর্ণতা আছে, সেটা নিশ্চয়ই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নয়। তাই বলে প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি এক, অবিভাজ্য ও অভিন্ন নয়। সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং সংকীর্ণতা এক বস্তু নয়, অথবা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা সংকীর্ণতা নয়। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থান, ভিন্ন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি নিয়ে ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতির একটা স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়েছে। আজ সেই জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা অর্থহীন এবং তাকে স্বীকার করলে ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ডতাও ক্ষুণ্ণ হয় না। বিভিন্ন নদ-নদীর বিচিত্র স্রোতধারা মহাসাগরে মিলিত হয়েছে, তাতে নদ-নদীর স্বতন্ত্র সত্তা বা ধারা বিলুপ্ত হয় না। তেমনি ভারত-সংস্কৃতির মহাসাগরে বিভিন্ন প্রাদেশিক জাতীয় সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারা মিলিত হলে তার ঐতিহাসিক অখণ্ডতা খণ্ডিত হয় না। প্রাদেশিক সংস্কৃতির কথাটা ঐতিহাসিক বিকাশের ফল, তার সঙ্গে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার সম্পর্ক নেই। এ-বিষয়ে ক্ষিতিমোহন বাবু

বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে আলোচনা করলে এই সত্যেই পৌছতেন। তা তিনি করেননি। অত্যন্ত সংক্ষেপে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করে তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। অথচ হিন্দু-সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আজ এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা না করলে অন্যায় হয়। আশা করি, ভবিষ্যতে ক্ষিতিমোহন বাবু এই সমস্যার যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করবেন। এই ত্রুটি ছাড়া পুস্তিকাখানি তথ্য ও আলোচনার দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান ও সুপাঠ্য হয়েছে।

রবিবারের দেশে: শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক: ২২, মোহিনীমোহন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক নবাগত বলা চলে। আলোচ্য গ্রন্থের আগে তাঁর আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কি না আমরা জানি না। হালকা ধরণের কতকগুলো আবৃত্তির উপযোগী কবিতা "রবিবারের দেশের" মধ্যে সংকলন করা হয়েছে। ছন্দের ঝঙ্কার, ছন্দ ও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবিতাগুলি স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি করতে ভালই লাগবে মনে হয়। "হাচ্ছো হ্যাচ্ছো," "নতুন জুতো," "রেড চলে," চীনে পটকা," "কি তো হলো", "ভীষণ চিৎকার", "বইটি কেমন চাই," "বাঙলা দেশের ছেলে," "ঘোড়াও ডিমের অমলেট" ইত্যাদি কবিতায় যেমন হাসির খোরাক আছে, তেমনি ছন্দোমাধুর্যও আছে। ইংরেজীতে যাকে "ননসেনস রাইমস" বলে, সেই ধরণের ছড়া আমাদের দেশে সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসু এত সুন্দর ভাবে লিখেছেন যে বিদেশী সাহিত্যেও তার তুলনা মেলা ভার। ছেলেদের ছড়া-রচনার শক্তি উপেন বাবুর যে রীতিমত আছে তা তাঁর "বইটি কেমন চাই", "খুকুমণির রাগ" "ঘুমো খোকা ঘুমো" ইত্যাদি কবিতা থেকেই বোঝা যায়:

> "খ"-এর খোঁড়া পায়ের থেকে পড়ম যাবে খুলে
> বর্গীয় "জ" ঘাম ছিঁড়ে ঝাম হাচেছে কূলে
> "ত" আর "খ" তাথৈ নাচে পা ভাঙ্গা "দ" দাঁড়িয়ে আছে
> "ভ" ভয়েতে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবতে গেছে ভুলে
> "ট" "ঠ" আসে ঠকাঠকিয়ে জোড়া টিকি তুলে।
> "এ" ধোপার পিঠে দুটো পুঁটলি আছে জমা
> উলটে গিয়ে "ঙ" কাঁদে উঁয়া উঁয়া উঁয়া
> "ব"-এর হাতে বাজলো বাঁশী
> "হ"-এর মুখে ফুটলো হাসি
> "ভ" বলছে ভালবাসি "চ"-এর মুখে চুমা
> "ক" "খ" "গ" পড়া হোল "ঘ" বলছে ঘুমা
> খোকা ঘুমা।
> (বইটি কেমন চাই)

উপেন বাবুর এই ধরণের ছেলেদের ছড়া লেখার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁর প্রথম বইয়ের মধ্যে এই ক্ষমতার পরিচয় যা পাওয়া যায় তা সত্যিকই প্রশংসনীয়। কিন্তু অনেক কবিতায় কষ্ট-কল্পনা ও চেষ্টিত উদ্ভট্ব এত প্রকট যে সেগুলো একই বইয়ের মধ্যে সংকলন না করলেই ভাল হত।

উত্তর

১। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক। দাড়ি-গোঁফ-চুল ইত্যাদিতে তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত থাকত বলে তাঁর নাম ছিল "কেশকম্বলী"। চার্বাকদের মত তিনিও আত্মা, ইহকাল, পরকাল, জন্মান্তর, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি পুণ্য কাজে বিশ্বাস করতেন না। পঞ্চভূতাত্মক দেহ এবং বাস্তব বহির্জগৎ ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়—এই হল অজিত "কেশকম্বলীর" দার্শনিক মত।

২। শাক্য রাজকুমারী। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। নারী-জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তিনি বুদ্ধ হবার জন্য সাধনা করেন।

৩। লঙ্কা বা বর্তমান সিংহলের প্রাচীন নাম "তাম্রপর্ণী"।

৪। বুদ্ধশিষ্য যে সারিপুত্রের উৎসব কিছু দিন আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরই তিন ছোট বোন হলেন চালা, উপচালা, শিশুপচালা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসার-ত্যাগের কথা শুনে তাঁরাও সংসার ছেড়ে সাধনা করেন।

৫। বর্তমান "পার্ক স্ট্রীটের" প্রথম যুগের নাম এই ছিল, কারণ এই পথে ইংরেজদের গোরস্থানে যেতে হত।

৬। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে।

৭। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা—এই ছয়টি দর্শন হিন্দুদের প্রসিদ্ধ "ষড়দর্শন"। এদের প্রণেতা যথাক্রমে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বাদরায়ণ বা ব্যাস।

৮। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ-মন্দির একাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব তৈরী করেন।

৯। দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় থেকে পড়াশুনা করত এবং ১০০ বক্তৃতা-গৃহ থেকে আচার্যেরা ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

১০। তক্ষশিলা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া

প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তি লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল অবশেষে তাহার সমাধান হইয়াছে। ৭ই মার্চ (১৯৪৯) ওয়াশিংটনে আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য উহা সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রেরিতও হইয়াছে। এই খসড়া-চুক্তিতে মোট ১২টি ধারা আছে। তন্মধ্যে পঞ্চম ধারাটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনও একটি সদস্য রাষ্ট্রের উপর সশস্ত্র আক্রমণ হইলে উহা সকলের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং নিরাপত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা উহা বহাল রাখিবার জন্য অবিলম্বে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ সহ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হইবে। খসড়া-চুক্তির দ্বিতীয় ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করিবে। পঞ্চম ধারাটি ঠিক কি ভাবে রচিত হইয়াছে প্রেরিত সংবাদ হইতে তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। কিন্তু এই ধারাটিই যে আটলাণ্টিক চুক্তির প্রাণ-স্বরূপ (key clause) তাহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল এই ধারাটি লইয়াই। 'সামরিক সাহায্য' সংক্রান্ত এই ধারাটি প্রথমে যে ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহাতে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন একটি রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলেই, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমেরিকাও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত। সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ টম কনালীই এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এই চুক্তি শেষ পর্য্যন্ত যে আকারই ধারণ করুক না কেন, সিনেট কর্ত্তৃক এই চুক্তি অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ এবং নিরাশ না হইয়া পারে নাই। তাহারা সকলেই আশা করিয়াছিল যে, আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাও যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে। কিন্তু মার্কিণ শাসনতন্ত্র অনুসারে একমাত্র কংগ্রেসই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অধিকারী। আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য অতি উৎসাহের ফলে কংগ্রেসের এই অধিকারের কথা অনেকের পক্ষেই ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত ধারাটি এমন ভাবেই রচিত হইয়াছিল যে, মার্কিণ শাসনতন্ত্র সংশোধন না করিয়া উহা বহাল রাখা সম্ভব ছিল না।

আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটি দেশ যদি রাশিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সিনেটের সদস্যগণ আপত্তি করিবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকা এ সম্বন্ধে সিনেটরদের যে অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ৯৬ জন সিনেটরের মধ্যে ৫০ জনই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে ভোট দিবেন। আমেরিকার সামরিক সাহায্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার কোনই কারণ নাই। সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত ধারাটির রচনায় যে শব্দই ব্যবহৃত হউক না কেন, আটলাণ্টিক চুক্তি যে আসলে সামরিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা সকলেরই জানা কথা। এই চুক্তির প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা চুক্তির উদ্যোক্তাগণ কেহই গোপন রাখেন নাই। আটলাণ্টিক চুক্তি যেমন সামরিক চুক্তি, তেমনি এই সামরিক চুক্তি যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাহাতেও কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪২ সালে বৃটেন এবং রাশিয়ার মধ্যে ২০ বৎসরের জন্য এক মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তির ফলে উক্ত দুইটি চুক্তিই ছেঁড়া কাগজের টুকরার মতই মূল্যহীন হইয়া পড়িল। মিঃ হেনরী ওয়ালেস বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত কমিটির নিকট (Foreign Affairs Committee) বলিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক চুক্তি এবং মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা যুদ্ধ এবং দেউলিয়া অবস্থাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি "made aggressive gesture against Soviet Union by establishing military bars near her border." অর্থাৎ রাশিয়ার সীমান্তের নিকটে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন দ্বারা উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইঙ্গিত করিতেছে। 'আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সমিতি' আটলাণ্টিক চুক্তির তাৎপর্য্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। এই সমিতিটি বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া গঠিত এবং উহা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে এই চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রের এশিয়াতে উপনিবেশ আছে। আমেরিকা এই সকল উপনিবেশের মালিকদিগকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করায়, প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, আমেরিকা কি ঐ সকল দেশের উপনিবেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করিল? এই চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিবে উপনিবেশের মালিকরা কি তাহা উপনিবেশের জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে? বস্তুতঃ, আমেরিকা এশিয়াস্থ উপনিবেশ সমূহের ইউরোপীয় মালিকদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিতেই সাহায্য করিতেছে। আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে উহা যে ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহের মৈত্রী চুক্তি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক শক্তিই নিজ নিজ

উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য আক্রমণাত্মক কার্য্যে ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহ যে পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছে গত সাড়ে তিন বৎসরের ঘটনাবলীই তাহার প্রমাণ। এই সাহায্য এক দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে কূটনৈতিক সমর্থন দ্বারা আর এক দিকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তি উপনিবেশের মালিকদের শক্তি-সংহতি অধিকতর দৃঢ় করিবে।

স্কেণ্ডিনেভিয় দেশ ও আটলাণ্টিক চুক্তি—

আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে আর একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সোভিয়েট রাশিয়া একটি অনাক্রমণ চুক্তি করিবার জন্য নরওয়ের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিল, গত ৪ঠা মার্চ্চ নরওয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যান-পত্রে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সনদে স্বাক্ষর করার ফলেই উভয় দেশ পারস্পরিক অনাক্রমণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া অনাক্রমণ চুক্তি করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া নরওয়ে মনে করে না। নরওয়ে এক দিকে যেমন রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে অস্বীকার করিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি সোভিয়েট রাশিয়াকে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নরওয়ে প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তির প্রাথমিক আলোচনায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক। ৩রা মার্চ্চ (১৯৪৯) নরওয়ের পার্লামেণ্টের এক গুপ্ত অধিবেশন হইবার পর নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদানের সঙ্কল্প ৪ঠা মার্চ্চ ঘোষণা করা হইবে বলিয়া স্থির করেন। নরওয়ের আটলাণ্টিক চুক্তির আলোচনায় যোগদান করার সঙ্কল্প ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার পরেই ডেনমার্কও আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদান সম্পর্কে শেষ আলোচনা করিবার জন্য তাহার পররাষ্ট্র-সচিবকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়া প্রথমে প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে নরওয়ের মনোভাব জানিতে চায়। এ সম্পর্কে নরওয়ের উত্তর পাওয়ার পর গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) রাশিয়া নরওয়ের নিকট এক অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করে।

স্কেণ্ডিনেভিয় দেশত্রয় অর্থাৎ নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেন এই তিনটি দেশ মিলিয়া সাধারণ রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিল তাহা যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই আলোচনা চলিবার সময়ই যে আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদানের জন্য নরওয়ের উপর যে চাপ পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ককে বুঝাইতে পারে নাই যে, আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদান না করিয়া নিজেদের মধ্যে রক্ষা-চুক্তি করাই তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। রাশিয়া যখন নরওয়ের নিকট আটলাণ্টিক চুক্তি সম্বন্ধে তাহার অভিমত জানিতে চাহিয়াছিল তখন উহাকে সকলেই নরওয়ের উপর রাশিয়ার চাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাবও নরওয়ের উপর রাশিয়ার চাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গোপনে যে নরওয়ের উপর চাপ দিয়াছিল তাহা মার্কিণ সংবাদপত্র সমূহের মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকা মন্তব্য করেন, "We want friends, not satellites, a strong and interdependent Western Europe, not a military outpost of the U. S." অর্থাৎ আমরা বন্ধু চাই, তাঁবেদার চাই না। আমরা পরস্পর নির্ভরশীল শক্তিশালী পশ্চিম-ইউরোপ চাই, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সামরিক অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি চাই না। উক্ত পত্রিকা আরও মন্তব্য করেন, "It is unwise to demand iron fetters when silken threads are adequate." অর্থাৎ 'রেশমী সূতা দ্বারাই যেখানে কাজ সম্পন্ন হইতে পারে সেখানে লৌহ-শৃঙ্খল ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' মিঃ ওয়াল্টার লিপম্যান স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে, স্কেণ্ডিনেভিয় দেশত্রয়ের উপর চাপই শুধু দেওয়া হয় নাই, খসড়া-চুক্তি চূড়ান্ত ভাবে রচিত হওয়ার পূর্ব্বেই উহাতে সম্মতি দিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

নরওয়ে এবং ডেনমার্কের আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদান করা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে পারিলে এই চাপ দেওয়ার কারণ অনুমান করা কঠিন হয় না। রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় রক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্পিটবারজেন (Spitzbergen), বোর্ণহোলম্ (Bornholm) এবং গ্রীনল্যাণ্ড উত্তর-আটলাণ্টিকের এই তিনটি দ্বীপের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই তিনটি দ্বীপ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি উত্তর মেরুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে, তাহা হইলে আটলাণ্টিক চুক্তির মূল্য বিশেষ কিছুই থাকিবে না। গ্রীনল্যাণ্ড হইতে বিমান-পথে নিউইয়র্ক দুই হাজার মাইল এবং স্পিটবারজেন হইতে নিউইয়র্ক বিমান-পথে সাড়ে তিন হাজার মাইল। স্পিটবারজেন দ্বীপটি নরওয়ের এবং অপর দ্বীপ দুইটি ডেনমার্কের। কাজেই নরওয়ে এবং ডেনমার্কের উপরেই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোপন চাপ বেশী পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই চাপের ফলেই নরওয়ের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ল্যাঙ্গে ওয়াশিংটনে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আক্রান্ত হইলে দ্রুত সামরিক সাহায্য পাওয়া সম্বন্ধে কোন আশ্বাস না পাইয়াই তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সামরিক সাহায্য সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া সত্ত্বেও নরওয়ে প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তিতে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছে। ডেনমার্কও অনুসরণ করিয়াছে নরওয়েকে। স্কেণ্ডিনেভিয় দেশত্রয়ের মধ্যে একমাত্র সুইডেনই রহিল নিরপেক্ষ।

রাশিয়া আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কা প্রকাশ্যেই প্রচার করা হইতেছে এবং যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে প্রকাশ্যেই। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি এই আয়োজনের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে নরওয়ে ও সুইডেনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ভূমধ্য সাগরেরও সামরিক গুরুত্ব বড় কম নয়। তাই ভূমধ্য সাগরীয় ইউনিয়ন গঠনের কথাও উঠিয়াছে। তুরস্ককে একান্ত ভাবেই ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। আরব রাষ্ট্রগুলিও ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যের উপর কম নির্ভরশীল নহে। কিন্তু মিশর, সৌদী আরব, লেবানন ও ইজরায়েল রাষ্ট্রের এই ভূমধ্য সাগরীয় ইউনিয়নে যোগদানের কথা উঠে নাই।

কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টির কারাদণ্ড—

হাঙ্গেরীর 'জনগণের বিশেষ আদালত' (Special People's Court) কর্তৃক কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আন্তর্জ্জাতিক প্রতিক্রিয়া যে সুদূরপ্রসারী হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মার্কিণ রাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী এবং বৃটিশ সেক্রেটারী নিজ নিজ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মার্কিণ এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই দণ্ডাদেশকে কম্যুনিজম ও রুশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবেন, ইহাও খুব স্বাভাবিক। পোপ দ্বাদশ পায়স কার্ডিনালের প্রতি এই দণ্ডাদেশে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শুধু রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহেই নহে, পৃথিবীর সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্রেই এই দণ্ডাদেশের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টির বিচার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এবং কম্যুনিষ্ট আদর্শবাদের মধ্যে বর্ত্তমান তীব্র বিরোধকেই সুস্পষ্ট ভাবে রূপায়িত করিয়াছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে লৌকিক রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের সহিত বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেন্ট দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায়।

কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টির সহিত আরও ছয় জন অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হইয়াছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) জনগণের বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক এই দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। কার্ডিনালের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তিন দফা অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল: (১) হাঙ্গেরী প্রজাতন্ত্রের দেশরক্ষা বিধান ভঙ্গ করা, (২) হাঙ্গেরী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তোলা এবং (৩) মুদ্রার চোরা-কারবার। বিশেষ আদালত এই তিনটি অভিযোগেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার আদেশ প্রদত্ত হয়। অপর ছয় জন দণ্ডিত ব্যক্তিও তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম বাধিয়া উঠিলে মধ্য-ইউরোপে হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টি এবং কয়েকটি বৈদেশিক শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন। মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ১৯৪৭-৪৮ সালেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং কার্ডিনাল এইরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, ঐ সময় তিনি কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেন্টকে উৎখাত করিতে সমর্থ হইবেন। এই আশা এবং উদ্দেশ্যেই যে তিনি কাজ করিতেছিলেন, কার্ডিনাল তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির বিরোধী কতিপয় রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ এই ব্যাপারে তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। মুদ্রার চোরা-কারবার সংক্রান্ত অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু নিজের লাভের জন্য নয়, যে উদ্দেশে তিনি কাজ করিতেছিলেন, তাহার জন্য তহবিল গঠনের জন্যই তিনি মুদ্রার চোরাকারবার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম-ইউরোপ এবং উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে যে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এবং তাঁহার মানসিক প্রতিরোধ-শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ানো হইয়াছিল। এই সন্দেহ সত্য হইতেও পারে, আবার না-ও পারে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এইরূপ জঘন্য পন্থা যে অবলম্বিত হয় না, তাহাও নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার মনোমত কথা বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরে হাঙ্গেরীতে বিপুল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের যে প্রতিক্রিয়া এই দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের উপর হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্ব্বে রাজনৈতিক দিক্ হইতে হাঙ্গেরীর মত অনগ্রসর দেশ ইউরোপে দ্বিতীয় আর একটি ছিল কি না সন্দেহ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। হাঙ্গেরীর রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীও প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ এবং সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীই ছিল প্রকৃতপক্ষে হাঙ্গেরীর শাসক সম্প্রদায়। উভয়ের মধ্যে যে গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট পার্টি যখন হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া বসিল, তখন এই দুইটি পার্টি দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেন্টের সহিত রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ এবং সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর তীব্র সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবে, ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেন্ট ভূমি-ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহাতে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের ক্ষমতাও যে খর্ব্ব হয় নাই, তাহাও নয়। হাঙ্গেরীর স্কুলগুলির উপর ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রভুত্বের জন্য শুধু ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্যাথলিক চার্চ্চের রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা কঠিন বলিয়া স্কুলগুলিকেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টি যে এই দুইটি ব্যবস্থারই তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য্য। এই ব্যাপারে তিনি পোপ এবং হাঙ্গেরীর চার্চ্চের সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া উভয় পক্ষে তীব্র সংগ্রামের পর এই বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই মামলায় হাঙ্গেরীস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ চাপিনও জড়িত ছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং বিশেষ আদালতের রায়ে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্যও করা হইয়াছে। কার্ডিনাল মিণ্ডস্ জেন্টির কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার আদেশে তাঁহার সম্পত্তিগত কোন ক্ষতি হইবে না। অন্যান্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রিন্স পল এস্তারহাজী এক সময়ে ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী ভূস্বামী ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের সময় ৩০ লক্ষ একর ভূমি হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এখনও তাঁহার দেড় লক্ষ একর জমি অষ্ট্রিয়াতে এবং দুই হাজার একর জমি দক্ষিণ-জার্ম্মাণীতে আছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ কংগ্রেস—

পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতার জন্য যে ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের কংগ্রেস (The Congress of Peoples against Imperialism) তাহার স্বরূপের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আট মাস পূর্ব্বে ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার ৩০টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া প্যারী নগরীতে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে। গোল্ডকোষ্টের মি: ডবলিউ ল্যাম্পটি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং ভারতীয়দের মধ্যে ডা: এন গাঙ্গুলী এবং বৃটিশ শ্রমিক দলের মি: ফেনার ব্রকওয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ম: জাঁ রু (ফ্রান্স)। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) রাত্রিতে এই কংগ্রেস লণ্ডনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এই কংগ্রেস পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে, বিশেষ করিয়া আফ্রিকা হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছে যে, সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের উদ্যোগ-আয়োজন স্বরূপ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সমূহ সুদৃঢ় করা হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের কংগ্রেসের সম্পাদক বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই কংগ্রেসের সভায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফরাসী উপনিবেশ সমূহ এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের কার্য্যকলাপের উপর আরোপিত লৌহ-যবনিকা সম্বন্ধে যে ... প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহ ঔপনিবেশিক দেশগুলি সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য কি ভাবে গোপন করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হওয়ার প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। অতএব যে তাঁহারা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাইতে ইচ্ছুক, ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাও তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কংগ্রেস তাঁহার এই প্রচার-কার্য্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

গত তিন বৎসর ধরিয়া উপনিবেশ সমূহে স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হইতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং যে কোন উপায়েই হউক, উপনিবেশগুলির উপর তাহাদের অধিকারকে অধিকতর সুদৃঢ় করিতে তাহারা ইচ্ছুক। সাম্রাজ্যবাদীদের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কৌশল হইল উপনিবেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস। তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, স্বাধীনতাকামী জাতির সংগ্রামকে সামরিক শক্তি দ্বারা দমন করা অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ায় কতকগুলি তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্য ফ্রান্স ডা: হো চি মীনকে বাদ দিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বাও দাইয়ের সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। এই জন্য মালয়ে বৃটেন চীনাদের বিরুদ্ধে মালয়ীদিগকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে পরাধীন জাতিগুলি অধিকতর অনগ্রসর, স্বাধীনতা-সংগ্রামের কৌশল জানে না, অথবা অস্ত্রশস্ত্রও নাই, সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আফ্রিকায় সামরিক ঘাঁটি সমূহ সুদৃঢ় করার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের কংগ্রেস আরও সংবাদ পাইয়াছেন যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বহুসংখ্যক নূতন সামরিক বিমান ঘাঁটি এবং সড়ক তৈয়ার করা হইয়াছে। একটি পূর্ব্ব-আফ্রিকা নৌ-বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় অনেক সৈন্য-বাহিনীও গঠন করা হইতেছে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় সামরিক শিল্প সমূহ গড়িয়া উঠিতেছে। ইটালীকে পশ্চিম ইউনিয়নের সদস্য হইবার জন্য প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যে ইটালীর প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতার দাবীতে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে।

মি: ফেনার ব্রকওয়ে বলিয়াছেন যে, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিলেও এখনও এই দেশ দুইটিতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি মনে করেন, ভারত সম্বন্ধে এ কথা ততখানি জোরের সঙ্গে বলা যায় না। ভারতে বৈদেশিক অর্থনৈতিক স্বার্থ তেমন শক্তিশালী নয়, এই ধারণা তাঁহার মনে কেন সৃষ্টি হইল, তাহা অনুমান করা কঠিন। ভারতে বিদেশী অর্থনৈতিক স্বার্থ যে কতখানি শক্তিশালী, তাহা ভারতবাসী ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। এই কংগ্রেস সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের নূতন কৌশলের যে স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহা যেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে নূতন সংহতি পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামকেও অত্যন্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছে।

আমেরিকা কি জাপান ছাড়িবে?—

মার্কিণ সামরিক বিভাগের মুখপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান পর্য্যন্ত সকলেই টোকিও হইতে প্রেরিত যে সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য-বিভাগের সেক্রেটারী মি: কেনেথ রয়েল টোকিও সহরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আমেরিকার সরকারী নীতি জাপান হইতে সরিয়া আসিবার এবং জাপানীদের হাতেই জাপানের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিতে সিদ্ধান্ত করিবার দিকেই ক্রমশ: অগ্রসর হইতেছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা সরকারী ভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে এবং মি: রয়েল সত্যই কি বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধও মতভেদ দেখা যায়। মি: কেনেথ সম্প্রতি সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার দখলী অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। উল্লিখিত উক্তি তিনিই করিয়াছেন বলিয়া মার্কিণ সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয় কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করেন। আমেরিকার প্রধান প্রধান সামরিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে জাপানকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; সুতরাং জাপান হইতে সমস্ত মার্কিণ সৈন্য গোপনে অপসারিত করার নীতিই তাঁহারা সমর্থন করেন। মার্কিণ সামরিক বিশেষজ্ঞগণ সত্যই এইরূপ ধারণা পোষণ করেন কি না, তাহা অনুমান করিবার কোন সূত্র অবশ্য পাওয়া যায় না। অনেকের বিশ্বাস যে, মার্কিণ রাষ্ট্র দপ্তরের কেহ কেহ ঐরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই ধারণার মূলে যে যুক্তি আছে, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

রাশিয়ার সহিত যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার

উপর বিমান আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে জাপানের কোন সার্থকতা নাই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিমান-ঘাঁটি সমূহ এবং জাপান ও ফরমোসার মধ্যবর্ত্তী ওকিনাওয়া দ্বীপই বিমান আক্রমণ চালাইবার উপযুক্ত ঘাঁটি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জাপানে যদি আমেরিকার দখলকার সৈন্য অবস্থান করিতে থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধারম্ভের পর জাপানের ৮ কোটি অধিবাসীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রকে বহন করিতে হইবে। কাজেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে জাপান সম্পদের পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দায়ে পরিণত হইবে। এইরূপ দায় বহন করিবার পক্ষে কোন দিক দিয়াই আমেরিকার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, জাপানে যে দখলকার সৈন্য অবস্থান করিতেছে, তাহা প্রধানতঃ মার্কিণ সৈন্য। জাপানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই মিত্রশক্তিবর্গের উদ্দেশ্য এবং এই গণতন্ত্র যে মার্কিণ গণতন্ত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাপানস্থ মার্কিণ সৈন্যের কি অবস্থা হইবে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে অনুমান করা কঠিন। কাজেই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই মার্কিণ সৈন্য নিরাপদ স্থানে সরাইয়া আনাই সঙ্গত। জাপানকে দখলে রাখা সম্পর্কে মার্কিণ নীতির সত্যই কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানা না গেলেও সামরিক কূটকৌশল এবং পররাষ্ট্র-নীতির দিক হইতে আমেরিকা যে সুদূর-প্রাচ্যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথমে এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক জাপানকে পুনর্গঠিত হইতে দেওয়া হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয়ের এই ধারণা ছিল যে, রাশিয়ার সহিত কোন গোলযোগ বাধিলে গণতান্ত্রিক জাপান নির্ভরযোগ্য মিত্র হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে উত্তর-চীনের সমগ্র অংশই কম্যুনিষ্টদের দখলে গিয়াছে। বর্ত্তমানে কোরিয়ার শুধু উত্তরার্দ্ধ রাশিয়ার তথা কম্যুনিষ্টদের দখলে থাকলেও সমগ্র কোরিয়াই কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। এই অবস্থায় তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রামের মধ্যে জাপান হস্তদূরবর্ত্তী এমন একটি সামরিক ঘাঁটি হইবে, যাহাকে রক্ষা করা বড় সহজ হইবে না। জাপানের সামরিক শিল্প-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিলে জাপানের পক্ষে যেমন কম্যুনিজমের গতি রোধ করা সম্ভব হইবে না, তেমনি জাপানের জনগণ এবং জাপ গভর্ণমেণ্টের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে জাপানের সামরিক শিল্প-সম্ভাবনাকে বাঁচিত হইতে দেওয়ার বিপদও উপেক্ষার বিষয় নহে। জাপানে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা এবং মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ভূম্যধিকারী পরিবার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। জাপানের সমস্ত ব্যাঙ্কিং ও জাহাজী ব্যবসা এবং শিল্পের উপর মাত্র ছয়টি পরিবারের একচেটিয়া অধিকার। এই ছয়টি পরিবারের একচেটিয়া অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। সুতরাং জাপানের অর্থনৈতিক শক্তি সমগ্র ভাবে এই ছয়টি পরিবারের কর্ত্তাদের হাতেই রহিয়াছে। ইঁহাদের সহিত জাপানের সমর নায়ক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা ছিল। বড় বড় কয়েক জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি হইলেও সমর-নায়ক ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব সামান্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেই পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব জাপানে এখনও রহিয়াছে এবং আরও অনেক দিন থাকিবে, এ কথাটা আমেরিকা বুঝিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। জাপানের লোকসংখ্যা আট কোটি এবং দিন দিনই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। জাপানে উৎপন্ন খাদ্যশস্য দ্বারা এই আট কোটি লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালেরও একান্ত অভাব। খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল আমদানি করিলে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে কোথা হইতে? জাপানী পণ্য রপ্তানি এবং জাপানী জাহাজে মাল বহন দ্বারা এই মূল্য সঙ্কুলান অবশ্যই করা যাইতে পারে; কিন্তু জাপানী পণ্যের প্রতিযোগিতার কথাও উপেক্ষা করা যায় না। ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশ জাপানী বস্ত্রের প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

দখলকার সৈন্য দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে জাপানে মার্কিণ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্ট হওয়া মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। তাছাড়া অন্য দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে দখলকার সৈন্য রাখা যে নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধোত্তর কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমেরিকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। ডলার-নীতি (Dollar diplomacy) দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় ইটালী ও ফ্রান্সে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জাপানে দখলকার সৈন্য না রাখিয়া ডলার-নীতি দ্বারা যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সৈন্য অপসারণে আপত্তি হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মলোটভ অপসারিত—

রুশ পররাষ্ট্র-সচিবের পদ হইতে মঃ মলোটভের অপসারণ এবং তাঁহার স্থানে মঃ ভিসিনস্কীর নিয়োগ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তি সমূহের মধ্যে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। বিশেষতঃ যে-দিন নরওয়ে অনাক্রমণ চুক্তির জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেই দিনই রুশ পররাষ্ট্র-সচিবের পদ হইতে মলোটভের অপসারণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ায়, উভয় ঘটনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা লইয়াও কেহ কেহ মাথা ঘামাইতেছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ৪ঠা মার্চ্চ মস্কো বেতারে মলোটভের অপসারণ সম্বন্ধে যে সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা খুব সংক্ষিপ্ত। বেতার ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সর্ব্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলী (The Supreme Soviet Presidium) মঃ মলোটভকে পররাষ্ট্র-সচিবের কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। পররাষ্ট্র-সচিবের পদ হইতে অপসারিত হইলেও মঃ মলোটভ মন্ত্রিসভার সহকারী চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিতই রহিয়াছেন।

মঃ ভিসিনস্কী পররাষ্ট্র-সচিব হওয়ায় রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতির গুরুতর কোন পরিবর্ত্তন হইবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। কারণ মঃ মলোটভ ব্যক্তিগত ভাবে রুশ পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই এবং মঃ ভিসিনস্কীও ব্যক্তিগত ভাবে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালন করিবেন না। যে কয়েক জনের ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যায়, মঃ মলোটভ তাঁহাদের অন্যতম। এই অপসারণের মধ্যে তাঁহার সেই সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল কি না,

তাহাও অনুমান করা কঠিন। মলোটভের পূর্ব্বে মঃ লিটভিনব ছিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব। আজ আর তাঁহার নামও শোনা যায় না। অতঃপর লিটভিনবের মত মলোটভও কি বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইবেন ?

অশান্ত মালয়—

মালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা কি ? গত আট মাস ধরিয়া নিরাপত্তা সৈন্য-বাহিনী (Security Forces) কম্যুনিষ্টদিগকে দমনের জন্য যে-সংগ্রাম করিতেছে, তাহার ফল কি হইয়াছে ? বৃটিশ পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ লিওনার্ড গাম্মান্‌স্ গত ফেব্রুয়ারী মাসে মালয় পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অধৈর্য্য গোপন রাখেন নাই। মালয় কর্ত্তৃপক্ষ শুধু কোন রকমে কম্যুনিষ্টদিগকে ঠেকাইয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি মনে করেন, ইতিপূর্ব্বে মালয়ের কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রামে যে ভাবে জয়লাভ করা হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দ্রুত জয়লাভ করা প্রয়োজন। মালয়ের এই বিদ্রোহ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হওয়ার ফলে বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিলাতের শাসক সম্প্রদায় যথাসম্ভব সত্বর বিদ্রোহীদিগকে দমনের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যত টিন উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগই উৎপন্ন হয় মালয়ে। বৃটিশ অর্থনীতিতে মালয়ের রবার-শিল্পের গুরুত্বের কথা কাহারও অজানা নাই। আফ্রিকাস্থ বৃটেনের ১৭টি উপনিবেশের মোট বাণিজ্য অপেক্ষা মালয়ের বাণিজ্য অনেক বেশী। মালয় হাতছাড়া হইলে—এই সমস্তই বৃটেনের হস্তচ্যুত হইলে ডলার অর্জ্জনের প্রধান অঞ্চলটি বৃটেন হারাইবে এবং সুয়েজ খালের পূর্ব্ব দিকে বৃহত্তম বন্দর সিঙ্গাপুরও কম্যুনিষ্টদের কবলে যাইয়া পড়িবে। চীনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার যে প্রধান বিপদ-স্বরূপ হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মালয়ের বিদ্রোহীদের সহিত সংগ্রামে অতিক্রুত সামরিক বিজয় লাভ করাই এই বিপদ কাটাইবার একমাত্র উপায়।

প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া মালয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গঠিত হইয়াছে। গার্ডস্ ব্রিগেড, চতুর্থ হুসার, সীফোর্থ, ইনিস্কিলিংস, ডেভন এবং কিংস অয়ুন ইয়র্কশায়ার লাইট ইনফেন্ট্রির সৈন্য সহ বৃটিশ বাহিনী এই নিরাপত্তা বাহিনীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ। বৃটিশ বাহিনীর সহিত আছে গুর্খা সৈন্য। আর-এফ-এ এবং নৌ-বাহিনী নিরাপত্তা সৈন্য-বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। স্থানীয় নিয়মিত পুলিশ বাহিনীতে ১৫ হাজার লোক আছে। স্পেশ্যাল কনেষ্টবলের সংখ্যা ৩২ হাজার। অনেকে মনে করেন যে, নিরাপত্তা সৈন্য-বাহিনীর সংখ্যা যদি ৮০ হাজারের দ্বিগুণও হয়, তাহা হইলেও মালয়ের মত জঙ্গলাকীর্ণ দেশে কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করা বড় সহজ হইবে না। মালয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৫০,৮৫০ বর্গ-মাইল। ইহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ অংশই জঙ্গলাকীর্ণ। এই সুবিস্তীর্ণ জঙ্গলের সমস্ত অন্ধি-সন্ধিই কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের নখদর্পণে। বিদ্রোহীদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত পাঁচ শত বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া গরিলা যুদ্ধ চালাইতেছে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই জুনের পর তিন জন বৃটন প্রথম নিহত হওয়ার সময় হইতেই এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ৩রা আগষ্ট তারিখে মালয়ে কম্যুনিষ্ট প্রজাতন্ত্র গঠন করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। তাহাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু মালয়ে এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কাহারা এই বিদ্রোহী ? কোথায় এই বিদ্রোহের মূল ? দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বৃটিশ হাই-কমিশনার জেনারেল মিঃ এম, ম্যাকডোনাল্ড দিল্লী হইতে সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গত ৫ই মার্চ্চ কলিকাতায় এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, মালয়ে অল্পসংখ্যক কম্যুনিষ্টরাই গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছে এবং মালয়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিতে এবং শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ-পর্য্যন্ত ৭ শত কম্যুনিষ্ট ধৃত বা নিহত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই চীন হইতে আসিয়া মালয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রায় পাঁচ হাজার কম্যুনিষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে। এই সকল অস্ত্র তাহারা যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করে। কম্যুনিষ্টরা জঙ্গলে আত্মগোপন করিবার সুবিধা পায় বলিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে বিলম্ব হইতেছে, ইহাই মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অভিমত। বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষের ফলে পাঁচ শত বিদ্রোহী যেমন নিহত হইয়াছে, তেমনি জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ২৪ জন অসামরিক ইউরোপীয়, সশস্ত্র বাহিনীর ৭৭ জন লোক, ১০০ জন পুলিশ ও ৩৩০ জন চীনা ও মালয়ী নিহত হইয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধের সময় এই গরিলাদিগকেই লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছিলেন। আজ তাহাদিগকেই সন্ত্রাসবাদী ও কম্যুনিষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হইতেছে। কিন্তু মালয়ের ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বুধ সিং যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) মাদ্রাজে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মালয়ের বর্ত্তমান হাঙ্গামার জন্য শুধু কম্যুনিষ্টরাই দায়ী নহে। গণতন্ত্রবিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট এবং অসন্তোষ-জনক অর্থনৈতিক অবস্থাও উহার জন্য দায়ী। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, শুধু নেতিবোধক পন্থায় কম্যুনিজম দমন করা সম্ভব নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় এবং তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাহাতে প্রসারিত হয়, তাহার জন্য কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু শুধু মুখে এই সকল ভাল ভাল কথা বলিয়া কার্য্যতঃ দমননীতি চালাইলে মালয়ের বিদ্রোহ সহজে প্রশমিত হইবে কি ?

শ্যামের বিদ্রোহের স্বরূপ—

সম্প্রতি শ্যামদেশে বিদ্রোহের যে প্রচেষ্টা হইয়া গেল, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) শ্যামের প্রধান মন্ত্রী পিবুল সঙ্গকরাম ঘোষণা করেন, "ক্রমবর্দ্ধমান কম্যুনিষ্ট উপদ্রব দমনের জন্য আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্যামে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবে।" এই ঘোষণায় তিনি ইহাও জানান যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে

শ্যামমালয় সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিতে শ্যাম সম্মত হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই ব্যাঙ্কক হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, শ্যামের কয়েক জন সামরিক অফিসারকে এবং কম্যুনিষ্ট সন্দেহে ২১ জন চীনাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহারা না কি মার্শাল পিবুল সঙ্গকরামের গবর্ণমেণ্টকে উৎখাত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সামরিক অফিসারদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীরা না কি প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার সহযোগী মন্ত্রীদিগকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। সরকারী মহল হইতে দাবী করা হয় যে, পুলিশ এই ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার পর ব্যাঙ্কক হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে পূর্ব্বরাত্রে ব্যাঙ্ককের রাজপথে শ্যামের সৈন্য-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর কতক সৈন্যের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার কথা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ-বিরতি হইয়া এই সংগ্রামের অবসান হয় এবং গবর্ণমেণ্ট একটি আপোষ কমিশন (Conciliation Commission) গঠন করেন। যে ভুল বুঝার ফলে সৈন্য-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য এই কমিশন গঠিত হইয়াছে বলিয়া সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধের সময় জাপ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা প্রিদি পানোময়োং-এর অসামরিক অনুবর্ত্তীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ হইতেই সৈন্য-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। নৌ-বাহিনীর অনেক অফিসার প্রিদি পানোময়োং-এর সমর্থক। এই সঙ্কটের সময় শ্যামের বিমান বাহিনী এবং পুলিশ নিরপেক্ষ ছিল।

শ্যামের এই বিদ্রোহ আসলে প্রাসাদ-বিদ্রোহেরই অনুরূপ, এ-কথা বলিলে ভুল বলা হয় না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ চলিতেছে, শ্যামের রাজনীতির সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। শ্যামের রাজনীতি আসলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লিকের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্যামে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয়, কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। এই প্রাচুর্য্য ও চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের দেশটির চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ সমূহে চলিতেছে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ। জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্যও তাহাদিগকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারে নাই। জনসাধারণকে লইয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনেরও কোন চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। শ্যামে মাত্র দুই শত লোক আছেন, যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে কার্য্যকরী ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই চীনা। অর্থ উপার্জ্জন লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। অভিজাত শ্রেণী, সামরিক অফিসারগণ এবং জন কতক পেশাদার রাজনীতিক রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একমাত্র শ্যামই পরাধীনতার আস্বাদ পায় নাই। বোধ হয়, এই জন্যই শ্যামে জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। ষোল বৎসর পূর্ব্বেও শ্যাম ছিল স্বৈর তান্ত্রিক রাজা দ্বারা শাসিত। ১৯৩২ সালে যে বিপ্লবের ফলে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান হইয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাও অতি অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারাই হইয়াছে। এই প্রাসাদ-বিপ্লবের নেতা ছিলেন প্রিদি পানোময়োং। যে সকল সামরিক অফিসার এই বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পিবুল সঙ্গকরাম ছিলেন অন্যতম। যে হঠাৎ আক্রমণের দ্বারা সঙ্গকরাম ক্ষমতা অধিকার করেন, তাহাও মুষ্টিমেয় লোক দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে শ্যামের রাজা নিহত হওয়ার দায়িত্ব মার্শাল পিবুল প্রিদির উপর চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্যামের রাজা নিহত হওয়া সম্পর্কে সত্য নির্দ্ধারণ অপেক্ষা বালক রাজাকে নিহত করার অপবাদ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হেয় প্রতিপন্ন করাই মার্শাল পিবুলের প্রধান উদ্দেশ্য। কম্যুনিজম্-বিরোধিতাকেও তিনি তাঁহার দলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনেই নিয়োজিত করিয়াছেন। যাঁহারা পিবুলের বিরোধী, তাঁহাদিগকেই পিবুলের দলের লোকেরা কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং নিজদিগকে কম্যুনিষ্টবিরোধী বলিয়া দাবী করে। পিবুলের গবর্ণমেণ্টের সমর্থকরূপে বৃটেন ও আমেরিকাকে পাওয়াই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অক্টোবর মাসে যে হঠাৎ এক প্রতি-আক্রমণ হইয়াছিল পিবুলের সমর্থকগণ উহা কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে যে সংঘর্ষ হইয়া গেল, তাহাও দুইটি ক্লিকের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ডারবান দাঙ্গা তদন্ত কমিশন—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ডারবানে দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে এই কমিশনের [illegible] থাকা অসম্ভব এবং কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি [illegible] সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই [illegible] নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কোন অশ্বেতকায় [illegible] পক্ষে এই তদন্ত কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অধিকার ছিল না। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস এবং আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস ডাঃ জি এস লোয়েনকে এই দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ব্যবহারজীবী নিযুক্ত করা সম্ভব হইলেও জেরা করা সম্পর্কে চেয়ারম্যান আপত্তি করায় ভারতীয় ও আফ্রিকানগণ কার্য্যতঃ কমিশন বর্জ্জন করিয়াছেন। তদন্ত-কার্য্যে বিলম্ব হইবে বলিয়া সত্যনির্ণয়েচ্ছু কোন বিচারপতি জেরায় আপত্তি করিতে পারেন, ইহা সত্যই এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। জেরায় দাঙ্গার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়াই যে জেরায় আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ লোয়েন দাঙ্গার যে সকল কারণ উপস্থিত করেন, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, জনৈক আফ্রিকাবাসী যুবককে আক্রমণ করার হাঙ্গামা আরম্ভ হয় নাই এবং কতিপয় ভারতীয় কর্ত্তৃক আফ্রিকাবাসীর নিকট হইতে পণ্যের অত্যধিক মূল্য আদায় করাতেও হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় নাই। বস্তুতঃ যে সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রেও এই অত্যধিক মূল্য শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা যে অত্যধিক মূল্য আদায় করিয়াছে তাহার তুলনায় বেশী নহে। অথচ আফ্রিকাবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে নাই, শ্বেতাঙ্গদের সম্পত্তিও নষ্ট হয় নাই। ডাঃ লোয়েন আরও বলেন, "দাঙ্গার সময় এক দল শ্বেতাঙ্গ তাহাদের আচরণ দ্বারা আফ্রিকাবাসীদিগকে হয় উৎসাহিত করিয়াছে, না হয় প্রত্যক্ষ ভাবে উস্কাইয়া দিয়াছে, কমিশনের নিকট আমরা ইহা প্রমাণ করিব। দাঙ্গার সূত্রপাতে কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় ভাবে হাঙ্গামা দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে এবং দাঙ্গা

দমনে সাফল্য লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেন, আমরা এই অভিমতের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক।" দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন যে, ইউরোপীয়ানদের প্ররোচনা, মন্ত্রীদের বক্তৃতা, আফ্রিকানদের অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাস এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বিদ্বেষ দ্বারা এই দাঙ্গা সৃষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কম্যুনিষ্টপন্থী বলিয়া বিচার-সচিব যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ কোহেন বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক অভিযোগ।

তদন্তের দ্বিতীয় দিবসে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য দুই জন আফ্রিকানকে উপস্থিত করা হয়। ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক আফ্রিকানদের শোষণই যে এই দাঙ্গার মূল কারণ, তাহাই তাহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের এক জন সাক্ষী বলে যে, নেতৃবৃন্দ যদি তরুণ বয়স্ক হইত, তাহা হইলে ১৯০৬ সালের জোলাসী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি ঘটিত। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি [illegible] উক্ত আফ্রিকানদ্বয়ের অন্যতম ব্লিকিকে যে [illegible] প্রশ্ন করেন তাহার উত্তরে সে বলে যে, ইউরোপীয়[illegible] স্থানে বাস করিতেছে। বিচারপতি[illegible] হইতে তদন্তের উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত [illegible]।

দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] আফ্রিকানদের গৃহ-প্রাঙ্গণে [illegible] আফ্রিকান মহিলা একটি দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে [illegible] হইলে তিন শত আফ্রিকান ভারতীয়দের বাস আক্রমণ [illegible] তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে। কিছুক্ষণ পরে আর একটি বাসের উপর ইষ্টক বর্ষিত হয়। পরের দিন [illegible]ও এক আফ্রিকান জনতা ভারতীয়দের বাস ও মোটর গাড়ী সমূহ আক্রমণ করে এবং এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ডারবানে ভারতীয় বিরোধী নূতন হাঙ্গামা বাধিবার আশঙ্কা সৃষ্ট হয় এবং হাঙ্গামা আরম্ভ করিবার জন্য আফ্রিকানদের মধ্যে [illegible] বিলি করা হয়। গবর্ণমেণ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা [illegible] আর নূতন কোন হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু [illegible]ই মার্চ্চ পুনরায় হাঙ্গামার আশঙ্কা [illegible] সহস্রাধিক আফ্রিকাবাসীকে [illegible] করে।

চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার আর কত দূর ?—

চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সান ফো ৮ই মার্চ্চ (১৯৪৯) তারিখে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগ গৃহীত হওয়ার সংবাদ যখন ঘোষণা করা হয়, তখন চীনের পার্লামেণ্টে যেরূপ আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাতেই তাঁহার পদত্যাগ যে সকলেরই বিরূপ আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পদত্যাগের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে ৫ই মার্চ্চ কম্যুনিষ্ট বেতারে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হয় যে, প্রধান মন্ত্রী সান ফো শান্তিকামীর ছদ্মবেশে যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত আছেন। ডাঃ সান ফো চাপে পড়িয়াই যে পদত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহার পদত্যাগে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি বাধা যে দূর হইল তাহাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ডাঃ সান ফোর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা নিষ্প্রয়োজন। শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে চিয়াং কাইশেকই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাহা নানা ভাবেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তিনি এখনও হুকুমজারী করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ফেংহুয়ায় অবস্থান করিতেছেন। দেশত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার উপর ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে চাপ দেওয়া হইতেছে। নবগঠিত শান্তি কমিটির দুই জন বিশিষ্ট সদস্য অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের নিকট সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া বিদেশে চলিয়া যাইবার জন্য জেনারেল চিয়াং কাইশেককে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ জানাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও বিদেশে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে 'বিনীত অনুরোধ' করা হইয়াছিল। কিন্তু চিয়াং কাইশেক এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

শান্তির সর্ত্তাবলী রচনার জন্য দশ জন সদস্য লইয়া নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই কম্যুনিষ্টদের সহিত শান্তি আলোচনা আরম্ভ হওয়ারও আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যদি চিয়াং কাইশেকের হাতেই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে শান্তি প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিতে তিনি বিরত থাকিবেন, ইহা আশা করা কঠিন। শুধু গৃহ-যুদ্ধেই নয়, কুয়োমিণ্টাংএর শাসনে চীনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কম্যুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা আর তাহাদের নাই। আলোচনার পথেই হউক আর সংগ্রামের পথেই হউক, গৃহযুদ্ধের অবসান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। গৃহযুদ্ধের অবসান হইয়াছে [illegible] কম্যুনিষ্টরা জয়ী হইয়াছেন, ইহাও অনেকে মনে করেন।

ব্রহ্মদেশের সমস্যা—

কারেণদের রেঙ্গুন দখলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও কারেণ ও কম্যুনিষ্টদের সহিত ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সংগ্রাম প্রবল ভাবেই চলিতেছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) ব্রহ্মের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নয়া দিল্লীতে কমনওয়েলথের অন্তর্গত চারিটি দেশের প্রতিনিধিদের এক ঘরোয়া সম্মেলন হয়। আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান এই সম্মেলনে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নাই। সম্মেলনে সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আপোষ-মীমাংসা দ্বারাই ব্রহ্মে পুনরায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব। সশস্ত্র বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি আপোষ কমিশন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্রে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার কারণ কিছুই জানা যায় না। আপোষ কমিশন যে কি ভাবে মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা করিবে, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতার জন্য আপোষ কমিশন অপেক্ষা সাহায্যই বেশী পছন্দ করিবে, ইহাও স্বাভাবিক।

ব্রহ্মদেশ তাহার চাউল রপ্তানির সুবিধার জন্য আর্থিক সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু গৃহবিবাদের প্রশ্ন বাদ দিয়া চাউল রপ্তানির প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য দান অর্থহীন।

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট পরাপরি মানিয়া লইবে [illegible]

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য হেগে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণকেও এই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমন্ত্রণের উত্তরে তিনি জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাজধানী যোগ্যাকর্তায় পুনরায় প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। গোলটেবিল বৈঠক যে একটা চাল মাত্র, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রী নেতারা যেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সমর্থ না হইতে পারে। আবার তাঁহাদের এই যোগদান না করাকেই তাহারা বিশ্ববাসীর কাছে এই বলিয়া প্রচার করিবে যে, প্রজাতন্ত্রীরা ছাড়া আর সকলেই ডাচদিগের সহিত বিরোধের মীমাংসার জন্য সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ ডাচদের এই ধাপ্পায় অবশ্যই ভুলিবে না। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিকার করিতে অসমর্থ।

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কেহই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। কিন্তু এই প্রস্তাবও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা অমান্য করিতে সাহস করিয়াছে কাহার জোরে, এই প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় নহে। নিরাপত্তা পরিষদ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়াই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে তাহাদের খুশী-মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাশালী মহল হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে পন্থাই গ্রহণ করুক, বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিবেই। এই সকল রাষ্ট্র যে প্রকাশ্যেই ডাচদের অনুকূলে তাহা যে কোন লোকই বুঝিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের অনুকূল বলিয়াই সাধারণতঃ মনে হয়। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে হল্যাণ্ড একান্ত ভাবেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ইহাও অতি সত্য কথা যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত হল্যাণ্ডের উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হল্যাণ্ডের উপর আদৌ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজ্য যদি প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে ইন্দো-নেশিয়ার স্বাধীনতা একটা পরিহাসের বিষয় হইয়া থাকিবে।

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা সমাধানের পথে ;—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ইজরাইল রাষ্ট্র ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় প্যালেষ্টাইনে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি সুগম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু সমস্যা এই যুদ্ধ-বিরতির চুক্তির পরেও যে সহজ হয় নাই, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ইজরাইল ও ট্রান্সজর্ডানের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা যে প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, ট্রান্সজর্ডানের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহাদিগকে ট্রান্সজর্ডান গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। তাছাড়া, ট্রান্সজর্ডানের প্রতিনিধিমণ্ডলী সোজাসোজি ইজরাইল রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালাইতে রাজী নহেন। প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁহারা অস্থায়ী মধ্যস্থ ডাঃ বাঞ্চের মারফৎ আলোচনা চালাইয়া থাকেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়াই যে মিশর যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্তে রাজী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ট্রান্সজর্ডান সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের উপর নির্ভরশীল। ইহার উপর ইরাকের পক্ষেও ট্রান্সজর্ডানের কথা বলিতে অধিকারী বলিয়া দাবী করাতেও সমস্যা জটিল হইয়াছে। গত ৭ই মার্চ্চ ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ইজরাইলের সহিত শান্তি আলোচনায় ইরাকের প্রতিনিধিত্ব করিতে ট্রান্সজর্ডানের কোন অধিকার নাই। প্যালেষ্টাইন সীমান্তের ইরাক অধিকৃত ত্রিকোণাকার ভূমি সম্পর্কে ট্রান্সজর্ডানের সহিত আলোচনা করিতে ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলও অস্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, জেরুজালেম লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা দেখা দিবে। সিরিয়া ইজরাইলের সহিত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছে। ইজরাইল-লেবানন যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সম্বন্ধে আশা দেখা যাইতেছে। ইহা শুধু যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি। যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হইলে পরে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ফ্রান্স-বাওদাই চুক্তি—

ইন্দোচীন সম্পর্কে ফ্রান্স ও বাওদাইয়ের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে এক নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ৮ই মার্চ্চ (১৯৪৯) সংবাদে প্রকাশ। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এই চুক্তির খসড়া সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রকাশ, বাওদাই ২৫শে এপ্রিল ইন্দোচীন অভিমুখে রওনা হইবেন। তিনি ইন্দোচীন পৌঁছিবার পূর্ব্বে চুক্তির বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই চুক্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা যে কিরূপ হইবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদে যে সাত দফা সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি সর্ত্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইন্দোচীনের মুদ্রা ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঁ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ফরাসীরা ইন্দোচীনে অবাধে মূলধন খাটাইতে পারিবে। ভিয়েটনাম শুধু চীন, শ্যাম ও ভ্যাটিকানে নিজস্ব কূটনৈতিক প্রতিনিধি রাখিতে পারিবে। ভিয়েটনামের নিজস্ব সেনাবাহিনী অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী ভিয়েটনামে অবাধে চলাফেরা করিতে পারিবে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারিবে এবং যুদ্ধের সময় ভিয়েটনামের সৈন্যবাহিনীও ফরাসী সেনাপতির অধীনে থাকিবে। এই কয়েকটি সর্ত্ত হইতেই ভিয়েটনামের স্বাধীনতার যে স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা স্বাধীনতার পরিহাস মাত্র। হো চি মীন কখনই এইরূপ সর্ত্তে রাজী হইতেন না। এই জন্যই তাঁহাকে বাদ দিয়া প্রাক্তন সম্রাট বাওদাই-এর সহিত চুক্তি করা হইয়াছে।

প্রসাদ রায়
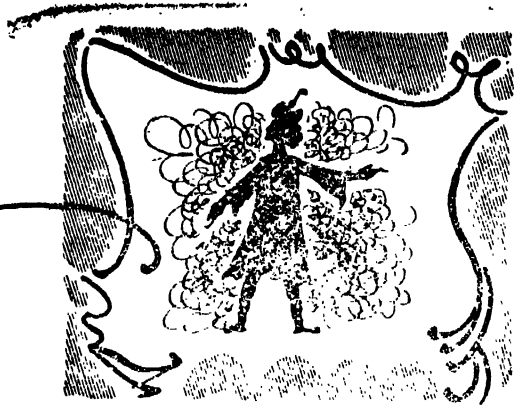
"All art is one ; spiritualist, realist are only words !" ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, চিত্রকর গিজেনের কাছে তিনি ঐ মতটি প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানেন, পরের জীবনে ঐ কথাগুলি জোলার মুখের কথা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ বস্তুতান্ত্রিকদের হয়ে দস্তুর মত কোমর বেঁধে জোলার মত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করেননি আর কোন লেখক।

সাহিত্যের মত নাট্য-জগতেও "ইজমে"র পর "ইজমে"র ঝড় বয়ে গিয়েছে। প্রথমে "classicism" তার পর "romanticism" এবং তার পর "naturalism" বা "realism"—এমনি আন্দোলনের পর আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নাট্যকলা এসে দাঁড়িয়েছে বর্ত্তমান যুগে, কিন্তু এখনো বহু ছোট-বড় "ইজম্" তাকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

'ক্লাসিসিজমে'র পর 'রোমান্টিসিজ্‌ম'—সে একটা স্মরণীয় অভিযান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য ও আর্টের নায়ক ছিল ফ্রান্স। সেখানে সর্ব্বাগ্রে যে আন্দোলন জাগ্রত হত, পরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত য়ুরোপের অন্যান্য দেশে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ফরাসী সাহিত্য ও নাট্যের উপরে ছিল ক্লাসিকাল লেখকদের প্রভাব। অতীতের বাঁধা-ধরা মাপকাটির দ্বারাই তখনকার নাট্য-সাহিত্যের বিচার করা হত—একটু এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষা ছিল না। তার পর এমন এক দল লেখক দেখা দিলেন যাঁরা এই কঠিন বন্ধন আর সহ্য করতে পারলেন না। এঁরাই রোমান্টিকের দল ব'লে বিখ্যাত। ইতিহাসে এই দলের নায়করূপে নাম করা হয় ভিক্টর হুগোর। কিন্তু এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। হুগো রোমান্টিক আন্দোলনকে সব দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আলেকসাঁদ্রে ডুমা—"মণ্টিক্রিষ্টো" ও "থ্রি মাস্কেটিয়ার্সে"র বিখ্যাত লেখক।

আজ ডুমা রোমান্টিক ঔপন্যাসিকরূপেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমধিক পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার ফরাসী দেশে আর কেউ ছিলেন না এবং তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন চল্লিশখানির কম নয়। তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীর সংখ্যা তিন শত। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তার মধ্যে সে-সব নাটকের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

হুগো সগর্ব্বে প্রচার করলেন : "নিদ্রিত নাট্যকলার চতুর্দ্দিকে লিলিপুটের তালপাতার সেপাইরা যে লূতাতন্তু বুনে রেখেছে, মাত্র এক পদ অগ্রসর হলেই সে তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারবে।"

নাট্যকলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার গ্রহণ করলেন ডুমা। ইতিমধ্যেই স্যর ওয়াল্টার স্কটের রোমান্টিক উপন্যাসগুলি তাঁর পথনির্দ্দেশ করতে পেরেছিল। ডুমা প্রথমেই যে নাটক রচনা করলেন তার নাম "ক্রিষ্টাইন"। এখানি পুরোদস্তুর রোমান্টিক নাটক নয়—প্রাতঃসন্ধ্যার আলো-আঁধারির মত এর মধ্যে ছিল দু'-রকম প্রভাব—ক্লাসিক ও রোমান্টিক।

"Comedic Francais" হচ্ছে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়। তার জন্যে নাটক নির্ব্বাচনের ভার ছিল ব্যারণ টেলরের উপরে। একখানি পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করে যুবক ডুমা নিজের নাটক নিয়ে তাঁরই দ্বারস্থ হলেন। তার পর যে কৌতুককর দৃশ্যের অবতারণা হল এখানে তা উদ্ধার করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না।

টেলরের ভৃত্য ডুমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল মনিবের স্নানাগারে। ডুমা দেখলেন, চৌবাচ্চার ভিতরে আকণ্ঠ ডুবিয়ে টেলর বসে আছেন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত এবং চৌবাচ্চার পাড়ে উপবিষ্ট এক হবু-নাট্যকার, সেই অবস্থায় তিনি গড়-গড় করে পড়ে যাচ্ছেন নিজের নাটকের প্রকাণ্ড এক পাণ্ডুলিপি। নাটকের ঠেলায় টেলর যে রীতিমত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাঁর মুখ দেখে সেটাও বেশ বোঝা গেল।

নাট্যকার আশ্বাস দেবার জন্যে বললেন, "মহাশয়, বাকি আছে মোটে আর দু'টো অঙ্ক।"

টেলর মরিয়ার মত বললেন, "দু'খানা তরবারির কোপ, দু'খানা ছুরির খোঁচা, দু'খানা ছোরার আঘাত। যা-কিছু একটা এনে আমাকে একেবারেই সাবাড় করে ফেললে ভালো হয়।"

অটল নাট্যকার বললেন, "গভর্ণমেণ্ট

বিদুষী ভার্য্যার নবাগতা মলয়া দেবী

আপনাকে নাটক শোনবার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। আমার নাটক আপনি শুনতে বাধ্য।"

টেলর বললেন, "আপনাদের উপদ্রবে আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে দেখছি। আমি মিশরে পালাব। আমি নীল নদের উৎস খোঁজবার জন্যে নিউবিয়ায় যাত্রা করব। আমি চন্দ্রলোকের পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকব।"

নাট্যকার বললেন, "ইচ্ছা করলে আপনি চীন দেশেও যেতে পারেন। কিন্তু আজ তো আমার নাটকের শেষ পর্য্যন্ত শুনুন!"

টেলর নিরুত্তর হয়ে মাথা নত করলেন। বেগতিক দেখে ডুমা পাশের ঘরে গিয়ে বসে রইলেন। সেখান থেকেও শোনা যেতে লাগল নাট্যকারের একটানা কণ্ঠস্বর। তাঁর মন টেলরের প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল?

তার পর পাঠশেষে নাট্যকারের প্রস্থান, শীতে কাঁপতে কাঁপতে টেলরের প্রবেশ। তিনি ডুমার হাতের পাণ্ডুলিপির দিকে তাকালেন সন্দেহপূর্ণ নেত্রে।

ডুমা গাত্রোত্থান করে বললেন, "আজ আপনি বড়ই শ্রান্ত। আমি আর এক দিন আসব।"

আত্মত্যাগী বীরের মত মাথা নেড়ে টেলর বললেন, "না, না, যখন এসেছেন, হাঙ্গাম একেবারে চুকিয়ে ফেলাই ভালো। পড়ুন আপনার নাটক!" তিনি বিছানায় উঠে লেপ মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

ডুমা বললেন, "আপনার কষ্ট হলেই আমি পড়া বন্ধ করব।"

টেলর বললেন, "আপনি দয়ালু!"

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত। ডুমা শুধোলেন, "আমি কি পরের অঙ্কও পাঠ করব?"

টেলর বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের পাঠ শেষ। ডুমা উঠে দাঁড়ালেন—বিচারকের সামনে খুনী আসামীর মত।

টেলর এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ে বললেন, "আপনার নাটক আমার পছন্দ হয়েছে।"

কিন্তু রঙ্গালয়ের কোন বড়কর্ত্তা গাইলেন উল্টো সুর। বললেন, "বড়ই মুস্কিল। নাটকখানা ক্লাসিক কি রোমান্টিক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে!"

ডুমা বললেন, "ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এ-খানা সুনাটক কি কুনাটক?"

সমস্যার সমাধান হল না। ভালোই হোক আর মন্দই হোক, "ক্রিষ্টাইন" তখনকার মত ধামা চাপাই রইল—তার অভিনয় হয় ডুমা বিখ্যাত হবার পরে।

কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা খেয়ে ডুমা দমে গেলেন না, "তৃতীয় হেনরি" নামে আবার একখানি নূতন নাটক রচনা করলেন, এ পালাটি খোলা হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। এখানিই হচ্ছে যথার্থরূপে প্রথম রোমান্টিক আন্দোলন বা কল্পপন্থার প্রথম নাটক—ক্লাসিক বা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কলা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রবল প্রতিবাদ। তার অভিনয় আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

"তৃতীয় হেনরি"র প্রথম অভিনয়-রাত্রে প্রেক্ষাগার পরিপূর্ণ হয়ে গেল ক্লাসিকের ভক্ত প্রাচীনপন্থী ও কল্পতন্ত্রের ভক্ত নবীন রোমান্টিকদের দ্বারা। সর্ব্বত্রই ভীষণ উত্তেজনা! এত দিনের অচলায়তনে ভাঙন ধরবার উপক্রম দেখে প্রাচীন-পন্থীরা হায় হায় করতে লাগলেন এবং রোমান্টিকরা করতে লাগলেন জয়ধ্বনির পর জয়ধ্বনি—শেষোক্তদের দলে ছিলেন ভিক্টর হুগো ও ডি ভিগ্নি প্রমুখ তখনকার অতি আধুনিক সাহিত্যিকরা। ডুমার নাটক অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করলে এবং এক দিনেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন লর্ড বাইরণের মত!

এর পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হুগোর রোমান্টিক নাটক "হার্নানি" মঞ্চস্থ হল, যার ফলে আধুনিক নাট্য-জগতের উপর থেকে "ক্লাসিসিজমে"র প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা এমন হট্টগোল সুরু করে দিলেন যে, প্রথম অভিনয়-রাত্রে কেউই শুনতে পাননি নাটকের একটিমাত্র পংক্তি! কিন্তু হুগো কেবল লেখক ছিলেন না, তাঁর দল গড়বার শক্তিও ছিল অসাধারণ। রোমান্টিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার জন্যে তাঁর আহ্বানে ছুটে এলেন গোতিয়ের, ডি ভিগ্নি ও ডুমা প্রমুখ নবীন সাহিত্যিক ও চিত্রকরের দল। তাঁদের সাজ-পোষাকও কম রোমান্টিক ছিল না! মাথায় তাঁদের চিত্রকর রেমব্রাণ্ডের মতন বাহারী টুপী ও বাতাসে উড়ন্ত লম্বা চুল, গায়ে বেগুনী ও টকটকে লাল রঙের 'ওয়েষ্ট-কোট' ও সবুজ রঙের পা-জামা এবং হলদে রঙের পাদুকা? তাঁদের পাশে প্রাচীনপন্থীদের কালো পোষাকের মোটেই খোলতাই হল না। অভিনয়ের সময়ে প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবীনরাও সমান চ্যাঁচাতে ও ঠাট্টা-টিটকারী বর্ষণ করতে লাগলেন। রোমান্টিকদের দলে ঔপন্যাসিক বালজাকও বিদ্যমান ছিলেন। রাত্রির পর রাত্রি ধরে "হার্নানি"র অভিনয় হয় এবং রাত্রির পর রাত্রি ধরে প্রেক্ষাগারে চলে এই রকম হুলুস্থুলু! সচতুর হুগো প্রত্যেক অভিনয় রাত্রেই একশোখানা আসনের উপরে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের এনে বসিয়ে দেন—গলাবাজির দ্বারা প্রাচীনপন্থীদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে! কিন্তু কেবলই কি গলাবাজি? ক্লাসিক নাটক ভালো কি রোমান্টিক নাটক ভালো, তা প্রমাণিত করবার জন্যে হাতাহাতি ও 'ডুয়েল' লড়ালড়ি পর্য্যন্ত হয়ে গেল! অবশেষে জয়-গৌরব অর্জ্জন করলেন রোমান্টিকরাই!

"তৃতীয় হেনরির" পর "হার্নানি"র আবির্ভাব রোমান্টিক বা কল্পপন্থীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করলে বটে, কিন্তু খাঁটি নাটক হিসাবে তার মূল্য বেশী নয়। তার মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য্য থাকলেও, চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে আছে যথেষ্ট উদ্ভটতা এবং অস্বাভাবিকতা। বর্ত্তমান কালে "হার্নানি" কোন রঙ্গালয়ের উপযোগী হবে না।

প্রাচীনপন্থীদের অচলায়তন ভাঙবার জন্যেই কল্পন্থীরা একজোট হয়ে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষির অভাব ছিল না। কল্পপন্থায় পদার্পণ করে ডুমাই সর্ব্বপ্রথমে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, শ্রেষ্ঠতর শক্তির অধিকারী হয়েও হুগো এটা বরদাস্ত করতে পারননি। তিনি মনে মনে ডুমাকে হিংসা করতেন —যদিও ডুমার মুখে সর্ব্বদাই শোনা যেত হুগোর প্রশংসা।

বালজাকও ছিলেন ডুমার বিরোধী। এক দিন এক বন্ধু-সম্মিলনে ডুমাকে আঘাত করবার জন্যে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বললেন,

অরোরা ফিল্মসের

বন্ধুর পথ

কাহিনী—নিতাই ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা—চিত্ত বসু

সুর—পরিতোষ শীল

শ্রেঃ—রেণুকা, মিহির, ধীরাজ,
অহীন্দ্র, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী ও
আরো অনেকে।

শ্রী

শ্যামাশ্রী (হাওড়া)

মায়াপুরী (শিবপুর)

সাফল্যের সহিত চলিতেছে

"আমি যখন আর কিছু করতে পারব না তখন নাটক রচনা করতে বসব।"

ডুমা পাল্টা জবাব দিলেন, "তাহ'লে আর বিলম্বে কাজ কি, আজ থেকেই কলম নিয়ে বসে যাও!"

সত্য কথা বলতে কি, নাট্যকার হবার জন্যে বালজাকেরও উৎসাহ বড় কম ছিল না। তিনি একাধিক বার সে চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু নাট্যলক্ষ্মীর বিশেষ সুদৃষ্টি লাভ করতে পারেননি। এদিক্ দিয়ে ডুমা বাস্তবিকই ভাগ্যবান। রোমান্টিক নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে শক্তিবান লেখক হয়েও জনপ্রিয়তায় হুগো তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি। আবার রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও হুগো বা বালজাকের চেয়ে ডুমার জনপ্রিয়তা ছিল বেশী এবং এখনো তা অক্ষুণ্ণ আছে।

রোমান্টিক লেখকদের কোন নাটকই বর্ত্তমান যুগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না বটে, কিন্তু তাঁদের শুভ আবির্ভাব ললিত-কলার জগতে দিকে দিকে খুলে দিলে নূতন নূতন পথ। তাঁদের প্রধান গৌরব হচ্ছে, প্রাচীন কলাপদ্ধতির যে বেড়াজালের ভিতরে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আর্ট তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল, তাঁরা তাকে সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে এলেন জনতাপূর্ণ অবাধ হাটে-মাঠে-বাটে। তার ফলে কেবল নাট্যকলার ক্ষেত্রে নয়, কথা-সাহিত্য, চিত্র-ভাস্কর্য্য-স্থাপত্য এবং সঙ্গীত-কলার ক্ষেত্রেও কলাবিদরা নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে হয়ে পড়লেন কল্পপন্থার পথিক। একবার আবদ্ধ গিরিগুহার বাইরে আসতে পারলে নির্ঝরিণী যেমন সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নানা দিকে নব নব ধারা সৃষ্টি করে, ঊনবিংশতি শতাব্দীর ললিত-কলা তেমনি কেবল কল্পতন্ত্র নিয়েই মত্ত হয়ে রইল না, আরো নূতন নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় বিপুল উৎসাহে আত্মনিয়োগ করলে। এই জন্যেই বহু শতাব্দী আড়ষ্ট হয়ে থাকবার পর গত এক শতাব্দীর মধ্যেই ললিত-কলা যত ভাব থেকে ভাবে, রূপ থেকে রূপে আনাগোনা করতে পেরেছে, তার আর তুলনা নেই।

কিন্তু সেই প্রথম স্বাধীনতার—অর্থাৎ কল্পপন্থার যুগে প্রত্যেক শিল্পীই সানন্দে অনুভব করতে পারলেন, ললিত-কলা আবার নবজন্ম লাভ করেছে। অপূর্ব্ব সেই যুগ! এক শ্রেণীর আর্টের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর আর্টের পার্থক্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল, চিত্রকর ও ভাস্কররা ধরলেন লেখকের কলম এবং লেখকরা ধরলেন শিল্পীর তুলি; সকলেই একসঙ্গে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে নিযুক্ত হলেন এবং সঙ্গীত-শিল্পীরা রচনা করতে লাগলেন কবিতা! ঐতিহাসিক বলছেন: "The excitement was tremendous. Such men as Delacroix, Delaroche, Auber, Meyerbeer, Hugo, Gautier, Merimee, Berlioz, David, Lamartine, Musset, Halevy, Dumas pere were the new artists who could and did do everything." যে শিল্পীদের নাম করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চিত্রকর আছেন, সঙ্গীতবিদ্ আছেন, নাট্যকার আছেন, ঔপন্যাসিক আছেন, কবি আছেন এবং গল্প-লেখক আছেন।

রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ অবশেষে বঙ্গোপসাগরেরও কূলে এসে লেগেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে। হুগোর পর আবার ডুমার পালা। তাঁর নূতন নাটকের নাম "অ্যান্টনি"। আবার বিষম উত্তেজনা! তার বর্ণনা এখনো পাওয়া যায় গোতিয়ের রচনায়। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে "অ্যান্টনি" অতুলনীয় সাফল্য অর্জ্জন করলে। নাটকখানি উপর-উপরি একশো-ত্রিশ রাত্রি ধরে চলল—তখনকার যুগের পক্ষে অভাবিত ব্যাপার! তার এতটা সাফল্যের কারণ, রোমান্টিক হলেও "অ্যান্টনি" রঙ্গালয়ে এনেছিল প্রথম আধুনিক সুর। তরুণ কল্পপন্থীদের উপরে তার প্রভাব হল বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত! লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল ডুমার নাম!

আর্টের অন্যান্য আন্দোলনের মত ক্রমে রোমান্টিক আন্দোলনের দিন ফুরিয়ে এল। প্রাচীন কলাপদ্ধতির শিকল ভাঙবার পর জনসাধারণ আর একঘেয়ে কোন কিছু নিয়ে বেশী দিন মেতে থাকতে রাজী হল না, এক যুগ পরেই তাদের মন চাইতে লাগল আবার নতুন কিছু বিশেষত্ব। এই সময়ে বালজাক্ একাধিক নাটক রচনা করলেন। তাঁর মধ্যে দু'-রকম যুগধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। রোমান্টিকদের দলভুক্ত হলেও বাস্তবতাকেও তিনি পরিহার করেননি, তাই বস্তুতান্ত্রিকরাও তাঁকে টেনে নিতে চান নিজেদের দলে এবং সত্য কথা বলতে কি, তাঁর রচনার উপরে শেষোক্ত দলেরই প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট।

কিন্তু নাট্য-জগতে আসল বাস্তবতার আন্দোলন এনেছিলেন ঔপন্যাসিকরূপে অমর ডুমারই পুত্র—যিনি ছোট ডুমা নামে বিখ্যাত। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র! "La Dame aux Camelias" নামে নিজের একখানি উপন্যাসকে তিনি নিজেই নাটকাকারে রূপান্তরিত করলেন এবং এই পালাটিই হচ্ছে রঙ্গালয়ের প্রথম বস্তুতান্ত্রিক নাটক (১৮৫২ খৃ:)। ছোট ডুমা আরো কয়েকখানি ঐ শ্রেণীর নাটক রচনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে কোন কোনখানি তাঁর প্রথম নাটকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও খ্যাতির দিক্ দিয়ে তার সমকক্ষ হতে পারেনি। হয়তো অমর নটী সারা বার্ণার্ডের অপূর্ব্ব অভিনয়ই সমধিক বিখ্যাত করে তুলেছে তাঁর প্রথম নাটকখানিকে।

নাট্য-জগতে রোমান্টিক আন্দোলন যখন অত্যন্ত প্রবল, তখনকার আর এক জন নাট্যকারের কথা এইখানে বলা উচিত। নাম তাঁর ইউজিন স্ক্রাইব, বর্ত্তমান কালের জনসাধারণের কাছে এ নাম অজ্ঞাত। তিনি না কি প্রতি বৎসরে একশোখানি নাটক প্রস্তুত করতে পারতেন! তাঁর সমগ্র নাট্য-গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ-সহস্র! তিনি নিজে কোন বিশেষ দলে বা আন্দোলনে যোগ দেননি, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের খুসি করা। তাঁর নাটকগুলিকে বলা হয় "well-made play,"—জনসাধারণের চিত্তজয়ের জন্যে সেগুলির মধ্যে থাকত পাশাপাশি হাসির ও অশ্রু, বিস্ময় ও ঘটনা, কোমলতা ও মধুরতা—অর্থাৎ গাছতলার দর্শকরা যা চায়, তাই! কাজেই তাঁর নাটকগুলি সাময়িক ভাবে মালিকদের পেটের খোরাক এবং হেটো দর্শকদের মনের খোরাক যে জোগাতে পারত তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সব পল্লবগ্রাহী ও 'চরিত্র'-হীন নাটকের অগভীরতা সমসাময়িক যুগের উচ্চশ্রেণীর দর্শকদের আকৃষ্ট করত না একেবারেই। কথিত আছে, ফ্রান্স-প্রবাসী জার্ম্মান কবি হাইনে যখন মৃত্যুশয্যায়

খ্যাবিত এবং যখন তাঁর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছে, তখন কোন উৎকট রসিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি এখন টিটকারি দিতে পারেন ?" কবি হাইনে জবাব দিয়েছিলেন, "না। এমন কি স্ক্রাইবের নাটক দেখেও নয় !"

কিন্তু আজ প্রকাশ পেয়েছে একটি প্রয়োজনীয় সত্য। স্ক্রাইব স্থায়ী যশের অধিকারী হননি বটে, কিন্তু তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদা থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট "সুগঠিত নাটক"গুলিকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেবল তাঁর সমসাময়িক যুগে নয়, পরের যুগেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারেরও উপরে পড়েছে তাঁর স্পষ্ট প্রভাব! বাস্তব নাটকের আখ্যানবস্তু গঠন করবার সময়ে ছোট ডুমাও তাঁকে অনুসরণ না করে পারেননি। এবং তাঁরও পরে আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের গুরুস্থানীয় ইবসেন পর্য্যন্ত সামাজিক নাটক রচনার সময়ে অবলম্বন করেছেন স্ক্রাইবেরই কলা-কৌশল।

উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার না হলেও স্ক্রাইবের হাতে-গড়া এক জন শিষ্য আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাম সার্দো। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে বার্ণার্ড শ' একটি নূতন কথা উদ্ভাবন করেছেন—Sardoodledum।

হুগো ও ডুমা প্রভৃতি যখন নাট্য-জগতের মায়া যথাসম্ভব কাটিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে ফলাচ্ছেন সোনার ফসল, বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকাররূপে ছোট ডুমা তখন আসর জমিয়ে রাখলেন। এর মধ্যে এবং এর পরে আরো অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক পাদ-প্রদীপের দীপ্তির দিকে আকৃষ্ট হলেন পতঙ্গের মত, কিন্তু শেষটা তাঁরা ডানা পুড়িয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হলেন, অন্যান্য বিভাগের খ্যাতি তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি।

পাদ-প্রদীপের মায়া হচ্ছে মরুমায়ার মত ;—আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়, তৃপ্ত করে না। এলেন উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য-গুরু ফ্লবেয়ার; এলেন ঔপন্যাসিক গঁকোট, গল্পলেখক দোদে, কবি ডি ভিগ্নি ও মুসে এবং অপূর্ব্ব স্রষ্টা বালজাক। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টার পর তাঁদের পাততাড়ি গুটোতে হল একে একে।

তার পর এলেন মহা বিখ্যাত জোলা। তাঁর বাস্তব উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। তিনি স্থির করলেন অতঃপর বাস্তব নাটকের দ্বারা নাট্য-জগতও জয় করবেন। লিখলেন বাস্তব নাটক। সমালোচকরা মতপ্রকাশ করলেন: "বালজাকের মত আর এক জন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বিপথগামী হয়েছেন।" তবু দমবার পাত্র নন জোলা। তিনি 'ট্র্যাজেডি' লিখলেন, তিনি 'কমেডি' লিখলেন, তিনি বার বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বার বার ফল হল ঐ একই। নাট্য-রসিকরা বস্তুতন্ত্রের ভক্ত হয়েছে বটে, তবে জোলার বস্তুতান্ত্রিকতা তারা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু প্রকৃতির কি নির্ম্মম পরিহাস! বাতাস কত সহজে বদলায়! উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য-রসিকরা জোলার বাস্তবতাকে 'বয়কট' করেছিল। কিন্তু পরের যুগে প্রায় সেই শ্রেণীর বাস্তবতাই হয়েছে নাট্য-জগতের প্রধান অবলম্বন। আজও জোলার বাস্তবতা সেকেলে হয়ে পড়েনি।

আধুনিক বাঙলা গানের অচল অবস্থা

কে এম সীমহাচলম

আধুনিক বাঙলা গানের কথা উঠলে শিক্ষিত এবং সুস্থ রুচির লোকেরা বিরক্তি বোধ করেন। বলেন, দিন-রাত ওই ন্যাকামি-আর নাকে কান্না ভাল লাগে না মশাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতির গান আধুনিক হলেও "আধুনিক" বাঙলা গানের আলোচনা তাঁদের বাদ দিয়েই হবে, কারণ তাঁদের গানের এবং সুরের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ স্কুলের সৃষ্টি হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার সময় কেউ বলে না যে, সে আধুনিক গান গাইছে। সে বলে যে, সে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল-প্রমুখ বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকারের গান বাদ দিলে ইদানিং রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা, থিয়েটার এবং বিভিন্ন সামাজিক আসরে আধুনিক বাঙলা গান নামে যা পরিবেশন করা হয় তার সারাংশ হচ্ছে ফ্রেনালিপনা, ন্যাকামি, কান্নাকাটি এবং বিকৃত যৌন-ক্ষুধার ততোধিক বিকৃত প্রকাশ। কাজেই নানা প্রকার যন্ত্র এবং মাইক্রোফোন মারফৎ এই সমস্ত অসুস্থতার বীজাণু যখন বাতাসে ছাড়া হয়, তখন স্থানীয় বাতাবরণ হয়ে ওঠে কলুষিত আর সেই বাতাবরণে সুস্থ লোকের দম আটকে যায়।

গান হচ্ছে সূক্ষ্ম শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মত তার মূল লক্ষ্য ও সৌন্দর্য এবং আনন্দ পরিবেশন করে জনগণের অগ্রগতিতে সহায়তা করা। গায়কের আনন্দ সার্থক শিল্প-সৃষ্টিতে এবং শ্রোতার আনন্দ সার্থক শিল্প-রসে সঞ্জীবিত হয়ে। কোন শিল্পই সমাজ এবং জীবন নিরপেক্ষ হতে পারে না। সঙ্গীত তো নয়ই। সমাজ ও জীবনকে বাদ দিয়ে যে শিল্প, সে শিল্প তেতলায় টবে তালগাছ বসিয়ে তাকে গগনচুম্বী করে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মতই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে গাছের শিকড় যত বেশী মাটির নীচে গভীর দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেছে, সেই গাছ তত বেশী সরস, সঞ্জীবিত, পল্লবিত এবং দীর্ঘায়ু। শিল্পকেও যদি বৃক্ষ বলে ধরে নেওয়া যায়, তা'হলে সমাজ এবং জীবন হচ্ছে মাটি। সমাজ এবং জীবনের অন্তস্তল থেকে যে শিল্প যত বেশী আয়ু সংগ্রহ করে নিতে পারবে, সেই শিল্প তত বেশী সরস, সঞ্জীবিত, পল্লবিত এবং দীর্ঘজীবী হবে।

আমাদের আধুনিক বাঙলা গানের উত্থানের যুগ গেছে দশ-পনের বছর আগে। দশ-পনের বছরের মত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই গানের অধঃপতন এত প্রকট হয়ে উঠল কেন? যে গান শুনে এক কালে লোক মনে-প্রাণে মেতে উঠত, সেই গান শুনেই আজ লোকের মাথা ঘুরে গা বমি-বমি করে কেন? এই কারণ অনুসন্ধানের আগে আধুনিক বাঙলা গানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। গত আট-দশ বছরের রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা, থিয়েটার এবং সামাজিক আসরে শত শত আধুনিক বাঙলা গান শুনে শুনে বেশ বোঝা গেছে যে, আধুনিক বাঙলা গান হচ্ছে সহুরে "সংস্কৃতি"। বাঙলার বৃহৎ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ নেই। এই গানের বিষয়-বস্তু হচ্ছে প্রেম এবং বিরহ, প্রকাশভঙ্গি ক্রন্দনাত্মক এবং সুর হচ্ছে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ভগ্নাংশের সমন্বয়। অবশ্য সব গান সম্বন্ধেই এক কথা খাটে না। এর মধ্যে মাঝে-মাঝে বৈচিত্র্যও দেখা যায়, কিন্তু সে বৈচিত্র্যও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। "আধুনিক" বাঙলা গানের প্রধান ত্রুটি হল এর মধ্যে "আধুনিকতা" একটুকুও নেই, আছে চিরাচরিত গতানুগতিকতা। ভাবে ও ভাষায় এ অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী! আধুনিকতার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে কিন্তু আধুনিক বাঙলা গান হল চরম কাপুরুষতা এবং হতাশার প্রতীক। প্রায় সব গানের মূল বক্তব্য হল: হে প্রিয়তম, তুমি এক দিন এসেছিলে, কিন্তু আজ চলে যাচ্ছ। অবহেলা করে চ'লে যাও বটে, তবে বহু দিন আগে আমার গলায় যে কুসুমের মাল্য দুলিয়ে দিয়েছিলে, সেই শুকনো ফুলের গন্ধ বার বার সে-দিনের কথা স্মরণ করিয়ে চোখে জল এনে দিচ্ছে, কিংবা—তুমি ফিরে আসব বলে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলে। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল, ঝড় উঠল। হায় রে, তুমি হয়ত কোথাও কারও সঙ্গে মিলন-রাত্রি যাপন করছ আর আমি এখানে তোমার প্রতীক্ষায় কেঁদে কেঁদে কাল কাটাচ্ছি। কেউ কেউ স্বপ্নে দেখেন যে, পাহাড়ী দেশের বন্ধু তাকে অজানা স্বপনপুরীতে নিয়ে যাবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাজেই খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ব্যর্থতা, হতাশা এবং পলায়ন কামনাই আধুনিক বাঙলা গানের সার কথা। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা চরম ব্যর্থতা এবং হতাশার অভিজ্ঞতাই লাভ করছি এবং দুর্বলচিত্ত লোকেরা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পেয়ে বাস্তব ক্ষেত্র থেকে পলায়নের কথা চিন্তা করছে। আধুনিক বাঙলা গানের মধ্যেও তারই অভিব্যক্তি দেখছি আমরা। আগেই বলেছি, আধুনিক বাঙলা গান সহুরে সংস্কৃতি। শুধু সহুরে নয়, একেবারে মধ্যবিত্ত এবং তার উপরের স্তরের সংস্কৃতি। আধুনিক বাঙলা গানের রচয়িতা, গায়ক-গায়িকা এবং শ্রোতারা মধ্যবিত্ত এবং তার উপরের স্তরের লোক। সহরের বিরাট জঙ্গী মজুরশ্রেণীর সঙ্গেও তার কোন যোগাযোগ বা সম্বন্ধ নেই। স্বভাবতই তাঁরা বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকেই চিরন্তন সত্য ধরে নিয়েছেন এবং সেই সেই নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী চরম নির্যাতনকে হয় মাহাত্ম্য আরোপ করে হজম করবার চেষ্টা করছেন, না হয় পলায়নের পথ খুঁজছেন। কাজেই বাঙলা গান বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এই গানে স্বীকৃত হয় না। বাঙলার গ্রামাঞ্চলের হাটে-মাঠে সহরের খেটে-খাওয়া লোকেদের মধ্যে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার যে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী চেতনা জেগে উঠেছে, তার কথাও এই গানে নেই। সুতরাং এই গান আজকের দিনের বড় সত্যকেই অস্বীকার করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই গানে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অধীনস্থ একটি সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতর চেতনাকে রূপ দিয়ে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এ গানে বর্ত্তমানের একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি আছে। ভবিষ্যতের সূর্যালোককে বর্ত্তমানের খণ্ড কালো মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখার প্রয়াস আছে। তাই হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং ন্যাকামিই তার সার কথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক বাঙলা গানের একঘেয়েমির কারণই এই। এর মধ্যে আজকের দিনের সব চেয়েও বড় সত্যই নেই সত্যিকার সমাজ-জীবনে এর কোন মূল নেই।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, আধুনিক বাঙলা গানের উত্থানের যুগেও তো মশাই গানের বিষয়-বস্তু এই একই ছিল, তা সত্ত্বেও তো গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কথার উত্তর দিতে হলে বলতে হয় যে, আধুনিক বাঙলা গানের উত্থানের যুগে জিনিষটা ছিল নতুন। দেশী-বিদেশী সুরের সমন্বয় সাধন করে, দেশী-বিদেশী যন্ত্রের সাহায্যে গান গাইবার প্রচলন তখন কেবল আরম্ভ হয়েছে মাত্র। কাজেই নূতনত্বের মোহে তখন লোকে অকস্মাৎ চমকে গিয়েছিল। সে গানে নূতনত্ব ছিল, কিন্তু সার বস্তুর অভাব ছিল বড় বেশী। সেই গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্পৃহা বাড়ল, কিন্তু তাদের সে স্পৃহার দাবী মেটাবার পথ রইল না আধুনিক বাঙলা গানের। তার পরিধি যে সীমাবদ্ধ! তাই আজ বাঙলা গানের এই দুরবস্থা।

আধুনিক বাঙলা গানের অচল অবস্থার জন্ম গায়ক-সম্প্রদায়কে দোষী করা বোধ হয় যায় না। তার জন্য দায়ী গান-রচয়িতারা। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা যে গান রচনা করেন, তা এতই ...গর্ভ যে, বর্ত্তমান লোকের মত অকবিও বাজী রেখে দিনে সেই গান দশখানা করে রচনা করতে পারেন। এ গানের ভাব এবং ভাষা অত্যন্ত মামুলী—শুধু এক লাইনের শেষ শব্দের সঙ্গে অপর লাইনের শেষ শব্দের মিল হলেই হল। তার উপর অনেক গানের সিমিলি ও মেটাফর হাস্যকর রকমের অদ্ভুত। গানের প্রথম দিকের বক্তব্যের সঙ্গে মাঝের ও শেষের দিকের বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

গান-রচয়িতাদের এই সমস্ত ভয়ঙ্কর রকমের গলদ সত্ত্বেও সুরে এবং তালে গায়ক-গায়িকারা বৈচিত্র্য সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করেন, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু "ওগো, তোমায় আমি ভালবাসি", কথাটা বড় জোর এক হাজার রকমে বলা যায়, তার বেশী বলতে গেলেই পুরোনো রকমের পুনরাবৃত্তি না করে উপায় থাকে না। তা ছাড়া ভালবাসার কথাটা প্রকাশ করবার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। বীর অথবা বীভৎস রসের সমাবেশ করে কোন অষ্টাদশীকে ভালবাসার কথা বললে স্মেলিং সল্টের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। গায়ক-গায়িকারা এখন এই দ্বিধায় পড়েছেন। গত ১০।১২ বছর ধরে রেকর্ড, রেডিও, সিনেমা, চায়ের আসর, ড্রইং-রুম, সামাজিক আসর, ভাবী স্বামী অথবা শ্বশুরের পাত্রী দেখার আসর, ছেলেদের মেয়ে ধরার আসর আর মেয়েদের ছেলে ধরার আসর প্রভৃতি মারফৎ যে কথা অসংখ্য বার শোনানো হয়েছে, আজও সেই কথা শোনাতে গেলে হয় গতানুগতিক ভাবেই শোনাতে হয়, না হলে স্মেলিং সল্ট আর বরফ আসরে মজুত রাখতে হয় কাজেই গায়ক সম্প্রদায়ের খুব বেশী দোষ আছে বলে মনে হয় না।

আধুনিক বাঙলা গানের সংস্কার করে তাকে আবার জনপ্রিয় করতে হলে, বাঙলা গানকে সত্য সত্যই আধুনিক করে গড়ে তুলতে হলে, প্রথমেই বিরাট জন-সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গানে রূপায়িত করতে হবে। গানের ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়-বস্তুকে বাতিল করে বাস্তব ও সমাজকেন্দ্রিক করতে হবে, জীবনের প্রকৃত সত্যকে গানের

বাক্য ও সুরে ধ্বনিত করতে হবে। এ ছাড়া আধুনিক বাঙলা গানের বর্তমান অধঃপতনের হাত থেকে মুক্তি নেই, অগ্রগতিও অসম্ভব। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, দেশে সঙ্গীত-চর্চা বৃদ্ধির ফলে আজ বহু সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকার সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁদের প্রতিভা এবং দক্ষতা আধুনিক বাঙলা গানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর পাষাণ-প্রাচীরে আঘাত পেয়ে বার বার ফিরে আসছে স্বস্থানে। কোন নূতনত্ব, বৈচিত্র্য এবং মঙ্গলের বাণী শোনাতে পারছে না সে, খালি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে ব্যর্থতায়। যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গল এবং আনন্দের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে আমাদের জীবনকে রূপে-রসে ধন্য করতে পারত, তারা কান্না গেয়ে আর ন্যাকামি করে আমাদের চরম বিরক্তি উৎপাদন করছে। বর্তমান বাঙালী গায়ক-গায়িকাদের এই ব্যর্থতা আমার মত অবাঙালীকেও ব্যথিত করেছে, তাই নিজের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করবার জন্য কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। এ কি আমার ধৃষ্টতা?

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

চার কলম কুড়ি ইঞ্চি

বিজ্ঞাপন দিলেই প্রয়োজকের সব কামনার নিবৃত্তি হচ্ছে আজ-কাল। তখনই বুঝতে পারা যায় যে, শুধু বিজ্ঞাপনে একমাত্র কাগজ চলতে পারে (দৈনিক, মাসিক কি সাপ্তাহিক) আর সবই অচল। ভালো ছবির জন্যে ভালো বিজ্ঞাপন খুবই ভালো কথা। কিন্তু অচল চিত্রকে বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্যে চলচ্চিত্র করা যাবে না কিছুতেই। হলিউডে বছরের যেগুলি এক্‌স্‌ট্রা-অর্ডিনারী প্রোডাক্‌সন, তার ক্যাম্পেন হয় বিরাট ভাবে। অর্ডিনারী ছবির পাবলিসিটি অর্ডিনারীই হয়। কিন্তু হলিউড থেকে টালিউড অনেক দূর। এখানে সিনেমা যতই ছিঃ-নেমা হয়ে উঠতে থাকে, পাবলিসিটির সিটি আওয়াজ দিতে থাকে ততই জোরে। আর বিজ্ঞাপনের নীচে এক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে ঘোষণা অমুক কর্তৃক প্রচারিত। বিজ্ঞাপন একটা ক্র্যাফট, কত বড় ক্র্যাফট্‌স ম্যানে হলে তবে লেখা যায় অমুক কর্তৃক ইস্যুড, সেটা এই অক্ষম অনুকারকদের বোঝানো যাবে কবে? আমাদের দেশে যা বিজ্ঞাপন হয়, তাতে তার নীচে লেখা উচিত কারুর দ্বারা প্রচারিত নয়। কারণ প্রচারের পেছনে যদি কেরাণী না থেকে কোন সত্যিকারের মাথা থাকত, তাহলে অকারণ উচ্ছ্বাসে, হাস্যকর হেডলাইন এবং বিচ্ছিরি ব্লকে বিচিত্রিত আমাদের সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়ে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত না কিছুতেই।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও বাংলা ছবি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রেস কনফারেন্স ডাকেন, ঘন ঘন এক্সপ্রেস করেন তাঁদের সদিচ্ছা। কিন্তু ভুলেও কখনও ভাবেন না যে, ছবির মধ্য দিয়ে আজকে দেশের লোকদের কাছে ভালো জিনিষের আবেদন কত ব্যাপক করা যেতে পারে। কোন তাঁরা ছবিওয়ালাদের বাধ্য করেন না লোকহিতকর এবং দেশের বহুবিধ সমস্যা জড়িত বিষয়গুলি নিয়ে ছোট ছোট দু'-তিন রীলার ছবি তুলতে? তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করার চেয়ে বেশী কাজ হবে এতে। মাসে এক বার কি তিন মাসে তিন বার একটা ফিল্ম-কনফারেন্স ডাকা হোক। নিউ থিয়েটার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে ডেকে বলা হোক: "—পয়সার জন্যে যেমন ছবি তুলছ তোল। কিন্তু বছরে একখানা কি দু'খানা ছবি তুলতে হবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক।" বিষয় হবে যাদবপুর টি, বি, হসপিট্যাল থেকে আরম্ভ করে বিশ্বভারতী পর্য্যন্ত। অর্থাৎ রোগ কি করে ঠেকাতে হয়—কখন তাই নিয়ে ছবি। কখন আবার শিক্ষার কি গুণ, ইট কাঠের বাড়ীর বাইরে খোলা হাওয়ায় বসে কেমন ভাবে মন ও দেহ গড়ে তোলা যায়, সে সম্বন্ধেও দেশের লোককে ছবি মারফৎ জানাতে হবে। যার ফিল্মওয়ালাদেরও জানা দরকার, "ছায়াছবি" তুলতে হবে অতঃপর—'জলছবি' আর নয়, তার দিন গেছে।

বি, এম, পি, এ, ও আনন্দবাজার

শোনা যাচ্ছে, 'আনন্দবাজারে' সিনেমার বিজ্ঞাপনের রেট নিয়ে বি, এম, পি, এ'র সঙ্গে গোলমাল চলছে। আমাদের নিরেট বুদ্ধিতে অবশ্য কিছুতেই আসছে না যে, যারা বি, এম, পি, এ'র মাথা—মানে নিউ থিয়েটার্স, ডি, লুক্স এদের নামেও আবার 'আনন্দবাজারে' বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে, অথচ যত দূর আমরা জানি, বি, এম, পি, এ'র নির্দেশ ছিলো 'আনন্দবাজারে'র রেট ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন না দেওয়া। অবশ্য আমরা পুরোটাই হয়ত ভুল জানি, কাজেই কোন মন্তব্য কোরব না। তবে ফিল্ম প্রডিউসারদের মধ্যে এক জনও যাযাবর না থাকলেও এদিকে 'দৃষ্টিপাত' করা দরকার। দৃষ্টিপাত এবং সেই সঙ্গে আমাদের মত অভাগাদের জন্যে কিঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত। না হলে নিউ থিয়েটার্সের ব্র্যাকেটে 'ইষ্ট' দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলে অনিষ্ট না হোক, লাভ নেই কারুরই।

আমার কাগজে বিজ্ঞাপন দিন

যদি না দেন ত আমি যে দৈনিকের সিনেমা-সম্পাদক, সে দৈনিকের সেল জানেন ত?—আর আমার নিজের মাসিক বা সাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন না দেওয়া মানেই আপনার ছবির যা বিড়ম্বনা হবে, তাহ'লে সেই দৈনিকে তা আপনিই বুঝে দেখুন প্রভু। এই হল আমাদের দেশের সিনেমা-বিত্তওলাদের বিবেক বুদ্ধি!—কাজেই সমালোচনা কি রকম হয় এদেশে (আমাদের স্বদেশে আর কি!) বুঝে দেখুন। আর এই ধরণের সিনেমা-সম্পাদকদের কাছেও প্রশ্ন—

...কাগজের সিনেমা-এডিটর হিসেবে নিয়োগই কি কাগজ বার করবার একমাত্র অঙ্গ হবে? আর কোন প্রতিভাই কি দরকার নেই?

সুশীল মজুমদারের নোতুন ছবি

গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি 'সর্বহারা'র পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার আরো একটি ছবির মহরৎ করেছেন পার্ক সার্কাসে রূপশ্রীর নবনির্মিত ষ্টুডিওতে। গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের। সুশীল মজুমদারই বাংলার একমাত্র পরিচালক যার কাছ থেকে আজ পর্য্যন্ত একখানাও খারাপ বাংলা ছবি পাওয়া যায়নি। যদিও বোম্বেতে তিনি দু'খানা অতি বাজে হিন্দি ছবি টাকার জন্যে তুলেছিলেন। মজুমদার মশাইকে শুভ কামনা জানাই।

অরোরার বন্ধুর পথ

আজকের দিনের সব চেয়ে সার্থক ছায়াচিত্র গল্প-লেখক নিতাই ভট্টাচার্য্যের লেখা 'বন্ধুর পথ' শ্রীতে চলছে। পরিচালনা চিত্ত বসুর। ...চৌধুরী, ধীরাজ, রেণুকা যাঁদের যাঁদের থাকবার কথা বাংলা ছবিতে, তাঁরা সবাই আছেন।

'সন্দীপন পাঠশালা'র বিজ্ঞাপন

অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং উল্লেখযোগ্য হয়েছে। সিনেমার বিজ্ঞাপন বাংলায় ভালো হয় না, এ অপবাদও মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে আজকাল। সন্দীপন পাঠশালার ডিজাইন এবং লেখা দুই-ই ভালো হয়েছে! 'সন্দীপন পাঠশালার' পুঁথি-ষ্টাইলের নিমন্ত্রণ-পত্র অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন! বঙ্কিম দৃষ্টিতে দেখলেও সন্দীপন পাঠশালার বিজ্ঞাপন যে ভালো হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে! এখন বইটা ভালো হলেই হয়।

সমাস থেকে ছায়াচিত্র

'বহুব্রীহি' কি—ছেলেবেলায় পণ্ডিত-মশাইর এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মার খেয়েছি মনে আছে। এখন জিজ্ঞেস করলে সোজা জবাব দিতাম—"বহুব্রীহি, স্যার, বহুব্রীহি মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি, যা দেখলে আপনার এক চোখে হাসতে ও এক চোখে কাঁদতে হবে।" আমরা ভাবছি যাদের এক চোখ কাণা, সেই অভাগাদের কি হবে?—যে চোখটি ভালো, সেটিতে তারা হাসবে না কাঁদবে? বহুব্রীহি তাই আর শুধু সমাস নয়—এক মহান্ সমস্যাও বটে!

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেট

১৬ই ফাল্গুন ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ভারতীয় পার্লামেণ্টে যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, স্বাধীন ভারতের উহা দ্বিতীয় বাজেট। ট্যাক্সের বর্ত্তমান হারে হিসাব করিয়া আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ৩০৭.৭৫ কোটি টাকা আয় এবং ৩২২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই হিসাব অনুযায়ী বৎসরের শেষে ঘাটতি দাঁড়াইবে ১৪.৭৯ কোটি টাকা। চলতি বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে ২৫৫.২৪ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং সংশোধিত হিসাবে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ৩৩৮.৩২ কোটি টাকায় অর্থাৎ বরাদ্দকৃত আয় অপেক্ষা [illegible] কোটি টাকা বেশী। চলতি বৎসরের বাজেটে বরাদ্দ ব্যয় ছিল ২৫৭.৫৮ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩৩৯.৮৭ কোটি টাকায় অর্থাৎ বরাদ্দকৃত ব্যয় অপেক্ষা ৮২.২৯ কোটি টাকা বেশী। ইহার মধ্যে দেশরক্ষা বাবদ বৃদ্ধি ৩৪.৩৫ কোটি টাকা আর অবশিষ্ট ৪৮.১৪ কোটি টাকা অসামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য।

আগামী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালের বরাদ্দ বাজেটে অর্থসচিব মহোদয় অনেক প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মূলধনের মূল্যবৃদ্ধির ট্যাক্স অপসারণ, যাহার ফলে ঘাটতি হইবে ১.০০ কোটি টাকা। আয়-করের হার এবং উপার্জ্জিত আয় সম্পর্কে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের সর্ব্বোচ্চ হার হ্রাস। এই প্রস্তাবে প্রথম অংশের জন্য ক্ষতি হইবে ৩ কোটি এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য হইবে ২.১ কোটি টাকা। সর্ব্বসমেত ক্ষতির পরিমাণ হইবে ৫.১০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে আয়কর পুল হইতে বিভিন্ন প্রদেশের অংশে যাইবে ৩.০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ঘাটতি দাঁড়াইবে ২.১০ কোটি টাকায়। এই দুইটি প্রস্তাবই শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য এবং তদর্থে আসলে ক্ষতি হইবে মোট ৬.১০ কোটি টাকা। এভিয়েশন স্পিরিটের ডিউটি সম্পর্কে রিবেট বৃদ্ধির ফলে ঘাটতি হইবে ৪০ লক্ষ টাকা। তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে রপ্তানি-শুল্ক অপসারণের ফলে ১.৫০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। কাঁচা মালের আমদানী শুল্ক হ্রাস করিবার ফলে ক্ষতি হইবে ৩৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্বসমেত প্রস্তাবিত রিলিফের জন্য ঘাটতি দাঁড়াইতেছে ৮.৩৫ কোটি টাকা। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃত ঘাটতি হইবে রাজস্ব খাতে এবং রিলিফ খাতের ঘাটতির যোগফল অর্থাৎ ২৪.১৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক সরকারের উপর ৩ কোটি টাকার ঘাটতি চাপাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ২০.১৪ কোটি টাকা।

এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব মহোদয় কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্কের হার ও মূল্য বৃদ্ধি করিবার এবং নূতন কয়েকটি শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পোষ্টকার্ড ও খাম ইত্যাদির প্রস্তাবিত মূল্য বৃদ্ধির ফলে আয় হইবে ২.৮৪ কোটি টাকা। কাচ, ছুরী-কাঁচি ইত্যাদির শুল্ক বৃদ্ধির ফলে আয় হইবে ২.৪০ কোটি টাকা। চিনির উপর উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধির ফলে পাওয়া যাইবে ১.৫০ কোটি টাকা এবং মিলজাত কাপড়ের উপর প্রস্তাবিত উৎপাদন-শুল্ক হইতে আসিবে ১ কোটি টাকা। সুপারীর উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির জন্য আয় হইবে ১ কোটি টাকা। সিগার, সিগারেট ও চুরুটের উপর নূতন রপ্তানী-শুল্ক হইতে পাওয়া যাইবে ৬০ লক্ষ টাকা। টায়ারের উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির ফলে আয় হইবে ৭০ লক্ষ টাকা এবং মোটর স্পিরিটের গ্যালন-পিছু আমদানী শুল্ক ১২ আনা হইতে ১৫ আনা করার ফলে আয় হইবে ২.৫৫ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত উপায়ে মোট আয় হইবে ১০.৫৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ যাদুদণ্ডের স্পর্শে ঘাটতি বাজেট বাড়তি বাজেটে রূপান্তরিত হইল, এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইল ৪৫ লক্ষ টাকা। অর্থসচিব মহোদয় ধনীর উপর হইতে দরাজ হাতে ট্যাক্স-ভার লাঘব করিয়াই তেমনি দরাজ হাতে দরিদ্রের উপর চাপাইয়াছেন। এই দিক্ দিয়া তাঁহার রেকর্ড অভূতপূর্ব্ব। বস্তুতঃ গত [illegible] পুঁজিপতিরা যে সকল দাবী করিয়া [illegible] ডাঃ জন মথাই তাহাই যথাসম্ভব পূরণ করিবার [illegible] সুবিধা দেওয়ার ফলে ঘাটতি বাড়িয়া [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কার্ড ও এনভেলাপের দাম [illegible] ২.৮৪ কোটি টাকা ঘাটতি কমাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ১৭.৩ কোটি ঘাটতি পূরণের জন্য নির্ভর করিয়াছেন প্রধানতঃ উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধির উপর। ইহার অর্থ জিনিষের মূল্য [illegible] দরিদ্রের ব্যয় বৃদ্ধি। আয়কর সম্বন্ধে ধনীদিগকে [illegible] হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি আরও বর্দ্ধিত হইবে [illegible] পাইয়া তাঁহারা যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবেন এমন কোন [illegible] নাই। সরকার জোর দিয়াও তাহা করাইতে পারিবেন [illegible] না।

পশ্চিমবঙ্গের আয়-ব্যয়

১২ই ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। রাজস্ব খাতে আয়ের বরাদ্দের মধ্যে দেখা যায়, চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের আয় অপেক্ষা ১৯৪৯-৫০ সালের বরাদ্দকৃত আয় ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা বেশী। কিন্তু চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের ব্যয় অপেক্ষা ১৯৪৯-৫০ সালের বরাদ্দকৃত ব্যয় ২ কোটি ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা বেশী

হওয়ায়, ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়-কর এবং কৃষি আয়কর সংশোধন বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে ৮০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবে। আমোদ-প্রমোদ কর বৃদ্ধি করিবার জন্ম বিল উত্থাপিত করা হইবে। ইহার ফলে আয় বাড়িবে ২০ লক্ষ টাকা। সুতরাং আসলে অপূরণ ঘাটতি থাকিবে ১০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

১৯৪৯-৫০ সালে রাজস্ব খাতে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। সংশোধিত বিক্রয়-কর, কৃষি আয়কর এবং আমোদ-প্রমোদ করের আয় এই হিসাবে ধরা হয় নাই। ধরিলে আয় দাঁড়াইবে ৩২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জুয়া খেলার উপর, ঘোড়দৌড়ের উপর এবং ইলেকট্রিসিটির উপর বর্দ্ধিত হারে কর ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চের পর স্থায়ী করিবার জন্ম বিল উত্থাপিত হইবে। ঐ তিনটি বর্দ্ধিত হারে কর হইতে যে আয় হইবে, তাহা ধরিয়াই আয়ের উল্লিখিত বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চলতি বৎসরের বাজেট বরাদ্দে ৩১ কোটি ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে আয় কমিয়া ৩০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কমিয়াছে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। [illegible] ষ্ট্যাম্প ডিউটি হইতে ২০ লক্ষ টাকা, রেজিষ্ট্রেশন হইতে ২ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক আবগারী খাতে ৭ লক্ষ টাকা এবং [illegible] খাতে ৫ লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে। [illegible] কোটি টাকা আয় কম হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ [illegible] রাজস্ব ৬০ লক্ষ টাকার বেশী কমে নাই।

আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ [illegible] মোট ব্যয় ৩২ কোটি ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার [illegible] বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের বাজেটে ৩১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে ব্যয় হইয়াছে ৩০ কোটি ৮২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, [illegible] বাবদ ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ কম হ[illegible] ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার অধিক কমে নাই। [illegible] দিকে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। [illegible] ব্যয় খাতেই ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগে গম ও গমজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লোকসানই এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ। পুলিশ বিভাগে ব্যয় বাড়িয়াছে ৩৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের জন্ম ব্যয় বরাদ্দকৃত অপেক্ষা সংশোধিত হিসাবে কিছু কমিয়াছে। কৃষি বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। সাধারণ শাসন পরিচালনের ব্যয় এবং জেল বিভাগের ব্যয় বাড়িয়াছে।

আগামী বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনার খাতে ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে এই খাতে ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা; আগামী বৎসরের জন্ম বরাদ্দ হইয়াছে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। আশ্রয়প্রার্থী বাবদ চলতি বৎসরের ব্যয় ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; আগামী বৎসরে হইবে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। পুলিশের জন্ম ব্যয় চলতি বৎসরে ৪ কোটি ১৩ হাজার টাকা এবং আগামী বৎসরের জন্ম বরাদ্দ হইয়াছে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। সাধারণ শাসন পরিচালন বাবদ চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ১'৬১ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসর ব্যয় হইবে ১'৮১ কোটি টাকা। আগামী বৎসর শিক্ষা বাবদ ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, জনস্বাস্থ্য বাবদ ৭৮ লক্ষ টাকা এবং কৃষি বাবদ ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বাধীনতা লাভের পরেও পুলিশের ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ সেই অনুপাতে কৃষি ও শিক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ অতি সামান্যই বাড়িয়াছে। জনস্বাস্থ্যের ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এই বাজেট বরাদ্দে সাধারণ মানুষের কোন সুবিধাই হয় নাই।

রেলওয়ে বাজেট

ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে এবং চলাচল ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযুক্ত এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১৯৪৯-৫০ সালের যে রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল বাবদ মোট ২১০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চলতি বৎসর ১৯৪৮-৪৯ বাজেটে এই বাবদ মোট ১৯০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, মোট আয় বাড়িয়া ২০৪'৫০ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে রেলওয়ে পরিচালনার সাধারণ ব্যয় ১৫৯'০৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা চলতি বৎসরের ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৩'১৭ কোটি টাকা বেশী। চলতি বৎসরের বাজেটে এই বাবদ ১৪৭'১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৫'৮৬ কোটি টাকা।

যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় যাত্রীর ভাড়া বাবদ আয় অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু যাত্রীদের কোন সুবিধা হয় নাই। যাত্রীর ভাড়া বাড়িয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাদের যে সামান্য সুখ-সুবিধা ছিল তাহাও আর নাই। ইহাকে নিশ্চয়ই রেলওয়ে পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রীয় বেতন তদন্ত কমিশনের সুপারিশ, রাজাধ্যক্ষের এওয়ার্ড, মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি, রানিং ষ্টাফের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ফলে আগামী বৎসর হইতে রেলওয়ের উপর অত্যধিক চাপ পড়িবে। সে অর্থ আসিবে যাত্রীদের পকেট হইতেই। যাত্রীর ভাড়া বাবদ যে আয় হয়, তাহার অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতেই আসে। অথচ রেল ভ্রমণে তাহাদেরই সব চেয়ে বেশী শাস্তিভোগ করিতে হয়। তাহাদের জন্ম গাড়ীর সংখ্যা এখনও বাড়ান হয় নাই। রেলওয়ে-সচিব বলিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে সাহায্য করিবার জন্ম সোশ্যাল সার্ভিস

ওয়ার্কার অনেক রেলওয়েতেই নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু যাত্রীরা তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সুবিধাই পান না। আসল কথা, রেল বিভাগের নৈতিক শক্তি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এ কথা রেলওয়ে-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন। উহার প্রতিকার যদি না হয়, তাহা হইলে রেলের ব্যয় বৃদ্ধি জনসাধারণের অধিকতর দুর্গতির কারণ হইবে।

—

রেলওয়ে ফেডারেশন ও ধর্ম্মঘট

১ই মার্চ্চ প্রাতঃকাল হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে বলিয়া নোটিশ দিবার জন্য রেলওয়ে ফেডারেশন প্রথমে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, সব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে রেলকর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। ধর্ম্মঘটে বিরত থাকিয়া রেলওয়ে সচিবের সহিত আলোচনা চালান এবং বর্ত্তমানে অর্জ্জিত সাফল্যকে এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটি ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেওয়া স্থগিত রাখিবার জন্য সুপারিশ করেন এবং সাধারণ পরিষদ এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন।

রেল ধর্ম্মঘটের ফলে ভারতের সমগ্র চলাচল ব্যবস্থাই একরূপ অচল হইয়া উঠিবে। এই অচল অবস্থার প্রথম ফলভাগী হইবে দরিদ্র জনসাধারণ। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর রেল ধর্ম্মঘটের ফলে মাল চলাচল বন্ধ হইয়া গেলে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠিবে। দরিদ্র জনসাধারণের কথা রেলকর্ম্মীরা উপেক্ষা করিতে পারেন কি?

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ চারিটি কারণে ধর্ম্মঘট করা সঙ্গত মনে করেন নাই। প্রথমতঃ, জনসাধারণের মনে ধর্ম্মঘট-বিরোধী ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে দেশে একটা ফ্যাসিষ্ট-শাসন ব্যবস্থা চলিতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে বিপদ আসিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, কম্যুনিষ্ট-নিয়ন্ত্রিত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গণ্ডগোল করিতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ সম্পর্কে আমরা এই কথাই বলিব যে, শ্রমিক নেতারাই শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন।

ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে আসন্ন রেল ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা সাময়িক ভাবে দূর হইয়াছে। স্থায়ী ভাবে তাহা দূর করিবার দায়িত্ব শুধু রেলকর্ম্মীদেরই নয়, গবর্ণমেণ্টেরও। বরং গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বই বেশী। উপযুক্ত মাগ্‌গী ভাতা দাবীই রেলকর্ম্মীদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আপোষ মীমাংসায় যদি তাঁহাদের মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে রেলের খরচ আরও বাড়িবে। ফলে যাত্রী ও মালের ভাড়া বাড়িয়া জীবনযাত্রার ব্যয়ও বর্দ্ধিত হইবে। তখন আবার মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইতে হইবে। এই ভাবে সমস্যার সমাধান হইবে না, হইতে পারে না। দাবী নিরোধের একমাত্র উপায় নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং রেল, ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট-বিমুখতার জন্য কাম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক বহু-প্রচারিত ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘট শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

—

ভারত সরকার ও বেকার সমস্যা

রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানিতে চাহিয়াছিলেন, যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কোন কোন দেশ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরে ভারত সরকার বলিয়াছেন, বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য এ পর্য্যন্ত ভারত বিশেষ কিছুই করে নাই। তবে যন্ত্রশিল্প, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে নূতন নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

ভারতে বেকার-সমস্যা দেখা দিবার কারণ দেখাইতে গিয়া ভারত সরকার বলিয়াছেন—(১) পাকিস্তান হইতে ২০ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হইয়া ভারতে আসিয়াছে (২) যুদ্ধোৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে এবং (৩) পুরাতন যন্ত্রের অংশ বদলানো হয় নাই অথচ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার করা সম্ভব হইতেছে না। যে রাজনৈতিক কারণে নেতারা ভারত বিভাগে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার জন্যই আজ আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর যুদ্ধ-কারখানার কর্ম্মচারীরা বারবার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিয়াছে—যুদ্ধকালের কারখানাগুলিকে শান্তিকালীন উৎপাদনের জন্য কাজে লাগান হউক, অন্যথা বহু লোক বেকার হইবে। কিন্তু সে কথায় নেতারা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অন্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি না পাওয়ায় শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হইতেছে বলিয়া নেতারা জানাইয়াছেন, অথচ ভারতের সোভিয়েট দূত মঃ নোভিকভ জানাইয়াছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে যন্ত্রপাতি দিতে পারে। ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের ভয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য কোন দেশ হইতে বিশেষ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে যন্ত্রপাতি জোগাড় করিতে রাজী নহেন।

আজ বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন—(১) ভারতে বিদেশী মূলধন আমদানী করা হইতেছে, (২) স্বদেশে ব্যক্তিগত এবং সরকারী ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ দেওয়া হইতেছে, (৩) বিদেশ হইতে অধিক খাদ্য আমদানী বন্ধ করিবার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে, (৪) আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য ভাণ্ডার ও অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্য লওয়া হইতেছে। বিদেশী মূলধন ভারতে সস্তায় কাঁচা মাল বেশী পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু কল-কারখানা গড়িয়া তোলার চেষ্টা ব্যাহতই করিবে, পাছে ভারতের বাজার নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে। উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ হইতেও বিশেষ ভরসা পাওয়া যায় না। কারণ, উৎপাদন যদি শুধু লাভের জন্যই হয়, উৎপন্ন দ্রব্যের দর বেশী থাকে এবং অর্থাভাবে জনসাধারণ তাহা কিনিতে না পারে, তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না, বরং আরও বর্দ্ধিত হইবে। বেকার-সমস্যা দূর করিতে হইলে কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, জমি ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের নেতারা তাহা করিতে রাজী নহেন।

ইহা কি অসন্তোষের আগুন ?

১৪ই ফাল্গুন শনিবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিনটি স্থান—দমদম বিমান ঘাঁটী, দমদমস্থ গোলা-বারুদের কারখানা এবং জেসপ এণ্ড কোং-এর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা সশস্ত্র আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরে তাহারা বসিরপুর ফাঁড়ি, বসিরহাট থানা, সাব-জেল এবং সাব-ট্রেজারী আক্রমণ করে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বহু-প্রশংসিত সরকারী গুপ্তচর বিভাগ এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন আভাষই পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই। এই সশস্ত্র হানাদাররা এগারটি রাইফেল লইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা মনে করিলে কোন ভুল হইবে না। আক্রমণের মূল কোথায়, তাহা এখনও অজ্ঞাত। কিন্তু দেশে একটা প্রবল অসন্তোষের আগুন রহিয়াছে, তাহার ধুম আমরা দেখিতে পাইতেছি।

শুভ বিবাহ

গত ১৮ই ফাল্গুন (১৩৫৫) বুধবার উত্তরপাড়ার স্বর্গত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল; সি, এস, আই মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ'র সহিত চন্দননগরনিবাসী স্বর্গত কার্ত্তিকচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধীরা (মায়া) দেবীর শুভ পরিণয় 'রাজেন্দ্র ভবনে' মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে চন্দননগরে এবং উত্তরপাড়ায় কয়েক দিবস যাবৎ বিভিন্ন প্রীতি-উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উৎসবে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পশ্চিম-বঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-বাণী প্রেরণ করেন। চন্দননগর এবং উত্তরপাড়ায় শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি, ই, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি আত্মীয়গণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত অতিথিগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন দিবসে চন্দননগর এবং উত্তরপাড়ায় যাঁহারা যোগদান করেন তন্মধ্যে শ্রীশচন্দ্র নন্দী, স্যার হরিশঙ্কর পাল, বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা এস বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, সুকুমার সেন (চীফ সেক্রেটারী), শ্রীকানাইলাল গোস্বামী, শ্রীসুকুমার গুপ্ত (আই, জি) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারাণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক আই, সি, এস, খান বাহাদুর রবিয়ল হক, খান বাহাদুর এ, এফ, এম রহমান, শ্রী বি, বি, সরকার আই, সি, এস (বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার), মিঃ ও মিসেস্ আর, এ, পেন, মিঃ ও মিসেস অরুণ বসু, বার-এট-ল, ডাঃ প্রভাত সান্যাল, সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস, বিভূতিভূষণ

শ্রীমতী সুধীরা দেবী, ও শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন ও শ্রীযুক্তা প্রেমাঙ্কুর দে, রায় বাহাদুর শশধর দাসগুপ্ত, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীশরৎচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দৈনিক বসুমতী), শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক), কুমার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মহারাজকুমার শ্রীসৌমেন নন্দী (কাশিমবাজার), তালচর ষ্টেটের ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ভকত, ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় বাহাদুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র ও সৌখীন আলোকচিত্র শিল্পে বিশেষ পারদর্শী। আমরা নব দম্পতির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সর্দ্দারজী ও বণিক্ সম্প্রদায়

মাদ্রাজের বিভিন্ন বণিক সমিতি প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন,—"আপনারা আমার নিকট হইতে ইহা বেদবাক্যের মত সত্য বলিয়া জানিয়া রাখুন যে, বর্ত্তমানে কোন শিল্পকেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ক্ষমতা বা সঙ্গতি এই গবর্ণমেণ্টের নাই। যদি কেহ শিল্প-সমূহ জাতীয়করণের কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি নেতৃত্বের লোভেই এ কথা বলেন, শিল্প সমূহ জাতীয়করণের জন্য নহে। ঐরূপ নেতৃত্বে আমার বিশ্বাস নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ব্যবস্থা পরিষদের বাহির হইতেই গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবিত করিবার বিপুল শক্তি আপনাদের রহিয়াছে। চাবিকাঠি

আপনাদেরই দখলে। যদি আত্মস্বার্থের সহিত কিঞ্চিৎ দেশপ্রেমের খাদ মিশাইতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দান করিতেও আপনারা সমর্থ হইবেন" দেশপ্রেমের নূতন সংজ্ঞা পাওয়া গেল। যে দেশপ্রেমের সাহায্যে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিতে পারা যায়, তাহাই সত্যকারের দেশপ্রেম।

গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবিত করিবার বিপুল শক্তি যে পুঁজিপতিদেরই হাতে, তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন। সেই জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট এক দিকে শ্রমিকদের ক্ষুধা-নিবৃত্তির দাবীকে কঠোর হস্তে দমনের ব্যবস্থা করিয়া অপর দিকে তাঁহাদের তোয়াজ করিতেছেন, তাহাও তাঁহারা বুঝেন। কিন্তু শুধু তোয়াজেই তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চান গবর্ণমেণ্টকে ডিক্টেট করিতে। চান শিল্প-বাণিজ্যে অবাধ অধিকার, লাভের মাত্রা এবং শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারণ করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। একমাত্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার সময় ছাড়া আর কোন সময়ই সরকারী হস্তক্ষেপ তাঁহারা সহ্য করিতে রাজী নহেন। সর্দ্দারজী তাহা বুঝেন বলিয়াই বলিয়াছেন,—"আসুন, আমরা একত্রে বসিয়া সততার সহিত সহযোগিতা করিবার উপায় উদ্ভাবন করি।" শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে শ্রমিকরা অত্যন্ত উত্তেজিত। আপনারা (শিল্পপতিরা) বা আমি (গবর্ণমেণ্ট) তাঁহাদিগকে যে কথাই বলি না কেন, তাহা তাঁহাদের নিকট রুচিকর হইবে না।" কৃষক-শ্রমিক রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, কে বলে?

সর্দ্দারজী অভিযোগ করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেসকে পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। করেন কি না আমরা সঠিক জানি না, কিন্তু যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভুল করিয়াছেন। আসলে কংগ্রেস 'পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান' নয়, পুঁজিপতিদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকের শক্তিতে কংগ্রেস শক্তিশালী হইয়াছে, কিন্তু উহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে পুঁজিপতিদের নির্দ্দেশক্রমে। সর্দ্দার প্যাটেল বেশ স্পর্দ্ধা করিয়াই বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের এই অধঃপতিত অবস্থাতেও দুই, তিন বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন দল ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, অন্তত পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থায় গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী এক রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়া দেশের গবর্ণমেণ্টের উপরও পড়িবে। ভারতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা হইবে তিনি এই বিপ্লবের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের দুই কর্ত্তার উক্তির মধ্যে মিল পাওয়া যাইতেছে না। ইহা কি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃত গরমিল?

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সমস্যা বাঙ্গালা দেশে প্রায় এক যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অখণ্ড বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রিসভার বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁহাদের উত্থাপিত বিল সমূহে সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। খণ্ডিত বাঙ্গালায় পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি আবার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাকে মন্ত্রিমণ্ডলী কি রূপ দিতে চান, বিলে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। রূপ দিবার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪২ জন সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন ১১ জন এবং ৭ জন আছেন সরকার-মনোনীত সদস্য। প্রধান শিক্ষক থাকিবেন ৪ জন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ২ জন। এই বোর্ডে অন্ততঃ পক্ষে ৭ জন অধ্যাপক গ্রহণের প্রস্তাব আছে। মাধ্যমিক স্কুলে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কলেজের শিক্ষাদান প্রণালী তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং বোর্ডে এত অধিক সংখ্যক অধ্যাপক থাকা নিষ্প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্ম্ম-পরিষদই প্রকৃত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক জন প্রতিনিধিরও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এত কম টাকা বরাদ্দের কোন সঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষকদিগকে যেখানে গবর্ণমেণ্ট জন-প্রতি ১০ টাকার বেশী মাগ্‌গী ভাতা দিবার প্রস্তাব করিতে পারেন নাই, সেখানে বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বেতন ধার্য্য হইয়াছে মাসিক আড়াই হাজার টাকা। মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি সরকার-নিরপেক্ষ স্বায়ত্ত-শাসিত ব্যবস্থা না হয়, (৪২ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জন সরকার-মনোনীত অথবা সরকারী সদস্য।) তাহা হইলে জাতির জীবনে উহা কল্যাণকর হইতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তহারা

কিছু দিন পূর্ব্বে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে আগত হিন্দু ও শিখ বাস্তত্যাগীদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের আবার পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাওয়াই গবর্ণমেণ্ট বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাস্তহারাদের সাহায্য করা সম্বন্ধে একই নীতি অনুসৃত হইবে. তবে পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তহারাদের সাহায্য দানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। পাকিস্তানের উভয় খণ্ডের বাস্তহারাদের সম্বন্ধে একই নীতি অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে মোট দশ কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ লক্ষের অধিক টাকা পান নাই। এই তারতম্য কেন?

আজ এ সত্য গোপন করিবার উপায় নাই যে, পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের দুর্দ্দশার ও বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী। পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মনোভাব তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন তাঁহারা খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য পাকিস্তানী হিন্দুদিগকে মুসলিম লীগের হাতে তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মাজী বলিতেন—"ভারত বিভাগ মহাপাপ।" আর তাঁহার শিষ্যেরা গদীর লোভে তাহাই করিয়াছেন। বাস্তুহারা সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করিয়া আজ ভারত গবর্ণমেণ্টকে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

যে পাকিস্তানে ভারত গবর্ণমেণ্টের হাই-কমিশনারকে মহাত্মা গান্ধীর পাদমূলে মাল্য অর্পণ করিবার অধিকার দেওয়া ইসলাম-বিরোধী বলিয়া গণ্য হয়, যেখানকার শিক্ষা-মন্ত্রী বাঙ্গালা ভাষা আরবী হরফের সাহায্যে শিখাইবার প্রস্তাব করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেখানে শুধু হিন্দুর ধর্ম্ম নয়, বাঙ্গালীর ভাষা ও কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখাও অসম্ভব। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যার অন্য কোন সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নয়।

সরোজিনী নাইডু

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর সরোজিনী নাইডু ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ গবর্ণর হাউসে পরলোক গমন করিয়াছেন। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ১৬ বৎসর বয়সে বিলাত যান। প্রথমে লণ্ডনের কিংস কলেজে এবং পরে কেম্‌ব্রিজের গার্টন কলেজে যোগদান করেন। তিনিই কেম্‌ব্রিজে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ছাত্রী। সেই বয়সেই বিলাতে তাঁহার কবি-খ্যাতি রটে। তাঁহার রচিত "গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড" "বার্ড অফ টাইম" উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৯৪১ সালে রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার"-এর সদস্যা নির্বাচিত হন।

তিন বৎসর পর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে ১৯ বৎসর বয়সে ডাঃ গোবিন্দ বরদারাজুলু নাইডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু কেবল কাব্য ও সংসার লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। দেশবাসীর দুঃখ ও পরাধীনতার বন্ধন তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি শ্রীমতী আনি বেশান্ত-প্রবর্ত্তিত হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের কঠোর সমালোচনা করিয়া সংবাদপত্রে বহু আলোচনা করেন। তার পর মহাত্মা গান্ধী ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলে তিনি পূর্ণোদ্যমে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থার বিষয় চাক্ষুষ ভাবে অবগত হইবার জন্য ১৯২৪ সালে তিনি সেখানে যান। জেনারেল স্মাটসের সহিত ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নারী হইয়াও দেশের জন্য যে দুঃখ-কষ্ট বরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কৃতজ্ঞ জাতি সম্মান প্রদর্শন করে ১৯২৫ সালে কাণপুর কংগ্রেসের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া। এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারিণী তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনে তিনি অদ্ভুত সাহস ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দেন। মহাত্মা গান্ধী ও আব্বাস তায়েবজীর গ্রেপ্তারের পর তিনিই আন্দোলন পরিচালিত করেন। মে মাসে দর্শনায় লবণ-গোলায় অভিযান চালনার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি মুক্তি লাভ করেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করিলে তিনি বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। শাসক-শক্তির সহিত কংগ্রেসের মতানৈক্য ঘটায় তিনি গান্ধীজীর সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে পুলিশ কমিশনরের আদেশ অমান্য করিয়া বোম্বাই ত্যাগ করায় তিনি জরুরী ক্ষমতা অর্ডিনান্সের কবলে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হন। স্বাস্থ্যহানির জন্য পরে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তাঁহাকে ভারতরক্ষা বিধানে বোম্বাইতে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালের ২১শে মার্চ্চ অসুস্থতার জন্য মুক্তি পান।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তিনি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা গবর্ণর। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সপ্ততিতম জন্ম-দিবসে দেশবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অব ল" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে, ভারতের নারী-জাগরণে শ্রীযুক্তা নাইডুর দান অপরিসীম। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ ইত্যাদি বহু কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তিনি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু কথায় নয়, কাজেও। ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও অব্রাহ্মণকে বরমাল্য দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের নারী সমাজের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। এই মহীয়সী মহিলার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

কিরণশঙ্কর রায়

৮ই ফাল্গুন রবিবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব কিরণশঙ্কর রায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

কিরণশঙ্কর ১৮৯১ সালে কার্ত্তিক মাসে ঢাকা জেলার তেওতার বিখ্যাত জমীদার-বংশে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তেওতায় গ্রামের বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শেখেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৭ সালে হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ-এ পড়িবার প্রথম বৎসরেই তিনি বিলাত চলিয়া যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৩ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন এবং ইতিহাসে ট্রাইপস পান। ১৯১৩ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন এবং ১৯১৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে সংস্কৃত কলেজেও অধ্যাপনা করেন। এই ভাবে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি সরকারী চাকুরী করেন। ঐ বৎসর আবার তিনি বিলাত যান এবং ফিরিয়া আসিয়া ১৯২০ সালে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

১৯২০ সালে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত পরিচয় ঘটিলে তিনি কিরণশঙ্করের উপর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভার অর্পণ করেন এবং পরে তিনি উক্ত পরিষদের সম্পাদক হন। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ফলে তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের পক্ষে ইনি বাংলার পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎপরে বাঙ্গালা কংগ্রেসের সম্পাদক হন। আজীবন তিনি বাঙ্গালার বিখ্যাত বিপ্লবী যুগান্তর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কিরণশঙ্কর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে প্রথম জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন এবং ১৯১৪ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত 'সবুজপত্রের' লেখক ছিলেন। 'সপ্তপর্ণ' নামক পুস্তকে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

গত বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার কংগ্রেস তাঁহারই বুদ্ধি-প্রভাবে পরিচালিত হইয়াছে। বঙ্গীয় আইন সভায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না বলিলে ভুল বলা হয় না। স্বাধীনতা লাভ এবং ভারত তথা বাঙ্গালা বিভাগের পর প্রথমে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে থাকিয়াই সেখানকার হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহা অসম্ভব, তখন পশ্চিমবঙ্গ হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের রক্ষার ব্যবস্থা করা সঙ্গত এবং সম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র-সচিবের গুরু দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় ছিল উদার, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি ছিল তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাঘ সংখ্যা মাসিক বসুমতীর ৪৪৩ পৃষ্ঠায় "বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় ঈশ্বরের নামে"র তালিকার শিরোনামায় 'দেশ' ও 'ভাষা' মুদ্রিত হয়। 'দেশ' কথাটির স্থলে 'জাতি' এই কথাটি পাঠ হইবে।

এবং

৪৮৭ পৃষ্ঠায় দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু মহাশয়ের চিত্রের নামকরণে ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় হইবে।

এই সংখ্যায় (ফাল্গুন) 'শ্যাম দেশে ভাষায় ভারতীয় প্রভাব' স্থলে 'শ্যাম দেশের ভাষায় ভারতীয় প্রভাব' পড়িতে হইবে।

অজ্ঞানকৃত এই প্রমাদগুলির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—চৈত্র ঃ ১৩৫৫ সাল

২য় খণ্ড ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সব পথই মানি

আমি বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম ;—পনর দিন রেখেছিলাম। সব ভাব কিছু দিন কিছু দিন করতাম, তবে শান্তি হ'তো। আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

এক জনের একটি রঙের গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য্য গুণ যে, যে যে রঙে কাপড় ছাপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙেই ছুপে যেত। কিন্তু এক জন চালাক লোক বলেছিল, তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রংটি দিতে হবে। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)

কেন একঘেয়ে হব? অমুক মতের লোক তাহলে আসবে না এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই. অধর সেন বড় কর্ম্মের জন্য মাকে বলতে বলেছিল—তা ওর সে কর্ম্ম হ'লো না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে!

আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'লো ওরা নিরাকার নিরাকার করে ;—তাই ভাবে বল্লুম, 'মা! এখানে আসিসনি, এরা তোর রূপ-টুপ মানে না।”

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

বাঙলা প্রবাদ

রেভাঃ লঙ সম্পাদিত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

১৮৬। হবু কাল কে দেখেছে ?

১৮৭। আলস্য দরিদ্রতার কুঁজী কাঠি।

১৮৮। উত্তম খাদ্য বটে, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য।

১৮৯। এক গাধার অনেক স্বামী হলে সে নেকড়ের গর্ভস্থ হয়।

১৯০। করাঘাতে শশাক নষ্ট করা অনুচিত কর্ম্ম।

"অর্থাৎ তাহাতে আপনারই হানি।"

১৯১। কালো মন অপেক্ষা রাঙ্গা মুখ ভাল।

১৯২। তার মাথা আছে বটে, কিন্তু আলপিনেরও মাথা আছে।

১৯৩। দয়িতা আর দর্পণ সর্ব্বদা বিপদাক্রান্ত।

১৯৪। নারী আর কুক্কুটী অধিক ভ্রমণে পথভ্রষ্ট।

১৯৫। পুরুষ অনল সম, রমণী কাপাস।

শয়তান জেলে দিয়ে করে সর্ব্বনাশ।

"ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্

তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।"

১৯৬। বাঘের দাঁত গেলেও ইচ্ছা যায় না।

১৯৭। ভেড়ার লাথিতে নেকড়িয়ার আনন্দ।

১৯৮। মধু, গাধার মুখের জন্য নয়।

১৯৯। মুখাবরোধ করাতেই নির্বিরোধে আছি।

"বোবার শত্রু নাই।"

২০০। সুবিমল জল যদি তোমার হে চাই।

নির্ঝর হইতে তবে তোল তাহা ভাই।

২০১। যেই জন মাছ ধরে। সে যেন না জলে ডরে।

"মাছ ধরতে গেলেই কাদা মাখতে হয়।"

২০২। যে কুকুর অধিক ডাকে, তার কামড় বড় কম।

২০৩। যে দ্বারের অনেক চাবী, তার প্রতি সাবধান।

২০৪। লাঠি হস্তে যে সন্ধি, সে সন্ধি নহে, বিগ্রহ।

২০৫। সমুদ্রে বারি প্রদান।

"সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ।"

২০৬। অণ্ডের কেশ মুণ্ডন।

"শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া।"

২০৭। অল্পকালে পাকে যেই, ত্বরায় পচে সে।

অল্পকালে জ্ঞানী হৈলে, শীঘ্র যায় টেঁসে।

২০৮। অস্ত্র, নারী, আর গ্রন্থ প্রত্যহ দেখা আবশ্যক।

২০৯। আগুনের উপর তৈল দান।

"জ্বলন্ত অনলে ঘৃতের আহুতি।"

"কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে।"

২১০। আনাড়ী ছুতারেরই অধিক খুঁচির প্রয়োজন।

২১১। আপনার লেপের সীমা পর্য্যন্ত পা ছড়াও।

২১২। আলস্য ক্ষুধার জন্মদাতা আর চৌর্য্যের সহোদর।

২১৩। উৎক্রোশ যখন কপোতের ছন্দ দেয় না।

২১৪। এক ঘরে যুগল মোরগে সদা দ্বন্দ্ব।

বিড়াল মুষিকে যেইমত ভাব মন্দ।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সেরূপ প্রকার।

কলহ কোন্দল কত করে অনিবার।

২১৫। একটা ঘেয়ো ভেড়ায় খোঁয়াড় নষ্ট।

"এক বিন্দু গোমূত্রে এক কলসী দুধ নষ্ট।"

২১৬। এক পিপা সির্কা অপেক্ষা এক গণ্ডূষ সরবতে অধিক মাছি আটকে।

২১৭। এক লাঙ্গলে, গাধা ও বলদের ভাল যোগ হয় না।

২১৮। কচী ফেকড়ী নত হয়, গুঁড়ি কভু নয়।

২১৯। কাঁটা খোঁচার আঘাত বড়। দুষ্ট জিহ্বার আঘাত দড়।

২২০। কান পাতলা ছেলেদের প্রতি সাবধান। কারণ ছোট কলসীর বড় কাণা।

২২১। কুক্কুট আপন গোবর-গাদায় মহাবীর।

"শৃগাল আপন কোটে সিংহ।"

২২২। কুকুরকে আদর দিলে কাপড় ময়লা করে।

"কুকুরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে।"

২২৩। খরগোসেরাও মৃত সিংহের দাড়ী ধরিয়া টানে।

"হাবড়ে পড়িলে হাতী ব্যাঙ্গে মারে চাট।"

আগামী সংখ্যায়

দিনামার ও ফরাসী প্রবাদ

২২৪। গর্জ্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে।
"যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।"

২২৫। গাধাকে যব দিলেও সে কাঁটা ঘাসের তরে দৌড়ে।
"তথাপি জম্বুবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি।"

২২৬। গাধা দানা বয়ে মরে, ঘোড়াতে আহার করে।
"চিনির বলদ।"

২২৭। গোলাব ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু কাঁটা চিরকাল থাকে।

২২৮। চালিত লাঙ্গল কালে চাকচিক্য ছাড়ে।
স্থির নীরে কেবল দুর্গন্ধ মাত্র ছাড়ে।

২২৯। চিত্রিত পুষ্পে গন্ধ নাই।

২৩০। চিরকাল গাধা চড়া অপেক্ষা, এক বৎসর ভাল ঘোড়াতে চড়া ভাল।

২৩১। চোরের গৃহে চুরি করা দুঃসাধ্য।

২৩২। জনশ্রুতির নাম অর্দ্ধমিথ্যা।

২৩৩। জালে না পড়িলে কাৎলা বলিয়া চীৎকার করিও না।

২৩৪। জোয়ার মাত্রেরই ভাটা আছে।

২৩৫। ঢাক বাজাইয়া খরগোশ ধরা।

২৩৬। তার এক ঝুড়ি জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু ঝুড়িটি তলা ফুটা।

২৩৭। তাকে আঙ্গুলটি দিলে তোমার হাতটি ধরবে।
"বসতে পেলে শুতে চায়।"

২৩৮। তার শিশার ছুরির ন্যায় ধার।

২৩৯। তিমির আর তমস্বিনী চিন্তার জননী।

২৪০। তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।

২৪১। ধূম হতে পলাইয়া অগ্নিতে পতন।

২৪২। নষ্ট নারী যার, ধরায় নরক তার।

২৪৩। না আছাড় খেলে সুন্দর পা হয় না। "ঠেকে শেখা।"

২৪৪। নূতন জোড়া না পাইলে পুরান জোড়া ছেড় না।

২৪৫। নেড়ে পোতা গাছ তেজাল হয় না।

২৪৬। পাতায় লতায় ভয় হইবে যাহার।
সে যেন না যায় কভু বনের মাঝার।

২৪৭। প্রথম ঘাতেই গাছ পড়ে না।

২৪৮। বংশ-মাহাত্ম্য অপেক্ষা মনের মাহাত্ম্য সমধিক পূজ্য।

২৪৯। বড় গাছেই বড় ঝড়।

২৫০। বড় বক্তারা ছোট কর্ত্তা।

২৫১। বড় বিদ্বান হলেই বড় জ্ঞানী হয় না।

২৫২। বড় বিজ্ঞেরা বড় অধার্ম্মিক।

২৫৩। বহু কাল কূপে কুম্ভ গিয়ে বার বার।
পরিশেষে তবু তার হৈল চুরমার।

২৫৪। বাঘের সহিত তার গর্জ্জন প্রভব।
ভেড়ার সহিত কিন্তু ছাড়ে ভ্যা-ভ্যা রব।

২৫৫। বাছুর ডুবিলে পর কূপের মুখ রুদ্ধ করা।

২৫৬। বিড়াল ইন্দুর ধরিবার সময় মেও-মেও ডাক ছাড়ে না।

২৫৭। বিড়ালে মারিলে ঘুম, ইন্দুরে নৃত্যের ধূম।
"বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর।"

২৫৮। ব্যাং সোণার পিঁড়িতে বসিলেও, ডোবা দেখলে লাফ দিবে।
"ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

২৫৯। ভিখারীর হাতে তলা-ফুটা ঝড়ি।

২৬০। মধু বটে বড় মিষ্টি, মৌমাছির হুলরিষ্টি।

২৬১। মক্ষিকারে হস্তী জ্ঞান, ইন্দুর-ঢিবীতে পর্ব্বত আরোপ।

২৬২। মাটি দিয়ে মুখ ভর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লোভের শান্তি নাই; অর্থাৎ লোভ আমরণ পর্য্যন্ত সহচর।

২৬৩। যদি ডিম্ব খেতে সাধ, তবে সহ হংসনাদ।

২৬৪। যদি সবে আপনার নাছ ঝেঁটাইত।
তবে রাজপথমাত্রে বিমল থাকিত।

২৬৫। যার মধুর প্রয়োজন, সে যেন মৌমাছির হুলে ভয় করে না।

২৬৬। যাহাতে ব্যয় নাই, তার আবার মূল্য কি।

২৬৭। যাহার মাখনের মাথা, সে যেন উননের নিকট না যায়।
"ননীর পুতুল নয় যে, রৌদ্র পেলে গলে যাবে।"

২৬৮। যে ইন্দুরের একমাত্র গর্ত্ত, সে শীঘ্র ধরা পড়ে।

২৬৯। যে কুকুরের মুখে হাড়, তার বন্ধু কোথায়।

২৭০। যেখানে চুল নাই, সেখানে চুল বাঁধা লোংরামী।
"শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া।"

২৭১। সমধিক গাঢ় হয় যে খালের তল।
সেই খালে আগে বাগে বেগে যায় জল।

২৭২। রসুয়ে আর ভাণ্ডারীতে ঝগড়া লাগিলে কে ঘি-চোর, তাহা জানতে পারা যায়।

২৭৩। রাজমুকুট শিরঃপীড়ার ঔষধ নয়।

২৭৪। ল্যাজ না খসলে গরু ল্যাজের মূল্য বুঝতে পারে না।
"দাঁত থাকতে দাঁতের মরম জানে না।"

২৭৫। শুওরের পেট ভরিলেই ডাবা উপুড় করিয়া ফেলে।

২৭৬। সত্যকালের পুত্র।

২৭৭। স্বর্ণ অঙ্গুরী ধারণ করিলেও যে বানর সেই বানর।
"তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

২৭৮। হংসী চিৎকার করে, কিন্তু কামড়ায় না।

২৭৯। ক্ষীণ সূতা আস্তে টান।

২৮০। ক্ষুধাই উত্তম চাটনী।

২৮১। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের কর্ণ নাই।

২৮২। ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার, কৃষকের নয়ন আর চরণ।

"কি সুন্দর এবং কি সুন্দর নয় এ নিয়ে ভারি গোলমাল বাধে, যে রচনা করেছে এবং যারা রচনাটি দেখেছে বা পড়েছে কিংবা শুনেছে তাদের মধ্যে। কেন না সবারই মনে একটা করে' সুন্দর অসুন্দরের হিসেব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিসেবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনায় সৌন্দর্যের হিসাবে সে নানা ভুল দেখে।"

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমাদের শিক্ষিত সমাজের ধুরন্ধরগণ অধুনা সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সর্ব্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত সকল বিষয়ে তাঁহাদের কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে অনধিকার-চর্চ্চায় যে দেশের ও দশের ক্ষতি সাধন করা হয়, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এই কথাটি বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। আদার ব্যাপারীদের পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করা হইতেছে।]

"যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাস-প্রশ্বাস দমন করে, কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখীর মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনা-লোকে ও বাস্তব-জগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তার পর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds.—(Millet)."

* * * *

"শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে 'নালমতিবিস্তরেণ।' অতি-বিস্তরে যে অপর্য্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত। আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তার মস্ত, কিন্তু খেলে পেটটা মস্ত হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম।"

* * * *

"আদানে ক্ষিপ্রকারিতা, প্রতিদানে চিরায়ুতা'—শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে, সব জিনিষের কৌশল আর রস চটপট্ আদায় করতে হবে; কিন্তু সেটা পরিবেষণ করবার বেলায় ভেবে-চিন্তে চলবে।"

* * * *

"রসবোধই নেই রস-শাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়।"

* * * *

"যত দিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, তত দিন সে তার চারি দিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলেছিল, পর্ব্বত-শিখরকে ভাবছিলো দুরারোহ, ভীষণ; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোন প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সবই বিরাট রহস্যের মত ঠেকছিল; সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর মন ছন্দময় বেদময় হয়ে উঠলো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে সবলে।"

* * *

"রমণীর শিরোমণি তাজ, দুনিয়ার মালিক সাহাজাহান তার স্বামী, সোহাগ-সম্পদ সে কি না পেয়েছিল, কিন্তু তাতেও তো সে তৃপ্ত হলো না, সাহাজাহানের অন্তরে ছিল যে শিল্প, তারই শেষ দান চেয়ে নিলে—দু'জনের জন্যে একটি মাত্র কবর, যার মধ্যে দু'জনে বেঁচে থাকবে। এমন কবর যার জোড়া ত্রিভুবনে নেই।"

* * * *

"আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং শেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাই নে, রস পাই নে, পাবার চেষ্টাও করি নে, তাদের কাছ থেকে শিল্পী দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য্য কি? "অলসস্য কুতো শিল্পং অশিল্পস্য কুতো ধনং।"

* * * *

"Inspiration কি অমনি আসে? অর্জ্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই। আমাকে প্রত্যয় না হয় তো এখনকার ইউরোপের মহাশিল্পী রোঁদা কি বলেছেন দেখ—

"Inscription ! Ah ! that a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination; it will drive him one night to make a masterpiece straight off because it is generally at night these things occur. I do not know why...Craftsmanship is everything; craftsmanship shows thoughtful work; all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art !"

* * *

"শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জ্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হলো 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।"

* * *

"যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চল্লো—কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন সহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্য থেকে আনন্দ পাবেন বলে। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস্, এক মাইলোস্, এক রোঁদা, এক মেস্টোভিক ব্রেজেস্কা, এমনি জানা এবং দেশের এবং বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগল-বাদশার রত্ন-ভাণ্ডারে তিন পুরুষ ধরে জমা হতে লাগলো মণি-মাণিক্য, সোনা-রূপা—এক রাজ-শিল্পীর ময়ূর-সিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্ম্মিতি দেবে বলে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন করছি, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা, শিল্পের হাট, কারুসত্র, কলাভবন, এটা-ওটা বসাচ্ছি, সব সেই একটি আর্টিষ্টের, একটি রসিকের জন্য সে হয়তো এসেছে কিম্বা হয়তো আসবে।"

—'বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী' হইতে

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

"হংস এল সাদা হয়ে, শুক এল সবুজ হয়ে, ময়ূর এল বিচিত্র হয়ে, তারা সেই ভাবেই জগৎচিত্রের মধ্যে গত হয়েই রইল, অবিদ্যমানকে জানতে পারলে না। রচনাও করতে পারলে না কল্পনাও করতে চাইলে না। মানুষ মনের মধ্যে ডুব দিয়ে অবিদ্যমানের মধ্যে বিদ্যমানকে ধরলে,—সে হ'ল শিল্পী, সে রচনা করলে, চিহ্নবর্জিত যা ছিল তাকে চিহ্নিত করলে, পাথরের রেখায় রঙের টানে সুরের মীড়ে গলার স্বরে।

বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্কা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়া এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ নিরাবরণ, শীত তাকে পীড়া দেয়, রৌদ্র তাকে দগ্ধ করে, বাস্তব জগৎ তার উপরে অত্যাচার করে বিশ্বচরাচরে রহস্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে তাকে বন্দী করতে চায়—এই মানুষ যখন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার, সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে' নিলে সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।"

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-ষড়ঙ্গ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ ১৩২১ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলী ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের এই ষড়ঙ্গ-ব্যাখ্যান অনেক শিল্পশাস্ত্রী সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। তৎসত্ত্বেও এ বিষয়ে যাঁহারা চর্চা করিবেন, শিল্পাচার্য্যের এই ব্যাখ্যান গভীর অভিনিবেশের সহিত তাঁহাদের আলোচনার যোগ্য, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমরা ভারত-ষড়ঙ্গের ছয়টি অঙ্গের সারাংশ মাত্র মুদ্রিত করিতেছি।

১। রূপভেদ

রূপভেদাঃ—রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্মভেদ বা রহস্য-উদ্‌ঘাটন—জীবিত রূপ, নির্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, সু-রূপ, কু-রূপ ইত্যাদি।

মায়ের কোলে সব-প্রথম চোখ খুলিয়া অবধি আমরা রূপকেই দেখিতেছি। "জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি। গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতি রূপকে প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার জ্যোতি রূপকে প্রকাশিত দেখিতেছে—আলোকের ছন্দে, ভাবের ছন্দে—বহুধা বহু প্রকারে। যথা—

> জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি রূপঞ্চ বহুধা স্মৃতম্
> হ্রস্বোদীর্ঘস্তথা স্থূলশ্চতুরস্রোঽণুবৃত্তবান্‌। ৩৩
> শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তঃ পীতো নীলারুণস্তথা।
> কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো মৃদু দারুণঃ। ৩৪
> —মহাভারত, শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ১৮৪ অধ্যায়

হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও নানা কোণ—যেমন ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণাদি এবং গোলাকৃতি, অণ্ডাকৃতি, অথবা শ্বেত, কৃষ্ণ, নীলারুণ (বেগুনি) ও নানা বর্ণের মিশ্রিত রূপ, রক্ত-পীতাদি এক এক স্বতন্ত্র বর্ণরূপ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম, কৃশ, স্নিগ্ধ, স্বল্প), পিচ্ছিল অর্থাৎ পিছল—যেমন কাদা, যেমন জল; পিচ্ছিল যেমন ছত্রাকার ময়ূরপিচ্ছ; মৃদু যেমন শিরীষ ফুল, দারুণ যেন লোহার ভীম। ছোট বড়, রোগা মোটা, কাটা-ছাঁটা, গোল-গাল, কালো-ধলো, একরঙা, পাঁচরঙা ইত্যাদি। উপরের শ্লোকে যে ষোলো প্রকার রূপ কথিত হইয়াছে তাহার বিস্তার অশেষ। এই রূপের অসীমতা এক-এক পদার্থে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন দেখা এবং এই অখণ্ড বিভিন্নতাকে একে সমাহিত—অসীমে প্রতিষ্ঠিত—দেখাই হইতেছে চক্ষুর এবং আত্মার পরিচয়—ইহাই হইতেছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা।

* * *

২। প্রমাণ

প্রমাণানি—বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমবিহীন জ্ঞানলাভ করা, বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ, এক কথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।

চোখ দেখিতেছে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, অথচ কয়েক-অঙ্গুলি-পরিমিত পটখানিতে আমায় সমুদ্র দেখাইতে হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীলবর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সমুদ্র। কেন না সেখানি দেখাইতেছে একখানি চতুষ্কোণ নীল কাচ; —একেবারে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ। অনন্তের বিন্দুমাত্র আভাস তাহাতে নাই। এই সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই দুই সীমা দিয়া পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে পটের একখানি, আকাশকে একখানি স্থান অধিকার করিতে দিব ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়া দিব;—এই হইল আমাদের প্রমাণ-চৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য্য। তাহার পরে প্রমার দ্বারা আমরা নিরূপণ করিতে বসি—বালুতটের সহিত সোনার-আলোয়-রঞ্জিত আকাশের পীতবর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে রুক্ষতা ও কর্কশতার ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরঙ্গিত-রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত আকাশের মেঘমালার রূপভেদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিস্তারাদির ভেদ;—শুধু ইহাই নয়, ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত। আকাশের নির্নিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি তটভূমির সসহিষ্ণু নিশ্চলতা পর্য্যন্ত। পরিষ্কার আকাশের দীপ্তির গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে যে গভীরতাটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে, সেটুকু পর্য্যন্ত প্রমার দ্বারা পরিমিতি দিয়া আমরা নিরূপণ করিয়া লই। তট, সমুদ্র এবং আকাশ, ইহাদের মধ্যে দূরত্ব ও নৈকট্য ইহাও আমরা প্রমার সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। এই প্রমা হইতেছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়া লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য্য মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তরেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর দুয়েরই মাপ দিতেছে:—রূপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে।

* * * *

৩। ভাব

ভাবঃ—আকৃতির ভাব-ভঙ্গী, স্বভাব ও মনোভাব ইত্যাদি এবং ব্যাঙ্গ্য।

শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।

শরীর এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিকার-বিধায়ক হইতেছেন ভাব; বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি হইতেছেন ভাব। 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।' নির্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন।

চিত্ত স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে—মাটির পাত্রে এই জলটুকুর মত। সে স্বভাবত নির্বিকার বিশাল হ্রদের মত সে স্বচ্ছ; তাহার নিজের কোনো বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা নাই;—ভাবই তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে।

কোন্ সকালে বসন্তের বাতাস বহিয়াছে, আকাশের কোন্ প্রান্তে বর্ষার গুরু-গুরু মৃদঙ্গ বাজিয়াছে, কোন্ দিন শরতের অমল ধবল মেঘ দেখা দিয়াছে, শীতের শিহরণটি উত্তরের নিশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর অমনি এই চিত্ত-হ্রদের জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব উত্তমাধম-নির্বিচারে কেবল যে মানুষেরই চিত্তবিকার ঘটাইতেছে, তাহা নয়, ভাবাকাশে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা তাবৎই রোমাঞ্চিত হইতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে দেখি।

এই ভাবের কার্যটি আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পারি। যেমন আকৃতির নানা ভঙ্গীতে। বসন্তে নূতন ফুল, কচি পাতার বর্ণের উৎকর্ষে ও তাহাদের সতেজ ভঙ্গীতে, ঝড়ের দিনে গাছের ঝ'[illegible]য়া পড়া শুইয়া পড়ার ভঙ্গীতে এবং সমুদ্রের তাণ্ডব-আস্ফালনে; তোমার গালে হাত দিয়া বসায় চোখে আঁচল দিয়া কাঁদায়, তোমার আলুথালু বেশের ভঙ্গীতে, তোমা[illegible] ছুটিয়া চলায়, বসিয়া থাকায়, তোমার চোখের পাতাটি ছুইয়া পড়া[illegible] তোমার অধরের একটু কম্পনে, জ্রর সামান্য কুঞ্চনে, হাতখানি হাতে দিবার, গালে দিবার ভঙ্গীতে।

চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গী দিয়া—ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করিতে পারি। কোকিলের কণ্ঠ কি যে জানাইতেছে, শীতের কুহেলিকা কাহাকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, শরতের মেঘের রথ কাহাকে যে বহন করিয়া চলিয়াছে, আমার মধ্যে কাহার বেদনা বাহিরের বসন্তের সমস্ত আনন্দের বর্ণে বর্ণে দুঃখের কালিমা লেপন করিতেছে, কাহার আনন্দ অন্ধকারে আলো দিতেছে—তাহাকে দেখা চোখের সাধ্য নয়, মনের আয়ত্তাধীন। সুতরাং কেবল চোখে ভাবের কার্য যে ভঙ্গীটুকু পড়িতেছে, কেবল সেইটুকু মাত্রই চিত্র করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; কেন না এ রূপে ভাবের ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পূর্ণ বাদ পড়িতেছে। চিত্রের কেবল স্ফুট দিকটি অর্থাৎ অঙ্গের দিকটি দেখাইলে চলে না; চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে—ইঙ্গিতের অভাবে, ব্যঙ্গ্যের অভাবে। শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্তবরং স্মৃতম্। ব্যঙ্গ্য অভাবে শব্দ চিত্র, বাক্য-চিত্র এমন কি লিখিত চিত্রও অনুত্তম হইয়া পড়ে। ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গে। চিত্রমাত্রই উত্তম হয় ব্যঙ্গ থাকিলে।

সুতরাং ভাবটি দেখিতেছি দুইমুখো সাপ! এক মুখ তাহার চোখে দেখিতেছি ও দেখাইতে পারিতেছি ভঙ্গী দিয়া—রেখার ভঙ্গী, বর্ণের ভঙ্গী, আকৃতির নানা ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু সাপের আর এক মুখ দেখিতেছি ব্যঙ্গ্য ও গূঢ়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় ছায়ার মায়ার মতো সে দেখা দিতেছেও বটে, দেখা দিতেছে নাও বটে! কাজেই চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি, এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি, তাহাও বিচার করিতে হইবে।

* * * *

৪। লাবণ্যযোজনা

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কার্যকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত অশ্বের মতো অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমন কি অশোভনরূপে আপনাকে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো অপরিমিতরূপে হাত-পা নাড়িয়া, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া, উদ্দণ্ড ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে, 'স্থিরো ভব! পাগল হইলে যে!'

প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুন্দর সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না, কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে।

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।

উজ্জ্বলনীলমণি।

মুক্তার রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ, যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং ভাব প্রমাণ এবং সকলই নিষ্প্রভ, যদি না এই তিনে লাবণ্য আসিয়া দীপ্তি দেয়।

চিত্রের সমস্ত ভাব-ভঙ্গীতে লাবণ্য একটি শীলতা শোভনতা দিয়া চিত্রটিকে নয়নস্নিগ্ধকর ও মনোহর করিয়া তোলে। লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদে ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি লাবণ্য না থাকিলে চিত্রের রসাস্বাদে ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং লাবণ্যের পরিমাণ, পাকা গৃহিণীর মতো, চিত্রকরকে বুঝিয়া-সুঝিয়া—এক কথায়, প্রমা দ্বারা পরিমিতি দিয়া—প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত লাবণ্যে চিত্রের ভাব-ভঙ্গী তিক্ত হইয়া পড়ে, অত্যল্প লাবণ্যে তাহা আস্বাদহীন হয়।

[ইহার পর ৭৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

“জয়ন্তী-অনুষ্ঠান”

বিগত ১৫ই চৈত্র, ১৩৫৫ সাল, রবিবার দিবসে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং কতিপয় উত্তোগী শিল্পী ও সাহিত্যিক মহোদয়গণের শুভ প্রচেষ্টায়
৩২এ জয়মিত্র স্ট্রীটস্থ আধুনিক
গৌড়বঙ্গের নবীন শিল্পীদের
অন্যতম প্রতিষ্ঠান "রূপযানী"র
পক্ষ হইতে নব্য-ভারতের
শ্রদ্ধেয় যুগন্ধর শিল্পগুরু
আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব অনু-
ষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ-
নুপলক্ষে আচার্য্যদেবের বরাহ-
নগরস্থ 'গুপ্তনিবাস' ভবনে
উক্ত দিবস প্রাতঃকালে প্রাথ-
মিক অনুষ্ঠানে প্রণাম নিবেদন
মানপত্র পাঠ ও আচার্য্যদেবে
আশীর্ব্বাদ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হ
এবং বৈকালে ৬৮, যতীন্দ্র
মোহন অ্যাভেনিউ সভাপ্রাঙ্গণে
জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়
সভায় শিল্পাচার্য্যের চিত্র
লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রদর্শ
হয়।

সভায় যাঁহারা উপস্থি
ছিলেন তন্মধ্যে অর্দ্ধেন্দ্রকুমা
গঙ্গোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘো
যামিনী রায়, অতুল ব
হারীতকৃষ্ণ দেব, মুকুল
নির্ম্মলকুমার বসু, পূর্ণ চক্রবর্
গোপাল ঘোষ, শান্তি পা
প্রাণকৃষ্ণ পাল, অতীন্দ্রনা
ঠাকুর, অলক ঠাকুর, প্রশা
ঠাকুর, সন্দীপ ঠাকুর, প্র
ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঘো
সুনীল পাল, ইন্দ্র দুগা
প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, অ
পাল, বাণীপ্রসাদ মজুমদা
সুনয়নী দেবী, নীতি
দে, মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্য
কমলারঞ্জন ঠাকুর, শো
লাল ও শিবশঙ্কর বন্দে
পাধ্যায়, গোবিন্দ দে, রমে
নাথ মুখোপাধ্যায়, তা
দত্ত, নির্ম্মল দত্ত, নরেন্দ্র
রাধারাণী দেবী, শ
চক্রবর্ত্তী, সজনীকান্ত
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ম
দে, সুরূপা দেবী, পারুল
ইরা দেবী, অমুজা দেবী, লতিকা দেবী, কল্যাণী দেবী ও পদ্মা দে
নাম উল্লেখযোগ্য। জয়ন্তী উপলক্ষে শিল্পী সুনীল পাল চি
চিত্তাকর্ষক আমন্ত্রণ-লিপির প্রতিরূপ এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

[৭৩১ পৃষ্ঠার পর]

লাবণ্য-লেখাটি হইতেছেন সকল সময়ে শুচি এবং সংযতা। তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে, কিন্তু সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। লাবণ্য যেন কষ্টিপাথরের কোলে সোনার রেখাটি, কিংবা পরনের শাড়িখানির কোলে সোনালি পাড়টি।

* * * *

৫। সাদৃশ্য

ঘরের কোণে বসিয়া বুড়ি চরকা ঘুরাইতেছে আর ছড়া কাটিতেছে—

চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।

বুড়ির চরকাটি যে তাহার নাতি কিংবা হাতী অথবা পুতের অনুরূপ তাহা নয়, বুড়ির এরূপ দেখিবার কারণ হইতেছে, চরকাটির সঙ্গে বুড়ির সংসার ও বুড়ির নিজের মনোভাবের—হাতী কেনা ইত্যাদির—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটুকু। সুতরাং দেখিতেছি, রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করিতেছে, তখনই হইতেছে সাদৃশ্য। চরকাটি যদি কোনো উপায়ে নাতির রূপটি মাত্র লইয়া বুড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইত —যেমন ইতালীর চিত্রকরের দ্রাক্ষাগুচ্ছ পাখিকে দেখা দিয়াছিল —তবে বুড়ি হয়তো ঠকিত, কিন্তু যেদিন সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিত, সেদিন চরকার একখানি কাঠিও সে আর আস্ত রাখিত না।

সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া; সোনার সাপ গড়িয়া লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো এক রূপের ভাব অন্য কোনো রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্তম্। এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক করে—দুয়ের আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও। যদি একটি জায়গায় দুয়ের মিল থাকে, সেই জায়গাটি হইতেছে দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম। আকৃতির মধ্যে মিল আছে সেই জন্য বেণীর সহিত সর্পের সাদৃশ্য দেওয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু বেণীর স্থানে সাপটিকে কিংবা সাপের স্থানে বেণীটিকে যেমন রাখিয়াছি, অমনি দুয়েরই স্বধর্মে আঘাত করিয়াছি এবং সাদৃশ্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। সর্পের ধর্ম নয় যে, মস্তক হইতে লম্বমান থাকা, মস্তকে দংশন করাই তাহার ধর্ম। কিম্বা বেণীর ধর্ম নয় যে, গাছের তলায় পড়িয়া ভয় দেখানো নির্জীব সর্পের মতো। আবার দেখি চামরের ধর্ম গাত্রে লম্বিত রহা, কেশেরও ধর্ম তাহাই; ইহাদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মের মিলও আছে। কাজেই একে অন্যের স্থান অধিকার করিলেও সাদৃশ্যকে অধিক ক্ষুণ্ণ করে না। চামরও কেশের মতো। আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুইয়ের স্ব স্ব ধর্মেরও সাদৃশ্য তেমন সুলভ নহে; সেই জন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বধর্মের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেওয়াই ভালো।

* * *

৬। বর্ণিকাভঙ্গ

বর্ণিকাভঙ্গ—নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ভাব, বর্ণ-বর্তিকার টান-টোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি।

বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষড়ঙ্গ-সাধনার চরম সাধনা এবং সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন: 'বর্ণজ্ঞানং যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈঃ'। যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মিল, যদি বর্ণিকাভঙ্গটি—ঐ সরু কাঠির টানটোন—দখল না হইল, তবে ষড়ঙ্গের পাঁচটি সাধনাই বৃথা। সাদা কাগজ সাদাই থাকিয়া যাইবে। যদি তোমার বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, তোমার হাতের তুলিটি সাদা কাগজে নানা বর্ণের আঁচড় টানিবে অথবা ঘুণাক্ষরের মতো একটা কিছু লিখিবে, যদি বর্ণিকাভঙ্গে তোমার দখল না হয়। ষড়ঙ্গের আর পাঁচটিতে তোমার মোটামুটি দখল জন্মিতে পারে সাদা কাগজে একটি মাত্র আঁচড় না টানিয়া! রূপের ভেদাভেদ তুমি চোখ দিয়া মন দিয়া, বুঝিতে পার, প্রমাণকেও তুমি তুলি ব্যতিরেকেই দখল করিতে পার; ভাব লাবণ্য সাদৃশ্যকেও চোখে দেখিয়া; মনে বুঝিয়া জানিতে পার; কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের বেলায় তুলি তোমাকে ধরিতেই হইবে। এই যে সাদা কাগজখানি—যাহাকে ইচ্ছা করিলেই শত খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি—তুলির ডগায় একটুখানি কালি লইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে এত ভয় পাই কেন? চিত্রিত করিবার মানসে সাদা কাগজখানিকে যখনই নিজের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়াছি, তখনই আর সেখানি সাদা কাগজ নাই। তখন সে আমার আত্মার দর্পণ। বীজের যেমন সম্পূর্ণ গাছটি নিহিত থাকে, তেমনি ঐ সাদা কাগজখানিতে সমস্ত রূপ, সমস্ত প্রমাণ, সমস্ত ভাব লাবণ্য ও বর্ণভঙ্গী লইয়া আমার আত্মাটি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে দেখি। সেই জন্য সহসা তাহাকে তুলি দিয়া স্পর্শ করিতে ভয় হয়, হাত কাঁপিতে থাকে। পটখানির উপর এই শ্রদ্ধা, এই সমীহটুকু চিত্রকরের চিরকাল অনুভব করা চাই। কিন্তু তুলি ধরিলেই ঐ যে হাতটি কাঁপিতেছে, ঐ ভয়-টুকুও মন হইতে দূর করা চাই। হাত একটু কাঁপিবে না; তুলি আমার অনিচ্ছায় এক তিল অগ্রসর হইবে না বা পিছাইবে না, বামে দক্ষিণে একটু মাত্র হেলিবে না। বর্ণিকাভঙ্গের এই সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। কাগজের কাছে তুলিটি লইবা মাত্র চুম্বকের মতো কাগজ যেন তুলিকে টানিয়া লইতেছে, কিছুতেই রুখিতে পারিতেছি না; হাত যেন প্রবল জ্বরে কাঁপিতেছে, বাধা মানিতেছে না। এই হাতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকেও বশে আনাই প্রধান কাজ। এটি হইয়া গেলে আর বাকী কাজ সহজ।

সিতো নীলশ্চ পীতশ্চ চতুর্থো রক্ত এব চ।
এতে স্বভাবজা বর্ণা...
সংযোগজা পুনস্তেভ্য উপবর্ণা ভবন্তি হি।

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত এই চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হয়।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের

[ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রবর্তনের কৃতিত্ব এক জন ইংরেজের। নাম তার জেমস অগাস্টাস হিকি। ছাপাখানার শিক্ষানবীশ, ডাক্তারের সহকর্মী, ব্যবসাদার, প্রেসওয়ালা, সংবাদপত্রের সম্পাদক—হিকি জীবিকা অর্জনের জন্য সম্ভব-অসম্ভব হেন কাজ নেই, যা করেননি। হিকি জেল পর্যন্ত খেটেছেন—ক্ষুধার অন্ন জোগাতে হিকিকে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে কলকাতার রাজপথে। ভারতের প্রথম সংবাদপত্রসেবীকে আমরা ভুলতে বসেছি—তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা না করলে পৃথিবীর চক্ষে আমরা নিন্দিত হব।]

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রকিংহাম নামক জাহাজে চড়ে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম পদার্পণ করেন। নাম তাঁর জেমস অগাস্টাস হিকি। ইনিই ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের জন্মদাতা হিকি। হিকির পৃথিবীতে আসার জন্ম, ক্ষণ, তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে ১৭৩৯ অথবা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি যে প্রথম পৃথিবীর আলোক দর্শন করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিকির বাবার নাম উইলিয়ম হিকি। তিনি লংগ একারের এক জন তাঁতি। পনের বছর বয়সে হিকি লণ্ডনের এক ছাপাখানায় শিক্ষানবীশী সুরু করেন; এবং এইখানেই তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ে হাতেখড়ি বলা চলে। হিকি কিছু কাল আইন ও ওষুধ-পত্তর নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন। বস্তুতঃ এক জন সার্জনের সহকর্মী হিসেবে কাজ করেই তিনি সমুদ্রযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

হিকি যখন কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর মনে ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে কোনই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তখনকার দিনের বহু ইংরেজের মত তিনিও স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু টাকার মোহে তিনি হয়ে উঠলেন অবিমৃষ্যকারী। এমন অবিবেচকের মত তিনি নানা ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে লাগলেন যে, অচিরাৎ চূড়ান্ত বিপর্যয় আসন্ন হয়ে উঠল এবং তাঁর সওদাগরী জীবনের ঘটল অপমৃত্যু। বিপুল ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়লেন হিকি। পাওনাদারেরা ভিমরুলের চাকের মত ছেঁকে ধরল তাঁকে। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হিকি বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে কলিকাতার জেলে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু এই হঠাৎ বিপর্যয়ই হিকির জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল—হিকি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের প্রকৃত কর্মধারা। যে মহৎ কাজের সূত্রপাত করে তিনি বাংলার জনসাধারণের চিত্তে অমর আসন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার শুভ সূচনা এই জেলেতে বসেই। কলিকাতার অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে কারাকক্ষে হঠাৎ এক দিন একখানি মুদ্রণ পুস্তিকা তিনি হাতে পেয়ে গেলেন এবং অবসর সময়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে লাগলেন সেখানিকে। তাঁর নিজের কথায়—'মুদ্রণ-কার্য সুরু করার উপযোগী যথেষ্ট মাল-মশলা পেয়ে গেলাম।'

হতভাগ্য লোকটির তখন নিজস্ব বলে আর কিছুই ছিল না এ পৃথিবীতে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রও হিকি নন। স্বাভাবিক উদ্ভাবনী-শক্তির দ্বারা তিনি সহজেই জয় করলেন সমস্ত বাধা-বিপত্তি। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি নিজেই কতকগুলি টাইপ তৈরী করলেন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক মাল-মশলা নিজের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কারিগরের দ্বারা তৈরী করিয়ে নিলেন। এই ভাবে হিকির প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হোল কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে হিকির নামও ছড়িয়ে পড়ল বাজারে—কাজ আসতে লাগল হু-হু করে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সারা দিন-রাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেও কাজ আর শেষ হোত না। কাজের সঙ্গে টাকারও আমদানী হতে লাগল। হিকি এবার ইংল্যাণ্ড থেকে উপযুক্ত টাইপ ও যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিলেন।

ব্যবসাকে ভিন্ন খাতে সম্প্রসারণের পূর্বে হিকি দু'বছর ছাপার কাজ চালিয়েছিলেন। ঠিক কবে, কোন্ মুহূর্তে সংবাদপত্র বের করার চিন্তা. হিকির মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল, জানা যায়নি। বরং যে সমস্ত প্রমাণাদি পাওয়া যায় তা থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, সাংবাদিকতার অজানা সমুদ্রে তরী ভাসানোর কোন ইচ্ছাই ছিল না হিকির। এমন কি তিনি এ মন্তব্যও করেছেন যে—"সংবাদপত্র বের করার আমার বিশেষ কোন ঝোঁক বা আকর্ষণই ছিল না।"

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র—হিকির বেঙ্গল গেজেট (Bengal Gazette) বা ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভারটাইজার (Calcutta General Advertiser)—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হিকির সম্পাদনায় কলিকাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রটির জীবনকাল অতি সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুখবন্ধে বলা হয়েছিল—"দল-নিরপেক্ষ কিন্তু সর্বদলীয় একটি রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-বিষয়ক সাপ্তাহিক।" প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভের এক স্থানে হিকি মন্তব্য করেছিলেন—"বিবাদ-বিসংবাদের পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে দৃঢ় হস্তে হাল ধরে সুচিন্তিত ধীরগতিতে সত্য-লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

বেঙ্গল গেজেট ছিল চার পৃষ্ঠার কাগজ—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বার ও আট ইঞ্চি; এবং প্রতি পৃষ্ঠায় তিন কলম লেখা থাকত। ভারতীয় মুদ্রণ-জগতের তখন মধ্যযুগীয় অবস্থা, কিন্তু সে তুলনায় হিকির কাগজের ছাপা যে বেশ ভালই ছিল, সে সম্পর্কে কারুরই মতদ্বৈধতা নেই। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ও কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে হিকির কাগজের একটি অসম্পূর্ণ সংগ্রহ রক্ষিত আছে।

প্রথম দিকে হিকির কাগজে সম্পাদকীয় ছাড়া তৎকালীন ইউরোপ ও ভারতের যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ, যুদ্ধসংক্রান্ত চিঠিপত্র এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। সকল দেশের সংবাদপত্রের মতই বিজ্ঞাপনে বাড়ীভাড়া, সম্পত্তি বিক্রয়, নীলামে কেনা-বেচা, হারাণ প্রাপ্তি প্রভৃতির সমাচার প্রধান স্থান জুড়ে থাকত। এ ছাড়া সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় হাল ফ্যাশান ও সামাজিক সংবাদ পরিবেশনেরও ব্যবস্থা ছিল। আর একটি অংশে উদীয়মান কবিরা হৃদয়ের ভাব উদ্দাম ভাবে প্রকাশিত করতেন। তার পর ক্রমশঃ কলিকাতা সংবাদ নাম দিয়া স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনেরও ব্যবস্থা হল এবং তাতে অগ্নিকাণ্ড, নদী-দুর্ঘটনা ও ঝড়ের ক্ষতির সংবাদ প্রভৃতি থাকত। এখানে নমুনা হিসাবে কয়েকটি প্রকাশিত খবর উদ্ধৃত করা হল।

জন্মদাতা জেমস অগাষ্টাস হিকি

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

বাগান ভাড়া বা বিক্রীর বিজ্ঞাপন

আর্মেনিয়ান গীর্জার বিপরীত দিকে মিষ্টার বনফিল্ডের নীলাম-ঘরে বেলিয়াঘাটা-মুখী প্রশস্ত রাজপথের উপর মিষ্টার চার্লস ওয়েষ্টের বাগানের বিপরীত দিকে একটি বিরাট সজ্জিত উদ্যান ব্যক্তিগত চুক্তির দ্বারা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করা যাইবে।

একটি অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ

গত একুশে শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শোভাবাজারের দেশীয় বারবনিতাদের আড্ডা বব বাজারে একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রসিদ্ধা নাচওয়ালী শান্তিরাণীর মাতা সাংঘাতিক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে—তাহার জীবনের আশা কম। আমাদের ইংরাজ নাবিকদের এক দল এই অগ্নিকাণ্ডের সময় কালা রূপসীদের নিকট আমোদ করিতেছিল। ইহা স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট সৌভাগ্য, কারণ নাবিক দল কেবল যে স্ত্রীলোকদের স্থানান্তরিত করিয়াছিল তাহা নহে, সেই অগ্নির মধ্য হইতে স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয়, টাকাকড়ি এবং প্রসাধন সামগ্রী সহ বড় বড় বাক্সগুলিও বাহির করিয়া উদারতার সহিত তাহাদের প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কালা রূপসীরা যথা-শীঘ্র নূতন বাসা তৈয়ারী হইলেই নাবিকদের পারিতোষিক হিসাবে এক দিন উত্তম ভোজন, নৃত্য-গীত, আমোদ-আহ্লাদ এবং বিনা দক্ষিণায় রাত্রিবাস করিতে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

তৃতীয় সংবাদটি একটি নদী-দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত

গত সোমবার কাশীনাথ ঘাটে যখন এক জন হিন্দু স্নান করিতেছিল, তখন একটি হাঙর তাহার একটি পদের জানুর নিম্ন অংশটুকু কাটিয়া লয়, যাহার দারুণ যন্ত্রণায় লোকটি অপরাহ্ণে মারা যায়।

হিকির সম্পাদিত কাগজে প্রকাশিত কবিতারও একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হইল—

"সুসানা নাম তোমার মেয়ে।
তুমি সুন্দরী সু,
তুমি কত মিষ্টি!
চিনির চেয়েও মিষ্টি।
মধুর চেয়ে চিনি যত ভাল
তুমি আমার তার চেয়ে ভাল,
চিনির চেয়ে।"

বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হবার পর প্রথম কয়েক মাস কাগজ বেশ ভালই চলেছিল। কিন্তু কিছু দিন পরে কাগজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায়। ব্যক্তি-বিশেষের গোপনীয় খবর সম্বলিত দু'-একটি প্যারাগ্রাফ কাগজে দেখা দিতে লাগল। খবরগুলি অবশ্য বেনামীতেই প্রকাশিত হত, কিন্তু তা থেকে আসল মানুষটিকে চেনা আদৌ কঠিন হত না। ক্রমশঃ এই ধরণের সংবাদই কাগজে বেশী গুরুত্ব পেতে লাগল এবং হিকি শালীনতার পথ ছেড়ে দিয়ে এমন সব লেখা ছাপাতে লাগলেন, যা অতি কদর্য রুচির পরিচায়ক। পত্রিকা সম্বন্ধে নানা অভিযোগও আসতে লাগল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে J. Z. Kiernander নামক এক জন সুইডিস মিশনারী সর্বপ্রথম হিকির বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনলেন। বিচারে হিকির চার মাস জেল ও পাঁচশ' টাকা অর্থদণ্ড হল।

কিন্তু এই শাস্তিভোগে হিকি একটুও দমিত হলেন না, বরং তিনি আরো মারমুখো হয়ে উঠলেন। ঠিক এই সময়ে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) আর একখানি কাগজ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হল। কাগজটির নাম 'ইণ্ডিয়া গেজেট'। সঙ্গে সঙ্গে হিকিও জ্ঞানশূন্য হয়ে কাগজটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাগজটির বিরুদ্ধে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ তুলে তিনি রীতিমত একটা সোরগোল সৃষ্টি করলেন। হিকির তখন এমনি দিক্‌বিদিকশূন্য অবস্থা যে, তিনি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রীর নামও এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িত করে কুৎসা প্রচার করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা রটনাকে হেষ্টিংস উপেক্ষা করলেন না। যথা সময়ে বজ্রাঘাত হোল। ডাকঘরের মারফৎ হিকির কাগজ প্রচার নিষিদ্ধ করে সরকারী নির্দেশ জারী হল। হিকির পক্ষে এ মর্মান্তিক শেল। কারণ হিকির কাগজের বেশীর ভাগ গ্রাহকই পশ্চিমের বাসিন্দা। অর্থের দিক থেকে হিকির ক্ষতি হোল মাসিক চারশ' টাকা। এ ক্ষতি সহ্য করা হিকির ক্ষমতার অতীত।

হিকি আহত শার্দুলের মত তাঁর কাগজে গর্জন সুরু করে দিলেন।…"তাঁর কাগজ বিক্রী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তথাপি তিনি অত্যাচারীর নিকট কখনো মাথা নোয়াবেন না—হীনতা স্বীকার করবেন না। বরং দরকার হলে তিনি কবিতা রচনা করে হোমারের মত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বেড়াবেন।"

এই অপূরণীয় ক্ষতি হিকির মানসিক ক্ষমতা নষ্ট করে দিল। যারা তাঁর শত্রু, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই তিনি নির্মম ভাবে গালিগালাজ-পূর্ণ লেখা বর্ষণ করতে লাগলেন। সরকারী, বে-সরকারী, এমন কি মহিলাগণও তাঁর কুৎসার হাত থেকে রেহাই পেলেন না। তখনকার দিনের ভারতের দু'জন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ—গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও কলিকাতার প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিয়া ইম্পের বিরুদ্ধেও দিনের পর দিন অপমানসূচক লেখা প্রকাশিত হতে লাগল 'বেঙ্গল গেজেটে'।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হিকি স্বগৃহে গ্রেপ্তার হলেন এবং হেষ্টিংসের অভিযোগক্রমে দু'টি স্বতন্ত্র মানহানির মামলায় অভিযুক্ত করা হল তাঁকে। দু'টি মামলাতেই হিকি দোষী সাব্যস্ত হলেন। হিকির জেল হল এক বছর।

কিন্তু 'বেঙ্গল গেজেটে'র সম্পাদককে জেলে প্রেরণ করেও কাগজ প্রকাশ বন্ধ করা গেল না। মুদ্রাকর-সম্পাদকের অবর্তমানেও নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি কাগজ বের হতে লাগল বাজারে। কিন্তু কি ভাবে যে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, তা চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকবে। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যথাপূর্বং শাণিত তীর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

আবার এক নতুন বিপদ দেখা দিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যদিও হিকির কারাদণ্ডের মেয়াদ তখনও উত্তীর্ণ

হয়নি, আর এক দফা নতুন অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন তিনি। বিচারে কারাবাসের সময় বেড়ে গেল আরো এক বছর। সেই বছরেই আরো দু'টি মানহানির মোকর্দ্দমা দায়ের হয়েছিল এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সর্বনাশা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ হয়েছিল। এই সময় সরকার থেকে হিকির ছাপাখানাটিও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। এইবার সত্য সত্যই 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রকাশ চিরকালের জন্ম বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু এই ব্যাপারে হতভাগ্য হিকি একেবারে মুষড়ে পড়লেন। একমাত্র আয়ের পথ চিররুদ্ধ, দীর্ঘমেয়াদী কারা-জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা—হিকি হারিয়ে ফেললেন তাঁর অমিত তেজ, অদম্য উৎসাহ। সমসাময়িক দলিল-পত্র পাঠে জানা যায়, এর পর হিকি বিচারকদের নিকট বার বার দণ্ড মকুব করার জন্ম কাতর আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করলেন। তবে ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি হিকির অর্থদণ্ড মকুব করে গিয়েছিলেন।

এই নির্ভীক সম্পাদকের শেষ জীবন এত দুঃখ আর গ্লানিতে কেটেছে যে, নিষ্ঠুরতম হৃদয়হীনের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হতে বাধ্য। ঠিক কবে হিকি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তারও কোন সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। জেল থেকে বেরিয়ে হিকি দেশে ফিরে যাওয়ার জন্ম ব্যর্থ-চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্বদেশবাসিগণ তাঁকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছিল। সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের নিকটও তাঁর পক্ষে দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল। স্বজন-স্বজাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে হিকিকে শেষ পর্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে। তবুও ভারতীয়দের মহলে ডাক্তারী করে কথঞ্চিৎ অর্থাগম হত বটে, কিন্তু তাতে নিজের ও বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণ হত না।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কোন এক দিনে এই কলিকাতা মহানগরীতে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। "I hoped to pay off all my debts......to purchase a little house in the middle of a garden; rise with lark, sow my own peas and beans......and live in peace with all mankind." একটি বাগান-ঘেরা বাড়ীতে সবার সাথে সুখে-শান্তিতে বাস করবেন, এই ছিল হিকির চিরদিনের সাধ। কিন্তু হায়! ইহ-জীবনে সে ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল। আদর্শবাদী হিকি তার অবিবেচক কার্যের দ্বারা কেবল নিজেকেই বিপদগ্রস্ত করেননি—বিপদগ্রস্ত করে গেছেন সমস্ত পরিবারবর্গকে।

●

"যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায়, তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য কাঁদে তাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য ভাবে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জিনিষ ব্যবহার করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশের পুরাণ কথা লইয়া আলোচনা করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধাবান তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। আর যাহারা ছেলেবেলা হইতে দল বাঁধিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ করে, মনের সহিত তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি।"

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি পুরাতন এবং দুষ্প্রাপ্য; হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "The Hindoo Patriot" পত্রিকায় ইংরাজী ১৯১৩ সালের জুন মাসের একটি সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রটি প্রথম মুদ্রিত হয়।

জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা চিত্রটি প্রচ্ছদে পুনর্মুদ্রিত করলাম। শিল্পাচার্য্যের বয়স তখন ৪২ বৎসর। এখন তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর চলছে।

বসুমতীর সম্পাদকের
সহিত
স্বামী বিবেকানন্দের
কথোপকথন

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত 'বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়ের কথোপকথন' নামক এই রচনাটি যে একদা 'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ যাবৎ তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি প্রাণতোষ ঘটক মহাশয় এই রচনাটি উদ্ধার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং বসুমতীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের এক অত্যুজ্জ্বল কাহিনীর সন্ধান দিয়াছেন। আমরা রচনাটি যথাযথ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

বঙ্গের কায়স্থ বংশ অনেক উজ্জ্বল রত্ন প্রসব করিয়াছে। রাজা প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম পাঠান ও মোগল শাসনের শেষ সময়ে স্বনামখ্যাত বীরপুরুষ—স্বচেষ্টায় উন্নত ও স্বাধীন রাজ্যের স্থাপয়িতা। তাঁহারা তত্তৎ সময়ের বঙ্গের শিবজী। পুণ্যভূমি যশোহরে বর্ত্তমান সময়েও এক বীরপুরুষের নাম শুনা যায়। ইনি সুদূর ব্রাজিলে নেথরয়ের যুদ্ধে বিখ্যাত বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি থার্ম্মপলীর যশোগৌরব ম্লান করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ধর্ম্মাধিকরণের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ৺দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্তেশ্বর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা কে না জানে? বিজ্ঞান-বিভাগে বাবু জগদীশচন্দ্র বসু আজ সমস্ত জগতে খ্যাত। ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে অতীব যশস্বী বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত আমাদের জন্য বিদ্যুৎগতিতে যে প্রকার সমুদয় ঋক্ বেদের অনুবাদ এবং সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রের মূলানুবাদ সহ সার সংগ্রহ—ওল্ড ও নিউ টেষ্টেমেন্টের ন্যায়—সমুদয় শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ইতিহাস লিখিয়া ব্যাসের মহাভারতের ন্যায় আপন মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তুল্য নাম আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আমরা যে কায়স্থ-সন্তানের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারও ধীশক্তি কম নহে। ইনি প্রচ্ছন্ন-নামে খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। ইঁহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—এমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহার সহিত বসুমতী-সম্পাদকের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ঐ কথোপকথনের কতকাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্র। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম এখনও আছে কেন?

উ। দুই কারণে। খৃষ্টধর্ম্মে যেরূপ প্রকৃতির উপযোগী, সেরূপ সরলবিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন বলিয়া এখানে আজকালকার অশাস্ত্রীয় ছুঁই-ছুঁই ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবোধে সরল বিশ্বাসে এক শ্রেণীর লোক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, অপর শ্রেণী ইহা না মানিলেও পৈত্রিক আচার বলিয়া রক্ষা করে মাত্র।

প্র। আগে কি এরূপ ছুঁই-ছুঁই ভাব ছিল না?

উ। না। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক পুরাণ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রে কুত্রাপি এমন পাইবেন না যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্পৃষ্ট অন্নাহার সম্বন্ধীয় কোনও বাধা ছিল। শুধু তাহা নহে, পূর্ব্বে দ্বিজবর্ণের পাচক শূদ্রই ছিল। এখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা কি মনে করেন—বাঙ্গালার এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারির জোরে? বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে। মুসলমানের সদংশ বাঙ্গালী আদৌ দেখিতে পায় না। মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয় স্থানস্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ যে পথে যান, চণ্ডাল সে পথে যাইতে পায় না; কিন্তু সেই চণ্ডাল খৃষ্টান হইলে অবাধে সেই পথে যাইতে পারে।

প্র। যে হিন্দুধর্ম্মে অদ্বৈতবাদ রহিয়াছে, সে হিন্দুধর্ম্মে এত ছুঁই-ছুঁই ভাব দেখি কেন?

উ। খৃষ্টধর্ম্মের স্রোতে আমাদের জাতীয়তা নাশ করিতেছিল; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই মহান্ উদ্দেশ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জন কয়েক লোক পাশ্চাত্য মত প্রচার দ্বারা আমাদিগকে জাতীয়তাশূন্য করিতে প্রয়াসী হইতেছিল, এখনও দুই-এক জন করিতেছে। ইহারই বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে। এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বর্ষ ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন-স্রোত চলিতেছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচার-প্রসূত জাতি-বিদ্বেষও প্রচারিত হইতেছে। তাই আপনি এ সময়ে এই ছুঁই-ছুঁই ভাবের এত প্রাখর্য্য দেখিতেছেন। এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই। আমাদের পরেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহারা ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থায় অনুসরণ করিবে। তখন আর ছুঁই-ছুঁই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু-হৃদয় লাভ করিবে। এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এত দিন জাতীয়তা হারাইতাম।

প্র। সকল বর্ণের কি সন্ন্যাসে অধিকার আছে?

উ। আছে।

ইউরোপে এখনও খৃষ্টধর্ম্ম আছে কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি যে প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নামের উপযুক্ত; আর বোধ হয় যদি বুথ সাহেব হিন্দু হইতেন, তবে তিনিও ঐরূপ উত্তর দিতেন। উহাতে এ দেশের সমস্ত হিন্দু জাতির অবস্থা-জ্ঞান ও তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ জ্ঞান যে বক্তার হৃদয়-কন্দরে লুকায়িত, তাহা অনুভূত হইতেছে। সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের নিকট ভিন্ন এরূপ সহৃদয় অবস্থা-জ্ঞান আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে?

এই "ছুঁই-ছুঁই ভাব" যে হিন্দুধর্ম্ম নহে, ইহা যে অশাস্ত্রীয়, এ কথা ব্যক্ত করিয়া, অযাচিত ভাবে ব্যক্ত করিয়া স্বামীজী সকল হিন্দুর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের মহিমা এই স্পর্শদোষ-প্রথারূপিণী রাক্ষসী হরণ করিয়াছে। ইহাকে বধ করাই প্রধানতম হিন্দু-প্রচারকের চিন্তার বিষয় হইবে না ত কি হইবে?

দ্বাদশ খণ্ড নব্যভারতের দ্বাদশ সংখ্যায় 'স্পর্শদোষ-প্রথার

রাক্ষসী মূর্ত্তি নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রথাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। বৈদ্যুতিক-স্পর্শ দোষ। ২। ছায়া-স্পর্শ দোষ। ৩। গাত্র স্পর্শ দোষ। ৪। জল-স্পর্শ দোষ। ৫। খাদ্য-স্পর্শ দোষ। ৬। দেব-স্পর্শ দোষ। ৭। পরমাত্মা-স্পর্শ দোষ।

স্বামীজী স্বয়ং বৈদ্যুতিক স্পর্শ-দোষের এক উদাহরণ দিয়াছেন। মান্দ্রাজে যে পথে ব্রাহ্মণ যায়, চণ্ডালকে সে পথে যাইতে দেওয়া হয় না। কি জানি চণ্ডালের দৃষ্টিতে কোন বৈদ্যুতিক শক্তিযোগে যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ধ্বংস হয়। ছায়া, গাত্র, জল ও খাদ্য নামীয় স্পর্শ-দোষে যে অনেক হিন্দু জাতি দূষিত, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেবস্পর্শ দোষে অনেক ব্রাহ্মণও দূষিত আছেন। ব্রাহ্মণ হইয়া না জন্মিলে জন্মান্তরেও যে মুক্তি নাই, ইহাকেই আমরা পরমাত্মা স্পর্শ দোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই কদর্য্য সঙ্কীর্ণ স্পর্শদোষ প্রথাই বর্ণবিদ্বেষ-প্রচারক পত্রসমূহে অধিকার ভেদ বলিয়া প্রচ্ছন্ন নামে প্রচারিত হইয়া থাকে। কেন না, এই পিশাচীকে যাহারা আপন স্বার্থের সহায় করিয়া লইয়াছে, তাহারাও ইহার নামোল্লেখে সাহসী নহে। এই পিশাচী আজ হিন্দুদেহকে পর্ণগ্রাসে কবলিত করিয়াছে। স্বামীজী বলিতেছেন, ইহা অশাস্ত্রীয়। ইহা বেদে নাই এবং ইহা আধুনিক পুরাণেও নাই। এই যদি ঠিক কথা, তবে স্বামীজী এই প্রথা নিরসনের জন্য বঙ্গে কোন আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারেন কি না, ইহা আমাদের এক বিনীত প্রার্থনা।

স্বামীজী যে অংশ উল্লেখ করিয়াছেন, কর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম। যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণ গেলেও তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন ক্ষত্রজাতি এই ভাবে অহরহঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। বিশেষতঃ সমাজ সংস্কার জন্য প্রাচীন কাল হইতে শক্তি ও প্রতিভাশালী, সমাজের মানদণ্ডস্বরূপ এই ক্ষত্র বা কায়স্থানুরূপ মধ্যবর্ত্তী জাতিই প্রসিদ্ধ। পুরাণে যে সকল অবতারের কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক পরশুরাম ভিন্ন সকলই বিবেকানন্দের বর্ণেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরশুরামকে রামের সমকালে কল্পিত করিয়া পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে ইহাই দেখাইতেছেন যে, যে বর্ণে আর্য্যানার্য্যের রক্ত সমতুল্য, এমন মিশ্রবর্ণোৎপন্ন নবদূর্ব্বাদল শ্যামল (না কৃষ্ণ না গৌরবর্ণ) রামচন্দ্রই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার উপযুক্ত ধুরন্ধর। কেন না, এতাদৃশ ব্যক্তিরই আর্য্যানার্য্যের সংযোগ হইবার উপযুক্ত সকল বর্ণের পূর্ণ-বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র। হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য গর্ব্বী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অল্প।

ফলে নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিয়া, উচ্চ শ্রেণীকে সংযত করিয়া, নিজে নম্র হইয়া, সমাজকে সাম্যাবস্থায় আনয়নপূর্ব্বক নব-বলে বলীয়ান করার ভার বিধাতা কায়স্থাদি মধ্যবর্ত্তী জাতির উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। গন্তব্য পথে গমন করিতে আমাদের যে সাহস হইবে, আর কাহার তাহা হইবে না। স্থির নিশ্চিত পথে গমন করা—বীরের ন্যায় সমাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদেরই জাতীয় ধর্ম্ম। স্বামীজী স্বয়ংই ইহার এক উদাহরণ স্থল। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে স্পর্শদোষ-প্রথা পদদলিত করিবার জিনিস হইলে আমরা তাহা কেন করিব না? শত শত অনাচারণীয় হিন্দুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় স্বর্গরাণী সীতারূপিণী ইন্দ্রাণীর কেন পুনরুদ্ধার করিব না? কেন হলবাহিনী সীতাদেবী অনশনে, অযত্নে ও অপমানে চিরদিন রোদন করিবেন?

স্বামীজী বঙ্গীয় মুসলমান বা কোরাণিক হিন্দুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আরও তত্ত্বশালিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী। তিনি বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকে বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে।" দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের নিত্য-পূজ্য বঙ্কিমচন্দ্র এতাদৃশ নাটককারগণের প্রথমাসনে উপবিষ্ট।

"মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয় স্থান" বলিয়া তিনি যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উৎপত্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অতীব সত্য।

এই প্রকারে স্পর্শদোষ ও বর্ণভেদের অত্যাচার দ্বারা আমরা কোটি কোটি লোককে জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক ও পাপে মগ্ন হইয়াছি, ইহার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না? এই দেখুন, বিলাত-ফেরত বাবু অমৃতলাল রায় বৈদ্য সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া, বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কায়স্থ সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্রূপ সমাজে মিলিত হইয়াছেন। সেই প্রকারে কি কাদির উদ্দিন, ছমীরুদ্দিন সাহেব হিন্দু-সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে পারেন না? খাদ্য-বিচার লইয়া কথা কহিলেও এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাঁহারা মাংসাহার করেন না, মহম্মদ ও কোরাণকে মানেন না, মাংসাহারী ও ইশলামী মুসলমানের পক্ব অন্নাহার করেন না এবং তদ্বিধ মুসলমানের সহিত আদান-প্রদানের পরে আর কোন সংস্রব রাখেন না। ইহারা কি, খাদ্য বিচারের চক্ষে দেখিলেও বাবু অমৃতলাল ও নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা হিন্দুত্ব লাভ করিতে কম যত্নবান? এইরূপ মুসলমানের সংখ্যা এখন দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। তাহা হইলেও যে উহাদের সংখ্যা লক্ষাধিক এক্ষণেও আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা অনেকেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত বা তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। স্বামীজী কি এই সকল কোরাণিক হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে পুনরানীত করিবার জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করিবেন? কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে কোরাণিক ও বৈদিক হিন্দুর সম্মিলন দৃঢ়ীভূত হয়, ইহা কি তাঁহার মত এক জন প্রথম শ্রেণীর প্রচারকের চিন্তারও বিষয় নহে?

ফিরিয়াছেন তিনি বঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে এক্ষণ তাঁহার উচ্চ শ্রেণীর শক্তি সঞ্চালিত হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রকৃত কৃতিত্বের সূত্রপাত জনসমাজের নিম্নস্তর হইতে। তাঁহার হৃদয় যেরূপ প্রশস্ত, চিন্তা যেরূপ সর্ব্বত্র প্রসারিণী, যদি কার্য্যকারিণী শক্তি সেইরূপ বিকশিত হয় বা অন্যত্র হইতে আসিয়া জোটে, তবেই বঙ্গে প্রকৃত সমাজ-সংস্কারের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। সমগ্র হিন্দু জাতিকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, তাহাদিগকে নূতন বন্ধনে একজাতীয়তায় বাঁধিতে হইলে, সহজ, সরল ও সর্ব্বজনাভীপ্সিত এই স্পর্শদোষ-প্রথা নিবারণই আশু সংস্কারের স্থানীয় করিয়া লওয়া উচিত। আমরা কি স্বামীজীর এ দিকে কোন মনোযোগের চিহ্ন দেখিব না?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

১৩০৩, চৈত্র,—নব্যভারত।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গোড়ার কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীতারানাথ রায়

ভারতের সংস্কৃতি ধ্বংসকারী অত্যাচারী ম্লেচ্ছ শাসনের অবসান করতে চেয়েছিল আর এক বিদেশী—এতে দেশবাসী হিন্দু [illegible]দের যেমন আপত্তি ছিল না—বাস্তে কাজেই হিন্দু নেতাদের [illegible] মুসলমান জনসাধারণেরও আপত্তি ছিল না। বাংলার সমাজপতিরা তখন আগ-বাড়িয়ে চিন্তা করতে পারেননি। বেণে জাতের হাতে হাতিয়ার দেখেও সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধার জন্য [illegible]দের মতলব ভাল করে বুঝতে পারেননি। এক মুঠো ইংরেজকে [illegible] পাঞ্জা লড়াইয়ে কাবু করে ফেলা যাবে, এ তাঁরা স্বতঃসিদ্ধান্ত [illegible] ফেলেছিলেন, কিন্তু অন্ন-লুণ্ঠন ও ধর্ম-লুণ্ঠনের অভিনব অভিযানে নতুন বিপদের সৃষ্টি হবে—এতে যে জাতের দেহ ও মন একেবারে [illegible] হয়ে যাবে, এ কথা যখন তাঁরা আঁচ করেছিলেন, তখন বড্ড দেরী [illegible] গেছে।

ফিরিঙ্গী বণিককে বাংলা লুঠতে তাঁরা দেখেছেন—লুঠতে সাহায্যও [illegible]ছেন। ভেবেছেন যদি ৬শ' বছরের মধ্যযুগের বর্বরপন্থী দলদহীন [illegible] ও পরধর্মী শাসনের অবসান হয়। কিন্তু ফিরিঙ্গী রাজনীতিক [illegible] তাঁরা বেচাল হয়ে গেছেন।

ইংরেজ বণিক বাংলা থেকে সেদিন যে ফি-বছর ১ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা মুনাফা রাজস্ব সংগ্রহ করত, তার সংগ্রহ-কেন্দ্র ছিল [illegible]কাতা। আর এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ-এশিয়ার [illegible] ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়েছিল। ইংরেজ [illegible]নীতিকরা [illegible]—It is the focus of our whole political system in Asia" কলকাতা থেকে বর্মায়, [illegible], ক্যান্টনে, পেকিনে অভিযান চালিয়েছিল ইংরেজ। এখান থেকেই অস্ট্রেলিয়ার মাওরিদের সভ্য করবার উদ্যোগ আয়োজন [illegible]ছিল। এখান থেকেই সোলেমান গিরিশ্রেণী ও পশ্চিম হিমালয়ের [illegible] পাঠানদের বুকে তলোয়ার বসান হয়েছিল। এখান থেকেই মরিশাস ও দক্ষিণ-আফ্রিকার উপনিবেশের নয়া ব্যবস্থা [illegible]ছিল। কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস থেকেই [illegible] ও [illegible] ইংরেজের দূত [illegible] মুনাফা [illegible] দিয়েছিল—পাঞ্জাব, আফগানিস্থানের রাজা কলকাতার সই [illegible] বাধ্য হয়েছিল। কলকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কামধেনু।

"In 1758 a long procession of a hundred boats, laden with seven hundred chests, and then a second despatch brought to Calcutta the largest prize that the British people had ever taken, or £ 11,10000 in silver rupees…

"Its swarming sixty millions would enable Calcutta to send to the mother country a clear annual surplus of from 4 to 6 millions sterling. For it is with the twelve millions of revenue yielded every year by Bengal that Calcutta has spread the British Empire all over Southern Asia"

—(George Smith)

হিন্দু সমাজপতিরা এ সব ক্রমে বুঝতে পারছিলেন। পুরানো ইমারত যে মহা বিপ্লবের ভূমিকম্পে খান্‌-খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করছিলেন। আদিম মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সে সময় ইউরোপে মাতন লাগিয়েছিল, তার প্রভাব-প্রবাহ কলিকাতায় এসেও পড়েছিল।

"The work of destruction had begun and Hindoo hands had been first to try to pull down their Dagon of falsehood, while Government officials had been active, more or less, in propping it up. The Bengalees, beginning to leave even the glimmering and reflected light of natural religion as embodied in the varied concrete of their own system, were groping in the still darker region where all was doubt, where the old was gone and nothing had taken its place. Who was to arrest demoralization? Who could check the fermenting process as to work the mass into the leaven which is slowly leavening in the whole lump? Who should begin the work of construction side by side with that of a disintegration. Such as even the nihilists of the Hindoo College had not dared to dream of?"

সে যুগের নয়া বাংলার প্রেরণা এসেছিল ফরাসী বিপ্লব থেকে। তাদের প্রিয়তম গ্রন্থ টম পেইনের "Age of Reason"। এক মার্কিন গ্রন্থ-প্রকাশক হাজার কপির এক সস্তা সংস্করণ ছেপে সমস্তই কলকাতায় এনে ছড়িয়ে দিয়েছিল ("Tom Pain's Age of Reason and his minor pieces born of the filth of the work period of the French Revolution, an American publisher issued in a cheap edition of a thousand copies and shipped the whole to the Calcutta market")। এ নতুন জাত সেক্সপিয়ার, শেলী পড়ত না। পড়ত—হিউম, গিবন, বার্ণ। হিন্দু কলেজের তরুণদের কণ্ঠে সে দিন ধ্বনিত হত—

"For a 'that,' and a 'that
It's comin' yet, for a 'that,
That man to man the world o'er
Shall brothers be, for a 'that"

"Man to man the world over shall brothers be"

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্মিলনের প্রথম বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের প্রেরণা। ২৩ বছরের তরুণ ডিরোজিয়ো সেদিন প্রকৃত স্বাধীনতার যে মন্ত্র নয়া বাঙ্গালীর কানে উচ্চারণ করেছিলেন তা থেকেই নব ভারতের সৃষ্টি। মাণিকতলার যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে এক দিন তাঁর 'একাডেমি'তে যে সব ছাত্র দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রায় বাহাদুর রামগোপাল ঘোষ, ডেভিড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো (এনকোয়ারার) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, লালবিহারী দে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক (জ্ঞানান্বেষণ) প্রভৃতি। একাডেমির ফিরিঙ্গী গুরু সে দিন বলেছিলেন—ভারতবর্ষ তাঁর স্বদেশ, ভারতবাসী তাঁর স্বজাতি। কোন দেশের শাস্ত্রই অভ্রান্ত নয়। শাস্ত্রের অনুশাসন যেখানে ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী, সেখানে বিদ্রোহী হও।

এদের দেখে দেশের বুড়োরাও যেমন ভয় পেয়েছিল, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল মিশনারীরাও তেমনি ভয় পেয়েছিল। বেপরোয়া ও অভিনব এই নয়া-বাংলাকে সুবুদ্ধি দেবার জন্ত এক দিকে গোঁড়া হিন্দুরা যেমন লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করছিল, তেমনি রাজা রামমোহনও পাদ্রিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ওদের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করছিলেন। ("Rammohan Roy at once offered the small hall of the Bramho Sobha, in the Chitpore Road, for which he had been paying to the five Brahman owners five pounds a month rental···Driving at once to the spot, the generous Hindoo reformer secured the hall for the Christian Missionary from Scotland···Standing up with Rammohan Roy, while the lads showed the same respect as their own Raja, the Christian Missionary prayed the Lord's Prayer slowly in Bengalee etc.) 13 July, 1830--Life of Dr. Duff.

খৃষ্টান ধর্ম প্রচার আর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ সেদিন অভিন্ন ছিল। মেকলে ইংরেজকে উপদেশ দিলেন—চালাও ইংরেজী শিক্ষা, এতে তৈরী হবে—"Indian in blood and colour, but English in taste and opinion, in moral and in intellect", ডাঃ এলেকজেণ্ডার ডাফ চাইলেন—"ultimate subversion of the whole Brahmanical system and the substetution of an indigenous Christian Church."

কিন্তু মাণিকতলার বাগানে সেদিন নয়া নাস্তিক তৈরীর কারখানা বসেছিল। ওরা ভয় পেয়েছিল। সভয়ে বলেছিল— "Having free unrestricted access to the whole range of our English literature and science, they will despise and reject their own absurd system of learning. Once driven out of their own systems, they will inevitably become infidels in religion. And shaken out of the mechanical routine of their own religious observances, without moral principle to balance their thoughts or guide their movements, they will as certainly become discontented, restless agitators,—ambitious of power and official distinction and possessed of the most disloyal sentiments toward that Government which, in their eye, has usurped all the authority that rightfully belong to themselves. This is not a theory, it is a statement of fact. I myself can testify in this place, as I have already done on the spot, that expressions and opinions of a most rebellious nature have been known to drop from some of the very proteges of that Government, which, for its own, sake, is so infatuated as to insist on giving knowledge apart from religion. But as soon as some of these bec[ome] converts to Christianity, through the age[ncy] already described, how totally different t[he] tone of feelings towards the existing Gove[rn]ment !···In like manner and for the same reas[on] there are not more loyal or partiotic subjects [of] the British crown than the youngmen that co[m]pose the more advanced classes in our Instituti[on]."

—Dr. Duff—18[illegible]

এই মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতেই রাজনৈতিক প্রগতি[illegible] বিপ্লবী দলের পত্তন এর দশ বছর আগে—আর এর ৮ বছর প[illegible] এই বাগান-বাড়ীতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচা[illegible] পরামর্শ দেবার জন্ত নয়া-বাংলা আমন্ত্রণ করেছিল বিখ্যাত বৃ[illegible] নেতা জর্জ্জ টমসনকে। এই বাগান-বাড়ীতেই মহাবিপ্লবের দী[illegible] এখানে বাংলার জোয়ানরা প্রথম শুনেছিল—"While th[ey] profess to be friends of you and your count[ry] affect to despise your thirst for knowledge, yo[ur] aspiration after better things, your yearnings [to] be useful to the wretched and ignorant around yo[u]. Care not for the opposition of such. Fear n[ot] their power of redicule. Take no trouble t[o] answer their abuse······You have other wor[k] to do."

—Thompson—18[illegible]

এখানেই প্রথম বিদ্রোহের ধ্বনি—"And can a ju[st] Government reconcile it to its conscience to t[ake] so large a portion of the fruits of their indus[try] from the people of this country and at the sa[me] time say in face of such monstrous and manif[est] abuse, "we can effect no improvements that w[ill] involve great expense ?"······We are now told th[at] the promotion of the Europeans to superior offi[ces] is a matter of importance, paramount to [all] consideration of the good of the people····"

"My heart bleeds for the millions of my fell[ow] subjects, who prevented by the power of th[e] sword from asserting their rights, are from ye[ar] to year compelled to live under a system whic[h] converts into plnnderers the very men wh[o] should be their protectors and makes them regard with horror, as the worst of all foes, thos[e] who should be the ministers of justice. I regar[d] as wholly without excuse the Government of th[is] country, who having bound the population han[d] and foot, have left them, knowingly and willfully, a prey to merciless oppressors."

--Thompson—27th. Feb. 18[illegible]
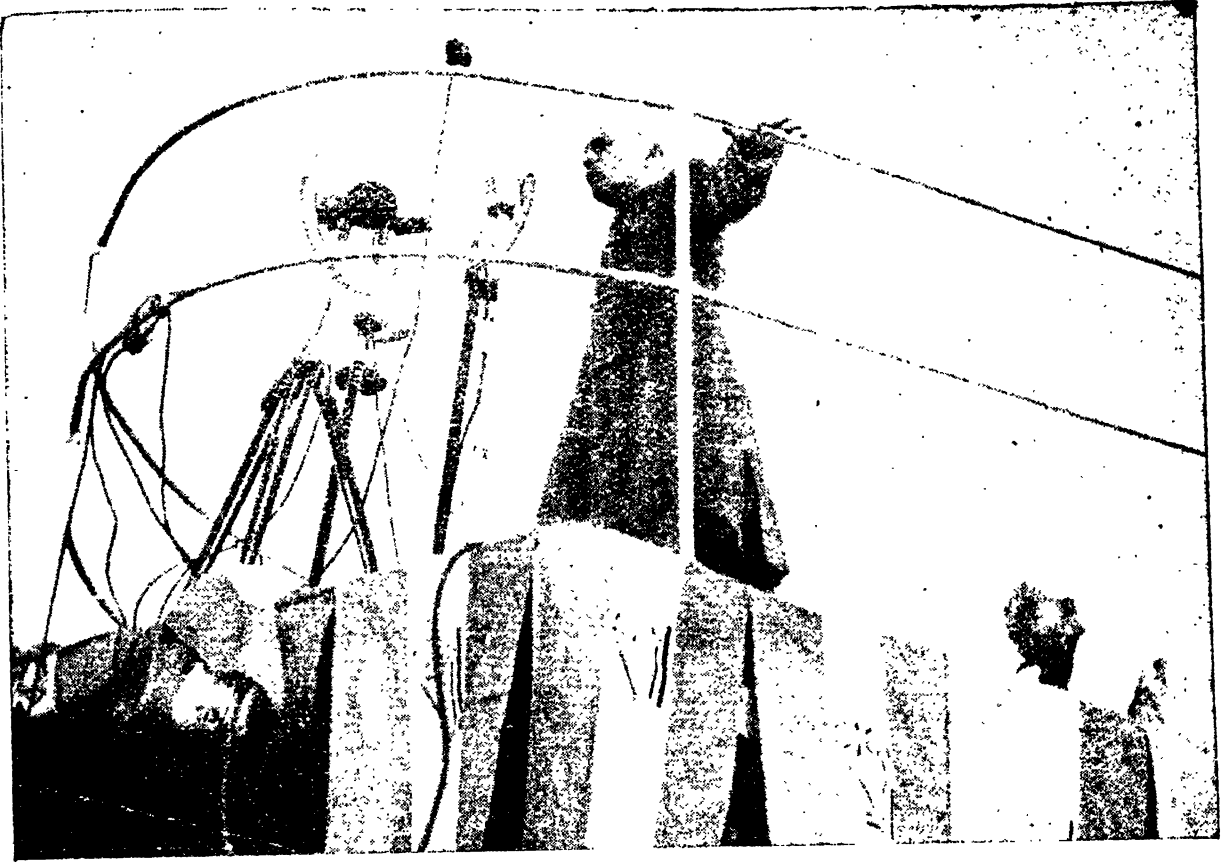
ঠিক নেতার মত দাঁড়িয়ে আছেন (প্রধান মন্ত্রী নেহেরু) —পান্না সেন

ঠিক মানুষের মত হাসছে —সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়

— নির্মলকুমার দত্ত

আকাশ পথে
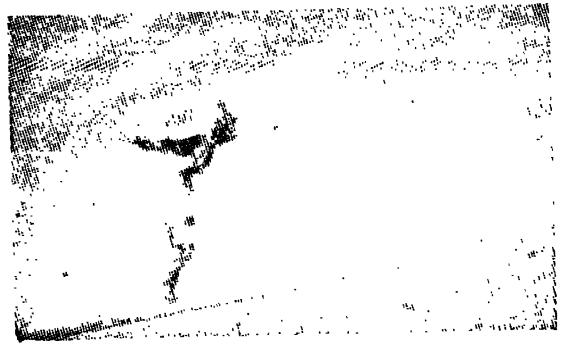
—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

শিখা

ও

শিখ

—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

—সুনীলকুমার গুপ্ত

এক যে ছিল রাণী —জি. কে. সিংহ

মেছুনী —পরিমল গোস্বামী

—নীতিন্দ্রনাথ দত্ত

—অ, ক, দে

লেখা পড়া করে যে,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে ॥

এবং মায়ের কোলে চড়ে সে —আশীষ চট্টোপাধ্যায়

শিশু-নৃত্য

নাচে তো ছোটোরাই। তারাই তো সত্যিকার প্রাণের তাগিদে নেচে উঠতে পারে! মা যশোদা নাচাতেন তাঁর নীলমণিকে। ছোট্ট নীলমণি তার ছোট্ট ছোট্ট হাত দু'খানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতো, খুশীতে উপ্‌ছে পড়ে নাচতো, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে টল্‌-মল্‌ করে নাচতো।

বৃহৎ পারাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে নটরাজ মহাদেবের নৃত্যকলা, তাঁর সন্ধ্যানৃত্য গণনৃত্য তাণ্ডবনৃত্যের যতো বৃত্তান্তই লেখা থাক্‌,— নন্দ গোপের গৃহাঙ্গনে নটবর শিশু-কৃষ্ণের সহজ-নৃত্য তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি মাতিয়েছে মানুষকে, মজিয়েছে মানুষকে, কাঁদিয়েছে মানুষকে। নটবর শিশু-কৃষ্ণ দক্ষতায় নয়, সহজ সৌন্দর্য্যে হারিয়ে দিয়েছে নটরাজ মহাদেবকে।

প্রলয় নাচন নাচলে যখন— ভূমিকায়—শিপ্রারাণী বাগ
আলোকচিত্র—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

আপন খেয়ালে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে টলোমলো পা ফেলে ওরা যখন নাচে,—আমরা মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি—

> কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি,
> দুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি।
> তাথেই থেই তালির সাথে
> কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
> রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনী।
> কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি।

ওদের নাচিয়ে আর নাচ দেখে আমরা এত আনন্দ কেন পাই? ওদের পায়ের ছন্দ তো অটুট নয়, ওদের নৃত্য-ভঙ্গিমা তো নিখুঁৎ নয়। তবু কেন ওদের নাচ ভাল লাগে, তবু কেন মা যশোদারা গান গেয়ে আর করতালি দিয়ে তাঁদের নীলমণিকে নাচিয়ে আত্মহারা হয়েছেন চিরকাল?

ছোটদের নাচের কি একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য্য আছে, আকর্ষণ

চাও চাও বদন তোল কথা কও, মুচকে হেসে,
দেখ না প্রাণ আকুল হ'ল।
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের
বাঁশীর কথা কই!

ভূমিকায়—কৃষ্ণা চৌধুরী ও কুহু চৌধুরী
আলোকচিত্র—রায় শিখীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু
ঐখানে থাক। —চণ্ডীদাস

আছে। তাদের অঙ্গ-সঞ্চালনের স্বাভাবিক ভঙ্গীটাই লালিত্যময়। তার উপর বিদ্যা ও কৌশলের অটুট ছন্দের প্রলেপে সেই লীলায়িত ভঙ্গিমা যখন সুসংযত হয়ে ওঠে, তখন তাদের রসোত্তীর্ণ নৃত্যোচ্ছ্বাস হয়ে ওঠে আরো মনোহর।

ছোটদের নাচ যখনই দেখি, যেখানেই দেখি,—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাই তারা রাধাকৃষ্ণ সেজেছে।—রাস্তায় যেতে যেতে দেখি, ফুটপাতে একটি লোক গামছায় বেঁধে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম্‌ বুকে ঝুলিয়ে গাইছে,—'ওগো মা নন্দরাণী, নীলমণি তোর মানব নয়'—

[ইহার পর ১৫৩ পৃষ্ঠায়]

এ মান সহজে যাবে না
তাও কি জান না ?
মনে বুঝে দেখ না ।

—মাইকেল

কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন্ রন্ধ্রে, রাধা বলি ডাকে আমার নাম ।

— জ্ঞানদাস

ফিরায়ো না মুখখানি,
রাণী, ওগো রাণী
ভ্রূভঙ্গে তরঙ্গ কেন
আজি সুনয়নী ।

—রবীন্দ্রনাথ

মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিতচোরনি
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি সঁপি ।

—গোবিন্দদাস

না কর না কর ধনি এত অপমান
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ।

—চণ্ডীদাস

প্রাণে বহে প্রেমের তুফান শ্যামের বামে
রাই কিশোরী ।
চাঁদের ফাঁদে বাঁধে চাঁদে চাঁদে-চাঁদে ধরাধরি

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

"তোমার ডাকের কিছু নাহি ঠিক-ঠিকানা,
খেয়ালী, খেয়ালে তব নাহি পাই সীমানা।
কখন আস না আর কখন যে আস তার
জানিবার জানাবার নাহি কোন নিশানা।
বিপরীত রীতি তব অবলার অজানা।"

"বাজাই বৃথা এ বাঁশী,
তুমি যদি সখি বেণুটিরে ধরি' না বাজাও হাসি হাসি।
বড় সাধ মোর বুকে,
এই ধড়া-চূড়া তোমাকে পরাই বেণু ধরি তব মুখে।"

"অভিমান সে ত নিঃশেষে করি আপনার সবি দান,
তুচ্ছ তনুরে সরাইয়া দূরে সঁপে-দেওয়া সারা প্রাণ।
অভিমানে রাগ রোষ অভিনয়,
নন্দলীলায় নব অভিনয়,
রাজা হ'তে চায় প্রাণের প্রণয় শুনিবারে স্তব-গান।"

"এক হয়ে গেছে আজি দুইটি মিলে,
এক পুন বহু হয়ে জাগে নিখিলে।"

—ব্রজবেণু—কালিদাস

আর ঝমঝম্ কোরে ছোট-ছোট পা ফেলে এগিয়ে চলেছে কৃষ্ণ দু'টি কালো কালো ছেলে। কপালে তাদের চন্দনলেখা, মাথায় মকুট, অঙ্গে পীতবসন, গলায় মালা, পায়ে নূপুর।

এত কিছু থাকতে ওদের বৃন্দাবনের নন্দরাণীর নীলমণি সাজাবারই বা এত লোভ হয় কেন আমাদের? কারণ, বৃন্দাবনের সেই চির কি[শোর] আর চির কিশোরীকে ছাড়া আমরা আমাদের আর কোন দেবতা[কে] তো শিশুর বেশে দেখিনি? আর কোনো দেবতাকেই তো দে[খিনি] এলোমেলো পা ফেলে আনন্দে নেচে উঠতে? তাই শিশু কিশোর-কিশোরীদের নৃত্যবেশ পরাবার সময় সবার আগে চিরচঞ্চল শ্যামলকিশোরের কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়। শিশু-নৃত্যশিল্পীদের অধিকাংশেরই হাতে আমরা তুলে দিই মোহন [বাঁশী] মুকুটে দিই ময়ূরপুচ্ছ।

কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

[এই পত্র তিনখানি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত।]

১

জয় জগদীশ

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক ঝঞ্ঝাস্রোত, তাহাতে শরীর বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এক ঘণ্টা কালও মনস্থির করিয়া থাকিতে পারি না, এত ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে যেরূপে সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্মচারিগণ আমার সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সমাজ আমার অতি স্নেহের ধন, সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার ধন-প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে, সেই সমাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যে সমাজের কার্য্য অনুগত ভৃত্যের ন্যায় এত দিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, সেই সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। ঈশ্বরের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিব। দেশ-বিদেশে ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইবে।

কলিকাতা, কলুটোলা

২৫শে মাঘ, ১৭৮৬ শক। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

* * * *

২

কলুটোলা, কলিকাতা।

২৮শে জুলাই, ১৮৭১।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্ম সমাজের বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিপূর্ণ পত্র আমার সেইরূপ। আপনার প্রদত্ত উপহারের জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। আপনি জানেন, আপনার প্রথম ভাগ বক্তৃতা আমার আদরের ধন ও যত্নের বস্তু, দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্য বিশেষ অনুরাগ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা

২১শে নভেম্বর, ১৮৮৩

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

এত দিন পর একটু বল পাইয়াছি। আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনার স্নেহ ও মমতার জন্য, আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। "ব্রহ্মপরায়ণ দাদা" এ সম্বোধনটি আপনার মিষ্ট লাগে, আমি তৎ-প্রয়োগে কেন বিমুখ হইব?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

[এই পত্রখানি স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন।]

চুঁচুড়া,

১৭ই এপ্রেল ১৮১৩।

শুভাশিষঃ সন্তু।

স্নেহাস্পদ যোগীন্দ্র,

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধু ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্‌কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে ভালবাসেন। আমার পিতা যে এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল, কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম? তিনি বলিলেন "কেন বাবা!

পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে এটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না, কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটিও আমাকে পুথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার দোষ হইয়াছিল, তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন ঐ সকল কথা হয়, তখন ক্লাশের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে সে চাহিতেছিল। ছুটির পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া হাণ্ডসেক্ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি? কোথায় তোমার বাড়ী?" ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু, এই দিন হইতেই ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্প কাল মধ্যে উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন, আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন। গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই, মধু আমায় তজ্জন্য কোন দিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীতে ধরণ ও মধুর বাবার বাসা-বাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল, সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয় এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাশে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত সেখানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকা হিসেবে ১৬ মাসে ৮০ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না। অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি না কি হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ করবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ? ৫ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমার পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর আমরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্প দিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু এ কথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম তাহা নহে, আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েক জন সমপাঠী আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত, কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয় আমার সহিত তাহার কোন কথা বার্ত্তা হইত না, সে সকল বিষয় আমার নিকট সযত্নেই গোপন রাখিত। কখন কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এক দিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি, ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু ফেসি ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, "এ কি করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি এক জন জিনিয়স (Genius)। জিনিয়াস্ যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্‌ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ-চুড়া, কি সাত-চুঁড়া, কি ন'-চুঁড়া কাটিয়া আসতে, তা হলে যা হোক্ একটা নূতন রকম কিছু হতো, তা না করে ফিরিঙ্গীর মতন চুল কেটে এসেছ। এরূপ নীচ অনুকরণ-প্রকৃতিটা ভাল নয়।" আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সে দিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটুকু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পর দিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মধু খৃষ্টান হইবে, খৃষ্টান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরে আমাকে কোন দিন বলে নাই। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া আমি ইহা অণু মাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল, কথা সত্য নহে, আবার মনে হইল, যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে ত মধু আমাকে এ বিষয় একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েক জন মিলিয়া কলেজের ছুটীর পর দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তাহা

...ট উইলিয়মে রাখিয়াছে। সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী ...ের একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যেদিন খৃষ্টান ...ন, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর ... স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন থাকিয়া বিসপ্‌স্‌ কলেজে ...মন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। ...ও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ...য় সে মুখের ভাব, সে চক্ষের জ্যোতি কোথায়? মধুর পূর্ব্ব ...কারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

বিসপ্‌স্‌ কলেজে কিছু কাল থাকিয়া মধু মান্দ্রাজে যাত্রা করে। ...খানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে ...আমার মা'র কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, "আমার প্রণীত 'ক্যাপটিভ্ লেডি' নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।" বাস্তবিক আমার ...া অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। তরল সৌন্দর্য্য তাঁহার ...ল না, যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণা ...র্ত্তি তাঁহার ছিল।

আমি মধুর উক্ত পত্রের জবাব দি, কিন্তু উহার পর হইতেই পরস্পরে সংস্রব বেশী না থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়া যায়। কিছু দিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ...ই সময়ে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ ...দ উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্ম একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা ...হীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই, এবং উক্ত ... আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যত বার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

*　　*　　*　　*

মধু আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত। এমন কি সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবনচরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় হইব।" আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে এক জন প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতাম। * * ফলতঃ অন্য পথে না যাইয়া দেশীয় পবিত্র নীতিমার্গের অনুকরণ করিয়া চলিলে, মধু স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যোগিতা-বলে স্বদেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারিত, এবং সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়গ্রাহী হইত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না। পূর্ব্বের সেই সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর, কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায়, মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পড়িয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মা'র কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মায়ের নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে প্রকৃতির হস্তবিনির্ম্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু পবিত্র মানবরত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিলাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত, কবির চক্ষে নিমে দত্তের আদর্শীভূত।

ইহার কিছু দিন পরে মধু 'তেক্ষুটার বধ' কাব্য রচনা করেন, এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করে। এত দিন পরস্পরে সংস্রব রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটুক আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ ব্যাপার তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ বই আর কি।

শুভার্থী

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

[মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে নবীন সেনের অধ্যাপক ছিলেন। সেই অবধি তিনি তাঁকে গুরুর মত ভক্তি ও তাঁর সরল আড়ম্বরহীন দেবচরিত্রের জন্য তাঁকে পূজা করতেন। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য প্রকাশিত হলে তিনি এক দিন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি নবীন সেনের মুখে 'রৈবতক' শুনতে চাইলেন। এবং নিজেই 'রৈবতকের' অংশবিশেষ বেছে-বেছে তাঁকে পড়তে দিলেন। নবীন সেনের আবৃত্তির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর অশেষ প্রশংসা করেছিলেন। 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হওয়া মাত্র নবীন সেন তাঁকে 'গীতা', 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' এক এক খণ্ড উপহার পাঠিয়েছিলেন। পরে তিনি এ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে চারখানি পত্র লেখেন নবীন সেনকে।]

১

শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা,

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

অপর দুইখানি গ্রন্থ (রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র) এখনও সমস্ত পাঠ করা হয় নাই; কিয়দংশ মাত্র পড়িয়াছি। কিন্তু যত দূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে দেখিলাম যে গীতার ভূমিকায় আপনি কথায় যাহা বলিয়াছেন, আপনার উক্ত কাব্যদ্বয়ে কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন! আপনি উক্ত ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কাব্যে ও ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।" এবং আপনার 'কুরুক্ষেত্রে' যে উজ্জ্বল ত্রিমূর্ত্তি অপূর্ব্ব ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—

"——জ্ঞানবল, আত্মদান।
ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত সমপ্রাণ।"

তাহাও শিক্ষা দিতেছে।

আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনার 'মহাভারত' গানের সুগম্ভীর

ধ্বনি শুনিয়া সংসার-কান্তারে পথশ্রান্ত ও বিষয়-বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত পথিক অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে ও পরমানন্দধামে যাইবার পথের পথিক হইতে উৎসাহিত হইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২

শ্রীহরিঃ
শরণং।

নারিকেলডাঙ্গা
৬।১০।৯৪

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত করিয়া উহার উত্তর লিখিব। কিন্তু শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে অনেক বিঘ্ন সহজেই ঘটিয়া থাকে। এবং আমি কতকগুলি নিত্য (বা অনিত্যই বলুন) কর্ম্মের মধ্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কাম্য কর্ম্ম করিবার বিন্দুমাত্রও অবকাশ পাই নাই। আপনার পত্রের উত্তর দিতে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বেই এই পত্রখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আপনি যে এত ভক্তিপূর্ণ ও বিনীত ভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা আমার গুণে নহে ইহা কেবল আপনার হৃদয়ের গুণে। যে হৃদয় সমস্ত জগৎ।

'অনন্তে অন্তের ক্রীড়া চির সম্মিলন'

এই ভাবে দেখে এবং বিচিত্র কল্পনা-কৌশলে অপরকে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারে, সে হৃদয় যে ভক্তি ও বিনয়পূর্ণ হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আপনি আমার এক জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং আমি আপনাকে 'তুমি' না বলিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি. ইহাতে আপনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষোভের কারণ নাই। এরূপ সম্বোধন বর্ত্তমান স্থলে স্নেহের অভাব-ব্যঞ্জক নহে। আপনি এক সময়ে আমার এক জন অতি সুশীল ছাত্র ছিলেন বলিয়া আপনার প্রতি যে স্নেহ ছিল তাহার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে আপনি এক জন চিন্তাশীল, পরমার্থ-পরায়ণ কবি বলিয়া আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহা সেই স্নেহের সহিত মিলিত হওয়ায় আপনার প্রতি এমন একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে যে অন্তরে সামান্য ছাত্রের স্থান অপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানে আপনাকে রাখিতে ইচ্ছা হয়। এবং সেই জন্যই আপনাকে সামান্য ছাত্রের ন্যায় সম্বোধন করি নাই।

আপনি আমার এখানে সুযোগ মত এক দিন আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আসেন তাহা হইলে পরম সুখী হইব। 'রৈবতক' এবং 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ করা সমাপ্ত হইলে সময় পাইলেই আপনাকে পুনরায় লিখিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

["কুরুক্ষেত্রের" আশাতীত সাফল্য দেখে রাণাঘাটে শ্রীশ্রীজগদ্ধা... পূজার দিন ১৮৯৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে নবীন বাবু প্রভাস রচনা আর... করেন এবং দু'সর্গ সেখানে শেষ করে কলিকাতায় বদলী হ... কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতির পর শেয়ালদহের ১০ নং গো... লেনের বাড়ীতে বসে তিনি ১৮৯৫ খৃঃ জুলাই মাস হতে আব... প্রভাস লেখা সুরু করেন। প্রভাস লিখতে প্রায় দেড় বছর সম... লেগেছিল; উহা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে শেষ হয়।

প্রতিদিন সকালে নবীন বাবু একটু একটু করে প্রভা... লিখিতেন। এই সময়কার একটি ঘটনা সম্বন্ধে নবীন বা... 'আমার জীবনীতে' লিখেছেন—প্রভাসের "বীণাপূর্ণতান" স... লিখিয়া যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্র ত্যাগ করিতেছে সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত-ভক্ত-সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅ... অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব? আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; আমার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু অবির... ধারায় পড়িতেছে। কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে, অক্ষর ভাসি... যাইতেছে। আমি সেই কাগজ ফেলিয়া দিয়া স্নানকক্ষে গি... বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বার বার লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, বার বার লেখা অশ্রুজলে ধুইয়া যাইতেছে। আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভায়রা-ভায়ের স্ত্রী কি... কার্য্য উপলক্ষে উপরের ঘরে আসিয়া আমার এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বামীকে ডাকিয়াছেন। তাঁহারা সে সময়ে কলিকাতা... এক পীড়িত পুত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার কন্যা ও আমার স্ত্রীও আসিয়াছেন। তাঁহারা চুপে-চুপে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমার এ অভিনয় দেখিতেছেন। আমি কিছুই টের পাই নাই। আমার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নির্ম্মল এ... কথা শুনিয়া ছুটিয়া আমার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান হইল, তাহাকে বলিলাম,—"বাবা! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তুই এক বার আমার বুকে আয়!' সে ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে পড়িল। * * * এইরূপে প্রভাস শেষ করিলাম। আমার বোধ হইল, আমার চৌদ্দ বৎসরের ধ্যান ভাঙ্গিল; আমার চৌদ্দ বৎসরের স্বপ্ন শেষ হইল। * * আমার সমস্ত শরীর যেন কি এক ভারমুক্ত হইল! সমস্ত সংসার যেন শূন্য হইল। আমি বুঝিলাম, আমার কাব্য-জীবন শেষ হইল।"

প্রভাস প্রকাশিত হবার পর মাননীয় গুরুদাস বাবু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা
৯ই নবেম্বর ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু—

আপনার 'প্রভাস' পাঠ করিতেছি, এখনও পাঠ সম্পূর্ণ হয় নাই। যত দূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে (আপনার অপূর্ব্ব ভাষায় যদি বলিতে অনুমতি দেন)

"প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

যদিও কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ শব্দ-বাহুল্য আছে বলিয়া কাহারও

হইতে পারে, কিন্তু ভাবের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে এত বিমুগ্ধ হয় যে ভাষার প্রতি বড় লক্ষ্য থাকে না।

বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার কাব্যের মূল মন্ত্র এবং বিশ্বপতিই ইহার ... । এইরূপ কাব্যরস পান করিলে মোহান্ধ জীবের নয়ন ...লিত হয়, এবং জীব কিঞ্চিৎ দেখিতে পায় যে—

"সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী।
এই তীরে সন্ধ্যা, উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"

...ই দুইটি পংক্তিতে আপনি কি পবিত্র, কি মধুর, কি অপূর্ব্ব গীতই ...য়াছেন। আর অধিক কি লিখিব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[দেখা গেছে যাঁদের মন দর্শন-প্রবণ, তাঁরা 'রৈবতক'কে ...; যাঁদের মন ভাব-প্রবণ তাঁরা 'কুরুক্ষেত্রকে' প্রথম, ... যাঁদের মন ভক্তি-প্রবণ তাঁরা 'প্রভাস'কেই প্রথম স্থান ...ছেন।]

জ্যোৎস্না দেবীর প্রেমপত্র

[দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় পোষ্ট অফিস পরিদর্শন উপলক্ষে একবার ... নবীন সেনের গৃহে অতিথি হন। অন্যান্য বন্ধুদের সহিত ... দিন তিনি নবীনচন্দ্রের এক সতকর্মীর গৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ...দের বিলম্ব দেখে দীনবন্ধু বাবু প্রস্তাব করলেন যে, তাঁর লীলাবতী ... অভিনীত হক। তখন গ্রীষ্মকাল। বাইরে ... ...ৎস্না। সুরায়, সংগীতে চারি দিক বোমাঞ্চিত। সবাই ...ন বাবুর জামা খুলে, উড়ানিখানি ধড়ার মত পরিয়ে হাতে ... দিয়ে জোর করে তাঁকে ত্রিভঙ্গ করে দাঁড় করালেন। ললিতের ... তাঁকে দেওয়া হল আর মিত্র মহাশয় নিজে নদেরচাঁদের ... করলেন। তখন নবীনচন্দ্রের তরুণ যৌবন। দেহে ভগবান ... রূপ ঢেলে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপী কবিকে অপূর্ব সুন্দর ...ছিল। এই ভাবে লীলাবতী নাটকের অভিনয় চলতে লাগল। ...ক পাশের ঘরে দরজার আড়াল থেকে কোন এক নব যুবতীর ... বর্ণাভ ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের চিত্ত চাঞ্চল্যে অধীর করে তুলছিল। এক ... বন্ধু বললেন, উনিই গৃহস্বামীর কন্যা জ্যোৎস্না। অভিনয়ান্তে জ্যোৎস্নার পিতা কতকগুলি কবিতা এনে মিত্র মহাশয়ের হাতে ...লেন। জ্যোৎস্নার রচনা। তিনি জ্যোৎস্নার লেখা কবিতা নবীন সেনের দ্বারা সংশোধিত করে নিতে আদেশ দিলেন ...কে।

এই ঘটনার পর আর বহু দিন নবীন বাবুর সঙ্গে এই পরিবারের ...ক্ষাৎ হয়নি। কদাচিৎ মেয়েটি তাঁকে পত্র লিখত বা তার কোন ...বিতা সংশোধনের জন্যে পাঠিয়ে দিত। নবীন বাবু তখন অসুস্থ। ... মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছেন এবং ছুটি-মঞ্জুরী সাপেক্ষ গ্রহণ ... কলিকাতায় বেড়াতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, জ্যোৎস্নাদের ... থেকে নিমন্ত্রণ এল জ্যোৎস্নাদের বাড়ী যাওয়ার আগে এক দিন নবীন বাবু কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ...ম বাবুর সঙ্গে তাঁর নাতি-ঠাকুর্দা সম্পর্ক—রসিকতা চলে। ...থায় কথায় বঙ্কিম বাবু তাঁকে বললেন—"খুব সাবধান। সেখানে যাচ্ছ, ছোকরারা তোমার ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে।" জ্যোৎস্নার রূপ ও সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই তখন কলিকাতার পুরুষ সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সবলেরই বিশ্বাস, জ্যোৎস্না নবীন বাবুকে ভালবাসে এবং সেই কারণেই অনেকেই নবীন বাবুর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ। আর সত্যিই জ্যোৎস্নাও নবীন বাবুর প্রেমে মুগ্ধা। সে কবির প্রত্যেকটি চিঠি অতি যত্নে রেশমী রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছে।

"আমার জীবনীতে" নবীন বাবু জ্যোৎস্নার সহিত তাঁর মিলনের একটি অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন—"আমার চক্ষু হইতে কি একটা আবরণ পড়িয়া গেল। আমার সমস্ত দেহ ও হৃদয় অমৃতে সিক্ত হইল। আমি আত্মহারা হইলাম। নয়নে কি যেন এক স্বর্গ খুলিয়া গেল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি শয্যায় বসিয়া তাহার দুই কর লইয়া ঊর্দ্ধমুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার অশ্রুপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম—'জ্যোৎস্না, তুমি দেবী। আমি এই দশ বৎসর অদৃশ্য থাকিয়া তোমাকে দেবীর মত পূজা করিয়াছি ও ধ্যান করিয়াছি। আমি জানিতাম, তুমি আমাকে ভালবাস। আমি বড় ভাগ্যবান।' * * * * তাহার মুখ আমার মস্তকের উপর হেলিয়া পড়িল। * * * দুই জনের অশ্রুধারা পড়িতেছিল, অশ্রুতে অশ্রু মিশিতেছিল। আজও সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে আমার বক্ষঃ সিক্ত হইতেছে।"

কিন্তু স্বার্থপর মানুষদের চক্রান্তে জ্যোৎস্নার সহিত কবির স্নিগ্ধ প্রেমের দীপ এক দিন নিবে যায়। শেষ অবধি জ্যোৎস্না কবিকে লেখা তার চিঠি-পত্র ফেরৎ চেয়ে নেয় এবং কবির উপহার দেওয়া বই-পত্তরও ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় কবিকে। কেবল মাত্র পুরী যাওয়ার সময় যে পত্রখানি জ্যোৎস্না লিখেছিল, সেই পত্রখানি ভুলক্রমে কবির কাছে থেকে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নার সহিত কবির আর এ জীবনে কখন দেখা হয়নি।

জ্যোৎস্না কাহিনী কবির জীবনের এক সত্যকার রোমান্টিক অধ্যায়। "আমার জীবনীতে" কবি লিখেছেন—"আমি এ জীবনে দুইটি রমণীরত্নের ভালবাসা পাইয়াছিলাম। এই ভালবাসার নাম আত্মারক বক্তৃতা—নিষ্কাম, অনাবিল, পুণ্যময়, প্রেমময়। এক জন আজ স্বর্গে আর এক জন আজ স্বপ্নে।"

কবির এই লেখার মধ্যেই কবির গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর আছে জ্যোৎস্নার পরিচয় প্রকাশ নয়।

জ্যোৎস্নার লেখা পত্রখানি নিম্নরূপ।]

—"জীবনসর্ব্বস্ব আমার!

আমার ক্ষমতা নাই, কি লিখিব? ক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইয়া নয়ন দৃষ্টিহীন হইয়াছে, হৃদয়-রক্ত মরণ-পথ দিয়া ঝরিতেছে। আমি মরিলাম না কেন? ইহার সানুকূল উত্তর কে দিতে পারে? বলিয়া দেও, আমি সেই উপায় অবলম্বন করি। মানুষ সকল সহ্য করিতে পারে, আমি কিছুই পারি না। পাষাণ গলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে। আমি পাষাণময়ী মূর্ত্তিবিশেষ ছিলাম—সেই পাষাণ দ্রব হইয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, কি লিখিব? যেই তুমি লিখিয়াছিলে তোমার পুরী

যাইবার আদেশ আসিয়াছে, সেই দিন হইতে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিয়াছি। তুমি আসিলে—চলিয়া গেলে,—আমার সকলই ফুরাইল। সন্ধ্যার সময়ে তুমি গাড়ী হইতে নামিলে—আমি তখন সেখানে দাঁড়াইয়া—আমার ইচ্ছা হইল আমি মরি! তুমি বিদায় লইতে আসিয়াছ।

আবার সেই রাত্রি! যখন তুমি ট্রেন miss হইবে বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলে, তখনও মৃত্যুকে ডাকিলাম। অভাগিনীর আরাধনা ঈশ্বর শুনিলেন না। মৃত্যুও শুনিল না। তুমি গাড়ীতে উঠিলে, আমি আত্মহারা হইলাম, কম্পিত দেহভার বহন করিতে পারিতেছিলাম না। পা অচল হইল, শরীর অচল হইল, কাঁপিতেছিলাম, পড়িয়া যাইতে যাইতে টেবিল ধরিলাম। আলো আমার হাত হইতে পড়িয়া নিবিয়া গেল, আমিও আশ্রয় পাইয়া দাঁড়াইলাম। অন্ধকারে আর কেহ আমাকে দেখিল না। আমি ছুটিয়া অন্য বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ভ্রাতা চীৎকার করিয়া ডাকিল, আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল। আর এ সকল লিখিয়া কি ফল? পুনর্ব্বার গাড়ীর শব্দ শুনিলাম, আমার হৃদয়ের আঘাতের সঙ্গে তাহা মিশিয়া গেল, আমি চঞ্চল হইলাম। তোমার নিকট যাইতে পারিলাম না। আমার তখন ভ্রম হইতেছিল—ভয় শেষ মুহূর্ত্ত। তোমাকে দেখিলাম—কি দেখিলাম! তাহা বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষু-কর্ণ দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতেছে, কি লিখিব? তোমার সিক্ত মুখ আমার নয়নের নিকট ভাসিতেছে। আবার যখন দেখিব, তখন সেই দৃশ্য ভুলিব। নতুবা সেই মুখ মনে করিয়া মরিব। যেরূপ অবস্থা, মৃত্যু নিকট—মরিলে দুঃখ নাই। আর এই নিরাশময় জীবন-ভার বহন করিতে পারিব না। আশা নিবিয়া গিয়াছে, উৎসাহ ভাসিয়া গিয়াছে, সমুদয় অন্ধকার। অবস্থা শোচনীয়। সত্য সত্যই অশ্রুজলে চক্ষু ক্লান্ত হইয়াছে, তুমি এ মুহূর্ত্তে আমাকে দেখিলে জানিতে পারিতে এই কয় দিনে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে কি না। আমার কোন কথা মনে আসিল না। তরঙ্গে তরঙ্গে সকলই ডুবিয়া গেল। যখন কিছু বলিব ভাবিতাম, তোমার মুখ দেখিলে সমুদয় ভুলিয়া যাইতাম। আজ তোমাকে লিখিতে সকলই ভুলিয়াছি। কেন অশ্রু তুমি লিখিতে দিতেছ না? আমি আর পারি না। কাগজ ভিজিয়া যাইবে। তুমি ব্যথিত হইবে। আমার অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর লিখিতে পারিব না।

তুমি নিরাপদে সুস্থ শরীরে পুরী পৌছিয়াছ শুনিলে কিছু স্থির হইব। সেই আশায় পথ চাহিয়া আছি। অদ্য পত্র না লিখিলে তুমি দুঃখিত হইবে, সেই জন্য বিদীর্ণ হৃদয়ে লিখিলাম। তোমাকে কবে দেখিব বলিয়া দেও, সেই আমার মোহমন্ত্র হইবে। তাহা মনে করিয়া যদি মন ভাসাইতে পারি ও বাঁচি!

তোমার মৃতপ্রায়—"

[পত্রটির স্থানে স্থানে কয়েকটি শব্দ চোখের জলে মুছে গেছে। নবীন বাবু পত্রখানিকে তাঁর চিতানলে সমর্পণ করার জন্য ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।]

চিঠি-পত্রাদিতে সাধারণতঃ আমরা যে ভুল কথাগুলি লিখিয়া থাকি, নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি, অদ্যও
অধীনস্থ	অধীন
অপমান হইয়া	অপমানিত হইয়া
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত, অধীন
একত্রিত	একত্র, একত্রীভূত
কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
পোষ্যাবর	পোষ্ট্‌বর
ত্রৈমাসিক	ত্রিমাসিক
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা, দারিদ্র্য
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নির্দ্দোষী	নির্দ্দোষ
পৈত্রিক সম্পত্তি	পৈতৃক সম্পত্তি
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
ভদ্রস্থতা	ভদ্রতা
মহতী মহিমা	মহান মহিমা
মহামহিমাবর	মহামহিমবর
মহিমা সাগর	মহিম সাগর
মহদুপকার	মহোপকার
বশম্বদ	বশংবদ
বারম্বার	বারংবার
বয়স্ক	বয়স্থ
বাহ্যিক	বাহ্য
বিদ্বান	বিদ্বান, বিদ্যাবান
বিবিধ প্রকার	বিবিধ, নানাপ্রকার
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
সবিনয়পূর্ব্বক	বিনয়পূর্ব্বক, সবিনয়ে
সশঙ্কিত	শঙ্কিত, সশঙ্ক
সাবকাশ নাই	অবকাশ নাই
সৌজন্যতা	সুজনতা, সৌজন্য

ভারতের মু[illegible] আন্দোলনের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভেদনীতি ও শোষণ। Divide and Rule, ইহাই হইতেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল কথা। ভারতেও এই একই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ততই শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসী কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কংগ্রেস সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া উঠিল। জাতীয় ঐক্য বিদেশী শাসনের পক্ষে মারাত্মক। ভারতের জাতীয় সংহতি নষ্ট করার জন্য বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞগণ ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য তাহারা সুকৌশলে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর চরম নির্য্যাতন ও অত্যাচার করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানগণ এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই অপরাধে মুসলমান সম্প্রদায় সরকারের বিষ-নজরে পতিত হয়। সরকারের সুপরিকল্পিত অবিচার ও নির্য্যাতনের ফলে মুসলমান সম্প্রদায় প্রাণহীন ও নির্জীব হইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগরণ ও পুনর্গঠনের জন্য কাজ করিতে আরম্ভ করেন। স্যার সৈয়দ প্রথম জীবনে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমগ্র জাতির উন্নতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি তাঁহার মতবাদ পরিবর্ত্তন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে কাজ করিতে থাকেন। এই প্রতিভাবান প্রভাবশালী নেতার এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনের মূলে ছিল আলিগড় শিক্ষায়তনের বৃটিশ প্রিন্সিপ্যালদের সুচতুর প্রচার-কার্য্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কর্মিগণ যাহাতে কংগ্রেসে যোগদান করিতে বিরত থাকেন, সে জন্য স্যার সৈয়দ শেষ জীবনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের চেষ্টা সত্ত্বেও বহু প্রভাবশালী মুসলমান নেতা প্রথম হইতেই সক্রিয় ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজী ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। স্যার সৈয়দের অন্যতম প্রধান সহকর্মী মৌলানা সিবলী ভারতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের পুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ভারতের প্রভাবশালী উলেমাগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন। বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আয়োজন করা হয়। পৃথক্ পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য লর্ড কার্জন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। লর্ড কার্জন নবগঠিত পূর্কবাংলা প্রদেশকে 'মুসলমান প্রদেশ' হিসাবে অভিহিত করেন। ঢাকার নবাব সালিমুল্লা প্রথমে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। অল্প সুদে এক লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিয়া সরকার নবাবকে দলে টানিতে সমর্থ হন। কিন্তু বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির জন্য লর্ড কার্জন যে চেষ্টা করেন তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়। সাধারণ ভাবে বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। বহু প্রভাবশালী মুসলমান নেতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯০৬ সালে মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধি দল ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও আইন সভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক্ প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। বড়লাট তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মাননীয় আগা খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। প্রথম কয়েক বৎসর লীগের কার্য্যাবলীর মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। বহু বিশিষ্ট মুসলমান নেতা মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া লীগের বাহিরে কাজ করিতে থাকেন। প্রথম কয়েক বৎসর লীগের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিয়া মৌলানা সিবলী লক্ষ্ণৌ মুসলিম গেজেটের এক সংখ্যায় লেখেন, "The league to keep up appearences passed some resolutions of national interest, but every one knows that it is rouge and not the natural bloom. Day and night its constant refrain is that the muslims oppressed by the Hindus and so they must be given safeguards." মৌলানা সিবলীর সমালোচনা হইতে মুসলিম লীগের প্রথম কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলীর আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলিম লীগের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার দিকে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, এরূপ কথা বলা যায় না। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে তুরস্কের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'আল হেলাল' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সাহায্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে থাকেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নব জাগরণে 'আল হেলালের' অবদান সামান্য নহে। ১৯১৫ সালে লীগের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ প্রাধান্য লাভ করেন। ঐ বৎসর কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন একই স্থানে ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্য লীগের অধিবেশনে যোগদান করেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এই প্রাধান্যের ফলে লীগের স্থায়ী সভাপতি মাননীয় আগা খাঁ পদত্যাগ করেন। পর-বৎসর লক্ষ্ণৌ-এ ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত হয়। কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্না তখন জাতীয়তাবাদী নেতারূপে পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-চুক্তির ফলে কিছু দিনের জন্য লীগে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের লীগের সভাপতি হিসাবে মৌলানা মহম্মদ আলী বলেন, "The interests of the country are paramount, we need not tarry to argue whether we are muslim first or Indians. The fact is we are both and to us the question of precedence has no meaning." মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার খিলাফৎ রক্ষা সম্পর্কে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইবার পর, তাহা রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকারের বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হয়। ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ভারতের হিন্দু ও মুসলমানগণ একযোগে কাজ করেন। ইহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। জালিওয়ানালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ তাহা সমর্থন করেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সর্বময় প্রীতির সম্পর্ক বেশী দিন বজায় থাকে না। পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ লীগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। সাইমন কমিশন গঠন লইয়া লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাইমন কমিশনকে অভ্যর্থনা করার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু লীগ কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্য কমিশন বয়কটের অনুকূলেই মত দেন। প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ লাহোরে এক বৈঠক করিয়া এক প্রস্তাবে সাইমন কমিশনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত করেন। এই বৈঠকের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ফিরোজ খাঁ নুন ও স্যার মহম্মদ ইকবাল। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কায়েদে আজম জিন্না জাতীয়তাবাদের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। মুসলিম লীগ যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠে, বৃটিশ সরকার সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে কাজে লাগাইবার জন্য বৃটিশ সরকার বহু দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে তাহারা সাফল্য লাভ করেন। মুসলিম লীগের প্রচার-কার্য্যের ফলে মুসলমানগণ ক্রমশঃ কংগ্রেসের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহারই ক্রমপরিণতি হিসাবে পাকিস্থানের দাবী উপস্থিত করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে লীগের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কিছু পরিমাণে দায়ী, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন সমূহে হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী মুসলমান যোগদান করেন ও দেশের মুক্তির জন্য নির্য্যাতন বরণ করেন। জমিয়ৎ উল উলেমার ন্যায় প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান বরাবর কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে যথাযোগ্য গুরুত্ব না দিয়া লীগকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিতে থাকেন। লীগকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার জন্য দাবী উপস্থিত করা হয়। বৃটিশ সরকার লীগের এই দাবীর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে ব্যবহারের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। এই দাবী স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ দেওয়া হইতে থাকে। কংগ্রেসও ক্রমশঃ এই দাবী স্বীকার করিয়া লয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। নূতন শাসন-সংস্কারে আইন সভা-সমূহে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই শাসন-সংস্কারের ফলে ভারতীয়গণের হাতে কার্য্যতঃ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ হইতে ভারত শাসন আইনের সমালোচনা করা হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। নূতন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে কংগ্রেসই কেন্দ্রীয় আইন সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করিল। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইল—সভাপতিত্ব করিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সভাপতির ভাষণে পণ্ডিত নেহরু বলিলেন যে, ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে যোগদান করিতে পারে না। তিনি ভারত শাসন আইনেরও তীব্র সমালোচনা করিলেন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারত শাসন আইনের সমালোচনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। সাধারণ নির্বাচনের ফলে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে আইন সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াও কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠনে অসম্মত হয়। পরে কংগ্রেসের এই নীতি পরিবর্তিত হয়। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেসী সদস্যদিগকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিলেন। ইহার ফলে ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। মুসলিম লীগ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নানা ভাবে প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৯৩৭ সালে ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এবারেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন যে, ভারতের দুঃখ-দুর্দশা সমাধানের জন্য ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা আবশ্যক। বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে খুব বেশী দিন মন্ত্রিত্ব করা সম্ভব হইবে না, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে পুনরায় বৃটিশ সরকারের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির কাজ চালান সহজ হইবে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ইহাও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কৃতিত্বের সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন। মুসলিম লীগ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহার একটিও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহরু মুসলিম লীগের সহিত আপোষ-রফার জন্য মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা চালান, কিন্তু লীগ সভাপতির অযৌক্তিক ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য তাহা ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালানই তখন মুসলিম লীগের একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে কংগ্রেস ও মুসলমান লীগের রাজনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

[ক্রমশঃ

দাস=ব্যবসায়

পূর্ব্বাপর প্রায়ঃ এরূপ ঘটিয়া আসিতেছে যে বলবান্ ও বিক্রমশালী ব্যক্তিরা দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টদিগের উপর পরাক্রম প্রকাশ ও প্রভুত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত ত্রুটি করে না; অপর এরূপ ব্যক্তিবিশেষে আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাও পরস্পরকে অধীন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই চেষ্টা পৃথিবীর কুত্রাপি সম্যক্ নিবৃত্ত হয় নাই; কি সভ্য কি অসভ্য সকল স্থানেই হইয়া থাকে. কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার লাঘব দেখা যায়। হিন্দুরা যখন স্থানান্তর হইতে আগমনপূর্ব্বক এতদ্দেশে বাস করেন তখন তাঁহাদিগের ঐরূপ সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত ভীল ও অন্যান্য কতিপয় অসভ্য জাতি পর্ব্বতে পলায়ন করে

আমেরিকা-খণ্ডের আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর ইউরোপ-খণ্ডের যে সকল লোক তথায় গমন পূর্ব্বক উপনিবাস স্থাপন করে, তাহাদিগের আগমনে আদিমবাসী ইণ্ডিয়ন জাতিরা উত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ ঔপনিবাসিদিগের লক্ষ্য বহির্ভূত স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু তথাপিও বিদ্বেষী ঔপনিবাসিকেরা অশেষ প্রকারে তাহাদিগের অনিষ্ট করণে বিরত রহিল না।

অপর বলীয়ানেরা নিকৃষ্টদিগের উপর যে কেবল একেকালে নিগ্রহ-ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত থাকে এমত নহে, তাহাদিগকে চিরায়ত্ত করণ অভিপ্রায়ে তাহারা ক্রয়-বিক্রয় করত তাহাদিগকে চিরকাল দাস-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঐ দাসত্ব অতি ভয়ানক ব্যাপার, যাহার নাম শ্রবণ করিলেই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাবৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাহার মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি শ্রেষ্ঠতার নিদানভূত। ইহা যথার্থ বটে যে সকল মনুষ্যের সমান ক্ষমতা নহে, কিন্তু সকলে যে এক সাধারণ প্রণালীতে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহার যে অংশে অভাব অথবা ন্যূন আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার বিহিত উপায় অবধারিত করিয়া মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ-সাধন ও নিজ অসামান্য মাহাত্ম্য প্রচারিত করেন। অতএব বিক্রমশালীর উচিত যে নিকৃষ্টকে স্নেহ করা, যাহাতে তাহার নিকৃষ্টতার অপলাপ হইতে পারে, তাহার উপায় করা। তিনি নিগ্রহ-ব্যবহার করিবেন, পরমেশ্বরের কখন এমত অভিপ্রায় নহে। অতএব মনুষ্যের যে স্বজাতির প্রতি নিগ্রহ-ব্যবহার অথবা তাহাকে ক্রয় কিম্বা বিক্রয় করিবার কোন স্বত্ব নাই, ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতেছে। পরন্তু প্রাচীন মনুষ্যেরা বিষয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করে নাই, এবং তন্নিমিত্তই যুনান. পারস্য. মিশর, রোম ও অন্যান্য স্থানে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় করার রীতি প্রচলিত ছিল, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি নির্দ্দেশ আছে। ভগবান মনু সপ্তপ্রকার দাস নির্ণীত করেন যে "যুদ্ধলব্ধ, পালিত, দাসীগর্ভজ; ক্রীত, অথবা দত্ত, পূর্ব্বপুরুষাগত, ও দণ্ডকৃত, এই সাত প্রকার দাস আছে। নারদ ঋষি স্বীয় পুস্তকে পঞ্চদশ প্রকার নির্ণীত করেন। তিনি কহেন, প্রভুর বাটীতে জাত দাসী-পুত্র মূল্য দ্বারা ক্রীত, অন্য দ্বারা দত্ত, পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির সহিত প্রাপ্ত। দুর্ভিক্ষকালে রক্ষিত; পূর্ব্বদাসী দ্বারা বন্ধকগ্রস্ত, কোন মহাঋণ হইতে উদ্ধৃত, যুদ্ধে, অক্ষাদি-ক্রীড়ায় জিত, স্বয়ংদত্ত, বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পতিত, পালিত, স্ত্রীপ্রাপ্তির নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকারকৃত এবং বিক্রীত এই সকল ব্যক্তিকে দাস বলা যায়।

বৃহস্পতি এবং কাত্যায়ণ প্রভৃতি স্মৃতি-প্রবর্ত্তকেরা দাসদিগের কার্য্য নির্ণয় বিষয়ে লিখেন; গৃহ মল, পথ ও দ্বার পরিষ্কার করণ অথবা মল ও অন্যবিধ অপবিত্র বস্তু স্থানান্তর করণ দাসের কার্য্য, ভৃত্যের নহে। প্রভুর পদসেবন ও তাঁহার আমোদ চরিতার্থ করণ দাসের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দাস-পুত্রেরা প্রস্রাব ও মল পরিষ্কার করিবেক, প্রভুর গাত্রসেবা ও গো ও অন্য পশুর সেবা করিবেক।

এই যে কয়েক প্রকার দাসের উল্লেখ করা গেল, ইহারা যে নানা প্রকারে দাসত্ব নিবন্ধন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিত ইহা আশু উপলব্ধ হয়। পরন্তু হিন্দুরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন; তাঁহারা দয়ালু স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া যে হঠাৎ অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদিগের দাসেরা ভৃত্য হইতে অধিক শ্রম করিত এমত বোধ হয় না। আবার দাসত্ব-মুক্তিরও অনেক ব্যবস্থা আছে, তৎসাহায্যে দাসেরা বন্ধন-মুক্ত হইতে পারিত।

সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুদিগের মধ্যে দাস-প্রচলনের অথবা ব্যবসায়ের আধিক্য ছিল, সহজে ইহার নির্দ্দেশ করা যায় না। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাদিগের দাসত্বে অসদৃশ জাতির ব্যবহার হইত এমন বোধ হয় না। অপর তাঁহারা অন্যত্র হইতে ভিন্ন অথবা অস্পৃশ্য জাতি আনাইয়া দাস করিতে পারিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা অন্য দেশে গমনে তাদৃশ উৎসুক নহেন, সুতরাং তাঁহাদের অধিক দাস করিবার উপায় ছিল, এমত কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন করা যায় না। এইখানে ইংরাজদিগের আজ্ঞায় দাস ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে, পরন্তু অন্যান্য দেশে তাহা নিঃশেষ হয় নাই।

সরকেশিয়া ও মিশর দেশ হইতে পারস্য দেশে দাসী সকল আনীত হয়। এই সকল দাসীরা অন্তঃপুর-গেহিনীর পরিচারিকা হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না। ইঙ্গরাজদিগের মধ্যে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, পরন্তু তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সহকারে তাহার লোপ পাইয়াছে। বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য-বিষয়ক জ্ঞান ও তন্নির্ব্বাহকারিণী শক্তি জন্মে না; সুতরাং হেয় স্বভাব পরিত্যক্ত হয় না। উইলবর্ফোর্স, ক্লার্কসন, কহম্, ও জাফেরি প্রভৃতি পার্লিয়ামেন্টের অধ্যক্ষ মহাত্মারা অসামান্য জ্ঞানোদ্ভাবিত যুক্তি ও বিবিধ প্রকার চেষ্টা দ্বারা ইংরাজদিগকে দাস-ব্যবসায় পরিত্যাগ করণে প্রবর্ত্তিত করেন। ইংরাজেরা ঐ অবধি আপনাদিগের অধিকার মধ্যে দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়াছেন। কিছু কাল পরে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া ও বহুব্যয়-পূর্ব্বক ইউরোপ-খণ্ডের অন্যান্য জাতিদিগকেও আপনাদিগের অনুবর্ত্তী করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপ-খণ্ডে এক কালে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। যাহাদিগের যত দাস ছিল, তাহারা সকলকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ-খণ্ডে যেরূপ ঐ ঘটনা সিদ্ধ হইয়াছে, আমরিকা-খণ্ডে সেরূপ হয় নাই। আমরিকা-খণ্ডের অনেক স্থানে বিশেষতঃ ইউনাইটেড ষ্টেট রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত দাস-ব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে। তত্তৎস্থান-বাসীরা আফরিকা-খণ্ড হইতে দাস না লইয়া যাইতে পারে, এতদর্থে

আফরিকার নিকটবর্ত্তী আটলাণ্টিক মহাসাগরে ও অন্যান্য সমুদ্রে ইংরাজেরা চৌকির জাহাজ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে দাস-ব্যবসায়ের একান্ত নিবারণ হয় নাই। অদ্যাপি দুরাত্মা দাস-ব্যবসায়ীরা গোপনে আফরিকা-খণ্ডের দক্ষিণ হইতে কাফরিদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। তৎসময়ে ঐ দাসদিগের অবস্থা দেখিলে অথবা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সত্বরে পৌঁছিবেক বলিয়া ধৃত ব্যক্তিদিগের এক কালে শত শত ব্যক্তিকে একত্রে বদ্ধ করিয়া এক ক্ষুদ্র তরীতে লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তিদিগের শয়নের কথা দূরে থাকুক তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিয়া যাইতে পারে না। ঐ সময়ে তাহারা আহার পায় না বলিলেই হয়। অধিকন্তু অনেকে তরী-গর্ভে থাকাতে শ্বাসকর্ম্মের উপযুক্ত বায়ুরও অনটন ভোগ করে। ক্রমাগত মাসাবধি ঈদৃশ বিজাতীয় ক্লেশ ভোগ করাতে পথেই অনেকের মৃত্যু হয়। যাহারা প্রাণে প্রাণে সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগকে চিরকাল দাসত্ব নিবন্ধন দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। তাহারা বিক্রীত হইলে ক্রেতারা তাহাদিগকে সাধ্যাতীত কর্ম্মে সতত প্রবৃত্ত রাখে, এবং সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে না পারিলেই নির্দয়রূপ প্রহার করিয়া থাকে। দাস-প্রভুরা কর্ম্ম করাইবার নিমিত্তই দাস ক্রয় করে, সুতরাং দাসের সুখের প্রতি তাহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না; যেরূপে হউক না কেন কর্ম্ম করাইতে পারিলেই হইল। ফলতঃ আমরিকা-খণ্ডে দাসদিগের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই; বোধ হয় ভূমণ্ডলের সমস্ত দাসের সহিত তুলনা করিলে দাসত্ব যাতনা সর্ব্বাপেক্ষায় ভয়ঙ্কর নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

অনেকে বলিয়া থাকেন কাফরি জাতির উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই, তাহারা আপনাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দতা আপনারা সম্পাদন করিতে পারে না। অপর তাহাদিগের দেশের অবস্থা এমত নহে যে তথায় কোন উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অতএব কাফরি জাতিকে অন্যত্র লইয়া কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিলে তাহাদিগের কল্যাণ সাধন করা হয়। কিন্তু এ উক্তি বাগ্‌জাল মাত্র, যেরূপ স্বর্ণাবৃত করিলে কোন সামান্য ধাতুময় দ্রব্য স্বর্ণ বলিয়া আপাততঃ জ্ঞান হয়, পরে ব্যবহার বা অন্য কোন কারণবশতঃ স্বর্ণ উঠিয়া গেলে যে অপকৃষ্ট ধাতু সেই অপকৃষ্ট ধাতুই প্রকাশ হইয়া পড়ে, দাস-ব্যবসায়ের সহায়ের বাক্য প্রকৃত সেইরূপ। তাহা যে কোন প্রকারে যুক্তি দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিবাদিত হউক না কেন, ক্রমে তাহার অবাস্তবিকত্ব প্রকাশ পাইবেক, সন্দেহ নাই। আফরিকা দেশীয়দের বর্ত্তমান অবস্থান প্রতি কটাক্ষ করিলে প্রতীত হইবেক যে দাস-ব্যবসায় রহিত হওয়া অবধি তাহাদিগের অবস্থা অনেক প্রকারে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয়েরা যখন নিরুদ্বেগ থাকে, তখন তাহারা হাটে হাটে এক প্রকার তালের তৈল আনয়ন করে। বৎসরে এই সামগ্রী দুই কোটি টাকায় বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা শ্যামা বীচির তৈল প্রস্তুত করে, তাহাও লাভজনক। অপর দেশীয়েরা অনেক প্রকার বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে। তাহাদিগের তুলা চাষ হইতেছে এবং তাহারা তুলা ভালরূপ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। অনেক স্থলে কয়লা আছে; এঙ্গোলা ভূভাগে তাম্রখনি প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্দেশীয়েরা পরিশ্রম করিতেছে; এবং পরিশ্রমে তাহাদের যত্নও আছে। অপর তাহারা যৎকালে অন্য দেশের মনুষ্যের সহিত বাণিজ্য-চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; তৎকালে তাহাদের অবস্থা বিষয়ক উৎকর্ষ সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ কি? বাণিজ্য অর্থোপার্জ্জনের ও সভ্যতা প্রচারের বিহিত উপায়। যখন দেশীয়েরা ঐ কল্যাণ-কারিণী বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগী হইয়াছে ও অর্থ উপার্জ্জনের উপায় চেষ্টা করিতেছে, তখন অচিরাৎ তাহাদের অবস্থা উন্নত হইবেক এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অতএব ইহাদিগের দাস-নিবন্ধন অনুৎসাহ ও বিধিমতে জীবন ক্ষেপিত করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ অথবা মনুষ্যের উচিত কর্ম্ম বলা যায় না।

—বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১২৫

ভারতে দাস-ব্যবসা

'যুগযাত্রী'

ফিরিঙ্গী বণিক এ দেশে মানুষেরও বেসাতি করত। রেশম আর কার্পাসের চাইতে এতে লাভ হত ঢের বেশী। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ব্যবস্থায় ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত আসামীকে তার গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দেওয়া হত, আর তার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সবাইকে ইংরেজ বাহাদুরের কেনা গোলাম বানান হত। ("the family of the criminal shall become the slaves of the State, and shsll be disposed of for the general convenience and benifit of the people according to the discretion of the Government") জেল পরিচালনের খরচা ছিল অনেক। তাই, সেকালে দণ্ডিতদের জেলে আটক না রেখে ক্রীতদাস করে বিক্রী করে সুমাত্রা দ্বীপের মার্লবরো কেল্লায় কোম্পানীর কারবারে নির্বাসিত করা হত। কোর্ট হাউসে নিয়মিত ভাবে ক্রীতদাসদের নাম রেজেষ্টারী করা হত। রেজেষ্টারীর শুল্ক খরচা মাথা-পিছু ৪৷৹ আনা।

মগ আর পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা এ সময় বাংলা থেকে মানুষ পর্য্যন্ত লুঠে নিয়ে যেত। এদের ঘাঁটি ছিল সুন্দর বন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের মাত্র ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-বাংলা থেকে আঠার শ নর-নারী ও শিশুকে (এদের মধ্যে সিকি ভাগই শিল্পী) মগেরা লুট করে নিয়ে, দশ দিনে আরাকানে পৌঁছে তাদের রাজার দরবারে হাজির করে। রাজা শিল্পীদের বেছে-বেছে নিয়ে তাঁর গোলাম করে রাখেন। বাকী নর-নারী-শিশু ফিরে পায় বোম্বেটেরা। ওরা এদের গলায় দড়ী বেঁধে গরু-ভেড়ার মত হাটে-বাজারে নিয়ে বিক্রী করে। জন-প্রতি দাম ২০ টাকা থেকে ৭০ টাকা। ক্রেতারা হতভাগাদের নিয়ে চাষের কাজে লাগাত, আর মাসে প্রত্যেককে দিত ১৫ সের চাল। এর অল্প কয় দিন পর মগরাজ দুরুং গেরী কোতোয়াল কুদ্হল পোরী তাকে সিংহাসনচ্যুত করে। গোলমালে সুযোগে ২৫ জন দাস নরনারী পালিয়ে জুন মাসে চট্টগ্রামে পৌঁছে আরাকানের অধিবাসীদের তিন ভাগই তখন বাঙ্গালী, এরা ইংরেজদের কাছে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানায় আর স্থির হয়, তারাও ইংরেজদের এ কাজে সাহায্য করবে। দক্ষিণ-বাংলার মগদের অত্যাচার

...বরই ছিল। ওরা চট্টগ্রাম উপকূলে নেমে ও অঞ্চলের ভেতর ঢুকে ...পুড়াত, মাল লুঠত—যা লুঠতে না পারত, নষ্ট করে যেত, আর ...বাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করত। কোম্পানীর আমলে ...সব উৎপাত থেমে গেছল। (East India Chronicle, 1758)

১৭৬০ খৃষ্টাব্দেও কলকাতার উপকণ্ঠ আকরা, বজবজ প্রভৃতি ...লে পর্তুগীজ ও মগ বোম্বেটেদের এত উৎপাত ছিল যে, ১৭৭০ ...ষ্টাব্দে কলকাতা বন্দর তাদের হাত থেকে নিরাপদ করবার জন্য ...শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের কাছে গঙ্গার উপর দিয়ে শেকল খাটিয়ে ...দেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকটায় ভারতের সব জায়গায় বাংলার ...-নারী-শিশুর কেনা-বেচা চলেছিল। আমীর লোকের ঘরে বালকদের ...ঙ্গা করে অন্তঃপুরে চাকর রাখা হত, আর ছোট-ছোট মেয়েদের ...বৃত্তি করতে বাধ্য করা হত। ("numbers of boys of tender age were bought by dealers and mutilated so as to grow up as suitable servants for the harems of rich lords and little girls were disposed of to evil characters, to be brought up to lives of shame and vice")

কলকাতা সুপ্রিম আদালতের প্রধান বিচারক স্যর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কলকাতা শহরে এমন কোন নরনারী নাই যার অন্ততঃ পক্ষে একটা শিশু দাস নাই। এরা হয় নাম মাত্র দামে কেনা, না হয় বোম্বেটের হাত থেকে উদ্ধার করা। বড় বড় নৌকাতে শিশু বোঝাই করে কল... ...ভাবে প্রকাশ্যে যে বিক্রী করা হয় আপনাদের অনেকে বোধ হয় দেখে থাকবেন। এদের অধিকাংশই হয় ছেলেধরাদের চুরী করে আনা, না হয় দুর্ভিক্ষের সময় দুই-এক কাঠা চালের বদলে কেনা।"

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কলকাতার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এই রকম বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল—

"Wanted—Two coffrees (কাফ্রি) who can play very well on the French Horn and otherwise handy and useful about a house, relative to the business of a consumer or that of a cook; they must not be fond of liquor. Any person or persons having such to dispose of, will be treated with by applying to the printer."

"To be sold—Two French Hornmen, who dress hair and shave, and wait at table."

"Strayed—From the service of his mistress, a slave boy aged twenty years, or there about, pretty white or colour of musty, tall and slender, broad between the cheek bones, and marked with small pox. It is requested that no one after the publication of this will employ him as writer or in any other capacity etc.......".

মুসলমানরা এ দেশে দাস ব্যবসায়ের পত্তন করেছিল, তাদের কাছ থেকে এ ব্যবসার ভার নিয়েছিল খৃষ্টানরা। ("The Company had assumed the Government of the country from Mahomedan rulers, who had recognised legalised bondage, and as most of the Moslem laws for the administration of justice had been unavoidably retained in their entirety, the enactments pertaining to slavery were perpetuated under the Company") কি ক্যাথলিক, কি প্রটেষ্টাণ্ট সব দলের খৃষ্টান ভারতের মাত্র ধন-সম্পত্তি-ইজ্জত লুঠত না, মানুষগুলোকেও গৃহপালিত পশুর মত কেনা-বেচা করত ("This traffic is generally resorted to by the Catholics to supply themselves with domestics; and I am, sorry to say, a few who prefers the Protestant faith, though only in outward appearance, are also concerned in this inhuman traffic—A correspondent in the 'Bengal Chronicle', Feb. 1831)

পশুরা বালক ও বালিকা কেড়ে বা চুরি করে আনাত হিন্দু জননীদের কোল থেকে। অভাবগ্রস্তা অনশনক্লিষ্টা নারী অনেক সময় দানার বিনিময়ে সন্তান বিক্রী করত। বয়স-ভেদে ও প্রয়োজন-ভেদে বালিকার দাম ছিল ১৬৲ থেকে ১০০৲ টাকা। এদের উপর যে ব্যবহার চলত তা নিষ্ঠুরতম। পুলিশ ছিল লুঠেরাদের হাতের মানুষ; কাজেই ভয়ে ওরা পালাতেও পারত না; আদালতের আশ্রয় নেবার মত শক্তিও ওদের ছিল না। সামান্য সামান্য কারণে এরা যে শাস্তি পেত তা বীভৎস। শাস্তির সাধারণ পদ্ধতি—বালিকা, এমন কি যুবতীকে পর্য্যন্ত বাড়ীর পুরুষদের সামনে উলঙ্গ করে বাঁধা হত, তার পর চলত চাবুক। আর এক পদ্ধতি—দারুণ শীতে হতভাগিনীদের নিয়ে যাওয়া হত এক কুয়োর কাছে, তার পর কলসীর পর কলসী ঠাণ্ডা কুয়োর জল এমন ভাবে অবিরাম তাদের মাথায় ঢালা হত যে, ওদের দম আটকে যেত।

হিন্দু-বাড়ীতেও অনেক হতভাগ্য দাস হয়ে থাকত। কিন্তু হিন্দুরা ওদের ভাল করে খাওয়াত-পরাত। প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সময় ওরা নগদ টাকা পুরস্কার পেত। তাদের বিয়ে দেওয়াও হত যত্ন করে। মুসলমানদের সমাজেও অনেক সুন্দরী ক্রীতদাসী হারেমে স্থান পেত। কিন্তু খেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায়ীরা যে ভাবে মানুষ বেচেছে ও হতভাগ্যদের ব্যবহার করেছে তাতে ইংরাজরাও লজ্জা পেয়েছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ওরা দাস-চালান বন্ধ করেছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারী কর্মচারীরা যে চাষী প্রজাদের নিয়ে বেচত তা বন্ধ করবারও হুকুম হয়েছিল ১৮১১ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফল হয়নি। ১৮৩৩-এর সুপ্রসিদ্ধ চার্টার বা সনদ এই দাস-ব্যবসায় পরোক্ষ সমর্থন করেছিল—চার্টার এই ব্যবসা নিষেধ করেনি।

দেশে অবশ্য এ নিয়ে অশান্তি জেগেছিল। বহ্নি যে ধূমায়িত হচ্ছিল, ইংরেজ তা বুঝেছিল। তাই সেপাই-বিপ্লবের ১২ বছর আগে (১লা আগষ্ট, ১৮৪৫ খৃঃ) ইংরেজ মুলুকের সব দাসকে মুক্তি দেবার আদেশ হয়েছিল কিস্তিবন্দী ভাবে। ৬ বছর বয়সের শিশুরা তখনি মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু গৃহপালিত দাসরা আরও ৪ বছর এবং গোলাম চাষীরা আরও ৬ বছর মনিবদের খেটে দিয়ে পরে রেহাই পেয়েছিল।

সেকালে জুতার মর্যাদা

এ যুগের বাঙালীরা তাঁদের পেটেন্ট লেদারের জুতো পরেই যেখানে-সেখানে এবং যার-তার সামনে যেতে অভ্যস্ত। জুতো পরে উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে হাজির হবার দুঃসাহস দেখানোর ফলে তাঁদের পূর্ব পুরুষরা যে দণ্ড দিয়াছেন, সে কথা বিশ্বাস করতে এ যুগের বাঙালীদের বেশ একটু কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন: রাজার ঈর্ষার যোগ্য মণিমুক্তা-খচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে এক জন ক্রোড়পতি বাঙালী খালি পায়ে এক জন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এ যুগে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করতে সত্যই কষ্ট হয়, কিন্তু তখনকার উগ্র আবহাওয়ায় মর্যাদা রক্ষার খাতিরে এমন কানুন চালু ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই উৎপীড়নের প্রথম শীকার বলেই আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য তাঁর ব্যাপারটা অন্য রূপ নেয় এবং তিনি তাঁর উৎপীড়নের প্রতিশোধ যথাযোগ্য ভাবেই নিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সাল। কলকাতার দরবার-হলে রাজকীয় ঘোষণা-বাণী পাঠ করা হবে। এমন ঐতিহাসিক দৃশ্য এবং যুগান্তকারী ঘটনা সচরাচর হয় না। যথানির্দিষ্ট সময়ে দরবার বসল। কলকাতার ধনী ও মানীদের সামনে গুরুগম্ভীর স্বরে ভারতের মহান্ সনদের উদাত্ত বাণী পাঠ করা হল। মূল সনদ পঠিত হবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডাক পড়ল।

সনদের বাংলা অনুবাদ পাঠ করে শোনবার ভার ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর। কিন্তু কোথায় সেই পণ্ডিত? দরবারে তাঁকে পাওয়া গেল না। নিরুদ্দিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠান হল। কিন্তু হায়, পণ্ডিতকে পাওয়া গেল দরবার হলের গেটের বাইরে। দেশী ধুতি এবং ঠনঠনিয়ার চটি পরে বিষণ্ণচিত্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এই পোষাক ছাড়া তিনি আর কোন পোষাকের ধার ধারতেন না। দরবার-হলের গেটের দারয়ানরা কিন্তু তাঁর এই পোষাক দেখেই তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি! এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে তাড়াতাড়ি উপরে নিয়ে যাওয়া হল। গুরুভার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য চটি পরেই তিনি দরবার-হলে গিয়ে হাজির হলেন।

নদীয়া জেলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান পবিত্র, মধুর ও মহত্তম চরিত্রের অধিকারী স্বনামখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর ভাগ্যেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৬৫ সালে এলাহবাদ সহরে। সেই সময় তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্ণর ছিলেন সার এডওয়ার্ড ড্রমণ্ড। তাঁর চাকরী-জীবনের প্রথম যুগে তিনি যখন বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় রামতনু লাহিড়ী ছিলেন বর্দ্ধমানের এক জন স্কুল-শিক্ষক। রামতনু এলাহবাদ বেড়াতে গিয়ে বিখ্যাত বাবু নীলকমল মিত্রের অতিথি হন। তাঁর ধারণা ছিল, মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর বর্দ্ধমানের শিক্ষকটিকে বিস্মৃত হননি। তাই তিনি নীলকমল বাবুর কাছে প্রকাশ করেন যে, তিনি গবর্ণরের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হবেন। নীলকমল বাবুর তখন সৌভাগ্য-সম্পদের অভাব নেই। তা ছাড়া তিনি ছিলেন খুব সহজ ও সরল প্রকৃতির লোক। রামতনুকে তিনি বোঝালেন যে, রামতনুর মত দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের পক্ষে জোর করে প্রদেশের শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ঔদ্ধত্য হবে বলে তিনি মনে করেন, কাজেই রামতনুর পক্ষে এমন আশা পোষণ করা উচিত নয়। যাই হোক, রামতনু যা ভাল বুঝলেন, তাই করলেন। গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে পত্র লিখে তিনি গবর্ণরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তাঁকে বেশী দিন প্রতীক্ষায় কাটাতে হয়নি। অতি সত্বরই গবর্ণমেন্ট-হাউস থেকে সাক্ষাতের দিন নির্দিষ্ট করে পত্রের উত্তর চলে এল। নীলকমল বিস্মিত হলেন বটে, তবে নিজের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর চেয়েও খুশী আর কেউ হননি। নির্দিষ্ট সময়ে নীলকমলের চমৎকার ল্যাণ্ডোয় চেপে তিনি গবর্ণর-হাউসের প্রাঙ্গণে গিয়ে নামলেন। গাড়ী থেকে নামতেই গবর্ণরের ১৮।১৯ বছর বয়সের এক বদমেজাজী ছেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই ছোকরা অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল: এখানে কোন কাজে এসেছ বাপু? গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে আছে না কি? রামতনু বললেন: আজ্ঞে হ্যাঁ, গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।

ছোকরা ড্রমণ্ড বলল: আগে থেকে সময় নির্দিষ্ট করা আছে কি? রামতনু বললেন, আছে। উত্তর শুনে ছোকরা "বাবু"দের সম্বন্ধে অস্ফুট নানা রকম মন্তব্য করতে করতে সরে পড়ল। এদিকে রামতনুর ল্যাণ্ডো আর তার জুড়ি ঘোড়া দেখে চাপরাশীরা তো অবাক্। গবর্ণমেন্ট হাউসের যত চাপরাশী ছিল, সব এসে রামতনুকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা সকলে মিলে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে রামতনুকে লাট সাহেবের সামনে নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, বকশিসের পরিমাণটি মোটেই ছোট-খাট হবে না। কিন্তু তারা সকলেই রামতনুর জুতো খোলবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনও—কোন দিনই হতে পারে না। চাপরাশীদের কাছে অনুনয় করে লাভ নেই। একশ'—এমন কি হাজার টাকা দিলেও তারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারবে না। রামতনুর পক্ষে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ এবং অনুনয় করা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না। এদিকে বিলম্বের ফলে গবর্ণর অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এক জন দেহরক্ষীকে অনুসন্ধান করতে পাঠালেন। দেহরক্ষী বাইরে এসে দেখেন, চাপরাসীরা রামতনুকে এমন ভাবে ঘিরে রয়েছে যে, তাঁর পক্ষে এক পা এগোনো সম্ভব নয়। দেহরক্ষী ব্যাপারটা গবর্ণরের কাছে গিয়ে বলতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর যৌবনের বাঙালী বন্ধুদের জন্য জুতো-কানুনের কড়াকড়ি হ্রাসের আদেশ দিলেন।

ঠনঠনিয়ার চটি ১৮৭৪ সালে বিদ্যাসাগরকে আর একবার বিশেষ অসুবিধায় ফেলেছিল। তখন মিউজিয়াম ছিল পার্ক ষ্ট্রীট এসিয়াটিক সোসাইটির বাড়ীতে। বিদ্যাসাগর তাঁর এক পশ্চিমা বন্ধুকে নিয়ে মিউজিয়ামে গেছেন বেড়াতে। গেটের দারওয়ান বলল যে, চটি পরে তিনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। হয় চটি জোড়া তাঁকে বাইরে রেখে যেতে হবে, না হয় চটি জোড়া হাতে করেই মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াতে হবে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এই মহামানব বাড়ী ফিরে এলেন এবং সোসাইটি-কর্ত্তৃপক্ষ এবং মিউজিয়াম-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সুদীর্ঘ পত্র লিখে বিষয়টা তাদের জানালেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে উত্তর তাদের কাছ থেকে পেলেন, সে উত্তর মোটেই আশানুরূপ সন্তোষজনক নয়। সরকারী দপ্তরে ঠনঠনিয়ার চটি এখনও অপাংক্তেয় এবং নিন্দার্হ বলেই মনে হয়। মাদ্রাজে তো হাইকোর্টের বিচারপতি এবং আইন পরিষদের সদস্যরা পর্য্যন্ত খালি পায়ে গবর্ণরের পার্টিতে যোগদান করেন।

স্বামীজী মহারাজ

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সংসারে বিশ্বাসের ন্যায় বন্ধু ও আশ্রয় আর কিছুই নাই। ভাগ্যক্রমে যদি একবার কোন পথহারা পথিকের ভগবান রামকৃষ্ণের অবতারত্বে ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস হয় ত তাহার পথ হারাইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে যে যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের বাণীতে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে ত উত্তম। কিন্তু যদি তোমার বিচারপরায়ণ মন সেরূপ ঐতিহাসিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের জীবন-কাহিনী ও বাণীকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তোমার সেরূপ কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না; কারণ ইনি অতি আধুনিক এবং গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি রত্নস্বরূপ অতি বুদ্ধিমান ও বিচারপরায়ণ বিদ্যার্থী শ্রীশ্রীঠাকুরকে যথেষ্ট পরিমাণে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের উত্তর-জীবনে তাঁহাদের অক্লান্ত কপট, প্রাণপাতী সাধনা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান হইতে বুঝিয়াছিলেন যে রামকৃষ্ণের প্রতি উক্তিটি অকাট্য সত্য এবং অভ্রান্ত। হে পথহারা পথিক, যদি তুমি নিজেকে পথহারা মনে কর, যদি তুমি তোমার জীবনের গন্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হও, যদি তুমি নিজেকে আশ্রয়হীন মনে কর, যদি সত্যকে জানিবার জন্য তোমার আন্তরিক আগ্রহ থাকে, ত শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লও, তাঁর শ্রীমুখনির্গত ভগবদ্বাক্যকে বিশ্বাস কর, এবং তাঁকে তোমার জীবনের একমাত্র আদর্শ, আরাধ্য ও গতি বলিয়া গ্রহণ কর। দেখিবে শান্তি তোমার করায়ত্ত, তুমি আনন্দের অধিকারী হইয়াছ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা ক্রমশঃ তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'দেখলাম, পূর্ণ অবির্ভাব তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য।' সেবাক্যটিকে অবলম্বন করিয়া আমরা স্বামীজীর জীবনের মূল রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বেদান্তপ্রচারকার্য্যে, দেশের সেবায়, দেশবাসীর ভিতর জাগরণ আনয়ন বিষয়ে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি এক জন অসাধারণ কর্ম্মযোগী। এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন "হাঁ, বিবেকানন্দ এক জন খুব বলনেওয়ালা, খুব এক জন কর্ম্মযোগীও বটে; তবে যাকে প্রকৃত সাধু বলে সে রকম ত আর তাঁকে বলা যায় না।" তিনি কর্ম্মযোগী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কিসে তাঁহাকে কর্ম্মযোগী করিল ইহাই আলোচনার বিষয় এবং এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বুঝিব, তিনি এক জন প্রেমিক সন্ন্যাসী ও নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুগাবতার, যুগ কার্য্যসিদ্ধির জন্য, জগতে উদার, অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রচারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ শুদ্ধসত্ত্বগুণমণ্ডিত ছিলেন যে তাঁর দ্বারা জগতের কার্য্য করিয়া বেড়ান সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন পূর্ণশক্তির অবতার এবং শক্তির পূর্ণত্বের অবস্থায় তাহার কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না। তাই তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রনাথের ভিতর তাঁর শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই মহাশক্তিই স্বামীজীকে এক মহান কর্ম্মযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীজী স্বরূপতঃ ছিলেন নিত্যসিদ্ধ, মহা পবিত্র, ধ্যাননিষ্ঠ ঋষি, ভগবানের পার্ষদ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "অবতারের সঙ্গে কল্পান্তের ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ, তাঁদের দ্বারাই ভগবান কার্য্য করেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে, তাঁর আরব্ধ যুগকার্য্যের সহায়স্বরূপে তিনি জগতে আসিয়াছিলেন—তাই তিনি কর্ম্মযোগী। তিনি ত সাধুশ্রেষ্ঠ, কেবল কয়েক দিনের জন্য সংসার-রঙ্গমঞ্চেও এক কর্ম্মযোগীর অভিনয় করিয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় একস্থানে সমাহিত হইয়া থাকা সাধুর ন্যায় শুধু তিনি ছিলেন না বটে; কিন্তু সাধনা দ্বারা ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজী জন্ম হইতেই সে অবস্থার অধিকারী ছিলেন। অতএব তিনি যে কিরূপ সন্ন্যাসী সাধু ছিলেন তাহা তাঁর চরিত্র-সমালোচকগণ যেন প্রকৃত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিয়া দেখেন। স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছেন, "ইচ্ছা করলে কি আমি হিমালয়ে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি না? তা আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ঠাকুর কালী কালী বলে যাঁকে ডাকতেন সেইটা আমার ভিতর ঢুকে গেছে, সেইটেই আমাকে এ কাজ ও-কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়।" সেই পবিত্র কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে মনে কর স্বামীজীর ভিতর ঠাকুরের শক্তি-সঞ্চারের কাহিনী। অতএব শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায়, ঠাকুর ছিলেন শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহাশক্তি অবতাররূপে আবির্ভূত এবং তাঁর কার্য্যের জন্য সত্ত্বের সহিত রজঃ মিশ্রিত স্বামীজীকে এক বিরাট কর্ম্মশক্তিরূপে তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন যিনি তাঁর বর্ত্তমান জগতের গোড়া ধরে নাড়া দিয়াছিলেন। ইহাই হইল স্বামীজীর জীবনের মূল রহস্য।

ধ্যাননিষ্ঠ যোগীকে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহার কি প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমি কেবল সমাধিস্থ হয়ে থাকব, যখন একটু দেহজ্ঞান আসবে তখন দেহরক্ষার জন্য একটু খেয়ে আবার সমাধিতে লীন হয়ে থাকব।" মহাচক্রী ঠাকুর। নরেন্দ্রনাথের পরমারাধ্য হৃদয়দেবতা এ-কথায় যেন সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ইচ্ছা করেন নাই যে, নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকুক। উত্তর শুনিয়া সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই ত বড় হীনবুদ্ধি। বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় কোথায় তুই অগণিত লোকের আশ্রয় হবি, তা না তুই স্বার্থপরের মত নিজের সুখ, নিজের মুক্তি চাচ্ছিস।" নিত্যমুক্ত স্বীয় সন্তানকে যিনি নিজ মায়ায় বদ্ধ করিয়া সংসারে নিজ কার্য্য-সাধনের জন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তিনি তাঁর প্রার্থনা আংশিক ভাবে পূর্ণ করিলেন বটে, তিনি তাঁহাকে সমাধির আস্বাদ দিলেন, কিন্তু সমাধিভঙ্গের পর বলিলেন, "অদ্বৈতের ঘরে এখন তালা দেওয়া থাকল, চাবি আমার কাছে থাকবে, তুই মা'র কাজ করবি। কাজ যখন শেষ হবে—তখন চাবি খুলে দেব।" ভক্ত-ভগবানের মধ্যে কি মধুর সম্বন্ধ—ভক্ত শিষ্য, ভগবান গুরু। এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা এতই গভীর যে, উহা উভয়কে একে পরিণত করে। তখন আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না, ভক্ত-ভগবান সম্বন্ধ থাকে না—তখন থাকে এক সত্তা, এক জ্ঞান ও এক আনন্দ। প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য নরেন্দ্রনাথ তখন আর কি করেন? তিনি কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি প্রতিটি কার্য্যে, প্রতিটি পদবিক্ষেপে আত্মারাম ঠাকুরের মুখাপেক্ষী ছিলেন; তাঁর

নির্দ্দেশ না পাইলে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। প্রেমময় রামকৃষ্ণও নরেনের প্রেমে এতই বাঁধা ছিলেন যে, তিনি নিয়তই তাঁর অন্তরঙ্গ পরম প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ, তথাপি তিনিই নরেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের ইহা প্রত্যক্ষ করা সত্য।

সেই চিকাগো সহরের বিশাল ধর্ম্ম মহামেলা, সহস্র সহস্র সুধীবৃন্দ সমবেত ও দেশবরেণ্য বাগ্মী সকল সমুপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইলেন, তখন সাময়িক ভাবে অসংভাবাপন্ন হওয়ায় তিনি একটু বিচলিত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর যখন তাঁর আরাধ্য দেবকে স্মরণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়া তাঁর আত্মাস্বরূপ সেই শ্রীরামকৃষ্ণই বক্তৃতা প্রদান করিলেন, অখ্যাত নরেন্দ্রনাথ তখন জগৎপ্রখ্যা বিবেকানন্দে পরিণত হইলেন কখন কখন তাঁহাকে কঠোর বিপদের সম্মুখীনও হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁর হৃদয়-দেবতা তাঁহাকে সেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁর অপার স্নেহ ও কৃপার নিদর্শন তাঁহাকে দেখাইয়াছেন! কখন কখন স্বামীজী মনে করিতেন যে, তাঁর জানা সব কথাই ত বলা হইয়া গিয়াছে, পুরান কথা ত পুনঃ পুনঃ বলা সঙ্গত হইবে না। কি নূতন কথা আর বলা যাইবে? সেই সময়ই রাত্রিতে তিনি অলৌকিক ভাবে কত নূতন চিন্তা ও ভাবরাশি-পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেন এবং ঐ সকল বিষয় তিনি পরদিন বক্তৃতায় বলিয়া যাইতেন। এগুলি তাঁর আত্মারূপী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ভিন্ন আর কিছুই নহে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সহিত অভিন্ন শ্রীশ্রীমার আদেশ, আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছায় তিনি আমেরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি ঝটিকার ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন করিতেন ও তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। অতএব তিনি যে এক জন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক কর্ম্মযোগী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাঁর প্রবর্ত্তিত শিবজ্ঞানে জীবসেবাও কর্ম্মযোগের অন্তর্গত এক যোগবিশেষ। এই কর্ম্মযোগের যথাযথ অনুষ্ঠানে শিবের সেবক জীবও শিবত্ব লাভ করে। শিবত্বলাভের এ এক অভিনব পন্থাই বটে। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম্মযোগও তিনি তাঁর হৃদয়-দেবতার নিকটই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পূর্ণরূপে আবির্ভূত শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীহস্তের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন স্বামীজী—যিনি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাকে জগৎময় প্রচার করিয়া জগৎবাসীর অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীকে কেবল মাত্র কর্ম্মযোগী বলিলেই চলিবে না, তিনি এক জন মহান্ জ্ঞানযোগীও বটে। তন্দ্রালুপ্ত ভারতভূমিকে জাগাইবার জন্য তিনি কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র নরেনই জ্ঞানের অধিকারী। স্বামীজী ছিলেন জ্ঞানঘন মূর্ত্ত বিগ্রহ। জ্ঞানাগ্নি তাঁর ভিতর নিয়ত প্রজ্বলিত থাকিত। বেদান্তের সুমহান্ অদ্বৈতবাদকে তিনি মনুষ্য সমাজে আনয়ন করিয়াছিলেন। দেশের মানুষ কর্ম্ম ও জ্ঞানহীন হইয়া ঘোর তমতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই জন্য তিনি প্রথমে তাহাদিগকে রজোগুণী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। রজোগুণী হইতে হইলে, আলস্য-জড়তা প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে হইলে হইতে হইবে কর্ম্মযোগী, হইতে হইবে শিবজ্ঞানে জীবসেবা-পরায়ণ, হইতে হইবে মহা পবিত্র, এবং তাহা হইলে মানুষ সাত্ত্বিকতার মহিমা বুঝিতে পারিবে এবং তখনই সে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম লাভের অধিকারী হইবে। সর্ব্বোত্তম অধিকারী না হইলে জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। স্বামীজী উত্তম অধিকারী, তাই তিনি জ্ঞানযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন।

স্বামীজীকে আমরা কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগিরূপে দেখিয়াছি, এইবার তাঁহাকে ভক্তিযোগিরূপে দেখার চেষ্টা করিব। যে জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটিরই চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় সেই জীবনই সার্থক। স্বামীজী মহারাজের জীবনে এই তিনেরই চরমোৎকর্ষ দেখা যায়। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এই তিনের সমন্বয় সাধন করিয়া এক পূর্ণ জীবনের আদর্শ তাঁর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তিনিও সেই আদর্শানুসারে নিজ জীবন গঠন করিয়াছিলেন। ভক্তিযোগ ছিল স্বামীজীর অন্তরের ভাব। বাহিরে তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলিয়া মনে হইলেও তাঁর ভিতরটি ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা ঠিক তাঁর গুরু মহারাজের বিপরীত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বাহিরে ভক্তিময়, কিন্তু ভিতরে জ্ঞানময়। ভক্তি ও ভাবে পাছে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন, এই জন্য স্বামীজী যথাসাধ্য উহাকে চাপিয়া রাখিয়া কর্ম্মের কঠোর আবরণে নিজেকে আবৃত রাখিতেন। ব্রহ্মজ্ঞ—সর্ব্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তিনি যাঁর শ্রীচরণভিখারী, যাঁর তিনি কিঙ্কর, সেই শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তাঁর নিকট স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না, কারণ সর্ব্বজীবে তিনি আত্মাকে দর্শন করিতেন। 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক' এই ভগবদ্বাক্য তাঁর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর তাঁর অদ্বৈত ভাবকে স্বামীজীর ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, চাবি দেওয়া থাকিলেও তিনি অদ্বৈতের আস্বাদ ভুলিতে পারেন নাই। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা কখন কি অদ্বৈত অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারেন? স্বামীজীর প্রতি বক্তৃতায়, বাক্যে ও কার্য্যে অদ্বৈত ভাব ফুটিয়া উঠিত। কর্ম্মজীবনে কিরূপে অদ্বৈতকে খাপ খাওয়াইতে হয় তাহা স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। মহা-জ্ঞানী স্বামীজী মহারাজ তাঁর তীক্ষ্ণতম বুদ্ধি প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কি রহস্য পদার্থ তাহা বুঝিতে ও অপরকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। তত্রাপি শ্রীরামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ অখণ্ড বস্তু বলিয়া তাঁহার স্বরূপকে কি করিয়া মুখে বুঝাইবেন? তাই তাঁকে বুঝাইলেও তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ধ'রে কে যে এসেছিলেন, তা আজীবন তপস্যা ক'রেও কিছুমাত্র বুঝতে পারলুম না।" জ্ঞানঘন মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণই স্বামীজীতে রূপান্তরিত, তাই স্বামীজীও স্ব স্ব রূপে সদা জাগ্রত। গুরু রামকৃষ্ণ ও শিষ্য স্বামী প্রেমে এক, আবার প্রেম আস্বাদন জন্যই সেই এক দুইয়ে বিভক্ত এই লীলার আসরে।

মহা খেলোয়াড় ঠাকুর প্রথমে নরেন্দ্রনাথের নিকট নিজেকে প্রকট করেন নাই, তাই ঠাকুর তাঁর চির আদরের সঙ্গীকে দর্শন মাত্র চিনিয়া লইলেও রামকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিছু দিন এইরূপ লুকোচুরি খেলার পর নরেন্দ্রনাথ জানিলেন—যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানিং রামকৃষ্ণ, মন্দিরের ঐ

আনন্দময়ী মাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তাঁর সম্মুখে বিরাজমান। তখন 'তোমারেই করিয়াছি জীবনেরই ধ্রুবতারা' এইরূপই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর হৃদয়ের ভাব। এইবার মহাভক্তরূপে বিবেকানন্দ আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছেন। তাঁর হৃদয় ছিল মাখনের ন্যায় কোমল, রামকৃষ্ণ-প্রেমের সামান্য উত্তাপে উহা একেবারে গলিয়া যাইত। 'নিত্যসিদ্ধের থাক' হইতে আগত স্বামী 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এই নাম শুনিলে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, পাগলপ্রায় হইয়া যাইতেন, সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে প্রেম তাহা অবর্ণনীয়, অতুলনীয়, স্বর্গীয়, উপভোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও গতি এই প্রাণ মাখান প্রেমের জন্যই তিনি সময় সময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও অভিমান করিতেন। তাঁর পরমারাধ্য হৃদয়-দেবতার নিকট তিনি প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধি। পুত্র তব ......দাস তোমা দোঁহাকার।" "যস্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য, তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।" তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ, সোঽয়ং জাতঃ প্রথিত-পুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।" অতএব রামকৃষ্ণই তাঁর আপন জন, পরম আত্মীয় ও বন্ধু, মাতা, পিতা, গুরু ও আরাধ্যতম ইষ্টদেব। ধ্যানের অগোচর নির্বিকল্প পুরুষ, আনন্দঘন মূর্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণরূপী পরব্রহ্মকে কিঞ্চিৎও যদি বুঝিতে হয় ত স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব স্বামীজীই প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ... বিবেকানন্দই ব্যাখ্যাস্বরূপ। স্বামীজীকে বাদ দিয়া ঠাকুরকে বুঝিতে যাইলে পণ্ডশ্রমই সার হইবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণভাবের ব্যক্তমূর্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের ব্যবহারিক অভিব্যক্তি, স্থির সমুদ্ররূপী রামকৃষ্ণের উপরিস্থিত উত্তাল তরঙ্গ। এই তরঙ্গকে ভেদ করিতে না পারিলে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ জ্ঞান ও প্রেমসিন্ধুর মধ্যে প্রবেশ করা যাইবে না।

স্বামীজীর জীবনের আর একটি গভীরতর দিক্ আছে, উহা শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর ঐকান্তিকী ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। ঠাকুরের প্রতি তাঁর যে ভক্তি তাহা তাঁর শ্রীশ্রীমার প্রতি যে ভক্তি তাহার তুলনায় ফিকে। শ্রীশ্রীমা যে মহাশক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী, ইহা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। শ্রীমার প্রতি তাঁর যে ভক্তি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—উহা এক অপার্থিব দেববাক্যের বিষয়। শ্রীশ্রীমা অপেক্ষা বড় আর কিছুই তাঁহার নিকট ছিল না, তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমার নিকট মা'র কৃপা বাবার কৃপা অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিকতর মূল্যবান।" জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি দৈবী সম্পদ পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের শ্রীশ্রীমাই যে একমাত্র অধিকারিণী। সেই মহাশক্তির কৃপা না হইলে যে কিছুই হইবার নহে। মা ভিন্ন সন্তানের দুঃখ আর কেহই দূর করিতে সক্ষম নহেন, একমাত্র শ্রীমাই সন্তানকে তার চিরকাম্য শান্তি ও আনন্দ দানে সমর্থা। কর্মযোগীর কর্মশক্তিও সেই মা। শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণই একমাত্র সাধ্য-বস্তু, তাই স্বামীজীর জীবনে শ্রীশ্রীমার প্রতি ভক্তি এত প্রকট, এত গভীর, এত মধু মাখা। এই মাতৃভক্তিই স্বামীজীর জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, নচেৎ কেবল মাত্র কর্ম ও জ্ঞানকে লইয়া থাকিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইত।

আজ ভারতবাসী তার জাগরণের জন্য, তার সর্ববিধ উন্নতির জন্য মুখ্যতঃ স্বামীজীর নিকট ঋণী, এমন কি রাজনৈতিক নেতাগণও তাঁর জীবন ও বাণী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যানুকরণ-মোহ-মদিরা পানোন্মত্ত ভারতবাসীর মোহ তিনিই ভঙ্গ করিয়া তাহাকে আত্মসংবিদ দান করিয়াছেন। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী পুনরায় আত্মবিশ্বাসী হইতেছে। অস্পৃশ্যতা যে বর্জ্জনীয় ইহা ভারতে পূজনীয় স্বামীজীরই প্রথম আন্দোলন। শিবজ্ঞানে জীবকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বে গ্রন্থমধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, স্বামীজীই উহা এবং জীবজ্ঞানে শিবের সেবারূপ ধর্ম্মকে মানব-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। ভারতের ভাবরাশি ও ঐশ্বর্য্যকে পাশ্চাত্যে প্রচার ও বিস্তারের মূলেও শ্রীবিবেকানন্দ। তাঁর প্রচারের ফলেই ভারত আজ পাশ্চাত্য জগতে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। এই শিবরূপী স্বামীজীর জীবন ও বাণী যতই আলোচনা করা যাইবে ততই মঙ্গল, ততই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ।

"ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।

প্রভো, এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমরা মহাপাপী—স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট, নরক-মার্গ—ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া অধোগতি হইয়াছে। বাপ্, আকাশ-পাতাল ভেদ!! প্রভু কি গল্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলিয়াছেন, 'ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী'—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। আর আমরা বলিতেছি—"দূরমপসর রে চণ্ডাল"—অরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা;— "কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী"—কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে!"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রভাত-সঙ্গীত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

মহাস্থবির

মাতাল

হারাণ

মাতালের ঠিক সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। যে মদ্যপান করে তাকেই কি মাতাল বলা চলে? তা বোধ হয় নয়, কারণ 'মাতাল' শব্দটি অপবাদাত্মক তো বটেই এবং প্রয়োগও হয়ে থাকে প্রায় আক্রমণ হিসাবেই। বেদ থেকে আরম্ভ করে আজকের নাটক-নভেল পর্যন্ত মাতালের কেলেঙ্কারী পড়ে, নিজের যা জানাশোনা, কোনো মদ্যপায়ী পূর্বাচার্যদের ইতিবৃত্ত শুনে এবং নিজে দেখে বিচার করে লোকে মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলে গালাগালি দিয়ে থাকে।

অথচ এই মদ অনেকেই খায়। দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে যাঁদের আসতে হয়েছে সারা জীবন ধরে, তাঁরাই জানেন যে পরিচিতদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ জন লোক মদ্যপান করে থাকে। যাঁরা মদ্যপান করেন না তাঁদের মধ্যে শতকরা একটা মোটা অংশ মদ্যপান করেন না—খেতে খারাপ লাগে, বাড়ীর ভয়, স্ত্রীর ভয় ইত্যাদি নানা ভয়ে—মদের প্রতি ভয় বা ঘৃণা বশতঃ নয়।

'মাতাল অসহনীয়'—এই বাক্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে নিশ্চয় কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সহনীয় মাতালও আছে। সংখ্যায় কম হোলেও এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যে মদ্যপান করলেও অভদ্র নয় এবং মত্ত অবস্থাতেও যে ভদ্রতা-চ্যুত হয় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, শুধু মদ্যপানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 'ভালো'র সংখ্যা অল্পই হয়ে থাকে।

'অধিকারী ভেদ' বাক্যটি যে নিশ্চিত সত্য তা আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যারা মদ্যপানের অধিকার নিয়েই সংসারে আসে তাদের ছাড়া মদ্যপানের অধিকার আর কারুর নেই। কিন্তু মুস্কিল এই, কে যে সত্যকারের অধিকারী আগে থেকে তা জানবার উপায় নেই। সকলেই নিজেকে 'অধিকারী' মনে করে সুরু করে দেয় এবং অনধিকারিত্ব প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও ছাড়তে পারে না, তাইতেই মদ্যপায়ীর এত দুর্নাম। যে যুক্তিতে ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দেবতা বলা হয়েছে, সেই যুক্তি অনুসারেই মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলা হয়েছে। ছেলেবেলায় অনেক মাতালই চোখে পড়েছে, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বাল্যকালে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, 'মাতাল' দেখবার আগেই ভাগ্যগুণে এক মদ্যপায়ীর সংস্পর্শে এসেছিলুম। যাঁর কথা বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ ছিল প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের। কিন্তু বয়সের এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল ভদ্রলোকের অপা[র] ঔদার্য। আমি, আমা[র] ছোট ভাই ও তিনি এই তিন জনে মি[লে] আমরা এমন আড্ডা জমিয়েছিলুম [যে] লোকের চোখে [সেটা] বিসদৃশ ঠেকত। [এ] কথা এক দিন শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—ওরা নিজেরা বুড়ো হয়েছে কি না তাই সবাইকে বুড়ো দেখে। ওদের কথা কানে তুলো না ব্রাদার।

তাঁর অন্তরটি ছিল কাব্যময়। কাছে গিয়ে বসলেই, দু'-চার এ-কথা-সে-কথার পর প্রায়ই কাব্যের কথা পাড়তেন—অধিকাং[শ] ইংরিজী কাব্য। কাব্যের অলঙ্কার নয়, কাব্যের ভাবরূপের কথা। বয়সের হিসাবে আমাদের বুদ্ধি একমাত্র 'লেখাপড়া' ছাড়া আর প্রায় সব বিষয়েই একটু 'ইয়ে' থাকলেও কাব্যসাগরে ডুব মারবার মত দম তখনো তৈরি হয়নি। কিন্তু কাব্যের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব সম্বন্ধে যে অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে তিনি আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছে দিতেন তা স্মরণ করে আজও বিস্মিত হই। বালক-মনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এমন সহমর্মিতা তাঁর ছিল যা কদাচিৎ মেলে।

এই ভদ্রলোক মদ্যপান করতেন। এমনিতেই তাঁর স্বভাবটি ছিল মিষ্টি, কিন্তু যখন মদ্যপান করতেন তখন তাঁর কথাবার্তা, ব্যবহার মধুরতর হয়ে উঠত। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 'লেখা-পড়া' নাটকের অভিনয় সুরু হোতো আর এই সন্ধ্যা বেলাটাই ছিল তাঁর মৌতাতের সময়। শনি, রবিবার ও অন্য ছুটির সময় বাড়ীর অগোচরে ফুরুৎফাৎ পালিয়ে মাঝে মাঝে আমরা দু'-ভাই তাঁর আসরে গিয়ে হাজির হতুম। এই দিনগুলির কথা স্মৃতি-সাগরের তলায় মহামূল্য রত্নের মতন থিতিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য আমার সারা জীবনকে ব্যেপে রয়েছে।

প্রধানত এই কারণেই, হয়ত এর সঙ্গে পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকলেও থাকতে পারে—মদ্যপায়ীর প্রতি একটা কৌতূহল ছিল ছেলেবেলায়। বয়সের সঙ্গে চোখ-কান খুলতে লাগল আর মদ্যপায়ীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ প্রকট হোতে লাগল চোখের ওপর।

সে যুগে অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনের তুলনায় এখন মাতালের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেলেও পথে-ঘাটে মাতালের কেলেঙ্কারী আর দেখতেই পাওয়া যায় না, বলা চলে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ডেকো-হেঁকো মাতালের চাইতে চোরা-মাতালের সংখ্যা বেড়েছে বেশী।

আমাদের পাড়ায় ছিল হারাণের দোকান। তার বাড়ী ছিল আহিরীটোলা অঞ্চলে আর দোকান ছিল এদিকে। আমাদের জ্ঞান হওয়া এস্তক হারাণকে সেই দোকানে দেখেছি। হারাণ ঘুড়ি তৈরী করত। তার মতন ভাল ঘুড়ি তৈরী করতে কলকাতায় আর কেউ পারত না। কলকাতা মানে, এখনকার মধ্য ও উত্তর কলকাতা। বালীগঞ্জ বা ভবানীপুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হোতো না। ভবানীপুরের বাসিন্দারা এদিকে আসতে হোলে বলতেন, কলকাতায় যাচ্ছি। ঘুড়ি ছাড়া হারাণ লম্বা তাদের

...ছুনে কাঠের গোল চাকতি লাগানো 'ফাইল'ও তৈরী করত। ...ল সাতটা-আটটা থেকে বেলা বারোটা, আবার ওদিকে বেলা ...টো-তিনটে থেকে রাত্রি দশটা অবধি, তার দোকানে গেলেই ...ত পাওয়া যেত সে কিছু না-কিছু করছেই—সে ছিল একলা ...র কাজের জন্য অন্য কোনো লোক সে রাখত না।

হারাণ ছিল একেবারে আর্টিষ্ট। বড় বড় মোটা বাঁশ এনে ...শিল্পীর মতন অধ্যবসায়ে সেই বাঁশ চিরে চিরে ছোট ছোট কাঠি ...রে, সে-গুলোকে চেঁচে-ছুলে ঘুড়ির কাঁপ তৈরি করত। ছুটির ...পাড়ার ছেলেরা ঝাঁক বেঁধে হারাণের সামনে গোল হয়ে ...তার কাজ দেখত।

পঞ্চাশের ওপরে বয়েস হলেও বুড়ো লোককে সে একেবারেই ...চ ঘেঁষতে দিত না। পাড়া-বেপাড়া যত ছেলের সঙ্গে ছিল তার ...আর তারাই ছিল তা'র বন্ধু।

ছেলেদের কারুর আসল নাম ধরে সে ডাকত না। প্রত্যেকেরই ...করে সে নাম দিয়েছিল আর সেই নামেই তাকে ডাকত। ...করণ করার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল—প্রত্যেকের নামই ছিল কোনো ...আজের বা সব্জীর, যেমন আলু, পটল, ঝিঙে, করলা ইত্যাদি। ...কের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শাক-সবজীর আকৃতি ও ...তিগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করবার প্রতিভা ছিল তার আশ্চর্য ...ম্মর।

একবার পাড়ায় এক জনেরা এল। তাদের বাড়ীর একটি ...লে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছিল। ...লেটির সঙ্গে দু'-দিনেই আমাদের খুব ভাব জমে গেল। নতুন ...টিরও ছিল ঘুড়ি ওড়াবার সখ। এক দিন বিকেলে তাকে নিয়ে হারাণের দোকানে গিয়েছি ঘুড়ি কিনতে—ছেলেটার গায়ে ছিল সবুজ ...ির ওপর লম্বালম্বি শাদা ডোরাকাটা সার্ট। হারাণ তখন ...নীচু করে ঘুড়ির কাঁপ চাঁচছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে ...ই বললে—হ্যাঁ ভাই রাঙা আলু, এই চিচিঙ্গেকে কোথা থেকে ...াড় করলে ভাই?

বলা বাহুল্য, হারাণ আমাকে রাঙা আলু বলে ডাকত। ...দের সেই নতুন বন্ধুর নাম ছিল মনমোহন, ডাক নাম মোনা। ...দারের একমাত্র ছেলে, বাড়ীতে ও দেশে দোর্দণ্ড প্রতাপ তার। ...অবস্থা থেকে আজ্ঞে, হুজুর, বাবু শোনাই তার অভ্যেস। ...ৎ ম্যালেরিয়ার ঠেলায় কলকাতায় চলে এসেছে—তাকে কি না ...িঙ্গে! মনমোহন তো রেগে একে বারে টং হয়ে গেল। সেও ...ড় কিনতে এসেছিল কিন্তু ঘুড়ি না কিনেই চলে এল। আমাকে ...লে—ঐ ছোটলোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন রে তোর? তোকে ...আলু বলে আর তুই কিছু বলতে পারিস নে!

সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতে চিচিঙ্গের সঙ্গে হারাণের এমন ভাব ...গেল যে তার বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল—দিন-...র একটা বুড়োর সঙ্গে তোর এত কথা কিসের রে?

হারাণের হাল-চালই ছিল এক রকমের। চমৎকার রং-বেরংয়ের ...সে তৈরি করত কিন্তু আমাদের মনের মতন রং বেছে ...কেনবার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তার দোকানের ...ার একখানা শ্লেট ঝুলত আর তাতে লেখা থাকত—আজ ...ময়লা, আজ সতরঞ্চি, আজ পক্ষীওয়ালা ইত্যাদি। এক দিনে নানা রংয়ের ঘুড়ি বিক্রি না করার পক্ষে তার যুক্তি ছিল এই যে, রং-বেরংয়ের ঘুড়ি উড়লে আকাশ মানায় না। আমাদের যুক্তি ছিল ঠিক তার উল্টো, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই সে মানত না। সে বলত—তবে অন্য জায়গা থেকে কিনে আনো, আজ শ্লেটে যখন লেখা হয়ে গেছে এক-ময়লা, তখন অন্য ঘুড়ি আর এখানে বিক্রি হবে না।

আমরা বলতুম—ওঃ, একেবারে হাইকোর্টের বিচার!

হারাণ হেসে হেসে বলত—আমার বিচার হাইকোর্টের বিচারের বাবা। বুঝলে ভাই রাঙা-আলু, হাইকোর্টের রায় আপীলে টলে যেতে পারে কিন্তু হারাণের বিচার কোনো আপীলেই টলে না।

এমনি অদ্ভুত ছিল তার হাল-চাল।

এক দিন বিকেলে হারাণের দোকানে ঘুড়ি কিনতে গিয়ে দেখি, পাড়ার ছয়-সাতটি ঘুড়ি-উড়িয়ে ছেলে হারাণের সামনে উবু হয়ে বসে রয়েছে। বিমর্ষ তাদের মুখ—সামনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে গালে হাত দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে হারাণ। সেই পরিস্থিতির গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে ইশারাতে এক জনকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

বন্ধু কোনো কথা না বলে ইসারাতেই হারাণকে দেখিয়ে দিলে।

কিছুই হদিশ না পেয়ে হারাণকে বললুম—একখানা দেড়-তে ঘুড়ি দাও তো?

হারাণ এতক্ষণ মুখ নীচু করেই ছিল। আমার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে অতি কাতর ভাবে বললে—আজকে আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই রাঙা-আলু।

তার মুখের চেহারা দেখে ও কথা শুনে মনে হোলো, বাড়ীতে কেউ মারা-টারা গেছে।

সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ?

হারাণ স্বভাবতই বক্-বক্ করতে ভালবাসত। দু'-হাতের সঙ্গে তার মুখও সমানে চলতে থাকত। এক-এক দিন ঘুড়ি কিনতে গিয়ে তার বক্‌বকানি শুনতে শুনতে এত দেরী হয়ে যেত যে পালিয়ে আসতে হোতো। অনেকক্ষণ বাক্-সংযম করে এবার তার ধৈর্যচ্যুতি হোলো। হারাণ সুরু করলে—আর ভাই রাঙা-আলু, কি বলব! আজ ক'দিন থেকে ওপরের কষের একটা দাঁত চক্-চক্ ক'রে নড়ছে। কাল রাত থেকে জিভটা লেগে গেছে সেই দাঁতটার পেছনে, দাঁতটাকে ওখান থেকে তাড়াবেই তাড়াবে—খেতে, শুতে, কাজ করতে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। জিভটাকে বেশ ক'রে মনের লাগাম চড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে কাজ করতে সুরু করি আর সেই সুযোগে জিভটা আবার দাঁতের পেছনে লেগে যায়। আরে ভাই, কাজ করব হাতে, মন থাকবে হাতধরা, তবেই তো হাতের কাজ হবে। তা সেই মনই যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে জিভের সঙ্গে যোগ দেয় তো হাতের কাজ কি করে হয়!

কাজ করতে না পারার এমন কিণ্ডারগার্টেনীয় ব্যাখ্যা শুনে হাসি পেলেও চেপে যেতে হল। বললুম—ও দাঁতটা তুলিয়ে ফেল।

হারাণ একটু বক্র হেসে বললে—রাঙা আলু ভাই, তুমি কি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছ। এই ঝিঙে ভাইও বলছিল দাঁতটা তুলে ফেলতে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি শুধু ওটা নয়, ছত্রিশ পাটি দাঁতই তুলে ফেলব।

হারাণ ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের লোক হঠাৎ তার ঐ সর্বনাশা স্পৃহা দেখে আমরা ভড়কেই গেলুম। ঝিঁডে জিজ্ঞাসা করলে—কেন! সবগুলো তুলবে কিসের জন্ম?

হারাণ বললে—ঝিঁডে ভাই, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একটা দাঁতে যদি এক হপ্তার কাজ বন্ধ করে, তা হলে ছত্রিশটাতে ক'হপ্তা হয় বল দিকিন? এত দিন যদি কাজ না করতে পারি তা হলে আমার যন্ত্রণা ভোগ ও ক্ষেতির কথা ছেড়েই দাও, কত লোকের কত রকমের অসুবিধা হবে বল দিকিন? কাজ কি ভাই অত হাঙ্গামার। শাস্ত্রে বলেছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, ব্যস্।

এই রকম সব পাকা-পোক্ত হিসাব ও যুক্তির বাঁধনে হারাণ রাজ্যের ছেলের মন বেঁধেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর এক জন বললে—আমাদের হারাণের বুদ্ধি আছে, যে যাই বলুক।

কথাটা শুনে হারাণ বেশ খুশী হয়ে বললে—টাঁড়স্ ভাই, তোমাদের এই ঘুড়িওয়ালা হারাণ অনেক হারাণ বাবুর চেয়ে বুদ্ধি ধরে বেশী। যদি বল, তবে তুমি এ কাজ করছ কেন, হাইকোর্টের জজ হলেই তো পারতে? তার উত্তরে আমি বলব, বুদ্ধি কম থাকার দরুণ যে হাইকোর্টের জজ হতে পারিনি তা নয়—এ কাজ করাচ্ছে আমার নেয়ৎ।

এই বলে হারাণ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

তাকের ওপরে তাড়া করা ঘুড়ি রয়েছে দেখে বললুম—ঐ তো অত ঘুড়ি রয়েছে, দাও না।

হারাণ বললে—তা কি হয়! আজ আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই, সব বাড়ী যাও।

বিকেল বেলাটা হল মাটি। ঘুড়ির বদলে—হারাণ কাল দাঁত তোলাবে এই সংবাদটি সংগ্রহ ক'রে সেদিন যে যার বাড়ী ফেরা গেল।

পরের দিন বিকেলে হারাণের দোকানে গিয়ে দেখলুম বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সে কাজ করছে। একখানা ঘুড়ি কিনে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হারাণ দাঁত তুলিয়েছ না কি?

হারাণ বললে—দেখ ভাই রাঙা আলু, কাল সারা রাত্রি ঘুমুইনি, খালি ভেবেছি। ভেবে দেখলুম যে দাঁতের ওপরে খুবই অবিচার করা হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁতের ব্যথা না হ'য়ে যদি পায়ে যন্ত্রণা হোতো তা হোলে পা টা কেটে তো আর ফেলে দিতে পারতুম না। আরে, নড়া-দাঁতের ধর্মই হোলো কটকট ঝনঝন করা। মন যদি ওদিকে যায় তো মনের দোষ—মনের দোষে দাঁতকে কেন সাজা দেবো। ঠিক বলছি কি না, বল তুমি?

ঠিক বলছ বলে তখনকার মতন পালিয়ে বাঁচলুম।

তখনকার দিনে বৌবাজার থেকে আরম্ভ করে সেই গ্রে ষ্ট্রীট অবধি বড়-রাস্তার ওপরেই অনেকগুলো মদের দোকান ছিল। পথচারীরা এক পোয়া রাস্তা দূর থেকেই নাকে কাপড় দিত আর দোকানের কাছাকাছি এসে দিত কান চাপা। দোকানের ভেতর সেই সকাল থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি অসংখ্য মাতাল তারস্বরে গান, তর্ক, চ্যাঁচামেচি ঝগড়া করতে থাকত। সরকারী হুকুমে এই সব দোকান এখন বড়-রাস্তার ধারে সরু সরু গলির মধ্যে উঠে গেছে। এতে তিন পক্ষই হয়েছে খুশী। বড়-রাস্তা থেকে একটা বীভৎস দৃশ্য সরে গেছে। মাতালেরাও বেঁচেছে—ঢুকতে বেরুতে চেনা লোকের চোখে পড়া, রাস্তায় বেরিয়ে দু'-দণ্ড যেতে না যেতেই পুলিশ কনষ্টেবল, যারা মালদার মাতাল শীকার করবার জন্যই ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের খপ্পরে পড়া ইত্যাদি হাজার হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পেয়েছে দোকানদারেরাও খুশী কারণ তাদের খদ্দের বেড়েছে।

আগেই বলেছি, সেকালে প্রায় সব সময়েই রাস্তায় ভদ্রলোক ছোটলোক সব শ্রেণীরই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। 'সুরাপানে সাম্য ভাব প্রবল হয়' কথাটা খুবই সত্যি। কারণ সম্প্রদায়গত প্রভেদ থাকলেও ব্যবহারগত প্রভেদ তাদের মধ্যে বিশেষ দেখতে পাওয়া যেত না। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বা কাল্পনিক শত্রুর উদ্দেশে হাত-পা ছুঁড়ছে, আধ-আধ ভাষায় এড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। হয়ত দুই প্রাণের বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান করে ফিরছে পথে কি তর্ক হতে হতে লেগে গেল তুমুল কাণ্ড—বাড়াবাড়ি হলে পুলিশে রুলের গুঁতো লাগাতে লাগাতে টেনে নিয়ে যেত থানায়। কেউ বা পথের ওপরেই হাত-পা চিতিয়ে লম্বা—বসন অসংবৃত, হুঁস নেই। সামনে বাড়ীর লোকেরা বালতি-বালতি জল এনে মাথায় ঢালছে—দেখে-দেখে শিউরে উঠতুম আর ভাবতুম, এমন আত্মবিস্মৃতিকারী অসংযম লোকে মূল্য দিয়ে কেনে কেন?

হারাণ বললে—ব্যাটারা যা হজম করতে পারবি নে তা গিলিস কেন।

এমন যে বুদ্ধিমান, দার্শনিক হারাণচন্দ্র, নেহাৎ বরাতের দোষে বলে যে হাইকোর্টের জজ না হয়ে চিঠির ফাইল ও ঘুড়ি ম্যানুফ্যাকচার করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে সেও মদ্যপান করত—তবে বছরে একবার মাত্র।

এক দিন ইস্কুলে যাবার জন্য পথে বেরিয়েই দেখি, হারাণ তার পাশের পরোটাওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সেই দোকানদারকে গাল পাড়ছে। হারাণের এতদবস্থা এর আগে কখনো চোখে পড়েনি। চোখা চোখা বোলচাল ছাড়লেও ঝগড়া ফ্যাসাদকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করত এবং তা থেকে দূরে থাকবার জন্য আমাদেরও উপদেশ দিত।

আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ?

'চোপরাও'—বলে সে এমন চেঁচিয়ে ধমক ছাড়লে যে দশ হাত দূরে ছিটকে গেলুম। বাপ রে! ব্যাপার কি!

ইতিমধ্যে আর গুটি কয়েক পাড়ার ছেলে বই বগলে সেখানে এসে জমা হোলো। হারাণ আমাদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলতে লাগল—ছেলেমানুষ আছ ছেলেমানুষের মতন থাকবে। ইস্কুলে যাচ্ছ সিধে ইস্কুলে চলে যাও সব।

কথাগুলো বলেই হারাণ আবার পরোটাওয়ালাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলে।

পরোটাওয়ালা হিন্দুস্থানী হলেও বাংলা ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারত ও বলতে পারত। কিন্তু পাছে সেই ভাল ভাল অভিধান বহির্ভূত বাক্যগুলি পরোটাওয়ালার বুঝতে কষ্ট হয় সে জন্য হারাণ সেগুলিকে হিন্দীতে তর্জমা করে বলতে লাগল আর তাই শুনে রাস্তার লোকেরা হো-হো করে হাসতে আরম্ভ করে দিলে। একাধ

...ধরণের গালাগালি আর সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষা শোনবার জন্য ...েই ভীড় বাড়তে লাগল।

একটা জিনিষ বরাবর দেখেছি যে বাঙালীর পেটে মদ পড়লেই, ...র ক্ষেত্রেই সে ইংরিজী, হিন্দী, উর্দু, ফরাসী ভাষায় বুলি কাটতে ... করে—ইংরেজ কিংবা ফরাসী মাতালকে স্প্যানিশ কিংবা তুর্কী ...য় কথা বলতে শুনিনি। যা হোক্, হারাণ সেই অদ্ভুত হিন্দী ...ায়—যা একমাত্র হারাণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না অথচ ...লেই বুঝতে পারে—পরোটাওয়ালাকে গালাগালি দিয়ে চল্‌ল।

পরোটাওয়ালা লোকটা ছিল আকাট ষণ্ডা। আশ-পাশের যত ...দুস্থানী দোকানদারদের মুরুব্বী ও ভরসাস্থল ছিল সে। হারাণের ...েন দশটাকে সে খালি হাতেই পাট করে দিতে পারত। কিন্তু দেখলুম ... হারাণের সম্বন্ধে নির্বিকার হ'য়ে সে নিজের কাজ করে চলেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। পরোটা-...লাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলা গেল—কি হয়েছে, হারাণ তোমাকে ... গালাগালি দিচ্ছে কেন?

পরোটাওয়ালা তার নির্বিকারত্ব বজায় রেখেই বললে—কি আবার ...! ব্যাটা সরাব টেনেছে।

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল—দুঃখের নয়—...কের। মনে হোলো—এঁ্যা, হারাণও সরাব খায়! ইস্কুলের দেরী ...য়ে যাচ্ছে দেখে অমন মজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হোলো।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার। ...টার দোকানের সামনে খুব ভীড়, তার মধ্যে বই-হাতে ইস্কুল-...র ছেলেই বেশী। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি হারাণ ও পরোটা-...লা দু'জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—হারাণের হাতে ঘুড়ির সরু একটা ...প আর পরোটাওয়ালার হাতে সরু মাথা-বাঁকানো লম্বা একটা ...হার শিক, যা দিয়ে তাদের সেই বিপুলগর্ভ উনুনে খোঁচা দেওয়া ...ও থাকে। কিন্তু পরোটাওয়ালার হাতের অস্ত্র হারাণের হাতের ...র চেয়ে ঢের বেশী ভয়াবহ হোলেও হারাণের মুখনিঃসৃত মিনিটে-...শটা বোমার আঘাতে সে ব্যক্তি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ...ছে—একেবারে সম্মোহিত অবস্থা।

রাজ্যের লোক সেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। এক ...লোক হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে হ্যা?

হারাণ হুঙ্কার ছেড়ে বললে—কি হয়েছে! কি হয়েছে এই ...ড়োকে জিজ্ঞাসা কর।

পরোটাওয়ালা বলতে লাগল—বাবু, লোকটা সরাব খেয়ে আজ ...াল থেকে আমার দোকানের সামনে এই হাঙ্গামা লাগিয়েছে। ...া দিন এই ভীড়, খদ্দের আসতে পারছে না, সকাল থেকে বিক্রি-...টা আমার বন্ধ হয়ে গেছে।

হারাণ তার হাতের অস্ত্র আপসাতে আপসাতে বললে—...র দোকানে কেউ পা দেবে না, শালা চোর।

পরোটাওয়ালা একবার চোখ পাকিয়ে হারাণের দিকে চেয়ে ...বার সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে—দেখছেন!

ভদ্রলোকটি উদাস ভাবে বললেন—পুলিশে খবর দাও।

সেদিনে এক চোর-ডাকাত ছাড়া পুলিশকে ভয় করে না এ ...র লাখে ত একটা মিলত কি না সন্দেহ। পুলিশের নাম হওয়া মাত্র ...ড় পাতলা হয়ে গেল। পরোটাওয়ালা গুটি-গুটি তার দোকানে উঠে উনুনের সামনে গিয়ে বসল। হারাণ কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে—এমন সময় একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ঐ লাল পাগড়ী—

আর যায় কোথা! হারাণ দৌড়ে, গড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে নিজের দোকানে ঢুকে পড়ল।

শোনা গেল, বছর কয়েক আগে হারাণ এক দিন একখানা পরোটা কিনেছিল, তাতে দোকানদার না কি তরকারী দিয়েছিল কম। সেদিন থেকে হারাণ যত বার মদ্যপান করে তত বারই না কি সেই এক দিন কম তরকারী দেওয়ার জন্য—যে তরকারী পরোটার সঙ্গে শ্রেফ দয়া করে দেওয়া হয়ে থাকে—হাঙ্গামা করে।

বাড়ীতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসতে না বসতে হারাণের হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। বাড়ীতে এক জন গুরুস্থানীয়া মহিলা বল্‌লেন—আজ তোমাদের হারাণ মদ খেয়ে সকাল থেকে রাস্তায় এমন হাঙ্গামা লাগিয়েছে যে কান পাতা যাচ্ছে না। আর এক জন বল্‌লেন—অমন লোকের কাছ থেকে কারুর কোনো জিনিষ কেনা উচিত নয়।

ঘুড়ির মাধ্যমে হারাণের কিছু-কিছু গুণ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা আছে—এই রকম কিছু মন্তব্য আশা করছিলুম সে তরফ থেকে, কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ছুটলুম হারাণের খেল্ দেখতে।

গিয়ে দেখি যে, হারাণ আবার আসরে নেমেছে। চারি দিকে আগের চাইতে ভীড় বেশী। অবস্থা তার খুবই খারাপ, পা টলমল করছে, কথাবার্তা যা বলছে তা শুনে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে অসুবিধার জন্য কথা কিছু কম বলছে না।

শোনা গেল, পুলিশের নামে ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে সে উপরি-উপরি কয়েক পাত্র টেনে এমন দুঃসাহস সঞ্চয় করে এসেছে যে রনাঙ্গণে ভূপাতিত হবার আগে নড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

হারাণ মদ-দর্পে টলে টলে পরোটাওয়ালাকে ইংরিজী ও হিন্দীতে মিলিয়ে উচ্চরবে উপদেশ দিচ্ছে, এমন সময় ভীড়ের সামনেই কোথা থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর ভেতর থেকে জন চারেক ভদ্রবেশধারী যুবক টপ্-টপ্ করে ভীড় ঠেলে একেবারে হারাণের সামনে এসে দাঁড়াল। এক জন জিজ্ঞাসা করলে—এ কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে? হঠাৎ তাদের আবির্ভাবে হারাণ একেবারে হতবল। সে কি একটা বল্‌লে বটে, কিন্তু তা বুঝতে পারা গেল না। এক জন ধমকের সুরে বললে—চল, বাড়ী চল।

এবার হারাণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একবার যা যা—বলে সে অবস্থায় যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকানের দিকে দৌড় দিলে। আগন্তুকেরা আর বাক্যব্যয় না করে হারাণকে ধরে একেবারে কোলপাঁজা ক'রে তুলে ফেললে। হারাণ হাত-পা ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল কিন্তু ততক্ষণে তারা তাকে গাড়ীর মধ্যে পুরে ফেলে গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত করতেই গাড়ীখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই ভীড় একেবারে সাফ্। শুনলুম, ওরা হারাণের ছেলে। মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি করে যে ওরা টের পায় তা কেউ জানে না। প্রতিবারেই হঠাৎ এসে পড়ে আর কথা বলতে না দিয়ে তারা বাপকে ঐ রকম চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার মুখে দেখলুম, হারাণ লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘাড় হেঁট করে ফাইল তৈরি করছে। [ক্রমশঃ।

মিনাকুমারী

সতীনাথ ভাদুড়ী

তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না এক দিনও? তুমি এমন কেন? সব কাজের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কথা মনে হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেরী কর না।

তোমারই
অভিমন্যু
১৩-৬-৪৭

মি না কু মা রী আর অভিমন্যুর জীবনের মামলায়, চিত্রগুপ্তের হাতের সব চেয়ে মারাত্মক দস্তাবেজ এইখান। এক অদ্ভুত কলহোন্মুখ পরিবেশের ভিতর হঠাৎ নাটকীয় ভাবে চিঠিখান বের করে দিয়েছিল এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

গত কয়েক মাসে ইউনিয়নের শক্তি বাড়ায় মজুরদের বুকের পাটা বেড়েছে, আর শিউচন্দ্রিকার কাজের সুবিধা হয়েছে। কেসর-পাকের পাট শেষ হওয়ার পর আর অনাথালয়ের সঙ্গে কোন বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ নেই। হাকিম-হুকুমদের ডাকবাংলায় থাকা নিয়ে আর রেখে-ঢেকে কথা বলে না শিউচন্দ্রিকারা।

কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন এক দিন ম্যাকনীলের কুঠীতে টেনিস খেলতে। মজুররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে আজ নিশ্চয়ই ম্যানেজার সাহেব দালাল ইউনিয়নটা কায়েম করবার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবে।

মিল-গেট থেকে বেরনোর সময় কলেক্টর সাহেবের গাড়ী ঘিরে ফেলেছিল মজুরের দল। বলেছিল একটু বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে এখানে;—দেখবেন হুজুর কত রাত পর্য্যন্ত মেয়েরা কাজ করে এই মিলে। আপনার সম্মুখে তো সব অস্বীকার করে দেয়; আজ অন্য তিনটে গেট বন্ধ করে দিয়ে এই গেটে যদি দাঁড়ান, হুজুর, তাহ'লে নিজের চোখে হুজুর দেখে যেতে পারবেন। আর এই দেখুন মিলের 'গ্রেন-শপ'-এর চালের নমুনা। চাল বেশী কি কাঁকর বেশী আপনিই বলুন হুজুর। এ সস্তা চাল নিয়ে লাভ কি?

"তা তোমরা দুপুরের খাওয়াটা মিলের ক্যান্‌টিনে খেলেই পার।"

সে আর বলবেন না হুজুর। সরকারী গুদামের পচা আটা বাংলা সরকার 'গরুর খাবার যোগ্য' বলে গত বছর নিলাম করেছিল। তাই এরা ক'হাজার বস্তা নিয়ে এসেছিল নৌকোয় করে, গঙ্গা দিয়ে। সকালে সেই আটার কচুরী, আর দুপুরে সেই আটার রুটি দেয় হুজুর ক্যান্‌টিনে, একেবারে যেন বিষ; খেলে পেট খারাপ হয়। হুজুর, একবার সস্তা 'গ্রেনশপ'-এ এই আটাটাও দেখে নেবেন। এখনই না দেখলে হুজুর দেখা আর না-দেখা সম'ন।

"না, না, এখন আমার একটু কাজ আছে ডাক-বাংলোতে। আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালে নিশ্চয়ই দেখব।"

হলও তাই। পরদিন সকালে কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন 'গ্রেন-শপ'এ। অভিমন্যু আর মজুররা সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। কলেক্টর সাহেব মোটর গাড়ীতে বসে বসেই অভিমন্যুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেন।

হাসতে তাঁকে 'গ্রেন-শপ'এর আটাটার অদ্ভুত রং আর তার ভিতর শান্তিপ্রিয় কীটগুলো বিবরণ শোনায়।—হুজুর সার, বাংলা দেশ থেকে যত হাজার বস্তা এসেছিল তার আর্দ্ধেক গিয়েছে ষ্টেশনের কাছের চনচনিয়া ফ্লাওয়ার মিলে। সেখানকার মজুরদের, সার, ভারি সুবিধা হয়েছে। ভাল আটার সঙ্গে কতটা পর্য্যন্ত এই আটা মিশোলে খেতে খারাপ লাগে না, আর খেলে পেটের অসুখ করে না তারই পরীক্ষা করবার জন্য, রোজ বিনা পয়সায় কচুরী খেতে পাচ্ছে সেখানকার মজুররা। এখানকার 'গ্রেন-শপ'এর আটার বস্তাগুলোর উপর, সার, দেখবেন এখনও সি, এফ, অর্থাৎ Cattle Fodder ছাপ মারা আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অভিমন্যুর বলার ভঙ্গীতে না হেসে পারেন না। 'গ্রেন-শপ'এ কিন্তু এক বস্তাও সে আটা পাওয়া যায় না। জয়নারায়ণ প্রসাদ বলে—দেখলেন তো সার, ইউনিয়নের লোকদের সত্যি কথার একটা নমুনা।

"সব সরিয়ে ফেলেছে; কাল রাতে এসে দেখতে পারতেন, সার।" অপ্রস্তুত অভিমন্যু কথার খেই হারিয়ে ফেলছে। তার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কলেক্টর সাহেব গাড়ীতে গিয়ে বসেন।

"ইউনিয়নের কর্মীর মিল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।"

গাড়ী ষ্টার্ট দেয়।

যত দিন মজুররা ভাল ভাবে সংগঠিত হতে পারেনি, তত দিন মিল-কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নটাকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন না। মিটিং-এ একটা-দু'টো জোর-গলায় বক্তৃতা দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিতে চায় শিউচন্দ্রিকা তো করুক, তাতে কোম্পানীর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

সে ভাব আর রাখা চলে না। জয়নারায়ণ প্রসাদ ম্যাকনীল সাহেবকে বুঝোয়:—আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে গিয়েছে শিউচন্দ্রিকা, আর ঐ স্কাউণ্ড্রেল অভিমন্যুটা। দিন-রাত মজুরদের উস্‌কানি দিচ্ছে। এ কি ছেলেখেলা পেয়েছে? মজুরদের সহজদাহ্য মন বেশ তেতে উঠেছে এরই মধ্যে, তার লক্ষণ কি দেখতে পাচ্ছেন না, সার? আর ইউনিয়নের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। এখনও পিষে ফেলা যেতে পারে, পরে আর পারবেন না, সার।...

ম্যাকনীল সাহেবকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। এইবার ইউনিয়নের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষে এগিয়ে আসে ম্যানেজার আর এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

খবর চাপা থাকে না। ম্যানেজারের অফিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার অধিকাংশ জিনিষের গন্ধ পায় মজুররা। দু'পক্ষই সচেতন হয়ে ওঠে। সুবিধা পেলে কেউ কাউকে ছাড়বে না।

মজুরদের দশ দফা দাবীর ফিরিস্তি ম্যাকনীল সাহেব পান।

সাহু-ব্যারাকের মাঠে শিউচন্দ্রিকার সভাপতিত্বে যে মিটিং হয়, তার প্রস্তাবগুলো বেরোয় পার্টির কাগজে।—এই মিটিং বলীরামপুর জুট মিলের মজুরদের ন্যূনতম মজুরী সপ্তাহে আরও দুই টাকা তিন আনা করিয়া বাড়াইবার দাবী করিতেছে ···ক্যান্টিনের অব্যবস্থার ঘোর নিন্দা করিতেছে।···ক্যান্টিনের তৈয়ারী করা মুড়ি-ভরা জলখাবার ৩০'৫'৪৭ তারিখে সন্ধ্যায় রিকশায় করিয়া অনাথালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিতেছে।···মিলের 'ক্রেশে'র নাম করিয়া যে দুধ আসে, তাহার সমস্তটাই উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কুঠীতে চলিয়া যায়, এবং 'ক্রেশে'র অল্পবয়স্ক শিশুদের কেবল ভাতের মাড় খাওয়ানো হয় কি না, এ বিষয়ে পাবলিকের সম্মুখে তদন্ত করা হউক।···সরকারী কর্মচারীরা বলীরামপুরে আসিয়া কোথায় ভোজন করেন, এবং টুরে আসিয়া কে কি কাজ করেন তাহার তদন্ত করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।···

এ ছাড়া আরও অনেক খুচরা দাবীর প্রস্তাব বিশদ ভাবে পার্টির কাগজে দিয়াছে। সবই ম্যানেজার সাহেবের নজরে পড়ে।

অভিমন্যু প্রত্যহ ছুটির সময় মিল-গেটে বক্তৃতা করে, আর সন্ধ্যার পর সাহু-ব্যারাকে ভজনের দলে গান গায়।

ইউনিয়নের অফিসঘরের বাড়ীওয়ালা হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দেয়, সে নিজেই না কি ঐ বাড়ীতে থাকবে। এক নম্বর গেটের পাশের এত কালের তালা দেওয়া গুদামটার উপর এক দিন হঠাৎ একটা নিশান ওড়ে। রামভরোসা সর্দ্দারের নতুন ইউনিয়ন খুলেছে সেখানে! সিরিয়া নামের একটি অল্পবয়সী নতুন মজুরণী সাহু-ব্যারাকে এক দিন রাত দুপুরে চেঁচিয়ে উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। এরই জন্য কালু সর্দ্দারকে পুলিশ গ্রেফতার করে ধরে নিয়ে যায়। এস, ডি, ও, সাহেব তার জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

মিলের প্রায় অর্দ্ধেক মজুর থাকে মিলের ব্যারাকে। আর বাকী সকলে থাকে বাইরের লোকেদের অন্য সব ব্যারাকে, ঘর ভাড়া নিয়ে। মিলের ব্যারাকের সাপ্তাহিক ভাড়া আদায় করে দু'জন গুণ্ডা ভোজপুরী দারোয়ান। তারা হঠাৎ এক দিন ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মজুরের ঘরে তালা দিয়ে দেয়; তারা না কি সময় মত ভাড়া দেয় না।

শিউচন্দ্রিকার কাছে ছাপরার উকীলের নোটিস আসে—ভগাওন সিং-এর বিধবা স্ত্রী তাহার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা শিউচন্দ্রিকা বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সে টাকার হিসাব এক মাসের মধ্যে যেন শিউচন্দ্রিকা বাবু দিয়া দেন। নচেৎ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আইনের অপ্রিয় পথ লইতে হইবে।

রহমৎ বলে, এ সব করাচ্ছে সরযু সিং, অভিমন্যুর পেয়ারের দোস্ত। রামভরোসা সর্দার, আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে ওটাকে গুজ-গুজ করতে দেখেছি। মনিঅর্ডারের রসিদগুলো তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে অভিমন্যু ভুলে গিয়েছিল।

শত্রু-শিবির একেবারে তছনছ করে দিতে চায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল তা সে জানে।

অপর পক্ষও বসে থাকে না চুপটি করে। লুম-ডিপার্টমেন্টেই ইউনিয়নের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। এই তাঁত-ঘরের মজুররা কালু সর্দারের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক দিন কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

মিল আর রেল-লাইনের মধ্যে যে জলা জমিটা আছে সেখানে চরতে গিয়েছিল ধনিরাম ব্যারাকের মালিকের মোষ দু'টো। যেদিন কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন, সেদিন ঐখানেই রাতারাতি ফেলা হয়েছিল বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের 'পশুর খাদ্য' ছাপ দেওয়া আটার বস্তাগুলো। তার পরের দিনই ধনিরামের মোষ দু'টো—চড়তে গিয়ে ঐ 'পশুর খাদ্য' আটা খায়। তার দু'দিনের মধ্যে রক্ত-আমাশার মত একটা ব্যায়রামে দু'টোই মরে যায়। ধনিরাম সেই কথা বলতে আসে শিউচন্দ্রিকাকে। তাকে দিয়ে শিউচন্দ্রিকা মিলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনায়। সে জানে যে, এ মোকদ্দমা চলবে না; কিন্তু কাগজ-কলমে একটা প্রমাণ থেকে যাবে ম্যাকনীল সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদের বিরুদ্ধে; কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাদের গিয়ে; ধনিরাম খরচ করে ভাল উকিল রাখবে তাদের জেরা করবার জন্য।······

মজুরদের উপর জুলুমের প্রতিবাদের জন্য টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম যায় পাটনায়। ধর্মঘটের চরম-পত্রের নকল যায় লেবার কমিশনর সাহেবের কাছে। শিউচন্দ্রিকা নিজে পাটনা যায় মজুর বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অনেক কাজ; এই সব ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় নেই। তবে তিনি শিউচন্দ্রিকার দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন লেবার কমিশনারের কাছে আর তাঁকে লিখে দেন, যত শীঘ্র সম্ভব বলীরামপুর যেতে।

লেবার কমিশনার সাহেব দুই পক্ষকেই ডাকেন ডাক-বাংলাতে।

শিউচন্দ্রিকা গেলে তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, সন্ধ্যার পর তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান একান্তে, সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে। আর পনর মিনিট পর থেকে মজুরদের দাবীর তদন্ত আরম্ভ হবে। বসুন ততক্ষণ আপনারা ঐ ঘরে।

ডাকবাংলার একটা টেবিলের চারি দিকে সবাই বসে। মধ্যখানে লেবার কমিশনার। তার এক দিকে ম্যাকনীল সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদ; অন্য দিকে শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু। এক দিক্‌কার লোকরা অন্য দিকের লোকদের দিকে তাকায় না। সকলেই যেন লেবার কমিশনারের সঙ্গে গল্প করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ম্যাকনীল সাহেবের মত কেতা-দুরস্ত লোকও আজ শিউচন্দ্রিকাকে অভিবাদন করে না। ম্যানেজার সাহেব মনে করে যে, আজ শিউচন্দ্রিকার প্রতি শিষ্টাচার দেখালে, যে কয় জন মজুরদের দিকের সাক্ষী বাইরে বসে রয়েছে তারা ভুল ভাববার সুযোগ পাবে যে, সাহেব শিউচন্দ্রিকার খোসামোদ করছে। আর শিউচন্দ্রিকারও ভয়-ভয় করে যে আজ জয়নারায়ণ প্রসাদকে সাধারণ সৌজন্য দেখালেও, মজুররা আবার তাকে শুদ্ধ 'দালাল' না বলে বসে।

মিছিল করে নানা রকম ধ্বনি দিতে দিতে কয়েক হাজার মজুর এসে ঢোকে ডাক-বাংলায় হাতায়। লেবার কমিশনার সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

"এদের আবার কেন আনিয়েছেন শিউচন্দ্রিকা বাবু? এদের তো আসবার কথা ছিল না।"

"না সার, আমি আসতে বলিনি। আপনি এসেছেন শুনতে

পেয়ে ওরা এসেছে আপনার কাছে। এ বিষয়ে ওরা আমার কথাও শুনবে না।"

"তাহ'লে আবার আপনার মজুরদের উপর প্রভাব কি আছে?"

লেবার কমিশনার সাহেব নিজে গিয়ে তাদের ফিরে যেতে বলেন।

"না হুজুর, আমরা একটুও গোলমাল করব না।"

কি আর করেন কমিশনার সাহেব। হয়ত এগুলো একটা গোলমাল বাধাবে বলেই এসেছে। বারণ করলেও শুনবে না। জোর জার করতে গেলে এখনই হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে একটা। আজকাল আর সম্মানের সঙ্গে চাকরী-বাকরী করবার উপায় নেই। "আচ্ছা তোমরা তাহ'লে বসে পড় যে যেখানে আছ। চেঁচামেচি করলে কিন্তু তোমাদের এখানে থাকতে দেব না।"

হঠাৎ ডি, এস, পি, আর এস, ডি, ও, সাহেব মোটরে এসে হাজির হন ডাক-বাংলাতে।

"আপনাদের কে খবর দিল আসতে?" কে যে খবর দিয়েছে, তা আর কমিশনার সাহেবের বুঝতে বাকী নেই।

অভিমন্যুই জবাব দেয়, "এখানে আসবার জন্য খবর পাবার দরকার হয় না ওঁদের। প্রায় রোজই আসেন ওঁরা এখানে।"

তার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানে জয়নারায়ণ প্রসাদ আর ডি, এস, পি।

শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে কোন কথা বলতে বারণ করে; হাওয়া এখন আমাদের দিকে। দু'টো সস্তা ঠাট্টা করে সেটাকে নষ্ট হতে দিও না। শিউচন্দ্রিকা মনে মনে বোঝে যে, আজ আবহাওয়া ভাল! লেবার কমিশনার মজুরদের উপর একটু প্রসন্ন আছেন কেন যেন। ইনি ন্যায়বিচার করবার চেষ্টা করবেন আজ! "আচ্ছা, এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক।"—বাইরে মজুরদের গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায়।

"—আমার 'থ্যাঙ্কলেস' কাজ, আপনাদের দুই পক্ষের সহযোগিতা বিনা অসম্ভব। আমি যত দূর বুঝেছি, বর্তমানে মজুর ও মিল-মালিক দুই পার্টিরই শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ করবার মনোভাব নেই। কিন্তু এই মনের ভাব কারও পক্ষেই ভাল নয়। সব দায়িত্বশীল লোকই বুঝবেন যে, দেশের পক্ষেও জিনিষটা ক্ষতিকর···"

কোন পক্ষই লম্বা লেকচার শুনতে তৈরী নয়। কাজের কথা চায় তারা।

ম্যাকনীল সাহেবই প্রথম কথা বলে;—আমরা আপোষ করতে চাই মজুরদের সঙ্গে, তাদের তথাকথিত নেতাদের সঙ্গে নয়।

শিউচন্দ্রিকা বলে—আমরা তো সার সদ্ভাব চাই বলেই আপনাকে খবর দিয়েছি।

তার পর আরম্ভ হয় উভয় পক্ষের শুনানী। শুনানী মানে বাক্-বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি; কখনও নরম তর্ক, আবার কখনও বা হাতাহাতি হবার উপক্রম। জয়নারায়ণ প্রসাদ কথায় কথায় স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে ওঠে। হাত-পা নেড়ে মাথা নেই মুণ্ডু নেই কত কি বলে যায়। ম্যাকনীল সাহেবের সম্মুখে আরও বেশী করে সে নিজের কর্মনিষ্ঠা দেখাতে চায়।

শিউচন্দ্রিকা বাজে কথা বলে না একটিও। মজুররা ভাবে, এত বহস্ করছে এসিষ্টান্ট ম্যানেজার, ওরই বুঝি জিত হবে। কিন্তু শিউচন্দ্রিকার প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। কাগজ-পত্র, ফাইল, তারিখ, সব তার তৈরী। কলকাতার কোন জুট মিলে কি মজুরী দেয় বিভিন্ন বিভাগে, সব তার মুখস্থ। কলকাতার প্রতিটি জিনিষের দাম, এখানকার সরকারী গেজেটের বাজারদর, মুনাফার হার, আবশ্যক জিনিষের দরের প্রতি মাসের সূচক-সংখ্যা সব তার নখদর্পণে। বলীরামপুর জুট মিলের গত দশ বছরের লাভের এবং মজুরদের আয়ের পাশাপাশি 'গ্রাফ' এঁকে রেখেছে সে কমিশনার সাহেবের সুবিধার জন্য। লেবার কমিশনার কেন, ম্যাকনীল সাহেব পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।—কাগজ-পত্র মাপ-জোখ, হিসাব, সংখ্যা, কিছু নিয়েই সে তৈরী নেই; নিশ্চিত ভাবে শিউচন্দ্রিকার একটা যুক্তিরও সে খণ্ডন করতে পারছে না; কেবল বাজে চেঁচামেচি করছে।

তবে এই মজুরীর বিষয়ে ঝট করে কিছু করতে চান না লেবার কমিশনার। মিল-কর্ত্তৃপক্ষও কাগজ-পত্র নিয়ে ভাল ভাবে তৈরী হলে মাস খানেক পরে এর বিচার করতে আবার আমি আসব। কলকাতার রেট আপনারাও আনাবেন মিষ্টার ম্যাকনীল। আর সব দরকারী হিসাব-পত্র······

"হিসাবের কোন্ খাতাটা হুজুর? ইনকাম-ট্যাক্সেরটা না আসলটা? মজুরদের হাজরী-বই পর্য্যন্ত দু'সেট আছে সার।"

অভিমন্যু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শিউচন্দ্রিকা তাকে থামিয়ে দেয়। বাইরের মজুরদের গুঞ্জন-ধ্বনিতে বোঝা যায় যে, অভিমন্যুর কথাটা তাদের বেশ মনের মত হয়েছে।

"আচ্ছা, এইবার দুই নম্বরের আইটেম 'ক্যান্‌টিন'এর সম্বন্ধে অভিযোগ, আর তিন নম্বরের আইটেম, 'ক্রেশে'র সম্বন্ধে অভিযোগে আসা যাক। দেখুন মিষ্টার ম্যাকনীল, মজুরদের সুখ-সুবিধা দেবার বিষয়গুলিতে আমি খুব গুরুত্ব দিই। এ সব বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি দেখতে পেলে আমি আপনাদের ছাড়ব না।"···

শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে, আসল মজুরী বাড়ানোর দাবীটা কমিশনার এখনকার মত চাপা দিয়ে দিলেন। এখন এই সব ছোট-খাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজের পক্ষপাতহীনতা দেখাবেন।

"হুজুর রামপীরিত আহির সাক্ষী দেবে 'ক্রেশে'র দুধটা কার কার বাড়ী যায়; আর ক্যানটিনের ব্যাপারটায়···

কথাটা শেষ হবার আগেই লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে জয়-নারায়ণ প্রসাদ।—"কাদের সঙ্গে কথা বলছেন হুজুর, কতকগুলো চরিত্রহীন ছোটলোকের দল, যারা মজুরদের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের পেট চালায়···"

হাঁ-হাঁ করে উঠে দাড়িয়েছে বাইরের রুম্-ডিপার্টমেণ্টের মজুররা; তার পর তাদের দেখাদেখি অন্য সব মজুররা। তাদের মন্ত্রীজীর সম্বন্ধে এই কথা বলতে সাহস করছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার! তাদেরই সম্মুখে! আশ্চর্য্য বুকের পাটা লোকটার! দু'-দু'টো অনাথালয়ের মেয়েকে এখনও ঢুকিয়ে রেখেছে মিলের মধ্যের কোয়ার্টারে; অনাথালয়ের মেয়ে পাঞ্জাবে বেচে, যার রোজগার মিলের রোজগারের চাইতে বেশী, সেই লোকটাই অভিমন্যু আর শিউচন্দ্রিকাকে লম্পট বলে! জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।

এগিয়ে আসে রহমৎ, তার বিবির চাকরীর কথা ভুলে। এগিয়ে আসে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টের বচ্‌কন সর্দ্দার। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।

ম্যাকনীল আর এস, ডি, ও, সাহেব মজুরদের হাব-ভাব দেখে ভয় পেয়ে যায়। লেবার কমিশনার শিউচন্দ্রিকার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করেন,—এই জন্য মজুরদের এখানে আসতে দিতে আমার আপত্তি ছিল—তা তো আপনারা শুনলেন না। এখন যে রকম দেখছি, কাজ স্থগিত করে দিতে হবে।

শিউচন্দ্রিকা বলে—"অভিমন্যু গিয়েছে বাইরে। এক মিনিটের মধ্যে মজুররা ঠাণ্ডা হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসবে।"

হলও তাই। অভিমন্যু ফিরে এসে বসল নিজের চেয়ারে। ডি, এস, পি, আর্দালীর মারফৎ কি যেন একখান চিঠি পাঠালেন থানার দারোগার কাছে।

চারি দিক্ নিস্তব্ধ হলেও ঘরের সকলেই বোঝে যে, জয়নারায়ণ প্রসাদের আর একটি অসাবধান কথার ফুলকি, দপ করে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এই বারুদের স্তূপে। তখন আর হাজারটা অভিমন্যু এলেও আর তাদের থামাতে পারবে না।

চতুর্দিকের এই থমথমে ভাবটা কিন্তু একটুও দমাতে পারে না জয়নারায়ণ প্রসাদকে। এই অগাধ আত্মপ্রত্যয়ই তার জীবনের সাফল্যের মূলে।

"উভয় পক্ষের সম্বন্ধ যথেষ্ট তেতো হয়েছে। অযথা আর তা বাড়িয়ে লাভ কি?" লেবার কমিশনার জয়নারায়ণ প্রসাদকে আর একটু বুঝে-শুঝে কথা বলতে বলেন ইউনিয়নের কর্মীদের সম্বন্ধে।

"প্রত্যেকটি কথা আমি আগে ওজন করে নিয়ে তবে বলেছি। সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না। আপনি সার, এই ইউনিয়নের গুণ্ডাদের চেনেন না।"

অবাক হয়ে যায় শিউচন্দ্রিকা। এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারকে সে ভাল ভাবেই জানে। তার মত কূটবুদ্ধি লোক হঠাৎ গায়ে পড়ে এত গালাগালি দিতে আরম্ভ করল কেন তাদের? আর কিছু কি বলবার নেই মিল-মালিকের পক্ষ থেকে? দিক, প্রাণ ভরে গালাগালি দিক জয়নারায়ণ। গালাগালির জবাবে শিউচন্দ্রিকা দেবে নথী, প্রমাণ, কাগজ। মাথা গরম করলে, ইউনিয়নের দাবী পূরণের থেকে কিছু সুবিধা হবে না। আর সব চেয়ে বড় কথা যে লেবার কমিশনার নিজেই এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের এই অসংযত কথাবার্তা পছন্দ করছেন না। জয়নারায়ণের কথা যেন একটাও তার কানে যায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে, শিউচন্দ্রিকা ফাইল থেকে বার করে ধনিরামের ষোষ মরার মোকদ্দমার কাগজপত্র।

অভিমন্যু চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ;—মুখ সামলে কথা বলবেন জয়নারায়ণ বাবু! কমিশনার সাহেব, আপনিই জিজ্ঞাসা করুন জয়নারায়ণ বাবুকে, ডাক-বাংলার এই ঘরখানাকে কেন এক দিন পাড়ার লোকে আদ্ধেক রাত্রে ঘিরে ফেলেছিল।

এস, ডি, ও, সাহেবের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। লেবার কমিশনারের মুখে একটু যেন কৌতূহল প্রকাশ পায়। বাইরের মজুরদের মৃদু স্বরে রুক্ষতার আভাস পাওয়া যায়। তারা অভিমন্যুর তারিফ করছে,—বলার মত যা কিছু বলছে তো অভিমন্যুই; মন্ত্রীজীর আজকে কি যেন হয়েছে; কাগজের লেখা তো হাকিম যখন ইচ্ছে পড়ে নিতে পারবে; কিন্তু তার সম্মুখে জবাব দেবার সুবিধা তো আর পরে পাবে না।...

"ডাক-বাংলাতে কবে কি হয়েছিল না হয়েছিল, আজকের তদন্তের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা' আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কেবল অনর্থক আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার নতুন নতুন রাস্তা বার করছে এরা।" এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ম্যাকনীল সাহেব।

"দু'টোর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই বলছি, না হলে বলতাম না।" রুক্ষ স্বরে জবাব দেয় অভিমন্যু।

বাইরে মজুরদের কথাবার্তাও বেশ তীব্র ঝাঁঝালো হয়ে এসেছে; আর বোধ হয় তাদের সংযত করে রাখা যাবে না।......

"এই দেখুন সার, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের একখান প্রমাণ-পত্র।"—নাটকীয় ভাবে ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করে, একটি-একটি করে ভাঁজ খুলে জয়নারায়ণ প্রসাদ চিঠিখানি দেয় লেবার কমিশনারের হাতে। তার মুখে বিজয়ীর দীপ্তি, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সাফল্যের ব্যঞ্জনা। মরা বাঘের দেহটার উপর এক পা তুলে দিয়ে বন্দুকধারী শিকারী ফটো তুলতে দাঁড়ালে ঠিক এমনি দেখায়।

লেবার কমিশনার চিঠিখান পড়েন। "ব্যাপারটা কি পরিষ্কার করে বলুন তবে তো বুঝি।"

শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখবার জন্য। কমিশনার সাহেব চিঠিটা দেন শিউচন্দ্রিকাকে। উদগ্র কৌতূহলে দশ হাজার মজুরের কান খাড়া হয়ে ওঠে।

অভিমন্যুর ক্রোধের আগুন দপ্ করে নিবে যায়। মুখখান ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ধরা পড়ে গিয়েছে সে হাতে-নাতে। রহমতের বিবির মারফৎ পাঠানো এই চিঠিখান কি করে এল জয়নারায়ণ প্রসাদের হাতে? মিনাকুমারীর বাক্স থেকে নিশ্চয়ই কোন রকমে চুরি করিয়েছে জয়নারায়ণ। চিঠিখানা সযত্নে বোধ হয় তুলে রেখেছিল মিনাকুমারী বিছানার নীচে। চিঠিখান পড়ে তখনই যদি ছিঁড়ে ফেলে দেয় মিনাকুমারী, তা'হলে আর এ বিপদে পড়তে হয় না। ছেঁড়া বললেই কি ছেঁড়া যায় এ সব চিঠি। অভিমন্যু নিজেও তো জানে! কত বার হয়ত পড়েছে মিনাকুমারী এই চিঠিখান—কত রাত পর্য্যন্ত।...

বর্তমান আবেষ্টনীতে এ চিঠির গুরুত্ব সে স্পষ্ট বোঝে। এতগুলো মজুরের চোখে সে মুহূর্তের মধ্যে এস, ডি, ও, সাহেবের চাইতেও হেয় হয়ে যাবে। আর সব চাইতে বড় কথা যে, শিউচন্দ্রিকার কাছে সে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে। এর পর জয়নারায়ণকে হয়ত বা শিউচন্দ্রিকা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তাকে কোন দিনই পারবে না। আর সময় নেই ভাববার। কোণঠাসা জানোয়ারের মত সে মরিয়া হয়ে ওঠে।...সে নিজের কথাই ভাবছে এতক্ষণ। আর মিনাকুমারীর দিকটা সে ভাবছেই না; অনুশোচনায় তার মন ভরে ওঠে। তার নামেও কলঙ্ক লাগিয়েছে সে।...ইউনিয়নের স্বার্থে আঘাত লাগবে বলে অভিমন্যু তার জীবনের স্বপ্ন, সাধ মুছে ফেলে দিতে পারে না। কারও মুখ চেয়ে সে কথা বলবে না। সে সর্ব-সমক্ষে পরিষ্কার ভাবে তার প্রাণের কথা বলবে। বলবে যে, সে চায় মিনাকুমারীকে, আর মিনাকুমারী চায় তাকে। তারা চায় বাসা বাঁধতে; এর মধ্যে অসম্মানজনক কিছু নেই; কারও কাছে লুকোবার কিছু নেই।

শিউচন্দ্রিকাও অবাক হয়ে গিয়েছে চিঠিখান দেখে। ভাল নয় তো! হাতের লেখা তো অভিমন্যুর মতই মনে হচ্ছে। অভিমন্যু! অভিমন্যুর মুখের দিকে তাকিয়েই সে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ধারণা করে নেয়। শিউচন্দ্রিকা স্থিতধী লোক। অভিমন্যুর উপর চটবার সে অনেক সময় পাবে পরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই চিঠিখানি প্রকাশ হয়ে যাবার ফলাফল—মজুরদের দাবীর উপর, লেবার কমিশনারের মনের উপর ইউনিয়নের সংগঠনের উপর আর তার পার্টির সুনামের উপর, কি হবে, সেইটাই সে মনে মনে হিসাব করছে। সেই বুঝেই এখানকার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে এখনই। অভিমন্যুর কথা কানে আসে,—"হাঁ সার, এ চিঠি আমারই লেখা।"

জয়নারায়ণ প্রসাদ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—"তবু ভাল যে আপনারা চিঠিখানাকে জাল বলেননি।"

তার পর কমিশনার সাহেবকে আদ্যন্ত ঘটনাটা শোনায়—"মিনাকুমারী মিলের ক্যানটিনে মেয়েদের বিভাগের সুপারভাইজর। তাঁর কোয়ার্টার মিলের ভিতর। তাঁর কাছে এই মহাত্মাটি এই অভদ্র চিঠিখান পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা তো এই চিঠি পেয়ে রাগে অপমানে কেঁদে-কেটে আকুল। তার পর তিনি এই চিঠিখান ম্যানেজার সাহেবকে দেন এই অপমানের প্রতিকারের জন্য। বোঝেনই সার, এক জন অবিবাহিতা ভদ্রমহিলার এই সব বিষয় নিয়ে কোর্টে যাওয়াও কতটা বিপজ্জনক। আমি খালি এই স্কাউণ্ড্রেলটার আসল রূপ আপনার কাছে ধরে দেওয়ার জন্য এই চিঠি সকলের সমক্ষে আনলাম। ক্যানটিন আর ক্রেশের সুপারভাইজর দুই জনকেই এই ইউনিয়নের মহাত্মাদের তদ্বিরে আমরা কাজে বহাল করি। সেই মহিলারা নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হতে পারেন, এটা বোধ হয় এঁরা আশা করেননি। আমার শালীনতাবোধ এর চাইতে পরিষ্কার করে কথাটা আপনাকে বলতে দিচ্ছে না। অল্প কথায়,—প্রেমে হতাশ না হলে ক্যানটিন আর ক্রেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসত না, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।"

আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছিল অন্য রকম। জয়নারায়ণ যখন আক্রমণের নীতি নেয়, তখন আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করে। চোখ রাখে সজাগ, কান রাখে খাড়া করে। সব রকম অস্ত্র শাণ দিয়ে ঝকঝকে করে রাখে, কখন কোন্‌টার দরকার পড়বে কিছু বলা যায় না। জলের মত বইয়ে দেয় টাকা। উপরের সরকারী অফিসার থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়নের নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত সকলকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করে টাকা দিয়ে। যাদের লোভ দেখিয়ে হাত করতে পারে না, তাদের জন্য তৈরী হয় কড়া ওষুধ।

অভিমন্যু চিঠিখান দিয়েছিল ঠিকই রহমতের বিবির হাতে। টাকার খেলাতেই চিঠিখান মিনাকুমারীর হাতে না পড়ে, পড়ে রুকণীর হাতে। রুকণীই চিঠিখানা দেয় জয়নারায়ণকে। রুকণীর সঙ্গে জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধটা ঠিক আলাপ-পরিচয়ের পর্যায়ে পড়ে না। একটু হয়ত বাড়িয়ে বললেও অনাথালয়ের ডেঁপো ছেলেরা মোটামুটি ঠিকই বলত।

জয়নারায়ণ টাকা চালতে রাজী ছিল অভিমন্যুর চিঠির জন্য। অনাথালয়ে মানুষ-হওয়া মেয়ের পক্ষে টাকার লোভ সামলানো শক্ত, এ কথা জয়নারায়ণ প্রসাদ বোঝে। তাই রুকণী যখন চিঠিখান নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিল, তখন সে আশ্চর্য্য হয়নি।

কিন্তু একটা কথা রুকণী ছাড়া আর কেউ জানে না। এই চিঠির ব্যাপারে জয়নারায়ণের দেওয়া টাকার কথাটাই তার কাছে সব ছিল না। এ ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিষ তার মনের মধ্যে কাজ করেছে। হয়ত একটা ঈর্ষার ছোঁয়াচ ছিল এর মধ্যে। সে মিনাকুমারীর থেকে সুন্দরী; তার কথাবার্তার একটা আকর্ষণ আছে, সে কথাও সে জানে। তবু সে অভিমন্যুর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। মিনাকুমারীর কাছে এই প্রথম পরাজয়ের গ্লানিটা, সে বোধ হয় মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি একেবারে। মিনাকুমারীর সব মনের কথা সে শোনে; কিন্তু নিজের মনের গোপন কোণের এই খবরটা সে মিনাকুমারীকে জানতে দেয়নি কোন দিন। কত কথা মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে, সব কি বলা যায়? আর অভিমন্যুর কথা কি কখন বলা যায় মিনাকুমারীর কাছে?······মিনাকুমারী বিয়ে করে এখান থেকে চলে যাক, তাও রুকণী চায় না। দু'জন একসঙ্গে থাকলে তবু লোকের মুখ কতকটা বন্ধ করা যায়।······আজকালকার চাকরীর জীবনও রুকণীর খারাপ লাগে না। বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। তবে সে বিবাহিত জীবনে চায় স্বাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধি; আর বিবাহের পরও সে চায় উচ্ছল জীবনের স্পন্দনের নিত্য-নূতন উদ্দীপনা। বোধ হয় অনাথালয়ের মেয়ের পক্ষে অমন বিবাহ সম্ভব নয়। সেই জন্য সে জোর করে নিজের বিয়ের কথা ভাবতে ভুলেছে। তবু মাঝে-মাঝে বার্দ্ধক্যের কথা মনে হলে ভয় হয়। এখনও রক্তের জোর আছে, যখন সেটা থাকবে না, তখন কি হবে? বিয়ে করতে হলে এখনই করা ভাল, কত দিন এ কথা তাকে বুঝিয়েছে মিনাকুমারী।

এ সব সত্ত্বেও হয়ত রুকণী অমন সুশ্রী হাসিমুখ ছেলেটাকে বিপদে ফেলবার জন্য এমন ষড়যন্ত্র করত না এসিষ্টান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে মিলে। কিন্তু যখন তার কাজের সম্বন্ধে, তার 'ক্রেশ'র সম্বন্ধে অভিযোগ অভিমন্যুরা কাগজে ছাপিয়ে বার করতে লাগল, তখন আর সে নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারল না, এক জন তার অনিষ্ট করে যাবে, আর সে নির্বিবাদে সয়ে যাবে, তেমন মেয়ে রুকণী নয়। একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে সে উঠে-পড়ে লাগতে জানে; আঘাত ফিরিয়ে দিতে জানে।

আর মিনাকুমারী এখনও জানতে পারেনি, অভিমন্যুর এই চিঠি-খানির কথা। সেই দিনকার সন্ধ্যার স্মৃতির পরশ এখনও লেগে আছে তার মনে; খালি মনে কেন, সারা দেহে। অভিমন্যুকে সে ভালবাসে বলেই তার মন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চায় না আর। তাই সে অভিমন্যুর কোন চিঠির জবাব দেয় না আজকাল। আর সে অভিমন্যুর ব্যথার আগুন বাড়তে দেবে না নিজে ইচ্ছা করে। সে তো বেশী কিছু আশা করেনি অভিমন্যুর কাছে। চেয়েছিল মাত্র একখান বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট অঙ্গন। এই সামান্য আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করতে পারল না অভিমন্যু।···অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা-শুনা বন্ধ করা যায়; কিন্তু তার কথা ভাবা কি কখনও বন্ধ করা যায়? ভেবে ফুরোনো যায় না অভিমন্যুকে। তার জীবনটা ভরে আছে অভিমন্যুতে, অথচ সারা জীবন কাটাতে হবে তাকে না পেয়ে। রহমতের বিবির অভিমন্যুর সংবাদ আনবার বিরাম নেই

মিনাকুমারীরও তার জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কাকে সে দোষ দেবে এর জন্য নিজেকে ছাড়া ?······

রুকণী এসে তাকে কাগজ দেখায়।—এই দ্যাখ অভিমন্যুদের প্রস্তাব, ক্যান্টিনের খাবার আমরা নিয়ে গিয়েছি অন্যায়ভাবে। মিনাকুমারী জানে যে খবরটা সত্যি, কিন্তু এও জানে সে অভিমন্যু তার বিরুদ্ধে কিছুতেই যেতে পারে না, যতই কাগজে কিছু লিখুক না কেন। এ হচ্ছে ঐ শিউচন্দ্রিকার কাজ। 'সেই কাজ, যা খই ভাজ'—আর কিছু পেলে না তো আমাদের পিছনেই লাগো। তুই যাই বলিস রুকণী, অভিমন্যু আমার বিরুদ্ধে লিখেছে, এ কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

রুকণী তাকে ঠাট্টা করে—"দীক্ষিতদের আমবাগানের কথাটা আজও ভুলতে পারিসনি তুই দেখছি। তুই মেম্বর হয়ে যা ইউনিয়নের।"

এ কথায় মিনাকুমারীর হাসি আসে না। সে জানে যে, সে বাঁচাতে পারে অভিমন্যুকে। সেই রুদ্ধ কান্নার ঢেউই এসে লাগছে তার মনে অষ্টপ্রহর। সে নিজেকে অপরাধী মনে করছে চব্বিশ ঘণ্টা; কিন্তু উপায় নেই। বর্তমানের আনন্দটুকুই সব নয়, আমের মুকুলের মধু ক'দিন ঝরে বছরে?···

চিঠি তো নয়—একটা যেন বোমা পড়েছে লেবার কমিশনারের টেবিলের উপর। কথার খই ফুটছে জয়নারায়ণ প্রসাদের মুখে। বাজ পড়েছে অভিমন্যুর মাথায়। হকচকিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছে সাইনের লোকের দল। এসিষ্টান্ট ম্যানেজারের গর্বোদ্ধত মুখের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়েছে শিউচন্দ্রিকা। লেবার কমিশনার একটু নড়ে-চড়ে বসেন, তাঁর মেদবহুল শরীরটাকে চেয়ারখানার সঙ্গে খাপে-খাপে বসিয়ে নেওয়ার জন্য। কোটের পকেট থেকে বোতামটা এঁটে, চশমার কাচ রুমাল দিয়ে মুছে, এক চুমুক জল খেয়ে, একবার গলা-খাঁকারী দিয়ে তিনি যেন আবার নতুন করে তৈরী হয়ে নেন। শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে, এ কমিশনার নতুন মানুষ। আর ইউনিয়নের কোনও কথা তাঁর মনে দাগ কাটতে পারবে না। এতক্ষণের যুক্তিগুলো মুছে সাফ করে ফেলেছেন মনের থেকে। রঙের তাস খেলেছে এসিষ্টান্ট ম্যানেজার। একেবারে নিরস্ত্র করে দিয়েছে শত্রুপক্ষকে, তছনছ করে দিয়েছে এতক্ষণের শিউচন্দ্রিকার জমানো যুক্তি :

অভিমন্যু এখনও বার করে দিতে পারে তার ঝোলার মধ্যে থেকে মিনাকুমারীর চিঠিখান। তাতে হয়ত তার সম্বন্ধে কমিশনার সাহেবের একটা ভুল ধারণা কেটে যেতে পারে। মিনাকুমারী নিজে দিয়েছে এই চিঠি ম্যানেজারের কাছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না; কিন্তু রূঢ় প্রমাণিত বাস্তবের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। কোন সন্দেহ করবার কারণ নেই জয়নারায়ণের কথায়। মিনাকুমারী বদলেছে। আগেও বোধ হয় এই রকমই ছিল; অন্য রকম থাকলে তবে তো বদলাবার কথা ওঠে। না, না, তা হতে পারে না। এত দিনের এত কথা, চোখের জল, আদর-অনুযোগ, চিঠির উপরের কালির আঁচড়গুলো, দীক্ষিতদের বাগানের আমের মুকুলের সৌরভ, সবই কি মিথ্যে? প্রতি পদে-পদে সে কি ভুল বুঝে এসেছে? অসম্ভব! হ'তে পারে না তা। সে নিজেকে যত দিয়েছে, বোধ হয় তার চাইতেও বেশী করে মিনাকুমারীকে পেয়েছে। কোন দিন তার রেশ যাবার নয়। নিজের সাফাই গাইবার জন্য সেই মিনাকুমারীকে কি অভিমন্যু নীচু করে দিতে পারে? জয়নারায়ণ প্রসাদকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবার জন্য সে কি বার করে দেবে মিনাকুমারীর চিঠিখান, সেই রকমই নাটকীয় ভাবে ভাঁজ খুলে-খুলে? অতটা অমানুষ সে নয়।···অভিমন্যুর ভালবাসার ভিতর যে অনাবশ্যক পৌরুষের গর্বটুকু মেশানো ছিল, সেইটা মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে এতক্ষণে। সেইটাতে আঘাত দিয়েছে মিনাকুমারী, মনের উপর আঘাতের চাইতেও জোরে। অপমান করেছে তার ভালবাসার। এই জন্য মিনাকুমারী এত দিন খবর দেয়নি। বাস্তবের রুক্ষ আলোতে তার রঙীন স্বপ্ন-সাধ মুছে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। তার নিজের হাতে কাটা ঐ কাঁটা কালির আঁচড়ের ধাক্কায় তার মনের ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। এখানকার নথীপত্র, কথার ফুলঝুরি সব নিরর্থক মনে হচ্ছে এখন তার কাছে।···তবু মিনাকুমারী, সেই মিনাকুমারীই থাকবে তার কাছে। তার নিজের জগৎ মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে গিয়েছে বলে সে সেই মিনাকুমারীর নামে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগতে দিতে পারে না। এর ফল যাই হোক, লোকে তাকে যা ইচ্ছে মনে করুক, তার সম্মান পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাক, সে আর বাইরের জগতের তোয়াক্কা রাখে না। তবুও তো তার মনের কাছে, তার মিনাকুমারী একান্ত ভাবে তারই থাকবে চিরকাল! এতগুলি সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে, তার একান্ত আপন জিনিসটা সে আনতে পারে না, কিছুতেই।

সকলের হাব-ভাব লক্ষ্য করছে বাইরের মজুররা। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর মনগড়া অর্থ করে নিজেরা মোটামুটি তারা ঠিকই বুঝেছে যে, হাকিমের মন ঝুঁকছে মিল-মালিকের দিকে। তারা চেঁচামেচি আরম্ভ করে। হাওয়া দিক্ বদলেছে। ফেঁপে উঠেছে বারুদের স্তূপ। সবাই জানতে চাইছে সারা ব্যাপারটা। আর বোধ হয় তাদের থামিয়ে রাখা গেল না।

জয়নারায়ণ প্রসাদ ঘরের ভিতর থেকে হাত তুলে মজুরদের শান্ত হয়ে বসবার জন্য অনুরোধ করেন। গত কয়েক মিনিটে তিনি এই ধৃষ্টতা দেখাবার সাহস অর্জন করেছেন।

মজুরদের দিকে তাকাতে শিউচন্দ্রিকা সঙ্কোচ বোধ করে। তবু জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দেয় মজুরদের দাবীর বহস্, যেখান থেকে বাধা পড়েছিল, ঠিক তার পর থেকে। কাগজ-পত্র সব সে একের পর এক দেখিয়ে যায়। তার শাণিত যুক্তির ধার আগে থেকে একটুও ভোঁতা হয়নি এখন, তবু যেন তা লেবার কমিশনারের মনে একটা আঁচড়ও কাটতে পারছে না। অভিমন্যুর চিঠি কমিশনার সাহেবের মনের সম্মুখে—যে বধির প্রাচীরটা তুলে দিয়েছে, তাতে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসছে কথাগুলো। শিউচন্দ্রিকা নিজেই মনে মনে অনুভব করে যে, একটা সঙ্কোচের শৈত্যে তার কথার মধ্যে আবেগের উষ্ণতা একটু কমে এসেছে বোধ হয়। মজুরদের দাবীর ন্যায্যতার সঙ্গে এক জন ইউনিয়নের কর্মীর প্রেমপত্রের কোনই সম্বন্ধ নেই, এ কথা সে বোঝে। তবু যে সত্যনিষ্ঠার বলে সে কারও কাছে মাথা নোয়ায়নি কোন দিন, তারই ভিত্তি যেন দুর্বল করে দিয়েছে অভিমন্যুর চিঠিখানা। ত্রুটিহীন নিষ্ঠার সঙ্গে সে দাবী পেশ করে চলেছে কমিশনার সাহেবের কাছে,

কিন্তু তিনি শুনছেন দায়সারা ভাবে, কর্তব্যের খাতিরে। আঙুল মটকে, টেবিলের উপর হাবিজাবি নক্সা এঁকে, হাই তুলে, নখ খুঁটে, তিনি তাঁর অধৈর্য্যতা চাপবার চেষ্টা করছেন। কথার তুবড়ি জয়নারায়ণ শান্ত হয়ে বসেছে, আর এখন তার চৈ-চৈ করবার দরকার নেই। ম্যাকনীল সাহেবের মুখে ফুটে উঠেছে প্রসন্নতার আভাস। অভিমন্যু ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের উপর মুখ গুঁজে।

বাইরে ক্ষেপে উঠেছে মজুরের দল। জিতবার হাত পেয়েও আজ তারা হেরে যাচ্ছে। আর সব ঐ লক্ষ্মীছাড়া অভিমন্যুটার জন্য। আবার মুখ লুকোচ্ছে! আসতে দে শালাকে বাইরে একবার। তার পর দেখে নেব ঐ ভিজে বেড়ালটাকে!······হিংস্র জন্তুর মত তারা এখনই অভিমন্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ঐ মিটমিটে শয়তানটাকে এখনই ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলতে চায়।

আস্ফালন সব চেয়ে বেশী করছে ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টের সরযু সিং, মনিঅর্ডারের রসিদের আঙুলের ছাপের উপর যে হাত বুলোতো।

শিউচন্দ্রিকার বলা শেষ হওয়ার পর, লেবার কমিশনার উভয় পক্ষকে ধন্যবাদ দেন। বিজয়ী বীরের মত ম্যাকনীল সাহেব, আর জয়নারায়ণ প্রসাদ গট-গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান; মজুররা ঝুঁকে আদাব করে, তাদের মোটরে পৌঁছুবার পথ করে দেয়।

কমিশনার সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে বলে দেন যে সন্ধ্যার প… তাদের যে দেখা করতে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে, সেটা আর হ… উঠবে না; তাঁর শরীরটা একটু খারাপ-খারাপ লাগছে।

অজস্র হাসি-টিটকারীর মধ্যে থানার কনষ্টেবলরা অভিমন্যুকে কর্ডন করে ঘিরে ইউনিয়ন অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসে।

ডি, এস, পি, আর এস, ডি, ও, সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে চিন্তি… হতে বারণ করেন—"দু'জন পুলিস রাতে ইউনিয়ন অফিস পাহা… দেওয়ার জন্য থাকবে; ভয়ের কোন কারণ নেই।"

[ক্রমশ

"যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলি দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। যে গুণ মানুষকে একত্র করে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলি অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই সয়তানের দংশক বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্য রক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সঙ্কল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে—নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া অবিশ্বাস করিয়া উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধনা, গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে, তখন আমরা সর্ব্ব প্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব, তখন আমরা দাসত্ব করিব না—তাহা আমাদের প্রভু যত বড়ই প্রবল হউন। জল যখন জমিয়া কঠিন হয়, তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মত তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখা-প্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধকে হার মানিতে হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর অভীশ্বর সেন

প্রত্যেক [illegible] অংশ[illegible]শেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সকল সজীব দেহ জীবকোষে পরিপূর্ণ। মৌমাছির চাকের মতই ইহাদের গঠন। যে কোন জীবকোষ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ, তাহাই জীবন-রস। জীবকোষের মধ্যে কোথাও না কোথাও জীবন-রসে মগ্ন অন্ধকার কেন্দ্র থাকে, সেখানে এক রঞ্জনীসূত্রের সমষ্টি। জীব-জন্তু বা উদ্ভিদ-দেহ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষেরাও সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। বৃদ্ধির সময় যখন একটি জীবকোষ ভাঙ্গিয়া দুইটি জীবকোষের সৃষ্টি হয়, তখন তাহার ভিতরকার রঞ্জনীসূত্রগুলিও বিভক্ত হইয়া যায়। এগুলি দেখিতে সূত্রের মত, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এগুলির ভিতর ক্রোমেটিন বলিয়া এক প্রকার রঞ্জন দ্রব্যের অসংখ্য খণ্ড আছে। জীবকোষ যখনই বিভক্ত হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেখা যায় জোড়রূপে আর এক জোড়া রঞ্জনীসূত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, এই রঞ্জনীসূত্রের ভিতর-ভাগ পদার্থবিশেষের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিপূর্ণ। ইহাদের বলা হয় জিন বা জীবনাণু। জীবকোষের কার্য্যপ্রণালী ইহাদের উপরই নির্ভর করে।

পুরুষ অথবা স্ত্রী, প্রতি জীবকোষেই রঞ্জনীসূত্র ও জিন আছে। রঞ্জনীসূত্র জীবকোষের অন্ধকার কেন্দ্রকে তৈরী করে। তাহার ভিতরে থাকে জীবনাণু। জীব-জন্তু, মানুষ বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করে এই সকল জিন। তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখে জীবন-রস। এই জীবনাণু এত ক্ষুদ্র যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ হইতে, তাহাদের ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব, বর্ণ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য লইয়া জীবনাণুদের সংগ্রহ করিয়া যদি একত্র করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ধরিয়া রাখিবার জন্ত একটি ক্ষুদ্র দোয়াতই যথেষ্ট। অথচ এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনাণু পৃথিবীর সমস্ত মানব বৈশিষ্ট্য, সমগ্র জান্তব ও উদ্ভিজ্জ প্রবৃত্তির জন্ত দায়ী। পৃথিবীর কোটি কোটি মানবের বিভিন্ন বিশেষত্বকে রাখিবার জন্ত দোয়াত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র আধার। অথচ ইহা যে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অতি ক্ষুদ্র জীবনাণু ও জীবন-রস কি এই বংশের অগণিত বংশধরদের বৈশিষ্ট্য বন্দী করিয়া রাখিয়া প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব এত ক্ষুদ্র আধারে রক্ষিত করিয়া রাখে? কাহাকেই বা বন্দী করিয়া রাখে তাহারা? একটি নির্দ্দেশ-প্রণালীর বিরাট পুস্তক না কতকগুলি বিশেষ পরমাণুর সমষ্টি? না প্রত্যেককেই কোন না কোন সুযোগের উপর নির্ভর করিতে হয়? জীবন-রস হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভ্রূণ বংশগত বিশেষত্ব আনিয়া তুলে—আণবিক ধারায় জিন ও সাইটোপ্লাসমকে সুসংবদ্ধ করিয়া পুরাতন ইতিহাসকে তাহারা লিপিবদ্ধ করে। এমন কি, যে মাতা গর্ভাধান হইতে তাহার শিশুকে বহন করিয়া থাকে, সন্তানের উপর তাঁহারও প্রকৃতিগত দান নিতান্ত কম; কারণ, সন্তান পিতার বা মাতার কাহার মত হইবে তাহাও ঠিক করে এই জীবনাণুরাই। গর্ভ হইবার পূর্ব্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সন্তানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের জন্ত বিবর্ত্তন-প্রণালীর অনেক সময়ের প্রয়োজন। কোন জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত এবং তাহার সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিবার জন্ত ইহা একটি প্রণালী। আত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পূর্ণতা ঘটে। ইহা কোন অজ্ঞাত শক্তিশালী সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট, মানুষ বুঝিতে পারে না বলিয়া না বুঝিবার জন্ত সদা চঞ্চল বলিয়া বিধাতা তাহা বুঝাইয়া দিতে আসিবেন না। বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্য ও ক্রমাগত একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নূতন পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। সুযোগ বা আকস্মিক ঘটনা বিবর্ত্তন-প্রণালীকে খুব কম পরিচালিত করে—কেবল মাত্র বংশগত পরিবর্ত্তনগুলিতে সীমাবদ্ধ পিতা-মাতার বিভিন্নতার উপর ইহার কিছু কার্য্য আছে।

প্রজাপতির জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে আসে বিভিন্ন অবস্থা। প্রথমে আসে লোম-পরিপূর্ণ কীট। এই অবস্থায় প্রজাপতি প্রচুর খাদ্য ভক্ষণ করে ও বড় হয়। শেষে আরাম করিয়া রেশমের মত এক প্রকার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া শুক-কীটের অবস্থায় আসে। শরীরের জীবকোষসংঘগুলি গলিত হইয়া জীবকোষ ও মিশ্রিত জীবকোষের এক অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়ায়। কোন বিশ্লেষক আজ পর্য্যন্ত শরীরের এক অংশ হইতে অপর অংশের বিভিন্নতা বলিয়া দিতে পারে না অথবা দুইটি অংশ পৃথক্ করিয়া ফেলিতেও পারে না। ঠিক সময়ে শুক-কীটের প্রত্যেকটি জীবকোষ নূতন কার্য্যের সন্ধান করিয়া লয়, এবং শুক-কীট একটি নূতন জীবে পরিণত হয়। ক্রমে শুক-কীট উন্মুক্ত হয় এবং পৃথিবীতে প্রজাপতির মত একটি সুন্দর পতঙ্গ বাহির হইয়া আসে। প্রজাপতির নরম পক্ষগুলি নল দিয়া তৈরী, ইহার ভিতর দিয়া প্রজাপতি রক্ত পরিচালন করে। পক্ষগুলি রক্ত সঞ্চালনের ফলে স্ফীত হয়, তাহা প্রজাপতিকে উড়িতে সাহায্য করে। নানা রঙ হইয়া প্রজাপতি যখন বাতাসে উড়িতে থাকে তখন আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখি, ইহার পক্ষ পালকের মত আঁশ দিয়া আবৃত এবং লাল, সবুজ অথবা পীত রঙের ডানার দাগগুলি প্রজাপতি-মাতার ডানায় ঠিক যেরূপ সজ্জিত ছিল, ইহাতেও ঠিক সেই রকম থাকে। ইহার দাগগুলি ইহার পিতা-মাতার দাগের অনুরূপ, ইহার বিভিন্নতা একেবারে হয় না। জীবনাণুর এই নির্দ্দেশ শক্তি কি? তাহারা জীবকোষের নিয়ন্ত্রণ করে; জীবকোষেরা বিশ্বস্ত সৈনিকদের মত সঠিক ভাবে তাহাদের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করে। গণিত শাস্ত্রের একই প্রশ্ন দুইবার সমাধান করার মত তাহা হয় নির্ভুল।

বস্তুবিশেষের বিশেষ রঙের আলোক-রশ্মি গ্রাস করার এবং অপর রঙের আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত করার জন্ত রঙের সৃষ্টি হয়। আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত বড়, এক ইঞ্চির মধ্যে আলোক-তরঙ্গ থাকে তেত্রিশ হইতে ছেষট্টি হাজার; রেডিও-তরঙ্গ থাকে প্রতি ইঞ্চিতে এক কোটি; এক্স্‌-রেতে আরও বেশী। হয়ত ভবিষ্যতে আরও বেশী ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক মানুষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে এক প্রকারের প্রজাপতি দেখা যায়, যাহাদের পক্ষে কোন স্বচ্ছ পদার্থের আঁশের আবরণ থাকে। তাহার ভিতর দিয়া আলোক ভ্রমণের কালে নীল বর্ণের আলোক-রশ্মি এত সুন্দর ভাবে বিচ্ছুরিত হয় যে, সে বর্ণের সহিত কেবল নীলকান্ত মণির তুলনা হয়। প্রজাপতির ডানার ঐ আবরণের ঘনত্ব যদি এক হাজার ভাগের এক ভাগেরও পরিবর্ত্তন হয়, রঙের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, হয়ত কোন রঙই দেখা যাইবে না। জীবনাণুর পদার্থকণার সজ্জা এত সুন্দর যে সহস্র বংশধরেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে না।

মানুষ রেডিয়ম এবং অন্যান্য রশ্মির দ্বারা জীবনাণুদের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইহার ফলে পক্ষবিহীন মক্ষিকা, বিকৃতাবয়ব উদ্ভিদ এবং অনেক অদ্ভুত বিচিত্র প্রাণীর সৃষ্টি করিতে পারে। হয়ত এক দিন বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক জীবের উন্নতি বিধান করিবে। ইতিমধ্যে সে অমূল্য জ্ঞান সে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার ফলে প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ও পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

এখন জানা গিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জীবন আসিয়াছে একটি সজীব জীবকোষ হইতে। জীবনের উৎস সম্বন্ধে আর যে সকল মতবাদ আছে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। এখন দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন জীব-জন্তুর দলগুলির ক্রমোন্নতির মধ্যে মধ্যে কতকগুলি শূন্য স্থান আছে এবং তাহাদের পূরণ করা সম্ভব নয়। এমন কি নিকটতম সম্পর্কে আবদ্ধ প্রাণীগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহারা উক্ত পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অসমর্থ হয়। অশ্ব ও গর্দ্দভের সম্মিলনে খচ্চর জন্মে, কিন্তু খচ্চরদের আর সন্তান-সন্ততি হয় না। আমরা যতই জীবনের আদি-উৎসের দিকে অগ্রসর হই, দেখিব, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংযোগ বরাবর সাধারণ ঘটনাই। এক দিন হয়ত আমরা সকলে কল্পনা করিতে পারিব, এক দিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত জীবনের সংযোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী সম্পূর্ণ জীবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ক্লাম ও অক্টোপাস দুই-ই সামুদ্রিক মৎস্যজাতীয় কাটলফিস কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দুই জনেরই পরিবর্ত্তন প্রায় অসম্ভব।

জীবজন্তুর মধ্যে এই সকল বিভাগ সৃষ্টির প্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাণীই বিশিষ্ট হইয়া শেষে ফিরিয়া যাইবার অথবা নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি হারাইয়াছিল। এই ক্রমবর্দ্ধমান অসামর্থ্যের জন্য অনেক প্রকার প্রাণী অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে, যদি অন্য জন্তুদের পক্ষে সাধারণ জীবনযাত্রা-প্রণালী অসম্ভব হইয়া উঠে নাই।

মানুষ স্তন্যপায়ী এবং ইহার দৈহিক গঠন-প্রণালী বানরদের মত কিন্তু বানরদের সহিত কঙ্কালের সামঞ্জস্যই প্রমাণ নয় যে আমরা বানর-পূর্ব্বপুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বা বানরেরা মানুষের বিকৃত বংশধর। কেহ বলিবে না, রুই মাছ কাতলা হইতে আসিয়াছে, যদিও দুই প্রকার মাছই একই জলাশয়ে থাকে, একই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, এবং উহাদের কঙ্কালশ্রেণী প্রায় একরূপ। ইহার কেবল এই অর্থই হয়, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংযোগ-রক্ষা কালে দুই প্রকার প্রাণীকেই একই রকম অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা দেখা যায়, মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আছে, কোন পদার্থ ধারণ করিবার শক্তি, যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে—মানুষের অগ্রসর হওয়ার এবং আত্মরক্ষা করিবার শক্তি আছে। বানরের অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতেই নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কখনও বৃক্ষবাসী বানরদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে আসে নাই, কারণ, প্রকৃতির নিকট হইতে হারাণো জিনিষ কখনও ফেরত পাওয়া যায় না। অশ্বেরা এখন বিশেষ ভাবে গঠিত, উন্নত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া ধাবমান হয়, তাহারা কখনও তাহাদের অতীতের পূর্ব্ব-পুরুষদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ফিরিয়া পাইবে না। যাহাই হোক, আমাদের কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পূর্ব্ব-পুরুষদের কথা ভাবিতে হইবে না। মনে হয়, মানুষ পূর্ব্ব-পুরুষদের "হারাণো সূত্রে"র যে সন্ধান হইতেছে, তাহা কোন দিন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

একই জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের পুরুষ ও স্ত্রীর জৈব সম্মিলন ঘটাইয়া ইচ্ছানুরূপ নূতন নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করা যায়। গ্রে হাউণ্ড পিকনিন অথবা পুগ কুকুরই ইহাদের উদাহরণ। যদি বার বার ইহাদের নিখুঁৎ ভাবে জন্মানো যায় তাহাদের পরিবর্ত্তন কখনও ঘটিবে না। যদি প্রকৃতির উপর তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সযত্নে বর্দ্ধিত কুকুরগুলি কালে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নেকড়ে বাঘের মত হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে নূতন নূতন কুকুর জাতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা যদি বার বার বজায় রাখা হয়, তবে তাহারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কুকুরই রহিয়া যাইবে।

বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই নিত্য নূতন ধরণের পায়রার উদ্ভব হইয়াছে —ইহারা ফ্যানটেল, পাউটার জিক ও ক্যাকুপট। জীবনাণুরা কি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছে, সুবিধা পাইলেই তাহারা পুরাণ অভ্যাসে ও অবয়বে পায়রাদের ফিরাইয়া আনিবে। বহু অযত্নে বর্দ্ধিত যে কোন পায়রাকে দেখিলেই তাহারা যে পুরাণ অভ্যাসে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা প্রতীয়মান হইবে। তাহাদের দেহে প্রায় একই রকমের চিহ্ন এবং দেহের বর্ণের সমতা রক্ষা একটা বিশেষ চেষ্টা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সাধারণতঃ সঙ্কর জাতিতে বিরাগ—পঞ্চপদ বা দ্বিমস্তক গাভীকে আমরা ভয় করি। চরিত্রহীন না হইলে সুন্দর নর বা নারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু সকলকার চেয়ে বেশী পছন্দ করি স্নেহশীলা মাতাকে।

জীবনাণুরা যৌন জীবকোষদের অংশ কিন্তু তাহারা মানুষের অবয়ব গঠনে কোন সাহায্যই করে না। তাহারা একত্র থাকে মানব-শরীরের সামান্য সামান্য কোন কার্য্যের কোন অংশও গ্রহণ করে না। জীবাণুরা জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। পিতা মাতার অভ্যাস পরিবর্ত্তনে তাহারা পরিবর্ত্তিত হয় না। কেবল খারাপ স্বভাব-চরিত্র রোগী বা দুর্ঘটনার সময়ে খুব খারাপ জিনিষ হইয়া তাহাদের কাজ করিতে হয়। শক্তিশালী দম্পতি শক্তিশালী সন্তান সন্ততিই পায় কিন্তু তাহা কেবল শক্তিশালী পূর্ব্ব-পুরুষদের জন্য।

জনক-জননী সন্তানদের জন্য মন্দির অথবা নর্দ্দমা রাখিয়া যাইতে পারেন। অমর আত্মার জন্য কিন্তু নর্দ্দমা প্রকৃত স্থান নহে মানুষের সকলের অপেক্ষা বড় দায়িত্ব হইতেছে পিতৃ-মাতৃত্ব।

মানুষ দাড়ি কামায় বলিয়া তাহাদের ছোট দাড়ি হয় না। বিড়ালের লেজ কাটিয়া দিলে তাহার যে শাবক হয় তাহারা লেজবিহীন হয় না। বিড়াল-মাতা লেজের জীবনাণু হারাইয়া ফেলে বটে, কিন্তু তাহার সন্তান-সন্ততি এই জীবনাণু ব্যতীত লেজসম্পন্ন হইয়াই আসে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবনাণুদের কার্য্যপ্রণালী ধীরে ধীরে বহু পরিবর্ত্তন আনে এবং এই সকল পরিবর্ত্তন যদি সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তনগুলি রহিয়া যায়। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে, কারণ পরিপার্শ্বিক অবস্থা এই প্রাণি-জীবনের পক্ষে অনুকূল থাকে না। মেক্সিকো দেশের লোমহীন কুকুর হয় ত মেরুপ্রদেশে লোমবিহীন শাবক প্রস

পারে, কিন্তু সেখানের প্রবল শৈত্যে শাবকদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব না।

বিবর্ত্তন-প্রণালীর প্রবর্ত্তকেরা জীবনাণুদের অস্তিত্বের কথা কিছুই জানিতেন না। যেখানে বিবর্ত্তন-প্রণালীর আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সেইখানেই সে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার কারণ বিবর্ত্তন-প্রণালী জীবকোষের অস্তিত্বকে বাদ দিয়া গঠিত হইয়াছে; জীবকোষ জীবনাণুদের বাহক ও গৃহ।

কেমন করিয়া কয়েক লক্ষ জীবনাণু অতি ক্ষুদ্র জীবকোষের ভিতর আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত জীবনের উপর অধিকার বিস্তার করে, ইহা আজও বিজ্ঞানের প্রকাণ্ডতম বিস্ময়।

কে প্রথমে আসিয়াছিল—অণ্ড অথবা পক্ষী—এই সমস্যার সমাধান নিশ্চিন্ত ভাবে হইয়াছে। ইহা অণ্ডও নয়, পক্ষীও নয়। ইহা হইতেছে অতীত জগতের একটি সজীব জীবকোষ! অণ্ড হইতেছে জীবের খাদ্য, ইহার ভিতরে আছে একটি জীবকোষ, তাহা তাহার জীবের সহিত মিলিত হইয়াছে। যখন জীবকোষের জীবনাণুরা মিলিত হয় এবং বিভক্ত হয়, জীবন-রস এবং এই জীবনাণুরা তখন বাধ্য হয় একটি পক্ষীর জন্ম দিতে। পক্ষীকে কালে আবার অণ্ড প্রসব করিতে হয়।

নিজ্জীব পদার্থদের দেখিলে মনে হয় তাহারা উদ্দেশ্যহীন,—প্রাকৃতিক আইন-কানুনগুলি মানিয়া চলা সত্ত্বেও ইহাদের কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু যখন জীবন্ত পদার্থেরই কোন না কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য থাকে; তাহা হইতেছে জীবনাণুদের দ্বারা পরিকল্পিত পরিকল্পনায় একটি বৃক্ষ, লতা, উদ্ভিদ বা একটি জীবের জন্ম দেওয়া।

জীবন বাধ্য করে নূতন বংশ বিস্তার করিতে—যাহাতে জাতি বাঁচিয়া থাকে। এই প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যে এত বেশী যে তাহার জন্য সকল কিছু ত্যাগ করিতে তাহারা পারে। কোন কোন প্রাণীর মধ্যে যখন এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, বহুসংখ্যক জীব একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। Mayfly ইহার একটি উদাহরণ। এই বাধ্যতামূলক শক্তি নিজ্জীব পদার্থের নাই। কোথা হইতে এই সকল প্রচণ্ড প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, এবং একবার এই সকল প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে তাহারা আজও লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, কেহ তাহার উত্তর দিতে পারে না। ইহা হইতেছে সজীব প্রকৃতির বিধান, ঠিক রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ প্রণালীর মতই সুদৃঢ়। মানুষের আজও ইহা অজ্ঞাত। অদৃশ্য হইতে যেন ইহা আসে।

পৃথিবীর সকল নিজ্জীব ও সজীব পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং আদি পার্থক্য হইতেছে যে নিজ্জীব পদার্থগুলি মিলিত হয়, স্ফটিক গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়—যদিও অণু-পরমাণুর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না এবং তাহাদের মধ্যে কোন সজ্ঞান সম্পর্ক নাই। অপর দিকে জীবন্ত পদার্থের মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলি অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়, প্রত্যেকের নিজের কার্য্য-প্রণালীর ভিতর অপরের সহিত প্রতিযোগিতা চলে এই জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য। যেখানে জীবন নাই, সেখানে এই অন্তর্নিহিত ও সজীব সহযোগিতা একেবারেই নাই। ইহার কারণ কেহ বলিতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেরূপ নিশ্চিন্ত ইহাও তেমনি—একই কারণ হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে।

অণুদের সংঘবদ্ধ অবস্থা বলিয়া জীবনাণুদের জানা গিয়াছে। ইহারা প্রতি সজীব প্রাণীর যৌন জীবকোষে আছে। প্রতি প্রাণীর পরিকল্পনা, বংশগত ইতিহাস, প্রতি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট ইহারা বহন করিতেছে। ইহারা নির্ভুল ভাবে মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প ও ফলের যেরূপ গঠন করে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর গঠন-প্রণালী, বহিরাবরণ, লোম অথবা পক্ষ ঠিক সেই ভাবেই সযত্নে ইহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

একটি হরীতকী মাটিতে পড়ে, ইহার শক্ত পীত আবরণ ইহাকে রক্ষা করে। পচিয়া গিয়া হরীতকী-বীজ কোথাও মাটির গর্ভে গিয়া পড়ে। বসন্তের সময় বৃক্ষশিশু জাগরিত হয়, যখন পীত আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়, শস্যের মত অংশ যাহার ভিতর জীবনাণুরা লুকাইয়া থাকে, তাহারা বৃক্ষশিশুকে খাওয়ায়। তাহারা মাটির ভিতর শিকড় পাঠায়, ক্রমে ক্রমে এই হরীতকীর চারা, একটি বৃহৎ বৃক্ষ, ক্রমে কয়েক বৎসরে বিরাট হইয়া উঠে। জীবনাণুপূর্ণ সজীব জীবকোষ সংখ্যায় হইয়া দাঁড়ায় কোটি কোটি; বৃক্ষের কাণ্ড, ত্বক, প্রত্যেকটি পত্র এবং প্রত্যেক সুস্বাদু হরীতকী ফল তাহারা তৈরী করে। যে হরীতকী হইতে বৃক্ষের জন্ম হইয়াছিল তাহারই মত হরীতকী তাহাতে ফলিতে থাকে। শত শত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ হরীতকীর প্রত্যেকটিতে লুকাইয়া আছে অণু-পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট মিলন-প্রণালী—লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে যেরূপে পৃথিবীর প্রথম হরীতকীর জন্ম হইয়াছিল।

কোন হরীতকী বৃক্ষ হইতে আমের বীজ পাওয়া যায় না। কোন তিমি মৎস্য হইতে সাধারণ মৎস্য পাওয়া যায় নাই। ধান্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দানাই ধান্য—গোধূমের ক্ষেত্রে গোধূম। জীবনাণুদের আণবিক মিলন-প্রণালীর বিশেষ বিধান আছে, তাহারা তাহা প্রতিপালন করে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত—প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি উদ্ভিদের গঠন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া।

হেকেল বলিয়াছিলেন, বাতাস, জল, রাসায়নিক দ্রব্য ও সময় পাইলে তিনি মানুষ তৈরী করিয়া দিবেন। তিনি জীবকোষ ও জীবনাণুর কথা বাদই দিয়াছিলেন। মানুষ তৈরী করিতে হইলে তাঁহাকে অদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অণুদের অনুসন্ধান করিয়া সজ্জিত করিতে হইবে, জীবনাণু গঠন করিতে হইবে এবং তাহাদের জীবন দিতে হইবে। যদি তাহা কোন দিন কাহারও দ্বারা সম্ভব হয়, অজ্ঞাতপূর্ব্ব একটি দানবের সৃষ্টি না করিয়া মানুষের সৃষ্টি করার সম্ভাবনা লক্ষের মধ্যে এক। এই দুরূহ ব্যাপারও যদি সম্ভব হইয়া উঠে তবে তাহা কোন দিন ঘটনাক্রমে ঘটিয়া উঠিবে না, তাহা ঘটিয়া উঠিবে সুকৌশলে, অশেষ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিকল্পনায়।

রহস্যজনক ভাবে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই অজ্ঞাত সৃষ্টিকর্ত্তা চিরকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

লিয়োনিদ
আন্দ্রিভের স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

মানসী রায়

সাধারণের পারস্পরিক সম্পর্কের সততা পরখ করিবার তাহার এক ভারি বিশ্রী পন্থা ছিল। করিত কি, হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করিয়া বসিত: জান, ঐ "ব—তোমার নামে কি বলেছে?" কিংবা হয়ত বলিয়া বসিল: "স—তোমার নামে বলছিলেন কি……" এবং ঘন কাল চোখে তাহার চোখের দিকে মনের ভাবটা বুঝিবার উদ্দেশ্যে চাহিয়া রহিত। একবার বলিয়াছিলাম: "দেখ, এমনি কাণ্ড যদি চালাতে থাক ত সব বন্ধুতে বন্ধুতে তুমি ঝগড়া বাধিয়ে দেবে দেখো।"

সে জবাব দিল: "তাতে কি হয়েছে? এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে যদি তারা ঝগড়া বাধায় ত বুঝতে হবে তাদের সত্যিকার কোন মনের সম্পর্ক ছিল না।"

"বেশ, তুমি চাও কি শুনি?"

"দৃঢ়তা, স্তম্ভের মত স্থির, সুন্দর সম্পর্ক। আমাদের প্রত্যেকের বুঝতে হবে আত্মার বন্ধন কত কোমল, কত যত্ন করে একে ধরে রাখতে হয়। বন্ধুতা টিকিয়ে রাখতে খানিকটা কল্পনাবিলাসিতা দরকার। পুশকিনদের দলে সেটি ছিল; তাদের উপর ভারি ঈর্ষা হয় আমার। মেয়েদের মন কেবল ঝাঁকে নরম ভালবাসার দিকে। তাদের ধর্মবাণী হলো ভিকেনারন।"

কিন্তু আধ ঘণ্টার ভিতরেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় এই মতকে সে সর্বাংশে পরিত্যাগ করিল এবং অনেক কামোন্মত্তের সহিত পাবলিক স্কুলের একটি মেয়ের কথোপকথনের এক অদ্ভুত বিবরণ বর্ণনা করিয়া গেল।

আরটাসবাশেভকে সে সহিতে পারিত না এবং তাহার স্ত্রীলোককে কেবলমাত্র কামলোলুপ বলার মত পক্ষপাতী মতকে তীব্র ভাবে ব্যঙ্গ করিত।

এক দিন সে এই গল্পটা করিয়া গেল। বছর এগার বয়সে সে কোন উদ্যানে না পার্কে, গাঁজার দাতব্য-মন্ত্রীকে একটি তরুণীকে চুম্বন করিতে দেখে।

শিহরিয়া সে নিম্নকণ্ঠে কহিল: "দু'জন দু'জনকে চুমু দিয়ে কাঁদতে লাগল।" গভীর কথা কিছু কহিতে গেলেই তাহার নমনীয় কোমল পেশীবদ্ধ কঠিন হইয়া উঠিত। "মেয়েটি, জান, রোগা, দুর্বল, ছোট ছোট দেয়াশলাইয়ের কাঠির মতো পা, আর সেন্ট ডেকন, মোটা এক কসা চর্বিওয়ালা চকচকে ছুঁড়ি। তখন লোকে কেন যে চুমু খায় তা জেনেছি, কিন্তু চুমু দিয়ে কাঁদা সেই প্রথম দেখলুম, ভারি মজা লাগল। লোকটার দাড়ি মেয়েটার খোলা জামায় পড়েছে গিয়ে। লোকটা মাথা নাড়াতে লাগল। তাদের ভয় দেখানোর জন্যে শিষ দিলুম, দিয়ে নিজেই ভয় খেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলুম। সেই দিনই সন্ধ্যায় মনে হ'ল যেন আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের দশ বছরের মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছি।

তাকে ছুঁয়েও দিলুম, কিন্তু [illegible] কাজেই তাকে আর ভালবাসা গেল না। তার পরে আমার ... পড়শীর ঝিয়ের প্রেমে পড়লুম—পা দু'টো খাটো, সাদা ভুরু, ... উঁচু বুক—সেন্ট ডেকনের পেটটার মতোই ওর বুকটা আমার ... ফুলে উঠত। খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তার কাছে গিয়ে তা... জানালুম। সেও খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাবে আমার কানটি মলে দি... তাতে কিন্তু আমার ভালবাসা একটুও কমেনি; আমার মনে হ... সে ভারি রূপসী, যতই চিনতে লাগলুম, ততই যেন তার ... বাড়তে লাগল, সে যেমন যন্ত্রণা, তেমনি মধুর। সত্যিকার সুন্দ... মেয়ে ঢের দেখেছি, মনে বুঝতুম তাদের তুলনায় আমার প্রি... একটি রাক্ষুসী, তবু আমার কাছে সেই সবার চেয়ে সুন্দরী হ... রইল। এই জানাটাই যেন আমার সুখ ছিল; আমি ছাড়া ... সাদা ভুরুওয়ালা মোটা হতচ্ছাড়া ছুঁড়ীকে আর কেউ ভালবাস... পারত না, কেউ না—বুঝেছ? কেউ তাকে পরম রূপসীর চে... সুন্দরী বলে ভাবতে পারত না।"

এ কাহিনী সে সানন্দে কৌতুক রসের পাত্রে যে অপূর্বর... সরবরাহ করিয়াছিল, সে আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না... ভারি খারাপ লাগে যখন ভাবি যে, এমনি কৌতুক রস... বক্তাটি তাহার রচনাকে এই রসে সরস করিতে পারে নাই কি... করিতে ভয় পাইত। ছবির ঘন কালো রংয়ে রহস্য-রসের নানা ... মিশিয়া পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ছিল তাহার ভয়।

যখন কহিলাম যে, এই ছোট পাওয়ালা মেয়েটার ভিত... সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, সেই আজ বাস্তব... কুৎসিত রাজ্যে সৌন্দর্য্যের স্বর্ণসূত্রটিকে খুঁজিয়া পায় না—এর ব... দুঃখ আর নাই। সে চোখটা একেবারে বুজিয়া ধূর্তের ম... আমুদে সুরে কহিল: "কি মিষ্টি কথা! না না, আমি বাড়া... চাই নে তোমাকে, যে স্বপ্নবিলাসী তোমরা…" স্বপ্নবিলাসী যে সেই স্ব... এ কথা তাহাকে বিশ্বাস করানো সম্ভবপর ছিল না।

যে 'সঞ্চয়িতা'খানা সে আমাকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উপহা... দিয়াছিল, তাহাতে লিয়োনিদ লিখিয়াছিল: "অ্যালেক্স, কোরিয়া... বার্গমষ্ট হইতে সুরু করিয়া যাহা কিছু ইহাতে লেখা আছে, স... তোমার চোখের সমুখে ঘটিয়াছে, ইহা অনেকটা আমাদের সম্পর্কে... ইতিহাস।" দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা সত্যই তাহাই ছিল, 'দুর্ভাগ্য বশতঃ,' কারণ আন্দ্রিভ যদি তাহার কাহিনীগুলিতে আমাদে... 'পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস' না ঢুকাইত, সেই ছিল ভাল... কিন্তু সে তাহাই করিয়া বসিয়াছে এবং আমার মতামতকে 'খণ্ড... করিতে গিয়া সবটা মাটি করিয়া দিয়াছে, মনে হইল যেন আমা... ব্যক্তিত্বের তাহার অদৃশ্য শত্রু রূপ পাইয়াছে। সেবার সে কহিল "একটা এমন গল্প লিখেছি, যা তোমার কক্ষনো পছন্দ হবে না... পড়বে সেটা?" পড়িলাম। দুই-একটা বাড়তি কথা ছাড়া সমস্তটা অত্যন্ত ভাল লাগিল।

চটি জোড়ায় ফটফট করিয়া সাড়া তুলিয়া সারা ঘর ঘুরিয়া ... উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল: "ওগুলি সামান্য কথা, শুধরে নেব।" আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে চুলগুলিকে পিছনে ঠি... আমার চোখে চাহিল।

"বুঝছি, তুমি সত্যি করেই গল্পটার প্রশংসা করলে, কিন্তু কি... করে তোমার ভাল লাগল বুঝতে পারলাম না আমি।"

"দুনিয়ার অনেক কিছুই আমার ভাল লাগে না। তবু, ঘুরে দেখি তাদের কোনটাই তার চেয়ে খারাপ নয়।"

"এমনি করে যুক্তি করে তুমি কোন দিন বিপ্লবী হতে পারবে না।"

"বেশ বেশ, তুমিও কি নেচেভের মত বিপ্লবীদের অমানুষ বলে মনে কর না কি?"

আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে হাসিয়া উঠিল: "নিজেকে তুমি নিজে ঠিক মত বোঝ না। কিন্তু দেখ, যখন 'চিন্তা' লিখি, তখন তোমার কথা মনের মধ্যে ছিল। অ্যালেক্সি স্যাভিকভ হচ্ছো তুমি। এই দেখ, একটা কথা রয়েছে—'অ্যালেক্সি প্রতিভাশালী নয়'—কথাটা লেখা হয়ত আমার পক্ষে অন্যায়—ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার একগুঁয়েমিতে মধ্যে মধ্যে এত বিরক্ত লাগে। মনে হয়, তোমার কিছু প্রতিভা নেই। ওটা তাই বলে লেখা অন্যায় হয়ে গেছে, না?" সে বিব্রত হইয়া উঠিল এবং লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

তাহাকে শান্ত করিয়া কহিলাম, "নিজেকে আমি আবৰী হিড ঘোড়া বলিয়া মনে করি না, বরং ছ্যাকরা গাড়ী-টানা ঘোড়া বলিয়াই জানি। সহজাত প্রতিভার চেয়ে আমার কর্মক্ষমতা, কর্মপ্রীতিই আমার জীবনে সাফল্য আনিয়াছে।"

বাধা দিয়া কোমল কণ্ঠে সে কহিল: "তুমি ভারি আশ্চর্য্য মানুষ!" এবং সহসা সমস্ত কথাবার্তার সুরটা পাল্টাইয়া সরস কণ্ঠে নিজের কথা, নিজের মানসিক চাঞ্চল্যের কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল। সাধারণ রাশিয়ানদের পাপ-স্বীকৃতি এবং অনুতাপ করিবার অস্বস্তিকর অভ্যাসটা তাহার ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে আত্মমর্য্যাদার কিছুমাত্র লাঘব না করিয়াও পুরুষোচিত সংযমের সহিত, এমন কি তীব্র ভাবেই নিজের সম্বন্ধে কথা কহিয়া যাইত। তাহার স্বভাবের এই অংশটুকু বড় সুন্দর লাগিত।

কহিল: "জান, প্রত্যেক বার যখন কিছু লিখবার জন্য খুব বেশী অস্থির লাগে, মনে হয়, বুকের মধ্যে থেকে একটা পাথর ভেঙ্গে বার হবে এবার বুঝি বা; তখন নিজেকে ভাল করে চিনি, আর যদি আমার রচনায় যা প্রকাশ পায়, তার চেয়ে প্রতিভা আমার অনেক বেশী। ধর এই 'চিন্তা।' ভেবেছিলুম, তোমায় আশ্চর্য্য করে দেব এ গল্পে, অথচ এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ গল্প যেন কত উদ্দেশ্য নিয়ে মতলব করে লেখা, সে উদ্দেশ্যও আবার ভাল করে প্রচার হয়নি।"

লাফাইয়া উঠিয়া সে চুরুটা ফিরাইয়া আধা-কৌতুকের স্বরে কহিল: "তোমাকে আমার ভয় করে, তুমি বড় বদ লোক, আমার চেয়ে তোমার শক্তি বেশী। আমি তোমার কাছে হার মানতে চাই না।" এবং পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিল: "আমার মধ্যে যেন কিসের অভাব রয়েছে। খুব প্রয়োজনীয় কিছু কি ভাই? অ্যা? তোমার কি মনে হয়?"

আমার মনে হইত, সে তাহার প্রতিভাকে অমার্জ্জনীয় রকম অবহেলা করিত, জ্ঞানেরও তাহার আরো প্রয়োজন ছিল।

"পড়াশুনো করতে হবে, শিখতে হবে, ইউরোপ গিয়ে…"

হাতটা নাড়াইয়া সে কহিল: "আসল ব্যাপার তা নয়। নিজের জন্ম নিজের দেবতাটিকে খুঁজে নিতে হয় আর নিজের জ্ঞানে বিশ্বাস রাখতে শিখতে হয়।"

তাহার পরেই রীতিমত তর্ক বাধিয়া গেল। একবার এই রকম তর্কের পরে সে আমাকে তাহার 'দেওয়াল' গল্পটির পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং তাহার 'ভূত' গল্পটির উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিল: "এই পাগল যেটা, সেটা আমার মনের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে আর ঐ উৎসাহ ইয়েগর হলে তুমি। তোমার আত্ম-শক্তিতে সত্যিই বিশ্বাস আছে, এই বিশ্বাস তোমাদের সব স্বপ্ন-বিলাসীদেরই আছে। যুক্তি আদর্শবাদীর দল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বপ্ন নিয়ে স্থিরবিশ্বাসে বসে আছ।"

তাহার 'পাতাল' গল্পটা বাহির হইয়া যে কলরব উঠিল, তাহার বেগে সে অস্থির হইয়া গেল। ছাপাখানার নোংরা তামাশায় মাতিবার জন্য যে সকল লোক সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহারা কলঙ্ক রটনার প্রয়াসে আন্দ্রিভের নামে নানা কদর্য্য, এমন কি অসম্ভব সব সংবাদ প্রকাশ করিতে সুরু করিয়া দিল। এমনি এক কবি খবরের পত্রিকায় জাহির করিয়া বসিলেন যে, আন্দ্রিভ এবং তাহার ভাবী বধূ অঙ্গে কোন আবরণ রক্ষা না করিয়া স্নান করিয়া গেছে।

আন্দ্রিভ বিষণ্ণ স্বরে কহিল: "তবে কি সে বলে যে, স্নান করার সময়েও চোগা-চাপকান পরে নামতে হবে? তা ছাড়া বাজে কথাই লিখেছে। সঙ্গিনী নিয়ে ত দূরের কথা, একাও আমি স্নানই পুরো বছরটা করিনি মোটে; নদী কোথা এখানে নাইবার মত? দেখ, আমি ঠিক করিচি, একটা কথা ছেপে দেয়ালে দেয়ালে মেরে দেবার ব্যবস্থা করব, সেটাতে পাঠকদের একটা ছোট অনুরোধ করা থাকবে: "তারাই আছ ভাল, যারা পড়নি পাতাল।"

অত্যন্ত অধিক উৎকণ্ঠার সহিত সে কাগজের প্রতিটি মন্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিত এবং হয় একটু বিব্রত নয় বিরক্ত হইয়া সমালোচক এবং আলোচকদের নগ্ন অভদ্রতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিত। এমন কি, একবার সে ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিল।

"এটা না করলেই ভাল হয়।" তাহাকে অনুরোধ করা হইল। "না, করতেই হবে! নইলে লোকগুলো আমাকে শোধ-রাবার উৎসাহে আমার কানের মাথা খাচ্ছে—গরম জলের মত কথায় আমার গা ছ্যাঁকা হয়ে গেল।"

বংশগত মদ্যপ স্বভাবের ব্যাধিতে সে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করিত; এ ব্যাধি তাহার থামিয়া থামিয়া কিছু পরে পরে দেখা দিত, কিন্তু দেখা দিলে প্রায়ই প্রকোপের অবধি থাকিত না। ইহার বিরুদ্ধে সে প্রাণপণে যুঝিয়াছে, সে লড়াইয়ে তাহার শক্তিক্ষয়ের শেষ ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে চরম হতাশায় সে আপনার এই ক্ষথিবার প্রয়াসটাকেই ব্যঙ্গ করিত।

"আমি এমন একটা লোকের গল্প লিখবো যে বয়স হতে হতেই সুরু করে পঁচিশ বছর ধরে একটুখানি ভড্‌কা গিলতেও ভয় পেত। এই করে সে বহু দুর্লভ মুহূর্ত কাটিয়ে দিল, তার উন্নতির পথ গেল শেষ হয়ে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে সে এমনি অসার্থকতায় ক্ষল বয়ে আড়কের ফাঁকে বাঁশ চালানোর চেষ্টা করে মরে গেলো।"

সত্যই সে যেবার আমার সঙ্গে নিজনিতে সাক্ষাৎ করিতে আসে, এই গল্পের পাণ্ডুলিপিখানি লইয়া আসিয়াছিল।

নিজনিতে আমার বাড়ীতে লিয়োনিদ আরজামাসের প্রধান পুরোহিত ফাদার ফিয়োডোর ব্র্যাডিমিরস্কিকে দেখিল। তিনি পরে দ্বিতীয় রাষ্ট্র ডুমার সভ্য হইয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হন। ইহার পরে তাহার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব, আপাততঃ তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া দিই।

ভয়ঙ্করী আইভানের সময় হইতেই আরজামাস শহরে খাল হইতে জল সরবরাহ হইত, গ্রীষ্মকালে খালে জলমগ্ন বিড়াল, ইন্দুর, কুকুর, মোরগ প্রভৃতির শবদেহ ভাসিত এবং শীতকালে বরফের তলে জল জমিয়া দুর্গন্ধ ছাড়িত। ফাদার ফিয়োডোর শহরে পরিষ্কার পানীয় সরবরাহের জন্য মনস্থির করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আরজামাসের আশে-পাশে লুক্কায়িত জলস্রোতের সন্ধানে বারোটা বৎসর কাটাইয়া দিলেন। বৎসরের পর বৎসর প্রতি গ্রীষ্মে প্রত্যূষে তিনি ডাণ্ডারের মতো মাঠে-জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিতেন— কোথায় জমি একটুও ভিজা দেখায়; দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের পরে তিনি জমির তলে ঝর্ণার সন্ধান পাইলেন, তাহার গতি লক্ষ্য করিলেন, খাল কাটিয়া তাহাকে শহরের মাইল দুই দূরে জঙ্গলের গর্তে আনিয়া ফেলিলেন; দশ হাজার নগরবাসীর জন্য এক লক্ষ গ্যালন পরিষ্কার ঝর্ণার জলের সন্ধান আনিয়া তিনি শহরে জল-সরবরাহের প্রস্তাব করিলেন।

শহরের এক ধনী ব্যবসায়ী হয় জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে, নয় ক্রেডিট ব্যাঙ্ক স্থাপনা করা হইবে, এই সর্ত্তে কিছু টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং মাথালো ব্যক্তিবর্গ শহরের বাহিরে দূরের ঝর্ণা হইতে ঘোড়ায় বহাইয়া জল পাত্রে ভরিয়া রাখিতেন, জল-সরবরাহ ব্যবস্থায় তাঁহাদের কোন উৎকণ্ঠা থাকিবার কথা নহে, তাঁহারা ফাদার ফিয়োডোরের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া টাকাটা ক্রেডিট ব্যাঙ্ক স্থাপনার কাজে লাগাইতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন; আর অগণ্য জনসাধারণ চির-প্রচলিত রীতি অনুসারে নির্বিকার নিশ্চেষ্ট হইয়া খালের নোংরা জল গিলিতেই থাকিল। কাজেই জলের সন্ধান পাইয়াও এই তীব্র স্বার্থপরতালিপ্ত ধনীর জিদ আর দরিদ্রের অন্ধ মূঢ়তার সহিত ফাদার ফিয়োডোরের দীর্ঘ ক্লান্তিকর সংঘাতের অবধি রহিল না!

আরজামাসে পুলিশ-পাহারার বেড়ার মাঝখান দিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন তাঁহার বাক্স-প্যাঁটরাগুলি জড়ো করিবার কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। একাধারে দুর্ভাগ্যে জর্জ্জরিত এই লোকটিই আজারমাসিয়ানদিগের ভিতর সর্ব্বপ্রথম আমার সহিত নির্ভয়ে আলাপ করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কিন্তু আজারমাসিয়ান কর্তৃপক্ষ জেমস্টভোর সকল কর্মচারীকে এবং অন্যান্য সকল সরকারী কর্মচারীদিগকে আমার সহিত সাক্ষাতে নিষেধ জারী করিয়া দিল এবং তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্য ঠিক আমার জানলার তলে পুলিশ-পাহারা বসাইয়া দিল।

বর্ষণসিক্ত এক সন্ধ্যায় ফাদার ফিয়োডোর আমাকে দেখিতে আসিলেন, ঘন বাদলে তাঁহার চুল হইতে নখ অবধি ভিজিয়া কাদায় মাখামাখি হইয়া গেছে। পরনে ধূমল রংয়ের দীর্ঘ পুরোহিতের পোষাক। পায়ে কৃষকদের মতো ভারী জুতা, বিবর্ণ টুপী মাথায়— সবগুলি ভিজিয়া যেন এক তাল ভিজা কাদার মতো লাগিতেছে। তাঁহার সেই হাড়-ওঠা, মাটি-খোঁড়া হাতে আমার হাতে কঠিন চাপ দিয়া রুক্ষ, মৃদু, ভারী কণ্ঠে কহিলেন: "তুমিই সেই অনুতাপহীন পাপী, যার আত্মার উন্নতির জন্যে কর্তারা আমাদের কাছে হঠাৎ ঠেলে পাঠালেন? আচ্ছা, তোমার আত্মার উন্নতি করে দেবো! একটু চা খাওয়াতে পারো?"

তাঁহার পাকচো ছোট ছোট দাড়ির তলে যে মুখখানা দেখা যাইতেছিল, সে একটি ব্রহ্মচারীর শুষ্ক মুখ। তাঁহার গর্ত্তে বসা চোখ দু'টির মধ্যে অনুভূতিশীল দৃষ্টির ক্লান্ত হাসি চমকিয়া গেল।

"সোজা জঙ্গল থেকে আসচি। কাপড় বদলানোর মতো বাড়তি পোষাক আছে তোমার?"

তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট শুনিয়াছিলাম। জানিতাম তাঁহার ছেলে রাজনৈতিক নির্ব্বাসন লাভ করিয়াছে, একটি মেয়ে 'রাজনৈতিক কারণে' অন্তরীণাবদ্ধ, দ্বিতীয়া কন্যাটিও সেই পথে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। জানিতাম, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এই জলের সন্ধানে ব্যয় হইয়া গেছে, বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছে, এখন দেউলের মতো নিজের হাতে জঙ্গলে খাদ কাটিয়া মাটি দিয়া বাঁধ বাঁধিতেছেন। যখন শরীরে কুলাইত না, খৃষ্টের নাম করিয়া প্রতিবেশী কৃষকদের সাহায্যার্থে ডাকিয়াছেন। তাহারা সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু নগরবাসী সন্দিগ্ধ ভাবে এই 'অদ্ভুত' পাদ্রীর কার্য্যকলাপ চাহিয়া দেখিয়াছে, সাহায্যের জন্য একটা আঙুল তুলে নাই।

এই মানুষটিকেই লিয়োনিদ আমার বাড়ীতে দেখে! সেদিন ছিল অক্টোবরের রুক্ষ শীতল দিন, বাতাস দিয়েছিল। পথে কাগজের টুকরো, পাখীর পালক, ঘুনিয়নের ছাল উড়িতেছে। জানলার সার্সিতে পথের ধুলা ধাক্কা দিতেছে, ঘন বর্ষার কালো মেঘখানা গ্রাম হইতে শহরে নামিয়া আসিল। ধূলা-মাখা চোখ ঘাসতে ঘাসতে হঠাৎ ফাদার ফিয়োডোর উসকো-খুসকো চেহারায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে কে তাঁহার ছাতা এবং হাতব্যাগ চুরি করিয়া নিয়াছে এবং গভর্ণর জেনারেল ক্রেডিট ব্যাঙ্কের চেয়ে সরবরাহ-ব্যবস্থা স্থাপনার অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে চাহিতেছে না—তাহাদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লিয়োনিদ চোখ দুইটা বড় করিয়া আমার কানে-কানে মৃদু স্বরে কহিল: "এ আবার কি?"

ঘণ্টা খানেক পরে চায়ে বসিয়া এই অদ্ভুত শহর আরজামাসের প্রধান পুরোহিত নষ্টিক (বুদ্ধিবাদী, বিশ্বাসবাদী নহে) দিগের গীর্জ্জার সাম্যবাদী রীতির বিরুদ্ধে লড়িয়া 'ভগবান সাধারণ লভ্য নহেন' এই প্রমাণ-প্রয়াসকে একান্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন, সে হাঁ করিয়া কথা গিলিতে লাগিল।

"এই নাস্তিকগুলি মনে করে, ওরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সন্ধানে ফিরচে, ওদের আত্মাই উন্নত কিন্তু জনসাধারণ বিজ্ঞ গুরুর মধ্য দিয়েই তো ভগবানের জ্ঞান আত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে?"

'অবতারবাদ', 'সর্ব্বপূজাবাদ', 'অখণ্ডবাদ'— ফাদার ফিয়োডোর সুর ধরিলেন, আর লিয়োনিদ আমাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিতে লাগিল: "একেবারে খাঁটি আজারমাসিয়ান —সাংঘাতিক!"

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, ফাদার ফিয়োডোরের সম্মুখে হাতখানা নাড়িয়া সে চিন্তার মূল্যহীনতা প্রমাণ করিতে বসিয়া গেছে,

পুরোহিত দাড়ি নাড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন: "চিন্তা আসলে প্রাণহীন নয়, অবিশ্বাসেরই অর্থ নাই।"

"অবিশ্বাসই ত চিন্তার মূল..."

"লেখক মশাই, তোমার ভুল হচ্ছে..."

শার্সিতে বৃষ্টির ছাঁট লাগিতেছে; এই বৃদ্ধ এবং তরুণ প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। দেওয়াল হইতে বিশ্বের এবং তীর্থপথ-যাত্রী লিয়ো টলষ্টয় ছোট যষ্টি হস্তে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সব কিছু শেষ হইল, মাঝ-রাত্রে আমরা আমাদের নিজ নিজ ঘরে গেলাম। আমি পূর্ব্বেই আসিয়া একখানি পুস্তক-হাতে শয্যা নিয়াছি, দরজায় ঘা পড়িল এবং উদ্‌ভ্রান্ত, অস্ত কেশ, কলার ছেঁড়া লিয়োনিদ ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমার শয্যায় বসিয়া সে উৎসাহে ভাঙ্গিয়া পড়িল: "কি অদ্ভুত পাদ্রীটা! কি করে আমায় বুঝল, এঁ্যা?" সহসা তাহার চোখে অশ্রু ছলছল করিয়া উঠিল: "তোমার ভাগ্য বড়ো ভাল অ্যালেক্সি, উচ্ছন্নে যাও তুমি! তোমার চারি পাশে সর্ব্বদা সুন্দর সুন্দর লোক সব, আর আমি—একেবারে একলা... নিজেকে নিয়েই নিজে রয়েছি..."

হাতখানি নাড়াইয়া সে থামিয়া গেল। ফাদার ফিয়োডোরের জীবন-কথা তাহাকে বলিলাম। কেমন করিয়া তিনি জল ফিরিয়াছেন, তাঁহার ওল্ড টেষ্টামেন্টের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির কথা বলিলাম—সেখান হইতে যাজক-সভা তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিয়াছে। বলিলাম, তাঁহার "প্রেম এবং জীবনের রীতি"খানাও যাজক-সভা নিষিদ্ধপাঠ্য করিয়া দিয়াছে। এই পুস্তকখানিতে ফাদার ফিয়োডোর পুসকিন এবং অন্যান্য কবিদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মানুষে মানুষে এই যে ভালবাসার অনুভূতি, জীবনের অস্তিত্ব এবং গতির মূল ইহাই, এবং ইহার শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে কোন অংশে খাটো নহে, পরন্ত অনেকাংশে মিলে। লিয়োনিদ খুশী হইয়া কহিল: "ঠিক। অনেক জিনিষ আমার শেখা দরকার, বুঝেছ, শিখতেই হবে, নইলে এই পাদ্রীটার সম্মুখে লজ্জায় পড়ব..."

আবার দরজায় ঘা পড়িল। পোষাকটাকে কোন মতে গায়ে জড়াইয়া খালি-পায়ে দুঃখিত মুখে ফাদার ফিয়োডোর প্রবেশ করিলেন।

"ঘুমোওনি তোমরা? বেশ বেশ...আমি এলাম, কথাবার্ত্তা শুনে মনে হল, আমার এসে ক্ষমা চেয়ে যাওয়া দরকার। আমি বড় বেশী চেঁচিয়েছি বাছারা, মনে কিছু কর না।...শুয়ে শুয়ে তোমাদের কথাই ভাবছিলুম, বড় ভাল ছেলে তোমরা। মনে হ'ল, অনর্থক রেগে উঠলুম কেন...তাই এলুম, ক্ষমা কর আমায় তোমরা। আমি শুতেই যাচ্ছিলাম..."

দুই জনে বিছানায় বসিয়া পুনর্ব্বার সমাপ্তিবিহীন আলোচনায় মগ্ন হইয়া গেল। লিয়োনিদ উদ্‌গ্রীব আনন্দে বারংবার হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

"কি অদ্ভুত আমাদের এই রাশিয়া! দেখ, ভগবানের অস্তিত্বসমস্যার সমাধান হল না। আর তোমরা খেতে ডাকছ! বিলিনস্কিই শুধু এ কথা বলে যাননি। সমস্ত রাশিয়াই ইউরোপকে এই কথা বলছে। ইউরোপ আমাদের অন্নপানের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, শুধু মাত্র ভাল করে ভোজ জমাবার ডাক, আর কিছু না।"

ফাদার ফিয়োডোর তাঁহার পুরোহিতের পোষাকের তলে রোগা হাড়-ওঠা পা ঘষিয়া হাসিমুখে জবাব দিলেন: "তা'হলেও, ইউরোপ আমাদের ধর্ম্ম-মা. এ কথা ভুল না। তার ভল্টেয়ার, তার বিজ্ঞানীর দল ছাড়া আজ এই দর্শন নিয়ে কোন তর্ক তোলা সম্ভবই হ'ত না আমাদের; বসে বসে সস্তা রুটি চিবোতুম শুধু।"

প্রত্যুষে ফাদার ফিয়োডোর আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই তিনি আজারমাসিয়ানে জল-সরবরাহের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে লাগিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অবধি ঘুমাইয়া আন্দ্রিভ উঠিল, কহিল: "ভাব ত, কোন উৎসাহে, কিসের জন্য এত বড় প্রাণবন্ত, বিজ্ঞ, সুন্দর এই পাদ্রী এখানে এই পচা ছোট শহরে পড়ে থাকবেন? এঁ্যা? এ কি বিশ্রী! মানুষের থাকবার মত জায়গা হ'ল এক মস্কো। এ জায়গা ছেড়ে চলো। বিশ্রী, বৃষ্টি, নোংরা..."

তৎক্ষণাৎ সে গৃহে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ শুরু করিয়া দিল।

রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সে কহিল: "তবু পাদ্রীটা ভারি অদ্ভুত! সবটাই যেন কেমন গল্পের মত লাগছে।"

কোন বড় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াই সে একাধিক বার অনুযোগ তুলিয়াছে: "তুমি বেশ ওদের খুঁজে পাও। আর আমার যেন সঙ্গে সঙ্গে চার পাশ ঘিরে একটা বাধা চলে। এ হয় কেন বল ত?"

অনেকের নাম আমি করিয়াছি, যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাহার অনেক লাভ হইতে পারে—শিক্ষিত, মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন ভদ্রলোক। ভি, ভি, রোজানোভ এবং আরো অনেকের কথা কহিলাম। রোজানভ-এর সহিত মিশিলে আন্দ্রিভের যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়াই মনে করিতাম।

সে বিস্মিত হইল: "তোমার কথা বুঝি না আমি।" বলিয়াই সে রোজানভের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার কথা বলিতে শুরু করিয়া দিল, অথচ তাহার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। তাহার প্রকৃত অন্তর রাজনীতির সহিত এতটুকু জড়িত ছিল না, মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগিত মাত্র। রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে তাহার মতামত সে সরল ভাবে 'যেমন ছিল, তেমনি হবে' গোছে ব্যক্ত করিয়াছে।

আমি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইলাম যে, শিক্ষা বস্তুটা যেমন মূর্ত্তিমান শয়তান কিংবা চোরের নিকটেও গ্রহণ করা যায়, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছেও তেমনি গ্রহণীয়। শিক্ষা গ্রহণ করা আর আত্মসমর্পণ করা এক নহে।

সে জবাব করিল: "এ কথাটা পুরো ঠিক নয়। শিক্ষা নেওয়া মানেই তথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা। আর রোজানোভকে আমি দেখতে পারি নে। ওকে দেখলেই আমার বাইবেলের সেই বমি ফিরে গেলা কুকুরটার কথা মনে পড়ে।"

মাঝে মাঝে মনে হইত, বড় বড় লোকদের সহিত ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা জিনিষটা তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার ভয়ে সে এড়াইয়া চলিতে চাহে। এই প্রকার লোকের সংস্পর্শে এক বার কি দুই বার আসাই তাহার যথেষ্ট বোধ হইত। কখনো সে হয়ত

তাঁহাকে প্রশংসাও করিত এবং সে প্রশংসায় আন্তরিকতার অভাব থাকিত না, কিন্তু তাহার ঔৎসুক্য থাকিত স্বল্পকাল।

সাভ্‌ভা মরোসোভের বেলায়ও তাহাই ঘটিল। প্রথম দীর্ঘ আলোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম সংস্কৃতিগামী চিত্ত, বিস্তৃত জ্ঞান এবং প্রবল উদ্দীপনাতে আন্দ্রিভ ভাসিয়া গেল। তাঁহাকে ইয়ারমক টিমোফিভিচ (সাইবেরিয়া বিজেতা) নামই দিয়া বসিল এবং কহিল যে, তাহার দ্বারা মস্ত বড় রাজনৈতিক ভূমিকা অলঙ্কৃত হইবে: "ওঁর বাইরেটা তাতার, কিন্তু ভিতরে ভিতরে, বন্ধু, ওঁর মনটি ইংরেজ অভিজাত ভদ্রলোকের মত।"

আর সাভ্‌ভা মরোসোভ আন্দ্রিভ সম্বন্ধে কহিলেন: "ভদ্রলোক আত্মসচেতন বটে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস নেই নিজের সম্বন্ধে; সেই বিশ্বাসটা মনের মধ্যে খুঁজে বেড়ান। অত্যন্ত চঞ্চল মন, নিজেও তা জানেন, তাই তার পরে একটুও বিশ্বাস নেই।"

[ক্রমশ:

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের অবস্থা

ললিত হাজরা

দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিজি দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক লাভজনক উপনিবেশ। এই উপনিবেশের আয়তন হল মোট সাত হাজার পঞ্চাশ বর্গ মাইল। রাজধানীর নাম সুভা। আড়াই শত দ্বীপ নিয়ে সংগঠিত হ'য়েছে এই দ্বীপপুঞ্জ। তন্মধ্যে ভিটি লেভু (Viti Levu) ও ভানুয়া লেভু (Vanua Levu) দ্বীপ দুইটি হল বৃহৎ। মোট আয়তনের সাত ভাগের ছয় ভাগ হল এই দুই দ্বীপের আয়তনের পরিমাণ। জনসংখ্যাও কম নয়। মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ এই দুই দ্বীপের জনসংখ্যা।

১৮৭৪ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। তুলা চাষ ও কারবারের নামে এখানে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ের নামে বাংলা দেশে যে সব পন্থা অনুসরণ করেছিল, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অবশেষে ফিজির সর্দারেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামী করতে বাধ্য হয়। তুলা চাষে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মূলধন নিয়োগ করতে লাগল প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ হল না বিশেষ। এই লাভ বেশী না হওয়ার প্রধান কারণ হল ফিজির শ্রমিকদের আবাদী কার্য্যে দক্ষতার অভাব। মজুরীও তারা বেশী দাবী করত। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা কম খরচে অত্যধিক পরিমাণে লাভ করতে চেয়েছিল। এই যুগটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তরের যুগ। সাম্রাজ্যবাদ ফিন্যান্স ক্যাপিট্যালের দিকে গতি ফিরাইয়াছে। যাই হোক, ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ১৮৬০ হতে ১৮৭৭ সাল—এই সতের বৎসরে সলোমন, লাইন দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ হেব্রাইডস্ থেকে সাড়ে আট হাজার শ্রমিক আমদানী করল, কিন্তু এতেও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হল না। এই আমদানী শ্রমিকদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে তুলা চাষের অপেক্ষা ইক্ষু চাষে লাভের পড়তা বেশ দাঁড়াতে লাগল দেখে ইংরেজ প্ল্যানটাররা ইক্ষু চাষে পুঁজি নিয়োগ করতে লাগল। অষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক শর্করা পরিষ্কৃত কোম্পানী (Colonial Sugar Refining Company of Australia) ভারতবর্ষ থেকে আগত শ্রমিকদের সাহায্যে পুরা দমে ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা করে দিল। অষ্ট্রেলিয়ার এই কোম্পানী "সি-এস্-আর-সি" (C. S. R. C.) নামে পরিচিত।

১৮৭৭ সালে ফিজির এজেন্ট জেনারেল অব ইমিগ্রেশন (Agent General of Immigration, Fiji) ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত অল্পসংখ্যক শ্রমিক যাতে ফিজিতে আমদানী করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সাথে একটা বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা দেন। ১৮৭৮ সালে ভারত সরকারের সাথে এই ব্যাপারে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল। এই চুক্তিতে বলা হল যে, ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিত শ্রমিক সরবরাহ করা হবে কিন্তু দশ বৎসরের শেষে তাদের এ দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে ও তাদের যাতায়াতের ভাড়া ঔপনিবেশিক সরকারকে বহন করতে হবে। ফিজি সরকার এই দাবী মেনে নিলেন। ফিজি সরকার সরাসরি এই শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের অধীনে যে সব জমি-জায়গা ছিল, তাতেই এদের নিযুক্ত করতে লাগলেন। যাই হোক, ১৮৭৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী ১৮৭৯—১৮৮৯ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে ফিজিতে প্রেরিত শ্রমিকের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ১ শত ১৫ জন। ১৮৮৯ সালে চুক্তি অনুযায়ী এদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফিজিতে যারা থাকতে লাগল, তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও রীতিমত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯০১ সালে ফিজিতে মোট ভারতীয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭ হাজার ১ শত ৫ জন। ১৯০১-১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৪০ হাজার ২ শত ৮৬ জনে। এই সময়ে প্রতি বৎসরে ভারত থেকে গড়পড়তায় শ্রমিক আমদানী হয়েছিল ২ হাজার ৮৪ জন, কিন্তু প্রতি বৎসরে মাত্র ৪৮২ জন করে ভারতবর্ষে পাঠানোর ফলেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। স্বল্প মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যেতে লাগল এবং সহজ-প্রাপ্য হওয়ায় ইক্ষু-প্ল্যাণ্টারগণ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের উপর আর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করল না। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই প্ল্যাণ্টারগণ তাদের বিদায় দিতে লাগল। ভারতীয় শ্রমিকদের এর ফলে কিন্তু বিপন্ন হতে হল না। তারাও এখানে জমি-জায়গা কিনেই হোক আর বন্দোবস্ত করেই হোক, স্বাধীন ভাবে ধান অথবা অন্যান্য শস্য উৎপন্ন করে জীবিকা অর্জন করতে লাগল। অবশ্য এ সময়ে বাজারে ধান-চালের চাহিদা থাকায় ভারতীয় শ্রমিকদের বেগ পেতে হয় নাই। এই সময়ে আবার মৌরিটাস, বৃটিশ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ থেকে বহু ভারতীয় স্বেচ্ছায় ফিজি দ্বীপপুঞ্জে এসে জুটে গেল। ভারত সরকারের সাথে ফিজি সরকারের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় এরা পড়ল না। এরা একেবারে ইক্ষু-আবাদে মনোনিবেশ করল, কিন্তু শ্রমিক হিসাবে নয়—মালিক

প্রভাবে। ইংরেজ প্লান্টারেরা এদের সহ্য করতে পারল না। তারা ছিল শ্রমিক, কিন্তু এরা হল মালিক। স্বার্থ-সঙ্ঘাত বেধে গেল। ইংরেজদের মধ্যে প্রবল ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা দিল। এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে আনীত শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে লাগল। চুক্তিপত্রে ভারত সরকারের এজেন্ট জেনারেল যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা আর রক্ষা করলেন না। ফলে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। নৈতিক চরিত্রের যাতে অধঃপতন ঘটে, তার জন্যে ঘৃণ্য ব্যবস্থা করতে প্লান্টারগণ কোনরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করে না। ভারতীয় শ্রমিকদের থাকবার জন্যে একটা জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। একে বলা হতো "কুলি-লাইন"। এই কুখ্যাত কুলি-লাইনে যারা বিবাহিত, তাদের জীবন যাপনের জন্যে কোন পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। একটি মাত্র বিরাট ব্যারাকে এদের গরু-ভেড়া-ছাগলের মত থাকতে হতো। ফলে নারী-শ্রমিকের পক্ষে আব্রু বাঁচিয়ে জীবন যাপন করা ছিল দুঃসাধ্য। তা'ছাড়া পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। ফলে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিল। "লাইন" হয়ে উঠল বেশ্যালয় আর দুরারোগ্য যৌনব্যাধির আড্ডা। শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠায় ভারতীয়দের মধ্যে মারাত্মক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল। অনেকে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করল। ভারতবর্ষে এই সব ভয়াবহ সংবাদ আসতে থাকায় ভারতে এ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভারত সরকার ফিজি উপদ্বীপে ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থার তদন্তের জন্য এক ডেপুটেশন পাঠালেন। "ম্যাকনিল-চমনলাল ডেপুটেশন" ১৯১৪ সালে তাঁহাদের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন, কিন্তু ভারতবাসী এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ভারতবাসী দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও উইলিয়াম পিয়ার্সনকে এই ব্যাপারে তদন্তের জন্যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে পাঠালেন। তাঁদের তদন্তের ফলে আরও ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ প্রকাশিত হয়ে গেল। ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৭৮৮ সালের চুক্তি বাতিল করে ১৯১৬ সালে ভারত থেকে চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক প্রেরণ নিষিদ্ধ করে এক আইন জারী করলেন। এই আইন ১৯১৬ সালের "Abolition of Indenture Act" নামে পরিচিত। অবশ্য নতুন করে শ্রমিক সংগ্রহ নিষিদ্ধ হলো বটে, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যে সব শ্রমিক ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রহ ভোগ করে আসছিল তাদের জন্যে ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা করলেন না। ১৯১৭ সালে পুনরায় দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে তদন্ত করতে ফিজিতে পাঠান হলো। তাঁরই নির্দ্দেশে অষ্ট্রেলিয়ার মিস্ ফ্লোরেন্স গার্ণহাম ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় নারীদের শোচনীয় অবস্থার তদন্ত করতে গেলেন। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে—১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত যাদের চুক্তি অনুযায়ী আনা হয়েছিল—তাদের চুক্তির মেয়াদ থেকে রেহাই দেওয়া হলো। ১৯২০ সালে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আর কোন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক থাকল না। প্লান্টারদের দাসত্ব থেকে এরা মুক্তি লাভ করে স্বাধীন ভাবে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ লাভ করল। ১৯২১ সালে ফিজিতে ভারতীয় জনসংখ্যার মোট সংখ্যা দাঁড়াল—৬০ হাজার ৬ শত ১১ জন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটালে এই ধরণের শ্রমিক পাঠান হতো কিন্তু সেখানেও অত্যাচার করায় ভারত সরকার তথায় শ্রমিক প্রেরণ নিষিদ্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাটালের অবস্থা দেখে ফিজির প্লান্টারেরা চিন্তিত হ'য়ে উঠল। ভাবী সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে তারা ১৯১২ সালে কঠোর শ্রমিক-নীতির কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করল। শ্রমিকদের অপরাধের জন্যে যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল সেটা উঠিয়ে দিল আর দৈনন্দিন কাজের চাপ কিছু পরিমাণে কমিয়ে দিল। অষ্ট্রেলিয়ার সি-এস-আর কোম্পানী ১৯১৪ সালে ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে তাদের জন্যে কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত করে দিতে লাগল। কেউ ভাগ জোতে অথবা কেউ খাজনায় জমি নিতে লাগল। এর ফলে অবশ্য ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রা একটু সহজ হ'য়ে উঠল। কিন্তু ১৯১৬ সালের "Abolition of Indenture Act" পাশ হবার ফলে সি-এস-আর কোম্পানীর শ্রমিক-সঙ্কট দেখা দিল। ইক্ষু আবাদ ও চিনির কল প্রায় অচল হয়ে উঠল। কোম্পানী আবার এক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল। ১৯১৬ সালে কোম্পানী এক একটি গ্রুপ করে ভারতীয়দের সরাসরি একশ' একর করে জমি ইজারা দিল। অবশ্য ভারতীয়েরা গ্রুপ তৈরী করে কোম্পানীর কাছে আবেদন করলেই ইজারা পেত না। কোম্পানী নিজের মনোমত ভারতীয়দের মধ্যে গ্রুপ তৈরী করে জমি ইজারা দিত। সবটাই কোম্পানীর মর্জ্জির উপর নির্ভর করত। ইজারার সর্ত্ত থাকত যে, কোম্পানীর নির্দ্দেশ মত প্রয়োজন মাফিক ইক্ষু আবাদ করতে হবে আর সে ইক্ষু কোম্পানীকেই বিক্রয় করতে হবে। ফসলের মূল্য কোম্পানীই ঠিক করে দেবে। তাতে ইজারা গ্রহণকারীর লাভই হোক আর লোকসান হোক সে নিয়ে কোম্পানী মাথা ঘামাবে না। অবশ্য ইজারা-গ্রহণকারীদের যে লাভ হতো না তা সুনিশ্চিত। কোম্পানীর এই শোষণের মাত্রা এত বৃদ্ধি পেয়ে গেল যে, ১৯২০ সালেই গোটা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়েরা কোম্পানীর শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করতে বাধ্য হলো। ধর্মঘটে কোম্পানীর পরাজয় হলো। ফলে গ্রুপ করে জমি ইজারা দেওয়ার প্রথার অবসান ঘটল এবং ভারতীয়েরা প্রত্যেকেই জমি ইজারা নেবার অধিকার কায়েম করল। শুধু তাই নয়, কৃষকের ফসলের মূল্য নির্দ্ধারণে কোম্পানীর হাত থাকল না। ফসলের গুণাগুণ বিচার করে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা হলো। এ ছাড়া, ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকেও ভারতীয়েরা সরাসরি জমি-জায়গা ইজারা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকে আবার নাম মাত্র খাজনা দিয়ে নিজেরা জমি-জায়গা কিনেছে। মোটের উপর ফিজি দ্বীপপুঞ্জে মোট ভারতীয়ের দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি ইক্ষু আবাদ করে জীবিকা অর্জ্জন করছে। ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতীয়েরা এই বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইক্ষু আবাদ করেছিল। এই সময়ে এই ফসলের মূল্য হয়েছিল ৩৫ লক্ষ ডলার।

কোম্পানীর কাছ থেকে যারা জমি ইজারা নিয়েছে তাদের গড়পড়তায় পরিমাণ হলো ১০ একর, আর ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে আড়াই একর থেকে ১২ একর পর্য্যন্ত। কোম্পানীর ইজারা দেওয়া জমিকে চার ভাগে বিভক্ত করতে হয়। অর্থাৎ এক এক ভাগে আড়াই একর পড়ে। এই এক একটি ভাগে চার রকম ফসল তৈরী করতে হয়। ইক্ষু, মৌরিটাস বীন, Ratoon Crops—এগুলোর আবাদ বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয়, কখন

জমিতে লাঙল দিতে হবে, জমির আগাছা ছিঁড়তে হবে ও জমিতে ফসল বুনতে হবে—এ সবই কোম্পানীর নির্দেশ মত করতে হবে। ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকে ইজারা নেওয়ায় জমির বেলায় এ সব বাধ্য-বাধকতা নাই। ইজারা-গ্রহণকারী নিজ ইচ্ছা মত চাষ আবাদ করতে পারে। এই বাধ্য-বাধকতা না থাকায় কোম্পানী এ সব জমিতে উৎপন্ন ইক্ষু কিনতে অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে, কোম্পানীর নির্দেশিত সার জমিতে না দেওয়ায়—কোম্পানীর নির্দেশিত সময়ে আবাদ না করা ও ফসল না কাটায় তারা এ ফসল কিনবে না। এই অজুহাতের নির্গলিতার্থ এই যে, কোম্পানীর কাছ থেকে জমি ইজারা না নিলে কোম্পানী ফসল কিনবে না, আর ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকে সস্তায় জমি ইজারা নেওয়া বন্ধ করা। ১৯৪০ সালের হিসাবেই দেখা যায় যে, ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকে ভারতীয়েরা যে জমি ইজারা নিয়েছে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬ হাজার ৪ শত একর আর সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেওয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ৫ শত একর মাত্র। এ ছাড়া ভারতীয়দের নিজস্ব জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার একর। কোম্পানীর কাছ থেকে ইজারা নেওয়া জমির পরিমাণ ৬৩ হাজার একর, আর খাজনা করে নেওয়া জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ হাজার একর। এ ছাড়াও ভারতীয়দের অধীনে আছে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর অনাবাদী জমি। অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলছে।

ফিজির শতকরা ৮০ ভাগ জমির মালিক হলো ফিজির উপজাতিরা আর বাকী ২০ ভাগ সরকারী জমি; কিন্তু সরকার এই জমিকে সি-এস-আর কোম্পানীকে দান করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের শতকরা ৮০ জনকে জমির উপরই নির্ভর করতে হবে। ১৯০৯ সালে সরকার এক বিধান জারী করে ফিজির অধিবাসীদের সরাসরি ভারতীয়দের কাছে জমি জায়গা হস্তান্তরকরণ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ফলে ভারতীয়দের পক্ষে জমি-জায়গা কেনা অসম্ভব হয়ে উঠে। এই আইন জারীর ফলে ফিজির অধিবাসীরা কেবল মাত্র সরকারকেই জমি-জায়গা বিক্রয় করতে পারত। সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়েরা ইজারা নিতে পারত, কিন্তু তাও আবার ফিজির অধিবাসীদের মতসাপেক্ষ ছিল। ১৯৩৭ সালে ৭ ও ৯ নম্বর অর্ডিন্যান্সের ফলে জমি ইজারা দেওয়া ও তার রাজস্ব নির্দ্ধারণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতীয়দের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই অর্ডিন্যান্স দু'টো পাশ হয়ে গেল। ফিজির মালিকদের নিজেদের নাক কেটে ভারতীয়দের যাত্রা ভঙ্গ করতে প্রলুব্ধ করা হল এই বিধানের সাহায্যে। ভারতীয়েরা অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলছে—এ স্বার্থের প্রতি তাদের লক্ষ্য পড়ল না—ভারতীয়দের জমি ইজারা দিয়ে তাদের যে আর্থিক লাভ হচ্ছিল, এতেও লক্ষ্য পড়ল না—এমন কি, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সরকার সঙ্কুচিত করল, তাতে তারা অপমানিত হলো না, কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষতি করতে হবেই—এইটে হলো তাদের কামনা। ৯ নম্বর অর্ডিন্যান্সের মূল উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয়দের সাথে যে বন্দোবস্ত ছিল, তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর নতুন করে বন্দোবস্ত না করার প্ররোচনা দান। ১৯৩৮ সালের নেটিভ ল্যাণ্ডস্ অর্ডিন্যান্স (Native Lands Ordinance) ও নেটিভ ল্যাণ্ডস্ (অকুপেশন) অর্ডিন্যান্স জারী হল। এই দুই অর্ডিন্যান্সের বলে ফিজির অধিবাসীদের জ[illegible] বঞ্চিত করে সি-এস-আর কোম্পানীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হ[illegible] ভারতীয় ও ফিজির অধিবাসীদের মধ্যে দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপ[illegible] বিশেষ জমি-জায়গা লইয়া কোন বিরোধ ঘটিলে তার মীমাংসা ক[illegible] চূড়ান্ত রায় দেবার ক্ষমতা সপারিষদ গবর্ণরের হাতে দেওয়া আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা যে অর্ডার দিয়ে থাকে[illegible] সেটা confirm করাই হল সপারিষদ গবর্ণরের এ্যাডজুডিকেশন। এর ফলে ভারতীয়দের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে জমি-জায়গা কিনতে [illegible] দেওয়ায় ভারতীয়গণকে কোম্পানীর ক্ষেত-মজুর হতে বাধ্য কর[illegible] হচ্ছে। কোন রকমেই ২১ বৎসরের বেশী ইজারা দেওয়া হচ্ছে না। সরকারী সম্মতি ব্যতিরেকে ফিজির অধিবাসীরা ভারতীয়দের ক[illegible] জমি-জায়গা হস্তান্তরও করতে পারছে না। অবশ্য সরকা[illegible] অনুমতি যে একেবারেই দেওয়া হয় না, তা সহজেই অনুমেয়। ১৯[illegible] সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Native Lands Trust Ordinan[illegible] জারী করে উপনিবেশের যাবতীয় জমি-জায়গার কর্তৃত্ব সরকার [illegible] হাতে গ্রহণ করেছেন। একটা নির্দিষ্ট পরিমিত জমি ফি[illegible] অধিবাসীদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে সুনির্দিষ্ট হয়েছে আর বাকী ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অধিবাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। অন্[illegible] এর মধ্যে ভারতীয়দেরও ধরা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সে ইজা[illegible] দেওয়ার যাবতীয় কঠোর সর্ত্তাদি লিপিবদ্ধ করা হলেও কিন্তু ইজা[illegible] পুনঃ ব্যবস্থার (renewal) কথা একেবারেই উল্লেখ করা হয় না[illegible]

১৯৪৩ সালের জুন মাসে ইক্ষু-চাষীরা (অধিকাংশই ভারতী[illegible]) যুদ্ধজনিত জীবনযাত্রার খরচা বৃদ্ধির জন্যে কোম্পানীর কাছে উৎ[illegible] ফসলের মূল্য বৃদ্ধি দাবী করে, কিন্তু সি-এস-আর কোম্পানী চাষী[illegible] এই দাবী প্রত্যাখান করে। কোম্পানীর বর্দ্ধিত হারে ইক্ষুমূ[illegible] প্রদানে অস্বীকৃতির ফলে গোটা দ্বীপপুঞ্জে প্রবল অসন্তোষ দে[illegible] দেল। তাই সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপন গরজে উপনিবে[illegible] বিভাগ হতে মিঃ সি ওয়াই সেফার্ডকে ইক্ষু-চাষীদের অভিযো[illegible] তদন্ত করতে পাঠান হলো। মিঃ সেফার্ড ১৯৪৫ সালের আ[illegible] মাসে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করলেন। তিনি সুপারি[illegible] করলেন যে, (১) নেটিভ ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইজারা প্র[illegible] ১১ বৎসর পর আবার রিনিউ করতে হবে; (২) সি-এস-আ[illegible] কোম্পানীকেও এই নীতি মেনে চলতে হবে; (৩) কোম্পানী[illegible] লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং চিনির কথা ছেড়ে দিয়ে[illegible] ইক্ষু খরিদের সময়ে ঝোলা গুড়ের মূল্য ধরে মূল্য দিতে হবে[illegible] (৪) কোম্পানীর ইক্ষু ওজনের দাঁড়ি-পাল্লা ও চক্রর মধ্যে মধ্যে পুলি[illegible] কর্তৃক পরীক্ষা করতে হবে এবং (৫) প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ্চ পর্য্য[illegible] কোম্পানীকে চাষীদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে হবে। এ বৎসর[illegible] হিসাবের জের টেনে নিয়ে আগামী বৎসরের হিসাবের সঙ্গে গোলমা[illegible] করা চলবে না। মিঃ সেফার্ডের সুপারিশ যে কার্য্যকরী করা হয় নাই, তা বলাই বাহুল্য।

কোম্পানী কর্তৃক ইজারা দেওয়া জমিতে কোন চাষীই ইক্ষু ছা[illegible] শাকসব্জী বা অন্য কোন ফসল বুনতে পারে না। ১৯৪০ সালে[illegible] হিসাবে দেখা যায় যে—ফিজি দ্বীপপুঞ্জে কোম্পানীর ৬৬ হাজা[illegible] একর জমিতেই ইক্ষু চাষ হয়েছে আর ফিজির বহির্বাণিজ্যের দু[illegible] তৃতীয়াংশই হয়েছে চিনি রপ্তানীতে।

ফিজি সরকারের কৃষি বিদ্যায়তন আছে। এই বিদ্যায়তনে কিন্তু ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেবল মাত্র ফিজির অধিবাসীরাই এখানে কৃষি-বিদ্যা অর্জ্জন করতে পারে। ভারতীয়দের কেন কৃষি বিদ্যায়তনে জ্ঞানার্জ্জন করতে দেওয়া হয় না তারও একটা চমৎকার কারণ দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, ভারতীয়েরা জন্মগত চাষী বলেই তারা অনুন্নত ফিজির অধিবাসীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলেই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, কালা আদমীদের দেশেও কালাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রের বিধিতে বাধে না।

আর্থিক অবস্থা

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আর্থিক অবস্থার সামান্যতম আভাষ আমরা দিয়ে এসেছি। এইবার আমাদের সবিস্তারে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯১৭ সালে দীনবন্ধু সি, এফ., এণ্ড্রুজকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের তদন্ত করতে পাঠান হয়েছিল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তদন্ত করে দেখলেন যে, সি-এস-আর কোম্পানী ভারতীয় শ্রমিকদের মাত্র ৬ পেনী হিসাবে দিন-মজুরী দেয়! এই শোচনীয় মজুরীতে কোন শ্রমিকেরই খোরাক হয় না! তাই তিনি দাবী করলেন যে, কোম্পানীকে প্রতিটি শ্রমিককে প্রতিদিন ১ শিলিং হতে ১ শিলিং ৩ পেন্স পর্য্যন্ত মজুরী দিতে হবে। ১৯১৯ সালে এক সরকারী কমিশন সুপারিশ করলেন যে, ভারতীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম দিন-মজুরী ৩ শিলিং ৪ পেন্স হওয়া প্রয়োজন। এক জন সরকারী কর্ম্মচারীকে শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে সরকারের কি করা উচিত, তার একটা সুচিন্তিত মতামত তাঁকে দিতে বলা হয়। এই কর্ম্মচারীটি সরকারের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি চাপা দিয়েও শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্যে নিম্নতম দৈনিক মজুরী ৪ শিলিং হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা না বলে পারলেন না। ১৯৩১ সালেও কিন্তু শ্রমিকদের দিন-মজুরী ২ শিলিং ৩ পেন্স থেকে ২ শিলিং ৬ পেন্সের মধ্যে উঠা-নামা করেছে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের সরকারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনের অর্দ্ধেকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

এই নিম্নতম হারে মজুরী দেওয়ার ফলেই ভারতীয় শ্রমিকেরা ঋণে জর্জ্জরিত হয়েছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই নিম্নতম মজুরীই ভারতীয় শ্রমিকদের দেনায় ডুবে যাবার একমাত্র ও প্রধানতম কারণ। ১৯৩১ সালে ফিজির আইন পরিষদে সরকার স্বীকার করেছেন যে, কেবল মাত্র রেওয়া, নাদী ও বা এই তিনটে জেলাতেই ভারতীয়দের ঋণের মোট পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নীচের তালিকা হতে ঋণের হার বোঝা যাবে :—

১৯২৫ সাল	১৯৩৫ সাল	১৯৩৬ সাল
	(পাউণ্ড হিসাবে)	
১১,৯৬১	৪৮,২৩৬	৯৬,২২৮

ঠিক এই সময়েই ভারতীয়দের কত জমি বন্ধকী দেওয়া হয়েছে, তারও হিসাব নীচে দেওয়া হলো :—

১৯২৫ সাল	১৯৩০ সাল	১৯৩৬ সাল
	(একর হিসাবে)	
৫,৪৪৬	৮,৫৯৭	১০,৫০৮

উল্লিখিত হিসাব থেকে ভারতীয়দের আর্থিক দুর্গতি কোন পর্য্যায়ে উঠেছে, তা আর বুঝতে বিলম্ব হয় না।

গোটা উপনিবেশে ভারতীয়দের ঋণের পরিমাণ ১৯৩৭ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আর ভারতীয়দের কৃষি-আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৬ লক্ষ পাউণ্ড।

সরকার ও ফিজির অধিবাসীদের কাছ থেকে যে সব ভারতীয় জমি ইজারা নিয়ে ইক্ষু চাষ করে, তাদেরই ঋণের পরিমাণ বেশী, কিন্তু কোম্পানীর কাছ থেকে যারা জমি ইজারা নিয়েছে, তাদের অবস্থা এতটা শোচনীয় নয়। এর কারণ হলো এই যে, প্রথমোক্ত চাষীরা মহাজনদের নিকট ফসল বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ নেবার অধিকার পেয়েছে, কিন্তু শেষোক্তগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভারতীয়দের ঋণে জর্জ্জরিত হবার আরও কারণ হলো ভারতীয় মহাজনদের অত্যধিক চড়া সুদে টাকা দাদন দেওয়া; এই মহাজনেরা ফসল বন্ধক নিয়ে ফসলের ন্যায্য মূল্য ত দেয়ই না উপরন্তু ফসল রাখার জন্যে মূল্য থেকে শতকরা ২০ ভাগ কেটে নেয়। মহাজনদের এই সর্ব্বনাশা ব্যবসায় আইন করে নিয়ন্ত্রণ করা ফিজির সরকার আজও কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নাই।

শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কে কিছু আইন করা হয়েছে। ১৯৪১ সালে "The Industrial Association Ordinance XVIII নামে এক আইন পাশ করা হয়েছে এবং এর ফলে কল-কারখানার শ্রমিকদের সঙ্ঘ, সংগঠন ও সরকার কর্ত্তৃক সে সঙ্ঘের রেজেষ্ট্রী করার কথা স্বীকার করা হয়েছে। সঙ্ঘ বা ইউনিয়নের রেজেষ্ট্রীকরণ বাধ্যতামূলক। এই বিধি কৃষিকার্য্যে রত ক্ষেত-মজুরদের বেলায় প্রযোজ্য হয় নাই, যদিও কৃষকদের বেলায় এটা প্রযোজ্য হয়েছে। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসাকল্পে এই সঙ্গে আরও একটা আইন পাশ করা হয়েছে। এই আইনের নাম হলো—"The Industrial Disputes Ordinance XIX of 1941"—যদি কোন বিশেষ ধরণের কারখানায় শ্রমিক-মালিকের বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা থাকে, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হয়েছে যে, গবর্ণর স্বয়ং হয় উভয় পক্ষকে একত্রিত ক'রে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন, নতুবা কোন সালিসী কমিটির (Corciliation Board) কাছে বিষয়টা বিবেচনার জন্যে পাঠাতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। সম্প্রতি "কিষাণ সভা" ও "মজদুর সঙ্ঘ" গোটা দেশে শিকড় চালিয়েছে। ১৯৪১ সালে Labour Welfare Ordinance XX পাশ হয়েছে। এর ফলে এক জন লেবার-কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন উপনিবেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি তদারক করার জন্যে।

শিক্ষা

১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত উপনিবেশের শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব ছিল খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে, কিন্তু ১৯১৯ সাল হতে সরকারের এই দিক্ দিয়ে তাঁদের যে কর্ত্তব্য আছে—এই জ্ঞানটা জন্মাল। সরকার কিন্তু সব দায়িত্ব নিলেন না। মিশনারীদের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করার নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারের মারফতে এই যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা হলো। যাই হোক, একটি শিক্ষা-বোর্ড গঠিত হলো। আট জন সদস্য নিয়ে

গঠিত হয়েছে এই বোর্ড আর এর মধ্যে আছে মাত্র দু'জন ভারতীয় সদস্য। সরকারী বিভাগ হতে শিক্ষা বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তার মধ্যেও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ১৯৩৫ সালে ফিজি সরকার শিক্ষা বাবদ যে অর্থ মঞ্জুর করেন তার মধ্যে দেখা গেল যে, মোট অর্থের শতকরা ১৫·৫% ভাগ খরচ হয়েছে ভারতীয়দের জন্যে আর ২১·৮% ভাগ খরচ হয়েছে ইউরোপীয়দের জন্যে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২·৪% জন হলেন ইউরোপীয় আর ৪২·১৮% জন হলেন ভারতীয়। এই বৈষম্যমূলক আচরণের এইখানেই শেষ নয়—আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ই হলো সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, কিন্তু শিক্ষা বাবদ মোট খরচের ৫০% ভাগ অর্থ ভারতীয়দের আদায় দিতে বাধ্য করান হয়েছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপরই যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মোট রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগই ইউরোপীয়দের শিক্ষা-খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। ১৯৪০ সালে শতকরা ২০ জন বালক ও শতকরা ১১ জন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করেছিল। ১৯৪১ সালে ভারতীয়দের মাত্র ৮৮টি বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছিল, কিন্তু এই সময়ে ইউরোপীয়দের বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩০টি। এর মধ্যে ফিজির অধিবাসীদেরও বিদ্যালয় আছে। এ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয় বা কারিগরী বিদ্যায়তনে ভারতীয়দের শিক্ষার্জনের কোন সুযোগই নাই।

সামাজিক অবস্থা

১৯৫৮ সালে যে "আগন্তুক অর্ডিন্যান্স" (Immigration Ordinancc) পাশ হয়েছে তার ফলে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের সামাজিক মর্যাদা পুরা মাত্রায় যে ক্ষুন্ন হয়েছে, তার মধ্যে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করার পূর্বে ভারতীয়দের কয়েকটা সর্ত পূরণ করে কিছু টাকা জামীন-স্বরূপ জমা দিলে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে পা দিতে দেওয়ার "পারমিট" দেওয়া হবে। বিবাহিত ভারতীয়গণ স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ফিজিতে আবাদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসলেই তাকে জাহাজ থেকে অবতরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এমন কি, ফিজিতে যে সব ভারতীয় বহু দিন ধরে বসবাস করে আসছেন, তাঁদেরও দেশ থেকে বিয়ে করে সন্তান সহ ফিজিতে বাস করার জন্যে বাধ্য করান হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ফিজির নারীদের বিবাহ করা চলবে না।

শ্রমিক আমদানী যুগের পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা মাত্রায় অল্প থাকায় ভারতীয় সমাজে যে মারাত্মক ব্যাধি প্রবেশ করেছিল, তার কোন চিহ্ন আজও মুছে যায় নাই। ১৯৩৮ সালে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতেও দেখা যায় যে, তখনও পাঁচ জন পুরুষ-পিছু চার জন নারী। এমন কি ১৯৪০ সালেও দেখা যায় যে, বিবাহযোগ্য পুরুষের ১০ হাজার নারীর অভাব। এর ফলে গো-মহিষাদি বিনিময়ের মত সেকালে শিশু বালিকা বিনিময় হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। এত বড় মারাত্মক অবস্থার অবসানে সরকারী দৃষ্টি নাই। ভারতীয়দের মধ্যে নিজস্ব ধর্মমতে বিবাহ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে, দেখা দিয়েছে আইনগত বিবাহ। শিক্ষিতা মহিলাগণ সম্প্রতি এই সামাজিক কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে "ইণ্ডিয়ান উইমেনস্ লীগ" (Indian Women's League) নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করে ভারতীয় সমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চালাচ্ছেন।

রাজনৈতিক অবস্থা

গবর্ণরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে একটি লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিল ও একটি একজিকিউটিভ্ কাউন্সিল আছে। এ ছাড়াও প্রধানদের একটি কাউন্সিল আছে; আর এ কাউন্সিল গবর্ণরকে পরামর্শ দান করে। ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ৬০ হাজার ভারতীয়ের নিজস্ব নির্ব্বাচিত কোন প্রতিনিধি কোন পরিষদে ছিল না। গবর্ণর এক জন প্রতিনিধি মনোনীত করে দিতেন ৬০ হাজার ভারতীয়ের জন্যে। ১৯২৫ সালে অবস্থার সামান্য রূপান্তর ঘটলো। এই বৎসরে মনোনীত সভ্যের পরিবর্ত্তে ২ জন সভ্যের ব্যবস্থা হলো আর ২ জনই ভারতীয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে আসবেন, এই ব্যবস্থা হলো। আইন সভায় ১৯২৯ সালে ৫ই নভেম্বর তারিখে অনেক ভারতীয় সদস্য এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে, ভারতীয়েরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির পরিবর্ত্তে যৌথ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। এই প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানালেন ইউরোপীয় সদস্যগণ। তাঁরা খোলাখুলি স্বীকার করলেন যে, যৌথ নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হলে ইউরোপীয়দের নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের আশা নাই। এই প্রস্তাবের ফল হলো বিপরীত। ফিজির সাম্রাজ্যবাদী শাসক ১৯২৯ সালে ভারতীয়দের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় নির্ণয় করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তিন জন সদস্য প্রেরণের পাকা ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারতীয় সদস্যদ্বয় আইন পরিষদ ত্যাগ করে চলে আসলেন। ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ অসহযোগিতা করলেন। ১৯৩৭ সালে নয়া শাসনতন্ত্র রচিত হলো। এই শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা হলো যে, আইন সভা একত্রিশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এই একত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন হবেন সরকারী সদস্য আর বাকী ১৫ জন হবেন বে-সরকারী সদস্য। বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে ইউরোপীয়, ফিজির অধিবাসী ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ৫টি সদস্যপদ লাভ করবেন। ইউরোপীয়দের ৩ জন হবেন নির্ব্বাচিত আর ২ জন মনোনীত, ফিজির অধিবাসীদের ৫ জন সদস্যই হবেন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত আর ভারতীয়দের ৩ জন নির্ব্বাচিত ও ২ জন মনোনীত। সকল সম্প্রদায়ের জন্যে সমান ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ৫টি করে সদস্যপদ লাভ করলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষম্যই বজায় রাখা হয়েছে। ১৯৩৭ সালে যে আদম সুমারীর রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় যে, দ্বীপপুঞ্জে মোট ফিজিয়ানের সংখ্যা ৯৯ হাজার ৫ শত ১৫ জন, ভারতীয়ের সংখ্যা ৮৯ হাজার ৩ শত ৩৩ জন আর ইউরোপীয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২ শত ৩৮ জন মাত্র। লোকসংখ্যার অনুপাতে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বার্থের তারিফ করতে হয়। শাসন পরিষদে কিন্তু ভারতীয়দের কোন প্রতিনিধি নাই।

ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্যে সেক্রেটারী ফর ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স নিযুক্ত হয়েছেন। এই পদটি আজও অধিকার করে আছেন অনৈক গবর্ণমেন্ট ডাক্তার। এ ভদ্রলোক যে সরকারের দিকেই ঝোল টানবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? মোটের উপর, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরের "দক্ষিণ-আফ্রিকা" হয়েছে।

বাড়ী এসে বিপ্রপদ আবদুলের চিকিৎসার জন্ত দেশের ভিতরের সেই ভাল ডাক্তারটিকে ডেকে পাঠিয়েছেন—পারিশ্রমিকটা অবশ্য তিনিই দেবেন এবং খুনী আসামীদের বাড়ী এমন পরিমাণ ধান পাঠান—যা ভেনে-কুটে ওরা স্বচ্ছন্দে তিনটিতে খেয়ে থাকতে পারে ধানের জমা ঠিক রেখে। এই গেল প্রথম ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—তালুকটার আদায়-উসুলের ভার পড়ে নিতাই ও ইমামের ওপর। দু'জনে মিলে-মিশে কাজ করবে, দূর থেকে উপদেশ দেবেন বিপ্রপদ। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে বুদ্ধিদাতা রইল ইছমাইল মিঞা। কারুর ওপর যেন অত্যাচার না হয়, কেউ যেন কখনও নালিশ করতে না পারে মনিবের কর্মচারীর বিরুদ্ধে। সামান্ত তালুক, লাভের আশায় এ তালুক খরিদ করা হয়নি—খরিদ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠার আশায়। তা যেন বিফল না হয়। এমনি আরো অনেক উপদেশ দিয়ে নিতাইকে সাধারণ ভাবে কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দেন বিপ্রপদ। শিবপদ ও রূপপদকে তিনি এর মধ্যে আনেন না, কারণ দোষ হলে তাদের তিরস্কার করা যাবে না—করলে হয়ত তা কালে কালে গৃহবিবাদে পরিণত হবে। তারা সংসারের দশটা পাঁচটা যে কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে তাই নিয়েই থাক। তারাও মনিব, ঘরে বসে সেলাম পাবে এই ভাল।

ছুটি শেষ হয়ে গেছে—বিপ্রপদ আবার নায়ে ওঠেন, কার্য্যস্থলে যাবেন।

মধ্য-রাত্রে ষ্টীমার যে ঘাটে থামে, সে একটা বড় বন্দর। আজ এখানে অনেক সময় ষ্টীমার থামবে, কারণ একটা কল বিগড়ে গেছে। সেটা না মেরামত হলে খুলতে পারবে না ঘাট থেকে। আজ কেন জানি ষ্টীমারটা এক রকম খালি। এখানে তেমন যাত্রীও ওঠেনি। বিপ্রপদর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আর ঘুম আসতে দেরী আছে। তিনি মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করেন ডেকের ওপর। আবার গিয়ে শুয়ে পড়েন বিছানায়। দুমদাম করে হাতুড়ির ঘা পড়ছে তবু বিকল লোহার পাঁজরটা অবিকল হচ্ছে না। মুস্কিল, এ ভাবে কতক্ষণ কাটবে? তেমন কেউ যাত্রী থাকলেও বসে বসে আলাপ করা যেত। যে ক'জন আছে তারা লেপ মুড়ি দিয়েছে শীতের রাত্রে।

রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দেখেন আকাশ একেবারে নির্ম্মল, নীচের জলও তেমনি। সহস্র সহস্র তারায় আকাশ একাকার। যেন সাদা ফুলের ফুলঝুরি। কিন্তু হিমেল হাওয়ায় যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নদীর জল সময় সময় ছলছল করে উঠছে। এই যে অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ—এর নীচে নদীটা কতটুকু! আবার আরোহী বিপ্রপদ? নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র ঐ আকাশের মত সুদূরপ্রসারী। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিপ্রপদ তা অতিক্রম করতে পারবেন কি না সন্দেহ। তবু তাঁকে ছুটে চলতে হবে। আশা বুকে নিয়ে বল্গাহীন অশ্বের মত উধাও হয়ে। দেখতে হবে সীমানা। তিনি ক্ষুদ্র কিন্তু তাঁর আশা অসীম। এ আশা না দুরাশা? কেন দুরাশা হতে যাবে? তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন—খড়-বিচালী কাটতেন, মাছ ধরতেন, মাঝে মাঝে দিন যেতো অর্দ্ধাহারে। সে তুলনায় আজ তিনি কোথায়? কত দূর এগিয়ে গেছেন। আরো এগিয়ে যাবেন—আরো—আরো।

আবার নদীর জলের ছলছলানি শুনতে পাওয়া যায়—সেই তালে তালে বিপ্রপদর হৃদয়ও নাচতে থাকে।

একটা মর্ম্মভেদী চীৎকারে বিপ্রপদ চমকে ওঠেন।

এ প্রাণহানির আশংকায় আর্ত্তনাদ নয়—তার চেয়েও যেন বৃহত্তম ক্ষতির আশংকার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্ত করুণ আকুতি। আবার সেই চীৎকার। বিপ্রপদ সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুটে যান। কোন্ দিক দিয়ে শব্দ এলো? মনে হয় স্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠ। কেবিনটার মধ্যে না ফ্ল্যাটের ও-পাশে? বিপ্রপদ ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় কেবিনটার দরজা খুলে ফেলেন, সেখানে একটা বুড়ো খালাসী শুয়ে। এখানে তো না। তবে শব্দটা এলো কোথেকে? তিনি ফ্ল্যাটের ওপর যেতে পারেন না, এর মধ্যে একটি যুবতী ফ্ল্যাট ও জাহাজের মধ্যের সিঁড়ির ওপর এসে হুড়মুড় করে পড়ে। সে আর্ত্ত কণ্ঠে হিন্দুস্থানী ভাষায় বিপ্রপদকে তাহার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে বলে, জড়িয়ে ধরে পা। কিছুক্ষণের জন্ত তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।

তিনি হিন্দি কথা বোঝেন না, কিন্তু বিষয়টা অনুমান করে বুঝে উঠতে তার বেশী সময় লাগে না। তিনি স্ত্রীলোকটিকে পিছনে রেখে, সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে দু'টো রেলিং চেপে ধরে সতেজে দাঁড়ান। এক দল উচ্ছৃঙ্খল লোক তাঁর সুমুখে এসে বাধা পেয়ে মারমুখো হয়ে রয়েছে। তাদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় তারা রিক্সাওয়ালা, কুলী অথবা সহরে জুয়াড়ী হবে। এক দল কাপুরুষ সামান্ত একটা মেয়েমানুষের ওপর হানা দিতে জুটেছে।

'বাবু, রাস্তা ছেড়ে দিন—ওকে সায়েস্তা করতে হবে। ও আমাদের একটা মনিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে।' ভীড়ের মধ্যে লোকটাকে ঠিক চেনা যায় না।

'তোমরা শাসন করতে কে? নিয়ে থাকে পুলিশে খবর দাও।'

'ছাড়ো ছাড়ো বাবু, তোমার দেখি বড্ড দয়া। রাস্তা মুখ

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

দেখেছ বুঝি ? দলের ভিতর থেকে একটা ছোক্‌রা বিদ্রূপ করে, বাবু রাঙা মুখ দেখেছে যে।'

তার কথায় সায় দিয়ে দলের বাকী লোকগুলো হেসে ওঠে। 'ছাড়ো বাবু, এখনও মান থাকতে থাকতে পথ দাও। কেষ্টা এসে পড়লে তোমার আর রক্ষা থাকবে না। সামান্য একটা পাগলীর জন্য অপমান হবে। সরে দাঁড়াও, পথ-দাও।' তারা দু'-তিন জনে এগিয়ে আসে কিন্তু বিপ্রপদর চোখের দিকে চেয়ে আবার সভয়ে পিছিয়ে যায়।

ষ্টীমারের এক জন কেরাণী বিপ্রপদকে সাবধান করে, 'দেখুন মশাই, ওরা সহরে গুণ্ডা গাড়োলের দল—ওদের সংগে আপনার ঝগড়া সাজে না। আপনি ভদ্রলোক, আপনার ঝামেলায় কাজ কি, পথ ছেড়ে দিন।'

'প্রাণ গেলেও আমি তা পারি নে। শিয়াল-কুকুরের কামড়ের ভয় করলে তো আর সংসারে থাকা যায় না।'

'কি রে, কোন্ শালা রোখে আমাদের ?' বলে কেষ্টা এসে একটা ধাক্কা দেয়।

বিপ্রপদ দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, 'দাঁড়া হারামজাদা পাজির দল। যাকে তাকে যা-তা বলা।' তার পর তিনি দু'টোর চুল ধরে ঠেলতে ঠেলতে সমস্ত দলটাকে ফ্ল্যাটের ওপর নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে নদীতে ঠেলে ফেলে দেন। দু'-একটা লোহা-লক্কড় দড়ি-কাছি ধরে থাকে —অপরগুলো নদীতে পড়ে হাবুডুবু খায়।

বিপ্রপদ জাহাজে ফিরে আসেন। উপস্থিত লোকগুলো, বিশেষতঃ কেরাণীটা সিংহ দেখলে যেমন সভয়ে পিছিয়ে যায় তেমনি সরে গিয়ে বিপ্রপদকে পথ করে দেয়। এমন দুর্জয় সাহসী পুরুষ এ পথে সে এই বত্রিশ বছর চাকরীর বয়সে আর দেখেনি। ঐ গুণ্ডাগুলো সুবিধা পেলেই যাত্রীদের ওপর কত অত্যাচার করে, অভদ্র ব্যবহার করে, কিন্তু এমন প্রত্যুত্তর কাউকে কখনও দিতে দেখেনি, বা শোনেনি। মনে মনে সে সন্তুষ্ট হয় খুবই কিন্তু আশংকা করে যে এর জের এত সহজে মেটার নয়।

বিপ্রপদ কেবিনে গিয়ে দেখেন যে তাঁর বিছানার কাছে একটা কোণে সেই মেয়েলোকটি বসে আছে। দুয়ারে শব্দ হতেই সে সভয়ে পিছিয়ে যায়। বিপ্রপদকে দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসে নতনেত্রে বসে থাকে।

এতক্ষণ পরে বিপ্রপদ দেখেন যে, এ অগ্নি-কণিকা। ধোপার মেয়ে সুখীর হাসিতে আগুন আছে—আর এর সারা দেহে আগুন। এ আগুনের কাছে এলে যেন কারুর রক্ষা নেই!

'তোমার নাম ?'

'লোকে বলে পাগলী। কিন্তু, মেরে নাম মালা।'

'তোমার বাড়ী কোথায় ? বেশ বাঙলাও জানো, হিন্দীও বলতে পারো।'

'মোর ঘর হিন্দুস্থান।'

'পশ্চিম দেশে ? এখানে এলে কি করে ?'

'বনমে জংগলমে জলমে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে চলা আয়া।'

বিপ্রপদ অর্থ বুঝতে পারেন না, মনে করেন পাগল না হলেও এ মেয়েটার মাথার ছিট আছে। হয়ত বা পাগলই না কি তাই বা কে জানে! 'কি বললে ?'

'বনে জংগলে পাহাড়ে জলে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি।'

'কি খুঁজতে খুঁজতে এসেছ ?'

'ইয়াদ নেহি বাবুজী, ইয়াদ নেহি।'

'মানে ?'

পাগলী অর্থ করে দেয়। 'মনে নেই বাবুজী, মনে নেই।'

'খুঁজে বেড়াচ্ছ অথচ মনে নেই, এ তো বড় অদ্ভুত কথা। সাধে তোমাকে লোকে পাগলী বলে। তুমি এমন সুন্দর বাঙলা শিখলে কি করে ?'

'শুনতে শুনতে।'

'শুনতে শুনতে তো বুঝলাম। কিন্তু এখানে এলে কি করে ?'

'আয়া পায়দলসে।'

'মানে পায় হেঁটে ? কত দূর থেকে মালা ?'

'কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় ঘুমকে বাঙলামে আয়া, তভি দেখা নেহি মিলা।'

'কাশী থেকে আসছ, এখন কোথায় যাবে ?'

'আপনার সাথে।'

'এ কি বিপদ! আমি যাবো কোথায় সমুদ্রের ধারে, থাকব একা একা একটা কাছারিতে, তুমি সেখানে যাবে কি করে? আমার সংগে কোন স্ত্রীলোক নেই, তুমি থাকবে কি করে ?'

সে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দেয়, 'আমি যাবই বাবুজী, নিশ্চয় যাবো আপনার সাথে।'

বিপ্রপদ মনে মনে ভাবেন: আসমানতারাকে দিয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে। তাঁর দাঁত ভেঙেছে, আর ও-ঝামেলায় কাজ নেই। একটু একটু শীত করছিল, তিনি গায়ের কাপড়টা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েন। বেশী অন্তরংগতা ভাল না। তা হলেই ঘাড়ে চাপবে। আর বিপ্রপদর এমন ভাগ্য, তাঁর জন্য যত আপদ রাস্তা-ঘাটেও বসে থাকে। তিনি চোখ বুঁজে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকেন। যদি মেয়েলোকটি আপনা থেকে নেমে চলে যায় তবে খুবই ভাল হয়। কিন্তু তিনি নিজের মুখে ওকে নেমে যেতে বলবেন কি করে? আর ও যাবেই বা কোথায়? এখানে নামলে যে বিপদের মুখ থেকে ওকে রক্ষা করা হলো, সেই বিপদের কবলেই কি ঠেলে দেওয়া হয় না? যাক, তিনি চুপ করে থাকবেন—ও যা ভাল বোঝে করবে। বিপ্রপদ নির্লিপ্ত থাকলে ও আর সাহস পাবে না কাছে ঘেঁসতে।

সময় কতক্ষণ অতিবাহিত হয় বলা যায় না, বিপ্রপদও ঘুমাতে পারেন না. পাগলীও নড়ে না।

সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ হয়। সেই ষণ্ডা ছোকরাগুলোর সাথে এক জন পুলিশ-অফিসার এসে কেবিনে হাজির হয়, জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি না কি একটি স্ত্রীলোককে ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'কে বলল এ সব কথা ?'

'এই তো এরা।'

'এদের কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? ঘটনাটা শুনুন, জাহাজের খালাসী থেকে কেরাণী পর্যন্ত প্রত্যেকেই জানে, আমি একে রক্ষা না করলে এমন একটা ঘটনা আপনাদের এলাকায় ঘটত আজ যা সকলের পক্ষেই লজ্জাজনক।'

'কি বলুন তো ?'

'ওই ওর মুখেই শুনুন, পরে সাক্ষী-সাবুদ নিতে পারবেন।'

'তোমার নাম কি?'

'মেরে নাম মালা।'

'কি হয়েছিল?'

মালা সব খুলে বলে। পুলিশ-কর্মচারীটি নিবিষ্ট মনে বর্বরদের ... উদ্দেশ্যের কথা শুনে যায়। তার পর সে বলে, 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'যাবো বাবুর সাথে।'

বিপ্রপদ বাধা দেন। 'না, না, আমার সাথে যাবে কোথায়? ... সাথে থানায় যাও। আর কোন ভয় নেই তোমার—বাবু তোমার রক্ষার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'না, আমি আপনার সংগে যাবো।'

'যাবো বললেই যাওয়া হলো। আমি যাবো কোথায় তার নেই ঠিক, তুমি যাবে কি করে সেখানে? আমি একা পুরুষ মানুষ।'

মালা চুপ করে বসে রইল, তার নড়া-চড়ার ইচ্ছা নেই।

পুলিশ-কর্মচারীটি একটু মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

কেবিনের বাইরে গিয়ে ধমক ছেড়ে গুণ্ডার দলটাকে শাসায়। '... শালা, তোদের দেবো খেলাপে। চিনিস আমাকে—আমার নাম রুদ্র সেন।'

বিপ্রপদ মহা বিরক্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়েন। এই মেয়েটাকে নিয়ে তিনি কি করবেন? সঙ্গে অন্য কোন স্ত্রীলোকও নেই যে ... আশ্রয়ে ওকে নিয়ে যাবেন। লোক উঠবে নামবে তাদের ... দৃষ্টির কাছে এই বিদেশিনীর কি পরিচয় দেবেন? পরনে ঘাগরা, গায় ওড়না—ও এদেশী লোকের কাছে রীতিমত প্রশ্নের ও কৌতূহলের সামগ্রী। বিপ্রপদ সে কৌতূহল ও প্রশ্ন দমন করবেন কি দিয়ে? ওকে যে কোনও প্রকারে এড়াতেই হবে। সেই এড়াবার ফন্দীই তিনি মনে মনে আঁটতে থাকেন। ফাঁকি দিয়ে ষ্টীমারে ... গেলে কেমন হয়? কিন্তু সে সুযোগ কি ষ্টীমারে থেকে নামার পূর্বে হবে? ততক্ষণ ওর জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? বিছানা থেকে একটা চাদর ও কম্বল টেনে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেন, 'মালা কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'আগে ষ্টীমার ছাড়ুক।'

বিপ্রপদ মনে মনে বড় বিরক্ত হন। জ্ঞানের নাড়ী তো বেশ টনটনে—পাগল বলে কে? এমন অদৃষ্টের ফের, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ঝামেলা সইতে হবে।

ঘন্টা পড়ে, ষ্টীমারও ছাড়ে।

মালা ধীরে ধীরে উঠে স্ত্রীলোকের কেবিনে চলে যায়।

ওর এই সুবুদ্ধিতে বিপ্রপদ খানিকটা স্বস্তি বোধ করেন।

তখন পর্য্যন্ত ভোর হয়নি। জনবিরল জাহাজের কেবিন থেকে একটা সুন্দর হিন্দী গানের কলি কে যেন সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছে। বার বার একটা গানই একই মাধুর্য দিয়ে সে গাইছে। ওর গানের ঝংকারে ঘুম ভাঙল বিপ্রপদর। আকাশের অন্ধকার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিপ্রপদর কাছে গানের কোন অর্থই পরিষ্কার হচ্ছে না। কিন্তু কি মিষ্টি গলা, যেন মধু ঝরছে। তিনি কেবিনের বাইরে এসে দেখেন যে, জাহাজের হিন্দুস্থানী জমাদারটা তার ঝাড়ু বন্ধ রেখে, গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে। মালা গান গাইছে আর জমাদারটা যেন তার দেশে বসে শুনছে। বিপ্রপদ কোনও অর্থ বুঝতে পারেন না, তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে জমাদারটার কাছে এসে দাঁড়াল। জমাদারটা কেবলি মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। একমাত্র সেই সমঝদার—এমনি একটা গর্বের ভাব তার ভংগিতে। মালা থামে না, ভোরের হাওয়ায় মধু ঝরতে থাকে, ওরা ক্রমে ক্রমে তন্ময় হয়ে যায়।

গান থামতেই বিপ্রপদ সহজে আত্মসম্বরণ করে নিজের জায়গায় এসে বসেন। বাস্তব সমস্যায় তাঁকে বিব্রত করে তোলে। মালা তার কাছে একটা জ্বালার মত বোধ হতে থাকে। তিনি গত রাত্রির ঘটনা উপেক্ষা করে অন্যান্য সকলের মত শুধু দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ কণ্টক তাঁর গন্তব্য পথে এসে বিঘ্ন জন্মাত না। যা হবার তা হয়েছে, এখন কি উপায়ে তিনি এ কাঁটা তুলবেন?

'নমস্তে বাবুজী—সুপ্রভাত।'

'মানে? তুমি এখানে কি চাও? কেবিনে যাও।'

'ম্যয় ভুখা হুঁ।'

এবার বিপ্রপদ কিছুই বুঝতে পারেন না। তিনি কি মালার ইয়ার্কির পাত্র না কি? তিনি গম্ভীর হয়ে থাকেন—কি মুস্কিলেই পড়েছেন!

সেই সময় জাহাজের কেরাণী এসে বলে, 'মশাই, ওর ভাড়াটা?'

'আমার কাছে চাইছেন কেন?'

'তবে কার কাছে চাইব? আপনি ওকে নিয়ে এলেন, আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, ভাড়া দেবে কি কোম্পানী?'

'উপকার যে করে তাকেই বুঝি বাঘে খায়?'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি ভদ্রলোক, আপনার ও-সব ঝামেলায় কাজ নেই।'

'তা হ'লে আপনার মতে ভদ্রলোকের ঝামেলা ক'রে নিরীহ স্ত্রীলোককে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচান উচিত না?'

চোখ দু'টো একটু পিট-পিট করে কেরাণী উত্তর খুঁজে বলে, 'এ-ও তো এক প্রকার কোম্পানীর অত্যাচার। আপনি ভদ্রলোক অসহায় স্ত্রীলোকটিকে বাঁচান, আমাকেও রক্ষা করুন—ওর ভাড়ার টাকা ক'টি দিয়ে দিন।'

'কত ভাড়া?'

'আপনার গন্তব্য স্থান?'

'তার সাথে ওর সংস্রব কি? ও কোথায় যাবে?'

'এই, তুমি যাবে কোথায়?'

'বাবুর সাথে।'

আবার চোখ পিট-পিট করে কেরাণী হাসতে থাকে। বলে, 'এখন দিয়ে দিন, যত ঘাঁটবেন তত পাঁক উঠবে। বলতেই বলে স্ত্রীবু দুষ্কুলাদপি—অর্থাৎ স্ত্রীলোক ভয়ানক দুষ্ট। তাদের মর্জি বোঝা দায়। এই তো আমারও মশাই ঘরে একই জ্বালা—আজ পর্য্যন্ত তার যে কি অভিরুচি তাই বুঝলাম না। প্রায় এই কুড়ি বছর সংসার করছি, মশাই, তার মন পেলাম না। বেঁকা বেঁকা—এমন বেঁকা যে একেবারে চলতি সাপের মত বেঁকা।' সে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রসিদ বইটা খুলে ফেলে।

এ-সব কথা বিপ্রপদর মোটেই ভাল লাগে না। তিনি একখানা পাঁচ টাকার নোট কেরাণীর হাতে দিয়ে নিজের গন্তব্য স্থানের নাম

করেন। বাকী পয়সা মালার হাতে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই কিনে খেতে নির্দেশ দিয়ে চুপ করে থাকেন।

কিছুক্ষণ বাদে মালা ফিরে আসে, তার হাতে এক ঘটি জল। ঘটিটা বিপ্রপদরই। 'বাবু, মুখ-হাত ধোবেন না, অনেক বেলা হয়েছে, কিছু খাবেন না? আমি যাই, চা নিয়ে আসি।'

'আমার চোদ্দ পুরুষেও চা খায়নি, আমি তো দূরের কথা।'

'চা খান না, তবে খাবেন কি?'

'কিছুই খাই নে সকাল বেলা—আমার সন্ধ্যাহ্নিকও বাকী।'

'সামনের ষ্টেশনে জাহাজ ভিড়লে দুধ কিনে আনব, আর কলা?'

'তুমি খেলে আনতে পার, আমার ও-সব লাগবে না।'

'তবে কি খাবেন আপনি?'

'আঃ, আমাকে বিরক্ত করো না, তোমার কাজে যাও।'

সরলা বালিকার মত মালা বলে, 'আমার তো কোন কাজ নেই, বাবুজী।'

'তবে যা ইচ্ছা তাই করো।'

মালা একটু সাহস পেয়ে যেন বলে, 'তবে যাই, নিয়ে আসি দুধ-কলা কিনে।'

ঘাগরা ঘুরিয়ে ও মোড় ফিরে চলে যায়।

বিপ্রপদর মনটা একটু হাল্কা হয় মালার সারল্যে।

বাস্তবিকই অনেক বেলা হয়েছে, কিছু ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। তিনি গামছাখানা নিয়ে নীচে নেমে যান। ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, মালা কেবিনের মধ্যে সব প্রস্তুত করে রেখেছে। সব অর্থে—দুধ ও কলা। এর বেশী এখানে কিছু খেতে পাওয়া যায় না।

এবার আর ছেলেমানুষের মত খাবার জিনিসের ওপর বিপ্রপদ রাগ করতে পারেন না, কারণ মালার ওপর থেকে বিরক্তি অনেকটা শিথিল হয়েছে। তাকে এখন অনেকটা সহ্য হয়ে আসছে। ওর ব্যবহারটা মন্দ না।

কিন্তু তবু বিপ্রপদকে মালার সংগ ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে এই মালা এক দিন তাঁর কণ্ঠের জ্বালা হয়ে দাঁড়াবে। আসমান-তারা কি তাঁকে কম দুঃখ দিয়েছে! ভুগিয়েছে কম! কিন্তু মালা যাবে কোথায়? কোথায় যাবে, সে প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁর কাজ কি! একটা ভবঘুরে মেয়েলোক ঘুরতে ঘুরতে যেখানে ইচ্ছা চলে যাক—তাঁর তাতে মাথা-ব্যথা কি!

দিনটা কোন প্রকারে কাটে। সন্ধ্যার একটু আগে ষ্টীমার ঠিক জায়গায় এসে থামে। বিপ্রপদ নিজের বাক্স ও বিছানাটা ঠিক করে নেন। এইবার কোন প্রকারে ওকে এড়িয়ে নেমে গয়নায় নৌকায় চাপতে পারলেই হয়। তিনি একটা কুলীর মাথায় জিনিষগুলি দিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই ব্যস! কিন্তু কুলী তো আসে না। কুলীর সন্ধানে তিনি নীচে নেমে যান।

কেবিনে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, তাঁর বাক্স-বিছানা নেই—উধাও হয়েছে। বাঃ, আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে! তিনি ত্বরায় নীচে নেমে যান। চোরে নিল না কি? কিন্তু তার নাম-লেখা বাক্স এই প্রকাশ্য দিবালোকে চোরে চুরি করাও তো সহজ কাজ নয়। তবে হলো কি?

সিঁড়ির কাছে মালা দু'হাতে দু'টো বোঝা নিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

শীতকালেও বিপ্রপদ যেন ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠেন। মালার মুখের দিকে চেয়ে তিনি শুধু 'চলো' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না।

২৯

প্রায় একটা বছর গত হয়ে গেল! অনেক চেষ্টা করেও অমরেশ ও বিনুর তেমন কোনও ভাল পড়ার ব্যবস্থা কমলকামিনী করতে পারেননি। স্বামী ও দেওরদের এদিকে লক্ষ্য নেই একেবারেই। দিন দিন অমরেশের উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই যাচ্ছে। কমলকামিনী মনে মনে প্রমাদ গণেন! পড়াশুনোর নাম অমরেশ করে না, কেবল পাখী ছানা শীকার, মাছ-ধরা এবং খেলা নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ীর কেউ তাকে শাসন করতে পারে না—সামলাতেও পারে না। বিনু বরং সভ্য শান্ত ছিল, ভয়ও ছিল বেশ, কিন্তু অমরেশের উপদেশে সে বিগড়ে যেতে শুরু করেছে। এ সব বাড়ীর পুরুষদের দৃষ্টি এড়ালেও কমলকামিনীর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তিনি শিবপদকে একজন ভাল শিক্ষক, যে সামান্য কিছু ইংরেজীও জানে, এমন লোক খুঁজে আনতে বলেন। অনেক চেষ্টার পর একটি লোক জোটে। দুর্দান্ত অমরেশকে বাধ্য করার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে লোকটি বেশ বুদ্ধিমান।

'অমরেশ, তুমি রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?'

'না।'

'বিনু?'

'উঁহু।'

'তবে আমি পড়ি, তোমরা শোন। তার পর বুঝিয়ে দেব।'

গল্পের কথা শুনে বোসের বাড়ীর দু'টি দুর্দান্ত শিশু সভ্য শান্ত হয়ে বসে। তাদের এই কৃত্রিম সংযমটা অনেকের চোখেই হাস্যকর বলে ঠেকে।

পণ্ডিতটি সুর তাল মান দিয়ে ললিত কণ্ঠে ত্রিপদী ও পয়ার পড়ে যায়। কখনও ভাবাবেশে বিভোর হয়ে পড়ে সে, কখনও তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামতে থাকে। বিগলিত শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারার মত এই অমর কাব্যধারা দিকে দিকে গলে ঝরে পড়ে। মন্দির, পূজা-মণ্ডপ অনুরণিত হয়ে ওঠে। বৌ'রা, মেয়েরা হাতের কাজ ফেলে কমলকামিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে একমনে শুনতে থাকে।

জনম-দুঃখিনী মা জানকীর দুঃখে, পুত্রহারা গান্ধারীর শোকে এমন যে দস্যু অমরেশ, তারও দু'চোখ বেয়ে জল ধারা নামতে থাকে। বিনুও কাঁদে।

দূরে বসে কমলকামিনীরও এ দৃশ্যে হৃদয় সজল হয়ে ওঠে।

এমনি ভাবেই কিছু দিন কাটে। কমলকামিনী নিশ্চিন্ত মনে সংসার করতে থাকেন। তিনি মেয়েমানুষ হয়ে যতটা করা সম্ভব করতে পেরেছেন, আপাততঃ তাই যথেষ্ট। অমরেশ গল্পের লোভে পড়ায় মন দিয়েছে। সামান্য একখানা পাঠ্য পুস্তক থেকে রামায়ণ মহাভারত কম না। এখন একটু অঙ্ক আর ইংরেজী শিখলে যে কোন ইস্কুলে উঁচু ক্লাশে ভর্তি করা যাবে। আর নানাবিধ নীতি-কথা পড়ে ওর মনটা নরম হবে, মেজাজটাও বদলাবে। তাঁরা আর কি পড়েছেন! ঐ পর্য্যন্তই তো বিদ্যা। কিন্তু তাতেই সংসার চলে। ছেলেদের একটু পাশ-টাশ করা দরকার। আর একটু বড় হলে তিনি যাঁর ছেলে তাঁর গলায় গেঁথে দেবেন। তখন তিনি এ

কিছু ব্যবস্থা না করে কি চুপচাপ থাকতে পারবেন ? মোটের ওপর, কমলকামিনী অমরেশের যেটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট এখন।

কিন্তু সহসা এক দিন কাল বোশেখীর মত সোনালী এসে সব ওলট-পালট করে দেয়। একাগ্রচিত্ত অমরেশকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার পুঁথি-পুস্তক থেকে। জানকীর অশ্রু, গান্ধারীর বিলাপ তাকে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারে না। বাঁধা পশু দড়ি ছিঁড়লে যেমন উন্মত্তের মত খানিকটা ছুটোছুটি করে, তেমনি করতে থাকে অমরেশ ও সোনালী।

যে অমরেশ এক প্রকার শীতলাতলার বাগানের কথা ভুলেই গিয়েছিল, সেই অমরেশ ভোর না হতেই সেখানে গিয়ে হাজির। অন্ধকারে গা একটু ঝম্‌ঝম্ করে, মনটা একটু কেমন করে, কিন্তু তা ক'...কর জন্য। ফুল তোলার নামে দু টিতে বাগান উজাড় করে দেয়। একটি কুঁড়ি পর্য্যন্ত অপর কেউ এসে পায় না। কমলকামিনী প্রতিবেশীদের নালিশে-নালিশে অস্থির। ছেলেকে চোখ রাঙালে শোনে না, মারলে বোঝে না—এ এক বিষম জ্বালা!

এক দিন কমলকামিনী বলেন, 'দাঁড়া, তোকে পাঠিয়ে দেবো কলকাতায়, তখন বুঝবি কেমন মজা।'

'বেশ তো, দাও না পাঠিয়ে। রেলগাড়ী চড়ে যাবো দিদির কাছে—দিব্যি হুস-হুস করে।'

'দিদিকে চিনিস, একটু বেয়াড়াপনা করলেই মার!'

'মারুক দেখি আমাকে, কার সাধ্যি ? আমি কি কারুর ভাতে না কাপড়ে ?'

'কথা তো শিখেছিস খুব—অর্থ বুঝিস আর নাই বুঝিস।' কমলকামিনী বলেন, 'তুই ও-বাড়ীর সোনালীর সাথে মিশতে পারবি নে কিছুতে। ও-দিক মাড়াতে পারবি নে মোটেই!'

'কেন ?'

'ওটা মেয়ে তো না, পাঁচু ভটচাযের ষাঁড়।'

অমরেশ ঠিক বুঝতে পারে না—এটা কত বড় গালাগালি।

'আচ্ছা, দেখা হক একবার ওর মা'র সাথে, বলব ওটাকে বেঁধে রাখতে। বুড়ো মাগী, এখনও লজ্জা-সরম হলো না—পাড়ায় পাড়ায় ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবে।' আরো অনেক কটু কথা গায়ের রাগে কমলকামিনী বলে যান।

এ-সব কথা কেমন করে যেন ঘুরতে ঘুরতে সোনালীর মা'র কানে যায়। সে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসে। উঠান থেকেই ডেকে বলে, 'বলি ও বড়বৌ, এ দেশের তালুক কিনেছ বলে কি সকলের মাথা কিনে নিয়েছ ? আমরা গরীব হলেও তোমাদের খানা-বাড়ীর খাইওৎ না যে, যা যখন মুখে আসবে, তাই তখন বলবে! অত অহংকার ভাল না, ভাল না, বলে দিচ্ছি! আমার মেয়েকে ষাঁড় বলতে তুমি কে ? এই যে মেয়ের বিয়ে দিলাম ভদ্রাসনটুকু বন্ধক রেখে, তখন তো এমনি একটি পয়সাও দাওনি! এখন অত বড় কথা কিসের ? তোমার ছেলে যায় কেন আমাদের বাড়ী ঢুঁ মারতে ? যত দোষ আমার মেয়ের—গরীবের মেয়ে দেখেছ বুঝি, তাই অত ধড়ফড়ানি! তাই অত গড়-গড়ানি! আজ বলে গেলাম, অত দেমাক ভাল না, ভাল না—বিধাতা সইবে না! নিজের ঘর আগে সামলাও—নিজের বাছুর আগে বাঁধ—তার পর অপরকে শাসিও।'

বাড়ীশুদ্ধ সকলে থ' মেরে যায় ব্যাপারখানা দেখে। কেউ এই নাম-করা-মুখরা বিন্দি ঠাকরুণকে আর ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

বিন্দি ঠাকরুণ চলে যেতে সবাই জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছিল বড়বৌ, হয়েছিল কি ?'

'হবে আবার কি ? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।' কমলকামিনী রাগে, ক্ষোভে, অপমানে মাথা হেঁট করে থাকেন। মনে মনে ভাবেন : আজ আসুক একবার হারামজাদা—ওর এক দিন না হলে তাঁর এক দিন।

তখন পূব দিকের বাগানে গেলে দেখা যায়—যাদের নিয়ে কলহ তারা দু'টিতে গাছের মাথায় উঠে পাতলা ডালে বসে অধ্যবসায়ের সাথে ডাঁশা নোনা ফল পাড়ছে। একটির বুকের ওপর দিয়ে কোমরে কাপড় জড়ান, অপরটির হাতে একটা দুর্বল আঁকশি।

এ গাছটা বিপ্রপদর সীমানা ছাড়িয়ে দীনুর বাড়ীর সীমানায় জন্মেছে। দূর থেকে দীনু ওদের চিনতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্ত্তা শুনতে চেষ্টা করে। তার পর রান্না-ঘরে গিয়ে চুপি চুপি গৃহিণীকে ডেকে আনে। 'দেখ, চেয়ে দেখ!'

'ও আর কি দেখব, রোজই তো দেখি। রাস্তার পাশের গাছ যে ইচ্ছা—'

'তা বলছি নে, তা বলছি নে আমি! তোমার পেটে দু'টো থাকলেও ত অত বড়ই হ'ত—অমনি সুন্দর দেখাত! আমি তুমি নোনা ফল দিয়ে করব কি, ওরা খাক্, ওরা পেড়ে নিয়ে যাক। আহা! আবার পড়ে না যায়!' বলতে বলতে নিঃসন্তান দীনুর মন নরম হয়ে আসে।

গৃহিণী মন্তব্য করে, 'পোড়া কপাল, এত কাল বাদে মিনসের আবার শোক উথলে উঠল।'

গৃহিণী অদৃশ্য হয়— দীনু চুপ করে চেয়ে থাকে।

স্ত্রীলোকের যা পাওয়ার ও চাওয়ার, তা সবই পেয়েছেন কমলকামিনী। স্বামি-সংসার, পুত্র-কন্যা, টাকা-পয়সা, ধান-চাল—কোনটারই অভাব নেই তাঁর। তবু তাঁর সংসারে শান্তি নেই। একটি মাত্র ছেলে—সে হয়েছে অবাধ্য। বিস্ময়ই বা আশা কি! এই যে অর্থ ও বিত্ত চরম দুঃখ করে সঞ্চয় করা হচ্ছে—এ কাদের জন্য, ভবিষ্যতে ভোগ করবে কে ? শ্বশুর-বংশের নামই বা রাখবে কে ?

ছেলের চেয়েও এক এক সময় ঐ মেয়েটার ওপরই রাগ হয় বেশী। ও যদি দেশে না আসত, তা হ'লে অমরেশের মতি-গতির যে পরিবর্ত্তন হয়েছিল, তাতে আপাততঃ তেমন কিছু চিন্তার ছিল না। যত নষ্টের মূল ঐ বজ্জাত মেয়েটা। ওর জন্যই যত অনর্থের সৃষ্টি। অমরেশের দোষ কি ? ওর যেমন বয়স অল্প, মতিও তেমনি তরল। জলের মত যে পাত্রে ঢালবে, সেই পাত্রের রূপ পরিগ্রহ করবে। ছেলেরা না হয় ডানপিটে হতে পারে, কিন্তু মেয়েরাও যে অমন হবে, তা ভাবতেই পারা যায় না।

'কাকীমা, দু'-দু'টো মেয়ের বিয়ে দিলে, কই আমাকে ত কিছু খাওয়ালে না ? ঘরে চিঁড়ে-মুড়ি, দুধ-কলা কি আছে দাও খাব।'

কমলকামিনী যে এইমাত্র ওর বিষয় চিন্তা করছিলেন এবং বিরক্তিতে তাঁর মন যে ওর ওপর বিমুখ হয়ে আছে, এ কথা মুখ দিয়ে তিনি বলতে পারলেন না—কিন্তু এমন করে অযাচিত ভাবে খেতে

চাইল বলে ওকে আপ্যায়নও করতে পারলেন না। তিনি নীরবে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

বেহায়া মেয়েটা কমলকামিনীর ঐ অবস্থা দেখে এতটুকুও সংকুচিত না হয়ে ফের বলে, 'কাকীমার মন ভাল না, কিন্তু আমার পেটটা ত ভাল আছে, যাই, আমি নিজেই নিয়ে খাই গে। আয় অমরেশ, আমার সংগে আয়।' সোনালী নিজেই চিঁড়ে-মুড়ির ভাণ্ড টেনে এনে একটা বড় বাটিতে ঢেলে নিয়ে দুধ-কলা, গুড়ের সন্ধানে যায়। দিব্যি পেট ভরে খাবে। গুড় সহজেই বড় ঘরে পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ, কলা কোথায়? অনেক খুঁজেও তা মেলে না।

'কাকীমা, আমাকে দুধ-কলা না দিয়ে একা একা খেলে তোমার হজম হবে না। তুমি ভাবছ, চুপ করে থেকে এড়াবে, তা পারবে না—বল কলা কোথায়? দু'-দু'টো বিয়ের নেমন্তন্ন।'

কমলকামিনী আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারেন না। যে সাপের ভয়ে তিনি নিজের শাবকের জন্য অস্থির, সেই সাপিনীকেই দুধ-কলা এনে দেন।

সোনালী অমরেশকে ডেকে বলে, 'হাবারাম, খেতে হলে এসো! চুপ করে থাকলে আর পাবে না।'

'তুমি খাও, আমি চাই নে। বিয়ের সময় কত রসগোল্লা সন্দেশ আমরা খেয়েছি।'

'তা কি এখনও পেটে আছে?' বলে এক দলা মাখা চিঁড়ে-মুড়ি অমরেশের হাতে দেয় সোনালী। 'খা, খা, দুধ ঝরছে।'

অগত্যা অমরেশ খেতে থাকে।

বিনু এসে বলে, 'বা রে, আমি বাদ যাব না কি?'

'না, বাদ যাবি কেন?'

ইতিমধ্যে সেবা আসে—এ-বাড়ী, ও-বাড়ীর দশটি-পাঁচটি এসে প্রলুব্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সকলের হাতে একটু একটু দিতে দিতে ভাণ্ডটা খালি হয়ে যায়।

কমলকামিনী বলেন, 'মেয়েটাকে তোরা খেতে দিলি নে—সব বুভুক্ষুর দল।'

'তাতে হয়েছে কি কাকীমা, আমি এই মাত্র খেয়ে এসেছি।'

'না, না—খেয়ে এলেও তোকে আবার খেতে হবে। বস্ বস্, আমি সব নিয়ে আসছি।'

'অত তাড়নায় কাজ নেই, বললাম যে আমি খেয়ে এসেছি।'

'তা হয়েছে কি, আবার খাবি।'

'তবে আনো, আনো শীগ্‌গির করে।'

কমলকামিনীর ফিরতে বেশী দেরী হয় না। সোনালী খেতে থাকে, কমলকামিনী বলেন, 'তোমরা মা পাড়ায় পাড়ায় না ঘুরে বাড়ী বসে খেলতে পার না? অমরেশটা মোটেই পড়াশুনা করে না—ওকে নিয়ে ঘুরলে তোমার ঘাড়েই দোষ পড়ে, তুমিই ত বড়।'

'আমি কি, কাকীমা, ওকে পড়তে নিষেধ করি? ও-ই তো ইচ্ছা করে পড়ে না।'

'না পড়লে ওকে নিয়ে আর খেলা কর না। বুঝলে মা, ও বড্ড দুষ্টু হয়েছে।'

'আচ্ছা।'

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তা রক্ষা করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। অমরেশ ওর কাছে যাবে কি, ও-ই অমরেশকে আকর্ষণ করে, যেন একটা ক্ষুধিত চুম্বক। যত দিন যায়, ততই ওর টান বাড়ে। একটু সময় না দেখলে সোনালী থাকতে পারে না। অমরেশের যেতে দেরী হলে, আসতে একটু দেরী হলে ও পথের দিকে চেয়ে দণ্ড-পল গুণতে থাকে। দাওয়ায় বসে মা'র সঙ্গে আবোল-তাবোল বকে, আর চেয়ে থাকে কখন ও আসে।

কিছু দিন পরের কথা বলছি।

সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অমরেশের দেখা নেই। তার এই ব্যবহারে সোনালী মনে মনে বড় বিরক্ত হয়েছে। গত কাল অমরেশ একটা ডাহুক, গোটা দু'য়েক বকের ছানা ধরে এনে জিম্মা করে দিয়ে গেছে সোনালীকে। খাঁচা নেই, একটা খোলা ঝাঁপায় করে কাঁহাতক রক্ষা করে রাখা যায় এগুলোকে। বাড়ীতে একটা পোষা বিড়াল আছে, সেটা ভামের চেয়েও পাজি। সারা রাত ঘুমাতে পারেনি ও এই উৎপাতে। বকের ছা পুষে হবে কি? ডাহুকেই বা কোন বুলি আওড়াবে? যদি একান্তই পুষতে হয় তবে টিয়া কিম্বা শালিখের ছা পোষাই উচিত। সেগুলো কত: দেখতে সুন্দর—কথা শিখলে তো ভালই।

কিন্তু সারা দিন অমরেশ এলো না বলে পাখী তিনটার তদ্বির তালাশি করতে সোনালী কসুর করে না। ভয়ে—পাছে অমরেশ এসে তার সখের পাখীগুলোর অযত্ন দেখে ক্ষেপে যায়।

এই আসে, এই আসে করে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখন সোনালীর রীতিমত চিন্তা হলো। কেন, এমন কি কারণ ঘটল, যার জন্য ও একটি বারও এলো না আজ। যাবে না কি সোনালী অমরেশের খোঁজে? বোসের বাড়ী আর কতটুকুই বা পথ!

'সোনালীদি!' ঘনায়মান অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অমরেশ এসে হাজির। তার ডাক শুনে সোনালী চমকে ওঠে।

'সারা দিন আসিস নে কেন?'

'বলছি। পাখী তিনটা কেমন আছে? মরেনি তো?

'না—মরেনি, ভালই আছে। ঐ দেখ, ঐ ডালায়।'

অমরেশ সোনালীর হাতের প্রদীপটা নিয়ে সাগ্রহে পাখী তিনটা একবার দেখে এসে আশ্বস্ত হয়ে তার কাছে বসে।

'তোর হাতে ওটা কি?'

'সারা দিন মা আমায় আজ কয়েদ করে রেখেছিল, বেরুতে দেয়নি, আর এই কঞ্চিটা দিয়ে—'

'মেরেছে। সন্ধ্যার সময় তাই বুঝি ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছিস্?'

'হুঁ।'

'এখন আর তোকে খুঁজবে না?'

'না। ভাববে, আমি ঘুমিয়েছি। আমি আর বাড়ী যাব না আজ। সন্ধ্যার সময় খেয়ে এসেছি। আজ রাত্রে খুঁজে না পেলে আচ্ছা শিক্ষা হবে। সারাটা দিন কেন আমায় আটকে রাখল।'

'বেশ তো, রাত্রে আমার কাছে শুয়ে থাকবি।'

'তুমি একটা গল্প বলবে, আমি শুয়ে শুয়ে শুনব। কিন্তু কেউ ডাকতে এলে যেন ব'লো না যে, আমি এখানে আছি।'

'না, না, তা কি বলব বোকা! তুই আমার কাছেই রাত্রে থাকবি।'

সোনালীর মা'র তখন নিত্য-নৈমিত্তিক কম্পজ্বর এসেছে, সে ঘরের ভিতর লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। আর মাঝে মাঝে যা-তা বকছে। এ বাড়ীতে এ জ্বর প্রাত্যহিক ব্যাপার। মা ও মেয়ের গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই কেউ সেবা পাওয়ার জন্ত বা করার জন্ত ব্যাকুল হয় না।

বাইরের বারান্দায় সোনালী রাতের জন্ত তার ও অমরেশের শয্যা রচনা করে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাটটাও সেরে ফেলে।

রাত্রি গভীর হয়।

দু'জনে মিলে অনেক গল্প-গুজব হয়।

সোনালী একটা পুরোন পাঁজি বের করে কতগুলো অশ্লীল বিজ্ঞাপন অমরেশকে পড়ে শুনায়। অমরেশের তা ভাল লাগে না —সে শুনতে চায় রূপকথা। কল্পলোকের রম্য কাহিনী।

রাত্রি আরো গভীর হয়। চার দিক নির্জন—শুধু বাইরের বেত-ঝাড়ে একটা ডাহুক গলা ফাটিয়ে ডেকে যাচ্ছে। আম, জাম ও সুপারি গাছের মধ্যে একেবারে গাঢ় অন্ধকার জমে গেছে। একটুও ফাঁক নেই যেন। দূরে একটা চৈলা গাছে কতগুলো জোনাকী পোকা দানা বেঁধে একবার জ্বলছে, আবার নিবছে।

অমরেশের তন্দ্রা আসতে চায়।

হঠাৎ এক ফুঁতে সোনালী প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়। দিয়ে—অসতর্ক অমরেশকে টেনে এনে তার হাত দু'খানা ওর উন্মুক্ত বক্ষের ওপর রাখে। তার পর একটা চুমো খায় সোনালী।

অতর্কিতে আগুনে হাত পড়লে মানুষ যেমন ছিটকে পিছিয়ে যায়, তেমনি ভাবে হাত সরিয়ে নেয় অমরেশ। 'তুমি বড্ড [illegible], বড্ড অসভ্য সোনালীদি'—বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। রাগে দুঃখে হাতের কাছের কঞ্চিটা দিয়ে নির্বিচারে ঘা-কতক বসিয়ে দেয় সোনালীর নাকে-মুখে। তার পর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে বাড়ীর দিকে—গভীর অন্ধকারেই।

রোরুদ্যমান ছেলেকে দেখে কমলকামিনীর বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করতে থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে? অমরেশ, কাঁদছিস কেন? বল না, চুপ করে রইলি কেন? কি হয়েছে বাবা?'

ভিড়ের মধ্যে সে কিছু বলতে চায় না। কমলকামিনী তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে সব কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলে।

কমলকামিনী বজ্রাহতের মত মাটিতে বসে পড়েন।

এ আঘাত সহ্য করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে তাঁর। তিনি উঠে অমরেশের হাত-পা ধুইয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন। এই ডাইনীর কবল থেকে কি করে তাঁর দুধের ছেলেকে রক্ষা করবেন, সেই চিন্তারই তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাঁর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে কেউ কিছু আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না। ক্রমে ক্রমে ভিড় কমে যায়।

কালই তিনি একখানা চিঠি লিখে লোক পাঠাবেন বিপ্রপদর কাছে। যাঁর ছেলে তিনি এসে রক্ষা করুন। মেয়েমানুষের সামর্থ ও ক্ষমতা সংক্ষিপ্ত। যদি বিপ্রপদ না আসেন, তবে কমলকামিনী নিজেই যাবেন ছেলেকে নিয়ে। সেখানে গেলে যা-হক একটা ব্যবস্থা হবেই।

এখনও তিনি যদি কোন ব্যবস্থা না করেন, নিজের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকেন—তা হলে পড়ে থাকবে তাঁর সংসার, ঘর-দোর, দেবসেবা। কমলকামিনী ছেলেকে নিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায়, সে দিকে চলে যাবেন। গাছতলায় থেকে দিনান্তে ভিক্ষা করে খাবেন। তবু অমরেশকে মানুষ করতে হবে। ছিনিয়ে নিতে হবে ডাইনীর কবল থেকে। মেয়ে তো না, রাক্ষসী! ও তাঁর ছেলেকে গিলে খেতে চায়। কিন্তু বিপ্রপদ পুরুষ মানুষ, তিনি কি এ সব কথা বিশ্বাস করবেন? হেসে উড়িয়ে দেবেন না তো? কমলকামিনীর সাথে কি শত্রুতা ঐ মেয়েটার যে, তিনি ওর বিরুদ্ধে বলতে যাবেন যত কলঙ্কের কথা! ওটা তো ওঁর মেয়ের বয়সী। কিন্তু স্বামীর কাছে চিঠিতে কি লিখবেন? এ সব কথা কি খুলে লেখা যায় পত্রে? লজ্জা ও ঘৃণায় তাঁর মন রি-রি করতে থাকে।

রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না কমলকামিনীর। অতি প্রত্যূষে উঠে তিনি নিতাইকে ডাকতে পাঠান, পাঠিয়ে পত্র লিখতে বসেন। কি ভাষা ব্যবহার করবেন, তা বুঝেই উঠতে পারেন না। এ এমন একটা জটিল ও জঘন্য ঘটনা যে, স্বামীর কাছে লিখতেও স্ত্রীর কলম ওঠে না। কমলকামিনী শেষ পর্য্যন্ত এইটুকুই লিখতে পারেন যে: পত্র-পাঠ চলিয়া আসিও, অমরেশের সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার আছে। যদি না আসিতে পার, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি আসিতেছি। তাহাতে সমস্যা মীমাংসা হইবে না, বরঞ্চ খরচান্ত হইতে হইবে। ইত্যাদি···

পত্র লেখা শেষ হলে কমলকামিনী পড়ে দেখেন যে, পত্রের ভিতর গুরুত্ব থেকে রহস্যের অবতারণা করা হয়েছে বেশী। এর চেয়ে ভাল মুসাবিদা করা তখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারুর কাছে যখন পরামর্শও নেওয়া যাবে না, তখন এই চিঠিই দিতে হবে—এর ফল ভাল-মন্দ যা-ই হোক্।

নিতাই এসে কাপড়ের খুঁটে পত্রখানা বেঁধে নিয়ে রওনা দেয়। এমন একটা কি জরুরী প্রয়োজন যে, এক্ষুনি বাবুকে আবার আসতে হবে—তা সে বহু প্রশ্ন করেও বুঝতে পারেন না। ভাবে—বড় মানুষের বুদ্ধির খেয়াল গরীবের বুদ্ধির অগম্য!

'মা, তবে কি বাবুকে নিয়ে আসতেই হবে?'

'হ্যাঁ বাবা! কত বার আর এক কথা বলতে হবে?'

উষ্মার ভাব প্রকাশ পায় দেখে নিতাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

একমাত্র ছেলে, তার সম্বন্ধে সংবাদ—হয়ত বিপ্রপদ খুবই উদ্বিগ্ন হতে পারেন—তাই কমলকামিনী ফের নিতাইকে ডেকে বললেন, 'বলো যে চিন্তার কিছু নেই, সব ভাল আছে, কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা মা, তাই বলব। আর চিঠিতে তো সব লেখাই আছে।'

'সব কথা কি আর চিঠি-পত্রে লেখা যায়? তোমাকে তো সব বুঝিয়ে বললাম—তুমি ঠিক মত সব বলো।'

আচ্ছা মা, এখন তবে রওনা হই।'

'এস গে'—সাবধানে যেও।'

[ক্রমশঃ

ত্রিধারা

শ্রীশোভ হুই

উদয়াস্ত খাটুনীতে স্নেহলতার আর বিশ্রাম নাই, সংসারে যে কেহ নাই, তাহাও নহে। খাইবার টেবিলে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া দশ-বার জন। কিন্তু কাজের সময় এক কালা চাকর, নাম—রামহরি; আর এক মুখরা ঠিকা ঝি, নাম—কমলমণি। বরাবর একটা ঠাকুর স্নেহলতা রাখিতই কিন্তু এখন আর অবস্থায় কুলায় না। প্রতিটি জিনিষ অগ্নিমূল্য, ঠাকুর-চাকরেরও রেট চড়া; কাজেই ঠাকুর ত দূরের কথা, একটা কর্মিষ্ঠ চাকর রাখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। আয় তো সেই অনুপাতে বাড়ে নাই।

স্নেহলতার দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বেশ বড় হইয়াছে তিন জনেই। অর্থাৎ তিন জনেই সাবালক হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া এখন রাজনীতিতে মাতিয়াছে। বড় বীরেন্দ্র (কমিউনিষ্ট), মেজ রমেন্দ্র (কংগ্রেস) এবং মলয়া ছাত্রীসংঘের নেত্রী।

ছেলে-মেয়ে সারাদিন সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা দেয়, আর রাত্রিতে খাইবার ঘরে যে যাহার মত লইয়া আস্ফালন করে। কর্তা মহেন্দ্র গুপ্ত সংসার এবং ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে নির্বিকার, মাসের প্রথম মাহিনার সব কয়টি টাকা স্নেহলতার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত। তাহার পর দশটা-পাঁচটা অফিস করিয়া সন্ধ্যায় তাসের আড্ডায় আসর জমান, তাসের আড্ডাটি অবশ্য তাঁহারই বাড়ীর বৈঠকখানায়। এই আড্ডাটি মহেন্দ্র বাবুর পিতামহ প্রথম আরম্ভ করেন। তখন সস্তার দিন ছিল। খেলার সঙ্গে সঙ্গে চা, পান, তামাক এবং নানারূপ মুখরোচক খাবার চলিত। খেলাও জমিত ভালো। বাড়ীর চার টাকা মাহিনার চাকর সারা দিন সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া আবার সন্ধ্যায় অম্লান বদনে সমানে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত পান, তামাক, চা, খাবার সরবরাহ করিত। কিন্তু এখন দিন-কাল অন্য রকম। চাকরদের মন-মেজাজ বুঝিয়া মনিবকে চলিতে হয়। এখন ত্রিশ টাকার চাকরকেও হুকুম বুঝিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যায় তো তাহারা নিজেদের আড্ডায় যাইবেই। দ্বিপ্রহরে যাইবে ইউনিয়নে, মনিবদের দোষ আলোচনা এবং তাহাদের শাস্তি ব্যবস্থা করিতে, আরও তাহাদের কত কাজ। মহেন্দ্র বাবুর চাকরটি অবশ্য চারি বৎসর আছে। তা আজ-কালকার তুলনায় অনেক দিনই স্বীকার করিতেই হইবে। চাকরটির গুণ অনেক—বদ্ধ কালা, অত্যন্ত কুঁড়ে, ভীষণ ছিঁচকে চোর আর বধিরতার জন্যই হউক কিংবা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ডানে বলিলে বাঁয়ে, উত্তরে বলিলে দক্ষিণে। স্নেহলতা ভাবেন, যেমন হোক টিকিয়া তো আছে, এই লাভ।

যাই হউক, পিতা-পিতামহের সময় আড্ডায় মুখ চলিত, কিন্তু এখন চলে বচন, সংস্কার আলোচনা। রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, রাজনীতি—দুনিয়ার সব রকম নীতির সমালোচনা। আর তাহা সহিত উত্তেজনা, চীৎকারে আড্ডা গমগম করিতে থাকে। স্নেহলতা রাগ করেন। প্রায়ই অনুযোগ স্বামীর কাছে করেন। কি যে তোমরা চেঁচাও। চুপ-চাপ তাস খেললেই তো পার বাবু, তা না, বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে। মহেন্দ্র হাসিয়া বলেন, আহা, রাগ কর কেন? খালি পেটে না হয় একটু চেঁচালাম। সারা দিনের ঝঞ্ঝাট একটু চেঁচিয়ে ভুলে থাকতে চাই আর কি। তাতে তোমার অত আপত্তি কেন? আড্ডা তো এখন শিবনেত্রে ধুঁকছে; গিন্নী, আমাদের সঙ্গেই শেষ হবে।

এক দিকে তাসের আড্ডা, অন্য দিকে খাবার টেবিলে ছেলেদের রাম-রাবণের যুদ্ধ। কাহারও শোন ভাবনা নাই। বাপের হোটেলে খাইয়া তিন ভাই-বোন যে যাহার দল-বল লইয়া ব্যস্ত। ঘরের মায়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই; তাছাড়া, তাহাদের সময়ই বা কোথায়? দেশ-মায়ের বন্ধন মোচন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও তিনি ব্যথায় ধুঁকিতেছেন, কাজেই বেদনা দূর করা তো তাহাদেরই কর্তব্য। কারণ, তাহারাই দেশের আশা-ভরসা। ভোরে চা খাইবার পর হইতে ভাই-বোনের দেখাই হয় না। সারা দিন কর্ম্ম-ব্যস্ততায় কাটিয়া যায়, কাজেই রাত্রিতে খাবার টেবিলে একটু কথাবার্ত্তা না বলিলে চলিবে কেন? কথাবার্ত্তা মানে—যে যাহার মত, পথ, দল লইয়া ভীষণ তর্ক। শুধু কি মুখ, কোন কোন দিন হাত-পা সবই চলিতে থাকে। কোন কোন দিন ঝোলের বাটি উল্টাইয়া জলের গ্লাস পড়িয়া খাওয়াই নষ্ট হইয়া যায়।

বৈঠকখানার শব্দ ভাসিয়া আসে। সারা দিনের নিস্তব্ধ নিঝুম বাড়ীটা রাত্রিতে মুখর হইয়া উঠে।

সেদিন দু'-এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়াই মেজ ছেলে রমেন্দ্র (কংগ্রেস) স্নেহলতাকে বলিল, "মা, কিছু খাওয়া যাচ্ছে না; ভাতে বড্ড কাঁকর, ঝিকে দিয়ে ভাল করে বাছিয়ে নিও।"

'স্নেহলতা উত্তর দিলেন, "ঝি তো বেছেইচে, তাছাড়া আমিও তো ধুয়েছি ভালো করে। ছোট-ছোট কাঁকর জলের সঙ্গে মিশে থাকে, ধুলেও যায় না।"

এমন সময় একটা বেশ বড় কাঁকর রমেন্দ্রর চোয়ালের দাঁতের ফাঁকে পড়িয়া কট করিয়া উঠিল। রমেন্দ্র "উঃ" বলিয়া ভাত ফেলিয়া মুখব্যাদান করিয়া বসিয়া রহিল। বড় ভাই বীরেন্দ্র

(কম্যুনিষ্ট) ও বোন মলয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া রমেন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল। "তোরা হাসছিস্ যে ?"

মলয়া বলিল, "আহা দাদা, রাগ করছ কেন ? শিশু-রাষ্ট্রের চড় খেয়ে তুমি যে হাঁ করেই বসে রইলে।"

ব্যাস্, লাগিয়া গেল তুমুল তর্ক। ঘরে যেন ঝড় বহিতে লাগিল। স্নেহলতা কিছুতেই থামাইতে পারেন না। মলয়া আর বীরেন্দ্র এক দিকে, রমেন্দ্র বেচারা একা। শেষ পর্য্যন্ত রমেন্দ্র তর্কে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং সজোরে টেবিলে এমন চপেটাঘাত করিল যে, থালা, গ্লাস, বাটি বিকট শব্দে ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল। দুই-একটা মাটিতেও গড়াইয়া পড়িল। স্নেহলতা রাগে-দুঃখে দিশেহারা হইয়া নিজের কপাল দেয়ালে দুই-চারি বার ঠুকিয়া দুম্‌দাম্ পা ফেলিয়া রান্নাঘরে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। মায়ের অবস্থা দেখিয়া তি. ভাই-[illegible] [illegible] নিঃশব্দ হইয়া গেল।

বড় ভাই বীরেন্দ্রের সহিত মলয়ার মনের ও মতের দুই মিল আছে। কাজেই বীরেন্দ্র মলয়াকে দিয়াই মায়ের নিকট কথাটা বলাইল। শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় মলয়া বলিল, "মা, বড়দা এক কমরেডকে বিয়ে করতে চায় এই মাসেই। তোমায় জানিয়ে দিতে বলেছে।"

স্নেহলতা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের নাম কি ?"

—"নাম রীতা সেন।"

প্রথম ছেলের বিয়ে—আনন্দিত হওয়াই উচিত, কিন্তু [illegible]তা বিশেষ খুশী হইতে পারিলেন না। পুত্র যে তাঁহার মনোমত বধূ আনিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, কাজেই ইহা ত অপ্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশাই তিনি করিয়াছিলেন এইরূপ। তবুও মায়ের অবোধ প্রাণ বেদনায় টন-টন করিয়া ওঠে। পুত্র-কন্যার মতি, গতি, প্রকৃতি দেখিয়া তিনি বুঝিতেই পারিয়াছেন, উহাদের কোন বিষয়েই বলিতে যাওয়া অরণ্যে রোদনেরই সমান। ইহারা যাহা করিবে মনে করিয়াছে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। মলয়া মায়ের বিমর্ষ ভাব দেখিয়া বলিল, "মেয়েটি বেশ ভাল মা, রূপে গুণে বিদ্যায় সব দিক দিয়েই উপযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা মেয়ে। সত্যি মা, এমন বউ পাওয়া দাদার ভাগ্যের কথা। আমি জোর করে বলতে পারি, রীতাকে দেখলে তোমার খুব পছন্দ হবে।"

দিন-কতকের মধ্যেই বীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে বিশেষ কিছু আড়ম্বর হইল না। আড়ম্বর করিবার মত অবশ্য মনোরমার আর্থিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না। যাহা হউক, স্নেহলতা কিন্তু বধূর মুখ দেখিয়া খুশীই হইলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই রীতাকে দেখিয়া পছন্দ করিল। স্নেহলতাকে তাহারা বলিল, "তোমার বৌ-ভাগ্য ভাল, রূপে ত লক্ষ্মী!"

নববধূর শুধু রূপ নয়, স্বভাবও খুব মিষ্টি। কিন্তু কর্ম্মী মেয়ে, বাহিরের কাজেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। শাশুড়ীর সেবা করা বা ঘরের কাজে সব সময় ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; কাজেই স্নেহলতাকে খাটিতেই হইত। বরং বেশী, তবু কম নয়। কারণ ভোরের চায়ের পরই বীরেন্দ্রের সহিত রীতা হাতে ঘড়ি বাঁধিয়া কাঁধে লম্বা ব্যাগ ঝুলাইয়া বাহির হয়, আর বাড়ী ফিরে রাত্রিতে। স্নেহলতা কপালে করাঘাত করিয়া বলেন, "ভাগ্যে আমার সুখ থাকলে ত বউ কাজ করবে ? বরং আমাকেই বউয়ের চায়ের কাপ, ভাতের থালা মুখের সামনে ধরতে হয়। জীবনটা আমার এই করেই গেল।" দিন-কতক বীরেন্দ্রের কাছেও অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে উত্তর দিয়াছে, "বাড়ী খুঁজিতেছে, পাইলেই চলিয়া যাইবে।"

এবার পালা মেজ ছেলে রমেন্দ্রের। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইয়া দিল যে, তাহার বিবাহে রুচি নাই। শীঘ্রই সে কোন গান্ধী-আশ্রমে চলিয়া যাইবে। সংসারের ঝঞ্চাট তাহার ভাল লাগিতেছে না ইত্যাদি, যদিও সে কোন ঝঞ্চাটই আজ পর্য্যন্ত ঘাড় পাতিয়া লয় নাই। স্নেহলতা ছেলেদের দিক হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু মেয়েকে লইয়া তিনি পড়িলেন মুস্কিলে। মেয়েও যে কথা শুনিবে না, তাহা তিনি জানিতেন, তবুও মায়ের প্রাণ সর্ব্বদাই অস্থির হয়। স্নেহলতা মেয়ের বড় বড় বোল-চাল শুনিয়া আতঙ্কিত হন। সব সময় ধনীদের গালাগালি। যাহারা বাড়ী করে, গাড়ী চড়ে, তাহারা সকলেই চোর, যাহারা টাকা জমাইয়া রাখে, তাহারা ছোট লোক, আরও কত কি! অর্থাৎ তাহার ভাবটা এই—টাকা মাটি—মাটি টাকা।

ছেলেদের দিক দিয়া ত স্নেহলতা আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি মেয়ের সম্বন্ধেও তাঁহার মন গাঢ় নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। আজ স্নেহলতার অতীতের কত কথাই মনে হয়। এই তিনটি ছেলে-মেয়ে লইয়া কত স্বপ্ন, কত আশা! কঠোর পরিশ্রমে বুকের রক্ত জল ক'রিয়া তাহাদের মানুষ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তখন চোখের সামনে ছিল সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং ইহার সহিত ছিল নিজেদের বৃদ্ধ বয়েসের সুখ, শান্তি, আরাম, বিশ্রাম। সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। মানুষের স্বপ্ন বোধ হয় ভগবান এইরূপেই ভাঙ্গিয়া দেন।

ক'দিন হইতেই স্নেহলতা লক্ষ্য করিতেছে, মলয়া কি যেন সর্ব্বদা চিন্তা করে। মেয়ে বড় হইয়াছে, পড়াও শেষ করিয়াছে এখন তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। কয়েকটি ভালো ভালো সম্বন্ধও আসিয়াছে কিন্তু মেয়ে মত করিতে চায় না। তবু এক দিন মলয়ার বিবাহের কথা স্নেহলতা তুলিলেন, কথার প্রথমেই মলয়া মাকে থামাইয়া দিল—"আমার বিয়ের জন্তে তোমায় ভাবতে হবে না। পাত্র আমার মনের মত দেখে নেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘরে চব্বিশ বৎসরের কুমারী যুবতী থাকিলে কোন্ মা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? ছেলে-মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হইলে চিরকাল মা-বাপই তো ভাবিয়া থাকে, এখন আবার নিজের বিবাহের ভাবনা নিজেই ভাবে, ভালোই, নূতন যুগের নূতন হাওয়া! কাজেই স্নেহলতার নীরব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় নাই।

মলয়ার স্পষ্ট কথাতেও স্নেহলতা সব সময় চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মেয়েকে সতর্ক করিয়া বলে, "দেখে-শুনে ভালো করে বিবেচনা করে কোরো। চোখের মোহে যাকে-তাকে কোরো না। একবার বাঁধা পড়লে চির জীবন বইতে হবে। আমি তোমার মা, এ কয়টি কথা অন্ততঃ মেনে চলবে।"

মলয়া উত্তর দেয়, "তুমি যদি শুধু শুধু ভাব আমাদের জন্যে, কি করতে পারি আমি! বিবেচনা করেই করব, তবে তোমার পছন্দ হবে কি না বলতে পারি না। আর তুমি যে বললে, বাঁধা পড়লে আর ছাড়তে পারব না, সে সব তোমাদের সময়ে ছিল, আমাদের সময়ে বাঁধাবাঁধির কোন ব্যাপার নেই, সব সময়ই free।"

মেয়ের কথায় মা কিন্তু সান্ত্বনা পাইলেন না। চিন্তিত ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

কয়েক মাস এই ভাবে চলিয়া গেল। এক দিন মলয়া মাকে ডাকিয়া বলিল, "মা আমার বিয়ের প্রায় সব ঠিক করে ফেললাম।" খবরটা শুনিয়া স্নেহলতা বিস্ফারিত নয়নে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—"হ্যাঁ মা, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? কয়েক দিনের মধ্যেই আমার একটি সহপাঠীকে বিয়ে করব। অবশ্য ছেলেটি গরীব, তা হোক্, তার হৃদয়ের সম্পদ যথেষ্ট আছে।" আর সে জাতিতেও মুসলমান বলিয়া বোধ হয় কথাটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য একটু হাল্কা ভাবে হাসিল। তাহার পর কয়েক মিনিট চুপ করিয়া আবার বলিল—"আজকাল জাতি আবার কি! সবাই সেই এক মহাজাতি, যাকে বলা হয় 'মনুষ্য জাতি'। আর কালই আমি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করব। তখন আমার নাম হবে আমিনা খাতুন। বাবাকে জানিয়ে দিও খবরটা। অবশ্য তোমাদের আশীর্ব্বাদ কিংবা অভিশাপ আমি সমান ভাবেই মাথা পেতে নেব।" স্নেহলতা বাক্য-হারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রীড়াশীল নদী-তরঙ্গের ন্যায় কালস্রোত ভাসিয়া চলে; সে অবিরাম স্রোতধারার কাহারও দিকে চাহিবার অবকাশ নাই। মানুষের জীবন-গতিও তাহার সমতালে সুখে, দুঃখে, শোকে, চিন্তায়, বিষাদে অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় তাহার নাই। স্নেহলতারও বিষাদপূর্ণ দিনগুলি কাল-স্রোতে বহিতে লাগিল। সংসারে কাজ করিতে হয় করেন। মনে স্ফূর্ত্তি নাই, দেহে শক্তি নাই। যেন দেহ-মন নিরাশার কালো ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

স্নেহলতার মানসিক এই অবস্থার মধ্যেই এক দিন সকালে বীরেন্দ্র অতিশয় ত্রস্ত ভাবে আসিয়া মাকে জানাইল যে, তাহাকে আর রীতাকে এই মুহূর্ত্তেই পলাইতে হইবে, কারণ পুলিশ তাহাদের যে কোন সময় গ্রেপ্তার করিতে পারে, এইরূপ খবর আসিয়াছে। আর বেশী কথা বলিবার তাহাদের সময় নাই। রীতা তাহার চার মাসের শিশু-সন্তানকে শাশুড়ীর কোলে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "মা, চললাম খোকাকে আপনার কাছে রেখে।"

পুত্র ও বধূ নিখোঁজ হইয়া গেল।

কচি শিশু মাতৃস্তনের অভাবে কেবল ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া কাঁদে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে কিছুতেই শুইতে চায় না। সুষুপ্তি-মগ্ন গভীর রাত্রিতে স্নেহলতা নাতিকে দোলাইতে দোলাইতে গুন্-গুন্ করিয়া ছড়া কাটিতে থাকেন—

'খোকন আমাদের সোনা!
আমি সোনার নূপুর গড়িয়ে দেব
তোমরা কেউ কোরো না মানা।'

নরম-গরম

অনুপা গুপ্ত

বিলেত গিয়ে দেখেছিলো, চণ্ডীচরণ চাকলাদার।
শক্ত 'হ্যাম'ও নরম হয়, 'স্মোকিং' করে কি স্বাদ তার।

বৌ দজ্জাল, করতে ঠাণ্ডা
মাথাতে তার কসিয়ে ডাণ্ডা,
হাত-পা বেঁধে ঝলিয়ে দিলে, করতে নরম মেজাজ তার।

নীচের জেলে দিলে আগুন,
বৌ চেঁচালে, 'পুড়ে ম'লুম',
পাড়ার লোকে ছুটে এল, 'কি হে, এ সব কি ব্যাপার?'

দেখেই চক্ষু ছানা-বড়া,
কেউ ছুটলো আনতে ঘড়া,
কেউ শুধালো, 'করছ এ কি, পাগল হয়ে গেলে আবার?'

বললে তখন চণ্ডীচরণ,
মেজাজ করে মেজাজ গরম,
'বুঝবে ব্যাপার কেমন করে, বিলেত কভু যাওনি তো আর।
'হ্যাম'-এর চেয়েও অধিক খেলো, বলতে কি চাও, বৌ আমার?'

অলঙ্কার-শিল্পে বাঙালী

অলঙ্কার-শিল্পে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রায় লোপ পেয়ে যেত, যদি না কয়েক জন বিচক্ষণ অলঙ্কার-ব্যবসায়ী এই শিল্পটিকে তাঁদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই রচনাটি এই ধরণের একটি অলঙ্কার-প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ইতিকথা।
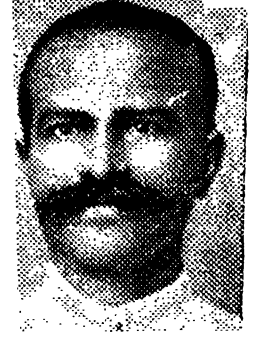
বি, সরকার এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা
৺ হাজারীলাল সরকার

"অবাঙালী ব্যবসায়ীরা লোটা-কম্বল সম্বল করে বাঙলা দেশে আসেন, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই সমগ্র বাঙালী জাতকে কম্বল ও লোটা-পেটা করে, খেতলে নিংড়ে রস বার করে নিয়ে বোম্বাই, ..., দিল্লী আর রাজপুতনার নীরস মরুভূমিতে মরুদ্যান রচনা ..."—এমন অভিযোগ আজকাল হাটে-মাঠে-ঘাটে শুনতে পাওয়া ... চোখ মেলে চারি দিকে তাকিয়ে দেখলে সাধারণ বাঙালীর মধ্যে ... অভিযোগটা স্বাভাবিক ভাবেই বদ্ধমূল ... যায়।

... ব্যবসা-বাণিজ্যের জগৎ থেকে বাঙালীরা ... অন্যান্য জাতির সমবেত পদাঘাতে ... চ্যুত হয়ে 'নিজ বাসগৃহে পরবাসী' ... রয়েছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই না কি ... বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূভাগের শতকরা ... ভাগ অবাঙালীদের হাতে চলে ...। কলকাতা থেকে তো ইতিমধ্যেই ... বিতাড়ন সুরু হয়ে গেছে। ... কলকাতা বলতে যে জায়গাটা ... যায়, সে জায়গাটা ইতিমধ্যেই ...দের হস্তচ্যুত হয়েছে। আসাম, ... এবং বিহারের পর খাস বাঙলা থেকে যখন বাঙালী উচ্ছেদ সুরু ... এবং হয়ত খুব দেরী নেই) তখন ...সাগরের সুবিস্তীর্ণ জলরাশি ছাড়া ...কোথাও যে আমাদের ঠাঁই হবে না, ...াই বাহুল্য। বাঙলার ক্লীব, ...হীন, নির্লজ্জ, ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী ...কে গাল দিয়ে লাভ নেই। রাজ... ক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয় এসেছে অর্থনৈতিক পরাজয়ের লেজুড় ...

...দেশের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যাদের ...ত, বুর্জোয়া রাজনীতির নেতৃত্বও তাদেরই হাতে, ব্যবসা, বাণিজ্য ...ল্পের ক্ষেত্রে বাঙালী অচ্ছুৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে বোম্বেওয়ালা, মারওয়াড়ী ও পাঞ্জাবীদের সঙ্গে পংক্তিভোজনের অধিকার সে হারিয়েছে।

অবাঙালীদের দালালি করে যে যত বাংলার সর্বনাশ করতে পারবে বাঙলা দেশে সে তত ক্ষমতার অধিকারী হবে। আজ আর বাঙলা দেশের নিজের কোন রাজনীতি নেই। ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন, আজ আর বাঙলা দেশে নেতা নেই। নেতা

পাথর সেট করা হইতেছে (গিনি হাউস)

বলে যাঁরা চেলাদের ফুলের মালা গলায় পরেন তাঁরা আসলে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের নাচের পুতুল। প্রভুর কেরামতিতে তাঁরা আসরে আসরে ধেই ধেই করে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছেন আর আত্মীয়-কুটুম্বদের ভবিষ্যতের সংস্থান করছেন চাকরী-বাকরী আর পারমিট মারফৎ। এ ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন কাজ নেই।

কিন্তু থাক সে কথা। বাঙালী ব্যবসায়ীর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক আবার। নানা কারণে বাঙালী আজ ব্যবসা-বাণিজ্য-চ্যুত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বড় বড় কোন ব্যবসাতেই বাঙালীর আজ আর স্থান নেই, ছোট ছোট ব্যবসাও ক্রমবিলীয়মান। এখনও বাঙালীর যে সমস্ত শিল্প-ব্যবসা টিঁকে আছে, তার মধ্যে অলঙ্কার-শিল্প অন্যতম। শিল্পানুরাগী বাঙালীরা সূক্ষ্ম কারুকাযে বিশেষ পটু, বিশ্বের বড় বড় প্রদর্শনীতেও বাঙালী অলঙ্কার-শিল্পীদের কলা-কুশলতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শুধু শিল্পী থাকলেই শিল্প গড়ে ওঠে না। শিল্পীর দায়িত্ব শিল্প সৃষ্টি করা, শিল্পীর সৃষ্টিকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া অথবা সকল শিল্পীর সৃষ্টির সমন্বয়

৺ বিশ্বেশ্বর সরকার (বি, সরকার)

সাধন করে বিরাট শিল্প গড়ে তোলার সংগঠকের (Entrepriser) স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবস্থায় (ল্যাসে ফেয়ার) এই সংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে বাদ কোন শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠতে পারে না।

বাঙলার প্রগতিশীল অলঙ্কার-শিল্প উঠেছিল এমনি এক জন সুযোগ্য সং প্রচেষ্টায়। 'গিনি হাউসের' প্রতিষ্ঠাতা হাজারীলাল সরকারকে অনায়াসেই বা অলঙ্কার-শিল্পের যুগপ্রবর্তক বলা যেতে কারণ তিনিই এই শিল্পকে নূতন ভাবে নূতন রূপে গড়ে তোলেন। পরবর্তী যুগে 'গিনি হাউস' এবং সরকার-পরিবারকে করেই এই শিল্প সারা ভারতে প্রসার লাভ করে। সাধারণ অবস্থা থেকে হাজারীলাল যে কেমন করে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পেলেন, সে কাহিনী বৈচিত্র্যময়। এক দিন হঠাৎ 'গিনি হাউস' তৈরি করে তার মালিক হয়ে বসেননি। ১৮৭৬ সালে যশোহর ঝিনাইদহ মহকুমার নারাপুর গ্রামে

বাঙলা হাতের কাজে নূতন শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পিতা স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর সরকার স্বগ্রামে ...খাট ব্যবসা করে কিছু বিত্ত ও ...পত্তি করেছিলেন। পিতার ব্যবসা-স্তা-স্পৃহা সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, ... এ বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল ... তাই দাসত্ব দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের ...। বাগবাজারে এক সোনা-রূপার ...নে চাকরী নিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ...ত লাগলেন। তরুণ হাজারীলাল অদম্য ...হ ও কর্মদক্ষতায় শীঘ্রই অলঙ্কার-...র সকল গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করে নিলেন।

চাকরী করতে করতে অলঙ্কার ব্যবসায়ের ... কটী তাঁর চোখে পড়ল। প্রথমতঃ, ...রা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপরই গহনাপত্র ...বেচা করেন বটে, কিন্তু জিনিসের ... সম্বন্ধে তাঁদের মনে সব সময়েই সন্দেহ ...থায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদের সময়-...র অভাব। নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতারা ...নও তাঁদের অলঙ্কার পেতেন না। ...কার কাল' একটি প্রবাদ-বাক্য দাঁড়িয়ে ...ছিল, হাজারীলাল সঙ্কল্প করলেন, নিজে ...সা আরম্ভ করে তিনি এই দুই সমস্যার ...ধান করবেন।

কিছু দিন বাদে ১৬০।১ বউবাজার ষ্ট্রীটে ...টি ছোট কামরা নিয়ে পিতার নামানুসারে ..., সরকার এণ্ড সন্স" নাম দিয়ে তিনি ...টি গহনার দোকান খোলেন। ব্যবসায়ের ...মন্ত্র ছিল সততা ও সময়নিষ্ঠা। সকলেই ...নেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে অলঙ্কার শুধু দেহসৌষ্ঠবের আড়ম্বর ..., বিপদ-আপদ-দুর্যোগের দিনের সাথী—সম্পত্তি। লোকে ...য় বলে, "স্ত্রীর গহনা এখনও আছে", অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত ...ষ হঠাৎ যখন চরম বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন স্ত্রীর ...নাই তাঁর শেষ ভরসা। তাই অলঙ্কার-ক্রেতারা চান যে ...ষ্যতে যেন অলঙ্কারে রূপান্তরিত সোনারূপার দাম ক্ষুণ্ণ না হয়। ...জারীলাল সাধারণ মানুষের মনের কথা জানতেন। তাই ব্যবসায়ের ...তেই ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দোকান (বি, সরকার এণ্ড সন্স) ...মাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতা এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা ...রলেন যে, তাঁর দোকান থেকে কেনা যে কোন অলঙ্কার যে কোন ...য় তৎকালীন গিনি সোনার বাজার-দরে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ...ঙ্কার-শিল্পে এই নূতন 'গ্যারাণ্টি'-প্রথা ক্রেতাদের সন্দেহের ...ও কারণ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিল। হাজারীলাল প্রায় ...রাতি ব্যবসা-জীবনের চরম সাফল্য, অর্থাৎ লোকের আস্থা লাভ ... ফেললেন। 'গিনি হাউসের' বর্তমান কর্ণধারদের কাছে খোঁজ ... জানা গেছে যে, প্রথম বছর হাজারী বাবু তৎকালীন ...র-দর ১৫।১৬ টাকা ভরিতে যে সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় ...ছিলেন, সেই সমস্ত অলঙ্কার এখনকার বাজার-দর অনুসারে অর্থাৎ ১০০।১১০ টাকা ভরি দরে এখনও 'গিনি হাউসে' ফিরিয়ে নেওয়া হয়। 'গিনি হাউসের' বর্তমান সমৃদ্ধির মূল হাজারী বাবুর প্রবর্তিত এই গ্যারাণ্টি-প্রথা। পরবর্তী যুগে অন্যান্য বহু ব্যবসায়ী নিজ নিজ ব্যবসায়ে এই প্রথার প্রবর্তন করে বিশেষ লাভবান হয়েছেন।

নক্সার কাজ করছে (গিনি হাউস)

হাজারীলালের ব্যবসা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করতে লাগল। অন্যান্য ভাইদের এনে তিনি তাঁর কারবারে ঢোকালেন, তাঁর ব্যবসায়ের মূলধন ছিল সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা ও বিশ্বাস, তাই ক্রেতাদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই তিনি সময়নিষ্ঠার প্রবর্তন করে 'স্যাকরার কাল' প্রবাদ-বাক্যের অবসান করেন। কাজে তিনি এত আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন যে নিজের পুত্রশোক পর্যন্ত তাঁর কর্তব্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

হাজারীলাল ছিলেন কর্মী, প্রবেশিকার ঊর্দ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করার সুযোগ তাঁর ঘটে ওঠেনি, কিন্তু চরিত্র ও মনোবলে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ, মাতৃ-পিতৃভক্তি, পুত্র ও ভ্রাতৃবাৎসল্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্গুণই তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

শো-রুমের সেলস্‌ম্যান অর্থাৎ বিক্রেতা—অলঙ্কার-ব্যবসায়ে ইহাও কম শিক্ষণীয় বিষয় নহে

হাজারীলাল খুব দিন বাঁচেননি, ১১১৭ ... তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সাত-আট বছর ব্যবসা... তিনি যে বিরাট ... ও সাফল্য অর্জন ক... ইতিহাসে তার ... বিরল।

মানুষ চিরদিন ... বাঁচে না, কিন্তু তার ... চিরস্থায়ী। হাজারীলাল ... নেই, কিন্তু অলঙ্কার-... তাঁর অতুলনীয় দানের ... চিরদিন বাঙালী শ্রদ্ধার স্মরণ করবে। তাঁর 'গিনি হাউস' তাঁর পর... পুরুষের কর্তৃত্বে পরিচা... হচ্ছে। বর্তমান পরিচাল... হাজারীলালের সেবার আ... অটুট থেকে তাঁর ঐ... যোগ্যতার সঙ্গেই ... করতে পেরেছেন। ... আজ 'গিনি হাউস' স... ভারত তথা বহির্ভারে... অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার প্রস্তু... কারক ও বিক্রেতা হিস... যশ ও সম্মান লাভ ক... একটা দিকে অন্তত বাঙা... মুখোজ্জ্বল করে রেখেছেন

মধু-মুহূত

(মূল ফরাসী গল্প অবলম্বনে)

শ্রীপুরন্দর গুহ

[এই গল্পটি (L' Heure du Berger) ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত Le Heures perdues নামক একটি ফরাসী ছোট গল্প-সংগ্রহ হইতে কিছু বাদ দিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। এই বইটির রচয়িতা R. D. M Cavalier Francois—ইহা একটি ছদ্ম নাম। অনেকে মনে করেন ইহা Dame galantes-এর রচয়িতা রসরাজ Abbe de Brantome-এর লেখনীপ্রসূত এবং ঐ পুস্তকেরই পরিশিষ্ট।]

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সব পুরুষ বা নারীর ভাগ্যে কোন রসিকা বা রসিকের প্রেমলাভের সৌভাগ্য ঘটেছে তাদের জীবনে কোন না কোন সময়ে একবার 'মধু-মুহূর্তের' আবির্ভাব নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু, তারা হয়ত সেই অননুভূ... পূর্ব মনোভাবের কারণ কি তা' জানে না। আমি তাদের সে... বুঝিয়ে দেব যাতে তারা ঠিক সময়ে তার সুবিধে নিতে পারে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, প্রেমের 'আলম্বন' অর্থাৎ নায়ক বা নায়ি... স্বয়ং যার দর্শনে ও স্পর্শে অন্তরে রতির আবির্ভাব হয় তখন স্বভা... আপনা থেকেই নিজের কর্তব্য করে যায়; এর সঙ্গে যদি কি... 'উদ্দীপন' থাকে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। এই রতি নায়... নায়িকার পরস্পরের অঙ্গ থেকে আকর্ষণ করে রসকে একেই বলে 'অনুরাগ'। অনুরাগের চরম পরিণতি হয় মিলনে যে ক্ষেত্রে এই মিলন ঘটে না তখনই এই অতৃপ্ত প্রেম অন্তরে আ...

কার, তাকেই বলা হয় 'স্মরদশা'। অভিলাষ থেকে ক্রমে ক্রমে সে চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি। কল্পনা মিলনের ভাবী মুহূর্তকে সুখ-করে তোলে। তার ফলে হয় বারুদে অগ্নি-সংযোগ। যদি রসিক নায়ক নায়িকার মনের সেই বিশেষ মুহূর্তটির সন্ধান তাহ'লে তার অভিলাষ পূর্ণ হতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই মুহূর্তটি প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই সে ধরতে পারে না, ফলে সেও হয় ক্ত। আর বেচারা নায়িকা? তারও সেই দশা! কারণ নায়িকার সন্তালনের ফলে যে সাত্ত্বিক রসের আবির্ভাব হয় সে রস যদি নায়কের অজ্ঞতা বা অত্যধিক সাবধানতার ফলে তৃপ্তিলাভ করতে পারে তাহ'লে সেই রসপ্রবাহ তার সাধারণ গতিপথে না চ'লে আর মনের বিকার উপস্থিত করে। তার যে বিষময় ফল হয় আমরা প্রত্যহ সমাজ-জীবনে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।

কোন কোন রসবোধহীনা নারী, যাদের জীবনে এই 'মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তের' (psychological moment) কখনো আবির্ভাব হয়নি বা যারা অন্ততঃ মুখে তা স্বীকার করে না, তারা বলে 'এ সব বাজে কথা'। কিন্তু আমি এক জন যুবতীর কথা জানি যে, কেউ যে নিকটে আছে তা না জেনে, তার সখীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে গোপনে আলোচনা করছিল। তারা দু'জনেই স্বীকার করলে যে এই রকম মুহূর্ত প্রায়ই জীবনে আসে—বিশেষতঃ সব মেয়েরা পুরুষদের সাহচর্যে আসবার সুযোগ পায় তাদের। সেই মেয়ে দু'টির মধ্যে যে আগে কথাটা তুলেছিল সে বললে—

"এ কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণস্বরূপ কিছু দিন আগের এক ঘটনা বলি শোন—তুমি তো জান, অনেক দিন থেকে 'অমুক' (সেই লোকটার নাম বললে) আমাকে নানা রকম শিষ্টাচারে খুশী করবার চেষ্টা ক'রে আসছে, আর আমার মন পাবার জন্যে আমি যা ভালবাসি প্রাণপণে তাই করে থাকে যদিও তার কোন 'বিশ্রম্ভনে' কোন দিন আমি সায় দিইনি। তুমি তো জান আমি স্বাধীন, আর আমি তাই থাকতেই ভালবাসি, এ অবস্থা থেকে বন্ধনের মধ্যে যাবার কল্পনাও আমার নাই। যাই হক, এক দিন সন্ধ্যের সময় জানলার বাজুতে হেলান দিয়ে দু'হাতের মধ্যে মাথাটা ধরে অনেক কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হল, আমার জীবনে প্রেমের স্থান কতটুকু? আর মনে পড়ে গেল ঐ লোকটার কথা—যাকে আমি দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষা করে আসছি। আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছিল—সে এখনো আমার পিছু-পিছু কেন ঘোরে! তার অচঞ্চল অনুকূলতা, তার অনুরাগ আর সকল সময়েই যে শ্রদ্ধা আমার প্রতি সে দেখিয়ে আসছে, সেই সব ভেবে একটা যেন উচ্ছ্বাস হঠাৎ অন্তরের মধ্যে অনুভব ক'রলাম। এই উচ্ছ্বাস ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, তখন ঠিক করলাম যে তাকে আর আগের মত উপেক্ষা না করে তার অনুরাগের প্রতি একটা মধুরতর আনুকূল্যের নিদর্শন দেব।

আমার মনের মধ্যে এই অনুরাগ যখন ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে তখন দেখলাম দূরে সে আসছে। রাস্তা দিয়ে বরাবর আমার বাড়ীর দিকেই আসছিল সে। অনুরাগ উদ্দীপ্ত হওয়ায় মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোন কথা চিন্তা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আলো না জ্বাললে পাশের লোককে চেনা যায় না এমনি একটা দালান-ঘরে তার অপেক্ষায় দাঁড়ালাম, যাতে আমার এই অশান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনার কোন উপায় মেলে সেই আশায়।

সেই পথ দিয়ে তাকে আসতে হবে। সে এলো। তার পায়ের শব্দ শুনে আমি এগিয়ে গেলাম, আর, যেন অন্ধকারে দেখতে পাইনি এই ভাবে তার গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার পর চমকে ওঠার ভাণ করে যাতে গোলমাল না হয় সেইজন্যে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম—'ওমা! কে এখানে!' আমি তখনও তাকে ছাড়িনি। মনে করলাম, আমার গলার স্বর শুনে আর আমি যে তাকে তার অনুরাগের প্রতিদান দিচ্ছি তা বুঝতে পেরে সে সুদ শুদ্ধ তা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু সেই 'শুভ মুহূর্তের' সুযোগ না নিয়ে সে আমার হাতটা তার হাতে চেপে ধরে তাতে একটা চুমু দিয়ে বললে—'ওঃ তুমি! আমার কি সৌভাগ্য! যে অনুগ্রহ আমি আশা করতেও পারিনি বা মুখ ফুটে চাইতে পারিনি আজ কোন্ দেবতা আমাকে তাই জুটিয়ে দিলেন!'

তার রুদ্ধশ্বাস বিচলিত অবস্থা দেখে ভাবলাম যে এই ভাবে আমার দেহের পরশ পেয়ে আর আমার প্রতি তার যে গভীর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা আছে তারই জন্যে বোধ হয় এই দুর্বল মুহূর্তে সে নন্দনের দরজা উন্মুক্ত দেখেও ইতস্ততঃ করছে প্রবেশ করতে। মনে হল, তাকে বলি—'প্রিয়, তুমি যদি খুশী হয়ে থাক তাহলে এই ভাবে আজ তোমার সঙ্গে মিলন হওয়ায় আমি দুঃখিত হইনি। তাই এসো, সাহস কর, যে ভাগ্য তোমাকে তোমার আশার অতীত আনন্দের সুযোগ এনে দিয়েছে তাকে ধন্যবাদ দাও।'

যখন মনে মনে এই কথা ভাবছিলাম তখন আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই ছিল, আমি ইচ্ছে করেই তা টেনে নিইনি যাতে সে বুঝতে পারে, যে মধু-মুহূর্তটি এসেছে আর সাহস করে সে যাতে তার সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু হায়, আমার ঈপ্সিত সুযোগ না নিয়ে সে একটা নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা করলে—'আহা! যদি তুমি না হয়ে অন্য কেউ হত তা'হলে সুযোগ নেবার উপযুক্ত জায়গা বটে এটা!'

তার পর সে কিছু না করে চুপ করে রইল। যখন আমি দেখলাম যে তার বলার কথা ফুরিয়ে গিয়েছে তখন দারুণ ক্ষোভে সরোষে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বললাম—'এই জায়গাটা বাস্তবিকই সুযোগ দেবার উপযুক্ত স্থান বটে তবে পাত্রবিশেষে—আপনি না হয়ে যদি অন্য কেউ হত!'

তার পর ফিরে গিয়ে তার মুখের ওপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম, যে লোক যেচে সুবিধে দিলেও নিতে জানে না তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

তার পর থেকে সে তার অভ্যস্ত নির্বোধ অভিনিবেশের সঙ্গে আমাকে খুশী করবার চেষ্টা করতে লাগল, যাতে সাহস আর বিবেচনার অভাবে সে যা হারিয়েছে, তাই আমি তাকে ফিরিয়ে দি। কিন্তু মনস্তত্ত্বের সেই 'মধু-মুহূর্ত' চলে গিয়েছে! আমি তাই তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি—'এক জায়গায় একবার সুযোগ হারালে আর তা ফিরে আসে না, কাজেই এ দিকের আশা ছেড়ে অন্যত্র চেষ্টা দেখুন, আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা নাই।'"

সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য যে, এই 'মধু-মুহূর্ত' কখন যে কি ভাবে কার ভাগ্যে আসে তার ঠিকানা নাই। তাই সর্বদা সজাগ হয়ে থাকতে হয় পাছে ফস্কে না যায়।

যেখানে শুয়েছিল মীরা, বিছানার সেখানটা একটু গর্ত হয়ে আছে। এখনো ঈষৎ উষ্ণ লাগে, এক জনের শরীরের তাপ-সঞ্চারিত স্থানটায়। উঠে গেছে এখুনি, মনে হয়, নাকে গন্ধ আসে ওর গায়ের···পরিচিত অভ্যস্ত গন্ধ। সারা রাত বিছানায় কাটালে যেমন হয়। কেউ বহুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে গেলে যেমন লাগে! বসন্ত নিজের দিক হতে গড়িয়ে এল এ-পাশে। গর্তটায়, সামান্য খোঁদলটায় এসে পড়তেই মনে হল অন্যের টাট্‌কা ছোঁয়া লাগে, গরম বাসি পরিত্যক্ত জায়গাটা ছ্যাঁক্‌ করে ওঠে। রাত্রের শোয়ার আগের ফাঁপা-ফোলা ভাজা বালিশটা টোল খেয়ে পড়ে আছে; ব্যবহৃত, ঘাঁটা, তোবড়ানো। তার ঠিক মধ্যিখানে একটু তেলা-তেলা, অতি অল্প; ঈষৎ ধূসর যেন। ফর্সা, ধোপার কাচা জিনিসে একটু একটু ঘাম লাগলে যেমন ঠেকে। চারি পাশ বেশী সাদা পরিষ্কার ধপধপে; মাঝখানটি, যেখানটা এক রাশ চুলশুদ্ধি মাথা আরামে নিদ্রা যায়, ময়লা ময়লা। আশ-পাশের মত ঝকঝকে নয়, মলিন। ওখানে নাক গুঁজলে হয়তো ওর চুলে মুখ ডোবানোর মত অনুভূতি হয়···ভুরভুরে একটু ... গন্ধ। একটু একটু তেলের মৃদু মৃদু গন্ধ। গন্ধের অদ্ভুত ক্রিয়া, দূরকে নিকট করে, নিকটকে দূর। পুরোনোকে ফিরিয়ে দেয়, উজ্জ্বল করে, স্পষ্ট করে, তীব্র জুলাকর মত অলৌকিক হয়ে ওঠে ফেলে-আসা মুছে-যাওয়া কবেকার ক্ষণ।

আশীষ বর্মণ

বিশেষ মুহূর্ত, দিবস কিংবা কাল। ধরা পড়া আগুনের ঔজ্জ্বল্য সেখানে গভীর, গভীর অনুভব।

—কৈ, উঠলে না? মীরা ঘরে এসে বলে।

বসন্ত ও-পাশ ফিরেই রইল। ভালো লাগল তার জবাব না দিয়ে পড়ে থাকতে। ধোয়া টুথ-ব্রাস্‌ ঝাড়তে ঝাড়তে ও ঘরে ঢুকল, তা টের পেল সে শুয়ে শুয়েই। খুট করে আওয়াজ হতে বুঝল ডক্টর ওয়েষ্টয়ের ব্রাস্‌ তার খাপে গেল। স্বচ্ছ কাচের খাপে সবুজ রংয়ের ব্রাস্‌। ব্রাসটা ওর এক বাই, ম্যানিয়া। স্নানের ঘরের কাঁটায় কিছুতেই ঝুলিয়ে সুস্থির হবে না। নিরন্তর মনে হবে, ধুলো পড়ছে, মাকড়সার জাল বুনছে সুঁয়োগুলোয়, আরশোলা চেটে যাচ্ছে। মোজাইকের চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর মোছা দেয়ালেও ওর জন্যে এ সব শত্রু ওৎ পেতে আছে দিবারাত্রি। কোনো দিন ভুল হলেই রক্ষা রাখবে না। মনের সাধে চেটে-পুটে জাল বুনে যাবে। হয়তো মাকড়সার ডিম থাকবে খাঁজে খাঁজে। আর পেচকে খাওয়া রস···চিট্‌চিটে কাঠি-কাঠি ঠ্যাং ল্যাবড়ান। তাই দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি খুস্‌খুস্‌ করবে প্রথম প্রথম, পরে ফুলবে, চুলকোবে। দেখতে দেখতে রস গড়াবে লালার মত। গরল হয়ে যাবে মুখে, লালা খেয়ে-খেয়ে ক্রমান্বয়ে পেটে ঘা। ঘা থেকে ক্ষা, ছুঁচ থেকে ফাল। তিল থেকে তাল···আসেও ওর মাথায়!

—ব্যাপার কি আজ কর্তার? মীরা খাটের কিনারে দাঁড়ায়। ওর গলায় সেই আভাস, সেই আদর করার আর ... খাওয়ার আগে যেমন হয়। গাঢ়, আর ঠিক স্থির নয়, অ... নয়—ঘড়ঘড়ে, একটু কেমন ঘড়ঘড়ে।

একই ভাবে পড়ে থেকে আর একই দিকে চেয়ে দে... বসন্ত অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা দেখতে পায় ওর মুখ। উঁচুতে, তখ... আবছা আবছা আদলটা কেবল। যে রেখা স্পষ্ট হলে ওর নেয়···চোখ, নাক, কোমল কান দু'টো। কানে নতুন পান্না পড়েছে আশ্চর্য্য লাগে শ্বেত তুষারের মধ্যে দু'ফোঁটা গাঢ় সবুজ।

বসন্ত কামনা করে পড়ে পড়ে, ও আরো নীচু হয়ে আসু... কাছে আসুক, ছোঁয়া লাগুক···সাপটে পিষে মারবে তখন। নি... মধ্যে গলিয়ে নেবে দেহটাকে।

—টি পটে চা দেয়া হয়েছে···চোখ পিট্‌পিট করছ কি? ... বসল। হাতটা রাখল ঝুঁকে এসে বসন্তর বুকের সামনে। চিকচিক ... সরু সরু সোনার চুড়িগুলো। হাল ফ্যাসানের, নতুন! চোখ আছে যাই হোক, যাকে বলে শিল্পবোধ! নিত্যি ঢং পাল্টালেও দৃষ্টি কোনটা নয়। স্বল্প চারুকলার খুব আত্মিক ও। নতুন ... যা করাচ্ছে, যা আনছে সব চমৎকার, মানান-সই। সাধা... চলন-সইও হয় না, হয় বিশ্রী···ওর সেদিকে টনটনে রূপস... পরিমিতি জ্ঞান। ধার আছে চোখের, বাছা-বাছির। কো... মানায়, কোনটা না মানায়, তা ঠিক করে ধরে। ঘোম নেয়ে ওঠে বিস্তর জিনিসের মধ্যে, পছন্দ-অপছন্দের সীমাহীন দ্বন্দ্ব নে... স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় আছে, বড়-ঘরের বৌয়ের যোগ্য আত্ম-বিশ্বাস।

বসন্ত ধীরে ধীরে ওর সুডোল হাতের উপর দিকে চুড়িগু... উঠিয়ে দেয়, সবগুলো আঁটো হয়ে বসলে ঝুর-ঝুর করে না... দেয় ফের। কোমল মসৃণ পূর্ণাঙ্গ বাহু আস্তে আস্তে ঘাঁ... সোনালি রোঁয়াগুলো কাঁপে, চুড়ির চাপে সিঁটিয়ে যায়, আর ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে ওঠে। সোনা-সোনা ওর গায়ের রোঁয়াগু... অথচ মাথার চুল তো কালো! পাতলা, প্রায় অদৃশ্য সোনা গোঁফের রেখা আছে···সত্যি যদি গোঁফ হত! হঠাৎ ওর হা... একটা রোঁয়া দুই আঙুলে দলে দেয় বসন্ত।

—উঃ, লাগে! মীরার মুখে যন্ত্রণা দেখা দেয়, কুঁচকে ... গালের আর ঠোঁটের সীমান্তটা। ভুরু দু'টো ভেঙে দুমড়ে গেল জট-পাকান সুতোর মত হয়ে রইল।

—ইস্‌···ছি ছি! বসন্ত হাত বুলোয় জায়গাটায়। রোঁয়া উঠে গেল কি না দেখে সরে এসে।

—লোমফোঁট হবে যখন, বুঝবে! মীরা বলল হাত সরাব... চেষ্টা করে।

—কিছু হবে না—হাতটা ধরে রেখে বলে বসন্ত—রোঁয়া ঠিক আছে।

—রগড়ে রগড়ে তুলে দাও এবার!

—আদর করছি তো···লাগে?

—ভাখো না, লাল হয়ে গেল।

—তুমি এম্নিই লাল।

মীরা হাসল, প্রসন্ন মৃদু হাসি। বিগলিত হল না, কিন্তু ... হল। উচ্ছলতা কমে এসেছে সময়ে, আগে আগে উথলা অহোরাত্র। দু'জনেই তখন সর্বক্ষণ মদির। হৃদয়ে অনর্গ... আবেগ, চোখ থেকে গভীর কামনা মোছে না সহজে। তার ...

...ষ্টি হলে পলি পড়তে থাকল যেন! ধীর হল সম্পর্ক, চাহিদা ...ল বটে, কিন্তু হাঁই-হাঁই ভাব গেল। গিয়ে ভালোই হল মনে ...। সত্যিই হল? না কি এটা সম্বন্ধ ঠাণ্ডা হয়ে আসার লক্ষণ, ...র বৃদ্ধির? কৈ, তেমন তো মনে হয় না, বরং মনে হয়, আগের ...থা অস্বাভাবিক পাগলামী মিটেছে। কোন্‌টা অস্বাভাবিক? ...অবস্থা, না পূর্ব্বের? তখন মনে হত তাই অনিবার্য্য, মধুর, ...ের সমুদ্র। এখন মনে হয় ক্ষ্যাপামী···এইটেই ঠিক, নিয়মিত। ...সলে যে সময় যেটা নিয়ম; এর ঘাড়ে ওকে চাপান যায় না ...হয়। নতুনে পুরোনোয় তফাৎ চিরকাল, দুটো দু ধাঁচের। ...সে ঝোল করার মানে নেই, হবেও না।

বসন্ত ওর গলাটা আরো টেনে আনে নীচে···চোখ চাইতে ...রছে না ও আর। নম্র কাম্য ...ীড়ায় চাউনি ভরে গেছে এ অবস্থায় অদ্ভুত অতল আর ...টলে লাগে মীরার চোখ, মণি দুটো তরল মনে হয়। ভাসা-ভাসা ভিজে-ভিজে কাচের মত।

গরম নিশ্বাস এসে পড়ে মুখে, ঠোঁট চেপে ধরে চুমু খায় ধীরে ধীরে। কাঁচা আলতো ভাবে থেমে থেমে গভীর টানা আবেগে [illegible]।

—চল, ওঠ এবার। মীরা কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে ভারী গলায় বলল। তখনও তার আকণ্ঠ ভরে আছে হৃদয়াবেগে। কথা বলতে কষ্ট হয়। ...জড়ান ভাব, অস্বচ্ছতা ... [illegible] কেমন শোনায় ...ন নিজেরই হঠাৎ মুখ ...ওঠে মীরার। তাড়া... দাঁড়িয়ে চুলের গোছা ঠিক করতে থাকে সে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে ডান পাশটা আঁচড়ায়।

দড়ির গেরো। সাদা চোখে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েও যখন আচমকা মালুম দেয় পুতুল সেজে ফিরে বেড়ানর কথা। সুতোগুলো সব ওঁদের আঙুলে আঙুলে, তার টানে হেঁচকানে হাত-পা নাড়া, [illegible] সাজা, [illegible] না। মোচড়ে মোচড়ে [illegible] দেয়া, [illegible] গরব করা। এগুলোয় সাধারণত বাধা নেই, উঠতে বসতে চোখে [illegible] হয় না। নিজেদেরই অন্তরের আঁচ এ সব, [illegible] অনুমান।

—চিনি লাগবে? মীরা সুগার-বেসনটা এগিয়ে দেয়।

—না, কিটস ফুরিয়ে গেছে?

—বললুম ত হবেন।

—কাল বললেই পারত···আপিসে ফোন করে দিলেও এসে যায়।

চায়ের টেবিলে চা ঢালতে ঢালতে ও কথাটা পাড়বে স্থির করে। পাড়ার আগে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবে আবহাওয়া সম্বন্ধে। সাফল্যের সম্ভাবনা দূর-পরাহত নয় বুঝে বলবে। অনেক ভেবে ও শিখেছে এ জিনিস। মর্জ্জির ওপর সব নির্ভর করে, মানুষটা মুডি। কিংবা পুরুষগুলোই এই। অন্তত চেনা-জানার কর্ত্তারা সবাই প্রায়। ঠিক মুডি নন এঁরা, আসলে ছোটো-খাটো অটোক্র্যাট্, মেজাজী প্রভু। হ্যাঁ করলেন ত হল, না করলে হাজারো হেতু থাকলেও তা বাতিল। কোন যুক্তি-বিবেচনা নেই সে ক্ষেত্রে। কি আছে হয়ত নিজেদের দৃষ্টিকোণের, সুবিধে-অসুবিধের, স্বার্থের, কায়েমী বিধির। তার মূল্য ওঁরাই বোঝেন, এ পক্ষের সেটা বেড়ি; বেদনাও। মাঝে মাঝে অন্তত তীব্র কষ্ট হয়, উপলব্ধি করা যায় চারি দিকের অসংখ্য

—ভুলে গেছিল বোধ হয়।

—খাবার বেলায় ত ভোলে না···ইডিয়ট!

হঠাৎ বিরস হয়ে গেল পরিবেশ। এতক্ষণ ইতস্তত করার জন্যে নিজের ওপর রাগ হয় মীরার। এখন হয় ত সব মাটি হল। এমনি যা মতি, স্থিরতা নেই একটুও। এক ব্যবসায় ভিন্ন। সেদিকে ছিদ্রহীন, মতামত পাকা, বিচক্ষণ। বড়দের সঙ্গে খাতিরের সম্বন্ধ, ছোটদের সঙ্গে অন্য রকম। দুটোই কিন্তু বাইরের গৃহের নয়। অন্দরের ব্যক্তিটি একেবারে আলাদা, সেখানের দস্তুরও পৃথক্। কত রূপই হয় লোকের···আশ্চর্য্য! স্থানে স্থানে রং পাল্টায়, ভাব পাল্টায়। গলার স্বর, চোখের চাউনি সবই ভিন্ন হয়। আর কি আন্তরিক, অকাতর সে পরিবর্তন···একান্ত ধারাবাহিক।

কোন ক্লেশ নেই তার পশ্চাতে, নিছক ছল, চাতুরী। যেটুকু আছে তা নগণ্য, প্রধানত স্বভাবের সঙ্গে যোগ বর্তায়। নইলে এমন হয় না···হয়? নিজের বাপ-ঠাকুরদাকে অন্তত দেখিনি। আদতে দুইয়ের তফাৎ দুস্তর—জমিদার আর ব্যবসাদারে। ওঁরা ছিলেন গোঁয়ার একবগ্‌গা স্থাণু; এঁরা অধুনা চিক্‌, ঝকঝকে, পিচ্ছিল, বহুরূপী। এঁরা কুটায়-লতায়-পাতায় অদ্ভুত সূক্ষ্ম, ক্ষুরধার। ওঁরা ভোঁতা, লেঠেল মার্কা; সনাতনী দাম্ভিক। বুদ্ধি মোটা ছিল ওঁদের নিশ্চয়ই, সবাইকে ধরলে; জ্ঞানের পরিধিও ছিল কম··· আর জ্ঞানের, বুদ্ধির তো ঘনিষ্ঠ যোগ।

—অম্‌লেটটা খেলে না? মীরা বলল।

—খাওয়া যায় না, ল্যাতপ্যাত করছে···ভাজেও না! ঠিক করে আজকাল।

—তুমিই ত একটু নরম রাখতে বলেছিলে। মীরার স্বর নিম্ন, দ্বিধান্বিত, আলগা আলগা।

—বলেছিলাম···তাই বলে কাঁচা রাখতে বলিনি।

মীরা চুপ করে থাকল। বলতে পারল না যে, ডিমটা কাঁচা নয় মোটেই। নরম আছে···তা নরম ত রাখতে বলেইছিলে! কি পুড়িয়ে কার্বন করে আনো হবেন—বলা হয়েছিল—অমলেটও করতে পার না ঠিক! এখন হঠাৎ গরম হয়ে গেছেন, বিগড়ে গেছেন উনি···কথায় কথায় বিগড়ে যান। আপিসে আমোদ-খানায় সজ্জনদের সামনে সামনে এখানে নিজেকে সামলানোরও শক্তি থাকে না। ফুরিয়ে যান উনি এখানেই, ভদ্র সাহচর্য্য থুয়ে আসেন যথাস্থানে। পেখাড়ে আর আতর ছড়ান কেন, যেখানের যা, এখানে বস্তুচক্ষু প্রদর্শনই যথেষ্ট! জুজু থাকবে তাহলেই, নইলে পেয়ে বসবে, দরাক সরা জ্ঞান করে ইয়ার্কি মারবেন··· ফুলস্‌! হার্ট্‌ লেস অফ পিগস্‌!

—এদের প্যাস্ট্রিগুলো অদ্ভুত···সাধে লোকে ভোলে না! মীরা বলল। আস্তে প্যাস্ট্রিতে দাঁত বসিয়ে বলে। তার পর প্লেটটা সরিয়ে দেয়। ভালর দিকে যাক কথাবার্তা; হাওয়া বঁক গুমোট গিয়ে। এ অবস্থা অসহনীয়···অন্তত একটা দিন কাটুক সুস্থ ভাবে, পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে। প্রতিদিনের মন-কসাকসি, জ্বালা, আর তাপ ঘা করে তুলছে কোমলতায়, একটা স্থায়ী দ্বেষ আর প্রতিরোধ-স্পৃহা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে শেষ পর্যন্ত। বিশ্রী ভয়াবহ ভাবটা, মনের দুরারোগ্য ব্যাধি! এতে অন্তহীন যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব। মনে মনে কাটাকুটি বিচার-বিশ্লেষণ! পদে পদে ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড। তার চেয়ে ভাল বুঁদ হয়ে থাকা···ও সব চেতনা ভোঁতা থাকলেই সুখ। কপালে যা এল, মেনে নেয়াই শ্রেয়। তাতে শান্তি মেলে, ক্ষুব্ধ বিরোধ থাকে না। কাদার মত যে কোন ছাঁচের যোগ্য হতে পারলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। যায় কি? যদি যেতই, তা'হলে আর দ্বন্দ্বের, বিরোধের মূল কোথায়? এ অবস্থায় পড়েই বা কেন লোকে? গায়ে পড়ে সুখের স্থলে অসুখ চায় কে? সব কথার কথা—মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া, শান্ত থাকা···নেহাৎ কথার কথা! বিরোধ থেকেই যায়, অন্তর্দাহ। ও সব ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না সহজে, এই যা! তলে তলে প্রবাহটা বয়।

—দুপুরে লাঞ্চ খাব বাইরে, তুমি খেয়ে নিও। বসন্ত বলল। ওঠার জন্যে শরীরটা আন্দোলিত করে কথা কয়। মীরার পানে না চেয়ে বলেছিল ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে। গলা এখনো অপরিষ্কার, গাঢ়। চাউনিও সহজ হয়ে আসেনি, কেমন এক ধার রয়ে গেছে, কাঠিন্য। নিজেকে আয়ত্ত করে আনতে পারেনি যতক্ষণ বাড়ী থাকবে, পারবেও না। ও অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপিসে কারখানায় মন বাধাহীন অবলম্বন পায়, বাড়ীতে যেন চাপা-চাপা, রুদ্ধ। দম বন্ধ হয়ে অকাল-মৃত্যু হবে যে কোন ব্যস্ত লোকের এমন পরিবেশে বেশীক্ষণ থাকতে হলে। ষ্টিফ্‌লড টু ডেথ

—বিকেলে কখন ফিরবে? মীরা মুখের দিকে চেয়ে বলে।

—যেমন ফিরি। চেয়ারটা থাই দিয়ে পিছনে ঠেলে বসন্ত উঠে পড়ে। একটু দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তার পর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লম্বা শুভ্র পা-জামাটা ওর দীর্ঘ চমৎকার দেহটাকে অপূর্ব্ব লাগে। চলার ভঙ্গীতে অদ্ভুত প্রত্যয়···মনে হয়, যেন মুঠোয় দুনিয়া নিয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য নিরুত্তাপ ঠাণ্ডা কর্ম্ম-বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা। অতটা কি ভালো নয়, নিজের বিষয় নাক উঁচু বেশী বেশী। মীরার জিনিষটা মাঝে মাঝে বিস্ময়কর ঠেকে। যে গৃহে এত অসহিষ্ণু অবিবেচক অস্থির, সেই বাইরের বিভিন্ন কাজে কি স্থির, নিশ্চিত অব্যর্থ।

মীরা টি-পটের কাজ-করা কভারটায় হাত বুলোয় একা বসে বসে। কি চমৎকার জিনিষ। মানুষের অভিনব শিল্পবোধ আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অফুরন্ত ক্ষমতা। সুতোয়-রেশমে-জরিতে তা বুনে বুনে আলেখ্যর ন্যায় আলপনা আঁকে। দেখতে দেখতে মোহ লাগে। অথচ এ সব কাজের মতই যেন সুন্দর নয় সব আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে চিনি গুলোতে গুলোতে ফুলদানির ফুলগুলোর দিকে চেয়ে থাকে মীরা···যা বলবে ভেবেছিল, তা বলা হল না। প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যখন ফলের, তখনই সব ভেস্তে গেল। কোথা থেকে কথা-গোড় ঘুরলো আর তাকে সরল করা হল না। প্রাণান্তকর চেষ্টা বৃথাই। দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে, আজ তো খেতেও আসবে না দুপুরে। বাইরে খাবে, অসন্তোষের ঘোরান-ফেরানো ভাব এটা। যার প্রভাব জানে নিশ্চিত, কিছু করার না থাকলেও যাতে সবাই শঙ্কিত হবে, অস্বস্তি বোধ করবে সমস্ত সময়টুকু মেয়েরা সাধারণত রাগারাগি, কাঁদাকাঁদি করলে খায়ই না, খেতে পারে না সহজে অক্ষম বেদনায়। এঁরা বাইরে খান, মেজাজও দেখান···ছোটো জিনিসটাই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক পক্ষের অসহিষ্ণুতার, বড় ঘরের, ভদ্রঘরের বৌ-ঝি'র অথর্বতার।

সন্ধ্যেতে বসন্ত ফিরল অন্য অবস্থায়। মস্ত চওড়া সিঁড়িগুলো তর-তর করে উঠে এল লাফিয়ে লাফিয়ে। এ বয়সেও শরীরের সজীবতা যায়নি। প্রধানত এখন থেকেই হাড়ে হাড়ে জং ধরে, জড়তা আসে দেহ-সঞ্চালনে। ওর ব্যায়াম-করা কাঠামো আজো যেন তরল, বেতের ছিলার মত আয়ত্তাধীন ও পেলব। ইংরিজি স্যাপল কথাটার সার্থক প্রয়োগ হয় ওর ওপর। পা আর থাই দু'টো কি জোরালো···নগ্ন দেখলে মীরার রক্ত তপ্ত হয়ে ওঠে। স্যুট পরলে ওর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে হয়। আগে আগে তাই পরত, ইদানিং নয়া সাজ হয়েছে। পণ্ডিতজীর মত পোষাক,

...দের মহলে না কি ওই সাম্প্রতিক চাল। খাদি টুপিটি মাথায় ...য়ে দিব্যি সাবলীল লাগে, অথচ কেন যে পরত না তখন···তখন ...া শুনেছি জিনিসটা অকওয়ার্ড, ক্লামসি। মাথা! যেখানে ...খানে যা-তা বলা; বাক্যের অপব্যবহার! মাংস আর পেশীর ...ছুল্য নেই কিন্তু কোথাও, যেখানে যতটুকু শোভন ততটুকুই ...চর হয়। মাঝে পেটটা একটু যেন আলগা হয়েছিল, অমনি ...্যায়ামের ভোল বদলাল। ভিন্ন কসরতে ঢিট করে দিল বেয়াদপি। ...পের পেটের মত চিকণ মসৃণ হয়ে ওঠে উদর।

—নাও···এ সুধা ফের বাজার ভরে যাচ্ছে। বসন্ত চকোলেটের ...ন-চারটে বার টেবিলে রাখে, বলে—ভিতরে ক্রিম···ডিলিসিয়াস্। ...খ দু'টো খুশী-খুশী, উৎফুল্ল মুখ। গলা ঝরঝরে, সজীব স্নিগ্ধ ...র। সকালের ছায়া সম্পূর্ণ লুপ্ত। এখন হঠাৎ দেখলে চিনতে ...ষ্ট হয়। কপাল ওর ঈষৎ উঁচু, এক দিকের ভুরু তোলার দরুণ ...াতে রেখা পড়ে। এটা ওর মুদ্রাদোষ, বেশী আমোদ হলেই ...শ্রী ভাবে ভুরু বানায়। ছাত্র-জীবনে প্রথম প্রথম না কি চাল ...রত ওই করে, পোস্। উইলিয়ম পাওয়েলের ভয়ানক ভক্ত ...ল। পরে দাঁড়িয়ে গেল অভ্যেস, অর্থাৎ বদ-অভ্যেস। হলে ...ন তখন অকস্মাৎ মুখ বানায়।

—চা দিতে বলি? মীরা বলে।

—বল···আসছি এখনি।

এতক্ষণে চায়ের আসরে মীরার বলার সুযোগ হল। সারা দিন পরে ...স্ত শেষে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। আর সময়ই বা কোথায়? চিঠি পেয়ে ...ান্তি তো বসে থাকবে না। এদিকে কিছু ঠিক নেই, এসে দেখলে কি ...প্রস্তুতেই পড়বে বেচারী। এত দূরে এসে উপযুক্ত অভ্যর্থনাই পা...। ...য়ের ওপর নুনের ছিটে।

—শান্তিকে আসতে লিখে দিলাম। মীরা বলল শেষ বেশ। ...র মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রইল তার। তখুনি কোনো জবাব এল ...া ওদিক থেকে। মুখেও হঠাৎ ভাবান্তর হল না। মাছের প্যাটিটা ...ুরি দিয়ে কেটে মুখের কাছে কাঁটা এনে বসন্ত বলল—দিয়েছ?

—হ্যাঁ, তোমায় বলব বলব করে···

—না বলাই ভালো, বুঝলে। বসন্ত হাসল। অহেতুক বিষ-মাখান হাসিটা। নয় তো কি? অপরাধ করেনি কিছু সে। ...ন্ধু আসবে লিখেছিল তাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেছে। ভীষণ খুশী ...বে এলে জানিয়েছে। কত দিন পর প্রিয়বন্ধুর দর্শন পাবে··· ...ালো লাগবে না? না লাগাটাই অস্বাভাবিক, ব্যতিক্রম। শান্তি আর সে জীবনের ক'টা বছর কি অচ্ছেদ্য ছিল, কি নিবিড় গভীর ...াদের অন্তরঙ্গতা। যত রস-স্বপ্ন আর যৌবন-মোহ সবই তারা একত্রে আলাপ করেছে···বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত। সাজিয়ে দিয়েছিল সে-ই আশ্চর্য্য নিপুণ হাতে ভাবতেও পারত না, এত দিন দু'জনে অসাক্ষাতে অনায়াসে থাকতে পারবে।

হ্যাঁ, আসতে লেখার আগে বসন্তকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। পদে পদে অনুমতি চাই, সামান্যতম কাজের?

—সব কথা বেঁকিয়ে নাও কেন? মীরার স্বর হঠাৎ কর্কশ শোনায়, উষ্ণ আঁচ পাওয়া যায়: মুখটা দেখায় মরিয়ার মত।

বসন্ত কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইল। দু'জনের চোখের মণি নিশ্চল নিবদ্ধ থাকল ক্ষণকাল। পাতা পড়ল না কারুর। সামান্য কাঁপন পর্য্যন্ত নেই। স্থির একাগ্র লক্ষ্য উভয়ের, যেন এ ওকে বিদ্ধস্ত করে দেবে তীক্ষ্ণতায়। দেখতে দেখতে অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে ওঠে বসন্তর চাউনি, তাতে ছোটান শ্লেষ, মর্মঘাতী নিষ্ঠুরতা। চেয়ে থেকে থেকে কপট বিস্ময়ে সে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তোলে, বলে—শাসাচ্ছ না কি···ডার্লিং?

মীরা আর চেয়ে থাকতে পারে না, মনের মধ্যে কেঁপে ওঠে··· হঠাৎ ভীষণ দুর্বল অসহায় মনে হয় নিজেকে। বিশ্রী, ভয়ঙ্কর ভীতি অনুভব করে তীব্র ভাবে, ঝলকানির মত তড়িৎ বেগে। গা-হাত অবশ হয়ে যায় যেন, রক্ত চলাচল গাঢ় হতে থাকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বলে, ঈষৎ কম্পিত অশ্রুবিদ্ধ গলায় বলে—আমি কে শাসাবার—তবু সামান্য অধিকার আছে, জানতাম।

—সামান্য কেন, অসামান্য···আমার স্ত্রী হিসেবে।

মীরা কথা বলতে পারল না। গলা তার বন্ধ হয়ে গেল। কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকল, গরম লাল হয়ে ওঠে। নাকের ভিতরটা ভীষণ ভাবে ঝাঁঝে আসে, হঠাৎ সাবেন ফেমানেড খেলে যেমন হয়। কান্না ঠেলে এল বুক ফেটে দুমড়ে দুমড়ে। ওকে বাদ দিয়ে তার সত্তা নেই, কিছু নেই,···কিছু না। অনুমাত্র অধিকারও স্ত্রী ভিন্ন নেই।

—বুদ্বুদ ফিরেও আমার'চে ক্ষমতা বেশী! মীরার গলা সজল ভাঙা-ভাঙা; পরাস্ত, হেরে যাওয়া। অসহ্য কষ্ট তাকে ছাইয়ের মত দেখায়। চোখ দু'টো কেবল উজ্জ্বল, দপদপে, তেজপূর্ণ।

—তুমি তো বুদ্বুদ নও···না ওই আদর্শ···যা সাম্যের হাওয়া!

মীরা উঠে পড়ে আচমকা। সে চলে যাবে, বেরিয়ে যাবে সে এ যন্ত্রণার মুঠি থেকে। অজস্র জলভরা চোখে অন্ধ ভাবে সে দৌড়ে যায় শোবার ঘরে। আলমারিটা খুলে ছোট্ট এ্যাটাচিতে কয়েকটা কি এলোপাথাড়ি পুরে নেয়। তখন সম্পূর্ণ বেঘোর সে, বেদনার জ্বালায় ক্রোধে হতজ্ঞান। তার পর তেমনি ঝড়ের বেগে এ-ঘর থেকে ও-ঘর পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়ে। বসন্ত চেয়ারে পিঠ এলিয়ে চেয়ে থাকে। কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করে নীরবে। নাটক হচ্ছে··· মেয়ে হলেই ন্যাকা হয় খানিকটা। বুড়ো ধাড়ি হয়ে গেলেও কিছু কিছু থেকে যায়। স্বভাবই ওদের টানে, নদগদে···বিশ্রী একটা কথা হঠাৎ মুখে এসে যায় তার।

বারান্দা দিয়ে তুফানের মত মীরাকে যেতে দেখে ওর চোখ দু'টো সঙ্কুচিত হয়ে যায়, সোজা বসে গলা বাড়িয়ে বলে—যাচ্ছ কোথায়? ··· ···পরনে?

যেতে যেতে হঠাৎ মীরা স্থির হয়ে যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তার হাত হতে এ্যাটাচিটা পড়ে যেতে। মাথা ঘুরতে থাকে প্রবল ভাবে ··· ··· ··· এই সামান্য কি একটা ধরবে—ধরবে সে ··· ···উঃ। দুর্দিব কি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল! অসংখ্য বিন্দু ভাসছে সাগরের ওপর রাশি রাশি বুদবুদের মত। তার পিছনে অন্ধকার, ঘন নিবিড় অন্ধকার, আর বৈশাখী মেঘের মত তা ছেয়ে এল। আছাড় খেতে খেতে সে জড়িয়ে ধরে কাছে যা পায়, তাই সঙ্গে সঙ্গে অস্থির অসহ্য কান্নায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। বসন্ত পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আসে তাকে ঘরে। চুলগুলো সরিয়ে কপালটা পরিষ্কার করে দেয়। ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে শুভ্র গ্রীবায় মোলায়েম ভাবে চিমটি কাটে।

১

তখনও পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তান হয় নাই। কাগজে-কলমে হয়ত হইয়াছে, কিন্তু মানুষের মন ত কেবল মাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়াই চলে না, তাই পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা তখনও নিশ্চিন্ত মনেই দেশে ও স্ব স্ব গৃহে ঘর-সংসার করিতেছিল। তবে মন্দ ভাগ্য, সুখ-নীড় বুঝি বা ভাঙ্গিয়া পড়ে! সেদিন সন্ধ্যায় তাহারই সূচনা দৃষ্ট হইল।

২

সত্যহরি একলা বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, দুই পৌত্র প্রেমহরি ও প্রণয়হরি আসিয়া প্রশ্ন করিল, দাদু, আমরা স্বাধীনতা উৎসব করব না?

বৃদ্ধ সত্যহরির অন্তঃকরণটিকে কে যেন একটা ধাক্কা দিল; অসীম শক্তিশালী ভদ্রলোক, আঘাত সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন, করবে বৈ কি, দাদু, করবে বৈ কি!

প্রেমহরি বলিল, মা কাকা কলকাতা থেকে ত্রিবর্ণ পতাকা

অশোকচক্র

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এনেছিলেন, আপনি দেখেছিলেন ত? সুন্দর পতাকা, না দাদু; মাঝখানে অশোকচক্র আঁকা, রেশমের পতাকা, ভারি সুন্দর!

প্রণয়হরি কহিল, বাবা পতাকাগুলোকে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখলেন, বললেন, পতাকা টাঙানো হবে না।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবা কোথায় দাদু?

বৈঠকখানায় বসে কাগজ পড়ছেন। ডাকব দাদু?

ডাক ত দাদু।

দুইটি নাতিই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল, বৃদ্ধ ডাকিলেন, আ... এখন থাক্ দাদু, আমি সন্ধ্যে-আহ্নিক ক'রে আসি, তার পর তোমা... বাবার সঙ্গে কথা কইব।

এখনই ডাকি না দাদু?

আমি সন্ধ্যেটা কল্লে নিই না দাদু! সারা দিন ত ভগবান... মনে করবার সময় পাই নে, সন্ধ্যে বেলাটা একটু নিয়ম রক্ষে ক... ফেলি দাদু। তোমরা বরং মা কাকী কাউকে বল, আমার আ... করে দিক্।

তাহাদের আর সে কষ্ট করিতে হইল না। ব্যাঙের মা ... জল, কোশাকুশি হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, চ্যাঙের মা প্রজ্ব... একটি টেবিল-ল্যাম্প আনিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিয়া বা... দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাং, চ্যাং, তোরা এখানে ... করছিস রে? তোদের মাষ্টার আসেননি?

প্রেমহরির নাম ব্যাং, এবং প্রণয়হরি ... ও পরিচিতগণ মধ্যে চ্যাং নামে অভিহি... তাহারা একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, মাষ্টার মশাই সাত দিন আসবেন না, স্কুল কাল থেকে ... দিন ছুটি।

ছোট বৌ অর্থাৎ চ্যাঙের জননী হা... বলিলেন, সাত দিন ছুটি! তোদের স্কুল ... যায়নি ত রে?

চ্যাং ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, উঠে যাবে কে... বা রে, স্বাধীনত-উৎসবের ছুটি হবে ন... কলকাতায় স্কুলগুলো এক মাস ক'রে ... থাকবে। তা জান?

ওহো, তাই, বলিয়া ছোট বৌ প্রস্থা... করিলেন। বড় বধূ ব্যাঙের মা বলিলেন, ... এখানে কি হাঙ্গামা করছিস্? যা, বাইরে ... দাদু এখন পূজো করবেন। গোল করিস্ ন... না পড়িস, না পড়িস, গোরাকে নিয়ে খে... কর গে।

গোরা বাবার কাছে বসে হাড়ী-কল... লিখছে।—প্রেমহরি বলিল; বলিয়া কিশোর... কক্ষ ত্যাগ করিল। গোরার পোষাকী না... গৌরহরি, প্রেমহরির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চার বৎস... পার হইয়া পাঁচে পা দিয়াছে। ব্যাং ও চ্যা... কক্ষ ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু দূরে বাই... পারিল না; দাদুর ঘরের আসে-পাশে ঘুরি... বেড়াইতে ও মাঝে-মাঝে দরজার পাশে দেওয়া... কান পাতিয়া কোশাকুশি নাড়ার শব্দ...

স্বাচ্চারণ শব্দের বিরতি অনুভব করিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে বলিতে হয় যে, তাহারা ঐ ব্যাপারটার মীমাংসা করিয়া স্থির হইতে পারিতেছে না। দুয়ে-দুয়ে চার হয়, যেমন অভ্রান্ত, তাহাদের আশঙ্কাও তেমনই দুরন্ত। স্কুলে দের কয়েক জন সহাধ্যায়ী এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে যে, কিস্তানে তিন-রঙা পতাকা উড়াইলে, যে উড়াইবে, তাহাকে ধরিয়া ঠেঙ্গাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িবে। ইহারা জবাবে বলিয়া-ছে, তাহারাও ঠেঙ্গাইতে ও গো-বেড়েন করিতে জানে। কিন্তু দের বাবা তাহার ন'কাকাকে যখন ত্রিবর্ণ পতাকাগুলিকে তাহার সিন্দুকে পুরিয়া ফেলিতে বলিলেন, তখন হইতে তাহাদের স, আনন্দ ও উল্লাস একেবারে শিকায় উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে হাইকোর্ট, তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, তাই সেই দাচ্চ আদালতে আপীল রুজু করিয়া শুনানীর অপেক্ষায় আকুল ধৈর্য্যে তাহারা কাল হরণ করিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, দিন ত দাদুর এত বিলম্ব হয় না; আজ তবে কি দাদু মস্ত গীতাখানার আগাগোড়া সবটাই পড়িয়া ফেলিতেছেন, না কি?

দাদু প্রণাম সাঙ্গ করিয়া মুখ তুলিতেই দেখিলেন, সম্মুখে ও চ্যাং, এবং অকারণেই বৃদ্ধের মুখখানি মলিন ও বিমর্ষ হইয়া গেল। তিনি মুখ খুলিতে পারিলেন না, তাহারাও তাহার অপেক্ষা করিল না; বলিল, বাবাকে ডাকি, দাদু?

দাদু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। একটু পরে তাহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল, চ্যাংও সঙ্গে। চ্যাঙের পিতা হরহরি কলিকাতায়; কাল বিকালে তাঁর আসিবার কথা আছে। ছেলেরা, মেয়েরা ও বৌয়েরা আশা করিতেছে, আসিবার কালে তিনি গৃহ-সজ্জার—আলোক-সজ্জার বিবিধ উপকরণ আনিবেন। চ্যাং একখানা ও ব্যাঙ দু'খানা তাঁহাকে লিখিয়াছে। হরহরি নূতন ডাক্তার এবং বাড়ীর মধ্যে তিনিই সৌখীন লোক; তিনি যে ভাল ভাল জিনিষই আনিবেন, তাহাতে কাহারও একটুও সন্দেহ নাই।

সত্যহরি সম্ভবতঃ ইঙ্গিতে ইসারায় কোনরূপ নির্দ্দেশ দিয়া থাকবেন, ব্যাঙের পিতা কৃষ্ণহরি পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিলেন, তোরা এখন যা, একটু পরে তোদের ডাকবো'খন—বলিয়া তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দ্বার বন্ধ করিবার কারণ যে কি থাকিতে পারে, বালকবৃন্দের বুদ্ধির তাহা অতীত; কিন্তু বন্ধ যখন হইয়াই গিয়াছে, তখন সেখানে দাঁড়াইয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা বৈঠকখানায় ঢুকিয়া হাঁড়ী-কলসী অঙ্কনরত গৌরহরিকে লইয়া পড়িল অর্থাৎ তাঁহাকে কাঁদাইতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে দ্বার মুক্ত হইল। কৃষ্ণহরি বৈঠকখানায় পা দিবা মাত্র গোরা তাহার লাইনার অতিরঞ্জিত বিচিত্র ইতিবৃত্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেই ব্যাঙ ও চ্যাঙ অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও বাঁ কাঁধে কক্ষ ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। গোরা যে কোন কথাই গোপন করিবে না, তাহারা তাহা জানিত এবং এখনি তাহাদের ডাক পড়িবে, হয়ত বা কৃষ্ণহরির আদেশমত গোরা উভয়ের কান ধরিয়া দোল খাইয়া পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইবে, ইহা তাহাদের জানা ছিল, তাই নিঃশব্দে তাহারা দাদুর শরণাপন্ন হইল। সেখান হইতে আসা না আসা শুধু মাত্র তাহাদের ইচ্ছাতেই নির্ভর করে না, দাদুর ইচ্ছা সর্ব্বদা সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়।

তাহাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না; একটু পরেই গোরা ও তাহার দিদি আসিয়া এত্তেলা দিল যে, বাবা তাহাদের দুই জনকেই ডাকিতেছেন। গোরা তাহারও উপর একটু রং চড়াইয়া বলিল, বাবা মোটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মজা দেখবে এস না!

ব্যাঙ দাদুর বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া দাদুর কানে কানে কি বলিল এবং দাদু ব্যাঙের ভগিনী লক্ষ্মীহরির উদ্দেশে কহিলেন, লক্ষ্মী দিদি, তোমার বাবাকে বল গে, ওরা একটু পরে যাবে।

লক্ষ্মীর তাহাতে বিশেষ অমত ছিল না, কিন্তু পিতৃভক্ত গোরা পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতে দেখিতে চাহে, সে এত সহজে রাজী হইতে পারে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া অবশ্রান্ত কণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। অগ্রজদ্বয়ের পিতৃ-সকাশে যাইতে যত বিলম্ব হইবে, দুর্গতির মাত্রা যে ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, গোরা সে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেও ভুলিল না। তাহাতেও যখন অপরাধী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন "দাঁড়াও না বাবাকে ডেকে আনছি" বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। মধ্যপথে তাহার জননী তাহাকে ধৃত করিয়া গোরার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া ফেলিলেন।

পতাকা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সে রাত্রে স্থগিত রাখিতে হইল। দাদু বলিলেন, কাল সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করা হইবে।

৩

"সিংহ স্থবির" এই কথাগুলি সত্যহরির সম্বন্ধে যেমন সুপ্রযোজ্য, এমন আর দেখা যায় না। সত্যহরির জীবনের পঞ্চাশ বর্ষাধিক কালের ইতিহাস বাঙ্গলা দেশের লোক আজও সগর্ব্বে রূপকথার অলংকারে সাজাইয়া বিবৃত করিয়া থাকে। দুঁদে-দুঁদে গোরা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও মল্লিকপুরে বদলীর খবর শুনিলে পেণ্টলুন বদলাইতে হইত। যাহারা আসিতে বাধ্য হইত, তাহারা সর্ব্বাগ্রে সত্যহরির সখ্যতা যাচ্ঞা করিত; জানিত ও বলিত, সত্যহরি রাখিলে থাকিব, নহিলে পদ্মার জলে মৃতদেহ ভাসিবে, নিশ্চয় জানি। সত্যহরি বলিত, সাহেব, আমাদের পেছু লেগ না, আমরা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না। আমরা লাঠি খেলি, কুস্তি করি, দঙ্গল বাঁধি, আমাদের দেহ শক্ত করবার জন্যে। লাঠি দিয়ে ইংরেজের কামান হটাইতে যখন পারিবার ভরসা নাই, তখন মিছে কেন আমাদের উত্যক্ত কর? তদবধি মল্লিকপুর জেলায় লাঠি খেলায় কেহ বাধা দেয় নাই। মাঝে-মাঝে ডাকাতির অভিযোগে তাহাদের ধর-পাকড় শুরু হইত, কিন্তু আদালতে অপরাধ প্রমাণ হইত না, সত্যহরিরা খালাস পাইত। লাভের মধ্যে অজ্ঞাত কারণে দু'-চারটা দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল মরিয়া পড়িয়া থাকিত। রেগুলেশন থ্রিতে আটকাইয়া দেখা গিয়াছে, সত্যহরি ও সাঙ্গোপাঙ্গ জেলে পচে বটে, কিন্তু জেলার ডাকঘরও পুড়ে, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙলোয় আগুনও লাগে, আদালতের নথীপত্র ভস্মীভূতও হয়। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। ম্যাজিষ্ট্রেট উপরে লেখালেখি করিয়া আবার তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনে। এই বছর তিনেক পূর্ব্বেও একটা সহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অনেকগুলা হিন্দু মরিয়াছিল,

অনেকগুলার ঘর পুড়িয়াছিল, দুই-তিনটি হিন্দু নারী নিখোঁজ হইয়াছিল। খবর শুনিয়া সত্যহরি শুধু "ওরে রে" বলিয়া বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা ডাক্ ছাড়িয়াছিলেন; শুনা গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ নারীর খোঁজ, পোড়া ঘর খাড়া ও গ্রামের হিন্দু-মুসলমান 'ভাই ভাই' হইয়াছিল! সেই সত্যহরি, হায়, আজ সকাল হইতে হা-পিত্যেশ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন; যাহাদের ডাকিতে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের আসিবার আর সময় হইয়া উঠিতেছে না! অথচ এক দিন ছিল, এই দাওয়ায় বসিয়া "ওরে" করিলে সারা গ্রামখানাই এই প্রাঙ্গণে জড় হইত। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান এক ঘাটে জল খাইত।

গ্রামের কয়েক জন মাতব্বরকে সত্যহরি বারংবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন; দুই পাশে দুই জন মানুষের ওপর ভর দিয়া চলিয়াও বাড়ীর বাহিরে যাইতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন; মাথা ঘুরে, পা টলে; নহিলে নিজেই যাইতেন, এই কথাও নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন। তবু গ্রামের লোক-এ, পাড়া ও-পাড়ায় বাস বই ত না—বেলা একটা বাজিয়া গেল, এক জন লোকও আসিবার অবসর করিতে পারিল না! মধ্যাহ্ন অতীত; বৌমারা ব্যস্ত হইয়া শ্বশুরকে অন্দর-মহলে আনিয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অন্য দিন অপরাহ্ণ ৪টার পূর্ব্বে দিবা-নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, আজ তিনটার সময় উঠিয়া বসিয়া মেজ ছেলে হরহরিকে ডাকিয়া বলিলেন, আর একবার কলিমদ্দি সাহেবকে ডেকে এস।

সকালে দু'বার গেছি—

সে ত জানি বাবা, আর একবার যাও! কি জানি, ও-বেলা হয়ত সময় করতে পারেনি। এ-বেলা যেন একটি বার অতি অবিশ্যি আসেন, বলে এস। বোলো, তার জন্যেই আমি বাইরে এসে বসে আছি।

এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণহরি আসিয়া বলিল, ফুলচাঁদ মিঞার সঙ্গে দেখা হল।

বৃদ্ধ সে কথায় কান না দিয়াই হরহরিকে বলিলেন, তুমি আর বিলম্ব কর না হর। বেলা পড়লে যদি আবার কোথায়ও বেরিয়ে যান, তুমি যাও, বাবা!

জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণহরি ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কোথায়?

হরহরি বলিল, কলিমুদ্দিকে ডাকতে।

তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে, তিনিও ফুলচাঁদ মিঞার বাড়ীতে ছিলেন তখন।

বৃদ্ধ হরহরিকে বলিলেন, পার যদি সঙ্গে করে নিয়ে এস। বোলো, আমার দেহটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। বসে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে; তবু তার জন্যেই বসে আছি। এ কথা শুনলে না এসে পারবেন না।

ভায়ে-ভায়ে চোখে-চোখে কথা হইল, নিষ্ফলতা সম্বন্ধে উভয়েই একমত, তথাপি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে ইসারায় শেষ বৃথা-চেষ্টায় যাইতে বলিলে হরহরি চলিয়া গেল।

কৃষ্ণহরি বলিলেন, ওরা আমাদের পতাকা তুলতে দেবে না বাবা। ওরা না কি খবর পেয়েছে, কলকাতায় চাঁদ-তারা-মার্কা পতাকা ওড়ানো বারণ হয়েছে, ওরাও তাই এখানে তিন-রঙা পতাকা তুলতে দেবে না।

আমাকে দেওয়া উচিত, বলিয়া অতি বৃদ্ধ সত্যহরি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন। কৃষ্ণহরি বলিলেন, সেই জাতই বটে।

সত্যহরি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, জাতের দোষ দিতে নেই, কৃষ্ণ, সব জাতেই ভাল মানুষও আছে, মন্দ লোকও আছে। গোটা জাতটা কখনও খারাপ হয় না। ঐ কলিমুদ্দিকে তোমরা জান না; তামাম তল্লাটের থানা পোড়াবার ও ছিল আমার দলের সর্দার; দু'-দু'টো আহেলি গোরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে থলের পূরে মেঘনায় ভাসিয়ে দিয়েছে ঐ কলিমুদ্দি সেখ। স্বদেশী ডাকাতিতে ও আমার ডান হাত। ওর গলার "বন্দে মাতরম্" গান শুনলে মড়াও জ্যান্ত হয়ে উঠে বসত। কলিমুদ্দির মত মানুষ হয় না!

সেকালের কথা ভুলে যান বাবা।

ভাল কথা যে ভুলতে পারি নে কৃষ্ণ! হাঁসপোতার ক[illegible] বয়াটে ছোঁড়া চারু ডাক্তারের মেয়েকে অকথা-কুকথা বলেছিল, সেই শুনে ঐ কলিমুদ্দি গিয়ে ক'বেটা নেড়ের চাল কেটে বাস তুলে দিয়ে আসেনি? সে ত বেশী দিনের কথা নয় কেষ্ট, তোমার ত মনে থাকা উচিত।

কৃষ্ণহরি চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, তোমার মা মারা যাওয়ার পর তোমাদের সঙ্গে এক মাস অশৌচ পালন করেছিল ঐ কলিমুদ্দি সেখ। সে কথাটাও কি ভুলে গিয়েছ কৃষ্ণ? জাত মুসলমান, গাঁয়ের মোড়ল হয়েও এক মাস ও নিরামিষ খেয়েছিল, জুতো পায়ে দেয়নি, হবিষ্যি করেছিল? মনে পড়ে কি? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে চেয়েছিল, অনেক কষ্টে আমিই থামাই, মনে নেই? বলিতে বলিতে সত্যহরি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শেষ কালে বলিলেন, জাতের খোঁটা দিয়ে কথা বলতে নেই, ও ওতে ভগবানের নিকট অপরাধ হয়।

কৃষ্ণহরি জেলা কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল, তর্ক করিতে চাহিলে অনেক কথাই বলিতে পারিতেন; কিন্তু পিতাকে অধিক উত্তেজনার সুযোগ দিয়া অসুস্থতার পথ প্রশস্ত করা অসঙ্গত বোধে নীরব রহিলেন। সত্যহরি কহিলেন, বালক কালে ওর মা মরেছিল, স্বদেশী করতে আমার বাড়ীতে এসে তোমার মাকে মা বলে ডেকেছিল; সেই থেকে একটি দিন, একটি বারের জন্যে তোমার মা'র কথার অবাধ্য হয়নি। জমির ফসল হোক্ আর গাছের ফল, পুকুরের মাছ হোক্, প্রথম জিনিষটি, ভাল জিনিষটি সকলের আগে তোমার মা'র চরণে উচ্ছুগু করে দিয়ে তবে নিজের বাড়ী গেছে। মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের দেহে এ সব কথা ভুলব কি করে, বল ত বাবা কৃষ্ণহরি?

প্রবল বর্ষায় নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে অবিরাম যেমন জলস্রোত ছুটিয়া বাহিরায়, সত্যহরির অন্তরের কবাট আজ খুলিয়া গিয়াছিল, কথা আর থামে না। পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তিন আইনে আমাকে ওরা আড়াই বছর আটকে রেখে দিলে, তখন তোমার বয়স দশ, চাপার আট, হর'র পাঁচ, নর দু'বছরের ছেলে; এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমার মা একলা স্ত্রীলোক, আতান্তরে ভাসছে। ঐ কলিমুদ্দি পাটা যোয়ান ছেলে এসে তোমার মাকে বলেছিল, মা, কলিমুদ্দি তোর বড় ছেলে, সে বেঁচে থাকতে তোর ভাবনা কিসের বল্ ত শুনি? এক দিনের জন্যে কাউকে বুঝতে দেয়নি যে, সংসারের অভিভাবক নেই। জমি চাষ করিয়েছে, পাট বি[illegible]

করেছে, তোমাদের স্কুলে-পাঠশালায় পড়িয়েছে, অসুখে-বিসুখে বুক দিয়ে পড়েছে। তোমার গর্ভধারিণীর কাছে শোনোনি সে কথা? মরবার দিন কলিমুদ্দিন বাড়ী ছিল না, নসিমপুরে হাট করতে গেছল; দুপুর থেকে টান উঠল, কথা বন্ধ হয়ে গেল; তোমরা সব কাছে বসে, তবু যখনই চোখ চাইতে পেরেছেন, কেবল ঘরের দোরের দিকে চোখ ফেলেছেন, কলিকে খুঁজেছেন। সূর্য্যাস্তের সময় কলিমুদ্দিন এসে ঘরে ঢুকে ডাকলে, বড় মা! তোমার মা যেন চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন; মুখখানি যেন হেসে উঠল, আমাকে জল দিতে ইসারা করলেন। যেমন জল দেওয়া, সব শেষ!

কৃষ্ণহরি বলিল, আমাদের মনে আছে বাবা! কত দিন আমরা নালিশ করেছি যে মা'র প্রাণটুকু কলি দাদার জন্তেই বার হতে পায়নি। মা যে ওকে বড্ড ভালবাসতেন।

ও যে ভালবাসার সামগ্রী, কৃষ্ণ। ওকে ভাল না বেসে থাকবার জো কি!—তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, হরহরি আসিয়া বলিল, সন্ধ্যের পর আসবেন বললেন।

বৃদ্ধের মুখখানি শুকাইয়া গেল; বলিলেন, এখন একবার আসতে পারলে না?

না।

তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?

না।

কথাটা একটু তুললে না কেন, হর?

অনেক লোক ছিল, কথা বলার সুবিধে ছিল না।

সন্ধ্যের পর ঠিক আসবে ত? তুমি না হয় একবার সন্ধ্যের আগেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে যেয়ো—সঙ্গে করে নিয়ে এস।

হরহরি বলিল, বাইরে ওঁরা সব এসেছেন, নন্দী মশাই, গোবিন্দ ভট্‌চায, শিরীষ রায়—

সত্যহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ কথা জানতেই এসেছেন বোধ করি?

হ্যাঁ? ডাকব?

সত্যহরি গ্রামবাসী আগন্তুকদের কহিলেন, ভাই, আমি কলিমুদ্দিন মোড়লকে ডাকিয়েছি, সন্ধ্যের পরে আসবে বলেছে। এলেই কথা কয়ে নোব; তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কহিলেন, দত্ত মশাই, নিশ্চিন্ত থাকতে দিচ্ছে কৈ? পাড়ায়-পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে বলে গেছে, যার বাড়ীতে পাকিস্তানের পতাকা না দেখতে পাবে, পরশুই তার শেষ দিন। বলছে, ঘরে আগুন দিয়ে জেল খেতে হয়—যাবে; জবাই করে ফাঁসী যেতে হয়—যাবে, শহীদ হবে।

নন্দী মহাশয় ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক; তিনি বলিলেন, আমাকে দু'খানা পতাকা দিয়ে বলে গেছে, একখানা স্কুলে আর একখানা বাড়ীতে নিজের হাতে টাঙ্গাতে হবে। টাঙ্গিয়ে আবার অভিবাদন করতে হবে।

শিরীষ রায় বলিলেন, আমার মেজ ছেলে বুঝি একখানা ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যাগ দেখিয়ে বলেছিল, সেইখানে টাঙাবে; তাকে বলে গেছে, ঈদের কোরবানীর কথা মনে রাখতে। আরও বলেছে, ডাকঘর লুঠ করে আগুন ধরিয়ে আমাকে তারই মধ্যে পুড়িয়ে মারবে।

বৃদ্ধ সত্যহরির মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না; অতি শীর্ণ, শুষ্ক ঠোঁট দু'খানা নাড়িয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কোটরগত চক্ষু দুইটা কোটর ভেদ করিয়া যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল; কিন্তু একটি শব্দও মুখ দিয়া বাহির হইল না। পৃথিবীর ভিতরে যে কম্পন, তাহা যতক্ষণ না ভূমিকম্পের রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসে, মানুষ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। অতিবৃদ্ধ সত্যহরির অন্তরে যে কি ভীষণ আলোড়ন হইতেছিল, আগন্তুকগণ তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইলেন না; কিন্তু সত্যহরির পুত্রদ্বয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আর কিছু না পারিলেও তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারিবে। সত্যই আশঙ্কা হইতেছিল, সত্যহরি পড়িয়া যাইবেন।

শিরীষ রায় বলিতে উদ্যত হইলেন, এই কি আমাদের অদৃষ্টে···

সত্যহরি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এ হতে পারে না, শিরীষ বাবু, এ হতে পারে না। চল্লিশ বছর ধরে আমরা বুকের রক্ত ঢেলেছি, সে কি এরই জন্যে? ফাঁসী-কাঠে ঝুলেছি, দ্বীপান্তরে গেছি, জেলে পচেছি, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, সে কি এই অপমান সইবার জন্যে? কথখনো না, এ হতে পারে না! আমি বলছি, এ হতে পারে না! আপনারা দেখবেন, কলিমুদ্দি আমার তেমন ছেলে নয়! এর বিহিত সে করবেই, না করে সে পারে কখনও? সে আসুক একবার—বলিতে বলিতে প্রবল উত্তেজনা বশে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাকিয়াটা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সত্যহরি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

হরহরি আগন্তুকদের বলিল, আপনারা এখন যান্! কলি দাদার সঙ্গে কথা হওয়ার পরে যা ঠিক হয়, আমি আপনাদের বাড়ী-বাড়ী বলে আসব।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে, পুত্রদ্বয় পিতাকে ধরিয়া অন্দর-মহলে শয্যা-গৃহে লইয়া গিয়া শয়ান করাইয়া দিল এবং নাতিরা দাদুর ঘরের আসে-পাশে ঘুরিতেছে দেখিয়া দাদুকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিল। ব্যাং ও চ্যাং এই বলিয়া তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছিল যে, আজকের এই রাতটুকু বাকী, কখনই বা কাগজ-টাগজ এনে মালা করব, কখনই বা কি···ইত্যাদি।

হরহরি বলিলেন, থাম্, চেঁচাস্ নে! দাদু ঘুমিয়েছেন।

৪

এক প্রহর রাত্রে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্বশুরের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, বাবার খুব জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে, বড্ড ছটফট করছেন। বোধ হয় তোমায় ডাকছেন, একবার দেখ দেখি।

হরহরি ঘরে ঢুকিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিল, নাড়ী ধরিয়া নাড়ীর গতি নিরীক্ষণ করিল এবং উৎকর্ণ হইয়া পিতার অব্যক্ত ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরে আসিয়া ভ্রাতৃজায়াকে বলিল, আমাকে না, কলিমুদ্দি কলিমুদ্দি করছেন! তুমি কাছে থাক বৌদি, আমি একবার কলিদা'র বাড়ী ঘুরে আসি।

ভ্রাতৃজায়া কহিলেন, তুমি মেজকে পাঠিয়ে দিয়ে যাও ঠাকুরপো আমি গোরাটাকে ঘুম পাড়িয়ে আসছি, ওটারও জ্বর।

তাই দিচ্ছি, বলিয়া হরহরি তাহার স্ত্রীর সন্ধানে চলিল। কলিমুদ্দির ভরসা তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে যে আসিবে না, আসিতে পারিবে না, হরহরি ইহা বুঝিয়াই বিকালে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তথাপি সহরের দুই-তিন শত হিন্দু আকুল আগ্রহে তাহার পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে—একবার শেষ চেষ্টা করা বিশেষ দরকার বিবেচনায় পুনরায় সে কলিমুদ্দির বাড়ী গেল। কলিমুদ্দি গৃহে ছিল না। যাহারা কলিমুদ্দি সেখের চণ্ডীমণ্ডপ মশগুল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদেরই এক জন শ্লেষভরে কহিল, কলিমুদ্দির বাড়ী চষে ফেললেও সে হবে না দত্ত মশাই, ভালয় ভালয় পাকিস্তানী পতাকা উড়োও গে যাও।

আর এক জন আর একটু রং চড়াইয়া কহিল, কলি মিঞা ম্যাজিষ্টরের কুঠিতে গেছে, দত্ত মশাই! গেছে যাক্, ম্যাজিষ্টরের বাবাও পারবে না হিন্দুস্থানের পতাকা তুলতে বলতে। হয় না হয়, পো'র খানেক পরে এসে নিজের কানেই কলি মিঞার মুখ থেকে কথাটা শুনে যেও।

ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, হিন্দু-মুসলমান একতা, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি লইয়া হরহরি তর্ক করিতে পারিত, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। মাথা চুলকাইয়া উঁই-গাঁই করিয়া পরে আসব, এই ধরণের নানা কথা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ভাবে বলিতে বলিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাবার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার শরীরের খবর লইতে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাও অভাবিতপূর্ব্ব। পিতা ব্যাং-চ্যাংকে লইয়া পতাকা, ফুল, ফানুস, শিকল প্রস্তুত করিতেছেন। হরহরির স্ত্রী চুপে-চুপে কহিল, জ্বরে গা ভেঙ্গে যাচ্ছে। পুত্র বোধ করি কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, সত্যহরি তৎপূর্ব্বেই কহিলেন, দাদু, তোমরা রাত থাকতে চান্ করে কাচা কাপড় পরে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আমার কাছে আসবে। আমি নিজের হাতে এই বড় পতাকাখানি চিলের ছাদে উড়িয়ে দিয়ে আসব। দেখি কে কি করে?

ব্যাং ও চ্যাং বিজয়-গর্ব্বে হরহরির পানে চাহিয়া লইয়া দ্রুতহস্তে রঙীন কাগজ কাটিয়া ডাঁই করিতে লাগিল। সত্যহরি পিতার উদ্দেশে কহিল, কলিমুদ্দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের মত জানতে গেছে, ফিরতে দেরী হবে।

হোক্ গে, বলিয়া সত্যহরি পৌত্রদের কারুশিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। প্রবল জ্বর, সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, গরম নিশ্বাস যেন আগুনের হল্কা, তথাপি কি দারুণ উন্মাদনা!

৫

রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতীত হইয়াছে, কলিমুদ্দিন আসিয়া কৃষ্ণহরিকে ডাকিয়া তুলিল; কৃষ্ণহরিকে ডাকিয়া বাহিরে আসিল।

কলিমুদ্দিন বলিল, ভাই কৃষ্ণ, ভাই হর, কালকের দিনটা কোন মতে কাটিয়ে দাও ভাই, তার পরে এক দিন সকলে মিলে বৈঠকে বসে একটা মিটমাট করে ফেলা যাবে। কালকের দিনটা কংগ্রেস-ফ্ল্যাগ উড়িয়ে কাজ নেই, ভাই।

কৃষ্ণহরি বলিলেন, কলিদা, ওকে কংগ্রেস-ফ্ল্যাগ বলছো কেন ভাই? ও ত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ।

কলিমুদ্দিন ম্লান মুখে বলিল, সে ত জানি দাদা, কিন্তু ছোঁড়ারা যে কোন কথাই শুনতে চায় না। আমি কি কম বুঝিয়েছি? খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কত বলেছেন। সরকারী উকীল খান বাহাদুর কত বোঝালেন যে, হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও তাহ'লে সেখানে পাকিস্তানী পতাকা তুলতে পারবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল গেল না দাদা!

হরহরি কহিল, কিন্তু কলিদা, বাবা ত কারও কথা শুনবেন না, তিনি নিজের হাতে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অশোকচক্র পতাকা তুলবেন বলেছেন। তাঁকে ত তুমি ভালই জান, যা বলবেন, তাই করবেন; তাঁকে ঠেকাবে কে?

কলিমুদ্দি কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিল; তার পর বলিল, কখন তুলবেন বলেছেন? ক'টার সময়?

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, খুব ভোরে।

হরদা, আমার একটি কথা রাখবে?

বল।

বাবাকে আটকো না। কিন্তু তিনি পতাকা তুলে নীচে আসবা মাত্র তুমি ভাই চুপে-চুপে ছাদে উঠে আস্তে আস্তে সেটি নামিয়ে রেখে এসো। লক্ষ্মী দাদা আমার, এই কথাটি আমার অতি অবিশ্যি রেখো—বলিয়া কলিমুদ্দি হরহরির দু'টি হাত চাপিয়া ধরিল। একটু থামিয়া আবার বলিল, কিন্তু হর ভাই, দেখো, তিনি যেন না দুঃখ পান!

কিন্তু ছেলেগুলো পতাকা নামাতে দেখলে কি কাণ্ড করবে, কে জানে!

কলিমুদ্দিন এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া বলিল, এক কাজ কোর ভাই, "চল্, সহর বেড়িয়ে আসি" বলে ব্যাং-চ্যাংকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো, তাহ'লেই ওঁরা ভুলে যাবে, আর হাঙ্গামা করবে না।

কৃষ্ণহরি বলিলেন, কলিদা, তুমি তোমাদের গুণ্ডা ছেলেদের ঠাণ্ডা করতে পারলে না? আমরা সবাই ভেবেছিলুম, তোমার কথা ওরা ঠেলতে পারবে না; তুমি বললে—

কলিমুদ্দিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কৈ আর পারলুম ভাই? এই যে তোমাদের এখানে এসেছি, তাও লুকিয়ে এসেছি। দু'বছর ধরে 'মারকে লেঙ্গে', 'লড়কে লেঙ্গে' করে করে মেজাজ গরম হয়ে আছে, ভাল কথা কানে নেবে কেন?—একটু থামিয়া আবার বলিল, কালকের দিনটে কোন রকমে কাটিয়ে দিও ভাই, তার পর বোঝাপড়া একটা হবেই। আমি বরং কাল বিকেলে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করবো। এখন যাই; রায় মশাই, নন্দী বাবুদেরও সাবধান করে দিয়ে যাই। কলিমুদ্দি মোটা উড়নীখানা দিয়া মুখ ও মাথা ঢাকিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুত্রবধূদ্বয় শ্বশুরের ঘরেই ছিলেন, কৃষ্ণ ও হরকে দেখিয়া বড় বধূ ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে রয়েছেন, জ্বর ত চারের ওপর। মাথায় জলপটি দোব?

হরহরি বলিলেন, হ্যাঁ, তা চারের ওপর যখন, তখন দিতে পার বৈ কি?

কৃষ্ণহরি বলিল, একটু অডিকলোন এনে দোব?

"দিদি," "দিদি"—মেজ বধূ ডাকিয়া উঠিতে, সকলেই ছুটিয়া ঘরের ভিতরে আসিলেন। সত্যহরি উঠিয়া বসিয়াছেন, জ্বরের জৌলুষে আরক্ত আনন জ্বল্-জ্বল করিতেছে, রক্ত-জবা চোখ দু'টি

…করাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে, সত্যহরি দুই হাত প্রসারিত করিয়া কি যেন হাতড়াইতেছেন ; অথচ পাইতেছেন না। বিছানার পাশে তাঁহার নিত্য-সহচর, সদা-ব্যবহার্য্য গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র, সংবাদপত্র, গামছা, পিকদানী প্রভৃতি থাকিত, হাত লাগিয়া সেগুলা ইতস্ততঃ স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া কৃষ্ণহরি পাশে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই বলুন না, আমরা দেখে দিচ্ছি !

সে কথা বোধ হয় বৃদ্ধের কানে গেল না ; তিনি পূর্ব্বের মতই ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ কাগজে প্রস্তুত একখানা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা তুলিয়া লইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, প্যাং, চ্যাং, চল দাদু, ভোর হয়েছে, স্বাধীনতা পতাকাখানি উড়িয়ে আসি—চল—বলিয়া উত্তেজিত ভাবে উঠিতে গিয়া টলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণহরি পিতার মাথাটি ধরিয়া বালিশে ন্যস্ত করিতে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হর, হর, দেখ্ ত ভাই ?

হরহরি পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

ছেলেগুলার চোখে ঘুম ছিল না ; ভোর হইতে আর দেড় ঘণ্টা দেরী, এই খবরটুকুই তাহারা দাদুকে দিতে আসিয়াছিল। হরহরি তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন, ঐ দেখ, তোদের দাদু স্বর্গে অশোক পতাকা তুলতে চলে গেলেন। নে, হতভাগারা, পায়ের ধুলো নে !

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

ওভারকোটের পকেটে হাত দু'টো পুরে দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে পা টেনে-টেনে পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে উঠছি। এ সব রাস্তায় পা গুণে-গুণে চলা যায়। প্রত্যেক পদক্ষেপটাই আয়াসসাধ্য। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে; ভারতের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী শীত।

এটা সীজন্ নয়। কাজেই চেঞ্জারের ভিড় মোটেই নেই। একাই পেছনের পাহাড়টার চড়াই ভেঙ্গে ওপর দিকে উঠছি। সামনের পাহাড়টাতেই লোকেরা বেড়াতে আসে। সামনের পাহাড় থেকেই নিচের ভ্যালিটাকে দেখা যায় কি না। পেছনের দিকটায় যায় না কেউ। ওদিকের পথটার ঠিক কোনো বাঁধা-ধরা ঠিকানা নেই। উঠতে উঠতে পাথরের খাঁজে-খাঁজে এঁকে-বেঁকে পথ ঠিক কোরে নিতে হয়। দুরারোহ মোটেই নয় অবশ্য, তবু ওদিকে যাবার ফ্যাশান্ নেই এখানে। পেছনের পাহাড়টা উপেক্ষিত হয়েই থাকে।

সামনের পাহাড়টায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে পুরোনো হয়ে গেছে। হঠাৎ আজ খেয়াল হল, পেছনটা ঘুরে দেখতে হবে। তাই চড়াই ভেঙ্গে উঠছিলাম। পাহাড়ের পথের মজা এই যে, চলতে চলতে সামনের প্রত্যেকটা জিনিষ, প্রত্যেকটা দৃশ্যই চমকে দিয়ে হাজির হয় চোখের সামনে। সমতল রাস্তার মতো অনেকটা দূর থেকেই তাকে আবছা দেখতে দেখতে চোখে সইয়ে নেবার উপায় থাকে না। এ সব রাস্তার পথগুলো আমাদের চমকে দেবার জন্তেই যেন তৈরী।

কিন্তু তাই বলে পাহাড়টা যে হঠাৎ আমাকে এতখানি চমকে দেবে, তা একটু আগেও ভাবতে পারিনি। চলতে চলতে গোটা-কতক দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে বাঁক ফিরতেই হঠাৎ চোখে পড়লো একটা একতলা ছোট বাংলো ধরণের কাঠের বাড়ী। চার পাশে বাগান দিয়ে ঘেরা। এই পাহাড়ের ওপর একটা পুকুর দেখলেও বোধ হয় ততটা আশ্চর্য্য হতাম না, যতটা হলাম ঐ বাড়ীটা দেখে।

এখানে বাড়ী! যিনি করেছেন, অদ্ভুত মানুষ তো তিনি!

বাড়ীটাতে যে বর্ত্তমানে কেউ বাস করে না, সেটা বেশ বোঝা গেল কাঠের দেয়ালে উইয়ের বাসাগুলির বিস্তার দেখে, আর বাগানের শ্রীহীন অবস্থা দেখে। বাগানের পেছন দিকে সুন্দর একটি কুঞ্জ চোখে পড়লো। কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্কিড-হাউসের মতো অনেকটা। ভেতরটা তেমনি অন্ধকার অন্ধকার, তেমনি স্যাঁৎসেঁতে। কুঞ্জের ভেতরে দু'টো কাঠের বেঞ্চ রয়েছে। একটা পাতাবাহার গাছের ঝোপ বেঞ্চ দু'টোর মাঝখানে বেশ একটা আড়ালের পাঁচিল তুলে দিয়েছে যেন। ওভারকোটের কলারটা তুলে দিয়ে চুপ-চাপ বসে পড়লাম সেই বেঞ্চ দু'টোর একটাতে।

আধ ঘন্টাটাক কাটবার পর উঠি-উঠি করছি, এমন সময় একটি মেয়ে এসে ঢুকলো কুঞ্জটার মধ্যে। বেশ সুশ্রী, একটু রোগা,—সাজ-সজ্জায় একটু বাহুল্য থাকলেও রুচি আছে।

এমন জায়গায় একটি মেয়েকে আসতে দেখে সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম। বাড়ীটার চেয়েও অবাক্ করে দিল ঐ মেয়েটি।—কে ও? এখানে কি করতে এসেছে? প্রচণ্ড একটা কৌতূহল হল।

বেশ বুঝলাম, এ-জায়গাটার সঙ্গে মেয়েটির অনেক দিনের পরিচয়। আমার মতো হঠাৎ একে আবিষ্কার করার কোনো বিস্ময়ের রেখাই তার চোখে-মুখে নেই। ঝোপের ও-পাশের বেঞ্চটাতে যে কেউ থাকতে পারে, এ সন্দেহই হয়নি তার মনে, তাই আমার উপস্থিতি তার দৃষ্টিগোচর হল না মোটেই। মেয়েটি বসেই নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে আপন মনেই বলে উঠলো,—'একটু আগে এসে পড়েছি দেখছি।'

বুঝলাম, মেয়েটি কারুর সঙ্গে নিরিবিলিতে সাক্ষাৎ করবার জন্তেই এসেছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই নির্জ্জন কুঞ্জটিতে।—কে সে?

ঝোপের ফাঁক দিয়ে মেয়েটির খোঁপা আর ব্লাউজটাই দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি মাঝে-মাঝেই তার ভ্যানিটি ব্যাগ বের কোরে প্রসাধনের ওপর একটু-আধটু ফিনিশিং টাচ দিয়ে নিচ্ছিল।

বেশ টের পেলাম, আকাঙ্ক্ষিত আগন্তুকটির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আমার এ স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু হঠাৎ আচম্কা মেয়েটির সামনে দিয়ে চলে গেলে মেয়েটি অসুবিধেয় পড়বে না কি? তাই আসল চিকিৎসার আগে 'ফার্ষ্ট-এড' দেবার মতো আমার উপস্থিতিটা সম্বন্ধে মেয়েটিকে একটা প্রাথমিক আভাস দেবার জন্তে একটা সিগার ধরিয়ে ফেললাম। কাজও হল সঙ্গে সঙ্গেই। মেয়েটি [illegible] যেন ত্রস্ত ভাবে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো। কোনো অবাঞ্ছিত তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাবের গন্ধ পেয়ে ও যেন ভয় পেয়ে গেছে।

ঠিক তখুনি বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্তে বেঞ্চ থেকে উঠে দুই পদক্ষেপে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল মুহূর্ত্তের জন্তে। মেয়েটি বেঞ্চ থেকে পা দু'টো এমন এগিয়ে দিয়ে বসেছে যে, পা না মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বলতে যাচ্ছিলুম—'পা দু'টো একটু সরিয়ে নেবেন কি দয়া কোরে?'—কিন্তু তার আগেই মেয়েটির আতঙ্কিত চোখ দু'টো আমার জুতোর ডগা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আমার দেহ বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার মুখের ওপর এসেই কোন্ এক অজানা বিভীষিকায় কুঁকড়িয়ে গেল। তার পর একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে মেয়েটি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

ব্যাপারটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটে ঘটে গেল যে, ভাল করে সমস্তটা অনুধাবন করবার আগেই মেয়েটি উর্দ্ধশ্বাসে কুঞ্জটা থেকে বেরিয়ে পাথরকুচির সরু রাস্তাটা ধরে ঝড়ের বেগে বাগানের পেছন দিকের দরজাটা খুলে আরো গজ-দশেক দৌড়ে গেল। তার পর হঠাৎ তাকে আর দেখা গেল না।

দৌড়ে এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। দেখলাম, বাগানের দরজা পেরিয়ে গজ-দশেক এগিয়েই সেই পাথুরে জমিটা হঠাৎ যেন খাড়া দিয়ে নিচে নেমে গেছে! প্রায় তিরিশ ফুট গভীর একটা খাদ। ওপর থেকেই হেঁট হয়ে দেখলাম, মেয়েটির দেহটা পড়ে রয়েছে নিচে। মাথাটা প্রায় চূর্ণ হয়ে গেছে···কিন্তু সে বর্ণনা থাক্।

একটি ডাক্তারের ক্লিনিকে নিয়ে তোলা হল মেয়েটিকে। চিকিৎসার খরচটা আপাতত আমাকেই বহন করতে হল। সেই সঙ্গে মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করার ভারটাও আমিই নিলাম স্বেচ্ছায়।

অচৈতন্ত মেয়েটির পকেট থেকে পাওয়া গেল ওখানকারই একটা হোটেলের কার্ড। অনুসন্ধানের সুবিধে হতে পারে ভেবে কার্ডটা পকেটে পূরে নিলাম।

উক্ত হোটেলের প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম যখন, তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। শুনলাম তিনি না কি কোথায় বেরিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। কাজেই হোটেলের সংলগ্ন বাগানটাতেই পায়চারি করতে লাগলুম। কিন্তু কতক্ষণ বা পায়চারি করা যায় এমন ভাবে? শেষ কালে বসে পড়লাম ঘাসেরই ওপরে, সেই অন্ধকারেই। চারি দিকের কিছুই দেখা যায় না ভাল করে;—কেবল মাথার ওপরকার আকাশের উজ্জ্বল তারকা আর আমার হাত-ঘড়িটার রেডিয়ম্ লাগানো জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলো ছাড়া। এমন অন্ধকারে চোখ চেয়ে আবছা দেখতে পাওয়ার চেয়ে চোখ বুজে কিছু দেখতে না পাওয়াও ভাল। তাই চুপ-চাপ চোখ বুজেই বসেছিলাম।

হঠাৎ কানে এল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর,—'কে ওখানে বসে?'

সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। একটা টর্চ্চের তীব্র আলো এসে পড়ল আমার মুখে। তীব্র আলোর রশ্মি ভেদ করে টর্চ্চধারী মানুষটাকে মোটেই দেখা যায় না। চক্ষের নিমেষে সেই আলোর রেখাটা সশব্দে মাটির ওপর পড়ে গেল। তার পর লম্বা আলোর রেখাটা গড়িয়ে গড়িয়ে এক সময় স্থির হয়ে গিয়ে একটা অন্ধকার ইউক্যালিপটাস্ গাছের খানিকটা আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলল।

ব্যাপারটা ভাল করে অনুধাবন করতে না করতেই শুনতে পেলাম একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ আর দ্রুত পদক্ষেপের ক্রম-বিলীয়মান শব্দ। অস্পষ্ট দেখতে পেলাম, একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি বাগান পেরিয়ে হোটেলের ভেতরে ক্ষিপ্রপদে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

দু'-চার পা এগিয়ে ঘাসের ওপর থেকে জ্বলন্ত টর্চ্চটাকে তুলে নিলাম। টর্চ্চের গায়ে খোদাই করা রয়েছে—'প্রোপ্রাইটার, হিল্ সাইড্ হোটেল।'

মনে হল, প্রকাণ্ড একটা অজানা রহস্তের পর্দ্দা যেন সহসা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। যে ব্যাপারটাকে রহস্তের মর্য্যাদাই দিলাম না কোন দিন, আজ সেটা শুধু গভীর একটা রহস্তের রূপ নিয়েই দাঁড়াল না, সেই সঙ্গে তার গভীরতম রহস্তের কৃষ্ণ-যবনিকাটাকেও সরিয়ে দিলে এক লহমায়।

বার বার মনে পড়ে যেতে লাগল দাদার কথা। দাদা? হ্যাঁ, দাদা বৈ কি! হলই বা মাত্র কয়েক মিনিটের বড়, তবু দাদা ত। দাদার জন্মলাভের পর ধাত্রী যখন বসু-মল্লিকদের বাড়ীর সেই নতুন অতিথিটির পরিচর্য্যায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় প্রসূতি আর একটি শিশু প্রসব করলেন। বসু-মল্লিকদের সংসারে একসঙ্গে দু'টি পুত্র উপহার দিয়ে মা চলে গেলেন। মাতৃহীন শিশু দু'টিকে মানুষ করে তুললেন বাবা।

বাবা রায় বাহাদুর ক্ষিতীন্দ্রনাথ বসু-মল্লিক যখন মারা গেলেন, তখন আমাদের দু'টি ভাইয়ের বয়স বাইশ। বাবা মারা যাবার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গুটি কয়েক মোসাহেব বন্ধুদের প্ররোচনায় দাদা হঠাৎ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রস্তাব করে বসল। সেটা যে আমার পক্ষে কতখানি মর্ম্মান্তিক সংবাদ হয়েছিল, তা আজো মনে আছে। শুনে অবধি সারা দিন একা ঘরে বসে-বসে কেঁদেছি আর ভেবেছি, চেহারায় যাদের এতটুকু পার্থক্য দিলেন না ভগবান, মনে তাদের এতখানি অমিল কেন হল?

কিন্তু শেষ অবধি হলও তাই। দাদা পৃথক্ হয়ে গেল, সংসার থেকেই নয় শুধু, মন থেকেও। শুনতে পেতাম তার নতুন খেয়ালের কথা। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কত ওড়াল। খবর একটু-আধটু রাখতুম বৈ কি! হাজার ভাই ত। দাদার সম্বন্ধে শেষ খবর পেয়েছিলাম মাস আগে। খবর পেলাম, সে না কি মাস খানেক আলমোড়াতে এবং সেখান থেকে হঠাৎ এক দিন তার বন্ধুদেরও না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

তার পর থেকে আর কোন খবরই পাইনি। পাবার করিনি।

এবারে আমি যখন আলমোড়ায় আসবার ঠিকঠাক্ করি, অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন,—'এমন অসময়ে আলমোড়ায় কেন?' তখন বলেছিলাম,—'এমনি।'

কিন্তু আজ আমাকে কেন্দ্র করে পর-পর এই দু'টি অদ্ভুত ঘটনা বার পর মনে হচ্ছে, বিধাতা পুরুষ কোন্ এক অজ্ঞাত রহস্তের পর্দ্দা বার জন্তেই বোধ করি আমাকে এখানে টেনে এনে ফেলেছেন। নিরুদ্দেশের রহস্যটা কিছু-কিছু যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। পাল্লা দু'টো খুলে গিয়ে এখন যেন রয়েছে কেবল কাচের সা কিন্তু সার্সির কাচে এখনও ধূলো জমে রয়েছে, পরিষ্কার যাচ্ছে না বাইরের দৃশ্য। সার্সির কাচটাকে মুছে পরিষ্কার হবে।

হিল সাইড হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম হেয়ার কাটিং সেলুনে। চুল আর গোঁফের পরিবর্ত্তন পারলে মুখের চেহারাটারও পরিবর্ত্তন হবে নিশ্চয়ই। না অন্ত ব্যবস্থা করতে হবে। চেহারার পরিবর্ত্তন করাই যে আমার সর্ব্বপ্রধান কাজ।

পরদিন ডাক্তারের ক্লিনিকে গেলাম মেয়েটিকে দেখ সকালে জ্ঞান হয়েছে। ব্যাণ্ডেজের শক্ত বাঁধনে চূর্ণ মাথা কোনক্রমে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফাঁকা একটা অর্থহীন দৃ অলস ভাবে তাকিয়েছিল মেয়েটি সামনের জানলার এতক্ষণে ভাল কোরে দেখতে পেলাম মেয়েটিকে। বয়েস একুশের মধ্যেই মনে হল। ছেলেমানুষ। মুখটি ভারী চোখ দু'টি ডাগর, কিন্তু কেমন যেন বড্ড করুণ। দেখলে মায়া

ধীরে ধীরে মেয়েটির বেড্-এর পাশে গিয়ে বসলুম। নাড়বার উপায় নেই। মেয়েটি কোন রকমে একবার আ মুখের দিকে তাকালো। তার পর ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,—'আপ কি আমাকে পাহাড়ের ওপর থেকে তুলে এনেছিলেন?' তার জবাবের অপেক্ষা না রেখেই আবার বললে,—'হঠাৎ পাহা ধারে বসে থাকতে থাকতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম।' কিছু চুপ কোরে থেকে আবার বললে,—'ভীষণ অম্বলের অসুখ কি না আমার। এর আগেও দু'বার ঠিক ওমনি অজ্ঞান গিয়েছিলাম। তবে সে দু'বারই বাড়ীতে।'

আসল ব্যাপারটাকে একটু ঘুরিয়ে বললুম,—'কিন্তু পাহা নিচ থেকে আমি যেন দেখলাম, আপনি দৌড়তে দৌড়তে সামলাতে না পেরে ওপর থেকে হঠাৎ খাদের মধ্যে পড়ে গেলে তাই নয় কি?'

মেয়েটির মুখটা নিমেষে কেমন রক্তহীন হয়ে গেল। ক্ষীণ

প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—'না, না, ভুল করেছেন আপনি দেখতে। ...ঠিক দৌড়োইনি···দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম···অত দূর থেকে দেখতে আপনার নিশ্চয়ই ভুল ...ছে। শুধু শুধু আমি দৌড়তে যাবো কেন বলুন? তার পর ...াৎ অস্ফুট সুরে বলে উঠলো,—'আমাকে একটু একা থাকতে দিন; ... কষ্ট হচ্ছে।'

সন্ধ্যায় আবার গেলাম ক্লিনিকে। প্রথমেই ডাক্তারটির সঙ্গে ...খা হল। অত্যন্ত বিষন্ন মুখে জানালেন,—'অবস্থা মোটেই ভাল ...। ভয় পাচ্ছি বেশ। দুপুর থেকেই মেয়েটি অপেক্ষা করছে ...পনার জন্তে। বার বার খোঁজ নিয়েছে আপনি এসেছেন কি না। ... যেন বলতে চায়।'

মেয়েটির ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেসে মেয়েটি ...লে,—'আসুন।'

বললাম,—'মাথাটাকে অমন কোরে নাড়াবেন না, ক্ষতি হতে ...রে।'

ক্ষতি?—মেয়েটি হাসলো। মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর সেই হাসি ...নে কোন দিনই ভুলতে পারবো না বোধ হয়।

মেয়েটি আবার বললে,—'বসুন।'

বসলাম।

মেয়েটি বললে,—'আপনি সেদিন ঠিকই দেখেছিলেন।'

'কি?'

'দৌড়তে দৌড়তেই পড়ে গিয়েছিলুম আমি।'

'কেন বলুন তো?

'কেন? আজ আর সে কথা বলতে ভয় নেই।'

'কেন?'

মেয়েটি আবার সেই অদ্ভুত হাসি হাসলো। তার পর বললে,— ...তে পারেন, এ জন্মের পাপের ফল কি আগামী জন্মেও ভোগ ...তে হয়? হলেই বা কি আর করছি! কিন্তু এক দল লোক যদি ...উকে বাধ্য করায় পাপ করতে,—তাহ'লে?' মেয়েটি কেঁদে ফেললে।

জীবনের মেয়াদ যার ফুরিয়ে এসেছে, তার প্রাণে আঘাত দিতে ...োই মন চাইছিলো না। কিন্তু দাদার কথাটা না জেনেই বা ...কি কি কোরে? বাধ্য হয়েই প্রকাণ্ড একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে ... আমাকে। বলে ফেললুম একটু কঠিন স্বরেই,—'বিমলকান্তি ... মল্লিক কোথায়?'

দাদার নামটা শুনেই শিউরে উঠলো মেয়েটি। অস্ফুট স্বরে ... বললে,—'তাঁর নাম আপনি জানলেন কেমন কোরে?'

বললুম,—'সে কথা থাক্, শুধু বলুন সে বেঁচে আছে কি না?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালে,—'না।'

মুখ ফিরিয়ে নিলাম মেয়েটির দিক থেকে। এত দিনে দাদা ...ই পৃথক হয়ে গেল। পৃথিবীতে সে এসেছিল আমার চেয়ে ... কয়েক মিনিট আগে, আর চলে গেল কতো তাড়াতাড়ি!

সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে বাইরে। ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন ...ছে। আলো জ্বলেনি তখনো ঘরে। ফায়ার প্লেসের সঞ্চরমান ...শিখা আমার ছায়াটাকে সামনের দেয়ালে নাড়া-চাড়া করছে। ...টি নার্সকে বাইরে যেতে বললে। নার্স যাবার সময় দরজাটা ...জয়ে দিয়ে গেল।

আমাকে উদ্দেশ্য কোরে মেয়েটি এবার যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে বললে,—'কিন্তু সে এসেছিল!···হ্যাঁ হ্যাঁ, সে এসেছিল ঐখানেই।··· ঠিক তেমনি দামী সিগারের গন্ধে রুমটাকে ভরিয়ে দিয়ে সে এসেছিল।···আমি দেখেছি···আমি তাকে দেখেছি···ঐ যেখানে তার লাশ ওরা পুঁতে ফেলেছিল, ঠিক সেইখানেই।'

ঘুরে দাঁড়ালুম আবার মেয়েটির দিকে। জিজ্ঞেস করলুম,—'ওরা কারা?'—কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম কোরেই বললুম।

'ওরা?'—চুপ কোরে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো মেয়েটি। তার পর হঠাৎ কেমন ধারা হাসলো। তার পর বললো,—'আজ তো আর মৃত্যুভয় নেই আমার।'—আবার কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। তার পর হঠাৎ মেয়েটি বললো,—'ওদের, দলপতি হচ্ছেন আমার মেশো মশাই, হিল সাইড হোটেলের প্রোপ্রাইটার। তাঁর প্রধান সহকারী হচ্ছেন মাসীমা, আর আছে একটা বোবা নেপালী চাকর।

"আমরা খৃষ্টান। মা ছিলেন কলকাতার একটা বিলিতি দোকানের টাইপিষ্ট। শুনেছিলাম, আমার বাবা না কি স্প্যানিশ। বাবাকে দেখিনি কখন। মা'র সঙ্গে না কি তাঁর অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি। হিল সাইড হোটেলের প্রোপ্রাইটার বছরে দু-তিন বার কলকাতায় আমাদের ফ্ল্যাটে মা'র কাছে এসে থাকতেন। ওঃ, কি মদই না খেতেন তিনি! আমার বয়স যখন বার, তখন হঠাৎ এক দিন শুনলুম উনি না কি আমার মেশো মশাই হন্, আর আমাকে না কি কালই ওঁর সঙ্গে আলমোড়ায় চলে যেতে হবে।

"আলমোড়ায় এসে দেখেছিলাম একটি মেয়েকে। তার নাম ছিল ডোরা। হোটেলের ছাদের ছোট্ট খুপরি ঘরটাতে শুয়ে থাকত। বয়স তখন তার সতের হবে। কি একটা অসুখে ভুগছিল সে। যন্ত্রণায় একা শুয়ে-শুয়ে গোঙাত। তখন কিছুই বুঝিনি, পরে বুঝেছি, কি বিচ্ছিরি অসুখে ভুগছিল সে।

"সেই অন্ধকার ছোট্ট ঘরটার মধ্যেই হঠাৎ এক দিন তার ছোট প্রাণটা থেমে গেল। ডোরা আমাকে কত বার তার কাছে ডাকত, কিন্তু মাসীমা কিছুতেই তার ঘরে ঢুকতে দিতেন না। বলতেন,—'না মা, যেয়ো না, বড্ড ছোঁয়াচে অসুখ কি না।'—আজ ভাবছি, যদি কোন রকমে এক দিনও মাসীমাকে লুকিয়ে তার কাছে একটি বারের জন্তেও গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম, তাহলে হয়ত এই দুর্বিসহ জীবনের বোঝা বয়ে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে চলে যেতে হত না। ডোরা কত বার ডেকেছে। ইসারায় আমাকে বোঝাতে চেয়েছে,—'পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও খুকী এখান থেকে।'—মাসীমা বলতেন,—'রোগে ভুগে ভুগে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কি না।'

"তখন কি জানতুম যে, ঐ ডোরার শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্তেই আমাকে আনা হয়েছে কলকাতা থেকে?

"মাসীমা ও মেশো মশাই-এর তত্ত্বাবধানে থেকে দিশী-বিলিতি কত গানই শিখলুম। নাচও শিখলুম অনেক। বিলিতি নাচও বাদ দিইনি। মানে, যে-কোন ধরণের যত বড় পার্টিই হোক্ না কেন, আমাকে বেকায়দায় ফেলার উপায় ছিল না।

"সীজন-টাইমে কত লোক আসে হোটেলে। কত রকমের মানুষ। মাসীমা মক্কেল বেছে আ...প করিয়ে দিতেন। তার পর কিছু দিন বাদেই মেশো মশাই তাঁর নাবালিকা সরলা এই শ্যালিকা

কতাদিন প্রতি সেই হতভাগ্য যুবকের কলঙ্কময় গর্হিত আচরণের দোষারোপ করে আইনের ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায় করতেন।

"এই ভাবে কত যুবকেরই যে সর্ব্বনাশ করেছি!—মাঝে মাঝে আমার ভেতরকার মানুষটা বিদ্রোহী হয়ে উঠত যখন, তখনই ঐ বোবা নেপালী চাকরটার পাহারায় আমাকে বন্দী করে রাখা হত ছাতের সেই ছোট খুপরি ঘরটাতে,—যেখানে ডোরা থাকত। চিৎকার করলে নেপালীটা চাবুক দিয়ে মারত। উঃ, কী বীভৎস তার মুখটা! অর্দ্ধেকটা ঝলসে গেছে আগুনে।

"কিছু দিন ঐ ভাবে থাকবার পর আবার বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করতে হত ওঁদের কাছে। মাকড়সার মত আবার সেই জঘণ্য ষড়যন্ত্রের জাল ফেলতে হত।

"বিমলকান্তি বাবুও ঠিক ওমনি ভাবে পড়লেন আমার জালে। সুপুরুষ চেহারা। বাবরি চুল। বাহারি গোঁফ। বড্ড দামী সিগারেট খেতেন তিনি। প্রত্যেকের মত তাঁকেও এক দিন চরম ঘটনার জন্তে টেনে নিয়ে গেলাম পাহাড়ের ওপরে আমাদের একটা গুপ্ত কুঞ্জ আছে, সেইখানে। প্রত্যেকের বেলায় শেষ দৃশ্যে যা হয়ে থাকে, এবারেও তাই হল। আমার সঙ্গে তিনি যখন একটু বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভদ্র-পরিবারের মুখোস্ এঁটে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে ঢুকলেন মেশো মশাই।

"তার পর এর আগে অন্যান্য শিকারের ভাগ্যে যা ঘটেছে, বিমলকান্তি বাবুর ভাগ্যেও হয়ত তাই ঘটত। অর্থাৎ মোটা কিছু টাকা দিয়ে আইনের ভয় এড়াতে পারতেন হয়তো আর পাঁচ জনের মতোই। কিন্তু হঠাৎ কেমন মাথা গরম করে ফেললেন তিনি। আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে মেশো মশাইকে বলে উঠলেন,—'এ ব্যবসা কতো কাল চালাচ্ছেন? লীলাখেলা যাতে আর বেশী দিন না চলে তার ব্যবস্থা কি করে করতে হয়, আমি ভাল করেই জানি।'—বলেই ঝড়ের মতন বেরিয়ে গেলেন কুঞ্জ ছেড়ে। মেশো মশাইও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

"বাইরে থেকে ওঁদের দু'জনের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলুম; কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম, দু'জনেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

"হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল। আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম, মেশো মশাই আর সেই নেপালী চাকরটা সেই কুঞ্জের ভেতরে একটা জায়গায় মাটি চাপা দিচ্ছে।

"গত কাল অমনি আর একটি শিকারকে ফাঁদে ফেলবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম কুঞ্জের ভেতর। এমন সময় নাকে এল বিমল বাবুর মতই দামী সিগারের গন্ধ। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল; পর-মুহূর্ত্তেই দেখলাম, তিনি স্বয়ং পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার ঠিক সামনেই।—উঃ! সে কী ভয়ানক! ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম পাহাড় থেকে। তার পরের কথা সবই ত আপনি জানেন…।"

মেয়েটি বলতে বলতেই শিউরে উঠল। আর কিছু বলতে পারল না। ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়েছে সে তখন।

সেই রাত্রেই মেয়েটি মারা গেল। তাকে জানাতেও পারলুম না যে, স্বর্গীয় বিমলকান্তি বসু-মল্লিকের ছায়ামূর্ত্তিকে সে দেখেনি সেদিন, দেখেছিল তারই যমজ ভাই অমলকান্তি বসু-মল্লিককে। কি জানি কেন, কেবলি মনে হচ্ছে মেয়েটি বেঁচে উঠলে যেন বড্ড ভাল হত। মেয়েটির জন্যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

আপনি কি জানেন?

১। উত্তর-ভারতের এক ছোট পুলিশ-ফাঁড়ীতে উত্তেজিত জনতা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বলে, অহিংস-সাধক মহাত্মাজী তাঁর ভারত-জোড়া আন্দোলন ত্যাগ করেছিলেন। সেই ইতিহাসবিখ্যাত স্থানের নাম করুন।

২। অতল সমুদ্র কথাটা একান্তই কবি-কল্পনা। জানা গেছে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছেই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা সর্বাধিক। কত আন্দাজ করুন।

৩। অতি শিশুকালে দুরন্ত রোগে দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি হারিয়েছিল মেয়েটি। আজ ছেষট্টি বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর বিস্ময়। বিদুষী মহীয়সী সেই মহিলা কে?

৪। বর্তমান আণবিক যুগেও বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক দক্ষতার কিনারা করা যায়নি। মিশরের মমি তার অন্যতম। ভারতীয় একটি পরিচিত উদাহরণ বলুন তো?

৫। জাভা দ্বীপেই লোক-বসতির ঘনত্ব সর্বাধিক। সেখানে প্রতি বর্গ-মাইলে বাস করে আট'শ সতেরো জন লোক। বাংলা দেশে কত?

৬। দিল্লীর মসনদে একমাত্র সুলতানা কে?

৭। মানুষটির একটি পা ছিল ছোট। অপূর্ব সুন্দর তিনি কবিতা লিখে বিশ্বজয় করেছিলেন। ইংলণ্ডের বাসিন্দা এক দিন স্বদেশ ত্যাগ করে গ্রীক বিদ্রোহে প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি কে?

৮। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কুখ্যাত রাওলাট রিপোর্টে একটি মাত্র বাঙালী সহি দিয়েছিলেন। সেই রাওলাট মিশনের নাম কি?

[উত্তর ৮৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভাগ্যলিপি

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

স্বামী বিবেকানন্দ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এইবার আমরা বাংলার দুই জন মহান্ সন্তানের রাশিচক্রের আলোচনা করিতেছি! ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে দুই জনের পথ বিভিন্ন হইলেও এই দুই মহান্ নেতার সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠে যে সিদ্ধ-বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, নব ভারতের ইহাই হইল দীক্ষামন্ত্র—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর;···ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,······বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই উদাত্ত বীরবাণীই অহিংস মন্ত্রের সাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবনে চরম ব্রতরূপে পরিণত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ নবীন ভারত গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের চিরাচরিত সন্ন্যাসধর্ম্মের মোড় সমাজ-সেবার দিকে ফিরাইয়া দেন। 'রামকৃষ্ণ-মিশন' এই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহাবিপ্লবী সন্ন্যাসীর সে মহান্ স্বপ্ন কিন্তু অল্প ভাবে সফল হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তিনি যখন আইন পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে বিবেকানন্দ (পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে 'পার্লামেন্ট অব রিলিজন্স্' নামক বিশ্বধর্ম্মসভায় তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের মর্ম্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করেন। প্রকৃতপক্ষে জগৎ-সভায় ভারতের ইহাই প্রথম পরিচয়।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান কি ভাবে নবীন ভারতকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস কালের কষ্টিপাথরে এক দিন নির্ণীত হইবে। সেই উদাত্ত আহ্বানে কত যুবক সংসার ছাড়িয়া দেশের সেবায়, জাতির সেবায় আত্মবিলোপ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সন্ন্যাসী শুধু ধর্ম্মনেতা নহেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তিনিই আত্মচেতনা ও ত্যাগমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। যে বাঙ্গালী তরুণ যুবকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিপ্লবের আলোড়নে ভারতের স্বাধীনতা দ্রুত সম্ভব করিয়াছে, তিনি বাংলার দুলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলার এই বীর যুবক সন্ন্যাসী না সাজিলেও নাম, যশ কিংবা পার্থিব ভোগ-সুখের মধ্যে তিনি নিজের শান্তি খুঁজিয়া পান নাই; যৌবনের উন্মেষ হইতেই দেশের মুক্তির স্বপ্নে তিনি বিভোর। বিদেশী শাসকের সহিত যেমন তিনি কোনরূপ আপোষ করিতে পারেন নাই, তেমনি মতানৈক্যের জন্য কংগ্রেসের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেতৃগণের বিরোধিতাও তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার অদম্য তেজস্বিতা কিছুতেই দমিত হইবার নহে। এই লোকপ্রিয় নেতাকে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশ দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'আজাদ-হিন্দ-বাহিনী' গঠন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে তাঁহার উপস্থিতি ও 'আজাদ-হিন্দ-বাহিনী' গঠন করিয়া ব্রহ্ম হইতে ভারতের দিকে তাঁহার অভিযান জগতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর কাহিনী। এই কথা আজ অনস্বীকার্য্য যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় দ্বিতীয় মহাসমরে ইংরেজ, আমেরিকা ও রুশিয়ার মিলিত শক্তি জয়লাভ করিলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে বিপ্লবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই আতঙ্কে ইংরেজ-শক্তি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এখন আমরা উভয়ের জন্ম-কুণ্ডলী বা জন্মকালীন রাশিচক্রের আলোচনা করিতেছি। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃত্ব করেন, তাঁহাদের রাশিচক্র সাধারণতঃ একটু জটিল ধরণের হইয়া থাকে, সাধারণ-দৃষ্টিতে বিচার করিলে এইরূপ রাশিচক্রের অসাধারণত্ব আবিষ্কার করা বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়ে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাজযোগ সৌভাগ্যেরই দ্যোতক। অবশ্য রাজা, মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি প্রভৃতির দ্যোতক যোগাযোগও আছে। দলপতি কিংবা

বহুজনপ্রতিপালক প্রভৃতি যোগও বিচার করা যায়। যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে 'অনফা' নামে একটি বিশিষ্ট যোগ আছে; এই যোগে জাতক প্রভু, নীরোগ, শীলবান্, খ্যাতকীর্ত্তি হইয়া থাকে। 'অধিযোগ' নামক আর একটি বিশিষ্ট যোগ হইলে জাতক রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, বিভবসম্পন্ন, সুখী হইতে পারে। এইরূপ শতাধিক গ্রহযোগ রহিয়াছে। অনফা যোগ—(১) চন্দ্রের দ্বাদশে রবি ভিন্ন গ্রহ থাকিবে; বা (২) চন্দ্রের দশমে রবি ভিন্ন গ্রহ থাকিবে; অথবা (৩) চন্দ্রের নবাংশের দ্বাদশে রবি ভিন্ন গ্রহ থাকিবে। অধিযোগ—চন্দ্রের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র যে কোন প্রকারে থাকিবে। এইরূপ যোগাযোগ অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া নবম ও দশম স্থানের অধিপতি গ্রহগণের অবস্থানও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। ভাগ্যস্থানের অধিপতি ও বৃহস্পতির অবস্থান অনুযায়ীও মানবের ভাগ্য সূচিত হইয়া থাকে। ভাগ্যস্থানে অশুভ গ্রহ থাকিলেও, যদি তাহা তুঙ্গী হয় কিংবা ইহা তাহার স্বগৃহ কিংবা মিত্রগৃহ হয়, তাহা হইলে ফলের কোন হানি হয় না। আবার নবমপতি অর্থাৎ ভাগ্যপতি নবম স্থানে না থাকিলে, যে গৃহে থাকিবে, সেই রাশির অধিপতির উপর ভাগ্য নির্ভর করে। সেই গ্রহ যদি শুভ গৃহগত হন, তাহা হইলে ফলও শুভ হইয়া থাকে। ভাগ্যস্থ গ্রহ তুঙ্গী হইলে শুভ; ঐ গ্রহের উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অতিশয় শুভ হয়। এইরূপ জাতক মহাপুরুষ হইতে পারে।

বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধ—এই তিনটি গ্রহ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় অথবা পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি যদি বুধ অথবা শুক্রের ক্ষেত্রে থাকে কিংবা বুধ ও শুক্রের দ্বারা যুক্ত হয়, অথবা বুধ ও শুক্র এইরূপ অবস্থিত বৃহস্পতিকে দেখে, তাহা হইলে অত্যন্ত প্রবল যোগ হয়। আমরা দেখিতে পাই, বৃহস্পতি দ্বিতীয়ে অবস্থান করিলে স্বভাবতই জন্ম-কুণ্ডলীর ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িবে। বৃহস্পতি পঞ্চমে থাকিলে এইরূপে নবম, একাদশ ও লগ্নস্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িবে। দ্বিতীয় স্থান বা ধনভাবে অর্থ, সম্পদ, বাক্য, ক্রয়-বিক্রয়, দাসদাসী ও ভরণীয়বর্গের চিন্তা করিতে হয়। পঞ্চম স্থানে পুত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, রচনা ও পুণ্যাদি নির্ণীত হয়। নবম স্থানে ভাগ্য, ধর্ম, তপস্যাদি ও দশম স্থানে প্রভুত্ব, রাজ্য, যশ, জীবনোপায় প্রভৃতি বিচার হইয়া থাকে। ষষ্ঠে শত্রু এবং অষ্টমে মৃত্যু, জয়-পরাজয় প্রভৃতি; লগ্ন স্থানে দেহ, চরিত্র ও স্বভাবাদি চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং বৃহস্পতি দ্বিতীয় কিংবা পঞ্চমে থাকিলে সেই অনুযায়ী উক্ত স্থানগুলির শুভ হইয়া থাকে। তার পর বৃহস্পতির উপর পূর্ণ দৃষ্টি দিতে হইলে শুক্রকে এক ক্ষেত্রে নবমে, অপর ক্ষেত্রে একাদশে অবস্থান করিতে হয়। ইহাতেও দেখা যায়, এই দুইটি শুভ স্থান, শুভ গ্রহের অবস্থান হেতু অধিকতর শুভপ্রদ হইবে।

বৃহস্পতির গুণাগুণ চিন্তা করিলে দেখা যায়,—বৃহস্পতি সুরগুরু, ব্রাহ্মণ, সত্ত্বগুণপ্রধান, সদাত্মা ও বিদ্বিজ্ঞ। শুক্র ব্রাহ্মণ, দৈত্যগুরু, নীতিবিদ্ ও কাব্যকলার কারক। দুই জনেই শুভগ্রহ; ইহারা পরস্পর পূর্ণ দৃষ্ট হইলে উভয় ভাবেরই শুভ হইবে। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-কুণ্ডলীতে ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম-কুণ্ডলীতে বৃহস্পতি ও শুক্র পরস্পরের সপ্তমে আছে। বুধ ও শুক্রের যোগও রাষ্ট্রনায়কগণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্ম-কুণ্ডলীতে চতুর্থে বুধ ও শুক্রের যোগ ঘটিয়াছে এবং বৃহস্পতি স্বক্ষেত্র ষষ্ঠে থাকিয়া কর্ম্ম-স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে। মঙ্গল সাধারণতঃ পরাক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যের দ্যোতক। এইরূপ শনি-মঙ্গলের যোগাযোগ জাতককে অত্যন্ত জেদী ও তেজস্বী করে এবং সেই হেতু জাতককে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির একাদশে মঙ্গল ও রবি এবং লগ্নে বৃহস্পতি, নবমে শুক্রের অবস্থান ছিল। মঙ্গল তৃতীয় কিংবা দশম স্থানে থাকিলে অধিকতর শুভ ফল দান করে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর তৃতীয়ে মঙ্গল অবস্থিত।

রাশিচক্র বিচার করিবার সময় আর একটি বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক; তাহা গ্রহগণের সম্বন্ধ-বিষয়ক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে, মিত্রগৃহে কিংবা তুঙ্গ স্থানে অবস্থান করিলে তাহাদের ফল শুভ হইয়া থাকে; গ্রহগণের দৃষ্টির কথাও আমরা আলোচনা করিয়াছি। আপাতদৃষ্টিতে অনেক জন্ম-কুণ্ডলীতে কোনরূপ বিশিষ্ট ভাগ্যের লক্ষণ দেখিতে না পাইলেও সম্বন্ধ-যোগে তাহা অনন্যসাধারণ হইয়া উঠে। এইরূপ সম্বন্ধ চারি প্রকার হইতে পারে: (১) গ্রহগণ পরস্পর নিজ নিজ ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে বিনিময়-সম্বন্ধ কহে। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ। যেমন মেষরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র ও মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র; এখন যদি মঙ্গল মীনরাশিতে এবং বৃহস্পতি মেষরাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে উভয়ের বিনিময়-সম্বন্ধ হইবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-কুণ্ডলীতে চন্দ্র ও বৃহস্পতির এইরূপ বিনিময়-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। (২) গ্রহগণ পরস্পর পূর্ণ দৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধ হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম-কুণ্ডলীতে নবমপতি বৃহস্পতি ও সপ্তমপতি শুক্রের এইরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের তৃতীয় ও ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি ভাগ্যস্থানে অবস্থিত এবং তৃতীয়ে শনি অবস্থিত; এই শনি দেশবন্ধুর চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানের অধিপতি। বৃহস্পতির সপ্তমে শনি থাকায় দেশবন্ধুর জন্ম-কুণ্ডলীতে দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের জন্ম-কুণ্ডলীতে বৃহস্পতির সঙ্গে রবি ও মঙ্গলের এইরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। মঙ্গল ও শনির দৃষ্টি সম্বন্ধে মঙ্গলের চতুর্থে শনি ও শনির দশমে মঙ্গল থাকা আবশ্যক। বরেণ্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম-কুণ্ডলীতে শনি ও চন্দ্রের উক্তরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। (৩) তৃতীয় প্রকার সম্বন্ধ-যোগে উভয় গ্রহের মধ্যে একটি অপরটিকে দেখিবে, অথচ নিজে অপরটি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবে না; এইরূপ সম্বন্ধ ঘটিলে উভয় গ্রহের মধ্যে একটি অপরের ক্ষেত্রস্থ হওয়া আবশ্যক। স্যার আশুতোষের জন্ম-কুণ্ডলীতে শনি ও বুধ এই সম্বন্ধে আবদ্ধ; শনি বুধের ক্ষেত্র কন্যারাশিতে আছে, এবং বুধ মিথুনরাশিতে আছে। (৪) গ্রহগণ এক রাশিতে পরস্পর মিলিত হইলে চতুর্থ প্রকার সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত চারি প্রকার সম্বন্ধ বিচার করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র এবং লগ্নের নবম ও পঞ্চম স্থানকে ত্রিকোণ বলা হয়। কেন্দ্র ও কোণপতির সম্বন্ধই বিশিষ্ট ভাগ্যের দ্যোতক। ইহাতে সম্পদ, পরাক্রম, শ্রী ও যশ প্রভৃতি সমস্তই বুঝায়। লগ্ন ও পঞ্চমপতি, চতুর্থ ও পঞ্চমপতি, সপ্তম ও পঞ্চমপতি, দশম ও পঞ্চমপতি—

কেন্দ্রপতির সঙ্গে কোণপতির এই কয়েক প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। আবার নবমপতির সঙ্গে কেন্দ্রপতির এইরূপ কয়েকটি সম্বন্ধ ঘটিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, কেন্দ্র ও কোণপতির সম্বন্ধই বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক। লগ্ন হইতে চতুর্থ, চতুর্থ হইতে সপ্তম—এইরূপ পর পর স্থানগুলি অধিকতর গুরুত্বশীল। সুতরাং দশমপতি ও পঞ্চমপতি কিংবা নবমপতি ও দশমপতির সম্বন্ধ অধিকতর বলবান্। এইরূপ কেন্দ্র কিংবা কোণপতি দুঃস্থানের অধিপতি হইলেও সম্বন্ধ-যোগের ফল কোন না কোন সময় জীবনে প্রতিফলিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ধনু লগ্নে জন্ম। লগ্নে রবি অবস্থিত। এই রবি তাঁহার নবম স্থান বা ভাগ্য-ধর্মস্থানের অধিপতি। এই রবি ধর্ম ও কর্মের কারক। লগ্নে রবির অবস্থান নিশ্চয়ই তাঁহার দেহ-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পৌষ মাসে স্বামীজির জন্ম, এই মাসে ধনুলগ্নেই রবির উদয়; সুতরাং রবি অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় আছেন। এই সময়ে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে আত্মস্থ করিতে সহায়তা করে। পৃথিবীর মগ্ন অবস্থা মানুষকে পার্থিব-বিলাসের নশ্বরতার আভাস দেয়। এই সময়ে জাতব্যক্তিগণ স্বভাবতই একটু চিন্তাশীল হইয়া থাকেন; অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থা অনুকূল না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক ও উপদেষ্টার ভাব দেখা যায়। ধনুলগ্ন বৃহস্পতির ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে আবার রবি রহিয়াছে; সুতরাং বিবেকানন্দের মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও দর্শনাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রতিভা থাকিবার কথা। অনুকূল রবির জন্য তাঁহার আত্মা দীপ্ত, তিনি মহত্ত্বে গরীয়ান্, তাঁহার মুখে জাগরণের বাণী; জগৎকে জাগাইবার জন্যই তাঁহার জন্ম। জড়তা ত্যাগ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইতে বিবেক-বাণীর আহ্বান। স্নিগ্ধ সৌরকরে তাঁহার বাণী স্নিগ্ধ। তাঁহার লগ্ন ও চতুর্থ স্থানের অধিপতি বৃহস্পতি একাদশ স্থানে অবস্থিত। একাদশস্থ বৃহস্পতি পঞ্চম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছে এবং পঞ্চমের অধিপতি মঙ্গল স্বস্থানে পঞ্চমে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্থানে বুধ ও শুক্রের অবস্থান জাতককে বাগ্মী ও সত্যবাক্ করিয়াছে। ধর্মপাত রবি বলবান, একাদশে লগ্নপতি বৃহস্পতি ও দ্বিতীয়স্থ শুক্র বিবেকানন্দকে সংসার-ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ধর্মের দিকে টানিয়াছে। ষষ্ঠস্থ কেতুও মানুষকে যোগী করিয়া তুলে। বিশেষতঃ সপ্তমাধিপতি বুধ সপ্তমস্থানকে মোটেই দেখিতেছে না; এবং পত্নীকারক গ্রহ শুক্রেরও ঐ স্থানে দৃষ্টি নাই, সুতরাং বিবাহ হইতে পারে নাই। অষ্টমাধিপতি চন্দ্র শনিযুক্ত হওয়ায় আয়ুযোগও প্রবল হয় নাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম-কুণ্ডলী একটু স্বতন্ত্র ধরণের। মেষলগ্নে তাঁহার জন্ম। মঙ্গল দ্বিতীয়ে অবস্থিত; রবি পঞ্চমের অধিপতি, কিন্তু তাহার অবস্থান এস্থলে মকর রাশিতে। বৃহস্পতি নবম স্থান বা ভাগ্য স্থানের অধিপতি; বৃহস্পতি এখানে পঞ্চমে অবস্থান করিতেছে; সপ্তমের অধিপতি শুক্র একাদশে আছে; বৃহস্পতি ও শুক্রের পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। মঙ্গল পরাক্রমের কারক; নেতাজীর দশম পতি বা কর্মপতি শনির সঙ্গে লগ্নপতি মঙ্গলেরও দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিয়াছে। এই গুলিই তাঁহার জন্মকুণ্ডলীর বিশেষত্ব। সাধারণভাবে বিচার করিলেও পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি জাতককে অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা-সম্পন্ন করিবার কথা। তাঁহার বুদ্ধি নির্মল, তাঁহার আত্মা সত্ত্ব গুণ-প্রধান; তিনি উদার ও নির্ভীক। মঙ্গলের প্রভাবে তিনি বীরকীর্ত্তি; বৃহস্পতি ও রবির জন্য তাঁহার অতুলনীয় আত্মত্যাগ, শুক্রের জন্য তিনি রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ। অনফাযোগে তাঁহার জন্ম, তিনি নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, বাগ্মী, বিনীত, বিখ্যাত-কীর্ত্তি, ও বহুগুণযুক্ত। চারিটি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে তাঁহার জীবন রহস্যপূর্ণ, এ জীবনে বহু অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। শৌর্য্যের আধার মঙ্গলের ক্ষেত্রে তাঁহার জন্ম; এই মঙ্গল বৃহস্পতিকে দেখিতেছে, আবার মৃত্যু ও ভাগ্য-স্থানকে দেখিতেছে; মঙ্গল তাঁহাকে প্রাণ থাকিতেও অবনমিত হইতে দিবে না। বিভিন্ন-ধর্মী গ্রহের প্রভাবে এই মহান্ পুরুষ আপনার হৃদয় ও শৌর্য্যের প্রভাবে জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারেন। মঙ্গল আবার তাঁহার বাক্ স্থানে অধিষ্ঠিত; তাঁহার বাক্য-প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মী মানব একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে; তিনি সুরে ও অসুরে মিলন ঘটাইতে পারেন। আত্মত্যাগ ও প্রেমই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। দশমস্থ রাহু তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই; শুধু কাজ আর কাজ; কাজের জন্য এরূপ জাতক সুখে শয়ন করিবারও অবসর পায় না। এরূপ জাতকের জীবন সহজে শেষ হয় না; শনি তাঁহার মৃত্যুকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখে। মহীয়ান্ ভবিষ্যৎ তাহা সপ্রমাণ করিবে।

শামসুদ্দিন

বৎসরের এল শেষ দিন
গেল মাস সবুজ রঙীন
বরষার নৃত্যময়ী রূপ
শরতের কনক ভূষণ
কালের কপোলতলে
একে একে হ'ল বিস্মরণ।
মুঞ্জরিত মাধবী বিতান
স্মৃতি-ভারে হ'ল ম্রিয়মাণ।

জানি তবু পাতা-ঝরা গানে
মাটির অঙ্কুর জাগে প্রাণে।
রসে রসে নব শষ্পদল
আকাশের রূপ হেরিবারে
গুঞ্জরিবে মঞ্জু-ছায়া তলে
অনাগত প্রভাতের দ্বারে।
রাত্রির তপস্যা আনে দিন
নহে কিছু আঁধার মলিন।
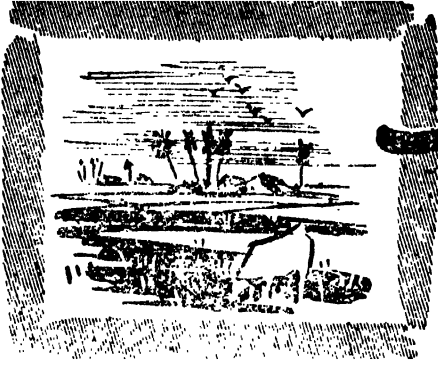
নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : "বাঙ্গালী যে আজ শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালী অর্থোপার্জ্জনের এই পথটিকে চিরদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ সাধারণ বাঙ্গালীর মনে একটি ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য বড় কঠিন ব্যাপার। অথচ ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যাহারা এবং যে সকল সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রচুর সার্থকতা ও প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহারা কেহই খুব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান বা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন নহে। আমাদের যুবকগণকে আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, তাহারা যদি সকল দুর্বলতা ও পরাজয়ের ভাব ত্যাগ করিয়া সাহস ও নিষ্ঠার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পকে জীবিকা অর্জনের পথ বলিয়া আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে যে বুদ্ধি, সততা এবং শিল্প-নিপুণতা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিলে বাঙ্গালী সহজেই শিল্প-জগতে সফলতা লাভ করিতে পারিবে।" কথাগুলি সত্য সত্যই সকল বাঙ্গালীর গভীর চিন্তার যোগ্য। কেবল চিন্তা নহে, বাস্তব ক্ষেত্রে কি করা যাইতে পারে, তাহাও অবিলম্বে স্থির করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* * * *

বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালার বাহিরে যে-ভাবে বাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে, তাহাতে এখন আর বৃথা বসিয়া থাকিবার সময় নাই। কলিকাতা শহরে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাঙ্গালী প্রাধান্য চোখে পড়ে। ইহার জন্য অবশ্যই আমরা অবাঙ্গালীর দোষ দিব না, দিতে পারি না। আপন হাতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা যদি যথা-সর্ব্বস্ব পরকে বিলাইয়া দি, তাহা হইলে পর কেন তাহা লইবে না ?

* * * *

বাঙ্গালী যুবক এবং ছাত্র-সমাজের দৃষ্টি এখন ব্যাপক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি দিতে হইবে। কেবল চাকরীর প্রতি নজর রাখিয়া চলিলে অদূর কালে বাঙ্গালীদের অবস্থা কি হইবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সরকারী বা বেসরকারী চাকরী শতকরা কয় জন লোক পাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকের দল কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, কলিকাতার অবাঙ্গালী সামান্য পানওয়ালা, আলুওয়ালা প্রভৃতি ছোট ব্যবসায়ীর দল মাসে কত রোজগার করে এবং কত টাকা প্রতি মাসে বাঙ্গলার বাহিরে, বিশেষ করিয়া যে-সব প্রদেশে বাঙ্গালী আজ বি... ভাবে মার খাইতেছে, সেই সব প্রদেশে প্রেরণ করিতেছে ? এই সামান্য হিসাব দিতেছি :

পূর্ব্ব-কলিকাতার কোন একটি সাব-পোষ্ট আপিস হইতে প্রতি মাসে একদল পানওয়ালা, আলুওয়ালা প্রভৃতি প্রায় ১৭৫০০ টাকা বিহার প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করে। এই হিসাব ছাড়া ঠেলাওয়ালা, রিক্সওয়ালা, আলুকাবলিওয়ালা প্রভৃতি জন-প্রতি প্রায় মাসে প্রায় ৪০।৫০৲ টাকা করিয়া বাঙ্গালার বাহিরে নিজ-নিজ প্রদেশে প্রেরণ করে। সামান্য একটি অঞ্চলের কথা এই ; এখন এক বার ভাবিয়া দেখুন, সমগ্র এই কলিকাতা সহর হইতেই প্রতি মাসে খুচরা এবং ছিটকে ব্যবসায়ীরা কত লক্ষ টাকা বাঙ্গলার বাহিরে প্রেরণ করিতেছে! অথচ খাস্ বাঙ্গালায় বাঙ্গালী বেকার কত লক্ষ, তাহা জানি না!

* * * *

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অবান্তর হইবে না। পাঞ্জাব প্রভৃতি দূর স্থান হইতে কলিকাতায় বহু বাস্তুত্যাগী আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নগণ্য দু'-এক জন ছাড়া আর কেহই ৪০৲।৫০৲ টাকার চাকরীর জন্য ছোট-বড় আপিসের দরজায় দরজায় বৃথা ঘুরিয়া মরিতেছে না। প্রায় সকলেই কোন-না-কোন ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে কাহারও গোলামী না করিয়া। কিন্তু অপর দিকে হাজার হাজার বাঙ্গালী বেকার যুবক সামান্য চাকরীর জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান প্রভৃতি করার কথা—নগণ্য দু'-এক জন ছাড়া কেহই চিন্তা করিতেছে না। প্রতিকার কি—মুক্তি কোন্ পথে—তাহা অন্য কেহ বলিয়া দিতে পারে না। সমস্যা আমাদের। সমাধান-সন্ধান আমাদেরই করিতে হইবে।

* * * *

অনেকে বলিবেন, বাঙ্গালী কোন্ সম্বলে, কি ভরসায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে পা বাড়াইবে ? কিন্তু ডাঃ রক্ষিত জবাব দিয়াছেন : "বাঙ্গালীর হাতে অধিক মূলধন নাই, সুতরাং বাঙ্গালী যুবকগণের পক্ষে কোন বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তুলিবার কার্যে হাত না দিয়া বাঙ্গালার মৃতপ্রায় কুটির-শিল্পগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করাই অধিক সঙ্গত। তাহা ছাড়া এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প

আছে, যাহা সামান্য পুঁজি লইয়া আরম্ভ করা যায়।" এমন অনেক শিল্প-ব্যবসা আছে যাহাতে প্রথমে টাকা কম লাগে, সেই সব ব্যবসায়ে বেকার বাঙ্গালী যুবক আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এ বিষয় সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে প্রচুর। পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারের নব-নিযুক্ত প্রচার-অধ্যক্ষ শ্রীঅমল হোম, সরকারী প্রচার বিভাগকে এই দিকে কাজে লাগাইতে পারেন। কেবল গবর্ণর, মন্ত্রী এবং অন্যান্য বড় বড় সরকারী কর্ত্তাদের বাণী এবং ছবি প্রচার করিয়া প্রদেশ বা দেশের লোকের কোন প্রকার হিতসাধন করা যাইবে না।

* * * *

'বীরভূম-বাণী' যখন বলেন:—"শুধু শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তর, শিক্ষা-বিভাগ, শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদি গঠন এবং বহুক হাজার বৈতনিক বা অবৈতনিক গ্রাম্য-বিদ্যালয় খুলে দিলেই যে জাতি শিক্ষিত হবে, তা নয়। শিশুর শূন্য মনে প্রথমে যে ভাব প্রবেশ করবে, তাই তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। সুতরাং শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম কথা বোর্ড গঠন, বিভাগ গঠন ইত্যাদি নয়। শিক্ষা দানের ব্যবস্থাটা সুচারু হলেই যে শিক্ষা হবে, তাও নয়,' সবটাই নির্ভর করবে শিক্ষার বিষয়-বস্তু এবং তার আদর্শের উপর। কি শিক্ষা দেওয়া হবে, সেইটাই মুখ্য, বাকি প্রণালীগুলি গৌণ।" এই মন্তব্যের সহিত আমরা যোগ করিয়া দিব—"প্রচার-মন্ত্রীর দপ্তর, সরকারী বেতার কেন্দ্র এবং সরকারী ইনফরমেশন দপ্তর।" কেবল দপ্তর বৃদ্ধি বা স্থাপন করা 'এন্‌' হইলে লাভ কি হইবে? দপ্তরগুলিকে 'মিনস্ টু এন্ এণ্ড' বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই মত কার্য্য করা দরকার।

* * *

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন কালে 'বীরভূম-বাণী' বলেন:—"অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স করা হয়েছে সাত বৎসর। কোন ছয় বৎসরের বালককে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না করবার সরকারী নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দ্দেশের যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না। পল্লীগ্রামে যে বালক চারি বৎসরে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হবে, তাদের দুই বৎসর বেকার রাখিলে দুই বৎসরের পাঠ-বিমুখতার বদভ্যাস বালকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করবে, সেটা অপসারণ করতে সময় লাগবে। আর প্রথম জীবনের এইটি মূল্যবান বৎসর এই ভাবে নষ্ট হওয়া জাতির পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হলে একটা নিম্নতম বয়স থাকা প্রয়োজন; কিন্তু সেটাও পাঁচ বৎসর হওয়া দরকার। শিক্ষা গ্রহণেরও স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে অনেক ছাত্র অল্প বয়সেই অনেক কিছু আয়ত্ত করবে, সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই বয়সের গণ্ডী দেওয়া আমরা ভাল মনে করি না। আশা করি, শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে বিবেচনা করবেন।" প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে আমাদের মত সহযোগীর সহিত এক। জোর করিয়া যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রীকে চার, পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (অবৈতনিক) প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা বুঝিলাম না। অথচ এই বয়সে 'অবৈতনিক' যে-কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐ ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছামত ভর্ত্তি হইতে পারিবে! অন্যান্য নানা বিষয়ে যেমন পাকা হাতের কাঁচা নিয়ন্ত্রণ সরকার বাহাদুর চালাইতেছেন, শিক্ষা বিষয়েও কি তাহাই করিতে চাহেন? এ বিষয় আমরা মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, কারণ মন্ত্রিমণ্ডলীতে শিক্ষা বিষয়ে বুঝিতে এবং কথা বলিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সারা দেশেও খুব কম আছে।

* * * *

'বর্দ্ধমানের ডাক' হইতে একটি বিষয় সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি:—"চোরাকারবার ও সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার অজুহাতে যে ডি-পি এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছিল, পুনরায় কেন তাঁহাকে বহাল করা হইল? জেলাবাসীর স্বার্থের খাতিরে এই পুনর্নিয়োগের কারণ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা উচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। গত বৎসর যে মাসে মেমারী থানা পুলিশের অভিযোগ অনুযায়ী XXIV ৪৩ আইনের ৭ ধারা মতে ১(১২)৪৭ নম্বরের যে দুর্নীতি-বিষয়ক মামলা বর্দ্ধমানে রুজু হইয়াছিল, তাহাতে এই জেলার দুই জন প্রাদেশিক কংগ্রেস সদস্য জড়িত ছিলেন; কিছু দিন পরে স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশক্রমে ঐ মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কেন?" আশা করি, ব্যাপারটি কি তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রকার বহু ঘটনার কথা আমাদের কানেও আসে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মন্ত্রিমণ্ডলীর ছোট-খাট মামলা এবং দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সকল সময় সম্ভব নহে। কিন্তু ছোট-খাট ব্যাপারই বহু ক্ষেত্রে বৃহৎ কাণ্ডের সূত্রপাত করে। তথাকথিত বহু কংগ্রেসী নেতা দেশের শাসন ব্যাপারে কি ভাবে হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলীর জানা দরকার। পশ্চিম-বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। 'দলীয় স্বার্থ' এবং লাভ-ক্ষতির বিষয় না ভুলিলে কোন কাজ হইবে না।

* * * *

কয়েক মাস পূর্ব্বে সর্দ্দার প্যাটেল বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে কতকগুলি নিষ্ঠুর উক্তি করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালা কেবল কাঁদিতেই জানে। বাঙ্গালায় নিরীহ এবং দরিদ্র শিখদের ট্যাক্সী এবং বাসের লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে না! বাঙ্গালী জাতি প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন, এমন ইঙ্গিতও সর্দ্দারজী করেন। কিন্তু হঠাৎ সর্দ্দার প্যাটেল বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সদয় হইয়া বলিতেছেন:—"যদিও দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অখণ্ডই রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে দেশকে কেহই বিভক্ত করিতে পারিবে না।" কথাগুলি অতি মহৎ আদর্শমূলক। তার পর তিনি বলেন:—"একদা বাঙ্গালা দেশের নিকট হইতেই আমরা রাজনৈতিক স্বপ্ন-সুধা পান করিয়াছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের যে সকল বিরাট পুরুষ নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা অনুপ্রেরণা পাইয়াছি। আধুনিক কালে বাঙ্গলা দেশ যে দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহা কি বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর? ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস কে বিস্মৃত হইতে পারে? যে দুঃখ ও দুর্গতি নোয়াখালি ভোগ করিয়াছে, তাহাই কি ভুলিতে পারা যায়? নোয়াখালিতে বসিয়াই গান্ধীজী "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং সে আদর্শের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। দেশ বিভাগের দিন হইতে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত এক ও অখণ্ড রহিয়াছে

এবং সম্ভবতঃ অনাগত বহু শতাব্দী এক ও অখণ্ডই থাকিবে—এ অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রাদেশিক বিরোধ কি ভাবে দেখা দিতে পারে?" এই সকল নিখিল ভারতীয় প্রেম-মূলক বাণী শ্রবণ করিয়া কোনও বাঙ্গালীর প্রাণে পুলক শিহরণ জাগিবে কি না জানি না। সাধারণ ভাবে সর্দারজীর বাণী হয়ত সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাতে কোন আশা বা আনন্দ আমরা পাইলাম না। বাঙ্গলার দুঃখে ত সর্দারজীর প্রাণ হঠাৎ কাঁদিল, কিন্তু বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের বাঙ্গালী-বধ বন্ধ করিবার জন্য তিনি কি করিলেন? বাঙ্গলার চোরাই অঞ্চলগুলি পুনরায় বাঙ্গলাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কেন্দ্র-নেতা হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর প্রতি কোন্ সুবিচার করিলেন? ভারতবর্ষ না হয় এক এবং অখণ্ডই রহিল, কিন্তু বিভক্ত বাঙ্গলার পশ্চিম অংশ আজ কোন্ অপরাধে মানভূম, ধলভূম, সিংভূম প্রভৃতি বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি হইতে এখনো বঞ্চিত রহিল? কথায় বলে—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী যদি প্রাণেই না বাঁচিল, তাহা হইলে অখণ্ড ভারতের গৌরব এবং মহত্ত্ব আমাদের প্রাণে কি আনন্দ দান করিবে?

* * * *

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তহারাদের বিষয়ে সর্দারজী বলিতেছেন যে:—"যাহারা বাস্তহারাদের দুঃখ-কষ্টকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে, তাহারা বাস্তহারাদের কোনই কল্যাণ সাধন করিতেছে না। এক শ্রেণীর লোক যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, তাহা যে প্রকৃত সহানুভূতি নহে, যথাসময়ে তাহা প্রমাণিত হইবে। যে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে, সে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া লক্ষ লক্ষ গৃহহীন নরনারীর কথা বিস্মৃত হইতে পারে বা তাহাদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তিতে কাল কাটাইতে পারে? কিন্তু প্রবল ঝড়ের সম্মুখে মানুষ হয়ত শক্ত চেষ্টা করিয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। কেহ যেন এ কথা মনে না করেন, গবর্ণমেণ্ট সমগ্র সমস্যাটিকে এড়াইয়া চলিতেছেন। সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইতেছে। বাস্তহারাদের দুঃখ-দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতে পারে, এমন কিছুই করা উচিত হইবে না। যাহার দেশপ্রেম বা মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, সে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না।" নাক ঘুরাইয়া শরৎ সি বসুকে গালাগালি করিয়া কোন লাভ হইবে না বাস্তহারাদের প্রতি শরৎ বাবুর দরদ যে মতলবী দরদ, তাহা এখনো সর্দারজী প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মৌখিক দরদ দেখানো ছাড়া বাঙ্গালী বাস্তহারাদের বিষয় সর্দারজী তথা কেন্দ্রীয় সরকার এমন বিশেষ কিছুই করেন নাই, যাহাতে তাঁহারা বাহবা দাবী করিতে পারেন। অবাঙ্গালী বাস্তহারাদের তাঁহারা বিহার, এমন কি বাঙ্গলার বহু স্থানেও বসবাসের সুবিধা দিয়াছেন বলিয়া শুনি; কিন্তু এক আন্দামানে ছাড়া কয় জন বাঙ্গালীকে তাঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পাঠাইয়াছেন? প্রকারান্তরে তাঁহারা এ বিষয়ে সর্ব্ব-দায়িত্ব বেচারা গরীব পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন: বাঙ্গালী এখনো নিরীহ আছে, তাই তাহাদের এ চরম দুরবস্থা!

* * * *

বিহার হইতে বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালী বিতাড়নের নীতির প্রতিবাদকল্পে মানভূমে আগামী ৬ই এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইবে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গালী-মহলে ইহার জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে। মানভূম জেলা লোকসেবক-সংঘের সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ইহাতে নেতৃত্ব করিবেন—অবশ্য যদি নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে তিনি কারারুদ্ধ না হয়েন। শ্রীযুক্ত ঘোষ এক বিবৃতিতে বলিতেছেন:—"মানভূমের জনগণকে (বাঙ্গালী) আজ নানা রকমে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাদের নৈতিক বল নষ্ট করিয়া, তাহাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ আনিয়া, তাহাদের এক বিশৃঙ্খল জীবনের পথে প্ররোচিত করিয়া মানভূমে এক প্রচণ্ড অরাজকতা আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে।" বলা বাহুল্য, বিহার সরকার এই কার্য্যে গোপন এবং মৌন সমর্থন জানাইতেছেন। কয়েক জন বিহারী কংগ্রেসী নেতা বাঙ্গালীদের বন্দুকের গুলীতে ঠাণ্ডা করিবার হুমকীও দিয়াছেন। বিহারী মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালীদের প্রতি পরম বিদ্বেষে কাউন্সিল-চেম্বারে প্রকাশ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারী নেতারা মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের হুমকীতে বাঙ্গালী ভীত হইবে এবং নিজেদের 'Bengalee Speaking Biharee' হইতে পুরাপুরি Hindi speaking Bihareeতে পরিণত করিবে।

* * * *

মানভূমে যে নাটকের অভিনয় হইতে চলিয়াছে, সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীর দায়িত্ব এবং অংশ সেই নাটকে কম নহে। সরকার আইন করিয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে পারেন না। অন্ততঃ কংগ্রেসী সরকার তাহা কখনই করিবেন না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে মানভূমের বাঙ্গালী আজ চলিবার সংকল্প করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালীকে এই মহা সংগ্রামে যোগদান করিতে হইবে। সত্যাগ্রহ সংগ্রাম যদি প্রচণ্ড এবং দেশব্যাপী হয়, তাহা হইলে বিহার হইতে বাঙ্গলার চোরাই অঞ্চল মানভূম, ধলভূম, সিংভূম (টাটা নগর সমেত) পুনরায় বাঙ্গলায় ফিরাইয়া আনিতে বিলম্ব হইবে না। বিহারী অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া বাঙ্গালী যদি আর সহ্য করে, তাহা হইলে আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীদের আজ না হয় কাল দেশে হতমান হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। এখন আর বৃথা আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের সময় নাই। বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে নৈতিক যুদ্ধ সকল সময় ফলপ্রদ হয় না। কথায় বলে—'যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।'—এ প্রবাদ-বাক্যের মূল্য আমাদের জাতীয় জীবনে আজ বড় কম নহে।

উত্তর

১। চৌরী-চৌরা।
২। প্রায় পৌনে সাত মাইল।
৩। হেলেন কেলার।
৪। দ্বিতীয় মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ।
৫। ৭৭১।
৬। রিজিয়া।
৭। বায়রণ।
৮। পি. সি. মিত্র।

কোঁচদের চড়কপূজা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

এক সময়ে শিব ছিলেন আসমুদ্র-হিমাচল মহাভারতের মহেশ্বর। বেদে তিনি মাত্র অগ্নিরূপে উল্লিখিত হইলেও পরবর্ত্তী সহস্র সহস্র বৎসরের সাহিত্যে,—রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি ধর্ম্মসংহিতায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি-পুস্তকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়নে শিবপ্রসঙ্গ, শিবের মাহাত্ম্য এবং স্তব-স্তুতি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে ভাবে শৈবধর্ম্ম ভারতের একচ্ছত্র-প্রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এক সময়ে শিব শুধু মহেশ্বরই ছিলেন না, আচণ্ডাল-দ্বিজ সর্ব্ব-সাধারণের তিনি হৃদয়েশ্বরও হইয়া উঠিয়াছিলেন; সকলের স্তব-স্তুতির অগ্রভাগ তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। 'ধান ভানতে শিবের গীত' বাংলায় এই প্রবাদ-বাক্য তাঁহারই কথা-কাহিনীর এক কালের লোকপ্রিয়তার ও বহু-বিস্তৃতির সাক্ষ্য প্রদান করে।

কিন্তু শিবের স্থান, শিবের প্রভাব যে আজ ভক্ত-হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। ভারতে এমন জনপদ অতি অল্পই আছে, যেখানে একটিও শিবালয় নাই বা শিবের পূজা-অর্চনা হয় না। আজও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বারাণসীর অধীশ্বর 'বাবা বিশ্বনাথ'; আজও শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ কালীঘাটে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করেন,—'নকুলেশ্বরায় ভৈরবায় নমঃ'; আজও পল্লীর পাঁচ বৎসরের কুমারীরা শিবের মাথায় জল ঢালিয়া ছড়া বলে,—'শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অক্ষরে ধরে—;' আজও বহু সতী মৃত পতির অক্ষয় শিবলোক কামনায় শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; আজও শিব-চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাসে সারা দেশে সাড়া পড়িয়া যায়; আজও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার দিকে দিকে বিরাট পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এখানে-ওখানে মেলা বসে। বস্তুতঃ এই ভোগ-বিলাস এবং ঐশ্বর্যের যুগে বিচরণ করিয়াও হিন্দু ভুলিতে পারে নাই তাহার আদর্শ দেবতা,—কটিবাসপরিহিত সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর।

শিবের চৈত্রোৎসবই শিবভক্তদের সর্ব্ব-প্রধান উৎসব। কিন্তু এই উৎসবে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ধনী ও শিক্ষিত হিন্দুদের অপেক্ষা তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর দীন-দরিদ্র, অশিক্ষিত, কোঁচ, কৈবর্ত্ত, হদি, বাগদী, নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী প্রভৃতি হিন্দুদেরই অধিক উৎসাহ এবং আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অতুল ঐশ্বর্যশালিনী রাজ-রাজেশ্বরী ভবানীর উৎসবে 'কাঙালিনী মেয়ে' যেমন দূর হইতে তাহার ভক্তি-প্রণতি জানায়, অনাড়ম্বর অসামাজিক দরিদ্রবেশ আশুতোষ শঙ্করের উৎসবেও তেমনি অভিজাত ভক্তেরা অন্তরালে থাকিয়াই ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে। সঙ্কোচ উভয়েরই উভয় স্থানে অপর সকলের সঙ্গে উৎসব-মত্ত হইতে বাধা দেয়। এক জনের সঙ্কোচ দারিদ্র্যের, আর এক জনের সঙ্কোচ ঐশ্বর্যের! এ সঙ্কোচ থাকিলে উৎসব চলে না, নীরবে উপাসনাই চলে।

শিবোৎসব বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মালদহ, রংপুর, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে 'গম্ভীরা-উৎসব', চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে 'শিবের গাজন' ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে 'চড়ক পূজা'—এইরূপ বিভিন্ন নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। স্থানভেদে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অল্প-বিস্তর পার্থক্যও যে না আছে, তাহা নয়। এই সুপ্রাচীন শিবোৎসবের ভিতর দিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনের ইতিহাসের একটি বিশেষ ধারা ফল্গু প্রবাহের ন্যায় বহিয়া আসিয়াছে। এই বিষয়ে আমার পূর্ব্বগামী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত তাঁহার 'আদ্যের গম্ভীরা' পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন। ইতিহাস-সাহিত্যের মাটি-কাটা মজুর হিসাবে আমি এখানে শুধু পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ জেলার আলাপসিং ও রণভাওয়াল পরগণার কোঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চড়কপূজা বা শিবোৎসবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। একবার ইহাদের এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সব বিষয় দেখিবার ও শুনিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

কোঁচদের পরিচয়

স্থানীয় লোকদের নিকট কোঁচেরা 'মাস্কাই' নামে পরিচিত। উহারা সাধারণতঃ 'শঙ্করদাস' উপাধি ব্যবহার করে। কৈলাসনিবাসী শঙ্করের তাহারা বংশধর, এই ধারণা তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে। শিবই তাহাদের সর্ব্ব-প্রধান দেবতা, ইঁহার পূজা করিলে অন্য দেবতার পূজার আবশ্যক করে না। ইহাদের আর একটি পূজা 'গ্রাম পূজা'। প্রতিবেশী অন্যান্য হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকিয়া ইহারা বৎসরে একবার কালী পূজা এবং শীতলা পূজাও করিয়া থাকে। মৃতাশৌচ অপেক্ষা জাতকাশৌচই ইহাদের মধ্যে প্রবল; কোন বাড়ীতে সন্তান জন্মিলে শুধু জ্ঞাতিরা নহে, সগোত্র প্রত্যেকেই সেই অশৌচ গ্রহণ করে। ইহারা বর্ত্তমানে বড়ই দুরবস্থার মধ্যে আছে; অনেকেরই চাষ আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত খামার নাই; এক সময়ে ইহারা জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিত, জমিদারের কাছারীতে পাইক-পেয়াদা হইত, চৌকিদারী চাকুরি পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সব সুযোগ-সুবিধা আর নাই; বাঁশের কাজ ও কাঠের কাজ ইহারা ভাল জানে; কিন্তু কাজ করাইবে কে? ইহাদের বংশ ক্রমে লোপ পাইতেছে, অনেকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। বৃদ্ধেরা কিন্তু বলিয়া থাকে, শিব পূজার নিয়ম-নীতি না মানিয়া চলার দরুণই তাহাদের আজ এই শোচনীয় অবস্থা; কাহারও প্রতি তাহাদের অনুযোগ বা কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই। আপনাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই কোঁচদের উপর শিবের অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে,—এই কথা কয়টি এখনও তাহারা সাশ্রুনেত্রে বলিয়া থাকে। ইহাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যদি সুযোগ পাই, প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে তাহাদের সর্ব্ব-প্রধান পূজা চড়কপূজা বা শিবোৎসবের কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

পরিচালন পদ্ধতি

বারোয়ারী বা সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যাপারে আমরা যেমন সমিতি গঠন করি, অবস্থা-ব্যবস্থা বিষয়ে সকলে আলাপ-আলোচনা করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করি, ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ চাঁদার খাতা লইয়া বাহির হই, শিবোৎসব উপলক্ষে কোঁচদের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। দুই-এক জন উদ্যোগী হইয়া গ্রামের অপর সকলকে একত্র করে। এক জন দলপতি নির্ব্বাচিত হয় এবং তাহার অধীনে থাকে বহু কর্ম্মী। তাহাদের এক-এক জন উৎসবের এক-এক অঙ্গের কার্যভার গ্রহণ করে।

সন্ন্যাসী নির্ব্বাচন

চড়কপূজার পুরোহিতকে সন্ন্যাসী বলা হয়। প্রধান বা মূল সন্ন্যাসীর কয়েক জন সহকারী সন্ন্যাসী থাকে ; সহকারীরা কোঁচ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়েরই হইতে পারে, তবে মূল সন্ন্যাসী অধিকাংশ স্থলেই কোঁচ-বংশের কেহ হন। এই সাময়িক সন্ন্যাসী-ব্রতে দীক্ষা লইবার প্রাক্কালে ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান করিবার এবং গলায় সূত্রগুচ্ছ (উপবীত) ধারণ করিবারও নিয়ম আছে।

দেইলপাট পূজা

পূজার অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তির এগার দিন পূর্ব্বে 'ঘটস্থাপন' ও 'দেইলপাট' পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ বেল কাঠ দিয়া বঁটি-দা-এর হাতলের মতো করিয়া 'দেইলপাট' প্রস্তুত করা হয়। 'পাটে' কয়েকটি বঁড়শী ও ত্রিশূল বিদ্ধ করা থাকে। প্রথমতঃ জলাশয়ের ধারে 'দেইলপাট'টি একটি জলচৌকির উপর স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে জলঘট বসাইয়া এবং একটি খড়্গ ও দুইটি লোহার শলাকা পুতিয়া দিয়া যথাবিধি পূজা করা হয়। অতঃপর 'পাট'টি নূতন গামছা দিয়া ঢাকিয়া মাথায় করিয়া গীত, বাদ্য ও নৃত্যসহকারে পূজার মণ্ডপের দিকে আনা হয়। মণ্ডপ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া মূল সন্ন্যাসী ভিতরে যান এবং হরগৌরীর মূর্ত্তির সম্মুখে 'পাট'টি স্থাপন করেন। জলঘট, খড়্গ এবং বাণ দুইটিও যথাস্থানে রাখা হয়। এই দিন হইতে সন্ন্যাসীদিগকে উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক বার মাত্র নিরামিষ আহার করিতে হয়। মূল সন্ন্যাসীকে আরও অনেক কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

শোভাযাত্রা ও নৃত্যগীতাদি

ঘটস্থাপনের পর হইতে সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য শিব-ভক্তেরা 'দেইলপাট' লইয়া প্রত্যহ গ্রামে-গ্রামে বাহির হয় এবং ঢাকের বাদ্য ও নৃত্য-সহযোগে শিবদুর্গাবিষয়ক বিবিধ গান গাহিয়া বিস্তর চাউল, পয়সা সংগ্রহ করে। সন্ধ্যায় উৎসব-কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়া 'দেইলপাট'টি যথাস্থানে রাখা হয় এবং ভোগ-নৈবেদ্য দিয়া আরতি করা হয়। মূল সন্ন্যাসী সাধারণতঃ সকলের সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে যান না ; কিন্তু যদি কোন দিন দূর গ্রামান্তর হইতে সন্ন্যাসীদের ফিরিবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে 'দেইলপাটে'র পূজা-আরতির জন্য তাঁহাকেও সঙ্গে যাইতে হয়।

সন্ন্যাসীর ভাণ

প্রত্যেক দিন আরতির শেষে সন্ন্যাসী হাতে মালা লইয়া বিকট ভঙ্গিতে মাথা ঝুলাইয়া শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। —ইহাকে 'ভাণ' করা বলে। এই সময়ে সন্ন্যাসী গ্রামস্থ অনেকের গুপ্ত অপরাধের কথা প্রকাশ করিয়া দেন। অনেকে কিসে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একটা কিছু উত্তর পান।

গাছ জাগান

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন চড়ক গাছকে জাগাইতে হয়। একটি গাছকে বহু বৎসর, এমন কি বহু পুরুষ ধরিয়া পূজা করা চলে। যে জলাশয়ে উক্তরূপ পূজিত চড়ক গাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসীরা নৃত্য, গীত এবং বাদ্য-সহকারে তাহার তীরে যাইয়া সমবেত হয় এবং 'দেবের দেবের' বলিয়া 'গাছ' অন্বেষণে নামিয়া পড়ে। প্রবাদ আছে—চড়ক গাছ সহজে ধরা দেয় না, ভক্তদের মন পরীক্ষার জন্য অথবা তাহাদের কোন অপরাধের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। এই গাছ না কি 'জাগ্রত', ইহাকে অমান্য করিলে কাহারও নিস্তার থাকে না। ভক্তদের অনেক জলক্রীড়া ও অনুসন্ধানের পর গাছটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং উহাকে উঠাইয়া উহার সর্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া জলাশয়ের ধারেই সেদিন রাখিয়া আসা হয়। বহু দিনের পূজিত পুরাতন গাছ না থাকিলে বেল, গজারি বা এই জাতীয় অন্য কোন কাঠ দিয়া চড়ক গাছ তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।

হরগৌরী প্রভৃতির মুখানৃত্য

গাছ উঠাইবার পর আরম্ভ হয় বাড়ী-বাড়ী গিয়া মুখা পরিয়া ভক্তদের নৃত্যের পালা। এক জন শিব সাজে, আর এক জন সাজে গৌরী। শিবের মাথায় থাকে প্রকাণ্ড জটা, হাতে ত্রিশূল ও ঝোলা, মুখে রং বা মুখা। গৌরী পরে স্ত্রীলোকের কাপড়, শাঁখা সিঁদুর, তাহারও মুখে থাকে রং বা মুখা এবং এক হাতে থাকে ঝাঁটা ও অপর হাতে একটি পাত্রে প্রথম ভিক্ষার চাল। কেহ ঢেঁকির উপর চড়িয়া নামাবলী গায়ে দিয়া নারদের অভিনয় করে; কেহ বা মুখোস্ পরিয়া কোমরে লেজ গুঁজিয়া ডাল-পালা হাতে লইয়া হনুমান সাজে। এতদ্ব্যতীত দলের প্রায় প্রত্যেকেই ভূত-প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতির কোন না কোন সাজে সজ্জিত হয়। কেহ আবার একটি লোহার শলাকা মুখে পুরিয়া বা বুকের দুই পার্শ্বে কৌশলে বিধাইয়া রাখে। ঢাকের আকাশভেদী বাদ্যের তালে-তালে নৃত্য ও গান চলিতে থাকে। আনন্দ-উল্লাসের সীমা থাকে না। নারদ মধ্যে মধ্যে গৌরীর নিকট আসিয়া 'মামী' 'মামী' বলিয়া তাহাকে বিরক্ত করে; গৌরীও তাহার হাতের ঝাঁটাগাছা দিয়া ভাগিনেয়ের প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ করে না। হরগৌরী আসিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে উঠানে দরজার সামনে বসে এবং নারদ চিমটি কাটিয়া মাটি তুলিয়া তাহাদের আঁচলে দেয়। ইহাতে না কি গৃহস্থের মঙ্গল হয় এবং তাহার দেয় চাল-পয়সার পরিমাণটাও একটু বাড়াইয়া দেয়। গ্রাম হইতে ফিরিয়া শিব-মণ্ডপের সম্মুখেও অনেকক্ষণ নৃত্যগীতাদি চলে।

সংক্রান্তির পূর্বদিন রাত্রিতে হরগৌরীর যে পূজা হয়, তাহাতে এগারটি পাত্রে এগার দিনের এগারটি ভোগ দেওয়া হয় এবং পায়রা ইত্যাদি বলি পড়ে।

ব্রহ্মাপূজা

'পাট' পূজার পর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সাত হাত কিংবা একুশ হাত লম্বা এবং হাত দুই প্রশস্ত ও গভীর একটি গর্ত্ত পূর্ব্বেই করিয়া রাখা হয়। সন্ন্যাসীরা তাহার পার্শ্বে বসিয়া বেল, বট, খদির ইত্যাদি যজ্ঞকাষ্ঠ মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিসংযোগে সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে থাকে। গর্ত্তের ধারে একটি খড়্গ ও লোহার কয়েকটি শলাকা পুতিয়া দেওয়া হয়। কয়েকটি পায়রা কাটিয়া জলন্ত আগুনে উৎসর্গ করা হয় এবং সকল সন্ন্যাসী মিলিয়া ফুল-বেলপাতার অঞ্জলি দিয়া পূজা শেষ করে।

তার পর চলে ভক্তদের 'আগুন ঝাঁপের' পালা। মূল সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িয়া ধূলার আবরণে খড়্গের ধার বিনষ্ট করিয়া দেন এবং

ভক্তদের এক-এক জন সেই খড়্গের উপরে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও মহোল্লাসে নাচিতে থাকে। নৃত্যের তালে-তালে চলে ঢাকের বাজনা এবং 'দেবের দেবের' ধ্বনি। সেই ভীষণ দৃশ্যে এবং শব্দে নিতান্ত ক্ষীণবল মানুষের দেহেও যেন রক্ত টগবগ করিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত না আগুন একেবারে নিবিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে। অতঃপর সন্ন্যাসীরা গর্ত্তটি বন্ধ করিয়া দেয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে।

অমৃত ফলের বৃক্ষরোপণ ও হনুমান নৃত্য

আম্র সহ একটি প্রকাণ্ড আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া প্রোথিত করা হয় এবং সকলে তাহা বেষ্টন করিয়া থাকে। এক জনে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা ওখানে কি করিতেছ?' অপরে উত্তর দেয়—'স্বর্গের অমৃত ফলের গাছ পাহারা দিতেছি।' সহসা দেখা যায়, কেহ হনুমান সাজিয়া আসিয়া ফলগুলি ছিঁড়িয়া লইতেছে! সকলে তাহাকে ধরিয়া লেজে আগুন দিয়া ছাড়িয়া দেয়। হনুমানের তখন কি উল্লাস! ছেঁড়া কাপড়ের লেজ নাড়াইয়া চারি দিকে আগুন ছড়াইয়া সে কি তাণ্ডব!

উৎসবে কৃষিকার্য

তার পর কয়েক জন আসে বলদ সাজিয়া; ক্রেতা-বিক্রেতাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বিক্রেতারা প্রত্যেকটি বলদের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা বলিয়া যায় আর ক্রেতারা দাম-দস্তর করে। বলদ ক্রয়ের পর আরম্ভ হয় জমির চাষ-আবাদের পালা। দুই জন লাঙ্গল টানার অভিনয় করে, এক জন খুঁটি চাপিয়া ধরে, গোরু তাড়ায়; আর এক জন পিছনে পিছনে ধান বুনিয়া যায়। এই সব ব্যাপারে আমোদ-স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না।

শ্মশান পূজা

শ্মশান পূজাকে সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ 'আজরা পূজা' (ময়মনসিংহে 'আজর' শব্দের এক অর্থ ভূত-প্রেত) বলিয়া থাকে। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন গভীর নিশীথে মূল সন্ন্যাসী একটি প্রদীপ, পাঁচটি সুপারি এবং সিঁদুর লইয়া শ্মশানে যান, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্ত্র পড়েন, সমস্ত দেবতা ও ভূত-প্রেতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। ইহাকে সাধারণ কথায় 'চিতা জাগান' বলে।

শেষ রাত্রিতে শ্মশানে পূজা হয়। একটি খড়্গ ও দুইটি লৌহ শলাকা প্রোথিত করিয়া তাহার গোড়ায় মূল সন্ন্যাসী কি জানি কি মন্ত্র বলিয়া পূজা করেন। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তখন ঢাকের বাদ্যে ও তাণ্ডব নৃত্যে স্থল, জল, আকাশ সব কাঁপাইয়া তোলে। পূজার শেষে একটি শকুল মৎস্য পোড়াইয়া, পায়রা ভাজিয়া ও সাতটি পিঠা করিয়া ভূত-প্রেতের উদ্দেশে একটি কলাপাতায় ভোগ দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীদের মুখে শ্মশানপূজার বিপদ ও ভয়ঙ্করত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প কথা ও কিংবদন্তী শুনা যায়। সে সব আর এখানে উল্লেখ করিব না।

ধূপ চালনা

শ্মশান পূজার পর প্রধান সন্ন্যাসী দুইটি লোককে মৃতের কোনও দেহাংশ আনিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এক জনের হাতে থাকে একটি জ্বলন্ত ধূপের পাত্র, অপরের হাতে থাকে খড়্গ। মূল সন্ন্যাসী ক্রমাগত মালা জপেন, জপিতে জপিতে উক্ত ভক্ত দুই জনের উপর যেন 'ভর' নামিয়া আসে অর্থাৎ ভূতাবেশ হয় এবং তাহারা উন্মাদের মত দৌড়াইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে বন-জঙ্গল, নদী-নালা অবলীলাক্রমে পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া যায়। যে পর্য্যন্ত শ্মশান না পায় এবং মৃতের কোন দেহাংশ সংগ্রহ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে না। সফল হইয়া ফিরিয়া আসিলে মূল সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িয়া তাহাদের শরীরে জল ছিটাইয়া দেন এবং তাহারা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠে। কিংবদন্তী আছে, অনেক সময় গ্রামান্তরের বিরুদ্ধ সন্ন্যাসীর চক্রান্তে এই 'ধূপ চালনা' অনুষ্ঠানে বিপদ ঘটে। মূল সন্ন্যাসী যদি প্রবল না হন, তাহা হইলে ভক্তদের ফিরাইয়া আনা দুষ্কর হইয়া উঠে। তাহারা যথাসময়ে পূজা-স্থানে ফিরিতে পারে না;—শ্মশানে-মশানে, বনে-জঙ্গলে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছুটিতে ছুটিতে অনেক সময় মৃত্যুও বরণ করে। এই সব আশঙ্কায় বর্ত্তমানে 'ধূপ চালনা'র পদ্ধতি আর পালিত হয় না; নিকটস্থ শ্মশান হইতে পূর্ব্বাহ্ণেই মৃতের কঙ্কাল আনিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

গাছ উত্তোলন

মূল পূজার দিনে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে চড়ক গাছটিকে তিন রংয়ে আঁকা হয়:—ইট গুঁড়া করিয়া লাল, তুঁষ পোড়াইয়া কাল এবং আতপ চাউল পিষিয়া শাদা রং করা হয়। গাছের মাথাটিতে যথারীতি পূজা-অর্চ্চনা করিয়া প্রধান সন্ন্যাসী গাছ পুঁতিবার গর্ত্তে যাইয়া নামেন। অমনি উপর হইতে একটি কাপড় দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। গর্ত্তের ভিতর একটি জীবিত পায়রা ও প্রদীপ একটি পাতিলের নীচে রাখিয়া এবং 'অব্যক্ত' আরও কি কি করিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া আসেন এবং সকলে মিলিয়া নৃত্যে, বাদ্যে ও 'দেবের দেবের' ধ্বনিতে গাছটিকে সেই গর্ত্তের মধ্যে দাঁড় করায়।

অতঃপর সন্ন্যাসীরা নদীর ঘাটে যায় এবং গঙ্গাপূজা করে। তখন বহু পায়রা, পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজার শেষে জলে নামিয়া দুই ব্যক্তি লৌহ-শলাকা দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করে (বিদ্ধ করিবার ভাণ করে) এবং হরগৌরীর পূজার মণ্ডপে আসিয়া ক্ষতস্থানে অমৃত ফলের (আম্র) কষ (রস) লাগায়।

গাছে চড়া ও বাণ ফোঁড়া ইত্যাদি

পূজার মণ্ডপে যথারীতি হরগৌরীর পূজা ও 'দেইলপাট' পূজা সম্পন্ন হইলে জলাশয়ের ধারে চড়ক গাছের পূজা আরম্ভ হয়। এই গাছের গোড়ায় বহু শত হাঁস, পায়রা, পাঁঠা বলি পড়ে। মানত মত বহু ক্রোশ দূর হইতেও লোক পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি লইয়া আসে। রক্তে সমস্ত গাছটি রক্তের স্তম্ভের আকার ধারণ করে। পূজার শেষে সন্ন্যাসী 'গাছে' চড়িয়া প্রথমেই কয়েকটি পায়রার মাথা ছিঁড়েন এবং সেগুলি শূন্যের দিকে নিক্ষেপ করেন। পায়রার পালক ধরিবার জন্য তখন সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ির ধুম পড়িয়া যায়! সেই পালকের কবচ ধারণ করিলে না কি শুভ হয়। দণ্ডায়মান চড়ক গাছটির মাথায় উহার সহিত সমকোণ করিয়া আর একটি

...র হাত লম্বা কাঠ জুড়িয়া দেওয়া হয়; তাহার এক দিকে ...সী এবং অন্য দিকে অপর কয়েক জন ঝুলিয়া পড়িয়া তাহা ...জোরে ঘুরাইতে থাকে। পূর্ব্বে না কি সন্ন্যাসীরা পিঠে বঁড়শী ... বাণ ফুঁড়িয়া ঘুরিত, এখন নিজেদের দেহ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ...।

উৎসব-কর্ম্মীদের সামাজিক সাম্য বোধ

রাত্রিতে মূল সন্ন্যাসী ভিন্ন অপর সকলেই মদ্য-মাংসের বিরাট ...জ গ্রহণ করে। এই ভোজে স্পর্শদোষের কোন প্রশ্ন উঠে না, ...ল বর্ণের হিন্দুরা একত্রে বসিয়া খায়। তখন সকলেরই মনে এই ...টি আসে—'যত্র জীব তত্র শিব।' ঘট-স্থাপনের দিন যাহারা সন্ন্যাস ...র পূজার কার্য্যে নিযুক্ত হয় অর্থাৎ যাহারা সন্ন্যাসী-ব্রত ...ত্যেক ভাবে গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে যদি কাহারও মৃতাশৌচ হয়, ...অপর সকলকে সেই অশৌচ পালন করিতে হয়। এ স্থলে ব্রাহ্মণের ...শৌচ কোঁচকে এবং কোঁচের অশৌচ ব্রাহ্মণকেও গ্রহণ করিতে হয়। ...শৌচ লইয়া উৎসবের কাজ-কর্ম্ম করিতে কোনও বাধা নাই; ...ন্তু জাতকাশৌচ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উৎসব-প্রাঙ্গণে আসিতে ...র না। জাতকাশৌচ জ্ঞাতি ভিন্ন অপর কাহারও পালন করিতে ...য় না।

বিসর্জ্জন

পয়লা বৈশাখ নৃত্যে, গানে ও বাদ্যে এবং 'দেবের দেব মহাদেব' ...নিতে 'গাছটি' উঠাইয়া গঙ্গাপূজা করিয়া জলে বিসর্জন করা ...। 'দেইলপাট'টি স্থায়ী শিব-মন্দিরে অথবা মূল সন্ন্যাসীর বাড়ীতে ...খিয়া দেওয়া হয়। এই দিন প্রধান সন্ন্যাসী হবিষ্যান্ন ত্যাগ ...রিয়া মদ্য-মাংস খাইতে পারেন।

এইরূপে তের দিন অনুষ্ঠিত হইবার পর কোঁচদের শিবোৎসব ...প্ত হয়।

চড়কের গান

শিবোৎসবে শিবদুর্গাবিষয়ক যে সকল গান গাওয়া হয়, সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নের কয়টি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:— ১। শিবের বন্দনা। ২। সৃষ্টি-বর্ণনা। ৩। শিবের কৃষিকাজ ৪। শিবদুর্গার কলহ। ৫। গঙ্গা ও গৌরীর বিবাদ। ৬। শিবের শাঁখারিবেশ ধারণ ও গৌরীর শঙ্খ-পরিধান। ৭। শিবের ...চপাড়ায় গমনাগমন প্রভৃতি। এই সকল গানের বিষয়-বস্তু ...লার প্রায় সর্ব্বত্রই এক,—পার্থক্য শুধু বিভিন্ন স্থানের মৌখিক ভাষায় এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে। বিভিন্ন পুঁথি-পুস্তকেও অনেকটা ...র্জ্জিত আকারে এইগুলি স্থান পাইয়াছে। আমি এখানে আমার ...গৃহীত ময়মনসিংহের শিবোৎসবের কয়েকটি গানের নমুনা দিতেছি। ...ত্য ও ঢাকের বাদ্যের তালে-তালে পঙ্ককাল ধরিয়া হিন্দুর সকল ...প্রদায়ের লোক মিলিয়া এই সকল গান গাহিয়া থাকে। ...মনসিংহের পল্লী-ভাষার সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই এবং ...ৎসব-কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা এই গান শুনেন নাই, জানি ...া তাঁহারা শুধু পড়িয়া পড়িয়া ইহাদের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য ...পভোগ করিতে পারিবেন কি না।

(১)

নিম্নের গানটিতে দেখা যায়, আষাঢ় মাসের নূতন জলের সংস্পর্শে মাগুর মাছের পুলকের সীমা নাই; উহারা কিলবিল করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃন্দাবনের কানাই তাহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রলুব্ধ হইয়া বাঁশীটি তীরে রাখিয়া মাছ ধরিতে নামিয়া পড়িলেন; ওদিকে সুযোগ বুঝিয়া রাধিকা সে বাঁশীটি আঁচলে লুকাইয়া প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ আসিয়া মাতুলানীকে ধরিয়া বসিলেন: উভয়ের মধ্যে বেশ রসাশ্রিত বাক্যের আদান-প্রদান হইতেছে, ওদিকে গৃহের ছাদ হইতে মৃদুমন্দ বাতাসে বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'শিব-দুর্গা' ধ্বনি বাজিতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কৃষ্ণের বাঁশী রাধাকৃষ্ণ না বলিয়া শিবদুর্গা বলিতেছে।

> জ্যৈষ্ঠি আষাঢ় মাসে উজায়১ মাগুর মাছ
> হস্তের বাঁশী ভূমে থইয়া কানাই ধরে মাছ
> মাছ ধরিতে মাছ ধরিতে লাম্‌লো হাঁটু জলে
> আইক্কলে২ ছাপাইয়া৩ বাঁশী, বাঁশী নিলো চোরে।
> কেবা চোরে নিলো বাঁশী আমি ত জানি
> আইক্কলে ছাপাইয়া বাঁশী লইয়া গেলো মামী
> মামী, মামী, ওগো মামী, ভাল মাইনষের ঝি
> তাইগ্গার হাতের বাঁশী দিয়া কাজ করিবা কি?
> আমরা ত গোয়ালের নারী দধি দুগ্ধ বেচি
> ভাইগ্গার হাতের বাঁশী দিয়া বানাই দুধের কাটি
> নাড়িয়া চাড়িয়া তুইল্যা থইলাম চালে
> লীলুয়া৪ বাতাসে বাঁশী শিবদুর্গা বলে।

(২)

দ্বিতীয় গানটিতে শিব এবং গঙ্গা ও গৌরী দুই সপত্নীতে ঝগড়াটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। গৌরী পিত্রালয়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গঙ্গা বা শিব কেহই তাঁহাকে যাইতে দিবেন না। এই উপলক্ষে একে অপরের ছিদ্র ধরিয়া ধরিয়া নিতান্ত ইতর জনোচিত ভাষায় ও ভাবে একে অপরকে প্রাণ ভরিয়া নিন্দা করিয়া চলিয়াছেন।

> শিব-শঙ্কর ভোলানাথ কৈলাসের অধিকারী
> গৌরী যে যাইবো৫ নাইয়র তারে বলো কি?
> 　গৌরী যে যাইবো নাইয়র শুনতে লাগে ধাক্কা
> 　কার্ত্তিক গণেশ দুইটি পুত্র থইয়া মোর বাক্কা।
> গঙ্গা উঠিয়া বলে, শিব বুদ্ধি নাই রে তোর
> এমন যৌবতী৬ কন্যা কেবা দেয় নাইয়র!
> 　গৌরী সে উঠিয়া বলে, তুই সে বড় সতী
> 　জ্যৈষ্ঠি আষাঢ় মাসে তোর উৎপত্তি
> 　না জানিয়া না শুনিয়া নরলোকে তোর জল খায়
> 　ষোল শ' গাবরে৭ তোর বুকে বৈঠা বায়।
>
> *　*　*　*
>
> চালো৮ নাইগো ছন৯ গৌরী, বেড়াৎ১০ নাইগো বন১১
> বৎসরে বৎসরে গৌরী নাইয়রে সাজন!
> গেছিলাম গেছিলাম গৌরী তোর বাপের বাড়ী
> খাইতে না দিল্ ভাং ধুতুরা, বইতে না দিল্ পিঁড়ি

ভাং খাও ধুতুরা খাও বুইড়্যা শিব গো ভাঙ্গের মর্ম জান
গাং পাইড়্যা যত ভাং বুন্দু১২ বাইন্ধ্যা আন
বুন্দু বাইন্ধ্যা আইন্যা ভাং তুইল্যা থ্‌ইলো চালে
বৈকালে নামাইয়া ভাং ঢেঁকী দিয়া কুটে
বারখানা ঢেঁকী শিবের, তেরখানা কুলা
রাইতে দিনে কুইট্যা মরে জটুয়া১৩ ভাঙ্গের গুঁড়া।

(৩)

গৌরী পিত্রালয়ে রৌদ্রে ধান শুকাইতেছেন; তাঁহার চুল এলোমেলো. শিব ছদ্মবেশে গিয়া তাঁহার নিকট জল চাহিলেন; কিন্তু গৌরীর কোন উত্তর পাইলেন না। শিব বক্রোক্তি করিলেন, গৌরী তখন গাড়ু ও ঘাট দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু জল কোথায়, সবই যে শুকনায় পড়িয়া আছে!

ধান লাড়১৪ ধান লাড় গৌরী আউলাইয়া১৫ মাথার কেশ
জল চাইলে না দেও জল এই বা কোন্ দেশ?
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দিও পানি দেশ কেন নিন্দ
এ ভব আলিয়ার১৬ মাঝে ঠমক্ কেন মার?
ঠমক নয়, ঠমক নয় ঠমক তোমার হিয়া
একটি কথা জিজ্ঞাস করি ঘাট কোনখান দিয়া?
হস্তী না হয়, ঘোড়া না হয়, গেরা১৭ না হয় জল
তুমি নি খাইতে পার শুক্না সাপলার১৮ জল?

(৪)

শিবের ইচ্ছা হইল, গৌরীকে একটু ক্ষেপাইবেন। তাই কোঁদলের ওস্তাদ নারদের ডাক পড়িল। নারদ গিয়া চণ্ডিকাকে বুঝাইলেন, মামীমা, মামা ত আর একটি বিবাহ করিয়াছেন। শুনিয়া গৌরী ত পিত্রালয় হইতে তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন সবই সত্য। গৌরী ইচ্ছা মত শিবকে গালি দিলেন, কিন্তু শিব ক্রুদ্ধ না হইয়া আপোষ করিয়া ফেলিলেন।

নারদ কিন্তু ইহাতে স্বস্তি পাইলেন না; ঝগড়া না বাধাইতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি কোথায়? তখন তিনি মাঠে গিয়া এক কৃষকের নিড়ানো জমিতে অপর কৃষকের জমির জঞ্জাল আনিয়া অলক্ষ্যে ফেলিয়া দিলেন। দুই কৃষকে তখন তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হইল। তাহাদের মারামারি কিলাকিলি দেখিয়া নারদের আনন্দের সীমা নাই।

শিব বলে শুন ভাইগ্না১৯ নারদ তপোধন
তোমার মামীরে আন দেখিতে নাচন
একে ত কোন্দলিয়া২০ নারদ, আরো আইজ্ঞা পাইলে
কোন্দলের ঝুলিখান কান্ধে তুইল্যা নিলো
এমত শুনিয়া নারদ করিল গমন
চণ্ডিকার নিকটে গিয়া দিল দরশন।
নারদ বলে, শুন মামী হেমন্ত-নন্দিনী
বাড়ীর আগে আনছে মামা কোথাকার রমণী!
নারদ মুনি বলিয়াছেন যে সব বিধানে
চণ্ডিকা আসিয়া দেখে সবই বিদ্যমানে
চণ্ডী বলে, ভাঙ্গুরা২১ শিব, তোর লাজ নাই
তোরে যে দেবতা বলে তার মুখে ছাই!
শিব বলে, শুন চণ্ডী রাগ কেন কর
আপনারি মনে আপনি বিচারিয়া দেখ
নলের ছোবায়২২ কভু নাহি জন্মে বাঁশ
স্ত্রী হইয়া স্বতন্তর লোকে উপহাস।

* * * *

দুই হালুয়ার বাড়ী তখন নারদ চলে যায়
সারা দিন উবাসী২৩ নারদ ভ্রমিয়া বেড়ায়
এক ক্ষেতের হাজাউড়া২৪ আর এক ক্ষেতে ফালায়
দুই হালুয়ার কিলাকিলি নারদ বইসে রঙ্গ চায়
অষ্টমী হইল সাঙ্গ নবমী আসিল
চান বদন২৫ ভরিয়া সবে দেবের দেবের২৬ বল।

পাদটীকা:—(১) স্রোতের বিপরীত দিকে যায়; (২) আঁচল; (৩) লুকায়িত করিয়া, (৪) [illegible], [illegible]; (৫) যাইবে (এ স্থলে [illegible]); (৬) যুবতী, (৭) এক শ্রেণীর জলাধ জাতি. (৮) খড়ের চালে; (৯) উলুখড়, (১০) যবের বেড়া, (১১) উলুখড়; (১২) আঁটি, বোঝা; (১৩) জটাযুক্ত (জটুয়া). (১৪) রৌদ্রে ছড়াইয়া দিতেছ, (১৫) এলোমেলো করিয়া আঁচড়াইয়া; (১৬) সংসারের (?); (১৭) খড়কুটা; (১৮) কুমুদ; (১৯) ভাগিনেয়; (২০) ঝগড়াখোর কলহে ওস্তাদ; (২১) সিদ্ধিখোর; (২২) ঝাড়; (২৩) উপবাসী; (২৪) জঞ্জাল, আগাছা, আবর্জ্জনা; (২৫) চন্দ্রবদন; (২৬) মহাদেব।

আপনি বোধ হয় জানেন না?

১। "ওয়াকে-নবীশ" কাকে বলে?
"পৃথিবীর" উৎপত্তি হয় কত দিন আগে?
"মাতুল-কন্যা বিবাহ" ইত্যাদি কি আধুনিক প্রথা?
"জীবনের" আবির্ভাব কবে হয় পৃথিবীতে?
ভারতবর্ষের প্রথম প্রেসে ছাপা বই কি?
বিলেতের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র কবে প্রকাশিত হয়?
"পুণ্ড্রবর্দ্ধন" কোথায়?
"তাম্রলিপ্ত" কার নাম?
নববধূ দ্রৌপদীকে কুন্তীদেবী কি বলে আশীর্ব্বাদ করেন?

[উত্তর ৮৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শেষ অনুরোধ

মীরা দেবী

সারি সারি সেল।

এখানে ফাঁসীর আসামীরা প্রতীক্ষা করে শেষ মুহূর্তের জন্যে। প্রতীক্ষা করে বলিলে ভুল বলা হয়। প্রায় মৃত একটি দেহ পড়িয়া থাকে আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর অপেক্ষায়। সময় হইলে অর্দ্ধোন্মাদ একটি প্রাণীকে সশস্ত্র শান্ত্রীরা এক প্রকার হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায় ফাঁসীমঞ্চের দিকে।

এমনি একটি সেলে চিৎ হইয়া পড়িয়া মানব গুন্-গুন্ করিয়া মনে মনে গাহিতেছিল…

আমি তনু মন প্রাণ
সঁপেছি তোমারে…’

খট্…খট্…খট্… !

প্রহরী আসিয়া দাঁড়াইল।

মানবের খেয়াল নাই…

প্রহরী অবাক হইয়া গেল। চিরদিন সে দেখিয়া আসিয়াছে প্রতীক্ষারত ফাঁসীর আসামীদের। তারা খাবার মুখে তোলে না, রাত্রে ঘুমায় না। মাঝে-মাঝে অর্থহীন চীৎকার করিয়া কাঁদে। কেউ বা গরাদে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া রক্তপাত করে। ধমক দিলে চুপ করে আর ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকায়। কিন্তু…এমনি করিয়া নিশ্চিন্তে কীর্ত্তন গান। সে তাজ্জব হইয়া গেল। তার পর বোধ করি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া এই ভদ্রতাকে চাপা দিবার জন্যেই সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল।

"এই, চুপ রহো শূয়ারকা বাচ্চা…চুপ… !"

অন্যমনস্ক মানবের গান এই আকস্মিক চীৎকারে বন্ধ হইয়া গেল। "কেয়া হুয়া ?"

মানব আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তাহার মুখে মৃদু হাসি। সে প্রহরীর কথাগুলি শুনিতে পায় নাই। মন তাহার তখন গানের ভাবে বিভোর।

মানবের হাসি দেখিয়া প্রহরীটা রাগিয়া আগুন হইয়া গেল। পুনরায় সে অশ্লীল গালি দিয়া উঠিল।

মানব স্তম্ভিত হইয়া গেল। অকারণে লোকটা তাহাকে ইতর গালাগালি করিতেছে। সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

প্রহরীটা গজ-গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সহসা মানব সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না, বিনা প্রতিবাদে কি করিয়া এই সব সহ্য করিল। তাহার মনের কোণে আজ যেন কোথায় একটু অভিমানের সাড়া জাগিল। মনে পড়িল একে একে সি, আই, ডি আর দারোগাদের ব্যবহার। শিক্ষিত বাঙ্গালী হইয়া তাহারা যে সব উক্তি করিয়াছিল, তাহা যে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে মানবের ধারণা ছিল না। সে ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ ছাত্র—চিরদিন প্রশংসাই পাইয়া আসিয়াছে। তাই যদিও শারীরিক অত্যাচার সে অকাতরে সহিয়াছে, মানসিক অত্যাচার দিয়াছে সত্যিকারের বেদনা। গ্রেপ্তার করার সময় বাঙ্গালী দারোগা তাহার পূজনীয়া মা-বাবাকে পর্য্যন্ত লইয়া যে-সব কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহা মানব সহিতে পারে নাই। তবু সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিলিটারী ট্রেণ উড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্রের। বিনা প্রমাণে বিচার হইয়া গেল। শাস্তি চরম দণ্ড। হয়ত আগষ্ট আন্দোলনে প্রমাণের বালাই নাই। যাক্ ভাবিয়া কাজ নাই। মরিতে সে ভয় পায় না। তবু কেন যেন এই কথাগুলি মনে পড়িয়া তার বুকের মাঝখানটায় ব্যথায় টন টন্ করিতে লাগিল। এদের জন্যই সে সব ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে নামিয়াছে। স্নেহ-প্রেম দু'হাত আগুলিয়া বাধা দিয়াছে, ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ইহারা হইবে স্বাধীন তাহার মত যুবকদের বুকের রক্তের বিনিময়ে। অথচ সে নিজে কি পাইল ?

তাহারই জন্য কাটা গিয়াছিল বৃদ্ধ অসহায় পিতার পেন্সন। অনাহারে অচিকিৎসায় তাঁর হইয়াছে মৃত্যু। অতি আদরের একমাত্র বোন ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া পথে নামিয়াছে। সমাজের লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিতে দিতে হয়ত আজ সে নিজেই ছাই হইয়া গেছে, অথচ এই বোনটিকে ঘিরিয়া কত স্বপ্নই না সে রচনা করিয়াছিল। আর সে নিজে ? এদের ছাড়িয়া সারা দেশময় পলাইয়া বেড়াইয়াছে স্বাধীনতার অন্বেষণে !

ধরা পড়ার পর কেহ তাহার জন্য মাথা ঘামায় নাই—এক মণিকা ছাড়া।

মানবের মণিকাকে মনে পড়িয়া গেল।

এই তো কিছুক্ষণ আগে মণিকা শেষ দেখা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ সে কোন কথা বলিতে পারে নাই। শুধু তার পায়ের ওপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়াছে। মানব বাধা দেয় নাই, কোন কথা বলে নাই। যাবার সময় অশ্রুসিক্ত মুখখানি মানবের বুকের উপর রাখিয়া মণিকা বলিয়াছিল—"একটি কথা শুধু বলে যাও, তুমি কি আমায় ভালোবেসেছিলে ? ওগো বলো। মিথ্যে করেই না হয় বলো, আমায় তুমি ভালোবাসতে।

তুমি ত চলে যাবে, আমি থাকব কি নিয়ে? বলো—বলো! শুধু একটি বার আমি কাণে শুনি…"

আর বলিতে পারে নাই, উচ্ছ্বসিত কান্নায় সে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মানব ধীরে ধীরে দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গরাদের মধ্য দিয়া দূরে মাত্র এক ফালি আকাশ দেখা যায়। সেই দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—কেন তাহার আজ এমন হইতেছে? কাল আর সে এই পৃথিবীতে থাকিবে না বলিয়া? মণিকাকে সে ভালবাসে সত্য…কিন্তু বিদায় বেলায় সেটা না বলিলেই কি নয়? মণিকা—মণিকা, মণিকার মুখখানা মানবের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সহসা সে যেন জাগিয়া উঠিল।

না! মণিকাকে বলিতেই হইবে! তার ভালবাসার অধিকার সে ধরণীতে প্রতিষ্ঠা করিবে। সে মরিবে না। জীবনে সে কিছুই পায় নাই।

কেন সে মরিবে? কাহার জন্ম? আদর্শ?—আদর্শ চুলোয় যাক। সে সবাইর জন্ম সব দিয়া যাইবে অথচ কেহ তাহাকে এতটুকু কিছুই দিবে না? এ কেমনতরো কথা? ইহা হইতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন তাহাকে পথের কুকুরের মত দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সামান্য আশ্রয়টুকুও পায় নাই। বৃদ্ধ পিতা তাহার তিলে তিলে শুকাইয়া মরিয়াছে। তাহার অভাগিনী বোন…না!—না! ইহা হইতে পারে না। মানব মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। বলিবে—তাহার ভুল ভাঙিয়াছে। সে বাঁচিতে চায়। সে স্বাধীনতা চায় না…এখনো সময় আছে। সে বাঁচিবে। মণিকাকে লইয়া চলিয়া যাইবে দেশান্তরে নির্জন পল্লীপ্রান্তে। রচিয়া তুলিবে একখানি সুখের নীড়। তাহার জন্ম মণিকা অনেক সহিয়াছে। আর নয়। মণিকার ভালবাসার অপমান সে করিতে পারিবে না। সে বাঁচিবে। সে বাঁচিতে চায়।

জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে খবর দিতে হইবে।

মানব ঘণ্টা বাজাইবার দড়ি ধরিয়া জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল। টং-টং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

খট্—খট্—খট্।

প্রহরী আসিয়া দাঁড়াইল।

"কেয়া হুয়া? ঘণ্টা বাজাতা কাঁহে?"

প্রহরীর কণ্ঠস্বরে মানব নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

এ কি সে ভাবিতেছিল। ছিঃ, তাহার হইল কি? গম্ভীর গলায় বলিল, "কুছ নেহি।"

প্রহরীটা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। মানব একদৃষ্টে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি করিয়া এক দিন ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তার জন্ম চাই রক্ত। মানব মনকে রাশ টানিয়া সংযত করিল। সে প্রশান্ত ভাবে মৃত্যুকে বরণ করিবে। আদর্শ রাখিয়া যাইবে ভাবী কালের কাছে।

সে উঠিয়া আসিয়া কাগজ-কলম টানিয়া লইল। মণিকাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

* * *

প্রিয়তমা মণি,

প্রথম ও শেষ লেখা আমার। এখানা যখন পাবে তখন আ… থাকবো না। মণি আমার—তুমি হয়ত আজ সারা রাত কাঁদবে… কেঁদ না। কেন, আমার ত মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। আর মরণ… সে তো আসবেই। আগে আর পরে, এই ত কথা। মরে সবাই… কিন্তু দেশের জন্ম প্রাণ দেবার সৌভাগ্য হয় কয় জনের? যাক্, … জন্ম লিখতে বসেছি। তোমায় আমি ভালবাসতাম ও শেষ মু… পর্য্যন্ত ভালবাসব। যে কথা এত দিন জানতে চেয়ে তুমি কো… উত্তর পাওনি—আজ শেষ বিদায় ক্ষণে তা আমি বলে যাচ্ছি। … আজ তোমায় সম্বোধন করছি প্রিয়তমা বলে। আমার একটি অনুরোধ রেখ। তুমি বিয়ে কোর। তোমার সুখের জন্ম বলছি না। তোমায় হতে হবে আদর্শ মা। গড়ে তুলতে হবে এমন সন্তান যারা মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। নয় তো কি হবে ভেড়ার পালকে স্বাধীনতা দিয়ে? ওদের খোঁয়াড়ে পরাধীন করে আটকে রাখাই ওদের পক্ষে ভালো। স্বাধীন করে ছেড়ে দিলে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। অথচ দেখ… চিড়িয়াখানার বাঘকে ছেড়ে দিলে সে স্বচ্ছন্দেই বিচরণ করবে। তাই বলছি—তুমি বিয়ে কোর। মণি, আমি তোমার মধ্যেই বেঁচে থাকব। আমার জন্ম মনে করার এক জন অন্ততঃ এই পৃথিবীতে রইল—এই তো আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। আমার কথা মনে করে দুঃখ তুমি পেও না। বিদায় মণি… ভগবানকে ডাকবার সময় কোন দিন পাইনি। এত দিন কেটে গেল মানুষের ভগবানের খোঁজে। আজ অবসর পেয়েছি … ডাকছি তাঁকে তোমার জন্ম। একটা কথা লক্ষ্মীটি—আমায় ভুলে যেও! সংসারের যাত্রা-পথে দুঃখের বোঝা নিয়ে অনর্থক বিব্রত হয়ো না। বিদায়—

তোমার মানব।

চিঠিখানা ভাল করিয়া মুড়িয়া তার উপর মণিকার নাম-ঠিকানা লিখিয়া মানব চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের সেই এক ফালি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ এ ভাবে বসিয়াছিল খেয়াল নাই। হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া দেখিল আকাশের গায়ে অতি ক্ষীণ আলোর আভাস। তাহার জীবনের শেষ প্রভাত। সে জোরে জোরে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া তাহার শেষ আশ্রয়টাকে একবার অন্ধকারেই চোখ বুলাইয়া লইল। সেই অতি ক্ষীণ আলোয় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল একখানা বই। সোনার জলে লেখা নামটা জল-জল করিতেছে। আসন্ন অন্ধকারে আলোর সংকেত। কাছে গিয়া দেখিল—গীতা। মণিকা দিয়া গিয়াছিল—পড়া হয় নাই।

মানব অতি সযত্নে বইখানা হাতে তুলিয়া লইল। তার পর ধীরে ধীরে খুলিয়া প্রথম পাতায় লিখিল—মণিকাকে…মানব। তার পর কি মনে হইল, ভাঁজ-করা চিঠিখানা খুলিয়া যে যায়গায় লিখাছিল—'আমায় ভুলে যেও, তার পর 'না' এই কথাটি বসাইয়া পুনরায় ভাঁজ করিয়া রাখিল।

* * *

দূরে বুটের শব্দ হইতেছে না?

আর কত দেরী?…

আধুনিক স্বাধীনা নারী

শ্রীনমিতা পাল-চৌধুরী

স্ত্রী-স্বাধীনতা কথাটা আজকাল সর্ব্বত্রই শোনা যায়। আমাদের দেশও আজ স্বাধীন, সুতরাং স্বাধীন ভারতে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে পুরুষের ন্যায় আমাদেরও সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি একটা কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে। কিন্তু স্বাধীনতা ভ্রমে এক শ্রেণীর নারী আজ কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছেন তারই সামান্য একটু আলোচনা করবো।

আধুনিকা নারী বলতে সাধারণতঃ সকলে যাঁদের বুঝে থাকেন—সেইরূপ দু'-চার জন আধুনিকার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু আমার মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে যে, এরা কি সত্যিই আধুনিকা বা স্বাধীনা ?

পুরুষের অত্যাচারে নারী জর্জ্জরিত—নারীকে তারা ক্রমাগত ঠকাচ্ছে এবং গৃহে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে—পুরুষের বিরুদ্ধে এই আমাদের অভিযোগ এবং পুরুষের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, স্বাধীনা বলে যাঁরা গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন তাঁরা কি এই সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন ? স্ত্রী-স্বাধীনতা বলতে কি এই শ্রেণীর নারীদেরই বোঝায় ?

আমার মতে তাঁরা জয়ী তো হননি, বরং পুরুষের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন। পুরুষ আজও আমাদের ঠকাচ্ছে—তবে কৌশলে। নারীর প্রেম লাভ করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পুরুষ আজ সচেষ্ট নয়—নিজের শৌর্য্য-বীর্য্য-বল বৃদ্ধি না করেই নারীকে সে অনায়াসে লাভ করতে চায়। এর জন্য সে এমন কৌশলপূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যে, আমরা ভাবি, পুরুষ আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছে। যে শ্রেণীর নারীরা নিজেদের 'আধুনিকা ও স্বাধীনা' বলে প্রচার করেন তাঁরা বাস্তাবিকই স্বধর্ম্মচ্যুত হতে বসেছেন। পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, গল্প করা, সিনেমা দেখা—এক কথায় পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করতে পারলেই তিনি স্বাধীনা নারী। কিন্তু এ সব করা কেন ? পুরুষের চোখে ভাল লাগবে বলেই তো ? তাদের চোখে ভাল লাগবে বলেই তো তাঁরা নানা রকমের মনোরম ভঙ্গী আয়ত্ত করেন—দেহকে অপরূপ সাজে সাজান ! মানুষের সুন্দর হওয়ার প্রবৃত্তি অবশ্য সহজাত, কিন্তু দেহকে কত ভাবে এবং কত উপায়ে যে প্রকাশ করার এবং পুরুষের চোখে লোভনীয় করার চেষ্টা হয়ে থাকে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এবং দেখলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। তা'হলে স্বাধীনতা কোথায় ? পুরুষের আকাঙ্ক্ষা নারী চিরদিনই মিটিয়ে এসেছে—আজও মেটাচ্ছে। স্বাধীন সে কোথায় ? আজও সে পুরুষের আমোদের সামগ্রী এবং এই আমোদ এঁরা—এই আধুনিক স্বাধীনারা যুগেয়ে চলেছেন অত্যন্ত হাস্যকর উপায়ে। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা ছিলেন বন্দিনী, কিন্তু গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে তাঁরা ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনা। আর এখনকার এই শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিতা, স্বাধীনা নারী কেবল মাত্র পুরুষের বিলাস-সঙ্গিনী হয়েছেন। নারীর প্রতি পুরুষের যে প্রেম তা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। এঁদের প্রাণের সহচরী করতে পুরুষের বাধে—পুরুষরা আজ নারীকে সতী বলেও বিশ্বাস করতে চায় না। এই শ্রেণীর নারী আজ পুরুষের নিকট অত্যন্ত সহজলভ্যা হয়ে উঠেছেন। এই ভাবে স্বাধীনতা-ভ্রমে যাঁরা স্বেচ্ছাচারিণী বিলাসিনী হয়ে উঠেছেন, তাঁদের বিবাহিত জীবনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় অশান্তিময়। দাম্পত্য জীবনের কোন শান্তি, কোন পবিত্রতা রক্ষা হয় না—স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই হন অসুখী।

আর এই অশান্তিময় সংসারে যে শিশুদের আবির্ভাব হয়—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাদের মনও সবল, সুদৃঢ় চরিত্রনিষ্ঠায় গড়ে ওঠে না। বর্ত্তমানে এর প্রতিকার প্রয়োজন। এখন গৃহকোণে বন্দিনী হয়ে থাকলেও চলবে না ; পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন করবে আর নারী শান্তিতে ঘর-সংসার চালাবে—সে যুগ আর নাই। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এর প্রতিকূলে। সুতরাং এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে নারীর 'বন্দিনী' হলেও চলবে না—বিলাস-সঙ্গিনী হলেও চলবে না। বিলাসিতা, সৌখিনতার সময় এটা নয়। আধুনিকতার এই হালকা দিকটা নিয়েই যাঁরা মেতে আছেন তাঁদের এ ভুল ভেঙ্গে যাওয়া উচিত। এই শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিতা নারী আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধা। তাঁরা স্বদেশের সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে প্রাণপণে বিদেশীদের নকল করছেন। এঁদের আধুনিকা বলা চলে না—এঁরা আজও বহু পশ্চাতে পড়ে আছেন। অন্যকে নকল করতে গিয়ে তাঁরা নিজেকে যে কতখানি নীচে টেনে নামান—নিজেকে কতখানি হাস্যাস্পদ করে তোলেন, তা কি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না ? আমরা ভারতীয়েরা কি এতই নিঃস্ব !

যে সকল নারী নিজেদের আধুনিকা ও স্বাধীনা বলে অন্যকে নকল করতে ব্যস্ত, তাঁরা ভারতের সমস্ত নারী জাতির গৌরব নষ্ট করছেন। আশা করি, তাঁরা এবার সচেতন হয়ে উঠবেন এবং নিজেদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন। আজ তাঁদের সত্যিকারের আধুনিকা ও স্বাধীনচেতা হতে হবে। পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সদা সর্ব্বদা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করলে চলবে না এবং ইংরাজের নকলনবিশীও বর্জ্জন করতে হবে। আমাদের ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এঁদের সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলবার কাজে সকলকেই সাহায্য করতে হবে।

নারী মাত্রেরই স্বাধীন ভারতে কর্ত্তব্য আছে। দেশের কাজে, দশের কাজে আমাদের যেতে হবে—সবল সুস্থ সন্তান গড়ে তুলে দেশকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলতে হবে। সুতরাং মনে-প্রাণে ও কর্ম্মে আমাদের আজ হতে হবে আধুনিক স্বাধীনা নারী।

বাঙালীর একান্নবর্ত্তী সংসার ভেঙে যাচ্ছে কেন ?

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা

বাঙালীর একান্নবর্ত্তী সংসার ভেঙে যাচ্ছে কেন ? এর উত্তর চাইলে প্রবীণা শাশুড়ীরা দেবেন বধূদের স্ব-স্বপ্রধান মনোবৃত্তির দোষ এবং আধুনিকারা উল্লেখ করবেন নানা অসুবিধার কথা।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা যাক এর কারণগুলো। পূর্ব্বে ঘরে ঘরে যার প্রচলন ছিল, এখন তার বিলুপ্তির প্রধান কারণ—পুরুষেরা কাজের খাতিরে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছেন। পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাবার ফলে ছোট সংসারের বহুল প্রচলন হয়েছে। যেখানে হয়ত একত্র থাকা সম্ভব, সেখানে দেখা যায়,

"ভাই-ভাইয়ে ঠাঁই ঠাঁই" হয়ে বসবাস করছেন। এটা হয় কেন? আমরা যদি মনে করি যে, আলাদা থাকার ফলে আর্থিক দিক্ দিয়ে আমরা লাভবান হই, তা'হলে সে কথাটা ভুল। কারণ, চারটি ভাই যদি মাসে প্রত্যেকে একশ' টাকা করে পান, তাঁরা একত্রে থাকলে যে ক্ষেত্রে স্বচ্ছল ভাবে চলে যাবে, আলাদা আলাদা বাসা ভাড়া করে, চাকর রেখে তাঁদের টানাটানি পড়ে যায়। একত্রে বাসা ভাড়া করে একত্রে রান্না-খাওয়া করে অনেক কম খরচে চলে।

এ কথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না যে, শিক্ষা আমাদের মধ্যে খানিকটা আত্ম-সচেতন ভাব এনে দিয়েছে। সেটা একান্নবর্ত্তী সংসারের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। একান্নবর্ত্তী সংসার সৃষ্টির প্রথম কথা আত্ম-বিলোপের সাধনা—সেটা সব ক্ষেত্রে আমরা পেরে উঠি না। কাজেই স্বল্প আয়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আলাদা সংসার পাতি।

প্রবীণারা হয়তো বলবেন যে, "আমরাও ত এক কালে তোমাদের বয়স কাটিয়েছি বাপু, আমরা কেমন করে সব নিয়ে ঘর করেছি?" তা'হলে আমি বলব যে, অসন্তোষ ও অশান্তি তখনও ছিল, কিন্তু ছিল না সেটা—সেটার ফলে আলাদা সংসার করার সুযোগ। তা ছাড়া, যুগের সাথে সাথে মানুষের মনের ও শিক্ষারও বহুল পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা সে ভালই হক্ আর খারাপই হক! তখনকার দিনের মেয়েরা জানত যে, তাদের সামনে একটি মাত্রই পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে শ্বশুরবাড়ীতে সকলের প্রিয়পাত্রী হওয়া। স্বামীদেরও খুব কমই সাহস ছিল বউ নিয়ে আলাদা সংসার করবার। এক কথায় বাঙালীর সমাজ তখন এক আলাদা ছাঁচেই গড়া ছিল।

লক্ষ্য করলে হয়তো এ-ও দেখা যাবে যে, বিয়ের আগে যে সব ভাইয়েরা এক সাথে মা-বাপ নিয়ে থাকত, বিয়ের পরই তারা একে একে আলাদা সংসার পাতছে। তখন দোষটা স্বভাবতই বউয়ের উপরে গিয়ে পড়ে।

আগেকার দিনের বউয়েরা যা পারত, আমরা তা পারি না কেন? তার কারণ, আমাদের মায়েদের আমলে মেয়েদের বার-তের বৎসর বয়সে বিয়ে হত, তাঁরা ভায়ে-ভায়ে বিভিন্ন শিক্ষা ও পরিবারের বেষ্টনী থেকে আসলেও তাঁদের আসল শিক্ষাটা হত শ্বশুরবাড়ীতে। ছোট বয়সে বিয়ে হওয়াতে বাপের বাড়ীটাই তাঁদের পর হয়ে [illegible] কাজেই বিরোধ বাধলেও চট করে আলাদা সংসার পাতবার [illegible] তাঁদের মনেও হতো না।

এখন আমরা ছোট থেকেই শুনি "মেয়েরাও মানুষ"। [illegible] বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা অর্জ্জনে কাটিয়ে কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সে বউ [illegible] আসি। প্রায় পুরো শিক্ষাটাই আমাদের শেষ হয়ে যায়। কা[illegible] নিজেকে বিয়ের পরে নূতন করে গড়ে নিতে পারি না।

প্রবীণারা বলেন—"সংসারের রক্ষাকর্ত্রী নারী; পুরুষ যাকে [illegible] তোমরা যাবে গড়ে।" তাঁরা বলবেন, নারীর আদর্শ হচ্ছে আপনা[illegible] উজাড় করে সংসারে বিলিয়ে দেওয়া। কিন্তু নবীনারা বলবেন, "না[illegible] কর্ম্মক্ষেত্র আজ আর শুধু সংসারের মাঝেই গণ্ডীবদ্ধ নয়।" স্থির[illegible] ভেবে দেখলে কোনটাই অস্বীকার করা চলে না। সময়-ভেদেই এই ম[illegible] পার্থক্য। তখন যেটুকুর মধ্যে আমরা ছিলাম, সেটাই ছিল আমা[illegible] জগৎ, এখন তা আশা করতে গেলে আঘাত পেতে হবে বৈ কি?

হ্যাঁ, এখন আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। একান্ন[illegible] সংসার আবার ঘরে-ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রবীণাদের মনে রাখতে হ[illegible] যে, তাঁদের সঙ্গে এখনকার যুগের মেয়েদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাতে ফল ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, সে প্রশ্ন আজ থাক্, ত[illegible] এটা ঠিক যে, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আমাদের উপর দিয়ে ঘটে গেছে। আর দ্বিতীয় কথা, পেটের মেয়ে রক্তের টানেই আপন হয়, কিন্তু এক[illegible] পরের মেয়েকে আপন করতে হলে অনেকখানি স্নেহ ও প্রীতির দরকার।

আর নবীনাদের বলি, সংসারে যেখানে নিজেকে ভাল ও উন্ন[illegible] প্রতিপন্ন করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা চান, সেখানে আত্ম-সংযম দরকার। যাঁরা সন্তানের মা, তাঁরা নিশ্চয়ই বোঝেন যে, সন্তানের জন্য কত [illegible] করতে হয়। সেই সন্তান বড় হলে তাদের কাছ থেকে যদি স্নেহের কিছুমাত্র প্রতিদান না পাওয়া যায়, তবে কেমন লাগে? শ্বশুর শাশুড়ীদের স্নেহেই যে সন্তান প্রতিপালিত, তাঁদের ত্যাগ করে নিজেরা একটু সামান্য স্বাধীনতা ও সুখ ভোগ করার স্পৃহা—দেশ ও কালের পক্ষে অস্বাভাবিক না হলেও—নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক।

১। খবরের কাগজ বা ছাপাখানা যখন হয়নি, সেই মোগল যুগের প্রাদেশিক সংবাদদাতাদের "ওয়াকে-নবীশ" বলত। হাতে লিখে ওয়াকে-নবীশরা যে সংবাদ দূত মারফত পাঠাতেন, তা সাধারণতঃ নবাবদের পড়ে শোনাতেন বেগমরা। এই সংবাদই নবাবদের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করত।

২। আজ থেকে ৩৩৫ কোটি বছর আগে।

৩। "মহাভারতের" যুগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল অর্জ্জুন সুভদ্রাকে, সহদেব মদ্ররাজকন্যাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে এবং পরীক্ষিৎ উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। প্রত্যেক কন্যাই পরিণেতাদের মাতুলকন্যা।

৪। পৃথিবীতে প্রথম জীবের (অমেরুদণ্ডী) আবির্ভাব হয় আজ থেকে ১০ কোটি বছর আগে।

৫। পর্ত্তুগীজ ফ্রান্সিস জেবিয়রের "Catechism" ১৫৫৭ সালে ছাপা হয়।

৬। ১৬২২ সালের মে মাসে, নাম "The Weekly News from Italy, Germany etc"—প্রকাশক, নিকোলাস বোর্ণ, টমাস আর্চার।

৭। বর্ত্তমান রাজশাহী ডিভিশন ও কুচবিহারকে প্রাচীন কালে বলত "পুণ্ড্রবর্দ্ধন।"

৮। মেদিনীপুরের বর্ত্তমান "তমলুকের" প্রাচীন নাম "দামলিপ্ত," "তাম্রলিপ্ত" ও "তামালাইট্স।"

৯। "ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রের অনুগতা, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন সোমের, দময়ন্তী যেমন নলের, ভদ্রা যেমন বৈশ্রবণের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের, তুমিও সেই রকম ভর্ত্তৃচিত্তের অনুগামিনী হও। তুমি বীরপুত্রের জননী হও, বহু সুখ-সৌভাগ্যে কালযাপন কর, সুভগা হও, সুখ-সম্ভোগে কালাতিপাত কর, পতিব্রতা ও যজ্ঞপত্নী হও।"
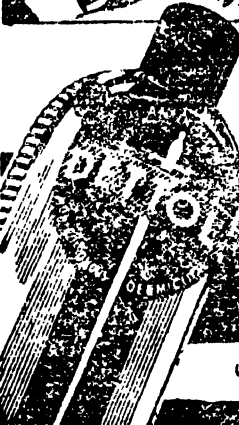
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

ছোটদের আসর

অসাধারণ নেতৃত্ব

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ
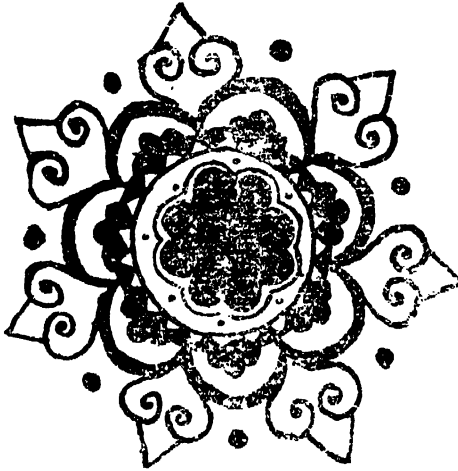
মানুষের মধ্যে অনেক শক্তিশালী নেতাই নেতৃত্ব করে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকের নাম এবং কাহিনী তোমাদের জানা আছে, কিন্তু এ ত অতি সাধারণ ব্যাপার, কারণ এ ধরণের নেতার অভাব মানুষের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটেনি, কিন্তু পশু-পাখীদের মধ্যে নেতৃত্ব একটু অসাধারণ নয় কি? এই ধরণের কয়েকটি অসাধারণ নেতৃত্বের কথাই আজ তোমাদের শোনাব, বলি তবে এখন।

পেলিক্যান পাখীরা যখন দল বেঁধে উড়ে চলে, তখন তাদের পাখার আওয়াজে কোন এক বিশেষ শব্দ শুনবার উপায় থাকে না কিন্তু বিপদের মুখে এরা দলপতির ইঙ্গিতে নিমেষের মধ্যে বিপরীত দিকে উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হিমালয়ের তুষার-প্রদেশে এক জাতের স্বর্ণ-ঈগল দেখতে পাওয়া যায়। এদের দলপতি যখন যেদিকে যায়, তার দলের অন্য পাখীরাও অন্ধ ভাবে সেই দিকেই তার অনুসরণ করে। অবশ্য দলপতির দৃষ্টি সব সময়েই তার দলের পাখীদের বিপদের কবল থেকে রক্ষা করবার দিকে থাকে।

দলপতিরা সব সময়েই তার দল-বলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু ভেড়াদের বেলা দেখা যায় এর বিপরীত অবস্থা। এক ছোট ভেড়ার বাচ্চাকে তার জন্মের কিছু দিন পরেই নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। বাইরের সকল রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে স্বভাবতঃই অন্য ভেড়াদের চেয়ে সাহসী হয়ে ওঠে। তার পর এক দিন যখন সে তার সগোত্রদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, তখন অন্য ভেড়ারা তাকে বিনা দ্বিধায় দলপতি বলে স্বীকার করে নেয়। ঘণ্টা ধ্বনি করতে করতে দলপতি চলে আগে আগে, আর তার পিছনে পিছনে চলে একান্ত অনুগত ভেড়ার দল। কিন্তু এই আনুগত্যই শেষে তাদের সর্ব্বনাশ করে। এক দিন মেষপালকের সঙ্কেতে ভেড়ার দল তাদের দলপতির পিছন পিছন এক গাড়ীতে এসে ওঠে। পালকের ইঙ্গিতে দলপতি নেমে পড়ে আর বাকী ভেড়াদের নিয়ে গাড়ী চলে যায় কসাইখানায়।

পিঁপড়েদের মধ্যে একনায়কত্বের প্রভাব যে খুব বেশী, তা তোমরা জান নিশ্চয়ই? এরা বিভিন্ন দলে রাণীর অধীনে বাস করে। রাণীই এদের রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। অনেক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাণীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

এবার তোমাদের বলি পশু-রাজ্যের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা। ঘটনাটি শুনে তোমরা হয়তো এটা একটা কল্পনাপ্রসূত গল্প বলেই মনে করবে, কিন্তু এটা ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডেরই এক বিখ্যাত শিকারীর জীবনে। এক দিন তিনি যখন আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক বানর-বাহিনীর সামনে এসে পড়েন। ব্যাপারটা যে মোটেই সুবিধের নয় তা বুঝতে পেরে তিনি গুলী ছুড়লেন না। এদিকে বানরেরা ততক্ষণে গাছের ডাল-পালা ভেঙে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাব-ভাব দেখে শিকারী ভয় পেয়ে গেলেন। ওদিকে এক গম্ভীর গর্জ্জনে অনুচরদের নিরস্ত করে বানর-দলপতি সদর্প পাদক্ষেপে শিকারীর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর তাঁর হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ও তাঁর মাথা থেকে এক টানে টুপিটা খুলে ফেলল। সব শেষে সে এক জন অভিজ্ঞ পুলিশ-সার্জ্জেন্টের মতই শিকারীর দুই পকেটে হাত ভরে দিয়ে কি যেন মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখল। শিকারী স্থির ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বানরাধিপতির কাজের প্রতিবাদ করবার মত সাহস তখন তাঁর ছিল না। পরীক্ষান্তে বানর-দলপতি নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরেই শিকারীকে পরিত্যাগ করে সদলবলে গভীর বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গল্প হলেও সত্যি'

শ্রীতন্ময় বাগচী

১৯০৪ সালের জুলাই মাস……

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে লাহোরে। উর্দ্দু সাহিত্যের দিক্‌পাল কবি ইক্‌বাল ও তখনকার প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি হালি ছিলেন ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা, ভারতের সমস্ত দেশ থেকে নানা জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত মৌলবী উপস্থিত হয়েছেন সম্মেলনে। সে সময় 'লিসানুল সিদ্দিক' নামে এক সাময়িক উর্দ্দু-পত্রিকা শিক্ষিত মুসলমান সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কারণ, সম্পূর্ণ অপরিচিত সম্পাদকের নির্ভীক মতামতে ও সুষ্ঠু পরিচালনায় পত্রিকাটি প্রচারিত বা প্রসারিত হতে বেশী সময় লাগেনি। তাই সম্মেলনে মূল বক্তা হিসাবে ঐ সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করে আনা হল।

সভা আরম্ভ হয়েছে। চারি দিকে অগণিত দর্শক আর শ্রোতার ভীড়। অসীম ধৈর্য আর অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছেন মূল বক্তাকে দেখবার ও তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য। এমন সময় উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক জন এক ১৬।১৭ বছরের কিশোরকে সভা-স্থলে এনে 'লিসানুল সিদ্দিক' পত্রিকার সম্পাদক বলে পরিচয় করে দেয়। সমস্ত সভা স্তম্ভিত···নির্বাক্···নিস্তব্ধ। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে থাকে। কেউই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে ঐ তরুণ এক জন এত বড় প্রতিভাবান পণ্ডিত। তার পর সবাই যখন তাঁর ভাষণ শুনলেন, তখন এক বাক্যে স্বীকার করলেন যে, ঐ তরুণই এক দিন ভারতবর্ষে সমগ্র মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা হবে। পরবর্তী কালে সেদিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যা হয়নি তার প্রমাণ আজও রয়েছে।

ঐ কিশোর প্রতিভাবান সম্পাদক হচ্ছেন ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি ও জাতীয় সরকারের শিক্ষা-সচিব মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

স্বামীজীর মানব-প্রীতি

শ্রীরবিপ্রসাদ সরকার

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"।

এই উক্তির সত্যতা স্বামীজী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ মানব-হৃদয়ে তিনি চিরজাগ্রত, চিরপূজ্য। ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে যাহারা ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, সেই ঘৃণিত অবজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠের বাণী চিরদিনই প্রতিবাদের সুরে বেজে উঠেছিল। সে সুরে কোমলতার রাগিণী ফুটত না, ছিল বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত। স্বামীজীর চরিত্রে মানব-প্রীতি কি ভাবে স্থান পেয়েছিল তা আমরা দেখতে পাই "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" নামক পুস্তকে,—স্বামীজীর সহিত জনৈক গো-রক্ষণ সভার প্রচারকের আলোচনায়।

স্বামীজী যখন বিলাত হইতে কলিকাতায় আসেন সেই সময় এক জন হিন্দুস্থানী (গো-রক্ষণ সভার প্রচারক) তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসেন। উক্ত ব্যক্তি সভার কথা পাড়িলে স্বামীজী তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে—সেখানে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হয়।

স্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়া-পরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক। মাড়োয়ারী বণিক্ সম্প্রদায় এ কার্য্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্য্যে বহু অর্থ দান করেন।

স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষ কালে কোন সাহায্য-দানের আয়োজন করিয়াছে কি?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবল মাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাত-ভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে অন্ন দিয়া সাহায্য করা উচিত মনে করেন নাই?

প্রচারক। না; লোকের কর্ম্মফলে—পাপে—এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের এই কথায় স্বামীজীর অন্তঃস্থিত অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইয়া যেন এই ঘৃণিত দুরাচারকে ভস্মীভূত করিতে চাহিল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ শক্তিতে উহাকে দমন করিয়া বলিলেন—"যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরিতেছে দেখিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশি-রাশি অন্ন বিতরণ করে, তাহার সহিত আমার কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই।—তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মফলে মানুষ মরছে—এইরূপে কর্ম্মের দোহাই দিলে, জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন আপন কর্ম্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্চেন ও মরচেন—আমাদের উহাতে কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।" এই ঝাঁঝালো এবং বিদ্রূপ-বাক্যবাণে অপ্রতিভ হইয়া প্রচারক যাহা বলিয়াছিল তাহার উত্তরে সে পাইয়াছিল আরও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "গরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণই বুঝিয়াছি—তা না হইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন।"

কর্ম্মফলের দোহাই দিয়াই আজ ভারতীয় তথা বাংলার মানব সমাজ কর্ম্মক্ষেত্রে সকল জাতির পশ্চাতে রহিয়াছে! কর্ম্মফলের দোহাই দিয়াই তাহারা ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রে নিশ্চুপ হইয়া রহিয়াছে। বিদেশীর শাসন-নীতি, মালিকের মজুত-নীতি যেখানে অন্নাভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে যাহারা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া সেই নিরন্ন মানুষকে সেবা করে নাই—তাহাদের সাহায্যের দিকে অগ্রসর হয় নাই; সেই দুর্ব্বৃত্তদের চোখে আঙুল দিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ মানব-জীবনকে অবহেলায় নষ্ট হতে দিও না। সর্ব্বাগ্রে তারই সেবা কর। মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মনুষ্য-সেবাই ঈশ্বর-সেবার প্রকৃত রূপ।

শুধু একটা দিন

জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে কাস্তেখানা চালায় শরিফ মিয়া। এমন মাঠ-ভরা ফসল অনেক দিন কাটেনি শরিফ তার জীবনে। যেদিকে তাকায়, শুধু রাশি-রাশি সোনালী ধান। কেমন একটা অজানা পুলকে সারা দেহ-মন ভরে ওঠে শরিফের। আকাশে অদ্ভুত গাঢ় নীলচে রং ধরেছে। এমন সোনা-ঝরা দিন শরিফ বড় একটা দেখে না। মাথার ওপরের ঐ দিগন্ত-প্রসারী সুগভীর সুনীল আকাশের তলায় সোনালী ধানগুলি কাটতে কাটতে কিসের নেশা ধরে যায় তার প্রাণে। শরিফ কবিতা কি জিনিষ, জানে না। কবিতা সে লিখতে পারে না। 'আকাশ মাটির বুকে নেমে এসেছে'—এ কথার মর্ম্ম উদ্ঘাটন সে করতে পারে না। তবে কাজের ফাঁকে মাঝে-মাঝে মাথা তুলে দূরে দৃষ্টি ফেললে তারও মনে হয়, যেন মাথার ওপরকার ঐ আকাশটা তার সোনালী ধানের ক্ষেতের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। ভারি মিষ্টি লাগে দিনটা শরিফের। এমন নিবিড় ভাবে কোন দিনকে অনুভব করেনি সে এর আগে।

এক মনে কাস্তে চালায় শরিফ। আর ওরই ফাঁকে মাঝে-মাঝে টান মারে হুঁকোটায়।

রোদ যে কখন মাথার ওপর উঠে আসে, সে খেয়ালই নেই শরিফের। কি একটা নাম-না-জানা গানের এক কলি বেসুরে ভাঁজতে ভাঁজতে কাস্তে চালিয়ে যায় সে আপন মনে। তার প্রশস্ত মসৃণ কাল ললাটের ওপর বেশ বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। পেশী-বহুল বাহু দু'টো আর গা-পিঠ বেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ওঠে। তবু

ক্লান্তি নেই শরিফের এতটুকু। কিসের নেশা পেয়ে বসেছে আজ তাকে!

এমনি সময় হঠাৎ—বাপ্‌জান……

পিছন ফেরে শরিফ। তার তিন বছরের ছোট্ট ছেলেটা তাকে ডাকতে এসেছে। বুঝতে পারে সে তার খাবার সময় বহু ক্ষণ উৎরে গেছে। কাস্তে ফেলে ধীর পদক্ষেপে ছেলের পিছু-পিছু ঘরে চলে শরিফ মিয়া।

অপূর্ব্ব তৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাপন করে শরিফ। অনেক দিন এ রকম ভাবনা-চিন্তাহীন প্রাণে সে মুখে গ্রাস তোলেনি। মস্ত-বড় একটা গ্রাস মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে কাঁচা পেঁয়াজের আধখানা কামড়াতে কামড়াতে শরিফ ভাবে—নিশ্চিন্ত মনে ভাবে ফেলে-আসা কয়েকটা বছরের কথা। কি অকালটাই গেল সে বার! কত লোকই না মরলো! উঃ! ভাবতেও পারা যায় না। বড্ড জোর বেঁচে গেছে শরিফ আর তার পাশাপাশি ক'ঘর। ভাবতে ভাবতে বিষম লেগে যায় হঠাৎ! না—আর ভাববে না শরিফ ও-সব কথা। মুছে ফেলে মন থেকে একেবারে হঠাৎ-জাগা ম্লান স্মৃতিটুকু। খুব সহজেই নেমে যায় গ্রাসগুলি শরিফের গলা দিয়ে আজ।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ছাড়াছাড়ি! আবার শরিফ নেমে আসে মাঠে। আবার চলে কাস্তে, ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর। সারা দেহ ঘামে ভিজে সপ-সপ করে ওঠে। তবু নুয়ে পড়ে না শরীরটা। শরিফ কি মানুষ? পড়ন্ত রোদ কখন যে সামনের বড় গাছটার মাথার ওপর উঠে এসেছে, খেয়ালই নেই তার। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে পিছন ফেরে। দেখে,-হারাণ আর বেচু তাদের গরু-গাড়ী দু'খানা নিয়ে উপস্থিত। 'কি মিয়া, কত কাটলে?' জিজ্ঞাসা করে বেচু শরিফের মুখের পানে চেয়ে।

শরিফ এর কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে। নিজের সুখ-স্বপ্নে সে মশগুল!

কাটা ধানগুলি হাতাহাতি করে ভরে দেয় সে বেচু আর হারাণের গাড়ী দু'খানাতে। ধানের ভারে মস্‌-মস্‌ করে ওঠে গাড়ী দুখানা।

'যাবার আগে একটা বিড়ি দাও মিয়া'—হারাণ হাত বাড়ায় শরিফের দিকে। শরিফ হাত দিয়ে চট্‌ করে মুছে নেয় কপালের ঘামটুকু! তার পর হারাণকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে ধরায়।

সরু মেঠো পথখানা ধরে চলতে সুরু করে দেয় গাড়ী দু'খানা। অস্ত-সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু তখনও মুছে যায়নি। শরিফ তাকিয়ে থাকে ওদের চলার পথ পানে। এই কিছুক্ষণ আগেই কি একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তার সারা মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু এখন কেমন একটা অজানা বেদনায় তার সমস্ত দেহটা টন্‌-টন্‌ করে উঠল। ধূসর পট-ভূমিকায় শরিফের কালো ছায়াটাকে বড় অবছা ও অস্পষ্ট মনে হয়!

কে জানে, শরিফ কেন বোঝে না—যা ঘটেছে তা খুবই স্বাভাবিক। ধান ত তার নয়। ধান কাটার ভারটা শুধু তার। ধান ত সে কেটেছে—আর তার আনন্দটুকুও সে উপভোগ করেছে প্রাণ ভরে! তবে কেন তার হৃদয়টা এত বেশী ভারাক্রান্ত ওদের ঐ চলার পথ পানে চেয়ে?

শরিফের সমস্ত অন্তরটা নাড়া দিয়ে ওঠে তাকে বোঝাতে চায় এ কথা।

তবু তার সচেতন মনটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এটা। বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়। বলে—'ওরা ত ধানগুলো নিয়ে গেল না শুধু……ওরা যে আমার সমস্ত সুখটুকুও নিঙ্‌ড়ে নিয়ে গেল।

হারাণ আর বেচুর গাড়ী দু'খানা মোড় বেঁকলে দেখতে দেখতে আর দেখা যায় না কিছুই। শরিফ তবু গোধূলির ক্ষীণ আলোতে কি দেখবার চেষ্টা করলে যেন। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে সুদূরের পানে। কি যেন ছিল এই কিছুক্ষণ আগেই, আর এক মুহূর্ত্তে কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে।

হঠাৎ কিসের ছোঁয়া লেগে এমনি সময় চমকে ওঠে শরিফ। সাপ নয় তো? না। ছেলের দিকে তাকিয়ে শরিফ একটু হেসে ফেলে। কখন্‌ যে নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি সে। খোকা তার ছোট্ট কোমল বাহু দু'টি দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল। তার বেশী নাগাল আর সে পায়নি। কোন কথা বলে না শরিফ। ম্লান হেসে বিশাল বক্ষের মাঝখানে টেনে নেয় খোকাকে। ঘরে ফেরার মুখে একবার শুধু তাকিয়ে নেয় পিছন দিকে। অনেক ধান সে কেটেছে—তবু এখনও অনেক কাটতে হবে তাকে। কাটতে পারবে ত সে? নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না শরিফ মিয়া।

…আস্তে আস্তে পা ফেলে শুধু ঘরের দিকে।

পথিক মোরা

সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

পথিক মোরা, পথিক মোরা
আবাস পথে শয্যা ধূলা,
মনের দুয়ার সদাই খোলা
আপন-ভোলা পথিক মোরা।

প্রীতির বাঁধন ছিঁড়েছি আমরা
কঠোর আঘাতে বাজ হানিয়া
সুখের আবাস ফেলেছি ভাঙিয়া—
আপন-ভোলা পথিক মোরা।

শক্তি আমরা, শক্ত আমরা
অসীম আকাশ করিব জয়,
আসুক বিপদ নাহি করি ভয়
আপন-ভোলা পথিক মোরা।
বিপদের ছবি চিনেছি আমরা—
রক্ত-রাঙা আমাদেরই বুকে
দুঃখের রূপ রাখিয়াছি এঁকে,
আপন-ভোলা পথিক মোরা।

মহাভারতের সমাজ : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। সপ্ততীর্থ। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

ভারতের দু'টি মহাকাব্য "রামায়ণ" ও "মহাভারত"কে ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণখনি বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "প্রাচীন সাহিত্যের" মধ্যে বলেছেন : "রামায়ণ ও মহাভারতকে মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস, বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।···ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে।···রামায়ণ, মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।···ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।" মহাভারতের গুরুত্ব সম্বন্ধে এই ভূমিকাটুকুই যথেষ্ট।

গ্রন্থকার সুখময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রবিদ্ ও পণ্ডিত হিসাবে সুপরিচিত। মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও উপাখ্যানাদি থেকে তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের একটা চিত্র রচনা করার যোগ্যতা নিঃসন্দেহে তাঁর আছে। কিন্তু "মহাভারতের সমাজ" নামটি যেমন ব্যাপক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতে বর্ণিত সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির সংকলন ও বিশ্লেষণ করার পূর্ব্বে "মহাভারতের" রচনা-কাল ও রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত। গ্রন্থকার তাঁর "নিবেদনের" মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়। শুধু তাই নয়, তিনি ম্যাক্‌ডোনেল, উইন্টারনিৎস, সুখথঙ্কর, হপকিন্‌স, অধ্যাপক সিদ্ধান্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতবিদ্‌দের সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন : "কোন কোন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মহাভারতের অনেক অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই আপন আপন রুচির প্রতিকূল অংশের প্রক্ষিপ্ততা ঘোষণা করেন।" এ অভিযোগ একেবারে যুক্তিহীন। কোন ভারতবিদ্‌ই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিযোগ সত্য বলবেন না। ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (পুনা) থেকে "মহাভারতের" যে বিরাট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তার কথা গ্রন্থকার জানেন এবং উল্লেখও করেছেন। ইনষ্টিটিউটের প্রস্‌পেক্টসে দেখা যায় যে, "মহাভারত" ও "হরিবংশের" মোট পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় ১২৮৪, তার মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের ৬১০ এবং বাংলা দেশের ৭৭খানা। এ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রায় ২০০ পাণ্ডুলিপি আছে, তার মধ্যে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসেই আছে ৫৬ খানা। এই সব পাণ্ডুলিপির বিশ্লেষণ এখনও অবশ্য শেষ হয়নি, তাহ'লেও মহাভারতের আখ্যান, এমন কি মূল কাঠামোর মধ্যে পর্য্যন্ত যে অনেক জায়গায় সাদৃশ্য নেই, তা পাণ্ডুলিপিগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়। মহাভারতের যে কাহিনী এখন আমরা পড়ি, তার মধ্যে এক বার নয়, অনেক বার প্রক্ষেপ-কাজ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মহাভারতের এই রচনা, সংযোজনা ও প্রক্ষেপ সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্‌রা যা বলেছেন, তার মধ্যে হপ্‌কিন্সের অভিমতই উল্লেখ-যোগ্য ও প্রণিধেয় :—

ভারত (কুরু) আখ্যান	খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ বছর
পাণ্ডুদের কীর্ত্তি আখ্যান	" ৪০০-২০০ বছর
শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ও প্রধান নায়ক	" ২০০-২০০ খৃষ্টাব্দ
অন্যান্য পর্ব্ব	" ২০০-৪০০ খৃষ্টাব্দ

হপ্‌কিন্স তাঁর "The Great Epic of India" গ্রন্থে মোটামুটি এই রচনাকাল পর্য্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এইটাই ভারতবিদ্‌দের মতে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলা যায়। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে, বৌদ্ধ-যুগ থেকে শুরু ক'রে গুপ্ত-যুগ পর্য্যন্ত হ'ল মোটামুটি "মহাভারতের" রচনা কাল। সমস্ত দেশের প্রাচীন মহাকাব্যের মতো "রামায়ণ" "মহাভারত"ও মুখের গাথা সঙ্গীত আখ্যান-বর্ণনা থেকে ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী ধরে মহাকাব্যে বিকাশ লাভ করেছে। এইটুকু মনে না রাখলে, মহাভারতে বর্ণিত সামাজিক অবস্থা, বিশেষ করে তার অনেক স্ববিরোধী রীতিনীতি-প্রথার তাৎপর্য্য বোঝা যাবে না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুরা হপ্‌কিন্সের "The Great Epic of India" এবং অধ্যাপক সিদ্ধান্তের "The Heroic Age of India" নামক মূল্যবান গ্রন্থ দু'খানি পড়লে উপকৃত হবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব হল তিনি মহাভারতের শ্লোকগুলিকে সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এবং বাংলা গদ্যে তার ব্যাখ্যা করে পাদটীকায় শ্লোক-সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। তিন খণ্ডে তাঁর সমস্ত আলোচনা বিভক্ত। "প্রথম খণ্ডে" বিবাহ, নারী, চাতুর্ব্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, শিক্ষা, বৃত্তি, কৃষি, পশু-পালন, বাণিজ্য-শিল্প, আহার-আহার্য্য, পরিচ্ছদ-প্রসাধন, পারিবারিক ব্যবহার ইত্যাদি; "দ্বিতীয় খণ্ডে" ধর্ম্ম, দেবতা, উপাসনা, শবদাহ, অশৌচ, রাজধর্ম্ম, যুদ্ধ, দায়বিভাগ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি; "তৃতীয় খণ্ডে" আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, দার্শনিক মতবাদ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক ইতিহাসের ছাত্র, বিশেষ করে অনুসন্ধানী ছাত্রদের কাছে এই গ্রন্থের উপকরণ-মূল্য বেশী।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাংলার ঐতিহাসিকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নাম অবিস্মরণীয়। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর নানা দিকের মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণার ধারা ছিল অভিনব। প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও প্রাক্তন প্রতিভার অপূর্ব্ব সংযোগেই তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হয়ে উঠেছিল। শুধু ঐতিহাসিক গবেষণায় নয়, সাহিত্যে, কলাবিদ্যায়, বাগ্মিতায়, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী যুগে তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা বাঙালীর হৃদয়ে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। শেষ জীবনে রাজোপাধিতে তিনি ভূষিত হলেও যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্য্য পেয়েছেন জীবনে, তাঁরাই জানেন, স্বদেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ কত প্রগাঢ় ছিল! এক বার কোন এক বিখ্যাত প্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে একখানি স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস, প্রকাশকের স্বার্থে কিছুটা বিকৃত করে রচনা করার জন্য অক্ষয়কুমারকে অনুরোধ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রকাশককে জানান যে, আত্মবিক্রয় ক'রে স্বদেশের মিথ্যা ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য স্থির রেখেই তিনি ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

অক্ষয়কুমারের প্রাথমিক রচনাগুলি গ্রামবার্ত্তার "হিন্দুরঞ্জিকা" ও কুমারখালির "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"য় প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সাল থেকে তিনি মাসিকপত্রে নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "সাধনা" পত্রিকায় তাঁর "সিরাজদ্দৌলার" প্রথমাংশ এবং "সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর "সীতারাম" প্রকাশিত হয়। তার পর তাঁর রচনা প্রধানতঃ "সাহিত্য", "ভারতী", "প্রদীপ", "উৎসাহ", "ঐতিহাসিক চিত্র", "বঙ্গদর্শন" (নবপর্য্যায়) "বঙ্গভাষা", "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

সিরাজদ্দৌলা, সীতারাম রায়, মীরকাসিম, ফিরিঙ্গি বণিক, গৌড়লেখমালা ইত্যাদি।

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক মূল্যবান রচনা আজও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রয়েছে। এই রচনাগুলি প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত পত্রিকাগুলিতেই ছড়িয়ে রয়েছে। ব্রজেন্দ্র বাবু বলেছেন যে, এগুলি একত্র করে একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারলে অক্ষয়কুমারের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হয়। আমাদের মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মতো প্রতিষ্ঠানই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন এবং নেওয়া উচিতও। ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি একটি খণ্ডে এবং অন্যান্য রচনাগুলি "বিবিধ প্রবন্ধ" নামক স্বতন্ত্র খণ্ডে সংকলন করলেই ভাল হয়। ব্রজেন্দ্র বাবু কোন রচনা কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি তালিকা আলোচ্য চরিত কথার মধ্যে দিয়েছেন। অনুসন্ধানী পাঠকদের এতে যে যথেষ্ট সুবিধা হবে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবু বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রচনাগুলিকে যদি সংকলিত করে সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশ করা হয়, তাহ'লে ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠকরা আরও বেশী উপকৃত হবেন বলে আমরা মনে করি।

ইংরেজী

INTRODUCING INDIA (Part I): Edited by K. N. Bagchi & W. Griffiths. Published by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1, Park Street, Calcutta. Price Rs 6 only.

কিছু দিন আগে বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ সোসাইটির সভ্যবৃন্দ ও বিদ্যোৎসাহী সাধারণের জন্য কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের এই বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বক্তৃতাগুলি যে মূল্যবান ও তথ্যবহুল, তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি বক্তৃতাগুলি সম্পাদন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। "Introducing India" নামটিও উল্লেখযোগ্য।

স্যার নরমান এন্ডাসের "ভারতীয়-মন্দির" সম্বন্ধে রচনাটির মধ্যে হিন্দু-স্থাপত্যের মধ্যে ধর্মভাবের প্রভাব ও বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা পর্যাপ্ত না হলেও প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক জে. এন. ব্যানার্জ্জির "ভারতের দেব-দেবী" সম্বন্ধে রচনাটিও মূর্ত্তিপূজার ব্যাখ্যা হিসাবে মূল্যবান।

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল "প্রাচীন ভারতের আইন ও বিচার-প্রণালী" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রিফিথ্‌স সাহেবের "ভারতের কৃষ্টি" সম্বন্ধে আলোচনা ভারতীয় নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের সর্ব্বাধুনিক গবেষণা সম্বলিত। অধ্যাপক ডিকিনসন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার কলা-শিল্পে গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা কলারসিকরা পড়ে উপকৃত হবেন। "তেরশ' বছর আগের ভারতবর্ষ" নামক রচনার মধ্যে মিঃ এজ্‌লে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ইউয়াং চোয়াং-এর ভ্রমণ-কাহিনী অবলম্বনে তদানীন্তন ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "ক্লাইভের কালে বাংলা" এবং ডাঃ বিমলাচরণ লাহার "প্রাচীন বাংলার কয়েকটি ভৌগোলিক কেন্দ্র।"

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়াও, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধানী পাঠকদের কৌতূহল জাগানোর উপযুক্ত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, রেভারেণ্ড কুলশ' সাহেব "সাঁওতালদের রীতিনীতি ও ব্যবহার" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে জ্ঞাতব্য নতুন তথ্য অনেক আছে। তা ছাড়া মাল্লান সাহেবের "আসামের পার্ব্বত্য জাতি" সম্বন্ধে আলোচনাও মূল্যবান ও তথ্যবহুল। ডাঃ হোরার "বাংলার মাছ" সম্বন্ধে রচনাটি প্রাণিবিদ্যার ছাত্রদের কাছে ভাল লাগবে।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নানা দিক নিয়ে এই ধরণের মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির তরফ থেকে আরও বেশী প্রকাশ করা উচিত। টাইসন সাহেবের "যুদ্ধ ও ভারতীয় শ্রমশিল্পের আলোচনা" যতই মূল্যবান হোক না কেন, আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান হয়েছে মনে হয়। সংকলনের মধ্যে অন্যান্য যে সব ক্ষিপ্রতাজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তাও ভবিষ্যতে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রন্থের মূল্য এত বেশী করার কারণ কি বোঝা যায় না।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

শ্রীধর কথক

১৯৪৫ সালের ৯ই আগষ্ট। আগষ্ট বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী দিবস। বোম্বাই-এ পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। সভাপতিত্ব করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। সেই দিন সকালেই বিহারে মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসীর সংবাদ সর্দার প্যাটেলের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বক্তৃতা দিতে উঠিয়া সর্দার প্যাটেল বজ্রকণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিলেন—বিহারে মহেন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় যুবককে ফাঁসী না দিয়া ফাঁসী দেওয়া উচিত লর্ড লিনলিথগোর। আগষ্ট-বিপ্লবের ঘটনাবলীর জন্য তিনিই প্রধানতঃ দায়ী। এই নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা সর্দার প্যাটেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সর্দার প্যাটেল অল্প কথার মানুষ। তিনি নীরবে কাজ করার পক্ষপাতী। মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যে সর্দার প্যাটেলের ন্যায় সংগঠন-প্রতিভা আর কাহারও নাই। গান্ধীজী আদর্শ বিশ্লেষণ করিতেন ও কর্মপন্থার নির্দেশ দিতেন। গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজ চালাইতেন সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজীর সহিত নিজের ভাগ্য জড়িত করার পর হইতে সর্দার প্যাটেলই কার্য্যতঃ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। অন্ধ ভাবে কোন জিনিষ গ্রহণ করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গান্ধীজী আমেদাবাদে গমন করেন। সর্দার প্যাটেল তখন সেখানকার অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার। গান্ধীজীর আদর্শ ও কথাবার্ত্তা লইয়া আমেদাবাদের উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ হাসি-ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষীণকায় নম্র-স্বভাব এক ব্যক্তি অহিংসার সাহায্যে পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করার কথা বলিতেছেন—গান্ধীজীর কথায় সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাসি পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক! বল্লভভাইও অপর সকলের সংগে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিতেন। গান্ধীজী এক দিন আমেদাবাদ ক্লাবে বক্তৃতা দিলেন। গান্ধীজী বক্তৃতা দিতেছেন, আর সর্দার প্যাটেল সভা-কক্ষের পিছন দিকে বসিয়া তাস খেলিতেছেন। কিন্তু যেদিন সর্দার প্যাটেল ঠিক করিলেন যে, তিনি সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া গান্ধীজীকে অনুসরণ করিবেন, সেদিন প্রকাশ পাইল তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা ও অতুলনীয় চরিত্র-শক্তি। গান্ধীজীর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সর্দার প্যাটেল অনন্যচিত্তে তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়াছেন। কোন কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্দার প্যাটেল বিশ্রাম গ্রহণ করেন না। কঠিন, দুরূহ কাজ করিতেই তিনি অধিক আনন্দ পান। তিনি হইতেছেন প্রকৃত কর্মযোগী।

ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার বিপ্লবী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিয়া শিক্ষকগণ হতাশ হইয়া যান। তাঁহার অশান্ত প্রকৃতি বিধি-নিষেধ লংঘনের জন্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার নিকট হইতে এই অশান্ত প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। গুজরাটের খেড়া জেলায় নাদিয়াদের নিকট করমসাদ নামক গ্রামে ১৮৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে [illegible]র প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। নাদিয়াদ হাই স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেলার আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গোধরায় ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সাধারণতঃ ফৌজদারী মামলায় আসামী পক্ষের হইয়া লড়াই করিতেন। তিনি যে সকল মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেন, সেই সব মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসামীরা মুক্তি লাভ করিত; ক্রমশঃ বিচারকদের নিকট

যখন গোঁফ ছিল

তিনি ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট বোরসাদ হইতে 'আনন্দ' নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইল। সর্দার প্যাটেল 'আনন্দে' গিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট পুনরায় 'বোরসাদে' স্থানান্তরিত করা হইল। বল্লভভাই যে অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী, সেই সময়েই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিন বল্লভভাই আদালতে একটি মামলা পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার হাতে একটি তার-বার্তা দেওয়া হইল। উক্ত তার-বার্তা তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল। বল্লভভাই তারবার্তাটি পাঠ করিয়া পকেটে রাখিয়া মামলার কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হইল না। আদালতের কাজ শেষ হইবার পর সকলে জানিতে পারিল যে, তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। কর্তব্য সম্পাদনের সময় ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ সম্পর্কে তিনি চিরদিনই উদাসীন। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার জন্য বল্লভভাই ইংলণ্ডে গমন করেন। প্রথম বার তাঁহার পাসপোর্ট লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই প্যাটেল ইংলণ্ডে যান। বিঠলভাই প্যাটেলের নামও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাত। বল্লভভাই ইংলণ্ডে গমন করিয়া খুব কৃতিত্বের সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি আমেদাবাদে আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরিচিত হইবার পর বল্লভভাই আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

এক অভিনব পদ্ধতিতে গান্ধীজী জনসাধারণকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিলেন। নিরস্ত্র দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সংঘবদ্ধ ভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভব, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীই

সর্বপ্রথম ইহা প্রমাণিত করিলেন। ১৯১৮ সালে গান্ধীজী গুজরাটের খেড়া জেলায় কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। অন্যায় ভাবে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদেই এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। সত্যাগ্রহের সময় সর্দার প্যাটেল আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া গান্ধীজীর সহিত যোগদান করেন এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনায় এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষকগণ সত্যাগ্রহে জয়লাভ করিল। সরকার তাহাদিগকে খাজনা হইতে রেহাই দিলেন। ১৯২২ সালে বোরসাদ সত্যাগ্রহের সময় সর্দার প্যাটেল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অভিনব কৌশলের পরিচয় দিলেন। সশস্ত্র ডাকাত দলের বিরুদ্ধে ও পুলিসের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে নাগপুরে যে পতাকা সত্যাগ্রহ হয়, সর্দার প্যাটেল তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন। এই সকল সংগ্রামে সাফল্য লাভ করায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা হিসাবে সর্দার প্যাটেলের নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। গুজরাটের কৃষকগণ তাঁহার নির্দেশে সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত হইল। বর্দৌলী সত্যাগ্রহ পরিচালনার সময় বল্লভভাই অসাধারণ সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি-কৌশল ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেন। জমির খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে গুজরাটের বর্দৌলী তালুকের কৃষকগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিল। গান্ধীজীর নির্দেশে বল্লভভাই তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। খাজনা প্রদান বন্ধ করায় কৃষকদিগকে নানাবিধ নির্য্যাতনের সম্মুখীন হইতে হইল। সরকারের কর্মচারীরা আসিয়া তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্ত করিল। খাজনা প্রদানের জন্য তাহাদের উপর নানা ভাবে চাপ দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু বল্লভভাই-এর নেতৃত্বে কৃষকগণ অটল রহিল, তাহারা কোন মতেই খাজনা প্রদান করিল না। তাহাদিগকে দলে দলে গ্রেপ্তার করা হইল, কিন্তু ইহাতে সত্যাগ্রহের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। ছয় মাস ধরিয়া এই সত্যাগ্রহ চলিল এবং অবশেষে কৃষকগণ জয়লাভ করিল। গবর্ণমেন্ট-নিযুক্ত তদন্ত কমিটি খাজনা বৃদ্ধি অযৌক্তিক হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। বর্দৌলী সত্যাগ্রহের অভিনব সাফল্যের পর সমগ্র ভারত বল্লভভাইকে সর্দার বলিয়া অভিবাদন করিল। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সর্দার প্যাটেল গুজরাটে আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অসামান্য সাফল্যের সহিত আন্দোলন পরিচালনা করিলেন। ১৯৩১ সালে সর্দার প্যাটেল করাচী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি নিজেকে কৃষক বলিয়া অভিহিত করিলেন। ভারতের লক্ষ্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, "There is no receding from the Lahore resolution of complete independence. This independence does not mean, was not intended to mean, a churlish refusal to associate with Britain or any other power. Independence therefore does not exclude the possibility of equal partnership for mutual benefit and dissolvable at the will of either party."

১৯৩২ সালে সর্দারজী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন। দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে কয়েক বৎসর কারাগারে যাইতে হইল। কিন্তু কারাগারের অভ্যন্তরে ও কারাগারের বাহিরে, কোন অবস্থাতেই তাঁহার অদম্য উৎসাহ ম্লান হইল না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতে যে সাধারণ নির্বাচন হইল, কংগ্রেস তাহাতে অংশ গ্রহণ করিল। পার্লামেন্টোরী সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সর্দার প্যাটেল নির্বাচন-কার্য্য পরিচালনা করিলেন। নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে ও অধিকাংশ প্রাদেশিক আইন-সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিল। ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। সর্দার প্যাটেল বিশেষ দক্ষতার সহিত কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পরিচালনা করিলেন এই সময়ে সর্দার প্যাটেল পার্লামেন্টোরী রাজনীতির অপূর্ব জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন। সর্দার প্যাটেল দেশবাসীকে চরম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানাইলেন। ক্রিপস্ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পর আগষ্ট-বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল। সমগ্র দেশ অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধূমায়িত হইয়া উঠিল। চরম মুহূর্তের জন্য সকলেই রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আগষ্ট-প্রস্তাব গৃহীত হইল। বোম্বাই-এ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহূত হইল। বিপ্লবের ঝড় উঠিবার পূর্বেই কংগ্রেসকে চরম আঘাত হানিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রস্তুত হইলেন। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে আগষ্ট-প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সর্দার প্যাটেল বলিলেন, "The British need not worry to whom to transfer power. Let her transfer power to Muslim League, to Hindu Mahasava, to any Indian so long as they give up their control over India."

১৯৪৩ সালে মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। সর্দার প্যাটেল তখন কারাগারে। এই ভয়াবহ মন্বন্তরের সংবাদ শুনিয়া রাগে-দুঃখে সর্দার প্যাটেলের চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি বলিলেন, "What pained us most in the jail was the tragedy of the Bengal Famine. Millions were literally poured into the furnace of famine but there was none to rescue them. No one even came out and said, 'loot if you can, murder if you need to save your lives'. The result was that we lost more men than the total casualties of the Allies in the present war."

দীর্ঘ দিন সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিল। দেশ-বিভাগের ফলে বহুবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল—অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, ভারত তাহার নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ জাগিল। জাতীয় ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে সহকারী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বল্লভভাই দৃঢ়হস্তে রাষ্ট্র তরণীর পরিচালনা-ভার

গ্রহণ করিলেন এবং বহুবিধ জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতের স্বাধীনতাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিলেন। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনে সর্দার প্যাটেল যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে চিরদিন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বৃটিশ শক্তি যখন ভারত ত্যাগ করিল, ভারত তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে হৃতসর্বস্ব। গুরুতর সমস্যা দেখা দিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত পাঁচ শতাধিক ছোট-বড় দেশীয় রাজ্য লইয়া। দেড় বৎসরের মধ্যে এই পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার অসাধারণ কৃতিত্ব সর্দার প্যাটেলের। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই একটি মাত্র কার্য্যের জন্যই সর্দার প্যাটেলের নাম অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক সূত্রে বাঁধিবার স্বপ্ন ভারতের বহু নরপতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, কিন্তু বিরাট বাধা অতিক্রম করিয়া কোন সম্রাটই এই স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বর্তমানে সর্দার প্যাটেলের চেষ্টায় এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে।

সর্দার প্যাটেলকে কঠোর প্রকৃতির লোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা আংশিক ভাবে সত্য। ভারতের শত্রুদের নিকট তিনি নির্মম ও নিষ্করুণ। ভারতের অগ্রগতির পরিপন্থী শক্তি-সমূহকে চূর্ণ করার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। ভারতের শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত। ভারতের কল্যাণ-বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে সর্দার প্যাটেলের নিকট কাহারও ক্ষমা নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ জানেন যে, সর্দারজীর কঠোর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে স্নেহময় হৃদয় বিরাজমান। অনেকের ধারণা, সর্দার প্যাটেল কখনও হাসেন না। এ কথা সত্য নহে। হাস্য-পরিহাস করিতে সর্দারজী খুবই ভালবাসেন। গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ কাহাকে করা হইবে, এই বিষয় লইয়া এক বার গান্ধীজী ও তাঁহার মধ্যে আলোচনা হয়। গান্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "এই বিষয় সম্পর্কে চিন্তার কি আছে? আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন।" গান্ধীজী হাসিয়া বলিলেন, আপনি ছাত্রদিগকে কি শিখাইবেন? সর্দারজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, ছাত্ররা যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা যাহাতে তাহা ভুলিয়া যায়, আমি সে জন্যই চেষ্টা করিব। সর্দারজীর কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সর্দারজী নিজেকে কৃষক বলিয়া অভিহিত করিতে ভালবাসেন। কৃষকদের ন্যায় তাঁহার জীবনযাত্রা সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি চিরদিন বিলাসিতা হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছেন। সর্দার প্যাটেলকে 'Iron man' বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনি শক্তির উপাসক। তিনি জানেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে দুর্বলের কোন স্থান নাই। পৃথিবী শক্তিমানের পূজারী। বিশ্বসভায় যোগ্য আসন লাভ করিতে হইলে ভারতকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানে সর্দার প্যাটেল সেই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান সর্দার প্যাটেল দীর্ঘ দিন জীবিত থাকিয়া ভারতকে পরিচালনা করুন, আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

বসন্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

খোলা জানালার ধারে
গ্রামান্তের ছবি।
আগাছায় ভরা পোড়ো ভিটে
শেওলা ধরেছে ইটে ইটে
ফাঁকে ফাঁকে গজায়েছে চারা
অশথ, পাকুড় বট,
আর যত অখ্যাত-নামারা
চেয়ে দেখি ছায়াচ্ছন্ন মনে।
অকস্মাৎ চোখে পড়ে
হরিতকি গাছের পিছনে
ও বাড়ির উত্তর সীমায়
ঝড়ে ডাল ভাঙা
অতি বৃদ্ধ পুরোন শিমুল
মাথা তার সাদা নয়, রাঙা।
পলকে ঝলসে ওঠে মন
ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর বন-উপবন
শিমুলে শিমুলে যায় ছেয়ে
খোলা জানালার ধারে
রক্তিম বসন্ত দেখি চেয়ে।
ভাঙা ইটে, আগাছা জঙ্গলে
যত রঙ গলে
সবই বুঝি নিঙড়ানো শিমুল
বাসনা বিকৃত হৃদিমূল।

আমের মুকুল ভরা ডালে
মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে
চাক বাঁধে পড়ন্ত বিকালে।
পাতা ঝরা শেষ হোল
বাতাবী লেবুর ফুল ঝরে
জানালার দক্ষিণ শিয়রে।
তোমার চুলের ফুল,
তোমার নামের ফুল,
তোমার ফুলের মত
মুখ মনে পড়ে।

আর দেখি
কাঁটা ঘেরা ডাল ভরে ফুল
ওরা কি শিমুল
শিরায় শিরায় যত
রক্তের ঝলক সংজ্ঞাহীন
আমার হৃদয়ে বেঁধা'
কালগুনের দিন।

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

বারো

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম……"

বিরাম নেই আর। সকাল থেকে পাশের বাড়ির রেডিয়োতে অবিশ্রাম বেজে চলেছে। তার মাঝে-মাঝে হচ্ছে ইংরেজি ও হিন্দীতে ধারা-বিবরণী। মহাত্মা গান্ধীর শববাহী শোকযাত্রা অগ্রসর হচ্ছে রাজঘাটের দিকে। ইণ্ডিয়া গেট না কি গেট যেন পার হয়ে গেছে। পৌঁছোতে আর বেশী বাকী নেই।

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম……"

এদিকে আমার ভৃত্য জানিয়ে গেছে যে, ক্লাবসাইড মোটরসের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে। ট্যাক্সি আসবে ঠিক সময়ে। শিলিগুড়ি থেকে ক্যালকাটা-মেলে বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে। কিছু অসুবিধা হবে না। সব ঠিক।

সব ঠিক। আজ রওনা হলে কাল সকালে কলকাতা পৌঁছোতে পারব। তার পরে এক দিনের বিশ্রাম নিয়ে পরশু সকালে, দোসরা ফেব্রুয়ারী, আপিস করতে কষ্ট হবে না। শৈলশিখরে ছুটি কাটিয়ে নূতন উদ্যম নিয়ে আবার নিজেকে নিয়োজিত করতে পারব আত্মোন্নতির নির্ধারিত পথভ্রমণে। সব ঠিক। কিন্তু—

"……পতিত পাবন সীতারাম।"

সব ঠিক। কিন্তু কী যেন নেই। দূরে ওই হিমালয় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। আমার সামনের চেয়ারটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। এতটুকু নড়েনি। উপরে সূর্য কিরণ বিকিরণ করছে অবিশ্রান্ত তেজে। সব ঠিক আছে। কিন্তু তবু কী যেন নেই।

আমার ডান হাতে ঠিক পাঁচটা আঙুলই আছে, বাঁ হাতে তাই। হাত এবং পা দু'টো করেই আছে। চোখ এবং কান দু'টো। মাথাও একটা, যেমন আগে ছিল। সব কিছু ঠিক আছে, যেমন কাল ছিল। কিন্তু তবু, কী যেন নেই। কোথা থেকে কী যেন চলে গিয়েছে।

যা গেছে, তা আমার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। ও যখন ছিল তখন জানিইনি যে সে ছিল। কিন্তু তবু, এখন জানি যে সে নেই। কী ক্ষত হয়েছে জানিনে, কিন্তু রিক্ত যে হয়েছি তার ব্যথা অনুভব করছি সর্ব অঙ্গ ব্যেপে। সর্বাঙ্গীন সত্তায় সঞ্চারিত হয়েছে সব-হারানোর সম্পূর্ণ অসহায়তা।

আকাশে সূর্য নেই। চন্দ্র নেই। খেদ করিনে। কিন্তু তারা গেল কোথায়? ধ্রুবতারা? দিগ্‌নির্দেশের জন্যে সেই ধ্রুবতারার দিকে তাকাইনি এর আগে: সাধিয়া মরেছি ইহারে, উহারে, তাহারে। কিন্তু তবু, আজ কেন মনে হচ্ছে, পথ হারিয়েছি? কেন কেঁদে মরছি শিশুর মতো? অপরাধীর মতো?

"……সবকো সম্মতি দে ভগবান।"

সকাল থেকে সহস্র বার হাত ধুয়েছি। কাল রাত্রের হিম-শীতল জলে। তবু, কেবলি যেন মনে হচ্ছে রক্তের দাগ যেন রয়ে গেছে হাতের মাঝখানে। সে দাগ যেন মুছবার নয় কলের জলে। একটু

গোটা সমুদ্রের জলেও যেন মুছবে না সেই রক্তের দাগ। সে-রক্ত নিষ্ঠুরতায় লাল, অপরাধে কালো। লাল গেলেও কালো যেন থেকেই আছে। সে যেন যাবার নয়।

হাত ধুয়ে চলেছি তবু। কলের জলে। চোখের জলে। কিন্তু মোছে কই দাগ? ঘোচে কই দুঃখ?

…"রঘুপতি রাঘব রাজারাম"

এ বাড়ির বেয়ারাটা রোজ সকালে চা দেবার সময় আমাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। আমি চোখ খুললেই হেসে সুপ্রভাত জানায় হাসির ভাষায়। আজ যখন চোখ খুললেম তখন তার মুখে হাসির আভাসমাত্র ছিল না, ছায়া ছিল কোন বিষাদের।

জিজ্ঞাসা করলে ও নিজেও বলতে পারতো না কেন এই বেদনা-বোধ। ও তাঁকে দেখেনি কখনো, নাম শুনেছে কারো কাছে বা, কখনো বা অপরের হাতের খবরের কাগজে দেখেছে ছবি। অমন ছবি তো দেখেছে আরো কত জনের, নাম শুনেছে কত খেলোয়াড়-চিত্রাভিনেতার।

ও জানে না, তিনি কেন খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জানে না, কেন তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। জানে না, কেন তিনি বেঁচেছিলেন বা কেন এই মুহূর্তে তিনি বেঁচে নেই! তাঁর বাণীর কোনো কথা বা আদর্শের কোনো ইঙ্গিত পৌঁছোয়নি এই বালভৃত্য ভুটিয়ার প্রাণে বা কানে। কিন্তু তবু চোখে কেন জল?

…"জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম"

আমি আবার স্নানের ঘরে প্রবেশ করলেম হাত ধুতে। জানি যে লাভ নেই। তবু।

…"পতিত পাবন সীতারাম।"

হঠাৎ দরজায় আঘাত শুনতে পেলেম। চমকে উঠলেম। কে এলো? পুলিশ, না কে? ধরা পড়ে গেলেম নাকি? তা আবার রক্তাক্ত হস্তে? এখন? পালাবো কী করে? লুকাবোই বা কেমন করে? এখন?

ভীত কণ্ঠে বললেম, "কে!" বাইরে থেকে শোনা গেল না বোধ হয়।

বেয়ারাটার পরিচিত কণ্ঠও ফৌজদারী আদালতের বাদী কৌঁসুলীর জেরার মতো শোনালো। আমি যেন অভিযুক্ত আসামী।

হাত থেকে সাবানটা নামিয়ে রেখে আবার বললেম, "কে?"

"একটি ছোটো ছেলে অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আরো বসতে বলব?"

"হ্যাঁ, বসতে বলো। আমি এখনি আসছি।"

আমার সেই 'এখনি' কতক্ষণ হোলো জানি না। সময়ের পরিমাপের কথা মনে ছিল না। ভীরু পদক্ষেপে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে কাউকে দেখতে পেলেম না। আরেকটু এগিয়ে এসে দেখি, একেবারে বাইরের দরজার কাছে নীরবে নতনেত্রে মোহন দাঁড়িয়ে আছে।

মোহন কাঁদছে।

আমাকে দেখতে পায়নি তখনো। দরজার গায়ে হাত রেখে তার উপর মাথা দিয়ে কেবলি কাঁদছিল মোহন!

চোখের জলে দৃষ্টি বুঝি হয়েছিল রুদ্ধ। তাই বুঝি দেখতে পায়নি আমাকে। তাই বুঝি কাঁদছিল বিনা লজ্জায়।

একেবারে শিশু যে, কান্নাই তার ভাষা। সে কাঁদে সহজেই, লজ্জিত হয় না! অপর পক্ষে, যাকে জীবনের অনেক কিছু দেখতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে, সে জানে যে কান্না ছাড়া উপায় নেই বেশীর ভাগ সময়েই। আরো জানে যে কান্না গোপন করায় নিহিত নেই কোনো অলৌকিক গৌরব।

কিন্তু এই দু'য়ের মাঝের দিনগুলিতে লজ্জাবোধ থাকে বড়ো প্রখর। চোখের জল ফেলাকে তখন মনে হয় শোচনীয় কাপুরুষতা। তখন, অশ্রু-বিসর্জনের চাইতে প্রাণ-বিসর্জনও যেন সহস্রগুণে সহজ!

মোহনের বয়স। এখন সেই জায়গায়। কাঁদতে তার অসীম লজ্জা। পাছে কেউ মনে করে বসে সে ছেলেমানুষ রয়ে গেছে, বড়ো হয়নি! ছি, ছি!

কিন্তু মোহন আমায় দেখতে পায়নি! জানতোই না যে আর কেউ আছে তার কাছাকাছি। তাই সে মাথা নীচু করে কাঁদছিল কল্পিত নিভৃতে, দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছছিল নিমেষে নিমেষে। চোখের জল যেন ফুরোয় না আর।

মোহনকে প্রথম যেদিন দেখেছিলেম, সেদিন সে বলেছিল তার একাধিক আত্মীয়-বিয়োগের কথা। পিসী, কাকা, আরো কে-কে যেন নিহত হয়েছিল পাঞ্জাবের পাশবিক দাঙ্গায়। তাদের কথা বলতে বলতে মোহন কেঁদে ফেলেছিল। সে তার পিসীর কোলে ঘুমিয়েছে অনেকগুলি রাত্রি, কাকার সঙ্গে বেড়াতে গেছে অসংখ্য বিকেল, ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছে অনেক চকোলেট, বোনের সঙ্গে খেলেছে সারা শৈশব। তাদের মৃত্যুতে মোহন কাঁদবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। না কাঁদলেই অস্বাভাবিক হোতো।

মৃত্যু কী মোহন না জানতে পারে। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পারে যে, পিসী-কাকা-ভাই-বোনের মৃত্যু মানে পিসী আর তাকে ঘুম পাড়াবে না, কাকা নিয়ে যাবে না বেড়াতে, ভাই দেবে না চকোলেট, বোন আর আসবে না খেলতে। সে সেখানে জানে কী গেছে, কী আর আসবে না। কাঁদবে বৈ কি!

কিন্তু আজ? আজকের কান্না কেন ছাপিয়ে উঠেছে সেদিনের কান্নাকে? কেন বাধা মানছে না আজকের অশ্রু? কে আর চকোলেট দেবে না? কে নিয়ে যাবে না বেড়াতে?

তেমন কেউ নয়। তবে? তবে কেন চোখ ব্যথা হোলো কেঁদে, হাত ব্যথা হোলো চোখ মুছে?

হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে মোহন ফিরে পেল তার বয়সোচিত লজ্জাবোধ। শশব্যস্ত হয়ে চোখ মুছলো মুখ লুকিয়ে। করুণ ভাবে হাসতে চেষ্টা করল একটু আমার দিকে মুখ তুলে। ক্রন্দনও এর চাইতে করুণতর হতে পারতো না!

আমি শিশু নই, কিন্তু কিশোরও নই। অশ্রু গোপন করে দুঃসাহসিকতা প্রমাণ করবার দায় নেই আমার। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেম আমার ঘরের দরজার পাশে। দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেম মোহনের দিকে।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মোহন আর পারলে না অশ্রুরোধ করতে। কিছু না বলে ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল অনেকক্ষণ। কিছু বলবে

বলে এসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি মাত্র কথা না বলে পালিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু চোখের জল।

যেন আমার নিজের ছিল তার অভাব!

আমি মোহনকে ডাকলেম না। জানতে চাইলেম না ইচ্ছা-পূরণে কেন সে হয়েছে এমন শোকাচ্ছন্ন।

* * * *

কতক্ষণ প্রস্তর-মূর্তির মতো স্থির হয়ে দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছিলেম জানি না। আসলে স্থির হয়ে নয়, অস্থির হয়ে, যদিও স্থাণু হয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠলেম ভৃত্যের আবির্ভাবে। বলল, কী কী বাঁধবে আর কোন জিনিষ কোন বাক্সে রাখবে, যদি একবার দেখিয়ে দিই। হাতে আর খুব বেশী সময় নেই কি না।

সময় নেই? কিসের? ও হাঁ। আমার আজ দার্জিলিং ছেড়ে কলকাতা ফিরে যাবার কথা যে! ছুটি যে ফুরিয়েছে! আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। অর্থাৎ আপিস। উঃ ভগবান!

কিন্তু তার পরের লাইনগুলি কী? হাঁ মনে আছে, 'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই।' কিন্তু আমার? আমার পাত্র তো শুধু তো রিক্ত হয়নি, পাত্রখানি চূর্ণ হয়েছে।

তার পরের লাইনটা? 'শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই।' আমার বেলায় এই পূর্ণ করার প্রশ্নই অবান্তর। আমার পাত্রই সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়েছে, এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে জঞ্জালের মতো। যেগুলি সব মিলিয়ে ছিল সুন্দর একটি পাত্র, যা তার মধ্যে ধারণ করতে পারতো স্বর্গের সুধা, সেগুলি এখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে অট্টহাস্য করছে আমার জীবনের উপর। আমার অতীতের উপর, আমার বর্তমানের উপর, আমার ভবিষ্যতের উপর। যার পাত্রই নেই, সে পূর্ণ করবে কী।

ও হাঁ, কিন্তু বাক্সগুলি ভর্তি করতেই হবে। ভৃত্য আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে। ট্যাক্সি আসবে তিনটেয়। তার আগে সেরে নিতে হবে অনেক কাজ। কিনে নিতে হবে, যা কিছু আছে দার্জিলিং থেকে কুড়িয়ে নেবার; এক বার দেখা করে যেতে হবে মিসেস্ রায়ের সঙ্গে, ধন্যবাদ জানাবার জন্যে। শিখা বোধ হয় আর দার্জিলিঙে নেই, ভালোই হয়েছে। আর কলিন? জানিনে। তার কথা চিন্তা করতেও ভয় হয়। আর, একবার দেখা করতে হবে সেই নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে, কাল যিনি বলছিলেন যে পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতম শুভকর্মও ব্যর্থ হতে পারে না। হাঁ, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা চাই-ই।

অনেক কাজ। সময় অল্প। বেরিয়ে পড়লেম পথে।

পা দু'টো যেন চলতে চায় না। উঁচু-নীচু যে পথ গত পনেরটা দিন অবলীলাক্রমে পরম আগ্রহভরে আনন্দের সঙ্গে এত বার অতিক্রম করেছি, আজ যেন সেই দয়াহীন পথ অসংখ্য উপলখণ্ডে আকীর্ণ হয়ে দুর্গম হয়েছে। চলতে পারিনে আর।

অপরিসীম অশান্তির বোঝা কাঁধে করে দার্জিলিঙে এসেছিলেম। জায়গাটাকে ভালো লেগেছিল প্রাণ ভরে। আজ ফিরে যেতে হবে। যাবার আগে দার্জিলিঙের সকল আকর্ষণ এমন নিঃশেষে মুছে যাবে, কল্পনাও করিনি। আজ দূরের ওই আকাশকে মনে হচ্ছে ঊষর মরু বলে, ওই হিমালয়কে মনে হচ্ছে পৃথিবীর পিঠে কুৎসিত কুব্জের মতো। সব কিছুকে মনে হচ্ছে কুৎসিত, নগণ্য, অর্থহীন।

কিছু দূর যেতে দেখা হয়ে গেল 'কাঞ্চনজংঘা বর্ণারের' বেয়ারার সঙ্গে। সে আসছিল আমারই কাছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, "ভালোই হোলো।" পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলল, "আমাদের ঠিকানায় এই চিঠিটা এসেছে আপনার নামে। সেই জন্যেই আপনার ওদিকে যাচ্ছিলেম।"

আমি চিঠিটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম মিসেস্ রায়ের কুশল। বেয়ারা বলল, "ভালো নেই। কাল থেকে কী যেন হয়েছে। আজ ভোরে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। চাকরকে বলেছেন ফালুতে যাবেন। ঠাকুরকে বলেছেন, কার্শিয়াং যাবেন, কী না কি দরকার আছে। বুঝতে পারছিনে কিছু। সাহেব মরে যাবার পর থেকেই কেবল কাঁদতেন, আর কিছু করতেন না। শুধু কাল রাত্রে এক বার বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসেই পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়লেন। আর আপন মনে কত কী বলতে থাকলেন। এক বার বলেন ডাক্তার ডাকতে, আরেক বার বলেন পুলিশ ডাকতে। বলেন, পুলিশের সঙ্গে কী জরুরী কথা আছে, যা আজ না বললেই নয়। কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"তাই তো!" আমি কিছু শুনছিলেম, কিছু শুনছিলেম না; কিছুই বুঝছিলেম না। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেম, "কাল কখন থেকে এ রকম হোলো?"

"এই তো বিকেল থেকে। রেডিয়ো শুনছিলেন একা বসে। হঠাৎ রেডিয়োর গান থেমে গেল। তার পর কী যেন বলল ইংরেজিতে। আর অমনি মেমসাহেব চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন আর তার পর থেকে সারা রাত কেবল বলেছেন, 'পুলিশ ডাকো, আমার অনেক কথা আছে পুলিশের সঙ্গে। শীগগির পুলিশ ডাকো, আর সময় নেই।' আমরা কিছুই বুঝলেম না।" বেয়ারা একটু থেকে যোগ করল, "আমার ভয় হয় মাথার কিছু দোষ হয়েছে।"

"হবে। মেমসাহেব ফিরে এলে বোলো, আমি আজ চলে যাচ্ছি।" আমার সময় ছিল না। বখশিস দিয়ে বিদায় করতে চাইলেম বেয়ারাকে। সে কিন্তু চলতে থাকল আমার সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে বলল, "আচ্ছা, গান্ধী লামা কি হিন্দু ছিলেন, না বৌদ্ধ?"

আমি বললেম, "হিন্দু।"

"উহুঁ, নিশ্চয় বৌদ্ধ। উনিই বুদ্ধ।" বেয়ারা বলল একান্ত নিশ্চিত নিঃসন্দেহ কণ্ঠে। বৌদ্ধ ছাড়া এমন হবেন কী করে?

তৎক্ষণাৎ এমনি গভীর নিশ্চয়তাপূর্ণ আরো অনেকগুলি উক্তি ভেসে এলো আমার কানে:

"উহুঁ, উনি নিশ্চয় খৃষ্টান। উনিই খৃষ্ট। তা নইলে এমন হবেন কী করে?"

"উহুঁ, উনি নিশ্চয় মুসলমান। উনিই পয়গম্বর, তা নইলে এমন হবেন কী করে?"

"উহু, উনি নিশ্চয়…"

উনি সত্যি কী ছিলেন তা নিশ্চয় করে আমি বলতে পারিনে। কোনো বিশেষ ধর্মে দেবত্বর মনোপলি আছে বলে আমি জানিনে। তাই চুপ করে রইলেম বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী দাবীর সম্মিলিত আবরণে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বেয়ারা আবার বলল, "উনি নিশ্চয় বৌদ্ধ ছিলেন।"

"তুই কী করে জানলি ?"

"আমি জানি।" আর কিছু বলবার ভাষা পেল না নিরক্ষর ভুটিয়া বেয়ারা। সে জানে গান্ধীজী ওর আত্মীয় ছিলেন, স্বধর্মী ছিলেন, আপন জন ছিলেন। আর কিছু জানে না, কী করে জানে, তাও জানে না, কিন্তু জানে, নিশ্চয় করে জানে।

আমি বললেম, "দেখেছিস কখনো তাঁকে ?"

"না।"

"তবে ?"

"বা রে, ভগবানকেও তো দেখিনি, তাই বলে কি তিনি নেই ?"

এর পরে প্রশ্ন চলে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে দেখেছি নানা প্রত্যক্ষ প্রাণীর সাক্ষ্য দিয়ে, কিন্তু এক জন ঐতিহাসিক অস্তিত্বমান, সমসাময়িক পুরুষের কথা প্রমাণ করবার জন্যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া, এমন আর দেখিনি এর আগে। অশিক্ষিত ভুটিয়া বেয়ারা, তার যুক্তি-চাতুর্য এর চেয়ে বেশি আর হবে কী করে!

আমি চোখ নীচু করে পথ চলছিলেম। বেয়ারা কখন নিঃশব্দে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে গেছে, জানতেম না। বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না জানবার। আমি এগিয়ে চলছিলেম ধীরে, আপন মনে।

দু'দিকের দোকানগুলি বন্ধ। সন্ধ্যা-সমাগমে সূর্য অস্ত গেলে সূর্যমুখীর সারি যেন চোখ মুদেছে কিছু লাজে, কিছু ভয়ে, কিছু অভিমানে। শীতের দার্জিলিঙে এটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। এই সময়টায় পথ এমনিতেই সাধারণত জনহীন থাকে। কিন্তু তবু, কী যেন প্রভেদ আছে। নিদ্রিতের সঙ্গে মৃতের যে প্রভেদ।

আর সব দোকানের মতো প্রিভাও বন্ধ। দরজার সামনে রয়েছে বড়ো একটা মাল্য-ভূষিত আলোকচিত্র, মহাত্মা গান্ধীর। যিনি সারা জীবন আন্দোলন করেছেন প্রিভার প্রধান ব্যবসায়ের প্রধানতম পণ্যের বিক্রয়ের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে বড়ো অসঙ্গতি আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আজ একে শঠ কপটতা বলে মনে হোলো না একবারও।

দোকানটার সামনে মাইলষ্টোনের মতো একটা পাথরের টুকরো আছে। আমি তারই উপর কোনো ক্রমে একটু বসলেম। বিশ্রামের জন্যে, কিন্তু কেবল মাত্র বিশ্রামের জন্যেও নয়। আমার পকেটের ভিতরকার চিঠিটা গলা টিপে রাখা মানুষের মতো আর্তনাদ করছিল।

খামের উপরের ঠিকানার হস্তাক্ষর একান্ত পরিচিত। এ চিঠি তারই লেখা, যার অবহেলা এমন গভীর হয়ে মনে না বাজলে আমার দার্জিলিঙে আসাই হোতো না। অজানা থাকতো জীবনের নিবিড়তম আনন্দ, অজানা থাকতো জীবনের গভীরতম বেদনা আর কঠিনতম নৈরাশ্য।

ভয়ে ভয়ে খুললেম চিঠিটা, কী জানি আরো কোন আঘাত সঞ্চিত রয়েছে ওইটুকু ওই ক্ষুদ্র খামের মধ্যে! অল্প কিছু দিন মাত্র আগে ওই হাতের লেখা চিঠি খুলতে আশার ঢেউয়ে বুক হয়ে উঠতো উত্তাল। আজ আর আশা করতেই সাহস পাইনে কোনো কিছু থেকে। খুললেম চিঠিটা।

সে ফিরে যেতে লিখেছে।

বিশ্বাস করতে পারছিলেম না। আবার পড়লেম ছোটো চিঠিটা। আবার। আবার। হ্যাঁ, সত্যি আমার ফিরে যেতে লিখেছে। সত্যি।

আর কিছু চাইনে। কিছু না। খ্যাতি চাইনে, বিত্ত চাইনে, জন্মচক্র থেকে মুক্তি চাইনে, মোক্ষ চাইনে—শুধু যদি তোমার কাছে যাবার নিমন্ত্রণ পাই, অনুমতি পাই তোমার কাছে থাকবার। শুধু যদি এই কথাটি জানতে পাই, আমার হৃদয়ে যে আমার সকল ত্রুটি, সকল অক্ষমতার ক্ষমা আছে তোমার কাছে। শুধু যদি জানি যে, তোমার হৃদয় থেকে আমার ঘটেনি চির-নির্বাসন, শুধু যদি বলো যে, আমাকে রাখবে তোমার কাছে—তাহোলে হেলাভরে বিসর্জন দিতে পারি সমগ্র বিশ্বকে, হেলা করতে পারি সমগ্র বিশ্ব-সমাজকে, উপেক্ষা করতে পারি সকল অপবাদ, উদাসীন থাকতে পারি আর সব কিছুর যত কিছু অসঙ্গতি, তার সব কিছুর প্রতি। একবার শুধু বলবে যে, আমাকে নেবে তুমি তোমার করে চিরকালের করে। আর তো কিছু চাইনে। শুধু তোমার হতে চাই। নিজেকে শুধু সমর্পণ করে দিতে চাই তোমার ওই কোমল বাহুর নিঃসীম প্রশান্তির নিশ্চিত নির্ভরতায়। কোনো প্রশ্ন করব না, কোনো উত্তর চাইব না। আমার হাতে নাই ভুবনের ভার। আর এক বার শুধু বলো আমাকে ফিরে যেতে, বলো যে, ফিরে গেলে আর আমায় যেতে দেবে না কোথাও কখনো; কোনো প্রশ্ন থাকবে না আমার, থাকবে না কোনো দুঃখ!

দুঃখ ?

কীটসের সেই forlorn কথাটার মতো এই দু'অক্ষরের কথাটা কর্কশ ঘণ্টা-ধ্বনির মতো আমাকে নির্দয় ভাবে টেনে আনল স্বপ্ন থেকে। আর অমনি সহস্র প্রশ্ন, লক্ষ সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরল অপরাধীর মতো!

দুঃখ হচ্ছে সৃষ্টির গোড়ার কথা। আর সব অস্বীকার করা চলে, উপেক্ষা করা চলে; কিন্তু দুঃখকে না মেনে উপায় নেই। সে-দুঃখ তো শুধু হারানোর দুঃখ নয়, পাওয়ার দুঃখ। যা না পাওয়ার দুঃখে দার্জিলিঙে এসেছিলেম স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, আজ তাই পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে, মুহূর্তমাত্র পূর্বে, মন ভরে উঠল আনন্দে।

কিন্তু তার পর? বাসনা কি এমনি প্রবল থাকবে কলকাতায় নামবার পরেও? পাবার পরেও?

রয় না। রয় না। যে দোকানের সামনে বসেছিলেম তার পণ্যেরই মতো একান্ত সাময়িক এর উত্তেজনা! তখনকার মতো, চাহিয়া দেখি রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি। কিন্তু শুধু তখনকারই মতো। যেই মাত্র তারে নিকটে আনি টানি, রাখিতে চাহি বাঁধিতে চাহি তারে; অমনি, আঁধারে সে যে মিলায় বারে বারে। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে তখন যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা আর যাই হোক, যা চেয়েছিলেম তা নয়, তা নয়। আজ যে বাহুবন্ধনে সব-চাওয়া,

সব-পাওয়া অঞ্জলি দিয়ে মনে হচ্ছে সব হারিয়ে সব পেলেম, কাল সে বাহুবন্ধন শিথিল হবে। নয় তো আমারই কাছে সেই বাহু-ডোর শৃঙ্খলের মতো অসহনীয় হয়ে উঠবে।

তার পর? তখন কী বাকী রইবে? তখনকার নৈরাশ্য যে হবে আজকের হতাশার চেয়েও গভীর। সে দিনের অবসাদ যে আজকের অবহেলার চেয়েও অসহনীয়!

তখন কোথায় যাবো কী চাইতে? শেষ কোথায় এর?

কিন্তু না। সময় নেই আমার। গাড়ী ধরতে হবে যে! পরশু সকালে ঠিক সাড়ে ন'টায় হাজির হতে হবে যে আপিসে। নইলে চাকরি যে হবে বিপন্ন, বাধা হবে যে উন্নতির পথে! কাজ রয়েছে আমার।

আমি আবার পথ চলতে থাকলেম, অনেক কিছু কিনতে হবে। পিছনে রইল রুদ্ধদ্বার প্রিয়া।

* * * *

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার সেই সহযাত্রীর সঙ্গে। বিষণ্ণ, বিমর্ষ ভদ্রলোক চলেছেন নিষ্প্রাণ গতিতে। ট্রেণের সেই সাবধানী বিচক্ষণ ব্যবসায়ীকে চেনাই যায় না যেন, কী যেন বিপর্যয় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। পায়ের তলা থেকে যেন সরে গেছে মাটি।

ভদ্রলোক বললেন, "কী খবর?"

"আপনার কী খবর?"

"খবর আর কী। কিছু আর বলবার নেই!" বহুভাষী ভদ্রলোক আজ কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আমিও আর কিছু না পেয়ে বললেম, "আপনার সেই তিরিশ না তিন শো ওয়াগন টিম্বার, সে কি···"

"টিম্বারের কথা বলে আজ আর লজ্জা দেবেন না মশাই। আর মুখ দেখাবার উপায় নেই!"

ভদ্রলোকের এমন লজ্জার কারণ কী বুঝলেম না। ঠিক সময়ের মধ্যে বুঝি দিয়ে উঠতে পারেননি সাপ্লাই, তাই বুঝি কনট্রাক্ট বাতিল হয়ে গেছে, না কি ক্যাশিয়ার পালিয়েছে টাকাকড়ি নিয়ে, না কি পুলিশের বা ইনকাম ট্যাক্সের চোখ পড়েছে তাঁর গচ্ছিত অর্থের উপর?

অচিরেই বোঝা গেল যে এ সবের কিছুই হয়নি। এমন কি এ সব বিষয়ের তিনি উল্লেখ মাত্র করলেন না। আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে যেতে যা বলতে থাকলেন, তার অল্পই আমাকে বলা। যেন নিজের মনে বলতে থাকলেন, "আর কিছু ভালো লাগছে না। আজ আমার ফিরে যাবার কথা কলকাতায়। অনেকগুলি জরুরী কাজ জমে আছে। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছিনে কিছুতেই। না গেলে অনেক লোকসান হবে ব্যবসায়। তবু মনে জোর পাচ্ছিনে গিয়ে আবার সেই কাজের ঘানিতে মাথা গলাতে। হোক লোকসান। সেইটেই কি সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি?"

এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন!

ভদ্রলোক আপন মনে বলে চললেন, "আচ্ছা এমন লোকটাকে মারল কী করে সুস্থ-মস্তিষ্ক আর একটা লোক? এক বার হাত কাঁপল না, অবশ হয়ে গেল না সারা দেহ? এক বার নয়, দু'বার নয়, বার বার গুলী করতে পারল ওই অস্থিসর্বস্ব বৃদ্ধকে! অমন লোককে!"

গত রাত্রের পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করে বললেম, "ও তো পাগল ছিল।"

"তাই হবে। তাই হবে। ঠিক অবস্থায় কি পারে কেউ অমন কাজ করতে? হতেই পারে না।"

ভদ্রলোক একটু শান্ত হলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র। আবার আপন মনে বলতে থাকলেন, "অবিশ্যি বেঁচে থেকেই বা করতেন কী? আমরা কি কেউ তাঁর কথা শুনছিলেম না কাজ করছিলেম সেই অনুযায়ী? তিনি একা আর কী করতে পারতেন?"

"অনেক কিছু। তাই নয়?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু আমরা কী ভয়ানক স্বার্থপর দেখুন। আমরা তাঁকে দিয়ে হাজারো রকমের কষ্ট সহ্য করিয়ে, ত্যাগ করিয়ে, শাস্তি দিয়ে খাটিয়ে নিলুম। তাঁর নেতৃত্বে আর ত্যাগে স্বরাজ যেই কাছে এলো, হাতে এলো ক্ষমতা, অমনি আমরা মেতে উঠলুম দেশব্যাপী উন্মাদনায়। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করলুম, ভাইকে উপবাসী রেখে ধনী হতে চাইলুম—পরের কথা বলছিনে, একেবারে নিজের কথা বলছি—বোনকে বঞ্চিত করলুম তার লজ্জা নিবারণের কাপড়টুকু থেকে। এই পাগলামিতে যোগ দিলুম সবাই মিলে, সবাই বলে—চাই, চাই, আমার এটা, ওটাও আমার! স্বাধীন হলুম আমরা। 'জয় হিন্দ' বলে ফিরিঙ্গি টাইপিষ্টের ভ্যানিটি ব্যাগ কেড়ে নিয়ে দেশপ্রেম দেখালুম, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে ব্যাংকে ডাকাতি করে সাম্যবাদ দেখালুম, আরো কতো কী! ছি ছি! লজ্জার আর শেষ নেই!

"এই মত্ততায় যোগ দিলেন না শুধু এক জন। গান্ধীজী। তখন আর তাঁকে আমাদের প্রয়োজন নেই। অতএব মারো ওঁকে। ও যে আমাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটায় বেসুরো কতগুলো সৃষ্টিছাড়া কথা বলে। ওর যে কাজ ফুরিয়েছে। মারো ওকে! বিদেয় করো বুড়োকে, থামাও বকবকানি। আমাদের খেলায় যদি যোগ না দিল, যদি না মাতল আমাদের লুটে, কাজ নেই অমন আপদ রেখে। মারো ওকে।"

আমি চুপ করে শুনছিলেম। অন্য সময় হলে বিস্ময়ে চমকে উঠতেম অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীর এমন আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্ম-অভিযোজন দেখে। বিস্ময় প্রকাশ করে তারিফ করতেম তাঁর বিলম্বিত সুবুদ্ধির, নয় তো উড়িয়ে দিতেম অসৎ ভণ্ডামি বলে। কিন্তু আজ, এখন, প্রিভায় মহাত্মার ছবি দেখে যেমন অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করিনি, তেমনি এই লোভী ব্যবসায়ীর কবুলতিও অনান্তরিক বলে উড়িয়ে দিতে পারলেম না। বরং মাথা হেঁট হোলো নিজেকে তাঁর বর্ণিত অপরাধের সক্রিয় অংশীদার মনে করে।

"···রঘুপতি রাঘব রাজারাম"

হাত দু'টো এতক্ষণ ছিল পকেটের মধ্যে। আবার বের করে দেখলেম। সেই লাল, সেই কালো। মোছেনি কিছু। আমি 'আচ্ছা চলি' বলে বিদায় নিলেম ভদ্রলোকের কাছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেম। পথের কোনো একটা জলের কলে আরেক বার ধুয়ে নিতে হবে হাত দু'টো।

"পতিত পাবন সীতারাম।" বহু জনের মিলিত কণ্ঠে ভজন চলেইছে। বিরাম নেই।

গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে সাধু আছে যত, চোর আছে তার

চেয়ে বেশি; এদের মধ্যে সৌহার্দ্যের চাইতে বিরোধ আছে সহস্রগুণ বেশি—জাতিগত, শ্রেণীগত, ভাষাগত, স্বার্থগত—; এদের মধ্যে বেশির ভাগই গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করলেও সে অনুযায়ী কাজ করবার সাহস আছে অল্প সংখ্যকেরই। তবু, আজ এই মুহূর্তে এই যে সবাই মিলে কাঁদছে—আমি কাঁদছি—এর মধ্যে নেই এতটুকু কপটতা। এই যে শোক, এই যে পরিতাপ, এ মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়।

"সবকো সম্মতি দে ভগবান•••"

আমি ভাবছিলেম ভদ্রলোকের কথাগুলি। সত্যি কি চোখের জল ফেলবার অধিকার আছে আমাদের? গুলী করেছে বটে এক অসুস্থ, অজ্ঞাত, অখ্যাত মারাঠী ব্রাহ্মণ; কিন্তু সেটা তো পুরো কাহিনী নয়। নাথুরাম তো আমাদের অনুচ্চারিত বা অজ্ঞাত আত্মার বাহক মাত্র। ওকে পাগল বলে ফাঁসি দিলেই কি আমাদের সকল অপরাধের স্খালন হয়ে যাবে? হাতের রক্ত মুছে যাবে?

হাত দু'টো পকেটের মধ্যে পুরে আবার এগিয়ে যেতে থাকলেম সামনের দিকে।

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম"

ক্ষমতার ছায়া মাত্র লাভ করে, সত্যি, কী অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেলেম আমরা সবাই। সবাই মিলে কী অসম্ভব ত্বরার সঙ্গে বিস্মৃত হলেম সকল দায়িত্বের কথা। মনে রইল শুধু পাওনার কথা। এটা আমার চাই, ওটা আমি না পেলে স্বরাজের অর্থ হোলো কী?

একটি লোক শুধু একঘেয়ে সুরে বলতে থাকল, এ নয়, এ নয়। সে বদলাল না এতটুকু। নাথুরাম তাই আমাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিল এই অসঙ্গতির। কাঁদব কোন মুখে?

"সবকো সম্মতি দে ভগবান।"•••

কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলেই কি প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হোলো? আর কিছু থাকল না করবার? কিন্তু করব কী?

সেই পুরানো প্রশ্ন। দল বেঁধে ভালো করতে গেলে ভালোর চেয়ে মন্দ ফলবে বেশী, সেই সংগঠিত মন্থনে অমৃতের চাইতে হলাহল উঠবে বেশী। আর একা চলতে গেলে তো নাথুরাম দাঁড়িয়ে আছে পথ রুখে। কী করব?

"জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম"

কলের জল নেই কোথাও কাছাকাছি। হাত দু'টো মুহূর্তের জন্যে পকেট থেকে বের করে আবার লুকিয়ে রাখলেম।

হঠাৎ দেখলেম হাঁটতে হাঁটতে মহাকালে উঠে গেছি। সেই সুড়ঙ্গের মুখটার কাছে, যেখানে দেখা হয়েছিল সেই ভক্ত নেপালীর সঙ্গে। আজ তাঁকে আমার বড়ো প্রয়োজন। তিনিই বলেছিলেন যে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সামান্যতম সুকৃতিও ব্যর্থ হতে পারে না। তার ফল কোনো না কোনো দিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। তার পুণ্যে অংশ আছে সমগ্র জগৎবাসীর। তিনিই বলেছিলেন, "নিভৃততম অন্ধকারে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রতম অন্যায়ও নয় নগণ্য, তারও ফল বিশ্ব-বিস্তৃত, তারও পাপে অংশ আছে সমগ্র জগৎবাসীর।

হাত দু'টোকে আরো ভালো করে পকেটে পুরে এক জনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেম আমার বন্ধুর কথা। সহজেই বুঝতে পেরে বললে, "নেই তো। আর সাত জনের সঙ্গে আজ সকালেই যে উনি রওনা করেছেন তিব্বতের দিকে। আর তো ফিরবেন না উনি।"

ফিরবেন না? আমাকে যে বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে যাবার কথা। এবার আমি কোথায় যাবো? কী করব?

বসে পড়লেম আমি সামনের একটা পাথরের উপর।

এবার বাকী জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নাথুরামের পাপের। আমার নিজের পাপের। পালাবার উপায় নেই হিমালয়ের গুহায়। হিমালয়ের উচ্চতা আর বিস্তৃতি ব্যেপে লেখা রয়েছে, 'প্রবেশ নিষেধ।' যেদিন দার্জিলিং এসেছিলেম, সেদিন হিমালয়কে মনে হয়েছিল অন্তর জগতের উন্মুক্ত দ্বার। আজ তাকে মনে হচ্ছে প্রবেশরোধকারী প্রহরী বলে। দার্জিলিঙের সকল সৌন্দর্য নিমেষে নিঃশেষে অন্তর্হিত হোলো! আমার চার দিকের সমস্ত জায়গাটাকে মনে হোলো বিরাট শ্মশান বলে, আক্ষেপ হোলো সত্যি তা নয় বলে।

* * *

কত ক্ষণ বসেছিলেম জানিনে। সময় থেমেছিল। কিম্বা চলেছিল, তার চলায় হিসাব রাখিনি।

সূর্যটা পড়েছিল একটা মেঘের আড়ালে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল দশ দিক। সেই অন্ধকারের সুরেই আজকের দিনটি ছিল বাঁধা। তাই হঠাৎ চমকে উঠলেম তখনই, যখন আবার জ্বলে উঠল মেঘটা সরে গেলে। সামনে তাকিয়ে দেখলেম, সূর্য আছে আপন অবিচল মহিমায়। ওইটুকু মেঘ কি পারে অত বড়ো সূর্যকে আড়াল করে রাখতে? ছায়া ফেলতে পারে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তার বেশী নয়।

হঠাৎ মনে এলো অস্পষ্ট কয়েকটা কথা। নাথুরামের দেশবাসী আমি, তার কলঙ্কে আমার কলঙ্ক। কিন্তু আমি তো গান্ধীজীরও দেশবাসী, মহাত্মারও সন্তান। তাঁর পুণ্যে কি নেই আমার কিছু মাত্র অধিকার? তাঁর জীবনময় সুকৃতিতে নেই আমার সামান্যতম অংশ? ওইটুকু মেঘে দেবে এত বড়ো সূর্যকে অবলুপ্ত করে! হতেই পারে না। হতেই পারে না।

কাল ফিরে যাবো। দার্জিলিঙের পনেরটা দিনের স্মৃতি রইবে চিরজীবনের মতো অম্লান হয়ে। কলকাতা গিয়ে কী করব জানিনে। এখানে, এই হিমালয়ের তলায়, অজ্ঞাতের আমন্ত্রণের যে অদৃশ্য সংকেতের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে গেলেম, হয়তো তার কোনো প্রভাবই রেখাপাত করবে না আমার কাল থেকে পরের দিনগুলির ছোটো খাটো অকিঞ্চিৎকর কাজের মধ্যে।

হয়তো বা করবে। তাহোলে আমার দার্জিলিং-যাত্রা ব্যর্থ হয়নি।

সমাপ্ত
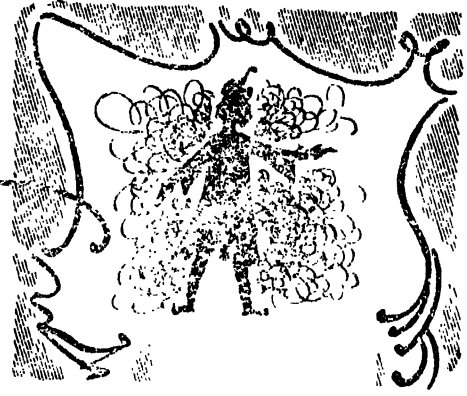
"বিচিত্রা!" অতি-আধুনিকরা নিশ্চয়ই এ নামের সঙ্গে পরিচিত নন এবং প্রাচীনদেরও অনেকে হয়তো তার নাম শোনেননি, কারণ সাধারণ জনতার সঙ্গে "বিচিত্রা"র কোনই যোগ ছিল না।

"বিচিত্রা" হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আজ তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার স্মৃতি আমরা কোন দিনই ভুলতে পারব না। কেন না এক সময়ে বাঙ্গালীর সমস্ত সংস্কৃতি ও ললিত কলার কেন্দ্র ছিল ঐ "বিচিত্রা"ই। কিন্তু "রঙ্গ-পটের" মধ্যে "বিচিত্রা"কে টেনে আনতে দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে বসেছি।

বত্রিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ নিজের জোড়াসাঁকোর বাস-ভবনে "বিচিত্রা"র প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি একটি সংসদ। দেশের বাছা-বাছা লোককে সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করা হত। সভ্যদের ব্যবহারের জন্যে তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটি উচ্চশ্রেণীর প্রকাণ্ড পুস্তকালয়। সভ্যদের কোন রকম চাঁদা দিতে হত না। সংসদের সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু বিনা চাঁদায় এমন চমৎকার পুস্তকালয় ব্যবহারের সুযোগ দিত বলেই "বিচিত্রা"র নাম স্মরণীয় নয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি স্থানেও বিনা চাঁদায় বই পড়বার সুযোগ পাওয়া যায়। "বিচিত্রা" অতুলনীয় হয়ে উঠেছিল অন্য কয়েকটি কারণে।

বাংলা দেশে বোধ হয় আর কখনো "বিচিত্রা"র মত সভার প্রতিষ্ঠা হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজের বাসভবনে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" নামে যে সাহিত্য-সভা গঠন করেছিলেন, তার কার্য্য-পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। তবে এইটুকু জানি যে, দেশে যখন সাধারণ রঙ্গালয়ের অভাব ছিল, তখন নাট্য-রসিকদের মনের খোরাক জোগাবার জন্যে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"র সভ্যগণ মাঝে-মাঝে অভিনয়ের আয়োজন করতেন এবং সেখানে "বেণীসংহার", "বিক্রমোর্ব্বশী" ও "সাবিত্রী সত্যবান" প্রভৃতি বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল।

যে সময়ে "বিচিত্রা"র জন্ম হয়, তখন বাংলা নাট্যকলার চরম দুর্দ্দশা। কি অভিনয়ে আর কি নৃত্য-গীতে তখন এমন এক জনও উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, যিনি আধুনিক বিদ্বজ্জন-সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারতেন। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি শিক্ষিত শিল্পীরা তখনও সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেননি।

আর সত্য কথা বলতে কি, কোন দেশেরই সাধারণ রঙ্গালয় উচ্চশ্রেণীর বাছা-বাছা রসিকদের মানস-ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না। কারণ তাদের নির্ভর করতে হয় সাধারণ দর্শকদেরই উপরে। সাহিত্যরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটকের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য্য কোন দিনই জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেনি!

এই পরম সত্যটি সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ফ্রান্সের আন্দ্রে অ্যা'টয়েন (১৮৫৮—১৯৪৩)। প্যারিস সহরের গ্যাস কোম্পানীর আপিসে তিনি ছিলেন সামান্য এক কেরাণী মাত্র। অবসর কালে করতেন সখের অভিনয়। তিনি ছিলেন গরিব, মাহিনার টাকা কয়টি ছাড়া তাঁর আর কিছু সহায়-সম্বল ছিল না। তবু আশায় বুক বেঁধে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Theatre Libre একটি ছোট রঙ্গালয় খুলে বসলেন এবং যে-সব নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে গৃহীত হয় না, সেখানে সেইগুলিরই অভিনয় আয়োজন করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাঁর রঙ্গালয় জমেনি বটে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কেবল নিজের দেশের উচ্চশ্রেণীর নূতন নাট্যকারদের নয়, ইবসেন, টলষ্টয় ও হাউপ্টম্যান প্রভৃতি বিদেশী নাট্যকারদেরও সর্ব্বপ্রথমে তিনি জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন বললেও চলে। ফ্রান্সের নাট্য-জগতে বাস্তবতারও অগ্রদূত ছিলেন তিনিই।

দেখতে দেখতে অ্যান্টয়নের প্রভাব ও আদর্শ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। রুশিয়ার "মস্কো আর্ট থিয়েটার" এবং আমেরিকার "থিয়েটার গিল্ডে"র মত বিশ্ববিখ্যাত রঙ্গালয়েরও পরিচালকরা অ্যান্টয়নেরই পায়ে-চলা পথের পথিক হয়েছিলেন। ফ্রান্সেও লুগ্নে-পো নামে তাঁর এক শিষ্য ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ শ্রেণীর আর একটি রঙ্গালয় খোলেন এবং সেখানে অভিনীত হয় ইবসেন, হাউপ্টম্যান, টলষ্টয়, অস্কার ওয়াইল্ড, দান্নুনসিয়ো, সিঞ্জে ও কাইজার প্রভৃতির নাটক। এমন কি দুই জন ভারতীয় নাট্যকারের দু'খানি বিখ্যাত নাটকও—"মৃচ্ছকটিক" ও "শকুন্তলা"ও—তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডেও কবি ও সাহিত্যিকদের চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর নাটক অভিনয়ের জন্যে "অ্যাবি থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য "লিট্‌ল্ থিয়েটার" দেখা যায়। সেগুলির প্রতিষ্ঠাতাদেরও উপরে যে অ্যান্টয়নের প্রভাব আছে, এটুকু অনুমান করা চলে অনায়াসেই।

মাস-তিনেক আগে দেখিয়েছিলুম, এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মতামত। প্রসঙ্গক্রমে তার কিয়দংশ আবার উদ্ধার করলে মন্দ হবে না। "সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়,—যাঁরা ললিত কলার

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্যে কি বাংলা দেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না ? * * * * এমন একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় অবশ্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে চলতে পারে না। এ জন্যে কয়েক জন গুণগ্রাহী রসিকের সাহায্য আবশ্যক। * * * * দর্শকদের মুখ চেয়ে সাধারণ রঙ্গালয় যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্ব্বাচিত হবে, কলা-রসিকের মনে তারা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে সব উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভবপর হবে। এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদেরও অভিনয় দেখবার সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবার ইচ্ছা জাগে।"

একুশ কি বাইশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। "বিচিত্রা"র আসর তখন ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কতকটা ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই "বিচিত্রা"র আসর পাতা হয়েছিল।

"বিচিত্রা"র একতলায় ছিল পুস্তকালয় এবং দ্বিতলে ছিল সুদীর্ঘ একটি হলঘর। দক্ষিণে প্রশস্ত বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে সামনেই অঙ্গনের ওপারে চোখে পড়ে অবনীন্দ্রনাথদের বাসভবন। তারই উত্তর-পূর্ব্ব দিকে পুরাতন ঠাকুরবাড়ী।

হলঘরে বসত "বিচিত্রা"র সান্ধ্য আসর। সভ্যদের জন্যে কাষ্ঠাসনের ব্যবস্থা ছিল না, তাঁরা আসন গ্রহণ করতেন ঘর-জোড়া জাজিমের উপরে। মহিলারা বসতেন এক দিকে, পুরুষরা আর এক দিকে। রবীন্দ্রনাথের জন্যে নির্দ্দিষ্ট থাকত একটি বিশেষ ধরণে তৈরী উচ্চাসন। প্রায়ই তাঁর সামনে একখানি থালার উপরে ছড়ানো থাকত গন্ধ ফুল কিংবা ফুলের মালা।

বলেছি, বত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন যাঁরা "বিচিত্রা"র সভ্য ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে, যেমন—প্রিয়ম্বদা দেবী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, গিরিজাকুমার বসু ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া, রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনকেও দেখেছি ঐখানে।

"বিচিত্রা" ছিল না কেবল সাহিত্য-সভা বা কেবল পুস্তকালয়। ওখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আপন আপন রচনা পাঠ করে শুনিয়েছেন বটে, কিন্তু কেবল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা পাঠও ওখানকার প্রধান বিশেষত্ব ছিল না। "বিচিত্রা" আনন্দ বিতরণ করত নাট্যকলা ও তৌর্য্যত্রিকের প্রত্যেক বিভাগেই এবং সেই জন্যেই তার অভাব অনুভব করি যখন-তখন।

এক দিন আমন্ত্রণ এল "ডাকঘর" নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে। আসরে হাজির হয়ে দেখি, হলঘরের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধা হয়েছে একটি রঙ্গমঞ্চ। আকারে ছোট, কিন্তু কি চমৎকার! একটি মাত্র "সেট-সিন" বা কাঠামোর উপরে স্থাপিত দৃশ্যই সমস্ত পালাটির জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে বটে, কিন্তু তারই মধ্যে অনুভব করলুম প্রথম শ্রেণীর আধুনিক শিল্পী-মনের অনন্যসুলভ অভিব্যক্তি! লম্বায়-চওড়ায় তা উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই আছে প্রতীক, কাব্য, সম্ভাবনার ইঙ্গিত ও কলাবিদের রেখা-লেখা। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের মালিকরা এক-একটি পালার জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করে দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপটের জাঁক-জমক দেখিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করতে চান। কিন্তু শিল্পী এখানে আমাদের চমকে দিতে চাননি, তিনি চেয়েছেন ঘুমন্ত কল্পনাকে জাগিয়ে তুলে আমাদের মনকে মোহিত করতে। আজকাল প্রতীচ্যের সাধারণ রঙ্গালয়েও এমনি সব কলা-সম্মত দৃশ্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের পট-শিল্পীরা এই বিংশ শতাব্দীতেও বাস করছেন আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ীর দেশে। অর্দ্ধশতাব্দী আগেও আমি বাংলা রঙ্গালয়ে যে আদর্শের দৃশ্যপট দেখেছি, আজও তা অচল নয়। সাধারণ দর্শকরাও তা সহ্য করে—এমন কি তাই দেখে হাততালি দিয়েও উৎসাহ প্রকাশ করে। বেশ বুঝি, মাথার চুল পাকিয়েও মনে মনে তারা আজও সাবালক হয়নি।

"ডাকঘরে"র অভিনয়ও যা দেখেছিলুম, আজও তা মনের পটে আঁকা আছে অগ্নিরেখায়। পেশাদার অভিনেতাদের প্যাঁচের ধাক্কা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে দিন যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, কেবল ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্রনাথ নন, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ভ্রাতৃযুগলও ইচ্ছা করলে অভিনয়-কলায় উচ্চাসন অধিকার করতে পারতেন। বিশেষ করে হাস্যরসাশ্রিত ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতেন অদ্ভুত দক্ষতা।

"ডাকঘরে"র পরে ওখানে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা।"

কেবল সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় নয়, নাট্য-কলাতেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের দান হচ্ছে অসামান্য। বাংলা দেশে যখন সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বপ্নও কেউ দেখেনি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী তখনই নাট্য-জগতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব'লে গুণেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেরই কাছে সুপরিচিত ছিলেন। অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনা করবার জন্যে তাঁরা লেখকদের সাদরে আহ্বান করতেন এবং কোন নাটক নির্ব্বাচিত হলে নাট্যকারকে পুরস্কার দিতেও কার্পণ্য করতেন না। "নব-নাটক" ও "হিন্দুমহিলা" নাটক রচনা ক'রে যথাক্রমে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও বিপিন মোহন সেনগুপ্ত দুই শত টাকা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন—তখনকার দিনের পক্ষে এ বড় সামান্য পুরস্কার নয়। মাইকেল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ও "একেই কি বলে সভ্যতা"ও ওখানে অভিনীত হয়েছিল। ওখানকার প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা।"

রবীন্দ্রনাথও প্রায় বালক বয়স থেকেই নট ও নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গৃহীত প্রথম ভূমিকা হচ্ছে "বাল্মীকি" (বাল্মীকি-প্রতিভায়)। তার পর স্বরচিত অধিকাংশ নাটকেই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ ক'রে তিনি নাট্য-রসিকদের আনন্দবর্দ্ধন করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ও তাঁর পর্য্যাপ্ত দান থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিছু দিন আগে "মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এখানে তাই আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।

কিন্তু কেবল "ডাকঘর" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয়ের পরেই "বিচিত্রা"র বৈচিত্র্য ফুরিয়ে যায়নি। নাট্য-লক্ষ্মীর সামনে সে নিবেদন করত নিত্য নব নব নৈবেদ্য।

এক সময়ে এ দেশে মুকুন্দ দাসের "স্বদেশী" যাত্রা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। খবরের কাগজে, লোকের মুখে-মুখে তার সুখ্যাতি। পালাটির নাম ছিল "মাতৃপূজা"। তার জন্যে মুকুন্দ দাসকে না কি কারাবরণও করতে হয়েছিল। এক দিন দল-বল নিয়ে তিনি "বিচিত্রা"র আসরে এসে হাজির হলেন এবং ছবহু যাত্রার কায়দাতেই আমাদের দেখিয়ে গেলেন "মাতৃপূজা"র অভিনয়।

আর এক দিন হল, স্বর্গীয় সুরসিক শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসুর নৃত্যাভিনয়। তাঁর নাচ ও গান বেশ লেগেছিল।

এক দিন কর্ণাট থেকে এলেন এক জন বিখ্যাত ওস্তাদ গায়ক। তিনি শোনালেন নিজের দেশের গান। তাঁর গান শুনে বুঝেছিলুম, একই রাগিণী ভারতের এক এক প্রদেশে গিয়ে ভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে ভিন্ন সময়ে গাওয়া হয়।

তখনও বাংলা দেশে শিক্ষিত নব্য সমাজের ছেলে-মেয়ের মধ্যে নাচের রেওয়াজ হয়নি। আমরা বড় বড় য়ুরোপীয় শিল্পীর আসরে গিয়ে জনতা সৃষ্টি করে নৃত্যকলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতুম এবং নিম্নশ্রেণীর দেশী নাচ কায়ক্লেশে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করত থিয়েটারের নাচিয়েদের এবং বাইজী বা খেমটাওয়ালীদের সাহায্যে। "বিচিত্রা" উঠে যাবার পর দেশী নাচকে আবার জাতে তোলেন সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথই। কিন্তু নৃত্যকলার প্রতি নিশ্চয় বরাবরই তাঁর একটি প্রাণের টান ছিল। কারণ "বিচিত্রা"র সভ্যগণকেও তিনি নাচের আমোদ থেকে বঞ্চিত করেননি। এবং সে নাচও ফিরিঙ্গী নাচ নয়, খাঁটি প্রাচ্য নাচ—রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্রা" না থাকলে যা দেখবার সৌভাগ্য আমার কোন দিনই হত না।

জাপান থেকে এক তরুণী নর্ত্তকী এসেছিলেন ভারতবর্ষে, তাঁর নামটি আমার ঠিক মনে নেই—হেঙ্কোয়া বা ঐ রকম কিছু একটা হবে। খাসা মেয়েটি, ফুলের মতন সুন্দর, মাথায় এতটুকু। তিনি ছিলেন না কি তখনকার জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী। "বিচিত্রা"র রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে তিনি আমাদের দেখালেন জাপানী নাচ। ভারতের মত জাপানের নাচের "ব্যাকরণ"ও অত্যন্ত জটিল, একটু ভুরুর বা চোখের বা আঙুলের ভঙ্গিতে এবং অঙ্গভঙ্গের মধ্যে থাকে বিশেষ বিশেষ অর্থ। যাঁরা জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে সে সব অর্থ আবিষ্কার করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং সেই রূপসী নর্ত্তকীটি নাচের মধ্য দিয়ে কোন অর্থ প্রকাশ করছেন, তা বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু উপভোগের আনন্দে আমাদের অভিভূত করলে তাঁর অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র নৃত্য-নৈপুণ্য। এইখানেই আর্টের সার্থকতা, তা হচ্ছে সার্ব্বজনীন ভাষা। সাপ তো রাগিনী চেনে না, কিন্তু তবু সে না কি নাচে সাপুড়ের বাঁশীর ছন্দে তালে তালে। বিশেষ করে ভালো লেগেছিল তাঁর যে নাচটি, তাঁর
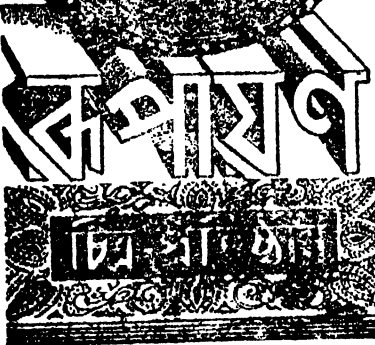
নাম হচ্ছে "একটি সকুয়া কুল" এই নৃত্যানুষ্ঠানের অল্প দিন পরেই একটি খবর পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলুম। ঐ নর্ত্তকীটি না কি ভারত থেকে সিংহলে গিয়ে অজ্ঞাত কোন কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এমনি দেশ-বিদেশের গুণী ও শিল্পীরা কলকাতায় এলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এনে "বিচিত্রা"র হলঘরে আসরস্থ করতেন। সমস্ত অনুষ্ঠানের কথা এখানে খুঁটিয়ে বলবার জায়গা হবে না।

তার পর সকলের উপরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে—যাঁকে বলা চলে 'একাই একশো'। নূতন কবিতা রচনা করলে তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন। নূতন নাটক, গল্প বা উপন্যাস রচনা করলেও তিনি হ'তেন পাঠক, আমরা হতুম শ্রোতা। রবীন্দ্রনাথের পাঠ ছিল একটি পরম উপভোগ্য ব্যাপার, তা একসঙ্গে আবৃত্তি এবং নটচর্য্যা। রঙ্গালয়ে গিয়ে বড় বড় নটের অভিনয় দেখেও আমরা যা লাভ করতে পারতুম না, রবীন্দ্রনাথের মুখে নাটক-পাঠ শুনে সেই দুর্লভ আনন্দই উপভোগ করতুম তদ্গত চিত্তে। পুরুষ ও নারী ভূমিকায় যা কিছু বিশেষত্ব, সমস্তই ফুটে উঠত সুমধুর ও সংযত বাক্যাভিনয়ে। পাঠের সময়ে মাঝে মাঝে দেখতুম তাঁর ভ্রূকুটি ও তর্জ্জনীর ইঙ্গিত, তা ছিল যথেষ্ট ভাবদ্যোতক। তাঁর মঞ্চাভিনয়ের সময়েও লক্ষ্য করেছি, তিনি বিশেষভাবে আঙ্গিক ভঙ্গির সাহায্য গ্রহণ করতেন না, প্রধানতঃ বাক্যাভিনয়ের দ্বারাই ব্যক্ত হ'ত তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি।

"চিরকুমার সভা" অভিনয়ের আয়োজন করে এক দিন তিনি পড়ে শোনালেন। কি আনন্দই যে পেয়েছিলুম! কেবল পাত্র-পাত্রীদের কথা নয়, মাঝে-মাঝে পড়াত পড়তে প্রেমে নাটকের গানগুলিও তিনি স্বভাব-মৃদু কণ্ঠে গেয়ে যেতে ভুলতেন না।

"বিচিত্রা"র মাঝে-মাঝে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও বিশেষ আসর বসত। পরে ঋতু-উৎসব উপলক্ষে রচিত যে সব গানের মালা কলকাতায় সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল, সে শ্রেণীর অনুষ্ঠানও আরম্ভ হয় ঐ "বিচিত্রার" যুগেই। বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম ঋতু-উৎসবের বৃহৎ আসর বসেছিল বিচিত্রা-ভবনের উত্তর দিকের জমির উপরে।

অভিনয়, আবৃত্তি নাচ ও গান—সব বিভাগের সব চেয়ে উপভোগ্য জিনিষ পরিবেষণ করে "বিচিত্রা" নিয়মিত ভাবে মাতিয়ে রাখত সুধীসমাজকে। তারই দৌলতে অপরিমিত আনন্দের সঙ্গে যে দুর্লভ শিক্ষা ও চিন্তার খোরাক লাভ করেছি, জীবনের যাত্রাপথে বহু দূর অগ্রসর হয়ে আজও তা মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। বাংলা দেশের রসিকজনের কাছে "বিচিত্রা" ছিল সত্য সত্যই একটি "লিটল থিয়েটার" বা অসাধারণ রঙ্গালয়েরই মত। "বিচিত্রা"র সভ্য হবার সৌভাগ্য লাভ করে মনে মনে যে গর্ব্ব অনুভব করতুম না, এমন কথাও বলতে পারি না।

কিন্তু আমাদের এত আদরের ও এত গর্ব্বের "বিচিত্রা"র আসর যে দিন ভেঙে গেল, সেদিন যে কতখানি বাথা পেয়েছিলুম, ভাষায় তা প্রকাশ করা সহজ নয়। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আজ যখন বাজে বিতর্ক, রেষারেষি ও দলাদলি নিয়ে মত্ত হয়ে থাকতে দেখি, মনে মনে তখন এই কথাই বলি—তোমরা শাঁস ফেলে খোসা নিয়েই খুসি হয়ে আছ! কতটুকুই বা দেখেছ, আর কতটুকুই বা পেয়েছ! "তে হি নো দিবসা গতাঃ!"

পেশাদারী অভিনয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

জনৈক পেশাদার

সচরাচর দেখা যায় যে অভিনেতার ডাক প্রচুর অর্থাৎ নানা ধরণের চরিত্র রূপায়ণে যার দক্ষতা অতি প্রসিদ্ধ, তাকে সাত দিনে সাতটিরও বেশী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে ফিরতে হয়। রঙ্গমঞ্চ, গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা এই ক'টি হল যে-কোন অভিনেতার লীলাক্ষেত্র এবং সেখানেই তিনিই দর্শকের নয়নপুত্তলী।

এই ধরণের অভিনেতাদের অভিনয়-নৈপুণ্যকে বিশ্লেষণ করলে স্বতঃই যা নয়নগোচর হবে তা হোল, যে কোন নাটকীয় চরিত্রের বিশিষ্টতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি স্বাভাবিক ভাবেই কৃত্রিম হতে পারেন। বাচনে, ভঙ্গিমায় এবং চরিত্র-স্ফুটনে তিনি আপনার ব্যক্তিত্বকে একটা কাদামাটির ডেলার মত ব্যবহার করছেন। যেমন করেন ভাস্কর তার মনের নানা ধারণাকে মূর্তি-গঠনের কাজে। অথচ বাহ্যিক দিকে নট আপনার বেশভূষায় কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের সুযোগই নিচ্ছেন না।

এ ভ্রান্তি অত্যন্ত মারাত্মক যে, কেবল মাত্র সাদা চরিত্রে অর্থাৎ যে চরিত্রের মধ্যে লেখক বিচিত্র ভাব প্রকাশের অবসর দেননি, সে চরিত্র ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়া যে-কোন তরুণ ও অনিপুণ অভিনেতার পক্ষে সম্ভব এবং টাইপ চরিত্র অর্থাৎ যে চরিত্রে অভিনেতাকে আপন অভিনয়-দক্ষতার চরম ক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তার পক্ষে গুণী পাকা অভিনেতার একান্ত প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের মতে কোন চরিত্রই সহজ অর্থাৎ সাদা নয়, যেমন কোন বিশেষ চরিত্রের নাম টাইপ চরিত্র নয়। তাঁরা বলেন, অভিনেতাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে চরিত্রে তিনি পাদ-প্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাই হচ্ছে টাইপ চরিত্র। এ উপলব্ধি না এলে কোন অভিনেতার পক্ষেই কোন চরিত্র সম্যক্ ভাবে ফুটিয়ে তোলার পরিপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।

এর পূর্ব্বেও বহু বার বলা হয়েছে যে কোন দু'টি মানুষ অবয়বে এবং মানসিক বিশিষ্টতায় এক হতে পারে না। এই কারণে যে কোন সাদা পার্ট অভিনয় করার সময় অভিনেতা যদি নিজের ব্যক্তিত্বকেই বার-বার তুলে ধরেন তবে তার অভিনয় নিতান্তই একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য। দর্শক বলতে বাধ্য হয় যে অমুক অভিনেতার আর সব গুণ আছে, কেবল মাত্র অভিনয় করার গুণ ছাড়া। এ-ধরণের সমালোচনায় বিভূষিত হলে অভিনেতার ভবিষ্যৎ আর উজ্জ্বল বলা চলে না।

এই কারণে দুর্বল শ্রেণীর অভিনেতাদের নিয়ে কোন নাট্যকার সবল নাটক লিখতে পারেন না এবং বাধ্য হয়ে পরিচালককে নানা ধরণের রূপসজ্জার ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ এ ধরণের নানা নাটকও বিরল নয় যেখানে এক জন অভিনেতাই নিজের স্বাভাবিক বেশভূষায় অনেক ঢঙের চরিত্রকে এমন বিচিত্র ও অপূর্ব ভাবে তুলে ধরছেন নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্যে যে দর্শক-মন অভিনয়ের সময়টুকুতে ভুলেই যাচ্ছে যে এই চরিত্রটি অভিনয় করছেন তাদের এক পরিচিত নট এবং যিনি গত সপ্তাহে আর একটি ভিন্ন ধরণের চরিত্র সবল ভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। এই হোল অভিনেতার

পক্ষে সর্বোত্তম কৃতিত্ব। তিনি যে মুহূর্তে মনে করছেন যে তাঁর পার্ট টাইপ পার্ট অর্থাৎ তিনি যে চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন তা একটি বিশিষ্ট মানসিকতার সম্মেলন মাত্র, তখনই তিনি নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে ফুটিয়ে যাচ্ছেন সাবলীল ভাবে। তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের কোন কৃত্রিম দুর্বার চেষ্টার ভাব নেই এবং অপর একটি ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলারও আড়ষ্টতা নেই। দর্শকও সেই কারণে রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে চায় না, সে প্রত্যাশা করে একটি আশ্চর্য চরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে।

নাটক ও জীবন নামক একখানি বইতে এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সুন্দর মন্তব্য করা আছে :

'প্রত্যেকটি নাটকীয় চরিত্রের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। নাট্যকারের সংলাপ, দৃশ্য অবতারণা এবং পরিচালকের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ আর দ্বিতীয়টি হোল পরিবর্তনশীল, বাচনে ভঙ্গীতে রূপায়ণে যা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠবে। অভিনেতাকে এই দু'টি জিনিসের সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অবশ্য প্রথমটির সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তার কারণ তত গুরুতর নয়। সংলাপ এবং দৃশ্যসজ্জার মধ্যে [illegible] নিজেকে মানিয়ে নিলেই তার চলবে। সে পথে তার স্বাধীনতা প্রচুর নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সফল হবার [illegible] শিল্পী [illegible] সংলাপ বলার জন্য একটি মানুষকে দাঁড় করাতে হবে তাকে [illegible] দৃশ্যের পর দৃশ্যে একটি সজীব মানুষের রূপকে উদ্ঘাটিত করে দেখাতে হবে। এর জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জনেরও প্রয়োজন হতে পারে।'

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য কথা হোল যে, অন্য সব গুণান্বিত হবার পরও অভিনেতাকে বিশেষ ভাবে শিল্পি-মন নিয়ে কাজ করতে হবে এবং তার জন্য তার কল্পনাকে প্রখর ও ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে। এই কল্পনাশক্তিই তাকে ধারণ করে থাকবে এবং তার সমগ্র অভিনয়ে কৃত্রিমতা ও ঢিলেমিকে প্রতিরোধ করবে!

একটা দৃষ্টান্তে বক্তব্যটুকু হয়ত আরও সহজ হবে। মনে করা যাক, অভিনেতা একটি দৃশ্যে অন্য কয়েকটি সহযোগী অভিনেতার সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। দৃশ্যের প্রথম দিকেই অভিনেতা তাঁর সংলাপের মধ্যে এক বিরোধ বাধিয়ে তুলেছেন এবং প্রতি সংলাপের মধ্যে অভিনেতা নিজের চরিত্রটিতে এক প্রবল প্রাধান্য ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃশ্যটি অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শেষের দিকে বেশ অনেকখানি সময় সেই অভিনেতার মুখে কোন সংলাপ নেই, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীরও কোন বিশেষ নির্দেশ নেই। এই সময়টুকুতেই হোল অভিনেতার পরীক্ষা। অন্য চরিত্রগুলি কথা কইলেও দর্শক স্বভাবতই সেই কঠিন ও প্রবল নিঃশব্দ অভিনেতার আচরণ লক্ষ্য করছে এবং তার ভঙ্গিমায় সামান্য মাত্র বিচ্যুতি ঘটলে তা দর্শকের লক্ষ্য এড়িয়ে নিতে পারছে না। এই সময়ে অভিনেতাকে বাঁচিয়ে রাখছে তার প্রবল কল্পনা-শক্তি। তাকে ভুলতে দিচ্ছে না একটি ক্ষণও যে সে মহারাজ, নরহরি সরকার নয়।

সেই কারণে পরিচালকরা বলেন যে, অভিনেতার সব ক্ষমতা থাকলেও যদি এই কল্পনা-শক্তি বিবর্জিত হন তিনি, তবে তাঁকে যাই করা যাক না কেন, শ্রেষ্ঠ শিল্পী করে তোলা যায় না। কল্পনা-শক্তি যাঁর মধ্যে প্রখর, তাঁর পক্ষে বাচনে, ভঙ্গিমায় এবং স্বাভাবিকতায় উৎরে যাওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। [ক্রমশঃ।

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

এ্যামিউসমেণ্ট না Amusement Tax ?

এত দিন সিনেমা-গৃহাভিমুখে আপনি যেতেন কিছুক্ষণ amused হতে, এখন সেখানে গেলেই abused হবেন। টিকিটের দাম দিতেই ট্যাঁক খালি হত আগে, এখন তার ওপর ট্যাক্স বসেছে নোতুন করে। ছায়াছবি হচ্ছে আজকের জগতে সব চেয়ে সুলভ re-creation. পৃথিবী জুড়েই তার বিজয়াভিযান—দরিদ্র মানুষকে আনন্দ, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক দুঃসহ অবস্থার হাত থেকে কিছু ক্ষণের জন্যে মুক্তি দিতে। কিন্তু আমাদের সরকারের কাছে ফিল্ম-ব্যবসা ব্যবসার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ব্যাঙ্কের মত লোকে বলছে, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিনেমা-ট্যাক্স এ যাবৎ যাহা যা নিয়েছে, তার প্রত্যেকটি পাই-পয়সা ফেরৎ না দেয়, তবে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য ফিল্মওয়ালাদের মত তাঁকেও ষ্টুডিওর দরজা বন্ধ করে যেতে হবে হলিউডে, পেটের দায়ে। আমাদের জন্ম-বধির সরকারকে এ সব কথা বলা বৃথা। সিনেমা ব্যবসা থেকে আখের মত মেড়ে যতটুকু আপাত-রস বা রসদ মেলে, তাতেই চলে যাবে ভাবছেন তাঁরা। কিন্তু তাতে চলবে না। রস মিলবে না বেশী দিন, রসদও না। আজকে ফিল্ম বন্ধ হয়ে গেলে শুধু অর্থ নৈতিক ক্ষতি হবে দেশের, এ কথা ভাবা ভুল, কারণ আমাদের দেশে ছাড়া পৃথিবীর আর সর্বত্র ফিল্ম হচ্ছে জাতীয় আদর্শে mass-mindকে গড়ে তোলার সব চেয়ে বড় প্লাটফর্ম!

ফিল্মকে ট্যাক্স না করে ট্যাক্স করা উচিত ফিল্ম-ষ্টারকে! অধ্যাপক সত্যেন বোস যেখানে মাসে দেড় হাজার টাকা পায়েন, সেখানে কাননবালা কেন পাবেন তার দশ গুণ? ট্যাক্স যদি করতে হয়, ট্যাক্স কর এদের। Income যাদের লাখের অঙ্কে, ভারতবর্ষে Income tax free হন তাঁরাই! এই হল আমাদের রাজ-চক্রবর্তীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী।—এই দৃষ্টিভঙ্গী যত দিন না বদলাচ্ছে, তত দিন আমাদের দ্বারা কোন creation হবে না, তত দিন আমাদের জীবনে কোন re-creationও নেই।

এবার আর বাউণ্ড্রী নয়, ওভার-বাউণ্ড্রী!

বলছেন বহু-অপেক্ষিত 'বিদুষী ভার্য্যা'র পরিচালক নরেশ মিত্র। এ না কি তাঁর 'স্বয়ংসিদ্ধার' চেয়েও বড় সাফল্য হবে। শ্রীউপেন গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটি লিখেছেন মূর্খ স্বামীর বিদুষী একটি স্ত্রীকে কেন্দ্র করে। উপেন বাবু গল্প লেখেন পাকা হাতে এবং নরেশ মিত্রের চেয়ে বড় অভিনয়-শিক্ষক আজকের ছায়াচিত্র-জগতে আর কেউ নেই। তাই ছবিটি বিপুল দর্শক আকর্ষণ করবে মনে হয়। দু'টি নোতুন মেয়ে—মলয়া ও কবিতার মুখ দেখা যাবে এই ছবিতে।

'কবি'র রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে

একটি প্রীতি অনুষ্ঠানে এই সর্বপ্রথম ছবির কর্মীদের, একেবারে কুলী থেকে কুশি-লব পর্যন্ত সকলকে অভিনন্দন জানান এর প্রযোগ-কর্তা। ছবি শেষ হলেই এই সব অজ্ঞাত কর্মীদের লোকে ভুলে যায়, তাই আজ যে তার ব্যতিক্রম সম্ভব হচ্ছে, তা দেখে স্বভাবতই মন ভরে ওঠে। দেবকীকুমার বসু যখন নিজের হাতে দরিদ্র কুলীদের মালা দিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন তখন উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন। চিত্রমায়ার কীর্ত্তি অক্ষয় হোক, এই কামনা জানিয়ে সকলে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদায় নেন। গ্রন্থকার তারাশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন।

'সন্দীপন পাঠশালা'র সার্থক চিত্ররূপ

অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পর্দায় তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা'কে যে বাণীরূপ দিয়েছেন, তা আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে। সব চেয়ে যে কাঁদিয়েছে, সে ট্রামের হাতল-ধরে ঝোলা সেই বাচ্ছা ছেলেটি, তার বিদায়-করুণ মুখ ছবি দেখার পরও বহুক্ষণ ভুলতে পারিনি। সমস্ত ছবিটির প্রধান গুণ হল—এর dignity; প্রধান দোষ হল—ক্লাইম্যাক্স নেই। যাঁরা সরকারকে নামিয়ে ভালো কাজ করেছেন অর্দ্ধেন্দু বাবু। আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁকে একেবারে ডুবিয়েছেন। ভালো গাওয়া আর ভালো সুর দেওয়া যে দু'টো একেবারেই আলাদা ক্ষমতা, এ কবে বুঝবেন আমাদের পরিচালকরা, তাই ভাবছি।

শ্রীমতী কাননের নব-পরিণয়

অশোক-কানন বিবাহ বাতিল হওয়ার পর শ্রীমতী কাননের আবার বিবাহ হয়েছে বাংলার প্রদেশপালের এ. ডি. সির সঙ্গে সংবাদ প্রকাশ। শ্রীমতীর দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কামনা করি আমরা।

বসুমিত্রের নোতুন ছবি

বসুমিত্রের নোতুন ছবি 'উল্টো রথের' শুটিং আরম্ভ হয়েছে ইষ্টার্ণ টকীজের ফ্লোরে। 'উল্টো রথ' শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী রচিত মঞ্চ-সফল "ডক্টর মিস কুমুদ"এর বাণীরূপ। হাসির এই ছবি পরিচালনা করছেন শ্রীঅমলকুমার বসু। ভূমিকায় আছেন পাহাড়ী, মলিনা, রেণুকা, শিপ্রা, শিশির ও গুরুদাস।

তিমিরবরণের সঙ্গীত চিত্র

জানা গেল, মিউজিক্যাল ছবি করবেন বলে plan করছেন। তাঁর মতে কয়েকখানা গান ঢোকালেই তা musical ছবি হয় না; music-এর এ্যাটমস্‌ফেয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেই হবে musical ছবি-হয়। আমাদের বিশ্বাস, তিমিরবরণ এর যোগ্য লোক। তাঁকে দিয়ে এ এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে পারেন প্রযোজকরা। অযোগ্য লোকের হাতে এর ভার দিলে প্রযোজক দেখবেন তা joke হয়ে দাঁড়াচ্ছে! গতানুগতিক পথ না ত্যাগ করলে পঁচিশ বছর বাদেও দেখা যাবে বাংলা ছবি যে তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরেই!

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুয়াসা'

'কালোছায়ার' লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমানে 'কুয়াসা' তুলছেন ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে। শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য এতে একটি অসাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। স্ত্রী-ভূমিকায় শিপ্রা এবং ছায়া দেবী আছেন।

'দেবী চৌধুরাণী' মুক্তি প্রতীক্ষায়

এ বৎসরের সর্বাধিক ব্যয়ে প্রস্তুত, অমর বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় 'দেবী চৌধুরাণী' এখন মুক্তি প্রতীক্ষায় ছায়া-পর্দায়। সুমিত্রা আছেন নাম ভূমিকায় এবং প্রদীপ বটব্যাল নায়কের অংশে। ছবি বিশ্বাস একটি প্রধান চরিত্রকে রূপদান করেছেন। রূপায়ণের এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন সতীশ দাশগুপ্ত। প্রফুল্ল রায় বিশেষ দৃশ্য, বহির্দৃশ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যগুলির নির্দেশ দিয়েছেন। সুরকার হলেন কালীপদ সেন।

বিবেকানন্দের বাণীরূপ

বিবেকানন্দের জীবনকে ভিত্তি করে অমর মল্লিক প্রোডাকসন্সের 'স্বামিজী' সেন্সর-বোর্ড অনুমোদিত হয়েছে। 'স্বামিজী'র ভূমিকাভিনেতার সঙ্গে স্বামিজীর আকৃতিগত সাদৃশ্য না কি বিস্ময় সঞ্চার করবে। শুধু তাই নয়, স্বামিজীর শিষ্যদের চেহারা মেলাবার জন্যেও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন অমর মল্লিক। পরিচালনা করেছেন তিনি নিজেই। 'স্বামিজী' বাংলা ছায়াছবিকে নোতুন মর্যাদা দান করুক।

রাম চৌধুরীকে ধন্যবাদ

কালিকার রাম চৌধুরীর রাম নাম যেন এত দিনে সার্থক হয়েছে। তিনি যে নিজের নামের মর্য্যাদা বুঝে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রীচরণে এত দিনে আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে তাঁকে সাধুবাদ না দিলে একান্ত অন্যায় হবে।

আজকের দিনেও সেই সব আদিম প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে সেই সব আদিম বীর এবং আদিরসাত্মক বই দেখতে দেখতে যখন আমরা 'রাম, রাম! ছি!!' বলতে বলতে উঠে আসি, তখন কালিকায় রাম চৌধুরীর 'যুগাবতার' দেখলে সত্যিই যেন এক রামরাজ্য সগর্ব্বে দেখতে পাই—যেখানে পামেলা আর জওহরলাল নেই, পুলিশ জুলুম নেই, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার নেই—আছেন শুধু বাঙালীর নবযুগের কয়েক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ—যাঁদের জন্য আমাদের এই তথাকথিত স্বাধীনতার পূর্ব্বাভাষ মাত্র আমরা পেয়েছি।

'যুগাবতার' একবার দেখবার বই নয়, বার বার দেখতে হয়। নবাগত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের প্রণাম।

সাহিত্যের বাজারে বাজারে সাহিত্যিক

সাহিত্যের ক্ষেত্রে না হলেও বাজারে আজকাল সাহিত্যিকদের পোয়া বারো। দু'খানা তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করে বাজারে যাঁরা দোকান ফেঁদে বসেছেন, তাঁদের নিয়েই সকলে টানাটানি শুরু করে দিয়েছেন। এ সব সাহিত্যিকদের একটি মহৎ গুণ এই যে, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী। স্বজাতীয় এবং স্বদলীয় ব্যতীত আর যে-কেউই তাঁদের কাছে বিজাতীয় কিংবা বদজাতীয়। যাঁরা শুধু তাঁদের টাকার পাহাড়ে চাপিয়ে রেখেছেন, তাঁরাই ছায়াছবির আনন্দবাজারে থৈ পাবেন, আর অন্য যে-কেউ তাঁদের কাছে আমলই পাবে না। আমলাতন্ত্র থেকে তন্ত্রশাস্ত্র, বম্বে থেকে কলকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট থেকে গাষ্টিন প্লেস—সকল ক্ষেত্রেই এই জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের হাম্বা-হাম্বা রব শুনবেন। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ব্যতীত আর কোন নতুন পার্ব্বণ তাঁদের নেই—হেরো মাসেও এমন একটি বইও পাবেন না, যা পড়লে সত্যিই মনে হবে, তাঁরা সত্যিকার সাহিত্যিক।

আমরা এখন কিছু বলতে চাই না, তবে মঞ্চ ও পর্দা সম্বন্ধে আজকাল তাঁরা যা বলছেন, তা শুনে শুধু একটি কথাই বলতে ইচ্ছা হয়—কলকাতায় 'অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে'।
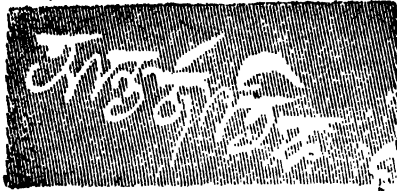
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি

গত ৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৯) ওয়াশিংটনে বারটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব বিপুল আড়ম্বরের মধ্যে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র সমূহ তাহাদের একের উপর আক্রমণকে সকল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য করিবে। এই চুক্তি দ্বারা উক্ত বারটি রাষ্ট্র তাহাদের রাজ্যের সংহতি এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বাধীন সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করিতে সচেষ্ট হইবে। এই চুক্তি প্রথম দশ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং অতঃপর আরও ১০ বৎসরের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য এই চুক্তির সর্ত্তগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদন উৎসবের বিবরণ শক্তিশালী মার্কিণ বেতার যন্ত্রের সাহায্যে পঞ্চাশটি ভাষায় সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলিকে লক্ষ্য করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বারটি দেশ আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে :— (১) বেলজিয়ম, (২) কানাডা, (৩) ডেন্‌মার্ক, (৪) ফ্রান্স, (৫) আইস্‌ল্যাণ্ড, (৬) ইটালী, (৭) লুক্সেমবার্গ, (৮) নেদারল্যাণ্ড, (৯) নরওয়ে, (১০) পর্ত্তুগাল, (১১) বৃটেন, (১২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, সংক্ষেপে আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদন কোন একটা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে সকল ঘটনা-পরম্পরা অবশেষে আটলাণ্টিক চুক্তিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বলা হইয়াছে যে, নয় মাসের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এক দিক হইতে কথাটা খুবই সত্য। গত জুন মাসে (১৯৪৮) মার্কিণ সিনেটের বৈদেশিক নীতি কমিটির সভাপতিরূপে রিপাবলিকান সিনেটর ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্থায়ী এবং কার্য্যকরী স্বাবলম্বন এবং পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে রচিত কোন আঞ্চলিক এবং অন্যবিধ সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেন, তাহা হইতেই উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা অনস্বীকার্য্য। তাঁহার এই প্রস্তাব ১৯৪৮ সালের ১১ই জুন মার্কিণ সিনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ৮ই জুলাই হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আটলাণ্টিক রক্ষা-ব্যবস্থা মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে ব্রুসেলস্ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমূহ এবং কানাডার সহিত আলোচনা আরম্ভ করে। কিন্তু চুক্তির মূলদেশ যে আরও দূরে এবং গভীর প্রদেশে নিহিত রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে পৃথিবীর ৫০টি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদে স্বাক্ষর করিয়া আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত হওয়ার চারি বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই উক্ত সনদে স্বাক্ষরকারী ১২টি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদন করা খুবই তৎপর্য্যপূর্ণ হইলেও দুর্ব্বোধ্য নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে অকালমৃত লীগ অব নেশানসের প্রেতাত্মা হয়ত বলা যায় না, কিন্তু উহা যে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সন্তান, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিশ্ব-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রোম-বার্লিন অক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রীর মধ্যে যে স্ববিরোধ আত্মগোপন করিয়াছিল, ইটালী ও জার্ম্মাণী পরাজিত হইতে না হইতেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এক দিকে বৃটেন ও আমেরিকা এবং আর এক দিকে সোভিয়েট রাশিয়া—উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের কথা নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ই আমেরিকার মনে সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং এ বিষয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী যে আর কেহ থাকিবে না, সে সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট ভরসা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, সোভিয়েট রাশিয়া একটি প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের আসনই শুধু দখল করেন নাই, জার্ম্মাণী ও জাপানের অধিকৃত দেশগুলিতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরোধিতা করিয়া ঐ সকল দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ, যুদ্ধের পরে সমগ্র ইউরোপই ধীরে ধীরে কম্যুনিষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। এই আশঙ্কা হইতেই যুদ্ধের পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সম্পর্কে তাহার পররাষ্ট্র নীতিকে ঢালিয়া সাজিয়াছে।

রাশিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা হইল এই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে তাহার অংশীদাররূপে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে গণ্য করিবে। মার্কিণ স্বরাষ্ট্র বিভাগের নীতিগঠনকারী ষ্টাফের ডিরেক্টার জর্জ্জ কেনান (George Kennan) রাশিয়া সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর মার্কিণ-নীতির যে কাঠামো রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, "It must continue to regard the Soviet Union as a rival not a partner in the political arena." আমেরিকা এই নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ্চ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, যে সকল স্বাধীন জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা বাহিরের চাপের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগকে সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, 'যদি এই সাহায্য আমরা না করি, তাহা হইলে আমাদের নিজের দেশও বিপন্ন হইবে।' তিনি কম্যুনিষ্টদের চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য গ্রীস এবং তুরস্ককে সামরিক সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করিতে মার্কিণ কংগ্রেসকে অনুরোধ

করেন। এই ঘোষণার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন বা ট্রুম্যান-নীতি নামে খ্যাত। তৎপর ৫ই জুন (১৯৪৭) তদানীন্তন মার্কিণ রাষ্ট্র সচিব মিঃ জর্জ্জ সি মার্শাল হারবার্ড ইউনিভারসিটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মার্শাল-পরিকল্পনা উহারই পরিণাম। ইহার পর ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি দেশের সহিত মিলিত হইয়া রিও-ডি-জেনিওরোতে আন্তঃ-আমেরিকা পারস্পরিক রক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ইহাই প্রথম আঞ্চলিক রক্ষা চুক্তি। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই পাঁচটি দেশ ব্রসেলস নগরে ৫০ বৎসরের জন্য পারস্পরিক রক্ষা-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহাই ব্রসেলস চুক্তি নামে অভিহিত। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসকে জানান যে, ব্রসেলস-চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলিকে তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকা অবশ্যই সাহায্য করিবে। ইহার পর ১১ই জুন ভ্যাণ্ডেনবার্গের উল্লিখিত প্রস্তাব মার্কিণ সেনেটে গৃহীত হয় এবং ৮ই জুলাই হইতে আটলাণ্টিকের জন্য কথাবার্ত্তা সুরু হয়। প্রস্তাবিত আটলাণ্টিক চুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা আরম্ভ হয় ১০ই ডিসেম্বর (১৯৪৮) তারিখে।

গত ১৮ই মার্চ্চ (১৯৪৯) আটলাণ্টিক চুক্তির যে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায়, এই চুক্তিতে মোট ১৪ দফা সর্ত্ত আছে। এই সকল সর্ত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু এই চুক্তির একটি মারাত্মক ত্রুটি সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। সশস্ত্র আক্রমণ বলিতে কি বুঝায়, তাহা এই চুক্তিতে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সশস্ত্র আক্রমণ কি না তাহা স্থির করিবার ভার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে অর্পণ না করিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের প্রতি আস্থা স্থাপন সম্পর্কে চুক্তির মুখবন্ধে (preamble) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই চুক্তি উক্ত সনদের ৫১ ধারা সম্মত হইয়াছে, এ কথাও বলা অসম্ভব। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার উভয় পক্ষের প্রত্যেক পক্ষই আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। সশস্ত্র আক্রমণ বলিতে কি বুঝায় এবং কিরূপ আক্রমণ সশস্ত্র আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা ১৮ই মার্চ্চ তারিখে মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডীন একিসন সাংবাদিক সম্মেলনে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর সোভিয়েট এলাকার উপর দিয়া বার্লিণে সরবরাহ প্রেরণের সময় যদি কোন মার্কিণ বিমানকে আক্রমণ করা হয়, তাহা হইলে উহা যুদ্ধাত্মক আক্রমণ বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু ইহা একটা উদাহরণ মাত্র, সশস্ত্র আক্রমণের সংজ্ঞা নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সব কিছু নির্ভর করিবে আক্রমণের গুরুত্বের উপরে। যে আক্রমণের ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হইতে পারে এবং যে আক্রমণ সীমান্ত ঘটনের সংঘর্ষ মাত্র, এতদুভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য রহিয়াছে। পার্থক্য থাকিলেও মিঃ একিসন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের উপর বাধ্যকর নয়। এমন কি, তাঁহার উক্তি দ্বারা মার্কিণ কংগ্রেসও বাধ্য নয়। মিঃ একিসন বলিয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপকে সশস্ত্র আক্রমণ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ যদি বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য দ্বারা পুষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা সশস্ত্র আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং চুক্তিতে আবদ্ধ সকল দেশ মিলিয়া উহা দমন করিতে চেষ্টা করিবে। আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বাহির হইতে সাহায্য পাইতেছে কি না, তাহা তো আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলিই নির্দ্ধারণ করিবে? এরূপ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ দমনের জন্য এই চুক্তির সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে—উহা বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য পাইতেছে,—ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিবে এবং প্রমাণ করিতেও কোন অসুবিধা হইবে না।

আটলাণ্টিক চুক্তিতে পশ্চিম-ইউরোপ এবং উত্তর-আমেরিকার দেশগুলির নিরাপত্তা এবং উহাদের উপনিবেশগুলির নিরাপত্তার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে চুক্তির ৪র্থ, ৫ম এবং ষষ্ঠ ধারার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পঞ্চম ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির কোন একটি বা একাধিক দেশ সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহা চুক্তিতে আবদ্ধ সকল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ সহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চুক্তিতে আবদ্ধ কোনও একটি বা একাধিক দেশের উপর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বলা হইয়াছে চুক্তিপত্রের ষষ্ঠ ধারায়। ষষ্ঠ ধারায় বলা হইয়াছে, চুক্তিতে আবদ্ধ ইউরোপ এবং উত্তর-আমেরিকার যে কোন দেশ, ফরাসী-অধিকৃত আলজিরিয়া, চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির যে কোন দেশের ইউরোপস্থ দখলকার সৈন্য, উত্তর-আটলাণ্টিক এবং কর্কটক্রান্তির উত্তর দিকস্থ উক্ত যে কোন দেশের অধিকৃত যে কোন দ্বীপ অথবা উক্ত অঞ্চলে উক্ত যে কোন দেশের যে কোন জাহাজ বা বিমানের উপর আক্রমণ সশস্ত্র আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু চুক্তির ৪র্থ ধারাটি কোন সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহে। চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির কোন দেশের উপনিবেশ আক্রান্ত হইলেও তাহা চতুর্থ ধারার আওতায় আসিবে। এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি বিষয়টি লইয়া আলাপ-আলোচনা করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত কোন প্রতিশ্রুতি নাই। কিন্তু আটলাণ্টিক চুক্তির নবম ধারাটি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই ধারায় চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে ডিফেন্স কমিটি গঠনের কথা আছে। চুক্তিপত্রের তৃতীয় ও পঞ্চম ধারায় চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির একক এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, এই ডিফেন্স কমিটি তাহা অবলম্বন করিবেন। এই ভাবে সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে তাহাদের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

যদিও আটলাণ্টিক চুক্তি আত্মরক্ষামূলক, তথাপি উহা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধেই তাহা সহজেই বুঝা যায়। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় রাশিয়ার আছে তাহার কোন

পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই চুক্তি দ্বারা যে রাশিয়াকে অগ্রিম সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই চুক্তি দ্বারা যুদ্ধ নিরোধ করা সম্ভব হইবে কি? এই চুক্তি শান্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে কি সমর্থ হইবে? মিঃ পারটিন (Mr. Partin) বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় এই চুক্তি সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মিউনিক হইতে মিঃ চেম্বরলেনের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "I believe this historic occassion will go down in the history to be damned as that one was." অর্থাৎ মিউনিক চুক্তির মত আটলান্টিক চুক্তিও ইতিহাসে নিন্দনীয় হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ, চুক্তি দ্বারা কাহাকেও শান্তিরক্ষায় বাধ্য করা যায় না। বরং এইরূপ চুক্তি যে ভীতির সৃষ্টি করে তাহাই পরিণামে যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়। আটলান্টিক চুক্তিতে যোগদানকারী শক্তি সমূহের নিকট রাশিয়া প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির অভিযোগ করিয়াছে। এই চুক্তি যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ এবং ইয়াল্টা ও পটস্‌ডাম চুক্তির বিরোধী তাহাও এই প্রতিবাদ-পত্রে জানান হইয়াছে। এই অভিযোগের উত্তরে আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র সচিবগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, এই আত্মরক্ষামূলক কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা করার জন্য এই চুক্তি করা হয় নাই। কিন্তু এই চুক্তির লক্ষ্যস্থল যে রাশিয়া তাহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি আটলান্টিক চুক্তি যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করা কঠিন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি—

আটলান্টিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই আরও দুইটি আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। তন্মধ্যে একটি ভূমধ্যসাগরীয় চুক্তি, আর একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ঘোষণা করিয়াছে যে, আর কোন আঞ্চলিক চুক্তিতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় আমেরিকার নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আটলান্টিক চুক্তির পর আর কোন আঞ্চলিক চুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অথবা সুদূর প্রাচ্যে যদি কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আটলান্টিক চুক্তির ১০ নং ধারা অনুসারে চুক্তিবদ্ধ শক্তিবর্গ সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই ঘোষণা সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পর্কে যে একটা গোপনতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। চীনে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভ এবং ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ে অশান্ত অবস্থা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়া সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে বৃটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট চারি জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্টদের প্রসার এবং রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করাই যে তাঁহাদের এই পরিভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে গোপন রাখা হইয়াছে তাহা মনে করিবার অনেক সঙ্গত কারণ আছে। প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করাই যে এই উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত চারি জন প্রতিনিধিদের মধ্যে বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী লর্ড লিষ্টওয়েল অষ্ট্রেলিয়ায় যাইয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় রক্ষা-চুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। উল্লিখিত চারি জন প্রতিনিধির অন্যতম মিঃ প্যাট্রিক গর্ডনওয়াকার করাচী হইতে কলম্বো যাইবার পথে বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শুধু কম্যুনিজমের প্রশ্ন তাঁহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পরিভ্রমণের কারণ নয়। কম্যুনিজম ব্যতীত অপর কারণটি কি তাহা কি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? বিশেষতঃ লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনার কথা অস্বীকার করায় সন্দেহ আরও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোন অভিপ্রায় না থাকিলে লর্ড লিষ্টওয়েল প্রকাশ্য ভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির কথা বলিতে পারিতেন, এ কথা মনে করা অসম্ভব। তবে কথাটা হয়ত তিনি অসময়ে ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্যাম মন্ত্রিসভার জনৈক মুখপাত্র সম্ভাবিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। জাপানের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিসেস্ কোনদা অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশকে জাপানের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিতে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সম্মতি না থাকিলে তিনি এইরূপ অনুরোধ করিতে পারিতেন কি?

প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু অনুমান করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রতীচীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন, "Eastern Asia is a main base of Western Europe, and even apart from any direct consequences in the Pacific sphere, further reverses in South-East Asia could undermine the West European prosperity which is America's first defence. অর্থাৎ পূর্ব্ব-এশিয়া পশ্চিম-ইউরোপের প্রধান ঘাঁটি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ পরিণামের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যদি আরও বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা হইলে পশ্চিম-ইউরোপের সমৃদ্ধির যথেষ্ট ক্ষতি হইবে এবং আমেরিকার উহাই প্রথম রক্ষা-ব্যূহ। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পর্কে, বলিয়াছেন, "It offers guns where agricultural machinery is needed and implies atom bomb sites where countries are in urgent need of irrigation dams." অর্থাৎ যেখানে কৃষিকার্য্যের জন্য যন্ত্রপাতি দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে ইহা (প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি) দিতে চায় কামান এবং যে দেশগুলিতে সেচ-ব্যবস্থার জন্য ড্যাম নির্ম্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরমাণু বোমার জন্য স্থান করিতে চায়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ক্ষীয়মাণ প্রভুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির

উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোড়াতেই এই উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়া গেলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কাতেই 'ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়' নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। বৈদেশিক প্রভুত্ব আবার জাঁকিয়া বসিবে, এই সম্ভাবনায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পর্কে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির উৎসাহিত হইবার কোন কারণ নাই।

বিশ্বশান্তি সম্মেলন—

গত মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে নিউইয়র্ক সহরে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হইয়া গেল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই প্রকাশিত হয় নাই। এই সম্মেলন আরম্ভ হয় ২৫শে মার্চ্চ। এই সম্মেলন সম্বন্ধে এরূপ কথাও বলা হইয়াছে যে, বিশ্বশান্তি সম্মেলনের যাহা উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা নয়। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বিরোধী রাষ্ট্র-গোষ্ঠী এই এই সম্মেলনকে তাহাদের আবরণরূপে ব্যবহার করিয়াছে এবং পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই অভিযোগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। মার্কিণ সংবাদপত্র সমূহ এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে তোর মন্তব্য করিয়াছে বলিয়াই এই সম্মেলনকে তুচ্ছ করা যায় না, অথবা এই সম্মেলন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।

বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ যখন শান্তিরক্ষার নামে যুদ্ধের আয়োজন সুরু করিয়াছে, তখন সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে না। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা সাধারণ মানুষেরই জীবন অধিকতর বিপন্ন হয়। কাজেই জনসাধারণের দিক্ হইতে শান্তির দাবী উত্থাপিত হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী এটর্নী-জেনারেল বলিয়াছেন যে, মঃ ষ্টালিন যখন শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তখন প্রেসিডেণ্ট টুম্যানকে তাঁহার সহিত শান্তি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিতে মার্কিণ জনগণের অনুরোধ করা আবশ্যক। বস্তুতঃ, শান্তিরক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধের আয়োজন করা আবশ্যক, এই নীতি শান্তির পক্ষে আদৌ অনুকূল বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই বিশ্বশান্তি সম্মেলনের গুরুত্ব সাধারণ মানুষ উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু এই সম্মেলনে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সমূহের নীতি কতটুকু প্রভাবিত হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

আমেরিকায় মিঃ চার্চ্চিল—

গত ১লা এপ্রিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন সহরে (মেসাচুসেটস্) মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফুলটনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বরং ফুলটন-বক্তৃতা অপেক্ষাও এই বক্তৃতার তীব্রতা অনেক বেশী। ফুলটনের বক্তৃতায় তিনি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে এবং বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে বলিয়াছেন। আটলাণ্টিক চুক্তি দ্বারা তাঁহার সেই অনুরোধ কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। ঐ বক্তৃতায় তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, পরমাণু বোমার রহস্য আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব-শক্তিকে জ্ঞাত করান উচিত নয়। তাঁহার সেই দাবীও রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু পরমাণু বোমা-রহস্য গোপন রাখার ফলেই পরমাণু শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হইতেছে না, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে কি? বোষ্টনের বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "পরমাণু বোমার বাধা না থাকিলে অনেক আগেই ইউরোপ কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইত এবং লণ্ডনের উপর বোমা বর্ষিত হইত।" কিন্তু পরমাণু বোমা থাকা সত্ত্বেও চীনের কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে পতন হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না কেন? অথচ কম্যুনিষ্টদের আক্রমণে চীনের পতনকে মিঃ চার্চ্চিল মিত্রশক্তির বিজয় লাভের পর সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মঃ চার্চ্চিল ইহাও জানেন যে, ফ্রান্সে পরমাণু কমিশনের যিনি প্রধান কর্ত্তা তিনি এক জন লাল বিজ্ঞানী। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট পরমাণু বোমা সম্বন্ধে যে কোন রাজনীতিক অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তিনি বলিয়াছেন যে, আগামী যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণে পরমাণু বোমা প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালী খুব বেশী দিন একটা মাত্র দেশের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে, তাহাও তিনি মনে করেন না।

যদিও মিঃ চার্চ্চিল তৃতীয় মহাসমর অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করেন না, তথাপি তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া এই কথাই মনে জাগে যে, রাশিয়া পরমাণু বোমার প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কারের পূর্ব্বেই পরমাণু বোমা বর্ষণ করা তাঁহার অভিপ্রায়। মিঃ চার্চ্চিল মনে করেন, রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের শত্রুতা অপেক্ষা বন্ধুত্বকেই বেশী ভয় করে। বলশেভিজমকে শৈশবেই কেন গলা টিপিয়া হত্যা করা হয় নাই, তাঁহার এই আক্ষেপ উক্তিই রাশিয়ার পশ্চিমী শক্তিবর্গের বন্ধুত্বকে ভয় করিবার কারণ কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। মিঃ বেভিনের যে উচ্ছসিত প্রশংসা তিনি করিয়াছেন তাহাতেও রাশিয়ার মনে এই আশঙ্কা জাগিতে পারে যে বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভা রাশিয়া সম্পর্কে চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতিই অনুসরণ করিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক গমচুক্তি—

সুদীর্ঘ আলোচনার পর গত ২৩শে মার্চ্চ (১৯৪৯) ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক গম-সম্মেলনের অধিবেশনে গম সম্পর্কে চারি বৎসরের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্তানুসারে চুক্তির চারি বৎসরের প্রতি বৎসর ৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ শত ৮১ বুশেল গম আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ছাড়া হইবে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পার্লামেণ্টে এই চুক্তি অনুমোদিত হইলে ১৯৪৯ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে এবং উহা বলবৎ থাকিবে ১৯৫৩ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা দ্বারা পৃথিবীর গমের বাজারকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এই চুক্তি অনুমোদিত হইলে বিগত ২০ বৎসরের এই চেষ্টা সফল হইবে। গত বৎসরও ওয়াশিংটনে অনুরূপ একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু

সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের পর্য্যাপ্ত সংখ্যক দেশ ঐ চুক্তি অনুমোদন না করায় উহা বলবৎ হয় নাই। বর্ত্তমান চুক্তি ১৯৪৯ সালের ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে। পৃথিবীর ৫টি রপ্তানিকারক দেশ এবং ৩৭টি আমদানিকারক দেশ সম্মেলনে যোগদান করিয়া এই চুক্তি করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যতম দুইটি প্রধান গম-উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া এবং আর্জ্জেন্টাইন এই চুক্তিতে নাই। রাশিয়া প্রথমে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু গম রপ্তানি সম্পর্কে রাশিয়ার কোটা লইয়া মতানৈক্য হওয়ায় রাশিয়া সম্মেলন পরিত্যাগ করে। রাশিয়া প্রথমে ১০ কোটি বুশেল গম রপ্তানি করিতে চাহিয়াছিল এবং পরে উহা কমাইয়া ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল রপ্তানি করিবার সর্ত্ত দাবী করে। কিন্তু প্রধান তিনটি রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার রপ্তানির পরিমাণ ৫ কোটি বুশেলের বেশী করিতে রাজী হয় না।

এই চুক্তি অনুসারে কানাডা ২০,৩০,৬৯,৬৩৫ বুশেল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৬,৮৯,৬৯,৬০৩ বুশেল, অষ্ট্রেলিয়া ৮০,০০,০০০ বুশেল, ফ্রান্স ৩৩,০৬,৯৩৪ বুশেল এবং উরুগুয়ে ১৮,৩৭,৪৮৪ বুশেল গম রপ্তানি করিবে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ বৎসরে ৩,৮২,৮৬,১৯৬ বুশেল, সিংহল ২৯,৯১,৪৯৭ বুশেল এবং চীন ১৩,৪৪,১৮৩ বুশেল গম ক্রয় করিতে পারিবে। ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য গমের সর্ব্বোচ্চ দর প্রতি বুশেল ১ ডলার ৮০ সেন্ট এবং সর্ব্বনিম্ন দর প্রতি বুশেল ১ ডলার ৫০ সেন্ট ধার্য্য হইয়াছে। অতঃপর বৎসরে ১০ সেন্ট করিয়া কমিয়া ১৯৫২-৫৩ সালে ১ ডলার ২০ সেন্ট দর হইবে। চুক্তিকৃত দরের বাহিরে ক্রয়-বিক্রয় করিবার পথে কোন বাধা হইবে না।

এই চুক্তি যে ভারতের পক্ষে অনুকূল হইয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রথমতঃ, আগামী চারি বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন গম পাওয়া সম্বন্ধে ভারত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে এবং পাকিস্তান হইতে গম পাইবার অনিশ্চিত অবস্থার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ভারতের যে ব্যয় হয় তাহাও হ্রাস পাইবে। বর্ত্তমানে ভারতে গম পৌঁছিবার সময় উহার দর দাঁড়ায় ১৫৲ টাকা মণ। অতঃপর গম ভারতে পৌঁছিলে সর্ব্বোচ্চ দর ১০৷৵০ আনা মণ এবং সর্ব্বনিম্ন দর ৭৷৵০ আনা মণের বেশী হইবে না। এই চুক্তিতে ভারতের আর একটা সুবিধা আছে এই যে, সর্ব্বনিম্ন দর ব্যতীত চুক্তির সমস্ত গম ক্রয় করিতে ভারত বাধ্য নয়।

প্যালেষ্টাইন ও ইজরাইল রাষ্ট্র—

প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান আশাপ্রদ কি না, সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) ইজরাইল রাষ্ট্র এবং মিশরের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গত ২৩শে মার্চ্চ লেবাননের সহিত এবং গত ৩রা এপ্রিল ট্রান্সজর্ডানের সহিত ইজরাইল রাষ্ট্রের যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সিরিয়াও ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু গত ৩০শে মার্চ্চ সিরিয়ার সেনানী-মণ্ডলীর অধিনায়ক কর্ণেল হোসেনী জায়েম হঠাৎ বিনা রক্তপাতে সিরিয়ার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁহার নূতন গবর্ণমেণ্টও ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চালাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশ। ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত মিশর, ট্রান্সজর্ডান এবং লেবাননের যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি করায় অন্যান্য আরব রাষ্ট্রও যে সহজেই যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি করিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু ইহাতেই প্যালেষ্টাইন সমস্যা সহজ হইয়া গেল তাহা মনে করা কঠিন। আকাবায় বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ইজরাইল রাষ্ট্র অভিযোগ করিয়াছে। ইহাতে নিরাপত্তা পরিষদের ২৯শে মে তারিখে (১৯৪৮) প্রস্তাব লঙ্ঘন করা হইয়াছে এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় এই লঙ্ঘনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের সালিশ ডাঃ বাঙ্কেও আকাবায় বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃটিশের পক্ষে কথা এই যে, ট্রান্সজর্ডানের সহিত দীর্ঘ দিনের যে চুক্তি রহিয়াছে তদনুসারেই আকাবায় বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

আকাবায় বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যই প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। লেক সাক্সেসের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মহল মনে করেন যে অবশেষে প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইন সংগ্রাম আসন্ন হইয়া না উঠিলেও অচিরেই তাহা আরম্ভ হইবে এবং উহা অনিবার্য্য। দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইন যুদ্ধ অনিবার্য্য কেন তাহা অনুমান করা খুব সহজ নয়। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার আরব আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা সমাধান না হইলে প্রস্তাবিত শান্তি সম্মেলনে যোগদান করিবে না, এ কথা প্যালেষ্টাইন আপোষ-কমিশনকে জানাইয়া দিয়াছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী হইলেই কার্য্যতঃ ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। অনেকে মনে করেন, শান্তি আলোচনা না হইলেও কালক্রমে পৃথক্ পৃথক্ দ্বৈধ চুক্তি দ্বারা ইজরাইল রাষ্ট্র এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্য এবং উস্কানী না পাইলে আরব রাষ্ট্রগুলি আবার ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ইহা মনে করা কঠিন। বর্ত্তমানে ইজরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে সমগ্র প্যালেষ্টাইন দখল করিয়া লওয়াও কঠিন নয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইজরাইল রাষ্ট্রের সুনাম রক্ষার জন্যও ইজরাইল রাষ্ট্র এই পথ গ্রহণ করিতে পারে না। যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি অনুযায়ী ইহুদী-প্যালেষ্টাইনের যে সীমান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা সাময়িক ব্যবস্থা হইলেও স্থায়ী সীমান্তরেখা প্রায় উহার অনুরূপই হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহাই যদি হয়, তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভাগ-প্রস্তাবে ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনের যে পরিমাণ ভূমি দেওয়া হইয়াছিল ইহুদীরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভূমি পাইবে। প্যালেষ্টাইনের মোট আয়তন ১০ হাজার বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ৬ হাজার ৮ শত বর্গ মাইল অঞ্চল ইহুদীরা বর্ত্তমানে দখল করিতেছে। বিভাগ প্রস্তাবে তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল ৫ হাজার ৫ শত ৭১ বর্গ-মাইল। এই প্রস্তাবে ইহুদীদিগকে যে-সকল অঞ্চল দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে মিশমার হায়ারদেন অঞ্চল এবং তুলকার্ম অঞ্চল ছাড়া আর সমগ্র অঞ্চলেই ইহুদীরা

তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলটি সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটি ইরাকের সৈন্যবাহিনীর দখলে। বিভাগ-প্রস্তাবে সমগ্র নেগেভ অঞ্চল ইহুদীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহুদীরা সমগ্র নেগেভ দখল করিতে পারে নাই, কিন্তু বীরসেবা তাহাদের দখলে। বীরসেবা সম্বন্ধে কোনো স্থায়ী মীমাংসা এখনও হয় নাই। গাজা সহ উপকূল [illegible] বিভাগ-প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইন আরবকে দেওয়া হইয়াছে [illegible] পাইবে বলিয়া মনে হয়।

কেন্দ্রীয় প্যালেষ্টাইন আরবদের [illegible] বটে, কিন্তু ইহুদীরা উহার [illegible] তাহাতে জেরুজালেমের সহিত উপকূলবর্তী ইহু[illegible] কারী করিডরের পক্ষে [illegible]। বিভাগ-প্রস্তাবে [illegible] দেওয়া হইয়াছিল। উহা ইহুদীরা দখল করিয়াছে। [illegible] করায় ইহুদীরা [illegible] ভূমি [illegible]। বিভাগ-প্রস্তাবে উহা প্যালেষ্টাইন-আরবকে দেওয়া হইয়াছিল। নূতন জেরুজালেম ইহুদীদের এবং প্রাচীন জেরুজালেম [illegible] দখলে। বিভাগ-প্রস্তাবে [illegible] জেরুজালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার [illegible] হয়। জেরুজালেমের বর্তমান [illegible] না। তবে কেন্দ্রীয় প্যালেষ্টাইন [illegible] রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবেন [illegible] অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা মনে [illegible] না যে, কাউন্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনায় [illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছিল ইহুদীরা তাহার [illegible] পাইবে।

সিরিয়ায় ডিক্‌টেটরী শাসন—

যে অতর্কিত সামরিক হানার ফলে [illegible] ডিক্‌টেটরী শাসন প্রবর্তিত হইল তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এখনও [illegible] না। গত ২১শে মার্চ (১৯৪৯) গভীর [illegible] সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী প্রধান সরকারী দপ্তরখানায় এবং কারী ভবনগুলিতে হানা দেয় এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে গ্রেফতার করে। পরদিন ভোরের মধ্যে সমস্ত সিরিয়া সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে এবং সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি নিজকে ডিক্‌টেটর বলিয়া ঘোষণা করিয়া একটি সামরিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছেন। [illegible] শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি প্রবেশ [illegible] শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট দখল করা [illegible] বলিয়া কর্ণেল হোসেনী জায়েমের সদর অফিস হইতে প্রচার করা হইয়াছে।

হতভাগ্য ইন্দোনেশিয়া—

গত ২৩শে মার্চ্চ ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে কার্য্য [illegible] প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের [illegible] সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত দুইটি [illegible] ওলন্দাজ ও প্রজাতন্ত্রিগণ যাহাতে একমত হইতে পারেন [illegible] ইন্দোনেশীয় কমিশনকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে [illegible]) যোগ্যকর্ত্তায় প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং (২) [illegible] ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে হেগে একটি গোল [illegible] বৈঠকের ব্যবস্থা করা। গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৪৯) নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে যোগ্যকর্ত্তা প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট এই নির্দ্দেশ প্রতিপালন করেন নাই। প্রজাতন্ত্রী নেতাদিগকে তাঁহারা মুক্তিও দেন নাই। এই অবস্থায় কানাডার প্রস্তাবের কোন সার্থকতাই দেখা যায় না। যোগ্যকর্ত্তায় প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের। কাজেই এই বিষয়ে ওলন্দাজ ও প্রজাতন্ত্রীদিগকে একমত করিবার চেষ্টা করা অর্থহীন। পুনরায় যদি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করারও কোন অর্থ হয় না।

চীনে শান্তির আলেয়া—

চীনের শান্তির আলেয়া আর কত দিন বিভ্রম সৃষ্টি করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জেনারেল হো ইং চিং কর্ত্তৃক চীনের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় এবং পররাষ্ট্র-সচিবের পদে মস্কোর চীনা রাষ্ট্রদূত ডাঃ ফু পি চাং নিযুক্ত হওয়ায় শান্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেকের মনেই আশা জাগিয়াছিল। বস্তুতঃ, ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত চীনা সরকারী প্রতিনিধি দল কম্যুনিষ্টদের সহিত শান্তি আলোচনার জন্য ১লা এপ্রিল (১৯৪৯) নানকিং হইতে পিকিং যাত্রা [illegible]। ৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৯) তারিখে নানকিং হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—চীনা জাতীয়তাবাদীদের প্রস্তাবে কম্যুনিষ্টরা সম্মত হইয়াছেন, [illegible] হইতে যুদ্ধবিরতির নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে এবং ইহার পরেই শান্তি আলোচনা আরম্ভ হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, শান্তির আশা ক্রমেই আলেয়ার মত দূরে সরিয়া যাইতেছে। শান্তি আলোচনার প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা কেহই জানেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্ম সংবাদ—

গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে মান্দালয়ের উপর কম্যুনিষ্ট ও কারেণদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশের সঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে। অতঃপর মিটকিলা, মায়মু, লাসিও সরকারী বাহিনী পুনরায় দখল করার পর মান্দালয়ও পুনরায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দখলে আসে। কিন্তু প্রোমে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহী ও সাদা আণ্ডাদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমগ্র ভাবে ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থার কোনও উন্নতি লক্ষিত হয় না। ঘটনাচক্র ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অনুকূল হইয়া উঠে ইনসিনের কারেণরা আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায়। কিন্তু কারেণ-সভাপতি স বা উ গয়ি আত্মসমর্পণ-পর্ব্ব সম্পন্ন করিবার জন্য সরকারী সৈন্যবাহিনীর সদর কার্য্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, বল পূর্ব্বক আত্মসমর্পণের প্রশ্ন লইয়া কারেণ-নেতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী বাহিনী না কি কারেণদের উপর পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে কারেণ বিদ্রোহীরা থারাবতি ও লেটপাডান সহর দখল করিয়া ফেলিয়াছে।

আজিকার কংগ্রেস ও সেকালের মডারেট

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর হইতে যতই দিন যাইতেছে, ততই এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে, যে প্রতিশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ কংগ্রেসকে ক্ষমতার আসনে বসাইয়াছে, কংগ্রেসী রাষ্ট্রনায়করা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে নারাজ অথবা অক্ষম। ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তাঁহার "আত্মজীবনী"তে সেকালের লিবারেলদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"স্বরাজ বলিতে তাঁহারা বোঝেন, সব কিছুই আগেকার মত চলিতে থাকিবে, শুধু ছোট একটু পালিশ...একটু পরিবর্তন তাঁহারা কামনা করেন, যাহাকে ব্যক্তিগত পরিবর্তন নামে অভিহিত করা চলে। তাঁহাদের মতে কাজ-কর্ম, সরকারী অফিস, আইন সভা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, জমিদার, দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এবং সর্বোপরি আই-সি-এস গোষ্ঠী বজায় থাকিবে। কিন্তু কংগ্রেস কেবল শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় না, চায় নূতন একটি রাষ্ট্র।"

আজ পণ্ডিত নেহরু ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভা ভারতের যে অবস্থা করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপ্রার্থী মডারেট নেতাদের কল্পিত ভারতের পার্থক্য কোথায়? পুরাতন সেই সবই তো রহিয়া গিয়াছে। পরিবর্তন যাহা হইয়াছে, তাহা সেই "ব্যক্তিগত পরিবর্তন।" মডারেট নেতাদের কপাল না খুলিয়া খুলিয়াছে কংগ্রেসী নেতাদের। এই একমাত্র পার্থক্য! মহারথী, রথী, অর্ধরথী সবাই স্ব স্ব যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু জনসাধারণ, যে তিমিরে সেই তিমিরে! ইংরেজ বড়-সাহেবদের স্থান কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু দেশের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তাহার নাই, আই-সি-এসদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না, বিদেশী পুঁজিপতিদের তোষামোদ না করিলে চলে না। জমিদার এবং শিল্পপতিরাই আজ তাহার আশা-ভরসা স্থল।

এই তথাকথিত স্বরাজে দেশের লোক তুষ্ট হইতে পারে নাই। ফলে প্রায়ই কংগ্রেসী কাজ-কর্মের তীব্র সমালোচনা হইতেছে, মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে। নেহরু-প্যাটেল-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিতেছেন,—"এ সব কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না।" কিন্তু কঠোরতা দ্বারা কি স্বতঃস্ফূর্ত এই অসন্তোষ দমন করা যায়? রাষ্ট্রনায়করা বলেন,—"নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া অবধি অপেক্ষা কর; তখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।" কিন্তু এই নূতন শাসনতন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে নূতনত্ব কিছুই নাই। স্বয়ং প্রণেতা ডাঃ আম্বেদকর স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটিশ আমলের কুখ্যাত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ইহা সাড়ে পনের আনা অনুকরণ মাত্র। জনসাধারণ আর শান্ত থাকে কি করিয়া?

পণ্ডিত নেহরুই এক দিন বলিয়াছিলেন,—"একটা সঙ্কট মুহূর্তে সমাজের মূল ভিত্তিটাই যেখানে বদলাইতে হইবে, সেখানে সংস্কারের মারফৎ কোন বড় সমস্যারই সমাধান হয় না। ভবিষ্যতে যত ধীরেই অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, প্রথমে বর্তমান ঘুণ-ধরা সমাজ-ব্যবস্থার সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিতে হইবে।" ঠিক এই কাজটাই আজ তাঁহার গবর্ণমেন্ট করিতে নারাজ। এই জন্যই তাঁহারা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের হাতে জমি দেন নাই, কল-কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন নাই। বৃটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করেন নাই, পুরাতন বৃটিশ আমলের শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোও ধূলিসাৎ করিয়া দেন নাই। তাহা হইলে সেকালের মডারেট আর আজিকার কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রভাষা

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তবিংশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"সমস্ত ভারতবাসীর ভাষা এক নয়। কয়েকটি বৃহৎ ভাষা-গোষ্ঠীতে ভারতবর্ষ বিভক্ত এবং অতিরিক্ত ছোট ছোট সব ভাষাগোষ্ঠীও আছে।" এই অবস্থায় কোন একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া সকলের শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা করিলে ইংরেজী আমলের বিড়ম্বনারই পুনরাবৃত্তি করা হইবে। ভারতবর্ষকে একটি ভাষার শৃঙ্খলে বাঁধিতে না পারিলে একটি জাতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না এবং তাহা না হইলে জাতীয় ঐক্য না কি একেবারে ছারখারে যাইবে! এই ধরণের দুশ্চিন্তার নায়করা প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ। অর্থাৎ গোড়ায় গলদ। ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ নহে, বহু জাতির দেশ। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক করিতে হইবে এ কথা সত্য, কিন্তু অশোক, আকবর অথবা ইংরেজের একরাষ্ট্র ভারতবর্ষ নহে। দেশের শাসন আজ যাঁহাদের হাতে আসিয়াছে, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বহু জাতির অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে নারাজ, ফলে একতার নামে বিভিন্ন প্রদেশের উপর কেন্দ্রের আধিপত্য যে ভাবে চালান হইতেছে, তাহাকে "হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যবাদ" বলিলে ভুল হইবে না। এই ভুল সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আজ যদি সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই স্বীয় লিপির সহিত দেবনাগরী লিপিও গ্রহণ করে অর্থাৎ যদি দেবনাগরী লিপিতেও প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মুদ্রণ হয়, তবে তাহাতে প্রদেশগুলির পক্ষে পরস্পরের সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করার পথ শুধু সুগম হইবে, তাহা নয়, বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলি একটা স্বাভাবিক সমন্বয় এবং সর্বভারতীয় ঐক্যের পথে চলিবে।" ভারতীয় ঐক্যের জন্য এই প্রস্তাব বিস্ময়কর নহে কি? কেবল

একই হরফে মুদ্রিত হইলে বাঙ্গালীরা তামিল ভাষা এবং মারাঠীরা উড়িয়া ভাষা বুঝিবে, এ কথা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণই তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আসল কথা, যাঁহারা ভারতীয় ঐক্যের নামে নিত্য-নূতন অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন, তাঁহারা একতা ও এক ছাঁচে ঢালাই করা ইউনিটি ও ইউনিফর্মিটিকে সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকেন। সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকবে মিল, মিলের মধ্যে থাকবে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে দিয়েই আসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের যথার্থ ঐক্য।" এই সহজ সত্যটা না বুঝিবার জন্যই ভারতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক আকাশে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতেছে।

রাষ্ট্রভাষা যে কি বস্তু, তাহা আমরা জানি না। এই সম্পর্কে আমাদের নেতৃবৃন্দ যতই বিবৃতি দিতেছেন, ব্যাপারটা ততই ঘোলাটে হইয়া পড়িতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রভাষাকে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী যে নামেই অভিহিত করা যাক না কেন, উহা জনসাধারণের ভাষা হইবে, অল্পসংখ্যক পণ্ডিতমণ্ডলীর ভাষা হইবে না। অধিকন্তু এই রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরীতে লেখা হইবে। মাদ্রাজের লোকেরা হিন্দীতে কথা বলে না। সুতরাং যেমন শিক্ষিত কয়েক জন ইংরেজীতে কথা বলিত, না হয় তাহারা হিন্দীতে কথা বলিবে। কিন্তু জনসাধারণ মাতৃভাষা ছাড়িবে কেন? পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,—"নিখিল ভারতীয় ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত হইবে। জোর করিয়া একটা ভাষা জনগণের উপর চাপাইয়া দিয়া কৃত্রিম উপায়ে একটা নিখিল ভারতীয় ভাষা সৃষ্টি করা হইবে না।" কিন্তু বাস্তবে তাহাই করিবার চেষ্টা চলিতেছে না কি? তিনি এ[illegible] বলিয়াছেন,—"এক ভাষা-গোষ্ঠীর যথেষ্ট সংখ্যক বালক-বালিকা যেখানেই থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে।" বিহারে ও আসামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠ রোধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের হিন্দী-ভাষাভাষী নিখিল ভারতীয় নেতারা তো তাহার প্রতিবাদ করেন না। উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে শিক্ষা-সচিব পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র বলিয়াছেন,—"এই প্রদেশের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উড়িয়া ভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র বাহন বলিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।" বৃটিশ আমলের ইংরেজী ভাষা কি ঠিক এই দোষ করে নাই? তখনকার বিরক্তি আজ অনুরূপ অত্যাচারের সময় কোথায় গেল? বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে হিন্দী বা উড়িয়া ভাষার সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণের সহিত ইংরেজীর মারফৎ শিক্ষা গ্রহণের পার্থক্য কোথায়?

মানভূমে কেন হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইবে, তাহা বুঝাইতে গিয়া বিহারের শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ শর্ম্মা বলিয়াছেন,—"গত ৬০।৭০ বৎসর ঐ জেলায় বাঙ্গালা ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিন জন বৃটিশ ডেপুটী কমিশনারের বিবৃতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, নানা কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা বাহির হইতে ঐ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষা ছিল বাঙ্গালা এবং তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে আসিয়া মানভূমে বসবাস করেন।" কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার "লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"মানভূম বাঙ্গালা-ভাষাভাষী জেলা; এবং সিংভূমের ধলভূম অঞ্চলেও ঐ ভাষাই প্রচলিত।" স্বার্থান্ধ হইয়া বিহারী কংগ্রেসী নেতারা কি সত্যকে একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন?

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"প্রাদেশিক ভাষাগুলির যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।" পরক্ষণেই আবার বলিয়াছেন,—"ছেলেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।" কিন্তু শুধু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেই কি প্রাদেশিক ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইবে? প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি ধ্বংস না করিয়া জনসাধারণের বোধগম্য কোন একটি ভাষা কস্মিন্ কালেও সারা ভারতের জাতীয় ভাষায় পরিণত হইতে পারে না।

বাঙ্গালা ও বিহার

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা কালে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন,—"ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমাদিগকে ভারত-বিভাগে সম্মত হইতে হইয়াছিল, কারণ উদ্ধার পাইবার অন্য কোন পন্থাই ছিল না।" এই বিভাগের ফলে সব চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী এবং ইহার জন্য সম্পূর্ণ না হইলেও অধিকাংশ পরিমাণে দায়ী কংগ্রেস। সর্দ্দারজী বাঙ্গালীকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশ বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে কেহ বিভক্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং কৃষ্টি ও ভাষার দিক হইতে বাঙ্গালা দেশ অবিভক্তই থাকিবে।" পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা আরবী লিপিতে লিখিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে, এবং পশ্চিম-বঙ্গের উপর রাষ্ট্রীয় ভাষা চাপাইবার কথাও নেতৃবৃন্দের মনে বিশেষ ভাবে উদয় হইতেছে। তাহা হইলে বাঙ্গালার ভাষা এবং কৃষ্টি কি করিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে টিঁকিয়া থাকিবে?

ভারতে বাঙ্গালীর ভাগে জুটিয়াছে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, অখণ্ড বঙ্গের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্র করিয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হয়। বিহারের মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ইত্যাদি বাঙ্গালার ভাগেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ কোন দাবী উত্থাপন করিলে গেলেই বিহারের পরম জাতীয়তাবাদী নেতারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন নূতন করিয়া বিবেচনার জন্য জয়পুর কংগ্রেসে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালার কয়েক জন নেতা সম্প্রতি সেই কমিটিকে বিহার-বাঙ্গালা সীমানা সম্পর্কে বাঙ্গালীদের বক্তব্যটা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র ডাঃ সচ্চিদানন্দ ঐ কমিটির সদস্য ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তারযোগে জানাইলেন,—"জয়পুর কংগ্রেস যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্যই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা উহাকে দেওয়া হয় নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কমিটির সুপারিশগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালার জনসেবকদের প্রস্তাব মাফিক কোন একতরফা আলোচনায় বাঙ্গালা-বিহার সীমানা সমস্যার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক প্রশ্নের বিচার করা উচিত হইবে না।"

এই দাবীর অজুহাত নূতন নহে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও ঠিক এই অজুহাতেই এত দিন বাঙ্গালার দাবীকে কোণঠাসা করিয়া আসিয়াছেন। অথচ বাঙ্গালার দাবী বিবেচনার জন্ম স্বতন্ত্র কোন কমিটি নিয়োগেও ভারতীয় নেতারা রাজী হন নাই। বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করিবার প্রস্তাব শুনিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, শ্রীমুরলী মনোহরপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেস নায়কেরা বাঙ্গালার অঞ্চলবিশেষ গ্রাস করিবার পাল্টা দাবী তুলিতেও লজ্জিত হন নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং বিহারের বাঙ্গালীদের হিন্দী শিখাইয়া সমস্যার গোড়া কাটিয়া দিবার প্রস্তাবও নির্ব্বিকার ভাবে করিয়াছিলেন। যিনি আজ বাঙ্গালাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ম এই সকল কুযুক্তির আমদানী করিতেছেন, সেই ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহই ১৯১২ সালে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন,—"সমগ্র মানভূম এবং সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা বাঙ্গালা-ভাষাভাষী; সুতরাং বাঙ্গালার সহিত তাহাদের যুক্ত করাই উচিত। বিভাগটির বাকি অংশ (অর্থাৎ ছোটনাগপুর) থাকিবে বিহারের সহিত। সাঁওতাল পরগণায় যে সব অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙ্গালা-ভাষী, সেগুলি বাঙ্গালার সহিত, আর যে সব অঞ্চল হিন্দী-ভাষী, সেগুলি বিহারের সহিত থাকিবে। এই ব্যবস্থা যদি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তবে বাঙ্গালা এবং বিহার উভয়েই তাহা সমর্থন করিবে, সন্দেহ নাই।' আজ কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার দাবী উঠিতেই ডাঃ সচ্চিদানন্দ তাহার মধ্যে বিতর্কের গন্ধ আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে কমিশন বসান হইয়াছিল, তাহার সদস্যেরা গভীর গবেষণার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্ম এ প্রশ্নটা ধামা-চাপা দিয়া রাখাই ভাল।

কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া মনে করেন যে, ভাষা-ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে বিলম্ব করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তিনি অন্ধ্রের অধিবাসী; এবং অবিলম্বে যাহাতে একটি স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হয়, সেদিকে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সীমা রদ-বদল করিবার জন্ম কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। যত বিতর্ক কেবল বাঙ্গালার দাবীতেই। কেন্দ্র ও বিহারের নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালাকে যে কি চোখে দেখেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ তখনকার সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে জানাইয়াছিলেন যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের সময় "বাঙ্গালাকে দুর্ব্বল করিবার ইচ্ছাই ছিল প্রধান কারণ।" আমাদের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট কি উত্তরাধিকারসূত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সদিচ্ছাটি পাইয়াছেন ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্ম বিহার সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও কোনরূপ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেসী নেতারাও এই সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহারা এই দাবী সমর্থন করাইবার জন্ম কোনরূপ সম্মিলিত চেষ্টা করেন নাই। নববঙ্গ সমিতির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ করা হয়, তিনি যেন ইহাদের কয়েক জন প্রতিনিধির সহিত পশ্চিমবঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন যে, নূতন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণের পক্ষে যতই যুক্তি থাকুক না কেন, আপাততঃ উহা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের তালিকা-ভুক্ত নয়; কংগ্রেস কর্ত্তারা অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি নূতন ভাষা-ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা এখন আলোচনা করিবেন; আপাততঃ বাঙ্গালার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই।

কলিকাতায় এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন, "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অপরিহার্য্য। ভারতবর্ষ চিরকাল বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সাধনা করিয়াছে। কিন্তু আজ যদি ঐক্যের নামে জবরদস্তি চালাইবার চেষ্টা হয়, তবে তাহার ফল খুবই ক্ষতিকর হইবে।" ডাঃ ঘোষের মত শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যক্তি যখন এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শুধু আপত্তি জানাইলেই দায়িত্ব ফুরাইয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারী নেতারা দক্ষিণ-ভারতের সমস্যা বিবেচনা করিবার সময় পাইতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালার সমস্যা সম্পর্কে কর্ণপাত করিবার অবসর পাইতেছেন না। এই মনোভাব যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, সে সম্পর্কে চেষ্টা করিবার দায়িত্ব বাঙ্গালার কংগ্রেস কমিটির যেমন, তেমনই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে ডাঃ ঘোষেরও কম নয়। সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথম অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্পর্কেই চিন্তা করা হইবে। অন্য সব এখন ধামা-চাপা দেওয়া যাক। ডাঃ পট্টভী এখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষ উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বাঙ্গালীদের যে দুরবস্থা হইতেছে, সে দিকে তাঁহাদের দৃক্পাত নাই। সমস্যা এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, মানভূম কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বিহার সরকারের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। বিহারের বাঙ্গালীরা আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

ভারত ও কমনওয়েলথ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ডোমিনিয়ন হিসাবে থাকিলে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা কিছুতেই উপভোগ করিতে পারিবে না। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছিলেন —"ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করিবে না, ভারতবর্ষকে একঘরে করিয়া রাখিবে।" এখন সেই পণ্ডিতজীই জানাইয়াছেন, কমনওয়েলথের দেশগুলি ভারতবর্ষকে

কমনওয়েলথের সহিত বর্ত্তমান সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুরোধ জানাইয়াছে এবং এই অনুরোধ রক্ষা করিবার বিষয়ও ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। দুইটি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? 'সহযোগিতা' কথাটি অস্পষ্ট এবং জনসাধারণকে ব্যাপারটা বুঝিতে না দিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা ইচ্ছা করিয়াই এই কথাটি ব্যবহার করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের পক্ষে ভারতবর্ষকে লেজুড় হিসাবে রাখিতে চাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ভারতবাসীর প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার পর সহযোগিতার কথা উঠিতেই পারে না। সেকালের মডারেটদের সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতজী এক সময় লিখিয়াছিলেন,—"বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থায়িভাবে চলিতে থাকিবে, মডারেটেরা সেই শাসনের ভিত্তিতেই দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবেন।" আজ স্বয়ং পণ্ডিতজী ও অন্যান্য কংগ্রেস রাষ্ট্রনায়কেরা কি তাহাই করিতেছেন না?

কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে থাকিলেই ভারত সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের খপ্পরে পড়িবে, নিরপেক্ষ থাকার নীতি ধূলিসাৎ হইবে এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমস্ত চেষ্টাই বানচাল হইবে। ভারতবর্ষকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার চেষ্টার ফল দেশবাসীর পক্ষে কখনই মঙ্গলকর হইবে না। ইহার ফলে বিদেশী বণিকদের অর্থনৈতিক আধিপত্যের হাত হইতে ভারতের মুক্তিলাভ অসম্ভব হইবে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির প্রয়াস ব্যাহত এবং ব্যর্থ হইবে, ভারতবর্ষ ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে জড়াইয়া পড়িবে এবং এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে পরাধীন জাতিগুলির ঘৃণার পাত্রে পরিণত হইবে। এই জন্যই কি দেশবাসী এত দিন কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়াছিল? এই পণ্ডিতজীই এক সময় লিখিয়াছিলেন,—"ভারতীয় স্বাধীনতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী বস্তু; শাসন অথবা তোষণ কোন কিছুতেই মিলন সম্ভব হইবে না"। আজ তিনি ভারতবর্ষকে বৃটিশ খপ্পরে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার অর্থ, হয় আমরা স্বাধীনতা লাভ করি নাই অথবা আপোষ করিবার ফলে তথাকথিত যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার পিছনে জনসাধারণের অজ্ঞাত এমন কতকগুলি সর্ত আছে, যাহাতে স্বাধীনতা ভুয়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২রা এপ্রিল বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, ভারতের কমনওয়েলথে যোগদান করা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই এ-পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত ইহা একটি প্রস্তাব মাত্র। কমনওয়েলথের কাঠামো যদি এমন ভাবে গঠিত হয় যে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের পক্ষে যোগদান সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারত কমনওয়েলথের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এমনও ঘটিতে পারে যে, ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব হইবে না। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির সহিত কমনওয়েলথের যোগদানের প্রশ্ন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ৮ই মার্চ তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারত কোন রাষ্ট্রশক্তির দলে ভিড়িবে না। কমনওয়েলথে যোগদান করিলে ভারতের পক্ষে এইরূপ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব হইবে না।

ভারত সরকারের সব চেয়ে বড় বিপদ কম্যুনিজম। বোধ হয় সেই ভয়েতেই কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার প্রশ্ন রাষ্ট্রনায়কদের মনে জাগিয়াছে। কম্যুনিজমকে অবশ্যই রুখিতে হইবে; কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যে কম্যুনিজম রুখিবার নাম করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, এই প্রশ্নও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কম্যুনিজম নিরোধের যে পন্থা গ্রহণ করিতে উদ্যত, তাহা নেতিবোধক পন্থা। এই সম্পর্কে বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা লিখিয়াছেন,—"বৃটিশ বাহিনী দ্বারা শুধু দমননীতি

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক চিত্র (পার্শ্বে উপবিষ্ট রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

চালাইয়া কম্যুনিজম দূর করা যায় না।" ভারতের পক্ষে এই পথে চলা মোটেই উচিত হইবে না। ভারতের সম্মুখে আজ সমস্যা দেখা দিয়াছে তিনটি: লৌকিক রাষ্ট্রগঠন, দরিদ্রতার উচ্ছেদ সাধন এবং কম্যুনিজম নিরোধ। প্রথম দুইটিতে তাঁহারা যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করিবেন, কম্যুনিজম নিরোধের শক্তি সেই পরিমাণেই বর্দ্ধিত হইবে। বিদেশী মূলধন, বিদেশী সমর-সম্ভার এবং বিদেশী শক্তিবর্গের লেজুড় হইয়া থাকা অপেক্ষা লৌকিক রাষ্ট্র এবং দরিদ্রতার উচ্ছেদ কেবল কম্যুনিজম নিরোধেরই শ্রেষ্ঠ উপায় নহে, মহাত্মাজীর রামরাজ্যের আদর্শও এই পথেই সফল হইবে।

৩রা এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস পরিষদ সদস্য এবং কংগ্রেস কর্মীদের সভায় পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,—"স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও ভারত কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে এবং ইহা দ্বারা আমরা বিশ্বশান্তি রক্ষায় সাহায্য করিতে পারিব।" বিহার ও লক্ষ্ণৌ, স্থান ভিন্ন বলিয়া কি কথাও বদলাইয়া গেল! ২রা এপ্রিল কমনওয়েলথের গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল না, কিন্তু ৩রা কি তাহা জানিতে পারা গিয়াছে? যত দূর আমরা জানি, সকল ব্যাপারই এখনও অজ্ঞাত আছে, তাহা হইলে হঠাৎ ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথে যোগদান কল্যাণকর হইয়া উঠিল কিরূপে? এই দুইটি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া বেশ কঠিন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিষদের এবং দেশবাসীর উপর তাঁহার প্রভাব অতুলনীয়। শেষের উক্তির দ্বারা কি তিনি ভারতের কমনওয়েলথে যোগদান সম্পর্কে মত সৃষ্টি করিতেছেন?

ভারতে অর্থ নৈতিক নীতি

ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ডাঃ জন মাথাই অর্থ-দপ্তরের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত সরকারের আর্থিক নীতি ও অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি আশা দিয়াছেন যে, এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। উৎপাদনের হিসাব দেখিলে কি খাদ্যশস্য, কি শিল্পজাত দ্রব্য কোনটারই ঘাটতি খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ঘাটতির অনুপাতে মূল্য অনেক বেশী। কাজেই ঘাটতি অপেক্ষা মূল্যের হ্রাসই প্রধান সমস্যা। সরকারী হিসাব-পত্রে পাইকারী দর ১০·১১ মাত্রা কমিলেও খুচরা দর কমে নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই সরকারী মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক নীতির সাফল্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সন্দিহান। দাম কমাইয়া দেওয়াই মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায় না হইতে পারে; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের অবশ্যম্ভাবী ফল মূল্য হ্রাস। অর্থ সচিব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কিছু কালের জন্যও যদি একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস করিয়া আনা সহজ। যুক্তির দিক দিয়া ইহা ভাল, কিন্তু কার্য্যকরী কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ইহার সহিত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি আনিয়া যোগ করায় ব্যাপারটা অত্যন্ত ধোঁয়াটে হইয়া গিয়াছে। "সমগ্র পৃথিবীর পণ্য-মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে হঠাৎ মূল্য হ্রাস করিলে সমস্তা ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইবে"—এ কথায় প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থ-সচিব বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। চিনির দর ভারতে ২৮৷৹, ভারতের বাহিরে ১৭৲ টাকা! ভারতীয় অপেক্ষা জাপানী কাপড় সস্তা। সুতরাং তাঁহার এই উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? অধিকন্তু ১লা এপ্রিল হইতে কাপড়ের দর বৃদ্ধিই করা হইয়াছে।

মূলধন নিয়োগ করিবেন ও উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে এই আশায় সরকার শিল্পপতিদের ৬ কোটি টাকার ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কিন্তু সত্যই যে তাঁহারা মূলধন নিয়োগ করিবেন সে সম্বন্ধে সরকারও সন্দিহান। এই জন্যই ভারতে বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণের কথা তাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছে। মার্শাল-পরিকল্পনায় ডলার যে সকল দেশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বাজেট পরীক্ষা করিতে আমেরিকার অধিকারের কথা যখন উঠিয়াছে তখন বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু গত ৬ই এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে দেশের উন্নতির জন্য বিদেশী মূলধনের সাহায্য গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

শর্করা-শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা

ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীকে, সি, নিয়োগী শর্করা-শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার কাল বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, শর্করা-শিল্প ১৯৩২ সাল হইতে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে এই সুবিধা আরও দুই বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন গত ১৭ বৎসর ধরিয়া এই সুবিধা দিবার জন্য দেশবাসী বেশী দামে চিনি কিনিয়া যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার প্রতিদানে চিনি-শিল্পের মালিকরা দেশবাসীকে কি সুবিধা দিয়াছেন? গত আট বৎসর ধরিয়া নানা কারণে ভারতে বিদেশী চিনি আমদানী করা সম্ভব না হওয়ায় শিল্পপতিরা একচেটিয়া কারবার চালাইয়াছেন। ভবিষ্যতেও [illegible] অনেক দিন পর্যন্ত ডলারের অভাব এবং জাহাজে স্থানাভাবের জন্য বিদেশী চিনি ভারতে আমদানী হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পাকে-প্রকারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চলিতেছেই এবং চলিবেও। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পরই চিনির দর ২০৶৹ আনা হইতে একেবারে ৩৫৷৶৹ আনা করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে দাম কমাইয়া ২৮৷৹ করা হইলেও প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় দাম প্রায় তিন গুণ। খুচরা দাম তো ৪·৫ গুণ। এই অবস্থায় চিনি-শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা পাইবার অধিকারী হইল কি কারণে, জনসাধারণের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

চিনি-শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত আছে, এই ১৭ বৎসরে মুনাফারূপে তাহার ছয় গুণ অর্থ উঠিয়া আসিয়াছে। চিনি-শিল্পের এই উজ্জ্বল অবস্থা সত্ত্বেও জনসাধারণের কথা না ভাবিয়া বাণিজ্য-সচিবের শিল্পপতিদের প্রতি এত দরদ উথলাইয়া পড়িল কেন? একটি কারণ অবশ্য সহজেই বুঝা যায়। ব্রেজিল, জাভা এবং কিউবার চিনির মূল্য ভারতীয় চিনির মূল্যের অর্দ্ধেক। সুতরাং বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতা যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে ভারতের

চিনি-শিল্প টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ভারতীয় চিনির মূল্য বেশী কেন, প্রথমে তাহা বিবেচনা করা উচিত নয় কি? কোন দেশের কোন শিল্প ভারতের চিনি-শিল্পের মত এত দীর্ঘ কাল সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এত করিয়াও যদি চিনি-শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরিচালন-ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের শর্করা-শিল্প রক্ষা করিবার উপায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা নয়, ইহাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই একমাত্র উপায়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শিল্প উন্নয়নের জন্য মূলধন নিয়োগ-খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করিয়া শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন,—"শিল্পের দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা [illegible] শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের লোক [illegible] হয় নাই।" তাঁহার এই উক্তি [illegible] প্রাদেশিকতার গন্ধ পায়, সেই আশঙ্কায় [illegible] প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে [illegible] শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, প্রদেশের [illegible] গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শিল্প [illegible] সকল প্রয়াস কোন কাজেই আসিবে না।" পশ্চিমবঙ্গবাসী [illegible] এই সুযোগ গ্রহণ করিবে, শ্রমিকদের দিক হইতে তাহা [illegible] করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এখনও বেশীর ভাগ শ্রমিক [illegible] বাহির হইতে আসিয়া থাকে। কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, আলস্য এবং শ্রম সম্বন্ধে মর্য্যাদা [illegible] ধারণার জন্যই এই প্রদেশের জনসাধারণ পিছাইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই দুইটি ছাড়া আরও কারণ আছে। শিল্প-মালিক বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীকে সুযোগ দিতে তাঁহারা বিশেষ ইচ্ছুক নন।

শ্রীযুক্ত সরকার আরও বলিয়াছেন,—"ভারতের পাট-শিল্পের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। [illegible]-শিল্পে শতকরা ৫০ ভাগ, মৃৎশিল্পে শতকরা ৬০ ভাগ, বেল্টিং শিল্পে শতকরা ১০০ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে শতকরা ৩০ ভাগ, হোসিয়ারী-শিল্পে শতকরা ৮০ ভাগ, এনামেল-শিল্পে শতকরা ৫০ ভাগ এবং চা-শিল্পে শতকরা ২৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়।" ইহা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমৃদ্ধিরই পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বোধ হয় একমাত্র বস্ত্র-শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-ব্যবসায়ে বাঙ্গালী [illegible]নের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন,—"ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত পুরাতন শিল্পগুলিকে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে [illegible] হইতে পারে, সেইগুলিকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য [illegible] করাই এই গবর্ণমেণ্টের নীতি।" আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালার পুঁজিপতিগণ অনায়াসেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই শিল্পনীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-ব্যবস্থায় বাঙ্গালী মূলধনকে স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সরকার কুটীর-শিল্প এবং ছোটো-খাটো শিল্প-প্রচেষ্টার উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যই গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল ছোটো-খাটো শিল্প-প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সরকারের এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে যে ইচ্ছুক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপদ আছে ঢের। অবাঙ্গালী পুঁজিপতিরা সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালার মূলধন নিয়োজিত শিল্পকে খর্ব্ব ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। টাকার জোরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁহারা সাফল্য লাভ [illegible]রেন। যেখানে একান্ত না পারেন, সেইখানেই প্রাদেশিকতার [illegible] তুলিয়া কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি [illegible]রেন। দ্বিতীয়তঃ, আমলাতান্ত্রিক ব্যূহ ভেদ করিয়া জনসাধা[illegible]র সহিত সরকারের যোগসূত্র স্থাপন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া এই সরকারী শিল্পনীতি যদি সজী[illegible] হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলেই জনসাধারণের এই স[illegible]গিতার আগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং আইনে সংশোধিত ধারা

এই বৎসর ভারতীয় আইন সভা[illegible]ীত ব্যাঙ্কিং আইনের কয়েকটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর থাকিলে অপর একটি ব্যাঙ্কের [illegible]র থাকিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত, ক[illegible]নিযুক্ত অথবা অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর থাকিলে সেই ব্যাঙ্কের পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই ধারাগু[illegible]ন সভায় গৃহীত হইবার পর কিছু দিন যাইতে না যাইতেই [illegible] সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের [illegible] অনুসারে ঐ ধারাগুলির প্রয়োগ আগামী ছয় মাসের জন্য [illegible]রা স্থগিত রাখিয়াছেন। এই নূতন নির্দ্দেশের কারণ অনু[illegible]রা কঠিন নহে। বর্ত্তমানে এ দেশের শিল্পপতিদের পরিচা[illegible]ব্যাঙ্কগুলি এবং কল-কারখানাগুলি সাধারণ পরিচালক-মণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই অবস্থায় অবি[illegible]ইনটি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে শিল্পপতিরা অসুবিধ[illegible]তে পারেন বলিয়াই সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের এই নির্দ্দেশ। তবে [illegible] মনে হয়, যে আশঙ্কায় আইনের প্রয়োগ ছয় মা[illegible] স্থগিত রাখা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অমূলক। কৌশলে শিল্পপতিরা মন্ত্রিত্বের আসন অলঙ্কৃত করিবার সঙ্গে কোম্পানীর ডিরেক্টর-তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম লোপ এবং মন্ত্রিত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাম আবার যথাস্থানে শোভা পাইতে থাকে ঠিক সেই কৌশল এ ক্ষেত্রেও অবলম্বিত হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

১ই চৈত্র কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন-কর্তা শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় সাংবাদিক সম্মেলনে কর্পোরেশনের ১৯৪/-৫০ সালের আয়-ব্যয়ের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসর ৫ কোটি ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আয় এবং ৫ কোটি ১১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। অর্থা/ ঘাটতি হইবে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। যে ১৪ লক্ষ ২/ হাজার টাকার তহবিল লইয়া বৎসর আরম্ভ হইবে, ঐ টাকা হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, চলতি বৎসর (১৯৪৮-৪৯) মোট আয় ৪ কোটি ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা হইবে। সুতরাং রাজস্ব খাতে ঘাটতি হইবে ৫৮,/লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। কলিকাতার জনসংখ্যা এবং জিনিষ-পত্রে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিই যে ইহার কারণ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু কর্পোরেশনের আয় বাড়ে নাই বলিয়া আয়-ব্যয়ের মা/ ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এ কথাও সত্য। আয় / জন্ম চেষ্টা করা হয় নাই, ট্যাক্স বাকী পড়িয়া আছে, কর্পোরেশনের ক্ষতি করিয়া ট্যাক্স নির্দ্ধারণের জন্য সম্পত্তির মূল্য বহু/ই কম করিয়া ধরা হইয়াছে, মিতব্যয়িতার জন্য কোন চেষ্টা কর/র থাক, অযোগ্য কনট্রাকটারদের কাজ দিয়া কর্পোরেশনের অর্থে যথেষ্ট অপচয় করা হইয়াছে,—এই সকল কারণ মিলিত হইয়া যে কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীযুক্ত রা/তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে কনসলিডে/ কর হইতে ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা আদায় কম হইয়া/কিন্তু তবুও পূর্ব্বেকার দুই বৎসরের চেয়ে বেশী। মাগ্‌গী ভা/ত্তির দরুণ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকা যেমন/ পাওয়া গিয়াছে, তেমনি এই বৎসর গবর্ণমেন্টের ঋণের /ক্ষ টাকা পরিশোধও করা হইয়াছে। ভূমি এবং গৃহাদির / হইতে ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা বেশী আয় হইবে বলিয়া/ান করা হইয়াছে। সমগ্র বৎসর বর্দ্ধিত হারে ভাতা দিতে/ বলিয়া তদ্‌বাবদ সরকারী সাহায্য ২'১৮ লক্ষ টাকা বেশী পা/ইবে। আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ঋণ বা/ সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না।

আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্ম যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কর্পোরেশনের এলাকা মধ্যে যে সকল গৃহাদি সম্পত্তি আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশানুসারে সেগুলির নূতন করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে কর্পোরেশনের প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি দ্রব্যের উপর নগর-শুল্ক ধার্য্য করার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলি : গার্হস্থ্য জ্বালানী কয়লা বাদে অন্যান্য কয়লা, কাঁচা পাট, চা, মদ, সুরাসার, বিয়ার, সিগার, সিগারেট, পাইপের তামাক, টিনে রক্ষিত খাবার, বিদেশী সিল্ক, গালা, রেলের স্লিপার এবং জ্বালানী কাঠ বাদে অন্যান্য কাঠ। খরচা বাদে এই কর হইতে আয় হইবে ২৪ লক্ষ টাকা।

শ্রীযুক্ত রায় আশা করেন যে, ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে উদ্বৃত্ত হইবে। নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারগণ অর্থাভাবের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারদের হাতে অর্পণ করিবেন। কিন্তু অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থার জন্ম কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা আবার যাহাতে খারাপ না হয়, তাহার জন্ম যোগ্য ব্যক্তিদিগকে কাউন্সিলার নির্ব্বাচন করার দায়িত্ব করদাতাদের।

বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি

১লা এপ্রিল হইতে মোটা কাপড়ের মূল্য শতকরা ৫৲ টাকা, মাঝারি কাপড়ের মূল্য শতকরা ৩।০ টাকা, মিহি কাপড়ের মূল্য শতকরা ৩।০ হইতে ৫৲ টাকা এবং অতি মিহি কাপড়ের মূল্য শতকরা ৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইল। উৎপাদকদিগকে বেশী দাম দিয়া সূতা আমদানী করিতে হয়, কাজেই কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আবার তুলার দাম বেশী বলিয়া সূতার দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিল্পপতিদের লাভ কম হইলে চলিবে না ; কারণ, লাভ কম হইলে তাঁহারা কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবেন না। অতএব, জনসাধারণের স্কন্ধেই বোঝাটা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিরীহ জনসাধারণের কোন কিছু করিবার উপায় নাই। নগ্ন থাকাও সম্ভব নহে। সুতরাং শেষ অবধি না খাইয়া, ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়াও কাপড় কিনিতে হইবে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত